756.3
.002/3

756.3
.002/3

[বর্ণানুক্রমিক বিষয়সূচী]

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
ধরি-শিশু (কবিতা)	শ্রীমণীন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ	৪৮৩
দীর্ঘরোগের জল-চিকিৎসা	শ্রীসুলরঞ্জন মুখোপাধ্যায়	৭৮৬
দ্বিপুর		
বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালী	নারীশিক্ষামন্দির	৬০
নারীর শিক্ষা ও তাহার প্রয়োজন	শ্রীপুষ্পরাণী ঘোষ	৬৪
গৃহশিক্ষা	শ্রীইন্দিরা দেবী	৬৬
মনের ডাক	অনুর্ব্বাপল্লা	৩৮৫
অন্তঃপুর	শ্রী.....	৪৬৬,৬৩২
অসবর্ণ (আলোচনা)		
অধিকার এবং দেশের অবস্থা	শ্রীরাধাকমল চৌধুরী	
অসবর্ণ বিবাহ	শ্রীনরেন্দ্রদেব চৌধুরী	
অর্থের বিপর্য্যয় (উপন্যাস)	শ্রীমেঘেন্দ্রলাল রায়	৫৩৮,৬০৮,৭২৮
আমরা বাঙ্গালী (নাটিকা)	শ্রীললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়	২০১
আরোপ হইতে বিবাহ (সচিত্র)	শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন	
আলপাইনের প্যাগোডার কাহিনী (সচিত্র)	শ্রীললিতমোহন রায়তা	৪৮৪
আষ্টি মিথ্যা কথা (গল্প)	জলসুল করিম	১৩২
ইচ্ছার সমতা (কবিতা)	শ্রীইন্দিরারাণী মুখোপাধ্যায়	৫৮৮
উদাসী (গল্প)	শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য্য	৫১৭
উদি বিহারীলাল	শ্রীজনক বন্দ্যোপাধ্যায়	৫১৩, ৫৭৯
উষা ও আবির (কবিতা)	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু	১৭২-ক
একাকীত্বে কয়েক দিন (সচিত্র ভ্রমণ)	শ্রীপুলিনবিহারী চক্রবর্ত্তী	৪১
কুক (কবিতা)	শ্রীহরিপদ দত্ত	২১৪
কৃষ্ণকর্ণে মৎস্য	শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র বিশ্বাস	৭১৬
কেক ও ঝাড়া (সচিত্র)	শ্রীনীলরতন কর	৩৫১
খুকী (কবিতা)	শ্রীহরিপদ দত্ত	৮২৪
খেলনা (কবিতা)	শ্রীঅমূল্য সেন	৫২৬
খোকি ও ঝনিবাপ (গল্প)	শ্রীপ্রফুল্লকুমার মণ্ডল	৩২৮
গুরুপাঠী	শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী	৩৭
গৃহ	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ রায়	৫১১
গৌরীর (গল্প)	শ্রীসুধীরচন্দ্র রাহা	৮০৫
চিকিৎসা (গল্প)	শ্রীঅন্নপূর্ণা দেবী	৫২৭
চিত্র-পরিচয়	শ্রীঅমিত রায়	১০৯
চীন-জাপান যুদ্ধের ভূমিকা	শ্রীরামকৃষ্ণপরম দেব	৪৭৯
ছুটির দিন (গল্প)	শ্রীপ্রভাতকুমার দেব সরকার	৬৭১
জন্মভূমি (গল্প)	শ্রীজাহ্নবী মুখোপাধ্যায়	৩৬০
জয়পুর (সচিত্র ভ্রমণ)	শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষ	২৮৩
জাপানী কবিতা	শ্রীজীবনকৃষ্ণ শেঠ	১৮৮
জীবন-চিত্র (নক্সা)	শ্রীবিজয়বালা দেবী	৭৮৩
তাজমহল (সচিত্র)	শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ	৪১২
দক্ষিণ সমুদ্রে প্রবালের বড় বাঁধ (সচিত্র)	শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৭৫৫
দুর্ব্বোধ্য (গল্প)	শ্রীবিজয় গুপ্ত	১৩
ধাত্ত (সচিত্র)	শ্রীশরচন্দ্র দাশগুপ্ত	১৭৩
নট্ এ পাইস (নক্সা)	শ্রীনরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	২৮২
নদীয়ার কথা (সচিত্র)	শ্রীবীরেন্দ্রমোহন আচার্য্য	২৫৪,৩২৪,৪৩৮,৬১৪,৭২৩
নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ (সচিত্র)	শ্রীকিরণেন্দু নাগচী	৪৪২,৬২২
নিতাই দাসের মেয়ে (গল্প)	শ্রীকণা দত্ত	৫৫২
নির্ম্মল বাবু (গল্প)	শ্রীসুধীরচন্দ্র রাহা	২২৬
নীড় (গল্প)	শ্রীজগদীশ বসু	৪৭৪
পরশুরামকুণ্ড-স্নান (সচিত্র)	স্বামী ভূমানন্দ	৬৫৯,৭৩৪
পরীক্ষা (গল্প)	শ্রীকানাইলাল মণ্ডল	৭৫০
পলিয়াদের বিবাহ	শ্রীবিশ্বরঞ্জন গুহ নিয়োগী	৭৬১
পিতৃ-ঋণ (গল্প)	শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়	৭৮১
পুরুষ (কবিতা)	শ্রীরসময় দাশ	১২৭
পৌত্তলিক (কবিতা)	শ্রীহরিপদ দত্ত	৩২৩
প্রথম বৌদ্ধ সঙ্গীতি	শ্রীম···	৬১৭
প্রিয় বাজন (কবিতা)	শ্রীজগদানন্দ বিশ্বাস	৫২২
ফিরে আয় (কবিতা)	শ্রীগুরুপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৩১
ফিরে চল (কবিতা)	শ্রীমোহিনী চৌধুরী	৪৬৫
ফৌজ্ কিটে (কবিতা)	শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারী	৫১০
বঙ্কিম ও মুসলমান সম্প্রদায়	শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশ	১১৬
বনশ্রী (কবিতা)	শ্রীনিত্যানন্দ কর্ম্মকার	২৮১
বনস্পতি (কবিতা)	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	
বর্ত্তমান জগৎ	শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী	
বসুন্ধরা (কবিতা)	শ্রীমমিতা দেবী	
বাংলা সাহিত্যে বসন্তঋতু	শ্রীমনোমোহন ঘোষ	
বাংলার মাটী (উপন্যাস)	শ্রীঅপরাজিতা দেবী	৫৩, ১৮৩, ২৯৩

বিষয় ৫০১৮

বাঙ্গালী সাহিত্যিক-বাঙ্গালা

শব্দ — শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায় ৩৭৬
বাঙ্গালার বৎস্য (সচিত্র) — শ্রীক্ষেত্রগোপাল মুখোপাধ্যায় ৭৪
বাসনা (গল্প) — শ্রীসুধীরচন্দ্র রাহা ৪০১
বিচিত্র জগৎ (সচিত্র) — শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১০২, ১১৩
মধ্য-এশিয়ার যাযাবর জাতি ৩১৭
নাহারার পথে লবণবাহী উষ্ট্রশ্রেণী
বিজ্ঞান-জগৎ (সচিত্র) — শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী ১৩৫, ২৪৬, ৩২৪
বুদ্ধু দক্ষাতা — শ্রীসুধীরচন্দ্র ধর ৬১৯
বেরিবেরি ও তাহার প্রাকৃতিক চিকিৎসা — শ্রীসুরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ৩৭৩
বৈষ্ণবকবি লোচনদাস — শ্রীরামপদী কর্ম্মকার ৪৭১
ব্যবধান (কবিতা) — শ্রীগোপাল ভৌমিক ৩৬৪
ভারতীয় বৎস্য (সচিত্র) — শ্রীক্ষেত্রগোপাল মুখোপাধ্যায় ৩৩৬
ভারতের পথে (সচিত্র) — শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন ৫৯৯
ভাড়াটে (গল্প) — শ্রীরঞ্জন সেন ৭৯
ভিখারিণী (কবিতা) — শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ৩৮
মহানগরীর রূপ (গল্প) — শ্রীবীরেন সেনগুপ্ত ৫৮৭
মহামানব (কবিতা) — শ্রীঅমিয়কৃষ্ণ রায়চৌধুরী ৪৭০
মা (কবিতা) — শ্রীহরিপদ দত্ত ৫৫৬
মাতৃবিয়োগ (কবিতা) — শ্রীকনকভূষণ মুখোপাধ্যায় ৫৯
মৈমনসিংহ পরিচিতি — শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামী ৩৯
রাজধর্ম্ম-কৌস্তুভের লিখনীয় বিষয়
রোডেসিয়া (সচিত্র) — শ্রীঅভিলাষ দাস
লবণ বাণিজ্যে বাংলা (সচিত্র) — শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ
লুই পাস্তুর (সচিত্র) — শ্রীজিতেন্দ্রকুমার নাগ
শ্রীনীলরতন কর ৮৪, ২১৫, ৬৭৭
শিকার কলিকাতা — শ্রীচুণীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৮৬
শূকর-মদ্দব-সমস্যা — শ্রীনীহারকণা রায় ৩৯৪
শ্মশান-সাধনা (কবিতা) — শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ৪৭০
সংবাদ ও মন্তব্য ৫৯৮, ৫৪৪, ৬৮২, ৮২৫
সন ১৩৩৬ সাল (কবিতা) — শ্রীমধুসূচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী ৪৫১
সন্ধ্যাতারা (গল্প) — শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ২৫৪
শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য

সম্পাদকীয়
ষড়যন্ত্রের আরম্ভ
গান্ধীজির সংগঠন-প্রচেষ্টার সমালোচনা
শিল্প-বাণিজ্য ও দেশের উন্নতি
কৃষি ও দেশের উন্নতি
কংগ্রেসের প্রচারণায় একটি উদাহরণ
লর্ড রিডিংয়ের ও মুক্তারের প্রতিজ্ঞা
গান্ধীজীর অনাবশ্যক পুনরুক্তি এবং প্রয়োজনমূলক স্বীকারোক্তি

বিষয় পৃষ্ঠা
মিঃ সত্যেন্দ্র বসুর অসার চিন্তার নমুনা ১১১
বাংলার বৈশিষ্ট্য ১১০
বাংলার বৈশিষ্ট্য ও ভারতীয় একের সাধনক্ষেত্র রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনীয়তা ১১০
বৈধতন্ত্র ও সাম্যবাদে সংঘর্ষে অনিবার্য্য ১১৭
জগতের সাম্যবাদিগণের নিকট কংগ্রেসের ঘোষণাপত্র ও ভারতবাসীর স্বাধীকারণ
কাহার জীবন বিভিন্নতা ও বিচ্ছিন্নতার স্থান নাই
আসামের প্রধান-মন্ত্রীর কার্য্য-সূচী
কংগ্রেসের সভাপতির
ভারতবাসী জন-সাধারণের প্রধান সমস্যা
আর্থিক অসন্তোষ সাধনের পন্থা
ভারতের প্রধান সমস্যা-সমূহ সমাধানার্থ প্রয়োজনীয় অপরিহার্য্য গুণাবলী
ভারতরক্ষা
ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের গত সভাপতি নির্ব্বাচনের শিক্ষা
ফেডারেশন ও কেন্দ্রীয়করণ-ইতিহাসের কথা
বর্ত্তমান কংগ্রেস ও কংগ্রেসীর স্বরূপ
মিঃ গান্ধীর হিংসা-অহিংসার দৃষ্টান্তে এবং মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুর উল্লেখে কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথা
বালুকা বন্যার কারণ এবং আর্থিক সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা
প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন ও সাহিত্য সম্বন্ধে কয়েকটি কথা
স্ত্রী-স্বাধীনতা ও স্ত্রীপুরুষের অবাধ মিলন
সাহিত্যের সংজ্ঞা ও আদর্শ সম্বন্ধে শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর মতবাদ
সাহিত্যের সংজ্ঞা ও আদর্শ সম্বন্ধে ঋষিবিশেষের সমালোচন
পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণের মতবাদ
গান্ধীজী ও তাঁহার অনুচরবর্গ কি দেশ-দ্রোহিক না আত্মবিস্মৃত দেশদ্রোহী ?
মিঃ গান্ধীর অনশন ও তাহার তাৎপর্য্য
মিঃ গান্ধীর অনশন হইতে ভারতীয় জনসাধারণের শিক্ষণীয় বিষয়
মিঃ গান্ধীর অনশন হইতে মুসলিম জনসাধারণের শিক্ষণীয় বিষয়
জগতের প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্য ও তাহার বিতরণ
ধনতন্ত্রের ত্রুটি ও তাহার সংশোধন-পন্থা
ইহাই কি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ?
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিল্প ও কৃষিগত উন্নতি
কুমিল্লা সাহিত্য-সম্মেলন ও ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
ডক্টর সুনীতিকুমারের মুখবন্ধ
উনবিংশ শতকের চতুর্থপাদে ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজ
বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের প্রথম যুগে বাঙ্গালা সাহিত্যের অবস্থা
বাঙ্গালা ভাষার সাহিত্যের পক্ষে
মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্য
ভারতীয় আর্য্য-ভাষাসমূহের মধ্যে বাঙ্গালার স্থান
মানব-সমাজের প্রধান বন্ধন ভাষা
রাষ্ট্রীয় জীবনে ভাষাগত জাতীয়তা বোধ
ভারতের রাষ্ট্র-ভাষা হওয়ার পক্ষে বাঙ্গালা ভাষার দাবী
উপসংহার
দর্শনশাস্ত্র ও মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী
দর্শনের সংজ্ঞা
নানা দর্শনের নানা কথা
ব্যাসের ব্রহ্মসূত্র
তাহাতে যুক্তি আছে তাহাই কি সত্য ?
রাজকোট সংঘর্ষ ও মহিলা সত্যাগ্রহের বিপত্তি
রাজকোটের বিপত্তি ও তাহার তাৎপর্য্য

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
ভারতীয় কবির সভ্যতা ও কৃষ্টি সম্বন্ধে আধুনিক ধারণার নমুনা		৫৪৭
ভারতীয় সভ্যতা ও আদর্শের প্রকৃতি সম্বন্ধে অনিলবরণ বাবুর মতবাদ		৫৪৯
ভারতীয় সভ্যতা ও আদর্শের প্রতি ভারতীয় বহুলোকের বিরক্তির কারণ সম্বন্ধে অনিলবরণ বাবুর মতবাদ		৫৫৮
ঘুঁষখোর সম্বন্ধে অনিলবরণ বাবুর মতবাদ		৫৫৯
বিবাহাদিয়ের সম্বন্ধে হিন্দু পরিবার ব্যবস্থা বিষয়ে অনিলবরণ বাবুর মতবাদ		৫৬০
বিলাতি ও ফ্রেঞ্চ কাটিনের দাবির		৫৬৩
কলিকাতায় নিখিল-ভারত-কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশন এবং ভেদনীতিমূলক ব্যবস্থার কুফলাবলী।		
কংগ্রেসের সভাপতির পদত্যাগের দাবির		
ভারতীয় কবির সভ্যতা ও কৃষ্টি সম্বন্ধে আধুনিক ধারণার নমুনা (পূর্বানুবৃত্তি)		
ভারতীয় কবির শাস্ত্রানুসারে বৈধব্য-পালনের অবস্থা		
বৈধব্য-পালন কি ধর্মের পক্ষে শাস্তি অথবা কর্তব্য-পালন		
জীবের সুখ ও দুঃখের কারণ		
উপসংহার		
আধুনিক যুদ্ধের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক হইবার নিমিত্ত সাধারণ বুদ্ধি-বিবর্জ্জিত হওয়া কি প্রয়োজন?		
বৈজ্ঞানিক নির্ব্বুদ্ধিতার নমুনা ও জনসাধারণের পরিত্রাণ-সমস্যার সমাধান		৫১২ খ
সরস্বতী (কবিতা)	শ্রীসুরেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়	৭৭
সিপাহী-যুদ্ধের নূতন কথা	শ্রীসুশীলপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী	১১৫,৩৮৯,৪৯৩
সাম্প্রদায়িকতা [আলোচনা]		
হিন্দু-মুসলমান ও কংগ্রেস	গৌরহরেয়া বাবুন	৬১৭
হিন্দু-মুসলমান ও পালা-পার্ব্বণ	শ্রীমতী ইলা দত্ত	৬৬৬
সাহিত্যে কালাপাহাড়	শ্রীযতীন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী	৭৭১
সেকালের পাঠশালা	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ রায়	৩০৫
সেকালের শিক্ষা	শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়	৪৩৩
সেকালের সমাজ	শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়	৭০
স্থিতি ও গতি (উপন্যাস)	শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ	১২০,২৩৮,৩৪৩,৪৫৭,৬২৬,৭৯১
স্মৃতি (কবিতা)	শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার নিয়োগী	৬৭০
হেঁয়ালী (কবিতা)	কস্তচিদবোধস্ত	৪৩২
হেঁয়ালী নং ২ (কবিতা)	কস্তচিদবোধস্ত	৬২১

বর্ণানুক্রমিক লেখক-সূচী

শ্রী...
- অন্তঃপুর

শ্রীঅ...
- প্রথম বৌদ্ধ সঙ্গীতি

শ্রীঅন্নপূর্ণা দেবী
- চিকিৎসা (গল্প)

শ্রীঅপরাজিতা দেবী
- বাঙ্গলার মাটী (উপন্যাস)

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য
- ত্রিপাত্রিণী (কবিতা)
- পণ্যান-সাধনা (কবিতা)

শ্রীঅমিত রায়
- চিত্র-চরিত্র

শ্রীঅমিয়কৃষ্ণ রায়চৌধুরী
- মহামানব (কবিতা)

শ্রীঅমূল্য সেন
- গান (কবিতা)

শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন
- ইউরোপ হইতে বিদায় (সচিত্র)
- ভারতের পথে (সচিত্র)

অম্বুধাপ্লুতা
- গায়ের ডাক [অন্তঃপুর]

শ্রীইন্দিরা দেবী
- পৃথিনিকা [অন্তঃপুর]

শ্রীমতী ইলা দত্ত
- হিন্দু-মুসলমান ও পালা-পার্ব্বণ [সাম্প্রদায়িকতা]

শ্রীইলারাণী মুখোপাধ্যায়
- কচির নমুনা (কবিতা)

শ্রীকণা দত্ত
- নিতাই বাগের মেয়ে (গল্প)

শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায়
- কবি বিহারীলাল

শ্রীকনকভূষণ মুখোপাধ্যায়
- মাতৃবিয়োগ (কবিতা)

কস্তচিদবোধস্ত
- হেঁয়ালী (কবিতা)
- হেঁয়ালী নং ২ (কবিতা)

শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামী
- নরসিংহ পরিচিতি

শ্রীকানাইলাল মণ্ডল
- পরীক্ষা (গল্প)

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ
- স্থিতি ও গতি (উপন্যাস)

শ্রীকিরণেন্দু বাগচী
- নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ (সচিত্র)

শ্রীকুলরঞ্জন মুখোপাধ্যায়
- অজীর্ণরোগের জলচিকিৎসা

শ্রীক্ষেত্রগোপাল মুখোপাধ্যায়
বাঙ্গালার মসলা (সচিত্র)
আমলের মসলা (সচিত্র)
শ্রীগুরুপদ বন্দ্যোপাধ্যায়
হিংয়ে জাৎ (কবিতা)
শ্রীগোপাল ভৌমিক
কবরখানে (কবিতা)
শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষ
ধরস্রোত (সচিত্র ভ্রমণ)
শ্রীচুণীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
শিক্ষার অগ্রগতি
শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়
সিন্দুক-কথা (গল্প)
শ্রীজগদানন্দ বিশ্বাস
প্রিয় স্বজন (কবিতা)
শ্রীজগদীশ বসু
নীড় (গল্প)
শ্রীজীতেন্দ্রকুমার নাগ
সরল-বাণিজ্য বাংলা (সচিত্র)
শ্রীজীবনকৃষ্ণ শেঠ
জাপানী কবিতা
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ রায়
চন্দ্র
সেকালের পাঠশালা
শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র বিশ্বাস
ক্রিয়াকল্পে মন্ত্র
শ্রীতারাগোবিন্দ চৌধুরী
ঔষধের এবং দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা (অর্থসচিব]
বেগম হেমন্তা খাতুন
হিন্দু-মুসলমান ও কংগ্রেস (সাম্প্রদায়িকতা]
শ্রীনমিতা দেবী
কল্পনা (কবিতা)
নারীশিক্ষাব্রতী
বর্তমান শিক্ষা-প্রণালী (অর্থসচিব]
শ্রীনিত্যানন্দ কর্মকার
বন্দী (কবিতা)
শ্রীনিহারকণা রায়
পুকুর-বন্ধন-সমস্যা
শ্রীনীলরতন কর
খাদ্য ও স্বাস্থ্য (সচিত্র)
পূর্ব পাকার (সচিত্র)
শ্রীপুলিনবিহারী চক্রবর্তী
কাশ্মীরে কারকদিন (সচিত্র ভ্রমণ)
শ্রীপুষ্পরাণী ঘোষ
নারীর শিক্ষা ও তাহার প্রয়োজন (অর্থসচিব]
শ্রীপ্রফুল্লকুমার মণ্ডল
ঘড়ি ও ঘনিষ্যাস (গল্প)
শ্রীপ্রভাতকুমার দেব সরকার
দুটি দিন (গল্প)
ফজলুল করিম
একটি বিদায় কথা (গল্প)
শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়
জন্মভূমি (গল্প)
শ্রীবরদারঞ্জন চক্রবর্তী
সাহিত্যে কালাপাহাড়
শ্রীবিজনবালা দেবী
জীবন-চিত্র (কবিতা)
শ্রীবিজয় গুপ্ত
দুর্যোগ (গল্প)
শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
দক্ষিণ সমুদ্রে প্রবালের বড় বাঁধ (সচিত্র)
বিচিত্র-জগৎ (সচিত্র)
শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
নবজাতা (গল্প)
শ্রীবিশ্ববন্ধু গুহ মজুমদার
পলিগ্রামের বিবাহ
শ্রীবীরেন্দ্রমোহন আচার্য
নবীগার কথা (সচিত্র)
স্বামী ভূমানন্দ
পরওয়ারদেগার-স্নান (সচিত্র)
শ্রীমণীন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ
অগ্নিশিখা (কবিতা)
শ্রীমতিলাল দাশ
রাজবর্ত্ম-কৌস্তুভের শিক্ষণীয় দিক
শ্রীমধুসূদন সর্বাধিকারী
সন ১৩৫৩ সাল (কবিতা)
শ্রীমনোমোহন ঘোষ
বাংলা সাহিত্যে বসন্তকুমার
শ্রীমনোমোহন চৌধুরী
বাংলার কৃষিজীবী [অর্থসচিব]
শ্রীমেঘেন্দ্রলাল রায়
আমলের বিপর্যয় (উপন্যাস)
শ্রীমোহিনী চৌধুরী
ফিরে চল (কবিতা)
শ্রীরজত সেন
আড়াই (গল্প)
শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী
চতুষ্পাঠী ৭৩
বিজ্ঞান-জগৎ (সচিত্র) ১৩৩, ২১৯, ৩৬৪
শ্রীরমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
নট এ পাইস (নক্সা)
শ্রীরসময় পাল
পুরুষ (কবিতা)
শ্রীরামকৃষ্ণশরণ দেব
চীনজাপান যুদ্ধের ভূমিকা
শ্রীরামপদী কর্মকার
কৈবর্তকবি দোচনদাস
শ্রীললিতমোহন রায়রা
ইডেন গার্ডেনের স্যাংগোডার কাহিনী (সচিত্র)

শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারী
ছোট্ট মিষ্টি (কবিতা)
শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়
সেকালের শিক্ষা
সেকালের সমাজ
শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য্য
কল্যাণী (গল্প)
শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার নিয়োগী
স্মৃতি (কবিতা)
শ্রীশ্রীশচন্দ্র দাশগুপ্ত
খাদ্য (সচিত্র)
শ্রীশ্রীবন্ধন সেন গুপ্ত
মহাকালীর রূপ (গল্প)
শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য
সম্পাদকীয়
বহুদিনের আনন্দ
গান্ধীজীর সংগঠন-জ্ঞানের নমুনা
শিল্প-বাণিজ্য ও দেশের উন্নতি
কৃষি ও দেশের উন্নতি
কংগ্রেসের প্রচারণায় একটি উদাহরণ
লর্ড লিনলিথগো ও যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা
গান্ধীজীর অনাবশ্যক পুনরুক্তি এবং প্রচারণামূলক রাষ্ট্রনীতি
মিঃ শরৎচন্দ্র বসুর অসার চিন্তার নমুনা
বাংলার বৈশিষ্ট্য
বাংলার বৈশিষ্ট্য ও ভারতীয় ঐক্যে সামঞ্জস্য রাখার প্রয়োজনীয়তা
বৈরতন্ত্র ও সাম্যবাদে সংঘাত অনিবার্য
জগতের সাম্যবাদিগণের নিকট কংগ্রেসের ঘোষণাপত্র ও ভারতবাসীর দাবীজ্ঞাপন
জাতীয় জীবনে দ্বিতিশীলতা ও বিক্রিয়তার স্থান নাই
আলোকের প্রবাস-যাত্রীর কার্য্য-সূচী
কংগ্রেসের সভাপতিত্ব
ভারতবাসী জন-সাধারণের প্রধান সমস্যা
আর্থিক স্বচ্ছলতা সাধনের পন্থা
ভারতে প্রধান সমস্যাসমূহ সমাধানার্থ প্রয়োজনীয় অপরিহার্য্য গুণাবলী
ভারতরক্ষা
ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের গত সভাপতি নির্ব্বাচনের শিক্ষা
ফেডারেশন ও ফেডারেশন-হীনতার ফল
বর্ত্তমান কংগ্রেস ও কংগ্রেসীর স্বরূপ
মিঃ গান্ধীর হিংসা-প্রবৃত্তির দৃষ্টান্ত এবং মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুর উদ্দেশ্যে কয়েকটি প্রবর্ত্তন-বাক্য ১৭২-৬
বালুকা-স্তরের ক্রমবাস এবং আর্থিক সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা ১৭২-৮
প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন ও সাহিত্য সম্বন্ধে কয়েকটী কথা ১৭২-ঘ
স্ত্রী-স্বাধীনতা ও স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মিলন ১৭২-ঙ
সাহিত্যের আদর্শ ও সংজ্ঞা সম্বন্ধে শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর মত ১৭২-চ
সাহিত্যের আদর্শ ও সংজ্ঞা সম্বন্ধে অন্যদিগের মতামত ১৭২-ছ
পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণের অভিমত ১৭২-জ
গান্ধীজী ও তাঁহার অনুচরবর্গ কি দেশ-দ্রোহিতা না আত্মরক্ষার দেশপ্রেমী? ২৬১
মিঃ গান্ধীর অনশন ও তাহার তাৎপর্য্য ২৬৪
মিঃ গান্ধীর অনশন হইতে ভারতীয় জনসাধারণের শিক্ষণীয় বিষয় ২৬৭
মিঃ গান্ধীর অনশন হইতে কুটিল জনসাধারণের শিক্ষণীয় বিষয় ৫৬৮
জগতের আকৃতিক ঐশ্বর্য্য ও তাহার বিতরণ ৫৭৬
খাদ্যের ত্রুটি ও তাহার সংশোধন-পন্থা ২৭২
ইহাই কি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস? ২৭৪
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিল্প ও কৃষিগত উন্নতি ৫৭৯
কুমিল্লা সাহিত্য-সম্মেলন ও ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ৫০১
ডক্টর সুনীতিকুমারের বৈশিষ্ট্য ৫০২
উনবিংশ শতকের চতুর্থপাদে ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজ ৫০৩
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রথম যুগে বাঙ্গালা সাহিত্যের অবস্থা ৫০৫
বাঙ্গালা ভাষায় সাহিত্যের পত্তন ৫০৬
মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্য ৫০৭
ভারতীয় আর্য্য-ভাষাসমূহের মধ্যে বাঙ্গালার স্থান ৫০৮
মানব-সমাজের প্রধান বন্ধন ভাষা ৫০৯
রাষ্ট্রীয় জীবনে ভাষাগত জাতীয়তা বোধ ৫১০
ভারতের রাষ্ট্রভাষা হওয়ার পক্ষে বাঙ্গালা ভাষার দাবী ৫১২
উপসংহার ৫১৩
দর্শনশাস্ত্র ও মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী ৫১৫
দর্শনের সংজ্ঞা ৫১৬
নানা দর্শনের নানা কথা ৫১৯
ব্যাসের উক্তিতে ৫২১
যাহাতে মুক্তি আছে তাহাই কি সত্য? ৫২৩
রাজকোট সম্বন্ধে স্যার মরিস গয়ারের নিষ্পত্তি ৫২৫
রাজকোটের নিষ্পত্তি ও তাহার তাৎপর্য্য ৫৩০
ভারতের ঋষির সভ্যতা ও কৃষি সম্বন্ধে আধুনিক ধারণার নমুনা ৫৩১
ভারতীয় সভ্যতা ও আদর্শের প্রকৃতি সম্বন্ধে অনিলবরণ বাবুর মতবাদ ৫৩১
ভারতীয় সভ্যতা ও আদর্শের প্রতি ভারতীয় বহুলোকের বিরক্তির কারণ সম্বন্ধে অনিলবরণ বাবুর মতবাদ ৫৩৮
ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে অনিলবরণ বাবুর মতবাদ ৫৩৯
বিধবাবিবাহের সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রের ব্যবস্থা বিষয়ে অনিলবরণ বাবুর মতবাদ
বিশ্বশান্তি ও গ্রেট কুটনের ধারিত্ব
কলিকাতায় নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশন এবং তেজনীতিমূলক ব্যবস্থায় কৃতকার্য্যতা
ফেডারেট্ট স্কীমের গলদ কি রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষকতার পরিচায়ক?
কংগ্রেসের সভাপতির পদত্যাগের ধারিত্ব
ভারতীয় ঋষির সভ্যতা ও কৃষি সম্বন্ধে আধুনিক ধারণার নমুনা (পূর্ব্বানুবৃত্তি)
ভারতীয় ঋষির শাস্ত্রানুসারে বৈধব্য-পালনের ব্যবস্থা
বৈধব্য-পালন কি রমণীর পক্ষে শাস্তি অথবা কর্ত্তব্য-পালন
জীবের সুখ ও দুঃখের কারণ
উপসংহার
আধুনিক যুগের আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক হইবার নিমিত্ত সাধারণ বুদ্ধিবিবর্জ্জিত হওয়া কি প্রয়োজন?
বৈজ্ঞানিক নির্ব্বুদ্ধিতার নমুনা ও জনসাধারণের বাহ্যিক-সমস্যার সমাধান ৭২২-খ
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
বসন্তশ্রী (কবিতা)
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু
কাচ ও আমির (কবিতা)
শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী
বর্ত্তমান জগৎ
শ্রীসলিলকুমার চট্টোপাধ্যায়
আমরা বাঙ্গালী (নাটিকা)

শ্রীসুধীরচন্দ্র ধর
দুরন্ত সন্ধ্যা
শ্রীসুধীরচন্দ্র রাহা
চাষীরা (গল্প)
নির্মল বাবু (গল্প)
বাসনা (গল্প)
শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ
ত্রিগেডাল (সচিত্র)
রোডেসিয়া (সচিত্র)
শ্রীসুশীলপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী
সিপাহী-যুদ্ধের নূতন কথা
শ্রীসুরেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
সরস্বতী (কবিতা)
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
বাঙ্গালা সাহিত্যে অ-বাঙ্গালী লেখক
শ্রীহরিপদ দত্ত
চুম্বক (কবিতা)
গঙ্গা (কবিতা)
পৌরাণিক (কবিতা)
মা (কবিতা)
শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশ
হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়

বর্ণানুক্রমিক ষাণ্মাসিক চিত্র-সূচী

চিত্র	শিল্পী	পৃষ্ঠা
অধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় (কার্টুন)	শ্রীশৈলনারায়ণ চক্রবর্ত্তী	৭৫০
অনাথ (দ্বিবর্ণ, ফোটোগ্রাফ)	শ্রীপরিমল গোস্বামী	৫০৪
অন্ধের আলোক-প্রাপ্তি (কার্টুন)	শ্রীশৈলনারায়ণ চক্রবর্ত্তী	৭৬৬
অহল্যার শাপমুক্তি (ত্রিবর্ণ)	শ্রীঅরুণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৭৭০
অহিংসার বিক্রম (কার্টুন)	শ্রীশৈলনারায়ণ চক্রবর্ত্তী	৩১৬
অহিংসার বিস্ফোরণ (কার্টুন)	শ্রীশৈলনারায়ণ চক্রবর্ত্তী	২৯
ইউরোপ হইতে বিদায়		
অ্যাক্রোপলিস কাম্পিডোলিও অঙ্কিত শিল্পী রুবেন্স-অঙ্কিত 'ক্রুশ হইতে অবতরণ'		
আকাশ হইতে অ্যাক্রোপলিস বন্দর ও প্রাচীন কার্থিজের		
ত্রাসেল্সের প্রাচীন বন্দর-দৃশ্য		
ইতি মুক্তোপমুক্ত উপাখ্যান (কার্টুন)	শ্রীশৈলনারায়ণ চক্রবর্ত্তী	১৪৪
ইডেন গার্ডেনের প্যাগোডার কাহিনী		
মূল হইতে প্যাগোডার দৃশ্য		৬৮৪
উঞ্ছজীবী (দ্বিবর্ণ, ফোটোগ্রাফ)	শ্রীপরিমল গোস্বামী	৩৬৮
উরু-ভঙ্গের পর (কার্টুন)	শ্রীশৈলনারায়ণ চক্রবর্ত্তী	৪২৮
একটি মুখ (দ্বিবর্ণ)	শ্রীগোবর্দ্ধন আশ	৭২২-ক
কংগ্রেসের নাগরদোলা (কার্টুন)	শ্রীশৈলনারায়ণ চক্রবর্ত্তী	৩৭৬
কণ্টক-শয্যা (কার্টুন)	শ্রীশৈলনারায়ণ চক্রবর্ত্তী	১১২-ব
কাশ্মীরে কয়েকদিন		
হিমগৃহ		
শঙ্করাচার্য্য পাহাড় হইতে হিমগৃহের দৃশ্য		
নিশাৎবাগ		
চেশমাশাহী		৪৩
শ্রীনগর শিকারা পল্লী		৪১
শালিমার		৪৪
গুলমার্গ		৪৫
কায়া ও ছায়া (কার্টুন)	শ্রীশৈলনারায়ণ চক্রবর্ত্তী	১৬০
কিস্তি (ত্রিবর্ণ)	শ্রীসুধীরনাথ মুন্সী	প্রবাসী-চৈত্র
কুটীর (ত্রিবর্ণ)	শ্রীজীবনলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	প্রবাসী-ফাল্গুন
কেরিয়ার লেফচার্স (কার্টুন)	শ্রীশৈলনারায়ণ চক্রবর্ত্তী	৩৩
খাদ্য ও স্বাস্থ্য		
বিভিন্ন বৃত্তি-উপজীবীর দৈনিক শক্তির প্রয়োজনীয়তা		
কলকাতার রাসায়নিক বিশ্লেষণ		
গৃহস্থালী (ত্রিবর্ণ)	শ্রীমাণিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	প্রবাসী-জ্যৈষ্ঠ
ছায়াবাজী (কার্টুন)	শ্রীশৈলনারায়ণ চক্রবর্ত্তী	২২
ছি ছি এত্তা গুজরাল (কার্টুন)	শ্রীশৈলনারায়ণ চক্রবর্ত্তী	৮২২
জয়পুর		
রামগড় হ্রদ	শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষ	২৬৪
রামগড়ের পথে		২৬৪
অম্বর		২৬৬
গরুর গাড়ী		২৬৭
জহর সাক্সিফাল ওয়ার্ড (কার্টুন)	শ্রীশৈলনারায়ণ চক্রবর্ত্তী	১৭
তাত-তালিমাৎ (কার্টুন)	শ্রীশৈলনারায়ণ চক্রবর্ত্তী	৬৪৬
ত্রাসল্যাল		
কেন্দ্রীয় নারীর দল		

চিত্র পৃষ্ঠা

টুকরী-বিক্রেতা ৪৩৩
বার্ণার্ডটের বৃক্ষবীথিবেষ্টিত পথ ৪৩৪
ব্রাসেলসে নদী পার হইবার পুল ৪৩৫
হিপ্টোড্রিয়া, চার্চ্চ কোয়ার ৪৩৬
কুমার ক্যাপেলার পরিচ্ছদ-সিংহী ৪৩৭
হিপ্টোড্রিয়ার পশুশালার ওলন্দাজী ৪৩৯
দক্ষিণ সমুদ্রে প্রবালের বড় বাঁধ
'আক্রোপোরা' শ্রেণীর প্রবালের দুইটি উদাহরণ
সমুদ্রের জল সরিয়া যাওয়ায় 'টাবুলা' প্রবালের বিচিত্র বৃক্ষ
হিরণ আইল্যাণ্ডের বৃক্ষ
লো আইল্যাণ্ড
বাঁধের উত্তর-পূর্ব দিক্
ফ্রাইডাক্সে পাসেজের নিকট মৈসর্গিক দৃশ্য ৭৬৯
ঘড়িবাজী (কার্টুন) শ্রীশৈলনারায়ণ চক্রবর্ত্তী ৪৪২
দিদি (ত্রিবর্ণ) শ্রীশৈলনারায়ণ চক্রবর্ত্তী ২২
ধানের নৌকা (ত্রিবর্ণ) শ্রীমাণিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ৬১৮
ধাতু
মৌতলী বালু প্রবাহিত ও মৌতলী সববালু প্রবাহিত অঞ্চল
পৃথিবীর বৃষ্টিপাত-চিত্র
পৃথিবীর ধাতুক্ষেত্রসমূহ
পর্ব্বতপার্শ্বে ধাতুক্ষেত্রের চিত্র
চাউল প্রস্তুত করিবার ব্রহ্মদেশীয় যন্ত্র
চাউল ঝাড়াইবার যন্ত্রের বহির্দৃশ্য
চাউল ঝাড়াইবার যন্ত্রের প্রকৃতি
নদীয়ার কথা
জগন্নাথ মিশ্রের স্বহস্ত-লিখিত পুঁথির দুইখানি পত্র
শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব
নদীয়ার শিক্ষিতের সংখ্যাবৃদ্ধির হার
কৃষ্ণনগর কলেজ
নব-ম্যাকবেথের বিভীষিকা
(কার্টুন) শ্রীশৈলনারায়ণ চক্রবর্ত্তী
নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ
মুর্শিদ-পত্নী মসেরখানুম-বেগমের সমাধি
নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর সমাধি
মুর্শিদ-কন্যা জিন্নতেসেসা বেগমের সমাধি
মুর্শিদ-জামাতা নবাব সুজাউদ্দীনের সমাধি
কাটরা মসজিদ
জোড়-কোঠা
পণ্ডিত যখন পণ্ডিতে লাগে
(কার্টুন) শ্রীশৈলনারায়ণ চক্রবর্ত্তী

চিত্র শিল্পী পৃষ্ঠা

পদ্মানদীর মাঝি (ত্রিবর্ণ) শ্রীগোবর্দ্ধন আশ প্রবাসী-আষাঢ়
পরশুরামকুণ্ড-স্নান
মিশমী-ঘাট ৭৬৭
মিশমী-ঘাট, অপর পার ৭৬৮
ডুবি-পূর্ণ নদীগর্ভ ৭৬৯
মিশমী পাহাড় ৭৭১
তেজু ফরেষ্ট ৭৭৩
তেজু বাজার হইতে তেজু ৭৭৫
পরশুরাম-কুণ্ড ৭৭৭
পল্লীশ্রী (ত্রিবর্ণ, ফোটোগ্রাফ) শ্রীপরিমল গোস্বামী ৪৩২
বঙ্গশ্রী (ত্রিবর্ণ) শ্রীমাণিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবাসী-মাঘ
বাঙ্গালার মৎস্য
সরল পুঁটি, Barbus Sophore
মহাশীর, Labeo Mahseera
মিরগেল, Cirrhina Mrigala
কাতলা, Catla Catla
ডানকোনা খাটা, Rasbora Dainconius
বোয়াল, The Fresh-water Shark
কাঁটা চাঁদা, Stickleback
কালবেলে, Sobies
নিৰ্ব্বাসকা, The Black-spot Sophore
বাগদা, The Goonch
রুসীয় বহুহীন ষ্টার্জেন, Volga Sturgeon
বুল-ফাইট (কার্টুন)
বিচিত্র জগৎ
নব-এসিয়ার মানচিত্র
কিরঘিজ রমণীর শীত-ভোগ
পৃষ্ঠে বালকের মাঝিকের সম্পত্তি
বয় পরিধায় কন্যার লোমা উপায়
বাদুর বোনা
দুধ দোওয়া
কাজাক দাসী কাপড়ে সুল তুলছে
কিরঘিজ সুন্দরী
কিরঘিজ মা ও শিশু
কিরঘিজ বালক
বৌদ্ধ মঠে কিরঘিজ সর্দ্দার সহস্র বেশ
শিকারী ঈগল সহ কিরঘিজ শিকারী
কাচি লম্বুরের লম্বের তৈয়ারী বিবার
লবণবাহী ধনিজ-লবণের এক অংশ
বিশ্রামস্থলে বিশ্রামরত উটের দল

চিত্র	শিল্পী	পৃষ্ঠা
লক্ষ্যের ধ্বনিতে কার্যারম্ভ ঘোষণা		৩৭০
দাবাখেলা-রত		
বিজ্ঞান-জগৎ		
রাসায়নিক পরীক্ষার যন্ত্র		১০৭
ওজন চিত্র		১০৪
ওজন চিত্র		১০৫
চীন ও ভারতের খাদ্যের তুলনামূলক চিত্র		১০৮
দৈহিক বৃদ্ধির উপর মিশ্রিত ও অমিশ্রিত খাদ্যের প্রভাব		১০৮
পুষ্টিকর খাদ্য প্রয়োগের ফলে পুরুষানুক্রমে দৈহিক বৃদ্ধি		১০৮
আমেরিকার ডিমোক্রেসি		২৫১
একজন পরিচালিত ডুবোজাহাজের দৃশ্য		২৫১
বাড়ির বেতনভুক্ত ঘানটি দেখাইয়া দিতেছে		৩৬৫
দাস শিশুকে বেচা দিতেছে		৩৬৬
পাহারার উপর বেয়নেট-চার্জ প্রয়োগ করা হইতেছে		৩৬৭
কৌটাবদ্ধ রশ্মি ব্যবহার করা হইতেছে		৩৬৮
চক্ষুর ঠিক উপরে কতখানি শীতল আলোকপাত করিয়া পরীক্ষা করা হইতেছে		
বোঝার উপর শাকের আঁটি (কার্টুন)		
ভারতীয় মৎস্য		
মৌরলা, Minnow		৩০৬
ভারতীয় ট্রাউট, Indian Trout		৩০৭
ছোট কাঁটালি, Pumpkin Seed		৩০৭
কৈনা, Anchovy		৩০৮
বীলপাতা, Brill		৩০৮
লেদি, Bowfin		৩০৯
শলার, Pike		৩০৯
বাটুলা, ভাঙ্গনজাতি, Mullet		৩১০
হালিবাট, Halibut		৩১০
উড়ুক্কু মৎস্য, Flying Fish		৩১০
ডানকোনা ও ডেকোকোহাটি, Dace		৩১১
চেলা, Pilchard		৩১১
বাদামেল, Brown Trout		
টাংরা, Cat Fish		
ভারতের পথে		
হিন্দুর দীপদান		
সুরেন্দ্রনাথের জীবন সম্বন্ধীয় প্রবেশিকা		
কাশ্মীরের প্রসিদ্ধ প্রাচীন দুর্গ ও মসজিদ		
সুরেন্দ্রনাথের মুখে খালনির্ম্মাতার প্রতিমূর্ত্তি		
ম্যাপ (ত্রিবর্ণ, কার্টুন)	শ্রীশৈলনারায়ণ চক্রবর্ত্তী	
মুখবন্ধিকা (ত্রিবর্ণ)	শ্রীতিলক বন্দ্যোপাধ্যায়	
		প্রফুল্ল-বৈশাখ

চিত্র	শিল্পী	পৃষ্ঠা
রাজনৈতিক থার্মোমিটার (কার্টুন)	শ্রীশৈলনারায়ণ চক্রবর্ত্তী	৩৬৪
রোডেসিয়া		
সেসিল জন রোডস		
বেনীয় নারীগণ পশু পরিচ্ছদ করিতেছে		৬০৭
রোডেসিয়ার দর্শনীয় সুবর্ণ পশু ওরিবি		৬০১
আখেজি হ্রদে হেরাঞ্জ নরনারী		৬০৮
ওমযুট-ক্ষেত্র		৬০৯
বেনীয় মৌকায় নদী পার হওয়া		৬১০
রোডেসিয়ার কুমীর		৬১১
টমবাসি সহরের প্রধান পথ		৬১৪
ভিক্টোরিয়া প্রপাত		৬১৫
জিম্বাবউয়ের নিকট বিরাজিত প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ-সম্মুখে নৃত্যরত বেনীয় লোকের দল		
ভিক্টোরিয়া প্রপাতের পার্শ্ববর্ত্তী বিজ্ঞাপনাগার		
লবণ-বারিজো বাংলা		
লোনা মাটি সংগ্রহ		৮১৩
সুবন্দোবস্তে ইণ্ডিয়ান সল্ট কোম্পানীতে সুন্দর খাল কেবল হইতেছে		৮১৪
বেঙ্গল সল্ট কোম্পানীর খাঁথি কারখানায় কয়েক লক্ষ মণ প্রস্তুত করা হইতেছে		
ব্রহ্মদেশীয় পদ্ধতিতে লোনা জলকে রৌদ্রে জল করা হইতেছে		
বর্ষাপ্রণালীতে কলিকাতায়		
সুই পাস্তার		
ডাঁ বাপ্তিষ্ট ছুমা		
চুম্বাকরণক বীজাণু		
ফ্রেড বেরো		
ইস্ট-কোষের মুকুলোদ্গম প্রণালী		
পাস্তুরের পরীক্ষায় ব্যবহৃত কাচপাত্র		
মাখনের পচনকারী বীজাণু		
সুই পাস্তার		
জিয়াডোর পরোক্ষ		২১৭
ছুইস ফল্ সিরিপ		২১৭
পাস্তারিক ভাঁড়া		৩১১
পেবরিন রোগগ্রস্ত কীটের একাংশ		৩১৮
অতিপক্ক ব্যাধিগ্রস্ত রেশম পতঙ্গ		৩১৯
ভাঁড়ায় চর্ব্বির উপরি পেবরিন রোগের কলঙ্কিত অতিপক্ক ব্যাধিগ্রস্ত ভাঁড়া		৩১৯
পেবরিন জীবাণু-জীবনের বিভিন্ন অবস্থা		৩২০
বিদ্রূপবাদ ও বুদ্ধ (কার্টুন)	শ্রীশৈলনারায়ণ চক্রবর্ত্তী	৩৮৫
স্বীকারোক্তি (কার্টুন)	শ্রীশৈলনারায়ণ চক্রবর্ত্তী	৪৩৯
হাত মিলন হ'ল (কার্টুন)	শ্রীশৈলনারায়ণ চক্রবর্ত্তী	৬৫২

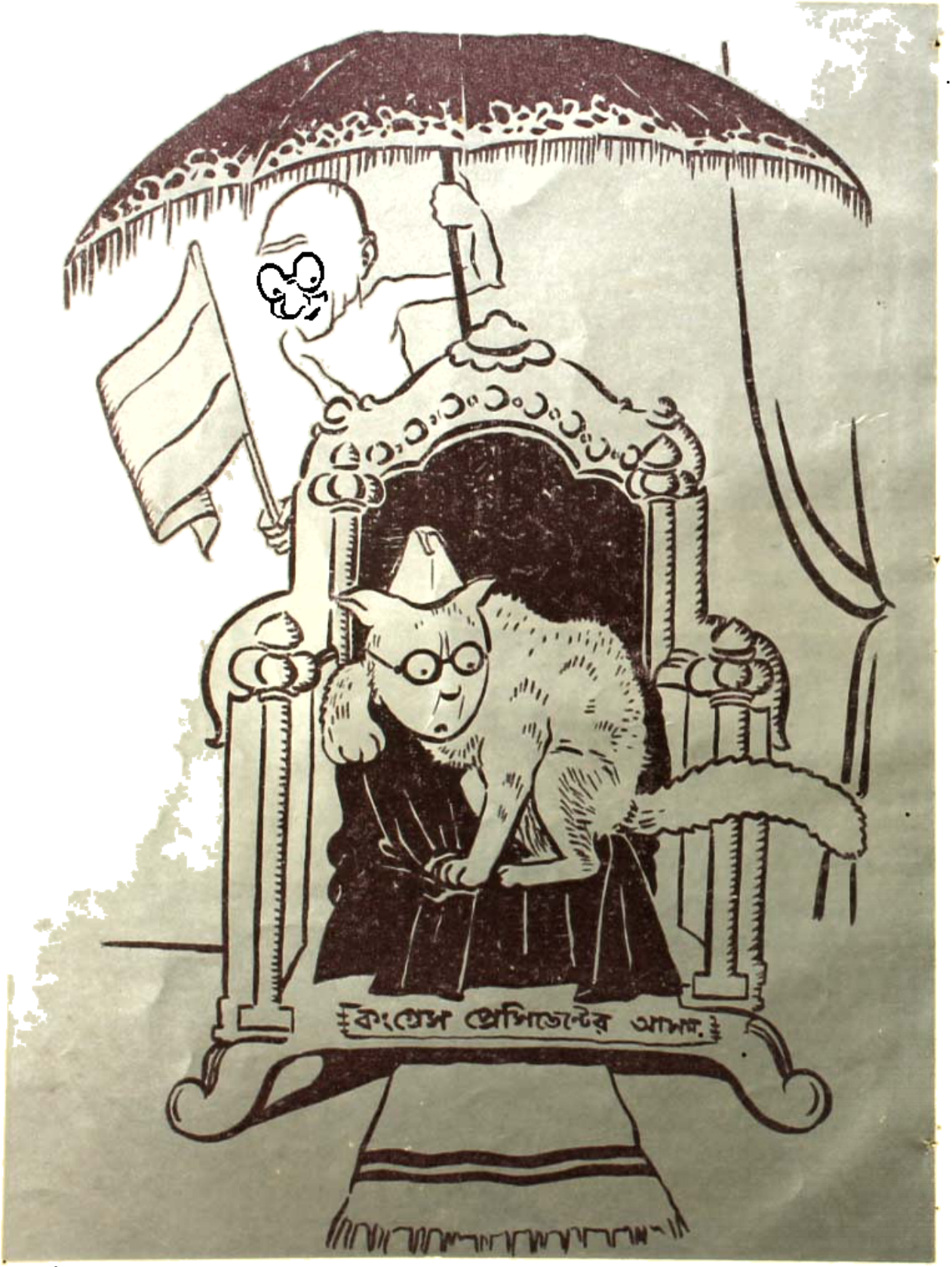
কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের আসন

[শিল্পী—শ্রীমাণিকলাল বন্দ্যোপাধ্যা

CALCUT

"ত্বদ্মীস্ত্বং ধান্যরূপাসি প্রাণিনাং প্রাণদায়িনী"

বঙ্গশ্রী

মাঘ—১৩৪৫

৭ম বর্ষ, ১ম খণ্ড—১ম সংখ্যা

সম্পাদকীয়

—শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য

বড়দিনের আনন্দ

যাঁহারা আমাদিগের নেতা, তাঁহারা আমাদিগকে কিরূপ ভাবে পরিচালিত করেন, কিরূপ আদর্শ তাঁহারা আমাদিগের সম্মুখে আনয়ন করেন, কিরূপ সম-প্রাণতা তাঁহারা আমাদিগের প্রতি দেখাইয়া থাকেন, তাহার চিত্র পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করা আমাদিগের এই সন্দর্ভের উদ্দেশ্য। পাঠকবর্গ হয়ত জিজ্ঞাসা করিবেন যে, যাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া আমরা "আমরা" বলিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিয়াছি, সে "আমরা" কাহারা? তাহার উত্তরে আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, যাঁহারা অন্ততঃপক্ষে বাহ্যিক ভাবেও বড়দিনের হৈ-চৈ ও আনন্দ উপভোগ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বাদ দিলে, এই বিশাল ভারতবর্ষে আর যাঁহারা বাকী থাকেন, তাঁহারা সেই "আমরা"র অন্তর্গত।

পাঠকবর্গের মধ্যে কেহ কেহ হয়ত বলিবেন যে, বড়দিনের হৈ-চৈ ও আনন্দ ত' সকলেই উপভোগ করিয়াছে। যাঁহারা বড়দিনের হৈ-চৈ ও আনন্দ উপভোগ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বাদ দিলে আর কে বাকী থাকে, তাহাই তাঁহাদিগের জিজ্ঞাস্য হইবে। বাস্তবিক পক্ষে, অগণিত সিনেমা, থিয়েটার, ক্রিকেটের মাঠ, হোটেল, রেস্তোরাঁ, বড় লোকের মজলিস্ এবং হিন্দু-মহাসভার বার্ষিক সভা, প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্যের বার্ষিক রসনৃত্য-ক্ষেত্র, বোলপুরের আনন্দক্ষেত্র, ওয়ার্দ্ধার আশ্রম-ক্ষেত্র, ওয়ার্দ্ধা শিক্ষা-পরিকল্পনার গবেষণা-ক্ষেত্র, যুক্ত-প্রদেশের রাজনৈতিক অগ্রগতির বাস্তু-ক্ষেত্র, পাটনার মুসলমান নেতৃবর্গের ও ছাত্রবর্গের হুঙ্কার-ক্ষেত্র, কলিকাতার ছাত্র-সম্মেলন ও স্বাধীনতা অভিনয়ের ক্ষেত্র, বেঙ্গল অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরীর জ্ঞানোদীপনী ক্ষেত্র প্রভৃতি স্থানে যে লক্ষ লক্ষ অথবা ক্রোড় ক্রোড় মানুষ সমবেত হইয়াছিলেন, তাহার প্রতি নজর করিলে বিশাল ভারতবর্ষের সকলেই যেন বড়দিনের আনন্দে নাচিয়া উঠিয়াছিলেন, ইহা আপাতদৃষ্টিতে মনে হইয়া থাকে।

ইহারা আপাতদৃষ্টিতে যতই অসংখ্য বলিয়া পরিজ্ঞাত হউন না কেন, ভারতবর্ষের ছত্রিশ কোটীর তুলনায় ইহাঁরা কয় জন, তাহাই আমরা আজ পাঠকবর্গকে ভাবিতে অনু-

রোধ করিতেছি। পাঠক, নেতৃবৃন্দের আস্ফালন, রক্ত-নৃত্য, উপাসনা, হুঙ্কার, আনন্দ-কল্লোল অথবা বিস্তৃত ভাষায় তাঁহাদিগের রতি, হাস, শোক, ক্রোধ,উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা, বিস্ময়, নির্ব্বেদ, গ্লানি, শঙ্কা, অসূয়া, মদ, শ্রম, আলস্য, দৈন্য, চিন্তা, মোহ, স্মৃতি, ধৃতি, ব্রীড়া, চপলতা, হর্ষ, আবেগ, জড়তা, গর্ব্ব, বিষাদ, ঔৎসুক্য, নিদ্রা, অপস্মার, সুপ্তি, প্রবোধ, অমর্ষ, অবহিত্থতা, উগ্রতা, মতি, ব্যাধি, উন্মত্ততা, মরণ, ত্রাস এবং বিতর্ক প্রভৃতি যত কিছু ভাব আছে, তাহা এই বড়দিনের সময় সকলই ফুটিয়া উঠিয়াছে। উপরোক্ত একচত্বারিংশৎ ভাবের প্রত্যেকটি নেতৃবর্গের ললাটে প্রতিভাত দেখা গিয়াছে বটে, কিন্তু ঐ একচত্বারিংশৎ ছাড়া আরও আটটি ভাব এই বিশ্ব-দুনিয়ার বিদ্যমান আছে। সেই আটটি ভাবের খেলা আমাদিগের নেতৃবর্গের মধ্যে প্রায়শঃ দেখা যায় না। যাহারা প্রতি-নিয়ত স্তম্ভিত, ঘেমাক্ত ও রোমাঞ্চিত হইয়া থাকে, যাহারা দৌর্ব্বল্যের জন্য স্বরহীন হয়, যাহারা আহারাভাবে স্বাদ-জ্ঞানবিহীন হইয়া পড়ে, যাহারা সর্ব্বদাই বেপথু, বিবর্ণ ও অশ্রু-প্লবযুক্ত, তাহাদিগের সন্ধান বড়দিনের হৈ-চৈ-ক্ষেত্রে নেতৃবর্গের সভা ও মিলন-ক্ষেত্রে পাওয়া যায় নাই।

যাহাদিগের দেখা এই নেতৃবর্গের আখড়ায় পাওয়া যায় নাই, তাহারা আমাদিগের ছত্রিশ-কোটীর কয়জন, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে, একবার নেতৃবর্গের আখড়ারূপী নরক ছাড়িয়া দিয়া পল্লীগ্রামে প্রবেশ করিতে হইবে। সে স্থান বড় দুর্গন্ধ। বড় পূতিগন্ধযুক্ত। সেখানে মোটর গাড়ীর রাস্তা নাই, রেল ও এরোপ্লেনের ষ্টেশন নাই, থিয়েটার নাই, সিনেমা নাই, বায়স্কোপ নাই, হোটেল নাই,রেস্তোরাঁ নাই, প্রগতির নৃত্য নাই, আনন্দের কল্লোল নাই, প্রণয়ের কপটতা নাই, বৈজ্ঞানিকের ঝঞ্ঝার নাই, মূর্খ-পণ্ডিতের গোঁড়ামির আস্ফালন নাই। আছে কেবল প্রকৃতির সহিত তথাকথিত সভ্যতার বিবাদ। সভ্যতা তথায় প্রবেশ করিতে পারে নাই, কখনও পারিবে না,অথচ নির্ম্মম সভ্যতা কোমল প্রকৃতিরাণীর সহিত দ্বন্দ্ব-প্রবৃত্তি হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে সম্মত নহে। তাই পল্লীগ্রামে কোমলতা, শান্তি ও লক্ষ্মী-প্রসবিনী মা আমাদিগের বিধ্বস্তা হইয়া পড়িয়াছেন। নির্ম্মমতা যখন মাতৃজঠরকে বিধ্বস্ত করিয়া তোলে, তখন কি বীভৎস দৃশ্যের অভ্যুদয় হইতে পারে, তাহা পাঠক একবার কল্পনা করুন। এই কল্পনায় কৃতকার্য্য হইতে পারিলে আপনি যেখানে আছেন, সেইখানে বসিয়াই পল্লীগ্রামের চিত্র আপনার মানস-নেত্রে অনুভব করিতে পারিবেন। পাঠক, দুর্গমতার কথা ভাবিয়া কম্পিত হইবেন না। আসুন, অগ্রসর হউন, সভ্যতার দূতগুলির কৃতকার্য্যতা পর্য্যবেক্ষণ করুন। আপনারা কখনও দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত স্থানে রক্ত-মাংসবিহীন, শুষ্ক-মেদ, শুষ্ক-অস্থি, শুষ্ক-মজ্জা, শুষ্ক-বসা ও শুষ্ক-চর্ম্ম যুক্ত মানবাবয়ব দেখিয়াছেন কি? যদি না দেখিয়া থাকেন, তাহা হইলে দেখিবেন চলুন! তাহারা কোটী কোটী সংখ্যায় প্রতি পল্লী-গ্রামে বিরাজিত রহিয়াছে। তাহারা পোলাও, কোর্ম্মা, কারী অথবা চপ-কাটলেটের স্বাদ জানে না। সে স্বাদ তাহারা চাহে না। ছাগলের দুগ্ধ অথবা বেদানার রস তাহারা যাচ্ঞা করে না। চাহে তাহারা দুটী মোটা ভাত, অথবা দুইখানি অর্দ্ধ-সিদ্ধ মোটা রুটী, এক খাবোল নুন ও কয়েকটি মরিচ। তাহাও তাহারা পায় না। একমুঠো 'চানা' চিবাইয়া এক লোটা জল খাইতে পাইলে তাহারা অনেক সময় তৃপ্তি অনুভব করে। তাহাও তাহাদিগের ভাগ্যে জুটে না। অথচ তাহারাই আপনা-দিগের বিলাসের দ্রব্য সরবরাহ করিতেছে। আপনারা তাহাদিগকে শিক্ষা ও সভ্যতার নামে নানারকমের দ্রব্যের জন্য প্রলুব্ধ করিয়া তুলিয়াছেন। ঐ প্রলোভনের বশে প্রমত্ত হইয়া যাহার দ্বারা রক্তমাংসের উৎপত্তি ঘটিয়া থাকে, সেই শস্যের বিক্রয়ে তাহারা লালায়িত হয় এবং আপনারা কতিপয় কাগজ ও ধাতুর বিনিময়ে উহা ক্রয় করিয়া পরোক্ষভাবে তাহাদিগের রক্ত ও মাংস কাড়িয়া লইয়া থাকেন। পাঠক, আপনারা কত বড় পাপী এক বার ভাবিয়া দেখিবেন কি? আপনাদিগের নিজের ও সন্তান-সন্ততির অস্বাস্থ্য, অশান্তি, অসদ্বৃত্তি, নফরগিরী, অর্থাভাব, অকাল-বার্দ্ধক্য ও অকাল-মৃত্যু কি অমূলক?

তাহারা শুধু যে অনাহারে এতাদৃশ অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহা নহে। অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে

যে, ম্যালেরিয়া, কলেরা ও বসন্ত প্রভৃতি দুরারোগ্য ব্যাধি-সমূহও তাহাদিগকে প্রতিনিয়ত ঘিরিয়া বসিয়া রহিয়াছে। ইহাও বর্ত্তমান সভ্যতার নির্ম্মমতার পরিচায়ক। বর্ত্তমান সভ্যতার দূত—আপনাদিগের রেল-গাড়ী, মোটর-রাস্তা, পুল ও সহস্রবন্ধ নদীসমূহের অবাধ গতির বাধা প্রদান করিতেছে। ফলে নদীসমূহ ক্রমেই শুষ্ক হইতে শুষ্কতর হইয়া পড়িতেছে এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে পল্লীগ্রামের জল-হাওয়া বিবিধ জটিল রোগের কীটাণুর আবাসস্থল হইয়া উঠিয়াছে।

অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, পল্লীগ্রামের এই রক্তমাংসহীন মানুষগুলি আমাদিগের ছত্রিশ কোটীর বিশ কোটী।

যাঁহারা আপনাদিগের মাতা, ভগ্নী, দুহিতা ও পত্নী, তাঁহারা যদি বস্ত্রাভাবে উলঙ্গ হইতে বাধ্য হন, তাহা হইলে আপনাদিগের মনে কি ভাবের উদ্ভব হইতে পারে, তাহা একবার চিন্তা করুন এবং ঐ ভাব লইয়া চাহিয়া দেখুন যে, পল্লীগ্রামের কোটী কোটী নারী ও বালিকা কখনও বা সম্পূর্ণ উলঙ্গাবস্থায়, কখনও বা অর্দ্ধোলঙ্গাবস্থায় জীবন-যাপন করিতে বাধ্য হইতেছে। পাঠক, আপনারা কি পাষাণ?

আমাদিগের ছত্রিশ কোটীর এই বিংশতি কোটী বড়-দিনের আনন্দ উপভোগ করে নাই, এই আনন্দ তাহারা জানে না, এই আনন্দ এখনও তাহারা চাহে না।

ছত্রিশ কোটীর ঐ বিংশতি কোটী বাদ দিলে বাকী যে ষোল কোটী থাকে, তাহারা সকলেও যদি সম্পূর্ণরূপে কোন আনন্দ উপভোগ করিতে পারিত, তাহা হইলেও আমাদিগের মত ক্ষুদ্র মানুষের এত বেশী আপশোষ করিবার কোন কারণ বিদ্যমান থাকিত না।

বিংশতি কোটী খাঁটি কৃষক বাদ দিলে যে ষোল কোটী বিদ্যমান থাকে, তাহার মধ্যে এগার কোটী ছুতার, কর্ম্ম-কার, কাঁসারী, তাঁতী ও জোলা প্রভৃতি কুটীর-শিল্পী। কুটীর-শিল্পিগণ এখনও অগ্নি-চর্ব্বণায় হয় নাই বটে, কিন্তু দারিদ্র্যের প্রপীড়ন ও অর্থের অনটন তাহাদিগের মধ্যেও সম্পূর্ণভাবে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, টাকা, আনা, পয়সার অর্থ কোন দিনই তাহারা বহুল পরিমাণে উপভোগ করিতে পারে নাই বটে, কিন্তু একশত বৎসর আগেও অন্নাভাব অথবা স্বাস্থ্যাভাব অথবা চাকুরীরূপী নরকগিরী যে কি জিনিষ, তাহা তাহারা জানিত না। তখনও আত্মীয়-কুটুম্বগণকে আদর-আপ্যায়ন করিবার কোন সামগ্রীর অভাব তাহারা অনুভব করিত না। হিন্দু-মুসলমান-নির্ব্বিশেষে তাহাদিগের অনেকেরই ঘরে ঘরে তখনও বারমাসে তেরপার্ব্বণের আনন্দ-কোলাহল ধ্বনিত হইত। কিন্তু এখন আর তাহাদিগের সে দিন নাই। এই এগার কোটী কুটীর-শিল্পিগণও বড়দিনের আনন্দের কোন খবর রাখিতে পারে না এবং কোন খবর রাখে না।

ছত্রিশ কোটীর এই একত্রিশ কোটী বাদ দিলে, বাকী যে পাঁচ কোটী থাকেন, তাঁহারা প্রায়শঃ চাকুরীজীবী, উকিল, ডাক্তার ও বিভিন্ন ব্যবসায়ী, যন্ত্রশিল্পের শ্রম-জীবী ও তাঁহাদের সন্তান-সন্ততি। একমাত্র তাঁহারাই বড়-দিনের আনন্দে যোগদান করিয়াছেন। এই ছত্রিশ কোটীর মধ্যে কেবলমাত্র ঐ পাঁচ কোটী বড়দিনের আনন্দে যোগদান করিয়াছেন বটে, কিন্তু এই পাঁচ কোটীর মধ্যেই বা কয় জন ঐ আনন্দ যথাযথভাবে উপভোগ করিতে পারিয়াছেন?

সংবাদপত্রের পাতা উল্টাইয়া দেখুন, ব্যক্তিগতভাবে সাধারণ রকমে সংবাদ সংগ্রহ করুন, দেখিতে পাইবেন—কোন পরিবার বা আত্মহত্যার নিষ্ঠুর কাহিনীতে মর্ম্মাহত, কোন পরিবার বা অকালমৃত্যুর শোকে বিধ্বস্ত, কোন পরিবার বা আসন্ন অকালমৃত্যুর আশঙ্কায় ব্যাকুলিত, কোন পরিবার বা পুত্র-কন্যার বিদ্রোহ ও দুশ্চরিত্র লুক্কায়িত করিবার জন্য শশব্যস্ত, কোন পরিবার বা পরিজনের বেকার অবস্থার জন্য আকুলিত, কোন পরিবার বা প্রয়োজনীয় অর্থাভাবে জর্জ্জরিত, কোন পরিবার বা রেল ও মোটর-গাড়ীর দুর্ঘটনার জন্য কালিমামুক্ত, কোন পরিবার বা চুরি, ডাকাতি ও প্রতারণার জন্য সন্ত্রস্ত, কোন পরিবার বা ব্যবসা-বাণিজ্যের মন্দাবস্থার জন্য হা-হুতাশগ্রস্ত, কেহ বা প্রণয়িনীর বিশ্বাসঘাতকতার জন্য উত্তেজনা-গ্রস্ত, কেহ বা প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য লালায়িত! যে শান্তি থাকিলে আনন্দ যথাযথভাবে উপভোগ করা যায়,

তাহা চিরদিনের জন্য মনুষ্য-সমাজ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে।

খুঁজিয়া দেখুন, প্রকৃত আনন্দ প্রায়শঃ কাহারও হৃদয়ে স্থান পায় না।

তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই যে, তবে বড়দিনের মাতা-মাতি কিসের জন্য, প্রকৃত আনন্দ প্রায়শঃ কুত্রাপি এখন আর স্থান পায় না। স্থান পায় কেবল আনন্দের অভিনয় এবং তজ্জনিত মাতামাতি।

এ সময় আমাদিগের নেতৃবর্গ কি করিতেছেন, তাহা একবার অনুসন্ধান করিতে হইবে।

হিন্দু-মহাসভায় বার্ষিক সভায় প্রবেশ করুন, প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্যের রসনৃত্য-ক্ষেত্রে স্থান গ্রহণ করুন, বোলপুরের আনন্দ-ক্ষেত্র পর্য্যবেক্ষণ করুন, ওয়ার্দ্ধার আশ্রম-ক্ষেত্র দর্শনপ্রার্থী হউন, ওয়ার্দ্ধা শিক্ষা-পরিকল্পনার গবেষণা-ক্ষেত্রের শ্রোতা হউন, যুক্তপ্রদেশের রাজনৈতিক অগ্রগতির বাঙ্ময়-ক্ষেত্রের বাদনা শ্রবণ-নিরত হউন, পাটনায় মুসলমান নেতৃবর্গের ও ছাত্রবর্গের হুঙ্কার লক্ষ্য করুন—কলিকাতার ছাত্র-সম্মেলন ও স্বাধীনতা অভিনয়ের রঙ্গনৃত্যে যোগদান করুন, ইয়োরোপীয়ান অ্যাসোসিয়েশনের মিলন-ক্ষেত্রে মিলিত হউন, চেম্বার অফ কমার্সের জ্ঞানোদ্দীপনী-ক্ষেত্রের দিকে জ্ঞানপিপাসু হইয়া তাকাইয়া থাকুন, ঐ স্থানের প্রত্যেক বক্তৃতাটি পর্য্যালোচনা করুন, সর্ব্বত্রই রকম-বেরকমের আস্ফালন, আত্ম-বিজ্ঞাপন ও বিনয়ের নামে আত্মম্ভরিতার পরিচয় পাইবেন। দেশের যে একত্রিশ কোটী সর্ব্বদা অর্থাভাবে, স্বাস্থ্যাভাবে এবং অশান্তিতে জর্জ্জরিত, তাহারাও যে তাঁহাদের কেহ, তাহাদের জন্য যে মানুষের কোন কর্ত্তব্য আছে, এমন কোনভাব কোন বক্তৃতার কুত্রাপি খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। কি করিয়া মানুষের অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব ও অশান্তি সর্ব্বতোভাবে দূরীভূত হইতে পারে, তাহার একটি কথাও কোন একটী বক্তৃতার কোন অবজ্ঞাত কোণেও স্থান পায় নাই।

তাই আমরা বলি যে, বড়দিনের পাশবিক আনন্দ আমরা চাই না। নেতৃবর্গের এই দ্রুবয়-বিদারক আস্ফালন ও নৃত্য না দেখিবার জন্য যদি আমাদিগকে অন্ধ হইতেও হয়, তাহাও বরং ভাল, তথাপি যেন তাঁহাদিগের ঐ লজ্জা-উৎপাদক চেহারা আমাদিগকে কখনও দেখিতে না হয়। তাঁহারা তাঁহাদিগের নিজেদের চাল-চালনে লজ্জিত হন না বটে, কিন্তু আমরা উহা দেখিলে অথবা ভাবিলে লজ্জিত হইয়া থাকি। ইহাঁদের বড়দিনের আনন্দের কথা শুনিলে আমাদিগের শুধু বলিতে ইচ্ছা হয়, মা, কতদিন আর এই বীভৎস দৃশ্য দেখাবি, মা! অপদার্থ এই দুঃখী সন্তান তোর কোল ভিক্ষা করে, মা!

গান্ধীজীর সংগঠন-জ্ঞানের নমুনা

সমগ্র মানব-সমাজ অধুনা যে অসংখ্যক সমস্যার সম্মুখে সমাসীন, সেই সমস্যাগুলি আমাদিগের মতে, মূলতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণীর নাম আর্থিক সমস্যা, দ্বিতীয় শ্রেণীর নাম স্বাস্থ্য-সমস্যা এবং তৃতীয় শ্রেণীর নাম চরিত্র-সমস্যা।

আর্থিক সমস্যার সমাধান করিতে পারিলে, দরিদ্রের মোটা ভাত ও মোটা কাপড় প্রভৃতির অভাব, ধনীর মোটর-গাড়ী ও সুসজ্জিত অট্টালিকা প্রভৃতির অভাব তিরোহিত হইতে পারে। যে সঙ্কেতে মানব-সমাজের প্রত্যেকের প্রত্যেক রকমের আর্থিক অভাব দূর করা অসম্ভব হয়, তাহা সঙ্কেত হিসাবে যতই প্রসিদ্ধি লাভ করুক না কেন, উহাকে আর্থিক সমস্যার সমাধানের সর্ব্বাঙ্গীণ সঙ্কেত বলিয়া আদর করা সঙ্গত নহে। "মানুষ যতই উৎকর্ষ লাভ করুক না কেন, দারিদ্র্যকে সর্ব্বতোভাবে মনুষ্য-সমাজ হইতে দূর করা সম্ভব নহে"—এবংবিধ মতবাদ পোষণ করিলে, "সর্ব্বনিয়ন্তা জীবের সৃষ্টি সাধন করিয়া তাহার আহার্য্যের ব্যবস্থা করেন নাই"—ইহাই পরোক্ষ-ভাবে বলা হইয়া থাকে। সর্ব্বনিয়ন্তার সর্ব্বব্যাপী কার্য্য কি করিয়া প্রত্যক্ষ করিতে হয়, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, মনুষ্যের আর্থিক দারিদ্র্য সম্বন্ধীয় উপরোক্ত মতবাদ আদৌ সুচিন্তিত নহে।

মানুষের আর্থিক সমস্যা সর্ব্বতোভাবে বিদূরিত করিতে

হইলে তিনটী বিষয়ের জ্ঞান ও একটী কর্ম্ম-ক্ষমতার প্রয়োজন হয়।

কোন্ কোন্ বস্তু কতখানি পরিমাণে এবং কিরূপভাবে ব্যবহার করিলে সুস্থ শরীর ও সুস্থ মন লইয়া মানুষ দীর্ঘ-যৌবন ও দীর্ঘজীবন উপভোগ করিতে পারে, এতদ্বিষয়ক জ্ঞান মানুষের আর্থিক সমস্যা সমাধানের সর্ব্বপ্রথম সঙ্কেত।

কোন্ কোন্ বস্তু কতখানি পরিমাণে এবং কিরূপ ভাবে ব্যবহার করিলে মানুষের শরীর ও মন অসুস্থ হইয়া পড়ে এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে মানুষ অকালবার্দ্ধক্য ও অকালমৃত্যুর গ্রাস হইয়া থাকে, এতদ্বিষয়ক জ্ঞান মানুষের আর্থিক সমস্যা সমাধানের দ্বিতীয় সঙ্কেত।

জল ও স্থল-মিশ্রিত এই ভূ-মণ্ডলে যত কিছু দ্রব্য ও কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার প্রত্যেকটীর কিয়দংশ মানুষের উপাদানের সহিত সমতাবিশিষ্ট, আর কিয়দংশ উহার সহিত বৈষম্য-সম্পন্ন। কেন এইরূপ হইয়া থাকে, এতদ্বিষয়ক জ্ঞান মানুষের আর্থিক সমস্যা সমাধানের তৃতীয় সঙ্কেত।

যে যে বস্তু মানুষের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উৎকর্ষ-সাধক, যাহা করিলে সেই সেই বস্তু মানুষের অনায়াস-লভ্য হইতে পারে, এবং যে যে বস্তু মানুষের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের অপকর্ষ-সাধক, যাহা করিলে সেই সেই বস্তু মানুষের কষ্ট-লভ্য হইতে পারে—এবংবিধ কর্ম্ম মানুষের আর্থিক সমস্যা সমাধানের চতুর্থ সঙ্কেত।

একটু গভীর ভাবে চিন্তা করিবার ক্ষমতা অর্জ্জন করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, উপরোক্ত চারিটী সঙ্কেত উদ্ধার করিবার পন্থা নির্ণয় করিতে না পারিলে অন্য কোন পন্থায় মানুষের সর্ব্ববিধ অর্থাভাব দূর করা কোন ক্রমেই সম্ভবযোগ্য নহে।

এই চারিটী সঙ্কেতের প্রথম তিনটী জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ক, চতুর্থটী সংগঠন বিষয়ক।

উপরোক্ত চারিটী সঙ্কেত উদ্ধার করিতে হইলে, রস, তেজ, বায়ু এবং আকাশ (intermolecular space or ether) নামক যে চারিটী বস্তু বায়ু-মণ্ডল, জল, স্থল, অচর-জীব এবং চর-জীব প্রভৃতি প্রত্যেকের শক্তির উন্মেষ, বিকাশ, বৃদ্ধি ও ক্ষয় প্রতিনিয়ত সাধিত করিতেছে, সেই চারিটী বস্তুর উৎপত্তি-স্থান কোথায় এবং কিরূপে ঐ চারিটী বস্তুর প্রত্যেকের উন্মেষ-প্রবৃত্তি, উন্মেষ, উন্মেষ-বৃদ্ধি, বিকাশ-প্রবৃত্তি ও বিকাশ সাধিত হইতেছে, তাহা জানিবার প্রয়োজন হয়। ইহা ছাড়া, যে-বায়ুমণ্ডল আমাদিগের চক্ষের সম্মুখে বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই বায়ু-মণ্ডল, জল-ভাগ স্থল-ভাগ, চর-জীব ও অচর-জীবের উৎপত্তি কিরূপে হইতেছে, প্রকৃতিতে সমস্তই বায়ু-মণ্ডল না হইয়া কেনই বা সংখ্যাহীন অণু-পরমাণুবিশিষ্ট জল-ভাগ, অনুভূতি-সম্পন্ন স্থল-ভাগ, সংখ্যাযুক্ত অথচ স্ত্রী-পুরুষ-লিঙ্গ-ভেদ-বিহীন অচর জীব, এবং সংখ্যাযুক্ত ও স্ত্রী-পুরুষ-লিঙ্গ-ভেদ-যুক্ত চরজীবের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহাও জানিবার প্রয়োজন হয়।

যে অর্থ-নীতি এতাদৃশ জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই অর্থ-নীতির দ্বারা মানুষের আর্থিক সমস্যা সর্ব্বতোভাবে নিরাকৃত হইতে পারে।

একদিন উপরোক্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত অর্থ-নীতি সমগ্র মনুষ্য-সমাজে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল এবং তখনকার দিনে মানুষ ব্যক্তিগত হিসাবে কাহারও কোনরূপের নফরগিরী না করিয়া, জাতিগত হিসাবে কোন দেশ অপর কোন দেশের বাজারের (marketing) উপর নির্ভরশীল না হইয়া সর্ব্বতোভাবের সন্তুষ্টি-প্রদ প্রাচুর্য্যের মধ্যেই জীবন-যাপন করিতে পারিত। যখন ইয়োরোপীয়গণ ব্যবসা-সম্পাদনের নামে জগতের চারিদিকে ঘুরিতে ফিরিতে আরম্ভ করেন নাই, তখন তাঁহাদিগের জীবন-যাত্রা কিরূপভাবে নির্ব্বাহ হইত, তাহার ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে আমাদিগের উপরোক্ত কথার সত্যতা প্রতিপন্ন হইবে।

তৎপরবর্ত্তী কালে, উপরোক্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত অর্থ-নীতি মানুষ বিস্মৃত হইয়াছে এবং মনুষ্য-সমাজে অর্থ-সমস্যার বিকটতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

অর্থ-সমস্যার বিকটতা সূচিত হওয়া অবধি, মানুষ পুনরায় অর্থ-নীতির সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তাহার ফলে অ্যাডাম স্মিথ হইতে আরম্ভ করিয়া মার্শ্যাল পর্য্যন্ত

বিবিধ অর্থ-নৈতিকের উৎপত্তি সাধিত হইয়াছে। কিন্তু যে-রাস্তায় চলিলে সর্ব্বাঙ্গীন অর্থ-নীতির দেখা পাওয়া সম্ভব হয়, সেই রাস্তার নির্দ্দেশ মানুষ এতাবৎ ভাগ্যবলে লাভ করিতে সক্ষম হয় নাই। ইহারই ফলে এত বড় বড় অর্থ-নীতি ও অর্থ-নৈতিকের উদ্ভব হওয়া সত্ত্বেও মনুষ্যসমাজের প্রায় প্রত্যেকের আর্থিক অবস্থা উত্তরোত্তর ঘোরাল হইয়া উঠিতেছে এবং এমন কি মনুষ্য-সমাজের ভিত্তি পর্য্যন্ত টলটলায়মান হইয়া পড়িয়াছে। যাঁহারা অ্যাডাম্ স্মিথ প্রভৃতি আধুনিক কোন অর্থ-নৈতিকের কোন গ্রন্থ সমালোচকভাবে অধ্যয়ন না করিয়া ও পক্ষীর মত উপরোক্ত গ্রন্থসমূহের স্থানে স্থানে ঠোকর দিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কু-গঠনবশতঃ অর্থ-নীতি বিষয়ে পি-এইচ. ডি., পি. আর. এস. প্রভৃতি উচ্চ উপাধি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাঁহারা আমাদিগের কথা বুঝিতে পারিবেন না বটে, কিন্তু আমাদিগের কথা যে সত্য, তাহা আধুনিক অর্থ-নৈতিকগণের যে-কোন গ্রন্থ সমালোচক-ভাবে অধ্যয়ন করিলে প্রতীয়মান হইবে। প্রকৃতি-বিষয়ক জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত অর্থ-নীতি পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, সাধারণ মনুষ্যের মস্তিষ্কে অর্থ-নীতি বিষয়ে যতটুকু বুদ্ধির বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, অ্যাডাম স্মিথ, মার্শ্যাল প্রভৃতি গ্রন্থকারের ও বড় বড় উপাধিধারী তাঁহাদিগের অনুচরবর্গের কথায় ও লেখায় ততটুকু বুদ্ধির পরিচয় পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না।

'ব্যোম', 'তেজ', 'বায়ু' ও 'আকাশ'-সম্বন্ধীয় যে জ্ঞান-বিজ্ঞান পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে মানুষের আর্থিক সমস্যা সর্ব্বতোভাবে নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে, সেই বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষের স্বাস্থ্য-সমস্যা এবং চরিত্র-সমস্যাও সর্ব্বতোভাবে সমাধান করা সম্ভব হয়।

এতাদৃশ কথার সার্থকতা কোথায়, তাহা আমরা পাঠকবর্গকে অনেকবার দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। এখানে তাহার পুনরুল্লেখ করিব না।

'ব্যোম', 'তেজ', 'বায়ু' ও 'আকাশ'-সম্বন্ধীয় যে জ্ঞান-বিজ্ঞান পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে মানুষের আর্থিক সমস্যা, স্বাস্থ্য-সমস্যা ও চরিত্র-সমস্যা সর্ব্বতোভাবে সমাধান করা সম্ভব হয়, তাহা গান্ধীজী প্রভৃতি নেতৃবর্গ আদৌ পরিজ্ঞাত নহেন। ফলে, এই নেতৃবর্গ দেশের বিবিধ সমস্যা সমাধানের নামে দেশবাসিগণকে যে সমস্ত সঙ্কেত প্রদান করিয়া আসিতেছেন, তাহা প্রায়শঃ অর্থহীন এবং প্রয়োগের অযোগ্য হইয়া থাকে। ঋষি-প্রণীত সংস্কৃত ভাষায় "অর্থ", "স্বাস্থ্য" ও "চরিত্র" বলিতে যাহা বুঝায়, তদনুসারে গান্ধীজী প্রভৃতি এই নেতৃবর্গ প্রায়শঃ নিজেরাই অর্থহীন, স্বাস্থ্যহীন ও চরিত্রহীন এবং তাঁহাদিগের কার্য্য-ফলে তাঁহাদিগের প্রতি অনুরক্ত যুবকবৃন্দও অর্থহীন, স্বাস্থ্যহীন ও চরিত্রহীন হইয়া পড়িতেছেন। সমগ্র দেশটী একটী তাণ্ডবনৃত্যের আখড়াস্থল হইয়া উঠিয়াছে। ইহাদের প্রভাবে এখানকার মানুষের বুদ্ধি ক্রমশঃ জড়তা প্রাপ্ত হইতেছে। যদি ভারতীয়গণের একজনেরও বুদ্ধি অটুট থাকিত, যদি প্রায়শই তাঁহাদিগের বুদ্ধি জড়তা প্রাপ্ত না হইত, তাহা হইলে ঐ "সোনার চাঁদ" যুবকগুলি মাতৃহৃদয় ব্যথিত করিয়া শস্য-শ্যামলা ভারতবর্ষে ভিখারীর মত দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া ফিরিয়া নফরগিরীর জন্য ব্যাকুল হইতে, অথবা অশিক্ষিতা ম্যাজিষ্ট্রেটী প্রভৃতি নফরগিরী পাইয়া আত্ম-বিক্রয় হইতে বাধা হইত না এবং তাহারা প্রায়শঃ অকালবার্দ্ধক্য ও অকালমৃত্যুর গ্রাস হইয়া উঠিত না।

যদি ভারতীয়গণের বুদ্ধি প্রায়শই জড়তা প্রাপ্ত না হইত, তাহা হইলে তাঁহার অপগণ্ডগুলি "পাপাত্মা" "প্রতারক" প্রভৃতি আখ্যানেও সম্পূর্ণভাবে বর্ণিত হয় না, সেই গান্ধীজী "মহাত্মা" নামে বিকাইতে পারিতেন না।

গান্ধীজী যে অত্যন্ত বুদ্ধিহীন ও তাঁহার কথায় যে মানুষ প্রতারিত হইয়া থাকে, তাহা তাঁহার যে কোন বক্তৃতা অথবা লেখা বিশ্লেষণ করিলে প্রতিভাত হয়।

সম্প্রতি তিনি ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সংস্কার সম্বন্ধে কয়েকটী বাণী তাঁহার 'হরিজন' পত্রিকায় প্রচার করিয়াছেন।

সুরাট ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের অগ্রেসী সভ্যগণ আগামী এপ্রিল মাসে জাতীয় সপ্তাহ পালন করিবার উদ্দেশ্যে একটী এস্তেহার জারী করিয়াছেন। এই এস্তেহারকে ভিত্তি করিয়া গান্ধীজীর বাণী কয়টী প্রচারিত হইয়াছে।

ঐ বাণী কয়েকটীর প্রথম কথা, "যদি তোমরা আমার আশীর্ব্বাদ আশা কর, তাহা হইলে তোমাদিগকে এখনই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। অবসর-যাপনের মত কেবল

এক সপ্তাহের জন্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে চলিবে না। তোমরা যতদিন সভ্য থাকিবে, ততদিন বেতনভোগী কর্ম্মচারীর মত নিয়মিতভাবে তোমাদিগকে কার্য্য করিতে হইবে। অবশ্য, তোমাদিগের সাংসারিক ও অপরাপর কর্ত্তব্য যাহাতে যথাযথভাবে নির্ব্বাহ হয়, তদ্বিষয়েও তোমাদিগকে অবহিত হইতে হইবে।"

("If you want my blessing, you must begin work now and not merely for one week as a holiday, but for the whole term of your office and regularly as if you were members of the paid staff—no doubt consistently with your domestic and other obligations.")

এই কথাগুলি আপাতভাবে শুনিতে যে দেশপ্রাণতার পরিচায়ক, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী যে সমস্ত ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপ্যাল বোর্ড বিদ্যমান আছে, তাহার কয়জন সভ্য অবৈতনিকভাবে বেতনভোগী কর্ম্মচারীর মত প্রতিদিন ৮।১০ ঘণ্টা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের কার্য্য সম্পাদন করিয়াও স্ব স্ব সাংসারিক ও অপরাপর কর্ত্তব্য নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম? গান্ধীজী নিজে কোন পাবলিক ফণ্ডের সহায়তা অথবা বন্ধুবর্গের উপহার না লইয়া দেশের কাযের নামে তাঁহার Inner Call-এর রসনামৃত শুনাইবার কার্য্য ও তৎসঙ্গে সঙ্গে স্বকীয় জীবিকানির্ব্বাহের কার্য্য পরিচালনা করিতে কয়দিন সক্ষম হইতে পারেন, তাহা তিনি ভাবিয়া দেখিবেন কি?

একটু ভাবিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, নেতৃবর্গের এতাদৃশ কার্য্যতালিকার জন্যই প্রত্যেক বোর্ডে উৎকোচ আদান-প্রদানের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাইতেছে। এই শ্রেণীর উক্তি আপাতদৃষ্টিতে দেশ-প্রাণতার পরিচায়ক হইলেও বাস্তবিক পক্ষে নিজেকে ও দেশকে ঠকাইবার প্রবৃত্তির পরিচায়ক।

আমাদিগের মতে, মানুষের আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য অনায়াস-লভ্য না হইলে কাহারও পক্ষে, এমন কি গান্ধীজীর পক্ষেও সৎভাবে 'ঘরের খাইয়া বনের মহিষ' তাড়ান সম্ভব নহে। আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য অনায়াস-লভ্য করিতে হইলে কি কি প্রয়োজন, তাহার সন্ধান পাইলে দেখা যাইবে যে, তখন আর মিউনিসিপ্যাল ও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সংগঠনেরও কোন প্রয়োজন থাকে না।

কাযেই বলিতে হইবে যে, আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য কি করিয়া দেশবাসীর প্রত্যেকের পক্ষে অনায়াস-লভ্য হইতে পারে, তাহার কথা না বলিয়া ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের সংস্কারের বাণী প্রচার করা স্বকালের সুশোভনীয় হইলেও হইতে পারে বটে, কিন্তু বাস্তব সংসারক্ষেত্রে নির্ব্বুদ্ধিতা ও আত্ম-প্রতারণার পরিচায়ক।

গান্ধীজীর দ্বিতীয় কথা :—

"যে সব বিষয়ে ভোট না দিলে নয়, সেই সব বিষয়ে কেবলমাত্র ভোট দিবার জন্য তোমরা কার্য্যালয়ে মিলিত হইবে। কিন্তু কখনও দীর্ঘস্থায়ী বাদানুবাদে অথবা ক্ষুদ্র কর্ম্মনিয়োগের বাগ্‌বিতণ্ডায় অথবা তাদৃশ কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে না।"

("You will meet officially only to vote items you must, but never to hold long debates or wrangle over petty appointments and the like.")

গান্ধীজীর এই কথাটীও অবিবেচকতার দৃষ্টান্ত। দেশ যখন অসংখ্য "ব্যাস-দেবে" পরিপূর্ণ হয়, অর্থাৎ সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞান-বিজ্ঞান যখন মানুষ আয়ত্তাধীন করিতে পারে, তখন কোন বাদানুবাদ না করিয়া নিজেদের মধ্যে মানুষের পক্ষে বিষয়-বিশেষের কর্ত্তব্য স্থির করা ও ভোট প্রদান করা সম্ভববোধ্য হইতে পারে বটে, কিন্তু আজকাল মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান যে অবস্থায় উপনীত, তাহাতে কোন বিষয়ের কর্ত্তব্য স্থির করিতে হইলে, চিন্তা ও বাদানুবাদ একান্তভাবে প্রয়োজনীয় হইয়া থাকে। এতদবস্থায় চিন্তা ও বাদানুবাদ না করিয়া ভোট প্রদান করিতে হইলে যে, কর্ত্তব্য-জ্ঞান বিসর্জ্জন দিয়া "কর্ত্তাভজা" হইতে ও হাত তুলিতে হয়, তাহা বোধহয় যাঁহারা চিন্তাশীল, তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিবেন।

কাযেই, যাহাতে "কর্ত্তাভজার" দল বৃদ্ধি পায়, তাহাই করা গান্ধীজীর এই উক্তির উদ্দেশ্য, ইহা বলিতে হয়।

যদি মানুষের খাওয়া-পরার অভাব ক্রমশই করিয়া যাইতেছে বলিয়া দেখা যাইত, তাহা হইলে আমরাও

"কর্ত্তাভজা" হইতে আপত্তি করিতাম না। কিন্তু যখন দেখা যায় যে, গান্ধীজীর প্রভাবের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসীর খাওয়া-পরার অভাবও বৃদ্ধি পাইতেছে, তখন "কর্ত্তাভজা"র দলের পরিপুষ্টি সুসঙ্গত অথবা অসঙ্গত, তাহা পাঠকবর্গ বিচার করুন।

গান্ধীজীর তৃতীয় কথা :—

"তোমাদিগের বাস্তব ও অনমনীয় কার্য্য থাকিবে অফিসের বাহিরে। যে সমস্ত রাস্তা তোমরা নিজেরা নির্ম্মাণ করিবে, সেই সমস্ত রাস্তা পাইয়া তোমাদিগকে গর্ব্বানুভব করিতে হইবে।

("But your real and solid work would be extra-official. You would take pride in having first-class roads which you will have built yourselves)"।

গান্ধীজীর এই কথাটির মর্ম্ম আমরা সঠিকভাবে বুঝিতে পারিয়াছি কি না, তাহা বলিতে পারি না। ঐ কথা হইতে আমাদিগের যাহা মনে হইয়াছে, তদনুসারে বলিতে হয় যে, ডিষ্ট্রিক্ট ও মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের কংগ্রেসী সভ্য হইতে হইলে, এখন হইতে শারীরিক শ্রমজীবী হইয়া রাস্তা-নির্ম্মাণের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। ইহা হইতে আরও বুঝিতে হয় যে, গান্ধীজীর মতে দেশটা শারীরিক শ্রমজীবীতে পরিপূর্ণ হইলেই দেশোদ্ধার-কার্য্য নিষ্পন্ন হইবে। গান্ধীজী হয় ত মনে করেন যে, শারীরিক শ্রমজীবী হইলেও মানুষের পক্ষে বুদ্ধি-জীবী হওয়া অনায়াস-সাধ্য হইতে পারে। গান্ধীজী যখন 'বেদিয়া-বংশোদ্ভব' এবং 'ধনিত-শূদ্রের' কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াও নিজেকে কীর্ত্তিমান্ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন ও নেতৃত্বের কার্য্যে অসঙ্কুচিত, তখন এতাদৃশ মতবাদ তাঁহার পক্ষে সুশোভনীয় হইলেও হইতে পারে বটে, কিন্তু যাঁহারা মন, বুদ্ধি ও আত্মাকে নিজ শরীরের মধ্যে কি করিয়া প্রত্যক্ষ করিতে হয়, তাহার অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মতবাদ ও "দর্শন" উহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁহাদিগের দর্শনানুসারে মানুষ স্বভাববশেই প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণীর নাম বুদ্ধিজীবী (অথবা "আর্য্য") এবং অপর শ্রেণীর নাম শ্রমজীবী (অথবা "শূদ্র")। যাঁহারা স্বভাবতঃ বুদ্ধিজীবী হইয়া জন্ম-পরিগ্রহ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে শারীরিক শ্রমের কার্য্যে নিযুক্ত করিলে উহা কখনও সর্ব্বতোভাবে সুসম্পন্ন হয় না, আবার যাঁহারা স্বভাবতঃ শ্রম-জীবী হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে বুদ্ধি-সাধ্য কার্য্যে নিযুক্ত করিলে ঐ বুদ্ধি-সাধ্য কার্য্যও সর্ব্বতোভাবে সু-সম্পন্ন হয় না।

মানুষের এতাদৃশ স্বাভাবিক শ্রেণী-বিভাগ যে বাস্তব, তাহা স্কুলের বালকগণের স্বভাব নিরীক্ষণ করিতে পারিলে সহজেই প্রতীয়মান হয়। এক একটী ছেলে খেলাধূলার কার্য্যে যেরূপ সুনিপুণ হয়, পুস্তকপাঠের কার্য্যে সেইরূপ সুনিপুণ হয় না, আবার এক একজন ছেলে পুস্তকপাঠের কার্য্যে যেরূপ সুনিপুণ হয়, খেলাধূলার কার্য্যে সেইরূপ সুনিপুণ হয় না। পুস্তকপাঠের কার্য্য ও খেলাধূলার কার্য্য, এই উভয়েই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুনিপুণতা প্রায়শঃ একাধারে দেখা যায় না। ইহারই জন্য "কামার" মানুষকে 'কুমারে'র কার্য্যে ব্রতী না করিয়া "কামার"কে কামারের কার্য্যে এবং "কুমার"কে কুমারের কার্য্যে নিযুক্ত করা তাঁহাদিগের নির্দ্দেশ। এই নির্দ্দেশের ব্যভিচার করিলে, অর্থাৎ স্বাভাবিক বুদ্ধিজীবীকে শ্রমজীবীর কার্য্যে এবং স্বাভাবিক শ্রমজীবীকে বুদ্ধিজীবীর কার্য্যে নিযুক্ত করিলে, উভয়েরই পতন অবশ্যম্ভাবী হইয়া থাকে এবং মানবসমাজে বুদ্ধি-শ্রমশীলতা ও শারীরিক শ্রমশীলতা, এই উভয়ই হীনতা প্রাপ্ত হয়। উপরোক্ত দার্শনিকগণের কথা যে অতীব যুক্তিযুক্ত তাহার সাক্ষ্য মানবসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা। বর্ত্তমান মানবসমাজে মানুষের এই স্বাভাবিক শ্রেণী-বিভাগের তাৎপর্য্য না বুঝিতে পারিয়া কয়েকশত বৎসর হইতে উহার ব্যভিচার করিয়া আসিতেছে বলিয়াই মানবসমাজ হইতে বুদ্ধি-শ্রমশীলতা একরূপ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং শ্রমজীবীগণের শ্রমের কার্য্যকাল যাহাতে ১০ ঘণ্টার স্থলে ৭ ঘণ্টায় পরিণত হয়, তাহার চেষ্টা চলিয়া আসিতেছে। মানবসমাজে যদি বুদ্ধি-শ্রমশীলতা কথঞ্চিৎ পরিমাণেও বিদ্যমান থাকিত, তাহা হইলে সর্ব্বব্যাপী অর্থাভাব, অনাহার, চাকুরীরূপী নফরগিরী ও বেকারতা কি করিয়া সর্ব্বতোভাবে দূরীভূত হইতে পারে, তাহার একটা না একটা সঙ্কেত কাহারও না কাহারও মস্তিষ্ক হইতে এতদিনে প্রসব লাভ করিতে পারিত।

আমরা যে শ্রমিকগণের কথা বলিতেছি তাঁহাদিগের মতে বুদ্ধি-শ্রমশীলতা ও শারীরিক-শ্রমশীলতাকে ভিত্তি করিয়া মানুষের মধ্যে স্বাভাবিক শ্রেণী-বিভাগ বিদ্যমান আছে বটে, কিন্তু মানুষের মধ্যে এই শ্রেণী-বিভাগ লইয়া কোন উচ্চতা ও নীচতা বিদ্যমান নাই, কারণ সমাজ-পরিচালনার জন্য বুদ্ধি-শ্রমশীলতা যেরূপ প্রয়োজনীয়, শারীরিক শ্রমশীলতাও ঠিক ঠিক সেইরূপভাবে প্রয়োজনীয়। মানুষের স্বাভাবিক শ্রেণী-বিভাগের মধ্যে যে উচ্চ ও নীচভাব বিদ্যমান আছে, তাহা স্বাভাবিক নহে, উহা সম্পূর্ণ কু-শিক্ষাপ্রসূত। যুক্তি অনুসরণ করিলে দেখা যাইবে যে, মানুষের অবস্থার পরিবর্তন সাধন করিয়া উহার সমাক্ উৎকর্ষ সাধন করিতে হইলে কু-শিক্ষাপ্রসূত উচ্চ-নীচভাব বিদূরিত হইয়া স্বাভাবিক শ্রেণী-বিভাগ অনুযায়ী কার্য্য-বিভাগ যাহাতে সম্পাদিত হয়, তদনুরূপ সংগঠন করা একান্ত প্রয়োজনীয়।

কাজেই মিউনিসিপ্যাল ও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড-এর সভ্যমাত্রকেই শ্রমশীলীরূপে রাস্তা-নির্ম্মাণের কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ার উপদেশ দেওয়া আপাতভাবে শ্রুতিমধুর হইলেও হইতে পারে বটে, কিন্তু উহা জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিবর্জ্জিত মূর্খতার পরিচায়ক। কংগ্রেসের "কর্ত্তাভজা"গণ গান্ধীজীর রসনামৃতানুসারে ঐ কার্য্যে ব্রতী হউন, তাহাতে আমাদিগের আপত্তি নাই, কারণ, স্বভাবতঃ তাঁহারা প্রায়শঃ ঐ কার্য্যের উপযুক্ত বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে। আমাদিগের অনুরোধ, তাঁহারা তাঁহাদিগের "অবতারটী"কে যেন একটী বড় ঝুড়ী এবং বড় কোদালী প্রদান করেন এবং ঐ মহাশয়টী যাহাতে প্রতিদিন অন্ততঃ পক্ষে ৮।১০ ঘণ্টা রাস্তা-নির্ম্মাণ-কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন, তদ্বিষয়ে অবহিত হন। আমাদিগের বিশ্বাস, তিনি ভারতবাসীদিগকে যে রাস্তার আলোক গত আঠার বৎসর হইতে যেরূপভাবে দেখাইতেছেন, তাহাতে উহাই তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুরস্কার হইবে। "Example is better than precept"—এ কথাটী ভুলিয়া যাওয়া কোনক্রমেই সঙ্গত নহে। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে জওহরলালজী, সুভাষচন্দ্র, আনন্দবাজার পত্রিকার কর্ণধরগণ ও কংগ্রেসের কার্য্যকরী সভার অপরাপর সভ্যবৃন্দ যেন ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপ্যাল বোর্ড-এর সভ্যবৃন্দের স্কন্ধোপরি হইতে মুক্তিলাভ করেন। বেত্র-হস্ত সর্দ্দারের প্রয়োজন হইলে বিনা বেতনে না পাইলেও অল্প বেতনে আমরা নিযোগ প্রার্থনা করিতেছি। আমাদিগের ধরখাস্ত যেন তাঁহাদিগের স্মরণ থাকে।

গান্ধীজীর এই পরিকল্পনা যাহাতে সহজেই সিদ্ধিলাভ করে, তদুচিত উৎসাহ প্রদান করিবার জন্য সম্মুখে রাখিতে হইবে নানাবর্ণোপশোভিত আমাদের রক্তমাংসে গড়া ঐ ধাতুগণের অনাহার ও হতাশাক্লিষ্ট বদনের, ও উচ্ছৃঙ্খলতাপ্রাপ্ত আমাদের মায়ের ভাগ্যির মূর্ত্তির চিত্র। ইহা আমাদিগের হাসাসা নহে। যদি কাহারও প্রাণ থাকে তাহা হইলে তিনি দেখিতে পাইবেন যে, যখন পিতার অথবা জ্যেষ্ঠের স্পর্দ্ধা হৃদয়ের পোষণ করিয়াও পুত্র-কন্যা এবং ভ্রাতা-ভগ্নীর হতাশার ক্লেশ দূর করা অসম্ভব হয়, তখন যিনি বেহুদ্দের গৌরবে গৌরবান্বিত, তিনি ছেলে-খেলায় প্রবৃত্ত হইলে এতাদৃশ কথাগুলি প্রত্যেকের প্রাণে সজীব হইয়া উঠে।

গান্ধীজীকে আমরা 'ঘৃণিত শূদ্রে'র কার্য্যে প্রবৃত্ত বলিয়া অভিহিত করিয়াছি। ইহা আপাতদৃষ্টিতে তাঁহার পক্ষে অপমানকর বলিয়া মনে হইলেও হইতে পারে বটে, কিন্তু তাঁহাকে অপমান করা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে এবং উহা আমাদিগের সাধ্যায়ত্তও নহে। আমরা যাহা সত্য বলিয়া মনে করি, তাহাই আমরা ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিয়া থাকি। স্মৃতিপ্রণীত সংস্কৃত ভাষানুসারে, যাঁহারা গুণাগুণ বিচার না করিয়া অথবা উহা বিচার করিবার সক্ষমতা অর্জ্জন না করিয়া কথায় ও লেখায় যে সমস্ত ভাব চর্ব্বিতচর্ব্বণ, সেই সমস্ত ভাবের ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণবংশোদ্ভব হইলেও 'ঘৃণিত শূদ্রে'র কার্য্যে প্রবৃত্ত। আমরা এই অর্থেই গান্ধীজীকে 'ঘৃণিত শূদ্রের কার্য্যে' ব্যাপৃত বলিয়া অভিহিত করিয়াছি।

উপরোক্ত তিনটী কথা ছাড়া গান্ধীজীর আলোচ্য বাণীটীতে আরও অনেক কথা আছে। তাহার প্রত্যেকটীও সমানভাবে অপরিণামদর্শিতার পরিচায়ক ও নিন্দনীয়। অবসরাভাবে আমরা এখানে আর তাহার আলোচনা

করিব না। আমাদিগের বক্তব্যে তাঁহারও সন্দেহ আছে তাহা জানিতে পারিলে আমরা আবার উহার আলোচনা করিব।

উপসংহারে, আমরা দেশবাসীকে এখনও এই নেতৃবৃন্দ সম্বন্ধে সতর্ক হইতে অনুরোধ করি। কংগ্রেস না হইলে আমাদিগের কোন সমস্যারই সমাধান করা সম্ভব হইবে না। ভগবান্ স্বয়ং আমাদিগের যাবতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, ভারতীয় ও ইংরাজকে মিলনের প্রবৃত্তিতে প্রবুদ্ধ করিয়া কংগ্রেসের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহা আমাদিগের কাল্পনিক ঋষি-প্রণীত সংস্কৃত ভাষা পরিত্যাগ করিয়া "ভগবান্" কাহাকে বলে এবং তাঁহার কার্য্য কি, তাহা জানিতে পারিলে আমাদিগের উপরোক্ত কথার সত্যতা প্রতিভাত হইবে। আমাদিগের এতাদৃশ প্রয়োজনীয় কংগ্রেস আজ রাহুরূপী বিপথগামী ও অল্পবুদ্ধি নেতৃবর্গের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। দেশের কোন সমস্যার সমাধান করিতে হইলে যাঁহার কার্য্য পাপাত্মার পরিচায়ক, তাঁহাকে "মহাত্মা" না বলিয়া "পাপাত্মা" বলিয়া অভিহিত করিতে শিখিতে হইবে এবং কোন বলাবলির দ্বন্দ্বকলহে প্রবৃত্ত না হইয়া যাহাতে কংগ্রেসকে রাহুমুক্ত করা যায়, তাহার কার্য্যপদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইবে। কি সেই কার্য্য-পদ্ধতি, তাহা আমাদিগের "ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর বর্ত্তমান অবস্থা ও কর্ত্তব্য" নামক গ্রন্থ পাঠ করিলে জানা যাইবে। পাঠকবর্গকে আমরা এই গ্রন্থ পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি।

শিল্প-বাণিজ্য ও দেশের উন্নতি

অনেকে মনে করিতেছেন যে, শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করিতে পারিলেই দেশের অন্ন-সমস্যা ও বেকার সমস্যার সমাধান হইবে এবং তাহা হইলেই দেশের উন্নতি হইবে। শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি সম্বন্ধে ইঁহারা যাহা যাহা বলেন তাহা হইতে বুঝিতে হয় যে, যাহাতে বহুল পরিমাণে শিল্প-জাত দ্রব্যের উৎপত্তি হয়, যাহাতে বিদেশীয় কোন শিল্প-জাত দ্রব্য ভারতবর্ষের বাজারে বিক্রয় না হয়, যাহাতে ভারতবাসী ছাড়া আর কেহ ভারতবর্ষের বাজারে ক্রয়-বিক্রয় না করিতে পারে, তাহা করার নাম শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি।

যাহাতে বহুল পরিমাণে শিল্প-জাত দ্রব্যের উৎপত্তি হয় তাহা করিবার জন্য ইঁহারা প্রধানতঃ বিবিধ পন্থার উপদেশ দিয়া থাকেন। প্রথম,—বাষ্প-পরিচালিত যন্ত্র-শিল্পের অবলম্বন, দ্বিতীয়,—হস্ত-পরিচালিত যন্ত্রের দ্রুত কার্য্য-সাধন-বিষয়ক উন্নতি।

যাহাতে বিদেশীয় কোন শিল্প-জাত দ্রব্য ভারতবর্ষের বাজারে বিক্রয় না হয় তাহার উদ্দেশ্যেও ইঁহারা প্রধানতঃ দুইটী পন্থা অবলম্বন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর। প্রথম—বিদেশ-জাত শিল্প-জাত দ্রব্যের উপর উচ্চহারে আমদানী শুল্ক (Import duty) স্থাপন, দ্বিতীয়—স্বদেশ-প্রেমের নামে ভারতবাসিগণ যাহাতে উচ্চমূল্যে স্বদেশ-জাত দ্রব্য ক্রয় করিতে প্রবুদ্ধ হয় তদনুরূপ শিক্ষা প্রদান।

ভারতবাসী ছাড়া আর কেহ যাহাতে ভারতবর্ষের বাজারে ক্রয়-বিক্রয় না করিতে পারে তজ্জন্য কি মতলব যে অবলম্বন করা উচিত তাহা ইঁহারা এখনও সঠিকভাবে ঠিক করিয়া উঠিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। আয়-করের (Income tax) প্রস্তাবিত নূতন আইন অনুসারে বিদেশীয়গণের উপর যে উচ্চহারে আয়-কর ধার্য্য করিবার প্রথা চলিতেছে, উহা পরোক্ষভাবে বিদেশীয়-গণের ভারতবর্ষে বাণিজ্য করা অসুবিধা-জনক করিয়া তুলিবে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

একটু তলাইয়া চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, এতাদৃশ ভাবে ভারতবর্ষের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি হইতে পারে এবং ভারতবাসীর অন্ন-সমস্যা ও বেকার-সমস্যার সমাধান হইতে পারে বলিয়া যাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা পাশ্চাত্য শিক্ষা ও বিজ্ঞানের দাসানুদাস এবং তাঁহাদিগের মস্তিষ্ক চতুষ্পদ জীবগণের মস্তিষ্কের মত অসার। ইঁহারা চতুষ্পদ জীবগণের মত হিংস্র হওয়াই জীবনের কাম্য বলিয়া স্থির

করিয়া লইয়াছেন এবং মনে করেন, সমস্ত দেশবাসীকে স্বাধীনতার নামে হিংস্র করিয়া তুলিতে পারিলেই দেশের চরম উন্নতি সাধিত হইবে। এই দলের নেতা গান্ধিজী। দুঃখের বিষয়, শিক্ষিতের নামে যাঁহারা অশিক্ষিত অপেক্ষাও ঘৃণিত জীবনযাপন করিয়া থাকেন, সেই কুশিক্ষিতগণ এই গান্ধিজীকে মাথায় করিয়া নাচিতেছেন এবং দেশের মধ্যে কতকগুলি অযথা হৈ চৈ তুলিয়া দিয়া মানুষের আসল দুঃখের কথা এবং আসল দুঃখের সমাধানের চেষ্টা আবৃত করিয়া দিয়াছেন। লজ্জার বিষয় এই যে, যাঁহার প্রত্যেক কার্যাটী "ক" হইতে আরম্ভ করিয়া "ক" পর্য্যন্ত (A to Z) চতুষ্পদ জন্তুর কার্য্যের মত হিংসা-জনক তিনিই অহিংসার কথা বলিয়া থাকেন এবং আমরা তাঁহাকে একটা কিন্তু অবতারের মত মনে করিতে পারিলে গৌরান্বিত অনুভব করি।

সাদা কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, দেশের মধ্যে যাঁহারা বাক্-পটুতায় নিপুণ তাঁহাদিগের মস্তিষ্ক, মস্তিষ্কের যে বস্তুর জন্য মনুষ্যের মস্তিষ্ক চতুষ্পদ জন্তুর মস্তিষ্ক হইতে পৃথক্ হয়, সেই বস্তুহারা হইয়া পড়িয়াছে এবং ইহারই জন্য গান্ধিজীর মত হিংস্র মানুষ মনুষ্য-সমাজে অহিংসার কথা বলিয়া আদর লাভ করিতে পারিতেছেন।

শিল্প-জাত দ্রব্যের প্রয়োজনীয়তার পরিমাণ সম্বন্ধে একটা সীমানা আছে। এই ভারতবর্ষের ৩৬ কোটী লোক যত শিল্প-জাত দ্রব্য ব্যবহার করিতে পারে, তদপেক্ষা অধিক পরিমাণের শিল্প-জাত দ্রব্যের উৎপত্তি সাধন করিবার চেষ্টা করিলে কোন শিল্পানুষ্ঠানই লাভজনক হইতে পারে না, পরন্তু প্রত্যেক শিল্পানুষ্ঠানই বিপন্ন হইয়া পড়ে। কাযেই, তদ্বিষয়ে অবহিত না হইয়া যাহাতে কেবলমাত্র বহুল পরিমাণে শিল্প-জাত দ্রব্যের উৎপত্তি হয় তাহার চেষ্টা করিলে শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করা ত' দূরের কথা, কার্য্যতঃ শিল্প-বাণিজ্যের অবনতিই সম্পাদিত হইয়া থাকে। মানুষের মত যথাযথ ভাবে শিল্প-বাণিজ্যের জ্ঞানে প্রবিষ্ট হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, ভারতবর্ষের ৩৬ কোটী মানুষ যত-পরিমাণ শিল্প-জাত দ্রব্য ব্যবহার করিতে পারে, তাহা একমাত্র বাষ্প পরিচালিত যন্ত্র-শিল্পের দ্বারা উৎপন্ন করিবার চেষ্টা করিলে, শিল্পানুষ্ঠানে নব্বই লক্ষের বেশী মানুষের কর্ম্মনিয়োগ হইতে পারে না এবং তাহার ক্রয়-বিক্রয়ে অর্থাৎ বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানে ষাট লক্ষের বেশী মানুষের কর্ম্ম-নিয়োগ সম্ভব নহে। শিল্পানুষ্ঠান কেবলমাত্র বাষ্প-পরিচালিত যন্ত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইলে, তাহার উৎপত্তি ও ক্রয়-বিক্রয় কার্য্যে সর্ব্বসমেত দেড় কোটী মানুষ প্রতিপালিত হইতে পারে। ঐ কার্য্যে দেড় কোটী অপেক্ষা বেশী লোক নিযুক্ত হইলে ঐ ব্যবসায়ের প্রত্যেকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে লোকসান সহ্য করা অনিবার্য্য হইয়া থাকে। হয়ত এমনও হইতে পারে যে, কিছুদিন কোন কোন প্রতিষ্ঠান লাভজনক হয়, আবার তাহা লোকসান-গ্রস্ত হইয়া পড়ে। শিল্প-জাত দ্রব্যের প্রয়োজনীয়তার পরিমাণ সম্বন্ধে যে একটা সীমানা আছে, তাহা ইয়োরোপীয়গণ এবং তৎশিষ্যগণ এতাবৎ বুঝিতে পারেন নাই বলিয়াই শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারের দ্বারা তাঁহাদিগের অন্ন-সমস্যা ও বেকার-সমস্যার কোনরূপ সমাধান করা সম্ভব হয় নাই। পরন্তু তাঁহাদিগের প্রত্যেক সমস্যাটীই উত্তরোত্তর জটিলতা প্রাপ্ত হইতেছে।

বাষ্প-পরিচালিত যন্ত্র-শিল্পের দ্বারা যেরূপ ভারতবর্ষের দেড় কোটির অপেক্ষা অধিকসংখ্যক মানুষের অন্ন-সমস্যা ও বেকার-সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নহে, সেইরূপ হস্ত-পরিচালিত যন্ত্র-শিল্পের (অর্থাৎ কুটীর-শিল্পের) দ্বারাও সাড়ে তিন কোটীর অধিক মানুষের জীবিকা নির্ব্বাহ করা সম্ভব হয় না।

ভারতবর্ষে বাষ্প-পরিচালিত যন্ত্র-শিল্পের প্রসার সাধন করিলে ১॥ কোটী মানুষের এবং হস্ত-পরিচালিত যন্ত্র-শিল্পের প্রসার সাধন করিলে ৩॥ কোটী মানুষের কর্ম্ম-নিয়োগ (employment) সমাধান করা সম্ভব হয় বটে, কিন্তু কৃষিকার্য্য যাহাতে অনায়াস-সাধ্য ও লাভজনক হয় তাহা না করিতে পারিলে, ঐ ১॥ কোটী অথবা ৩॥ কোটী মানুষের শিল্প-বাণিজ্যও লাভজনক হওয়া সম্ভব নহে। কারণ, ৫৬ কোটী মানুষের ক্রয়-শক্তি সমানভাবে রক্ষিত না হইলে ১॥ কোটী অথবা ৩॥ কোটী মানুষের কার্য্যের দ্বারা যে-পরিমাণ শিল্প-জাত দ্রব্যের উৎপত্তি হওয়া সম্ভব, সেই পরিমাণ শিল্প-জাত দ্রব্য বিক্রয় করা সম্ভব হয় না। ইহা ছাড়া, কৃষির দ্বারা কাঁচামালের

উৎপত্তি না হইলে কোন শিল্পানুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় না।

কাযেই বলা যাইতে পারে যে, কৃষিকার্য্য অনায়াস-সাধ্য এবং লাভজনক না হইলে, বাষ্প-পরিচালিত যন্ত্র-শিল্পই হউক আর হস্ত-পরিচালিত যন্ত্র-শিল্পই হউক, কোন শিল্প-বাণিজ্যানুষ্ঠানেরই প্রকৃত উন্নতি সাধন করা সম্ভব-যোগ্য নহে। পরন্তু, যাহাতে কৃষিকার্য্য অনায়াস-সাধ্য এবং লাভজনক হয় তাহা না করিয়া দেশে যাহাতে শিল্প-জাত দ্রব্যের উৎপত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় তাহার কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের বিপদ্-গ্রস্ততা অনিবার্য্য হইয়া পড়ে।

শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি বিষয়ে, বহুল পরিমাণে শিল্প-জাত দ্রব্যের উৎপত্তি সাধন করার পন্থা যেরূপ অসার, সেইরূপ বিদেশীয় কোন শিল্প-জাত দ্রব্য যাহাতে ভারত-বর্ষের বাজারে বিক্রয় না হয় তদনুরূপ পন্থাসমূহ নিষ্ফল হইয়া থাকে। বিদেশীয় কোন শিল্প-জাত দ্রব্য যাহাতে ভারতবর্ষের বাজারে বিক্রয় না হয় তদনুরূপ কোন পন্থা অবলম্বন করিলে আপাতদৃষ্টিতে শিল্প-বাণিজ্যাধিষ্ঠিতগণ লাভ-বান্ হইয়া থাকেন বটে, কিন্তু তাহাতে দেশের জনসাধারণের কোন উপকার হয় না, পরন্তু, অপকারই হইয়া থাকে। কোন কূ-চক্রের দ্বারা ব্যবসা-ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার প্রতিবন্ধক সাধন করিলে, শিল্প-বাণিজ্যাধিষ্ঠিতগণ তাঁহা-দিগের উৎপন্ন দ্রব্য অপেক্ষাকৃত উচ্চহারে বিক্রয় করিবার সুযোগ পাইয়া থাকেন এবং পরোক্ষভাবে জনসাধারণ ঐ শিল্প-বাণিজ্যাধিষ্ঠিতগণের সমৃদ্ধির জন্য চাঁদা দিতে বাধ্য হইয়া থাকেন। ইহাতে শিল্প-বাণিজ্যাধিষ্ঠিতগণের টাকা, আনা, পয়সার লাভ আপাতভাবে একটু বৃদ্ধি পায় বটে, কিন্তু জনসাধারণের জীবিকা নির্ব্বাহের খরচ দ্রুতহারে পরিমাণে বাড়িয়া যায়। যাঁহারা টাকা, আনা, পয়সার আপাত-লাভে উৎফুল্ল হইয়া থাকেন, তাঁহাদিগের লাভও দীর্ঘ-স্থায়ী হয় না। তাঁহাদিগের অন্যায় লাভের সঙ্গে সঙ্গে খরচ বৃদ্ধি পায় এবং ব্যবসার উন্নতির নামে ঋণগ্রস্ততা বাড়িয়া যায়। অধিকন্তু, ব্যবসার মূলনীতিতে যখন সাধুতা নষ্ট হইয়া অসাধুতা প্রবেশলাভ করে, তখন কর্ম্মচারিবৃন্দের অনাচার বৃদ্ধি পাওয়া অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। এইরূপে, বিদেশীয় কোন শিল্প-জাত দ্রব্য যাহাতে বাজারে প্রবেশ-লাভ না করিতে পারে তাহার প্রচেষ্টায় উদ্যত হইলে, শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি হওয়া ত দূরের কথা, শিল্পী ও জনসাধারণ উভয়েই আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকেন। ইহা ছাড়া দেশের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও বিবাদ অবধারিতভাবে বৃদ্ধি পায়। দ্বন্দ্ব ও কলহের দ্বারা কখনও কোন মানুষের ব্যক্তিগত অথবা জাতিগত কোন প্রকার উন্নতি সংসাধিত হওয়া সম্ভবযোগ্য নহে ইহা বলাই বাহুল্য।

উপরের কথাগুলি হইতে ইহা বলা যাইতে পারে যে, আমাদের রাজনৈতিক ধুরন্ধরগণ দেশের উন্নতিকল্পে শিল্প-বাণিজ্যবিষয়ক যে সমস্ত বুলি কপচাইয়া থাকেন, তদ্দ্বারা জনসাধারণের অথবা দেশের কোন উপকার সাধিত হওয়া সম্ভবযোগ্য নহে। ইঁহারা বস্তুতপক্ষে আমাদিগকে ফাঁকি দিয়া ঘোড়লী চালাইতে সক্ষম হইতেছেন এবং আমরা ক্রমে ক্রমে উৎসন্নের অভিমুখে ধাবিত হইতেছি। আমরা বিপদ্ হইতে রক্ষা পাইতে হইলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ-ভাবে গান্ধী-জওহরলাল-কোম্পানী-পরিচালিত অনুষ্ঠান-গুলিকে এবং তাঁহাদিগের ধ্বজাধারিগণকে সর্ব্বাগ্রে দেশবাসী সকলের চিনিতে হইবে। নতুবা কেবলমাত্র হা-হুতাশ করিলে কোন সুফলের উদয় হওয়া সম্ভব হইবে না।

কৃষি ও দেশের উন্নতি

দেশের জনসাধারণের বুভুক্ষা নিবারণ করিতে হইলে কৃষির উন্নতি যে সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়, তাহা এই বিশাল মানব-সমাজে অসংখ্য অক্ষরে একদিন প্রতি হৃদয়ে হৃদয়ে অঙ্কিত ছিল। ইহার প্রমাণ বেদ, কোরাণ এবং বাইবেল। কৃষির এই প্রয়োজনীয়তা একদিন বিশাল মানব-সমাজের প্রত্যেক হৃদয়ে সুস্পষ্ট অক্ষরে অঙ্কিত ছিল বটে, কিন্তু কালক্রমে মানুষ ঐ সত্য বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল। "বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মীঃ তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি" এতাদৃশ কথা

যে মূর্খ-পণ্ডিতের হৃদয়ে স্থান পাইয়াছে তিনিও পাণ্ডিত্যের খ্যাতি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। জনসাধারণের জীবন ধারণের মূল পন্থা যে কৃষি, তাহা মানুষ সর্ব্বতোভাবে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল বলিয়াই, চারি বৎসর আগেও কৃষির উন্নতির কথা মানুষের হৃদয়ে তাদৃশ ভাবে স্থান পায় নাই। পরন্তু, এমন কথাও মানুষ বলিতে সাহসী হইয়াছে যে, যে-দেশ কৃষি-কার্য্যের উপর নির্ভরশীল, সে দেশের দারিদ্র্য অনিবার্য্য। ইহাদিগের মতে ভারতবাসিগণ যখন কৃষি-কার্য্যের উপর নির্ভরশীল, তখন তাহাদিগের দরিদ্র না হইয়া চলাফেরা করিবার আর কোন পন্থা নাই।

আমাদিগের মতে ভারতবাসিগণের দারিদ্র্য একটু অদ্ভুত রকমের। টাকা, আনা, পয়সার পরিমাণে ভারতবাসিগণ যে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র তাহা অস্বীকার করা যায় না। অথচ, ভারতবাসিগণের দারিদ্র্য এত অদ্ভুত রকমের যে, জীবিকার্জ্জনের জন্য প্রায় প্রত্যেক দেশই অনেক সহস্র বৎসর হইতে কখনও বা মজুরের বেশ লইয়া কখনও বা ভিক্ষুকের করুণ চাহনি লইয়া, কখনও বা প্রবঞ্চকের মনোমুগ্ধকর হেলানি-দুলানি লইয়া, কখনও বা ডাকাতের বীভৎস হুঙ্কার লইয়া ভারতবর্ষে উপনীত হইতে বাধ্য হইয়া আসিয়াছেন, অথচ ভারতবাসিগণ কাহাকেও দুয়ারে যাইতে বাধ্য হয় নাই। আমাদের সাধারণ জ্ঞানানুসারে বড়লোকের বাড়ীতেই দরিদ্রগণ ভিক্ষা করিতে, মজুরগণ পরিশ্রম করিতে, প্রবঞ্চকগণ প্রবঞ্চনা করিতে এবং দস্যুগণ ডাকাতি করিতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। "ভারতবর্ষ দরিদ্র", এই কথা স্বীকার করিলে পরোক্ষভাবে এখানে উপরোক্ত সাধারণ নিয়মের ব্যতিচার হইতেছে এতাদৃশ কথা স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে, একশত বৎসর আগেও ভারতবর্ষ দরিদ্র ছিল না, এখনে তাহার দারিদ্র্য অসহ্য হইলেও অন্য কোন দেশের তুলনায় ভারতবর্ষ অধিকতর দরিদ্র নহে। টাকা, আনা, পয়সার পরিমাণ হিসাবে ভারতবর্ষ দরিদ্র, অথচ তাহার অধিবাসিগণ জীবিকানির্ব্বাহের জন্য অন্য কোন দেশের দ্বারস্থ হন না, পরন্তু অন্যান্য সমস্ত দেশই ভারতবর্ষের দ্বারস্থ হইতে বাধ্য হন, কেন তাহা চিন্তা করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, এই বিসদৃশ অবস্থার একমাত্র কারণ টাকা, আনা, পয়সার প্রচলনের মূলে যে ঐ-বিষয়ক সংগঠন আছে তাহার ত্রুটী। টাকা, আনা, পয়সা যে নিয়মে অথবা যে নিয়মহীনতায় প্রচলিত হইয়া থাকে তৎসম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার ও ভাবিবার আছে; কিন্তু মানব-সমাজ যে অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে তাহা চিন্তা করিলে উহা এক্ষণে বলিয়া কোন লাভ নাই। কাযেই, ঐ সম্বন্ধে আমরা এক্ষণে নির্ব্বাক্ থাকিব।

জনসাধারণের রক্ষার জন্য কৃষি-কার্য্য যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়, তাহা চারি বৎসর আগে বর্ত্তমান মানব-সমাজের কেহই তাদৃশ ভাবে বুঝিতে পারিতেন না বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে বটে, কিন্তু এখন আর সে দিন নাই। সমাজ-রক্ষার জন্য কৃষিকার্য্য যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় তাহা অনেকেই বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু কি করিয়া যে কৃষিকার্য্যের প্রকৃত উন্নতি সাধন করা অথবা উহাকে অনায়াসসাধ্য করা সম্ভব হয়, তাহা এখনও অনেকেই স্থির করিতে পারেন নাই বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে।

আধুনিক ধারণানুসারে কৃষি-কার্য্যের উন্নতি সাধন করিবার প্রধান পন্থা দুইটী, যথা :—

(১) বৈজ্ঞানিক সেচ-প্রণালী, (২) বৈজ্ঞানিক সার-ব্যবহার-প্রণালী।

প্রকৃতির সৃজনে কোন্ নিয়ম ও প্রকরণবশতঃ জল, স্থল, অচরজীব ও চরজীব এই চারি শ্রেণীর উৎপত্তি হইয়া থাকে, তদ্বিষয়ক বিজ্ঞান পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, বৈজ্ঞানিক সেচ-প্রণালীই হউক আর বৈজ্ঞানিক সার-ব্যবহার-প্রণালীই হউক, ইহার কোনটীর দ্বারাই জমীর উর্ব্বরাশক্তি স্থায়ীভাবে বৃদ্ধি করা সম্ভব নহে। পরন্তু ঐ দুইটী প্রণালীর কার্য্যবশতঃ আপাতভাবে সামান্য কয়েক বৎসরের জন্য জমীর উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি পাইলেও পাইতে পারে বটে, কিন্তু অচিরে পুনরায় উহা নষ্ট হইয়া যায়। অধিকন্তু ঐ দুই প্রণালীর সহায়তায় যে শস্য, ফল এবং শাক-সব্জী প্রভৃতির উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহা আপাতদৃষ্টিতে অপেক্ষাকৃত মনোহর হইয়া থাকে বটে, কিন্তু উহার কোনটীই কখনও মানুষের স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্য সর্ব্বতোভাবে অনুকূল হয় না।

ঐ উপরোক্ত কথাগুলি বিজ্ঞানের সাহায্যে বুঝা অপেক্ষাকৃত ক্লেশসাধ্য। তাহা সাধারণের পক্ষে সম্ভবযোগ্য নহে। বিজ্ঞানের সাহায্যে উহা বুঝা যতই ক্লেশসাধ্য হউক না কেন, বৈজ্ঞানিক সেচ-প্রণালী অথবা বৈজ্ঞানিক সার-ব্যবহার-প্রণালী যে কৃষির উন্নতির পক্ষে মঙ্গলজনক নহে তাহা মোটামুটিভাবে সাধারণ বুদ্ধির দ্বারা বুঝা ক্লেশসাধ্য নহে। বিংশতি বৎসরের উপরে যে যে স্থানে বৈজ্ঞানিক সেচ-প্রণালী অথবা বৈজ্ঞানিক সার-ব্যবহার-প্রণালী পরিগৃহীত হইয়াছে সেই সেই স্থানের অবস্থা কিরূপ অবস্থায় উপনীত হইয়াছে তাহার অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, কৃত্রাপিও সুফলোদয় হয় নাই। কোথাও বা বিবিধ প্রকারের জ্বরের ও রোগের বৃদ্ধি, কোথাও বা হিংসা-দ্বেষের বৃদ্ধি, কোথাও বা জমীর মূল্যের বৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে বটে, কিন্তু কৃত্রাপি কৃষকের অন্নাভাব ও দারিদ্র্য এমন কি আংশিক মাত্রাতেও হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই। অধিকন্তু, যে কৃষক এক দিন কাহারও নিকট বেতনভোগী চাকুরীর প্রার্থী না হইয়া স্বাধীনভাবে কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিত, সেই কৃষক, যে যে স্থানে বৈজ্ঞানিক সেচ-প্রণালী ও বৈজ্ঞানিক সার-ব্যবহার-প্রণালী বিস্তৃতভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে, সেই সেই স্থানে প্রায়শঃ স্বাধীনতা বিসর্জ্জিত করিয়া বেতনভোগী মজুর হইয়া পড়িতে বাধ্য হইয়াছে। ইহা আমাদিগের কাল্পনিক কথা নহে। বাকাবাগীশ গ্রন্থকারগণের মন্তব্যে অবহিত না হইয়া স্ব স্ব বুদ্ধির দ্বারা অনুসন্ধান করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, আমাদিগের প্রত্যেক কথাটী বর্ণে বর্ণে সত্য।

কাযেই, বৈজ্ঞানিক সেচ-প্রণালী ও বৈজ্ঞানিক সার-ব্যবহার-প্রণালী যে কৃষিকার্য্যের প্রকৃত ও স্থায়ী উন্নতির সাধন সম্পর্কে মঙ্গলজনক নহে, তাহা যুক্তিযুক্তভাবে স্বীকার করিতেই হইবে।

আজকাল আর এক ধুয়া উঠিয়াছে যে, দেশের নদীগুলিকে 'ড্রেজারের' সাহায্যে কাটিয়া ফেলিতে পারিলে কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধন করা সহজসাধ্য হইতে পারে।

কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধন করিতে হইলে দেশের নদীগুলিতে যাহাতে বারমাস সর্ব্বনিম্ন নিম্নক বালুকাস্তর পর্য্যন্ত জল থাকে তাহা করিতে হইবে বটে, কিন্তু ড্রেজারের সাহায্যে তাহা করা কখনও সম্ভবযোগ্য হইবে না। ড্রেজারের দ্বারা নিম্নক বালুকাস্তর পর্য্যন্ত ত' দূরের কথা, যে স্তরে অর্দ্ধেক বালি এবং অর্দ্ধেক কর্দ্দম আছে সেই স্তর পর্য্যন্ত গভীর করিয়া কাটিয়া উঠা ক্লেশসাধ্য ব্যাপার। ড্রেজারের সহায়তা লইলে কতকদূর অগ্রসর হওয়া অপেক্ষাকৃত দ্রুতগতিতে সম্ভবপর হয় বটে, কিন্তু একমাত্র ড্রেজারের সাহায্যে লক্ষ্যস্থলে উপনীত হওয়া সম্ভবযোগ্য নহে। দেশের নদীগুলিতে যাহাতে বারমাস সর্ব্বনিম্ন নিম্নক বালুকাস্তর পর্য্যন্ত জল থাকে তাহা করিতে হইলে নদীর স্রোত যাহাতে কোনরূপ বাধাপ্রাপ্ত না হয়, তাহা করা একান্ত প্রয়োজনীয়।

ইহার বিস্তৃত আলোচনা আমরা আমাদিগের "ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর অবস্থা ও কর্ত্তব্য" নামক পুস্তকে করিয়াছি। এখানে উহার পুনরুল্লেখ করিব না। অনুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গকে ঐ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে অনুরোধ করি।

উপসংহার

উপরোক্ত "শিল্প-বাণিজ্য ও দেশের উন্নতি" এবং "কৃষি ও দেশের উন্নতি" এই দুইটি সন্দর্ভ পাঠ করিয়া একটু চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, অধুনা শিল্প, বাণিজ্য, এবং কৃষির নামে ধুরন্ধরগণ যে সমস্ত কার্য্য করিতেছেন ও আমাদিগকে যে সমস্ত উপদেশ দিতেছেন তাহার কোনটির দ্বারাই দেশের প্রকৃত উন্নতি হওয়া সম্ভব নহে। ফলেও তাহা হইতেছে না।

মানুষ এখনও বুঝিতে পারে না বটে, কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে বুঝিতে পারিবে যে, এই ধুরন্ধরগণের মস্তিষ্ক জড়তা-প্রাপ্ত হইয়াছে। মানুষেরও মস্তিষ্ক থাকে, চতুষ্পদ জন্তুগণেরও মস্তিষ্ক থাকে, অথচ মানুষ বিপদমুক্ত এবং চতুষ্পদ জন্তুগণ বিপদযুক্ত হয় কেন, তাহার তথ্য জানিতে পারিলে বুঝা যাইবে যে, মানুষের মস্তিষ্কের মধ্যে স্নেহ ও রসের সমতায় যে উপকরণ থাকে, চতুষ্পদ জন্তুর মস্তিষ্কের মধ্যে সেই উপকরণ বিদ্যমান থাকে না।

স্নেহ ও রসের সমতার এই উপকরণের জন্যই মানুষ 'মানুষ' হইয়া থাকে এবং সে সর্ব্বজীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ

করিতে পারে। তেজ ও রসের সমতার এই উপকরণ বড়ই অল্প-স্বল্পুর। যে সমস্ত দ্রব্যে রসের তীব্রতা বিদ্যমান থাকে সেই সমস্ত দ্রব্য পাত্ররূপে গৃহীত হইলে, যে সমস্ত দ্রব্যে রূপের তীব্রতা বিদ্যমান থাকে সেই সমস্ত দ্রব্য চক্ষুর তৃপ্তির জন্য দৃষ্টরূপে গৃহীত হইলে, যে সমস্ত দ্রব্যে গন্ধের তীব্রতা বিদ্যমান থাকে, সেই সমস্ত দ্রব্য নাসিকার তৃপ্তির জন্য সুগন্ধিরূপে গৃহীত হইলে, যে সমস্ত কার্য্যে শব্দের তীব্রতা বিদ্যমান থাকে, সেই সমস্ত কার্য্য কোনরূপে পরিগৃহীত হইলে, যে সমস্ত বস্তুতে স্পর্শের তীব্রতা বিদ্যমান থাকে, সেই সমস্ত বস্তু আরামের জন্য ব্যবহৃত হইলে, তেজ ও রসের সমতার ঐ উপকরণ অতর্কিত ভাবে শুষ্ক হইয়া যায়। মানুষের ঐ উপকরণ শুষ্ক হইয়া গেলে মানুষের কতকাংশ পশু অপেক্ষাও নিম্ননীয় হয়। তেজ ও রসের সমতার ঐ উপকরণ রক্ষা করিয়া প্রকৃত মানুষের মত জীবন রক্ষা করিতে হইলে, পুরুষ-মানুষকে পুরুষের মত থাকিতে হয় এবং স্ত্রীলোকগণকে স্ত্রীলোকের মত থাকিতে হয়। পুরুষ স্ত্রীলোকের কার্য্যে ব্যাপৃত হইলে, এবং স্ত্রীলোক পুরুষের কার্য্যে ব্যাপৃত হইলে, অথবা দুই শ্রেণীর মানুষ অবাধ মেলামেশায় উদ্যত হইলে, তেজ ও রস সমান রাখিবার যে উপকরণ মানুষের মধ্যে বিদ্যমান থাকে তাহা শুষ্ক হইয়া যায়। সেইরূপ আবার দ্বন্দ্ব-কলহ, রাগ-দ্বেষ, অভিমান, কপটতা, মিথ্যাবাদিতা, প্রভুত্ব, ব্যক্তিত্ব, প্রভৃতির প্রবৃত্তিও মানুষের ঐ উপকরণের ক্ষীণতা সম্পাদন করে। মদ্য প্রভৃতি বুদ্ধি-অপহারক পানীয়, পেঁয়াজ-রসুন মিশ্রিত তীব্র রস-যুক্ত খাদ্য মানুষের তেজ ও রসের সমতার ঐ উপকরণ অটুটভাবে রক্ষার পক্ষে নিতান্ত বিরোধী।

অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, রাজনীতি, অর্থ-নীতি, শিক্ষানীতি, বিজ্ঞান প্রভৃতি ক্ষেত্রের প্রায় প্রত্যেক ধুরন্ধরটী, যাহা যাহা মানুষের তেজ ও রসের সমতা রক্ষাকল্পে বিরোধী, তাহার প্রত্যেকটী ব্যবহার করিবার জন্য নূতন কৌশল আবিষ্কৃত করিতেছেন এবং সমাজে যাহাতে তাঁহাদের প্রাধান্য বজায় থাকে সেই জন্য ঐ ঐ ব্যবহার যাহাতে অবাধে চলিয়া যায় তাহার সংগঠন-কার্য্য আবিষ্কার করিতেছেন। এইরূপে অতর্কিত ভাবে ইহারা নিজেরা যেরূপ পশু অপেক্ষাও নিম্ননীয় হইয়া পড়িতেছেন, সেইরূপ সমগ্র সমাজটীকেও গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন। ফলে মানুষের হাহাকার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। নিরীহ মানুষ কখন কখন 'অদৃষ্টের' দোহাই দিয়া, কখনও 'কর্ম্ম-ফলের' দোহাই দিয়া কোনরূপভাবে সান্ত্বনা লাভ করিতেছে। সন্তানসন্ততিকে রক্ষা করিতে হইলে এইরূপভাবের সান্ত্বনালাভ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিলে চলিবে না। ধুরন্ধরগণকে ঠিক করিতে হইবে। গান্ধিজী, জওহরলালজী, নবনীত-তুল্য সুভাষচন্দ্র ও বিভিন্ন প্রদেশের মন্ত্রিবর্গ মাসের পর মাস কি করিতেছেন তদ্বিষয়ে লক্ষ্য করিতে হইবে। আমাদিগের 'সাপ্তাহিক বসুশ্রী'র "নেতৃবর্গের চাল-চলন" শীর্ষক সংবাদগুলি প্রতি সপ্তাহে পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে, ইহারা একজনও অগণিত জন-সাধারণকে অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব এবং অসন্তুষ্টি হইতে রক্ষা করিতে হইলে যাহা যাহা একান্ত প্রয়োজন তাহার কোন কার্য্যেই ভুলক্রমেও হস্তক্ষেপ করিতেছেন না। অথচ দল-গঠন করিয়া দেশবাসীর সমগ্রগাত্রে ভুলের মালা পরাইয়া দিয়া নিজের কণ্ঠে ভুলের মালা সংগ্রহ করিতেছেন।

দেশবাসিগণ কি এখনও নিজ নিজ ভুল সংশোধন করিবেন না?

যে বিদ্যা ও যে বুদ্ধির দ্বারা নিজেদের রক্ত-মাংসে গড়া পুত্রকন্যাগণের ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলা সম্ভব হয় না, সেই বিদ্যা ও বুদ্ধির গৌরব কি এখনও বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হইবেন না? যে বিদ্যা ও বুদ্ধির ফলে নফরতা, চরিত্রহীনতা, স্বাস্থ্যহীনতা, ভ্রান্তিকতা জীবনের অলঙ্কার হইয়া থাকে, এবং সন্তান-সন্ততি কখনও বা স্বাস্থ্যহীনতার জন্য, কখনও বা চরিত্রহীনতার জন্য, কখনও বা অর্থা-ভাবের জন্য, কখনও বা চাকুরীর জন্য প্রতিনিয়ত করুণ ভাবে জীবনযাপন করিতে বাধ্য হয়, সেই বিদ্যা ও বুদ্ধি আপাত-দৃষ্টিতে যতই মনোমুগ্ধকর হউক না কেন, তাহা বাস্তবিক পক্ষে গৌরবের কি না, তদ্বিষয়ে বিশ্লেষণ-প্রবৃত্তি কি এখনও জাগ্রত হইবে না?

ধুরন্ধরগণকে ঠিক করিতে হইবে বলিয়া তাঁহাদিগের সঙ্গে কলহে প্রবৃত্ত হইলে চলিবে না। তাঁহাদিগকে বুঝাইতে হইবে যে, দেশের জন্য প্রকৃত সাধনানিরত না

হইয়া, তদুপযোগী চরিত্র গঠিত না করিয়া নেতৃত্ব করিবার লোভপরায়ণ হইলে দেশের নিকট ফুলের মালা পাওয়া যায় না, পরন্তু ধিক্কার পাইতে হয়। তাঁহারা যখন দেখিবেন যে, চরিত্রবান্ ও সাধক না হইয়া নেতৃত্ব করিতে গেলে, অথবা দেশের জনসাধারণ যাহাতে খাইতে ও পরিতে পায় তাহার কথা না করিয়া স্বাধীনতার কথা কহিতে গেলে, ফুলের মালার স্থানে জুতার মালা কণ্ঠের অলঙ্কার হইয়া থাকে, তখন তাঁহারা আপনা হইতেই নিজদিগকে পরিবর্ত্তিত করিতে বাধ্য হইবেন। ইহারই নাম ধুরন্ধরগণকে ঠিক করা। আমাদিগের কথা বুঝিতে কি আরও বিলম্ব হইবে?

কংগ্রেসের প্রতারণার একটি উদাহরণ

ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে যুক্তপ্রদেশের রাজনৈতিক সম্মেলনে, কংগ্রেসী আমলে ঐ প্রদেশে যে-সকল উন্নতি সূচিত হইয়াছে তাহার একটি লম্বা ফিরিস্তি দাখিল করা হইয়াছে। ঐ সম্মেলনে অপরাপর জাতির সহিত যুক্ত-প্রদেশের ছয় জন কংগ্রেসী মন্ত্রী, প্রধান-মন্ত্রী মিঃ পান্থ, স্পীকার এবং মহামতি পণ্ডিত জওহরলাল উপস্থিত ছিলেন।

যুক্তপ্রদেশে উন্নতি সূচিত হইয়াছে বলিয়া যে তালিকাটি দাখিল করা হইয়াছে, তাহা সুদীর্ঘ। ইহার ফলে যদি সত্যই জনসাধারণের বাস্তব অবস্থার কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হইত, তবে আমরা খুশী হইতাম। কিন্তু আমাদের মতে, ইহার ফলে জনসাধারণের অবস্থা বিষয়ে বিন্দুমাত্রও উন্নতি হয় নাই, কংগ্রেসের নেতারা জনসাধারণকে ধাপ্পা দিতেছেন মাত্র।

আমাদের এই মতবাদ যথার্থ, না, কংগ্রেসের বিবরণ সত্য, তাহা স্থির করিতে হইলে, ঐ তালিকা পাঠকদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া, তদন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি বিষয় উল্লেখ করিয়া আমাদিগকে দেখাইতে হইবে, উহা কোন্ শ্রেণীর উন্নতির পরিচায়ক।

তৎপূর্ব্বে আমাদিগকে নির্দ্ধারণ করিতে হইবে, বর্ত্তমান অবস্থায় জন-সাধারণের প্রাথমিক প্রয়োজনসমূহ কি এবং তাহা পূরণ করিবার উপায়ই বা কি। বলাই বাহুল্য যে, জন-সাধারণের প্রয়োজনসমূহের প্রকৃতি এবং তাহা পূরণের পন্থা সুনির্দ্ধারিত না হইলে, স্থির করা সম্ভব নহে যে, জন-সাধারণের অবস্থার উন্নতিকল্পে যাহা করা হইয়াছে, তাহা তাহাদের প্রয়োজনানুরূপ কি না। ক্ষুধার অন্ন ও তৃষ্ণার জলাভাবে মৃত্যুপথ-যাত্রী ব্যক্তিকে বাঁচাইতে হইলে আর কিছু না করিয়া অন্ন ও পানীয় জলের ব্যবস্থা করিবার দরকার। পৃথিবীতে এমন দৃষ্টান্তের অভাব নাই, যখন লক্ষপতিকে যথা-সময়ে এক টুকরা রুটি না পাইয়া মরিতে হইয়াছে। লক্ষ-পতি হওয়া সত্ত্বেও এবং এক টুকরা রুটির বিনিময়ে সর্ব্বস্ব দান করিবার ইচ্ছা সত্ত্বেও, যথাসময়ে সেই একটি টুকরা রুটি না পাইয়া লক্ষপতির মৃত্যু হইয়াছে, ইহার একাধিক দৃষ্টান্ত আছে। প্রয়োজনীয় রসের অভাব বৃক্ষকে যখন নিঃশেষ করিতেছে, তখন তাহার ডালপালা ছাঁটিয়া উহাইয়া তাহাকে বাঁচান যায় না,—ঐ বৃক্ষকে বাঁচাইতে হইলে আর কিছু ব্যবস্থা না করিয়া প্রয়োজনীয় পরিমাণ রস সরবরাহের ব্যবস্থা অবশ্য কর্ত্তব্য। এই জন্যই আমরা বলিতেছি, যুক্তপ্রদেশে কংগ্রেসী সরকারের সূচিত কার্য্যসমূহের উন্নতির প্রকৃতি বিচার করিতে হইলে, আমাদিগকে সর্ব্বাগ্রে স্থির করিতে হইবে, জন-সাধারণের প্রাথমিক প্রয়োজন কি এবং তাহা পূরণের উপায়ই বা কি।

জন-সাধারণের প্রাথমিক প্রয়োজন কি, তাহা স্থির করা সুকঠিন। কেন না, এমন দুইটি ব্যক্তি পাওয়া যাইবে না, যাহারা ঠিক একই বস্তুর প্রয়োজনীয়তা বোধ করে। কেহ মোটর গাড়ী কিংবা অট্টালিকার জন্য হা-হুতাশ করিতেছেন, কেহ বা ঐসবের প্রতি বিন্দুমাত্রও দৃক্‌পাত না করিয়া পাণ্ডিত্যের খ্যাতি অর্জ্জন করিতে পারিলে? নিজদিগকে সুখী বোধ করিতেছেন। বিভিন্ন ব্যক্তির প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষা বিভিন্ন। কাজেই জন-সাধারণের অবশ্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের তালিকা স্থির করা সুকঠিন। কিন্তু বিভিন্ন ব্যক্তির প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষা বিভিন্ন হইলেও, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত সত্য যে, প্রত্যেক ব্যক্তিই তাহার প্রয়োজনানুযায়ী এবং আদর্শানুরূপ আর্থিক স্বচ্ছলতা যথাসম্ভব শ্রমের সহিত অর্জ্জন করিতে চাহে। যদি বাস্তব না করিয়া আর্থিক প্রয়োজন মিটান সম্ভব

ঠ্যাঙ কাটি মাথা করি "আর্ল"-মাথা কাঁচিতে। ঠ্যাঙে গজাইলে মাথা তবে পাবে বাঁচিতে॥

ওপেন ডিসেন্সর মিঃ ডগলাস নেহরু এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন :—এই হইতেছে আমার আদর্শ, প্রত্যেক

হয়, তবে কেহই অপরের দাসত্ব করিতে ইচ্ছুক নহে। সুতরাং যদি আমরা বলি যে, যথাসম্ভব স্বাবলম্বনে উপার্জ্জিত "অভাবপূরক আর্থিক প্রাচুর্য্য" মনুষ্য জাতির প্রাথমিক অবশ্য-প্রয়োজন, তবে তাহাতে মতভেদ হইবে না বলিয়াই আমরা মনে করি।

তারপর, সমগ্র মনুষ্যসমাজে এমন একটি ব্যক্তিও পাওয়া যাইবে না, যে নিজে এবং নিজের পরিবারের অস্বাস্থ্যের প্রতি-বিধান কামনা করে না। সুতরাং বলা যাইতে পারে, মনুষ্য জাতির দ্বিতীয় অবশ্য-প্রয়োজন, "অস্বাস্থ্যের আমূল প্রতীকার।" কথা উঠিতে পারে যে, রোগ হইলে তাহার প্রতীকার-ব্যবস্থাতেও জন-সাধারণ খুসী থাকে। কিন্তু যাহাতে সমাজ হইতে অস্বাস্থ্যকে নির্ম্মূল-করিয়া বিতাড়িত করা যায়, যদি এরূপ ব্যবস্থা সম্ভব হয় তবে পাঠকগণের মধ্যে এমন কে আছেন, যিনি আরোগ্যের জন্য রোগে ভুগিতে চাহেন?

তৃতীয়তঃ, প্রত্যেক ব্যক্তিই সন্তুষ্টি ও শান্তিতে জীবন যাপন করিতে চাহে। ইহা ব্যতীত যখন কোন ব্যক্তিই সুখী হইতে পারে না, তখন বলিতে হয় যে, মনুষ্যজাতির তৃতীয় অবশ্য প্রয়োজন "মানসিক শান্তি ও সন্তুষ্টি।"

অতএব আমরা ধরিতে পারি যে, যুক্তপ্রদেশের কংগ্রেসী সরকার যে উন্নতির তালিকা দাখিল করিয়াছেন, তদ্দ্বারা যদি জনসাধারণের এই তিনটি ব্যবস্থা, অর্থাৎ স্বাবলম্বনে উপার্জ্জিত আর্থিক প্রাচুর্য্য, অস্বাস্থ্যের কারণ দূরীকরণ এবং মানসিক শান্তি ও সন্তুষ্টির ব্যবস্থা সূচিত হইয়া থাকে, তবে কংগ্রেসী সরকার কর্ত্তৃক প্রকৃতপক্ষেই জনসাধারণের উন্নতি সাধিত হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। অন্যপক্ষে, যদি দেখা যায়, তাঁহাদের তালিকায় এমন কোন ব্যবস্থাই নাই যদ্দ্বারা এই তিনটির একটি ব্যবস্থাও সম্ভব হয়, তবে এই তালিকা কার্য্যকরী করিতে যদি লক্ষ লক্ষ মুদ্রাও ব্যয়িত হয়, তথাপি আমাদিগের ইহা না বলিয়া উপায় নাই যে, কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ জনসাধারণকে নির্লজ্জ ধাপ্পাবাজী দিতেছেন।

এই প্রশ্নের আরও একটি দিক্ আছে। কথা উঠিতে পারে যে, এই তালিকানুযায়ী জনসাধারণের পক্ষে উপরের তিনটি ব্যবস্থা অনতিবিলম্বে সাধিত না হইলেও, ইহার পরিণাম ভাল এবং এই তালিকা ঐ সকল ব্যবস্থা কার্য্যকরী করিবার উপায়স্বরূপ। কংগ্রেস কর্ত্তৃক সূচিত আলোচ্য কার্য্যসমূহ ঐ সকল ব্যবস্থা কার্য্যকরী করিবার উপায়স্বরূপ কি না, ইহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে, আমাদিগকে দেখিতে হইবে, জন-সাধারণের অবশ্য-প্রয়োজনসমূহ পূরণের জন্য অবলম্বনীয় কর্ম্ম-পদ্ধতি কি।

আমরা ইহা বারংবার দেখাইয়াছি যে, জনসাধারণের পক্ষে স্বাবলম্বনে উপার্জ্জিত আর্থিক প্রাচুর্য্য ভোগ করিবার প্রথম ও প্রধান উপায়, লাভজনক এবং নিশ্চিত কৃষিব্যবস্থা ও তৎসহ লাভজনক ও নিশ্চিত কুটীর-শিল্প এবং লাভজনক ও নিশ্চিত বাণিজ্য-ব্যবস্থা। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য সম্বন্ধে "লাভজনক ও নিশ্চিত" বলিলে কি বুঝায়, তাহার অর্থ সুস্পষ্ট। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের "লাভজনকতা ও নিশ্চয়তা" বলিতে আমরা বুঝাইতে চাহি যে, এই সকলের এমন ব্যবস্থা, যাহাতে কিঞ্চিৎমাত্র লোকসানের সম্ভাবনা না থাকে। কিঞ্চিৎমাত্রও লোকসানের সম্ভাবনা থাকিবে না, কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের এরূপ ব্যবস্থার কথা শুনিলে প্রথমতঃ আশ্চর্য্য হইয়া যাইতে হয়। কিন্তু আমরা জানি, ইহা সম্ভব এবং প্রয়োজন হইলে জগৎসমক্ষে আমরা প্রতিপন্ন করিব, কিরূপে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য ব্যবস্থিত হইলে, উহাতে কিঞ্চিৎমাত্র লোকসান হয় না, পরন্তু কেবল লাভই হইতে পারে।

যদি এমন কোন বৈজ্ঞানিক থাকেন, যিনি চরাচর সৃষ্টির তত্ত্ব অবগত হইয়াছেন, যদি এমন কেহ থাকেন, যিনি জগৎ সৃষ্টির সর্ব্ববিধ সংস্থান নির্ভুল ভাবে উপলব্ধি করিতে পারিয়া-ছেন, তবে তাঁহার নিকট এক মুহূর্ত্তে প্রতিভাত হইবে যে, আধুনিক তথাকথিত বৈজ্ঞানিক জল-সেচবিধান দ্বারা জমীর উর্ব্বরাশক্তি এবং জমীজাত দ্রব্যের সমূহ অনিষ্টকারিতা সাধিত হইতেছে। তিনি ইহাও উপলব্ধি করিবেন যে, আধুনিক তথাকথিত সারও জমীর উর্ব্বরাশক্তি এবং জমীজাত দ্রব্যের সমান অনিষ্ট সাধন করিতেছে। কেবল ইহাই নহে, ইহাও উপলব্ধি হইবে যে, তথাকথিত বৈজ্ঞানিক সারদ্বারা কৃষি ব্যবস্থিত হইলে তাহা কখনও নিশ্চিত ভাবে লাভজনক হইতে পারে না।

কৃষক, তথা মধ্য-স্বত্বাধিকারী ভূম্যধিকারী ও সরকারের পক্ষে কৃষিকে নিশ্চিত ভাবে লাভজনক করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে

এমন ব্যবস্থা করিতে হইবে, যাহাতে দেশের সর্ব্বত্র নদী-সমূহের সর্ব্বনিম্ন বালুকান্তর পর্য্যন্ত বৎসরে সকল সময় জল বিদ্যমান থাকে। কি করিয়া এই ব্যবস্থা সম্ভব, তাহা "ভারত-বাসীর অবস্থা ও কর্ত্তব্য" শীর্ষক পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। জিজ্ঞাসু পাঠককে উহা পড়িতে অনুরোধ করি।

যদি একবার কৃষিকে নিশ্চিতভাবে লাভজনক করিয়া গড়িয়া তুলা যায়, তবে লাভজনক কুটীর-শিল্প ও বাণিজ্য-ব্যবস্থা অতি সহজেই আয়ত্তাধীন হইতে পারে।

এমন অনেক তথাকথিত দেশপ্রেমিক ব্যক্তি আছেন (আমাদের মতে তাঁহারা নির্ব্বোধ এবং তাঁহাদের চালচলন নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক), যাহারা যন্ত্রশিল্প ব্যতীত দেশের বেকার ও আর্থিক সমস্যা সমাধান সম্ভব বলিয়া মনে করেন না। ইঁহাদের হৃদয়ে যদি প্রকৃত দেশানুরাগ থাকিত এবং ইঁহাদের মস্তিষ্কে যদি বিন্দুমাত্র সারপদার্থ থাকিত, তবে তাঁহারা অতি অল্প আয়াসেই বুঝিতে পারিতেন যে, যন্ত্রশিল্প দ্বারা জন-সাধারণের স্বাস্থ্য রক্ষিত হইতে পারে না এবং ইহার সাহায্যে বেকার-সমস্যারও সমাধান হইতে পারে না। ইঁহারা যদি আত্মম্ভরি না হইতেন, তবে দৃষ্টিতে পড়িত যে, যন্ত্রশিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিবৃন্দের অতি সামান্য কালের জন্যও সুস্থতা থাকিতে পারে না। যন্ত্রশিল্পে জনসাধারণের কর্ম্ম-নিয়োগ সম্ভাবনা অত্যন্ত সামান্য এবং সামান্য পঞ্চাশ বৎসর কালের জন্যও কোন পরি-চালিত যন্ত্রশিল্পকে নিশ্চিত ভাবে লাভজনক করিয়া তুলা সম্ভব নহে।

আমাদের এই উক্তির যথার্থ্য সম্বন্ধে যাঁহার মনে সন্দেহ জাগিবে, তাঁহাকে আমরা বাস্তব ঘটনার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে বলি এবং মনে রাখিতে বলি যে, মনুষ্যসমাজের শিল্প-জাত দ্রব্যের প্রয়োজন সীমাহীন তো নহেই, বরঞ্চ অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। যন্ত্রপরিচালিত প্রত্যেক শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে তত্ত্বাবধান বাবদ কিঞ্চিৎ ব্যয় করিতে হয়। ইহার জন্য প্রতিষ্ঠানকে অন্ততঃ কিছু কাজ করিতে হয় (Minimum Production)। মুখে 'অন্ততঃ কিছু কাজ,' এই কথাটি বলিতে সামান্য, কিন্তু আসলে ইহাতে বেশ মোটা রকমের কাজ এবং যদি মনুষ্যজাতির প্রত্যেকটি প্রয়োজনীয় সামগ্রীর জন্য পৃথিবীর প্রত্যেক দেশ-পিছু একটি করিয়া শিল্প-প্রতিষ্ঠান থাকে, তবে পৃথিবীর অর্দ্ধেক দেশের শিল্প-প্রতিষ্ঠান-জাত এই-রূপ সামগ্রীর পরিমাণ সমগ্র মনুষ্যজাতির প্রয়োজনের অপেক্ষা দ্বিগুণ হইতে বাধ্য। সমগ্র পৃথিবীর ২০২ কোটি সংখ্যক অধিবাসীর প্রয়োজন মাত্র ২০ কোটি মনুষ্যের পরিশ্রমে পূরণ করা সম্ভব এবং ভারতের ৩৬ কোটি অধিবাসীর প্রয়োজন পূরণে যদি যন্ত্রশিল্পের সাহায্য গ্রহণ করা হয়, তবে মাত্র ৩৯ কোটি ভারতবাসীর পরিশ্রমেই উহা সম্ভব হইতে পারে। ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে, যদি এদেশে শিল্প-সংগঠনের এমন ব্যবস্থা করা হয় যাহাতে ৩৯ কোটি অপেক্ষা অধিক লোকের কর্ম্ম-নিয়োগ পাইবার সম্ভাবনা, তবে অতিরিক্ত উৎপাদন অবশ্যম্ভাবী এবং প্রত্যেকটি ভারতীয় শিল্প-প্রতিষ্ঠানের প্রথমে মারাত্মক লোকসান যাইতে যাইতে অবশেষে লালবাতি জ্বালাইতে হইবে।

কিন্তু শিল্প-সংগঠনে কর্ম্মনিয়োগ-সম্ভাবনা যেমন সীমাবদ্ধ কৃষি-সংগঠনে তেমনই সীমাহীন, যদি অবশ্য তরিতরকারী, ফুলের ও ফলের উৎপাদন নিয়মানুগ করা হয় এবং খাদ্য শস্যের উৎপাদনের প্রসারণ বৃদ্ধি করা হয়। কেন না, খাদ্য শস্যের উৎপাদন যত প্রচুরই হউক না, এমন কি, উহার উৎপাদন যদি মনুষ্যসমাজের প্রয়োজনাতিরিক্তও হয়, তথাপি তদ্দ্বারা মনুষ্য-জাতির কোন অনিষ্টকর সম্ভাবনা নাই। উদ্বৃত্ত শাকসব্জী, ফুল ও ফল মাটি ও হাওয়ার পক্ষে যেমন ক্ষতিকর, তেমনই উদ্বৃত্ত খাদ্য-শস্য মাটি ও হাওয়া উভয়ের পক্ষে হিতকর, ইহা বিজ্ঞানের জ্ঞাতব্য।

যদি কৃষিকে কৃষকের পক্ষে নিশ্চিতভাবে লাভজনক করিয়া সংগঠিত করা যায়, তবে তাহারা বৎসরের পাঁচ মাস মাত্র পরিশ্রম করিয়া নিজেদের সম্বৎসরের প্রয়োজনের চারিগুণ নিশ্চয়ই উপার্জ্জন করিবে এবং তখন বৎসরের বাকী সাত মাস তাহারা কুটীর-শিল্পে নিয়োজিত হইতে পারে। ইহাতে কুটীর-শিল্পের পড়তার মজুরীর হার নামমাত্র হইবে, ফলে কুটীর-শিল্পের প্রতিযোগিতায় যন্ত্রশিল্পের টিকিয়া থাকা কঠিন হইবে।

যাঁহারা এই বিষয়ে চিন্তা না করিয়াছেন, তাঁহাদের আমাদের বক্তব্যের এই অংশ সংজ্ঞবোধ্য হইবে না, কিন্তু তথাপি ইহা যথার্থ।

নদীসমূহের যথাযথ সংস্কার সাধিত হইলেই যেরূপ জন-সাধারণের দ্বারা স্বাবলম্বনে আর্থিক প্রাচুর্য্য অর্জ্জনের পথ সুগম

হইতে পারে, তেমনই অণু-সম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় সামান্য জ্ঞান অর্জ্জিত হইলেই যে, জনসাধারণের অন্নাভাবের কারণ দূরীভূত হইতে পারে ও তাহাদের মানসিক শান্তি ও সন্তুষ্টি নিহিত হইতে পারে, ইহাও প্রমাণিত হইবে।*

এই বিষয়ক বিজ্ঞান সাধারণের পক্ষে বুঝিয়া উঠা কঠিন। অণু-সম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় তথ্য বলিতে আমরা বুঝাইতে চাহি, যে-কারণে মনুষ্যাবয়বস্থ অসংখ্য অণু পরস্পর সম্বন্ধবিশিষ্ট রহিয়াছে, সেই কারণ উপলব্ধির কার্য্য। আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, তাহার অণু-পরমাণুসম্বন্ধীয় জ্ঞানের গৌরবে যতই না কেন গৌরবান্বিত হউক, ইহা বাস্তব সত্য যে, উপরিলিখিত বিজ্ঞান তাহার অজ্ঞাত। মনুষ্যাবয়বের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের এবং নাসিকা, কর্ণ ও চক্ষুর আণবিক সংগঠন যখন উপলব্ধ হয়, তখন বুঝা যায়, আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রতীকার-পন্থা, শরীর-বিধান ও শরীর-সংগঠনবিদ্যা যে মিথ্যা ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠানান এবং উহা জনসাধারণের অন্নাভাবের কারণ দূর ত' করিতেছেই না, উপরন্তু তাহাদের অন্নাভাবের প্রতীকার না করিয়া উহার বৃদ্ধি সাধন করিতেছে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, অংশবিশেষের জ্ঞানলাভ সমগ্রাংশের সহিত ঐ অংশের সম্বন্ধের সম্পূর্ণ জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত এবং এই সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জিত না হইলে অংশবিশেষের কোন জ্ঞান বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না। অর্থাৎ, কোন অংশবিশেষের জ্ঞানার্জ্জন সমগ্রাংশের জ্ঞান ব্যতিরেকে সম্ভব হইতে পারে না। এই সামান্য কথাটি বুঝিতে পারিলে বুঝা যাইবে যে, আধুনিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ক বিদ্যার অধিকাংশই বিশ্বাসের অযোগ্য, কেন না, কোন কিছুর সম্পূর্ণ জ্ঞান বিজ্ঞানের আয়ত্ত নহে।

নদীসমূহের যথাযথ সংস্কার বিধান এবং অণু-সম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় জ্ঞান দ্বারা জনসাধারণের যাহা অবশ্য প্রয়োজন, আর্থিক প্রাচুর্য্য, অন্নাভাবের কারণ নাশ এবং মানসিক শান্তি ও সন্তুষ্টি ব্যবস্থিত হইতে পারে, ইহা প্রতিপন্ন হইলেও কি উপায়ে ইহা সাধিত হইবে, ইহাই পরবর্ত্তী প্রশ্ন। এই সম্বন্ধে আমরা "ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর অবস্থা ও কর্ত্তব্য"-শীর্ষক পুস্তকে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি।

সেই আলোচনায় দেখা গিয়াছে যে, নদীসমূহের যথাযথ সংস্কার বিধান এবং মনুষ্যাবয়বস্থ আণবিক সংগঠনের প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জ্জনের অনুকূল ব্যবস্থার প্রথম সোপান ভারতের বিচ্ছিন্নাংশের সম্পূর্ণ ঐক্য।

এই দুই ব্যবস্থা সাধনের জন্য যে ঐক্যের প্রয়োজন, তাহা ঐক্য স্থাপনের জন্য বক্তৃতা দ্বারা কিংবা সাম্প্রদায়িক চুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইবে না। ঐক্যবদ্ধ ভারতের সংস্থাপনার্থে কি প্রয়োজন, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে সমগ্র মনুষ্য-সমাজের বিবিধ অনৈক্যের মধ্যে ঐক্যসূচক বিষয়সমূহ কি করিয়া পৃথক্ করিয়া লইতে হইবে তাহার জ্ঞান প্রয়োজন। ইহা সাধন-সাপেক্ষ। তথাকথিত ঐশী প্রেরণার (inner calls) ভণ্ডামী দ্বারা ইহা সাধিত হইবে না। ইহাতে বরং অনৈক্যের কারণ আরও বৃদ্ধি পাইবে। পৃথিবীর বিবদমান জাতিসমূহের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করিতে হইলে, নেতা, মন্ত্রি-সভা সংস্থাপক এবং অন্যান্য বিবিধ বিষয়ক বহুরূপী অপেক্ষা অধিকতর অধ্যয়ন-রত সাধক ছাত্রের প্রয়োজন। সূচনাতেই বাঞ্ছিত ঐক্য কার্য্যকরীরূপে সাধিত হইতে পারে না। কিন্তু কংগ্রেস ও লীগের কার্য্যপদ্ধতিতে এমন কোন বিষয় সন্নিবিষ্ট হইলে চলিবে না, যাহাতে দেশের একটি ব্যক্তিরও উহাতে যোগদান করিতে বাধা উপস্থিত হয়।

যদি এক মুখে বলা যায় যে, আমি ভারতের ঐক্যস্থাপনে অভিলাষী এবং অন্য মুখে বলা যায়, যে অহিংসা কিংবা আমার কর্ম্মপদ্ধতিতে বিশ্বাসী নহে, সে আমার প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিবার অনুপযুক্ত, তবে উহা কি ছেঁদো কথার সামিল হয় না এবং উহার দ্বারা কি নিজেকে এবং অপরকে প্রতারণা করা হয় না?

কিন্তু যদি বলা যায় যে, আমার প্রতিষ্ঠান আর্থিক প্রাচুর্য্য, অন্নাভাবের কারণ নাশ এবং মানসিক শান্তি ও সন্তুষ্টি বিধানে ব্রতী, এবং যে কেহ এই তিনটি উদ্দেশ্য পূরণে অভিলাষী, সেই আমার প্রতিষ্ঠানের সদস্য হইতে পারে, তবে আমরা জোর করিয়া বলিতেছি, পৃথিবীতে এমন কেহ নাই, যে সেই প্রতিষ্ঠান হইতে যুক্তিসঙ্গত ভাবে দূরে থাকিতে পারে।

---

* ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত "ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ভারতীয় কবিগণের কথা"য় ইহার আভাস পাওয়া যাইবে এবং অতঃপর আরও কয়েকটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ইহার সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

আমরা মনে করি, ভারতের বিভিন্নাংশের ঐক্যস্থাপনের মূল সূত্র ইহাই হওয়া উচিত। যদি কংগ্রেস এবং লীগ উভয়ের কর্মতালিকা হইতে অনৈক্যসূচক বিষয়সমূহ বর্জন করিয়া ঐক্যমূলক বিষয়ের ভিত্তিতে কর্মতালিকা প্রস্তুত হয়, তবে বাঞ্ছিত ঐক্য অনতিবিলম্বে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। এইবার আমরা দেখিব, যুক্তপ্রদেশ রাজনৈতিক সম্মেলনের আলোচ্য অধিবেশনে যে সুদীর্ঘ কার্যতালিকা উপস্থিত করা হইয়াছে, তাহাতে আর্থিক প্রাচুর্যের অর্জনোপায়, অন্নাভাবের কারণ-নাশের উপায়, মানসিক শান্তি ও সন্তুষ্টিবিধানের উপায় অথবা ভারতীয়গণের ঐক্য সাধনের কোন পন্থার ইঙ্গিত পাওয়া যায় কি না।

এই তালিকার উন্নতিসূচক কার্যের প্রথম বিষয় হইতেছে, টাকা বৃদ্ধির ব্যাপারে আইনতঃ নিম্ন-পরিষদের শেষ কথা বলিবার দাবী স্বীকার।

তালিকার অবশিষ্টাংশ এইরূপ :—

(১) ব্রিটিশ রীতি অনুযায়ী পার্লামেন্টের সেক্রেটারিদিগের শাসনতন্ত্রের ও পার্লামেন্টের কার্য-পদ্ধতির দাবী নির্দেশ। (২) পরিষদের সভাপতির নিরপেক্ষতা বজায় রাখিয়া স্পীকারের রাজনীতিগত কার্যভার অংশ গ্রহণ। (৩) পরিষদে বিধি হিসাবে, (ব্যক্তিগত হিসাবে নহে) হিন্দুস্থানীতে বক্তৃতা দানের রীতি। (৪) মহীশূরের যুদ্ধ সম্পর্কে শান্তিবিধিতে কোন বিষয়ের অন্তর্ভুক্তির প্রতিবাদ। (৫) সম্রাট কর্তৃক প্রদেশের অধিবাসিগণের দেওয়ান ও পরবী বিতরণ, নিন্দাসূচক প্রস্তাব পরিষদ্ কর্তৃক গ্রহণ এবং সংস্কারের দ্বারা সমর্থন। (৬) রাজকীয় চিহ্নের পরিবর্তে সরকারী সেক্রেটে এবং কাগজপত্রে একটি বিশেষ প্রাদেশিক চিহ্ন ব্যবহারের ব্যবস্থাপন। (৭) প্রাদেশিক পরিষদ কর্তৃক বিচারকের বাপনের দাবী। (৮) মাদক দ্রব্য বিক্রয় নিবারণের জন্য রাজস্বের ষাটতি পূরণার্থ আয় সংকোচ ও নূতন ট্যাক্সের প্রবর্তন। (৯) কোর্টফি এবং ট্যাক্স আইনের সংশোধন ও ফলে ৩০ লক্ষ টাকা বার্ষিক আয়বৃদ্ধির সম্ভাবনা। (১০) শর্করার উপর সেস বসান, ফলে বার্ষিক ৫০ লক্ষ টাকা আয়বৃদ্ধির উপায়। (১১) সুরার উপর কর-বৃদ্ধি, ফলে আয়বৃদ্ধি এবং মেদ্যপতার মাত্রা উৎপাদনের সম্ভাবনা। (১২) পল্লী-উন্নয়ন এবং কৃষি-তাগাভি কার্যে ৫০০০ হাজার শিক্ষিত যুবকের নিয়োগব্যবস্থার দ্বারা বেকার-সমস্যার সমাধান প্রয়াস। (১৩) পুলিশ বিভাগের সংস্কার, ব্যয়বৃদ্ধি এবং কার্যের উৎকর্ষ বৃদ্ধি। (১৪) চিকিৎসা বিভাগের সংস্কার ও জনস্বাস্থ্যের শিক্ষার জন্য স্কুল স্থাপন। (১৫) পুলিশ বিভাগের আরও সংস্কার কার্য, সামরিক ও প্রহরাকার্যে কাপুরুষ পুলিসের বাদসূত্র ব্যবস্থা। (১৬) যুদ্ধক্ষেত্রে আতিসমূহের প্রতি অধিকতর সদয় ব্যবহার। (১৭) সাম্প্রদায়িক বিবাদসমূহের উল্লেখযোগ্য বিশ্লেষণ। (১৮) কানপুর শ্রমিক হাঙ্গামায় সরকারের দায়ত্ব ও অধিকতর সন্তোষজনক কার্যনির্দেশ। (১৯) টুণ্ডার জমিদারীর ব্যাপারে সরকারী কর্মচারীদের পক্ষগ্রহণ ও মুসলমান সম্প্রদায়ের আপত্তি মিটাইতে অবহেলার ব্যবস্থা। (২০) তুমিসংক্রান্ত ও সাম্প্রদায়িক ব্যাপারে আগ্রের হকুম জমন এবং জিলা ম্যাজিস্ট্রেটের কর্তৃত্বাধীন পুলিশকর্তৃক বস্তুতার রিপোর্ট গ্রহণের ক্ষমতা দান। (২১) সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষসূচক ও হিংসাত্মক বক্তৃতার উপর নিয়ন্ত্রণ। (২২) উৎকোচ-প্রতিবিধান বিভাগ স্থাপন ও পতকরা আশীটি উৎকোচ ও জোরজুলুমের ব্যাপার ধরা। (২৩) অস্থায়ী ধরা উপরে ও কলেরা মহামারীর কালে সাহস ও দৃঢ়তা প্রদর্শন। (২৪) শৈলবিহার পণ্ডিত ও কর্মিদলের পদ স্থায়িত্ব করা। (২৫) উচ্চ, মধ্য ও নিম্ন বেতনভোগী সরকারী কর্মচারীর বেতন সংস্কার। (২৬) আমলাদের ৫৫ বৎসর বয়সে পেনসন দিবার ব্যবস্থা। (২৭) অনেক প্রভিন্সিয়াল চাকুরিকে সেক্রেটারিয়েটে কার্য দান। (২৮) জিলা কর্মচারীদের কর্মফল জমা স্থাপনে কার্যের উৎকর্ষের প্রতি দৃষ্টি রাখা। (২৯) আইন-অমান্য আন্দোলন কালে বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি ও তহবিলের প্রত্যর্পণ। (৩০) রাজনৈতিক কার্যকারিতা ব্যক্তিদের উপর হইতে পুলিসের নজর প্রত্যাহার। (৩১) জেল হইতে সাম্প্রদায়িক কয়েদীর মুক্তি। (৩২) রাজনৈতিক বন্দী সম্পর্কিত আইন-কানুনের উন্নয়ন। (৩৩) কংগ্রেস-পতাকা উত্তোলনে বাধা না দিবার জন্য কমিশনারগণকে নির্দেশ দান। (৩৪) নাবিকগণের হাতে হৈয়ারী কাগজ হস্তান্তরের এবং সরকারী কর্মচারীদের জাহাজে প্রস্তুত কাগজ হস্তান্তরের ব্যবস্থা। (৩৫) ছাত্রিসংক্রান্ত সরকারী কুপাসমূহ ব্যবহার করিবার অধিকার দান। (৩৬) সরকারী চাকুরিতে অধিকতর সংখ্যায় তপশীলভুক্ত জাতির পদপ্রার্থীদের স্থান। (৩৭) আমের আমলে নির্দিষ্ট অনেকগুলি পুস্তকের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার। (৩৮) পরিষদে বিরুদ্ধাচরণ প্রস্তাবের সংস্কার আইন আমদন। (৩৯) প্রথা ও অবমর্দন বিরুদ্ধে ডিক্রিজারি ও খাজনা-আইন অনুযায়ী খাজনা মকুব। (৪০) শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ পৃথক্‌করণ। (৪১) পরিবর্তিত নিয়মানুযায়ী অনারারী ম্যাজিস্ট্রেটের সৃষ্টি। (৪২) বিদ্যালয় কর্তৃক কংগ্রেস পক্ষীয় সংবাদপত্রের গ্রাহক হইবার নিষেধাত্মক ইস্তাহার প্রত্যাহার। (৪৩) জনসাধারণের বিশ্বাস উৎপাদনার্থ কার্যপদ্ধতি অনুযায়ী সংবাদপত্রসমূহের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের লইয়া পরামর্শবিভাগ গঠন। (৪৪) জনস্বাস্থ্য ও পল্লীউন্নয়ন কার্যের সংগঠন। (৪৫) অকরমান প্রসারের আন্দোলন। (৪৬) জেল বিভাগের সংস্কার।

যদি এই উন্নতিবিধায়ক তালিকার উপরোক্ত ছেচল্লিশটি পথের প্রত্যেকটি এক এক করিয়া গভীরভাবে পরীক্ষা করা হয়, তবে দেখা যাইবে যে, তাহার একটিও জনসাধারণের আর্থিক প্রাচুর্য, অন্নাভাবের কারণনাশ অথবা মানসিক শান্তি ও সন্তুষ্টিবিধানের বিন্দুমাত্র সহায়ক নহে। এই তালিকার প্রত্যেকটি হয় সম্প্রদায় নয় ব্যক্তিগত স্বার্থের

ছায়ারাজা ৫৭/৮৮৭.

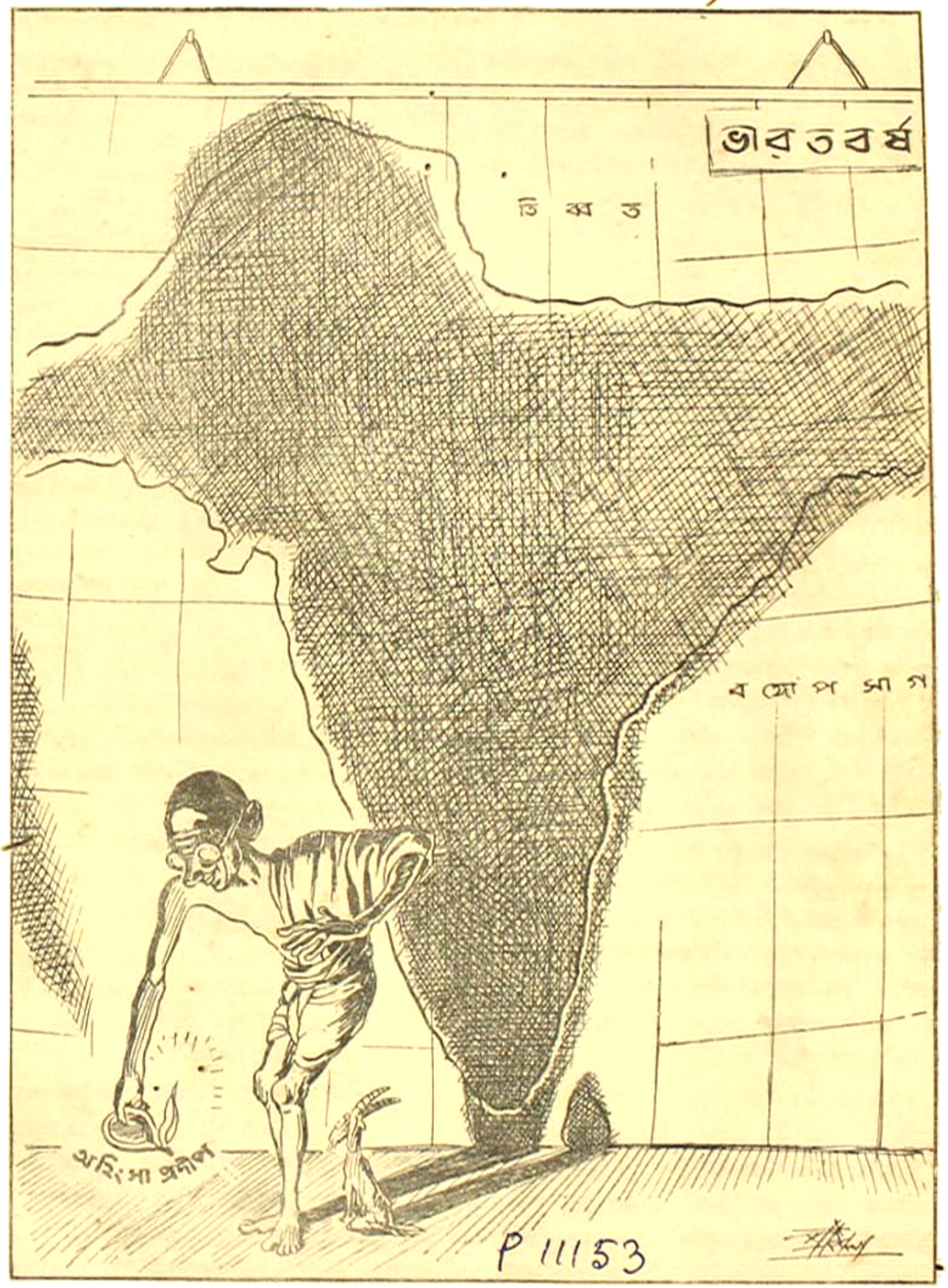

'এখনও নিজেরই ছায়া
রহিছে কত যে গায়া...'

পোষক। যদি গত এক বৎসর কালের মধ্যে যুক্তপ্রদেশের কংগ্রেসী সরকার মোট এই কার্য্য করিয়া থাকেন, তবে ইহাকে 'এক বৎসরের শৃঙ্খলাবদ্ধ উন্নতি' বলিবার কি যুক্তি-যুক্ততা থাকিতে পারে? ঐক্য-সংগঠনের দিক্ হইতে দেখিলেও দেখা যাইবে যে, তালিকার প্রত্যেকটি দফা বর্ত্তমান অবস্থার উন্নতি সাধন তো করিবেই না, বরং অধিকতর অনৈক্য সৃষ্টি করিবে। সুতরাং আমরা ইহাকে 'কংগ্রেসের ধাপ্পাবাজীর নমুনা' আখ্যা দিয়াছি। জন-সাধারণ এই সকল ধাপ্পাবাজ কংগ্রেসী পাণ্ডাদের কতদিনে চিনিবেন, আমরা তাহার প্রতীক্ষা করিতেছি। যদি অনতি-বিলম্বে তাঁহারা ইহাঁদের স্বরূপ না বুঝিতে পারেন, তবে তাহার পরিণাম ভীষণ হইবে।

লর্ড লিনলিথগো ও যুক্তরাজ্য প্রতিষ্ঠা

আমাদের পাঠকবর্গ অবগত আছেন যে, এসোসিয়েটেড চেম্বার্সের গত কলিকাতার অধিবেশনে বড়লাট লর্ড লিন-লিথগো বাহাদুর একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার অভিভাষণে তিনি অনেক কথারই উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু মূলতঃ তাঁহার বক্তৃতার প্রসঙ্গই ছিল, "ফেডারেশন" বা যুক্তরাজ্য-প্রবর্ত্তন-সমস্যা। তাঁহার বক্তৃতাটি প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

এতদ্ব্যতীত ফেডারেশনের বিরুদ্ধে যে সমস্ত যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি প্রথমভাগান্তর্গত। এই উক্তির মর্ম্মার্থ এই যে, ফেডারেশনের বিরোধীর যুক্তিগুলি এ-পর্য্যন্ত যাহাই তাঁহার গোচরীভূত হইয়াছে, সে সবই যুক্ত-রাজ্য পরিকল্পনার রচয়িতাগণ পূর্ব্ব হইতেই বিবেচনা করিয়া লইয়াছিলেন। এই বিভাগভুক্ত বড়লাটের নিম্নলিখিত উক্তিগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :—

(১) ফেডারেশনের প্রবর্ত্তকগণ নিশ্চয়ই পরিজ্ঞাত ছিলেন যে, মনুষ্যের মস্তিষ্ক-প্রসূত কোন কর্ম্মপন্থাই নিখুঁত হইতে পারে না। বিশেষতঃ যে ক্ষেত্রে দুরূহ ও কঠিন সমস্যার মীমাংসা আবশ্যক এবং যে দুঃসাধ্য সমাধান ইতিপূর্ব্বে কোন জাতির ইতিহাসেই সংঘটিত হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না, সে-স্থলে গুরুতর ত্রুটী থাকিলেও বিস্ময়ের কোন কারণ নাই।

(২) ভারত-শাসনতন্ত্র-সমস্যার যুক্তরাজ্য পরিকল্পনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং সর্ব্বতোভাবে কার্য্যকরী।

(৩) ভারতের বিভিন্ন অংশের ঐক্য প্রতিষ্ঠাই এই পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য।

(৪) ভারতের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ঐক্য-প্রতিষ্ঠার এতদপেক্ষা অধিকতর ফলপ্রসূ কোন পরিকল্পনা আজি প্রস্তুত নহি।

(৫) এই ঐক্যবন্ধনের প্রয়োজনীয়তা তিন বৎসরের পূর্ব্ব অপেক্ষাও আজ সমধিক ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

(৬) ইউরোপীয় পরিস্থিতিতে যে সমস্ত পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে এবং তাহাতে যে সমস্ত নব নব ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে, সেগুলির সহিত ব্রিটিশ রাজনীতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায় এই অবস্থার পরিকল্পনা আরও আবশ্যকীয় হইয়া পড়িয়াছে।

(৭) প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের সাফল্যে যুক্তরাজ্যের মধ্যদিয়া বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা সমধিক ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

(৮) প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যের সাফল্য যতই বাড়িতে থাকিবে, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশগুলি—যেহেতু তাহাদের পরস্পরের জাতি ও ধর্ম্মসম্বন্ধ এবং অর্থনীতি ও রাজনৈতিক অবস্থা এতই পৃথকত্বাপন্ন—কেন্দ্র হইতে ক্রমেই দূরে অপসারিত হইয়া পরস্পরের মধ্যে ঐক্যবন্ধনে পরিপন্থী হইবে এবং ক্রমে ভারত-শাসনে ঐক্যপ্রতিষ্ঠামূলক আমাদের ভবিষ্যৎ উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

বক্তৃতার দ্বিতীয় ভাগের বিষয়—যুক্তরাজ্যের উপকারিতা অথবা গোটা (সমগ্র) ভারতবর্ষের মধ্যে ঐক্য-সংস্থাপন। এই সম্বন্ধে বড়লাটের বিশেষ প্রণিধানযোগ্য উক্তিটী নিম্নলিখিতভাবে বিবৃত হইয়াছে।

(১) সর্বজাতির সমক্ষে ভারতের সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি একমাত্র ঐক্যের উপরেই নির্ভর করে এবং একতার বলেই ভারত আবার তাহার লুপ্ত গৌরব উদ্ধার করিয়া তাহার প্রাচীন ইতিহাস, পূর্বগৌরব এবং নিজস্ব কৃষ্টির অধিকার লাভে সমর্থ হইবে।

তৃতীয়—ফেডারেশনের অর্থ-নীতির গুরুত্ব লইয়া। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, একতার সম্পূর্ণ সাফল্য একদিনে সম্ভব নয়, কিন্তু শীঘ্রই আশাতীত ফললাভ অনিবার্য্য। নানারূপ অসুবিধা এবং বাধাবিঘ্নসত্ত্বেও প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন মোটামুটিভাবে যেরূপ সফল হইয়াছে, ফেডারেশনও সেইরূপ সুফল প্রসব করিবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে।

বড়লাট বাহাদুরের বক্তৃতার বাকী অংশগুলির তাৎপর্য্য এই যে—

(১) তাঁহার পূর্ব্বানুমানটি কার্য্যে পরিণত হইয়াছে।

(২) যুক্তরাজ্যে যোগদানকল্পে দেশীয় রাজ্যগুলির উপর সরকার বাহাদুর কোনই চাপ দিবেন না।

(৩) প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও যুক্তরাজ্য এতদুভয়েরই মূল উদ্দেশ্য—ভারতের স্বার্থ সংরক্ষণ।

উপসংহারে বড়লাট বাহাদুর পরস্পরের সংহতির জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়া বক্তৃতাটি শেষ করিয়াছেন।

আমরা ভারতবাসী, আমরা বুঝি যে, আমাদের রাজার সুযোগ্য প্রতিনিধির মুখ হইতে যে সকল উক্তি নিঃসৃত হইয়াছে তাহার প্রতিবাদ করিবার আমাদের সঙ্গত অধিকার নাই, এবং তিনি যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন তাহা গলাধঃকরণ করিতেই আমাদের চেষ্টা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। আমাদের চিরন্তন জ্ঞান এই যে, আমাদের রাজা নরদেহে ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছু নহেন। আবহমান কাল হইতে আমাদের ধারণা —"মহতী দেবতা হেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি" এবং তাঁহার প্রতিনিধিগণকে তাঁহারই অনুরূপভাবে আমাদিগকে দেখিতে হইবে, এবং এই রাজপ্রতিনিধিগণ যেরূপ দূরদর্শী, তাহাতে তাঁহাদের ভবিষ্যদ্বাণী যে প্রকৃতই সত্য ঘটনায় পরিণত হওয়া সম্ভব, এ বিষয়ে বিস্ময়ের কি কারণ আছে? আমরা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করি যে, কেবল দেশীয় রাজ্যের শাসনকর্ত্তা কেন, কোন লোকের প্রতিও বাধ্যতামূলক নীতির পরিকল্পনা অসম্ভব। যতদিন পর্য্যন্ত আমাদের শাসনকর্ত্তাগণ জানেন যে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও যুক্তরাজ্য—এতদুভয়েরই উদ্দেশ্য একমাত্র ভারতের স্বার্থসংরক্ষণ, ততদিন পর্য্যন্ত আমাদের সন্দেহের কোন কারণ নাই। যখন বড়লাট বাহাদুর স্বয়ং আমাদিগকে এরূপ আশ্বাস দিতেছেন এবং সংহতির জন্য সকলকে আহ্বান করিতেছেন তখন আমাদের স্বতঃই ধরিয়া লইতে হইবে যে অনুরূপ সহযোগিতা প্রদান করিলে আমাদের কোন অনিষ্টই হইবে না।

আমরা সাধারণ মানব এবং আমরা বলিতে দ্বিধা করি না যে, বড়লাটের ন্যায় আমাদের মস্তিষ্ক এত প্রখর নয়, তাই তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণীর বিপক্ষে আমরা কিছু বলিতে চাহি না। যদিও আমাদের শক্তিমান্ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কেহ কেহ এবং সাংবাদিকগণ ইদানীং এখানে সেখানে বিরুদ্ধ মত উত্থাপন করিতেছেন বটে, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস যে, যুক্তরাজ্য পরিকল্পনা ব্যাপারেও প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের ন্যায়ই পূর্ব্বোক্ত মুখর ভারতবাসিগণ কর্ত্তৃক প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে সহযোগিতা প্রদত্ত হইবে, আর যুক্তরাজ্য প্রবর্ত্তনও প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের মতই সাফল্যলাভ করিবে।

বড়লাট বাহাদুরের বক্তৃতার শেষ চারিটী অংশ সম্বন্ধে আমাদের কোন আপত্তি নাই এবং সে বিষয়ে আমরা কিছু বলিবও না।

প্রথম তিনটী অংশ বিশেষ রূপে অনুধাবনযোগ্য, কিন্তু বড়ই সমস্যাপূর্ণ। এ সম্বন্ধে যে কয়টি কথায় আমাদের মনোযোগ বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়, তাহা নিম্নলিখিতরূপে বিবৃত হইতে পারে।

(১) ভারতের জন্য একতা একান্ত প্রয়োজনীয়।

(২) যে কোন কর্ম্মপন্থাই প্রবর্ত্তিত হউক না কেন, উহার একমাত্র উদ্দেশ্য একতা।

(৩) প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের কার্য্যপ্রণালী বেশ সুষ্ঠুতার সহিত সম্পন্ন হইয়াছে।

(৪) প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রণালী যত বেশী ফলপ্রসূ হইবে, ততই উহাদিগের কেন্দ্রাপসারিত হইবার আশঙ্কা আছে।

এই শেষোক্ত কথাটিতে আমাদের বড়ই বিস্ময় জন্মিয়াছে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এই কথাটির অর্থ-ই হয় না। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের কর্ম্মদাক্ষ্যে একতাবন্ধনের

যদি বস্তুতই কোনও রূপ হানি হয়, তবে কি আমরা ইহা বুঝিব না যে, বড়লাট বাহাদুর হয় মনে করেন যে, একতাবন্ধন বস্তুতই প্রয়োজনীয় নয়, তাই এতদুদ্দেশ্যে কোন কর্ম-পন্থার প্রবর্তনেরই কোন আবশ্যকতা নাই ; নতুবা মনে করেন যে, একতার প্রয়োজন আছে বটে, কিন্তু প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনে যখন একতাবন্ধন হয় নাই, অতএব উহা অচিরেই পরিত্যাগ করা কর্তব্য।

আমরা বড়ই গোলে পড়িলাম। বড় লাটের ন্যায় শক্তিমান্ পুরুষের কথার অর্থ বুঝিবার মত আমাদের বুদ্ধি নাই। আমাদের পাঠকবর্গ আমাদের সহায়তা করিলে আমরা বাধিত হইব। আমরা এখন কি করিব? আমরা এখন কি হুইস্কি-সোডার আশ্রয় গ্রহণ করিব, না, কাটলেট-কারীতে উদরতৃপ্তি করিব? আমরা কি এখন উদ্যান-সম্মিলনী ও নৃত্যানুষ্ঠানে যোগদান করিয়া স্ত্রীলোকগুলিকে পুরুষে আর পুরুষগুলিকে স্ত্রীলোকে রূপান্তরিত করিব, না, খেলাধূলায় মনোনিবেশ করিয়া শক্তিসঞ্চয়ে নিরত থাকিব ও শক্তিবলে মস্তিষ্কের দ্রবপদার্থগুলি হস্তপদের অস্থিমাংসে পরিণত করিব? আমরা কি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া চাকুরী লাভ করিবার মনোভাবই অর্জন করিব, না, আমরা ওয়ার্দ্ধার কল্পিত শিক্ষাপ্রণালী অনুসরণ করিয়া বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা একেবারে জলাঞ্জলি দিয়া সমগ্র জাতিকে শ্রমজীবীতে পরিণত করিব, অথচ এই শ্রমজীবিগণ কিরূপে অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিবে সেই ইঙ্গিতটী পর্যন্ত জানাইয়া দিতে পারিব না? সত্যই আমরা বড় মুস্কিলে পড়িলাম ত!

বড়লাটের এই কথাটীর অর্থ বড়ই বিস্ময়কর।

বড়লাটের কথার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য একতার প্রয়োজনীয়তা। তিনি বলেন—

(১) সমগ্র জাতির মধ্যে ভারতের প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি নির্ভর করে একমাত্র একতার।

(২) জগতের ইতিহাসে ভারতবর্ষ কিরূপ যোগ্যস্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইবে তাহাও নির্ভর করে একতার।

(৩) জগতের শক্তিসংগঠনের প্রতিযোগিতায় ভারত আবার তাহার নিজস্ব ইতিহাস, যোগ্যতা এবং কৃষ্টি অনুযায়ী আপন প্রাধান্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইবে কি না তাহাও নির্ভর করে একতায়।

বোধ হয় তাঁহার এই কথাগুলি আমাদের উপলক্ষ করিয়া বলা হয় নাই। আমরা কাহারা? আমরা বাগ্মী নই এবং আমাদের কথা বুঝাইবার মত শক্তিও আমাদের নাই; কিন্তু আমরা সামান্য নহি। আজ আমরা বলিতে বাধ্য যে, দেশের ৩৬ কোটী লোকের মধ্যে যে ৩৫ কোটী এখন পর্যন্ত শিক্ষা বা সভ্যতার কোন সন্ধান পায় নাই, আমরা তাহাদেরই অন্তর্গত। আমরা রাজনীতি বা শাসনতন্ত্রও বুঝি না। বিজ্ঞানসম্মত কৃষিবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, জীবতত্ত্ব বা নৃতত্ত্ব কোন বিদ্যারই আমরা সন্ধান রাখি না। আমরা প্রাধান্য, প্রতিপত্তি, জাতীয়তা প্রভৃতি কথার মর্মও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিনা, কিন্তু আমরা বুঝি একমাত্র কথা—"একতা"। আমরা বুঝি আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য অন্নবস্ত্র, বাসস্থান ও পানীয়, কিন্তু 'জগতের সমক্ষে ভারতের যোগ্যস্থান রক্ষা করিবার শক্তি' প্রভৃতি বড় বড় কথার ধার আমরা ধারি না। আমাদের দেশবাসীর অর্থসমস্যা পূর্ণ করিতে অথবা স্বাস্থ্যহানি বা দেহক্ষীণতা নিবারণ করিতে যাঁহারা আমাদিগকে উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া দিতে সমর্থ, আমরা অবনত মস্তকে তাঁহাদের কথাই গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি। তাই, যতদিন আমরা আমাদের হাত পা ও মন ঠিক রাখিতে পারি ততদিন যে শক্তির উপরেই আমাদের শাসনভার ন্যস্ত থাকুক না কেন, আমরা সে বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ।

বোধহয় বক্তা, রাজনৈতিক বা সাংবাদিকের উচ্চকণ্ঠই কেবল আমাদের রাজ-প্রতিনিধি মহাশয়ের কর্ণে পহুঁছিয়াছে, তাই আজ তিনি তাঁহাদেরই প্রয়োজন মত একতার উপকারিতা সম্বন্ধে ধারণা করিয়া বসিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারাই কি সব? আমাদের নীরব ভাষা কি বড়লাট বাহাদুরের মর্ম্মে প্রবেশ করে নাই? তিনি কি ভাবিয়াছেন, পুরুষানুক্রমে সম্বন্ধে তাঁহার প্রদত্ত সহযোগিতার অর্থ আমাদের বোধগম্য হইবে? আমরা আমাদের প্রাণের বেদনা, হৃদয়ের ব্যথা, প্রকৃত অভাবের কথা তাঁহাকে বুঝাইতে পারি না সত্য, এবং তিনিও আমাদিগকে তথাকথিত জাতীয় মহাসমিতির ন্যায় উপেক্ষা করিতে পারেন বটে, কিন্তু যথাসম্ভব বিনয়ের সহিত আমাদের মর্ম্মব্যথা বিদিত করিতে হইতেছে যে, ছয়ত্রিশ কোটী লোকের মধ্যে অবশিষ্ট ৩৫ কোটি দেশবাসীরই

আমরা একজন। আমরা মুক হইতে পারি, অসভ্য হইতে পারি, অশিক্ষিত হইতে পারি, কিন্তু আমাদের শক্তি উপেক্ষণীয় নয়! আমাদের ক্রয়বিক্রয় আছে যে, আবশ্যক হইলে আমাদের কোটী লোকের সম্মিলিত কণ্ঠ—মানবজাতির ত কথাই নাই, স্বর্গের দেবতার আসনও স্পন্দিত করিতে সমর্থ হইবে।

আমরা চাই, আমাদের এবং আমাদের পরিবারবর্গের অর্ধ-ক্লেশ, ব্যাধি, অসুস্থতা এবং অশান্তি সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হউক। ইহাই আমাদের একমাত্র কাম্য এবং এইটুকু পাইলে আমরা আর কিছু চাহি না। সামান্য সামান্য অভাব আমরা গ্রাহ্যই করি না, কিন্তু অভাবের প্রাচুর্য্য যখন আমাদের ধৈর্য্যের সীমায় পঁহুছে, তখন আমরা বিচলিত হইয়া পড়ি। যে শাসনতন্ত্র আমাদের এই অভাব বুঝিতে এবং দূর করিতে সমর্থ তাহার পতন অসম্ভব, কিন্তু আমাদের অভাব এবং অভিযোগ সম্বন্ধে যে গবর্ণমেণ্ট উদাসীন, কোন বাগ্মীর উচ্চকণ্ঠই উহার অনিবার্য্য পতন রোধ করিতে সমর্থ হইবে না।

যদিও আমরা ইতিহাস-বিশেষজ্ঞ নই, কিন্তু একথা আমাদের সুধীর লাট বাহাদুরকে বুঝাইতে চাই যে, হিন্দুরাজা ও মুসলমান নবাবগণের আমাদের বিষয়ে ঔদাসীন্যেই তাঁহাদের রাজ্যের পতন হইয়াছে। দেশের বাগ্মিক সম্প্রদায় (vocal public) উহা রক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই। এই সম্প্রদায় জনসাধারণের তুলনায় খুবই সংখ্যালঘিষ্ঠ এবং যে ভাবেই বা যেরূপেই তাহাদের উচ্চ কণ্ঠ গগন প্রতিধ্বনিত করিয়া উচ্চারিত হউক না কেন, দেখা যায় যে, তাহারা প্রচলিত শাসনতন্ত্রের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পোষকতাই করিয়া থাকে।

ইতিহাস-বিশেষজ্ঞগণ হয় ত দেখিয়া থাকিবেন কি না জানি না, কিন্তু এ কথা সত্য যে, মুসলমান রাজত্বের অবসান কালে কোন কোন মুসলমান নবাব আপন আপন বিলাস, স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রভুত্ব-প্রিয়তার এত বেশী আসক্ত ছিল এবং প্রজাগণের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি এতই উদাসীন ছিল যে, দেশবাসীর অসহনীয় দারিদ্র্যই ইহার পরিণামের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। পক্ষান্তরে আমাদের বড়লাটের পূর্ব্ব পুরুষগণ বাণিজ্য করিতে আসিয়া চাকুরী এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা-প্রদানে বড়ই তৎপর ছিলেন। ইহাতেই তাঁহারা প্রজার হৃদয় অধিকার করিতে সমর্থ হন এবং ইহাতেই মুসলমানরাজ্য ধ্বংস হইয়া তৎস্থলে ইংরাজ-রাজ্য প্রতিষ্ঠার সুবিধা হয়। ঐই সময় মুদ্রণ সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল না। তদবধি মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজ্য-কালের শেষ সময় পর্য্যন্ত এইরূপ চাকুরী ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা প্রদান করিয়া তাঁহারা বরাবর আমাদের সাহায্য করিয়াছেন। অবশ্য ইহাতে তাঁহাদেরও সুবিধা হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু যাহারা কেরাণী, বণিক্ বা উচ্চ চাকুরীজীবী রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহাদেরও বিস্তর সুবিধা হইয়াছে। ইহা শোষণনীতি বলিয়া আখ্যাত হইতে পারে না। পরস্পর পরস্পরের প্রতি সহযোগিতা-নীতিতেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সম্পূর্ণতা সম্পাদিত হয় এবং মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালের শেষ সময় পর্য্যন্ত এই নীতি সর্ব্বত্র খুবই সুফল প্রসব করে।

কিন্তু সব ভাল থাকিলেও, একটি বিষয়ের বড়ই অভাব ছিল। আমরা কৃষিকার্য্যে তাঁহাদের ঔদাসীন্যের কথা বলিতেছি। অবশ্য কেবল এই বিষয়ে তাঁহাদিগকে দায়ী করাই ন্যায়সঙ্গত হইবে না, কারণ তাঁহারা ব্যবহারিক কৃষিজীবী নন, আর এই বিষয়ে তাঁহাদের বিশিষ্ট জ্ঞানও নাই। কিন্তু তাহাদের ভুল যে তাহাদের এই জ্ঞানাভাব তাঁহারা স্বীকার করেন না। ইহাতে ভারতের কৃষি-শিল্প ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং ভারতবাসিগণ দারিদ্র্যগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইয়াছে এবং আত্মরক্ষার জন্য আজ ইহাদের অস্ত্র উপায়ের প্রয়োজন হইয়াছে। এই কারণেই জনসঙ্কুল পথে দেশবাসীকে পরিচালিত করিয়াও কংগ্রেস কতকটা প্রতিষ্ঠালাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু আমরা শীঘ্রই দেখিতে পাইব যে, বর্ত্তমান কংগ্রেস ইংরাজদের অপেক্ষাও বেশী অনিষ্টের কারণ হইবে। ইংরাজ জাতিকে আমরা সম্মান করি। এই ইংরাজই গতির নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছে এবং যন্ত্রপাতি এই নিয়মেই পরিচালিত হইতেছে। এই ইংরাজজাতিই বর্ত্তমান মুদ্রাবিনিময়, টাকার পরীর ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিয়া দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। এই সমস্ত প্রথার প্রবর্ত্তনায় অন্যের কৃতিত্বও থাকিতে পারে, কিন্তু কালের নিয়মে অনুধাবন এবং বিশ্লেষণমূলক অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে স্বতঃই স্বীকার করিতে

হইবে যে এই সমস্ত প্রথা-প্রচলনের কৃতিত্ব একমাত্র ইংরাজদের। আমরা এ কথা বলি না যে, স্যাঙ্কিং বা কারেন্সীর নিয়মকানুন একেবারে নিখুঁত ও সর্ব্বথা প্রশংসাযোগ্য কিন্তু এ কথা ঠিক যে ঐ প্রথাগুলি ইংরাজ মস্তিষ্ক প্রসূত না হইলে এই সংসার ঘোরতর দুরবস্থায় নিপতিত হইত।

হাঁ, আমাদের ব্রিটিশ জাতিকে সম্মান করিবার যথেষ্ট প্রবল যুক্তি আছে, কিন্তু এ কথাও ঠিক যে এক শতাব্দীর পূর্ব্বে যে ব্যক্তিগত জীবনের ঔদার্য্য ও ন্যায়পরায়ণতা তাঁহাদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল তাহা অনেক অংশে ম্লান হইয়া পড়িয়াছে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও ইংরাজদের মধ্যে যে পরস্পর সহযোগিতা ও সৌজন্য সুস্পষ্ট দেখা যাইত, আজ তাহা যেন অন্তর্হিত হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই সমস্ত বিশিষ্ট গুণের অভাব হইয়া পড়িয়াছে এবং প্রভুত্বপ্রিয়তা অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। আর যদিও তাহাদের কোন কোন বিষয়ে উদারতার বৃদ্ধি হইয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস করিবার কারণ আছে, কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত তাহাদের যেরূপ ন্যায়-পরায়ণতা অতিমাত্রায় দৃষ্ট হইত, তদূর পর্য্যন্ত এখনও তাহারা আসিতে পারেন নাই। পরস্পর সহযোগিতা ও উদারতার দৃষ্টান্ত এখন যদিও আবার সুরু হইয়াছে কিন্তু তাহা অধিকাংশই বাহ্যিক, অন্তরের সঙ্গে উহার বিশেষ যোগ নাই। না থাকিলেও এই কথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে, তাহাদের শিরায় শিরায় ব্রিটিশ জাতীয়তার সম্পূর্ণ তেজ প্রবাহিত। তাই তাহারা জগতের অন্য সকল জাতি অপেক্ষাই অধিকতর শ্রদ্ধার পাত্র এবং তাহাদের ত্রুটি এবং আন্তরিকতার অভাব সত্ত্বেও আমরা তাহাদিগকেই অধিকতর সম্মান করিয়া থাকি। আমাদের বিশ্বাস, অন্যান্য সকল জাতি অপেক্ষা ইংরাজজাতি অধিকমাত্রায় সৎকার্য্যের অধিকারী। আমরা একথা বলি না যে, তাহারা একেবারেই অন্যায় করেন না, কিন্তু আমরা বলি যে ন্যায়নিষ্ঠ কার্য্য তাঁহাদের দ্বারা যত অধিক অনুষ্ঠিত হয়, অন্য কোন জাতি কর্ত্তৃক তাহা হয় না। এ কথা যদি অসত্য হইত, তবে আরও একটি আন্তর্জ্জাতিক সমরে বিধ্বস্ত হইয়া মানব-সমাজ বর্ত্তমান সময় অপেক্ষা আরও অধিক ঘোরতর দুঃখসাগরে নিমজ্জিত হইত।

আমরা বড়লাট বাহাদুরকে এই সত্যটি শুনাইতে চাই, যদি তিনি ঐ ৩৫ কোটী লোক যাহাতে প্রচুর খাদ্যসামগ্রী পাইতে পারে এবং পীড়া ও মন্দস্বাস্থ্যের হাত হইতে উদ্ধার পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করেন এবং তাহাতে যদি ঐ সুখের এককোটী লোকের অসন্তুষ্টি এবং অভাব অভিযোগের কথা নাও শুনিতে হয়, তবু ঐ ৩৫ কোটী লোকই কেবল যে ভারতে ব্রিটিশ শাসন স্থায়ী ও দৃঢ় করিতে সমর্থ হইবে তাহা নয়; পরন্তু, ঐ ছত্রিশ কোটী লোকই ষাট কোটী লোকের আর্থিক দুরবস্থা পূরণ করিতে এবং তাহাদের আর্থিক প্রাচুর্য্য প্রদান করিতে সমর্থ হইবে এবং আবশ্যকীয় জিনিষ সরবরাহ করিয়া দিবে। আমাদের মনে হয় যে, কিরূপ কার্য্যপ্রণালী সঙ্গত অথবা নূতন কোন বিজ্ঞানের ইঙ্গিত প্রদান করা আমাদের ন্যায় অর্দ্ধ-শিক্ষিত লোকের পক্ষে সমীচীন নয়, কিন্তু আমাদের মনে হয়, বড়লাট বাহাদুরের কাছে এমন কোন কার্য্যপন্থা নাই যাহাতে আমাদের প্রয়োজনীয় অভাব-অভিযোগ দূরীভূত হইতে পারে। যদি বড়লাট বাহাদুরের ব্যক্তিগত-ভাবে আমাদের প্রতি সামান্য শ্রদ্ধা থাকে, তবে আমরা প্রমাণ করিতে পারি, এইরূপ দুরবস্থা দূর করিবার জন্য আমাদের হাতে বিশিষ্ট কর্ম্মপন্থা আছে।

যে কোন রকমেই হউক না কেন, দেশের আপামর-সাধারণের দুঃখ-কষ্টের কথা ভুলিয়া এক কোটী লোকের সুবিধার জন্য যে স্কীম হইয়াছে আমরা তাহা খুব শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে পারি না।

তৃতীয় কথাটি আমাদের উপরে প্রযোজ্য এবং এতৎ সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছু বলিবার নাই।

বড়লাট বাহাদুর ঘোষণা করিয়াছেন, মনুষ্যের মস্তিষ্ক-প্রসূত কোন কর্ম্মপন্থাই নির্ভুল হইতে পারে না।

এ কথাটিও আমরা গ্রহণ করিতে পারিলাম না। আমরা জানি, আমাদের ভারতীয় ঋষিগণ সংহিতা প্রভৃতিতে এমন সমস্ত রাজনৈতিকতত্ত্ব লিপিবদ্ধ রাখিয়াছেন যে, সেগুলি সব সময়ে বা অবস্থায় নির্ভুল ও নিখুঁত কর্ম্মপন্থা উৎপাদন করিতে সমর্থ হইবে। ইহা কাহিনী নহে, কিন্তু আমরা বহু পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, তাহা সম্ভব। ভারতীয় ঋষিগণ যে ভাষায় কিরূপ অর্থে তাঁহাদের সংহিতা প্রণয়ন করিয়াছিলেন তাহা বর্ত্তমান সময়ের শাস্ত্রকার ও পণ্ডিতগণ সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত নন। কেন না শব্দ-বিজ্ঞানের উপরেই—গতানুগতিক অভি-

ধানের উপরে নয়,—সেই বেব-ভাষা নির্ভর করে। যদি আমাদের বড়লাট বা অন্য কোন রাজপ্রতিনিধি বস্তুতঃই আমাদের আন্তরিক মঙ্গল কামনা করেন, তাহা হইলে আমরা এ বিষয় তাঁহাদিগকে নিশ্চয়ভাবে বুঝাইয়া দিব যে, আমাদের কথা উঁহাদের প্রলাপ নয়, উহা ঐব সত্য ও ভারতের প্রকৃত মঙ্গলপ্রদ।

গান্ধীজীর অনাবশ্যক পুনরুক্তি এবং প্রতারণামূলক রাষ্ট্রনীতি

গত ৬ই জানুয়ারীর দৈনিক সংবাদগুলি পাঠে আমরা অবগত হইলাম যে, বিখ্যাত ইংরাজ সাংবাদিক শ্রীযুক্ত এচ. ডি. হডসনের সেওগাঁতে গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ ও আলোচনা হইয়াছে। উক্ত আলোচনার প্রধান বিষয়ই হয়, কংগ্রেস নিজেকে দেশের অন্যান্য রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্যতম গণ্য না করিয়া ক্রমে একদলসর্বস্ব (Totalitarian) হইয়া পড়িয়াছে কি না।

ঐ আলোচনা সম্বন্ধে গান্ধীজীর মতামত পাঠ করিলে স্বতঃই মনে হয় যে, গান্ধীজী স্বীকার করেন না যে, কংগ্রেস অন্যান্য দলের ন্যায় একটি না হইয়া একদল-সর্বস্ব হইয়া পড়িয়াছে।

একদলসর্বস্ব বলিয়া স্বীকার না করিলেও গান্ধীজী নিম্নলিখিত উক্তি প্রদান করিতে দ্বিধা করেন নাই।

(১) কংগ্রেস দাবী করে যে, কংগ্রেসই একমাত্র দল, যাহা ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করিতে সমর্থ।

(২) কোন না কোনও সময়ে কোন না কোনও দল এই-রূপ ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করিতেই হইবে।

(৩) কোন সম্প্রদায়বিশেষের নয়, সমগ্রজাতির সর্বাঙ্গীন ভাবে প্রতিনিধিমূলক হওয়াই কংগ্রেসের উচ্চাকাঙ্ক্ষা। এই শ্লাঘনীয় আকাঙ্ক্ষা কংগ্রেসের ঐতিহ্যেরই অনুযায়ী।

(৪) প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভ হইতেই কংগ্রেস কোন রূপ ভেদ বা বৈষম্য প্রদর্শন না করিয়া সমভাবে দেশের সকলের সেবা করিয়া ও সকলের প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান হইতে বরাবর সচেষ্ট হইয়াছে।

(৫) মোসলেম লীগ যদি কংগ্রেসের অঙ্গীভূত হইতে ইচ্ছা করে, তাহাতে কংগ্রেসের আনন্দ বই আর কিছুই নাই।

(৬) ধর্ম এবং সামাজিক কার্য্যাবলীর জন্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠান থাকিতে পারে।

আলোচনার দ্বিতীয় বিষয় ছিল যে, কংগ্রেস অন্যান্য দলগুলিকে আপনার অন্তর্ভুক্ত করিয়া একদলসর্বস্বতার দিকে অগ্রসর হইতেছে কি না। এই বিষয়টি আলোচিত হওয়ার হেতু এই যে, গান্ধীজী বর্তমান অবস্থায় কংগ্রেসকে কিছুতেই একদলসর্বস্ব বলিয়া আখ্যা দিতে প্রস্তুত নহেন। অবশ্য তিনি একথা অস্বীকার করেন না যে, অবস্থাবিশেষে কংগ্রেস অন্যান্য দলকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতে চায় এবং ইহার পোষকতায় তিনি উপরোক্ত ছয়টী উক্তি করিয়াছেন।

দ্বিতীয় বিষয়টী সম্বন্ধে গান্ধীজীর উক্তিগুলি বিবৃত করিতেছি।

(১) কংগ্রেসকে একদলসর্বস্ব বলিয়া অভিহিত করিয়া আপনি উহাকে নিন্দনীয় প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতে পারেন।

(২) কোন দেশ যখন বিদেশীর হস্ত হইতে ক্ষমতা কাড়িয়া লইবার সংগ্রামে ব্যাপৃত, তখন এইরূপ একীভূত হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

(৩) কংগ্রেস অন্য কোন পৃথক্ প্রতিযোগী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান থাকিতে দিতে পারে না।

(৪) তৃতীয় এবং ক্ষমতাধিকারী দলকে আসনচ্যুত করিবার জন্য দেশের সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করিতেই হইবে।

(৫) এখন ভারতে তাহাই হইতেছে।

(৬) এই সকল দলের বিপক্ষে যখন কোন সাধারণ বিপদ থাকে না, তখন বিভিন্ন চিন্তাধারার প্রতিনিধিমূলক বিভিন্ন দল থাকিবেই।

অহিংসার বিস্ফোরণ

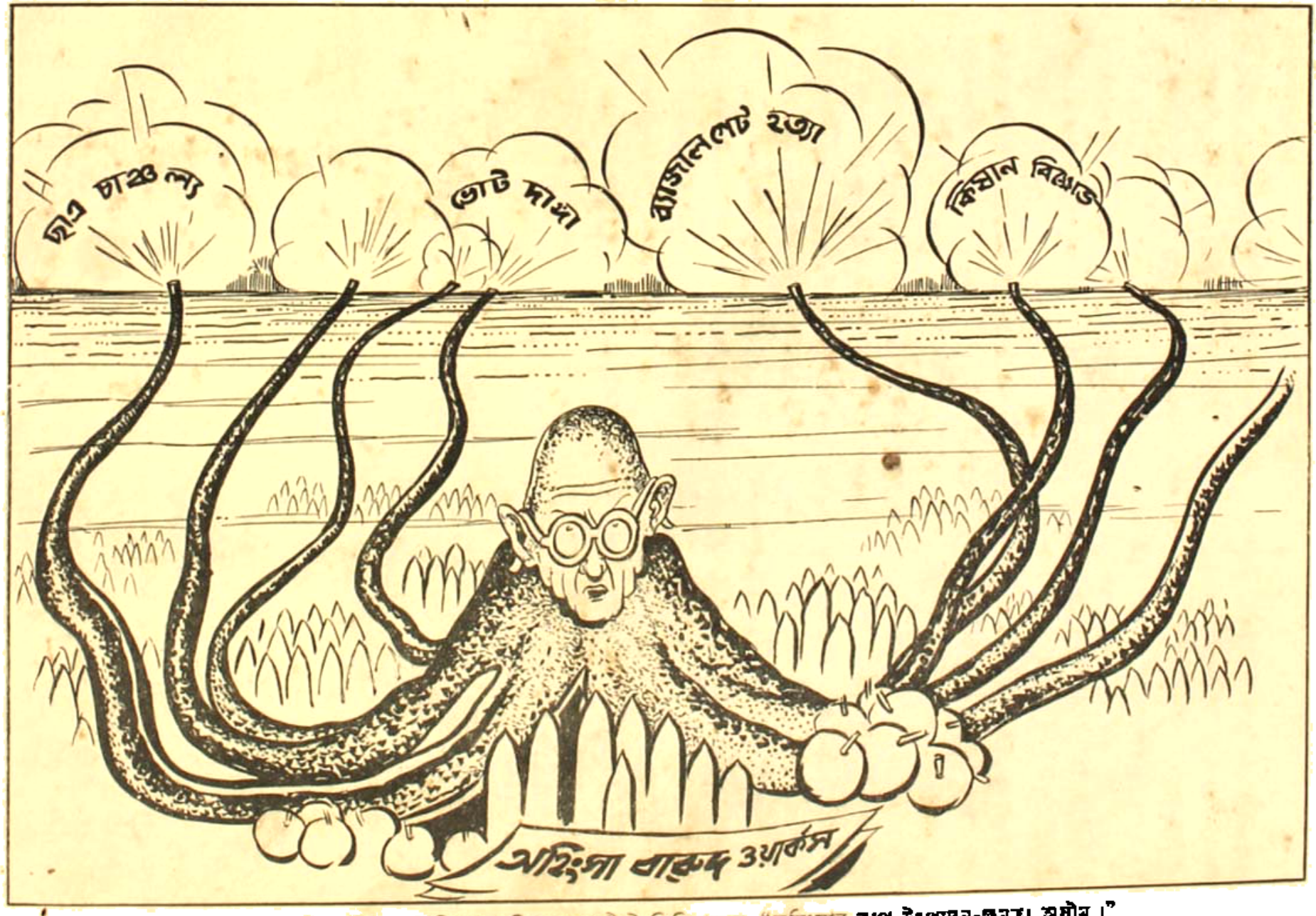

৬ই জানুয়ারী তারিখের 'হরিজন' পত্রিকায় গান্ধীজী লিখিয়াছেন, "অহিংসার তাপ-উৎপাদন-ক্ষমতা অসীম।"

(৭) আপনার স্মরণ রাখা উচিত যে, কংগ্রেস তাহার ইচ্ছা কাহারও উপর জোর করিয়া চাপায় না। ইহার শাস্তিমূলক ব্যবস্থাসমূহ (sanctions) অহিংস।

আলোচনার তৃতীয় বিষয়টি এই যে, যদি মুসলমানগণ সঙ্গে থাকিত, তবে সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ পালন পাওয়ার উদ্দেশ্যে আমাদের পদক্ষেপ আরও দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইত কি না।

এই বিষয়টী সম্বন্ধে গান্ধীজীর শ্রীমুখ হইতে নিম্নলিখিত বাণী নিঃসৃত হইয়াছে।

(১) নিশ্চয়ই, হইবে বই কি।

(২) যে বিষয়ে মুসলমানেরা আপত্তি করে, ব্যক্তিগত ভাবে আমিও তাহা হইতে বিরত চাই না।

(৩) হিন্দু-মুসলমান গণভোটের দীমাংসা হওয়ায় বহুদিন লাগিবে বলিয়া অধিকাংশ লোক মনে করেন আমার বিশ্বাস উহা তাহার পূর্বেই হইবে।

(৪) আমি বিশ্বাসক মনে সমগ্র অবস্থাটি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছি বলিয়া আমি দাবী করিতেছি।

(৫) আমাদের কলহের কোন তাৎপর্য্য নাই।

(৬) বিরোধের বিষয়গুলি অসারীয়, সমঝোতার বিষয়গুলি গভীর ও স্থায়ী।

(৭) রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক পরাধীনতা আমাদের সকলের পক্ষেই সমান।

(৮) একই আবহাওয়া, একই নদী এবং একই ভূমি উভয়কেই বাঁচায়, বাড়ে ও ফল সরবরাহ করে।

(৯) সেনাদল, মহাজোট এবং যৌথবাহিনী যাহাই বলুক বা করুক, জনসাধারণ যখন সম্পূর্ণ জাগ্রত হইবে তখন তাহারা আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়া সমস্ত-সাধারণের অসন্তোষের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইবেই হইবে।

(১০) কমিউনিষ্ট ও সোস্যালিষ্ট প্রচারকার্য্যে সাধারণের একত্বের উপর কোন ফলেও উহা সম্প্রদায়ের অসন্তোষের পরস্পরের আরও নিকটে আসিবে।

মূল কথা ইহাও সাংবাদিক হুডসন সাহেবের সহিত গান্ধীজীর তিনটি বিষয়ে আলোচনা হয়, প্রথম বিষয়ে তিনি ৩টি উক্তি করিয়াছেন, দ্বিতীয় বিষয়ে ৭টি এবং তৃতীয় বিষয়ে ১০টি।

সাংবাদিকের কার্য্যে প্রবেশেচ্ছু হিসাবে আমাদের মনে হয়, যে সমস্ত বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছে এবং তাহাতে যে উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে তাহা ভাল কি মন্দ কেবল তাহারই যে আলোচনা করিব তাহা নয়, যাঁহারা এই বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা অভিজ্ঞ কি অনভিজ্ঞ এই বিষয়ে স্বাধীন মতামত প্রকাশ করাও আমাদের কর্ত্তব্য।

বর্ত্তমান আইন-কানুনের গতি ও ব্যক্তিগত ধারণার কথা করিয়া আমাদের মনে হয় যে, যে কথা সব সময়ে বলা বড় নিরাপদ নয়। কিন্তু সাংবাদিক হিসাবে আমাদের একটা নৈতিক দায়িত্ব আছে এবং তাহা স্মরণ করিয়া আমাদের প্রত্যেক বিষয়ে মূলানুসন্ধান করা এবং প্রতি বিষয়ে ব্যক্তি-বিশেষের বিশ্বাসভিত্তিতে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া কর্ত্তব্য সম্পাদন হিসাবে যে ধারা, তাহা বলাই আমাদের প্রধান কার্য্য। ভালরূপ সময়ভাব পড়িয়া আমরা চিন্তা করিয়া দেখিলাম যে আমাদের নৈতিক কর্ত্তব্য সম্পাদনই একমাত্র প্রকৃষ্ট পথ।

গান্ধীজী ও মিঃ হুডসনের মধ্যে যে বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছে সবই প্রাসঙ্গিক এবং আমাদের মনে হয় যে, যিনি প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া এইরূপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহাতীত অবস্থা তিনি বিশেষভাবে অনুধাবন করিয়া থাকেন আর তিনি প্রত্যেক ভারত বিষয়ের মূলানুসন্ধান করিতেও চাহেন। কেবল তাহাই নয় তিনি আরও জানেন যে, যে ব্যক্তির চিন্তাধারা অন্যান্য গোলমেলে, তাহাকে জেরা করিয়া কিরূপে তাহার ভ্রান্ত চিন্তাধারা চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দেওয়া সম্ভব। তাই মিঃ হুডসনকে খুব চতুরই বলিতে হইবে।

পক্ষান্তরে ঐ সমস্ত প্রশ্নের উত্তরগুলি যদি খুঁটানুপুঙ্খভাবে পর্য্যালোচনা করা যায় তবে স্বতঃই প্রতীয়মান হয় যে, ঐ উক্তিগুলি পরস্পর-বিরোধী আর অজ্ঞান এবং অসারতায় পরিপূর্ণ। বলিতে কি, নিরপেক্ষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, উত্তরদাতা কি যে বলিতেছেন, তাহা তিনি নিজেই বোঝেন নাই; তা ছাড়া তিনি সহজোচিত বোধশক্তি বর্জ্জিত বলিয়াই মনে হয়।

আমাদের মতে ভারতের জাতীয় প্রতিষ্ঠান সর্ব্বপ্রথমে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, ভারতবাসী এবং ইংরাজের সহিত পরস্পর মিলনের ফলে একটি স্বর্গীয় অনুষ্ঠানরূপে গড়িয়া উঠিয়াছিল। যদিও একাধিক লোকের একত্র সমবায়েই ইহার প্রথম উৎপত্তি, তথাপি কোন ব্যক্তিবিশেষকে ইহার স্রষ্টা বলা সঙ্গত নয়। ইহার অনুষ্ঠাতাগণ যদিও ইহার উদ্দেশ্য কিছুই প্রথমে বিবৃত করেন নাই কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে মানব-সমাজের যে সমস্ত সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে, সেই সকলের সমাধানই মূলতঃ ইহার লক্ষ্য ছিল বলিয়া মনে হয়। আজকাল পার্টি বলিতে যাহা বুঝা যায়, জাতীয় মহাসমিতির সূচনায় ভারতে সেইরূপ কোন দলই বিদ্যমান ছিল না। আমাদের জাতীয় মহাসমিতি একটি দলরূপে গঠিত হয় নাই, তবে সহানুভূতি, পরস্পরে প্রেম এবং মানব-সমাজের আপনাপন কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব সম্পাদন করিয়া ইহা যাহাতে একদল-সর্ব্বস্ব হয়, মূলতঃ তাহাই উদ্দেশ্য ছিল। মানব-জাতির ঐক্য সম্পাদনের ইহা প্রতীকস্বরূপ ছিল এবং যদি অনুষ্ঠাতাগণের উদ্দেশ্যানুরূপ কার্য্য এই মহাসম্মিলনী কর্ত্তৃক পরিচালিত হইত, তবে আজ মানব-সমাজের সম্মুখে যে সমস্ত গুরুতর সমস্যা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, আমাদিগকে নিশ্চয়ই তাহাদের সম্মুখীন হইতে হইত না। কংগ্রেসের ভারতীয় নেতৃবৃন্দ ইহা বিপথে পরিচালিত করার জন্যই মানব-সমাজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত আজ টলটলায়মান হইয়া পড়িয়াছে। প্রকৃত নেতার অনুরূপ অভিজ্ঞান ও চরিত্রবলে বিভূষিত না হইয়াও গান্ধীজী আজ জাতির নেতৃপদে অধিষ্ঠিত, ফলে ভারতবাসী আজ কি অর্থবলে, কি স্বাস্থ্য হিসাবে, কি বুদ্ধি প্রভাবে একেবারে ধ্বংসের পথে আসিয়া পঁহুছিতে বাধ্য হইয়াছে।

উপরে যাহা বলিলাম তাহাতে ভাষার বাগাড়ম্বর নাই উহার প্রত্যেকটি কথা বর্ণে বর্ণে সত্য। আমাদের কথা যে অভ্রান্ত, খেয়ালপ্রসূত নহে, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য গান্ধীজীর উক্তিগুলি আমরা একটির পরে একটি করিয়া আলোচনা করিতে প্রস্তুত আছি।

প্রথমেই দেখিতে পাই যে, গান্ধীজী বলেন, কংগ্রেসই একমাত্র ক্ষমতা-নিয়ন্ত্রণকারী দল (that can deliver the goods) অথচ তিনি উহা একদলসর্ব্বস্ব বলিয়া উহার ব্যাখ্যা দিতে পারেন না। চমৎকার যুক্তি!

Totalitarian-এর অর্থ,—যে নীতিসূত্রে অন্যদলের অস্তিত্ব বা প্রাধান্য স্বীকার করা হয় না, তাহারই সরল অর্থ, —একদলসর্ব্বস্বতা। গান্ধীজী বলেন, কংগ্রেসই একমাত্র দল যাহা ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। যদি কংগ্রেসই ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য একমাত্র দল বলিয়া গণ্য হয় তবে আমাদের পূর্ব্বোক্ত অর্থানুসারে কংগ্রেস তো একদল-সর্ব্বস্বই হইল। ইহা তো একজন শিশুও বুঝিতে পারে!

তারপরে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, আজ কংগ্রেসের যে অবস্থা, তাহাতে ইহা প্রকৃত ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে, ইহা বলিলে কি ঠিক কথা বলা হয়? যদি কোন দল জাতির প্রকৃত ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করিবার অধিকার চায়, তবে তাহাদের কিরূপে আপনার দেশবাসীর অর্থকৃচ্ছ্রতা, স্বাস্থ্যহানি ও ব্যাধির নিবৃত্তি হয় এবং মানসিক শান্তিলাভ হয় তাহাই সর্ব্বাগ্রে ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। এ পর্য্যন্ত কংগ্রেস কি তাহা করিতে সমর্থ হইয়াছে? গান্ধীজী কি জানেন—কি করিয়া তাহা করিতে হয়? বর্ত্তমান কংগ্রেসের কোন সত্তা কি সে বিষয়ে কোন জ্ঞান রাখেন? গান্ধীজী জানেন কি, দেশের প্রকৃত ঐশ্বর্য্য কাহাকে বলে এবং কি করিয়া উহা অর্জ্জন করিতে হয়? তিনি যদি প্রকৃতই উহা জানেন, তবে চতুর্দ্দিকে এত হাহাকার কেন, দারিদ্র্য এরূপ মুখব্যাদান করিয়া আছে কেন, কেন এত অস্বাস্থ্য ও অকালমৃত্যু এবং এত অসন্তোষ-বৃদ্ধিরই বা কারণ কি? আমরা গান্ধীজীকে আহ্বান করি যে, জাতির ঐশ্বর্য্য অর্জ্জন করিবার পন্থা তিনি অবগত থাকিলে তাহা তিনি প্রমাণ করুন। পরন্তু একথা অনেকেই বিশ্বাস করেন যে, প্রভুত্ববেষণ, দলসৃষ্টি, প্রতারণা এবং অনুদ্ঘাত প্রভৃতিতে তিনি সিদ্ধহস্ত, আর তাঁহার কতকগুলি অনুবর্ত্তী আছেন, যাঁহারা নিজেরাই স্ব স্ব হিতসাধনে সর্ব্বদাই ব্যস্তপর, আবার সদুপায়ে জীবিকা অর্জ্জন সম্বন্ধেও সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

আবশ্যক হইলে আমরা প্রমাণ করিয়া দিব যে, প্রকৃতভাবে গান্ধীর নীতি অনুসরণকারী ব্যক্তি জনসংখ্যার শতকরা একজনও নয়। আমাদের অত্যাবশ্যকীয় অভাব দূর করিবার পক্ষে ইংরাজের ব্যর্থতায় এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা পাইলে অভাব দূর হইবে বলিয়া গান্ধীজীর তোকবাক্যে ভুলিয়া, আমাদের দুর্দ্দশাগ্রস্ত দেশবাসী কিছু দিনের জন্য তাঁহাকে নেতা বলিয়া স্বীকার করিয়াছে বটে, কিন্তু কংগ্রেসে অচিরেই

গান্ধীজীর প্রভাব যে বিলীন হইয়া যাইবে, আর তিনি জন-সমাজে অত্যন্ত ঘৃণ্যজীব বলিয়া পরিগণিত হইবেন, তাহা সত্য এবং সেদিনেরও বড় বেশী বাকী নাই।

তাঁহার দ্বিতীয় উক্তি—কোন কোনও দিন কোন দলকে ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করিতেই হইবে।

এ কথাও ঠিক নয়। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, গান্ধীজী প্রকৃত রাজনীতির সূত্র জানেন না। যেদিন ভারতবাসী আপন আপন আবশ্যকীয় অভাবমত সব জিনিষ অর্জন করিতে সক্ষম হইবে, সেদিন ভারতে আর কোন দলাদলির অস্তিত্ব থাকিবে না। সেদিন আবার তাহারা আপনাদিগকে এক মানব-সমাজান্তর্গত বলিয়া জ্ঞান করিবে। কেবল দলাদলি নয়, তাহারা যে 'হিন্দু' কি 'মুসলমান' কি 'খ্রীষ্টান' এই সমস্ত কথা, কিম্বা পরস্পরের মধ্যে কোনও কোন পার্থক্য রাখার উপরেও তাহাদের স্পৃহা থাকিবে না। পাশ্চাত্যগণও এই নীতি বিস্মৃত হইয়া 'জাতি', 'দল' প্রভৃতি কথার সৃষ্টি করিয়া বসিয়াছে। 'নেশানের' ব্যুৎপত্তিগত অর্থ দেখিলে বুঝা যাইবে যে, পশু পাখী প্রভৃতির ন্যায় 'মানুষ' কথাটীতেই একমাত্র ইহার শ্রেণীবিভাগ সম্ভব। পাশ্চাত্যগণের এই ভ্রান্তির জন্য তাহারা প্রত্যেকেই এখন বিভিন্নরূপ ক্লেশ ও সমস্যার দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। আজ হয়ত একথা উপহাসজনক মনে হইতে পারে, কিন্তু অচিরেই—এবং সেদিন প্রায় সমাগত যখন ইংরাজ আবার ভারতবাসীর সহিত একই জাতির অন্তর্ভুক্ত হইয়া, হাতে হাত ধরিয়া কাজ করিতে আরম্ভ করিবে এবং উভয় জাতি একভাবদ্ধ হইয়া জগতের অন্যান্য জাতিসমূহকে মানুষের অভাব দূরীকরণের প্রকৃত পন্থার নির্দ্দেশ দিবে। সেদিন প্রায় সমাগত এবং সেদিন আর প্রকৃত ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের জন্য তথাকথিত কংগ্রেসের ন্যায় কোন দলের আবশ্যক হইবে না।

গান্ধীজীর তৃতীয় উক্তি—কোন সম্প্রদায়বিশেষের নয়, সমগ্র জাতির নির্ব্বাচনভাবে প্রতিনিধিমূলক হওয়াই কংগ্রেসের উচ্চাকাঙ্ক্ষা। এই প্রার্থনীয় আকাঙ্ক্ষা কংগ্রেসের ঐতিহ্যেরই অনুযায়ী।

হাঁ, তাহা হওয়া উচিত বটে, কিন্তু বর্ত্তমান কংগ্রেসে তাহা হয় না। যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে কংগ্রেসে স্বাধীনতা, ইংরাজকে বিতাড়িত করণ এবং ব্রিটিশ পণ্যবর্জ্জন প্রভৃতি সম্বন্ধে কোন কথাই উঠিত না। দেশে এমন অনেক লোক আছেন এবং তাঁহাদের সংখ্যা নিতান্ত স্বল্প নয়, তাঁহারা সঙ্গতভাবে মনে করেন যে, ইংরাজগণ অনেকদিন পর্য্যন্ত ভারতবাসীর—যাহারা এখন জাতি বলিয়া গণিত হইতে চাহেন, যথেষ্টউপকার সাধন করিয়াছে; তাই তাঁহারা মনে করেন, ইংরাজের সহিত বিরোধ অকৃতজ্ঞতা বই আর কিছুই নয়।

গান্ধীজীর চতুর্থ উক্তি—প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভ হইতেই কোনরূপ ভেদ বা বৈষম্য প্রদর্শন না করিয়া সমভাবে দেশের সকলের সেবা করিতে ও প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান হইতে কংগ্রেস সচেষ্ট হইয়াছে।

ইহাও হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু গান্ধীজীর নেতৃত্বাধীনে পরিচালিত কংগ্রেস কার্য্যতঃ তাহা করে নাই। যদি কংগ্রেসের নীতি কোন দলের বিরোধী না হইত, তবে কংগ্রেস-সভাপতি কোন কোন সম্প্রদায়কে ব্যবস্থা-পরিষদ হইতে বিতাড়িত করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করেতেন না, আর কংগ্রেস-নেতৃত্বাধীনে সম্মিলিত দল গঠন করিতেও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতেন না।

গান্ধীজীর পঞ্চম উক্তিটি এই—কংগ্রেস মুসলিম লীগের অন্তর্ভুক্ত হইলে আনন্দ বই তাঁহার নিরানন্দের কোন কারণ নাই।

এইরূপ মনোভাব খুবই প্রশংসনীয় বটে, কিন্তু গান্ধী অথবা কংগ্রেসের কার্য্যের সহিত এই মনোভাবের কোনও মিল নাই। যদি প্রকৃতপক্ষে তাহা থাকিত, তবে মুসলিম লীগ মুসলমানদের প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান নয়, এই গোঁড়ামী কখনও প্রদর্শিত হইত না। এ কথা বলা কি ঠিক হইবে না যে, যদি লীগ মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান না হয়, তবে তথাকথিত কংগ্রেসও হিন্দুদের একমাত্র প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান নয়। কংগ্রেস লীগকে অন্তর্ভুক্ত করিতে কখনও চাহিয়াছে কি? গান্ধীজী অবশ্য বলিবেন, লীগ অন্তর্ভুক্ত করিতে কোন চেষ্টা হইয়াছে কি?

গান্ধীজী কি মনে করেন, বিবাদ, ভয়প্রদর্শন ও যুদ্ধবিগ্রহ দ্বারা কোন প্রতিষ্ঠান অধীকৃত করিয়া লওয়া সম্ভব? আমরা নিশ্চিত বলি যে, তাহা যদি কখনও সম্ভব হইত, তবে ইংরাজও ভারতবাসিগণকে অধীকৃত করিয়া লইতে পারিত।

প্রথম বক্তৃতা বিষয়ে তিনি শেষ উক্তি করিয়াছেন—"ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধীয় কার্য্যাবলীর জন্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠান থাকিতে পারে।"

এই উক্তিতে ধর্ম্মের নিগূঢ় অর্থ সম্বন্ধে গান্ধীজীর সম্পূর্ণ অজ্ঞতা প্রমাণিত হয়। ইহাতে বুঝায়, তিনি বেদ, কোরাণ, বা বাইবেলের কোনটিরই মর্ম্ম যথাযথভাবে জ্ঞাতব্য নহেন। অর্থাৎ তিনি খাঁটি হিন্দুও নহেন, খাঁটি মুসলমানও নহেন, খাঁটি খ্রীষ্টানও নহেন—তিনি একটি এক নম্বরের ভণ্ড। যদি তিনি উক্ত তিনখানি ধর্ম্মশাস্ত্রের কোনখানিরই প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে পারিতেন, তবে মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার ধারণা হইত যে, মানুষ প্রকৃত ধার্ম্মিক হইলে তাহার নিত্য আবশ্যকীয় অভাব দূরীকরণার্থ প্রাচুর্য্য লাভ করিতে কোন কষ্ট হইতে পারে না, আর ধর্ম্ম সম্বন্ধেও কোন পার্থক্য তাহার বিশ্বাস হইত না; তবে তিনি বুঝিতেন, সকলের ধর্ম্মই এক মানব-ধর্ম্ম। মানবজাতির প্রকৃত ইতিহাস উদ্ঘাটিত হইলে বুঝা যাইবে, এক সময়ে ধর্ম্ম সম্বন্ধে কাহারও সহিত কাহারও পার্থক্য ছিল না এবং বেদ, কোরাণ ও বাইবেলের ঋষিগণ একই শ্রেণীভুক্ত মানুষ ছিলেন। একই নীতি তিন ভাষায় পৃথকভাবে তিন ভাবে লিখিত হইয়াছে এবং প্রত্যেক ধর্ম্মশাস্ত্র জগতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের লোকদের যেন বোধগম্য হইতে পারে, তাই প্রত্যেক ধর্ম্মগ্রন্থ শব্দ-বিজ্ঞান অবলম্বন করিয়াই লিখিত হইয়াছে। যতদিন পর্য্যন্ত দেশবাসীর আবশ্যকীয় অভাব দূর করিবার পক্ষে কোন বাধা ছিল না, ততদিন কোন পার্থক্যও উপলব্ধি হয় নাই। কালস্রোতে মানুষ শব্দ-বিজ্ঞান ভুলিয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মের নীতিগুলির খাঁটি অর্থও তাহারা বিস্মৃত হইল। আমরা যাঁহাদিগকে 'হিন্দু' 'পণ্ডিত' এবং 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া আখ্যা দিয়া থাকি, তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণই আমাদের এই ক্ষতির জন্য প্রধানতঃ দায়ী। পরিণামে অর্থ-প্রাচুর্য্য, নীরোগতা ও মানসিক শান্তির প্রত্যেকটির অভাবই প্রচুর পরিমাণে পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। কিছুদিন পরে আবার প্রকৃতির নিয়মে বুদ্ধ, খ্রীষ্ট ও মহম্মদ নামক তিনজন মহাপুরুষের আবির্ভাব হইল। ইঁহারা প্রত্যেকেই ধর্ম্মের খাঁটি নীতি প্রচার করিতে থাকেন। ইঁহারা শব্দ-বিজ্ঞানের প্রকৃত অর্থ বুঝাইতে লাগিলেন এবং কিছুদিনের জন্য আবার মানবজাতি দুঃখ-কষ্টের হাত হইতে রক্ষা পাইল। কিন্তু তাঁহারাও বেশী দিনের জন্য সংসারে অবস্থান করিতে পারিলেন না। ফলে আবার ধর্ম্মশাস্ত্রের কদর্থ হইতে লাগিল এবং তখন হইতেই হিন্দুধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম, খ্রীষ্টধর্ম্ম ও মুসলমান-ধর্ম্মরূপ বিভিন্ন নামের সৃষ্টি হইল, ক্রমে ক্রমে পরিবাদ ও কলহও আরম্ভ হইল।

উপরোক্ত আখ্যানটি আমাদের কল্পনাপ্রসূত নহে। যদি আবার শব্দ-বিজ্ঞান পুনরাবিষ্কৃত হয়, প্রত্যেক ধর্ম্মশাস্ত্র হইতেই এই সত্যই প্রতিভাত হইবে। যতদিন পর্য্যন্ত জনগণ স্ব স্ব ধর্ম্ম লইয়া বিসংবাদে প্রবৃত্ত থাকিবে, ততদিন তাহারা অভাবের জ্বালায় দারুণ কষ্ট পাইবে; এবং যতদিন পর্য্যন্ত আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির প্রাচুর্য্য না থাকিবে ততদিন কেহই শব্দ বিজ্ঞান বুঝিতে সক্ষম হইবে না, কারণ, শব্দ-বিজ্ঞান জিহ্বার সজীবতা (সরলতা) ভিন্ন আয়ত্ত করা অসম্ভব।

যে মুহূর্ত্তে কোন মানুষ বা প্রতিষ্ঠান সর্ব্বান্তঃকরণে ও সরল ভাবে ধর্ম্মের পূর্ব্বোক্ত ঐক্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইবে, তখনই সেই ব্যক্তি বা সেই প্রতিষ্ঠান জনসাধারণকে আবশ্যকীয় দ্রব্য-সামগ্রীর অভাবের হাত হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে এবং সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির অস্তিত্বও অন্তর্হিত হইবে। মিঃ গান্ধীর প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ আমাদিগকে উপহাস করিতে পারেন, কিন্তু যদি ভগবান্ তাঁহাদিগকে আরও বিশ বৎসর বাঁচাইয়া রাখেন, তবে আমাদের ভবিষ্যদ্বাণীর মূল্য তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন।

দ্বিতীয় বিষয়টী সম্বন্ধে গান্ধীর প্রথম উক্তি এই—কংগ্রেসকে একদল-সর্ব্বস্ব বলিয়া অভিহিত করিয়া আপনি নিন্দনীয় প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিতে পারেন।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, অপর সকলের শক্তি হরণ করিয়া নিজে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হওয়া মন্দ কি? কিন্তু যদি ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞান কেহ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝিতে চেষ্টা করেন, তবেই দেখা যাইবে যে, কর্ত্তব্য সম্পাদন এবং পরস্পরের সহানুভূতি প্রদর্শন ব্যতীত প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসান অসম্ভব। ব্রিটিশ বিজয়ের ইতিহাস এবং ভারতের শাসনযন্ত্র প্রতিষ্ঠাও ইহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরাজ যখন কেবল বাণিজ্যপ্রসারে নিবিষ্ট, তখন ভারতবাসীর জন্য তাহাদের যথেষ্ট সহানুভূতি দেখা যাইত এবং ভারতীয়দিগের উপকার সাধন করিয়াই তাহাদের উপার্জ্জনে তাহারা নিরত থাকিত। পরবর্ত্তী ঐতিহাসিকগণ যুদ্ধবিগ্রহের বড়াই করিতে পারেন, কিন্তু ভারতবাসীর মনোবৃত্তির উপর প্রভাব বিস্তার করিবার ইহাই তাহাদের প্রধান সহায় হয়। বস্তুতঃ শাসন প্রতিষ্ঠার

সময়ে এই ভাবটী প্রবল থাকায় তাহারা ভারত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় কৃতকার্য্য হইয়াছে। পরে—বহু পরে, ধনসম্পত্তির ক্রোড়ে যে সকল ইংরাজ রাজপুরুষ প্রতিপালিত হইতেছিল, তাহারা তাহাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করার সুযোগ ধরিয়া রাখিতে উদাসীন হইল এবং ক্রমে শক্তি প্রভাবে অপরের শক্তি সংহরণ করিবার প্রবৃত্তি যতই বাড়িতে লাগিল, মহানুভূতি, পরোপকারবৃত্তি যতই হ্রাস পাইতে লাগিল, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তিও ততই শিথিল হইতে আরম্ভ হইল।

যে দিক্ হইতেই কেন দেখি না, পশুশক্তির প্রভাবে কখনও অপ্রতিদ্বন্দ্বী হওয়া সম্ভব নয়। প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিলে ইহা বলিতে হয় যে, অপ্রতিদ্বন্দ্বী হওয়াতে দোষ নাই। কোন কোন ইংরাজ ইহা করপে ধরিতে পারে, যেহেতু তাহারা ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞান অবগত নয়, নতুবা এতদিন এত অবনতি হইত না। কংগ্রেস একদল-সর্ব্বস্ব এ কথা অস্বীকার করা, খোসা লইয়া মারামারি করা ভিন্ন আর কিছুই নয়। গান্ধীজী ঠিক তাহাই করিতেছেন।

দ্বিতীয় বিষয়ের দ্বিতীয় উক্তিটী এই—কোন দেশ যখন বিদেশীর হস্ত হইতে ক্ষমতা কাড়িয়া লইবার সংগ্রামে ব্যাপৃত, তখন এইরূপ অস্বীকৃত হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে গান্ধীজীর ইহা অপূর্ব্ব অভিব্যক্তি! আমরা ইহাকে মূর্খের যুক্তি বলি এবং এ যুক্তি সাধারণ জ্ঞান বিবর্জ্জিত। যখন কাহারও সহিত সংগ্রামে লিপ্ত থাকা যায়, তখন কি একতায় কিছু অর্জ্জন সম্ভব?

হয় ত অনেকে বলে আসা সম্ভব। কিন্তু এটাও ত ঠিক, যে বহুলোক আবার অপর দলেও চলিয়া যায়। গান্ধীজী কি জানেন না, কোনরূপ যুদ্ধবিগ্রহেই বহুদলোৎপত্তির একান্ত সম্ভাবনা? বস্তুতঃ তাঁহার এই যুক্তিতে বুদ্ধির কোন পরিচয়ই নাই।

গান্ধীজীর এই বুদ্ধিতেই তাঁহার ভারতের স্বাধীনতার জন্য তথাকথিত সংঘর্ষের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবার পর হইতেই এত দল ও উপদলের সৃষ্টি হইয়াছে। সকলেই স্বীকার করেন এবং ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা যে, ভারতের মুক্তির জন্য ভারতের সর্ব্বত্র একতাবন্ধনই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়। আশ্চর্য্যের বিষয়, তথাপি দেশবাসী গান্ধীজীকে এই নির্ব্বোধ সংগ্রাম পরিচালনা করিবার জন্য নিয়োজিত করিয়া রাখিয়াছে, এই কারণেই আমরা বলি, গান্ধীজী মানুষের উপযোগী বুদ্ধিবিবর্জ্জিত। বিদেশী শাসনতন্ত্র হইতে ক্ষমতা লাভ করিতে যে সংগ্রাম প্রয়োজন, তাহাতে সময় অতিবাহিত না করিয়া আমাদের সন্তান-সন্ততি ও দেশবাসীর অভাব পূর্ণ করিবার পন্থা কি, তাহা যদি গান্ধীজী না জানেন, তবে তো তাঁহার অবসর গ্রহণ করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। দেশবাসীর নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই স্বয়ং নারায়ণ তাহাদিগকে পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন।

দ্বিতীয় বিষয়ের তৃতীয় উক্তি—ইহা অন্য কোন পৃথক্ প্রতিযোগী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান থাকিতে দিতে পারে না। হাঁ, এ কথা ঠিক। কিন্তু গান্ধীজী কি বুঝিতেছেন না যে, দেখিতে দেখিতে দেশে বহুতর রাজনৈতিক দলের অনুষ্ঠান হইয়াছে। গান্ধীজী কি দেশবাসীকে বলিয়া দিবেন, কিরূপে দলসৃষ্টির পথ রোধ করিয়া ঐক্যসংঘটন সম্ভব? সকলেই জানে, আবেদন-নিবেদনে হইবে না, চতুরতায়ও সম্ভব নয়, জোর করিয়া কাড়িয়া লইবার চেষ্টাও মূর্খামির নামান্তর মাত্র! তবে কি উপায়? আমাদের দৃঢ় ধারণা, একমাত্র সত্য ও দূরদর্শিতার পরিচায়ক পন্থা ব্যতীত মুক্তির উপায় অসম্ভব।

গান্ধীজীর চতুর্থ উক্তি—তৃতীয় এবং ক্ষমতাধিকারী দলকে আসনচ্যুত করিবার জন্য দেশের সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করিতেই হইবে।

হাঁ; ইহা শুনিতে খুব ভাল বটে, আর বলাও সহজ; কিন্তু কিছুতেই কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না। ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা যে, কাহারও হস্ত হইতে ক্ষমতা চ্যুত করিতে প্রবৃত্ত হইলে অপর একটি দলের উদ্ভব হইবেই, এবং তাহাতেই দেশ বিভক্ত হইতে আরম্ভ করে। গান্ধীজী এই সমস্ত বিজ্ঞান ও মনস্তত্ত্বের কথা কিছুই জানেন না।

গান্ধীজীর পঞ্চম উক্তি—এখন ভারতে তাহাই হইতেছে, অর্থাৎ সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করিতে হইতেছে।

গান্ধীজী বলিতে চান যে, তৃতীয় দল এবং ক্ষমতাধিকারী দলকে অপসারিত করিতে দেশের সমগ্র শক্তি নিয়োজিত হইয়াছে। যদি ক্রমে দলগুলি হ্রাস হইতে থাকিত, তবেই একথায় সারবত্তা থাকিত। কিন্তু দেশবাসীকে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারাই একবার তাকাইয়া দেখুন—গান্ধীজীর নেতৃত্ব গ্রহণের পূর্ব্বে যতগুলি দল ছিল তদপেক্ষা আজ উহার সংখ্যা অতি মাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছে কি না। ইহার পর যদি গান্ধীজীকে মস্তিষ্কবিহীন বলা যায়, অথবা 'সত্য-ঘটনার তিনি অপলাপ করিয়াছেন' এই সিদ্ধান্তে কেহ উপনীত হয়, তবে কি তাহার ভুল হইবে?

গান্ধীজীর ষষ্ঠ উক্তটি এই—এই সকল দলের বিপক্ষে যখন কোন সাধারণ বিবাদ থাকে না, তখন বিভিন্ন চিন্তাধারার বিভিন্ন দল থাকিবেই।

এটী আবার গান্ধীজীর মনস্তত্ত্ব ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে অজ্ঞানতার আর একটী নিদর্শন। ব্রহ্মাণ্ডের নৈসর্গিক নিয়ম এবং স্থানবিশেষ ও ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে সংঘটিত ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ কারণ নির্দ্দেশ করিলে স্বতঃই দেখা যায় যে, বিরুদ্ধ ঘটনায়—

যুদ্ধ-বিগ্রহ ও অনৈক্যের সৃষ্টি হয়। পক্ষান্তরে বিরুদ্ধ কার্য্য-কারণ না হইলে কোন অনৈক্য বা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। লীলাবতীর বীজগণিতের গূঢ়তত্ত্ব উপলব্ধি করিবার সৌভাগ্য যদি গান্ধীজীর থাকিত, তাহা হইলে তিনি বুঝিতে পারিতেন, আমাদের এই যে নীলাকাশ—যাহা আমাদের এই প্রত্যক্ষ জগৎ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, তাহারও উপরে স্তরে স্তরে তিনটি পদার্থ রহিয়াছে—ব্যোম, বায়ু ও তেজ; ঐ সব স্তরে কোন বিগ্রহ নাই এবং উহারা একই নিয়মের অধীন, ইহাই বীজগণিতের অন্তর্ভুক্ত বিষয় ও মূলতত্ত্ব। ঐ নীলাকাশের উপরে দৃষ্টিপাত ঐক্য, কিন্তু নিম্নেই মানুষ এবং তাহাতে বৈষম্যের সৃষ্টিতেই বিদ্রোহ ও সংঘর্ষের সৃষ্টি হইয়াছে। ঐ শত্রুতা ও বিদ্রোহের উৎপত্তি হইলেই উহারা আর এক নিয়মে আবদ্ধ থাকে না, একই প্রাকৃতিক নিয়মে প্রথমে চারিটিতে এবং ক্রমশঃ শতধা বিভক্ত হইয়া যায়, ইহাও বীজগণিতের অন্তর্ভুক্ত বিষয়। যদি গান্ধীজীর ক্ষেত্রতত্ত্বের বিন্দু একই নিয়মে কিরূপে সরল রেখা ও বৃত্তে পরিণত হয় এই বিষয়ে বিন্দুমাত্র ধারণা থাকিত, তাহা হইলে তাঁহার উহা বোধগম্য হইত। কিন্তু তিনি এ সমস্ত কিসিম বুঝিবার মত মস্তিষ্কপ্রসূত কি?

ইউরোপে দলগত রাজনীতি একরূপ অস্বাভাবিক। বর্ত্তমান ইউরোপ ইহা বুঝিতে পারিবে না, তাই সেখানকার অবস্থা সকল দিক হইতেই জটিল আকার ধারণ করিয়াছে। এই প্রবন্ধে আমরা সেই সমস্ত বিষয় আলোচনা করিব না তবে একথা বলিতে পারি যে, ইউরোপ দলগত রাজনীতির অস্বাভাবিকতা ও বিষময় ফল শীঘ্রই উপলব্ধি করিবে।

গান্ধীজীর শেষোক্তি—আপনার স্মরণ রাখা উচিত যে, কংগ্রেস তাহার ইচ্ছা কাহারও উপরে জোর করিয়া চাপায় না; ইহার শাস্তিমূলক ব্যবস্থাসমূহ (sanctions) অহিংস।

প্রথমাংশ গান্ধীজীর অসত্যপ্রিয়তার, আর দ্বিতীয়াংশ তাঁহার আত্মপ্রতারণা ও প্রকৃতির নিয়ম সম্বন্ধে অজ্ঞতার পরিচায়ক। কংগ্রেসের সভ্যবৃন্দের কাহারও দ্বারা দলপুষ্টি করিবার জন্য যদি কোন উৎকোচের দৃষ্টান্ত না থাকিত, তবে তাঁহার কথা প্রকৃত বলিয়া ধরিতাম যে—কংগ্রেস কাহারও স্বাধীন ইচ্ছার উপরে হস্তক্ষেপ করে নাই। আমরা যদি বলি যে, দলপুষ্টি করিবার জন্য তাঁহাদের কেহ কেহ অনেকের মধ্যে চাকুরী বিতরণ করিয়া তাহাদিগকে বাধ্য করিয়াছেন, অথবা সেই উদ্দেশ্যে বহু অর্থ বিতরণ করিয়াছেন, তবে আইনতঃ অপরাধ হইতে পারে বটে, কিন্তু কথাটা কি অমূলক? ইহার প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, অনুপযুক্ত এবং চরিত্রহীন লোক যাহাতে কংগ্রেস-কমিটী অথবা ব্যবস্থা-পরিষদে নিয়োজিত হয়, তাহাও তিনি নিজেই করিয়া থাকেন। এই সমস্ত বিষয় সত্ত্বেও কংগ্রেস অঙ্গের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপন মত-প্রতিষ্ঠার ব্রতী নহে, একথা বলায় কি সত্যের অপলাপ হয় না?

গান্ধীজীর 'অহিংসা' কথার ছড়াছড়িও আত্মপ্রতারণা মাত্র এবং "অহিংসামূলক" কথার বুৎপত্তি সম্বন্ধে অজ্ঞতা। যদি সে বুৎপত্তি থাকিত, তবে তিনি বুঝিতেন—নীলাকাশের উর্দ্ধে ব্যোম, বায়ু ও তেজোমণ্ডলে সম্পূর্ণ শান্তি সম্ভব, কিন্তু জগতের কোন অংশে—মানুষ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ উদ্ভিদ্, বৃক্ষাদি এবং ভূতলেও সম্পূর্ণ শান্তি বা অহিংসা একেবারে অসম্ভব। শাসন-সংযত হিংসা বরং সম্ভব, কিন্তু অহিংসা একেবারে অসম্ভব।

অতএব আমরা দেখিতে পাই যে, এই ব্যক্তিটি নেতা সাজিয়া এইরূপ প্রতারণার লোক ভুলাইয়া রাখায় দেশের দুঃখ-দৈন্য, দারিদ্র্য ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে এবং অবস্থা ক্রমেই সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। আজ আমরা এমন অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছি যে, জনক, জ্যেষ্ঠতাত, জ্যেষ্ঠভ্রাতা বা শাস্ত্রানুযায়ী হিসাবে আমাদের সন্তান ও আত্মীয়গণের জীবিকা অর্জ্জনের পথটি পর্য্যন্ত বলিয়া দিতে পারিতেছি না; ফলে অনেক সোণার প্রাণ আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করিয়া অমূল্য জীবনের অবসান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এই দুর্দ্দশার আর প্রসার না হয়, তাই এখন আমাদিগকে প্রকৃষ্ট পথ অবলম্বন করিতে হইবে। আমরা ইতিপূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় তাহা দেখাইয়াছি, এখন ইংরাজীতেও তাহা দেখাইব।

গান্ধীজীর তৃতীয় উক্তিও পূর্ব্বোক্তানুরূপ অজ্ঞতাপূর্ণ। স্থানাভাবে এবার আমরা তাহা আলোচনা করিতে বিরত থাকিলাম।

—শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী

গাছ বৃদ্ধির উপায়

ঘনসন্নিবিষ্ট পাদপশ্রেণীর গাছ লক্ষ্য করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ঐগুলির বৃদ্ধির হার অত্যন্ত কম। একটি পাইন গাছের ব্যাস ২৯ বৎসরে ৪½ ইঞ্চি মাত্র বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তৎপরে কতকগুলি গাছ কাটিয়া ফেলিবার পর ১৫ বৎসরে ৭ ইঞ্চি ব্যাস বৃদ্ধি হইয়াছিল। যে অরণ্যে ঐ গাছটি ছিল সেই অরণ্যের অধিকাংশ গাছ কাটিয়া ফেলিবার পর ঐ গাছটির বৃদ্ধির হার তিনগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বর্তমানে কাগজের কারখানার ব্যবহারের জন্য প্রচুর পরিমাণে গাছ কাটা হইতেছে। যে পরিমাণ কাঠ প্রতি বৎসর জন্মায় সেই পরিমাণই যদি কাটা হয় তাহা হইলে ক্ষতির কারণ নাই।

দন্তরোগ ও থুতু

আমেরিকার নর্থ ওয়েষ্টার্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ে দন্তের এনামেলের উপর থুতুর ক্রিয়া পরীক্ষা করা হইয়াছিল। দেখা যায় যে কোন কোন ব্যক্তির থুতুতে দন্তের এনামেল দ্রবীভূত হয়। একটি নলে দন্তের এনামেল চূর্ণ করিয়া রাখা হয়। তন্মধ্যে যে ব্যক্তির থুতু পরীক্ষা করিতে হইবে তাহার থুতু দিয়া নলটি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা হয়। একটি পাত্রে শরীরের তাপের মত গরম জল রাখিয়া উহার ভিতরে নলটি প্রায় ৪ ঘণ্টাকাল ঘুরান হয়। এই প্রক্রিয়া দ্বারা যদি দেখা যায় যে, পরিমাপ করিবার মত যথেষ্ট পরিমাণ এনামেল দ্রবীভূত হইয়াছে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির চিকিৎসা করা প্রয়োজন নচেৎ তাহার দন্ত শীঘ্রই ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে।

প্রাগৈতিকহাসিক মানবের আয়ুষ্কাল

ডক্টর হেনরী সি. ভ্যালসিয়াম ১৮৭টি প্রাগৈতিহাসিক নরকঙ্কাল পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। ইহার মধ্যে ৫৪% নিগ্রোয়েডপ্যাল, ৩৪·৩% উচ্চ প্যালিওলিথিক এবং ৩৭% মেসোলিথিক মানব ২০ বৎসর বয়ক্রম হইবার পূর্বেই প্রাণ-ত্যাগ করিয়াছিল। অবশিষ্টের মধ্যে অধিকাংশই, অর্থাৎ ৪০% মেসোলিথিক ও ৪৩% উচ্চ প্যালিওলিথিক মানব ২০ হইতে ৪০ বৎসর বয়সের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। অবশিষ্ট ১৬টির মধ্যে ৫% নিগ্রোয়েডপ্যাল, ১·৫% মেসোলিথিক ও ১·৮% উচ্চ প্যালিওলিথিক মানব ৪০ হইতে ৫০ বৎসর পর্যন্ত জীবিত ছিল এবং মাত্র ৩ জনের বয়স ৫০ বৎসরের অধিক হইয়াছিল। এই ৩ জনকেও বৃদ্ধ বলা চলে না।

ব্রোঞ্জযুগে এবং রোমান যুগের মিশরবাসীদিগের আয়ুষ্কাল প্রাগৈতিহাসিক মানবের তুলনায় অনেক অধিক। প্রাগৈতি-হাসিক মানবের মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের আয়ুষ্কাল অধিক হইতে দেখা গিয়াছে। এই সকল অনুসন্ধানের ফলে আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে, সভ্যতা মানুষের আয়ুষ্কাল হ্রাসের কারণ নহে।

কলাগাছের ব্যাধি নিরাকরণ

মধ্য-আমেরিকায় কলাগাছের ব্যাধি নিরাকরণের জন্য কতকগুলি রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করা হইতেছে। এই মিশ্রণকে 'বোর্দো মিকস্চার' বলা হয়। ৫০ গ্যালন জলে ৫ পাউণ্ড তুঁতে ও ৫ পাউণ্ড চুণ মিশ্রিত করা হয়। ১ একর জমীতে এই মিশ্রণের ২৫০ হইতে ৩০০ গ্যালন এক পক্ষ অন্তর প্রয়োগ করিতে হয়। বৎসরে প্রায় ১৮ বার এই মিশ্রণ প্রয়োগ করিলে কলাগাছের 'সিগাটোকা' (sigatoka) নামক ব্যাধি দূরীভূত হয়। এই চিকিৎসার পর কলগুলি প্রথমে মৃদু হাইড্রোক্লোরিক অম্ল ও তৎপরে পরিষ্কার জলে ধৌত করিয়া লইতে হয়।

ভিখারিণী

—শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

অস্তরবির রাঙ্গাপথ বাহি নেমেছে তখন সন্ধ্যা,
সেজেছে নবরী নটিনীর মত, ফুটেছে রজনীগন্ধা,
গন্ধ-মদির দখিণা পবনে
নিশুবধূরা হাসিছে স্বপনে,
জ্বলিতেছে দীপ পৌর-ভবনে,
অভিসারে নিশি মত্তা,
নদীর লহরে চাঁদের কিরণ হারায়েছে তার সত্তা।

বিপাশার কূল মুখর করিয়া নূপুরের মধুছন্দে।
মন্দির হ'তে ফিরিছে 'চন্দ্রা' রাজবালা মহানন্দে।
অদূরের পথ-তরু-শাখা প'রে
গা'হিছে কোকিলা পঞ্চম-স্বরে,
অজানা ফুলের গন্ধ বিহরে
বিরহের স্মৃতি পাসরি
দূর মন্দিরে রহিয়া রহিয়া বাজে উৎসব-বাঁশরী।

রূপ-গরবিণী রাজার দুলালী রতন পরেছে অঙ্গে,
নানা আভরণ মণিমুকুতার ঝলমল করে রঙ্গে।
সেই পথ দিয়া চলিয়াছে 'সোনা',
পরণে তার যায় সব গোপা,
জীর্ণ-বসনা, মলিন-আননা
বহিছে বেদনা গোপনে,
অন্তরে তার হয় ত' বাসনা জাগিয়া ঘুমায় স্বপনে।

চলিয়াছে সে যে মন্দির পানে মাটীর থালাটি ধরিয়া
পূজার অর্ঘ্য লইয়াছে করে শুষ্ক কুসুম ভরিয়া,
আষাঢ়-মেঘের সম মন্থর
দেবালয়ে যেতে চাহে সত্বর,
অন্তরে তার জপ-মন্তর
হয় ত মূর্ত্ত সহসা।
ক্ষণিক পুলকে হয় ত' থেমেছে তাহারি দুখের বরষা।

হয় ত বা 'সোনা' পাগলিনী মেয়ে অথবা হয় ত দুখিনী,
আঁধারের মাঝে দীন-সংসারে অলকানন্দা রূপিণী।
উপহাস তারে করিয়াছে সবে,
সহিয়াছে 'সোনা' সকলি নীরবে,
বয়স তাহার বেশী নাহি হবে,
বত সে ধরম-করমে,
কি জানি কি কথা রয়েছে লুকায়ে মৌন মেয়ের মরমে।

'ধূলিমাখা এই করা ফুলগুলি সাজায়ে মাটীর থালাতে,
দিতে যাও পূজা দেবালয়ে কেন এমনি সাঁঝের বেলাতে?
সোনার পাত্রে ফুল রাখ নাই,
দেবতা-চরণে নাহি তার ঠাঁই,
এ সব হেরিয়া বড় লাজ পাই—
পূজাটি হবে গো বিফলে!
শুদ্ধ নহেক মাটীর থালা ও—শোন নাই বলে সকলে!

মৌন-নীরব 'সোনা' পথ চলে সর্ব্বহারা সে ললনা,
রাজনন্দিনী কহিছে—'গরবী কথাটি আমার নিল না'
শুভ্র হেউল-প্রাঙ্গণে আসি
দেবতারে কহে—"আমি তব দাসী
ক্ষম অপরাধ করুণা প্রকাশি'
এসেছে অভাগী দুয়ারে,
তোমার পূজার যোগ্য কুসুম কেমনে দিব গো তোমারে!"

মন্দিরে তার নাহি অধিকার দেবতা চরণ-পরশে,
কত না যাত্রী করিছে প্রবেশ, হেরিছে পূজারী হরষে,
একটি করুণ সজল নয়ন
প্রাঙ্গণ-পথে বেদনামগন
একটি জীবনকুসুম কখন
ব্যর্থ হয়েছে ভুঁয়ে,
প্রথম তাহার করুণ-গীতিকা উঠিছে দখিণা-বাতাসে।

পরদিন প্রাতে রাজনন্দিনী অদ্ভুত হেরে চক্ষে,
ভিখারী 'সোনার' পূজাসম্ভার রয়েছে প্রভুর বক্ষে।
তার ফুল রহে ধূলি পরে হায়!
পূজারী তাহারে কেবলি বুঝায়—
'আমি ত কুসুম দিয়েছি পূজায়···!'
শোনে না রাজার দুলালী,
অবশেষে কহে—'ভিখারিণী হায়! কেমনে প্রভুরে ভুলালি!'

মৈমনসিংহ-পরিচিতি

—শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামী

আদমসুমারি

১৮৭২ সন লোকসংখ্যা গণনা আরম্ভ হয়। এই গণনা নানা অসুবিধা ও অপরিণত অবস্থার মধ্য দিয়া চালনা করাতে, ইহার বিবরণ সঠিক ভাবে ধরা যায় না। প্রকৃত প্রস্তাবে ১৮৮১ সাল হইতে আদমসুমারি বা সেন্সাস্ আরম্ভ হয়, বলিতে পারা যায়। বিজ্ঞান-সম্মত আদমসুমারি একটি অত্যন্ত আধুনিক ব্যাপার। অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে আদমসুমারি করা যে কি কঠিন ব্যাপার, তাহা সুদক্ষতোই যাহারও বুঝিবার উপায় নাই। ১৮৮১ সালে যখন আদমসুমারির বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়, তখন দেশের জন-সাধারণের মধ্যে কিরূপ অশান্তির ও বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা তৎ-কালীন অনেক প্রত্যক্ষদর্শীই সাক্ষ্য দিবেন।[১]

বিভিন্ন সময়ে লোকগণনায় দেখা যায় যে, ক্রমেই লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৮৭২ সালে যে লোকসংখ্যা ছিল, ১৯০১ সালে তৎস্থানে প্রায় দ্বিগুণ হইতে চলিয়াছে।

১৮৭২	১৮৮১	১৮৯১	১৯০১
২৩৮৯৯১৭	৩০৪৫২৩৭	৩৪১২১৮৪	৩৯১৪০৬৮

সকলেই যে এই জেলার লোক তাহা নয়, ইহার মধ্যে আবার অনেক বিদেশীও আছে। দেশের বাহিরে অন্যত্র যাহারা চাকুরী অথবা ব্যবসায়ে লিপ্ত আছে, তাহাদের সংখ্যাও ধরা হইয়াছে। আমরা নিম্নে তাহাদের একটী আনুমানিক সংখ্যার তালিকা দিতেছি :

প্রবাসী—মোট ১১৮০১০ ; তন্মধ্যে পুরুষ—৮২৭৩০, স্ত্রী—৩২২৪০।

বিদেশ হইতে যাহারা আসিয়া এ দেশে বসবাস করিতেছে :

মোট—৮০৫৬। পুরুষ—৪৪৯৭১ স্ত্রী—৩৪৩৯৫।

এই জেলায় হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যাই অধিক ; তন্মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা হিন্দুর সংখ্যার প্রায় দ্বিগুণ। দিন দিন হিন্দু হইতে মুসলমানের জনসংখ্যা আরও অধিক বৃদ্ধি পাইতেছে। সমস্ত জেলাকে বিভিন্ন মহকুমায় ভাগ করিয়া হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যার তারতম্য দেখাইতেছি :

	হিন্দু	মুসলমান
(১) সদর মহকুমা—	৪৮৫০৯০	১৪১৯৮৮৬
(২) নেত্রকোণা মহকুমা—	৩১৩২২৮	৭১৩০৩৪
(৩) জামালপুর মহকুমা—	২৪৭৭৪৬	১০৯৫৩৮৩
(৪) টাঙ্গাইল মহকুমা—	৪৪৮৪৭৬	১৩৭৯১০১
(৫) কিশোরগঞ্জ মহকুমা—	৪৪৬১২৬	৯৮২০৮৮

এই জেলায় হিন্দু ও মুসলমানের বিভিন্ন জাতির স্ত্রী ও পুরুষের সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(১) হিন্দু

জাতি	পুরুষ
ব্রাহ্মণ	১৫৭৪৭
কায়স্থ	৫৫১০০
বৈদ্য	১৮০৪
আদির মোহালা	১৩০১৫
বাগদি	১৮০৯
বৈষ্ণব (বাউল বৈরাগী)	৬৯৫২
বাকই	
বাউরি	
ভুঁইমালী	
চর্মকার	
ধোপা	
ডোম	
গন্ধবণিক্	
গাড়	
গোয়ো	
হাজং	
হাড়ি	
কৈবর্ত্ত	
কুর্মী	
কাওরা	
কোচ	
কেলে	
কিরর	
কাঁতি	
কুমার	
সুবর্ণবণিক্	
সাহা	
কর্ম্মকার (কামার)	
কপালী	
কৈরি	

১। 'I do not remember ever to have noticed such strangulation in public opinion, that is, if we consider that of the masses and not of the educated minority ; perhaps it was the excitement caused by the census year.' *General Administration Report, 1881-82.*

কুমার		
দাস		
বৃদ্ধি		
নবশূদ্র		
কুলিয়া		
বাপড়		
পাটনি		

(২) মুসলমান

শেখ	১৩৬২১৩	১২১৬৪৮০
সৈয়দ	৩৩১৭	৩৯৩১
পাঠান	১৩২৫২	১৫৩৩৯
মোগল	৪৮৭	৪৬৩
খাঁ	৩১৪৩	৩১৩৩
নাগারচি	২২৭৩	২১৫৩
মাঝি-মল্লাহ	৭৭০	৬৭৩
জুলু	১৮৩৩	১৪৬৯০
কসবি	১৩২	১৮৩৩
জোলা	১৪১১৭	১৪০১২
বাদিয়া	২৪০০	২১৩৩
বাজিয়া	৬৮২	৬১২

সেন্সাসের সময় এই আভিধিকার লইয়া বড়ই হাঙ্গামা হয়। প্রচলিত বিদ্যুশ্রেণীর লোকগণ ইহাতে এত তয়ের চক্ষে দেখিত যে, সঠিক লোকসংখ্যা কিছুতেই ঠিক হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না।

আভিধিকার লইয়া শুধু যে বিদ্যুশ্রেণীর মধ্যে হাঙ্গামা চলিয়াছিল তাহা নয়; উচ্চশ্রেণীর মধ্যেও ইহা ব্যাপক হইয়া উঠিয়াছিল। ১৮৭১ সালের সেন্সাসের সময় এই জেলার বৈদ্য ও কায়স্থগণ আপন আপন শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টায় অনেক আন্দোলন করিয়াছেন। যদিও এই সেন্সাসের পূর্ব পর্যন্ত এই জেলার উপবিভাগে বৈদ্য ও কায়স্থের মধ্যে বিবাহপদ্ধতি ছিল।

আজকাল যাঁহারা 'মাহিষ্য' নামে পরিচিত, পূর্বে তাঁহারা এই জেলায় 'হালুদাস' নামে পরিচিত ছিলেন। ইঁহারা সরকারের নিকট আবেদন করিয়া 'মাহিষ্য' হইয়াছেন। ২

এই সময় দুলী ও সুবর্ণবণিক 'ব্রাহ্মণ'-শ্রেণীভুক্ত হইতে চান। সময় ময়রাগণও ব্রাহ্মণ-শ্রেণীভুক্ত হইবার জন্য তাঁহাদের সমাজে অনেক দলিল-পত্র দাখিল করেন। সেন্সাস্ রিপোর্টে তাঁহাদের দলিলের কথাই উল্লেখ পাই, সরকার প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের আবেদন গ্রাহ্য করিয়াছিলেন কি না সে বিষয়ে কোন উল্লেখ নাই। দুলীগণ যজ্ঞসূত্র ধারণ করিবার জন্য অনেক প্রয়াস করিয়াছেন এবং এ জন্য প্রভূত অর্থব্যয় করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু তাঁহাদের আন্দোলনে শেষ পর্যন্ত একটা ব্যাপক আন্দোলন হইয়া সর্ববাদিসম্মত রূপে কিছুই পুষ্টিলাভ করে নাই। কিশোরগঞ্জ মহকুমায় আজ পর্যন্তও অনেক দুলী যজ্ঞসূত্র ধারণ করেন।

নবশূদ্রের সংখ্যা এ জেলায় সর্বাপেক্ষা অধিক। ইঁহারা পূর্বে এই অঞ্চলে 'চন্দ' বলিয়া পরিচিত ছিলেন, উপাধির পরিবর্তে বর্তমানে 'নবশূদ্র' হইয়াছেন।

শুধু হিন্দুর মধ্যেই যে এই 'উপাধির' আন্দোলন আসিয়াছিল তাহা নয়, ইহা মুসলমানদের মধ্যেও সংক্রামক হইয়া উঠিয়াছিল। গত সেন্সাসের সময় মুসলমানদিগের মধ্যে জুলু ও জোলা সম্প্রদায় যথাক্রমে 'মোগল' ও 'কাজির' এই বলিয়া অভিহিত হইবার জন্য সরকারের নিকট আবেদন করে।

মুসলমান ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক হইলেও তাঁহারা শেখ, সৈয়দ, মোগল, পাঠান, জুলু ও জোলা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হইয়া গিয়াছেন।

এই জেলায় একটি উল্লেখযোগ্য জাতি গারো জাতি। ইঁহাদের মধ্যে ২১৩২ পুরুষ ও ২০৯১ স্ত্রী। এই সকল গারো হিন্দু ও খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী। মূলতঃ ইঁহারা প্রেতোপাসক। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে খৃষ্টীয় মিশনারীরা আসিয়া গারো জাতির মধ্যে খৃষ্টধর্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। মূলতঃ ইঁহারা প্রেতোপাসক হইলেও হিন্দুধর্মের আওতায় এতদিন বর্দ্ধিত হইয়াছিল। খৃষ্টান মিশনারীদিগের দেখাদেখি হিন্দু মিশনারীগণও গারোদিগের মধ্যে সংস্কৃত হিন্দুধর্ম প্রচার করিতে সমর্থ হন এবং কিছিৎ কৃতকার্যও হইয়াছেন বলিতে হইবে।

পূর্বে গারোগণ হিন্দুদিগের মধ্যে জল-আচরণীয় ছিলেন না। কিছুদিন হইল হিন্দু মিশনারীদের প্রচেষ্টায় গারোগণ হিন্দুদিগের মধ্যে জল-আচরণীয় হইয়াছেন।

হাজং ও হদি নামে একই পাখার দুইটি জাতি। বাঙ্গালার অন্য কোন জেলাতে ইঁহাদের অবস্থান লক্ষ্য করা যায় না। ইঁহারা এই জেলার আদিম অধিবাসী। নৃতত্ত্বের দিক দিয়া গারো, হদি ও হাজং জাতির সম্বন্ধে আজও বিশেষ উল্লেখযোগ্য আলোচনা ও গবেষণা হয় নাই। আমরা ইহাদের সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিবার ইচ্ছা রাখি।

ভেকধারী বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মদিগকে সেন্সাসের তালিকায় হিন্দু মধ্যে গণনা করা হইয়াছে। ব্রাহ্মের সংখ্যা এই জেলায় ১০০ মাত্র। তন্মধ্যে পুরুষ ৫৩ ও স্ত্রী ৫৭। ভেকধারী বৈষ্ণবের সংখ্যা এই জেলায় ১২০৯১; তন্মধ্যে পুরুষ ৪৯৫২, স্ত্রী ৭১৩৯। ভেকধারী বৈষ্ণবগণের মধ্যে অধিকাংশই রামকৃষ্ণ গোসাঁই-এর শিষ্য। রামকৃষ্ণের মতাবলম্বী খাতাঁত, খাটল, গুরুসভা, আগল-পক্ষ, প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বীই দেখিতে অনেক দেখা যায়।

২। Census Superintendent's letter No 1627, dated 21. II. 1900. মাহিষ্যগণ পরে তাঁহাদের এই আবেদন প্রত্যাহার করেন। এ সম্বন্ধে জানি যথার্থ গল্প আছে। সেন্সাস্ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট লিখিয়াছেন—'He (P. S. I.) called some of these castemen and explained that the word 'মাহিষ্য' was derived from the Sanskrit word মহিষ by adding the affix 'ষ্য' and signified the offspring of buffalos,...and they expressed no desire to change 'Halua Das' হালুয়া দাস into Mahishya মাহিষ্য।—*District Census Report 1901.* কাগজটী নিতান্ত কৌতুকাবহ বলিয়া উল্লেখ করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। ইহার পশ্চাতে আমাদের জন্য কোন মতলব নাই, ইহা বলাই বাহুল্য।

কাশ্মীরে কয়েকদিন

—শ্রীপুলিনবিহারী চক্রবর্ত্তী

কাশ্মীরে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা বহুদিন হইতেই পোষণ করিতেছিলাম। হঠাৎ বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে শ্রীনগরে যাওয়ার একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িল। ১৪ই আগষ্ট দিল্লী-কাল্কা মেলে শ্রীনগর উদ্দেশে যাত্রা করিলাম। বন্ধুবর শ্রীযুত সতীন্দ্রমোহন মজুমদার ধাবড়া ষ্টেশনে গাড়ীতে উঠাইয়া দিলেন। পথের কথা অনেকের নিকটেই ইতঃপূর্ব্বে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। কেহ বলিলেন, অম্বু হইয়া গেলেই সুবিধা, আবার অন্যেরা রাওয়ালপিণ্ডি হইয়া যাইতেই সম্মতি দিলেন। নানা বিষয়ে চিন্তা করিয়া সম্প্রতি লাহোর পর্য্যন্ত টিকিট করাই মনস্থ করিলাম।

রাত্রি ৯টা ১৩ মিনিটে গাড়ী ছাড়িল। গাড়ীতে সঙ্গীদের মধ্যে একজন দিল্লী-প্রবাসী বাঙ্গালী ছিলেন, তিনি এস্. ডব্লিউ. রেলওয়ের ভূতপূর্ব্ব ইঞ্জিনিয়ার। তাঁহার নিকট হইতে কাশ্মীরের অনেক বিষয় জানিতে পারিলাম। তিনি আমাকে তাঁহার বন্ধু শ্রীনগরে ষ্টেট ইঞ্জিনীয়ার শ্রীযুত ললিত বসু মহাশয়ের সহিত দেখা করিতে উপদেশ দিলেন এবং সঙ্গে এক-খানি পরিচয়-পত্রও লিখিয়া দিলেন। ভোরবেলা গাড়ী মোগলসরাই পৌঁছিল। আমার টিকিট ভায়া সাহারাণপুর থাকাতে মোগলসরাইতে গাড়ী বদল করিতে হইল। বেলা ৮টায় গাড়ী বেনারস্ ক্যাণ্টনমেণ্ট ষ্টেশনে পৌঁছিল। আমার পাঠ্য-জীবনের কিছুটা অংশ কাশীতে কাটিয়াছে। কাজেই পুরাতন বন্ধুদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেশে বেনারসে একদিন বিশ্রাম করিলাম। পরদিন দেরাদুন এক্সপ্রেসে পুনরায় বেনারস হইতে কাশ্মীরের উদ্দেশে যাত্রা করিলাম। গাড়ী অযোধ্যা ষ্টেশনে আসিয়া থামিয়াছে। দূর হইতেই অযোধ্যার মন্দিরের চূড়াগুলি স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল, এখানে ঝুলন-যাত্রার মেলা আরম্ভ হইয়াছে। দলে দলে নরনারী এদিক সেদিক হইতে অযোধ্যার দিকে ধাবিত হইতেছে, কেহ বা দর্শনান্তে ফিরিতেছে। তাহাদের রামজী কী জয় ধ্বনিতে দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত হইতেছিল। শ্রীরামচন্দ্রের অনুচরদিগকে পশ্চিমের অধিকাংশ তীর্থেই দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু এই অঞ্চলে তাহাদের অত্যাচারের মাত্রাটা একটু বেশী। এমন কি, জানালা দিয়া গাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া কিছু লইয়া যাইতেও তাহারা শঙ্কা বোধ করে না। তাহাদের বিশেষ ভয় নাই, কারণ স্ব স্ব সীমানায় বল প্রকাশ করিতে কেহই কুণ্ঠা বোধ করে না।

ট্রেন এখন পূর্ণ বেগে লক্ষ্ণৌর দিকে চলিতেছে। দূর হইতে লক্ষ্ণৌ সহরের মস্‌জিদের গম্বুজ ও মিনারগুলি দৃষ্টিপথে আসিতে লাগিল। তখনও সন্ধ্যা হইতে কিছু বিলম্ব আছে। ট্রেন লক্ষ্ণৌ ষ্টেশনে আসিয়া থামিয়াছে। আমার সহযাত্রি-গণ সকলেই এখানে নামিয়া গিয়াছেন, গাড়ীতে আমি ছাড়া আর কেহ নাই। কয়েক মিনিট বাদেই ট্রেন ছাড়িল। দুই দিকে কেবল পলাশ বন, মাঝে মাঝে খেজুর গাছ, কোথাও বা বিস্তীর্ণ উষর ভূমি। মাঝে মাঝে দুই চারিটি পল্লী দেখা যায়। বিহারের পল্লী হইতে এই পল্লীগুলি কিছুটা উন্নত প্রণালীর। আমি ঘুমাইয়া পড়িয়াছি, হঠাৎ যাত্রীদের গোলমালে ঘুম ভাঙ্গিল। জাগিয়া দেখি মোরাদাবাদে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। দুইজন মুসলমান আমার কামরায় আসিয়া উঠিলেন। চাল-চলনে খুব পরস্থ বলিয়া মনে হইল। তাঁহাদের সঙ্গে দুই চারিটি উর্দ্দু বাত হওয়ার পর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মিল। তাঁহাদের মধুর আলাপ ও ব্যবহার আমি কখনও ভুলিতে পারিব না। তাঁহারা দুই জনেই লাকসার ষ্টেশনে নামিয়া গেলেন। আমারও এখানে গাড়ী বদল করার কথা। কিন্তু দীর্ঘ সময় গাড়ীতে থাকাতে আমি অবসাদ অনুভব করিতেছিলাম, কাজেই হরিদ্বারে দুই একদিন বিশ্রাম করা সাব্যস্ত করিলাম। আমাদের ট্রেন হরিদ্বারে আসিয়া থামিয়াছে। তখন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। দুই একটি তারা তখনও মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছিল। আমি গাড়ী হইতে নামিয়া গঙ্গার ধারে ভোলাগিরির ধর্ম্মশালায় আশ্রয় লইলাম। প্রাতঃকালীন ভ্রমণান্তে গঙ্গায় স্নান করিতে গেলাম। উদ্দাম খরস্রোতে কলকল রবে গঙ্গা বহিয়া যাইতেছে। কাহারও সাধ্য নাই যে, ইহাতে নামিয়া পুণ্য সঞ্চয় করে। একটু অসাবধান হইলেই —

স্রোতে লইয়া যাইবে। বহুক্ষণ প্রয়াসের পর ডুব দিতে চেষ্টা করিলাম। পুণ্য বোধ হয় অর্দ্ধেকের বেশী হয় নাই, কারণ কোনও প্রকারেই সম্পূর্ণ শরীর ডুবাইতে সাহস পাই নাই।

হৃষীকেশ, লছমনঝোলা ইত্যাদি দেখিতে দুই দিন কাটিয়া গেল। ভ্রমণকারীদের ভিতরে হরিদ্বারে বেশীর ভাগ পাঞ্জাবীই দেখিলাম। পাঞ্জাবী মেয়েরা খুব স্বাধীন, নিজেরা দোকানে যাইয়া ইচ্ছামত জিনিষপত্র খরিদ করে এবং যাকে তাকে গলা কাঁপাইয়া শাসন করিতেও ভয় করে না। বাংলা দেশের তুলনায় নারীপ্রগতির মাত্রা পাঞ্জাবীদের মধ্যে অনেক বেশী।

বেলা পাঁচটায় হরিদ্বার ত্যাগ করিয়া পুনরায় কাশ্মীরের উদ্দেশে যাত্রা করিলাম। সন্ধ্যা ছয়টায় ট্রেন লাক্সার ষ্টেশনে পৌঁছিল। কিছুক্ষণ পরেই পাঞ্জাব এক্সপ্রেস আসিল এবং আমাদের গাড়ীখানি এক্সপ্রেসের সাথে জুড়িয়া দেওয়া হইল। গাড়ীতে একজন পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের সাথে আলাপ আরম্ভ করিলাম। তিনি রাওয়ালপিণ্ডিতে ওকালতী করেন। তিনি আমাকে লাহোর যাইয়া গন্তব্য পথ ঠিক করিতে উপদেশ দিলেন। ইহার কিছুদিন পূর্ব্বেই কাশ্মীর মোটর সার্ভিসে ধর্ম্মঘট হইয়াছিল। রাওয়ালপিণ্ডির পথে ধর্ম্মঘট মিটিয়া গিয়াছে, এই খবর পূর্ব্ব হইতেই অবগত ছিলাম। আমার জম্মু হইয়া যাওয়ার ইচ্ছা ছিল, কাজেই ঐ পথে ধর্ম্মঘট মিটিয়া গিয়াছে কি না, সঠিক খবর কোনও প্রকারেই জানিতে পারিলাম না। সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া লাহোরে নামিয়া পড়িব ইহাই ঠিক করিলাম। খুব ভোরে জাগিয়া দেখি অমৃতসর ছাড়াইয়া আসিয়াছি। দুধারেই বিস্তীর্ণ মাঠ, শস্যাদি বিশেষ কিছুই নাই। মাঝে মাঝে লোকের বস্তি আছে। প্রায়ই মাটীর দেওয়ালের ঘর। ছাদের উপর খাটিয়াতে লোকজন শুইয়া আছে, আবার কেহ কেহ লোটা হস্তে উন্মুক্ত প্রান্তরে প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিতেছে। সকাল ছয়টায় লাহোরে পৌঁছিলাম। গাড়ী হইতে নামিয়াই একখানি টাঙ্গা করিয়া কাশ্মীরগামী মোটরবাসের নিকটে গেলাম। সেখানে খবর লইয়া জানিতে পারিলাম, জম্মুর পথে তখনও সম্পূর্ণভাবে ধর্ম্মঘটের অবসান হয় নাই। দুই এক দিনের মধ্যেই সব মিটিয়া যাইবে এবং ফিরিবার পথে জম্মু হইয়া আসিতে কোনও বাধা থাকিবে না। আমি আর ষ্টেশনে ফিরিয়া গেলাম না, এখান হইতে মোটরবাসেই রাওয়ালপিণ্ডি হইয়া শ্রীনগর যাইতে মনস্থ করিলাম।

লাহোর-রাওয়ালপিণ্ডি

লাহোর হইতে রাওয়ালপিণ্ডি মোটরবাসে যাইতে আট-নয় ঘণ্টা সময় লাগে। ভোরে তথা হইতে পুনরায় শ্রীনগরের দিকে বাস্ ছাড়ে। লাহোর হইতে জম্মু হইয়াও বরাবর বাসে শ্রীনগর যাওয়া যায়। সাধারণতঃ অমৃতসর হইতে শিয়ালকোট হইয়া ট্রেনে জম্মু গেলে এবং তথা হইতে বাসে শ্রীনগর গেলে খরচ একটু কম পড়ে। তবে অমৃতসর হইতে জম্মু পর্য্যন্ত কোনও থ্রু ট্রেন না থাকাতে পথিমধ্যে গাড়ী বদল করিতে হয় এবং উহাতে একটু সময় বেশী লাগে। এই সব বিষয় চিন্তা করিয়া আমি লাহোর হইতে জম্মু হইয়া শ্রীনগর যাইব এবং ফিরিবার পথে রাওয়ালপিণ্ডি হইয়া আসিব, ইহাই কল্পনা করিয়াছিলাম। কিন্তু জম্মুর পথে ধর্ম্মঘটের অবসান না হওয়ায় আমার সব কল্পনা ব্যর্থ হইল এবং আমাকে বাধ্য হইয়া রাওয়ালপিণ্ডির দিকে যাত্রা করিতে হইল। লাহোর হইতে ট্রেনে বরাবর রাওয়ালপিণ্ডি যাওয়াই সুবিধাজনক। কিন্তু বাস কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ আমাকে কম ভাড়ায় রিটার্ণ টিকিটের প্রলোভন দিয়া বরাবর বাসে রাওয়ালপিণ্ডি হইয়া শ্রীনগর যাইবার এবং ফিরিবার পথে জম্মু হইয়া আসিবার টিকিট কিনিতে বাধ্য করাইল। ইহার মূলে যে তাহাদের প্রভূত স্বার্থ আছে, আমি তাহা পূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই। এই প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিব।

সকাল সাড়ে আটটায় বাস্ ছাড়িল। যাত্রীদের মধ্যে আমি ভিন্ন সবই পাঞ্জাবী ও পেশোয়ারী। পাঞ্জাবে রেলওয়ে ও বাস্ সার্ভিসে ভীষণ প্রতিযোগিতা, রেল হইতে বাসের ভাড়া একটু কম, ইহার ফলে বাসে খুব লোকের ভিড় হয়। সহরের ভিতর দিয়া গাড়ীখানি অগ্রসর হইতেছে। দুই দিকের দোকান-পাটসমূহে উর্দ্দু হরফের বিজ্ঞাপন, মাঝে মাঝে গুরুমুখীও আছে। সহর ছাড়াইয়াই আমরা মাঠের ভিতর আসিয়া পৌঁছিলাম, বিস্তীর্ণ মাঠ ধূ-ধূ করিতেছে, শস্যাদি বিশেষ কিছু নাই, ক্বচিৎ দুই একটি স্থানে ধানের ক্ষেত দেখা

যায়। দুইদিকে গাছের সারি, পিচ-ঢালা রাস্তা ; একেবারে সোজা চলিয়া গিয়াছে, মোটর যাতায়াতের পক্ষে বিশেষ সুবিধা। দুই ঘণ্টা বাদেই গুজরাণওয়ালা সহরে পৌঁছিলাম। নোংরা সহর, রাস্তাগুলি ধূলিধূসরিত। বাস্ হইতে নামিয়া কিছু আঙ্গুর কিনিয়া লইলাম, এখানেও আঙ্গুরের সের আট আনা। কয়েক মিনিট অপেক্ষা করার পর বাস্ ছাড়িল, বেলা সাড়ে এগারটায় ওয়াজিরাবাদে আসিলাম। এখান হইতে একটি রাস্তা রাওয়ালপিণ্ডি হইয়া পেশোয়ার অভিমুখে এবং অপর রাস্তা শিয়ালকোট হইয়া জম্মুর দিকে চলিয়া গিয়াছে। যাত্রীদের অনেকেই এখানে নামিয়া গিয়াছে, বাস্-কণ্ডাক্টর 'পিণ্ডি' 'পিণ্ডি' বলিয়া যাত্রী সংগ্রহের জন্য চীৎকার করিতে লাগিল। রাওয়ালপিণ্ডিরই সংক্ষিপ্ত নামকরণ 'পিণ্ডি', গরমে আমরা অতিষ্ঠ হইয়া গিয়াছিলাম, তাহার উপরে বাস্-কণ্ডাক্টরের বিকটস্বরে চীৎকার অত্যন্ত অসহনীয় বলিয়া মনে হইতেছিল। যাত্রীদের দুই তিন জনের সঙ্গে ড্রাইভার ও কণ্ডাক্টরের বচসা হওয়ার পর গাড়ী ছাড়িল। এবার দুপাশে কেবল ধানের ক্ষেত, যুক্তপ্রদেশের ন্যায় যব ও গমের ক্ষেত বড় বিশেষ দেখিতে পাইলাম না। ইরিগেসন্ ক্যানাল থাকাতে ক্ষেতে জল সরবরাহের বিশেষ সুবিধা। চেনাব নদী হইতে সোজা খাল কাটিয়া লওয়া হইয়াছে। খালও ছোট-খাট নদীর মত, ঐ খালের আবার বহু শাখা উপশাখা মাঠের ভিতরে গিয়াছে। ইহার ফলে ক্ষেতসমূহে ইচ্ছামত জল সরবরাহ ও জল নিষ্কাষণ করা যায়।

আমাদের বাস্ খুব বেগে চলিয়াছে, রাস্তার মাঝে মাঝে জীবনকায় পাঠানদের দেখা যায়, আবার মধ্যে মধ্যে ঘোড়া অথবা খচ্চরের পিঠে বসিয়া গ্রাম্য লোকদিগকে যাতায়াত করিতে দেখা যায়। মেয়েদিগকেও মাঝে মাঝে ঘোড়ার পিঠে বসিয়া যাইতে দেখা যায় ; এই অবস্থায় সহিসরা ঘোড়ার বল্গা ধরিয়া আগে আগে হাঁটিতে থাকে। সোয়া বারটায় গুজরাট সহরে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত, নামিয়াই ইচ্ছামত কূপোদক পান করিলাম। কুয়ার জলের স্বাভাবিক এত মধুর আস্বাদ আমি অন্য কোথাও উপলব্ধি করি নাই। গুজরাট হইতে লালামুষা হইয়া বেলা দুইটায় ঝিলামে আসিলাম। এখানে কিছু দই ও পুরি খাইয়া লইলাম। মিষ্টি জিনিষগুলি বাঙ্গালীর পক্ষে অখাদ্য। ফলের ভিতরে আঙ্গুর, ছোট ছোট লশা ও পেয়ারা পাওয়া যায়। আহারান্তে পান খাওয়ার ইচ্ছা হইল। কিন্তু পাঞ্জাবীদিগকে বড় বেশী পান খাইতে দেখা যায় না, কাজেই ছোট-বাট সহরগুলিতে পানের দোকান বড় বিশেষ দেখিতে পাইলাম না। প্রায় আধঘণ্টা বাদে বাস্ ছাড়িল। ঝিলামের প্রকাণ্ড পুল পার হইয়া আমরা ক্রমাগত পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। এখান হইতে ক্রমশঃ মালভূমি আরম্ভ। বৃক্ষ-লতার চিহ্নও নাই। কেবল কাঁকর ও রাস্তার দুপাশে লাল রং-এর গুহাগহ্বর। মাঝে মাঝে ডাকবাঙ্গলা আছে। প্রায় বিশ-পঁচিশ মাইল এই প্রকার ঊষর-ভূমি অতিক্রম করার পর আমরা পুনরায় সমতলক্ষেত্রে প্রবেশ করিলাম। এই ভাবে চলিতে চলিতে অপরাহ্ন সাড়ে পাঁচটায় রাওয়ালপিণ্ডিতে পৌঁছিলাম। লাহোর হইতে রাওয়ালপিণ্ডি প্রায় ১৮০ মাইল।

বাস্ ষ্ট্যাণ্ডের অতি সন্নিকটেই রামমহল হোটেল। হোটেলের কামরাগুলি খুবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, প্রত্যেক কামরার সঙ্গেই স্নানের জন্য পৃথক্ কামরা আছে। স্নান করিয়া তাড়াতাড়ি আহারে প্রবৃত্ত হইলাম। ভাত ও মাংস ইচ্ছামত উদরসাৎ করিলাম। সন্ধ্যার পর সহরে একটু বেড়াইতে বাহির হইলাম। হোটেলের নিকটেই সহরের ব্যবসা-কেন্দ্র। দালালগণ বিদেশীয়দিগকে বড় উৎপীড়ন করে। দর-কষাকষিও খুব চলে। পাঁচ টাকা দাম চাহিলে, আড়াই টাকা হইতে দরকষাকষি আরম্ভ করিতে হয়। তিন টাকার ঊর্দ্ধে গেলে অবশ্যই ঠকিতে হইবে। পাঞ্জাবী ও পেশোয়ারীদের বড় বড় দোকানেও এই অবস্থা। সারা দিন বাসে ভ্রমণহেতু অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। কাজেই কিছুক্ষণ বাদেই হোটেলে যাইয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম। খুব ভোরে জাগিতে হইল, কারণ ছয়টায় শ্রীনগরের দিকে বাস্ ছাড়ার কথা। হোটেলে রেট এক টাকা ও খাওয়া বাবদ পৃথক্ এক টাকা লইল। এই সব হোটেলগুলিতে প্রথমতঃ বিদেশীদিগকে বিশেষ ভাবে আপ্যায়িত করা হয়। কিন্তু আগে দরদস্তুর না করিয়া ভদ্রলোক সাজিয়া গেলে অনেক সময়ই অপদস্থও হইতে হয়।

রাওয়ালপিণ্ডি-শ্রীনগর

রাওয়ালপিণ্ডি হইতে শ্রীনগর পর্যন্ত তিন-চারটি কোম্পানীরই বাস্ সার্ভিস আছে। তন্মধ্যে নন্দা কোম্পানীর বাসই আরামদায়ক ও সবচেয়ে দ্রুতগামী। সকাল ছয়টায় যাত্রা করিলে রাত্রি আটটায় শ্রীনগর পৌঁছায়। মেল মোটরে অথবা অন্যান্য কোম্পানীর গাড়ীতে গেলে পথিমধ্যে এক রাত্রি কাটাইতে হয়। কারণ পার্ব্বত্য প্রদেশে সন্ধ্যা সাতটার পরে কোনও বাস চালান নিষিদ্ধ। বারমুলার পরে শ্রীনগর পর্য্যন্ত এই ৩৫ মাইল রাস্তা সমতল ক্ষেত্রের ভিতর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। ঐ স্থানে যে কোনও সময়েই গাড়ী চালান যায়। নন্দা কোম্পানীর বাসে ড্রাইভার সহ ১৮ জনের সিট্ নির্দ্দিষ্ট আছে। ড্রাইভারের পাশের সিট্ ফার্ষ্ট ক্লাস এবং বাকী সিটগুলিকে সেকেণ্ড ক্লাসের পর্য্যায়ভুক্ত করা হইয়াছে। সামনের সিটগুলি একটু ভাল। আগে গিয়া বলিতে পারিলেই সামনে সিট্ পাওয়া যাইবে এমন ব্যবস্থা নাই। আমি রাত্রিতেই সিট্ বুক করাইয়া রাখিয়াছিলাম, কাজেই সামনের দিকে ভাল সিটই মিলিয়াছিল। নির্দ্দিষ্টসংখ্যক যাত্রী হইতে কোনও অবস্থায়ই গাড়ীতে একজনও বেশী লওয়া হয় না। কারণ এদিকে পুলিসের দৃষ্টি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ।

রাওয়ালপিণ্ডি হইতে টোল-সহ নন্দা কোম্পানীর বাসে মুরি হইয়া শ্রীনগরের ভাড়া দশ টাকা এবং আবটাবাদ হইয়া গেলে এগার টাকা। বিশ সের পর্য্যন্ত লগেজ ফ্রি দেওয়া হয়। তদূর্দ্ধ লগেজে এক মণের ভাড়া আদায় করা হয়। প্রতি মণ চারি টাকা। একজন যাত্রীকে দশ টাকার স্থলে সাড়ে সাত টাকায় টিকিট কিনিতে দেখিলাম। অনুসন্ধানে জানিলাম যে, কোম্পানীর নির্দ্দিষ্ট ভাড়ার হারের কোনও কমিয়া অর্দ্ধ নাই, যাহার নিকট যাহা পায় তাহাই আদায় করে। তবে কোনও অবস্থায় ছাপান রেট্ হইতে অধিক আদায় করা হয় না। যাত্রীদের সংখ্যা যখন পুরাপুরি না হয়, তখনই কম ভাড়ায় লোক লওয়া আরম্ভ হয়; এমন কি দশ টাকার স্থলে কেহ কেহ পাঁচ টাকায়ও যাইয়া থাকে। সস্তায় যাইতে হইলে কোনও সময়েই এক টাকা মাত্র কমিশনে রিটার্ণ টিকিট কিনিতে নাই এবং যাত্রীদের সংখ্যার পরিমাণ বুঝিয়া শেষ সময়ে টিকিট করা উচিত। টোল লইয়াও অনেক গোলমাল হয়। রাওয়ালপিণ্ডি হইতে শ্রীনগর পর্য্যন্ত যাত্রী প্রতি টোল এক টাকা বার আনা। কিন্তু কোম্পানী প্রায়ই এগার আনা আড়াই টাকা আদায় করিয়া থাকে। এই সব কারণে কোম্পানীর ম্যানেজারের সঙ্গে শ্রীনগরে প্রায়ই যাত্রীদের ঝগড়া হয়। অনেক বচসার ফলে আমি আট আনা ফিরাও পাইয়াছি।

আমাদের গাড়ী ছাড়িতে প্রায় সাতটা বাজিয়া গেল। কিছুক্ষণ অগ্রসর হওয়ার পর 'সতের মিল ষ্টপেজে' আসিয়া বাস্ থামিল। রাওয়ালপিণ্ডি হইতে স্থানটি ১৭ মাইল দূরে, এই জন্যই ইহার নাম সতের মিল ষ্টপেজ হইয়াছে। এখানে টোল দিতে হইল। ১০।১৫ মিনিট বাদেই আবার গাড়ী ছাড়িল। মাঝে মাঝে পার্ব্বত্য ঝরণা-পাহাড়ের পাদদেশে মাঝে মাঝে গমের ক্ষেত দেখা যায়। প্রায় আট মাইল অগ্রসর হওয়ার পর আমাদের গাড়ীর এঞ্জিনখানি খারাপ হইয়া গেল, হঠাৎ গাড়ী এমন ভাবে নড়িয়া উঠিল, মনে হয় যেন একপাশে পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। ড্রাইভারটি অতিশয় দুঃসাহসিক, সে কিছুতেই গাড়ী থামাইল না। যাত্রীরা চীৎকার করিলে সে বলিতে লাগিল 'মাৎ ঘাবড়াইয়ে সাহেব, আভী তামাম ঠিক হো জায়গা'। এই ভাবে ড্রাইভারের সঙ্গে বচসা করিতে করিতে আমরা ট্রেটে আসিয়া পৌঁছিলাম। এখান হইতে মুরি ১৩ মাইল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পাহাড়ের জঙ্গলের ভিতর একটি কাঁচকলার গাছ দেখিতে পাইলাম। উহাতে কলাও ফলিয়াছে, তবে কলাগুলি বিশেষ পুষ্ট নয়। সামনে ক্রমশঃ চড়াই। আমরা প্রায় পাঁচ হাজার ফুট উচ্চে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। রাস্তার দুদিকে পাহাড়ের গায়ে সরল গাছের সারি, দেখিতে বাঙ্গলা দেশের ঝাউ গাছের মত। এই গাছগুলিকে দেখিয়া কালিদাসের 'দেবদারুদ্রুমাণাম্' এর কথা মনে পড়িল। বেলা পৌনে দশটা বাজিয়াছে, আমরা মুরি আসিয়া পৌঁছিয়াছি। শ্রীনগর এখান হইতে ১৫০ মাইল। আবার গাড়ী চলিতে লাগিল। এখন আমরা ঝিলামের পারে দিয়া চলিতেছি। আঁকাবাঁকা রাস্তা পাহাড়ের গা ঘেঁসিয়া চলিয়াছে। একটু অসাবধান হইলেই অতি নিম্নে ঝিলামের গর্ভে গাড়ী পড়িয়া যাওয়ার সম্ভাবনা। কাজেই গাড়ী অতি সন্তর্পণে চলিতে লাগিল। ঘণ্টায় বেগ ১২ মাইল হইতে ১৫ মাইলের ভিতর।

পাহাড়ের গায়ে স্থানীয় অধিবাসীদের ঘরবাড়ী দেখা যায়। এ অঞ্চলের ঘর-বাড়ীগুলি বিহার, ইউ-পি অথবা পাঞ্জাবের মত নয়। এক এক গৃহস্থের বাসোপযোগী এক একটি বাড়ী; ইহারা বহুলোক একত্র হইয়া এক সীমার মধ্যে থাকে না। ঘরগুলির দেওয়াল কাঠ অথবা পাথরের তৈরী, ছাদগুলি অধিকাংশ স্থলেই খড় ও অন্যান্য তৃণাদির উপরে মাটির লেপ দিয়া করা হইয়াছে। সমীপবর্ত্তী পার্ব্বত্য ঝরণার মধ্যে পাইপ লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং ইহার ফলে চব্বিশ ঘণ্টাই ইহাদের কলের জল পাইতে কোনও অসুবিধা হয় না। ঝিলাম এখন আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই পথপ্রদর্শক হইয়া চলিয়াছে। অপর পারে পুরু ষ্টেট্। এই ভাবে কখনও চড়াই এবং কখনও উৎরাই অতিক্রম করিতে করিতে বেলা সাড়ে বারটায় কোহালায় আসিয়া পৌঁছিলাম। কোহালা পাঞ্জাব প্রদেশের শেষ সীমানা। ইহার উত্তর-পশ্চিম কোণে সীমান্ত-প্রদেশ। কোহালাতে ঝিলাম নদীর পুল পার হইয়া আমাদের গাড়ী অপর পারে কাশ্মীর সীমানায় পৌঁছিল। আমরা এখন উত্তর-পূর্ব্বদিকে যাইতেছি। রাস্তা ক্রমশই খারাপ, বৃটিশের এলাকার রাস্তা কতকটা ভাল। রাস্তার পার্শ্বস্থিত গুহাগহ্বরে অথবা ঝিলামের বক্ষে যাহাতে গাড়ী পড়িয়া না যায়, এ জন্য বৃটিশ সীমানায় বৃহদাকার প্রস্তরখণ্ড সমূহ মাঝে মাঝে রাস্তার এক ধারে রাখা হইয়াছে। এ বিষয়ে কাশ্মীর রাজ্যের ব্যবস্থা একটু ভাল। সেখানে রাস্তার কিনারায় পাথরের টুকরা দিয়া দেওয়াল গাঁথিয়া দেওয়া হইয়াছে। ঝিলাম এখন আমাদের বামদিকে সাথে সাথে চলিয়াছে, আর একদিকে উচ্চ পাহাড়। দুইটি টানেলের ভিতর দিয়া আমরা পার হইলাম। পথে বহু লাল রঙের ঝরণার সাথে আমাদের দেখা হইল। রাস্তা ক্রমশই খারাপ, তাহার উপর বৃষ্টি হওয়ায় কাদা হইয়া গিয়াছে। এক ধারে পাহাড়ের গায়ে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরের খণ্ড পতনোন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। যদি দৈবাৎ এক আধটি খসিয়া পড়ে, তবে আর রক্ষা নাই। সামনে একটি প্রকাণ্ড টানেলের ভিতর দিয়া আমাদের গাড়ীখানি পার হইয়া গেল। বামদিকে ঝিলাম আমাদের সঙ্গ কিছুতেই ছাড়িতেছে না। দূরে অপর পারে সীমান্ত-প্রদেশের পর্ব্বতশ্রেণী মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এই ভাবে চলিতে চলিতে বেলা দুইটায় আসিয়া ডোমেলে পৌঁছিলাম।

এখানে সরকারী অফিসে আমাদের নাম-ধাম লিখিয়া দিতে হইল। পুলিস ভাল-ভাল করিয়া আমাদের সকলের লাগেজ গুলিয়া দেখিল। আমার খুব ভাত হইয়া পড়িয়াছি। ছাতুপাতির আকৃতিবিশিষ্ট বাউগোলা ও অন্যান্য স্থানীয় ফল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ফলগুলি বড়ই মধুর এবং রসে ভরপুর। পয়সায় দুই-তিনটা করিয়া পাওয়া যায়। আমরা সকলেই ইচ্ছামত ইহাদের সৎকার করিলাম। তিনটা পাঁচ মিনিটে ডোমেল হইতে গাড়ী ছাড়িল। গাড়ী প্রায় দুই ঘণ্টা লেট। ঝিলাম এবার অদৃশ্য হইয়াছে। তুধারেই কিছু দূরে পাহাড়, তাহার মধ্যবর্ত্তী সমতল স্থান দিয়া আমরা চলিতেছি। প্রকৃতি এখানে বড়ই অভিরাম দৃশ্য ধারণ করিয়াছে। দূরে পাহাড়ের গায়ে যখন মেঘের ছায়া পড়ে, তখন হঠাৎ সম্পূর্ণ পাহাড় নীল হইয়া যায়; আবার যখন মেঘ অপসারিত হয়, সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লতা-গুল্ম শ্যামল যৌবন-শ্রীতে মুঞ্জরিত হইয়া উঠে। প্রকৃতি তাহার নীল ও সবুজের ভাণ্ডারকে এখানে বোধ হয় নিঃশেষে ঢালিয়া দিয়াছে। নীল-সবুজের এই প্রকার খেলা কোথাও দেখি নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে জনৈক কবি বিরচিত "নীল-সবুজের প্রাণের দোলায়" শীর্ষক একখানি কবিতার বই পড়িয়াছিলাম। কবির নিকট আমার অনুরোধ, তিনি যেন একবার এখানে আসিয়া এই নয়ন ও চিত্ত-বিমোহন নীল-সবুজের লুকোচুরি খেলা দেখিয়া যান। এখন আর পাহাড়ের গায়ে প্রস্তরখণ্ড নাই, পাহাড়-পর্ব্বত নানাবিধ তৃণগুল্ম সুশোভিত। ছাগ ও ভেড়ার পাল মনের আনন্দে তাহাদের উপর চরিয়া বেড়াইতেছে, আর থাকিয়া থাকিয়া ঝরণার জলে তৃষ্ণা নিবারণ করিতেছে। রাস্তার দুই পাশে সমতলক্ষেত্রে প্রচুর ধান হইয়া রহিয়াছে, কোথাও বা ধান কাটাও হইতেছে। বর্ষা, বসন্ত ও হেমন্তের এই প্রকার সংমিশ্রণ আমি আর কখনও দেখি নাই, দেখা দূরে থাকুক ভাবিতেও সাহস পাই নাই।

এই ভাবে প্রকৃতির খেলা দেখিতে দেখিতে আমরা অগ্রসর হইতে লাগিলাম। হঠাৎ আমাদের গাড়ীর এঞ্জিন খারাপ হইয়া গেল। সহযাত্রীদের ভিতর একজন আংলো-ইণ্ডিয়ান

ছিলেন, তিনি আমাদের ড্রাইভারকে গাড়ীর এঞ্জিন ফিট্ করিতে সাহায্য করিলেন।

এখানে রাস্তার দুধারে অসংখ্য পরিমাণে বন্য দাড়িম ফলিয়া রহিয়াছে। সংযাত্রীদের ভিতর চার পাঁচ জন কাশ্মীরী ছিলেন, তাঁহারা আমাদিগকে পেটের অসুখ ও অন্যান্য ব্যারামের ভীতি দেখাইয়া এগুলি খাইতে নিষেধ করিলেন। আমরা দুই তিন জন তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া উহাদের সৎকার করিতে লাগিলাম। অম্লরসের অতিমাত্রায় আধিক্য, কাজেই দুই তিনটির বেশী কিছুতেই সৎকার করা গেল না। ইতাবসরে এঞ্জিন ফিট্ হইয়া গেল, আমরা আবার চলিতে লাগিলাম। ঝিলাম এখন আমাদের সাথে লুকোচুরি খেলিতে লাগিল। এক আধ মাইল সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া হঠাৎ অদৃশ্য হয়, আবার খানিক পরে হঠাৎ দেখা দেয়।

সন্ধ্যা ছয়টা হইয়াছে, আমরা উরিতে পৌঁছিয়াছি। শ্রীনগর এখান হইতে আরও ৭০ মাইল। পুলিশ এখানে আমাদের গাড়ীখানি আটক করিল এবং ড্রাইভারকে থানার ভিতরে লইয়া গেল। অনুসন্ধান করিয়া জানা গেল যে, কিছুদিন পূর্বে একটি লোক গাড়ী চাপা পড়িয়াছিল, তাই সন্দেহক্রমে পুলিশ আমাদের ড্রাইভারকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। ড্রাইভার যে আসামী নহে এ বিষয়ে সন্তোষজনক যথেষ্ট প্রমাণ দেওয়া সত্ত্বেও যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণার লোভে পুলিশ কর্ম্মচারী তাহাকে ছাড়িতে কিছুতেই স্বীকৃত হইল না। আমাদের আংলো-ইণ্ডিয়ান সংযাত্রী সৈন্য-বিভাগের ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারী। তিনি জামিন হইতে চাহিলেন, তথাপি কোনও ফল হইল না। যখন পুলিশ কর্ম্মচারী জানিতে পারিল যে, আমাদের আংলো-ইণ্ডিয়ান সহযাত্রীর কাশ্মীরের ইন্‌স্পেক্টর জেনারল অব পুলিশের সঙ্গে বিশেষ পরিচয় আছে, তখন ভয়ে ভয়ে আমাদের ড্রাইভারকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল; এমন কি, আমাদিগকে চা পানে আপ্যায়িত করিতেও ত্রুটি হইল না। টাইম্ টেবল অনুযায়ী উরি হইতে পৌনে চারিটায় বাস্ ছাড়িবার কথা, নানা দিক্ হইতে বিবিধ বিঘ্ন উপস্থিত হওয়ায় বাস ছাড়িতে সোয়া ছয়টা বাজিয়া গেল। সাত আট মাইল অগ্রসর হওয়ার পর আবার আমাদিগকে পুলিশ আটক করিল। তখন রাত্রি হইয়াছে। পার্ব্বত্য প্রদেশের রাত্রিতে মোটর চলাচল নিষিদ্ধ, কাজেই আমাদিগকে বাধ্য হইয়া সেই স্থানে রাত্রি যাপন করিতে হইল।

স্থানটির নাম রামপুর। একটি ডাকবাঙ্গালা আছে, খাওয়ার কিছুই মিলিল না। এক কাপ চা ও একখানা কেক্ মিলিল, তাহারও দাম আট আনা; তাড়া বাবদ অতিরিক্ত এক টাকা দিয়া ডাকবাঙ্গালাতেই রাত্রি কাটাইয়া দিলাম। সম্মুখে ঝিলাম প্রচণ্ড গর্জ্জনে বহিয়া যাইতেছে, তাহার এই 'রম রম্' 'ঝম্ ঝম্' শব্দে রাত্রিতে মোটেই নিদ্রা হইল না। সকালে ছয়টায় মোটর ছাড়িল, বেলা নয়টায় বারমুলা পৌঁছিলাম। শ্রীনগর এখান হইতে সোয়া ঘণ্টার পথ, পার্ব্বত্য প্রদেশের এইখানেই অবসান। এখান হইতে রাস্তা সমতলভূমির উপর দিয়া সোজা শ্রীনগর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। রাস্তার দুদিকেই এক জাতীয় গাছ দেখিতে পাইলাম। মাথাটি ঠিক পিরামিডের আকৃতি বিশিষ্ট, পাতাগুলি অনেকটা বাংলা দেশের ভাওড়া গাছের পাতার ন্যায়। মনে হয় কোন শিল্পী যেন গাছগুলিকে একই 'ইউনিফর্ম' পরাইয়া দিয়াছেন। দুপাশে কেবল ধানের ক্ষেত, চাষারা মনের আনন্দে ধান কাটিতেছে। আমাদের দেশে এখন শ্রাবণ মাস, আর এ স্থানে আসিলে মনে হয় যেন অগ্রহায়ণ মাস চলিতেছে।

আমরা শ্রীনগরের উপকণ্ঠ দিয়া চলিতেছি, গ্রাম্য স্ত্রীলোকেরা দলে দলে তরকারীর বোঝা মাথায় করিয়া সহরের দিকে যাইতেছে; পুরুষরা চামড়ার থলিতে করিয়া চাউল ও অন্যান্য জিনিষ লইয়া যাইতেছে। রাস্তার দুধারের গৃহ হইতে জানালার ফাঁক দিয়া অসংখ্য চক্ষুর দৃষ্টিও আমাদের উপর নিপতিত হইতে লাগিল। এই ভাবে শ্রীনগরের দৃশ্য দেখিতে দেখিতে বেলা সোয়া দশটায় আমাদের বাস্ সহরের মধ্যস্থলে ডিপোর নিকটে যাইয়া থামিল।

বাস্ হইতে নামা মাত্রই কতকগুলি লোক আমাদিগকে পঙ্গপালের মত ঘিরিয়া ফেলিল। ঐ লোকগুলি "শেঠ সাহেব, হাউস বোট চাহিয়ে" এই কথা বলিতে বলিতে আমাদিগকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। বাহিরের লোক মাত্রকেই তাহারা খুব ধনী বলিয়া মনে করে। তাহাদের বিশ্বাস—দেশদেশান্তর হইতে ভ্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে এখানে কখনও গরীব বা মধ্যবিত্ত

লোক আসে না। তাহাদের এই বিশ্বাসের মূলে কিছুটা সত্যও নিহিত আছে।

গাড়ীতে আলাপ ব্যবহারের ফলে সহযাত্রীদের মধ্যে দুইজনের সঙ্গে আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। একজনের বাড়ী করাচী, তিনি ব্যবসায়ী এবং তদুপলক্ষে বৎসরে দুই তিন বার শ্রীনগরে আসিয়া থাকেন। তাঁহার নাম মতিরাম। অপর জনের বাড়ী সুরাট, তিনি ভ্রমণের উদ্দেশ্যে এখানে আসিয়াছেন। আমি এবং শেষোক্ত ভদ্রলোক দুইজনেই নবাগত, কাজেই আমরা মতিরামের শরণাপন্ন হইলাম। মতিরামের পরামর্শে আমরা তিনজনেই ম্যাজেষ্টিক হোটেলে দৈনিক তিন টাকা ভাড়ায় একটি কামরা ঠিক করিলাম। দেশীয় হোটেলের মধ্যে উহাই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোককেই এই হোটেলে আশ্রয় লইতে দেখিলাম। হোটেলের ম্যানেজার কাশ্মীরী মুসলমান এবং মুসলমানই সেখানে রান্নার কার্য্য করে। আমি ও মতিরাম সনাতন-পন্থী, কাজেই আমাদিগকে অন্য হোটেলে যাইয়া আহার করিতে হইত। শিখদের পরিচিত খালসা হোটেলও মন্দ নয়, ইহা ছাড়া বাঙ্গীর হোটেল নামে কাশ্মীরী ব্রাহ্মণের পরিচালিত একটি হোটেলও আছে। সবগুলি হোটেলই পাশাপাশি এবং সহরের কেন্দ্রস্থলে মীরাকদল নামক স্থানে অবস্থিত। ম্যাজেষ্টিক হোটেলের ন্যায় অন্য হোটেলগুলি তত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নয় এবং ছারপোকা ও পিস্তর অত্যাচারও যথেষ্ট। পিস্ত লাল রঙ্গের এক প্রকার ক্ষুদ্র কীট, প্রকৃতিও পিস্তলের ন্যায়, যে স্থানে দংশন করে সদ্য সেই স্থান ফুলিয়া উঠে। ম্যাজেষ্টিক হোটেলে এই সবের উৎপাত মোটেই ছিল না।

স্নানাদি সমাপন করিয়া আমি ও মতিরাম বাঙ্গীর হোটেলে খাইতে গেলাম। ভাত ও রুটি উভয়েরই বন্দোবস্ত আছে, যাহার যে প্রকার ইচ্ছা তাহাই খাইতে পারে। উপকরণের মধ্যে ডাল ও দুইটি তরকারী। সবগুলিতেই প্রচুর পরিমাণে ঘি ঢালিয়া দেওয়া হইল, আমি অতি কষ্টে দুই চারি গ্রাস খাইলাম। ঘির ভিতরে বোধ হয় অর্দ্ধেকের বেশী চর্ব্বি মিশান হইয়াছে। উৎকট ও নিতান্ত অনুপাদেয় গন্ধ হেতু বিশেষ কিছু খাইতে পারিলাম না। এই খাদ্যেই পাঁচ আনা দক্ষিণা দিতে হইল।

আহারাদির পরে মিউজিয়াম দেখিতে গেলাম। উহা ঝিলামের অপর পারে অবস্থিত। দর্শনীয় জিনিষের মধ্যে কুশান যুগের কতকগুলি বৃহদাকার প্রস্তর মূর্ত্তি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। হিমালয়ের আশে পাশের নানা বর্ণের কতকগুলি হংসও রক্ষিত হইয়াছে, ঐ জাতীয় হংস সাধারণতঃ দেখা যায় না, অপর একটি কোঠায় ডোগরা সৈন্যেরা যুদ্ধে যে সব বন্দুক ও ঢাল তরবারি ব্যবহার করিত, তাহাদের নমুনাস্বরূপ কতকগুলি রক্ষিত হইয়াছে। মিউজিয়ামে কাশ্মীরের চারুশিল্পের তেমন কিছু উৎকৃষ্ট নিদর্শন দেখিতে পাইলাম না।

আমার কাশ্মীরে আসার মূল উদ্দেশ্য হস্ত-লিখিত প্রাচীন পুঁথির সন্ধান করা। মিউজিয়ামে একজন শাস্ত্রীর সঙ্গে দেখা হইল, তাঁহার নিকটে আমার উদ্দেশ্য নিবেদন করিলাম এবং তিনি আমাকে এই সম্বন্ধে রিসার্চ্চ ডিপার্টমেণ্টে খোঁজ করিবার জন্য বলিলেন। রিসার্চ্চ ডিপার্টমেণ্ট মিউজিয়ামের অতি সন্নিকটেই অবস্থিত। প্রাচীন সংস্কৃত পুঁথি মুদ্রণ করা এই বিভাগের প্রধান কার্য্য। শাস্ত্রীজীর উপদেশানুযায়ী আমি সেখানে গেলাম। সেখানে ঐ বিভাগের একজন কর্ম্মচারীর সঙ্গে আমার আলাপ হইল। তিনি আমাকে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট লইয়া গেলেন। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আলাপ এবং বাহ্যিক ব্যবহারে অতিশয় ভদ্র। প্রায় দেড় ঘণ্টা তিনি আমার সঙ্গে নানাবিধ আলাপ করিলেন, কিন্তু হস্তলিখিত প্রাচীন কোন পুস্তক দেখান দূরে থাকুক্—কোনও প্রকার বিবরণ দিতেও স্বীকৃত হইলেন না। আমি তাঁহার আপাতমধুর ব্যবহারে কোনও প্রকারেই সন্তুষ্ট হইতে পারিলাম না। কেবল এই নয়—তিনি স্থানীয় পণ্ডিতদের নিকটে ঘোষণা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন যে, কলিকাতা হইতে প্রাচীন পুঁথির সন্ধানে একজন বাঙ্গালী আসিয়াছে, তাহাকে যেন কোনও প্রকারেই পুঁথির সন্ধান দেওয়া না হয়।

সন্ধ্যার পরে আর একটি হোটেলে খাইতে গেলাম। সেখানেও একই প্রকার অবস্থা। ক্ষুধার শান্তি না হওয়ায় বাসায় আসিয়া কিছু ফল খাইলাম। এখানে নানা প্রকার ফল পাওয়া যায়। স্থানীয় আঙ্গুরগুলি বেশ বড়, তবে তত মিষ্ট নহে। প্রতি সের চারি আনা হইতে ছয় আনা পর্য্যন্ত

বিক্রয় হয়। আপেলের ডজন চার পাঁচ আনা। ইহা ছাড়া বাউগোসা ও স্থানপাতির আকৃতিবিশিষ্ট অন্যান্য ফল পাওয়া যায়। ডজন দু' আনা দশ পয়সা। আমি প্রায়ই রাত্রিতে ফল খাইয়া কাটাইতাম।

পরদিন সকালে টাঙ্গা করিয়া সহর দেখিতে বাহির হইলাম। টাঙ্গাওয়ালাদের সঙ্গে পূর্ব্বে দর-কষাকষি করিয়া না লইলে শেষে বড়ই গোলমাল করে। সাধারণতঃ ঘণ্টায় ছয় আনা হইতে আট আনা পর্য্যন্ত লইয়া থাকে। যেখানেই যাই, সেখানেই হাউস-বোটের দালালগণ অত্যন্ত জ্বালাতন করিতে লাগিল। প্রধান প্রধান রাস্তা দিয়া যদৃচ্ছা-ক্রমে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। ঘরগুলির ছাদ ও মেজে প্রায়ই কাঠের। দেওয়ালে কাঠ ও পাথরের খণ্ড দুইই আছে। সরু গলির ভিতরে মাটীর দেওয়ালের ঘরই বেশীর ভাগ। সহরটি খুবই নোংরা, গলিগুলি কাশীর সরু গলির ন্যায়। অধিবাসীদের মধ্যে মুসলমানই বেশীর ভাগ। স্থানীয় হিন্দুদের মধ্যে কাশ্মীরী পণ্ডিত (ব্রাহ্মণ) ভিন্ন অন্য জাতি বড় দেখিতে পাইলাম না। ধোপা ও নাপিতের কাজও মুসলমানদেরই করিতে দেখিলাম। তবে অন্যান্য সহরের ন্যায় মুসলমান ও হিন্দুদের বিভিন্ন পল্লী নাই। এক পল্লীতেই হিন্দু ও মুসলমান পাশাপাশি বাস করে। এখানকার হিন্দু ও মুসলমান উভয়ই স্বভাবতঃ দীর্ঘাকৃতি, তবে কেহই তেমন বলিষ্ঠ নয়। ঝিলাম নদী শ্রীনগর সহরকে ঘুরিয়া ফিরিয়া নানা ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। সহরের ভিতরে ঝিলামের উপরে প্রায় ছয়টি পুল আছে। নদীতে হাউস-বোটে বহু-সংখ্যক লোক বাস করে। অনেকক্ষণ ঘুরিয়া ফিরিয়া বেলা দশটায় বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

রুচি পরিবর্ত্তনের জন্য এই বেলা খালশা হোটেলে গেলাম, এক প্লেট মাংসও লইলাম। খাদ্যের বিন্দুমাত্র পার্থক্য অনুভব করিলাম না। মাংস খাইয়াও কোনও প্রকার তৃপ্তি অনুভব করিতে পারি নাই।

মাংস খাওয়াতে ছয় আনা দক্ষিণা দিতে হইল। কোনও হোটেলেই ডাল, দুইটি তরকারী এবং মাংস ছাড়া অন্য কিছু উপকরণ পাওয়া যায় নাই। তবে যিনি ইচ্ছা করেন, তিনি কতকগুলি কাঁচা টমাটো ও পেঁয়াজের টুকরা ফ্রি পাইতে পারেন। অতিরিক্ত দক্ষিণা দিলে ঘই সরবরাহ করা হয়। এই পর্য্যন্তই উপকরণের সীমা। শিখদের পরিচালিত হোটেলে মাঝে মাঝে শূকরের মাংসেরও সৎকার হইয়া থাকে।

কিছুক্ষণ বিশ্রামান্তে স্থানীয় বাঙ্গালী ভদ্রমহোদয়গণের সাথে দেখা করিতে বাহির হইলাম। প্রথমেই শ্রীনগরের চীফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার শ্রীযুক্ত ললিত বসু মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। শ্রীনগরে তিনি বোস্ সাহেব বলিয়া খ্যাত। তাঁহাকে আমার শ্রীনগরে আগমনের উদ্দেশ্য জানাইলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে রিসার্চ বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের ব্যবহারের বিষয়ও আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিলাম। তিনি আমাকে এ বিষয়ে স্থানীয় শ্রীপ্রতাপ কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামলাল কাঞ্জিলাল মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিতে বলিলেন এবং পরদিন বিকাল বেলা তাঁহার বাসায় জলযোগের নিমন্ত্রণ করিলেন।

বোস্ সাহেবের সঙ্গে কথাবার্ত্তা শেষ করিয়া শ্রীনগরের উপকণ্ঠে শঙ্করাচার্য্য পাহাড় দেখিতে গেলাম। পাহাড়ের উপরে শঙ্করাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দির। এখান হইতে চতুর্দ্দিকের দৃশ্য বড়ই মনোরম। চতুর্দ্দিকে শত যোজন-বিস্তৃত পর্ব্বতশ্রেণী মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, আর মধ্যস্থলে অনেক দূর বিস্তৃত সমতল ক্ষেত্র। ইহাই কাশ্মীরের বৈশিষ্ট্য এবং এই জন্যই বোধ হয় স্থানটি ভূস্বর্গ বলিয়া খ্যাত।

কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া সন্ধ্যার কিছু পরে বাসায় ফিরিলাম। আসিয়া দেখি আমাদের সুব্রাটের বন্ধুটি অতিরিক্ত মাত্রায় মদ্য সেবন করিয়া বেহুঁস হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার এই অবস্থা দেখিয়া আমি ও মতিরাম পরদিন সকালে এক শিখ হোটেলে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

বেলা আটটার মধ্যে আহারাদি সমাপন করিয়া আমরা শ্রীনগরের বাহিরে 'চশমা শাই', 'নিশাৎ বাগ', 'শালিমার' প্রভৃতি উদ্যানসমূহ দেখিতে গেলাম। সর্ব্বত্রই উদ্যানসমূহ শ্বেতবর্ণের প্রস্তরখচিত। নিশাৎবাগে অনেকগুলি ফোয়ারা একই সময়ে তীব্র বেগে জল উদ্গিরণ করিতেছিল। রবিবার ভিন্ন এই ফোয়ারাগুলি খোলা হয় না। শালিমারের উদ্যানটি বিচিত্র বর্ণের নানাবিধ নয়নাভিরাম লতা-গুল্ম-পাদপে সুশোভিত। ফোয়ারার উচ্ছ্বসিত জলের ধারায় বিচিত্র বর্ণের বিবিধ ফুলের প্রতিবিম্ব বড়ই চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠে।

এদিকে সেদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখার পর অপরাহ্নে বোস্ সাহেবের বাসায় নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গেলাম। কাশ্মীরের জুডিশিয়াল মিনিষ্টার শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রগোপাল মুখোপাধ্যায়, মহাশয় এবং স্থানীয় অন্যান্য দুই তিন জন বাঙ্গালী ভদ্রলোকও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বোস্ সাহেব আমাকে প্রত্যেকের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলেন। শ্রীনগরে মাত্র ছয় সাত ঘর বাঙ্গালী আছেন। এখানে বাঙ্গালীর সংখ্যা দ্রুতবেগে কমিয়া যাইতেছে। বোস্ সাহেব ও অধ্যাপক কাঞ্জিলাল মহাশয়ও শীঘ্রই অবসর গ্রহণ করিবেন। কোনও বাঙ্গালীর চাকুরী হওয়া দূরে থাকুক, যাঁহারা সেখানে পূর্ব্ব হইতেই আছেন, তাঁহারাও নিজেদের স্থায়িত্ব বিষয়ে নিশ্চিন্ত নহেন। বোস্ সাহেবের বাসায় উদরকে পূর্ণমাত্রায় বোঝাই করিয়া অধ্যাপক কাঞ্জিলাল মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করিতে আসিলাম। তিনি আমাকে তাঁহার সহকারী অধ্যাপক জগদ্ধর ভাকরু সঙ্গে পরিচিত করাইয়া দিলেন এবং আমার উদ্দেশ্য যাহাতে সফল হয়, সে বিষয়ে চেষ্টা করিতে অনুরোধ করিলেন। অধ্যাপক জগদ্ধর কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ এবং কাহার নিকট কি পরিমাণ প্রাচীন পুঁথি আছে, এ বিষয়ে অনেক খবর রাখেন। অধ্যাপক জগদ্ধরের সহিত আমি অনেক কাশ্মীরী পণ্ডিতদের বাড়ীতে প্রাচীন পুঁথি দেখিতে গিয়াছি এবং পণ্ডিতদের চালচলন সম্বন্ধে অনেক অভিজ্ঞতাও অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছি। আমাদের দেশে পণ্ডিত বলিলে আমরা সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন ব্যক্তিবিশেষকে বুঝিয়া থাকি, কিন্তু কাশ্মীরী পণ্ডিত শব্দের অর্থ কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ। সংস্কৃতে ব্যুৎপন্ন ব্যক্তিদিগকে এখানে শাস্ত্রী বলা হয়। পণ্ডিতদের বাড়ীগুলি প্রায়ই গলির ভিতরে। ঘরগুলি বিশেষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন নহে, দেওয়ালগুলি প্রায়ই মাটীর। দরজাগুলি খুবই ছোট ছোট, একটু অসাবধান হইলেই মাথায় আঘাত পাওয়ার সম্ভাবনা। দরজাগুলির এই প্রকার আকার সম্বন্ধে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, স্থানীয় পণ্ডিতরা বলিলেন যে, প্রাক্-বৃটিশ যুগে সৈন্য-সামন্তগণ অশ্বপৃষ্ঠেই অন্দরের ভিতরে প্রবেশ করিয়া নানারূপ অত্যাচার করিত, যাহাতে দ্রুতপদবিক্ষেপে বাহিরের কেহ অন্দরমহলে প্রবেশ না করিতে পারে, তজ্জন্য এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। ইহার মূলে কি পরিমাণে ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে জানি না। গরীব ও মধ্যবিত্ত পণ্ডিতদের বৈঠকখানা প্রায়ই ঘরের উপর তলায় অবস্থিত। বিদেশী ভদ্রলোক কেহ দেখা করিতে আসিলে ইহারা পরম যত্নে ঘরে লইয়া বসায় এবং চা, তামাক ও মধুর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিয়া থাকে। বাড়ীর ভিতরে ইহারা প্রায়শঃ অর্দ্ধ-নগ্ন অবস্থায় থাকে। গায়ে একটি জামা এবং পরিধেয় একটি কৌপীন ভিন্ন অন্য কিছুই থাকে না। আমার নিকট এই দৃশ্য অত্যন্ত অদ্ভুত মনে হইতেছিল, কিন্তু তাহাদের ভ্রূক্ষেপ নাই। তাহারা এই অবস্থাতেই আমার সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিল। ইহাদের বৈঠকখানায় চিত্র-বিচিত্র কার্পেট বিছান থাকে, চেয়ার-টেবিলের আধুনিক সভ্যতা এখনও ইহাদের ভিতরে ততটা প্রবেশ করে নাই। অন্যান্য সব বিষয়েই ইহারা বিশেষ ভদ্র, তবে নিজেদের নিকট সংরক্ষিত প্রাচীন পুঁথি ইহারা সহজে দেখাইতে স্বীকৃত হয় না। 'বহুত্ দুরসে নিম্‌নেকী উমেদ হ্যায়, অব মুঝে কুরসৎ নহীঁ হ্যায়, ফুরসৎ মোঁ আনেকী কৃপা করেঁ', এই প্রকার বাক্যদ্বারাই তুষ্ট করিতে চেষ্টা করে। পূর্ব্বপুরুষের লিখিত পুস্তকগুলিকে ইহারা পরম পবিত্র মনে করে এবং সকাল ও সন্ধ্যায় ইহাদের উপরে অনেকেই ফুল ও ধূপ দেয়। তবে অধ্যাপক জগদ্ধর শাস্ত্রীর কৃপায় আমি অনেক পুঁথিই দেখিতে সমর্থ হইয়াছি। প্রাচীন পুঁথিগুলি প্রায়ই ভূর্জ্জপত্রে লিখিত। কোনও বাসাতুকে যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণা দিলে অনেক সময়েই কেবল-পুঁথি কেন, অনেক কিছু অতিলঘিত দ্রব্যই অনায়াসে সংগ্রহ করা যায়। এখানকার অধিকাংশ লোকই সাধারণতঃ গরীব এবং অল্প পয়সার জন্য অনেক কিছুই করিতে পারে।

সংস্কৃতে ব্যুৎপন্ন অনেক শাস্ত্রীদের সঙ্গেও আমি এই ব্যাপারে দেখা করিয়াছি। বাঙ্গালীদের সম্বন্ধে তাঁহাদের অতি উচ্চ ধারণা। তাঁহারা মনে করেন, বাঙ্গালীমাত্রেই কিছু না কিছু সংস্কৃত জানে। আমার সঙ্গে দেখা হওয়া মাত্রই একজন শাস্ত্রী অন্য কোন পরিচয় না জিজ্ঞাসা করিয়া সংস্কৃত ভাষায় আলাপ আরম্ভ করিয়া দিলেন। ইহাদের উচ্চারণ একটু বিভিন্ন রকমের। মনোনিবেশ করিয়া না শুনিলে সব কথা বুঝা যায় না। খ, ঘ, ধ ইত্যাদি মহাপ্রাণ বর্ণের উচ্চারণ ইহাঁরা সহজে করিতে পারেন না। ভগবানকে 'বগবান্' উচ্চারণ করিয়া থাকেন, ইহাঁদের বদ্ধমূল ধারণা যে,

বঙ্গদেশে তন্ত্রশাস্ত্রের চর্চ্চা খুবই আছে এবং বাঙ্গালীদের গ্রামে অনেকেই বর্ত্তমান, ইহাদের ইতঃপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি।

মহারাজের নিজস্ব প্রাচীন পুস্তক-ভাণ্ডারের সংরক্ষক শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত হরদত্ত শাস্ত্রীর সঙ্গে আমার পুস্তকসংগ্রহ ব্যাপারে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। তাঁহারা আমাকে এই ব্যাপারে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ। শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী অতিশয় সজ্জন, তিনি আমাকে তাঁহার বাড়ীতে থাকিবার জন্য বড়ই অনুরোধ করিতে লাগিলেন। আমি স্বীকৃত না হওয়ায় তিনি অসন্তুষ্ট হইলেন। একদিন আমাকে তাঁহার বাড়ীতে রাত্রিতে ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন, আমি স্বীকৃত হইলাম। তাঁহার নিকটেও আমি কাশ্মীরী পণ্ডিত সমাজের অনেক ব্যাপার অবগত হইলাম। পণ্ডিতদের অধিকাংশেরই গ্রামে সম্পত্তি আছে, তদ্দ্বারা বৎসরের আহারের কাজ সমাধা হয়। প্রাচীনকাল হইতেই গ্রামে বড় কেহ বসবাস করেন না, বিবাহ-সম্বন্ধ ইত্যাদি সহরের মধ্যেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। শ্রীনগর হইতে ২৪ মাইলের অধিক দূরে ইহাঁদের কোনও সমাজ নাই এবং ইহার বাহিরে কোনও ব্রাহ্মণের বসবাসও নাই। বাল্যবিবাহের প্রচলন ইহাঁদের মধ্যে খুবই বেশী।

বাঙ্গালাদেশের সঙ্গে ইহাঁদের চালচলন ও সামাজিক জীবনের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। প্রত্যেকের বাড়ীতেই শিবলিঙ্গ ও শালগ্রাম শিলার পূজা হইয়া থাকে। সন্ধ্যা-বন্দনাদির মন্ত্রও বঙ্গদেশের মতই, তবে ইহাঁরা প্রাতঃকালেই তিনবেলার সন্ধ্যাবন্দনা সমাপন করিয়া থাকেন। শিব ও শক্তির উপাসনাই বিশেষভাবে প্রচলিত। বাঙ্গালীদের ন্যায় মৎস্য, মাংসভক্ষণে ইহাঁরা নিপুণ। চাউলই প্রধান উপজীব্য, রুটীর প্রচলন বিশেষ নাই। পূজাপার্ব্বণে পাঁঠাবলি একটি আনুষঙ্গিক কর্ম্ম। উচ্ছিষ্টজ্ঞান বাঙ্গালীদের ন্যায় তত বেশী নাই, এ বিষয়ে তাঁহারা একটু উদাসীন। শিবনাথ শাস্ত্রীর বাড়ীতে কার্পেটের উপরে একখানি তসরের কাপড় ভাঁজ করিয়া পাতিয়া দেওয়া হইল, আমি ও শাস্ত্রী মহাশয় দুইজনে একই আসনে বসিয়া আহার করিলাম। আমি এই ব্যবস্থার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে, শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন যে, তসরের কাপড়ে পংক্তিদোষ ধরা হয় না। শাস্ত্রী মহাশয়ের পুত্র আমাদের পরিবেশন করিল। যথেষ্ট পরিমাণে নানাবিধ ব্যঞ্জনাদিদ্বারা উদর পরিপূর্ণ করিলাম। বাঙ্গালীদের ন্যায় কাশ্মীরী পণ্ডিতগণও তৈল দিয়াই তরকারী পাক করিয়া থাকেন। ঘির বিশেষ প্রচলন নাই। তবে তরকারীর স্বাদ একটু অন্যরকমের। প্রায় তরকারীতেই জাফ্রাণ দেওয়া হইয়া থাকে এবং অনভ্যস্ত বিদেশীদের পক্ষে উহার ক্রিয়া সামলান একটু কঠিন হইয়া পড়ে। পানের ভিতরেও ইহাঁরা জাফ্রাণ এবং অন্যান্য উত্তেজক দ্রব্য ব্যবহার করিয়া থাকেন।

কাশ্মীর সম্বন্ধে বাঙ্গালীদের কি ধারণা, এ বিষয়ে শাস্ত্রীজী আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ইহার উত্তরে আমি বলিলাম যে, আমাদের দেশের লোকের ধারণা কাশ্মীর ভূস্বর্গ এবং এখানে চির-বসন্ত বিরাজিত। শেষোক্ত কথা শুনিয়া তিনি হাসিয়া উঠিলেন এবং আমাকে বলিলেন যে, ডিসেম্বর হইতে ফেব্রুয়ারী মাসের ভিতরে এখানে একবার আসিয়া থাকিবেন এবং বসন্তের উপভোগটা পূর্ণমাত্রায় করিয়া যাইবেন। আমি এই কথার অর্থ জিজ্ঞাসা করতেই তিনি বলিলেন যে, রাস্তাঘাট বরফে আচ্ছাদিত হইয়া কি প্রকার বসন্তের দৃশ্য ধারণ করে, নিজে একবার ঐ সময় না আসিলে উপলব্ধি হইবে না। ইহা ছাড়া প্রসঙ্গক্রমে কাশ্মীরের পদ্মমধুর কথা উল্লেখ করাতে তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং আমাকে ইহার মর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম পদ্মমধু চোখের একটি প্রধান ঔষধ এবং কাশ্মীর হইতে বঙ্গদেশে উহা আমদানী করা হইয়া থাকে। তিনি এবং উপস্থিত ব্যক্তি-গণের মধ্যে সকলেই বলিয়া উঠিলেন, মৌমাছি অনেক রকম ফুল হইতে মধু সংগ্রহ করে; এই আমরা জানি। বঙ্গদেশীয়গণ বোধ হয় অধিক সৌভাগ্যসম্পন্ন, কাজেই তাঁহাদের ভাগ্যই বোধ হয় একমাত্র পদ্ম হইতে মধু সংগ্রহ করে। শিবনাথ শাস্ত্রী রহস্য করিয়া সংস্কৃত ভাষায় বলিলেন, পদ্মমধু শশশৃঙ্গ তুল্য, ইহার বাচক আছে, বাচ্য নাই। আমরা যে পদ্মমধু সম্বন্ধে কি প্রকার ভ্রান্তধারণা পোষণ করিতেছি, তাহা এখানে আসিয়া বুঝিতে পারিলাম।

অনেক কথাবার্ত্তার পরে রাত্রি প্রায় এগারটায় বাসায় ফিরিলাম। পরদিন সকালে উঠিয়াই আমরা হাউস্-বোটের সন্ধানে যাত্রা করিলাম, কারণ ছারপোকা ও পিস্ত আমা-

দিগকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিতেছিল। অনেকগুলি বোট দেখার পর আমি, মতিরাম ও একজন পাঞ্জাবী ভদ্রলোক, এই তিন জনে মিলিয়া দৈনিক চারি টাকা ভাড়ায় একটি হাউস্-বোট ঠিক করিলাম। হাউস্-বোটেও বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা আছে এবং বাস করিবার পক্ষে খুবই সুবিধা। সন্ধ্যার পরে বোটের ছাদে বসিয়া চন্দ্রিকা-উদ্ভাসিত গিরিমালা ও তাহার তীরস্থিত বৃক্ষরাজির শোভা সত্যই উপভোগ্য। ছোট ছোট নৌকায় এদিকে সেদিকে যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণেরও বিশেষ সুবিধা আছে, স্থানীয় লোকেরা এইগুলিকে 'শিকারা' বলিয়া থাকে। এই জাতীয় ক্ষুদ্র নৌকায় ছিপছিপে কার্পেট বিছান আছে এবং তাহার উপরে দুই তিন জনের আরামে বসিবার উপযুক্ত গদি আছে। বিদেশীয়দিগকে দেখিলেই নৌকার মাঝি ও বালালগণ 'শেঠ সাহেব, আইয়ে, শিকারা চাহিয়ে' এই বলিয়া বিরক্ত করিতে আরম্ভ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে 'শেঠ সাহেব, কশ্মীরমে আয়ে হ্যাঁয়—গানা ঔর নাচ্‌কী মজলিশ পর চলিয়ে, অ্যায়সা চীজ আপর ন দেখ্‌কে তব কহুগে কোয়া আয়ে হ্যাঁয়, দশ পনরহ রুপেয়া দীজিয়ে, বহুত্ অচ্ছা চীজ মিলেগা' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা প্রলোভিত করিতে থাকে। এখানে যে আসে সেই শেঠ সাহেব। কার্পেট ও শালওয়ালারা প্রথমেই শেঠ সাহেবদের নিকট জিনিষের মূল্য দ্বিগুণের বেশী চাহিয়া বসে, তারপরে দর-কষাকষির পরে, যেখানে যাইয়া ঠেকে, সেখানে বিক্রয় করিতে থাকে।

পরদিন আমরা শ্রীনগর হইতে বিশ-পঁচিশ মাইল দূরে ক্ষীরভবানীর মন্দির দর্শনার্থে যাত্রা করিলাম। মন্দিরের ভিতর কারুকার্য্য-সমন্বিত কোনও বিগ্রহ নাই। একখানি প্রস্তরখণ্ড, ইহাই ভবানীর মূর্ত্তি বলিয়া প্রসিদ্ধ। দেবীকে ক্ষীরের ভোগ দিতে হয়। নিকটে একটি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। যাত্রীদিগের ভিতরে কেহ কেহ একত্রে চাউল, ডাইল বাঁধিয়া দিয়া সিদ্ধ করিয়া লইল। ফিরিবার পথে নাসিমবাগে নামিলাম। এখানে ফুল ছাড়া আঙ্গুর, অ্যাপেল, বাউগোসা, আলুবোখরা প্রভৃতি নানাবিধ ফলের বাগানও আছে। বাগানের মালীকে সামান্য কিছু দক্ষিণা দিয়া আমরা ফলের সৎকার করিতে বিন্দুমাত্রও ত্রুটি করিলাম না। নিশাৎবাগ ও শালিমার প্রভৃতির কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ইহা ছাড়া 'গুলমার্গ' 'উলার লেক্' (পদ্মফুলের আকর) 'লোলাব ভেলি', 'ফিরোজপুর নালা' প্রভৃতি দর্শনীয় স্থানসমূহের মধ্যে অন্যতম।

দেখিতে দেখিতে কাশ্মীরে কয়েকদিন কাটিয়া গেল। শ্রীনগরের সঙ্কীর্ণ রাস্তা ও অপরিষ্কৃত বস্তি বাহিরের লোকের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে বলিয়া মনে হইল না, তবে ইহার চারিপার্শ্বের প্রাকৃতিক দৃশ্য বড়ই উপভোগ্য। আমি দিনের বেলায় শহরের বাহিরে দর্শনীয় স্থানসমূহ দেখিতে বড়ই আনন্দ পাইতাম, কিন্তু রাত্রিতে বাসায় ফিরিলেই মনে হইত, কবে এই স্থান ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে সমর্থ হইব; কারণ আহারের কষ্ট আর কিছুতেই সহ্য হইতেছিল না। যাঁহারা অতিরিক্ত মাশুল সাহেব তাঁহাদের কোনও অসুবিধা নাই। হাউস্ বোটেই মুসলমান বাবুর্চ্চি মোরগের মাংস প্রস্তুত করিয়া দেয়; কিন্তু সনাতনপন্থীদের ভয়ানক অসুবিধা। আমি ও মতিরাম দিনের বেলায় এখানে সেখানে খাইয়া আসিতাম এবং রাত্রি বেলায় প্রায়ই ফল খাইয়া কাটাইতাম। কিন্তু ফল খাইয়া আর কয়দিন কাটান যায়! বাধ্য হইয়া এখন দেশের দিকে প্রস্থান করিতে সচেষ্ট হইলাম। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী ও অধ্যাপক অমলের জন্য আমাকে পুনর্ব্বার সপরিবারে আসিবার জন্য বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন এবং যাহাতে হিন্দুয়ানি অক্ষুণ্ণ থাকে, সেই জন্য তাঁহাদের বাড়ীতেই নিজ কোঠা ছাড়িয়া দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। আমি তাঁহাদের আন্তরিক ভালবাসা কখনই ভুলিতে পারিব না।

বন্ধুদের নিকট বিদায় লইয়া ১০ই সেপ্টেম্বর বেলা দশটায় জম্মুর পথে স্বদেশাভিমুখে বাসে যাত্রা করিলাম, প্রায় বাট মাইল অগ্রসর হওয়ার পর পাহাড়ের গায়ে রাশীকৃত রং-বেরঙের ফুলের দৃশ্য দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। ফুলের দৃশ্য শেষ হইবার পরেই মাইলের পর মাইল সিন্দূরে রঙের পাথর। আমরা পাহাড়ের গা ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্রমশঃ উপরে উঠিতেছি। আকাশ যেন অধিকতর নীল বলিয়া মনে হইতে লাগিল। দুপাশে এদের রঙের ছোট ছোট ফুল পথিকদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য যেন সচেষ্ট হইয়া রহিয়াছে। সন্ সন্ বাতাসের শব্দ, হাওয়া স্নিগ্ধ—মনে হইতেছে, মেঘ যেন আমাদিগকে ডাকিয়া লইতেছে। দূরে পাহাড়ের গায়ে রৌদ্র ও মেঘের খেলা বড়ই চিত্তাকর্ষক। এখানকার পথের দুপাশের গাছগুলিরও একটা বৈশিষ্ট্য আছে, এ গুলির গঠন দেখিলে মনে হয়, উহারা যেন প্রাকৃতিক নিয়মে পুষ্ট ও রক্ষিত নহে। কোনও কৌশলী ব্যক্তির চেষ্টায় যেন উহারা রক্ষিত হইয়াছে। দেখিলে

মনে হয়, যেন গাছগুলি একই ইউনিফর্ম পরিহিত সৈন্যশ্রেণীর ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে। প্রকৃতির এই প্রকার কৃত্রিম পোষাক পরিধান প্রণিধানযোগ্য। বেলা চারিটা বাজিয়াছে, আমরা 'বানিহাল' পৌঁছিয়াছি। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর গাড়ী ছাড়িল। রাওয়ালপিণ্ডির পথে যিনি আমাদের সাথী ছিল। এবার তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। যিনির তুলনায় তাহার গর্জন অনেক বেশী। সন্ধ্যা সাতটায় 'কুদ্' আসিয়া পৌঁছিলাম, এখানে রাত্রি যাপন করিতে হইবে। খাওয়ার বিশেষ কিছু মিলিল না। রুটি ও তরকারী পাওয়া যায়, কিন্তু ইহাদের আকৃতি, ও প্রস্তুত-প্রণালী স্বচক্ষে দেখিলে কিছুতেই খাওয়ায় প্রবৃত্তি হইতে পারে না। আট আনা দক্ষিণা দিয়া এক রাত্রির জন্য একখানি খাটিয়া পাওয়া গেল। পাহাড়ের অধিবাসীরা সারা রাত্রি তাহাদের গৃহে আলো জ্বালাইয়া রাখে। গভীর রাত্রে দূরের পাহাড়ের কুটীরগুলিতে যখন মিটমিট করিয়া আলোগুলি জ্বলিতে থাকে, তখন মনে হয়, যেন পাহাড়ের গায়ে অসংখ্য মাণিক জ্বলিতেছে।

ভোরে বাস্ ছাড়িল। আবার পাহাড় ঘুরিয়া ঘুরিয়া উপরের দিকে উঠিতেছি, দূরে পাহাড়ের গায়ে মনে হয় যেন মেঘ লাগিয়া রহিয়াছে। কিছুক্ষণ এই ভাবে চলার পর ক্রমশঃ পাহাড়ের রাজা হইতে সরিয়া পড়িতেছি। সামনে একটা প্রকাণ্ড বটগাছ, বাঙ্গালা দেশের সত্য-শুদ্ধও এখন কিছু কিছু দৃষ্টিগোচর হইতেছে। টির নদীর পুল অতিক্রম করিলাম, জম্মু আর মাত্র সাত মাইল। টির নদীর অনেক ধারা। নদীগর্ভে ও পথের দু'পাশে সাদা এবং কাল রঙের অসংখ্য পাথরের খণ্ড স্তূপীকৃত হইয়া রহিয়াছে। বেলা সাড়ে এগারটা বাজিয়াছে, আমরা জম্মু আসিয়া পৌঁছিয়াছি। এখানে দেড় ঘণ্টা বাস্ অপেক্ষা করে, বাস্ হইতে নামিয়াই রঘুনাথজীর প্রকাণ্ড মন্দির দেখিয়া আসিলাম। সেখানে একজন শাস্ত্রীর সঙ্গে দেখা হইল। তিনি ঐ মন্দিরেই কয়েকজন ছাত্রকে সংস্কৃত পড়ান। সংস্কৃত ভাষায় দুই চারিটী কথা আওড়াইবার পরেই আমার সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠতা জন্মিল। তিনি আমাকে প্রচুর জলযোগে আপ্যায়িত করিলেন। তাড়াতাড়ি আসিয়া বাসে উঠিয়া পড়িলাম। দুইটায় বাস্ ছাড়িল, সাড়ে তিনটায় শিয়ালকোটে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। সহরটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, রাওয়ালপিণ্ডির পথের শহরগুলির ন্যায় নোংরা নয়। আবার মাঠের ভিতর দিয়া চলিতেছি। পাঞ্জাবের সোজা রাস্তা—নাক-বরাবর চলিয়াছে, এই কথা বলিলে মোটেই অত্যুক্তি হইবে না। লাহোরে আসিয়া যখন পৌঁছিয়াছি, তখন সূর্য্য অস্তোন্মুখ।

দীননাথ

—শ্রীঅন্নপূর্ণা দেবী

লতাপাতা-ঘেরা ঘরখানি তার বামুনপাড়ার মাঝে,
দীননাথ সেথা বাস করে একা দীন ভিখারীর সাজে।
বিঘে দশ বারো জমি আছে তার কে বলিবে তারে দেখে,
লোকে বলে বুড়ো কৃপণের ধাড়, কথাও বলে না ডেকে।
সকালে উঠিয়া সেথাকার কেহ দেখে না তাহার মুখ,
কেহ ত শোনে না কোথায় বেদনা, কোনখানে তার দুখ।
ছিল পরিবার পুত্রকন্যা, সাজানো গোছানো ঘর,
শ্মশান-চিতায় হারায়েছে সব, ঘরে গেছে তার কড়।
রামায়ণখানি সম্বল তার সকাল-সাঁঝের সাথী,
সীতা-বনবাসে চোখে জল আসে, হায় রে ব্যথার ব্যথী!
একদিন বুড়ো ভাবিল মনেতে, কি হবে থাকিয়া ঘরে,
জমিজমাগুলি বেচে ফেলি সব তীর্থের কড়ি তরে।
আট শত টাকা পণেতে বেচিল বারো বিঘা জমি তার,
ত্যাগ করি ভিটে তীর্থের পথে হইল সে আগুসার।
সহসা সে দেখে আগুনের খেলা চাঁড়াল-পাড়াটি ভরি',
ছুটিল বৃদ্ধ ব্যাকুল নয়ন, কাঁপে হিয়া থরথরি।
বহু লোক সেথা হইয়াছে জড়, করিতেছে ছুটাছুটি,
সন্ধ্যা-তারাটি গগনের গায় উঠিয়াছে বুঝি ফুটি।
আগুন লেগেছে মেথোর বিধবা দুখীর জীর্ণ ঘরে,
হায় হায় মাতা সন্তান রাখি গিয়াছে ভিক্ষা তরে!
কে আনিবে শিশু, কে যাইবে ওই আগুনের বুক চিরে—
দীননাথ ধায় না মানি বারণ, আনি দিল শিশুটিরে।
বিধবার হাতে টাকাগুলি দিয়ে গৃহ বাঁধিবারে বলে,
শ্রীহরি স্মরিয়া সবহারা আজি তীর্থের পথে চলে।

বাংলার মাটী

—শ্রীঅপরাজিতা দেবী

৪৫৬

'এই দেশা ছিল মণি! কপালে আমার'।

কয়েকদিন মেজ-বৌয়ের কাছে রাত্রি কাটাইয়া বড়-বৌয়ের একটা পরিবর্ত্তন আসিল। চেহারার উগ্র ব্যাকুল ভাব অনেকটা কম, যেন একটা অন্তর্নিবিষ্ট ভাবে আচ্ছন্ন; ঈষৎ চিন্তাকুল—কিন্তু শান্ত মুখচ্ছবি।

মেজ-বৌ সুখেনকে বলিলেন, 'তুমি কিছু ভেব না, ওর দিকে নজরও রেখ না, আপনার ভাবে থাকতে দাও, আপনি ঠিক হবে—'

'না, আপনার কাছেই রাখুন—আমি আর কিছুই চাইনে, শুধু বড়-বৌকে আগের মতন দেখতে চাই।'

আগের মত! হায়, তাও কি সম্ভব? নবপল্লবযুক্ত লতার মাঝামাঝি ছেদন করিলে আর কি তেমন সতেজ, তেমনি শ্যামলতা থাকে? বাঁচিয়া থাকে বটে, কিন্তু সে জীবন্মৃত হইয়াই।

বড়-বৌ মেজ-বৌয়ের কাছেই থাকে, অন্য কাহারও সহিত বড় কথা বলে না, মেজ-বৌয়ের সঙ্গেও দিনের বেলা বেশী কথাবার্ত্তা কহে না, মেজ-বৌয়ের অবসরও নাই—শত রকম কাজ, শত রকম পরামর্শ, শত রকম উপদেশ লইয়াই তাঁকে দিন কাটাইতে হয়, কিন্তু একটি চোখ বড়-বৌয়ের দিকে থাকে।

কালের মত চিকিৎসক কে আছে? বেলি, মণি, বেলির ছোট ভাই দুইটি, কানু ভানুরা সব সময়ে বড়-বৌয়ের কাছে আসে, তাদের একমাত্র দুঃখ, বড়-মা তাদের সঙ্গে কথা কয় না, চাহিয়াও দেখে না। তবু তারা দিনে দু'একবার আসিবেই। একদিন মেজ-বৌ দেখেন, বড়-বৌ কমলের কাছে চিরুণী চাহিয়া লইয়া, বেলির রুক্ষ অগোছালো চুলগুলিতে তেল দিয়া খোঁপা বাঁধিয়া দিতেছে।

তার পরের দিন সকালে মেজ-বৌ স্নান করিতে যাইবার সময় বড়-বৌকে দেখিতে না পাইয়া একাই স্নান করিতে গেলেন। নির্জ্জন ঘাটে বড়-বৌ একরাশ তামা ও পিতলের পূজার বাসন মাজিতেছে। বাসনগুলির দিকে চাহিলেই বোঝা যায় যে, কত অনাদৃত ও আবর্জ্জনার অবস্থা হইতে এগুলি উদ্ধার করা হইয়াছে, এতই কাদামাটি-মাখা ও কলঙ্ক-ধরা।

মেজ-বৌ বলিলেন, 'বাড়ীতে গেছলি না কি?'

বড়-বৌ উত্তর দিল, 'না, বেলিকে দিয়ে আনালাম, কিন্তু হারিয়ে গেছে অর্দ্ধেক।'

'তা হারাক, আমার কাছে তোলা আছে কিছু কিছু পূজোর বাসন—যা হারিয়েছে, তার থেকে নিস এখন।'

মেজ-বৌ পূজা সারিয়া উঠিলে বড়-বৌ স্নান করিয়া আসিল। মেজ-বৌয়ের পূজার আসনের খানিকটা দূরে নিজের পুরাণো কম্বলের আসনখানি পাতিল, শূন্য ফুলের সাজিটি লইয়া গিয়া কতকগুলি ফুল তুলিয়া আনিল—তার পরে চন্দন ঘসিয়া লইয়া পূজা করিতে বসিল।

মেজ-বৌ রান্নাঘরে গেলেন। ঘণ্টাখানেক পরে আসিয়া দেখেন, বড়-বৌ আসনখানা বাঁ হাতে ও পূজার অন্য সরঞ্জাম সব ডান হাতে লইয়া ঘর হইতে বাহির হইতেছে। মেজ-বৌকে দেখিয়া কহিল, 'খুড়িমা কিছু ফেলে না, সব ভুলে গেছি, মনে হচ্ছে, একবার বাড়ী গিয়ে বসে দেখি, মন সুস্থির হয় কি না।'

মেজ-বৌ বলিল, 'তাই যা, তোর শোবার ঘরে বসিস।'

মাথায় কাপড় একটু টানিয়া দিয়া ধীর চিন্তাচ্ছন্ন গতিতে বড়-বৌ চলিয়া গেল।

দুপুর বেলা খাইবার সময় পিসিমা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বিশুর বৌ কই? দেখছিনে যে?'

'সে বাড়ী গেছে।'

'তা ডাক নি? বেলা কি কম হয়েছে! ডাকতে পাঠাও।'

---

* এই উপন্যাসটির পূর্ব্বাংশ এতদিন 'বন-রমণী' নামে প্রকাশিত হইয়াছিল।—ঃ সঃ

'ডাকব এখন, আপনি বসুন।'

'সে কি হয়? তোমরা অমনি থাকবে? আর আমারই এত গরজ? এক সঙ্গে বসব। কমলকে পাঠাও না।'

'আমি গিয়ে ডেকে আনব, তার একটু দেরী হবে হয় ত। আপনি আর দেরী করবেন না।'

পিসিমার খাওয়া হইলে, মেজ-বৌ ঘর বন্ধ করিয়া শোবার ঘরে আসিলেন। বড়-বৌকে ডাকিতে গেলেন না, একখানা কম্বল পাতিয়া রামায়ণ লইয়া বসিলেন।

আজকাল বেলা একটু বাড়িয়াছে, তিনটার সময়ও বেশ রোদ থাকে, ঠিক দুপুর বেলার মত। দুই ঘরে বিশ্বাস-বাড়ী গেলেন। সামনেই সরলাকে পাইয়া মেজ-বৌ বলিলেন, 'স্বর্ণ কোথা রে?'

সরলা বসিবার আসন দিয়া কাছে বসিয়া বলিল, 'বড়দি সেই ভোরবেলা এল, এসে শোবার ঘর ঝাড়লে, লেপে মুছে রেখে আবার নেয়ে এসে ফুল তুলে নিয়ে গোর ভেজিয়ে পূজোয় বসল। আমাদের এদিককার কাজ মিটতে বারোটা বেজে যায়, দেখেছি বড়দি চলে গেছে। খেয়ে উঠে ঘরে যাবার সময় দেখি, দরজা তেমনি ভেজান, খিল বন্ধ করতে গিয়ে দেখি—আসনের ওপর বড়দি ঘুমিয়ে রয়েছে, আর ডাকি নি। একটু আগেও মেজদি একবার দেখে এল, ঘুমোচ্ছে।'

'আমি একবার দেখে আসি।' মেজ-বৌ উঠিলেন, বিশ্বাসের ঘরের দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে পা দিতে আপনি একটা গভীর নিশ্বাস পড়িল, ঘর জুড়িয়া কি শ্রীহীন শূন্যতা! ঘরের একদিকে ছোটখাট ইষ্ট-দেবতার এক-খানি ছবি ফুল-চন্দনে প্রায় ঢাকা, সাজিতে একটিও ফুল নাই। পূজা-শেষে পূজারিণী ভূমি-শয্যায় শয়ানা, রুক্ষ চুলের রাশি মাটীতে ছড়ান, নিরাভরণ হাতদুখানি বুকের উপর, মুখে একটি দিব্য শান্ত-শ্রী ফুটিয়া রহিয়াছে।

দরজা খোলার মৃদু শব্দটুকুতেই বড়-বৌ চোখ খুলিয়া চাহিল, বলিল, 'মেজ বুড়িনা? এস—'

'বেলা গেল, ওঠ—'

'উঠি বুড়িমা। আমি স্বপ্ন দেখছিলুম তাঁকে; যেন বিছানায় বসে রয়েছেন, বলছেন, অত কেঁদ না তুমি, জল চাইলেন, জল এনে দিলাম, তার পরে যেন মাঠে কাজ করতে বেরিয়ে গেলেন, আর দেখলাম না। ঘুম ভেঙে গেল। উঠতে ইচ্ছে হোল না, চোখ বুজে পড়ে আছি।'

'নির্জ্জলা উপোস গেল আজ তোর, এখন চল।'

'তোমারও উপোস গেল আমার জন্যে, মুখ দেখেই বুঝতে পারছি।'

'তা যাক্, মাঝে মাঝে উপোস ভাল। শরীর ভাল থাকে, আমি ইচ্ছে করেই ডাকি নি তোকে, এখন আয়।'

'এখন আর যাব না, সন্ধ্যা-জপ সেরে একেবারে যাব। তুমি যাও গে।'

মেজ-বৌ হাসিয়া বলিলেন, 'আজ আর অন্ন নয়। সব ওদের ঘরে ধরে দিয়েছি। রাত্তিরে এক গেলাস জল-টল যা হয় কিছু খাওয়া যাবে এখন। তবে আমি যাই, তুই সব সেরে নিয়ে আয়।'

৪৬

'করিয়া গ্রহণ—কোন্ দোষে বিসর্জ্জিলে—'

মেজ-বৌ যে-ঘরে থাকেন, সংসারের প্রধান ভাঁড়ার সেই ঘরেই—পিসিমা বরাবর এই ঘরে থাকিতেন এবং সমস্ত ভাইপো, ভাইঝি, নাতি-নাতনী এই ঘরেই তাঁর কাছে মানুষ হইয়াছে। সন্তোষকে লইয়া এবার তাঁহার ঘর ছাড়িতে হইয়াছে। পশ্চিম-দুয়ারী বড় ঘরটিতে সন্তোষকে লইয়া তিনি থাকেন। সে ঘরে বাক্স, ডেস্ক, আলনারী ইত্যাদি থাকে, সহজে যা ভাঙ্গিয়া যায় না।

মেজ-বৌয়ের পূজা-আহ্নিকের জায়গা দুই জায়গায়। এক এই ঘরের কোণে, আর নিরিবিলি গোয়ার ঘরের এক পাশে। যেখানে যে সময় সুবিধা হয়, সেইখানে বসেন। পূজার জায়গার ত্রিসীমায় কাহারও যাইবার যো নাই, গেলে অমন যে স্নেহশীলা মেজ-বৌ, রাগিয়া আগুন হইয়া যান। সন্তোষের নজর কিন্তু এই ঠাকুরের দিকেই বেশী। ভোগ দিয়া মেজ-বৌ জপে বসেন, জপশেষে চাহিয়া দেখেন, ভোগের রেকাবীশুদ্ধ অদৃশ্য। আর একদিন ফুলের সাজিটি নাই। শেষে একদিন দেখা গেল, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বাঁধান ছবিখানি আসন হইতে চুরি গিয়াছে। পাগলের মত মেজ-বৌ ছুটিলেন, বেল-গাছতলায় দাঁড়াইয়া সন্তোষ

ছবিটি দেখিতেছে; মেজ-বৌকে ছুটিয়া আসিতে দেখিয়া, ছবিটি ছুঁড়িয়া দিয়া সে ছুটিল। ছবির কাঁচ ভাঙ্গিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল। মেজ-বৌ কুড়াইয়া আনিলেন।

এই দিন হইতে মেজ-বৌ ঘরের দিকে সতর্ক নজর রাখেন। দুয়ারে খিল না দিয়া পূজায় বসেন না এবং ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইবার সময় শিকল লাগাইয়া তবে যান।

এই সব দেখিয়া শুনিয়া পিসিমা পশ্চিম-দুয়ারী ঘরে গিয়াছেন। এ ঘর খুব বড়, স্বচ্ছন্দ আয়গা, সন্তোষের প্রিয় খাবারও এই ঘরেই থাকিত, এখন আর সন্তোষ অন্যান্য ঘরে অতখানি উৎপাত করে না।

মেজ-বৌ হাতের কাছে একখানা লাঠি রাখিয়া কাজে বসেন, কাজেই মায়ের কাছে সন্তোষ বড় যায় না। মেয়েদের গায়ে মেজ-বৌ কোনদিন হাত তোলেন না। কিন্তু সন্তোষকে সর্ব্বদা পিটিতেছেন—দারুণ অত্যাচার অসহ্য বোধ হয়। মেজ-বৌ কিন্তু কোন দিন সন্তোষকে একটি চড়-চাপড়ও দেন নাই, অমন যে সুন্দরকান্তি, হাত তুলিতে মায়া হয়; আবার ছেলেটা দুষ্টের শিরোমণি, মারিতে গেলে ছুটিয়া আসিয়া দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়াই কোলের মধ্যে ওয়ে মুখ লুকাইয়া ফেলে, তখন কোন্ পাষাণ না তাকে কোলে তুলিয়া লইবে? যতই গালাগালি কর, ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দাও, গাল টিপিয়া ধর, চুল ধরিয়া টান, বড় বড় সরল চোখ দুটি মেলিয়া অবাক্ হইয়া চাহিয়া দেখে।

পিসিমা সকলের বড়, ছোট ভাই-বোনদের মানুষ করিয়াছেন, তারপরে ভাই-পো, ভাই-ঝি, বোন-পো, বোন-ঝি, তার পরে তাদের ছেলে-মেয়েরা, কিন্তু এমন দুর্গতি কোন দিন তাঁর হয় নাই। এরকম একটি ছেলে কেহ চৌদ্দ পুরুষে দেখে নাই; সকলে এক বাক্যে এই কথাই বলে। পিসিমা প্রাণ ধরিয়া তা স্বীকার করেন না, মনে মনে বোঝেন কি না, কে জানে? কিন্তু মুখে কাহারও কাছে বলিবেন সন্তোষের বিষয়ে, এমন অন্তরঙ্গ তাঁর কেহই নাই। তাঁর চোখে একজনও সন্তোষকে দেখে না, আবার মেজ-বৌই যে সব চেয়ে বেশী বিরক্ত।

বড়-বৌ আজকাল ভোর-বেলা উঠিয়াই বাড়ী যায়, বেলা দোটা দশেকের সময় আসে, তাদের মত মেজ-বৌয়ের সঙ্গে থাকে, কাজের অনেক সাহায্যও করে। দুপুর বেলার পরে আবার বাড়ী যায় এবং রাত্রে শুইবার আগে আসে। মেজ-বৌয়ের সমস্ত কাজ-কর্ম্মের অন্তরালে মনটি যে কোথায় পড়িয়া থাকে, তাহা বড়-বৌ অনেকটা ধরিয়াছে। একদিন রাত্রে সে মেজ-বৌয়ের কাছে তাঁহার জীবনের ইতিহাস জানিতে চাহিল—এতদিন নিজের সীমাহীন দুঃখের মধ্যেই ডুবিয়া ছিল—এবার অপরের দুঃখের ভাগ লইবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছে।

মেজ-বৌয়ের সমবয়সী বৌ গ্রামে অনেক, বড়-বৌ, শশী রায়ের বৌ, মিস্ত্রী-বাড়ীর বৌ, দে-বাড়ীর বড়-বৌ, রায়-বাড়ীর মেজ ও সেজ-বৌ, পুব-পাড়ার আরও অনেক বৌ একই বছরে বিবাহিতা হইয়াছে। রয়ি-বাড়ীর মেজ-বৌ এগারো বছরে বাপের বাড়ী ছাড়িয়া এই ঘরে আসেন। মেজ-রায়ের দ্বিতীয় পক্ষের বৌ,—একে বাপের আদুরে মেয়ে—তায় নিতান্ত বালিকা, শাশুড়ী, বড় যা আর সকলে দিনরাত কোলে কোলে রাখিতেন—তবু মেজ-বৌয়ের কান্না থামে না, কাঁদিয়া কাটিয়া দু চার দিন পরেই বাপের বাড়ী যাইবার পাশ পাইলেন—সর্ব্বাদি-সম্মতরূপে। ইহার দিন কুড়ি পরে মেজ-রায়ের বিবাহ—এই বিবাহ উপলক্ষে আবার আসিতে হইল এবং আসিয়াই দেখিলেন, ঠিক তারই বয়সী আর একটি মেয়ে বাপের ঘর ছাড়িয়া এই ঘরেরই বৌ হইয়া আসিয়াছে এবং সে তাঁহার ছোট যা—দিদি বলিয়া ডাকিবে। তখন আগের বারের মত অত কান্না পাইল না। বৌ-পরিচয়ের দিন বর-বধূ মাঝখানে বসিয়া—প্রণাম ও আশীর্ব্বাদের পালা—তখন গাঢ় বেগুনী রংয়ের রেশমী শাড়ীখানি পরিয়া মেজ-বৌও পূজনীয়াদের দলে ভিড়িয়া, অমন যে দৈত্যের মত চেহারার মেজ-রায়—তাঁহার মাথায় ধানে-দুর্ব্বা দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, আর তাঁর পাশের সেই ক্ষুদ্র মেয়েটিকেও। মেজ-রায় মেজ-বৌয়ের পা ছুঁইয়া প্রণাম করিয়া একটু হাসিলেন—আনন্দে গর্ব্বে এক নিমেষে মেজ-বৌ যেন অনেকখানি উপরে উঠিয়া গেলেন—নূতন গহনাখানি দিয়া বড় যায়ের মতই স্নেহগম্ভীর মুখে মেজ-বৌকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

এ বার আর বাপের বাড়ী যাবার জন্য কান্নাকাটি হইল না। শাশুড়ীর কাছে দুই মায়ের আদর, আবদার, অভিমান, কান্নার আর শেষ নাই। রাত্রে দুই জনে দুই দিকে শুইবেন। দুই জনেই বাল্যে মাতৃহীনা—এমন স্নেহ জীবনেও পান নাই। বধূদের গায়ে-মাথায় কাপড় থাকে না, এলোচুলে ছুটাছুটি করিয়া খেলে—কুলতলায় বিষম ঝগড়া বাধায়। কৃষ্ণ রায়ের বড় মেয়ে মণিও এই দলে, পুতুলমাদের জন্য ঠাকুরমায়ের কাছে মণি বেদখল হইয়া গেল; সে শান্ত মেয়ে, ছায়ার মত পুতুলমাদের সঙ্গে থাকে। মণির মা বড় প্রতাপান্বিতা—সকলে তাঁহাকে ভয় করিত, কিন্তু নূতন বৌয়েরা নয়। তিনি একটু শাসন করিলে মেজ-বৌ অমনি শাশুড়ীর কাছে আসিয়া কাঁদিয়া পড়ে, 'মা বড়দি বকেছে ও ঘরের রান্না খাব না—তুমি রেঁধে দেবে চল।' শাশুড়ী বিখ্যাত সুগৃহিণী, এমন বুদ্ধিশালিনী মহিলা সেকালেও দুর্লভ ছিল। দীর্ঘ দিনের পরিশ্রমের পর বিশাল সংসার বড়-বৌ ও বড় মেয়ের হাতে সঁপিয়া দিয়াছেন। এখন বিশ্রামের সময়। সন্ধ্যা, পূজা ও নাতি-নাতিনী লইয়া দিন কাটান।

এ হেন কালে এ কি উপদ্রব বাধিল। মেজ-বৌ বেশ বুদ্ধিমতী, একবার বুঝাইয়া বলিলে বেশ বোঝে, কিন্তু মেজ-বৌকে লইয়া বাড়ীর একদণ্ড শান্তি নাই। না চুল বাঁধা, না কাপড় পরিবার ছিরি, সারাদিন কেবল নালিশ আর কান্না—মায়ের এক পা কোথাও যাইবার যো নাই, গেলে মেজ-বৌ সঙ্গে যাইবে—মা তার নিজস্ব, কাহাকেও সে ভাগ দিবে না। কৃষ্ণ রায়ের বাড়ীর ভিতরে আসা একেবারেই বন্ধ হইয়া গেল। বিশেষ কারণে আসিতে হইলে আগে ডাক দিতেন, 'মা, আমি আসছি, মেজ-বৌমা কোথায়?' মেজ-বৌ কি বেশে কি অবস্থায় সামনে পড়িবেন তার তো ঠিক নাই, কাজেই সতর্ক হইয়া ও সতর্ক করিয়াই আসিতে হয়। ছেলের সাড়া পাইবামাত্র মা অমনি মেজ-বৌকে সরাইয়া দেন—না হয় আঁচল চাপা দেন।

মেজ-রায় বিদেশে থাকেন—মায়ের অনুরোধে পড়িয়া বিবাহ করিয়াছেন—তার এই আধ-পাগলা নাবালিকা বৌ, বিয়ের পরে দুই বছর বাড়ীতেই আসিলেন না। মার মনে ভয় হইল—ছেলে বিবাগী হইয়া না যায়। এ দিকে মেজ-বৌ এখন সুকুমারী, নব-যৌবনা কিশোরী, কিন্তু স্বভাবটি পূর্ববৎ আছে। মেজ-বৌ এখন ধীর শান্ত হইয়া সংসারের কাজে মন দিয়াছে। মণি বিবাহিত হইয়া শ্বশুর বাড়ী গিয়াছে, একা মেজ-বৌ মনের সাধে মাকে দখল করিয়া পরমানন্দে দিন কাটাইতেছেন।

মাথার দিব্য দিয়া চিঠি লিখিয়া মা মেজ-রায়কে এবার বাড়ীতে আনিলেন। বলিলেন, 'বৌকে নিয়ে যা বাবার।'

মেজ-রায় বলিলেন, 'সে কি মা? ওকে নিয়ে আমি করব কি? আমার এত সময় নেই যে, ঝিনুকে করে দুধ খাওয়াব।'

'নিতেই হবে। লোকে নিন্দে করে, তোর দাদার দোষ দেয়, বলে এমন এক বিচ্ছিরি বৌ এনে দিয়েছে ভাইকে যে ভাই দেশত্যাগী হল। অমন ভাই তার কি এই বৌ, আসবে কেন? সেই দেশেই একটা বিয়ে থা করে সংসার পেতেছে, তাই আসেও না চিঠিও দেয় না।'

মেজ-রায় চকিত হইয়া বলিলেন, 'সে কি মা? দাদার নিন্দে কেন হয়? দাদা ধাড়ী বৌ ভাল বাসেন না, ছোট দেখে বৌ এনে নিজের মত গড়ে নেবেন, এই তাঁর মত। এতো সবাই জানে?'

'জানলে কি হয় বাবা? লোকে নিন্দার সুযোগ পেলে ছাড়বে কেন? সেজ-বৌ ত দিব্যি সংসার করছে, কেমন লক্ষ্মী হয়েছে—ওবেলা তোদের পরিবেশন করলে, তুই কত সুখ্যাত করলি, কেমন চাল-চলন, কেমন লজ্জা।'

'তা মেজ বৌকে তো এসে অবধি দেখছি তোমার আঁচলের তলায় রেখেছ, দিলে না কেন সেজ-বৌয়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশন করতে?'

'ও আমার কপাল—সে করবে পরিবেশন, কারও মাথায় ঝোলের থালা ঢেলে না ফেলে ত বাঁচি। ওবেলা কুলীনদের খেতে আসতে বেলা হল, বড়-বৌ নাইতে গেছে, সেজ-বৌ দুধ জাল দিচ্ছে, আমি নেয়ে এসেছি সবে, তা বললাম, মেজ-বৌ সব বাড়া রয়েছে কমলাদের ঘরে দাও। কাপড় ছেড়ে এসে দেখি, ওমা কি কাণ্ড। অর্দ্ধেক

ভাত পড়েছে থালায়—অর্ধেক মাটীতে, আর দিকে থেকে ডালের গামলা পাড়তে গিয়ে সব ডাল নিজের গায়ে মাথায় ঢেলেছেন। সেই মূর্ত্তি নিয়ে মাছের ঝোল দিতে এসেছেন, কামলারা খাবে কি, মুখ ফিরিয়ে হাসি চাপছে। তাই কি মাথায় ঘোমটা আছে? শেষে আমি হাত থেকে থালা নিই। মেজ-বৌ দুধ এনে দেয়—তবে বাছাদের খাওয়া হয়। আমি এই বয়সে এই সব করব না কি? সারা দিন ওর পেছনে থাকি—তপ-জপ আমার মাথায় উঠেছে।'

'মা বললে ভাল, এই তুমি আমার ঘাড়ে চাপাতে চাও? যা তুমি পারলে না তাই আমি পারব?'

'না না, পারি নি কে বললে? ও আমার মানুষ খুব ভাল। বাপের বাড়ী জেঠির তাড়া খেয়ে মানুষ, কেউ ত কিছু শেখায় নি, কাজেই অমনি পাগলা তৈরী হয়েছে। আমার এখন আর শেখাবার সময় নেই, একটু শান্তিতে দিন কাটাতে চাই। তুই নিয়ে যা, দেখিস দুদিনে ঠিক হয়ে যাবে।'

'আচ্ছা না, বললে যখন তোমার কথা থাক, তবে তুমিও চল।'

'না বাবা, আমার আর টানিস নে, বাড়ী ছেড়ে কোথাও গিয়ে এখন আর শান্তি পাব না।'

'তবে দিদি, কি বড়-বৌ একজন কিছুদিনের জন্যও অন্ততঃ চলুন।'

'না, ও বুদ্ধিও ভাল নয়। তোর একটা কথায় যা কাজ হবে, অন্যের হাজার কথায়ও তা হবে না। শুধু গোলমাল বাড়বে, ছ'মাস নিয়ে গিয়ে দেখ, যদি পোষ না মানে, আমায় ফিরিয়ে দিয়ে যাস, তুই ফেলতে পারবি, মা-মরা মেয়ে আমি ফেলতে পারব না। বাঘ নয় ভালুক নয়, ধর্ম্ম সাক্ষী করে বিয়ে করেছিস, তাকে নিয়ে এত ভয়? তুই মানুষ হলে অমন হত না, ভালবাসায় বনের পশু বশ হয়—আর নিজের বৌ হয় না?'

মার কথায় অভিমানের আভাস, মুখের ভাবে ব্যথার ছায়া; মেজ-রায় বলিলেন, 'আচ্ছা মা নিয়েই যাব। তুমি সব গোছগাছ করে দাও।'

৪৭

'ওরে উপজিল ব্যথা
এ বালীরে করিলা প্রহণ।'

মেজ-বৌয়ের কথায় কথায় কান্না দেখিয়া বিবাহের পরই মেজ-রায় নাম দিয়াছিলেন 'কাঁদুনি'। মেজ-বৌ যখন শুনিল, এবার মেজ-রায়ের সঙ্গে তাহাকে জলপাই-গুড়ি যাইতে হইবে, তার মাথায় বজ্রাঘাত হইল। একেবারে শাশুড়ীর কোলের উপর গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল।

রায়েরা প্রত্যেকেই দীর্ঘ বিশাল দেহশালী, তেমনই শক্তিমান; মেজ-রায় ঘরের শালকাঠের খুঁটি একটানে উপড়াইয়া ফেলিতে পারেন। দশ জন এক দিকে, তিনি একা এক দিকে, তবু হার মানেন না। দুর্দ্দান্ত-প্রকৃতি, ভয়ানক তেজী স্বভাব। মুখের দিকে চাহিয়া কেহ কথা বলিতে সাহস করে না, এখন সেই মানুষ নখ দন্তহীন বৃদ্ধ ব্যাঘ্রের মত। কোন কিছুতে আপত্তি নাই, রাগ নাই। ছেলে-পিলেরা ইচ্ছামত দুরন্তপনা করিয়া বেড়ায়, চেঁচা-মেচি করে। পঁচিশ বছর আগে বাড়ীতে টুঁ শব্দটি হইত কি? অমন যে তেজস্বিনী মা তিনিও এই ছেলেটিকে ভয় করিতেন।

মেজ, সেজ, দুই ভাইয়ের আকৃতিগত সাদৃশ্য খুবই বেশী, মেজ-বৌ বুঝিতে পারিত না: কোন্‌টি কে, আবার দুই জনেরই বাঁ বাহুতে সোনার তাবিজ, কাজেই আরও গোলমাল হয়। এবার মেজ-রায় প্রায় দিন কুড়ি বাড়ীতে রহিলেন, মা যখন তখন মেজ-বৌকে পান-জল দিয়া পাঠাইতেন, বিছানা করা, ঘর গোছান, কাপড় কোঁচান প্রভৃতি মেজ-রায়ের সব কাজই মেজ-বৌকে দিয়া করাইতেন। বড়-বৌ মেজ-বৌকে দিয়া চুল বাঁধান—ভাল কাপড় পরাইতেন, বন্য হরিণীকে পোষ মানাইবে কে? কাপড়খানা ছুঁড়িয়া আলনায় ফেলিয়া পান-জল চৌকাঠের কাছে রাখিয়া বৌ পলাইয়া আসিত। মেজ রায়ের সোনার স্বভাব, যেমন স্নেহশীল, তেমনই সদানন্দ হাসি মুখ—পাড়াশুদ্ধ সব তাঁর অনুগত—বাড়ীর তো কথাই নাই; তবু মেজ-বৌ ভয় পান, তিনি মনে মনে বোঝেন যে, মেজ-রায়ের চোখ সর্ব্বদা তাঁহাকে লক্ষ্য করে এবং চোখোচোখি

হইলেই সে মুখের চেহারা না—মুখ কেমন গম্ভীর হইয়া যায়।

এই পরিবর্ত্তনে ও সব সময়ে মেজ-বৌ চিনাইয়া দিতে দিতে মেজ-বৌ দেখে মেজ-রায়কে চিনিতে পারিলেন। তবে ভয় গেল না। রাত্রে মেজ-বৌ খাওয়া বন্ধ করিয়াছে, কখন লুকাইয়া ঘরের বাতি নিভাইয়া মার বিছানায় ঘুমে অজ্ঞান হইয়া থাকে কেহ টের পায় না, আর চোখে ঘটি ঘটি জল ঢালে, টানিয়া ঘরের মেঝেয় নামাও সে ঘুম ভাঙ্গে না। বড় মা অবশ্য কিছুতেই হাল ছাড়েন না—শেষে কাপড়-চোপড় আঁটিয়া মেজ-বৌকে কোলে তুলিয়া লইয়া যাইতে উদ্যোগ করেন। কিন্তু মা বারণ করেন—বধূর পরিণাম ভাবিতে ভাবিতে নিতান্ত চিন্তা-বিষণ্ণ মনে দুয়ার বন্ধ করিয়া বিছানায় শুইবামাত্র ঘুমে অচেতন বৌ তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বুকে মুখ লুকাইয়া বলে—'আমার ভয় করে মা—আমার ভয় করে কি রকম চোখ করে চেয়ে থাকে মা ও—ঠিক ডাকাতের মতন, ওর কাছে আমি যাব না মা, তোমার কাছে থাকব।'

নিজের ছেলের এই বর্ণনায় মা হাসিবেন কি রাগিবেন ঠিক পান না—অবাধ্য দুরন্ত বৌটির গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে শেষে তাঁহার চোখে জল ভরিয়া উঠে।

যাত্রার আয়োজন হইতে লাগিল। বৌ প্রথম বিদেশে যাইবে, ঘর-সংসারের অনেক জিনিস দরকার—সে সব কতক ফরমাস দিয়া, কতক কিনিয়া, কতক তৈয়ারী করিয়া মা এক বিরাট কাণ্ড-কারখানা করিয়া তুলিলেন। এক হাতে চোখের জল মোছেন, আর হাতে জিনিস-পত্র গোছান। সঙ্গে সঙ্গে একবার ছেলেকে, একবার বৌকে বুঝাইতে থাকেন। দিন যতই আগায়—মার চোখের জল ততই বাড়ে—'আহা, ও না খেয়ে সন্ধ্যাবেলা ঘুমিয়ে পড়ে—কে তুলে খাওয়াবে? ক্ষুধা নেয়ে আসবে—কে মাথার তেলটুকু দিয়ে দেবে? কাঁটা মাছ খেতে পারে না—ভিমটুকু নইলে ওর চলে না—ভাত ভেঙ্গে না দিলে খায় না, তারপর যা কাল পড়ে—খাবেই বা কি?' এই সব খেদোক্তি শুনিতে শুনিতে মেজ-রায় বাড়ীর ভিতর আসা এক রকম ছাড়িয়া দিলেন। বাড়ীশুদ্ধ লোক ঝালাপালা হইল। মেজ-রায় একদিন বলিলেন, 'আচ্ছা মা বৌকে কি বনবাসে পাঠাচ্ছ না কি? এত দুঃখটা তোমার কিসের?'

মা ভীষণ রাগিয়া উঠিলেন, 'আমার কথার ওপর কথা! থাকত তোদের মানুষের আত্মা, বুঝতে পারতিস আমার মন—মা-বাপ-মরা মেয়েকে যে মানুষ করে—সেই জানে দরদ কি?'

মেজ-রায় পলায়ন করিলেন।

মেজ-বৌয়ের আহার-নিদ্রা একেবারে ত্যাগ, কিছুতেই সান্ত্বনা মানে না। যাইবার দিন নিজের হাতে বৌকে চুল বাঁধিয়া সাজাইয়া দিয়া মেজ-রায়কে মা ডাকিয়া পাঠাইলেন, চোখে জল—গম্ভীর মুখ—বলিলেন, 'আমার কাছে স্বীকার কর—কটু কথা বলিবিনে ওকে?'

'তা আবার স্বীকার করব কি মা? উনি যা ইচ্ছে তাই করে বেড়াবেন—কটু কথা বলতে হবে না কি?'

'না—ও যত যা কিছু করুক—যত অবাধ্য যত দুরন্ত হোক্, তুই কিন্তু বলতে পারবিনে, মিষ্টি কথায় বুঝিয়ে বলবি, গাল-মন্দ দিবিনে—কটু কথা বলবিনে—স্বীকার কর্—স্বীকার কর্ আমার কাছে।'

মার চোখ-মুখের ভাব দেখিয়া মেজ-রায়ের মাথা নীচু হইল, আর প্রতিবাদ করিলেন না। মা বলিলেন, 'ধর, এর হাত ধরে বল্, সব দোষ মাপ করবি—'

এক ঘরভরা লোক, বাড়ীর ও পাড়ার। বিদায়ের সময় সকলেই আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহারই মধ্যে মেজ-রায় মেজ-বৌয়ের হাত ধরিয়া স্বীকার করিলেন যে, বধূকে কোন দিন কটু কথা কহিবেন না, তিরস্কার করিবেন না। সব দোষ মার্জ্জনা করিবেন।

পাল্কীর মধ্যে মণির ছোট ভাই খোকাকে দেওয়া হইয়াছিল। খোকার বয়স বছর খানেক, তা ছাড়া ভাগিনেয়, ভাসুর-পোরাও ষ্টেশন পর্য্যন্ত সঙ্গে আসিয়াছিল। মার হুকুমে পাল্কীর দুই দিকের দরজা খোলা ছিল, অনবগুণ্ঠিতা বধূ চোখ মুছিতে মুছিতে ও দুইদিকে চাহিয়া দেখিতে দেখিতে চলিয়াছে।

মেজ-রায় অনেক অনেক আগেই ঘোড়ায় চড়িয়া ষ্টেশনে পৌঁছিয়াছেন। ষ্টেশনে অপরাইণ্ডড়ি-যাত্রী সম্ভ্রীক দু'তিন

জন মিলিয়া গেল। ইহার মধ্যে দুই জনই রায়ের দূর সম্পর্কের কুটুম্ব ও মেজ-রায়ের বিশেষ পরিচিত। সংক্ষেপে মেজ-রায় ব্যাপারটা তাঁহাদিগকে জানাইয়া দিলেন। তাঁহার সরল রহস্যময় কথাবার্ত্তার ধরণ—পরকে আপন করিয়া লইতে একটুও দেরী হয় না। ফলে মেজ-বৌয়ের পাল্কী আসিয়া যখন পৌঁছিল, তখন এই তিনজন যাত্রিণী এমন করিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিলেন, যেন কতকালের চেনা।

দীর্ঘ পথ-যাত্রায় আর কোন কষ্ট হইল না, জলপাই-গুড়িতে পৌঁছিয়া মেজ-রায় নিজের বাসায় সকলকে লইয়া গেলেন। পরদিন সকলে চলিয়া গেলে বাসার ঝিকে সব বলিয়া কহিয়া মেজ-রায় কাজে গেলেন। ফিরিতে অনেক রাত্রি হইল, ঝি বারান্দায় শুইয়া বৌ পাহারা দিতেছে। ঘরে বিছানায় বৌ ঘুমাইয়া আছে।

ঘুম ভাঙ্গিয়া মেজ-বৌ চাহিয়া দেখিলেন, স্বামী তাঁহার চোখে জল দিয়া জাগাইয়া তুলিয়া বসাইয়াছেন। হাত ধরিয়া নামাইয়া আসনে বসাইলেন, নেক্‌ড়েতে খাবার ঢাকা দেওয়া ছিল, মেজ-বৌয়ের সামনে সব সাজাইয়া দিয়া আর একটা থালায় নিজে লইয়া বসিলেন। ঘুমের ঘোরে দিব্য অসঙ্কোচে মেজ-বৌ খাইতে আরম্ভ করিলেন।

খাওয়ার পরে তাড়াতাড়ি মেজ-বৌ বিছানায় যাইতেছে—ডিবা হইতে স্বামী পান দিলেন—বাঁ হাতে কোন মতে পানটি লইয়া মুখে পুরিয়া মেজ-বৌ শুইয়া পড়িলেন, ঘুম তাঁহার অসাধারণ বেশী—ইহার জন্য অহরহ বকুনি খাইতে হইয়াছে—বাপের বাড়ী ও শ্বশুর-বাড়ীতে।

অনেক রাত্রে একবার বুঝি ঘুম ভাঙ্গিয়াছিল, ঘরে আলো জ্বলিতেছে—খুব মৃদু ভাবে। বৈশাখের গরম—সব জানালা খোলা, বাহিরে ভীষণ অন্ধকার, মেজ-রায় মোটেই গরম সহিতে পারেন না, হাত-পাখায় বাতাস দিতেছেন—সে বাতাস যতটা না নিজের লাগিতেছে, ততটা মেজ-বৌকে লাগিতেছে। [ক্রমশঃ

মাতৃ-বিদায়

—শ্রীকনকভূষণ মুখোপাধ্যায়

পূজার বাঁশরী বাজিবার আগে জননী আমার উষ্ঠিত ভোরে,
দেবীর দেউলে প্রণাম সারিয়া বলিত,
"ও বাপ, ওঠ না ওরে—
চারিদিকে শোন্ পাখীর কূজন,
বাথানের দিকে আর না ঘুরে।"
আমি জড়িমায় বলিতাম "নাঃ",
মা কহিত, "ব্যাটা বাদ্‌শা কুঁড়ে!"
বিজয়ার পর জননীর মোর বুজিয়া আসিল চোখের পাতা—
চক্ষের জলের অর্ঘ্য সাজায়ে ভাইদের সাথে কহিনু, "মাতা,
জনম জনম জঠরে তোমার যেন শিশু হয়ে জনম লভি—
আমাদের ভাল সকল মন্দ বিচার না করি নিও মা সবি।"
মমতায় যাঁর নিমেষে ভাঙ্গিয়া ঘুমাইল-মাতা মরণ-ঘুমে—
দুখিনী মায়ের চরণযুগল ভরাছু আমরা শেষের চুমে।
শরতের চাঁদ সেদিন শ্মশানে মোর মুখখানি করিল আলো—
সারা নিখিলের মাধুরী-মেশান যাকে
অপরূপ লাগিল ভালো।
ভরা-জ্যোছনায় রূপময়ী মায় দিলাম তুলিয়া চিতার 'পরে—
চিতার আগুনে ছাই করি শেষ কাঙাল হইয়া ফিরিনু ঘরে।
আজিও ভুবনে গগনে গগনে হাসিয়া ফিরিছে চাঁদের রাতি—
গ্রাম-ঘর আলো সেই পুরাতন,
তবু যেন নিভে প্রাণের বাতি।
কে বুঝিবে আর এই ধরণীতে চাহিবার আগে মনের কথা—
আঁখির ভাষায় ভুলাবে কে আর ছেলের মনের চঞ্চলতা?
বিনে-আশিন বড় দুর্দ্দিন; বেদনা জাগিছে প্রতিটি পলে—
আজীবন ধরি হারানর ব্যথা স্মরণ করিতে নয়ন-জলে।
এপার হইতে হায় গো জননী,
তোমা তরে মোরা কাঁদিয়া ফিরি—
সতীলোকে মাতা মিশিয়াছ বুঝি মোদের পিতৃ-চরণ ঘিরি?
সেথা নন্দন-ফুলের গন্ধে ঘুমাও জননী পতির সনে—
চিরদিন হেথা দুঃখ সয়েছ—সেই ব্যথা আজি কাঁদিছে মনে।

আমাদের দাও সেবারত প্রাণ তোমার মতই পাগল-করা—
সকলের লাগি বাঁচিবার সুখ দাও মা শক্তি আঁধার-হরা।

বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালী

শিক্ষাসংক্রান্ত নানা সমস্যার কথা আজকাল প্রায়ই নানা পত্রিকার পাতায় দেখা যায়। একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, বর্ত্তমানে যে শিক্ষাপ্রণালী আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে অনুসৃত হচ্ছে তা' ত্রুটিবহুল। এই বহু ত্রুটি সম্বন্ধে বহু কথা বলবার আছে, ভাববার আছে। দু'এক কথায় এত বড় সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। শিক্ষাব্রত গ্রহণ করে আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, তা' থেকে দু'একটি সমস্যার অবতারণা করব মাত্র। প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষাদান-কার্য্যে যাঁরা ব্রতী, তাঁদের অনেকেরই মনে এসব সমস্যা জাগে, কিন্তু সমাধান যে ঠিক কোথায়, তার স্থির সন্ধান করতে অনেকেই সক্ষম হন না। আমার সন্ধানই যে সমর্থ, একথা বলার ধৃষ্টতা আমার নেই, তবে যেটুকু মনে হয়েছে, সেটুকু প্রকাশ করলে হয়ত অনেক অন্ধকার কোণে আলোকপাত হবে, এই ভরসাতেই তা' প্রকাশ করতে সাহসী হয়েছি। ত্রুটি ঘটলে সুধীজন মার্জ্জনা করবেন, এ আশা রাখি।

শিক্ষার ব্যর্থতার কথা আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই কথা ওঠে, শিক্ষার উদ্দেশ্য কি? এ প্রশ্নের উত্তরে অনেক মনীষী অনেক কথা বলেছেন, যার হয়তো সবগুলিই সত্যি। আমার মতে, অনেক বিষয়ের মতই এবিষয়েও এক কথায় একটা সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে—To make a person fit for life, to make one an all-round man,—a good citizen. এটা একটু ভরাশা হলেও অনেক পরিমাণে সত্য এবং কার্য্যতঃ এই উদ্দেশ্য সফল করতে পারলে মানুষের সামাজিক জীবনযাত্রা সহজ হয়। কিন্তু শিক্ষার সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য হ'চ্ছে—To broaden one's outlook. শিক্ষার উদার আলোক যদি মনের সকল রকম সঙ্কীর্ণতা দূর করতে পারে, তবে তার চেয়ে মহৎ আর কোনও উদ্দেশ্য হ'তে পারে না। ব্যক্তিগত উদারতাই মানুষের সামাজিক জীবনকে সহজ করে তোলে। মনের প্রসারতা থাকলে, সহজ বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তিও বাড়ে, তাতেই মানুষ প্রতিদিনের জীবনযাত্রার উপযুক্ত হয়।

আজ অনেকেই অনুভব করছেন, এ উদ্দেশ্য আমাদের অনেক ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হচ্ছে। তার কারণ একটা নয়, অনেক। সে সব সমস্যার সমাধান আমার দ্বারা সম্ভব নয়। চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই তার সমাধান চিন্তা করছেন।

স্কুলের শিক্ষা-প্রণালীই আমার আলোচ্য। ম্যাট্রিকুলেশনের বেশী পড়ার সুবিধা অনেকেরই হয়ত হয় না। কিন্তু প্রবেশিকা পরীক্ষা, যেমন একদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারে প্রবেশের ছাড়পত্র দেয়, তেমনই অন্যদিকে যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙিনায় প্রবেশ করবে না, তাদেরও জীবনের রঙ্গমঞ্চে প্রবেশের পথে কিছু সহায়তা করবে, এটুকু আশা মনে রেখে আমাদের শিক্ষাপদ্ধতির সংস্কার প্রয়োজন। এ সূত্রে একটা কথা মনে হয়; জীবনযাত্রার সহায়ক অনেক কিছুই এবং তা' আয়ত্ত করা সময় ও বয়সসাপেক্ষ, সুতরাং প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীকে অনাবশ্যক ভাবে পীড়িত করলেই যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে, এ কথা যেন আমরা মনে না করি। ছাত্রদের বয়সোপযোগী যেটুকু তারা গ্রহণ করতে পারে, সেইটুকুই যদি সুচারুরূপে তাদের শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহলেই ভবিষ্যতে তারা আপন আপন পথে সফল হ'তে পারবে। বিদ্যালয়ে শুধু পোড়াপত্তন হবে, কিন্তু ভিত যদি দৃঢ় হয়, তবেই ইমারৎ হবে শক্ত।

শিক্ষক ও অভিভাবক—এই দুজন ছাত্রের জীবন গড়ে' তুলতে সাহায্য করেন। অভিভাবকের দায়িত্ব অনেক বেশী, কিন্তু শিক্ষকেরও কম নয়। তরুণ মনের ওপর কত সহজে

ছাপ পড়ে, একথা আমাদের অত্যন্ত বেশী করে' মনে রেখে আমাদের ব্যবহার, আমাদের শিক্ষাদান-প্রণালী সব নিয়ন্ত্রিত না করলে ফল যে কি হয়, তা' বলা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এ বিষয়ে আমরা কতটুকু চিন্তা করি? অনেক সময়েই দেখেছি, ছাত্রদের বুদ্ধির প্রতি দোষারোপ করেই আমরা নিশ্চিন্ত হই, কিন্তু ভেবে দেখি না, দোষ আমাদেরই, দায়িত্ব আমাদেরই। একথা আমি বলি না যে, অধিকাংশ শিক্ষকই দায়িত্বজ্ঞানশূন্য; কিন্তু তাঁরা যে ভাবে চিন্তা করে এসেছেন, যে প্রণালীতে কাজ করে এসেছেন, সে ধারারও যে পরিবর্তন প্রয়োজন হ'তে পারে, বা হয় ত তাঁরা ভুল পথে গেছেন, এ কথা তাঁরা স্বীকার করতে চান না। হয়ত আত্মাভিমানে বাধে।

গতানুগতিকতার পথ ছাড়বার সময় এসেছে। পরিষ্কার দিনের আলোয় সব কিছু খুঁটিয়ে দেখতে হবে, তবেই খুঁজে পাওয়া যাবে পথের সন্ধান। বড় সমস্যার কথা বড় করে দেখছি, কিন্তু একটা কথা আমরা ভুলেছি,—একেবারে গোড়ার কথা,—ছোটখাট সমস্যার কথা। ভুলেছি যে, বিন্দু দিয়েই বৃহৎ সাগরের সৃষ্টি।

অভিভাবকদের প্রতি আমার এইটুকু নিবেদন যে, যদি তাঁরা সত্যিই সন্তানদের মঙ্গল চান, তবে অপরের ছিদ্রান্বেষণ-প্রবৃত্তি ছাড়ুন। শিক্ষাদান সম্বন্ধে তাঁদের কিছুমাত্রও অভিজ্ঞতা নেই, তাঁরা যেন অবলীলাক্রমে শিক্ষকের ত্রুটি আবিষ্কার না করেন। বাড়ীতে পুত্রকন্যার অসুখ করলে তাঁরা চিকিৎসক ডাকেন। সকল সময়ে যে সুযোগ্য চিকিৎসক মেলে, তাও নয়, তবু তাঁরই হাতে নিশ্চিন্ত বিশ্বাসের সঙ্গে সন্তানকে আরোগ্য করার ভার দেন। চিকিৎসা-প্রণালী সম্বন্ধে চিকিৎসককে পরামর্শ দিতে যাওয়া বা তাঁর দোষ-ত্রুটি ধরা তাঁরা ধৃষ্টতা ও অনধিকারচর্চ্চা বলেই মনে করেন। কিন্তু পুত্রকন্যার শিশু মনগুলির ভার তাঁরা শিক্ষাব্রতীর হাতে ছাড়তে অনেক সময়েই রাজী হন না। তার কারণ, শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা যে কতটা, তা' তাঁরা জানেন না, স্বীকারও করেন না। ছাত্রের সামনেই তার শিক্ষকের দোষ-ত্রুটি, পাঠন-ক্ষমতা প্রভৃতির আলোচনা করে বা নানা প্রশ্ন ও উক্তি করে, শিক্ষকের প্রতি ছাত্রের মনে যে অবজ্ঞা জাগিয়ে তোলা হয়, এ যে কত ক্ষতিকর তাঁদেরই সন্তানদের পক্ষে, তা' কি তাঁরা বুঝেন? তাঁরা ভুলে যান যে, তাঁদের সন্তানদের সহজ-বুদ্ধি খুব প্রখর। 'তারা কিছু বুঝবে না', এ ধারণা নিতান্ত ভুল। যে সকল অভিভাবকেরা শিক্ষাদানে অভিজ্ঞ, তাঁরা অনেক সময় নিজেদের মনোমত শিক্ষা দিতে চান; তাঁরা সন্তানদের বিদ্যালয়ে না পাঠিয়ে নিজেরাই তাদের শিক্ষার ভার নিতে পারেন। শিক্ষকের প্রতি অবজ্ঞা না জাগিয়েও সন্তানের শিক্ষার প্রতি পিতামাতা বা অভিভাবক সতর্ক দৃষ্টি রাখতে পারেন। 'শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্' এ কথার সত্যতা সকলেই উপলব্ধি করেন। আমাদের ছাত্রেরা আজ এই শ্রদ্ধা হারিয়ে জ্ঞানও হারাতে বসেছে।

তার পর গৃহশিক্ষকের কথা। আজকাল দেখতে পাই, ছাত্রদের মধ্যে বেশীর ভাগেরই গৃহশিক্ষক আছে। অনেক ছাত্রই দু'এক বিষয়ে কম বোঝে, বা পিছিয়ে পড়ে' থাকে, ক্লাসের সঙ্গে চলতে তাদের কষ্ট হয়, সে রকম জায়গায় বাড়ীতে একজনের সাহায্য খুবই প্রয়োজন। গৃহশিক্ষক ছাত্রের দুর্বলতা আবিষ্কার করে' তাকে যদি তার ক্লাসের উপযুক্ত করে দেন বা তা'র সাধারণ জ্ঞান বাড়িয়ে দেন, খুবই ভাল। কিন্তু দেখতে পাই, ক্লাসে শিক্ষক যা' পড়'লেন, ছাত্র তা' মন দিয়ে শুনলই না, কারণ সে জানে, বাড়ীতে "মাষ্টার মশায়" ত' আছেন, ক্লাসের পড়া করিয়ে নেবেন। কোনও বিষয় একবার শুনে মনে রাখবে এত স্মৃতিশক্তি খুব কম ছাত্রেরই আছে। কিন্তু স্কুলের শিক্ষক ত' কলেজের 'লেক্‌চারার' নন, তাঁর কাজ, ছাত্রের সঙ্গে সঙ্গে তাকে সাহায্য করে' তাকে শিখিয়ে দেওয়া। এরকম স্থলে শিক্ষক এক প্রণালীতে শিখিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু গৃহশিক্ষক অন্য রকম শেখালেন,—ফলে শিশু-মনে দ্বন্দ্ব, সংশয়, অশ্রদ্ধা জাগল, শেখা কি হল, বলা নিষ্প্রয়োজন। আর আজকাল অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, গৃহশিক্ষকরা নিজেরাই অশিক্ষিত। কয়েকটি টাকার জন্য তাঁরা তাঁদের সামান্য জ্ঞান নিয়েই শিক্ষাদান করতে যান, পেটের দায়ে। পিতামাতা, অভিভাবক ভাবেন, "ছোট ছেলেমেয়ে কতই বা পড়বে, তাদের জন্য অল্প পড়া-শুনো জানা মাষ্টার হলেই চলবে।" কিন্তু অল্প-জানার চেয়েও ভয়ানক, ভুল-জানা। ছোট মনে যে সেই ভুল ছাপ পড়ছে, গোড়াপত্তন হচ্ছে ভুল দিয়ে, পরে আর সে ভুল সংশোধন অত্যন্ত কঠিন।

অভাবগ্রস্ত অশিক্ষিত লোকদের অবস্থা শোচনীয় সন্দেহ নেই, কিন্তু ভবিষ্যতের অবস্থা কি আরও ভয়াবহ নয়? শিক্ষাধারা এই রকম ভাবে চললে, অদূরভবিষ্যতে কি অবস্থা হবে? অশিক্ষিত যে "হাবলী" সে বিষয়ে কি সন্দেহ আছে? আমার নিজের শিক্ষক-জীবনের অভিজ্ঞতায় এ রকম বহুবার দেখেছি যে, ক্লাসে যা বলে শিখিয়ে দিয়েছি, ছাত্র তার সম্পূর্ণ বিপরীত, শুধু বিপরীত নয়, একেবারে ভুল শিখে এসেছে। প্রশ্ন করে জেনেছি, বাড়ীতে "মাষ্টার মশায়" বলে দিয়েছেন। ছাত্রের খাতায় দেখেছি, বাড়ীর মাষ্টার মশায়রা ছাত্রের ভুল যা সংশোধন করেছেন, সেটাও ভুল। তখন কি করে গৃহ-শিক্ষকের প্রতি ছাত্রের মনে অবজ্ঞা না জাগিয়ে সে ভুল সংশোধন করা যায়? এ রকম অভিজ্ঞতা অনেক শিক্ষকেরই হয়েছে মনে হয়। শিক্ষাব্রত অত্যন্ত দুরূহ, প্রত্যেক শিক্ষকের একথা মনে রাখা উচিত। বিভিন্ন প্রণালী থাকতে পারে, কিন্তু যা শেখাচ্ছি সেটা যে নির্ভুল, অন্ততঃ এ বিষয়ে নিঃসংশয় হওয়া চাই। এই জন্য কিছু সময় আমাদের প্রতিদিন দেওয়া উচিত, যা পড়াতে হবে সে বিষয়ে আরও দু'একখানা বই থেকে তথ্য সংগ্রহ করে পাঠ তৈরী করতে। যদি কোনও সংশয় থাকে, তখনই সে সংশয় দূর করে নিতে হবে, অভিধান বা প্রামাণ্য গ্রন্থ থেকে।

শিক্ষা প্রণালীর ত্রুটীর কথা বলতে গেলে সব আগে মনে আসে, ছাত্রদের না বুঝে মুখস্থ করার প্রবৃত্তি। আজ কত বছর এই প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এসেছি, তাই বলতে পারি যে, এ প্রবৃত্তি কোনও বিষয় পাকা করে শিখবার কত বড় অন্তরায়। সে কথা বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। প্রত্যেক শিক্ষক এ বিষয়ে তাঁদের অভিজ্ঞতা থেকে সাক্ষ্য দেবেন, কত অদ্ভুত ভুলের নমুনা যে পাওয়া যায়, ছাত্রদের খাতা থেকে, তা যাঁরা শিক্ষক তাঁরা জানেন।

কতগুলি জিনিষ আছে, যা মুখস্থ করা প্রয়োজন,—যেমন সংস্কৃত শব্দরূপ, ধাতুরূপ বা সমস্ত ভাষারই শব্দার্থ। স্মৃতি-শক্তির চর্চ্চা ও আবৃত্তির জন্য কবিতা মুখস্থ করার রীতিও প্রয়োজন। কিন্তু পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ইতিহাস, বা ইংরাজি গল্প বা প্রবন্ধ মুখস্থ করা, সম্ভাবনীয় প্রশ্নের উত্তর, essay, substance, explanation প্রভৃতি সব মুখস্থ করার স্মৃতিশক্তির পরীক্ষা হতে পারে, কিন্তু রচনাশক্তির কি অবস্থা হয়, সে কথা কি আমরা কিছুতেই বুঝব না? Keybook-এর কল্যাণে আজ এমন কোনও বই পাঠ্য করা যায় না, যার প্রশ্নোত্তর, ব্যাখ্যা প্রভৃতি ছাত্রেরা মুখস্থ করতে পারবে না। যদিই নীচের ক্লাসের বইয়ের নোট না থাকে, গৃহশিক্ষক আছেন, তাঁরা নিজেরা সব লিখে ছাত্রদের সেগুলি মুখস্থ করিয়ে দেন।

দু'একটা শোচনীয় অভিজ্ঞতার কথা বলি। চতুর্থ শ্রেণীতে রচনা লিখতে দিয়েছিলাম স্বাস্থ্য সম্বন্ধে, ইংরাজিতে। স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান এখন সকল শ্রেণীরই পাঠ্য, স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অনেক কথাই এখনকার ছাত্ররা জানে। রচনা পড়ে দেখলাম, পাকাহাতের রচনা, বড়বড় ইংরাজি কথা দিয়ে ভরা। দু'-একজন শুধু তাদের ইংরাজি-জ্ঞানের সীমা ছাড়িয়ে যায় নি, সেই সব রচনার দুরূহ ইংরাজি কথাগুলির বাংলা অর্থও ছাত্রেরা বলতে পারল না। প্রশ্ন করে জানা গেল, কোনও রচনা তার গৃহশিক্ষকের, কোনওটি বা ছাত্রের দাদার বা অভিভাবকের। এই অভিজ্ঞতা আরও অনেকেরই হয়, আমার নিজেরও এই একবার নয়, বহুবার হয়েছে। বাধ্য হয়ে বাড়ীতে রচনা লিখতে দেওয়া বন্ধ করেছি।

ইতিহাসের প্রশ্ন দিয়েছি, উত্তর বইয়ের পৃষ্ঠা থেকে মুখস্থ লেখা, দু'একটি কথা কোথাও ছেড়ে যাওয়ায় জন্য, কোথাও বা বোধগম্য না হওয়াতে, অদ্ভুত ভুলের সৃষ্টি হয়েছে। বুদ্ধি খাটিয়ে কোনও প্রশ্নের উত্তর লেখা বিরল। সুনির্দ্দিষ্ট উত্তর দেওয়া যখন প্রয়োজন, তখনই সব গোলমাল, কারণ বইয়ের পৃষ্ঠার কোন্ লাইন থেকে আরম্ভ করতে হবে, বুঝতে পারে নি। অনাবশ্যক খুঁটিনাটি বইয়ে যা' আছে, সব মুখস্থ, কিন্তু যেটা ইতিহাসের জ্ঞানের জন্য বিশেষ প্রয়োজন সেইটাই জানা নেই। প্রশ্নের উত্তর হল না, কিন্তু একটা সূত্র ধরে পাতার পর পাতা মুখস্থ লেখা হয়ে গেছে, সে বিষয়ে যা পড়েছে সব। এ রকম আর কত দৃষ্টান্ত দেব!

কেন এমন হচ্ছে? আমাদেরই দোষে নয় কি? আমরা, শিক্ষকরা, ছোটদের শিক্ষার গোড়াপত্তনের সময় যে প্রণালীতে শেখাচ্ছি, তাতে পড়ান হচ্ছে কিন্তু শেখান হচ্ছে না। ছাত্রের মনে ঠিক ধারণা হল কি না, না-জেনেই পরীক্ষা করবার জন্য আমরা ব্যস্ত। পরীক্ষার প্রাধান্য এত

বেশী যে, স্বভাবতঃই ছাত্রদের মনে পরীক্ষার ভয় জাগে, ফলে তারা ভালো মুখস্থ করাই পরীক্ষা পাশের শ্রেষ্ঠ ও সংক্ষিপ্ত উপায় বলে মনে করে। অনেক জিনিষ আমরা বুঝিয়ে যাই আমাদের নিজেদের ধারণা অনুযায়ী; যে গ্রহণ করছে সে ধারণাই গ্রহণ করতে পারল কি না; সেটা পরীক্ষা করার সময় আমাদের হয় না।

New Education বা শিক্ষার নবধারা অনুসারে এখন শিক্ষককে শিক্ষাদানকার্য্য সম্বন্ধে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করতে হচ্ছে। New Education-এর প্রবর্ত্তক যাঁরা—তাঁদের মত অনুসারে, (১) পরীক্ষা যত কম হয় ততই ভাল, (২) যতদূর সম্ভব Dalton Plan অনুসারে শিক্ষা দেওয়া, এবং (৩) Class teaching উঠিয়ে দেওয়া, ভাল'। তবে ক্লাস যদি রাখতেই হয় তবে ক্লাসে ছাত্রসংখ্যা খুব কম থাকবে; পঁচিশজনের বেশী কিছুতেই নয়। আরও যে সব মত বা principles আছে, সেগুলি ছেড়ে দিলেও একটি মূল কথা এই যে, ছাত্রকে নিজে শিখতে দিতে হবে, শিক্ষক তাকে সাহায্য করে যাবেন।

নবশিক্ষা-প্রবর্ত্তকদের মতানুসারে বর্ত্তমান বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষা দেওয়ার অনেক বাধা আছে। প্রথমতঃ, ক্লাসের ছাত্রসংখ্যা। বুদ্ধিমের ছাত্র নিয়ে একটি ক্লাস করলে বিদ্যালয়ের ক্ষতি হয়; বিদ্যালয়ের আর্থিক মঙ্গল দেখতে গেলে ছাত্রসংখ্যাবৃদ্ধি অনিবার্য্য। আমাদের দেশে বিদ্যালয় পরিচালন কতদূর দুরূহ,—এ অভিজ্ঞতা যাঁদের আছে তাঁরাই তা জানেন। সেই জন্য যতদিন পর্য্যন্ত না এ অবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন হচ্ছে, ততদিন ক্লাসের ছাত্রসংখ্যা ইচ্ছানুযায়ী রাখা কঠিন।

অনেক সময়েই দেখা যায়, এক শ্রেণীর 'সিলেবাসে' যে পরিমাণ বিষয় নির্দ্ধারিত থাকে, সেই শ্রেণীতে তা' শেষ করা সম্ভব হয় না। তদূর্দ্ধ শ্রেণীতে নূতন শ্রেণীর 'সিলেবাস' অনুযায়ী পড়তে হয়; সুতরাং, এক শ্রেণীর অসমাপ্ত অংশটুকু আর কখনই সমাপ্ত হয় না; কোনও রকমে কাজ চালান হয়, কিন্তু শিক্ষার ফাঁক থেকে যায়। কোন্ শ্রেণীতে কি পড়া হবে, সেটা স্থির করে রাখা প্রয়োজন বটে, কিন্তু যতটা পড়ান সম্ভব ততটাই 'সিলেবাসে' থাকছে কি না, দেখা দরকার। হয়ত কোনও বছর যতটা পড়ান সম্ভব হয়েছে, অন্য আর এক বছরে তা' হল না। সেই জন্য প্রত্যেক বছর নূতন করে 'সিলেবাস' ঠিক করা উচিত, যে পরিমাণ কাজ আগের বছর হয়েছে—সেই অনুসারে। প্রত্যেক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের নিজ বিদ্যালয়ের প্রয়োজন অনুসারে 'সিলেবাস' পরিবর্ত্তনের স্বাধীনতা থাকা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

এ বিষয়ে আর একটি কথা মনে হয়। যে সকল শিক্ষকেরা শিক্ষাদান-প্রণালী শিখেছেন (যাঁদের trained বলা হয়), তাঁরা সকলেই জানেন lesson বা এক একটি বিষয়ের পাঠ কি রকম ভাবে দেওয়া হয়ে থাকে। সকল সময়ে প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি (details) মেনে না চললেও মোটামুটি যে ভাবে পাঠ দেওয়া উচিত, সেই ভাবে পড়ালে যে প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ্য (course) শেষ করা অসম্ভব, একথা কি তাঁদের মনে হয় না? দেখা যাচ্ছে, শিক্ষাদান প্রণালী ও পাঠ্যের পরিমাণের মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব। অগত্যা, গতানুগতিকভাবে পাঠনকার্য্য চালান ছাড়া উপায় নেই। শিক্ষাব্রতী এরূপ স্থলে কোন্ পন্থা অবলম্বন করবেন? যখন শিক্ষকদের পাঠনের পরিদর্শন হবে, তখন পর্য্যবেক্ষক বলবেন—'গতানুগতিকভাবে পাঠন-কার্য্য চলে, ছাত্রদের আগ্রহ বা ঔৎসুক্য জাগানোর চেষ্টা হয় না,' ইত্যাদি। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় সম্প্রতি ইতিহাস অবশ্যপাঠ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্পূর্ণ—দুই বৎসরে পাঠ্য। শিক্ষাদান-প্রণালী অনুযায়ী রীতিতে পাঠ দিয়ে দু'বৎসরে এই দু'খানি বৃহৎ ইতিহাস গ্রন্থ শেষ করা কি সম্ভব? শিক্ষকগণ লক্ষ্য করে থাকবেন—ইংলণ্ডের ইতিহাস যে রকম ভাবে লেখা, (প্রত্যেকটি পুস্তকে লেখা—প্রবেশিকা পরীক্ষার সিলেবাস অনুযায়ী) তা' আয়ত্ত করা চৌদ্দ পনের বৎসরের বালক-বালিকার পক্ষে দুরূহ। বাংলায় যে ক'খানা ইংলণ্ডের ইতিহাস বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত, সে কখানাই বৃহৎ ও নানা দুরূহ বিষয়ে পূর্ণ; অথচ যতদূর স্মরণ হয়, ইংলণ্ডের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসই বোধ হয় প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীর পাঠ্য।

বর্ত্তমান শিক্ষা সম্বন্ধে সর্ব্ব-প্রধান সমস্যা বোধ হয় পরীক্ষা। বৎসরে একবার পরীক্ষার প্রথা না থাকলে বর্ত্তমানে বিদ্যালয়ের কাজ সুশৃঙ্খলভাবে চালানো কঠিন। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, অনাবশ্যক পরীক্ষার ভারে ছাত্র

জর্জরিত। ছাত্রের শিক্ষা সফল হল কি না—শিক্ষক ইহাই তা' জানতে পারেন, পরীক্ষার সাহায্য না নিয়েও। প্রচলিত পরীক্ষা-প্রথায় যে ঠিক ছাত্রের জ্ঞানের পরিমাণ হয় না, এ বিষয়ে অনেকেই একমত। উপরন্তু, এ রকম পরীক্ষা-প্রথায় অহৈতুকী মুখস্থ করার প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পায়। পরীক্ষার বন্ধন থেকে মুক্তি পেলে ছাত্রের শিক্ষা সরল ও সহজ হয়, শিক্ষকেরও স্বাধীনতা থাকে প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষাদানের। প্রত্যেক শিক্ষকই জানেন, এই পরীক্ষাভীতি বা পরীক্ষাপ্রীতি (?) ছাত্রদের মধ্যে কত প্রবল। যে বিষয় পরীক্ষা হবে না, সে বিষয় জানবার আগ্রহ ছাত্রদের মধ্যে ক্রমশঃই বিরল হচ্ছে।

বিদ্যালয়ের শিক্ষা শুধু পরীক্ষা-পাশের বন্ধনালে পর্যবসিত হচ্ছে। এতে প্রকৃত শিক্ষা যে সুদূরপরাহত, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে কি?

যতদূর সম্ভব, ডাল্টন প্লান (Dalton Plan) অনুসারে শিক্ষা দেওয়ারও উপরোক্ত বাধা আছে। তবে এ বিষয়ে শিক্ষক অনেক পরিমাণে নিজের বিবেচনা অনুসারে চলতে পারেন। অন্ত অনেক principles বা মত অনুসারে চলতে বাধা পেলেও, শিক্ষাদানের মূল সূত্রটি মেনে চলা প্রত্যেক শিক্ষকেরই নিজের হাতে। তাতে অনেক সমালোচনা ও গোলমালের সৃষ্টি হওয়া বিচিত্র নয়—তবুও আমার মনে হয়, প্রত্যেক শিক্ষাব্রতীরই একথা মনে রাখা দরকার, যে রকম করে হোক্ পাঠ্য শেষ করে দিলেই আমাদের কর্তব্য ফুরিয়ে যায় না। যে মহা দায়িত্ব আমাদের উপরে, তার গুরুভার স্বতন্ত্ররূপে বহন করতে যদিই বা সক্ষম না হই, তবুও যেন তা' ধূলায় ফেলে না দিই। কোথায় দোষ, কোথায় ত্রুটি সেটা দেখবার চেষ্টা করতে আত্মাভিমানে যেন না বাধে।

—নারী-শিক্ষাব্রতী

নারীর শিক্ষা ও তাহার প্রয়োজন

বিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে—এই বর্তমান নারী-প্রগতির যুগে নারীর শিক্ষা সম্বন্ধে বহু আলোচনা হইয়া গিয়াছে; কিন্তু তাহার অধিকাংশই বিশেষ এক শিক্ষা-প্রণালীর স্বপক্ষে বা বিপক্ষে আলোচনা, অথবা শিক্ষা মানেই বিশেষ কোন শিক্ষাপ্রণালী—ইহাই ধরিয়া লইয়া আলোচনা। বর্তমান প্রবন্ধে শিক্ষাপ্রণালী-বিষয়ক কোন কথা না বলিয়া নারীর শিক্ষার প্রয়োজন কি ও কতখানি, তৎসম্বন্ধে কথঞ্চিৎ ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

প্রথমতঃ কি নারী, কি পুরুষ, কাহারও সম্বন্ধেই শিক্ষার প্রয়োজন আছে কি না এ প্রশ্ন অবান্তর—অত্যন্ত অজ্ঞতা-সূচক। প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া পরিপূর্ণ ও আদর্শ জীবন যাপনের জন্ত শিক্ষা অপরিহার্য; নির্মল বায়ু ও উজ্জ্বল সূর্যালোকের মতই ইহা মানুষের একান্ত প্রয়োজনীয়। শিক্ষা ব্যতীত মানুষ কখনই সুন্দর ও সহজ জীবন যাপন করিতে পারে না।

বর্তমানে শিক্ষা অত্যন্ত ব্যয়বহুল; নারীর ক্ষেত্রে সেটা আরও বেশী মনে হয় এই জন্ত যে, দেশের আর্থিক দুরবস্থা-নিবন্ধন শিক্ষা বলিতেই অর্থকরী শিক্ষা বোঝানতে লোকের মনে ভালই হউক, আর মন্দই হউক, সাধারণতঃ এই ধারণা আছে যে, পুরুষের শিক্ষার জন্ত যে অর্থ ব্যয় হয়, কালে তাহার প্রতি-দান পাওয়ার আশা থাকে, কিন্তু অধিকাংশ নারীর ক্ষেত্রেই সে প্রশ্ন ওঠে না। নারীর শিক্ষার আরও প্রতিবন্ধক আছে। অধিকাংশ লোকের পক্ষেই স্কুল প্রভৃতি সাধারণ শিক্ষা-প্রতি-ষ্ঠানে পুত্রকন্তাকে শিক্ষিত করা সুবিধাজনক, কিন্তু আমাদের দেশে বহু পরিবারেরই নিকটবর্তী স্কুলেও মেয়েকে একাকী হাঁটিয়া যাইতে দেওয়া নিরাপদ বলিয়া বিবেচিত হয় না, বাস বা অন্ত কোন ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। ইহা একটি অতিরিক্ত খরচ ও শিক্ষার প্রতিবন্ধক, কারণ অনেক জায়গায় এইরূপ কোন ব্যবস্থার অভাবের জন্তই স্কুলে পাঠান বন্ধ থাকে। ইহা ব্যতীত বহু স্থানেই মেয়েদের জন্ত পৃথক্ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানও থাকে না।

উপরোক্ত কথাগুলিতে দেশের অর্থকষ্ট, শিক্ষাপ্রণালীর ব্যয়বাহুল্য ও সামাজিক প্রথার জন্ত নারীর শিক্ষা কিরূপ বাধাপ্রাপ্ত হয় তাহাই বোঝায়, কিন্তু এই সকল কারণের জন্ত যে নারীর শিক্ষার কোন প্রয়োজন নাই, তাহা কখনই বোঝায় না। বাধা আছে বলিয়া একটা জিনিষের প্রয়োজনীয়তা

অস্বীকার করা চলে না, বরং কিরূপে বাধা দূর করিয়া প্রয়োজনকে স্বীকার করিয়া লওয়া চলে, তাহাই চিন্তা করিতে হয়।

স্ত্রীপুরুষনির্ব্বিশেষে প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিবার জন্যই যে শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন, একথা ছাড়িয়া দিলেও ব্যবহারিক জগতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই যে নারীর অশিক্ষা ও অজ্ঞতার দরুণ সমাজের অনেক ক্ষতি হয়, তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও শিশুপালনের জন্য নারীর শিক্ষার যে কত বেশী প্রয়োজন তাহার সীমা নিরূপণ করা যায় না। আমাদের দেশের অধিকাংশ গৃহের গৃহিণীই স্বাস্থ্যের নিয়ম ভাল করিয়া জানেন না। কেবল মুখরোচক সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুতই গৃহিণীর সবচেয়ে বড় কর্ত্তব্য নয়, খাদ্যের গুণাগুণ জানা; শিশু, বালক, যুবক ও বৃদ্ধভেদে আহার্য্যদ্রব্যের বিশেষ করা; আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনের দরুণ কি কি পাওয়া উচিত ও কি কি খাওয়া উচিত নয়; ব্যক্তিবিশেষের বিশেষ ধাতের জন্য কি পথ্য ও অপথ্য, কোন রোগে কি খাওয়া উচিত ও রোগমুক্তির পর আরোগ্যলাভের সময় কোন্ পথ্য স্বাস্থ্যলাভের অনুকূল ইত্যাদি বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞানের একান্ত প্রয়োজন। মোটের উপর গৃহিণীর পদ অতিশয় দায়িত্বপূর্ণ। পরিবারস্থ সকলের শরীর ও মনের তত্ত্বাবধান; সকলের মধ্যে প্রীতি ও ঐক্যের বন্ধন দৃঢ় রাখা; গৃহে একটি শান্তিপূর্ণ আনন্দময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করা এ সকলই গৃহিণীর কর্ত্তব্য। ইহা ব্যতীত মিতব্যয়িতার প্রতি দৃষ্টি রাখা, সুন্দরভাবে ও সুরুচির সহিত গৃহের পরিপাটী বিধান, অতিথি-অভ্যাগত আত্মীয়-কুটুম্বগণের সম্বর্দ্ধনা এ সকল ত আছেই। এক কথায় গৃহিণীর সকল কর্ত্তব্য সম্যক্‌ভাবে পালন করিতে গেলে সহৃদয়তা, সহানুভূতি, তীক্ষ্ণদৃষ্টি, বিচারশক্তি, ধৈর্য্য, বিনয় ইত্যাদি বহু গুণের একান্ত আবশ্যক হয়; বিনা শিক্ষায় কি সে সকলের সম্যক্ বিকাশ সম্ভব? আমি বলিতেছি না যে, শিক্ষিতা নারী মাত্রেই উপরোক্ত বিষয়গুলি জানেন বা তাঁহাদের মধ্যে এই সকল গুণ বর্ত্তমান। সে হয় ত শিক্ষাপ্রণালীর দোষ—বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীতে এসব শিক্ষা দেওয়া হয় না। আমার বক্তব্য এই যে, না জানিলেও অশিক্ষিতা নারী অপেক্ষা শিক্ষিতা নারীর এই সকল বিষয়ে বেশী কৌতূহল হইবার সম্ভাবনা এবং সে কৌতূহল অন্য-নিরপেক্ষ হইয়া চরিতার্থ করিবার সুযোগও অনেক বেশী।

শিশুপালন বিষয়েও যথেষ্ট অজ্ঞতা দেখিতে পাওয়া যায়। শিশুর আহারাদি বিষয়ে বিশেষ কোন নিয়ম পালন করা হয় না; স্বাস্থ্য বিষয়েও বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হয় না। তার পর একটু বড় হইলে তাহার বর্দ্ধমান কৌতূহলী মনের দিকে কোন দৃষ্টি ত দেওয়া হয়ই না; বরং তাহার অবিরাম প্রশ্নজালে বিরক্ত হইয়া তাহার কৌতূহল ও বিস্ময়-প্রবৃত্তি, যাহা শিক্ষা ও জ্ঞান-লাভের পক্ষে অপরিহার্য্য, তাহার মূলে রূঢ় আঘাত করা হয়, অথবা ভূতের ভয় দেখাইয়া তাহাদের মন ভীরু, পঙ্গু করিয়া দেওয়া হয়। মিথ্যা কথায় ভুলাইয়া মিথ্যা শেখান হয়। আমাদের দেশের মেয়েদের আর একটা বড় দোষ, অন্য কাহারও উপর রাগ হইলে সে রাগের ঝাল ঝাড়েন তাঁহারা আপন সন্তানের উপর। ইহা যে কতদূর খারাপ, কিরূপ অন্যায়, শিশুর সুকুমার মনের পক্ষে কি ভীষণ ক্ষতিকর, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। নিজের মন ভাল থাকিলে ত শিশু দোষ করিলেও শাস্তি পাইল না, কিন্তু নিজের মন খারাপ থাকিলে ত শিশু বিনাদোষেও শাস্তি পাইল—এরূপ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। শিশুমনে ইহার ফল বিষময়। প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিতা মাতা শিশুপালন সম্বন্ধে বিশেষভাবে শিক্ষা না পাইলেও এ সকল দোষ হইতে মুক্ত থাকেন।

সাধারণতঃ মেয়েদের সম্বন্ধে একটী অনুযোগ শোনা যায় যে, তাঁহারা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণচিত্ত। প্রায় সকলেই একথা বলেন কিন্তু ভাবিয়া দেখেন না যে, কোমলতা, স্নেহপ্রবণতা, সহৃদয়তা প্রভৃতি নারীর তথাকথিত বিশেষ গুণগুলির সহিত এই কথাগুলি কতকটা বিরুদ্ধ হইয়া দাঁড়ায়। সঙ্কীর্ণতা বা উদারতা কিছুই নারীর বা পুরুষের প্রকৃতিগত বিশেষ দোষগুণ নহে। উহা খানিকটা ব্যক্তিগত স্বভাব এবং বহুলপরিমাণে পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। নারীর ক্ষেত্রে সঙ্কীর্ণতা অধিক পরিমাণে দেখা যায়, কারণ, তাঁহারা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকেন। সংসারের প্রাত্যহিক দীনতা ও হীনতার মধ্যেই যাঁহাদের জীবন অতিবাহিত হয়—তাহার বাহিরে যাঁহাদের দৃষ্টি যাইবার কোন পথ নাই, তাঁহাদের মনোবৃত্তি সঙ্কীর্ণ না হইয়া কি হইবে? যাঁহারা সঙ্কীর্ণভাবে কেবল নারীর বিশেষ দোষ ভাবেন, তাঁহারা একবার পল্লীগ্রামে কর্ম্মহীন, অলস পুরুষবৃন্দের চণ্ডীমণ্ডপের আলাপ-আলোচনা শুনিয়া আসুন—তাহা হইলেই স্পষ্ট প্রতীতি হইবে যে,

সঙ্কীর্ণতা কেবল নারীর ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নহে। উদার আবহাওয়ার মধ্যে থাকিতে না পাইলে ইহা মানবমনে স্বতঃই জন্মলাভ করে। শিক্ষার দ্বারা এই সঙ্কীর্ণতা দূর করা যায়। শিক্ষিতা মেয়েদের অন্য যে দোষই থাক, এই দোষটি যে নাই তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। আমি অবশ্য একথা বলিতেছি না যে, তথাকথিত শিক্ষিতা নারী কিম্বা অন্য সকলেই সঙ্কীর্ণচিত্ত, তাহা মোটেই নহে—অশিক্ষিতা নারীদের মধ্যেও অনেক উদারহৃদয়া মহিলা আছেন—কিন্তু কথা হইতেছে যে, তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে অশিক্ষিতা নহেন—শিক্ষার যাহা সার তাহা তাঁহারা লাভ করিয়াছেন, খোঁজ করিলে জানা যাইবে যে, তাঁহাদের শৈশব ও বাল্য উদার পরিবেশের মধ্যে অতিবাহিত হইয়াছে।

আজকাল শিক্ষিতা মেয়েদের বিরুদ্ধে সাধারণতঃ এই অভিযোগ করা হয় যে, তাহারা বিলাসী, অপব্যয়ী, গৃহবিমুখ ও লঘুপ্রকৃতি। এ রকম মেয়ে একেবারেই নাই তাহা নহে, তবে সমস্ত শিক্ষিতা নারীর তুলনায় তাহাদের সংখ্যা খুবই কম। মনে হয়, সেই অল্পসংখ্যকের জন্য বাকী সকলকেই এক পর্য্যায়ে ফেলা অসঙ্গত ও যুক্তিবিরুদ্ধ। আর সে মেয়েদের ঐরূপ মনোভাবের জন্য শিক্ষা দায়ী নহে। খানিকটা ব্যক্তিগত বিশেষ স্বভাব ও খানিকটা পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীর জন্য তাহাদের ঐরূপ মনোভাব গড়িয়া উঠে, তাহারা শিক্ষার জন্যই যে শিক্ষালাভ করে তাহা নহে, পরন্তু ফ্যাশন হিসাবে অনেকটা করে। ইহারাই সাধারণের সম্মুখে নিজেদের বেশী প্রচার করে বলিয়া সাধারণের মনে শিক্ষিতা নারী বলিতে ইহাদের কথাই জাগে ও বিরুদ্ধভাবের সৃষ্টি করে, কিন্তু প্রকৃত চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিবেন যে, সকল স্থলে, সকল ক্ষেত্রেই এরূপ ব্যতিক্রম থাকিবেই থাকিবে। কিন্তু ব্যতিক্রমের জন্য নিয়মকে নিন্দা করা বা তাহার প্রয়োজন অস্বীকার করা যুক্তিযুক্ত নহে। এখন শিক্ষার প্রচলন হইয়াছে তাই শিক্ষার ভিতর দিয়া তাহাদের বিশেষ মনোভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে; শিক্ষার প্রচলন না থাকিলে অন্যভাবে অন্য দিক্ দিয়া তাহা ফুটিয়া উঠিত।

রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংজ্ঞা নিরূপণ করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, 'কমলালেবুর ভারটা হলো শিক্ষা আর তার থেকে যে দীপ্তি ঠিকরে পড়ে তাই হলো সংস্কৃতি।'—প্রকৃত শিক্ষা যে নারী লাভ করিয়াছেন, তাঁহার সমস্ত কাজের মধ্যে এই দীপ্তি আলোক সম্পাত করিবে। তাঁহার সমস্ত পরিবেশ শ্রী-মাধুর্য্যে মণ্ডিত হইয়া শান্ত ও স্নিগ্ধ কিরণ বিকীর্ণ করিবে। স্বজনের ও বিশ্বজনের প্রকৃত কল্যাণে আপনাকে নিয়োজিত করিয়া তিনি আপনার ও আপনার প্রিয়জনের জীবন সার্থকতায় ও পরিপূর্ণতায় ভরিয়া তুলিতে পারিবেন।

—শ্রীপুষ্পরাণী ঘোষ

গৃহশিক্ষা

গৃহশিক্ষা সম্বন্ধে কিছু বলব। গৃহশিক্ষার ইংরাজী নামকরণ করা যেতে পারে 'Education at Home.' এই হিসাবে প্রথমে দেখা যাক, গৃহশিক্ষা বলতে আমরা কি বুঝি, তারপর দেখব, গৃহ এবং শিক্ষার পৃথক্ কোনও তাৎপর্য্য আছে কি না। সাধারণতঃ আমরা দুটো দিক্ থেকে এর আলোচনা করতে পারি। আমরা, অর্থাৎ বাংলা দেশে আমারই মত মধ্যবিত্ত গৃহস্থ মেয়েদের কথা বলছি—সংসারে বসবাস করতে গেলে এবং সমাজে চলাফেরা করতে গেলে, শিক্ষার প্রয়োজন হয়। তা না হলে এর অভাবে সংসার আমাদের শ্মশান হয়ে ওঠে, সংসারে বাস করা হয়ে ওঠে অসম্ভব। সংসারধর্ম্ম প্রত্যেক নারীকে পালন করতে হয়, কিন্তু সুষ্ঠুভাবে সংসার চালনা করা সকলের ভাগ্যে ঘটে ওঠে না, অনেক সময় অজ্ঞতা ও অশিক্ষা ও কুশিক্ষার দরুণ। সংসারে আমরা বাস করি, কি করলে সংসারে শান্তি থাকে, আনন্দ থাকে এবং যাদের কেন্দ্র করে আমরা সংসার পাতি, তাদের সর্ব্ববিধ সুখ-সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্য বজায় থাকে, সংসারে আপনা থেকে নেমে আসে শান্তির, তৃপ্তির ছায়া, ঘর আমাদের প্রিয়-পরিজনদের আনন্দ-কোলাহলে ভরে ওঠে—এই সমস্ত নির্ভর করে মেয়েদের উপর এবং তাদের শিক্ষার উপর। শিক্ষা অর্থে আমি দুটো জিনিষ মনে করি। প্রথমটা হচ্ছে প্রভাব বা ইংরেজীতে যাকে বলে influence; অর্থাৎ যে সংসারে আমরা বাস করি, সে সংসারের আবহাওয়া অনুযায়ী

আমাদের চরিত্র, স্বভাব ও সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম-পদ্ধতি গড়ে ওঠে। সে জন্য দেখা যায়, আমাদের মানসিক ও ব্যবহারিক সকল কাজের উপর আমাদের পিতামাতার শিক্ষা-দীক্ষা, সংস্কারের ছাপ বর্ত্তমান থাকে—এ হ'ল শিক্ষার একটা দিক্। আরও একটা দিক্ হ'ল কেতাবী শিক্ষা—অর্থাৎ পুঁথিগত বিদ্যা।

প্রত্যেক মেয়েকে প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে 'মা' হতে হয়, কাউকে আগে কাউকে পরে। 'মা' হওয়ার দায়িত্ব এত বড় যে, ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। সংসারধর্ম্ম প্রতিপালন করা বড় দুরূহ ব্যাপার। রাজাকে যেমন সর্ব্বদা চিন্তা করতে হয় যে, কি করলে দেশের উন্নতি হবে, কি করলে প্রজারা সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকতে পারবে—কি করলে বহিঃশত্রুর আক্রমণ হতে রাজ্য ও তার অধিবাসীদের রক্ষা করা যাবে—এমনি বিভিন্ন চিন্তায় রাজাকে বিব্রত ও চিন্তিত থাকতে হয়—তেমনি মেয়েদের ভাবতে হয়, সংসারের নানাবিধ উন্নতির কথা—কি করলে ছেলে-মেয়েরা ভাল থাকবে, সুখে ও আনন্দে থাকবে, কি ভাবে চললে প্রিয়-পরিজনদের কর্ম্মক্লান্ত জীবনে আনন্দ-রেখা দেখতে পাবে—কি করলে সংসারের সাশ্রয় হবে, সংসারের অপচয় কম ঘটবে, ভদ্রতা রক্ষা হবে, কৌলীন্য ও সম্মান বজায় থাকবে—এমনি বিভিন্ন ভাবে সংসারকে আনন্দে রাখার ও তার যাত্রাপথ সরল ও সুন্দর করে তোলার অন্যতম উদ্দেশ্য হ'ল গৃহশিক্ষা। পুরুষ হ'ল বাইরের জগতের জীব—পৃথিবীর কর্ম্মব্যস্ততার ভিতর সে আপনাকে ব্যাপৃত রাখে, আর নারী তার সংসারের রথচক্র সবল রেখে, সুন্দরভাবে চালিয়ে তার প্রত্যেক কাজে অনুপ্রেরণা দান করে, তার কর্ম্মক্লান্ত জীবনে আনে উৎসাহের বাণী, আনন্দের গান। অন্তর্জগতে অর্থাৎ সংসারে স্থান হল নারীর—আর বহির্জগতে, উদার উন্মুক্ত কর্ম্মক্ষেত্রে—বাস্তব কর্ম্মক্ষেত্রে স্থান হল পুরুষের। উভয়ে উভয়ের সহযোগিতায় ও সহানুভূতির বিনিময়ে সংসারকে ও আপনাদের জীবনকে আনন্দমুখর করে তোলে।

যে আবহাওয়ার ভিতর আমরা ছোটবেলা থেকে মানুষ, যে শিক্ষা আমরা মার নিকট হতে পাই—আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনে অন্য সমস্ত শিক্ষার চেয়ে পিতামাতার সেই শিক্ষা ও সংসারের আবহাওয়া গভীরভাবে রেখাপাত করে এবং সংসারযাত্রা বিষয়ে আমাদের ভবিষ্যৎ কর্ম্ম-পদ্ধতির গতিপথ নির্দ্ধারিত করে দেয়। বাহিরের শিক্ষা অর্থাৎ পুঁথিগত শিক্ষার প্রভাবকে সংসারের আবহাওয়ারূপ শিক্ষার ঠিক পরেই স্থান দেওয়া যেতে পারে।

গৃহশিক্ষার ভিতর আমি প্রাধান্য দেব—মনের ও দেহের সুস্থতার উপর। কেন না দেহ অসুস্থ হলে মন আমাদের ভেঙ্গে পড়ে এবং যে গৃহে আমরা আমাদের ঘর-সংসার পাতি—সে গৃহকে এবং গৃহীকে আমরা বিপর্য্যস্ত করে ফেলি—যদি আমাদের দেহ অসুস্থ থাকে। আরও একটা জিনিষ বিশেষভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, সৌন্দর্য্য ও শ্রী দেহের সুস্থতার উপর নির্ভর করে খুব বেশী—দেহের সুস্থতাই সৌন্দর্য্য ও শ্রী রক্ষার প্রধান ও প্রত্যক্ষ ভিত্তি—প্রসাধনের জিনিষগুলো পরোক্ষ এবং নিত্য অভাবগ্রস্ত সংসারে প্রসাধনের ব্যয়ভার বহন করাও সম্ভবপর হয় না। আমার এজন্য সত্যই দুঃখ হয়, যখন দেখি, বাংলা দেশের মেয়েদের সুদৃষ্টি এদিকে থাকে না। এজন্য দোষারোপ করতে গেলে পিতামাতা বা অভিভাবককে বেশী করে দোষ দেওয়া চলে। কেন না, যতদিন না মেয়ের বিবাহ হয়, ততদিন পিতামাতার দৃষ্টি মেয়ের উপর থাকে, তার দেহের সুস্থতার উপর থাকে। কিন্তু সে গুরু কর্ত্তব্যকর্ম্ম যখন শেষ হয়ে যায়, অভিভাবকবর্গের স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ে, আর মেয়েটীর তখন নিজের উপর, নিজের দেহের উপর মমতা কমে আসে। 'কি হবে ছাই এ দেহ নিয়ে' এই ভাবটা ফুটে ওঠে। অর্থাৎ বিবাহের জন্যই যেন দেহটীকে এতদিন সচল অবস্থায় রাখা হয়েছিল, এখন দেহ অচল হয়ে এলে আর ভাববার কিই বা আছে, কারণ বিয়ে তো হয়ে গেছে। এ রকম মনোবৃত্তি আমি বাস্তব ক্ষেত্রে অনেক জায়গায় অনেকেরই দেখেছি। এ মনোবৃত্তিটাকে দূর করতে হবে—এই হবে গৃহশিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য। আমরা শুধু নিজের উপর অবিচার করি না—আমাদের ভিতর দিয়ে যারা এ সংসারে আসে তাদের রুগ্ন ও ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য আমরা দায়ী—কিন্তু তা বিচার করবার মত বিশ্ব-সংসারে কেউ নেই। যে-সংসার, যে সমাজ, যে-রাষ্ট্রকে আমরা সুস্থ, সবল, সুন্দর, প্রাণ-চঞ্চল গতিবিধি দেব—তার অগ্রগতির পথে এনে দিই আমরা রুগ্ন, ভগ্ন-স্বাস্থ্য ভবিষ্যৎ

বংশধর—সংসারে, সমাজে ও রাষ্ট্রের কাছে তারা হয়ে রইল অকাজের, অভ্যুত্তরতের মত আগাছা হয়ে। এ জন্য দায়ী কে? দোষ কার?

সংসারে ও সমাজে শান্তি, আনন্দ ও তৃপ্তি আনতে গেলে সাধারণভাবে মোটামুটি রকমে স্বাস্থ্যবিধির কতকগুলো নিয়ম-কানুন জানা দরকার এবং সেগুলো যাতে দৈনন্দিন জীবনের মাঝে কাজের ভিতর আসতে পারে, তাও দেখা দরকার। এই হবে গৃহশিক্ষার মূল ভিত্তি—এই ত আমার মনে হয়। তারপর শিশু-পালন, রোগ-পরিচর্যা—যাকে বলে nursing এগুলো এর অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

তারপর সৌন্দর্য্য-বোধের প্রতি একটা সাধারণ অনুরাগ আনা দরকার। মনের ভিতর, কাজের ভিতর একটা সামঞ্জস্য-বোধ জাগান দরকার। অভাবগ্রস্ত সংসার জানি, কিন্তু তা বলে বিশ্রী ভাবে বাস করতে হবে, এর কোন অর্থ হয় না। সংসারে খুঁটীনাটী জিনিষপত্রগুলো যথা স্থানে গুছিয়ে, মেজে ধুয়ে, ঝেড়ে-মুছে রাখতে হয়—তা হলে অল্পপরিসর স্থান হলেও ঘরের ভিতর বা বাড়ীর ভিতর কেমন একটা কমনীয় ভাবে ফুটে উঠে। আমি অনেকের রান্নাঘর দেখেছি—নরক বিশেষ—নোংরা, অপরিষ্কার, ধূলি-মলিন, ঝুলে ভরা—অথচ এখান থেকেই আমাদের আহার্য্য দ্রব্য তৈরী হচ্ছে এবং স্বচ্ছন্দে, নির্বিচারে আমরা সেই আহার্য্য উদরস্থ করছি। আমি একটা ছবি দেখেছি—বড় চমৎকার ছবি, কিন্তু সেটা ক্যানভাসের উপর তুলির নয়, সেটা হল মেয়েদের হাতে তৈরী করা অতি সাধারণ একটা ঘর। কি নিখুঁত আর কি পরিষ্কার। ঝকঝকে-তকতকে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, অতি সস্তা ও অতি সাধারণ জিনিষে ঘর ভরা, কিন্তু সেগুলোকে যথাযথভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখার দরুণ ঘরের ভিতর কেমন একটা স্নিগ্ধতার আবহাওয়া এনেছে। আবার অনেক অভিজাত সম্প্রদায়ের বাড়ী দেখেছি—অনাবশ্যক ও আবশ্যক জিনিষে ঘর যেন মীর মোকাম হয়ে আছে। পরিচ্ছন্নতার উপর অনুরাগ নির্ভর করে স্বভাবের উপর এবং সেটুকু গঠিত হয় সংসারের আব-হাওয়া অনুযায়ী।

তারপর ধরুন রান্নাবান্নার কথা। এগুলি মেয়েদের পক্ষে জানা অত্যাবশ্যক—তা না হলে সংসার অচল হয়ে পড়বে—দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার নির্ব্বাহ করা কষ্টকর হয়ে উঠবে। মেয়েদের শিক্ষার পাঠ্যতালিকার ভিতর cooking বলে যে জিনিষটির নাম পাওয়া যায়—বাস্তবক্ষেত্রে সংসারের ভিতর সে শিক্ষার কোন সার্থকতা আছে কি না, আমি জানি না। এগুলি হল 'exhibition রান্না', বাস্তবক্ষেত্রে তার কোন স্থান নেই। দু'একটা অভিজ্ঞতার কথা আপনাদের বলি। কোন কলেজের দু'টি মেয়ে, বোন হয় তারা, কলেজে পড়ে, লেখা-পড়ায় বেশ ভাল, কাজকর্মও জানে—একদিন তাদের বাড়ী গিয়ে দেখি, শুকনো পাঁউরুটী আর দুধের সদ্ব্যবহার করছে। কি ব্যাপার? রান্নুন আসে নি! ভাবুন দেখি কি শোচনীয় অবস্থা!

কাজেই সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করার মত অভিজ্ঞতা এ বিষয়ে থাকা দরকার এবং মধ্যবিত্ত গৃহস্থ মেয়েদের অভিজ্ঞতা এ বিষয়ে আছে বলেই আমার বিশ্বাস।

মেয়েদের লিখতে পড়তে জানা দরকার এবং আধুনিক যুগে না শেখাটা হল অসভ্যতা। মেয়েরা যতই লেখাপড়া শিখুন, মেয়েদের বাস্তব কর্ম্মক্ষেত্রে অতি অল্প মেয়েকেই নেমে আসতে হয়, বাকী যাঁরা, তাঁরা চলে যান ঘর-সংসারের বাস্তব কর্ম্মক্ষেত্রে।

মেয়েদের উচ্চ-শিক্ষার বিরোধী আমি মোটেই নই, তবে বর্ত্তমান জগতে শিক্ষিত যুবকদের ভিতর যে মনোভাব ও দুরবস্থা দেখা যাচ্ছে, সেদিক্ দিয়ে দেখলে বলা যায়, মেয়েদের লেখাপড়া শেখান নিরর্থক। কেন না, সেই স্কুল-মাষ্টারী, ইনস্যুরেন্স-এর দালালী প্রভৃতি ভিন্ন তাঁদের জন্য আর কোনও পথ খোলা নেই। তা ছাড়া সে পথগুলি প্রায় ভরে গেছে। আর একটা কথা, উচ্চ-শিক্ষার বেদীমূলে নিজেদের সমস্ত দৈহিক সম্পদটুকু মেয়েরা অর্পণ করে আসেন। মেয়েদের এমন একটা সময় আসে, অন্ততঃ বয়সের দিক্ দিয়ে, যখন সর্ব্বপ্রকার মস্তিষ্কের কাজ থেকে নিজেদের অব্যাহতি দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু সেটুকু না হওয়ার দরুণ পেলী, কীটস, বায়রণ মুখস্থ করতে করতে আমাদের জীবনান্ত ঘটে। আরও একটা কথা, যখন সংসারধর্ম্ম প্রত্যেক মেয়েকে করতে হবে, তখন তার পাথেয় আগে থেকে সংগ্রহ করার প্রয়োজন আছে। কিন্তু আমরা সে কথা ভাবতে সময় পাই না। আমার মনে হয়, লেখাপড়া চলনসই অর্থাৎ

ম্যাট্রিক ক্লাশ অবধি যথেষ্ট। প্রত্যেক দিক্ দিয়ে একটা সীমারেখা থাকা দরকার—ডাল উপলে উঠলে আমরা যেন আতঙ্কে চীৎকার করে না উঠি, সামান্য একটু তেল ছড়িয়ে দিয়ে তার উদ্বেগটুকু কমান যায়—এটুকু বুঝি—সে অভিজ্ঞতা-টুকু আমাদের যেন থাকে—আবার মালিশের ওষুধ না খাইয়ে বসি, এটুকু জানার মতও শিক্ষা থাকা দরকার। নারীর জীবনে, মেয়েদের সমস্ত জীবন ভরে সামঞ্জস্য প্রয়োজন—এর ব্যতিক্রম ঘটলে সংসারে অশান্তি আসে, অভাব আসে, নিরানন্দ আসে, তখন মানুষের বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা থাকে না। নারী-জীবনের সমস্ত সাফল্যের মূল হল সামঞ্জস্য। এই সামঞ্জস্যের মূল ভিত্তি হল গৃহশিক্ষা।

সংসারের অস্বচ্ছলতা প্রভৃতি দূর করার জন্য মেয়েদের আরও কতকগুলি জিনিষ শেখা দরকার? এগুলো জানা থাকলে অনেক সময় মনকে নিয়োজিত রেখে সংসারের এক-ঘেয়ে কাজের ভিতর বৈচিত্র্য আনা যায়—যেমন ধরুন হাতে-বোনা শিল্প। অবশ্য আমাদের, অর্থাৎ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ মেয়েদের সংসারের খুঁটিনাটী কাজে ব্যাপৃত থাকতে হয় বলে অনেক সময় এদিকে দৃষ্টি দেবার অবসর ঘটে উঠে না—তবে অবসর মত এগুলো করা যায়, এ জন্য সামান্য একটু দরদ ও আন্তরিকতা থাকা প্রয়োজন। কেন না, দরদী দৃষ্টি ও আন্তরিকতা থাকলে অবসর মত অল্পে অল্পে এগুলো করা চলে, তাতে করে দৈনন্দিন কাজের ভিতর আসে বৈচিত্র্য ও সংসারে অর্থের দিক্ দিয়ে ঘটে স্বচ্ছলতা। আমাদের দেশের রীতি-নীতি আগে আগে মেয়েদের পঙ্গু করে রেখেছিল অর্থ-নৈতিক দিক্ দিয়ে; অবশ্য সে নীতিবোধের মূলে এখন জাদন ধরেছে। সুতরাং মেয়েরা অবসর মত সংসারের খুঁটিনাটিগুলো শেষ করে ব্যক্তিগতভাবে সংসারে স্বচ্ছলতা আনতে পারে—ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের শার্ট, পেনী, ফ্রক নিজেদের জামা তৈরী করে। তা ছাড়া রুমাল, টেবিল ঢাকা, বালিশের ওয়াড়ে নানাবিধ সূক্ষ্ম সূচীকর্ম্ম করা চলে, এতে দরকার হয় শিল্পী মনের ও একাগ্রতার, নিষ্ঠার। অনেক সংসারে এগুলো বাজারে বিক্রি করে সংসার নির্ব্বাহ হতে আমি দেখেছি। তা ছাড়া পশম দিয়ে সোয়েটার, মাফলার বোনা, দড়ী দিয়ে পাপোষ তৈরী করা, উল দিয়ে ছোট ছোট ব্যাগ তৈরী করা, এতে সময়ের প্রয়োজন হয়, আর প্রয়োজন হয় একাগ্রতার। এসব কাজগুলো বাড়ী থেকে শেখা চলে। এর ভিতর কতকগুলো নিছক প্রয়োজনের তাগিদে জন্মলাভ করে, যেমন ধরুন ছেলেমেয়েদের পেনী, ফ্রকগুলো—আবার কতকগুলো অতি বাস্তব প্রয়োজনে জন্ম নেয় না—যেমন ধরুন উল দিয়ে ব্যাগ তৈরী, সোয়েটার ও মাফলার বোনা, দড়ী দিয়ে পাপোষ তৈরী, কাঁথায়, কাপড়ের জমীতে বা পাড়ে নক্সা ফুল তোলা। নক্সা তোলার রকমফের নির্ভর করে রুচিবোধের উপর। অবসর সময়ে চিত্ত-বিনোদনের জন্য তুলো দিয়ে বিভিন্ন পশুপক্ষী তৈরী করা, মৎস্য লোকের বাণী কাপড়ের উপর রঙীন সুতোর সাহায্যে লেখা, বড় কৈ মাছের মাথার পাথর দিয়ে নানাপ্রকার কাজ, ঝিনুক, কড়ি, মাছের আঁশের কাজ, আরও অনেক কিছু আছে, যে-গুলোর জন্য যথেষ্ট সময় ও অবসর দরকার।

মানুষ যা ভাবে তা হয় না, যা চায় তা পায় না। বিশেষ করে মেয়েদের জীবনে 'খাপ খাইয়ে' নেওয়ার রীতি-টুকু সুপরিস্ফুট হওয়া একান্তভাবে প্রয়োজন, তা না হলে সংসারে শান্তি থাকে না। যার ভিতর এ জিনিষটুকু যত বেশী পরিমাণে আছে, বাস্তব জগতে সাংসারিক দিক্ দিয়ে সে ততখানি সুখী। এই মানিয়ে চলা সর্ব্ব অবস্থার মধ্যবিত্ত গৃহস্থ মেয়েদের বড় প্রয়োজন। সেটুকু সম্যক্ ভাবে নির্ভর করে গৃহশিক্ষার উপর, পিতামাতার উপর। তারপর শোভ-নতা, শালীনতা, ভদ্রতাগুলো অস্বীকার করলে আমাদের গহন অরণ্যে গিয়ে বাস করতে হয়।

মেয়েদের সাংসারিক জগতে বাস করতে গেলে যে অতি সাধারণ জিনিষগুলির প্রয়োজন, সেটুকু গড়ে উঠে সংসারের আবহাওয়ায়, সঙ্গগুণে, পিতামাতা বা অভিভাবকগণের শিক্ষা-দীক্ষায়। সেজন্য আবহাওয়া, শিক্ষা-দীক্ষা অনুযায়ী সব মেয়ের রুচিবোধ এক হয় না, কাযাধারার ভিতর সুসামঞ্জস্য থাকে না—বিভিন্ন রুচি, বিভিন্ন ভাবধারা, বিভিন্ন মত—এই নিয়েই সংসার, এই নিয়েই সমাজ।

—শ্রীইন্দিরা দেবী

সেকালের সমাজ

—শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়

অর্দ্ধ শতাব্দ পূর্ব্বে বাঙ্গালায়, বিশেষতঃ মধ্য এবং পশ্চিম বাঙ্গালী সমাজের যে রূপ ছিল, এখন তাহার সে রূপ আর নাই। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্লাবনে তাহা বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। এখন বাহিরের কাঠামোটা যদিও স্থানে স্থানে বজায় আছে, কিন্তু উহার সে-কালের সে জীবনী-শক্তি আর নাই। অবশ্যই পরিবর্ত্তনের সহিত ব্যবস্থারও পরিবর্ত্তন হইয়াছে, ইহা সত্য, কিন্তু তাহা হইলেও উহার সে পরিবর্ত্তন অত্যন্ত দ্রুত এবং অবাঞ্ছিতভাবেই হইয়াছে। সমাজের যে সংহতি-শক্তি তাহা চলিয়া গিয়াছে। সেই জন্য পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার এবং ভাবের আমদানীই বিশেষ দায়ী। যাঁহারা সে-কালের সমাজ এবং এ-কালের সমাজ দেখিয়াছেন এবং তাহার তুলনা করিতে পারেন, তাঁহারাই তাহা বুঝিবেন।

একটা গ্রাম লইয়াই পল্লী-সমাজ গঠিত হইত না। কতকগুলি গ্রাম লইয়া একটি সমাজ হইত। পূর্ব্বে প্রত্যেক সমাজে একজন করিয়া সমাজপতি থাকিতেন। তিনিই ছিলেন সমাজের নিয়ামক বা পরিচালক। আমি যে সময়ের কথা জানি, সে সময়ে সাধারণ সমাজপতি-দিগের ক্ষমতা হ্রাস হইয়া আসিতেছিল। আমাদের গ্রামে একজন বড় জমিদার ছিলেন। কার্য্যতঃ তিনিই ছিলেন সমাজপতি, কিন্তু নামতঃ সমাজপতি ছিলেন গোবরডাঙ্গার সন্নিহিত ইছাপুর গ্রামের চৌধুরী মহাশয়রা। ইঁহারা ছিলেন বিখ্যাত রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশের বংশধর, সুতরাং গোষ্ঠীপতি। কিন্তু তাঁহাদের আর্থিক অবস্থা ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়াতে সমৃদ্ধিশালী জমিদার মহাশয়ই কার্য্যতঃ সমাজপতিত্ব লাভ করেন। আমি যখনকার কথা জানি, তখন গ্রামের প্রধান জমিদার স্বর্গগত, তাঁহার পুত্রগণ কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীনে বিদ্যাশিক্ষা করিতেছিলেন। সেই জন্য তখন ইছাপুরের চৌধুরী মহাশয়রা সমাজপতি। গোবরডাঙ্গার স্বর্গগত জমিদার সারদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় অত্যন্ত ন্যায়নিষ্ঠ এবং অমায়িক ভদ্রলোক ছিলেন বলিয়া এখনও লোক তাঁহার প্রশংসা করে। শুনিয়াছি, তিনি কাহাকেও অযথা পীড়ন করিতেন না। ইছাপুরের স্বর্গীয় সুরনাথ চৌধুরী মহাশয়ও একজন খুব public spirited লোক ছিলেন। তিনিও সমাজপতি হিসাবে কখনও কাহাকেও বিনা অপরাধে কোনরূপ পীড়ন করেন নাই, বরং লোককে বিপদ আপদে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। সুতরাং সমাজপতির অত্যাচার, যাহা আজকাল মাসিকপত্রের গল্পে ঘোরালভাবে বর্ণনা হয়, তাহা আমরা বাল্যকালে বড় একটা দেখি নাই। আমার মাতুলালয় নদীয়া জেলার অন্তর্গত 'সুবর্ণপুর' ব্রাহ্মণ-প্রধান স্থান ছিল। তথাকার জমিদার রায় মহাশয়ের বেশ সুনাম ছিল। তিনি কোন ব্যক্তির উপর অযথা পীড়ন করিয়াছেন এরূপ কথাও আমরা শুনি নাই। সমাজপতিরা কোথাও একাকী কাহারও কোন অপরাধের শাস্তি দিতেন না। তাঁহারা গ্রামের মতস্থর লোকদিগের পরামর্শ লইয়াই কাজ করিতেন। তবে দুর্ব্বৃত্ত এবং উচ্ছৃঙ্খল লোকের হস্তে ক্ষমতা পড়িলে সর্ব্বত্রই ক্ষমতার অপব্যবহার হয়। সে কালেও তাহা হইত।

এখন জিজ্ঞাস্য, সমাজ বলিতে আমরা কি বুঝি? সমাজ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ, যাহারা এক সঙ্গে গমন করে বা যাহা মানুষকে প্রকৃষ্টরূপে স্থাপিত করে, তাহাই সমাজ (সমাজ=সম—অজ—ঘঞ)। 'অজ্' ধাতুর দুইটি অর্থ, একটি অর্থ, গমন করা, আর একটি অর্থ, স্থাপন করা। সুতরাং ইহার অর্থ দাঁড়ায়, যাহা মানুষকে (সভ্যতার পথে) সমানভাবে গতি করায় বা অগ্রসর করায় তাহাই সমাজ। আবার 'অজ্' ধাতু স্থাপন অর্থে ধরিলে উহার অর্থ হয় যাহা মানুষকে প্রকৃষ্টভাবে স্থাপন করে তাহাই সমাজ। অর্থাৎ যাহাতে থাকিলে মানুষ এরূপভাবে স্থাপিত হয় যে, তাহারা কল্যাণ লাভ করে (বা সভ্য হয়) তাহাই সমাজ। দুইটি অর্থ শেষ সেই একই দাঁড়ায়। সমাজই যে মানুষকে সভ্যতার পথে অগ্রসর করিয়াছে ও করি-

তেছে,—ইহা আজকালকার ইউরোপীয়রাও বলিয়া থাকেন। তবে তাঁহারা সমাজবদ্ধ হইবার বহু পূর্ব্বেই ভারতীয় মনীষীরা একথা বলিয়া গিয়াছেন। সংহতি-শক্তিই সমাজের প্রধান বন্ধন। পূর্ব্বে পল্লী-সমাজে যে বন্ধন ছিল, এখন তাহা এলাইয়া পড়িয়াছে এবং পড়িতেছে। এখন আমাদের পল্লী সমাজে সংহতি-শক্তি নাই, পরস্পর সহযোগিতাও বিরল হইয়া পড়িয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে কতকগুলি যুবক পল্লী-জীবনে সহযোগিতা স্থাপনের চেষ্টা করিতেছে সত্য, তাহাদের সে চেষ্টা প্রশংসনীয় তাহা শতবার স্বীকার্য্য; কিন্তু আমার যেন মনে হয়, উহাতে পূর্ব্বের ন্যায় সে আন্তরিকতা বা স্বাভাবিকতা নাই। আমার যেন মনে হয়, তাঁহারা রঙ্গমঞ্চের অভিনেতার ন্যায় এই কার্য্য করিয়া যান, ইহা তাঁহাদের কার্য্যের দোষ, কি আমার মনের দোষ, তাহা আমি ঠিক বুঝিতে পারি না। তবে, আমি একথা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে, সেকালে এক এক পাড়ার লোক যেন অনেকটা আপনাদিগকে একান্নবর্ত্তী পরিবারভুক্ত বলিয়াই মনে করিতেন। তখন এক এক পল্লীতে প্রায় এক এক গোষ্ঠীর লোক বাস করিত: যথা মুখুজ্যে পাড়া, বাঁড়ুজ্যে পাড়া, সমাদ্দার-পাড়া। পঞ্চাশ বা চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বেও আমরা দেখিতে পাইতাম যে, যদি কোন প্রতিবেশীর বাড়ীতে দ্বিপ্রহরে কোন কুটুম্ব আসিত, তাহা হইলে সমস্ত পাড়ার লোক সেই প্রতিবেশীর গৃহে নিজ নিজ রন্ধনশালা হইতে অন্ন-ব্যঞ্জন লইয়া হাজির হইতেন। জামাতা আসিলে ত' কথাই নাই। তাঁহার অতর্কিত আগমনের কথা গৃহস্থকে জানাইতে হইত না। প্রতিবেশীরা ছেলেমেয়ের মুখে সংবাদ পাইয়াই আপনাদের অবশ্যকর্ত্তব্য বোধেই তাহা করিতেন। তদ্ভিন্ন কুটুম্বকে, বিশেষতঃ আগন্তু জামাইকে ও বৈবাহিককে প্রতিবেশীরা প্রত্যহ নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন। সুতরাং গরীব গৃহস্থের কুটুম্ব প্রভৃতি আসিলে তাহাদের কোন কষ্ট হইত না। কাহারও কঠিন পীড়া হইলে প্রতিবেশীরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আসিয়া পালাক্রমে রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করিতেন। কেহ ডালিম, কেহ আনারস, কেহ শশা, কেহ পেঁপে, কেহ পেয়ারা, কেহ পানিফল প্রভৃতি যিনি যাহা পারিতেন, তিনি তাহাই অযাচিত ভাবে আনিয়া দিতেন। এমন কি অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন গৃহস্থকেও তাহা দিতেন, তিনিও তাহা লইতে কুণ্ঠা বোধ করিতেন না। তখন প্রত্যেক গৃহস্থের অঙ্গনে দুই-একটা ডালিম, পেঁপে প্রভৃতি রোগীর পথ্য-উৎপাদক বৃক্ষ থাকিত। লোকে কথায় কথায় জিনিস কিনিবার জন্য পয়সা হাতে করিয়া বাজারে ছুটিত না। প্রায় সকল গৃহস্থই তাহাদের বাড়ীতে কিছু কিছু তরকারী উৎপন্ন করিত। চাল-কুমড়া, ওলকপি, শশা, কলা, কচু, শিম, বেগুন, বিলাতী কুমড়া, লাউ, ডুমুর প্রভৃতি সমস্ত তরকারীই কাহারও না কাহারও বাড়ীতে জন্মিত। তাহারা তাহা ফ'ড়ে ডাকিয়া বাজারে বিক্রয় করিতে পাঠাইত না। তাহারা ঐ সকল জিনিস পরস্পর আদান প্রদান করিয়া খাইত। ফলে কাহারও বড় একটা পয়সা দিয়া তরকারী কিনিতে হইত না। এখন এ ভাবটার অতি ক্ষীণ অবশেষ কোন কোন সুদূর পল্লীগ্রামে আছে। পশ্চিম-বঙ্গে এ ভাবটা সামান্য কিছু আছে, পূর্ব্ব-বঙ্গে অনেকটা আছে। মধ্য বঙ্গে প্রায় বিলুপ্ত; সর্ব্বত্রই individualism বা ব্যক্তিত্বের অধিষ্ঠানে এই ভাবটা সম্পূর্ণ তলাইয়া যাইতেছে। তখন গোল আলু, বিট্, কপি, শালগম প্রভৃতি অজ্ঞাত ছিল। আমি আমার পিতৃদেবের মুখে শুনিয়াছি, আমাদের এই অঞ্চলে পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ-কায়স্থরা বিলাতী কুমড়া খাইত না। উহাকে 'ঘুচেন কুমড়া' বলিয়া অপাঙ্‌ক্তেয় করিয়া রাখিয়াছিল। এখনও অনেকে চিচিঙ্গা খান না। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বিলাতী কুমড়া ব্রাহ্মণ-ভোজনে দুচির পাতে পাঙ্‌ক্তেয় হইয়াছে, ইহা আমি দেখিয়াছি। তখন লোক ঘরে ঘরে গাভী পুষিত। গ্রাম-প্রান্তে গোচর মাঠ থাকিত। সকালে গাভী-দোহনের পর রাখাল গোরুর পাল লইয়া মাঠে যাইত। কাজেই সাধারণ গৃহস্থের বাড়ীতে ঘৃত-দুগ্ধের অভাব ছিল না। মহিলারা সকালবেলা উঠিয়া ঘোল টান দিয়া মাখন তুলিতেন। তখন খাদ্যে 'ভিটামিন' অভাবে লোকের বেরি-বেরি হইত না। খাঁটি সর্ষপ তৈল আট সের দশ সের টাকায় আমি দেখিয়াছি; ঠাকুরমার মুখে শুনিয়াছি, তৎপূর্ব্বে উহা টাকায় আঠার সের, আর মণ পর্য্যন্ত পাওয়া যাইত। সে প্রায় একশত বৎসরের পূর্ব্বের কথা। আমার খুল্ল-

পিতামহীর মুখে শুনিয়াছি যে, তাঁহাদের বাল্যকালে লোকের পরস্পর সাহায্য করিবার মনোভাব খুব প্রবল ছিল। একপাড়ার লোক সকলেই যেন পরস্পর পরস্পরকে এক পরিবারভুক্ত মনে করিতেন।

আজকাল কোন লোকের পীড়া হইলে তাহার চিকিৎসার জন্য গৃহস্থকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়। সে কালে তাহা হইতে হইত না। আমি যখনকার কথা বলিতেছি, তখন আনাচে কানাচে এত ডাক্তার হয় নাই। মেডিক্যাল কলেজ হইতে উত্তীর্ণ ডাক্তার কোন কোন গণ্ডগ্রামে একজন, কি বড় জোর দুইজন, দেখা যাইত। দূর পল্লী-গ্রামে ত' ছিলই না। তখন কবিরাজদিগের পশার এমন ভাবে বাড়া যায় নাই। কবিরাজ মহাশয়দিগের নিকট চিকিৎসার ব্যয় অতি অল্পই ছিল। ডাক্তারদিগকে যেমন যতবার আনিতে হয় ততবারই 'দর্শনী' দিতে হয়, তাঁহা-দিগকে তাহা দিতে হইত না। কবিরাজ মহাশয় প্রথম রোগী দেখিতে যে দিন আসিতেন, সে দিন তাঁহাকে একটি টাকা দর্শনী দিতে হইত। গরীব লোকের নিকট হইতে তাঁহারা প্রায়ই দর্শনী বা প্রণামী লইতেন না। তাহার পর যতদিন রোগী অসুস্থ থাকিত, ততদিন তিনি প্রত্যহ আসিতেন, রোগী দেখিতেন, ঔষধ দিতেন। ঔষধের মূল্য কিছু কিছু দিতে হইত। সে সপ্তাহান্তে একদিন। শেষে যে দিন রোগী 'আরোগ্য স্নান' করিত, সে দিন কবিরাজ মহাশয়কে একটি টাকা ত' দিতে হইতই,—অধিকন্তু যাঁহারা সম্পন্ন গৃহস্থ, তাঁহারা খুসী হইয়া কবিরাজকে ধুতি-চাদর দিতেন, বড়লোকরা গরদের ধুতি-চাদর এবং শাড়ী দিতেন; একটু অবস্থাপন্ন গৃহস্থরা কবিরাজ মহাশয়কে ধুতি-চাদরের উপর একখানি শাড়ী দিতেও ভুলিতেন না। ইহা ভিন্ন রোগী যে দিন পথ্য পাইত, সে দিনও কেহ কেহ কবিরাজ মহাশয়কে ভালরূপ একটি সিদা বা ভোজ্যদ্রব্য দিত। এটা সকলে দিত না। যে ক্ষেত্রে রোগী আর বাঁচিবে না বলিয়াই শঙ্কা হইয়াছিল, সেই ক্ষেত্রেই কবিরাজকে ভোজ্য দিয়া রোগী ভোজন করিত। গরীব লোকের চিকিৎসায় কবিরাজ প্রায় পাচনেরই ব্যবস্থা করিতেন। পাচনের 'বকাল' পাড়ার সকলেই যোগাড় করিয়া দিত। পাচনের চিকিৎসা ধাতু-ঘটিত ঔষধের চিকিৎসা অপেক্ষা কোন অংশে হীন ছিল না। টাটকা 'বকাল' হইলে উহা সাধারণ রোগ বিতাড়নে বজ্র-শক্তির ন্যায় কাজ করিত। পাচনের চিকিৎসায় ঔষধ খরিদ বাবদ বিশেষ ব্যয়ও ছিল না।

আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময়ে রোগ হইলে কবিরাজকে সংবাদ দিতে হইত। শুনিয়াছি, তৎপূর্ব্বে কবিরাজ মহাশয়রা তাঁহাদের নিজ নিজ পাড়ার মধ্যে প্রাতে ভ্রমণে বাহির হইয়া প্রত্যেক গৃহস্থকে তাঁহার বাটির কুশল জিজ্ঞাসা করিতেন। গরীব লোকদিগের নিকট কবিরাজরা দর্শনী লইতেন না। অনেককে ঔষধও বিনামূল্যে দিতেন। অস্পৃশ্য এবং অন্ত্যজ জাতিকে এবং টোলের ছাত্রদিগকে কবিরাজরা বিনামূল্যে চিকিৎসা করিতেন। সে সময়ে হাকিমী চিকিৎসাও প্রচলিত ছিল। ভাল ভাল হাকিমরাও গরীব লোকদিগকে বিনা মূল্যে চিকিৎসা করিতেন।

ডাক্তাররা তখন ভিজিট ও ঔষধের দাম লইয়া চিকিৎসা করিতেন। ডাক্তারী চিকিৎসা ব্যয়বহুল ছিল। তবে সেই সময় পল্লীগ্রামে ম্যালেরিয়ার বিস্তার হইতে আরম্ভ হয়। ম্যালেরিয়ায় কুইনিন দিয়াই ডাক্তাররা বিশেষ ভাবে পশার জাঁকাইয়া তুলিয়াছিলেন। প্রথম প্রথম ম্যালেরিয়ার আক্রমণে লোক অধিক মরিত, সেই জন্য লোক ডাক্তারদিগের দ্বারা চিকিৎসিত হইতে প্রলুব্ধ হয়। ইহা ভিন্ন ডাক্তাররা প্রায় অস্ত্রোপচারের কার্য্যে বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইতেন। আমাদের গ্রামে জমিদারদিগের একটি দাতব্য চিকিৎসালয় ছিল। একজন বিচক্ষণ ডাক্তারই উহার চিকিৎসক ছিলেন। তাঁহার চিকিৎ-সালয়ে অধিকাংশই অস্ত্রোপচারের রোগীই আসিত। চিকিৎসালয়টি সরকারের পরিদর্শনাধীন ছিল।

তখনকার সমাজের লোক অত্যন্ত অতিথি-সেবাপরায়ণ ছিল। বাড়ীতে অতিথি আসিলে লোক খুব আনন্দিত হইত। বড়লোক মাত্রেরই একটি করিয়া অতিথিশালা বা অতিথিগৃহ থাকিত। তথায় অতিথিদিগকে রন্ধন করিয়া খাইতে হইত। কিন্তু তাহার খাদ্যদ্রব্য এবং ইন্ধন বাড়ীর কর্ত্তা যোগাইতেন। ইহা ভিন্ন ব্রাহ্মণের বাড়ীতে সকল জাতিই আতিথ্য গ্রহণ করিতেন। অনেক ব্রাহ্মণ

গৃহস্থের গৃহিণী অতিথির প্রতীক্ষায় বেলা আড়াই প্রহর পর্য্যন্ত উপবাসী থাকিতেন। ব্রাহ্মণ বাড়ীতে প্রায়ই অতিথি আসিত, কারণ যাহারা রাঁধিয়া খাইতে অনিচ্ছুক বা অশক্ত, তাহারা ব্রাহ্মণ-বাড়ীতেই আতিথ্য গ্রহণ করিত। বৈদ্য এবং কায়স্থের বাড়ীতে অতিথি আসিলে হয় তাহাকে রাঁধিয়া খাইতে হইত, না হয় গৃহস্বামী কোন প্রতিবেশী ব্রাহ্মণ-মহিলাকে ডাকিয়া তাঁহার দ্বারা রন্ধন করাইয়া তাহাকে খাইতে দিতেন। অবশ্য গৃহস্বামীর স্বজাতি অতিথি হইলে তাঁহার গৃহেই অতিথি খাইতেন। তখন অতিথি হইতে কেহ লজ্জাবোধ করিতেন না। তখন এই অতিথি-সেবা ছিল বলিয়া সমাজে কেহ অভুক্ত থাকিত না।

তখনকার লোক কোন অপরাধ করিলে পল্লীবাসীরাই তাহাকে শাসন করিতেন। কেহ গুরু অপরাধ করিলে সমাজপতিই সমাজের দুই একজন মাতব্বর লোককে লইয়া তাহার দণ্ডের ব্যবস্থা করিতেন। অপরাধীকে প্রায় সামাজিক দণ্ডই দেওয়া হইত। বিশেষ অপরাধ, যথা ব্যভিচার, সমাজদ্রোহ, সামাজিক ব্যবস্থার লঙ্ঘন প্রভৃতি করিলে অপরাধীকে 'একঘরে' করা হইত। তবে কখন কখন ব্যক্তিবিশেষকে লঘু অপরাধের জন্য গুরু দণ্ড এবং গুরু অপরাধের জন্য লঘুদণ্ডও দেওয়া হইত। আমি যে সময়ের কথা জানি, সে সময়ে সামাজিক শাসন প্রায় উচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। রাজ-শাসনই বিশেষভাবে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। তবে তখন এখনকার মত মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার লোক যত্রতত্র পাওয়া যাইত না। জাল-জালিয়াতিও হইত; তবে অধিকাংশ লোক ধর্ম্মভীরু ছিল। আদালতে যাহারা হলফ পাঠ করিয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দিত, সমাজে তাহাকে নিন্দিত হইতে হইত। সমাজশক্তি তখন অনেকটা শিথিল হওয়াতে সকলে নিন্দার ভয় করিত না। সামাজিক দণ্ডদানের অপব্যবহার যে না হইত তাহা আমি বলি না, কিন্তু এখনকার মত সাজান মামলা তখন হইতে পারিত বলিয়া মনে হয় না।

ফলে তখনকার পল্লীসমাজে কমিউনিজম বা সর্ব্বস্বত্ববাদের ভাবটা কিছু ছিল। সমাজে কাহারও দুঃখকষ্ট থাকিলে সকলে তাহাকে যেন সামাজিক ব্যবস্থা মতেই সাহায্য করিত। তাহাকে দারিদ্র্যজনিত যাতনা ভোগ করিতে হইত না। কেহ ধনাঢ্য হইলে সে স্বয়ং বা তাহার পরিবারবর্গই কেবল সেই ধন ভোগ করিত না। তাহাকে বারমাসে তের পার্ব্বণ করিতে হইত, দশজনকে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে কিছু দান করিয়া তাহা ভোগ করিতে হইত। পূজাপার্ব্বণে লোকজনকে খাওয়াইতে হইত। অনেকে রাজপথ-নির্ম্মাণ, পান্থশালা-স্থাপন, জলাশয়-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি করিত। তবে কমিউনিজম্ প্রতিযোগিতাকে জীবনযাত্রার ক্ষেত্র হইতে নির্ব্বাসিত করিতে চাহে, হিন্দুসমাজ তাহা করিতে চাহিত না। প্রতিযোগিতায় অযুক্ত ব্যক্তি যে একাই তাহার ধন ভোগ করিবে, হিন্দুসমাজ সে ব্যবস্থা করে নাই। তাহাকে পরাজিত ব্যক্তিকেও কিছু দিতে বাধ্য করিত। এ স্থলে সে কথার বিস্তৃত আলোচনা অনাবশ্যক। তবে হিন্দু-সমাজে তখন দারিদ্র্যজনিত উৎকট দুঃখ ছিল না।

তখনকার লোক সাদাসিধাভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। তখন সমাজে বিলাসিতা বিশেষভাবে প্রবেশ করে নাই। সাধারণতঃ পোষাক-পরিচ্ছদ দেখিয়া কে ধনাঢ্য, কে গরীব তাহা বুঝা যাইত না। ধনী বাড়ীর নারীরা বাহিরে আসিবার সময় ভারি ভারি অলঙ্কার পরিতেন বটে, কিন্তু গৃহে থাকিবার সময় সাধারণ ভদ্রলোকের মেয়েদের মতই তাঁহাদের সাজসজ্জা ছিল। ধনাঢ্য বাড়ীর গৃহেও মেয়েরাই রন্ধনাদি করিতেন। যাঁহাদের বাড়ী অধিক লোক খাইত, তাঁহাদের রাঁধুনী বামুন থাকিত সত্য, কিন্তু ঠাকুরঘরের রন্ধন, বিধবাদিগের রন্ধন ও আপনাদের কতক কতক রন্ধন বাড়ীর মেয়েদেরই করিতে হইত। বিশেষ বড়লোক না হইলে কেহ সুপকার রাখিতেন না। যাঁহারা শুদ্ধাচারী ছিলেন, তাঁহারা এবং যাঁহারা শুদ্ধাচারের ভাণ করিতেন, তাঁহারাও রাঁধুনী বামুনের হাতে খাইতেন না। কাজেই তখন বাড়ীর মেয়েদেরই রন্ধন করিতে হইত। তখন ছিল plain living ও high thinking-এর যুগ। এখন যেমন 'ভিতরে ছুঁচার কীর্ত্তন, বাহিরে কোঁচার পত্তন' হইয়াছে, তখন তাহা ছিল না। তখন দারিদ্র্যটা পাপ বলিয়া লোকে মনে করিত না এবং দরিদ্রকে পরিহার করিয়াও কেহ চলিত না। তখন লোক দরিদ্রকে সঙ্গে লইয়াই প্রগতির পথে অগ্রসর হইত। মনে রাখিতে হইবে, যুধিষ্ঠির সহযাত্রী কুকুরকে ছাড়িয়া স্বর্গে যাইতে চাহেন নাই। এখন জিজ্ঞাস্য, হিন্দুদিগের এই সনাতনী ব্যবস্থা ভাল, না পাশ্চাত্য সোসালিজম্, কমিউনিজম্ ভাল?

বাঙ্গালার মৎস্য

—শ্রীক্ষেত্রগোপাল মুখোপাধ্যায়

বাঙ্গালী কেন মৎস্য ভক্ষণ করে

ভারতের মধ্যে বাঙ্গালী জাতি মৎস্যভুক্ বলিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধ। বাঙ্গালীরা ভারতীয় অন্যান্য জাতিগণের ন্যায় শুধু নিরামিষ আহার করিয়া জীবন ধারণ করিতে বিশেষ অভ্যস্ত নয়। শতকরা নিরানব্বই জন বাঙ্গালীর পক্ষে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে, মাছই অন্যতম সর্ব্ব-প্রধান সামগ্রী। মাছ ও ভাত বাঙ্গালীর প্রাণী ও বাঙ্গালীর সংসারে নানা প্রকার সুখাদ্য নিত্য প্রস্তুত হইলেও মাছ না হইলে একদণ্ডও চলে না। বাঙ্গালার সামাজিক ক্রিয়াকলাপে, প্রীতি-ভোজাদিতে মাছই একমাত্র উল্লেখযোগ্য প্রধান জিনিষ। নদীমাতৃক বাঙ্গালা-দেশের জলে অগণিত মৎস্য আবহমান কাল ধরিয়া বাঙ্গালীর খাদ্য যোগাইয়া আসিতেছে এবং খাদ্য হিসাবে ভাতের পরই মাছ দেশবাসীর দৈনন্দিন খাদ্য-তালিকার মধ্যে একটি প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে।

ঠিক কতকাল পূর্ব্বে বাঙ্গালী জাতি মৎস্য-ভক্ষণে অভ্যস্ত হইয়াছে, সে কথা বলা কঠিন; তবে বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর বসবাস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে বলিয়া বোধ হয়। অন্য পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে বাঙ্গালী যে শুধু মাছ খাওয়ায় অভ্যস্ত হইয়াছে, এ কথা ঠিক নয়। ফলমূল, তরি-তরকারী, দুধ-ঘি প্রভৃতি পুষ্টিকর সামগ্রীর যে বাঙ্গালা দেশে একান্ত অভাব, বা বাঙ্গালী এই সকল জিনিষ খায় না, এ কথাও বলা চলে না, যেহেতু বাঙ্গালা দেশে যে সকল অবাঙ্গালী—ইংরাজ, মাড়োয়ারী, পাঞ্জাবী, হিন্দুস্থানী, মারাঠী, মাদ্রাজী প্রভৃতি জাতিরা বাস করেন, তাঁহারা মৎস্যভোজনে অভ্যস্ত না হইলেও বাঙ্গালা দেশোৎপন্ন অন্যান্য পুষ্টিকর খাদ্য ভক্ষণ করিয়াই দেহের পুষ্টি সাধন করেন। তবে কেন বাঙ্গালী মৎস্য-ভক্ষণের বিশেষ পক্ষপাতী? এ কথা আমাদের মনে স্বতঃই উদয় হয়। কিন্তু এই প্রশ্নের কারণ অনুসন্ধানে আমরা দেখিতে পাই যে, ইহার মূলে আছে বাঙ্গালার ভৌগোলিক তথ্য ও আয়ুর্ব্বেদোক্ত মৎস্য-খাদ্যের উপকারিতা। প্রথমতঃ বাঙ্গালার ভৌগোলিক অবস্থান ও আবহাওয়া আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, বাঙ্গালা দেশ সমুদ্রগর্ভ হইতে সামান্য পরিমাণ উচ্চ, দক্ষিণ-বঙ্গ ও কলিকাতা সমুদ্রগর্ভ হইতে মাত্র ৩২ ফুট হইতে ৪০ ফুট উচ্চ। এই কারণে বাঙ্গালা দেশ সাধারণতঃ নিম্ন ও নদী-মাতৃক বলিয়া এ দেশের ভূমি প্রধানতঃ আর্দ্র ও জলাংশেতে, এবং ইহার আবহাওয়া বিশেষ ভাবে সজল। এই সমস্ত কারণে ও তদুপরি ভারতের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা এখানে বৃষ্টিপাত অধিক হওয়াতে, বাঙ্গালায় বাত-ব্যাধির প্রকোপ অত্যন্ত অধিক দেখা যায়। দ্বিতীয়তঃ আমরা মৎস্যের খাদ্য-গুণের উপকারিতা সম্বন্ধে, আয়ুর্ব্বেদে দেখিতে পাই যে, পরিশ্রমী, শ্রান্ত, দুর্ব্বল ও বায়ুপ্রধান ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের পক্ষে মৎস্য অতি হিতকর খাদ্য এবং মৎস্যাশী ব্যক্তি কখনও বাত-রোগে আক্রান্ত হয় না। মৎস্যের গুণ পুষ্টিকর, বলকর ও স্নিগ্ধ এবং কিঞ্চিৎ কফ ও পিত্তজনক। আধুনিক পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদের মতেও মৎস্যে ফসফরাসঘটিত লবণ অধিক মাত্রায় থাকায়, ইহা চক্ষু ও মস্তিষ্কের পক্ষে বিশেষ উপকারী। মৎস্য-খাদ্যের এই সকল গুণ ও উপকারিতা আছে বলিয়াই, বাঙ্গালী অতি প্রাচীন কাল হইতে মৎস্য ভক্ষণ করিতেছে, অন্য কারণে নয়। সুতরাং এই প্রকার সজল আবহাওয়া ও বাত-ব্যাধির প্রকোপযুক্ত দেশে, যেখানে দেশের লোকের মধ্যে শতকরা ৯০ জন চাষী ও শ্রমিক—জল-কাদার মধ্যে সারাদিন যাহাদের পরিশ্রম করিতে হয়, সে স্থানের অধিবাসি-গণের পক্ষে শরীর সুস্থ রাখিবার জন্য, মৎস্য-খাদ্যই বিশেষ হিতকর, সে কথা বলা বাহুল্য মাত্র। মৎস্য-খাদ্যে বিশেষ সুগুণ বর্ত্তমান আছে বলিয়াই আর্য্যঋষির যজ্ঞে আহুত, কর্ম্মোদ্যোগত নিষ্ঠাবান্ উচ্চ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের বংশধরগণ উত্তরকালে মৎস্য-ভক্ষণে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন, নিতান্ত সামান্য কারণে তাঁহারা নিজ নিজ কুলপ্রথা ভঙ্গ করিয়া নূতন বিধানের পক্ষপাতী হন নাই।

এই প্রকার বিধানের পরিবর্ত্তন করিয়া নব-বিধানের প্রবর্ত্তন করিতে পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্য জাতির মধ্যেই দেখা

যায়। যে দেশের মাটী ও আবহাওয়ায় মানুষ বাস করিয়া তাহাকে মাতৃভূমি বলিয়া স্বীকার করিয়া আসিতেছে, সে দেশের রীতি-নীতি, পরিচ্ছদ ও খাদ্য গ্রহণ করিয়া নিজের জীবন-যাত্রার সহিত প্রকৃতি ও দেশগত সামঞ্জস্যের ধারা বজায় রাখিতে না পারিলে, সেই দেশে নিজের অস্তিত্ব বজায় রক্ষা সম্ভবপর হইতে পারে না—ইহা ধ্রুব সত্য। বাঙ্গালী যদি আজ নিজেদের মাছ-ভাত খাওয়ার চিরন্তন অভ্যাস ত্যাগ করিয়া, পাশ্চাত্য আদর্শে ইউরোপীয় পরিচ্ছদ ও আহারের প্রথা গ্রহণ করিয়া, এদেশে সেই আদর্শে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করিতে চেষ্টা করে ও অধিকতর স্বাস্থ্যবান্ হইতে চায়, তবে বাঙ্গালী তাহার নিজ জাতিগত আদর্শ ও অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলিয়া শীঘ্রই যে অকালে আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদের মত একেবারে লোপ পাইবে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

দেশ ও প্রকৃতিগত সামঞ্জস্য রক্ষা এমনই বড় জিনিষ। বাঙ্গালী যেমন উত্তর মেরুতে বা আলাস্কায় বাস করিয়া সেই স্থানের অধিবাসী এস্কিমোদের মত খাদ্য গ্রহণ না করিলে নিজেদের মাছ-ভাত ভক্ষণে আপন অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারিবে না, তেমনি এস্কিমো বা তিব্বতীরাও বাঙ্গালা দেশে বাস করিয়া বাঙ্গালীর আদর্শে পোষাক-পরিচ্ছদ ও খাদ্য গ্রহণ না করিলে, এ দেশে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করিতে পারিবে না; ইহা খুব সত্য কথা। অনিয়ম ও সামঞ্জস্যহীনতার জন্য অচিরকাল মধ্যেই তাহারা দুর্ব্বল ও রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িবে। দেশাচার অনুযায়ী জীবনযাত্রাই তদ্দেশবাসীর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পন্থা।

আয়ুর্ব্বেদে মৎস্যের গুণ

বাঙ্গালা দেশের শতকরা ৯৯ জন যখন মৎস্য ভক্ষণ করিয়া থাকে, তখন মৎস্যের গুণাগুণের সহিত পরিচিত হওয়া প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য। সকলেই মৎস্য ভক্ষণ করিয়া থাকেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, মৎস্য-খাদ্যের কি বিশেষ উপকারিতা বা অপকারিতা আছে, তাহা অনেকেই জ্ঞাত নহেন। ইহা ব্যতীত বাঙ্গালা দেশের জলাশয়াদিতে কোন্ কোন্ শ্রেণীর মৎস্য দেখিতে পাওয়া যায়, সে বিষয়েও সাধারণে বিশেষ খোঁজ রাখেন না। বাঙ্গালী হইয়া যদি নিজ দেশের মৎস্যাদির বিষয় না জানা যায়, তাহা বড়ই অগৌরবের কথা। বাঙ্গালার বিশিষ্ট মৎস্যাদির বিষয় জানিতে হইলে যদি নিজেদের অভিজ্ঞতার অভাবে বিদেশীয় লিখিত পুস্তকাদির সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়, তবে বড়ই লজ্জার বিষয় সন্দেহ নাই। এমন বিষয় অনেক দেখা যায় যে, আমরা যে-দেশের মাটীতে জন্মিয়া চিরকাল বর্দ্ধিত হইতেছি, সে দেশের বিশিষ্ট উৎপন্নাদির বিষয়ে আমরা কিছুই জানি না, অথচ একজন বিদেশীয় সামান্য কিছু দিনের জন্য এ দেশে বেড়াইতে আসিয়া সেই বিশিষ্ট দ্রব্যের বিষয়ে বিরাট গ্রন্থ রচনা করিলেন। যাহা হউক, আমরা বাঙ্গালী হইয়া যে বিশিষ্ট সামগ্রীর উপর নির্ভর করিয়া জীবন ধারণ করি, তাহার বিষয়ে সম্যক্‌রূপে পরিচিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

আমরা আয়ুর্ব্বেদে দেখিতে পাই যে, সকল মৎস্যই একই গুণসম্পন্ন নয়; প্রত্যেক বিশিষ্ট মৎস্যের বিশিষ্ট গুণাগুণ বর্ত্তমান আছে। মৎস্যের সেই বিশিষ্ট গুণাগুণসমূহ মানব-দেহে নানা প্রকার ক্রিয়া করিয়া থাকে। আচার্য্য ভাবমিশ্র মৎস্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, ক্ষুদ্র মৎস্যের গুণ হইতেছে—স্বাদু, বায়ু-পিত্ত-কফ-নাশক, লঘু, রুচিকর, বলপ্রদ ও স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব হিতকর। অতি ক্ষুদ্র মৎস্য কিন্তু শ্লেষ্মক, বায়ু ও কাশ-নাশক হইলেও ইহা অতি বা নিত্য ভোজনে পুংস্ত্ব নাশ করিয়া থাকে। মৎস্যের অণ্ড বা ডিম্ব বৃষ্য, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকর, লঘু, কফ ও মেদপ্রদ, বলকর, মেহনাশক কিন্তু শারীরিক গ্লানিকর। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন যে, মৎস্য-ডিম্ব রুচিপ্রদ ও বলকর হইলেও বাতরোগীদের পক্ষে ইহা উপযুক্ত খাদ্য নহে; যে-হেতু মৎস্য-ডিম্বে "নিউক্লিন্" নামক পদার্থ অধিক পরিমাণে থাকার জন্য, ইহা ভোজনে বাতব্যাধির বৃদ্ধি হইয়া থাকে; সুতরাং ইহা অধিক আহার করা উচিত নয়। শুষ্ক মৎস্যের গুণ—বলকর, দুষ্পাচ্য ও মল প্রতিরোধক ও বায়ুকর। লবণাক্ত বা নোণা মৎস্য—রুচিপ্রদ, পিত্তপ্রদ, দুষ্পাচ্য ও অহিতকর। দগ্ধ মৎস্য—গুণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, পুষ্টিকর, বলপ্রদ ও লঘু।

জলাশয় বিশেষে আবার মৎস্যের গুণ নানা প্রকার হইয়া থাকে যথা—কূপজাত মৎস্য—শুক্র ও মূত্র-বর্দ্ধক, কিন্তু অধিক আহারে শ্লেষ্মা ও কুষ্ঠরোগকারক হইয়া থাকে। সরোবর-জাত মৎস্য—মধুর, স্নিগ্ধ, বলকর। চুটী (ডোবা বা ক্ষুদ্র পুকুর)-জাত মৎস্য—পিত্তকর স্নিগ্ধ, মধুর, শীতল ও বাত-

নাশক। নদীজাত মৎস্য—গুরু, বাতনাশক, রক্তপিত্তকারক, বৃষ্য (বীর্যবর্দ্ধক,) স্নিগ্ধ ও উষ্ণবীর্য্য ও বল বর্দ্ধকারক। সমুদ্রজাত মৎস্য—রুচিপ্রদ, বলকর, গুরু, মলমূত্রসংগ্রাহক, উষ্ণ, পিত্তকর, মেদকর এবং কফ ও বাতনাশক। তড়াগজাত মৎস্য—গুরু, বৃষ্য, শীতল, বলকর ও মূত্রজনক। নির্ঝরজাত মৎস্য—তড়াগজাতের ন্যায় গুণশালী ও ইহা বল, আয়ু মতি ও দৃষ্টিশক্তি বর্দ্ধক।

ঋতুবিশেষে আবার মৎস্যাদি স্বাস্থ্যের পক্ষে নানা প্রকার গুণসম্পন্ন হইয়া থাকে। যেমন :—

গ্রীষ্মকালে চুন্টজাত মৎস্য, বর্ষাতে তড়াগজাত মৎস্য, মানবের পক্ষে হিতকর। বর্ষাকালে নদীজল ঘোলা ও অপরিষ্কার হওয়ায় জন্য নদীজাত মৎস্য এই সময়ে মানবদেহে অজীর্ণ রোগের উৎপত্তি করিয়া থাকে। সুতরাং বর্ষায় নদীজাত মৎস্য ভক্ষণ করা অহিতকর। শরৎকালে নির্ঝরজাত মৎস্য খুব উপকারী। হেমন্তে বৃহৎ কূপজাত মৎস্য হিতকর, এবং শীতকালে নদীজাত মৎস্য মানব-শরীরের পক্ষে বিশেষ কল্যাণকর। সামুদ্রিক মৎস্যও শীতকালে খুব উপকারী হইয়া থাকে, যেহেতু শীতকালে মানবের পরিপাক-শক্তি বিশেষরূপে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে বলিয়া সমুদ্রজাত তৈল ও বসাযুক্ত মৎস্য শরীরের পুষ্টির পক্ষে খুব হিতকর।

নানা প্রকার শ্রেণী ও জাতিবিশেষে মৎস্য নানা প্রকার গুণসম্পন্ন হইয়া থাকে, যথা :—

(১) রোহিত (রুই)—ইহা মৎস্যকুলের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণসম্পন্ন। ইহা কৃমি, অর্দ্বিতনাশক (অর্দ্বিত—বায়ুরোগবিশেষ), বাত, বাতরক্ত, বাতপিত্তকর। ইহার মস্তক ও তৈল ঊর্দ্ধজত্রুগত রোগনাশক (জত্রু—কণ্ঠের উভয় পার্শ্বস্থিত দুইখানি অস্থি) ও চক্ষুর পক্ষে বিশেষ হিতকর, এবং ইহার মস্তক নিয়মিত ভক্ষণে মানবের নষ্ট পুংস্ত্ব আরোগ্য হইয়া থাকে।

(২) শিলঙ (শিলোন বা চাঁই)—শ্লেষ্মজনক, বলকর, মধুর, বিপাক, গুরু, আমবাতকর ও বাতপিত্তজনক।

(৩) ভাকুর (ভেটকী)—মধুর, শীতবীর্য্য, শ্লেষ্মাকর, গুরু, স্নিগ্ধতাজনক ও রক্তপিত্তনাশক।

(৪) মোদিকা (চিতল)—বাতঘ্ন, বলকর, মধুর, গুরু, পিত্তনাশক, কফকর ও রুচিজনক। ইহা বীর্য্যবৃদ্ধিকল্পে পক্ষে হিতকর।

(৫) পাবিন (বোয়াল)—শ্লেষ্মাকর, বলকর, বিষ্টম্ভজনক, রক্তপিত্ত বৃদ্ধিকারী ও কুষ্ঠপ্রদ।

(৬) মৃগী (শিঙ্গি)—বাতনাশক, স্নিগ্ধ, শ্লেষ্মাকর, লঘু ও রোচক।

(৭) ইলিস (ইলিশ)—মধুর, স্নিগ্ধ, রোচক, অগ্নিবর্দ্ধক, পিত্তনাশক, কফকর, বায়ুনাশক ও লঘু। কিন্তু ইহা তৈলে খুব ভাজিয়া খাইলে শরীরের পক্ষে অহিতকর হয়।

(৮) পঙ্কনী (পোয়া)—মলসংগ্রাহক, হৃদ্য, মধুর ও কণ্ঠরোগবিনাশিনী ও গুরু।

(৯) ধর্মি (বাম)—বায়ুপিত্তনাশক, রুচিকারক, লঘু ও বলকর।

(১০) বত্ত (ডানকুনি ও খাড়কে)—তিক্ত, রক্তপিত্ত ও কফনাশক, বাতশ্লেষ্মাশ্রয়, গুরুজনক ও বলকর।

(১১) এরল (আড়)—মধুর, স্নিগ্ধ, শ্লিষ্টবী, শীতল ও লঘু।

(১২) মহাশকর (মহল পুঁটী)—তিক্ত মধুর, পিত্তকফনাশক, শীতল, রোচক ও বাত নাশাল।

(১৩) শ্রোষ্টি (পুঁটী)—তিক্ত, গাঢ়, গুরু, গুরুজনক, কফ ও বাতনাশক, রোচক, লঘু, স্নিগ্ধ, মুখ ও কণ্ঠরোগনাশক। পুঁটী মাছ ঘৃতে ভাজিয়া খাইলে গলার কণ্ঠরোগ আরোগ্য হয়।

(১৪) গলদী (চাং বা গড়ুই)—তিক্ত, কষায় ও মধুর, বাতপিত্তহর কফঘ্ন, রোচক, লঘু, অগ্নীদীপক, ও বলবীর্য্যকারক।

(১৫) মদ্গুর (মাগুর)—বাতনাশক, বলকর, গুরু, লঘু ও কফজনক।

(১৬) শফর (গরেচড়া গোপিয়া মাছ)—মেধাজনক, মেধ্যকারক, বাতপিত্তজনক ও রোচক।

(১৭) চাঁদা—গুরু ও বলবর্দ্ধক।

(১৮) খলিসা—বায়ু, পিত্ত, কফ, শূল ও আম বিনাশক ও বলকর।

(১৯) পাঁকাল—মেধ্যকারক ও অগ্নীদীপকারক।

(২০) চেঁয়া—কফনাশক, লঘু, অগ্নিদীপক ও পিত্তনাশক।

(২১) ঝবিকা (কই)—রুচিকর, কফ ও বায়ুনাশক, পিত্তকর ও আমঘ্ন।

(২২) কাতল (কাতলা)—ত্রিদোষনাশক।

(২৩) মৃগশির (মিরগেল)—ইহা রোহিতের ন্যায় গুণযুক্ত।

(২৪) পাবদা—বায়ুনাশক ও বলবর্দ্ধক।

(২৫) বাটা—বায়ুপিত্তনাশক কিন্তু শ্লেষ্মাকর।

(২৬) খয়রা—বায়ুপিত্তনাশক, বলকর ও শ্লেষ্মাকর।

(২৭) ভেলে (পোয়া)—বলকর কিন্তু শ্লেষ্মাজনক।

(২৮) কমুই—বলকারক।

(২৯) বেলে—বায়ুরোগে হিতকর, আমঘ্ন, বলকর, লঘু ও মলসংগ্রাহক।

(৩০) গজার (গাল)—গুরু, বলকর, পিত্তকর ও রক্তপিত্তবৃদ্ধিকারক।

(৩১) মৌরলা—লঘু, হৃদ্য, রোচক, স্নিগ্ধ, ত্রিদোষঘ্ন ও বলকর, বায়ুনাশক ও শ্লেষ্মাকারক।

(৩২) শুলে—লঘু, বায়ুপিত্ত নাশক, স্নিগ্ধ, বলকর, কফকর ও রোচক।

(৩৩) বাটা—লঘু, হৃদ্য, পিত্তশ্লেষ্মানাশক ও বলকর।

সরল পুঁটি—Barbus Sophore

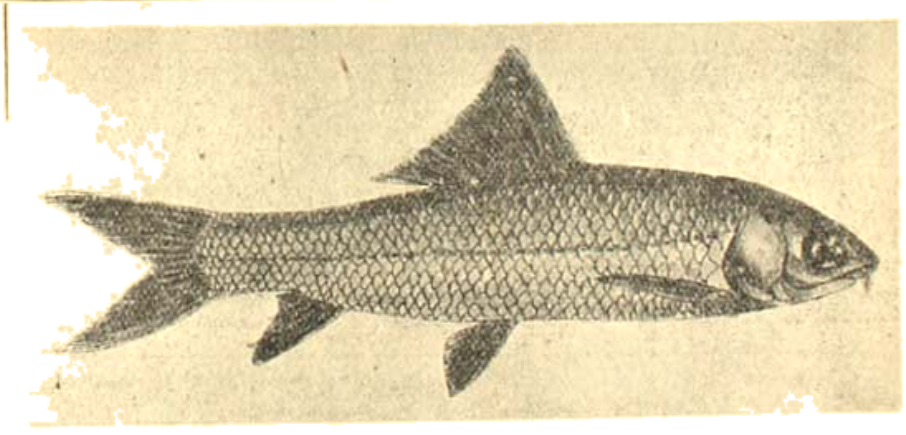

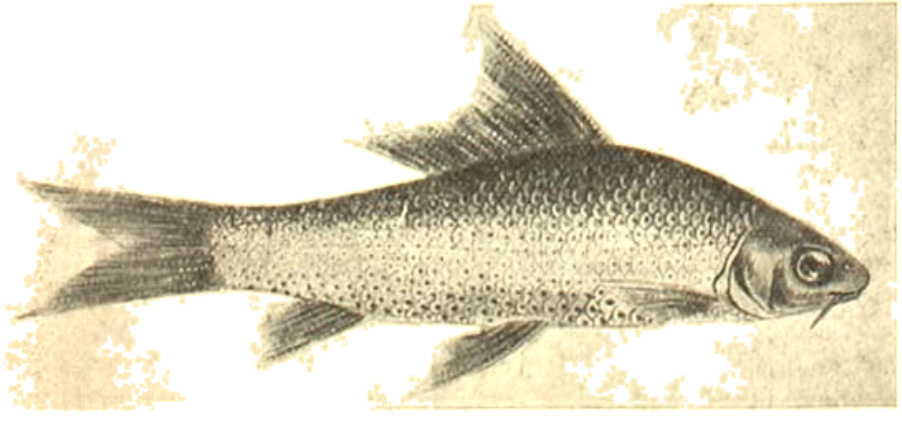

কাতলা—Catla Catla

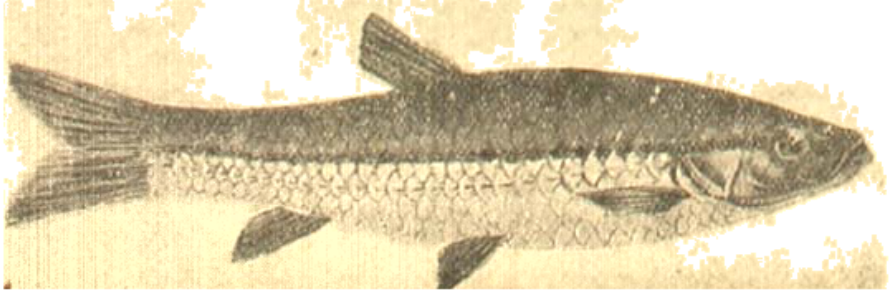

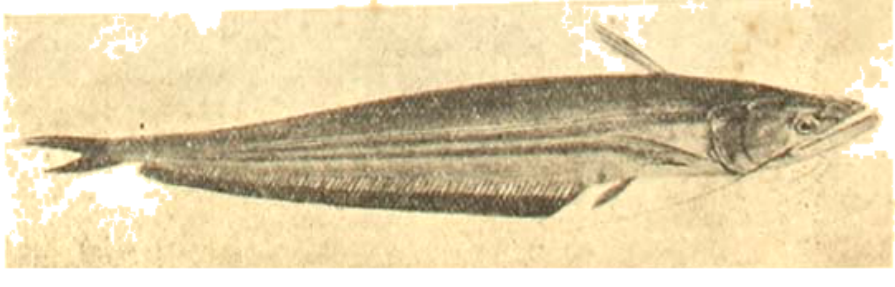

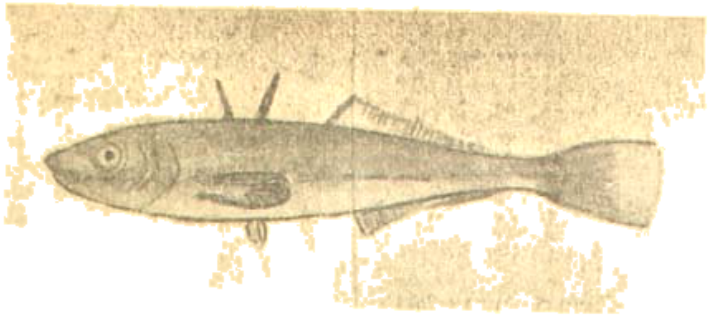

কাদাবেলে—Sobies

বিষ্ণুশফর—The Black-spnt Sophore

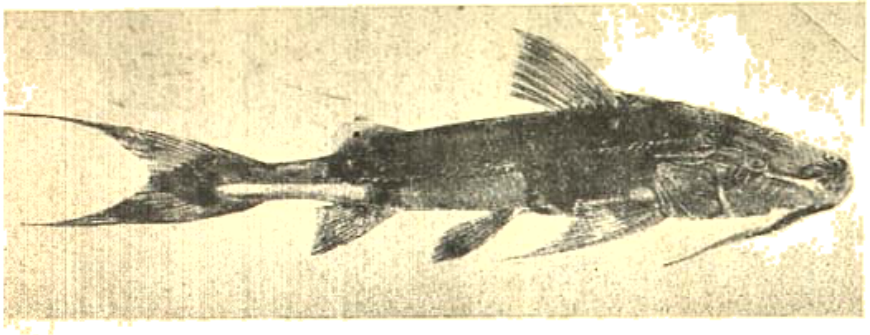

বাগরা—The Goonch

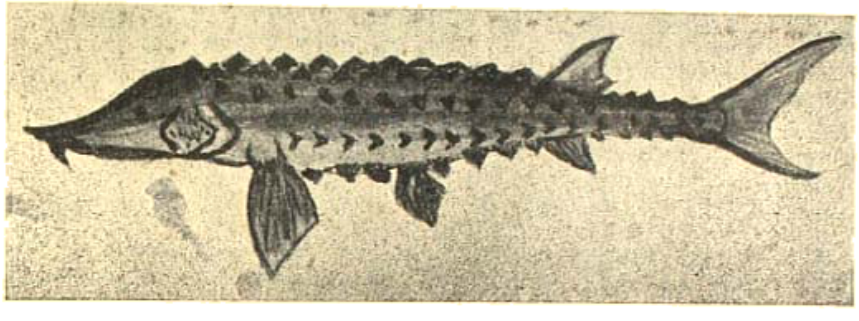

শ্বেত শফরাদি হাঙ্গর—Volga Sturgeon.

(৩৪) মহানীর—প্রায় রোহিতের মতই গুণসম্পন্ন কিন্তু কিঞ্চিৎ পিত্তকর।

(৩৫) চিংড়ী—রুচিপ্রদ, বলকর, বেশ পিত্ত ও রক্তদোষনাশক, কিন্তু রুক্ষ ও বাতবর্দ্ধক।

মৎস্য প্রকারভেদে আবার উপকারী বা অপকারী হইয়া থাকে। মৎস্য সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত, এক শ্রেণী শ্বেত ও অপর শ্রেণী লোহিত বর্ণের মাংসবিশিষ্ট। যে সকল মৎস্য কাটিলে মাংসের বর্ণ লোহিত দেখায়, সেই সকল মৎস্য খাইতে খুব সুস্বাদু এবং তাহারা গুরুপাক ও শরীরের পক্ষে পুষ্টিকারক। কিন্তু যাহাদের মাংস শ্বেত বর্ণের দেখায়, সেই সকল মৎস্য লঘুপাক ও অল্প পুষ্টিকর হইয়া থাকে। শ্বেত বর্ণের মৎস্যদিগের মধ্যে বাটা, পুঁটী, মৌরলা, শিঙ্গি, মাগুর, টেংরা, খলিসা প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে; এইগুলি সহজপাচ্য, রসাহীন ও অল্প পুষ্টিকারক হওয়ায় রোগীদের পথ্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শিশু ও রোগীদের পক্ষে লোহিত বর্ণের মৎস্য অহিতকর হইয়া থাকে; তাহাদের পক্ষে শ্বেত বর্ণের মৎস্য হিতকর। কিন্তু ভেটকী, ইলিস প্রভৃতি মৎস্য শ্বেতবর্ণের হইলেও অধিক রসাযুক্ত হওয়ায় বিশেষ গুরুপাক ও দুষ্পাচ্য বিধায় স্বল্পাগ্নি ব্যক্তিগণের পক্ষে অহিতকর। চিংড়ির মধ্যে বড় গলদা চিংড়ি অতিশয় দুষ্পাচ্য, এজন্য অধিক আহার করা হিতকর নহে।

সরস্বতী

—শ্রীঅরেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়

নহ দেবী মূর্ত্তিময়ী, নহ নারী, সংসারবাসিনী
হে মৌনতা আঁধার নাশিনী;
কোন সন্ধ্যা, কোন প্রাতে গৃহাঙ্গনে, দিগন্ত সীমায়
স্নান কিংবা শুভ্রবেশে, আলো ছায়া মিশ্র মহিমায়
দাঁড়াও না ক্ষণকাল; ঊর্দ্ধে অধে কোন সরোবরে
কোন বিকশিত পদ্মে,—তব যুগ্ম-পদ নাহি পড়ে
মানবের কল্পলোকে, আদি অন্তহীন পারাবারে
আবির্ভূতা হও বারে বারে।

তোমার নাহিক ক্ষুধা, লজ্জাহীনা, অমূর্ত্তা সুন্দরি,
দিকে দিকে বেড়াও সঞ্চরি';
নক্ষত্রের অক্ষৌহিণী বক্ষে বহে পদচিহ্ন তব,
বিদ্যুতের দ্যুতিকায়,—তব স্পর্শ কম্পন-গৌরব;
শূন্য তরঙ্গিত হয় তব কণ্ঠ নির্ঝরিণী সুরে,
ধরণীর তৃণে পত্রে অরণ্যের লক্ষ শাখা জুড়ে,
জাগে তব সঙ্গীত-মূর্চ্ছনা;
ধরণীর বক্ষ জুড়ি নানা বর্ণে পড়ে আলিম্পনা,—
বর্ণহীনা অসীম শুভ্রতা,
তোমার চরণ-স্পর্শ-আশীর্ব্বাদ-লব্ধা চিরব্রতা।

দিকে দিকে যুগে যুগে মানুষের মূঢ় অভিলাষ—
তব মূর্ত্তি অঙ্কন-বিলাস;—
কণ্ঠ দেয় অসমর্থ, অসম্পূর্ণ ভাষা উপচার,
চক্ষের তৃষার পথে বক্ষ দেয় অশ্রু উপহার,
গূঢ় আত্ম-চেতনার বেদনার, তরঙ্গ-কম্পন
হৃদয়ের তুলিকা চায় বর্ণরূপে করিতে অঙ্কন;
যেটুকু প্রকাশ তব, বেশী তার নিত্য-অন্তহীন
অন্তরেতে রহে কুণ্ঠাহীন।

ভ্রান্তিহীন ধ্রুব তবু, চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্রে গগনে,
কোলাহলে, একান্ত নির্জ্জনে,—
অসীমারে সীমা দিতে, অরূপারে বাঁধিতে আকারে,
কী জিজ্ঞাসা, কী সন্ধান, দুখে সুখে দুয়ারে দুয়ারে,
স্বার্থহীন প্রার্থনার অপরূপ, কী সে মহোৎসব,
যুগ যুগ ধরি মহা কী গৌরবময় পরাভব;
দয়াহীনা কুণ্ঠাহীনা লজ্জাহীনা অমূর্ত্তা সুন্দরি,
চিরাদৃতা বেড়াও সঞ্চরি'।

কর না ক' দয়া কারে, কারও প্রতি নাহিক বিদ্বেষ—
ধ্যানময়ী সন্ন্যাসিনী বেশ;
তবু তব পদ-প্রান্তে; দুঃখ সুখ তরঙ্গ-প্রবাহ
স্নেহ প্রেম ভালবাসা,—শান্তিহীন দুর্নিবার দাহ
শত দিক্ হতে এসে, মিলিয়াছে পদ্মদল সম
সৃষ্টির রহস্য-কেন্দ্রে,—আকর্ষণে ধ্বনিবার তম।
প্রলয় সৃজন ব্যাপি' কাঁপি নিত্য তারই সুরধ্বনি
অবিশ্রাম দিতেছে পাহারা।

মূর্ত্তিহীনা লজ্জাহীনা উলঙ্গিনী মায়াময়ী বাণী,—
পদ্মাসনা কল্পনার রাণী!
অনির্দ্দেশ্য কল্পলোকে সঙ্গীতের ছন্দের হিল্লোলে
পরিবৃতা রূপে আছ,—নিম্নে তব চরণের তলে;
বিকশিত মহাপদ্ম শত লক্ষ মেলিয়াছে দল
মহাসুখ মুগ্ধ হয়ে উপভোগ করে পরিমল।
যুগে যুগে বারম্বার ঝরে পড়ে
অনন্ত-নূতন,—
শূন্য স্থান করিছে পূরণ।

ভাড়াটে

—শ্রীরজত সেন

সে দিনের স্মৃতি আজও তার মনে কাপসা হয়ে যায় নি, যে সব রাত্রে সুবালার অপেক্ষায় নিস্তব্ধ রাত্রির মুহূর্ত-গুলো ভারাক্রান্ত হয়ে উঠত। খোলা জানলা দিয়ে হাওয়া আসত, আলনার কাপড়-জামাগুলো খস্ খস করে উঠত, সুরেশের মনে হত বুঝি সুবালার শাড়ীর শব্দ। তার চুড়ির টুংটাং যেন বিদ্যুতের ঝলসান দীপ্তি।

কিন্তু অবশেষে আসে সে মুহূর্ত।

'কি আশ্চর্য্য! রোজই এমন দেরী কর কেন?'

সুবালা হেসে ওঠে, 'কৈ আজ ত মশা নেই!' সে বলে। তার হাসির ধারে যেন ঘরের অন্ধকার খান খান হয়ে যায়। শুভ্র শয্যায় কয়েক টুকরো চন্দ্রালোক।

'মশা না হয় নেই, কিন্তু মানুষের ঘুম পায়।' সুরেশের কণ্ঠে বিরক্তি, 'ঘুম পায় ত জেগে কেন?'

'খুকী, না? ঘুমিয়েছে কি নিস্তার আছে না কি? ঘুম ভাঙ্গাবার ফন্দীগুলো তবু যদি না শিখতে!'

'আচ্ছা যাও, ঘুমোও, কে তোমাকে জাগাতে আসে দেখ না। আমি চললাম মার ঘরে।' সুবালা যাবার জন্যে পা বাড়ায়।

সুরেশ ত্রস্তে এগিয়ে এসে চেপে ধরে তার আঁচল; 'ছাড়ো! তোমার না ঘুম পেয়েছে!'

'পেয়েছেই ত! কিন্তু এখন আর একা ঘুম পাবে না, এল।'

কিন্তু আজকাল আর ঘুমের জন্যে আড়ম্বরের প্রয়োজন হয় না, শয্যাগ্রহণের এক মিনিট পরেই সুরেশ আর এ-জগতে নেই। আজও তেমনি শাড়ীর খস খস শব্দ হয়, অন্ধকারে বেজে ওঠে চুড়ির টুংটাং, কিন্তু সুরেশের নিদ্রা-জগতে সে শব্দ পৌঁছায় না। সুবালা মাথার কাপড়টা নামিয়ে দেয়, জল গড়িয়ে রাখে শিয়রে, দরজা বন্ধ করে, জামাটা খুলে টাঙ্গিয়ে রাখে আলনায়, আর—কোথায় সুরেশ? মাঝখানে শুধু কয়েকটি বছরের ব্যবধান। কিন্তু সুরেশের ঘুম আজ ভাঙ্গে না। সংসারের কাজের পর আলাপের ধৈর্য্য থাকে না। ঘুম আসতে তারও মাত্র লাগে কয়েকটি মিনিট।

খেয়ে পান দেবার সময় সুবালা বললে,

আজ, কথা আছে।'

বিছানায় শুয়ে সুরেশের পুরান দিনের কথা মনে পড়ে কি না কে জানে, জেগে থাকবার জন্যে সে খানিকক্ষণ চেষ্টা করে, তারপর নিঃস্পন্দ, নিদ্রিত।

জলের গ্লাসটা রেখেই সুবালা বলল, 'শোন, ঘুমিয়ে পড়নি ত?'

উত্তর নেই। সুবালার মনে হল, সুরেশের এত শীগ্‌গির ঘুম আসে নি কিছুতেই, ঘুমের ভান করে ও পড়ে আছে।

কাছে আসতেই তার ভুল ভেঙ্গে গেল, সুরেশ ঘুমিয়েই পড়েছে। কিন্তু সুবালা আজ স্থির-চিত্ত, কোন কথাই সে শুনবে না আজ, অফিসে লোক আর কাজ করে না, সবাই অমনি কুম্ভকর্ণের মত ঘুমোয়?

'শুনছ?' সুবালা প্রায় কাণের কাছে মুখ রেখে ডাকলে।

সাড়া নেই।

'শুনছ?' তার গা ধরে ঠেলে দিলে।

'আঃ কি ছেলেমানুষি হচ্ছে?' সুরেশ জেগে গিয়ে বললে, 'বয়স বাড়ছে না কমছে? সমস্ত দিন অফিসে খাটুনির পর একটু নিশ্চিন্তে ঘুমোবার উপায় নেই।'

'রাখ তোমার ঐ এক কথা', সুবালা বিছানার এক পাশেই শুয়ে পড়ল সটান।

'চোখ দুটো খোলা না বন্ধ?' সুবালার কণ্ঠে ঝাঁঝ।

'আর ভূমিকা কতক্ষণ চলবে? কি অপদার্থ বাবা মেয়েগুলো।'

'ভূমিকা নয়', সুবালা বললে, 'একেবারে আখ্যায়িকা আরম্ভ, বাড়ীটা বদলাবে তুমি, না আমি মাণিকতলা চলে যাব দাদার কাছে?'

'ও, তাই বল', অন্ধকারে সুরেশের মুখে নিশ্চিন্ত হাসি ফুটে উঠল।

'তাই ত বলছি, আজ আমি একটা জবাব চাই।'

'আমিও স্পষ্ট কথাই বলি।'

'দেখ, রসিকতা ক'র না বলছি, ভাল হবে না।'

'তুমি মাণিকতলা গেলে খাওয়া-দাওয়া চলবে কেমন করে?'

'সে আমি জানি না, অফিসে কাজ কর বলেই অমনি সাত খুন মাপ, না? কত দিন ধরে বলছি বাড়ীটা বদলাও, তা বাবুর কাণে তোলবার নাম নেই।'

'কেন কি হল এখানে, তুমি ত' অমনি বলেই খালাস, বাড়ী বদলাও। কিন্তু বাড়ী বদলানর হাঙ্গামা ত আর তোমায় পোয়াতে হবে না; রোদ্দুরে ঘুরে ঘুরে বেড়াও এখন, হ্যাঁ মশাই বাড়ী ভাড়া আছে? হ্যাঁ মশাই বাড়ী ভাড়া আছে?'

'তুমি না করলে করবে কে? আমি যাব?'

'তা আমি জানি না, কিন্তু আমি পারব না ও-সব গোলমাল করতে।'

'বেশ, আমিও তোমায় বলে দিলাম এ বাড়ীতে আমি থাকব না।'

সুবালা পাশ ফিরে শুল।

সকাল থেকে দু'পক্ষেই কথাবার্তা নেই।

সুবালা চা নিয়ে এল। 'আজ তোমার দুপুরে কোন কাজ নেই ত? এই বেলাই বা অন্য কিছু?'

'কেন?'

'তা হলে চল একবার বেরই, বাড়ী দেখা যাক, যখন থাকবে নাই স্থির করেছ এখানে।'

'তোমার অফিস নেই?' সুবালা জিজ্ঞেস করে।

'না, ছুটি আছে।'

বাস্তবিক ছুটি ছিল না, কিন্তু একদিনও তার দেরী করতে সাহস হল না। কেন না একবার হাত পুড়িয়ে চোখের জল আর নাকের জলে একাকার হয়ে এক বেলা সে কোন রকমে খেতে পেয়েছিল, পরদিনই তাকে ছুটতে হয়েছিল মাণিকতলা।

দুপুরে একটু বিশ্রামের পর ওরা বেরিয়ে পড়ল। রৌদ্রের তেমন তাপ নেই, আকাশটা সকাল থেকেই মেঘলা। রাস্তাঘাটে লোক-চলাচল নিতান্ত কম। বাড়ীর পাশ দিয়ে, গাছের ছায়ায় ছায়ায় মন্থর পদক্ষেপ সুরেশের অপূর্ব্ব লাগছিল, কোথায় চেয়ারে হেলান দিয়ে কলম চালান আর এই বেড়ান। মৃদু, টুংটাং গল্প হচ্ছিল, নানা কথা, নানা বিষয়। বাড়ী খোঁজবার কথা প্রায় তারা ভুলেই গিয়েছিল। দু'জনেই বুঝতে পেরেছিল, আসল কাজের প্রতি তাদের মনোযোগ শিথিল হয়ে গিয়েছে; নিজেদের অজ্ঞাতে তারা পরস্পরের কাছে রমণীয় হয়ে উঠেছে; কখন পুরাতন, বৈচিত্র্যহীন আবেষ্টনী থেকে দুটি আত্মার যেন মুক্তি ঘটেছে আজ, তাই কাজের কথা মনে করিয়া দেবার কারুর আর সাহস নেই।

'খুব বাড়ী দেখছ?' সুবালা বলে ফেললে হাসতে হাসতে।

সুরেশ চমকে উঠল, 'কৈ একটাও টু-লেট তোমার চোখে পড়েছে?'

'অনেক।' সুবালার কণ্ঠে তেমনই কৌতুক।

'সর্ব্বনাশ! বলনি কেন?'

'তুমিও ত দেখেছ।'

'আমি? না, না, আমি কি আর তোমার মত অন্য-মনস্ক ভেবেছ না কি? পুরুষ মানুষের একটা কর্ত্তব্য-বোধ নেই? ঐ যে। ঐ দেখ একটা টু-লেট ঝুলছে, চল, দেখলে ত?'

অনেক কড়া-নাড়া এবং হাঁক-ডাকের পর তবে দরজা খুলল এক বৃদ্ধ। কৃশ জীবন্ত একখানা কঙ্কাল, খালি গা, বুকের সব ক'খানা হাড় গোনা যায়, মুখে এক টুকরো বাঁকা হাসি।

'দেখুন, এখানে কি বাড়ী ভাড়া আছে?' সুরেশ বললে।

'আছে বৈ কি!' বুড়ো হেসে বললে, 'না হলে আপনারা আর এলেন কেন? এই যে এই দু'খানা ঘর, এ'খানা আর একখানা পাশে, ওপরে আমি থাকি; কল, বাথরুম সব আলাদা, একটা রান্নাঘর, উঠোন, প্রায় চার দিকই খোলা, আপনাদের ঢোকবার আলাদা রাস্তা,

আমাদের আলাদা, কোন রকম অসুবিধে নেই, সব সময়েই আলো হাওয়া খেলছে, ঐ সামনেই একটা পার্ক, বেড়াবার কোন অসুবিধে হবে না, কাছেই বাজার, পাঁচ মিনিটের রাস্তা, চোখ তুললেই হাই স্কুল, পড়াশুনোর কোন অসুবিধে হবে না, মোড় ফিরলেই বাস, বা যদি ট্রামের মানুষটি থাকে ত এই মিনিট পাঁচ ছয়। পাড়া খুব ভাল, সম্ভ্রান্ত পল্লী, সব ভদ্রলোক। কয়েকটা বাড়ী পরেই হাইকোর্টের এক জজ থাকেন, আরও কয়েকটা বাড়ী পরে একজন রায় বাহাদুর, তাঁর ছেলে আবার ডেপুটি। আর চারদিকেই দেখছেন ত' কেমন খোলা, ঝকঝকে তকতকে। আজকাল লোকে শিখেছে মশাই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কেমন করে থাকতে হয়। একেবারে নূতন বাড়ী, ছেলে বদলি হয়ে চলে গেল নাগপুরে, সঙ্গে বৌ আর দুই নাতি, ঘরগুলো আর পড়ে থাকে কেন, ভাড়া দিয়ে যদি কয়েকটা টাকা আসে। আমি চাই ভদ্রলোক, টাকার প্রতি লোভ আমার বিন্দুমাত্র নেই, আসুন না এখানে, এলেই বুঝতে পারবেন পেশাদার বাড়ীওয়ালার সঙ্গে আমার তফাৎ। যাদের কাছ থেকে টাকা নেয় লোকে তাদের প্রতি ভাল ব্যবহার করে না, অথচ তাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করাই সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজন, দুনিয়াতে টাকাই সব নয়।'

'তা, দেখি একবার ঘরগুলো ভাল করে।' সুরেশ অবশেষে বললে।

'নিশ্চয়ই, দেখবেন বৈ কি! দেখবেন না? যেখানে সংসার পাতবেন, যেখানে একটা পাকাপাকি বন্দোবস্ত করতে যাচ্ছেন—সেখানে সব দেখে শুনে ভেবে চিন্তে—দেখবার কিছু নেই আপনাকে বলে দিলুম আমি, এমন সুবিধার বাড়ী কদাচিৎ মেলে, তিনটে কল, ছুটো চৌবাচ্চা, স্নানের ঘর, একটা উঠান, বারান্দা, একটা ভাঁড়ারের জায়গা, মেথর আসবার আলাদা একটা রাস্তা, রান্নাঘরের পাশেই খাবার জায়গা, কাপড় শুকোবার বিন্দুমাত্র অসুবিধা নেই, দরকার হলে ছাদ ব্যবহার করতে পারেন, বেড়াতে পারেন ছাদে, দক্ষিণের জানলা দিয়ে হু হু করে হাওয়া আসে, পুবদিকে খটখটে রোদ। আর কোন রকম ঘোর-ছাঁচড়ের উৎপাত নেই, সটান খুলে বেরিয়ে যান না, কোন পরোয়া নেই, দিন-রাত রাস্তায় পুলিস টহল দিচ্ছে; দেবে না? পুজোর বকশিশ, দোলের বকশিশ, বড়দিনের বকশিশ।'

'কৈ, ঘরে ত' খুব আলো নেই।' সুরেশ ভাল করে চারদিকে তাকিয়ে বললে।

'বাইরেই কি আজ আলো আছে মশাই?' বুড়ো বললে, 'যা মেঘ করেছে, দেখেননি রাস্তায় আসতে আসতে?'

'না এ যেন বড্ড অন্ধকার মনে হচ্ছে।'

ঘরের জানালাগুলো খোলাই ছিল, বুড়ো আরও ভাল করে খুলে দিয়ে বললে, 'এর চাইতে আর কি বেশী আলো চান?'

সুরেশ জানলার কাছে এসে বাইরে তাকাল ভাল করে, 'কৈ, আপনি বলছিলেন পুবদিকে খোলা, বিরাট এক বাড়ী দেখছি, রীতিমত অট্টালিকা মশাই। মাঝখানে ক'হাত জায়গা আছে হিসাব করতে পারেন?'

বুড়ো বললে, 'প্রায় পনেরো হাত, কলকাতা শহরে ওর চাইতে বেশী আর কি খোলা চান আপনি?'

সুরেশ বললে, 'তা বটে, আলো এলেই হল, বাড়ী থাক আর নাই থাক।'

সুবালার মুখে হাসি ফুটে উঠল।

বুড়ো বললে, 'ঠিকই ত! বুদ্ধিমান্ আপনি! আর আলো মশাই লাগে কিসে? খাবার জিনিষ? পেট ভরে?'

'তা দক্ষিণ দিকটা খোলা ত?' সুরেশ দক্ষিণের জানালার দিকে এগিয়ে গেল, দক্ষিণেও একতলা এক খানা বাড়ী। 'একি মশাই, এদিকটাও যে বন্ধ দেখছি।'

'কৈ বন্ধ?' বুড়ো এগিয়ে এল জানলার কাছে, 'বাতাস কি মাটিতে হামাগুড়ি দিয়ে আসে? হাওয়া ত আসবে বাড়ীর ওপর দিয়ে? দাঁড়ান দিকি একবার জানলার কাছে নাক বার করে, নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে। খালি জায়গা কি কলিকাতা শহরে পড়ে থাকবার জো আছে?'

'ঘরে কি ড্যাম্প ওঠে?' সুরেশ বললে।

'ড্যাম্প? রামোঃ। মাটির নীচে ক'হাত খোয়া সুরকি দিয়ে ভিত গাঁথা হয়েছে, তার ধারণা করতে

পায়েন ? ডাম্প কোথেকে উঠবে ? নীচে কি কেউ ছিল কোন দিন, দরজা জানলা সব সময়েই বন্ধ, একটু ভিজে ভিজে ত লাগবেই।'

'অনেক দিন বোধ হয় চুণকাম করা হয় নি ঘরগুলো, আমরা যদি আসি—'

'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, নাঃ এ একটা কি কথা বললেন ? আমার কি একটা আক্কেল নেই ? এই ত সেদিন সমস্ত বাড়ী চুণকাম করা হয়েছে, কিন্তু তাতে কি এসে যায় ? আবার চুণকাম করে দেব, আগে কথাবার্ত্তা পাকা হোক।'

'চলুন, দেখা যাক ভাল করে।'

তিনজনেই বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

'কৈ উঠোন কোথায় বলছিলেন যে ?'

'কেন ? ঐ জায়গাটাকে কি বলবেন আপনি ?' বুড়ো চোখ দুটো কপালে তুলে ফেললে।

সুরেশ এবং সুবালা দু'জনেই তাকিয়ে দেখে চৌবাচ্চার পাশে কয়েক হাত নোংরা জায়গা, বাড়ীর সমস্ত জঞ্জাল জড় করা, কতদিন যে পরিষ্কার করা হয় নি কে জানে, একটা ভ্যাপসা দুর্গন্ধ ভেসে আসছে।

'ঐ উঠোন ? ও দিয়ে কি হবে ?'

'কেন ? বাসন-মাজা, বড়ি শুকোতে দেওয়া, চাই কি টবে ফুলগাছ লাগিয়ে একটা বাগানও করতে পারেন, কি হবে মানে কি ? কলকাতা শহরে এক কাঠা জায়গার দাম ক'হাজার টাকা খোঁজ রাখেন ? ঐ জায়গায় আপনি দু' বেলা জন বৈঠক মারতে পারেন, মানে স্বাস্থ্যচর্চ্চা আর কি ! আসুন ! এই যে আর একখানা ঘর, দেখুন ভাল করে।'

এ ঘরখানা অপেক্ষাকৃত ছোট, জানলাও কম, দিনের বেলাতেও বেশ অন্ধকার।

'এটা ত মশাই রীতিমত অন্ধকার।' সুরেশ বললে।

'বলেন কি ? অন্ধকার ! ও-ঘরের চেয়ে একটু উনিশ-বিশ।'

'একটা গন্ধ পাচ্ছেন না ?'

'গন্ধ ? কৈ না ত।'

সুরেশ জানলার পাশে এসে দেখল পাশেই একটা কাঁচা নর্দ্দমা, পচা ভাত আর ডাল, ময়লা ন্যাকড়া। সুরেশ সরে এল জানলা থেকে।

'নর্দ্দমাটা বাঁধিয়ে ফেললেই পারেন, রাস্তার ড্রেনের সঙ্গে স্লোপ করে।'

'ফেলবই ত ! বাড়ীতে কে আছে যে অত হাঙ্গামা করব ! থাকি ওপরে, বলতে গেলে নীচের সঙ্গে প্রায় কোন সম্বন্ধই নেই। আপনারা যদি থাকেন কয়েক বছর তা হলে আস্তে আস্তে সব ঠিক করে দেব।'

'যদি আসি আগেই এ-সব ঠিক করে দিতে হবে, বড্ড আন্‌হেল্‌দি মনে হচ্ছে আমার—'

'রান্নাঘর কোন্ দিকে ?' সুবালা মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলে।

'ঐ যে !' বুড়ো আঙুল দিয়ে বারান্দার প্রান্ত দেখিয়ে দিলে, 'ঐ কোণটা টিন দিয়ে ঘিরে দিলে চমৎকার রান্না-ঘর হবে, একটা ছোট দরজাও থাকবে—'

'তা আপনি বলছিলেন যে, একটা রান্নাঘর আছে !'

'ঐ ত' হল, ছোট বাড়ীতে আর কত বড় রান্নাঘর দরকার ? আপনারা লোকও ত' বেশী নয় মনে হচ্ছে, ওতেই সব ম্যানেজ করতে পারবেন, রান্নাঘর রান্নার জন্যে, শোবার জন্যে ত নয়, বেড়াবার জন্যেও নয়।'

'ভাঁড়ার কোথায় হবে ?' সুরেশ জিজ্ঞেস করলে।

'ঐ ত ! ওর মধ্যে হবে না ? একটু বেশী করে ঘিরে দেব। বাঙ্গালীর আবার ভাঁড়ার। চাল ডাল ত থাকবে শোবার ঘরে, নুন তেল আর মশলা, তেজপাতা আর জল—এ-কটা জিনিস রাখতে ক'হাত জায়গা লাগে ভাই, ওতেই সব কুলিয়ে যাবে।'

সুরেশের কয়েক মিনিট বাক্যস্ফূরণ হল না। আচ্ছা লোক ত ! 'বাথরুম কোথায় ?' সুরেশ জিজ্ঞেস করলে।

'ঐ ত !' চৌবাচ্চার পাশে সেই নোংরা জায়গা বুড়ো হাত দিয়ে দেখিয়ে দিলে।

'ওখানে কি স্নান করা যায় না কি ?'

'যায় না ? বলেন কি ? নেহাৎ চান ত দু'খানা দরমা দিয়ে ঘিরে দেব।'

'শুনুন !' সুরেশের কণ্ঠে বিরক্তি, 'যদি এখানে আসা ঠিক হয়, তা হলে পয়লা নম্বর ঐ কাঁচা ড্রেনটা পাকা করে দেবেন, দ্বিতীয় নম্বর চৌবাচ্চার পাশে ঐ কাঁচা জায়গাটা বাঁধিয়ে দেবেন এবং বেশ করে টিন দিয়ে ঘিরে স্নানের

জায়গা করবেন, তৃতীয় নম্বর ঘরগুলো চুণকাম করতে হবে। দেখুন যদি রাজী হন তা হলে কথাবার্তা পাকা করে ফেলা যাক আজকেই, চান ত কিছু বায়না করেও যেতে পারি।'

'যা আপনার লিষ্টি', বুড়ো নরম গলায় বললে, 'তাতে একশ টাকার ধাক্কা দেখছি।'

'বাঃ এ-সব না হলে চলবে কেন? রোগে মরতে পারি না ত!' কয়েক মিনিট উভয় পক্ষই চুপচাপ।

'বাজার কোথায় করেন আপনারা?' নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে সুরেশ জিজ্ঞেস করলে।

'কেন কাছেই ত! ল্যান্সডাউন মার্কেট।'

'ল্যান্সডাউন মার্কেট কাছে হল?' সুরেশ আকাশ থেকে পড়ল 'এখান থেকে এক মাইল পথ যে!'

'এক মাইল আবার পথ না কি?' বুড়ো খানিকটা হেসেই ফেললে, 'এ বয়সে ও-টুকু রাস্তাকে ভয়? ছেলে বয়েসে মশাই পাকা তিন মাইল রাস্তা হেঁটে সমানে সাত বছর স্কুল করেছি, বাঙালীর অধঃপতনের কি একটা কারণ?'

'যা হোক, বাজার কোন রকমে চলে যাবে, এক সঙ্গে দু'দিনের জিনিসপত্র কিনে আনলেই চলবে, কিন্তু বাস খুব কাছে বলছিলেন—'

'কাছে, খুব কাছে, হাজরার মোড়—'

'হাজরার মোড়?' সুরেশ আশ্চর্য্য হয়ে তাকাল বৃদ্ধের মুখের দিকে, 'হাজরার মোড় ত' এখান থেকে তিন পোয়া পথ।'

'না না, কি বলছেন আপনি। আপনার যাতায়াত নেই কি না, তাই।'

'কে বললে যাতায়াত নেই? না মশাই এখানে থাকা হবে না, আপনার একটা কথারও ঠিক নেই; শেষকালে হয় ত বলবেন বাড়ীটাই আপনার নয়, আপনি শুধু—'

'মুখ সামলে কথা বলবেন মশাই!' বুড়ো ভীষণ রেগে গেল।

'মুখ সামলে কথা বলতে আপনারই শেখা উচিত,' সুরেশ রুখে দাঁড়াল, সুবালা তাকে বাধা দিতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই সে বলে উঠল, 'গোড়া থেকে যা সত্যি কথা বলে আসছেন, যুধিষ্ঠির লজ্জায় মাথা হেঁট করত।'

'এই মুহূর্ত্তে আপনি আমার বাড়ী থেকে বেরিয়ে যান।'

'আমার সন্দেহ আছে এ বাড়ী আপনার কি না। থাকতে আসিনি আপনার বাড়ীতে, কিন্তু আপনি দম-কালেই অমনি পালাব না, ধীরে সুস্থে যখন খুশি যাব।'

বুড়ো রাগে গর গর করতে করতে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

'চল, আর গোলমাল করে কাজ নেই।' সুবালা তার হাত ধরে আকর্ষণ করল।

'দেখি না, বুড়ো কি করে।'

কিন্তু বুড়ো আসা পর্য্যন্ত সুবালা তাকে অপেক্ষা করতে দিলে না, তারা রাস্তায় এসে পড়ল।

দ্বিপ্রহরের প্রখরতা কমে এসেছে। ঐ অন্ধকার, অপরিচ্ছন্ন ঘর থেকে রাস্তার খোলা হাওয়ায় এসে ওরা নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল।

এগিয়ে চলল তারা। আর একখানা টু-লেট-এর বিজ্ঞাপন দেখে তারা সে বাড়ীর কড়া নাড়ল। একজন মধ্যবয়সী লোক দরজা খুলে দিলে।

'বাড়ী ভাড়া আছে?' সুরেশ জিজ্ঞাসা করল।

'আছে, আসুন।'

দুজনে দেখলে সব ঘুরে ফিরে। তিন খানা ঘর, ভালই প্রায় সবই আলাদা ব্যবস্থা; স্নানের ঘর, রান্নাঘরও আছে।

'কত ভাড়া?' সুরেশ জিজ্ঞাসা করলে, বাড়ী আমার পছন্দ হয়েছে।'

'পঁয়তাল্লিশ।'

'বড্ড বেশী, গোটা পঁয়ত্রিশেক টাকা হলে আমার সুবিধে হয়।'

'না, দেখুন, অত কমে হবে না। টাকা দুই কমিয়ে দিতে পারি, যদি আপনারা এক বছর থাকবেন লেখাপড়া করে দেন।'

'থাকার ব্যাপারে কি লেখাপড়া করে দেওয়া চলে মশাই?' সুরেশ বললে, 'কত কি কারণ ঘটতে পারে,

ভবিষ্যতের কথা কি বলা যায়? আমি আর গোটা দুই টাকা দিতে পারি বেশী, দেখুন যদি হয়।'

লোকটা মাথা নাড়লে, বললে, 'তেতাল্লিশ টাকা হতে পারে যদি অন্ততঃ দু'মাস থাকবেন লিখে দেন।'

ফিরে এল তারা। আবার রাস্তা। হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে; সন্ধ্যারম্ভের আর দেরী নেই বিশেষ।

ফেরবার পথে রাস্তার ধারে আর একখানা বাড়ীর প্রতি তাদের নজর পড়ল।

বাড়ীর মালিক একজন বিধবা। বাড়ী তারা দেখল।

একখানা বড় ঘর আর একখানা ছোট, দুই দিক বন্ধ, দুই দিক খোলা; তা হোক, সুরেশ ভাবলে গরীবের আবার পছন্দ কি? তা ছাড়া মন্দ কি। থাকতে থাকতে আবার ভাল লেগে যাবে। দরজার পাশেই সামান্য একটু খানি জায়গা, 'এইখানটায় রাঁধতে পারবে না কোন রকমে?' সুরেশ জিজ্ঞাসা করলে।

'পারব।' সুবালা মাথা নেড়ে বললে। ছোট ঘরটায় মাকে দেবে, বড় ঘরটায় তারা থাকবে, ঘরে কয়েকটা তাক আছে তাতেই রান্নার জিনিসপত্রগুলা কোন রকমে গুছিয়ে রাখবে।

'আচ্ছা বাথরুম কোথায়?' সুরেশ জিজ্ঞেস করল।

'ভিতরে বাথরুমে মেয়েরা স্নান করবেন আর ঐ বাইরে আপনি আর অন্যান্য যদি কেউ থাকে।'

'ঐ রাস্তার উপর খোলা জায়গায়? ওখানে কি কেউ স্নান করতে পারে না কি?'

'বাঃ, পারবে না কেন? আর আগে যারা ছিল তাদের মেয়েরাত ওখানেই স্নান ধোয়া-মাজা করত।'

'আচ্ছা জায়গাটা না হয় আমি ঘিরেই নেব, তা ভাড়া কত?'

'পঁয়ত্রিশ।'

'আশ্চর্য্য! দু'খানা ঘরের জন্য পঁয়ত্রিশ টাকা ভাড়া? তার আবার একখানা বেজায় ছোট!'

'পঁয়ত্রিশ টাকা বেশী না কি, ওই যে ও-ফুটে দোকানটা দেখছেন ওর ভাড়া বলতে পারেন? আটত্রিশ টাকা।'

'না, দেখুন ভাড়া বড় বেশী।'

আবার রাস্তা।

সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। আর বাড়ী খোঁজবার সময় নেই। ঝি বোধ হয় এতক্ষণে উনুনে আগুন দিয়েছে।

'চল, এবার বাড়ী ফিরি, অনেক বাড়ী দেখা হয়েছে।' সুবালা বললে।

ফেরবার পথে।

'আচ্ছা কাল রাত্রে বাড়ী দেখতে বলছিলে, কৈ অসুবিধে কি তা বল নি ত'।'

'অনেক অসুবিধে।'

'কি?'

'রান্নাঘরে জল পড়ে, বৃষ্টি এলেই ভিজে একাকার।'

'কৈ এত দিন ত বল নি।'

'বলে লাভ কি?'

'দুখানা টিন দিয়ে দিলেই ত আর জল পড়ত না।' সুরেশ ক্লান্ত কণ্ঠে বললে।

'টিন দেবার ওখানে জায়গা কোথায়?'

'অনেক জায়গা আছে। আর কি অসুবিধে?'

'একটা চৌবাচ্চা না হলে চলে কখনও? কলে জল কতক্ষণ থাকে?'

'চৌবাচ্চা একটা ত' নিজেরাও করে নিতে পারি, ক'টাকাই বা খরচ?'

'ঘরগুলোতে চুণকাম করা দরকার, বাড়ীওয়ালা খারাপ লোক, সে কি চুণকাম করে দেবে?'

'না দেয়', সুরেশ উৎসাহিত কণ্ঠে বললে, 'আমি করে নেব, মোটে চার পাঁচ টাকার ব্যাপার।'

নানা কথাবার্ত্তার পর তারা ফিরে এল তাদের পুরান আস্তানায়, মন তাদের আনন্দে ভরে গেল, চারিদিকে শৃঙ্খলা আর শান্তি, পরিষ্কার আর ঝটঝটে, দক্ষিণের খোলা জানালা দিয়ে বাতাস আসছে হু হু করে। এমন বাড়ী কলকাতা সহরে আর আছে না কি? গন্ধ নেই, ধুলো নেই, ধোঁয়া নেই, যে অসুবিধেগুলো তাদের কাছে এত দিন অসহনীয় মনে হয়েছিল, আজ আর সে-সব অত ভয়াবহ মনে হচ্ছে না, বরং এ চমৎকার বাড়ী ছেড়ে অন্য কোথাও যাবার দুর্ব্বুদ্ধি হয়েছিল বলে তারা মনে মনে লজ্জিত হল। কোনদিন তারা বোকেনি এ বাড়ীর ঘর, আঙ্গিনা, তুলসীতলা তাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে এমন আশ্চর্য্যরূপে খাপ খেয়ে গেছে।

হাত পা ধুয়ে সুরেশ নিশ্চিন্ত হয়ে বসল। সুবালা গেল রান্নাঘরের দিকে, এক ফাঁকে জল গরম করে সুবালা তৈরী করে নেবে দু পেয়ালা চা।

লুই পাস্তুর

—শ্রীনীলরতন কর

অকপট সারল্যের সহিত নিজ মানসিক ক্ষমতার গভীরতা সম্বন্ধে সজাগদৃষ্টি পাস্তুরের মধ্যে যুগপৎ বিকাশ লাভ করেছিল। সাধারণতঃ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের মধ্যে যে গর্ব বা অহঙ্কার স্বভাবতই জাগ্রত হয়, তার বিন্দুমাত্রও তাঁর মধ্যে ছিল না; তৎপরিবর্তে নম্র কমনীয় ভাব তাঁর চরিত্রে মহনীয়রূপে প্রকাশিত হয়েছিল।

এদিকে ষ্ট্রাসবুর্গে নানাবিধ প্রস্তাবের সংবাদ যেতে সুরু হল। রেক্লো প্রস্তাব করলেন যে, তিনি নিজে একল্ পলিটেক্-এর অধ্যাপনা ছেড়ে দিয়ে সেই স্থান পাস্তুরকে দেবেন। আবার অনেকে বললেন যে, পাস্তুরকে একল্ নর্মালের প্রধান অধ্যাপক পদে নিয়োগ করা হোক। পাস্তুর কিন্তু সে সকল কথায় কিছুমাত্র কর্ণপাত করলেন না। কি করে কতকগুলি আলোক-সক্রিয় বস্তুর স্ফটিকাকার বিভিন্ন দ্রবণকারী বস্তু সাহায্যে পরিমিত করা যায়, তখন তিনি সেই চিন্তাতেই নিমগ্ন।

আগষ্ট মাসে তাঁর সঙ্গে জার্মানির স্ফটিকবিদ্ মিৎসার্লিক্ ও রোজ্ মহাশয়ের সাক্ষাৎ হয়। তাঁরা সে সময়ে ফরাসী বিজ্ঞান-পরিষদের সম্মত মনোনীত হওয়ায়, ধন্যবাদ জ্ঞাপনের নিমিত্ত পারীতে গিয়েছিলেন। সেখানে আকাদেমীর অন্যান্য সদস্যেরাও নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন; একমাত্র পাস্তুরই তাঁদের মধ্যে আকাদেমীর সভ্য ছিলেন না। নিমন্ত্রণ-সভায় তাঁদের নানা প্রসঙ্গ আলোচনা হচ্ছিল। তার মধ্যে থেকে পাস্তুর শুনতে পেলেন যে, জার্মানির এক টার্টারিক্-অ্যাসিডের কারখানায় কিছু পরিমাণ রেসিমিক্ অ্যাসিডও তৈরী হয়। মিৎসার্লিক্ বললেন—'আমার বিশ্বাস, কেস্টনেয়ার্ ১৮২০ অব্দে যে অ্যাসিড প্রস্তুত করেছিলেন, তার জন্য টার্টার গিয়েছিল জিধেন্তে হতে।' এই সংবাদ পেয়ে পাস্তুর জিধেন্তে যাবার সঙ্কল্প করেন। রেসিমিক্ অ্যাসিডের উৎপত্তি বিষয়ে সন্ধান করবার জন্য যাতে মিনিষ্ট্রি, অথবা বিজ্ঞান-পরিষদ্ হতে ব্যবস্থা হয়, এই উদ্দেশ্যে তিনি বিয়ো এবং দ্যুমাকে অনুরোধ করলেন। কিন্তু সরকারী কাজের বিধিনিয়মের দীর্ঘসূত্রতা তাঁর কাজের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল। তিনি অপেক্ষা করে করে শেষে উত্যক্ত হয়ে উঠলেন। ইতিমধ্যে তিনি মিৎসার্লিকের নিকট হতে, ফিকেকার নামে লাইপজিগের এক উত্তম টার্টারিক অ্যাসিডের কারিগরের সংবাদ পাওয়ায়, অপর কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে বৈজ্ঞানিক অভিযানের বন্দোবস্ত করে ফেললেন। ১৮৪২-এর ১২ই সেপ্টেম্বর তাঁর যাত্রা সুরু হল।

লাইপজিগে গিয়ে পাস্তুর খবর পেলেন যে, ফিকেকার বিশ বৎসর আগে রেসমিক্ অ্যাসিড পেয়েছিলেন। সে সময়ে টার্টারসমূহ জিধেন্তে হতে যেত। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সেরূপ বেশী পরিমাণে রেসিমিক অ্যাসিড পাওয়া যায় নাই। কারণ পল্লী অঞ্চল হতে যে সকল টার্টার সেখানে পৌঁছায়, তার সমস্তই অন্তত একবার করে শোধন করা থাকে। তখন তিনি ভাবলেন যে, যে সকল স্থানে একেবারে প্রকৃতিজাত অশোধিত টার্টার পাওয়া যায়, সেইখানে যেতে হবে।

তিনি ১৮ই সেপ্টেম্বর মেপলস্ হতে আনীত এক টার্টারের নমুনা পরীক্ষা করেন। নমুনাটি একবার শোধন করা ছিল, সে জন্য খুব সূক্ষ্ম পরীক্ষা করে তবে রেসিমিক্ অ্যাসিডের সন্ধান পেলেন। এই পরীক্ষায় তাঁর আর কোন সন্দেহই রইল না যে, প্রথম শোধন প্রক্রিয়াতেই টার্টার হতে অধিকাংশ রেসিমিক্ অ্যাসিড পৃথক্ হয়ে যায়। কিন্তু এই তথ্য প্রমাণ করার জন্য তিনি নানাস্থানের টার্টার পরীক্ষা করতে লাগলেন।

ভিয়েনার কোন এক টার্টারিক অ্যাসিডের কারখানা পরিদর্শন করতে গিয়ে তিনি সেখানকার কারিগরদের কাছে এক অদ্ভুত খবর শুনলেন; তাদের শোধন-প্রক্রিয়ায় না কি 'সল্‌ফেট অব পটাশ' নামক বস্তুবিশেষ সংযোগের সূত্রপাত করছে। কিন্তু পাস্তুর দেখলেন যে, সেটি রেসিমিক্ অ্যাসিড ব্যতীত অপর কিছু নয়।

অতঃপর তিনি গ্রাসের কোন এক টার্টারিক্ অ্যাসিড কারখানা দেখতে যান। ডক্টর বাস্‌মান্ নামে এক ব্যক্তি সেখানকার রসায়নবিদ্ ছিলেন। তাঁর নিকটে পাস্তুর

রেসিমিক অ্যাসিড প্রস্তুতের বিষয় জিজ্ঞাসা করায় তিনি তাচ্ছিল্যভরে বললেন যে, ও সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা অনাবশ্যক; তিনি বহুদিন পূর্বেই রেসিমিক অ্যাসিড প্রস্তুত করেছেন; রেসিমিক্ অ্যাসিড বাজারের জিনিষ; কারখানায় যথেষ্ট পরিমাণে তৈরী হয়ে থাকে। এইরূপ উত্তর পেয়ে পাস্তুর আগ্রহান্বিত হয়ে রাস্‌মান্‌কে বললেন, 'আপনি তা' হলে রসায়ন-জগতে একটা খুব বড় তথ্য আবিষ্কার করেছেন। হয়ত আপনি তার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারছেন না। আমি ত' এই আবিষ্কারকে খুবই সুসাধ্য ভাবছায়। আমি আপনার গোপন তথ্য বিষয়ে জানতে চাই না, কিন্তু সেটি প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করব। আচ্ছা, আপনি কি তা' হলে বিশুদ্ধ টার্টারিক অ্যাসিড হতে রেসিমিক্ অ্যাসিড প্রস্তুত করতে পারেন?'

উত্তরে রাস্‌মান স্পষ্ট কিছু বলতে পারলেন না। তখন পাস্তুর মনে মনে এই কথা ইতস্তত করতে লাগলেন যে, যদি তিনি প্রকৃতই টার্টারিক অ্যাসিড হতে রেসিমিক্ অ্যাসিড প্রস্তুতে সমর্থ হয়ে থাকেন, তা হলে একটা খুবই বড় তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু রাস্‌মান্ ভুল করেছিলেন। তাঁর কাজ ফিকেল্কার-এর অপেক্ষা কোন অংশে শ্রেষ্ঠ ছিল না। অবশেষে পাস্তুরেরই গবেষণা-ফলে বিশুদ্ধ টার্টারিক্ অ্যাসিড রেসিমিক্ অ্যাসিডে রূপান্তরিত হয়েছিল।

পাস্তুরের সেই গবেষণা-কার্য্য পর্য্যালোচনার নিমিত্ত ১৮৫৩ অব্দের ৩রা জানুয়ারী তারিখে আকাদেমীতে সভা হয়। এই কার্য্যের জন্য পাস্তুর legion de' honeur দ্বারা সম্মানিত হন এবং পারীর ফার্মেসিউটিকল্ সোসাইটি হতে ১,০০০ ফ্রাঁ পুরস্কার পান। তিনি সেই অর্থের অর্দ্ধেক ব্যয় করেন ষ্ট্রাসবুর্গ আকাদেমীর বীক্ষণাগারের যন্ত্রাদি ক্রয় করতে। কারণ রাজকোষ হতে সমগ্র রসায়ন বিভাগের খরচা স্বরূপ মাত্র ১,২০০ ফ্রাঁ দেওয়া হত, সেই সামান্য অর্থে বীক্ষণাগারের অভাব পূরণ হত না। পুরস্কার লাভ করে পাস্তুর নবীন উৎসাহে স্ফটিকতাত্ত্বিক গবেষণাকার্য্য পরিচালনা করেন। সেই অনুসন্ধানের ফলে অণুর বিপরীত-সামরস্য (molecular dissymetry) বিষয়ে যে নূতন তত্ত্ব গড়ে উঠেছিল, তাকেই ভিত্তি করে রসায়নিক বিজ্ঞান বিস্তার এক অভিনব শাখা উদ্ভূত হয়েছে। তার নাম 'ষ্টেরিও কেমিষ্ট্রি' বা অণুর বিভিন্ন অংশের বৈশিক বিন্যাসতত্ত্ব।

লিল্ ফাকুল্‌তের অধ্যক্ষ পদে; দুগ্ধাম্লজনক কিণ্বন-ক্রিয়া বিষয়ে গবেষণা; সুরাম্লজনক কিণ্বনক্রিয়া বিষয়ে অনুসন্ধান; একল্ নর্ম্মালে তত্ত্বাবধায়কের কার্য্য

"কোন বিষয়ের মূলসূত্র কিংবা অন্তর্নিহিত তত্ত্ব সম্বন্ধে না জেনে কাজ করলে চিরাচরিত অভ্যাসের পুনরাবৃত্তি ব্যতীত আর কিছুই হয় না। থিওরী বা সিদ্ধান্তের ভিতর দিয়েই নূতন আবিষ্কারের স্পৃহা জাগ্রত হয়। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সকল সময়ে ব্যবহারিক কাজে না লাগলেও তাকে উপেক্ষা করা উচিত নয়। এ প্রসঙ্গে ফ্রাঙ্কলিন একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। একদা ফ্রাঙ্কলিন জনসাধারণ সমক্ষে তাঁর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার প্রদর্শন করছিলেন। দর্শকগণ হঠাৎ তাঁকে প্রশ্ন করল যে, সেই আবিষ্কারের আবশ্যকতা কি? তদুত্তরে ফ্রাঙ্কলিন জিজ্ঞাসা করলেন, 'বলতে পারেন নবজাত শিশুকে কি প্রয়োজন আছে?'

যেমন অল্পবয়স্ক শিশুর মধ্যেই তার ভবিষ্যৎ প্রতিভার বীজ সুপ্ত থাকে, বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ার মধ্যেও তেমনই তার ভবিষ্যৎ কার্য্যকারিতা নিহিত থাকে। তারই সাহায্যে ভবিষ্যতের আশা জাগ্রত হয়।

কেবল তার অনুশীলন করা এবং বর্দ্ধনে সাহায্য করা প্রয়োজন। যখন এই কার্য্যের পরিণতি মঞ্জরিত হয়ে দেখা দেয়, যখন তার ফলপ্রসূ ঐশ্বর্য্যসম্পদ্ প্রকাশ পায়, তার সুগন্ধি এবং আস্বাদনের মধুরতা তখনই অনুভূত হয়।

অনেক সময়ে কোন কোন বৈজ্ঞানিক অকস্মাৎ একটি সামান্য ঘটনা দেখে একটা বড় রকম বৈজ্ঞানিক তথ্যের সন্ধান পান। কিন্তু সেই ঘটনা লক্ষ্য করার সুযোগ গ্রহণ করতে তাঁদের মন পূর্ব্ব হতেই প্রস্তুত থাকে।"

এইরূপে পাস্তুর বিশাল জনমণ্ডলী সমক্ষে বক্তৃতা করছিলেন। সেদিন লিল্ ফাকুল্‌তে দে সিয়াঁসের প্রথম উদ্বোধন-দিবস।

লিল্ ফ্রান্সের উত্তর অঞ্চলের একটি সমৃদ্ধ সহর; নানারূপ ব্যবসায়-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল। সেখানকার সহরবাসীদের প্রদত্ত অর্থে 'লিল্ ফাকুল্‌তে দে সিয়াঁস' নামক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। পাস্তুর ১৮৫০ অব্দের মে মাসে সেখানকার অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ (doyen) পদে

নিযুক্ত হন। ছাত্রগণ যাতে অল্প বেতনে বিজ্ঞান বিষয়ে অধ্যয়ন ও পর্যবেক্ষণ করতে পারে, সেখানে তার উপযুক্ত ব্যবস্থা ছিল। কারখানা বা শিল্পকার্যালয়ে তত্ত্বাবধায়করূপে প্রবেশ-অভিলাষী ছাত্রেরা সেখানে দুই বৎসর হাতে-কলমে শিক্ষালাভ করে, সেই শিক্ষালয় হতে উপাধি লাভ করত। অল্পদিনের মধ্যেই সেখানকার ছাত্রমহলে পাস্তুরের রসায়ন ক্লাসের সুনাম প্রসার লাভ করেছিল। তাঁর অধ্যাপনা-নৈপুণ্যে, তাঁর নিখুঁত ভাষায়, তাঁর প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা-প্রণালীতে সকলের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছিল।

ছাত্রেরা যখন আনন্দিত চিত্তে তাঁর ক্লাসে বক্তৃতা শুনত, তখন তারা ধারণা করতে পারত না যে, বিষয়টিকে সহজবোধ্য ও তৃপ্তিপ্রদ করে তুলতে কতটা শ্রম এবং কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে। পাস্তুর, অধ্যাপনা ও অধ্যক্ষতার নিয়মিত কার্য ব্যতীত ছাত্রদের উপকারার্থে নিজের অমূল্য সময় ব্যয় করেও তাদের নানাভাবে সাহায্য করতেন। তিনি তাদের বিভিন্ন স্থানের শিল্পাগার, চোলাই-এর কারখানা এবং ধাতু-প্রস্তুত কারখানায় দেখাতে নিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন। সেজন্য তিনি একবার বেলজিয়ম পর্যন্ত গিয়েছিলেন।

লিল্ ফাকুলতের বীক্ষণাগারে তাঁর কাজের খুব সুবিধা হয়েছিল। তিনি সমস্ত দিন-রাত্রের মধ্যে যে কোন সময়ে পরীক্ষা-কার্য করতে পারতেন। সেখানে থাকতে তিনি দুগ্ধাম্লজনক কিণ্বনক্রিয়া বা ল্যাক্টিক্ ফার্মেনটেসন্ সম্বন্ধে গবেষণা-কার্য আরম্ভ করেন এবং 'ব্যাকটেরিয়ম ল্যাক্টিস্ অ্যাসিডি' নামক জীবাণুর সন্ধান পান।

এই জীবাণু, দুধ, কোলাগুড় অথবা অপর কোন শর্করা-সংশ্লিষ্ট বস্তুর উপর ক্রিয়া করে ল্যাক্টিক্ অ্যাসিড প্রস্তুত করে। অরক্ষিত বাসি দুধ এই জীবাণুর ক্রিয়ার ফলে অম্লতা প্রাপ্ত হয়। দুধের মধ্যে ল্যাক্টোজ নামে একপ্রকার শর্করা আছে; সেই শর্করার রাসায়নিক পরিবর্তনে যে অম্ল জন্মে তাকে ল্যাক্টিক অ্যাসিড বলে। 'ব্যাকটেরিয়ম ল্যাক্টিস্ অ্যাসিডি' বা দুগ্ধাম্লকারী জীবাণু সেই রাসায়নিক প্রক্রিয়া সাধনে সমর্থ।

নানাপ্রকার দ্রব্য প্রস্তুত কার্যে ল্যাক্টিক্ অ্যাসিড ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ঔষধ হিসাবেও এই অ্যাসিডটি ব্যবহৃত হয়। পশমীবস্ত্রাদি রঞ্জনের জন্য ল্যাকটিক অ্যাসিডের প্রয়োজন হয়। কিন্তু চর্ম-সংস্কার ব্যবসায়ে অ্যাসিডটির ব্যবহার সর্বাপেক্ষা অধিক।

ল্যাক্টিক্ অ্যাসিড প্রস্তুতের জন্য যে সকল কারখানা আছে, সেখানে শর্করাযুক্ত রস বা মাখন তোলা দুধে, দুগ্ধাম্লকারী জীবাণু সংযোগ করা হয় ও তন্মধ্যে সেই জীবাণুর পুষ্টিযোগ্য খাদ্য এবং খড়ি মিশ্রিত করে চল্লিশ হতে পঁয়তাল্লিশ সেন্টি-গ্রেড ডিগ্রী তাপমাত্রার মধ্যে উত্তপ্ত রাখা হয়। এই প্রকার অবস্থায় জীবাণুটির ক্রিয়াশীলতা অতিশয় আনুকূল্য লাভ করে এবং ল্যাক্টিক্ অ্যাসিড গঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে খড়ির উপর দুগ্ধাম্লের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে ক্যাল্সিয়ম্ ল্যাক্টেট্ পাত্রের নিম্নভাগে প্রক্ষিপ্ত হতে থাকে। জীবাণু-সাহায্যে ল্যাক্টিক্ অ্যাসিড প্রস্তুতকালে মিষ্ট রসের মধ্যে খড়ি অথবা অপর কোন কার্বনেট সংযোগ করা অত্যাবশ্যক, নতুবা সামান্য অ্যাসিড প্রস্তুত হবার পরই দুগ্ধাম্লকারী জীবাণু নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। কারণ রসের মধ্যে ল্যাক্টিক্ অ্যাসিডের পরিমাণ শতকরা একভাগের অধিক হলে তাদের ক্রিয়া প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। ক্যালসিয়ম্ ল্যাক্টেট্-এর উপর সাল্ফিউ-রিক্ অ্যাসিড প্রয়োগ করে ল্যাক্টিক্ অ্যাসিড পাওয়া যায়।

জীবাণুরই প্রভাবে দুগ্ধের অম্লতাদোষ উৎপন্ন হয়ে থাকে, এই তথ্য সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন লুই পাস্তার। তিনি দুগ্ধাম্লকারী জীবাণুর আবিষ্কর্তা। তাঁর তৎসম্বন্ধীয় অনুসন্ধান-ফল ১৮৫৭ অব্দের আগষ্ট মাসে 'লিল সোসিয়েতে সিয়ঁতিফিক'-এ প্রকাশিত হয়। সেই গবেষণাপূর্ণ নিবন্ধে (Memoire sur la fermentation appelee lactique), জীবাণু জগতের কর্মকথা প্রথম ব্যাখ্যাত হয়ে জীবাণুতত্ত্ব ও প্রাণী-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় রসায়ন শাস্ত্রের প্রারম্ভ সূচনা করে এবং অস্ত্রোপচার বিদ্যার নবযুগ প্রবর্তনের ভিত্তিভূমি গঠিত হয়। দুগ্ধাম্লজনক কিণ্বনক্রিয়ার গবেষণাকালে পাস্তারের মনে আর একপ্রকার কিণ্বনক্রিয়া বিষয়ে অনুসন্ধানের অভিলাষ জাগে। লিল-এর সুরাকারগণের মদ্য প্রস্তুত করণে অসুবিধার পরিচয় পেয়ে তাঁর সেই ইচ্ছা প্রবল হয়ে ওঠে।

লিল-এ যে সকল পদার্থবিদ্যের কার্যালয় ছিল, তন্মধ্যে সুরা প্রস্তুতের কারখানা সর্বপ্রধান। সেখানে অনেকেই বীট হতে সুরা প্রস্তুত করত। কিন্তু সুরা প্রস্তুত করতে গিয়ে

প্রত্যেকেই নানাবিধ অসুবিধায় পড়ত। কিছুতেই উৎকৃষ্ট সুরা প্রস্তুত করা যেত না। অথচ প্রস্তুত কার্যে কি যে ব্যতিক্রম ঘটত তা' কেউই নিরূপণ করতে পারত না। একদা এক সুরাকার মদ্য-প্রস্তুত-কার্যে হতাশ হয়ে সে বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণের নিমিত্ত পাস্তুরের নিকট যান। পাস্তুর তাঁর কাছে সুরাজনক কিণ্বনক্রিয়ার অসুবিধার সংবাদ পেয়ে সে সম্বন্ধে পরীক্ষা করতে প্রবৃত্ত হন।

সুরাজনক কিণ্বনক্রিয়া বিষয়ে গবেষণাকালে তিনি প্রায় প্রতিদিন একবার করে মদ্যের কারখানাসমূহ পরিদর্শন করতে যেতেন। সেখানে কিছুক্ষণ অতিবাহিত করে নিজের বীক্ষণাগারে প্রত্যাবর্তন করতেন। পাস্তুরের বীক্ষণগৃহে একটি সেকেলে ধরণের কোকপ্রজ্বলিত চুল্লী ও একটা অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছিল। তারই সাহায্যে তিনি নানারূপ পরীক্ষা করে সুরামধ্যস্থ বর্তুলকণাগুলি লক্ষ্য করতেন। ছাঁকা পরিষ্কৃত রসের সঙ্গে অপরিষ্কৃত রসের প্রভেদ কি তা' তুলনা করে দেখতেন। পরীক্ষার ফলে তাঁর মনে যে সকল সন্দেহ ও ধারণা জাগরিত হত, তৎসমুদয় নোট-বইয়ে লিখে রাখতেন। যখন পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিনের ধারণার সঙ্গে পরবর্ত্তী সময়ের পরীক্ষা ফল মিলত না, তিনি তখন সেই সব লেখার নীচে 'ভুল' বা 'প্রমাদপূর্ণ' বলে লিখে রাখতেন। এই ভাবে মাসের পর মাস পরীক্ষা-কার্য্য চলছিল। তাঁর অনুসন্ধান-প্রণালী রসায়ন-জগতে এক বিরাট পরিবর্ত্তন সাধনে ভবিষ্যতের পথে যাত্রা করেছিল।

এদিকে লিল্ ফাকুলতের কার্য্যাবলী বেশ ভালভাবেই চলছিল। কিন্তু একল্ নর্ম্মালের পূর্ব্বেকার উন্নত অবস্থার চিহ্নমাত্র ছিল না। পাস্তুর ভাবলেন যে, লিল্ ফাকুলতে নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে স্বাবলম্বী হতে লিখেছে, সেখানে তাঁর আর প্রয়োজন কি? কথাটা শিক্ষা-বিভাগে জানালেন, অনুমতিও পেলেন। একলের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অর্থ-বিভাগের বিধি-ব্যবস্থা, নিয়মকানুন ও তত্ত্বাবধানের ভার পড়ল তাঁর উপর।

অন্ধকার ঘর, সামান্য কয়েকটা যন্ত্রপাতি, বৎসরে ১,৮০০ ফ্রাঁ সাহায্য—একলের বীক্ষণাগারের সামর্থ্য বড় বেশী কিছু ছিল না। পাস্তুরের পরিশ্রমের অনুপাতে, সেখানকার বাস্তব সাহায্য যৎসামান্যই গিয়েছিল। সমস্তই তাঁর কাছে স্বপ্নের মত মনে হল। গৃহের ছাদের উপরকার দুটি কুঠুরীতে তিনি তাঁর বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম খাড়া করলেন। কেউই তাঁর কাজে সহায়তা করতে গেল না। কিন্তু প্রথমকার সেই বাধাবিঘ্নে তাঁর উৎসাহদীপ নিষ্প্রভ হল না। তিনি অকিঞ্চন বীক্ষণাগারেই দৃষ্টচিত্তে কাজ করতে লাগলেন। তাঁর মানস-চক্ষে কিণ্বনক্রিয়ার সমাধান স্পষ্টরূপে ভেসে উঠেছিল। দেখলেন কোথা হতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবগুলি আসছে, কি সামান্য তাদের আয়তন, অথচ তাদের ক্ষমতা কত বিশাল, কত তীব্র। কিন্তু তিনি সে সকল কথা ব্যক্ত করতে ব্যস্ত হলেন না। তিনি লিখলেন, 'পরীক্ষামন্দির বিজ্ঞানের রাজ্যে ঘটনা ও তথ্যগুলি যতদিন পর্য্যন্ত মানুষকে স্বীকার করে নিতে বাধ্য না করায়, তার পূর্ব্বে কোন মত বা তথ্য নিঃসন্দেহে মেনে নেওয়া কোন ক্রমেই সঙ্গত নয়।'

পরীক্ষামন্দির শারীরতত্ত্ব বিষয়ে পুরস্কারপ্রাপ্তি ; তথাকথিত স্বতঃজননবাদ ; বায়ুমণ্ডলস্থ জীবাণু পরীক্ষা

টার্টারিক অ্যাসিড বিষয়ে গবেষণার পর পাস্তুরের অনুসন্ধানপ্রবণতা রসায়ন শাস্ত্রের গণ্ডী অতিক্রম করে শারীরতত্ত্বের অভিমুখে গমনোন্মুখ হয়। ১৮৬০ অব্দের ৩০শে জানুয়ারী, আকাদেমী দে সিয়াঁস তাঁকে কিণ্বনক্রিয়া সম্পর্কে গবেষণার জন্য ১৮৫৯ অব্দের পরীক্ষামন্দির শারীরতত্ত্ব-বিষয়ক পুরস্কার প্রদান করেন। সুরাজনক কিণ্বনক্রিয়া (alcoholic fermentation), দুগ্ধাম্লজনক কিণ্বনক্রিয়া (lactic acid fermentation) ও টার্টারিক অ্যাসিডের কিণ্বনক্রিয়া সম্পর্কে তাঁর পরীক্ষাসমূহ আকাদেমী কর্ত্তৃক সর্ব্বসম্মতিক্রমে সমর্থিত হয় এবং শারীরতত্ত্ববিদ্ ক্লোদ্ বের্নার তার বিবরণী লিপিবদ্ধ করেন।

পাস্তুরের গবেষণার আলোকরশ্মি জীবনমরণ সমস্যার দুর্ভেদ্য কুহেলিকা অতিক্রম করে দিগ্বিদিকে প্রসারিত হবার চেষ্টা করছিল। তাঁর অনবদ্য পরীক্ষা-প্রণালীর আবিষ্কৃত তথ্য জীবের স্বতঃজননবাদের (spontaneous generation) মিথ্যা ধারণা অপসারণে প্রয়াসী হয়েছিল।

যে অতীতকাল হতে এই অদ্ভুত মতবাদের ইতিকথা জানা যায়, তখন গ্রীক সভ্যতার স্বর্ণযুগ। অ্যারিষ্টটল হতে আরম্ভ করে লুক্রেসিয়াস্, ভার্জিল্, ওভিড, প্লিনী,—দার্শনিক, কবি, বৈজ্ঞানিক সকলেই জীবের স্বতঃজনন ব্যাপারে বিশ্বাস

করতেন। ষোড়শ শতাব্দীতে ফ্যান্ হেল্‌মুট নামে এক ব্যক্তি একটি পাত্রের মধ্যে কয়েক টুকরা ছিন্নবস্ত্র, কিছু ধান ও পনীর রেখে ইঁদুর সৃষ্টির এক অদ্ভুত ব্যবস্থা করেছিলেন। তার কিছুকাল পরে বুওনারি নামে এক ইতালীবাসী এমন কথা প্রচার করলেন যে, তাঁরা উদ্ভিদের আরবা উপন্যাস রচনা করাও সম্ভব নয়। তিনি বললেন—সাগরের জলে কোন কাষ্ঠাদি পচলেই ফলে, একরূপ কীটের উদ্ভব হয়, সেই কীটসমূহ প্রজাপতির জন্ম দেয়, আবার সেই প্রজাপতিগুলি ক্রমশঃ পক্ষীর আকার ধারণ করে। ইতালীদেশীয় চিকিৎসক ও কবি, ফ্রাকেস্‌কো রেদি স্বয়ম্ভু জীবের কল্পনায় সন্দিহান হয়ে, তাঁর অলীকতা প্রতিপাদনের জন্য প্রত্যক্ষ প্রমাণ সংগ্রহে ব্রতী হন এবং কয়েকটি সুস পরীক্ষার সাহায্যে দেখান যে, পচনশীল মাংসাদি হতে মক্ষিকার উৎপত্তি হয় ব'লে যে ধারণা প্রচলিত আছে, সেটি সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। যে সকল ফলের ভিতর ক্রিমিকীটের অস্তিত্ব দেখা যায়, সেই ফলগুলি ফুল হতে ফলাকারে পরিণতি লাভের পূর্ব্বেই তন্মধ্যে কোন না কোন উপায়ে কীটাদির ডিম্বসমূহ ন্যস্ত থাকে, এই ঘটনাটি স্প্যালনজানি নামে এক ইতালীয় বিজ্ঞানাচার্য্যের দৃষ্টিগোচর হয়েছিল। এইরূপ প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যসমূহ স্বতঃজননের কল্পনার বিলুপ্তিসাধনে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল, কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীতে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কার সেই মিথ্যা ধারণাকে পুনরুজ্জীবিত করতে নূতন যুক্তির অবতারণা করে। সকলে বলেন যে, স্বতঃজনন ব্যতিরেকে কি প্রকারে বৃষ্টির জলে অসংখ্য আণুবীক্ষণিক জীবের আবির্ভাব সম্ভব হতে পারে। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে বৈজ্ঞানিক যুক্তি অবলম্বন ক'রে এই সমস্যাটি সমাধানের চেষ্টা হয়। নীডহাম নামে এক ইংরেজ এবং স্প্যালান্‌জানি নামে এক ইতালীয় পাদ্রি তদ্বিষয়ে পর্য্যবেক্ষণ-কার্য্য আরম্ভ করেন। নীডহামের সঙ্গে বুফঁ নামে অপর এক ব্যক্তি যোগ দেন। নীডহাম এবং বুফঁ নানারূপ কল্পনা ও পরীক্ষার সমবায়ে স্বতঃজননের পক্ষে যুক্তি দেখান। কিন্তু স্প্যালান্‌জানি তাঁদের পরীক্ষার ভ্রম নির্দ্দেশ করে তাঁদের নিরস্ত করেন।

মতবাদের এই দ্বন্দ্বযুদ্ধের সময় (১৭৬৯) ভোল্‌তেয়ার এক পত্রিকায় পরিহাস করে লিখেছিলেন, "স্বতঃজননের অদ্ভুত ঘটনায় বিস্মিত হয়ে দার্শনিকবৃন্দ বিভিন্ন সুরে চীৎকার করছেন—কেউ বলেছেন, 'সমস্তই প্রকৃতির প্রাণশক্তি সাহায্যে সৃষ্ট হচ্ছে'; কেউ বলছেন, 'আকর্ষণ'; কেউ বলছেন, 'বস্তুর সমাবেশ'; আবার কেউ বা 'জৈব অণুর সম্মিলন'-এর মহিমা কীর্ত্তন করছেন।"

রুঁা মিউজিয়মের ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত পুশে ১৮৪৮ অব্দের ডিসেম্বর মাসে আকাদেমী দে সিয়াঁসে এক নিবন্ধ পাঠান; নিবন্ধের নাম 'কৃত্রিম বায়ুতে উদ্ভিদ্ এবং অণুজাতীয় সূক্ষ্ম জীবের স্বতঃজনন কথা।' সেই নিবন্ধে তিনি লেখেন যে, তিনি পরীক্ষা করে, বায়ুবর্জ্জিত স্থানে সূক্ষ্ম জীবগণের স্বতঃ-উৎপত্তি লক্ষ্য করেছেন এবং প্রয়োজন হলে তিনি সেই নির্ভুল পরীক্ষা সর্ব্বসমক্ষে প্রদর্শনে প্রস্তুত আছেন। পুশের এই উক্তি পাস্তারকে তার সত্যতা নিরূপণে ব্যাপৃত করে। তিনি এক বৎসর যাবৎ বায়ুমণ্ডলস্থ বস্তুরাশি অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করে এই মন্তব্য করেন যে, বায়ুমধ্যে জ্ঞাত বা অজ্ঞাত যে কোন বস্তু থাকুক না কেন, জীবাণু ব্যতীত অপর কোন দ্রব্যই সেই জীবোৎপত্তির মূল কারণ নয়। এই শুনে পুশে উত্তর দিলেন, 'এ কখনই সম্ভব নয়; বাতাসের প্রতি ঘন মিলিমিটরে* স্থানে কি একেবারে লক্ষ লক্ষ জীবাণুর কোরক বিদ্যমান আছে?' পুশের শিষ্য এবং প্রশিষ্য নিকোলাস্-জোলি ও শার্ল মুসুলে গুরুর পক্ষ সমর্থন করে এক গবেষণা-পূর্ণ নিবন্ধে লেখেন যে, তাঁরা এমন কথা বলছেন না যে, সম্পূর্ণ বস্তুবর্জ্জিত স্থান হতে জীবাণুর উৎপত্তি ঘটে, তাঁদের বক্তব্য এই যে, জনক-জননী ব্যতিরেকে কেবলমাত্র জৈব পদার্থ (organic matter) হতে নূতন জীবের উদ্ভব হতে পারে। তাঁদের সমর্থন পেয়ে পুশে পাস্তারের উক্তির বিরুদ্ধে নানারূপ আপত্তি জানান।

পাস্তার কিন্তু তাঁর আলোচনার প্রসঙ্গটি দীর্ঘায়িত করে পরীক্ষাকার্য্য আরম্ভ করেছিলেন। তিনি কার্পাসের স্তরের ভিতর দিয়ে বায়ু সঞ্চালিত করে, তারপর সেই তুলার টুকরাকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করেন। ছাঁকন-প্রক্রিয়াতে তুলার উপরে যে ধূলিকণাসমূহ সঞ্চিত হয়েছিল, তন্মধ্যে তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণু-কোরকের সন্ধান পান। কিন্তু তুলা জৈব পদার্থ হওয়াতে স্বতঃজননবাদিগণ কার্পাসকেই

* এক মিলিমিটার এক ইঞ্চির প্রায় ২৫ ভাগের এক ভাগ।

জীবাণু উৎপাদনের কারণ বলে সন্দেহ করতে পারেন, এই ভেবে পাস্তুর তুলার বদলে 'আলবেনটস্' ব্যবহার করেন এবং তাতেও একই রূপ ফল পান।

বায়ুমণ্ডলস্থ জীবাণুরই সাহায্যে যে জৈব পদার্থের মধ্যে জীবাণুর উদ্ভব ঘটে, এই তথ্য প্রমাণের নিমিত্ত পাস্তুর একটি কৌশল অবলম্বন করেন। তিনি কতকগুলি ছোট ফাঁপা কাঁচের গোলক তৈরী করে এবং তাতে একটি করে সরু কাচের নল সংযোগ করেন। সেই গোলকে পচনক্ষম রস পূর্ণ করে এরূপ উত্তপ্ত করেন, যাতে পাত্রের অভ্যন্তরস্থ জীবাণুসমূহ ধ্বংস হয়ে যায়। নল সংযুক্ত গোলকটি এমন কৌশলে প্রস্তুত যে, তার মুখটি খোলা থাকলেও বাহিরের বায়ুতে ভাসমান জীবাণু পাত্রস্থিত তরল পদার্থে প্রবেশ করতে পারে না; কাচনলের বক্রাংশে আবদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু পাত্রটি নলের দিকে নীচু করে ধরলে নলের বক্রাংশে সঞ্চিত জীবাণু পচনক্ষম রসের সংস্পর্শে গিয়ে তার বিকৃতি ঘটায়। এই পাত্রটির সাহায্যে পরীক্ষা ক'রে পাস্তুর বায়ুমণ্ডলে জীবাণুর অস্তিত্ব সপ্রমাণ করেন। কিন্তু পুনে বললেন, "বায়ুমণ্ডলে যদি এতই অধিক সংখ্যক জীবাণু থাকে, যাতে প্রত্যেকটি জৈব-রসের পরিবর্তন ঘটে, তা হলে সমস্ত বায়ুমণ্ডল ঘন কুয়াশার আচ্ছন্নবৎ দেখাত।" এই কথার সমাধান করতে গিয়ে পাস্তুরকে মহাসমস্যায় পড়তে হল। তিনি বললেন, "আচ্ছা এও ত হতে পারে যে, জীবাণু বায়ুমণ্ডলের সর্বত্র সমভাবে ব্যাপ্ত নয়, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পরিমাণে বিকীর্ণ।" শুনে স্বতঃজননবাদিগণ হেসে বললেন, "বাঃ, এ ত মন্দ যুক্তি নয়, নিজের সুবিধা মত' কোথাও জীবাণুর অস্তিত্ব কল্পনা করবেন আবার কোথাও নাস্তিত্ব কল্পনা করবেন।"

তাঁদের এই পরিহাসে পাস্তুর বিচলিত হলেন না। তিনি জীবাণু দ্বারা পরিবর্তনক্ষম নানারূপ রস কাচপাত্রে পুরে, তাকে প্রথমে উত্তপ্ত ক'রে জীবাণুমুক্ত করলেন; তারপর পাত্রগুলির মুখ উত্তাপ দিয়ে গালিয়ে বন্ধ করে দিলেন। সেই সকল পাত্রে তিনি নানাস্থানের বাতাস ভরতে লাগলেন। ফলে হল কি, বিভিন্ন স্থানের বায়ুর বিশুদ্ধতার তারতম্য অনুসারে রসের বিকারেরও তারতম্য দেখা গেল। অর্থাৎ কোন রস বিশুদ্ধ রইল, আবার কোনটি প্রায় সম্পূর্ণ বিকৃত হল।

পাস্তুর তিয়াত্তরটি রসপূর্ণ কাচপাত্র সঙ্গে ক'রে ১৮৬০ অব্দের আগষ্ট মাসে আর্বোয়া অভিমুখে যাত্রা করলেন। পথিমধ্যে গমনকালে তিনি একে একে পাত্রগুলি উন্মুক্ত করতে লাগলেন। সর্বত্র সমপরিমাণে পচনকারী জীবাণু বিদ্যমান না থাকায়, বিশটি উন্মুক্ত পাত্রের মধ্যে মাত্র আটটি বিকার লাভ করল। অতঃপর তিনি সার্না নামক স্থানে এক পর্বতে গিয়ে উঠলেন। পর্বতটি সাগরপৃষ্ঠ হতে আট শত পঞ্চাশ মিটার* উচ্চে। সেখানে বিশটি পাত্র উন্মুক্ত করে পরীক্ষা হ'ল। পাস্তুর দেখলেন যে, বিশটি পাত্রের মধ্যে সেখানে মাত্র পাঁচটির রস পরিবর্তিত হ'ল।" এইভাবে পরীক্ষা ক'রে তিনি যখন দেখলেন যে, উচ্চতার আধিক্য অনুসারে জীবাণুর সংখ্যা হ্রাস প্রাপ্ত হচ্ছে, তখন আরও উর্ধ্বে আরোহণ করে পরীক্ষা করার ব্যবস্থা করলেন।

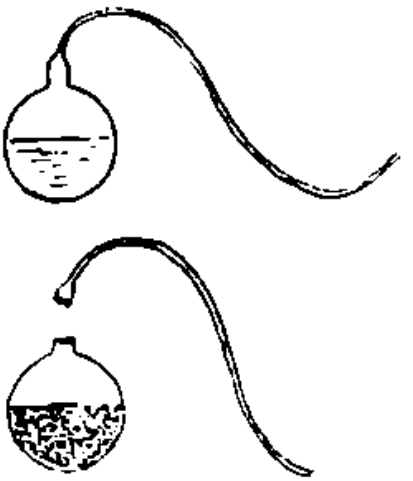

পাস্তুরের পরীক্ষায় ব্যবহৃত কাচপাত্র।

একটা অশ্বতরের পৃষ্ঠে, জীবাণুমুক্ত রসপূর্ণ তেত্রিশটি পাত্র বোঝাই করা হল। সেগুলি যাতে না ভাঙে, তার ব্যবস্থা করতে করতে পাস্তুর আল্পস্ পর্বতে আরোহণ করতে লাগলেন। পর্বতের উপরিভাগ সর্বত্র তুষারে আবৃত, তার উপর সূর্যের আলো প্রতিফলিত হচ্ছে, আলোর আলোয় দৃষ্টির বিভ্রম ঘটাচ্ছে। একে আলোকের প্রাচুর্য, স্পিরিট বাতির মৃদু শিখা লক্ষ্যেই পড়ে না, তার উপর বায়ুর গতি এত এলোমেলো যে, দীপশিখা কখনও স্থির থাকে না, প্রতি মুহূর্তে বিভিন্ন দিকে কম্পিত হয়ে যাচ্ছে। এমন অবস্থায় কাচপাত্রের মাথা খুলে তার মধ্যে বাতাস ঢুকিয়ে,

* এক মিটার প্রায় ৩০ ইঞ্চি।

সেই খোলা অংশটি স্পিরিট বাতির উত্তাপে কাচ গলিয়ে বন্ধ করা সম্ভব হল না। তিনি বাধ্য হয়ে উন্মুক্ত অবস্থাতেই পাত্রগুলিকে নীচে নামিয়ে নিয়ে গেলেন। ধূলিময় বাতাসের সংস্পর্শ পেয়ে তেরোটি পাত্রের মধ্যে প্রত্যেকটিই বিকৃত হয়ে উঠল। কাজেই পরদিন বাকী বিশটি পাত্র নিয়ে তাঁকে নূতন ক'রে কাজ আরম্ভ করতে হ'ল। এবার তিনি স্পিরিটের বাতিটিকে এমন কৌশল ক'রে রেখেছিলেন যে, পূর্বদিনের অসুবিধা এড়ান শক্ত হল না। পরীক্ষায় বিশটি পাত্রের রসের মধ্যে একটি ছাড়া সকল গুলিই অবিকৃত থাকল। তখন পাস্তুর দৃঢ়নিশ্চয় হলেন যে, ধূলিরাশির মধ্যেই জীবাণুর অধিষ্ঠান। তাঁর এই পরীক্ষামূলক ভ্রমণ বৃত্তান্ত আকাদেমীতে বিবৃত ক'রে তিনি বললেন :

মাখনের পচনকারক জীবাণু।

"এইবার গবেষণার ধারা এমনভাবে পরিচালিত করতে হবে, যাতে বিভিন্ন রোগের উৎস সন্ধানের পথ প্রশস্ত হয়ে যায়।"

২

বিউটিরিক্ কিণ্বনক্রিয়া ; আকাদেমী দে সিয়াঁসের সদস্যপদ লাভ ; স্বতঃজননবাদের অলীকতা প্রতিপাদন ; জনসাধারণের মতামত

ক্ষুদ্রকায় জীবাণুগণ যে কেবলমাত্র কিণ্বনক্রিয়ার হেতু নয়, সর্বপ্রকার পচনক্রিয়ার কারণ, এ ধারণা পাস্তুরের মনে পূর্ব হতেই জাগরূক হয়েছিল। তিনি ১৮৬০ অব্দের নভেম্বর মাসে সুরাজনক ও দুগ্ধাম্লজনক কিণ্বনক্রিয়া সম্পর্কে কার্য পুনরারম্ভ করেন। ল্যাক্টিক্ কিণ্বনক্রিয়া বিষয়ে অনুসন্ধান করতে গিয়ে আর একটি প্রক্রিয়া তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়। সেই প্রক্রিয়ার নাম বিউটিরিক্ কিণ্বনক্রিয়া। সময় সময়, মাখন এবং নবনীত জাতীয় পদার্থ হতে একপ্রকার পচা দুর্গন্ধ অনুভব করা যায়, বিউটিরিক্ কিণ্বনক্রিয়াই তার কারণ। এই সম্বন্ধে পাস্তুর লিখেছিলেন, "পুনঃ পুনঃ পরীক্ষণের ফলে আমি বেশ বুঝতে পারছি যে, infusory animalcule জাতীয় একপ্রকার জীবাণু, শর্করা, ম্যালেট এবং ল্যাক্টিক্ অ্যাসিডকে বিউটিরিক অ্যাসিডে পরিবর্তিত করে। সেই জীবাণুর দেহ ক্ষুদ্র দণ্ডের ন্যায় এবং তার দুই প্রান্ত বর্তুলাকার। তারা কিন্তু বায়ু না পেলেও জীবিত অবস্থায় বংশবৃদ্ধি করে। কেবল তাই নয়, বায়ুপ্রভাবে তাদের মৃত্যু ঘটে। যে রসের মধ্যে এই জীবাণু বংশ বৃদ্ধি করছে, তার ভিতর যদি দুই এক ঘণ্টা কাল বায়ু সঞ্চালিত করা যায়, তা হলে সেই জীবাণুদের মরণপ্রযুক্ত বিউটিরিক্ কিণ্বনক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু সেইরূপ রসে বিশুদ্ধ কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস প্রবাহিত করলে সেই জীবাণুদের কোন ক্ষতি হয় না। এই পরীক্ষা হতে দুইটি মন্তব্য করা যায়। প্রথম—একপ্রকার জীবাণুর দ্বারা বিউটিরিক্ কিণ্বনক্রিয়া সংঘটিত হয়; দ্বিতীয়—সেই জীবাণুরা অক্সিজেন গ্যাস ব্যতিরেকে জীবনধারণ করতে পারে।"

যে সকল জীবাণু বায়ু ব্যতিরেকে জীবনধারণ করে, পাস্তুর পরবর্তীকালে তাদের anaerobes বা অবায়ুপ্রাণ এবং যারা বায়ু সাহায্যে জীবন ধারণ করে, তাদের aerobes বা বায়ুপ্রাণ আখ্যা দিয়েছিলেন।

১৮৬২ অব্দের ৮ই ডিসেম্বরে আকাদেমী দে সিয়াঁস পাস্তুরকে সদস্য নির্বাচিত করেন। তখনও তাঁর কিণ্বনক্রিয়া বিষয়ে গবেষণা-কার্য চলছিল। সে সময়ে ক্লোদ বের্নারও তাঁর পরীক্ষা-কার্যে যোগদান করেছিলেন। তিনি কুকুরের শরীর হতে টাটকা রক্ত নিয়ে কাচপাত্রে বন্ধ ক'রে, ৩রা মার্চ হতে ২০শে এপ্রিল পর্যন্ত তাকে অনুষ্ণ ত্রিশ সেনটিগ্রেড ডিগ্রীতে উত্তপ্ত করেন।' ফলে, রক্তের কোন বিকার ঘটে নাই। দুধ নিয়েও সেই ভাবে পরীক্ষা করায় একই রকম ফল পাওয়া গিয়েছিল। সেই পরীক্ষাসমূহ হতে পাস্তুর মন্তব্য করেন যে, এই ভাবে যে কোন জৈব রস পরীক্ষা করলে একই রূপ পরিণাম ঘটবে অর্থাৎ তার কোন বিকৃতি ঘটবে না।

পাস্তুর এই সকল পরীক্ষা সাহায্যে স্বতঃজননবাদের নিরসন করছিলেন, কিন্তু স্বতঃজননবাদীরাও নিরস্ত ছিলেন না। পুশে, জোলি এবং মুস্যে পাস্তুরের পর্বতারোহণ পর্বের কার্যাবলী অনুসরণ ক'রে তাঁর ভ্রম সন্ধানে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁরা বহু আয়াস স্বীকার ক'রে এমন কি জীবনকে বিপদাপন্ন করেও পাস্তুরের অপেক্ষা হাজার মিটর উর্ধ্বে আরোহণ করেন। সেখানে পরীক্ষা ক'রে কাচপাত্রের রস বিকৃত হয়ে যাওয়াতে তাঁরা ভাবলেন যে, তাঁদের আয়াস স্বীকার সফল হয়েছে। নিজেদের সৌভাগ্যের কথা চিন্তা ক'রে পুশে বিজয়গৌরবে ঘোষণা করলেন—"উচ্চ পর্বতরাজির উপরিস্থ বায়ুতেও পচনক্ষম তরল রস পরিবর্তিত হয়, কাজেই স্বতঃজনন ব্যাপারটি সম্পূর্ণ সত্য।

তাঁরা তাঁদের এবং পাস্তুরের অভিমতের মধ্যে কার মত সত্য, সেটি নিরূপণের জন্য আকাদেমী যে সিদ্ধান্তকে অনুরোধ করেছিলেন। পাস্তুরের পরীক্ষিত সত্যকে আকাদেমীর সকলে মেনে নিলেও, তাঁদের এই প্রস্তাবে পাস্তুর অমত জানান নাই। কিন্তু অনর্থক কালক্ষেপ না ক'রে সেই আলোচনার যাতে শীঘ্র মীমাংসা হয়ে যায়, তদুদ্দেশ্যে তিনি মার্চ মাসের প্রথম দিকে দিন ধার্য করতে বলেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যাঁরা পাস্তুরের পরীক্ষাকে মিথ্যা ব'লে প্রমাণের জন্য আকাদেমীর নিকট আবেদন জানিয়েছিলেন, কার্যকালে তাঁরাই পরীক্ষার দিন নির্দ্ধারণে বিলম্ব করতে লাগলেন। পুশে এবং তাঁর শিষ্যেরা বললেন, "এখন অত্যন্ত ঠাণ্ডা পড়েছে, এ সময়ে পরীক্ষা করলে আমাদের যথার্থ ফল হয়ত পাওয়া যাবে না কাজেই গ্রীষ্মকালে এই প্রসঙ্গে পরীক্ষা করা যাবে।" এই খবর পেয়ে পাস্তুর লিখলেন, "পুশে, জোলি এবং মুস্যে মহাশয়ের বিলম্ব দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি। তাঁদের এত দেরী করার ত' কোন প্রয়োজন দেখি না। যে রকম উষ্ণতার মধ্যে তাঁদের পরীক্ষা করার অভিপ্রায় একটা ষ্টোভের সাহায্যে তা' সম্ভব হতে পারে। বেশ ত' তাঁরা যদি গ্রীষ্মকালে পরীক্ষা ক'রে দেখতে চান তাতেও আমার আপত্তি নেই। এখনই একবার দেখা হোক না কেন?"

১৮৬৪ অব্দের জুন মাসে, স্বতঃজননবাদিগণ, পাস্তুর এবং তাঁদের বিরুদ্ধ বক্তব্যের মীমাংসা করতে আহূত হলেন। বলা বাহুল্য, পাস্তুরেরই পরীক্ষা জয়যুক্ত হ'ল। এই ঘটনার প্রায় দুইমাস পূর্বে পাস্তুর সর্বনের বক্তৃতা-গৃহে স্বতঃজনন বিষয়ে বক্তৃতা দিতে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। সেখানে তিনি স্বতঃজননবাদের ভ্রম বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলেন :

"বর্তমানে মানবসমাজে বড় বড় সমস্যা আলোচিত হচ্ছে। মানুষের প্রথম পদাঙ্করেখা কোন্ শতাব্দীর অন্তরালে ভূপৃষ্ঠে অঙ্কিত হয়েছিল, তার বিভিন্ন 'রেস্' বা জাতির মাঝখানে কি প্রকার সংযোগ-চিহ্ন আছে, জীবকুলের (species) পুরুষানুক্রমিক ধারা কি ভাবে পরিবর্তন লাভ করেছে, এই বিভিন্ন প্রসঙ্গ বর্তমান যুগের আলোচনার বিষয়। আজকাল 'বস্তুর নিত্যতা' এবং 'ঈশ্বরের ধারণার অপ্রয়োজনীয়তা' প্রসঙ্গেও নানারূপ তর্কবিতর্ক চলছে। এই সকল প্রসঙ্গ অপেক্ষা আমার আলোচ্য বিষয়টী অন্য ধরণের; এটি সম্পূর্ণরূপে পর্যবেক্ষণ ও সূক্ষ্ম পরীক্ষাসাপেক্ষ। 'পৃথিবীতে কোন জীব তজ্জাতীয় প্রাণীর সম্পর্ক ব্যতিরেকে উদ্ভূত হতে পারে কি না?' এই সমস্যার সমাধানে স্বতঃজননের সমর্থক যুক্তিগুলি বহুদিন পূর্বে ভিত্তিহীন হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীতে অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ায় সমস্যাটির নূতন ভাবে পর্যালোচনা শুরু হয়েছে।...পুশে মহাশয় সেই বিষয়ে অনুসন্ধান করতে গিয়ে অত্যন্ত ভ্রমপূর্ণ পরীক্ষাকার্য করেছেন।...পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে যে ধূলিরাশি ভাসমান রয়েছে, তাহা বহু লক্ষ লক্ষ জীবকণা-সংশ্লিষ্ট। তার সংস্পর্শ-নির্মুক্ত অবস্থায় যে কোন জৈবরস বহুকাল অবিকৃত থাকতে পারে। কিন্তু যদি পরিস্রুত জলের মত, নির্মল স্বচ্ছ জৈবরস নিয়েও তার মধ্যে পচনকারী জীবাণুর কোরক মিশ্রিত করা যায়, তা হলে অনুকূল অবস্থায় তন্মধ্যে বহুসংখ্যক কীটাণু জন্মাবে এবং রসটি এক দিনের মধ্যেই অপরিচ্ছন্ন হয়ে যাবে। তদ্রূপ রসের কিয়দংশ যদি একটা লম্বা গলাযুক্ত বোতলে ভরে তীব্র উত্তাপ প্রয়োগে তন্মধ্যস্থ জীবাণুকে ধ্বংস করা যায়, তা হলেও তার বিকার ঘটবে, কারণ বাহিরের বায়ু হতে জীবাণু প্রবেশের পথ উন্মুক্ত আছে। কিন্তু উত্তপ্ত করবার আগেই যদি বোতলটির গলা খুব সরু করে বেঁকিয়ে দেওয়া যায়, তা হলে বাতাসের ধূলিকণা ও জীবাণুসমূহ তার বক্রাংশে আটকা পড়বে। বায়ুর প্রবেশপথ রুদ্ধ না করেও এই উপায়ে রসের সঙ্গে বাহিরের জীবাণুর সংস্পর্শ বন্ধ করা যায়। এইরূপ বক্রকণ্ঠ বোতলে পচনক্ষম

রস রেখে তাকে উত্তাপ প্রভাবে জীবাণুমুক্ত করতে পারলে, যতদিন ইচ্ছা অবিকৃত রাখা যেতে পারে, কারণ, উত্তাপের প্রভাবে বোতলের অভ্যন্তরস্থ জীবাণু ধ্বংস হয়ে যাবে এবং বাহির হতেও কোন জীবাণু প্রবেশের সুবিধা থাকবে না; অথচ তার মধ্যে বায়ু প্রবেশের পথ উন্মুক্ত থাকবে। ধূলিকণা ব্যতীত আপনারা ওজোন্, বিদ্যুৎ, চুম্বক প্রভৃতি যে কোন বস্তু কল্পনা করুন না কেন, কারও সেখানে গমনে বাধা নেই। কেবল বাতাসের ধূলিকণা না ঢুকলে সবই ঠিক থাকবে। কিন্তু বোতলটি যদি খুব ঝাঁপুনি দিয়ে নেড়ে দেওয়া হয়, তা হলে বাতাস এত জোরে প্রবেশ করবে যে, তার সঙ্গে ধূলিকণা-সংলগ্ন জীবাণুরাও প্রবেশ লাভ করবে এবং রসের বিকার ঘটা অসম্ভব হবে না। আমি, বিশাল সৃষ্টির পর্যাপ্ততার মধ্য হতেই কয়েক বিন্দু তরল রস সংগ্রহ করে পরীক্ষা করেছি; তার মধ্যে নিকৃষ্ট জীবের বর্দ্ধনোপযোগী সকল বস্তুই সঞ্চিত ছিল। সেই রসপূর্ণ পাত্র নিয়ে আমি বৎসরের পর বৎসর অপেক্ষা করেছি, লক্ষ্য করেছি, জিজ্ঞাসা করেছি; প্রথম সৃষ্টির অদ্ভুত রহস্যটার আমার চক্ষের সম্মুখে উন্মুক্ত করার চেষ্টা করেছি; কিন্তু হায়! মৌন প্রকৃতি আমার কাছে চিরদিনই মূক হয়ে আছে, জীবনের কোনই সাড়া পাওয়া যায় না। কেন? কারণ তা হতে একটি পদার্থকে আমি সরিয়ে রেখেছি; সেটি প্রাণ, জীবন, জীবাণু, যা বাতাসের মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছে; মানুষ যাকে কোন দিনই সৃষ্টি করতে পারে নাই। সহজ পরীক্ষামূলক পর্যবেক্ষণের আক্রমণে স্বতঃজননবাদিগণের অভিমত চিরতরে নিরস্ত হয়েছে।"

কিন্তু পাস্তারের পরীক্ষামূলক প্রমাণ সত্ত্বেও স্বতঃজননবাদিগণ নিরস্ত ছিলেন না। তাঁরা জনসাধারণের ভিতর তাঁদের অভিমত প্রচার করছিলেন। সমস্যাটি, পর্ব্বতশিখর হতে, বীক্ষণাগার হতে নেবে গিয়ে দাঁড়াল সামাজিক মতামতের মধ্যে। লোকে বলতে লাগল, "পাস্তারের কথাই যদি ঠিক হবে, তা হলে প্রথম জীবাণুটি কোথা হতে এল?" পাস্তার বললেন, "এ ত সর্ব্ববিষয়েরই প্রথম উৎপত্তির প্রশ্ন। প্রশ্নটি আমি অস্বীকার করি না, এটি মানুষের চিরন্তন প্রশ্ন, নির্জ্জন অবসর-চিন্তার বিষয়; কিন্তু এ প্রশ্নের কাছে, চিরকালই আমাদের নীরবে মাথা নত করে থাকতে হবে। বিজ্ঞানের কারবার কেবল ঘটনা আর তথ্য নিয়ে।"

জনসাধারণ সত্য তথ্যের সঙ্গে কল্পনা ও বিশ্বাস মিশিয়ে ফেলছিল; কেউ তাঁকে ধর্ম্মমতের বিরোধী বলে অভিশাপ দিল; কেউ বা আধ্যাত্মিকতার সমর্থক বলে পূজা করল, কিন্তু তাঁর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার সংস্কার তাদের মনে একটিও রেখাপাত করল না। পাস্তার বৃথাই বললেন, "এখানে ত ধর্ম্ম, দর্শন, নাস্তিকতা, বস্তুতান্ত্রিক তা অথবা আধ্যাত্মিকতার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। এটা হল সত্য ঘটনা। সত্য ঘটনা প্রচার করার জন্য কেউ যদি আমাকে অবৈজ্ঞানিক বলেন, তাতেও আমার আপত্তি নেই। আমি যখন সমস্যাটির সমাধানে নিযুক্ত ছিলাম, তখন যদি পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা স্বতঃজননের ব্যাপারটিই দৃষ্টিগোচর হ'ত, তা হলে আমি এখনকারই মত' সমান জোরে ও-পক্ষের মতটাই মেনে নিতাম। কিন্তু এখনও যাঁরা আগেকার বিশ্বাসকেই সত্য ভেবে চোখ বুজে আঁকড়ে আছেন, তাঁদের অন্ধ ছাড়া কি বলা যায় জানি না।"

এই মতামতের লড়াই শেষ হবার পরেও কেউ কেউ পাস্তারের কাছে গিয়ে তাঁর প্রতি জনসাধারণের প্রতিবাদ ও প্রশংসাবাণী বিষয়ে উল্লেখ করতেন। সেই প্রকার কথার প্রত্যুত্তরে একদা পাস্তার বলেছিলেন, "সমসাময়িক কালের এইরূপ দুই একটি অপমান ও অভিযোগের কথা গ্রাহ্য করা বৈজ্ঞানিকের শোভা পায় না; সে বিষয়ে পরবর্ত্তী শতাব্দী কি বলবে তৎসম্বন্ধেই তাঁর চিন্তা করা কর্ত্তব্য।"

প্রকৃত জ্ঞান লাভের উপায়

ঋষিদিগের উপদেশানুসারে 'সহজাত জ্ঞান' হইতে সাধারণতঃ 'কামে'র এবং 'সঙ্কল্প ও বিকল্পে'র অথবা 'কল্পনা'র উদ্ভব হয়। 'কাম' এবং 'সঙ্কল্প' পরিত্যাগ না করিতে পারিলে কোন প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয় না এবং তাহা কি করিয়া পরিত্যাগ করিতে পারা যায়—তাহার বিস্তারিত ও নির্দ্দেশ তাহাদের বর্ণনে যত্র তত্র ব্যক্ত হইয়াছে। 'সহজাত জ্ঞানে'র উপর আস্থা স্থাপন না করিয়া এবং কল্পনাবিলাসী না হইয়া প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিবার বিধিবদ্ধ চেষ্টা করা—তাহাদের ঋষিদিগের উপদেশ।...

দিদি

[শিল্পী—শৈলনারায়ণ চক্রবর্ত্তী

দুর্বোধ্য

—শ্রীবিজয় গুপ্ত

অবাক্ হইবার মত ছেলে নিশিকান্ত নয়। অনেক কিছু অদ্ভুত ও অবাস্তব লইয়া তাহার কারবার। তাহারই বইয়ের পাতায় পাতায় এমন অদ্ভুত ও আশ্চর্য্য ঘটনা কত যে ঘটে, তাহার আদি অন্ত নাই। এই সমস্ত ঘটনায় হয় ত পাঠক-সম্প্রদায় চমকিয়া উঠিতে পারেন, কিন্তু সে কেন আশ্চর্য্য হইবে? এ সবের জন্মদাতা সে ত নিজেই, তবে। বর্দ্ধমান বাজারের কাছ হইতে যে রাস্তাটা সরাসরি সহরের অপর প্রান্তে চলিয়া গিয়াছে, সেই পথ দিয়া চলিতে চলিতে ডান-দিকের একটি জানালার পানে চোখ পড়িতেই নিশিকান্ত থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল। দাঁড়াইয়া ছিল সে অনেকক্ষণ। এমন করিয়া রাস্তার মাঝে দাঁড়াইয়া একজনের জানালার পানে চাহিয়া থাকা যে উচিত নয়, এ কথা তাহার মনেই হয় নাই।

রাস্তার ওপারে ছাদের পিছনে ঝুঁকিয়া-পড়া আকাশের দিকে চাহিয়া, অন্যমনস্কভাবে মিনতি দাঁড়াইয়া ছিল, হঠাৎ দৃষ্টিটা নামিয়া আসিল নিশিকান্তর উপরে। মিনতিকে চিনিতে নিশিকান্তের বিলম্ব হইল না, মিনতিরও না। চিনিতে পারি-য়াই ঈষৎ শ্রীবাভঙ্গী করিয়া মিনতি কি তাহাকে ইসারা করিয়া ডাকিয়াছিল?—বোধ হয়। নতুবা খোলা দরজাটা অতিক্রম করিয়া সোজাসুজি উঠানে আসিয়া দাঁড়াইবার মত লোক নিশিকান্ত নয়। আন্তরিকতার আবেদন ব্যতিরেকে শুধু মাত্র পরিচয়ের দাবি লইয়া অন্তরঙ্গ হইবার মত তরলতা আর যাহারই থাকুক, তাহার অন্ততঃ নাই।

যাহা হউক উঠানে আসিয়া দাঁড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে একান্ত পরিচিতের মত আন্তরিক অভ্যর্থনা পাইল সে।

'হঠাৎ বর্দ্ধমানে, এমন সময়?' এমনি অসংলগ্ন ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন করিল মিনতি।

'যাদের কাজের তাগিদ নেই, অথচ বেড়াবার সখ আছে, তাদের পক্ষে এ আর হঠাৎ কি!'

মিনতির পক্ষে জবাবটা হয়ত তেমন মনোমত হয় নাই—ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া পুনরায় সে জিজ্ঞাসা করিল, 'কি করছ আজ-কাল?'

সময়টা তখন অপরাহ্ণ, ছাদের ঘুলঘুলির ফাঁক দিয়া এক-টুকরা পড়ন্ত রোদ আসিয়া পড়িয়াছিল মিনতির মুখে। সেই পড়ন্ত রোদের আলোর মাধুর্য্যে মিনতিকে সুন্দর দেখাইলেও একটু যেন রোগা দেখাইতেছিল। চিবুকের রেখায় রেখায় চোখের নীচে যেন মালিন্য জাগিয়া উঠিয়াছে। অবরুদ্ধ চূর্ণালকের ছায়ায় গালের উপর বিচিত্র রেখাজালের সমাবেশ লক্ষ্য করিতে করিতে নিশিকান্ত জবাব দিল, 'সাহিত্যচর্চ্চা করছি আর ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি।'

নিশিকান্ত ভাবিয়াছিল, উত্তরটা শুনিয়া মিনতি নিশ্চয়ই মাসিকের পাতায় তারই লেখা চরিত্র সম্বন্ধে কিছু না কিছু মন্তব্য করিবে। কিন্তু আশ্চর্য্য, মিনতি সে দিক্ দিয়াও গেল না। তবে কি মিনতি মাসিকপত্রও পড়ে না? মনে মনে নানান কিছু কল্পনা করিতে করিতে নিশিকান্ত অস্বস্তি বোধ করিল।

'বস আসছি,' বলিয়া হঠাৎ মিনতি বাহির হইয়া গেল।

একা ঘরের ভিতর বসিয়া বেয়াল-বড়িটার শব্দ শুনিতে শুনিতে নিশিকান্ত ভাবিতে লাগিল, মিনতির সহিত তাহার প্রথম পরিচয় হয় সুহাসদের বাড়ী। সুহাসের মধ্যস্থিতায় তারই লেখা একখানা নাটক মেয়েরা অভিনয় করিবে বলিয়া মনো-নীত করিয়াছিল। কাজেই নাট্যকারের দাবীতে অভিনয় শিক্ষার ভার পড়িয়াছিল তাহারই উপর। মিনতির বুদ্ধি ও প্রতিভা তাহাকে আশ্চর্য্য করিয়া না দিক—মুগ্ধ করিয়াছিল বটে। মিনতির গুণের প্রতি অনুরাগবশতঃ তাহার সহিত ঘনিষ্ঠ হইতে নিশিকান্তর বেশী বিলম্ব হয় নাই। তার পর অভিনয় মিটিয়া গেলেও সুহাসদের ওখানে প্রায় প্রত্যহই তাহার আবির্ভাব ঘটিত। নিশিকান্ত ভাবে কি ভাগ্যি, কার্য্যান্তরে পড়িয়া সে যশোর চলিয়া গিয়াছে—নতুবা উভয়ের ঘনিষ্ঠতাটুকু গাঢ় হইয়া কোন্ পথে প্রবাহিত হইত কে বলিতে পারে। বছর দুই পরে যশোর হইতে ফিরিয়া সুহাসদের ওখানে যাইবার তীব্র আকর্ষণ অনুভব করিয়া সে অবাক্ হইয়া গিয়াছিল। ঠিক সুহাসদের বাড়ীর সামনে একদিন

মিনতির কাকার সহিত দেখা হইল। মিনতির সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করিবার পূর্বে তিনি নিজেই বলিয়াছিলেন, 'মিনতি না হয় চলেই গেছে, তাই বলে এ পাড়ায় আসাই বন্ধ করে দিলেন?'

'আমি এখানে ছিলাম না।' তার পর একটু থামিয়া সে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'মিনতি নেই কেন?'

'তার বিয়ে হয়ে গেছে।'

'কোথায়?'

'বর্দ্ধমানে। কে জানে, কেমন আছে।' মিনতির কাকা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়াছিলেন।

'চিঠিপত্রও লেখে না না কি?' নিশিকান্তর কণ্ঠস্বরে বিস্ময়ের প্রাচুর্য্য ভাসিয়াছিল।

'লিখিবে কি,' মিনতির কাকা হতাশ হইয়া বলিয়াছিলেন, 'জামাইয়ের নিষেধ আছে।···কি করব, শেষারের বাজারে ডুবে গেলুম বলেই না অমন একটা ছেলের হাতে দিতে হোল।'

অনুপযুক্ত জামাইয়ের সম্বন্ধে আরও বিস্তৃতভাবে নানান অভিযোগ শুনিতে শুনিতে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল সে—তাহার নিকট এসব আক্ষেপ করার হেতু আবিষ্কার করিবারও ইচ্ছা হয়ত হইয়াছিল। নিশিকান্তর কাছ হইতে তেমন কোন জবাব না পাইয়া মিনতির কাকা বলিয়াছিলেন, 'চিঠি না দিক সুখে থাকলেই আমরা নিশ্চিন্দি—'

তবে কি মিনতি সুখীও হয় নাই? এই সূত্রটুকু টানিয়া সাহিত্যিক নিশিকান্ত অনেক কিছু কল্পনা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। তাই বলিয়া এতকাল পরে সেই সূত্রটুকু ধরিয়া মিনতির সহিত দেখা হইবার আশায় নিশিকান্ত বর্দ্ধমানে আসে নাই সে আসিয়াছে খেয়ালে পড়িয়া বেড়াইতে। রাজার বাড়ী, পাহারাখানা, শ্যামসায়র, কৃষ্ণসায়র ইত্যাদি দেখিতে। তাহার সাহিত্যিক দৃষ্টিতে এ সব দেখিবার যথেষ্ট মূল্য আছে।—কিন্তু···নিশিকান্ত অবাক হইয়া ভাবে: মিনতিকে দেখিয়া তেমন কিছু তো বোধ হয় না! তবে কি মিনতির কাকার এসব কল্পনা—মেয়ের পাত্রীর প্রতি করুণাবশতঃ অকারণ উৎকণ্ঠা? কিংবা এমনও ত' হইতে পারে যে, বাহির হইতে মিনতিকে দেখিয়া বুঝিবার মত বোধশক্তি নিশিকান্তর নাই। তাছাড়া আর একটা জিনিষও লক্ষ্য করিয়াছে যে, মিনতি যেন আগেকার চেয়ে অনেক গম্ভীর হইয়া গিয়াছে। এটা বয়সের ছাপ, না অশান্তির ছায়া?

নিশিকান্তর ক্রমবর্দ্ধমান দুশ্চিন্তার মধ্যে মিনতি প্রবেশ করিল, হাতে চায়ের বাটি। এইটাই মেয়েদের বিশেষত্ব। তাহাদের অন্তরঙ্গতা এমন গাঢ় ও সুষ্ঠু যে, বিস্মৃতি বা অপরিচয়ের এতটুকু ব্যবধান কোথাও প্রকাশ পায় না।

মিনতি দাঁড়াইয়া রহিল; পুরুষের সামনে মেয়েদের বসাটা না কি সুশোভন নয়।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে নিশিকান্ত বলে, 'এই একটু আগে পথ চলতে চলতে ভাবছিলুম, একটা চায়ের দোকান পেলে হয়।'

'এখনও সেই রকম আগেকার মত চা খাও ত'?'

মেয়েরা এতও মনে রাখিতে পারে। তবু ভাল, মিনতি তাহা হইলে একেবারে ভুলিয়া যায় নাই।

নিশিকান্ত হাসিয়া জবাব দেয়, 'অভ্যেস কি ছাড়তে পারা যায়!' তারপর বলিতে আরম্ভ করে, 'ভেবেছিলুম ক' একদিন থেকে বর্দ্ধমান সহরটা ভাল করে দেখে যাব, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, একটাও ভাল হোটেল পেলুম না।'

'কেন, বাজারের ঠিক ডানধারের হোটেলটা?'

'নাঃ আমার কেমন পছন্দ হোল না।'

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া মিনতি বলে, 'দেখবার কি-ই বা আছে এখানে।'

'কেন, শ্যামসায়র, কৃষ্ণসায়র, রাজার বাড়ীর পোষা কুমীর···'

'সে আর কতক্ষণ লাগে, বাধা দিয়া মিনতি বলিল, 'সকালের গাড়ীতে এসে সব দেখে বিকেলে ফিরে যাওয়া যায়।'

'তার চেয়ে থাকবার একটা জায়গা পেলে দু'একদিন থেকে ধীরেসুস্থে দেখে যাওয়া যেত।'

ঘড়িতে টং টং করিয়া পাঁচটা বাজিয়া গেল। আশ্চর্য্য, এতক্ষণের মধ্যে মিনতি একবারও বাড়ীর কথা জিজ্ঞাসা করিল না। এ সব বিষয়ে সে যেন মেয়েদের সনাতন প্রকৃতিকে লঙ্ঘন করিয়াছে।

বাক্যালাপটা হঠাৎ বন্ধ হইয়া যাওয়াতে ঘরের আবহাওয়াটিকে বড় নিস্তব্ধ বোধ হইতে লাগিল। এমন নিস্তব্ধ

যে, নিঃশ্বাসের শব্দ পর্যন্ত শোনা যায়। ঘড়িটার দিকে হঠাৎ চাহিয়া মিনতি বলিল, 'পাঁচটা তিপ্পান্নোয় একটা কলকাতা যাবার ট্রেন আছে, তারপর, আবার সেই আটটায়···এটাতে গিয়ে আরামও আছে, এক্সপ্রেস কি না।'

মিনতি কি তাহাকে তাড়াইতে চায় না কি? ট্রেনের খবর তো সে জিজ্ঞাসা করে নাই—তবে? মিনতি অনুরোধ করিলেও সে হয়ত এখানে থাকিত না; কিন্তু 'আজ থেকে যাও' বলিয়া অনুরোধ করিবার মত সহজ সৌজন্যটুকুও কি তাহার নাই! না, মিনতির অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে, সহজ-সাধারণ ব্যবহারের স্বচ্ছতায় গ্লানি দেখা দিয়াছে—মানসিক ঐশ্বর্যের দীপ্তিতে মলিন ছায়া পড়িয়াছে। মিনতি ত' এমন ছিল না। জগতের পরিবর্তনের ইতিহাসে যা ছিল না, তা-ই হওয়াই তো স্বাভাবিক।

না, মিনতির সম্বন্ধে এতটুকু দুর্বোধ্যতা সে রাখিবে না, তাই স্থিরনিশ্চিত হইবার জন্য নিশিকান্ত জিজ্ঞাসা করিল, 'তাহলে সেই আটটা পর্যন্ত বসে না থেকে পাঁচটা তিপ্পান্নোর এক্সপ্রেসটাতেই যাওয়া যাক, কি বল?'

'হুঁ, শুনেছি গাড়ীখানায় গিয়ে আরাম আছে।'

নিশিকান্ত উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে যাইতেই হইবে, এখানে থাকিয়া কোন লাভ নাই। অকস্মাৎ মিনতির সঙ্গে দেখা হইয়া ক্ষণিকের জন্য যেটুকু আশা ও আনন্দ জাগিয়াছিল, সেটুকু একেবারে নিধূর্ম হইয়া নিভিয়া গেছে।

উঠান পার হইয়া সদর দোরের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে নিশিকান্ত বলিল, 'তোমার কাকার সঙ্গে সেদিন দেখা হ'ল, সবাই ভাল আছেন; এবার দেখা হলে তোমার কথাও বলব।'

ভাল শোনা গেল না, মিনতি বোধ হয় অস্ফুটে 'হুঁ' বলিয়া সায় দিল।

'তাহলে চললাম', নিশিকান্ত পা বাড়াইল।

'হাঁ, পার তো এস আর একদিন।'

তবু ভাল, যাইবার সময় একটা অনুরোধ যে করিয়াছে এই-ই যথেষ্ট। কিন্তু শেষ মুহূর্তে এমন একটা কোন অনুরোধ না করিলেই কি চলিত না?

কিন্তু বাড়ী হইতে বাহির হইয়া খানিকটা পথ যাইতে না যাইতেই আবার তাহাকে ফিরিতে হইল। কে জানিত যে, মিনতির স্বামীই তাহার পরিচিত এবং সহপাঠী বন্ধু নরেশ?

'আরে নিশিকান্ত না?' নরেশ নিশিকান্তর হাতটা ধরিয়া ফেলিল।

'চিনতেই পারিনি—সাহেব সেজেছ যে, ব্যাপার কি? কি করছ আজকাল?'

'হোমিওপ্যাথিক প্র্যাকটিস করছি—বিকেল ডিউটি দিই চ্যারিটেবল ডিস্পেন্সারীতে।'

'এখন বুঝি সেইখান থেকেই ফিরছ?'

'চল, চল, অনেকদিন পরে দেখা, দুটো কথাবার্তা কওয়া যাবে।'

'কিন্তু, আমি যে আজ ফিরে যাব মনে করছি।'

'কেন হে, এত তাড়াতাড়ি কিসের?

'না না, তাড়াতাড়ি কিছু নেই, তবে—'

নরেশ শুনিল না, নিশিকান্তকে টানিয়া লইয়া গেল। তখনো কিন্তু নরেশকে মিনতির স্বামী বলিয়া সে কল্পনাও করিতে পারে নাই। সদর-দরজার নিকটবর্তী হইয়াই সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল।

'কি হে দাঁড়ালে কেন, এস—'

ও কথার জবাব না দিয়া কৌতুক করিবার জন্য নিশিকান্ত বলিল, 'তোমার বাইরের ঘরে ঢোকবার আগে কি কি জিনিষ আছে তা' আমি বলে দিতে পারি।'

নরেশ হাসিয়া বলিল, 'আজকাল সাহিত্যের বাজারে মন্দা দেখে এই ব্যবসা ধরেছ না কি—তা নেহাৎ মন্দ নয়।'

'মন্দ হোক, আর ভালই হোক, যদি তোমার স্ত্রীর নামটুকু বলে দিতে পারি?'

ইহাদের সাড়া পাইয়া মিনতি ভিতর হইতে বাইরের ঘরের খিলটা খুলিয়া দিয়া আড়ালে গিয়া দাঁড়াইল। ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে নরেশ জবাব দিল, 'যদি পার, তাহলে বুঝব যে, সাহিত্যের আট কেন, লোক-ঠকাবার আটও তুমি আয়ত্ত করেছ।'

নিশিকান্ত মৃদু মৃদু হাসিতে থাকে।

'দাঁড়াও, চায়ের কথা বলে আসি—'

নিঃশেষিত কাপটা তখনও টেবিলের উপর পড়িয়া ছিল। সেই দিকে চাহিয়া নিশিকান্ত বলিল, 'একটু না হয় পরেই হবে, ঐ যে দেখ না, এইমাত্র পেয়ে গেছি, বোধ হয় দশ মিনিটও হয় নি।'

সত্যি চায়ের কাপটার দিকে চাহিয়া নরেশ অবাক্ হইয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিল, 'মিনতিকে তুমি চেন না কি?'

'চিনি বই কি—বছর দুই আগে ওরা কতকজন মিলে, আমায় একখানা নাটক প্লে করেছিল। তাতে মিনতি করেছিল মেন পার্ট।' একটুখানি ছেদ পড়িতে না পড়িতেই বাক্যালাপের ধারার পরিবর্ত্তন ঘটিল।

নরেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'তারপর হঠাৎ এখানে যে? মিনতির সঙ্গে দেখা করতে বুঝি?'

'তা কেন, এমনি বেড়াতে এসেছিলুম। মিনতি যে বর্দ্ধমানে থাকে একথা আমার মনেই ছিল না।'

তারপর একটুখানি নীরব থাকিয়া বলিল, 'সত্যি কথা বলতে কি, একটা মনের মত হোটেল পেলুম না যে, একদিন থেকে সহরটা ভাল করে দেখে যাই।'

'কেন মিনতি তোমায় থাকবার কথা বলে নি?'

'তুমি নেই, অনুমতি না নিয়ে কেমন করে বলে বল?'

দোরের ওপাশে বোধ হয় অনবধানবশতঃ চুড়িগুলো বাজিয়া উঠিয়া নিঃশব্দচারিণীর অস্তিত্বের কথাটা ফাঁস করিয়া দিল।

উচ্চকণ্ঠে নরেশ জবাব দিল, 'কেন, আমার কি সে-রকম কোন কড়া-হুকুম আছে না কি?'

'সে তোমরাই জান।'

'বুঝলে নিশিকান্ত, স্বামিত্ব-ঘর করতে শিখতে হয়—সে ওরা শেখে নি কখন। থাক্, একন্তে ত্রুটি যা হয়েছে সেইটুকুর মার্জ্জনা আমিই চাইছি—তুমি কিন্তু মনে কর না ভাই—এখানে থাকতে পার যতদিন খুসী।'

নিশিকান্ত হাসিয়া বলিল, 'যতদিন না হক, আজকের রাতটা তো কাটাতেই হবে।'

'খুব খুব—বুঝলে নিশিকান্ত, এসব শুধু ভদ্রতা নয়, কর্ত্তব্য বটে। কি ভাগ্যি, দেখা হল, নয় ত চিরদিনের জন্যে দোষী হয়ে থাকতে হত।'

'তাই বা কেমন করে হত,' নিশিকান্ত অবাক হইয়া বলে, 'দেখা না হলে ত' জানতেই পারতাম না যে, মিনতির সঙ্গে তোমার কোনরকম সম্বন্ধ আছে।'

নরেশের কণ্ঠস্বরে উষ্ণতার ছোঁয়াচ লাগিল, 'না-ই বা জানলে, মিনতির সঙ্গেও ত' তোমার পরিচয় ছিল?'

'ছিল, সেটা তেমন ঘনিষ্ঠ নয়; আর তা ছাড়া, মেয়েরা চিরকালই পরাধীন—সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক তাদের যতই থাক, জোর খাটাবার মত অধিকার কি আছে?'

হঠাৎ নরেশ যেন উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, 'তা' যদি নেই ত' অনুমতি করবার অধিকার কে ওদের দিয়েছে। সত্যি বলছি নিশিকান্ত—থাকবার আশায় না এসে তুমি যদি সিনেমায় যাবার কথা বলতে ত' নিশ্চয়ই ও রাজী হয়ে যেত—সেখানে আমার অনুমতির কোন অপেক্ষাই দরকার হ'ত না।'

কথাবার্ত্তা ক্রমশঃ জটিল পথ ধরিতেছে। কিই বা জবাব দিবে নিশিকান্ত। এই সঙ্গে মিনতির কাকার কথাটা তাহার মনে পড়িয়া যায়,—'চিঠি না দিক, সুখে থাকলেই আমরা নিশ্চিন্দি।' এমন সময় ভিতরের দিকে বন্ধ করা দরজার গায়ে ঝনঝন্ করিয়া শিকলটা বাজিয়া উঠিল। মিনতি নরেশকে ডাকিতেছে।

জবাবটা নরেশ এইখান হইতেই দিল, 'এখানে আসতে পার। এ তোমারই বন্ধু নিশিকান্ত।'

চায়ের পেয়ালা হাতে প্রবেশ করিল মিনতি। খুব এতখানি অবগুণ্ঠনের ব্যবস্থাও নাই, লজ্জায় ভাঙিয়া পড়ার মত ভঙ্গীও নাই। টেবিলের ওপর চায়ের পেয়ালা রাখিতে রাখিতে সপ্রতিভ দৃষ্টিতে নিশিকান্তর প্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আবার ফিরে এলে যে!'

'কি আর করি, নরেশ ছেলেবেলার বন্ধু, ছাড়লে না, কাজেই...'

'তোমরা বুঝি একসঙ্গে পড়তে?' নরেশের মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল মিনতি।

'হাঁ—এককালে আমাদের দু'জনে বেশ ভালরকমই বন্ধুত্ব ছিল।'

নিশিকান্ত আশ্চর্য্য হইয়া গেল। যে সব কথা নরেশ এতক্ষণ ধরিয়া আলোচনা করিয়াছে, সে সবের বাষ্প পর্য্যন্ত এখন আর নাই। মিনতির অবর্ত্তমানে তাহার সম্বন্ধে কত উষ্ণ মন্তব্যই না সে উচ্চারণ করিয়াছে—কিন্তু এখন?

'নাও হে চা টা ঠাণ্ডা হয়ে গেল।' নরেশ নিশিকান্তর দিকে কাপটা একটু ঠেলিয়া দিল।

'আবার খাব? এই যে খানিক আগে খেয়েছি!'

নিশিকান্তর দিকে আর একবার দৃষ্টিপাত করিয়া মিনতি বলিল, 'এসেছ যখন দিন দুই থেকে যাও।'

নরেশ কহিল, 'নিশ্চয়ই থাকবে। কালকের দিনটা থেকে সেই পরশু না হয় যাবে।'

'তাহলে তোমরা গল্প কর, আমি যাই'—মিনতি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

নিশিকান্ত কথা কহিতে আরম্ভ করে, 'আজ তাহলে থেকে যাওয়াই সাব্যস্ত হল কি বল?'

'নিশ্চয়ই। এ সংসারে আমার সবটুকু দাবী ও অনুরোধ দিয়ে আমি তোমায় থেকে যেতে বলি।'

নিশিকান্তর বেশ লাগে, তবু, নরেশকে বুঝিতে তাহার যেন কষ্ট হয়। মানুষ কেমন করিয়া যে মুহূর্মুহুঃ পরিবর্তনশীল হইতে পারে, তাহা সে বুঝিতে পারে না। তবে এটুকু সহজ ও স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, এদের ব্যবহারের মধ্যে যেন একটা অসঙ্গতি আছে। কিন্তু, সেটুকু যে কোথায়, তাহাই আবিষ্কার করিবার জন্য নিশিকান্তর সমস্ত সাহিত্যিক মন উন্মুখ হইয়া থাকে।

হঠাৎ এক সময় নরেশ জিজ্ঞাসা করে, 'আচ্ছা কতদিন পরে তুমি মিনতিকে দেখলে বল তো?'

একটু হিসাব করিয়া নিশিকান্ত বলে, 'তা প্রায় তিন বছর হবে।'

'আগেকার চেয়ে ও কি রোগা হয়ে গেছে?'

'তা হয়েছে বই কি।'

নরেশ গম্ভীর হইয়া যায়, তারপর বলে, 'হতেই হবে; মনের সুখ যেখানে নেই, সেখানে কি শরীরের সুবিধে হয়?'

অবাক হইয়া নিশিকান্ত জিজ্ঞাসা করে, 'মনের সুখ নেই কেন?'

'থাকবে কেমন করে', সহজভাবে নরেশ বলিয়া যায়, 'তোমাদের ছেড়ে একলা একলা কি ভাল থাকতে পারে?'

কি যে বলিতে চায় নরেশ তাহা বুঝিবার যো নেই। 'তোমাদের ছেড়ে' কথাটার অর্থ কি? মিনতি কি তাহাদের ছাড়িয়া সত্যই অসুখে আছে। তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া মিনতির সম্বন্ধে এমন সব মন্তব্যের তাৎপর্য্য কি?

এমন সময় কি একটা প্রয়োজনে মিনতি আবার ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইল। নিশিকান্তের দিকে চাহিয়া বলিল, 'অনেকদিন পরে দেখা, দুই বন্ধুতে মিলে খুব গল্প করছ, নয়?'

জবাবটা নরেশ দিল, 'হাঁ, তোমার কথাও বাদ পড়ে নি।'

'তাই না কি?' মিনতি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করে, 'কি সব হচ্ছিল বল ত'?'

'বলছিলাম, তোমাদের ছেড়ে মিনতি দিন দিন রোগা হয়ে যাচ্ছে।'

'কোথায় আবার!' ভ্রূভঙ্গী করিয়া মিনতি বলিল, 'তোমার সব তাতেই বাড়াবাড়ি।'

মিনতির কথা বলার ভঙ্গীতে নিশিকান্ত চমকিয়া তাহার পানে চাহিল। কোথাও এতটুকু ক্লেশের ছায়া নাই।

তবে কি, এদের সম্বন্ধে ভুল ধারণা করিয়া সে ক্রমাগতই ভুলপথে হাঁটিতেছে?

নিশিকান্তকে উদ্দেশ করিয়া মিনতি বলিতে আরম্ভ করে, 'ওঁর নাটকে কেমন করে পার্ট করেছিলাম জান?'

হঠাৎ অঙ্গভঙ্গী করিয়া মুখস্থ বলিয়া যায়: "সখি কেমনে ভুলিব বল সে রূপমাধুরী!—দিবানিশি আঁখির সুমুখে জাগে সে আঁখি"।'

নিশিকান্ত হাসিয়া বলে, 'খুব স্মরণশক্তি ত', এখনও মনে আছে?'

হঠাৎ তাহার দিকে ফিরিয়া মিনতি বলে, 'কী ছেলে-মানুষই ছিলাম তখন, নয়?'

কথাটার কেহই জবাব দিল না। সমস্ত ঘরখানি নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দে ভারাক্রান্ত হইয়া রহিল।

২

বাহির হইতে কাহার ডাকাডাকিতে গভীর রাত্রে নিশিকান্তের ঘুম ভাঙিয়া গেল।

'কে?'

'ডাক্তারবাবু আছেন?'

'আছেন। দাঁড়াও ডেকে দিচ্ছি।' নিশিকান্ত উঠিয়া নরেশকে ডাকিতে গেল।

'নরেশ, ও নরেশ?'

'উঃ।'

'ওঠ হে একজন ডাকছে।'

নরেশ বাহির হইয়া আসিল। লণ্ঠনটা তুলিয়া ধরিয়া আগন্তুককে চিনিতে পারিয়া বলিল, 'বাড়াবাড়ি হয়েছে বুঝি?'

'আজ্ঞে হাঁ।'

'পালকী এনেছ?'

'বেহারাদের বলে এসেছি তারা অপেক্ষা করছে।'

'তাই চল, মোড়ের মাথা থেকেই উঠব।'

নরেশ প্রস্তুত হইয়া আসিল। একখানা মোটা বই ও কমুয়ের বাক্সটা আগন্তুকের হাতে দিয়া বলিল, 'একটু সজাগ থেক নিশিকান্ত, আমি বোধহয় এখুনি ফিরব, মিনতি ঘুমুচ্ছে বলে তাকে আর জাগালাম না।'

নরেশ দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। মিনতি কি এখনও ঘুমাইয়া আছে না কি? মেয়ে মানুষের এমন ঘুম ত' দেখা যায় না! তা ছাড়া নরেশকে ডাকিবার সময় গোলমালও ত' কম হয় নাই। এতেও মেয়ে মানুষের ঘুম ভাঙে না, এ কেমন কথা? নিশিকান্ত ঘরের মধ্যে পায়চারী করিয়া বেড়াইতে লাগিল। এ তাহার ছেলেবেলার অভ্যাস, একবার ঘুম ভাঙিলে সহজে আসিতে চায় না।

তারপর পায়চারী করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া এক সময় সে ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুম ভাঙিয়াই মনে হইল, নরেশ কি কাল রাত্রে বাড়ী ফেরে নাই? কিংবা এমনও ত' হইতে পারে যে, সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া মিনতিকে ডাকিয়া দরজা খোলাইতে হইয়াছে। সামনের উঠানে বসিয়া ঝি বাসন মাজিতেছিল—নিশিকান্ত জিজ্ঞাসা করিল, 'হ্যাঁ ঝি, তোমাদের বাবু কোথা?'

'তিনি সেই রুগী দেখতে গেছেন রাত্তিরে, আর ত' ফেরেন নি।'

নরেশ তাহা হইলে ফেরে নাই। ওদিক্ হইতে ঝিকে উদ্দেশ করিয়া মিনতির কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'বাবুকে দোকান থেকে চা এনে দিয়ে যাও ঝি।'

'পাঁচ বাড়ীর কাজ, আমার আর সময় কই মা।'

'কিন্তু, আমার ত' এ সব পাঁচদিনের কাজ নয় বাছা—শুধু একটা দিন, না করলে চলবে কেন বল?'

'কাজ নেই, আমিই না হয় দোকান থেকে খেয়ে আসছি' বলিতে বলিতে নিশিকান্ত ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। দালানের অপর প্রান্তে মিনতির ঘরের পানে চোখ পড়িতেই দেখে, ভিতর হইতে খোলা জানালাটার সামনে দাঁড়াইয়া মিনতি কথা কহিতেছে, আর ঘরের দুয়ারে ঝুলিতেছে একটা তালা। তাহাকে দেখিয়া মিনতি ভীষণভাবে হাসিতে আরম্ভ করিল। এ হাসির অর্থ কি! নিশিকান্তর বিস্মিত মুখের পানে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে জানালার আরো কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল, 'আমার হাসি দেখে খুব আশ্চর্য্য হয়েছ, নয়? হাসি কি আর সাধে! সত্যি, কি আশ্চর্য্য মানুষ বল ত', তাড়াতাড়ি খেয়ালের মাথায় আমার ঘরে তালা লাগিয়ে দিয়ে গেছে।'

এ সব কি ব্যাপার! এ সমস্ত যেন নিশিকান্তর বিস্ময়কেও অতিক্রম করিতেছিল।

নিজের অবস্থাটাকে সহজ পর্য্যায়ে নামাইয়া আনিবার জন্য নিশিকান্ত জিজ্ঞাসা করে, 'আমায় সজাগ থাকতে বলে, সেই যে গেছে এখনও ফেরেনি বুঝি?'

'না।'

'তবে, আমায় যে বলে গেল, 'এখুনি ফিরব'।'

মিনতি মৃদু মৃদু হাসিতে থাকে, 'তা' কখনও হয়, যেতে চারক্রোশ আসতে চারক্রোশ—আর এগারটার আগে কিছুতেই ফিরতে পারবে না।'

নরেশের যাইবার সময় মিনতি তাহা হইলে জাগিয়া ছিল! তবে, নরেশ যে বলিয়া গেল, মিনতি ঘুমাইয়া আছে—সে কি মিথ্যা? আর তাছাড়া যাতায়াতে আট ক্রোশ পথ আনিয়াও এখুনি ফিরিবার কথা বলিয়া যাইবার উদ্দেশ্য কি? নরেশ কি আজকাল অকারণে মিথ্যা বলিতে অভ্যাস করিয়াছে না কি? কিংবা এমনও ত' হইতে পারে যে, এর অন্তরালে একটা সুগভীর জটিল রহস্য আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে। ভুল করিয়া মিনতির ঘরের দরজায় তালা লাগাইয়া যাওয়াটাও কি এই সব জটিল রহস্যের পর্য্যায়ভুক্ত না কি? নিশিকান্ত অনুভব করে, তাহার বুদ্ধির বাহিরে একটা অদ্ভুত কিছু যেন সংঘটিত হইতেছে।

'তাইত এমন করে কতক্ষণ থাকবে?' নিশিকান্ত সহানুভূতিসূচক কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল।

'না থাকলে কে আর খুলে দিচ্ছে বল।' তারপর একটু থামিয়া আবার বলিল, 'নিয়ে এস না টুলটা টেনে, তোমার সঙ্গে একটু গল্প করি।'

নিশিকান্ত জানালার কাছে টুলটা টানিয়া আনিয়া বসিল। ভিতরে মিনতি আর বাহিরে নিশিকান্ত—মাঝখানে লোহার পরাদের ব্যবধান।

'আচ্ছা', সামান্য একটু ভূমিকা করিয়া মিনতি আরম্ভ করিল, 'সেদিন সেই যে হঠাৎ চলে গেলে, আর ত' দেখাই দিলে না। কতদিন ধরে রোজই তোমার কথা ভেবেছি।'

কিন্তু, এ সব কথার মধ্যে মূল্য যতই থাক, আজ তাহা নিরর্থক হইয়া গেছে।

নিশিকান্ত জবাব দিল, 'কি করব বল, ঘণ্টার পেকে ফিরে দেখলুম, তুমি নেই।'

হঠাৎ মিনতির কণ্ঠস্বর তীব্র হইয়া উঠিল, 'কেন থাকব, যাবার সময় একবার দেখা করতে এসেছিলে কি? তুমি চলে যেতে পারলে হঠাৎ, আর আমিই বা পারিনে কেন?'

'বেশ ত', তার জন্যে আমি কি তোমায় কিছু বলেছি?'

মিনিট কয়েক নীরবে কাটিয়া গেল। তারপর নীরবতা ভঙ্গ করিয়া নিম্নস্বরে ধীরে ধীরে নিশিকান্ত বলিল, 'তুমি যেন কেমন বদলে গেছ মিনতি—তোমার কথাবার্ত্তা, ব্যবহার সবই যেন আমার কাছে দুর্ব্বোধ্য ঠেকছে।'

মিনতি কথাটার মোড় ফিরাইয়া দিল, 'আমাদের বাড়ীর সবাই কেমন আছে জান?'

'ভালই। সেদিন তোমার কাকার সঙ্গে দেখা হল, কথায় কথায় তোমার কথা উঠতে বললেন, 'চিঠিপত্র না দিক, সুখে থাকলেই আমরা নিশ্চিন্দি।'

নিশিকান্ত সচকিত করিয়া দিয়া মিনতি খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, 'ও, কাকার বুঝি রাগ হয়েছে; এই ত' সেদিন চিঠি দিলাম—রোজ একখানা করে চিঠি দিই, সে সময় কই? আর সুখে থাকব নাই বা কেন, এ সব তাঁরা তাঁদের অন্যায়; এই ত' তুমি এলেছ, অসুখটা কি দেখছ বল ত?'

মিনতি উত্তরের আশায় তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। যা হক কিছু একটা উত্তর দিবার জন্য নিশিকান্ত অস্থির হইয়া ওঠে।

মিনতির কান্ত হইতে পুনরায় তাগাদা আসিল, 'বল না, চুপ করে রইলে কেন?'

'না না, তেমন কিছু নয়, ও তোমার কাকার বাড়াবাড়ি।'

হঠাৎ নিশিকান্তর মনে পড়িয়া গেল। টুল হইতে উঠিয়া তালাটার পানে চাহিয়া বলিল, 'আমার পকেটে একটা চাবি আছে বোধ হয় লাগতে পারে, একবার দেখব।'

'না, না থাক—বেশ মজা হবে।'

এমন করিয়া ঘরের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে মজা লাগে না কি? হইবেও বা।

তবু আর একবার নিশিকান্ত বলে, 'দেখিই না, যদি খোলা যায়।'

'আমার কিন্তু এইতেই বেশ মজা লাগে', বলিতে বলিতে একটু থামিয়া নেহাৎ অনিচ্ছাকৃত স্বরে মিনতি বলে, 'আচ্ছা, বলছ যখন, একবার চেষ্টা করে দেখতে পার।'

৩

মিনতি ঠিকই বলিয়াছিল, নরেশ যখন ফিরিল, তখন প্রায় এগারটা। ভিজিটের টাকাগুলি বাক্সে তুলিয়া চাবি দিতে দিতে বলিল, 'বুঝলে নিশিকান্ত, অনেক দূরে গিয়ে মনে পড়ল যে, ভুলে মিনতির ঘরের দোরে তালা দিয়ে এসেছি।'

নিশিকান্ত জবাব দিবার পূর্ব্বেই মিনতি প্রবেশ করিল।

'এ কি, খুললে কেমন করে?'

নরেশের কণ্ঠস্বরে এমন একটা ভাষা ধ্বনিত হইল যে, মনে হয় ভুল করিয়া তালা দেওয়ার পর তালা খুলিয়া ভুল সংশোধন করাটা তাহার যেন মনোমত হয় নাই।

জবাবটা নিশিকান্তই দিল, 'আমার পকেটে একটা চাবি ছিল, বরাতক্রমে সেটাতে লেগে গেল।'

'হুঁ' নরেশ ভীষণভাবে গম্ভীর হইয়া গেল।

সমস্ত দিনের মধ্যে নরেশের মুখ হইতে গাম্ভীর্য্যের ছায়া অপসারিত হয় না। কঠিন গাম্ভীর্য্যে কপালে, চিবুকে সময়ে অসময়ে বিনা কারণে রেখা ফুটিয়া ওঠে। ব্যাপারটা ক্রমশঃই জটিল হইয়া উঠিতেছে—নিশিকান্তর আত্মসম্মানেও বুঝি ঘা লাগিবে। নিশিকান্ত মনে মনে সঙ্কল্প করে, আজই রাত্রের গাড়ীতে সে নিঃশব্দে বর্দ্ধমান ত্যাগ করিবে। এরকম নিঃসাড়ে পলাইয়া যাওয়াতে যদি এরা সন্দেহ করে ত' করুক, নিশিকান্তর তাহাতে আপত্তি নাই।

দিবানিদ্রার পর অপরাহ্নে নিশিকান্ত বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল। ফিরিল যখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

চাকিটেবল ডিস্পেন্সারী হইতে নরেশ তখনও ফেরে নাই। জামা খুলিয়া নিশিকান্ত রান্নাঘরের সামনে গিয়া দাঁড়াইল। উনানের আগুনে মিনতির মুখখানি লোহিতাভ হইয়া উঠিয়াছে। কপালে, গালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমিতেছে। সমস্ত ভঙ্গীতে কেমন যেন একটা স্তিমিত বিমর্ষভাব···মিনতি কি যেন ভাবিতেছে। পিছন ফিরিয়া হঠাৎ নিশিকান্তকে দেখিতে পাইয়া মাথার কাপড়টা টানিয়া দিতে দিতে মিনতি বলিল, 'ঘুম থেকে উঠে কখন চলে গিয়েছিলে বল ত?'

'প্রায় তিনটে হবে তখন—এখানকার সবই প্রায় দেখা হয়ে গেল।'

'জলখাবার দিতে গিয়ে আমি ভাবলুম, না বলে বুঝি কলকাতায় চলে গেলে।'

'গেলে তোমাদের বলেই যাব।'

'তবু ভাল।' মিনতি পিছন ফিরিয়া কি একটা কাজে মনোনিবেশ করিল।

'বেশ গরম পড়েছে, ছাদে গিয়ে বসিগে।'

নিশিকান্ত ছাদে উঠিয়া গেল। একতলা ছাদ, আলিসা নাই, উঁকি মারিয়া নীচের রাস্তায় লোক-চলাচল দেখা যায়। রাস্তার ওপারে অর্দ্ধোন্মুক্ত বাতায়নপথ দিয়া এক ঝলক আলো আসিয়া পড়িয়াছে। মাথার উপর নক্ষত্রখচিত কাল আকাশটার পানে চাহিয়া নিশিকান্ত কি যেন ভাবিবার চেষ্টা করে, কি ভাবে সেই জানে।

খাবারের থালা হাতে মিনতি উপরে আসিয়া উপস্থিত হইল।

'কি করি, বাবা হয়ে এমন অসময়ে দিতে হল,' বলিয়া থালাটা হাতে দিয়া পেয়ালাটা নামাইয়া রাখিয়া যাইবার জন্য মিনতি পিছন ফিরিল।

'মিনতি!' এখানে আসিয়া এই প্রথম নিশিকান্ত তাহার নাম ধরিয়া ডাকিল।

'উঁ', মিনতি ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছে।

'বস না, একটু গল্প করি।'

'সে ভাগ্যি কি করেছি, কত কাজ!'

মিনতির কণ্ঠস্বরে অভিযোগের সুর ফুটিয়া উঠিতেছে না কি? না, না, তা কেন, এ সব মেয়েদের বাক্য-বিলাস।

'আচ্ছা মিনতি, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?' উত্তরের আশায় অপেক্ষা করিয়া রহিল।

'কি, বল না!'

'বুদ্ধিটা আমার চিরকালই কম', নিশিকান্ত ভূমিকা করিল।

'তা জানি, কিন্তু বেশী বিনয়ও ভাল নয়।'

নিশিকান্ত আর একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, 'আমার সন্দেহ হয়···'

'কি সন্দেহ?' মিনতি বিস্ময়ে ঝুঁকিয়া পড়িল।

'সন্দেহ হয়, তুমি বোধ হয় তেমন সুখী হও নি।'

'বা রে, অসুখটা কোথায়? এই ত' বেশ সুখে রয়েছি।' হাত দুটি নাড়িয়া চমৎকার একটি ভঙ্গী করিয়া মিনতি হাসিতে লাগিল।

'আচ্ছা, নরেশ কি কাল ইচ্ছে করে তালা দিয়েছিল?'

'কি যে বল!' মিনতি খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। হাসির প্রাবল্যে মিনতি কি ভাঙিয়া পড়িবে নাকি?

'উঁহুঁ হুঁ, আর পেছিও না আলসে নেই ছাদের।'

নিশিকান্ত মিনতিকে হাত নাড়িয়া নিষেধ করিল। 'সর্ব্বনাশ করেছিল, আর একটু হলে পড়ে যেতে যে।'

'ও ভুলে গিয়েছিলাম, আলসে নেই বুঝি?'

মিনতি ঝুঁকিয়া পড়িয়া নীচের রাস্তাটা একবার দেখিয়া লইল। বলিল, 'আচ্ছা, পড়লে মরে যেতাম নয়?'

এ কি অদ্ভুত প্রশ্ন, নিশিকান্ত মিনতির হাত ধরিয়া পুনরায় আকর্ষণ করিল।

তবুও উঁকি মারিয়া রাস্তাটা দেখিতে দেখিতে মিনতি বলে, আচ্ছা, 'হাতটা ছিনিয়ে নিয়ে এখুনি যদি লাফিয়ে পড়ি?'

'সে কি কথা!' নিশিকান্তর গা ছমছম করিতে থাকে।

ক্ষণপরে নিজেকে সংবরণ করিয়া একটু ভাবিয়া ধীরকণ্ঠে নিশিকান্ত জিজ্ঞাসা করে, 'এমন লাফিয়ে পড়ার সখ কেন বলতে পার?'

ও কথার জবাব না দিয়া অসংলগ্নভাবে মিনতি বলিয়া

যায়, 'কি বললে? আমি এখানে অসুখে আছি? কাল ও আমার ইচ্ছে করে তালা বন্ধ করেছিল? কেমন করে আস্পর্দ্ধা কর বল ত'?'

আবার খিলখিল করিয়া মিনতি হাসিতে থাকে। এ হাসি যেন থামিবে না। অথচ ইহার মধ্যে হাসির কি আছে! অবশেষে, বোতাম টিপিয়া বৈদ্যুতিক আলো নেভানর মত এত হাসিও দপ করিয়া নিভিয়া যায়—মিনতির কণ্ঠস্বরে আগেকার হাসির এতটুকু রেশও পাওয়া যায় না।

গম্ভীর হইয়া হঠাৎ সে বলে, 'ঐ যাঃ, সব বুঝি পুড়ে গেল, উনুনে তরকারী চড়িয়ে এসেছি যে!'

হুড়হুড় করিয়া তীব্রগতিতে সে সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া যায়।

অতি সন্তর্পণে পা টিপিয়া টিপিয়া নিশিকান্ত নীচে নামিয়া আসিল। অদূরে উনানের দিকে চাহিয়া নিস্পৃহভাবে বসিয়া আছে মিনতি। আয়ত আঁখি-তারকায় উনানের লাল আভা প্রতিফলিত হইয়াছে। জামাটা গায়ে দিয়া নিশিকান্ত নিঃশব্দে রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল। অস্পষ্ট আলোকে হাত-ঘড়িটা দেখিয়া ষ্টেশনের পথটুকু অতিক্রম করিতে করিতে সে ভাবে: সত্যই কি নরেশ ভুল করিয়া তালা দিয়াছিল? জগতে প্রত্যেক ভুলের পিছনে থাকে অবচেতন মনের অজ্ঞাতের, গোপন একটি ইচ্ছা। ভুলই যদি করিয়া থাকে ত' এর মূলে কোন্ ইচ্ছা ছিল? এমন সন্দেহজনক প্রেরণা কেমন করিয়া তাহার মনে উদয় হইল?

ষ্টেশনে আসিয়া নিশিকান্ত দেখে ট্রেন দাঁড়াইয়া আছে। জংশন ষ্টেশন, কাজেই ধীরেসুস্থে গাড়ীতে চাপিয়া বসিতে তেমন কোন কষ্ট হইল না। ট্রেনখানা ছাড়িয়া দিবার পর হঠাৎ একটা অদ্ভুত চিন্তা তাহাকে পাইয়া বসে। নিশিকান্ত মনে মনে ভাবে:

খানিক পরে, কাজ সারিয়া তাহাকে খুঁজিতে আসিয়া সত্যই কি মিনতি ছাদ হইতে লাফাইয়া পড়িবে না কি? কোনরকম অসুখে না থাকিয়াও ছাদ হইতে লাফাইয়া পড়িবার দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছা যদি মিনতিকে ভর করিয়া থাকে ত', কি করিতে পারে সে?

বনস্পতি

—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

বনস্পতি ঊর্দ্ধে তুলে শির
বনানীর দিগন্ত-প্রসার—
ছন্দিপন্ন সৌরভে অধীর
পাঞ্জন্য ব্রততী-লতার।

মাঝে রচে নিবিড় বিতান
ব্যবধান সুদূর বিথার,
প্রেমস্পর্শে তবু কম্পমান
হিল্লোলিত অন্তর আত্মার।

লতা হ'তে উড়ে মধুকর
বসে এসে বর-তরুটিতে,
চকা-চকী বিরহ-কাতর
বাঁধা পড়ে নিবুদ্ধ নিশীথে।

বসন্তের ঘন পত্রচ্ছায়
রশ্মিস্নাত শিশির-শীকর—
শরতের, হেমন্তের বায়
কানাকানি করে নিরন্তর।

হিমানীর নিষ্ঠুরতা যায়
বনসভা হয় শোভাহীন,
সজ্জাচ্যুত বনস্পতি তায়
বনলতা হতশ্রী মলিন।

নিঃসহায় একান্ত বিজন
মৌন-মূক কানন নীরব,
শুধু কল-কাকলি-কূজন
জনহীন চির-মধুৎসব।

এরি মাঝে যুগল প্রাণের
জেগে ওঠে মিলনের গান,
এখনো ত' দেরী ফাগুনের
এ কি হায়! বিচিত্র বিধান!

মধ্য-এসিয়ার যাযাবর জাতি

—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বোখারা ও সমরখন্দ ছাড়িয়ে তাসখন্দ। তাসখন্দ থেকে পূর্বদিকে চীন পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে প্রাচীনকালের রেশম-ব্যবসায়ী বণিকদের যাতায়াতের পথ।

দীর্ঘ শোভাযাত্রা বার হয়, ঝোলা ঢিলেঢালা পোষাক-পরা চীনা বা তুর্কী বণিকেরা হাত নেড়ে বাজারে লোকের ভিড়ের মধ্যে জিনিষপত্রের দরদস্তুর করে।

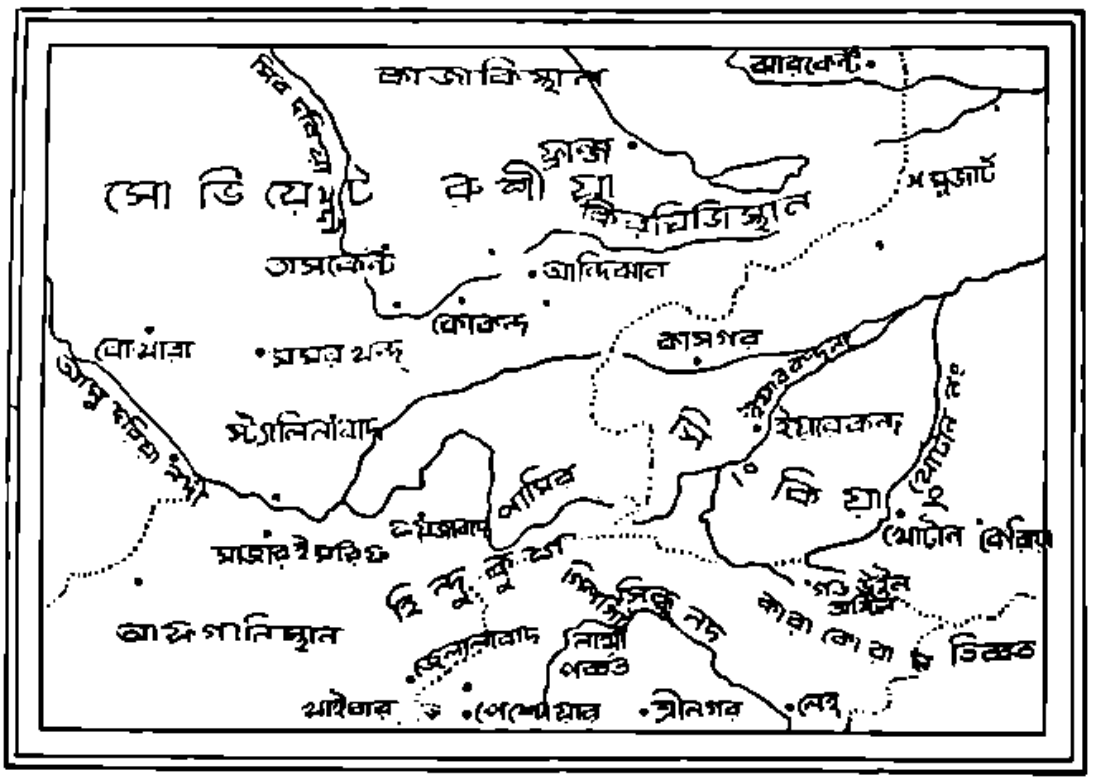

মধ্য-এসিয়ার মানচিত্র।

তুন্দ্রা অঞ্চলে এবং জনহীন পার্বত্য প্রদেশ পার হয়ে এঁকে-বেঁকে এ রাস্তা রুশীয়-চীন সীমা পার হয়ে চলেছে সিংকিয়াং প্রদেশের রাজধানী কুলজা সহরে, সেখানকার বাজার সব জাতীয় লোকের এক মহাসম্মেলন-স্থল।

শীতকালে এখানে প্রাচীন-পন্থী রাশিয়ানেরা সারা রাত্রি আমোদ-প্রমোদে অতিবাহিত করবার পরে ট্রইকা গাড়ী করে বাড়ী ফেরে, ঘোড়ার পিঠে মোঙ্গল বৌদ্ধ পুরোহিতদের দীর্ঘ শোভাযাত্রা বার হয়, ঝোলা ঢিলেঢালা পোষাক-পরা চীনা বা তুর্কী বণিকেরা হাত নেড়ে বাজারে লোকের ভিড়ের মধ্যে জিনিষপত্রের দরদস্তুর করে।

গ্রীষ্মকালে ট্রইকা গাড়ীর বদলে মন্থরগতি গরুর গাড়ী চলে রাস্তায়। এসময় রাস্তা ধুলোতে ভর্ত্তি হয়ে যায়, বালির এক ইঞ্চি সূক্ষ্ম পর্দ্দা সারা সহরের উপর শবাধারের আস্তরণের মত উপুড় হয়ে থাকে।

এই কুলজা সহরে আমি (এড্‌ওয়ার্ড মায়ের বর্ণনা থেকে উদ্ধৃত) শীত ও গ্রীষ্মের সাত মাস অতিবাহিত করার পরে একদিন বিখ্যাত টেকেস্ উপত্যকার সন্ধানে অশ্বপৃষ্ঠে

যাত্রা হলাম। সহর থেকে দু'দিনের রাস্তা দক্ষিণ মুখে চলবার পরে পার্ব্বত্য অঞ্চলে প্রায় পদার্পণ হয়ে গেলাম।

একটি অর্দ্ধশুষ্ক নদীখাতের ভেতর দিয়ে আমি ঘোড়া চালাচ্ছিলাম।

দুদিকে উঠেছে খাড়া পাহাড়ের দেওয়াল, তাতে বড় গাছ ছিল না আদৌ, কিন্তু নিবিড় তৃণরাশি ও ছোট ছোট জংলী গাছে তাদের সানুদেশ আচ্ছন্ন।

এই তৃণাবৃত পর্ব্বত-প্রাচীর আমার সঙ্কীর্ণ পথের দুদিকেই; এত সঙ্কীর্ণ সে পথ এবং এত উঁচু দুধারের পর্ব্বত-প্রাচীর যে, মাথার ওপর মাত্র একফালি নীল আকাশ এবং সামনের ঝাঁকা-বাঁকা, সরু পথ ছাড়া আর কিছু বড় একটা চোখে পড়ে না।

হঠাৎ আমার সম্মুখের বন-জঙ্গলের মধ্যে থেকে একজন অশ্বারোহী বার হয়ে আমার পথ রোধ করে দাঁড়াল। তার পরিচ্ছদ দেখে বুঝলাম, সে কালমাক্ জাতির লোক। তার কৃষ্ণ দেহবর্ণ, উঁচু চোয়ালের হাড় এবং কানবিহীন ফেল্টের টুপি তার জাতির পরিচয় দিলে আমার অভিজ্ঞ চোখের সামনে। আমার মনে হ'ল, আড়াল থেকে সে অনেকক্ষণ ধরে আমার আগমন লক্ষ্য করছিল এবং আমার সামনে আবির্ভাবের মূলে তার কোন উদ্দেশ্য আছে।

কিছুক্ষণ আমরা চললাম অশ্বপৃষ্ঠে নির্ব্বাক্ অবস্থায়।

যাযাবর জাতির মধ্যে প্রথা এই, অভিবাদনের পূর্ব্বে কিছু সময় নির্ব্বাক্ অবস্থায় থাকা।

আমি এ প্রথা জানি এবং নিজে আগে কথা না বলে সব সময়েই অপর পক্ষকে কথা বলতে দিই। হঠাৎ সে ঘোড়ার পিঠ থেকে পিছন দিয়ে আমার দিকে চেয়ে বললে—কোথায় যাচ্ছ তুমি?

ওর মুখ দেখে মনে হ'ল আমার প্রতি বন্ধুত্বের মনোভাব ওর নয়।

আমি বললাম—টেকেস্ উপত্যকায়।

—সেখানে তোমার কি দরকার?

—কিরঘিজ্‌দের সর্দ্দার সজন বেগের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।

লোকটী ঘোড়ার লাগাম কসে ঘোড়ার মুখ আমার দিকে ফেরালে। ওর মুখের চেহারা তখন একদম বদলে গিয়েছে, বন্ধুত্বের প্রসন্ন হাসিতে ওর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

বললে,—এ-পথ টেকেস্ উপত্যকায় যাবার পথ নয়। এ পথ ধরে কিছুদূর গেলে তুমি পর্ব্বতের মধ্যে দিক্‌ভ্রান্ত হয়ে হারিয়ে যাবে। আকাশের তলায় রাত কাটাতে হবে। তার পরে কোন্ পথে গেলে আমি ঠিক জায়গায় পৌঁছুতে পারব তার বিস্তৃত সন্ধান দিলে।

যাবার সময়ে বলে গেল,—কিরঘিজ্‌দের সর্দ্দারকে কালমাক্ জাতির অভিবাদন জানিও।

আমার মনে হ'ল সে একজন প্রহরী, টেকেস্ অঞ্চলে কালমাক্ জাতির পশুচারণ ভূমির পরদারিতে নিযুক্ত।

লোকটার নির্দ্দেশমত আমি একটা পুরোনো ভেড়ার পৌঁয়াড়ের পাশ কাটিয়ে গিয়ে কর্দ্দমাক্ত পথের অবস্থা পরীক্ষা করবার জন্যে ঘোড়া থেকে নামলাম।

কাদার ওপরে ছাগলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদচিহ্ন নীচের ঢালু অংশ থেকে পাহাড়ের ওপরের দিকে উঠে গিয়েছে। পায়ের চিহ্ন দেখে মনে হয়, অল্পক্ষণ মাত্র পূর্ব্বে ছাগলের দল এ-পথ দিয়ে গিয়ে থাকবে।

আমি সেই পথে দক্ষিণ দিকে উঠে কতগুলো দুরারোহ ছোট ছোট শিলাস্তূপ অতিক্রম করে পাহাড়ের শেষ থাকের শীর্ষদেশে পৌঁছে গেলাম।

আমার পায়ের নীচে পাহাড়ের ওপারেই বিখ্যাত টেকেস্ উপত্যকা বিস্তৃত। মধ্য-এসিয়ার যাযাবর জাতিদের স্বর্গ এই টেকেস্ উপত্যকা। আমার সামনে বিরাট পাহাড়শ্রেণী পৈ পৈ করছে ঘুরে—উপত্যকার ওদিকের দেওয়াল যেখানে, সেখান থেকে পার্শ্বশৈল-শ্রেণীর সম্মিলিত শিখরদেশ যেন এক ঘুরপ্রসারী সবুজ সমতলভূমি রচনা করেছে চোখের সামনে, যে সমতলভূমি দূরে তুষারাবৃত পর্ব্বতশিখরের সঙ্গে মিশে গিয়েছে বলে মনে হচ্ছে এখান থেকে।

আসলে এই মালভূমি সব জায়গায় সমতল নয়—অনেক স্থানে উঁচু-নীচু। যাযাবর জাতিদের পশুচারণের উপযুক্ত ক্ষেত্র হিসেবে এর প্রসিদ্ধি বহুদূর বিস্তার লাভ করেছে। সুদূর ইস্তানবুল শহরে বসে আমি এই টেকেস্ মালভূমির গল্প শুনেছি।

আমিও শুনেছিলাম গ্রীষ্মকালে যাযাবর জাতিরা তাদের পশুদল নিয়ে এই মালভূমিতে গ্রীষ্মের ক'মাস যাপন করতে আসে, এই মালভূমিতে আসবার স্বপ্ন দেখে তারা সারা বছর। এখানে তারা সময়টা মহা আনন্দে অতিবাহিত করে, ঘোটকীর দুগ্ধ পান করে প্রচুর পরিমাণে ভেড়ার মাংস খায়, প্রেম করে, বিবাহ করে।

গ্রীষ্মের মাসগুলি ওদের পক্ষে বছরের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সময়।

অনেক দূরে উপত্যকার একটা খাঁজের মধ্যে যেন কতকগুলো দূসর রঙের তাঁবু দেখা গেল। গাছপালার মধ্যে, কুলগাতে বন্ধু-বান্ধবেরা যে-রকম বর্ণনা দিয়েছিল, তার সঙ্গে তাঁবুগুলোর অবস্থিতি-স্থানের দৃশ্য মিলে গেল। নিশ্চয়ই ওই তাঁবুই কিরঘিজ্ সর্দারের সজন বেগের গৃহ—যাযাবর জাতিরা উপত্যকার ওই অংশে শীতকাল যাপন করে, তার পর যেমন গ্রীষ্মকাল পড়বে, ওরা টেকেস্ মালভূমির ওপর উঠে যাবে।

আমি ঘোড়ার লাগাম ধরে অতি সন্তর্পণে সেই আঁকা-বাঁকা পথ দিয়ে নামতে লাগলাম।

সজন বেগ আমায় দেখে বললে—তা হলে তুমি সত্যই একজন আমেরিকান?

বোধ হয় সর্দার কখনও আমেরিকান সাহেব দেখেনি এর আগে।

সজন বেগ একটা সেদির বা তুর্কি কেদারায় হাঁটু-মুড়ে বসে আমার পরিচয়-পত্রখানি পাঠ করছিল। সেই সময় আমার টেকেস্ উপত্যকায় আগমনের কারণ তাকে শোনালাম। সজন বেগের জ্ঞাতি-ভ্রাতারা ইস্তানবুলের রবার্ট কলেজে আমার ছাত্র ছিল। তাদের মুখে আমি কুলগা সহর ও টেকেস্ উপত্যকার কত গল্প শুনেছি, তখন আমার ইচ্ছা হ'ত, যদি কখনও অবসর ঘটে, যাযাবর জাতির স্বর্গ এই বিখ্যাত উপত্যকায় নিজে একবার যাব। তারপর আমার ছাত্রেরা লেখা-পড়া শেষ করে যখন বাড়ী ফিরল, আমায় তারা তাদের দেশে আসবার নিমন্ত্রণ পাঠালে।

সজন বেগের চেহারা কিন্তু ঠিক দুর্দ্ধর্ষ যাযাবর সর্দারের মত নয়।

লোকটা মাথায় ছোট, হাতপায়ের হাড় সরু, সরু যেন অনেকটা মেয়েলি কমনীয়তা মাখান ওর দেহে। কিন্তু বেশীদিন ধরে লোকটার সঙ্গে থেকে বুঝেছিলাম ওই খর্বায়তন দেহে কি অদম্য প্রাণশক্তি, কি উৎসাহ, কি তেজ। আমার মনে হ'ত, ওর প্রাণশক্তির বুঝি সীমা নেই। সজন বেগের ধরণধারণও ঠিক রাজার মত। সেইরকম কর্তৃত্বপূর্ণ সুরে দৃঢ়ভাবে আদেশের বাণী উচ্চারণ করে। আমার মনে হয়, ওর দেহে রুশীয় রক্ত কিছু মিশ্রিত আছে, অন্যান্য কিরঘিজ-জাতীয় লোকের তুলনায় সজন বেগের দেহবর্ণ অনেক ফর্সা।

সজন বেগের মাথায় কাজ-করা টুপি। টুপি মাথায় না দিয়ে সভ্যসমাজে আলাপ করা কিরঘিজদের প্রথা নয়—ঘরের মধ্যেই হ'ক বা বাইরেই হ'ক। ওর অন্যান্য পরিচ্ছদের মধ্যে একটা রাশিয়ান শার্ট, রাশিয়ান কোট ও ঘোড়ায় চড়ার ব্রিচেস্। পায়ে হাঁটু পর্যন্ত উঁচু ভাল রাশিয়ান চামড়ার বুট-জুতো। চারিদিকে খবর গেল যে, একজন বিদেশী ভ্রমণকারী সর্দারের তাঁবুতে দেখা করতে এসেছে।

খবর পাওয়ামাত্র সম্ভ্রান্ত কিরঘিজ ভদ্রলোকেরা সর্দারের তাঁবুতে উপস্থিত হতে লাগল। সজন বেগ এবং আমি সামনা-সামনি কেদারায় বসেছিলাম—দর্শকেরা তুর্কীদের ধরণে মেজের উপরে বসেছিল বা দাঁড়িয়েছিল।

দেখলাম, এইসব যাযাবর জাতির লোকের ভৌগোলিক জ্ঞান নিতান্ত সীমাবদ্ধ। পৃথিবী তাদের নিকট সমতল; কোন যুক্তিতর্কেই ওদের সে ধারণা বদলান সম্ভব নয়। একটীমাত্র বৃহৎ মহাসাগর পৃথিবীকে ঘিরে রেখেছে। সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে। তারা রাশিয়া, চীনদেশ, ইরান, কাশ্মীর, হিন্দুস্থান, তিব্বত, আফগানিস্থান এবং সুদূর রহস্যময় ইংলণ্ডের নাম শুনেছে। কিন্তু আমেরিকা কোথায়, কতদূরে তাদের কোনও ধারণাই নেই।

আমাকে ওরা রাশিয়ান বলে ধরে নিয়েছে।

আমি তাদের বললাম, আমি রুশিয়ান নই কিরিঙ্গি, অর্থাৎ পশ্চিম ইউরোপবাসী।

চারিধার থেকে আমার ওপর নানাধরণের অদ্ভুত প্রশ্ন-বর্ষণ হচ্ছিল। তারই ফাঁকে একটু অবসর পেয়ে আমি এই উপত্যকাবাসী নিজের জাতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করলাম ওদের।

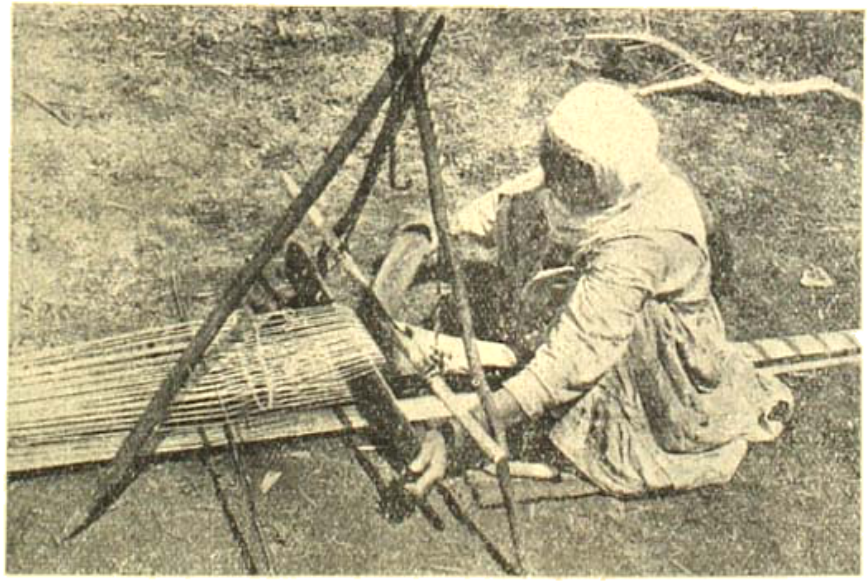

কিরঘিজ রমণীর তাঁত-বোনা

এই তিনটি গরুর পিঠে যাযাবর মালিকের সমস্ত সম্পত্তি আছে, আর তার রাত্রিবাসের ফেল্ট এবং তাঁবু

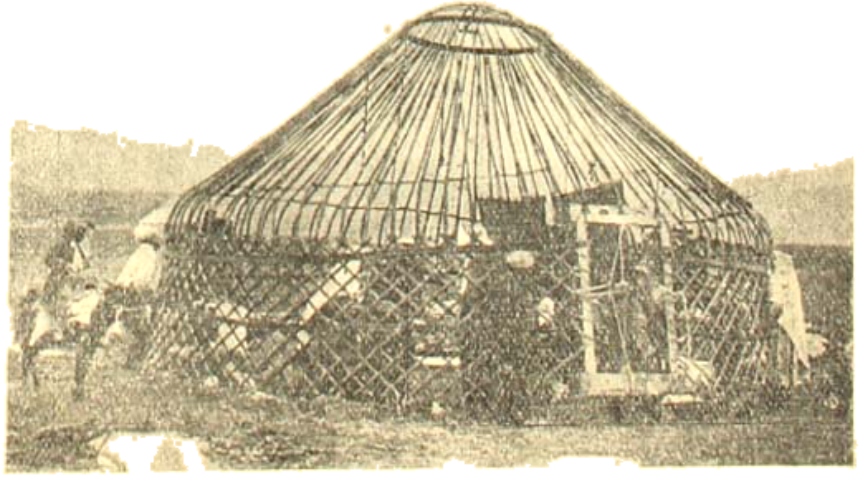

তার পরিবার বহনের সোজা উপায়—ফেল্টের আচ্ছাদন তুলে তাঁবুর কাঠামোটা অল্প আঘাতেই ভেঙে ফেলা হ'ল

কাজরী গাঁয়ে কাপড়ে ফুল তুলছে

কিরঘিজ্ সর্দ্দার উত্তর দিলে,—টেকেস্ উপত্যকায় সাধারণতঃ দুটী প্রধান জাতি বাস করে। ঘোষবর তুর্কী ও মোঙ্গোল। তুর্কী-জাতীয় লোকের মধ্যে আমরা আছি আর আছে কাজাকরা। এই দুই উপজাতির আচার-ব্যবহার, ভাষা এবং ধর্ম্ম প্রায় একই রকম। চেঙ্গিস্ খাঁয়ের সময়ে আমরা একই জাতি ছিলাম। এখন আমাদের মধ্যে ক্রমে কিছু পার্থক্য দেখা দিচ্ছে। ভাষার মধ্যে পার্থক্য দেখা দিয়েছে। কিরঘিজ্ রমণীদের শিরোপা একটু অন্যরকমের। কিরঘিজরা বেশী ধনীও বটে। আমরা এসেছি রুশীয় কিরঘিজস্তানের ইসক্-কুল বলে হ্রদের তীর থেকে; কাজাকরা এসেছে উত্তর সাইবিরিয়ার কাজাকিস্তান থেকে।

—টেকেস্ উপত্যকার অপর দিকে কালমাক বা মোঙ্গোলরা বহু শতাব্দী থেকে বাস করছে। ওদের ধর্ম্ম তিব্বতীয়, ভাষা মোঙ্গোলীয়, রীতিনীতিও অদ্ভুত ধরণের। ওরা সব সময়েই নিজেদের দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন নিজেদের ধরণে চালিয়ে এসেছে।

—চীনজাতি অনেকদিন ধরে আমাদের জাতির ওপর প্রভুত্ব করে এসেছে—কিন্তু ওরা যখন দেখলে আমাদের ঠিক-মত শাসনে রাখা ওদের সাধ্যায়ত্ত নয়, তখন ওরা আমাদের স্বায়ত্তশাসন দান করে নিশ্চিন্ত হ'ল।

—তা সত্ত্বেও এ-অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু হ'ল, তখন চীন গবর্ণমেণ্ট কেন্দ্রীয় শাসনের উপযোগিতা বুঝতে পারে এবং আমাদের বংশের লোকদের ওপর সমস্ত টেকেস্ উপত্যকার দেওয়ানী কার্য্যের পরিচালনার গুরু ভার অর্পণ করে।

—এতে ক'রে আজকাল কাজ খুব ভালই চলছে এবং আমরাই চীন গবর্ণমেণ্ট ও আমাদের জাতির মধ্যে মধ্যস্থতার কাজ করছি। শুধু আমাদের জাতির মধ্যে নয়, কিরঘিজ্, কাজাক ও মোঙ্গোলদের মধ্যেও বটে। তবে কালমাক-জাতির লোক সম্পূর্ণ ভিন্ন-প্রকৃতির, ওদের ব্যাপারে আমরা খুব বেশী হস্তক্ষেপ করতে যাই না।

কালমাকদের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখাবার জন্যে কিরঘিজ্ সর্দ্দার ঝাঁজের সঙ্গে বলে উঠল—ওরা এমনি অসভ্য যে, ওরা মৃতদেহ সমাধিস্থ করে না! উলঙ্গ অবস্থায় সেগুলো কুকুরের মুখে ফেলে দেয়।

আমি কিন্তু বলবার আগে সর্দ্দার প্রতিবাদের ভঙ্গিতে হাত তুলে বললে—দাঁড়াও, একটু ধৈর্য্য ধর, সবই জানতে পারবে ক্রমে ক্রমে। তুমি কালমাকদের পশুচারণ-ভূমিতে যেতে চাও, আলা বেগ তার সব ব্যবস্থা করে দেবে, সেই তোমার সঙ্গী এবং পথপ্রদর্শক হবে।

সঙ্গে সঙ্গে একজন তরুণ কিরঘিজ্ যুবকের দিকে সহাস্য-মুখে চেয়ে ওর কথা শেষ করলে। যুবকটীর বয়স আন্দাজ ২৫ বছর। সে খুব কায়দা করে ফেল্টের টুপিটা বাঁকাভাবে মাথায় পরেছে, গায়ে তার একটা মোটা কাপড়ের কোট, পায়ে রিবেস্ এবং হাঁটু পর্য্যন্ত তোলা রুশীয় বুট জুতা। কোমরে বরে-বোনা মোটা কাপড়ের কোমর-বন্ধ।

সঙ্গন বেগ বললে—আলা বেগ টেকেস্ উপত্যকার প্রত্যেক লোক, প্রত্যেক ঘোড়াটী এবং—(তারপর আমার দিকে একটু চোখ টিপে) প্রত্যেক মেয়েকে জানে। আর একটা বড় কথা, কিরঘিজদের মধ্যে ওই একমাত্র লোক যে কালমাকদের ভাষা বেশ ভাল জানে।

আলা বেগ বৌদ্ধধর্ম্মের রহস্য সম্বন্ধে একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি, ও সঙ্গে থাকলে তোমার সময় আনন্দে কাটবে, তোমাকে অনেক রকম গল্প পড়ে শোনাবে। চাই কি, তোমার জন্যে একটি পাত্রী বেছে দিতে পারে, তুমি তাকে বিয়ে করে আমাদের মধ্যে স্থায়ীভাবে সুখ স্বচ্ছন্দে বসবাস করতেও পারবে।

পরদিন সকালে আলা বেগকে বললাম—আমার মনে হয় কালমাক্ জাতির লোকে তাদের মৃত ব্যক্তিদের দেহ কুকুরের মুখে ফেলে দেয়, সর্দ্দার এটা নিশ্চয়ই ঠাট্টা করেই বলেছিলেন, তুমি কি বল?

আলা বেগ হেসে বললে—তোমরা ফিরিঙ্গিরা অনেক কথাই বিশ্বাস করতে চাও না দেখছি। যখন তোমাকে সঙ্গে করে কালমাকদের দেশে নিয়ে যাব, তখন তুমি দেখবে সর্দ্দার একটুও বাড়িয়ে বলেন নি। কালমাকদের মেয়েরাও অত্যন্ত কুশ্রী ও অপরিষ্কার, মাগোঃ! আচ্ছা, তোমাদের আমেরিকার মেয়েরা কেমন দেখতে, বেশ সুন্দরী?

আমি আলা বেগকে বোঝালুম যে, যদি কোন আর্কিন দেশের মেয়েকে সে দেখে, তবে তার মুণ্ড ঘুরে যাবে। তাদের চেহারাই আলাদা।

পরক্ষণেই ভদ্রতা করবার জন্যে বললুম,—আমি কোনও কিরঘিজ্ মেয়েকে এ পর্য্যন্ত দেখি নি।

আলা বেগ বললে,—আমি আগে কিরঘিজ্ অঞ্চলভূমিতে তোমায় নিয়ে যাই, সেখানে গিয়ে মেয়েদের দেখ। আচ্ছা, আমার সঙ্গে এস, আমাদের জাতির একটী চমৎকার সুন্দরী মেয়ে যে কত সুন্দর হতে পারে তোমাকে দেখাই চল।

আলা বেগ একশ গজ দূরবর্ত্তী একটা ফেল্টের তাঁবুর দিকে আঙুল দিয়ে দেখালে।

ভৃত্য আমাদের দুজনের ঘোড়া নিয়ে এল। আলা বেগই ঘোড়া আনতে বললে।

আমি বললুম,—ঘোড়ার দরকার কি? এটুকু ত', বেশ হেঁটে যাব এখন।

আলা বেগ আশ্চর্য্য হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে বললে,—হাঁটতে যাব কেন? আমাদের কি ঘোড়া নেই? আমরা কি চাকর না কি?

আমি বুঝলাম, আমার ভুল হয়েছে। এ দেশে সম্ভ্রান্ত লোকের পক্ষে পায়ে হেঁটে যাওয়ার মত অপমানকর ব্যাপার আর কিছুই নেই। আলা বেগের কাছে এ প্রস্তাব উত্থাপন করা আমার উচিত হয় নি।

ফেল্টের তাঁবুটার সামনে আমরা ঘোড়া থেকে নামলাম ও গলায় দড়ি একটা ছোকরা চাকরের হাতে দিয়ে তাঁবুর মধ্যে ঢুকে জুতা খুলে কার্পেটের ওপর বসে পড়লাম। তাঁবুর মালিক একরাশ বালিশ হেলান দিয়ে একপাশে বসে লম্বা নলযুক্ত সটকায় টান দিল।

হুঁকায় সাত আটবার টান দেবার পর আমাদের আগমন লক্ষ্য করবার অবকাশ হ'ল তার।

—সেলাম আলেকুম।

—সেলাম আলেকুম।

আমরা প্রথমে বসেছিলাম তাঁবুর দরজার দিকে পিছন ফিরে। পরস্পরের অভিবাদন বিনিময়ের পরে তাঁবুর মালিক আমাদের মেঝের মাঝখানে তাঁবুর দোরের দিকে মুখ করে বসবার জন্যে অনুরোধ করলে। এটাই অতিথিদের সম্মানের আসন।

আলা বেগের মুখে আমি তাঁবুর মালিকের ইতিহাস শুনেছিলাম।

লোকটা তাতার, কিন্তু একটি কিরঘিজ্ মেয়েকে বিয়ে করেছে। আমি নিজে তাতার বণিকদের মধ্যে অনেকদিন বাস করেছিলাম, লোকটাকে দেখেই মনে হল, সে সৌখীন ও সম্ভ্রান্ত তাতার বংশের লোক। কিরঘিজ্ মেয়েকে বিবাহ করার ফলে নিজের জাতির লোকে তাকে সমাজে একঘরে করে। ফলে সে নিজের দেশ ও সমাজ ছেড়ে টাকাকড়ি ও স্ত্রীসহ শ্বশুর-বাড়ীর দেশে এসে বাস করছে। লোকটা বেশ ধনী ও মার্জ্জিতরুচি সৌখীন সহরে লোক, স্থানীয় কিরঘিজেরা এজন্যে তাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখায়।

প্রকাণ্ড তাঁবুটার একধারে ছিল মেয়েরা।

তাঁবুর মালিকের কন্যাটি বেশ হৃষ্টপুষ্ট, গোলগাল, দেখতেও বেশ সুশ্রী। সে সম্ভবতঃ সোভিয়েট রাশিয়া থেকে আমদানী রঙীন কাপড়ের পোষাক সেলাই কার্য্যে নিযুক্ত ছিল।

মেয়েটি যে অভিজাত তাতার বংশের মেয়ে, তা তার সৌখীন পরিচ্ছদ ও পরিবার-পরিচ্ছন্নর চেহারা দেখলে বোঝা যায়। সাধারণ কিরঘিজ্ মেয়েদের মত সে অপরিচ্ছন্ন নয়।

মেয়েটির মা আমাদের জন্যে ঘোটকীর দুগ্ধ পেয়ালায় ঢেলে দিচ্ছিলেন এবং তার পিতামহী একটা ঘোড়ার চামড়ার পাত্রে ঘোটকীর দুগ্ধ মন্থন করছিলেন। তাঁর মাথায় অনেকখানি লম্বা মোটা কাপড়ের একটা শিরস্ত্রাণ।

কিছু দূরে একটি কাজাক দাসী বসে তুর্কী তোয়ালের ওপর সূচীশিল্পের কাজ করছিল। তার মনিবের মেয়েটির শীঘ্রই বিবাহ হবে—সেই বিবাহের পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি তৈরী করতে তাকে খাটতে হয়, এ থেকে বোঝা গেল।

আমি ইস্তাম্বুলে ছিলাম, সুতরাং তাঁবুর মালিক আমাকে সেই সহর সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করছিলেন। আলা বেগ তখন হামাগুড়ি দিয়ে তাঁবুর অপর পাশে মেয়েদের কাছে চলে গেল এবং কিছুক্ষণ পরে দেখি, সে মেয়েদের সঙ্গে গল্প বেশ জমিয়ে তুলেছে।

কিছুক্ষণ পরে আমরা সকলকে অভিবাদন করে বিদায় গ্রহণ করলাম।

তাঁবুর বাইরে এসে আলা বেগ আমায় বললে,—মেয়েটিকে কেমন দেখলে?

আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই সে বললে, মেয়েটির সঙ্গে আমার বিবাহ ঠিক হয়ে গিয়েছে—কেবল মেয়ের বাবাকে বিবাহের পণটা দিয়ে দিলেই সব মিটে যায়। পঁচিশটা ঘোড়া এবং তিনশ ভেড়া পণ ধার্য্য হয়েছে।

আমি আর আলা বেগ যখন ঘোড়া চড়ে ফিরছি, এক জায়গায় দেখি, একজন কিরঘিজ্ একটা কাঠের ঘর তৈরী করছে।

আলাবেগ আমার দিকে চেয়ে বললে,—কিরঘিজ্ জাতির মধ্যে কেউ এ রকম কাঠের বাড়ী তৈরী করে বাস করে না। মাথা খারাপ যার সেই এ রকম করে।

আমি বললাম,—শুনেছি পার্ব্বত্য যাযাবর জাতিরা জমি চাষ কখন করে না, কিন্তু গ্রামের মধ্যে আমি ত' অনেক বাগান দেখেছি?

—ও সব বাগান আমাদের জাতির লোকে তৈরী করে নি। যেখানে দেখবে বাগান, বুঝতে হবে চীনা বা তাতার কিংবা তুরান জাতিরা তা তৈরী করেছে। যখন আমরা মালভূমিতে চলে যাই গ্রীষ্ম কালের প্রথমে, আমাদের মনে হয় গমের চাষ করলে আমাদের দৈনন্দিন তোজের চা এবং ভেড়ার মাংসের সঙ্গে রুটী খেতে পাওয়া যেত, কিন্তু ঐ মনে হওয়া পর্য্যন্তই, ওটাকে কোন দিন কাজে পরিণত করতে পারি নি। কখন কখন আমরা দু একজন বৃদ্ধা এবং দুচারজন চাকরকে নিম্নভূমিতে রেখে যাই নদীতীরের সমতল ভূমিতে সামান্য কিছু গমের চাষ করবার জন্যে। যা সামান্য ফসল উৎপন্ন হয় তাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট।

—তা বলে নিজে তুমি কোন জমি চাষ কর না?

আলা বেগ আমার প্রশ্ন শুনে হেসে আর বাঁচে না। আলা বেগ কোদাল হাতে জমি কোপাবে! তবেই হয়েছে!

কিরঘিজ্ এবং কালমাক্ জাতিদের মধ্যে নিয়ম আছে, বিবাহের সময় বরের কাছ থেকে তারা পণ আদায় করে। এ প্রথাটার কথা দু'শো বছর পূর্ব্বে মার্কো পোলো তাঁর ভ্রমণ-কাহিনীর মধ্যে লিপিবদ্ধ করে গিয়েছিলেন এবং মনে হয়, মার্কো পোলো এসিয়া ভ্রমণ করতে যাবার বহু শতাব্দী পূর্ব্ব থেকে মধ্য-এসিয়ার যাযাবর কিরঘিজ্ এবং কালমাকদের মধ্যে এ প্রথা প্রচলিত আছে।

ধনী ব্যক্তি যথেষ্ট উচ্চ মূল্যে ধনীর কন্যা বিবাহ করে, আবার সমাজের নিম্নস্তরের দরিদ্র ভৃত্য শ্রেণীর লোকে সামান্য মূল্যে তার সমশ্রেণীর মেয়েকে ঘরে আনে।

আলা বেগ একটি তের বছরের মেয়ের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে,—ওই যে মেয়েটি দেখছ, ওর মূল্য ঠিক হয়েছে কুড়িটা ঘোড়া আর একশ ভেড়া।

আর একটি দাসী শ্রেণীর অল্পবয়স্কা বালিকা জল নিয়ে আসছিল। আলা বেগ তাকে দেখিয়ে বললে,—আর ওই যে মেয়েটি আসছে ওর দাম মাত্র ষোলটা ভেড়া। আমাদের একজন চাকর ওকে বিয়ে করবে ঠিক হয়ে গিয়েছে। সে ওর পণের জন্যে প্রতি বছর দুটো ভেড়া ওর বাবাকে দেয়।

মেয়েটা ইতিমধ্যে জল নিয়ে আমাদের নিকটবর্ত্তী হল।

আলা বেগ তাকে বললে,—তুমি কবে তোমার স্বামীর তাঁবুতে যাচ্ছ?

মেয়েটি লজ্জায় ছুটে পালিয়ে গিয়ে একটি তাঁবুর পিছনে লুকাল।

আর একটি বয়স্কা দাসী সেখানে ছিল। সে হেসে বললে,—ওর স্বামী আর আটটা ভেড়া দিতে পারলেই বিয়ে হয়ে যায়। আর চার বছর।

ছোট মেয়েটিকে আমি পরে তাঁবুর মধ্যে থেকে বার করেছিলাম। এক টুকরা মিছরি হাতে দিয়ে তাকে বশ করে নিয়ে আমি তার বয়স কত জিগ্যেস করলাম, সে বললে,—আট বছর।

সজন বেগ একদিন আহারের পর প্রস্তাব করলে, কালমাক্ জাতিদের পরিদর্শন করতে যাবে।

পরদিন সকালেই ঘোড়া নিয়ে আসা হল এবং আমরা কালমাক্ জাতির পশুচারণ-ভূমির উদ্দেশে যাত্রা করলাম। পথে যেতে টেকেস্ নদীর ঘোড়সামার বড়ির সেতু।

সজন বেগ বললে,—এই সেতু পার হওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক ব্যাপার। সেতুর উপরে লোক আছে, যে আমাদের ঘোড়া পার করে দেবে।

আমি এ প্রস্তাবে মনে মনে হেসেছিলাম প্রথমটা। নিজেই নিজের ঘোড়া পার করব ভেবেছিলাম। তার পর দেখলাম টেকেস্ নদীর সেতু সত্যই বিপজ্জনক।

সজন বেগ বলল,—সেতু মাঝে মাঝে পুরাণো হয়ে পড়ে।

কয়েকজন করে অশ্বারোহী সেই সময়টা যারা থাকে, তার পর সেতু আবার নতুন করে তৈরী করা হয়।

কালমাকদের সম্বন্ধ আছে মোঙ্গোলদের সঙ্গে, এ কথা শুনে আসছি। আসলে তারাই মোঙ্গোল-জাতীয় লোক। প্রাচীন যুগে পশ্চিম মোঙ্গোলীয় জাতির যে বিরাট সঙ্ঘ ছিল কালমাক্ জাতি সেই সঙ্ঘভুক্ত।

কালমাকদের ইতিহাস খুব স্পষ্ট নয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে ওরা টেকেস্ উপত্যকা এবং নিকটবর্ত্তী ভূভাগের অধিপতি ছিল। চৈনিক যোদ্ধাদের উৎপাতে ও অত্যাচারে রুশীয় তুখ্রা অঞ্চল পার হয়ে ওদের মধ্যে অনেকে ভল্গা নদীর তীরে বাস করে।

আশী বৎসর পরে চীন সম্রাট্ চিয়েন হুং (১৭০৬-৯৬) টেকেস্ উপত্যকায় একটি মধ্যবর্ত্তী রাজ্য বসাবার কল্পনা করেন। ভল্গা নদীর তীরে কালমাকদের তিনি আহ্বান করেন, তাহাদের অনেক লোভ দেখান। সকলে ফিরে আসে নি। যারা আসে নি, তাদের বংশধরগণ এখনও রুশীয় কালমাক নামে পরিচিত হয়ে ভলগা নদীর তীরে বাস করছে।

কালমাক্ জাতি অতীব অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন। ওরা কখনও স্নান করে না, পোষাক বদলায় না। নতুন কোট গায়ে দিয়ে কখনও সেটা বদলায় না, না ছিঁড়ে যাওয়া পর্য্যন্ত। কিন্তু অপরিচ্ছন্ন হলেও কালমাক্ জাতির লোকে অর্থ উপার্জ্জন করতে হয় কি করে তা জানে। তাদের মেষ-পালের সীমা-সংখ্যা নেই, বড় বড় পশুচারণ-ভূমি ওদের ঘোড়ার খুরে কাল হয়ে আছে। ওদের জীবনযাত্রার ধারা অত্যন্ত সরল, মানুষের তৈরী কৃত্রিম অভাব কিছুই নেই ওদের মধ্যে। মাঝে মাঝে হয় ত বাড়ীর বিবাহযোগ্যা কুমারী মেয়ের জন্যে ভেড়া এবং ঘোড়ার বদলে সোণার ইয়ারিং কিংবা বালা বাজার থেকে কেনে, বাইরের খরচের মধ্যে এ ছাড়া আর কোন খরচই তাদের নেই।

কালমাকদের তাঁবুতে খেতে বসে দেখেছি, প্রত্যেক অতিথির সামনে একটা টুলে মোঙ্গোল চিনি-মিশ্রিত ঘব-চূর্ণের এক রকম পানীয় এবং ছাগলের দুধের পনীর দেওয়া হয়। শেষের জিনিসটা খেতে মন্দ নয়, কিন্তু আমি যখনই জিনিসটা খেতে গিয়েছি, তখনই দেখেছি তাতে অসংখ্য চুল মেশান।

এর একটা প্রধান কারণ কালমাক মেয়েরা মাথায় লম্বা লম্বা পরচুলা ব্যবহার করে, পনীর তৈরীর সময় সেই চুল কি করে পনীরের সঙ্গে অজস্র মিশে পনীরকে অখাদ্য করে তোলে।

এই পরচুলা সাধারণতঃ অশ্বলোমের হয়ে থাকে—তবে ওদের মধ্যে ধনী ও সৌখীন মহিলারা কালমাক জাতির মৃত দেহের মাথা থেকে চুল সংগ্রহ করে থাকেন কিংবা বাজারে চীনাদের কাছ থেকে মানুষের চুল কেনেন। চুলের বিনুনি তাঁরা বাড়ীতেই করে নেন।

কুল্জা সহরের বাজারে আমি মানুষের চুল কিরি করে বিক্রি করতে দেখেছি; অনেক দাম এ চুলের, এক গোছা ভাল চুলের দাম একটা তাগড় পুষ্টপুষ্ট ভেড়ার দামের চেয়েও বেশী।

মেয়েদের নিজেদের মাথায় যা স্বাভাবিক চুল থাকে, তা কখন এরা ধোয় না বা পরিষ্কার করে না। চিরুণী এদের কাছে প্রায় অজ্ঞাত পদার্থ। মাঝে মাঝে এক রকম চর্ব্বি জাতীয় জিনিষ চুলে মাখায়, তাকে চক্‌চকে করবার জন্যে। এই সব অত্যাচারের ফলে ওদের মাথার চুল ঝরে যায়, কিংবা খুব পাৎলা হয়ে পড়ে।

দরিদ্র কাহারা ?

...ভারতবাসিগণ তাঁহাদিগের পূর্ব্বাবস্থার তুলনায় অত্যন্ত দরিদ্র হইয়া প্রায়শঃ অন্নহীন ও বস্ত্রহীন হইয়া পড়িয়াছেন এবং এই দারিদ্র্যের অন্ত প্রতীকার না হইলে শুধু ভারতকেই কেন, অপরের সঞ্চিত ধনভাণ্ডারের অফুরন্তপুর কিছুদিন ধনিমাণ রাজাও সত্য বটে, কিন্তু এখনও ভারতবাসিগণ ইয়োরোপের কোন জাতির তুলনায় অধিকতর দরিদ্র নহেন। ভারতবাসিগণ যদি প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্র হইতেন, তাহা হইলে ভারতবাসী ধনভাণ্ডারের দলে দলে আবাসনিবন্ধের জন্য ভারতবর্ষের বাহিরে অন্যান্য জাতির রাজ্য হইতে হইত, কারণ, আহার্য্যের জন্য দরিদ্রের পক্ষে ধনীর রাজ্যে হওয়া স্বভাবের বিধান। কিন্তু বস্তুতঃ দেখা যায় যে, মুসলমান পর এক সহস্র বৎসর হইতে অন্যতম অন্যান্য জাতিগণই অর্থোপার্জ্জনের জন্য ভারতবর্ষের রাজ্য হইতেছেন এবং এখনও তাঁহারা প্রায়শঃ নিজেদের দেশে থাকিয়া সর্ব্বসাধারণের নিরোগ ও আহার্য্য সংস্থান করিতে পারিতেছেন না, অথচ ভারতবাসিগণ এখনও অন্ন-সংস্থানের জন্য ভারতবর্ষের বাহিরে কাহারও দুয়ারে যাইতে বাধ্য হন নাই।...

চিত্র-চরিত্র

—শ্রীঅমিত রায়

মাইকেল মধুসূদন

১৮৭২ সালের প্রথমে লাউডন ষ্ট্রীটের আবাস তুলিয়া দিয়া মধুসূদন ইটালী বেনিয়াপুকুর রোডে উঠিয়া আসিলেন।

এই সময়ে পঞ্চকোটের মহারাজা তাঁর পরিচয় পাইয়া তাঁকে নিজ রাজ্যের দেওয়ান-ম্যানেজার পদে নিযুক্ত করিলেন; তাঁর পক্ষে এ পদ গ্রহণ করিবার প্রধান কারণ মনে হয়—তিনি এই উপলক্ষে পাওনাদারদের কবল হইতে দূরে যাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

কিন্তু কোন দেশীয় রাজ্যে মধুসূদনের মত লোকের পক্ষে চাকুরী করা কি রকম সম্ভব—তা সহজেই অনুমান-যোগ্য! অল্প দিনের মধ্যেই উপরিতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর গোলমাল আরম্ভ হইল; কয়েক মাস কাজ করিবার পরে বিরক্ত হইয়া চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। তাঁর চাকুরীর সময়ের একটি মাত্র প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য—পঞ্চকোট রাজ্যের প্রাচীন মন্দির, মঠ প্রভৃতি রক্ষা করিবার চেষ্টা তিনি করিয়াছিলেন।

২

সেপ্টেম্বর মাসে যখন তিনি পুনরায় বারিষ্টারী আরম্ভ করিলেন তখন নানাবিধ যন্ত্রণা দ্বিগুণিত উৎসাহে তাঁকে আক্রমণ করিয়াছে—কণ্ঠনালী-প্রদাহ, প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধি, অর্শ, রক্তবমন ও শূল; সপ্তরথীর ব্যূহ হইতে আর বাহির হইবার উপায় ছিল না।

পীড়ায় ব্যবসা বন্ধ হইল; আয় যতই কমিতে লাগিল মানসিক স্থৈর্য্য ততই কমিতে লাগিল—আর মনে শান্তি লাভের জন্য মদের মাত্রা চড়াইতে চড়াইতে মধুসূদন প্রায় আত্মহত্যার সীমায় গিয়া পৌঁছিলেন।

সেই দিন দুপুর বেলা, কলিকাতার গ্রীষ্মকালের দুপুর; মনোমোহন ঘোষ মধুসূদনের বাড়ীতে তাঁর কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইলেন, তিনি সেই গরমে দরজা জানালা বন্ধ করিয়া গরমে একাকী বসিয়া অনিদ্রাবী নির্জ্জলা সুরা পান করিতেছেন।

মনোমোহন বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"একি করিতেছেন? এর পরিণাম কি আপনি জানেন না?" মধুসূদন মরিয়া হাসির হাসিয়া বলিলেন, "এরূপ মদ্যপান ও আত্মহত্যা যে একই তাহা আমি জানি, তবে কণ্ঠে অস্ত্রাঘাত অপেক্ষা ইহাতে ক্লেশ কিছু অল্প, this is a process equally sure, but less painful." এ যে মৃত্যু-ব্রতীর উক্তি! ঘরের চারিধার হইতে অমর মৃতের দল নিস্তব্ধভাবে এই পাগলের কাণ্ড দেখিতে লাগিল। মনোমোহন ঘোষ ঘরের একটা জানালা খুলিয়া দিতেই নীচের তলার আঙিনা হইতে একদল পাওনাদারের সম্মিলিত ওৎসনার ঐকতান ঘরে প্রবেশ করিল। মধুসূদন কেবল ঘর উত্তপ্ত করিয়া তুলিবার জন্যই জানালা বন্ধ করেন নাই।

মধুসূদন মৃত্যু-ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন! এক একদিন রক্তবমনে বড় বড় পাত্র পূর্ণ হইয়া যাইত! কিন্তু কে কার কথা শোনে! কে তাঁকে উপদেশ দিবে আর কে সেই উপদেশ গ্রহণ করিবে! এমন কি যে বন্ধু-বাৎসল্য মধুসূদনের সহজাত বলিলেও চলে, এই উপলক্ষ্যে মাঝে মাঝে তারও পরীক্ষা হইয়া যাইত।

রামকুমার বিদ্যারত্নকে মধুসূদন অতিশয় স্নেহ করিতেন, তিনি মধুসূদনের এ-হেন অবস্থা দেখিয়া একদিন নিভৃতে তাঁকে সুরাপান ছাড়িতে অনুরোধ করিলেন; মধুসূদন বলিলেন, "পণ্ডিত! আমি তোমাকে অতিশয় ভালবাসি কিন্তু এরূপ অনুরোধ আর করিও না। এরূপ করিলে আমার সহিত তোমার আর কোন সম্বন্ধই থাকিবে না।"

ইহাও মৃত্যু-ব্রতীর উক্তি।

৩

কিন্তু কবীর বিশ্রামের সুযোগ কোথায়? সেই অসুস্থ শরীরেই ১৮৭৮ সালের প্রথমে একটি মোকর্দ্দমা উপলক্ষে

তাঁকে ঢাকা যাইতে হইল। সেখানকার অধিবাসীরা একটি সভায় তাঁকে বিশেষ ভাবে অভিনন্দিত করিয়াছিল; মধুসূদনও ঢাকা নগরীকে সম্বোধন করিয়া একটি সনেট লিখিয়াছিলেন।

মার্চ্চ মাসে মধুসূদনের পীড়ার যন্ত্রনা অতিশয় বাড়িয়া উঠিল—সঙ্গে উত্তমর্ণগণের তাগাদাও ছিল! তারা আর কিছুতেই ধৈর্য্য ধরিতে চায় না; চোখের সম্মুখে অধমর্ণের জীবন-শেষ লক্ষ্য করিলে কোন্ উত্তমর্ণ নিষ্ক্রিয় থাকিতে পারে।

মধুসূদন একজন উত্তমর্ণকে তাঁর বাড়ীর চেয়ার, টেবিল আসবাব পত্র বিক্রয় করিয়া তার প্রাপ্য শোধ করিয়া লইতে বলিলেন। আর একজনকে বলিলেন, তাঁর কক্ষের মহাকবিদের মূর্ত্তি ও তাঁর লাইব্রেরীর গ্রন্থগুলি নীলামে চড়াইয়া তার প্রাপ্য শোধ করিয়া লইতে। আবার অন্য একজনকে নিজের অপ্রকাশিত রচনাসমূহ দান করিতে উদ্যত হইলেন— "মুন্সী! আমার কতকগুলি অপ্রকাশিত কবিতা আছে, সেগুলি তবে তুমি গ্রহণ কর, তাহা ছাপাইলে নিশ্চয়ই আমার ঋণ পরিশোধ হইবে।'

ইহা মরিয়া ব্যক্তির বিসর্জ্জিং-যজ্ঞ—যাইবার পূর্ব্বে কিছু আর বাকি রাখিবেন না—জীবনে-মরণে দেউলে হইবার উৎকট উল্লাসে যে উন্মাদ, এ তারই উক্তি!

৪

১৮৭১ সালে মধুসূদন হেক্টর-বধ কাব্য প্রকাশ করেন; এই গ্রন্থখানি ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে উৎসর্গীকৃত; উৎসর্গপত্রে কবি বলিতেছেন—

"প্রায় চারি বৎসর হইল, আমি শারীরিক পীড়িত হইয়া, এমন কি, ৩।৪ মাস স্বকর্ম্মে হস্ত নিক্ষেপ করিতে অশক্ত হইয়াছিলাম; সময়াতিপাতার্থে উরূপাখণ্ডের ভগবান্ কবিগুরুর জগদ্বিখ্যাত ইলিয়াস নামক কাব্য সদা সর্ব্বদা পাঠ করিতাম। পাঠের সময় মনে এইরূপ ভাব উদয় হইল যে, এ অপূর্ব্ব কাব্যখানির ইতিবৃত্ত স্বদেশীয় ইংলণ্ড-ভাষানভিজ্ঞ জনগণের গোচরার্থে মাতৃভাষায় লিখি, লিখিত পুস্তকখানি চারি বৎসর মুদ্রালয়ে পড়িয়া ছিল; এমন সময় পাই নাই যে, ইহাকে প্রকাশি।"

মধুসূদনের সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে হেক্টর বধ সর্ব্বাপেক্ষা অনাদৃত ও অপঠিত। তিনি বাংলা গদ্যকে যে নূতন পথে চালনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, স্বাস্থ্য ও সময়ের অভাববশতঃ তাহা সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। যদি তিনি সুস্থ ও জীবিত থাকিয়া হেক্টর বধের অনুরূপ কিন্তু উচ্চতর গদ্যরীতিতে আরও দুই চারিখানি গদ্য-কাব্য রচনা করিতে পারিতেন, তবে নিঃসন্দেহ বাংলা গদ্যরীতি নূতন একটা পথ কাটিয়া লইত।

মেঘনাদ বধের পূর্ব্ববর্ত্তী তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে যেমন অপরিণত অমিত্রাক্ষর—হেক্টর বধেও তেমনি অপরিণত গদ্যছন্দ; তিলোত্তমাসম্ভবের পরে মেঘনাদ বধ পাইয়াছি, তাই অমিত্রাক্ষরের পরিণাম জানি; হেক্টর বধের পরে অন্য গদ্য-কাব্য না পাওয়াতে তার পরিণাম কি হইতে পারিত জানি না। তবে এ কথা ঠিক যে, মাইকেল সে পথ খুলিয়া দিলে তাহাতে পথিকের অভাব হইত না; বিশেষ বাংলা গদ্য রচনায় ক্রিয়াপদ লইয়া পদে পদে যে গোল বাধে, মাইকেলী প্রতিভার তীব্র রোলার বাংলা গদ্যের উপর দিয়া একবার চলিয়া গেলে, সে বাধা অনেক পরিমাণে সুগম হইয়া যাইত। মাইকেল বাংলা পদ্যে নাম ধাতুর বহুল প্রচার করিয়া দিয়া যে উপকার করিয়াছিলেন, হেক্টর বধের গদ্যরীতি প্রচলিত হইলে, গদ্যে সেই জাতীয় সমস্যার বহুকালের জন্য সমাধান হইয়া যাইত।

মাইকেল যখন বিশেষ অসুস্থ তখন বেঙ্গল থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষের অনুরোধে 'মায়াকানন' ও 'বিব না ধনুর্ভঙ্গ' নামে দুইখানি নাট্য রচনা আরম্ভ করেন; কোনখানিই তিনি শেষ করিতে পারেন নাই; রচনায় মাইকেলী প্রতিভার বিশেষ চিহ্ন নাই, কেবল নাম দুইটিতে তাঁহার শেষ জীবনের অদৃষ্টের পরিহাসের ইঙ্গিত যেন বর্ত্তমান—'মায়াকানন'! 'বিব না ধনুর্ভঙ্গ'।

এই সময়ে তিনি কয়েকটি স্কুল-পাঠ্য নীতি-কবিতা রচনা করেন; ছাত্রজনোচিত যে নীতিই এগুলিতে থাকুক, লেখকের পক্ষে প্রধানত ইহারা অর্থনীতিমূলক। মাইকেলের প্রবর্ত্তিত কাব্যের অনেক ধারাই আজ বাঙ্গালা সাহিত্যে চলিতেছে। শেষ জীবনে স্কুল-পাঠ্য গ্রন্থ রচনার

রীতি তন্মধ্যে অক্ষুণ্ণতম ; তাঁহার পরে প্রথম শ্রেণীর কোন লেখক ইহার ব্যতিক্রম করেন নাই।

৫

মাইকেলের জীবনের শেষভাগে লিখিত সকল কবিতাতেই কেবল অর্থের স্বপ্ন, যে অর্থ প্রতিনিয়ত অধিকতর ভাবে তাঁহার আয়ত্তাতীত হইয়া যাইতেছিল।

পঞ্চকোটস্থ রাজশ্রীর প্রতি—

দেখিনু স্বপনে আমি নিশার স্বপনে।

আবার—

হেরেছিনু গিরিবর প্রমার প্রমাদে
হেরেছিনু মোর ভালে হে রমা সুন্দরী।

পঞ্চকোট গিরির বিষাদ লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

কোথায় সে রাজলক্ষ্মী যাঁর স্বর্ণ জ্যোতি
উজ্জ্বলিত দুখ তব ?

ঢাকাবাসীদের অভিনন্দনের উত্তরে যে সনেটটি লিখিয়াছিলেন, তাহাতেও এই ঐশ্বর্য্যের স্বপ্ন !

শোভ তুমি এ সুন্দর স্থানে
ফুলকুলে ফুল বঙ্গ রাজাসনে রাণী।
প্রতি ঘরে যাঁরা লক্ষ্মী (থাকে এই গানে)
নিত্য অতিথিনী তব সেবী বীণাপাণি।

নীতি-কবিতার অধিকাংশেও এই অনায়ত্ত বাস্তব ঐশ্বর্য্যের স্বপ্নরূপ পরিদর্শন—

কত এ-দেশের নাম বিখ্যাত জগতে।
ভারতের শিরোমণি
যা নাই তাহার জেনে
নিত্য অলঙ্কার বীণা, মুক্তা, মরকতে।

আবার নেহাৎ দরিদ্র গদাও পথে যাইতে যাইতে দেখিল—

ঝলো এক পদ্মেতে পড়িয়া।
ওড়ে দুই ঝলো তুলি
হেরে কুতুহলে খুলি
পূর্ণ ঝলো সুবর্ণ মুদ্রায়,
তোলা ভার, এত ভারি তায়।

ব্রহ্মতেজ রোগীর মত মাইকেল চারিদিক সুবর্ণের পীতবর্ণে লাঞ্ছিত দেখিতেছিলেন। অনায়ত্ত ঐশ্বর্য্যের লোভ এমন একটা বাতিকে দাঁড়াইয়াছিল যে, জীবন ছাড়িয়া তাঁহার কাব্যলোক পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়াছিল।

ঢাকা পঞ্চকোট যখনি যেখানে গিয়াছেন, এই ভাবটা বেশি করিয়া তাঁহার মনে পড়িয়াছে যে, আর সকলেই সম্পন্ন, ধনবান্, আমিই কেবল দরিদ্র।

বঙ্গভূমিকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

অতল দুখ সাগরের জলে
ডুবিনু কি হং তব হবে অস্তাচলে !

ঢাকাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

করিও না ঘৃণা মোরে, তুমি ভাগ্যবতি !

আবার স্বপ্নে রমা কবিকে পঞ্চকোটস্থ রাজশ্রীকে দেখাইয়া দিয়া বলিতেছেন—

বিবিধ আছিল পুণ্য তোর জন্মান্তরে,
তেই দেখা দিলা তোরে আজি হৈমবতী
যেরূপে করেন বাস উত্তর রাজ্যরে
পঞ্চকোট, পঞ্চকোট—ওই গিরি পতি।

জীবনের প্রথমার্দ্ধে যেমন কাব্য-লক্ষ্মীকে বশে আনিবার জন্ত মধুসূদনের মানসিক ভারকেন্দ্র বিপর্য্যস্ত হইয়াছিল, শেষার্দ্ধে তেমনি আবার তাঁহার ভারকেন্দ্র বিপর্য্যস্ত অর্থ-লক্ষ্মীকে বশ করিবার জন্ত। মাঝখানে সামান্ত চার পাঁচটি বছরের জন্ত মাইকেলের জীবনের ভারকেন্দ্রে সমতা আসিয়াছিল। তখন লক্ষ্মী সরস্বতী উভয়েই ধরা দিয়াছিলেন। মানুষের মত দেবতারাও অতিরিক্ত ছটফটি দেখিলে ধরা দেন না—দূরে দাঁড়াইয়া নিষ্ঠুর কৌতূহলে হাসিতে ও দেখিতে থাকেন।

৬

১৮৭৩ সালের এপ্রিল মাসে মধুসূদন সপরিবারে উত্তরপাড়ার জমিদারদের লাইব্রেরী-ভবনে আসিয়া কিছু দিন ছিলেন ; স্থানটি নির্জ্জন, গঙ্গার উপরেই। কলিকাতার কোলাহল ও অশান্তি নাই। উত্তমর্ণদের পক্ষে এতদূরে আসা সব সময়ে সম্ভব নয়। কিন্তু অনবচ্ছিন্ন সুখ কোথায় ? উত্তরপাড়াতেও ডাকঘর আছে—উত্তমর্ণদের চিঠি আসিতে লাগিল। তার ভাষা এমন নয় যে, পৌড়জন সুধা মনে করিয়া পান করিতে পারে।

মধুসূদন ১৮৬৯-এ আর একবার এখানে আসিয়াছিলেন। আজ নিশ্ছিদ্র দুঃখের অন্ধকারের সেদিনের সুখদুঃখের গোধূলির আলো-আঁধারির কথা মনে পড়িয়া গেল। মনে পড়িল, একদিন হেনরিয়েটা পিয়ানো বাজাইতেছিল, শর্ম্মিষ্ঠা একটি ইংরাজি গান গাহিতেছিল, আর তিনি স্বয়ং পিয়ানোর উপরে কনুইয়ের ভর দিয়া দাঁড়াইয়া তন্ময় হইয়াছিলেন; প্রশস্ত কক্ষ উচ্ছ্বসিত সুরের ইন্দ্রজালে ভরিয়া গেল; হঠাৎ কখন মাতার কণ্ঠ কন্যার সঙ্গীতে যোগ দিল; মধুসূদন শর্ম্মিষ্ঠাকে জড়াইয়া ধরিয়া ঘরময় নৃত্য করিয়া ফিরিতে লাগিলেন; দুই চোখ দিয়া বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

সে আজ অনেক দিনের কথা; জীবন তখন এমন কৃপণ ভাব ধারণ করে নাই; আজ দেউলে হইবার প্রান্তে বসিয়া কবির সেই দিনের কথা মনে পড়িয়া গেল।

উত্তরপাড়াতে মধুসূদনের স্বাস্থ্যের কোন উন্নতি দেখা গেল না। সারা দিন নির্জ্জীবের মত শয্যাগ্রহণ করিয়া রক্তবমন করিতেন। যখন উঠিতে পারিতেন, ছাদের উপরে গঙ্গার হাওয়ায় একাকী পায়চারি করিয়া বেড়াইতেন—আবার ফিরিয়া আসিয়া শয্যা লইতেন।

চরম শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে তাঁহার স্বাভাবিক প্রফুল্লতা ও সরলতা ফুটিয়া বাহির হইত। একদিন তিনি বারান্দায় রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন কিশোরীচাঁদ মিত্র একটি সভাতে কৃষি বিষয়ে বক্তৃতা করিতে যাইতেছেন। বক্তৃতার বিষয় শুনিয়া মধুসূদন হাসিয়া উঠিলেন; বলিলেন—"It is all humbug, কৃষি বিষয়ে আবার বক্তৃতা কি? চাষারা কি জানে না, কি করিয়া বীজ রোপণ করিতে হয়। খাজুকি করিয়া? তাহাদের আবার কৃষি-বিদ্যা কি শিখাইবে?" জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত মধুসূদনের বাস্তব-বোধ অটুট ছিল।

এই সময়ে তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়, ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও মহারাণী স্বর্ণময়ীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিতেন। এই প্রশংসা মধুসূদনের অহঙ্কারের একটা রূপান্তর; বাস্তব অপরিশোধিত ঋণকে প্রশংসা দ্বারা পরিশোধের চেষ্টা। অহঙ্কারী লোক কাহারো কাছে ঋণী থাকিতে চায় না।

কিন্তু ব্যাধি ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। ডাক্তারী চিকিৎসায় উপকার দর্শিতেছে না। কবিরাজি চিকিৎসা করিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইলে মধুসূদন চমকিয়া উঠিলেন—কবিরাজি চিকিৎসা! তাহা হইলে আমার সগোত্র ব্যারিষ্টার ও স্বধর্ম্মী খৃষ্টানগণ আমাকে একঘরে করিবেন! মধুসূদনের মধ্যে সবটি সমান ভাবে জাগ্রত আছে!

ক্রমে ব্যাধি দারুণ আকার ধরিল—পতি পত্নী উভয়েই শয্যাশায়ী—কাহারও উঠিবার সামর্থ্য নাই—কে কাহার সেবা করে?

গৌরদাস প্রায়ই বন্ধুকে দেখিতে যাইতেন; "একদিন গৌরদাস গিয়া দেখিলেন, শয্যাশায়ী মধুসূদনের মুখ দিয়া রক্ত গড়াইতেছে, তিনি রোগ-যন্ত্রণায় অধীর হইয়া হাঁফাইতেছেন—আর তাঁহার পত্নী অরঘোরে ভূতলে লুণ্ঠিতা। গৌরদাসকে গৃহে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া, মধুসূদন অতি কষ্টে একটু উঠিয়া বসিলেন, প্রবল বেগে অশ্রু নির্গত হইয়া তাঁহার গণ্ড ও বক্ষঃ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। নিজের যন্ত্রণা অপেক্ষা পত্নীর শোচনীয় অবস্থা মধুসূদনের পক্ষে সমধিক মর্ম্মপীড়াদায়ক হইয়াছিল। পত্নীর রোগ-যন্ত্রণা দেখিয়া নিজের যম-যন্ত্রণা ভুলিয়া মধুসূদন অধীর ও উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাই গৌরদাসকে দেখিয়াই মধুসূদন কেবল মাত্র বলিয়া উঠিলেন—afflictions in battalions! তৎপরে গৌরদাস যখন অবনত হইয়া অভাগিনী হেনরিয়েটাকে দেখিতে গেলেন, তখন চির-পতিপ্রাণা সাধ্বী দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক, অতি ক্ষীণ স্বরে বলিলেন—'আমাকে ছাড়িয়া উঁহাকে দেখুন, উঁহার শুশ্রূষা ও যত্ন করুন, আমি মরিতে ভয় করি না'।"

দুঃখের চিত্র হিসাবে ইহাই যথেষ্ট; বোধ করি, যথেষ্টেরও বেশী; কিন্তু বাঙালী জীবনী-চরিতকারের কলমের কালী ও অশ্রু অত সহজে নিঃশেষ হয় নাই। স্বামি-স্ত্রীর দুরবস্থা বর্ণনা করিয়া শিশু দু'টির কথা মনে পড়িয়া গিয়াছে; তাহাদের দিয়া পর্য্যুষিত অন্ন খুঁটিয়া আহার করাইয়া ছাড়িয়াছেন; এবং সপরিবারের এই চারি স্তম্ভের উপরে নীতি-উপদেশের ব্যাবিলনের

সূক্ষ্মোজ্ঞান রচনা করিয়া বেত্র-হস্ত হেডমাষ্টারের মত ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন! তিনি কিছুতেই ভুলিতে পারেন নাই যে, মধুসূদন সনাতন হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছিলেন! খৃষ্টান হইয়াছিলেন—তাঁহার চোখে ইহাই মধুসূদনের সব দুঃখ-দুর্দ্দশার মূল—যাহাকে বলে ওরিজিন্যাল সিন!

পরদিন কবি সপরিবারে সুচিকিৎসার জন্য কলিকাতায় নীত হইলেন।

হেনরিয়েটা

হেনরিয়েটা বাঙ্গালী কাব্য-রসিকদের উপেক্ষিতা। তাহাকে আমরা কতটুকু জানি। মধুসূদনরূপী পূর্ণচন্দ্রের সঙ্গে তাহার উদয়—মধুসূদনরূপী পূর্ণচন্দ্রের সঙ্গে তাহার অস্ত। মাঝে মাঝে দু' এক বারের জন্য চন্দ্র মেঘাবৃত হইলে সেই স্নিগ্ধোজ্জ্বল তারকা আমাদের চোখে পড়িয়াছে। এইরূপ কয়েকটি ক্ষণিক দর্শনের স্মৃতির সমষ্টি হেনরিয়েটা! কোন প্রথম শ্রেণীর বাঙ্গালী সাহিত্যিকের এমন পত্নী-ভাগ্য হইয়াছে কি না সন্দেহ!

মধুসূদন উগ্র ব্যক্তিত্ব ও বিরাট প্রতিভা দ্বারা আমাদের চিত্ত ও দৃষ্টি এমন ভাবে আকর্ষণ করে যে, আর কাহারও দিকে তাকাইবার অবকাশ থাকে না—যাহার প্রতিভার আলোকে তৎকালীন বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের কিয়ৎ পরিমাণে ছায়া-শরীরী বলিয়া মনে হয়; ভূদেব ছায়া-শরীরী উপদেশ-বর্ষণকারী; বিদ্যাসাগর ছায়া-শরীরী গুণ সন্ধানকারী; রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন ধর্ম্ম-ধ্বজা-বহনকারী; গৌরদাস বসুর তৃপ্তি-সহকারে আহারের জন্য কাঁটা চামচ সন্ধানে ব্যস্ত; 'পুওর মধু' গ্রীষ্মের দুপুরে মদ্যপানরত-ব্যক্তির কক্ষের জানালা খুলিবেন কি না দ্বিধাগ্রস্ত; যতীন্দ্রমোহন গ্রন্থ-মুদ্রণের বিল শোধে আনন্দিত—আর পাইক পাড়ার রাজারা রঙ্গমঞ্চ সাজাইতেছেন—প্রতি মুহূর্ত্তে শঙ্কিত—কখন প্রধান অভিনেতা আসিয়া উপস্থিত হয়! এ হেন বিরাট পুরুষের ব্যক্তিত্বের উগ্র আলোতে হেনরিয়েটা যে এক আধ বারের জন্যও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ—ইহাই চরম বিস্ময়।

কেবল দুই বার হেনরিয়েটা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, দুই বারের দুইটি ঘটনায়; একবার যখন সে অনাহারের মুখ হইতে পুত্র-কন্যাকে ছিনাইয়া লইয়া স্বামীর উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ছাড়িয়া ইউরোপ যাত্রা করে তখন, আবার যে-দিন সে ইউরোপ হইতে আসন্ন অনাহার সবলে ঠেলিয়া ফেলিয়া পুত্র-কন্যাদের লইয়া স্বামীর উদ্দেশ্যে কলিকাতায় রওনা হয়, সে দিন! প্রখর ব্যক্তিত্ব-বতী রমণী ছাড়া এ দুটি ঘটনা আর কাহারও পক্ষে সম্ভব হইত না। কিন্তু দুই বারই ঘটনাক্ষেত্রে মধুসূদন অনুপস্থিত; মধুসূদনের উপস্থিতিতে হেনরিয়েটার ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধি সব বিলীন হইয়া যাইত—স্বামীর বিরাট ব্যক্তিত্বের মধ্যে। আর বিরাট ব্যক্তিত্ববান্ পুরুষেরা বোধ করি প্রখর ব্যক্তিত্ববতী পত্নী পছন্দ করেন না। মধুসূদন করিতেন না, কি জীবনে, কি কাব্যে। প্রমীলা ব্যক্তিত্ববতী রমণী, কিন্তু মেঘনাদের সমক্ষে সে লতার ন্যায় সুকুমার, কোন রকম দৃঢ়তা তার চরিত্রে আছে, বুঝিবার উপায় নাই। কিন্তু মেঘনাদের অবর্ত্তমানে সেই প্রমীলা যখন লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিতেছে, তখন তাহার প্রচ্ছন্ন ব্যক্তিত্ব হীরকের দ্যুতিতে ও কাঠিন্যে চোখ ঝলসাইয়া প্রকাশমান। মেঘনাদ প্রমীলার ব্যক্তিত্বের প্রখরতা সহ্য করিতে পারিতেন না, কারণ মেঘনাদের স্রষ্টারও তাহা সুসহ ছিল না।

মধুসূদনের অন্তিম লগ্নে এক আধ বার হেনরিয়েটাকে চোখে পড়ে, মধুসূদনের সান্নিধ্য সত্ত্বেও চোখে পড়ে, কিন্তু তখন মধু-প্রতিভা মৃত্যুর আসন্ন স্পর্শে ম্লান; অস্তমলিন চাঁদের আলোয় স্বল্প-ভাস্বর সন্ধ্যাতারা। কিন্তু দু' জনেরই অন্তক্ষণ সমাগত—এক দিগন্তের চিতাতেই উভয়ের সহমরণ।

৭

মধুসূদন ও হেনরিয়েটা বেনিয়া পুকুর রোডের বাসায় ফিরিয়া আসিলেন—কিন্তু রোগ বাড়িয়াই চলিল, তখন বন্ধুরা চিকিৎসার যোগ্যতর ব্যবস্থার জন্য হেনরিয়েটাকে জামাতা ক্লরেন্স সাহেবের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া মধুসূদনকে আলিপুর জেনারেল হাসপাতালে প্রেরণ করিলেন।

মধুসূদনের ব্যাধি নিরাময় হইবার নয়, তবু যে কয়দিন এখানে ছিলেন কিছু পরিমাণে স্বস্তি অনুভব করিয়া-

ছিলেন—উপযুক্ত চিকিৎসার, যোগ্যতর শুশ্রূষার—এবং বোধ করি, হাসপাতালে উত্তমর্ণদের প্রবেশের নিয়ম না থাকায়।

ব্যাধির প্রকোপ যখন কম থাকিত, মধুসূদনের স্বভাব প্রকাশিত হইয়া পড়িত। সেই হাস্যরস জ্ঞান ও বাক্-পটুতা, সেই নির্মল মস্করা, সেই উচ্ছ্বসিত কাব্যালোচনা; সেই আইরিশ মস্করা। একজন ভক্ত তাঁহাকে অন্যত্র লইয়া গিয়া যোগ্যতর ভাবে চিকিৎসার প্রস্তাব করিয়াছিল—মধুসূদনের সম্মতি ছিল না; লোকটি তাঁহাকে সম্মত করাইবার জন্য কাকুতি মুক্ত করিল—মধুসূদন গম্ভীর ভাবে তাহাকে বলিলেন—"তুমি এখানে ওরূপ বালকের ন্যায় ক্রন্দন ও গোলযোগ করিও না। এ সাহেবদিগের হাসপাতাল।"—আর সেই আজন্ম অকুণ্ঠিত কণ গ্রহণে—শুশ্রূষাকারিণীকে কিছু দিবার জন্য তাঁহার মুন্সীর কাছে কণ চাহিলেন—"তোমার কাছে কিছু আছে কি?" যাহা ছিল তাহা লইয়া অত্যন্ত উদার ভাবে শুশ্রূষাকারিণীকে দিলেন—"Here is something for you!"

বাঁচিবার আশা নাই জানিতে পারিয়া, তিনি রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডাকিয়া পাঠাইলেন; তাঁহার নিকটে খৃষ্টানজনোচিত অন্তিম স্বীকারোক্তি করিলেন,—পুত্রের প্রতি অগাধ বিশ্বাস জ্ঞাপন করিয়া, তাঁহার করুণার উপর নির্ভর করিয়া মরিতেছেন জানাইলেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের তখনকার মনের ভাব জানা যায় না; বিশ্বাস করিয়াছিলেন, না মনে মনে হাসিয়াছিলেন! মধুসূদনের খৃষ্টধর্ম গ্রহণের ইতিহাস তাঁহার চেয়ে বেশী কে আর জানিত! কিন্তু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের যে হাস্যরস বোধ ছিল—এ অপবাদ এ পর্য্যন্ত কেহ দেয় নাই।

২৬শে জুন হেনরিয়েটার মৃত্যু হইল। সমাধি ব্যাপার শেষ করিয়া গভীর রাত্রিতে মনোমোহন ঘোষ, 'পুওর মন্থ', মধুসূদনকে সংবাদ দিতে হাসপাতালে গেলেন।

মধুসূদন সংবাদ আগেই পাইয়াছিলেন—এখন মনোমোহনকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কেমন মনোমোহন, সকল ত ভদ্রোচিত ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে? কোনও ত্রুটি হয় নাই ত? কে কে উপস্থিত ছিলেন? বিদ্যাসাগর, যতীন্দ্র ও দিগম্বর উপস্থিত ছিলেন কি?"

মনোমোহন ঘোষ বলিলেন, "সকলই নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে, কোন ত্রুটিই হয় নাই। বিদ্যাসাগর প্রভৃতিকে সংবাদ প্রেরণের সময় হয় নাই।"

আষাঢ়ের রাত্রি দুর্য্যোগময়ী; বাহিরে অবিরাম বৃষ্টি ও ঝড়; বহুকাল পূর্ব্বে বহুদূরের এক পার্ব্বত্য প্রদেশে, ম্যাকবেথের প্রাসাদ-ভবনের বাহিরেও এমনি দুর্যোগময়ী রাত্রি ছিল সেদিন—সেক্সপীয়রের নাটকের মধ্য দিয়া বঙ্গার সেই আর্ত্তনাদ কাণে প্রবেশ করিতে লাগিল, সদ্য-পত্নী-বিযুক্ত মাইকেল চমকিয়া উঠিলেন, নিজেকে ম্যাকবেথ বলিয়া মনে হইল—ম্যাকবেথ ছাড়া আর কি? ম্যাকবেথের মতই তাঁহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, একদা-শোভন জীবনের উপকূল আজ ছায়াসার; হেনরিয়েটা সদ্য-সমাহিত; বেদনার বিদ্যুতালোকে নিরাবরণ অদৃষ্টের সঙ্গে আজ মুখোমুখী সাক্ষাৎ—আর বাহিরে দারুণ দুর্যোগে যেন তারই প্রতীক নিয়ত ঝঞ্জিত।

"তুমি তো সেক্সপীয়র পড়িয়াছ—সেই কয়টি পংক্তি কি তোমার স্মরণ হয়?"

মনোমোহন ঘোষ বলিলেন, "কোন্ কয়টি পংক্তি?"

"লেডি ম্যাকবেথের মৃত্যুতে ম্যাকবেথ যাহা বলেন? আমার স্মৃতি লোপ হইয়া আসিতেছে, কোন কথাই আর আমার স্মরণ হয় না।"

কিন্তু সে কয়টি পংক্তি কি ভুলিতে পারেন? আবৃত্তি করিলেন—

To-morrow, and to-morrow, and to-morrow,
Creeps in this petty pace from day to day
To the last syllable of recorded time.
... ...
Out, out, brief candle,
Life's but a walking shadow.....

মনোমোহন তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিলেন; মধুসূদন ডাক্তারের মুখে অবধারিত মৃত্যুর কথা শুনিয়াছেন, তিনি শান্ত হইবেন কেন? মনোমোহনকে বলিলেন, "এক্ষণে আমার এই শেষ অনুরোধ যে, তোমার অন্ন থাকিলে যেন আমার পুত্র দুটি তোমার পুত্রগণের সহিত অন্ন পায়। তুমি যদি ইহা স্বীকার কর, তাহা হইলে আমি নিশ্চিন্ত মনে প্রাণত্যাগ করিতে পারি।" মনোমোহন বলিলেন, "আমি অঙ্গীকার করিতেছি, যদি আমার পুত্রগণ

এক মুষ্টি অন্ন পায়, তাহা হইলে আপনার পুত্রদ্বয়কে না দিয়া কখনও খাইবে না।"

"God bless you, my boy"

'পুওর মনু' আবার আই-সি-এস ফেল করিয়াছে; এখন সে ব্যারিষ্টারি পড়িবে, কিন্তু সে কি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ইংরেজ জুরিদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অনর্গল ইংরাজি বলিতে পারিবে!

মনোমোহন বিদায় হইলেন—প্রতিমুহূর্তে রাত্রি গভীরতর ও প্রকৃতি ভীষণতর হইতে লাগিল। হাসপাতালের স্তিমিত আলোকে, মুমূর্ষুর স্তিমিততর মস্তিষ্কে জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা অন্তিম উগ্রতার স্মৃতির শোভাযাত্রা চালনা করিতে লাগিল; লেডি ম্যাকবেথের মৃত্যুর সেই উক্তি ক্রমে বাস্তবতর হইয়া উঠিল out, out, brief candle! জীবনের জীর্ণ জ্বরের অবসানে অবসন্ন সাহিত্যিক ম্যাকবেথ! অসম্ভব উচ্চাকাঙ্ক্ষার ডাকিনীরা কোন্ দুস্তর জীবন-মরুভূমির মধ্যে তাহাকে ডাকিয়া আনিয়াছে! ব্যাঙ্কোর উত্তরপুরুষ বাহিনীর মত কাহাদের এ ছায়ামূর্ত্তি মেখলা তাহার মনোমুকুরে উদ্ভাসিত! অন্ধ কবি মিল্টন!

"কালিদাস, ভার্জিলের সমকক্ষ হওয়া সম্ভব—কিন্তু মিল্টন অসম্ভব।" মেঘনাদ বধ নামে একখানা সদ্যঃ প্রকাশিত কাব্য হাতে মধুসূদন দত্ত। "ইহা কি আমাকে অমরত্ব দান করিবে না, রাজনারায়ণ?" কৃষ্ণচন্দ্রের অনুসরণে ভারতচন্দ্র! "তুমি খুব করিয়াছ, কিন্তু ভারতচন্দ্রকে ছাড়াইতে পারিয়াছ, মনে হয় না!" আঃ কৃষ্ণনগরের সেই লোকটা! ইংলণ্ডের রাজকবি লর্ড টেনিসন! "বর্দ্ধমানের মহারাজা কি আমাকে রাজকবি করিবেন না।" মাইকেল এম. এস. ডাট, ব্যারিষ্টার-অ্যাট্-ল প্রে'জ ইন! 'পুওর মনু' আই-সি-এস ফেল। চটি-চাদরে মাই ডিয়ার ডিউ। "শুনিনু নিয়ারে আমি, নিকুঞ্জ কাননে, মনোহর বীণাধ্বনি।" অর্দ্ধোন্মুক্ত বাতায়নপথে উত্তমর্ণের তীব্র ভৎর্সনা! মেঘনাদবধ কাব্য, ব্রজাঙ্গনা, বীরাঙ্গনা! রাশি রাশি অপরিশোধিত বিল! অমরত্ব ও ঐশ্বর্য্যের দুই কোটির অসম্ভবের সাধনায় দগ্ধভগ্ন জীবনের হরধনু! out, out, brief candle!

২৯শে জুন রবিবার বেলা দুইটায় মাইকেল মধুসূদনের মৃত্যু হইল।

বঙ্গীয় কবিকুল এই বহু-আকাঙ্ক্ষিত সুযোগের জন্য কলম গুটাইয়া প্রস্তুত হইয়া বসিয়াছিল। এমন উপলক্ষ্য ছাড়িবার পাত্র বাঙালী কবিরা নয়। কবির স্মৃতি লক্ষ্য করিয়া কাব্য-গোষ্টি নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল।

'খোল দ্বার খোল ত্বরিতগতি
হিরণ্ময় জ্যোতি যায়'
বলিলা কৃতান্ত ডাকি অনুচরে
ধুধুতে প্রীতির ভরে।

•

মধুসূদনের দ্বার
শুনে বুক ফেটে যায়
দাতব্য চিকিৎসালয়ে চারার মরণ'

•

ভীষণ শেলের সম বাজিল হৃদয়ে,
শুনিলাম যবে শুধু যমকবি-রাজ
প্রাণহরা বোল আসি ডেকেছে তোমায়।'

মধুসূদন আগেই না মরিলে শোকের এমন শোচনীয় কবিতা শুনিয়া নিশ্চয় প্রাণত্যাগ করিতেন।

[সমাপ্ত

গণতন্ত্র

...আধুনিক গণতন্ত্র যদি সর্ব্বসাধারণের কোন মঙ্গল সাধন করা সম্ভব হইত, তাহা হইলে জগতের যে যে দেশে যখনই সংস্থাপিত হইয়াছে, সেই সেই দেশের জনসাধারণের অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব, শান্তি ও সন্তুষ্টির অভাববিষয়ক সমস্যা-সমূহ কথঞ্চিৎ পরিমাণেও সমাধান করা সম্ভবযোগ্য হইত। কিন্তু জনসাধারণের অবস্থা যথাযথভাবে পর্য্যালোচনা করিবার পদ্ধতি কি, তাহা বিহিত হইয়া তদনুসারে বর্ত্তমান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির অবস্থা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, উহার প্রত্যেকটির জনসাধারণের কোন অবস্থার কোনরূপ উন্নতি হওয়া তো দূরের কথা, প্রত্যেক অবস্থাটি উত্তরোত্তর অধিকতর অবনতির প্রাপ্ত হইতেছে। যু শিক্ষা ও কু-সাধনা। যখন বিপ্লব ঘটে এবং তাহার স্থানে যখন কু-শিক্ষা ও কু-সাধনা বিদূরিত লাভ করে, তখন অবশ্যই কালে এতাদৃশ গণতন্ত্রের প্রবর্ত্তন উদ্ভব হয়। চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, এতাদৃশ গণতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্টের পরিবর্ত্তনা মানুষের কু-শিক্ষা ও কু-সাধনার ফল।...

বঙ্কিম ও মুসলমান সম্প্রদায়

—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশ

ইদানীং প্রায় সর্ব্বত্রই শুনিতে পাই, বঙ্কিম মুসলমান-বিদ্বেষী ছিলেন। একথা অনেক মুসলমান বলেন, আবার সঙ্গে সঙ্গে অনেক হিন্দুও বলিয়া থাকেন। বিগত বঙ্কিম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে কেহ কেহ পরাণ মণ্ডল এবং হাসিম শেখের উল্লেখ করিয়া সামঞ্জস্য দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু উকীলের সে যুক্তি বিশেষভাবে আমাদের মর্ম্ম স্পর্শ করে নাই। অথচ জাতিবিশেষের প্রতি বিদ্বেষ-ভাব পোষণ বঙ্কিমের ন্যায় ন্যায়নিষ্ঠ লোক-শিক্ষকের পক্ষে একেবারে অসম্ভব। বঙ্কিম কেন, কোন লোক-শিক্ষকই এরূপ ভাব পোষণ করিতে পারেন না।

এ-পর্য্যন্ত আমি তিনজন মহাপুরুষের জীবনালোচনা করিয়াছি। ইহাঁরা কেহই সঙ্কীর্ণ বুদ্ধি বা ভেদজ্ঞান লইয়া লেখনী সঞ্চালন বা নেতৃত্ব গ্রহণ করেন নাই। ইহাঁরা তিন জনই ছিলেন জাতির মহোপকারী প্রাণবন্ত পুরুষ। একজন ছিলেন জাতীয় ঋষি, একজন জাতীয় কবি আর একজন জাতির অধিনায়ক। ইহাঁরা বাঙ্গলার অশেষ হিতসাধন করিয়াছেন এবং একথা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, কোনও ভেদবুদ্ধি ইহাঁদের কাহাকেও বিচলিত করে নাই। ইহাঁরা হিন্দুরও নহেন, মুসলমানেরও নহেন, সমগ্র জাতির। বস্তুতঃ ভেদবুদ্ধি থাকিলে কেহই জাতির উপদেষ্টা বা পরিচালক হইতে পারে না।

জাতির নেতা দেশবন্ধু ধর্ম্মমূলক প্রবন্ধ ও কবিতা অনেক লিখিয়াছিলেন বটে, আর তিনি ইতিহাসও পড়িয়াছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু ইতিহাস লিখিবার সুযোগ তাঁহার কখনও হয় নাই। অন্য দুই জন আবার ইতিহাস অবলম্বন করিয়া অনেক কিছুই লিখিয়াছেন—একজন উপন্যাস আর একজন নাটক। দেশবন্ধু যেমন বাহিরে ভিতরে হিন্দু-মুসলমানের প্রতি সমদর্শিতা দেখাইবার সুযোগ পাইতেন, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস বা গিরিশের নাটকে সে সুযোগ না থাকিলেও, তলাইয়া দেখিলেই সকল জাতির প্রতি তাঁহাদের সমদর্শিতা তুল্যভাবে প্রতীয়মান হয়। অধিনায়কের কার্য্য হইতে কবি ও নাট্যকারের কার্য্য স্বতন্ত্র, কারণ, ইতিহাসমূলক রসসাহিত্য রচনা করিতে, উপাদান ইতিহাস হইতেই সংগ্রহ করিতে হয়। ইতিহাস সত্য না হইলে স্থায়ী হয় না। তাই সত্য ঘটনার উল্লেখে বিদ্বেষ অনুমিত হইলেও সত্য ঘটনাশ্রিত নাটক বা উপন্যাস প্রকৃতপক্ষে বিদ্বেষমূলক নয়।

ইতিহাস বিবৃতিতে সম্প্রদায়বিশেষের দুঃখিত হওয়ার কারণ নাই, বরং ইতিহাস দৃষ্টে উভয় জাতির ভ্রম সংশোধিত হওয়া সম্ভব। দৃষ্টান্ত স্বরূপ স্যার ওয়ালটার স্কটের উপন্যাস এবং সেক্সপিয়রের নাটকের উল্লেখ করা যাইতে পারে। Wars of the Roses-এর বর্ণনায় Yorkists এবং Lancastrians-এর পরস্পর বিরোধ দৃষ্ট হয়, কিন্তু উভয়েই একই জাতি। ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের লোক এখন একই জাতি বিশিষ্ট, অথচ তাহাদের দ্বন্দ্ব এবং রাউণ্ডহেড ও ক্যাভিলিয়ারের বিরোধ লইয়া স্কটের উপন্যাসাবলী রচিত। এই সব পুস্তক পড়িয়া ইংরাজ ও স্কটস্ যেমন পরস্পর বিদ্বেষভাবাপন্ন হন না, আমাদের হিন্দু-মুসলমানেরও পূর্ব্বদ্বন্দ্ব স্মরণ করিয়া বর্ত্তমান যুগে ইন্ধন প্রদান বুদ্ধিমানের কার্য্য নয়।

গিরিশচন্দ্রের "সংনাম" নাটক হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্ব অবলম্বনে এবং "ছত্রপতি শিবাজী" হিন্দুসাম্রাজ্য স্থাপন লক্ষ্য করিয়া রচিত হইয়াছিল, অথচ সর্ব্বত্রই হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য ও প্রীতিবন্ধনই মূর্ত্ত হইয়াছে। গিরিশ বারম্বার প্রচার করিয়াছেন—

"স্বাধীনতাপ্রিয় মনুষ্য মাত্রেই একজাতীয়। স্বাধীনতায় তারা একসূত্রে আবদ্ধ। যে স্বাধীনচেতা, তার হৃদয়ে হিন্দু মুসলমান ভেদাভেদ নাই। ভেদবুদ্ধি কাপুরুষের হৃদয়ে, কাপুরুষে হিন্দু মুসলমান ভেদাভেদ করে।"

গিরিশের 'সিরাজদ্দৌলা' এবং 'মিরকাশিম'ও খাঁটি বাঙ্গালী চরিত্র। কবি তাঁহাদিগকে সমগ্র বাঙ্গালী জাতির ভাবী নায়করূপে চিত্রিত করিয়া আমাদের জাতীয় জীবন

আরও সমুন্নত ও সরস করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, উনারভাবাপন্ন হইলেও সরকারের আদেশক্রমে এই কয়খানি নাটকেরই মুদ্রাঙ্কণ ও প্রচার বন্ধ হইয়া রহিয়াছে।

বঙ্কিমের উপন্যাসের আবার অন্যরূপ দুর্দ্দশা। হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের উপর দৃঢ়বদ্ধ হইয়াও ইহাদের দুর্নাম যে, বিদ্বেষ প্রচারই ইহাদের কার্য্য। দেখিতেছি, ওসমান ও মোবারকের মহত্ব বা সাহস কোন বিরোধীরই হৃদয় স্পর্শ করে না। মুসলমান ভ্রাতৃগণের মুখে নিয়তই শুনিতে পাই, বঙ্কিমের 'সীতারাম' ও 'রাজসিংহ' বিরোধানল প্রজ্বলিত করিতেছে। বড়ই পরিতাপের বিষয়, বঙ্কিমের প্রকৃত মনোভাব লোকে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। বুদ্ধিভ্রংশেই 'বন্দেমাতরমে'র অঙ্গচ্ছেদ হইয়াছে। যাঁহার লেখনীতে সমদর্শী চাঁদশা ফকির সকল চরিত্রের তুলনায় উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়াছে, বিরোধ কি তাঁহাতে সম্ভব? বস্তুতঃ হিন্দু-মুসলমানে সমভাবে রক্ষা করিবার জন্যই যে, বঙ্কিম সীতারামের দ্বারা হিন্দুরাজ্য স্থাপন করাইয়াছিলেন, একথা কেহই অনুসন্ধান করিয়া দেখেন না। এ পর্য্যন্ত এ সমস্ত কথার আলোচনাও বড় কেহ করেন নাই।

আজ নয়, সেদিন নয়, জাতীয় মহাসমিতি প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বেই বঙ্কিম তাঁহার উন্নত মনোভাব দেশবাসীকে বুঝাইয়াছিলেন। চাঁদশা ফকিরই যে সীতারামের প্রধান সহায়, বঙ্কিম "সীতারামে" তাহা বরাবর দেখাইয়াছেন, কিন্তু স্বল্পদৃষ্টি পাঠক তাহা দেখিয়াও দেখেন না বলিয়াই আজ গোড়ার কথাটি বলিবার প্রয়োজন হইয়াছে।

কিরূপে বঙ্কিম চাঁদশার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাঁহারই সহায়তায় হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করেন, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিমের লিখিত উক্তিতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। অবশ্য উপন্যাসখানিতে এই অংশ একেবারে বর্জ্জিত হইয়াছে—কারণ উপন্যাসের উদ্দেশ্য ধর্ম্মপ্রচার নয়, কলার উৎকর্ষ সাধন। অতঃপর এ সম্বন্ধে বঙ্কিমও কিছু ভাঙ্গেন নাই, পাঠকও বুঝে নাই। কিন্তু অর্দ্ধ শতাব্দী পরে আজ আমরা বঙ্কিমের এই পরিত্যক্ত অংশ সাহেব্রক্ষণে পাঠককে উপহার দিব।

"সীতারামের" প্রথম সংস্করণ হয় ১৮৮৭ মার্চ্চ ৪, কিন্তু সীতারাম "প্রচারে" প্রথম বাহির হয় ১৮৮৪, জুলাই, ১২৯১, শ্রাবণ। আমরা যে অংশ উল্লেখ করিতেছি, তাহা বাহির হয় "প্রচারের" ১২৯২, শ্রাবণ মাসে অর্থাৎ ১৮৮৫, জুলাই। আমাদের প্রথম জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হয় ১৮৮৫ ডিসেম্বর মাসে।

সীতারাম লক্ষ্মীনারায়ণ জীউর মন্দির দর্শনে চলিয়াছেন। সবিস্ময়ে তিনি দেখিলেন যে, দেবমন্দির-দ্বারে দেবমূর্ত্তি সমীপে একজন মুসলমান বসিয়া আছে। বিস্মিত হইয়া সীতারাম জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কে বাবা তুমি?'

মুসলমান বলিল, "আমি ফকির।"

সীতারাম। "মুসলমান?"

ফকির। "মুসলমানই বটে।"

সীতারাম। "আ সর্ব্বনাশ!"

ফকির। তুমি এত বড় জমিদার। হঠাৎ তোমার সর্ব্বনাশ কিসে হইল?

সীতা। ঠাকুরের মন্দিরের ভিতর মুসলমান।

ফকির। দোষ কি বাবা, ঠাকুর কি তাতে অপবিত্র হইলেন?

সীতা। হইলেন বৈকি? তোমার এমন দুর্ব্বুদ্ধি কেন হইল?

ফকির। তোমাদের এ ঠাকুর, কি ঠাকুর? ইনি করেন কি?

সীতা। ইনি নারায়ণ, জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা।

ফকির। তোমাকে কে সৃষ্টি করিয়াছেন?

সীতা। ইনিই।

ফকির। আমাকে কে সৃষ্টি করিয়াছেন?

সীতা। ইনিই; যিনি জগদীশ্বর তিনি সকলকেই সৃষ্টি করিয়াছেন।

ফকির। মুসলমানকে সৃষ্টি করিয়া ইনি অপবিত্র হন নাই—কেবল মুসলমান ইঁহার মন্দির দ্বারে বসিলেই ইনি অপবিত্র হইবেন? এই বুদ্ধিতে বাবা তুমি হিন্দুরাজ্য স্থাপন করিতে আসিয়াছ? আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। ইনি থাকেন কোথা? এই মন্দিরের ভিতর

থাকিয়াই কি ইনি সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করেন? না, আর থাকিবার স্থান আছে?

সীতা। 'ইনি সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বঘটে সর্ব্বভূতে আছেন।'

ফকির। তবে আমাতে ইনি আছেন?

সীতা। অবশ্য—তোমরা মান না কেন?

ফকির। যদি ইনি আমাতে অহরহঃ আছেন, তাহাতে তিনি অপবিত্র হইলেন না—আমি উহার মন্দিরের দ্বারে বসিলাম ইহাতেই ইনি অপবিত্র হইলেন?

একটি স্মৃতিব্যবসায়ী অধ্যাপক ব্রাহ্মণ থাকিলে ইহার যথাশাস্ত্র একটা উত্তর দিলে দিতে পারিত—কিন্তু সীতারাম স্মৃতি-ব্যবসায়ী অধ্যাপক নহেন, কথাটার কিছু উত্তর দিতে না পারিয়া অপ্রতিভ হইলেন। কেবল বলিলেন, 'এইরূপ আমাদের দেশাচার।'

ফকির বলিল, 'বাবা! শুনিতে পাই তুমি হিন্দু-রাজ্য স্থাপন করিতে আসিয়াছ, কিন্তু অত দেশাচারের বশীভূত হইলে, তোমার হিন্দুরাজ্য সংস্থাপন করা হইবে না। তুমি যদি হিন্দু-মুসলমান সমান না দেখ, তবে এই হিন্দু-মুসলমানের দেশে তুমি রাজ্য রক্ষা করিতে পারিবে না। তোমার রাজ্যও ধর্ম্মরাজ্য না হইয়া পাপের রাজ্য হইবে। সেই একজনই হিন্দু-মুসলমানকে সৃষ্টি করিয়াছেন। যাহাকে মুসলমান করিয়াছেন, সেও তিনিই করিয়াছেন। উভয়েই তাঁহার সন্তান। উভয়েই তোমার প্রজা হইবে। অতএব দেশাচারের বশীভূত হইয়া প্রভেদ করিও না। প্রজায় প্রজায় প্রভেদ পাপ। পাপের রাজ্য থাকে না।

সীতা। মুসলমান রাজা প্রভেদ করিতেছে না কি?

ফকির। করিতেছে। তাই মুসলমানরাজ্য ছারে খার যাইতেছে। সেই পাপে মুসলমানরাজ্য যাইবে; তুমি রাজ্য লইতে পার ভালই, নহিলে অন্যে লইবে। আর যখন তুমি বলিতেছ, ঈশ্বর হিন্দুতেও আছেন, মুসলমানেও আছেন, তখন তুমি কেন প্রভেদ করিবে? আমি মুসলমান হইয়াও হিন্দু-মুসলমানে কোন প্রভেদ করি না। এক্ষণে তোমরা দেবতার পূজা কর, আমি অন্যত্র যাইতেছি। যদি ইচ্ছা থাকে বল, যাইবার সময় আবার আসিয়া তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া যাইব।

সীতা। দেখিতেছি আপনি সিদ্ধ। অবশ্য আসিবেন।

ফকির তখন চলিয়া গেল। সীতারামের দর্শন ও পূজা ইত্যাদি সমাপন হইলে সে আবার ফিরিয়া আসিল। সীতারাম তাহার সঙ্গে অনেক কথাবার্ত্তা কহিলেন। সীতারাম দেখিলেন, সে ব্যক্তি জ্ঞানী। ফারসী, আরবী উত্তম জানে সে। তাহার উপর সংস্কৃতও উত্তম জানে। এবং হিন্দু-ধর্ম্ম বিষয়ক অনেকগুলি গ্রন্থও পড়িয়াছে। দেখিলেন যে, যদিও তাহার বয়স এমন বেশী নয়, তথাপি সংসারে সে মমতাশূন্য বৈরাগী, এবং সর্ব্বত্র সমদর্শী। তাহার এবম্বিধ চরিত্র দেখিয়া নন্দা রমাও (ভার্য্যাদ্বয়) লজ্জাত্যাগ করিয়া একটু দূরে বসিয়া তাহার জ্ঞানগর্ভ কথা সকল শুনিতে লাগিলেন।

বিদায় কালে সীতারাম বলিলেন, "আপনি যে সকল উপদেশ দিলেন, তাহা অতি শ্লাঘ্য। আমি সাধ্যানুসারে পালন করিব। কিন্তু আমার ইচ্ছা যে আমার নূতন রাজধানীতে আপনি বাস করেন। আমি এ উপদেশের বিপরীতাচরণ করিলে আপনি নিকটে থাকিলে আমাকে সে সকল কথা আবার মনে করিয়া দিতে পারিবেন। আপনার ন্যায় জ্ঞানী ব্যক্তি আমার নিকটে থাকিলে আমার রাজ্যের বিশেষ মঙ্গল হইবে।

ফকির। তুমি একটী কথা আমার নিকট স্বীকৃত হইলে, আমিও তোমার কথায় স্বীকৃত হইতে পারি। তুমি রাজধানীর কি নাম দিবে?

সীতা। শ্যামাপুর নাম আছে—সেই নামই থাকিবে।

ফকির। যদি উহার "মহম্মদপুর" নাম দিতে স্বীকৃত হও, তবে আমিও তোমার কথায় স্বীকৃত হইতে পারি।

সীতা। এ নাম কেন?

ফকির। তাহা হইলে আমি খাতিরজমা থাকিব যে তুমি হিন্দু-মুসলমানে সমান দেখিবে।

সীতারাম কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। ফকির তখন বলিল,—

"আমি ফকির, কোন গৃহে বাস করিব না। কিন্তু

তোমার নিকটেই থাকিব। যখন যেখানে থাকি তোমাকে জানাইব। তুমি খুঁজিলেই আমাকে পাইবে।"

গমনকালে ফকির তিনজনকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

•

পাঠক, পঞ্চাশ বৎসরের অধিক হইল "প্রচারে" বঙ্কিমের মনোভাব আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, কিন্তু উপন্যাস প্রচার-কার্য্য নয় বলিয়া পুস্তকে পূর্ব্বোক্ত সব অংশই পরিত্যক্ত হইয়াছে।

কিন্তু অর্দ্ধ শতাব্দী পরে আজ সর্ব্বকালোপযোগী বঙ্কিমের এ কথাগুলি সকলকে স্মরণ করাইয়া দিলে জাতির মঙ্গলদায়ক হইবে না কি? হিন্দু ও মুসলমান বঙ্কিমের এই কথাগুলি চিরন্তন সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে বাঙ্গালা দেশ আজ পরস্পরের বিরোধ, দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষে বিধ্বস্ত হইত না; এক বাঙ্গালা একমনপ্রাণে জগতের সমক্ষে বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইতে পারিত; সকলের পূজ্য আসন লাভ করিতে সক্ষম হইত।

নরমেধ যজ্ঞ

—শ্রীচুণীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

আমরা মুটে, আমরা মজুর, আমরা কুলী দেশের বল,
আমরা আছি—তাই তোমরা রয়েছ বেঁচে বাবুর দল।
আমাদেরই শ্রমের ফলে 'ধনের মালিক' তোমরা ভাই,
তোমরা সুখে মোটর হাঁকাও—মোদের ঘরে অন্ন নাই।
রেল কোম্পানীর মজুর মোরা—চা-বাগানের আমরা কুলী,
মরণ মাথায় বরণ করে সাগর হ'তে মুক্তা তুলি।
আমরা আছি—তাই তোমাদের চলছে কল চলছে গাড়ী,
সহরের ঐ রঙ-মহলে অট্টালিকা সারি সারি।
তেলের খানি আমরা টানি, কাপড়ের কল আমরা চালাই,
সুতোর পরে সুতো কেটে রঙ-বেরঙের সাড়ী বুনাই।
পাহাড় কেটে নগর গড়ি, শস্য ফলাই সাহারায়,
সিংহ মেরে আবাদ করি বন-জঙ্গল আফ্রিকায়।
তোমাদের ঐ রাজপ্রাসাদে হাজার ডালে জ্বলে বাতি,
ভাঙ্গা ঘরে আমরা থাকি অন্ধকারে সারা রাতি।
শস্য ফলাই আমরা ক্ষেতে, আমরা করি উপবাস,
সোনার থালে খাও তোমরা চপ্-কাটলেট বারমাস।

বসুমতীর গর্ভ চিরে পাতাল হতে সোনা আনি,
সুরেজ হতে লহর কেটে মরুভূমে জোগাই পানি।
তোমাদের সুখ বাড়ছে যত বাড়ছে তত মোদের দুখ,
তোমরা খাচ্ছ মাছের মুড়ো, মোদের পাতে কাঁটাটুক্।
নাই আমাদের সুখ-দুঃখ, নাই আমাদের ভালবাসা,
তোমাদেরই করতে সেবা মোদের যেন রেখার আশা।
নরমেধের আগুন জ্বলে জগত-জোড়া আলোড়ন,
মুহুর্মুহুঃ উঠছে কেঁপে বিশ্বনাথের সিংহাসন।
দুখের উপর জমছে দুঃখ—তাপের উপর বাড়ছে তাপ,
আর কত কাল সইব বল জগদ্দল এই ব্যথার চাপ।
সবার পেটে ক্ষুধার জ্বালা জাগ্রত আজ নারায়ণ—
রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে আগুন জ্বলে কাঁপছে সকল সিংহাসন।
পশ্চিম হতে উঠল ঝড় অগ্নি-বৃষ্টি জলোচ্ছ্বাস—
মহাকালের শিঙ্গা বাজে সৃষ্টি বুঝি হয় বিনাশ।
সম্মিলিত গণশক্তি ক্ষুধার জ্বালা সবাকার—
সমাজ বল, রাষ্ট্র বল, ভেঙ্গে করবে একাকার।

বিশ্বনাথের ঘণ্টা বাজে মেঘে মেঘে গর্জ্জে বাজ,
সবার ক্ষুধায় ক্ষুধিত আজ রাজার রাজা মহারাজ।
মনুষ্যত্বে 'নড়' হয়ে আবার যদি বাঁচতে চাও,—
ছোটির মুখে অন্ন দিয়ে ক্ষুধার জ্বালা ঘুচিয়ে দাও।

স্থিতি ও গতি

—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ

'সত্যি না কি বিন্দু, যা শুনলাম ?'

'কি শুনলি মীনা ?'

'তুই না কি বিয়ে করবি এখুনি ?'

লালিম মুখখানি তরিয়া একটু সলজ্জ হাসি ফুটিয়া উঠিল। ঈষৎ সলজ্জ দৃষ্টিতে চাহিয়া বিন্দুমতী কহিল, 'করব কি ভাই ? বল্ বরং হবে।'

'হবে ! ও ! কেন ?'

'কেন ? বিয়ে ত সবারই হয়। তোর কি হবে না ?'

অগ্নিবর্ণ মুখে উত্তেজিত স্বরে মীনা কহিল, 'না ! হবে না ! কক্ষনও না ! যদি ইচ্ছে কখনও হয়, ভাল কাউকে লাগে, বিয়ে তখন ক'রব। নইলে হবে না।'

'তা হ'লেই ত হ'ল ভাই !'

'সে হওয়া হ'ল আলাদা কথা। আমি কর্ত্তা, একটা কিছু ক'রব, কাজেই সেটা হবে। আর তোর যে এই বিয়ে হওয়া—সে তোকে আর কি ব'লব ? এ দেশের নারী জাতেরই এই দুর্ভাগ্য যে, বিয়ে তাদের হয়।'

'সেটা কি বড় একটা দুর্ভাগ্য হ'ল মীনা ?'

'দুর্ভাগ্য নয় ? দুর্ভাগ্য আর কাকে বলে ? বিয়ে মেয়েরা করে না, তাদের হয়। অর্থাৎ বাবা, খুড়ো, জ্যাঠা, দাদা কি মামা, যেই হ'ক একজন কেউ, ভারটা আর বইতে না পেরে, কি বইতে না চেয়ে, তাদের খুসী মত যাকে পাওয়া গেল, তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়।'

'ভার ? বলিস্ কি মীনা ? ছি, ভার কেন আমরা হব ! মেয়ের বিয়ে যে লোকে দেয়, সে ঘাড়ের ভার বোঝা নামাবে ব'লে দেয় ?'

'কেন তবে দেয় ?'

'দেয় মেয়ে সুখী হবে ব'লে।'

'সুখী হবে ! কিসে ? কেন ? একটা পুরুষের আশ্রয় না পেলে কি মেয়েমানুষ সুখী হ'তে পারে না ? নিজের মধ্যে সুখের অবলম্বন কি কিছুই তার নেই ?'

একটু কি ভাবিতে ভাবিতে বিন্দুমতী উত্তর করিল, 'সুখের আসল অবলম্বন সবারই বোধ হয় নিজের মধ্যে, স্বামীর আশ্রয় ত' এইটুকু যে, তিনি খেতে পরতে দেন। জীবনের কতটুকু সুখ আর তাঁর উপরে নির্ভর করে ভাই ?'

'হুঁ, খেতে পরতে দেন, তাই ত একেবারে দাসী হ'য়ে তাঁর ঘরে থাকতে হয়। কেন মেয়েমানুষ কি নিজে খেটে, দুটি খেতে প'রতে পায় না ?'

'তা পাবে না কেন ? পায়। ঢের মেয়ে ত নিজেরাও খেটে খাচ্ছে।'

'খাচ্ছে—সে অন্য দেশে, অন্য সমাজে। এ দেশে তোদের এই হিন্দুসমাজে কোথায় কোন্ মেয়ে খেটে খাচ্ছে বল্ ত ?'

'খাচ্ছে না ? বলিস কি ! এই যে সব ঝি, বামনী, গয়লানী, মেছোনী, মেথরানী, বেদেনী—'

'ও, এরা !'

'কেন, এরা কি এ দেশের মেয়েমানুষ নয় ?'

'তা—বটে ! তবে তোরা ত—'

হাসিয়া বিন্দুমতী উত্তর করিল, 'তা আমরা ব'লতে যাদের বোঝায়—অর্থাৎ একটু ভাল অবস্থার ভদ্রলোকের মেয়ে যারা—কোনও দেশেই তারা বোধ হয় খেটে খায় না, অন্ততঃ স্বামী যাদের আছে।'

'তবু তারা এমন সর্ব্বতোভাবে দাসী হ'য়ে স্বামীর ঘরে থাকে না। আর এই যে ঝি বামনী-টামনীদের কথা বললি, এরাও, রোজগার ক'রে যারা খায়, একেবারে দাসীর মত স্বামীর অধীন হ'য়েও সেদ্ধ হয় থাকে না।'

'দাসী, অধীন—এই কথাগুলো সর্ব্বদাই শুনতে পাই। কিন্তু কেন যে সবাই বলে, কেন যে এই রকম একটা ধারণা লোকের হ'য়ে গেছে, বুঝতে পারি না। স্ত্রী খাওয়া পরার জন্য স্বামীর উপর নির্ভর করে ঠিক, কিন্তু স্বামীও কি অশেষ রকম সুখের জন্য, আরামের জন্য, স্ত্রীর

উপরে নির্ভর করে না? তার সংসার বলতে যা বোঝায়, স্ত্রীই ত তা রক্ষা করে, গুছিয়ে রাখে। আর তাই করে বলেই না কাজকর্ম ক'রে ঘরে এসে একটু স্বস্তি স্বামীরা পায়। বাইরে করা কি-চাকরগুলো হুকুম মত কতকগুলো কাজ করে, আপনার ব'লে দরদ ক'রে কিছু করে না। কেবল তাদেরই হাতে সংসারের শ্রী থাকে না, শৃঙ্খলা কিছু থাকে না, সত্যিকার আনন্দ কি আরাম-বিরামও কেবল তাদের কাছে কেউ কোথাও পায় না। স্বামী ম'লে পয়সার অভাব হয়; কিন্তু গিন্নী ম'লে এক একটা সংসারই একেবারে ভেঙ্গে পড়ে; সুখ স্বস্তি কারও কিছু থাকে না। ছেলে-মেয়েগুলো একেবারে ভেসে যায়।'

মীনা কহিল, 'তা বিয়ের মন্তরে বশ করা, শাস্ত্রের শাসনে বাঁধা, স্ত্রীর মত এমন পাকা দাসী ত আর কেবল পয়সায় মেলে না?'

একটু হাসিয়া বিন্দুমতী কহিল, 'তা সে মন্তরে আর সে শাসনে স্বামীও স্ত্রীর দাস বড় কম হয় না। বাইরে খেটে সে যা রোজগার করে, ঘরে স্ত্রীর হাতেই এনে দেয়। সেই পয়সা দিয়ে কি হবে, ক'টা স্বামী তার খোঁজ নেয়? যা দরকার সবই ত স্ত্রীরা করে। আর তার কতটুকু ভাগ নিজের খাওয়া পরার জন্য স্বামীরা ভোগ করে। নিজের আরাম-বিরামের চাইতে স্ত্রীর আরাম-বিরামই বেশীর ভাগ স্বামীরা অনেক বেশীই বরং দেখে। পয়সা যারা বেশী রোজগার করে, স্ত্রীরা ত তাদের ঘরে রাণীর হালে থাকে। স্বামীর রোজগারের খুব বড় একটা ভাগই স্ত্রীরা তাদের ইচ্ছে মত নিজেদের আরামে আর সাজ-পোষাকে আজকাল খরচ করে। খরচটা খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে, স্বামীর ভাগের চাইতে সেটা অনেক বেশী।'

'আর স্বামীরা যখন মাতাল হয়, লক্ষীছাড়া হয়, ঘরে এসে স্ত্রীকে ধ'রে মারে?'

'উল্টে অমনি স্ত্রীরাও মাতাল হ'য়ে ঘরে এসে স্বামীকে ধ'রে যদি মারতে পারত, সেটা কি তাদের পক্ষে খুব ভাল হ'ত মীনা?'

মীনা হাসিয়া উঠিল—

'দূর হ! তা কে ব'লছে? তবে—হাঁ—স্বামীরাই যা স্ত্রীদের উপরে এমন সব দুর্ব্যবহার করতে পারবে কেন?'

'সে যার যেমন ভাগ্য। ক'রলে আর উপায় আছে কি?'

'এই ভাগ্য কি কেবল স্ত্রী-জাতিরই ভোগ করতে হবে!'

বিন্দুমতী কহিল, 'তাই কি কেবল করে ভাই? ঠিক এই ধরণের না হ'ক, দাম্পত্য-জীবনের দুর্ভাগ্য অনেক স্বামীকেও ভোগ করতে হয়। কত ঝগড়াটে, হিংসুটে, স্বার্থপর, কুঁড়ে, বোকা স্ত্রীকে নিয়ে কত অশান্তি কত স্বামী ভোগ করছে। স্বস্তিতে একটি দিন ঘরে টিকতে পারে না,—হাড়ভাঙ্গা খাটুনী খেটে এসেও একটু আরাম পায় না। অথচ সেই স্ত্রীর হাতেই সর্ব্বস্ব এনে সঁপে দিচ্ছে, তার আরাম-বিরামের জন্য প্রাণপণ করছে, তার মন রাখতে নিজের বাপ মা, ভাই বোনদের থেকেও আলাদা হ'য়ে যাচ্ছে। কত এমন দেখা যায়। এ সব ভাই ভাগ্যের কথা। মাতাল, দুশ্চরিত্র, নিষ্ঠুর স্বামী, আবার অতি স্বার্থপর, ঝগড়াটে, হিংসুটে, অকর্মা স্ত্রী—বহু সংসারে সব দেশেই আছে। তোদের দোষ হয়েছে এই, পরের দেশের কেবল ভালটাই দেখবি, আর নিজের দেশের কেবল দেখবি কোথায় কি খুঁৎ আছে। ভালর দিকে চোখ একেবারেই পড়ে না।'

'ভাল কিছু থাকলে ত প'ড়বে?'

'দেশটা থেকে আলাদা হয়ে পরদেশীর মত দূরে থাকিস, তাই পড়ে না। আপন বলে একটা মমতাও তাই হয়নি।'

মীনা উত্তরে কহিল, 'ওসব ভাবের কথা বুঝি-সুঝি না ভাই। বুঝি, নারীর অধিকারের কথা। বুঝি, নারী কোথাও কোনও দেশে, পুরুষের অধীন হয়ে থাকবার জন্যে জন্মায় নি। যেখানে যতখানি ন্যায্য অধিকারে সে বঞ্চিত, ততখানিই অন্যায় সেখানে তার উপরে করা হয়েছে—যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে তাকে দাঁড়াতে হবে। গৃহে, সমাজে, রাষ্ট্রে, জীবনের সকল ক্ষেত্রে, পুরুষের সঙ্গে সমান অর্থাৎ ন্যায্য অধিকার তাকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

'হ্যাঁ, স্বীকার করছি, এ দেশের মত অত না হ'ক ওদেশেও নারী বহু ন্যায্য অধিকারে বঞ্চিত, অনেক অবিচার অত্যাচার তার উপরে হয়ে থাকে। তাই না একটা women movement—নারী-বিদ্রোহ ওদেশেও মাঝে মাঝে দেখা দিয়েছে। খাওয়া-পরার জন্যে পুরুষের উপরে অনেকটা নির্ভর করতে হয়, তাই এত অবিচার অত্যাচার তাকে সইতে হয়। তাই তার দাবী আজ হয়েছে আর্থিক স্বাধীনতা—economic independence!'

বিন্দুমতী কহিল, 'হ্যাঁ, পড়ি বটে সে দাবীর কথা—আর মনে মনে হাসি। এদেশে কি ওদেশে প্রায় প্রত্যেকটি স্বামীর রোজগারের যে-পরিমাণ মালিক স্ত্রীরা, তার উপরে আবার আর্থিক স্বাধীনতা যে কি হতে পারে জানি না। খেতে পরতেও স্বেচ্ছায় স্বামীরা না দিলে আদালতে নালিশ করেও স্ত্রীরা আদায় করে নিতে পারে। সেটাও স্বামীর রোজগার যত বেশী, তত বেশীই স্ত্রীরা পায়। আর তোদের ওই অধিকারের কথা? তা ভাই, এই টুকু বুঝি স্ত্রী-পুরুষ এ পৃথিবীতে এ ওর প্রতিদ্বন্দ্বী কোনও বিষয়ে হতেই পারে না। অধিকার নিয়ে লড়াই এক শ্রেণীর পুরুষ আর এক শ্রেণীর পুরুষের সঙ্গে করতে পারে। কিন্তু মেয়ে-পুরুষ হল, মা-ছেলে, স্বামী-স্ত্রী, ভাই-বোন, বাপ-মেয়ে। ভালবেসে মিলেমিশেই সংসার তাদের করতে হয়। দুই দল হয়ে লাঠি হাতে করে দু'ধারে দাঁড়াতে পারে না।'

'না তা পারে না! পারে কেবল পুরুষরাই লাঠি মারতে, মেয়েরা পারে কেবলই মাথা নীচু করে সেই লাঠি খেতে আর খেয়েও দেবতা দেবতা বলে তাদের পায়ে লুটিয়ে পড়তে। ঐ যে সেদিন কি একটা কথা বইতে পড়ছিলাম, কে বলেছিল, 'মেরেছিস কলসীর কানা, তাই বলে কি প্রেম দেব না?' ঠিক তেমনি—নয়?'

হাসিয়া বিন্দুমতী কহিল, 'কলসীর কানায় মাথা কেটে রক্ত পড়ছে, সেই রক্ত হাতে মুছতে মুছতে হাসি মুখে প্রেম যদি কেউ দিতে পারে, সে ত মানুষের উপরে, দেবতা! জগৎ সে বশ করতে পারে। জগাই মাধাই এই প্রেমেই নরম হয়েছিল, পাল্টা আর একখানা কলসীর কানা ছুড়ে মারলে হত না। সে যাই বলিস, মীনা, মেয়েরা যদি সব কলসীর কানা খেয়েও নিতাই-এর মত অমনি প্রেম দিতে পারত, এই পৃথিবী সত্যই স্বর্গরাজ্যে পরিণত হত।'

'তুই বুঝি এমনি ঘা খেয়েও প্রেম দিয়ে তোর জগাই মাধাইকে বশ করবি ভাবছিস?'

হাসিয়া বিন্দুমতী উত্তর করিল, 'ভাগ্যে যদি জগাই মাধাই-ই জোটে, তবে কলসীর কানা মারব না। কিন্তু নিতাই-এর মত—' বলিতে বলিতে থামিয়া গেল।

মীনা অভাব পূরণ করিয়া কহিল, 'কিন্তু কিছু নেই। দেখছি নিতাই-এর মত প্রেম দিতে গিয়েই পায়ে লুটিয়ে পড়বি।'

'যদি পারি ভাগ্যিই মনে করব।'

বলিতে বলিতে মুখে অতি মৃদু একটি ম্লান হাসি ফুটিল। সঙ্গে সঙ্গে একটি নিশ্বাসও বুক ভরিয়া উঠিল।

হাসিয়া মীনা কহিল, 'ওটা তাহলে কেবল মুখেরই কথা। আসল ভেতরের কথাটা ঐ নিশ্বাসেই ব্যক্ত হচ্ছে।'

বিন্দুমতী উত্তর করিল, 'হাঁ, তা কতক হচ্ছে বই কি? জগাই মাধাই কেউ যদি সত্যি কপালে জোটে, নিতাই-এর ধর্ম্ম আমি পালন করতে পারব কি না কে জানে?'

'সে পারিস না পারিস, জগাই মাধাই কেন কপালে জুটবে? কেন জোটাবি? এই বেলা ভাল করে দেখে শুনে নে।'

বিন্দুমতী একটু হাসিল। কহিল, 'দেখে যাঁরা নেবার তাঁরাই নিচ্ছেন।'

চমকিয়া মীনা কহিল, 'অ্যাঁ! বলিস কি বিন্দু! দেখেশুনে নেবার অধিকারও বাপ-মার হাতে ছেড়ে দিচ্ছিস?'

'এ অধিকার আমার কি তাঁদের সেইটে ঠিক করে কেউ বলতে পারে কি? আমার ত মনে হয়, তাঁদেরই হবে। অন্ততঃ এ অধিকারের বড় একটা ভাগ তাঁদের আছেই।'

'কিসে?'

'তারা মা বাপ। তাঁদের হ'তেই এ পৃথিবীতে এসেছি, তাঁদের স্নেহেই মানুষ হয়ে উঠেছি, ভালবেসে আমার ভাল কে আর এ পৃথিবীতে তাঁদের চেয়ে বেশী দেববে ভাই?'

মীনা উত্তর করিল, 'যতই যে বাসুক, আমায় চাইতে আমাকে বেশী ভাল কেউ বাসতে পারে না। তাঁদের হ'তে জন্মেছি, তাঁদের স্নেহে মানুষ হয়ে উঠেছি, এটা প্রকৃতির নিয়ম। আমি যখন আমি, কে আমাকে ছোট করে রাখবে? আমার মানবত্বের ন্যায্য অধিকার কেন আর কারও হাতে ছেড়ে দেব? তুই কি বলছিস বিন্নু? কচি খুকীটি ত আর নস। হঠাৎ একদিন অচেনা অজানা একটা লোকের হাতে হাত বেঁধে দেবেন, আর সারাটি জীবন নিঃশব্দে সেই বাঁধনে বাঁধা থাকতে হবে, এও কি হয় কখনও?—এত বড় কেন তবে তোকে হ'তে দিলেন, কেন লেখাপড়া শিখিয়ে চোখ মুখ ফোটালেন? এর চাইতে ছেলে বেলায় যেমন তোদের নিয়ম আছে—একটা 'চেলীর পুঁটুলী' করে কারও হাতে সঁপে দিলেই পারতেন?'

আবার একটা নিশ্বাস ছাড়িতে ছাড়িতে বিন্নুমতী উত্তরে কহিল, 'জানি না ভাই, তাই করলেই বোধ হয় ভাল হ'ত। তবে জানিস ত আমার দিদি ছেলে বেলায় বিধবা হয়েছেন কি না, তাই বাবা—'

কিছু উত্তেজিত স্বরে বাধা দিয়া মীনা বলিল, 'সেটাও ভাল করেন নি, এটাও ভাল করছেন না! মেয়েদের সম্বন্ধে ভাল কিছু, উচিত কিছু, কেউ এদেশে করে না। যেন খেলার পুতুল সব। যা খুসী তাই তাদের জীবনটা নিয়ে এরা করতে পারে।'

একটু হাসিয়া বিন্নুমতী কহিল, 'দেশ যা আছে তা আছে। ভাল-মন্দ রীতি কোন্ দেশে না আছে? আমার ত—'

'কি?'

'আমাদের দেশের এ জীবনটা—'

'হ্যাঁ?'

'মোটের উপর বেশ ভাল,—মিষ্টিই লাগে।'

'নারী জীবনটাও?'

'হাঁ, নারী জীবনটা! কেন লাগবে না? মেয়েরা ত —তাই-অমুখী এ দেশে নয়। হাঁ, দুঃখও আছে। কোথায় না আছে? স্বামী নিজেরাই বেছে নিক কি না বাপেই বেছে দিক, ঠিক বাছতে কেউ বোধ হয় পারে না। সব ভাগ্য ভাই। কেউ বাছে না, বাছতে পারে না। ভাগ্য যে যেমন নিয়ে এসেছে, তাই ব'য়ে বাছেন বা বেছেই রেখেছেন ওপরের কেউ।'

'হি হি হি! ওপরে আবার কেউ আছেন নাকি—আমার ভাগ্য যিনি বেছে দেবেন বা বেছেই রেখেছেন? আমি তবে কে? কি করতে এসেছি? কি করে বেড়াচ্ছি। ওপরের কেউই যদি আমার কর্তা হয়, তবে কেবল একটা মাটির পুতুল হলেই ত চলত। মানুষ হয়ে কেন তবে জন্মেছি? মানুষের বুদ্ধি, মানুষের ইচ্ছা, মানুষের বিচারশক্তি কেন পেয়েছি?'

বিন্নুমতী উত্তরে কহিল, 'মানুষ হয়েই জন্মেছি, বুদ্ধিও আছে, ইচ্ছাও আছে, বিচারশক্তিও আছে। আবার ওপরেও বড় একজন, অতি বড়ই একজন আছেন—যাঁর নির্দ্দেশের অধীন হ'য়েই মানুষ আমাদের বুদ্ধি কি ইচ্ছা কি বিচার-শক্তি—যাই বলিস্—সব চ'লছে। যত সেই নির্দ্দেশের অধীন হ'য়ে আমরা চলতে পারব, ততই মঙ্গলের ভাগী বোধ হয় হব।'

'হুঁ! তা সেই নির্দ্দেশটা-কি নির্দ্দেশগুলো—কই ডাক ছেড়ে ওপরের কেউ কাউকে ব'লছে কি বলেছে বলে ত শুনতে পাই নি?'

'শুনবার ভাগ্যি সবার হয় না। যাদের হয় কি হয়েছে, তাঁদের উপদেশ মেনেই চলতে হয়।'

'হুঁ! সেই উপদেশই বুঝি তোরা যাকে ধর্ম্ম বলিস তার সব কথা?'

'হাঁ, তা তোরা কি ধর্ম্ম ব'লে কিছু সত্যিই মানিস না? ওপরে যে একজন আছেন—'

একটু অবজ্ঞার ভাবে হাসিয়া মীনা উত্তর করিল, 'থাকতে পারেন কেউ, যাকে লোকে ঈশ্বর বলে। তবে নিজে যাকে দেখতে শুনতে পাইনে, যার অস্তিত্বের কোনও প্রমাণ বুদ্ধিতে ধরা দেয় না, মানতে তাকে প্রস্তুত নই। আমাকে জানি, আমাকে মানি। আমার ওপরে কেউ—

নিরাকার কি সাকার কোনও ঈশ্বর আছেন, কি দেবতা আছেন, না ভাই, তা জানি না। কেন মানব?'

'তোরা কি ব্রহ্মজ্ঞানী নস তবে? তারাও ত—'

'না, ব্রহ্মজ্ঞানী-ট্যানী কিছু আমরা নই। বাবা ওসব কিছুই মানেন না, আমিও মানি না। মানবার কোনও প্রয়োজনও দেখতে পাই না।'

হাঁ করিয়া বিন্দু চাহিয়া রহিল। কি ভাবিতে ভাবিতে শেষে কহিল, 'বড় সর্ব্বনেশে কথাই বলছিস মীনা! এমনটা ত আমি ভাবতেও কখনও পারি নি! তোরা তবে সত্যিই নাস্তিক?'

'Positivist (বাস্তব জড়বাদী)। নাস্তিক বলতে চাস্, তাই সই! আস্তিকরা যত বাজে ভার মাথায় ব'য়ে চলে। পদে পদে তাদের বাঁধন, ইচ্ছে মত একটু নড়বার চড়বার যায়গা এত বড় পৃথিবীটায়ও তাদের মেলে

তার চাইতে নাস্তিক আমরা বেশ হালকা আছি, মুক্তভাবে চলি ফিরি। পথে কোথাও কোন বাঁধন কি কাঠোর বাধা আমাদের নেই। সুন্দর সুগন্ধ সব ফুলই কেবল ফুটে রয়েছে!'

বিন্দুমতী উত্তর করিল, 'কবে দেখবি ফুল সব শুকিয়ে ম'রে পড়েছে, গন্ধ সব উপে গেছে, পথ ভ'রে রয়েছে কেবলই কাঁটা। আস্তিকের ধর্ম্ম তার মাথায় ভার নয়, পায়ের বাঁধন নয়, ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ, পথের আলো! মানতে একদিন হবে। তবে ঈশ্বর করুন, সেদিন মানতে যেন পারিস! পাষাণের যে দেয়াল তুলেছিস, তাতে বৃথাই মাথা খুঁড়ে না মরতে হয়!'

ছুটীর পর কলেজের প্রাঙ্গণে মীনা আর বিন্দুমতী গাড়ীর অপেক্ষায় পায়চারী করিতেছিল। মীনার বাড়ী হইতে পিতার গাড়ী আসে। বিন্দুমতী বাড়ীতে যায় কলেজের গাড়ীতে। গাড়ী তখন প্রথম এক দল মেয়েকে বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিয়া ফিরিয়া আসিয়া সম্মুখের পথে দাঁড়াইল।

মীনা কহিল, 'ঐ তোর গাড়ী এল, যা তবে। যদি মাথা খুঁড়ি, তোকে ডাকব, তুই এসে ঘরের দোর খুলে দিস।'

ছোট একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া বিন্দুমতী কহিল, 'দোর যেন আপনিই খোলে, ঘরের মালিক যিনি তাঁর মায়ায়। আর কেউ তা খুলে দিতে পারে না। তা আসি ভাই, তোর গাড়ী যে এখনও আসছে না আজ?'

'কি জানি,—বাবা ত বলেছিলেন, কোথায় যাবেন, ফিরবার পথে আমাকে তুলে নেবেন। পাঁচটা ত বাজল, এখুনি এসে পড়বেন। তুই যা।'

[ক্রমশঃ

পুরুষ

—শ্রীরসময় দাশ

এক বিন্দু অশ্রু? হায়, দেও ফেলিব না:
মরুময় হৃদয়ের বিশুষ্ক বেদনা
বাঁধিয়া রাখিতে হবে চির রাত্রি দিন,
অশ্রুর সান্ত্বনা কোথা?—পুরুষ কঠিন!

ওই যে উচ্চ শিরে পর্ব্বত সমান,
দুখে বুঝি কাঁদে তা'র বিশাল পরাণ,

তুষার-বেদনা তাই নদ-অশ্রুধারে
গলিয়া ঝরিয়া নিত্য ভিজায় ধরারে!

ক্ষুদ্র নর তবু মোরা পাব না কাঁদিতে,
পুরুষের অশ্রু কভু শোভা নাহি পায়;
অনন্ত অজ্ঞার সম বিফল হাসিতে
ঢাকিয়া রাখিতে হবে অনন্ত ব্যথায়।

বেদনায় পাষাণেরও বক্ষে ঝরে জল,
তথাপি পুরুষ মোরা র'ব অচঞ্চল!

সিপাহী-যুদ্ধের নূতন কথা

—শ্রীসুশীলপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

[ডাঃ সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী মাত্র ৩৪ বৎসর ইইল পরলোকগমন করিয়াছেন। চিকিৎসা ব্যবসায়ে তাঁহার সুনামের কথা প্রবাসে অনেকের হয় ত' জানা থাকিতে পারে। ইনি ভারতবাসীদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম সিনিয়র ও মিলিটারি সার্জ্জন, 'ক্যালকাটা জর্ণাল মেডিসিন'-এর সর্ব্বপ্রথম ভারতবর্ষীয় 'এডিটর', ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথম মেডিক্যাল কংগ্রেসের প্রাইস্-প্রেসিডেন্ট (তখনকার তৎকালীন সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার .....তখন হইতে আসেন সভাপতি হইতে) কলেজ অব্ ফিজিসিয়ান্স্ এণ্ড সার্জ্জন্স্-এর (এখনকার কারমাইকেল কলেজ) প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি, ভারতীয় বিজ্ঞান-সভা স্থাপনে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের আদি সহকর্ম্মী 'The Indian World' ও 'ভারতবাসী' নামক সুপ্রসিদ্ধ পুরাতন পত্রিকাদ্বয়ের প্রাণস্বরূপ, 'সাহিত্যসভা' ও 'বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। প্রকাশ্য দরবারে বঙ্গদেশের তৎকালীন শাসনকর্ত্তা সার বিডন ষ্টুয়ার্ট সূর্য্যকুমারকে সংবর্দ্ধনা করেন এই বলিয়া—

"Who would have thought that these mild appearances covered the spirit of an ardent mutiny veteran who was present at many bloody actions not indeed to add to human miseries but to relieve so far as science, skill and devotion could", ("এই সৌম্যমধুর মূর্ত্তির অন্তরালে সিপাহীযুদ্ধের তেজঃপুঞ্জ ওজস্বিতা বর্ত্তমান, ইহা কেহ কল্পনা করিতে পারে কি? রক্তলিপ্ত কত রণক্ষেত্রের বুকের উপর দাঁড়াইয়া এই যোদ্ধা যুদ্ধ করিয়াছেন—যুদ্ধে নিযুক্ত মানবের দুর্দ্দশা বা যন্ত্রণা বাড়াইবার জন্য নহে, প্রাণপণ শক্তিতে বিপুলভাবে বিজ্ঞানের সাহায্যে তাহার লাঘব করিতে।")

গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এই কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন—বাঙালীর কর্ত্তব্যনিষ্ঠার এই স্বীকারোক্তি বাঙালী জাতির পক্ষে বিশেষ গৌরবের। সূর্য্যকুমারের ন্যায় কর্ম্মবীরের জীবন-কাহিনী পাঠে জাতির অশেষ কল্যাণ সাধিত হওয়ারই সম্ভাবনা। স্বর্গত কর্ম্মবীরের দিন-লিপিতে লিখিত সিপাহী-যুদ্ধকালীন নানা ঘটনার কথা আমরা পাঠক-পাঠিকাকে উপহার দিব। প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা পাঠে সিপাহীযুদ্ধ সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য ইহা হইতে জানিতে পারা যাইবে। বলা বাহুল্য, 'দিন-লিপি'তে বর্ণিত সিপাহী-যুদ্ধের কথা ইহার পূর্ব্বে কোথাও প্রকাশিত হয় নাই]

পূর্ব্বাভাষ

দ্বিতীয় ব্রহ্মযুদ্ধে প্রেরিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রণপোত 'ফায়ার কুইন'-এর সার্জ্জন ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী ব্রহ্মযুদ্ধ অবসানের পরে গার্ডেনরীচের সরকারী চিকিৎসকের পদে নিযুক্ত হ'ন। মেডিক্যাল কলেজ হইতে ছাড়-পত্র পাইয়াই তিনি ব্রহ্মযুদ্ধে গমন করেন। মেডিক্যাল কলেজে যোগদান করিয়া প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর পরীক্ষাদি হইতে শেষ পরীক্ষা পর্য্যন্ত প্রতি পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করায় সূর্য্যকুমার উচ্চ বৃত্তির অধিকারী হ'ন। প্রকৃতপক্ষে তিনি এবং তাঁহার সহপাঠী জগবন্ধু বসু কলেজের পরীক্ষক, পারিতোষিক ও বৃত্তির সবই যেন 'লুটিয়া খাইবার' ষড়্‌যন্ত্র করেন। পরীক্ষায় প্রথম স্থানাধিকারী—হয় সূর্য্যকুমার নয় জগবন্ধু। শেষ পরীক্ষার পরে সেই সূর্য্যকুমারের কলিকাতায় বা কলিকাতার বাহিরে 'নিষ্কিয়াদে' একটা চাকুরী পাওয়ার কোনও অসম্ভাবনা ছিল না। প্রকৃতপক্ষে সেই প্রকারের একটা সরকারী চাকুরী তাঁহার হাতের মুঠার মধ্যে আসিয়াও ছিল। তাহার লোভ ত্যাগ করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন কামানের মুখে।

আরও একটু কথা আছে। ব্রহ্মযুদ্ধে যাইবার দুই আড়াই বৎসর পূর্ব্বে সূর্য্যকুমারের বিবাহ হইয়াছিল। অভীষ্ট পথে যাইতে এই বন্ধন কিছুমাত্র অন্তরায় ঘটাইতে পারে নাই। সূর্য্যকুমারের পিতা ভক্ত মধুসূদন ভারতের তীর্থ ভ্রমণে পরলোকে তখন বহির্গত। সেই অবস্থাতেও বাঙালী যুবক সূর্য্যকুমার গৃহ-সংসারের মায়ায় আবদ্ধ রহিতে চাহে না। যে জীবন-পথ অবলম্বন তিনি করিতে যাইতেছেন, তাহার সঙ্গে পরে বিশদ জানিয়াও তিনি তাহাই করিতে অগ্রসর হইলেন। সূর্য্যকুমারের 'তাগেদা' বুঝিতে হইলে সূর্য্যকুমারকে বোঝার প্রয়োজন আছে। তাহাতে সুবিধা করাইতেই তাহার সম্বন্ধে এই সকল কথা বলা।

সূর্য্যকুমারের ডায়েরীর একস্থলে প্রকাশ, 'ফায়ার কুইন'-এ উঠিবার পূর্ব্বে পিতৃতুল্য জ্ঞাতি সম্পর্কের প্রসন্নকুমার ও সংস্কৃতের-সখা পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পদধূলি লইবার সময়ে জ্যেষ্ঠের প্রশান্ত মূর্ত্তি ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাব-বিহ্বলতা সূর্য্যকুমারের প্রাণে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। তাহা লক্ষ্য করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় সূর্য্যকুমারকে আলিঙ্গন করিয়া বলেন—

"তোমার যাত্রা শুভ হবে জল-যাত্রায় পরিণত হবে প্রাণ আমার ব'লছে"।

প্রসন্নকুমার সূর্য্যকুমারকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কুলবিগ্রহ ৺নীলমাধব ও কুলদেবতা শ্রীশ্রীরাধাকান্ত জীউর প্রসাদী ফুল তাঁহাকে অর্পণ করিল, সূর্য্যকুমার তাহা ভক্তিভরে মাথায় ছোঁয়াইয়া সযত্নে রাখিয়া দিলেন। সার হিউগ্ টুইন্‌ সূর্য্যকুমারের সংবর্দ্ধনা কালে তাঁহার "mild appearances covered the spirit of an ardent Mutiny veteran" বলিয়াছিলেন। সে স্পিরিটের অস্তিত্ব মিটটির মধ্যেও ছিল—প্রমাণ, দ্বিতীয় ব্রহ্মযুদ্ধে যোগদানে তাঁহার কর্ত্তব্যবোধ ও সেই অভিযানে পদে পদে তাঁহার অসমসাহসিকতা ও অসাধারণ কর্ত্তব্য-নিষ্ঠার পরিচয় প্রদানে। ইহার উপরে স্বকর্ম্মে তাঁহার ভক্তিপ্রবণতার দৃষ্টান্তে সূর্য্যকুমার-চরিত্রের আর এক দিক্ উদ্ভাসিত হইয়া যায়। কঠোরে-কোমলে ইহা এক অপূর্ব্ব রূপ।

দ্বিতীয় ব্রহ্মযুদ্ধ অবসানে কলিকাতায় ফিরিয়া সূর্য্যকুমার যখন গাজীপুরের সরকারী-চিকিৎসকের পদ গ্রহণ করিলেন, তখন সিপাহী-যুদ্ধ হইবার সম্ভাবনার কথা কোথাও শুনা যায় নাই। যদুনাথ তখনও তীর্থে—কবে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবেন কোনও স্থিরতা নাই। সূর্য্যকুমারও দেশ ছাড়িয়া আবার বিদেশে চলিলেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ভারতের নানাস্থানে রণদামামা বাজিয়া উঠিয়া সমরানল যখন প্রজ্বলিত হইল, সূর্য্যকুমার ও যদুনাথ বিভিন্ন স্থানে থাকিয়া সংহার-লীলার গতি স্বচক্ষে দেখিলেন। কি ভাবে সূর্য্যকুমার রণক্ষেত্রে উপস্থিত থাকেন, তাহার আভাস স্যর রিভার্স টমসনের সূর্য্যকুমারের প্রতি অভ্যর্থনা-বাণীতে সকলেই পাইবেন। যদুনাথ তখন তীর্থ করিতে করিতে কাশীধামে উপস্থিত। অসির ঝনঝনা, কামানের গর্জ্জন তখন জল, স্থল, ব্যোম কাঁপাইয়া দিয়াছে। সকল দিকের পথ রুদ্ধ—স্বদেশে ফিরিবার উপায় নাই। স্বদেশ ত' দূরের কথা, নিকটে গাজীপুরে পুত্রের কাছে যাইবার উপায় তিনি করিতে পারিলেন না। চারিদিকে সশস্ত্র সৈন্য সজ্জিত—সকলের গতিবিধি নিরীক্ষণে তাহারা সদাজাগ্রত। কাহারও সম্বন্ধে সন্দেহের ছায়াপাত হইলে, তাহার আর তাহাদের হস্তে নিস্তার নাই—আশু মৃত্যু অনিবার্য্য। "সিপাহী-যুদ্ধের নূতন কথা" বলিবার কালে যুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী যদুনাথের দিনলিপি হইতেও অনেক কথা বলিবার প্রয়োজন হইবে।

ডাক্তার সর্ব্বাধিকারী গাজীপুরে পৌঁছাইয়া প্রথমে অসামরিক চিকিৎসা বিভাগেরই ভারপ্রাপ্ত হন। সেই সময়ে ইণ্ডিয়ান্ সিভিল সার্ভিসের মিষ্টার ষ্টুয়ার্ট বেলি, (পরে স্যর ও বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা) ইণ্ডিয়ান্ মেডিক্যাল সার্ভিসের ডাক্তার পামার (পরে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের সর্ব্বেসর্ব্বা চিকিৎসক) প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য শ্বেতাঙ্গ সেখানে সরকারী কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। সূর্য্যকুমারের চিকিৎসা-নৈপুণ্য, স্বাভাবিক অমায়িকতা ও আত্ম-সম্মানজ্ঞানের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাইয়া সরকারের উচ্চপদস্থ শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারী ও বণিক্‌সম্প্রদায়ের অনেকে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন। নিকট পরিচয়ে, ডাক্তার সর্ব্বাধিকারীর প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধা বাড়িয়াই যায়। তাঁহাদের মধ্যে দুইজন মিঃ বেলি ও ডাঃ পামার, সূর্য্যকুমারের সহিত অকৃত্রিম বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হন। এ বন্ধুত্ব তাঁহাদের থাকে আজীবন। বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা হইয়াও স্যর ষ্টুয়ার্ট অপরাহ্ণে প্রাতর্ভ্রমণে বহির্গত হইয়া প্রায়ই ডাঃ সর্ব্বাধিকারীর সহিত দেখা করিতেন; ডাঃ সর্ব্বাধিকারীর ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটের বাটী একবার 'ঘুরিয়া যাওয়া' তাঁহার অভ্যাসের মধ্যে হইয়াছিল। ভারতবর্ষ হইতে বিদায়-গ্রহণ কালে ডাঃ পামার সূর্য্যকুমারকে যে কত স্মৃতি-উপহার দিয়া যান তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহাঁদের সম্বন্ধে অনেক কথা পরে বলিবার প্রয়োজন হইবে।

গাজীপুর অঞ্চলের সামরিক বিভাগের অধ্যক্ষ জেনারল নীলও সূর্য্যকুমারের পূর্ব্ব-পরিচিত। 'ফায়ার কুইন'-এ তাঁহার সহিত একযোগে তিনি কর্ম্মে নিযুক্ত থাকেন। সূর্য্যকুমারের সদ্‌গুণাবলীর কথা নীলের পূর্ব্ব হইতেই জানা ছিল। গাজীপুরে সূর্য্যকুমারকে আবার পাইয়া তিনি তাঁহার সাদর অভ্যর্থনা করেন। অসামরিক বিভাগের চিকিৎসক সূর্য্যকুমারকে সামরিক বিভাগের অধ্যক্ষ নীল ইহার পরে প্রয়োজন হইলেই নিজের চিকিৎসার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। চিকিৎসক রূপে গাজীপুরের জনসাধারণের নিকট তাঁহার প্রতিষ্ঠা লাভ, তাঁহার গাজীপুরে আসার অল্পকালের মধ্যেই হইয়াছিল। জেনারল নীলের চিকিৎসার জন্য আহূত ডাক্তার সূর্য্যকুমারের প্রতি সাধারণ সৈনিক দলেরও পক্ষপাতিত্ব এইবার দেখা যায়। শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ উভয় সৈনিকই তাহাদের পীড়াকালে সূর্য্যকুমারের শরণাপন্ন হইত। বাঙ্গালী চিকিৎসকের

এই অপূর্ব্ব জনপ্রিয়তার জন্য কোম্পানী বাহাদুর তাঁহাকে সিভিল ও মিলিটারী উভয় পদেই নিযুক্ত করিলেন।

দেশীয় সিপাহীরা তাহাদের অনেকের প্রাণদাতা ডাক্তার সূর্য্যকুমারকে ভক্তি করিত দেবতার মত। 'ডাক্তার সাহেব'-এর জন্য তাহারা প্রাণ দিতেও প্রস্তুত। এমন কার্য্য ছিল না, যাহা তাহারা তাঁহার অনুজ্ঞায় করিতে পশ্চাৎপদ। একবার ডাক্তার সূর্য্যকুমার কর্ত্তৃক প্রদত্ত একটা ময়না রিপোর্ট স্থানীয় কোনও ধনীর দুলালের বিপক্ষে যাওয়ায় সম্ভাবনায় ষড়্‌যন্ত্রকারীদিগের গোপন উদ্যোগে ডাক্তার সর্ব্বাধিকারীর প্রাণহানির চেষ্টা হয়। দৈনিক সম্প্রদায় তাহা জানিতে পারিয়া, দুষ্টকে দণ্ডদানে চঞ্চলতা প্রকাশ করিলে, ডাঃ সর্ব্বাধিকারী মিষ্ট বচনে তাহাদিগকে সে কার্য্য হইতে নিরস্ত করেন। তাহারা কিন্তু তাহাদের গণনায় বিপদ-কাল উত্তীর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত, উপরিওয়ালার হুকুম লইয়া পালা করিয়া তাঁহার শরীর-রক্ষীর কার্য্যে নিযুক্ত থাকে।

কি গুণে যে ডাক্তার সর্ব্বাধিকারী তাহাদিগকে এমন ভাবে বাঁধিয়াছিলেন তাহা তাহারা ত' জানিতই, অপর পাঁচজনেও যে না জানিত তাহা নহে। অপরের হৃদয় জয় করিয়া লইতে, পরকে আপন করিতে, যে সকল উপকরণাদির প্রয়োজন, সূর্য্যকুমারের তাহার কিছুরই অপ্রতুল ছিল না। অভুক্তকে তিনি খাওয়াইতেন নিজের অন্ন দিয়া, নিজে না খাইয়া। মারীভয়ের সময়ে আপনার জন যখন রোগীকে ফেলিয়া পলাইয়াছে, তখন সূর্য্যকুমার তাহাকে কোলে তুলিয়া তাহার চিকিৎসাকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। দুর্ভিক্ষ-পীড়িতের সাহায্যদান-কার্য্যে দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি তিনি নিজের আহার-নিদ্রার কথা পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছেন। এ সকল তাহাদের চোখে দেখা। এমন গুণবানের, এমন সদাশয়ের বন্ধুতা স্বীকার মানুষের কথা দূরে যাউক, পশু-পক্ষীও করিবে।

বর্ত্তমান যুগের পাঠক-পাঠিকার নিকটে সূর্য্যকুমার সম্পূর্ণ বিস্মৃত—অপরিচিত—ইহা লজ্জার বিষয় হইলেও সত্য। অন্য দেশে এ ব্যাপার অভাবনীয় হইলেও আমাদের দেশে নিত্য ঘটনা। বাঙালা যাঁহাদের দ্বারা গঠিত সূর্য্যকুমার তাঁহাদের মধ্যে একজন প্রধান। এ সকল কথা পাঠক-পাঠিকার জানা উচিত—তাহাতে তাঁহার দৈনন্দিন লিপি পাঠে তাঁহাদের সুবিধা হইবে। তখনকার গাজীপুরের কথাও এই সূত্রে কিছু বলা দরকার। সূর্য্যকুমারের পিতা ভক্ত যদুনাথ 'তীর্থভ্রমণে' গাজীপুরের বিশদ বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা হইতে অংশবিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

"গাজীপুরের পূর্ব্বনাম গাধীপুর। এই স্থানে গাধীরাজার বাটী-কেল্লা আছে। ইহাকে কোট কহে। এই স্থানে ডাক্তারখানা, ডিস্‌পেন্‌সারী···অতি উচ্চ-স্থান···উপর হইতে তাবৎ সহর দেখা যায়। ইহার অধিক উচ্চস্থান সহরের মধ্যে আর নাই।···কোটের নীচে মহাজনদের গুদাম আছে···তিসি, সোরা এবং চিনির কুঠী আছে। কলিকাতার অনেক হৌসের গোমস্তাগণ কুঠী করিয়া গ্রাম গ্রাম হইতে মাল আমদানি করিয়া কলিকাতায় চালান করে।

"গাজীপুরের পশ্চিম দীমান্তে ছাউনি, পূর্ব্বদিকে সহর। সহর মধ্যে কোতোয়ালি (ও) গোলাগঞ্জ, গঙ্গাতীরে সহর বাজার। ইহা ভিন্ন সকল মহল্লাতে বাজার আছে। ছাউনীতে গোরাবারিক ছিল। প্যারেডের মাঠ ইহার নিকট। গঙ্গাতীরে লর্ড কর্ণওয়ালিশের টুম্ব অর্থাৎ গোর-স্থান। এই টুম্ব প্রস্তরে অতি সুনির্ম্মিত। টুম্ব-হলের যেমত থাম নির্ম্মিত, সেই মত বার থামে চাঁদনী। তাহার ভিতরে ঘর আছে। ঐ ঘর মধ্যে গোর, মর্ম্মর মেজে বাঁধা। উপরে শ্বেতপ্রস্তরের গোর, তাহার উপর উত্তম-সুনির্ম্মিত শ্বেতপ্রস্তরের এক ব্রাহ্মণ, এক মৌলবী পূর্ব্ব-দিকে, এক গোরা, এক সিপাহী পশ্চিম দিকে।...টুম্ব তৈয়ারীতে লক্ষ টাকা ব্যয় হয়, রেল গেট বাগিচা তৈয়ার করাইতে লক্ষ টাকা, সর্ব্বশুদ্ধ দুই লক্ষ টাকা খরচ হয়।··· ইহার পশ্চিম এবং উত্তর দিকে ঘোড়ার আস্তাবল। এই খানে তুরুক-সওয়ারের ঘোড়া তৈয়ার হয়।···একণে হাজার ঘোড়া আস্তাবলে আছে।···

"মৌবাগে আফিঙের কুঠী, এই কুঠীতে সবলক টাকার মাল মজুত আছে, দুই সাত ক্রোর টাকার আফিঙ মজুত আছে।···গোরাগণ আফিঙের কুঠীতে চৌকী থাকে···

কুঠী বেষ্টিত করিয়া রেখা হইয়াছে।··· গাজীপুরের আফিংয়ের কুঠীর তুল্য কুঠী কোথাও নাই।···

"ওজ, কালেক্টর ম্যাজিষ্টর, ডেপুটী, সদর আমিন, সদরআলা ও মুন্সেফের কাছারি আছে। পোষ্টাফিস গোরাবাজারের নহে।···গাজীপুরে সর্ব্বজাতিতে ৬৪ ঘর বাঙ্গালী আছে।···"

সিপাহী যুদ্ধকালে গাজীপুরের আফিংয়ের কুঠীর উপর কোম্পানীর শত্রুদিগের লোলুপ দৃষ্টি ছিল। 'মবলক' টাকার লাল সর্ব্বদা সে স্থানে মজুত। ইহা ব্যতীত বিশ্ব-বিশ্রুত গোলাপের বাগান। যদুনাথের বর্ণনায়—

"আতর-গোলাপ গাজীপুরে যেমত জন্মে এমত কোথাও জন্মে না। গোলাপের বাগান (অসংখ্য) দশ হাজার বিঘাতে গোলাপ হইতেছে।···ইস্তক চারি আনা নাগাইদ ৮০৲ টাকা পর্য্যন্ত আতরের ভরি। গোলাপের আট টাকা পর্য্যন্ত বোতল বিক্রয় হয়।"

কুটীর শিল্পেরও অভাব নাই, যথা—

"চুড়ি উত্তম হয়, কাঁচের চুড়িতে পুথির এবং গন্ধকর কাজ, ছয় টাকা পর্য্যন্ত দামে বিক্রয় হইতেছে। সকল রকম কাপড় তৈয়ার হয়। মৌবর কাপড় অতি উত্তম।"

যুদ্ধ-বিগ্রহের সময়ে কোম্পানীর এ হেন গাজীপুরের উপর শত্রুর নজর না পড়াই আশ্চর্য্য ; সিপাহী-যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পরে চতুর্দ্দিক হইতে নৃশংস ঘটনার সংবাদ নিত্য পৌঁছাইলেও কর্ত্তৃপক্ষ গাজীপুরের সিপাহীদিগের ব্যবহারে বিশেষ সন্তুষ্ট থাকেন—তাহাদের চালচলনে অস্বাভাবিকতার লেশমাত্র না থাকায়। এ সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনাকালে এই কারণে কর্ত্তৃপক্ষের কেহ কেহ এমন কথাও বলেন—

"গাজীপুরে যুদ্ধাগ্নি প্রজ্বলিত হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই।"

এই কথা লিখিয়া সূর্য্যকুমার দিনলিপিতে বলিতেছেন—

"তথাপি কোম্পানী বাহাদুর বিশেষ ব্যবস্থা করেন—সাহিবের লোকজনের সহিত গাজীপুরের সিপাহীদিগের মেলামেশার দিকে প্রখর দৃষ্টি রাখিবার।"

সূর্য্যকুমার জানাইতেছেন—

"স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমিও সিপাহীদিগের সহিত মেলামেশা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক অধিক করিতে আরম্ভ করি। আমার মনে হয়, কর্ত্তৃপক্ষের সিপাহী-দিগের সম্বন্ধে ধারণা সত্য হইলেও দুই লোকে যদি কখনও মন বিগড়াইয়া দেয়, তাহা হইলে আমাদের সকলেরই সমূহ বিপদ। সে বিপদের আভাষ পূর্ব্বাহ্নে পাইলেও কতকটা রক্ষা। সিপাহীরা আমাকে ভালবাসে, ভক্তি করে সুতরাং আমার উপর তাহাদের অল্প স্বল্প বিশ্বাস আছে ধরিয়া লওয়া যায়। সেই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তাহাদের মঙ্গলার্থে এবং নিজেদের মঙ্গলার্থে তাহাদের সারিধ্য রক্ষা করিয়া যথাসাধ্য চলিতে আরম্ভ আমি করি। আশা, ইহাতে কর্ত্তব্যপালন করাও হইবে এবং সিপাহীদের ভিতর-কার কথা হয় ত' জানিতে পারাও যাইবে।"

ইহার পরে দিনলিপিতে লিখিত আছে—

"সিপাহীদিগের সহিত মেলামেশা করিয়া তাহা-দের পূর্ব্বভাবের অভাব প্রথম প্রথম আমি কিছুই দেখিতে পাই নাই। বেশ সহজ ভাবেই দিন যাপন করিতে তাহারা থাকে। এমন কি, কথাপ্রসঙ্গে—'নেমক' তাহারা রাখিতে জানে এ কথাও তাহাদের কেহ কেহ গর্ব্বভরে বলে।"

সিপাহীদিগের সেই কথায় ও তদুপযোগী ব্যবহারে সূর্য্যকুমার ও তাঁহার সহযোগীদিগের তখনকার মনের অবস্থা প্রকাশ পায়, তাঁহার দিনলিপির এই কয়টী কথায়—

"সেই ভীষণ দুর্দ্দিনে সিপাহীদিগের আশ্বাস-বাণীতে আরামের নিশ্বাস ফেলিবার সুযোগ আমরা পাইয়াছি।

উত্তেজনা-আতঙ্ক

তীর্থভ্রমণ ব্যপদেশে যদুনাথ যখন কাশীধামে, সেই সময়ে সেখানে গ্রীষ্মাধিক্য হেতু মারীভয় প্রবল হয়। সংবাদ পাইয়া সূর্য্যকুমার পিতাকে গাজীপুরে চলিয়া আসিবার জন্য ডাকযোগে পত্র লিখেন এবং কথা থাকে, তিনি গাজীপুরে পৌঁছাইলে পিতা-পুত্রে স্বদেশাভিমুখে

যাত্রা করিবেন। পুত্রের ইচ্ছামত পিতা যাত্রার আয়োজন করিতেছেন, সংবাদ আসিল—সিপাহী বিদ্রোহ আরম্ভ হইয়াছে। যদুনাথের 'রোজনামচায়' (৩০শে বৈশাখ, ১২৬৪, ইং ১১ই মে ১৮৫৭) পাওয়া যায়—

"দিল্লীর ছাউনীতে যে সৈন্যগণ ছিল, ইহারা মতান্তর হইয়া ষ্টেশনের রাজপুরুষগণকে হত করিয়া দিল্লীশ্বরের ব্যূহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দিল্লীশ্বরকে সাহায্য অস্ত করে।"

এই কারণে কলিকাতা বা অন্যত্র গমনাগমনের পথ রুদ্ধ হইয়া যায়।

সূর্য্যকুমারের দিনলিপিতে প্রকাশ—

"বাবাকে চিঠি লিখিবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমার ছুটী বাতিল হইয়া যাইবার হুকুম উপরিওয়ালার নিকট হইতে আমি পাই। ইহাতে বিশেষ ক্ষুব্ধ আমি হই এবং চাকুরীতে ইস্তফা দিবার সঙ্কল্প করিয়া মিঃ বেলি ও ডাঃ পামারের সহিত আমি দেখা করিতে যাই। সাক্ষাৎকালে তাঁহারা আমাকে ভিতরকার কথা বলেন। তাঁহাদের কথা শুনিয়া পিতার সম্বন্ধে আমার ভাবনার সীমা থাকে না। তাঁহাকে এখানে আনাইবার উপায় নির্দ্ধারণে বন্ধুদ্বয়ের সহিত পরামর্শ করিলে, তাঁহারা বলেন, 'এখনই আনাইতে পারেন ত' দেখুন'। আনাইবার আয়োজন করিতে করিতে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। বিপদকালে পিতা-পুত্র একস্থানে থাকার উপায় আর রহিল না।"

'আগুন জ্বলিয়া উঠা'র সংবাদ প্রচারিত হইতে বিলম্ব হইল না। কর্ত্তৃপক্ষ সংবাদটা যতক্ষণ সম্ভব, সাধারণের নিকট হইতে গোপন রাখিবার চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। সংবাদপত্রের বাড়াবাড়ি তখন ছিল না। সূর্য্যকুমার এই প্রসঙ্গে দিনলিপিতে বলিতেছেন—

"এক আধখানা সংবাদপত্রের চলন যাহা ছিল এবং যাহা বাহির হইতে আসিত তাহা যথেষ্ট দেরী করিয়া বিলি করিবার ব্যবস্থা করা হয়। সাধারণের পত্রাদির উপর নজর রাখা হয় খুবই। লোক গমনাগমনের উপর প্রখর দৃষ্টি থাকে। তথাপি খবর 'ফাঁস' হইতে বিলম্ব হইল না।"

গাজীপুরে অবস্থিত সিপাহীদিগের সম্বন্ধে উপরে যাহা উক্ত হইয়াছে তাহা 'খবর ফাঁস' হইবার পরের কথা। কোম্পানীর পক্ষে সাবধানতা অবলম্বনের পরেও, অত শীঘ্র খবর ফাঁস হইবার কারণ সূর্য্যকুমার বলিতেছেন—

"বিদ্রোহী-দলভুক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের, গাজীপুরে বা গাজীপুরের সন্নিকটে লুক্কায়িত অবস্থায় থাকা।"

স্থানীয় সিপাহীদের সম্বন্ধে কোম্পানী বাহাদুরের ধারণা ভাল থাকিলেও যাহাতে কোনও প্রকারে তাহারা কু-চক্রীদের খপ্পরে না পড়ে, সে সম্বন্ধে যে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বিত হয়, তাহার আভাস পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে।

সিপাহীরাও কোম্পানীর সম্বন্ধে তখন বিরুদ্ধভাব পোষণ না করিলেও বিদ্রোহী যাহারা, তাহাদের জন্য মনে মনে শুভকামনা করা তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক—জাত ভাই যে! আপনার জনের প্রতি 'টান' দেশীয়দিগের তখনও ছিল খুবই।

সূর্য্যকুমারের দিনলিপিতে প্রকাশ—

"এ টানের মূল খুঁজিলে দেশের ধর্ম্ম ও সমাজ-বন্ধনই দেখিতে পাওয়া যাইবে।"

তাঁহার মতে—

"কোম্পানীর এদেশে আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে দেশীয়ের অনেকের মধ্যে চাকুরী ও অর্থের লোভ, ধর্ম্ম ও সমাজের মূল আল্গা করিয়া দিবার উপক্রম করে—কোথাও কোথাও দেয়ও।"

তিনি লিখিতেছেন—

"ইহার ফলে তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধে পরশ্রীকাতরতা এমন কি নীচ চক্রান্তের অবধি থাকে না।"

দেশের এই অবস্থা বিশদভাবে যে স্থানে তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার এক স্থানের লিখিত অংশ এই—

"বঙ্গদেশেও ইংরাজ-ঘেঁসাদের মধ্যে দুইটি দল হয়—বনিয়াদী ও দুঁইকোঁড়। কোম্পানী বাহাদুর 'পৌরীসেন' হইয়া বসার দরুণ আপাতঃ অঙ্গল হইবার সুবিধা হয়। কোম্পানীর উদ্দেশ্য যেন তেন প্রকারে

কার্য্যোদ্ধার করা—মুড়ী-মুড়কীর পার্থক্য বুঝিয়া দেখার প্রয়োজন বা সময় তাহার নাই। সুতরাং সে 'নাভারনে' আসিল সেই 'কীর্ত্তনে' বনিয়া গেল। ও-দিকে বনিয়াদী যাহারা, তুচ্ছ কাঞ্চনের লোভ তাহাদের নাই। কোম্পানী বাহাদুর যাচিয়া যাচিয়া তাহাদিগকে সমাদর করিয়াছেন, বন্ধুত্ব ভিক্ষা করিয়াছেন। সেই সমাদরের প্রতিদানস্বরূপ কোম্পানীর যথার্থ বন্ধু, হিতৈষী হইয়া, নানাভাবে সাহায্য করিতে ইতস্ততঃ তাঁহারা কখনও করেন নাই।"

শেষোক্ত দল সম্বন্ধে সূর্য্যকুমারের অভিজ্ঞতা—

"তাঁহারা তেজস্বী ও স্পষ্টবক্তা। কোম্পানী বাহাদুরের কল্যাণ সাধনই তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্যে স্পষ্ট কথা বলিয়া বন্ধুত্ব বিগড়াইয়া যাইবার ভয়ও তাঁহারা রাখেন নাই। নূতন স্থানে নূতন জনের কাছে খুঁটি শীঘ্র গাড়িয়া বসিবার আগ্রহে খাঁটি লোকের খাঁটি কথা অনেক সময়ে কাজে লাগান হয় নাই। সেই সুযোগে স্বার্থপর বনিয়াদীদের মধ্যেও কেহ কেহ মনরাখা কথা কহিয়া, কর্তৃপক্ষের কাছে দিন কিনিয়া লইবার সুযোগ করিয়া লইয়াছে। ভুঁইফোঁড়দের লইয়া দলে তাহারা ভারীও হইয়াছে। এই 'জনমত'-এর দোহাই দিয়া কাজ চালাইয়া যাওয়া এবং কাজ করা সহজসাধ্য হইলেও তার একটা প্রতিক্রিয়া আছে। তাহার ফল সময়ে সময়ে ভীষণ হইয়া পড়ে। হাল্কা 'জনমত' অনুসরণ বঙ্গদেশের ন্যায়, কোম্পানীর দখলে অন্যান্য স্থানেও হয়ত' হইয়াছে। কোম্পানীর বিরুদ্ধে সিপাহীর এই বিরুদ্ধতার কারণ খুঁজিলে হাল্কাভাবের প্রশ্রয়দান, একটি বিশিষ্ট কারণে বহুদর্শী কেহ কেহ বলিতেছেন। সুখের বিষয়, গাজীপুরের কর্তৃপক্ষ ও দেশীয় যথার্থ লোকমান্যদের মধ্যে ভাবের আন্তরিকতা খুবই সুদৃঢ় দেখা গিয়াছে।"

ইহার পরে সূর্য্যকুমার লিখিয়াছেন—

"সে যাহা হউক সিপাহী-যুদ্ধের সময়ে কোনও বাঙ্গালীর কোনও প্রকার সাহায্য সিপাহীরা পাইয়াছে বলিবার উপায় কাহারও নাই। সাধ্যের অতিরিক্ত করিয়া বাঙ্গালী সে সময়ে কোম্পানীকে সর্ব্বত্র সর্ব্ব-বিষয়ে সাহায্যদানে অকুতোভয়ে অগ্রসর হইয়াছে।"

সেই সময়ে গাজীপুরে এবং অন্যান্য রণক্ষেত্রে অবস্থান হেতু ডাঃ সূর্য্যকুমার বঙ্গদেশের তৎকালীন অবস্থা প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ অবশ্য পান নাই। তাঁহার দিনলিপিতে এ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ স্বদেশের বিশিষ্ট আত্মীয়-বন্ধুর সংবাদ দানের উপরই লিখিত। ইহার মূল্য সুতরাং যথেষ্ট। সরকারী দলিল দস্তাবেজেও অশান্তি-কালে, বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে একটি কথা দেখিতে পাওয়া যায় না। অপর পক্ষে পাওয়া যায়, বঙ্গদেশের ভূস্বামী ও জমিদার এবং জনসাধারণের কোম্পানীকে অবিচলিত হৃদয়ে নানা প্রকারে সাহায্যদানের কথা।

হিন্দু ও মুসলমানের ধর্ম্মনাশের ছুতা সমরানল প্রজ্বলিত হইবার প্রত্যক্ষ কারণ। কোম্পানীর রাজ্যনাশের ষড়্‌যন্ত্রে নিযুক্ত চক্রীরা ধর্ম্মপ্রাণ সরল ব্যক্তিবর্গকে নাচাইয়া আগুন জ্বালাইয়া দেয়। কোম্পানীর শত চেষ্টাতেও তাহা নিবারণ করা সম্ভবপর হয় নাই। যদুনাথ 'তীর্থ-ভ্রমণে' লিখিয়াছেন—

"স্ততিবাক্যে রাজপুরুষদিগের সত্য বিবৃতি—টোটার বিষয়ে যে আমাদিগকে দোষী করিয়া কহিতেছ যে, তোমাদের ধর্ম্ম নষ্ট করিতেছি, ইহাতে ধর্ম্ম-নষ্টের দ্রব্য কিছু নাই। ইহাতেও যদি তোমাদের বিশ্বাস না হয়, তবে এ টোটা তোমাদের ব্যবহার করিতে হইবে না"।

কোথাও কোথাও এ 'স্তুতি' অল্পক্ষণের জন্য গ্রাহ্য হইলেও সে ভাব অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় নাই। বিষ ধরিয়াছিল এমন যে, তাহা হইতে আপনাদিগকে মুক্ত করিতে পারে নাই প্রায় কেহই। পারিবে কেমন করিয়া? তীব্র ধর্ম্মোন্মাদনার মুখে এমনই হয়। তাহার উপর 'বিশ্বাসী'রা 'অশিক্ষিত' অর্থাৎ ইংরাজী লিখন-পঠনে অনভিজ্ঞ। সে অবস্থায় রজ্জুতে সর্প দেখান, মতলববাজদের পক্ষে খুবই সহজ।

ডাঃ সূর্য্যকুমার তাই লিখিয়াছেন—

"রব উঠিল চোট্টা চর্ব্বিসংযুক্ত; অমনি চারিদিকে পড়িয়া গেল মার, মার, কাট, কাট…"

সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের তাই ভাবনা হয়—

"এই অবস্থায় গাজীপুরের অবস্থা সঙ্গীন হইতে কতক্ষণ!"

গাজীপুরের সিপাহীদের বিশ্বস্ততা, তাহাদের সহিত তাঁহার গভীর অন্তরঙ্গতা সত্ত্বেও ভাবনার হস্ত হইতে সূর্য্যকুমার মুক্তি পান নাই। আফিসের কুঠী প্রভৃতিতে শান্তিকালে প্রহরীর ব্যবস্থা যে ভাবে থাকে, তাহার অধিক ব্যবস্থা তখনও করা হয় নাই। গড়, ডিস্‌পেন্‌সারী প্রভৃতি একেবারে অরক্ষিত। দিল্লীর ঘটনা ঘটিবা মাত্র সোরগোল করিয়া ব্যবস্থার আধিক্য যদি করা যায়, প্রকারান্তরে সাধারণের প্রাণে ভীতি জন্মাইবার এবং যুদ্ধের কুচক্র সাধনে সহায়তা করা হইবে। এ সকল কথা সূর্য্যকুমারের মনে হইলেও বিলম্বে অনিষ্ট সংঘটনের সম্ভাবনাতেও তিনি আতঙ্কিত হইলেন। স্থানীয় বিশিষ্ট রাজকর্ম্মচারীদের প্রায় সকলের সহিত তাঁহার বিশেষ জানা শুনা থাকায়, তিনি তাহাদের কাছে এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন।

সূর্য্যকুমার দিনলিপিতে লিখিয়াছেন—

"আশ্বাসবাক্যে তাঁহারা আমাকে নিরস্ত করিলেন"।

৬ঃ সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারীর দিন-লিপি হইতে।

ফিরে আয়

—শ্রীগুরুপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

লীলা-চঞ্চল বসনাঞ্চল ভূমিলুণ্ঠিত নদীর তীরে,
তন্বী তরুণী তরলিকা চলে নৃত্য-অধীরা পথের পরে;
মত্তমদির বিলাস-বাসনা কজ্জল-কালো চোখে জাগে,
আধুনিকা অতি, বাধাহীন গতি, নবপ্রগতির অনুরাগে।

নটীর নাট্যভঙ্গিতে গাহে সঙ্গীত শত সুরবাহার,
যুবজন-মন-ভৃঙ্গ বিভোর, বেতুল হেরিয়া রূপ তাহার;
নগ্ন পিঠের পরে খোলা বেণী, কণিসম তারে ঠাঁই খোঁজে,
হেরি অপরূপ নবীনার রূপ, মহানারী লাজে চোখ বোজে।

রঙে রাঙা মুখ, আধখোলা বুক, নিত্য নূতন অঙ্গসাজ
রঙিন কাচের পেয়ালার প্রায় নারীরা নরের পণ্য আজ;
গণিকার পেলে প্রসাদকণিকা, লাস্যকলার হর্ষটুক্,
নারীজীবনের জয় মানি মনে, ভরে ওঠে মদগর্ব্বে বুক।

নর্ম্মলীলার রঙ্গ-তামাসার মায়ামৃগী চোখে দেয় ধাঁধা,
চির-চঞ্চলা চপলা যে তারে বাহুতে কি কভু যায় বাঁধা?
প্রকৃতি কাঁদিছে, নিভৃত মর্ম্মে পরশ-পাথর ছোঁয়াবে কে?
নরবিলাসিনী রমণীর মাঝে শক্তিরূপিণী লুকায়ে যে।

সীতা সাবিত্রী মহাসতী কই, গান্ধারী শত পুত্রবতী,
বীরের জননী বীরজায়া জনা, মহীয়সী নারী অরুন্ধতী,
দশুরথী যে বাজায় শঙ্খ, উত্তরা কোথা নিরুত্তরে?
সন্তান ডাকে সিংহবাহিনি, আয় গো জননি ফিরিয়া ঘরে।

একটি মিথ্যা কথা

—ফজলুল করিম

'ওস্তাদজী, আমার হাতখানা দেখিয়া দিন।'

বন্ধু-মহলে মিঃ খুরসিদ ওস্তাদজী নামে পরিচিত ছিলেন। গান-বাজনা, তাস-খেলা, হাত-দেখা, মাদুধরা, ওস্তাদজীর অজানা কোন বিদ্যা ছিল না। বিশেষতঃ, আমার মত রাসভ-কণ্ঠ লোককে দিয়া যিনি গান গাওয়াইতে পারেন, তিনি যে ওস্তাদ সে বিষয়ে সন্দেহ কি?

ওস্তাদজী তাঁর ছাগল-দাড়ীতে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন, 'হাত-দেখা, সে অভ্যাস যে বহুদিন পরিত্যাগ করিয়াছি।'

অবাক হইয়া কহিলাম, 'সে কি কথা! অত লাভের একটা ব্যবসা; বিনা মূলধনে শতকরা একশ' একটাকা লাভ। আর তাই কি না ছাড়িয়া দিলেন।'

ওস্তাদজীর নিয়ম ছিল, কেহ হাত দেখাইতে আসিলে পূর্বে সওয়া পাঁচআনা পয়সা ফেলিতে হইবে; সেই পয়সায় খাবার আনাইয়া বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে করিয়া জলযোগ করিতেন। প্রকৃতই ওস্তাদজী যে কতটা হাত দেখিতে জানিতেন বলিতে পারি না। তিনি নিজে বলিতেন, কতকটা শাস্ত্রজ্ঞান ও কতকটা ভূয়োদর্শন। তিনি নিজে যাই বলুন, এমন দিন ছিল না, যে-দিন অফিসের পাঁচশত কেরাণীর মধ্যে একজন না একজন তাঁহার কাছে হাত দেখাইতে আসিতেন। ফলে অফিসে জল খাওয়া বাবদ তাঁর নিজের তো প্রায় কোন খরচ হইতই না, তাঁর বন্ধু-বান্ধবদেরও বেশ দু'পয়সা বাঁচিয়া যাইত।

'দাগত্রের, বহু দুঃখেই সে বিদ্যা ভুলিয়াছি। সেই বিদ্যার ফলেই একদিন এমন বিপদে পড়িয়াছিলাম যে, সেই দিন হইতেই দিব্য করিয়াছি—জ্যোতিষ-শাস্ত্র আমার মাথায় থাকু। কিন্তু ও-বিদ্যা আর নয়।'

'আশ্চর্য্য! এমন কি গুরুতর বিপদে পড়িয়াছিলেন যে অমন মুনাফার ব্যবসাটা গুটাইতে হইল। প্রাইভেট কিছু কি?'

'না, প্রাইভেট তেমন কিছু নয়।'

'তাহা হইলে ব্যাপারটা শোনাই যাক। তবে ভূমিকা না দিয়া সোজা কথায় ব্যাপারটা বলিয়া ফেলুন।'

দাড়ীটা চুমরাইয়া নিজস্ব বিশিষ্ট-ভঙ্গীতে ওস্তাদজী সুরু করিলেন—

'সেবার চৈত্রমাসে গরমটা একটু বেশীই পড়িয়াছিল। মহামান্য ভারত গবর্ণমেণ্টের বাজেটের ঘাটতির দরুণ আমাদের কনটিন্‌জেন্সী (contingency) ফাণ্ডে তখন টাকার বাহুল্য। ফলে একটা বাজিতে না বাজিতেই পাখা বন্ধ হইয়া যাইত। মেদ-বহুল দেহ লইয়া আমার তখন যে কি অবস্থা, তাহা ডাঙ্গার তোলা মৎস্যই সম্যক্ অনুভব করিতে পারে। কেরাণীদের মাসেরও তখন কৃষ্ণপক্ষ—অর্থাৎ ষোল তারিখ। আমার জলখাবার ফাণ্ডে রৌপ্য-চাকৃতির অভাব। এক গ্লাস তরমুজের সরবতের জন্য প্রাণটা 'খা-খা' করিতেছিল। খোদার মরজী, দেখি এক ছোকরা-কেরাণী—ধরিয়া লও অজিত ঘোষ—ফল ও মিষ্টির এক ভেট লইয়া উপস্থিত। আরজী—তাহার বাড়ী যাইয়া হাত দেখিতে হইবে। দ্বিরুক্তি না করিয়া ফল ও মিষ্টির সদ্ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলাম।

'পরদিন শনিবার। অফিস ফেরত অজিতের বাসায় উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম আমার জন্য প্রচুর আয়োজন করিয়া রাখিয়াছে। যেন আমি তাহাদের গুরু বা পুরোহিত এই ভাবে আমার আদর আপ্যায়ন করিল। আসল কথাটা জলযোগের পর জানিতে পারিলাম। বছর তিনেক হইল সে বিবাহ করিয়াছে। কোন সন্তানাদি হয় নাই। দাম্পত্য-জীবনে সে অসুখী। স্ত্রীর সঙ্গে বনিবনাও হয় না। তার ধারণা তার স্ত্রীর চরিত্র ভাল নহে। সে সম্বন্ধে সে কিছু প্রমাণও পাইয়াছে। তাই আমাকে দিয়া স্ত্রীর হাত দেখাইয়া সে নিশ্চিন্ত হইতে চায়।

'পূর্বে জানিতে পারিলে এরূপ সর্তে হাত দেখিতে আমি কখনই রাজী হইতাম না। হইতে পারে, আমি হাত দেখিতে

জানি। হইতে পারে মেয়েটির চরিত্র প্রকৃতই ভাল নয়। কিন্তু তাই বলিয়া একটী ভদ্রমহিলার চরিত্র খারাপ এ কথাটা আমাকে দিয়াই প্রমাণ করিতে হইবে। অজিতকে কহিলাম —'এ রকম নোংরা কাজ আমি করিতে পারিব না।'

'সে আমার হাতে পায়ে জড়াইয়া ধরিল। কহিল, সন্দেহের আগুনে তাহার দেহ মন জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক হইয়া যাইতেছে। একটা কিছু সঠিক জানিতে না পারিলে সে হয়ত পাগল হইয়া যাইবে। ছেলেটীর বৃদ্ধা মাতাও বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। রাজী হইতে হইল।

'মেয়েটী তখন রান্না ঘরে ছিল। তাহার শাশুড়ী যাইয়া তাহাকে ডাকিল। সে কিছুতেই আসিতে চাহে না। তার স্বামী যাইয়া তাহাকে ডাকিল। সে তবুও আসিবে না। প্রথমে দু' একটা ধমক দিয়াও যখন কোন ফল হইল না, তখন তাহার স্বামী প্রায় জোর করিয়াই তাহাকে লইয়া আসিল। মেয়েটিকে আমার সম্মুখে বসাইয়া তাহার স্বামী তাহার বাঁ হাতখানা বাহির করিয়া ধরিল।

'মেয়েটী যেন ব্যাধভয়ে ভীতা-হরিণীর মত কাঁপিতে লাগিল। আর কি ভীতি-বিহ্বল করুণ মিনতি-মাখা তার চোখ! আমার মনে হইল, মেয়েটির সমস্ত সত্তা যেন তার চোখ দু'টী হইয়া, আমার পায়ে লুটাইয়া এতটুকু দয়া ভিক্ষা করিতে লাগিল।

'মেয়েটীর হাত দেখিলাম।

'তোমরা বিশ্বাস কর বা নাই কর, অতীত আমি প্রায় নির্ভুল ভাবেই বলিয়া দিতে পারি। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমার অবশ্য ততটা দক্ষতা নাই। মেয়েটির হাতে কি দেখিলাম বলিতে পার? কলঙ্কের চিহ্ন এমন স্পষ্টভাবে আর কাহারও হাতে আমি অঙ্কিত দেখি নাই। জ্যোতিষ-শাস্ত্র সম্বন্ধে আমার জীবনব্যাপী জ্ঞান বিপদাপন্ন করিয়াও আমি বলিতে পারি যে, সেদিন মেয়েটীর অতীত আমি নির্ভুল ভাবেই দেখিয়াছিলাম।

'মেয়েটীর মুখের দিকে চাহিলাম। আঠার উনিশ বছর হয়ত তার বয়স হইতে পারে। জীবন-কুসুম সবেমাত্র বিকশিত হইয়াছে। সংসার-পথে সবেমাত্র পা দিয়াছে। কত আশা, কত সম্ভাবনা। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মনে মনে কত কল্পনা-কুসুম রচনা করিয়াছে। হয়ত সমস্তই আমার একটী মাত্র কথার আঘাতে ঝরিয়া পড়িবে।

'কি অপরাধে?

হয়ত তোমার আমার মতই কোন পুরুষ (কাপুরুষ?) অপরিণামদর্শী এক বালিকাকে আপাতমধুর প্রলোভনে ভুলাইয়াছিল। প্রকৃতির ধর্ম্ম বজায় রাখিতে গিয়া সে বৈবাহ মানুষের তৈয়ারী ধর্ম্ম লঙ্ঘন করিয়া ফেলিয়াছিল। দেহের যে দাবী বিবাহের অনুষ্ঠানের মধ্যে মানিয়া চলাই সতীধর্ম্ম, বিবাহ-বন্ধনের বাহিরে সে দাবী স্বীকার করিলেই ঘোরতর অধর্ম্ম। অপরাধ কার? প্রকৃতির না মানুষের গড়া ধর্ম্ম-নীতির, প্রবঞ্চক পুরুষের না অজ্ঞান বালিকার?

'মনে করিও না, আমি বিবাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিতে চাহিতেছি। ছেলে-মেয়ে, স্ত্রী-পরিবার লইয়া বাস করি, কম্যুনিষ্ট হইবার মত দুঃসাহস আমার নাই। কিন্তু এক মুহূর্ত্তের ভুলের জন্যই কি একটা জীবন নষ্ট করিয়া দিতে হইবে। আমার মনশ্চক্ষে ভাসিতে লাগিল, সাবিত্রীরাণী··· প্রভাবতী প্রভৃতি পুরুষ-বিগৃহীতা নারীদের কথা।

'তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। আকাশে তারা ফুটিয়াছে। খোলা জানালার ভিতর দিয়া সন্ধ্যা-তারা জ্বল জ্বল করিতেছিল। আমার বড় মেয়ে ছলেমা তখন বন্ধারে স্বামী-গৃহে। মনে হইল, ছলেমা যেন সন্ধ্যা-তারা হইয়া আমার দিকে চাহিয়া আছে।

'যখন জ্যোতিষ-শাস্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলাম, তখন গুরুর নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, এ শাস্ত্র লইয়া কোন দিন মিথ্যা আচরণ করিব না। সে প্রতিজ্ঞা কেবল সেদিনই ভাঙ্গিয়াছিলাম।

'কহিলাম, 'আপনার পুত্রবধূ অতি সুলক্ষণা; সতী, সাবিত্রী-তুল্যা গুণসম্পন্না। ইহাঁর গর্ভে আপনার বংশ উজ্জ্বলকারী বংশধর জন্মগ্রহণ করিবে। পূর্ব্ব-জন্মের সুকৃতির ফলে ইহাঁর গৃহে কমলার আসন অচল। বহু পুণ্যফলেই এরূপ সতী-লক্ষ্মীস্বরূপিণী কন্যা পুত্র-বধূরূপে পাইয়াছেন।'

'আনন্দে কৃতজ্ঞতায় মেয়েটীর চোখে জল আসিল। গভীর শ্রদ্ধার সহিত আমার পায়ে মাথা ঠেকাইয়া সে ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল।

'স্ত্রীর সতীত্ব-গৌরবে স্বামীর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বাস্তবিক নিজের স্ত্রী সতী একথা বিশ্বাস করা প্রত্যেক স্বামীর পক্ষেই অত্যন্ত কষ্টকর। এবং যখন নিজের স্ত্রীর সম্বন্ধে এরূপ একটী ধারণা ভুল বলিয়া প্রমাণিত হয়, তখন তাহারা যে কি গভীর আনন্দ ও স্বস্তি লাভ করে, তাহা এরূপ অবস্থায় যে না পড়িয়াছে, সে অনুভব করিতে পারিবে না।

'বৃদ্ধা আনন্দে গদগদ হইয়া কহিল, 'তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক, বাবা, ফুল-চন্দন পড়ুক। আমিও তো তাই বলি বাবা। অমন লক্ষ্মী-প্রতিমে, সে না কি অমন অলক্ষণে কাজ করতে পারে। ছেলেকে কে যেন কি বলেছে, বাছার আমার সেই থেকে যে কি হ'ল, বৌটাকে আর দেখতেই পারে না। তা বাবা, ছেলে হবে না মেয়ে হবে।'

'একবার যখন মিথ্যার পথে পা দিয়াছি, তখন আর থামিবার উপায় নাই। কহিলাম—'ছেলে।'

'বৃদ্ধা আহ্লাদে ডগমগ হইয়া কহিল, 'তা বাবা 'সাধের' সময় কিন্তু তোমার নিমন্ত্রণ রহিল।'

'পাশের ঘরে তখন মান-ভঞ্জনের পালা আরম্ভ হইয়াছে। অজিত অনেক অনুনয়-বিনয় করিতেছে। আর মেয়েটা ফোঁফাইয়া ফোঁফাইয়া কাঁদিতেছে। এতদিনের জমাট বরফ উষ্ণ পরশে গলিয়া পড়িতেছে।

'অল্পক্ষণ পরে আর দু' একটা কথা বলিয়া আমি উঠিলাম। ছোকরা খানিকটা দূর আসিয়া আমাকে আগাইয়া দিয়া গেল।

'অজিত আমার দু' হাত ধরিয়া কহিল, 'দাদা, আজ আপনি আমাকে যে কি মহাপাপ হতে বাঁচালেন, তা ভগবানই জানেন। এতদিন স্ত্রীর প্রতি কি অন্যায়টাই না করেছি। সন্দেহের আগুনে আমার সারা দেহ-মন যেন চিতার আগুনে জলছিল। আমি হয়ত শেষটায় ওকে খুন করে নিজে আত্মঘাতী হতেম। আপনি আমাকে মহাপাতক হতে বাঁচালেন। বিবাহের পর থেকে এ তিন বৎসর আমার এই মানসিক যন্ত্রণার ভিতর কেটেছে। মনে হচ্ছে এতদিন পরে আমার স্ত্রীকে আমি ফিরে পেলাম।'

'হাসিলাম। বিশ্বাসের এমনই মূল্য। যে বিশ্বাস তাহার জীবনের তিনটী বৎসরকে বিষময় করিয়া তুলিয়াছিল, সেই বিশ্বাসই আজ তাহার সমস্ত জগৎ মধুময় করিয়া তুলিয়াছে। আর এই বিশ্বাসের বনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত হইল আমার একটী মিথ্যা কথার উপর।'

'সে মিথ্যার বনিয়াদ কি আজও টিকিয়া আছে।'

'আছে। এবং অতি চমৎকার ভাবে। আশ্চর্য্য, তার বৎসরখানেকের মধ্যেই মেয়েটীর একটী ছেলে হইয়াছিল। মেয়েটী বর্ত্তমানে কয়েকটি সন্তানের জননী। এই মেয়েটিকে কেন্দ্র করিয়া স্বামী-পুত্র-কন্যা পরিবৃত একটি সোনার সংসার গড়িয়া উঠিয়াছে। আজিও প্রতি চৈত্রমাসের ঐ তারিখে মেয়েটি আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া থাকে এবং আমার নিজের মেয়ের বাড়ীতেও যতটা সমাদর না পাই, সেখানে ততটা সমাদর পাইয়া থাকি।'

'সাধভক্ষণের নিমন্ত্রণ হইতে বোধ হয় বাদ যান নাই।'

'না।'

'কিন্তু আপনি যাই বলুন, আপনার মনোভাব যদি ব্যাপক ভাবে সমস্ত পুরুষদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে, তাহা হইলে মেয়েদের মধ্যে ব্যভিচারিতা প্রবল ভাবে বাড়িয়া যাইবে।'

'হয় ত। কিন্তু জীবনে আমি সজ্ঞানে সেই একটী ছাড়া মিথ্যা কথা বলি নাই। সেই একটী মিথ্যা কথা বলিয়া যত আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম আমার সারা জীবনের সমস্ত সত্য কথাও আমাকে তার অর্দ্ধেক আনন্দও দিতে পারে নাই।'

স্বাধীনতা

...মানবজাতির প্রকৃত ইতিহাস অনুসন্ধান করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, একদল যে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাকে মানুষ স্বাধীনতা বলিয়া আখ্যাত করিয়া থাকে, মানব-সমাজ চিরদিন তাহাকে প্রকৃত স্বাধীনতা বলিয়া মনে করিত না। পরন্তু আমরা যে অবস্থাটিকে প্রকৃত স্বাধীনতা বলিয়া অভিহিত করিতেছি, উহাই একদিন সমগ্র মানব-সমাজের আশার বস্তু হইয়াছিল।

ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে আরও দেখা যাইবে যে, যেদিন হইতে প্রকৃত স্বাধীনতার স্থলে একমাত্র রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা, স্বাধীনতা বলিয়া স্থান পাইয়াছে, সেই দিন হইতে পাশবিক বল ও অস্ত্রের অস্ত্র-পত্রের উৎকর্ষের উপর মানুষের আস্থা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করিয়াছে।...

৬নং চিত্র : রাতকাণা পরীক্ষার যন্ত্র

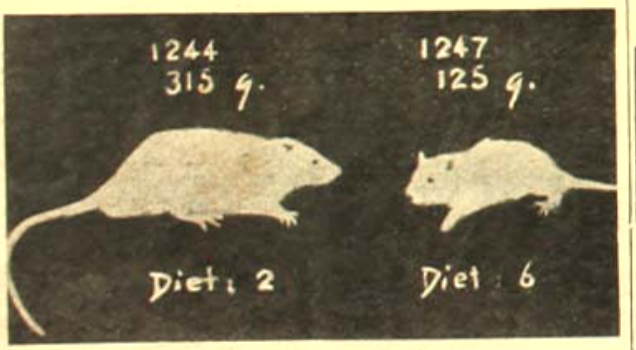

৩নং চিত্র : বামের ইঁদুরটিকে গম ও দুগ্ধ খাওয়ান হয়, দক্ষিণেরটিকে ভাত ও শাক-সব্‌জী দেওয়া হয়। দক্ষিণেরটির তুলনায় বামের ইঁদুরটির ওজন ২৫২% অধিক.

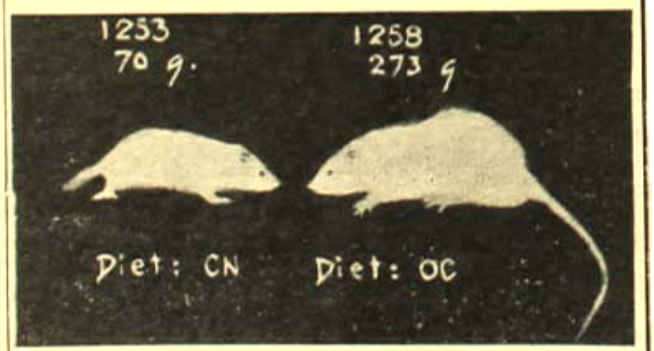

৪নং চিত্র : বামেরটি নিরামিষভোজী, দক্ষিণেরটিকে শাক-সব্‌জী, ডিম, মাংস ও দুগ্ধ খাওয়ান হয় ; দ্বিতীয়টি প্রথমটি অপেক্ষা ৩৯০% অধিক পুষ্ট

বিজ্ঞান জগৎ

খাদ্য ও স্বাস্থ্য

—শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী

সম্প্রতি পাশ্চাত্য দেশে আমিষ ও নিরামিষ খাদ্য সম্বন্ধে বহু গবেষণা ও পরীক্ষা চলিতেছে। নিরামিষ খাদ্য বলিতে কৃষিজাত শাক-সব্জীই কেবল বুঝিতে হইবে; দুগ্ধ বা দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত খাদ্যাদি বিলাতী মতে নিরামিষ পর্য্যায়ভুক্ত করা হয় না। স্বাস্থ্যের উপরে খাদ্যের প্রভাব পরীক্ষা করিবার জন্য সাধারণতঃ সাদা ইঁদুরকে মনোনীত খাদ্য দিয়া তাহার ওজন ও অবয়ব বৃদ্ধি পরীক্ষা করা হইয়া থাকে। চীন দেশের পল্লীগ্রামের লোকেরা নিরামিষাশী, সুতরাং তাহাদিগের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়াই নিরামিষ খাদ্যের গুণাগুণ বিচার করা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। ইহারা বহু শতাব্দী ধরিয়া নিরামিষই ভোজন করিয়া আসিতেছে, সুতরাং পরীক্ষাগারে অস্বাভাবিক অবস্থায় কয়েকটি শ্বেত ইঁদুর বা সামান্য সংখ্যক লোকের উপর পরীক্ষা করিয়া যে ফলাফল নির্ণীত হয়, ইহাদের স্বাস্থ্য ও খাদ্য পরীক্ষা করিয়া দেখিলে তদপেক্ষা অধিকতর নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যাইবে। চীনে শতকরা ১০ জন মাত্র নগরবাসী, অবশিষ্ট ৯০ জনই পল্লী-গ্রামে থাকে। দীর্ঘকাল কৃষিপ্রণালীর কোন প্রকার পরিবর্ত্তন না হওয়ায় ইহাদিগের আহার ও জীবন-যাত্রার প্রণালীর কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় নাই। অনুসন্ধানের ফলে দেখা গিয়াছে যে, পল্লী-অঞ্চলের চীনাদের খাদ্যের শতকরা ৮৮ ভাগই শস্য, ৪ ভাগ ফলমূল, ৪ ভাগ তৈল ও স্নেহ-জাতীয় পদার্থ ও মাত্র ৩ ভাগ আমিষ। কেহ কেহ বলেন যে, আমিষজাতীয় পদার্থ শতকরা ৩ ভাগের কম হইবে। দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের পরিমাণ শতকরা ০·১ ভাগেরও কম হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, চীনের পল্লী-অঞ্চলের অধিবাসিগণ সম্পূর্ণরূপে নিরামিষাশী, কিন্তু ইহা সত্ত্বেও তাহাদিগের স্বাস্থ্য কোন আমিষ-ভোজী জাতির স্বাস্থ্য অপেক্ষা বিশেষ নিকৃষ্ট নহে। আমেরিকার অধিবাসীদিগের খাদ্য, মার্কিন বৈজ্ঞানিকগণের মতে স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী, তবুও তাহারা চীনাদের অপেক্ষা অধিক কর্ম্মক্ষম নহে। চীন ও মার্কিনের খাদ্যতালিকার তুলনামূলক একখানি চিত্র (১নং চিত্র) প্রদত্ত হইল; উহা হইতে দেখা যাইবে যে, চীন ও আমেরিকার খাদ্যে কত প্রভেদ।

ধান্য-যবাদি শস্যই চীনের অধিবাসীদিগের প্রধান খাদ্য। ইহারা সিমজাতীয় লবীন (soybean) প্রভৃতিও আহার করে। উত্তর চীনে গোধূম, যোয়ার, বাওলিয়াং প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত রুটী প্রধান আহার্য্য; দক্ষিণ চীনে ভাতই প্রধান খাদ্য।

চীনাদিগের খাদ্যের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, ক্যালসিয়াম ও প্রোটিনের পরিমাণ বড়ই অল্প। পাশ্চাত্য দেশে যে-পরিমাণ ক্যালসিয়াম খাদ্যে থাকিলে উপযুক্ত পরিপুষ্টি হয় বলিয়া মনে করা হয়, চীনাদের খাদ্যে তাহা অপেক্ষা অনেক কম ক্যালসিয়াম আছে। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকদের মতে অস্থি-গঠন ও অবয়ব-বৃদ্ধির উপরে ক্যালসিয়ামের যথেষ্ট প্রভাব আছে, কিন্তু চীনারা ক্যালসিয়ামের অভাবে ক্ষুণ্ণস্বাস্থ্য নহে, ইহা বাস্তব সত্য। আমেরিকার শারীর-রসায়নবিদ্‌গণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, দুগ্ধ হইতেই ক্যালসিয়াম শরীরে শোষিত হয়, সুতরাং তাঁহারা

প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ পান করিবার উপদেশ দিয়া থাকেন। চীনারা দুগ্ধ পান করে না বলিয়াই তাহাদের খাদ্যে ক্যাল-সিয়ামের পরিমাণ অত্যন্ত অল্প।

প্রোটিনকে দুইটী ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে—(১) আমিষ দ্রব্য হইতে প্রাপ্ত প্রোটিন ও (২) নিরামিষ দ্রব্য হইতে প্রাপ্ত প্রোটিন। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, আমিষ প্রোটিন নিরামিষ প্রোটিন অপেক্ষা সহজপাচ্য ও অধিক পুষ্টিকর। সুতরাং দেহের সম্যক্ পরিপুষ্টির জন্য যে পরিমাণ আমিষ প্রোটিন যথেষ্ট বিবেচিত হয়, নিরামিষ প্রোটিন তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে আহার করা প্রয়োজন। ৬০ গ্রাম (প্রায় ১২ গ্রাম ১ পোলার সমান) আমিষ প্রোটিনে যে পরিপুষ্টি হইবে, প্রায় ৮০ গ্রাম নিরামিষ প্রোটিনে সেই কার্য্য হইতে পারে বলিয়া বৈজ্ঞানিকরা মত পোষণ করেন।

উত্তর চীনের অধিবাসিগণ কয়েক প্রকার শস্য মিশ্রিত করিয়া রুটি প্রস্তুত করে। বর্ত্তমানে, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাদ্বারা জানা গিয়াছে যে, মিশ্রিত শস্য শরীরের পক্ষে অধিক পুষ্টিকর; কারণ কোন একটী শস্য হইতে যে পরিমাণ প্রোটিন শরীরে শোষিত হয়, মিশ্রিত শস্য হইতে তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে প্রোটিন শরীর-পুষ্টির কার্য্যে ব্যবহৃত হইতে পারে। ২ নং চিত্রে পরীক্ষাগারে কয়েকটি প্রাণীকে নানারূপ মিশ্রিত শস্য ও অমিশ্রিত শস্য খাওয়াইয়া তাহাদের বৃদ্ধির হার দেখান হইয়াছে। সবগুলি পরীক্ষাতেই যে পরিমাণ খাদ্য দেওয়া হইয়াছিল তাহার শতকরা ১০ ভাগ প্রোটিন।

ইয়েনচিং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগারে একই বয়সের ও একই ওজনের একপালের কয়েকটি ইঁদুর লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, যে-গুলিকে নিরামিষ ও দুগ্ধ খাওয়ান হইয়াছিল সেগুলি কেবলমাত্র নিরামিষভোজী ইঁদুরগুলির অপেক্ষা অধিক পরিপুষ্ট হইয়াছিল ও যেগুলিকে আমিষ ও দুগ্ধ দেওয়া হইয়াছিল সেগুলির পরিপুষ্টি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছিল (৩ ও ৪ নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

পেইপিং ইউনিয়ন মেডিক্যাল কলেজে ডক্টর লিয়েন উ ও তাঁহার সহকর্ম্মিগণ নানারূপ মিশ্রিত শস্য খাইতে দিয়া আমিষভোজী ইঁদুরের অনুরূপ পরিপুষ্টি সাধন করা যায় কি না, তাহা পরীক্ষা করিয়াছেন। তাঁহাদের পরীক্ষার ফলে জানা গিয়াছে যে, আমিষভোজীর তুল্য পরিপুষ্টি কোনও প্রকার মিশ্রিত শস্য দ্বারা করা যায় না। ইঁদুরের উপর পরীক্ষালব্ধ ফল হইতে নিরামিষ প্রোটিন ও আমিষ প্রোটিনের গুণের পার্থক্য নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে।

চীনাদিগের খাদ্য প্রধানতঃ নিরামিষ ও দুগ্ধপূন্য হইবার কারণ এই যে, তথায় চাষযোগ্য ভূমির তুলনায় লোকসংখ্যা অত্যন্ত অধিক। দুর্ভাগ্যে গরুর জন্য বহু শস্য অপব্যয় করিতে কেহ সম্মত নহে; তদ্রূপ, মাংস খাইতে হইলেও বহু শস্য অপব্যয় হইবে। এরূপ অপব্যয় হইলে দেশের লোকের খাদ্য সঙ্কুলান হইবে না।

গত দশ বৎসর কাল বৈজ্ঞানিকগণ সর্ব্বাপেক্ষা পুষ্টিকর খাদ্যের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন। পরীক্ষাগারে প্রাণী-দিগকে নানারূপ খাদ্য প্রদান করিয়া দেখা গিয়াছে যে, খাদ্যে ক্যালসিয়াম, দুগ্ধের প্রোটিন ও ভিটামিন বেশী থাকিলেই প্রাণীদের ওজন অধিক বৃদ্ধি হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে লোকের গড় দৈর্ঘ্য পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি হইয়াছে; উত্তম খাদ্যই ইহার অন্যতম প্রধান কারণ। কনেক্‌টিকাট কৃষি-গবেষণাগারে বহুকাল হইতে সাদা ইঁদুর লইয়া উহাদিগের উপর নানারূপ খাদ্যের প্রভাব পরীক্ষা করা হইতেছে। ২৪ বৎসর ধরিয়া উত্তম খাদ্য পুরুষানুক্রমে ইঁদুরগুলিকে প্রয়োগ করিয়া অনেক বেশী পরিপুষ্ট করা গিয়াছে। ৫নং চিত্রে দেখা যাইবে যে, ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ইঁদুরগুলি অপেক্ষা ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের সমবয়স্ক ইঁদুরগুলির ওজন কত অধিক।

মানুষের সম্বন্ধেও হয়ত এইরূপ হইতে পারে, তবে মৈর্ঘ্য ও শারীরিক পুষ্টি অন্যান্য অনেকগুলি কারণের উপরেও নির্ভর করে। চীনের অধিবাসীদিগের খাদ্যে ক্যালসিয়ামের একান্ত অভাব দেখিয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাদের মতে ক্যালসিয়ামই অস্থিবৃদ্ধির প্রধান উপাদান। অনেকে অনুমান করেন যে, ক্যালসিয়ামের অভাবেই চীনের অধিবাসিগণ ইউরোপ বা আমেরিকাবাসী-দিগের অপেক্ষা খর্ব্বাকার। তাঁহারা বলিতেছেন, দুগ্ধের অভাব পূরণের জন্য কোনরূপ অধিক ক্যালসিয়ামবিশিষ্ট খাদ্যশস্যের অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

চীনে খাদ্য-সমস্যার যেরূপ ভাবে সমাধান হইয়াছে, তাহা চীনাদের পক্ষে কৃতিত্বের বিষয় সন্দেহ নাই, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে

সর্ব্বতোভাবে শরীর-পুষ্টির উপযোগী খাদ্যের ব্যবস্থা করিবার জন্য চেষ্টা চলিতেছে। খাদ্যে শস্যের পরিমাণ হ্রাস করিয়া শাক-সব্জীর পরিমাণ বৃদ্ধি ও ডিম প্রভৃতি খাদ্যের প্রচলন, যাহা কৃষির কোনরূপ ব্যাঘাত না করিয়াও প্রবর্ত্তন করা চলে সে বিষয়ে চেষ্টা হইতেছে। এ স্থলে একমাত্র বক্তব্য যেখানে যে ব্যবস্থাই করা হউক, তাহা দেশ ও কালের উপযোগী হওয়া আবশ্যক।

উন্মাদরোগে ইনস্যুলিন

১৯৩০ খৃষ্টাব্দে ভিয়েনার চিকিৎসক ডক্টর মানফ্রেড জাকেল কতকগুলি মর্ফিনসেবী রোগীর চিকিৎসা আরম্ভ করেন। তিনি দেখিতে পান যে, ঐ রোগীদিগকে মর্ফিয়া সেবন করিতে না দিলে উহারা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে—এমন কি উন্মাদের ন্যায় ব্যবহার করে। ডক্টর জাকেল এই বিষয় লইয়া চিন্তা করিতে থাকেন ও সিদ্ধান্ত করেন যে, রোগীর এই অবস্থায় শারীরিক ও মানসিক পরিবর্ত্তন হয়। তাঁহার মনে উদয় হয় যে, মর্ফিয়া সেবনে মস্তিষ্কের কোষগুলির যথেষ্ট ক্ষতি হয় ও এই অবস্থায় শরীরের গ্রন্থিগুলি হইতে বেশী পরিমাণে উত্তেজক দ্রব্য গৃহীত হয়।

বহুমূত্র রোগের চিকিৎসায় ইনস্যুলিন ব্যবহার পূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত আছে ও মনুষ্যশরীরে ইহার ক্রিয়াও জানা আছে। ইনস্যুলিন সুস্থ লোকের প্যান্‌ক্রিয়াসে প্রস্তুত হয় ও শরীরে শর্করা-শোষণের ক্রিয়া সম্পন্ন করে। বহুমূত্র রোগীর প্যান্‌ক্রিয়াস ইনস্যুলিন প্রস্তুত করিতে পারে না বলিয়া এই অবস্থায় ইনস্যুলিন প্রয়োগ করা হয়। অতিরিক্ত ইনস্যুলিন প্রয়োগ করিলে রক্তের শর্করাভাগ অত্যন্ত কমিয়া যায়, রোগী মাতালের ন্যায় ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে ও এমন কি অজ্ঞান হইয়া যাইতেও পারে। এই অবস্থা হইলে তৎক্ষণাৎ শর্করা প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। ইনস্যুলিনের এই ক্রিয়া দেখিয়া ডক্টর জাকেল মর্ফিয়াসেবী রোগীর উত্তেজিত অবস্থার প্রতিকারের অভিপ্রায়ে ইনস্যুলিন প্রয়োগ আরম্ভ করিলেন।

মর্ফিয়াসেবী রোগীদিগকে প্রথমে অল্প-মাত্রায় ইনস্যুলিন প্রয়োগ করিয়া ডক্টর জাকেল তাহাদের আশ্চর্য্য রকম মানসিক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করেন। অত্যন্ত অস্থির রোগীও স্থিরভাব ধারণ করিয়াছিল। যে সকল রোগী অন্তরে সর্ব্বদা দুঃখের জগৎ সৃষ্টি করিয়া সমাধিস্থ হইয়া থাকিত, তাহারাও বাস্তব-জগতে ফিরিয়া আসিতে লাগিল। যাহারা সর্ব্বদাই শত্রু-ভাবে ব্যবহার করিত তাহারাও বন্ধুভাব ধারণ করিল। ইনস্যুলিন সেবন বন্ধ করিবার অব্যবহিত পরে তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা উত্তেজিত হইয়া পড়ে, কিন্তু ইনস্যুলিন প্রয়োগ করিয়া দেখা যায় যে, উত্তেজনা অনেক প্রশমিত হয় ও সময় সময় সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়।

এই পরীক্ষার পর ডক্টর জাকেল উন্মাদরোগগ্রস্ত রোগীর উপর ইনস্যুলিনের ক্রিয়া পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। তিনি দেখিতে পান যে শিজোফ্রেনিয়া (Schizophrenia) রোগগ্রস্ত ব্যক্তির চিকিৎসায় ইনস্যুলিন প্রয়োগ করিলে প্রভূত উপকার পাওয়া যায়। এই রোগগ্রস্ত উন্মাদগণ স্বপ্নজগতেই বাস করে ও কল্পিত ব্যক্তিদিগের সহিত আলাপ করে। আপন স্বরূপ ভুলিয়া গিয়া তাহারা নিজেদের অপর ব্যক্তি মনে করিয়া থাকে। এই প্রকার উন্মাদের সংখ্যাই খুব বেশী। শিজোফ্রেনিয়া রোগের কারণ এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই।

ডক্টর জাকেল বহু রোগীকে ইনস্যুলিন প্রয়োগ করিয়া দেখিতে পান যে, ক্রমশঃ বেশী মাত্রায় ইনস্যুলিন প্রয়োগ করিয়া, যে মাত্রায় ৪।৫ ঘণ্টার মধ্যে রোগী অজ্ঞান হইয়া পড়ে, সেই মাত্রায় ইনস্যুলিন প্রয়োগ করিলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায়। এই সর্ব্বোচ্চ মাত্রা, রোগীর অবস্থানুযায়ী সপ্তাহে তিন হইতে ছয় দিন পর্য্যন্ত ব্যবহার করিলে যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়। কোন রোগীকে ৫০টি ইন্‌জেক্‌শন দিবার পরও যদি কোন উপকার না পাওয়া যায়, তবে তাহাকে আর ইন্‌জেক্‌শন্ দেওয়া হয় না। যদি কোন রোগী সর্ব্বোচ্চ মাত্রা প্রয়োগের ফলে অত্যন্ত বেশীক্ষণ অজ্ঞান অবস্থায় থাকে ও নাড়ীর গতি অতি দ্রুত বা অতি মন্দ হয়, তবে তাহাকে তিন চারিদিন বিশ্রাম দেওয়া হইয়া থাকে।

কতকগুলি রোগীকে আটবারের অধিক সর্ব্বোচ্চ মাত্রায় ইনস্যুলিন প্রয়োগও আবশ্যক হয় না এবং কাহাকেও ৫০ বার প্রয়োগ না করিলে ফল হয় না সুতরাং কতবার সর্ব্বোচ্চ মাত্রা প্রয়োগ করিতে হইবে সে বিষয়ে এখনও কোন স্থির সিদ্ধান্ত হয় নাই। সর্ব্বোচ্চ মাত্রা প্রয়োগে রোগী সুস্থ হইলে

ক্রমশঃ মাত্রা কমাইয়া প্রথম মাত্রার সমান করিয়া আনা হয় ও এইরূপে চিকিৎসা সমাপ্ত করা হয়।

ইনস্থালিন ইন্‌জেক্‌শন দিবার পূর্ব্বে রোগীকে কিছুই আহার করিতে দেওয়া হয় না। ইন্‌জেকশন দিবার ৩ ঘণ্টা পরে গ্লুকোজ প্রয়োগ করা হয় ও তৎপরে রোগীকে আহার করিতে দেওয়া হয়। ইহার পরে রোগী ইচ্ছামত বিশ্রাম বা চলাফেরা করিতে পারে। এই সময়েও লক্ষ্য রাখিতে হয় যে, রোগীর অবস্থা খারাপ হইয়া না পড়ে। কিন্তু খারাপ দেখিলে তৎক্ষণাৎ গ্লুকোজ প্রয়োগ করা হয়।

এইরূপে চিকিৎসা করিয়া ডক্টর জাকেল ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রথম রোগীকে আরোগ্য করেন। তৎপরে তিনি বহু রোগীর আরোগ্য-সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। এই সংবাদ প্রকাশ হইবার পর নানাদেশ হইতে বহু চিকিৎসক তাঁহার চিকিৎসা-প্রণালী দেখিতে আসেন।

ইউরোপ ও আমেরিকার সর্ব্বত্রই ডক্টর জাকেল-এর চিকিৎসা-প্রণালী অনুসারে উন্মাদ-রোগের চিকিৎসা হইতেছে; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উত্তম ফল পাওয়া গিয়াছে। কোনও কোনও রোগীকে প্রথম অল্প মাত্রায় ইনস্থালিন প্রয়োগ করিয়াই যথেষ্ট উন্নতি দেখা যায়, রোগী শান্তভাব ধারণ করে। ক্রমে মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া সর্ব্বোচ্চ মাত্রা প্রয়োগ করিলে অদ্ভুত মানসিক পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়। অনেক পুরাতন রোগীকেও এই চিকিৎসায় আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে।

ইনস্থালিন চিকিৎসার প্রারম্ভেই রোগী সময় সময় সুস্থ-চিত্ত হয় ও নিজের অসংযম ব্যবহার বুঝিতে পারে। ক্রমে চিকিৎসা যতই অগ্রসর হইতে থাকে, রোগীর মনের সুস্থ অবস্থাও ক্রমশঃ ততই বেশীক্ষণ স্থায়ী হয়। ইনস্থালিন চিকিৎসার প্রথম অবস্থায় কিছুক্ষণ সুস্থ থাকিবার পর রক্তে স্বাভাবিক পরিমাণ শর্করা আসিলেই পুনরায় উন্মাদের লক্ষণ প্রকাশ পায়। ক্রমে চিকিৎসা অগ্রসর হইলে দেখা যায় যে, রক্তের শর্করা স্বাভাবিক পরিমাণে আসিলেও রোগীর আর কোন প্রকার উন্মাদের লক্ষণ দেখা যায় না; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চিরতরে সুস্থ হইয়া যায়।

একটি রোগী ২৬ বৎসর বয়সে উন্মাদ হয় ও ৩২ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত নানারূপ কুকার্য্য করে ও ঐ অবস্থাতেই থাকে। এই সময়ে তাহার চিকিৎসা আরম্ভ হয়। ১৮টি সর্ব্বোচ্চ মাত্রা ও মোট ৩১টি ইনস্থালিন ইন্‌জেকশন প্রয়োগে সে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া যায়। তাহার সম্বন্ধে যে শেষ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায় যে, সে দৈনিক ১২ ঘণ্টা কঠিন পরিশ্রমের কার্য্য করিতেছে।

বহু রোগীর উপর পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, উন্মাদ রোগগ্রস্ত হইবার অল্পদিনের মধ্যে ইনস্থালিন প্রয়োগ করিলে অধিকাংশ রোগীই আরোগ্যলাভ করে, কিন্তু পুরাতন রোগীর অনেকেই প্রথমে কিছু সুস্থ হইয়া পুনরায় অসুস্থ হইয়া পড়ে, সুতরাং রোগের প্রারম্ভেই এই চিকিৎসা করান উচিত।

ইনস্থালিন প্রয়োগের ফলে রক্তের শর্করা কমাইয়া দিলে মস্তিষ্কের কি পরিবর্ত্তন হয় ও অজ্ঞান অবস্থায় রোগী কি বোধ করে, এই সকল বিষয়ে বহু গবেষণা চলিতেছে, কিন্তু কোন সিদ্ধান্তই হয় নাই।

একটি রোগীকে প্রশ্ন করিয়া জানা গিয়াছিল যে, ইনস্থালিন প্রয়োগের পর সে অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ করিয়াছিল, তৎপরে অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ হইয়াছিল ও ক্রমশঃ অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল। অজ্ঞান অবস্থায় যে কোন কোনরূপ স্বপ্ন দেখে নাই। কতক্ষণ অচৈতন্য অবস্থায় ছিল তাহা সে বলিতে পারে না।

অনেক রোগী বিনা চিকিৎসাতেও আরোগ্য হইতে দেখা যায়। এইরূপ রোগীকে প্রশ্ন করিয়া জানা গিয়াছে যে, তাহাদিগের মস্তিষ্কে কিরূপ ক্রিয়া চলিতে থাকে, তাহা তাহারা বলিতে পারে না। বিনা চিকিৎসায় যাহারা আরোগ্যলাভ করে, অসুস্থ অবস্থায় তাহাদের কি হইয়াছিল তাহা জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিতে তাহারা ইচ্ছা করে না। ইহাতে মনে হয় যে, তাহাদিগের কি হইয়াছিল বা তাহারা যে অসুস্থ মনে ছিল তাহা তাহারা সম্যক বুঝিতে পারে না।

ইনস্থালিন প্রয়োগে যাহারা আরোগ্যলাভ করে তাহাদিগকে প্রশ্ন করিলে তাহারা যে অসুস্থ হইয়াছিল তাহা অস্বীকার করে।

ইনস্থালিন চিকিৎসায় রোগী অল্প সময়ে আরোগ্য লাভ করে বটে কিন্তু এই চিকিৎসা অভিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা করাইতে হয়, নতুবা সমূহ বিপদের আশঙ্কা আছে।

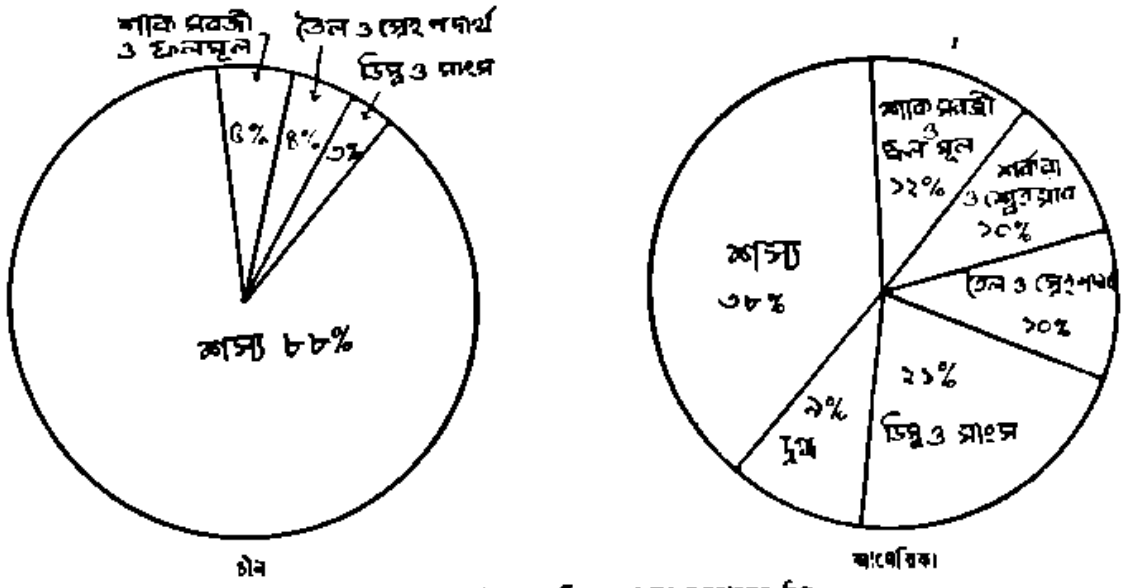

১নং চিত্র : চীন ও আমেরিকার খাদ্যের তুলনামূলক চিত্র

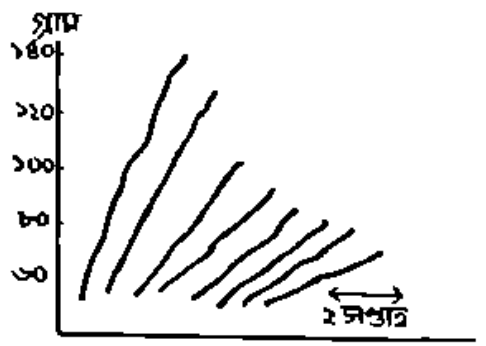

২নং চিত্র : দৈহিক বৃদ্ধির উপর মিশ্রিত ও অমিশ্রিত খাদ্যের প্রভাব ; বামদিক হইতে বামে পর পর খাদ্য এইরূপ—কাউলিয়াং কাউপি ; গোধূম ; জনার ও সয়াবীন ; সয়াবীন ; গম ও কাউপি ; যোয়ার, কাউলিয়াং ও সয়াবীন ; গোধূম, জনার ও সয়াবীন

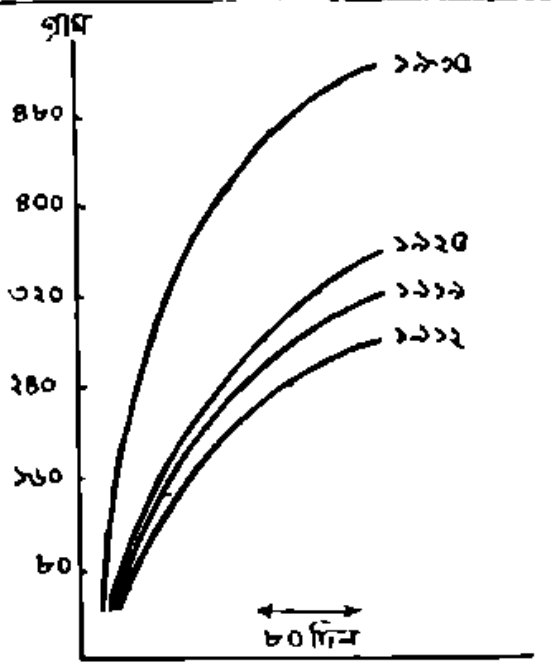

৪নং চিত্র : পুষ্টিকর খাদ্যপ্রদানের ফলে পুরুষানুক্রমে দৈহিক বৃদ্ধি

মানসিক চিকিৎসা

শরীরের উপরে যে মনের প্রভাব আছে তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। চিকিৎসকগণ বর্ত্তমানে অনেক সময় দেখিতে পান যে, রোগী তাহার রোগের যাহা বিবরণ দেয় পরীক্ষায় সেরূপ কিছুই দেখা যায় না।

কিছুদিন পূর্ব্বে ক্যালিফর্ণিয়া জেলে হত্যাপরাধে অভিযুক্তা একজন স্ত্রীলোক মানসিক শক্তি প্রয়োগে আত্মহত্যা করিতে স্থির করে। ফলে ক্রমে সে অচৈতন্য হইয়া পড়ে; হস্তপদ শিথিল হইতে থাকে; প্রায় ১১০ ঘণ্টা ঐরূপ অবস্থায় থাকিবার পর বহু চিকিৎসার ফলে সে চৈতন্য লাভ করে।

অনেক সময় পক্ষাঘাত, অন্ধতা, গলগণ্ড ও নানাপ্রকার অন্যান্য ব্যাধিও মানসিক কারণে উৎপন্ন হইতে দেখা যায়।

এক ব্যক্তির স্ত্রী দৈবদুর্ঘটনায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই ঘটনাতে সেই ব্যক্তি এত বিচলিত হইয়াছিলেন যে তিনি অন্ধ হইয়া যান। কিন্তু প্রায় দেড় বৎসর পরে পুনরায় বিবাহ করিয়া সুখী হন ও তাঁহার চক্ষু সম্পূর্ণ নিরোগ হইয়া যায়। কিছুদিন পূর্ব্বে এক ব্যক্তি হাত নাড়িতে পারেন না বলিয়া চিকিৎসকের পরামর্শ লইতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা অস্ত্রোপচার দ্বারা রোগ সারাইয়া দিবেন করিয়া অজ্ঞান করিবার জন্য ইথার প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করেন। রোগী অজ্ঞান হইবার পর দেখা যায় যে হাত অনায়াসে নড়ান যায় ও পেশীর কোন দোষই নাই।

একজন স্ত্রীলোক বলেন যে তাঁহার গলায় মাছের কাঁটা বিঁধিয়াছে ও নিঃশ্বাস ফেলিতে কষ্ট হইতেছে। প্রথমে একজন চিকিৎসককে দেখান হয়, তিনি গলার ভিতরে কিছুই দেখিতে না পাইয়া চলিয়া যান। কিন্তু রোগীর অবস্থা ক্রমেই মন্দ হইতে থাকে। আর একজন চিকিৎসককে দেখান হইলে তিনি বুঝিতে পারেন যে ইহা মানসিক ব্যাধি। একটি মাছের কাঁটা হাতের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া তিনি রোগিনীর গলার ভিতরে হাত দিয়া কিছুক্ষণ পরে হাত বাহিরে আনিয়া কাঁটাটি রোগিনীকে দেখান ও রোগিনী সুস্থ হয়।

কখনও কখনও হঠাৎ ভয় পাইয়া আত্মরক্ষা করিবার প্রবৃত্তি জাগিলেও অনেক রোগ আরোগ্য হইতে দেখা যায়। ভূমিকম্প বা বাড়ীতে হঠাৎ আগুন লাগিবার ফলে পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীকেও পলায়ন করিতে দেখা গিয়াছে।

কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন খ্যাতনামা অধ্যাপক কোন পদার্থ গলাধঃকরণ করিতে পারেন না বলিয়া একজন চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন। চিকিৎসক গলা পরীক্ষা করিয়া কোনরূপ রোধ দেখিতে পান না। তখন তিনি রোগীকে বলেন যে তাঁহাকে অজ্ঞান করা হইবে ও জ্ঞান হইলেই তিনি অনায়াসে তরল পদার্থ পান করিতে পারিবেন। নাইট্রাস অক্সাইড গ্যাস প্রয়োগ করিয়া তাঁহাকে অজ্ঞান করা হয় ও যখন জ্ঞান সামান্যরূপ ফিরিয়া আসিল তখনই তাঁহাকে দুধ খাওয়ান হইল। সম্পূর্ণ জ্ঞান হইলে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে তিনি দুধ খাইতে পারিয়াছেন। তিন দিন দুধ খাইবার পরে তাঁহাকে বলা হইল যে পুনরায় তাঁহাকে অজ্ঞান করা হইবে ও তৎপরে তিনি কঠিন পদার্থও আহার করিতে পারিবেন। পুনরায় অজ্ঞান করিয়াও ঐরূপভাবে তাঁহাকে কঠিন পদার্থ খাওয়ান হইয়াছিল; পরে আর কোন গোলযোগ উপস্থিত হয় নাই।

সৈন্যদিগের হাসপাতালে একটি অদ্ভুত রোগী আরোগ্য হইয়াছিল। সে বলিত যে সে কানে কিছুই শুনিতে পায় না। তাহাকে পরীক্ষা করিয়া কানে কোন রোগ দেখিতে পাওয়া গেল না। তাহার কাহিনী শুনিয়া চিকিৎসক অনুমান করেন যে অনবরত কামান গর্জ্জন শুনিয়া ঐ ব্যক্তি হয় ত মনে ভাবিত যে কানে শুনিতে না পাইলেই ভাল হয়। মনের এইরূপ ইচ্ছা বলবতী হওয়াতেই শরীরের উপরে এই ইচ্ছার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে ও সেই জন্যই লোকটি বধির হইয়া গিয়াছে। চিকিৎসক তাহাকে বিদ্যুৎ-প্রয়োগে আরোগ্য করিবেন বলেন ও তদনুযায়ী সকল ব্যবস্থা করা হয়। রোগীর মনে ধারণা জন্মান হয় যে, নানা রকম বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়া তাহার উপরে প্রয়োগ করা হইবে, কিন্তু চিকিৎসক কেবলমাত্র তাহার মস্তক মুণ্ডিত করিয়া মস্তকের চর্ম্মের উপরে বিদ্যুৎ চালনা করিলেন। চিকিৎসক পূর্ব্বে তাহার ভাবী পত্নীকে তাহার নিকট ঐ সময় টেলিফোন করিতে বলিয়াছিলেন। তদনুযায়ী সে টেলিফোন করিলে রোগী তাহা শুনিতে পায় ও আরোগ্য হইয়া যায়।

রাতকাণা পরীক্ষা করিবার যন্ত্র

সম্প্রতি রাতকাণা পরীক্ষা করিবার জন্য এক প্রকার যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে: ইহার নাম 'অ্যাডাপ্টোমিটার'।

এই যন্ত্রের দ্বারা রাতকাণা নির্দ্ধারণ করিতে আট মিনিট সময়ের আবশ্যক হয়। শরীরে উপযুক্ত পরিমাণে ভিটামিন 'এ' না থাকিলেই এই রোগের সৃষ্টি হয় বলিয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিকরা মত প্রকাশ করেন। চক্ষুর রেটিনাতে 'ভিসুয়াল্ পার্পল্' নামক একটি পদার্থ আছে; প্রখর আলোতে ইহা বর্ণশূন্য হইয়া যায়। মৃদু আলোকে দেখিতে হইলে উহা পুনরায় রঞ্জিত হওয়া আবশ্যক। শরীরে ভিটামিন 'এ' যথেষ্ট পরিমাণে থাকিলে উহার ক্রিয়ার ভিসুয়াল পার্পল পুনরায় রঞ্জিত হয় ও মৃদু আলোকে দেখা যায়।

একটি অন্ধকার ঘরে অ্যাডাপ্টোমিটার যন্ত্রের সম্মুখে, যে ব্যক্তিকে পরীক্ষা করিতে হইবে, তাহাকে বসান হয়। যন্ত্রটির উপরিভাগে একটি তীব্র আলোক প্রজ্বলিত করিয়া ঐ ব্যক্তিকে আলোর দিকে দেখিতে বলা হয় (৬নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। তিন মিনিটকাল এইরূপ চাহিয়া থাকিবার পরে আলোটি নির্ব্বাপিত করিয়া মৃদু আলোক জ্বালা হয়। তীব্র আলোকপাতে ভিসুয়াল পার্পল বিবর্ণ হইয়া যায় ও আলোক নির্ব্বাপনের কতক্ষণ পরে ঐ ব্যক্তি মৃদু আলোকটি দেখিতে পায় তাহা নির্ণয় করা হয়। সাধারণতঃ তীব্র আলোক নির্ব্বাপনের ৫ মিনিটের মধ্যেই মৃদু আলোকটি দৃষ্টিগোচর হওয়া উচিত। যদি তাহা না হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে ঐ ব্যক্তি রাতকাণা।

জীবন্ত মধুপাত্র

মধ্য অষ্ট্রেলিয়ার এক জাতীয় পিপীলিকা আছে, যাহারা তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও দেহ মধু-সংরক্ষণের পাত্র হিসাবে ব্যবহার করে। চার্লস্ ব্যারেট এই পিপীলিকার সন্ধান পাইয়া ইহা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইহারা দেখিতে সাধারণ কাল পিপীলিকার ন্যায়। ইহারা দলের ভিতরে কোনও একটিকে মধুপাত্র হিসাবে ব্যবহার করিবার জন্য নির্ব্বাচিত করে। অন্যান্য সকলে মধু সংগ্রহ করিয়া আনিয়া উহার নিকটে দেয় ও ঐ পিপীলিকাটিকে মধু পরিপাকরূপে করায়। ইহাদিগের দুইটি পাকস্থলী। একটি নিজের ব্যবহারের জন্য ও অপরটি সাধারণের জন্য। যখন দলের কেহ মধু খাইতে চায় তখন সে মধুপাত্ররূপ পিপীলিকাটিকে মৃদুভাবে স্পর্শ করিতে থাকে। এইরূপ করিলে মধুপাত্র পিপীলিকাটির মুখ হইতে এক বিন্দু মধু নিঃসৃত হয় ও অপরটি তাহা ভক্ষণ করে।

মধু-সংরক্ষণ করিবার ফলে মধুপাত্র পিপীলিকাটি দেখিতে অতি কদাকার হয়। ইহার মস্তক ও বক্ষস্থলের কোন পরিবর্ত্তন হয় না। স্থানীয় অধিবাসীগণ এইরূপ পিপীলিকা জীবন্ত অবস্থাতেই ভক্ষণ করে।

কয়লা ও রেড়ির তৈল হইতে কৃত্রিম রেশম

আমেরিকায় কয়লা ও রেড়ির তৈল হইতে কৃত্রিম রেশম প্রস্তুত করিবার চেষ্টা চলিতেছে। কয়লা হইতে যে আলকাতরা পাওয়া যায় তাহাতে 'ক্যাডাভেরিন' নামক একটি পদার্থ আছে। রেড়ীর তৈল হইতে প্রথমে সাবান প্রস্তুত করিয়া উহা কষ্টিক সোডার সহিত মিশ্রিত করিয়া ফুটান হয়। এইরূপ করিলে 'সিবেসিক অ্যাসিড' (sebacic acid) পাওয়া যায়। তৎপরে সিবেসিক অ্যাসিডের সহিত ক্যাডাভেরিনের ক্রিয়ায় যে পদার্থ পাওয়া যায় তাহা হইতেই নকল রেশমের সূত্র প্রস্তুত হয়। এই সূত্রগুলি বেশ দৃঢ় ও ঔজ্জ্বল্যবিশিষ্ট। এই নকল রেশম হইতে মোজা প্রস্তুত করিবার চেষ্টা হইতেছে।

দুগ্ধ হইতে নকল পশম

দুগ্ধের কেজিন হইতে আজকাল এক প্রকার নকল পশম প্রস্তুত হইতেছে। প্রায় ৩ বৎসর হইল এই নকল পশমের সহিত স্বাভাবিক পশম মিশাইয়া ইতালিতে বস্ত্রাদি প্রস্তুত আরম্ভ হইয়াছে। কেজিন হইতে নকল পশমের সূত্র প্রস্তুত করিবার জন্য প্রথমে জলে কেজিন ভিজাইয়া রাখিয়া নরম করা হয়। তৎপরে কষ্টিক দ্রবণে উহা রাখা হয়। ঐরূপ করিলে উহা জেলির ন্যায় পদার্থে পরিণত হয়। তখন উপযুক্ত পরিমাণ জল মিশাইয়া কিছুকাল রাখিয়া, উহা কতকগুলি ছিদ্রের ভিতরে চালিত করা হয় এবং এইরূপে সূত্র প্রস্তুত হয়। তৎপরে মৃদু অম্ল ও ফরম্যালডিহাইডের মিশ্রণ প্রয়োগ করিয়া সূত্রগুলি দৃঢ় করা হয়। এইরূপে প্রস্তুত পশমের সহিত স্বাভাবিক পশমের রাসায়নিক পার্থক্য এই যে ইহাতে স্বাভাবিক পশম অপেক্ষা গন্ধকের ভাগ কম থাকে।

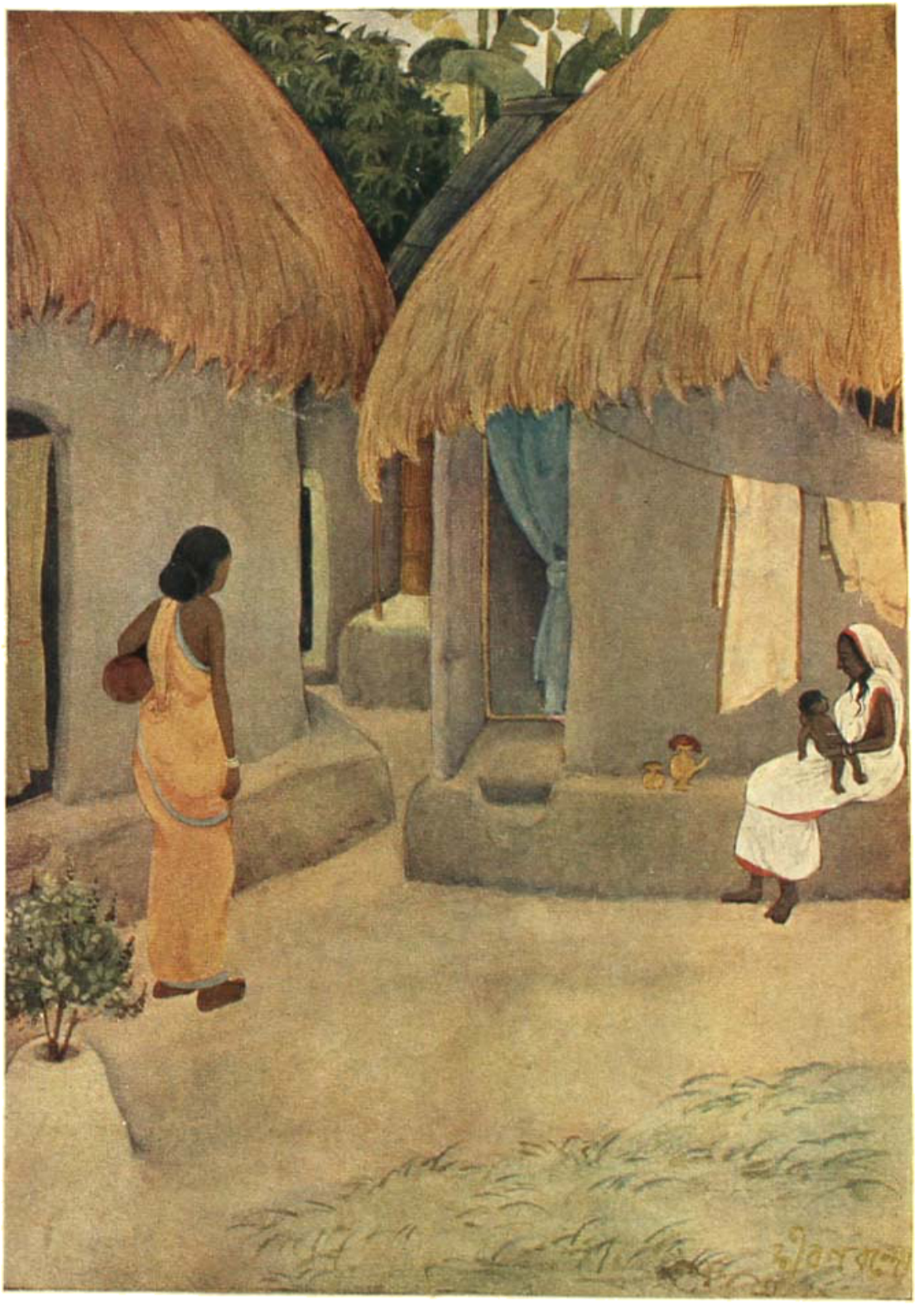

কুটীর

[শিল্পী—শ্রীজীবনলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

"লক্ষ্মীস্ত্বং ধান্যরূপাসি প্রাণিনা প্রাণদায়িনী"

বঙ্গশ্রী

ফাল্গুন—১৩৪৫

৭ম বর্ষ, ১ম খণ্ড—২য় সংখ্যা

সম্পাদকীয়

—শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য

মিঃ শরৎচন্দ্র বসুর অসার চিন্তার নমুনা

যে শ্রেণীর ভূয়োদর্শন, বাস্তব কার্য্যতৎপরতা চিন্তাশক্তি থাকিলে দেশের ও দশের জটিল সমস্যাসমূহ সমাধান করা সম্ভব আমাদিগের কংগ্রেসের বর্ত্তমান নেতৃবর্গের মধ্যে কাহারও সেই শ্রেণীর ভূয়োদর্শন, বাস্তব কার্য্যতৎপরতা চিন্তাশক্তি নাই। ইহাঁরা প্রায়শঃ পাশ্চাত্য রাজনীতি ও অর্থনীতির বাঁধা বুলিগুলি আওড়াইয়া থাকেন, অথচ সেই বুলিগুলির মধ্যে জন-সাধারণের প্রকৃত মঙ্গল-সাধনকর কোন পদার্থ আছে কি না, তাহা তুলিয়াও চিন্তা করেন না। এই নেতৃবর্গ সময় সময় স্বাধীন চিন্তার প্রয়োজনীয়তার কথা উচ্চারণ করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু ইহাঁদিগের কাহারও চিন্তায় প্রায়শঃ বিন্দুমাত্র স্বাধীনতাও পরিলক্ষিত হয় না। ইহাঁরা কার্য্যতঃ ইংরাজী শিক্ষা ও ইংরাজী সভ্যতার দাসানুদাস। ইহাঁদিগের কথানুসারে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জ্জন করা কংগ্রেসের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু ইহাঁরা বুঝিতে পারেন না যে, ইংরাজের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিয়া তাহা হইতে মুক্ত হইতে হইলে ইংরাজের শিক্ষা ও সভ্যতা হইতে সম্পূর্ণতর শিক্ষা ও সভ্যতা অর্জ্জন করা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়। ইংরাজের শিক্ষা ও সভ্যতা অনুসরণ করিলে ইংরাজদিগের শিষ্য হইয়া জীবনযাপন করিতে হয় এবং কোন শিষ্য কখনও গুরুর অধীনতা-পাশ নৈতিকভাবে ছিন্ন করিতে সমর্থ হয় না। ইংরাজী ধরণে কথা কহিব, ইংরাজী কায়দায় চলা-ফেরা করিব, ইংরাজী নিয়মে খাওয়া-দাওয়া করিব, ইংরাজের অন্ধ অনুকরণে ঘর-বাড়ী প্রস্তুত করিব এবং আসবাবের আয়োজন করিব, ইংরাজের চিন্তা বিভিন্ন ভাষায় ও ভঙ্গীতে বমন করিয়া চিন্তাশীল বলিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিবার চেষ্টা করিব, আর ভারতবর্ষ স্বাধীন হইয়া যাইবে, ইহা কখনও হইতে পারে না এবং হইবে না। ইংরাজের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিয়া বিশ্ব-কার্য্য-ক্ষেত্রে তাহার সমান আসন লাভ করিতে হইলে চিন্তা ও সংগঠন-বিদ্যা যাহাতে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও কার্য্যপ্রসূ হয়, তাহা সর্ব্বাগ্রে করিতে হইবে।

অনেকে হয়ত তর্ক করিবেন যে, ইংরাজের চিন্তায় ও সংগঠন-বিদ্যায় যাহা কিছু ভাল আছে, তাহা গ্রহণ না করা এবং বর্জ্জন করা গোঁড়ামীর পরিচয়। ইংরাজের চিন্তা, সংগঠন-বিদ্যা অথবা কার্য্য-নীতি যদি সম্পূর্ণভাবে দোষ-

মুক্ত হইত, তাহা হইলে উহা গ্রহণ না করা অথবা বর্জ্জন করার কথায় গোঁড়ামীর পরিচয় পাওয়া যাইত তাহা সত্য, কিন্তু তাহা হইলে ইংরাজের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিবার অথবা স্বাধীনতা অর্জ্জন করিবার কোন কথাই উঠিতে পারিত না; কারণ, ভারতবর্ষের জনসাধারণ ইংরাজের শাসনে সম্পূর্ণভাবে সন্তুষ্ট থাকিতে পারিত। ইংরাজের চিন্তা, সংগঠন-বিদ্যা এবং কার্য্য-নীতি যদি সম্পূর্ণভাবে, দোষমুক্ত হইত, তাহা হইলে কি করিয়া ভারতবর্ষের প্রত্যেককে সন্তুষ্ট রাখিতে হয়, ভারতবর্ষের প্রত্যেকে কি করিয়া অধিক সমস্যা, স্বাস্থ্য-সমস্যা এবং অশান্তি-সমস্যার হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে, তাহার পন্থা ইংরাজ আবিষ্কার করিতে পারিত এবং ভারতবর্ষের প্রত্যেকেই ইংরাজ-শাসনের প্রতি সন্তুষ্ট থাকিতে পারিত। বস্তুতঃ পক্ষে পাশ্চাত্য চিন্তা, সংগঠন-বিদ্যা ও কার্য্যনীতি প্রায়শঃ সম্পূর্ণভাবে দোষ-মুক্ত। ইহা তাঁহাদিগের কাহারও ব্যক্তিগত অপরাধ নহে। ব্যক্তিগত হিসাবে তাঁহাদিগের প্রায় প্রত্যেকের মধ্যে নিন্দনীয় অনেক কিছু আছে তাহা সত্য, কিন্তু তাঁহাদিগের ঐ নিন্দনীয়তা থাকা সত্ত্বেও তাঁহারা ভারতবাসী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রায় প্রত্যেকের তুলনায় প্রশংসার যোগ্য। তাঁহাদিগের চিন্তা, সংগঠন-বিদ্যা ও কার্য্যনীতি প্রায়শঃ সম্পূর্ণভাবে দোষ-মুক্ত বলিয়াই জগতের প্রত্যেক দেশে অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব ও শান্তির অভাবের জ্বালা দাউ দাউ করিয়া বৃদ্ধি পাইতেছে এবং তাঁহাদিগের শত চেষ্টা সত্ত্বেও উহার নির্ব্বাপণ করা সম্ভবযোগ্য হইতেছে না। ইংরাজদিগের চিন্তা, সংগঠন-বিদ্যা ও কার্য্যনীতি সম্পূর্ণভাবে দোষ-মুক্ত হইবার কারণ তাঁহাদিগের বিজ্ঞান ও সভ্যতার ত্রুটী। যে বিজ্ঞান ও সভ্যতার জন্য পাশ্চাত্য-গণ বড়ত্বের অভিমান পোষণ করিয়া থাকেন এবং যাহা শিক্ষা করিয়া ভারতবাসিগণ শিক্ষিতের গৌরব অর্জ্জন করিয়াছেন বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, সেই বিজ্ঞান ও সভ্যতা যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, গোড়াতেই গলদ রহিয়া গিয়াছে এবং ঐ গলদের জন্যই ইংরাজ আজ ভারতবর্ষে অপ্রিয় ও ভারতবাসিগণ ইংরাজের অধীনতা পাশে ছিন্ন করিবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হইয়াছে।

কংগ্রেসের নেতৃবর্গের মধ্যে কেহই এই সহজ কথাগুলি বুঝিতে পারেন না বলিয়া তাঁহারা ইংরাজী বিজ্ঞান ও ইংরাজী সভ্যতা অর্জ্জন করিয়া নিজদিগকে প্রকৃতভাবে শিক্ষিত ও সভ্য বলিয়া মনে করিয়া থাকেন এবং ঐ শিক্ষা ও সভ্যতা দেশের মধ্যে বিলাইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। ইহার ফলে যদিও ইঁহারা মুখে দেশের স্বাধীনতার কথা বলিয়া থাকেন, কিন্তু বাস্তব পক্ষে ইঁহা-দিগের কার্য্যের ফলেই দেশ অধিকতর পরাধীন ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া পড়িতেছে এবং দেশের প্রত্যেক স্তরের লোক অধিকতর অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব ও শান্তির অভাবে উত্তরোত্তর জর্জ্জরিত হইতেছে।

আমাদিগের উপরোক্ত কথাগুলি যে বর্ণে বর্ণে সত্য, তাহা যে-কোন কংগ্রেস-নেতার যে-কোন কথা তলিয়া পাঠ করিলে স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়।

গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী মিঃ শরৎচন্দ্র বসু মহাশয় বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অধিবেশনের সভাপতিরূপে জলপাইগুড়িতে যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছেন, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া আমরা এই সম্বন্ধে আমাদিগের উপরোক্ত কথাগুলির সত্যতা প্রমাণিত করিবার চেষ্টা করিব।

এই অভিভাষণে মিঃ বসু মহাশয়ের বক্তব্য বিষয় নিম্নলিখিত ত্রয়োবিংশতি :—

(১) বাংলার বৈশিষ্ট্য।
(২) বাংলার বৈশিষ্ট্য ও ভারতীয় ঐক্যে সামঞ্জস্য রাখিবার প্রয়োজনীয়তা।
(৩) বৈরতন্ত্র ও সাম্যবাদে সংঘাতের অনিবার্য্যতা।
(৪) জগতের সাম্যবাদিগণের নিকট কংগ্রেসের ঘোষণাপত্র।
(৫) ঘোষণাপত্রে ভারতবর্ষের দাবী জ্ঞাপন।
(৬) জাতীয় জীবনে দ্বিতিশীলতা ও নিষ্ক্রিয়তার ব্যর্থতা।
(৭) কংগ্রেসের চির উদ্যমশীলতা।
(৮) কংগ্রেসের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য পূর্ণ স্বরাজ লাভ।
(৯) প্রাদেশিক শাসন।
(১০) পূর্ণ স্বরাজের আদর্শ লইয়া ফেডারেশনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

(১১) ফেডারেশনের দ্বৈত শাসন।
(১২) আন্তর্জাতিক অবস্থা।
(১৩) অর্থ-নৈতিক অবস্থা উন্নত করা প্রয়োজন।
(১৪) মত-বিরোধের আশঙ্কা অবান্তর।
(১৫) বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করিবার দাবী অযৌক্তিক।
(১৬) ভাষার ভিত্তিতে বাংলাদেশ গঠন।
(১৭) প্রাদেশিক চাকুরী।
(১৮) বাংলার সমস্যা।
(১৯) বাংলার মন্ত্রিমণ্ডলের কার্যের হিসাব-নিকাশ।
(২০) রাজবন্দীদের মুক্তি-প্রচেষ্টা।
(২১) বাংলায় কংগ্রেসদলের মন্ত্রিমণ্ডল গঠন প্রয়োজন।
(২২) হিন্দু-মুসলমান সমস্যা।
(২৩) চাকুরীতে সাম্প্রদায়িক অনুপাত।

বাংলার বৈশিষ্ট্য

বাংলার বৈশিষ্ট্যের প্রসঙ্গে মিঃ বসু অনেক কথা বলিয়াছেন বটে, কিন্তু বাংলার বৈশিষ্ট্য যে কোন্ কোন্ বস্তুতে অথবা কোন্ কোন্ অবস্থায়, তৎসম্বন্ধে তিনি একটী কথাও বলেন নাই।

এই প্রসঙ্গে তাঁহার উপসংহারের কথা—

"ভারতবর্ষের কথা ভাবিলেই বাংলাকে ভুলিতে হইবে, এরূপ ধারণার কোন বাস্তব ভিত্তি নাই।" তাঁহার ঐ উপসংহারের যুক্তি তিনি নিম্নলিখিত ভাবে প্রদান করিয়াছেন :—

"যুক্তরাষ্ট্র বা ফেডারেশনই ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের রূপ, এ বিষয়ে কোন মতভেদ নাই। এই যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যেকটি অংশকে স্থানীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিতে দেওয়া হইবে—শুধু বজায় রাখিতে নয়, স্থানীয় বৈশিষ্ট্যকে পূর্ণ বিকশিত করিয়া নিখিল-ভারতীয় সভ্যতার একটা বিশেষ রূপ পর্য্যন্ত সৃষ্টি করিতে দেওয়া হইবে, এই নীতি কংগ্রেস কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। ঐক্যের মধ্যে বিচিত্রতা ও বিভেদের মধ্যে সমন্বয়, এই দুইই ভারতবর্ষে অনিবার্য্য।"

মিঃ বসুর উপরোক্ত উপসংহার এবং তাহার যুক্তি, এই দুইই পাশ্চাত্য ভাবধারার উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহার কোনটীই সমীচীন নহে।

স্বভাবের নিয়মানুসারে প্রত্যেক যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যেকটি অংশে কোন না কোনরূপ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে তাহা সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া যদি প্রত্যেকটি অংশের মানুষ স্ব স্ব অংশের বৈশিষ্ট্যের কথায় বিভোর থাকে, তাহা হইলে কোন বাস্তব যুক্তরাষ্ট্র সংগঠিত করা সম্ভব হয় না। মানুষকে "মানুষ" নামের যোগ্য হইতে হইলে ব্যক্তিগতভাবে কি কি লইয়া স্বকীয় বৈশিষ্ট্য, তাহা নিরূপণ করিতে হইবে এবং তদনুসারে নিজেকে সংগঠিত করিতে হইবে তাহা সত্য; কারণ, আত্মপরীক্ষার দ্বারা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করিতে না পারিলে আত্মগঠন করা সম্ভব হয় না। কিন্তু, তাই বলিয়া মানুষ যদি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের কথায় বিভোর থাকে, তাহা হইলে তাহার পক্ষে কখনও বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে যে সমতা বিদ্যমান আছে, তাহা উপলব্ধি করা, অথবা যথার্থভাবে "সাম্যবাদী" হওয়া সম্ভব হয় না। মিঃ বসুর বক্তৃতা বিশ্লেষণ করিলে তিনি যে নেতা হইবার মত বুদ্ধিমান্ অথবা অহঙ্কারশূন্য নহেন, তাহা সহজেই প্রতিভাত হয়। কাজেই তাঁহার পক্ষে উপরোক্ত বৈজ্ঞানিক সত্যটি বুঝা সম্ভব হইবে বলিয়া আমাদিগের মনে হয় না। পাঠকবর্গের মধ্যে যদি কেহ ভাবুক থাকেন, তাহা হইলে তিনি দেখিতে পাইবেন যে, মিঃ বসু ও তাঁহার সম্প্রদায় উহা বুঝুন আর নাই বুঝুন, ঐ কথাটি বাস্তব সত্য।

"ঐক্যের মধ্যে বিচিত্রতা ও বিভেদের মধ্যে সমন্বয়", এই দুইটি কেবলমাত্র ভারতবর্ষে অনিবার্য্য নহে। চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিবার শক্তি অর্জ্জন করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, উহা জগতের প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে, প্রত্যেকটি দেশের মধ্যে অনিবার্য্য। যাহার মধ্যে বায়ু, রস এবং তেজের খেলা নাই, এমন একটিও প্রকৃতিজাত বস্তু কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যাইবে না, অথচ ঐ তিনের অদল-বদল ও সংযোগ (permutation and combination) সর্ব্বতোভাবে সমান রহিয়াছে, এমন দুইটী বস্তু কুত্রাপি দেখা যাইবে না। বায়ু, রস ও তেজের বিভিন্নতা লইয়া বস্তু, জীব ও স্থানের ঐক্য, অথবা সমানতা

এবং ঐ তিনের অদল-বদল ও সংযোগের (permutation and combination) পার্থক্য লইয়া বস্তু প্রভৃতির বিচিত্রতা অথবা বৈশিষ্ট্য। এই নিয়মের ব্যভিচার কুত্রাপি নাই। মানুষকে মানুষের মত হইতে হইলে উপরোক্ত সমানতা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়া "সাম্যবাদী" হইতে হইবে। কাযেই বাঙ্গালীকে শুধু বাঙ্গালী কেন, প্রত্যেক মানুষকে মানুষের মত হইতে হইলে স্বকীয় দেহাভ্যন্তরস্থ বায়ু, তেজ ও রসের অদল-বদল ও সংযোগে (permutation and combination-এ) বৈশিষ্ট্য কোথায়, তাহা সাধনার দ্বারা উপলব্ধি করিয়া আত্ম-গঠন করিতে হইবে বটে, কিন্তু জাতীয় ভাবে ও কার্য্যে বাঙ্গালার কথায় ও এমন কি ভারতবর্ষের কথায় পর্য্যন্ত বিভোর হইলে চলিবে না। বাংলার কথা ও ভারতবর্ষের কথা ভুলিয়া গিয়া মনুষ্য-সমাজের একজন হিসাবে সমগ্র মনুষ্য-সমাজের কথা ভাবিতে না পারিলে জাতীয় ভাব ও কার্য্য-সম্বন্ধীয় কর্ত্তব্য কখনও নিষ্পন্ন করা সম্ভব হইবে না।

মিঃ বসু ও তাঁহার কংগ্রেস-মনা ব্যক্তিগণ উপরোক্ত সত্যটি যে পরিজ্ঞাত নহেন, তাহা আমরা জানি। তাঁহারা ঐ সত্যটি পরিজ্ঞাত নহেন বলিয়াই তাঁহাদিগের কার্য্যে দেশের ও দশের সর্ব্বনাশ সাধিত হইতেছে। তাঁহাদিগের গুরু পাশ্চাত্যগণের কোন দার্শনিক অথবা বৈজ্ঞানিক ঐ সত্যটী পরিজ্ঞাত হইতে পারেন নাই বলিয়া, কংগ্রেস-মনা ব্যক্তিগণের নিকটও উহা অপরিজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে। জীব ও বস্তুর বৈশিষ্ট্য ও সমতার ধর্ম্ম ও কারণ কি কি, তাহা নিখুঁত ভাবে পরিজ্ঞাত হইতে পারিয়াছিলেন একমাত্র ভারতীয় ঋষি এবং তাঁহারা উহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন তাঁহাদিগের "বৈশেষিক দর্শনে"। "বিশেষ" অথবা "বৈশিষ্ট্যের" ধর্ম্ম অথবা কারণ কি কি, তাহা ঐ গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে বলিয়া উহার নাম হইয়াছে বৈশেষিক দর্শন। এই দর্শনখানি যথাযথ অর্থে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ বৈচিত্র্য অথবা বৈশিষ্ট্য ও সমানতা অথবা ঐক্য সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহার প্রত্যেক কথাটি বালকোচিত এবং তাহা কোনক্রমেই গ্রাহ্যনীয় নহে। পাশ্চাত্য দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণের এতাদৃশ অজ্ঞতার জন্যই মানব-সমাজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত টলটলায়মান হইয়া পড়িয়াছে।

যাঁহারা "বাঙ্গালী" "বাঙ্গালা" অথবা "হিন্দু" "হিন্দু", এতাদৃশ প্রাদেশিক কথায় বিভোর হইয়া থাকেন, তাঁহারা যেই হউন, আধুনিক দর্শন ও বিজ্ঞানক্ষেত্রে তাঁহারা যতই খ্যাতি লাভ করুন, প্রকৃত দর্শন ও বিজ্ঞানক্ষেত্রে বালক এবং তাঁহাদিগের উপদেশ বিপথগামিতার সহায়ক, এই কথাটি বাঙ্গালীকে সর্ব্বপ্রথমে বুঝিতে হইবে।

এই কথাটি যতদিন পর্য্যন্ত বুঝা সম্ভব না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত যুবকগণের বেকার অবস্থা ও অনাহার-ক্লেশ সর্ব্বতোভাবে দূর করা কিছুতেই সম্ভব হইবে না।

মিঃ শরৎচন্দ্রের বক্তৃতা যে শুধু দার্শনিক ক্ষেত্রে অজ্ঞতার পরিচায়ক তাহা নহে, স্বাধীনভাবে ইতিহাস বুঝিবার ক্ষমতাও যে তাঁহার নাই, তাহাও এই বক্তৃতায় ফুটিয়া বাহির হইয়াছে।

"বাংলার বৈশিষ্ট্য" প্রসঙ্গে একস্থানে তিনি বলিয়াছেন—

"ভারতবর্ষ দ্রুতগতিতে ঐক্যের দিকে চলিয়াছে, বহুশত বৎসর পূর্ব্বে, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসের আরম্ভকালে যে ঐক্যের সূচনা হইয়াছিল, যে ঐক্য যুগে যুগে পূর্ণ হইতে পূর্ণতর হইয়া চলিয়াছে, তাহাকে সম্পূর্ণ ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার ভার আমাদিগের উপর।"

ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস যথাযথভাবে আলোচনা করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, উপরোক্ত কথার একটীও সত্য নহে।

ভারতবর্ষ গত বিশ বৎসর হইতে দ্রুতগতিতে যে অনৈক্যের দিকে চলিয়াছে, তাহা চক্ষু থাকিলে কখনও অস্বীকার করা যায় না। লিখিত ইতিহাসে আত্ম-কলহ ও অনৈক্যের কালিদাসের দৃষ্টান্ত যেরূপ সমুজ্জ্বল, ঐক্যের তাদৃশ দৃষ্টান্ত আধুনিক ইতিহাসে কুত্রাপি পাওয়া যাইবে না। কাযেই যুক্তি অনুসরণ করিলে বলিতে হইবে যে, মিঃ শরৎচন্দ্র হয় অন্ধ ও মনুষ্যাবয়বযুক্ত হইয়াও কাণ্ড-জ্ঞানহীন, নতুবা সত্যের অপলাপ করিতে কুণ্ঠাহীন। আমাদিগের মনে হয়, বর্ত্তমান বাঙ্গালী যুবকগণ কাণ্ডজ্ঞানহীন অথবা অত্যন্ত মিথ্যাভাষণপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছে।

হাত সুন্দোপসুন্দ উপাখ্যান

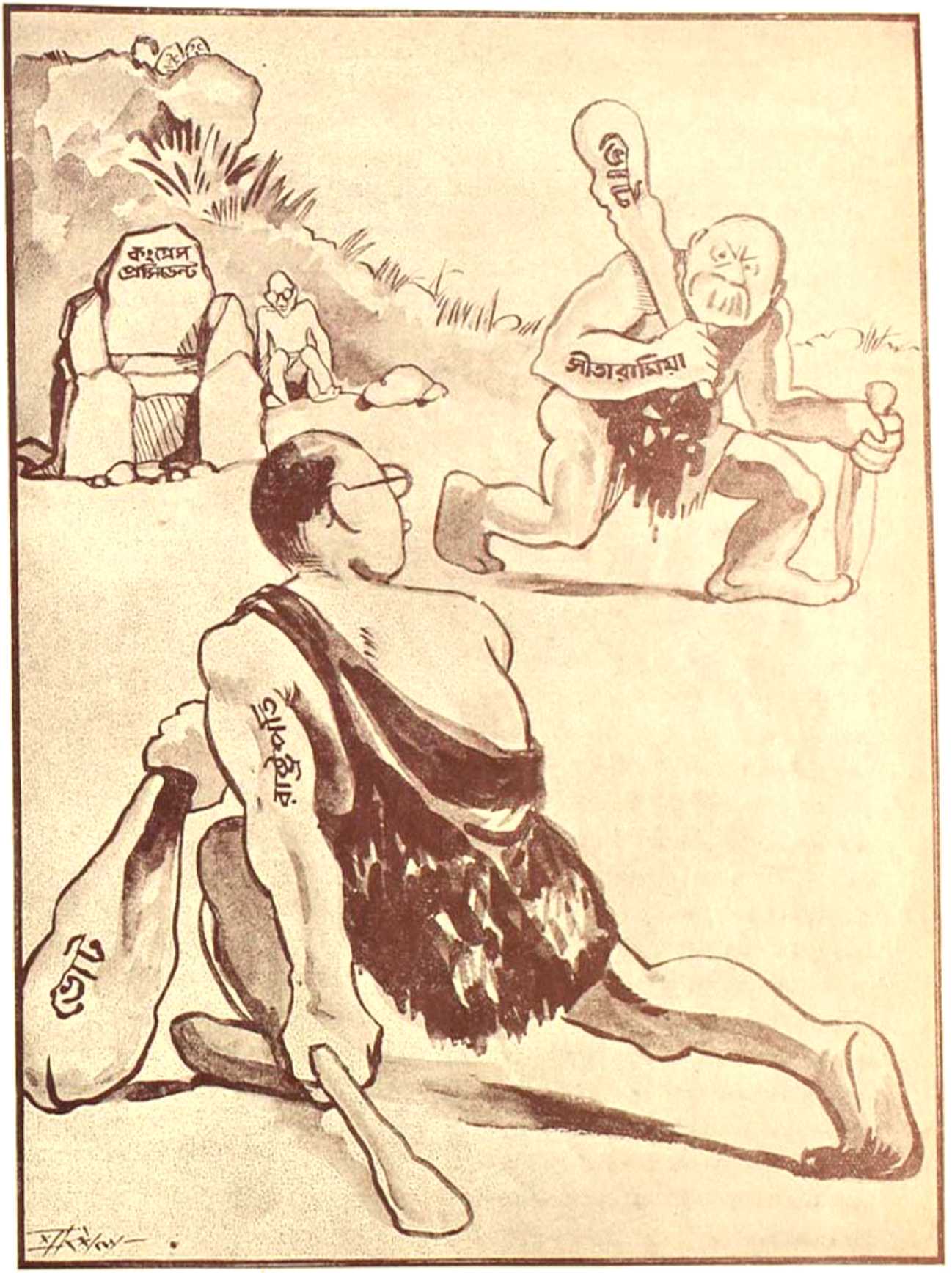

"যুযুধাতেঽতিসংরব্ধৌ প্রহারৈরতিদারুণৈঃ॥"

তাই তাহারা মিঃ শরৎচন্দ্রের মত মানুষকে নেতৃত্ব-পদে বরণ করিতে কুণ্ঠাবোধ করে না।

মিঃ শরৎচন্দ্রকে অথবা বাঙ্গালী যুবককে আমরা গঞ্জিকাসেবীর দলভুক্ত বলিয়া অভিহিত করিতে পারি না, কারণ, তাহা বর্ত্তমান আইনানুসারে অপরাধ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে এবং তাঁহারা যে প্রকৃতপক্ষে গঞ্জিকাসেবী তাহার কোন প্রমাণও নাই। আমাদিগের মনে হয়, বাঙ্গালী যুবকগণ গঞ্জিকাসেবীর মত অসার বুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে, তাই তাহারা অতবড় অসত্যপ্রসূত মিথ্যা কথাগুলিকে মানিয়া লইতে সঙ্কোচ বোধ করে না।

বাংলার বৈশিষ্ট্য ও ভারতীয় ঐক্যে সামঞ্জস্য রাখার প্রয়োজনীয়তা

এই প্রসঙ্গের উপসংহারে মিঃ বসু বলিয়াছেন—

"সুতরাং সর্ব্বাবস্থায় ও সর্ব্বকালে বাঙ্গালীকে নিখিল ভারতের সহিত সংহতি ও সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতে হইবে।"

এই উপসংহারের যুক্তি—

"আজিকার দিনে শুধু বাঙ্গালী জাতীয়তা লইয়া থাকিবার চেষ্টা করিলে, যুগধর্ম্মকে অস্বীকার করা হইবে। উহা সম্ভবও নহে, উচিতও নহে।"

মিঃ বসুর উপরোক্ত দুইটী কথা খুবই ঠিক। কিন্তু ঐ দুইটী কথা যে তিনি তলাইয়া চিন্তা করিয়া বলিয়াছেন তাহা আমাদিগের মনে হয় না। ঐ দুইটি কথা তিনি তলাইয়া চিন্তা করিলে পূর্ব্ব প্রসঙ্গের উপসংহারে উপনীত হইতে পারিতেন না।

বাঙ্গালীকে মনুষ্যোচিত হইতে হইলে নিজ কার্য্যক্ষমতা ও কার্য্য-প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ করিবার জন্য স্বকীয় বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তাহাকে মনে মনে সজাগ থাকিতে হইবে বটে, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে ও কার্য্যকালে বাঙ্গালী ও ভারতীয় ভাব সম্পূর্ণভাবে বিসর্জ্জিত করিয়া মনুষ্যসমাজের একজন বলিয়া অনুপ্রাণিত হইতে হইবে। মনুষ্যসমাজের একজন বলিয়া অনুপ্রাণিত না হইতে পারিলে কোন বাঙ্গালীর পক্ষে কখনও তাহার বাঙ্গালীর কর্ত্তব্য অথবা ভারতীয়ের কর্ত্তব্য সর্ব্বতোভাবে নিষ্পন্ন করা সম্ভব হইবে না। বাঙ্গালী ভাব অথবা ভারতীয় ভাব যাহার যত ফুটিয়া উঠিবে, ততই মনুষ্যোচিত ভাব, অর্থাৎ সে যে সমগ্র মনুষ্য-সমাজের একজন, এই ভাব হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে। সর্ব্বাবস্থায় ও সর্ব্বকালে বাঙ্গালীকে নিখিল-ভারতের সহিত সংহতি ও সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতে হইবে তাহা সত্য এবং তজ্জন্য বাঙ্গালার সহিত সমগ্র ভারতের ও সমগ্র মনুষ্য-সমাজের যে যে আকাঙ্ক্ষার সমানতা রহিয়াছে, সেই সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার জন্য কাযে ব্রতী হইতে হইবে তাহাও সত্য, কিন্তু বাঙ্গালার যে যে আকাঙ্ক্ষা সমগ্র ভারতের ও সমগ্র মনুষ্য-সমাজের আকাঙ্ক্ষা হইতে পৃথক্, সেই সেই আকাঙ্ক্ষা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিতে না পারিলে বাঙ্গালীর পক্ষে নিখিল-ভারতের সহিত সংহতি ও সামঞ্জস্য রাখিয়া চলা কখনও সম্ভব হইবে না। কাযেই বলিতে হইবে যে, বাঙ্গালার কায করিতে হইলে নিখিল-ভারতের কায করিতে হইবে এবং নিখিল-ভারতের কায করিতে হইলে সমগ্র মনুষ্য-সমাজের কায করিতে হইবে এবং সমগ্র মনুষ্য-সমাজের কায করিতে হইলে, বাঙ্গালার যে যে আশা ও আকাঙ্ক্ষা সমগ্র মনুষ্য-সমাজের, অথবা নিখিল-ভারতের আশা ও আকাঙ্ক্ষা হইতে পৃথক্, সেই সেই আশা ও আকাঙ্ক্ষা, অথবা যাহা লইয়া বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য অথবা পৃথক্ত্ব, তাহা সর্ব্বতোভাবে বিসর্জ্জিত করিতে হইবে।

রাজনীতি, অথবা অর্থনীতি সম্বন্ধে মিঃ বসুর যদি কোন কাণ্ডজ্ঞান অথবা চিন্তাশীলতা থাকিত, তাহা হইলে তিনি উপরোক্ত কথাগুলি যুবকগণের সম্মুখে স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারিতেন। আমাদিগের মতে অন্যায়ভাবে যাঁহারা মক্কেলের স্বার্থ সাধন করিবার নামে রামের ধন শ্যামকে দিবার যুক্তিজাল বিস্তার করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন না, সেই ব্যারীষ্টারগণের প্রকৃত কাণ্ড-জ্ঞান থাকা সম্ভব নহে এবং আধুনিক সমাজ এতাদৃশ ব্যারীষ্টারগণের নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে সঙ্কোচ বোধ করে না বলিয়া উহা এতাদৃশ বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। মানুষ যখন আবার উন্নতিমুখী হইবে, তখন এতাদৃশ ব্যারীষ্টারগণ যে সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতার একটি বড় কারণ ও তদনুসারে ঘৃণার্হ, তাহা সর্ব্বপ্রথমে বুঝিতে পারিবে। প্রকৃত উন্নতিমুখী হইতে হইলে খ্যাতনামা কোন ব্যারীষ্টার অথবা উকিল যাহাতে

তাঁহার কৃতকার্য্যের জন্য অনুতাপ প্রকাশ না করিয়া সমাজের কোনরূপ নেতৃত্ব না পান, তজ্জন্য সজাগ থাকিতে হইবে, কারণ খাতনামা ব্যারীষ্টার ও উকিলগণই দেশের ধন শ্রমিকের নিকট হইতে মূলিজাল বিস্তারকার্য্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পটুতার পরিচয় দিয়া থাকেন।

বৈরতন্ত্র ও সাম্যবাদে সংঘাত অনিবার্য্য

এই প্রসঙ্গে মিঃ বসু যে যে কথা বলিয়াছেন, তন্মধ্যে চারিটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :—

> আমি মনে করি, সমগ্র জগতের স্বাধীনতা-কামিগণের সহযোগিতা সত্যই আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনকে পুষ্ট এবং শক্তিমান্ করিবে।
>
> আজ পৃথিবীর যে তিন চারিটী দেশে জাতি-স্বাতন্ত্র্য ও স্বয়ং-পূর্ণতার আদর্শ অত্যন্ত উগ্র রূপ ধরিয়া দেখা দিয়াছে, উহারাও ঐ কথা জানে এবং জানে বলিয়াই জাতীয় গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া সমস্ত পৃথিবীর স্বেচ্ছাতান্ত্রিক সাম্রাজ্য-বাদিগণকে মিলিত করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে।
>
> এই বৈরতন্ত্রকে ঠেকাইয়া রাখিতে হইলে জগতের সকল স্বাধীনতাবাদী সাম্যবাদিগণকেও সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে।

(৪) সেই জন্য সমগ্র জগতের স্বাধীনতাকামীদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া একযোগে কাজ করিবার ব্যবস্থা এখন হইতেই আমাদিগকে করিতে হইবে।

মিঃ বসুর উপরোক্ত চারিটী কথাও মনস্তত্ত্ব এবং রাষ্ট্র-বিষয়ক জ্ঞানের অসম্পূর্ণতার পরিচায়ক।

অধুনা স্বাধীনতা বলিতে যাহা বুঝায়, তদনুসারে স্বাধীনতাকামী হইলে স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে অপর দেশের লোকের সঙ্গে মিলিবার চেষ্টা করা সম্ভব হইতে পারে বটে এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে মিলনের একটা অভিনয়ও হইতে পারে বটে, কিন্তু অকৃত্রিম মিলন কখনও সম্ভব হয় না। জগতের যে যে দেশ স্বাধীনতাকামী, সেই সেই দেশ স্বকীয় স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য বাহ্যিকভাবে ভারতবর্ষের সহিত সহযোগিতার ভাণ করিলেও করিতে পারে বটে, কিন্তু আধুনিক স্বাধীনতার এমনই স্বভাব যে, স্বার্থের কোন সংঘর্ষ উপস্থিত হইলেই সংঘর্ষ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে।

ভারতবর্ষের অর্থ-সমস্যা ও বেকার-সমস্যা সমাধান করিতে হইলে যাহাতে সমগ্র জগতের সহিত সম্মিলিত হইয়া অকৃত্রিম ভাবে একযোগে কার্য্য করা সম্ভব হয়, তদনুরূপ কার্য্যসূত্র গ্রহণ করিবার প্রয়োজনীয়তা আছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা করিতে হইলে স্বাধীনতাকামী ও সাম্রাজ্যবাদীনির্ব্বিশেষে সকলের সহিত মিলিত হইবার চেষ্টা করিতে হইবে। সাম্রাজ্যবাদীদিগের প্রতি অথবা কাহারও প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিলে প্রকৃতভাবে সাম্য-বাদী হওয়া যায় না এবং এমন কি স্বাধীনতাকামিগণের সহিতও অকৃত্রিম সহযোগিতা সম্ভব হয় না। ভারতবর্ষের অর্থ-সমস্যা ও বেকার-সমস্যা সর্ব্বতোভাবে দূর করিতে হইলে যাহাতে সমগ্র মানব-সমাজের অর্থ-সমস্যা ও বেকার-সমস্যা দূর করা সম্ভব হয়, সর্ব্বাগ্রে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে এবং তাহা করিতে হইলে ভারতবর্ষকে প্রকৃত সাম্য-বাদ গ্রহণ করিতে হইবে তাহা খুবই সত্য, কিন্তু প্রকৃত সাম্যবাদ গ্রহণ করিতে হইলে আধুনিক স্বাধীনতার কামনা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিতে হইবে। যাহাতে জগতের প্রত্যেক দেশের মানুষ অধিক স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে, তাহার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলে প্রকৃত সাম্যবাদী হওয়া সম্ভব হয়। তাহা না করিয়া যাহাতে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার মন্ত্র প্রসার লাভ করে, তাহার চেষ্টা করিলে প্রকৃত ও অকৃত্রিম সাম্যবাদ কখনও স্থান পাইতে পারে না। আধুনিক রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা-বাদ ও অকৃত্রিম সাম্য-বাদ কখনও এক স্থানে পরিপুষ্টি লাভ করিতে পারে না। আধুনিক স্বাধীনতাকামী হইয়াও যাঁহারা সাম্যবাদের কথা কহিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের সাম্যবাদ বাহ্যিক। উহা কখনও অকৃত্রিম হইতে পারে না। স্বাতন্ত্র্য ছাড়া কখনও আধুনিক স্বাধীনতার কার্য্যে অগ্রসর হওয়া যায় না। স্বাতন্ত্র্য ও সাম্যবাদ সর্ব্বদাই বিরুদ্ধধর্ম্মী। মিঃ বসুর রাজনীতি-জ্ঞান নিতান্ত অসার ও কলেজের

বালকোচিত বলিয়াই তিনি স্বাধীনতাবাদী সাধারণদিগের লক্ষ্যবস্তু হইবার আশা পোষণ করিতে পারেন।

স্বৈরতন্ত্র যত অনন্তের বলিয়া আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, প্রকৃত স্বৈরতন্ত্র তত অনন্তের নহে। মানুষ এক্ষণে বুঝুক, আর নাই বুঝুক মানব-সমাজের আধুনিক সমস্যাসমূহের সমাধান করিতে হইলে একদল প্রকৃত স্বৈরতান্ত্রিক মানুষের উদ্ভব অনিবার্য্য হইয়া পড়িবে। যে মন্ত্রে অথবা কার্য্যসূত্রে মানব-সমাজের অর্থাভাব, অন্নাভাব ও বেকার-সমস্যাসমূহ দূর করা সম্ভব, সেই মন্ত্র অথবা কার্য্য-সূত্র মানব-সমাজের প্রত্যেকের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে বুঝিয়া উঠা কখনও সম্ভব হইবে না; উহা এমন কি প্রথাতনামা বন্ধু-ভ্রাতৃত্বয়ের মত মস্তিষ্কেও কখনও স্থান পাইবে কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ আছে। কাযেই তাঁহারা গরীবের দুঃখে অকৃত্রিম ভাবে আপ্লুত হইয়া ঐ মন্ত্র প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতে পারিবেন, তাঁহারা বন্ধু-ভ্রাতৃত্বয়ের মত কলহ-প্রিয় অবোধ মানুষগুলিকে উপেক্ষার চক্ষে দেখিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে বাধ্য হইবেন।

ইহার ফলে স্বৈরতান্ত্রিকতার উদ্ভব হওয়া অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িবে এবং পরতঃপক্ষকাতর প্রকৃত কার্য্য-কুশল স্বৈর-তান্ত্রিক মানুষের পক্ষে জন-প্রিয় হওয়ার বিরুদ্ধে কেহ বাধা প্রদান করিতে সক্ষম হইবে না।

কোন্ কার্য্যসূত্রের দ্বারা মানবসমাজের অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব, শান্তির অভাব দূর হইতে পারে, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, জনতান্ত্রিকতা (democracy) কখনও মানবসমাজের জটীল সমস্যাসমূহ দূর করিতে সক্ষম হইতে পারে না। মানবসমাজে প্রকৃত বুদ্ধিমান্ ও কার্য্যকুশল কোন মানুষ বিদ্যমান থাকিলে জন-তান্ত্রিকতার কথা কখনও স্থান পায় না। সাধারণ মানুষের সহিত প্রকৃত বুদ্ধিমান্ ও কার্য্যকুশল মানুষের কখনও তুলনা হয় না। প্রকৃত বুদ্ধিমান্ ও কার্য্য-কুশল মানুষ প্রশংসার জন্য অথবা পুষ্পমালোর জন্য অথবা ভোটের জন্য কাহারও দ্বারস্থ হন না, অথচ স্বতঃপরতঃ হইয়া জনসমাজের প্রত্যেকেই প্রকৃত বুদ্ধিমান্ ও কার্য্য-কুশল মানুষের প্রতি অ-কৃত্রিম শ্রদ্ধা পোষণ করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান সময়ে যে জনতান্ত্রিকতার (democracy) উদ্ভাবনা এত প্রবাহিত, তাহা উপরোক্ত বুদ্ধিমান্ ও কার্য্যকুশল মানুষের অভাবের পরিচায়ক। বুদ্ধি বিষয়ে সকল মানুষই আধুনিক সমাজে প্রায় একশ্রেণীর হইয়া পড়িয়াছে, অন্ধের দল পরস্পরকে রাস্তা দেখাইবার কার্য্যের অভিনয় করিতেছে বলিয়াই জনতান্ত্রিকতা এই অন্ধের দলের এত প্রাণের বস্তু হইয়া পড়িয়াছে। এই অন্ধের দল বুঝিতে পারুক আর নাই পারুক, জীবকে রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বো-পরি তাহাদিগের অজানা আর একটী শক্তি সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছে। এই অন্ধের দল নিজ নিজ পাপের ফলে ধ্বংসমুখী হইয়া থাকে বটে, কিন্তু ঐ অজানা শক্তি সর্ব্বদাই মঙ্গল-ময়ের রূপ পরিগ্রহ করিয়া আছেন এবং তাঁহার বিদ্যমানতা বশতঃ এই অন্ধের দলকে পর্য্যন্ত সর্ব্বনাশ হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা সাধিত হইয়া থাকে। আজকাল জনতন্ত্র বলিতে যাহা বুঝায়, তদনুসারে এই সর্ব্ব-মঙ্গল-ময় কখনও জনতান্ত্রিক হন না। পরন্তু তিনি সর্ব্বদাই স্বৈর-তান্ত্রিকতা অবলম্বন করিয়া থাকেন। তিনি সর্ব্বাধিক জ্ঞানের আধার বলিয়া তাঁহার কাহারও সহিত কোন বিষয়ে পরামর্শ করিবার প্রয়োজন হয় না, অথচ তাঁহার অস্তিত্ব সর্ব্বদাই সর্ব্ববিধ জীবের স্বার্থসিদ্ধির জন্য। তাঁহার অস্তিত্ববশতঃ সকলের প্রাণেই সদসদ্বিবেচক কথার বীজ রোপিত হইয়া থাকে। অথচ নিজ নিজ পাপের ফলে মানুষ সদসৎ বিষয়ে অন্ধ হইয়া পড়ে। পাপের ভরা যখন পূর্ণ হয়, তখন আবার মানুষ "হা ভগবান্" বলিতে বাধ্য হইয়া থাকে। তখন আবার স্বৈরতান্ত্রিকতার উদ্ভব হয়।

জগতের ইতিহাস ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, অধুনা মানুষের পাপের ভরা পূর্ণ হইয়া আসিতেছে এবং এক্ষণে পুনরায় স্বৈর তান্ত্রিকতার উদ্ভব হওয়া কেহ বন্ধ করিতে পারিবে না। যাহারা পাপী, অন্ধ ও অত্যন্ত নাস্তিক, তাহারা ইহার বিরুদ্ধে চেষ্টা করিবে বটে, কিন্তু তাহাদিগের চেষ্টা অজ্ঞাত-কারণ বশতঃ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে।

মিঃ বসু যে তিন চারিটী দেশকে লক্ষ্য করিয়া জাতি-স্বাতন্ত্র্য ও স্বয়ং-পূর্ণতার আদর্শের কথা বলিয়াছেন, ঐ ঐ

দেশের প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে হইলে যে যে জ্ঞানের প্রয়োজন, সেই সেই জ্ঞান হইতে মিঃ বসু বঞ্চিত বলিয়া, তিনি তাঁহার শ্রোতৃবর্গকে অন্যায় কথাসমূহ শুনাইয়াছেন। জার্ম্মানীর হিটলার ও ইটালীর মুসোলিনীকে আপাতদৃষ্টিতে বৈরতান্ত্রিক বলিয়া মনে হয় বটে, কিন্তু তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বতোভাবের বৈরতান্ত্রিক নহেন। যে বুদ্ধি অথবা কার্য্য কুশলতা থাকিলে সর্ব্বতোভাবের বৈরতান্ত্রিক হওয়া সম্ভব হয়, সেই বুদ্ধি অথবা কার্য্যকুশলতার উদ্ভব এখনও হিটলার ও মুসোলিনীর মধ্যে হয় নাই। তাহারই জন্য তাঁহারা এখনও জার্ম্মানী অথবা ইটালীর জনসাধারণের কোন সমস্যাই আমূলভাবে পূরণ করিতে সক্ষম হন নাই।

জার্ম্মানী ও ইটালীর আধুনিক ইতিহাস যথাযথ ভাবে বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, ঐ ঐ দেশে কিছুদিন হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর পাপের রাজত্ব চলিয়া আসিতেছে এবং তাহাদিগের পাপের ভরা প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ইহারই জন্য পুনরুত্থান ঐ ঐ দেশে উঁকি-ঝুঁকি মারিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং বৈরতান্ত্রিকতাও উদ্গ্রোন্মুখী হইয়াছে। যে বুদ্ধি ও কার্য্যকুশলতা থাকিলে জনসাধারণের বিবিধ সমস্যা যথাযথভাবে পূরণ করা সম্ভব হয়, সেই বুদ্ধি ও কার্য্য-কুশলতা সমাকৃভাবে হিটলার ও মুসোলিনী এখনও লাভ করিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু মিঃ বসুর শ্রেণীর লোক তাঁহাদিগকে যত অবজ্ঞের বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা বাস্তবিক পক্ষে তত অবজ্ঞের নহেন। তাঁহারাই দুইজন বাস্তবিক পক্ষে বর্ত্তমান জগতের সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসনীয় শ্রদ্ধার্হ মানুষ। আজকালকার "উল্টা বুঝিলি রামের" দল তাঁহাদিগকে বুঝিতে পারে না বটে, কিন্তু জগৎ দেখিতে পাইবে যে, আগামী দশ বার বৎসরের মধ্যে সমগ্র জগৎ প্রায়শঃ তাঁহাদিগের পদানুসরণ করিবে। তাঁহাদিগের ব্যক্তিগত কার্য্য-কলাপ বিশ্লেষণ করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, উহা ভ্রমহীন নহে বটে, কিন্তু অকৃত্রিম জন-সর্ব্বস্বতার পরিচয় ঐ দুইজনের কার্য্যে যেরূপ পরিমাণে বিদ্যমান আছে, তাহা জগতের আর কাহারও কার্য্যে বিদ্যমান নাই। মিঃ বসুর শ্রেণীর লোক প্রাণহীন ও দম্ভযুক্ত বলিয়াই তাঁহাদিগের পক্ষে হিটলার ও মুসোলিনীর অতুলনীয় জন-প্রাণতা ও জন-সর্ব্বস্বতা বুঝিয়া উঠা সম্ভব হয় না।

মিঃ বসুর মতানুসারে বৈরতন্ত্র ও সাম্যবাদের সংঘাত অনিবার্য্য বটে, কিন্তু অদূরভবিষ্যতে মানুষ দেখিতে পাইবে যে, প্রকৃত সত্য উহার সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রকৃত বৈরতন্ত্র ও প্রকৃত সাম্যবাদই সর্ব্বদা মিলিত ভাবে বিদ্যমান থাকে এবং সংঘাত হয় আধুনিক স্বাধীনতাবাদ ও প্রকৃত সাম্যবাদের মধ্যে। আধুনিক স্বাধীনতাবাদের সহিত প্রকৃত সাম্যবাদের সংঘাত অনিবার্য্য। মানুষকে রক্ষা পাইতে হইলে বর্ত্তমান ভারতীয় কংগ্রেসের আধুনিক স্বাধীনতাবাদের মূল সর্ব্বতোভাবে উৎপাটিত করিতে হইবে। তাহা না করিয়া স্বাধীনতাবাদে উদ্বুদ্ধ হইলে মানুষের পক্ষে জেলে পচিয়া স্ব স্ব জীবনকে অসার করিয়া তোলা সম্ভব হইবে বটে, কিন্তু কাহারও আর্থিক সমস্যা ও বেকার-সমস্যার বিন্দুমাত্র লাঘব করাও সম্ভব হইবে না। মিঃ বসুর মত কাণ্ডজ্ঞানহীন লোকের পশ্চাতে যুবকগণ হৈ হৈ করিবে অথবা অর্থ-সমস্যা ও বেকার-সমস্যার সমাধানকল্পে কার্য্যে ব্রতী হইবে, তাহা তাহাদিগকে বাছিয়া লইতে হইবে। মিঃ বসুর মত কাণ্ডজ্ঞানহীন লোক যাহাতে কার্য্যক্ষেত্রের নেতৃত্ব হইতে অপসারিত হন, তাহা না করিতে পারিলে যুবকগণের অর্থাভাব ও বেকার অবস্থা অনিবার্য্য। "ডুচ্ ও টমাক" একসঙ্গে সেবন করা কখনও সম্ভব হইবে না। আমরা যুবকগণকে এখনও সাবধান হইতে অনুরোধ করি।

জগতের সাম্যবাদিগণের নিকট কংগ্রেসের ঘোষণা-পত্র ও ভারতবাসীর দাবী জ্ঞাপন

এই দুই প্রসঙ্গে মিঃ বসু যে যে কথা বলিয়াছেন, তাহার মূখ্য উদ্দেশ্য নিখিল-ভারতীয় কংগ্রেসের পক্ষ হইতে জগতের নিকট একটী বিজ্ঞপ্তি ঘোষণা করা। তাঁহার মতে এই বিজ্ঞপ্তিতে ভারতবর্ষের জনগণের প্রকৃত অবস্থা ও আন্তরিক অভিলাষ কি, তাহা জগতের সম্মুখে উপস্থিত করিতে হইবে। তিনি আশা করেন যে, কংগ্রেসের পক্ষ হইতে এই বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হইলে, আমেরিকান, অন্যান্য

বিদেশবাসী ও ভারতবাসীর সহায়তায় ব্রিটিশ শাসন-নীতির প্রশংসা প্রচার করিবার যে চেষ্টা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদিগণের পক্ষ হইতে অবিরত চলিতেছে, সেই চেষ্টা প্রতিরুদ্ধ হইবে এবং সমগ্র জগৎ ভারতবাসীর দুঃখে বিগলিত হইয়া অনতিবিলম্বে ভারতবাসিগণের স্বাধীনতা নামক বস্তুটী ইংরাজের কবল হইতে কাড়িয়া লইয়া ভারতবাসিগণকে প্রদান করিবে এবং ভারতবাসিগণ পুনরায় স্বাধীন হইয়া স্ত্রী-পুরুষে মিলিত হইয়া পাশ্চাত্যগণের মত নাচিতে নাচিতে হোটেল ও রেস্তোরাঁ আপ্লুত করিয়া তুলিবে।

আমাদিগের মতে মিঃ বসুর এই কল্পনা নিতান্ত নিন্দনীয়। একে ত আধুনিক জগতের কোন দেশে প্রকৃত সাম্যবাদ বিদ্যমান নাই, তাহার পর আবার স্বাধীনতা কেহ কাহাকেও দিতে পারে না, উহা হস্তান্তরিত করিবার বস্তু নহে। সুশিক্ষা ও সু-সাধনার দ্বারা মানুষের পক্ষে স্বাধীনতা লাভ করা সম্ভব-যোগ্য বটে, কিন্তু যে মানুষ প্রকৃত পক্ষে স্বাধীন হইবার উপযুক্ত নহে, তাহাকে অপর কেহ স্বাধীন করিয়া তুলিতে পারে না। যে মানুষ অথবা দেশ প্রকৃত পক্ষে স্বাধীন হইবার উপযুক্ত হয়, সেই মানুষ অথবা দেশ সর্ব্বতোভাবে নিজের উপর নির্ভরশীল হইবার কামনাযুক্ত হয় এবং কখনও কোন বস্তুর জন্য পরমুখাপেক্ষী হয় না। স্বাধীনতা ও পরমুখাপেক্ষিতা দুইটী বিরুদ্ধ ধর্ম্ম। যে ক্ষেত্রে স্বাধীনতার উপযোগিতা বিদ্যমান থাকে, সেই ক্ষেত্রে কখনও পরমুখাপেক্ষিতার ভাব বিদ্যমান থাকিতে পারে না। আবার, যে ক্ষেত্রে পরমুখাপেক্ষিতার ভাব বিদ্যমান থাকে, সেই ক্ষেত্রে কখনও প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করা সম্ভব হয় না। মিঃ বসুর শ্রেণীর মস্তিষ্কসম্পন্ন লোক এই কথাটী বুঝিতে পারুন আর নাই পারুন, উহা বাস্তব সত্য। যতদিন পর্য্যন্ত অন্য কোন দেশের সহায়তায় স্বাধীনতা লাভ করিবার চেষ্টা বিদ্যমান থাকিবে, অথবা ইংরাজ হৃদয়বান হইয়া নতুবা করুণাপরবশ হইয়া আমাদিগকে স্বাধীনতা প্রদান করিবে, এতাদৃশ আশা ও আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত ভারতবাসীর পক্ষে কখনও স্বাধীনতা লাভ করা সম্ভব হইবে না। পরন্তু ততদিন পর্য্যন্ত পরাধীনতার শৃঙ্খল অধিকতর কঠোর হইতে থাকিবে।

মিঃ বসুর কথাগুলি নিন্দা করিবার প্রচুর ভাষা আমরা খুঁজিয়া পাই না। আমরা আবার বলি যে, আমাদিগের মনে হয়, আমাদিগের যুবকদল অত্যন্ত নিম্নস্তরীয় হইয়া পড়িয়াছে, তাই তাহারা এতবড় নিম্নস্তরীয় মস্তিষ্কসম্পন্ন লোককে নেতার পদে প্রতিষ্ঠিত করিতে সঙ্কোচ বোধ করে না। গর্দ্দভিকাদেহিগণের আঙ্ক্রায় যেরূপ গর্দ্দভাপেক্ষা অধিক গর্দ্দভিকাসেবী দলপতি হইতে সক্ষম হইয়া থাকে, সেইরূপ আমাদিগের যুবকদলের মস্তিষ্ক অত্যন্ত নিম্নস্তরীয় হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া তাহাদিগের উপর মিঃ বসুর মত এতবড় নিম্নস্তরীয় মস্তিষ্কসম্পন্ন লোক নেতৃত্ব করিতে সক্ষম হইতেছেন। যুবকগণের ভবিষ্যৎ যদি কুজ্ঝটিকাপূর্ণ না হইত, তাহাদিগের অন্ন-সমস্যা ও বেকার-সমস্যা যদি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা-যুক্ত না হইত, তাহা হইলে তাহাদিগের এই কীর্ত্তিকলাপ উপেক্ষার চক্ষে দেখা যাইত, কিন্তু যখন তাহাদিগের মস্তিষ্কের উপর প্রাণঘাতক বজ্রপাত আলম্বিত, তখন তাহাদিগের এতাদৃশ বাচালতাময় প্রহসন বড়ই হৃদয়-বিদারক। যৌবনের মত্ততায় তাহারা অবস্থা সঠিকভাবে বুঝিতে পারিতেছে না, কিন্তু নেশার ঘোর কাটিলে তাহারা বুঝিতে পারিবে যে, মিঃ বসুর শ্রেণীর নেতাগণ মুখে স্বাধীনতার কথা কহিয়া থাকেন বটে, কিন্তু বস্তুতঃ পক্ষে তাঁহারাই জ্ঞান ও কর্ম্মের অধিষ্ঠান-ভূমি ভারতবর্ষকে পরাধীন করিয়াছেন এবং করিতেছেন। যুবকগণকে আসন্ন বিপদ্ হইতে রক্ষা পাইতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে মিঃ বসুর শ্রেণীর কলহপ্রিয় ও কাণ্ড-জ্ঞানহীন অদূরদর্শী মানুষগুলি যাহাতে জনসাধারণের সম্মুখে ধার-করা কোন কথা উচ্চারণ করিয়া তাহাদিগকে বিপথগামী না করিতে পারেন, তজ্জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে।

যে জ্ঞান থাকিলে কোন মানুষের মনোভাব সঠিকভাবে বুঝা সম্ভব হয়, সেই জ্ঞান মিঃ বসুর শ্রেণীর লোকের নাই বলিয়া তাঁহারা বর্ত্তমান জগতে সাম্যবাদী দেশ আছে বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। "সাম্যবাদ" শব্দটীর অর্থ যথাযথভাবে ধারণা করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, সাম্যবাদ ও সঙ্কীর্ণ স্বার্থ-রক্ষণ-প্রচেষ্টা একাধারে কখনও থাকিতে পারে না। সমগ্র মানব-সমাজের স্বার্থরক্ষা করাই সাম্যবাদীর স্বার্থ হইয়া থাকে। সাম্যবাদী কখনও ব্যক্তিগত

অথবা কোনোপ্রকার স্বার্থ-রক্ষায় প্রবৃদ্ধ হয় না। আজকাল-কার জগতে যে দেশে "চাচা আপন প্রাণ বাঁচা" এই ভাব বিদ্যমান নাই, এমন দেশের নাম শরৎবাবু করিতে পারিবেন

তাহা যদি না পারেন, তাহা হইলে সামাবাদী দেশের সহায়তা লাভ করিবার কথা বলিয়া কি ফলোদয় হইবে? এতাদৃশ কথা কি নিষ্ফল বাগ্‌বিতণ্ডার পরিচায়ক নহে?

ইংরাজ যে অন্যান্য দেশের বিরোধিতার ভয়ে অথবা সহায়তা লাভের জন্য ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিতেছে, তাহারই বা কি প্রমাণ আছে, তাহা শরৎ বাবু স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিবেন কি? ইংরাজের যে তাদৃশ ভয় অথবা লজ্জা আছে, তাহার প্রমাণ যদি না পাওয়া যায়, তাহা হইলে অপর দেশে ভারতশাসনের দুষ্টতা প্রমাণিত হইলেই যে ভারতবাসী স্বাধীন হইয়া যাইবে, তাহা মনে করিবার কোন হেতু থাকে কি? আবেদন, নিবেদন অথবা শরৎবাবুর প্রদর্শিত প্রচারকার্য্যের দ্বারা কখনও ভারতবর্ষের পক্ষে স্বাধীনতা লাভ করা সম্ভব হইবে না। ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা লাভ করিতে হইলে স্বাধীনতার আন্দোলন ছাড়িয়া দিয়া সমগ্র মানব-সমাজের অন্ন-সমস্যা ও বেকার-সমস্যার সমাধানোপায় শিক্ষা করিতে হইবে এবং একমাত্র এই অন্ন-সমস্যা ও বেকার-সমস্যার আন্দোলন উত্থাপিত করিতে হইবে। এই আন্দোলনের ফলে ভারতবাসীর প্রকৃত একতা সাধন করা সম্ভবযোগ্য হইবে এবং এই অবসরে ভারতবর্ষের নেতৃবর্গ যদি সমগ্র মানবসমাজের অন্ন-সমস্যা ও বেকার-সমস্যার সমাধানোপায় শিক্ষা করিতে পারেন, তাহা হইলে সমগ্র জগতের জন-সাধারণের প্রাণের বন্ধু এবং শ্রদ্ধেয় হইয়া উঠিবেন, কারণ এই সমাধানোপায় আর কোন দেশ বিদিত নহে এবং উহা কার্য্যে পরিণত করা আর কাহারও পক্ষে সম্ভব-যোগ্য নহে। ভারতবর্ষের ঋষি-যুগের ইতিহাস নিখুঁত-ভাবে পরিজ্ঞাত হইতে হইলে যে মালমসলার প্রয়োজন তাহা যথাযথভাবে বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, এই অনন্যসাধারণ জ্ঞান এবং রাগ-দ্বেষ ও দ্বন্দ্ব-কলহ-প্রবৃত্তি-হীন কর্ম্মকুশলতাই একদিন ভারতবর্ষকে শুধু প্রকৃত স্বাধীনতা কেন, সমগ্র জগতের শ্রদ্ধের শ্রীবৃদ্ধান প্রদান করিয়াছিল। সূর্য্য ও চন্দ্রের সহিত অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতবর্ষের সম্বন্ধ কিরূপ, তাহা যথাযথভাবে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, জগতের এই শ্রদ্ধেয় শ্রীবৃদ্ধান একমাত্র ভারতবর্ষের পক্ষেই লাভ করা সম্ভব, কারণ প্রাকৃতিক কারণে ভারতবর্ষ ও ভারতবাসিগণ যে তেজ ও রস লাভ করিয়া থাকে, তাহা অন্য কোন দেশ ও দেশবাসী লাভ করিতে পারে না। তাই ভারতবাসী তথাকথিত পরাধীন হইয়াও কখন জীবিকার জন্য অন্য কোন দেশের দ্বারস্থ হইতে বাধ্য হয় নাই, আর অন্যান্য দেশ স্বাধীন হইয়াও কখনও বা ভিক্ষুকের বেশে, কখনও বা চোর ও প্রতারকের বেশে, কখনও বা চাটুকারীর বেশে, কখনও বা দস্যুর বেশে ভারতবর্ষের দ্বারস্থ হইতে বাধ্য হইয়াছে।

কোন্ বেদনায় এই কলম চলিতেছে, তাহার বিজ্ঞাপন আমরা দিতে চাই না, তবে এইটুকু মাত্র বলিতে চাই যে, দেশের এই অবস্থার তুলনায় খাতকের ছুরিকাও আমাদের নিকট বরণীয়। সুপথে পরিচালিত হইলে এই অনন্যসাধারণ জ্ঞান ও কলহ-প্রবৃত্তিহীন কর্ম্ম-কুশলতা অদূরভবিষ্যতে আবার ভারতবাসীর পক্ষে লাভ করা সম্ভব হইতে পারে এবং আবার ভারতবাসী জগতের শ্রদ্ধের শ্রীবৃদ্ধান অর্জ্জন করিতে পারে, ইহা আমরা মনে করি বলিয়াই শরৎবাবুর শ্রেণীর নেতৃবর্গের বিপথ পরি-চালনা দেখিলে বিচলিত হইয়া থাকি। যুবকগণকে সাবধান হইবার জন্য পুনরায় অনুরোধ করিতেছি।

জাতীয় জীবনে স্থিতিশীলতা ও নিষ্ক্রিয়তার স্থান নাই

এই প্রসঙ্গে মিঃ বসু যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহাও অত্যন্ত ভ্রম-প্রদ। তাঁহার মতে জগতের অন্যান্য দেশে স্থিতিশীলতা এবং নিষ্ক্রিয়তা বিদ্যমান নাই এবং তাহারই জন্য অন্যান্য দেশ কর্ম্মে ও চিন্তায় জীবন্ত, প্রাণবান্ হইয়া থাকে, আর ভারতবর্ষে স্থিতিশীলতা ও নিষ্ক্রিয়তা বিদ্যমান আছে বলিয়াই আমরা কি কর্ম্মে, কি চিন্তায় জীবন্ত প্রাণবান্ হইতে হইতে পারি না।

বাস্তব অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, উহা ঐ মতবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত কথা

প্রমাণিত করিতেছে। বর্তমানকালে জগতের কোন দেশ কর্ম ও চিন্তায় ভারতবর্ষের তুলনায় অধিকতর জীবন্ত প্রাণবান্ প্রকৃতপক্ষে হইতে পারিয়াছে বলিয়া মনে করিবার মত কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। একটু গভীর ভাবে ভাবিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, যেখানে কর্ম ও চিন্তার প্রকৃত জীবন্ত প্রাণবত্তা বিদ্যমান থাকে, সেইখানে জনসাধারণের কাহারও মধ্যে দারিদ্র্য অথবা বেকার অবস্থা অথবা অস্বাস্থ্য অথবা অশান্তি বিদ্যমান থাকিতে পারে না। অন্যপক্ষে, যেখানে জনসাধারণের কাহারও মধ্যে দারিদ্র্য অথবা বেকার অবস্থা অথবা অস্বাস্থ্য অথবা অশান্তি বিদ্যমান থাকে, সেইখানে আপাতদৃষ্টিতে কর্ম ও চিন্তার প্রাণবত্তা বিদ্যমান আছে বলিয়া মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে উহা যে অসার তাহা বুঝিতে হয়। রোগীর মৃত্যু হইলেও অস্ত্রোপচার সফল হইয়াছে, এতাদৃশ বাক্য আধুনিক ডাক্তারগণের পক্ষে শুশ্রূষাজনীয় বলিয়া মনে করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু বস্তুতঃ পক্ষে অস্ত্রোপচার আপাতদৃষ্টিতে যতই সফল বলিয়া মনে করা যাউক্ না কেন, রোগীর মৃত্যু ঘটিলে উহা যে বাস্তবিক পক্ষে নিষ্ফল হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিলে জগতের মধ্যে আজকাল এমন একটী দেশ পাওয়া যাইবে না, যে দেশের জনসাধারণের অধিকাংশই দারিদ্র্য অথবা বেকার অবস্থায় অথবা অস্বাস্থ্যে অথবা অশান্তিতে জর্জরিত নহে। পরন্তু ইহাতে দেখা যাইবে যে, ভারতবর্ষের জনসাধারণ আজকাল তাহাদিগের আগেকার অবস্থার তুলনায় ক্রমবিধায়কভাবে দরিদ্র, বেকার, অসুস্থ এবং অশান্তিগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছে তাহা সত্য বটে, কিন্তু তথাপি তাহাদিগের অন্নাভাব অথবা অস্বাস্থ্য অথবা অশান্তি অন্য কোন দেশের জনসাধারণের তুলনায় অধিক নহে। আমেরিকা, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে কয়েকজন ক্রোড়পতি আছেন তাহা সত্য, কিন্তু ঐ ঐ দেশের সমগ্র জনসাধারণের সংখ্যার তুলনায় ক্রোড়পতির সংখ্যা অতীব নগণ্য এবং তাহাদিগের জনসাধারণের অবস্থা ভারতবর্ষের জনসাধারণের অবস্থা অপেক্ষাও শোচনীয়।

কাযেই, আমেরিকা ও ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে কর্মে ও চিন্তার আপাতদৃষ্টিতে প্রাণবত্তা বিদ্যমান আছে বলিয়া মনে হইলেও বাস্তবিক পক্ষে উহা যে অসার, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। নিঃ বসুর শ্রেণীর মস্তিষ্কসম্পন্ন লোক মনুষ্যাবয়বযুক্ত হইলেও প্রকৃত পক্ষে তোতাপাখীর মত পরের ধার-করা কথা উচ্চারণ করিয়া খ্যাতি লাভ করিতে প্রয়াসী বলিয়াই, তাঁহারা এই উপরোক্ত সহজ ও সত্য কথাটী বুঝিতে পারেন না। বাস্তবিক পক্ষে অতিরিক্ত মদ্যপান, স্ত্রী পুরুষের অবাধ মেলামেশা, পশুবৎ যৌনাচার এবং অতিরিক্ত খেলাধূলা-প্রমত্ততা বশতঃ অন্যান্য দেশের মানুষের কর্ম ও চিন্তা সম্পূর্ণ অসার হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহারই জন্য তাহারা এত বৎসর ধরিয়া দারিদ্র্যে ও বেকার অবস্থায় হাবুডুবু খাইয়াও পরমুখাপেক্ষী না হইয়া তাহাদিগের বিবিধ সমস্যার সমাধানোপায় এতাবৎ আবিষ্কার করিতে পারে নাই। কাযেই, যে কর্ম ও চিন্তা স্বকীয় সমস্যা সমাধানে অক্ষম, সেই কর্ম ও চিন্তা কখনও ভারতবর্ষের অনুকরণীয় হওয়া সঙ্গত বলিয়া মনে করা যায় না।

"জাতীয় জীবনে স্থিতিশীলতা ও নিষ্ক্রিয়তার স্থান নাই" এতাদৃশ মতবাদ আপাতভাবে কর্ণের তৃপ্তিকর হইলেও বাস্তবিকপক্ষে উহা বালকোচিত।

কোন জীবনে নিষ্ক্রিয়তার স্থান নাই ইহা সত্য বটে, কিন্তু স্থিতিশীলতার প্রয়াস প্রত্যেক জীবনের সাফল্যে একান্ত প্রয়োজনীয়। ভাবিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, যাহা সত্য তাহাই স্থিতিশীল হইয়া থাকে এবং যাহা অসত্য, তাহা ক্ষণভঙ্গুর ও পরিবর্তনশীল হয়। তিন আর দুই-এর যোগে যে পাঁচ হয়, তাহা সত্য এবং এই সত্য চিরদিন বিদ্যমান ছিল, আছে এবং থাকিবে। কিন্তু যখন মানুষ তিন আর দুই-এর যোগে যে পাঁচ হয়, তাহা ভুলিয়া গিয়া চারি অথবা সোয়া-চারি বলিতে আরম্ভ করে, তখন তাহার কথা নিত্য-পরিবর্তনশীল হইয়া পড়ে।

যাহা সত্য, তাহাই স্থিতিশীল হইয়া থাকে এবং যাহা অসত্য, তাহা ক্ষণভঙ্গুর ও পরিবর্তনশীল হয়, এই বাক্যটীর সারবত্তা উপলব্ধি করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, জাতীয় জীবনের আদর্শ স্থির করিতে হইলে কোন্ কর্ম ও কোন্ চিন্তা সমাজমধ্যে অবস্থান কাল অধিকসংখ্যক লোকের

মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন হয় এবং যে কর্ম ও চিন্তা সমাজের অধিকাংশ লোকের মধ্যে আবহমান কাল বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই কর্ম ও চিন্তাকে সত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়া আদর্শরূপে গ্রহণ করিতে হয়। এই হিসাবে যাহা প্রকৃত পক্ষে স্থিতিশীল, তাহা সন্ধান করিয়া বাহির করিতে না পারিলে এবং প্রকৃতপক্ষে স্থিতিশীল না হইলে মানুষের ব্যক্তিগত, সমাজগত ও জাতিগত ভাবে ধ্বংস অনিবার্য হইয়া পড়ে।

আধুনিক ইতিহাস সমালোচকভাবে অধ্যয়ন করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, গত তিন হাজার বছরের আধুনিক জগৎ স্থিতিশীল সত্যকর্ম ও চিন্তার অনুসন্ধান করিবার ক্ষমতা হারাইয়া বসিয়াছে বলিয়াই অসত্য কর্ম ও চিন্তাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতেছে এবং প্রতিনিয়ত ঐ কর্ম ও চিন্তার পরিবর্তন সাধিত হইতেছে। ফলে মানুষের দুঃখের স্রোত, অকালবার্ধক্য এবং অকালমৃত্যু বাড়িয়াই চলিতেছে। গত দুইশত বৎসর হইতে ইয়োরোপ যে সমস্ত নূতন আচার-ব্যবহার, কর্মশীলতা ও চিন্তা সমাজের মঙ্গলপ্রদ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, তাহার ইতিহাস সন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, উহার কোনটাই কোন বুদ্ধিমানোচিত চিন্তাপ্রসূত নহে এবং উহার প্রত্যেকটী মানবসমাজের অকল্যাণ সাধন করিতেছে। প্রকৃত স্থিতিশীলতার প্রতি অবজ্ঞা এবং ইয়োরোপের পরিবর্তনের অন্ধ অনুকরণ আমাদিগের বর্তমানে মধ্যবিত্তগণের দারিদ্র্য ও অস্বাস্থ্যের অন্যতম প্রধান কারণ। বর্তমান মধ্যবিত্তগণ যেরূপ উপরোক্ত কারণে দরিদ্র ও অসুস্থ হইয়া পড়িতেছেন, সেইরূপ ইহার পূর্ববর্তী মধ্যবিত্তগণও তথাকথিত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের ঋষিপ্রণীত শাস্ত্রের যথেচ্ছ ব্যবহারের জন্য এবং স্থিতিশীলতার প্রতি ঔদাসীন্য বশতঃ ততোধিক দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছিলেন। অনেকে মনে করেন যে, গোঁড়া-ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ স্থিতিশীল। কিন্তু, ঋষিপ্রণীত মূল শাস্ত্রের সহিত এই গোঁড়া-ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের ব্যাখ্যা মিলাইয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, ঐ ব্যাখ্যা আদৌ স্থিতিশীল সত্যের উদ্ঘাটক নহে, পরন্তু উহা প্রায়শঃ ঋষিপ্রণীত মূলশাস্ত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত। গোঁড়া ও মূর্খ তথাকথিত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের অথবা পাদ্রী ও মোল্লাগণের তথাকথিত স্থিতিশীলতা সমাজের সর্বনাশ সাধন করিয়াছে বলিয়া, প্রকৃত স্থিতিশীলতা সমাজের কাম্য নহে ইহা মনে করা অর্বাচীনতার পরিচায়ক। আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে, জাতীয় জীবনের কিছুই স্থিতিশীল নহে, কিন্তু শ্রমজীবিগণ যে জাতীয় জীবনের সর্বাপেক্ষা বৃহত্তম অংশ, তাহা মনে রাখিয়া অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, সমাজের অধিকাংশ চিন্তা ও কর্মই প্রকৃতপক্ষে স্থিতিশীল। "বাঁচিয়া থাকিতে হইলে সর্বাগ্রে আর্থিক স্বচ্ছলতা, শারীরিক স্বাস্থ্য ও মানসিক শান্তির প্রয়োজন এবং তজ্জন্য কর্ম ও চিন্তা সর্বপ্রধান কর্তব্য" এতাদৃশ বোধ এখনও প্রত্যেক সমাজের অধিকাংশ মানুষের হৃদয়ে জাগ্রত দেখা যাইবে। স্বাধীনতা ও কাল্পনিক সম্মানের প্রয়োজনীয়তা-বোধ অসত্য ও পরিবর্তনশীল। চারিশত বৎসর আগেও মানব-সমাজে এতাদৃশ চিন্তা ও কর্মস্রোতের প্রাবল্যের কোন নিদর্শন খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, ঐ স্বাধীনতা ও কাল্পনিক সম্মান লাভের কর্ম ও চিন্তা বর্তমানে তথাকথিত শিক্ষিতগণকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে বটে, কিন্তু এখনও শ্রমজীবিগণের মধ্যে অনেকেই উহার প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারে না। তাহারা অন্যভাবে অর্জিত হইয়া প্রত্যেক দেশে অন্তর্বিপ্লবের অগ্নি প্রজ্বলিত করিবে, এইরূপ আশঙ্কা করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু কোন দিন স্বাধীনতা ও সম্মানলাভের আশায় সর্বান্তঃকরণে কার্যক্ষেত্রে আত্ম-বিসর্জন দিবে এইরূপ আশা করা চলে না।

এই সব কথা চিন্তা করিলেও যদি বলা হয় যে, জাতীয় জীবনে স্থিতিশীলতার স্থান নাই, তাহা হইলে বক্তা যে মনুষ্যাবয়বী হইয়াও কার্যতঃ তোতাপাখীবৎ, এতাদৃশ সিদ্ধান্ত কি অলীক?

মিঃ বসুর প্রথম ছয়টী বিষয়ের চিন্তার ধারা যেরূপ অসার, বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, বাকী বিষয়ের কথাগুলিও ততোধিক ভাবের অসার। স্থানাভাববশতঃ আমরা এই বিশ্লেষণ-কার্য হইতে বিরত থাকিলাম। প্রয়োজন বুঝিলে আবার উহাতে হস্তক্ষেপ করিব।

উপসংহারে আমরা মিঃ বসুকে এবং তাঁহার শ্রেণীর

ওরে কাপুরুষ! মিঃ পটুভি সীতারামিয়া সুভাষচন্দ্রকে জানাইয়াছেন—"আমি আপনাকে সংবর্দনা জ্ঞাপন করিতেছি।"

নেতৃবর্গকে এখনও সাবধানতা অবলম্বন করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। নেতৃত্ব করা যত আকাঙ্ক্ষণীয়, উহার উপযোগিতা লাভ করা তত সহজসাধ্য নহে। মিঃ বসু স্বয়ং বুঝুন আর নাই বুঝুন, যে যুবকবৃন্দকে লইয়া তাঁহার ফুলের মালা-সংগ্রহকার্য্য সাধিত হইতেছে, সে যুবকগণ তাঁহার শ্রেণীর মানুষের চিন্তা ও কর্ম্মের অসারতা পেটের দায়ে অচিরেই বুঝিতে বাধ্য হইবে এবং তখন তিনিও অপদস্থ হইয়া যুবকগণের বিপথগামিতার সহায়তার কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবেন। আমরা এখনও তাঁহাকে সসম্মানে নেতৃত্বের কার্য্য হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া ছাত্রের মত কিছুদিন প্রকৃত রাজনীতি ও অর্থনীতি শিক্ষার এবং দাস্তিকতা-সংযমের কার্য্যে ব্রতী হইতে অনুরোধ করিতেছি। অনেকের তুলনায় স্বাভাবিক বুদ্ধি যে তাঁহার অধিক পরিমাণে আছে, তাহা তাঁহার বক্তৃতায় পরিস্ফুট হইয়া থাকে, কিন্তু কুশিক্ষা ও দাম্ভিকতার ফলে তাঁহার এই স্বাভাবিক বুদ্ধি বিপথগামী হইয়া সমাজের উপকার অপেক্ষা অধিকতর অপকার সাধন করিতেছে। নেতৃত্ব আপাততঃ ছাড়িয়া দিয়া প্রকৃত রাজনীতি ও অর্থনীতি শিক্ষার এবং দাম্ভিকতা-পরিত্যাগের কার্য্যে ব্রতী হইলে তাঁহার পক্ষে হয় ত একদিন, যাহা অনেকের পক্ষে সম্ভব নহে, সেই প্রকৃত মঙ্গলকর নেতা হওয়া সম্ভব হইতে পারে, ইহা মনে করিয়াই আমরা তাঁহাকে এই অনুরোধ জানাইতেছি। তাঁহাকে মনে রাখিতে হইবে যে, যে যুবকদল ফুলের মালা পরাইয়া থাকে, সেই যুবকদলই আবার জুতার মালা পরাইতেও সঙ্কোচ বোধ করে না।

আমাদিগের কথা বুঝিবার মত প্রকৃতি তাঁহার আছে কি?

আসামের প্রধান-মন্ত্রীর কার্য্য-সূচী

সংবাদপত্র-পাঠকবর্গ অবগত আছেন যে, আসামের প্রধান-মন্ত্রী মিঃ গোপীনাথ বড়দলই ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের প্রথম ভাগে কয়দিনের জন্য কলিকাতা আসিয়াছিলেন। তখন রেলওয়ে ষ্টেশন, সভা-সমিতি, শিল্প-প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি অনেক স্থানেই তিনি অভিনন্দন লাভ করিয়াছিলেন এবং বক্তৃতা দান করিয়াছিলেন। কলিকাতার এই সফরে প্রদত্ত তাঁহার বক্তৃতার নিম্নলিখিত উক্তিসমূহ উল্লেখযোগ্য :—

(১) আমাদের আগামী আর্থিক বৎসরের সূচনাতেই আমাদিগকে ১৫ লক্ষ টাকার ঘাটতি লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিতে হইতেছে। সুতরাং আসাম সরকারের বর্ত্তমানের একমাত্র সমস্যা হইতেছে, কেবল ধনীদিগের দেয় ট্যাক্স বৃদ্ধি করিয়া কি উপায়ে এই ঘাটতি পূরণ করা যায়।

(২) আরও বহুবিধ সমস্যা আছে, কিন্তু সকলেরই সমাধান আর্থিক সংস্থান-বুদ্ধিসাপেক্ষ।

(৩) যদি ট্যাক্স-বৃদ্ধির প্রস্তাব গৃহীত হয়, তবে ৩০ লক্ষ টাকা পাওয়া যাইবে।

(৪) উপজাতি, তপশীলভুক্ত জাতি এবং বহির্ভাগত জাতির মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারার্থ আমরা একটি নির্দ্দিষ্ট পন্থায় অগ্রসর হইতে চাহি।

(৫) প্রাথমিক শিক্ষার নিমিত্ত যে ব্যয়-বরাদ্দ আছে, আমরা তাহা বাড়াইবার চেষ্টা করিতেছি।

(৬) যদি অর্থের সঙ্কুলান হয়, তবে ব্যবস্থিত জল-সেচ পরিকল্পনানুযায়ী কার্য্য করিবার এবং পল্লী অঞ্চলে জল সরবরাহ ও যাতায়াত ব্যবস্থার জন্য ভারত সরকারের নিকট হইতে যে-অর্থ পাওয়া গিয়াছে, আমরা তাহার উপর উদ্বৃত্ত কিছু ব্যয় করিবার কথা চিন্তা করিতেছি।

(৭) আগামী আর্থিক বৎসরে সর্ব্বাধিক উল্লেখযোগ্য কার্য্য-পরিকল্পনা হইতেছে জন-সাধারণের আফিমের নেশা পরিত্যাগ বিষয়ক। কয়েকটি মহকুমা বাছিয়া লইয়া তথায় ক্রমাগত প্রচার-কার্য্য দ্বারা দুই বৎসরের মধ্যে জনসাধারণকে সম্পূর্ণভাবে এই নেশার হাত হইতে উদ্ধার করিতে হইবে।

(৮) কৃষি ও শিল্প বিষয়ে আরও অনেক ছোটখাট কার্য্য-পরিকল্পনা আছে, কিন্তু বর্ত্তমান সরকারের

কৃতকার্য্যতা আর্থিক সংস্থান ও জন-সাধারণের সহযোগিতা এবং সহানুভূতির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে।

উপরের বিবৃতি হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ঘাটতি পূরণ করিয়া উদ্বৃত্তের সংস্থান করিতে না পারিলে, মিঃ বড়দলই জনসাধারণের হিতার্থে বিশেষ কিছু করিবার আশা পোষণ করেন না। ইহার জন্য তিনি নানা ভাবে ট্যাক্স-বৃদ্ধির সঙ্কল্প করিয়াছেন। অবশ্য, দরিদ্রদিগকে ইহার ভার বহন করিতে হইবে না। সম্ভবতঃ কেবল ধনীরাই ইহার ফল ভোগ করিবে! সুতরাং, সরকারের আর্থিক ঘাটতির দরুণ মিঃ বড়দলইয়ের গবর্ণমেণ্ট যদি জনসাধারণের হিতকল্পে কিছু করিতে না পারেন, তবে তাঁহার পরিচালিত গবর্ণমেণ্টকে দোষ দেওয়া যাইবে না, ইহা আমাদিগকে ধরিয়া লইতে হইবে। কেবল মিঃ বড়দলই পরিচালিত গবর্ণমেণ্টকে কেন, ঘাটতির দরুণ সর্ব্বত্র কংগ্রেসী গবর্ণমেণ্টের প্রত্যেকটিকেই হয়ত জন-সাধারণের ক্ষুধা-তৃষ্ণায় মৃত্যু হইলেও, ক্ষমা করিতে বাধ্য হইতে হইবে। যাহা হউক, যদি প্রত্যাশিত আর্থিক সঙ্কুলান হয়, তবে মিঃ বড়দলই পরিচালিত গবর্ণমেণ্ট কি করিতে চাহেন, এখন আমরা তাহারই আলোচনা করিব।

তাঁহার উপরের বিবৃতিতে প্রকাশ, জনসাধারণকে আফিমের নেশা হইতে নিষ্কৃতিদানের কার্য্যই তিনি সর্ব্ব-প্রথম আরম্ভ করিবেন, কেন না তিনি ইহাকেই 'সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

তাঁহার আর যে-সকল কার্য্য করিবার ইচ্ছা আছে, তাহা হইল :—

(১) উপজাতি, তপশীলভুক্ত জাতি এবং বহির্দ্দেশাগত জাতির মধ্যে শিক্ষাবিস্তার।

(২) প্রাথমিক শিক্ষা।

(৩) জল-সেচ পরিকল্পনা।

(৪) পল্লী-অঞ্চলে যাতায়াত এবং জল-সরবরাহের ব্যবস্থা।

(৫) কৃষি ও শিল্প বিষয়ে ছোটখাট কার্য্যপরিকল্পনা।

আমরা বিচার করিয়া দেখিব, যদি অর্থের সঙ্কুলান হয়, তবে যে-সকল কার্য্য মিঃ বড়দলই করিতে চাহেন, তদ্দ্বারা দেশবাসী উপকৃত হইবে।

বলাই বাহুল্য যে, সরকারের কোন কার্য্য-পরিকল্পনা জনসাধারণের পক্ষে প্রকৃতপক্ষে হিতকরী কি না, তাহার বিচার করিতে হইলে, বর্ত্তমান অবস্থায় জনসাধারণের অতি-অবশ্য প্রয়োজনসমূহ কি, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, আর্থিক স্বচ্ছলতা, রোগ ও স্বাস্থ্যহীনতার প্রতীকার এবং মনের শান্তি, বর্ত্তমানে সর্ব্বত্র মনুষ্যসমাজের মধ্যে এই তিনটি হইতেছে জনসাধারণের প্রাথমিক প্রয়োজন-পূরণের প্রধান উপাদান। আমরা ইহাও দেখাইয়াছি যে, মানুষ যখন খাদ্যাভাবে মরিতে চলিয়াছে, তখন তাহাকে বাঁচাইতে হইলে আর কিছু না দিয়া তাহার খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে হয়। সুতরাং যদি দেখা যায় যে, মিঃ বড়দলই-প্রস্তাবিত কোন কার্য্য-পরিকল্পনায় জনসাধারণের আর্থিক স্বচ্ছলতা, রোগ ও স্বাস্থ্যহীনতার প্রতীকার এবং মানসিক শান্তি ব্যবস্থিত হইবার সম্ভাবনা আছে, তবে মিঃ বড়দলইকে প্রকৃতই জনকল্যাণ-ব্রতী এবং দেব-চরিত্রের বলিয়া মনে করিতে হইবে। পক্ষান্তরে যদি দেখা যায় যে, তাঁহার বহু-সাধের পরিকল্পনার একটিতেও ঐ তিনটির কোনটি ব্যবস্থিত হইতে পারে না, এবং তখন যদি মিঃ বড়দলইকে প্রধান-মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব-পালনের অনুপযুক্ত বলিয়া অভিহিত করা হয়, তবে আশা করি তাহা ভুল হইবে না। তদবধায় মিঃ বড়দলইকে যাঁহারা কার্য্য-নির্দ্দেশ দান করিতেছেন, কংগ্রেসের সেই কর্ত্তৃপক্ষ, দেশের লোকের নিকট যাহা বলিয়া নিজেদের প্রচার করেন, তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে যে তাহা নহেন, ইহা বলাও যুক্তিসঙ্গত হইবে।

সুতরাং আমরা মিঃ বড়দলই-এর পরিকল্পনাসমূহ একটি একটি করিয়া বিচার করিব।

আফিমের নেশা হইতে নিষ্কৃতির কার্য্য বিচার করিলে দেখা যায় যে, ইহা যেমন আসাম অধিবাসীর অধিকাংশের সংশ্লিষ্ট কার্য্য নহে, তেমনই ইহার দ্বারা তাহাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা, রোগ ও স্বাস্থ্যহীনতার প্রতীকার এবং মানসিক শান্তি ব্যবস্থিত হইতে পারে না। অন্যথায় আসামের অধিবাসীর যে অংশ আফিমের জন্যান্ন পরিবার

করিয়াছেন, অন্ততঃ তাঁহাদিগকে আর্থিক স্বচ্ছলতা, রোগ ও স্বাস্থ্যহীনতা হইতে অব্যাহতি এবং মানসিক শান্তি উপভোগ করিতে দেখা যাইত। কিন্তু বিশ্বাস করিবার কারণ আছে যে, তাঁহাদের অবস্থার পরিবর্তন হয় নাই।

তাঁহার দ্বিতীয় প্রস্তাব হইতেছে শিক্ষাবিষয়ক। প্রচলিত শিক্ষা আর্থিক প্রাচুর্য্য-সাধক, রোগ ও স্বাস্থ্যহীনতার প্রতীকারক কিংবা মানসিক শান্তির সহায়ক, ইহা বলা চলে না। যদি তাহাই না হইত, তাহা হইলে এই শিক্ষায় যাঁহারা শিক্ষিত হইয়াছেন, তাঁহাদের অধিকাংশের এই তিনটি প্রাথমিক প্রয়োজন মিটিয়া যাইত। তাহা ত হয়ই নাই, উপরন্তু বাস্তব অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলে যে-কোন ব্যক্তি স্থিরনিশ্চয় হইবেন যে, প্রচলিত বিশ্ববিদ্যালয়-মার্কা শিক্ষা যাঁহার যত অধিক, তাঁহার সন্তুষ্টি, স্বাস্থ্য, বিবেক এবং চরিত্রের তত অধিক অভাব। ইহা সত্য যে, শিক্ষিত ব্যক্তিবৃন্দের কিয়দংশ আর্থিক প্রাচুর্য্য সাধনে কোন কোন ক্ষেত্রে কৃতকার্য্য হন, কিন্তু ইহা তাঁহাদের শিক্ষার ফলে কি আর কোন কারণে ঘটে, তাহা বলা সুকঠিন। যদি বর্ত্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থাই আর্থিক প্রাচুর্য্যলাভের একমাত্র সোপান হইত, তবে অশিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে ধনবান্ হওয়া সম্ভব হইত না। কিন্তু বাস্তব ঘটনা অন্যরূপ। অশিক্ষিত ব্যক্তিরা যে অনেক ক্ষেত্রে ধনবান্ হন, ইহাই কেবল নহে, তাঁহাদিগকে শিক্ষিত ব্যক্তিদের সকলের অপেক্ষাও কোন কোন ক্ষেত্রে অধিকতর ধনবান্ হইতে দেখা যায়। যে-ক্ষেত্রে শিক্ষিত ব্যক্তির ভাগ্যে আর্থিক স্বচ্ছলতা জুটে, সে-ক্ষেত্রেও পুত্র-পরিজন লইয়া কদাচিৎ তাঁহাদিগকে শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করিতে দেখা যায়। কিন্তু অশিক্ষিত ব্যক্তিবৃন্দের ক্ষেত্রে সচরাচর অন্যরূপ ঘটিতে দেখা যায়। এইরূপ শিক্ষিত ব্যক্তির পুত্রদের ন্যায় অশিক্ষিত ব্যক্তিদের পুত্রবৃন্দ প্রায়শঃই অপদার্থ হয় না।

বর্ত্তমান শিক্ষার এই ব্যর্থতার বিষয়ে কেহ চিন্তা করিলে নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিবেন যে, 'শিক্ষা' শব্দের যে-অর্থ, বর্ত্তমান ব্যবস্থায় শিক্ষা তাহার কাছ-ঘেঁষিয়াও যায় না। সেই অর্থে শিক্ষা হইবে এইরূপ, যাহাতে শিক্ষার্থী জীবনযাত্রাপথে কোন বিষয় কিংবা বস্তুর বাহিরের রূপ দেখিয়া বিমুগ্ধ বা বিচলিত না হয়। তাহাকে এমন ধৈর্য্য শিক্ষা দিতে হইবে যে, জীবনে তাহাকে যে-সব বিষয়ের ও বস্তুর সম্মুখীন হইতে হয়, সেগুলি যেন সে বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করে, কেন কোন বস্তু বা বিষয় তাহাকে বিমুগ্ধ বা বিচলিত করিতেছে। শিক্ষার্থী যদি এইরূপ ধৈর্য্য এবং বিশ্লেষণ-শক্তি লাভ করে, তবে সে রাগ-দ্বেষবিমুক্ত হইয়া গভীরভাবে বিষয়সমূহে নিবিষ্ট হইবার সঙ্কল্পবিশিষ্ট হয়। ইহাতে সে প্রত্যেক বিষয়ের বাস্তব জ্ঞানলাভে সমর্থ হয় এবং অবশেষে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক হইতে পারে। এইরূপ নীতির অনুযায়ী শিক্ষার সহায়তায় সে স্বকীয় আর্থিক স্বচ্ছলতা, রোগ ও স্বাস্থ্যহীনতা হইতে মুক্তি এবং শান্তি ও সন্তুষ্টি উপভোগের নিমিত্ত নিশ্চিতভাবে কি প্রয়োজন, তাহা নির্দ্ধারণে সমর্থ হয়। পক্ষান্তরে শিক্ষার্থী যদি বস্তু বা বিষয়বিশেষের প্রতি রাগ কিংবা অনুরাগে বিচলিত বা বিমুগ্ধ হইবার শিক্ষা লাভ করে, তবে তাহার মনুষ্যোচিত গভীর অভিনিবেশের এবং কেন ইহা হয়, এই প্রশ্ন সমাধানের সামর্থ্য লোপ পায় এবং সে পশুচিত রিপু-পরবশ হইয়া পড়ে। বিদ্যালয়ের মারফৎ আমাদের সন্তানেরা বর্ত্তমানে সাধারণতঃ যে শিক্ষা লাভ করে, তাহা যদি যথাযথ ভাবে বিশ্লেষণ করা যায়, তবে দেখা যাইবে যে, আর্ট কিংবা সায়ান্স, উভয় বিভাগের ছাত্র হিসাবে যে সকল পুস্তক তাহাদিগকে পাঠ করিতে হয়, তৎসাহায্যে তাহারা উপরিলিখিত বিশ্লেষণ-সামর্থ্য লাভ করা অপেক্ষা দ্রষ্টব্য বা বিষয়ের বাহিরের রূপ দেখিয়া মুগ্ধ ও বিচলিত হইবার প্রবণতা অধিক লাভ করে। শ্রেষ্ঠ কবি বা সাহিত্যিক-লিখিত পুস্তকসমূহ যথাযথ ভাবে বিশ্লেষণ করিলে পাঠকের চক্ষে আমাদের উপরের উক্তির সত্যতা উদ্ভাসিত হইবে। হয়ত প্রশ্ন উঠিবে যে, বিজ্ঞানের পাঠ্য পুস্তকের রীতি বিভিন্ন। হাঁ, উহাদের রীতি সামান্যরূপে বিভিন্ন বটে, কিন্তু তাহাদের সাহায্যেও শিক্ষার্থীর মনে কোন বিষয় সম্বন্ধে "কেন" প্রশ্নের উদ্ভব হয় না, কেন না বর্ত্তমান বিজ্ঞান বিশ্বজগতের কোন কিছুর মূল কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করে না, ইহাই ধরা হয়। ছাত্রেরা যে-সকল পুস্তক পাঠ করে, তাহাদের আদ্যোপান্ত যে এইরূপ ত্রুটিপূর্ণ, কেবল ইহাই নহে, শিক্ষাদান-পদ্ধতিও সমান ত্রুটিপূর্ণ।

আমি করা যে-সকল অধ্যাপকের সহিত সাক্ষাৎ হয়, তাঁহাদের যে-কাহারও সহিত আলোচনা করিলে দেখা যায়, তিনি কেবল পঠিত বিষয়কে নানা ভাবে প্রকাশ করিবার চিন্তা আয়ত্ত করিয়াছেন। তরুণ শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দিবার পক্ষে যাহা অত্যন্ত প্রয়োজন, সেই মৌলিক চিন্তা এবং বিশ্লেষণ-সামর্থ্য কিছুই তাঁহার নাই। এই সব অধ্যাপক ও শিক্ষকদিগের অধিকাংশই পাশ্চাত্ত্য গ্রন্থকার ও গ্রন্থের দাস এবং তাঁহারা দাসজাতিরই সৃষ্টি করিতেছেন। দুঃখের বিষয় যে, তথাপি তাঁহারা শ্রদ্ধালাভ করেন।

আমাদের সন্তানদিগকে পাশ্চাত্ত্যদিগের ধাঁচে রূপান্তরিত করিতে আপত্তি ছিল না, যদি পাশ্চাত্ত্যের জাতিসমূহ মনুষ্যত্বের প্রয়োজনসমূহ পূরণে সমর্থ হইয়াছেন, ইহা দেখা যাইত কিংবা যদি তাঁহারা আর্থিক অভাব, অস্বাস্থ্যের প্রকোপ এবং মনের শান্তির অপ্রতুলতা হইতে মুক্ত হইতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহাদের অবস্থা এই দিক দিয়া আমাদের অপেক্ষা ভাল নহে, বরং খারাপ। সুতরাং ইহা অনস্বীকার্য যে, প্রচলিত শিক্ষাবিস্তারের বিষয় চিন্তা করা অর্থহীন। প্রকৃত শিক্ষা, অবশ্যই আমাদিগের পক্ষে এবং আমাদিগের সন্তানদিগের পক্ষে অতিশয় প্রয়োজনীয়, কিন্তু তাহা বর্তমানের এই শিক্ষা নহে। বর্তমানে মনুষ্য-সমাজে যে-শিক্ষা চলিতেছে, তাহার অপেক্ষা শিক্ষাহীনতা ভাল। কোন তথাকথিত অশিক্ষিত এবং নিরক্ষর ব্যক্তিকে পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, সে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মোটা মোটা ডিগ্রী ও সার্টিফিকেট প্রাপ্ত ব্যক্তিবৃন্দ অপেক্ষা অনেক ভাল। অপ্রিয় হইলেও ইহা সত্য। যদি বামলা-মোকর্দমা হইতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত অপরাধীদের তালিকা করা যায়, দেখা যাইবে, তাহাদের অধিকাংশই অশিক্ষিত এবং নিরক্ষর নহে, শিক্ষিত। বাস্তব জগতের দিকে চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিলে দেখা যায়, অশিক্ষিত এবং নিরক্ষর ব্যক্তিবৃন্দ শিক্ষিত ব্যক্তিদের তুলনায় অর্দ্ধেক অবিবেকী ও অসত্যবাদী নহে।

বর্তমান আর্থিক অবস্থায় প্রকৃত শিক্ষা-প্রণালীর প্রবর্তন সহজসাধ্য নহে। ইহার পরিকল্পনা করিতে হইলে দাসমনোভাব হইতে মুক্ত এবং সম্পূর্ণ সংস্কারহীন ও সর্বাবস্থায় অবিচলিত থাকিতে সমর্থ এবং সম্পূর্ণ স্বাধীনচিত্ত হইবার প্রয়োজন। মিঃ গান্ধী, কিংবা মিঃ জওহরলাল নেহেরু, কিংবা স্যর পি. সি. রায় কিংবা পরলোকগত স্যর আশুতোষের পুত্রাদি, কাহারও তদুপযোগী মস্তিষ্ক নাই। তাঁহারা বরাবরই অন্ধকে পঙ্গিল করিয়া চলিয়াছেন এবং যদি বিতাড়িত না হন, তবে তাহা পঙ্গিলতর করিবেন। শিক্ষা বিষয়ে বর্তমান অবস্থায় যাহা প্রয়োজন, তাহা হইতেছে উহাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া দেশবাসী জনসাধারণের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের দিনের প্রতীক্ষা করা।

মিঃ বড়দলই-এর তৃতীয় পরিকল্পনা, প্রাথমিক শিক্ষা-বিষয়ক। অন্য কোন অবস্থায় ইহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় ইহার নিশ্চয়ই প্রয়োজন নাই। ইহাও জনসাধারণের আর্থিক স্বচ্ছলতা ইত্যাদি যে-সব অবশ্য প্রয়োজন, তাহার পূরণে বিন্দুমাত্র সহায়ক নহে। তাহা না হইলে, যাহারা ইতিমধ্যেই প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়াছে, তাহারা দারিদ্র্য ও আধি-ব্যাধির দ্বারা প্রপীড়িত হইত না। যখন মানুষের পেটে ক্ষুধাতৃষ্ণার জ্বালা ধরে, তখন তাহার নিকট প্রাথমিক শিক্ষা কিংবা অপর কোন বিষয়ে কথা কহিয়া কোন লাভ নাই, উহা হজম করিবার শক্তি তাহার থাকে না।

মিঃ বড়দলই-এর চতুর্থ পরিকল্পনা জলসেচ-বিষয়ক। ইহা তাঁহার অভিজ্ঞতা এবং পর্যবেক্ষণ-শক্তির অভাবের পরিচায়ক। যে-সব অঞ্চলে বর্তমান বৈজ্ঞানিক পন্থায় জলসেচপ্রথা বিশ বৎসরের অধিক কাল প্রবর্তিত হইয়াছে, সেই সব অঞ্চলে উহার ফল কি দাঁড়াইয়াছে, আমরা তাহা মিঃ বড়দলইকে নিরীক্ষণ করিতে বলি। তিনি দেখিবেন, পৃথিবীর কুত্রাপি বৈজ্ঞানিক জলসেচ-প্রথায় প্রত্যাশিত ফল দেখা যায় নাই। যেমন, সময়ে সময়ে রোগীর মৃত্যু ঘটিলেও অস্ত্রোপচারকে কৃতিত্বপূর্ণ বলা হইয়া থাকে, বৈজ্ঞানিক জলসেচ-প্রথায়, কৃষকদিগের অবস্থার সংখ্যাহীন বিপর্যয় ঘটিয়া থাকিলেও উহা এই প্রবাদ-প্রসিদ্ধ কৃতিত্বই অর্জন করিয়াছে। বিশ বৎসরের অধিক কাল যে-সব অঞ্চলে উহা প্রবর্তিত হইয়াছে, তাহার যে কোন একটির সংবাদ লইলে দেখা যাইবে যে, কোথাও উহা জমির ফসল কিংবা উর্বরা-শক্তির বৃদ্ধি করিতে পারে নাই। ইহা

সত্য যে, গারস্তে বৎসর বার, ইহা কিয়ৎপরিমাণে জমির অনুর্বরতার বৃদ্ধি সূচিত করে, কিন্তু তৎসত্ত্বে জমির অবস্থা পূর্বাপেক্ষাও নিকৃষ্ট হয়। কেবল জমির উর্বরাশক্তির হ্রাস নহে, ইহা ভূ-নিম্নে অস্বাস্থ্যকর বাষ্পের সৃষ্টি করে, যাহার ফলে আবহাওয়া অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে এবং ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে মারীরূপে বহু রোগ বিস্তার লাভ করে।

মিঃ বড়দলই-এর চতুর্থ পরিকল্পনা গ্রাম অঞ্চলে যাতায়াত এবং জল-সরবরাহের ব্যবস্থা বিষয়ক।

বর্তমান অবস্থায় জনসাধারণের যাতায়াত যাহা অবশ্য-প্রয়োজন, তাহার পূরণে ইহাও সহায়ক নহে। ইহা পূরণ করা দূরে থাক, গ্রাম অঞ্চলের যাতায়াতের সুব্যবস্থা বলিতে বর্তমানে যাহা বুঝা যায়, তাহাতে দেশের অবস্থা আরও খারাপ হইবে। যদি উপলব্ধি করা যায় যে, জনসাধারণকে বর্তমান দারিদ্র্য হইতে বাঁচাইবার প্রথম উপায়, জমির স্বাভাবিক উর্বরাশক্তির উন্নতি, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, রেল ও মোটর-রাস্তার বিস্তার এবং ব্রিজ ও আধুনিক ধরণের সহরের প্রসার সূচিত না করিলে প্রত্যাশিত ভাবে উর্বরাশক্তির বৃদ্ধি বিন্দুমাত্র সম্ভব নহে। পল্লী-অঞ্চলের যাতায়াতের বর্তমান সুব্যবস্থা যদি জনসাধারণের দারিদ্র্য ও অন্নাভাব দূর করিতে পারিত, তবে ইউরোপের কোন দেশেই দারিদ্র্য এবং অন্নাভাব বিদ্যমান থাকিত না। কিন্তু ঐ সব অঞ্চলে বাস্তব ঘটনা অন্যরূপ।

ভারতীয় নেতৃবৃন্দ যে-ভাবের চিন্তাতেই দীক্ষিত হইয়া থাকুন না কেন, ইহা বাস্তব সত্য যে, ইউরোপের জনসাধারণের মধ্যে অন্নাভাব ভারতবাসী জনসাধারণের অন্নাভাব অপেক্ষাও তীব্রতর। জার্মানীকে খাদ্যাভাব বশতঃ জনসাধারণের মধ্যে, এমন কি খাদ্য-সরবরাহের ব্যবস্থাও আইন-কানুন দ্বারা বাঁধিতে হইয়াছে। আসামের প্রধান-মন্ত্রীকে তাই গ্রাম অঞ্চলের যাতায়াতের উন্নয়ন ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করিবার পূর্বে বিষয়টি একাধিকবার চিন্তা করিয়া দেখিতে আমরা অনুরোধ করি।

মিঃ বড়দলই-এর পঞ্চম পরিকল্পনা শিল্প ও কৃষি-বিষয়ক।

যদি বর্তমান জগতে প্রচলিত কোন শিল্প কিংবা কৃষি-পরিকল্পনা জন-সাধারণের অর্থকৃচ্ছ্রতা এবং অন্নাভাব-সমস্যার সামান্য সমাধানও করিতে পারিত, তবে তাহাদের অবস্থা ক্রমশঃ হীন হইতে হীনতর হইতে পারিত না। ভারতের প্রদেশসমূহের যে-কোন একটির শিল্প-বিষয়ক অবস্থা পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, প্রত্যেক প্রদেশে ত্রিশ-বৎসরের পূর্বের তুলনায় শিল্প-বৃদ্ধি দ্বিগুণ অথবা তদপেক্ষাও বেশী হইয়াছে। এইরূপ শিল্প-বিস্তার সত্ত্বেও প্রত্যেক প্রদেশের অবস্থা হীনতর হইয়াছে। বর্তমান ব্যবস্থায় কোন কৃষি-উন্নয়ন পরিকল্পনা কিংবা চাষযোগ্য জমির আয়তন বৃদ্ধি এবং বৈজ্ঞানিক সারের ব্যবহার, দরিদ্র কৃষিজীবীর অবস্থার উন্নতি করিতে কিছুতেই পারিয়া উঠিবে না। কেন পারিবে না, তাহা আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করিয়াছি।

জন-সাধারণের অর্থকৃচ্ছ্রতা এবং অন্নাভাব-সমস্যার সমাধানের একটি মাত্র পন্থা বর্তমান। সেই পন্থা হইতেছে, একই সময়ে জমির স্বাভাবিক উর্বরাশক্তির বৃদ্ধি, এবং শ্রমিক-বেতনের অনুপাতে নিয়ন্ত্রিত-মূল্য কুটিরশিল্প এবং বাণিজ্যের ব্যবস্থার হস্তক্ষেপ। আর যে কোন ভাবেই চেষ্টা করা যাউক না কেন, এই একটি উপায় ব্যতিরেকে বাস্তব সমস্যার কোন উল্লেখযোগ্য সমাধান সম্ভব হইবে না।

মোটের উপর, আমরা বলিতে বাধ্য যে মিঃ বড়দলই তাঁহার উদ্ভাবনী-শক্তির পরিচয় স্বরূপ বহুবিধ পরিকল্পনা উপস্থিত করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের নিকট হইতে হাততালি লাভ করিতে পারেন, কিন্তু স্বীয় প্রদেশের অধিবাসীদের ভীষণ দুরবস্থা হইতে উদ্ধার করিবার জন্য প্রধান-মন্ত্রীর যে-গুণাবলী থাকা একান্ত প্রয়োজন, তাহার প্রমাণ তিনি দিতে পারেন নাই। আসামের অধিবাসীরা হয়ত বর্তমানে আমাদের সহিত একমত হইতে পারিবেন না, কিন্তু তাঁহাদের স্বার্থের দিকে চাহিয়াই আমাদিগকে বলিতে হইতেছে যে, যদি তাঁহারা সতর্ক না হন এবং কংগ্রেসের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দের মনোভাবের পরিবর্তন সাধন না করিতে পারেন, তবে তাঁহাদিগকে বহু ভুগিয়া ভোগ করিতে হইবে। সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতা ও পাশ্চাত্যের অনুকরণলব্ধ আর্থিক পরিকল্পনার কথায় মাতিয়া সাময়িক-

ভাবে ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু তাহা জন-সাধারণের উদ্দেশ্যপূরণের কখনও সহায়ক হইবে না। উদ্দেশ্য পূরণ যুবে থাক, জন-সাধারণের অবস্থা ইহার জন্য ক্রমশঃ খারাপ হইয়া চলিবে।

উপসংহারে সরকারের আর্থিক ঘাটতি সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা প্রয়োজন। আমরা ইহার জন্য বৃটিশ জাতিকে সাধারণতঃ দোষ দিয়া থাকি, কেন না এখনও অর্থের নিয়ন্ত্রণ অংশতঃ তাঁহারাই হাতে রাখিয়াছেন। কিন্তু আমরা বলিতেছি যে, এতৎসত্ত্বেও, ধনী-দরিদ্র, কাহারও টাক্স বৃদ্ধি না করিয়া আর্থিক অসুবিধা মিটাইবার উপায় আছে। কোন ধনীদিগের টাক্স বৃদ্ধির কথা উঠাইলে, দরিদ্রদিগকে শান্ত করিবার একটি অজুহাত সৃষ্টি হইতে পারে, কিন্তু ইহা অদূরদর্শিতার পরিচায়ক। এমন কি, ধনীদের উপর টাক্স ধার্য্য করিলে দরিদ্রদের উহার ফল ভুগিতে হয়, কেন না জীবিকার্জ্জনের ব্যাপারে দরিদ্রদিগকে প্রধানতঃ ধনীদের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয় এবং ধনীদের যদি বর্দ্ধিত টাক্সের ভার বহন করিতে হয়, তবে তাঁহারা ব্যয়বৃদ্ধির দরুণ শ্রমিকদিগকে বর্দ্ধিত হারে বেতন দিতে পারেন না।

সরকারের এষ্টাব্লিশমেন্ট-খরচা, অর্থাৎ পরিচালন-ব্যয় হ্রাসই হইতেছে ঘাটতি-পূরণের একমাত্র কার্য্যকরী ব্যবস্থা, কেন না এই খাতেই সরকারের ব্যয় সর্ব্বাধিক। এষ্টাব্লিশমেন্ট-খরচা অর্থাৎ পরিচালনের ব্যয় কমাইবার উপায় দুই প্রকার—এক, কর্ম্মচারীর সংখ্যা-হ্রাস, অপর কর্ম্মচারীর বেতনহ্রাস। বর্ত্তমান বেকার সমস্যার যুগে কর্ম্মচারীর সংখ্যাহ্রাস যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে না হইতে পারে, সুতরাং ব্যয়হ্রাসের আর যে একটি মাত্র উপায়, কর্ম্মচারীর বেতন কমান, তাহাই অবশিষ্ট থাকে। বর্ত্তমানে দ্রব্যমূল্যের যে-উচ্চতা, তাহাতে ইহাও সম্ভব নহে, কেন না মোটা মাহিনা পাইলেও সরকারী কর্ম্মচারীদের স্বাচ্ছন্দ্যে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহিত হয় না, দরিদ্র যাঁহারা, তাঁহাদের তো কথাই নাই। যদি আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য দ্রব্যের মূল্য যথেষ্ট হ্রাস প্রাপ্ত হয়, তবেই ইহা সম্ভব হইতে পারে। বর্ত্তমান অবস্থায় আহার্য্য দ্রব্যের মূল্যহ্রাসের চেষ্টাও বিপজ্জনক, কেন না, তাহাতে গরীব শ্রমজীবীকেই অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু যদি শ্রমজীবীরা জমি হইতে কিংবা কুটীর-শিল্পের সাহায্যে প্রচুর উৎপাদনের সুযোগ লাভ করে, তাহা হইলে ইহা ঘটিতে পারে না।

সুতরাং, ইহা বলা যাইতে পারে যে, সরকারের আর্থিক ঘাটতি-পূরণের জন্য উপরে যে তিনটি উপায় উল্লিখিত হইয়াছে, (১) জমির স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তির বৃদ্ধি, (২) কুটীর-শিল্প, (৩) শ্রমিক বেতনের অনুপাতে নিয়ন্ত্রিত মূল্যের বাণিজ্য-ব্যবস্থা, তদনুরূপ কার্য্যের প্রথম প্রয়োজন।

আমাদের আশা আছে, জনসাধারণ শীঘ্রই এই সরল সত্যকথা বুঝিতে পারিবে, অন্ততঃ যখন তাহাদের অসহ্যভাব শেষ সীমায় উপস্থিত হইবে। ইহা না বুঝিলে জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দ্দশা আরও বাড়িয়া চলিতে বাধ্য।

পাট-শিল্পের পুনরুজ্জীবন

পাঠকবর্গ অবগত আছেন যে, গত ৯ই জানুয়ারী তারিখে কলিকাতার গ্রাইটার্স বিল্ডিংএ আন্তঃপ্রাদেশিক পাট-সম্মেলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালা-সরকারের কৃষি-মন্ত্রী মিঃ নামতুদ্দিন আহম্মদ এই সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন। উপস্থিত মহোদয়গণের মধ্যে মিঃ এ. কে. ফজলুল হক, মিঃ এন. আর. সরকার, মিঃ গোপীনাথ বরদলই এবং ডক্টর সৈয়দ মাহমুদের নাম উল্লেখযোগ্য।

সম্মেলনে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা প্রদত্ত হয়, একটি ডক্টর সৈয়দ মাহমুদের মুখনিঃসৃত, অপরটি সভাপতির।

ডক্টর সৈয়দ মাহমুদের বক্তৃতার নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখযোগ্য :—

(১) যদি তথ্যসংগ্রহে দেখাও যায় যে, পাট চাষের জমির অধিকতর হ্রাস বাঞ্ছনীয় নহে, তথাপি পাটের উচিত মূল্য রক্ষা অথবা বৃদ্ধির জন্য পাট চাষকে সুনিয়ন্ত্রিত করা আবশ্যক।

সম্ভবতঃ আরও একটি কাজ করা যায়, চেষ্টা করিয়া বাংলার প্রধান ফসল ধানের মূল্য বৃদ্ধি করিলে, ঠিক যে পরিমাণ জমিতে পাট চাষের প্রয়োজন, তাহার অপেক্ষা অধিক জমিতে পাট চাষ হইবে না।

(৩) প্রায়ই বলা হয়, পাটের মূল্যহ্রাসের অন্যতম কারণ, পাটের পরিবর্তে অন্য কোন উৎপ্রেণীর দ্রব্যের প্রচলনের ভয়। কিন্তু সময়ে সময়ে এই ভয়ের উল্লেখ মাত্র ছাড়াইয়া যায় বলিয়া আমার মনে হয়।

(৪) আমি বিশ্বাস করি না যে, পৃথিবীর অপর কোন দেশ, বাংলার জমিতে ও জল-হাওয়ায় যাহা সম্ভব, ৫।৬ মাসের মধ্যে এত সস্তায় কিংবা অনায়াসে ৩ কোটি ৫০ লক্ষ মণ ওজনের কোন উদ্ভিজ্জ তন্তু উৎপন্ন করিতে পারে।

(৫) পৃথিবীর বাজারের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যত দিন পাট উৎপন্ন করা হইবে, ততদিন তাহার মূল্যও পাওয়া যাইবে।

(৬) আমি জানি যে, পাটের কোন উপযুক্ত মূল্য নির্দ্ধারণ করিবার পক্ষে যথেষ্ট বাধা আছে, সেই মূল্য যাহাতে পাওয়া যায়, তাহার ব্যবস্থা করা আরও কঠিন।

(৭) বিশেষ পরীক্ষা না করিয়া পাটের সর্ব্বনিম্ন মূল্য নির্দ্ধারণের প্রস্তাব দেওয়া উচিত হইবে না।

(৮) যদি পাটের সর্ব্বনিম্ন মূল্য নির্দ্ধারিত করিবার ব্যবস্থা হয়, তবে অন্যান্য অনেক বিষয়ের সহিত পাটের মূল্যের সহিত তুলার মূল্যের কি সম্বন্ধ, তাহারও বিচার করিতে হইবে।

(৯) ওজনের মাপ নির্দ্দিষ্টীকরণ, বাজারসমূহের তালিকা করা, আড়তদার ও দালালদের লাইসেন্সের ব্যবস্থা এবং উৎকর্ষানুসারে পাটের শ্রেণীবিভাগ ইত্যাদিও বিবেচনার বিষয়।

(১০) পাটের নূতন নূতন ব্যবহারের পন্থা আবিষ্কার করিতে হইবে।

ডক্টর মৈত্র মাবুদের বক্তৃতার এই দশটি বিষয় লক্ষ্য করিলে পাঠক উপলব্ধি করিবেন যে, পাটচাষীরা যাহাতে তাহাদের মাল বিক্রয় করিয়া লাভবান্ হয়, তিনি তাহার উপায় নির্দ্ধারণার্থ ব্যাকুল হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহার সদিচ্ছা প্রশংসার্হ। কিন্তু আমাদের মতে, তিনি এই বিষয় সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ও পর্য্যবেক্ষণের সামর্থ্য অর্জ্জন না করিয়াই এই সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন এবং তিনি রোগীর উদ্দেশ্যে সুদীর্ঘ প্রেসক্রপসন করিলেও এবং উহা আপাতদৃষ্টিতে কার্য্যকরী মনে হইলেও, তিনি রোগীর রোগই নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারেন নাই। পাটচাষীর পক্ষে পাটের মূল্য লাভজনক করিতে হইলে কি পন্থা গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা স্থির করিবার জন্য সর্ব্ব-প্রথমে আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে, স্মরণাতীত কাল হইতে বাঙ্গালায় পাটের আবাদ চলিয়া আসিলেও উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের পূর্ব্বে উহার এত সুপ্রচুর পরিমাণে রপ্তানী সম্ভব হয় নাই কেন এবং তাহার পরেই বা উহা সম্ভব হইয়াছে কেন। ইহাও দেখিতে হইবে যে, কেন পাটের দাম এত উঠা-নামা করে, কেনই বা উহার মূল্য সময়ে মণপ্রতি ২৬৲ টাকা হয় এবং সময়ে মণপ্রতি ৪৲ টাকা দাঁড়ায়। এই দুই প্রশ্নের সমাধান করিতে হইলে, বাঙ্গালার পাটের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খরিদ্দার কাহারা এবং কেনই বা তাহারা উহা খরিদ করে, ইহা দেখিবার দরকার আছে।

আমরা যতদূর জানি, আমেরিকার যুক্তপ্রদেশ পাট-জাত দ্রব্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খরিদ্দার এবং অষ্ট্রেলিয়া পাটের ছালা বহুল পরিমাণে খরিদ করিয়া আসিতেছে। অবশ্য, তাহারাই একমাত্র খরিদ্দার নহে। আমাদের বক্তব্য এই যে, পাটজাত দ্রব্যের প্রধান দুইটি মাল ইহারাই সর্ব্বাধিক খরিদ করিত। আমেরিকার ও অষ্ট্রেলিয়ার কি জন্য পাটজাত দ্রব্য কিংবা পাটের ছালার এত প্রয়োজন, তাহা নির্দ্ধারণের চেষ্টা করিলে দেখা যাইবে যে, আমেরিকা যে পাটজাত দ্রব্য খরিদ করিত, তাহার অধিকাংশই ব্রিটিশ দ্বীপে এবং ইউরোপে আমেরিকা যে তুলার গাঁইট রপ্তানী করিত, তাহাই মুড়িবার কার্য্যে ব্যবহৃত হইত; অষ্ট্রেলিয়া যে পাটের ছালা খরিদ করিত,

তাহা ইউরোপে কিংবা পৃথিবীর অপরাপর দেশে অষ্ট্রেলিয়া যে শস্য রপ্তানী করিত, তাহাই মুড়িবার নিমিত্ত।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে যে পাটের রপ্তানী এত বাড়িয়াছিল, ইহাই তাহার গোড়ার কথা।

এশিয়া এবং অন্যান্য দেশের বাজারে বিক্রয়ার্থ বৃটেন এবং ইউরোপে বহুল পরিমাণে কাটা-কাপড় তৈয়ারী হইত এবং তজ্জন্যই তাহারা আমেরিকার নিকট হইতে প্রভূত তুলা খরিদ করিত। ফলে, তুলার গাঁইট মুড়িবার জন্য আমেরিকাকে সমধিক পরিমাণে পাটজাত দ্রব্য ক্রয় করিতে হইত। কিন্তু মহাযুদ্ধের পর হইতে ইউরোপের অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক দেশেও নিজেদের প্রয়োজনীয় কাটা-কাপড় তৈয়ারী সুরু হইয়াছে এবং তাহারই ফলে বৃটিশ দ্বীপ ও ইউরোপ, উভয়ের কাটা-কাপড়ের ব্যবসায়ে মন্দা পড়িয়াছে। সুতরাং আমেরিকার তুলা রপ্তানীর ব্যবসায় হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং ফলে আমেরিকার পাটজাত দ্রব্যের চাহিদাও কমিয়া গিয়াছে।

আমেরিকার পাটজাত দ্রব্যের খরিদ ব্যাপারে যাহা দেখা গেল, অষ্ট্রেলিয়ার পাটের ছালা খরিদের ব্যাপারেও অনুরূপ ঘটিয়াছে। ইউরোপের মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে অষ্ট্রেলিয়া যে পরিমাণ শস্য রপ্তানী করিত, উহার পরে আর তাহা করিতে পারিতেছে না।

পাটজাত দ্রব্যের এই দুই খরিদ্দারের উপর, মহাযুদ্ধ-কালীন ট্রেঞ্চ-যুদ্ধ চালাইবার জন্য প্রকৃত সংখ্যার পাটের ছালার প্রয়োজন হয়। এই জন্য যুদ্ধের সময়ে পাটজাত দ্রব্যের চাহিদাও যেমন বাড়িয়াছিল, তেমনই উহার মূল্যেরও বৃদ্ধি হইয়াছিল বলিয়া আমরা দেখিতে পাই।

উপরে যাহা বলা হইল, মোটামুটি ভাবে তাহার বক্তব্য হইতে দাঁড়ায় এই যে, পাটচাষীর পক্ষে পাটের লাভ-জনকতা রক্ষা করিতে হইলে, আবার সুদীর্ঘকাল-স্থায়ী ট্রেঞ্চযুদ্ধের প্রয়োজন। ইতিপূর্ব্বে বৃটিশ দ্বীপ ও ইউরোপের যে সুবিধা ছিল, এশিয়ার বাজারে বহুল পরিমাণে কাটা-কাপড় ছাড়িবার সেই সুযোগ তাহাদের পাওয়া চাই, যাহাতে তাহারা আমেরিকা হইতে প্রচুর পরিমাণে তুলার গাঁইট খরিদ করিতে পারে এবং অষ্ট্রেলিয়াও যাহাতে পূর্ব্বের ন্যায় পৃথিবীর বাজারে শস্য রপ্তানী করিতে পারে, অষ্ট্রেলিয়ারও সেই সুযোগ পুনরায় লাভের প্রয়োজন।

পৃথিবীর শিল্প-বাণিজ্যের বাজারের বর্ত্তমানে যে-অবস্থা, তাহাতে ঐ তিনটী ব্যবস্থার কোনটিও এখন সম্ভব নহে, কেন না প্রত্যেক দেশই এখন নিজের নিজের প্রয়োজন মাফিক মাল তৈয়ারী করিতে চাহিতেছে। সুতরাং ইহা নিশ্চয়ই বলিতে হইবে যে, পাট-চাষ ও পাট-শিল্পের ভবিষ্যৎ চিরতরে তমসাচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। এমন হইতে পারে যে, আরও কিছু কালের জন্য পাটের ব্যবসায় চলিতে থাকিবে, কিন্তু যত দিন যাইবে, ততই পাট-জাত দ্রব্যের প্রয়োজন হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে। যাঁহারা কলেজী-বিদ্যার জোরে বিশেষজ্ঞ বনিয়া বসিয়া আছেন এবং যাঁহারা যুক্তি-বিবেচনা না করিয়া বাণিজ্যের হ্রাস-বৃদ্ধির হিসাব করেন, তাঁহারা হয়ত বর্ত্তমানে ইহা বুঝিতে পারিবেন না কিংবা বুঝিতে চাহিবেন না, কিন্তু তাঁহাদিগকে আমরা বুঝিতে বলি যে, ৩ আর ২-এ চিরকালই ৫ হয়, আর কিছু হয় না।

প্রাদেশিক মন্ত্রিমণ্ডলে আমাদের যাঁহারা স্থান পাইয়াছেন, তাঁহারা পাশ্চাত্য অর্থনীতি হইতে তোতা-পাখীর ন্যায় অনেক কিছু মুখস্থ করিয়া বিচিত্র বাগ্‌বিন্যাস দ্বারা চাতুরী ও জ্ঞানের পরিচয় প্রদর্শন করিতে পারেন, কিন্তু তৎসাহায্যে দরিদ্র চাষীদের অবস্থার উন্নতি সাধিত হইবে না। তাঁহারা অদূরভবিষ্যতে দেখিতে পাইবেন যে, আগামী দশ বৎসরের মধ্যে পাটের ব্যয়বহুল চাষ স্বতঃই পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং কোন সরকারকেই ইহার সঙ্কোচার্থ আইন-কানুন কিংবা প্রচার করিতে হইতেছে না। যদি ইহাদের চাষী বলিতে প্রকৃতপক্ষে সামান্য দরদও থাকে, তবে জমির স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি কি ভাবে বৃদ্ধি পাইতে পারে, তাহা চিন্তা করিয়া তাঁহাদের তদনুযায়ী কর্ম্মপদ্ধতি গঠিত করা উচিত এবং যাহাতে চাষী তাহার জমিতে বৎসরের পাঁচ মাস মাত্র পরিশ্রম করিয়া,তাহার পরিবারের প্রাসাচ্ছাদনের অতিরিক্ত তিনগুণ ফসল পাইতে পারে এবং অবশিষ্ট সাত মাস কুটির-শিল্পের কার্য্য করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করা উচিত। বর্ত্তমানে তাহাদিগকে, তথা মনুষ্যসমাজকে বাঁচাইবার ইহাই একমাত্র উপায়।

কান্না ও হাস্না

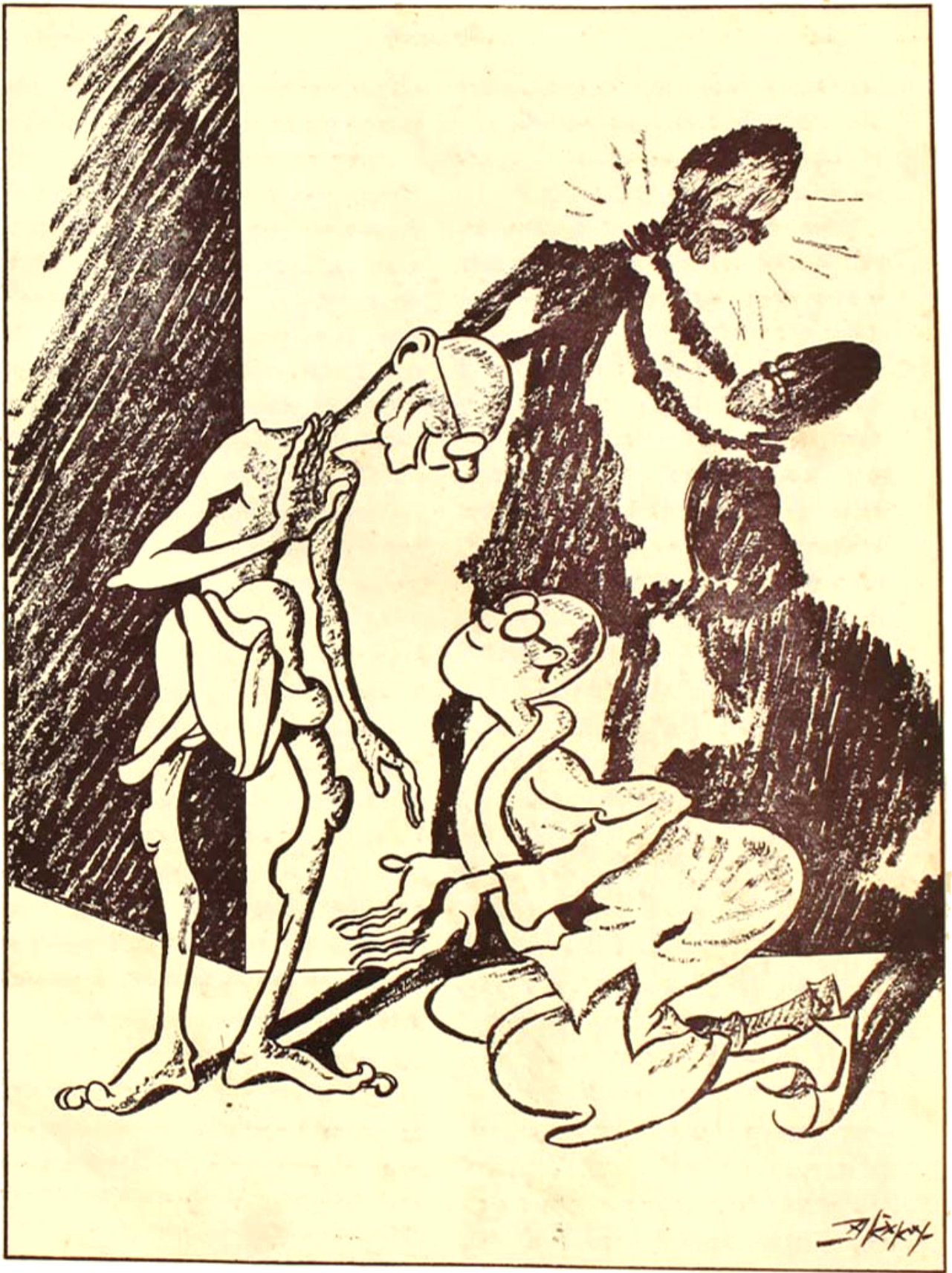

৩১শে জানুয়ারী গান্ধীজীর বিবৃতি :—সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধানে আমি আনন্দিত...পক্ষান্তরে আমি উহাদে প্রকাশ করিতেছি...যাহার হউক, সুভাষ বাবু ও আর যেসব পক্ষ বদলে।

সুভাষচন্দ্রের প্রত্যুত্তর :—আমার সম্বন্ধে তিনি যে অভিমতই পোষণ করুন না কেন, তাঁহার বিষাদ ও আহ্লাদান্বিত হইয়া থাকিবার জন্য আমি সর্বদাই দৃঢ়ই থাকিব।

তাঁহারা সহস্র উপায়ে ইহার চেষ্টা করিতে পারেন, কিন্তু তাহার প্রত্যেকটি ব্যর্থ হইতে বাধ্য। আমরা তাঁহাদিগকে দ্বান্দ্বিকতা পরিহার করিয়া, সময় থাকিতে সুবুদ্ধির পরিচয় দান করিতে অনুরোধ করি।

কংগ্রেসের সভাপতিত্ব

আগামী বৎসরের জন্য কংগ্রেসের সভাপতিরূপে নির্ব্বাচনপ্রার্থী ছিলেন মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু এবং ডাক্তার পট্টভি সীতারামাইয়া। কংগ্রেসের প্রতিনিধিবৃন্দই সভাপতি নির্ব্বাচন করেন। সাধারণতঃ, এই সদস্যদের পছন্দ-অপছন্দ অনুযায়ী কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। প্রশ্ন এই যে—'এইরূপ হওয়া কি উচিত?' কোন ব্যক্তিকে আমরা পছন্দ কিংবা অপছন্দ করিতে পারি, কিন্তু কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত করিবার কিংবা না করিবার পক্ষে তাহাই কি যথেষ্ট কারণ? আমাদের উত্তর, 'না।' কোন ব্যক্তিকে আমরা নানা কারণে পছন্দ করিতে পারি, কিন্তু তাঁহার যদি জনসাধারণের স্বার্থপূরণকল্পে কার্য্য করিবার জন্য যে গুণাবলী থাকা, অতি অবশ্য প্রয়োজনীয়, তাহা না থাকে, তবে তাঁহাকে নির্ব্বাচন করা অনুচিত। অন্য দিকে, কোন ব্যক্তিবিশেষ আমাদের পছন্দসই না হইতে পারেন, কিন্তু জনসাধারণের স্বার্থপূরণকল্পে যে-সকল গুণের প্রয়োজন, একমাত্র তিনিই যদি তাহার অধিকারী হন, তবে তাঁহাকে নির্ব্বাচিত করিতে আমাদের ইতস্ততঃ বোধ করা উচিত নহে।

ইহার কারণ-নির্দ্ধারণে বেগ পাইতে হইবে না। কংগ্রেস জনহিতকর প্রতিষ্ঠান, সুতরাং এমন ব্যক্তিকে তাহার সভাপতি নির্ব্বাচিত করা উচিত নহে, যিনি নিম্নের দুইটি গুণ হিসাবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নহেন :—

(১) জনসাধারণের অধিকাংশের সমস্যা-সমূহের প্রকৃতিসম্বন্ধীয় জ্ঞান।

(২) ঐ সকল সমস্যাপূরণসম্বন্ধীয় জ্ঞান।

সুতরাং যোগ্যতম ব্যক্তিকে কংগ্রেস-সভাপতি নির্ব্বাচন করিতে হইলে নিম্নের বিষয়সমূহ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হইবার প্রয়োজন :—

(১) বর্ত্তমান সময়ে ভারতবাসী জনসাধারণের অধিকাংশের জীবনে কি কি সমস্যা দেখা দিয়াছে।

(২) ঐ সকল সমস্যা সমাধানের উপায় কি।

(৩) ঐ সকল সমস্যা সমাধানের পক্ষে অতি অবশ্য ভাবে প্রয়োজনীয় গুণাবলী কি।

ভারতবাসী জন-সাধারণের প্রধান সমস্যা

বর্ত্তমান সময়ে ভারতবাসী জনসাধারণের অধিকাংশের জীবনের প্রধান সমস্যা কি, তাহার কথা বলিতে হইলে আমাদিগকে, সর্ব্বপ্রথমে অর্জ্জিত আর্থিক স্বচ্ছলতার সমস্যার বিষয় প্রথমে উল্লেখ করিতে হইবে। আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, এই সম্বন্ধে কোন মত-পার্থক্য থাকিতে পারে না। এমন কি, যাঁহারা বর্ত্তমানে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাকে সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করেন, তাঁহারাও ইহারই নিমিত্ত উৎসুক। তাঁহারা মনে করেন যে, দেশ-রাষ্ট্রীয় ভাবে স্বাধীন না হইলে দেশবাসী জনসাধারণের আর্থিক স্বচ্ছলতা ব্যবস্থিত হইতে পারে না। ইহাদের উদ্দেশ্যে আমাদের বক্তব্য এই যে, তাঁহারা যদি আর্থিক স্বচ্ছলতা-সাধনের পন্থা সম্বন্ধে জ্ঞান আমূলভাবে না অর্জ্জন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে জনসাধারণের আর্থিক স্বচ্ছলতার ব্যবস্থার্থ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয় কি না, তাহা তাঁহাদের পক্ষে জানা সম্ভব নহে। লক্ষ্যে উপনীত হইবার নির্দ্দিষ্ট পন্থার সম্পূর্ণ ধারণা না হইলে, লক্ষ্যানুসরণ-কালে কোন্ অংশ গ্রহণীয়, কোন্ অংশ বর্জ্জনীয়, তাহা স্থির করা সম্ভব নহে। আমাদের অভিযোগ এই যে, কংগ্রেসের বর্ত্তমান নেতৃবৃন্দ, ভারতবাসী জনসাধারণের আর্থিক স্বচ্ছলতা ব্যবস্থিত হইবার কি উপায়, তাহার সম্বন্ধে কোন সুনির্দ্দিষ্ট জ্ঞান অর্জ্জন করেন নাই এবং সেই জন্যই তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জ্জনই ইহার একমাত্র উপায়। আমরা মনে করি যে, তাঁহারা যে-মুহূর্ত্তে আর্থিক স্বচ্ছলতা ব্যবস্থিত করিবার পন্থা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিবেন, সেই

মুহূর্ত্তে উপলব্ধি করিবেন যে, বর্ত্তমান আমাদের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন নিছক ভ্রান্তির পরিচায়ক এবং এই আন্দোলনই দেশবাসীর ক্রমিক দারিদ্র্য-বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণস্বরূপ হইয়াছে।

বর্ত্তমান সম্বন্ধে আমাদের পরবর্ত্তী আলোচ্য, জনসাধারণের আর্থিক স্বচ্ছলতা কি উপায়ে ব্যবস্থিত হইতে পারে—পাঠক ইহা পাঠ করিলে নিশ্চিত বুঝিতে পারিবেন, আমাদের উক্তি সম্পূর্ণ সত্য।

যাহাই হউক, এমন কি কংগ্রেস-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরও কেহ যুক্তিসঙ্গতভাবে অস্বীকার করিতে পারেন না যে, বর্ত্তমান অবস্থায়, দেশবাসী জনসাধারণের অধিকাংশের জন্য আর্থিক স্বচ্ছলতা ব্যবস্থিত করাই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়। এই আর্থিক স্বচ্ছলতা জনসাধারণের যথাসম্ভব সত্বরের সহিত উপার্জ্জিত হওয়া প্রয়োজন।

আর্থিক স্বচ্ছলতা সাধনের পন্থা

দেশের জনসাধারণের আর্থিক স্বচ্ছলতা-সাধনই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন, ইহা যদি আমরা নিঃসংশয়ে উপলব্ধি করিতে পারি, তবে ইহার পন্থা-নির্দ্ধারণ দুঃসাধ্য নহে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে, উপার্জ্জনের পন্থা বহু প্রকার, কিন্তু ইহার সমস্তগুলিই মোটামুটি নিম্নলিখিত পাঁচটি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত: (১) কৃষি, (২) শিল্প, (৩) বাণিজ্য, (৪) স্বাধীন পেশা, এবং (৫) চাকুরী। উপার্জ্জনের এই পাঁচটি পন্থার মধ্যে, চাকুরী, যত উচ্চ বেতনেরই হউক না কেন, যথেষ্ট সম্ভ্রমসূচক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না, কেন না, আনুগত্যের নামে বেতনভোগী নফরকে প্রায়ই তাঁহার নিজের বুদ্ধি ও বিবেক বিসর্জ্জন দিয়া মনিবের হুকুম তামিল করিতে হয়। মানুষ ইহা পছন্দ করিতে পারে না। স্বাধীন পেশাসমূহ নিঃসন্দেহে অনেকখানি সম্ভ্রমসূচক, কিন্তু বর্ত্তমানের কঠিন প্রতিযোগিতায় স্বাধীন পেশাজীবীদেরও মক্কেলের মন রাখিতে অনেক সময়ে কার্য্যের এবং চিন্তার স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিতে হয়।

তাহা ছাড়া, দেশের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের কৃতকার্য্যতার উপরই পেশাসমূহের লাভজনকতা অনেকখানি নির্ভর করে। যদি কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের ফলে দেশের ঐশ্বর্য্য না বৃদ্ধি পায়, কোন পেশাই সম্পূর্ণ সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারে না। সুতরাং বলিতে হয় যে, পেশাসমূহও ক্রমশঃ বেতনভোগী নফরগিরির ন্যায় অসম্ভ্রমসূচক হইয়া পড়িতে বাধ্য এবং উহাদের আর্থিক কৃতকার্য্যতা সকল অবস্থাতেই নিশ্চিত নহে, উহা অন্যান্য উপার্জ্জনের পন্থার কৃতকার্য্যতার উপর নির্ভরশীল।

একমাত্র, কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের যে কোনটি সম্বন্ধেই এমন কথা নিশ্চিত ভাবে বলা চলে যে, কোন ব্যক্তির তাঁবেদারী না করিয়া কিংবা উপরওয়ালার চোখরাঙ্গানি সহ্য না করিয়া স্বাধীনভাবে পরিচালনা সম্ভব। এই দিক্ হইতে ইহার প্রত্যেকটিকে সম্ভ্রমসূচক বলা যায়। কিন্তু যদি দেশে লাভজনক কৃষির ব্যবস্থা না থাকে, তবে শিল্প-বাণিজ্যের কোনটিরই উন্নতি হইতে পারে না। কেন না, কৃষির সাহায্যে কাঁচামাল উৎপন্ন না হইলে শিল্পের বিস্তৃত ব্যবস্থা সাধিত হইতে পারে না এবং শিল্প ও কৃষি, উভয়ই সুব্যবস্থিত না হইলে বাণিজ্য চলিতে পারে না। ইহা ছাড়া আরও দেখা যায়, শিল্প-বাণিজ্যে কর্ম্মনিযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, কেন না শিল্প-বাণিজ্য দেশবাসীর প্রয়োজনের উপর নির্ভর করে, এই প্রয়োজন সীমাহীন নহে। উপরন্তু শিল্প-বাণিজ্যের সমৃদ্ধি ক্রেতার সমৃদ্ধির উপর নির্ভর করে, এই ক্রেতার অধিকাংশই কৃষক।

দেশে আর্থিক স্বচ্ছলতা ব্যবস্থিত করিবার মূল বিষয় তাহা হইলে কৃষি, ইহা অবশ্য-স্বীকার্য্য। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, মনুষ্যসমাজকে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, স্বাধীন পেশা এবং চাকুরী, এই পাঁচটি উপার্জ্জনের পন্থারই স্ব স্ব উপকারিতা আছে। কিন্তু কৃষি যদি সুব্যবস্থিত না হয়, তবে শিল্প-বাণিজ্য ভাল ভাবে চলিতে পারে না এবং শিল্প-বাণিজ্য ভাল ভাবে না চলিলে কোন স্বাধীন পেশাতেই উল্লেখযোগ্য আর্থিক স্বচ্ছলতা সাধিত হইতে পারে না। বেতনভোগী নফরগিরি সময়ে সময়ে অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, কেন না বড়লাটগিরি, ছোটলাটগিরি, মন্ত্রিত্ব, ভজিয়তী, ম্যাজিষ্ট্রেটগিরি, ম্যানেজারী, সমস্তই ইহার অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু হাজার হউক, ইঁহারা সকলেই বেতনভোগী নফর এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকে, যাঁহারা দেশের প্রকৃত ঐশ্বর্য্য-বৃদ্ধি-সাধনের সামর্থ্য অর্জ্জন করিয়াছেন বলিয়া

আত্মবিশ্বাস অর্জন করিতে পারেন, সেই পর্য্যন্ত কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য-সংশ্লিষ্ট স্বাধীন ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন বলিয়া দেখা যায়।

আর্থিক স্বচ্ছলতা ব্যবস্থিত হইবার উপায় তাহা হইলে কৃষিকে লাভজনক করিবার উপায়ের উপর নির্ভরশীল বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

ভারতের প্রধান সমস্যা-সমূহ সমাধানার্থ প্রয়োজনীয় অপরিহার্য্য গুণাবলী

উপরে যাহা বলা হইল, তাহা হইতে সহজেই বুঝা যাইবে যে, ভারতের প্রধান সমস্যা-সমূহ সমাধানার্থ প্রয়োজনীয় অপরিহার্য্য গুণাবলী কি, তাহা স্থির করিতে হইলে আমাদিগকে নির্দ্ধারণ করিতে হইবে, কৃষক, মধ্য-স্বত্বভোগী, জমিদার এবং সরকারের পক্ষে কৃষিকে কি করিয়া লাভজনক করিয়া সংগঠন করা যায়। সামান্য চক্ষু মেলিয়া চাহিলে যে-কেহ বুঝিতে পারিবেন যে, কৃষকের পক্ষে যদি কৃষি লাভজনক না হয়, তাহা হইলে মধ্যস্বত্বভোগীই হউক, জমিদারই হউন, সরকারই হউন, তাহারও পক্ষেই কৃষি লাভজনক হইতে পারে না।

সুতরাং প্রকৃত সমস্যা হইতেছে, কৃষকের পক্ষে কৃষিকে কি করিয়া লাভজনক করা যায়, তাহাই। আধুনিক কৃষি-বৈজ্ঞানিকগণ এবং রাজনৈতিক ধুরন্ধরগণ এই উদ্দেশ্য সাধনের অনেক পথ বাতলাইয়াছেন। আধুনিক কৃষি-বিজ্ঞানের মতে, বৈজ্ঞানিক জলসেচ-প্রথা এবং বৈজ্ঞানিক সার, উপরের উদ্দেশ্য সাধনের প্রধান উপায় বলিয়া বিবেচিত হয়। আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, বৈজ্ঞানিক জলসেচ-প্রথা কিংবা বৈজ্ঞানিক সারের সহায়তায় কৃষিকে কৃষকের পক্ষে লাভজনক করিয়া তুলা সম্ভব নহে। যদি ইহাদের সহায়তায় কৃষি কৃষকের পক্ষে লাভজনক হইত, তবে যে-সকল দেশে ঐ দুইটি বৈজ্ঞানিক পন্থায় কার্য্য করা হইতেছে, তাহার অধিবাসীদের এতদিনে অন্নাভাব ও বেকার-সমস্যার সমাধান হইত। কিন্তু যে সকল দেশে এই দুই বৈজ্ঞানিক পন্থায় কার্য্য করা হইতেছে, তাহাদের অবস্থার নিরপেক্ষ পর্য্যালোচনা করিলে প্রমাণিত হইবে যে, তথায় অন্নাভাব ও বেকার-সমস্যার সমাধান দূরে থাক, এই দুই সমস্যা আরও জটিল হইয়াছে।

এই বিষয়ে সামান্য বিচার করিলে যে-কেহ বুঝিতে পারিবেন যে, যদি জমির অভ্যন্তর-ভাগে রস ও তেজের সুপ্রচুর সঞ্চয়ের ব্যবস্থা সাধিত করিয়া জমিকে যথেষ্ট উর্ব্বর না করা যায়, তবে কৃষি কৃষকের পক্ষে কখনই লাভজনক হইতে পারে না। যদি মানুষের শরীরাভ্যন্তরে রস ও তেজের অভাব ঘটে, তবে যেমন বাহির হইতে উহার ব্যবস্থা করিয়া উল্লেখযোগ্য কালের জন্য তাহাকে সবল ও কার্য্যক্ষম জীবন দান করা যায় না, তেমনই জমির পক্ষেও কেবল বাহির হইতে রস ও তেজোদানের ব্যবস্থা করিয়া তাহাকে চিরকালের জন্য সুপ্রচুর উর্ব্বরাশক্তি প্রদান করা যায় না। যদি বৈজ্ঞানিক জলসেচ ও সারদান-প্রণালী বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করা যায়, তবে দেখা যাইবে যে, উহা কেবল অস্থায়ীভাবে এবং অবাঞ্ছনীয় অনুপাতে জমির মাত্র উপরিভাগে তেজ ও রস দান করিতে পারে, উহার অভ্যন্তরস্থ তেজ ও রসের কার্য্যসাধনের সহায়তা করা উহার দ্বারা সম্ভব নহে। এই জন্যই স্থায়ী ভাবে জমির উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধির ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক জলসেচ ও সারদান-প্রণালী, উভয়ই কার্য্যকরী নহে এবং তাহারই ফলে উহাদের সাহায্যে কখনও কৃষিকে কৃষকের পক্ষে লাভজনক করিয়া তুলা যায় না।

রাজনৈতিক ধুরন্ধরেরা বলিয়া থাকেন যে, জমির বিলি-ব্যবস্থা এবং খাজনার হার পরিবর্ত্তিত করিলেই কৃষকের সমস্যার সমাধান হইবে। যখন জমিতে স্থায়ীভাবে উর্ব্বরাশক্তি দানের উপায় কার্য্যকরী হইবে, তখন অবশ্য জমির বিলি-ব্যবস্থা এবং খাজনার হারের সামান্য পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইবে, কিন্তু জমিকে ন্যূনতম প্রয়োজনের উপযোগী উর্ব্বরাশক্তি দান না করিয়া, কৃষকের সমস্যা-সমাধানের পক্ষে জমির বিলি-ব্যবস্থা ও খাজনার রদ-বদল কোন কাজেই লাগিবে না। যাঁহারা জমির বিলি-ব্যবস্থা ও খাজনার রদ-বদলের কথা বলিয়া থাকেন, তাঁহারা কৃষকের দেয় খাজনার হার কমাইতে চাহেন এবং চাষের জন্য কৃষকের নিজস্ব কিছু জমির অধিক হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে চাহেন। কিন্তু যদি [illegible] কালে কৃষক ব্যক্তিগত ভাবে [illegible] তখনি জমি চাষ

(২) বর্ত্তমান রেলপথে রাস্তার ধ্বংস সাধনের ফলে যাঁহাদের ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে, তাঁহাদের ক্ষতিপূরণের উপায় সম্বন্ধীয় জ্ঞান।

(৩) দেশের অধিকাংশ অধিবাসীর মিলনের উপায় সম্বন্ধীয় জ্ঞান।

উপরিলিখিত গুণাবলীর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিলে দেখা যাইবে যে, মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুই হউন, ডাঃ পট্টভি সীতারামাইয়াই হউন, কংগ্রেসের কার্য্যকরী সভার বর্ত্তমান সদস্যবৃন্দের অপর যে-কেহই হউন, এমন কি স্বয়ং মিঃ গান্ধীই হউন, ইঁহাদের কাহারও এই তিনটি গুণ নাই। ইঁহাদের উক্তি ও বক্তৃতাসমূহ যথাযথ ভাবে পাঠ করিলে যে-কাহারও মনে বা নেত্রে পরিস্ফুট হইবে যে, এই প্রয়োজনীয় গুণাবলীর অধিকারী হওয়া দূরে থাক, উল্লিখিত ব্যক্তিবৃন্দের প্রত্যেকটি দাসমনোভাব-সম্পন্নতায় এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা ও বিজ্ঞানের ক্রীতদাসত্বের প্রকৃষ্ট প্রমাণ; ইহারই জন্য তাঁহাদের মস্তিষ্ক স্বাধীন ভাবে চিন্তার সামর্থ্য হারাইয়াছে। ফলে, কেবলই যে নিখিল ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হইবার জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলী ইঁহাদের কাহারও নাই, তাহা নহে, এই গুণাবলীর যোগ্যতা অর্জ্জনের সামর্থ্যও ইঁহাদের একেবারে নাই বলিলেই চলে।

উল্লিখিত গুণাবলীর প্রথম দুইটিকে বিশেষজ্ঞোচিত বলা যাইতে পারে এবং কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের ইহা না থাকিলে দেশ তাঁহাদিগকে ক্ষমা করিতে পারে। কিন্তু যদি দেখা যায় যে, ইঁহাদের কাহারও দেশবাসী জন-সাধারণের অধিকাংশকে মিলিত করিবার উপায় সম্বন্ধেও কোন জ্ঞান নাই, তাহা আমাদিগকে বলিতেই হইবে যে, ইঁহাদের প্রত্যেককে গলাধাক্কা দিয়া নেতৃত্বের গদী হইতে বিতাড়িত করিতে দ্বিধা বোধ করা উচিত নহে।

আমাদের বিগত সংখ্যাসমূহে আমরা আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি যে, দেশবাসী জন-সাধারণের অধিকাংশকে মিলিত করিবার উপায়ের প্রাথমিক সোপান, দ্বন্দ্ব-কলহ এবং সকল প্রকার সংঘর্ষের মনোভাব সম্পূর্ণ ভাবে পরিহার। কেন না, ইহা মনস্তত্ত্বসম্মত সত্য যে, দ্বন্দ্ব-কলহ এবং সংঘর্ষ হইতে অনৈক্য এবং পার্থক্য ঘটিতে বাধ্য। সাধারণ লোকের কর্ণে ইহা মধুবর্ষণ করিতে পারে যে, মিঃ গান্ধী ভারতের স্বাধীনতা-যুদ্ধের সেনাপতিত্বে অবতীর্ণ হইয়াছেন; কিন্তু তাহাদের যখন জ্ঞানোদয় হইবে তখন তাহারা বুঝিতে পারিবে যে, মিঃ গান্ধীর দুরভিসন্ধি মনোভাবের ফলেই প্রধানতঃ তাঁহার নেতৃত্বের আমলে ভারতে অনশন দল ও সম্প্রদায়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। যদি এই দুরভিসন্ধি মনোভাব পরিহার না করা যায়, তবে হাজামজা নদীর পুনঃসংস্কারার্থ যে-পন্থায় অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন, তাহা গৃহীত হইতে পারে না। ইহার অর্থ এই যে, যদি মিঃ গান্ধী ও তাঁহার সাকরেদগণের মনোভাব না পরিবর্ত্তিত হয়, কিংবা কংগ্রেসের নেতৃত্ব হইতে তাঁহারা না বিতাড়িত হন, তবে আমাদের অন্নাভাব ও বেকারসমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা পর্য্যন্ত দেখা যাইবে না। জন-সাধারণ হয়তো বর্ত্তমানে আমাদের কথা না বুঝিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে আমরা সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি যে, আগামী ঘটনাসমূহ তাঁহারা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতে থাকুন। ইহা করিলে আমাদের উক্তির যাথার্থ্য তাঁহারা অনতিবিলম্বে উপলব্ধি করিবেন।

হয় ত কেহ কেহ বলিবেন যে, সমগ্র পৃথিবীতে এমন একজন ব্যক্তি নাই, যিনি কংগ্রেসের সভাপতি হইবার প্রাথমিক যোগ্যতাসূচক উল্লিখিত তিনটি গুণ অর্জ্জন করিয়াছেন এবং তাঁহারা হয় ত বলিবেন যে, এমতাবস্থায় এই সব গুণের উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। ইহা হয় ত সত্য যে, বর্ত্তমান পৃথিবীতে এমন কোন ব্যক্তি নাই, যিনি উল্লিখিত তিনটি গুণের অধিকারী, কিন্তু এমন ব্যক্তি লাভ কঠিন নহে, যাঁহাকে প্রয়োজনীয় জ্ঞানের সন্ধান দান করিতে পারিলে, যাঁহার হাজামজা নদীর পুনঃসংস্কার, রেল-পথ ও রাস্তা ধ্বংস সাধনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবৃন্দের ক্ষতিপূরণ এবং অধিকাংশ ভারতবাসীর মিলন সাধনের জন্য যে পদে অধিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন, সেই পদ-মর্য্যাদা বর্ত্তমান।

আমরা ভারতের বড়লাট বাহাদুরের কথা বলিতেছি। হইতে পারে যে ভারতবাসীর অন্নাভাব ও বেকারসমস্যা সমাধানার্থে যে গুণাবলী থাকা অবশ্য প্রয়োজনীয়, সেই

গুণাবলী তাঁহার দ্বারা অর্জ্জিত হয় নাই, কিন্তু ইহাতে সন্দেহ নাই যে, যে পদে অধিষ্ঠিত থাকিলে প্রয়োজনীয় জ্ঞানের সন্ধান পাইলে তাহাকে কার্য্যে পরিণত করা যায়, যদি অবশ্য দেশের তথাকথিত নেতৃবৃন্দ তাঁহার কার্য্যে বাধা প্রদান না করেন, সেই পদে তিনি সমাসীন।

আমাদের মত এই যে, বর্ত্তমান অবস্থায় দেশবাসীর অভাব ও দেনার-সমস্যা যে স্তরে উপনীত হইয়াছে, তাহার প্রতি যথাযথভাবে অবহিত হইতে হইলে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতির পদ ভারতের বড়লাটকে গ্রহণ করিবার অনুরোধ জ্ঞাপন কর্ত্তব্য। ভারতের বড়লাটকে অনুরোধ করিবার ফল কি দাঁড়ায়, তাহা দেখিয়া কংগ্রেসের প্রতিনিধিবর্গ পরবর্ত্তী কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন।

ভারতরক্ষা

গত ২৪শে জানুয়ারী তারিখে পেলিটির রেস্তোরাঁয় কলিকাতা শাখার ইউরোপীয়ান এসোসিয়েশনের সদস্যবৃন্দের এক সভার অধিবেশন হয়। ঐ সভায় যে সব বিষয়ের আলোচনা হয়, তন্মধ্যে নিম্নের সমস্যাসমূহ উল্লেখযোগ্য :—

(১) ভারতের আক্রমণ-নিরোধসম্বন্ধীয় সমস্যা,

(২) রেডারেশন সম্বন্ধীয় সমস্যা,

(৩) ভারতসরকারের পরবর্ত্তী বাজেট,

(৪) গ্রেটবৃটেন ও ভারতের বাণিজ্যসম্পর্ক,

প্রথম সমস্যার প্রধানতঃ আলোচনা করেন কেন্দ্রীয় পরিষদের ইউরোপীয় সদস্য মিঃ পি. পি. মিলার, দ্বিতীয়টির আলোচনা করেন মিঃ এলিয়ট লকহার্ট, তৃতীয় এবং চতুর্থ সমস্যার আলোচনা করেন, মিঃ চ্যাপম্যান মটিমার।

ভারত-আক্রমণ-নিরোধ সমস্যার আলোচনাকালে মিঃ মিলার স্বীকার করেন যে, এই বিষয়ে ভারতসরকার যে ব্যয় করেন, মোট ৪৪ কোটি টাকার উপর, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক রাজস্ব মিলিয়া তাহা ভারতের সমগ্র রাজস্বের শতকরা ২৩ ভাগ এবং ভারতসরকারের বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাশে এই খাতেই সর্ব্বাধিক ব্যয় হয়। তিনি ইহাও স্বীকার করেন যে, ভারতের সংস্থানের পক্ষে ইহা দুর্ব্বিষহ ভার।

তৎসত্ত্বেও তাঁহার মত এই যে, এই ব্যয় বর্ত্তমানে স্বীকার না করিয়া উপায় নাই।

তাঁহার যে সিদ্ধান্ত—"ভারতের সংস্থান বিবেচনায় আক্রমণ নিরোধ-কল্পে যে ব্যয় হইবে, তাহা যতই দুর্ব্বিষহ বলিয়া মনে হউক না কেন, বর্ত্তমান অবস্থায় উহার প্রয়োজন আছে", সেই সিদ্ধান্তের যুক্তি দেখাইতে গিয়া তিনি নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের উল্লেখ করেন।

(১) ভারতের সমুদ্রোপকূলের বিস্তৃতি ৪ হাজার মাইলেরও উপর।

(২) সীমান্তের বিস্তৃতি সহস্র সহস্র মাইল, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত তাহার ৪৫০ মাইল।

(৩) সমগ্র পৃথিবী যখন সমর-সজ্জায় সজ্জিত এবং যুদ্ধোদ্যম তখন আক্রমণ-নিরোধ পূর্ব্বাপেক্ষা কঠিনতর এবং জটিলতর হইতে বাধ্য।

(৪) দেশান্তরে সর্ব্বত্র শিল্পকেন্দ্রসমূহে কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের প্রাবল্য এবং হাতুড়ী ও কাস্তে-শোভিত পতাকার বৃদ্ধি সর্ব্বত্র সমান ভাবে দেখা যায়।

(৫) ইহা সত্য যে, সনাতন রুশিয়া-ভীতি সাময়িক ভাবে তিরোহিত হইয়াছে, কিন্তু উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত তজ্জন্য সম্পূর্ণরূপেই বিপজ্জনক।

(৬) স্থলপথে পূর্ব্ব হইতে সুবৃহৎ সমরসজ্জা-সম্ভার লইয়া প্রবল শত্রুর আগমন আশঙ্কা এবং নিকট ও মধ্য-পূর্ব্বাঞ্চল দিয়া তাহাদের ধীরে ধীরে অগ্রসর হইবার সম্ভাবনা আছে।

(৭) যদি ইউরোপে সমরানল প্রজ্বলিত হয়, তবে পূর্ব্ব ও পশ্চিম হইতে এডেনের ন্যায় আক্রমণ-শীল যুদ্ধপোতসমূহের বহুসংখ্যায় আগমন কল্পনা করা যায়—বর্ত্তমানে যুদ্ধপোতসমূহ আবার প্রায়ই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বোমারু বিমানপোত বহন করে।

তবে সামরিক ব্যয়-হ্রাসের পন্থার সন্ধানলাভও দুষ্কর হইবে না।

যদি এমন কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায়, যদ্দ্বারা মনুষ্য-সমাজের প্রত্যেকের আর্থিক স্বচ্ছলতা সাধন এবং কাম-ক্রোধ-লোভাদি দমন সম্ভব হয়, তবে নিশ্চয়ই দেখা যাইবে যে, মনুষ্য-সমাজ হইতে যুযুৎসু মনোভাবের সম্পূর্ণ তিরোধান ঘটিয়াছে এবং যুদ্ধের জন্যই হউক কিংবা আভ্যন্তরীণ দেশরক্ষা-ব্যবস্থার জন্যই হউক, কিছুরই জন্য অর্থের সংস্থান করিবার প্রয়োজন হইবে না। মিঃ মিলার বলিয়াছেন যে, সমগ্র পৃথিবী সমর-সজ্জায় সজ্জিত এবং যুযুৎসু বলিয়া ভারতে সামরিক ব্যয়ের প্রয়োজন ঘটিয়াছে। আমরা তাঁহাকে গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিতে বলি যে, বর্তমান মনুষ্য-সমাজের প্রয়োজনানুরূপ আহার্য ও ব্যবহার্যের অভাব যদি সম্পূর্ণ ভাবে মিটিয়া যাইত, তাহা হইলে বর্তমান জগতে এত সশস্ত্রতা এবং যুযুৎসা দেখা যাইত কি না।

দেশের মধ্যে কমুনিষ্ট আন্দোলন, সনাতন রুশিয়া-ভীতি, স্থলপথ দিয়া পূর্ব হইতে বিপদের সম্ভাবনা এবং ইউরোপে সমরানল প্রজ্বলনের আশঙ্কা ইত্যাদির জন্য তিনি সামরিক ব্যয় প্রয়োজনীয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহাকে আমরা চিন্তা করিয়া দেখিতে বলি যে, ভারতে কিংবা পৃথিবীর কুত্রাপি কমুনিষ্ট আন্দোলন, রুশিয়া কিংবা প্রাচ্য হইতে বিপদ্ সম্ভাবনা কিংবা ইউরোপে যুদ্ধের সম্ভাবনার কোন একটি থাকিত কি না, যদি ঐ সব দেশের প্রত্যেকটিতে আর্থিক অস্বচ্ছলতা না থাকিত।

হয় তো অনেকে বলিবেন যে, এমন কোন ব্যবস্থা সম্ভব নহে, যদ্দ্বারা মানব-সমাজের প্রত্যেকের আর্থিক স্বচ্ছলতা কিংবা প্রত্যেকের কাম-ক্রোধ-লোভের দমন সাধিত হইতে পারে। আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি যে, ইহা সম্ভব, প্রয়োজন হইলে আবার উহার আলোচনা করা হইবে।

যদি প্রকৃত উপায় গৃহীত না হয়, তবে বিশৃঙ্খলা ঘটিতে বাধ্য এবং বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছে দেখিলে প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তি স্বীকার করিবেন যে, প্রকৃত উপায় গৃহীত হয় নাই।

আমরা আমাদিগের বৃটিশ বন্ধুদিগকে সময় থাকিতে সাবধান হইতে অনুরোধ করিতেছি।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের গত সভাপতি নির্ব্বাচনের শিক্ষা

পাঠকবর্গ অবগত আছেন যে, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের আগামী অধিবেশনে সভাপতিপদের জন্য মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু এবং ডাক্তার পট্টভি সীতারামাইয়ার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়, এবং মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু উহাতে জয়লাভ করিয়াছেন। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে জনসাধারণের কি কি বিষয় শিক্ষণীয়, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকালীন উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহের অনুধাবন আবশ্যক। ইহার জন্য আমাদিগকে গত ২২শে জানুয়ারী হইতে এই সম্পর্কিত বিবৃতির সারাংশ উপস্থিত করিতে হইবে। ঐ তারিখেই মিঃ বসু বিবৃত করেন যে, সভাপতিত্বের জন্য তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবেন স্থির করিয়াছেন। এই বিবৃতিতে তিনি যতদূর সম্ভব স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করেন যে, নির্ব্বাচন-প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হইবার স্বপক্ষে তাঁহার দুইটি প্রধান যুক্তি আছে, যথা :—

(১) ঘটনাসমূহ দৃষ্টে মিঃ বসুর মত এই যে, ভারতে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার দ্রুত আবর্তনের ফলে নূতন ধারণা, মতবাদ, সমস্যা ও কার্যনীতির উদ্ভব হইয়াছে। সুতরাং এই অবস্থায় নির্ব্বাচন-প্রতিদ্বন্দ্বিতা অবাঞ্ছনীয় নহে বলিয়া তিনি মনে করেন, কেন না ইহাতে চিন্তাসমূহ জটিলতা হইতে মুক্তিলাভ করিবে এবং ইহা জনমতের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি প্রকাশে সাহায্য করিবে।

(২) প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে সরিয়া দাঁড়াইবার বিষয় তিনি চিন্তা করিতে পারেন না, কেন না, কোন একটি প্রতিনিধির নিকট হইতেও তিনি ইহার আভাস কিংবা পরামর্শ লাভ করেন নাই। বরং তাঁহার অজ্ঞাতসারে এবং বিনানুমতিতেই কয়েকটি প্রদেশ তাঁহাকে সভাপতিপদের প্রার্থী হিসাবে

মনোনয়ন করিয়াছেন এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সমাজতন্ত্রী এবং অ-সমাজতন্ত্রীদের অনেকের নিকট হইতে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে না সরিবার নিমিত্ত সনির্বন্ধ অনুরোধ লাভ করিয়াছেন।

মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুর এই বিবৃতির উত্তরে, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সাতজন সদস্যের স্বাক্ষরিত একটি বিবৃতি ২৮শে জানুয়ারী তারিখে প্রকাশিত হয়। উহার সারাংশ নিম্নে দেওয়া হইল :—

(১) সভাপতি-নির্বাচনে এ পর্যন্ত কোনদিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় নাই।

(২) কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচন যদি প্রতিদ্বন্দ্বিতাধীন হয়, তবে কংগ্রেসের সাধারণ সদস্যবৃন্দের প্রতি অধিকতর সুবিবেচনা এবং পরস্পরের মত সম্বন্ধে পরস্পরের অধিকতর উদারতা ও সম্মান প্রদর্শন করা হয়।

ওয়ার্কিং কমিটীর কয়েকজন সদস্যের পরামর্শেই ডাক্তার পট্টভি সীতারামাইয়াকে সভাপতি নির্বাচিত করা স্থির হইয়াছে।

(৩) ওয়ার্কিং কমিটী মনে করেন যে, বিশেষ অবস্থার অধীন না হইলে, একই সভাপতির পুনর্নির্বাচন না করিবার কার্য্য-নীতি অপরিবর্ত্তিত রাখাই যুক্তিসঙ্গত।

(৪) মিঃ বসু যে ফেডারেশন-বিরোধিতার নীতির উল্লেখ করিয়াছেন, ওয়ার্কিং কমিটীর সকল সদস্যই সেই মত পোষণ করেন। কংগ্রেসেরও উহাই উদ্দেশ্য।

(৫) নূতন সভাপতির নির্বাচন-বিষয়ে মিঃ বসুকথিত মতবাদ, কার্য্যনীতি ও কার্য্যক্রমের উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক। কেন না, কংগ্রেসের কার্য্যনীতি কিংবা কার্য্যক্রম কংগ্রেসের সভাপতিরা স্থির করেন না। ইহাই যদি না হইত, তবে এক বৎসর কালের জন্য সভাপতি নির্বাচিত হইবার প্রথা বিধিবদ্ধ হইত না।

(৬) কংগ্রেসের কার্য্যনীতি ও কার্য্যক্রম যদি কংগ্রেসেই নির্দ্ধারিত না হয়, তবে ওয়ার্কিং কমিটী উহা নির্দ্ধারণ করেন।

(৭) সভাপতির পদ চেয়ারম্যানের পদ। তদুপরি, যেমন নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রতন্ত্রে দেখা যায়, সভাপতি জাতির ঐক্য ও সংহতির প্রতিনিধি ও প্রতীক স্বরূপ।

(৮) সভাপতির পদকে অন্যান্য সম্মানার্হ বলিয়া মনে করা হয়, ইহা সঙ্গত এবং তাই দেশের মনস্বী সন্তানগণের বহু জনকে এই সম্মানদান সম্ভব, যেন বৎসরান্তে নির্ব্বাচনদ্বারা তাহাই দান করিয়া থাকে।

ঐ তারিখেই মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুর এই বিবৃতির প্রত্যুত্তর প্রকাশিত হয়। তাঁহার প্রত্যুত্তরের উল্লেখযোগ্য উক্তি নিম্নানুযায়ী :—

(১) বিবৃতির স্বাক্ষরকারীদের ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্য হিসাবে স্বাক্ষর না করিয়া ব্যক্তিগত কংগ্রেসসদস্য ভাবে উহা করা উচিত ছিল, কেন না, ওয়ার্কিং কমিটীর কোন সভায় ডক্টর পট্টভি সীতারামাইয়াকে সভাপতি নির্ব্বাচনে করা স্থির হয় নাই।

এই প্রকার বিবৃতি নৈতিক জোর খাটাইবার সামিল।

(৩) সভাপতির পদ বর্ত্তমানে আর মিটিং-এর চেয়ারম্যানের পদের সহিত তুলনীয় নহে। কংগ্রেসের সভাপতি আমেরিকার যুক্তপ্রদেশের প্রধান-মন্ত্রী অথবা সভাপতির ন্যায়, তিনি স্বীয় কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা মনোনীত করেন। কংগ্রেসের সভাপতিকে আইনতান্ত্রিক নৃপতির সহিত তুলনা করা সম্পূর্ণ অসঙ্গত।

(৪) কার্য্যনীতি এবং কার্য্যক্রমের প্রশ্ন উত্থাপন অপ্রাসঙ্গিক হয় নাই, বস্তুতঃ নূতন শাসনাধিকার প্রবর্ত্তনের, অর্থাৎ ১৯৩৮ সনের পর হইতে যদি প্রতি বৎসরই দক্ষিণ ও বামপন্থী, উভয় দলের সমর্থনে সভাপতি হিসাবে বামপন্থী নির্ব্বাচিত না হইয়া আসিতেন, এই সকল প্রশ্ন ইহার বহু পূর্ব্বেই উত্থাপিত হইত।

ফেডারেল পরিকল্পনা বিষয়ে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী দল ও বৃটিশ সরকারের মধ্যে আগামী বৎসরে একটি রফা-নিষ্পত্তি হইবার আশঙ্কা আছে। এই জন্যই দক্ষিণপন্থীকে সভাপতি নির্ব্বাচিত করিবার চেষ্টা হইতেছে।

প্রকৃত ফেডারেশন-বিরোধী কাহাকেও যদি আগামী বৎসরে সভাপতি নির্ব্বাচিত করা হয়, তবে আমি প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রত্যাহার করিতে প্রস্তুত।

ফেডারেল পরিকল্পনার বিরুদ্ধে আমাদের যে অভিযান, সভাপতিপদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা তাহারই অন্তর্ভুক্ত। দেশের সম্মুখে ফেডারেশন পরিকল্পনাই বর্ত্তমানে প্রকৃত সমস্যা।

২৮শে জানুয়ারী তিনটি উল্লেখযোগ্য বিবৃতি প্রকাশিত হয়। প্রথম, ডক্টর সীতারামাইয়ার, দ্বিতীয়, সর্দ্দার প্যাটেলের তৃতীয়, মিঃ শরৎচন্দ্র বসুর।

ডক্টর সীতারামাইয়ার বিবৃতির উল্লেখযোগ্য উক্তি এইরূপ :—

(১) প্রতি বৎসর কংগ্রেসের সেই ব্যক্তিকে সভাপতি নির্ব্বাচিত করা উচিত, যিনি তদানীন্তন প্রয়োজন সাধনের অনুরূপ ওজনদার (answers the need of the hour)। বিভিন্ন প্রার্থীর অর্থাৎ বিভিন্ন প্রদেশের যথার্থ সম্মান রক্ষা হইয়াছে কি না, সভাপতি নির্ব্বাচনে সেই প্রশ্ন উঠা উচিত নহে।

(২) আমি গান্ধীবাদের অনুরাগী ভক্ত।

(৩) অন্য সকলের ন্যায় আমিও ১৯৩৫ সনের ভারত-শাসন আইনের অন্তর্ভুক্ত ফেডারেশন পরিকল্পনার বিপদ উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইয়াছি।

(৪) ফেডারেশন আমরা নিঃসন্দেহে চাহি, কিন্তু ব্রিটিশ জাতি ফেডারেশনের যে-পরিকল্পনা করিয়াছেন, তাহা ভারতকে বিকলাঙ্গ ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত করিবে।

(৫) যদি আমি নির্ব্বাচিত হই, তবে আমাদের ঘর সামলাইবার কার্য্যও আমি অবহেলা করিব না।

(৬) আমি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে সরিতে পারি না, কেন না, তাহা হইলে প্রকৃত সহকর্ম্মীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধ কার্য্য করা হইবে।

২৮শে জানুয়ারী তারিখে প্রকাশিত সর্দ্দার প্যাটেলের বিবৃতিতে মোটামুটিভাবে বলা হইয়াছে যে, সভাপতি নির্ব্বাচন বিষয়ে তিনি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর যে-কাহারও সহিত পরামর্শ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই মৌলানা আজাদের স্বপক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাকে যখন রাজী করা সম্ভব হয় নাই, তখন ডক্টর সীতারামাইয়াকেই নির্ব্বাচনে দাঁড় করাইতে হইয়াছে, কেন না, বর্ত্তমানে কংগ্রেসের আইন-কানুনের যে কার্য্যনীতি, তাহাতে তিনিই দ্বিতীয় ব্যক্তি। তাঁহাদের মনে দক্ষিণপন্থী কিংবা বামপন্থী লইয়া কোন প্রশ্নই উঠে নাই। কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্যবৃন্দের মধ্যে কেহ ভারত-শাসন আইনের অন্তর্ভুক্ত ফেডারেশন প্রস্তাবের স্বপক্ষে বলিয়া তিনি জানেন না। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর অনুমতি ব্যতিরেকে কংগ্রেসের সভাপতি কংগ্রেসের কার্য্য-নীতি প্রবর্ত্তন করিতে পারেন, এই মতের তিনি প্রতিবাদ করেন। দেশের স্বার্থের পক্ষে যাহা সর্ব্বাধিক অনুকূল, তাহাই একমাত্র বিবেচ্য হওয়া উচিত।

মিঃ শরৎচন্দ্র বসু তাঁহার বিবৃতিতে মোটামুটি বলিতে চাহেন যে, কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচন লইয়া যখন প্রতি-দ্বন্দ্বিতা বাধিয়াছে, তখন ওয়ার্কিং কমিটীর নামে এমন কোন বিবৃতি প্রকাশ করা উচিত ছিল না, যাহাতে প্রতিনিধিগণের মত প্রভাবিত হইতে পারে।

২৭শে জানুয়ারী তারিখে আবার তিনটি উল্লেখযোগ্য বিবৃতি প্রকাশিত হয়, প্রথমটি মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুর, দ্বিতীয়টি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর এবং অপরটি যুক্তপ্রদেশের মিঃ কিদ্ওয়াই-এর।

মিঃ সুভাষ বসু তাঁহার পূর্ব্ব বিবৃতির পুনরুক্তি করিয়া বলেন যে, যদি কোন বামপন্থী কিংবা প্রকৃত ফেডারেশন-বিরোধী সভাপতিপদের জন্য মনোনীত হন, তবে তিনি এখনও প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রত্যাহার করিতে প্রস্তুত।

পণ্ডিত নেহরু স্বীকার করেন যে, তিনি বাদানুবাদের খুঁটিনাটি সম্বন্ধে না জানিয়াই বিবৃতি দিয়েছেন। তথাপি তাঁহার বিবৃতিতে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় পাওয়া যায়, যথা :—

(১) সভাপতি-নির্ব্বাচন গুরু বিষয় হইলেও উহা গৌণ।

(১) মুখ্য বিষয় হইতেছে, কংগ্রেসের কার্যনীতি ও কার্যক্রম।

(২) আমি অতীতে বহুবার উল্লেখ করিয়াছি যে, সভাপতি নির্বাচনে, এই নীতির যেন কোন ব্যতিক্রম হইতে পারে না। কংগ্রেসের কার্য-নীতি হয় মূল কংগ্রেস, নয় অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস-কমিটী স্থির করেন।

(৩) কার্যনীতি অনুযায়ী কার্য্য হওয়া না হওয়া অবশ্য সভাপতির উপর নির্ভর করে। আমার মতে কংগ্রেসের সভাপতি কেবল মিটিং-এর চেয়ারম্যান মাত্র নহেন।

(৪) বলা অসঙ্গত হইবে কি না জানি না, যে, নির্বাচন লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতার আমি বিরোধী নহি এবং আমার মনে হয় যে, যখন নির্দ্দিষ্ট কার্যনীতি ও কার্যক্রম লইয়া বিরোধ বাধে, তখন প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইলে সাধারণতঃ ভালই হয় এবং উহাতে বিষয়-সমূহ প্রাঞ্জল হয়।

(৫) ভারতে অনেক গুরুতর সমস্যা বর্ত্তমান, কিন্তু যখন কেবল ফেডারেশন লইয়া কথা উঠিয়াছে, তখন ধরা যাইতে পারে যে, অপর কোন সমস্যা লইয়া সভাপতিনির্বাচনের বিরোধ নহে।

(৬) ফেডারেশন লইয়া কোন মতদ্বৈধ আছে বলিয়া আমার জানা নাই।

(৭) ব্রিটিশ সরকারের বৈদেশিক নীতি এমন মারাত্মক ভাবে নিকৃষ্ট এবং অযথা যে, আমার দেশের ঐ সরকারের সহিত বিন্দুমাত্র সংযোগ থাকে, ইহা আমার ইচ্ছা নহে।

(৮) বর্ত্তমানে আমাদের সম্মুখে একমাত্র সমস্যা এই যে, আগামী আন্তর্জ্জাতিক এবং আভ্যন্তরীণ সঙ্কট আমরা কিরূপে উত্তীর্ণ হইব।

(৯) আমাদের এমন কিছুই করা উচিত নহে, যাহাতে অযথা কলহের সৃষ্টি হয়। তাহার ফলে, যে সময়ে আমাদের ঐক্যের সর্ব্বাধিক প্রয়োজন, সেই সময়ে তাহাতে ঘুণ ধরিয়া আমাদিগকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিবে।

মিঃ বিশ্বওয়াই-এর বিবৃতিতে মোটামুটি বাঙ্গালী পক্ষের মতের প্রতিবাদ করা হইয়াছে এবং মিঃ সুভাষচন্দ্রের পুনর্নির্বাচন সমর্থন করা হইয়াছে।

২৮শে জানুয়ারী তারিখে আরও দুইটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়, একটি মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুর অপরটি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদের। পূর্ব্বের বিবৃতিসমূহে যাহা ব্যক্ত হইয়াছে, তদ্ব্যতিরেকে সুভাষচন্দ্রের এই বিবৃতিতে নূতন কোন বক্তব্য দেখা যায় না। তিনি কেবল তাঁহার নিবেদনের ভঙ্গী পরিবর্ত্তন করেন।

ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ কেবল প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন যে, যদি বৃটিশ সরকার জোর করিয়া চাহাতে ফেডারেশন প্রবর্ত্তন করেন, তবে কোন্ নীতি অনুযায়ী কার্য্য করা উচিত মিঃ বসু সংসম্বন্ধে দ্বিধানিশ্চয় নহেন এবং তিনি যদিও বামপন্থী বলিয়া নিজেকে প্রচার করেন, অনেক ক্ষেত্রে তিনি দক্ষিণপন্থীর অপেক্ষাও দুর্ব্বল বলিয়া প্রমাণিত হইবেন।

২৯শে জানুয়ারী তারিখে তিনটি বিবৃতি আত্মপ্রকাশ করে। একটি হইতেছে আচার্য্য নরেন্দ্রদেবের, দ্বিতীয়টি স্বামী সহজানন্দ সরস্বতীর এবং তৃতীয়টি মিঃ জয়প্রকাশ নারায়ণের। প্রত্যেকেই সুভাষচন্দ্রের সমর্থন করেন। ইহার একটিতেও বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন কথা পাওয়া যায় না।

৩০শে জানুয়ারী দৈনিক সংবাদপত্রে ঘোষিত হয় যে, মোট ২৮২২ ভোটের মধ্যে ২০৪ ভোট অধিক পাইয়া সুভাষ-চন্দ্র জয়ী হইয়াছেন এবং সকল প্রদেশেই তিনি পক্ষ ও বিপক্ষে ভোট লাভ করিলেও (মহাকোশলের সংবাদ পর দিবস প্রকাশিত হয়), বাঙ্গালা দেশ হইতেই তিনি তাঁহার স্বপক্ষে সর্ব্বাধিক ভোট লাভ করেন।

৩১শে জানুয়ারী তারিখে সভাপতিনির্ব্বাচনের ফলে জয়লাভ করিয়া মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু যে বিবৃতি দান করেন, তৎসহ তাঁহার কলিকাতার বন্ধুদের কয়েকটি অভিনন্দন-সভার বিবরণ প্রকাশিত হয়।

মিঃ বসুর এই বিবৃতির নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ উল্লেখযোগ্য।

(১) কংগ্রেসে কোনও ফাটল ধরে নাই, কংগ্রেস পূর্ব্ববৎ ঐক্যবদ্ধই আছে।

(২) কয়েকটি বিষয় লইয়া কংগ্রেসের সদস্যদের মত-

বিভিন্নতা থাকিতে পারে, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা বিষয়ে তাঁহারা সকলেই একমত।

(৩) দেশের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সর্ব্বদলের ঐক্য ও সংহতি, অতীত অপেক্ষাও বর্ত্তমানে অধিক প্রয়োজন।

উল্লাস প্রকাশের এ সময় নহে; বরং ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হওয়া এবং আত্মবিশ্লেষণের সময় আসিয়াছে।

(৪) ভবিষ্যতের বিষয় চিন্তা করিয়া আমি অভিভূত বোধ করিতেছি, আমাকে যাঁহারা ভোট দান করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই এই মনোভাব পোষণ করা উচিত।

মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুকে যাঁহারা অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন, তন্মধ্যে মিঃ এ. কে. এম. জ্যাকারিয়া, মিঃ সন্তোষকুমার বসু, মিঃ বঙ্কিম মুখার্জ্জী এম-এল-এ, সর্দ্দার ভগ্যাৎ সিং, মিঃ হেমন্তকুমার বোস, মিঃ এ. এম. এ. জামান এম-এল-এ, মিঃ প্রমোদ সেন এবং মিঃ নৃপেন্দ্রনাথ বাগচীর নাম বিশেষ করিয়া উল্লেখযোগ্য।

১লা ফেব্রুয়ারী তারিখে মিঃ গান্ধীর একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়। ঐ বিবৃতির উল্লেখযোগ্য উক্তি নিম্নানুযায়ী:

(১) মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ডক্টর পট্টভি সীতারামাইয়ার বিপক্ষে নিঃসন্দিগ্ধভাবে জয়ী হইয়াছেন।

(২) আমি স্বীকার করিতেছি যে, প্রথম হইতেই আমি তাঁহার পুনর্নির্ব্বাচনের বিরোধী ছিলাম।

(৩) তৎসত্ত্বেও আমি তাঁহার জয়ে খুসীই হইয়াছি এবং মৌলানা আজাদ তাঁহার নাম প্রত্যাহার করিলে ডক্টর সীতারামাইয়াকে নাম প্রত্যাহার না করার বাধ্য করিতে আমি যখন উদ্যোক্তা ছিলাম, তখন এ পরাজয় তাঁহার অপেক্ষা আমারই অধিক।

(৪) যদি আমি নির্দ্দিষ্ট নীতি ও কর্ম্মপন্থার রাখী না করিতে পারি। তবে আমার কোন মূল্যই নাই।

(৫) আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছি যে, কংগ্রেসের প্রতিনিধিগণ আমার কর্ম্মনীতি ও কর্ম্মোদ্দেশ্যের স্বপক্ষে নহেন। আমি এই পরাজয়ে উল্লাস বোধ করিতেছি।

(৬) দিল্লীতে এ. আই. সি. সি.-র বিগত অধিবেশন-কালে যখন সংখ্যালঘিষ্ঠ দল সভাগৃহ ত্যাগ করিয়া যান, তখন আমি প্রবন্ধে যাহা প্রচার করিয়াছিলাম, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার ইহাতে সুযোগ পাইলাম।

(৭) মিঃ বসু যাঁহাদিগকে দক্ষিণপন্থী বলেন, এখন তিনি তাঁহাদের অনুগ্রহে সভাপতি না হইয়া প্রতি-যোগিতামূলক নির্ব্বাচনে নির্ব্বাচিত সভাপতি।

(৮) ইহার ফলে তিনি একমতাবলম্বী সদস্যগণদ্বারা গঠিত ওয়ার্কিং কমিটীর মনোনয়ন এবং বিনা বাধায় তাঁহার রচিত কর্ম্মপন্থা অনুসারে কার্য্য করিবার ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন।

(৯) সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরু, এই উভয়দলের মধ্যে একটা বিষয়ে মতের মিল আছে। কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ পবিত্রতার জন্য উভয়েই আগ্রহশীল।

(১০) কংগ্রেস অতি দ্রুত দুর্নীতিপূর্ণ একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইতেছে, অর্থাৎ কংগ্রেসের খাতার মধ্যে বহুসংখ্যক ভুয়া সদস্যের নাম রহিয়াছে।

(১১) এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ যে, এই সকল ভুয়া ভোটারের ভোটে নির্ব্বাচিত বহু সদস্যের নির্ব্বাচন পরীক্ষার ফলে নাকচ হইয়া যাইবে।

(১২) যদি সমস্ত ভুয়া সদস্যের নাম কাটিয়া দেওয়া হয় এবং যাহাতে আর প্রবঞ্চনার পথ না থাকে তাহার ব্যবস্থা করা হয়, তাহা হইলেই যথেষ্ট হইবে।

(১৩) সংখ্যালঘু দলের নিরুৎসাহ হইবার কোন কারণ নাই।

(১৪) কংগ্রেসের বর্ত্তমান কার্য্যক্রমের উপর যদি তাঁহাদের বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা দেখিবেন যে, তাঁহারা সংখ্যালঘু অথবা সংখ্যাগুরু যাহাই হউন না কেন, এমন কি তাঁহারা কংগ্রেসের ভিতরে

অথবা বাহিরে যেখানেই থাকুন না কেন, এই কার্য্যক্রম অনুসারে কাজ করা চলিবে।

(১৫) কংগ্রেসের এই পরিবর্ত্তনের ফলে একমাত্র পার্লামেন্টির কার্য্যক্রমই সম্ভবতঃ পরিবর্ত্তিত হইবে।

(১৬) কংগ্রেসের কার্য্যক্রমের মধ্যে পার্লামেন্টির কার্য্যক্রম একটি অপ্রধান বিষয়মাত্র।

(১৭) যদি কোন বিষয়ে কংগ্রেসের নীতি অনুসারে তাঁহাদিগকে (অর্থাৎ কংগ্রেসী মন্ত্রীদিগকে) পদত্যাগ করিতে বলা হয়, কিংবা যদি তাঁহারা কংগ্রেসের সহিত একমত না হইতে পারিয়া পদত্যাগ করেন, তাহাতে তাঁহাদের বিশেষ কিছু যাইবে আসিবে না।

(১৮) মিঃ বসুর মতে, তাঁহার কার্য্যক্রম এবং নীতি সর্ব্বাপেক্ষা প্রগতিমূলক এবং সর্ব্বাধিক সাহসিকতার পরিচায়ক। সংখ্যালঘু দল কেবল উহার সাফল্য কামনা করিতে পারেন। তাঁহারা যদি উহার সহিত তাল রাখিয়া চলিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে অবশ্যই কংগ্রেসের বাহিরে চলিয়া আসিতে হইবে। তাঁহারা যদি তাহা পারেন, তাহা হইলে তাঁহারা সংখ্যাপরিষ্ঠদের শক্তি বৃদ্ধি করিবেন।

(১৯) সংখ্যালঘুদের কোনক্রমেই বাধা সৃষ্টি করা উচিত হইবে না।

(২০) কংগ্রেসসেবীদিগকে আমি স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, যাঁহারা কংগ্রেসী হইয়াও স্বেচ্ছায় কংগ্রেসের বাহিরে থাকিতে পারেন, তাঁহারাই কংগ্রেসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি।

(২১) যাঁহারা কংগ্রেসে থাকা অস্বস্তিকর মনে করিবেন, তাঁহারা বাহিরে চলিয়া আসিতে পারেন। কিন্তু তাঁহারা কোন প্রকার বিদ্বেষভাব পোষণ করিয়া বাহির হইবেন না, কার্য্যকরী ভাবে দেশের অধিকতর সেবার উদ্দেশ্য লইয়াই তাঁহারা বাহিরে আসিবেন।

যদি উপরের বিবৃতিসমূহ এবং তাহার উত্তর-প্রত্যুত্তর সমূহের সংক্ষেপে কোন বিশ্লেষণমূলক সারসংগ্রহের চেষ্টা করা যায়, তবে দেখা যাইবে যে, কংগ্রেসের সকল প্রখ্যাতনামা নেতৃবৃন্দ সকলেই, মিঃ গান্ধী, পণ্ডিত জওহরলাল, সর্দ্দার প্যাটেল, ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, মিঃ সুভাষ বসু, মিঃ শরৎচন্দ্র বসু এবং ডাঃ সীতারামাইয়া, এই বাদ-প্রতিবাদে যোগদান করেন। মিঃ গান্ধী মাত্র একটি বিবৃতি প্রকাশ করেন এবং পণ্ডিত জওহরলাল, ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, মিঃ শরৎ বসু এবং ডাঃ সীতারামাইয়া সকলেই একটি করিয়াই বিবৃতি প্রকাশ করেন।

সর্দ্দার প্যাটেল দুইটি বিবৃতি দান করেন, কিন্তু মিঃ সুভাষ বসু প্রদত্ত বিবৃতির সংখ্যা নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে চার এবং জয়লাভের পর এক। লক্ষ্য করিতে হইবে যে, যদিও মিঃ বসুর অজ্ঞাতসারে এবং বিনানুমতিতেই বিভিন্ন প্রদেশ হইতে তাঁহার নাম কংগ্রেসের সভাপতিরূপে প্রস্তাবিত হইবার সৌভাগ্য তিনি লাভ করেন এবং তিনি ইহার জন্য উৎসুক নহেন বলিয়া ঘোষণা করেন, তথাপি প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্বপক্ষে যুক্তি-প্রদর্শনের মনোভাব এবং সুযোগ তিনি চারিবার সৃষ্টি করেন, অন্যপক্ষে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী একটি মাত্র বিবৃতি দান করিয়াই নীরব হইয়া থাকেন।

বিবৃতিসমূহের প্রত্যেকটির স্বকীয় বৈশিষ্ট্য কি এবং উহা-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিবার পূর্ব্বে আমরা এই বাদ-প্রতিবাদসমূহের সারগুলি মিলিতভাবে পাঠ করিলে কি শিক্ষা পাওয়া যায়, তাহা সন্ধান করিবার চেষ্টা করিব।

মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু প্রদত্ত প্রথম বিবৃতির দিবস হইতে মিঃ গান্ধী-প্রদত্ত বিবৃতির দিবস পর্য্যন্ত যাহা যাহা ঘটে, তাহা পরপর রাখিয়া মনোযোগ সহকারে যদি পাঠ করা যায়, তবে দেখা যায় যে, প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রধান উপলক্ষ্য ফেডারেশন এবং নেতৃবৃন্দের প্রত্যেকেই ইহার বিরুদ্ধে আন্দোলনের মনোভাব পোষণ করেন এবং এই বিষয়ে মিঃ বসুর মনোভাব একেবারে কোনরূপ রফানিষ্পত্তি না করিবার স্বপক্ষে এবং বাঙ্গালার অধিকাংশ কংগ্রেসী সদস্য তাঁহার এই মনোভাবের সমর্থন করেন। ইহার ফল কি দাঁড়াইতে পারে, তাহা দেখাইবার জন্য ফেডারেশনের কিংবা ফেডারেশন-হীনতার কি ফল, তাহার আলোচনা করিতে হইবে।

ফেডারেশন ও ফেডারেশন-হীনতার ফল

১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইন মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, ভারত-শাসন পরিচালনার জন্যই ফেডারেশন পরিকল্পিত হইয়াছে। আমরা সকলেই জানি যে, বৃটিশ কিংবা ভারতীয় যাহাদের অধীনেই হউক, যদি সমন্বয়ের লক্ষ্য থাকে, তবে যতদিন প্রাদেশিক ভাবে স্বতন্ত্র প্রদেশসমূহ থাকিবে, ততদিন ভারত সরকার বলিয়া একটা কিছুও থাকিতে বাধ্য। অর্থাৎ যতদিন প্রাদেশিক শাসনতন্ত্র বলবৎ থাকিবে, ততদিন কোন না কোন রূপে ফেডারেশনেরও প্রয়োজন. ফেডারেশন-হীনতার কোন কথাই উঠিতে পারে না। এই সম্পর্কে যুক্তিসঙ্গত ভাবে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করিতে হইলে তাহা ইহার প্রণয়নবিধি লইয়া উঠাইতে হয় এবং তাহা করিতে হইলে প্রথমতঃ যাহা মিঃ গান্ধী অথবা মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু পরিচালিত আমাদের স্বদেশীয়েরা মানিয়া লইতে পারেন এমন একটি পরিকল্পনার প্রয়োজন। ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, বর্ত্তমান ফেডারেশনের পরিবর্ত্তে কি ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইবে, তাহার পরিকল্পনা উপস্থিত না করিয়া ইহার বিরুদ্ধে আন্দোলনের সম্বন্ধে চিন্তা করা, অনেকটা কলহের নিমিত্তই কলহ করিবার ন্যায় এবং তাহার দ্বারা কাহারও স্বার্থসিদ্ধি হইতে পারে না। আমরা যতদূর জানি, তাহাতে কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের কাহারও লেখনী-প্রসূত অপর কোন সম্পূর্ণ পরিকল্পনা এ পর্য্যন্ত মর-জগৎ দেখিতে পায় নাই।

তাহা হইলে সভাপতি-নির্ব্বাচনকালীন ঘটনা হইতে লব্ধ এক নম্বর শিক্ষা এই যে, মেসার্স গান্ধী সুভাষ কোম্পানী কলহের জন্যই কলহ করিবার অভ্যাসে অভ্যস্ত এবং যদিও তাঁহারা নিজদিগকে দেশপ্রেমিক বিবেচনা করেন, দেশের কোন শ্রেণীর স্বার্থের পক্ষেই যাহা অনুকূল নহে, তদনুরূপ কার্য্য এবং চিন্তায় তাঁহারা সময়ক্ষেপ করিতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত নহেন।

এইবারে আমরা যদি ইহার ব্যাবহারিক দিকে দৃষ্টিপাত করি, তবে অনতিবিলম্বে বুঝিতে পারিব যে, ভারত-শাসন চালাইতে হইলে, বৃটিশ রাজনীতি-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দ কোন না কোন প্রকার ফেডারেল পরিকল্পনা প্রবর্ত্তন করিতে বাধ্য এবং যতক্ষণ না সমগ্র ভারতবাসীর স্বার্থের অনুকূল অপর কোন পরিকল্পনা ভারতীয়গণের কাহারও কাহারও কর্ত্তৃক উপস্থিত করা হয়, ততক্ষণ তাঁহাদের নিজেদের মস্তিষ্ক-প্রসূত কোন পরিকল্পনা প্রবর্ত্তন করা ব্যতীত তাঁহাদের গত্যন্তর নাই। এই যখন অবস্থা, তখন আমরা বলিতে পারি যে, বর্ত্তমান ফেডারেল পরিকল্পনা প্রবর্ত্তিত হইবেই এবং যদি কংগ্রেস ইহার বিরুদ্ধে কোন প্রকার আন্দোলন চালাইতে চাহেন, তবে ইহার ফলে দেশের মধ্যে দলাদলি ও দ্বন্দ্ব-কলহের সৃষ্টি হইবে এবং তাহার সম্পূর্ণ দায়িত্ব কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের।

সুতরাং আমাদের দুই নম্বর শিক্ষা এই যে, মেসার্স গান্ধী-সুভাষ কোম্পানীই ভারতবাসীর দলাদলির জন্য প্রধানতঃ দায়ী।

তৃতীয়তঃ, বিষয়টি অর্থনীতির দিক্ হইতে বিচার করিলে আমরা অনতিবিলম্বে বুঝিব যে, জনসাধারণের অন্নাভাব ও বেকার-সমস্যা দূরীকরণে অপরিহার্য্য ভাবে যে-সব পরিকল্পনা প্রয়োজন, তজ্জন্য সমগ্র ভারতের ঐকাবদ্ধতার অবশ্য প্রয়োজন। ইহার অর্থ এই যে, যে-কেহ অনৈক্যসৃষ্টির কারণ উপস্থিত করেন, তিনিই ভারতবাসী জনসাধারণের বেকার অবস্থা ও অন্নাভাবের জন্য দায়ী।

তাহা হইলে তিন নম্বর শিক্ষা হইতেছে এই যে, মেসার্স গান্ধী-সুভাষ কোম্পানীর কার্য্যাবলীই প্রধানতঃ ভারতে অন্নাভাব ও বেকার-সমস্যার মূলে।

ইহা দুঃখের বিষয় যে, আমাদিগকে এই ঘটনা হইতে এইরূপ শিক্ষা লাভ করিতে হইতেছে, কিন্তু প্রকৃত সত্য ইহাই এবং ইহা না বলিয়া উপায় নাই। সুতরাং ইহা নিশ্চয়ই স্বীকার্য্য যে, ফেডারেশন-পরিকল্পনার বিরুদ্ধে আন্দোলন বর্ত্তমান অবস্থায় প্রশংসনীয় নহে এবং মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু যে ফেডারেশনের উপলক্ষে জয়লাভ করিয়াছেন, ইহাতে ভারত ও ভারতবাসীর ভবিষ্যৎ যে অত্যন্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন তাহাই প্রমাণিত হয়। হইতে পারে যে, বর্ত্তমানে মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুর সমর্থকেরা আমাদিগকে উপহাস করিবার অজুহাৎ পাইবেন, কিন্তু দেশবাসী শীঘ্রই আমাদের কথার সত্যতা উপলব্ধি করিবেন। বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ আগামী কিছুকালের জন্য অত্যন্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন, কেন না মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুর-সমর্থকদের অধিকাংশই বাঙ্গালারই। যদি আমাদের কথা

ভুল প্রমাণ হইত, তবে আমরা খুসী হইতাম, কিন্তু দুই আর তিনের যোগফল সর্ব্বদাই পাঁচ হয় এবং কেহই ইহা পরিবর্ত্তন করিতে পারে না।

বর্ত্তমান ফেডারেশন-পরিকল্পনার মধ্যে অনেক কিছু অবাঞ্ছনীয় থাকিতে পারে, কিন্তু এত বিলম্বে ইহার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়া কোন লাভ নাই। যদি ভারতের বর্ত্তমান শাসনতন্ত্র অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করা যায়, তবে দেখা যাইবে যে, অন্যায়ের মূল ফেডারেশন-পরিকল্পনায় নহে, তথাকথিত সাদেশিক শাসনতন্ত্রে উহার সূচনা এবং ইহার জন্য মেসার্স গান্ধী, মালবিয়া, সাপ্রু, জয়াকর প্রভৃতি ভারতীয় নেতৃবৃন্দ ব্যতীত আর কেহই প্রধানতঃ দায়ী নহেন। আমরা ইহা বলিতেছি, কেন না, যদি মনস্তত্ত্বের দিক্ দিয়া শাসনতন্ত্রের ইতিহাস বিচার করা যায়, তবে দেখা যাইবে যে, যদিও ইহা অস্বীকার করা যায় না যে, বৃটিশ রাজনীতিবিদ্‌গণের কেহ কেহ ভারত-বিভাগকারী এইরূপ একটি শাসনতন্ত্র রচনার দানবীয় মনোবৃত্তি পোষণ করিতেন, কিন্তু সমগ্র বৃটিশ জাতি এমন শাসনতন্ত্র চাহিয়াছেন, যাহা ভারতীয় ও বৃটিশ, উভয়েরই স্বার্থের অনুকূল। যদি ভারতীয় নেতৃবৃন্দ ঐরূপ শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিয়া নিজেদের জ্ঞানের তেমন পরিচয় দান করিতে পারিতেন, তবে তাঁহাদের পক্ষে সেই শাসনতন্ত্র অনুমোদন করিয়া লওয়া কঠিন হইত না এবং ইতিমধ্যে আমরা সুদিনের মুখ দেখিতে পাইতাম। কিন্তু অত্যন্ত শোচনীয় হইলেও আমরা বলিতে বাধ্য যে, ঐ সব ভারতীয় নেতৃবৃন্দের কাহারও সেরূপ মস্তিষ্ক নাই। জনসাধারণ হয়ত এখন আমাদের কথা মানিয়া লইবেন না, কিন্তু এমন অনেক কারণ বিদ্যমান, যাহাতে ভরসা হয়, তাঁহারা শীঘ্রই এইসব মনুষ্যাবয়ব-যুক্ত হইলেও তোতাপাখী বিশেষ এবং পাশ্চাত্যের তথাকথিত বিজ্ঞান ও সভ্যতার অত্যন্ত নিকৃষ্ট স্তরের শিষ্যস্বরূপ নেতাদের অপদার্থতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

বর্ত্তমান অবস্থায়, কংগ্রেসের পক্ষে উৎকৃষ্ট পন্থা হইতেছে, বিরুদ্ধ মনোভাব পরিহার করিয়া বৃটিশ রাজনীতিবিদ্‌রা শাসনতন্ত্র হিসাবে যাহা প্রবর্ত্তন করিতে চাহেন, তাহাই চালু করিবার চেষ্টা করা এবং ইহার পরিণতির জন্য তাঁহাদিগকেই সম্পূর্ণ দায়ী করা। যদি কংগ্রেসের সামান্য মাত্রও কাণ্ডজ্ঞান থাকে, তবে তাহাকে বৃটিশ রাজনীতিবিদ্‌গণ-প্রবর্ত্তিত সমস্ত বিধি ও বিধান অন্তরের সহিত মানিয়া লইতে হইবে, কিন্তু একই সঙ্গে যুক্তিসঙ্গত অর্থ-নৈতিক প্রয়োজনসমূহের দাবীও উপস্থাপিত করিতে হইবে এবং প্রত্যেক ভারতীয় ও বৃটনের জন্য কর্ম্ম-নিয়োগ দাবী করিতে হইবে। এই দাবীতে বৃটিশ রাজনীতিবিদ্‌গণের অপদার্থতা উদ্ঘাটিত হইবে, তৎসঙ্গে, ইহা যে কেবল রাজনীতির সহিত যাঁহারা আজিও তেমন সংশ্লিষ্ট নহেন, এমন সকল ভারতবাসীকে ঐক্যসূত্রে বদ্ধ করিবে, তাহা নহে, তৎসঙ্গীয় বৃটনগণকেও সেই সূত্রে গ্রথিত করিবে। কেন না বৃটিশ রাজনীতিবিদ্‌গণের সে বিজ্ঞান অজ্ঞাত, যদ্দ্বারা মানব-সমাজের প্রত্যেকে কর্ম্ম নিযুক্ত হইতে পারে এবং প্রত্যেকের যুক্তিসঙ্গত আর্থিক প্রয়োজন মিটিতে পারে। কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দকে ইতিমধ্যে ঐ বিজ্ঞানের শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। তাঁহারা যদি নিজেরা ইহাতে অক্ষম হন, তবে বঙ্গশ্রীর সাহায্য গ্রহণ করিতে পারেন, ইহাতে ঐ বিজ্ঞান লিপিবদ্ধ হইয়াছে। যেমন বৃটনগণের, তেমনই যাঁহারা পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও সভ্যতার গৌরবে গৌরবান্বিত, তাঁহাদের পক্ষে ঐ বিজ্ঞান বুঝিয়া উহা কষ্টসাধ্য হইতে পারে, কিন্তু যাঁহারা কায়মনে খাঁটি ভারতীয়, উহা তাঁহাদের পক্ষে বুঝিয়া উহা মোটেই কষ্টসাধ্য নহে।

যদি কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ একবার ঐ বিজ্ঞানে শিক্ষিত হইতে পারেন, বৃটিশ রাজনীতিবিদ্‌গণকে কোণঠেসা করা তখন তাঁহাদের পক্ষে মোটেই কষ্টকর হইবে না। কেন না তখন, যে সব ভারতবাসী আজিও রাজনীতির ক্ষেত্র হইতে দূরে আছে, যাহারা আমাদের ৩৬ কোটির ৩৪ কোটি, যেমন তাহাদের, তেমনই তৎসঙ্গীয় ব্রিটনগণের, যাহারা ব্রিটিশ-দ্বীপাধিবাসীর মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ, উভয়েরই প্রাণতন্ত্রীতে প্রকৃত সাড়া আসিবে।

ভারতবাসিগণের প্রকৃত স্বাধীনতা এই একমাত্র পন্থায় সাধ্য। স্বাধীনতার জন্য গগন বিদীর্ণ করিয়া চীৎকার করিলে স্বাধীনতা আকাশ হইতে টুপ্ করিয়া মুখে পড়িবে না। অন্য পক্ষে মানবমনোজ্ঞের সর্ব্বাধিক দুর্দ্দিনে, যদি অনর্থক চীৎকার স্থগিত করিয়া তাহার প্রত্যেকটি নরনারীর সেবায় নিয়োজিত-প্রাণ হওয়া যায়, তবে স্বাধীনতা অর্জ্জন সুনিশ্চিত। ইহাকে আকাঙ্ক্ষা-পূরণের যোগাভাঞ্জন বলা যাইতে পারে। আমরা জানি যে, আমাদের নেতৃবৃন্দকে

একদিন না একদিন এই কথা বুঝিতে হইবে, কিন্তু সময় থাকিতে আমরা তাহা তাঁহাদিগকে বুঝিতে বলি।

বর্ত্তমান কংগ্রেস ও কংগ্রেসীর স্বরূপ

সভাপতি-নির্ব্বাচন লইয়া সম্প্রতি যে বাদানুবাদ হইয়া গেল, তাহাতে বর্ত্তমান কংগ্রেসীগণের অযথা কলহ-প্রবৃত্তি সম্বন্ধে উপরে যাহা লিখিত হইয়াছে, ইহা ছাড়াও প্রমাণিত হয় যে, বর্ত্তমান কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের পরস্পরের মধ্যে কোন কার্য্যকরী ঐকমত্য কিংবা বাস্তব রাজনীতিজ্ঞান নাই।

বাদানুবাদকালীন বিভিন্ন প্রশ্ন সম্পর্কে যে-সব বিভিন্ন মত প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার মধ্যে আমাদের এই অভিযোগের প্রচুর সাক্ষ্য পাওয়া যায়।

এই সম্বন্ধীয় যে-সব প্রধান বিষয়, তাহা কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর প্রথম বিবৃতি এবং ২৪শে জানুয়ারী তারিখে প্রকাশিত মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুর প্রত্যুত্তরের মধ্যে পাওয়া যায়।

আমাদের মতে, এই বিষয় হইতেছে পাঁচটি, যথা :—

(১) যদি কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিষয় না হয়, তবে কংগ্রেসের সাধারণ সদস্য ইত্যাদির মধ্যে অধিকতর সংহতি সাধিত হইবে কি না।

(২) অত্যন্ত জরুরী অবস্থার উদ্ভব না হইলে, একই সভাপতির পুনর্নির্ব্বাচন না করার বিধি বলিয়া চলা সমুচিত কার্য্যবিধি কি না।

(৩) নূতন সভাপতি নির্ব্বাচনের ব্যাপার বিবেচনার সহিত মতবাদ, কার্য্যনীতি ও কার্য্যক্রমের উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক, ইহা সঠিক কি না।

(৪) সভাপতির পদ যে চেয়ারম্যানের পদের অনুরূপ, ইহা ঠিক কি না।

(৫) ওয়ার্কিং কমিটীর সকল সদস্যই ফেডারেশন-বিরোধী-নীতি সমর্থন করেন কি না।

উপরের প্রশ্নসমূহ সম্পর্কে যে-সব মতবাদ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে যে, অত্যন্ত মুষ্টিমেয় কয়জন নেতার মধ্যে সম্পূর্ণ মতৈক্য বর্ত্তমান, অধিকাংশের মধ্যে মারাত্মক মত-পার্থক্য বর্ত্তমান এবং তাঁহাদের সকলেই অতি অবশ্যরূপে প্রয়োজনীয় যে-বিচক্ষণতা, তাহার অনধিকারী।

কংগ্রেসের বিধি ও বিধান ও তাহার প্রয়োগ সম্পর্কে ঘটনা ও মতবাদ লইয়াই যদি নেতৃবৃন্দ সম্পূর্ণ একমত না হন, তবে ইহা নিশ্চয়ই বলা চলে না যে, তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে প্রকৃত ঐক্য বিদ্যমান। ইহাতে বুঝায় যে, এই সব বিষয়ে সত্য সম্বন্ধে তাঁহারা অজ্ঞ, কেন না যদি তাঁহাদের মধ্যে এক জনেরও সত্য ধারণা থাকিত, তবে মত-পার্থক্য ঘটিতে পারিত না। তিন আর দুই-এ যে পাঁচ হয়, এই সত্য সম্বন্ধে কোন মত-পার্থক্য থাকিতে পারে না। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের মধ্যে কাহারও বাস্তব রাজনীতিজ্ঞান নাই, কেন না সত্য সম্বন্ধে জ্ঞানের উপরই বাস্তব রাজনীতি-জ্ঞান নির্ভরশীল।

হয় ত অনেকে বলিবেন যে, কংগ্রেসের নেতাদের মধ্যে যখন লক্ষণীয় দ্বন্দ্ব নাই, তখন তাঁহাদের মধ্যে যে ঐক্য বর্ত্তমান, ইহা সিদ্ধান্ত করা চলে।

ইহার উত্তরে বলিব যে, প্রকৃত ঐক্য না থাকিলেও কেবল রফা-নিষ্পত্তির সাহায্যেই তেমন কোন দ্বন্দ্ব এড়াইয়া চলা যাইতে পারে, কিন্তু রফা-নিষ্পত্তির সাহায্যে এই যে দ্বন্দ্ব-হীনতা, ইহা কখনও স্থায়ী হইতে পারে না। ইহা মানুষকে কপট করিয়া তুলে এবং যে-কোন মুহূর্ত্তেই ইহা দ্বন্দ্বে পরিণতি লাভ করিতে পারে। সমাজের পক্ষে ইহা কখনও হিতকর বিবেচিত হইতে পারে না।

কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের এই প্রকার মতানৈক্য এবং রাজ-নীতিজ্ঞানের অভাব লক্ষ্য করিয়া দেশের জনসাধারণের সাবধানী হওয়া উচিত। নেতারা নিজেদের মধ্যেই যদি প্রকৃতপক্ষে ঐক্য-বদ্ধ হইতে না পারেন, তবে ভারতের জরুরী সমস্যাসমূহের সমাধান যাহার উপর একান্ত ভাবে নির্ভর করে, ভারতবাসী জনসাধারণের মধ্যে সেই প্রকৃত ঐক্য ইহাঁদের দ্বারা সাধিত হইতে পারে, ইহা কখনও আশা করা যায় না। ইহার জন্য আমরা মেসার্স গান্ধী-সুভাষ এণ্ড কোম্পানীর নেতৃত্বের এত বিরুদ্ধ সমালোচনা করিতেছি। যদি অস্তিত্ব রক্ষা করিতে হয়, তবে জনসাধারণকে প্রকৃত অবস্থা সম্যক্ ভাবে উপলব্ধি করিতে হইবে।

এই বাদানুবাদ হইতে নেতৃবৃন্দের ব্যক্তিগত স্বভাবের অনেক ত্রুটিই প্রমাণিত হইতে পারে, কিন্তু স্থানাভাবে উহা করা সম্ভব হইল না বলিয়া আমরা দুঃখ বোধ করিতেছি।

জনসাধারণকে আমরা এখনও সতর্ক হইতে অনুরোধ করিতেছি।

কণ্টক-শয্যা

স্বরাজ যে এসে ফিরে যায় শয্যা যে কণ্টক-শয্যা

মিঃ গান্ধীর হিংসাপ্রবৃত্তির দৃষ্টান্ত এবং মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুর উদ্দেশ্যে কয়েকটি প্রবর্তনবাক্য

পাঠকবর্গ বিদিত আছেন যে, ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখে কংগ্রেস সভাপতি-নির্ব্বাচন সম্পর্কে মিঃ গান্ধী একটি বিবৃতি প্রকাশ করেন। আমাদের মতে, এই বিবৃতি সম্পূর্ণ হিংসা-প্রবৃত্তিদুষ্ট এবং অসত্যপরিপূর্ণ, যদ্যপি তিনি সর্ব্বদাই নিজেকে অহিংসা ও সত্যোপাসক বলিয়া দাবী করেন। যদি মিঃ গান্ধীর আলোচ্য বিবৃতি সম্পূর্ণভাবে বিশ্লেষণ করা যায়, তবে আমাদের মতের সত্যতা নিঃসংশয়ে উপলব্ধ হইবে। আমরা পূর্ব্ব নিবন্ধে মিঃ গান্ধীর বিবৃতির উল্লেখযোগ্য উক্তিসমূহ সঙ্কলন করিয়াছি—পাঠকের দৃষ্টি তৎপ্রতি আকৃষ্ট করিতেছি।

যদি সমগ্র বিবৃতিটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুধাবন করা যায়, তবে বুঝা যায় যে, যদ্যপি মিঃ গান্ধী 'ডাঃ সীতারামাইয়া অপেক্ষা পরাজয় আমারই অধিক,' এবং 'আমি পরাজয়ে উল্লসিত বোধ করিতেছি' বলিয়া ঔদার্য্যের প্রমাণ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন,তথাপি মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুর জয় যে সম্পূর্ণ সন্তোষজনক নহে এবং বিপরীত পক্ষের পরাজয় যে অসঙ্গত হইয়াছে, ইহা প্রমাণের মনোভাব নেপথ্যে বিদ্যমান। যদি নেপথ্যে এই মনোভাব না থাকিত এবং প্রকৃতপক্ষে যদি মিঃ গান্ধী ইহাতে উল্লসিত বোধ করিতেন, তবে একই নিঃশ্বাসে তিনি ইহা ঘোষণা করিতেন না যে, কংগ্রেসের সদস্য-তালিকায় বহুসংখ্যক ভুয়া ভোটদাতার নাম স্থান পাইয়াছে এবং মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুর জয় যে-সব প্রতিনিধির ভোট লাভ করিবার ফলে সম্ভব হইয়াছে, তাঁহারা এই সকল ভুয়া ভোটারেরই ভোটে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন এবং পরীক্ষায় তাঁহাদের প্রতিনিধিত্ব নাকচ হইতে পারে।

ইহাই যথেষ্ট প্রমাণ যে, মিঃ গান্ধী প্রকৃতপক্ষে উল্লসিত নহেন, এবং তৎসত্ত্বেও তদনুরূপ ঘোষণা অসত্য এবং আত্ম-প্রতারণার পরিচায়ক। শব্দের প্রকৃতার্থানুযায়ী ইহা এক হিসাবে হিংসাপ্রবৃত্তির পরিচায়ক। যদি তাহাই না হইত, তবে তাঁহার স্বপক্ষের সহায়ক হইয়াছিল বলিয়া যে তালিকা তিনি ইতিপূর্ব্বে গ্রাহ্য করিয়া লইয়াছিলেন, বর্ত্তমানে সেই তালিকারই ঘোষণান করিতেন না। ইহা বলিলে কি সত্য কথা বলা হইবে না যে, এই তালিকার বলেই মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু গত বৎসরের নির্ব্বাচনে জয়ী হইয়াছিলেন এবং মিঃ গান্ধীর সমর্থন লাভ করিয়াছিলেন?

মিঃ গান্ধী এতদূর পর্য্যন্ত বলিয়াছেন যে, যদি সংখ্যা-লঘু দল মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুর কার্য্যনীতি ও কার্য্যক্রমের সহিত তাল রক্ষা না করিয়া চলিতে পারে, তাহাদিগকে কংগ্রেস ছাড়িয়া আসিতে হইবে। ইহা কি ভীতি-প্রদর্শনের তুল্য নহে? ইহা কি হিংস্র মনোবৃত্তির পরিচায়ক নহে? ইহা কি গণতান্ত্রিক নিয়মানুগ হইয়াছে? ইহার দ্বারা কি, মিঃ গান্ধী যে কার্য্যনীতি ও কার্য্যক্রমের প্রবর্ত্তনা করিয়াছেন, কংগ্রেস যদি তাহার পরিবর্ত্তনের সিদ্ধান্ত করেন, তবে কংগ্রেসের কার্য্যের সহিত অসহযোগের ভাব না প্রকাশ পায় লেও, তৎপ্রতি মিঃ গান্ধীর অন্ততঃ ঔদাসীন্যের মনোভাব প্রকাশ পায় নাই? গণতান্ত্রিক ভাব কি পরাজিত বিরুদ্ধ-পক্ষের নিকট হইতে, যদ্যপি তাহাদের কার্য্যনীতি ও কার্য্য-ক্রম সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়াও দেখা যায়, এবং সেই পরিবর্ত্তন যদি সংখ্যাগুরু দল কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত ও গৃহীত হয়, সক্রিয় সহযোগিতা দাবী করে না?

বিশেষ অবস্থায় সংখ্যালঘু দলকে কংগ্রেস ছাড়িয়া বাহিরে আসিবার হুকুম জারী করিয়া, তাঁহারা যেন কোন অবস্থাতেই কার্য্যে বাধা না উপস্থিত করেন, ইহা বলিবারও স্পর্দ্ধা মিঃ গান্ধী প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহা কি পরস্পর-বিরোধী হয় নাই? যদি সংখ্যালঘু দল কংগ্রেস ছাড়িয়া বাহিরে আসেন, তাহা কি আংশিকভাবে কার্য্যে বাধা উপস্থিত করিবে না? কংগ্রেসের সদস্য হিসাবে, সংখ্যালঘু দলের নিকট হইতে কংগ্রেসের যে সাহায্য প্রাপ্য, ইহাতে কি তাহা দিতে অস্বীকার করা হইবে না?

ইহাই আশ্চর্য্য যে, তৎসত্ত্বেও তথাকথিত অহিংসার প্রবর্ত্তক তাঁহার কার্য্যক্রমে হিংসার সন্ধান লাভ করিবেন না এবং তাঁহার চেলা চামুণ্ডারা তাঁহাকে অন্ধের ন্যায় অনুসরণ করিয়া চলিবে। যাহাই হউক, মোটের উপর মিঃ গান্ধীর বিবৃতি মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুকে বিস্ময়াহত করিয়া ছাড়িয়াছে এবং ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে তাঁহার যে-উত্তর প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে তিনি বলিতে দ্বিধা বোধও করেন নাই যে, মিঃ গান্ধীকে হঠাইবার প্রবৃত্তি তাঁহার ছিল না। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, চিরদিন তাঁহার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকিবে মিঃ গান্ধীর বিশ্বাস অর্জ্জনের চেষ্টা—এই সরল কারণে যে, তিনি যদি সকলের বিশ্বাস অর্জ্জন করিয়াও ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানবের বিশ্বাস অর্জ্জনে ব্যর্থ হন, তবে ইহা তাঁহার পক্ষে শোচনীয় হইবে।

ইহাতে মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুর অসত্যপরায়ণতা ও তাঁহার মতবাদের ফাঁকীর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

যদি তাঁহার মিঃ গান্ধীকে হঠাইবার মনোবৃত্তিই না থাকিত, তবে নির্ব্বাচন-প্রতিদ্বন্দ্বিতাকালে 'গান্ধীবাদ নিপাত যাউক' বলিয়া চীৎকার করা হইয়াছিল কেন?

আমরা ইহা যতদূর সম্ভব স্পষ্ট করিয়া বলিতে চাহি যে, মনুষ্যসমাজের বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে, যাহার মধ্যে সামান্য অসত্যও

আছে, এমন কোন কূটনীতিই কার্যকরী হইবে না। প্রধানতঃ এই কারণেই গান্ধীবাদ এবং বর্তমান রাজনীতির কার্যক্ষেত্র বার্থ হইতে বাধ্য। সাধারণ-বুদ্ধি ব্যক্তিবৃন্দের নিকট ইহা হয়ত এখনেই প্রতীয়মান হইবে না, কিন্তু ইহা সত্য যে, বর্তমান রাজনীতির কার্যনীতি এবং গান্ধীবাদ উভয়ই ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে।

যদি মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু এই সাদা কথা বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া মিঃ গান্ধী কিংবা বর্তমান জগতের কোন রাষ্ট্রনেতার প্রদর্শিত পন্থার অনুসরণ করেন, তবে তাঁহার কর্মজীবনের প্রারম্ভে তিনি যে ত্যাগ করিয়াছিলেন,তাহা বৃথা হইবে। দেশের জন্য তিনি যদি প্রকৃতই এমন কিছু করিতে চাহেন, যাহা বাস্তব এবং ফলপ্রদ, তবে তাঁহাকে সাহসের সহিত নিজস্ব পন্থা গবেষণা দ্বারা বাহির করিতে হইবে। প্রথমতঃ, তাঁহাকে সম্পূর্ণভাবে দ্বন্দ্ব-প্রবৃত্তি পরিহার করিতে হইবে এবং ভারতীয়ই হউক, আর ব্রিটনই হউক, যাহাতে কাহারও সহিত কোন প্রকার দ্বন্দ্বের আশঙ্কা আছে, এইরূপ কার্যের প্রত্যেকটির সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার প্রধান কার্য হইবে, বিশ্ববাসীর নিকট ঘোষণা করা যে, তাঁহার পরিচালিত কংগ্রেসের উদ্দেশ্য হইবে, ভারতীয়-ব্রিটিশনির্বিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য অনতিবিলম্বে আর্থিক স্বচ্ছলতা, শারীরিক স্বাস্থ্য এবং মানসিক শান্তিসাধন এবং তৎকল্পে যদি ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ্‌গণের সহানুভূতি লাভ করেন, তাহা হইলে তিনি স্বাধীনতার আন্দোলন পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদের সহযোগিতা-লাভ-চেষ্টার নীতি স্বীকার করিতেও প্রস্তুত আছেন। তাঁহার কর্মোদ্দেশ্যের এই পরিবর্তন সমগ্র ভারতের মিলন-সাধনের সহায়ক হইবে।

তৃতীয়তঃ তাঁহার কর্তব্য হইবে বর্তমান কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার মন্ত্রীদিগকে পদত্যাগে প্রবৃদ্ধ করা এবং যে সকল প্রদেশে কংগ্রেসের সংখ্যাপ্রাধান্য বর্তমান, তথায় মুসলমান-দিগকে মন্ত্রিসভা গঠনের অনুরোধ করা এবং তাঁহাদিগকে এই ভরসা দান যে, যদি তাঁহারা অনতিবিলম্বে দেশের বেকার ও অন্নাভাব-সমস্যার সমাধানোপযোগী গঠনমূলক কার্যকলাপ গ্রহণ করেন, তবে কংগ্রেস মুসলমান- মন্ত্রিসভার বিরোধিতা করিবে না।

চতুর্থতঃ, তাঁহার কর্তব্য হইবে, মুসলমান মন্ত্রিসভার মারফৎ প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ ও বড়লাটের নিকট ভারতীয়-ব্রিটিশনির্বিশেষে প্রত্যেকের অন্নাভাব ও বেকার-সমস্যা সমাধানের উপযোগী পরিকল্পনার দাবী উপস্থিত করা যে,যদি ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ্‌গণ অনতিবিলম্বে ভারতবাসীকে উক্ত পরিকল্পনার সন্ধান দান করুন, নয় ভারত-বাসিগণের হস্তে ঐ ভার সম্পূর্ণভাবে ছাড়িয়া দিন, যাহাতে তাহারা নিজস্ব পন্থায় ঐরূপ পরিকল্পনা প্রবর্তন করিতে পারে এবং তাহা তাহারা নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী সমর-বিভাগ ও অর্থনীতি-বিভাগ সংক্রান্ত আইনকানুনের সাহায্যে কার্যে পরিণত করিতে পারে।

পঞ্চমতঃ তাঁহার কর্তব্য হইবে, ভারতবাসী ও ব্রিটিশ-নির্বিশেষে প্রত্যেকের অন্নাভাব ও বেকার-সমস্যার যাহাতে সমাধান হইতে পারে, এইরূপ পরিকল্পনার সন্ধানদানের সহায়ক গ্রন্থসমূহ স্বয়ং অধ্যয়ন করা।

এই প্রণালীতে তিনি যদি পদে পদে অগ্রসর হইতে পারেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই দেশবাসী তথা সমগ্র মনুষ্যসমাজের সহায়ক কার্য করিতে পারিবেন এবং দেখিবেন যে, মিঃ গান্ধীই হউন কিংবা জগতের আর যে কেহই হউন, তাঁহাকে বাধা দিতে পারিবেন না। ফেডারেশন লইয়া অনর্থক দ্বন্দ্ব-কলহে অবতীর্ণ হইবার পূর্বে তিনি যাহাতে ভাল করিয়া বিষয়টি ভাবিয়া দেখেন, তজ্জন্য তাঁহাকে আমরা এখনও অনুরোধ জানাইতেছি।

বালুকা-বস্তার ফরমাস এবং আর্থিক সমস্যা-সমাধানের সম্ভাবনা

সম্প্রতি বৃটিশ সরকার কলিকাতার ইণ্ডিয়ান জুট মিল এসোসিয়েশনকে আগামী জুন মাসের মধ্যে ২০ কোটি বালুকা-বস্তা সরবরাহ করিবার ফরমাস দিয়াছেন। এই ফরমাস মাফিক কাজ হইয়া গেলেই আরও বালুকা-বস্তার ফরমাস আসিবে বলিয়া মনে হয়। ইণ্ডিয়ান জুট মিল্ এসোসিয়েশনের নিকট এই ফরমাস্ ছাড়াও, বৃটিশ সরকার ডাণ্ডীকে জুন মাসের শেষ পর্যন্ত প্রতি সপ্তাহে ৩০ লক্ষ করিয়া বালুকা-বস্তা সরবরাহ করিবার জন্য বলিয়া-ছেন। তদুপরি প্রকাশ যে, বেলজিয়ামের সরকারও ৪০ লক্ষ বালুকা-বস্তার জন্য 'টেণ্ডার' আহ্বান করিয়াছেন।

সন্দেহ নাই যে, এই সব ফরমাসের ফলে কাঁচা পাট এবং পাট-শিল্পের বাজার বেশ চড়িয়া যাইবে। তাহার লক্ষণ ইতিমধ্যেই পাওয়া গিয়াছে। কাঁচা পাট এবং পাটের সেয়ারের দাম বাড়িয়া গিয়াছে। ঠিক এক্সচেঞ্জের পাটের বাজারে এই ফরমাসে নূতন আশার সঞ্চার হইয়াছে

এবং তবলা ফিরিয়া আসিয়াছে। প্রত্যাশা করা হইতেছে যে, উদ্বৃত্ত তথায় আত মাল সাবাড় হইয়া যাইবে।

ইহার সমস্তই সত্য, কিন্তু প্রশ্ন এই যে, ইহা জন-সাধারণের অন্নাভাব ও বেকার-সমস্যা-সমাধানের বিন্দুমাত্রও সহায়ক হইবে কি?

সন্দেহ নাই যে, ব্রাত্তীয় পাট-শিল্প ও বাণিজ্যের সহিত যে-সকল ব্রিটিশ প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কয়েক কোটি টাকার লেন-দেন হইবে এবং কিছু সময়ের জন্য তাঁহাদের কাজও বাড়িবে, কিন্তু ইহাতে কি তাঁহাদের কোন স্থায়ী উপকার হইবে?

ভারতবাসীদেরও ঐ একই অবস্থা দাঁড়াইবে। যাঁহারা প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ ভাবে পাট-শিল্প ও বাণিজ্যের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন, কিছু সময়ের জন্য কিছু পরিমাণ টাকা তাঁহারা নাড়াচাড়া করিতে পারিবেন, কিন্তু ইহা কি স্থায়ী ভাবে বেকার ও অন্নাভাব-সমস্যার সমাধান করিতে পারিবে?

আমাদের উত্তর, না। সরকার ইহা স্বীকার করুন আর নাই করুন, ইহা সত্য যে, প্রত্যেক ভাগ জমির কৃষিজাত ফসল প্রতি বৎসর ক্রমশঃ দ্রুতগতিতে হ্রাস পাইতেছে, কৃষকের পক্ষে লাভজনক কৃষিব্যবস্থা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে এবং খাদ্য-শস্যে ঘাটতির আশঙ্কা নিশ্চয়তায় পরিণত হইয়াছে। যদি বিঘাপ্রতি জমির ফসল না বাড়াইবার ব্যবস্থা করা হয়, তবে কৃষকের পক্ষে যেমন কৃষি লাভজনক হইবে না, তেমনই খাদ্য-শস্যে ঘাটতির আশঙ্কাও দূর হইবে না এবং যদি খাদ্যশস্যে ঘাটতির আশঙ্কা দূর না হয়, তবে জন-সাধারণের মধ্যে যে অন্নাভাব ও বেকার-সমস্যা দেখা দিয়াছে, তাহা সমাধানের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা ঘটিবে না। কাগজের নোট কিংবা ধাতু-মুদ্রার আকারে টাকা, আনা, পাই কিংবা পাউণ্ড, শিলিং পেনী যত সংখ্যাতেই হউক না কেন, তাহার বিনিময়ে আহার্য এবং খাদ্যশস্যের প্রচুর সংস্থান না হইলে জন-সাধারণের পেটের আগুন নির্বাপিত হইবে না। পৃথিবীর সমগ্র লোকসংখ্যাকে প্রতিদিনের হিসাবে অর্দ্ধসের বিঘা গুণ করিলে দেখা যাইবে যে, ৩৬৫ দিনে পৃথিবীর সমগ্র লোকসংখ্যার যে পরিমাণ খাদ্য-শস্য প্রয়োজন, তাহা সমগ্র পৃথিবীর সমগ্র বৎসরে উৎপন্ন সমগ্র খাদ্যশস্যের দ্বারাও সঙ্কুলান হয় না। সঙ্কুলান হওয়া দূরে থাক, দেখা যায়, ১৯৩৪ সন হইতে বৎসর-পিছু সমগ্র পৃথিবীতে যে-খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইতেছে, তাহা সমগ্র পৃথিবীর লোকসংখ্যার প্রয়োজনের শতকরা ৯০ ভাগেরও কম। কৃষিজাত দ্রব্যের অতিরিক্ত উৎপাদন ইত্যাদি সম্বন্ধে নানাবিধ অর্থহীন কথা শুনা যাইতে পারে, কিন্তু কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন-বিবরণীতেই প্রকৃত তথ্য লিপিবদ্ধ আছে এবং প্রয়োজন হইলে ইহা প্রমাণ করা যাইতে পারে। সাধারণ লোকে উহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না, কেন না তাহাদের অধিকাংশেরই সমগ্র প্রয়োজনের অনুরূপ আহার্যক্রয়ের পক্ষে যথেষ্ট অর্থের সংস্থান নাই এবং তাহাদিগকে বাধ্য হইয়াই আংশিক ভাবে অনশনগ্রস্ত থাকিতে হয়। যদি পৃথিবীর সমগ্র অধিবাসীর সম্পূর্ণ প্রয়োজনের ক্রয়যোগ্য যথেষ্ট অর্থসংস্থান থাকিত, তবে একদিনেই তাহারা পৃথিবীর খাদ্যশস্যের ঘাটতির বিষয় উপলব্ধি করিতে পারিত। যতদিন পৃথিবীর খাদ্যশস্যে ঘাটতি পড়ে নাই, ততদিন বাণিজ্যঘটিত বাজার গরমের মারপ্যাঁচে ফল পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু ঐ ঘাটতি না মিটিলে ইহাতে আর ফল পাওয়া যাইবে না। যদি পাউণ্ড, শিলিং, পেনি, কিংবা টাকা, আনা, পাইয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করিলে অন্নাভাব-সমস্যার সমাধান হইত, তাহা হইলে জার্মানীতে আইন করিয়া বেশবাসীর খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা হইত না।

অবশ্য, কর্তৃপক্ষ যে, সমস্যা-সমাধানের জন্য আন্তরিক ভাবে চেষ্টা করিতেছেন, ইহা তাহারই দৃষ্টান্ত এবং কংগ্রেসী বাকানবীশগণের, যাঁহারা কোন কার্যকরী প্রতীকারপন্থার নির্দ্দেশ দান না করিয়া, কেবলই কলহে প্রবৃত্ত হন, ইহা হইতে শিক্ষালাভ করা উচিত। কিন্তু তাহা হইলেও পাশ্চাত্য-গণ যে অর্থনীতি-সম্বন্ধীয় প্রকৃত বিজ্ঞান সম্বন্ধে অজ্ঞ, ইহাকে তাহারও দৃষ্টান্ত হিসাবে দেখিতে হইবে। অর্থনীতি-সম্বন্ধীয় প্রকৃত বিজ্ঞানই একমাত্র জনসাধারণকে অন্নাভাব ও বেকার-সমস্যা হইতে উদ্ধার করিতে পারে।

পৃথিবীর উৎপন্ন খাদ্যশস্যে যখন ঘাটতি পড়িতেছে, তখন এই শ্রেণীর কৌশল সাময়িকভাবে কাজে লাগিতে পারে, অবশ্য যদি তৎসহ খাদ্যশস্যের ঘাটতিপূরণের জন্য চেষ্টা করা হয় এবং বিঘাপ্রতি জমির বাৎসরিক ফসলের উৎপাদন-হার বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিয়া কৃষকের পক্ষে কৃষিকে লাভজনক করিবার চেষ্টা করা হয়।

এই সঙ্গে সঙ্গে যদি এ চেষ্টার না হস্তক্ষেপ করা হয়, তবে বাণিজ্যঘটিত এই বাজার-গরমের ব্যাপার জনসাধারণকে ভ্রান্ত করিবে এবং তাহাদের অবস্থা হীনতর হইবে।

আমরা কর্তৃপক্ষকে সাবধান করিতেছি এবং সময় থাকিতে সতর্ক হইবার জন্য তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিতেছি।

নাই। শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীও ঋষিপ্রণীত শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাহীনা বলিয়া আমাদিগের বিশ্বাস, কারণ তাঁহার লিখিত গ্রন্থে ও বক্তৃতায় অনেক সময় ঐ শ্রদ্ধা উঁকিঝুঁকি মারিয়া থাকে।

কোন্ শাস্ত্রের নির্দ্দেশ অনুসারে তিনি স্ত্রীলোক হইয়া ও পুরুষের সহায় যোগদান করেন এবং উহার সভানেত্রীত্ব করিয়া থাকেন, তাহা তিনি আমাদিগকে জানাইয়া দিবেন কি?

সত্ত্ব, আত্মা এবং শরীর বিষয়ে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের মধ্যে প্রভেদ কোথায় এবং কেন হইয়া থাকে, তাহা ঋষিগণ মুখ্যতঃ দেখাইয়াছেন অথর্ব্ববেদে এবং ঋষিগণের ঐ উক্তি যে সঠিক, তাহা প্রত্যক্ষ করিবার পন্থা দেখান হইয়াছে "সাম" বেদে। ঐ দুইখানি গ্রন্থেই পরিষ্কার ভাবে দেখান হইয়াছে যে, মানুষের অন্তর্মুখীতা "প্রাকৃতিক" ধর্ম্ম এবং বহির্মুখীতা "স্বাভাবিক" ধর্ম্ম।

এইখানে অন্তর্মুখীতা ও বহির্মুখীতা বলিতে কি বুঝায় তাহা জানিয়া লইতে হইবে। কোন বস্তুর অথবা বর্ণের সৌন্দর্য্য অথবা সৌন্দর্য্যাভাব দেখিয়া তৎপ্রতি যথাক্রমে অনুরাগবিশিষ্ট অথবা বিদ্বেষবিশিষ্ট হইবার নাম বহির্মুখী হওয়া; আর, সৌন্দর্য্য অথবা সৌন্দর্য্যাভাব দেখিয়া তৎপ্রতি অনুরাগবিশিষ্ট অথবা বিদ্বেষবিশিষ্ট না হইয়া কেন ঐ বস্তুটিকে সুন্দর অথবা কুৎসিত মনে করা যাইতেছে, তাহা চিন্তা করার নাম অন্তর্মুখী হওয়া। অন্তর্মুখীতা মানুষকে জ্ঞান-বিজ্ঞান উদ্ঘাটন-কার্য্যে উদ্যত করিয়া তাহাকে প্রকৃত সুখী করিয়া তোলে আর বহির্মুখীতা মোহ ও উচ্ছৃঙ্খলতার দিকে প্রধাবিত করিয়া মানুষের সর্ব্বনাশ সাধন করে। বহির্মুখীতাকে কখনও সম্পূর্ণভাবে বাদ দেওয়া অথবা নিগ্রহ করা সম্ভব হয় না। সু-শিক্ষা ও সুসাধনার দ্বারা উহাকে সংযত করা সম্ভব হয়। বহির্মুখীতাকে সংযত করিতে না পারিলে কখনও অন্তর্মুখী হওয়া যায় না, অর্থাৎ মোহ ও উচ্ছৃঙ্খলতাকে সংযত করিতে না পারিলে কখনও প্রকৃত জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিকারী হওয়া সম্ভব হয় না।

মানুষ যতই সুশিক্ষিত ও সুসাধনাপরায়ণ হউক না কেন, বহির্মুখীতা কখনও কেহ জীবনের সর্ব্বসময়ে সর্ব্বতোভাবে নিগ্রহ করিতে সক্ষম হয় না। সহিষ্ণুতারূপ গুণের দ্বারা বহির্মুখীতাকে সংযত করিবার প্রাকৃতিক উপাদান প্রধানতঃ রহিয়াছে স্ত্রীলোকের মধ্যে, আর কর্ম্ম ও জ্ঞানের সাধনারূপ গুণের দ্বারা অন্তর্মুখীতাকে সজাগ করিয়া তুলিবার প্রাকৃতিক উপাদান প্রধানতঃ রহিয়াছে পুরুষের মধ্যে। বহির্মুখীতাকে সংযত এবং অন্তর্মুখীতাকে সজাগ করিয়া তুলিতে না পারিলে মানুষ কখনও প্রকৃত মানুষের মত হইতে পারে না এবং সমাজমধ্যে প্রকৃত মানুষ বিদ্যমান না থাকিলে, সমাজ কখনও ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পায় না। স্ত্রীলোক যদি নিজেই বহির্মুখীনী হয়, তাহা হইলে বহির্মুখীতাকে সংযত করিবার তাহার স্বাভাবিক উপাদান বিধ্বস্ত হইতে আরম্ভ করে এবং পুরুষ যদি উচ্ছৃঙ্খল ও কু-শিক্ষিত হয়, তাহা হইলে অন্তর্মুখীতাকে সজাগ করিয়া তুলিবার তাহার প্রাকৃতিক উপাদান আলোড়িত হইয়া পড়ে। স্ত্রীলোক যদি বহির্মুখীতাকে সংযত করিবার স্বাভাবিক উপাদান অটুট রাখিতে পারে, তাহা হইলে পুরুষের পক্ষে উচ্ছৃঙ্খল ও কুশিক্ষিত হওয়া কষ্টসাধ্য হইয়া থাকে। যে পরিবারে ও সমাজে স্ত্রীলোক পর্য্যন্ত বহির্মুখীনী হইয়া বহির্মুখীতাকে সংযত করিবার তাহার স্বাভাবিক উপাদান ক্ষুণ্ণ করিয়া ফেলে, সেই পরিবার ও সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা ও ধ্বংস অনিবার্য্য হয়। তখন পরিবার অথবা সমাজমধ্যে অন্নাভাব, অর্থাভাব, অস্বাস্থ্য এবং অশান্তি নিত্য-সহচরতার উপনীত হয়। পুরুষ উচ্ছৃঙ্খল এবং কু-শিক্ষিত হইলেও, স্ত্রীলোকের বহির্মুখীতা সংযত করিবার স্বাভাবিক উপাদান অটুট থাকিলে পুরুষের সংস্কার সাধন করিয়া পরিবার ও সমাজকে রক্ষা করা সম্ভবযোগ্য হইয়া থাকে বটে, কিন্তু স্ত্রীলোকের বহির্মুখীতা সংযত করিবার স্বাভাবিক উপাদান ক্ষুণ্ণ হইয়া গেলে, পরিবার ও সমাজকে রক্ষা করা দুঃসাধ্য ব্যাপার হইয়া থাকে।

এই তথ্যগুলি আধুনিক কোন বৈজ্ঞানিক বুঝিতে পারেন না বটে, কিন্তু ঐ তথ্য যে সর্ব্বতোভাবে ঠিক তাহা ঋষিগণ একাধিক গ্রন্থে দেখাইয়াছেন।

উপরোক্ত তথ্য তাঁহারা আনুপূর্ব্বিভাবে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন বলিয়াই স্ত্রীলোকের চাল-চলনের ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁহারা কঠোরতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। আজ-কালকার অনেকে মনে করেন যে, ঋষিগণ পুরুষ ছিলেন বলিয়া পুরুষের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করিয়াছেন। ঋষিপ্রণীত মূল শাস্ত্র বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, যাঁহারা এতাদৃশ

মনোভাব পোষণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা আজকালকার উচ্ছৃঙ্খল সমাজে যতই খ্যাতিলাভ করুন না কেন, বাস্তবিক পক্ষে আকাট মূর্খ। একদিন মানবসমাজ ঋষিদিগের সর্ব্ববিধ অনুশাসন সর্ব্বতোভাবে মানিয়া লইয়াছিল বলিয়া সর্ব্বতোভাবে সুখীও হইতে পারিয়াছিল। চারিশত বৎসর আগেও এমন কি ইয়োরোপীয় সমাজেও, স্ত্রী-পুরুষের অবাধ-মিলনের এবং স্ত্রীলোকগণের বহির্মুখীনী হইয়া স্বাধীনভাবে চাল-চলনের আজকালকার মত দৃষ্টান্ত দেখা যাইবে না। আজকালকার তুলনায় ইয়োরোপীয়ান পরিবারের ও সমাজের অর্থাভাব, বেকার, স্বাস্থ্যাভাব ও অশান্তি যে চারিশত বৎসর আগেও অপেক্ষাকৃত কম ছিল, তাহা কোন সত্যদর্শী ঐতিহাসিক অস্বীকার করিতে পারিবেন না। আর স্ত্রী-পুরুষের অবাধ-মিলন এবং স্ত্রীলোকগণের বহির্মুখীনী হইয়া স্বাধীনভাবে চাল-চলনের মাত্রা যতই বৃদ্ধি পাইতেছে, প্রত্যেক পরিবারের ও সমাজের অর্থাভাব, বেকার, স্বাস্থ্যাভাব এবং অশান্তিও ততই বাড়িয়া যাইতেছে, তাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি।

কাযেই ঋষিগণের এতদ্বিষয়ক অনুশাসন যে বিন্দুমাত্রও ভ্রমাত্মক, তাহা বাস্তব অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলেও মনে করা যায় না।

স্ত্রীলোক বহির্মুখীনী হইলে একদিকে যেরূপ পুরুষের পক্ষে অন্তর্মুখী হওয়া সম্ভব হয় না, সেইরূপ আবার স্ত্রীলোকের পক্ষে সু-সন্তান প্রসব করা সম্ভব হয় না। ইহাও তাঁহারা বেদের মধ্যে স্ত্রীলোকের শরীরতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিয়া অকাট্যভাবে প্রমাণিত করিয়াছেন। বেদে যেরূপ অকাট্যভাবে যুক্তিগুলি দেখান হইয়াছে, সেইরূপ সংহিতায় এতৎসম্বন্ধীয় অনুশাসনগুলি লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

মনুসংহিতার নিম্নলিখিত শ্লোক কয়েকটি ঐ অনুশাসনের প্রমাণ—

> অজাবে হ্যেষনাগীণাং নরাণামিহ দূষণং।
> অতোঽর্থান্ প্রসাধন্তি প্রমদাসু বিপশ্চিতঃ॥
> (২য় অধ্যায়, ২১৩ শ্লোক)
>
> অন্নাদং ভ্রূণহত্যা হি স্ত্রী সুতাদুতে তথাবিধং।
> তস্মাৎপ্রজাবিশুদ্ধার্থং স্ত্রিয়ং রক্ষেৎ প্রযত্নতঃ॥
> (৯ম অধ্যায়, ৯ শ্লোক)

মনুসংহিতার ১ম অধ্যায়ের সমাজসৃষ্টি ও রক্ষার মূল সূত্রগুলি যথাযথ অর্থে বুঝিয়া লইয়া পঞ্চম অধ্যায় ও নবম অধ্যায়ের স্ত্রীলোক-সম্বন্ধীয় কর্ত্তব্যের অনুশাসনগুলি সম্যক্-ভাবে বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, স্ত্রীলোকগণের পক্ষে কোন পুরুষের সভায় যোগদান করা যেরূপ গর্হিত, সেইরূপ পুরুষের পক্ষে স্ত্রীলোকগণকে তাহাদিগের কোন সভায় আহ্বান করাও সমধিক পরিমাণে কর্ত্তব্যবিরুদ্ধ।

স্ত্রীলোকগণ আজকালকার লেখাপড়ায় যতই অগ্রগামিনী হউন না কেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কখনও সু-সাহিত্যের প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয় না এবং হইবে না। সত্ত্ব, আত্মা এবং শরীরের মধ্যে যে উপাদান থাকিলে মানুষের পক্ষে সু-সাহিত্যের জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয়, স্ত্রীলোকের সত্ত্বায়, আত্মায় এবং শরীরে সেই উপাদান বিদ্যমান নাই। প্রধানতঃ এই উপাদান লইয়াই মানুষের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ এই দুইটী লিঙ্গের দুইটী প্রভেদ হইয়া থাকে এবং পুরুষ অন্তর্মুখীতা উদ্দীপ্ত করিবার শক্তিতে শক্তিমান্ ও স্ত্রীলোক বহির্মুখীতা সংযত করিবার শক্তিতে শক্তিমতী হয়। এই কারণেই ঋষিগণের অনুশাসন অনুসারে স্ত্রীলোকগণকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা হইতে দূরে রাখা হইয়া থাকে।

এই অনুশাসনের বিরুদ্ধে লীলাবতী, গার্গী, মৈত্রেয়ী ও খনার উদাহরণ দেখান হইয়া থাকে। 'লীলাবতী,' 'গার্গী,' 'মৈত্রেয়ী' ও 'খনা' এই শব্দ চারিটী ঋষি-প্রণীত গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা সত্য, কিন্তু যে যে স্থানে উহার উল্লেখ আছে, সেই সেই স্থান ভাল করিয়া পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, কোন মানুষের নাম এই অর্থে ঐ শব্দ কয়েকটীকে গ্রহণ করিলে ঐ ঐ স্থানের কার্য্য-কারণ সঙ্গত অর্থ হয় না। পরন্তু "লীলাবতী" শব্দটীকে "প্রকৃতির কার্য্যবিশেষ," এবং "গার্গী," "মৈত্রেয়ী" ও "খনা" এই শব্দ কয়েকটীকে "সাধনার কোন প্রকারবিশেষ", এই অর্থে গ্রহণ করিলে কার্য্য-কারণ সঙ্গত অর্থে উপনীত হওয়া যায়। বস্তুতঃপক্ষে শব্দ-বিজ্ঞানানুসারে "লীলাবতী" প্রকৃতির কার্য্য-বিশেষের নাম এবং "গার্গী," "মৈত্রেয়ী" এবং "খনা" সাধনার প্রকরণ-বিশেষের নাম।

আজকালকার পুরুষ সাহিত্যিকগণের মধ্যে কোন সু-সাহিত্যিক দেখা যায় না এবং তাঁহারা পুরুষ হইয়াও সাহিত্যক্ষেত্রে প্রায়শঃ স্ত্রীলোকগণের অপেক্ষাও নিকৃষ্টতর হইয়া পড়িয়াছেন। ইহারই জন্য কোন কোন স্ত্রীলোকের পক্ষে আধুনিক তথাকথিত কোন কোন পুরুষ সাহিত্যিকের তুলনায়

অপেক্ষাকৃত অধিকতর প্রশংসার যোগ্য হওয়া সম্ভব হইয়াছে বটে, কিন্তু কোন হীনোক্ত প্রকৃত সু-সাহিত্যিক হইতে পারেন নাই। শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী আমাদিগের এই কথার অন্যতম উদাহরণ। প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের সভানেত্রীরূপে শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন, তাহার কয়েকটী কথা বিশ্লেষণ করিলেই আমাদিগের ঐ মন্তব্য প্রমাণিত হইবে। আমরা এতদর্থে তিনি সাহিত্যের আদর্শ ও সংজ্ঞা সম্বন্ধে কি কি বলিয়াছেন, সর্ব্ব প্রথমে তাহার আলোচনা করিব।

সাহিত্যের আদর্শ ও সংজ্ঞা সম্বন্ধে শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর মতবাদ

সাহিত্যের আদর্শ কি এবং "সাহিত্য" শব্দটীর অর্থ কি, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিতে বসিয়া শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী যে কয়েকটি কথা বলিয়াছেন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কথা কয়েকটী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :—

(১) সাহিত্যের আদর্শ লইয়া বিস্তর মতভেদ আছে এবং তাহা থাকা খুবই স্বাভাবিক।
মানুষের যখন সাহিত্যের সৃষ্টিকর্ত্তা, তখন ভিন্ন রুচি এবং ভিন্ন আদর্শ সাহিত্যে স্থান পাইতে বাধ্য।
এতদ্ভিন্ন দেশ, কাল এবং ধর্ম্মগত আদর্শভেদও সাহিত্যে প্রভাব বিস্তার করে।

(২) এই সাহিত্য বস্তুতান্ত্রিক হউক অথবা ভাবতান্ত্রিক হউক, যদি তাহা একাধারে হৃদয়গ্রাহী এবং মনোহারী হয়, তবেই তাহা সার্থক।

(৩) সাহিত্য শব্দটীর দুই প্রকার অর্থ আছে।

(৪) তন্মধ্যে একটী অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক, অপরটী অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ।

(৫) বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি মিলাইয়া··· ব্যাপক "বাঙ্ময়" অর্থে সাহিত্য শব্দটী ব্যবহৃত হইতেছে।

(৬) সাহিত্যের অর্থ···(স্থানে স্থানে) রস-রচনা, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক প্রভৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ।

(৭) প্রথমেই আমাদিগের মনে রাখা প্রয়োজন যে, সাহিত্য সমাজের নিছক প্রতিবিম্ব নহে, উহা সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতম অভিব্যক্তি।

(৮) বাস্তবের সহিত কল্পনার মিলন যখন সুন্দর ও সুসমঞ্জস হয়, তখনই তাহা সু-সাহিত্য হইয়া দাঁড়ায়।

উপরোক্ত দশটী কথার মধ্যে প্রথম চারিটী 'সাহিত্যে'র আদর্শ সম্বন্ধীয় এবং পরবর্ত্তী ছয়টী "সাহিত্যের" অর্থ অথবা সংজ্ঞা সম্বন্ধীয়।

এই দশটী কথা বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, সাহিত্যের আদর্শ ও সংজ্ঞা সম্বন্ধে শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর পরিষ্কার কোন ধারণা নাই। অবশ্য এ কথা আমাদিগকে বলিতেই হইবে যে, এই দোষ-দশতঃ কেবলমাত্র তাঁহার যে নিন্দনীয়া তাহা নহে, আজকালকার যে কোন সাহিত্যিকের রচনা ও বক্তৃতা আলোচনা করিলে তাঁহাদিগের সাহিত্যের সংজ্ঞা ও আদর্শ-সম্বন্ধীয় অজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যাইবে। যাহা প্রকৃত সাহিত্য, অথবা সু-সাহিত্য তাহার সেবক হইলে মানুষ কখনও অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব অথবা শান্তির অভাবে জর্জ্জরিত হইতে পারে না। এমন কি, সু-সাহিত্যিক অথবা প্রকৃত সাহিত্যিকের দশ-সামন্ত্রিক সমাজমধ্যেও অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব এবং শান্তির অভাবের সম্ভব-যোগ্যতা হ্রাস পাইতে বাধ্য হইয়া থাকে। সাহিত্যের সেবা করিয়াও যখন অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব অথবা শান্তের অভাবের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া অসম্ভব হয়, তখন বুঝিতে হয় যে, প্রকৃত সাহিত্যের অথবা সু-সাহিত্যের অভাব হইয়া পড়িয়াছে এবং যাহা কিছু সাহিত্যের নামে চলিতেছে, তাহা দুষ্ট অথবা কু-সাহিত্য।

সাহিত্যিকের উপরোক্ত গুণাগুণ হৃদয়ঙ্গম করিয়া বিচার করিতে পারিলে, আধুনিক সাহিত্য যে সর্ব্বতোভাবে দুষ্ট এবং সাহিত্যিকগণ যে সর্ব্বতোভাবে নিন্দার্হ, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। নতুবা, সাহিত্যিকগণ এবং বর্ত্তমান সমাজ অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব এবং শান্তির অভাবে এতাদৃশ ভাবে জর্জ্জরিত হইতে পারিতেন না।

শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর প্রথম কথা—"সাহিত্যের আদর্শ লইয়া বিস্তর মতভেদ আছে এবং থাকা খুবই স্বাভাবিক"।

সাহিত্যের আদর্শ লইয়া বর্ত্তমান কালে যে বিস্তর মতভেদ আছে তাহা খুবই সত্য এবং ঐ মতভেদ যে বর্ত্তমান

স্বভাবামুগ হাসাও খুব সত্য ; কিন্তু শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীকে জানিতে হইবে যে, এতাদৃশ মতভেদ সর্ব্বযুগে বিদ্যমান ছিল না এবং থাকে না। মানুষ যখন কোন বিষয়ক সত্য বিস্মৃত হইয়া ঐ বিষয়ে কোন অসত্য অথবা ভ্রমে নিপতিত হয়, তখনই কেবলমাত্র মতভেদের সৃষ্টি হয়। কোন বিষয়ক সত্য যখন মানুষের হৃদয়ে যথাযথ ভাবে জাগ্রত থাকে, তখন মতভেদের সৃষ্টি হইতে পারে না। তিন আর দুই-এর যোগে যে পাঁচ হয়, তাহা যতদিন পর্য্যন্ত মানুষ বিস্মৃত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত তদ্বিষয়ে মানুষের মধ্যে কোন মতভেদের উদয় হয় না, কিন্তু যখন তিন আর দুই-এর যোগে পাঁচ ছাড়া আর কিছু হইয়াছে বলিয়া মানুষ মনে করিতে আরম্ভ করে, তখনই মতভেদের সৃষ্টি হইয়া থাকে। সাহিত্যের আদর্শ লইয়া বর্ত্তমান সাহিত্যিকগণের মধ্যে যে বিস্তর মতভেদ আছে, এই ঘটনা হইতেই বুঝিতে হয় যে, প্রকৃত সাহিত্য অথবা সু-সাহিত্যের আদর্শ বিষয়ে যে সত্য কি, তৎসম্বন্ধে তাঁহারা অজ্ঞ।

সাহিত্যের আদর্শ লইয়া মতভেদের বিদ্যমানতা "স্ব-ভাব"-জাত হইলেও হইতে পারে বটে, কিন্তু উহা কখনও "প্রকৃতি-জাত" হইতে পারে না। বর্ত্তমানে সাহিত্যিকগণ "স্বভাব" ও "প্রকৃতি" এই দুইটী শব্দ প্রায়শঃ একার্থে ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু শব্দের অন্তর পরীক্ষা করিয়া উহার অর্থ নির্দ্ধারণ করিবার পদ্ধতি অবগত হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে "প্রকৃতি" ও "স্বভাব" কখনও একার্থক হয় না। "প্রকৃতি" সর্ব্বপরিব্যাপ্ত, আর "স্বভাব" কেবলমাত্র জীব-পরিব্যাপ্ত। যে সমস্ত বস্তু স্ত্রী-পুরুষ-ভেদবিশিষ্ট লিঙ্গজ্ঞাপক নহে, যে সমস্ত বস্তুকে সংখ্যার দ্বারা পরিগণিত করা যায় না, যে সমস্ত বস্তুর বাক্যপ্রকাশক শক্তি নাই, সেই সমস্ত বস্তুর মধ্যে প্রকৃতিরূপী কার্য্য বিদ্যমান থাকে বটে, কিন্তু তাহার কোনটীর মধ্যে সত্ত্বার ভাবপ্রকাশক শক্তি, অথবা স্বভাব বিদ্যমান থাকে না। চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, কেবলমাত্র মেদ, অস্থি, মজ্জা, বসা, মাংস, রক্ত ও চর্ম্মের সহায়তায় সত্ত্বার ভাবপ্রকাশক শক্তি, অথবা স্বভাব বিকশিত হইয়া থাকে। উহা যাহাদের নাই, অর্থাৎ যে সমস্ত বস্তু মেদ, অস্থি প্রভৃতি বিহীন, সেই সমস্ত বস্তু স্বভাবহীন। অথচ তাহাদিগের মধ্যে বায়ু, রস ও তেজের কার্য্যের নিয়ম চলিতে থাকে বলিয়া তাহাদিগকে প্রকৃতিযুক্ত বলা হইয়া থাকে। এইরূপভাবে চিন্তা করিলে আরও বোঝা যাইবে যে, মানুষের মধ্যে প্রকৃতির কার্য্য ও স্বভাবের কার্য্য, এই দুই-ই বিদ্যমান থাকে। মানুষের অন্তরস্থ প্রকৃতির কার্য্য তাহাকে প্রত্যেক বিষয়ক সত্য পরিজ্ঞাত হইবার সহায়তা সম্পাদন করে আর তাহার স্বভাবের কার্য্য তাহাকে যেরূপ করে, কখন সত্যোদ্ঘাটনের সহায়তা সম্পাদিত করিতে পারে, সেইরূপ আবার কখন কখন অসত্যে বিভ্রান্ত করিয়া তুলিলেও তুলিতে পারে। কাযেই বলিতে হয় যে, প্রকৃতির কার্য্য যেরূপ সর্ব্বদা মানুষের মঙ্গলপ্রদ হইয়া থাকে, স্বভাবের কার্য্য সেইরূপ সর্ব্বদা মঙ্গলপ্রদ অথবা আদরের বস্তু না হইলেও হইতে পারে। পরন্তু, স্বভাবের কার্য্য যখন মতভেদের স্রষ্টা হইয়া থাকে, তখন ঐ স্বভাবের কার্য্য যে নিন্দনীয়, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

কাযেই বর্ত্তমানে সাহিত্যের আদর্শ লইয়া যে মতভেদ বিদ্যমান আছে, তাহা স্বাভাবিক হইলেও নিন্দনীয়। যাঁহারা প্রকৃত সাহিত্য অথবা সুসাহিত্যের সেবক, তাঁহারা "সাহিত্যের আদর্শ সম্বন্ধে মতভেদ আছে", কেবল মাত্র এই কথাটুকু বলিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না। পরন্তু, কি করিয়া ঐ মতভেদ দূরীভূত হইতে পারে, অথবা সাহিত্যের আদর্শ সম্বন্ধে সত্য যে কি, তাহা উদ্ঘাটন করিবার কার্য্যে ব্যাপৃত হইতে বাধ্য হইয়া থাকেন। আধুনিক কোন সাহিত্যিক যে এই সত্য উদ্ঘাটন করিবার কার্য্যে কখনও ব্যাপৃত হইয়াছেন, তাহার কোন পরিচয় কুত্রাপি পরিলক্ষিত হয় না। সুতরাং এই আধুনিক সাহিত্যিকগণ যে নিন্দনীয়, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর দ্বিতীয় কথা—"মানুষই যখন সাহিত্যের সৃষ্টিকর্ত্তা, তখন ভিন্ন রুচি ও ভিন্ন আদর্শ সাহিত্যে স্থান পাইতে বাধ্য।"

শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর এই কথাটী নিতান্ত অসত্য-প্রসূত। তিনি যদি প্রকৃত সাহিত্যের অথবা সুসাহিত্যের সেবিকা হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার হৃদয়ে এতাদৃশ কথা স্থান পাইতে পারিত না। অবশ্য তিনি এতাদৃশ কথা বলিয়াছেন বলিয়া আমরা তাঁহাকে নিন্দা করিব না, কারণ স্ত্রীলোকের নিকট হইতে প্রকৃত সাহিত্যসম্বন্ধীয় সর্ব্বতো-

ভাবের সত্যতাটি কখনও আশা করা যায় না। তিনি মাতৃস্বরূপা স্ত্রীলোক হইয়াও যে, সুসাহিত্যিকের খ্যাতি অর্জন করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন, এই প্রকৃতি তাঁহার পক্ষে নিন্দনীয়।

সাহিত্যিকগণকে সর্বপ্রথমে বুঝিতে হইবে যে, মানুষ কখনও সাহিত্যের সৃষ্টিকর্ত্তা হয় না। মানুষের দ্বারা সাহিত্য রচিত হয় বলিয়া মানুষই সাহিত্যিকের সৃষ্টিকর্ত্তা, ইহা আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে বটে, কিন্তু মানুষই যদি প্রকৃত পক্ষে সাহিত্যের সৃষ্টিকর্ত্তা হইত, তাহা হইলে প্রত্যেক মানুষই এক এক জন সাহিত্যিক হইয়া উঠিতে পারিত। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে সমগ্র জনসংখ্যার তুলনায় অতীব নগণ্যাংশই প্রকৃত সাহিত্যিক হইয়া থাকেন।

সাহিত্যের সংজ্ঞা লইয়া যতই মতভেদ থাক্ না কেন, 'বাঙ্ময়তা' যে সাহিত্যের মূল প্রাণ, তদ্বিষয়ে কোন মতভেদ নাই। চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, এই বাঙ্-ময়তার মূল কারণ তিনটী, যথা, (১) রস, (২) তেজ, এবং (৩) বায়ু। রস না থাকিলে জিহ্বা শুষ্ক হইয়া যায়, তেজ না থাকিলে মানুষ দুর্বল হইয়া পড়ে, বায়ু না থাকিলে রস ও তেজ এই দুইটীর কোনটীরই থাকা সম্ভব হয় না। জিহ্বা শুষ্ক হইয়া গেলে যেরূপ বাক্স্ফূর্ত্তি হওয়া অথবা লিখন-পঠন সম্ভব হয় না, সেইরূপ দুর্বল হইয়া পড়িলেও একই পরিণতিতে উপনীত হইতে হয়। উভয় পক্ষেই, অর্থাৎ রস ও তেজের অভাব হইলে সাহিত্যের সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে। কাজেই রস ও তেজকে সাহিত্যের মুখ্য কারণ এবং বায়ুকে উহার গৌণ কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। এই তিনটী বস্তু, অর্থাৎ রস, তেজ ও বায়ু যদি মানুষের দ্বারা সৃষ্টি করা সম্ভব হইত, তাহা হইলে মানুষকে সাহিত্যের সৃষ্টি-কর্ত্তা বলিয়া অভিহিত করা যাইত বটে, কিন্তু ঐ তিনটি বস্তুর কোনটীই মৌলিক ভাবে সৃষ্টির মধ্যে বিদ্যমান না থাকিলে মানুষের পক্ষে সৃষ্টি করা সম্ভব হয় না। কাজেই মানুষকে সাহিত্যের মূল সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া কোনক্রমেই অভিহিত করা চলে না।

মানুষকে যেরূপ সাহিত্যের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া অভিহিত করা চলে না, সেইরূপ আবার সাহিত্যে ভিন্ন রুচি ও ভিন্ন আদর্শ অনিবার্য্য হইতে পারে না। প্রাকৃতিক কারণে রস ও তেজের অল্প বদল ও মিশ্রণের (permutation and combination-এর) তারতম্য বশতঃ সাহিত্য-রচনার ভাষা ও ভঙ্গীর তারতম্য হওয়া অনিবার্য্য হইয়া থাকে বটে, কিন্তু তাহার নাম প্রকৃত সাহিত্য অথবা সু-সাহিত্য, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, সর্বত্রই সাহিত্য-ক্ষেত্রে রুচি ও আদর্শ একরূপ হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়। পরন্তু, রুচি ও আদর্শের বিভিন্নতা সাহিত্য-বিষয়ক মৌলিক 'সত্য' সম্বন্ধে অজ্ঞতার পরিচায়ক।

সাহিত্য যাহাতে একান্ত ও অত্যন্ত ভাবে মানুষের হিতকর হয়, তাহা করা সর্বাগ্রে প্রয়োজনীয়, এই সত্যটি বুঝিতে পারিলে, সু-সাহিত্য-রচনাক্ষেত্রে রুচি ও আদর্শের বিভিন্নতা যে স্থান পাইতে পারে না, তাহা সহজেই বুঝা যাইবে, কারণ যাহাতে একান্ত ও অত্যন্ত ভাবে মানুষের হিত সাধিত হইতে পারে, তাহার পন্থা মূলতঃ একাধিক হইতে পারে না এবং একাধিক নহে।

"সাহিত্য যদি একাধারে হিতকর এবং মনোহারী হয় তবেই তাহা সার্থক", এই কথাটী স্বীকার করিয়াও "ভিন্নরুচি এবং ভিন্ন আদর্শ সাহিত্যে স্থান পাইতে বাধ্য", এতাদৃশ কথা কওয়া গভীর চিন্তাশীলতার অভাবের পরিচায়ক। গভীর চিন্তাশীলতা থাকিলে দেখা যাইবে যে, এই দুইটী কথা পরস্পর-বিরোধী।

শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর তৃতীয় কথা—"এতদ্ভিন্ন দেশ, কাল এবং ধর্ম্মগত আদর্শভেদও সাহিত্যে প্রভাব বিস্তার করে।"

দেশ কাল এবং ধর্ম্মগত আদর্শভেদ যে সাহিত্যে প্রভাব বিস্তার করে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু দেশকালগত ভেদ কখনও মনুষ্যজীবনের এবং সাহিত্যের আদর্শ সম্বন্ধে কোন ভেদ সৃষ্টি করিতে পারে না। মনুষ্য-জীবনের এবং সাহিত্যের আদর্শ সম্বন্ধে কোন বৈষম্য মনুষ্য-সমাজে উপস্থিত হইয়াছে, ইহা দেখিতে পাইলে বুঝিতে হয় যে, তাৎকালিক মনুষ্য-সমাজ মনুষ্য-জীবন সম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় সত্যগুলি বিস্মৃত হইয়া বিভ্রান্তির স্রোতে নিপতিত হইয়াছে। দেশকালগত ভেদ-বশতঃ কেবল মাত্র মানুষের এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে তাহার সাহিত্যের ভাষা ও ভঙ্গী বিভিন্নতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সাহিত্যের আদর্শ ও রুচির মধ্যে

ভের উপস্থিত হইবার একমাত্র কারণ প্রকৃত জ্ঞান-বিজ্ঞানের ও সু-সাহিত্যের অভাব এবং কু-জ্ঞান ও কু-সাহিত্যের বিস্তার।

ধর্ম্মগত আদর্শভেদ সাহিত্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে তাহা সত্য, কিন্তু ঐ ধর্ম্মগত আদর্শভেদও প্রকৃত জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সু-সাহিত্যের অভাবের পরিচায়ক। দেশকালের বিভিন্নতা বশতঃ যেরূপ মনুষ্য-জীবনের আদর্শের বিভিন্নতা উপস্থিত হইতে পারে না, সেইরূপ মানুষের ধর্ম্মের জন্যও কোন আদর্শভেদ উপস্থিত হওয়া তাহার প্রকৃতি-সঙ্গত নহে। ধর্ম্মের জন্য সমাজ-মধ্যে মানুষের আদর্শে যখন বিভিন্নতা উপস্থিত হয়, তখন বুঝিতে হয় যে, মানুষ ধর্ম্মের নামে বি-ধর্ম্মের আশ্রয় লইয়াছে। "ধর্ম্ম" এই শব্দটীর মৌলিক অর্থ কি, তাহা যথাযথভাবে উপলব্ধি করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, মানুষ মাত্রেরই প্রকৃতি-সঙ্গত ধর্ম্ম একটী। শব্দ-বিজ্ঞানানুসারে সংস্কৃত ভাষায় উহার নাম হয় "মানব-ধরম্", হিব্রুভাষায় উহার নাম হয় "ক্রিশ্‌চিয়ানম্", আরবী ভাষায় উহার নাম হয় "ইস্‌লিথায়াম্"। এই তিনটী ধর্ম্মের মত-বাদের মধ্যে পার্থক্য আছে বলিয়া যে প্রতীতি হয়, তাহা মূল সংস্কৃত, মূল হিব্রু এবং মূল আরবী ভাষার শব্দ-যোজনা-বিষয়ক বিজ্ঞান সম্বন্ধে অজ্ঞান-প্রসূত। ঐ বিজ্ঞান যথাযথ ভাবে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, উপরোক্ত তথাকথিত তিনটী ধর্ম্মের মতবাদ সর্ব্বতোভাবে এক এবং তিনটী ধর্ম্মের গ্রন্থসমূহ মূল ভাষা-বিজ্ঞানের অজ্ঞতাবশতঃ ভ্রান্তভাবে অনূদিত হইয়াছে ও হইতেছে।

মনুসংহিতায় যেরূপ "মানব-ধর্ম্মের" অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, কোন ঋষিপ্রণীত গ্রন্থে সেইরূপ "আর্য্য ধর্ম্ম" অথবা "সনাতন ধর্ম্ম" অথবা "হিন্দু ধর্ম্ম" অথবা "ব্রাহ্ম ধর্ম্ম"-এর অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় না। ঋষি-যুগের অনেক পরবর্ত্তীকালে তথাকথিত পণ্ডিতগণ প্রকৃতপক্ষে মূর্খ হইয়াও পাণ্ডিত্যের অভিমানে ঋষি-প্রণীত ভাষা-বিজ্ঞানের ও গ্রন্থ-সমূহের অজ্ঞতাবশতঃ "আর্য্য ধর্ম্ম" প্রভৃতি শব্দগুলি সমাজমধ্যে প্রচারিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে অদ্ভুত অদ্ভুত মতবাদের সৃষ্টি করিয়া মানব-সমাজের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছেন। একমাত্র "মানব ধরম্" অথবা "ক্রিশ্‌চিয়ানম্" অথবা "ইস্‌লিথায়াম্" যে মানব-সমাজের সর্ব্বত্র ধর্ম্ম রূপে পরিগৃহীত হইয়াছে বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে, তাহা আমরা বহু প্রসঙ্গে দেখাইয়াছি। তথাকথিত পণ্ডিতনামা মূর্খগণই যে ধর্ম্মগত আদর্শভেদের মূল কারণ এবং ঐ তথা-কথিত পণ্ডিতনামা মূর্খগণের বংশধরগণের মধ্যে যাঁহারা প্রকৃত পক্ষে মূর্খ হইয়া পাণ্ডিত্যের অভিমান ও গোঁড়ামী এখনও পোষণ করিয়া থাকেন, তাঁহারাই যে মূলতঃ ধর্ম্মগত আদর্শভেদকে জাগ্রত রাখিয়া মানব-সমাজের ও স্ব স্ব বংশের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছেন, তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে। উপরোক্ত কথাগুলি চিন্তা করিয়া বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, যাহাকে আপাতদৃষ্টিতে ধর্ম্মগত আদর্শভেদ বলিয়া মনে হয়, তাহা বস্তুতঃ পক্ষে বি-ধর্ম্মগত আদর্শভেদ এবং তাহা কু-জ্ঞান ও কু-সাহিত্যের প্রভাবের পরিচায়ক।

শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর চতুর্থ কথা—"এই সাহিত্য বস্তুতান্ত্রিক হউক অথবা ভাবতান্ত্রিক হউক, যদি তাহা একাধারে হিতকর এবং মনোহারী হয় তবেই তাহা সার্থক"।

সাহিত্য একাধারে হিতকর এবং মনোহারী হইলে উহা যে সার্থক হয়, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু যাহা হিতকর তাহা কখনও সর্ব্বদা, সর্ব্বক্ষেত্রে মনোহারী হইতে পারে না। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, যাহা হিতকর, তাহা সর্ব্বদাই প্রকৃত জ্ঞানীর কাছে মনোহারী হইয়া থাকে বটে, কিন্তু উহা কু-জ্ঞানীর কাছে কখনও মনোহারী হয় না। কাজেই আজকালকার কু-সাহিত্যান্বিত যুগে হিতকারী-সাহিত্যের মনোহারী হইবার আশা করা বিধেয় কি না, অথবা হিতকারী সাহিত্যকে মনোহারী করিবার চেষ্টা করা সঙ্গত কি না, তাহা বিশেষভাবে চিন্তা করিবার যোগ্য।

সাহিত্য সর্ব্বদাই ভাবতান্ত্রিক এবং উহা বস্তুমূলকও বটে, কিন্তু উহা কখনও বস্তুতান্ত্রিক হইতে পারে না। "সাহিত্য" "ভাব", "বস্তু" ও "তন্ত্র", এই চারিটী শব্দের মৌলিক অর্থ যথাযথ ভাবে উপলব্ধি করিতে পারিলে আমাদিগের উপরোক্ত কথার সার্থকতা বুঝা যাইবে। সাহিত্যকে "বস্তুতান্ত্রিক" বলিয়া অভিহিত করায় মাতৃস্বরূপা শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী যে ঐ চারটি শব্দের অর্থ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট উপলব্ধিবিহীন, তাহার সাক্ষ্য পাওয়া গিয়াছে।

শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম কথা কয়টী, ভাষা-বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহার অজ্ঞতার পরিচায়ক।

পঞ্চম কথায় তিনি বলিয়াছেন যে, "সাহিত্য শব্দটীর দুই প্রকারে অর্থ আছে"। প্রকৃতিসঙ্গত ভাষার বিজ্ঞান তাঁহার জানা থাকিলে তিনি জানিতে পারিতেন যে, কোন প্রকৃতিসঙ্গত শব্দের কখনও দুই প্রকার অর্থ হয় না। অভিমান অথবা মিথ্যাজ্ঞানবশতঃ মানুষ অনেক রকমের শব্দ রচনা করিয়া থাকে বটে এবং ঐ অজ্ঞানের বশে মানুষের রচিত এক একটী শব্দে একাধিক অর্থ স্থির করা হয় বটে, কিন্তু প্রকৃতিসঙ্গত কোন শব্দের কখনও প্রকৃতিসঙ্গত একাধিক অর্থ হয় না। প্রকৃতিসঙ্গত পদের অক্ষর-সমষ্টির কখনও ব্যত্যয় হইতে পারে না। প্রকৃতিসঙ্গত ভাষা-বিজ্ঞানে, কোন্ বর্ণের পর কোন্ কোন্ বর্ণ মিলিত হইলে 'পদ' প্রকৃতিসঙ্গত অথবা প্রকৃতির ব্যভিচারী হইল বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাহার নিয়ম আছে। মানুষ যখন তাহার স্বভাবকে সংযত করিয়া প্রকৃতিমুখী করিতে এবং স্বাভাবিকরূপ প্রকৃতিকে প্রত্যক্ষ করিতে সক্ষম হয়, তখন তাহার পক্ষে ঐ নিয়ম যথাযথ ভাবে উপলব্ধি করা সহজসাধ্য হইয়া থাকে। বেদাঙ্গের অষ্টাধ্যায়ী সূত্র-পাঠ এবং "কচ্ প্রাতিশাখ্যং" যথাযথ অর্থে "অধ্যয়ন" করিতে পারিলেও ঐ নিয়ম আনুপূর্ব্বভাবে বুঝিতে পারা সম্ভব হয়। ইহা ছাড়া ভারত নাট্যশাস্ত্রে "ভাষাবিধানম্" অধ্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া "সঙ্কীর্ণ বিকল্পাধ্যায়" পর্য্যন্ত যে যে কথা বলা হইয়াছে, তাহাতেও ঐ তথ্য প্রকৃত সংস্কৃতজ্ঞ সাধারণ মানুষের আংশিক বোধ্য করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ঐ নিয়ম জানিতে পারিলে বুঝা যাইবে যে, 'সাহিত্য' এই পদটী প্রকৃতিসঙ্গত এবং উহার প্রকৃতিসঙ্গত অর্থ কেবলমাত্র একটী। প্রকৃত ভাষা-বিজ্ঞান অনবগতির জন্য বর্ত্তমান মনুষ্য সমাজ যথেচ্ছভাবে উহার একাধিক অর্থ স্থির করিয়া থাকে।

বালাকালে, রাগ-দ্বেষবিযুক্ত হইবার আগে, মানুষ যে সমস্ত শব্দ ও পদ ব্যবহার করে, তাহা প্রায়শঃ প্রকৃতিসঙ্গত এবং একার্থক। বাবা, মা, জল, ঘর, ঘটী, বাটী, পাখা, মাসী, ওয়াটার প্রভৃতি শব্দ কখনও মূলতঃ একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয় না।

যে সমস্ত 'পদ' প্রকৃতিসঙ্গত, তাহা মূলতঃ হয় কর্ম্ম নতুবা 'গুণ' নতুবা 'দ্রব্য'-বিষয়ক হইয়া থাকে। ঐ সমস্ত পদ মূলতঃ 'কর্ম্ম' নতুবা 'গুণ' নতুবা 'দ্রব্য' বিষয়ক হইয়া থাকে বটে, কিন্তু মূলতঃ কর্ম্ম-বিষয়ক পদ সময় সময় গুণ অথবা কর্ম্ম প্রকাশ করিবার জন্যও ব্যবহৃত হয়। তাহা হইলেও তাহার মৌলিক অর্থ কখনও সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয় না। "সাহিত্য" এই পদটীকেই উদাহরণ স্বরূপ গ্রহণ করিলে আমাদিগের উপরোক্ত কথা সুস্পষ্ট হইবে। "সাহিত্য" পদটী মূলতঃ "কর্ম্ম"-বিষয়ক। শব্দের অক্ষর দেখিয়া অর্থ নির্দ্ধারণ করিবার পদ্ধতি অনুসারে "সাহিত্য" এই পদটীতে বুঝিতে হয় "সেই কার্য্য,যে কার্য্যের দ্বারা কোন দ্রব্য অথবা গুণ অথবা কার্য্যের বহিঃস্থিত কোন রূপের সহিত তাহার অন্তর্স্থিত কার্য্য এবং সত্ত্বার কি সম্বন্ধ, তাহা শ্রোতা অথবা পাঠকের মনে জাগ্রত করা হয়"। অথবা "কোন দ্রব্য অথবা গুণ অথবা কার্য্যের বহিঃস্থিত কোন রূপের সহিত তাহার অন্তর্স্থিত কার্য্য এবং সত্ত্বার কি সম্বন্ধ, তাহা যে কার্য্যের দ্বারা কাহারও মনে জাগ্রত করা হয়, সেই কার্য্যের নাম সাহিত্য"। উপরোক্ত হিসাবে "সাহিত্য" এই পদটী মূলতঃ "কর্ম্ম"-বিষয়ক। "সাহিত্য" নামক উপরোক্ত কর্ম্ম যে দ্রব্যে অথবা গ্রন্থে বিদ্যমান আছে তাহাও "সাহিত্য"। এই হিসাবে সাহিত্য শব্দটী মূলতঃ কর্ম্ম-বিষয়ক হইলেও ব্যবহারে উহা "দ্রব্য"-বিষয়ক হইতে পারে। ব্যবহারে উহা "দ্রব্য"-বিষয়ক হইতে পারে বটে, কিন্তু যে গ্রন্থে অথবা দ্রব্যে "সাহিত্য" নামক কর্ম্ম বিদ্যমান নাই, সেই গ্রন্থ অথবা দ্রব্যকে কোন ক্রমেই "সাহিত্য" বলা চলে না। তাহাকে "কু-সাহিত্য" অথবা প্রকৃতপক্ষে সাহিত্য না হইয়াও সাহিত্য নামক কার্য্যের অভিমান-প্রকাশক গ্রন্থ বলিয়া অভিহিত করিতে হইবে।

এইরূপ আবার, "সাহিত্য" নামক কার্য্যের দ্বারা যে যে গুণ অভিব্যক্তি লাভ করে, সেই সেই গুণকেও "সাহিত্য" বলা যাইতে পারে। তখন ঐ পদটি "গুণ"-বিষয়ক হইয়া থাকে। "সাহিত্য" পদটি যখন "গুণ"-বিষয়ক কোন কথা প্রকাশার্থে ব্যবহৃত হয়, তখনও উহার মধ্যে "সাহিত্য" নামক কার্য্যটীর বিদ্যমানতা একান্তভাবে প্রয়োজনীয়। নতুবা উহাকে "সাহিত্য" বলিয়া অভিহিত করিলে "সাহিত্য" শব্দটীর অপব্যবহার হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে।

কাযেই দেখা যাইতেছে যে, সাহিত্য শব্দটীর মূলতঃ দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে না, তথাপি যাঁহারা ঐ শব্দটীকে একাধিক অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাঁহারা যে প্রকৃত "সাহিত্য" বিষয়ে অজ্ঞ, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর সপ্তম ও অষ্টম কথা—"বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি মিলাইয়া ব্যাপক "বাঙ্‌ময়" অর্থে সাহিত্য শব্দটী ব্যবহৃত হইতেছে।"

"সাহিত্যের অর্থ···(স্থানে স্থানে) রস-রচনা, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক প্রভৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ।"

'সাহিত্য' শব্দটীর অর্থ কি, তাহা বুঝাইতে বসিয়া শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী এই দুইটী বাক্য ব্যবহার করিয়াছেন। আমাদিগের মতে এতাদৃশ বাক্যের দ্বারা 'সাহিত্যে'র 'সংজ্ঞা' অথবা 'অর্থ' সুস্পষ্ট হয় না। ঐ সংজ্ঞা অথবা অর্থ সম্বন্ধে যে বক্তার ধারণা অত্যন্ত অস্পষ্ট, এতাদৃশ বাক্য তাহারই সাক্ষ্য। বক্তা যদি স্ত্রীলোক না হইতেন, তাহা হইলে বিদ্যাক্ষেত্রে এই লুকোচুরী খেলার জন্য আমরা তাঁহাকে যথেষ্ট তিরস্কার করিতাম। 'সাহিত্য' ও 'শাস্ত্র' এই দুইটী শব্দের সংজ্ঞা কি, তৎসম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা অর্জন করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি অবস্থা-বিশেষে কখন কখন 'সাহিত্য' নামে অভিহিত হইতে পারে বটে, কিন্তু উহা আবার সময় সময় 'শাস্ত্র' বলিয়াও পরিগণিত হয়। 'সাহিত্য' শব্দটীর সংজ্ঞা সম্বন্ধে আলোচনাকালে আমরা আমাদিগের এই কথা অধিকতর স্পষ্টভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস বিষয়ক রচনা মাত্রই যেরূপ সর্ব্বদা "সাহিত্য" নামে অভিহিত হইতে পারে না, সেইরূপ আবার রস-রচনা, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক মাত্রই সর্ব্বদা "সাহিত্য" নামে আখ্যাত হইতে পারে না। উহা সময় সময় কু-সাহিত্য, অর্থাৎ "সাহিত্য-বিরোধী রচনা" বলিয়া আখ্যাত হইবার যোগ্য হইয়া থাকে।

শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর নবম কথা—"প্রথমেই আমাদিগের মনে রাখা প্রয়োজন যে, সাহিত্য সমাজের নিছক প্রতিবিম্ব নহে, উহা সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতম অভিব্যক্তি।"

যে রচনায় কেবলমাত্র সমাজের নিছক প্রতিবিম্ব ও আশা আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতম অভিব্যক্তি অঙ্কিত থাকে, সেই রচনা সর্ব্বক্ষেত্রে ও সর্ব্বদা হিতকর হইতে পারে কি না, তাহা আমরা শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীকে চিন্তা করিতে অনুরোধ করি। ঐ চিন্তায় প্রবৃত্ত হইলে তিনি দেখিতে পাইবেন যে, সমাজ যখন উচ্ছৃঙ্খলার মত হয় অথবা অধিকতর উচ্ছৃঙ্খলার আশা ও আকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপ্ত হইয়া থাকে, তখন তাহার নিছক প্রতিবিম্ব রচনা করিলে তদ্দ্বারা সমাজের হিত সাধন করা তো দূরের কথা, অধিকতর অহিতই সাধিত হইয়া থাকে।

শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর দশম কথা—"বাস্তবের সহিত কল্পনার মিলন যখন সুন্দর ও সুসমঞ্জস হয়, তখনই তাহা সু-সাহিত্য হইয়া দাঁড়ায়।"

আমাদিগের মতে এতাদৃশ বাক্য "কল্পনা" শব্দটীর প্রকৃতি-গত মৌলিক অর্থ সম্বন্ধে অজ্ঞতার পরিচায়ক। কার্য্য-কারণ-সঙ্গত অতীত ও ভবিষ্যতের কোন আনুমানিক চিত্র আর কল্পনা কখনও একার্থক হইতে পারে না। যাহা বাস্তব, তাহা সর্ব্বদাই কার্য্য-কারণ-সঙ্গত হইয়া থাকে। কল্পনার সহিত তাহার কখনও মিলন হয় না। আজকালকার তথাকথিত সাহিত্যিক পণ্ডিতগণ সময় সময় "কল্পনা" শব্দটীকে "অনুমান" অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহা তাঁহাদিগের যথেচ্ছ ব্যবহার। "অনুমান" সর্ব্বদাই কার্য্য-কারণ-সঙ্গত জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। আর, "কল্পনা" সর্ব্বদাই অলীক হয়। কাযেই যাহা অলীক, তাহাকে কোন রচনায় বাস্তবের সহিত মিলাইবার চেষ্টা করিলেই ঐ রচনা বীভৎসাকার ধারণ করিয়া থাকে এবং উহা কখনও সু-সাহিত্য অথবা সমাজের হিতকর হইতে পারে না। আজকাল সাহিত্যিক হইয়াও যে, মানুষ ভিখারী, আত্মসম্মান-জ্ঞানহীন, চরিত্রহীন, দাম্ভিক, স্বাস্থ্যহীন এবং অশান্তিপূর্ণ হইয়া পড়িতেছে, তাহার কারণ এতাদৃশ বীভৎসাকারের রচনা।

সাহিত্যের আদর্শ ও সংজ্ঞা সম্বন্ধে শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী যে দশটী কথা বলিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটী যেরূপ নির্ভুল এবং সাহিত্যের জ্ঞান বিষয়ে বিভ্রান্তিকর, সেইরূপ যে কোন আধুনিক সাহিত্যিকের এতদ্বিষয়ক কথাগুলি সমালোচনা করা যাইবে, তাহার প্রত্যেকটীতেই অতাধিক পরিমাণের বিভ্রান্তির সাক্ষ্য পাওয়া যাইবে। সেদিনটী প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের যে নয়টী অধিবেশনের বক্তৃতা মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে, তন্মধ্যে কেবলমাত্র অনুরূপা দেবী ও মহামহোপাধ্যায়

পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ই সাহিত্যের সংজ্ঞা নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আর কোন দুরন্তও ঐ চেষ্টা পর্য্যন্ত করেন নাই। সাহিত্যের সংজ্ঞা সম্বন্ধে শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী ও মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত তর্কভূষণ মহাশয় যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহার তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে, শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর কথাগুলি বিভ্রান্তিকর ও নিন্দার্হ হইলেও তাহাতে স্বাধীন চিন্তার লক্ষ্য রহিয়াছে। পণ্ডিত তর্কভূষণ মহাশয়ের কথাগুলিতে তাদৃশ স্বাধীন চিন্তার চেষ্টা পর্য্যন্ত বিদ্যমান নাই। অধিকন্তু, ঋষি-প্রণীত শাস্ত্রে যে সত্য কথাগুলি সমুজ্জ্বলভাষায় অঙ্কিত রহিয়াছে, কার্য্য-কারণ-সঙ্গত চিন্তাশক্তির অভাবে তর্কভূষণ মহাশয়ের দ্বারা সেই কথাগুলি অধিকতর বিভ্রান্তিকর অসত্যরূপে প্রচারিত হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত তর্কভূষণ মহাশয়ের কথাগুলি কতখানি বিভ্রান্তিকর, তাহার বিচার করিতে হইলে, ঋষিগণ সাহিত্যের সংজ্ঞা ও আদর্শ সম্বন্ধে কি কি বলিয়াছেন, সর্ব্বাগ্রে তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে।

সাহিত্যের সংজ্ঞা ও আদর্শ সম্বন্ধে ঋষিগণের সত্যদর্শন

আমরা আগেই বলিয়াছি যে, শব্দের অন্বয় দেখিয়া অর্থ নির্দ্ধারণ করিবার পদ্ধতি অনুসারে "সাহিত্য" এই শব্দটীর অর্থ হয়—

"কোন দ্রব্য অথবা গুণ অথবা কার্য্যের বহিঃস্থিত কোন রূপের সহিত তাহার অন্তরস্থিত কার্য্য এবং দ্রব্যের কি সম্বন্ধ, তাহা যে কার্য্যের দ্বারা কাহারও মনে প্রকাশিত করা হয়, সেই কার্য্যের নাম 'সাহিত্য'।"

"সাহিত্য" শব্দটীর উপরোক্ত অর্থ ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে অন্তরস্থিত ক্রিয়া এবং সত্তা বলিতে কি বুঝায়, তাহা সর্ব্বাগ্রে বুঝিতে হইবে।

আমরা এই বিশ্ব-দুনিয়ার ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা কিছু দর্শন করিয়া থাকি, তাহা হয় "দ্রব্য" নতুবা "গুণ" নতুবা "কার্য্য", এই সত্যটী সর্ব্বাগ্রে উপলব্ধি করিতে হইবে। "দ্রব্য", "গুণ" এবং "কার্য্যে"র সংজ্ঞা জানিয়া লইয়া একটু চিন্তা করিলেই এই সত্য উপলব্ধি করা সম্ভব হইবে। 'কার্য্যে'র মূলে থাকে ক্রিয়া এবং ক্রিয়ার মূলে থাকে কর্ম্ম।

অখণ্ড-মণ্ডল ও খণ্ড-মণ্ডল লইয়া যে বিশ্ব-দুনিয়া তাহার সর্ব্বত্র "কর্ম্ম" পরিব্যাপ্ত। আমরা সাধারণত "কর্ত্তা মূলক "কর্ম্ম" হয় ইহা বলিয়া থাকি। কিন্তু বিশ্ব-দুনিয়ার কথা বুঝিতে বসিয়া "কর্ম্ম", "ক্রিয়া" ও "কার্য্যে"র মধ্যে কি কি পার্থক্য, তাহা জানিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, বিশ্ব-দুনিয়া পরিব্যাপ্ত যে কর্ম্ম সর্ব্বাবস্থায় ও সর্ব্বকালে একই ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার কোন "কর্ত্তা" নাই। তাহার আছে কেবলমাত্র একটী "কারণ"। ঐ "কারণে"র 'করণের' দ্বারা "কর্ম্ম" সম্পাদিত হইতেছে। ঐ "কারণের" মধ্যে আছে মানুষের "আত্মা"র "ইক্ষণ"-সাধ্য "অম্বু", "বহ্নি" এবং "ব্যোমে"র মিশ্রিত অবস্থা।

"কর্ম্ম"-সম্বন্ধীয় এই কথাগুলি আপাতদৃষ্টিতে বড়ই দুরূহ। কিন্তু, উহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলে উহা যে অতীব সহজ,তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে। আমরা এই কথাগুলি বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে যতদূর বুঝান সম্ভব, তাহা গত পৌষ সংখ্যার সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত 'সম্পাদকের বাঙ্গালা ভাষাজ্ঞানের নমুনা ও আধুনিক বিশ্বভারতী(১)' শীর্ষক প্রবন্ধে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। এখানে ঐ কথাগুলি আর বিস্তৃতভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিব না। উহা বুঝিবার ধৈর্য্য যাঁহাদিগের নাই, তাঁহারা ঐ সত্যগুলি জানিয়া রাখিলেই সাহিত্যের আদর্শ ও সংজ্ঞা সম্বন্ধীয় সত্য কথঞ্চিৎ পরিমাণে বুঝিতে সক্ষম হইবেন।

প্রথম অবস্থায় ঐ "কর্ম্ম" মানুষের "অ-বাঙ্ মনসো-গোচর"। তাহার পর ঐ "কর্ম্ম" "গুণের" উন্মেষ-উন্মুখী হইয়া থাকে। "কর্ম্ম" যখন গুণের উন্মেষোন্মুখী হয়, তখন তাহার নাম হয় "ক্রিয়া"। ইহার পর যুগপৎ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য গুণের উন্মেষ না হইলে কখনও দ্রব্যের উৎপত্তি হইতে পারে না। চলতি ভাষায় বিশেষণের উৎপত্তি না হইলে কখনও বিশেষ্যের উৎপত্তি হইতে পারে না। এই কথাগুলি চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, উহা আপাত-দৃষ্টিতে বড়ই দুরূহ, কিন্তু সাহিত্যের সংজ্ঞা সম্বন্ধীয় সত্য বুঝিতে হইলে উহা বড়ই প্রয়োজনীয়। এই কথাগুলি মূলতঃ রহিয়াছে "ঋক্ বেদে" এবং সাধারণ-বোধ্য করিয়া লেখা হইয়াছে "বৈশেষিক দর্শনে।" ঋষি-যুগের পরবর্ত্তী কালের যে ভাষ্যকার ও আচার্য্যগণ বৈশেষিক দর্শনের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঁহারা

বেদাধ্যয়ন না করিয়া উহা করিয়াছেন বলিয়া মানুষকে বৈশেষিক দর্শনের কথা সম্বন্ধে বিপথগামী করিয়া গিয়াছেন।

"গুণে"র উন্মেষ এবং "দ্রব্যে"র উৎপত্তি হইলে সর্ব্বপরিব্যাপ্ত "কর্ম্ম" যে অবস্থায় উপনীত হয়, তাহার নাম "কার্য্য"।

অখণ্ড-মণ্ডল ও খণ্ড মণ্ডলের সর্ব্বত্রই "কর্ম্ম" পরিব্যাপ্ত বটে, কিন্তু "ক্রিয়া" ও "কার্য্য" কেবল মাত্র খণ্ড-মণ্ডলে বিদ্যমান আছে। উহা অখণ্ড-মণ্ডলে বিদ্যমান নাই।

"ক্রিয়া"র উৎপত্তি হইলেই জীবের "সত্ত্বা"র উৎপত্তি হইয়া থাকে। "অণু" ও "পরমাণু" অথবা তেজ ও রস লইয়া জীবের "সত্ত্বা"। "সত্ত্বা"র উৎপত্তি হইলেই "কার্য্য" আরম্ভ হয়। কার্য্য প্রথমতঃ জীবের অন্তরে বিদ্যমান থাকে, তাহার পর ক্রমশঃ বাহিরে প্রকাশ পায়।

জীবের বাহিরের কার্য্য যে তাহার অন্তরের কার্য্য, সত্ত্বা, ক্রিয়া ও বিশ্ব-দুনিয়া পরিব্যাপ্ত কর্ম্মের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত, ইহা যতক্ষণ পর্য্যন্ত মানুষের স্মরণ থাকে এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত মানুষ তাহার কার্য্য, সত্ত্বা, ক্রিয়া ও কর্ম্মের সম্বন্ধ উপলব্ধি করিতে পারে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত মানুষ সর্ব্বতোভাবে জ্ঞানী হইয়া থাকে এবং তাহার কোনরূপ দুঃখ থাকে না। বাহিরের কার্য্য হইতে যথাক্রমে অন্তরের কার্য্য, সত্ত্বা, ক্রিয়া ও কর্ম্মের সম্বন্ধ উপলব্ধি করিবার নাম অন্তর্ম্মুখী হওয়া।

জীবের বাহিরের কার্য্য যে তাহার অন্তরের কার্য্যের সহিত ওতপ্রোত-ভাবে জড়িত এবং এই অন্তরের কার্য্য যে যথাক্রমে সত্ত্বা, ক্রিয়া ও কর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট, তাহা ভুলিয়া গিয়া মানুষ যখন বাহিরের কার্য্যে মুগ্ধ হইয়া পড়ে, তখন কখনও বা কোন দ্রব্যের সহিত, কখনও বা গুণের সহিত মোহজড়িত হয়। ইহাতে মানুষ ক্রমশঃ অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব ও শান্তির অভাবে জর্জ্জরিত হইয়া ধ্বংসোন্মুখী হয়। ইহারই নাম মানুষের "বহির্ম্মুখীতা"।

এক্ষণে "সাহিত্য" বলিতে কি বুঝায়, তাহা অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট হওয়া সম্ভব হইবে।

উদাহরণ স্বরূপ, একটী সুন্দর স্ত্রীলোকের রূপের কথা ধরা যাউক।

স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্য দেখিয়া প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর ভাবের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

কেহ বা ঐ সৌন্দর্য্য দেখিবামাত্র, কি করিয়া ঐ সৌন্দর্য্যের উপভোগ করিবেন, কোন্ উপায়ে ঐ সৌন্দর্য্য আরও অধিকতর মাত্রায় আপাত-সুখকর করিয়া তুলিবেন, তাহার চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া পড়েন।

আর কেহ বা, উপরোক্তভাবে সৌন্দর্য্যের উপভোগ প্রভৃতির চিন্তায় ব্যাকুল না হইয়া, কোথা হইতে ঐ সৌন্দর্য্যের উৎপত্তি হইল, ঐ সৌন্দর্য্যের সহিত স্ত্রীলোকটীর অন্তরের কার্য্য কিরূপভাবে সংশ্লিষ্ট, তাহার অন্তরের কার্য্যের সহিত যথাক্রমে তাহার সত্ত্বা, ক্রিয়া ও কর্ম্ম কিরূপভাবে সম্বন্ধ-বিশিষ্ট, স্ত্রীলোকটীর সৌন্দর্য্য কিরূপভাবে স্থায়ী করা যায়, এবংবিধ চিন্তায় নিমগ্ন হইতে পারেন।

বলা বাহুল্য যে, প্রথম শ্রেণীর চিন্তায় মানুষ অহিতের সমুদ্যোগ করে, আর দ্বিতীয় শ্রেণীর চিন্তায় মানুষের কখনও অহিত হইতে পারে না।

চিন্তার এই দুই শ্রেণী ও সাহিত্যের মূল সংজ্ঞা মনে রাখিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, "সাহিত্য" বলিতে বুঝিতে হইবে এমন রচনা, যে রচনায় ঐ দ্বিতীয় শ্রেণীর চিন্তার উদ্ভব হওয়া অনিবার্য্য হইয়া পড়িবে। অথবা এক কথায়, যে রচনার শ্রোতা অথবা দর্শক অথবা পাঠক অন্তর্ম্মুখী হইতে বাধ্য হয়, সেই রচনার নাম "সাহিত্য"। আর যে রচনার শ্রোতা অথবা দর্শক অথবা পাঠক অন্তর্ম্মুখী না হইয়া বহির্ম্মুখী হইয়া পড়ে, সেই রচনার নাম "কু-সাহিত্য" অথবা "সাহিত্য-বিরোধী রচনা।"

এইরূপ ভাবে সাহিত্যের সংজ্ঞা বুঝিয়া লইতে পারিলে, সাহিত্যের আদর্শ অথবা উদ্দেশ্য বুঝিয়া লওয়া অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইবে।

সংক্ষেপতঃ, যাহাতে বহির্ম্মুখীতার প্রবৃত্তি উদ্রিক্ত না হয় এবং যাহাতে অন্তর্ম্মুখীতার প্রবৃত্তি জাগ্রত হয়, তাহা কথাই সাহিত্যের উদ্দেশ্য অথবা আদর্শ।

অনেকে হয়ত বলিবেন যে, সাহিত্যের সংজ্ঞা ও আদর্শ সম্বন্ধীয় আমাদিগের উপরোক্ত কথাগুলি আমরা যদিও ঋষির কথিত বলিয়া প্রকাশ করিতেছি, তথাপি বাস্তবিকপক্ষে উহা যে ঋষি-কথিত তাহার কোন প্রমাণ নাই। পরন্তু উহা আমাদিগের স্বকপোল-কল্পিত।

ইঁহাদিগের প্রত্যুত্তরে আমরা বলিব যে, যদি সত্য সত্যই ঐ কথাগুলি ঋষির কথিত না হয়, তথাপি যদি দেখা যায় যে, উহার মধ্যে যুক্তি আছে এবং সাহিত্যের আদর্শ বলিয়া যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা মানিয়া চলিলে সমাজের হিত সাধিত হইতে পারে, তাহা হইলে উহা উপেক্ষণীয় হইতে পারে না।

ইহার উত্তরে আবার বলা যাইতে পারে যে, সাহিত্যের আদর্শ সম্বন্ধে যে কথাগুলি বলা হইয়াছে, তাহা মানিয়া চলিতে পারিলে সমাজের হিত হওয়া সম্ভব বটে, কিন্তু উহা মানিয়া চলা সম্ভবযোগ্য নহে।

এই আপত্তির উত্তরে, ঋষি-যুগে যে সমস্ত গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছিল, তাহার দিকে আমরা অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিব। ঋষিগণের প্রণীত অথবা ঋষি-যুগে প্রণীত বেদ, বেদাঙ্গ, উপবেদ, দর্শন, মীমাংসা, ইতিহাস, পুরাণ, কাব্য, নীতি, সংহিতা, তন্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র, নাটক, সঙ্গীত, শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে যে সমস্ত গ্রন্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার মধ্যে এমন একখানি গ্রন্থ পাওয়া যাইবে না, যাহা অধ্যয়ন করিলে অন্তর্ম্মুখী না হইয়া বহির্ম্মুখী হওয়া সম্ভব হইতে পারে।

ঐ ঐ বিষয়ের সমস্ত গ্রন্থই যে "সাহিত্য" তাহা নহে।

উহার মধ্যে কতকগুলি গ্রন্থ আছে, যাহা অধ্যয়ন করিলে বহির্ম্মুখী হইতে হয় না বটে, কিন্তু এই গ্রন্থগুলি মুখ্যভাবে অন্তর্ম্মুখী হইবারও কোন সহায়তা সম্পাদন করে না। এই গ্রন্থগুলিতে নিছকভাবে কতকগুলি তথ্য ও অনুশাসন মাত্র বিদ্যমান আছে।

আর কতকগুলি গ্রন্থ আছে, যাহার ছন্দ ও অর্থ এমন ভাবে রচিত যে, উহা রীতিবদ্ধ ভাবে পাঠ করিতে অথবা উহার অর্থোদ্ধার করিতে সক্ষম হইলেই বহির্ম্মুখীতা দমিত হইয়া মন স্বতঃই অন্তর্ম্মুখী হইয়া পড়ে।

এই দুই শ্রেণীর ছাড়া, তৃতীয় শ্রেণীর আর কতকগুলি গ্রন্থ আছে। এই গ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করিলে একদিকে যেরূপ কতকগুলি তথ্য ও অনুশাসন জানিতে পারা যায়, সেইরূপ আবার উহার ছন্দ ও অর্থের সাহায্যে বহির্ম্মুখীতা দমন করিয়া অন্তর্ম্মুখী হওয়া সম্ভব হয়।

ঋষিদিগের কথানুসারে যাহা কিছু শব্দ, পদ ও বাক্যের দ্বারা প্রকাশিত হয় তাহার নাম "বাঙ্ময়"। "বাঙ্ময়" প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণীর নাম শাস্ত্র এবং অপর শ্রেণীর নাম কাব্য।

যে রচনায় কেবল-মাত্র কতকগুলি তথ্য ও অনুশাসন মাত্র বিদ্যমান থাকে, সেই রচনার নাম শাস্ত্র। শাস্ত্র দ্বিবিধ, যথা—অপৌরুষেয় এবং পৌরুষেয়। মন্ত্র, সূত্র ও কারিকার সাহায্যে শাস্ত্র রচিত হইয়া থাকে।

অবস্থাবিশেষে প্রকৃতির কাব্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে তাহা হইতে কোন্ কোন্ স্বভাবের উৎপত্তি হয়, অথবা অবস্থাবিশেষে কোন স্বভাবের রূপ এবং কাব্য দেখিতে দেখিতে তাহার মূলে যে প্রকৃতি রহিয়াছে, সেই প্রকৃতির সহিত ঐরূপ ও কাব্যের সম্বন্ধ কোন্ শ্রেণীর, তাহা যে রচনায় জাগ্রত করা হয়, সেই রচনার নাম কাব্য।

এইখানে মনে রাখিতে হইবে যে, এই জগতে যাহা কিছু দেখা যায়, তাহার প্রত্যেকটীর মধ্যে প্রকৃতি ও স্ব-ভাবের কাব্য বিদ্যমান রহিয়াছে। দুইজনের প্রেমের মধ্যে, দুইজনের কলহের মধ্যে, নর-নারীর রূপের মধ্যে, পরস্পরের প্রবঞ্চনার মধ্যে, ফলের মধ্যে, ফুলের মধ্যে সর্ব্বত্রই প্রকৃতি ও স্ব-ভাব বিদ্যমান রহিয়াছে কাহারও প্রেমের কথা অথবা কলহের কথা অথবা প্রবঞ্চনার কথা অথবা কাহারও রূপের কথা বর্ণনা করা হইল, অথচ উহার মধ্যে প্রকৃতি ও স্ব-ভাবের যে কি খেলা, তাহা প্রস্ফুটিত করা হইল না, এতদবস্থায় এ রচনাকে "পদ্য" অথবা "গদ্য" বলা যাইতে পারে বটে, কিন্তু উহাকে "কাব্য" বলা চলে না। কোন ঘটনা অথবা রূপের মধ্যে প্রকৃতি ও স্ব-ভাবের কি খেলা আছে, তাহা দেখান হইলে ঐ রচনা কখনও মানুষকে বহির্ম্মুখী করিতে পারে না। পরন্তু ঐ রচনার সাহায্যে মানুষ অন্তর্ম্মুখী হইতে বাধ্য হয়। "শাস্ত্র", অর্থাৎ যাবতীয় তথ্য ও তৎ-সঙ্গত অনুশাসন যাঁহারা পরিজ্ঞাত নহেন, তাঁহাদিগের দ্বারা "কাব্য" রচিত হওয়া কখনও সম্ভব হয় না। "শাস্ত্র পূর্ব্বকত্বাৎ কাব্যস্যাং পূর্ব শাস্ত্রেষু অভিনিবিশেৎ"—কাব্যমীমাংসা নামক গ্রন্থের এই কথাটী বুঝা থাকিলে আমাদিগের উপরোক্ত কথার সত্যতা সহজেই প্রতীয়মান হইবে।

কাব্য দ্বিবিধ, যথা :—(১) পদ্য-কাব্য, (২) গদ্য-কাব্য।

কাব্য রচনা করিতে করিতে যখন তন্মধ্যে কি তথ্য ও অনুশাসন পাওয়া যায়, তাহা পরিষ্কার ভাবে দেখান হয়, তখন

ঐ রচনার নাম হয় "সাহিত্য"। সাহিত্যও দ্বিবিধ, যথা :—

(১) পদ্য সাহিত্য (২) গদ্য-সাহিত্য।

বুদ্ধ্যধীনাং সম্ভবঃ কস্য কীদৃক্
সাহিত্যং বঃ পরিস্ফূর্তিঃ।
শব্দার্থয়োঃ সন্তু চমৎ. কারঃ
কবিত্বঞ্চ প্রসাধকঃ।

"সাহিত্য মীমাংসা"র উপরোক্ত শ্লোকটী বুঝিতে পারিলে "কাব্য"ও"সাহিত্যে"র সংজ্ঞা সম্বন্ধে উপরে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা যে ঋষির কথা-সম্মত, ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে।

অস্ত্যেকং বস্তুনঃ স্বরূপমনুত্তমগুণম্।
হেতুত্বাৎ প্রতিপত্তেস্তৎ কাব্যালিঙ্গং তদুচ্যতে॥"

উদ্ভটের "কাব্যালঙ্কার সারসংগ্রহে"র উপরোক্ত শ্লোকটীও এই কথারই সাক্ষ্য প্রদান করিবে।

"শব্দার্থয়োর্যথাবৎ সহভাবেন বিদ্যা সাহিত্যবিদ্যা" কাব্য-মীমাংসার এই কথাটী উহার অন্যতম নিদর্শন।

অনেকে মনে করেন যে, "কাব্য" ও "সাহিত্য" একার্থক। কিন্তু ঐ মতবাদ যে ঋষির কথাসম্মত নহে, তাহা সাহিত্য-মীমাংসার উপরোক্ত শ্লোক হইতে প্রতীয়মান হইবে। "কাব্য" ও "সাহিত্যে"র সংজ্ঞা ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, সাহিত্যের মধ্যে কাব্য থাকে বটে, কিন্তু কাব্য কখনও সাহিত্য হয় না এবং সাহিত্যও কখনও কাব্য হয় না। ইহা ছাড়া আরও দেখা যাইবে যে, কাব্য না হইলে কখনও সাহিত্যের উৎপত্তি হইতে পারে না। মনুষ্য-সমাজের জ্ঞান-বিজ্ঞান ভ্রমহীন করিতে হইলে যেরূপ সু-সাধনারত শাস্ত্রকারের প্রয়োজন, সেইরূপ ঐ জ্ঞান-বিজ্ঞান অটুট ভাবে সংরক্ষিত করিতে হইলে প্রকৃত কবি নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া থাকেন। তাঁহার দায়িত্ব অতীব গুরু। ভারতীয় ঋষিগণ এই কথাগুলি সুদূরাতীত কালে মানব-সমাজকে শুনাইয়া গিয়াছেন।

ঋগ্বেদের "...কবিঃ অক্রতুঃ সতাঃ ...", "কবির্নৃচক্ষা...", "...কবিঃ অমিতঃ অসত্তাঃ", "...কবিঃ গৃহপতি...", "...কবিং অগ্নিং উপ স্তুহি..." প্রভৃতি ঋক্‌সমূহ যথাযথ অর্থে অধ্যয়ন করিতে পারিলে আমাদিগের কথার সত্যতা সহজেই প্রতীয়মান হইবে।

"কাব্য" ও "সাহিত্য" এই দুইটি কথার সংজ্ঞা যথাযথ ভাবে বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, প্রকৃত কাব্য ও সাহিত্যের দৃষ্টান্ত রহিয়াছে বাল্মিকী ও ব্যাসদেবের রচনায়। আজ-কালকার পণ্ডিত নামধারী ধার্ম্মিক মূর্খগণ ঋষি-প্রণীত সংস্কৃত ভাষা যথাযথভাবে বুঝিতে পারেন না বলিয়া ঐ রচনা আজ অলীক স্বপ্নে পরিণত হইয়াছে এবং উহার ফলে ঐ কু-ব্যাখ্যাতা ধার্ম্মিক মূর্খগণ নির্জ্জলা ও শ্রীভ্রষ্ট হইতে বাধ্য হইয়াছেন, হইতেছেন এবং হইবেন।

অন্য পক্ষে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের রচনা তো দূরের কথা, কালিদাস ও সেক্সপীয়ারের রচনাকে পর্য্যন্ত "কাব্য" অথবা "সাহিত্য" বলিয়া অভিহিত করা চলে না। মানব-সমাজ আজ বিপথে নিপতিত বলিয়া যে রচনা যত বেশী বহির্মুখীতা ও সর্ব্বনাশের সহায়ক, সেই রচনাকে তাহারা তত বড় কাব্য ও সাহিত্য বলিয়া গ্রহণ করিতেছে। ফলে মানব সমাজকে ক্রমেই ধ্বংসোন্মুখী হইয়া পড়িতেছে।

প্রকৃত কাব্য ও সাহিত্যের এই অবনতি আধুনিক নহে। ইহা কয়েক সহস্র বৎসর হইতে ঘটিয়া আসিতেছে। কাব্য ও সাহিত্য সম্বন্ধে যে-সমস্ত শাস্ত্র গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া অধুনা প্রচারিত হইতেছে, তৎপ্রতি লক্ষ্য করিলে "কাব্য" ও "সাহিত্য" যে কয়েক সহস্র বৎসর হইতে বিপথগামী হইতে আরম্ভ করিয়াছে এবং উহার বিপথগামিতা যে কয়েক শত বৎসর হইতে সম্পূর্ণ হইয়াছে তাহা বুঝা যাইবে।

কাব্য ও সাহিত্য সম্বন্ধে যে সমস্ত শাস্ত্র-গ্রন্থ এক্ষণে মুদ্রিতাকারে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য :—

(১) ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্র।
(২) নন্দিকেশ্বর বিরচিতং অভিনয়দর্পণং।
(৩) রাজশেখর প্রণীত কাব্যমীমাংসা।
(৪) সাহিত্যমীমাংসা।
[কাহার রচিত তাহা এখনও অজানা রহিয়াছে। তাহা বুঝিতে পারিলে উহা যে কোন ঋষিকল্প মানুষের রচিত তৎসম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হইতে হয়।]
(৫) উদ্ভট প্রণীত কাব্যালঙ্কারসারসংগ্রহ।
(৬) অজ্ঞাতনামা লেখকের বৃত্ত রত্নাকর।
(৭) অজ্ঞাতনামা লেখকের ধ্বনি।
(৮) ভোজদেবের সরস্বতী কণ্ঠাভরণং
(৯) বোপদেবের কবিকল্পদ্রুম।

(১০) বাগ্‌ভটের কাব্যানুশাসনং।
(১১) শিবদত্ত পণ্ডার বাসুদেববিজয়।
(১২) শ্রীবৎসকের অলঙ্কারসূত্রং।
(১৩) শ্রীলিঙ্গভূপালের রসার্ণব সুধাকর।
(১৪) গঙ্গানন্দের কাব্যডাকিনী।
(১৫) ভানুভট্টের রসমঞ্জরী।
(১৬) মম্মটভট্টের কাব্যপ্রকাশ।
(১৭) ভামহাচার্য্যের কাব্যালঙ্কার।
(১৮) বামনপণ্ডিতের কাব্যালঙ্কার সূত্রাণি।
(১৯) অমরচন্দ্রগণীর কাব্যকল্পলতাবৃত্তি।
(২০) জগন্নাথ পণ্ডিতের রসগঙ্গাধর।
(২১) কেশব মিশ্রের অলঙ্কার শেখর।
(২২) অপ্পয়দীক্ষিতের কুবলয়ানন্দ।
(২৩) বিশ্বনাথ কবিরাজের সাহিত্যদর্পণ।

গ্রন্থের ভাষা ও ভাব মেলিয়া কোন্ নিয়মে গ্রন্থ রচনা কাল স্থির করিতে হয়, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, উপরোক্ত নামগুলি রচনাকালের ক্রম অনুসারে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহা ছাড়া আরও দেখা যাইবে যে, উপরোক্ত ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্র প্রভৃতি প্রথম সাতখানি গ্রন্থ যে কবে রচিত হইয়াছে, তাহা বর্ত্তমান যুগে সঠিকভাবে স্থির করা দুঃসাধ্য এবং ঐ সাতখানি গ্রন্থ যে ৮।১০ হাজার বৎসর আগে রচিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

এই সাতখানি গ্রন্থ, যাঁহারা বেদাঙ্গ ও মীমাংসার সাহায্যে শব্দলক্ষণ ও শব্দবৃত্তি পরিজ্ঞাত হইতে পারেন নাই, তাদৃশ সংস্কৃতজ্ঞগণের পক্ষে সঠিকভাবে বুঝা কখনও সম্ভব নহে বটে, কিন্তু ঐ গ্রন্থগুলি সঠিকভাবে বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, একদিন পণ্ডিতগণ বেদ-সম্মত ভাবে "কাব্য" ও "সাহিত্য" রচনা করিবার ও বুঝিবার পদ্ধতি পরিষ্কাররূপে অবগত ছিলেন।

ভোজদেবের সরস্বতী কণ্ঠাভরণ হইতে গঙ্গানন্দের কাব্য-ডাকিনী পর্য্যন্ত পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, তখনও কাব্য এবং সাহিত্যের আদর্শ সম্বন্ধে কোন উৎকট বিকৃত ধারণা সমাজমধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই বটে, কিন্তু তখন হইতেই ঐ ধারণা অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

ভানু ভট্টের রসমঞ্জরী হইতে আরম্ভ করিয়া সাহিত্য-দর্পন পর্য্যন্ত গভীর ভাবে পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, এই-কালে কাব্য এবং সাহিত্যের সংজ্ঞা ও আদর্শ যেরূপ ক্রমেই অস্পষ্ট হইতে অস্পষ্টতর হইয়া পড়িয়াছে, সেইরূপ আবার উহার মধ্যে স্থানে স্থানে উত্তরোত্তর বেদ-বিরোধিতা পর্য্যন্ত প্রবেশ লাভ করিয়াছে।

এই গ্রন্থগুলির যে সমস্ত ভাষ্য বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, কোন ভাষ্যেই কোন গ্রন্থের মূল বক্তব্য সর্ব্বতোভাবে পরিষ্কার করা হয় নাই এবং এই ভাষ্যকারগণ প্রায়শঃ কাব্য ও সাহিত্যের সংজ্ঞা ও আদর্শ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিলেন। তাঁহাদিগের কথা ঐ সম্বন্ধে প্রায়শঃ বেদ-বিরুদ্ধভাব পরিপূর্ণ।

কাজেই কাব্য ও সাহিত্য সম্বন্ধে আধুনিক সাহিত্যিকগণের মধ্যে যে বিকৃতি স্থান লাভ করিয়াছে, তাহার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আধুনিক কবি ও সাহিত্যিকগণের স্কন্ধে আরোপিত করা যায় না। পরন্তু উহার সর্ব্বপ্রথম দায়িত্ব আধুনিক যুগের পূর্ব্ব-বর্ত্তী গ্রন্থকারগণের। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বিকৃতির মূলাধার ঐ পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থকারগণকেই আধুনিক পণ্ডিতগণ প্রামাণিক বলিয়া মনে করিয়া থাকেন।

প্রকৃত কাব্য ও সাহিত্য রচনা করিয়া মনুষ্যসমাজকে ও নিজদিগকে ক্রমিক ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করিতে হইলে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এবং তাঁহাদিগের অন্ধ ও অর্ব্বাচীন অনুচর-গণকে উপেক্ষা করা আবশ্যক। অবজ্ঞা অথবা উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে—ইহা আমাদিগের অভিমত।

কাব্য ও সাহিত্যের সংজ্ঞা ও আদর্শ সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণের মতবাদ

তর্কভূষণ মহাশয় তাঁহার বক্তৃতায় যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, কাব্য ও সাহিত্যের সংজ্ঞা ও আদর্শ সম্বন্ধে তাঁহার কোন স্পষ্ট ধারণা নাই এবং যাহা আছে, তাহাও অসত্য। অথচ তিনি নিজে চতুর এবং শ্রোতৃবর্গ গড্ডালিকা-প্রবাহে প্রবহমান বলিয়া যাহা মনে আসিয়াছে, শাস্ত্রের দোহাই দিয়া তাহাই বলিয়া বক্তৃতাটীকে সুদীর্ঘ করিয়াছেন এবং শ্রোতৃবর্গের করতালি আদায় করিয়া লইয়াছেন।

তাঁহার সমস্ত বক্তৃতা বিশ্লেষণ করা আমাদিগের এই সন্দর্ভে সম্ভব হইবে না।

সাহিত্যের সংজ্ঞা সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া, আমাদিগের মন্তব্য যে সত্য তাহা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিব। সাহিত্যের লক্ষণ ও উদ্দেশ্য কি তাহা বলিতে বসিয়া তর্কভূষণ মহাশয় বলিয়াছেন—

"সাহিত্যের অর্থাৎ গদ্য-পদ্যাত্মক কাব্যের উদ্দেশ্য যে রসসৃষ্টি, সে বিষয়ে কাহারও মতভেদ নাই…"

আমরা আগেই দেখাইয়াছি যে, "সাহিত্য" আর "কাব্য" কখনও শব্দ-বিজ্ঞানানুসারে সর্ব্বতোভাবে একার্থক নহে। উহা যদি সর্ব্বতোভাবে একার্থক হইত, তাহা হইলে সাহিত্য-মীমাংসাকার একই শ্লোকে বিভিন্নভাবে কাব্য ও সাহিত্যের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতেন না এবং কাব্য-মীমাংসাকারও বিভিন্ন ভাবে সাহিত্য ও কাব্যের লক্ষণের কথা তুলিতেন না।

সাহিত্য ও কাব্যের উদ্দেশ্য যে এক তাহা তর্কভূষণ মহাশয় কোন প্রামাণিক প্রাচীন গ্রন্থ হইতে প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন কি? আমাদিগের বিশ্বাস তাহা তিনি পারিবেন না।

দ্বিতীয় কথা, সাহিত্যের উদ্দেশ্য যে "রস সৃষ্টি", ইহাও অলীক। মনুষ্য-শরীর সম্বন্ধে একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, রস কোন মানুষ সৃষ্টি করিতে পারে না। রস, তেজ ও বায়ু এই তিনটী বস্তুর সৃষ্টিকর্ত্রী একমাত্র প্রকৃতি। সর্ব্বজগৎ-পরিব্যাপ্ত প্রকৃতির কার্য্যবশতঃ রস, তেজ ও বায়ু সর্ব্বদা মনুষ্য-শরীরে আপনা হইতেই বিদ্যমান থাকে এবং ঐ তিনটি বস্তুর কার্য্যবশতঃ মনের সৃষ্টি হয় এবং ক্রমে ক্রমে ইন্দ্রিয় ও মেদ, অস্থি প্রভৃতি সমলিত শরীরের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ইহার পর বিভিন্ন বিষয়ের সহিত সংযোগের জন্য মানুষের মন, ইন্দ্রিয় ও শরীর বিভিন্ন ভাবের উৎপত্তি সাধন করিয়া থাকে।

কাযেই মানুষের 'ভাব' সৃষ্টি করিবার সামর্থ্য আছে ইহা বলা যাইতে পারে বটে, কিন্তু মানুষ রস সৃষ্টি করিতে পারে অথবা তাহার কোন কাব্যের উদ্দেশ্য রস-সৃষ্টি, ইহা কোন ক্রমেই বলা যাইতে পারে না।

বস্তুতপক্ষে মানুষের ভাবের সহিত তাহার শরীর-মধ্যস্থিত রসের যে সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে, তাহা জাগ্রত করা কাব্যের অন্যতম উদ্দেশ্য।

মানুষের সর্ব্বসমেত কয়টী রস এবং কয়টী ভাব, তাহা জানিতে পারিলে আমাদিগের ঐ কথাটী পরিষ্কার হইবে।

মানুষের শরীরে কয়টী "রস" সর্ব্বদা বিদ্যমান আছে এবং তাহার শিক্ষা ও সাধনাক্রমে কোন্ অবস্থায় কয়টী "ভাবে"র উৎপত্তি হয়, তাহার বিস্তৃত বর্ণনা রহিয়াছে ভরতমুনির নাট্য-শাস্ত্রে। ঐ নাট্য-শাস্ত্রের ষষ্ঠাধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, বায়ু, তেজ ও রসের অল্প-বহুলের ও সংযোগের (permutation and combination এর) তারতম্যবশতঃ মনুষ্য-শরীরে সর্ব্বদা আটটী রস বিদ্যমান থাকে এবং তাহার শিক্ষা ও সাধনার তারতম্যবশতঃ সর্ব্বসমেত উন-পঞ্চাশৎ ভাবের উদয় হইয়া থাকে। মানুষের শরীরে রস বিদ্যমান আছে বলিয়াই তাহার ভাবের উদয় হয়। রস না থাকিলে মানুষ শুষ্ক হইয়া এমন কি মৃত্যুমুখে পর্য্যন্ত নিপতিত হয়। "রস" প্রকৃতিজাত এবং "ভাব" মানুষের স্বভাব-জাত। মানুষের সমস্ত ভাব কখনও যুগপৎ উদিত হয় না। শিক্ষা ও সাধনার তারতম্য-বশতঃ মন, ইন্দ্রিয় ও শরীরের পটুতা বিভিন্নাকার ধারণ করিয়া থাকে এবং ঐ পটুতার বিভিন্নতার জন্য বিভিন্ন বিষয়ের সংযোগে বিভিন্ন রকমের ভাবের উৎপত্তি হয়। ভাবের বিভিন্নতার সহিত মূল আটটী রসের সম্বন্ধ বিভিন্নাকার ধারণ করে। সুশিক্ষা ও সুসাধনার দ্বারা পরিমার্জ্জিত না হইলে মানুষ সাধারণতঃ তাহার ভাবের সহিত অন্তর্নিহিত সূক্ষ্ম রসের যে কি সম্বন্ধ, তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না।

ঐ সম্বন্ধ প্রস্ফুটিত করিয়া সাধারণের পর্য্যন্ত উপলব্ধি-যোগ্য করা কাব্যের অন্যতম উদ্দেশ্য।

রস-সৃষ্টিই যে সাহিত্যের উদ্দেশ্য, তাহা প্রমাণিত করিবার জন্য তর্কভূষণ মহাশয় ধ্বনিকারের নিম্নলিখিত কারিকাটী উদ্ধৃত করিয়াছেন।

> যত্নোঽয়ং মহতামাসীদ্ যদৌচিত্যেন যোজনম্।
> রসাদিবিষয়ে বৈতৎকর্ত্তুং মুখ্যং মহাত্মনঃ॥

এই কারিকাটীর অনুবাদে তিনি বলিয়াছেন যে, "রস-ভাবাদির সমুচিত ভাবে অর্থ ও শব্দের যে যোজনা, তাহাই মহাকবিগণের মুখ্যকর্ম্ম।"

এই অনুবাদ হইতে বাংলা ভাষার পাঠকগণ কিছুই বুঝিতে পারিবেন কি না তাহা তাঁহারা বিচার করুন। আমরা কিন্তু উহা হইতে কিছুই বুঝিতে পারি নাই। ঐ অনুবাদের বাক্যে কতকগুলি পদযোজনা আছে বটে, কিন্তু তাহার তাৎপর্য্য যে কি, তাহা আমাদিগের বুঝা অসাধ্য।

আমাদিগের মতে উহা তর্কভূষণ মহাশয়ের চতুরতার সাক্ষ্য।

ভাষার অর্থবোধ করিবার বৈয়াকরণসম্মত পদ্ধতি অবলম্বন করিলে ঐ কারিকাটীর নিম্নলিখিত অর্থ হইবে—

এক একটী বিষয়ের, অর্থাৎ ভাবের সহিত রসের সম্বন্ধ জাগ্রত করিয়া শব্দ ও অর্থের ঔচিত্য-সঙ্গত যে সম্বন্ধ, তাহা প্রস্ফুটিত করা মহাকবির মুখ্য-"কর্ম্ম"।

এই কারিকাটীও আমাদিগের কথার সত্যতাই প্রতিপন্ন করিবে।

বাকী বক্তৃতা কয়টী বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, উহার প্রত্যেকটী সম্পূর্ণভাবে অসার ও উদ্দেশ্যবিহীনতার পরিচায়ক। স্থানাভাবে আমরা ঐ বিশ্লেষণ হইতে বিরত থাকিলাম।

কাচ ও আবির

—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু

মুদীর দোকানে ফাগ ছিল এক গামলায়
হাওয়ায় তা যায় উড়ে মুদী থাকে সামলায়
টুকটুকে আবির সে আতরের গন্ধ,
চারিদিকে তুলিয়াছে উৎসব-দ্বন্দ্ব।
ঝুমঝুম করি তারে ছুঁড়ে মারে এ ওরে
গোলিতে মাতেনি আজ নাহি হেন কেহ রে।
হেসে চলে পড়ে ফাগ এর ওর বদনে,
রেশম পশম কয়ে মানা তবু না শোনে।
যারে ছোঁয় তারে দেয় নিজ রঙ্গে রাঙ্গিয়ে,
বাসন্তী গোলাপী হতে সাধ্য নেয় ভাঙ্গিয়ে।
এত যে সোহাগ তবু জান্ তার শুষ্ক,
লাল আভা মাঝে তার ভাব কিছু উষ্ণ।
ঝাড়া দিলে এতটুকু রয় রং ক্যাকাশে,
অপরে রাঙ্গাতে ফাগ উড়ে যায় আকাশে।

পটারীর কারখানা ছিল ঠিক পশ্চাতে,
কাচের বাসন তার রেকাবী ও মগেতে,
কঠিন কাচের জান্, সাদা তবু অন্তর
তার গায় ফাগ এসে দেয় রাঙ্গা মন্তর
কাচের গায়েতে তার রং কভু লাগে না।
ছোপ ধরাইতে তারে পারিল না ফাগে না,
ঘরের কোনেতে শুধু উনানের প্রকারে,
ছিল সে তরল কাচে ধরেনি তা আকারে।
উড়ে এল তার গায় পড়ে রাঙ্গা আবির,
পারে না এড়াতে কাচ রক্ত সে দাবীর।
ধরেছে কাচেতে রং ধরেছে তা নষ্ট,
ফেলে দিল দোকানী তা হ'ল মনে কষ্ট।
রাস্তার পাথরেতে পড়ে গেল গুড়িয়ে,
ভাঙ্গা কাচ দেখে কেউ নেয় নাকো কুড়িয়ে।

বুদ্ধি মাথায় দিল মাড়োয়ারী পাগড়ী,
জিলায় শুষ্ক ফাগে চুবাইল পাগড়ী।
নরম দেহটী তার চকচকে চেহারা,
বারাণসী হ'তে বয়ে এনেছিল বেহারা।

অভিজাত রেশম সে নহে কিছু অল্প,
আবির কহিল, আজি হইলাম ধন্য।

ধূলা 'পরে খেলা করে এতটুকু শিশুরা,
লাক্ষার কোমল করে গায় গায় বেসুরা।
একজন আর সাথে করিতেছে বড়সা,
কাঁপাইয়া পড়ে কেহ কাচ পরে সহসা।
কাটিল কোমল পদ ভাসি গেল রুধিরে,
ওরে বাবা মরে গেনু ডাক ছাড়ে কুদিরে।
তা'দেখি পাগড়ী ছিঁড়ি বাঁধি দিল শক্ত,
বেঁচে গেল কুদিরাম রোধ হয় রক্ত।

আবির কাচেরে ডাকি কহে "ওরে ভণ্ড,
মোর রং তোর গায় দেখি যে পাষণ্ড।
আমারে যে ধরে তার দেখেছিস কার্য্য,
কোমল রেশম তবু তাতে হীন আর্য্য।
সরল শিশুরে তুই করিলি যে ক্ষত রে,
উনি না থাকিলে দেতো হ'ত আজ হত রে।'

কাচ কহে, "শোন তবে, আমার কাহিনী,
রাখিনি তো লুকাইয়া কহিনি তো মিথ্যা।
ধরিয়াছি তব রং শুনিতে সে বার্ত্তা,
আজ একবার কহি কহিব না আর তা।

সেদিন আমার মনে ছিল কত স্ফূর্ত্তি,
হেরিয়াছিলাম রাঙ্গা অপরূপ মূর্ত্তি।
উত্তাপ ছিল গায় ছিল মোর দ্রবতা।
আজ তো সেদিন নাই কেমনে বা কব তা
অজানা আসিয়া তুমি পশেছিলে বক্ষে,
বরিয়া নিয়েছি তোমা সবার অলক্ষ্যে।
মিশিয়াছি পরে কত নীল কটা সবুজে,
ছোপ ধরাইতে কেহ পারিল না অবুজে।
জানি আজ এত কথা নেই তব স্মরণে,
পারিনি ছাড়িতে তবু তব ছাপ মরণে।
ভাল কি মন্দ বোঝা তোমাদের কর্ম্ম,
আমি শুধু পালিয়াছি কাচের স্বধর্ম্ম।

ধান্য

—শ্রীশ্রীশচন্দ্র দাসগুপ্ত

ধান্য শব্দ ধা-ধাতুনিষ্পন্ন, ধা-ধাতুর অর্থ ধারণ করা; পুষ্টি করা; দান করা (কবিকল্পদ্রুমঃ); ধারক (একাক্ষর-কোষঃ)। ধান্য শব্দের সমার্থক শব্দ ব্রীহি। ব্রীহি শব্দে আশুধান্য অথবা ধান্য মাত্রকেই বুঝায় (অমরকোষঃ)। ব্রীহি শব্দের ইংরেজী প্রতিশব্দ rice, ব্রীহি শব্দের O. Pers. রূপ এবং বর্তমান Pushto রূপ wrizey, wrijey; ইহার Aarb. রূপ wruzz, Ituzz এবং তথা হইতে Span. রূপ arroz; ইহার Gr. রূপ oruza, Oruzon=of Arab and Eastern Origin; ইহার L. রূপ Oryza, ইহা হইতে Ital. রূপ riso এবং O. F. রূপ riz; ris (Skeat's Etymological Dictionary of the English Language এবং Routledge's New Dictionary of the English Language)। সুতরাং ইহা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, ধান্যের উৎপত্তিস্থল প্রাচ্য এবং সম্ভবতঃ ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল।

১৩২৮ সালের শ্রাবণ মাসের ।।কার কৃষিসম্পদ্ নামক মাসিক পত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া শ্রীযুক্ত সন্তোষনাথ শেঠ মহাশয় তাঁহার "বঙ্গে চাষতত্ত্ব" গ্রন্থে বলিতেছেন যে, খৃষ্টপূর্ব ২৮০০ অব্দে চীনদেশে একটি উৎসবে সর্বপ্রথম ধান্য শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সময় না কি তদানীন্তন চীনসম্রাট Ilhinun স্বয়ং এক প্রকার এবং তাঁহার চারি পুত্র অপর চারি প্রকার ধান্যের বীজ বপন করিয়া ধান্যোৎসব প্রথা প্রবর্তন করেন এবং প্রতি বৎসর সম্রাট্ স্বয়ং ধান্যের বীজ বপন করার পর কৃষকেরা স্ব স্ব ক্ষেত্রে ধান্য বপন করিত। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, খৃষ্ট জন্মের ৬০০ বৎসর পূর্বেও জাপানে ধান্যের চাষ দেখা যায়। ধান্যের আদি জন্মস্থান ভারতের দাক্ষিণাত্য এবং তথা হইতেই না কি এসিয়ার নানা স্থানে ধান্যের চাষ প্রবর্তিত হয়; খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে আরবের বণিকগণ স্পেন দেশে ধান্যগাছ লইয়া যায় এবং ঘটনাক্রমে ১৬২৯ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার কেরোলিনাতে ভারতীয় ধান দইয়াই সর্বপ্রথম ধান্যের চাষ আরম্ভ হয় (বঙ্গে চাষতত্ত্ব পৃ. ৪০৬)।

উপরোক্ত বিবৃতির বিরুদ্ধে দুইটি কথা বলা চলে। প্রথমতঃ বেদে 'ব্রীহি'র ব্যবহার দেখিয়া ইহা মনে করা স্বাভাবিক যে, ধান্যের উৎপত্তি স্থল দাক্ষিণাত্য নহে, পরন্তু ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল; পুত্র প্রভৃতি ভাষায় ব্রীহি শব্দের উপরোক্ত প্রতিরূপ দেখিলে এই সিদ্ধান্ত আরও দৃঢ় হয়। এবং দ্বিতীয়তঃ প্রাচীনকালে স্থলপথে এসিয়া ও ইউরোপে উত্তর-ভারতের বাণিজ্যবিস্তারের কথা জানা থাকিলে, একমাত্র দাক্ষিণাত্য হইতেই বিদেশে ধান্যের প্রচার কল্পনা করিতে হয় না।

সংস্কৃতে ধান্য শব্দে ব্রীহি ভিন্ন অন্য শস্যও বুঝায়; যথা,

> ধান্যানি বিবিধানীহ যবগোধূমশালয়ঃ।
> কাঙ্গুমাষবরক্ষাশ্চ ধান্যকোদ্রবমুদ্গকাঃ।
> তুবরী রাজমাষাশ্চ তুষ্টুরঃ সুষকস্তথা।
> বনমুদ্গাঃ সুমুদ্গাশ্চ তিলকঃ কুলথাস্তথা।
> সর্ষপাশ্চ নীবারাঃ আঢকী চ কলায়কাঃ।
> মঙ্গল্যা যজ্ঞযোগ্যাশ্চ কীর্তিতা (কলয়ো?) দ্বিজসত্তমাঃ।
> তিলকাঞ্চনকাভাস্তে ধান্যানি কবিভামি বৈ।

(ইতি পাদ্মোত্তরখণ্ডে।১)

শালি—ষোলমহিক, ধান—ষাটকলাই, যবস—মধুরী কলাই, কোরব—কোরো ধান, সর্ষপ—সরিষা, তুবর—যাবসরিষা, রাজমাষ—বরবটী কড়াই, তুষ্টুরী—ধনিয়া, সুষক—শুন, কণু কাঙ্গনি ধান, কুলত্থক—কুলেপ কলাই, সর্ষপক—বড় সরিষা, নীবার—উড়ীধান, আঢকী—অরহর, কলায়ক—মটর, খেঁসারী, মঙ্গল্য—মঙ্গল, কীর্তিত, বহু স্থানে, কোরবী—শিমলী, যজ্ঞ—যজ্ঞমূল, তুণধান্য, চীনাধান, তিলক—তিল, চণক—বুট, ছোলা।

উপরোক্ত এই বিভিন্ন ধান্যকে গুণ অনুসারে ধান্য-নিঘণ্টুতে তিন শ্রেণীতে ফেলা হইয়াছে: (১) শুক ধান্য, (২) শমীধান্য এবং (৩) তৃণধান্য। (১) শুকযুক্ত শস্য মাত্রই শূকধান্য, যথা ধান্য-যবাদি। (২) দুইটি দলযুক্ত শমীজ শস্য শমীধান্য, যথা মাষাদি। শমী=সমী=ছিমড়া, সুঁটি। (৩) তৃণোদ্ভব ধান্য তৃণধান্য, যথা উড়িধান ইত্যাদি।

১। পদ্মপুরাণ—অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্যতম।

(১) শূকধান্যের গুণ ত্রিদোষশমনত্ব, তেজোবলাভিবর্ধনত্ব-বীর্য-বৃদ্ধিকারিত্ব।

(২) শমীধান্যের গুণ - গুরুত্ব, হিমত্ব, মূত্রপুরীষরোধক-রোপকারকত্ব।

(৩) তৃণধান্যের গুণ বাতাম্লকত্ব, শিশিরত্ব।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সংস্কৃতে ধান্যশব্দে একপত্রিক (monocotyledon) এবং দ্বিপত্রিক (dicotyledon) শস্য উভয়ই, অর্থাৎ (১) ধান্যশব্দ ধান, গোধূম, যব প্রভৃতি ও কলাই, মুগ প্রভৃতি এবং (২) তৈলশব্দ তিল, সরিষা প্রভৃতি বুঝায়।

জন্মের কাল অনুসারে বিভাগ করিয়া সংস্কৃতে ধান্যকে তিন শ্রেণীতে ফেলা হইয়াছে। (১) হেমন্ত কালে যাহা জন্মে উহা শালি; (২) গ্রীষ্মকালে যাহা জন্মে উহা ষষ্টিক এবং (৩) বর্ষাকালে যাহা জন্মে উহা আশু। (১) শালি ধান্যকে চলিত কথায় আমন ধান বলে। (২) ষষ্টিক ধান্যকে চলিত কথায় ষাটিয়া ধান বলে। বপনের ষাট দিন পর ইহার গাছ হইতে ধান পাওয়া যায় বলিয়া, অথবা এই ধান ছয় রাত্রি পাক করা হয় বলিয়া ইহার এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। (৩) আশুধান্যকে চলিত কথায় আউশ ধান বলে। কেহ কেহ মনে করেন, অন্য ধান অপেক্ষা এই ধানের ফসল শীঘ্র হয় বলিয়া এই ধানের নাম আশুধান্য।

বৃক্ষের জন্মের প্রণালী অনুযায়ী ধান্য দ্বিবিধ। (১) যে ধান ছড়াইয়া গাছ করা হয়, উহার ধানকে বাপিত ধান্য অথবা বাওয়া ধান বলে। ধানের চারা রোপণ করিয়া তাহা হইতে যে ধান পাওয়া যায়, উহা অবাপিত ধান্য অথবা রোপিত ধান্য। সংস্কৃতে রোপ্যাতিরোপ্য অথবা রোপিত-রোপিত এই দুই নামে একপ্রকার ধানের উল্লেখ আছে। সাধারণতঃ ধানের একই চারাকে দুইবার রোপণ করা হয় না। প্রথমে ধান ছিজাইয়া বাধা হয়, পরে জলসিক্ত স্বল্প পরিমাণ স্থানে উহা ছড়াইয়া দেওয়া হয়, কয়েকদিন পরে ঐ ধান হইতে গাছ জন্মিলে ("গজাইলে" অথবা "জালাইলে") ঐ ধানের চারা ("জালা") জলসিক্ত জমিতে দুই একটি করিয়া সিক্তি সারিতে পুঁতিয়া দেওয়া হয়। ইহাই ধান রোওয়া এবং এই ধান গাছ হইতে যে ধান পাওয়া যায়, উহা রোওয়া ধান অথবা রোপিত ধান্য। কৃষ্ট ও অকৃষ্ট উভয়বিধ ক্ষেত্রেই (অর্থাৎ চাষ করিয়া ও না করিয়া উভয় প্রকারেই) বাপিত ও রোপিত ধান্য করা চলে।

ধান্য শব্দের পর্য্যায় শব্দ প্রধানতঃ চারিটি। ১। ভোগ্য; ২। জীবনাধন; ৩। শুষ্ককরি অর্থাৎ শুষ্ককারক; এবং ৪। ব্রীহি অর্থাৎ শূক, শিম্বী, তৃণজাতীয় ধান্য মাত্র। সুতরাং এই পর্য্যায়শব্দ দ্বারা ধান্যের গুণ, প্রকৃতি ও জাতি বুঝা যাইতেছে।

বাওয়া ধানের গুণ, গুরুত্ব। রোওয়া ধানের গুণ বাওয়া ধানের গুণ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ হীন। রোপ্যাতিরোপ্যধান্যের গুণ, শীঘ্রপাকিত্ব, গুণোত্তরত্ব, অগ্নিদীপ্তি, দোষহরত্ব, বলাঢ্য, মূত্রবিবর্দ্ধনত্ব।

শালিধান্যের গুণ :—

শালয়ো মধুরাঃ স্নিগ্ধা বলাঃ বল্যাগ্নিবর্দ্ধনাঃ।
কষায়া লঘবো হৃদ্যাঃ ক্ষয়া মূত্রাল্প মূত্রলাঃ।
অল্পাবিলকফাঃ শীতাঃ পিত্তঘ্না মূত্রলাস্তথা।
শালয়ো বল্যতুল্যাস্তাঃ বর্ণ্যা লঘুপাকিনঃ।
স্বল্পমূত্রপুরীষাশ্চ ক্ষয়াঃ রোপ্যাপকর্ষণাঃ।
হৈমন্যা বাতপিত্তঘ্না গুরবঃ কফকৃন্মলাঃ।
কষায়া অল্পবর্চস্কা মধুরাশ্চ বলাবহাঃ।
হৈমন্যাঃ কৃষ্টজেক্ষব্যা ইষ্টাঃ।
মূলজাঃ বাতকৃৎ পিত্তকফঘ্না বাতপিত্তঘ্নাঃ।
কিঞ্চিৎ তিক্তাঃ কষায়াশ্চ বিপাকে কটুকা অপি।
গুণতঃ অকৃষ্টভূমিজাতাঃ। শ্রেষ্ঠাঃ আঢ্যাঃ।
বাপিত্যা মধুরা বৃষ্যা বল্যাঃ পিত্তপ্রণাশনাঃ।
রোপ্যাশ্চলঘবস্তাসু কষায়া গুরবো হিমাঃ।
বাপিত্যাঃ কৃষ্টজেক্ষে অকৃষ্টজেক্ষে চ।
বাপিত্যেভ্যো গুণৈঃ কিঞ্চিদ্ধীনাঃ প্রোক্তা অবাপিত্যাঃ।
কৃষ্টজেক্ষে অকৃষ্টজেক্ষে বা।
রোপিত্যাস্তু নবা বৃষ্যাঃ পুরাণা লঘবঃ স্মৃতাঃ।
তেভ্যস্তু রোপিত্য ভূয়ঃ শীঘ্রপাকা গুণাধিকাঃ।
ছিন্নরুহা ছিন্না জ্ঞেয়া বল্যাঃ পিত্তবিকাশনাঃ।
বল্মিটুকাঃ কষায়াশ্চ লঘবস্তাস্ত্রিদোষজাঃ।

রক্তশালির গুণ—

রক্তশালির্মতেষু স্যাৎ বর্ণ্যস্ত্রিদোষহিৎ।
চক্ষুষ্যো মুকুলঃ স্বাদুঃ গুরুর্নাতিহিমঃ সরঃ।
বিশদঃ পাচকঃ শ্লেষ্মপিত্তমেদোবিষাপহঃ।
তণ্ডুলাস্তস্য রক্তাভাঃ শালয়ো মধুরাম্লকাঃ।

"রক্তশালিঃ" ইতিভাষানী রীতি লোকে সমধিকরূপে প্রসিদ্ধঃ।

(ইতি ভাবপ্রকাশস্য পূর্বখণ্ডে ধান্যবর্গঃ)২

ষষ্টিক ধান্যের গুণ—

পৌরো ধীমঃ ষষ্টিকোঽয়ং ত্রিরাত্রাজ্জো

পচ্যতে শীঘ্রমেবায়ং।

বলাঃ পথ্যো ধীমনো বীর্যবৃদ্ধিঃ

কফে তস্মাৎ কিঞ্চিদূনো দ্বিতীয়ঃ।

(ইতি রাজনির্ঘণ্টঃ)৩

আশুধান্যের গুণ—

মধুরমম্। পাকে অম্লম্। পিত্তকারিম্। গুরুকম্।

(ইতি রাজবল্লভঃ)৩

শূক, শমী ও তৃণধান্যের গুণ এ স্থলে বিশদভাবে বলা যাইতেছে ; পূর্বেই এ সম্বন্ধে সামান্যভাবে উল্লিখিত হইয়াছে।

শূকধান্যের গুণ—

অত্র ত্রিদোষশমনং লঘু শূকধান্যং

তেজোবলাগ্নিসমধীবিবৃদ্ধিকারি।

হেমে হেমে শূকধান্যেষু সাধ্যং

আতুং পক্কা নৈব তৈমে ভবন্তি।

(ইতি রাজনির্ঘণ্টঃ)

শূকধান্যং শমীধান্যং সমাতীতং প্রশস্যতে।

পরতো বাতকৃদ্রুক্ষং প্রায়েণাতিনবং গুরু। (ইতি রাজবল্লভঃ)

ষষ্টে কথাঞ্চে বয়ঃ

শীতলো লেখনো মৃদুঃ।

অল্পং তিলবৎ পথ্যো

রুক্ষো মেধাগ্নিবন্ধনঃ।

কটুপাকোঽভিষ্যন্দী

ক্ষুধা বলকরো গুরুঃ।

রক্তপ্রসাদকো রক্ত-

পিত্তমেদঃপ্রণাশনঃ।

দীপনস্তাদৃশঃ শালি-

গুণলোহিতশূকজঃ।

অম্লাবস্তিকরো নূন-

মেতেষো নূনতরগুরুঃ।

(ইতি ভাবপ্রকাশে ধান্যবর্গঃ)

২। ভাবপ্রকাশ—ভাবমিশ্র বিরচিত।

৩। রাজনির্ঘণ্ট, রাজনিঘণ্ট অথবা রাজনিঘণ্টু, হরিয়ি পণ্ডিত বিরচিত।

রাজবল্লভ—রাজবল্লভ সেন কবিরাজ বিরচিত।

শমীধান্যের গুণ—

হৈমনা বয়সা গুরুঃ

কষায়ঃ কটুপাকিনঃ।

বাতলাঃ কফপিত্তঘ্না

বল্যমেধ্যা হিমাঃ।

ঋতে মুদ্গানমুদ্গাদ্যাৎ

অন্ন স্যাদ্গ্রাহিনঃ।

মুদ্গমসুরগোধূমশালিষষ্টিকযবনীবারেষ্বরা। ধ ত্ত সমধা।

এতেষ্বপি ত্রিদোষঘ্নেষু কারিষ্বপ্যনাদৃতাঃ।

(ইতি ভাবপ্রকাশে ধান্যবর্গঃ)

তৃণধান্যের গুণ—

মধুরম্। স্নিগ্ধম্। পবিত্রম্। পথ্যম্। লঘুতরম্।

(ইতি রাজনির্ঘণ্টঃ)

১নং চিত্র : মৌসুমি বায়ু প্রবাহিত অঞ্চল।

মৌসুমি নববায়ু প্রবাহিত অঞ্চল।

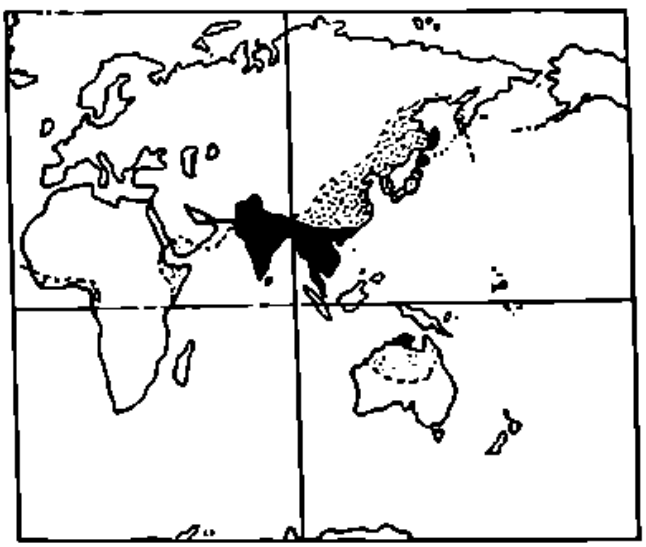

নূতন ও পুরাতন ধান্যের গুণবৈষম্য—

নবং ধান্যং অভিষ্যন্দি। সংবৎসরোষিতং ধান্যং লঘু।

সংবৎসরব্যবায়ুঃ ধান্যং ধাতুপ্রকোপণং গুরুং লঘুতরং পুংস্ত্বঘাতি।

শূকধান্যং শমীধান্যঞ্চ সংবৎসরাধ্যুষিতং প্রশস্যম্। শমীধান্যং

ঘর্মাক্লান্তঃ অতএব লঘুম্। অভিনবং তৎপ্রয়োগে গুরু।

ষষ্টিশালিং মাষাণ্ড

তিলাঙ্গারিনবা হিতাঃ।

পুরাণা বিদলা মুদ্গা

ন চ মাষকরা ইতরঃ।

কি কারণে ধান্য উৎপন্ন হয়—

অন্নাত্তঃ ব্রীহিতমঃ, অগ্র্যোগ্রাম্যঃ, অকৃষিজঃ বরঃ
ধান্য ন ওষধয়ঃ। অন্নানাত্তাৎ ধান্যঃ বিশেষ সর্ব্বধাতূপদেশকঃ;
(হরি রাজবল্লভঃ)

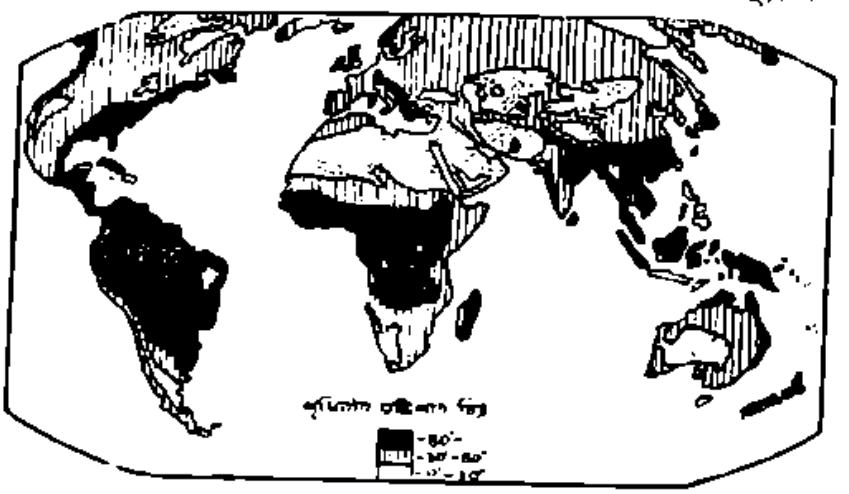

শুষ্কত্ব—স্নিগ্ধ, ধাতু-বর্দ্ধনকারক, দৃষ্টি শক্তিবৃদ্ধিকারক, শুক্রবর্ণ পুষ্টিকারক, বিপাক- চতুর্থাংশে (যাম) যাহা হয় তাহা রস। রসের পরিণাম বিপাক। অন্নস্কন্ধ—বিরেচক, পীনস - নাসিকারোগবিশেষ, ছেদ—ছিন্ন হওয়া; অপক্ক দধ, আমার—বাতনিরোধক রোগ বিশেষ।

সংস্কৃতে ধান্যশব্দে শুক, শমী ও তৃণ ধান্য বুঝাইলেও বাঙ্গালাভাষায় ধান বলিতে শমীধান্য বুঝি না, শুকধান ও তৃণধান্যের কয়েকটি পর্য্যায় মাত্র বুঝি। এক কথায় বলিতে গেলে, যে শস্য হইতে আমরা ভাত প্রস্তুত করিতে পারি, উহাকে ধান বলি। এই ধান হইতে আমরা চাউল পাই। আমরা প্রকৃতির উপর নির্ভর করিয়া ও নিজেদের পরিশ্রমে উপযোগী ক্ষেত্রে ধান উৎপন্ন করি। ধানের উৎপত্তিস্থান কেবলমাত্র বাঙ্গালা অথবা ভারতেই সীমাবদ্ধ নহে। পৃথিবীর উৎপন্ন ধান্যের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ অংশ চীন দেশে হয়; ভারতের স্থান উহার নিম্নে।

জলা-জমিতে ধান জন্মে। কিন্তু যে জমিতেই জল আছে, অথবা যেখানেই বর্ষা হয়, সেখানেই ধান জন্মে না। প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর জমিতে ধান পাওয়া যায়। ১। জলসিক্ত পার্ব্বত্য-ভূমি এবং ২। জলসিক্ত সমতল ও নিম্নভূমি। নিম্নভূমি অপেক্ষা পার্ব্বত্যভূমিতে জাত শস্যের আস্বাদ সাধারণতঃ বেশী। জলসিক্ত এই দুইপ্রকার জমি ভিন্ন পার্ব্বত্য উচ্চ ভূমিতেও একপ্রকার ধান হয়; এই ধান জলসিক্ত জমিতে হয় না। আমাদের দেশে পার্ব্বত্য অঞ্চলে পাহাড়ীরা একপ্রকার "জুমের ধান" করে। ইহারা পর্ব্বতের এক এক স্থান খুঁড়িয়া উহা প্রথমে পুড়াইয়া লয়, পরে অন্যান্য শস্যের সহিত ধানও বপন করে এবং বিভিন্নকালে সেই সেই কালোপযোগী শস্য সেই "জুম" হইতে আহরণ করে। এইরূপে ইহারা জুম হইতে ধানও পায়। পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম, পার্ব্বত্য ত্রিপুরা, নাগাপর্ব্বত, খাসিয়া-পর্ব্বত প্রভৃতি অঞ্চলে টিপ্‌রা, মণিপুরী প্রভৃতির নিকট "জুম" সুপরিচিত। বঙ্গ ও অন্যান্য দেশে অনেকসময় জমিকে অগ্নিতপ্ত করিতে দেখা যায়। ক্ষেত্রের ধান্য কর্ত্তনের পর ক্ষেত্রে যে খড় থাকে উহাতে আগুন লাগাইয়া দিয়া ক্ষেত্রটিকে পুড়াইয়া লওয়া হয়। তাহাতে ক্ষার জমিতে উৎপন্নপালি ধান্যের কথা বলা হইয়াছে (পালয়ো দগ্ধভূজাতাঃ কথ্যন্তা সমুপাকিনঃ)। যাহা বপনের উপযোগী ক্ষেত্র সাধারণতঃ সমতলভূমি এবং ঐ ভূমি এরূপভাবে অবস্থিত যাহাতে প্রয়োজনানুযায়ী জমিতে জলরক্ষা, জলনিষ্কাশন করা

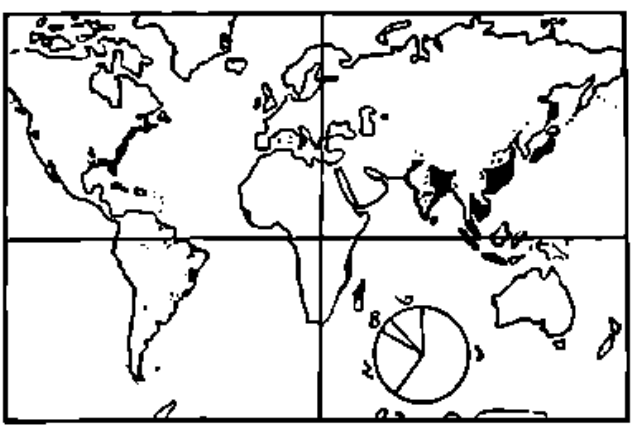

এই চিত্র: কৃষ্ণবর্ণ স্থানগুলি পৃথিবীর ধান্যক্ষেত্রসমূহ। ১—চীনদেশের উৎপাদনের পরিমাণ। ২—ভারতের উৎপাদনের পরিমাণ। ৩—অন্যান্য দেশের উৎপাদনের পরিমাণ। ৪—জাপানের উৎপাদনের পরিমাণ।

চলে। নিম্নভূমিতে সর্ব্বত্র জলনিষ্কাশনের ভাল ব্যবস্থা নাই এবং অনেক সময়ে ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে জল থাকে; এই কারণে নিম্নভূমির ধানগাছ অনেকসময়ে জমির উপরিস্থ

জলের উচ্চতার পরিমাণ বাড়ে, কিন্তু জল কমিয়া গেলে ইহারা নিজেরা দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না বলিয়া মাটিতে শুইয়া পড়ে। ধানের উপযোগী ক্ষেত, পৃথিবীর ধান্য-উৎপাদক দেশ ও পৃথিবীর বৃষ্টিপাতের চিত্র দেওয়া গেল।

ধানের শত্রু বলিতে আমরা ধানের বিভিন্ন পোকা, ইঁদুর, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি বুঝি। জড়াপোকা ও পুতিপোকা ধানের প্রধান শত্রু। জড়াপোকা চালের পরিমাণের বিশেষ ক্ষতি করে না। ইহারা কতকগুলি চালকে নিজেদের লালা দিয়া জড়াইয়া দেয়, উহাতে চালের পরিমাণ না কমিলেও, খুব সম্ভব চালের খাদ্যপ্রাণ নষ্ট হয়। পুতিপোকা ধান খাইয়া ফেলে। পামরীপোকা, চোরাপোকা, মাজরা পোকা, লেডাপোকা প্রভৃতি ধান-ক্ষেতে ধানগাছে লাগে ও গাছগুলিকে খাইয়া ফেলে। চিনিপোকা ধানের শীষগুলিকে কাটিয়া দেয়।

ধান বাহির হইবার পূর্ব্বে পোকা লাগিলে নানারূপ ঔষধের জল ও ধোঁয়া দিয়া অথবা ধানগাছের উপর দিয়া দড়ি কিম্বা চট প্রভৃতি টানিয়া অনেক সময়ে পোকা নিবারণ করা যায়। পাকা ফসলে পোকা দেখা দিলে শীঘ্র ফসল কাটিয়া লইতে হয়; কিন্তু ফসলে পঙ্গপাল লাগিলে আর উপায় নাই। সৌভাগ্যের বিষয় আমাদের দেশে পঙ্গপাল খুব কমই আসে, তবে অনেক সময় ক্ষেতে ফড়িং দেখা যায়। ধানের গুদামে ইঁদুরের গর্ত্ত বন্ধ করিয়া দিয়া অনেক সময়ে উহাদের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায় বটে, কিন্তু জমির ইঁদুর নিবারণ করা শক্ত। অনেক সময়ে শৃগাল ও পেচক প্রভৃতি নিশাচর পশু ও পাখীরা ইঁদুর মারিয়া আমাদিগের উপকার করে। সাঁৎসেঁতে গুদামে ধান রাখিলে উহা আপনিই নষ্ট হয়। ধান ফলিবার পূর্ব্বে ধানের শীষে বৃষ্টি লাগায় অনেক সময় ধানের ফসল ভাল হয় না। জমি হইতে ধানগাছ উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করিতে না পারিলেও ধানের ফসল ভাল হয় না। এইরূপ অ-পরিণত ধানকে চিটাধান বলে। অনেক সময় এই চিটাধানগুলি এত অপরিণত থাকে যে, উহা হইতে আর তণ্ডুল পাওয়া যায় না। জমির উর্ব্বরতা কমিয়া গেলে অনেক সময়ে অতি সহজেই শীষ হইতে ধান ঝরিয়া পড়ে। এই ধানকে ঝরাধান বলে। লোকে এই ধানের চাল খাইতে নিষেধ করে। জমিতে ঝরাধান হইলে, দুই এক বৎসর জমি ফেলিয়া রাখিতে

উহার পরে চাষ করিলে আর ঐ জমির ধান ঝরিয়া পড়ে না।

উড়িষ্যা অঞ্চলে একপ্রকার জলী ঝরা ধানের কথা শুনা যায়; ঐ ধান নাকি বিশেষ চাষ করিতে হয় না; ধান পাকিলে কিছু পরিমাণে কাটিয়া আনা যায়, বাকি অংশ ঝরিয়া পড়ে ও উহা হইতে গাছ হয়। এই ঝরাধানের ভাত ঐ অঞ্চলের লোকে খায় বলিয়া শুনা যায়।

আমরা যে চাউল খাই, উহা ধান সিদ্ধ করিয়া অথবা রৌদ্রে শুকাইয়া পাই। বর্ত্তমানে নানা স্থানে চাউলের কল হইয়াছে, ঐ সব কলে এক সঙ্গে বহুল পরিমাণে চাউল উৎপাদন করা হয়। নিজ ব্যবহারে চাউল করিবার জন্য গৃহস্থ আমাদের দেশে ঢেঁকি অথবা উদূখল ব্যবহার করে। এই উভয় যন্ত্রেই প্রচুর পরিশ্রম হয়। ব্রহ্মদেশে

অতি অল্প পরিশ্রমেই মাত্র একজন স্ত্রীলোক একটি ব্রহ্মদেশীয় চাউল প্রস্তুত করিবার যন্ত্রে অল্প সময়ে প্রচুর পরিমাণে আতপ চাউল প্রস্তুত করিতে পারে। ভারতীয় ও ব্রহ্ম দেশীয় চাউল প্রস্তুত করিবার যন্ত্রের পার্থক্য এই যে, ভারতীয় যন্ত্রে ধানকে উপর হইতে আঘাত করিয়া উহার খোসা (তুষ) ছাড়ান হয়, কিন্তু ব্রহ্মদেশীয় যন্ত্রে ধানকে একটি খাঁজের মধ্যে ফেলিয়া ঘষিয়া উহার তুষ ছাড়ান হয় এবং এই কারণেই ব্রহ্মদেশীয় যন্ত্র ব্যবহার করিলে কম পরিশ্রমে বেশী ফল পাওয়া যায়। এই যন্ত্র মূলতঃ আমাদের জাঁতার (ঘরট্ট=পেষণী) ন্যায়। এই যন্ত্রের দুইটি প্রধান অংশ আছে। নিম্নে ইহার একটি চিত্র দেওয়া গেল। আমাদের জাঁতার উপরের অংশ পূর্ণ চক্রাকারে (in full rotatory way) ঘুরাইতে হয়, কিন্তু

একজন লোক দাঁড়াইয়া অর্দ্ধচক্রাকারে (in half rotatory way) এই যন্ত্র ঘুরাইয়া থাকে। এক্ষেত্রে সিদ্ধচাউল ব্যবহার করা হয় না। এই যন্ত্রে আতপ চাউল প্রস্তুত করা হয়।

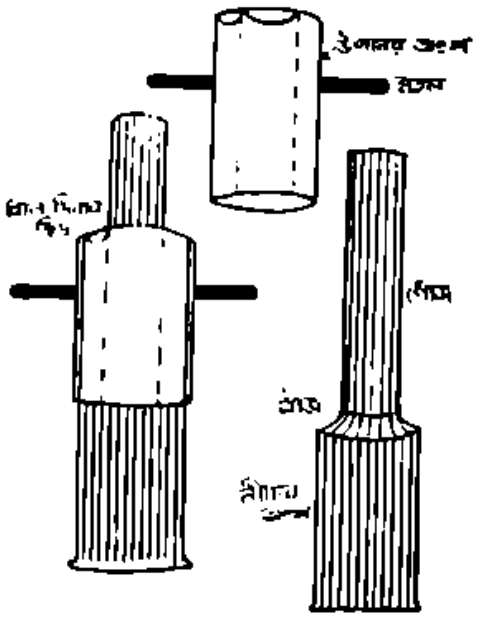

এন: চিত্র : ধুংসের নিত্যব্যবহার্য্য চাউল প্রস্তুত করিবার ব্রহ্মদেশীয় যন্ত্র। এই যন্ত্র অনায়াসে দুই ব্যক্তি দ্বারা নির্ব্বাহিত হয়। ধানগুলিতে যখন চাপ দেওয়া হয় তখন তাহারা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে।

ধান ভানিবার পর গৃহস্থ কুলায় করিয়া উহা ঝাড়ে এবং এইরূপে চাউল হইতে তুষ পৃথক্ করা হয়। এই প্রণালীতে এক সঙ্গে অল্প অল্প চাউল পাওয়া যায়। কিন্তু একটি যন্ত্র সাহায্যে অতি অল্প আয়াসে এইরূপ কার্য্য করিলে এক সঙ্গে প্রচুর পরিমাণ চাউল পাওয়া যায়। এই যন্ত্রের মূলবস্তু দুইটি। এক স্থানে তুষ সহিত চাউলগুলিতে বায়ুসঞ্চালিত করা, যেন সেই বাতাসে তুষগুলিকেই শুধু উড়াইয়া একটু দূরে পৃথক্ করিয়া রাখিতে পারে। এই যন্ত্র সম্পূর্ণভাবে লৌহনির্ম্মিত। বাস্তবিকপক্ষে এই যন্ত্রটি একটি হাপর (ভস্ত্রা) মাত্র; কিন্তু অধোলম্বগতি (perpendicular motion) দ্বারা সাধারণ হাপর হইতে বায়ুনিষ্কাশন করা হয়, আর পূর্ণবৃত্তাকারগতি (circular motion) দ্বারা এই যন্ত্র হইতে বায়ু উৎক্ষিপ্ত হয়। এদেশে ও ব্রহ্মদেশে এই যন্ত্রের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। নিম্নে এই যন্ত্রের চিত্র দেওয়া গেল।

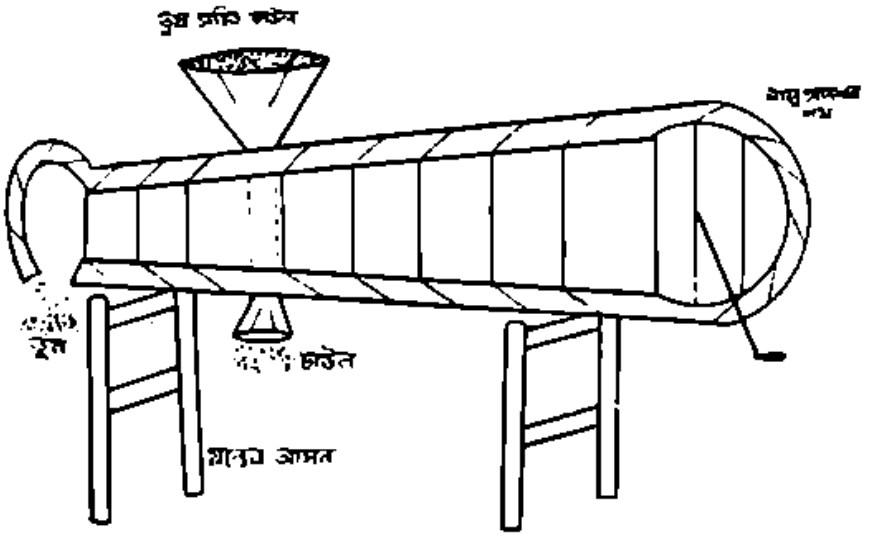

এন: চিত্র : চাউল ঝাড়াইবার যন্ত্রের বিবরণ।

বাঙ্গালা দেশের প্রত্যেক জেলায় নানা প্রকার ধান উৎপন্ন হয়: এই সব ধানের নাম অসংখ্য। এই সব বিভিন্ন ধানের নাম মনে রাখা ও উহাদের বিভিন্ন শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য চিনিয়া বাহির করা অত্যন্ত শক্ত। বাঙ্গালা ভিন্ন অন্য দেশ সম্বন্ধেও এই কথা সত্য। আমরা প্রথমতঃ জেলা অনুযায়ী এবং দ্বিতীয়তঃ কয়েকটি প্রধান শ্রেণী অনুযায়ী ধান চিনি ও উহা ব্যবহার করি। উপরোক্ত শালি, (চলিত কথায় আমন) বষ্টিক (চলিত কথায় বাটিয়া) এবং আউ (চলিত কথায় আউশ) শ্রেণীর অন্তর্গত উপশ্রেণীর ধান্যসংখ্যা গণনাতীত। শূকধান্য সম্বন্ধীয় এই কথা তৃণ ও শমী ধান্য সম্বন্ধেও সত্য। ভারতবর্ষীয় ধান্য সাধারণতঃ মনুষ্যের খাদ্যোপযোগী। এই সব ধান্য উৎকৃষ্ট ও পরিমাণে অল্প বলিয়া গবাদি পশুর খাদ্যরূপে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় না এবং বিদেশেও বিশেষ চালান যায় না। কিন্তু ব্রহ্মদেশ, শ্যামদেশ ও ইন্দোচীন প্রভৃতি দেশে গবাদি পশুর খাদ্যোপযোগী নিম্নশ্রেণীর ধান্য প্রচুর পরিমাণে হয় ও উহা বিদেশে চালান যায়। ব্রহ্ম প্রভৃতি দেশের মনুষ্যখাদ্যোপযোগী ধান্য অতি উৎকৃষ্ট। ব্রহ্মদেশীয় লোকদের নিজের খাদ্য হইতে উদ্বৃত্ত ধান্যও বিদেশে চালান যায়, কিন্তু উহার পরিমাণ অপেক্ষা পশুখাদ্যোপযোগী ধান্যের পরিমাণ

অনেক বেশী। ধান্য উৎপাদক অন্যান্য দেশের ধান বা চাউল কদাচিৎ বিদেশে চালান যায়। সাধারণতঃ কোন এক দেশ নিজেদের নিজেদের আহার্য্যোপযোগী ধান্য উৎপাদন করে, কিন্তু পার্শ্ববর্ত্তী দেশে এরূপ ধান্যের পরিমাণ অল্প হইলে, নিজেদের অতিরিক্ত শস্য তথায় চালান দেয়। ব্রহ্মদেশ, শ্যামদেশ, ইন্দোচীন ও কোরিয়া এই চারিটি দেশেই মাত্র চালানের উপযোগী অতিরিক্ত ধান্য হয় এবং আহার্য্যের জন্য সাধারণতঃ সিংহল, মালয়দেশ, দ্বীপপুঞ্জ ও জাপানদেশই মাত্র ধান্য বা চাউল আমদানী করে। ইওরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকার অধিকাংশ দেশেই কিছু কিছু ধান বা চাউল আমদানি করা হয়। এই ধান বা চাউলের অধিকাংশই মদ্যাদি প্রস্তুত করণার্থ অথবা পশুর আহারের জন্য চালান হইয়া থাকে। এই ধান ও চাউলের অধিকাংশই ব্রহ্মদেশ, শ্যামদেশ, ইন্দোচীন এবং কিয়ৎ পরিমাণে যুক্তরাষ্ট্র হইতে যায়। চীন, জাপান, ইষ্ট ইণ্ডিজ, সিংহল, ইটালী, স্পেন, ইজিপ্ট, ম্যাডাগাস্কার, পশ্চিম আফ্রিকার সিয়ারালিওনে, গায়না, অব মেক্সিকোর তীরবর্ত্তী যুক্তরাষ্ট্রস্থ প্রদেশ এবং ঐ রাষ্ট্রের পশ্চিম উপকূলস্থ সক্রামেন্টো নদীর উপত্যকা এবং দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিল, গিয়েনা, কলম্বিয়া, ইকোএডর এবং পেরুর উপকূলস্থ উপত্যকাগুলিতে ধান জন্মে; কিন্তু একমাত্র যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত অপর কোন দেশ হইতেই সাধারণতঃ ধান বা চাউল বিদেশে যায় না। ধান্যের রপ্তানিকারক দেশ প্রধানতঃ ব্রহ্মদেশ, শ্যামদেশ, ইন্দোচীন ও কোরিয়া। বিদেশে ধান বা চাউলের রপ্তানী-বাণিজ্যে ভারতের বিশেষ কোন স্থান নাই। পৃথিবীব্যাপী একটি ব্যবসায় আছে, ভারতে এই ব্যবসায়ের উপযোগী মালও উৎপন্ন হয়, তথাপি এই ব্যবসায়ে যোগ দিবার মত আমাদের কোন শক্তি নাই, অর্থাৎ বিদেশে বিক্রীর উপযোগী মাল আমাদের দেশে হয় না, ইহা শুনিলে সহসা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না; বিশেষতঃ ধান্য সম্বন্ধে প্রাচীন পণ্ডিতগণের বিস্তৃত আলোচনার কথা শুনিলে, বিদেশে আমাদের ধান্যের ব্যবসায় নাই, ইহা অসম্ভব মনে হয়। কিন্তু অসম্ভব মনে হইলেও ব্যাপারটি সত্য। প্রাচীনগণের ধান্যের শ্রেণীবিভাগ ও গুণনির্ণয় প্রভৃতি দেখিয়া মনে হয় যে, তাঁহারা ধানকে ভারতের একটি অত্যাবশ্যক খাদ্য হিসাবে বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়াছেন মাত্র, কিন্তু পূর্ব্বের তুলনায় বর্ত্তমান আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসায় অনেক বিস্তৃত, সুতরাং আমাদের প্রয়োজনানুযায়ী ধান্য উৎপন্ন হইলেও বিদেশের প্রয়োজনানুযায়ী আমাদের ধান্য হয় না, ইহা কল্পনা করিতে কষ্ট হয় না।

আমাদের দেশে চাউল ও ধানের ব্যবসায়ের একটি বিশেষ স্থান আছে। বিভিন্ন গোলায় ধান ও চাউল বিক্রয়ের বড় বড় কেন্দ্র ও আড়ত আছে, তথা হইতে অন্যান্য স্থানে নিয়মিত ধান ও চাউল চালান যায়। বিক্রয়ের এই ধান বা চাউল বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নরূপে ওজন করা হয়। কলিকাতায়

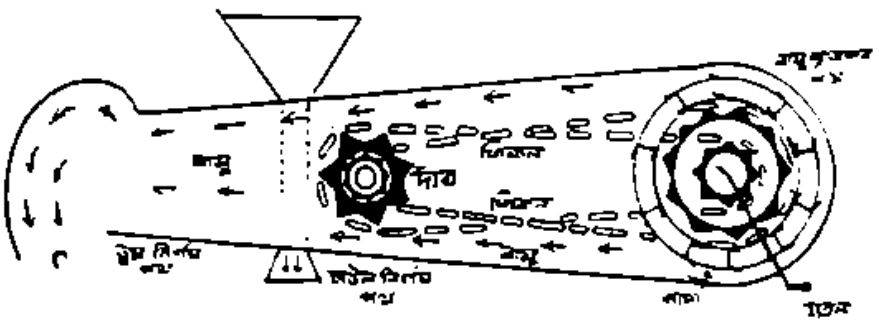

৭নং চিত্র: চাউল কাঁড়াইবার যন্ত্রের প্রকৃতি।

ওজনের মান খাদ্যান্নাদনের ওজনের মানের সমান; অন্যত্র বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় মান অনুসারে সেরের ওজন ধরা হয়। বাঙ্গালা দেশের অনেক স্থলে ৮২৯/ তোলায় সের, বরিশালে ৯৬ তোলায় ও ১০৮ তোলায় সেরও দেখা যায়। উড়িষ্যায় ১০৪ এবং ১২৬ তোলায় সেরের কথা শুনিয়াছি। সংস্কৃতে ধানের মান বুঝাইতে বলা হইয়াছে যে, ১টি ধানের ওজন ৩টি তিলের সমান এবং ৪টি ধান, ৩টি যব, অথবা ২টি গোধূমের ওজন ১টি গুঞ্জার (রতি) সমান, এবং ৬টি (মতান্তরে ৫টি) রতির ওজন ১টি মাষের সমান, এবং ৪টি মাষের ওজন ১টি শাণের (মুদ্রা) সমান; ২টি শাণের ওজন ১ তোলা, ২টি তোলার ১ কর্ষ (মুদ্রা); ৪টি কর্ষের সমান ১টি নিষ্ক, পল অথবা দিনার (মুদ্রা)। স্মৃতি, বৈদ্যক ও গণিতাদি মতে উপরোক্ত ওজনের কিছু কিছু ব্যতিক্রম আছে।

উপরোক্ত বিভিন্ন আহৃত ও কল প্রভৃতি দেখিলে ধানের অন্তর্বাণিজ্য বৃদ্ধি হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু উহাতে ধানের আনুপাতিক মূল্য বৃদ্ধি হয় নাই, সুতরাং চাষী অনেক সময়ে ধানের পরিবর্তে অন্য ফসলের চাষ পছন্দ করে। চাষীর আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য দুইটি অবস্থার প্রয়োজন। প্রথমতঃ উৎপন্ন ফসলের গুণ ও পরিমাণ বৃদ্ধি এবং দ্বিতীয়তঃ তজ্জনিত উহার আনুপাতিক ও মোট মূল্যের পরিমাণ বৃদ্ধি। ধানের আনুপাতিক মূল্য প্রয়োজনানুসারে বৃদ্ধি না হওয়ায় পরিমাণ বৃদ্ধি দ্বারা চাষী প্রথমোক্ত অভাব পূরণের চেষ্টা করে। পরিমাণ বৃদ্ধি দুই প্রকারে হয়, প্রথমতঃ জমির উৎপাদিকা শক্তি অর্থাৎ গুণবৃদ্ধি দ্বারা এবং দ্বিতীয়তঃ চাষের জন্য ব্যবহৃত জমির পরিমাণ অর্থাৎ আয়তন বৃদ্ধি দ্বারা। জমিতে সার দিয়া, অথবা পুড়াইয়া এবং অন্যান্য প্রণালী অবলম্বন করিয়া চাষী জমির গুণবৃদ্ধির চেষ্টা করে, কিন্তু তাহার এই চেষ্টা আশানুরূপ সার্থক না হওয়ায় বাধ্য হইয়া চাষীকে চাষের জমির পরিমাণ বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে হয়। কিন্তু জনবহুল অঞ্চলে চাষের জমির পরিমাণবৃদ্ধি সহজ নহে, সুতরাং গ্রামের সাধারণের জমিগুলি (যথা গোচারণের মাঠ প্রভৃতি) ক্রমশঃ লুপ্ত হইতেছে; ঠিক এই কারণে এবং ক্রমশঃ উলুখড়ের স্থান টিন গ্রহণ করায় নিম্নবঙ্গের উলুখড়ের জমিতে ক্রমশঃ চাষ হইতেছে। জমির গুণ ও পরিমাণ বৃদ্ধির প্রচেষ্টার মূল কারণ জমির উপর নির্ভরশীল লোকের অভাবের বোধবৃদ্ধি এবং ঐরূপ লোকের সংখ্যাবৃদ্ধি। নদীর প্লাবন, বৃক্ষাদির পতন প্রভৃতি নানা প্রাকৃতিক উপায়ে এবং খাল খনন প্রভৃতি জলসেচনের সুব্যবস্থা দ্বারা ও অন্যান্য কৃত্রিম উপায়ে জমির গুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব। নদীর স্রোত অন্যপথে প্রবাহিত হইলে অথবা সমুদ্র পূর্বের বেলাভূমি হইতে পশ্চাদ্বর্তী হইলে অথবা জলস্রোত বা অন্য কারণে দ্বীপাদির উদ্ভব হইলে প্রাকৃতিক উপায়ে এবং জল নিষ্কাশন ও অন্যান্য ব্যবস্থাদিদ্বারা মানবীয় প্রচেষ্টায় চাষের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি সম্ভব। বর্তমানে ভারতে জনবৃদ্ধি হওয়ায় জমির এই গুণ ও পরিমাণ বৃদ্ধি সম্বন্ধে বিভিন্ন আলোচনা হইতেছে। ভারতে এই আলোচনা নূতন নহে; প্রাচীন কালে এবং মধ্যযুগেও এই আলোচনা এবং এই সমস্যা-সমাধানের প্রচেষ্টা দেখা যায়। যাহা হউক, আমরা কৃত্রিম উপায়ে চাষের জমির পরিমাণবৃদ্ধির চেষ্টা করিলেও চাষের সমুদয় উপযোগী ক্ষেত্রগুলি বাস্তবিকপক্ষে ব্যবহৃত হইতেছে না। উত্তর ভারতে চাষের যেরূপ প্রসার দেখা যায়, দক্ষিণ ভারতে সেরূপ নাই, আবার উত্তর ভারতেরও সর্বত্র চাষের সমান প্রসার দৃষ্ট হয় না। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বহুস্থান হাতীকাঁধা অথবা সাবুই ঘাসে সমাকীর্ণ; এরূপ বহু স্থান জঙ্গলে পরিপূর্ণ অথবা তৃণসমাচ্ছন্ন থাকায় অনেক ক্ষেত্রে চাষ করা হয় না। এই উপযোগী ক্ষেত্রগুলি অব্যবহারের কারণ বহুবিধ। প্রথমতঃ (১) নিম্নভূমির জমিগুলি অতিপ্লাবনের ফলে অনেক সময় জলের নীচে থাকে এবং mangrove প্রভৃতি বৃক্ষ সমাকীর্ণ থাকায় ধানচাষের উপযোগী হয় না; (২) এ দিকে উপযুক্ত পরিমাণ জলের অভাবে এবং অনেক ক্ষেত্রে তৃণগুল্মাদিতে আচ্ছন্ন থাকায় উচ্চভূমিগুলি ধানচাষের অনুপযোগী হয়; (৩) প্রস্তরাকীর্ণ ও পর্বতের ঢালুদেশগুলিতে জলরোধ করার ব্যবস্থার অভাবে ধানচাষ সম্ভব হয় না; (৪) ধানের তুলনায় অন্য ফসলের (যথা পাট প্রভৃতি) আপেক্ষিক মূল্যবৃদ্ধি প্রযুক্ত চাষীরা ধানের জমিগুলি অন্য ফসল উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করে; দ্বিতীয়তঃ উত্তরাধিকার-আইন অনুযায়ী জমির বিভাগ হওয়ায়, ক্ষেত্রগুলি ব্যবহারের অযোগ্য হয়; এবং তৃতীয়তঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে চাষী ভিন্ন অন্য লোকেরা জমিদারী প্রতিপালিত হইলেও চাষের জন্য জমির ব্যবহার করে না।

প্রাগুক্ত উত্তরাধিকার আইনের ফলে জমির চাষের অযোগ্যতা দুই প্রকারে হয়। প্রথমতঃ যে চাষীর ১০০ বিঘা জমি আছে, তাহার নাতির ভাগে মাত্র কয়েক বিঘা পড়ে অর্থাৎ জমিগুলি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত হয়; এবং দ্বিতীয়তঃ উত্তরাধিকারসূত্রে একটি জমি এক পরিবারের কয়েকজনের অথবা বিভিন্ন পরিবারের কয়েক ব্যক্তির এজমালি অর্থাৎ যৌথ সম্পত্তি হওয়ায় উহাদের কোন একজনের বিশেষ স্বার্থ ঐ জমিতে থাকে না। এক কথায় বলিতে গেলে, একটি জমি হইতে যে কয়জন লোক প্রতিপালিত হইতে পারে, বাস্তবিকপক্ষে তদপেক্ষা অধিক লোক ঐ জমির উপর নির্ভর করে, সুতরাং ঐ অধিকসংখ্যক লোকের পক্ষে ঐ জমি অনুপযোগী হয়।

Indian Year Book-এ দেখা যায়, জনসংখ্যার

অনুপাতে ভারতে চাষীর সংখ্যা শতকরা ৭৫। এই হিসাব দেখিয়া মনে করা স্বাভাবিক যে, আমাদের দেশের লোকেরা বোধ হয় বাস্তবিকই কর্মলিপ্ত এবং সম্পন্ন। কিন্তু এই অনুপাতটিকে বিচার করিয়া দেখিলে অন্যরূপ প্রতীত হইবে। কারণ, যাহার জমি আছে এবং যে জমিচাষের ফল লাভ করে, মাত্র সে-ই চাষী পর্য্যায়ভুক্ত নহে; যাহার কোন জমিই নাই, কিন্তু অন্য চাষীর নিকট মজুর খাটে, সেও চাষী এবং যে দুই একটি গরু, মহিষ রাখে ও চাষের জন্য অপরকে ভাড়া দেয়, সেও চাষী পর্য্যায়ভুক্ত। সুতরাং প্রকৃত চাষী অর্থাৎ যে নিজে চাষ করে ও উহার ফলভোগ করে এরূপ ব্যক্তির সংখ্যা নির্ণয় করা দুষ্কর। এ দিকে, অনেক ভদ্রলোক, যাঁহারা মধ্যবর্ত্তী উপস্বত্বভোগী তাঁহারাও সময় সময় নিজেদেরকে চাষী বলায়, প্রকৃত চাষীর সংখ্যা নির্ণয় করা আরও কঠিন হয়। এবং চতুর্থতঃ যে চাষ করে অনেক সময়েই সে চাষ ভিন্ন অন্য কার্য্যও করে; প্রায়শঃ তাহার অন্য এক বা একাধিক উপজীবিকা থাকে। সুতরাং কেবলমাত্র চাষের উপস্বত্বের উপর নির্ভর করিয়া থাকে এরূপ চাষী এবং বিশেষতঃ ধানের এরূপ চাষীর সংখ্যা নির্ণয় করা প্রায় অসম্ভব।

চাষীর অর্থাৎ ধানের চাষীর অবস্থা বিচার করিতে হইলে পূর্ব্বোক্ত বিষয়গুলি বিচার করা প্রয়োজন। সুতরাং সহজে চাষীর অবস্থা বিশ্লেষণ করা যায় না। অর্থ-নৈতিক গ্রন্থে চাষীর অবস্থার নানারূপ বিশ্লেষণ করা আছে; উহার মূলকথা একই, অর্থাৎ এদেশের চাষীরা দেহে অসুস্থ, অর্থে দুঃস্থ, বিদ্যায় হীন, তবে নীতি ও ধর্ম্মে উন্নত; এক কথায় বলিতে গেলে হয় ত ইহা বলা যায় যে, আমাদের চাষীদের ইহলোক নাই, কিন্তু পরলোক আছে। ইহারা অশিক্ষিত, চিররোগী ও চিরঋণী কিন্তু অধ্যবসায়ী ও নিপুণ। উহাদের এই কর্ম্ম-নৈপুণ্য, অলৌকিক অধ্যবসায় ও ধর্ম্মভাব আছে বলিয়াই হয় ত উহারা আজও টিকিয়া আছে; এবং চাষের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে লিপ্ত থাকায় উহাদের সুবিধা হইতেছে ইহা নিঃসন্দেহ। চাষীরা বাজারের অবস্থা জানে না, মালের মূল্য উঠা-নামার প্রকৃত কারণ বোঝে না। পৃথিবীর বাজার সম্বন্ধে চাষীর কোন ধারণাই নাই। তাহাদের চাষের প্রণালী কার্য্যকরী নহে। কার্য্যকরী প্রণালীর চাষ ও সার প্রভৃতি সম্বন্ধে তাহাদের কোন জ্ঞান নাই এবং অনেক ক্ষেত্রেই তাহাদের জমি উন্নত প্রণালীতে চাষের অনুপযোগী। অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক অসুবিধা ও বিপদের হাত হইতে তাহাদের রক্ষা পাওয়ার উপায় নাই। অর্থের সুব্যবহার ও অপব্যবহারের পার্থক্য তাহাদের বোধগম্য নহে। সুতরাং তাহারা ঋণ করিতে পারে কিন্তু শোধ দিতে পারে না। এদিকে ব্যাঙ্ক প্রভৃতির সুবন্দোবস্ত না থাকায় ফসল বিক্রীর পর তাহাদের হাতের টাকা শীঘ্রই অন্য হস্তে যায়। চাষী মাত্রেরই যে অবস্থা, ধানের চাষীরও সেই অবস্থা হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই, বরং অন্যান্য শস্যের তুলনায় ধানের মূল্য কম, সুতরাং ধানের চাষীর অবস্থা নিঃসন্দেহ আরও শোচনীয়। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, কেবলমাত্র ধানের চাষী নির্ণয় করা দুঃসাধ্য, সুতরাং ধানের চাষীদের অবস্থা স্বতন্ত্রভাবে পর্য্যালোচনা করা অতি দুরূহ।

চাষীদের এই সমস্যা সম্বন্ধে বহুদিন হইতেই বহু আলোচনা চলিতেছে, কিন্তু উহাতে তাহাদের সমস্যার সমাধান হয় নাই। সম্প্রতি ঋণসালিশী বোর্ডের সাহায্যে বাঙ্গালার চাষীদের পূর্ব্ব ঋণভার লাঘবের সুবন্দোবস্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহাতে তাহাদের পুনরায় ঋণ পাওয়ার সম্ভাবনাও কমিয়াছে এবং পুনরায় ঋণ না পাইলে এবং তাহাদের উৎপন্ন ফসল বিক্রীর সুবন্দোবস্ত না হইলে তাহাদের চাষ চলা দুষ্কর হইবে, ইহা আশঙ্কা হয়। কেহ কেহ মনে করেন, জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক সাহায্যে ও সরকারী কৃষি-ঋণের মেয়াদ বাড়াইয়া দিয়া সমস্যার সমাধান করা যাইতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সমস্যার মূল (১) প্রকৃতি ও (২) মনুষ্যরচিত বিধানে নিহিত। অর্থাৎ প্রথমতঃ জমির গুণ ও পরিমাণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন; এবং দ্বিতীয়তঃ জমির বিভাগ ও মধ্যবর্ত্তী উপস্বত্বভোগীদের জমির স্বার্থবিলোপ বাঞ্ছনীয়। বিভাগ দ্বারা ক্রমেই জমি অল্প ফলপ্রসূ হয় এবং চাষী ভিন্ন অপর লোক অর্থাৎ মধ্যস্বত্বভোগী জমির উপর নির্ভরশীল হইলে জমির গুণবৃদ্ধির প্রতি তাহার দৃষ্টি থাকে না। উভয় ক্ষেত্রেই ফল একরূপ, অর্থাৎ জমি ক্রমশঃ গুণহীন ও অল্প ফলপ্রসূ হয়।

প্রকৃত চাষী, চাষসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, মধ্যস্বত্বভোগী জমিদার, চাউলের কলওয়ালা, ব্যবসায়ী শ্রমিক, রেল ও ষ্টীমার কোম্পানী এবং অপরাপর মালবহনকারী, সরকার এবং দেশের

প্রভৃতি সকলেরই ধানের চাষে স্বার্থ আছে। ইহাদের মধ্যে কাহার স্বার্থ কতটুকু এবং স্বার্থ বজায় রাখিতে কে কতটা ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত, ইহা বিবেচ্য। বাস্তবিক পক্ষে ইহাদের কাহারও স্বার্থ কম নহে এবং সম্ভবতঃ একমাত্র মালবহনকারী ভিন্ন অপর কেহই ধানের চাষ সম্বন্ধে উদাসীন থাকিতে পারে না। চাষী ধান্য উৎপাদন করে এবং তাহার হাত হইতে বাহির হইয়া বিভিন্ন হাত ঘোরার পর ভোক্তাকেই ধানের মূল্য সর্বাপেক্ষা অধিক মূল্য দিতে হয়। জমিদারের খাজনা বাবদ এবং নিজেদের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন খরচের জন্য চাষী ধানের মূল্য বাড়াইতে চেষ্টা করিলেও পরবর্তীদের চাপে ও আর্থিক দুরবস্থার ফলে বাধ্য হইয়া ধানের মূল্য যথাসম্ভব নিম্নস্তরেই রাখিতে হয়। প্রকৃতপক্ষে চাষ হইতে চাষী যে উপকার পায় তাহা ক্রমশঃ এত হ্রাস হইতেছে যে, শীঘ্রই একদিন যদি চাষী চাষ পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন কর্ম সংগ্রহের চেষ্টা করে, তবে তাহাকে দোষ দেওয়া উচিত হইবে না। অন্য পক্ষে, চাষী ভিন্ন অপরেরও ধানের সহিত অর্থনৈতিক, ব্যবসায়িক ও আহার্য গ্রহণের সম্বন্ধ থাকায় তাহাদের পক্ষেও ধানের চাষ অত্যাবশ্যক। তাহারা চাষীর পরিশ্রমের ফলভোগ করে ইহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু উহা তাহাদের একটা সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফল ইহা মনে করা অসঙ্গত। বর্তমান কালের এই অবস্থা বিভিন্ন ঘটনার সমন্বয়ে উদ্ভূত হইয়াছে এবং আমাদিগকে তজ্জনিত ফল ভোগ করিতে হইতেছে। এই ঘটনাসমন্বয়কে আমাদের অনুকূলরূপে পরিবর্তিত করিতে পারিলে এই অবস্থা বিভিন্নরূপ হইবে এবং ধান্য হইতে আমরা অনুরূপ ফল লাভ করিব।

বিভিন্ন উপায়ে চাষ ও চাষীর অবস্থা উন্নত করা প্রয়োজন, ইহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু কেবল মাত্র এই দুইটী পন্থা দ্বারাই আমরা সম্যক্ ফল লাভ করিব না। জমির ন্যায় ধানেরও গুণ ও পরিমাণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন, অর্থাৎ মনুষ্যখাদ্যোপযোগী ধানের গুণবৃদ্ধি এবং পশু-খাদ্যোপযোগী ধান্য চাষের প্রবর্তন বাঞ্ছনীয়। উৎপন্ন ধান্যের পরিমাণবৃদ্ধি দ্বারা বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারতের একটী সুনির্দিষ্ট স্থান লাভ সম্ভব। একমাত্র চীনদেশের পরই উৎপাদক দেশ হিসাবে ভারতের স্থান, কিন্তু চীনদেশের ন্যায় ধান্যের রপ্তানী-বাণিজ্যে ভারতের কোন স্থান নাই। কোন কোন মালের চাহিদাবৃদ্ধির জন্য আজকাল নানা উপায় অবলম্বিত হয়; সেইরূপ বিভিন্ন উপায় অবলম্বনে আমরা ধান্যের চাহিদা বৃদ্ধির সহায়তা করিতে পারি। প্রাচীনগণ বিভিন্ন মাঙ্গলিক কার্যে ধান্য, তণ্ডুল ও তণ্ডুল-গুড়িকা প্রভৃতির ব্যবহার প্রবর্তন করিয়াছিলেন; কলপ প্রভৃতির জন্য বিভিন্ন কার্যে শ্বেতসারের ব্যবহার দ্বারা কাল রং, কালী প্রভৃতি মাল প্রস্তুতের উপকরণরূপে এবং এমন কি ইন্ধন স্বরূপেও ধান্যের ব্যবহার দ্বারা এবং ধান্যের জন্য ধান্যের গুণবৃদ্ধি দ্বারা বর্তমানে আমরা ইহার চাহিদাবৃদ্ধির চেষ্টা করিতে পারি। গুণবৃদ্ধির প্রচেষ্টা দুই প্রণালীতে করা যাইতে পারে। (১) উৎকৃষ্ট ভূমিতে জাত উৎকৃষ্ট ধান্যের বীজের সহিত এইরূপে জাত অপরাপর উৎকৃষ্ট শূকধান্যের বিভিন্ন শ্রেণীর মিশ্রণ দ্বারা এবং (২) এইরূপ উৎকৃষ্ট ধান্যের চাষের জন্য কৃত্রিম উপায়ে জমির গুণবৃদ্ধি দ্বারা উৎপন্ন ফসলের গুণবৃদ্ধি সম্ভব। পুনঃ পুনঃ রাসায়নিক পরীক্ষায় এইরূপ চাষ ও ফসলের উন্নতি অবধারণ করা যাইতে পারে।

এইরূপে ধান্যের, চাষীর ও ব্যবসায়ের উন্নতি হইলেই আমরা অন্ন ও আনন্দ লাভ করিব।

নূতন ধান্যের সহিত আমাদের যে দেশব্যাপী উৎসব হয়, উহার আনন্দ আমাদের কাহো নাই, প্রকৃত পক্ষে সে উৎসব আজ মাত্র আচার পালনেই পরিণত হইয়াছে। ধান্যের চাষী ও ব্যবসায়ী প্রভৃতি নিজ নিজ ক্ষেত্রে সম্যক্ ফললাভ করিলেই আমাদের এই গৌরবময় কল্পনা সার্থকতা লাভ করিবে, অন্যথা উহা আনন্দের শুষ্ক কল্পনাতেই পর্যবসিত থাকিবে মাত্র।

বাংলার মাটী

—শ্রীঅপরাজিতা দেবী

৫৮

'জীবন-নাটক খুলিল দ্বিতীয় দৃশ্য—
চির অজ্ঞাত—'

সকালে উঠিয়া মেজ-বৌয়ের মনে হইল হঠাৎ যেন নির্ব্বাসিত হইয়াছে,—অভ্যাস মত অনেক বেলাতে ঘুম ভাঙ্গিল। মা না ডাকিয়া দিলে কোন দিন ঘুম ভাঙ্গিত না। আজ ঘুম হইতে উঠিয়া একটা শূন্য ভাব তাহাকে ঘিরিয়া ধরিল। দু'দিন পূর্ব্বে সঙ্গিনীদের সঙ্গে বেশ আমোদেই কাটিয়াছে, কাল বৈকাল পর্য্যন্তও তারা সঙ্গেই ছিল, এখন এই 'ভূতপুরীর মধ্যে কি করিয়া দিন কাটিবে?

হিন্দুস্থানী ঠাকুরটি 'দাল ভাত তরকারী' বেশ ভালই রাঁধে, কিন্তু মেজ-রায় বেশী রকম আমিষভক্ত—এবং নিজে জীবদেবের মতনই সুরসিক সুপকার। ঠাকুরের হাতে না ছাড়িয়া দিয়া নিজেই পছন্দমত রাঁধিয়া লন। বাসার পিছনে নদী—জেলে নিত্য মাছ যোগান দেয়। ঝি সব ঠিক-ঠাক করিয়া বলিল, 'দেখ ঠাকুরজী, দৌদা মাছ রাঁধবে এখন, তুমি যেন সর্দ্দারি করে সব নষ্ট করে বসো না।'

এমন সময় একটা চাঙ্গারী করিয়া একটা লোক বহু যোগ্য কতকগুলি জিনিস দিয়া গেল। নূতন ডুরে ও রঙ্গিন সাড়ী, সেমিজ, সাবান, খুব বড় একখানা আয়না, এক শিশি সুগন্ধি তেল, গামছা এই সব।

বাড়ীর ভিতরে অনেকখানি জায়গা—এবং অনেক রকম গাছপালা, বধূ নিতান্ত উন্মনাভাবে গাছের তলায় তলায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ঝি বলিল, 'অ বৌমা, এস গো লক্ষ্মী মেয়ে, নেয়ে নিয়ে রাঁধবে এস, তেতে পুড়ে অত বেলায় বাবু আসবে, এসেই কি হাঁড়ী ধরবে? এখন তুমি এসে সব দেখে-শুনে করবে-কম্মাবে।'

মেজ-বৌ তিরিক্ষে মেজাজে জবাব করিল, 'কি বললে? আমি রাঁধব? বয়ে গেছে আমার, আমি রাঁধুনি এনেছি তোমাদের, নয়?'

বৌয়ের পরিচয় কাল সন্ধ্যার দিকে সে কিছু কিছু পাইয়াছে, কি আশ্চর্য্য হইল না, একটু হাসিয়া ভাবিল—ছেলে মানুষ, সবাইকে ছেড়ে এসে মন খারাপ লাগছে, তা বাবু যে সোনার মানুষ দুদিনে ঠিক করে নেবে। বলিল, 'না রাঁধলে নেই, সকাল সকাল নেয়ে নাও, এস।'

তেমনি ভাবে জবাব আসিল,
এখন নাইব না।'

ঘণ্টা দুই পরে মেজ-রায় বাড়ী আসিলেন। তাঁহার পাঠান জিনিস-পত্র সব তেমনি পড়িয়া রহিয়াছে, জানালা দিয়া দেখিলেন, বাড়ীর প্রাচীরের গায়ে গাছতলায় মেজ-বৌ হেলান দিয়া বসিয়া রহিয়াছে।

জামা জুতা ছাড়িয়া মেজ-রায় স্ত্রীর কাছে গেলেন, মেজ-বৌ তেমনি ভাবে চাহিয়া রহিল, মাথার কাপড়ও দিল না, উঠিলও না।

হাত ধরিয়া ঘরে আনিয়া, নিজে বসিয়া কাছে বসাইয়া স্বামী বলিলেন, 'মেজ-বৌ, কেন অমন করছ, এ তোমার শ্বশুর-বাড়ী, সব ফেলে কেন গাছতলায় বসে রয়েছ? আরে কেঁদেছ, চোখ মুখ ফুলে উঠেছে যে?'

মেজ-বৌ বলিল, 'এ আমার শ্বশুর বাড়ী নয়—আমি থাকব না এখানে—'

'তা তুমি বলতে পার। তুমি ভয়ানক নিষ্ঠুর, আমি তোমার স্বামী হই, আর তুমি এই কথা বললে? আমি কত আশা করে তোমায় এনেছি, তুমি আমার ঘর আলো করে থাকবে, সুখে দুঃখে আমায় দেখবে, সব সময় তোমায় দেখে আমি শান্তি পাব, সব আশা তুমি আমার ভেঙ্গে দিতে চাও?'

মেজ-বৌ চুপ করিয়া রহিল।

মেজ-রায় বলিলেন, 'ভেবে দেখ আমার কি কষ্ট, এই এত দূর দেশে একা পড়ে থাকি, অসুখ বিসুখ হলে কে দেখে? সেবার এক মাসে জ্বর ছাড়ল না—ঠাকুরের জ্বর, বিয়ের জ্বর, আমি সেই জ্বর নিয়ে উঠে উঠে এদের পথ্য দিয়েছি—নিজে করেছি। তুমি থাকলে কি এত কষ্ট হত আমার?'

একটু শান্ত—কি একটা বলিতে

কে বলে তোমার বুদ্ধি নেই ? ছ'মাস
তার পরে বাড়ী গিয়ে দেখবে সবাইকে—যারা
তোমায় বলে পাগল, বুঝবে তোমার দাম। তুমি ছাড়া
আমার কে আছে বল ? এই টাকা-পয়সা দেখ, যেখানে
সেখানে পড়ে থাকে, হিসাব মেলে না, তুমি থাক না বলেই
না আমার এই দশা ? চাকরী আমার—সংসার তোমার।'

মেজ-বৌ মুখ নীচু করিয়া রহিল, পাষাণ গলিতেছে যেন!

'কিছু খাও নি ? কেন ? শরীর খারাপ হবে না ? যাও
খেয়ে এস, তার পর আরাম করো, আজ বৈকালে নদীর ধারে
বেড়াতে নিয়ে যাব, আমার এক বন্ধু আছে তাদের বাড়ীও
নিয়ে যাব, বেশ ভাল করে ফিট-ফাট হয়ে সেজে থাকবে,
যেন কেউ পাড়াগেঁয়ে বলে নিন্দে না করে—খেয়ে দেয়ে চুপুর
বেলা ঘুমোও, আমি সকাল সকাল আসব, বেড়িয়ে টেড়িয়ে
এসে রাত্রে তোমায় অনেক গল্প শোনাব।'

মেজ-বৌ পাড়াগাঁয়ের মেয়ে—পাড়াগাঁয়ে বিয়ে হয়েছে,
রেলগাড়ী ঘুরে যাক, ষ্টীমারও কোনদিন দেখেন নাই। কোঠির
কাছে নিতান্ত অনাদরে মানুষ, সংসারের বিষু-বিসর্গ জ্ঞান
এপর্য্যন্ত জন্মে নাই।

দূর হইতে যাহাকে ভীষণ ভয়ের কারণ মনে হইত তাহার
কথা এত মিষ্টি, এমন নরম, এত ভালবাসা-ভরা কে জানিত ?
চোখের চাহনি কেমন হাসিমাখা, কি রকম ফিট-ফাট মাথার
চুল—পোষাক-পরিচ্ছদ, আজ এত কাছে বসিয়াও মেজ-
বৌয়ের কোন ভয় করিল না, বরং নিজের এলো-মেলো বেশ-
ভূষার জন্য মনে মনে লজ্জা হইল,—ইনিও তাকে পাড়াগেঁয়ে
ভাবিতেছেন না ত ?

'এখন যাও, খেয়ে এস, তোমার কাপড়গুলো বড় মোটা,
এ গরমে কষ্ট হবে, আমি খুব মিহি কাপড় কিনে পাঠিয়ে
দিয়েছি, এইগুলো পরো—ওগুলো তোমার তুলে রেখে দিয়ো,
নীতের সময় পরবে—'

এ ধরণের কথাবার্ত্তা মেজ-বৌ জীবনে প্রথম শুনিল।
কাপড়—তার আবার সরু মোটা কি, মা যে অত ভাল
বাসতেন, তা কৈ এ সব কথা বলেন নি ত! বাড়ীতে সবাই
মোটা কাপড় পরে, পাতলা কাপড় কেহই পছন্দ করে না।

মনে মনে লজ্জিত ও খুসী হইয়া মেজ-বৌ উঠিল।

ঘণ্টাখানেক পরে স্নানান্তে আসিয়া দেখিল, ঘরের মেঝেয়
দু' খানি জায়গা ; মেজ-রায় বলিলেন, 'এ কাপড় পরনি যে ?'

'ও ভাল কাপড় যে, বৈকালে বেড়াবার সময় পরব—'

জীবনে এই প্রথম সরস কথা মেজ-বৌয়ের মুখে, দিব্য
স্বাভাবিক ভাব—মুখে-চোখে বিদ্রোহের লেশ নাই। মেজ-রায়
সহাস্যে কহিলেন, 'এ কাপড়ও আটপৌরে—বেড়াবার কাপড়
আমি নিয়ে আসব—'

'আমার চুল বাঁধবার ফিতেটা ছিঁড়ে গেছে চুল খুলবার
সময়।'

'ফিতে আমি এনে দেব, আর কি লাগবে বল ?'

'আর কিছু না।'

'আচ্ছা এস, খেতে বসি —'

'আমি ? এখন না—'

'না কেন ?'

'আমার একা খেতে ভাল লাগবে না, তুমি আমি এক—
স্ত্রী স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গ—কোন দোষ নেই, খেতে বস।'

নিরুপদ্রবে মেজ-বৌ আসনে বসিল।

বিছানায় বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে মেজ-রায় পানের
ডিবাটা একটু ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন, 'এরা পান সাজতে
জানে না, শুনেছি তুমি খুব ভাল পান তৈরী করতে পার,
একটা সেজে দেবে ?'

কথাটি সত্য নয়, মেজ-বৌ কোন কাজই ভালরকম পারে
না এবং ঘরে পরে সবাই বলে, 'বড্ড অকর্ম্মা বৌ, এক সঙ্গে
বিয়ে হয়েছে দু'জনার, একই বয়েস, মেজ-বৌ কেমন কাজকর্ম্মে
—কেমন শান্ত, কেমন লজ্জা, আর এটা বৌও নয়, বৌয়ের
জাতও নয়, সাধে কি মেজ-কর্ত্তা বাড়ী আসে না ?' এজন্য
ও বড় ভাসুর কিছু বলেন নাই কোনদিন।

মেজ-বৌ ব্যস্ত করিয়া পান সাজিয়া আনিল, কথাটায় যে
খুব খুসী হইয়াছে তা মুখ দেখিলেই বোঝা যায়। মেজ-রায়
পানটি খাইয়া অত্যন্ত খুসী হইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'এমন মিষ্টি
হাত তোমার, এ পান খেয়ে মুখ বদলে গেল যে, এখন উপায়
কি হবে ? আর কি অন্যের পান-সাজা খেতে পারব ?'

মেজ-বৌ সহসা একটু হাসিয়া ফেলিল এবং হাসিটুকু
লুকাইয়া ফেলিয়া সরিয়া গেল। সে পিছন ফিরিবা মাত্র

মেজরায় আগের দাজা-পানের ডিবে হইতে গোটাদুই পান খুলিয়া খয়ের ও সুপারীগুলি লইয়া মুখে ফেলিয়া মেজ-বৌয়ের দাজা পানের সুপারী-খয়েরের অভাব পূরণ করিলেন এবং তাড়াতাড়ি পানগুলি আবার ঠিক করিয়া রাখিয়া ভাল মানুষ সাজিলেন।

এবার মেজ-বৌ আর একটা ডিবা করিয়া পান আনিয়া রাখিল, মেজরায় বলিলেন, 'এরি মধ্যে এতগুলো পান সেজে আনলে? এমন লক্ষ্মী তুমি? নাঃ—আমার আর কোন কষ্ট নেই।'

মেজ-বৌ মুখ একটু নীচু করিয়া বালিশের নীচের বইখানা লইয়া নাড়া-চাড়া করিতে লাগিল। মেজরায় বলিলেন, 'তুমি পড়তে জান?'

মেজ-বৌ মাথা নাড়িল।

'আমি প্রথম ভাগ নিয়ে আসব, কিন্তু কেন শেখ নি? তোমার দাদারা এমন বিদ্বান্।'

'জ্যোঠিমা পড়তে দেন নি—একবার বাবা আমাকে আর আমার ছোট বোনকে পড়াতে বলেছিলেন, জ্যোঠিমা রাগ করে বই নিয়ে গিয়ে উনুনে ফেলে দিলেন।'

মাতৃহীনার লাঞ্ছিত জীবনের ইতিহাস। এই জ্যোঠিমার ছেলেরাই সুশিক্ষিত এবং মেয়েরাও লেখাপড়া জানে—অথচ ইহাদের বেলা তিনি এমন অকরুণ।

'আমি তোমায় শেখাব, আমার কাছে পড়বে?' স্বামীর কণ্ঠ বড় কোমল করুণ, মেজ-বৌ একটু ভয়ে ভয়ে বলিল, 'যদি পড়ায় না পারি, বকবে না?'

'না—কিছু বলব না, তোমার কোন ভয় নেই, আমাকে তুমি একটুও ভয় ক'র না। যার কাছে স্বীকার করে এসেছি তুমি যাই কর না কেন, তোমাকে একটি মন্দ কথা বলব না।'

'তবে পড়ব, সবাই লেখাপড়া জানে আমি জানিনে—আমার বড় লজ্জা করে।'

এমনি করিয়া দু'চার কথায় মেজ-বৌয়ের সঙ্কোচ অনেকটা কাটিয়া আসিল।

সন্ধ্যাবেলা দুইজনে বেড়াইতে বাহির হইলেন, বন্ধুর বাড়ী খানিকক্ষণ কাটাইয়া নদীর ধারের পথে বেড়াইতে বেড়াইতে মেজ-রায় নদীর ইতিহাস, গ্রামের নাম, স্থানীয় লোকদের পরিচয় প্রভৃতি বিষয় বলিয়া বুঝাইতে লাগিলেন।

বাসায় ফিরিবার পথ ঘন ঝোপের মধ্যে, সেখানে জোৎস্না ভাল পড়ে না। কোথায় একটা বিড়াল মিউ মিউ করিতেছে। রাত্রিতে অনেক দেবতারা বিড়াল-মূর্ত্তি ধরিয়া চলাফেরা করে, সুতরাং মেজ-বৌ ভয় পাইয়া একেবারে মেজ-রায়ের হাত ধরিয়া ফেলিল। উড়ন্ত পাখী আপনা হইতে আসিয়া ডালে বসিল।

সে রাত্রের কথা মেজ-বৌয়ের মনে এখন উজ্জ্বল হইয়া জাগে। খাওয়া দাওয়ার পরে আলো নিভাইয়া দুইজনে শুইয়া আছেন। জোৎস্নায় অর্দ্ধেক বিছানা প্লাবিত, সুন্দর ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছে, মেজ-রায় দময়ন্তীর গল্প করিতেছেন, মেজ-বৌ তন্ময় হইয়া শুনিতেছে।

অনেক রাত্রে জোৎস্না সরিয়া গেছে, মেজ-রায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। মেজ-বৌয়ের চোখে ঘুম নাই। জীবন-বীণায় এক নবীন সুরের ঝঙ্কার উঠিয়াছে। বিগত পনের বছর এক নিমেষে ধূলিসাৎ এবং নূতন এক অপূর্ব্ব সুন্দর জীবনের আরম্ভ! সে অনাদৃতা লাঞ্ছিতা নয়; সকলের তুচ্ছ বা অবহেলার সে মেজ-বৌ নয়, চুলবাঁধা, কাপড় পরা, স্নান আহারের ধরণ পর্য্যন্ত একদিনে বদলাইয়া গেল এবং রাণীর সম্মান আসিয়া জুটিল, আর আশ্চর্য্য এই যে—যে-লোকটি তার তিন বছরের বিবাহিত জীবনের একমাত্র ভয় ও আশঙ্কার পাত্র ছিল, তারই হাতে এ সুখসৌভাগ্য—যে-চোখে শাসন ও তিরস্কার ছিল আর কিছু দেখে নাই, সেই চোখ এমন স্নেহবর্ষী—কথার সুরে কত ভালবাসা, একমাত্র তারই সুখ-স্বচ্ছন্দতা ভিন্ন আর অন্য কোন চিন্তা নাই। দুপুর বেলা হইতে বাড়ীর কথা, বিশেষ করিয়া মণি, মেজ-বৌ এমন কি বার কথাটাও একবারও মনে পড়ে নাই! মনে একটু লজ্জা হইল, কিন্তু নূতন মধুর আনন্দের কাছে সে লজ্জা টিকিল না। আপন অজ্ঞাতেই পাশ ফিরিয়া, পাখাটি তুলিয়া লইয়া মেজ-রায়কে বাতাস দিতে আরম্ভ করিল।

৪৯

'বিদ্যাপতি সেই প্রেম নীরবের কত—
অমির অনাদ্য আখে—'

বনের হরিণীকে পোষ মানাইবার ক্ষমতা মেজ-রায়ের ছিল, নিজে তিনি একজন প্রধান শুণী। গান গাহিতে জানেন,

রাজনার সিংহাসন—আবার রাজার নলরাজা বা ভীমসেন। এ অঞ্চলে তাঁর প্রভাব অসাধারণ।

মেজ বৌয়ের ছিল একটি ময়না, একটি শালিক ও একটি বিড়াল। বিড়ালটা পায়ে পায়ে ঘোরে। রান্না হইলে একবার করিয়া মিউ মিউ করিতে করিতে মেজরায়ের কাছে যায়, আবার ফিরিয়া আসে, যতক্ষণ না তিনি ফিরিয়া আসেন। শালিকটা খাব খাবার বলে, ময়না কি সুন্দর কথা কয়, একদণ্ড না দেখিলে 'ও ময়না আয়' 'ও ময়না আয়' বলিয়া চেঁচায়।

বাড়ীতে আসিয়া এ তিনটির পরিচর্যা করিয়া তবে নিজের স্নানাহার। প্রথমটা মেজ-বৌ দাঁড়াইয়া দেখিত, তার পরে যত্ন করিতে শিখিল। কিন্তু ময়নাটার সহিত একটু বিবাদ বাধিয়া গেল। মেজ-বৌয়ের স্বভাব—হঠাৎ তাতিয়া উঠা ও রুক্ষ জবাব দেওয়া। একদিন ময়না ছাতুর জন্য চেঁচাইতেছে, মেজ-বৌ বলিল, 'বাবা!—কি রাক্ষস! একবাটী ছোলা রয়েছে—তবু 'ছাতু দে—ছাতু দে—' ক'টা কি বেরেছু যে হুকুম করতে করতে খাবার দেবে?'

এই কথা শুনিয়া ময়না খাঁচার কোনে গিয়া গোঁজ হইয়া বসিল। মেজ-বৌ খাবার দিলে, ঠোঁট দিয়া ঠেলিয়া সমস্ত মাথা ছাতু ফেলিয়া দিল। ফলে মেজ-বৌ আর এক চোট গালাগালি দিল।

যথাকালে রায় বাড়ী ফিরিয়াই টের পাইলেন যে, ময়না নীরব 'বাবা আয়—ময়না আয়'—বলিয়া রঙে রঙে চেঁচায়, জামা কাপড় না ছাড়িয়াই খাঁচার কাছে গিয়া বলিলেন—'কি বাবা, কি হয়েছে?'

পিছন হইতে মেজ-বৌ বলিল, 'এই দেখ, কি হয়েছে? সব খাবার ফেলে দিলে—পাখীর এত রাগ—মানুষ হলে না জানি কি হ'ত—'

'তুমি বকেছিলে বুঝি? ও বকুনি সইতে পারে না।'

'ও বাবা, ওর সঙ্গে কথা কইতে ভয়ে ভয়ে কইতে হবে?'

'তা হলে সকাল থেকে কিছু খাওয়া হয় নি বুঝি? যাও দেখি আবার—'

যেমন মেজ-বৌ ছোলা দিতে গিয়াছেন—অমনি ময়না তাঁহার আঙুল কামড়াইয়া দিল।

ঝর ঝর করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। মানুষে পাখীতে ঝগড়ার ফলে এক অপূর্ব্ব রাগিণীর সৃষ্টি হইল। শালিকটা উড়িয়া উড়িয়া মাথায় ও কাঁধে বসিতেছে—পায়ে গা ঘসিয়া ঘসিয়া বিড়ালটি মিউ মিউ করিতে লাগিল, সামনে আদরের বউ মুখ ভার করিয়া দাঁড়াইয়া—ওদিকে খাঁচার মধ্যে ময়না ঘাড় বাঁকাইয়া চাহিয়া আছে। সে এক চমৎকার অবস্থা।

বধূর হাতের রক্ত জলে ধুইয়া পরিষ্কার নেকড়ায় বাঁধিয়া দিয়া, রায় খাঁচার দরজা খুলিয়া ময়নাকে বুকের উপর ধরিয়া অনেক আদর সোহাগ করিয়া ঠাণ্ডা করিলেন—শেষে নিজের হাতে খাবার দিয়া স্নান করিতে গেলেন।

খাইতে বসিয়াও অনেক কাজ—বাঁয়ে মেজ-বৌ—ডান দিকে বিড়াল—কোলের কাছে শালিক,—পাতের মুড়াটি মেজ-বৌকে, ডিমটি বিড়ালের প্লেটে—দুধ মাখা ভাতের ছোট বাটীটি শালিককে দিয়া তবে তাঁর নিজের খাওয়া,—আবার তিন জনার দিকে লক্ষ্য রাখা চাই—কার কি লাগিবে।

মেজ-বৌ গম্ভীর হইয়া আছে—নিত্যকার মত হাসিখুসী ভাব নাই। মেজ রায় বাঁকা চোখে বারকয়েক দেখিয়া দেখিয়া শেষে বলিলেন, 'তোমার কি হয়েছে? মুখ যে বড্ড ভারি।'

'আমার কি হবে? আমি কি শালিক? আদর করে কোলে বসিয়ে খাওয়ান হচ্ছে—সব ডিম কি মিনিকে দেওয়া হল?'

স্বরে অভিমান ভরা—মেজ-রায় হাসিয়া বলিলেন, 'ও-ডিম ভালবাসে।'

'ওঃ ভারি নবাব—কত বিড়াল দেখেছি, এমন বাবু বিড়াল দেখি নি, বাসি দুধ খান না—মাটীতে বসেন না।'

বিড়ালটি চোখ তুলিয়া একবার মেজ-বৌকে দেখিল।

যথার্থই ইহাদের উপর মেজ-বৌয়ের কিছু রাগ আছে। মেজ-রায়ের মন অনেকখানি ইহারা হরণ করিয়াছে। নিজের হাতে স্নান করান,—আদর করা—ইহাতে দৈনিক অনেকটা সময় যায়। আবার তরুণী বধূ ধীরে ধীরে যে প্রভাব ছড়াইতেছে—তাহা বেশ ভাল রকম বুঝিয়াই ইহারাও মেজ-বৌয়ের উপর আদৌ সন্তুষ্ট নহে। স্নেহের ভাগীদার পশু-পাখীও সহিতে পারে না।

বিছানার এক কোণে এই মোটা সাদা রঙের মুস্ত্রী বিড়ালটি বরাবর শুইয়া থাকে। খাইবার সময় তাহাকে একটা ছোট পিঁড়ি দেওয়া হয়, কোনদিন মাটিতে পড়ায় না বা বসে না। মেজ-রায় নিজে যাহা তাহার মুখে তুলিয়া দেন বা মুখের কাছে ধরেন, সেই খাবারটি ভিন্ন কোনদিন অন্য কোন কিছুতে মুখ দেয় নাই। বাড়া ভাতের থালার কাছে বসিয়া পাহারা দেয় রান্নাঘরে তাহাকে রাখিয়া অন্য বিড়াল ও কাকের জন্য নির্ভয় হইয়া ঠাকুর এদিক ওদিক ঘোরে।

দুপুরবেলা খানিক বিশ্রামান্তে পড়া—প্রথম ভাগের অর্দ্ধেক-অর্দ্ধি প্রায় শেষ হইয়াছে—সারা দিনে কথায় মেজ-বৌ মোটা-মুটি দিবা হিসাব লেখে, যথা—'বসিন পাঁচ পইসা তখন নংকা আধলের হাটা সইয়া দেয়—।'

ধারাপাতের কল্যাণে হিসাব মিলাইয়া সহজাত বুদ্ধির দ্বারা টাকাপয়সাও বেশ মিলাইতে পারে—খরচ-পত্র আজ-কাল সেই করে এবং টাকাপয়সা সব রাখে।

লেখাপড়ায় অখণ্ড মনোযোগ। বর্ণ-পরিচয় আগেই ছিল,—যতক্ষণ মেজ-রায় অনুপস্থিত থাকেন মেজ-বৌ বেশী সময় পড়া ও লেখা লইয়া কাটায়। এই জন্যই এতখানি উন্নতি হইয়াছে; সম্প্রতি মার কাছে নিজের হাতে একখানি চিঠি লিখিতে আরম্ভ করিয়াছে,—কিন্তু লাইন দুই লিখিয়া চিঠির কাগজটি ভরিয়া যাওয়ায় ও আর কথা না যোগানতে চিঠি অসমাপ্ত রহিয়াছে।

হেমন্তের আকাশেই শীত পড়িয়াছে বেশ। রাত্রি প্রায় দশটা হইবে—পাড়া নিঃশব্দ, কেবল অদূরের নদীর ধার হইতে জেলেদের কথাবার্ত্তার গুঞ্জনসুর মাঝে মাঝে শোনা যায়। নৌকায় আগুনজ্বালা উনানের পাশে বসিয়া তামাক খাওয়া শেষ হইলেই মাঝনদীতে নৌকা ভাসাইয়া চলিবে। নদীর দিকের দেওয়ালে একটা নূতন জানালা কাটা হইয়াছে—মেজ-বৌয়ের নদী দেখিবার জন্য।

ঘরের দ্বারজানালা বন্ধ—বিছানায় বসিয়া মেজ-বৌ 'ঠাকুরমার ঝুলি' পড়িতেছে,—উত্তর দিকের মেয়া বারান্দায় কি ঘুমে অজ্ঞান।

হঠাৎ দরজায় ধাক্কা পড়িল, মেজ-বৌ চমকিয়া চাহিল কোন পদশব্দ নাই, অথচ ধাক্কা,—একবার মনে হইল কুকুর, তখনি আবার আর একবার ধাক্কা—এ ঠিক মানুষের হাত—

মেজ-বৌ হঠাৎ উঠিয়া নদীর দিকের জানালা খুলিয়া দেখিল—জেলেরা তখনও ঘাটে, নৌকা ছাড়ে নাই। আবার ফিরিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া বিছানার শিয়রের জানালা খুলিল, খাজাঞ্চিখানার বারান্দায় ব্রাহ্মণ বরকন্দাজ দু'জন কম্বল পাতিয়া বসিয়া কথাবার্ত্তা বলিতেছে। খাজাঞ্চিখানার পিছনে যে ঘর একখানা ঘর তাহাতে আগন্তুক এবং পাইক-পেয়াদারা থাকে—তাহাদেরও সাড়া পাওয়া গেল। অনেকেই ঘুমায় নাই।

দুই দিকেই সজাগ লোক জন দেখিয়া মেজ-বৌয়ের সাহস বাড়িল, জানালার শিক ধরিয়া মুখ ফিরাইয়া দরজার দিকে চাহিয়া রহিল—

—আবার দরজায় ধাক্কা—মেজ-বৌ চীৎকার করিয়া ডাকিল, 'ঠাকুর, ঠাকুর!—'

এদিকে মেজ-রায়ের ব্যস্ত বিব্রত সুর শোনা গেল—'আমি—আমি, মেজ-বৌ—আমি,' ওদিকে—'কুছ্ ডর নেহি—মা জি, কুছ্ ডর নেহি'—বলিতে বলিতে বড় বরকন্দাজটি লাঠি হাতে ছুটিয়া আসিল।

মেজ-বৌ ব্যাপারটা বুঝিয়া জানালা ছাড়িয়া সরিয়া আসিয়াছে, মেজরায় বরকন্দাজের দিকে আগাইয়া যাইতে যাইতে বলিলেন, 'আমি, এই মাত্র ফিরলাম।'

'ও বাবু!' তাহারা চলিয়া গেল। মেজ-বৌ দ্বার খুলিয়া দিয়াছে—মেজ-রায় ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, 'বেশ কাণ্ড করে তুলেছিলে, পেনি ওদের লাঠিতে আমার মাথাটি দু'খানা হয়ে যেত।'

লজ্জিত হইয়া মেজ-বৌ বলিল,
ভয় পেলে হুঁসের চেঁচিয়ে ডাকতে।'

'ভালই করেছ—আমি না হয়ে আর কেউ হলি হত? এবার অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েছি মেজ-বৌ, কাযাকালে তুমি যে সাহস হারাও নি, সত্যিই বড় আনন্দের কথা।'

'এতদিন ধরে পাখী-পড়া করে শিখাচ্ছ—তাও শিখব না? এখন হাত পা ধোও—খেতে বস।'

বেশী দিনের জন্য মফঃস্বল যাওয়া এ কয় মাসে এই প্রথম, মেজ-বৌ ব্যস্ত হইয়া আলো বাড়াইয়া দিল, হাত মুখ ধুইয়া আসিয়া আসনে বসিয়া মেজ-রায় বলিলেন, 'তুমি খাও নি?'

'না, আসবে আসবে করে বেগে বসেছিলাম,—বলেছিলে বৈকালে আসবে—এত দেরী করে এলে? কৈ গাড়ীর শব্দ পেলাম না যে?'

'গাড়ী দূরে রেখে হেঁটে এসেছি—তোমাকে ভয় দেখাব বলে।'

খাওয়ার পরে মেজ-বৌ নিজের হাতে ঈষানের আগুন দিয়া তামাক সাজিয়া দিল। একটা বড় রকমকে কাঁসার বাটী ভরা লাল পান গোলাপ জলে ভিজানো কয়সা নেকড়া দিয়া ঢাকা। একখানা চৌকিতে বাক্সগুলি ঘরের এক দিকে সাজান ছিল, সেই চৌকিখানা শোবার চৌকির সঙ্গে জুড়িয়া একটি ছাই রংয়ের বিলাতী কম্বলে ঢাকা হইয়াছে এবং একটি ডাকিয়া দিয়া বসিবার বিছানা করা হইয়াছে। সেইটায় মেজ-রায় বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে সমস্ত ঘরের পরিষ্কার সুশ্রী ভাবটি দেখিতে লাগিলেন। কাছারী-ঘরের উঠানে যে বেঞ্চিগুলি থাকে তাহার একখানা আনিয়া বাক্স ও ক্যাস-বাক্সগুলি উপরো-উপরি রাখা, বাক্সে সবুজ ছিটের ঢাকনী দেওয়া, ক্যাসবাক্স দুটিতে সাদা কাপড়ের ঢাকনী, আলনার জামাকাপড় দিয়া পরিপাটী, জুতাগুলি পরিষ্কার করা। মেজ-বৌ নিজেও সুন্দর ফিটফাট—আটসাঁট খোপায় সোনার চিরুণী। এই ঘর ও এই ঘরের নবীনা কর্ত্রীটিকে দেখিলে আজ কে বলিবে যে, রাঘবাড়ীর সেই আধ-পাগলা মেজ-বৌ এই, যে শুছাইয়া কাপড়টা পরিতে বা চুলটা জড়াইতেও জানিত না।

সফলতার একটা গৌরব আছে, মেজ-রায়ের হাতে-গড়া এই কর্মকুশলা বৌটি, প্রেমের চেয়ে স্নেহের মাত্রা অনেক-খানিই বেশী।

মেজ-রায় বলিলেন, 'কৈ দেখি এতদিনের লেখাপড়া?'

মেজ-বৌ হাতের লেখার খাতা দেখাইল, এবং নিজের চেষ্টায় যেটুকু পড়িয়াছে তাহাও পড়িয়া শুনাইল।

মশারী ঝাড়িতে ঝাড়িতে মেজ-বৌ একটু কুণ্ঠার সঙ্গে বলিল, 'আজ কি গল্প শোনাবে? মফঃস্বল থেকে এলে, তোমার শরীর হয় ত ভাল নেই—'

'না, আমি বেশ আছি। তোমার গল্প না শোনালে আমারও ঘুম হবে না—তোমারও ঘুম হবে না, আচ্ছা, চিঠি-পত্র আসে নি কিছু?'

'হাঁ, বাড়ীর চিঠি, আমি পড়তে পারি নি—এই নাও।'

চিঠি পড়িয়া মেজ-রায় হাসিয়া বলিলেন, 'মা যেতে লিখেছেন তোমায় নিয়ে।'

'সত্যি? যাবে?'

'যাব বৈকি, মাসখানেকের মধ্যেই কাজ কর্ম সেরে নিয়ে ছুটী নেব—কিন্তু আমার বড় ভয় হচ্ছে—'

'কি ভয় হচ্ছে?'

'ভয় এই যে—তুমি যদি না আসতে চাও আর।'

'এই ভয়? আমি কি তেমনি ভয় আছি? আমার বুদ্ধি হয় নি একটুও—না? তোমায় কাছে না এলে আমি বাঁচব বুঝি? কে আমায় রোজ রাত্তিরে এমন নতুন নতুন গল্প শোনাবে? কে এত আদর করবে—ভালবাসবে?' মেজ-বৌ হাসিতে লাগিল। নিঃসঙ্কোচ সরল হাসি।

'মাকে ভুলে গেলে মেজ-বৌ, এত শীগ্‌গির?'

'মাকে বুঝি ভোলা যায়—এই তোমার বুদ্ধি? আমরা মাকে আর চারুকে নিয়ে আসব এবার, কেমন? ওদের কথা ভেবেই আমার মনে যা কিছু কষ্ট।'

রামায়ণ মহাভারতের নামই শুধু মেজ-বৌয়ের শোনা ছিল, এ আট মাসে প্রতি রাত্রে ঘুমাইবার আগে একটি করিয়া কাহিনী মেজরায় বলেন। মহাভারত প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, গল্পের মধ্যে সামান্য ভুল থাকিলেও মেজ-বৌ এখন ধরিয়া ফেলে, নিজে পড়িয়া বোঝার চেয়ে মেজ-রায়ের মুখে শুনিয়া সহজে সে ভাল বুঝিতে পারে।

বাতি নিভাইয়া কম্বল গায়ে দিয়া একজন স্বভাবমধুর কণ্ঠে নারীপর্ব্বের সকরুণ ইতিহাস বলিতে লাগিল, আর একজন অতি নিবিষ্ট মনে তাহা শুনিতে লাগিল। অনেকটা দাদা-নাতনীর ধরণ, ঠাকুরদা'রা যেমন ঘুমের আগে নাতিনী-দের গল্প বলিয়া শোনান, তেমনি। বয়সের ব্যবধান উভয়ের মধ্যে আর নাই—এখন দু'জন দু'জনের সুখদুঃখভাগী অন্তরঙ্গ বন্ধু।

৫০

'অরুন্ধতী প্রীতিপ্রবাহিণী—'

এই দম্পতির জীবন সাধারণের মতন ছিল না। কে এমন করিয়া একটি পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিতা আধ-পাগলা

স্ত্রীকে পড়িয়া নিখুঁত করিয়া তোলে? কে এমন করিয়া পাখী-পক্ষীর মত করিয়া সংসারের সমস্ত রীতি-নীতি, মায়া-স্নেহ, ভয়া-ভক্তি—কাজ-কর্ম্ম হইতে সেবা-পড়াটি পর্য্যন্ত, স্নেহের ঘর, চুল বাঁধা, আলতা পরা, পান খাওয়া, সব শেখায়? দিনে দিনে তিলে তিলে শিক্ষা চলিয়াছে—দিবানিশি ধরিয়া। একজন প্রাণ ঢালিয়া শিখাইতে ব্যস্ত—আর একজন প্রাণ দিয়া শিক্ষা লইতে উন্মুখ। সেবা-পড়ায় মেজ-বৌ খুব বেশী অগ্রসর হইতে পারেন নাই। পড়িতে ও বুঝিতে একটু কষ্ট হইত, সাধারণ হিসাব-পত্র ও দু' একখানা চিঠি লেখা ভিন্ন বিদ্যার অপর প্রয়োজন সমস্ত তিনি স্বামীর নিকট হইতে শুনিয়াই পূরণ করিয়া লইতেন।

প্রায় বছরখানেক পরে মেজ-বৌকে দেখিয়া দেশের লোক সবাই অবাক্,—বাড়ীর লোকের আনন্দ ধরে না। মেজ-বৌয়ের হাতের রান্না ও পান খাইয়া কৃষ্ণ রায় আত্মীয় বন্ধুদের ডাকিয়া পরীক্ষা করান ও সগর্ব্বে বলেন, 'আমি তখনই বলেছি, সব শিখবে, মেজ-বৌমার খুব বুদ্ধি,—তোমরা ত সব হাল ছেড়ে দিয়েছিলে।'

মা বিদেশের এত দিনের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। বলিলেন, 'এত সব শিখলি কি করে? খুব ঝকমারি খেতে হত বুঝি?'

বাতুলীনার মা,—অনেক দিন পরে মেজ-বৌ মার কোলের কাছে শুইয়াছে, মেজ-বৌও নিজের ঘর ছাড়িয়া মার বিছানায় ছুটিয়াছে। মেজ-বৌ বলিল, 'না, মা, একটুও না। কত অন্যায় করেছি, কত জিনিষ নষ্ট করেছি, কোন দিন একটী কথা বলে নি,—তোমার চেয়েও বেশী ভালবাসে মা।'

ঘর অন্ধকার—মার মুখের হাসি ও চোখের জল কেহ দেখিতে পাইল না।

'এবার তুমি আর চাকু যাবে মা, সত্যি করে বল যাবে।'

'আমরা আর কি যাব মা, তোরা সুখে সচ্ছন্দে থাকলেই আমার সুখ।'

মার যাওয়া আর হয় নাই। ইহার বছরখানেক পরে মা অসুস্থ হইলে সেবার জন্য মেজ-বৌ বাড়ীতে রহিল। তার পরে মা স্বর্গে গেলেন।

এ পর্য্যন্ত মেজ-বৌ বেশীর ভাগ বিদেশেই কাটাইয়াছেন। ক্রমে বাড়ীর মেয়েদের বিবাহ হইল,—ছেলেরা পড়া ও চাকুরী লইয়া বিদেশে ছড়াইয়া পড়িল। একে একে তাহারাও বিবাহ করিয়াছে, তাদের ছেলে-পিলে বৌ লইয়া সকলেও একাধিকবার সংসার। কৃষ্ণ রায়ের বড় ছেলের প্রথম স্ত্রী একটী ছেলে ও একটী মেয়ে রাখিয়া স্বর্গবাসিনী হইয়াছে। সেই মেয়ে পিসিমার চোখের মণি ছিল, তাহাকে এতটুকু হইতে বুকে ধরিয়া মানুষ করিয়াছেন, এখন সে বিদেশে বাপ ও সৎমার কাছে থাকিয়া এ পক্ষের ভাই-বোনদের সঙ্গে লেখা পড়া করে। পিসিমা তারই কল্যাণের জন্য তাকে কাছছাড়া করিয়াছেন। এখন সংসারে সে মেয়েটির স্থান লইয়াছে।

গ্রামের মধ্যে এত বড় সংসার আর নাই, বিদেশে যারা থাকে, বাড়ীর দিকে টান তাদের ঠিক চুম্বকাকৃষ্ট লোহার মত। মেজ-রায় এ সংসারের জীবন্ত আবলম্বরূপ ছিলেন। উৎসব-ব্যাপারে তিনি নেতা,—তাঁর ঘরে সকলের আড্ডা। দিনে দু'শো পান তাঁর একার চাই,—আর তিনশো-অঙ্ক সবলের। এ সাধারণ দিনের খরচ—আর ক্রিয়াকর্ম্মের কাণ্ডে ত' খরচের কথাই নাই। বাহিরের তাসের ও তামাকের বৈঠক তাঁহাকে ঘিরিয়া অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত চলে। ওদিকে মেজ-বৌয়ের ঘরে পানে ও কড়ি খেলার আড্ডা। কি আনন্দ-বর্ণাধারার মধ্যেই দিনগুলি কাটিয়া গিয়াছে! ভোজন-বৈঠকে পরিবেশন করিবেন নিজে, আবার সমান করিয়া কলা-পাত কাটা দেখাইয়া দিলেন, পাড়ার বিখ্যাত রাঁধুনীরা রাঁধিতে বসিয়াছেন—তাতের প্রকাণ্ড হাঁড়ি কয়জনে মিলিয়া হয় ত ধরিয়া নামাইবার সুবিধা পাইতেছেন না। মেজ-রায় হাতের গামছা দিয়া ধরিয়া হাঁড়ি নামাইয়া দিলেন, বলিলেন, 'পল্লিনীরা হাঁড়ি নামাতে পারেন না। এই এক এক হাঁড়িই এক এক থালায় ঢেলে নিয়ে বসবেন এখন।'

'অ্যাঁ, বল কি? আমরা কি এই রকম খাই, হ্যাঁ ঠাকুরপো? লোকে শুনলে বলবে কি?'

'বলবে খুব অন্যায় কথাই। ঘরে দোর দিয়ে বসে খেও, ও কাজটা আড়ালেই ভাল চলে।'

'আ মরণ!' মেজ-রায়ের পিছন পিছন তাঁহাদের খিল খিল হাসি!

মেজ-রায়ের নিজের বাসাও একটি হোটেলের মতন ছিল। এক দল পাচক-বেহারা বাসার কাছে ছিল। সারা

দিন পরে কাহাকেও না বলিয়া
অতিথি হইত। এ ছাড়া যখন যা
ত লগা সর্ব্বদা।

দেশের আত্মীয়, কুটুম্ব, বন্ধু, পরিচিত, অপরিচিত যে কেহ হউক বিনা বিধায় গিয়া মেজ-রায়ের বাসাতে উঠিত—এবং দু' মাস হইতে এক বছর পর্য্যন্ত থাকিত। ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য ছুতার, মিস্ত্রী, নাপিত, ধুবা, মুসলমান, হিন্দু, যেই হউক না কেন, সকলের জন্য মেজ-রায়ের দ্বার খোলা। যতদিন ইচ্ছা থাক, খাও। অ বেলায় একদল বৈষ্ণব আসিয়াছে, তৎক্ষণাৎ সেবার আয়োজন আরম্ভ হইল। রাত দুপুরে হয় ত কোন ট্রেন ষ্টীমার কি বরযাত্রীর দল বিপন্ন হইয়া অতিথি, মেজ-রায় নিজে প্রকাণ্ড হাঁড়ি চাপাইয়া দিয়াছেন উনান জ্বালিয়া। দেশে বিদেশে সর্ব্বত্র সম্মানে ও সুখ্যাতি এমন দ্বিতীয় আর কাহারও ভাগ্যে জোটে নাই। ছুলছড়ি, গাইবান্ধা, গোয়ালন্দ প্রভৃতি ভাগ্যের হোটেলে উঠিয়া কয়েক ঘণ্টা ব'সিয়া অপেক্ষা করিতে হইত, নিজেই বাজার করিয়া আনিয়া রান্না চড়াইয়াছেন এবং অতিথি জুটাইয়াছেন, তা ষ্টিমারী কলীর কেহ হউক কিংবা তাঁহারই মত যাত্রী হোক।

এমনি যে স্বামী, সমস্ত দুঃখকষ্ট, অভাব অসুবিধা হইতে যিনি আড়াল করিয়া ঢাকিয়া রাখিতেন, সেই স্বামীর অভাবে যে বাঁচিয়া থাকে, তার কি কঠিন প্রাণ।

৫

'দুইটি জ্বর-বীণা একতানে বয়।'

গভীর নিশি, মেঘ করিয়া টিপি টিপি বৃষ্টি পড়ে, শীত আরও প্রবল। বাতাসে ঘরের আশপাশের সুপারী ও আম গাছের মধ্যে আলোড়ন ওঠে, অন্ধকার সূচী-ভেদ্য, তাহারই মধ্যে কম্বলের আবরণে দুই বাঁদিনী, একজন বিগত দিনের ইতিহাস বলে, আর একজন সমস্ত মন দিয়া তাহা শোনে। এ একদিনের কথা নয়—দিনে দিনে, ধীরে ধীরে, যখন কেউ জাগিয়া থাকে না, তখনই বলা ও শোনার সময়।

আবার অনেক সময় দুপুরবেলা কাঁথা সেলাই করিতে বসিয়াও কথাবার্ত্তা হয়, বড়-বৌ সূতা তুলিয়া দেয়, মেজ-বৌও কাছে বসিয়া শোনেন, মাঝে মাঝে বলেনও, মেজ-রায়ের জন্য তাঁর নিজের ভাইবোনেরা যত দুঃখিত মেজ-বৌ তার অনেক বেশী। এখন আর বাপ-বাড়ীতে তেমন আদরের হাট বসে না, দিন চলিয়া যায় এই মাত্র। কুল গাছে চড়িয়া কুল পাড়িয়া ফেলিতেন, বাড়ী শুদ্ধ বৌ-ঝি তাহা কুড়াইত, তার পর ধনেপাতা, লঙ্কা, নুন, তেল ও চিনি দিয়া সেগুলির উপাদেয় চাটনী করিয়া বিতরণ করিতেন সমভাগে। তাই-ঝি ভাগ্নীদের ডাকিতেন, 'আটকুড়ির মা—পেত্নীর মা' বলিয়া। বড়-বৌয়ের মাথাধরের হাত ছিল বেশ, মেজ-রায় বলিতেন, 'ও, বুঝেছি বুঝেছি বড়-বৌ, ওরা কি না বড় বেশী রকম সুশ্রী হয়েছে দেখতে, তাই তোমার হিংসে হয় ওদের উপর—অমন তেঁতটে নাক', তিনকিঁকে' মুখ ওদের হয়নি কি না—তাই তোমার এত রাগ! তা রাগ করে আর কি করবে বল? বিধিদত্ত যে গেছই পাথার ধরায়।' বড়-বৌ নাম-ডাকের সুন্দরী, তবু স্বভাবসিদ্ধ সন্দেহ যায় কোথা? এক সময় নিভৃতে আয়নায় মুখ দেখিয়া ভাবেন—সত্যিই কি তিনকিঁকে মুখ আমার? কে জানে, মেজঠাকুরপোর কোন্ কথাটা সত্যি আর কোন্‌টা মিথ্যা, তা যদি কোন দিন বুঝা যায়!

মুখে জবাব দেন—'হাঁ গো ভাই, নিজেরা সুন্দর কত! ভাই বোনেদের রঙের ভেল্লায় ঘরে বাতি জ্বালতে হয় না—'

মেজ-রায়ের ভাই-বোন প্রায় সবই শ্যামবর্ণ—দুটি বোন ফরসা, তবে বড়-বৌয়ের মতন কেহই নয়। মুখে যতই ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়া জ্বালাতন করুন না কেন, এমন দরদী বন্ধু আর কেহ নয়, তা সবাই জানে। সকলের সারা বছরের অভিযোগ জমা থাকে মেজ-কর্ত্তার জন্য।

বড়-বৌ নিজের সঙ্গে মেজ-বৌয়ের কথা মনে মনে মিলাইয়া বিচার করিয়া দেখে, মেজ-বৌয়ের মত অত সরল আত্মভোলা নয় সে, আত্মজ্ঞান তার প্রখর—অন্তরের মধ্যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি—সহজে গলিয়া যায় না। বিশালের ব্যবহার মেজ-রায়ের মত নয়। অমন করিয়া সে বড়-বৌকে মানুষ করে নাই। তবু বড়-বৌ ভাবে, মেজ-রায়ের ব্যবহারে স্নেহের পরিচয় যত বেশী প্রেমের ভাব তত নয়। কিন্তু বিশাল! বিশালের কথা ভাবিতে ভাবিতে বড়-বৌয়ের মন আর মেজ-বৌয়ের কথায় থাকে না।

মাঝের সে ভীষণ দুঃখদুর্দ্দশার দিন বড়-বৌয়ের ভাল মনে পড়ে না—আবছা রকম স্মৃতিটুকু আছে, কিন্তু শেষের দিকে গত কয় বছর সে যেন স্বর্গের কথা, এ-মর্ত্তের নয়।

সেই যে প্রথমবার মেজর বাড়ী গেল দুই জনে, টাকার জোর বেশী নাই, হার আর চুড়ি কয়টি গড়াইতে ভগীপতির কাছে কিছু দেনা হইয়াছিল, এক বছর ধরিয়া কিছু কিছু করিয়া দিয়া সে দেনা শোধ করিয়াছে। গহনা দেখিয়া মায়ের সে কি দারুণ অভিশাপ! তখন মার কোন কথা বড়-বৌ গায়ে মাখে নাই। সেই বিছানার বিশ্রামের রাত্রি প্রতীক্ষা, বড়-বৌয়ের ব্যস্ততা, সব কাজ কেবলি ভুল হয়, তাড়াতাড়ি করিতে গিয়া আরও দেরি হয়, ছোটবাবেরা বুঝিয়া হাসে, হাতের কাজ কাড়িয়া লইয়া পাঠাইয়া দেয়, সেই নৌকায় নৌকায় গ্রামান্তরে উদ্দেশ্যহীন আনন্দে ভ্রমণ, চলন্ত নৌকার উপরে দু'জনের রান্নার আয়োজন, বসিয়া বসিয়া দুই দিকের ছবি দেখা, আর কথা, হাসি, সমস্ত শুরু-পক্ষটা নৌকায় কাটাইয়া সুখের ঘোল আনা ভরিয়া যখন বড়-বৌ বাড়ীতে পা দিল, তখন আর একটি সোনার প্রতিমার সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে।

'সে তো স্বামী রেখে স্বর্গে গেছে—লক্ষ্মী ছিল—তাই, আমার পাপের সীমা নেই না মেজ-খুড়িমা? আচ্ছা—তুমি যে স্বপন রোজ মেজ-কাকাকে—তাতে তোমার মন ঠাণ্ডা হয়?'

'না হলে বেঁচে আছি কি করে? দিনটা কোন রকমে কাটলেই হয়, রাত্তিরে আমার আগের দিন ফিরে আসে না—সেই হাতে হাতে পান দিচ্ছি—জল দিচ্ছি, কি দুজনে বেড়াচ্ছি,—বাতাস দিচ্ছি, সব সেই রকম, চেহারাও ঠিক তেমনি—অসুখের চেহারা নয়।'

'অমনি করে দেখতে পেলে আমার হয় ত এত কষ্ট থাকবে না।'

সে দিন সকালবেলা হিমু শ্বশুর-বাড়ী যাইবে, মেজ-বৌ বিষম ব্যস্ত। অনেক বেলায় হঠাৎ মনে হইল বড়-বৌ আজ একবারও আসে নাই—একবার কাহাকেও পাঠাইবেন ভাবিলেন—কাজের চাপে তখনই আবার ভুলিয়া গেলেন।

স্নান করিতে সেদিন দুপুর উৎরাইয়া গেল। শেষ বেলায় জলে নামিয়া কমলকে বড়-বৌয়ের খোঁজে পাঠাইলেন।

সন্ধ্যাহ্নিক সারিয়া উঠিয়া দেখেন কমল আসিতেছে—বলিলেন, 'কৈ রে বড়-বৌ কৈ?'

'সে ছোট-বৌদির কাছে বসে রয়েছে—ছোট-বৌদির জ্বর হয়েছে যে—'

'এই টুনু ফেনে আসতে তোমার বেড় ঘণ্টা লাগল? ডাকলিনে তাকে? উপোস করে মরবে না কি?'

'উপোস করে নি—গুরুমা বললে—বড়-বৌদি নিজের হাতে রেঁধে সবাইকে খাইয়েছে, নিজেও খেয়েছে—মেজ-বৌদিকে সব কাজ একা করতে হচ্ছে—রাঁধবার সময় পায় নি।'

মেজ-বৌয়ের নির্ম্মল মনটি একটা শান্ত রসে ভরিয়া উঠিল।

রাত্রিতে বড়-বৌ আসিল না। মেজ-বৌয়ের খবর লইবার বড় ইচ্ছা ছিল না—আহা—যদি আবার নীড় বাঁধিতে চায়—কেন ব্যাঘাত ঘটান?

আবার মনে হইল বড়-বৌ যদি ভাবে মেজ-খুড়িমা একবার খোঁজও করিলেন না, যদি মনে কষ্ট পায়।

অনেক রাত্রি—সরলার জ্বর কম দেখায় মেজ-বৌ আবার উঠি উঠি করিতেছে, সুখেন দুই ছেলে লইয়া বাহিরের বৈঠকখানায় শুইয়াছে। ছোট ছেলে দুটি মার আশায় বিছানায় ঘুমন্ত। মাথার কাছে পাখা হাতে বড়-বৌ, সর্ব্ব-বিরক্ত উদাস চেহারা—চুলের গোছা একবারে ছোট করিয়া ছাঁটিয়া ফেলা।

মেজ-বৌকে আগেই সরলা দেখিয়া বলিল, 'আসুন খুড়িমা—দেখুন দিদি কি করেছে—নাইতে যাবার আগে চুল কেটে ফেলেছে, উনি দুঃখ করলেন কত—'

মেজ-বৌ বলিলেন, 'তা বেশ করেছে, জঞ্জাল বৈ ত নয়, ঝাঁচড়াও—বাঁধ—কত সময় নষ্ট আর কত উৎপাত।'

'সুখেন বুঝি বাইরে শোবে?'

'হ্যাঁ, এ-ঘরে দিদি থাকবেন—দুই ছেলেরা বড় বিরক্ত করে—'

কথাবার্ত্তা বলিয়া যাইবার সময় মেজ-বৌ বলিলেন, 'সকাল বেলা পারিস তো যাস্—আর একা নিরু কত করবে, সকালে কমলকে পাঠিয়ে দেব।'

বড়-বৌ বলিল, 'খুড়িমা, রয়েছি বটে, একটু মন লাগছে না—না করলে নয় তাই করছি—'

মেজ-বৌ বলিলেন, 'লাগবে না লাগবে—না লেগে উপায় কি? মরণ তো আসবে না।'

সরলা ভাল হইয়া উঠিতে দিন সাত আট গেল, কিন্তু বড়-বৌ আর আসিল না।

ঘাটে সরলার সঙ্গে দেখা হইল—মেজ-বৌ জিজ্ঞাসা করিলেন, সরলা বলিল, 'বড়দি ভালই আছে—তবে কথা-টথা কয় না বড়, রাত্তিরে বেলি, কানু, খোকা, ওঁর কাছে থাকে—তবে তারা থাকে চৌকিতে—বড়দি মেজের বিছানা করে শোয়, ছেলেপিলেরা সব সময় কাছে কাছে থাকে—আগের মতন বড়দি আর ভালবাসে না, বেশী সময়ই জপ-সন্ধ্যা নিয়ে থাকে।'

'বাসবে, ভালবাসবে—এখন কি না মন বজ্ঞ—'

'না খুড়িমা, না-বাসাই ভাল। ওদের ভালবেসে ওদের পেছনে যদি বড়দি সময় নষ্ট করে, তবে নিজের কাজ করবে কখন? এ সংসারে এসে সুখ করলে খুবই, এখন পরকালের কাজ করুক, যদি পরে সুখী হয়। আর যা সব স্বভাব হচ্ছে ছেলেপিলের খুড়িমা, যদি দেখ—একটা কথা শোনে না, মা বাবা মানে না, মেজ বৌদির ছেলেপিলেগুলো বেশ নরম স্বভাব—আমারি পেটে যত শত্রুর এসে জন্মাচ্ছে।'

'ছেলে বেলায় সবাই অমনি থাকে, বড় হলে সেরে যায়—তোর কলসীটা দে, মেজে দি।'

'সারবে না খুড়িমা, ভদ্দরের স্বভাব নয়, এমন সব খারাপ গালাগাল শিখেছে, সবাইকে যা তা বলে—'

'তা হলে একটু শাসন করিস।'

'কে করবে শাসন? আমার তো মানেই না, উনি কি বাড়ীর কোন কথায় থাকেন? বটঠাকুর গিয়ে অবধি কি রকম হয়ে যাচ্ছে দিন দিন, সারা দিন একটা কথা আমার সঙ্গে হয় কি না হয়, জানিনে কপালে কি আছে? একটা কথা বলতে গেলে যেন রুখে ওঠে, এমন ত ছিল না খুড়িমা, একটু চোখ গরম করে চায় নি কোন দিন আমার দিকে হাজার অন্যায় করলেও, ভাইয়ের শোকে দিন দিন কি হয়ে যাচ্ছে।'

চমকিয়া মেজ-বৌ চাহিলেন—ভাইয়ের শোকে, না সেই অভাগিনীর শোকে? সরলা কি বুঝিতে পারে

নিশ্বাস ফেলিয়া সরলা জলে নামিল। কাপড় কাচিতে কাচিতে বলিল, 'বাড়ীতে যা অশান্তি হয়েছে! মেজদির শরীর ত ঐ, কাজকর্ম্ম বড় পেরে ওঠে না, তার ওপর দিন রাত যার বকুনি, বড়দির সাড়া পেলেই আরও বকুনি বাড়ে—চোখে দেখে না যে, তবু মনের ঝাল মেটে নি। বড়দিও যাকে এড়িয়ে চলে; যার কাপড়খানা সারা দিন-রাত রোদে পুড়ে জলে ভিজলেও হাত দিয়ে ছোঁয় না, কোন একটা জিনিস চাইলেও সামনে দিয়ে হেঁটে যায়, তবু দেয় না।'

'এটা অন্যায় করছে, হাজার হলেও শাশুড়ী, তার বুড়ো মানুষ অন্ধ—এখন মনে রাগ রাখতে নেই—দিদি ওর হাতে খান তো এখন?'

'পোড়া কপাল, বড়দি দেবে যাকে রেঁধে? মার জন্যে আমাদের রান্নাঘরের কোণেই হেঁসেল করে নিয়েছি, আলাদা আলাদা বাসন-পত্তর অবশ্যি আছে। দু'ঘরে দু'রকম রান্না, আর সাতবার কাপড় ছাড়া, নাওয়া পেরে উঠিনে, সবাই বললেন, মা এখন শিশুর মতন ওঁর অত আচার-বিচারের দরকার নেই, কিধে-তেষ্টায় কষ্ট না পেলেই হল, আর সন্তান মতন আচার করলেই হবে।'

'তা সত্যি, তবে স্বর্গ এটা ভাল কাজ করছে না মোটে, শাশুড়ীকে দেখা উচিত।'

'তা খুড়িমা, সত্যি কথা বলতে গেলে খারাপ শোনায়। এখনও মা রাত-দিন যা বিচ্ছিরি গালাগাল দেয়, আমরা বলে কি যে করতাম! বড়দি তবু চুপ-চাপ থাকে। আর বড়দি অর্দ্ধেক দিন রাঁধেই না, যে দিন রাঁধে একেবারে বেলাশেষে, নয় রাত্তিরে। মার কি তাই পোষায়? আমাদের এদিকে যত কাজ যত তাগাদা হোক না কেন, মেজদি সকলের আগে মার ব্যবস্থা করে।' [ক্রমশঃ

মধ্য-এসিয়ার যাযাবর জাতি

—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

২

কালমাক্ তাঁবুতে আমরা অনেকক্ষণ বসে ছিলাম।

বাইরে তখন বেশ বৃষ্টি পড়ছে। এ-রকম যদি বেশীক্ষণ চলে তবে টেকেস মালভূমি থেকে বন্যা নেমে সব ভাসিয়ে দেবে। আমরা আলতানের তাঁবুতে বসে আছি, আলতানের স্ত্রী হলদে রঙের কালমাক্ টুপি মাথায় দিয়ে আমাদের মোঙ্গোল আরক পরিবেশন করছিলেন—ঘোটকীর দুধ চোলাই করে এই আরক তৈরী হয় বটে, কিন্তু দেখতে জলের মত দেখালেও, অনেক বেশী তেজস্কর জিনিস যে, তা পান করলেই বোঝা যায়।

আমি তা জানতাম বলেই যখন আলতানের স্ত্রীর প্রদত্ত রৌপ্যপানপাত্র সজন বেগ আমার হাতে দিলেন—পানপাত্র মুখে দিতে আমি একটু ইতস্তত: করছিলাম।

সজন বেগ সেটা লক্ষ্য করে রূঢ়স্বরে বললেন,—খেয়ে ফেল! ওঁদের অপমান ক'রো না!

এই একবার মাত্র আমি সজন বেগের অপ্রীতিভাজন হয়েছিলাম।

আমি একটু একটু করে চায়ের মত পান করছি দেখে সজন বেগ বলে উঠলেন,—ও কি! এক চুমুকে শেষ কর! কালমাক্দের মধ্যে এই রীতি প্রচলিত যে, প্রথম তিন পাত্র আরক এক চুমুকে খেয়ে ফেলতে হয়। তিনপাত্র শেষ করার পরে অবশ্য আরও একপাত্র আরক আমায় দেওয়া হল।

আমার সঙ্গে যারা ছিল, তারা যে কত পাত্র আরক উজাড় করলে তার সীমা সংখ্যা নেই—ওদিকে আলতানের পত্নী অতিথিদের শূন্য পানপাত্রগুলি অনবরত পূর্ণ করে দিচ্ছিলেন।

চেয়ে দেখি একটী বড় চামড়ার মশক বোঝাই আরক তখনও বহুল।

তারপর দেখলাম একজন একখানা বড়লা নেকড়া দিয়ে একটী বড় কেটলির ভিতরটা মুছে তাতে একটা চামড়ার বালতি থেকে জল ঢেলে এক কেটলি ভর্ত্তি করে, তাতে একমুঠো শুকনো কি পাতা ফেলে দিয়ে সিদ্ধ করতে দিলে আগুনের ওপরে।

শুনলাম, ওটা চা হচ্ছে।

আমি এই সময় কিছুক্ষণ তাঁবুর বাইরে পায়চারি করে নিলাম।

কিছুক্ষণ পরে তাঁবুর মধ্যে ঢুকে মনে হল, একটা পাগলা গারদের মধ্যে ঢুকেছি।

আমি আরক ও চায়বার পান করেছিলাম, কিন্তু অনেকেই তার দ্বিগুণের বেশী উদরসাৎ করেছে এবং এখন তারা চীৎকার ও মারামারি সুরু করছে। বিশ্বস্ত ভৃত্য আবেদ সকলকে নিরস্ত ও শান্ত করবার বৃথা চেষ্টা করছে।

ওখান থেকে রাত্রে আমরা সজন বেগের তাঁবুতে ফিরি, সেখানেও অতিথিসৎকারের কোন ত্রুটি হল না। কালমাক্দের অনুরোধে সজন বেগ এবার তাদের পশুচারণ-ভূমিতে তাঁবু ফেলে দিলেন গ্রীষ্মকাল কাটাবার জন্যে। প্রাচীরবেষ্টিত দামা সহরের প্রাচীরের পাশেই সে তাঁবু অবস্থিত ছিল।

এই সহরে একটি বিখ্যাত বৌদ্ধ মঠ আছে। আমি প্রস্তাব করলাম একদিন বৌদ্ধ মঠ পরিদর্শনে যেতে হবে।

সঙ্গল বেগও এ প্রস্তাবে সম্মত হলেন, কারণ তিনিও কখন না কি নগরপ্রাচীরের মধ্যে যান নি। তিনি প্রধান লামার কাছে সংবাদ পাঠালেন যে, আমরা মঠ পরিদর্শনে ইচ্ছুক, যাবার অনুমতি পাব কি না। প্রধান লামার নিকট থেকে উত্তর এল আমরা যদি যাই, তিনি নিজেকে সম্মানিত বিবেচনা করবেন।

কালমাক্ জাতির বিভিন্ন গোষ্ঠির মধ্যে একটি করে বৌদ্ধ মঠ আছে। বৎসরের কয়েকটি বিশেষ উৎসবের দিন ব্যতীত এই মঠের মধ্যে নারীজাতির প্রবেশাধিকার নেই।

কিরঘিজদের মধ্যে এ কথা প্রচলিত আছে যে, এই বিশেষ উৎসব-দিনগুলিতে মঠের মধ্যে এমন ধরণের আমোদ-প্রমোদ অনুষ্ঠিত হয়, যা সংযমের মাত্রাকে অতিক্রম করে।

আমি আলা বেগের সঙ্গে লামা-পুরোহিতদের ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করলাম। আলা বেগ বললে এ-কথা খুবই ঠিক যে, লামা পুরোহিতেরা অবিবাহিত থাকেন বা মঠের মধ্যে মেয়েদের যাওয়ার অধিকার নেই, কিন্তু পুরোহিতেরা সব সময়েই কালমাকদের তাঁবুতে যেতে পারেন।

মার্কো পোলোর লিখিত কয়েকটি ভ্রমণের গল্প আমার মনে পড়ল এ সম্পর্কে।

আমার তাতার ছাত্রটি বলেছিল, বিবাহের পরে কালমাক্ জাতির প্রথা অনুসারে দু'দিন লামাদের মঠে বাস করতে হয়। কিন্তু আলা বেগের নিকট জিজ্ঞেস করতে সে বললে, প্রায় কুড়ি বৎসর হল এ প্রথা রহিত হয়েছে।

টেকেস উপত্যকার প্রধান লামা খুব ধনী। তাঁর পশু-দল এ অঞ্চলের মধ্যে বৃহৎ, তাঁর পশুচারণ-ভূমি সুবিস্তৃত। তাঁর সামান্য ইঙ্গিত বা আদেশ মাত্রেই লোকে তাঁর ধন-সম্পদ্ বৃদ্ধি করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে, কারণ কালমাকেরা প্রধান লামাকে ভয় করে চলে তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তির জন্য।

আমরা মঠে পৌঁছে দেখি, বৃদ্ধ লামা স্বর্ণখচিত পরিচ্ছদে ভূষিত হয়ে আমাদের অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছেন।

একজন পুরোহিত আমাদের জন্য চামড়ার পাত্রে ঘোটকীর দুধ আনলেন এবং আমরা প্রথানুযায়ী তিন পাত্র দুধ পান করলাম।

লামার গৃহে দু'টি কুঠুরী। একটিতে তিনি ভোজন ও শয়ন করেন—অন্যটিতে দেবদেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। দেবতার ঘরের মাঝখানে একটি বড় বেদী। বেদীর ওপরে একটি উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্ত্তি। মূর্ত্তির সামনে বেদীর ওপরে অনেকগুলি তামার ছোট ছোট পেয়ালা—সম্ভবতঃ দেবতাকে ঘোটকীর দুগ্ধ নিবেদন করবার উদ্দেশ্যে এই পানপাত্রগুলি ব্যবহৃত হয়। কতকগুলিতে আবার রুটীর টুকরো এবং ফলের দানাও আছে।

আলা বেগ আমায় চুপি চুপি বললে,—কোন ভয় নেই, তোমায় ওরা ওসব খেতে বলবে না। বুদ্ধকে নিবেদন করার পরে ওরা দেবতার প্রসাদ নিজেরাই খায়।

আমি লামাকে জিজ্ঞেস করলাম,—আপনি কি তিব্বত গিয়েছিলেন?

আমার কথার উত্তরে তিনি একখানি লালরঙের দীর্ঘ খাম বার করে আনলেন এবং খুব সন্তর্পণে আমার সামনে সেখানা খুলে তার মধ্যে থেকে একখানা বাদামী রঙের কাগজ বার করলেন।

আমার সপ্রশংস দৃষ্টি লক্ষ্য করবার জন্য আমার দিকে আড়চোখে চেয়ে তিনি বললেন,—এই যে চিঠি দেখছ, এখানা তিব্বতের দলাই লামার চিঠি। আমার যৌবনে আমি তিব্বত গিয়ে সাত বৎসর সেখানে থাকি এবং শাস্ত্র-পাঠ করি। আমি দেশে ফিরবার পরে দলাই লামা আমায় অনেক চিঠি লিখেছিলেন।

তারপর তিনি একজন তরুণ লামাকে ডেকে, আমাদের মঠের চারিধার ঘুরিয়ে দেখাতে বললেন। ওখান থেকে বার হয়ে আমরা মন্দিরের সভাগৃহে ঢুকলাম।

সেখানে আমি আলা বেগকে বললাম, এই মঠের মত এত বড় বুদ্ধমূর্ত্তি আমি কোথাও দেখি নি।

কিরণিয়, সুন্দরী।

কিরণিয়, মা ও শিশু।

কিরণিয়, বালক, ছেলে হরিণশিশু।

আলা বেগ বললে,—আসল মূর্তিটা তো তবুও দেখ নি। মঠে একটা ওর চেয়েও বড় বুদ্ধমূর্তি আছে, আপাদমস্তক নিখাদ সোনার। আমি কখনও সেটা দেখি নি, কিন্তু কালমাক্ জাতিরা সকলেই সেই বুদ্ধমূর্তিকে তেকেল উপত্যকার জাগ্রত দেবতা বলে মানে।

সজন বেগ অত্যন্ত কৌতূহলের সঙ্গে বিভিন্ন মূর্তিগুলির দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিলেন।

আমি তার কাছে গিয়ে বললাম,—আলা বেগ বলছে এর চেয়েও বড় বুদ্ধমূর্তি মঠে আছে। মূর্তিটা না কি খাঁটি সোনার তৈরী। মূর্তিটা দেখবার কথা বললে দোষ কি?

সজন বেগ আমাদের সঙ্গের লামাটিকে সে কথা বলতে তিনি প্রধান লামার কাছে খবর পাঠালেন। কিছুক্ষণ পরে প্রধান লামা আমাদের তিনজনকে বড় বুদ্ধমূর্তিটি দেখাতে আদেশ দিলেন।

তরুণ লামাটি আগে আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন।

আমরা চার জনে একটা দুরারোহ সিঁড়ি বেয়ে খানিকটা উঠলাম।

দোতলায় উঠে একটা ঘরের মাঝখানে বড় একটা তাঁবুর মত খাটান। লামা তাঁবুর এক প্রান্ত উঠিয়ে দেবতার উদ্দেশে বার কতক অভিবাদন করে আমাদের ঢুকতে আদেশ করলেন।

আমরা ঢুকলাম বটে, কিন্তু বেদীর খুব নিকটে যাওয়ার আদেশ পেলাম না।

বুদ্ধমূর্তিটি প্রায় এক ফুট উঁচু এবং খাঁটি সোনার তৈরী। বেদী সাধারণ কালমাক্ মঠের বেদীর মতই।

মূর্তির গলায় দশ বার ছড়া বহুমূল্য প্রস্তরের হার। অন্ততঃ আমার তাই মনে হল। মূর্তির সম্মুখে দশ-বারোটা পানপাত্র স্থাপিত, যেমন অন্যত্র দেখেছি—এ ছাড়া কোনও একটি জানোয়ারের হাড়—বাইবেলে বর্ণিত পাথার চোয়ালের হাড়ের কথা মনে করিয়ে দেয়।

এ হাড়খানা ওখানে রাখার উদ্দেশ্য কি তা বোঝা গেল না, বা এ বিষয়ে সবজান্তা আলা বেগও কোন আলোকপাত করতে সক্ষম হল না।

তারপর কয়েকদিন কেটে গেল।

আমরা সজন বেগের তাঁবুতে খুব আনন্দেই কাটালাম দিনগুলো।

সজন বেগ কালমাক্ জাতির ধনী লোক, অর্থাৎ বড় বড় পশুপালের মালিকদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা করে অত্যন্ত ব্যস্ত অবস্থায় দিন কাটাচ্ছিলেন। আমাদের বিশেষ কোন কাজকর্ম ছিল না—কেবল তাঁবুতে বসে ঘোটকীর দুগ্ধ পান ও শুয়ে বসে গল্প-গুজব করে সময় অতিবাহিত করা ছাড়া।

একদিন সকালে তিনজন কালমাক্ অশ্বারোহী তাঁবুতে উপস্থিত হল। তাদের ভাব দেখে মনে হল বিশেষ কোন জরুরী কাজে তারা এসেছে।

তাদের জিনের সঙ্গে কাজ করা চামড়ার মশক বাঁধা।

এই চামড়ার মশকগুলো তারা আমাদের তাঁবুর মধ্যে নিয়ে এল, তারপর কোমর বন্ধ থেকে রূপার পানপাত্র খুলে মশক থেকে আরক ঢেলে ঢেলে আমাদের সকলকে পান করতে দিলে।

আমি ব্যাপারটা কিছু বুঝতে পারলাম না।

আলা বেগ আমার কানে কানে বললে,—লোকগুলো এসেছে কালমাক্ সর্দার আবদুকের তাঁবুতে আমাদের নিমন্ত্রণ করতে। এদের নিমন্ত্রণ করবার এই রীতি।

আমরা প্রত্যেকে প্রথানত তিনটি করে পানপাত্র শেষ করলাম। সজন বেগের তাতার-জাতীয় মাতার কাছে আমি একটি নতুন প্রথা শিখলাম। তিনি চতুর্থ পানপাত্রে ওষ্ঠ স্পর্শ করে নিমন্ত্রণকারীকে ফেরৎ দিতেই সে নিজে পানপাত্রটি নিঃশেষ করলে এক চুমুকে।

আমার হাতে চতুর্থবার পানপাত্র পড়তেই আমিও তাতে ওষ্ঠ স্পর্শ করে ফেরৎ দিলাম। নিমন্ত্রণকারী নিজে পানপাত্রটী নিঃশেষ করলে।

তার পর আমি শুনলাম, তৃতীয় বার পানপাত্র নিঃশেষ করবার পরে যদি আর একবার আরক দেওয়া হয়, তা হলে পান করবার ইচ্ছা না থাকলে, এ ভাবে সেটি ফেরৎ দেওয়া চলে। নিমন্ত্রণকারীকে না কি সে পানপাত্রস্থিত আরক এক চুমুকে পান করতে হয়, নতুবা নিমন্ত্রিতের অপমান করা হয় তাতে।

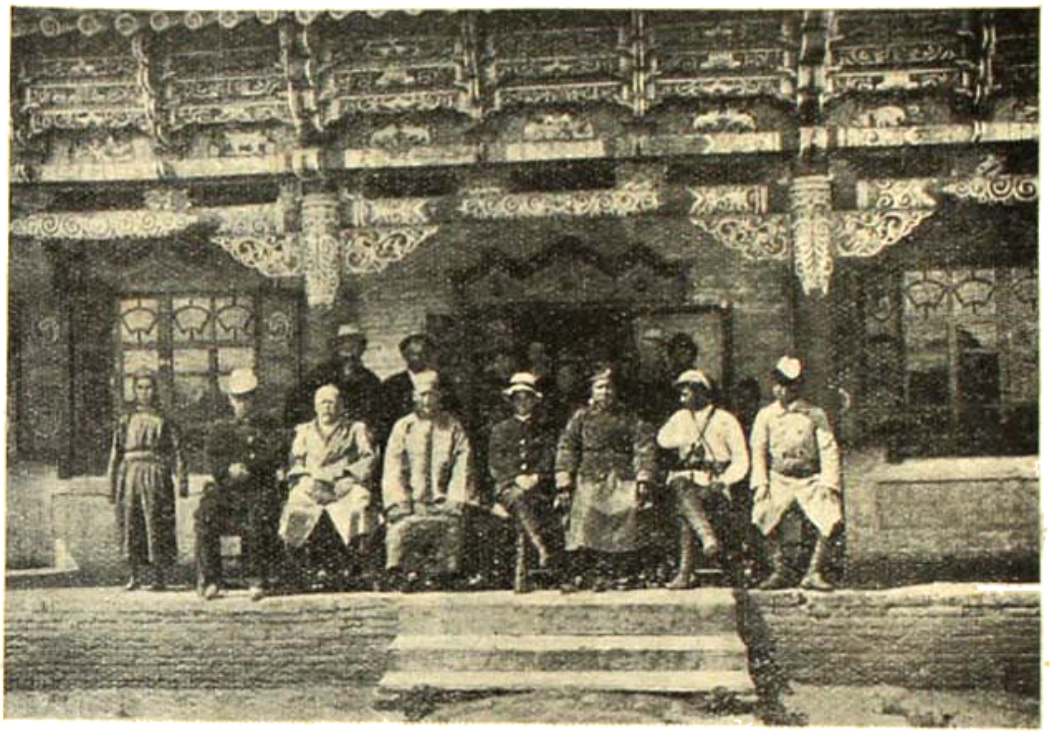

বৌদ্ধ মঠে কিরবিচ্ সর্দ্দার সহিত বেল।

শিকারী ইগল সহ কিরবিচ্ শিকারী।

নিমন্ত্রণকারিগণ নিমন্ত্রণ শেষ করে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে আমরাও অশ্বারোহণে কালমাক্ সর্দ্দার আরডুকের তাঁবুর উদ্দেশে যাত্রা করলাম।

পথে বার হলেই কিরঘিজ্‌গণের মধ্যে অশ্বারোহণের কৌশল প্রদর্শন করবার রীতি আছে, এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হল না।

আলা বেগ জনৈক তরুণ কিরঘিজ্ সওয়ারকে অশ্বারোহণের বাজিতে আহ্বান করলে এবং তারা দুজনে আমাদের ছেড়ে নক্ষত্রবেগে বহু দূর চলে গেল; অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখা গেল, তাদের দুজনের ঘোড়া সমান সমান চলেছে।

হঠাৎ আলা বেগ ঘোড়ার রাশ টেনে ঘোড়াকে থামিয়ে ফেললে। তরুণ সওয়ারটী নিজের ঘোড়া থামাতে গিয়ে বেগ সামলাতে না পেরে, জিন থেকে ছিটকে পড়ে গেল।

দূ বেন ঝি চীৎকার করে উঠল,—সাবাস! আলা বেগ! সাবাস!

ততক্ষণ ভূপতিত তরুণ সওয়ারটী হাসিমুখে ধুলো ঝেড়ে উঠে পড়েছে।

আমাদের সকলের ঘোড়া তারপর সারবন্দী হয়ে কালমাক্‌দের তাঁবুর মণ্ডলীর মধ্যে প্রবেশ করলে।

আমাদের অভ্যর্থনা করবার জন্যে সর্দ্দারের তাঁবুর বাইরে আরডুক এবং তাঁর নানা ভ্রাতা দাঁড়িয়েছিলেন। নানা মহাশয় কিছুক্ষণ আগে মঠ থেকে এসেছেন শুনলাম।

ওরা ওদের হাত আড়ষ্ট ভাবে সামনের দিকে প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে ছিল, এই এদের অভিবাদনের রীতি।

একটি সুবৃহৎ নূতন তাঁবুর মধ্যে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল। তাঁবুর মধ্যেকার মেঝেতে তখনও কাঁচা ঘাস দেখে মনে হয়, তাঁবুটী এ জায়গায় অল্পদিন ফেলা হয়েছে। আমরা কেউ কম্বলের ওপরে কেউ বা মাদুরের ওপরে বসলাম।

আলা বেগ সব বিষয়েই বাহাদুরী নিতে ছাড়বে না। আমায় চুপি চুপি বললে,—কাল এই তাঁবুটা আমিই এইখানে ফেলিয়েছি। ওরা যখন আমাদের নিমন্ত্রণ করে, তখন সব বন্দোবস্ত করবার জন্য আমাকে আগে ডেকে পাঠায়, কারণ কালমাক্‌দের অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্নতা আমরা দেখতে পারি নে। আজ ভোজের জন্য যে ভেড়া কাটা হবে, সেও আমিই কাটব।

আমি বললাম,—কেন ওরা ভেড়া কাটতে জানে না না কি?

আলা বেগ বললে,—তা নয়। কালমাক্‌দের ভেড়া মারার প্রথা অত্যন্ত নিষ্ঠুর। ওরা ভেড়ার মাথায় মুগুর মেরে সাবাড় করে, তারপরে গোটা ভেড়াটা সিদ্ধ করে কিংবা আগুনে ঝলসায়। অমন বর্ব্বর ভাবে হত্যা করা পশুর মাংস আমরা খাই নে, আমাদের শাস্ত্রে নিষেধ আছে। কিরঘিজ্‌দের প্রথানুযায়ী ভেড়া জবাই করা চাই, তবেই আমরা সেখানে খাব।

আবার তিন পাত্র আরকের ব্যবস্থা জনপিছু।

যেখানেই যাই, এ নিয়ম সব স্থানেই প্রচলিত।

আরকপান শেষ হবার পরে আমাদের সামনে নীচু চৌকী স্থাপন করা হল, তার ওপর চিনিমিশ্রিত ময়দার পিষ্টক ও শুক্‌নো পনির আমাদের খাওয়ার জন্যে দেওয়া হল।

আমি তখন অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়লাম মানুষের মাথার চুল থেকে পনিরের অংশ পৃথক্ করতে, কারণ পূর্ব্বেই বলেছি এ দেশের পনিরে মেয়েদের মাথার চুল অল্প পরিমাণ মিশ্রিত থাকে। এর কারণও আগে বলেছি। এ দেশের প্রত্যেক মেয়ে পরচুলো ব্যবহার করে। পরচুলোর ঢিলে চুল নানা কারণে পনির তৈরী করবার সময় পনিরের সঙ্গে মিশে যায়। কিরঘিজ্‌দের পনির খেতে খারাপ নয়; কিন্তু তা থেকে চুল বেছে পৃথক্ করবার মজুরী পোষায় না।

এমন সময় একটি ভেড়াকে টানতে টানতে আমাদের তাঁবুর দোরে নিয়ে আসা হল।

আমরা সকলে হাত তুলে প্রার্থনা করলাম কিরঘিজ্‌দের প্রথানুযায়ী। কালমাক্‌দের মধ্যে এ প্রথা প্রচলিত না থাকলেও তারা অতিথিদের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাবার জন্যে এ রকম করলে। অপরের ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করবার এই রীতি আমার কাছে বেশ ভাল লাগল।

আরডুক আমায় বললেন,—আমরা নিজেদের মধ্যেও কিরঘিজ্‌দের এ সুন্দর প্রথাটি আমরা মেনে চলি।

আলা বেগ যখন ভেড়ার মাংস রাঁধতে ব্যস্ত, আরডুক সে সময় আমাকে তাঁদের অন্য তাঁবুগুলো দেখাতে নিয়ে গেলেন।

কিরঘিজদের তাঁবুর সাধারণ দৃশ্য থেকে কালমাকদের তাঁবুর দৃশ্যের কোন প্রভেদ নেই দেখলাম। পুরুষেরা বসে গল্প করছে, মেয়েরা খাটছে।

মেয়েদের পরণে অতি অপরিষ্কার পোষাক, তাদের খোড়ার বালামচির পরচুলো তেলচিটে ও দুর্গন্ধ। অপেক্ষাকৃত বেশী বয়সের মেয়েরা যত খাটে, তরুণী মেয়েরা তত পরিশ্রম করে না। তারা সেজেগুজে বসে থাকে। কিরঘিজদের মধ্যেও ঠিক এ রকম দেখেছি।

অপরিচ্ছন্ন ভাবে থাকার দরুণ এবং খানিকটা অতিরিক্ত পরিশ্রম করবার দরুণও বটে, চল্লিশ বছরে পড়বার অনেক আগেই কালমাক মেয়েদের মুখশ্রী খারাপ হয়ে যায়, গাত্রচর্ম কুঞ্চিত হয়ে যায়, অল্প বয়সে বুড়ী দেখায়।

তরুণী মেয়েদের একারণেই বোধ হয় তাদের স্বামীরা কাজ করতে দেয় না। আমি লক্ষ্য করেছি তাঁবুর শ্রমসাধ্য কাজ যা কিছু, সবই করে বয়স্কা প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকেরা; তরুণীরা চিক্‌চিকে পরচুলো প'রে পুঁতির মালা গলায় দিয়ে, হাত কোলে করে বসে দিন কাটায়।

যতদিন তারা দেখতে ভাল থাকবে ততদিন তাদের খুব আদর। এদের মধ্যে কেউ কেউ বড় জোর বসে বসে সেলাইয়ের কাজ করে বা ভোজের সময় অতিথিদের ঘোটকীর দুগ্ধ পরিবেশন করে।

আলা বেগ যেখানে উনুনের ওপর ভেড়ার মাংসের কাবাব তৈরী করছিল, আমি সেখানে এসে দাঁড়ালাম।

ও ছিল মাটীর ওপর বসে, আমি ওর পাশেই এসে আসন নিলাম। আমার উদ্দেশ্য ওর কাছ থেকে কালমাকদের সম্বন্ধে গল্প শোনা।

আমাদের কথাবার্ত্তা বাধাপ্রাপ্ত হল এইজন্য যে, অল্পক্ষণ পরেই আরডুকের পিতা একদল সওয়ারের সঙ্গে ওখানে এসে উপস্থিত হলেন এবং কিছুক্ষণ উভয় দলের মধ্যে নস্যের কৌটার বিনিময় চলল।

পরস্পর দেখা যদি হয়, তবে কালমাকদের মধ্যে নস্য বিনিময় হয়। প্রত্যেক কালমাকের কাছে একটি পাথরের কৌটায় বা লাউয়ের খোলে নস্য থাকে। নস্য-বিনিময় একটি শিষ্টপ্রথা বলে গণ্য। কিন্তু কালমাকরা নস্য নাকে দেয় না। যদিও নস্যের সব উপাদানই এতে আছে, কিন্তু নস্যের কৌটা থেকে নস্য নিয়ে এরা মুখের মধ্যে ফেলে দেয়।

আরডুকের পিতা এসে পড়াতে আমাদের খাওয়া-দাওয়া পুরো বেগে চলল। আমি আবার অর্দ্ধেক ভেড়ার মাংস উদরসাৎ করার পরে তাঁবু থেকে বার হয়ে পড়লাম এবং আরডুককে অনুরোধ করলাম তার মায়ের কাছে আমাকে নিয়ে যেতে।

আরডুকের মায়ের বয়স চল্লিশের কম নয়। কিন্তু কালমাক মেয়েরা ও বয়সে যতটা বৃদ্ধা হয়ে পড়ে, তার তুলনায় এঁকে অনেক কম বয়স দেখায়। এঁর পরিচ্ছদ অন্যান্য কালমাক মেয়ের মত, তাঁর মাথায় একটা উঁচু ফেল্টের টুপি, গলায় ছোট বড় নানাশ্রেণীর কবচ। এই কবচের মধ্যে নানাবিধ মন্ত্র-সম্বলিত কাগজ আছে, যে-মন্ত্র তাঁকে সন্তানবতী রাখবে এবং তাঁর স্বামীকে তাঁর প্রতি কখনও বিরূপ হতে দেবে না। ওঁর পায়ে বাড়ীতে তৈরী একজোড়া খুব ভারি জুতো।

এই জুতোর সম্বন্ধে কিছু বলবার আছে। জুতোর তলা অত্যন্ত পুরু, এত পুরু যে সারাজীবনে আর জুতো বদলাবার দরকার হবে না। অধিকাংশ কালমাক মেয়ে বিবাহের সময় যে জুতো পরে থাকে, তাতেই তাদের সারাজীবন কাটে। স্ত্রী অল্প বয়সে মারা গেলে সেই জুতো দ্বিতীয় পত্নী ব্যবহার করে।

কালমাক মেয়েরা সাধারণতঃ মোঙ্গোলীয় ভাষা ছাড়া আর কোন ভাষা জানে না, সুতরাং আরডুকই তাঁর মা এবং আমার কথাবার্ত্তার সময় দোভাষীর কাজ করলেন। তিনি অপর তাঁবুর অতিথিদের জন্য ক্রমাগত আরক ঢেলে ঢেলে দুতোর হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিতে ব্যস্ত ছিলেন।

দুতাকে বার বার সাবধান করে দিচ্ছিলেন,—আর বেশী আরক নিয়ে যেও না। গোলমাল একটা বাধবে আমি বলে দিচ্ছি।

তাঁর কথা থেমে গেল খুব শিগ্‌গির।

অন্য তাঁবুর অতিথিদের কণ্ঠস্বর ক্রমেই সপ্তমে চড়তে লাগল। তাদের অনুরোধে আরডুকের নানা রাঙা বাঁশীর সুরের সঙ্গে নাচতে আরম্ভ করলেন। তারপরে ভীষণ চীৎকার-ধ্বনি শোনা যেতে লাগল—সবাই এক সঙ্গে চেঁচাচ্ছে। আমার মনে হল, সর্দ্দার সজন বেগ একটু অতিরিক্ত মাত্রায় আরক পান করেছেন।

আমি গিয়ে দেখি সজন বেগ জনৈক তুর্কী সিপাহীকে গালিগালাজ করছেন। তুর্কী সিপাহীর গালে একটা অস্ত্রের দাগ, তার কাপড়-চোপড় রক্ত-মাখা। আমার পাশেই কু বেন দি দাঁড়িয়েছিলেন।

তিনি বললেন,—তুর্কী সিপাহী ছুরি বার করে একজন কালমাক্‌কে জখম করেছে। দু'জনেই মাতাল হয়ে ঝগড়া করছিল।

সজন বেগ চেঁচিয়ে বললেন,—ওর তলোয়ার খুলে নাও। মাথার টুপি টান দিয়ে ফেলে দাও। ওর বন্দুকটা আমার হাতে দাও।

কাছেই একজন কালমাক ভৃত্য দাঁড়িয়ে ছিল। সজন বেগ তার মাথার তুর্কী সিপাহীর টুপিটা পরিয়ে দিয়ে এবং তলোয়ারখানা তার কোমরবন্ধে ঝুলিয়ে দিয়ে বললেন,—নিয়ে যাও তুর্কী সিপাহীটাকে! ও তোমার বন্দী। সে বেচারী তো অবাক!

এমন সময়ে ইয়াকুব বেগ বলে উঠলেন,—সজন বেগ, ছেড়ে দিন। যা হবার হয়েছে।

এক মুহূর্ত্তে সজন বেগের সব রাগ গিয়ে পড়ল ইয়াকুব বেগের ওপর। তিনি সপাসপ দুই চাবুক লাগালেন ইয়াকুব বেগের গালে ও কাঁধে। তারপরে বিস্মিত ও ভীত কালমাক্ ভৃত্যের দিকে চেয়ে বললেন,—নিয়ে যাও একেও। এ তোমার দ্বিতীয় বন্দী। ওদের ঘোড়া কেড়ে নাও।

আলা বেগ বেগতিক দেখে সরে পড়ল। আমরা তার কিছুক্ষণ পরে আরডুকের কাছে বিদায় নিয়ে ঘোড়া করে আমাদের তাঁবুর দিকে রওনা হলাম। পথে কিছুদূর এসে সজন বেগের নেশা বোধ হয় কিছু কেটে গেল, খোলা হাওয়ায়। তিনি ঘোড়ার রাশ সংযত করে আমাদের সকলকে থামতে বললেন। আমাদের দিকে চেয়ে বললেন,—ওঃ এ সব অতিরিক্ত আরক খাওয়ার ফল। কি কাণ্ডটাই করে ফেলছি আজ! তুর্কী সিপাহী আর ইয়াকুব বেগের কাছে আমাদের মাপ চাইতে হবে।

কিন্তু তুর্কী সিপাহী ও ইয়াকুব বেগ যে হেঁটে আসছে সারাপথ—তাদের জন্যে ঘোড়া পাঠান তিনি দরকার মনে করলেন না। সর্দ্দারের মুখ দিয়ে একবার যে হুকুম বার হয়েছে, তা রদ করবার ক্ষমতা নেই কারও। তাঁর নিজেরও না।

লহ নমস্কার

—শ্রীজীবনকৃষ্ণ শেঠ

শত বর্ষ পরে আজি দূর হ'তে দূর
ধ্বনিতেছে মম তব উদার মধুর
এ বঙ্গের চিত্তভূমে; দিকে দিকে দিকে
হেরিতেছি আজি তাই শুভ্র অনিমিখে,
উঠিয়াছে শোভাযাত্রা, কোটি কণ্ঠরোলে
ঘোষিত মাতৃস্তব, কাল-স্রোতে দোলে
অপরূপা মাতৃমূর্ত্তি অপূর্ব্ব-শোভনা
সুজলা সুফলা শ্যামা মর্ত্ত্য-অতুলনা।
হে ঋষি বঙ্কিম, লহ ভক্তি-নমস্কার,
ধূপের সুরভিসম প্রাণে যাহা মোর
উৎসারিত রাত্রি দিন; কর আশীর্ব্বাদ
মাতার প্রসন্নদৃষ্টি অমৃত প্রসাদ

দাও যেন, যেন দাও চিত্তে মোর
শক্ত্যর্থসাধিকা মূর্ত্তি দেশমাতৃকার।

আমরা বাঙ্গালী

— শ্রীললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রথম দৃশ্য

[একটি সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের শোবার ঘর। জানালা দিয়ে বিরাট একটি বাড়ীর কিয়দংশ দেখা যাবে—এই বাড়ীতে একটি ঘরে বর্তমান আখ্যানের তৃতীয় দৃশ্যের সংস্থান। এই এক পাশে একটি সাধারণ ড্রেসিং টেবিল, তাতে আট, অন্যপাশে আলমারী। বেওয়ালে দুই চারটি ছাতে-আঁকা ওয়াটার-কলার।

ঊর্ম্মিলা খাটের পায়ার দিকে মুখ করে শুয়ে আছে, চুল খোলা, মুখ-চোখে পিঠে ছড়িয়ে পড়েছে। শোভন সন্ধ্যা-স্নানের পর, পরণে বড় চার্কিশ ডোরাদার এবং জালি গেঞ্জি, ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে চুলে খুব চালাচ্ছে ও পাউডার মাখছে। ঘরখানা উজ্জ্বল কয়েক মুহূর্ত নিস্তব্ধতা।]

শোভন। (রূপ-প্রসাধন শেষ করে আলমারী খুলে একটি ধোপদোরস্ত সিল্কে-করা আদ্দির পাঞ্জাবী, জালি গেঞ্জি ও রুমাল খাটের ওপর রাখল, পরে কুঁচোন ধুতির সন্ধানে জামা-কাপড় ওলট-পালট করে খুঁজে, রেগে, একটা পাট করা ধুতি হাতে নিয়ে ঊর্ম্মিলার সামনে এসে) কাপড়টা কুঁচিয়ে রাখনি কেন ?

ঊর্ম্মিলা। (নিরুত্তর)

শোভন। (ঊর্ম্মিলার মাথা ঈষৎ হাত দিয়ে ঠেলে দিয়ে) শুনতে পাচ্ছ না ? কাপড়টা কুঁচিয়ে রাখনি কেন ? বলে গিয়েছিলুম না ? সমস্ত দিনটা করলে কি শুনি ?

ঊর্ম্মিলা। (নিরুত্তর)

শোভন। বোবা সেজে রইলুম, ব্যস, সাতখুন মাপ আর কী : (আপন মনে) দিন দিন impertinent হয়ে উঠছে।

[কাপড় নিয়ে 'উইংস'-এর ভেতর দিয়ে, পরে ফিরে এসে সেজে আর পাঞ্জাবী পরে পুনরায় ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে মাথায় ব্যাকব্রাশ চালাতে লাগল।]

ঊর্ম্মিলা। (নতমুখে) কখন ফিরবে ?

শোভন। (মুখ ফিরিয়ে রেগে) কখন ফিরবে ! কেন, তোমার কি দরকার ? যদি নাই ফিরি। তোমায় বিয়ে করেছি বলে কি আমার সমস্ত liberty তোমার হাতে তুলে দিতে হবে ? আমি কোথাও বেরুতে গেলেই তুমি interfere কর কেন ?

ঊর্ম্মিলা। (চোখ তুলে) না, ধারটার আগে এসো। (আস্তে আস্তে) কি কিছুতে বারটার পর থাকে না, তারপর সদর দরজা খুলতে বড় ভয় করে।

শোভন। আসব। এখন গোটাকুড়ি টাকা দাও দিকিন। আজ একটা অর্ডার পেয়েছি, পরশু টাকা পেলেই দিয়ে দোব।

ঊর্ম্মিলা। (নিরুত্তর)

শোভন। শুনতে পাচ্ছ না ?

ঊর্ম্মিলা। (নতমুখে) টাকা নেই।

শোভন। বললেই শুনব আর কি ! এই যে সেদিন টাকা দিলুম, জানি সেটা তুমি খরচ কর নি, তাই থেকে দাও।

ঊর্ম্মিলা। সে টাকা বাড়ীভাড়ার জন্যে রেখেছি।

[শোভন ঊর্ম্মিলার খাটের খুলে আলমারীর ড্রয়ারের চাবি নিয়ে ড্রয়ার খুলল।]

ঊর্ম্মিলা। (উঠে শোভনকে বাধা দিয়ে) সর, আমি দিচ্ছি (দুটো দশ টাকার নোট শোভনকে বার করে দিয়ে) আমি জানি তুমি কি রকম আবার ফিরিয়ে দেবে ; কিন্তু এ খেলেকারী কতদিন আর তুমি করবে ? আমি যে আর পাওনাদারদের মুখ দেখাতে পারছি না। এতটুকুও কি তোমার বিবেচনা নেই ? (বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে) এতটুকুও কি তোমার শরীরে দয়া মায়া নেই ?

শোভন। (যেতে যেতে ফিরে এসে) থাক্, যাবার সময় আর নাটক সৃষ্টি করতে হবে না। কি কুক্ষণেই যে তোমার পাণিগ্রহণ করেছিলুম, এখন তা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছি ; lifeটা hell করে দিলে।

ঊর্ম্মিলা। (চোখ মুছে) আচ্ছা আমার জন্যে না হয় এতটুকুও করুণা না করলে, কিন্তু যে কত আশার পরে

আসছে, তার মুখ চেয়েও কি আমার ওপর তোমার একটু খানি দয়া হয় না।

শোভন। দেখ, মিছিমিছি আর কেঁদ না, তোমার ঐ প্যানপ্যানানি কান্না দেখলে আমার পা থেকে মাথা অবধি রি রি করে জ্বলতে থাকে, যদি একবার আয়নাতে দেখতে কি সুন্দরই না তোমায় দেখতে হয়েছে!

উর্ম্মিলা। (আঁচলে চোখ মুছে) ভগবান তোমার মুখ রাখবেন। তুমি জেন আমি আর বেশীদিন বাঁচব না, শুধু যে আসছে তারই জন্যে আমার বেঁচে থাকা।

শোভন। শুধু যে আসছে, যে আসছে, আরে কে তাকে আসতে বলেছিল? আমি ত কোন কালেই তাকে আসতে বলি নি। আমার বলে নিজেরই চলে না, ত আর একজন যে আসছে তাকে শাঁখ বাজিয়ে অভ্যর্থনা কর—তার চেয়ে তার আগেই তুমি সরে পড় না কেন? আমি মুক্তি পাই, যে আসছে সে রেহাই পায়, আর তুমি নিজেও নিস্তার পাও।

উর্ম্মিলা। এত ঘেন্না? কই যে দিন প্রথম প্রেম নিবেদন কর, তখন ত এসব বল নি?

শোভন। তখনকার উর্ম্মিলাদেবী এখন তুমি নও। আমি নিজেও তোমার ওই পাণ্ডুর ওষ্ঠাধর, নিষ্প্রভ চোখ, আর মলিন অবয়ব দেখে ভাবি, এই কি সেই সপ্রতিভ উর্ম্মিলা রায়? তোমায় এখন দেখলে কেউ ভুলেও ভাববে না যে, কোন কালে তুমি বই হাতে করে কলেজ গুলজার করতে, আর মক্ষিরাণীর মত তোমার আশে পাশে ছেলের দল গুঞ্জন তুলত!

উর্ম্মিলা। (চোখের জলের মধ্য দিয়ে হেসে) এখন বুঝি লীলাদেবী তোমাদের মক্ষিরাণী হয়েছে, আর তোমরা আর্টিষ্ট, কবি, রাজনীতিক তার আশেপাশে অহরহঃ গুঞ্জন তুলছ? তা বেশ যাও, কিন্তু আমার কথা মনে না পড়লেও, অন্ধ মার কথা মনে করে একটু তাড়াতাড়ি করো, তুমি না এলে তিনি কেবল ভেতর-বার করতে থাকেন।

শোভন। তোমার এই লেকচারটাই intolerable। এই জন্যেই তুমি অসহ্য হয়ে উঠেছ (চলে গেল)।

(অন্ধ মার হাতড়াতে হাতড়াতে প্রবেশ)

মা। হ্যাঁ মা, শোভন বুঝি ঝগড়া-ঝাঁটি করে চলে গেল? (উর্ম্মিলার কাছে বসে তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে) শোভনটা আজকাল যেন কি রকম হয়েছে। কতলোক আসছে আর আমার বাছাকে গালাগালি দিয়ে চলে যাচ্ছে; শোভন বাড়ীতে রাগারাগি করে রাত দুপুরে বাড়ী ফিরছে, আর আমার মাটি মলিনমুখে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছে, চোখে না দেখলেও বুঝতে পারি না, তাই নারায়ণকে ডাকি, হে মধুসূদন, হে ঠাকুর, বাছার আমার অমঙ্গল দূর কর, আমার উর্ম্মিলা মার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর। ভালয় ভালয় দুটাই করে দাও, তোমায় ষোল আনার বাতাসা দেব (দু হাত কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার)। হ্যাঁ মা কথা বলছ না যে?

উর্ম্মিলা। আমায় বলতে দিচ্ছেন কই মা? সব ত আপনি নিজেই—যা মনে আসছে তাই—বলে চলেছেন।

মা। যা মনে আসছে তাই?

উর্ম্মিলা। তা নয়তো কি মা? আপনি যা ভেবে দুঃখ পাচ্ছেন তার কিছুই হয় নি। ঐ যে বাড়ীতে লোকজনের গোলমাল বলেন, কত লোক যে আপনার ছেলের কাছে ছবি আঁকাবার জন্যে আসছে তা আর কি বলব। আর এত ছবি ত আপনার ছেলে একলা এঁকে উঠতে পারে না, তাই লোকেরা দুধু জানাতে জানাতে চলে যায়। আর ওই যে রাতে ফেরার কথা বললেন না? কোথায় না জানি কোন্ বড়লোকের ঘরে কার ছবি এঁকে দিয়ে আসবার অর্ডার পেয়েছে তাই। এই আর কি। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন মা—তা'হলে সব মঙ্গল হবে।

মা। (উর্ম্মিলার চিবুক চুম্বন করে) আশীর্ব্বাদ করব বই কি মা—সাবিত্রী সমান হও, রাজরাজেশ্বর কোল আলো করুক (পুনরায় মস্তক চুম্বন)। আমি যে সদাই তোমাদের দুটিকে আশীর্ব্বাদ করছি—সে কি আর মনে করিয়ে দিতে হবে মা—সত্যি মধুসূদনের দয়ায় আমার শোভন যে দশজনের একজন হয়েছে, এত

লোক তার ছবির জন্যে আসছে, বড়লোকে তার ছবির কদর করছে—আমি জানতুম না মা—কেমন একটা অশুভ চিন্তা আমার মনকে কদিন থেকে ঘিরে রেখেছিল—ভগবান করুন আমারই যেন ভুল হয়—তুমি যা বললে তাই যেন হয় সত্যি। ঠাকুরকে কালকেই আমি পুজো দেব—চোখে দেখতে পাই না কি না মা—তাই মনটাই মনে জাগে আগে—আমারই যেন ভুল হয়, ঠাকুর, আমারই যেন ভুল হয়।

(বিভাসের প্রবেশ। পাশের বড় বাড়ীটার অধিকারী, শোভনের বন্ধুর ঘাট—বাড়ীর ছেলের মত বাড়ীর ভিতরে এর গতায়াত।)

বিভাস। কি ভুল জেঠাইমা?

মা। কে, বিভাস এলি বুঝি বাবা? এই বলছিলুম কেমন যেন একটা অমঙ্গল চিন্তা—এই শোভনকে নিয়ে, বৌমার কোলে যে আসছে তাকে নিয়ে, বৌমাকে নিয়ে মনের মধ্যে কদিন থেকে উঁকিঝুঁকি মারছিল, তাই ঠাকুরকে ডাকছিলাম তাদের যেন কোন বিপদ না হয় ঠাকুর, কোন অমঙ্গল তাদের ওপর যেন না পড়ে, তা আমার লক্ষ্মী মা বললে—আমি মিছেই ভেবে মরছি; আমার শোভনের কত নামডাক হয়েছে, কত লোক তার ছবি না পেয়ে দুঃখ করে ফিরে যাচ্ছে; কে বড়লোক তাকে দিয়ে ছবি আঁকাবার জন্যে ডেকে নিয়ে যাচ্ছে, তাই বলছিলুম বাবা, আমারই যেন ভুল হয়, কালই আমি ঠাকুরকে পুজো দেব।

উর্ম্মিলা। (ঠোঁটের ওপর আঙুল রেখে ইঙ্গিতে বিভাসকে কোন কথা খুলে বলতে মানা করে) মা, আপনার পুজোর সময় হোল, চলুন ঠাকুরঘরে যাই!

মা। আমি নিজেই যাচ্ছি মা, চোখ নিয়েছেন যিনি তিনিই আমায় নিয়ে যাবেন, কিন্তু বাবা বিভাস, তুমি খেয়ে যেও; বৌমা—বিভাসকে না খাইয়ে ছেড়ে না। ও ছেলে আমার বড় খেতে ভাল বাসে।

বিভাস। খাব বৈ কি জেঠাইমা—আর আপনার কাছে এসে কেই বা না খেয়ে ছাড়া পেয়েছে?

মা। সেই কামনাই কর বাবা, আমার ঘরে এসে কেউ যেন না খেয়ে ফেরে না। মা অন্নপূর্ণা আমার ঘরে অবতীর্ণ হন।

[মা চলে গেলেন, মিনিট দুইয়ের বিস্তব্ধতা : উর্ম্মিলা মাথানত করে পায়ের নখ খুঁটছে, বিভাস তাহাদিকে চেয়ে আছে, শোভন ঘরের ভেতর প্রবেশ করল, পকেট বাড়িয়ে)

শোভন। বাঃ কপোত-কপোতী যথা—

কিংবা, হয়ত হবে দাদা করে কিংবা

ভাবছেনী সাথে।

Bravo, বিভাস, my dear and best friend, a thousand congrats, যাক্, (উর্ম্মিলার দিকে চেয়ে) আমাকে আরও গোটাকুড়ি টাকা দিয়ে বাধিত কর।

(উর্ম্মিলা নিঃশব্দে চাবির থোলা ফেলে দিলে। শোভন আলমারীর দুয়ার খুলে টাকা নিলে)

তোমাদের আজকের মত আর বিরক্ত করব না, (বিভাসের দিকে চেয়ে) Wish a good time বিভাস।

[শোভন চলে গেলে মিনিটখানেক বিস্তব্ধতা]

বিভাস। (কতকটা যেন আপন মনে) শোভনটা দিনকে দিন উন্মাদ হয়ে উঠছে, কি ছিল কি হয়েছে। যা কল্পনা করতে শোভন একদিন ঘৃণায় শিউরে উঠত—এখন তা স্বচ্ছন্দে বলে চলে গেল। Nothing is a wonder in this earth!

উর্ম্মিলা। আপনি আর এ বাড়ীতে বেশী আসবেন না বিভাসবাবু!

বিভাস। তাই হবে উর্ম্মিলা! তোমার বলবার কিছু নেই, আমারও তোমায় জানাবার কিছু নেই। তবে যাবার সময় শুধু এইটুকু অনুরোধ তোমায় জানাই—যখনই প্রয়োজন বোধ করবে আমাকে স্মরণ কোর, লজ্জা পেও না। (এক বাণ্ডিল নোট উর্ম্মিলার হাতে দিয়ে) আর আজকে এইটে গ্রহণ কর—

উর্ম্মিলা। একটু দাঁড়ান—

(বিভাস ফিরে দাঁড়াল, উর্ম্মিলা গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করল। বিভাস দ্রুত ফিরিয়ে চলে গেল।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

[আলিপুর অঞ্চলে সৌখীন পাড়ায় একটি আধুনিক বাড়ীতে মিঃ সেনের ড্রয়িংরুম। লীলা পিয়ানো বাজিয়ে গান গাইছে। আশেপাশে গুটি কয়েক যুবক প্রশংসায় শতমুখে মুখরিত হয়ে উঠছে।]

লীলা। (গান)

"পাখী বলে, 'চাঁদা, আমারে তও,
যেন তুমি হেন নীড়ে রও।

প্রাণেতে আমি যারি যেখান
সাথী তাহাদের ফুরেই যান,
সে কি তুমি তব ছুরেই নও?
কেন তুমি তবে নীরবে রও?"

যুবকবৃন্দ।

এক নং—Beautiful,

দুই নং—Marvellous,

তিন নং—*Tres bien*,

চার নং—*Charmante*,

পাঁচ নং Go on, please.

লীলা—(হেসে। মুক করল)

"চাঁপা তবে বলে 'হায়-গো হায়,
যে আমার পাখনা শুনিতে পায়
নয়, নয়, পাখী সে তুমি নও।'"
"পাখী বলে, চাঁপা, আমারে কও,
কেন হেন তুমি গোপনে রও।
ফাগুনের প্রাতে উতলা বায়
উড়ে যেতে যে সে ডাকিয়া যায়,
সে কি তুমি তব ছুরেই নও?
কেন তবে হেন গোপনে রও।"

(পিয়ানো বাজাতে লাগল)

যুবকবৃন্দ। (সমস্বরে)—Excellent, go on.

লীলা।

"চাঁপা শুনে বলে, 'হায় গো হায়,
যে আমায় গুড়া দেখিতে পায়
নয়, নয়, পাখী সে তুমি নও।'"

[গান ও পিয়ানো থামিয়ে উচ্ছ্বসিত হাসিতে ভেঙ্গে পড়ল। শোভন প্রবেশ করল মস্তবড় এক ফুলের তোড়া বুকের মাঝে নিয়ে, পিছনে দুটো বেয়ারা, তাদের হাতেও একটা করে ফুলের বাস্কেট]

শোভন। রাখ্‌তো, টেবিলকা উপর।

[বেয়ারাদের বাস্কেট দুটী টেবিলে রাখলে, শোভন তাদের ১৲ টাকা করে বখসিস দিল, তারা সেলাম করে চলে গেল]

(চেঁচিয়ে)—লীলা দেবী।

[লীলা হাসি থামিয়ে দৌড়ে এল, শোভন তাকে টেনে এক পাশে টেনে এনে তাকে তোড়াটা দিয়ে, অভিমানবিক্ষুব্ধ স্বরে]

—এ সব কি লীলা দেবী? আপনি চিঠি পাঠালেন—আজ সন্ধ্যা আজকে একান্ত ভাবে আমার। আর এখি মধ্যে (ওপে,) ১, ২, ৩, ৪, ৫ জন আপনাকে ঘিরে বসে আছে। এর মানে কি?

লীলা। (চাপা স্বরে) মাপ করবেন শোভন বাবু, আমিও এর জন্যে প্রস্তুত ছিলুম না—কিন্তু বেচারীরা যখন এসে পড়ল একটা গান না শুনিয়ে কি করে বিদায় করি বলুন। বড্ড নিরীহ বেচারা সব, ঐ ওটি (একজনকে ইসারায় দেখিয়ে) এখনও কলেজের গেট পেরোয় নি, আর ঐটি (আর একজনকে আঙ্গুলের ইসারায় দেখিয়ে) ময়নাডাঙ্গার কুমার সাহেব, বাপ মরতেই একটা Packard কিনে আমার drive-এ নিয়ে যেতে এসেছে—একটা আস্ত simpleton (হাসল)।

শোভন। আপনি হাসছেন, কিন্তু আমার কান্না পাচ্ছে। যদি বুঝতেন কতখানি কষ্ট স্বীকার করে আপনার কাছে দৌড়ে এসেছি!

লীলা। (উচ্ছ্বসিত হাসিতে ভেঙ্গে পড়ল) সত্যি আপনি এ রকম রাগ করবেন জানলে মাথা ধরেছে বলে এদের সরিয়ে দিতুম। (শোভনের হাত ধরে) বসুন না একটু?

শোভন। (হাত ছাড়িয়ে) না, আপনি আপনার খেয়াল নিয়ে থাকুন—আমি চললুম। আপনি ছেলে-মানুষী করতে ভালবাসেন, কিন্তু আমার তা একদম ভাল লাগে না।

(বেগে চলে গেল)

লীলা। শুনুন শুনুন, please শোভন বাবু

(শোভনের অনুসরণ করলে)

যুবকবৃন্দ।

এক নং—আবার ঐ আর্টিষ্টটা—

দুই নং—যেন যমদূত, এলে আর ছাড় ছোড় নেই (বিরক্তির সঙ্গে) Something is rotten in Denmark

তিন নং—And also in this house; misfortune ভায়া, misfortune, পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি, আপন গন্ধে মম, কস্তুরীমৃগ সম।

কুমার সাহেব। কালকে আমার municipal market-এর সমস্ত flower stall উঠিয়ে আনতে হচ্ছে।

এক নং—কিন্তু তুমি ত থাকতে পারবেন না কুমার সাহেব।

(লীলার প্রবেশ)

লীলা। আমায় মাপ করবেন আপনারা, শোভন বাবু যে হঠাৎ ধূমকেতুর মত এসে আপনাদের বিরক্ত করবেন তা আমি স্বপ্নেও ভাবি নি।

যুবকবৃন্দ (সমস্বরে)। সে কি কথা লীলা দেবী, আমাদেরই ক্ষমা করবেন, আপনাকে বিরক্ত করছি···

লীলা। It's a pleasure, কিন্তু আজকে আবার একটি ছুটি দিতে হচ্ছে। (হাতঘড়ি দেখে) It's high time to join Mrs. Roy's party.

কলেজের ছোকরা। নিশ্চয়, নিশ্চয়—কিন্তু মাঝে মাঝে এসে আপনাকে এরকম বিরক্ত করতে অনুমতি পেতে পারি কি, মিস সেন ?

কুমার সাহেব। কালকে আমাকে যদি এই এত (হাত দিয়ে দেখিয়ে) ফুল নিয়ে আসতে kindly হুকুম দেন !

লীলা। (কুমার সাহেবকে) Many thanks ! ফুল আমি বড় ভালবাসি। (কলেজের ছোকরাকে) আপনি নিশ্চয়ই আসবেন কিন্তু (দু'জনের দিকে পর পর চেয়ে) We will have a nice drive (সকলকে) আচ্ছা Good night (আলস্যভাবে আড়মোড়া ভেঙ্গে) সত্যি, আজকে এত আনন্দ পেলুম। নমস্কার (চলে গেল)।

[সকলে একে একে প্রস্থান করলে লীলা ফিরে এল]

লীলা। (নিজে নিজে)—উঃ What a bore। মাছির মত ঘিরে বসে আছে, যত হাত দিয়ে সরিয়ে দি তত গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। শোভন বাবু রেগে ক্ষ্যাপা। বললুম ত অত করে একটু বাদে আসুন—আমি এদের সরিয়ে দিচ্ছি ; দেখি আসবে কি না (হেসে) আসবে নিশ্চয়ই। (একটু থেমে) যত সব পাগলদের নিয়ে পড়া গেছে।

(পেছন থেকে রবিনের প্রবেশ)

রবিন। তোমাকে আমার আজকে ভীষণ প্রয়োজন লীলা।

লীলা। (ফিরে) কে, রবিন ? তোমাকে ত আমি ডাকি নি, তুমি আবার কেন এলে ?

রবিন। ডাক না বলেই আসি—ডাকলে বোধ হয় আসতাম না—ফুল যখন তার বুকের মাঝে মধু আর সৌরভ নিয়ে শতদলে বিকশিত হয়ে ওঠে, তখন সে কি ভ্রমরমুখীকে আসুন আসুন বলে আহ্বান-লিপি পাঠায় ? না—পূর্ণিমার তিথিতে আকাশ যখন পরিপুষ্ট চাঁদের শোভায় ঝলমল করে হেসে ওঠে, সমুদ্রকে উদ্বেলিত হয়ে কূলে ওঠবার জন্যে সে সকাতর মিনতি জানায় ? It's in Nature, হতেই হবে। যাক্ শোন, টাটার স্টীমারশিপ যোগাড় হয়েছে, খুব শীগ্‌গিরই, বোধ হয় আসছে হপ্তাতেই আমাকে sail করতে হবে। তার আগেই আমাদের বিবাহটা হয়ে যাওয়া দরকার।

লীলা। রবিন (চুপ করে রইল)

রবিন। কি বলবে বল—থেমে গেলে তোমায় ভালবাসি কি না এই ত ?

লীলা। (সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ল)

রবিন। (পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে) Here's the proof, নাও পড়, (লীলাকে দিল)

লীলা। (ফিরিয়ে দিয়ে) আমি ভাল পড়তে পারি না, তুমি পড়।

My heart aches, for thee :
I strain my every nerve to forget you—
Forget the bliss and peace
You brought to me by your presence—
gracious and sweet.
Your perfumed body
Your silky hair
Your coral lips with a touch of Joy of Life.
But all in vain :
In vain I engage myself to work—
For, my spirit roameth about thee
And dive deep in the wine-dark sea
Of thine coal-black eyes
And knoweth not how and where to retreat.
And when I do succeed—
Succeed to collect my lost senses
You glide silently and softly.
In my sleep
Your unruly locks, I feel, quivering on my face
Your pitch-dark eye-lids, I see, staring at mine,
Slow upheaval of your breasts, round and soft
I perceive with all my sense.

এরপরও কি আবার গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে বলতে হবে, তোমায় আমি ভালবাসি?

লীলা। থাম, চুপ কর, বাবা বাড়ীতে আছেন।

রবিন। বেশ চুপ করলেম কিন্তু তুমি কথা দাও।

লীলা। বাবার মত নাও।

রবিন। তুমি রাজী হলেই হল, তাঁর মতের কিছু প্রয়োজন দেখি নে। (লীলার হাত ধরে) তুমি ত ছেলে মানুষ নও লীলা!

লীলা। না না, তা কিছুতে হতে পারে না, বাবাকে না জানিয়ে কিছুতে আমি রাজী হতে পারি না।

(মাথা নাড়তে লাগল)

রবিন। বেশ, তাই হবে। আজকে রাত্রেই আমি তোমার বাবার মত নেব। চল এখন একবার মার্কেট ঘুরে আসি। কিছু shopping করতে হবে।

লীলা। Extremely sorry, আমার এক বন্ধুকে এক্ষুণি আসতে নিমন্ত্রণ করেছি।

রবিন। ওঃ বুঝেছি, শোভনটা আসছে বুঝি? একেবারে বদ্ধ পাগল···এই সেদিন একটা ইউনিভার্সিটি-মেয়েকে করে তার সমস্ত ভবিষ্যৎটা নষ্ট করে দিলে, এখন লেগেছে তোমার পিছনে। Dont believe in those artists; please do come along, I'll drop you in half an hour। শোভনের চিন্তা নাই। He will, I do assure you my darling, sit like a rock and smell your balmy absence.

লীলা। তোমাদের নিয়ে মুস্কিল—দাঁড়াও এক কলম লিখে যাই (কাগজ কলম নিয়ে) কি লিখি বলত?

রবিন। Please do wait till I come, please. You will eat my head.

লীলা—(হেসে) থাক্, ওটা না লিখলেও চলবে। চল।

[দুজনে চলে গেলে মিঃ সেনের প্রবেশ। পরণে পায়জামার উপর ড্রেসিং গাউন, মুখে পাইপ। চেয়ারে বসে কাগজ-পত্র নাড়া-চাড়া করতে করতে কলিংবেল টিপলেন]

বেয়ারা। হুজুর।

মিঃ সেন। (কাগজপত্র দেখতে দেখতে মুখ না তুলে) হুইস্কি-সোডা।

[বেয়ারা হুইস্কি সোডার গ্লাস টেবিলের উপর রেখে গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে সোডা মিশিয়ে দিলে। মিঃ সেন একচুমুক পান করে]

মিস বাবাকো সেলাম দেও।

[বেয়ারা প্রস্থান করল এবং একটি সজ্জিতা প্রৌঢ়া মহিলা মিঃসেনের কাছে এসে মিঃ সেনের সামনের চেয়ারে বসল। মিঃ সেন মুখ তুলে দেখে, থমকে]

কে আপনি? কাকে চান?

মহিলা। আমি চাই আপনাকে, আমি কে তা কি আমাকে বলতে হবে? ভাল করে চেয়ে দেখ দিকি!

(বেয়ারার প্রবেশ)

বেয়ারা। মিস বাবা বাহারমে হাওয়া খানে গিয়া হুজুর! তুরন্ত আয়েঙ্গে দরোয়ানজীকো বোল গিয়া।

মিঃ সেন। আচ্ছা, ঠিক হায় যাও।

(বেয়ারার প্রস্থান)

মহিলা। চিনতে পারলে কি?

মিঃ সেন। (মহিলার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করে, তার চোখের দিকে চেয়ে অস্ফুটস্বরে)—তুমি, তুমি অঞ্চনতী?—তুমি কোথেকে প্রেতের মত এতদিন বাদে আবার আমার জীবনমঞ্চে আবির্ভূত হলে? কিন্তু তুমি যাও, অঞ্চ যাও, যা মহাকালের গর্ভে গিয়েছে নিঃশেষে, নিশ্চিহ্নে বিলীন হয়ে, তাকে আর তুমি নিষ্ঠুর ডুবুরীর মত টেনে তুল না—যে আবর্জ্জ এতদিন বাদে হয়েছে স্থির, মাটী জমেছে নীচে, জল হয়েছে স্বচ্ছ, তাকে আর তুমি তোমার ক্রূর নিয়তি দিয়ে ঘোর না পঙ্কিল—মিনতি আমার, করজোড়ে অনুরোধ জানাই অঞ্চ, তুমি যাও।

মহিলা। (হেসে) যাব বলে তো আর আসিনি। থাকব বলেই এসেছি। (গম্ভীর ভাবে) তোমার সঙ্গে গুটি কয়েক বিশেষ জরুরী কথা আছে।

মিঃ সেন। (চীৎকার করে) কোন কথা নেই। (আস্তে, নিজে নিজে) তুমি আমার কাছে একটা প্রকাণ্ড দুঃস্বপ্ন। আমার কাছে তোমার হয়েছে অপমৃত্যু বহু-কাল আগে। রাত্রি প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে আমার স্বপ্ন গেছে টুটে, যৌবনের সমাধির সঙ্গে সঙ্গে হয়েছে তোমার চিতাগ্নি। (হুইস্কি পান, পরে মহিলাকে হাত দিয়ে দুয়ার

দেখিয়ে, চীৎকারে) যাও বেরিয়ে যাও তুমি, তোমার কিছু প্রয়োজন নেই আমার কাছে।

মহিলা। (নিরুত্তরে বসে রইল)

মিঃ সেন। (আরও চীৎকার করে) যাও, এখনও গেলে না—(উত্তেজিত ভাবে দাঁড়িয়ে) বেয়ারা, বেয়ারা—

মহিলা। আঃ, কেলেঙ্কারী কোর না—তোমারই মুখ পুড়বে।

[মিঃ সেন অবসন্ন ভাবে চেয়ারে বসে পড়ে হাত দিয়ে কপাল টিপে ধরল, বেয়ারা এসে সেলাম করে দাঁড়াল]

মহিলা। সাহেব-কা ওয়াস্তে হুইস্কি সোডা, আউর বরফ।

[বেয়ারা সায় জানিয়ে বরফ নিয়ে চলে গেল ; মহিলা হাসি মিয়ে]

নাও, এইটে শেষ করে ফেল দিকি, nervousness কমবে।

[মিঃ সেন বিনা বাক্যে শেষ করে হাতের মধ্যে মাথা গুঁজে বসল]

মহিলা। এখন কাজের কথা বলছি, শোন, এক্ষুনি হয় ত কেউ এসে পড়বে। তোমার মেয়ে লীলা একটা society flirt হয়ে উঠেছে জান বোধ হয় ?

মিঃ সেন। (মুখ তুলে) তোমার ভাষাটা একটু সংযত কর অভ্র।

মহিলা। (হেসে) আচ্ছা, ঘুরিয়ে বলছি। লীলা বছরখানেক ধরে কয়েকটি প্রেম-মুগ্ধ যুবককে নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে, বোধ হয় খেয়াল রাখ। এই দেখ তার সাক্ষী (হাত দিয়ে ফুলগুলি দেখাল)।

মিঃ সেন। You are still vulgar, অভ্র।

মহিলা। (হেসে) It's in me, I can't help it. বেশ, এখন জবাব দাও, লীলার আশে পাশে গুটি-কয়েক যুবক রাত-দিন থাকে কি না ?

মিঃ সেন। কেউ কেউ হয় ত থাকতে পারে, কিন্তু এতে আমি কিছু দোষ দেখি না—কারণ লীলা আমায় খোলাখুলি ভাবে জানিয়েছে, এদের মধ্যে থেকেই এক জনকে সে শীঘ্রই জীবনের মত বেছে নেবে।

মহিলা। শুনে আন্তরিক সুখী হলুম। কিন্তু কথা তা নয়। কথা হচ্ছে, এদের মধ্যে একজন রবিন বলে আছে, তাকে নিয়ে,—তাকে চেন ?

মিঃ সেন। ঠিক আমার সঙ্গে আলাপ হয় নি, তবে লীলার মুখে শুনেছি, এইবারে সে বি. এ.-তে কোন্ সাবজেক্টে ফার্ষ্ট হয়েছে এবং টাটার স্কলারশিপের চেষ্টায় আছে।

মহিলা। হাঁ, জোগাড় হলে বিলেত যাবে আই. সি. এস. দিতে।

মিঃ সেন। কিন্তু তার সম্বন্ধে তোমার এই অহেতুক-কৌতূহল কেন ? কি রকম দেখতে বল দিকিন ?

মহিলা। (স্থিরভাবে চেয়ে) এই কতকটা তোমার আর কতকটা আমার মত। ধর, চোখ, কপাল, চিবুক তোমার মত, আর নাক ঠোঁট আমার মত ; Intellect-এ তোমাকেও ছাড়িয়ে যায়, vulgarism-এ আমাকেও হার মানায়।

মিঃ সেন। (চমকে উঠে) বলছ কি তুমি ! তুমি কি hint করছ আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

মহিলা। বোধ হয় একটু একটু পারছ।

মিঃ সেন। (চীৎকার করে) হেঁয়ালী ছাড় অভ্র, (হাত ধরে) বল তুমি কি বলতে এসেছ ?

মহিলা। আরে চেঁচাও কেন ? সেই ত বলছি। হাত ছাড়, লাগছে (হাত ছাড়িয়ে)—রবিন তোমার এবং আমার—দুজনেরই (মিঃ সেনের নিকট মুখ নিয়ে গিয়ে আসে আস্তে, যেমন লীলা তোমার এবং মিসেস সেনের···

[বাইরে রবিন এবং লীলার কণ্ঠস্বর শোনা গেল। মিঃ সেন উত্তেজিতভাবে ধরধর ছুটোছুটি করে মহিলার দুটো হাত ধরে তাকে চেয়ার থেকে উঠিয়ে তুলে]

মিঃ সেন। আমায় রক্ষা কর অভ্র, তোমার দুটি পায়ে পড়ি (নতজানু হল) তুমি, আমার ভেতরের বাগান দিয়ে বাইরে চলে যাও।

[মহিলা ধীরে ধীরে ভেতরে গেল। প্রবেশ করল লীলা এবং রবিন হাত ধরাধরি করে]

লীলা। (মিঃ সেনের বুকের কাছে এসে) বাবা তুমি আমায় ডাকছিলে ? বেয়ারা বলল।

মিঃ সেন। হাঁ মা, তোমার সঙ্গে একটা জরুরী কথা ছিল। কালকে তুমি আর আমি ডেরাডুন যাচ্ছি।

রবিন। বাঃ, তা কি করে সম্ভব হয় ? লীলা, তুমি আমায় introduce করে দাও, (স্বগতঃ) propose করে ফেলি।

লীলা। হ্যাঁ দিই। বাবা ইনিই মিঃ রবিন সরকার, এই বারের ঈশান স্কলার, বিলেত যাবেন আই. সি. এস. দিতে।

মিঃ সেন। (ভীতভাবে) বড় খুসী হলুম, রবিন, বড় সুখী হলুম বাবা, wish you success, my child.

রবিন। থ্যাঙ্কস্. যাক, আমি একটা অতি প্রয়োজনীয় এবং বিশেষ দরকারী—মানে যে কথার ওপর আমাদের দুজনকার life depend করছে—তা আপনার কাছে বলতে এসেছি।

(লীলা ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছিল)

মিঃ সেন। (লীলাকে) তুমি যেও না লীলা, তোমারও থাকা প্রয়োজন। বস ঐ সোফাটায় (লীলা বসল, রবিনের দিকে ফিরে) আমি জানি রবিন তুমি কি বলতে এসেছ।

(টেবিলের কাছে গিয়ে একখানা বই নিয়ে পাতা উল্টাতে থাকে, ঠোঁট পাইপ লাগিয়ে ধরবার পাতাটা করতে করতে উপায় খুঁজছে)

—কিন্তু তা হয় না রবিন, তা হবার নয়। It's absolutely impossible (টেবিলের কাছে)

[টেবিলের কাছে গিয়ে কলিংবেল টিপলে। বেয়ারা এলে, মিঃ সেন বইয়ের আঙুল তুলে বাতিটা দেখালো। বেয়ারা পুনরায় বাতি করে দিয়ে গেল]

রবিন। (চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে মিঃ সেনের সামনে দাঁড়িয়ে) কেন হয় না, কেন হবার নয়, কেন absolutely impossible তা জানতে পারি কি? (উত্তেজিতভাবে) আপনি জানেন না মিঃ সেন, আমাকে refuse করে আপনি কতখানি হারাচ্ছেন, আমাকে উপেক্ষা করে লীলার জীবনে কতখানি বিষ ঢেলে দিচ্ছেন; আমাদের মাঝে অর্গল টেনে দিয়ে কতখানি সৌভাগ্য থেকে আপনি আপনার লীলাকে বঞ্চিত করছেন।

মিঃ সেন। (বাধা দিয়ে) আমি জানি রবিন, জানি তোমাকে উপেক্ষা করে কতখানি আমি জিতছি। বিষ আমি লীলার জীবনে ঢেলে দিচ্ছি না, অনন্ত হলাহল থেকে তাকে আমি উদ্ধার করছি; তোমাদের মাঝে অর্গল টেনে দিয়ে লীলাকে সৌভাগ্য-শিখরে বসাতে অক্ষম হলেও তাকে কতখানি অনভীপ্সিত, দুর্ভাগ্য থেকে রক্ষা করছি।

রবিন। আপনি কি বলছেন, আমি বুঝতে পারছি নে, হেঁয়ালী আমি জীবনে জানিনে, পরিষ্কার করে খুলে বলুন, আমায় বুঝিয়ে দিন, কিসে আমি লীলার অনুপযুক্ত, কি কারণে?

মিঃ সেন। (হেসে) হেঁয়ালী, জীবনটাই তো একটা মস্ত হেঁয়ালী, it's not a question of fitness my dear boy, but of হেঁয়ালী। এই দেখ না, চাঁদ আর সূর্য্য কখনও পরস্পরের দেখা পায় না, যুগ যুগ ধরে পায় নি, যুগ যুগ ধরে পাবে না, তা বলে কি চাঁদের চন্দ্রিমা নেই, না সূর্য্য আলো দেয় না? আবার দেখ, বসন্তের আগমনে আকাশ মেঘমুক্ত হয়ে প্রশান্ত নীলিমায় হেসে ওঠে, তা বলে ত মেঘের অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে পারা যায় না, কারণ? কারণ জানতে চাইছে? কারণ হচ্ছে two parallel lines never meet together.

রবিন। আপনার হেঁয়ালী এবার mysteryতে পরিণত হল, কিন্তু তা' হলেও I do remind you, sir, it does not help the situation in the least. However আজকার মত good night, good night লীলা dear, (চলে গেল, পরে ফিরে এসে) just a word, লীলা, with your permission, মিঃ সেন।

[লীলা ও রবিন ডানের বাইরে গেলে, শোভনের প্রবেশ]

শোভন। আপনাকেই খুঁজছিলাম মিঃ সেন। একটা delicate কথা আমি এখুনি শেষ করে ফেলতে চাই।

মিঃ সেন। এই delicate কথাটা আজকের মত বন্ধ রাখলে ভাল হয় না?

শোভন। নাঃ নাঃ, লীলা দেবী দু'মাস ধরে নিজে এই কথাটা শুনতে চাইছে না, আপনাকেও শোনাতে দিচ্ছে না, কিন্তু আমি আজকে desperate হয়েছি (মিঃ সেনের সামনে এসে) আমি লীলার পাণিপ্রার্থী।

(বিভাসের প্রবেশ)

বিভাস। But my dear friend, you are already married and going to be a proud father very soon.

শোভন। (বিভাসকে) Please dont interrupt me, its none of your business (মিঃ সেনকে) আপনি ত জানেন মিঃ সেন, হিন্দু স্বামী একাধিকবার বিবাহ

করতে পারে। লীলাকে বিয়ে করতে আমি স্থির-প্রতিজ্ঞ।

বিভাস। আমারও একটি আরজী আছে আপনার কাছে মিঃ সেন। আমি লীলা দেবীকে বিবাহ করতে চাই, পরশু, কালকে কিংবা আজকে রাত্রেই।

(লীলার প্রবেশ)

মিঃ সেন। শান্ত হও, স্থির হও my boys, you put me into a funny dilemma (লীলাকে) লীলা, রবিন বাদে এই দুই ভদ্রলোকও তোমার পাণিপ্রার্থী ; আশা করি তুমি এদেরও চেনো এবং ভাল রকম জানো, এখন তুমি এই মুহূর্ত্তেই স্থির কর এদের মধ্যে কাকে তুমি prefer কর। I am pretty serious.

শোভন। আমি জানি মিঃ সেন, লীলা আমাকেই prefer করবে, she is the sole connoisseur of my art, she is my inspiration.

মিঃ সেন। Just a minute, young friend, তুমি কত টাকা ইনকাম-ট্যাক্স দাও ?

শোভন। (নিরুত্তর)।

মিঃ সেন। (বিভাসকে) তুমি, বিভাস ?

বিভাস। Here you are, মিঃ সেন (একটা রসিদ মিঃ সেনকে দিল)।

মিঃ সেন। (চোখ কপালে তুলে) By Jove, fifteen thousand Rupees, proprietor of nine coal-fields. Undoubtedly, you are the fittest groom for my লীলা।

(লীলাকে টেনে নিয়ে এসে, বিভাস এবং লীলার হাত এক করে) With all my blessings তুমি সুখী হও লীলা, আসছে রবিবার তোমাদের বিবাহ।

তৃতীয় দৃশ্য

[প্রথম দৃশ্যে যে বাড়ীটার বিবরণ দেওয়া হয়, সেই বাড়ীতে বিভাসের বসবার ঘর। এক পাশে একটা মখমলে ঢাকা খাটিয়া, তার ওপর ছেলেমেয়ে আঁকিয়া আর মধু-পালকের হাতপাখা। খাটিয়ার শিয়রে চুলের ওপর চাঁদে বাটির রবি আঁকা কুঁজো আর গ্লাস। মেজেতে ছড়ান তিন-চারটি বেতপাতার জলচৌকী। একদিকের দেয়ালে টেন দেওয়া একটা গড়ানে ডেস্ক, তার উপর টেলিফোন। যবনিকা উঠলে দেখা যায় বিভাস, সামনে সমুখ দিকের পুঁথি আর পেন্সি, খাটিয়ার উপর বসে ডাকিয়া কোলে নিয়ে সুর ভাঁজছে, বার কয়েক ইঁচু পরবার চেষ্টা করছে। হঠাৎ গান থামিয়ে]

বিভাস। মা, ও মা (চীৎকার করে) মা-মা-মা।

(নেপথ্যে—কী-ই-ই-ই)

বিভাস। একবার শীগ্‌গির এসো।

(মার ব্যস্তভাবে প্রবেশ)

মা। কি ! কি হয়েছে, (কৃত্রিম রাগতস্বরে) গাধার মত শুধু শুধু চীৎকার করছিস কেন ?

বিভাস। (গম্ভীর ভাবে) আমি গাধা, আমি বেবুন, আমি ভালুক, হনুমান, টিক্‌টিকি, গিরগিটী, গুবরে, হিপো-পটেমাস।

মা। তুই একটা আস্ত বাঁদর (স্বগত—আমার সাত রাজার ধন এক মাণিক) এমন কিচিমিচি করছিলি কেন ?

বিভাস। মা আমি ভেবে দেখলুম, তোমার উপদেশ-গুলো আলোচনা করে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হলুম, পরিষ্কার ভাবে উপলব্ধি করলুম।

মা। (কৃত্রিম রাগতস্বরে) কি বলবি বল, কাযের সময় অত ভূমিকা ভাল লাগে না।

বিভাস। আমার মন সম্মতি জানিয়ে যত দিল যে—

মা। (বাধা দিয়ে) আবার আমি চললুম (যেতে উদ্যত)।

বিভাস। (মার হাত ধরে টেনে নিয়ে এসে) থাঃ চটছ কেন ? আগে কি খাওয়াবে বল ?

মা। কি মজার খবর ? বলে ফেল্ বাপু, না হলে ফের চললুম বিভাস (চলে যেতে উদ্যত)।

বিভাস। মা আমি বিয়ে করতে মত করেছি (খাটিয়ায় বসল)।

মা। (একটা জলচৌকী টেনে নিয়ে আহ্লাদের সঙ্গে ছেলের পাশে বসে) সত্যি ; কি ভাগ্যি আমার।

বিভাস। হ্যাঁ, ঠিক করলুম, বিয়ে না করে জীবনটা মরুভূমি করে দেওয়া বাতুলতা মাত্র।

মা। তা হলে কালকেই সেই মেয়েটার জন্যে কথা পাড়ি ? তারা ত তোর জন্যে হ্যাংটান করছে।

বিভাস। না, না সেখানে নয়। মেয়ে আমি দেখে এসেছি ! এক রকম ঠিক করে এসেছি।

মা। (অবাক্ বিস্ময়ে) সে কি রে, কোথাকার মেয়ে, কাদের বাড়ীর মেয়ে, দেখতে কেমন ?

বিভাস। দেখতে ভালই, ব্যারিষ্টার মিঃ সেনের মেয়ে। গান গায়, নাচে, কাঁদে, হাসে, ওডোরোনো মাখে, নারকেল তেল ছোঁয় না, শ্যাম্পু করে, দু'দিন অন্তর এক শিশি সেন্ট ওড়ে।

মা। না বাপু ও সব মেয়ে চলবে না, আমাকে তুই ছেড়ে দে, আমি আরও ভাল মেয়ে নিয়ে আসব। তোর জন্যে মেয়ের অভাব ?

বিভাস। না মা, তা হবে না, একেই তোমার বৌ করতে হবে। তুমি কথা দাও মা, এ না হলে আমি আর কাউকে বে করব না।

মা। (ভাবিত স্বরে) তুই অবাক্ করলি বিভাস। এতদিন তো সবাইকে তাড়িয়ে আমাকে একটা মনের মত বৌ আনতে দিলি না, এখন একটা মেম-সাহেব ধরে নিয়ে আসছিস, যা ইচ্ছে কর (প্রস্থানোদ্যত)।

বিভাস। (মাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে এসে) চলে গেলে হবে না মা, তুমি কথা দাও। বল, ও এলে তুমি আমার কাছ থেকে কোথায় পালাবে না ? (কাতর ভাবে মার মুখের দিকে চেয়ে রইল)।

মা। (গম্ভীর স্বরে) বিভাস একটা কথা বলবি ?

বিভাস। কোন্ কথাটা তোমার কাছ থেকে লুকোই মা ?

মা। (বিভাসের চোখের দিকে স্থির নয়নে চেয়ে) তুই কি তাকে ভালবেসেছিস ? কই আমাকে ত কিছু বলিস নি।

বিভাস। না মা তুমি যা ভাবছ সে রকম কিছু নয়। তোমাকে স্পষ্টাক্ষরে বলছি তাকে আমি ভালবাসি না, বরঞ্চ মনে মনে অপছন্দ করি, কিন্তু এও তোমাকে জানাচ্ছি, তাকে বিবাহ করা ছাড়া আমার আর উপায় নেই (মার পায়ের কাছে নতজানু হয়ে বসে পড়ে) তুমি অনুমতি দিয়ে আমায় রক্ষা কর মা।

মা। (বিভাসকে দুই হাত দিয়ে উঠিয়ে মস্তক চুম্বন করে) ওঠ বাবা, ওঠ, তুই তাকেই বিয়ে করে ঘরে নিয়ে আয়, আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করি তোরা সুখী হ'।

[আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে চলে গেলেন]

বিভাস। (নিজে নিজে) থাক্, মাকে রাজী করিয়েছি, দেখি এইবার শোভনটা কি করে।

[উর্ম্মিলা প্রবেশ করে বিভাসের পায়ে লুটিয়ে পড়ল]

বিভাস। (আশ্চর্য্যভাবে) উর্ম্মিলা ? কি হয়েছে ? অত কাঁপছ কেন ? খুলে বল উর্ম্মিলা কি হয়েছে।

উর্ম্মিলা। (বিভাসের পায়ে মুখ গুঁজে) তাড়িয়ে দিলে, বিভাস-দা, তাড়িয়ে দিলে, আমি আর বাঁচব না বিভাস-দা, এই দেখ (উর্ম্মিলা বাহু দেখালে, তাতে প্রহারের চিহ্ন)।

বিভাস। (উত্তেজিত ভাবে) Scoundrel ! শোভনটা বুঝি বাড়ী ফিরে মারধর আরম্ভ করেছে (স্বগত) the last resort of a gentleman. (উর্ম্মিলা ধীরে ধীরে খাটিয়ায় শুয়ে পড়লে তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে)—তুমি কিছু ভেব না উর্ম্মিলা, আমি ডাক্তার আনছি এক্ষুণি ভাল করে দেবে (নিজের হাত দেখে) ইস্ ! রক্ত এল কোথেকে।

উর্ম্মিলা। আমি আর বাঁচব না, বিভাস-দা, আমার সর্ব্বশরীর কি রকম করছে, ওঃ বড্ড ব্যথা—সে যদি বেঁচে থাকে বিভাস-দা, তুমি তাকে কোলে তুলে নিও, তোমার বন্ধুর হাতে দিও না—বিভাস-দা যন্ত্রণায় মরে গেলুম (মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল)।

বিভাস। (চীৎকার করে) মা-মা-মা, শীগগির এস।

[মা ছুটে এল]

বিভাস। মা, উর্ম্মিলাকে শোভন মারধর করে তাড়িয়ে দিয়েছে, সে আমার কাছেই ছুটে এসে অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। (স্বর নামিয়ে) ও অন্তঃসত্ত্বা ছিল, বোধ হয় বেদনাও উঠেছে, (সকাতরে) তুমি একে রক্ষা কর মা।

মা। (কুঁজো থেকে জল নিয়ে উর্ম্মিলার চোখে মুখে ছিটিয়ে) তুই যা বিভাস এক্ষুণি ডাক্তার নিয়ে আয়, আমি এর ব্যবস্থা করছি। আর ঝিকে বলে যাস, এক বাটী গরম দুধ দিয়ে যাবে।

[বিভাস চলে গেল, মা হাত পাখা নিয়ে উর্ম্মিলার মাথায় বাতাস করতে লাগলেন]

উর্ম্মিলা। (আস্তে আস্তে চোখ চেয়ে, ঈষৎ নড়ে চড়ে, কাপড় গুছিয়ে) আমি কোথায় ?

মা। (পাখা রেখে উর্ম্মিলার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে) তুমি বিভাস-দার ঘরে, আমি বিভাসের মা—তোমার কোন ভয় নেই।

উর্ম্মিলা। বিভাস-দার মা, তবে তুমি আমারও মা, (উঠে বসে মা'র পায়ের ধুলো নিতে গেল)

মা। (ধরে শুইয়ে দিয়ে) থাক মা থাক হয়েছে, সাবিত্রী সমান হও।

উর্ম্মিলা। (ক্ষীণ হেসে) না মা ও আশীর্ব্বাদ আর করবেন না, বড় জ্বালা।

(ঝি দুধ নিয়ে প্রবেশ)

মা। তা বললে কি হয় বাছা, হিঁদু ঘরের বৌ-তুমি, সীতার মত কত সইতে হবে, নাও এটুকু খেয়ে ফেল।

[বাটীটা মুখের সামনে ধরলে, উর্ম্মিলা ঘাড় উঁচু করে দুএকটুখানি আস্তে আস্তে খেয়ে নিয়ে আবার শুয়ে পড়ল। ঝি পাখার বাতাস করতে লাগল, মা উর্ম্মিলার মাথায় হাত বুলোতে লাগলেন]

উর্ম্মিলা। মা!

মা। কি মা, কষ্ট হচ্ছে, গরম সেঁক দেবো?

উর্ম্মিলা। অনেক কম, কিন্তু তা নয়। বলছি সীতাও মা শেষকালে বসুমতীর কোলে স্থান নিয়েছিল।

মা। থাক বাছা, ও নিয়ে আর মাথা খারাপ কোর না। চুপ করে শুয়ে থাক দিকি, এক্ষুণি সেরে উঠবে।

উর্ম্মিলা। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে) সেরে আর আমি উঠব না মা, কেবল যে আসবে সে যদি থাকে, তাকে তুমি বাঁচিও, (একটু হেসে) বিভাস-দার মত করে মানুষ কোর।

মা। তুমি নিশ্চিন্ত থাক মা, আমি তাকে বুকে করে মানুষ করব, তোমার কোন ভাবনা নেই। এখন চল দিকি আবার ঘরে, একটু আরামে ঘুমুবে।

উর্ম্মিলা। বিভাস-দা কোথায়?

মা। ডাক্তার ডাকতে গেছে। এই এলো বলে, তুমি চলো আমার ঘরে, কষ্ট হবে না তো?

উর্ম্মিলা। না, চলুন।

[মা ও ঝি উর্ম্মিলার দুই বাহু নিজেদের কাঁধের ওপর রেখে ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে উর্ম্মিলাকে নিয়ে অন্তঃপুরের দিকে চলে গেল]

(কিছুক্ষণ পরে রবি ও লীলার প্রবেশ)

রবিন। এটা একটা আশ্চর্য্য লীলা যে, যখনই তুমি কোন বিশেষ দরকারে কারুর বাড়ীতে গেছ অমনি সে বাড়ী নেই, এ একেবারে inevitable, দিনের আলোর মত সত্য। (ঘরময় পায়চারী করতে করতে) পনের হাজার টাকা ইনকাম-ট্যাক্স। A blessed proprietor of nine coalfields. A renowned দাতাকর্ণ। A damned hypocrite.

লীলা। (হেসে) এলেন্ত ত হাত পাততে, তাতে আবার অত গায়ের জ্বালা কেন?

রবিন। Simply because of you, my dear লীলা, Simply because you have made me crazy and for you I borrow.

লীলা। কিন্তু রবিন ভয়ে আমার বুকের ভেতর এখনো ঢিপ ঢিপ করছে, জিব শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, গাটা থেকে থেকে শিউরে উঠছে, আর মনটা কেবলই ওমরে ওমরে বলছে, ভাল করলি নি, ভাল করলি নি। রবিন আমাকে ছেড়ে দাও, বুড়ো বাপকে ফেলে আমি পালাতে পারব না।

রবিন। (এগিয়ে এসে লীলার হাত বজ্রমুষ্টিতে ধরে) আমাকে ছেড়ে যাবে কোথায়? Do you prefer an old fossil of a dad to a prospective civilian? No fears। ট্রেনে চড়লেই all will be simple like a clock-work. তারপর জাহাজে চেপে পড়তে পারলে you and I and the all-engulfing sea. A hilarious time (রিষ্টওয়াচ দেখে) কিন্তু আহাম্মকটা এখনও আসছে না, এদিকে সময়ও আর বেশী নেই (যেন কি মনে পড়ে যেতে) হ্যাঁ, you better wait outside. ট্যাক্সির ভেতর গিয়ে উইণ্ডস্ক্রীন লাগিয়ে বসে থাকগে যাও। চালিয়াৎটা দেখে ফেললে সব মাটী হয়ে যাবে।

লীলা। আমি যাব না, আমি বিভাস বাবুকে সব খুলে বলব, আমি বাবাকে টেলিফোন করে এখুনি সব জানিয়ে দেবো (টেলিফোনের কাছে এগিয়ে গেল)।

রবিন। (বাধা দিয়ে) Don't be silly লীলা—Have mercy on my poor soul. Do please give me a chance You'll be happy, I assure

you, you will be lolling in never ending dreams. Now, do be good enough to come outside, darling dear, and wait in the taxi.

(লীলাকে এক রকম টানতে টানতে বাইরে নিয়ে গেল, লীলার হাত থেকে রুমালটা পড়ে গেল । রবিন আবার ফিরে এল)

(নিজে নিজে) কি মুস্কিলেই পড়েছি । কাছে রেখে নিস্তার নেই, আড়ালে রেখেও শান্তি নেই। কেবল বাপের এক মেয়ে, and that old fool has made a fortune. (পায়চারী করতে করতে) It's not that I don't feel any physical attachment towards her but when she will grow wrinkles, her fat purse might come to my aid. (হাতঘড়ি দেখে বিরক্তির সহিত) নাঃ বোগাস্‌টা আর মিনিট পাঁচেকের মধ্যে না ফিরলে without ticket এই start করতে হবে ।

(ডাক্তারের সহিত বিভাসের প্রবেশ)

রবিন । Excuse any intrusion বিভাসবাবু, আপনাকে আমার বিশেষ দরকার ।

বিভাস । Very sorry রবিনবাবু, একটু অপেক্ষা করতে হবে (ডাক্তারকে) আসুন আপনি (ডাক্তারকে নিয়ে অন্তঃপুরে গিয়ে খানিক পরে ফিরে এল) ।

রবিন । Formalityর আর সময় নেই। আমায় হাজার টাকা ধার দিয়ে কৃতার্থ করুন—Hero is the promissory note, I'll repay you with 12. p. c. interest.

বিভাস । (ডেস্ক খুলে হাজার টাকা নোটের তোড়া বার করে, ডেস্ক বন্ধ করে, তোড়াটা রবিনকে দিয়ে) এই নিন গুণে দেখতে হবে না ঠিক আছে—আর interest আপনাকে দিতে হবে না—promissory noteএরও আমার প্রয়োজন নেই—আমি কয়লা বেচে খাই রবিনবাবু, সুদের কারবার করি না। আর কিছু দরকার আছে কি ?

রবিন । No sir.

বিভাস । বেশ (ভেতরে চলে গেল) ।

রবিন । That fool has nine collieries but not a jot of common sense (শীষ দিতে দিতে চলে গেল) ।

(খানিক পরে ডাক্তার আর বিভাসের পুনরায় প্রবেশ)

ডাক্তার । To tell you honestly and frankly বিভাসবাবু, ভয় যে নেই, এমন কথা আপনাকে বলতে পারি না ।

বিভাস । কি উপায় ডাক্তার বাবু ?

ডাক্তার । উপায় ? উপায় ? দেখি (রিসিভার তুলে) P. K. 3890. Dr. Banerjee ? Yes, a delivery case. No, a very serious case of early hæmorrhage. No, no, removal is absolutely impossible (বিভাসের দিকে ফিরে) Dr. Banerjee দুটো নার্স নিয়ে আসবেন বলছেন ।

বিভাস । যতগুলো ইচ্ছে নিয়ে আসতে পারেন বলে দিন ।

ডাক্তার । (টেলিফোন মুখে দিয়ে) yes ! immediately, O. K. thanks. (রিসিভার রেখে দিয়ে ভিতরে ঢুকে গেলেন)

(ডাঃ ব্যানার্জী ও দুইজন নার্সের প্রবেশ)

ডাঃ ব্যানার্জী । এখান থেকেই কি ফোন করা হয়েছিল ?

বিভাস । আজ্ঞে হ্যাঁ ।

ডাঃ ব্যানার্জী । রুগী কোথায় ? Attending physician আছেন তো ?

বিভাস । হ্যাঁ, ভেতরে আছে, চলুন, (বিভাস ডাঃ ব্যানার্জীকে নিয়ে ভিতরে গেলে) ।

শোভন । সমস্ত বাড়ীটায় একটা মৃত্যু-শীতল নিস্তব্ধতা । কোণে কোণে অন্ধকার নিরেট হয়ে জমাট বেঁধে গেছে । বায়ুর রন্ধ্রে রন্ধ্রে আঘ্রাণ পাচ্ছি একটা ভাবী প্রলয়ের নীরব ইঙ্গিত (নার্সদের দেখে) তোমরা এখানে কেন ? কার জন্যে এসেছ ? ও-রকম পাথরের চোখের মত নিষ্পলক চেয়েই বা আছ কেন ? জবাব দাও, আমার উর্ম্মিলাকে দেখেছ ? সে বেঁচে আছে না মরেছে ? (প্রশান্ত হাসিতে মুখ উদ্ভাসিত করে) মরণেতেই ত শান্তি । কবি বলেছেন—

মরণরে,
তুঁহু মম শ্যাম সমান ।

বেদনাহত তুমি, মেঘ ঘটাযুত
রক্ত কমল কর, রক্ত অধর-পুট ;
তাপ-বিয়োগের করুণ কোমল রব,
মৃদু অশ্রু ঝরে ঝরে
তুমি যত দূরে তত সমান।

(বিভাসের প্রবেশ)

বিভাস। শোভন এসেছ ?

শোভন। (ছুটে গিয়ে বিভাসের কাছে নতজানু হয়ে, আবৃত্তির সুরে)—

আমায় মার্জ্জনা কর, বন্ধু,
তুমিই জিতেছ জীবনের
রণে।

(উঠে দাঁড়িয়ে) বিভাস। I am a failure in all respects, failure as an artist, failure as a man, failure as lover, failure as a husband, a failure, a damned failur in all respects. উর্ম্মিলাকে দেখেছ বিভাস ? তাকে আমি,—তুমি জান না,—কি নির্য্যাতনই না করেছি। এই হাত দিয়ে (হাত দেখাল) শেষ পর্য্যন্ত তাকে প্রহার করে বাড়ীর বার করে দিয়েছি। সে কোন কথাই বলে নি। ভীরু মৃগ-শিশুর মতই কেবল সে তার বড় বড় চোখ তুলে অসহায় ভাবে চেয়েছিল। তাকে তুমি দেখেছ বিভাস।

বিভাস। শান্ত হও শোভন। উর্ম্মিলা এখানেই আছে, ডাক্তাররা দেখছে (নার্সদের) আপনারা সার্জ্জিক্যাল আউটফিট নিয়ে ভেতরে যান, ডাঃ ব্যানার্জ্জী যাচ্ছেন।

শোভন। সার্জ্জিক্যাল আউটফিট ? ডাঃ ব্যানার্জ্জী ? বিভাস তোমরা আমার উর্ম্মিলাকে খুন করছ ?

[উন্মাদের মত দৌড়ে ভেতরে গেল, বিভাস তার পশ্চাদ্ধাবন করল, খানিক পরে মিঃ সেনের প্রবেশ]

মিঃ সেন। কাউকে ত দেখতে পাচ্ছি না। চাকরটা ত বললে একটু আগেই ওরা এসেছিল, গেল কোথা ? (ঘরময় পায়চারী করতে লাগল, হঠাৎ পায়ের কাছে লীলার রুমাল নজরে পড়তে, উঠিয়ে নিয়ে)

এসেছিল ঠিকই।

[বিভাস ও দুজন নার্স শোভনকে ধরাধরি করে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে গেল। শোভন বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল, পরে নিশ্চুপ হয়ে শুয়ে রইল]

মিঃ সেন। বিভাস, আমার লীলা কোথায় ?

বিভাস। আমি জানি না।

মিঃ সেন। Liar, a downright hyprocrite, লীলা ও রবিনকে একটু আগে তুমি দেখনি ?

বিভাস। আপনার ভাষাটা একটু সংযত করুন, মিঃ সেন, লীলাকে আমি দেখিনি, রবিন এসেছিল আমার কাছে।

মিঃ সেন। (রুমাল দেখিয়ে) এ রুমাল তাহলে এল কোত্থেকে ? এই, এইখানে পড়েছিল (পা দিয়ে দেখালো)।

বিভাস। আমি জবাবদিহি করতে অক্ষম—আমি বড় শোচনীয় ভাবে ব্যস্ত, আপনি এখন যান।

মিঃ সেন। তোমরা সকলে conspire করছ আমার লীলাকে কেড়ে নিতে, জান—লীলা দুপুর থেকে বাড়ী নেই ? রবিন এসে কি বলছিল ?

বিভাস। টাকা নিতে, হাজার টাকা।

মিঃ সেন। দিলে তুমি হাজার টাকা ? আমি তোমাদের সকলকে prosecute করব, রবিন লীলাকে elope করেছে, তুমি তার escapade এ সাহায্য করেছ (টেলিফোনের নিকট গিয়ে receiver তুললেন)।

(অঙ্গদষ্টীর প্রবেশ)

অঙ্গ (মিঃ সেনকে দেখে)। এই যে, খুঁজে খুঁজে তোমাকে পেলুম শেষকালে। লীলা নেই ত ? রবিনও নেই। এই দেখ রবিন লিখে গেছে লীলাকে নিয়ে চললুম বিলেত (একটা কাগজ দেখালো) আমি জানি শেষকালে এই আছে।

মিঃ সেন। (রিসিভার রেখে) তুমি আবার এসেছ ক্রূর পরিহাস করতে ? তুমি কি জীবনভোর অভিশাপের মত আমার পেছনে লেগে থাকবে ? তোমার নিষ্ঠুর অভিযানের কি শেষ নেই ? তোমার সর্ব্বাঙ্গে থরে থরে ভরে আছে তীব্র গরল, তোমার নিঃশ্বাসে বইছে ধ্বংসের লেলিহান শিখা, তোমার বিভীষিকা পরিব্যাপ্ত তোমার

রবিনের চারি পাশে, আমার লীলাকে আমাকে মুক্তি দেবে না।

অজ। উচ্চ্বাস থামিয়ে তাদের যাবার পথ বন্ধ কর, সঙ্কেতে তার করে দাও, তাদের জাহাজে ওঠা বন্ধ হোক্।

মিঃ সেন। (কাতর ভাবে) একটা টেলিগ্রাম করুন, একটা কাগজ (বিভাস কাগজ কলম দিল, মিঃ সেন লিখতে লাগল)।

(ডাক্তারের প্রবেশ।

ডাঃ ব্যানার্জ্জী। (অজ ডাক্তারকে) সমস্ত রাত hot bag চলবে, oxygen-এর immediate ব্যবস্থা করতে হবে, আমি গিয়ে ওষুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি, প্রতি ঘণ্টায় খাওয়াবেন।

বিভাস। ডাক্তারবাবু, operation successful?

ডাঃ ব্যানার্জ্জী। (হেসে) হাঁ, operation successful তবে I cannot guarantee her life, সকালে খবর দেবেন।

(ডাক্তারেরা চলে গেল, সকলে তাদের যাবার পথের দিকে তাকিয়ে রইল)

শোভন। (ঘুমন্ত, পাশ ফিরে) আঃ, আলোটা নিবিয়ে দাও না, উর্ম্মিলা।

বিভাস। (নিজে নিজে) সব যেন কি রকম হয়ে গেল। শোভন জ্যান্তে মরা—উর্ম্মিলা চোখের সামনে চলে যাচ্ছে কিছু করতে পারছি না। কেমন করে দুজনকে বাঁচাই, কেমন করে তাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত শিশুকে এই জগতের মাঝে টেনে আনি, কেমন করে শোভন আর উর্ম্মিলার ওষ্ঠাধরে আবার হাসি ফোটাই, কিছুই বুঝতে পারছি না। (ঊর্দ্ধনেত্রে যুক্তকরে) ভগবান্ তোমায় কোনদিনই ডাকি নি, কিন্তু আজ সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করছি, শোভনকে, উর্ম্মিলাকে তুমি শান্তি দাও! তাদের শিশু-পুত্রকে জগতের আলো দেখতে দাও!

(ষ্টেজের আলো ধীরে ধীরে নিবে যাবে।

হাতড়াতে হাতড়াতে শোভনের অজ্ঞ্য একদিক দিয়ে ঘরে ঢুকবেন]

[যবনিকা]

কৃষক

—শ্রী হরিপদ দত্ত

মাতিয়া যৌবনমদে বরষা যখন
ছড়ায় উচ্ছ্বাসধারা অঙ্গে বসুধার,
যৌবন সবায় যেন করে সংক্রমণ—
বহে পর স্রোতস্বতী সলিল-সম্ভার
ছাপিয়া উভয়-কূল, মহীরুহগণ
সন্ত্রস্ত আলিঙ্গনে বদ্ধ লতিকায়;
ছড়াছড়ি কিতি ছেয়ে হরিত বরণ—
মখমল-নিভ শয্যা শ্যামল দূর্ব্বার।
শিশু-ধান-গাছগুলি সহ সমীরণ
খেলে দোল-দোল খেলা—বন্যার সঞ্চার
হরিত-বর্ণের যেন জুড়িয়া ভুবন,
হরিত সাগরে বিশ্ব দেয় বা সাঁতার।
ছাড়িয়া মোদের এই সোনার বাঙ্গালা
না জানি কোথায় মিলে হেন দৃশ্যবালা!

না যাইতে হেমন্তের অর্দ্ধ বয়ঃক্রম,
পরিয়া সে ধানগাছ কনক-বসন
বহে শিরে স্বর্ণ-ভাণ্ডার অনুপম
দানিবারে উপহার জনকে আপন—
সবাজে কৃষক-আখ্যা যার পরিশ্রম
অক্লান্ত করিয়া সেবা করে উৎপাদন।
কিন্তু করি' অনুদার রাজস্ব-নিয়ম
কতটুকু অবশেষ করে সে গ্রহণ?
হায় ভাগ্য, ফেলি' পায়ে মাথার ঘরম,
করিয়া উপেক্ষা অর্দ্ধাশন, অনশন,
ব্যাধি, সর্প, হিংস্র-পশু শুষ্কব্যাঘ্র সম,
করে যে সংগ্রহ সর্ব্ব ধরার অশন,
অন্ন-বস্ত্র-ক্লেশে সেই সতত পীড়িত—
শোষিত যেমন ফল বাদুড়চুম্বিত।

লুই পাস্তুর

—শ্রীনীলরতন কর

একল্ নর্ম্মালের কার্য্য ;
মন্তের রোগ বিষয়ে গবেষণা।

বক্তৃতা ও গবেষণাকার্য্য ব্যতীত একল্ নর্ম্মালের কার্য্যাদিও পাস্তুর উত্তমরূপে পরিচালনা করছিলেন। তাঁর প্রভাব ছাত্রদের শুধু যে জ্ঞানার্জ্জনে ভাল লাগত তা নয়, তাদের অদম্য স্পৃহা ও দৃঢ় আকাঙ্ক্ষাও উদ্দীপিত হ'ত। তিনি প্রত্যেকের স্বাভাবিক প্রতিভাকে উদ্বুদ্ধ করতেন, তাদের নিজস্ব ধারায় চলার পথ নির্দ্দেশ দিতেন।

তাঁর পরিচালনানৈপুণ্যে অল্প সময়ের মধ্যেই পাঁচজন একল্ নর্ম্মালের ছাত্র কিউরেটর-পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ সেখানেই শেষ হয় নাই। কর্ম্মজগতে চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে যদি কখনও তাঁর কোন ছাত্রের মনে হতাশা আসত, তখন তিনি উপদেশ ও কর্ম্মের দ্বারা তাদের যথাসাধ্য সহায়তা করতেন। তিনি ছিলেন তাদের দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে সবলতার উদ্রেক। শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁর এক ভূতপূর্ব্ব ছাত্রকে একল্ নর্ম্মালের কিউরেটর-পদ হতে অপর কোন পৃথক্ কাজে নিযুক্ত করায়, ছাত্রটি তাঁকে একটি নৈরাশ্যপূর্ণ পত্র লিখেছিলেন। তার উত্তরে পাস্তুর লিখেছিলেন :

"তোমার যাবার সময় আমার সঙ্গে দেখা না হওয়াতে আমি অত্যন্ত দুঃখিত। তোমাকে আমি, যা তোমার কাজে লাগবে বলে মনে করি এমন দু'একটি কথা বলতে চাই। তোমার অসন্তুষ্ট হওয়া অন্যায় নয়, কিন্তু তাকে বাড়িয়ে তুলতে চেষ্টা করো না। তোমার প্রতিভা ও আকাঙ্ক্ষার ভিতর দিয়ে ঐকান্তিক ইচ্ছা জাগ্রত হোক। তোমার উপরে যে অবিচার হয়েছে, তার প্রতিবাদকে সর্ব্বাঙীণ কর্ম্মনিপুণতা দিয়ে প্রকাশ কর। শেষবারে যে চিঠিখানি লিখেছ, তার মধ্যে হতাশার ভাব লক্ষ্য করলাম, তোমার ন্যায় বিজ্ঞানদেবীর তা একেবারেই শোভা পায় না। তোমার ক্লাস, তোমার ছাত্র, আর তোমার অসম্পূর্ণ কাজ এই তিনটি চোখে চোখে রাখবে।···তোমাকে যেকাজের ভার দেওয়া হয়েছে সেটি যথাসাধ্য নিখুঁতভাবে সমাধা করতে চেষ্টা কর; অবশিষ্ট অংশটির জন্য তোমার মস্তিষ্ক চালনা অপ্রয়োজন।"

শেষ কাজগুলি পাস্তুর নিজেই করেছিলেন। তিনি নিজে নিবিষ্টচিত্তে গিয়ে তার প্রতি অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন।

একল্ নর্ম্মালের ছাত্রদের পাঠ্যকাল শেষ হবার পরেও যাতে ছাত্র এবং অধ্যাপকগণের মাঝে সংযোগ থাকে, সেজন্য পাস্তুর উদ্যোগী হয়েছিলেন। সেখানকার বৈজ্ঞানিক কার্য্য-সমূহের বিবরণী-পত্রিকা প্রকাশের ইচ্ছা তাঁর মনে গভীরভাবে জেগেছিল। তাঁর সেই সঙ্কল্প সফল হয় ১৮৬৩ অব্দের জুন মাসে। একল্ নর্ম্মালের প্রথম বৈজ্ঞানিক-বিবরণী-পত্রিকাটি তিনি আকাদেমী দে সিয়াঁসেতে পাঠান।

এর প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে তিনি একল্ নর্ম্মালের তিনজন ছাত্রের সঙ্গে আর্বোয়াতে গিয়ে দ্রাক্ষারসের বিকৃতি বিষয়ে পরীক্ষা করেন। সেজন্য একটি আঙ্গুর-ক্ষেতের সমস্ত ফলন কেনা হয় এবং তাঁরা সেখানকার আঙ্গুর নিয়ে খুব দ্রুতগতি পরীক্ষা আরম্ভ করেন। এর কারণ আঙ্গুরের মরসুম খুব বেশী দিন থাকে না। পৃথিবীর মধ্যে ফ্রান্স সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে মদ্য প্রস্তুত করে। প্রতি বৎসরে মদ্য উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ১০০,০০,০০,০০০ গ্যালন। কিন্তু তৎকালে ফ্রান্সে মদ্যের রোগ এরূপ বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, জগতের বাজারে ফরাসী মদ্যের সুনাম অন্তর্হিত প্রায় হয়েছিল। মদ্যের বিকার-হেতু ফ্রান্সে সুরা ব্যবসায়ে প্রযুক্ত পঞ্চাশ কোটী ফ্রাঁ ক্ষতি হয়। স্বদেশের ব্যবসায়ে এই দুরবস্থা দর্শনে পাস্তুর সমস্যাটির সমাধানে ব্রতী হন। সেই জন্যই তিনি আর্বোয়াতে গিয়ে বিকৃত মদ্যের জীবাণু বিষয়ে গবেষণা করছিলেন।

১৮৬৩ অব্দের জানুয়ারীতে তিনি বিজ্ঞানপরিষদে জানালেন যে, দ্রবত উত্তাপ, আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন এবং বায়ুর সংস্পর্শ এরূপ কয়েকপ্রকার শমীর বা আণুবীক্ষণিক উদ্ভিদের বর্দ্ধনে সহায়তা করে, যাতে মদ্যের বিকৃতি ঘটে। তিনি পরীক্ষা করে দেখলেন যে, মদ্যের বিকারের সঙ্গে কতকগুলি

আণুবীক্ষণিক উদ্ভিদের রোগ আছে। অম্ল, কটু, চট্চটে আটাল সব রকম বিকৃত মদ্যই তিনি পরীক্ষা করছিলেন। বিশেষতঃ জুরা অঞ্চলের বিখ্যাত মদ্যের অম্লতা-দোষ কিরূপে দূরীভূত করা যায়, সেই দিকেই তাঁর দৃষ্টি ছিল। বহু ব্যর্থ চেষ্টার পর তিনি দেখলেন যে, যে-সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরাশ্রয়পুষ্ট উদ্ভিদ্ এই বিকৃতি ঘটায় তাদের ধ্বংস করতে হলে, পঞ্চাশ হতে ষাট সেন্টিগ্রেড ডিগ্রীর মধ্যে উত্তপ্ত করা প্রয়োজন।

ফ্রান্সের মদ্য-ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত হবার পর জার্মানির মদ্যব্যবসায় বহুগুণে উন্নতি লাভ করেছিল। পাস্তুর ফ্রান্সকে পুনরায় জার্মান মদ্যের সহিত প্রতিযোগী করে তুলতে কৃতসঙ্কল্প হন। মদ্যপ্রস্তুতের প্রণালী পরিদর্শনের নিমিত্ত তিনি বিভিন্ন স্থানের সুরাপ্রস্তুতের কারখানায় গমন করেন। লামানিয়ের নামক স্থানে একটি প্রসিদ্ধ মদ্যের কারখানা ছিল। সেখানে গিয়ে তিনি মদ্যপ্রস্তুত-প্রণালীর প্রত্যেকটি প্রক্রিয়ার কারণ এবং উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন, কিন্তু কোন সদুত্তর পান নাই। সে সময়ে মদ্যপ্রস্তুতের প্রক্রিয়া বিষয়ে কারও সম্যক্ জ্ঞান ছিল না। পেইন্ঁ কর্তৃক লিখিত সুরারক্ষা সম্বন্ধীয় একটি পুস্তক তৎকালে প্রামাণিক পুস্তকরূপে ব্যবহৃত হত। সেই পুস্তকে ছত্রপৃষ্ঠধ্যোপী কেবল এই কথা লিখিত আছে যে, মল্ট বা অঙ্কুরিত যব দ্রবীকৃত অবস্থায় 'হপ্'-এর সঙ্গে মিশাইলে অঙ্কুরিত যবের মণ্ড (beer wort) প্রস্তুত হয়। ইহাটি শীতল হলে তন্মধ্যে ইস্ট সংযোগ করে সুরা-জনক কিণ্বনক্রিয়া ঘটান হয়। পেইন্ঁ 'বিয়ার' বা যবসুরার পরিবর্তন প্রসঙ্গে এক স্থানে লিখেছেন যে, সাধারণতঃ গ্রীষ্ম-কালেই যবসুরার 'স্বতঃ পরিবর্তন' ঘটে; এবং এতদূর অনুভব প্রাপ্ত হয় যে, পানের সম্পূর্ণ অযোগ্য হয়ে উঠে।

পাস্তুরের মূল বিশ্বাস ছিল যে, ফরাসী মদ্যকে জার্মান মদ্যের সহিত প্রতিযোগী করে তুলতে তাঁর স্বকীয় বৈজ্ঞানিক প্রণালীই হস্তক্ষেপ করে। তিনি জীবের স্বতঃজননবাদকে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাদ্বারা খণ্ডন করেন; তিনি দেখান যে, কিণ্বনক্রিয়ার মূলে আকস্মিকতার কোন স্থান নেই। খমীরের (ferment) সজীব প্রকৃতি, বিশেষত্ব এবং যথোপযুক্ত রসে তার চাষ-প্রণালী বিষয়ে তাঁর যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছিল। তিনি পূর্বেই দেখিয়েছিলেন যে, মাংসের সুরুয়া অথবা অপর কোন পচনক্ষম রসকে উত্তপ্ত করে দীর্ঘ, বক্রকণ্ঠ কাচপাত্রে রাখলে, জীবাণুগুলি গলদেশে আবদ্ধ হওয়ায় বায়ুর সংস্পর্শেও পরিবর্তিত হয় না। অতঃপর তিনি এরূপ এক পরীক্ষা-যন্ত্র আবিষ্কার করেন, যাতে বাহিরের ধূলিরাশির সহিত তন্মধ্যে জীবাণু প্রবেশ করে প্রকৃত কিণ্বনক্রিয়ার অনিষ্ট ঘটাতে না পারে। এই যন্ত্রের সাহায্যে তিনি প্রমাণিত করেন যে, যে-সকল প্রাণী মদ্যের বিকৃতি ঘটায়, তাদের অপসারণে মদ্য অবিকৃত থাকে।

সুরাজনক-কিণ্বনক্রিয়া ; পাস্তুরাইজেশন্ ও খাদ্যসংরক্ষণ পদ্ধতি

জীবাণুর সহিত সুরাজনক কিণ্বনক্রিয়ার সম্বন্ধ পাস্তুরের পূর্বে অজ্ঞাত ছিল। পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থেও সুরার ব্যবহার বিষয়ে উল্লেখ দেখা যায় বটে, কিন্তু সেকালে কিণ্বন-ক্রিয়া সম্বন্ধে কারও কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না।

প্রাচীন কালে সুরার প্রধান ব্যবহার ছিল পানীয় হিসাবে। তদ্ব্যতীত পুরাকালে ঔষধরূপেও সুরা ব্যবহৃত হত। প্রাচীন সংস্কৃতসাহিত্যে সুরা ব্যবহারের ভূরি ভূরি উল্লেখ পাওয়া যায়; চরকসংহিতায় বিভিন্ন প্রকার সুরা ও তার গুণাগুণ সম্বন্ধে বর্ণনা আছে। সেই গ্রন্থে, শর্করাজাত অরিষ্ট, পঞ্চরস নামক শীধু, গুড়কৃত অরিষ্ট, সুরাসব (সুরা চুয়ান মদ), মধ্বাসব (মধুজাত আসব), কিণমিদ ও ইক্ষুরস যোগে চুয়ান মদ্য, যবজ সুরা, মধুলক মদ্য (গোধূমকৃত), দৌবীরক, তুষোদক প্রভৃতি নানাবিধ মদ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু সে যুগে পানীয় এবং ঔষধ ব্যতিরেকে সুরার অন্য প্রকার ব্যবহারের কথা জানা যায় না।

বর্তমান যুগে বিভিন্ন শিল্পশিল্পে প্রচুর পরিমাণে সুরার আবশ্যকতা হেতু, সুরা উৎপন্ন করা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। শিল্পব্যবসায়ে ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত সুরায় শতকরা পঁচানব্বই ভাগ ইথাইল্ অ্যালকোহল্ থাকে। ফলের মহার্ঘতা হেতু, নানারূপ স্বল্পমূল্যে প্রাপ্তব্য দ্রব্যাদি হতে সুরা প্রস্তুত করা হয়, নতুবা বিভিন্ন শিল্পব্যবসায়ে সুরার বহুল প্রচলন সম্ভব হয় না। ইক্ষু এবং বীট-শর্করা প্রস্তুত কালে জাত আনুষঙ্গিক দ্রব্য মোলাগুড়, কাগজ-প্রস্তুতের অবশিষ্ট অব্যবহার্য কাষ্ঠের মণ্ড (the liquor from sulfite wood pulp)

দুই পাতায় (১৮২২-৯৪)।

[শিল্পী পৃথ্বী কর্তৃক পৃষ্ঠীত ফটোগ্রাফ

ক্লিভেলেণ্ডের প্রবোন।

দুই পাতায় (১৮২২-৯৪)।

প্রভৃতি, এই সুরা প্রস্তুতের উপাদান রূপে ব্যবহৃত হয়। চাউল, যব, গোধূমাদি শস্য, আলু এবং নানাবিধ শ্বেতসার-প্রধান বস্তু হতে সুরা প্রস্তুত করা যায়। তবে এই দ্রব্য-সমূহ খাদ্য হিসাবে অধিকতর প্রয়োজনীয়। কাঠ, করাতের গুঁড়া প্রভৃতি বস্তু হতেও সুরা প্রস্তুত হতে পারে। সুরার এরূপ কতকগুলি রাসায়নিক গুণ আছে, যার জন্য কোন কোন দ্রব্য প্রস্তুতে কাজে সুরা ব্যতীত অপর বস্তু ব্যবহার করা চলে না। উদাহরণ স্বরূপ ইথার নামক এক প্রকার দ্রবণ-কারী বস্তুর উল্লেখ করা যেতে পারে। এই দ্রব্যটি প্রস্তুত কার্যে সুরা অবশ্যপ্রয়োজনীয় উপাদান। আবার কতকগুলি বস্তু আছে, যা অপর দ্রব্য হতে প্রস্তুত করা গেলেও, সুরা হতে প্রস্তুত করা হয়। ক্লোরোফর্ম তার একটি প্রধান দৃষ্টান্ত। সুগন্ধি দ্রব্যের ব্যবসায়ে দ্রবণকারী বস্তু হিসাবে সুরা বিশেষ প্রয়োজনীয়। লাক্ষার বার্নিশ, সেলুলয়েড প্রভৃতির প্রস্তুত কালে সুরার ব্যবহার হয়ে থাকে। তদ্ব্যতীত ইন্ধন হিসাবে প্রচুর পরিমাণে সুরা আবশ্যক। তাপদীপ এবং আলোকদীপে সুরার ব্যবহার ব্যতীত, যান্ত্রিক শক্তি উৎপাদনের জন্য সুরার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। সুরার এই সকল ব্যবহারের নিমিত্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিনাশুল্কে সুরা পাওয়া যায়। সেই সুরা যাতে পানীয়রূপে ব্যবহৃত হতে না পারে, সেজন্য তন্মধ্যে নানা রূপ বিষাক্ত, বিস্বাদ অথচ ব্যবহারিক কার্যের পক্ষে নিরপেক্ষ বস্তুসমূহ মিশ্রিত করা হয়।

কিণ্বনক্রিয়ার ফলে কিণ্বনযোগ্য বস্তুসমূহ যেরূপ তীব্র ভাবে গাঁজিয়া ওঠে এবং তার লক্ষণগুলি যেরূপ সম্পূর্ণ পরিবর্তন লাভ করে, তদ্দর্শনে পূর্বকালে আল্‌কেমিষ্টগণের মনে স্বল্পমূল্য ধাতুকে সুবর্ণে পরিবর্তিত করার ধারণা জেগেছিল। আলকেমির যুগের অলৌকিকতা অতিক্রম ক'রে যখন রসায়ন-শাস্ত্র ক্রমশঃ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের জগতে প্রবেশ করতে আরম্ভ করল, তখন ধীরে ধীরে কিণ্বনক্রিয়া বিষয়ে নির্দিষ্ট ধারণা গড়ে উঠতে লাগল।

লিন্‌হিউস্ দ সা বো এ ১৬৪৯ অব্দে কিণ্বনক্রিয়াকে অন্যান্য গ্যাস উদ্ভবকারী রাসায়নিক ক্রিয়া হতে পৃথক্ ব'লে নির্দেশ করেন। ফান্ হেল্‌মণ্ট (১৬৪৪) কিণ্বনক্রিয়ায় উদ্ভূত গ্যাস পরীক্ষা ক'রে তার নাম রাখেন 'গ্যাস-ভিনোরম্' (gas vinorum)। হেয়ার্ন, কিণ্বনক্রিয়ায় উদ্ভূত গ্যাস পরীক্ষা ক'রে তাকে পটাসিয়ম্ কার্বনেটের উপর অ্যাসিড প্রভাবে উদ্ভূত গ্যাসের অনুরূপ বলে উল্লেখ করেন। ব্ল্যাক্-ব্রিড (১৭৫৪), কিণ্বনক্রিয়া কালে উদ্ভূত বায়বীয় পদার্থকে ব্ল্যাক্ কথিত 'ফিক্‌সড্ এয়ার' (কার্বন্‌ডায়ক্সাইড)-এর সহিত অভিন্ন ব'লে প্রতিপন্ন করেন। ক্যাভেন্‌ডিশ (১৭৬৬) বল্‌লেন যে সুরাজনক কিণ্বনক্রিয়াতে কেবল 'ফিক্‌সড্ এয়ার' (কার্বনডায়ক্সাইড্) উদ্ভূত হয়, কিন্তু পচনক্রিয়ায় 'ফিক্‌সড্ এয়ার' ও 'ইনফ্লামেবল্ এয়ার' (অর্থাৎ কার্বনডায়ক্সাইড্ ও অক্সিজেন) উদ্ভূত হয়। তাঁর পূর্বে বেথার (১৬৮৯) বলেছিলেন যে, কেবলমাত্র সুমিষ্ট রসেরই কিণ্বনক্রিয়া ঘটে। ক্যাভেন্‌ডিস্ ১৭৭৬ অব্দে শর্করার কিণ্বনক্রিয়াজনিত গ্যাসের পরিমাণ নিরূপণ ক'রে শতকরা ৪৭ ভাগ কার্বন-ডায়ক্সাইড্ পান। ক্রমে এটি প্রত্যক্ষ হয় যে, কিণ্বনক্রিয়ার ফলে সুরা এবং অম্লজাতীয় দ্রব্য প্রস্তুত হয়; পচনক্রিয়াতেও প্রায় তদনুরূপ ঘটনা ঘটলেও উভয়ের মধ্যে প্রভেদ কেবল সেই ক্রিয়ার পরিণামী বস্তুভেদে (বেথার)। ফ্লোজিষ্টির রসায়নবিদ্‌গণের সমসাময়িক টাল (১৬৯৭) এবং হিলিস (১৬৯৭) নামে দুই ব্যক্তি কিণ্বনক্রিয়ার স্বতঃ উৎপত্তি বিষয়ে ব্যাখ্যার জন্য সিদ্ধান্ত করেন যে, জলীয় তরল পদার্থ সংযোগে কিণ্বনযোগ্য বস্তুর কণাগুলি এরূপ তীব্রভাবে আলোড়িত হয় যে, তার ফলে তাদের বন্ধন শ্লথ হয়ে কতকগুলি বস্তু তরলদ্রব হতে বিতাড়িত হয় (কার্বনডায়ক্সাইড) এবং কতকগুলি বস্তু অবশিষ্ট থাকে (সুরাসার)। টাল্ স্পষ্টই বলেছিলেন যে, সেই অন্তর্ভাবকলাময় বস্তু, স্থির দ্রব্যের মধ্যেও আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে, সেই জন্য কিণ্বনশীল বা পচনশীল বস্তুর সংযোগে অবিকৃত বস্তুরও বিকার উপস্থিত হয়।

লাভোয়াজিয়ে ফ্লোজিষ্টির মতবাদের উচ্ছেদসাধন ক'রে রসায়ন জগতে যুগান্তর আনয়ন করেন। তিনি শর্করার কিণ্বনক্রিয়ার ফলে প্রাপ্ত বস্তুসমূহের রাসায়নিক বিশ্লেষণ ক'রে তাদের প্রত্যেকের মধ্যে কত কার্বন, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন আছে সে সম্বন্ধে হিসাব দেন।

লাভোয়াজিয়ের পরে ফাব্রোনি (১৭৮৯-১৭৯৯) এবং হেনার (১৮০৩) কিণ্বনক্রিয়া সম্পর্কে এক নূতন কথা প্রচার করেন। হেনার বলেন যে, যদ্যপি পক্সমধ্যস্থ গ্লুটেন, শ্বেতসার এবং শর্করার উপর ক্রিয়া ক'রে কিণ্বনক্রিয়া

ঘটায়। কিন্তু তিনি নিজেই খমীরের প্রকৃতি সম্বন্ধে সংশয়মুক্ত ছিলেন না। তিনি এ কথাও বলেছিলেন যে, কিণ্বনশীল রস পূর্ণ পাত্রের নিম্নভাগে সুরাকাষ্ঠী ইস্টের ন্যায় একপ্রকার শ্বেত পদার্থ সঞ্চিত হয়; সেই শ্বেত পদার্থে যে নাইট্রোজেন থাকে, সেটি সুরার পরিস্রবণ কালে অ্যামোনিয়ারূপে নির্গত হয়। তাঁর পরীক্ষার মধ্যে একটি তথ্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য; তিনি দেখেছিলেন যে, বিশুদ্ধ শর্করারসে ইস্ট সংযোগ করলে কিণ্বনক্রিয়ার শেষে একপ্রকার নাইট্রোজেনবর্জিত শ্বেতপদার্থ অবশিষ্ট থাকে, সেটি শর্করার উপরে কোনরূপ ক্রিয়া করে না। একটি বিষয়ে ল'ভোয়াজিয়ের সঙ্গে তেনারের মতভেদ ছিল। তেনার বলতেন যে, কিণ্বনক্রিয়ায় উদ্ভূত কার্বনডায়ক্সাইডের কিয়দংশ খমীরের কার্বন হতে উৎপন্ন হয়। তেনারের পর গে লুসাক্ (১৮০৩) নানাবিধ পরীক্ষা ক'রে প্রতিপন্ন করেন যে, কিণ্বনক্রিয়া ও পচনক্রিয়ার জন্য বায়ুর সংস্পর্শ আবশ্যক। তাঁর কথায় বলতে গেলে,"রসের উপর অক্সিজেনের প্রভাবে খমীর উৎপন্ন হয়; কিন্তু সুরাকারী ইস্ট যেমন তাপপ্রয়োগে নষ্ট হয়ে যায়, এই খমীরও তদ্রূপ তাপপ্রয়োগে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।" যে খমীর সাহায্যে দ্রাক্ষারসের পরিবর্তন ঘটে, গে লুসাক্ তাকে জলে দ্রবণশীল ইস্ট্ হতে স্বতন্ত্র বস্তুরূপে অনুমান করতেন, কিন্তু কর্ণ্যু (১৮২৬) বলেছিলেন, "কিণ্বনক্রিয়া যে-কোন বস্তুর সাহায্যেই আরম্ভ হোক না কেন, কিণ্বনক্রিয়ার ফলে সেই মূলবস্তু অপেক্ষা একটি অধিকতর সক্রিয় অদ্রবণশীল বস্তু সঞ্চিত হতে থাকে।" অন্যান্য রাসায়নিক ক্রিয়া অপেক্ষা কিণ্বনক্রিয়াতে কোন বিশেষত্ব আছে তৎকালে কারও মনে সেরূপ সন্দেহ হয় নাই। অবশ্য লিউএনহোক্ ১৬৮০ অব্দে বিভিন্ন স্থান হতে প্রাপ্ত ইস্টের আণুবীক্ষণিক পরীক্ষা করে তদ্বিষয়ে রয়্যাল সোসাইটিতে বর্ণনা করেছিলেন। তার প্রায় সার্দ্ধ এক শতাব্দী পরে দেমাজিয়ের (১৮২৬) মদ্যের উপরিভাগে সঞ্জাত পর্দা পর্যবেক্ষণ করে দীর্ঘকায় সজীব কোষের সন্ধান পান। তিনি সেই সজীব কোষের চিত্র অঙ্কিত করেন ও তার নাম রাখেন Mycoderma Cerevisiae। কিন্তু তিনি সেই জীবগুলিকে উদ্ভিদরূপে গণ্য করেন নাই, জন্তু বলেই অনুমান করেছিলেন। কিণ্বনক্রিয়ার সহিত সেই জীবের কোন সম্বন্ধ আছে কি না, সে সম্বন্ধে তিনি কিছুমাত্র উল্লেখ করেন নাই।

বহুকাল যাবৎ ইস্ট্ একটি রাসায়নিক বস্তুরূপেই পরিগণিত হচ্ছিল, অকস্মাৎ তিনজন বৈজ্ঞানিকের পরস্পর নিরপেক্ষভাবে গবেষণা প্রায় একই সময়ে ইস্টের সজীব প্রকৃতির বিষয় প্রকাশিত করে। কাগ্নিয়ার লাতুর, আকাদেমী ও সোসিয়েতে ফিলোমাতিক-এ বর্তুলাকার ইস্টের আকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং তাঁর গবেষণাকার্যের ফল ১৮৩৮ অব্দে নিবন্ধাকারে প্রকাশিত করেন। মুকুলোদ্গম প্রণালীতে ইস্টকোষের পুনরুৎপাদন হয় এবং ইস্টকোষ গতিশীল নয় এই দেখে তাদের তিনি উদ্ভিদ্ বলে প্রতিপন্ন করেন। তিনি দেখান যে, ইস্টকোষের উপরেই সুরার কিণ্বনক্রিয়া নির্ভর করে এবং তার সুরা উৎপাদন-ক্ষমতা কঠিন কার্বনিক অ্যাসিডের অপসারণেও বন্ধ হয় না। থিয়োডর শ্বান সম্পূর্ণ ভিন্ন উপায়ে কিণ্বনক্রিয়া-সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেন। ১৮৩৬ অব্দে ফ্রান্টফ শহরে জীবের স্বতঃউৎপত্তিবাদ বিষয়ে একটি গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধে লিখেছিলেন যে, সলফিউরিক অ্যাসিডের ভিতর দিয়ে পরিচালিত বায়ুর পরিবেশে, উত্তপ্ত করা জান্তব বা উদ্ভিজ্জবস্তুর দ্রব রাখলে তার পচন কিংবা কিণ্বনক্রিয়া ঘটে না। শ্বান (১৮৩৭) সেইভাবে পরীক্ষা করে দেখেন যে, উত্তপ্ত পূর্ণবায়ুমধ্যে উত্তপ্ত করা জীবজ রসকে অবিকৃত অবস্থায় রাখা যায়; এমন কি উত্তপ্ত বায়ুমধ্যে রক্ষিত উত্তপ্ত কিণ্বনক্ষম রসে ইস্ট সংযোগ ক'রে তাকে অপরিবর্তিত রাখা যেতে পারে। তিনি সুরার কিণ্বনক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে সজীব প্রাণীর পরিপুষ্টি লক্ষণ দেখতে পেয়েছিলেন। পটাসিয়ম্ আর্সেনাইট সংযোগে সুরার কিণ্বনক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু নাক্সভোমিকার নির্যাস যোগে তার কোন ব্যতিক্রম হয় না দেখে, তিনি অনুমান করেন যে, ইস্ট কোষ জন্তু নয়, উদ্ভিদ্। কুটসিং ১৮৩৭ অব্দে অণুবীক্ষণযন্ত্র সাহায্যে ইস্ট-কোষ পরীক্ষা করে তার উদ্ভিদের মত প্রকৃতি সম্বন্ধে সাক্ষ্য পান।

যে সময়ে কাগ্নিয়ার লাতুর, থিয়োডর শ্বান এবং কুটসিং-এর গবেষণামূলক প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হয়, তৎকালে বার্জেলিয়াস পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রসায়নবিদ্ ছিলেন। তিনি ১৮৩৯ অব্দে 'ইয়ারেস বেরিখট্' পত্রিকায় তাঁদের অভিমতের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেন। হোয়লের এবং লিবিগও তাঁদের মতের পক্ষপাতী ছিলেন না। বার্জেলিয়াস জানতেন

যে, ইস্ট এর 'catalytic force' বা 'সাহচর্যশক্তি' কিণ্বন-ক্রিয়া ঘটায়। লিবিগ কিন্তু বার্জেলিয়াসের মতকেও সমর্থন করেন না। সে সম্বন্ধে তাঁর যুক্তি এইভাবে সংক্ষেপে উল্লেখ করা যেতে পারে—"শর্করার সমস্ত কার্বন সুরাজনক কিণ্বনক্রিয়াফলে সুরা এবং কার্বনডায়ক্সাইডের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। শর্করাযুক্ত উদ্ভিদ্‌রসে বায়ুর সংস্পর্শহেতু খমীর নামে একপ্রকার অতি-পরিবর্তনশীল বস্তু উৎপন্ন হয়, তারই সাহায্যে কিণ্বনক্রিয়া ঘটে। সেই খমীরের মধ্যে রসের সমস্ত নাইট্রোজেন সঞ্চিত হতে আরম্ভ করে। শর্করার মধ্যে খমীরের অস্থিতিস্থাপক, পরিবর্তন-শীল অবস্থা সঞ্চারিত হওয়াতে তার রূপান্তর সংঘটিত হয়।" লিবিগ নিম্নোক্ত দৃষ্টান্ত হ'তে এই প্রকার অনুমান গ্রহণ করেছিলেন :

বিশুদ্ধ প্ল্যাটিনাম্ নাইট্রিক অ্যাসিডে দ্রবীভূত হয় না, কিন্তু রৌপ্য অথবা রৌপ্য ও প্ল্যাটিনামের মিশ্রণ সহজেই সেই অ্যাসিডে দ্রব হয়ে যায়। এই ক্ষেত্রে রৌপ্যের গুণ প্ল্যাটিনামে সঞ্চারিত হচ্ছে এইরূপ উপমা প্রয়োগ ক'রে, লিবিগ কিণ্বনক্রিয়ার ঘটনা ব্যাখ্যা করেন। এইরূপে ষ্টাল-এর চিন্তাধারা রসায়নজগতে পুনঃস্থাপিত হয়েছিল। তৎকালে ষ্টোয়ক্সেরার জৈব-রসায়নকে 'ভাইটাল্ থিওরী'-র প্রভাব হতে মুক্ত করায়, তারই প্রবর্তনায় বোধ হয় বার্জেলিয়াস এবং লিবিগ নিজেদেরই সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে কিণ্বনক্রিয়ার জীবজগতের সম্পর্ককে পূর্ণরূপে পরিহার করতে চেয়েছিলেন।

মিৎসার্লিক ১৮৩৪ অব্দে ইস্ট-এর উদ্ভিদের ন্যায় প্রকৃতি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হন। তিনি কাচনলমধ্যে ইস্ট রেখে তার উন্মুক্ত প্রান্তভাগে পার্চমেন্ট দ্বারা আবৃত ক'রে শর্করারসে মজ্জিত করেন। সেই পরীক্ষাতে তিনি দেখে-ছিলেন যে, নলের ভিতরের রস পরিবর্তিত হলেও কিণ্বন-ক্রিয়ার কোন লক্ষণ তার বহির্ভাগে দৃষ্টিগোচর হয় না; তাই থেকে তিনি অনুমান করেন যে, কিণ্বনক্রিয়া ইস্টকোষের প্রাচীরদেশে সংঘটিত হয়। তিনি বার্জেলিয়াসের ক্যাটালিটিক সিদ্ধান্ত অনুসারে কিণ্বনক্রিয়ার ব্যাখ্যা করেন। হেল্মহোলৎস (১৮৫৩) এবং ফনড্রুশ (১৮৫৪, ১৮৫৯, ১৮৬১) ইস্টকোষের প্রকৃতি সম্বন্ধে দৃঢ় সাক্ষ্য দেন। তাঁরা কার্পাস স্তরের ভিতর দিয়ে ছেঁকে-নেওয়া বায়ুতে নানাবিধ জৈববস্তু রক্ষা করে তাদের কিণ্বনক্রিয়া প্রতিরোধে কৃতকার্য হন। এই সকল পরীক্ষা সত্ত্বেও ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে উভয় প্রকার মতই বলবৎ ছিল। একদিকে কিণ্বনক্রিয়াবিষয়ক সিদ্ধান্ত বিস্তৃতভাবে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছিল, অপর দিকে জনকয়েক বৈজ্ঞানিক লিবিগের বিরুদ্ধ মত পোষণ করছিলেন।

এইরূপ মতদ্বৈধের মধ্যে পাস্তুরের চয়ননিষ্পত্তি-মূলক গবেষণা আরম্ভ হয়। তিনি ১৮৫৭ অব্দে। ডিসেম্বরে আকাদেমী দে সিয়াঁসে, সুরাজনক কিণ্বনক্রিয়া-বিষয়ক নিবন্ধ উপস্থাপিত করেন এবং পরবৎসরে সেখানকার পত্রিকাতে সেটি প্রকাশিত হয়। জীবনক্রিয়া প্রভাবে শর্করা কিরূপে সুরা ও কার্বনডায়ক্সাইডে পরিণত হয়, কতটা শর্করা হতে কি পরিমাণ সুরা, গ্যাস ও অন্যান্য দ্রব্যের উৎপত্তি ঘটে এ সকল তথ্য তাতে উল্লিখিত হয়েছিল। পাস্তুর বিশ্লেষণ করে দেখেছিলেন, একশতভাগ গ্লুকোজের কিণ্বনক্রিয়াতে নিম্নলিখিত দ্রব্য সকল পাওয়া যায় :

৪৮·৪	ভাগ	সুরাসার ;
৪৬·৬		কার্বনডায়ক্সাইড ;
৩·৩	"	গ্লিসেরোল্ ;
০·৬	"	সাক্সিনিক্ অ্যাসিড ;
১·১	"	ফিউজাল্ অয়েল ও সেলিউলোজ।

১৮৬১ অব্দে তাঁর 'ইস্টের পুষ্টিকরণ এবং সুরাজনক কিণ্বনক্রিয়ার অক্সিজেনের প্রভাব' নামক নিবন্ধ আকাদেমী দে সিয়াঁসে প্রকাশিত হয়। সেই নিবন্ধের ভিতর হতে এই কয়টি মূল কথা উল্লেখ করা যেতে পারে :

(১) সুমিষ্ট রস-মধ্যে ইস্ট বায়ুসংস্পর্শে থাকলে অক্সিজেন গ্যাস শোষণ করে এবং প্রচুর পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়; প্রকৃতপক্ষে ইস্ট এইরূপ অবস্থায় নিজের জন্যই ক্রিয়া করে; এ অবস্থাতে সুরা উৎপাদনের পরিমাণ খুবই সামান্য হয় এবং ইস্টের ওজনের অনুপাতে শর্করা শোষণের পরিমাণও নিতান্ত সামান্য হয়।

(২) কিন্তু বায়ুবর্জিত শর্করার মধ্যে বর্দ্ধনকালে ইস্ট বায়ু হতে অক্সিজেন গ্রহণ করতে না পারায়, অগত্যা কিণ্বনযোগ্য বস্তু হতে অক্সিজেন নিষ্কাশিত করে।

(৩) অতএব একথা স্বীকার করা খুবই স্বাভাবিক বলে প্রতীয়মান হয় যে, ইস্ট বায়ুবর্জিত স্থানে শর্করা হতে অক্সিজেন গ্রহণকালে কিণ্বনক্রিয়া ঘটায়। বিভিন্ন পরিমাণে অক্সিজেন গ্যাস সংযোগ করে ইস্টের কিণ্বন-ক্রিয়ার বেগ তীব্র অথবা ক্ষুণ্ণ করা যেতে পারে।

ইস্ট (yeast) বা সুরাবীজের শারীর প্রক্রিয়ার কতক-গুলি বিশেষত্ব আছে। বায়ু ব্যতিরেকে যেমন অগ্নির নিকাশ সম্ভবপর নয়, সেইরূপ সাধারণ জীবের পক্ষেও বায়ু ব্যতীত জীবন ধারণ অসাধ্য। কিন্তু ইস্ট ও কয়েক প্রকার নিম্ন-জাতীয় উদ্ভিদ বায়ু ব্যতীত জীবন ধারণ করতে পারে। ইস্টকে বায়ুসংস্পর্শে রাখলে আমাদেরই মতো অক্সিজেন গ্রহণ করে ও কার্বনডায়ক্সাইড ত্যাগ করে। কিন্তু অক্-সিজেন সরবরাহ বন্ধ করলে তারা অন্য উপায়ে জীবিত থাকে। শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় বাঁচবার বিশেষ উপায় থাকা হেতু ইস্টসমূহ মানুষের নিকট প্রয়োজনীয়। তারা রুটীর ভিতর থাকলে রুটীকে লঘু এবং সুপাচ্য করে, ফলের রসে নিমজ্জিত থাকলে ফেনায়িত পানীয় প্রস্তুত করে। কোন ফলের রস কিছুক্ষণ ফেলে রাখলে তার গন্ধে যে পরিবর্তন ঘটে, ইস্টের প্রক্রিয়াই তার প্রধান কারণ। তারা রসস্থিত শর্করার উপর জীবন ধারণ করে' সুরা এবং কার্বনডায়ক্সাইড উৎপন্ন করে। ইন্ধনের দহনের সময়ে যেমন তন্মধ্যে সঞ্চিত শক্তি নিঃসৃত হয়, শর্করার সুরা ও কার্বনডায়ক্সাইডে পরিবর্তন কালেও তদ্রূপ শর্করাস্থিত সঞ্চিত শক্তি বিকীর্ণ হয়।

রুটী প্রস্তুত, সুরা প্রস্তুত প্রভৃতি কার্য্যের নিমিত্ত বিশুদ্ধ ইস্ট চাষ একটি স্বতন্ত্র ব্যবসায় রূপে গড়ে উঠেছে। সাধারণ ভিজা অবস্থায় যে ইস্ট বিক্রীত হয়, তন্মধ্যে প্রতি আউন্সে প্রায় ৫০,০০০,০০০,০০০ সংখ্যক ইস্টকোষ থাকে। ইস্ট-এর আকার ডিম্বের ন্যায় এবং তার ব্যাস প্রায় ০·০১ মিলি-মিটর। ইস্টকোষের গাত্রদেশে তার এক একটি অংশ উদ্গত হয় এবং সেটি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হতে হতে অবশেষে মূল-কোষের ন্যায় আকৃতি লাভ করে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। অনেক সময়ে মূল-কোষে সংলগ্ন অবস্থাতেই সন্তান-কোষটির গাত্রদেশে একই উপায়ে নূতন কোষের উদ্গম হয়। ইস্টের এই বংশবৃদ্ধির প্রণালীকে মুকুলোদ্গম প্রণালী (budding) বলে।

[গত সংখ্যায় এই মুকুলোদ্গম প্রণালীর চিত্র প্রকাশিত হয়েছে।]

পাস্তুর তৎকালে তাঁর সুরাবিষয়ক গবেষণার ফলে তিনটি তথ্য অবিসংবাদিত রূপে প্রমাণিত করেন—

প্রথম—খমীরসমূহ সজীব পদার্থ।

দ্বিতীয়—প্রত্যেকটি বিভিন্ন ধরণের কিণ্বনক্রিয়ার বিশেষ বিশেষ খমীর আছে।

তৃতীয়—কোন খমীরই অংশু নয়।

লিবিগ্ ও তাঁর পক্ষাবলম্বীরা কিণ্বনক্রিয়াকে মৃত্যুর লক্ষণরূপে অনুধাবন করতেন, পাস্তুরের পরীক্ষায় তন্মধ্যে জীবনের লক্ষণ প্রকাশিত হয়। কিণ্বনক্রিয়া ইস্টের জীবন-ক্রিয়ার সহিত সংশ্লিষ্ট এই মন্তব্যটি পাস্তুর নিম্নলিখিত কয়েকটি নির্ভুল বাক্যাবলী ব্যক্ত করেছিলেন।

"কিণ্বনক্রিয়া মূলতঃ জীবনক্রিয়ার সহিত জড়িত। আমার মতে কোষের সমাবেশ, বৃদ্ধি এবং পুষ্টি সুগঠিত কিণ্বন-ক্রিয়ার সহিত যুগপৎ ঘটে থাকে। যে পরীক্ষা-ফলসমূহ আমার নিবন্ধে প্রকাশিত হয়েছে সেগুলি লিবিগ্ এবং বার্জেলিয়াসের মতের সম্পূর্ণ বিরোধী বলে মনে হয়। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন যে, কি প্রক্রিয়াক্রমে শর্করার তন্মধ্যপা ঘটে, তদুত্তরে আমি বলব যে, সে-বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

"আমরা বলব কি যে, ইস্ট শর্করা আত্মসাৎ করে সুরাসার ও কার্বনিকঅ্যাসিড ত্যাগ করে? অথবা ইস্টদেহের পরিপুষ্টি কালে 'পেপসিনের' ন্যায় এরূপ কোন বস্তু উৎপন্ন হয়, যা' শর্করার উপর ক্রিয়া করে তৎপরে পরিবর্তন লাভ করে? (কারণ সেরূপ বস্তু কিণ্বনক্রিয়াশীল রসে পাওয়া যায় না।) তদ্রূপ পূর্ব্বপরিকল্পনা বিষয়ে আমার কিছুই বলবার নেই। এ মত আমি স্বীকার করি না, অস্বীকারও করি না; ঘটনাকে অতিক্রম করে মত প্রকাশ থেকে আমি নিজেকে সংযত রাখতে চাই। পরীক্ষার ফলে কেবল এইটুকু তথ্য জানা গেছে যে, প্রত্যেক যথার্থ কিণ্বনক্রিয়া শারীরতাত্ত্বিক লক্ষণের সহিত সম্বদ্ধ।"

পাস্তুরের এই সমালোচনার গুরুত্ব উপলব্ধি ক'রে লিবিগ্ বহু বিলম্বে (১৮৭০) তার উত্তর দেন। তাতে তিনি ইস্টের উদ্ভিদের ন্যায় প্রকৃতি স্বীকার করেন, কিন্তু পাস্তুরের মন্তব্যকে কিণ্বনক্রিয়ার সমাধানরূপে গণ্য করেন নাই।

তিনি বলেছিলেন—"কোষের উপাদান-গুলি যে বন্ধনে একত্রিত থাকে সেই জায়াস্-এর বৃদ্ধি বন্ধ হবার পরে বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে; সে-কারণে গুরুত্বে যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়, তারই প্রভাবে শর্করার মৌলিকত্বয় বা তৈব অণুগুলি বিশ্লিষ্ট হয়ে যায়।"

এই উক্তির প্রত্যুত্তরে পাস্তার কৃত্রিম অবস্থার মধ্যে ইস্ট্ কোষের বৃত্তান্ত উল্লেখ ক'রে, লিবিগের প্রদত্ত উপাদান সাহায্যেই লিবিগের কথার বিরুদ্ধে প্রমাণ দেখাবার প্রতিশ্রুতি দেন। লিবিগ্ কিন্তু পাস্তারের সেই আহ্বান গ্রাহ্য করেন নাই। এইখানেই তাঁদের মতদ্বৈধের পরিসমাপ্তি ঘটে। অতঃপর পাস্তার তাঁর কিণ্বনক্রিয়াবিষয়ক সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত ক'রে ফিজোডর্ শয়ান্, ফ্রান্টস্ তদংশে, কেক্রিয়ার লাতুর এবং স্যুবিং-এর মন্তব্যকে দৃঢ় ভিত্তি প্রদান করেন।

কিন্তু কিণ্বনক্রিয়া-রহস্যের মধ্যে অধিকতর গভীরভাবে লিবিগের অনুপ্রবেশ চেষ্টা, অনেকের মনে প্রভাব বিস্তার করেছিল। পরীক্ষামূলক কোন প্রমাণ না পাওয়া সত্ত্বেও, ইস্ট্রের উদ্ভিদপ্রকৃতি বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ বাক্তিরাও অনুমান করেছিলেন যে সুরাজনক কিণ্বনক্রিয়া কোষের জীবনযাত্রা সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে সংঘটিত হয় না, কোষনিঃসৃত কোন রাসায়নিক বস্তুর সাহায্যে হয়ে থাকে।

পেইন্ এবং পেরো ১৮৩৩ অব্দে জল ও সুরাসারের সাহায্যে অঙ্কুরিত যব হতে diastase নামে এরূপ এক শ্বেত-চূর্ণক নিষ্কাশিত করেন, যার দ্রব ষ্টার্চকে শর্করায় পরিবর্তন করতে পারে; কিন্তু তাঁরা দেখেছিলেন যে diastaseকে উত্তপ্ত করলে তার সেই পরিবর্তনসাধনের ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। Diastase নামক বস্তুটি তাঁদেরও পূর্বে কির্খ্হোফ এবং ভ্রব্লাকো কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়েছিল। সেই পদার্থের প্রক্রিয়ার উপর ভিত্তি ক'রে মিচের্লিস্ ত্রাউবে (১৮৪৮) কিণ্বনক্রিয়াকে কোষনিঃসৃত বস্তুর রাসায়নিক ক্রিয়ারূপে অনুমান করেন। তিনি বলেন যে, এই বস্তুটি প্রোটিনের অনুরূপ পদার্থ, এরই ক্রিয়ার ফলে জলের হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন্ কি-রকম বস্তুর অণুতে সঞ্চারিত হওয়ায় আন্তর-আণবিক পরিবর্তন ঘটে। ফরাসী বৈজ্ঞানিক বের্থেলো ১৮৬০ অব্দে ইস্টের নির্য্যাস হতে invertase নামক বস্তু পৃথক্ করায় ত্রাউবের উক্তি সমর্থন পেয়েছিল। বের্থেলো বলেছিলেন যে, কিণ্বনক্রিয়াশীল পদার্থে যে-সকল জীবাণুর অস্তিত্ব দেখা যায়। তাদের খমীর না ব'লে খমীরের উৎপাদক বলা উচিত; জীবাণুর কোষমধ্যে বিধানতন্তুতে (tissue) এরূপ অদ্রবণশীল খমীর বা 'এনজাইম্' আছে, যাকে পৃথক্ করা যায় না।

হপে এবং সাইলেস্যার ১৮৭৬ অব্দে এনজাইমের কিণ্বন-ক্রিয়া ঘটাবার ক্ষমতা বিষয়ে সমর্থন করেন, কিন্তু খমীরের যথার্থ কার্য্য বিষয়ে ত্রাউবের মত সর্ব্বাংশে গ্রাহ্য করেন নাই। সে সময়ে বহু ব্যক্তি এনজাইমের কিণ্বনক্রিয়া-সাধন ক্ষমতা বিষয়ে অনুসন্ধান করছিলেন। লুডেয়ারস্ডর্ফ্ (১৮৪৬), শ্মিট্ (১৮৪৬), মারী ফন মোআসঙ্গ (১৮৭১, ১৮৭৭), আডল্ফ্ মাইয়ার্ (১৮৭৯) প্রভৃতি ব্যক্তিগণ ইস্ট্কে উত্তম-রূপে পেষণ ক'রে সেই চূর্ণসাহায্যে কিণ্বনক্রিয়া ঘটাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁদের প্রত্যেকের প্রয়াসই ব্যর্থ হয়। পাস্তারের শিষ্য ব্র-এর লেখা হতে জানা যায় যে, পাস্তার নিজে ইস্ট্কোষ পেষণ ক'রে, সৈন্ধা প্রয়োগ ক'রে, কোষের প্রটোপ্লাজ্ম্ সঙ্কুচিত করে (plasmolyse) এনজাইম্ নিষ্কাশনের চেষ্টা করেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হন নাই। নাগালি এবং লোয়েহ্ব (১৮৭৯) গ্লিসেরোল সাহায্যে ইস্ট্ হতে এনজাইম নিষ্কাশনের চেষ্টা ক'রেও অকৃতকার্য্য হন। এই সকল ব্যর্থ প্রয়াসে এনজাইম্ থিওরী পরীক্ষাক্ষেত্রে অযৌক্তিক রূপে প্রতিপন্ন হওয়াতে, নাগালি আণবিক প্রকৃতিতত্ত্বকে আশ্রয় ক'রে কিণ্বনক্রিয়ার এক অভিনব ব্যাখ্যা করেন। ত'াতে তিনি লিবিগ্, পাস্তার এবং ত্রাউবের সিদ্ধান্তের মধ্যে সামঞ্জস্য সম্পাদনে প্রয়াসী হন। কিন্তু যে বিশেষ লক্ষণটি ব্যাখ্যার নিমিত্ত তিনি থিওরীর অবতারণা করেছিলেন, সেইটিই পরীক্ষাক্ষেত্রে অপ্রমাণিত হওয়াতে, তাঁর সিদ্ধান্তের কোন মূল্য থাকে নাই। এই সকল বহুকালের তর্কবিতর্কের উত্তর দেন এডুয়ার্ড্ বুখ্নের্ ১৮৯৭ অব্দে। তিনি ইস্ট্ হতে এরূপ এক তরল রস প্রস্তুত করণে সমর্থ হন, যা সম্পূর্ণরূপে কোষ-বর্জ্জিত হয়েও শর্করাকে সুরাসার এবং কার্বন-ডায়ক্সাইডে পরিবর্তনক্ষম। সুরাজনক কিণ্বনক্রিয়া সমস্যার বুখ্নেরার-এর zymase আবিষ্কার পরীক্ষামূল-প্রণালীর এরূপ নূতন পন্থা প্রদর্শন করেছে যে, এনজাইমের প্রক্রিয়া,

প্রকৃতি ও কিণ্বনক্রিয়া-সাধনরহস্য বিষয়ে বহু নব নব তথ্য ১৮৯৭ অব্দের পরে আবিষ্কৃত হয়েছে।

হার্ডেন এবং ইয়ং (১৯০৪, ১৯০৮) গবেষণা-কার্য্য দ্বারা দেখিয়েছেন যে, কিণ্বনক্রিয়া ঘটনাটি, তৎবিষয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী অনুসন্ধানকারিগণের পরিকল্পনা অপেক্ষা অধিকতর জটিল। কেবলমাত্র zymase নামক এনজাইম্ প্রভাবে সুরাজনক কিণ্বনক্রিয়া সংঘটনসাধ্য নয়, তজ্জন্য co enzyme নামে আর একটি বস্তুর সহায়তা আবশ্যক। শুধু তাই নয়, শর্করার উপযুক্ত প্রাপ্তির জন্য একটি ফস্ফেটের অস্তিত্ব অপরিহার্য্য। শর্করা সুরা ও কার্ব্বনডাইঅক্সাইডে পরিবর্ত্তিত হবার সঙ্গে সঙ্গে এক প্রকার hexosephosphate (জটিল যৌগিক বস্তু) প্রস্তুত হয় এবং তা' হতে ফস্ফেটটি পৃথক হয়ে hexosephosphatase নামে এক বিশেষ এনজাইমের প্রক্রিয়াযোগ্য হয়ে থাকে। খমীরের এই জটিল বস্তু ব্যতীত কোষের মধ্যে এরূপ কয়েক প্রকার বিশেষ এনজাইম্ আছে, যারা, zymase এবং co-enzyme-এর ক্রিয়াকে নষ্ট করতে পারে, আবার antienzyme নামে একটি বস্তু আছে, যেটি সেই ধ্বংসকারী ক্রিয়াকে বন্ধ করতে পারে। উপরন্তু, শর্করার সুরায় পরিবর্ত্তন ধাপে ধাপে সংঘটিত হয়, তবে সেই প্রক্রিয়ার বিস্তারিত ধারাটি খুব স্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হয় নাই। এফ. এলিশ, (১৯০৪-১০) নয়বেরগ এবং ক্রোনেবী সে বিষয়ে বহু তথ্য আবিষ্কার করেছেন।

সুরার রোগ বিষয়ে পরীক্ষার ফলে পাস্তুর কিণ্বনক্রিয়া সম্বন্ধে নিম্নোক্ত তিনটি মূল নীতি প্রবর্ত্তন করেন:—

(১) ধবরণ্ডের (wort) অথবা মদ্যের প্রত্যেকটি বিকৃতি রোগের খমীররূপী জীবাণুর পরিবর্দ্ধন হেতু সংঘটিত হয়।

(২) সেই জীবাণুসমূহ—বায়ু, মদ্য প্রস্তুতের উপাদান এবং সুরাপাত্রের পাত্রাদি দ্বারাই নীত হয়।

(৩) মদ্যের ভিতর কোনও জীবন্ত জীবাণু না থাকলে তার পরিবর্ত্তন ঘটে না।

এই নীতিত্রয় প্রমাণিত ও সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ হবার পর মদ্যের গুণাগুণ সম্বন্ধে সুরাব্যবসায়ীদের অনিশ্চয়তা লুপ্ত হয়েছে এবং নতুনকে পকাশ হতে পকায় সেন্টিগ্রেড ডিগ্রীতে তাপ প্রয়োগ ক'রে জীবাণুমুক্ত পাত্রে বন্ধ রাখার ফলে তন্মধ্যে রোগের খমীর বর্দ্ধনের আশঙ্কা দূরীভূত হয়েছে। পাস্তুর প্রবর্ত্তিত বস্তু উত্তপ্ত করার এই প্রণালী মদ্যের পাস্তুরাইজেশন্ নামে খ্যাত।

পাস্তুরাইজেশন্ প্রণালী কেবল মদ্যের বিকৃতি বন্ধ করার নিমিত্তই প্রযুক্ত হয় নাই; নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণ ব্যাপারেও অবলম্বিত হয়েছে। উত্তাপের সাহায্যে খাদ্য-সংরক্ষণ প্রথা বোধ হয় মানুষের অগ্নি ব্যবহারের প্রথম যুগ হতেই প্রচলিত ছিল। কিন্তু খাদ্যরক্ষার নিমিত্ত যথাযথ ভাবে তাপ-প্রয়োগের ব্যবস্থা পাস্তুরের পূর্ব্বে সকল দেশে বহুল প্রচলিত ছিল না। পূর্ব্বকালে গলিত বিভিন্ন খাদ্য ব্যবসায়ে তাপ-প্রয়োগ প্রথা প্রচলিত হয়েছিল; তথাপি জীবের স্বতঃজননবাদ সম্পূর্ণরূপে অপ্রমাণিত না হওয়া পর্য্যন্ত উত্তাপ দ্বারা জীবাণুমুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় নাই।

নিকোলাস আপেয়ার নামে জনৈক ফরাসী ১৮১১ অব্দে খাদ্যসংরক্ষণ বিষয়ে মৌলিক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত করেছিলেন। তৎকালেও ইংলণ্ডে বায়ুপ্রবেশপথরুদ্ধ কৌটায় (hermetically sealed can) মদ্য, ফল, শাকসব্জি প্রভৃতি রক্ষা করার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। ১৮৯০ অব্দ হতে কৌটায় সুরক্ষিত খাদ্যের ব্যবসায় ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত হতে থাকে। আজকাল এই ব্যবসায় যথেষ্ট প্রসার লাভ করেছে। ফুটন্ত জলের উত্তাপে এবং বাষ্পীয় চাপে খাদ্যকে কৌটা-জাত করার পদ্ধতি প্রচলিত হয়েছে। কোন কোন জীবাণু-কোরক ফুটন্ত জলের তাপ-মাত্রাতেও ধ্বংস হয় না। তারা যাতে কৌটায় রক্ষিত খাদ্যের বিকার ঘটাতে না পারে, তজ্জন্য কৌটাকে তিন দিন ধরে অবিরত উত্তপ্ত রেখে তাদের সম্পূর্ণ বিনষ্ট করা হয়। বর্ত্তমানে কৌটায় খাদ্যরক্ষণ কার্য্যে বাষ্পীয় চাপে উত্তপ্ত করার জন্য অটোক্লেভ যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া হয়। উত্তাপের সংস্পর্শ ব্যতীত, খাদ্যদ্রব্যে জৈব-অম্ল এবং তৈল জাতীয় পদার্থ এই রক্ষণ ব্যাপারে বিশেষ সহায়তা করে। যে সকল খাদ্যে এই উপাদানসমূহের পরিমাণ অল্প বাক্টেরিয়া তন্মধ্যে অধিকতর সহজে আশ্রয় গ্রহণ করে। কৌটাকে উক্ত তাপ-মাত্রায় উত্তপ্ত করে' খাদ্যাদি কৌটাবদ্ধ করার তন্মধ্যস্থ বায়ু নিষ্কাশিত হওয়াতে তার ভিতর বায়ু-প্রাণ জীবাণুর বর্দ্ধনে অসুবিধা হয়। কোন কোন খাদ্যে জীবাণুর বর্দ্ধন প্রতিরোধের নিমিত্ত পাস্তুরাইজেশন্

প্রণালী ব্যবহৃত হয়। দুগ্ধ, ঘৃত, মদ্য, ভিনিগার, ফলের রস প্রভৃতি দ্রব্যে এই প্রণালীর প্রয়োগ খুব কার্য্যকরী।

বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যের পাস্তারাইজেশনের মধ্যে দুগ্ধের পাস্তারাইজেশনটি বিশেষ পরিচিত এবং পৃথিবীর অধিকাংশ সভ্য দেশে বহুলপ্রচলিত। রোগবীজমুক্ত নিঃসন্দেহে ব্যবহারযোগ্য দুগ্ধ ব্যবহারের ধারণা প্রবর্ত্তন করেন ডক্টর হেনরি কয়েট ১৮৯৩ অব্দে। সেই সময় হতে চিকিৎসাতাত্ত্বিক পরীক্ষায় বিশুদ্ধ ব'লে বিজ্ঞাপিত দুগ্ধের প্রচলনের ব্যবস্থা হয়। মাখন ও পনীর প্রস্তুতকার্য্যে বিশুদ্ধ কাল্‌চারের ব্যবহার সেই সময় হতেই বিশেষ ভাবে আরম্ভ হয়েছে।

দুগ্ধ সর্ব্বপ্রকার খাদ্যের মধ্যে একটি অতি প্রয়োজনীয় আহার্য্য, কিন্তু তার দোহন এবং সরবরাহ কালে দূষিত হবার সম্ভাবনা খুবই বেশী। বাজারে যে দুগ্ধ বিক্রীত হয়, তার শুদ্ধাশুদ্ধ সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট ক'রে কিছু বলা দুষ্কর। গরুর কোন রোগ থাকলে, অপরিচ্ছন্ন স্থানে গোশালা নির্ম্মিত হলে, অথবা গোশালা অপরিচ্ছন্ন রাখলে দুগ্ধের মধ্যে রোগের বীজাণু সংক্রামিত হয়। তদ্ভিন্ন দুগ্ধ সরবরাহ কালে, বাতাসে অবস্থিত জীবাণু ও নানাবাক্তির হস্তাদির সংস্পর্শ বিভিন্ন প্রকারে দুগ্ধকে দূষিত করতে পারে। গরুর রোগ হেতু যক্ষ্মা, ম্যাসটিটিস্ এবং আন্ত্রিক উপদ্রবকারী জীবাণু থাকা সম্ভব। অন্যান্য কারণে দুগ্ধের মধ্যে টাইফয়েড, ডিপথেরিয়া, বসন্ত প্রভৃতি রোগের জীবাণু সঞ্চারিত হতে পারে। রোগের জীবাণু দ্বারা যাতে দুগ্ধ দূষিত না হতে পারে, সেজন্য গাভীর সুস্বাস্থ্য বিষয়ে পরীক্ষা ক'রে নিঃসন্দেহ থাকা উচিত; দুগ্ধ সরবরাহকারী যাতে জীবাণুর বাহক না হয় এবং যাতে আবহাওয়া হ'তে দুগ্ধের মধ্যে জীবাণু সঞ্চার না ঘটে, সে বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন কর্ত্তব্য। গাভীর স্তন হতে দুগ্ধ দোহনের অব্যবহিত পরে তন্মধ্যে যত ব্যাক্টেরিয়া থাকে, তার সংখ্যা প্রতি বর্গ সেণ্টিমিটারে প্রায় পাঁচশত। তারা সাধারণতঃ শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক হয় না। কিন্তু দুগ্ধের সহিত কোন প্রকারে গোময়ের সংযোগ ঘটলে তন্মধ্যে আন্ত্রিক উপদ্রবকারী বহু জীবাণু সঞ্চারিত হয়। একগ্রাম গোময়ে প্রায় দশ কোটী ব্যাক্টেরিয়া থাকে; এ হতে সহজেই অনুমেয় যে, কত সামান্য পরিমাণ গোময় দ্বারা দুগ্ধে ব্যাক্টেরিয়ার পরিমাণ বর্দ্ধিত হতে পারে। তদুপরি দুগ্ধ-দোহনের পাত্র জীবাণুমুক্ত না থাকলে দুগ্ধের ভিতর বহু জীবাণু সঞ্চারিত হয়। একটি পরীক্ষায় দেখা যায় যে, কেবল মাত্র পাত্র পরিষ্কার না রাখা হেতু প্রত্যেক ঘন সেণ্টিমিটার দুগ্ধে একশত হতে দুই লক্ষ পঞ্চত্রিশ হাজার সংখ্যক জীবাণু সংযোগ হয়ে থাকে। এই কারণে দুগ্ধের পাত্র জীবাণুমুক্ত করার জন্য নানাবিধ 'ষ্টিম্ ষ্টেরিলাইজার্' ব্যবহার করবার পদ্ধতি আধুনিক দুগ্ধ ব্যবসায়ে প্রবর্ত্তিত হয়েছে। পাস্তার মদ্যসংরক্ষণ কার্য্যে যে উত্তাপ দেবার পদ্ধতি সর্ব্বপ্রথম উদ্ভাবন করেন, এক্ষণে দুগ্ধ-সংরক্ষণ ব্যাপারেও সেই পদ্ধতি প্রচলিত। পাস্তারাইজ করা দুধ পান করলে তা হতে কোন রোগ উৎপাদনকারী জীবাণু আক্রমণের শঙ্কা থাকে না। কারণ দুগ্ধের পাস্তারাইজেশন্ কালে তাকে প্রায় আধঘণ্টা কাল ১৪৫ ফারেনহীট ডিগ্রিতে উত্তপ্ত করায় তন্মধ্যস্থ রোগজীবাণু সমূহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। পাস্তারাইজেশন কালে দুধকে উচ্চতাপমাত্রায় উত্তপ্ত করার পরেই পঞ্চাশ ফারেনহীট ডিগ্রিতে ঠাণ্ডা করা হয়, কারণ গলিতজীবী জীবাণুরা (saprophytic bacteria) প্রদত্তোক্ত তাপমাত্রায় ধ্বংস হয় না, কিন্তু শীতল অবস্থাতে প্রায় নিষ্ক্রিয় থাকে। দুধকে পাস্তারাইজ করার ফলে তন্মধ্যস্থ অপকারী রোগ-জীবাণুরা নষ্ট হয়, কিন্তু তার ভাইটামিন অক্ষুণ্ণ থাকে। তবে টাটকা কাঁচা দুধ অপেক্ষা পাস্তারাইজড্ দুধের গুণের পার্থক্য এই যে, কাঁচা দুধ গরুর স্তন হতে দুহিত হবার পরে চার হতে আট ঘণ্টা পর্য্যন্ত জীবাণুর বর্দ্ধন প্রতিরোধ করিতে পারে। পাস্তারাইজড্ দুগ্ধের সেরূপ ক্ষমতা থাকে না। পাস্তারাইজ করা দুগ্ধ ফেলে রাখলে তার ভিতর ব্যাকটেরিয়াগুলি দ্রুতগতি বৃদ্ধি পাওয়াতে কাঁচা দুধ অপেক্ষা শীঘ্র অম্লতা প্রাপ্ত হয়। এই কারণে পাস্তারাইজড্ দুগ্ধে ব্যাকটেরিয়ার দ্রুত-বর্দ্ধন নিবারণের নিমিত্ত তাকে শীতল রাখা দরকার। প্রকৃত দুগ্ধাম্লকারী ব্যাকটেরিয়া, (streptococcus lacticus) স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী, কিন্তু তাদের অধিকাংশই পাস্তারাইজেসন প্রক্রিয়ায় বিনষ্ট হয়। যে সকল জীবাণু পাস্তারাইজড্ দুগ্ধে জীবিত থাকে তারা প্রকৃত দুগ্ধাম্লকারী ব্যাকটেরিয়া জাতীয় নয়। এই জন্য বাসি পাস্তারাইজড দুগ্ধ স্বাভাবিক নষ্ট দুগ্ধ অপেক্ষা অধিকতর বর্জ্জনীয়।

সর, মাখন, নবনীত, দধি পনীর, ছানা, ঘনীকৃত দুগ্ধ,

আইস্‌ক্রীম্ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার দুগ্ধজাত দ্রব্যে জীবাণু-সমূহের প্রভাব বিষয়ে বহু বৈজ্ঞানিক বিস্তারিত গবেষণা করেছেন। পাস্তুরাইজেসন্ ব্যতীত অন্যবিধ উপায়েও আহার্য্য বস্তু রক্ষা করা যেতে পারে। তন্মধ্যে শীতল স্থানে ভাণ্ডারজাত করার প্রথা আধুনিক যুগে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছে। এই উপায়ে ফল, দুগ্ধ, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ এবং অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী দেশ-দেশান্তরে টাট্‌কা অবস্থায় চালান যায়। দুগ্ধজাত দ্রব্যকে শীতল স্থানে ভাণ্ডারজাত করার প্রথা সর্ব্বপ্রথম প্রচলিত হয় ১৮৭৬ অব্দে। শৈত্য-প্রয়োগ দ্বারা খাদ্যদ্রব্য রক্ষিত থাকার প্রধান কারণ এই যে, তদবস্থায় জীবাণুরা বিশেষ সক্রিয় থাকে না। বিভিন্ন প্রকার দ্রব্যে বিশেষ বিশেষ জীবাণু-বর্দ্ধনের সম্ভাবনা অনুসারে পৃথক্ পৃথক্ তাপমাত্রা রক্ষা করা হয়। সার্ল ডেলিয়ে নামে এক ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার শৈত্য-প্রয়োগে রক্ষিত অবস্থায় মাংস রপ্তানীর প্রথম প্রচলন করেন এবং এক সুইডিস্ ইঞ্জিনিয়ার স্থানান্তরে দুগ্ধ রপ্তানীর নিমিত্ত শৈত্য-সংরক্ষিত প্রণালী বিষয়ে ১৮৯৫ অব্দে এক পেটেণ্ট গ্রহণ করেন।

খাদ্যকে বিশুদ্ধ অবস্থায় রক্ষা করার উপায়টিও বিশেষ কার্য্যকারী। আহার্য্যের জলীয় অংশ দূরীভূত করলে সহজে তার পচন ঘটে না। এই উপায়ে খাদ্যরক্ষার প্রথা গত মহাযুদ্ধের সময় হতে প্রসার লাভ করেছে। কিন্তু তার অনেক পূর্ব্বে ১৮৪০ অব্দে ক্লান্‌সে মার্স নামে এক ব্যক্তি আধুনিক খাদ্য বিশুষ্কীকরণ পদ্ধতি অনুসারে ফল এবং সব্জী জাতীয় দ্রব্যরক্ষণের প্রথা প্রথম প্রবর্ত্তন করেন। তার কয়েক বৎসর পরে বায়ুশোষণ পূর্ব্বক বিশুষ্কীকরণ প্রণালী জার্ম্মানীতে প্রচলিত হয়।

পূর্ব্বোক্ত পদ্ধতিসমূহ ব্যতীত, লবণ, তৈল ও নানাবিধ মশলা সহযোগে খাদ্য রক্ষা করার প্রথা চলিত আছে। ডিমকে রক্ষা করার জন্য একটি বিশেষ প্রণালী ব্যবহৃত হয়। সোডিয়ম সিলিকেট হতে প্রস্তুত 'ওয়াটার-গ্লাস' নামক পদার্থে ডিমকে নিমজ্জিত রাখলে বাহির হতে ব্যাকটেরিয়া প্রবেশের পথ রুদ্ধ থাকে। বেনজয়েট অব সোডা, বোরিক অ্যাসিড, সালিসাইলিক অ্যাসিড, ফর্ম্মালডিহাইড, সল্‌ফিউরিক্ অ্যাসিড, সোরা, সুগন্ধার প্রভৃতি রাসায়নিক দ্রব্য খাদ্য-রক্ষার নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়। রাসায়নিক দ্রব্যাদির সাহায্যে পানীয় জল-মধ্যস্থ ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করার প্রথা আজকাল সকল সভ্য দেশেই প্রচলিত হয়েছে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গেছে যে, উষ্ণ-রক্ত প্রাণীর মলাদি দ্বারা দূষিত জলে বি. কোলি (B. coli) নামক জীবাণু বহু সংখ্যায় বিদ্যমান থাকে; তদ্ব্যতীত অন্যান্য রোগজীবাণুও পানীয় জল মধ্যে থাকা সম্ভব। তাদের ধ্বংসের নিমিত্ত ক্লিটকিরী দ্বারা ঊর্দ্দম-নির্ম্মুক্ত ছাঁকা জলে ক্লোরিন, ক্লোর-অ্যামিন, পটাশিয়াম, ওজোন প্রভৃতি রাসায়নিক দ্রব্য সংযোগ করা হয়। আলট্রা-ভায়লেট রশ্মির সাহায্যেও পানীয় জল শোধন করা যেতে পারে। খাদ্য এবং পানীয় দ্রব্যাদিকে জীবাণু নির্ম্মুক্ত করার এই সকল প্রথা পাস্তুরের জীবাণুতত্ত্ব বিষয়ক গবেষণার প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ ফলরূপে গণ্য করা যেতে পারে।

বস্তুতত্ত্ব

...যৌগমূলের সহায়তায় জ্ঞান ও জ্ঞেয় কি তাহা বুঝিতে পারিলে 'বৈশেষিক দর্শনে'র সহায়তায় যাবতীয় বস্তুর উপাদান, গুণ ও কর্ম্ম কি এবং তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ কি তাহা জানিতে পারা যায়। যাবতীয় বস্তুর উপাদান, গুণ ও কর্ম্ম নির্দ্ধারণ করিবার সামর্থ্য লাভ করিতে পারিলে সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শনের সহায়তায় মানুষের সম্পূর্ণ ও সঠিক শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধীয় জ্ঞানলাভ সম্ভব হয়। তখন মানুষ তাহার বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়ের শক্তি সাধন করিবার সামর্থ্য লাভ করে এবং কোন অঙ্গের অসুস্থতা ঘটিলে তাহার আরোগ্য সাধন করিতে পারে। তখন প্রত্যেক বস্তুর বাহির, অন্তর, এবং আদি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ হয় বটে, কিন্তু কোন বস্তুর 'আদির আদি' সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না।...

নির্ম্মল বাবু

—শ্রীসুধীরচন্দ্র রাহা

ছেলের ভিতর বিভূতি বাবুর সহিতই আমার বিশেষ বন্ধুত্ব।

ভদ্রলোক কোন এক মোটরকার কোম্পানীর বড়বাবুর শ্রীচরণযুগল বহুদিন যাবৎ তৈলসিক্ত করিয়া, অবশেষে হাল ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছেন। সেদিন সন্ধ্যা বেলায়, গা ধুইয়া সবেমাত্র বারান্দায় দাঁড়াইয়া বিড়ি টানিতে টানিতে, ওধারের ফুটপাথে, একটা মালটানা গাড়ী নিরীক্ষণ করিতেছিলাম—এমন সময় বিভূতি বাবু আসিয়া রসভঙ্গ করিয়া দিলেন।

সশব্দে ছাতাটী তক্তাপোষের উপর রাখিয়া কহিলেন, 'দাদা, এবার আর চাকরী নয়, ব্যবসা করব ঠিক করেছি।'

হাসিয়া বলিলাম, 'ব্যবসা অবশ্য ভাল। বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী : এটা শাস্ত্রের কথা—তবে, ব্যবসাটা কিসের?'

'—ব্যবসা—খাঁটী ঘি আর সরষের তেলের।'

কহিলাম, 'বিভূতি বাবু, ব্যবসার লাইনটা ভালই। ও দু'টো জিনিষ সমস্ত অসরল পথকে সরল করে। এবার ঠিক রাস্তাই ধরেছেন।'

কিন্তু বিভূতি বাবু আমার কোন কথা গায়ে না মাখিয়া, বলিলেন, 'দেশ থেকে, মাল চালান আসবে—ব্যস তাই বিক্রী করব। বুঝলেন তপেন বাবু, আচার্য্য রায়ের কথাই খাঁটি। সারহীন ভেজাল জিনিষ খেয়ে খেয়ে, বাঙ্গালী জাতের মেরুদণ্ডে ঘুণ ধরে গেছে। চাকরীর পিছনে ঘুরে ঘুরে বাঙ্গালী ছেলে নিরীহ মেষ বনে গেছে। তপেন বাবু ও মায়া-মৃগীর পেছনে পেছনে ঘুরে আর অনর্থক হয়রাণ হবেন না। লেগে যান—ব্যবসায় মেতে পড়ুন।' কহিলাম—'বিভূতি বাবু, বর্ত্তমানে আমার ক্যাপিটাল নগদ সাড়ে পাঁচ আনা। এতে, বোধ হয় কোন ব্যবসাই হয় না। আপনি সুরু করুন, ভবিষ্যতে আমায় না হয়, দুই বখরায় অংশীদার করে নেবেন।'

বিভূতি বাবু আজ বহুদিন পর গুণ গুণ করিয়া গান গাহিতে গাহিতে কলতলায় নামিয়া গেলেন। বিভূতি বাবু আজ যেন মুক্তির পথ খুঁজিয়া পাইয়াছেন, আজ আকাশ সুস্বাদু, পানীয় সুশীতল, বাতাস যেন সুবাস। যেন বহুকাল পর জমাট অন্ধকারের ঘর হইতে কয়েদী মুক্তি পাইয়া, আলোকের প্রথম শুভ্র রেখাটী দেখিতে পাইয়াছে। প্রার্থনা করি, বিভূতি বাবুর ব্যবসার দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হোক্।

শনি ও রাহুর সম্মিলিত ষড়্‌যন্ত্র বুঝি ফাঁসিয়া গেল। আমার ভাগ্যাকাশে অন্ধকার কাটিয়া জ্যোৎস্নার আবির্ভাব হইল। আমি চাকরী পাইলাম! যে আকাশের চাঁদ এতদিন সুদূরে ছিল, আজ কিংস্টন্ কোম্পানীর আফিসে, যেন সেই সুদূরবর্ত্তী চাঁদকে করতলে পাইলাম।

আজ আর পৃথিবীকে ততটা কুশ্রী মনে হইল না। মোড়ের মাথায় বুড়ো খোঁড়া ভিক্ষুকটাকে আজ আর খারাপ লাগিল না। ভাত খাইতে বসিয়া, হরিচরণ বাবুর পচা রসিকতা, রাতে ফাজলামো আজ মন্দ লাগিল না। দাঁত-উঁচু কেষ্ট বাবুর মুখখানাও আজ যেন পরম সুন্দর লাগিতে লাগিল।

নিয়মিত আফিসে হাজিরা দিতেছি। বহু-আকাঙ্ক্ষিত চল্লিশ টাকা মাহিনার কেরাণীপদ পাইয়া, নিজে যেন ধন্য হইয়াছি এবং অন্যেরাও আমায় সম্ভ্রম করিতে সুরু করিয়াছে। মেসের ম্যানেজার, চাকর-ঠাকুর আজ আর আমায় তাচ্ছিল্য করিতে সাহস করে না। হাসিয়া হাসিয়া 'তপেন বাবু' বলিয়া সময় অসময়ে কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। বিনামূল্যে হাসি উপহার দিতে, আমিও বিন্দুমাত্র কৃপণতা করি না।

দিন বেশ চলিতেছে। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত, এই সময়টুকুর প্রতিটি মিনিট ও সেকেণ্ড যেন একসূত্রে একসুরে বাঁধা হইয়া গিয়াছে। সেখানে কোথাও কিছুমাত্র ফাঁক নাই।

মনের আকাশ হইতে, সকল রকম কবিতা, কাব্য—উচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষা, সব বিদায় দিয়াছি। তীক্ষ্ণ সূক্ষ্ম রসবোধ, চোখা চোখা ধারাল আকাঙ্ক্ষা সব, একভাবে পিটাইয়া, ভোঁতা করিয়া ফেলিয়াছি।

চীন-জাপানে না কি যুদ্ধ লাগিয়াছে—স্পেনে না কি সহস্র সহস্র নর-নারীর দেহ, কামানের গোলায় টুকরা টুকরা হইয়া

যাইতেছে। মুসোলিনি আমার বুকি হুঙ্কার দিয়া উঠিয়াছে। হিটলার সাহেব চোখ রাঙাইয়া দৃঢ় মুষ্টি বাড়াইতেছে। এসব খবরে আর যেন চমক লাগায় না। মনে হয় সব যেন নিষ্প্রয়োজন।

একমাত্র আশা, একখানি ছোট বাসা ও কিছু টাকা। আর রাষ্ট্রহীন কেরাণীর জীবন, সে ত লক্ষ্মীছাড়ার সামিল। আমার বন্ধুরা হয়ত বলিবেন, এ আমার অধঃপতন—এ আমার বহুবিস্তৃত উদার জীবনের আত্মহত্যা। কিন্তু আমি বলি, তা নয়। আমার ক্ষুধার অন্ন, পরিধানের বস্ত্রের নিকট, সেই ক্ষুধার বেগবতী জীবনের বহুবিস্তৃত উদারতার কোন দাম নাই। একমাত্র সত্য ক্ষুধার অন্ন—পরিধানের বস্ত্র, আর মাথা গুঁজিবার জন্য একটী বাসা।

সন্ধ্যাবেলায় ডালহৌসী-স্কোয়ারের চারপাশের রাস্তাগুলি জন-বহুল হইয়া উঠে। আফিস ভাঙ্গিয়া যায়। ওইসারের সরু ফুটপাথের উপর দিয়া আমরা কেরাণীবৃন্দ, বন্দুকের মত ছাতা কাঁধে ফেলিয়া মার্চ্চ করিয়া চলি। পিছনে ফেলিয়া আসা যুদ্ধক্ষেত্রে সমস্তদিন তিল তিল করিয়া যে রক্ত দিয়া আসিয়াছি, তাহার মূল্য কোথাও দেখি না। আমাদের এই নীরব আত্মোৎসর্গের জন্য, আজ জগতের কোন প্রান্তেও বিন্দুমাত্র জয়ধ্বনি শুনিতে পাই না।

মেসে ফিরিয়া আসি। ঠাকুর রান্নাঘরের উনানে আগুন দিয়াছে। জমাট ধোঁয়ার কুণ্ডলীতে, সমস্ত পাড়াখানার যেন দম বন্ধ হইয়া নাভিশ্বাস উপস্থিত হইয়াছে।

আফিসে চেয়ার টানিয়া বসিতেই, প্রথমে নজরে পড়ে, নির্ম্মল বাবুর মুখ। জানি না, এ নাম তাঁহার কে রাখিয়াছিল। হয়ত, বিধাতাকে বিদ্রূপ করিবার জন্যই এই নাম। ভদ্রলোকটির দেহ ও মনে কোথাও যে বিন্দুমাত্র নির্ম্মলতা আছে, তা আমার মনে হয় না। চেয়ারখানি দেখিবার জিনিষ—জগতের সমস্ত কুশ্রীতা যেন ঐ দেহে আশ্রয় লইয়াছে। কুঞ্চিত কুৎসিত মুখখানা বসন্তের দাগে বীভৎস, বাঁদিকের চোখটি ছানিপড়া। একটা বিবর্ণ সাদাটে রং সমস্ত চোখটাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। উপরের কালো পুরু ঠোঁটটীর দুই পাশ দিয়া, অপরিষ্কার লম্বা দাঁত ঝুলিয়া পড়িয়াছে, আর বাঁ গালে প্রকাণ্ড একটা মাংসের চিপি—তার মাথায় একটা বড় আঁচিল। সেখে মাংসের বালাই নাই।

নির্ম্মল বাবুকে দেখিয়া মনে হয়, অর্দ্ধদগ্ধ একটা মৃতদেহকে এইমাত্র শ্মশান হইতে তুলিয়া চেয়ারে বসাইয়া রাখা হইয়াছে। আমি অবাক হইয়া ভাবি, এই দেহকান্তি লইয়া, নির্ম্মল বাবুর নির্ম্মলত্ব বজায় থাকে কি করিয়া।

খাতার আড়ালে মুখ রাখিয়া, অনেকক্ষণ ধরিয়া নির্ম্মল বাবুর মুখের দিকে তাকাইয়া থাকি! ওর সমস্ত মুখে, গত দিনের ব্যভিচারের চিহ্ন। নির্ম্মল বাবুর চেহারা যেমন কদাকার কথাও সেইরূপ কুৎসিত! বিন্দুমাত্র সরসতা নাই—আচার-ব্যবহারে শ্লীলতা নাই—ভদ্রতা নাই, বয়সোচিত ব্যবধান অথবা বার্দ্ধক্যের গাম্ভীর্য্য নাই। লালপেড়ে ময়লা ধুতিখানি হাঁটুর উপর তোলা—গায়ে কোতাম নাই। কোতামহীন খোলা গাই দিয়া, বুকের কাল কাল লোমগুলি দেখা যায়। মুখে তাড়ীর গন্ধ, আর কাশির বিরাম নাই। কাশিতে কাশিতে মেঝের উপর থুতু ফেলিয়া ঘরটিকে নরক করিয়া তোলেন। কাশি থামিলে পর, পকেট হইতে কাঁকড়া জাতা আর পেয়ারা বাহির করিয়া, ছাতলা-পড়া দাঁতে কড়মড় করিয়া চিবাইতে থাকেন।

আমার মনে হয়, কুশ্রীতার আদর্শ যদি জগতে কেহ থাকে—তবে এই নির্ম্মল বাবু।

সে দিন আফিসে হঠাৎ নির্ম্মল বাবু আমায় বলিলেন, 'আপনি বিয়ে করেছেন না কি তপেন বাবু?' বলিলাম,—'না—সুযোগ হয়ে উঠেনি—'

'—সুযোগ হলেও করবেন না। চল্লিশ টাকার কেরাণীর আবার বিয়ে করবার সাধ কেন? চল্লিশ টাকায় ভালবাসা পাওয়া যায় না। আচ্ছা, ভালবাসায় কখনও পড়েছেন—যাকে বলে প্রণয়—'

উত্তর দিলাম না—মৃদু হাসিলাম।

নির্ম্মল বাবু সশব্দে 'ফাইল' বন্ধ করিয়া কহিলেন, 'প্রণয় নয়—ও প্রণয়। খবরদার ঐ কাজটি করবেন না, বুড়ো মানুষের কথা শুনুন।'

বলিলাম,—'ওটার উপর হাত নেই যে নির্ম্মল বাবু। গায়ের জোরে নেই বলে তুড়ি দিয়ে ওটাকে উড়িয়ে দেওয়াও যায় না। কিন্তু নির্ম্মল বাবু, আপনি ভালবাসার উপর অত

চটা কেন—ভালবাসা আছে, তাই পৃথিবী এত সুন্দর লাগে। আমি না ভালবাসাকে কার সঙ্গে তুলনা দেব। বেণুবনের বিধাদিত চন্দ্রালোকের সঙ্গে, না—সুস্নিগ্ধ রজনী-গন্ধার সঙ্গে। না—ওর তুলনা হয় এমন কোন বস্তুই, আমার নজরে পড়ে না নির্মল বাবু—'

'খবরদার', নির্মল বাবু চীৎকার করিয়া বলিলেন, 'খবর-দার, কাব্য আর কবিতা, আমি চক্ষে দেখতে পারিনে। কোন বাবে কবির পেলো কবিতা পড়েছেন বুঝি? আমাদের এই ভাঙ্গা ফুটো জীবনে কবিতা কেন? কবিতা আওড়াবে ঐ ওরা, যাদের চারতলা বাড়ী আর প্রকাণ্ড মোটরগাড়ী আছে।'

একটুখানি থামিয়া, হাঁপ লইয়া নির্মল বাবু বলিতে লাগিলেন, 'আর প্রণয়ের শেষ অবস্থা কি তা জানেন ত! সেটা হচ্ছে বিয়ে। কিন্তু অপেন বাবু, মনে রাখবেন এটা কলিকাল, সত্যযুগ নয়। হরিশ্চন্দ্রের সঙ্গে বিশ্বুক হবে, শৈব্যা পথে বেরিয়েছিলেন,—রামের সঙ্গে সীতাদেবী সব সুখ ত্যাগ করে, বনে গিয়েছিলেন। কিন্তু আজকালকার সীতা, শৈব্যা সব বেজায় সভ্য। চারতলা বাড়ী আর রোল্সরয়েস গাড়ীর কত দাম, তা তারা জানে। আর আমাদের মত মাছিমারা কেরাণীর স্ত্রী না হলেও বেশ চলে। আমাদের বিয়ে করা পাপ—মহাপাপ—'

কিন্তু আমি কি এসব জানি না—সবই জানি।

সামান্য কেরাণীর পক্ষে বিবাহ যে একটা উৎকট তামাসা এবং বিরাট বিলাসিতা এ কথা অস্বীকার করি না। কোনরূপে কায়ক্লেশে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য কিরূপ কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে, আর আর অগণ্য আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বলি দিয়াছি, তাহার মর্ম্মান্তিক বেদনার ইতিহাস ভুলিবার নয়—বা মুছিবার নয়।

ইহার মধ্যেই শরীরে ও মনে বিশ্রী হতাশার ছায়া ঘনাইয়া আসিয়াছে। দেহে যৌবনের উচ্ছলতা নাই, কেমন যেন একটা দারিদ্র্যের মালিন্যে আপাদগোড়া ঢাকিয়া গিয়াছে।

দুর্ব্বল আশা, তুচ্ছ স্বার্থ—নিষ্ঠাকার অভাব, রোগ, নীচতা সমস্ত যেন দল বাঁধিয়া আসিয়া এক সঙ্গে জীবনকে কুৎসিত ও কদর্য্য করিয়া তুলিয়াছে: সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মীর চরণচিহ্নের ছাপ কোথাও যেন বিন্দুমাত্র নাই!

তবুও স্তিমিত সন্ধ্যালোকে আকাশের নীচে—নিশীথরাত্রে, বাদলধারার মাঝে, অথবা জ্যোৎস্নালোকিত শুভ্র রাত্রির মাঝে, যখন সুধাবেশে সারা দেহমন উচ্ছ্বসিত উদ্বেলিত হইয়া উঠে, তখন নিজেকে মনে হয় বড় নিঃসঙ্গ। সেই সময় সেই সব পলাতক ক্ষণ বহুপূর্ব্বগুলির সাথে, একটি প্রিয় নারীর কৌতুক-কলহাস্যময় ইক্ষ সান্নিধ্যের মাঝে নিজেকে ডুবাইয়া ভাসাইয়া দিতে ইচ্ছা যায়। দারিদ্র্যের নির্য্যাতন হয়ত ভবিষ্যতের সমগ্র জীবনকে মলিন ও পঙ্গু করিয়া তুলিবে,—অসুস্থ-আকাঙ্ক্ষা আর তুচ্ছ স্বার্থ লইয়া হয়ত কলহ সুরু হইবে। তবুও এই গাঢ় অন্ধকারময় বর্ণহীন জীবনে, কোন নারীর চন্দ্রালোকের মায়া-মাধুর্য্যের রেখাপাত দেখিতে ইচ্ছা করে। সজীব ফাল্গুনরাত্রির মর্ম্মরধ্বনির সাথে শুভ্র চন্দ্রালোকিত নিশীথে, প্রিয়ার ঘুমন্ত মুখের কাছে, মুখ লইয়া কানে কানে প্রিয় নাম ধরিয়া ডাকিবার সাধ যায়।

মাস ফুরাইয়া যায়। মাসের প্রথম তারিখটি যেন বহুদিন ধরিয়া বৃষ্টিবাদলের পর সূর্য্যালোকের প্রথম রশ্মিটির মত সুমধুর মনে হয়। দীর্ঘ একমাস অপেক্ষা করার পর আজ মাহিনা পাওয়া যাইবে। আমি আনন্দে হাসিয়া উঠি। মনে মনে অনেক কিছু হিসাব করি—সেই সঙ্গে দু'একটী বিলাসিতার সামগ্রী কিনিবার বাসনা হয়। অমুক ইনসিও-রেন্স কোম্পানীর এজেন্ট ব্রহ্ম বাবুর কথা ভুলিতে পারি না। মাসে মাত্র সাড়ে তিন টাকা করিয়া প্রিমিয়াম দিতে পারিলে, দশ বৎসর পরে প্রায় আঠারশ টাকা পাওয়া যাইবে। কথাটির ভিতর যেন মাদকতা আছে। চেয়ারে বসিয়া ইনসিওরেন্স কোম্পানীর কথাই মনে মনে আলোচনা করি। দশ বৎসর পরে ঐ টাকাগুলি পাইলে ব্যাবসা করিতে পারি—এই ছোট খাট দোকান আর কি! সেই দোকান হইতে, প্রচুর লাভ হওয়াও অসম্ভব নয়। ইহার পর আর টাকার অভাব হইবে না। সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মেসের পাশের বাড়ীর মেয়েটীর কথা মনে হয়। ইন্দিরা। কি সুন্দর নাম! আর কি সুন্দর তার দুখানি ঘন পল্লবভারাতুর কৃষ্ণ-আঁখির চাহনি। বিমনা হইয়া উঠি।

নোটকখানি সাবধানে পকেটে রাখিয়া একসময় রাস্তায় পড়ি। সিগারেট ধরাইয়া অত্যন্ত অন্যমনস্কভাবে চলিতে চলিতে হঠাৎ একসময় চমকাইয়া উঠি! আর একটু হইলেই,

মোটরখানা ঘাড়ে আসিয়া পড়িয়াছিল আর কি! সেই মোটর হইতে কে যেন আমার নাম ধরিয়া ডাকিল, 'তপেন—তপেন যে। তারপর কেমন আছ?'

চিনিলাম, কলেজের বন্ধু সনৎ। বৌকে লইয়া হাওয়া খাইতে বাহির হইয়াছে। বৌটির সুন্দর মুখখানির দিকে চাহিয়া কহিলাম, 'এই কেটে যাচ্ছে—তারপর তুমি কেমন?' '—বেশ ভাল আছি। বহুদিন পর তোমায় দেখে বড়ই সুখী হলাম। আচ্ছা ভাই এখন যাই।' সোফার হাঁক দিয়াছে, মোটর বাহির হইয়া গেল।

তাহাদের দিকে তাকাইয়া দেখিতে দেখিতে, আমি যেন বেদনা বোধ করিলাম। কি সুন্দর উহাদের জীবন—অফুরন্ত অর্থ আর প্রাচুর্য্যে দেহ কেমন কান্তিময়। কোথাও বিন্দুমাত্র দারিদ্র্যের চিহ্নমাত্র নাই। হাওয়ায় মেয়েটীর ঘোমটা সরাইয়া দিয়াছে—শুভ্র ঘাড়ের উপর কালচুলের রাশি। মনে হইতেছে যেন এখনই ঝাঁপিয়া পড়িবে।

কি চমৎকার উহাদের জীবন। অসীম তৃপ্তি আর শান্তিতে উহাদের সমস্ত জীবন সুন্দর ও সুখময়। এই সুন্দর সন্ধ্যা বোধ করি শুধু উহাদের জন্যই সৃষ্টি হইয়াছে। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া হাঁটিতে লাগিলাম। রাস্তার ও ধারে মদের দোকানের সম্মুখে বেশ ভীড়। সেই ভীড়ের ভিতর হইতে, কে যেন জড়িতকণ্ঠে ডাকিল—'তপেন বাবু, ও তপেন বাবু—'

চমকাইয়া চাহিয়া দেখি, দোকানের সম্মুখে একটী চেয়ারে বসিয়া নির্ম্মল বাবু। পায়ের তলায় মদের বোতল গড়াগড়ি যাইতেছে, হাতে মদের গ্লাস।

চেহারা যেন আরও হতশ্রী ও কদর্য্য হইয়া উঠিয়াছে।

নির্ম্মল বাবুর নিকটে আসিয়া বলিলাম,'এ কি হচ্ছে নির্ম্মল বাবু, উঠুন উঠুন, বাড়ী যান।'

নির্ম্মল বাবু মদের গ্লাসটী এক হাতে চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, 'বাড়ী—কোথায় বাড়ী? বাড়ী নেই, বউ নেই, কেউ নেই। ছেলেটা ছিল বটে, বোধহয় এতক্ষণে সাবাড় হয়ে গিয়েছে ভায়া।'

আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম, 'হয়ে গিয়েছে? মানে—'

আরাম করিয়া চেয়ারে হেলান দিয়া, নির্ম্মলবাবু বলিলেন, 'মানে সহজ। বউ আর ছেলের অসুখ আজ দশদিন। ভেবে দেখ ভায়া, আজ এই দশ দিনের মধ্যে এক ফোঁটা ওষুধ দিতে পারিনি। হাতে একটা পয়সাও ছিল না ভায়া—আর ধার কর্জ্জই বা কার কাছে। চারিদিকে দেনা, কেউ আর ধার দিতে চায় না ভায়া। কিন্তু আমি বাবা নীলকণ্ঠ—ধার পেলে না করব না। যত যাও না কেন—ব্যস্ সব এইখানে রেখে দেব। ব্যোম্ ভোলানাথ—ভায়া—ভায়া—।' এই বলিয়া হুঙ্কার দিয়া, নির্ম্মল বাবু নিজের সরু লিক্‌-লিকে গলাটী হাত দিয়া দেখাইয়া দিলেন।

বিরক্ত হইয়া বলিলাম, 'তাই আজ মাসের টাকায় বসে মদ গিলছেন। আপনি আচ্ছা পাষণ্ড লোক ত।' এক চুমুকে মদ শেষ করিয়া, গ্লাসটি শূন্যে তুলিয়া ধরিয়া নির্ম্মল বাবু কহিলেন 'ভায়া, কেন যে মদ খাই, তা' তোমাকে বোঝাব কি করে। তিন মাসের ঘর ভাড়া বাকী—বাড়ীওয়ালা নোটীশ দিয়েছে। ঘরে চাল নেই, কারুর একখানা বই দুখানা কাপড় নেই, রোগে ওষুধ দিতে পারছিনে—আর চারিদিকে অনুযন্ত্র দেনা! দেনার মাথায় চুল অবধি বিক্রী হয়ে রয়েছে। মাইনে ত এই ক'টী টাকা, অফিস থেকেই সব ফুরিয়ে যায়। মাইরী, মদ বেশী খাই নি, মিথ্যে কথা বলছি। ভায়া, মদ খাই আলো জ্বলতে, কিন্তু গলা যেন আরও শুকিয়ে যায়—জ্বালা-যন্ত্রণা আরও বেশী হয়ে উঠে—তখন আবার খাই। ভায়া হে, এ পিপাসা কখনই মিটবে না—মিটবে না—।'

আমি নির্ম্মল বাবুর হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিয়া কহিলাম, 'চলুন আপনাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসি।'

নির্ম্মল বাবু দাঁড়াইয়া বলিলেন, 'কোন দরকার নেই। বাড়ীতে বেশ যেতে পারব—'

কিন্তু তাঁহার কথা শুনিবার জন্য দুইজনে হাঁটিতে লাগিলাম।

এ-রাস্তা সে-রাস্তা করিয়া অবশেষে একটা অন্ধকারময় সরু গলির মধ্যে দুইজনে ঢুকিলাম। সেই অন্ধকার গলির মধ্যে, একটা অতি জীর্ণ বাড়ীর সম্মুখে আসিতেই, একদল লোক কলরব করিয়া উঠিল।

নির্ম্মল বাবু তাহাদের দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন—'বাবা হুমে খাইও না ভুলে যাব,এ পাওনাদার ব্যাটারা ভুলবার লোক নয়। কি অসীম ধৈর্য্য দেখে নাও ভায়া। সেই কখন থেকে, দরজায় হত্যে দিয়ে পড়ে আছে—। মদ যে কেন খাই,

তা তুমি বুঝবে কি করে ভায়া। আমার মত অবস্থায় পড়, বাপের সুপুত্রের মত তুমিও মদ ধরবে।'

লোকগুলি যে পাওনাদার তা বুঝিতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব হইল না। তাহারা নির্ম্মল বাবুকে দেখিয়া সমস্বরে অশ্রাব্য ভাষায় অনর্গল গালাগালি সুরু করিল। সে ভাষা শুনিলে হয়ত মৃত ব্যক্তির তুষিন-শীতল দেহেও উষ্ণ রক্তস্রোত বহিয়া যাইবে।

আমি আবার আস্তিন গুটাইতেছিলাম—কিন্তু নির্ম্মল বাবু বাধা দিয়া কহিলেন,—'ভায়া মদ খেয়েছি বটে, কিন্তু জ্ঞান হারাইনি। আস্তিন গুটিয়ো না ভায়া—ওরাই যে দুদ্দিনের কাণ্ডারী। আর গালাগাল দেবে বই কি—ধারে মাল খেয়েছি, টাকা দিতে পারি নি—কারুর কাছ থেকে টাকা নিয়েছি, সুদ দিতে পারিনি—গালাগাল দেবে বই কি ভায়া।' সেই ছোট দরজার ভিতর মাথা ঢুকাইতেই, সকলে মিলিয়া নির্ম্মলবাবুকে চাপিয়া ধরিয়া কহিল—'আজ আর চালাকী চলছে না—টাকা চাই-ই।'

কিন্তু নির্ম্মলবাবুর মুখে বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য দেখা গেল না।

পকেটটি বাঁহাত দিয়া, চাপিয়া ধরিয়া, নির্ম্মলবাবু কহিলেন—'টাকা দেব—কারুর বাকী রাখব না বাবা—।' নির্ম্মলবাবু হাসিয়া উঠিলেন।

কিন্তু তাঁহার হাসিতে, তাহারা বিন্দুমাত্র মুগ্ধ বা বিভ্রান্ত হইল না। সকলে একসঙ্গে নির্ম্মলবাবুকে চাপিয়া ধরিয়া, তাঁহার দুই পকেটে হাত দিয়া টাকাগুলি বাহির করিয়া লইল।

টাকাগুলির দিকে চাহিয়া, নির্ম্মলবাবু কহিলেন—'বাবা সকলে ভাগ-ই ভাগ করে নাও। আজ, খুব কায়দায় পেয়েছিলে চাঁদেরা। যাও—এখন পরিষ্কার হও দেখি—দেখে চোখটা জুড়োক—'

আমাকে একরকম টানিয়া, নির্ম্মল বাবু বাড়ীর মধ্যে লইয়া গেলেন।

বাড়ীর ভিতর অন্ধকার। সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উৎরাইয়া গিয়াছে—কিন্তু কোথাও আলো নাই। মনে হইল, আলো-বাতাসময় প্রকাণ্ড পৃথিবী হইতে যেন নির্ব্বাসিত হইয়াছি। মাথার উপর যে প্রকাণ্ড আকাশ আছে, এ কথা ভুলিয়া গেলাম।

দেশলাই জ্বালাইয়া কহিলাম—'নির্ম্মল বাবু, লণ্ঠন কোথায় আছে—'

নির্ম্মল বাবু ততক্ষণ রোয়াকের উপর লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িয়াছেন। শুইয়া শুইয়া কহিলেন—

'ঐ যে, দরজার পাশেই আছে—জ্বেলে নাও ভায়া—'

লণ্ঠন জ্বালিয়া কহিলাম 'ওঁরা গেলেন কোথায়—'

ওয়াক্ ওয়াক্ করিয়া বমি করিতে করিতে নির্ম্মল বাবু কহিলেন—'ওঁরা মানে আমার বউ আর বাচ্চা ছেলেটা ত। দেখ ঘরের মধ্যে—হয়তো এতক্ষণ কাবার হয়ে গিয়েছে—আঃ গেলেই বাঁচি ভায়া - কালিঘাটে পুজো দিই' -

এইবার ঘরের মধ্য হইতে সাড়া আসিল—'কথা বলতে ঘেন্না হয় না—? নির্ল্লজ্জ বেহায়া মানুষ, মদ গিলে পয়সা ওড়াতে লজ্জা হয় না? যার ঘরে বউ ছেলে উপোসী, রোগে এক ফোঁটা ওষুধ পায় না—সাতবার করে লোকে টাকার তাগাদা দেয়—আর অপমান করে যায়, তার কথা বলতে লজ্জা হয় না—? ছিঃ—ছিঃ—ছিঃ।'

নির্ম্মল বাবু জড়িতকণ্ঠে কহিলেন, 'প্রেয়সী, একটুখানি চুপ করলে ভাল হয়। তোমার গুণপণা আর বাইরের ভদ্রলোকের কাছে, প্রকাশ করো না। সারাদিন পরিশ্রম করে, তোমার স্বামী ঘরে ফিরে এলেন—কি বলেন অপেন বাবু? পতিব্রতা নারী কোথায় পা ধোবার জল দেবে, বাতাস করবে—জলখাবার দেবে—তা নয় ঘরে ঢুকবামাত্রই, কোকিলকণ্ঠে ডাক ছাড়তে বসলেন।'

নির্ম্মলবাবুর ছোট ছেলেটি অনাবৃত শরীরে হামাগুড়ি দিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া, নির্ম্মলবাবুর মুখের কাছে, তাহার মুখটি লইয়া ডাকিল—'বাবা—বাবা—'

নির্ম্মলবাবুর হতশ্রী কদাকার মুখখানি নিমেষের মধ্যে স্নিগ্ধ হইয়া উঠিল। হাত বাড়াইয়া ছেলেটিকে কোলে করিয়া কি আনি কেন, নির্ম্মলবাবু কাঁদিয়া ফেলিলেন।

কান্নার শব্দে, ঘরের মধ্য হইতে ঝঙ্কারধ্বনি উঠিল—'আহা, কত চংই হচ্ছে। লোক-দেখান আদিখ্যেতা, আমার গুচকের বিষ। যে লোকের মাগ-ছেলেকে খেতে পরতে দেবার ক্ষমতা হয় না, তার আবার বিয়ে করা কেন?' স্ত্রীর উদ্দেশ্যে ঘরের দিকে মুখ ফিরাইয়া, নির্ম্মল বাবু চীৎকার করিয়া

বলিলেন, 'চুপ, চুপ, একটা কথা আর নয়। কথা বললে, কিন্তু খাচ্ছেতাই হয়ে যাবে।'

নির্ম্মলবাবুর স্ত্রীর চীৎকার কিন্তু ইহাতে বন্ধ হইল না, চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'কেন চুপ করে থাকবো, বার পই, যার ছেলে একমুঠো খেতে পায় না, তার অত সরাধি কিসের! মদ গিলতে লজ্জা করে না? কোলের ছেলেটা সকাল থেকে এক ফোঁটা দুধের জন্ত চীৎকার করছে, ঘরে না দুধ, না সাবু-বার্লি, না আছে একটু ওষুধ। ছাই বলতে একটু জিনিষ নেই, আছে শুধু লোকের তাগাদা, আর গালাগালি। কেন চুপ করবো?' ঘর হইতে নির্ম্মলবাবুর স্ত্রীর কান্না ভাসিয়া আসিতে লাগিল।

আমি লণ্ঠনের ম্লান আলোয় চতুর্দ্দিকে তাকাইয়া দেখিলাম। সমস্ত বাড়ীখানি শ্রীহীন ঘরের মধ্যে দারিদ্র্যের উলঙ্গ মূর্ত্তি। ঘরের এককোণে কতকগুলি ময়লা কাপড়-জামা জড় করা রহিয়াছে, আর সামান্ত কয়খানি পিতল কাঁসার বাসন মাত্র। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যেরও যথেষ্ট অভাব।

নির্ম্মলবাবুর দিকে চাহিয়া বলিলাম, 'নির্ম্মলবাবু ওদের খাওয়ার ব্যবস্থা করুন।'

নির্ম্মলবাবু দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বলিলেন, 'উপায় নেই। ঘরে একটা আধলাও নেই। সাবু, বার্লি, মিছরী আনবার মত একটা পয়সাও ঘরে নেই অপেনবাবু! কেউ ধার দেবে না তারা, নিজের পোড়া পেটের জন্তে একমুঠো চালও ঘরে নেই। অপেনবাবু, নিজের ছেলেমেয়েকে, বউকে খেতে দিতে, পরবার কাপড় দিতে, রোগে ওষুধ দিতে কার না সাধ যায়। কিন্তু দেব কোত্থেকে—চোখের সামনে সবই তো দেখলেন। দেনার মাথায় চুল পর্য্যন্ত বিকিয়ে রয়েছে। অপেনবাবু, আমার বর্ত্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ, সমস্তই এমাট অন্ধকার। বিন্দুমাত্র আলোর রেখা নেই। সেই জন্তেই বলেছিলাম, ভায়া, আমাদের মত লোকদের বিয়ে করাটা বিলাসিতা—পাপ। কেন মদ খাই, এবার বুঝলেন ত। মদ খাই, জ্বালা-যন্ত্রণা ভুলবার জন্তই—নেশার জন্ত নয়। ভায়া, আমিও একদিন মানুষ ছিলাম, আমারও একদিন স্বচ্ছলতা ছিল, আমিও একদিন ভদ্রলোক ছিলাম। কিন্তু জানি না—কার দোষে কি জানি কি হয়ে গেল। এই বোধ হয় অদৃষ্ট, এই বোধ হয় নিয়তি, না অপেন বাবু?'

রাত ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছিল। ছোট ছেলেটি ঘরে আর ক্ষুধার তাড়নায় চীৎকার করিতে লাগিল।

আমি একবার সেই ক্ষুদ্র বালকের ক্ষুধাতুর অশ্রুসিক্ত শীর্ণ মুখখানির দিকে চাহিয়া, পকেট হইতে একখানি দশ টাকার নোট বাহির করিয়া বলিলাম, 'আমি চললাম নির্ম্মল বাবু। এই টাকা রইল, এদের খাওয়ার ব্যবস্থা করুন।'

নির্ম্মল বাবুকে কোন কথা বলিবার বিন্দুমাত্র অবসর না দিয়া রাস্তায় নামিয়া আসিলাম। বাহিরের স্নিগ্ধ হাওয়ায় উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোর মাঝে, একটি নিঃশ্বাস ছাড়িয়া আজ বহুদিন পর যেন মহা শান্তি অনুভব করিলাম।

রাস্তায় দ্রুতগামী মোটরে উপবিষ্ট সুসজ্জিত নরনারীর উপর আজ আর বিন্দুমাত্র হিংসা হইল না, বরং তাহাদের পানে কৃপাদৃষ্টিতে চাহিয়া রাস্তা হাঁটিতে লাগিলাম।

বেশীদিন চাকুরী টিঁকিল না। একদিন নোটীশ পাইলাম ব্যয়সঙ্কোচের জন্ত আফিসের লোক কমাইতে হইবে, সুতরাং যাহারা অল্পদিন আফিসে ঢুকিয়াছে, তাহাদের সকলকেই বিদায় লইতে হইল। অতএব আবার পথে বাহির হইতে হইল।

পথে একদিন সুকুমারের সহিত দেখা। সে "স্বাধীন ভারতের" স্বপ্ন দেখিতেছে। তাহার কাছে দীক্ষা হইল।

অতঃপর স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে, একদিন সুন্দর প্রভাতে রাজবন্দীরূপে জেলখানায় আসিয়া পৌঁছাইলাম। প্রথমে জেলখানায় আসিয়া আনন্দই পাইলাম। বিনা পরিশ্রমে আহার ও নিদ্রাটা মন্দ কি? বাহিরে চাকরীর বাজার যেরূপ দুঃখময় হইয়াছে, তাহাতে এ স্থানটি কিছুকালের জন্ত আরামপ্রদ ও সুখকর বটে! কোনরূপ চিন্তা নাই—পরিশ্রম নাই—বড়লোকের বাড়ী যাইয়া চাকরীর জন্ত বা একটু সুপারিশের জন্ত নানা অপ্রিয় কথা শুনিবার চাহিবার নাই, অথবা চড়া দুপুর রৌদ্রে আফিসে আফিসে দরখাস্ত হাতে করিয়া ঘুরিবার কষ্ট নাই, মেসের তাগাদা নাই। সোভিয়েট রুশিয়ার সাম্যবাদের হাওয়া যেন জেলখানায় আসিয়া লাগিয়াছে। সমান সমান খাওয়া পরা—কাহারও কোনরূপ হিংসা করিবার কারণ নাই। আমি রীতিমত আনন্দই পাইলাম।

দিন চলিতে থাকে, কিন্তু পূর্ব্বের আনন্দ ও উৎসাহ যেন ক্রমশঃ কমিয়া আসিতে লাগিল। জেলের সঙ্কীর্ণ, অপরিসর

ঘরে শুইয়া, বাহিরের বিরাট জগতের মাঝে নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা উজ্জ্বল এবং বিরাট কল্পনা করিয়া ফেলিলাম। মুসোলিনি না কি এককালে ভিক্ষা করিতেন, কিন্তু এখন ভদ্রলোক একটা রাজ্যের হর্ত্তাকর্ত্তা, বিধাতা! হিটলার ও ষ্টালিন ভিক্ষা না করিলেও তাঁহারা তাঁহাদের অতীত জীবনে সামান্য লোকই ছিলেন। কিন্তু আজ তাঁহারা প্রত্যেকেই এক একজন সম্রাটের সমান। শুইয়া শুইয়া মনে মনে বিচার করিয়া দেখিলাম, তাঁহাদের এই ভাগ্য পরিবর্ত্তনের মূলে কি বস্তু রহিয়াছে। অনেক চিন্তার পর মনে হইল, একমাত্র অধ্যবসায় ও চেষ্টা-বত্ন। আর শুইয়া থাকিতে পারিলাম না, উৎসাহ-আবেগে চঞ্চল হইয়া উঠিয়া বসিলাম। হাতের কাছে নক্সের কৌটাটী ছিল, তাহা হইতে একটিপ নস্য লইয়া দুই নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করাইয়া বুদ্ধিটাকে প্রখর করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। মনে হইল, চেষ্টা করিলে আমি মুসোলিনি বা ষ্টালিন না হইতে পারিলেও, অন্ততঃ বাহির হইতে পারিলে এবার একটি ভাল চাকরী জুটাইতে পারি। কিন্তু পরক্ষণেই নিজের এই স্বল্প আশা দেখিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইলাম। ভাবিলাম কোথায় দৃপ্ত মুসোলিনির পরাক্রম, আর কোথায় একটা আফিসের কেরানীর নিগৃহীতা। ব্যাঘ্র হইয়া গর্জ্জন করিবার উচ্চাশাকে শেষে বিড়ালের মিউ মিউ ডাকের মাঝে রূপান্তরিত করিলাম! ধিক্—শতধিক্ আমাকে, কিন্তু মনের মাঝে বিশেষ কোন জোর পাইলাম না।

ভাবিলাম বাপু হে, বাঙ্গালীর ছেলের আবার ব্যাঘ্র-গর্জ্জনের সাধ কেন! তার চেয়ে ভাল ছেলের মত চাকরী-বাকরী জুটাইয়া, একটি চতুর্দ্দশী বালিকাকে বিবাহ করিয়া বেশ তৈল-সিক্ত নিরীহ সংসারী বনিয়া যাও। ব্যাঘ্র-গর্জ্জনের সাধ থাকুক, আফিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া বালিকা-বধূর সম্মুখে চা খাইতে খাইতে, সতর্কতার সহিত ইহার উহার নামে গর্জ্জন করিও। তাহাতে শান্তি পাইবে, বালিকা-বধূও আনন্দিত হইবে। ব্যাঘ্র-গর্জ্জনের সাধ ভুলিয়াও করিও না, তাহাতে অনেক ঝঞ্ঝাট। কিন্তু নির্ম্মল বাবুর সে দিনের সংসারের দৃশ্য চোখের উপর ফুটিয়া উঠিল। নির্ম্মল বাবুর কথা ভাবিলাম, তিনি কি আজিও বাঁচিয়া আছেন?

অবশেষে একদিন মুক্তি পাইলাম।

মুক্তি পাইয়া কিছুদিন পর দেশের বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম। কিন্তু দেখিলাম, বাড়ীতে আর কিছুদিন বসিয়া থাকিলে সমস্ত আশা-উৎসাহ একসঙ্গেই নিভিয়া যাইবে। অর্থ-হীন অবস্থার চরম দুর্দ্দশায় পড়িবার পূর্ব্বেই, আর কালবিলম্ব না করিয়া নিজের শেষ স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে তাহা একতলা বাড়ীখানিকে নগদ পঞ্চাশ মুদ্রায় বিক্রয় করিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিলাম।

আবার মেসে আছি। একটা চাকরী জুটাইতে পারি কি না, তাহাই এখন চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তহবিল যে পরিমাণ কমিয়া আসিতেছে, তাহাতে আর কিছুদিন পরে নাগা সন্ন্যাসীর মত হয় গাছতলা অথবা ফুটপাথ আশ্রয় করিতে হইবে! নানারূপ চেষ্টা-চরিত্র করিয়াছি, কিন্তু সমস্ত উৎসাহ যেন শেষ হইয়া গিয়াছে। সকল বল ফুরাইয়া যেন ফতুর হইয়া গিয়াছি। তৈলহীন দীপসম জীবন-প্রদীপ যেন এক একবার জ্বলিয়া নিভিয়া আসিতেছে।

মেসের ঘরে তক্তাপোষের উপর শুইয়া শুইয়া অনেক কিছু স্বপ্ন দেখি।

কিছু টাকা—একটি বাংলো ধরণের বাড়ী, চারিদিকে ফুলের আর তরকারীর বাগান। সেই সঙ্গে গৃহে একটি বালিকা-বধূ। শুইয়া শুইয়া চতুর্দ্দশী বালিকা-বধূর অলক্তক-রঞ্জিত দুখানি সুশ্রী শুভ্র নরম পায়ের পদধ্বনি যেন বুকের মাঝে অনুভব করি। কিন্তু সবই স্বপ্ন!

দিবসের কর্ম্মকোলাহলে ও রূঢ় আলোয় নিশীথের সকল স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া একাকার হইয়া যায়। ভাবি স্বপ্ন কেন সত্য হয় না—আর সত্যই যদি না হইবে, তবে কেন এ রঙ্গিন স্বপ্ন!

আমার কাছে পৃথিবী আর বিন্দুমাত্র সুশ্রী নয়।

মনে হয়, যেন এক বিরাট পুরুষের করধৃত স্বর্ণস্তূপের উপর এই পৃথিবীটি বন্ বন্ করিয়া ঘুরিতেছে! স্বর্ণহীন ব্যক্তিরা সেই পৃথিবী হইতে ছিট্‌কাইয়া পড়িয়া চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে। দুঃসহ রাতের কাজল-কাল দেহের অন্তরালে সেই সব অভাগার ভাগ্যাকাশ চিরকালের মত শশি-তারাহীন চির অমানিশার মত অন্ধকার হইয়া যাইতেছে, সেখানে সুখ নাই, প্রেম নাই, প্রাণ নাই।

রাস্তাঘাট যেন শ্রীহীন, মানুষগুলি যেন অস্থিচর্মসার, দুনিয়াও একটি ফুল ফুটতে চাহে না!

লোকগুলির মুখ বিন্দুমাত্র উৎসাহব্যঞ্জক নয়, পাণ্ডুর মুখ, তোবড়ান গাল, চাপদে-ধরা চোখ, পাণ্ডুটে কপাল—সমস্ত অবয়ব যেন ভাবলেশহীন ফ্যাকাসে।

দেখিলে মনে হয়, সমস্ত মানব আজ যেন ধ্বংসপথের যাত্রী হইয়া, পার হইবার জন্য কাহাকে যেন সকরুণ সুরে ডাকিতেছে, মাঝি—মাঝি—আয়—আয়, পারে নিয়ে যা।

বার বার মনে হয়, ইহার চেয়ে জেলখানার যেন পরম আরামে ছিলাম। অন্তরের ভাবনা যেমন ছিল না, তেমনি উৎসাহ ও আশার অভাব ছিল না। আজ সেই অসীম উৎসাহ, অনন্ত আশা ফুরাইয়া নিঃশেষ হইয়া যাইতেছে। কোথায় হইতে আসিয়া কোথায় যেন মিশিয়া গেলাম। ছিলাম ধাবমান নির্ঝরের ফেনসঙ্কুল গুনিবার খরস্রোত, আর এখন যেন হইয়াছি, অগভীর নিষ্প্রাণ সীমাবদ্ধ পুষ্করিণী।

এইরূপ মনের অবস্থায় একদিন বেড়াইতে বাহির হইয়াছি। ক্লি স্কুল ষ্ট্রীটের মোড় ঘুরিয়া ময়দানে যাইবার ইচ্ছা।

পাশে একটি সরাবের দোকানে পিল পিল করিতেছে লোক। দেখিয়া আমার আবার নির্মল বাবুর কথা মনে হইল।

কি হইল তাঁহার? বাঁচিয়া আছেন কি? কিন্তু তিনি মরিয়া গেলেও বুঝিলাম, অসংখ্য নির্মল বাবুতে দেশ ভরিয়া গিয়াছে।

সেইদিন হইতে যে দিকে চাহিতেছি, কেবলই নির্মল বাবুর দল দেখিতেছি। অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, বাসা নাই, শান্তি নাই, পিল পিল করিয়া সকলে ছুটিয়া চলিয়াছে, পিপীলিকার সারের ন্যায় মৃত্যুর দিকে।

এইবার সুকুমারের সঙ্গে দেখা হইলে, তাহাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব।

শীতের সন্ধ্যা

— শ্রীদীপ্তিরাণী মজুমদার

সোদ ডুবে গেছে তেরকল আগে বেলা মোটে নাই আর
গোচরের গাড়ী মাঠান পথের পানে চাহে বার বার।
ছাগল-ছাগলী খুঁটে খেয়ে চলে মটরের ভুঁই ঘরে,
খেজুরের গাছে হাঁড়ি বেঁধে গাছী ফিরিয়া আসিছে ঘরে।
বাবলার ডালে দইরাজ পাখী দিনের আহার খুঁজি
নিজ শাবকেরে খাওয়ারে এখন ঘুমায়ে পড়েছে বুঝি।
গাঁয়ের সড়কে লোক নাই মোটে কচিৎ দু'এক জন
হাটের বেসাতি শেষ করে ফেরে, শীতেতে বেমনা মন।
বিলের এপারে গাছে গা' লাগায়ে কেঁদে কেঁদে চখা-চখী
শেষ মিলনেতে আগত দুখের কথা যেন কহিল কি!
দূরে মসজিদে আজানের সুর ভেসে আসে বাতাসেতে
পথের পথিক লাগিল নমাজ পথ হেঁটে যেতে যেতে।
ঠাকুর-বাড়ীর আরতির কাঁসি এখনও ওঠেনি সারা
আবছা আকাশে জ্বল জ্বল করে উতল প্রভাতী তারা।
হালের বলদে খাওয়ায়ে রাখাল গোয়ালে তুলিয়া আনি
মাওয়ায় বসিয়া ভাটিয়াল সুরে বাজায় বাঁশের বাঁশী।
গাঁয়ের মেয়েরা তুলসী তলায় প্রদীপ দেখায়ে এসে
মাঝে বালসায় আগুন করিয়া বসে আছে গাও ঘেঁসে।
কেহ বলে সেই রূপ-কাহিনীর রাজকন্যার কথা
রূপার কাঠিতে ছিল যার চোখে মরণের অলসতা;
আরো কত কথা কত দুখের অশ্রুর ইতিহাস
চোখ মুছে তারা শোনে তাই তবু মেটে না মনের আশ!
কথা শেষ হয় রাত বেড়ে চলে তবু সেইখানে বসি
রাজকন্যার ব্যথা মনে করে বুক ওঠে নিঃশ্বসি!

বাহিরে নিথর গাঁয়ের পরাণ 'ওল' পড়ে ঝিমে যায়
শীতের সন্ধ্যা চুপে চুপে চলে প্রৌঢ়ের সীমানায়।

নদীয়ার কথা

—শ্রীবীরেন্দ্রমোহন আচার্য

সমাজনৈতিক বিবরণ

গৌড় ইতিহাসের সন্ধানে আমরা দেখিয়াছি, বাঙ্গালার অতীত বৌদ্ধযুগে দুর্গোৎসবে মহিষ বলীদানই বঙ্গের রাজগণ ধারণ করিয়া ছিল এবং পালদের যুদ্ধের অব্যবহিত কাল পরেই দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গে সেই আসুরভাব অনুপ্রবেশ করিয়াছিল। এই সূত্রে বাঙ্গালার সামাজিক শাসন-ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণেও ধবলীয়ার কর্তৃত্ব অবিসম্বাদিত।

সুদূর অতিপ্রাচীন যুগ হইতে সমগ্র বাঙ্গালা দেশ বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইয়া যায়। কালক্রমে ঐ বৌদ্ধধর্ম বিকৃত হইয়া বিবিধ মত, পন্থা ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত বাঙ্গালার সমাজজীবনে ঘোরতর বিপ্লব আনয়ন করিয়াছিল। ব্রাহ্মণ্য শাসনাধিকার ও জাতিগত উচ্চ-নীচভেদ সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়া সমগ্র সমাজ উচ্ছৃঙ্খল ও যথেচ্ছাচারে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।

অতঃপর হিন্দু-পুনরুত্থান কালে খৃঃ অষ্টম শতাব্দীর শেষে হিন্দু রাজচক্রবর্তী মহারাজ পুরুষোত্তম বা আদিশূর তাঁহার রাজশক্তির দ্বারা এই অরাজক বিশৃঙ্খল অবস্থা হইতে দেশকে রক্ষা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। কথিত আছে, কোন এক যজ্ঞ করিবার অভিপ্রায়ে তিনি সমগ্র বাঙ্গালা দেশ হইতে একজনও বেদজ্ঞ শুদ্ধ ব্রাহ্মণ না পাইয়া, কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন বেদবিৎ সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া যজ্ঞকার্য সমাধা করেন ও পরে এই দেশের নষ্টপ্রায় হিন্দুধর্ম ও হিন্দুশাসন সমাজনীতি উদ্ধার ও প্রতিষ্ঠা করিতে তাঁহাদিগকে প্রচুর ভূসম্পত্তি দান করিয়া এই দেশে প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত পঞ্চব্রাহ্মণের নাম সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কাহারও মতে তাঁহাদের নাম শ্রীহর্ষ, ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, ছান্দড় ও বেদগর্ভ এবং অন্যমতে ক্ষিতীশ, মেধাতিথি, বীতরাগ, সুধানিধি ও সৌভরি।* সম্ভবতঃ শেষোক্ত পাঁচজনই প্রথমে বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন এবং তাঁহারা দেশে ফিরিয়া গেলে পরে তাঁহাদের বংশধর ঐহর্ষাদি পঞ্চব্রাহ্মণকে সপরিবারে আনিয়া এই দেশে স্থাপন করেন।

* কোলাঞ্চদেশতঃ পঞ্চ বিপ্রা জ্ঞান-তপোযুতাঃ।
যজ্ঞায়াদিশূরেণ সমানীতাঃ সপত্নীকাঃ॥
ক্ষিতীশ-মেধাতিথি চ বীতরাগঃ সুধানিধিঃ।
সৌভরিঃ স চ বর্ণ্যান্তা আসন্ গৌড়মণ্ডলে।—ধরণিমিশ্র
ক্ষে-ঝণাভ-শাকে তু গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ।
ভট্টনারায়ণো দক্ষশ্ছান্দড়ো বেদগর্ভকঃ॥
অথ শ্রীহর্ষনামা চ সাত্ত্বিকৈঃ পরিবারিতাঃ।
আজগ্মুঃ পঞ্চ বিপ্রাস্তে কান্যকুব্জাদিহাগতাঃ॥
সস্ত্রীকাঃ সহ পুত্রৈশ্চ সহ ভৃত্যৈশ্চ তে তথা॥—কুলমিশ্র

যাহা হউক পঞ্চব্রাহ্মণই বাঙ্গালার উপযুক্ত রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের পূর্বপুরুষ। সেন-রাজাদের সময়ে সমাজে যে পাঁচটি গাঞি বিদ্যমান ছিল, তাহার মধ্যে রাঢ় (প্রধানতঃ বর্দ্ধমান বিভাগ) ও বরেন্দ্রভূমে (রাজসাহী বিভাগে) এই পঞ্চ ব্রাহ্মণ বসবাস আরম্ভ করিয়াছিলেন ও পরে তাঁহাদের বংশধরগণ স্ব স্ব স্থানের নামানুসারে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র নামে পরিচিত হন। অনেকে মনে করেন, এই পঞ্চব্রাহ্মণের সঙ্গে যে পাঁচজন অনুচর আসিয়াছিলেন, তাঁহারাই বঙ্গদেশে কায়স্থগণের পূর্বপুরুষ।

মহারাজ আদিশূর এই ভাবে সমাজে ব্রাহ্মণ্য শাসন-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিলেও দেশ হইতে তখনও বৌদ্ধ প্রভাব সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয় নাই এবং ইহার কিছু কাল পরেই পালরাজগণ পুনরায় বাঙ্গালার সিংহাসন অধিকার করিয়া বৌদ্ধমতাবলম্বী হন। কিন্তু পালরাজগণ বৌদ্ধ হইলেও হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন না, উপরন্তু হিন্দু শাস্ত্র ও বিদ্বান্ পণ্ডিতমণ্ডলীকে যথোচিত শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতেন বলিয়া জানা যায়।

পালরাজত্বের অব্যবহিত পরেই সেনবংশীয় মহারাজ বিজয়সেন গৌড়াধিপতি হইয়া হিন্দুর ধর্ম ও সমাজনীতির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টিত হইলেন। একাদশ শতাব্দীতে সেনরাজের সময় হইতেই প্রকৃতপ্রস্তাবে হিন্দুর সমাজসংরক্ষণ-ব্যবস্থা সুনিয়ন্ত্রিত হয়। বল্লালসেন সমাজে পূর্ণতা ও সদাচার আচরণ করিতে যে সকল আচার, প্রথা ও রীতি-নীতির প্রচলন করিয়াছিলেন, তাহা হইতেই অনুমান করা যায় যে, সমাজোন্নয়ন উদ্যমে তাঁহার চেষ্টা কি অপরিসীম।

আদিশূর আনীত বিভিন্ন কৌলীন্য পঞ্চব্রাহ্মণের বংশাবলী ক্রমশই বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছিল, কিন্তু পারিপার্শ্বিক বৌদ্ধ প্রতিক্রিয়ার সম্ভবতঃ তাঁহারা অধিককাল আপনাপন বিশুদ্ধি রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন নাই। তাই বিজয়সেনের পুত্র বল্লালসেন ব্রাহ্মণসমাজের বিশুদ্ধি রক্ষা করিবার জন্য পুনরায় তাঁহাদের গুণানুসারে উচ্চনীচ-ভেদ ও মৌলিক প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন অনুভব করিলেন।*

এই হইতেই কৌলীন্য প্রথার উদ্ভব। অকলঙ্কিত ও আচারভ্রষ্ট সমাজের মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, শান্তি, তপ, দান প্রভৃতি নয়টি কুললক্ষণসম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও গৌরব দিয়া কুলীন নামে আখ্যা দিলেন।† পরে বিশুদ্ধ ও মর্যাদাহীন সমাজমধ্যে কৌলীন্যের মর্যাদাবোধ জাগ্রত করিতে ও কুলজনক-পাত্রানুযায়ী

* বিজয়সেনো হি মহারাজো রাঢ়া বিজয়নন্দনঃ।
ব্রাহ্মণান্ কুলগুণৈর্যুক্তান্ কুর্বি কুলজন্ততঃ।—ধরণিমিশ্র
আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠা শান্তিস্তপো দানং নবধা কুললক্ষণম্।

(Exogonic theory) ক্ষেত্র অপেক্ষা বীজের শ্রেষ্ঠত্বসূচক বিবাহনীতি প্রচলন পূর্বক আচার-সম্পন্ন কুলীন পাত্রে কুলীনেতর বংশের কন্যা সম্প্রদান করিয়া আপনাদের বংশকে উন্নত করিতে নির্দেশ দিলেন। শুধু পুরুষানুক্রমে লক্ষ্মীশ্রী হইয়া আভিজাত্যের প্রতিষ্ঠা করে, এই মতে নির্ভর করিয়া অধঃপতিত হিন্দু সমাজে আদর্শের শাস্ত্রানুসারে কৃত্রিম উপায়ে সংস্কারকার্য্য আরম্ভ করিলেন।

সমাজতত্ত্বের দিক দিয়া বঙ্গীয় হিন্দু সমাজে এই কৌলীন্য প্রথা-প্রবর্তন নবদ্বীপের সর্ব্বপ্রধান গৌরবের কীর্ত্তি ও সেই সঙ্গে সর্ব্বাধিক দুঃখেরও কথা। সমাজের মঙ্গলের জন্য, উন্নতির জন্য যে প্রথার প্রবর্ত্তন, বাস্তবক্ষেত্রে অদৃষ্টফলে অল্পকাল মধ্যেই তাহাতে সামাজিক জীবনের শোচনীয় পরিণতির সূচনা হইল। সমস্ত বাঙ্গালা যাহারা কুলীনেতর বাকি দুইয়ের কুলীন পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিয়া ঘর কুলের সামাজিক পরমর্য্যাদা বাড়াইবার জন্য লালায়িত হইয়া উঠিলেন। ফলে কুলীন পাত্রের বিবাহ করাই হইল একরকম পেশা; এই ভাবে উচ্চ বঙ্গীয় রীতির প্রবর্ত্তনে হিন্দু উচ্চ বর্ণের মধ্যে যে কী ভয়াবহ সর্ব্বনাশকর পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন।

এই কৌলীন্য-মর্য্যাদা অবশ্য প্রথমে বংশগত বলিয়া ধরা হয় নাই। গুণসম্পন্ন ব্যক্তিরাই উহা প্রাপ্ত হইতেন ও পরে তাঁহাদের বংশধরগণের আচরণের নিম্ন স্তরের পরিচয় দিয়া ঐ মর্য্যাদা অর্জ্জন করিতে হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। বল্লালের পর লক্ষ্মণসেন এই মর্য্যাদা বংশানুক্রমিক করিয়া দেন। বল্লাল কর্ত্তৃক মর্য্যাদাপ্রাপ্ত ১৭ জন ও নূতন ৪ জনকে, একত্রে ২১ জনকে দান কৌলীন্য প্রদান করিয়া লক্ষ্মণসেন শ্রেষ্ঠীত্ব করেন।

ইহার পর নবদ্বীপে হিন্দুপ্রাধান্যের অবসান হইয়া ক্রমশঃ যখন মুসলমান শাসনাধিকার পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিতেছিল, সেই সময়ে দেশের মধ্যে বাহুবিষয়ে অপেক্ষাও সমাজবিষয়ে আরও অরাজক হইয়া উঠে বলিয়া মনে হয়।

কৌলীন্যের প্রচণ্ড বিস্ফোরণে বেপরোয় ঘোরতর অনাচারের গোপন স্রোতপ্রবাহ, সমাজপতি স্বার্থান্ধ নরপতির অত্যাচারে দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার এবং তৎসহ নবপ্রতিষ্ঠিত ইসলাম সভ্যতার সংঘর্ষ, দুর্নিবার আকর্ষণ ও প্রত্যাঘাত, চৈতন্যদেব প্রভৃতি দুর্ঘটনার দূরপথে আবর্ত্তিত হইয়া বাঙ্গালার হিন্দুসমাজ পুনরায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। ইসলামে ধর্ম্ম তখন রাজধর্ম্ম। তাৎকালের হিন্দু অভিজাত সমাজ-কর্ত্তারা নবধর্ম্মের প্রবল বন্যা হইতে আত্মরক্ষা করিতে গিয়া বিধিনিষেধের বন্ধনে নিজ সমাজকে বাঁধিয়া ফেলিলেন এবং এই কঠোরতায় হিন্দুসমাজ ক্ষিপ্রগতিতেই সমাজচ্যুতি ও জাতিচ্যুতি ঘটাইয়া আপনাপন বিভক্তি রক্ষায় সজাগ হইয়াছিলেন।

রাজধর্ম্মের সংস্পর্শ ও সংঘর্ষ তখন যে সমাজমধ্যে ঘোরতর রূপেই চলিতেছিল, সমসাময়িক সাহিত্যে তাহার বহু উল্লেখ আছে।* সমসাময়িক সাহিত্যে যেখানেই ইহার যে-পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা হইতে আমরা কিছু উদ্ধৃত করিলাম। উদ্ধৃতাংশকে সকল সময়ে ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই যেন না স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইলে সত্য-প্রকাশের শক্তির অভাব প্রকালে যেরূপ পরিলক্ষিত হয়, সেকালেই সেইরূপ ছিল। হিন্দু সমাজের নির্দ্দয় কঠোরতাতেই বহু উৎপীড়িত ব্যক্তি সমাজের বাহিরে চলিয়া যাইতে বাধ্য হয়। বর্ত্তমান পীরালি সমাজের উৎপত্তির কথা ঐ দুর্ভাগ্যের সাক্ষ্য।

নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী পিলা গ্রামবাসী (বর্ত্তমান পাবনা) ব্রাহ্মণগণের উপর একবার না কি প্রবল অত্যাচার হইয়াছিল বলিয়া জনশ্রুতি তাঁহার ঠেতন্য সমসাময়িক উল্লেখ করিয়াছেন। বলপূর্ব্বক অভক্ষ্যভক্ষণ করাইয়া বিতে পারিলেই ব্রাহ্মণগণ জাতিচ্যুত হইয়া পড়িবেন, ইহা অত্যাচারকোবিদের লক্ষ্য অজানা ছিল না, তাই নইলে পিলাগ্রামবাসী ব্রাহ্মণগণ পীরালি নামে সমাজবহির্ভূত হইয়া পড়িলেন। অন্যে পীরালি জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে যে প্রকার প্রমাণ তুলিতে পারেন যায়, তাহার সবগুলি এখানে তুলিবার প্রয়োজন নাই। তবে তাহাদের অধিকাংশেরই মতে বলপূর্ব্বক অভক্ষ্যভক্ষণে দীক্ষিত ব্রাহ্মণগণ সমাজে স্থান না পাইয়া এই খাঁকের উৎপত্তি ঘটাইয়াছেন। এই পীরালিগণের কেহ কেহ অবশ্য স্বসমাজে প্রবেশ করিলেও অধিকাংশই সমাজ ছাড়িয়া আচার ও ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন নাই। তথাপি ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ৭ আইনের ৭ ধারা হইতে জানা যায় যে, পীরালি ব্রাহ্মণদের পুরীতে জগন্নাথদেব দর্শন ও মন্দিরে প্রবেশ করিবার কোন অধিকার ছিল না, পরে ১৮১০ খৃষ্টাব্দে নিষিদ্ধ জাতির তালিকা হইতে তাঁহাদের নাম উঠিয়া যায়।

বহুকাল ধরিয়া বাঙ্গালার হিন্দু সমাজে এইরূপ বিশ্বস্ত কঠোরতা ও ও স্বধর্ম্ম-বিপ্লবের লীলা চলিতে থাকে। আজও কিছু কাল এই ভাবে অগ্রসর হইতে থাকিলে, বাঙ্গালায় হিন্দু সমাজ বলিয়া হয়ত উল্লেখযোগ্য কিছু থাকিত না। যত দিন যাইতে লাগিল, ততই মুসলমানধর্ম্মের সহিত মেলামেশায় ও শিষ্যালীকায় হিন্দুর সমাজবন্ধন শিথিল হইয়া পড়িতে লাগিল। জীবনযাত্রায় আচার, ব্যবহারে বিচার ক্রমশঃই পরিবর্ত্তিত হইয়া সমাজে আবার নূতন স্রোত প্রবেশ করিল। চৈতন্যজীবনীকার কৃষ্ণদাস কবি তৎকালীন হিন্দুসমাজের চিত্র আঁকিতে গিয়া লিখিয়াছেন—

কৃষ্ণ নাম ভক্তিশূন্য সকল সংসার
প্রথম কলিতে হইল ভবিষ্য আচার

---

* বহুচেষ্টা রাজচন্দ্র রাজার না যেন ধর।
কুদ্ধ হইল যেন উদ্যত আইল তার ঘর।
আসি তার ভূমি মণ্ডল খানা খৈল।
অবধ্য বধ করি ঘরে ঘরে খাইল।—চৈঃ চ অন্ত্যলীলা

ব্রাহ্মণ পাইলে লাথে পরম কৌতুকে
তার নৈষ্ঠা ছিঁড়ে ফেলে খুড়ু দেয় মুখে। —বিষ্ণব গুপ্ত
উন্নির হইল ব্রাহ্মণা বেপারীরে দেয় ঘাঁড়া
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হইল অরি। —ভবিষ্যপুরাণ
পিলা গ্রামেতে যৈসে অনেক যবন
উজ্জ্বল করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ
ব্রাহ্মণ দেখিলে বাপ খুন খুন করে
বিদায় পিলা গ্রাম নবদ্বীপের ভিতরে। —জয়ানন্দ

ধর্ম্ম কর্ম্ম লোক সব এই মাত্র জানে
জগন্নাথ চণ্ডীর পূজা করে জাগরণে
বড় করি বিষহরি পূজে কোন জন
পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়া বহু ধন
ধামালি পুজয়ে কেহ নানা উপহারে
মদ্য মাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে।

বাঙ্গালার এই ঘোর দুর্দ্দিনের সময়ে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নবদ্বীপে আবির্ভূত হইয়া হিন্দু সমাজকে অবশ্যম্ভাবী সর্ব্বনাশ হইতে রক্ষা করিলেন। মহাপ্রভুর সেই লোকোত্তর জীবন-কাহিনীর কথা বর্ত্তমানে প্রবন্ধে আলোচনা করিবার কোন প্রয়োজন নাই, তবে নবদ্বীপের এই প্রেমের ঠাকুরের অলৌকিক-সামান্য প্রতিভা বাঙ্গালার আচীন জীবনে কি মোহন স্পর্শ দিয়া এমন প্রাণবন্ত করিয়া তুলিয়াছিল, বাঙ্গালীর আধ্যাত্মিক ও সামাজিক জগতে সুধাময় আনয়ন করিয়াছিল, তাহার আলোচনা করিতে গেলে সভাই বিস্মিত হইতে হয়। তাঁহার বিশ্বব্যাপী প্রেমের বন্যায় বাঙ্গালার আধ্যাত্ম জীবনের ও সমাজজীবনের সমস্ত কলুষ-কালিমা যেন মুহূর্ত্তে বিধৌত হইয়া গেল।

তাৎকালিক অধঃপতিত বিপথগত হিন্দু সমাজে নবদ্বীপের এই নবধর্ম্মমতের অনুসরণে যে কতখানি সামাজিক সংস্কার সাধিত হইয়াছিল, তাহা আর বিশদ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। ঐতিহাসের পৃষ্ঠাবিশেষ পণ্ডিত সিদ্ধি করিয়া নবদ্বীপের প্রেমবন্যাপ্লাবনা তাৎকালিক হিন্দু সমাজকে আসন্ন মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিয়াছিল বলিলেই যথেষ্ট। সম্প্রদায়ের অহেতুক কঠোরতার নাগপাশে ছিন্ন করিয়া বৈষ্ণবাচারের উদারনীতি ব্রাহ্মণ-শূদ্র সকলকেই সমভাবে আলোন করিয়া সমাজে সম্মানজনক স্থান দিলেন। 'সর্ব্বভূতে নারায়ণ' ও 'তত্ত্বমেবাসি ষিতঃশ্বেতঃ কৃষ্ণিকিশোরায়ণঃ' এই সব সার্থক প্রেমের বাণী প্রচার করিয়া সংস্কৃতিনষ্ট হিন্দু সমাজে পুনরায় নবজাগরণের অভূতপূর্ব্ব উদ্দীপনার সঞ্চার করিলেন।

হিন্দুধর্ম্ম পুনরভ্যুদয়ের পূর্ব্বে সমগ্র বাঙ্গালা দেশ বিকৃত বৌদ্ধ তান্ত্রিকতায় প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল, পূর্ব্বেই তাহার উল্লেখ করিয়াছি। বাঙ্গালার বাহিরের সাধু ভারতের ব্রাহ্মণসমাজ সংস্কারকই পক্ষ পৌড়কে এই ভয়ের চক্ষে দেখিতেন যে, তীর্থযাত্রা উপলক্ষে এই দেশে আসিলে তাঁহাদের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে বলিয়া উদ্বেগ আছে। *

ইহার পর সমাজ-সংস্কারের কঠোর শুঙ্খলায় দেশবাসী অসংখ্য আচার-ভ্রষ্ট জনসাধারণ সমাজে কোন স্থান ত পাইই নাই, উপরন্তু তাহাদের উপর প্রচুর অত্যাচার ও লাঞ্ছনা বর্ষিত হইতে লাগিল। আচারভ্রষ্ট ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট পতিত বৌদ্ধ হিন্দু ও হিন্দুয়ানীর তখন নিরালম্ব নিরাশ্রয় অবস্থা। সমাজে তাহারা কোন স্থান না পাওয়ায় ইসলাম ধর্ম্মের অনুসরণে তাহারা দলে দলে মাতৃধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মের নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

হিন্দুয়ের উপর কোন প্রকার অত্যাচার হইলে, তখন এই দুর্দ্দশন উৎপীড়িত জনসাধারণ যুগ হইতে কেমন সাবধে তাহা উপভোগ করিত, প্রাচীন সাহিত্যের স্থানে স্থানে তাহার নিদর্শন রহিয়া গিয়াছে। সেই সঙ্গে একটু সহানুভূতিসম্পন্ন মনের আলিঙ্গন প্রদারিত করিয়া দিলে যে সমস্যা সহজেই মীমাংসা হইয়া যাইত, তাহাই আজ বাঙ্গলার ধর্ম্ম ও সমাজ-জীবন ঘনাকে এমন উপল-খণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে। মহাপ্রভুপ্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্মে এই সমস্যার অনেকখানি সমাধান হয়। নিত্যানন্দের পুত্র বীরচন্দ্র প্রভু প্রমুখ জন কয়েক বৈষ্ণবাচার্য্য স্মৃতিসংহিতা বৌদ্ধ "নাড়া" ও "নাড়ী"কে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া হিন্দু সমাজকে রক্ষা করেন। কিন্তু সেই সঙ্গে অতিবিশুদ্ধ বৈষ্ণব সমাজেরও সেই হইতেই অধঃপতনের সূচনা। নবদীক্ষিতবর্গ হিন্দু গণ্ডীর মধ্যে আসিল বটে, কিন্তু তাহাদের পূর্ব্বেকার রুচি-নীতির পরিবর্ত্তন ঘটিল না। ইহারাই বৈষ্ণব সমাজের সংযোগী বৈষ্ণব বা 'বেড়াবেড়ী'। এই বেড়াবেড়ীর স্পর্শে বৈষ্ণব সমাজের বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে বলিয়া অভিযোগ শুনা যায়, কিন্তু বঙ্গীয় হিন্দুর সামাজিক সমতাপ্রবণতায় ইহা যে সাহায্য করিয়াছিল, ইহা বিস্মৃত হইলে চলিবে না।

ষোড়শ শতকে অনেকগুলি বিবাহই নবদ্বীপের নাম শুনা যায়। এই সময়েই নবদ্বীপের স্মার্ত্ত রঘুনন্দন স্মৃতিশাস্ত্র মন্থন করিয়া যে ধর্ম্ম ও সামাজিক অনুশাসন বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, অদ্যাবধি বাঙ্গালার সমগ্র হিন্দু সমাজ সেই অনুসারেই শাসিত হইয়া আসিতেছে। ইহার ফল ভাল হইয়াছে কি মন্দ হইয়াছে, তাহা সুধীজনবিদিত, কিন্তু ইহা স্বীকার্য্য যে, নবদ্বীপের স্মৃতি-কারগণই স্বরূপের সর্ব্বপ্রকার লৌকিক ক্রিয়াকর্ম্ম ও সমাজশাসনের প্রবর্ত্তক। এই হিন্দু ক্রিয়া বর্ত্তমান বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের উপরে নবদ্বীপের কর্তৃত্বের প্রভাব প্রণিধানযোগ্য। চারিবর্ণ গঠিত হিন্দুজাতির মধ্যে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণ, তাহাদের বৃত্তি ও বৈশিষ্ট্য তৎকালে একেবারেই পরিত্যাগ করিয়া সুযোগিত ব্যবহার করিয়া বলিয়াই বোধ হয় রঘুনন্দন ব্রাহ্মণেতর সমুদয় হিন্দুকে শূদ্রজাতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া ফেলিলেন এবং দেশ, কাল ও অবস্থা বিবেচনা পূর্ব্বক সামাজিক অনুশাসন প্রচুর পরিমাণে শিথিল করিয়া সমাজ-রক্ষার ব্যবস্থা করিলেন।

বল্লালসেন, শ্রীচৈতন্যদেব ও রঘুনন্দন এই তিন জনই প্রকৃত পক্ষে হিন্দুর সমাজ সংরক্ষক ও সংস্কারের প্রধান অগ্রণী। এই হিসাবে নবদ্বীপই যে বর্ত্তমান বাঙ্গালার সমাজপতি তাহাতে সন্দেহ নাই। সংস্কার-বিরোধীরা "রোগো, ভোগে, বলা, এ তিন কলির চেলা" প্রভৃতি প্রবাদবাক্য রচনাপূর্ব্বক বোধ হয় ইহাদের সম্মান বৃদ্ধিই করিয়াছেন।

ইহাদের সমসাময়িক কালে আর একজন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি ভূলিয়ায় জন্মিয়া বিপথগত রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সমাজে বেদ বন্ধন করিয়া দিয়া সামাজিক অধোগতির প্রতিরোধ করেন—ইঁহার নাম দেবীবর ঠাকুর। দেবীবরকে শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক বলিয়া নূলাপঞ্চানন উল্লেখ করিয়াছেন।

---

* অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্রে মগধে তথা।
তীর্থযাত্রাং বিনা গত্বা পুনঃ সংস্কারমর্হতি।

উল্লেখ করিয়াছেন। • বাঙালী কৌলীন্য প্রথার সঙ্গে কায়স্থদের মধ্যেও ব্রাহ্মণসমাজের ভিতরে নানা প্রকার ঘোর প্রভেদ করিয়াছিল। বৈদ্যদের মধ্যেও সমাজে এক এক প্রকার ঘোরতর পরিবার শ্রেণীবদ্ধ করিয়া এক প্রকার ঘোর বন্ধন করিয়াছেন। (তাহাদিগের মাতৃকুলের পূর্ণপুরুষ যথা ধন্বন্তরিগোত্র গাংশ্রে সমাজে এইপ্রকার শ্রেণী ভাগ করিয়া পট্ট বন্ধন করিয়াছিলেন।

এতাবৎকাল পর্য্যন্ত কৌলীন্য প্রথা পুরুষানুক্রমিক হইলেও সাধারণ ব্যক্তি যৌবনকালে আপনাপন গুণের পরিচয় প্রদান করিয়া কৌলীন্য অর্জ্জন করিতে পারিতেন এবং পূর্ব্বার্জ্জিত কৌলীন্য কন্যা, পিতা, ব্যবহারে, বিবাহে প্রভৃতি দোষে নষ্ট হইয়া যাইত। কিন্তু বৈদ্যদের সময় হইতেই কৌলীন্য পুরুষানুক্রমিক হইল ও কন্যার বিবাহে কুলকার্য্য না করা ছাড়া আর কোন দোষেই কুল নষ্ট হইবার সম্ভাবনা রহিল না। † যে সকল দোষ ঘটিলে ইতিপূর্ব্বে জাতি পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া যাইত, সেনরাজত্বে তাপেক্ষাও গুরুতর দোষে উত্তম কুলীনের সংস্পর্শে আসিয়া কাটিয়া গিয়াছে।

যাহা হউক, সুদীর্ঘকাল ধরিয়া বিভিন্ন-প্রকার রুচি, রীতি ও সভ্যতার প্রভাবে পড়িয়া বাঙালীর সমাজবন্ধন ক্রমশই শিথিল হইয়া আসিতেছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। অষ্টাদশ শতাব্দের প্রারম্ভে নবদ্বীপের মহারাজ অধিনায়ক মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাহা পুনঃসংস্কার করিতে প্রযত্ন হইলেন। তিনি ছিলেন সুবিস্তীর্ণ বঙ্গিণমণ্ডলের একচ্ছত্র সমাধিপতি।

তাঁহার পরামর্শে প্রাঙ্গণে যেদিন বাঙ্গালার রাষ্ট্রকর্ত্তৃত্বের পরিসমাপ্তি ঘটিল। সমাজ-কর্ত্তৃত্বেরও সেইখানেই শেষ। অতঃপর সমাজের কর্ত্তৃত্বের অবসান ঘটিল ব্যক্তি-কর্ত্তৃত্ব বা ব্যক্তি-স্বাধীনতার সূচনা হইল। এতদিন পর্য্যন্ত সামাজিক গণ-মর্য্যাদা অর্থসৌষ্ঠবের উপর বিশেষ নির্ভর করিত না। বিদ্যা ও গুণসম্পন্ন ব্যক্তি আপনাপন কুলিয়ে ও মহলে যে সামাজিক গণমর্য্যাদা উপার্জ্জন করিতেন, পুরুষানুক্রমে তাহাই রোষণঘণ্ট করিয়া বাঙ্গালার অভিজাতের সৃষ্টি করিতেন। অর্থবলে তাহা কিনিতে পাওয়া যাইত না, কিন্তু ইহাতে ধনের সুচনায় অর্থের মর্য্যাদা বৃদ্ধি পাইল। ধনীব্যক্তিরাই সমাজপতি, অর্থ থাকিলেই অভিজাত্য লাভ করা যায়।

পূর্ব্বে হিন্দুরাজ ও রাজপুরুষগণ গুণসম্পন্ন সদ্ব্রাহ্মণ বাছিয়া বাছিয়া ভূ-সম্পত্তি প্রদানপূর্ব্বক দেশে একপ্রকার আভিজাত্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইংরাজ-রাজের হুসমান ফ্লাইড,হেষ্টিংস প্রভৃতি রাজপুরুষগণের মুন্সী, বুংমুন্সী, মুন্সীরা রাজানুগ্রহ লাভ করিয়া আর একপ্রকারের আভিজাত্যের সৃষ্টি করিলেন। পূর্ব্বকৌলীন্য ও এই কায়স্থ-কৌলীন্যের মূলে পার্থক্য আছে।

যাহা হউক, উনবিংশ শতাব্দের প্রারম্ভে সুদূর ইংরাজীসভ্যতাসিন্ধুর অমৃত আঘাতে-আঘাতে ও সভ্যতার প্রচণ্ড আলোড়নে পড়িয়া বাঙ্গালার সমাজের জীর্ণ নৌকা আবার বানচাল হইয়া গেল। যাহার অর্থ, তাহার সমাজ, সুতরাং এই কায়স্থ-কৌলীন্যে সমগ্র বঙ্গসমাজ আবার বিষাবিভক্ত হইয়া পড়িল। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ও সম্পদশালী শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা প্রগতি-পন্থী হইয়া বহুদূর অগ্রসর হইয়া পড়িলেন। অশিক্ষিত দরিদ্র জনসাধারণ তীব্র-সন্তপ্ত ভাবে আরও দূরে সরিয়া গিয়া পূর্ব্বসংস্কারের সহিত অন্ধ ভীতি-প্রবণতা ও ধর্ম্মযুদ্ধে প্রযুক্ত হইলেন। সুদীর্ঘ উনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক ইতিহাস এই দুই বাগ্‌যুদ্ধের কল-কোলাহলে মুখরিত। ক্রমে কোলাহল মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে। পাশ্চাত্যের বল ক্রমশঃ পরাজিত হইয়া অস্ত্র-ত্যাগ হইতে উদ্যত। ইহা মঙ্গলের কি অমঙ্গলের, অনাগত কালই তাহার বিচার করিবে। সমাজ ও ধর্ম্মের বিধিনিষেধ আজকাল আইন-সভার গভর্ণমেণ্টের দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়।

সনাতন ধর্ম্ম ও সমাজের প্রতি সহানুভূতি যাহার কম, জ্ঞান তাঁহার কম না থাকিলেও চলে। অর্থবল যাঁহার বেশী ও ধাপাড়ম্বরের যাঁহার সীমা নাই, এই পাশ্চাত্যের কোটাল রাজ্যে তাঁহারাই একমাত্র সমাজসংস্কারক।

'বঙ্গীয়'র এখানে স্থান নাই।

• স্ত্রী ছেলে নিয়ে বেটা বইয়তি ভড়।
মাতা পত্নী দুই ত্যাগী সন্ন্যাসেতে দড়।
এইকালে সঙ্কেতের মনে এক ছেলে।
নামে খাত দেবীবর লোকে ধারে বলে।
সেই ছোঁড়া মনে মনে কুল করে ভার।
সেই হতে কুলে আর ঘুচিলেক ধার।—নূতন পঞ্জানন
আর গুণ যার গুণ তার সঙ্গে যায়।
কুল গুণ মহাগুণ পুরুষক্রমে পায়।
যখন লক্ষণ হয় পিণ্ড ঠেকে যাবে।
ধর্ম্মের কিয়ার বাই কুল রক্ষা তবে।
হস্ত পিণ্ড ফলাকের বিপর্য্যয় পাই।
ঘটকেতে ফলে তার দোষ বাহি পাই।—কুলসার

বর্ত্তমান সংস্কৃত

…এখনে সংস্কৃত ভাষায় নামে যারা চলিতেছে, তাহা ভট্ট, আচার্য্য শ্রেণীর মানুষের দ্বারা প্রণয়নং প্রণীত। উহাদের ভাষাজ্ঞানের দ্বারা কেবল মাত্র উহাদের প্রণীত ও তৎপরবর্ত্তী গ্রন্থসমূহ পড়া সম্ভব হয়। উহার দ্বারা কখনও ঋষি-প্রণীত কোন গ্রন্থ যথাযথভাবে বুঝা সম্ভব হইতে পারে না এবং হয় না।…

স্থিতি ও গতি

—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ

২

"বলেন কি অখিল বাবু! আপনি নরেনের ছেলের বিয়েতে টাকা?"

হাসিয়া অখিল বাবু প্রতিবেশী ও বন্ধুস্থানীয় শরৎবাবুর এই প্রশ্নের উত্তরে কহিলেন, "বটে! তার চাইতে এই প্রশ্নটাই কর না ভায়া, নরেন কেন মেয়ের বিয়েতে টাকা দেবে না? ঢের ত তার আছে।"

"আপনারও ত ঈশ্বরেচ্ছায় কম নেই?"

"যাই থাক, আছে ব'লে কি আর চাইব না? তবে এই হাড়ভাঙা খাটুনী খেটে রোজগার কেন ক'রছি?"

"ক'রবার এমন দরকার কিছু দেখি না। বেশ দু'পয়সা ক'রেছেন, বাড়ীও কখানা হয়েছে, ছেলে মানুষ হ'য়ে উঠল, বয়েসও হ'য়েছে, এখন ত বেশ আরামেই ব'সে খেতে পারেন।"

"হয় ত পারি। কিন্তু ব'সে কেন খাব? খাটতে পারি, কেন খাটব না? পয়সা কি ফেলা যায় কারও? ভাল জিনিষ, যত হয় ততই ভাল।"

"পয়সার চাইতেও ভাল জিনিষ ঢের আছে। সে যাই হ'ক, খেটে আরও পয়সা আনতে চান, আসুন। কে আপনাকে বাধা দিতে পারে? তবে আপনার মত একজন ধনী লোকের পক্ষে ছেলের বিয়েতে টাকা নেওয়াটা—"

"আবার ঐ কথা! আমি ব'লছি, বলি অন্য দিকটা কেন দেখ না! নরেনেরও ত ঢের আছে, দিতে পারে, কেন দেবে না?"

শরৎ বাবু কহিলেন, "হাঁ, নরেন বাবুও ধনী, দিতে পারেন। কিন্তু তাই বলে—"

"তাই বলে কি? টাকা কেন দেবেন, এই? কিন্তু আমি বলছি দেবেন না কেন? ছেলে মানুষ হবে, সুখে থাকবে, তার জন্যে বাপেরা ঢের খরচ করে। আমিও রবীনের জন্যে কম খরচ করিনি। তা মেয়ের বাপ কি একেবারে মুক্তিপত্র নিয়ে এসেছে বিধাতার কাছ থেকে? মেয়ের সুখের জন্য কিছু খরচ তাকে করতে হবে না?"

"খরচ—তা—মেয়েকেও ত মানুষ করে তুলতে হয়—"

'হাঁ, চোদ্দ পনের বছর দুটি খাও পরে, কটা টাকা খরচ হয় তাতে? তবে নরেন আরও তিন চারটে বছর মেয়েকে পুষেছে, ইস্কুল-কলেজও ক'টা বছর পড়িয়েছে। তাতেই বা কি এমন খরচ তার হয়েছে? তার তুলনায় রবীনের পেছনে অনেক বেশী খরচ আমি করেছি। আবার বাই হয়েছে বিলাত যাবে। তাতে—সে যা বাবু ছেলে—পনেরটি হাজার টাকার কমে ত হবে না।'

শরৎ বাবু কহিলেন, "তা— সে খরচ যাই করুন, আপনার ছেলে মেয়েই রোজগার করবে, সে ত আপনারই হবে।"

"হাঁ, আজকালকার ছেলে, রোজগার করে বাপকে বড় দেয় কি না। বউ নিয়ে থাকবে, ফূর্ত্তি করবে, বাস্! আমাকে তার রোজগারের একটা ভাগও হাতে তুলে কখনও দেবে? বরং দিন গণবে, কবে মরব, ক্লেশ-কষ্ট করে যা জমিয়েছি সব হাতে গিয়ে পড়বে, একেবারে পোয়া-বার তার হবে।"

একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া শরৎ বাবু কহিলেন, "সেটা—হাঁ—তা যা বলছেন, অনেকটা ঠিক বই কি। দিন-কাল এমনিই পড়েছে বটে! কৃষিকার দোষে"—

"হাঁ, পথে এস এখন। দিন-কাল এই পড়েছে ত? তাহ'লে কেন আমি আরও পনের কুড়ি হাজার টাকা ছেলের পেছনে খরচ করব? ঢের করেছি, আর কেন? যার মেয়ে এসে সব ভোগ করবে, সেই করুক না? মেয়েকে এমন উন্নত অবস্থায় মানুষ করে স্থিতি করবে, নিজে খরচার সেটা তার হবে এটা কেন প্রত্যাশা তোমরা কর?"

একটু কাল নীরব থাকিয়া শরৎ বাবু উত্তর করিলেন, "অবিশ্যি দিন-কাল যা পড়েছে, তাতে করে কোনও যুক্তি দিয়ে আপনার এই যুক্তিকে খণ্ডন করা—হাঁ, শক্তই বটে। তবে কি জানেন, মনটার কথাগুলো ঠিক ব'লে ধ'রে নিতে

পারছি না। বিয়েটাকে এই রকম একটা লেনদেনের ব্যাপারের মধ্যে এনে ফেলা—সেটা কেমন যেন ভালই লাগে না আমার।"

হাসিয়া অখিল বাবু কহিলেন, "সেটা তোমাদের মনের দোষ দাদা। ভুল ভাবতে ভাবতে শক্ত একটা ভুলের ধারণাই মনে জন্মে গেছে। ঐ যা বললে—দিন-কাল যা পড়েছে! হাঁ, দিন-কাল যেমন পড়েছে, সবাইকে চ'লতেও তেমনি হবে। সংসারের সব ব্যাপার ঘরে পড়েছে লেনদেনের ব্যাপার। কেবল বিয়েটাকে তা থেকে আলাদা না করে নেওয়া চলে কি?"

একটু কি ভাবিতে ভাবিতে শরৎ বাবু আবার কহিলেন, "দিন-কাল পড়ে যেমন আমরা প'ড়তে দিই। এ দিন-কাল ফেরাতেই কি আমরা পারি না? সবাই মিলে তেমন চেষ্টা করলে তাও পারি বই কি?"

"পার দেখ! তবে আমি ফেরাবার এমন দরকার কিছু দেখতে পাই না। দিন-কালে এমন মন্দই বা পড়েছে কি? পয়সার হিসেবটা এমন তুচ্ছ করবার ব্যাপারও ত নয়। লোকের বরং চোখ ফুটেছে এখন। আগের হাবাগোবা গোবরগণেশ বুদ্ধি আর এখন কারও বড় নেই। আখেরে এতে ভাল হবে বৈ,কাল হবে। ঘরে গিয়ে নিরালা বসে একটু ভেবে দেখ হে। ব্যাটা ছেলেও ত ঘরে কটি জন্মেছে। বড় সড় হয়ে উঠুক, তখন বুঝবে দাদা, বুঝবে। এখন কেবল মেয়ের পালা কি না, দরজ তাই উল্টো। ওরে ভেতো! আরে ব্যাটা, ক'লকেটা ব'দলে দিয়ে যা না রে?"

পা-দুটি ছড়াইয়া দিয়া অখিল বাবু তাকিয়ায় বিশাল দেহভার নিখিল আরামে ন্যস্ত করিয়া চাই তুলিয়া দুইটি তুড়ি দিলেন। শরৎ বাবু বুঝিলেন, এ সম্বন্ধে আর কোনও আলোচনা ধনী প্রতিবেশীর প্রীতিকর হইবে না। পাশে একখানি খবরের কাগজ ছিল, একটু নাড়াচাড়া করিয়া তিনি উঠিলেন। ন্যস্ত দৃষ্টিতে একটিবার চাহিয়া অখিল বাবু কহিলেন, "চললে তায়া? আচ্ছা, এস তবে—রাতও হয়ে গেল।"

"হাঁ, আসি আজকে। নমস্কার।"

ঈষৎ একটু শিরঃসঞ্চালনে অখিল বাবু প্রতি-নমস্কার জ্ঞাপন করিলেন।

এক পাশের একটি দরজা খুলিয়া গৃহিণী বিরাজমোহিনী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

নিমিলিতলোচনে বহা আরামে অখিল বাবু ধূমপান আরম্ভ করিয়াছেন। দরজা খুলিবার সঙ্গে হাতের চুড়ীর ঠনক শব্দে চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন।

"কি গো! একদম সদরে যে!"

বিরাজমোহিনী কহিলেন, "বলি, কতই ত জল্পনাকল্পনা চচ্ছে। টাকা নেওয়ার ওকালতীও খুব হ'ল। ওদিকে ছেলে যে বেঁকে বসেছে।"

"বেঁকে বসেছে! কি রকম? কোথায় ব'সেছে? কোন্ ঠাইটা বেঁকেছে? দু'ঘা লাঠি মেরে সোজা করে তোলা যাবে না?"

"ও গো ঠাট্টার কথা নয়। লাঠি মারবার দিন আর নেই কো। হাঁ, সেই পাঁচ ছ' বছর আগে যখন এত করে বলেছিলাম, তখন বিয়ে দিলে ভাল হ'ত না? এমন হাভাতে ঘরের ছেলে ত নয় যে, রোজগার করতে না পারলে কচি বউটির ভাতকাপড় জুটত না। আসলে মনে মনে জানান ছিল, ছেলে ভাল পাশটা করে মানুষ হয়ে উঠুক, এক কাঁড়ি টাকা তখন পাওয়া যাবে। টাকার যেন বড় অভাব হয়েছে!"

"বলি কি হয়েছে বল না খুলে? কি বলে সে?"

"বলে ও বিয়ে করবে না।"

"কেন?"

"বিলেত যাবে, সংসারী হয়ে এখুনি ব'সতে পারে না।"

"কে তাকে সংসারী হ'য়ে ব'সতে বলছে আজই! বিলেত যাবে, যাক না? বিয়ে ক'রে কেউ বিলেত যায় না?"

"সে বলে, তা হ'লে খামকা এখন বিয়ে করে লাভ কি? পাঁচ বছর সাত বছর, যত দিন দরকার হয় বিলেতে থাকবে। ফিরে এসে পছন্দমত দেখে শুনে ভালবেসে তখন বিয়ে ক'রবে।"

"বটে! বিলেত তবে দেখি পাঠায় তাকে কোন্ শালা!"

গড়গড়ার নল দূরে নিক্ষেপ করিয়া অখিল বাবু সোজা হইয়া উঠিয়া বসিলেন।

হাসিয়া বিরাজমোহিনী কহিলেন. "পাঠাবে তুমি, তার পিসের শালা—"

"কক্ষণ না! একটি পয়সা আর ব্যাটার তরে খরচ করি ত বাপের হাড়ের দিব্যি লাগে।"

"ছি ছি ছি! অতবড় দিব্যিটা করতে আছে? রাগলে আর কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকে না। ছেলের দোষ দেব কি? ঐ রক্তেই ত জন্মেছে। কাজেই যা জিদ ধরে, না করিয়ে ছাড়ে না।"

"ছাড়তে এবার হবে। বিলেত যদি যেতে চায় ত বিয়ে করবে, শ্বশুরের টাকায় যাবে। নইলে ও'ওরবাটা যা খুসী করুকগে, আমার ব'য়ে গেছে। একটি পয়সা আর ওর তরে খরচ করি ত—"

'হ'য়েছে, থাম! আবার একটা বিশ্রী দিব্যি ক'রে ফেল না। মুখে ত আটকায় না কিছু। শেষে কর সবই, কেবল দিব্যির পাপটাই মাথায় থেকে যায়।"

"এবার তা করব না—করব না—করব না, এই তিন সত্যি!"

"সে তোমার খুসী, তিন-দশে তিরিশ সত্যি কর না? সত্যি ত আর সাপ না কিছু। যারা রাখে, তারাই সত্যি করতে ভয় পায়।"

"সে আর যাতে যাই করি, এ সত্যি আমি রাখব, রাখব, রাখব! বিলেত যেতে চায়, যে ক'রে পারে যাকগে। আমি ঘর থেকে পনের কুড়ি হাজার টাকা বের ক'রে দেব না, দেব না, দেব না!"

"কেন দেবে না? নিজের ছেলে—মানুষ হ'য়ে আসবে—"

"হাঁ, মানুষ হ'য়ে এসে বড় রাজা করে দেবে কি না আমাকে? মানুষ যদি হয়, নিজেই রোজগার করতে পারে, তুষ্টিতে থাকবে, আমার কি? টাকা সব এনে আমার হাতে গুণে দেবে?"

"পোড়া কপাল! কি যে বল, ছেলেকে বাপমায়ে মানুষ করে, সে কি রোজগার করে টাকা এনে দেবে বলে? করে প্রাণের টানে, না করে পারে না তাই। করতে হয়, বাপ-মার ধর্ম্মই হল এই।"

"ধর্ম্ম বুঝি কেবল বাপমার আছে? নেই?"

"থাকবে না কেন? ছেলেরও ধর্ম্ম আছে, বাপ-মার ওপর মমতার টান আছে। বাপ-মারটা যে ছেলে করে, সেই ধন্যে করে, টানে করে। বাপ-মার পরচের হিসেব ধ'রে করে না।"

একটু মুখ ঘোরাইয়া অখিলবাবু কহিলেন, "নেও, নেও, ও সব ধর্ম্মের বক্তিতে এখন রেখে দেও। ছেলে—তা আমার যা করবার তা করেছি। এখানকার লেখাপড়া যদ্দুর তা শিখিয়েছি। তার কাছে প্রত্যাশা কিছু রাখি নি।"

"তবে এখন বিলেত পাঠাতেই বা প্রত্যাশা কেন রাখছ? এত খরচ করেছ, আর পনের হাজার টাকা খরচ না হয় করলেই। তাতেই ত তোমার ধক্কের ভাণ্ডার খালি হয়ে যাবে না?"

"সে যাক কি নাই যাক, এই পনের হাজারই বা ঘর থেকে খরচ আমি কেন করব, যদি আর কারও কাছে পাই? সে শালা মেয়ে এনে ঘাড়ে ফেলে দেবে, আর সে ছুড়ে এসে ব'সে এত বড় সম্পত্তি ভোগ করবে, এটা তার একটু বিবেচনা নেই? কেন সে এর জন্যে খরচ করবে না?"

বিরাজমোহিনী কহিলেন, "সে কথা ত হচ্ছে না কিছু। ও যদি বিয়ে করত, না ধন নিতে। সেও ত সত্যি বড় লোক, দিতেও চাইছে, যদিও আমার ইচ্ছে ছিল অন্য রকম—"

"সে অন্য রকম ইচ্ছেটা কি শুনি?"

"এই গরীব গেরস্ত-ঘরের একটি লক্ষ্মী মেয়ে—"

"বটে! লক্ষ্মী বুঝি সব মূর্ত্তি ধরে গরীবের ঘরেই আস্তানা গেড়েছেন। বড়লোকের ঘরে আর তাঁর দেখাই মেলে না?"

"সে চুলোয় যাকগে। আমি ত আর পণ করে বসিনি যে গরীবের ঘরের একটি মেয়ে আনতেই হবে, আর টাকা-কড়ি কিছু নিতে পারবে না? সে কথাই হচ্ছে না। ছেলেই যে আমাকে বিয়ে করতে চাইছে না। বলছে বিলেত যাবে—"

"তা হলে বিয়েটিও তাকে আগে করে নিতে হবে। নইলে বিলেত যাবার খরচ আমার কাছে পাবে না, না—না। বুঝলে?"

"বুঝলাম। তা আমি বুঝলে কি হবে? ছেলেকে বোঝাও।"

"বোঝাব আবার কি? সোজা কথাটা বোঝাতে আবার হবে কি? তাকে ব'লেছিলে বিয়ে না করলে বিলেত যাবার খরচ ঘর থেকে আমি দেব না?"

"না, এমন শক্ত পণ তুমি করেছ, তা ত আর জানিনে।"

"এখন ত জানলে! বাস্, গিয়ে তাকে বল। বিয়ে করবে না? ব্যাটা! হারামজাদা! বিয়ে করবে না—বিলেত যাবে! আহা, বিলেত যাবে বলেই না নরেনের মেয়ের সঙ্গে এই সম্বন্ধ আমি করলাম।"

"বড় কাজই করেছ! প্রথম ছেলেটির বিয়ে দেবে, বউ ঘরে আনবে, তার এমন একটা উপলক্ষ্য ত আর পেলে না? আর তাও বলি, কেন, অত বড় ছেলে—বিয়ের সম্বন্ধটা গিয়ে করলে—আগে তার মতামতটা একটু বার জেনে নেওয়া উচিত ছিল না?"

"তার মতামত আবার গিয়ে কি জানতে হবে? আমার সঙ্গে বিয়ে দিলেম। বাবা আপত্তে এসে আমার মতামত জানতে চেয়েছিলেন দুই হাত জোড় করে?"

"ওগো, সে দিন আর নেই কো। সে তখন ছিল দুই একটা পাশ না দিতে দিতেই বাপেরা ছেলের বিয়ে দিত, হয় আঠার উনিশ বছর বয়েসে—"

"না হয় ওর বয়েস চব্বিশ পঁচিশ বছরই হয়েছে, আর পাশ না হয় দু তিনটে বেশী দিয়েছে। আর তাতেই এত বড় মাতব্বর হয়ে উঠল যে আমি বাপ তার গ্রাহ্যির মধ্যেই কেউ আর নই? মতামত! কেন, সে আর চায় কি? সম্বন্ধটা মন্দ কিছু করেছি? নগদ অতগুলো টাকা গুণে দিচ্ছে, নামকরা ঘর, মেয়েটিও দেখতে এমন খাসা, যেন লক্ষ্মীর শ্রী ঢল ঢল করছে, দেখলেই ইচ্ছে হয় অমনি কোলে তুলে ঘরে নিয়ে আসি। কেবল টাকা দেখেছি আর মেয়ে দেখিনি? তার পর বড়লড় হয়েছে, কালেজে পড়ে, গানবাজনাও বিবি শিখেছে। কেন, আর চায় কি সে?"

"কি চায় তা সেই জানে।—তবে এইটে—তুমি যতই চাও, সে চাইছে না।"

"চাইছে না? চাইবে, চাইতে হবে! চাইছে না তার আহাম্মুকী, খাসা অমন বউটি পাচ্ছে, আবার ঘরের টাকা ঘরে থাকবে, বিলেত যাবে, মানুষ হয়ে আসবে। কেন চাইবে না? দেখ, মিছে আর তর্কাতর্কিতে লাভ কিছু নাই। নরেনকে আমি কথা দিয়েছি। বিয়ে ওকে করতেই হবে। নইলে দূর করে তাড়িয়ে দেব। বিলেত ও যেতে থাক, সাতসমুদ্র তেরনদী, পারে, পাঁচরে পার হয়ে যাক। সেখানে গিয়ে সিঙ্কে করে—মজুরী করে খাক। বাপের ছেলে যদি হই, একটি পয়সাও আমি দিচ্ছি না। হাঁ, যাও, তাকে বুঝিয়ে বল।"

"আমার দায় প'ড়েছে! বোঝাতে হয়, তুমি গে বোঝাও যা খুসী ডেকে তাকেই বল।"

বলিয়াই বিরাজমোহিনী ঝনাৎ করিয়া দরজাটা খুলিয়া বাহির হইয়া গেলেন। অখিল বাবু হাঁকিলেন "ওরে কেষ্টা! ওরে, শ্যাখ ত রে' ব্যাটা কোথায়? ডাক ত এক্ষুণি হতভাগাকে!"

বিরাজমোহিনী ফিরিয়া কহিলেন, "থাক এক্ষুণি ডাকতে হবে না। দু'জনে আবার একটা কুরুক্ষেত্তর বাধিয়ে নিও না এই রাত্তির বেলায়। দেখি, কপালের ভোগ ত এড়াবার যো নেই—আমিই ধীরে সুস্থে যখন হয় বলব'খন।"

"যাও! এক্ষুণি গিয়ে তবে বল। কি বলে, আমায় এসে বলে যাও।"

"ও মা! বিয়ের লগন যেন এখুনি উৎরে যাচ্ছে। এত তাড়া কিসের? বলতে হবে, সে বলা যাবে এখন। আমি সময় বুঝে বলব।"

"সময় যদি তোমার ন' মাস ছ' মাসে না হয়?"

"নেও, আর বাজে বকো না।—ছ' মাস ন' মাস লাগবে না। আজই—আজ নেহাত না পারি কাল সুবিধে যখন হয় বলা যাবে। অত খাড়া হ'তে হবে না। মাথাটা একটু ঠাণ্ডা কর।"

বিরাজমোহিনী বাহির হইয়া গেলেন। অখিল বাবু আবার তাকিয়ায় পা ছড়াইয়া দিয়া গড়গড়ার নলটি মুখে তুলিয়া লইলেন। কেষ্টা কলিকাটি বদলাইয়া দিয়া পা টিপিতে বসিল।

৩

পরদিন, রাত্রি তখন প্রায় ন'টা, হোটেল হইতে ডিনার খাইয়া মস্ত একটা হাভানা চুরুট মুখে রবীন বাড়ীতে ফিরিল।

কাপড়-চোপড় ছাড়িয়া একটি ঢিলা পায়জামা আর কোর্ত্তা পরিয়া, শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া আর একটা চুরুট ধরাইল; তারপর বার্ণার্ড শ'র একখানি নাটক হাতে লইয়া শয্যার নিকটে আরাম-চেয়ারে অঙ্কশায়িত হইল।

"রবীন এসেছিস?" বলিতে বলিতে জননী বিরাজমোহিনী পর্দ্দা সরাইয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন।

"কি মা?"

পাঠা পৃষ্ঠায় আঙুল রাখিয়া পুস্তকখানি বন্ধ করিয়া রবীন মার দিকে চাহিল।

"রাম! চুরুটটা কেন রাখ্‌ না? আমার সামনে—"

হাসিয়া রবীন কহিল, "তা বল, এই রাখলাম। তবে যখন খাই-ই, তোমার সামনে খেতেই বা দোষ কি?"

"কি জানি বাবা, আমাদের চোখে ওটা ভাল লাগে না। ওঁর সামনে একটা চুরুট ফুঁকতে ফুঁকতে তুই খেতে পারিস?"

"আপত্তি কিছু নেই। তবে তিনি ভয়ঙ্কর আপত্তি করবেন জানি।"

"আপত্তি ত আমিও করছি—"

"করছ, এই ত রাখলাম। বাস! আর কি চাও?"

বিরাজমোহিনী কহিলেন, "যে ভাব-গতিক তোর হ'চ্ছে, এর পর বিলেত থেকে এলে দেখছি আমাদের সাম্‌নে বউ নিয়ে বসে মদও খাবি।"

আবার হাসিয়া রবীন কহিল, "মদ যদি খেলামই, বউ নিয়ে কেন খাব না? আর খেলে তোমাদের সামনে খেতেই বা বাধা কি?"

"থাক্‌, ওসব কথা আর শুনতে চাইনে বাবা। যেমন কপাল ক'রে এসেছি, কতই দেখতে হবে। তা এখন কি করবি?"

"এই ত বইটা প'ড়ছি। ঘণ্টা দেড়েক দুই বোধ হয় প'ড়ব, তার পর শোব।"

"পাগল দেখ! আমি যেন তাই জিজ্ঞাসা ক'রতেই এলাম।"

"তবে কি জিজ্ঞাসা করতে এলে?"

"বলি, এই যে বিয়ের সম্বন্ধটা উনি ক'রেছেন—"

"করেছেন! ক'রেই ফেলেছেন একেবারে?"

"বললেন ত নরেনবাবুকে কথা দিয়েছেন।"

"কেন দিলেন?"

"আমিও ত তাই বললাম বাবা, তুই এখন বড়-সড় হ'য়েছিস্—"

"হাঁ, এই ত চব্বিশ পেরিয়ে পঁচিশেরও ক'মাস হ'ল। আমি এখন পূর্ণবয়স্ক, স্বাধীন। বিয়ে আমার। আমাকে না জিজ্ঞেস ক'রে, আমি এখন বিয়ে আদবে ক'রবই কি না ঠিক না জেনে, একেবারে সম্বন্ধটা ক'রে ফেললেন, ভদ্রলোককে কথা দিলেন—না! এ সব অধিকার ওঁর আছে এটা আমি স্বীকার ক'রে নিতে প্রস্তুত নই!"

"তা বাবা, উনি হ'লেন—"

"হাঁ জানি, পিতা। কিন্তু ছেলের ওপর পিতার অধিকারেরও একটা সীমা ত আছে?"

বিরাজমোহিনী উত্তর করিলেন, "অবিশ্যি ছেলে বড় হ'য়ে উঠলে তার মতামতটা একবার জানা উচিত। তবে বিয়ে ত বাপমায়েই দেয়।"

"দেয় এই হতভাগা দেশে—কুসংস্কারের কুরীতির বেড়াজালে যেখানে সবাইকে ঘিরে রেখেছে, প্রত্যেকটি মানুষ যেখানে বাঁধা কতকগুলো বিধিনিষেধের নাগপাশে বাঁধা, ইচ্ছেমত একটু নড়বার চড়বার অবসর কারু নেই। স্বাধীন উন্নত কোনও দেশে বাপমায়ে ছেলের বিয়ে দেয় না। মানুষ মানুষ হ'য়ে, তার প্রবৃত্তি তার প্রয়োজন বুঝে, যাকে তার মনে ধরে, ভালবাসতে যাকে পারে, তাকে বিয়ে করে। তুমি ব'লেছিলে ওঁকে যে বিয়ে এখন আমি করব না?"

"সে ত বলেছিলামই। তা বললেন, সম্বন্ধ ক'রে ফেলেছেন, কথা দিয়েছেন—"

"দিয়েছেন তার দায়ী তবে তিনি। বিয়ে আমি করব না! এখুনি একটা শেকলে আপনাকে বাঁধা পড়তে দিতে আমি রাজী নই।"

"তা হ'লে কি হবে এখন?"

"কি হবে তার আমি কি জানি? কথা যিনি দিয়েছেন, তিনি বুঝুন।"

"বলিস্ কি রবীন! একটা কথা ভদ্রলোককে তিনি দিয়েছেন, আর তুই হ'লি ছেলে—"

"ছেলে—তবেই আর কি? হুকুমে একদম হাড়িকাঠে গলা বাড়িয়ে দিতে হবে!"

"বালাই! বালাই! ও সব কি কথা বলছিস্? বিয়ে করবি, অমন বড় ঘরের সোমত্ত মেয়ে, দেখতে সুন্দর, আবার কলেজেও পড়ে, তোরা যেমন চাস্—"

"হ'ক, মেনে নিচ্ছি সে রাজকন্যে, রূপে লক্ষ্মী, বিদ্যেয় সরস্বতী—আর যা ব'লতে চাও। কিন্তু আমি বিয়ে ক'রব না। বিয়েতে আমার মন নেই। তোমাদের হুকুমে একটা মেয়ের সঙ্গে জীবনের মত বাঁধা প'ড়তে পারিনে। যাকে দেখিনি, কোনও পরিচয় যার সঙ্গে কিছু নেই, আমার রুচি আর তার রুচি মিলবে কি না, কেউ কাউকে আদরে ভালবাসতেই পারব কি না, কিছুরই ঠিক নেই—না না, এমন অনিশ্চিত একটা ভাগ্যে আপনাকে সঁপে দিতে পারব না!"

"তা তুই গিয়ে দেখ না মেয়ে? দেখে—"

"দেখে কি হবে এখন? সম্বন্ধ ত তোমরা ক'রেই ফেলেছ। আমার মতের কি পছন্দের অপেক্ষাই ত কিছু রাখনি। দেখে আর কেলেঙ্কারী বাড়াবার দরকার কি? তার চেয়ে সোজা তাদের ব'লে পাঠাও বিয়ে আমি ক'রব না।"

"সে যদি উনি রাজি হ'তেন—"

"হ'তেই হবে! নইলে নিজে দেখে পস্তাবেন।"

"বড় চ'টে যাবেন যে, বাবা।"

"চটুন, কি করব আমি?"

বইখানি খুলিয়া রবীন সেইদিকে চক্ষু ফিরাইল। চুরুটটা হাতে করিতে গিয়া থামিল,—কালে মাতার আপত্তির কথাটা মনে পড়িল। মুখ তুলিয়া আবার কহিল, "মিছে আর দাঁড়িয়ে র'য়েছ কেন? আমার এই কথা; গিয়ে তাঁকে বল।"

একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া বিরাজমোহিনী কহিলেন, "বলব আর আমার মাথা মুণ্ডু কি ছাই! তিনি কি শুনবেন তাই?"

"কি করবেন তবে?"

"কি করবেন তিনিই জানেন, একটা অনর্থই ঘটল দেখছি। যেমন কপাল আমার।"

রবীন উত্তর করিল, "এত অযুত হলে অনর্থ অনিবার্য্য! কপালের দোষ এখন দিচ্ছ মিছে। আগেই বুঝে সাবধান হয়ে পড়ে এর একটা ব্যবস্থা করা তোমার উচিত ছিল।"

"তুই ত আগে আমায় বলিস নি কিছু।"

"বলতে কেন আমায় হবে? আর আগে কি জানতে আমায় দিয়েছ কিছু?"

"তা উনি যে বিয়ে দেবেন, মেয়ে দেখছেন এটা কি আর তুই জানতিস্ না?"

"খেয়াল করি নি কিছু। করবার দরকারও মনে করি নি। বিয়ে বিয়ে ত এই ক'বছর ধরেই তোমরা করছ। কি করে বুঝব যে আমার কিছু না বলে একদম চূড়ান্ত একটা নিষ্পত্তিই তোমরা করে ফেলবে? আর এটাই বা কেন মনে কর নি যে, আমি তোমাদের হাতে গড়া একটা পুতুল নই, একজন মানুষ আর এই ব্যাপারে আমার দায়িত্ব আর স্বার্থ সবার উপরে?"

বিরাজমোহিনীর ইচ্ছা ছিল না, আসল কথাটা, অর্থাৎ বিবাহ না করিলে পুত্রের বিলাত যাইবার ব্যয় যে পিতা বহন করিবেন না, এই কথাটা রবীনকে তখন বলেন। বিবাহে আপত্তি করিতেছে, অনেক ছেলেই করিয়া থাকে। ওটা আজকালকার ছেলেদের একটা বাই। শেষে আবার ধরপাকড়ে বিবাহ করে; করিয়া সুখেও থাকে, একেবারে বউ-অন্ত প্রাণ হয়,—ঘাট্, বয়েসের ছেলে, কেন হইবে না? যাহা হউক, বিবাহ করে ত তাঁহাদের কথায় তাঁহাদের মান রাখিতেই করুক, বিলাত যাইবার টাকার লোভে নয়, টাকা পাইবে না এই ভয়ে নয়, এইটিই তিনি চাহিয়াছিলেন। শেষের এই কুৎসিত সত্যটা সত্যই যদি হয়, তার বিকট নগ্ন মূর্ত্তিতে তাহার চোখের সামনে যেন না দেখা দেয়। কিন্তু এখন মনে হইল, কথাটা বলাই দরকার। স্বামীর প্রকৃতি তিনি জানেন। ছেলেও কম জেদী নয়। মতিগতিও আবার অদ্ভুত ঐ কি এক রকম হইয়া উঠিতেছে। কি জানি দারুণ কি একটা অনর্থ শেষে ঘটিবে, বড় ভয় তিনি পাইলেন। একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন, "দেখি আর একবার বলে। তা বিলেত কবে যেতে চাস্ তুই?"

রবীন উত্তর করিল, "পারলে এই পয়লার জাহাজেই যাই। তবে বন্দোবস্ত সব হয়ে ওঠেনি এখনও।"

"অনেক টাকা লাগবে। নয় রে?"

"সে ত লাগবেই। সত্যি ত আর জাহাজের কুলী হয়ে যেতে পারবে। সেখানে গিয়েও কিছু আর হোটেলের খানসামা হয়েও থাকতে পারব না।"

"ও মা, তাও কি হয় কখনও! তবে—"

"তবে—কি, আবার কি বলতে চাও?"

বিরাজমোহিনী কহিলেন, "কি আর বলব বাবা? যে ওঁর ভাবগতিক ত জানিস—"

"জানি, তা কি বলতে চান উনি? জাহাজের কুলী কি খালাসী করে পাঠাবেন? সেখানে গিয়ে—"

"পাগল! কি যে বলে! জাহাজের কুলী খালাসী কেন তুই হ'তে যাবি?"

"তবে কি? কি বলতে চান উনি?"

"এই বলছিলেন, এতগুলো টাকা ঘর থেকে না দিলে যদি চলে—"

"কোত্থেকে তবে আসবে?"

"উনি ত বলেন নরেনবাবু—"

"ও, নরেনবাবু দেবেন! খুব বাগিয়েছেন দেখছি! কিন্তু আমি যদি নরেনবাবুর মেয়েকে বিয়ে না করি?"

বিরাজমোহিনী কহিলেন, "সেই ত হয়েছে মুস্কিলের কথা বাবা, উনি এখন জিদ ধরেছেন—"

"কি? বিয়ে না করলে টাকা দেবেন না?"

চক্ষু-মুখ রবীনের অগ্নিবর্ণ হইয়া উঠিল।

"কি—করব বাবা? বলছেন তাই-ই—"

"কেন দেবেন না?"

"কেন দেবেন না—ঐ জিদ—আর কেন? তা টাকা হল তাঁর—"

"আজ তাঁর, কাল আমার! টাকা তিনি দান-খয়রাৎ করেও যাবেন না, সঙ্গে নিয়েও যাবেন না। আজ চোখ বুজলে কাল সব আমার হবে। যা আমার—অন্ততঃ যেদিন হক আমার হবেই—আমার ভালর জন্যে কেন তা তিনি খরচ করবেন না?"

একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া বিরাজমোহিনী কহিলেন, "ও সব আর আমাকে কেন বলছ বাবা? টাকা, যদ্দিন বেঁচে আছেন, ওঁর হাতেই ত সব থাকবে। না দিলে জোর করে ত তুমি কেড়ে নিতে পার না?"

"তাও যে না পারা যায়, তা নয়। তবে অতটা পেজোমো আমি করতে চাই না।"

"আমার হাতেও যদি থাকত কিছু"—

তীব্র দৃষ্টিতে মার দিকে চাহিয়া রবীন কহিল, "সত্যি কিছু নেই?"

"সে আর কটা টাকা! জমাতে কিছু পারি এত টাকা কি আমার হাতে কখনও দেন? এক যা গয়নাপত্তর আছে। তাও—"

"গয়নাপত্তর কে তোমার কাছে চাইছে? তা উনি কি সত্যিই এমন পণ করেছেন, বিয়ে না করলে টাকা আমায় দেবেন না?"

"বলছেন ত তাই-ই। তা স্বভাব ত জানিস—"

"জানি। জিদ একটা ধরলে, সেটা সঙ্গত কি অসঙ্গত যাই হোক, ছাড়তে উনি পারেন না। তা হলে এই রকমই জিদ একটা ধরেছেন?"

"মনে ত তাই-ই হয় বাবা। তা—"

"তা—কি? নরম হবেন?"

"ভরসা ত বড় করি না—"

"হুঁ!"

ভ্রূকুটিকুটিল অন্ধকার মুখে হস্তে অধর দংশন করিয়া শুব্ধ হইয়া রবীন বসিয়া রহিল।

বিরাজমোহিনী কহিলেন, "তা হ'লে কি করবি বাবা? ওঁকে কি বলব?"

"রাজী উনি হবেনই না?"

"তা একটু নরম হ'য়ে নিয়ে বরং—"

"কিচ্ছু হবে না! এ যে টাকা! আরও দশ-বারো হাজার!"

"তা হ'লে কি করবি?"

"কি করব? বিয়ে করতে হবে? নয়? আচ্ছা, দেখি। এখুনি কিছু বলতে পারছি নি। রাতটা ভেবে দেখি। কাল সকালে যা হয় বলব।"

বলিয়াই রবীন চুরুটটি ধরাইল। এবার আর জননীর

নিষেধের কথা মনে করিল না, অথবা মনেই ছিল না। বিরাজ-মোহিনীও আর কিছু না বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

সকালে উঠিয়া রবীন মাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবার সঙ্গে আর কোনও কথা হ'য়েছিল তোমার কাল?"

"হ'য়েছিল। তা—"

"টাকা তিনি ঘর থেকে তা চ'লে দেবেনই না?"

"সে ত কিছুতেই রাজী হচ্ছেন না বাবা—"

বলিতে বলিতে অতি উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে বিরাজমোহিনী রবীনের মুখের দিকে চাহিলেন।

একটু কাল থমকিয়া থাকিয়া রবীন কহিল, "বেশ, তবে গিয়ে বল, বিয়েই হবে।"

এই উত্তরে বিরাজমোহিনীর সর্ব্বাঙ্গ অজ্ঞাত কি ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। অন্য রকম উত্তরেও তিনি যে বিশেষ সুখী হইতেন, তা নয়। তবে এ কথায় মর্ম্মে মর্ম্মে গিয়া যেমন তীব্র একটা আঘাত লাগিল, ততটা বোধ হয় লাগিত না। সে যে একটা ভয় তাঁহার হইত, সেটা এক রকম। কিন্তু এ যে কি একটা দারুণ অমঙ্গলের বিভীষিকায় শিহরিয়া তিনি উঠিলেন, তেমন শিহরিয়া উঠিতেন না। রবীন কহিল, "কি ভাবছ মা? শেষে ফাঁকি দিয়ে একটা কেলেঙ্কারী করব? না, তা করব না। তা হ'লে বলতাম বিয়ে হবে না।"

ধীরে ধীরে বিরাজমোহিনী কহিলেন, "খুসী হয়ে ত বলছিস না বাবা—"

"না, তা বলছি না, বলতে পারি না। তোমরা বাবা করছ, উপায় নাই, কি করব?"

একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া বিরাজমোহিনী কহিলেন, "তা তুই একটি বার গিয়ে মেয়েটিকে কেন দেখ না?"

"দেখে কি হবে? কি দেখব? বিয়ে করাচ্ছ মেয়ে নয়, টাকা। তা সেটা আমার চাইতে বাবাই দেখে নিতে পারবেন ভাল।"

"ছি! অমন কথা ব'লতে নেই বাবা।—মেয়েটিও শুনেছি বেশ পছন্দের মত —"

"হক কি নাই হক, টাকার গরজেই ত আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চাইছ?"

"টাকা চান বলেই কি যা তা একটা বিশ্রী মেয়ে তোর ঘাড়ে উনি চাপিয়ে দেবেন? টাকাওয়ালা বাপের মেয়েকে কি আর ভাল হতে নেই?"

"হতে পারে। তার ভাল সে আছে। ভাল কি মন্দ সেটা একটিবার দেখে নেবার অবসর ত আমাকে দেওয়া হল না।"

"তা দেব না গিয়ে—"

"এখন আর কি দেখব। দেখবার দরকারই বা কি? বিয়ে আমার এই মেয়ের ঘরে তোমরা দেবে, সে ত ঠিকই হয়ে আছে।"

বিরাজমোহিনী কহিলেন, "তা এতই যদি অনিচ্ছে তোর থাকে, কাজ কি? নাই করলি বিয়ে?"

"বিলেত যাবার টাকা দেবে না ক'রলে?"

"টাকা আমি কোত্থেকে দেব বাবা? দেওয়ার মালিক হলেন উনি—"

"তবে আর কেন বলছ? বিলেত আমাকে যেতেই হবে। টাকাও চাই। টাকা আছে, তবু পাই না। আপনাকে বিকিয়ে দিয়েই তবে যোগাড় করতে হবে। কি করব? তাই হক। মিছে আর কথা বাড়াবার দরকার নেই; ভাল লাগছে না। যাও, ওঁকে গিয়ে বল, দিয়ে দিতে চান, তাই হবে।"

বলিয়াই রবীন বাহির হইয়া গেল। বিরাজমোহিনী কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। শেষে একটি নিঃশ্বাস ছাড়িয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া স্বামীকে গিয়া একবারে পায়ে ধরিয়া বসিলেন।

হাসিয়া অখিল বাবু কহিলেন, "ক্ষেপেছ তুমি। সে কি যেমন তেমন একটা হেলা-ফেলার মত মেয়ে? হাতে হাত একটিবার বাধাই পড়ুক না? বউ ছেড়ে আসবে তখন বিলেত যেতেই পারবে কি না সন্দেহ। চব্বিশ পঁচিশ বছরের সৌখীন ছেলে, তাতে আঠার বছরের অমন রাজকন্যের মত বউ এসে সামনে দাঁড়াবে—ইংরেজি পড়েছে, গান-বাজনা শিখেছে, বিরাগে অমনি হৃদয় ছেড়ে গেল আর কি? বাজে যত বিলেতী নভেল নাটক পড়েতে মাথা বিগড়ে গেছে কি না? পছন্দ করবে! পছন্দ আবার এর চাইতে ভাল কোথায় ও কাকে করবে?"

স্বামীর কথা অযৌক্তিক বলিয়া বিরাজমোহিনীর মনে হইল না। মনটা অনেক পরিমাণে আশ্বস্তও হইল। [ক্রমশঃ

বিজ্ঞান জগৎ

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস

—শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী

গত ২রা জানুয়ারী লাহোরে বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ষড়্‌বিংশ সাধারণ অধিবেশনের উদ্বোধন হয়। ভারতের নানাস্থান হইতে ৩৫০ জন প্রতিনিধি এই অধিবেশনে যোগদান করেন। ইহা ব্যতীত পাঞ্জাবের বহু বৈজ্ঞানিক, কর্মী এবং ছাত্রও সভায় যোগ দিয়াছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক ডক্টর জ্ঞানেন্দ্র ঘোষ মূল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মূল অধিবেশনের পরে বিজ্ঞান কংগ্রেস এগারটি বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয় এবং প্রত্যেক শাখার অধিবেশন পৃথক্ সভাপতির নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

মূল সভাপতি ডক্টর জ্ঞানেন্দ্র ঘোষ তাঁহার অভিভাষণে বলেন, এগার বৎসর পূর্ব্বে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভায় সভাপতিরূপে ডক্টর সাইমনসেন ভারতীয় রাসায়নিক-দিগকে ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ্ সম্বন্ধে মনোনিবেশ করিতে বলিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে রাসায়নিকগণ এদেশে যেরূপে গবেষণা চালাইতেছেন, তাহাতে মনে হয় সাইমনসেনের বাণী বিফল হয় নাই। ভারতের বিভিন্ন গবেষণাগারে জৈব রসায়ন সম্বন্ধে বহু গবেষণা সাধিত হইয়াছে। বাঙ্গালোরে ডক্টর পি. সি. গুহ এবং লাহোরে ডক্টর কে. এন. রায় এবং তাঁহাদিগের সহকর্ম্মিগণ উল্লেখযোগ্য গবেষণা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। বর্ত্তমান যুগে ভিটামিন এবং হরমোন সম্বন্ধে ভারতের বাহিরে বহু গবেষণাই হইয়াছে ও এই গবেষণার জন্য নোবেল পুরস্কারও প্রদত্ত হইয়াছে। এ দেশেও ডক্টর বর্দ্ধন, ডক্টর বি. সি. গুহ এবং তাঁহাদিগের সহকর্ম্মিগণ যথেষ্ট গবেষণা করিয়াছেন।

জৈব রসায়নের তুলনায় অজৈব রসায়ন বিষয়ে গবেষণা কম হইয়াছে। স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায়ই মারকিউরাস নাইট্রেট সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া অজৈব রসায়নের গবেষণার সূত্রপাত করেন। ডক্টর পুলিনবিহারী সরকারের ন্যানডিয়াম এবং বিভিন্ন মৌলিক পদার্থ ও আয়নের গঠন প্রণালীর সামঞ্জস্য-বিষয়ে গবেষণা কৃতিত্বের পরিচায়ক।

প্রাকৃতিক রসায়নের গবেষণা ভারতে অল্পদিন হইল আরম্ভ হইয়াছে। ডক্টর নীলরতন ধরই এ বিষয়ে অগ্রণী। ভূমিতে যে সকল রাসায়নিক ক্রিয়া চলিতেছে, প্রাকৃতিক রসায়নের তথ্যের সাহায্যে তাহার কারণ নির্ণয় করিতে তিনি এবং তাঁহার সহকর্ম্মিগণ সমর্থ হইয়াছেন। মাংসগুঁড় প্রভৃতি পদার্থ ভূমিতে প্রয়োগ করিলে নাইট্রোজেন কি ভাবে ভূমিতে সংলগ্ন হয় এবং কিরূপে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করে, সে বিষয়েও বহু তথ্য তাঁহারা আবিষ্কার করিয়াছেন। এই গবেষণার ফলে, কৃষির উন্নতি হইবে আশা করা যায়। এ বিষয়ে ডক্টর জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জির গবেষণাও উল্লেখযোগ্য। বৈদ্যুতিক উপায়ে আয়ন-শোষণ সম্পর্কে তাঁহার মতবাদ জমি-সংক্রান্ত নানা জটিল তথ্যের উপর যথেষ্ট আলোকপাত করিয়াছে। ডক্টর ভাটনগর, মাতাপ্রসাদ, কৃষ্ণমূর্ত্তি প্রভৃতিও প্রাকৃতিক রসায়ন শাস্ত্রে বহু গবেষণা করিয়াছেন।

চুম্বক-রসায়নেও সম্প্রতি বহু গবেষণা এ দেশে হইয়াছে। এ সম্পর্কে মিঃ পি. আর. রায়, ডক্টর ভাটনগর, কৃষ্ণন, ডি. এম. বসু প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকদিগের গবেষণা উল্লেখযোগ্য। আলোকের রাসায়নিক প্রক্রিয়া সংঘটনের শক্তি সম্বন্ধে ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়ে যে গবেষণা করা হইতেছে, ডক্টর ঘোষ তাহার বিস্তারিত আলোচনা তাঁহার অভিভাষণে করেন ও এই প্রসঙ্গে বলেন যে, প্রাকৃতিক রসায়ন সম্বন্ধে গবেষণার জন্য যেরূপ শিক্ষা ও যোগ্যতার আবশ্যক, এদেশে তাহার অভাব পরিলক্ষিত হয়। এ বিষয়ে সকল বিশ্ববিদ্যালয়েরই দৃষ্টি দেওয়া কর্তব্য।

বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ ফল শিল্পে প্রয়োগের দিকে সম্প্রতি কিঞ্চিৎ দৃষ্টি পড়িয়াছে। ডক্টর ভাটনগর বৈজ্ঞানিক ও শিল্প-পতিদিগের মধ্যে যে সংযোগ সাধন করিয়াছেন, তাহা প্রশংসনীয়। ডক্টর ভাটনগরের পরিচালনাধীনে ইণ্ডিয়া ব্রাদার্স-এর প্রদত্ত অর্থে তৈলজাতীয় পদার্থ সম্বন্ধে গবেষণা চলিতেছে। ক্রমে বহু শিল্প-প্রতিষ্ঠানই এরূপ গবেষণার মূল্য সম্বন্ধে সচেতন হইতেছেন। তুলা, পাট, ইক্ষু প্রভৃতি প্রধান প্রধান পণ্য সম্বন্ধে গবেষণার জন্য গবর্ণমেণ্ট গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। অরণ্যজাত নানা দ্রব্য এবং কাষ্ঠসংরক্ষণ সম্পর্কে ডেরাডুনে বহু গবেষণা ও পরীক্ষা হইতেছে। ডক্টর এচ কে. সেন-এর লাক্ষা সম্বন্ধে গবেষণাও উল্লেখযোগ্য।

ডক্টর ঘোষ আরও বলেন, ব্যাপকভাবে শিল্পোন্নয়ন না হইলে এ দেশের দারিদ্র্য ঘুচিবে না। পরিশেষে তিনি বলেন, বিজ্ঞান মানবের উন্নতির ও সুখসুবিধার জন্য ব্যবহৃত না হইয়া বর্তমানে মানবতার ধ্বংসের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে, ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। সুতরাং ধ্বংসমূলক কার্যের জন্য ব্যবহৃত না হইয়া যাহাতে গঠনমূলক কার্যে বিজ্ঞান যাহাতে ব্যবহৃত হয়, তজ্জন্য চেষ্টা করা বৈজ্ঞানিকগণের নৈতিক দায়িত্ব।

গণিত ও পদার্থবিজ্ঞান শাখা

ডক্টর কে. আর. রামনাথন এই শাখার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি পৃথিবীর চুম্বকত্ব এবং বায়ুমণ্ডলের উচ্চস্তর সম্বন্ধে তাঁহার অভিভাষণে আলোচনা করেন। বায়ুমণ্ডলের ওজোন গ্যাস, মেরুজ্যোতিঃ, বিদ্যুৎমণ্ডল, উচ্চাকাশ হইতে শব্দতরঙ্গের প্রতিফলন প্রভৃতি বিষয়ে যে সকল তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে বায়ুমণ্ডল সম্বন্ধে জ্ঞান বর্তমানে প্রসার লাভ করিয়াছে বলিয়া তিনি মত প্রকাশ করেন। ভূ-চুম্বক বিজ্ঞান আলোচনার দ্বারাই উচ্চস্তরের বায়ুর বৈদ্যুতিক গুণাবলী নির্ণীত হয়। এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া সভাপতি বলেন যে, পৃথিবীর চুম্বক-ক্ষেত্র দুইটি অংশ লইয়া গঠিত। একটি পরিবর্তনশীল ও অপরটি অনেকাংশে স্থায়ী। স্থায়ী অংশ পৃথিবীর অভ্যন্তরে আছে। দিনমানের সঙ্গে অথবা চন্দ্রকলার হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে চুম্বকক্ষেত্রে যে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় অথবা চুম্বকক্ষেত্রের যে আকস্মিক পরিবর্তন সংঘটিত হইতে দেখা যায়, তাহা পৃথিবীর বহির্ভাগের কোন ঘটনার জন্যই সংঘটিত হয়। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের মতে বায়ুমণ্ডলের উচ্চস্তরের যে বৈদ্যুতিক প্রবাহ পৃথিবীর সঙ্গে যুক্তিযুক্ত থাকে, তাহারই ফলে এইরূপ পরিবর্তন হয়। পৃথিবীর যে অংশে অধিক সূর্যালোকপাত হয়, সেই অংশেই বিদ্যুৎপ্রবাহের শক্তি অধিক। আরও দেখা যায় যে, শীত অপেক্ষা গ্রীষ্মকালে এই বিদ্যুৎপ্রবাহের শক্তি অধিক বৃদ্ধি পায়। প্রতিদিন বায়ুচাপের পরিবর্তনের ফলে বায়ুমণ্ডলের তড়িৎ-চালনক্ষম উচ্চস্তরে ঘূর্ণীগতির সৃষ্টি হয় ও উহাই তড়িৎ-প্রবাহ উৎপত্তির সহায়ক।

পরিশেষে ডক্টর রামনাথন বলেন, ভূ-চুম্বক-বিজ্ঞানের গবেষণা যত অগ্রসর হইবে, ততই ভূ-পদার্থবিজ্ঞানের বহু সমস্যা সমাধান করা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

রসায়ন শাখা

ডক্টর পুলিনবিহারী সরকার এই শাখার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি মৌলিক পদার্থ ও তাহাদের মূলক-এর (radicle) মধ্যে সামঞ্জস্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে, সাধারণ মৌলিক পদার্থ ও আয়নে যে সামঞ্জস্য তাহার সহিত উহাদের কেন্দ্রকের বাহিরের ইলেকট্রনের গঠনের বিশেষ সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়। গ্রহাপ্য-মৃত্তিকাগুলির (rare earths) মধ্যে সাদৃশ্যের কারণ সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, কেন্দ্রকের বাহিরের ইলেকট্রনের সংস্থান ও গঠন-প্রণালীই ইহার জন্য বিশেষভাবে দায়ী; কেন্দ্রকের গঠনের উপর এই সাদৃশ্য তত্দূর নির্ভর করে না। পরিশেষে তিনি বলেন, বিভিন্ন পদার্থের স্ফটিকের (crystal) জ্যামিতিক আকৃতির মধ্যে সাদৃশ্য থাকিলেই যে তাহাদের রাসায়নিক গুণাবলীরও সাদৃশ্য দেখা যাইবে তাহা নহে। সালফেট এবং সেলেনেট, মলিবডেট ও টাংস্টেট, সালফেট ও ফসফেট এবং নাইট্রাইট-এর আয়নের মধ্যে যে সাদৃশ্য দেখা যায়, তৎসম্বন্ধে তাঁহার নিজের

পরীক্ষা ও গবেষণার বিষয় উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, সমান মাত্রায় ও উৎসমষ্টি, সমান আকৃতির আয়ন এবং ইলেকট্রনের একই প্রকার সমাবেশের জন্যই এই গুলির মধ্যে সাদৃশ্য দেখা যায়।

ভূতত্ত্ব শাখা

ভারতীয় স্কুল অব মাইনস-এর ভূতত্ত্ব-বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর এম. কে. রায়, এই বিভাগের সভাপতিপদে নির্ব্বাচিত হন। তাঁহার অভিভাষণে তিনি বলেন, ভারতের খনিজ সম্পদ্ এখনও দেশবাসীর দৃষ্টি সমাকরূপে আকর্ষণ করে নাই। খনিজ পদার্থের রক্ষা এবং নূতন খনিজ পদার্থের অনুসন্ধান হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। খনিজ সম্পদ্ জাতীয় সমৃদ্ধি বর্দ্ধনের প্রভূত সহায়তা করে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কয়লা সম্বন্ধে দেশবাসীর এবং গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি কতকাংশে আকৃষ্ট হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট কয়লার অপচয় নিবারণের জন্য আইনও প্রণয়ন করিয়াছেন। এদেশে পেট্রোলিয়ম, অভ্র, ক্রোমেট ইত্যাদিও কিছু পরিমাণে পাওয়া যায়। খনির মালিকদিগের অজ্ঞতা ও যথোপযুক্ত সতর্কতার অভাবে ঐগুলির যথেষ্ট অপচয় হয়। এই অপচয় নিবারণের ব্যবস্থা যত সত্বর করা হয়, তাহাই মঙ্গল।

বহু প্রাচীনকাল হইতেই এদেশে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, সীসক, রাঙ, পারদ, হীরক, গন্ধক প্রভৃতির ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। এইগুলির মধ্যে কতকগুলি দ্রব্য প্রয়োজনের অনুরূপ পরিমাণে এদেশে পাওয়া যায় না এবং দুই একটি একেবারেই পাওয়া যায় না। এগুলির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া জাতীয় সম্পদ্ বৃদ্ধির দিক্ হইতেও বিশেষ প্রয়োজন ও বৈজ্ঞানিকগণের একটি প্রধান কর্ত্তব্য।

প্রাণিবিজ্ঞান শাখা

বাঙ্গালোর সেণ্ট্রাল কলেজের অধ্যাপক সি. আর. নারায়ণ রাও এই শাখার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার অভিভাষণে, দক্ষিণ ভারতীয় ভেকের গঠনপ্রণালী ও প্রকৃতির উপরে পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে, একই রূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থায় বর্দ্ধিত হইলে বিভিন্ন জাতীয় ভেকের মধ্যে এরূপ সাদৃশ্য দেখা যায় যে, ব্যবচ্ছেদমূলক পরীক্ষা ব্যতীত তাহাদিগকে পৃথক্ শ্রেণীবিভাগ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। সেইরূপে, একই জাতীয় ভেক বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থায় বর্দ্ধিত হইলে ঐ অবস্থার উপযোগী পরিবর্ত্তন তাহাদিগের দেহে দৃষ্ট হয়। উদাহরণ স্বরূপ তিনি বলেন, যে-সকল ভেক ঝরণা বা জলপ্রপাতের মধ্যে বসবাস করে, তাহাদের দেহের উপরে একপ্রকার আঠা দেখা যায়। এই আঠা দ্বারা তাহারা প্রস্তরগাত্রে দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন হইয়া থাকিতে পারে। অধ্যাপক রাও বলেন যে, একই মূল বংশ হইতে উদ্ভূত হইয়া বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িয়া বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে বর্দ্ধিত হইবার ফলে ভেকের নূতন নূতন শ্রেণীর বিবর্ত্তন ঘটিতেছে।

উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান শাখা

ডক্টর কৃষ্ণদাস বাগচী এই শাখার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি অরণ্যজাত বৃক্ষের ব্যাধি এবং ছত্রক প্রভৃতি যে সকল পরগাছা বৃক্ষের উপর জন্মায়, সে বিষয়ের আলোচনা করেন। দেবদারু-জাতীয় গাছগুলি ভারতের প্রধান আরণ্য সম্পদ্ কিন্তু ব্যাধি ও ছত্রকের আক্রমণে ইহা বহুল পরিমাণে নষ্ট হয়। এই সকল ব্যাধি ও ছত্রকের আক্রমণ হইতে কি প্রকারে এই বনজ-সম্পদ্ রক্ষা করা যায়, সে বিষয়ে গবেষণা করা প্রয়োজন।

বৃক্ষের রোগ নিবারণের উপায় সম্পর্কে আলোচনা করিয়া ডক্টর বাগচী বলেন যে, বৃক্ষের রোগ প্রতিকার করা এক প্রকার অসম্ভব, কারণ যেরূপ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে ঐ গুলির অবস্থান করিতে হয়, তাহাতে পরগাছার আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া কঠিন।

রাসায়নিক উপায়ে কাষ্ঠ অবিকৃত রাখা সম্বন্ধে পরীক্ষা চলিতেছে। বিভিন্ন জাতীয় ছত্রক কিরূপে কাষ্ঠ নষ্ট করে ও এই ছত্রকগুলির উপর রাসায়নিক পদার্থের কিরূপ ক্রিয়া হয়, সে বিষয়েও গবেষণা এবং পরীক্ষা চলিতেছে।

কৃষিবিজ্ঞান শাখা

ডক্টর টি. বি. রামকৃষ্ণ আইয়ার এই শাখার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। তিনি তাঁহার অভিভাষণে বলেন যে, প্রতি বৎসর যে পরিমাণ ফসল নষ্ট হইতেছে, তাহা নিবারণের চেষ্টা করা বৈজ্ঞানিকদিগের কর্ত্তব্য। মাটির রাসায়নিক ধর্ম্ম, বীজের স্বাস্থ্য, চারা গাছের বৃদ্ধি সম্বন্ধে নানা সমস্যা এবং

কীট-পতঙ্গ প্রভৃতির উপদ্রব হইতে ফসল রক্ষা করার উপায় সম্পর্কে বিস্তারিত গবেষণা হওয়া প্রয়োজন। ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধির উপায় ও রাসায়নিক সার সম্পর্কে যে গবেষণা হইয়াছে তাহার ফল কৃষকদের জ্ঞাপন করা প্রয়োজন। যে সকল কীট-পতঙ্গ ফসল নষ্ট করে, তাহাদিগের প্রকৃতি সম্বন্ধেও কৃষকদিগকে কিছু শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক।

গবর্ণমেণ্ট ও বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠানগুলি সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করিলে এবং কৃষকদিগকে ফসল রক্ষা করিবার উপায় সম্বন্ধে উপদেশ দিলে প্রচুর টাকার ফসল প্রতি বৎসর ধ্বংস হইতে রক্ষা পায়।

মনোবিজ্ঞান শাখা

মিঃ চরিপদ মাইতি এই শাখার সভাপতিপদ গ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার অভিভাষণে মনুষ্যের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে, মানসিক ব্যাধির চিকিৎসা-প্রসঙ্গে ব্যক্তিত্বের পর্য্যালোচনা যথেষ্ট পরিমাণে হইতেছে। এই গবেষণার ফলে জানা গিয়াছে যে, মানুষের মন ক্রমশঃ গড়িয়া ওঠে। বর্ত্তমানে, মানুষের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে গবেষণার ফলে ব্যক্তিত্ব-সমস্যার প্রতি বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে। ব্যক্তিত্বের স্বরূপ-নির্ণয় এবং বয়োবৃদ্ধির সহিত কিরূপভাবে শিশু-চরিত্র পরিবর্ত্তিত হইবে, সেই সম্পর্কে যাহাতে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়, তজ্জন্য গবেষণা চলিতেছে।

মানবেতর জীবের মনস্তত্ত্ব এবং মানুষের ব্যক্তিত্ববিকাশের ধারা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া মিঃ মাইতি তাঁহার অভিভাষণ সমাপ্ত করেন।

ভূগোল ও ভূমিতি শাখা

মিঃ সুব্রহ্মণ্যম্ এই শাখার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। তিনি ভারতের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। উত্তরদিকে দুর্গম হিমালয় পর্ব্বত দ্বারা ভারতবর্ষ এশিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন। তিনি মত প্রকাশ করেন যে, ভৌগোলিক সংস্থানের ফলেই ভারতবর্ষের কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব হইয়াছে। জাতিভেদ, বৃষ্টির পরিমাণ, পোষাক-পরিচ্ছদ, আহার্য্য প্রভৃতির বৈসাদৃশ্যের জন্য এই মহাদেশ কতকগুলি স্বতন্ত্রখণ্ডে বিভক্ত হইতে বাধ্য হইয়াছে। ইহার জন্যই ভারতের একটি বিশিষ্ট সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক সভ্যতায় ভারত এখনও পশ্চাতে পড়িয়া আছে।

শারীরবিজ্ঞান শাখা

মিঃ এন. এম. বসু এই শাখার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তাঁহার অভিভাষণে তিনি বলেন যে, ভারতে শারীর-বিজ্ঞানে বিশেষ গবেষণা হইতেছে না। অর্থাভাবই ইহার অন্যতম প্রধান কারণ। এই বিষয়ে এ দেশে যে সকল গবেষণা হইয়াছে, তিনি তাহার আলোচনা করেন। তৈল ও স্নেহজাতীয় পদার্থ, পাচক রস পরীক্ষা এবং চাউল ও ডালের প্রোটিন ও শ্বেতসার, মৎস্যজাত প্রোটিন ও দেহের মধ্যে ভুক্ত বস্তুর পরিবর্ত্তন সম্পর্কে এ দেশে গবেষণা হইয়াছে বলিয়া তিনি জানান। মুগ ও মসুর অপেক্ষা মাষকলাই-এর ডালের প্রোটিন-মূল্য অনেক বেশী। ভাতের সঙ্গে মুগের ডাল খুব পুষ্টিকর খাদ্য। পরিশেষে সভাপতি বলেন যে, স্বাস্থ্য-শাস্ত্র ও শারীরবিজ্ঞান গবেষণার জন্য একটি গবেষণাগার স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন।

নৃতত্ত্ব শাখা

ডক্টর ডি. এন. মজুমদার এই শাখার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। তিনি তাঁহার অভিভাষণে ভারতের আদিম জাতি সম্পর্কে আলোচনা করেন। ভারতে মোট অধিবাসীর শতকরা ৮ ভাগ আদিম জাতি। অনেক জাতি ক্রমশঃ ক্ষয়ের দিকে যাইতেছে এবং অনেক জাতির সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া জীবনযাত্রা-প্রণালীর পরিবর্ত্তনের ফলে বহু জাতি লোপ পাইতেছে। কয়েকটি আদিম জাতির জীবনযাত্রা-প্রণালী, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিধির আলোচনা করিয়া সভাপতি তাঁহার অভিভাষণ সমাপ্ত করেন।

পশুচিকিৎসা ও চিকিৎসাবিজ্ঞান শাখা

ডক্টর টি. এস. তিরুমূর্ত্তি এই শাখার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি বলেন যে, পাশ্চাত্ত্য দেশে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ইতিহাস আলোচনা ও শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে, কিন্তু ভারতে এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয় না। বাঙ্গালার এশিয়াটিক সোসাইটি সুশ্রুতের তিনখানি পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করিয়াছেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তেলা-

সংহিতার তাঞ্জোর পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত পুরাকালের চিকিৎসা-বিজ্ঞান সম্বন্ধে আর কোন পুস্তকাদি মুদ্রিত হয় নাই। প্রাচীন কীটদষ্ট সংস্কৃত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি এখনও অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যাইতে পারে। চিকিৎসাশাস্ত্রবিদ্ এবং বিশ্লেষকের উভয়ে সম্মিলিত হইয়া যদি প্রাচীন গ্রন্থ উদ্ধার করিবার চেষ্টা করেন, তবে প্রভূত উপকার হইবে। বৈদ্য, জাতক, যোগশাস্ত্র, তন্ত্র, কাব্য, পুরাণ, আদিম অধিবাসীদিগের চিকিৎসা-প্রণালী প্রভৃতির মধ্যে ইতিহাস সংগ্রহের বহু আবশ্যকীয় তথ্য নিহীত আছে; এ গুলির সম্যক্ আলোচনা করিয়া চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ইতিহাস সংগ্রহে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত।

প্রাচীন ভারতে রসায়নশাস্ত্র, শারীরবিজ্ঞান ও শরীর-সংস্থান-বিজ্ঞানের কিরূপ উন্নতি হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ করিয়া সভাপতি বলেন যে, আয়ুর্বেদে হিন্দু চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বহু প্রাচীন নিদর্শন। এই প্রসঙ্গে তিনি চরক, সুশ্রুত, বাগ্‌ভট্ট, ভরদ্বাজ প্রভৃতি প্রাচীন পণ্ডিতগণের চিকিৎসা ও শরীরসংস্থান-বিজ্ঞানে দান সম্বন্ধে উল্লেখ করেন।

বর্ত্তমান নিদানশাস্ত্র কিরূপে গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি প্যাস্তার, কখ, লিস্টার, স্যর উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকদিগের নাম উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, নিদানতত্ত্বের উপর চিকিৎসা-বিজ্ঞান বিশেষভাবে নির্ভর করে, সুতরাং নিদানতত্ত্ব সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকভাবে গবেষণা আরম্ভ হইলে চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতি হওয়া সম্ভব।

* * *

বিনা মাটিতে গাছ ফলান

বর্ত্তমানে আমেরিকায় বিনা মাটিতে গাছ ফলান হইতেছে। মাটিতে গাছ ফলাইলে উহারা মাটি হইতে রস শোষণ করিয়া দেহের পুষ্টি সাধন করে। মাটিতে যথেষ্ট খাদ্য না থাকিলে বর্ত্তমানে সার দিয়া গাছের খাদ্য সরবরাহ করা হয়। গাছের খাদ্য হিসাবে যে সকল রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োজন, সার হইতে তাহা জলে দ্রবীভূত হইয়া যায় ও গাছের মূলগুলি উহা শোষণ করিতে থাকে। বিনা মাটিতে গাছ ফলাইতে হইলে গাছের মূল জলের ভিতর রাখিতে হয় ও প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্যাদি জলে দ্রবীভূত করিতে হয়। পরিপুষ্টির জন্য যে সকল পদার্থ আবশ্যক, গাছের মূল এই দ্রবণ হইতে তাহা গ্রহণ করে। এইরূপে খাদ্যের পরিমাণ ক্রমশঃ কমিয়া যায়। সুতরাং রাসায়নিক বিশ্লেষণ না করিলে কোন্ কোন্ রাসায়নিক দ্রব্য কখন দিতে হইবে, তাহা স্থির করা যায় না। এই জন্য প্রায়শঃ দ্রবণটি পরিবর্ত্তন করিয়া যে পাত্রে গাছ ফলান হইতেছে, তথায় নূতন দ্রবণ দিতে হয়।

গাছ ফলানর জন্য কাঠ বা কংক্রিট-নির্ম্মিত চৌবাচ্চা প্রস্তুত করিয়া উহার ভিতরে অ্যাসফাল্টের প্রলেপ লাগান হয়। এই চৌবাচ্চাগুলি অন্ততঃ ছয় ইঞ্চি গভীর হওয়া আবশ্যক। ইহাতে উপরে অল্প স্থান খালি রাখিয়া জলপূর্ণ করা হয় ও যে পর্য্যন্ত জল ভরা হয়, সেই স্থানে একটি চিহ্ন দিয়া রাখা হয়। এই চিহ্নের বেশী নীচে জল যাহাতে নামিয়া না যায়, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হয়। একটি তারের জালে অ্যাসফাল্টের প্রলেপ দিয়া চিহ্নিত স্থানের প্রায় তিন ইঞ্চি উপরে চৌবাচ্চার ভিতরে রাখা হয়। ইহাতে দ্রবণের সহিত বায়ুর সংস্পর্শের কোন ব্যাঘাত ঘটে না। ইহা ব্যতীত একটি পাম্পযন্ত্রের দ্বারা দ্রবণের ভিতরে বায়ু চালনা করা হয়। এই কার্য্য একটি সাইকেলের পাম্প দ্বারাও সাধিত হইতে পারে। তারের জালের উপরে খড় এবং পাইন গাছের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড ছড়াইয়া দেওয়া হয়। এইগুলির উপরে বীজ ছড়ান হয়। প্রথম বীজ ছড়ানর সময় জালের এক ইঞ্চি নীচে পর্য্যন্ত চৌবাচ্চাটি রাসায়নিক পদার্থের দ্রবণে পরিপূর্ণ করা হয়। যখন খেতবর্ণের শিকড় বাহির হইয়া আসে, তাহার পরে জালের তিন ইঞ্চি নীচে চিহ্নিত স্থান পর্য্যন্ত দ্রবণ পূর্ণ করা হয়। গাছের শিকড় জালের ভিতর দিয়া গিয়া যাহাতে পরিশোষক দ্রবণের মধ্যে নিমজ্জিত থাকে, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হয়। বীজ বপন করিবার সময় জালের উপরের খড় ও কাঠখণ্ডগুলি ভিজাইয়া দিতে হয়। মাটি হইতে চারা তুলিয়াও এই চৌবাচ্চায় রোপন করা যাইতে পারে। ইহা করিলে কয়েকদিন পরে শিকড়গুলি নষ্ট হইয়া নূতন শিকড় বাহির হয় ও গাছ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। জালের উপরের খড়গুলি সকল সময়ে সামান্য ভিজা থাকা আবশ্যক, কিন্তু বেশী ভিজিয়া বায়ু সঞ্চালনের পথ যাহাতে রুদ্ধ না হয়, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। সকল সময়েই যে এইরূপে গাছ ফলানর পরীক্ষা কৃতকার্য্য হইয়াছে, তাহা নহে, তবে স্থান,

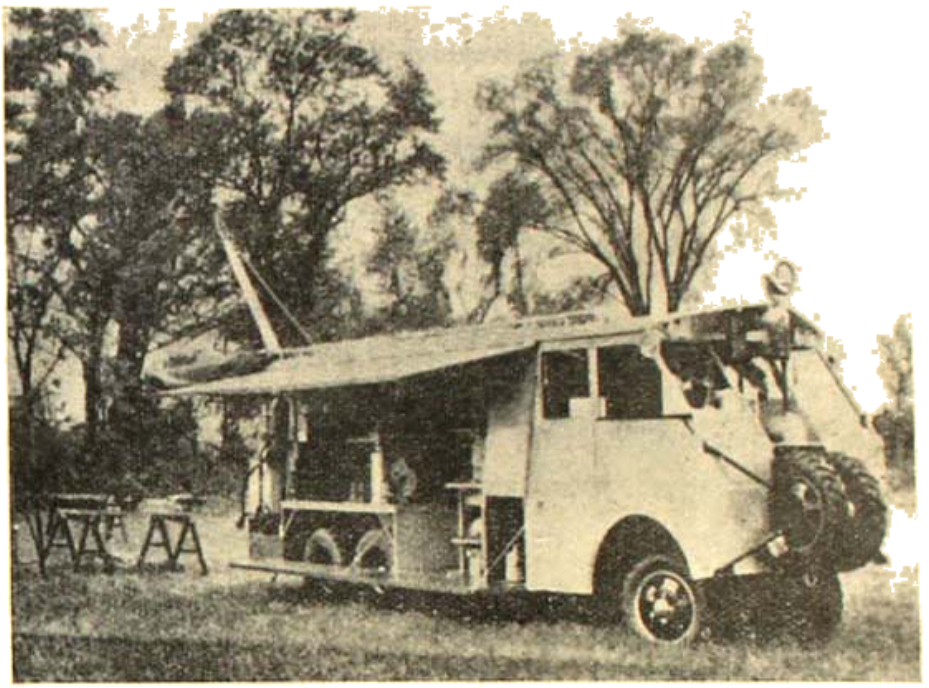

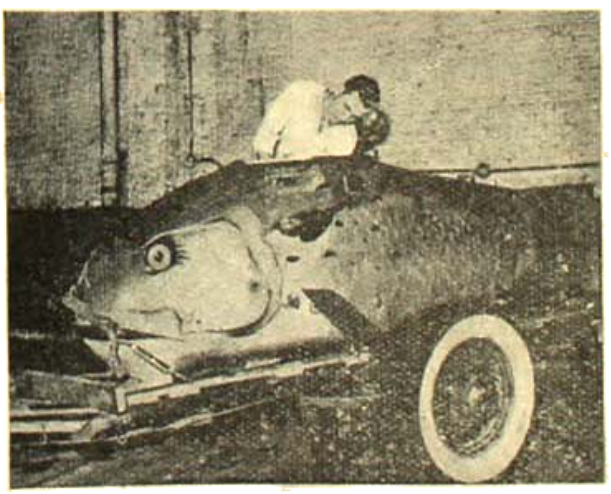

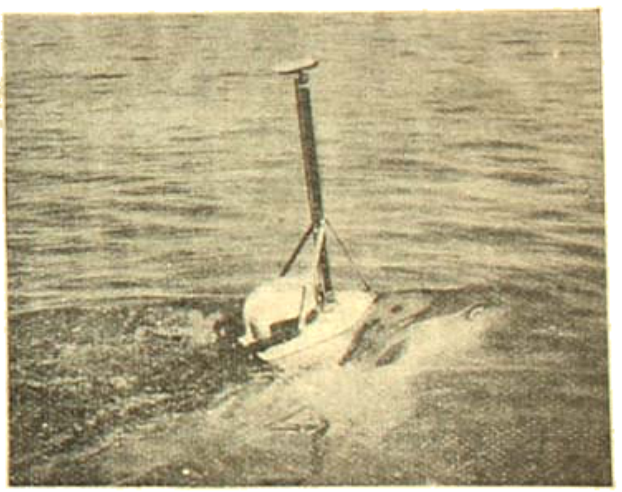

একজন পরিচালিত ডুবোজাহাজের রূপ :

উত্তাপ ও জলবায়ুর অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া উপযুক্ত পরিপোষক দ্রবণ প্রয়োগ করিতে পারিলে এই পরীক্ষায় প্রায়ই কৃতকার্য্য হওয়া যাইতে পারে।

যে সকল কীট মাটিতে থাকিয়া গাছের অনিষ্ট করে, তাহারা এই প্রকারে গাছ ফলাইলে অনিষ্ট করিতে পারে না, কিন্তু ছত্রক এবং বীজাণু দ্বারা এই গাছগুলিরও অনিষ্ট করিতে পারে। গাছ বৃদ্ধির উপায় আলোকের প্রভাবও যথেষ্ট। প্রচুর আলোক না পাইলে গাছের অনিষ্ট হয়। লরেন্স সি. পোর্টার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, স্বাভাবিক আলোক প্রচুর পরিমাণে না পাইলে বৈদ্যুতিক আলোক দ্বারা উহার অভাব কতক পরিমাণে পূরণ করা যায়।

টোম্যাটো, আলু, বীট, গাজর প্রভৃতি সাধারণ গাছ চৌবাচ্চায় ফলাইয়া উত্তম ফল পাওয়া গিয়াছে বলিয়া মার্কিন পরীক্ষকেরা দাবী করিয়াছেন। গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকা প্রভৃতি ফুলের গাছও উত্তম ফলে দেখা গিয়াছে। এই বিষয় লইয়া যাঁহারা গবেষণা ও পরীক্ষা করিতেছেন, তাঁহারা আশা করেন যে, ক্রমে শাকসব্জীর গন্ধ এবং ফুলের বর্ণ ও গন্ধ পরিবর্ত্তন করিতেও সমর্থ হইবেন।

স্বল্প ভোল্টের বিদ্যুতে বিপদ

মিঃ এস. ডবলিউ. আর্লিন বৈদ্যুতিক ধারা সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন যে, সাধারণতঃ এই ধারণা সকলেই পোষণ করেন যে, ২২০ ভোল্ট পর্য্যন্ত চাপে পরিচালিত বিদ্যুৎ সবল ব্যক্তির বিশেষ কোন ক্ষতি করে না, তাহা প্রকৃত নহে। যখন কোন বৈদ্যুতিক বেষ্টনী ভিজা বস্ত্রনীর দ্বারা সম্পূর্ণ করা হয়, তখন বার ভোল্টের অধিক বৈদ্যুতিক চাপই জীবনসংশয় করিতে পারে।

বাড়ী প্রস্তুতের নূতন দ্রব্য

ইস্পাতের কারখানায় ইস্পাত পরিষ্কার করিবার জন্য যে অম্ল-দ্রবণ ব্যবহৃত হয়, সেই দ্রবণে চূণ প্রয়োগ করিয়া নূতন প্রকারের একটি দ্রব্য প্রস্তুত হইয়াছে, বাড়ী প্রস্তুতের কার্য্যে উহা ব্যবহৃত হইতে পারে বলিয়া প্রকাশ। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, ঐরূপ ব্যবহারের উপযোগী অনেক গুণ এই দ্রব্যে বর্ত্তমান আছে। 'ফেরন' নামে যাহা বাজারে বিক্রয় হইতেছে, তাহা এই প্রকারেই প্রস্তুত। এই দ্রব্যগুলি খুব হাল্কা, তবে বর্ণ একেবারে সাদা নহে, সামান্য বাদামী।

একজন পরিচালিত সাবমেরিন

সম্প্রতি আমেরিকার মিশিগান সিটিতে একজন শিল্পী একটি মৎস্যাকৃতি একজন চালিত সাবমেরিন প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহা ইস্পাতের দ্বারা প্রস্তুত এবং ইহার ওজন প্রায় ১২ মণ মাত্র। শিল্পী বলেন যে, ইহা জলের ৩১ ফুট নীচে যাইতে পারে। জলের ৩ ফুট নীচে দিয়া তিনি ইহা চালাইয়া দেখান। ঝড়ের মধ্যেও ইহা চালনা করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে, জাহাজখানির কোন ক্ষতিই হয় না।

ভ্রাম্যমাণ বিমান-বন্দর

আমেরিকার নিউ মেক্সিকোতে মিঃ কে. ডবলিউ. কাউল একটি ভ্রাম্যমাণ বিমান-বন্দর প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহা যুদ্ধক্ষেত্রে লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ উপযোগী। ইহার চাকাগুলি এরূপ ভাবে প্রস্তুত যে, অত্যন্ত অসমতল ভূমির উপর দিয়াও যাইতে পারে। ইহা অনেক ওজন বহন করিতে সমর্থ। সম্মুখে দুইখানি অতিরিক্ত চাকা দ্বারা মোটরের বাম্পারের ন্যায় কার্য্য হয়। বিমান-বন্দরটির সহিত অত্যন্ত তীব্র আলোক জ্বালাইবার ব্যবস্থাও সংযুক্ত আছে। বিমান মেরামতের উপযোগী যন্ত্রপাতি সকল ইহার ভিতরে রাখিবার ব্যবস্থা আছে এবং সংবাদ আদানপ্রদানের জন্য বেতারেরও ব্যবস্থা আছে।

রক্ত-সঞ্চালন বৃদ্ধি করিবার আলোক

শরীরের ভিতরে গভীর প্রদেশে সংক্ষিত কোন অঙ্গে রক্ত জমিলে তাহা অপসারণ করিবার নিমিত্ত এক প্রকার আলোক প্রস্তুত হইয়াছে। আলোকটি কাল কাচে আচ্ছাদিত। এই কাচ ভেদ করিয়া কেবল ইন্‌ফ্রা-রেড রশ্মি বাহিরে আসিতে পারে। ইন্‌ফ্রা-রেড রশ্মিগুলি প্রতিফলিত হইয়া অনুস্থ স্থানে পতিত হয়। ঐ রশ্মিগুলি স্বাভাবিক রক্তের সঞ্চালন-ক্রিয়া বর্দ্ধন করিয়া ব্যাধি নিরাময় করে। ইন্‌ফ্রা-রেড রশ্মি আলোক-রশ্মি নহে, উহা তাপ-রশ্মি সুতরাং এই রশ্মি-প্রয়োগের উদ্দেশ্য তাপপ্রয়োগ মাত্র। সাধারণ তাপ

প্রয়োগের যে সকল ব্যবস্থা আছে, তাহা শরীরের গভীর প্রদেশস্থিত অঙ্গে পৌঁছিতে পারে না। ইন্‌ফ্রা-রেড রশ্মি-গুলি সমকেন্দ্রীভূত করিয়া পাত করিলে উহা গভীরতর প্রদেশেও পৌঁছিতে পারে।

দন্ত-ক্ষয় নিবারণ

মিশিগণ ডাকোটা, কলোরাডো এবং উইসকন্সিন-এ বহু সহস্র বালককে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, যাহাদিগের দাঁত বিবর্ণ তাহাদিগের দন্তক্ষয় কম হয়। যে প্রদেশের পানীয় জলে ফ্লুরোরাইড লবণ দ্রবীভূত আছে, তথায় বিবর্ণ দন্তের সংখ্যা বেশী দেখা যায়। এ বৎসরে বহুসংখ্যক বালককে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, যাহারা ফ্লুরোরাইডবিহীন জল পান করিয়া থাকে, তাহাদিগের মধ্যে দন্তক্ষয় বেশী দেখা যায়। দন্ত-চিকিৎসকগণ এখনও দন্তক্ষয় নিবারণের ফ্লুরোরাইডের প্রভাব সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছুই বলিতে সমর্থ হন নাই। অনেক বৈজ্ঞানিক বলেন যে, সম্ভবতঃ জলের ফ্লুরোরাইড কোন অজ্ঞাত পদার্থ দ্রবীভূত করিয়া রাখিতে পারে এবং তজ্জন্যই দন্তক্ষয় নিবারিত হইয়া থাকে, অথবা ঐ অজ্ঞাত পদার্থ ফ্লুরোরাইডের সহিত একত্রিত হইয়া দন্তক্ষয় নিবারণ করিতে পারে।

সহজপাচ্য দুগ্ধ

অনেক শিশু এবং বয়স্ক ব্যক্তিও দুগ্ধ সহজে পরিপাক করিতে পারেন না। ইহার কারণ দুগ্ধ পাকস্থলীতে গিয়া পাকস্থলীর রসের ক্রিয়ায় দুষ্পাচ্য দধিতে পরিণত হয়। ডক্টর লেসলি চেম্বার্স ইহা দেখিয়া দুগ্ধ সহজপাচ্য করিবার উপায় উদ্ভাবনে ব্রতী হন। দুগ্ধ যাহাতে পাকস্থলীতে গিয়া সহজ-পাচ্য দধিতে পরিণত হয়, সেইরূপ অবস্থায় দুগ্ধকে পরিবর্তিত করিবার চেষ্টা করিতে তিনি আরম্ভ করেন। তিনি দেখিতে পান যে, পান করিবার পূর্ব্বে দুগ্ধ দ্রুত আলোড়ন করিয়া দিলে উহা সহজপাচ্য হয়। এইরূপ করিবার জন্য একটি ২ ফুট ব্যাসযুক্ত মরিচাবিহীন ইস্পাতের গোলাকার পাত বৈদ্যুতিক-চুম্বক শক্তি প্রয়োগে এক সেকেণ্ডে ৩৬০ বার স্পন্দিত করা হয়। একটি মরিচাবিহীন ইস্পাতের কক্ষে দুগ্ধ রাখিয়া এই পাতটি সেই কক্ষে আঁটিয়া দেওয়া হয়। এইরূপে দুগ্ধ আলোড়ন করা হয়। ডক্টর চেম্বার্স বলেন যে, রোগী এবং শিশুগণের উপর পরীক্ষার ফলে তিনি দেখিয়াছেন যে, ইহাতে দুগ্ধের গুণ কিছু মাত্র হ্রাস পায় না, উপরন্তু উহা সহজ-পাচ্য হইয়াছে।

কাষ্ঠের সংরক্ষক

ধ্বংস হইতে কাষ্ঠ রক্ষা করিবার জন্য একটি নূতন রাসায়নিক পদার্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার নাম পেণ্টা-ক্লোরো-ফিনোল। ইহা পেট্রোলিয়াম দ্রবণে শতকরা ৫ ভাগ দ্রবীভূত করিয়া কাষ্ঠের উপরে প্রলেপ দিলে বা চাপ প্রয়োগ করিয়া লাগাইয়া দিলে কাষ্ঠ সহজে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে না। পূর্ব্বে এই উদ্দেশ্যে ক্রিয়োজোট বা অন্যান্য পদার্থের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। এই অভিনব পদার্থটি পূর্ব্বপ্রচলিত পদার্থ-গুলির অপেক্ষা এই হিসাবে ভাল যে, ইহাতে কোনরূপ গন্ধ নাই এবং ইহা প্রয়োগ করিলে কাঠে রঙ্ লাগাইবার কোন অসুবিধা হয় না। ইহা সোডিয়াম লবণ, জিলাটিন প্রভৃতি যে সকল দ্রব্য বীজাণু বা ছত্রক কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া নষ্ট হয়, সেগুলিকে সংরক্ষণ করিতে পারে।

বিজ্ঞানের সংজ্ঞা

……বর্ত্তমান বিজ্ঞান নির্ভরযোগ্য হইতে পারে না, কারণ তাহা অত্যন্ত অসম্পূর্ণ। কোন জ্ঞানের কথা আমূল জানিতে না পারিলে যাহা জানা হয়, তাহা কতদূর জানা হইয়াছে কি না তাহা বুঝা সম্ভব হয় না। কাযেই অসম্পূর্ণ বিজ্ঞান কখনও বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে

'বিজ্ঞান' বলিতে যাহা বুঝায়, তাহার আলোচনা তাহারই বৈশেষিক দর্শনে সম্পূর্ণভাবে আছে এবং ঐ আলোচনা বর্ত্তমান বিজ্ঞানের পুস্তকগুলির মত আংশিক নহে। কাযেই উহা নির্ভরযোগ্য।…

সবজান্তা

—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

নিমন্ত্রণ খাইয়া আসিয়া লিখিতে বসিয়াছি। খাইলাম, রান্নাবান্না না কি অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল।

'শুনিলাম' কথাটাতে আপনারা বিস্মিত হইয়া উঠিলেন দেখিতেছি। ভাবিতেছেন বোধ হয়—রসনা কোথায় ছিল। রসনা অবশ্য যথাস্থানেই ছিল; তবে আহার্য্যের—প্রকৃত আহার্য্যের সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ পায় নাই বেচারা। এটা নিশ্চয় মানিবেন যে, আহার্য্য উপার্জ্জন করিতে হইলে রসনার আর একটি শক্তিকে সক্রিয় করা প্রয়োজন—অর্থাৎ বাচনিক শক্তি। অবস্থা-বিপর্য্যয়ে বেচারি সেইটি পায় নাই। আশা করি এবার একটা শিক্ষা হইল।

নিমন্ত্রণ যে-খানটায় ছিল সে-জায়গাটা আমাদের সহরের বাহিরে, প্রায় মাইল চারেক দূরে। জায়গাটি নিজেই একটি ছোটখাট সহর; কাছাকাছি থাকায় আমাদের সহরের সঙ্গে নাড়ির একটা যোগ আছে, তবে দূরত্বটা নেহাৎ অবহেলার নয়, তাই দুইটি জায়গার বাসিন্দার মধ্যে পরিচয় যে খুব ঘনিষ্ঠ এমনও নয়। যাহাদের সঙ্গে বিষয়-কর্ম্মের কোন যোগ আছে তাহারা অল্পবিস্তর চেনা, বাকী সকলের মধ্যে পরস্পরের দেখা হইলে, মাথা নুয়াইয়া একটি ছোট্ট নমস্কার—'কেমন আছেন?' 'ভাল ত?'—ঐ পর্য্যন্ত।

নিমন্ত্রণ-বাড়ীতে পদার্পণ করিতেই গৃহকর্ত্তা হলধর বাবুর সহিত দেখা হইল। বলিলেন, 'আসুন, আসুন; বহুদিন পরে দেখা। আমিও এদিকে কাজটার হিড়িকে আর বেরুতে পারি নি। তারপর, খবর সব ভাল ত?'

বলিলাম—'হ্যাঁ, ভালই একরকম; কাজটি বেশ সুসম্পন্ন হয়েছে ত?'

এই সময় বাঁ-হাতে খুব বড় খোলের হুঁকা টানিতে টানিতে একটি কৃশ,বর্ষীয়সী ভদ্রলোক চঞ্চলপদে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং হুঁকাটা নিজের মুখ হইতে নিজেই যেন ছিনাইয়া লইয়া—চোখ দুইটা কপালে তুলিয়া হলধর বাবুকে প্রশ্ন করিলেন, 'এঁ্যা! তুমি এখানে নিশ্চিন্দি হয়ে গল্প করছ হলধর? ওদিকে সেই থেকে তোমায় খুঁজে খুঁজে আমার পায়ের সুতো ছিঁড়ে গেল। বলি তোমার ইষ্টের যোগাড় হয়েছে?···ঐ যে গো, কি যে বেশ বলে—দেখ, মনেই আসবে না, এত যে-বন্দোবস্তও কি মাথার ঠিক থাকে?' ডান হাতে মাথা চুলকাইতে লাগিলেন।

হলধরবাবু একটু 'বিদ্ধ' হইয়া বলিলেন, 'এই এঁর সঙ্গে একটু আলাপ করছিলাম, মধু কাকা; আমাদের শৈলেনবাবু, নাম শুনেছেন নিশ্চয়?'

মধু কাকা কি মনে করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন ভুলিয়া, এক পা পিছাইয়া আমার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে একটু চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর হুঁকাটা আরও দূরে সরাইয়া, চোখ দুইটা আরও কপালে তুলিয়া বলিলেন, 'আরে! আমাদের সেই শৈলেনবাবু? কৈ তুমি তো এতক্ষণ আমায় বলনি হলধর! আমি আজ গাড়ী থেকে নেমে ওবধি কত লোককে জিজ্ঞাসা করছি, আমাদের শৈলেনবাবুকে বলা হয়েছে কি না—শৈলেনবাবু আমাদের কখন্ আসছেন—'

হলধরবাবু নিশ্চয় এতটা ঘনিষ্ঠ পরিচয় এবং এতটা আগ্রহ প্রত্যাশা করেন নাই, আবার একটু 'বিদ্ধ' হইয়া বলিলেন, 'এইমাত্র এলেন কি না, শৈলেনবাবু। আপনার কথায় মনে হচ্ছে কাকা, যে শৈলেনবাবুর সঙ্গে আপনার আলাপ রয়েছে পূর্ব্বে থেকে।'

আমি বিমূঢ়দৃষ্টিতে লোকটির দিকে চাহিয়া ছিলাম, কেন না হাজার চেষ্টা করিয়াও মনে করিতে পারিতেছিলাম না যে ইহাকে কোথাও দেখিয়াছি। এখানে ত নয়ই। কথাবার্ত্তার ভাবে বোধ হইতেছে এখানে থাকেও না। তবে?

মধুকাকা কিন্তু খুব সপ্রতিভ।

হলধরবাবুর প্রশ্নে আবার কপালে চক্ষু তুলিয়া বলিলেন 'আলাপ! সে আজকের আলাপ না কি? শৈলেনবাবুকে

আজ দেখছি না কি ? হলধর হাসালে শৈলেনবাবু—বলে শৈলেনবাবুর সঙ্গে আলাপ আছে দেখছি ! আপনার সঙ্গে যেন আজকের পরিচয়। সেই ইয়ের কথা মনে আছে ? অবশ্য বহুদিন হয়ে গেল।'

আমি স্মৃতিশক্তিকে আলোড়িত করিবার চেষ্টা ছাড়িয়া, একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া স্খলিতকণ্ঠে বলিলাম, 'আজ্ঞে খুব মনে আছে, সে কি ভোলা যায় ?'

কি খুব মনে আছে তাহা আপনাদের বলিতে পারিলাম না, কেন না সে সম্বন্ধে আমার নিজেরই কোন ধারণা নাই। তবে ও-প্রশ্নের আমার মুখে আর ও-ভিন্ন উত্তর ছিল না।

আমার এ বিষয়ে একটু দুর্বলতা আছে।

ইনসিওরেন্স কোম্পানীর এজেন্ট নমস্কার করিবার জন্য কপালে হাত তুলিতে গিয়া একবারে স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। 'বাই জোভ ! আপনাকে যেন কোথায় দেখেছি মশাই ! দাঁড়ান,—'

মনে করিবার জন্য বগ দুইটা টিপিয়া একটু পরে তর্জনীটা উঁচাইয়া বলিল, 'হয়েছে ! লালগোলায়, ঈমার ঘাটে।'

জন্মে কখন লালগোলা ঘাট দেখি নাই। কিন্তু ঘাবড়ে হইলাম ; কুণ্ঠিত স্বরে বলিলাম,—'হবে—'

'হবে কি মশায় ! অবধারিত সত্য। আচ্ছা, লালগোলা ঘাটের দিকে কখন গিয়েছিলেন কি না বলুন ত—খুব মনে করে বলুন।' স্থির দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

আমি এত জোরে মনে করিলাম যে, কপালে ঘাম জমিয়া গেল। বলিলাম 'একবার যেন গিয়েছিলাম বলে মনে হচ্ছে।'

'মনে হচ্ছে কি মশায় ! নিশ্চয় গিয়েছিলেন। আমার ত ভুল হবার কথা নয়। অত ভুল হলে কি একলা মানুষ এতগুলো ইনসিওরেন্সের ব্যাপার সামলাতে পারতাম ? দাঁড়ান—গাড়ী থামতেই বৃষ্টি নামল—গাড়ী লেট, ওদিকে ঈমার ছাড়ে - ভিজে চুপসে গেছেন, সুটকেশ-সুদ্ধ—টেনে ছাতার মধ্যে নিয়ে নিলাম, আপনাকে সামলাতে নিজে পেছনে আছাড় খেলাম—মনে পড়েছে এবার ?'

অল্প হাসির সহিত আবার অপলক দৃষ্টিতে মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

কপালের ঘাম মুছিয়া বলিলাম, 'হ্যাঁ, এইবার পড়েছে মনে।'

লালগোলার ঘাটে কবে আছাড় খাইয়াছিল জানি না, তবে আবার আপাতত প্যাচে বাগাইয়া দিয়া এক আছাড় দিল। নিরুপায় ভাবে ইনসিওরড হইলাম।

দোকানে গিয়া বলিলাম, 'শাড়ী দেখাও দিকিন।' ছোকরা বেচনদার প্রশ্ন করিল, 'কি রকম শাড়ী দেব ?'

আমি উত্তর দেওয়ার আগেই গদির ওপর হইতে দোকানী ছোকরাকে এক ধমক দিল, 'খদ্দের চেন না ? —আবার জিগ্যেস করছ ? বের কর বাত্রাজী, শান্তিপুরী আর গুজরাটী শাড়ীর গাঁট কটা।···খদ্দের 'এই জিনিস চাই' বলেই খালাস, তারপর চোখের সামনে তাঁর পছন্দসই জিনিস বিছিয়ে দিয়েছি—আর আজকালকার এইসব ছোকরাদের দেখুন না—কি রকম শাড়ী যদি খুঁটিয়েই বলবেন ত তুই কি করতে আছিস ? তা ভিন্ন বাবু কি এই আজ প্রথম এলেছেন ? বছরের মধ্যে বোধ হয় কম করে বরলেও আট দশ খেপ মাল নিয়ে যাচ্ছেন, তবুও ভুল করবি ? আরে গেল !'

অবশ্য সে দোকানে এই প্রথম যাওয়া। কিন্তু সে কথা বলা গেল না। আটপৌরে একজোড়া শাড়ীর দরকার ছিল। দুই জোড়া মাদ্রাজী আর একজোড়া দামী শান্তিপুরী লইয়া বাড়ী ফিরিলাম।

ষ্টেশনে নামিলে, তাহারই গাড়ীতে নিত্য চড়ি,—চেনা লোক বলিয়া জোর করিয়াই ড্রাইভার লগেজসুদ্ধ একরকম জবরদস্তিই নিজের গাড়ীতে টানিয়া তুলিয়াছে—এমন ঘটনা আমার জীবনে বিরল নয়।

এই সবে ক্রমেই একটা ধারণা কেমন বদ্ধমূল হইয়া যাইতেছে যে, কে আমায় চেনে, কাহাকে আমি চিনি, কি কি ঘটনা সব আমার জীবনে কবে, কোনখানে ঘটিয়াছে, এ-সব সম্বন্ধে আমার কিছু জানা নাই, জোর করিয়া কিছু

বলা নিতান্ত অশোভন। সব চেয়ে নিরাপদ—যাহারা একটু জোর করিয়া বলিবার শক্তি রাখে তাহাদের কাছে আত্মসমর্পণ।

তাহাই করি; হলধরের কাকাকে বলিলাম, 'আজ্ঞে খুব মনে আছে, সে কি ভোলা যায়?'

হলধরবাবু বলিলেন, 'তবে কাকা, আপনি ততক্ষণ শৈলেনবাবুর সঙ্গে বসে একটু আলাপ করুন, কোণের ঘরটা খালি আছে। আমি একবার ওদিকে—'

মধু কাকার শীর্ণ মুখে খুব দুষ্টুমি একজোড়া কাঁচা-পাকা গোঁফে। তাচ্ছিল্যের হাসিতে সেটা আরও দুলাইয়া বলিলেন, 'আরে সে তুমি বলবে তবে? এতদিন পরে শৈলেনবাবুকে পেয়েছি আমি ছেড়ে দিতে পারি কখনও, না উনিই আমায় ছাড়বেন? কি বলুন শৈলেনবাবু?'

ক্লান্তির মধ্যে আবার হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলাম—'বিলক্ষণ! তা কখন পারি? কতদিন পরে দেখা।

হলধর বাবু চলিয়া যাইতে যাইতে আবার ঘুরিয়া আসিয়া বলিলেন—'তা হ'লে আর একটা কথা বলে যাই কাকা, জায়গা হলে তুমি ওঁকে একটু দেখো—যেন সাটের মধ্যে বসে ওঁর খাওয়ার কোন বিঘ্ন কি অসুবিধে…'

একটা জরুরী কাজে ওদিক থেকে কে ডাকিল, 'হলধর বাবু'। 'তাহ'লে আসি কাকা, নিশ্চিন্দি হইলাম' বলিয়া ত্রস্তপদে চলিয়া গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে খবর আসিল—জায়গা হইয়াছে।

ক্ষুধায় নাড়ি চন্ চন্ করিতেছিল। প্রথমতঃ, চার মাইল পথ ছ্যাকরা গাড়ীতে অতিক্রম করার জন্য, দ্বিতীয়তঃ, অসহায় ভাবে মধু কাকার গল্প শুনিতে শুনিতে। হেন বস্তু নাই যা লোকটা জানে না, হেন জায়গা নাই দেখে নাই, হেন মানুষ নাই চেনে না।… বদরিকাশ্রম, রেঙ্গুন, জওহরলালের পারিবারিক জীবন, হাওড়ার নূতন পুলের কন্ট্রাক্ট,এ সব সম্বন্ধে এত পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর এর পূর্ব্বে কোথাও পাই নাই। অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলাম। আহারের ডাক পড়িতেই—'তাহ'লে ওঠা যাক্ এবার'—বলিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলাম। একটি স্বস্তির নিশ্বাসও পড়িতে যাইতেছিল, মধু কাকা আস্তিনে টান দিয়া বলিলেন—'বসুন একটু।'

মুখের দিকে চাহিয়া চতুর দৃষ্টি হাসিয়া ঈষৎ হাস্যের সহিত প্রশ্ন করিলেন—'বুঝেছেন ত?'

বুঝিবার কিছুই খুঁজিয়া পাইলাম না, ক্ষুধার চোটে চিন্তার শক্তিও ভাগে হইয়া আসিয়াছিল, তবু হতাশ দৃষ্টিতে যতটা সম্ভব বুদ্ধির দীপ্তি ফুটাইবার চেষ্টা করিয়া হাসির অভিনয় সহকারে বলিলাম—'আজ্ঞে হ্যাঁ, সেই ঠিক।'

ঘনিয়া দেখিতে লাগিলাম—একটু সুবিধামত জায়গা পাইবার জন্য নিমন্ত্রিতের দল ঠেলাঠেলি করিয়া চলিয়াছে। একটি ক্ষুদ্র তৃণাসন, সামনে কাঠি দিয়া গাঁথা শুষ্ক জীর্ণ কয়েকখানি শালপত্র, পাশে আকারহীন একটি মৃৎ-জলাধার—মানব-সভ্যতার একেবারে আদিযুগের সাক্ষ্য। হায়, তাও বুঝি আজ অদৃষ্টে জুটিল না।

শেষ লোকটি পর্য্যন্ত যখন চলিয়া গেল, মধু কাকা বলিলেন—'উঠুন এবার, কি বলেন?'

বলিলাম—'হ্যাঁ, এইবার ওঠা চলে।'

ঘরে, বারান্দায়, ততক্ষণ সমস্ত আসন অধিকৃত। লোলুপ দৃষ্টিতে সুদূর কোণটি পর্য্যন্ত সন্ধান করিলাম, সব ভর্ত্তি। পরিবেশকরা লুচি দিতে আরম্ভ করিয়াছে। হিঙের সম্বরাদেওয়া কুমড়ার ছক্কা আর টাটকা লুচির একটা অপরূপ মিশ্র সুবাস উঠিতেছে, তাহার সঙ্গে চারিদিকেই যুক্তকু স্বাদ্বোর একটি মিষ্ট কলরব।… কি জোর কপাল এদের!

মধু কাকার ভ্রূক্ষেপ নাই, মোটা গোঁফজোড়ার পিছনে লিক্‌লিকে শরীরটি লইয়া ঝাঁকিয়া বাঁকিয়া পাশ কাটাইয়া ডিঙাইয়া চলিয়াছেন—তাঁহার উপরেই যেন আজকের সবচেয়ে গুরুভার, ভাবটা ঠিক এই রকম। শুধু বারান্দায় পহুঁছিতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া আমার পানে চাহিয়া বলিলেন—'ওপরে চলে আসুন।'

অগ্রসর হইয়া বলিলেন—'ওহে পথ ছাড় দিকিন। আহা, করো পরিবেশন, শৈলেন বাবু! দেখতে পাচ্ছ না? · ডিঙিয়েই আসুন না পাতটা মশাই, ছেলে মানুষ ওরা, দোষ কি? এই দিকে · এই যে, নমস্কার; আমাদের শৈলেন বাবু—চেনেন বোধ হয়, ভিড়ের মধ্যে তো ওঁর চলবে না। একটু ব্যবস্থা করে দিগে…আসুন, শৈলেন বাবু চলে আসুন—অত জড়সড় হয়ে চললে কি

নিমন্ত্রণ-বাড়ীতে চলে?···শৈলেন বাবু আমাদের চির-কালটা সেই একভাবেই রইলেন।' ছাদেও অনেকগুলি লোক বসিয়াছে তবে ভিড় অপেক্ষাকৃত কম। মধু কাকা একটি পংক্তির শেষ দিকে আমায় লইয়া দাঁড়াইলেন। একটি ধুবক লুচির ঝুড়ি লইয়া যাইতেছিল, হাঁক দিলেন এবং সে নিকটে আসিলে বলিলেন, 'রাখ দিকিন।···একটি আসন নিয়ে এস—দুখানা, নৈলে বসতে কষ্ট হবে শৈলেন বাবুর. আরও একটু তফাৎ করে পেছাও···হয়েছে···তিন খানা পাতায় কি দরকার ওঁর। মিতাহারী সদাচারী লোক ···তা দিয়েছ দাও, নেড়ে চেড়ে খেতে সুবিধে হবে।

'নিন্, এবার বসে পড়ুন শৈলেন বাবু। কোন ভাবনা নেই, এই আমি গ্যাট হয়ে বসলাম।'

'নাও এইবার লুচি দাও।'

ছোকরা পাঁচ দশ বার লুচি গুছাইয়া লইয়া পরিবেশন করিতে যাইতেছিল। মধু কাকা, 'হাঁ—হাঁ কর কি!' বলিয়া অর্দ্ধেক দাঁড়াইয়া উঠিলেন, তাহার পর ডান হাতের দুইটি আঙুল বিস্তারিত করিয়া বলিলেন—'তিন খানি—হদ্দ চারখানি—খুব ফুলকো, গরম গরম বেছে, ব্যস—শৈলেন বাবুর খোরাক জান না?···আপনাকে ভেবেছে কি এরা মশাই? চার খানাই দিক্—না তিন খানা?'

লুচির গোছার পানে একবার সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাস জোরে চাপিয়া বলিলাম—'না, চারখানা চলবে না।'

মধু কাকা বিজয়ানন্দে তর্জ্জনী ঘুরাইয়া বলিলেন—'চলবে না', ঐ শোন। শৈলেন বাবুর খোরাক আজ দেখছি, হুঁ···তিনখানা হদ্দ চারখানা। আজ কিন্তু রাত হয়ে গেছে কত! আর এতটা পথ যেতে হবে না? কিন্তু তা হলেও তুমি দাও চারখানাই, কোন রকমে রাজী করব শৈলেন বাবুকে।'

লুচির ওদিকে জোর তাগাদা চলিয়াছে, আড়চোখে দেখিলাম, বুধুদের মতই শুভ্রকান্তি চক্রগুলি পড়িতে না পড়িতেই অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে। ওদিকে চার পাঁচ জন হিমসিম খাইয়া যাইতেছে, জোগান দিতে পারিয়া উঠিতেছে না। এ ছোকরারও টান পড়িল। মধু কাকা বলিয়া দিলেন - বেগুন ভাজা পাঠিয়ে দাও।'

তাহার পর ডাকিলেন—'ওহে জলের ভাঁড়!'

একটি ছোট ছেলে জল দিতেছিল, উপস্থিত হইলে বলিলেন—'ভাঁড়টি রাখত বাবা; একটি ভাঁড় এইখানেই লেগে যাবে, শৈলেন বাবুর জলের টান জাননা ত - তুমি এই ছিলিমটি পালটে নিয়ে এসতো বাবা··রামজীবন চাকর, চেন ত? যাও, খাসা ছোকরা বাঃ।'

বেগুন ভাজা আসিল।

মধু কাকা বলিলেন—'দাও।···না দুখানাতে হবে না, আরও দুখানা দাও। ওটি ওঁর চিরকালের পেয়ারের জিনিস—জানা আছে কি না। তোমার হাতে কি হে?'

বেগুনের পিছনে ছিল কুমড়ার ছক্কা। ছোকরা এক হাতা তুলিতেই মধুকাকা হাত উঁচাইয়া বারণ করিয়া উঠিলেন—'না, ও চলবে না। হিং দেওয়া ত? উনি ওটা একেবারেই বরদাস্ত করতে পারেন না। ···না, দেবে একটু, শৈলেন বাবু? কি রকম রাঁধলে দেখতেন একটু বেশি ভেদ করছি না। সামান্য একটু, আহে খাতিরে পড়েও ত ঢেঁকি গেলে লোকে।'

নিজের রসিকতায় উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন।

আমি কোন রকমে মাথা তুলিয়া আড়ুল কয়টি জড় করিয়া বলিলাম 'খুব সামান্য দেবেন।'

ছোকরা আধ-হাতা তুলিয়াছিল, মধু কাকা ব্যস্ত হইয়া উঠায় তাহারও অর্দ্ধেকটা কাড়িয়া লইয়া বাকিটুকু অতি সন্তর্পণে আমার পাতে দিয়া দিল। মধুকাকা বলিলেন—'যাও, ভাল পাঠিয়ে দাও।'

আহার করিতে লাগিলাম। ততক্ষণে আসে-পাশের নিমন্ত্রিতদের মধ্যে আমার মিতাহার সম্বন্ধে বেশ একটি চাঞ্চল্যকর কৌতূহল পড়িয়া গেছে। ক্ষুধায় পিত্ত জ্বলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু পাছে একটুও ব্যস্ততা লক্ষিত হইলে মধু কাকার কথার সঙ্গে না খাপ খায়, সেই ভয়ে সেই চারখানি লুচি, বেগুন ভাজা আর দড়ি পরিমাণ ছক্কাকে যতটা সম্ভব টানিয়া বাড়াইতে লাগিলাম।

মধু কাকা আশ্বাস দিতে লাগিলেন, 'আপনি খুব রয়ে বসে চিবিয়ে চিবিয়ে খান, শৈলেনবাবু, আমি রয়েছি।'

যাহাকে কলিকা বদলাইতে পাঠান হইয়াছিল সে ফিরিয়া আসিল। কলিকাটি হুঁকায় বসাইয়া দু'একটি টান দিয়াছেন, এমন সময় যে ছোকরা ছক্কা দিয়া গিয়াছিল সে পিতলের বালতিতে জল লইয়া উপস্থিত হইল এবং হাতটি ডুবাইয়া একটু নাড়িয়া চাড়িয়া আমার পাতে ঢালিয়া দিল। খানিকটা স্বর্ণাভ ডালের সঙ্গে আধখানা কই মাছের মুড়া আমার পাতটিতে গড়াইয়া পড়িল।

সঙ্গে সঙ্গেই হুলুস্থুল কাণ্ড! মধু কাকা হুঁকাসুদ্ধ এক রকম প্রায় লাফাইয়া উঠিলেন—'অ্যাঁ! করলে কি হে! সব মাটি? এতক্ষণ বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে এসে শেষকালে ঘরে মরালে? শৈলেনবাবু রাত্তিরে মাছ খান না, বরাবর সবার এ কথা জানা—আর নাই জান, দেখছ ত কত সামলে কি করে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে আসছি··হিংয়ের গন্ধ বলে ডালনাটাতে পর্য্যন্ত এখনও হাত দেন নি, আর তুমি কি না

স্বচ্ছন্দে এক হাতা মুড়োসুদ্ধ ডাল হড় হড় করে ঢেলে দিলে! কি রকম বেয়াক্কেলে ছোকরা! একটু কাণ্ডজ্ঞান নেই···দেখছ, ঐ জন্যে আমিষ থেকে আলাদা করে বসিয়ে কত হেপাজৎ করে খাওয়ান হচ্ছে...এই টুকুও যদি বোঝবার ক্ষমতা নেই ত পরিবেশন করতে নেমেছ কেন বাপু?'

লোক জড় হইয়া গেছে। নিমন্ত্রিতদের হাত বন্ধ, 'কি হ'ল? শৈলেনবাবুর খাওয়া গেল বুঝি? না হয় অন্য একটা পাতা করে দিক না, একটু জিজ্ঞেস করে দিতে হয়, নিয়মই তাই পরিবেশনের'।

ছেলেটি ত লজ্জায় অপমানে কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। আমার যেন চোখ ফাটিয়া জল আসিতেছে—কতটা অবস্থাগতিকেও, কতকটা চোখের নীচেই মসলা আর ঘৃতপক্ক নবকান্তি মাছের মুড়াটার জন্য। কিন্তু মিতাহারের যশটা তখন ঘাড়ে জাঁকিয়া বসিয়াছে, অবশ্য অপযশের চেয়েও শুরুভার এবং দুর্বহ, কিন্তু ঝাড়িয়া ফেলি সে-ক্ষমতা আর আমার নাই তখন।

তবুও বলিলাম, 'একটা ভুল করে বসেছে ছোকরা, কি আর হবে, আমি ওগুলো ঠেলে সরিয়ে রাখছি পাতের ধারে।'

ছেলেটির জন্য কষ্ট হইতেছিল সত্য; কিন্তু পাতের একপাশে ঠেলিয়া রাখিবার আরও একটি উদ্দেশ্য ছিল, তাহা এখন আপনাদের বলিতে লজ্জা নাই। আধা ছিল পাতের এক পাশে থাকিলে কখন কখন একটু গড়াইয়া আসিবে; মধু কাকা পরিত্যক্ত পেয়ারের বেগুন যেন বিষ হইয়া উঠিতেছিল।

হায় রে দুরাশা!

মধু কাকা মাথা নাড়িয়া, হাত নাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন, 'আরে না, না, না, আপনি ভালমানুষ, বলবেনই, কিন্তু আমি বসে থেকে সেটা কি হতে দিতে পারি? হলধর আমার ওপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্দি আছে। না, পাতা সরিয়ে অন্য পাতা করে দাও। এইবার নিয়ে এস তিনখানি লুচি—একেবারে কড়া থেকে—থাক দু'খানিই নিয়ে এস, একটা বিস্ব হয়ে গেল, চাপ খাওয়া খাইয়ে কাজ নেই, খান দু'এক বেগুন ভাজা···ছকা উনি ছোন নি, কাজ নেই জবরদস্তি করে—আর যাও, নিরিমিষ ডাল, কপি আছে? হিং টিং দেওয়া নেই? নিরিমিষ ত? —নিয়ে এস তা হলে। গেরো ঘটিয়েছিল আর কি!'

আমার পাশেই একটি বৃদ্ধ দন্তহীন মুখে পোয়াটাক ওজনের একটা ল্যাজা লইয়া কসরৎ করিতেছিলেন, এত গোলমালেও বিরাম ছিল না; এবার তাহার শেষ কাঁটাটি পরিতোষ সহকারে চুষিয়া লইয়া বলিলেন, 'মাছ যাসে হ'ল আমুষিক আহার, চল্লিশের পর এসব ছেড়ে দেওয়াই ভাল; উনি ঠিকই করেছেন।'

প্রথম কুধার ধারটা কমিয়া গিয়াছে। সকলের, বিশেষ করিয়া বয়স্থদের মধ্যে সংযত আহারের প্রশংসাটা বেশ ছড়াইয়া পড়িল। সেই সঙ্গে আমারও যশটা বহু করিয়া বাড়িয়া চলিল এবং অচিরেই আমি শূন্যপাত্র সমেত সকলের পরম দর্শনীয় হইয়া পড়িলাম।

নিরামিষ ডাল আর কপি আসিল। কপিটা পুড়িয়া গিয়াছে; কাজের বাড়িতে অল্প ও আলাদা করিয়া রাঁধা নিরামিষ তরকারীগুলা প্রায়ই যায়। তবুও তাহাই অমৃতস্বাদে দু'একবার মুখে দিয়াছি, এমন সময় শব্দ হইল, 'দোঁকার ডালনা! দোঁকার ডালনা চাই? দোঁকা···'

আমি হাত বন্ধ করিয়া উৎকর্ণ হইয়া মুখ তুলিলাম, আশায়, আনন্দে বুকটা টিপ টিপ করিতেছে, আসল আমিষ ত পোড়া অদৃষ্টে জুটিল না, সিদ্ধটিকরা আমিষে তবু যদি একটু মাখনা পাওয়া যায়।

'দোঁকা! দোঁকার ডালনা!'

একটি কাল, নিতান্ত অপরিচ্ছন্ন গোছের যুবা মালদা লইয়া পরিবেশন করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছে; মনে হইতেছে যেন সাক্ষাৎ দেবদূত। পিছন হইতে, অন্য পংক্তি হইতে তাগাদা আসিতেছে, 'দোঁকাটা একবার দেখিয়ে যাবেন মশাই!···একবার ঘুরে যেও ভাই···'

একজন রসিক গোছের কে একজন বলিল, 'একবার এস দাদা, সত্যিই যেন দোঁকা দিও না।'

মধু কাকার হুঁকার ঘড়ঘড়ানি শুনিতেছি। সিধা হইয়া বসিয়া অপলক নেত্রে দোঁকার দিকে চাহিয়া রহিলাম। মোগলাই গন্ধটা ক্রমেই বাতাসটাকে আকুল করিয়া তুলিতেছে। স্খলিতদন্ত বৃদ্ধ স্খলিতস্বরে বলিলেন, 'আর ফিরে ক'বার আসবে, হ্যাঁ—ও একেবারেই দিয়ে যাও।' পাতের নাকখানটায় বেশ ভাল করিয়া পরিষ্কার করিয়া দিলেন। একরাশি ধূমায়মান দোঁকার সুবাস ভুরভুর করিয়া উঠিল।

তাহার পরই একটু জায়গা ছাড়িয়া আমার পাতা। হাতায় তুলিয়া দিতে যাইতেই মধু কাকা উঠিয়া পড়িলেন এবং হাতে হুঁকা ধরিয়া কোমর আর ঘাড় বাঁকাইয়া বলিলেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, দাও ঢেলে, মালসাসুদ্ধ ছেড় না। আমি সেই থেকে লক্ষ্য করে আছি, কি না দেখি কি করে—ডালের বেলা একবার দা খেয়ে শৈলেনবাবু পাত ছেড়ে সোজা হয়ে বসে আছেন, পাছে ভুলের চোটে আবার একটা বিভ্রাট ঘটে, তা তোমাদের কি বোঝবার কোন ক্ষমতা আছে? আপনি মুখ ফুটে বলবেন শৈলেনবাবু, যেটা খেতে চাইবেন, যেটা না চাইবেন, এত লজ্জাই

কি, আর সঙ্কোচই বা কি, শেষে···।' কেহ বোধ হয় অস্বীকার করিবেন না যে, দারুণ ক্ষুধায় বয়সনির্বিচারে সকলকেই ছেলেমানুষ করিয়া তোলে। আমি প্রায় কাঁদ কাঁদ হইয়া গিয়াছিলাম, কোন রকমে সামলাইয়া লইয়া কুণ্ঠিত ভাবে কহিলাম, 'এই বারণ করতে যাচ্ছিলাম, আর কি···।'

বৃদ্ধ একটু বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করিলেন, 'দোকাও খান না।'

মধু কাকা বলিলেন, 'না শৈলেনবাবুর প্রাণ ওতে সায় দেয় না। ওটা আত্মাকে একটা প্রবঞ্চনা কি না। মাংস খাব না ত আসল-নকল কিছুই খাব না—এই হচ্ছে শৈলেন বাবুর কথা। ওঁকে ত আজ থেকে দেখছি না।'

বৃদ্ধ মুখের দোকার রসে একটা সকারবহুল শব্দ করিতে করিতে বলিলেন—'কথাটা অতি উত্তম—মাংস যখন খাব না, তখন দোকা খেয়ে আত্মাকে বঞ্চনা করি কেন—বাঃ, সাধু!·· তবে দেবার জন্যে ছোকরা যখন তুলেছে তখন আবার রেখে না দিয়ে·····'

নিরাশায় এবং তাহার উপর আবার সাধুবাদের অত্যাচারে পিত্ত যেন জ্বলিয়া উঠিল, যথাসম্ভব মনের ভাব গোপন করিয়া বলিলাম—'না, না, রেখে দেব কেন, আপনাকেই দিই না, কতটুকুই বা, দাও ভাই ঐ পাতে দিয়ে দাও···'

বৃদ্ধ হাসিয়া পাতের চারিদিকের পাহাড়টা পিছনে ঠেলিয়া দিয়া দোকার জন্য আর একটু জায়গা করিয়া দিলেন, বলিলেন—'ঐ এক হাতার বেশী দিও না কিন্তু। খাওয়া এমনি ছেড়েই দিয়েছি। নেহাৎ দোকাটা একটু উৎরে গেছে, তাই···'

তরকারী-পর্ব শেষ হইল—খান পাঁচেক বেগুন ভাজা, একটু নিরামিষ ডাল আর সামান্য দধ কপির ডালনা।

আর হ্যাঁ, শেষে একটু চাটনি জুটিয়াছিল। মধু কাকা বলিলেন—'না, শৈলেনবাবু, এতে আপত্তি করলে শুনব না; গুরুতর আহারের পর চাটনি একটু খেতেই হবে। আচ্ছা বেশি দেবে না, আমি দেখছি···'।

মরিয়া হইয়া বোধ হয় এক্ষেত্রে মনের ভাবটা চাপিতে পারিতাম না; কিন্তু অনুকূল রসনা বড় বেশি সজল হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়াই বাক্য নিষ্ফল করা গেল না। মধু কাকার নিরবচ্ছিন্ন সতর্ক দৃষ্টির সামনে পিতলের চামচের একপ্রান্ত থেকে অল্প একটু রসের সঙ্গে দুইটি আলুবোখারা আর গুটি ছয় দানাদার কিসমিস নিতান্ত অপরাধীর মত মৃদুপ্রায় পাতের উপর আসিয়া পড়িল।

হলধরবাবু উপরে আসিলেন। চারিদিক দেখিতে শুনিতে আবার পাতের সামনে আসিয়া একটু বিস্মিত হইয়া বলিলেন—'এ কি শৈলেনবাবু পাতে যে কিছুই···

মধু কাকা হুঁকা হাতে দাঁড়াইয়া উঠিলেন, বলিলেন—'না—ব ঠিক আছে, তোমার কিছু ভাবতে হবে না। আমি পুরো চার্জ নিয়ে বসে আছি···উনি যা খান তা যথাস্থানেই পৌঁছবে, পাতে তুমি আর দেখবে কোথায়!'

বলিয়া হাঃ হাঃ করিয়া নিজের রসিকতায় আবার হাসিয়া উঠিলেন এবং তাহার পর হলধরবাবুর পিঠে গোটাকতক চাপড় দিয়া বলিলেন—'তুমি বরং নীচের দিকটা সামলাও—আমি যেতে পারছি না; ছেড়ে নড়বার জো নেই, সব বাটি ক'রে বসবে···'

নীচে থেকে ডাক পড়িল—'তা'হলে আমি নিশ্চিন্দি, কাকা রইলেন শৈলেনবাবু, যেন কোন···'

বলিলাম—'বিলক্ষণ!'

মধু কাকা বলিলেন—'কিছু ভাবতে হবে না; তুমি বরং একছিলিম তামাক সেজে পাঠিয়ে দাও···এখানে সব নির্ভুল চলবে,—আজকের পরিচয়! নাড়ীনক্ষত্র জানা আছে যে

দই আসিল। মধু কাকা তখন হুঁকার নূতন সাজা কলকে বসাইয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়াছেন, তাহিনে বাঁয়ে অল্প অল্প দুলিতেছেন—তরকারির কাঁড়া গেল এখন মিষ্টান্নের আক্রমণ হইতে কোন প্রকারেই আমায় যেন রক্ষা করিতেই হইবে।

'হাঁ—হঃ—হঃ—হাঁ—হাঁ: নয়, দই নয়—ন রাত্রৌ দধি-ভক্ষণম্—দেখলে কত সাধ্যিসাধনা করে, অনেক কষ্টে একটু চাটনি নিতে রাজী করালাম আর তুমি কি না সেই লোকের পাতে দৈ দিতে চলেছ!···তোমার হাতে ও কি?—বোঁদে? না, চলবে না।'

ছোকরা বলিল একটু…'

মধু কাকা বিরক্ত হইলেন—'আমায় যদি ওঁর খাওয়া সম্বন্ধে এতই অজ্ঞ মনে কর তোমরাই ওঁকে বল—রাজী কর। তবে হলধরের কাছে আমার কোন জবাবদিহি রইল না।'

—বলিয়া মুখটা অন্যদিকে ঘুরাইয়া সঘন তামাক টানিতে লাগিলেন।

বলিলাম—'না, বোধে দইটারই একটা অঙ্গ কি না…'

কথাটার দুইটা মানেই হয়, আমার অদৃষ্টে সোজা মানেটাই খাটিল। মধুকাকা বিস্ময়ের উৎফুল্লতায় মুখটা ঘুরাইয়া বলিলেন—'হ'ল ত? তোমরাই না হয় শৈলেনবাবুকে আজ দেখছ…বলে দই-ই নিলেন না ত বোধে! আরে দই ছাড়া বোধে সে ত হল যেমন…'

তর্কবিতর্কেই অমূল্য সময়টা কাটিয়া যায় দেখিয়া বৃদ্ধ অসহিষ্ণুভাবে তাগাদা দিলেন—'এই ছেলেটির পাতে একটু বোধে।'

দেখিলাম ছেলেটির দরকার নাই, তাঁহার নিজেরই পাত শূন্য।

মধু কাকা বলিলেন—'যাও, সন্দেশটা পাঠিয়ে দাও।'

বোধের পরিবেশক ঘুরিয়া বলিল—'সন্দেশ হয় নি ত, রসগোল্লা আর লেডিগেনী হ'য়েছে, নিয়ে আসছে।'

মধু কাকা একেবারে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন—'অ্যাঁ, শৈলেনবাবুকে নেমন্তন্ন করা হ'য়েছে আর সন্দেশ করা হয় নি! হলধর এ করলে কি! আমি যার ভরসায় রয়েছি—জিনিষটা ওঁর বরাবরই প্রিয়—অবরদস্তি গোটাকতক নেয়াবই—আর তুমি বললে কি না—সন্দেশের পাটই নেই!…'

সন্দেশ জিনিষটাকে আমি দু'চক্ষে দেখিতে পারি না। ও ছানার-ছাতু আমায় গলা দিয়া কখনও নামে না, তাহার উপর কান্না ঠেলিয়া উঠিয়া গলা আজ যেন একেবারে কাঠ হইয়া আছে।

মধু কাকা একেবারে মুষড়াইয়া গেলেন। রসগোল্লা আর লেডিগেনী আসিলে হতাশভাবে বলিলেন—"আরে ও কি খান কখনও শৈলেনবাবু যে বলব নেতে ওঁকে?"

খাইতে বলিলেনও না, তবে অবশ্য বারণও করিলেন না, কেমন যেন একটা ছাল ছাড়িয়া দেওয়া ভাবে তামাক টানিতে লাগিলেন।

আমি রসগোল্লাটা বাসি ভাল, পানতুয়া বা লেডীগেনীটা ততোধিক। কিন্তু প্রাণ ধরিয়া একটাও লইতে পারিলাম না।

তাহার কারণ, মধু কাকা দেখিলাম একেবারে দমিয়া গিয়াছেন, এর উপর যদি যে-রসগোল্লা-লেডিগেনী, তাঁহার মতে আমার অভক্ষ্য, তাহারই দুই চারিটা খাইয়া ফেলি ত ব্যাপারটা বড়ই মর্ম্মন্তুদ হইয়া পড়িবে। আর যে-জিনিষটা ভালবাসি না লোভের বশে সেইটাই আহার করিয়া ফেলিলে মুখ দেখাবই বা কেমন করিয়া লোকসমাজে?

যে ছেলেটি পরিবেশন করিতেছিল তাহাকে বলিলাম 'না, আর দরকার নেই, খাওয়াটা চাপ হ'য়ে গেছে।'

শেষের কথাটুকু ব্যঙ্গ,—শেষে ঐটুকুতেই যৎসামান্য সান্ত্বনার চেষ্টা করা গেল। হায়, কেই বা বুঝে ব্যঙ্গ!—তাঁহার কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়া যাওয়ায় মধু কাকা আবার উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। বলিলেন—'দেখলে ত? আসল কথা ও-দুটো জিনিস ওঁর রোচে না—কোন কালেই রোচে নি। তোমরা না হয় শৈলেনবাবুকে আজ দেখছ; কিন্তু আমার ত আজকের পরিচয় নয়, শৈলেনবাবু কি খান না খান আমার কাছে লিখিয়ে টিপসই করে নাও; অক্ষরে অক্ষরে না মেলে, যা চাও জরিমানা দিচ্ছি, হুঁ…কি হে ছোকরা, পান দিচ্ছ?…না, শৈলেনবাবু পান খান না।…সুপুরি লবঙ্গ দিয়ে একটু মসলা করে নিয়ে আসবে শৈলেনবাবু? না, তাও ছেড়ে দিয়েছেন এখনি?'

নিমন্ত্রিতেরা সব উঠিয়া পড়িয়াছে, বৃদ্ধ বা হাতটি কাটিতে চাপিয়া উঠিতে চেষ্টা করিতেছেন। চারিদিকে স্বজনের প্রশংসা এবং তৃপ্ত উদ্গারের মধ্যে আমার তখন চোখ কাটিয়া জল গড়াইয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। উঠিতে উঠিতে বলিলাম—'না, আজকাল হজমিই খাই একটু খেয়ে উঠে; তা সে পকেটেই আছে, আপনাকে আর কষ্ট দেব না।'

একটা মস্তবড় কাজ শেষ পর্য্যন্ত সামলাইয়া লইবার আনন্দে মধু গুড়ো মুদু হাস্যের সহিত ঘন ঘন তামাক টানিতে লাগিলেন।

[illegible]

"ত্বমস্মিস্তং ধান্যরূপাসি প্রাণেনা প্রাণদায়িনী"

রঙ্গশ্রী

চৈত্র—১৩৪৫

৫ম বর্ষ, ১ম খণ্ড—৩য় সংখ্যা

সম্পাদকীয়

—শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য

গান্ধীজী ও তাঁহার অনুচরবর্গ কি দেশ-প্রেমিক না, আত্মবিক্রীত দেশদ্রোহী ?

পাঠকগণ অবগত আছেন যে, কয়দিন পূর্ব্বে গা
করিয়া উপবাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন
ভঙ্গ করিয়াছেন।
গান্ধীজীর এই উপবাসে

বুঝি আমরা
বলিতেছি, বুঝিতে হইলে
কারণ কি, তাহার সন্ধান করিতে হইবে।

সকলেই জানেন যে, রাজকোট রাজ্যের সংস্কার সাধন করিবার জন্য সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল এবং রাজকোটের ঠাকুর সাহেবের একটী কমিটী সংগঠিত করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল। এই প্রস্তাবানুসারে উপরোক্ত কমিটীতে দশ জন সভ্য নিযুক্ত করিবার কথা হয় এবং স্থির হয় যে, ঐ দশজনের তিনজন সভ্য ঠাকুর সাহেব নিজেই মনোনীত করিবেন এবং বাকী সাতজনের নাম সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল নিরূপণ করিয়া ঠাকুর সাহেবের চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য তাঁহার কাছে উপস্থিত করিবেন। বল্লভভাই যে-কোন সাতজনের ঠাকুর সাহেব স্বেচ্ছায় সর্দ্দার জনকেই সভ্যরূপে গ্রহণ করিবেন, মধ্যবর্ত্তী হইয়া ঠাকুর সাহেব ব্যবস্থা করিবেন, নতুবা তিনি উপবাস করিয়া করিবেন।

কাযেই যাইতেছে
মূলে মূলতঃ দুইটী কারণ বিদ্যমান

সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের রাজকোটের শাসন-সংস্কার করিবার আন্দোলন (২) ঐ আন্দোলনে ঠাকুর সাহেবের বিরোধিতা। ইহা ছাড়া আরও দেখা যাইতেছে যে, বল্লভভাই প্যাটেলের দেশীয় রাজ্যশাসন-সংস্কারের আন্দোলন যাহাতে সাফল্যমণ্ডিত হয়, তাহা করিবার জন্য গান্ধীজী বড়লাট সাহেবের সহায়তা পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে বদ্ধপরিকর।

এক্ষণে অনুসন্ধান করিতে হইবে যে, দেশীয় করদ রাজ্য-শাসনসংস্কারের আন্দোলন উপস্থিত হয় কেন? এই সম্বন্ধে কংগ্রেস নেতাগণ যাহা যাহা বলিতেছেন, তাহা হইতে বুঝিতে হয় যে, ভারতবর্ষে সর্ব্বব্যাপী প্রজাতন্ত্র শাসন-পদ্ধতি যাহাতে প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা করাই তাঁহাদিগের কংগ্রেসের অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য। কাযেই, তাঁহারা যে, ভারতবর্ষের করদ রাজ্যগুলি যাহাতে প্রজাতন্ত্রের নীতি অনুসারে শাসিত হয় তজ্জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিবেন, তদ্বিষয়ে বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই।

দেশীয় করদ রাজ্যগুলির শাসনপদ্ধতি লইয়া কংগ্রেসের নেতৃবর্গের এই আন্দোলন যে তাঁহাদিগের কংগ্রেসের মূল নীতির সহিত সামঞ্জস্যযুক্ত, তদ্বিষয়ে যুক্তি-যুক্ত ভাবে অস্বীকার করা যায় না। তবে প্রশ্ন এই যে, যে-গান্ধীজী অসহযোগ-নীতির প্রণেতা এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের কোন অধ্যায়েই ইংরাজ রাজ-পুরুষগণের সহায়তা না লইতে অঙ্গীকারাবদ্ধ, সেই গান্ধীজী রাজকোটরাজ্যের শাসনপদ্ধতির সংস্কারবিষয়ক আন্দোলনে বড়লাট সাহেবের সহায়তা লইতে বদ্ধপরিকর হন কোন্ যুক্তিক্রমে? উহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, গান্ধীজীর এই কার্য্যটি তাঁহার মূল অসহযোগ-নীতির সহিত সামঞ্জস্যবিহীন। কাযেই, এক্ষণে আবার অনু-সন্ধান করিতে হইবে যে, গান্ধীজীর এই সামঞ্জস্যবিহীন কার্য্যটী কি কোন ভ্রমপ্রণোদিত অথবা অন্য কোন কূট অভিসন্ধিমূলক? গান্ধীজী সাধারণতঃ কোন ভ্রমে পতিত হন না, ইহা তিনি নিজে প্রায়শঃ বলিয়া থাকেন এবং তাঁহার অনুচরবর্গও ঐ কথা সর্ব্বদাই ঘোষণা করিয়া থাকেন। তাঁহার অনুচরবর্গের যদি এতাদৃশ ধারণা না থাকিত, তাহা হইলে আজ তাঁহারা গান্ধীজীকে সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের ডিক্টেটর করিতে পারিতেন না এবং গান্ধীজীর নিজের এইরূপ ধারণা না থাকিলে তিনি ভারতবর্ষের ডিক্টেটরের গুরু দায়িত্বভার লইতে স্বীকৃত হইতেন না। আমাদিগের বিশ্বাস যে, গান্ধীজী ভারত-বর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায় যাহা যাহা মৌলিক ভাবে কর্ত্তব্য তৎসম্বন্ধে বরাবরই ভুল করিয়া আসিতেছেন এবং দেশের ও দেশবাসীর সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছেন বটে, কিন্তু তথাকথিত রাষ্ট্রনৈতিক চালে অথবা কপটতার কার্য্যে তাঁহার প্রায়শঃ কোন ভুল হয় না। পূর্ব্বাপর চিন্তা করিলে এক্ষেত্রেও ভ্রমবশতঃ যে তাঁহার কার্য্যে মূল অসহ-যোগনীতির সহিত সামঞ্জস্যের অভাব ঘটিয়াছে, ইহা মনে করা যায় না। কাযেই, ভ্রমবশতঃ যে তাঁহার কার্য্যে সামঞ্জস্যের অভাব ঘটিয়াছে ইহা মনে করা চলে না, পরন্তু কোন কূট উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া যে তিনি করদ রাজ্যসমূহের শাসনপদ্ধতির সংস্কারকার্য্যে বড়লাট সাহেবের সহায়তা লইতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, ইহা স্থির করিতে হয়।

এক্ষণে আবার প্রশ্ন হইবে যে, গান্ধীজীর এই কার্য্যে কোন্ শ্রেণীর কূট উদ্দেশ্য থাকিতে পারে?

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, গান্ধীজী ও সর্দ্দার প্যাটেলপ্রমুখ তাঁহার অনুচরবর্গ যেরূপ বর্ত্তমানে দেশীয় করদ-রাজ্যসমূহের শাসনপদ্ধতির সংস্কারের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, ঠিক একই সময়ে ইংরাজ রাজ-পুরুষগণ এবং ইংরাজী সংবাদ-পত্রসমূহও ঐ সংস্কারের জন্য অত্যন্ত উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছেন। ইংরাজ রাজ-পুরুষগণ এবং ইংরাজী সংবাদপত্রসমূহ যে করদ-রাজ্য-সমূহের শাসনপদ্ধতির সংস্কারের জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন, তাহার সাক্ষ্য—

(১) ১লা মার্চ্চে প্রকাশিত বড়লাট সাহেবের জয়-পুরের বক্তৃতা।

(২) ২রা মার্চ্চে প্রকাশিত বড়লাট সাহেবের যোধ-পুরের বক্তৃতা।

(৩) ৩রা মার্চ্চে প্রকাশিত লর্ড জেটল্যাণ্ডের বিলাতের বক্তৃতা।

(৪) ৪ঠা মার্চ্চে প্রকাশিত ষ্টেট্‌সম্যান সংবাদপত্রের

"Worthless Ruler (অযোগ্য শাসক)" শীর্ষক সম্পাদকীয় সন্দর্ভ।

৬ই মার্চ্চে প্রকাশিত বড়লাট সাহেবের উদয়পুরের বক্তৃতা।

(৬) ৮ই মার্চ্চে প্রকাশিত ষ্টেটস্‌ম্যান সংবাদপত্রের "Moral Issues (নীতিগত প্রশ্নাবলী)" শীর্ষক সন্দর্ভ।

(৭) ১০ই মার্চ্চে প্রকাশিত ষ্টেটস্‌ম্যান সংবাদপত্রের "Indian India (ভারতীয় ভারত)" শীর্ষক সন্দর্ভ।

উপরোক্ত চারিটী বক্তৃতা ও তিনটী সম্পাদকীয় সন্দর্ভ পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে, দেশীয় রাজন্যবর্গের কু-শাসন উৎপাটন করিয়া একমাত্র প্রজাবর্গের হিতসাধনের উদ্দেশ্যেই ইংরাজ-রাজপুরুষগণ ও ইংরাজ-পরিচালিত সংবাদপত্রসমূহ ভারতবর্ষের করদ রাজ্যসমূহের শাসন-পদ্ধতির সংস্কার প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিতেছেন, অথবা এক কথায় তাঁহাদিগের কথানুসারে বিশ্বপ্রেমের চরিতার্থ করাই তাঁহাদিগের উপরোক্ত শাসনসংস্কারের উদ্দেশ্য। পূর্ব্বাপর চিন্তা করিলে, একমাত্র ভারতবাসিগণের হিতসাধন করিবার জন্যই অথবা বিশ্বপ্রেম চরিতার্থ করিবার জন্যই যে ইংরাজরাজপুরুষগণ ও সাংবাদিকগণ করদ-রাজ্যসমূহের শাসন-সংস্কার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, এই কথা স্বীকার করা যায় না। ইংরাজ জনসাধারণের মধ্যে যাঁহারা কোন রাজনীতির সহিত সংশ্লিষ্ট নহেন, তাঁহাদিগের অনেকেরই যে বিশ্ব-প্রেম ও ভারতীয় জনসাধারণের হিতচেষ্টা আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না বটে, কিন্তু উহাঁদিগের মধ্যে যাঁহারা রাজনৈতিক ধুরন্ধর অথবা statesmen, তাঁহাদিগের যে কি ইংরাজ অথবা কি ভারতীয় কোন জনসাধারণের জন্যই কোনরূপ প্রকৃত হিতসাধনচেষ্টা আছে, তাহা প্রমাণ করিবার কোন সাক্ষ্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই ইংরাজ ষ্টেটস্‌ম্যানগণের প্রাণে যদি কোন জনসাধারণের দুর্দ্দশার জন্য কোনরূপ আকুলতা বিদ্যমান থাকিত, তাহা হইলে ইংরাজ ও ভারতীয় জনসাধারণের উভয়েরই অর্থাভাবে, অস্বাস্থ্যে এবং অশান্তিতে সমানভাবে জর্জ্জরিত হইত না। জনসাধারণের দুঃখদুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য কোন খাঁটী (sincere) আকুলতা এই রাজনৈতিকগণের প্রাণে বিদ্যমান থাকিলে এতদিনে তাঁহাদিগের সমস্যাসমূহ সমাধান করিবার কোন না কোন সূত্র এই ষ্টেটস্‌ম্যানগণের মস্তিষ্ক হইতে আবিষ্কৃত হইত।

আমাদিগের সন্দেহ হয়, ভারতীয় করদ-রাজ্যসমূহের শাসন-পদ্ধতি সংস্কৃত করিবার উদ্দেশ্য অন্যরূপ।

ভারতীয় করদ-রাজ্যসমূহ যদিও প্রকারান্তরে ইংরাজ-রাজপুরুষগণের করতলগত, তথাপি এখনও তাঁহারা আইনতঃ প্রত্যক্ষভাবে ঐ করদ-রাজ্যসমূহের কোন নূতন আইন অথবা কোন নূতন বাণিজ্য-নীতি প্রবর্ত্তিত করিতে সক্ষম নহেন, এবং কোন চাকুরী নিয়োগেও তাঁহাদিগের ক্ষমতা অপ্রতিহত নহে। উপরোক্ত বিষয়সমূহে এখনও করদ-রাজ্যের শাসনকর্ত্তাগণ কথঞ্চিৎ পরিমাণে স্বাধীনতা উপভোগ করিয়া থাকেন। ১৯৩৫ সালের সংস্কৃত আইনে যে যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা বিদ্যমান আছে, করদ-রাজ্যসমূহের উপরোক্ত স্বাধীনতা খর্ব্ব করা উহার অন্যতম উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে। সকলেই জানেন যে, ১৯৩৫ সালের সংস্কৃত আইনে যে যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা বিদ্যমান আছে, সেই যুক্তরাষ্ট্রে যেমন ইংরাজশাসিত ভারতবর্ষের প্রতিনিধি থাকিবে, সেইরূপ করদ-রাজ্যের প্রতিনিধিও লওয়া হইবে। ইহা হইতে কি বুঝায় না যে, করদ-রাজ্যসমূহকে অনেকাংশে ইংরাজশাসিত প্রদেশসমূহের একই স্তরে পরিবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা এই যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনায় বিদ্যমান আছে? আরও একটু অগ্রসর হইলে ইহাও কি সন্দেহ করা যায় না যে, ভারতবর্ষের মানচিত্রের যে স্থানগুলি এখনও রক্তবর্ণে রঞ্জিত করা সম্ভব হয় নাই, সেই স্থানগুলি যাহাতে অন্ততঃপক্ষে কার্য্যতঃ গভীরতরভাবে রক্তাক্ত হইয়া যায়, তাহা করা যুক্তরাষ্ট্র-পরিকল্পনার অন্যতম বিশেষ উদ্দেশ্য?

আমাদিগের মনে হয়, এই উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্যই ইংরাজ-রাজপুরুষগণের পক্ষ হইতে করদ রাজ্যগুলির শাসন-সংস্কার করিবার জন্য এত ব্যাকুলতা দেখা যাইতেছে, কারণ, করদ-রাজ্যগুলির শাসন-ব্যবস্থা সংস্কৃত না হইলে তাহাদিগকে পুরাপুরি ভাবে যুক্তরাষ্ট্রের

সভ্যশ্রেণীর অন্তর্গত করিয়া তোলা সম্ভবযোগ্য নহে। আমাদিগের মতানুসারে করদ-রাজ্যগুলির শাসন-ব্যবস্থা এখনও সংস্কৃত করা সম্ভবযোগ্য হয় নাই বলিয়াই প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা এতাবৎ কার্য্যে পরিণত করা হয় নাই এবং যে মুহূর্ত্তে ঐ সংস্কার-কার্য্য সম্পূর্ণ হইবার আশা দেখা যাইবে, সেই মুহূর্ত্তেই যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা কার্য্যে প্রবর্ত্তিত হইবে। অবশ্য যুক্তি অনুসারে এ কথা আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হইলে অথবা করদ-রাজ্যসমূহের শাসন-সংস্কারের নামে উহাদিগকে এমন কি সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের করতলগত করিয়া তুলিলে ব্রিটিশ ভারতের প্রজাগণের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। কাযেই উহার জন্য আমাদিগের কোন অনুশোচনা করিবার যুক্তি দেখা যায় না।

মোটের উপর যুক্তিসঙ্গতভাবে ইহা সন্দেহ করা যাইতে পারে যে, ভারতীয় করদ-রাজ্যসমূহকে অধিকতর মাত্রায় স্বরাজাপন্ন করিবার জন্যই ইংরাজ-রাজপুরুষগণের পক্ষ হইতে উহাদিগের শাসনপদ্ধতি সংস্কারকার্য্যে এত ব্যাকুলতা দেখা যাইতেছে। তাহার পর আবার যখন দেখা যাইতেছে যে, ঐ করদ রাজ্যসমূহের শাসনপদ্ধতির সংস্কারকার্য্যে মিঃ গান্ধী এবং সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ব্যাকুলতাও অকিঞ্চিৎকর নহে, অধিকন্তু ঐ কার্য্যে যাহাতে বড়লাট সাহেব হস্তক্ষেপ করেন, তজ্জন্য গান্ধীজী প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিতে প্রস্তুত, তখন ইহা সন্দেহ করা কি অমূলক হইবে যে, ভারতবর্ষের মানচিত্রের যে সমস্ত স্থান এখনও লালবর্ণে রঞ্জিত হয় নাই, সেই সমস্ত স্থান যাহাতে কার্য্যতঃ লালবর্ণে রঞ্জিত হয়, তাহা করিবার জন্য ইংরাজ-রাজপুরুষগণের সহিত গান্ধীজী ও সর্দ্দার বল্লভভাই প্রমুখ তাঁহার অনুচরবর্গের যোগাযোগ আছে?

ইংরাজ রাজত্ব যাহাতে ভারতবর্ষে বৃদ্ধি পায়, আমরা তাহার কামনাযুক্ত, কারণ, আমাদিগের মতে ইংরাজের দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তৃত্বাধীনে ভারতবাসী জনসাধারণের অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব ও শান্তির অভাব বিদূরিত হইবার সম্ভাবনা যত অধিক, দেশীয় শাসনে উহা তত অধিক নহে, ইহারই জন্য আমরা এমন কি গান্ধীজীর স্বাধীনতা আন্দোলনের পর্য্যন্ত বিরোধী।

কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি যে, বাস্তবতঃ স্বাধীনতার আন্দোলন করা এবং ইংরাজগণের হাত হইতে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা কাড়িয়া লইবার অভিনয় করা, আর কার্য্যতঃ ভারতবর্ষের যে স্থানগুলি এখনও আংশিক ভাবে স্বাধীনতা উপভোগ করিতেছে, সেই স্থানগুলির ঐ আংশিক স্বাধীনতা ইংরাজের হাতে তুলিয়া দিবার সহায়তা করা কি প্রকৃত দেশপ্রেমের পরিচায়ক? ইহারই জন্য আমরা প্রশ্ন করিতেছি যে, গান্ধীজী ও তাঁহার অনুচরবর্গ কি দেশপ্রেমিক না আত্মবিক্রীত দেশদ্রোহী? ভারতবর্ষের বর্ত্তমান কংগ্রেসটী কি কোন বুদ্ধিমান্ মানুষের আজ্ঞা, না অপর কিছু, তাহা পাঠকবর্গ একবার ভাবিয়া দেখিবেন কি?

মিঃ গান্ধীর অনশন ও তাহার তাৎপর্য্য

এই প্রকার অনশন—ধর্ম্মমত, নীতি, শরীর-বিজ্ঞান, অর্থনীতি কিংবা রাজনীতি, কোন দিক্ দিয়াই সমর্থন করা যায় কি না, তাহার আলোচনা করাই আমাদের এই সন্দর্ভের উদ্দেশ্য।

ইউরোপীয় রেনাইসেন্স-যুগের আমল হইতে বর্ত্তমান যে চিকিৎসা-বিজ্ঞান মানব-সমাজে দেখা দিয়াছে, তাহা মনুষ্য-জীবন কিংবা ব্যাধির মূল কারণ অনুসন্ধান না করিয়াই সম্প্রতি কিছুকাল হইতে নির্ব্বিচারে উপবাস সমর্থন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তথাকথিত বিজ্ঞান-বীরদের মতে, এই চিকিৎসা-বিজ্ঞান যথেষ্ট উন্নতি ও কৃতকার্য্যতা প্রদর্শন করিয়াছে। কিন্তু ইহার প্রকোপেই বর্ত্তমান মনুষ্য-সমাজকে অভূতপূর্ব্ব ভাবে সংখ্যাহীন ব্যাধি এবং অকালমৃত্যুতে প্রপীড়িত হইতে হইতেছে। যদি 'ফলেন বৃক্ষ পরিচীয়তে', এই প্রবাদ-বাক্যকে যথাযোগ্য সম্মান দান করা যায়, তবে আমাদের মত এই যে, এই চিকিৎসা-বিজ্ঞানকে কোনক্রমেই নির্ভরযোগ্য কিংবা বিশ্বাসযোগ্য বলা চলে না।

ভারতীয় ঋষিরচিত মূল শাস্ত্রাদিতে অনশনের উপযোগিতা সম্বন্ধে কি উল্লেখ আছে, তাহা স্থির করিতে হইলে আমাদিগকে যজুর্ব্বেদের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে এবং প্রকৃত অর্থে উহা উপলব্ধি করিতে হইলে মহানির্ব্বাণ, শারদাতিলক, প্রপঞ্চসার এবং ঈশান শিবগুরুদেব পদ্ধতি, এই কয়খানি তন্ত্র অধ্যয়নের সাধনা স্বীকার করিতে হইবে। এই সকল গ্রন্থ প্রকৃত অর্থে বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, মাত্র দুইটি ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি অনশন গ্রহণ করিতে পারেন বলিয়া ইহাতে নির্দ্দেশ দান করা হইয়াছে এবং এই দুই ক্ষেত্র ব্যতীত আর কোন ক্ষেত্রে যদি কোন ব্যক্তি অনশন গ্রহণ করেন, তবে তাহাকে পাপী আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। যদি কেহ অসুস্থ হন কিংবা আত্মতত্ত্ব, অর্থাৎ প্রকৃত শরীর-গঠন ও শরীর-বিধান বিজ্ঞানের নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে চাহেন, তবে তাঁহাকে খাদ্য-পরিপাকের কার্য্য হইতে পাকস্থলীকে নিষ্কৃতিদান করিতে হইবে, কিন্তু আর কোন অবস্থাতেই এই ব্যবস্থার নির্দ্দেশ নাই, কেন না পাকস্থলীর শূন্যতা হয় শারীরিক অসুস্থতা নয় মানসিক পাপ-প্রবৃত্তি আনয়ন করিতে বাধ্য। এই সকল শাস্ত্রানুযায়ী মনুষ্যজীবন প্রধানতঃ, বায়ু (প্রচলিত অর্থে নহে, প্রকৃত অর্থে), বহ্নি (প্রকৃত অর্থে) এবং অম্বু (প্রকৃত অর্থে),—এই তিনটি উপাদানের, সুষুম্না, ইড়া, পিঙ্গলা, এই তিনটি প্রধান শারীর-নালীর মধ্যস্থ সহজ সঙ্করণের ফল। ইহারা যথাক্রমে পশ্চাৎ হইতে সম্মুখে এবং একটি বামে, অপরটি দক্ষিণে অবস্থিত। এই তিনটি প্রধান শারীর নালীর অভ্যন্তরস্থ সহজ সঙ্করণ—সত্ত্ব (অর্থাৎ সংক্ষেপে শরীরস্থ অণু সকলের নিমিত্ত তিনটি উপাদানের কার্য্য আত্মা (অর্থাৎ সংক্ষেপে সত্ত্বার ইন্দ্রিয় উৎপত্তির কার্য্য), শরীর (অর্থাৎ সংক্ষেপে আত্মা কর্ত্তৃক অস্থি, বসা, মাংস ও ত্বক্ প্রভৃতি সংগঠনের কার্য্য), মনুষ্যদেহের এই তিনটি ক্রিয়ার পরস্পর সংযোগ উপস্থিত করে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত মনুষ্য-দেহের তিনটি প্রধান শারীর-নালীর অভ্যন্তরস্থ তিনটি উপাদানের সহজ সঙ্করণ বাধামুক্ত থাকে, মনুষ্যদেহের যে তিনটি প্রধান ক্রিয়ার কথা বলা হইল, তাহাদের পরস্পর সংযোগও ততক্ষণ স্বচ্ছন্দ থাকে এবং দেহ সুস্থ থাকে। যখন কেহ দৈহিক উপসর্গে পীড়িত অথবা অসুস্থ হয় অথবা মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তখন বুঝিতে হইবে যে, তাহার দেহস্থ তিনটি প্রধান প্রণালীর অভ্যন্তরে তিনটি উপাদানের সঙ্করণ বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং ফলে উপরে যে তিনটি শক্তির উৎসের কথা বলা হইয়াছে, তাহাদের পরস্পর সংযোগ ব্যাহত হইয়াছে।

এই অবস্থায় মনুষ্যদেহের ব্যাধিসমূহের চিকিৎসার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক পন্থা হইতেছে, প্রধান তিনটি প্রণালীর মধ্যস্থ তিনটি উপাদানের সহজ সঙ্করণ পুনরানয়নের চেষ্টা করা। এতদর্থে প্রথম কর্ত্তব্য হইতেছে, ইহাদের অতিরিক্ত কার্য্য বন্ধ রাখা। তিনটি উপাদানের সহজ সঙ্করণের দিক্ হইতে খাদ্যদ্রব্যের পরিপাক-ক্রিয়া অতিরিক্ত কার্য্য এবং এই জন্যই কেহ শারীরিক উপসর্গে পীড়িত হইলে উপবাস করা নিশ্চিত বিধেয় বলিয়া বিবেচিত হয়।

কিন্তু যখন তিনটি উপাদানের সহজ সঙ্করণ অব্যাহত থাকে, তখন মনুষ্যদেহ সর্ব্বপ্রকারে ক্রিয়াশীল থাকে এবং রক্ত-মাংসের দাবী উপস্থিত হয়। এ অবস্থায় খাদ্য-দ্রব্যের অত্যন্ত প্রয়োজন এবং তখন উপবাস অত্যন্ত ক্ষতিজনক।

কখনও কখনও বহিঃস্থ কারণেও অসুস্থতা ঘটে। এই অবস্থায় কেবল মানসিক উপসর্গ দেখা যায়, শারীরিক উপসর্গ থাকে না। এই রূপ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ উপবাস প্রায়ই অত্যন্ত অনিষ্টকর হয়।

সুতরাং বলিতে হয় যে, অসুস্থতার কোন কোন নির্দ্দিষ্ট অবস্থায়, সকল অবস্থায় নহে, উপবাস আবশ্যক বটে, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে উপবাস অত্যন্ত অনিষ্টকর এবং ফলতঃ পাপ।

প্রাগুক্ত শাস্ত্রসমূহ অনুযায়ী যদি কেহ আত্মতত্ত্বের সাধনায় নিযুক্ত থাকেন, তবে অসুস্থ না হইয়াও উপবাস করিলে অনিষ্ট কিংবা পাপ হয় না।

এই সাধনায় নিযুক্ত হইতে হইলে উপবাস ব্যতীতও আরও অনেক ক্রিয়াকলাপের প্রয়োজন। যদি কেহ বিধিবদ্ধ ক্রিয়াকলাপ উপেক্ষা করিয়া কেবল উপবাস করেন, তবে কোন না কোন ভাবে তিনি অসুস্থ হইতে বাধ্য এবং তাঁহাকে পাপী বলিতে হইবে।

ঐ সকল শাস্ত্র যে প্রকৃত ভাষা-বিজ্ঞানের ভিত্তিতে লিখিত আমাদের হিন্দু পণ্ডিতবৃন্দ তাহা বিস্মৃত হইয়াছেন এবং সেইজন্য তাঁহারা ভারতীয় ঋষিরচিত মূল শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য সম্বন্ধে অন্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। ফলতঃ শাস্ত্রের

নামে তাঁহারা
তাঁহাদিগকে
করিতেছেন।

এই নিখিল যে পণ্ডিতবৃন্দ একদিন বিশ্বব্যাপী প্রচারে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহারা সর্ববাপী উপহাসের পাত্র হইয়া পড়িয়াছেন এবং মানব-সমাজের সর্বনাশ সাধন করিতেছেন। এই পণ্ডিতবৃন্দের অজ্ঞতার ফলেই 'মানবধর্ম' অভিহিত ভারতীয় ঋষিদের মূল ধর্ম লুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং ধর্মের নামে নানাপ্রকার বাদবিসংবাদ সৃষ্টি হইয়াছে।

বিশ্বাস করিবার কারণ আছে যে, মূল বাইবেল ও কোরাণ প্রকৃত অর্থে পাঠ করিতে পারিলে ঐ একই তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যাইবে।

ধর্ম, নীতি ও শরীর-বিজ্ঞানের দিক্ দিয়া তাহা হইলে মিঃ গান্ধীর অনশন সমর্থন করা যায় না, ইহা বলিতেই হইবে এবং এই দিক্ হইতে তাঁহার অনশনকে পাপকার্য বলিয়া আখ্যাত করিতে হইবে। বিবেচনাশক্তিসম্পন্ন পাঠক নিশ্চয়ই বুঝিবেন যে, পুণ্যাত্মাদের ফলে অসুস্থ হইতে হয় না এবং চারিদিন উপবাস করিয়াই মিঃ গান্ধী যে অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন, এই ঘটনাই নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন করে যে, মিঃ গান্ধী উপবাস করিয়া পাপাচরণ করিয়াছেন। বিবিধ বক্তৃতায় তিনি ভগবদ্ভক্তি ও ধর্মপরায়ণতার কথা বলিয়া থাকেন বটে, কিন্তু তাঁহার এই অনশন-কার্য দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, তিনি নিজেকে এবং জনসাধারণকে, উভয়কেই প্রতারণা করিতেছেন এবং প্রকৃতপক্ষে ভগবান ও ধর্ম বলিতে কি বুঝা যায়, তাহার উপলব্ধি নিমিত্ত বিন্দুমাত্র চেষ্টাও তাঁহার নাই।

মিঃ গান্ধীর অনশন অর্থনীতির দিক্ হইতে সমর্থনযোগ্য কি না স্থির করিতে হইলে, আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মানব-সমাজের বর্তমান অবস্থায় সর্ববাপী অনাহার-সমস্যার সমাধানই অর্থনৈতিক কর্তব্যের প্রথম সোপান। এই সমস্যার সমাধানে মিঃ গান্ধীর উপবাস সামান্য মাত্রও কার্যকরী হইতে পারে কি না, আমরা এক্ষণে তাহাই আলোচনা করিব। পাঠক বিদিত আছেন যে, রাজকোটের জনসাধারণের কল্যাণ-কামনায় প্রস্তাবিত কমিটীর সদস্য নির্বাচন সংশোধনের উদ্দেশ্যেই মিঃ গান্ধী অনশন আরম্ভ করেন। বলা হইতে পারে যে, প্রস্তাবিত কমিটীতে যদি যথাযোগ্য ব্যক্তিবৃন্দ আসন লাভ করেন, তবে রাজকোটের জনসাধারণের আর্থিক সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা ঘটিবে এবং যদি অযোগ্য পাত্রের স্কন্ধে ঐ ভার ন্যস্ত হয়, তবে ঐ সমস্যার সমাধান হইতে পারে না—সেইজন্যই প্রস্তাবিত কমিটিতে যথাযোগ্য ব্যক্তিদের নির্বাচন-ব্যাপারে মিঃ গান্ধী এত ব্যগ্র হইয়াছিলেন। ইহার উত্তরে বলিতে হয় যে, মনে রাখা প্রয়োজন, অনাহার-সমস্যার সমাধানের সামর্থ্য মানব-সমাজের কোন শ্রেণীবিশেষের একচেটিয়া নহে; ইহা যে কোনও ব্যক্তিসমষ্টি লাভ করিতে পারেন কিংবা তাঁহাদিগকে তাহাতে শিক্ষিত করা যাইতে পারে; এবং ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, কোনও প্রদেশবাসী কিংবা দেশবাসীর প্রভাবসম্পন্ন শ্রেণীবৃন্দের মধ্যে কোন প্রকার অনৈক্য কিংবা বাদ-বিসংবাদ বিদ্যমান থাকিলে কোনপ্রকারেই ঐ সমাধান সম্পূর্ণরূপে সফল হইতে পারে না।

উপরে যে যুক্তি ও তাহার প্রতিযুক্তি উপস্থিত করা হইল, তাহা যথাযথভাবে অনুধাবন করিতে পারিলে অনায়াসেই বুঝা যাইবে যে, রাজকোটের জনসাধারণের আর্থিক সমস্যার সমাধান যে-কোনও সদস্যমণ্ডলী কর্তৃক সাধিত হইতে পারে, যদি অবশ্য তাঁহারা সমাধান-প্রণালী শিক্ষা করিতে যত্নবান্ হন, কিন্তু রাজকোটের রাজা কিংবা রেসিডেন্টের সহিত জনসাধারণের যদি প্রত্যক্ষ কিংবা অপ্রত্যক্ষ কোন-প্রকার মনোমালিন্য বা বিবাদ বর্তমান থাকে, তবে উহা কোন ক্রমেই সাধিত হইতে পারে না। আর্থিক দিক্ হইতে প্রস্তাবিত কমিটীর সদস্য-নির্বাচন বিষয়ে মিঃ গান্ধীর ব্যগ্রতাকে তাহা হইলে নিষ্প্রয়োজনীয় বলিতে হয় এবং উপরন্তু বলা চলে যে, জনসাধারণের স্বার্থের পক্ষে ইহা অনিষ্টকর, কেন না রাজকোটের রাজা এবং তদ্রূপ জনসাধারণের মধ্যে ইহা প্রত্যক্ষ অনৈক্য না হইলেও অপ্রত্যক্ষ অনৈক্য আনয়ন করিবে।

আর্থিক দিক্ হইতে মিঃ গান্ধীকে সুতরাং অনৈক্যের সৃষ্টিকর্তা বলিতে হইবে—ইহা অসুরের কার্য।

রাজনৈতিক দিক্ হইতে মিঃ গান্ধীর কার্যের প্রশংসা করা যায় কি না, তাহা স্থির করিতে হইলে আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, রাজকোটের রাজা সম্মত না হইলে তিনি বড়লাটের হস্তক্ষেপ যাচ্ঞা করেন। ইহার ফলে অবশ্য

ব্রিটিশ ভারতে যেরূপ শাসনতন্ত্র সৃষ্টি হইয়াছে, রাজকোটেরও সেইরূপ একটি শাসনতন্ত্র লাভ হইতে পারে। যে ভাবেই হউক, ইহাতে সম্ভবতঃ ভারতের দেশীয় রাজ্যের ভারতীয়ত্বের কার্যতঃ অবসান ঘটিবে। যদি ব্রিটিশ ভারতের প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন কোনরূপ প্রশংসার যোগ্য হয়, তাহা হইলে মিঃ গান্ধীর উপবাসকে রাজনৈতিক দিক্ হইতে সমর্থন করিতে হইবে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে—ব্রিটিশ ভারতের প্রাদেশিক শাসনতন্ত্র কি কোনপ্রকার প্রশংসার যোগ্য?

কোন প্রদেশ কিংবা দেশের রাষ্ট্রিক সংগঠনকে যদি কেবল দেশবাসীর তথাকথিত রাষ্ট্রীয় কামনার পূরক না ধরিয়া আর্থিক সমস্যার পূরক বলিয়া ধরা হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশ-সমূহে বর্তমান প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন কল্পনাপ্রসূত নাটকের দৃশ্যবিশেষ ব্যতীত আর কিছুই নহে, কেন না, ইহা মন্ত্রিমণ্ডলকে সংখ্যাধিক্যের সমর্থন বজায় রাখিবার নিমিত্ত সর্বদা চক্রান্তে লিপ্ত হইতে বাধ্য রাখে এবং জনসাধারণের আর্থিক প্রয়োজন পূরণকল্পে পরিকল্পনা গঠনের অবসর লাভ হইতে তাঁহাদিগকে বঞ্চিত রাখে। যতদিন পর্যন্ত প্রদেশসমূহে এই প্রকার স্বায়ত্তশাসন সৃষ্টি হয় নাই, আমরা ব্রিটিশ রাষ্ট্র-বিদ্গণের অধীন ছিলাম এবং জানিতাম যে, জনসাধারণের কল্যাণের নিমিত্ত তাঁহারাই দায়ী। কিন্তু প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন সৃষ্টি হইবার পর হইতে অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ব্রিটিশ রাষ্ট্রবিদ্গণই ভারতের কর্ণধার আছেন ইহা সত্য, কিন্তু তাঁহারা এ ভাবে তাঁহাদের রাষ্ট্রনায়কত্ব ব্যবস্থিত করিয়াছেন যে, দেশবাসীর দুরবস্থার জন্য তাঁহা-দিগকে কিছুতেই দায়ী করা যায় না। এই দায়িত্ব আইনতঃ এমন ব্যক্তিবৃন্দের স্কন্ধে ন্যস্ত করা হইয়াছে, যাঁহারা দেশের প্রকৃত ধনসৃষ্টির উপায় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং হয় ধনীর দুলাল, নয় রাজের ধন কি করিয়া প্রজাকে বিলাইয়া জন-সাধারণের মাথায় কাঁঠাল ভাঙিয়া খাইতে হয়, তাহারই শিক্ষায় শিক্ষিত। ব্রিটিশ ভারতের প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন বস্তুতঃ দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া নেপথ্য হইতে নির্দেশদানের সুযোগ সৃষ্টি। কোনক্রমেই ইহার প্রশংসা করা যায় না। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, ইহার জন্য আমাদিগের কলহ করিবার কারণ নাই, কেন না, ইহা আমাদেরই ইচ্ছাপ্রসূত এবং আমাদেরই সৃষ্টি। কিন্তু রাষ্ট্রনীতি বলিতে প্রকৃতপক্ষে যাহা বুঝা যায়, আমাদের যদি তৎসম্বন্ধে কোন জ্ঞানজ্ঞান থাকে, তাহা হইলে ভারতীয় দেশীয় রাজ্যে ইহার প্রসার দাবী করা আমাদের উচিত নহে।

সুতরাং মিঃ গান্ধীর অনশনকে রাষ্ট্রনীতির দিক্ হইতেও সমর্থন করা যায় না।

যদি উপরের যুক্তিসমূহ অনুধাবন করা যায়, তাহা হইলে স্বতঃই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় যে, সকল দিক্ হইতেই মিঃ গান্ধীর অনশন সমর্থনের অযোগ্য। মানুষ হিসাবে তিনি পাপাশয়, অর্থনীতিবিদ্ হিসাবে নির্বোধ এবং রাষ্ট্রনীতিবিদ্ হিসাবে অকল্যাণকৃৎ, কেন না তাঁহার এই অনশন-কার্য এবং বড়লাটের হস্তক্ষেপ দাবীর ফলে ভারতের দেশীয় রাজ্য আজিও যে সামান্য স্বাধীনতা ভোগ করিতেছে, তাহাও অন্তর্হিত হইবার সম্ভাবনা আছে। ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে আমাদের কোন জাতিগত বিদ্বেষ নাই এবং যতক্ষণ পর্যন্ত কোন সরকার জনসাধারণের স্বার্থের পক্ষে কল্যাণজনক ও হিতকারী হয়, ততক্ষণ সরকার যাঁহাদেরই দ্বারা পরিচালিত হউক আমাদের কোন আপত্তি নাই। আমরা জিজ্ঞাসা করিতে চাই, যদি মিঃ গান্ধী মানুষ হিসাবে পুণ্যাত্মা, অর্থনীতিবিদ্ হিসাবে সমর্থ, এবং রাষ্ট্রনীতিবিদ্ হিসাবে দেশানুরাগী হন, তবে কেন তিনি বড়লাটের হস্তক্ষেপ দাবী না করিয়া রাজকোটের বিশৃঙ্খলা নিবারণ করিতে পারেন নাই?

মিঃ গান্ধীর অনশন হইতে ভারতীয় জন-সাধারণের শিক্ষণীয় বিষয়

যদি মিঃ গান্ধী একাকী অনশন করিতেন এবং তাঁহার এই কার্যে তাঁহার সতীর্থ কাহারও সমর্থন লাভ না করিতেন, তবে আমাদের আর কিছু বলিবার থাকিত না। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ঘটনা অন্যরূপ ঘটিয়াছে। কেবল মিঃ গান্ধী একাকীই এমন একটি কার্য করেন নাই, যাহাকে সকল দিক্ হইতে পাপ-কার্য বলা যাইতে পারে, শিক্ষিত ভারতীয়-গণের অধিকাংশের প্রতিনিধি স্বরূপ তাঁহার সকল সতীর্থই তাঁহাকে এই কার্যে সমর্থন করিয়াছেন।

তাঁহাদের প্রায় সকলেই মিঃ গান্ধীর বহুআকাঙ্ক্ষিত

বড়লাটের হস্তক্ষেপ যাচ্ঞার বিষয় যাহাতে পূরণ হয়, তজ্জন্য দূত সঙ্কল্পের পরিচয় দান করিয়াছেন।

আমাদের মতে, ইহা হইতে নিরক্ষর ভারতীয় জনসাধারণের গভীর শিক্ষণীয় বিষয় আছে। তাঁহাদিগকে বুঝিতে হইবে যে, গান্ধী একাকীই যে পাপাত্মা, তাহা নহে, তাঁহার অনুচরবৃন্দও তাঁহারই তুল্য। ইহার অর্থ এই যে, যে-সকল ব্যক্তি আজ ভারতীয় নেতা বলিয়া বিকাইতেছেন, তাঁহাদের নেতৃত্বের উপযোগী চরিত্রবত্তা ও শিক্ষা, উভয়েরই অভাব এবং তাঁহারা বিশ্বাস কিংবা নির্ভরযোগ্য নহেন।

আমাদের ভুলিলে চলিবে না যে, দেশবাসীর দারিদ্র্য ও অস্বাস্থ্য দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে এবং অনতিবিলম্বে তাহার উপশম প্রয়োজন; এবং তজ্জন্য ভারতীয়গণের হয় একজন প্রকৃত নায়ক, নয় নেতৃত্বের যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিবৃন্দের একটি মণ্ডলীর অতি শীঘ্র প্রয়োজন।

ইহা সত্য যে, বর্ত্তমানে এমন একজন ভারতবাসী নাই, যাঁহার উপর লোকের প্রকৃত নায়িত্ব আরোপ করিয়া যথার্থ ভরসা করা যায়, সঙ্গে সঙ্গে ইহাও সত্য যে, জরুরী সমস্যা সমূহের সমাধানার্থ নেতারও অত্যন্ত প্রয়োজন। সুতরাং অপরিহার্য্য সিদ্ধান্ত দাঁড়ায় এই যে, আমাদিগের পন্থা-নির্দ্দেশার্থ সাময়িকভাবে বৈদেশিকগণের প্রয়োজন।

প্রশ্ন এই যে, এমন বৈদেশিকেরই বা সন্ধান কোথায় পাওয়া যাইবে? আমাদের মতে, এমন একটি অভারতীয় ব্যক্তিও পাওয়া যাইবে না, যিনি আমাদিগকে সমস্যা-সমাধান-পন্থার নির্দ্দেশ দান করিতে পারেন, কেন না এমন একজন কেহ থাকিলে, আমরা সমগ্র পৃথিবীতে এমন একটি দেশ—সেই ব্যক্তির বাসভূমি—দেখিতে পাইতাম, যেখানে বেকার এবং অন্নাভাবের সমস্যা বিদ্যমান নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সমগ্র পৃথিবীতে এমন একটি দেশও নাই, যে দেশ এই সকল বিপর্য্যয় হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত। সুতরাং ইহা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, অভারতীয়গণের মধ্যেও প্রকৃত নেতার সন্ধান মিলিবে না।

সুতরাং ভারতীয় নিরক্ষর জনসাধারণের একমাত্র পন্থা অবশিষ্ট থাকে, তাহাদিগের নিজেদেরই প্রকৃত নেতা তৈয়ারী কিংবা সৃষ্টি করিতে হইবে। ইতিমধ্যে দেশের প্রকৃত শাসক ব্রিটিশজাতি যে শাসনতন্ত্র চালাইতে চাহেন, তাহাতেই আমাদিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। যদি ব্রিটিশ জনসাধারণের চরিত্রের প্রকৃত বিশ্লেষণ করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, তাহারা সাধারণতঃ ভারতীয়গণের প্রায়ই নির্দ্দোষ ও অনুদার। যদি তাহাদের কোন দোষ থাকে, তবে তাহা রাজনীতির সহিত যাহারা বিশিষ্ট তাহাদের নহে, সে দোষ ভারতীয়দের মধ্যেও যেমন রাজনীতির সহিত যাঁহারা সংশ্লিষ্ট সেই সব ব্যক্তির। ব্রিটিশ ও ভারতীয়গণের মধ্যে যাঁহারা রাজনীতির সহিত সংশ্লিষ্ট নহেন, তাঁহাদের মিলিত কর্ত্তা হইতেছে, এমন কোন কার্য্যসূত্র অনুসরণ, যাহাতে ভারতীয় ও ব্রিটিশ উভয় জাতির রাজনৈতিক ধুরন্ধরগণের রাজনীতিজ্ঞানের সম্পূর্ণ অভাব ধরা পড়ে। ইহাঁরা যখন ভোটের নিমিত্ত তাঁহাদের শরণাপন্ন হন, তখন জনসাধারণের অন্নাভাব, চাকুরীরতপ্রার্থতা এবং অস্বাস্থ্যের কবল হইতে নিষ্কৃতিলাভের পরিকল্পনা কি, সোজাসুজি যদি তাঁহারা তাহা জানিবার দাবী জ্ঞাপন করেন, তবেই ইহা সম্ভব হইতে পারে। এই রাজনৈতিক ধুরন্ধরগণের যে জনসাধারণের এই সকল সমস্যা সমাধানের উপযোগী কোন সদ্ভববোধ পরিকল্পনা নাই, এই দাবীতে তাহা অনতিবিলম্বে সুপরিস্ফুট হইবে এবং ইহার ফলে তাঁহারা যে জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার গৌরবে ধরাকে সরা মনে করেন এবং নিজদিগকে অপরের তুলনায় শ্রেষ্ঠ মনে করেন, তাহার মূল্য ও উপকারিতা যাচাই করিতে তাঁহারা প্রবৃদ্ধ হইবেন।

যদি ব্রিটিশ জন-সাধারণ এই কার্য্যসূত্র অনুসরণ নাও করেন, কেবল ভারতীয় জনসাধারণ কর্ত্তৃক ইহা গৃহীত হয়, তবে ব্রিটিশজাতির রাজনীতিজ্ঞানের অভাব প্রতিপন্ন হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত নেতৃত্বের উপযোগী গুণাবলী কি, তৎসম্বন্ধে ভারতীয় নেতৃবৃন্দও ইহারই ফলে সজাগ হইবেন। জনসাধারণ কি এখনও এই সূত্রানুযায়ী কার্য্যে অগ্রসর হইবেন না?

মিঃ গান্ধীর উপবাসে ব্রিটিশ জনসাধারণের শিক্ষণীয় বিষয়

বড়লাটের হস্তক্ষেপ যাচ্ঞা করিয়া মিঃ গান্ধী নিশ্চয়ই ব্রিটিশ জাতিকে রসোপভোগের খোরাক জুগাইয়াছেন। বর্ত্তমানে

যে প্রকৃত পক্ষে ব্রিটিশ জাতি ভারতীয় অপেক্ষা চাতুর্য বিষয়ে অধিকতর সুনিপুণ, ইহা তাহারই একটি জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। এতদিন পর্য্যন্ত ইহার ফলে যাহা ঘটিয়াছে, তাহা ব্রিটিশ জাতির পক্ষে হয়তো ভালই হইয়াছে, কিন্তু আমাদের মনে অতঃপর যাহা ঘটিবে, তাহাতে ব্রিটিশ জাতির অনেক কিছু শিক্ষার বিষয় থাকিবে।

বড়লাট মিঃ গান্ধীকে সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত নিমন্ত্রণ করেন। জনসাধারণের নীতিবোধের উপর ইহার যেরূপ প্রতিক্রিয়া হইবে, তাহা মোটেই প্রীতিপ্রদ হইবে না।

সরকার মাত্রেরই প্রাথমিক কর্ত্তব্য হইতেছে ব্যক্তিত্বের মূল্য না দিয়া প্রজা-সাধারণের উপর অপক্ষপাতসূচক ব্যবহার, আমাদের এই অভিমত সকলেই সমর্থন করিবেন। সকল ক্ষেত্রেই অপরাধীকে অপরাধের জন্য দায়ী দেওয়া কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি দেশের সুপ্রতিষ্ঠিত আইন-কানুন লঙ্ঘন করিতে দ্বিধাবোধ করেন না, পক্ষান্তরে এমন মতবাদ প্রচার করেন, যাহাতে অপরেও উহা লঙ্ঘনে প্ররোচিত হয়, সর্ব্বাবস্থাতেই তাঁহাকে অপরাধী বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। যে আইন নিকৃষ্ট, অর্থাৎ প্রকৃত বিজ্ঞানের ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত নহে, তাহার পরিবর্ত্তন-প্রয়াস আইনসঙ্গত হইতে পারে, কিন্তু আইন যত নিকৃষ্টই হউক না কেন, তাহা পরিবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে লঙ্ঘনের চেষ্টা করা যে বে-আইনী কার্য্য, ইহা অবশ্যস্বীকার্য্য।

আত্মহত্যার চেষ্টা, তাহা যে ভাবেই করা হউক না কেন, সম্বন্ধেও ঐ একই কথা প্রযুজ্য। বিভিন্ন দিক্ হইতে ইহার বিচার করিয়া ব্যাখ্যা করা হইতে পারে, কিন্তু সাদা কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, আমৃত্যু অনশন-পণ আত্মহত্যার চেষ্টার তুল্য এবং সকল ক্ষেত্রেই তাহা বে-আইনী।

উপরে যাহা বলা হইল, সেই দিক্ হইতে বিচার করিয়া আমাদের বলিতে সঙ্কোচ নাই যে, মিঃ গান্ধীর অনশন এবং আইন-অমান্যসূচক যে কার্য্যকলাপ, তাহা বে-আইনী এবং আমাদের রাজ-প্রতিনিধির নিকট শাস্তি ব্যতীত তাঁহার আর কিছুই প্রাপ্য হওয়া উচিত নহে।

কিন্তু তথাপি আমাদের রাজ-প্রতিনিধি তাঁহাকে সাক্ষাতের নিমন্ত্রণ পাঠাইয়া সম্মানিত করিলেন। ইহার ফলে যাহা ঘটিবে, আপাতদৃষ্টিতে তাহা জনসাধারণের হিতকারী বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু যদি যথাযথ ভাবে বিশ্লেষণ করা হয়, তবে দেখা যাইবে যে, ইহা দেশবাসী জনসাধারণের পক্ষেও যেমন, তেমনই রাজার পক্ষেও ভবিষ্যতে সর্ব্বনাশকর হইতে বাধ্য।

আমরা জানি যে, দেশের বর্ত্তমানে যে মেজাজ, তাহাতে আমাদের এই কথা অত্যন্ত অতিরিক্ত বলিয়া মনে হইবে, কিন্তু সাংবাদিকের দায়িত্ব পালনের নিমিত্ত আমরা বলিতে বাধ্য যে, ইহার ফল দেশের আইনের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তিদের পক্ষে ক্রমশঃ ভীষণ হইয়া উঠিবে। ইহাতে দেশের মস্তিষ্কহীন ও কূট অভিসন্ধিপরায়ণ ব্যক্তিদের আইন-অমান্যের ঝিড়িক বাড়িয়া যাইবে এবং জনসাধারণের পক্ষে প্রয়োজনীয় কার্য্যাবলীর গতি ঔদাসীন্য ঘটিবে। যদি প্রয়োজন হয়, প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, অতীতে রাজপুরুষগণের এই শ্রেণীর কার্য্যেই নিরুপদ্রব এবং রাজভক্ত ভারতবর্ষকে উপদ্রব এবং অরাজকতাপূর্ণ করিয়া তুলিবার অন্যতম কারণ।

আমরা জানি, রাজপুরুষগণ অসহায়, কেন না তাঁহারা জনসাধারণের আর্থিক সমস্যা সমাধানের পন্থা সম্বন্ধে অজ্ঞ। যদি তাঁহাদের এই পন্থা জানা থাকিত, তবে তাঁহারা প্রত্যেক ভারতবাসীকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহাদের আনুগত্য লাভ করিতে পারিতেন। যদি জনসাধারণের আর্থিক সমস্যার সমাধান করিয়া তাঁহারা প্রত্যেকের সন্তুষ্টি বিধান করিতে পারিতেন, তবে অপরাধীকে, তা যিনিই হউন না কেন, শাস্তি দান করিতে এই ইতস্ততঃ ভাব দেখা যাইত না।

ব্রিটিশ জাতির পক্ষে সুতরাং ইহা হইতে শিক্ষণীয় এই যে, সরকারী চাকুরী লাভ করিবার পূর্ব্বে যাহাতে সকলে দেশবাসী জনসাধারণের আর্থিক সমস্যাপূরণের পদ্ধতিতে শিক্ষিত হইতে পারেন, তাহার উপায় সন্ধান। আমরা তাঁহাকে এখনও অবহিত হইতে অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি।

জগতের প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্য ও তাহার বিতরণ

সংবাদপত্রে প্রকাশ যে, ব্রিটিশজাতির বিরোধিতা বিষয়ে জার্ম্মানীর অধিবাসীদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিয়াছে।

নাৎসিদলের নায়কগণ পৃথিবীর প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্যের বর্ত্তমান বিলি-ব্যবস্থায় অত্যন্ত অসন্তুষ্ট। তাঁহাদের মতে, ব্রিটিশ জাতিই ইহার মোটা অংশের অধিকারী, কেন না তাঁহাদের সাম্রাজ্য এবং বৈদেশিক বিনিময়ের জন্য প্রয়োজনীয় স্বর্ণভাণ্ডার মজুত আছে। ইহার ভাগ-বাঁটোয়ারা লইয়া একটি রফা-নিষ্পত্তি করিবার জন্য তাঁহারা অতিমাত্রায় ব্যস্ত হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়—তজ্জন্য যুদ্ধ করিতেও তাঁহারা পশ্চাদ্‌পদ হইবেন না। তাঁহারা মনে করেন যে, কতিপয় উপনিবেশের অধিকার লাভ করিলেই ভাগ-বাঁটোয়ারাতে আপত্তি করিবার কিছু থাকিবে না এবং জার্ম্মান জাতি শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করিতে থাকিবে। তাঁহাদের মতামতের সংক্ষেপে সরলার্থ দাঁড়ায় এই যে, জগতের প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্য কয়েকটি উপনিবেশ এবং স্বর্ণভাণ্ডার লইয়া এবং যে জাতি যত অধিক সংখ্যায় উপনিবেশ ও স্বর্ণের অধিকারী, সে-জাতির লোকজন তত সুখে ও শান্তিতে জীবন যাপন করে। যাহাই হউক, ব্রিটিশ জাতির বিরুদ্ধে যে নাৎসিদলের নায়কস্থানীয়গণেরই ক্ষোভ বর্ত্তমান, তাহাতে সন্দেহ নাই।

অপর পক্ষে জার্ম্মানীর জনসাধারণের মনোভাব অন্য প্রকার। তাহারা শান্তিকামী এবং তাহাদের মত এই যে, ব্রিটিশ সরকারের প্রধান-মন্ত্রী মিঃ চেম্বারলেনই তাঁহাদের শান্তি রক্ষা করিয়াছেন। জার্ম্মান জাতির জনসাধারণের মতে, যদি মিঃ চেম্বারলেন বাধা না দান করিতেন, তবে গত বৎসরেই হের হিটলারের নায়কত্বে যুদ্ধ বাধিয়া যাইত।

এই সংবাদ দিয়াছেন, 'মাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান' পত্রিকার কূটনৈতিক সংবাদদাতা। এই সংবাদে প্রকাশ যে, জার্ম্মান জন-সাধারণের মধ্যে বিক্ষোভ বৃদ্ধি পাইতেছে এবং তাহাদের নিকট নাৎসিদলের নিয়মানুগত্য ক্রমশঃ অধিকতর অরুচিকর হইয়া পড়িতেছে। তাহারা অন্ততঃ রবিবারটা কুচকাওয়াজে এবং হৈ-চৈএ যোগদান না করিয়া এবং বেতারে কিংবা বক্তার মারফৎ প্রচার-বক্তৃতা না শুনিয়া কাটাইতে চাহে। অবসর-বিনোদনের সকল বিষয়ে যে-সকল নিয়মকানুন বাঁধা হইয়াছে, বিশেষতঃ বাইচ ও ফুটবল খেলা এবং সঙ্ঘের মৌসিয়ার সম্বন্ধে যে-সব আইন করা হইয়াছে, তাহা প্রকৃত অবসর-বিনোদনের একান্ত বিরোধী বলিয়া মনে করা হইতেছে। ছাত্রেরা সামরিক ড্রিল উপেক্ষা করিয়া অধিক সময় পাঠে রত থাকিতে ভাল বাসিতেছে। জার্ম্মান পাণ্ডিত্যের বৈশিষ্ট্যে বিশেষ ত্রুটি দেখা দিয়াছে, বিশেষ করিয়া চিকিৎসা বিষয়ে এবং জন-সাধারণের মধ্যে চিকিৎসা-শাস্ত্র বিষয়ে অবিশ্বাস বিস্তার লাভ করিতেছে। বহু সামগ্রীর ক্রয়ের বিষয়ে বিধিনিষেধ আরোপিত হওয়ায়, গৃহিণীরা বিরক্ত ও বিষণ্ণ হইয়াছেন। গ্রামবাসীরা কৃষিকার্য্য ও গোপালনের পল্টনী কায়দাকানুন মোটেই পছন্দ করিতেছে না।

উপরের সংবাদসমূহের সার সংগ্রহ করিলে দাঁড়ায় এই যে, জার্ম্মান জাতির মধ্যে মুখর (অর্থাৎ রাজনীতি-সংশ্লিষ্ট) এবং মূক (অর্থাৎ রাজনীতি-সংশ্লিষ্ট নহে), এই উভয়াংশের মনোভাবের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য পরিদৃষ্ট হইতেছে। মূক-সাধারণ শান্তিকামী, মুখর-সাধারণ যুদ্ধ-কামী; মূক-সাধারণ তথাকথিত বৈজ্ঞানিক নিয়মকানুনের বেড়াজাল সহ্য করিতে পারিতেছে না, কিন্তু মুখর সাধারণ তজ্জন্য ব্যগ্রতা দেখাইতেছেন। যদি মোটামুটি পান-ভোজন, অবসরযাপন চলে এবং স্বাস্থ্য বজায় থাকে, তবেই মূক-সাধারণ খুসী, কিন্তু মুখর-সাধারণ সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি এবং স্বর্ণভাণ্ডারের প্রসার ব্যতিরেকে খুসী নহেন।

আমাদের মতে, এই ঘটনা-সংস্থান অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। হয় তো ইহাতে জার্ম্মানীর শত্রুপক্ষ তৃপ্তির হাসি হাসিবেন, কেন না, ইহাতে বুঝা যায় যে, জার্ম্মানীর জনসাধারণ এবং নেতাদের, অর্থাৎ মূক ও মুখর-সাধারণের মধ্যে ঘরোয়া বিবাদের সূত্রপাত দেখা দিয়াছে। কিন্তু বাঁচিয়া থাকিলে আর দশ বৎসরের মধ্যে তাঁহারা প্রত্যক্ষ করিবেন যে, পৃথিবীর সর্ব্বদেশে মূক ও মুখর-সাধারণের মধ্যে মনোভাবের এই শ্রেণীর ব্যাপক অনৈক্য পরিস্ফুট ও ভীষণভাবে মারাত্মক হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের এই ভবিষ্যদ্বাণীতে তথাকথিত

বিজ্ঞান-বীর ও রাষ্ট্রধুরন্ধরগণ হয়তো হাসিবেন এবং যথারীতি গণতন্ত্র, শিক্ষাবিস্তার, সাম্রাজ্য এবং স্বর্ণভাণ্ডার প্রভৃতির ইত্যাদির বুলি আবৃত্তি করিয়া যাইবেন। যে-প্রকৃত ঐশ্বর্য ব্যতীত মনুষ্য যথার্থ সুখ, শান্তি ও সন্তুষ্টি লাভ করিতে পারে না, তাহা যে তাঁহাদেরই তথাকথিত বৈজ্ঞানিক কাণ্ডকারখানা ও উন্নয়ন দ্বারা বিধ্বস্ত হইতেছে, যে-বুদ্ধি থাকিলে ইহা বোধগম্য হয়, দুর্ভাগ্যক্রমে পরাধুনিকতার চক্রান্তে বিলুপ্ত হইবার ফলে সেই বুদ্ধি তাঁহারা হারাইয়া বসিয়াছেন।

কেবলই যে জার্মানীর নেতৃবৃন্দ ভাবিতেছেন, জাতি অধিকসংখ্যক উপনিবেশ এবং স্বর্ণের অধিকার লাভ করিলেই জনসাধারণ সুখে শান্তিতে বাস করিবে তাহা নহে, তথাকথিত বৈজ্ঞানিকগণের প্রত্যেকেও ঐ একই ভাবে চিন্তা করেন। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, যত অধিক সংখ্যাতেই উপনিবেশ অধিকারে আসুক না কেন, যদি তাহাতে সুবিস্তৃত ফসলপ্রসূ ভূমি এবং বহুল লোকসংখ্যা না থাকে, তবে অধিকারী জাতির কোন লাভই নাই। যদি তাঁহারা মনে রাখেন, কি জন্য জাতির উপনিবেশের প্রয়োজন, তবে বুঝিতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব হইবে না যে, খাদ্যোৎপাদনের জন্য উপনিবেশের প্রয়োজন নহে, প্রয়োজন, কাঁচামাল ও খাদ্যের ব্যবহার নিমিত্ত, শিল্পদ্রব্যের বাজারের নিমিত্ত। উপনিবেশসমূহ যদি জনবিহীন মরুভূমি হয়, তাহাতে উদ্দেশ্য সফল হইবে না। যদি এই যুক্তি সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা যায়, তাহা হইলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, কোন জাতির মুক্তি অধিকৃত উপনিবেশের সংখ্যার উপর নির্ভর করে না। প্রত্যেক জাতির জন-সাধারণকে সুখে ও শান্তিতে জীবন যাপন করিতে হইলে উর্বর ভূমি ও লোকবহুলতার প্রয়োজন। এই জন্যই ভারতবর্ষকে সাম্রাজ্যের অধীনে পাইয়া, কিছু সময়ের জন্য পৃথিবীর মধ্যে ব্রিটিশ জাতি সর্বাপেক্ষা সুখী ও সন্তুষ্ট জাতি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল, কেন না তখন ভারতের ভূমি সর্বাপেক্ষা অধিক ফসলপ্রসূ ছিল এবং লোকসংখ্যায় ভারত পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিত। যদি সমগ্র ভারত কেবল চাষপুতনার ন্যায় মরুময় এবং বসতিহীন স্থানে পরিপূর্ণ হইত, তবে ব্রিটিশ জাতির কোন কার্যেই উহা লাগিত না।

যদি বৈজ্ঞানিকগণ 'ধন' শব্দের প্রাকৃতিক অর্থ জানিবার কষ্ট স্বীকার করেন এবং তৎসম্বন্ধে কোন শ্রদ্ধা পোষণ করেন, তাহা হইলে তাঁহারা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন যে, কোন দেশের প্রকৃত ধন বলিলে সেই দেশের স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র কিংবা অন্য কোন ধাতু, এমন কি কাগজের তৈয়ারী মুদ্রা বুঝায় না, বুঝায় দেশের শস্যসম্ভারকে—এমনকি, পাট, কয়লা, চা-কেও দেশের প্রকৃত ধন বলিয়া আখ্যাত করা যায় না।

ধন বা ঐশ্বর্যের মূল অর্থ সম্বন্ধে শ্রদ্ধাশীল হইলে দেখা যায় যে, যাহাতে মানুষের 'সমৃদ্ধি' বা 'সুখ' বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহাই ধন। সুখ কিংবা সমৃদ্ধি কিছুরই লাভ মানুষের পক্ষে সম্ভব হয় না, যদি সে প্রাণে না বাঁচিয়া থাকে কিংবা তাহার অস্তিত্ব যদি না বজায় থাকে। যদি ক্ষুধাশান্তির জন্য কোন প্রকার শস্যসম্ভার না পাওয়া যায়, তবে মনুষ্যজাতির অস্তিত্ব রক্ষা সম্ভব হয় না। যতই না কেন স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, অথবা যে কোন ধাতুনির্মিত কিংবা কাগজে তৈয়ারী মুদ্রা থাকুক, কিংবা পাট ও কয়লা থাকুক, যদি বিনিময়ের জন্য কোন প্রকার শস্য না পাওয়া যায়, তাহা হইলে উহাদের কোনটির সাহায্যেই মানুষের ক্ষুধা-তৃষ্ণার পূরণ হইতে পারে না। কেবল চা-য়ের সাহায্যেও জীবনধারণ সম্ভব নহে, কোন না কোন প্রকারে ইহাতে স্বাস্থ্য নষ্ট করিতে বাধ্য। সুতরাং ইহা বলা যাইতে পারে যে, মনুষ্যজাতির প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য অথবা ধন হইতেছে শস্যসম্ভার, অপর কিছু নহে। এই শস্য-সম্ভারের উৎস হইতেছে উর্বরা ভূমি।

সুতরাং এই দিক্ হইতে দেখিলেও বলিতে হয় যে, সুবিস্তৃত উর্বরা ভূমি এবং বহুল লোকসংখ্যাই মনুষ্যজাতিকে অনাহার হইতে বাঁচাইবার প্রাথমিক উপাদান—উপনিবেশও নহে, সঞ্চিত স্বর্ণভাণ্ডারও নহে।

মনুষ্যজাতির প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য সম্বন্ধে এই মূল সত্য, গত দুই শতাব্দী হইতে সকল জাতির মুখর-সাধারণ, বর্তমান বিজ্ঞান ও সভ্যতার মোহে বিস্মৃত হইয়াছেন এবং তাঁহারা মূক-সাধারণকে সাম্রাজ্য এবং স্বর্ণভাণ্ডার বিস্তারের জন্য যুদ্ধের প্রয়োজনা ধন করিয়া ভ্রান্ত করিতেছেন। ইহার ফলে জমীর উর্বরাশক্তি এবং পূর্ণবয়স্ক লোকসংখ্যার হ্রাস সাধিত হইয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে, প্রত্যেক দেশের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, কিন্তু আদমসুমারীর

পুঁথি-পত্র যদি সত্যই বিশ্লেষণ করা হয়, তবে দেখা যাইবে যে, প্রত্যেক দেশেই মোট লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে বটে, কিন্তু পঞ্চাশের উর্ধ্ববয়স্ক লোকের, অর্থাৎ পূর্ণবয়স্ক লোকের সংখ্যার অনুপাত সর্বত্রই হ্রাস পাইয়াছে।

ধন-বিতরণের উপলক্ষ্য গ্রহণ করিয়া এই সকল মুখর ব্যক্তি কাগজে নির্দিষ্ট মুদ্রার প্রয়োজনীয়তা প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু বিতরণ-সাম্যের দ্বারা প্রত্যেকটি নর-নারীকে সুখী ও সন্তুষ্ট রাখিবার নিমিত্ত প্রকৃতি যে নিজেই ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা তাঁহারা জানেন না। যদি সমগ্র পৃথিবীর লোকসংখ্যা দিয়া পৃথিবীর চাষযোগ্য সমগ্র জমীর পরিমাণকে ভাগ করা হয়, তবে দেখা যাইবে যে, মাথা-পিছু প্রত্যেকের অংশে প্রায় ১২ বিঘা জমি পড়ে। যদি জমীর স্বাভাবিক উর্বরাশক্তি বজায় থাকে, প্রত্যেকের সংভাবে জীবনযাপনের পক্ষে উহা যথেষ্টেরও অধিক। যদি প্রত্যেক দেশের চাষযোগ্য জমীর পরিমাণকে উহার লোকসংখ্যা দ্বারা ভাগ করা হয়, তাহা হইলেও ফল দাঁড়াইবে একই। যদি প্রত্যেক দেশের জমির স্বাভাবিক উর্বরাশক্তি রক্ষিত হয়, তবে কাগজে তৈয়ারী মুদ্রা প্রচলনের, কিংবা উপনিবেশ অধিকার কিংবা বিনিময়ার্থ স্বর্ণ-ভাণ্ডার স্থাপন কথা উঠিতে পারে না। কিন্তু কোন দেশেই এই চেষ্টা হয় নাই, এমন কি ইহার বিজ্ঞানের পর্যন্ত বিস্মৃতি ঘটিয়াছে। বিস্মৃতি ঘটিয়াছে বলিতেছি এই জন্য যে পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ, বেদ, বাইবেল ও কোরাণে এই বিজ্ঞানের সন্ধান আছে।

উক্ত বিজ্ঞান সন্ধানের কষ্ট স্বীকার দূরে থাক, এই সকল ব্যক্তি, যাঁহাদিগকে আমরা মুখর-সাধারণ বলিয়া অভিহিত করিতেছি, ভ্রান্ত কৃষিবিজ্ঞানের প্রচার করিয়া প্রত্যেক দেশের উর্বরাশক্তি ও স্বাস্থ্যের অপকর্ষ সাধন করিয়াছেন। শেষ পর্যন্ত ইঁহারা এমন মতবাদও প্রচার করিয়াছেন যে, মনুষ্যসমাজের প্রত্যেকেই সমৃদ্ধ হইতে পারে না, এবং প্রত্যেকের পক্ষে সমৃদ্ধিলাভ সম্ভব নহে বলিয়া জন্মশাসনের প্রচার অবধি আরম্ভ করিয়াছেন। ইহা পাপাচরণ, প্রকৃতির সুশৃংখলার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, কেন না ইহাতে ধরিয়া লওয়া হয় যে, প্রকৃতি জীব সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু তাহার খাদ্য সংস্থান করেন নাই। তদুপরি, এই সকল ব্যক্তি চাষের কাজ কিংবা তাহার কোন সাহায্য না করিয়াও চাষীকে তাহার ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিবার উপায় আবিষ্কারার্থ নিজেদের মধ্যে প্রাপ্যের মোটা অংশ ভাগবাঁটোয়ারা করিয়া লইবার জন্য বিস্তৃত ভাবে কাগজে নির্দিষ্ট মুদ্রার প্রচলনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। পাঠক হয় তো আমাদের এই উক্তিতে বিস্ময়াভিভূত হইবেন, কিন্তু যদি তাঁহারা সন্ধান লইয়া দেখেন যে, কি ভাবে সামান্য কয়েকটি মুদ্রা কি কাগজী নোটের পরিবর্তে চাষীদিগকে তাহাদের প্রত্যেকের কষ্টার্জিত ফসল বিক্রয় করিতে বাধ্য করা হয়—বর্তমানে যে-ফসল আবার অনেক স্থানেই তাহার স্বকীয় পরিবারের বাৎসরিক গ্রাসাচ্ছাদনের পক্ষে যথেষ্ট নয়—তবে বুঝিতে পারিবেন যে, আমরা যাহা বলিয়াছি, তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য।

এই পাপের প্রায়শ্চিত্তের সময় আসিয়াছে। শাসকদল, ইহাঁদের অধিকাংশই সুকৌশলী মিথ্যাবাদী ও কথার যাদুকর, যাহাই বলুন না কেন, যদি সন্ধান করা যায়, তবে দেখা যাইবে যে, প্রত্যেক দেশে জমীর স্বাভাবিক উর্বরাশক্তি বহুসাংশে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে এবং সর্বত্রই লাভজনক কৃষি অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে, ফলে সর্বত্র অনাহারের প্রকোপ দেখা দিয়াছে এবং মনুষ্যজাতির অস্তিত্ব পর্যন্ত টলটলায়মান হইয়া পড়িয়াছে। আত্ম-সর্বস্ব রাষ্ট্রধুরন্ধরগণ, শাসকদল এবং বৈজ্ঞানিকগণ ইহা না বুঝিতে পারেন, কিন্তু ইহাই বাস্তব সত্য, সর্বব্যাপক বেকারসমস্যা ইহারই লক্ষণ। ইহাকে হয় তো তাঁহারা বাণিজ্যচক্রের নিয়াবর্তন বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিবেন, কিন্তু অনতিবিলম্বে দেখা যাইবে যে, এই নির্বোধ বৈজ্ঞানিকগণের পাপের প্রায়শ্চিত্তার্থ ব্যাপকভাবে জন-সাধারণের মধ্যে নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সৃষ্টি করিয়া প্রকৃতি তাঁহার ভবিতব্যতার বিধি রক্ষা করিয়াছেন।

পাঠক, এখনও সময় আছে, আমরা সকলকে সময় থাকিতে সতর্ক হইতে অনুরোধ করি।

গণতন্ত্রের ত্রুটি ও তাহার সংশোধন-পন্থা

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের সভাপতিত্বে ফেব্রুয়ারী মাসের শেষভাগে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের ১৫০তম প্রতিষ্ঠাবর্ষ উদ্‌যাপিত হইয়া গিয়াছে। এই অধিবেশনে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে তিনি গণতন্ত্রাধীন হইয়া আমেরিকার অধিবাসীরা যে-সুখস্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিয়াছেন, তাহার বর্ণনা করিয়া তৎসহ রাষ্ট্রতন্ত্রের অধীন দেশবাসীদের অবস্থার তুলনা করিয়াছেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, বর্তমানে যে সকল রাজ্য রাষ্ট্রতন্ত্রের সহিত অধীনে পুনঃপ্রতিষ্ঠ হইয়াছেন, প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রের সহিত তাহাদের বিরাট পার্থক্য আছে।

যদি প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট তাঁহার বক্তৃতায় ইহাই বুঝাইতে চাহিয়া থাকেন যে, মনুষ্যসমাজের এবং পৃথিবী

বর্তমান অবস্থায়, সামাজ্য-নীতির পরিবর্তন করিয়া বর্তমান প্রতিনিধিমূলক যে গণতন্ত্র, তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট, তবে তাঁহার সহিত আমাদের মতপার্থক্য নাই, কিন্তু তিনি যদি বুঝাইতে চাহিয়া থাকেন যে, মনুষ্যসমাজের এবং জগতের সর্বাবস্থাতেই ব্যষ্টিতন্ত্র অপেক্ষা প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র অধিকতর কাম্য, তবে আমরা বলিতে বাধ্য যে, তিনি ভ্রান্ত।

আমরা যথার্থ বলিতেছি কি না, তাহা স্থির করিতে হইলে, আমাদিগকে সন্ধান করিতে হইবে যে, শাসনের উদ্দেশ্য কি এবং আদর্শের দিক্ দিয়া বিচারে কোন্ শাসনতন্ত্র সর্বোৎকৃষ্ট।

আমরা সকলেই বিদিত আছি যে, জনসাধারণের স্বার্থরক্ষাকল্পেই প্রত্যেক দেশের শাসনতন্ত্রের প্রয়োজন এবং তদুদ্দেশ্যে প্রত্যেক দেশেরই সরকারের প্রাথমিক দায়িত্ব হওয়া উচিত, সেই দেশের আইন ও শৃংখলা বজায় রাখা। যদিও আইন ও শৃংখলা রক্ষা করাই প্রত্যেক সরকারের প্রাথমিক কর্তব্য, তথাপি মনে রাখিতে হইবে যে, সরকারের প্রয়োজনীয়তা কেবল এই জন্যই নহে এবং জনসাধারণের স্বার্থরক্ষাকল্পেই আইন ও শৃংখলার প্রয়োজন। দেশের প্রত্যেকের স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা না করিলে, কোন সরকারই সরকার নামের যোগ্যতার উপযোগী হন্ না।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে, প্রত্যেক সরকারেরই উদ্দেশ্য, দেশের প্রত্যেকটি ব্যক্তির স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থাসাধন। পরবর্তী জিজ্ঞাসা এই যে—জনসাধারণের স্বার্থ বলিতে কি বুঝা যায়? এই প্রশ্নের উত্তরদান কঠিন, কেন না প্রত্যেক দেশের জনসাধারণের মধ্যে প্রকৃতিগত বিভিন্নতা বহু প্রকার এবং তাহাদের স্বার্থও বিভিন্ন। কিন্তু জনসাধারণের স্বার্থের প্রকার ও প্রকৃতিভেদ সম্বন্ধে যাহাই বলা যাউক না কেন, তাহাদের প্রত্যেকেই আর্থিক স্বচ্ছলতা, শারীরিক সুস্থতা এবং মানসিক শান্তির প্রার্থী—এই দিক্ দিয়া তাহাদের সকলেরই আকাঙ্ক্ষা এক।

সুতরাং ইহা বলা যাইতে পারে যে, প্রত্যেক দেশের সরকারকেই প্রজাসাধারণের প্রত্যেকের জন্য আর্থিক স্বচ্ছলতা, শারীরিক সুস্থতা এবং মানসিক শান্তি ব্যবস্থিত করিতে সচেষ্ট হইতে হয় এবং ইহার ব্যবস্থা সাধন না করিতে পারিলে, তাহার সামরিক সাজসজ্জা, শাসনবিভাগের রক্তমাংসে হৃদয়ের ও আদালতের নথিপত্র যতই জমকালো হউক, কোন সরকারেই সরকার নামের যোগ্য হইতে পারে না।

ইহা হইতে আরও বুঝা যায় যে, যে-দেশে যত বেশী সংখ্যক ব্যক্তি আর্থিক স্বচ্ছলতা, শারীরিক স্বাস্থ্য ও মানসিক শান্তি ভোগ করে, সে দেশের সরকারকে তত সার্থক বলা যাইতে পারে এবং সেই দেশের সরকারই সর্বোৎকৃষ্ট, যাহার শাসিত দেশের অধিকাংশ ব্যক্তি আর্থিক স্বচ্ছলতা, শারীরিক স্বাস্থ্য এবং মানসিক শান্তি ভোগ করে।

এই হিসাবে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের কি অবস্থা, তাহা আমরা এখন পরীক্ষা করিব। ইহা সত্য যে, সেখানে কয়েকজন লক্ষপতি ও ক্রোড়পতি আছেন, কিন্তু ইহাও সত্য যে, যুক্তরাষ্ট্রের ১০ কোটি ৭০ লক্ষ অধিবাসীর ১০ কোটি ৫০ লক্ষেরও অধিক ব্যক্তি আর্থিক অনচ্ছলতা ও শারীরিক অস্বাস্থ্যের চরম দৃষ্টান্ত এবং তাহাদের প্রায় প্রত্যেকেই অশান্তির দ্বারা বিক্ষুব্ধ। ইহা আমাদের গল্প নহে। প্রয়োজন হইলে এই সকল বিষয়ে যাঁহাদের রচনা প্রামাণিক বলিয়া মনে করা হয়, তাহা হইতে আমাদের উক্তির সত্যতা প্রতিপন্ন করিব।

সুতরাং ইহা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইতেছে যে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে যে শ্রেণীর শাসনতন্ত্র বিদ্যমান, তাহা পৃথিবীর অপরাপর দেশে যে সকল শাসনবিধি বর্তমান, তাহার তুলনায় ভাল হইলেও, আদর্শ শাসনব্যবস্থার নিকট দিয়াও যায় না।

অপর যে সব দেশে প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র বর্তমান, তাহাদের প্রত্যেক দেশের অবস্থাও প্রায় একই প্রকার।

সুতরাং ইহা বলিতে পারা যায় যে, গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার উচ্চপ্রশংসার কোন অর্থ হয় না।

বস্তুতঃ যদি কোন শাসনব্যবস্থা প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহাতে কখনও সুশাসন সম্ভব হয় না, কেন না, ইহার প্রাথমিক ব্যবস্থাই হইতেছে এই যে, দেশের সাধারণ লোক ইহার ব্যবস্থাপক-সভা নির্বাচন করিবে। যদি বিশেষভাবে শিক্ষিত না করা হয়, তবে জনসাধারণ কখনই সেরূপ কাণ্ডজ্ঞানের অধিকারী হয় না, যাহাতে দেশের প্রত্যেকের আর্থিক স্বচ্ছলতা, শারীরিক স্বাস্থ্য এবং মানসিক শান্তি ব্যবস্থিত করিবার উপযোগী ব্যক্তির

গুণাবলী নির্দ্ধারণ করা চলে। দেশের অধিকসংখ্যক লোককে এইরূপ শিক্ষায় শিক্ষিত করাও কখনই সম্ভব নহে, অথচ ইহারাই ব্যবস্থাপক সভার প্রতিনিধিমণ্ডলী এবং পরোক্ষভাবে মন্ত্রিসভা নির্ব্বাচন করে।

ইহার অনুষ্ঠায়ী পরিণতি স্বরূপ, যাহারা নিজের ঢাক বাজাইতে সুনিপুণ এবং ষড়্‌যন্ত্রের বিদ্যায় অভ্যস্ত, তাহারাই জনসাধারণের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইতে সমর্থ হয় এবং সরকারের ব্যবস্থাপক সভা ও মন্ত্রিসভা গঠন করে। প্রতিনিধি-মূলক শাসনের সর্ব্বাপেক্ষা দোষাবহ বিষয় এই যে, প্রতিনিধি-বৃন্দের কাহাকেও ব্যক্তিগতভাবে জনসাধারণের কল্যাণসাধনের জন্য যুক্তিসঙ্গত ভাবে দায়ী করা যায় না, কেন না, প্রত্যেকেরই কার্য্যকাল বৎসামান্য, কার্য্যারম্ভেই তাহা অতিক্রান্ত হইয়া যায়।

যাঁহারা মন্ত্রী কিংবা সভাপতি নির্ব্বাচিত হন, তাঁহাদের কাহাকেও উহার জন্য যুক্তিসঙ্গত ভাবে দায়ী করা যায় না, কেন না, তাঁহাদের যাহা কিছু কার্য্য, সমস্তই নেপথ্যে এবং আইনতঃ কমিটী কিংবা ব্যবস্থাপক সভা কর্ত্তৃক তাঁহারা নিয়ন্ত্রিত।

যদি গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করা যায়, তবে দেখা যাইবে যে, ইহা দোষরাশিতে পরিপূর্ণ এবং ইহাতে সৎলোকও অসৎ হইয়া পড়িতে বাধ্য।

যদি দেশে এইরূপ একদল ব্যক্তি থাকেন, যাঁহারা প্রকৃত দেশপ্রেমিক এবং কোনরূপ পুরস্কারের প্রত্যাশা না রাখিয়া জনকল্যাণ-সাধনে সমর্থ, তবেই আদর্শ শাসন-ব্যবস্থা সম্ভব।

ইহাঁদিগকে নাম-যশের আকাঙ্ক্ষা হইতে মুক্ত থাকিতে হইবে এবং দেশের প্রত্যেকে যাহাতে অধিক স্বচ্ছন্দতা, শারীরিক স্বাস্থ্য এবং মানসিক শান্তি ভোগ করে, তদুচিত পরিকল্পনা সন্ধানার্থ যে জ্ঞান ও গুণাবলী প্রয়োজন, তাহার অধিকারী হইতে হইবে।

যদি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসন্ধান করা যায়, তবে দেখা যাইবে যে, পৃথিবীর কুত্রাপি আজ প্রাগুক্ত গুণসম্পন্ন ব্যক্তি নাই। যদি ইহাই যথার্থ না হইত, তবে জন-সাধারণ যাহাতে নিজেদের অপরিহার্য্য ভাবে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লাভ করিতে পারে, তদনুরূপ কোন একটি পরিকল্পনাও গুণাবলী লাভ করিত।

কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় আদর্শ শাসন-ব্যবস্থা সম্ভব নহে বলিয়া জন-সাধারণের নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। আদর্শ শাসন-ব্যবস্থা সংগঠনের জন্য যাহা নিশ্চিতভাবে প্রয়োজন, সেইরূপ গুণসম্পন্ন ব্যক্তি সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত জনসাধারণকে অন্ততঃপক্ষে প্রয়াস সাধন করিতে হইবে। ইহা সাধনের নানাবিধ উপায় আছে। বর্ত্তমানে, যে-সকল লোকের চাকুরীর মাহিনা ব্যতীত জীবিকা-র্জ্জনের আর কোন পন্থা নাই কিংবা যাঁহারা নাম-যশের কাঙ্গাল বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছেন; যাঁহারা দেশের প্রত্যেকটি ব্যক্তি যাহাতে অধিক স্বচ্ছন্দতা, শারীরিক স্বাস্থ্য এবং মানসিক শান্তি ভোগ করিতে পারে, তদুপযোগী পরিকল্পনার সন্ধানের সামর্থ্য প্রমাণে নিজেদের স্বাধীন চিন্তা-শক্তির সাক্ষ্য উপস্থিত করিতে অক্ষম হইয়াছেন, তাঁহারা যাহাতে মন্ত্রিসভায় স্থান না পাইতে পারেন কিংবা তাহার পরিচালক না হইতে পারেন, কেবল তাহারই ব্যবস্থা সাধন করিতে বলি। অতঃপর প্রয়োজনানুরূপ বিভাগীয় কার্য্য পরিচালনার সামঞ্জস্য-বিধানকার্য্য দুঃসাধ্য নহে। প্রয়োজন বুঝিলে জনসাধারণের হইয়া আমরা সে-কার্য্যভার গ্রহণে প্রস্তুত আছি। আমরা এই অনাড়ম্বরিষ্ট অবস্থাতেও জনসাধারণকে সভাগৃহ হইতে নিবেদন জানাইতেছি।

ইহাই কি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস?

যাহাকে 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস' বলা হইয়া, তাহারই ত্রিপুরী অধিবেশন বর্ত্তমান সন্দর্ভের আলোচ্য। আমাদের মতে, ত্রিপুরীতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়াছে কি না, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে, আমাদিগকে পরীক্ষা করিতে হইবে, ইহার কার্য্যক্রমে এমন কিছুর সন্ধান পাওয়া যায় কি না, দেশের প্রত্যেকটি অধিবাসীর সহিত যাহার কোন সম্বন্ধ আছে।

আমরা যদি বলি যে, কোনও জনসমাগমকে 'জাতীয় কংগ্রেস' বলিয়া অভিহিত হইবার যোগ্য হইতে হইলে তাহাকে দেশের সর্ব্ব সম্প্রদায়, জাতি ও শ্রেণীর মিলিত সমাগম হইতে

হইবে এবং তাহাতে এমন সকল সমস্যার আলোচনা করিতে হইবে, যাহা দেশের প্রত্যেকের ভাগ্যের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তাহা হইলে আমাদের সহিত পাঠক একমত হইবেন বলিয়াই আমরা মনে করি।

এখন আমরা দেখিব, ত্রিপুরী কি শ্রেণীর জনসমাগম হয় এবং তথায় কি কি বিষয় আলোচিত হয়।

ভারতের সর্ব্ব সম্প্রদায়, জাতি ও শ্রেণী ত্রিপুরী অধিবেশনে যোগদান করেন কি না, তাহার বিচার করিতে হইলে আমাদিগকে সর্ব্বাগ্রে দেখিতে হইবে যে, লোকসমষ্টির দিক্ দিয়া ভারতের বর্ত্তমান রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্ম্মমতসংক্রান্ত এবং অর্থ-নৈতিক শ্রেণী-বিভাগ কি কি।

ভারতের বর্ত্তমান রাজনৈতিক মতামত সংক্রান্ত বিভাগ নিম্নলিখিত ভাবে প্রকাশ করা যায় :—

(১) যাঁহারা ব্রিটিশ প্রাধান্যের অবসান এবং স্ব-পরিচালিত শাসন কামনা করেন, ইহাঁদিগকে 'স্বাধীনতাবাদী' বলা যায়।

(২) যাঁহাদের ব্রিটিশ প্রাধান্যের অবসান অপেক্ষা সুশাসনের কামনা অধিক এবং ভারতীয় পরিচালিত শাসন তাঁহাদের অবাঞ্ছনীয় না হইলেও শাসন ব্যাপারে নিজেদের কিঞ্চিৎ কর্ত্তৃত্ব থাকিলেই যাঁহারা সুখী। ইহাঁদিগকে 'উদারনৈতিক' বলা যায়।

(৩) যাঁহারা শাসন কাহাদের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে, তৎসম্বন্ধে উদাসীন, কিন্তু নিজেদের দুইবেলার আহার, স্বাস্থ্য ও শান্তি যাহাতে বজায় থাকে, তদুপযোগী শাসনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। ইহাঁদিগকে 'নিরপেক্ষ' বলা যায়।

যদি দেশের অবস্থা গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করা যায় এবং খাঁটি সত্য বলিবার ক্ষমতা থাকে, তবে স্বীকার করিতেই হইবে যে, আজিও পর্য্যন্ত মোটামুটি শতকরা ৭৫ জন ভারতীয়ই নিরপেক্ষ, ৪ জন উদারনৈতিক এবং মাত্র ১ জন স্বাধীনতাবাদী।

ভারতের বর্ত্তমান সামাজিক শ্রেণীবিভাগ নিম্নানুযায়ী প্রকাশ করা যায় :—

(১) যাঁহারা ইউরোপীয় প্রথায় জীবনযাত্রার মোহে মুগ্ধ এবং বিলাত না যাইতে পারিলে কিংবা বিলাতী প্রথায় নিজদিগকে ও আত্মীয়স্বজনকে দীক্ষিত না করিতে পারিলে যাঁহারা জীবন ব্যর্থ বলিয়া মনে করেন। ইহাঁদিগকে 'প্রগতিপন্থী' বলা যায়।

যাঁহারা সম্পূর্ণভাবে বিলাতী ছাঁচেঢালা দীক্ষিত হইবার জন্য উৎসুক নহেন, কিন্তু ইউরোপীয় রীতিনীতি অনুযায়ী সামান্য পরিবর্ত্তনের বিরোধীও নহেন এবং সনাতন ভারতীয় রীতিনীতির বৈজ্ঞানিক ভিত্তি সম্বন্ধে অজ্ঞ হইয়াও তৎসম্বন্ধে প্রীতিবিশিষ্ট নহেন। ইহাঁদিগকে 'রক্ষণশীল' বলা যায়।

(৩) যাঁহারা সকল প্রকার পরিবর্ত্তনের বিরোধী এবং বিজ্ঞান না জানিয়াও সনাতন সকল প্রথা ও রীতি রক্ষার উদ্‌গ্রীব, যদিও তাহা রক্ষা করিতে যাঁহারা অসমর্থ। ইহাঁদিগকে 'সনাতনপন্থী' বলা যায়।

এই সামাজিক শ্রেণীবিভাগের দিক্ দিয়া দেখিলেও দেখা যাইবে যে, আজিও পর্য্যন্ত শতকরা ৯৫ জনই 'সনাতনপন্থী', ৪ জন 'রক্ষণশীল' এবং মাত্র ১ জন 'প্রগতিপন্থী'।

ভারতের বর্ত্তমান অর্থনীতি-সংক্রান্ত বিভাগ নিম্নানুযায়ী প্রকাশ করা যায় :—

(১) যাঁহারা ধনিসন্তান এবং বুদ্ধি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ পরমুখাপেক্ষী। তাঁহারা পিতৃপুরুষের নিকট হইতে প্রাপ্ত অর্থেই প্রধানতঃ জীবন যাপন করেন এবং বাহ্যতঃ রাজপ্রাসাদের অধিকারী এবং তদনুরূপ হাবভাবভঙ্গীর অধিকারী হইলেও আপাদমস্তক ঋণগ্রস্ত। ইহাঁদিগকে 'ধনী' বলা হইয়া থাকে।

(২) যাঁহারা বেতনভোগী নফর এবং নিজেরা দেশের প্রকৃত ধন উৎপাদন বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ হইলেও রামের ধন শ্যামকে দিবার বিদ্যায় যাঁহারা পারদর্শী। ইহাঁদিগকে 'মধ্যবিত্ত' আখ্যা দেওয়া হয়।

(৩) যাঁহারা প্রতিনিয়ত দেশের প্রকৃত ধন উৎপাদন ব্যাপারে নিয়োজিত থাকিয়াও সর্ব্বদাই দুইবেলার

দুই মুষ্টি অন্নসংস্থানে কষ্ট পাইয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে 'দরিদ্র' বলা হয়।

ভারতে অর্থনৈতিক শ্রেণীবিভাগের দিক্ দিয়া দেখিলেও দেখা যায়, শতকরা ৯৯ জনই 'দরিদ্র' শ্রেণীভুক্ত, ৬জন 'মধ্যবিত্ত' শ্রেণীভুক্ত এবং মাত্র ১জন 'ধনী'।

ভারতের ধর্ম্মমত-সংক্রান্ত শ্রেণীবিভাগ নিম্নলিখিত ভাবে প্রকাশ করা যায় :—

(১) যাঁহারা ভগবানকে বিশ্বাসও করেন না কিংবা বিশ্বাস করিতে বাধ্যও নহেন, যদিও জীবনযাত্রায় সুনীতি রক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। কোন প্রকার উপাসনাতেই যাঁহারা বিশ্বাসী নহেন। সাধারণতঃ তাঁহারা 'শিক্ষিত' আখ্যা পাইলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদিগকে 'নাস্তিক' বলিতে পারা যায়।

যাঁহাদের ভগবান্ সম্বন্ধে ধারণা নাই কিংবা সেই ধারণা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর নহেন এবং উপাসনার মধ্যে হৃদয়ে যোগদান করিলেও নিয়মিত যোগদান করেন না এবং কি জন্য উপাসনা করা হইবে, তাহা জানিবার প্রয়াসী নহেন। ইঁহাদের ধর্ম্মাচরণে ভগবানের অস্তিত্বে আন্তরিক বিশ্বাস অপেক্ষা ধার্ম্মিক বলিয়া নাম জাহিরের কামনাই অধিক বলিয়া মনে হয়। ইঁহারাই 'হিন্দু' 'জৈন' ইত্যাদি নামে সাধারণতঃ চলিতেছেন।

(৩) যাঁহারা, যদিও ভগবান্ কি, তাহার প্রকৃত ধারণা গঠনে অক্ষম এবং উপাসনার তাৎপর্য্য বুঝিতেও অসমর্থ, তথাপি ভগবান্ এবং কোন না কোন প্রকার উপাসনায় আন্তরিক বিশ্বাসী। ইঁহাদিগকেই সাধারণতঃ 'মুসলমান' ও 'খৃষ্টান' বলা হইয়া থাকে।

সুতরাং ভারতবাসীর শ্রেণীবিভাগ দাঁড়াইতেছে নিম্নলিখিত রূপ :—

(১) স্বাধীনতাবাদী (২) উদারনৈতিক (রাষ্ট্রীয়) (৩) নিরপেক্ষ (রাষ্ট্রীয়) (৪) প্রগতিপন্থী (সামাজিক) (৫) রক্ষণশীল (সামাজিক) (৬) সনাতনপন্থী (সামাজিক) (৭) ধনী (৮) মধ্যবিত্ত (অর্থনৈতিক) (৯) দরিদ্র (১০) শিক্ষিত অথবা নাস্তিক (১১) হিন্দু, জৈন, ইত্যাদি (১২) মুসলমান ও খৃষ্টান।

এই শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হইয়া যদি ত্রিপুরীতে 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন' আখ্যায় অভিহিত সভায় কি শ্রেণীর জনসমাগম হইয়াছিল, তৎনির্দ্ধারণে সচেষ্ট হওয়া যায়, তবে দেখা যাইবে যে, তথায় মাত্র মুষ্টিমেয় স্বাধীনতাবাদী শ্রেণীর—সামাজিকভাবে যাঁহারা প্রগতিপন্থী, আর্থিক দিক্ দিয়া মধ্যবিত্ত, ধর্ম্মমতের দিক্ দিয়া 'শিক্ষিত' অথবা 'নাস্তিক' তাঁহাদেরই সমাগম হইয়াছিল। আর্থিক দিক্ দিয়া যাঁহারা মধ্যবিত্ত, তাঁহাদের সকলেও উহাতে উপস্থিত ছিলেন না। রাষ্ট্রীয় ভাবে যাঁহারা উদারনৈতিক কিংবা নিরপেক্ষ, সামাজিকভাবে রক্ষণশীল কিংবা সনাতনপন্থী, আর্থিক দিক্ হইতে ধনী ও দরিদ্র, ধর্ম্মমতের দিক্ দিয়া যাঁহারা হিন্দু, জৈন, মুসলমান ও খৃষ্টান—ভারতবাসী এমন কেহই তথায় উপস্থিত ছিলেন না।

সুতরাং সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, যদিও ত্রিপুরীর জনসমাগমকে 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে, তথাপি ভারতবাসী শতকরা ৯৯ জনেরই উহার সহিত কোন প্রকার সংযোগ বিদ্যমান নাই।

অতঃপর, তথাকথিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ত্রিপুরী অধিবেশনে কি কি বিষয় আলোচিত হয়, আমরা তাহার বিশ্লেষণ করিব।

তদ্নিমিত্ত আমরা প্রতি দিনের অধিবেশনের বিষয়সমূহ উপস্থিত করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিব, উহার সহিত প্রত্যেক ভারতবাসীর কিরূপ সংযোগ বিদ্যমান।

প্রথম, ৬ই মার্চ্চ। এই দিবস নির্ব্বাচিত সভাপতি ত্রিপুরীতে উপনীত হন। ৬ই তারিখে উল্লেখযোগ্য ঘটনা দুইটি :—

(১) পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু কর্ত্তৃক কংগ্রেস-প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন, এবং

(২) কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদকের বিবরণী উত্থাপন।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে, কংগ্রেস-প্রদর্শনীর বিষয় ভারতবাসী প্রত্যেকের সহিত জড়িত, কিন্তু যদি সূক্ষ্মভাবে পর্য্যালোচনা করা হয়, তবে দেখা যাইবে যে, প্রকৃত সত্য উহার বিপরীত। এই প্রদর্শনী প্রধানতঃ খাদির—শিল্প ও

পন্থাপিন্ন, এই দুইটি উহার বৈশিষ্ট্য। মিঃ গান্ধী-পরিকল্পিত খাদি কিংবা ওয়ার্দ্ধা শিক্ষা-পরিকল্পনা কিংবা গ্রাম্য শিল্প-সংগঠন নীতি ভারতবাসী অধিকাংশের বাস্তব স্বার্থের অনুকূল নহে। যদি খাদি-প্রচারের কোন বাস্তব প্রয়োজনীয়তা থাকিত, তাহা হইলে, এই সময়ের মধ্যে—যখন ভারতবাসী জনসাধারণ অনাহারে মৃতপ্রায়, উহা বিস্তার লাভ করিতে পারিত। যদি খাদি-সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ অনুধাবন করা হয়, তবে বুঝা যাইবে যে, ইহার প্রবর্ত্তক শিল্প সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ব্যক্তি এবং তিনি বাস্তিকতার প্রতিমূর্ত্তিবিশেষ। ওয়ার্দ্ধার শিক্ষা-পরিকল্পনা এখনও পরীক্ষিত হয় নাই, সুতরাং জনসাধারণের নিকট এখনও উহার স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয় নাই। কিন্তু ইহা বলিবার আমাদের কারণ আছে যে, এই পরিকল্পনাও উহার প্রবর্ত্তকের প্রকৃত শিক্ষা সম্বন্ধে জ্ঞান ও তাহা অর্জ্জনের প্রণালী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞতার পরিচায়ক এবং জনসাধারণ অনতিবিলম্বে উপলব্ধি করিবেন যে, ইহাও ইহার প্রবর্ত্তকের বিদ্বেষ হামবড়াই-ভাবের অন্যতম প্রকাশ মাত্র, ইহার প্রবর্ত্তক নিজেকে শিক্ষার ইতিহাসে একজন 'কেউ-কেটা' বলিয়া পরিচিত হইবার লিপ্সাতেই জনসাধারণকে এই নূতন এক প্রকার ধোঁকাবাজী দিতেছেন। কেন না, শিক্ষিত ব্যক্তি যাহাতে শিক্ষানুযায়ী কার্য্য করিয়া লাভবান্ হইতে পারে—তদনুরূপ ক্ষেত্র সৃষ্টির চেষ্টা না করিয়াই ইহাতে জীবিকার্জ্জনের শিক্ষা দিবার চেষ্টার কথা উঠিয়াছে বলিয়া দেখা যায়। মিঃ গান্ধীর এই শিল্প ও শিক্ষা-পরিকল্পনা ভারতের লজ্জার বিষয়, কেন না ভারতই একদিন পৃথিবীবাসীকে শিক্ষা ও শিল্পের মূলনীতির সন্ধান দান করিয়াছিল। আমাদের এই উক্তির যাথার্থ্য সম্বন্ধে প্রমাণ পৃথিবীর বর্ত্তমান ইতিহাসে পাওয়া যাইবে না, কিন্তু ঋষিপ্রণীত সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ অভ্যাস করিয়া ভারতীয় ঋষির রচনা ও তদ্বাদি যদি প্রকৃত অর্থে পাঠ করা যায়, তবে দেখা যাইবে যে, আমরা যাহা বলিতেছি, তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য।

সাধারণ-সম্পাদকের বিবরণীতেও এমন কিছুই পাওয়া যায় না, যাহা প্রত্যেক ভারতবাসীর অবশ্যই সহিত জড়িত। তিনি তাঁহার বিবরণীতে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত দুইটি বিষয় উল্লেখযোগ্য :—

(১) "হরিপুরে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল, তাহা ভারতের দেশীয় রাজ্যের অধিবাসীদের আকাঙ্ক্ষার প্রতিকূল বলিয়া সমালোচনা করা হইয়াছে, কিন্তু এই সমালোচকদের মধ্যে যাঁহারা অগ্রণী, তাঁহাদের দ্বারাই মিঃ গান্ধী ও তাঁহার চিন্তায় চিন্তান্বিত যাঁহারা, তাঁহারা, ভারতের মোটামুটি ৫০০ শত দেশীয় রাজ্যের অধিবাসীরা যাহাতে স্বাধীনতা ও দায়িত্বশীল শাসনলাভে সমর্থ হয়, তজ্জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন।"

(২) "বর্ত্তমান বৎসরে কংগ্রেস সদস্যের সংখ্যা হইয়াছে ৪৪ লক্ষ ৭৮ হাজার ৭২০। এই সংখ্যা গত বৎসর অপেক্ষা ১৩ লক্ষ ৭৬ হাজার ৬০১ অধিক।"

ইহার প্রথমটি হইতে বুঝা যায় যে, মিঃ গান্ধী দেশীয় রাজ্যসমূহকে ব্রিটিশ ভারতের ব্রিটিশাধীন প্রদেশসমূহের সমকক্ষ করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন এবং দ্বিতীয়টিতে প্রমাণিত হয় যে, কংগ্রেস-সদস্যের সংখ্যা ব্রিটিশ-ভারতের লোকসংখ্যার শতকরা ১ জনও নহে।

এই দুইটি বিষয়ই ভারতবাসী প্রত্যেকের পক্ষে অতিমাত্রায় প্রয়োজন, সেই স্বকীয় জীবিকার্জ্জন ব্যাপারে কোন প্রকার সহায়ক নহে।

৭ই মার্চ্চ তারিখে অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটীর দায়িত্বপূর্ণব্যাপী এক অধিবেশনে কয়েকটি মামুলী বিষয় আলোচিত হয়। এই সকল বিষয়ের একটিও ভারতবাসী জনসাধারণের সকলের স্বার্থের সহিত সংশ্লিষ্ট নহে।

৮ই মার্চ্চ তারিখে অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটী ও বিষয়-নির্ব্বাচনী সমিতির অধিবেশন হয়।

উক্ত কমিটীই পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থের নিম্নলিখিত প্রস্তাব আলোচনা করেন :—

"মহাত্মা গান্ধীর প্রদর্শিত যে পন্থায় কংগ্রেস গত কয়েক বৎসর হইতে চলিয়াছে, এই কমিটী তাহার মূলনীতির সুদৃঢ় ভাবে সমর্থন করিতেছে এবং ইহার সুস্পষ্ট অভিমত এই যে, এই নীতির কোন প্রকার পরিবর্ত্তন অনুচিত এবং ভবিষ্যতে কংগ্রেসের কর্ম্মপদ্ধতি এই নীতি অনুযায়ীই পরিচালিত হওয়া কর্ত্তব্য।

"গত বৎসরে যে কার্য্যকরী সভা কার্য্য করেন, এই কমিটী তাহার কার্য্যে সম্পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করিতেছেন এবং

ইহার কোন একজন সদস্যের বিরুদ্ধেও যে-মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে, তজ্জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন।

"আগামী বৎসরের মধ্যে সঙ্কটজনক অবস্থার উদ্ভব হইতে পারে বলিয়া এবং কেবল মিঃ গান্ধীই সেই সঙ্কট হইতে দেশকে ও কংগ্রেসকে উদ্ধারের পথে অগ্রসর করিতে সক্ষম বলিয়া এই কমিটী ইহা অবিলম্বে বলিয়া মনে করেন যে, কংগ্রেসের কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাসভাজন হইবেন এবং সভাপতিকে গান্ধীজীর ইচ্ছানুযায়ী আগামী বর্ষের কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা নির্ব্বাচনার্থ অনুরোধ করিতেছেন।"

এই দিবস মিঃ এম. এম. গাজিগিল পণ্ডিত পন্থ আনীত প্রস্তাবের সমর্থন করেন।

২রা মার্চ্চ তারিখ সম্পূর্ণভাবে পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাবের সংশোধন-প্রস্তাব আনয়নে এবং মূল প্রস্তাব ও তাহার সংশোধন-প্রস্তাবের আলোচনায় অতিবাহিত হয়।

মিঃ পন্থের প্রস্তাবে অবশ্যই এমন কোন বিষয় পরিলক্ষিত হয় না, যাহা জনসাধারণের অনাহার, অস্বাস্থ্য এবং অশান্তি-বিষয়ক সমস্যা সমাধানের সহিত প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত।

১০ই মার্চ্চ মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুর সভাপতির অভিভাষণ এবং অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শেঠ গোবিন্দদাসের অভিভাষণ শ্রবণে অতিবাহিত হয়। পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাব সম্বন্ধেও আলোচনা হইয়াছিল।

সভাপতির অভিভাষণে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ উল্লেখ-যোগ্য :—

(১) মিশরের ওয়াফদ দলের প্রতিনিধিবর্গের সম্ভাষণ।

(২) সেপ্টেম্বর মাসের মিউনিক চুক্তির ফলে যে আন্তর্জ্জাতিক অবস্থার উদ্ভব হয় এবং সাধারণ-তান্ত্রিক স্পেন সরকারের ক্রমশঃ পতন ইত্যাদি।

(৩) আন্তর্জ্জাতিক অবস্থার ফলে ভারতের রাজনীতি এবং ব্রিটিশ সরকারের নিকট চরম প্রস্তাবরূপে দাবী-প্রেরণের প্রয়োজনীয়তা।

(৪) দেশীয় রাজ্যের জাগরণ।

(৫) কংগ্রেসের অভ্যন্তরস্থ দুর্নীতি ও দৌর্ব্বল্যের অপসারণ।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে চরম অভিযান নিয়ন্ত্রণার্থ কিষাণ ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের পরিচালনা।

সভাপতির অভিভাষণ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পাঠ করিলেও দেখা যাইবে যে, ইহাতেও ভারতবাসী জন-সাধারণের এবং শিক্ষিত যুবকবৃন্দের জীবন-মরণ সমস্যার সমাধান বিষয়ের কোন প্রত্যক্ষ উল্লেখ নাই। অবশ্য মিঃ বসু যখন তাঁহার বক্তৃতা রচনা করেন, তখন পীড়িত ছিলেন এবং সেজন্য তাঁহার বক্তৃতার ত্রুটিও মার্জ্জনাযোগ্য, কিন্তু এই অবস্থাতেও তিনি ব্রিটিশ-বিরোধী কলহ-বাসনা বিস্মৃত হন নাই।

কেবল ভারতীয় জনসাধারণ ও শিক্ষিত যুবক-বৃন্দের জীবন-মরণ সমস্যার বিষয় আলোচনাতেই তাঁহার বিস্মৃতি ঘটিয়াছিল।

শেঠ গোবিন্দদাসের বক্তৃতার মূল বক্তব্য মিঃ গান্ধীর প্রণালীতে অটুট বিশ্বাস সম্বন্ধীয়। তাঁহার বক্তৃতা সুদীর্ঘ হইলেও ইহার মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য বিষয়ই আলোচিত হয় নাই। তিনি বলিতে চাহেন যে, যদি ভারতীয়গণ মিঃ গান্ধী এবং তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপন্থার সেবা করিয়া চলেন, তবেই ভারতীয়গণের মুক্তিলাভে কোন বিঘ্ন ঘটিবে না। সুন্দর উক্তি সন্দেহ নাই এবং আমাদের ইহাতে আপত্তি নাই, কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি—গত বিশ বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত মিঃ গান্ধী এবং তাঁহার প্রদর্শিত পন্থার ধ্যান করিয়াও ভারতবাসী জনসাধারণের দারিদ্র্য ও অস্বাস্থ্য যখন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে; যখন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, মুখে হিংসার কথা বলিলেও মিঃ গান্ধীর প্রদর্শিত উপায়ে কেবল কলহ-বিবাদ সৃষ্টি হইতেছে এবং এই পন্থানুসরণের ফলে ভারতীয় জনসাধারণের ও শিক্ষিত যুবক-বৃন্দের জীবন-মরণ সমস্যার সমাধান বিষয়ে সর্ব্বব্যাপক ঔদাসীন্য প্রকাশ পাইতেছে, তখন মিঃ গান্ধীর প্রদর্শিত প্রণালী ধ্যানের কথা বলা কি মস্তিষ্কহীনতার পরিচায়ক নহে?

যাহাই হউক, শেঠ গোবিন্দদাস মহাশয় সভা করিয়া এমন কোন কথাই বলেন নাই, যাহাকে ভারতবাসী জনসাধারণের জীবন-মরণ সমস্যার সমাধানে প্রত্যক্ষ ভাবে সংশ্লিষ্ট বলা যায়।

১১ই ও ১২ই মার্চ্চ পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাবের আলোচনায় অতিবাহিত হয় এবং মিল-বিষয়ক কয়েকটি প্রস্তাবেরও আলোচনা হয় :—

(১) ভারতীয় দাবী (২) দেশীয় রাজ্যের প্রশ্ন (৩) কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ গুনীতি অপসারণ (৪) ব্রিটেনের বৈদেশিক নীতি।

যদি এই সকল প্রস্তাব মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করা যায়, তবে দেখা যাইবে যে, প্রত্যেকটি প্রস্তাবই পরস্পরিত কলহভাবের সাক্ষ্য এবং ইহার কোনটিতেই এমন কিছু নাই, যাহাতে প্রমাণ হয় যে, আমাদের নেতৃবৃন্দের কাহারও ভারতীয় জনসাধারণের দারিদ্র্য ও শিক্ষিত ভারতীয় যুবকবৃন্দের বেকার-সমস্যা সম্বন্ধে কোন কার্যকরী সহানুভূতি বিদ্যমান। হইতে পারে যে, তাঁহারা দারিদ্র্য ও বেকার-সমস্যার সমাধানকল্পে স্বাধীনতা অপরিহার্যভাবে প্রয়োজনীয় মনে করেন বলিয়াই স্বাধীনতা অর্জনের কথা কহিয়া থাকেন এবং উহার চিন্তা করেন। কিন্তু আমরা পাঠক-বৃন্দকে চিন্তা করিয়া দেখিতে বলি যে, কোন লক্ষ্যে উপনীত হইবার সম্পূর্ণ পন্থার সন্ধান জ্ঞাত না হইয়াও নেতৃবৃন্দ বলেন কিরূপে যে, সেই লক্ষ্যে পৌঁছাইবার নিমিত্ত ইহা কিংবা উহা কর্তব্য।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহা হইতে বুঝা যাইতে পারে যে, তথাকথিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ৫২তম অধিবেশনে ভারতীয় জনসাধারণের সকল শ্রেণী যোগদানও করেন নাই এবং তথায় এমন কোন বিষয়েরও আলোচনা হয় নাই, যাহাকে ভারতবাসী জনসাধারণের স্বার্থের সহিত প্রত্যক্ষ ভাবে সংশ্লিষ্ট বলা যায়।

এই জন্যই আমরা প্রশ্ন উত্থাপিত করিতে চাই যে, ইহাই কি ভারতের জাতীয় কংগ্রেস?

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিল্প ও কৃষ্টিগত উন্নতি

গত ১১ই মার্চ তারিখে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক কনভোকেশন অনুষ্ঠিত হয়। চ্যান্সেলর অনুপস্থিত ছিলেন বলিয়া ভাইস্-চ্যান্সেলর খাঁ বাহাদুর আজিজুল হক উহার সভাপতিত্ব করেন।

তাঁহার বক্তৃতার মূল বক্তব্য অর্থসাহায্যের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এবং তজ্জন্য শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মালিকগণের নিকট তিনি আবেদন জ্ঞাপন করেন।

তাঁহার মতে, দেশে শিল্প ও কৃষ্টিগত সমধিক উন্নতি হইয়াছে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই এই সব উন্নতির মূল।

আমাদের মতে, তাঁহার এই কথা একেবারেই ঠিক নহে। আমরা মনে করি যে, বর্তমান জগতে কুত্রাপি মনুষ্যসমাজের প্রকৃত শিল্প ও কৃষ্টিগত প্রয়োজন পূরণের পথে কোন উন্নতি হয় নাই এবং সুতরাং তদ্‌কল্পে কোন বিশ্ব-বিদ্যালয়কেই কোন কৃতিত্বসূচক প্রশংসা করা যায় না। আমরা ইহাও মনে করি যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে শিল্প ও কৃষ্টিগত উন্নতির নামে যাহা কিছু চলিতেছে, তাহা কু-শিল্প ও কু-কৃষ্টি; এবং এই তথাকথিত শিল্প ও কৃষ্টি-গত উন্নতি মনুষ্যজাতির হিত অপেক্ষা অহিত অধিক সাধন করিতেছে এবং উচ্চস্থ বিশ্ব-বিদ্যালয়সমূহ সর্বত্র প্রশংসা অপেক্ষা অধিক নিন্দার পাত্র।

আমাদের এই অভিমতের মূল কারণ অনুসন্ধানে বেগ পাইতে হইবে না। সকলেই স্বীকার করিবেন, শিল্পের উদ্দেশ্য প্রধানতঃ জনসাধারণের অনাহার ও বেকার-সমস্যার নিবারণে এবং কৃষ্টির প্রয়োজন অসন্তুষ্টির দূরীকরণার্থ। ইহা হইতে বলা যায় যে, যদি উন্নয়ন সত্ত্বেও কোন শিল্পের প্রসারে জনসাধারণের দারিদ্র্য, অনাহার এবং বেকার-সমস্যার বৃদ্ধিই পাইতেছে বলিয়া দেখা যায়, তবে উহা নিন্দনীয় এবং ভ্রান্ত। কৃষ্টি সম্বন্ধেও ঐ একই কথা প্রযুক্ত। যদি দেখা যায়, ইহার প্রসার সত্ত্বেও জনসাধারণের অসন্তুষ্টি বৃদ্ধি পাইতেছে, তবে ধরিতে হইবে যে, প্রচলিত কৃষ্টি নিন্দনীয় এবং উহা ভ্রান্ত।

এক্ষণে বর্তমান শিল্প ও কৃষ্টির সূচনাবধি বাস্তব অবস্থা যদি এইদিক্ হইতে পর্যালোচনা করা যায়, তবে দেখা যাইবে যে, সর্বত্র জনসাধারণের মধ্যে অধিক দুঃখ-দুর্দশা ও অসন্তুষ্টি বাড়িয়া চলিয়াছে। হইতে পারে যে, কয়েকজন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মালিক সাময়িকভাবে নিজেরা লাভবান্ হইতে সমর্থ হইয়াছেন, কিন্তু পৃথিবীর কুত্রাপি জনসাধারণের মধ্যে সমৃদ্ধি ও সন্তুষ্টির বিস্তার দৃষ্ট হয় না। শিল্প-প্রতিষ্ঠানের

যাঁহারা মালিক, এমন কি, তাঁহাদের মধ্যেও স্থায়ী সমৃদ্ধি দৃষ্ট হয় না।

যদি শিল্প ও কৃষিসম্বন্ধীয় প্রকৃত দর্শন মনোযোগ সহকারে অনুধাবন করা যায়, তবে দেখা যাইবে যে, বর্তমানে প্রচলিত শিল্প ও কৃষিগত প্রণালী জনসাধারণের কোন প্রকৃত হিত সাধন করিবে বলিয়া আশা করা যায় না। ইহারা বরং তাহাদের অনিষ্ট সাধন করিতে বাধ্য। ইহাদের বলিষ্ঠদেহে ভুল রহিয়া গিয়াছে এবং আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ধুরন্ধরগণ যে এই সরল কথাটি বুঝিতে পারেন না, তাহার কারণ তাঁহাদের বুদ্ধি ভ্রংশ হইয়াছে। ইহার নিমিত্ত অবশ্য দায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের কু-শিক্ষা।

খাঁ বাহাদুর আজিজুল হকের বক্তৃতার অনেকাংশ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ইতিহাস ও বিজ্ঞান-বিভাগের গবেষণার প্রশংসায় পরিপূর্ণ।

ইহা সত্য যে, প্রচলিত পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের বিস্তারের ফলে মনুষ্যসমাজ রেল, ট্রাম, মোটরগাড়ী, এরোপ্লেন, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, কলকব্জা পরিচালনার বহুপাতি ইত্যাদি বহুতর সামগ্রী লাভ করিয়াছে, কিন্তু তাঁহার বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈজ্ঞানিকগণের নিকট হইতে খাঁ বাহাদুর সন্ধান লইতে স্বীকৃত কি যে, তাঁহাদের মধ্যে কেহ বলিতে পারেন কি না, বিজ্ঞানের এই সব কাজ মনুষ্যসমাজের প্রকৃত উপকারী! দেখা যাইবে যে, তাঁহার বিশ্ববিদ্যালয়ের জনকয়েক বৈজ্ঞানিক হয়তো উপরের ঐ বহুবিধ দ্রব্যের প্রস্তুত-প্রণালীর তথ্য শিক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারাও হাতে-কলমে ঐগুলি প্রস্তুত করিতে পারেন না এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহই বলিতে সমর্থ নহেন যে, সমগ্রভাবে ঐ সকল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার মনুষ্যসমাজের উপকারী কি না।

শিল্পক্ষেত্রে বর্তমান পদার্থবিদ্যা এবং রসায়নের কি উপকারিতা, তাহার সন্ধান করিলে দেখা যায় যে, বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বর্তমানে যে পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন শিক্ষা দেওয়া হয়, শিল্পক্ষেত্রে এক ঔষধ প্রস্তুতের ব্যাপারে ব্যতীত তাহার আর কোন সংযোগই নাই—উহা আবার মনুষ্যসমাজের রক্ষা অপেক্ষা সর্বনাশের অধিক সহায়ক।

ইহাও দেখা যাইবে যে, বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে যে পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্রের শিক্ষা দেওয়া হয়, উহারা বর্তমানে শিল্পের উন্নতিতে সহায়তা তো করেই নাই, পক্ষান্তরে বর্তমান শিল্পই প্রায় সর্বক্ষেত্রে বর্তমান পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের মূলে রহিয়া গিয়াছে।

যদি পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্র সম্বন্ধীয় প্রকৃত দর্শন পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তবে দেখা যাইবে যে, বর্তমান পদার্থ-বিদ্যা ও রসায়ন প্রকৃত পদার্থ বিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্রের আখ্যা লাভ করিতে পারে না এবং প্রকৃত বুদ্ধিমত্তার পক্ষে উহা গৌরব অপেক্ষা অধিক লজ্জার বিষয়। ইহাও দেখা যাইবে যে, বর্তমান বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারসমূহের প্রায় প্রত্যেকটি মনুষ্যসমাজের বর্তমান দুঃখ-দুর্দশার অন্যতম কারণ। যদি বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় প্রকৃতিদত্ত মানুষের স্বাভাবিক বুদ্ধি নষ্ট না হইত, তাহা হইলে ইহা বুঝা কষ্টকর হইত না যে, যতদিন সমাজে প্রকৃত বিজ্ঞানের আধিপত্য থাকে, ততদিন জন-সাধারণের মধ্যে কোন প্রকার দুঃখ-দুর্দশা বিরাজমান থাকে না এবং বর্তমানে জনসাধারণের মধ্যে যে দুঃখ-দুর্দশা বিরাজ করিতেছে এবং ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে, উহাই যথেষ্ট প্রমাণ যে, বর্তমান বিজ্ঞানের প্রচার অপেক্ষা ধ্বংসই অধিকতর কাম্য।

বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতগণ ইতিহাস বলিয়া যাহা রচনা করিয়াছেন, উহাও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ব্যর্থতার প্রমাণস্বরূপ আর একটি লজ্জাকর বিষয়। উহা অলীক কল্পনায় পরিপূর্ণ, কার্য-কারণের যোগসূত্রের সন্ধানেও উহা টিঁকিতে পারে না। উহাতে এই প্রমাণ হয় যে, বর্তমান ঐতিহাসিকবৃন্দ কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানবিহীন।

বর্তমান ঐতিহাসিকবৃন্দের রচিত অধিকাংশ ইতিহাসই প্রমাণ করিতে ব্যস্ত যে, বর্তমান মনুষ্যসমাজ ক্রমবিবর্তনের নিয়মে উন্নতিশীল, কিন্তু এই সমস্তের মধ্যে কোন মনুষ্য-পরিবারের ইতিহাসের সহিতই এই বিবরণ খাপ খায় না, কেন না, পৃথিবীর প্রত্যেক স্থানে প্রত্যেক পরিবারেই অর্থকৃচ্ছ্রতা, বেতনভোগী নফরগিরী, অনাসৃষ্টি এবং অকালমৃত্যুর দুঃখ-দুর্দশা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে।

প্রকৃত ঘটনা এই যে, পৃথিবী বিপরীত দিকে চলিয়াছে এবং তৎসহ শিক্ষার নীতিও বিপরীত হইয়া পড়িয়াছে। মনুষ্যের উদ্বেগ-পূরণ-সহায়ক প্রকৃত বিজ্ঞান, প্রকৃত কলা,

প্রকৃত শিল্প এবং প্রকৃত ইতিহাসের মূল কেবল প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বেদে, প্রাচীন হিব্রুতে লিখিত বাইবেলে এবং প্রাচীন আরবী ভাষায় লিখিত কোরাণে পাওয়া যায়। এই তিনটি ভাষার কোনটিই এবং সেই জন্য এই তিনটি ভাষাতে লিখিত কোনও গ্রন্থই বুঝিয়া উঠা, যদি মনুষ্যদেহাভ্যন্তরস্থ শব্দের উন্মেষ ও গতি উপলব্ধি না করিতে পারিলে সম্ভব নহে। এই সকল গ্রন্থ রচনার বহু পরবর্ত্তীকালে রচিত, বর্ত্তমানে প্রচলিত ব্যাকরণ ও অভিধানের সাহায্যেও ঐ সকল গ্রন্থ বুঝিয়া উঠা যায় না। যখন প্রাগুক্ত শব্দবিজ্ঞান জ্ঞাত হওয়া যাইবে, তখন দেখা যাইবে যে, বর্ত্তমানে বেদ, কোরাণ ও বাইবেল এবং প্রাচীন সংস্কৃত, প্রাচীন হিব্রু ও প্রাচীন আরবীভাষায় লিখিত কোন গ্রন্থই যে অর্থে প্রচলিত, তাহা যথার্থ নহে এবং উহাদের প্রত্যেকটিই ভ্রান্ত অনুবাদের মারফৎ লোকসমাজে স্থান পাইয়াছে। যদি ঐ শব্দবিজ্ঞানের জ্ঞানার্জ্জনের চেষ্টা করা যায়, তবে ইহাও দেখা যাইবে যে, বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচারিত শিক্ষা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং ইহার প্রসার অপেক্ষা ধ্বংসই অধিকতর বাঞ্ছনীয়।

যে-সকল স্থানে আসীন হইবার যোগ্যতা যে সকল ব্যক্তির নাই, তাঁহারা সেই সকল স্থান অধিকার করিয়া আছেন এবং যে-সকল বিষয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করিবার সামর্থ্য যাঁহাদের নাই, তাঁহাদিগকে সেই সব বিষয়ে কথা কহিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে—ইহা পরিতাপের বিষয়।

বঙ্গশ্রী

—শ্রীনিত্যানন্দ কর্ম্মকার

কোথায় তোমার স্বর্গ দেখ ?—নয়কো দেবের নন্দনে ;
হেথায় যেগো স্বর্গ ভরা তোমার নিজ অঙ্গনে !
অপ্সরীকুল নয়কো সেথায়—
অদ্বিতীয় নৃত্যকলায়,
ফুলপরীদের নৃত্য জাগে প্রজাপতির বর্ণনে ;
কিন্নরীদের গানের সুধা কোকিল শিষায় বন্ধনে !

হেথায় আলো আঁধার রাতে
জোনাক্ জ্বলে গাছের পাতে,—
সোনার গাছে চাঁদের কুসুম ফোটায় ছলি স্বপ্নকে ,
চাঁদের আলোয় মাণিক ঝরে কোন্ দেবতার কোন্ লোকে !
হেথায় মধু কুঞ্জে তরুণ প্রেমের যত ঢেউ জাগে,
কোন্ ত্রিদিবের বক্ষ পরে বসন্তের এ বান্ জাগে ?

হেথায় ধরার সবুজ খেতে
স্বর্ণ ফলে দিনে রেতে,
কোন্ অরুণের তরুণ ভাতি লক্ষ মরণ মূর্চ্ছাতে
পীযূষ ঢালি জাগিয়ে তোলে নিত্যই নিশির শেষভাগে ?
কোথায় গেঁছে স্বর্গ তোমার ?—স্বর্গ হেথায় বঙ্গেতে :
দিবালোকের দীপ্তি জাগে ধরার সারা অঙ্গেতে !

লক্ষ বাসর এরই মাঝে
নব নিয়ে আজও রাজে,
লক্ষ মুণি যেথান যত মোক্ষ ফলের করেতে ;
লক্ষ দেবের চরণ ধূলায় স্বর্গ হেথায় বঙ্গেতে !
হেথায় আমি আমার যত স্বপন জাগা কল্পনে,
নিত্য নবীন স্বর্গ রচি আমার এ দীন অঙ্গনে ?

তরুণ প্রাণের নেশার সাথে
কতই কোটে দিনে রাতে—
পারিজাত আর অপ্সরীদের মন-মাতানো ভঙ্গিমা ;
আমার বুকে স্বর্গ যেগো চির-নবীন ভঙ্গিমা !

নট্ এ পাইস

—শ্রীরমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রবাদ আছে যে কিরি স্বর্গে গিয়াও শান্তি নাই; মানুষেরও সেই অবস্থা। যে সব আত্মীয়-স্বজন মর্ত্যে থাকে, তাহাদের চিন্তায় স্বর্গত আত্মা না কি কিছুতেই স্বস্তি পায় না। সবাই চিন্তা ছেলেগুলো মানুষ হইল তো; যে সামান্য কিছু রাখিয়া গেলাম, তাহার সদ্ব্যবহার হইতেছে তো।

স্বর্গত প্রেসিডেন্ট প্যাটেলের অবস্থা অনেকটা সেই রকমের। তদুপরি ইহলোকের মুখপত্র 'ইভেন টাইম্‌স্'-এ প্রকাশিত মর্ত্যের একটা বিবরণে তাঁহার চিন্তা আরও বাড়িয়াছে। ভারতের কংগ্রেস সভাপতির পদ লইয়া একটা গোলমালের সূচনা হইয়াছে। একদিকে সুভাষচন্দ্র, অন্যদিকে ওয়ার্কিং কমিটীর "নমিনী" পট্টভি সীতারাম। তিনি ভাবিয়া পাইলেন না, এ দ্বন্দ্ব কেন? গৃহবিবাদের আশঙ্কায় তাঁহার চিত্ত উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। একবার মনে হয়, গান্ধিজী কি বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়াছেন, তিনি জীবিত থাকিতে এইরূপ মতদ্বৈধ হইবার কারণ কি? বাঁচিয়া থাকিতে তিনি এইরূপ চিন্তাতেই অভ্যস্ত ছিলেন—স্বর্গে গিয়াও তাহাই করিতেছেন।

অনেকদিন ধরিয়াই তাঁহার ইচ্ছা মর্ত্যের একটা ফার্ষ্ট-হ্যাণ্ড খবর লন; কিন্তু মর্ত্যের খবর লওয়া একটা বিষম ব্যাপার, সবাই মর্ত্যের খবরের জন্য ব্যস্ত: একটী মাত্র "ফোন", তদুপরি কার্নেজী, রকফেলার ইত্যাদি স্বর্গে আসিবার পূর্ব্বেই মোটা টাকা দাদন দিয়া আসিয়াছেন, তাই তাঁহাদিগকে সর্ব্বাগ্রে ওবলাইজ করিতে হয়। মার্কনি সাহেবকে দোষ দেওয়া চলে না।

একটা গভীর নিশ্বাস প্যাটেল মহাশয়ের বুক হইতে নির্গত হয়। তিনিও যৎসামান্য দাদন দিবার ব্যবস্থা মর্ত্যে থাকিতেই করিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু চেকটী এখনও ক্যাশ না হওয়ার ফলে মর্ত্যে ফোন করিবার অধিকারে বঞ্চিত।

তাই অতি প্রত্যূষে উঠিয়া (সারারাত তাঁহার কংগ্রেসের চিন্তায় ঘুম হয় নাই) দেশবন্ধু দাসের বাংলোয় উপস্থিত। দেশবন্ধু সাধারণতঃ একটু বেলাতেই উঠেন, কিন্তু তিনিও তাঁহার প্রিয় শিষ্যের ইলেকসন্ ব্যাপারে বিনিদ্র রজনী যাপন করিয়াছেন। প্রেসিডেন্ট প্যাটেলকে দেখিয়া সস্মিত মুখে বলেন, 'হ্যালো মিঃ প্যাটেল, ব্যাপার কি, এত সকালে?'

প্যাটেল—'কংগ্রেসের গোলযোগে একটু চিন্তিত হয়ে পড়েছি। তাই আপনি যদি মার্কনি সাহেবকে একটা চিঠি দেন, তবে বল্লভভাইকে ফোন করে ব্যাপারটা সঠিক জেনে নি।'

প্রেসিডেন্ট প্যাটেলের প্রস্তাব দেশবন্ধুর মনঃপূত হইল; তিনি মার্কনি সাহেবকে একখানা পত্র দিলেন, যেন মিঃ প্যাটেলকে মর্ত্যে একটা ফ্রি-ফোন করিতে দেন। মিঃ মার্কনি অনেক দিন যাবৎ ইণ্ডিয়ায় ফোন সার্ভিস পপুলার করিবার কথা ভাবিয়া আসিতেছেন। তাই দেশবন্ধুর সুপারিশের সুযোগ সাদরে গ্রহণ করিলেন, বলেন—'মোষ্ট গ্ল্যাডলি, আপনি আপনার ভাইকে ফোন করতে পারেন, তবে একটা অনুরোধ—ভারতীয় ক্রোড়-পতিরা মরবার পূর্ব্বে দু' একটা কনেকসন দ্বারকে আপনার ভাই-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন।'

প্রেসিডেন্ট প্যাটেল বললেন—'নিশ্চয়, নিশ্চয় থ্যাংক য়ু!' প্রেসিডেন্ট প্যাটেলের সহিত বল্লভভাই-এর কথা আরম্ভ হইল।

প্রেঃ প্যাটেল—'হ্যালো'।

বল্লভভাই—'হ্যালো, কে, দাদা?'

প্রেঃ প্যাটেল—'হ্যাঁ, আমি, তোমাদের খবর সব ভাল? অনেকদিন তোমাদের খবর পাই না।'

বল্লভভাই-এর মনটা তখন অত্যন্ত খারাপ। সেই মাত্র কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর ১২ জন সভ্য পদত্যাগ করিবার সুদৃঢ় সংকল্প করিয়াছেন, অবশ্য শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র যদি ভোটে ইলেকটেড হন। মেম্বাররা সবাই চলিয়া গিয়াছেন, আছেন কেবল ভুলাভাই দেশাই ও রাজেন্দ্রপ্রসাদ।

প্রেঃ প্যাটেল—'কেন, তোমার মন খারাপ কেন? কংগ্রেস-প্রেসিডেন্টের ইলেকসন্ নিয়ে না কি গোলমাল বেধেছে?'

বল্লভভাই—'হ্যাঁ, সেই জন্যেই ত মনটা খারাপ। দেখুন, সমগ্র ভারত আমাকে মানে, বাপুজী খালি আমাকে ডাকেন, আপনি তাড়াতাড়ি করুন, হয়ত বাপুজী এখনি আবার ডাকবেন।'

প্রেঃ প্যাটেল—'তাতে হয়েছে কি? গান্ধীজী তো তোমাকে বরাবর স্নেহ করেন।'

বল্লভভাই—'স্নেহের কথা নয়, কাজের জন্য তিনি আমাকে ডাকেন, যেখানে কাজ সেখানেই বল্লভভাই।

তাই বাপুজী খালি আমাকে ডাকেন, আমার সময় বড় কম।'

প্রেঃ প্যাটেল—'কেন, গান্ধিজী কি বানপ্রস্থ অবলম্বন করেছেন? তোমার উপরেই সব ভার না কি?'

বল্লভভাই—'বাপুজী এখনও বানপ্রস্থে যান নাই বটে, তবে সব কাজই আমাকে করতে হয়। আর বলতে কি, আমি বল্লভভাই একপ্রকার ডিক্টেটর, নরিম্যান মাথা তুলেছিল তার মাথা ভেঙে দিয়েছি, যারে নিজের পায়ে হাঁটতে চেয়েছিল, তাকে মত ঠ্যাং খোঁড়া করে দিয়েছি—বুঝিয়ে দিয়েছি কংগ্রেসের কাঠের পা থাকতে নিজের পায়ে চলা চলবে না, তা যতই মজবুত হক। সুভাষ বসু—'

এই সময়ে ভুলাভাই ও রাজেন্দ্রপ্রসাদ ইঙ্গিতে বল্লভভাইকে চুপ করিতে বলিলেন। সুভাষ বসুর উপরে প্রেসিডেন্ট প্যাটেলের স্নেহ আছে, তাঁহাদের ধারণা।

প্রেঃ পেটেল—'কি বলছিলে—সুভাষ কি করেছে?'

গোঁয়ার-গোবিন্দ বল্লভভাই বন্ধুদের ইঙ্গিত গ্রাহ্য করিলেন না। বলিলেন—'সুভাষ, তোমার আদরের সুভাষ আমাকে মানতে চায় না। তাই তার জন্যে চিরদিনের জন্য—ডেথ সেনটেন্স তৈরী করে রেখেছি, সে আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চায় এত বড় তার সাহস—আমি বল্লভভাই, বাপুজীর দক্ষিণ ও বাম হস্ত। ইলেকটেড না হ'লে বাছাধনকে মজা দেখাব।'

প্রেঃ প্যাটেল—'বেশ তো, সুভাষ প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী তাতে হয়েছে কি? বড় জোর তাকে ভোট দেবে না।'

বল্লভভাই—'আপনি বুঝতে পাচ্ছেন না, মরে গেলে দেখছি, বুদ্ধিভ্রংশ ঘটে। এতে কংগ্রেসের ইনডিসিপ্লিন ঘটে—আর বলতে কি, আমি তাকে সুভাষকে দেখতে পারি না। আর বোধ হয় বুঝতে পাচ্ছেন, আমার দেখতে না পারা আর ইনডিসিপ্লিন একই কথা। তাই বাপুজীকে দিয়ে ওকে উইদড্র করতে চিঠি পাঠিয়েছি।'

প্রেঃ প্যাটেল—'গান্ধিজী রাজী হলেন এরূপ অন্যায় প্রস্তাব করতে?'

বল্লভভাই—'রাজী না হয়ে তাঁর উপায় নাই। পূর্বে বলেছি বাপুজী আমাকে সব কাজে খালি ডাকেন; বাপুজীকে না হলে কংগ্রেসের চলতে পারে, কিন্তু বল্লভভাই না হলে কংগ্রেসের চলবে না।'

প্রেসিডেন্ট প্যাটেল যেন একটু ক্ষুণ্ণ হইলেন। পরে বলিলেন—'বটে? তোমরা তবে কারো প্রিন্সিপল্-এর সম্মান করছ না।'

বল্লভভাই—'অন্যের আবার প্রিন্সিপল্ কি? আমার ও বাপুজীর প্রিন্সিপল্ ছাড়া কারও প্রিন্সিপল্ থাকা চলবে না, তাই সুভাষচন্দ্রকে বুঝিয়ে দেব।'

প্রেসিডেন্ট প্যাটেল বুঝিলেন বল্লভভাই-এর সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। মদগর্বে সে যেন ফাটিয়া পড়িতে চায়। তিনি চিন্তিত হইলেন। উইলের ব্যবস্থাগুলির সম্বন্ধে বলিলেন, 'হ্যালো! তোমাদের এই কলহে আমি ও দেশবন্ধু অত্যন্ত দুঃখিত, গান্ধীজীকে বল। গান্ধীজী যে শেষে কারও হাতের ক্রীড়নক হবেন কল্পনা করতে পারি নি। যাক, আমার টাকাটা সুভাষকে দিয়েছ?'

বল্লভভাই—'(আশ্চর্যান্বিত ভাবে) টাকা! কিসের টাকা?'

প্রেসিডেন্ট প্যাটেল আশ্চর্য্য হইলেন যথোধিক, বলিলেন, 'কেন, আমার উইলে যে টাকার বরাদ্দ আছে। করেন প্রোপ্যাগাণ্ডার জন্য।'

বল্লভভাই—'দেখুন, আপনি যদি ট্রাষ্টিদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে চান, তবে আমি আপনার বিষয়ের ট্রাষ্টি হতে অপারগ। আপনি স্বচ্ছন্দে নিজে তার ম্যানেজমেন্টের ভার নিতে পারেন;—আমি সুভাষকে এক পয়সা দিব না'—বলিয়া ফোন ছাড়িয়া দিলেন।

প্রেসিডেন্ট প্যাটেল যতই ভাই-এর কথা শুনিতেছিলেন ততই বিস্ময়ে অভিভূত হইতেছিলেন। বল্লভভাই, যে তাঁহার জীবদ্দশায় কোনদিন কথার বিরুক্তি পর্য্যন্ত করে নাই, যাহাকে সকলের কাছে 'লক্ষ্মণ ভাই' বলিয়া সগর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছেন, সেই ভাই মৃত্যুর পরে দাদার সামান্য অনুরোধ এইরূপে অবজ্ঞা করিতেছে। লোককে আর চিনিবার উপায় নাই!

প্রেসিডেন্ট প্যাটেল উদ্বিগ্নচিত্তে দেশবন্ধুর বাংলোর দিকে চলিলেন।

ভুলাভাই ও রাজেন্দ্রপ্রসাদ অস্থির চিত্তে বল্লভভাই-এর দিকে চাহিয়াছিলেন; বল্লভভাই-এর শেষের দিকের উত্তরে দু'জনার মন খুসীতে ভরিয়া গেল। উৎফুল্ল হইয়া ভুলাভাই বলিলেন, 'ওয়েলসেড সর্দারজী, 'নট এ পাইস, নট এ পাইস'।

রাজেন্দ্রপ্রসাদও সমান উল্লসিত, 'বলে সাবাস, সাবাস, এক দামড়ি নেহি দেনা।'

•

ক্ষুৎপিপাসায় মৃতপ্রায় স্বাধ্যাভাবে জীর্ণা শীর্ণা ভারত-মাতার বুক চিরিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল—কাহার কর্ণে তাহার শব্দ পৌঁছাইবে?

জয়পুর

—শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষ

জয়পুর প্রবেশ করিলাম।

কেবল রাজপুতনার মধ্যেই সহরটি নামী, শুধু যা দেখিতে সুন্দর তাহা নয়, সমগ্র ভারতবর্ষ ঘুরিয়া বাস্তবিক ভারতীয় সহর দেখিলাম জয়সিংহ-নির্ম্মিত এই জয়পুর। এই সহরেরই শ্বেতপ্রস্তরের সাহায্যে তৈয়ারী তাজকে আজ কৈফিয়ৎ দিতে হয় না, বরং চোখে ধাঁধা লাগায়, মনে হয় যেন গতকল্য ইহার নির্ম্মাণ-কার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে। তাজের যারা মজা, ইহারও তাহাই মজা। যত দেখা যায়, ততই দেখিতে ইচ্ছা করে, অরুচি বোধ হয় জয়পুরই ভারতে একমাত্র সহর, যাহার

আকর্ষণ, যাহার অপরূপ রূপের টান মনে মোহ সঞ্চার করে।

সমগ্র ভারতবর্ষ যদি মোটা মূল হয়, জয়পুর অকুটন্ত কুঁড়ি। এই কুঁড়ির দিকে চাহিয়া মনে হইল, এই সৌন্দর্য্যও বুঝি সেই দিন লুপ্ত হইবে, যেদিন সভ্য সহরের মত বাস্, ট্রাম, বহু ও বিস্তর বিদেশী মাল-পত্রে ঠাসাই-করা দোকান-পসারের ভীড় লইয়া গিয়া তাহার সৌন্দর্য্য বাড়াইবার চেষ্টা হইবে।

জয়পুর অকুটন্ত। কুটন্তের তুলনায় বুঝি ইহার সৌন্দর্য্যও তাই অধিক। অবশ্য সাধারণের কাছে কলিকাতা, বোম্বাই, ইত্যাদি আধুনিক ফ্যাসানের সহর থাকিতে আঁচড়ান-খোবড়ান যুগ-যুগান্তরের পুরাতন ভাঙ্গা-পড়া আবহাওয়ার মৃত কোন দিনই হৃদয়স্পর্শী নয়। কিন্তু যাহার কল্পনাশক্তি আছে, তাহার নিকট ইহার আবেদন অসাধারণ। জয়পুরে যে আধুনিকতা প্রবেশ করে নাই তাহা নয়, তবে আমের, আজানের, গলতা, পুরান ঘাট, রামগড় ইত্যাদি বহু পুরাকালের ভীর্ণ শীর্ণ দুর্গাদি আছে বলিয়া দু-একখানি ঝিক্‌ঝিকে, লিক-লিকে মোটর যাওয়ায় ইহার স্বভাব-সৌন্দর্য্যের বিশেষ হানি হয় নাই।

মযূরের ভীড় স্থানটির আবহাওয়ার সঙ্গে সুন্দর ভাবে খাপ খাইয়াছে। বর্ষার (জয়পুরীরা বর্ষাকে হারিয়ালী মরসুম অথবা চোমাসা বলিয়া থাকে) বাদলা হাওয়ার সঙ্গে যখন মযূরের নৃত্য আর তার সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গীন রাজপুতানীদের নানা রংয়ের ঘাগরা, লুগড়ী, কাঁচুলী, ওড়না নাচিতে থাকে, যখন বর্ষার বাদলা বেলা শীতের আমেজ আনিয়া মনকে নাড়া দেয়, তখন আলাউদ্দীনের আশ্চর্য্য প্রদীপের কথা মনে পড়ে। জয়পুর কি সেই প্রদীপের সৃষ্টি?

সেখানে বর্ষা স্পর্শ করিলেই বনে বনে রূপসীদের ভীর্ণ দুর্গাদির কোলে নৃত্য ও বনভোজনের সমারোহ সুরু হয়। শীতে গাছের পাতা ঝরার আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে দোলের ধুমধামে সহর হয় গুলজার। সন্ধ্যার শেষ পর্য্যন্ত মাথায় হিনটা, কাঁখে একটা, আর এক হাতে একটা, সর্ব্বসুদ্ধ চার পাঁচটি কলসী ঘড়া লইয়া, দলের পর দল জয়পুরাঙ্গনারা কূপ হইতে জল লইবার জন্য দোল খাইতে খাইতে বিশেষ করিয়া গ্রামের বেলাগুলিকে সুন্দর ভাবে রূপে, রসে এবং রচনায় সাজাইয়া রাখে।

কেবল জয়পুর নহে, অম্বরের কথাও ভুলিবার নহে। সেখানে এমন কিছু না থাকিলেও শিল্পীর জন্য যথেষ্ট খোরাক রহিয়াছে। জয়পুর হইতে মাইল পাঁচেকের রাস্তা অম্বর। পুরাকালের দুর্গ-প্রাসাদাদিতে, হ্রদে, খালে, বিলে, পর্ব্বতে অম্বর

পরিপূর্ণ। জয়পুর হইতে অম্বর যাইবার পথে নাহারগড়, অর্থাৎ টাইগার ফোর্ট, গণেশ গড়, জলমহল ইত্যাদির শান্ত দৃশ্যে অন্ধেরও বুঝি দৃষ্টি খুলিয়া যায়। প্রকৃতির সঙ্গে মিল খাওয়াইয়া এই নগরটিকে যেন গড়িয়া তোলা হইয়াছে। এই স্থানেই বাস্তব শান্তি বা নির্বাসনাও সম্ভব। আমার মনে হয়, লীগ অব নেশন্স-এর অধিবেশন কেনেভায় না বসিয়া এখন কোন স্থানে হইলে নিশ্চয়ই বিশ্বব্যাপী শান্তির কল্পনা এতদিনে সফল হইত।

সাঙ্গানের জয়পুর হইতে প্রায় মাইল দশেক দূরে। সাঙ্গানেরেরও ওই একই স্বভাব। কিন্তু তীর্থ স্থান-পূর্ণ। প্রাণই আঁকিবার জন্য সেখানে যাইব করিতাম। বাসিন্দারা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া হয়রান হইত যে, সাঙ্গানেরে আঁকিবার জন্য কেন আসিয়াছি! এখানে এই ভাঙ্গাচোরা, খোবড়া, প'ড়ো-দেয়ালের গা-ওয়া অশ্বথ, এই রুক্ষ বিধবারূপী মৌন হাব-ভাবের মধ্যে আঁকিবার কি আছে, তাহা তাহারা বুঝিতে পারিত না। অতি-পরিচয়ে ইহার মাধুর্য তাহাদিগকে মুগ্ধ করে না।

রামগড়ের পথে।

আমার আনন্দ আমি হাসিয়াই তাহাদিগকে জানাইতাম, নিশ্চয় কিছু পাইয়াছি, নহিলে রাজপুতানায় মে-জুনের কাটকাটা তাপ তুচ্ছ করিয়া আট নয় মাইল অতিক্রম করিয়া আসার সার্থকতা কি? আনন্দ রহিয়াছে বলিয়াই, তোমাদের রৌদ্র মন্দির-নগর পরিবেষ্টিত সাঙ্গানেরে আমার আসা। এইখানে বলিয়া রাখি, সাঙ্গানেরের ছোলার ডাল ভাজার কথা ভুলিবার নয়, ফেরার পথে রোজই অল্প কিছু ছোলার ডাল কিনিয়া বাইকে চড়িতাম।

জয়পুর সহরের চারিধারে ঘেরা উচ্চ প্রাচীর, প্রায় আট নয়টি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দরজা সহরে প্রবেশের পথ। সেই সব প্রবেশ-পথ দেখিবার হয় তখন, যখন ষ্টেট-প্রোসেসনের ধুমধাম আরম্ভ হয়। জয়পুরের পূর্ব দিকে যে দরজাটি, সেটি গলতা যাইবার পথ।

গলতা স্থানটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে বেশ নূতনত্ব আছে। সেখানেও আমার আসা-যাওয়া খুব ঘন ঘন ছিল। গলতা হিন্দুদের তীর্থস্থান বলিয়া তীর্থযাত্রীদের নিকট ইহা সু-পরিচিত।

প্রকৃতির আবহাওয়ার মোহে, ঘুরিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া সন্ধ্যায় গলতার বুড়া শিবমন্দিরে।

পুরানাঘাট স্থানটির পর খণ্ড ভাবে আকর্ষণ শক্তি থাকায় জন্য জয়পুর সহরের গৌরব এক ভাবে অনেক বাড়িয়াছে। আমার হষ্টেল হইতে খুব কাছে। তবে সেদিকটা কবরের নির্জনতার করুণ গুমোরে দিকে না গিয়া সন্ধ্যা-সকালে মুল-লওয়ানের ছুৎমুরে বাতাসে নিজেকে ভুলিয়া যতটুকু আনন্দ এবং উৎসাহ অর্জন করিতাম, মনে হয়, তাহা বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গ হইতে অনেক খাঁটী ও সত্য।

রামগড় দুর্গ হইতেও রামগড়ের হ্রদ জয়পুর রাজাকে অধিকতর রূপসী করিয়াছে। হ্রদটি সত্যই হ্রদ, লেক কিংবা ট্যাঙ্ক নহে। উদয়পুরের জয়সমুদ্র, কতেসাগর এবং অন্যান্য আরও বহু হ্রদের কাছাকাছি দাঁড়াইতে পারে এই রামগড় হ্রদটি।

বিশালে জলরাশি, তাহার চারিধারে প্রহরীর মত যুগ-যুগান্তরের পর্বত, গাছপালা, ইগারাই যেন হ্রদটির বন্ধু। ইহাদের সঙ্গে কত ভঙ্গীতে, কত প্রকার হাব-ভাবে রামগড় হ্রদ ওতপ্রোত ভাবে সংশ্লিষ্ট। রামগড় হ্রদের কোলে একখানি ষ্টেট-বাংলোতে আমার এক বন্ধুর নিকট মাঝে মাঝে হাওয়া পরিবর্তনের জন্য সহর হইতে বিশ মাইল অতিক্রম করিয়া অবসর কাটাইতে যাইতাম।

মাদ্রাজ হইতে রওনা হইয়া মধ্য-ভারত কাটিয়া বোম্বাই গুজরাট, মেবার হইয়া রাজপুতানা প্রবেশ করিয়া, ষ্টেট-এর গাড়ীতে করিয়া দলবল সহ 'রামু বাবু'র রামগাড়ে মাছ ধরিয়া, লেকে মোটর-সাফ চালাইয়া, বনে-জঙ্গলে শিকার করিয়া যে মহা আনন্দে কটাদিন হৈ-হৈ হৈ-হৈ করিয়া কাটিয়াছিল, তাহা ভুলিবার নয়।

গত ১৯৩১ সাল হইতে ১৯৩৪ সাল পর্য্যন্ত জয়পুরে ছিলাম। তার পর আবার ১৯৩৭ সালের আগষ্ট মাসে সেখানে যাই।

জয়পুর।

আজ প্রায় এক বৎসর হইল দক্ষিণ-ভারত হইতে মধ্য-ভারত যুক্ত-প্রদেশ হইয়া জন্মস্থান কলিকাতায় আসিয়াছি। ভাবিয়াছিলাম, বাংলার সন্তান বাংলা হইতেই এই তালিকার শেষ অঙ্ক পূরণ করিতে পারিব। কিন্তু এখানে দেখিতেছি, হোমরা-চোমরাদের ও ফ্যাসানের হুজুগ। এখানে তুলির ব্যাপারীর দিনাতিপাত করা কঠিন। আমার ব্যাপারীর সহিত তাহাদের খবরের যাহা সম্পর্ক, বাংলার সহিত তুলির প্রায় সেই সম্পর্ক। হায় মা জন্মভূমি!

হয় ত বাঙ্গালী হইয়া বাংলার এই স্বভাবের উল্লেখ না করাই ছিল ভাল। কিন্তু না করিয়া পারিলাম না। হয় ত আমার যে কথা মনে হইয়াছে, সেই কথা আরও কতজনের মনে হইয়াছিল ইতিপূর্ব্বে। তাঁহারা যদি তখন এ কথা বলিতেন, তবে দেশের যাঁহারা হোমরা-চোমরা, তাঁহাদের চমক এতদিনে কাটিয়া যাইত।

১৯৩০ সাল হইতে ১৯৩৯ সাল পর্য্যন্ত বাংলার বাহিরে যাহা সংগ্রহ করিয়াছিলাম, তুলি ও কলমের জন্য, এখন তাহাই লইয়া আবার বাংলার বাহিরে যাইতে হইবে। এ দেশের চাল-চালে দেখিতেছি, দেশের সর্ব্বতোভাবে উন্নতি যাহের উপর নির্ভর করে, তারা আরাম-কেদারায় নেহাৎ অবুঝের মত, দুর্ব্বল রোগীর মত মরিয়া মরিয়া বাঁচিয়া আছে। সুবিধা পাইলে নিজেদের খ্যাতিপ্রচার কিংবা অপরের অপকার করিবার জন্য সোঁক-সোঁক করিতেছে। একটা বেশ বড় রকম ওলট-পালট না হইলে এ দেশে কোন প্রকার কিছু করা অসম্ভব। বোধ হয় হেনরি ফোর্ড, লিনকন, রেমব্রান্ট ইত্যাদি এ দেশে জন্মাইতেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে আজ কেরাণীগিরি করিয়া পেটের ভাত করিতে হইত।

থাক আমার জন্মভূমি, আবার জয়পুর ফিরিয়া যাই।

জয়পুরের রামনিওয়াস বাগান লইয়া কিছু না বলিলে জয়পুর সম্বন্ধে লেখাই অসমাপ্ত রহিয়া যায়। রাজপুতনার মধ্যে রামনিওয়াস গারডেন-এর মত বহুরূপী বাগান আর নাই। আমার সন্দেহ আছে, ভারতের মধ্যে অন্যত্র আর দ্বিতীয় রামনিওয়াস গারডেন আছে কি না। তবে বোম্বাইয়ের মালাবার হিল গার্ডেন বোধ হয় ইহার স্বাভাবিক কিছুটা দাবী করিতে পারে।

রামনিওয়াস গার্ডেনের পশ্চাতে বিরাট মাঠ, মহারাজার কলেজ, এ দিকে মেয়ো হসপিটাল; আর একটি নবনির্ম্মিত বিরাট হসপিটাল; রামনিওয়াসের সম্মুখে এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল, আজমেরী দরওয়াজা। অবশেষে সাদানের যাইবার পথে মোতীডুংরী, মহারাজার প্রাসাদ।

জয়পুর হইতে ৬০ মাইল দূরবর্ত্তী সওয়াই মাধোপুর আর একটি সুরম্য স্থান। এবং মাধোপুর হইতে আরও কিছুদূরে বিরাট রাণথানভোর দুর্গ। যাহার ১০।১২ টি প্রবেশপথ না পার হইয়া কেল্লায় যাওয়া যায় না। সবগুলি ফটকই নির্জ্জন ভয়ঙ্কর জঙ্গলের মধ্যে দিয়া। সেই জঙ্গলের ধারে ঝরণার ঝুর ঝুরে ঠিড়। নানা রং-এর পাখীদের একধারে কূজন-গুঞ্জন।

তারই ফাঁকে ফাঁকে আকাশের চিকচিকে আলো জঙ্গলের গাঢ়ত্বকে স-ভাগ রাখিয়াছে। নহিলে গন্তব্য স্থানে অগ্রসরের সাধনই আসে না, তাহার চুপুরের প্রখর আলোয় যখন জঙ্গলে রাতের দাঁধা ভাগে, তখন আমার শিল্পতত্ত্ব, শিল্প, রস, রূপ, রচনা উপলব্ধির আকাঙ্ক্ষা উড়িয়া গিয়া বন্য জন্তুর ভয়ে সন্তর্পণে প্রাণ লইয়া পালাইবার পালা আরম্ভ হয়। অথচ সেই বাতাস-বওয়া সৌন্দর্য্যের টান টানিয়াই লইয়া গেল রানথানভোর কেল্লার চূড়ায়।

যেমন কাপড়ের ঝোলে কোন তফাৎ নাই, তবে পাড়ের নানা রকমের রচনায় তত্ত্ব পার্থক্য থাকে। ভারতের তিনটি স্থান—রানথানভোর (রাজপুতানায়), চিতোরগড় (মেবারে) এবং আবার কোলেগ (দক্ষিণ ভারত, মাদ্রাজ), ইহারা খালি পাড়ের জন্য আলাদা আলাদা, নচেৎ প্রত্যেকে জাতিতে এক। ভারতের শিল্পী এবং গভীর ভাবুকদের সভা তীর্থই বলুন আর সাধনার স্থানই বলুন, তাদের খোরাক জোগাইবার ভার, আনন্দ যোগাইবার আবহাওয়া, সমস্তই এই তিনটি স্থানে সমান।

ভ্রমণকাহিনীকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় সহর কলিকাতা মোটেই টলাইতে পারে না। যাহার স্মরণে রহিয়াছে তাহার অন্তরের অন্তরে ৯।১০ বৎসরের ভ্রমণ-অভিজ্ঞতা, তাহার আনন্দ, অর্থ এবং অর্থদ্বারা নির্ম্মিত এই সভ্য জগতের চালচলনে নয়, ভ্রমণ-অভিজ্ঞতায় তাহার স্থান।

আমার কয়টি বহু পুরাতন স্কেচ্, রেখাচিত্র এই প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত হইল। একটি রামগড় হ্রদের দৃশ্য আর একটি অম্বর যাইবার পথের আকর্ষণকারী আনন্দে মনোপরিবর্ত্তনের কোমল দৃশ্য। এবং আর যে একটি গভীর গাছপালার কোল দিয়া গ্রামের প্রাণ একখানি গরুর গাড়ী, সে দৃশ্য ভারতে তেলে-ভাজা খাদ্যের মত। স্থানবিশেষে ইহার প্রস্তুত, গড়নে ছাঁচে মাত্র পার্থক্য। দক্ষিণ ভারতে গরুর গাড়ীকে 'জটকা' বলে। আমরা গরুর গাড়ী বলি। কিন্তু বাংলার গরুর গাড়ীর গড়নের মত ভারতে আর একটি স্থানের গরুর গাড়ীর সঙ্গে একেবারে হুবহু মিল আছে। উদয়পুর 'মেবারের বেলগাড়ী।'

তেলেভাজা বেগুণী, ফুলুরী, আরও অনেক ভাজা ভারতের গ্রামে গ্রামে দেখা যায়। রাজপুতানায় ইহাদিগকে "পুড়িয়া" বলে। মাদুরা, মাদ্রাজ, ত্রিচিতে "বোন্ডা", এলাহাবাদ, আগ্রা, দিল্লী অঞ্চলে "পকাউড়া"। এই আমাদের গৌরবস্থান ভারতবর্ষ, জন্মভূমি, মাতৃভূমি ভারত। অবশ্য

গরুর গাড়ী।

তেলেভাজার কোরে নয়। প্রত্যেক রূপে আমাদের মতই আহার জলবায়ু প্রাকৃতিক দৃশ্য জলবায়ু হইতে উৎপন্ন বহু ভাষাভাষী ভারতীয় সকলেই পৃথক্, কিন্তু সকলের মধ্যে রহিয়াছে কোমলতার আগাগোড়া সমতান। সকলের উদ্দেশ্য ও দৃষ্টি এক—ইহাই মহামানবের সাগরভূমি, পুণ্যতীর্থ ভারতবর্ষ।

জাপানী কবিতা

—শ্রীজীবনকৃষ্ণ শেঠ

কোজিকি এবং নিহঙ্গী* নামক প্রাচীন ইতিহাস দুইটির মধ্যে জাপানী কবিতার আদি নিদর্শন পাওয়া গেলেও এ-কথা বলা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না যে, অষ্টম শতাব্দীতে Mau-yoshu (Collection of Myriad Leaves) নামে যে-কাব্যসঙ্কলন প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যেই য়ুরোপিকা-রক্ষিত অপরূপ অরুণাভাসের মত জাপানী কাব্যভারতীর অনতিস্পষ্ট রহস্যমধুর মূর্তিটি বাণীবন্ধনে ধরা পড়িয়াছে, কারণ উক্ত ইতিহাসদ্বয়ের মধ্যে যে-কবিতার নিদর্শন আছে, তাহা সাহিত্যপদবাচ্য নহে বলিলেই হয়। এ-গ্রন্থের সঙ্কলন-কালের সঠিক সন্ধান পাওয়া যায় না। যাহা জানা গিয়াছে তাহা বলা হইল: নৃপতি প্রধান সোমু (Shomu) ৭৫৬ খৃষ্টাব্দে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। এঁরই প্রিয়পাত্র রাজকুমার মোরো (Moroe) এ কাব্যের সংকলন-কর্তা, আর এঁর সহযোগিতা করিয়াছিলেন কবিলতাসদ্ Yakamochi। এ-সঙ্কলনের অন্তর্গত কয়েকটি কবিতা হয়তো অনেক পূর্বে রচিত হইয়া থাকিবে, তবে অধিকাংশই সপ্তম হইতে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে রচিত। ইহার মধ্যে ৪১৭টি তঙ্কা এবং ৩২৩টি নাগা-উতা, (গাথা বা Ballad ?) আছে। এই শেষোক্ত নাগাউতা কবিতার আলোচনা করাই এ-প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

ছন্দের দিক্ হইতে নাগা-উতা রচনায় অভিনবত্ব কিছুই নাই। তঙ্কার মতই ক্রমান্বয়ে পাঁচ এবং সাত অক্ষর পংক্তি চলিয়া গিয়াছে; উপর্যুপরি সাত অক্ষর পংক্তি ইহাতে নাই। তবে তঙ্কা যেরূপ পাঁচটি পংক্তি এবং ৩১টি অক্ষরে সমাপ্ত, ইহা সেরূপ নহে। ইহার দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হইতে সুরু করিয়া নাতিদীর্ঘ বহু গাথাই আছে। কিন্তু স্বল্পাক্ষর-কাব্যপ্রিয়তা জাপানে এত দেশি প্রবল যে, পরবর্তীকালে জাপানী কবিবৃন্দ নাগা-উতা রচনার প্রয়াস সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাঁহারা একবিংশাক্ষরে তঙ্কা পর্যায় পরিত্যাগ করিয়া সপ্তদশাক্ষর 'হক্কু' (কাবারেণু) জাতীয় কবিতা রচনায় মনোনিবেশ করেন।

নাগা-উতা কাব্যে যে-ভাবরাজ্যের অবতারণা করা হইয়াছে, তাহা যেমন সুন্দর তেমনই মধুর। কোন কবিতাকে বেষ্টন করিয়া রূপকথার কল্পলোক বিরাজ করিতেছে। কবি-কল্পনা অন্তহীন নিসর্গ সৌন্দর্যের দুর্নিরীক্ষ রহস্যান্তঃপুরে উত্তীর্ণ হইয়াছে। আবার কোন কবিতায় এরূপ সর্বজনগ্রাহ্য ভাবরাশি ও গভীর বাস্তবানুভূতির পরিচয় আছে যে, অতি প্রাচীন যুগেও জাপানী কবিমানসের সম্পূর্ণ আধুনিকতা লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইতে হয়। কালের হিসাব করিয়া আধুনিকতা মাপা চলে না, ভাবের হিসাব করিয়াই ইহা মাপিতে হয়। এই দিক্ দিয়া বিচার করিলে সহজেই প্রতিভাত হইবে যে, ইহারা সম্পূর্ণভাবে আধুনিক। সর্বোপরি ইহাদের প্রকাশভঙ্গীর সরলতায় মন আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না।

নিম্নে কয়েকটি নাগা-উতা কবিতার আলোচনা করা গেল।

ধীবর যুবক উরাসিমা

উরাসিমার কাহিনীটি প্রাচীন। সরকারী দপ্তরেও এ-কাহিনীর উল্লেখ আছে। লিখিত আছে যে, সম্রাট্ Turyaku'র রাজত্বের একবিংশতি বৎসরে Tango প্রদেশান্তর্গত Tosa জেলার অধিবাসী, শিমানেমি দেবতার বংশধর যুবক উরাসিমা একটি মৎস্য ধরিবার তরীতে আরোহণ করিয়া স্বর্গে গিয়াছিলেন; এবং সম্রাট্ Go-Junwa'র সময়ে যুবক ফিরিয়া আসেন। তাঁহার প্রথম অন্তর্ধান ঘটে ৪৭৭ খৃষ্টাব্দে এবং পুনরাগমন ও মৃত্যু ঘটে ৮২৭ খৃষ্টাব্দে। মধ্যে প্রায় চারিশত বৎসর অতীত হইয়া যায়। উরাসিমার সমাধি, সাগরকন্যা প্রদত্ত রত্নাগার, দুইটি মূল্যবান্ প্রস্তরখণ্ড ও মৎস্য ধরিবার জাল ইয়োকোহামার নিকটবর্তী কানাওয়ার একটি মন্দিরে না কি রক্ষিত আছে। এই কাহিনীর ঐতিহাসিক

* Kojiki [Record of Ancient Matters] published in 772 A.D. Nihonji [Chronicles of Japan] published in 720 A. D.

সিন্ধুবাদ নাবিক ও বৃদ্ধ

তথ্য ও ভৌগোলিক সংস্থানের কথঞ্চিৎ সত্যতার জন্য অনেকেই ইহার ভিত্তিকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন।

বসন্তকাল সুমিনরি তটে কুহেলি আসিয়ে নামি'
অতীতেরে স্মরি' লাগর বেলায় নীরবে দাঁড়ায় আমি'।
চলেছে তরণী এদিকে ওদিকে ঘুম কথা মনে জাগে,
সাগরের সাথে উধাসিয়া হবে পাড়ি দিত অনুরাগে।
একথা দুবক কিছিল না জানে গত কিবস যামি
সাগরের সীমা পার হ'য়ে চলি গিলিল সাগর-পারী।
প্রেম অনুরাগে ভাসিল দুজনে চির সবুজের দেশে*
সাগর রাজার প্রাসাদে পশিল নব-পরিণীত বেশে।
কাটি বেলার চির-বিরাজিত যৌবন অক্ষীন,
অনুরাগে দোঁহে যাপিল সেথায় দীর্ঘ রজনীদিন।
একদিন দুবা যাগিল বিদায়, 'আবার আসিব ফিরে
পিতারে শুধায়ে একটি বারতা, জানাইয়া অবীরে'।
সাগরের মেয়ে জানালো দুবকে, ফিরিতে বারণ করি
'ধরা-আবার মিলায় তোমার সাথে রেখো নিজমনি।
'খুলিও না তারে করি সাবধান, খুলো না মিনতি করি।'
তবুও চলিল দুবক সুমিনরি তীর ধরি।
কোথা গৃহ তার চির-পুরাতন? এযে গ্রাম অজানিত,
চারি ভিতে শুধু নূতন কুটীর কিছু নহে পরিচিত।
কহে বিস্ময়ে, 'ছাড়িয়াছি গ্রাম, কেটেছে বছর তিন
এরই মাঝে মোর শৈশব-পুর হয়েছে কোথায় লীন।'
[জানে না দুবক, কত কত যুগ চির বছরের ঘাঁকে
কেমনে অতীতে হয়েছে বিলীন ফিরিয়া চক্রপাকে।]
'প্রিয়ার সে ঘর তবু আমার যাবেক খুলিলে পরে
'হয়তো ফিরিবে পুরাতন গ্রাম ফিরে পাব মোর ঘরে'।
খোলে আবরণ, উর্দ্ধে উঠিয়া কুপালি ধূমের লাগি
'চির সবুজের দেশে, গেল ফেলে, দুবা উঠে চীৎকারি।
ফিরি করিলে অশ্বারোহী তার ক্ষুরে লুটাইয়া পড়ি,
কভু লম্বক, উন্নত কভু প্রলয় বৃত্যা ঝড়ে।
ফিরে ফুরে গেল অঙ্গ তাহার শুভ্র মাথার কেশ,
ক্ষুব্ধ দুবা সহসা ধরিল জরাদুর্ব্বিত বেশ।
ক্ষীণ নিশ্বাস ক্ষীণতর হ'ল, মৃত্যু নামিল ধীরে,
জ্ঞান আঁখিতারা স্থির হয়ে এল, দুবক লুটাল তীরে।
যেথায় আছিল গৃহখানি তার বিষাদে হতেছি চারি'
ঘুমির হৃদয়ে রেখেছিছি শুধু কিছু নাহি, কিছু নাহি।

সুমিনরি তটে নামে ধীরে ধীরে কাল কুহেলির ছায়া,
অতীত কাহিনী ভেসে যায় মনে বসিয়ে কোমল মায়া।

কবিতাটির মধ্যে কোন রূপকের আভাস পাওয়া যাইতেছে কি? আত্মকেন্দ্রী স্বার্থপর যে প্রেম বহির্বিশ্ব পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র প্রেমানন্দকে লইয়া সার্থক হইতে চাহিয়াছিল তাহা বিধাতা কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছে এবং পরিণামে মৃত্যু বহন করিয়া আনিয়াছে। বোধ হইতেছে এরূপ কোন রূপক নাই। এ কবিতা অতি প্রাচীন যুগের; জাপানি সাহিত্যিক বুদ্ধি তখনও ততখানি পরিণত হয় নাই। ইহাকে বরং রূপ-কথা বলা যাইতে পারে। এ যেন সদ্য ঘুমভাঙা শিশুর চোখে বিশ্ব-পৃথিবীকে দেখা। তখনও মানুষ অতিমাত্রায় আত্মসচেতন হইয়া প্রকৃতিকে অচেতন বলিয়া দূরে পরিহার করে নাই। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য নানারূপ ধরিয়া তাহাকে আকৃষ্ট করিতেছে; অন্তরে সজীব আহ্বান প্রেরণ করিতেছে। কবি নিসর্গ সৌন্দর্য্য রহস্যের অন্ত খুঁজিয়া পান নাই। দূর-সীন, নীলোর্ম্মিনন্দিত সিন্ধুতট, কুহেলিকার কৃষ্ণছায়া একটি কোমল মোহ-আবরণের সৃষ্টি করিয়াছে। এই অনতিস্পষ্ট কৃষ্ণ যবনিকার অন্তরাল হইতে কোন মায়াসুন্দরী কবিকে আহ্বান করিল! কবি সম্ভব অসম্ভবের দ্বন্দ্ব অতিক্রম করিয়া কল্পলোকে পাড়ি দিলেন যেখানে শুক্তিগর্ভে মুক্তার ন্যায় প্রবালের পালঙ্কশায়িতে চির-ঈপ্সিতা রাজকন্যা নিদ্রিতা। সে কল্পলোক কেমন?

'কাটি বেলার বিতা বিরাজে
যৌবন-অক্ষীন।'

ইহাই তো সমগ্র মানুষের চির আকাঙ্ক্ষার বস্তু। নিত্য সৌন্দর্য্যলোকে অনন্ত যৌবন কামনাই কি যুগ যুগ ধরিয়া মানব চিত্তকে উদ্বেলিত করে নাই? আর রূঢ় বাস্তবতাকে পরিহার করিতে কি মানুষ রূপকথার মধ্য দিয়া এই মায়ালোকের সৃষ্টি করে নাই? ইহা হয়তো ছেলেমানুষী, নিমেষেই হয়তো এ স্বপ্ন ভাঙিয়া যায়, তবু এই ছেলেমানুষী, এই স্বপ্নই কঠোর বাস্তবতা-নিপীড়িত মানুষকে অপার আনন্দ দান করে। কবিতাটিকে ঘিরিয়া একটি রূপকথার স্বপ্নরাজ্য দিক্‌চক্রেরেখার ন্যায় বিরাজ করিতেছে। শেষের ছত্রে এ স্বপ্ন ভাঙিয়া পড়িয়াছে, কবি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়াছেন। তবু ইহা পাঠ করিয়া মনের মধ্যে যে মোহস্বপ্ন ঘনাইয়া আসে তাহা অস্বীকার করা চলে না।

* Evergreen Land, 'চিরহরিতের দেশ' হইলেই ভাল হয়। ভাবসম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ রাখিতে ইহা যোজনা করা হইয়াছে।

উনাই* মেয়ের সমাধি

থমকি দাঁড়ানু উনাই মেয়ের
সমাধির পুরোভাগে
অতীতে যাহারে ঘুগল প্রেমিক
দেখেছিল অনুরাগে।
যুগ যুগ ধরে সমাধি তাহার,
কাহিনীও চিরকাল
অনাগত নরে ডাকি তার কথা
তাহারে বলিবে ভাল।
হে যোগত পথিক যেন গো
ভুলে না করিতে শোক
অশ্রু ফেলিয়া সমাধির পরে
অথবা গাঁয়ের লোক
ব্যথার আকুল সমাধি বেড়িয়া
চিরদিন যেন কাঁদে,
অনন্তকাল যেন তার কথা
অমর বীণায় বাঁধে,
হইতো পাষাণ পথের পাশে
রচিত বিরাট দিলা
লি যতকাল রবে
আকাশে মেঘের লীলা।
অবশেষে আমি আসিয়া দাঁড়ানু
সমাধির পানে চাহি'
অতীত কাহিনী বেদনা জাগিছে
প্রকাশিতে ভাষা নাহি।

উনাই মেয়ের কাহিনীটি লিপিবদ্ধ করিয়াছি। Yamato Monogatori (Tales of Japan) ইয়ামাতো-মনোগাতারিতে কাহিনীটি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে। প্রাচীনযুগে Setsu প্রদেশের উনাই জেলায় এক অপরূপ সুন্দরী কন্যা বাস করিতেন। মুরাসা নামক সেই মেয়ের এক যুবক এবং ইজুমি দেশের চিহু নামক অন্য এক যুবক এই কিশোরীর পাণিপ্রার্থী হন। উভয়ের আকৃতি, প্রকৃতি, বয়স প্রভৃতির কোন পার্থক্য ছিল না। কুমারীদ্বয় কাহাকেও অসন্তোষ করিতে পারিল না। তিনি স্থির করিলেন যে, তাঁহাদের মধ্যে যিনি তাহাকে বেশি ভালবাসেন তাঁহাকেই পতিত্বে বরণ করিবেন। কিন্তু দেখা গেল যে, উভয়ের ভালবাসা সমান। মাসের পর মাস ধরিয়া তাঁহাদের প্রেম-সাধনা চলিল। কেহই এতটুকু বিক্ষোভ প্রদর্শন করিলেন না। কাহাকে গ্রহণ করিবেন কিশোরী কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। প্রেমিক যুগলের কথা ভাবিয়া তাঁহার হৃদয় বেদনায় ভরিয়া গেল।

অবশেষে কিশোরীর মাতা-পিতা যুবকদ্বয়কে ডাকিয়া বলিলেন যে ইখুতা নদীতে যে পক্ষীটি ভাসিয়া চলিয়াছে যিনি তাহাকে বধ করিতে পারিবেন তাঁহাকেই কন্যা দান করা হইবে। উভয়েই একসঙ্গে তীর নিক্ষেপ করিলেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, একই সময়ে একজনের তীর মস্তকে এবং অন্যজনের তীর পশ্চাদ্ভাগে আঘাত করিয়া পক্ষীটিকে নিহত করিল। প্রণয়পীড়িতা কুমারী মনের দুঃখে নদীতে ঝম্প প্রদান করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। যুবকদ্বয়ও তাঁহাকে অনুসরণ করিলেন। তাঁহাদের প্রেমের গভীরতা উপলব্ধি করিয়া মুগ্ধ জনগণ কুমারীকে মধ্যস্থলে সমাহিত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন সমাধারে যুবকদ্বয়কে তাঁহার দুই পার্শ্বে সমাধিস্থ করিলেন। এ-সমাধি নাকি আজিও আছে এবং Maiden's grave নামে ইহা পরিচিত। কাহিনীটি এইখানেই শেষ হয় নাই। তবে কবিতাটি উপভোগ করিতে হইলে ইহার অধিক জানিবার প্রয়োজন নাই।

সমগ্র কবিতাটির মধ্য দিয়া একটি বিষাদের সুর বাজিয়া উঠিয়াছে। উনাই মেয়ের ট্রাজিক পরিণামের কথা ভাবিয়া মন বেদনায় ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে। কবে কোন সুদূরতম অতীতে এই কাহিনী ঘটিয়াছিল, হয়তো ইহার সত্যতাও সন্দেহজনক, তবুও ইহার করুণ সুর যুগযুগান্তর অতিক্রম করিয়া পরবর্তীকালের কবিচিত্তকে ব্যথাপ্লুত করিয়াছে। কবি সেই কিশোরীর প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন করিবার জন্য তাঁহার সমাধির পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তিনি যথার্থই বলিয়াছেন, এ কাহিনী

'যবে যতকাল যতকাল রবে
আকাশে মেঘের লীলা।'

রূপকথা হইলেও এ কবিতা শাশ্বত ভাবে আধুনিক।

গৃহ ত্যাগকালে সীমান্ত সৈনিকের আক্ষেপ

নৃপতি-বিধান, সীমান্ত দেশে যাইতে হইবে মোরে।
•সংবৎসরাল জননী আমায় টানি নিল স্নেহ-ক্রোড়ে।

* উনাই নামক জেলার অধিবাসিনী।

• ইহা করিয়া আসিবার জন্য জননী বলল সংবৎসর অপেক্ষা করিতেছেন।

দুরাশা-স্বপ্ন-পূর্ণ পিতার তরু অঙ্ক করে,
'চলে যাবে তুমি?' অশেষ ব্যথিতে তবুও মিনতি করে।
'প্রভাত বেলায় চলে যাবে তুমি, একাকী পুরহীন,
'তোমারে চাহিয়া দীর্ঘ বরষ যাপিব ক্লান্ত দিন।'
কাঁদিল বন্ধু—'আর একদিন থাক তুমি গৃহকোণে
'কথা শুনি, কথা বলি তব সাথে, সান্ত্বনা আনি মনে'।
অশ্রুভরা চোখে প্রেয়সী আমারে বাঁধিল বাহুর পাশে
চঞ্চল শিশু করিল আকুল বিরহের কলভাষে।
বেদনা-জড়ানো মিনতি প্রিয়ার ছেড়ে যেতে বাধা বাজে
সংযত বহু রাজাদেশ-ভীতি পশ্চিমা চিত্ত মাঝে।
ছেড়ে চলে এনু পথে যেতে যেতে পাহাড়ের প্রতি বাঁকে
স্নেহভরে ফিরে চাহি শতবার 'কে যেন আমায় ডাকে।'
ঘুম ঘুমে ঘুমে চলিয়াছে কত অরিরাম যত দেশ,
আমার হৃদয়ে দুঃখ-স্মৃতি, তবু বেদনায় বেশ।
অকস্মাৎ 'সুমি' সাগরের তটে অর্ধা সাজায়ে ধরি'
দেবতারে ডাকি' বিরহ-আনত করুণ মিনতি করি,
'মানুষ আমিতো জানিতে পারিনে, কতকাল বাঁচি হয়,
'সাগরের বুকে বিপদের পথে অজানিত অভিনয়
'যাবে যেতে হ'বে, হে মোর দেবতা, মিনতি জানাই আগে
'একাকিনী বধূ পিতারে মাতারে ব্যথা যেন নাহি লাগে।'
সাগরদেবতা কানেনা জানেনা। ঝটিকার মোহনায়
ক্ষেপণী-বাহিত পোত ও নাবিক ডুবেছে প্রতীক্ষায়।
দুরাশা-সেবিত নানিওয়া হতে আমারে লইবে ঘুরে।
বিদায়ের ক্ষণে আমার মিনতি জানাই করুণ সুরে
*'প্রভাত বেলায় আসিয়া চলিনু কেবিল সিন্ধু পথে
প্রিয় জনে মোর এ-কথা বলিও, ভুলিও না কোন মতে।'

সীমান্ত সৈনিকের দুঃখের কথা ভাবিয়া কবি-হৃদয় বেদনায় হাহাকার করিয়া উঠিয়াছে। 'বেদনা-জড়ানো মিনতি প্রিয়ার' বাহুতঃ উপেক্ষা করিয়া সংযতচিত্তে সৈনিক চলিতেছেন; কিন্তু পরক্ষণে যে চলিতে চাহে না,—

ছেড়ে চলে এনু, পথে যেতে যেতে
পাহাড়ের প্রতি বাঁকে
স্নেহভরে ফিরে চাহি' শতবার
'কে যেন আমায় ডাকে।'

হৃদয় বেদনায় শতখান হইয়া ভাঙিয়া পড়িতে চায়, তবুও যাইতে হইবে, ছবিটি করুণ ও সুন্দর। কবিতার শেষের কয়েক ছত্র লক্ষ্য করিতে হয়। সৈনিক 'সুমি' সাগরের তটে সাগর-দেবতাকে মিনতি জানাইলেন, সে মিনতি অসহায় আর্তনাদের মতই হৃদয় ফাটিয়া বাহির হইয়াছে, তবুও এখানে তাঁহার সংযমের অভাব ঘটে নাই। কিন্তু শত শত ক্ষেপণী-বাহিত অর্ণবযান যখন তাঁহাকে লইয়া দূর সমুদ্র-পথে পাড়ি দিল তখন সৈনিক আর সংযম রক্ষা করিতে পারেন নাই। বিচ্ছেদ-বেদনায় একান্ত বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছেন; কাহাকে লক্ষ্য না করিয়া তাঁহার হৃদয় আর্ত চীৎকার করিয়া উঠিয়াছে—

'প্রভাত বেলায় আসিয়া চলিনু
কেবিল সিন্ধু পথে,
প্রিয়জনে মোর একথা বলিও
ভুলিও না কোন মতে।'

এই আত্মবিহ্বলতা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং উচ্ছ্বাসের কবিত্ব-শক্তির দ্যোতকও বটে। কালিদাসের যক্ষ প্রিয়াবিরহে চেতন-অচেতনের জ্ঞান হারাইয়া ছিলেন। এখানেও অনুরূপ ভাবের অভিব্যক্তি লক্ষ্য করি। সুরাসুর-সেবিত নানিওয়া হতে সৈনিককে যখন বিচ্ছিন্ন করিয়া লওয়া হইল তখন তিনি দেশ, কাল, পাত্র ভুলিয়া বেদনায় হাহাকার করিয়া উঠিলেন। তাঁহার এই করুণ মিনতি, বেদনার ক্রন্দন যে একান্ত অর্থহীন সৈনিক এ কথা ভাবিতেই পারিলেন না।

কবিতার এ অংশটি সত্যই অপরূপ।

ভিক্ষুকের অভিযোগ

ঝড়ের রাত্রি ঘনাইয়া আসিয়াছে, বৃষ্টি পড়িতেছে অজস্র ধারাপাত হইয়া গিয়াছে। নিরন্ন, অনাবৃতকায়, শীতার্ত ভিক্ষুক কল্পনা করিতেছে, 'এই হিমবর্ষী শীতের দুর্যোগময়ী নিশীথে কি আমার চেয়ে দুর্ভাগা কেহই নাই? সে এখন কী করিতেছে?' সে প্রশ্ন করিল, 'হে বন্ধু এমন রাত্রি তুমি কেমন করিয়া কাটাইতেছ?' পরে নিজের কাহিনী বিবৃত করিতে বসিল। কবিতাটির মধ্যে যেন ঈষৎ কৌতুকের ভাব রহিয়াছে।

খালী আকাশ ঘড় কলে ঢাকা, আমি ত ক্ষুদ্র বেহি;
আলোকবর্ষী চন্দ্রসূর্যে আঁধার হয়েছে যেহি।
কিষ্ট মানব সকলে অপরা বেদনা আমারি তরে?
কি হেতু আমার মানবজীবন দুর্মতি ধরা পরে?
ছিন্ন মলিন পৃষ্ঠের বাস শীত নিবারণ তরে
উর্ধ্ব-আকাশে আমারা যেমন পতঙ্গ আসিয়া পড়ে।

* এ মিনতি কাহাকে করিতেছেন তাহার কোন উল্লেখ নাই।

দুঃখ-আঁধার আই পুটির অনাবৃত চিরদিন
তৃণ-শয্যায় শুয়ে শুয়ে শুনি আর্ত কণ্ঠ ক্ষীণ।
বৃদ্ধ চলক তরুণী ধাঁধিছে পুত্র ও পরিবার,
দুঃখ বন্যায় ভাইল কাতর, দিকে দিকে হাহাকার।
হয়ই পাত্রে পড়ে আছে কোথা, ধাকড়সা জাল টানে
আগুন জ্বলে না, কে যেন রেখার কাল অভিশাপ হানে।
'মড়ার উপরে খাঁড়ার আঘাত' প্রবাদ প্রমাণ তবে
বেত হতে গ্রামের কর্তা ধাঁড়াল দুয়ার পরে।
"কর দিতে হবে" বলিছে ধাঁকিয়া, নাহি বুঝি নিস্তার;
আমার জীবনে আছে কি শুধুই দুঃখ, ঘৃণা, হাহাকার?

দরিদ্রতার নির্মম, নিষ্করুণ মূর্তি এ-কবিতায় তীব্রভাবে পরিস্ফুট, এরূপ কবিতা সহজে চোখে পড়ে না। দারিদ্র্যের কশাঘাতে সমগ্র নিসর্গ-সৌন্দর্যও দৃষ্টিপথ হইতে অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আলোকবর্ষী বিরাট চক্ষুর্দ্বয়ও নিপীড়িত ভিক্ষুকের নিকট ক্ষুদ্র, নিষ্প্রভ, বিচ্ছিন্নকান্তি। বেদনার তীব্রতা উপলব্ধি করি, কবি যখন বলিলেন,

হয়ই পাত্রে পড়ে আছে কোথা
ধাকড়সা জাল টানে,
আগুন জ্বলে না কে যেন রেখায়
কাল অভিশাপ হানে।

দারিদ্র্যের চরমতা ইহার অধিক আর কি হইতে পারে। সুন্দরী ধরিত্রী সৌন্দর্যের অজস্রতায় দিকে দিকে অপরূপ ভাবে উদ্ভাসমানা, কিন্তু কবির চোখে সবই অর্থহীন, অনুভবের প্রলয় নৃত্য ছাড়া অন্য কিছুই নহে। কাল অভিশাপ যেন সুন্দরী ধরণীকে গ্রাস করিয়াছে। সর্বহারার নিস্পৃহের মতই কবি এই অভিশাপ-জর্জরিত জীবনকে কৌতুক করিতে ছাড়েন নাই,

'মড়ার উপরে খাঁড়ার আঘাত,'
প্রবাদ প্রমাণ তবে,
বেতহস্তে গ্রামের কর্তা
ধাঁড়াল দুয়ার পরে।

ইহাইতো স্বাভাবিক। জীবনের সব আকর্ষণ-ই যখন চলিয়া গিয়াছে, সব আশাই যখন নির্মূল হইয়াছে তখন জগৎ ও জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া কৌতুক করা ছাড়া অন্য কি করা যাইতে পারে?

এ-কবিতায় বাস্তবতা এবং কল্পনার অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। আধুনিক জগতের সভ্যতার ধারা যাহারা লক্ষ্য করিয়াছেন তাঁহারা দেখিতে পাইবেন, এ-কাব্যের সত্যতা কতখানি? কারণ ইহা কি সত্য নহে যে, বর্তমান যুগে শত শত দরিদ্র মানুষ এইরূপ কঠোর জীবন যাপন করিতেছে। জীবনের অতি এবং একান্ত প্রয়োজনীয় সামান্য বস্তু হইতেও তাহারা বঞ্চিত। তাহাদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে অন্ন, আলোক, মুক্ত বায়ুও ছাড়িয়া দেওয়া হয় নাই। বহু প্রাচীন যুগে রচিত হইলেও এ-কাব্যের মধ্যে আধুনিক কালের শত-সহস্র মানবের জীবন-যাত্রাপ্রণালী সুস্পষ্টভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে।

মাত্র চারিটি লাইন-উদ্ধার আলোচনা করিয়া এ-প্রবন্ধ পরিসমাপ্ত করিলাম।

ভারতীয় কংগ্রেসের নেতৃবর্গের স্বরূপ

...."ভারতবর্ষের বর্তমান দরিদ্রতা ও তাহা দূরীকরণের উপায়" শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা দেখাইয়াছি যে, গান্ধীজী প্রমুখ কংগ্রেসের বর্তমান নেতৃবর্গ গত বিশ বৎসর ধরিয়া যাহা কিছু করিয়াছেন, তাহার ফলে আমাদের জাতীয় জীবনের আশা-ভরসার স্থল যুবকবৃন্দ দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ উপাধিগুলি লাভ করিয়াও বেকার থাকিতে বাধ্য হইতেছেন, এমন কি, হতাশায় বিক্ষিপ্ত হইয়া অকালে আত্মহত্যা পর্যন্ত সাধন করিতেছেন।

আমাদের কৃতবিদ্য উকিল, ডাক্তার প্রভৃতি ব্যবসায়িগণ দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়াও প্রায়শঃ স্ব স্ব জীবিকার্জনে অক্ষম হইয়া পড়িতেছেন; জাতীয় সমৃদ্ধির ইহা ঐ কৃষক, শিল্পজীবী ও ধনিকগণ সমগ্র বৎসর পরিশ্রম করিয়াও স্ব স্ব ব্যবসায় লাভবান্ করিতে সমর্থ হইতেছেন না, এমন কি, অনেকে স্বীয় স্ত্রী-পুত্রের জীবিকা নির্বাহ পর্যন্ত করিতে পারিতেছেন না।....

বাংলার মাটী

—শ্রীঅপরাজিতা দেবী

'মহারাজি!—মম—
ছায়াতে শুয়ত—কেন দও আর?'

বছর জলের মত কাটিয়া যায়। আজ যাহারা শিশু, কাল দেখিবে তাহারা সাবালক, দু'দিন না যাইতেই পাকা সংসারী হইয়া বসে।

স্কুলেরই একটি মাষ্টারের কথাটা শ্যামল শুনিয়াছিল। তাহারই সঙ্গে মেয়ে দেখিয়া কথাবার্ত্তা পাকা করিয়া সেই দিনই অনেক রাত্রে শ্যামল বাড়ী ফিরিল।

সংসারে দারুণ অভাব, ক্ষেতে অজন্মা, পাটের দর নাই। অনেকগুলি শিশু কঠিন পীড়ায় ভুগিয়াছে, তিনটি মা-বাপকে ফাঁকি দিয়া পলাইল। নানা কষ্টে ঋণের পরিমাণও কম হয় নাই। এই দুঃসময়ে শ্যামল ছেলের বিবাহ দিয়া বসিল। ছেলেও লেখাপড়ায় ভাল নয়। এ বছর সবে ম্যাট্রিক ক্লাশে উঠিয়াছে মাত্র।

দুর্জ্জয় রাগ ও গো বিশ্বাস-বংশের ধারা। শুভ কাজ শেষ হইল বটে, কিন্তু যে নগদ টাকা পাইবার আশা ছিল, বেয়ান ঠাকুরাণী তাহা কন্যার গহনা দিয়া বুঝাইয়া দিলেন, সুতরাং বেশ ভাল রকম ঋণ করিয়াই ব্যাপার শেষ হইল এবং ইহা লইয়া দুই ভাইয়ে মনান্তর সৃষ্টি হইল।

বৌ দেখিতে বেশ সুন্দরী। সারা গায়ে গহনা, মায়ের আদুরে মেয়ে—ঘর ছাড়িয়া বাহির হয় না, মণিও ঘরেই থাকে প্রায় সময়। শ্যামল বিবাহ দিয়াই নিশ্চিন্ত, আর কিছু দেখে না। মেজ-বৌ নিরিবিলি স্বভাবের মানুষ—হাজার বিরক্ত হইলেও কটু কথা তাহার মুখ হইতে বাহির হয় না।

বিবাহের পর মণি বৌ লইয়া জোড়ে শ্বশুরবাড়ী গেল, সে এক খরচের ধাক্কা। একমাস পরে, আশ্বিন মাসে বৌকে বিদায়গমনে আনিতে হইল; সে খরচও কম নয়।

দিন কয়েক পরে রায়-বাড়ীর মেজ-বৌ ফুল তুলিতে তুলিতে দেখিলেন, একখানা বড় নৌকা শ্যামলদের বাহির ঘাটে ভিড়িল।

রায়েদের ঘাটে তখন একখানিও নৌকা ছিল না, ওদিকে দত্ত-গিন্নী নিজেদের ডিঙীতে চড়িয়া বসিয়াছেন, মেজ বৌ ডাকিয়া বলিলেন, 'আমায় তুলে নিয়ে যান।'

মণির শাশুড়ী ছেলে, মেয়ে, বৌ সবশুদ্ধ মেয়ে বাড়ী বেড়াইতে আসিয়াছেন। ধবধবে সাদা পান পরা, শরীর খানিও দিয়া ভারী। স্বামী উকীলের বহুরী ছিলেন, টাকা-পয়সা যথেষ্ট। অতি সপর্দ্ধ ভাব—গলায় একটি পেটা সোনার হার,—যার পাড়াগাঁয়ে আলো চলন নাই।

মেয়ের রং মলো হইয়া গিয়াছে, শরীরে কিছু নাই, বলিয়া মেয়ের মা বেয়ানকে যথেষ্ট মিষ্ট অনুযোগ করিলেন দত্ত-গিন্নী ও মেজ-বৌয়ের সামনেই। মহসা কাপড়পরা মণির মা খুব লজ্জিত ভাবে মৃদু মৃদু কয়েকটা প্রতিবাদ করিল, কিন্তু বেয়ান কর্ণপাতও করিলেন না, দত্ত-গিন্নীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'মেয়ের বিয়ে এখন দেবার ইচ্ছেই আমার ছিল না, নেহাৎ বেয়াই ধরে পড়লেন, ছেলেটিও দেখে বড্ড পছন্দ হয়েছিল'—ঐ টানিয়া 'গহনা গাঁটি কম দিই নি আমি'—

বৈকালে সকলে বিদায় হইয়া গেলে, শ্রান্ত ভাবে মেজ-বৌ বসিয়া ছিল, সরলা বলিল—'একেবারে কাপড় কেচে এল—'

'বিছানা টিছানা করিনি কিছু এখনো'—

'যা ঝড় গেল সারাদিন, বৌ-মা করুক না ও সব।

'বৌ এই নিয়ে গুল।'

'অবেলায় আবার শোয়া কি? তুমি কিছু বল না বলে আমিও বলতে পারিনে—'

'এমনি বেয়ান কত শুনিয়ে গেল। আবার বলব?'

'তুমি ছেলের মা নও? ঐ তোমার স্বভাবের জন্যেই সবাই যো পায়। আস্পর্দ্ধা দেখ! বাড়ী বয়ে এসেছেন শাসন করতে। তুমি শক্ত হলে একদিনে সব ঠিক হয়ে যায়।'

গিরি আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'সত্যি বলেছ, মেজ-দিটা ভারী হবে, আস্কারা দিয়ে নষ্ট করে ফেললে বৌকে।'

'শুধু ভয়? মানে যেন শাশুড়ী! সন্ধ্যা অবধি পড়ে পড়ে ঘুমোয়, সারারাত গল্প করে—শ্বশুর-শাশুড়ী বাড়ী ভরা—একটু মানে না। কাল মেজ-ঠাকুর খাবার জল চাইলেন, বৌ চুলই বাঁধছে, দিলেই না জল, শেষে আমরা ছিলাম চৌকি-ঘরে, সেইখানে গিয়ে জল চাইলেন।'

মেজ-বৌ বলিল, 'ভাল লাগে না আমার, দু'জাতে নিত্যি ঝগড়া, পাড়ার লোকে বলে, ওরা ভেন্ন হবে এবার, শুনে লজ্জায় দুঃখে মরে রয়েছি—'

গিরি বলিল, 'লজ্জা আর কি? তোমরা, আমরা আর যারেরা এ ছাড়া এ গাঁয়ে একটা ঘরও ত একঘর নেই।'

মেজ-বৌ বলিল, 'ছেলে বিয়ে দিয়ে এক কাঁড়ি টাকা দেনা করলেন, ঠাকুর-পো কেন সইবে?'

সরলা বলিল, 'আমি তা ভাবিনে দিদি, তোমার কাজ কি আমার নয়? তোমায় বলতে কি গিরি, আসলে ছোট-কর্ত্তাটির মুখে আটক নেই, যাচ্ছেতাই গালাগাল দেয়, শুরুজন মানে না। নিত্যি মাঠ থেকে এসে টাকা—টাকা করে মেজ-ঠাকুরের সঙ্গে ঝগড়া বাধাবে। এ রকম যন্ত্রণার চেয়ে ভেন্ন হওয়া ভাল বই কি, সুখ না হোক, শান্তি হবে, অন্ত সব বাড়ীর মতন আমরা যারে যারে ঝগড়া করে ভেন্ন হচ্ছি নে। তবু ভাল কি জান, সুখে দুঃখে এক হয়ে আছি, আলাদা বলে থাব, আলাদা রাঁধব এ কথা মনে হলেও বুক ফেটে যায়—'

সরলা মুখ ফিরাইয়া চোখের জল মুছিতে লাগিল।

গিরি বলিল, 'বেলি—তোর বৌ'দিকে জল দিতে বল, এক গেলাস—'

একটু পরে মণির বৌ দেখা দিল। মাথায় অনেকখানি ঘোমটা, চুল আলগা, আঁচলটা মাটীতে লুটান, ঘুমে চোখ মুখ ভারি ভারি, দীর্ঘ হাতে গহনাগুলি চলচলে দেখায়।

গিরি শাশুড়ীসুলভ গম্ভীর হইয়া বলিল, 'সন্ধ্যে অবধি ঘুমোও কেন? শাশুড়ীরা খেটে মরে, তুমি একটু আরাম দেবে, তা ঘর ছেড়ে বারই হও না—'

ঘোমটার মধ্য হইতে স্পষ্ট উত্তর হইল, 'আমি কি করব, ওঁরা কোন কাজ আমায় বলেন না।'

তিন জনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি হইল। গিরি হাসিয়া ফেলিল। বলিল, 'তুমি ছোট নও, শাশুড়ীদের দুঃখ বুঝতে হয়, কত আদরের বৌ তুমি। যাও, ভাল করে পান সেজে নিয়ে এস দেখি, চুল বাঁধনি কেন এখনও, সন্ধ্যে বেলা এলো চুলে থাকলে অলক্ষ্মী লাগে ঘরে, চুল বাঁধ, বেঁধে যা পার কাজ করগে।

বৌ বলিল, 'বেশী কাজ করলে মা বকেন, বলেন, 'শরীর নষ্ট হয়ে যাবে—'

'আ কপাল! এই শিখিয়েছে তোমার মা? তাই পড়ে পড়ে ঘুমিয়ে শরীরের এই ছিরি? আমরা উঠি সেই ভোরে—বিছানায় যাই রাত্তিরে—দু'দিন আমাদের মতন করে দেখ, সিরি শরীর হবে—'

গিরির ছেলেপিলে হয় নাই। সেই এখন বাড়ীর গৃহিণী হইয়া উঠিয়াছে। দৃঢ় স্বাস্থ্য, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও চৌকশাটে সংসারটা ঠিক রাখিয়াছে। দুই বোনের চেহারার সাদৃশ্য খুব, কিন্তু দুঃখে কষ্টে মেজ-বৌয়ের দেহ ভাঙিয়া পড়িতেছে যেন।

পরের দিন মণি সাজিয়া গুজিয়া মায়ের কাছে পাঁচটা টাকা চাহিল। মেজ-বৌ বলিল, 'টাকা কি হবে?'

'আমার ছোট শালীকে পাকা দেখতে আসবে আজ—শাশুড়ী কাল অনেক করে বলে গেছেন যেতে—অমনি একখানা কাপড়ও কিনে নিয়ে যাব—শুধু হাতে কি যাব?'

সরলা বলিল, 'কৈ আমাদের কিছু বলেন নি?'

'না বলেছেন ত কি হয়েছে? হয়ত মনে নেই, বিয়ের নেমন্তন্ন করবেনই। দাও মা টাকা—বেলা হয়ে যাচ্ছে—'

মেজ-বৌ বিপন্নভাবে বলিল, 'হাতে একটিও টাকা নেই।'

'না—নেই! এত ধান-কলাই বিক্রী কর—আমি জানিনে বুঝি? দাও শীগগির—'

সরলা বলিল, 'বছরের খরচ কুলোয় না—তা বিক্রী করব—তুই বলিস কি?'

'হ্যাঁ—হ্যাঁ—আমি সবই জানি', মণি অধৈর্য্য হইয়া বলিল, 'কৈ মা—দিলে না?'

'বলছি নেই—মিছে বলছি না কি? আমার টাকা পয়সা সব তুই-ই খুইয়েছিস্—'

'ইস্—ক'টা টাকা দিয়েছ আমায়? আমি চাইলেই বল নেই। বাবা যখন চায়—তখনই দেখি বার করে দাও—ও সব আমি বুঝি! না দাও যেদিকে চোখ যায়—চলে যাব, আর আসব না—ভাল চাও ত দাও—'

মণির বেহায়াপনায় ও ধৃষ্টতায় সরলা রুষ্ট হইয়া উঠিয়া কি বলিতে যাইতেছিল—মেজ-বৌয়ের মুখের দিকে চাহিয়া থামিয়া গেল এবং তথা হইতে সরিয়া পড়িল।

'যে দিদিমা করতে বল করছি—সত্যি আমার কাছে কিছু নেই—বেলির কাপড় নেই—তা কিনতে পারছি নে অবধি—'

'তবে মাসিমার কাছ থেকে এনে দাও—'

তেঁতুল তলার ঘাটে নৌকা থাকে না—জলে নামিয়া দাঁতার দিয়া গিয়া দত্ত বাড়ী উঠিল এবং গিন্নি ও দত্ত-গিন্নী দু'জনার কাছ হইতে সংগ্রহ করিয়া পাঁচটি টাকা আনিয়া মণিকে দিয়া স্নান করিতে গেল।

রান্নাঘরের পিছনে বেতের ডগা কাটিতে কাটিতে সুখেন সব শুনিয়াছে।

বৈকালে শ্যামল ফিরিয়া রাত্রে সুখেন তাহাকে সকালকার ঘটনাটা বলিল, শ্যামল চুপ করিয়া রহিল। সুখেন প্রশ্ন করিল—'কথা বলছ না যে?'

'কি বলব?'

'বলবার কিছুই নেই? তুমি ইচ্ছে কি? এই দু'মাস ছেলের পেছনে কি রকম খরচ করছ জান? কতক তুমি দাও কতক মেজ-বৌ লুকিয়ে দেয়—এ দিকে ছেলেপিলেরা না পায় দুধ—না পায় ওষুধ—ব্যাপারটা কি? সুদে আসলে কত হল হিসেব রাখ?'

'তুই রোজ রোজ আমার টাকার খোটা দিস নে—দিন দিন তারি মুখ বেড়ে যাচ্ছে তোর—'

'বটে—আমারি মুখ বেড়েছে? ছেলে যে ভাম্‌কেয়ার করে চাকর উড়িয়ে নিত্যি শ্বশুরবাড়ী যায়—তাকে কই একটা কথা বলতে শুনি নে? তোমার মতন অকেজো ভীতু লোক আর আমি দেখি নি, বৌকে ভয় কর—ছেলেকে ভয় কর—আবার ছেলের বৌকেও ভয়াও—'

শ্যামল হুঁকা-কলকে ফেলিয়া আগুন হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল—'কি বললি? আমি ভীতু? আমার মতন একজন বীর কয় দেখি কাঞ্চনপুরে। আর আমি তোর সঙ্গে থাকব না—আজই পৃথক হব,—আমি ছেলেকে ভয় করি, বৌকে ভয় করি—আমি ভীরু—তোর মতন বীর-পুরুষের সঙ্গে থেকে আমার কাজ নেই, মুর্খ গোঁয়ার চাষা কোথাকার। বড় ভাইয়ের মনে রাখতে জানিসনে—আর যদি একত্র থাকি তো আমি শ্যামল বিশ্বাস নই—'

রাগের মাথায় সুখেনও উৎকট শপথ করিয়া ফেলিল।

মেজ-বৌ সভয়ে স্বামীকে বলিল, 'তুমি করলে কি? ঠাকুরপোকে আলাদা করে দিয়ে তুমি সংসার চালাবে? সরলাকে ধান দিয়ে আনি? ছেলেকে একটি কথা বলি না, সত্যিই বলেছে ঠাকুরপো। বৌ তোমার রাজকন্যে—এই বেলা তুমি আমায় মাথায় চাপালে? এত রাগ কিসের তোমার? ওরা দু'জনই তো সংসার চালাচ্ছে!—আমার এই শরীর—তুমি হওগে ভেন্ন, আমি হব না।'

শ্যামলের রাগ তখন পুরা মাত্রায় রহিয়াছে—ভ্রূকুটি করিয়া বলিল, 'মেয়ে মানুষের মত নেমকহারাম আর নেই। স্বামীর মান অপমান তোমার গ্রাহ্য হল না—তুমি ওদের হাতে পায়ে ধরে একত্র থাকতে চাও? তোমার মুখ দেখলে পাপ হয়!'

এই আর যায় কোথা! মেজ-বৌ আপাদমস্তক কাপড় ঢাকা দিয়া ভূমিশয্যা লইল। শ্যামল ভোর রাত্রে উঠিয়াই শ্বশুরের পরামর্শ চাহিতে গেল।

রাত্রে বাড়ীর মেজ-বৌ ননদের বাড়ী গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া শুনিলেন, শ্যামলের স্ত্রী তিন দিন উপবাসিনী ও শয্যাশায়িনী।

একটু পরেই শ্যামল আসিয়া বলিল, 'খুড়িমা একবার এস—যদি বাঁচাতে পার দেখ—'

মেজ-বৌকে দেখিয়া সরলা বলিল, 'তুমি যা হয় কর খুড়িমা, পাড়ার সবাই হাঃ মেনে গেছে—'

মাটীতে মিশিয়া অভিমানিনী শুইয়া আছে—মেজ-বৌ অনেক সাধাসাধি করিয়া শেষে টানিয়া উঠাইয়া বসাইলেন। ক্ষীণ-স্বরে সে বলিল, 'যে কথা বলেছেন উনি, তার পর আর বাঁচতে চাইনে—'

শ্যামল কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, 'দোষ করলে কি বাপ নেই? কখন একটা উঁচু কথা বলেছি তোমায়? হঠাৎ রাগের মাথায়—'

মেজ-বৌ বলিলেন, 'স্বামী বাপ চাইলে আর রাগ করতে নেই, ওঠ এবার—'

'দিনে চারবার বার বাপ তেপেছি খুড়িমা, তা কাণে তোলে নি—'

'ছি নিরু! স্বামীর পায়ের ধুলো নাও। আর পাপ বাড়িয়ো না ওঠ—'

দাম্পত্য কলহের অবসান হইল।

আসল ব্যাপার ক্রমশঃ জটিল হইয়া উঠিতেছে, বেতন সময় মত না পাইয়া কৃষ্ণাণরা একে একে কাজ ছাড়িয়া দিতেছে। শ্যামল কোন দিনই সংসারী নয়। এলা সুখেন বড় হইয়া খাটে—সঙ্গে সঙ্গে মেজাজও চড়িতে থাকে। সুখেনের প্রকৃতিও কেমন যেন হিংস্র ও ভীষণ হইয়া উঠিতেছে।

সকাল বেলা সুখেন ঘরের বেড়া বাঁধিতেছে—সরলা বিছানা তুলিতে আসিয়া এদিকে ওদিকে দেখিয়া লইয়া বলিল—

'আ মেজ-বৌদির খরচ বেশী তোমরা বল—আমি দেখি, ছেলেদের অসুখ-বিসুখ, লেখা-পড়ায় আমাদেরই চার গুণ বেশী—সারা বছরের খরচটা হিসেব করে দেখ না কেন? মণির বিয়ের কি এমন খরচ হয়েছে? ও সব মত ক'র না—দুখে-সুখে এক হয়ে থাকাই ভাল—'

সুখেন চটিয়া উঠিয়া বলিল, 'থাম থাম, আমি মেয়ে মানুষের বুদ্ধি নিয়ে কাজ করিনে—'

'তা করবে কেন? মাথায় ভূত চেপেছে তোমার; ভাল কথা বলতে এলাম—তা জবাব শোন!'

'ভাল কথা! তোমার ভাল কথায় আমি ঝাঁটা মারি—খবরদার!—ফের পরামর্শ দিতে আসবে ত—'

সুখেনের চোখ দেখিয়া মনে হইল, হাতের দা খানা বুঝি এখনই ছুড়িয়া মারিবে। বিনা বাক্যে সরলা সরিয়া গেল।

শ্যামল কৃষ্ণ রায়ের কাছে পরামর্শ চাহিল, তিনি সুখেনকেও ডাকাইয়া আনিলেন। দুই ভাইকে অনেক বুঝাইয়া বলিলেন।

শ্যামল বলিল, 'আর নয় কাকা, ওটা দিন দিন যেমন গোঁয়ার হয়ে উঠছে, কোন দিন মেরেই বসবে আমায়, খরচ কম হোক, বেশি হোক, আমি শান্তিতে থাকতে চাই, রাত দিন চোখরাঙানি আর সহ্য করি সইতে পারব না।

সুখেন বলিল, 'আমারও সইবে না, আমি খালা খেটে মরব আর তোমরা বাপ-ব্যাটা নিজের নিজের পরিবারের পায়ে তেল মালিশ করবে, সে সইব না।'

তখন গ্রামের প্রধানদের ডাক পড়িল, সকলের সাক্ষাতে একটা লেখাপড়াও করিয়া রাখা হইল, সেই রকম ভাবে কাজ হইবে। স্থির হইল, পরদিন সকালে সকলে উপস্থিত থাকিয়া বিশ্বাসদের ভাগ বণ্টন করিয়া দিবেন।

অনেক রাত্রে সভা ভঙ্গ হইল। বাড়ী ফিরিয়া শ্যামল স্ত্রীকে বলিল, 'জঞ্জাল মিটে গেল, এবার শান্তিতে থাকবে—চাই কি ঘরে তালা দিয়ে দু'চার মাস তোমার বাপের বাড়ীই কাটানো যাবে।'

ও ঘরে সুখেন গর্জ্জিতেছিল, 'দেখা যাবে এবার, বাবুর মতন বাপ-ব্যাটা ইস্কুল করলেই চার বেলা খাওয়া জোটে কি না।'

৫৩

—অন্তর বিচ্ছেদে
শত খণ্ডে খণ্ডীকৃত—

সকাল বেলা কৃষ্ণ রায়েরা দুই ভাই এবং অন্যান্য মুরুব্বিরা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গিন্নীরাও দু চারি জন আছেন, দত্ত-গিন্নী আসিবার সময় রায়-বাড়ীর মেজ-বৌকে ডাকিয়াছিলেন, তিনি আসেন নাই, বলিলেন, 'সংসার ভেঙ্গে খান খান হবে তাই কি দেখতে আছে?'

উঠানে বড় বড় মাদুর পাতিয়া দেওয়া হইয়াছে, বড় কৃষাণ তামাক দিতে ব্যস্ত।

বিশালের ঘরের বারান্দায় পরশমণির পাশে বসিয়াছেন দত্ত-গিন্নী, বড়-বৌ চৌকাঠের ও-পাশে দত্ত-গিন্নীর আড়ালে রহিল।

পাল-গিন্নী বলিলেন, 'বড়-বৌয়ের কি করবে তোমরা? ওকে একেবারে আলাদাই করে দাও, এদের সংসারে নিত্যি নানান খরচ—ওর কি? আলাদা হলে ইচ্ছে মতন খরচ-পত্তর করবে, হাতে দুটো পয়সা থাকবে, দুটো বামুন বোষ্টম খাওয়ালে, কি তিথী-ধর্ম্ম করলে।'

শশী রায় বলিলেন, 'সে ঠিক কথা। একত্র থাকলে অনেক ক্ষতি হয়, কিন্তু উনি যে মানুষ বধূমাতারের হাতে থাকবে সব, দেখতে শুনতে পারবেন না, যা আয় হবে, সিকি পাবেন কি না সন্দেহ।'

শ্যামল বলিল, 'বড়-বৌ আমার ছেলে মেয়ে মানুষ করেছে তাদের সঙ্গেই থাকবে।'

ব্রজ দত্ত বলিল, 'এখন তোমার কিছু না বলাই ভাল, বড়-বৌ একা, সবাই ভাববে তার অংশটা তোমার ভাগে গেলে, তোমার ঢের সুবিধা হবে।'

নৃপ রায় বলিল, 'মা আর বড়-বৌ এক সঙ্গে থাকুন, ওঁদের এক ঘরের কারবার, মা অন্ধ, বড়-বৌ নির্ব্বাট মানুষ, সেবা যত্ন করতে পারবে সব চেয়ে বেশী। সোনা সেখ ওদের জমি-জমার ভার নিক।'

এ কথাটা সকলেই অনুমোদন করিলেন। শশী রায় প্রশ্ন করিলেন, 'বড়-বৌ তা হলে রাজী?'

বড়-বৌ দত্ত-গিন্নীকে নিঃশব্দে অভিমত জানাইল। দত্ত-গিন্নী বলিলেন, 'বড়-বৌ শাশুড়ীর সঙ্গে থাকবে না।'

—'থাকবে না?' সভায় একটা বিস্ময় গুঞ্জন উঠিল।

দত্ত-গিন্নী বলিলেন, 'না।'

সকলের চোখ একবার বড়-বৌয়ের উপর পড়িল, মাথা নীচু, মুখে আধ-ঘোমটা, কপাটে হেলিয়া ঘরের দিকে একটু ঘুরিয়া বসিয়াছে, মলিন, কুণ্ঠিত, লজ্জাবিনম্র ভাব, কিন্তু মতি অপরিবর্ত্তিত।

পরশমণি চাপা সুরে গর্জ্জিয়া উঠিলেন, 'থাকবে না আমার সঙ্গে? কে ওর ছোঁয়া—'

সেজ-রায় থামাইয়া দিয়া বলিলেন, 'থাক বৌ ওসব কথা।'

শশী রায় আর একবার ভাল করিয়া বুঝাইলেন, সাল-গিন্নী; দত্ত-গিন্নীও বলিলেন, 'শাশুড়ীর সেবা তোমারই কাজ, তোমারই ধর্ম্ম। ওরা ছেলে পিলে সংসার নিয়ে তোমার মতন পারবে না। শাশুড়ী অসমর্থ, তোমারও আর কোন লক্ষ্যি নেই, এমন সময় তুমি যদি না দেখ ওঁকে, উনি মহাকষ্ট পাবেন, তোমারও মহাপাপ—'

এবার দত্ত-গিন্নীকে কিছু না বলিয়া বড়-বৌ ঘোমটার মধ্য হইতে ধীর শান্ত ভাবে উত্তর দিল, 'আমার যত পাপ হোক আমি মাথায় করে নেব, কিন্তু ওঁর কোন ভার আমি নেব না।'

স্বর সংযত হইলেও যথেষ্ট দৃঢ়।

অক্রুর মিস্ত্রী বলিল, 'তবে ছেলেরা একজন থাকে

পরশমণি বলিলেন, 'আমি যতা বলব, চারটা বৌ এসেছে বটে, কিন্তু কানুর মা আমার যেমন সেবা করে, এমনটি কোন ঝিরি নয়—'

'তবে সুখেনের সঙ্গেই আপনি থাকুন। বড়-বৌ একেবারে আলাদাই থাক, একখানা রান্নাঘর তার জন্যে—'

'—সে আপনারা যা হয় করুন, সুখুকে কি কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে ভাসিয়ে দিতে পারি আমি? আমার যা কিছু অর্দ্ধেক যেচে ওর দেনা শোধ দিক, আমি ছেলেগুলোকে আগলে রাখলে সরলা অনেকখানি বাঁচবে, যা তার দেহ—'

সুখেন বলিল, 'সে বাঁচুক বা মরুক, তোমার সম্পত্তি দিয়ে আমি ঋণ শোধ করতে চাইনে, তোমারও আমার দিকে এসে কাজ নেই।'

কৃষ্ণ রায় বলিলেন, 'কি আশ্চর্য্য সুখেন! তুমিও আপত্তি করছ?'

'হাঁ কাকা।'

'মায়ের ওপর তোমার কোন কর্ত্তব্য নেই?'

'আমি অনেক কর্ত্তব্য পালন করি নি, সে আপনারা জানেন। মায়ের ভার আমি নেব না।'

'এই অন্ধ নিঃসহায় মানুষকে একা পৃথক্ করে দেবে?'

'সে আপনার যা হয় করুন, উনি নিঃসম্বল নন্।'

পরশমণি থ' হইয়া গিয়াছেন, গালে হাত দিয়া পাথরের মত বসিয়া আছেন, শুধু দৃষ্টিহীন চোখ দুটি কথার শব্দ লক্ষ্য করিয়া এদিক ওদিক করিতেছে।

কৃষ্ণ রায় সকলের দিকে একবার চাহিয়া দেখিলেন, সদলবলেও এই মানুষটির ভার গ্রামের কেহই বোধ হয় লইতে চাহিবে না।

শ্যামল বলিল, 'মার টান সুখেন আর ছোট বৌয়ের ওপর —আমরা জানি, মা ওদের কাছেই থাকবেন। তা যখন হল না, মা কি ভেসে যাবেন? সেজ-বৌয়ের শরীর ভাল নয়, তা হক, আমরা মার কষ্ট হতে দেব না সাধ্য মতন—'

শশী রায় বলিলেন, 'তা'হলে তুমি মার ভার নিলে?'

'নিলাম।'

সুখেন বলিল, 'আমার একটা কথা', বলিয়া উঠিয়া বিশালের ঘরের চৌঠার এক পা তুলিয়া বড়-বৌকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, 'বড়-বৌ তুমি জান দাদা তোমারই কথা ভেবে শান্তি পান নি—তুমি যদি আমার দিকে থাক, মাথায় করে রাখবে। আমার ব্যবহারে দাদা অনেক কষ্ট পেয়েছেন—হয়ত তুমিও পাবে, আমি গোঁয়ার, বদমাশ কিন্তু মা কি ছেলের স্বভাব সহে নেয় না? আর তুমি যদি মনে কর আলাদা থাকলে শান্তি পাবে—তবে তাই হোক আমার সংসারে দুঃখকষ্ট, অভাব অনেক বেশী—'

কয়েক মুহূর্ত্ত সকলে নির্ব্বাক—সুখেন ফিরিয়া স্বস্থানে বসিল।

একটু পরে বস্ত্র-গিন্নী বলিলেন, 'বড়-বৌ বলছে সুখেনের সঙ্গে থাকবে।'

কৃষ্ণ রায় বলিল, 'মা তুমি নিজের মুখে বল—সবাই শুনবে—'

ভাঙ্গা ভাঙ্গা রুদ্ধ স্বরে উত্তর হইল—'আমি ছোট ঠাকুর-পোর ভাগেই থাকব।'

৫৪

'কর্ম্মক্ষেত্রে যেই বীজ করেছ বপন
ফলিবে তেমনি তব অনুরূপ ফল!
ভাবিতে পারনা কভু বিধাতা তোমার
নিজ হাতে এই দিন আনিতে না হয়!'

মেজ-বৌ হঠাৎ গাছ হইতে মাটীতে পড়িয়াছে, কাজ-কর্ম্মে সে মোটেই সরল নয়, কিন্তু মুখ দেখিয়া কেহ মনের কথা টের পায় না।

আজকাল খুব ভোরেই দুই জন উঠিয়া পড়ে। শ্যামলকে ক্ষেতে ক্ষেতে তদারক করিতে যাইতে হয়, মাঠ হইতে ফিরিয়া স্কুলে যায়। মেজ-বৌ শাশুড়ীকে বারান্দায় বসায়, শীতের দিনে গরম দুধ, গরম কালে সরবৎ দিয়া কোলের ছেলেটি তাঁহার কাছে রাখিয়া কাজে যায়, অপটু হাতে কাজ সারিতে বেলা যায়। একেবারে রান্না সারিয়া আগে শাশুড়ীকে খাওয়ায়, ময়লা কাপড়-বিছানা ক্ষার দিয়া প্রায়ই ধুইয়া দেয়। নিজের বেলা শেষ হয়, তবু মুখে বিরক্তি নাই, বড় জোর বলে, 'বৌমা গুধটা একবার দেখ' কি—'মা কি চাইছেন দেখ দেখি শীঘগির—'

সরলার সংসারে কাজের কষ্ট হইবার কথা নয়, দুটি মা-ই পরিশ্রমী, কিন্তু ফল দাঁড়াইল উল্টা। বড়-বৌ লক্ষ্য-জপ লইয়াই থাকে, বাকী সময়টুকু বাঁশতলায় কাটায়। প্রায়ই উপবাস দেয়, দেখিয়া দেখিয়া সরলা দুপুরে আবার স্নান করিয়া বড়-বৌকে রাঁধিয়া দিতে আরম্ভ করিল।

বস্ত্র-গিন্নী একদিন বলিলেন, 'দেখ বড়-বৌ এখন তো চালাই আছিস, ছোট বৌটাকে একটু না দেখলে ও যে বাঁচে না, একা হাতে এই সংসার পারে?'

বড়-বৌ কোন উত্তর দিল না।

বড়-বৌয়ের নিন্দাও রটিয়াছে, শাশুড়ীর আমলে নাকানি চুবানি খাইয়া এখন ঘরের উপর এমন সুস্থ সবল দেহ লইয়া বসিয়া থাকা কি উচিত?

সুখে দুঃখে বছর ঘুরিয়া গেল। মণির বৌ একটি মেয়ে কোলে বাপের বাড়ী হইতে ফিরিয়াছে। মেজ-বৌয়ের কাজ বাড়িল, নাওনিকে তেল মাখান, ঘুম পাড়ান, কত আদরের মণি, তারই মেয়ে! শ্যামল দুঃখে বলে, 'মেজবৌ কি হয়ে গেলে? পৃথক্ হয়ে তোমাকে যে শেষ করলাম।'

আনন্দে মেজ-বৌয়ের চোখে জল আসে, 'আর তুমি? যা কোন দিন কর নি তাই করছ না?'

বে-বৌ ঘর হইতে বাহির হইত না, এবার দেখা গেল, সে নিজে হইতেই অনেক কাজ করিতে আসে, শ্বশুর-শাশুড়ীর কাছে কাছে থাকে, কেবল দিদিশাশুড়ীর কাছে ঘেঁসে না।

তা না থাক, পরশমণির কথার খৃত ছাড়িয়া যায়, এ ত মানুষ। মেজ-বৌ এখন শাশুড়ীকে আগের চেয়ে অনেক বেশী যত্ন করে। শ্যামল ঘরে ফিরিয়াই আগে মায়ের খোঁজ লয়, 'মা কই? কেমন আছে?'

পরশমণির নিজের বাড়ীতে চলা-ফেরা করিতে বাধে না—অনুভব ও শ্রবণশক্তি বড় প্রখর। সুখেন ছেলেদের পাঠায় মারধোর করে—সরলার সঙ্গে ঝগড়া বাধায়—বেড়া বাঁধে, বড়ি পাকায়—সবই পরশমণির সামনে—কিন্তু ভুলিয়াও মায়ের সঙ্গে একটি কথা বলে না।

'—সুখেন—অ সুখেন—'

'কেন?'

'হাট থেকে আমার জন্যে ছোট্ট একখানা কাপড় আনিস, এ দশখাতি কাপড় আর টানতে পারি নে'—

'আমার কাছে টাকা নেই'—

'টাকা আমিই দেব।

'তবে মেজদাদাকে দিও'—

'আ—আমার কপাল! বৌ-ছেলের কথনা রাত দিন করছিস, আমারই একখানা—'

'কাজের সময় ক্যান ক্যান করো না।'

দুপুর বেলা সুখেনের ঘরে গোলমাল শুনিয়া পরশমণি বলিলেন, 'এই ভর-দুপুরে কি হল তোর? বৌটা হাড্ডিসার—বকছিস কেন? চান করিস নি বুঝি—যা চান করে আয়'—

'তোমার চান হয়েছে ত? তা হলেই হ'ল।'

'আমি কি সাধ করে চান করি? মেজ বিবি যে সন্ধ্যার আগে আমারে নাইয়ে খাইয়ে জঞ্জাল মিটিয়া ফেলে'—

'হারি অন্যায় করে! তুমি আমার সব কথায় কথা কয়ো না।'

'তা বলছি বই কি, তোরা সব চামার! চামার! আমি মা—কত দুঃখে মানুষ করেছি, ধর্ম্মে সইবে না রে ধর্ম্মে সইবে না!'

'ভাল জ্বালা! কালই মাস্তামোকি বেড়া তুলে দেব—দিন-রাত আর বকবকানি সয় না।'

ঘাটে মেজ-বৌ বলিল, 'কি হয়েছিল রে?'

কলসী ও একগাদা কাপড় নামাইয়া সরলা বসিল। পাঁচটি ছেলে হাসিতে খেলিতে শিখিয়া একে একে গিয়াছে কঠোর শ্রমে ক্লান্ত দেহ, মলিন মুখ, কোথায় সরলার সে দুরন্ত দর্প, কথার জ্বালা, চোখের অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ! স্বামীলাঞ্ছিতা শোকাহতার চোখের জল কিসে বাধা মানিবে?

মেজ-বৌ বলিল, 'ভর দুপুরে কাঁদিস নে, এমনি যা সুখ, ঠাকুরপো দিন দিন কি হচ্ছে যেন—কথা কইতেই আমার ভয় হয়, চোখ দুটো পাকিয়েই আছে! একটু সয়ে থাকিস বোন, বড্ড সময়টা খারাপ, তার পেঁয়ার মানুষ।'

'খারাপ সময় কি মেজ-বট্‌ঠাকুরের নয়? ক্ষেতে আকাল তা আমার কি দোষ?'

রায়-বাড়ীর গিন্নিমা জিজ্ঞাসা করিলেন একদিন, 'কেমন আছ বৌ আজকাল? মণির মা যত্ন করে বেশ? বলতে নেই, তোমার ছিরি, চোখ গিয়েছে এই যা দুঃখ নইলে বোধের ঘরে যা শরীর খানা হয়েছে, এমন কোন কালে ছিল না।'

পরশমণি খুশী হইলেন না মোটে, 'কি জানি ঠাকুরঝি, কি ছাই মাটী খাওয়ায় ওরাই জানে। দেখতে ত পাইনে, মেজবিবিটা জন্ম-পেত্নী, তারই হাতে খেতে হচ্ছে। কপালের ভোগ! আবার কচি-বৌটার ঘাড়ে সংসার ফেলে কর্ত্তাগিন্নী দিন-রাত নাতনী নিয়ে সোহাগ করছেন, শ্যামলটা বৌয়ের গোলাম—গোলাম! বেয়ান মরি ঠাকুরঝি, বড়বিবি ত বাঁশতলায় খ্যামটা নাচছেন অষ্টপহর! ও ঠাকুরঝি রেখে নিয়ো তুমি ওটা আবার বেঙ্কলো বলে—'

কাঞ্চনপুর হইতে মাইল দুই দূরে পলাশী গাঁয়ে মেয়েদের একটা পাঠশালা খুলিয়াছে—বার টাকা মাহিনায় মণি গোপনে সেখানে কাজ লইয়াছে। নিতাকার মত স্কুলে যাইবার সময় বাহির হয়—যায় পাঠশালে পড়াইতে। মাসের পরে বেতনের টাকা মায়ের হাতে দিয়া সব খুলিয়া বলিল। শ্যামল দুঃখিত হইল, আবার ছেলের সুমতি দেখিয়া সুখীও হইল।

বেশ-বিলাস ছাড়িয়া মণি বাপের কাছে ক্ষেত-খামারের কাজও শিখিতে লাগিল। পাড়াগাঁয়ে ক্ষেত হইতে যদি সম্বৎসরের শস্যটা পাওয়া যায়, তবে নগদ কুড়ি পঁচিশ টাকা হইলেই সংসার বেশ ভাল চলে। বছর দুই দেনা শোধের দিকে মন দিয়া অনেক কষ্ট সহিবার পরে তৃতীয় বছরে দেখা গেল, শ্যামল একখানা বড় টিনের ঘর তুলিতে আরম্ভ করিয়াছে। রাত্রে গ্রামে দুটি ছেলেকে পড়ায়, পাঁচ টাকা পায়। ইহাতে সে বেলির গলার হার ও হাতে বালা গড়াইতে দিল। মায়ের জন্য ভাল ভাল শাড়ের দাড়ী আনে। বড় মা ও ছোট মাকে ধামরাইয়ের বিখ্যাত রথ দর্শন করাইয়া তাহাদের বহুদিনের সাধ মিটাইল।

পরশমণি বাহিরের উঠানে দাঁড়াইয়া আভাসে জিজ্ঞাসা করেন, 'কে রে—কে যায়?'

যেই যাক্ না কেন, তাঁহার হাত ধরিয়া সেখানে তাঁহার ইচ্ছা পৌঁছাইয়া দিয়া যায়।

হাটে যাইবার সময় সরলা বলিল, 'সকালে অম্বুবাচী লেগেছে, এ বেলা ত গেল অন্ন জল কি পাবে এখন—আম, কাঁঠাল, কলা বেশী বেশী তিন দিনের মতন এন।'

'আম-কাঁঠাল পয়সা দিয়ে আনতে হবে না কি? গাছের গুলোয় ঝুলোয় না?'

'আষাঢ় মাসে গাছে আম কোথা? ৩'একটা যা আছে ওতে কি হবে? ছেলেপিলের বাড়ী—কাঁঠাল যা আছে কাঁচা।'

'ওঃ অমুখাটী না ভোজবস্তি!—যত সব! তা হলে কাপড় আনা হবে না।'

'দিদির কাপড় একেবারে ছেঁড়ে না হলে'—

পরশমণি নিজের বারান্দা হইতে বলিলেন, 'হাতে পয়সা নেই যত সব ফরমাস হচ্ছে, ভবানী ঠাকুর কি, মেজ-বৌ কোন মুখে আমাদের ছেলে অমুখাটী কয়ে? কালই ত আমাকে বড়বিবিকে বলে গেছে।'

'কি?' সুখেন গর্জ্জিয়া উঠিল, 'তুমি চুলোয় যাও, আমি মরেছি না কি যে আমার ঘরের বৌকে পাড়ার লোকে দরদ দেখাতে আসে? ফের ও সব শুনি ত'—

হাট হইতে ফিরিয়া সুখেন শুদ্ধ হইয়া বসিয়া আছে, কলের প্রকাণ্ড ঝুড়িটা পরলা টানিয়া ঘরে তুলিল। বড়-বৌয়ের সন্ধ্যাহ্নিক শেষ হইয়াছে, পরলা বলিল, 'দিদি, আড়াল করে রাখ, যা ছেলেরা, আর এই তোমার কাপড় একজোড়া আমি নিয়ে যাই,সকালে কেচে দেব।'

বড়-বৌ বলিল, 'তোর কাপড় এনেছে?'

'না, টাকা ছিল না।'

'তোর যে একেবারে নেই, আমার তবু আছে, এ কেমন আক্কেলের কথা? যাই, আমি বলি গে—'

'না তুমি যেও না, আগুন হয়ে রয়েছে, তিনখানা ধানে ভরা ক্ষেত—দু'বছরের দুঃখ যেত, আজ টাকা দেবার শেষ দিন ছিল। কাল থেকে বংশী পরামাণিকের হবে।'

'সে কি রে? আমি ত কিছু জানি নে? কবে কর্জ্জ করলে? কত টাকা?'

'এক শো পাঁচ টাকা, নবদ্বীপ গেলে, গুরুবাড়ী গেলে, পঞ্চমী স্নান সারা হল, এই সব জন্যে। ছেলেদের পেছনেও কিছু গেছে।'

'এই সব জমি বন্ধক দিয়ে করেছে? আমায় জানাস নি কেন?'

বড়-বৌ সুখেনের কাছে গেল। 'ঠাকুরপো ওঠ হাতে মুখে জল দাও, এমন কাজও করে! তুমি জেদ ধরলে তাই না গেলাম? আমার তীর্থ করবার কি ঠেকা পড়েছিল বল দেখি—'

'ওঃ কত দরদ! থাক শুয়ে বসে, তুমি জানবে কি? পাড়ার ব্যাটা-বেটিদের কত মাথা ব্যথা, তীর্থ করলে না—হাতের জল শুদ্ধ হল না—কেউ তোমায় ছোঁয়া খায় না। বাড়ীর কাজে পাড়ার লোক এসে রাঁধে—কৈ তখন বলতে পার নি তাদের?'

বৈধব্যের পর গঙ্গা স্নান ও তীর্থ-ভ্রমণ করতে হয়। বড়-বৌ অতি দুঃখেও হাসিল। 'না খেত নাই খেত, কাকেই বা ঘটা করে রেঁধে খাওয়াচ্ছি! তা বলে তুমি এমন সর্ব্বনাশ করলে?'

'বেশ করেছি, কোন বাবশা বেগমের পরামর্শ চাই নে, খাটব খাওয়াব।'

'এস কল-টল কেটে দিচ্ছি, এস আমার ঘরে।'

'ও ভাব্‌ভাব তোর আমার চলবে না। তুমি যাবে না আমায় জ্বালাবে? ঐ ধেড়ে তোমাদের দেখলে আমার রাগ ধরে।'

পরদিন বৈকালে ঘরের পৈঠায় হুক্কা বসাইতে বসাইতে সুখেন বলিতেছিল, 'এক ঝুড়ি ফল আনলাম, তা কোন বেটি প্রাণ ধরে এক টুকরো হাতে দিলে? বাপরে বাপ—এ কি অমুখাটী—না পুতনা রাক্ষসী? কাঁটা মার অমন ভাব্‌ভাব মাথায়।'

'ঠাকুর-পো, কি বলছ? আমি এখনও ঝুড়িতে হাত দিই নি।'

'কি—হাত দাও নি? দত্ত-বাড়ী রায়-বাড়ী পাতা পেতেছিলে গিয়ে? সব গেল, আমার মান-সম্মান সব গেল এই কাঠকুড়ুনীদের জ্বালায়, দূর কর সব—ঝুড়িশুদ্ধ জলে ফেলে দাও, দিয়ে জন্মের মত পাড়ায় পাতা পাত গে।'

সুখেন খুঁটি যা ফেলিয়া বড়-বৌয়ের ঘরের দিকে চলিল।

'থাম, থাম, সব আমি ধুয়ে রেখেছি, ছুঁয়ে ফেলো না। পরলা যা যোগাড় করে রেখেছিল, তাতেই চলছে বলে—'

'তবে কিছু কিছু এ বাড়ী ও বাড়ী দিয়ে এস। কেবল নিতেই জান, দিতে শেখ নি, তোমাদের জাড়ই খারাপ।'

৫৫

এখনও পরীর কাঁদে আমি অভাগার,
কপাল চাপড়ে দুঃখে বর্ষীয় বিস্তার।

মেজ-বৌ স্নানে আসিয়া দেখিলেন, নদি কাঁদিতে কাঁদিতে নৌকা চড়িয়া চলিয়াছে, বলিলেন 'কি হয়েছে রে?'

'ছোট-পুড়িমার ফিট হয়েছে, ডাক্তার আনতে যাচ্ছি।'

'আমার তোদের বাড়ী নামিয়ে দিয়ে যা।'

বারান্দায় বিছানা করিয়া সরলাকে শোয়ান হইয়াছে। ছেলেদের কান্না-চীৎকার, বাড়ীশুদ্ধ ব্যস্ততা। বড়-বৌ বাতাস দিতেছে। উঠানে বসিয়া সুখেন ধামা, কাঠ, কুলা বেতের বাঁধন দিয়া মেরামত করিতে নিবিষ্টচিত্ত, নদিকে দেখিয়া বলিল, 'তুই তোর কাজে যা'।

মেজ-বৌ বলিলেন, 'কি হয়েছিল?'

বড়-বৌ বলিল, 'ঘরে এল গরম-মসলা নিতে, চৌকাঠে বেধে পড়ে অমনি অজ্ঞান, জ্বর হচ্ছে রোজ, অরুচি, কিছু খেতে পারে না।'

সরলার মুখ ও মাথা জলে ভিজা, মেজ-বৌ পাখাটা লইয়া বাতাস দিতে লাগিলেন, একটু পরে সরলা চোখ চাহিয়া দেখিয়া আবার চোখ বুজিল।

মেজ-বৌ বলিলেন, 'কিচ্ছু শরীরে নেই, এমন কাহিল হয়ে পড়েছে, না একটু ওষুধ, না ডাক্তার, সুখেন, তোর ভাবটা কি বল দেখি?'

সুখেন বলিল, 'রাখ খুড়ি মা, ও সব নিত্যি-অসুখ বড় ঘরে পোষায়। কাঞ্চনপুরে ক'টা বৌয়ের জন্যে ডাক্তার আসে? ও সব ভঙ্গী তোমরা বুঝবে কি?'—তাচ্ছীল্যের সহিত সুখেন কুলার বাঁধন শক্ত করিয়া কষিতে লাগিল।

বেলা চড়ুর গড়াইয়া যায়। মেরামতি কাজ শেষ করিয়া সুখেন মাছ ধরিবার পলো তৈয়ারী করিতেছে। বড়-বৌ আসিয়া ডাকিল, 'ঠাকুর-পো খাবে এস, আজ কি সারাদিন কলিই চালাবে? আমি বেরুবো কখন?'

'অত পেটে আগুন ধরে থাকে তুমি নিজের ঘরে যাও গে, কাজ শেষ না হলে আমি উঠব না।'

'তুমি খেয়ে নিয়ে ছেলে দু'টোকে দেখতে।'

'কাল কাল ইস্কুলে না গেলেই হোত আজ, দোহাগী বিছানায় টান-টান, ছেলে ধরব আমি? ধড়াম করে পড়ে পাড়া শুদ্ধ ভড় করা হল, সাত ব্যাটা-বেটী এখন সাতখানা করে ব্যাখান করুক!—ও ছিটকিলিমি না দেখেছি ত আমার নাম ফিরিয়ে দিও, থাক না বাপের বাড়ী, এগুনি দূর হয়ে যাক চোখের সামনে থেকে,' আপদ, জঞ্জাল!'

বড়-বৌ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

'বলি দাঁড়িয়ে রইলে যে? ভঙ্গী টঙ্গী ছাড় দেখি একবার, ওতে আমি ভুলিনে। যত সেব-সেবা জুটেছে আমারি কপালে, তোমরা দুটোই দূর হ'লে তবে আমি শান্তি পাই।'

নির্জ্জন বাঁশবনে বড়-বৌ বসিয়া আছে, রুক্ষ চুল, মলিন মুখ, তন্দ্রাগ্র চোখ ভাঁসিয়া নামিতে নামিতে হঠাৎ চকিত হইয়া চাহিল, কোমল দু'খানি হাতে কে গলা বেড়িয়া ধরিয়াছে।

কৃষ্ণ রায়ের পৌত্রী—বাড়ী হৈনা নলিনী, ইহাকেই রায়-বাড়ীর সিসিমা নামুষ করিয়াছিলেন। বাবা ও সংসার সঙ্গে বিবাহের জন্য বেশে আসিয়াছে। বছর চৌদ্দ বয়স, তুলি-আঁকা চোখ-মুখ, রঙটি রক্তাভ গৌর। দুঃখিনী বলিয়া মনটা এত তীক্ষ্ণ ও করুণ যে, চোখে জল লাগিয়াই আছে। বেড়াইতে আসিয়াছে, তাও এক পাল বাচ্চা-কাচ্চাশুদ্ধ বিড়াল সঙ্গে।

'কে বকেছে? মেজ-খুড়ী মা বললে, তুমি নাওনি খাওনি।'

'কেউ না, আমার অদৃষ্ট'—বলিয়া বড়-বৌ সোজা হইয়া বসিল। নলিনীর চোখে জল, তাহার মুখখানা দেখিতে দেখিতে বড়-বৌয়ের বহু কাল আগে-দেখা মায়ের মুখের অস্পষ্ট ছবি মনে পড়িল, হাত দিয়া নলিনীর চুলগুলি গুছাইয়া দিল, শিশুর মত নিষ্পাপ মুখ, সেই মুখখানি বড়-বৌ নিজের মুখের উপরে চাপিয়া ধরিল।

'এবার ওঠ—নাইবে ওঠ।'

'না, এখন না। তুমি আমার কাছে থাকবে একটু? তোমাকে আমার মায়ের মতন মনে হচ্ছে।'

'তোমার মা? না, তুমিই আমার মা, আমার ত মা নেই, ওঠ আমি তোমার সঙ্গে যাব আজ, ওঠ না মা—'

ভগবান্ কার জন্য কোথায় সান্ত্বনা সঞ্চিত করিয়া রাখেন

কে বুঝিবে? এই মুহূর্তে নলিনী ভিন্ন কে বড়-বৌকে শান্ত করিতে পারিত?

বাড়ীতে বিবাহের আয়োজন। নলিনী বড়-বৌয়ের কাছে থাকে, আবার কিরিয়া তাহাকে ব্যস্ত করে। মা-মেয়ের কথার শেষ নাই। নলিনীর একটি বিড়ালের তিনটে বাচ্চা হইয়াছে, বড়-বৌকে পায়স রাঁধিয়া তাহাদের অন্নপ্রাশন দিতে হইল।

নলিনীর বিবাহে বড়-বৌয়ের দুঃখ যত বেশী, আনন্দও তত। এক হাতে চোখের জল মুছে আর দিয়ের কাজ করে। ভয়ে ভয়ে ও লজ্জার সঙ্গে সরলাকে বলিল, 'মেয়েটাকে এক-খানা কাপড় যদি দিতাম—'

সুখেন শুনিয়া হেসে-জলে অলিয়া উঠিল, 'আমি দেনা কর্জ্জে ডুবে গেলাম, বিবিদের খয়রাতি দেখ! এক আনা পয়সা নেই হাতে, ফরমাস হল সাড়ীর। চুলোয় যাও, অমন যে-দরদী মানুষের কপালে মার ঝাঁটা।'

গায়ে-হলুদের নিমন্ত্রণে সকলেই গিয়াছে, বড়-বৌ যায় নাই—

সুখেন আসিয়া বলিল, 'ওঠ বড়-বৌ, মাপ কর আমায়। আমি চণ্ডাল, জান আমার মুখের ঠিক নাই। এই নাও তোমার কাপড়, লাল রং এনেছি, আর সিঁদুর এক পান, যাও দিয়ে এস তোমার মেয়েকে।'

জ্যোৎস্না রাত্রি। বর-কনে বিদায় হইতেছে। বৈকাল হইতে বড়-বৌ বাঁশ-বাগানে বসিয়া আছে, আজ আর নলিনী আসিয়া উঠাইবে না।

বাদ্য, শঙ্খ ও হুলুধ্বনির মধ্যে সকলে নৌকায় নলিনীকে তুলিয়া দিবে। রায়-বাড়ীর আলোতে চারিদিক আলো হইয়া আছে, বাঁশবনের নিবিড়তা ভেদ করিয়া সে আলোকের তীব্র সূক্ষ্ম রেখা বড়-বৌয়ের আশে পাশে সামনে গায়ে পড়িয়াছে।

প্রকাণ্ড নৌকা হেলিয়া দুলিয়া চলিল। কামরার জানালাগুলি খোলা, চারিদিকে জলের উপর আলো পড়িয়া ছোট ছোট ঢেউগুলি চিক্‌মিক্ করিতেছে। ঘরের পাশে নলিনী বসিয়া আছে, গোলাপী সিল্কের শাড়ী পরা, কাণে, গলায়, হাতে নূতন গহনা, মাথায় একটু কাপড় দেওয়া, সিঁথির সিঁদুর স্পষ্ট দেখা যায়, নলিনী কত দূর-দূরান্তরে চলিয়া যাইতেছে, সে জানে না তার অনাথা মা একা ঘরের পিছনের জঙ্গলে বসিয়া আছে, জানিলে নিশ্চয়ই জানালা দিয়া একবার চাহিয়া দেখিত।

বাজনা সঙ্গে সঙ্গেই বাজিয়া চলিয়াছে। এত বড় নৌকা সঙ্কীর্ণ স্রোত-কাড়ে ঘেরা গ্রামে জলপথে সাবধানে চালাইতে হয়, না হইলে এ-পাশ এ-পাশের ডাল-পালায় বাধে।

আধ মাইল খানেক গেলে তবে নদীতে পড়িবে। দুই দিকের বাড়ীর ছোট বড় সকলে নিজ নিজ ঘাটে দাঁড়াইয়া দেখিতেছে, ধীরে ধীরে নৌকা চোখের আড়াল হইয়া গেল। কেবল অশান্ত জলরাশির ঢেউগুলি ঘাটে ঘাটে আছড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

বাড়ীর ভিতরে রান্না-বাড়ীর মেজ-বৌয়ের গলা শোনা গেল। একটু পরে তিনি আসিয়া বড়-বৌয়ের কাছে বসিলেন, বলিলেন, 'নলিনী বলে গেল, আমার মাকে দেখে এস, আর তোমার কাছে আজ রেখ, নইলে সারা রাত কাঁদবে। মা-মরা মেয়ে মানুষ করার দুঃখ যে এত কে জানত, কি করে থাকব যে—সব শূন্য হয়ে গেছে, এখন মন—সকাল থেকে কেঁদে কেঁদে সবাইকে কাঁদিয়ে ছেড়েছে।'

রান্না-ঘর হইতে সরলা আসিল। ওদিক হইতে মেজ-বৌ আসিল। নলিনীর বিবাহ বেশ ভালই হইয়াছে, ছেলেটি রায়েদেরই আত্মীয়—সেদিন অবধি বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইয়া ঘুরিতেছিল—আজ নিশ্চিন্ত হইয়াছে।

মেজ-বৌ বলিলেন, 'বাপনি কেন সরলা, নলিনীর যাবার সময়?'

'কি যাব, একে এই শরীর, তায় যা সুখ মনে—তোমায় বলব কি খুড়িমা, বাহিরের ঘরেই বেশী দিন শোয়, আমায় দেখলে না কি রাগ করে। দু'চার দিন বাপের বাড়ী যাব, তা ভয় হয়, যদি না উঠতে দেন বাড়ীতে আর। এ বাড়ী ওবাড়ীই যা একটু আধটু যেতাম, বকুনির চোটে ছেড়েছি। নলিনীর গায়ে-হলুদের দিন গেছলাম—রাগ করে হাতেই খেলেন না সেদিন—'

মেজ-বৌ বলিলেন, 'কি জানি এমন ধারা কেন হচ্ছে ও।'

'মরণ হয়েছে খুড়িমা, সে দিন সেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম, শত্রুরও একবার মুখে জিজ্ঞাসা করে, ফিরেও দেখলেন না। উল্টে কলাই ভাজা হয় নি বলে কি অপমান!

চুলের মুঁটি ধরে বাড়ীর বার করে দেবেন, যদি না কাজ হয়—সেই রাত্তিরে আধ মণ ডাল করে না রাখি।'

'এক দিনে এত ডাল কিসের?'

বড়-বৌ বলিল, 'নিজেদের মত রেখে সব কলাই ডাল করে বেচে ফেলা হয়, ডালে লাভ বেশী, কলাইয়ের ঝঞ্ঝি নেই, ঐতে হাটের সওদা আসে। তা তুমি একটু বুঝিয়ে বলবে খুড়িমা? সরলা ত বাঁচে না আর, আমি যদি কিছু করতে গেলাম, অমনি দরলার ওপরই চেপে পড়বে, বলে বড়-বৌকে বাঁদী রেখেছ?'

সরলা চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, 'মনে হয় খুড়িমা যদি সে বেঁচে থাকত—আনিয়ে নিতাম, সংসার দেখত, ছেলেদের দেখত আমার এত কষ্ট হত না।'

মেজ-বৌ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, 'তার কথা মনে হয় তোর?'

'হয় খুড়িমা খুব হয়। অষ্ট পহরই যে উনি মনে করিয়ে দিচ্ছেন—আমি ডাইনি—রাক্ষুসী—আমি তাকে মেরে ফেলেছি, একেও একদিন মেরে ফেলব এই সবই তো বলছেন সারা-দিন। কথাগুলো একেবারে মিথ্যেও নয় যে! খেতে দিইনি সত্যিই, কাছুকে নাহুকে কি ভাল বেসেছে, কোল থেকে কেড়ে নিয়েছি। দুর দুর করে তাড়িয়েই দিলাম শেষ কালে—মেঝেয় শুয়ে শুয়ে প্রাণান্ত খেটে খেটে সেই যে জ্বর নিয়ে গেল, আর ভাল হল না—'

সরলার গলা ভারিয়া কান্নায় যেন বন্ধ হইয়া আসিল। ওদিকে শয়ন-ঘর হইতে ছেলের চীৎকার ও সুখেনের গর্জ্জন শোনা গেল, বড়-বৌ ব্যস্ত হইয়া বলিল, 'যা যা।'

চোখ দুটি মুছিতে মুছিতে সরলা উঠিয়া গেল। মেজ-বৌ বলিলেন, 'তারই শোক সুখেনকে পুড়িয়ে মারছে। যে দুঃখ তাকে দিয়েছিল, তার শোধ উঠবে না? ভগবানের বিচার চুলচেরা। নে, আয় বর্ষা, বাড়ীতে রান্নার কাজ ফেলে এসেছি।'

'তুমি যাও, আমি একটু পরে যাব—রাত বারোটার আগে আর শোবে না আজ।'

'বারোটা? ভোর হয় কি না তাই দেখ, একা বসে মন খারাপ কেন করছিস, দেরী করিস নে।'

মেজ-বৌ চলিয়া গেলেন, বড়-বৌ বসিয়া রহিল। বাড়ীর সাদা-কালো রংয়ের কুকুরটা শুইয়া আছে, বিড়ালটাও দুটি ছোট ছানা লইয়া বড়-বৌয়ের পিঠ ঘেঁসিয়া নিদ্রিত। চাঁদ মাথার উপরে উঠিয়াছে—আকাশের পশ্চিম কোণে কয়েক খণ্ড ধূসর মেঘ—বাতাসের জোরও একটু বেশী হইয়া উঠিল।

পাড়ার ঘরে ঘরে আলো জ্বলিতেছে, ছেলে পিলের গোলমাল, বৌ-ঝি ব্যস্ত, গিন্নীরা মালা হাতে বসিয়া উপদেশ দিতেছেন, এবার খাওয়া দাওয়া আরম্ভ হইবে।

ছোট ছোট নৌকা ও ডিঙ্গীর তাড়নে জলের অস্ফুট কুলু-কুলু ধ্বনি যেন কাহার করুণ কান্নার সুরের মত।

অভাগিনী পঞ্চমী অর্দ্ধাহারে নীর্ণা, দারুণ পরিশ্রমে অবসন্ন, রুক্ষ জট-বাঁধা চুল, ময়লা কাপড়, মনে করুণ মুখে ওই কাঁঠাল গাছের গায়ে হেলান দিয়া অনেক বিশ্রাম করিয়া লইত, দুপুর বেলা এই বাঁশ-তলায় বড়-বৌয়ের কাঁধে মুখ রাখিয়া পিছন হইতে চুপি চুপি বলিত 'দিদি কড়ি খেলা হয় নি আজ একবারও—লক্ষ্মী সোনা একবার শুধু আনি?'

বড় ঘরের মেয়ে অবস্থা গতিকে এই পাড়া গাঁয়ে গৃহস্থ ঘরে পড়িয়াছিল, কত আনন্দ আশা লইয়াই ঘর করিতে আসিয়াছিল, স্বামীর দিকে চাহিয়া দুনিয়ার লাঞ্ছনা সহিয়াছে—স্বামীর জন্য জীবন দিয়াছে।

বহু দিন সেই বধূ-জীবন হইতে এই বাঁশতলা সুখে দুঃখে বড়-বৌয়ের একমাত্র আশ্রয়। সুখের দিনে বাঁশের সঙ্গে এই খানে কৌতুক করিয়াছে—খেলিয়াছে, দুঃখে চোখের জল ফেলিয়াছে—আর একজন তাহারই মত এই খানে অংশ লইয়াছিল।

বাঁশবন বাতাসে উতলা হইয়া উঠিল, সাক্ষী—সাক্ষী—নির্ব্বাক্ সাক্ষী ইহারা—সমস্ত দুঃখ, অশ্রু, বিষাদ ইহাদের সঙ্গে গাঁথা। একে একে পাড়ার ঘরে ঘরে দীপ নিবিতে লাগিল, আলোড়িত বেণুবনের বৃন্তচ্যুত লঘু পাতাগুলি বড়-বৌয়ের গায়ে মাথায় করিয়া পড়িতেছে।

৫৬

'যে যত দুখেরে ঘরে নিয়া যেই দেয়া ঘরে
জগতে তুলনা নাহি তার।'

মোহিনী দুইটি ভাসুরপোকে মানুষ করিয়াছিল। নরেন ও ধীরেন লেখাপড়ায় দুটিই ভাল। বড় ছেলে নরেনের বিবাহ হইয়াছে, একটি ছেলেও হইয়াছে। ধান-পাটের কারবার ও সংসার ইহাদিগকে বুঝাইয়া দিয়া স্বামী-স্ত্রী তীর্থ-বাসে গেল। বলিয়া গেল, বেশী কষ্ট হইলে বড়খোকীকে যেন আনিয়া লয়।

মোহিনীর বাড়ী বিশ্বাসদের যেমন একটা বিশ্রাম ও বেড়ানোর জায়গা—এ বাড়ীতে নরেন ধীরেনেরও তেমনি আদর-আব্দার। দুই দিন না যাইতেই নরেন নৌকা করিয়া আসিয়া উপস্থিত।

সুখেন বলিল, 'নিয়ে যাও আমায় অমত নেই।'

কানু-ভানুর কল্যাণে কথাটা অচিরাৎ সকলের গোচর হইয়াছে, পরশমণি বলিলেন, 'নরেন অ নরেন, বলি ক্ষেপেছিস না কি? সর্ব্বনাশীকে সেধে নিতে এলি, এ কুমতি কে দিলেরে তোকে? ছামলটা বোয়ের গোলাম হোক, যা হোক, বুদ্ধি আছে—ওকে নিলে না। দেখ কেমন সংসার উথলে উঠেছে তার, সুখেনটা হাঁদা গবারাম, অলক্ষ্মীকে নিলে ঘাড় পেতে সব্বস্বি যায় যায়—দু'দিন পরে ভিক্ষেয় বেরুবে।—তোর রাজার সংসার, এমন কম্ম করিস্‌নে।'

সরলা খুব সকাল সকাল যাইবার আয়োজন করিয়া দিল। নেজবৌ স্নান করিয়া আসিয়া বড়বৌয়ের জন্য রাঁধিতে বসিল, ফেরি হইলে পৌঁছাইতে রাত্রি হইয়া যাইবে।

পরশ বলিতেছেন, একটু সুর করিয়া—

'দুর্বিষি যে চুল এলিয়ে উঠলো গিয়ে মাঠ—
ও দিদি, দেখবি তোরা আয়—'

'ভবানী—অ ভবানী, আয় না একবার, বলি, এসে দেখ না।

সত্য-গিন্নীর সঙ্গে চির-সখিত্ব অনেক ঝগড়া-ঝাঁটির ধকা দিয়াও বজায় আছে।

নরেনের সংসারে বড়বৌ মায়ের আসন পাইয়াছে। বৌ, দুই ভাই সব সময় আদেশ নেয়, বুদ্ধি নেয়, পরামর্শ করে। বৌ একটি কাজ করিতে দেয় না, শুধু ছেলেটিকে কাছে রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া কাজে যায়।

বড়-বৌ আর ছেলে-পিলে ভাল বাসে না। স্নেহ ও মায়া যেন লোপ পাইয়াছে। শাশুড়ীর বাহাস সহিতেই পারে না। সংসারে যা করে নিতান্ত কর্ত্তব্য বোধেই করে, নিন্দা-সুখ্যাতি কিছুই খেয়াল করে না। সেই তাহাকে এই ছেলেটি বাঁধিতে চায়, এ বড় বিড়ম্বনা। আর মা যদি এমন করিয়া সঁপিয়া দিয়া যায় তবে মায়া না হয় কোন্ পাষাণীর?

এ বাড়ী বড়-বৌয়ের অচেনা নয়, এই ঘরেই সে ও বিশাল শুইয়াছে, এইখানে তার সুখের দিনগুলি ঝরণার মত উছল আনন্দে কাটিয়া গিয়াছে। সর্ব্বত্র বিশালের স্মৃতি।

অনেক রাত্রি জাগিয়া সে ভাবে, সরলার কথা মনে হয়, ছেলেগুলিকে দেখা শোনা করে নাই তেমন, সে কথাও ভাবে। সংসারের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াইতে পারে না। আর—ইচ্ছাই নাই। তবু নিজের আচরণগুলি মনে পড়িয়া কষ্ট হয়।

শীত পড়িয়াছে। কাঞ্চনপুরের জল শুকাইয়া গিয়াছে, মাঠে মাঠে ধানকাটা, ঘরে ঘরে নবান্নের উৎসব, পিঠে-পার্ব্বণ, এ বাড়ীরও কত সমারোহ, কিন্তু কাঞ্চনপুরের দীনতার মধ্যেও কত অমৃতকণা লুকান।

সুখেনের জ্বর হইয়াছে, সরলার চিঠি আসিল।

নরেন বলিল, 'ক'দিন পরে আসবে বল, নইলে যেতে দেব না—'

'ভাল রে ভাল, নিজের বাড়ীঘরে গিয়ে থাকব না?'

বৌ গাল ফুলাইয়া বলিল, 'আমরাও কেউ নই, এটাও আপনার বাড়ী নয়?'

এই মেয়েটির মুখের চেহারা অনেকটা নলিনীর মত, চাল-চলন ধরণ-ধারণে পঙ্কজীকে মনে পড়ে, সেও এমনি কথায় কথায় গাল ফুলাইত।

কাঞ্চনপুর পৌঁছিতে রাত্রি হইল। সুখেন শুইয়া আছে। বড়-বৌ কাছে গিয়া দাঁড়াইল, সুখেন মুখটা প্রথমে বাঁকাইল, পরে ফিরিয়া শুইল।

কয়েক দিন পরে সুখেন ভাল হইয়া উঠিতে না উঠিতে নরেন আবার আসিয়া হাজির। সুখেন বলিল, 'তা যাবেন বই কি, তোমার বাড়ীর রাজ-ভোগ খেয়ে এ বাড়ীর সুধ-কুঁড়ো মুখে রুচবে কেন?'

নরেন হাসিয়া বলিল, 'না মাগা, বড়মাগী দিনে চারটের ত রাঁধেন, তা শাক ছাড়া অন্ন কিছু না।'

সরলা বলিল, 'দিদি গেলে আমাদের বড্ড কষ্ট হয় বাবা—'

'ধীরেনের বিয়ে দেব—দিলে বড় মাগী মাঝে মাঝে গেলেই চলবে। ওরা দু'বোয়ে পারবে তখন—এখন এ দুটো মাস না গেলে আমরা বাঁচি নে মাগী!'

বড়-বৌকে যাইতে হইল। সূর্য্য মাথার উপরে, শীতের মধ্যাহ্ন, দু পাশে ধান-সরিষার ক্ষেত, পাল্কীর দুয়ার অর্দ্ধেকটা খোলা-বাড়ীর ঘরগুলির উপর দিয়া বাঁশঝাড়ের আগা, তেঁতুল ও কাঁঠাল গাছের মাথা দেখা যায়, কুকুরটা সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে। কাঞ্চনপুরের দেওয়া অবিচ্ছিন্ন দুঃখ-যন্ত্রণার উৎসের মধ্যে আনন্দের তৃপ্তির যে অমূল্য সুধাকণা লুকান আছে তা যে পায় সেই জানে—অন্যে কি বুঝিবে?

[সমাপ্ত

সেকালের পাঠশালা

—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ রায়

শতবর্ষ পূর্ব্বে আমাদের এই বাঙ্গালা দেশে বালক-বালিকাদের শিক্ষার ব্যবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা জানিতে স্বতঃই কৌতূহল জন্মে। তখন অবশ্য এখনকার মত যেখানে সেখানে মধ্য ইংরাজী বা মধ্য বাঙ্গালা স্কুল অথবা উচ্চ প্রাথমিক বা নিম্ন প্রাথমিক পাঠশালার অস্তিত্ব ছিল না। তখন শিশুদের জন্য পাঠশালা ও বয়স্ক ব্রাহ্মণ ছাত্রদের জন্য টোলের ব্যবস্থা দেখা যাইত। সাধারণ হিন্দু ছাত্রেরা গ্রাম্য পাঠশালার গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় এবং মুসলমান বালকেরা মোক্তাবে মৌলবী সাহেবের নিকটে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিত। সেকালে পারশীর খুব আদর ছিল। সেইজন্য অনেক হিন্দু ছাত্রও অতিরিক্ত মৌলবী সাহেবের মোক্তাবে প্রেরিত হইত।

১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক তৎকালে প্রচলিত দেশীয় শিক্ষার অবস্থা পরিদর্শন করিবার জন্য উইলিয়ম আডাম নামক একজন ইংরাজ কর্ম্মচারীকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি পাঠশালাসমূহের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া গভর্ণমেণ্টের নিকটে একটি প্রতিবেদন (রিপোর্ট) প্রেরণ করেন। তাহাতে অনেক বিষয় জানিতে পারা যায়।

এখনকার মত সে সময়েও পাঁচ বৎসর ছাড়াইলেই হিন্দু পিতামাতা বালকগণের হাতে-খড়ি দিয়া বিদ্যারম্ভের ব্যবস্থা করিতেন। সেকালে পাঠশালাতেই শিশুগণের পাঠারম্ভ হইত। শুভদিন দেখিয়া শিশুকে পাঠশালার গুরুমহাশয়ের নিকটে পাঠাইবার নিয়ম ছিল। প্রায় প্রতিগ্রামেই একটি করিয়া পাঠশালা বা মোক্তাব থাকিত। বড় বড় গ্রামে একাধিক পল্লীতে দুই তিনটি পর্য্যন্ত পাঠশালা দেখা যাইত।

লচরাচর বর্দ্ধমান জেলা হইতে কায়স্থজাতীয় গুরুমহাশয়গণ আসিয়া পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গের অনেক স্থানে পাঠশালা খুলিতেন। কোন কোন উগ্রক্ষত্রিয়কেও এই কার্য্য করিতে দেখা যাইত। এখন যেমন ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণের লোককেই গুরুগিরি করিতে দেখা যায়, সেকালে এরূপ নিয়ম ছিল না। ৬০ বৎসর পূর্ব্বেও আমরা একাধিক পল্লীগ্রামে কায়স্থজাতীয় ভদ্রলোকদিগকেই গুরুগিরি করিতে দেখিয়াছি। পূর্ব্বকালে প্রত্যেক বর্ণের একটা সাধারণ বৃত্তি ছিল, ব্রাহ্মণসন্তানের পক্ষে মুদীর দোকান খোলা অর্থাৎ মুদির উপজীবিকা গ্রহণ হিন্দুসমাজে স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। এরূপ কার্য্য করিলে সমাজে নিন্দনীয় ও একঘরে হইতে হইত। শিক্ষিত ব্রাহ্মণের পক্ষে টোল খোলা এবং কায়স্থের পক্ষে জমিদারী সেরেস্তায় চাকুরী করা সাধারণ উপজীবিকা ছিল। এইজন্য চাকুরীর অভাবে অনেক কায়স্থকে গুরুগিরিদ্বারা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইত। চাকুরীকে ব্রাহ্মণেরা বৃত্তি বোধে ঘৃণা করিতেন, এখন কিন্তু অধিকাংশ ব্রাহ্মণসন্তান এই নিকৃষ্ট কুক্কুর-বৃত্তি লাভের জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। আগন্তুক গুরুমহাশয় কোন জমিদার বা অবস্থাপন্ন গৃহস্থের চণ্ডীমণ্ডপে অথবা বাহিরের ঘরে পাঠশালা খুলিতেন।

সেকালে সকালে ও বিকালে, প্রত্যহ দুইবার পাঠশালা বসিত; এখনকার মত ইংরাজদের অনুকরণে দশটা হইতে চারিটা পর্য্যন্ত একটানা পাঁচ ছয় ঘণ্টা পড়ানর নিয়ম ছিল না। অধিকাংশ সময়েই ছাত্রেরা দুঁতি ও চাদর লইয়া পড়িতে যাইত, জামা-কোড়ার বালাই দেখা যাইত না। শিশুরা প্রভূষে পাততাড়ি বা তাড়াপত্র বগলে লইয়া পাঠশালায় যাইত। একখানি ক্ষুদ্র কম্বলের আসন বা ছোট মাদুর দ্বারা জড়ান কয়েকটি তালপাতাকে পাততাড়ি বা তাড়াপত্র বলা হইত। গুরু মহাশয়ের পৌঁছিবার কিছু পূর্ব্বেই বালকেরা পাঠশালায় গিয়া যথাস্থানে মাটির উপরে আপনাপন মাদুরাদি পাতিয়া বসিয়া পড়িত। বলা বাহুল্য, সেকালে বেঞ্চি ও টেবিলের বালাই ছিল না। নির্দ্দিষ্ট সর্দ্দার-পড়ুয়া (ছাত্র) গুরুমহাশয়ের আসনখানি লইয়া আসিত ও যথাস্থানে পাতিয়া দিত এবং সেইসঙ্গে একগাছি কঞ্চি বা বেত রাখিত। গুরুমহাশয় আসিয়া নিজস্থানে উপবেশন করিতেন। ইহার পরে হাজিরা লওয়া হইত। সর্দ্দার-পড়ুয়া কোন্ কোন্ ছাত্র অনুপস্থিত রহিয়াছে, তাহা তাঁহাকে জানাইয়া দিত। বাকী ছাত্রেরা তাঁহার নিকটে আসিয়া ডান হাতের চেটোয়

উপরে এক এক ঘা মৃদু-বেত্রাঘাত খাইত এবং নিজ নিজ আসনে গিয়া বসিত। এইরূপে হাজিরা লওয়া শেষ হইত।

তখন পাঠশালায় সুস্পষ্ট শ্রেণীবিভাগ ছিল না। তবে যে সকল বয়স্ক ছাত্র কাগজে লিখিবার অধিকার পাইত, তাহাদিগকে সর্দ্দার-পড়ুয়া বলা হইত। ইহারা পালা করিয়া ছোট ছোট শিশুদের পড়া ধরিত ও শটকে (শতকিয়া) পড়াইত। তাহাতে গুরুমহাশয়ের কার্য্যে অনেক সাহায্য হইত।

হাজিরা লওয়ার পরে ছাত্রেরা সকলে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া সমস্বরে শতকিয়াদি পড়িত। একটি সর্দ্দার-পড়ুয়া উচ্চৈঃস্বরে এক, দুই, তিন ইত্যাদি করিয়া প্রথমে একশত পর্য্যন্ত সংখ্যা আবৃত্তি করিত। বাকী ছাত্রেরা তাহাকে অনুকরণ করিত। দুষ্ট ছাত্রেরা অনেকে শুধু মুখ নাড়িত মাত্র—সবটা বলিত না; তবে ধরা পড়িলে বিলক্ষণ প্রহার খাইত। এই উপায়ে শিশুদিগকে মুখে মুখে সংখ্যা শিখান হইত। ইহার পর পালা অনুসারে এক এক জন সর্দ্দার-পড়ুয়া কড়াকিয়া, গণ্ডাকিয়া প্রভৃতি এবং ২০ ঘর পর্য্যন্ত নামতা বলাইত।*

পরে বানান ও ফলা পড়ান হইত। অর্থাৎ শিশুরা সর্দ্দার-পড়ুয়ার নিকট হইতে শুনিয়া শুনিয়া মুখে মুখে ক'য়ে আকার কা, খ'য়ে আকার খা, ক'য়ে ইকারে কি, খ'য়ে ইকারে খি, ক'য়ে ঈকারে কী ইত্যাদি ক্রমে কা, কি, কী, কু, কূ, কৃ, কে, কৈ, কো, কৌ ইত্যাদি এবং ক'য়ে র-ফলা ক্র, খ'য়ে র-ফলা খ্র, এইরূপে ক্ল, ক্ব ইত্যাদি ফলা সংযোগ শিক্ষা করিত। এইরূপে প্রত্যহ আবৃত্তি করিতে করিতে শিশুরা অক্ষর পরিচয়ের পূর্ব্বেই কা, কি, কু ইত্যাদির উচ্চারণ শিক্ষা করিয়া ফেলিত। সুতরাং পরে পুস্তক পাঠ সহজসাধ্য হইয়া পড়িত।

ইহার পরে হাতের লেখা আরম্ভ হইত। আজকালকার পাশ্চাত্য ধরণের পাঠশালায় শিশুদিগকে অধিকাংশ সময়ই পড়িতে হয়। সেকালে এরূপ হইত না। তখনকার দিনে পড়া অপেক্ষা হাতের লেখার দিকেই গুরুমহাশয়দিগের বিশেষ দৃষ্টি থাকিত। ছাত্রেরা যাহাতে উত্তরকালে সুন্দররূপে লিখিতে সমর্থ হয়, সেজন্য তাঁহারা বিশেষ চেষ্টা করিতেন। তখন ছাপার পুস্তকের বালাই ছিল না; কাজেই ছাত্রকে রামায়ণাদি অনেক পুস্তক হাতে লিখিয়া লইতে হইত। উহাদের নাম ছিল পুঁথি। অনেক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগের গৃহে হস্তলিখিত মূল্যবান্ অনেক পুঁথি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদের অক্ষরগুলি যেন মুক্তার মত আজিও ঝক্ ঝক্ করিতেছে বলিয়া মনে হয়।

পাঠশালায় গিয়া বালকেরা প্রথমে মাটির উপরে 'রামখড়ি' দিয়া, অ, আ, ক, খ ইত্যাদি বর্ণ লিখিতে অভ্যাস করিত। বর্ত্তমান সময়ে স্কুল-কলেজে যে সাদা খড়ি দিয়া কাল বোর্ডের উপরে অঙ্ক প্রভৃতি কষা হইয়া থাকে, উহার নাম স্কুলখড়ি। উহা অতি প্রাচীন সামুদ্রিক কীটের বিকৃত কঙ্কালের সমষ্টি মাত্র। সেকালে পাঠশালায় উহার ব্যবহার ছিল না। পূর্ব্বে বাজারে এক বিঘত অর্থাৎ ৮।৯ ইঞ্চি লম্বা এবং প্রায় এক ইঞ্চি পেটমোটা, আগা-সরু, কটা-রঙের একরূপ নরম পাথর বিক্রীত হইত। উহার নাম ছিল রামখড়ি। উহা দ্বারা পাঠশালায় মাটির মেঝের উপরে গুরুমহাশয় এক একটি বালকের জন্য অ, আ, ক, খ ইত্যাদি বর্ণকে ৮।৯ ইঞ্চি লম্বা করিয়া 'দাগিয়া' অর্থাৎ লিখিয়া দিতেন। এক সঙ্গে দুই তিনটি হরফের বেশী লিখিতেন না। বালকদিগকে ঐ সকল দাগা বুলাইতে হইত অর্থাৎ বালকদিগকে ঐ সকল বড় বড় অক্ষরের উপরে আপন আপন রামখড়ি বুলাইয়া অর্থাৎ ঘষিয়া উহাদের লিখিবার প্রণালী আয়ত্ত করিয়া লইতে হইত। গুরুমহাশয়ের পাকা হাতের উৎকৃষ্ট অক্ষরের অনুকরণ করায় তাহাদের লেখা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সুন্দর হইবার সুযোগ লাভ করিত। বৎসরাধিক কাল এইরূপে দাগা বুলাইয়া অ,আ, ক, খ ইত্যাদি বর্ণমালা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিলে পর, বালকেরা তালপাতার পড়ুয়া (ছাত্র) হইবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইত। তখন তাহারা তালপাতার উপরে কালী-কলমের সাহায্যে অ, আ, ক, খ ইত্যাদি লিখিতে শিখিত। বলা বাহুল্য, গুরুমহাশয় স্বহস্তে তালপাতার উপরে কালী দিয়া অক্ষরসকল দাগিয়া দিতেন; বালকদিগকে ঐ দাগা বুলাইতে হইত। তাহারা নিজ নিজ গৃহ হইতে

* কড়া, গণ্ডা, বুড়ি, পণ, কাঠা প্রভৃতি এবং নামতা মুখে মুখে পড়ানর নাম ছিল ডাক-বলান। উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া অর্থাৎ হাঁকিয়া এই সকলকে বলাইতে হইত বলিয়াই উহার নাম ছিল ডাক-বলান বা ডাক-যোগান।

তালপত্র সংগ্রহ করিয়া পাঠশালায় আসিত। প্রত্যেক পাতাটি যথাসম্ভব প্রশস্ত হইত। তালগাছ হইতে পাতা কাটিয়া উহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া একটা গর্ত্তের মধ্যে গোবর-জলে কয়েকদিনের জন্য রাখিতে হইত। পরে ঐগুলিকে তুলিয়া পরিষ্কার করিয়া লইলে পাতাগুলির বেশ সোনালি রঙ্ ধরিত।

এখন পিতলা লোহার কলম বা ষ্টীল পেন দিয়া প্রথমেই কাগজের উপরে লিখিতে অভ্যাস করে। তখন কিন্তু এরূপ ব্যবস্থা ছিল না। বালকেরা নিজ নিজ বাড়ী হইতে কঞ্চি, সরু, খাগ অথবা কলমীর কলম লইয়া পাঠশালায় আসিত। প্রথম প্রথম গুরুমহাশয় এক এক পাব কঞ্চিকে বাড়িয়া অর্থাৎ কাটিয়া কলম প্রস্তুত করিয়া দিতেন। কলমের মুখটিকে বাঁকাভাবে কাটা হইত। ইহার নাম ছিল আড়কত কাটা কলম। এইরূপ ভাবে কাটার কারণ এই ছিল যে, তাল-পাতার উপরে মোটা মোটা করিয়া অক্ষর লেখায় ইহাতে বিশেষ সুবিধা হইত। প্রত্যেক বালক বাটী হইতে মাটির বা কড়িকুটার দোয়াত সুতার সাহায্যে ঝুলাইয়া পাঠশালায় লইয়া আসিত, সেখানে কালী দিবার কোন ব্যবস্থা ছিল না। কালীযুক্ত দোয়াত বা কালীর বড়ি তখন বাজারে বিক্রীত হইত না; নিজ নিজ বাটীতে মা, মাসীমা, পিসীমা প্রভৃতি স্ত্রীলোকেরা কালী তৈয়ারী করিয়া দিতেন। প্রস্তুতপ্রণালীও খুব সহজসাধ্য ছিল; খোলাহাঁড়ির নীচে সচরাচর যে ভূষা বা কালী পড়িয়া থাকে, উহাকে সংগ্রহ করিয়া উহার সহিত "কিউনি" মিশাইয়া লইলেই ভূষাকালী প্রস্তুত হইত।

কিউনি—উনানের (আখার) উপরে একটা খোলা হাঁড়ি অথবা একখানা লোহার কড়াই চাপাইয়া উহার উপরে সামান্য পরিমাণ আতপ চাউল দিয়া হাতা দ্বারা অনবরত নাড়িতে হইত। চাউলগুলা যখন পুড়িয়া "খাঁই" অর্থাৎ খামার মত কাল হইয়া পড়িত, তখন উহাদিগকে একটা মালসার জলের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া এক রাত্রি ভিজান হইত। পরদিন উহা-দিগকে ভালরকম করিয়া রগড়াইয়া একখানি সরু পাৎলা উড়ানীর টুকরার মধ্য দিয়া ছাঁকিয়া লইলেই যে ঈষৎ লাল কষজল পাওয়া যাইত উহারই নাম ছিল 'কিউনি'।

একখানা মাটির সরার উপরে সামান্য পরিমাণ ভূষা রাখিয়া একটা 'ঘোটনা' অর্থাৎ কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা উহাকে অনেকক্ষণ ধরিয়া ঘুঁটিতে বা চূর্ণ-বিচূর্ণ করিতে হইত। উত্তমরূপে চূর্ণীকৃত হইলে ঐ ভূষার সহিত পূর্ব্বোক্ত কিউনি অর্থাৎ কষজল একটু একটু করিয়া মিশাইতে হইত। একবারে অনেকখানি কষজল সরার উপরে ঢালিয়া দিয়া তাড়াতাড়ি কালী প্রস্তুত করিতে গেলে কালীর উপরে ভূষা ভাসিয়া বেড়ায়, কালী ভাল হয় না। কষজলের সহিত অল্পে অল্পে কিউনি ঢালিয়া ঘোটনা দ্বারা উত্তমরূপে মিশান একটু ধৈর্য্যের কাজ। এই ভূষাকালী অবশ্য দীর্ঘকালস্থায়ী হইত; লেখাগুলা শীঘ্র ফ্যাকাসে বা বিবর্ণ হইয়া পড়িত না। আর একটা সুবিধা এই ছিল যে, কালীর জন্য বিশেষ কিছু ব্যয় হইত না বলিলেই হয়। ঐ কালীপূর্ণ লোহার অব্যবহার্য্য অবস্থায় অনেকদিন ধরিয়া পড়িয়া থাকিলে কালীর উপরে একপ্রকার সাদা ছাতা বা সর পড়িত মাত্র। উহাকে উঠাইয়া ফেলিয়া দিলেই আবার উত্তম কালী পাওয়া যাইত। কালীর সহিত কোনরকম আসিড মিশান হইত না বলিয়াই ঐরূপ ছাতা পড়িত। বলা বাহুল্য, এইরূপ কালীতে লোহার নিব সহজে ক্ষয় পায় না।

উড়িষ্যা-অঞ্চলে তালপত্রের উপরে নক্সের মত এক রকম লোহার শিক দিয়া লেখার প্রথা ছিল, কিন্তু বাঙ্গলা দেশে কালী-কলম দিয়াই লিখিতে শিখান হইত। প্রথমে তাল-পাতার উপরে কালী দিয়া স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ ও যুক্তাক্ষর লেখা অভ্যাস করিবার নিয়ম ছিল। পরে শতকিয়া, কড়াকিয়া ইত্যাদি লিখিতে হইত। ইহার পরে তালপত্রের শ্রেণী হইতে কলার পাতার পত্রবাদের বলে উন্নীত হইবার রীতি ছিল। তখন কলার পাতার উপরে তেরিজ (যোগ), জমাখরচ (বিয়োগ), কাঠাকালি, বিঘাকালি প্রভৃতি শুভঙ্করীর অঙ্ক কষা শিখিতে হইত। সকলের শেষে ছাত্রেরা কাগজের শ্রেণীতে উঠিয়া চিঠিপত্র লিখিতে শিখিত। সে-কালের বাঙ্গালা চিঠির ভাষাও অদ্ভুত রকম ছিল। ঐ কাগজও এই দেশেই প্রস্তুত হইত। আমরাও বাল্যকালে খেড়ে ও হলদে নামক দুই প্রকার মোটা রকমের স্বদেশী কাগজ পাঠশালায় ব্যবহার করিয়াছি।

সেই সময়ে কাগজ প্রস্তুতের প্রণালী ছিল এইরূপ: ছেঁড়া নেকড়া, কাঁথা প্রভৃতিকে উত্তমরূপে জল দ্বারা পচাইয়া ছেঁচিতে কুটিতে হইত। উহা যখন মণ্ডের

হইয়া পড়িত, তখন উহার সহিত কাতের মাড় (ফেন) মিশাইয়া লইলেই উহা পাৎলা হইয়া পড়িত। তখন উহাকে চালুনির উপরে বিছাইয়া দিয়া রৌদ্রে উত্তমরূপ শুকাইয়া লইতে হইত। ঐ কাগজের উপরে ফেন লাগাইয়া পুনরায় শুকাইয়া লইলেই মেড়ে কাগজ প্রস্তুত হইত। আর ফেনের সঙ্গে কিছু পরিমাণ হরিতাল চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া লইলেই উহা দ্বারা হলদে কাগজ তৈয়ারী হইয়া যাইত। হরিতালের গুণে, পোকামাকড়ে সহজে ঐ জাতীয় কাগজ কাটিয়া নষ্ট করিতে পারিত না। যে সকল লোকে ঐরূপ কাগজ প্রস্তুত করিত, তাহাদিগকে 'কাগজিয়া' বলা হইত। এখন বিদেশী বা দেশী কলে প্রস্তুত সস্তা কাগজের কল্যাণে দেশীয় কাগজিয়ারা নিরন্ন হইয়া অন্যরূপ উপজীবিকা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে।

পাঠশালার শেষ শ্রেণীতে বালকেরা জমিদারী ও মহাজনী বিষয়ক খতপত্র লিখিতে শিক্ষা করিত। কিরূপে জমিদারের নিকটে জমিজমা সম্বন্ধে দরখাস্ত লিখিতে হয়, কিরূপে মহাজনের কাছে টাকা ধার লইবার জন্য খত লিখিয়া দিতে হয়, ইত্যাদি অত্যাবশ্যক বিষয়সকল শিক্ষা দেওয়া হইত। এখনকার মত ইতিহাস, ভূগোল, পাটীগণিত ও বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা দেওয়ার তখন নিয়ম ছিল না। শুভঙ্করীর আর্য্যা মুখস্থ করিয়া উহার সাহায্যে অঙ্ক কষা অভ্যাস করিতে হইত।

সে-কালের পাঠশালার সহিত বর্ত্তমানের পাঠশালার বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয়। এখন পাঠশালাতেও কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট শ্রেণী সৃষ্ট হইয়া থাকে। বালকেরা বৎসরান্তে পরীক্ষা পাশ করিয়া উপরের শ্রেণীতে উঠিয়া থাকে সে সময় এরূপ ধরাবাঁধা নিয়ম ছিল না। প্রতিভা অনুসারে ছাত্রেরা বৎসরের মধ্যেই উপরের শ্রেণীতে উঠিতে পারিত। সে কালের অনেক অক্ষরের আকার পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। সে-কালের হাতের লেখা পুঁথির অনেকগুলি অক্ষর এখনকার বি-এ ও এম-এ পাশ ব্যক্তিও পাঠ করিতে সমর্থ হইবেন না। এখন আমরা যেরূপে ঘ, র, ক্ষ, ক্ল, পু ত্ত, ন্ত, ন্ধ ইত্যাদি লিখিয়া থাকি, সেকালে সেরূপ লেখার নিয়ম ছিল না। অনেকটা ইংরাজী W অক্ষরের মত করিয়া ঘ লিখিতে হইত। ব অক্ষরের পেট কাটিয়া দিলেই র, এবং ব-এর পেট কাটিলে ঘ হইত। মাত্রাহীন ঈ-কে বু বলিয়া পড়িতে হইত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানানের যে নূতন নিয়ম প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে বাঙ্গালা বর্ণমালা এবং যুক্তাক্ষর লিখনের আরও পরিবর্ত্তন ঘটিবে এবং দুই এক শতাব্দী পরে লোকে প্রাচীন পুঁথি ও যুগের কথা, আধুনিক কালের মুদ্রিত পুস্তকাদি সহজে পাঠ করিতে সমর্থ হইবে না। পূর্ব্বকালে উকারের চিহ্ন ছিল মাত্রাহীন ত-এর মত। এখনও আমরা রু, শু, পু, গু ইত্যাদিতে ঐরূপ উকারের ব্যবহার দেখিতে পাই। ক্রূ (ক্রু এইরূপ) অক্ষরে প্রাচীন উকারের চিহ্ন দেখা যায়। হূ কিন্তু হু রূপে লেখা হইত, এখনও না হয়, এমন নহে।

সেকালের পাঠশালায় প্রচলিত শিক্ষা-প্রণালীর উৎকর্ষের মধ্যে এইটুকু দেখা যাইত যে, পাঠশালায় শিক্ষিত বালকেরা মানসাঙ্ক বিষয়ে অত্যাশ্চর্য্যরূপ পারদর্শিতা লাভ করিত। তাহারা অনেক কঠিন কঠিন অঙ্কের উত্তর মুখে মুখে চক্ষুর নিমেষে করিয়া দিতে পারিত। এখন যেমন চাকরবাকরের ৭ দিনের বেতন হিসাব করিয়া দিতে হইলে ইংরাজী স্কুলে-পড়া বি-এ পাশ করা ছেলেদের পক্ষেও কাগজ ও পেন্সিল প্রয়োজন হয়, তৈরাশিকের অঙ্কপাত করিয়া কাগজ ভরিয়া ফেলিতে হয়, তখন সেরূপ হইত না। এখনকার স্কুলের ছেলেদের অঙ্ক বিষয়ে জ্ঞান যথেষ্ট থাকিলেও, শিক্ষা-প্রণালীর দোষে উহা পূর্ব্বের ন্যায় সংসারক্ষেত্রে কার্য্যকরী হয় না। ইংরাজ ব্যবসাদারেরা যে বড় বড় অঙ্ক সহজে কষিতে পারে না, তাহা অবশ্যই নহে; তবে সে-ক্ষেত্রে এক একখানি করিয়া হিসাবের বই হাতের কাছে থাকা দরকার; বিনা পুস্তকে বড় বড় হিসাবনবীসও মুখে মুখে কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন না। সেইজন্য শুভঙ্করীর আর্য্যাগুলি শিক্ষাদান করা উচিত বলিয়া মনে হয়। তবে ভৃগুরাম দাসও কিরূপে

* শুভঙ্কর—সেকালের একজন বিখ্যাত গণিতজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার প্রকৃত নাম ছিল ভৃগুরাম দাস। পশ্চিম অঙ্গ কাঞ্চনপুলে তাঁহার জন্ম হয়। অঙ্কশাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ বুৎপত্তি ছিল। পণ্ডিতের জটিল বিষয়সমূহ ত্যজিয়া তিনি নিত্যব্যবহার্য্য অঙ্ক সমস্ত সমাধান করিবার অতি সহজ সরল সঙ্কেত (আর্য্যা) সমূহ রচনা করিয়া বাঙ্গালার জনসাধারণের অশেষ উপকার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আর্য্যাগুলি সাধারণ লোকের পক্ষে বিশেষ উপকারী অর্থাৎ শুভঙ্কর বলিয়া তিনি শুভঙ্কর নামেই পরিচিত এবং আর্য্যাগুলিকে শুভঙ্করের আর্য্যা বলা হয়।

ঐগুলি রহিত করিয়াছিলেন, পাশ্চাত্যদিগের সাহায্যে উত্তমরূপে ব্যাখ্যা করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি সেকালে দিনে দুইবার পাঠশালা বসিত। সকালে কিছুক্ষণ পড়াশুনা করার পর ছেলেরা জল-খাবারের জন্য কিছুক্ষণের মত ছুটি পাইত। ঘড়ির অভাবে আধ ঘণ্টা বা ৪৫ মিনিটের জন্য ছুটি হইত না। প্রাতরাশ শেষ করিয়া ছাত্রেরা শীঘ্র শীঘ্রই পাঠশালায় ফিরিত। এইবার গুরুমহাশয় বড় ছেলেদের অঙ্ক কষাইতেন ও খত-পত্রাদিলিখন দেখিতেন। কোন কোন বড় ছেলে ছোট ছেলেদের কাজ দেখিত। এইরূপ কাজ কিছুক্ষণ চলিত। পরে মধ্যাহ্নের কিছু পূর্ব্বে পাঠশালার ছুটি হইত। আবার বিকাল ৩।৪ টার সময় পাঠশালা খুলিত। বলা বাহুল্য, সেকালের অধিকাংশ পাঠশালা খোলা চালাঘরে বসিত। ঘরের কাঁচা মেঝে মধ্যাহ্নে গোবর দিয়া নিকান হইত। এই কারণে ঘরের মেঝেতে বিশেষরূপ ধূলার উৎপাত দেখা যাইত না। সর্দ্দার-পড়ুয়াদের সাহায্যে গুরুমহাশয় ৫০।৪০টি ছাত্রের পঠনপাঠন সহজেই সমাধা করিতে পারিতেন।

আবৃত্তিঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণাম্
বোধাদপি গরীয়সী।

অর্থাৎ পাঠ্য বিষয়ের অর্থ সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারুক আর নাই পারুক, ছাত্রদিগের পক্ষে সকল রকম শাস্ত্র প্রথমে পাঠ ও মুখস্থ করাই ভাল। এই মন্ত্র পাঠশালায় সেকালে বিশেষ ভাবে প্রচলিত ছিল। বালকেরা না বুঝিয়াই নামতা প্রভৃতি প্রত্যহ একবার করিয়া সর্দ্দার-পড়ুয়ার নিকট হইতে মুখে মুখে শুনিয়া আবৃত্তি করিত মাত্র। কিন্তু পরে দেখা যাইত তাহারা ঐ সকল বিষয় সম্পূর্ণ নির্ভুল ভাবে আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে। অধিকন্তু শিশুকালে উপার্জ্জিত এই বিদ্যা বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত সকলের স্মৃতিপথে গাঁথিয়া থাকিত। টোলের ছাত্রেরা আবৃত্তির ফলে বৃদ্ধাবস্থাতেও নানা শাস্ত্রের বচনসকল বিতর্ক-সভায় অনায়াসে মুখেই আবৃত্তি করিয়া প্রতিপক্ষের সহিত অনায়াসে তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারিতেন, পুঁথি পাঁতি দেখার আবশ্যক অনুভব করিতেন না।

গুরুমহাশয় বিকালে মধ্যে মধ্যে অনুপস্থিত থাকিতেন; কোন ছাত্রের পীড়া, গ্রামবাসী কাহার গৃহবিবাদ মীমাংসা করা ইত্যাদি কাজে তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে সর্দ্দার-পড়ুয়াদের উপরে পাঠশালার ভার দিয়া অন্যত্র যাইতে হইত। গুরু-মহাশয়ের অনুপস্থিত কালে মধ্যে মধ্যে গণ্ডগোল বাধিত। কে না জানে, "বামুন গেল ঘর, ত লাঙ্গল তুলে ধর"; ইহা ছাত্রদেরও সনাতন নীতি। এই সুযোগে অনেক দুষ্ট ছেলে হুটকে (শত্রুক্রিয়া) পড়িবার সময় ফাঁকি দিত; কেহ পড়ার শেষে আওড়া বলিত; কেহ কেহ আবার আরও বিকৃত করিত। যেমন ২৫ কড়ায় সওয়া ছয় গণ্ডা স্থলে দুষ্ট ছেলে ছটা আওড়া ইত্যাদি বলিয়া সকলকে হাসাইয়া দিত।

ছেলেদের আমচুরি, জামচুরি, পেয়ারাপাড়া, পরস্পরের মধ্যে মারামারি, পিতা, মাতা ও অন্যান্য গুরুজনদিগের অবাধ্যতা, এমন কি গ্রামস্থ কোন বয়স্থ নিম্নশ্রেণির ব্যক্তির প্রতি অসম্মান-প্রদর্শন ইত্যাদি বহুবিধ দোষের বিচার পাঠশালায়ই এলাকাধীন ছিল।

গুরুমহাশয় একাধারে ম্যাজিষ্ট্রেট ও জজের কাজ করিবার অধিকারী ছিলেন। আর তাঁহার বিচারের আপীল ছিল না। সেকালে ছেলেরাও যেমন দুষ্টামি করিত, গুরু-মহাশয়ের শাস্তিদানের প্রণালীও সেইরূপ অদ্ভুত ছিল।

১৮৩১ খৃষ্টাব্দে উইলিয়াম আডাম সাহেব এ দেশীয় পাঠ-শালা সমূহের অবস্থা পরিদর্শন করিয়া লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের গভর্ণমেণ্টের নিকটে যে প্রতিবেদন পাঠাইয়াছিলেন, উহাতে প্রায় ১৪ রকমের শাস্তির উল্লেখ আছে। ঐগুলির কোন কোনটির বিবরণ শুনিলে এখন অনেকেরই হৃৎকম্প উপস্থিত হইবার কথা। একই অপরাধের জন্য সকল ছাত্রকে গুরু-মহাশয় একইরূপ শাস্তি দেওয়া আবশ্যক মনে করিতেন না; ছাত্রের প্রকৃতি বুঝিয়া শাস্তিদান করিতেন। তবে তাঁহার নিকটে বাদী ও প্রতিবাদী দুই ছাত্রই বেত্রাঘাত খাইত। ইহার নাম ছিল মাথাকাটি বিচার। সুতরাং অনেক সময়ে যে উধোর (উদ্ধবের) পিণ্ড, বুধোর (বুদ্ধ-দেবের) ঘাড়ে না পড়িত এমনও নহে। সেকালের কতকগুলি শাস্তি, যথা :—

(১) হাতছড়ি—পাঠশালায় আসিতে অযথা বিলম্ব ঘটিলে ছাত্রকে ডানহাতের পাতার উপরে গুরুমহাশয়ের বেত্রাঘাত সহিতে হইত। ইহারই নাম ছিল হাতছড়ি।

(২) কীর্ত্তিপ্রদর্শন—অজ্ঞানকৃত অনেক দোষের জন্য

শিশুগণ কেবলমাত্র তিরস্কৃত হইত ও প্রহারের ভয় পাইত মাত্র, কিন্তু সত্য সত্য বেত্রাঘাত খাইত না।

(৩) নাক ও কানমলা একাধিকবার কোন এক দোষের সাধারণ শাস্তি ছিল সকল ছাত্রের সমক্ষে নিজ হস্তে নিজেরই নাক ও কানমলা এবং আর কখন ভবিষ্যতে এরূপ দোষ করিবে না এইরূপ প্রতিশ্রুতি প্রদান।

(৪) এক পায়ে দাঁড়ান—অধিকতর দুষ্টামির জন্য এইরূপ শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে ঊর্দ্ধে উত্তোলিত পাখানিকে মাটিতে ফেলিলে সঙ্গে সঙ্গে বেত্রাঘাত হইত।

(৫) দেওয়াল বা খুঁটির সঙ্গে নাক লাগাইয়া দাঁড়াইয়া থাকা—গুরু মহাশয়ের ইচ্ছা হইলে কোন কোন ছাত্রকে সামান্য দোষের জন্য একটা দেওয়াল অথবা খুঁটির গায়ে নাক লাগাইয়া দাঁড়াইয়া থাকার ব্যবস্থাও হইত।

(৬) খুঁটির সঙ্গে বাঁধিয়া রাখা—ছোট ছোট ছেলেদের অনেক সময় প্রথম অপরাধের জন্য পাঠশালায় একটা বাঁশের খুঁটির সহিত তাহাদেরই কোঁচার কাপড় দিয়া বাঁধিয়া ছুটির সময় বাড়ী ফিরিতে না দিবার জন্য দেখান হইত। বলা বাহুল্য যথাসময়ে ছাত্রদিগকে ছাড়িয়া দিতে গুরুমহাশয়ের বিলম্ব ঘটিত না।

(৭) নাক-ঘষা—গুরু মহাশয় পাঠশালায় মাটির মেঝের উপরে তাঁর হাত লম্বা একটা স্থান চিহ্নিত করিয়া দিতেন। অপরাধী ছাত্রকে ঐ স্থানের উপরে নিজ নাক ঘসিয়া ঘসিয়া চলিতে হইত। তৎসঙ্গে ভবিষ্যতে ঐরূপ দোষ আর কখন হইবে না, এইরূপ অঙ্গীকার করিতে হইত।

ভাল ছেলেদের জন্য এইরূপ শাস্তি অনেক সময় প্রথম অপরাধের জন্য দেওয়া হইত।

(৮) বেত্রাঘাত—আমচুরি, জামচুরি, পেয়ারা ও কুলচুরি প্রভৃতি নিত্য অনুষ্ঠিত দুষ্টামির জন্য দোষী ছাত্রদিগকে পাঠশালায় এক একটা খুঁটির সহিত তাহাদের নিজ নিজ কাপড় দ্বারা উত্তমরূপে বাঁধিয়া পশ্চাদ্দেশের কাপড় সরাইয়া বেত্রাঘাত করা হইত। ইহা অবশ্য একটা গুরুতর শাস্তি।

(৯) জলবিছুটি-প্রদান কখন কখন বেত্রাঘাতের পরিবর্ত্তে জল বিছুটি দ্বারা উন্মুক্ত পশ্চাদ্দেশে প্রহার করা হইত। ইহা আরও অধিকতর কঠিন শাস্তি। বেত্রাঘাতেও যে সকল ছাত্রের সুশিক্ষা হইত না, তাহাদের জন্যই এই প্রকার শাস্তির বিধান ছিল।

(১০) স্কন্ধদেশে পদস্থাপন—অপরাধী ছাত্রকে মাটির উপরে বসাইয়া জোর করিয়া কখন তাহার একখানি আবার সময় সময় দুইখানি পদ স্কন্ধের উপরে রাখিয়া দেওয়া হইত। বালকটি কিছুক্ষণ ব্যাঙের মত অবস্থায় থাকিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিত।

(১১) লাঙ্গুগোপাল—অপরাধী ছাত্রকে গোপাল অর্থাৎ শিশু শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় হামাগুড়ি দিবার অবস্থায় থাকিতে হুকুম দেওয়া হইত। তৎপরে তাহাকে ডান হাতখানাকে ঊর্দ্ধে তুলিতে বলা হইত। হাত উঠাইবার পর, উহার উপরে একখানা বড় রকমের পান ইট বা অপর কোন একটা ভারী দ্রব্য চাপাইয়া দেওয়া হইত। হাতখানা ভারিয়া গেলে অথবা কোনও প্রকারে ভারী দ্রব্যাদি মাটিতে পড়িয়া গেলে, অসহায় ছাত্রটির পশ্চাদ্দেশে গুরুতর বেত্রাঘাত পড়িত। তিন হাত পায়ের উপরে থাকাও যে বয়স্ক বালকদিগের পক্ষে কষ্টকর ও বিরক্তিজনক, ইহা বলাই বাহুল্য মাত্র।

(১২) ত্রিভঙ্গ মূর্ত্তি—আর একপ্রকারের শাস্তির নাম ছিল ত্রিভঙ্গ-মূর্ত্তি। কোন কোন বৈষ্ণব গৃহস্থের ঘরে রাধা-কৃষ্ণের পট দেখা যায়। উহাতে শ্রীকৃষ্ণ নিজ বামপদের উপরে ভরদিয়া দাঁড়াইয়া দক্ষিণ পদখানিকে বাঁকাইয়া বৃদ্ধাঙ্গুলের দ্বারা মৃত্তিকা স্পর্শ করতঃ ত্রিভঙ্গঠামে দাঁড়াইয়া আছেন, এইরূপ দৃষ্ট হয়। শ্রীকৃষ্ণের বামপার্শ্বে অনুরূপভাবে শ্রীমতী রাধিকাও দণ্ডায়মান থাকেন। অপরাধী বালকের পক্ষে ঐরূপ দাঁড়ানর নাম ছিল ত্রিভঙ্গ-মূর্ত্তি। এরূপ অবস্থায় দণ্ডায়মান বালকের হাতে একটা বিষম ভারী জিনিষ দেওয়া হইত, একটু হেলিলে বা একবার মাত্র উঁচু পা খানিকে মাটিতে ফেলিলে অমনি পশ্চাদ্দেশের কাপড় তুলিয়া কঠিন বেত্রাঘাত করা হইত।

(১৩) মদনগোপাল দোষী বালকটিকে ত্রিভঙ্গমূর্ত্তিতে দাঁড় করাইয়া তাহার মাথার উপরে একখানা পান ইট বা অন্য কোন ভারী দ্রব্য রাখিলে মদনগোপাল শাস্তি দেওয়া হইত।

(১৪) রামধনুকী—অপরাধী বালক দুই পা ফাঁক করিয়া দাঁড়াইয়া হাত বা মাথার উপরে পান ইট বা অন্য কোন

ভারী বস্তু লইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকার নাম ছিল রামশুওলী শাস্তি।

(১৫) চাংরোলা—কোন কোন গুরুমহাশয় উপরোক্ত শাস্তি অপেক্ষাও গুরুতর শাস্তির ব্যবস্থা করিতেন। তাহাকে চাংরোলা বলা হইত। যে সকল ছাত্র প্রায়ই পাঠশালায় না গিয়া অন্যত্র ঘুরিয়া বেড়াইত, কেবল তাহাদের জন্যই এই গুরুতর শাস্তির বিধান ছিল। কোনও বালক গুরুমহাশয়ের প্রহারের ভয়ে অথবা ইচ্ছাপূর্বক পাঠশালায় না আসিলে, তাহাকে ধরিয়া আনিবার জন্য তিনি চার জন বলবান বড় বড় ছাত্রকে প্রেরণ করিতেন। তাহারা হতভাগা ছাত্রটিকে ঘরে, বাহিরে, পথে-ঘাটে, বনে-জঙ্গলে বা গাছের উপরে, যেখানে পাইত, সেখান হইতে তাহাকে বন্দী করিয়া লইয়া আসিত। আনিবার সময় তাহাকে হাঁটিয়া আসিতে দিত না—পাছে পলাইয়া যায়। সকলে মিলিয়া তাহাকে হাতে পায়ে ধরিয়া চিৎভাবে ঝুলাইতে ঝুলাইতে পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের সম্মুখে হাজির করিয়া দিত। ইহারই নাম ছিল—চাংরোলা। এই অবস্থাতেই অসহায় বালকটীকে গুরুতর ভাবে প্রহার করা হইত। এইরূপ প্রহার এক এক সময় এত ভীষণ হইয়া পড়িত যে, হতভাগা ছাত্রটি ভয়ে বা প্রহারের যাতনায় মল-মূত্র ত্যাগ করিয়া ফেলিত। ফলতঃ গুরুমহাশয় ও ছাত্রদিগের উর্ব্বর মস্তিষ্কে শাস্তির যতপ্রকার অদ্ভুত অদ্ভুত প্রণালী উদ্ভাবিত হইতে পারিত, উহাদের কোনটিই একেবারে বাদ পড়িত না।

(১৬) বাং-বাং—দোষী বালক মাটিতে বসিয়া আপন উরুদেশের তলদেশ দিয়া নিজের এক হাত চালাইয়া নিজেরই বিপরীত কান ধরিয়া কিছুক্ষণ থাকিবে। অথবা দুই উরুর তল দিয়া চালাইয়া দুই কান ধরিয়া উপুড় হইয়া বসিয়া থাকিতে বাধ্য হইবে। এইরূপ শাস্তি এখন কোন অপরাধী চোরকে দিলেও লোকে নিন্দা করিয়া থাকে।

(১৭) থলের পোরা—সময় সময় দুই বালককে একটা থলের মধ্যে একটা বিড়ালের সঙ্গে পুরিয়া বস্তার মুখ বাঁধিয়া মাটির উপরে গড়ান হইত। হতভাগা বালকটি ক্রুদ্ধ বিড়ালটির কামড়ে ও নখরাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া পড়িত। এই অবস্থায় একমাত্র বাঘিনী-মুখরা পিসীমাতাই বালকটিকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইতেন। শাস্তির আধো-জনের সঙ্গে সঙ্গেই কোন কোন বালক ছুটি লইয়া গৃহে গমন করিত ও পিসীমাতাকে সুসংবাদ দিত। সাধারণ পিতা মাতা ও অন্যান্য গুরুজনেরা গুরুমহাশয়ের শাস্তিকে পুত্রের কার্য্য কল্যাণের আকর বলিয়া মনে করিতেন। ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বেও পল্লীবাসিগণের অনেকেরই এইরূপ ধারণা ছিল। আমার এখনও সুস্পষ্ট মনে আছে, একদিন এক বয়স্ক পাঠান আমাদের পাঠশালায় আসিয়া এই বলিয়া অভিযোগ করে যে, গুরুমহাশয় তাহার ছেলেটিকে মারেনও না, বিদ্যাও দেন না। ইহার পর হইতে গুরুমহাশয় ঐ পাঠান ছাত্রটিকে সময়ে অসময়ে যথেষ্ট পরিমাণে বেত্র সাহায্যে বিদ্যাদান করিতেন। অপ্রাসঙ্গিক হইলেও না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না যে, ঐ বালকটি কুসিয়ালের ব্যবসায় দ্বারা উত্তর কালে বেশ দু পয়সা রোজগার করিয়া স্ব-সমাজে একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি হইয়াছিল। বোধ হয় গুরুমহাশয়ের বেত্রাঘাত ও বিদ্যাদান সফল হইয়াছিল।

ইহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে, শাস্তির ভয়ে বালকেরা অনেক সময় পাঠশালা হইতে পলাইয়া অত্যন্ত কষ্টভোগ করিতেও পশ্চাৎপদ হইত না। কৃষ্ণনগর (নবদ্বীপ) রাজবাটীর ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান ৺ কার্ত্তিকের চন্দ্র রায় মহাশয় তাঁহার স্বরচিত আত্মজীবন-চরিতে একটি ঘটনার কথা লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন "আমার সমবয়স্ক স্ব-সম্বন্ধীয় কয়েকজন বালক কৃষ্ণনগরে চৌধুরীদের বাটীর পাঠশালায় শিক্ষালাভ করিতেন। এই পাঠশালায় আমার এক পিসতুতো ভ্রাতা ভালরূপ শিক্ষা না করাতে সর্ব্বদাই দণ্ডিত হইতেন। প্রথমে মধ্যে মধ্যে পলাইয়া আমার বাটীতে আসিতেন; কিন্তু গুরুমহাশয়ের দূতেরা গুপ্তভাবে আসিয়া তাঁহাকে ধৃত করিয়া লইয়া যাইত। কাহারও বাটীতে রক্ষা পাইবার অনুপায় দেখিয়া একদা এক বারোয়ারি ঘরের মাচার উপরে অনাহারে এক দিবা ও এক রাত্রি থাকেন। একদা শীতকালে মাঠে অড়হরের ক্ষেত্র মধ্যে যাপন করেন। ঐ গুরুমহাশয় চৌধুরী বাটীর এক বালকের গাত্রদেশে এরূপ বেত্রাঘাত করেন যে, তাহার চিহ্ন তাঁহার যৌবনাবস্থা পর্য্যন্ত ছিল।"

কৃষ্ণনগর সোণাড়ী-নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ ৺ রামতনু লাহিড়ী মহাশয় তাঁহার দৈনিক লিপিতে (ডায়েরীতে) একস্থানে

লিখিয়াছেন যে, তিনিও এক এক সময়ে প্রহারের ভয়ে পাঠশালা হইতে পলাইতেন; সে জন্য তাঁহার পিতা ৺ রামকৃষ্ণ লাহিড়ী মহাশয় গভীর মনোবেদনা পাইতেন। *

আমরাও বাল্যকালে শুনিয়াছি, যে ছাত্র গুরুজনদিগকে লুকাইয়া গুরুমহাশয়কে তামাকাদি দ্রব্য যত বেশী দিতে পারিত, সে তাঁহার তত প্রিয়পাত্র হইত। সে পাঠশালা হইতে বিনা কারণে অনুপস্থিত হইলে বা পাঠে অমনোযোগী হইলেও সমুচিত শাস্তি পাইত না। গুরুমহাশয়ের তামাক সাজা, লুকাইয়া তাঁহার জন্য মাখা তামাক সংগ্রহ করা ইত্যাদি কার্য্যের জন্য খারাপ ছেলেরা সর্ব্বদাই বিশেষ ব্যগ্র থাকিত এবং এই উপায়ে গুরুমহাশয়ের প্রহার হইতে রেহাই পাইত। আর যে সকল বালক কিছু দিতে পারিত না, তাহাদিগকে সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত অবস্থায় সময় কাটাইতে হইত; উঠিতে-বসিতে নড়িতে চড়িতে, অর্থাৎ ছুতায় নাতায় গুরুমহাশয়ের বেত তাহাদের পৃষ্ঠদেশে সজোরে পড়িত। এখনকার পাঠশালার ছেলেদের যে প্রহার খাইতে আদৌ হয় না, এরূপ নহে; তবে অনেক কম বলিতে হইবে। কোন কোন গুরুমহাশয়ের একটা না একটা বাতিক থাকে। ঐ সম্বন্ধে কথা তুলিয়া দুষ্ট বালকেরা পাঠ দিবার হইতে গুরুমহাশয়কে অন্যমনস্ক রাখিবার জন্য বিশেষ ভাবে যথাসাধ্য চেষ্টা করে এবং পাঠের নির্দ্দিষ্ট সময়টা কাটাইয়া দেয়; পাঠ প্রস্তুত না করার জন্য আর সেদিন বেত্রাঘাত খাইতে হয় না। কোন কোন হাই স্কুলে বর্ত্তমান সময়ে ছাত্রদিগকে স্কুলের ছুটির পর ধরিয়া রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। দুষ্ট বালকেরা নির্দ্দিষ্ট পাঠ প্রস্তুত করিয়া দিয়া তবে বাড়ী যাইতে পায়। এই উপায়ে দুষ্ট ছাত্রদিগের সহিত পরিশ্রান্ত কোন কোন শিক্ষক মহাশয়কেও পীড়ন করা হইয়া থাকে। তবে ছাত্রদের কল্যাণকামী শিক্ষকগণ এই কষ্টকে গুরুতর ক্লেশকর বলিয়া মনে করেন না। সেকালের গুরুমহাশয়েরা দুষ্ট প্রকৃতির ছাত্রদিগকে এইরূপে হাতে না মারিয়া ভাতে মারিবার কৌশল জানিতেন না; কারণ অকালপক্ক আদুরে ছেলেদের সায়েস্তা করিতে গিয়া তাঁহারা কখন কোন অদূরদর্শী অভিভাবকের নিকট হইতে অত্যধিক প্রহার জনিত মামলা মোকর্দ্দমার জন্য যাইতেন না। ছাত্রদিগকে তাঁহারা বিনা দোষে মারেন না এবং মারার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছাত্রকে সংশোধন করা একথা তখনকার লোকেরা যেন বেশী স্বীকার করিতেন।

সেকালে গুরুমহাশয়েরা বর্ত্তমান পাঠশালা ও স্কুলের শিক্ষকদিগের মত কোনও ব্যক্তিবিশেষ বা কমিটীর নিকট হইতে মাসে মাসে নির্দ্দিষ্ট হারে বেতন পাইতেন না। তাঁহারা আলিয়া যে এক গৃহস্থের বাটীতে পাঠশালা খুলিয়া বসিতেন, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। দেখিতে দেখিতে দুই দশটি করিয়া ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাইত। প্রত্যেক গৃহস্থ আপনাপন বালকদিগকে পাঠশালায় দিবার সময় গুরুমহাশয়ের সহিত অবস্থা অনুসারে পৃথক্ পৃথক্ বন্দোবস্ত করিতেন, শ্রেণী অনুযায়ী বেতনের কোন নির্দ্দিষ্ট হার ছিল না। শিমলা পাহাড়ে দেখিয়াছি গবর্ণমেণ্ট হাইস্কুলেও দেশীয় অভিভাবকের আর্থিক অবস্থানুযায়ী ছাত্রবেতন দিবার নিয়ম অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। এই নিয়মটি কিন্তু এক হিসাবে মন্দ নয়। অনেক গরীব ছাত্রও এই উপায়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিবার বিশেষ সুবিধা পাইতে পারে। বলা বাহুল্য ছাত্রবেতন হইতে মাসে মাসে সামান্য ৭।৮ টাকা মাত্র আয় হইত। অনেক ক্ষেত্রে ইহা অপেক্ষাও কম টাকা উঠিত। এতদ্ভিন্ন পূজা-পার্ব্বণ, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিদ্যারম্ভ, বিবাহাদির অনুষ্ঠান-কালে গুরুমহাশয়কে কিছু কিছু উপরি পাওনা দিবার প্রথা বিদ্যমান ছিল। দশমী, একাদশী, পূর্ণিমা ইত্যাদি পূর্ব্বদিনে প্রত্যেক গৃহস্থ তাঁহাকে সিধা দিতেন। অন্ততঃ একদিনের খাওয়ার মত চাউল, ডাল, তেল, নুন, হলুদ, লঙ্কা প্রভৃতি ভোজ্যদ্রব্য প্রদানের নাম ছিল সিধা দেওয়া। ইহাতেও মাসের শেষে তাঁহার অনেক খাদ্য সামগ্রী জুটিত। সাধারণতঃ গুরুমহাশয়গণ সম্পন্ন গৃহস্থের বাটীতেই আশ্রয় ও আহারাদি পাইতেন। ধনী ব্যক্তিরা তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে কাপড় চোপড় দান করিতেন। এই সব উপায়ে তাঁহাদের সংসার-যাত্রা কোন রকমে নির্ব্বাহ হইত।

সরস্বতীর সেবকেরা চিরকালই দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিতে অভ্যস্ত। লক্ষ্মী ও সরস্বতী দেবীদ্বয়ের বিবাদ সকল দেশেই প্রবাদ বাক্যে পরিণত, আজিও এ বিবাদের সম্পূর্ণ নিষ্পত্তি ঘটে নাই। ৬০ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের পল্লীগ্রামে ৺রামচন্দ্র সরকার নামে একজন

* ৺ শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় প্রণীত "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ" ৪র্থ সংস্করণ, ৩২ পৃষ্ঠা।

বৃদ্ধ গুরুমহাশয় ছিলেন। তাঁহাকে আমরা পালাক্রমে প্রতিদিন সিধা দিতাম। তিনি নিজ সম্প্রদায়-পড়ুয়াদিগের দ্বারা বাড়ী বাড়ী হইতে সিধা সংগ্রহ করিতেন ও উদ্বৃত্ত দ্রব্য বেচিয়া পয়সা সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন। আমরা সাধারণ তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত এবং অনেক বিষয়েই তাঁহার পরামর্শ লইত। তিনি নিজ অর্থে নূতন পঞ্জিকা ক্রয় করিয়া গ্রামবাসী বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদিগকে শোনাইতেন এবং একাদশী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা ও গ্রহণাদির তারিখ সবস্ব মত বলিয়া দিতেন। সে সময় ঘরে ঘরে পাঁজি রাখার নিয়ম ছিল না, সকলে পড়িয়া বুঝিতেও পারিত না।

পূর্ব্বকালে অতি অল্প আয়ে যথাসম্ভব শিক্ষিত গুরুমহাশয়-গণ কিরূপে সংসার যাত্রা সমাধা করিতেন, ইহা চিন্তার বিষয় বটে। তবে এ কথা বলা একরূপ নিষ্প্রয়োজন যে, সেকালে বাঙ্গালা দেশে পয়সা বড়ই দুর্ম্মূল্য ছিল। নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি এত সুলভ ছিল যে, এখনকার ছেলে মেয়েরা শুনিলে অবাক্ হইয়া যাইবে; কেহ কেহ হয় ত বিশ্বাসই করিতে পারিবে না। একটি ঘটনার কথা এখানে না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। তখন আমার বয়স ৭।৮ বৎসর হইবে। আমার বেশ মনে পড়ে, একদিন একটি মাত্র পয়সা দিয়া মা আমাকে বাজারে পাঠান। আমি উহা একজন সদ্গোপকে দেই সে আমাকে ৫০টা বড় বড় বেগুন দেয়। আমি অতগুলি বেগুন লইতে অস্বীকার করি। লোকটা আমাকে পয়সা ফিরাইয়া দিতে চাহে না। অতগুলা বেগুন আমি কিরূপে বাটী লইয়া যাইব স্থির করিতে না পারিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করি। পিতাঠাকুর ঘটনাক্রমে সেই সময় গঙ্গাস্নান সারিয়া বাজারের মধ্য দিয়া বাড়ী ফিরিতেছিলেন। তিনি আমার ক্রন্দনের কারণ অনুসন্ধান করিয়া ব্যাপারটা বুঝিতে পারেন। তখন তিনি সদ্গোপটিকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিয়া পয়সাটা ফেরৎ লন এবং একটি মুদিখানার দোকানে আনাইয়া ২৫টা কড়ি পান। পরে ৪ কড়ার শাক, দশ কড়ার ডাল, ৪ কড়ার বেগুন ইত্যাদি বাজার করিয়া গামছা বোঝাই করিয়া আমার হাতে দেন। আমি সেই দিন হইতে বাজার করিতে শিখি। সে দিন আর নাই; এখন দশ আনার বাজারও ক্ষুদ্র একখানা রুমালে করিয়া অনায়াসেই গৃহে আনা চলে।

কৃতবিদ্য কোন কোন ছাত্র উত্তর কালে দুর্গোৎসবের সময় গুরুমহাশয়কে ধুতি ও চাদর দিয়া সম্মানিত করিতেন, এরূপও দেখিয়াছি। ফলতঃ গুরু ও শিষ্যের মধ্যে এখন আর সেকালের মত মধুর সম্বন্ধ প্রায়ই দেখা যায় না, তিনি বড় জোর একজন বেতনভোগী কর্ম্মচারীর সম্মান পাইয়া থাকেন মাত্র।

প্রাচীন কালে অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে পাঠশালার কাজ বন্ধ থাকিত, প্রতি রবিবারে নহে। বিশেষ বিশেষ পর্ব্ব দিনেও ছাত্রদিগকে পাঠশালায় যাইতে হইত না। তবে এখনকার মত শীত ও গ্রীষ্মের দীর্ঘ ছুটির নিয়ম ছিল না। আকাশে অসময়ে মেঘের আড়ম্বর দেখা দিলেই সেদিনকার মত ছুট হইয়া যাইত।* বৃষ্টির জলে ভিজিলে জ্বর হওয়ার আশঙ্কাই যে এইরূপ ছুটির একমাত্র কারণ ইহা বলাই বাহুল্য। প্রতি বৎসর নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ছুটির দিন পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্ধারিত হইবার ব্যবস্থাও তখন ছিল না। সুতরাং পাঠশালা বন্ধ করা না করা গুরুমহাশয়ের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন থাকিত।

পূর্ব্বোক্ত শাস্তির বিবরণ পাঠে অনায়াসে মনে হইতে পারে যে, সেকালের গুরুমহাশয়কে ছাত্রেরা যমের মত ভয় করিত। কথাটা আদৌ মিথ্যা নহে। অধিকাংশ ছাত্রই তাঁহার দৃষ্টির বাহিরে থাকিবার জন্য চেষ্টা পাইত। নানা কারণে বেত্রাঘাতের আশঙ্কা থাকিত। বাড়ীতে বা পাড়ায়

---

* ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে জনৈক অধ্যাপক রূপে আমি যাই। একদিন বিকালে একটি বটবৃক্ষের তলায় কয়েকটি ছাত্রকে পড়াইতেছি। এমন সময়ে ছুটির ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। আমি মনে করিলাম ছেলেদিগকে বৃষ্টির হাত হইতে রক্ষা করাই বুঝি ছুটি দেওয়ার উদ্দেশ্য। ঘণ্টার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেরা উঠিল দাঁড়াইল এবং ঘরে ফিরিয়া গেল। বলা ভাল, বিদ্যালয়টি একটি বোর্ডিং স্কুল; গ্রামান্তরের কোন ছাত্র তখন ঐ স্থানে পড়িতে আসিত না। অল্পক্ষণ পরেই আমি সবিস্ময়ে দেখিলাম যে ছাত্রেরা এক একজন অধ্যাপকের (শিক্ষকেরা এখানে অধ্যাপক পদবাচ্য) অধীন বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া বৃষ্টিতে ভিজিবার জন্য ঘর বাড়ির মাঠের দিকে প্রস্থান করিল এবং অনেকক্ষণ ভিজিয়া ঘর্ম্ম উপভোগ করতঃ আশ্রমে ফিরিয়া আসিল। রৌদ্র ও বৃষ্টিতে সহ্য শক্তি বৃদ্ধি পাইতে পারে। এই বিশ্বাসেই ঐরূপ করার আদেশ ছিল।.....

—লেখক

কোন প্রকার দুষ্টামি করিলে, স্ত্রীলোকেরা কোনও ছাত্রের মারফৎ তাঁহাকে সব কথা জানাইয়া দিতেন। তৎক্ষণাৎ অপরাধী ছাত্রদিগের যথাযোগ্য শাস্তি হইত। একালে কিন্তু এ নিয়ম উঠিয়া গিয়াছে। যাহা হউক প্রাচীন কালে গুরুমহাশয় ছাত্রদিগের ঘরে-বাইরে অভিভাবকত্ব করিতে বাধ্য হইতেন। প্রত্যেক ছাত্রের পিতা ও অন্যান্য গুরুজনদিগের সহিত বিশেষরূপে পরিচিত থাকায় ছাত্রেরা তাঁহার বাধ্য থাকিত। তবে একথাও সত্য যে, ভাল ছেলেরা তাঁহার নিকট কখন অযথা প্রহার খাইত না; বরং তাহারাই তাঁহার বিশেষ অনুরক্ত থাকিত। অসুখ-বিসুখের সময় আত্মীয়ের সহিত তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিত।

গুরুমহাশয় ছাত্রদিগকে দুতায় নাতায় শুধুই মারিতেন, তাহাদের প্রতি যে তাঁহার আন্তরিক টান ছিল না, ইহা নহে। কোন ছাত্র পীড়িত হইয়াছে শুনিলে তৎক্ষণাৎ তাহার বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইতেন ও যথাসম্ভব নিজে শুশ্রূষা করিতেন এবং বয়স্ক ছাত্রদিগের দ্বারা তাহার পরিচর্য্যার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতেন। পীড়া গুরুতর হইলে তিনি সারারাত্রি জাগিয়া ছাত্রের পার্শ্বে বসিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিতে পরাঙ্মুখ হইতেন না। আমরা এরূপ ঘটনা একাধিকবার দেখিয়াছি। এইরূপ সময়ে তাঁহার ছাত্রপ্রীতি ও কোমল হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যাইত। বিনা তাড়নায় বালকদের নষ্ট হইয়া যাইবার বিশেষ সম্ভাবনা থাকে বুঝিয়া তিনি বাহ্যিক রুঢ় ভাব দেখাইতেন মাত্র। সেকালে বিলাতেও গুরুমহাশয়ের বেত্রাঘাতের অভাব ঘটিলে যে ছাত্রগণ খারাপ হইয়া যাইতে পারে, এইরূপ একটা প্রবাদ প্রচলিত ছিল। কথাটা যে একেবারেই মিথ্যা, অনেক স্থলে এরূপ মনে হয় না।

সেকালে এখনকার মত ঘড়ির এত প্রচলন ছিল না। ছাত্রেরা সূর্য্য ও নির্দ্দিষ্ট দ্রব্যের ছায়া দৃষ্টে সময় নিরূপণ করিত। এই উপায়েই পাঠশালা বসিবার ও ভাঙ্গিবার সময় নির্ণীত হইত। সাধারণ গৃহস্থেরা আকাশে সূর্য্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র বিশেষের অবস্থান দেখিয়া মোটামুটি ভাবে এক প্রহর, দুই প্রহর বা মধ্যাহ্ন, তৃতীয় প্রহর ইত্যাদি দিবা ও রাত্রি নিরূপণ করিত। ঘণ্টা ও মিনিটের তখন রেওয়াজ ছিল না। পল্লীগ্রামে এখনও এইরূপ ব্যবস্থা আজিও দেখিতে পাওয়া যায়। গুরুমহাশয় ছাত্রদিগকে এইরূপ শিক্ষা প্রদানে বিশেষ সাহায্য করিতেন।

বর্ত্তমান সময়ে বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রদিগের মধ্যে যেরূপ ফুটবল-প্রতিযোগিতা দেখা যায়, সেকালে ভিন্ন ভিন্ন পাঠশালা বালকদের ভিতরে সেইরূপ অঙ্কের পাল্লা-পাল্লি চলিত। এক পাঠশালার বালকেরা গুরুমহাশয়ের নিকট হইতে একটা অতি কঠিন অঙ্ক সংগ্রহ করিয়া ভিন্ন গ্রামের পাঠশালায় প্রেরণ করিত। সেখানকার ছাত্রেরা উত্তর করিতে না পারিলে, গুরুমহাশয়ের আশ্রয় লইত এবং উহার উত্তর সহ পাল্টা আর একটা দুরূহ প্রশ্ন পাঠাইয়া দিত। এইরূপে অঙ্ক-সাহায্যে বালকেরা প্রতিপক্ষদিগকে হারাইবার চেষ্টা করিত। এই কার্য্যে গুরুমহাশয়রা আপন আপন ছাত্রদিগকে যথেষ্ট উৎসাহ দিতেন। বর-পক্ষের সঙ্গে আগত ছেলেপিলেকে অঙ্ক-সাহায্যে পরাস্ত করা তখনকার দিনে আমোদের ব্যাপার ছিল। বলা বাহুল্য, যে-পাঠশালার বালকেরা প্রদত্ত অঙ্কের প্রকৃত উত্তর বলিয়া দিতে না পারিত, তাহাদের পাঠশালা ও সেই সঙ্গে গুরুমহাশয়েরও হার হইত।

সেকালে শুভঙ্করীর আর্য্যা-সাহায্যে অনেক কঠিন কঠিন অঙ্ক অনায়াসে মুখে মুখে কষা যাইত বটে কিন্তু পাটীগণিতের গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক, লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক প্রভৃতি বহু বিষয়-ঘটিত অঙ্ক কষার নিয়ম পাঠশালায় শিখান হইত না। অধিকাংশ গুরুমহাশয়ই পাটীগণিতের অনেক অঙ্ক কষিতে পারিতেন না। সুতরাং ঐসকল বিষয়ের অঙ্ক প্রদত্ত হইলে অনেক গুরুমহাশয়েরও পরাজয় হইত। আমরাও বাল্যকালে এরূপ প্রতিযোগিতা দেখিয়াছি। একবারকার ঘটনা এখনও আমার মনে রহিয়াছে। চণ্ডীপুর গ্রামের একটি ছাত্র আমাদের খড়তলা গ্রামের পাঠশালায় আসিয়া সর্দ্দার-পড়ুয়াকে একটি প্রশ্ন দিয়া যায়। সেটি এইরূপ ছিল:—দুইটি চোর একগাছা সোনার কণ্ঠ-মালা হার চুরি করিয়া একটি বনের মধ্যে যায় ও সমান দুই অংশে ভাগ করিবার জন্য চেষ্টা করে। কিন্তু দেখা যায় যে একটি কাঁঠি পলা উদ্বৃত্ত থাকে। কে ঐটি লইবে, ইহা লইয়া তাহাদের দুজনের মধ্যে বচসা আরম্ভ হয়। এমন সময়ে সেখানে তৃতীয় একজন চোর আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন তাহারা মালা দুছড়াকে সমান তিন অংশে ভাগ করিতে চেষ্টা করে।

কিন্তু সেবারেও একটি পলা বাড়ে। ঐটির জন্ত আবার গোলযোগ বাধে। এমন সময়ে আর একজন চোর দেখা দেয়। মালাছড়াকে চারি ভাগ করা হয়। সেবারেও একটি পলা বাকী থাকে। এইরূপে পর পর ছয় জন একত্র হইলেও মালা ভাগের সময় প্রতিবারেই একটি করিয়া পলা বাকী থাকে। কিন্তু রাত্রিশেষে সপ্তম চোর আসিলে মালা-গাছটিকে সাত সমান অংশে ভাগ করা হয়। আশ্চর্যের বিষয়, এইবার সকলে সমানসংখ্যক পলা পায় ও চলিয়া যায়। বল দেখি কণ্ঠমালাটিতে কতগুলি পলা অর্থাৎ কাঁঠিপলা ছিল?

আমাদের পাঠশালার বড় বড় ছাত্রেরা এই অঙ্কটিকে দুই তিন দিন ধরিয়া কষিবার জন্ত বৃথা চেষ্টা করে। গুরু-মহাশয়ও অকৃতকার্য্য হন। ইহাতে আমাদের পাঠশালার পয়ারের একরূপ সুনিশ্চিত হইয়া উঠে। তখন ছোট ছোট ছেলেদের মধ্যেও কতকটা জানাজানি হয়, যে-কোন ব্যক্তি দ্বারা উহার উত্তর পাইবার জন্ত সকলের মধ্যে একটা আকাঙ্ক্ষা দেখা দেয়। আমরা দুইটি ছাত্র উত্তরটি বাহির করিবার জন্ত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হই। আমাদের ধারণা ছিল কণ্ঠমালা গাছটিতে আর দুই শতের অধিক কাঁঠিপলা থাকা সম্ভব না। সুতরাং উত্তরটি ঐ সংখ্যার মধ্যেই থাকিবে। রাধাকৃষ্ণ বাগচি ও আমি প্রত্যূষে পাঠশালায় আসিয়া ৮, ৯,১০ ইত্যাদিক্রমে এক একটি সংখ্যা লইয়া ক্রমাগত ভাগ করিয়া পরীক্ষা করিতে থাকি, কিন্তু উত্তর মিলে না। সাত দিন ধরিয়া পরীক্ষা কার্য্য চলে। রাধাকৃষ্ণ যে সংখ্যাটিকে লইত আমি তাহার পরবর্ত্তীটি লইয়া পরীক্ষা করিতাম। ইহাতে কাজের সুবিধা হইবে ভাবিয়াই আমরা কার্য্যে অগ্রসর হইতে থাকি। ২০০র মধ্যে উত্তর না পাওয়ায় আমরা ৪০০ পর্য্যন্ত পরীক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্প হই। অষ্টম দিবসে রাধাকৃষ্ণ ৩০০ এবং আমি ৩০১ লইয়া পরীক্ষা সুরু করি। আমি দেখিতে পাই যে ৩০১ কে, ২,৩,৪,৫,৬ দিয়া পর পর ভাগ করিলে প্রত্যেক বারেই ১ পড়িয়া থাকে ৭ দিয়া ভাগ করিলে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। সংখ্যাটিকে আমি দুইবার কষিয়া দেখি। রাধাকৃষ্ণও আমার কথায় অঙ্কটিকে ২ বার পৃথক ভাবে কষে। তখন আর আমাদের উত্তরটি সম্বন্ধে কোনরকম সন্দেহ থাকে না। আমরা সগর্ব্বে গুরুমহাশয়ের নিকটে গিয়া উত্তরটি বলিয়া দেই। তিনি তৎক্ষণাৎ সর্দ্দার-পড়ুয়াদের পরীক্ষা করিতে বলেন ও নিজেও পরীক্ষা করিয়া দেখেন। সেইদিন তিনি আমাদিগকে যথেষ্ট আদর করেন। তাঁহার ভাবে ভঙ্গীতে ইহাই প্রকাশ পায় যে আমরা ছোট ছেলে হইলেও সেযাত্রার মত আমাদের পাঠশালা সহ তাঁহার মান রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। সেইদিনই বিকালে আমাদের পাঠশালা হইতে চণ্ডীপুরে একটি অস্তিত পত্রকের অঙ্ক পাঠান হয়। বলা বাহুল্য উত্তরটি সেই সঙ্গেই যায়। তখন ঐসব অঙ্ককে অত্যন্ত কঠিন বলিয়া বোধ হইত। কিন্তু এখন দেখিতেছি পাটীগণিতের ল. সা. গু. * এবং বীজগণিতের সমীকরণের সাহায্যে ঐসকল অঙ্ককে অনায়াসে কষা যাইতে পারে।

অনেক পল্লীগ্রামে একমাত্র গুরুমহাশয়ই পণ্ডিত ব্যক্তি বলিয়া গণ্য হইতেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, কোনদিন কি তিথি—কোন তারিখে—গ্রহণ হইবে ইত্যাদি বিষয় জানিবার জন্ত পল্লীবাসী নিরক্ষর আপামর সাধারণকে তাঁহারই সাহায্য লইতে হইত। কোন গৃহস্থের বাড়ীতে অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি ব্যাপার ঘটিলে, পূর্ব্বাহ্নেই তিনি জানিতে পারিতেন এবং উপযুক্ত সময়ে সশিষ্যে উপস্থিত হইয়া তিনি ঐ কার্য্যে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন। আমি আমাদের গুরুমহাশয়কে অনেক গৃহস্থের কাজে সাহায্য করিতে দেখিয়াছি। কেহ কেহ কাঁচা ঘরের চাল বাঁধিবার ও ছাইবার জন্ত তাঁহার নিকটে অনেকগুলি দড়ির 'বেটে' অর্থাৎ একটা কঞ্চির গায়ে জড়ান একছাড়া দড়ির চাল দিয়া যাইত। বিকালের পাঠ শেষ করিয়া তিনি বড় বড় ছাত্র-দিগের সাহায্যে উহা দুই বা তিন ছাড়া করিয়া পাকাইয়া 'কুড়ি' প্রস্তুত করিয়া লইতেন এবং গৃহস্থকে যথাসময়ে ছাড়া দ্বারা পাঠাইয়া দিতেন। এই রূপে অনেকপ্রকার বেগার তাঁহাকে অনেক দিতে হইত। এতদ্ভিন্ন গ্রামা রোগীদিগের হাতদেখা অর্থাৎ নাড়ী পরীক্ষা দ্বারা রোগ ও উহার প্রকৃতি

---

* ২,৩,৪,৫ এবং ৩০০ + ১ = ৮ তাদফল, অবশিষ্ট ১।

৪ × ৫ + ১ = ২১ বাহা ১ দ্বারা বিভাজ্য। সুতরাং নির্ণেয় সংখ্যক কাঁঠিপলা = ৬০ × ৫ + ১ = ৩০১টি উত্তর। লেখক।

বলিয়া দেওয়া এবং উপযুক্ত পাচন ও অন্যান্য গাছগাছড়ার বিনা পয়সায় ব্যবস্থা করা তাঁহার একরূপ দৈনন্দিন কার্যের অঙ্গ ছিল। এইসকল কারণে তিনি গ্রামস্থ সাধারণ লোকের নিকটে প্রিয় থাকিতেন ও শ্রদ্ধাভাজন হইতেন। তখন পেস্টালোৎসী ফ্রীবেল বা মণ্টেসরীর প্রবর্তিত শিশু-শিক্ষার নূতন নূতন প্রণালী উদ্ভূত হয় নাই। সুতরাং গুরুমহাশয়গণ নিশ্চয়ই আধুনিক মতেই পাঠ দিতে পারিতেন। গৃহকার্য পিতা-মাতা ও অন্যান্য অভিভাবকদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করা বালকদিগের পক্ষে অবশ্যকর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত। এই কারণে অনেক বয়স্ক ছাত্র আবশ্যক হইলে মাঝেমধ্যে ও অন্যান্য কৃষিকার্যের জন্যও পাঠশালা হইতে দশ পনের দিনের জন্য ছুটি পাইত। সময় সময় অনেক দুষ্ট বালক এইরূপ একটা না একটা মিথ্যা ওজোরের আশ্রয় লইয়া গুরুমহাশয়ের সাজার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য চেষ্টা করিত।

বর্তমান কালে রাজভাষা ইংরাজী শিখিবার জন্য অনেকে যেমন ব্যস্ত, সকলে ভাল ভাল ছেলেরা তেমনই পারসী ও আরবী ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য লালায়িত থাকিত। পাঠশালার কাজ শেষ করিয়া তাহারা কোন মৌলবীর নিকটে গিয়া পাঠ অভ্যাস করিত। মোক্তাবে সাধারণতঃ পারসী ও আরবী ভাষা শিক্ষাদানের উপরে জোর দেওয়া হইত। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের সন্তানেরা অবশ্য পাঠশালা ছাড়িয়া কোনও অধ্যাপকের টোলে থাকিয়া শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিত। তিনি ছাত্রদিগকে স্বগৃহে রাখিয়া আহার্যাদি প্রদান করিতেন ও শিক্ষা দিতেন। দেশীয় ধনীব্যক্তিরা শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণকে নানাপ্রকারে অর্থ-সাহায্য করিতেন। অনেক রাজা তাঁহাদিগকে নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর জমি প্রদান করিতে ক্ষান্ত হইতেন না। তাঁহাদের চাল-চলন অত্যন্ত সাদাসিদে থাকায় ঐ সকল জমির ধান ও সময়ে সময়ে প্রাপ্ত বিদায় আহার যাবাই নিজ সংসার ও ছাত্রদিগের ভরণ-পোষণ করিতেন। অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী হইয়াও যাঁহারা সামান্য হেতুতে পাত্রাপাত্র বিচার সহকারে আহার সমাধা করিতে পারিতেন, তাঁহাদেরই ছাত্রেরা যে কুঁড়েঘরের মৃত্তিকার দরমার উপরে শুইয়া সুখে নিদ্রালাভ করিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য কি আছে? যে যুগে বিখ্যাত অধ্যাপক-গণই এরূপ সরল জীবনযাপন করিতে অভ্যস্ত ছিলেন, সে-কালে গ্রাম্য গুরুমহাশয়গণ যে তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ-পূর্বক অনাড়ম্বর কাঙ্গালের জীবিকায় সন্তুষ্ট থাকিবেন, ইহা একরূপ স্বতঃসিদ্ধ। ইঁহাদের সাধারণ বেশ-ভূষা ও অতি সরল জীবনযাত্রা-প্রণালী এখন আর আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে না। আমরা পাশ্চাত্যের অনুকরণে বিলাসের ফাঁস স্বেচ্ছায় গলায় লাগাইয়া আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছি। এখন পাঠশালার ছাত্রেরাও ব্যয়বহুল ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস প্রভৃতি খেলার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে; দেশীয় দাণ্ডাগুলি, হাডুডুডু, ঘুনদাড়ি খেলা কৃষক পাড়ার আশ্রয় লইয়াছে। বিদ্যা পূর্বের ন্যায় এখন আর বিনয় দান করে না, যেহেতু টোল ও পাঠশালার আদর্শ অধ্যাপক ও শিক্ষকের একান্ত অভাব ঘটিয়াছে।

এখন গুরুশিষ্যের হৃদয়ের যোগ একরূপ লোপ পাইতে বসিয়াছে। ছাত্রেরা গুরুমহাশয়কে আর আগেকার মত ভয়ও করে না, ভক্তিও করে না। মাসিক বেতন দিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদ্যা ক্রয় করে মাত্র। তিনিও কোন রকমে দিনগত পাপক্ষয় করিয়া নিশ্চিন্ত মনে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া থাকেন এবং অন্য উপায়ে আয় বৃদ্ধির চেষ্টা পান। ছাত্রদের ভবিষ্যৎ জীবন যে তাঁহারই দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে গঠিত হইয়া থাকে, এ কথা তিনি এখন যেন বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন। চির পরিবর্তনশীল কালই ইহার জন্য মুখ্যতঃ পরিমাণে দায়ী।

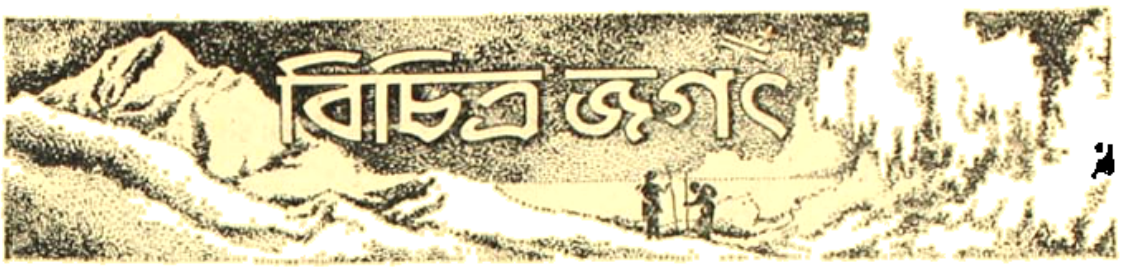

সাহারার পথে লবণবাহী বণিক্-দল

—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৩৬ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর আমি লণ্ডন ত্যাগ করে (ঘর্ণটন ক্রিসাণ্ডের বর্ণনা থেকে) সাহারা মরুভূমিতে রওনা হই। আমার উদ্দেশ্য ছিল প্রতি বৎসর যে পনের হাজার উট সহ সার্থবাহ বণিক্-দল কাচি ও ফিল্মার লবণ-খনিতে যায়, তাদের ফটো সংগ্রহ করা। 'জেরিকো' বলে বিখ্যাত ফিল্মে এই ফটোগুলি ব্যবহৃত হবে।

আমার সঙ্গে ছিলেন টি. এ. স্লোভার; তিনি বিখ্যাত ভ্রমণকারী, সাহারার এ অঞ্চলে ইতিপূর্বে কয়েকবার তিনি এসেছেন।

আলজিয়ার্স থেকে প্রকৃতপক্ষে আমাদের যাত্রা সুরু হল। দু'খানা মোটর-লরিতে করে আমরা দু'হাজার মাইল দূরবর্তী আগাদিসের উদ্দেশে রওনা হ'লাম।

যাত্রা করার সঙ্গে সঙ্গেই বেধে গেল গোল। মরুভূমির ওপর দিয়ে রাস্তা বলে কিছু ছিল না, যা ছিল তা অতি খারাপ, একদিনে আমাদের গাড়ীর দু'খানা টায়ার ফেটে গেল। এর ফলে গারদিয়া নামক স্থানে একখানা মোটর আমাদের ছাড়তে হ'ল। এ ঘটনা ঘটল আলজিয়ার্স থেকে চারশো মাইল দক্ষিণে। নতুন টায়ারের জন্য আলজিয়ার্সে খবর পাঠান হ'ল এবং পরিত্যক্ত গাড়ীখানাতে আমাদের ক্যামেরা-পরিচালক কেট্‌লওয়েল রইল। বাকী গাড়ীখানাতে এ গাড়ীর জিনিষপত্র চাপিয়ে আমরা আবার রওনা হই।

দু'শো মাইল দূরে আল্ গোলিয়া। সেখানে আবার এক গোল বাধল।

স্থানীয় সামরিক কর্তৃপক্ষেরা আমাদের কিছুতেই আগাদিস যেতে দেবে না। তারা বললে, "গত বছর এই পথে মরুভূমির মধ্যে দিয়ে আগাদিস যেতে গিয়ে এগার জন মোটর-যাত্রী মারা পড়েছে। ওদের উদ্ধার করবার জন্যে সাহায্যকারী দল পাঠাতে পাঠাতে আমরা হয়রান হয়ে পড়েছি। মরুভূমির মধ্যে পথ হারালে তাদের খুঁজে বার করা কি সোজা কথা মশাই? আমরা যেতে দেব

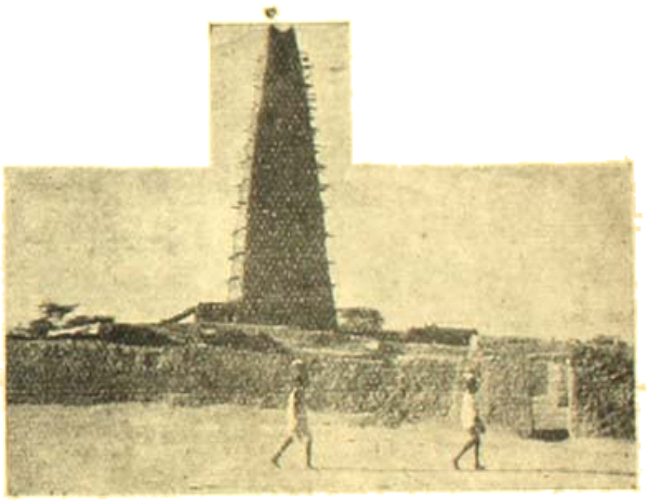
কাচি সহরের লবণের বৈঠকী দিনার।

না আর কাউকে এ পথে।"

অনেকক্ষণ তাদের সঙ্গে আমাদের তর্ক-বিতর্ক চলল। তারা নাছোড়বান্দা। কিছুতেই যেতে দেবে না। ভয়ানক পথ, এ পথে মোটর নিয়ে যাওয়া নিরাপদ নয় আদৌ।

অবশেষে আমরা আলজিয়ার্সের গবর্ণর-জেনারেলের এক চিঠি বার করলাম—তাতে আমাদের গমনপথে যতগুলি দুর্গ আছে, প্রত্যেক দুর্গের অধ্যক্ষকে আমাদের অগ্রসর হতে

বাধা না দেবার আদেশ আছে। সে চিঠিখানাতে কাজ হ'ল। আমরা অগ্রসর হবার অনুমতি পেলাম।

যাবার সময় সামরিক কর্ম্মচারীরা আমাদের বললে—"যদি আপনাদের কিছু হয়, সে জন্য গবর্ণর-জেনারেল তো দায়ী হবেন না, দায়ী হব আমরা।"

এ রকম বলেছে প্রত্যেক দুর্গের লোকেরা। একশো বেড়শো মাইল অন্তর অন্তর সেই মরুভূমির মধ্যে ফরাসীদের দুর্গ আছে। প্রত্যেক দুর্গের লোকেই আমাদের এ যাত্রার সাফল্য সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছে। এমন কি পরবর্ত্তী দুর্গে পৌঁছতে পারব কি না এ বিষয়েও সন্দেহ প্রকাশ করতে ছাড়ে নি।

আমরা ইন্‌সালা পৌঁছলাম—পথ যে কি ভয়ানক, তা বর্ণনা না করাই ভাল।

লবণবাহী বণিক-দলের এক অংশ।

আমার অত্যন্ত ইচ্ছা হ'ল সেই সব লোকগুলোকে একবার সামনে পেতে, যারা বলেছিল মরুভূমির মধ্য দিয়ে দিব্যি চমৎকার মোটরের রাস্তা আছে। কখন কখন মরুভূমির মধ্যে আমরা অন্য মোটরের চক্র-চিহ্ন দেখতে পেলাম—নয় তো প্রায়ই তিন চার মাইল দূরবর্ত্তী কোন ছোট পাহাড়ের দিকে মোটর চালিয়ে সেখানে পৌঁছে আবার পরবর্ত্তী পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হওয়া—মরুভূমি-ভ্রমণ এমনি একঘেয়ে।

গত পনের দিনের মধ্যে ইন্‌সালা দিয়ে মাত্র একখানা মোটর-লরি মরুভূমির দিকে গিয়েছে শোনা গেল। কিন্তু সে মোটর-লরি মরুভূমির মধ্যে যাবার জন্যেই তৈরী। মাটী থেকে তার চক্রপথের উচ্চতা ৫' ফুট, আমাদের মোটে চার ইঞ্চি।

দিনের মধ্যে একবার বা দু'বার আরবীয় পথিক দলের সঙ্গে আমাদের দেখা হত। কিন্তু আমরা শীঘ্রই আবিষ্কার করলাম যে, ঘাঁড়ান ভাল নয়, কারণ আরবীয়েরা জল চেয়ে বসে। এই মরুভূমির কোথাও না আছে কূপ, না আছে পুকুর, না আছে লোকের বাড়ী। জল এখানে অতি মূল্যবান, তা চাইলেই কি বিলিয়ে দেওয়া যায়!

এই ভয়ানক মরুভূমির মধ্যে এক জায়গায় একখানা 'বেন্‌জো' গাড়ী দেখি অচল অবস্থায় পড়ে আছে।

শোনা গেল এ গাড়ীর হতভাগা আরোহীগণ তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে তৃষ্ণায় প্রাণ হারিয়েছে।

সে মরুভূমির মধ্যে দুদিন আমরা একটি মানুষকেও দেখতে পাইনি—গাছপালা নয়, উট নয়, বাড়ীঘর ত নয়ই।

রাস্তা এমন খারাপ যে, অনেক সময় আমরা লরির মাল নামিয়ে আধ মাইল পর্য্যন্ত রাস্তা তৈরী করে নিয়ে, গাড়ী খালি অবস্থায় পার করিয়ে দিয়ে মাল নিজেরা বহন করে গাড়ীতে নিয়ে উঠাতাম। রাস্তা তৈরী মানে রাজপথ তৈরী করতাম তা নয়, মোটর চলার উপযোগী রাস্তা কোন রকমে করে নিতাম বালি পাথর সরিয়ে।

সারা রাস্তা গাড়ীর যে কি ভীষণ ঝাঁকুনি তা বলবার কথা নয়। এ ঝাঁকুনিতে দাঁতের অপকার হয় আগে শুনেছিলাম, এবার সে অভিজ্ঞতা হল। আমার দাঁত সত্যিই শিথিল হয়ে গিয়েছিল মরুপথে মোটর-ভ্রমণের পরে।

অবশেষে অর্দ্ধমৃত অবস্থায় আমরা তো আগাদিস্ সহরে পৌঁছে গেলাম এবং কল্পনা করলাম দিন কতক এখানে বিশ্রাম করে অবসাদ দূর করতে পারব। কিন্তু ভগবান আমাদের অদৃষ্টে সুখ লেখেন নি সেবার।

সেই রাত্রেই আমরা যে দলটি পেছনে ফেলে এসেছিলাম, সেই দলের জনৈক আরবীয় গাইড টলতে টলতে অর্দ্ধমৃত অবস্থায় আমাদের তাঁবুতে ঢুকল। তার পা দুখানা কেটে

ইঞ্জিন পড়ছে, তার শরীর ও স্নায়ুমণ্ডলীর অবস্থা খুবই খারাপ।

তার মুখে যে সংবাদ শোনা গেল তাতে আমাদের বিশ্রাম করা আর চলল না।

যে-গাড়ীখানা আমরা পিছনে ফেলে এসেছিলাম, তার লোকজন আলেক্সিয়াস থেকে টায়ার এনে গাড়ী মেরামত করে নিয়ে আমাদের ধরবার উদ্দেশে সজোরে মোটর চালায়। তার ফলে আগাদিস থেকে ৫০ মাইল দূরে ঘোর মরুভূমির মধ্যে মোটর বিগড়ে অচল হয়ে পড়ে। না পড়লে আশ্চর্য্যের বিষয় হত। মোটরে যারা ছিল, তাদের এ ধারণা ছিল না যে আগাদিস্ সহর এখনও ৫০ মাইল দূরে। তারা নিতান্ত নির্ব্বোধ; উস্মানের যা না করে, তাই করে বসল—অর্থাৎ বাকী পথ টুকু হেঁটেই যাওয়া যাক, এই সঙ্কল্প করে সেই ভীষণ জলহীন, পথচিহ্ন-হীন, উত্তপ্ত মরুভূমির মধ্যে দিয়ে আগাদিস অভিমুখে পদব্রজে রওনা হল।

কিন্তু মাত্র দশ মাইল পথ অতিক্রম করার পরেই, সকলেই তৃষ্ণায় ও ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে আর এক পাও হেঁটে অক্ষম হয়ে পড়ল। তাদের মধ্যে এই সাহসী ও বিশ্বাসী আরবীয় ভৃত্য কেবল একটু খাড়া ছিল এবং সে একা প্রায় ছুটতে ছুটতে এসেছে তীক্ষ্ণ প্রস্তরসঙ্কুল এই চল্লিশ মাইল রাস্তা আমাদের সংবাদ দিতে।

আমরা স্তম্ভিত অবাক হয়ে গেলাম এই আরবীর গাইডের ক্ষমতা ও অদ্ভুত কষ্টসহিষ্ণুতা দেখে। যে রাস্তায় মোটর হেঁটে পারে না অত বেগে, সে রাস্তায় ঠিক তত বেগেই সে দৌড়ে এসেছে, নইলে এত শীঘ্রগির সে আমাদের কাছে এসে খবর দিতে পারত না।

যাই হ'ক আমরা লরিতে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি বোঝাই করে সেই মুহূর্ত্তেই রওনা হলাম। আরবীয় ভৃত্যটি আমাদের সঙ্গে নিজের ইচ্ছাতেই চলল, বললে সে সঙ্গে না থাকলে আমরা সঙ্গীদের খুঁজে বার করতে পারব না।

আমরা গিয়ে দেখি কেটলগুলো ও বেলাবাহুল অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে।

বিস্ময় আরবীয়টীর অদ্ভুত সাহস ও প্রভুভক্তির গুণই এ যাত্রা তাদের বেঁচে গেল, নতুবা তাদের মৃত্যু ছিল নিশ্চিত। গাড়ীখানার যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছিল। আমরা কয়েকঘণ্টা ধরে গাড়ী মেরামত করবার ব্যর্থ চেষ্টা করবার পরে স্থির করলাম, যেখানা টেনে আগাদিসে নিয়ে যাওয়াই শ্রেয়ঃ। মরুভূমির মধ্যে পড়ে থাকলে আরবীয়েরা এ গাড়ীর লোহা-লক্কড় কিছু রাখবে না।

৩০শে নভেম্বর তারিখে আমরা আবার আগাদিস পৌঁছলাম।

পৌঁছে শুনতে পেলাম লবণব্যাপারী বণিক্-দলের উটগুলি ৩' দিনের পূর্ব্বে আগাদিস থেকে চলে গিয়েছে বিল্মার দিকে।

আগাদিস থেকে বিল্মা পাঁচশো মাইল দূরে। আমরা যে-কাজের জন্যে এসেছি তা করতেই হবে। বিল্মাগামী বণিক্‌দলের নাগাল ধরতেই হবে আমাদের। অথচ এই

মরুস্থানে বিশ্রামরত উটের দল।

পাঁচশো মাইল পথ মোটরে যাওয়া আর চলবে না। সুতরাং আমরা উট কিনে এই পথ দ্রুত অতিক্রম করা ঠিক করে ফেললাম।

আগাদিস আফ্রিকার মরুভূমির মধ্যস্থ অন্যতম প্রধান সহর। এর চারিধারে মাটির দেওয়াল দিয়ে ঘেরা, সহরের মধ্যে লোকসংখ্যা প্রায় ৩'হাজার। সুলতানের প্রাসাদ এবং উঁচু মিনারওয়ালা মসজিদ সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে।

প্রাসাদ বলতে যা বোঝায়, সুলতানের প্রাসাদ তা নয়। অত্যন্ত সাদাসিদে ধরণের ব্যাপার। সমগ্র সহরটি কতকগুলি মাটির তৈরী বাড়ীর সমষ্টি মাত্র। মরুভূমির সমুদ্রের মধ্যে এ যেন একটি দ্বীপ।

তবে এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, আগাদিস সহর অতীব প্রাচীন।

বহুকাল থেকে এ সহর দক্ষিণগামী সার্থবাহ বণিকদল ও তাদের উষ্ট্র-বাহিনীর পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আফ্রিকার এ অঞ্চলের অন্তর্বাণিজ্যের কিছু অংশ নিয়ন্ত্রিত করছে।

ফরাসী গবর্ণমেণ্ট এখানে এক দল সৈন্য রেখে দিয়েছেন, কারণ এই সব মরু মধ্যস্থ সহরে আরবীয় দস্যুদের উৎপাত অত্যন্ত বেশী। লুঠতরাজ সাহারা মরুভূমির প্রধান শিল্প বললেও অত্যুক্তি হয় না। শাসনযন্ত্র একটু শিথিল হলেই দস্যুরা তার সুযোগ নিয়ে অধিবাসীদের ধনপ্রাণ বিপন্ন করে

মেহারীতে বাবে বাবে লুঠতরাজ।

তুলবে। ফরাসী গবর্ণমেণ্টের কড়া শাসনে, বর্ত্তমানে দস্যুদের কিছু অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে সন্দেহ নেই, তবে একেবারে যে তাদের কাজ বন্ধ হয়ে তারা বেকার হয়েছে তা নয়। মাঝে মাঝে লুঠতরাজ বেশ চলে।

এ অঞ্চলে সাধারণতঃ তুয়ারেগ জাতি বাস করে।

এরাই সাহারা অঞ্চলের 'অবগুণ্ঠনকারী আরবীয়' বলে প্রসিদ্ধ। এই নামের কারণ এরা সর্ব্বদাই দাদা, কালো বা নীলবস্ত্রে এদের মুখ ঢেকে শুধু চোখ দুটি বার করে রাখে। অবশ্য মরুভূমির ভীষণ উত্তপ্ত বাতাস এর খানিকটা কারণ, বাকীটা বোধ হয় ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশাসনের ব্যাপার। তুয়ারেগ জাতির লোকেরা দীর্ঘাকৃতি, একহারা ও কষ্টসহিষ্ণু। এদের মুখমণ্ডলের গড়ন নিগ্রোদের মত নয়, অনেকটা ইউরোপীয়দের মত।

এরা অত্যন্ত সাহসী এবং স্বাধীন প্রকৃতির মানুষ। কাউকে বড় একটা ভয় করে চলে না। সাহারার মধ্যে উটের ভাল চড়নদার হিসেবে এদের খ্যাতি আছে।

তবে এদের একটা দোষ এই যে, এরা নিজেদের আভিজাত্য সম্বন্ধে গর্ব্ব পোষণ করে এবং অন্যান্য জাতিকে ঘৃণার চক্ষে দেখে।

পুরুষদের চেয়ে মেয়েরা বেঁটে। অনেকেই পাঁচ ফুটের বেশী লম্বা নয়, বয়স বেশী হয়ে গেলে প্রায়ই মোটা হয়ে পড়ে, যেটা পুরুষেরা আদৌ হয় না। সুলকায় পুরুষ এদের মধ্যে দেখা যায় না।

তুয়ারেগ মেয়েরা গৃহকর্ম্ম করে, পুরুষেরা গৃহকর্ম্মে এদের কোন সাহায্য করে না, বরং বসে থাকে। এর কারণ এই যে, তুয়ারেগরা প্রাচীন আমলের যোদ্ধা জাতি। তাদের পুরুষেরা দূরপথে ভ্রমণ, যুদ্ধ বা লুঠতরাজকেই পুরুষের উপযুক্ত কাজ বলে মনে করে।

উট যোগাড় করতে আমাদের বেশ বেগ পেতে হল, কারণ সরবরাহী বণিকদল এ অঞ্চলের সব উট নিয়ে গিয়েছিল। যে সব উট আমরা পেলাম, তারা আগাদিস্ থেকে বিলমা যাবার উপযুক্ত নয়; মরুভূমির মধ্য দিয়ে অত দূর পথে পাড়ি দেবার শক্তি তাদের নেই।

দশ বার বছর বয়েস না হলে উট ভার বইতে পারে না বা পূর্ণবয়স্ক বলে গণ্য হয় না, পনেরো বছর এদের পূর্ণ যৌবনের বয়েস। কুড়ি বছর পার হয়ে গেলে তাকে দিয়ে কোন কঠিন কাজ করান আর চলে না, ত্রিশ বছরে এদের কার্য্যকাল শেষ হয়ে যায়।

উট অদ্ভুত জন্তু। মানুষের মত এদের মধ্যেও খোস্-মেজাজী ও বদমেজাজী উট আছে। তবে সাধারণতঃ ওরা নিরীহ প্রকৃতির প্রাণী।

আগাদিস্ সহরের চারি দিকে ৫০ মাইল পর্য্যন্ত বহু অনুসন্ধানের ফলে আমরা অবশেষে পঁয়তাল্লিশটি উট যোগাড় করি।

১৬ই নভেম্বর তারিখে বিলমা রওনা হই।

উটের জোগাড় করতে আমাদের লেগেছিল পনের দিন।

আমরা আবার বেরিয়ে পড়লুম মরুভূমির উদ্দেশে।

লবণবাহী বণিক্‌দলকে ধরতে গেলে খুব তাড়াতাড়ি আমাদের যাওয়া দরকার। সুতরাং প্রথম থেকেই আমি কি উটকে কি মানুষকে যত জোরে চালাতে পারা যায় তাই চালাচ্ছিলাম।

দিন আঠার ঘণ্টা করে আমাদের যেতেই হবে।

এতে কাটত সারা দিন এবং অর্দ্ধেক রাত্রি—রাত বারটা পর্য্যন্ত।

এর ফলে উটের দল যে ক্রমশঃ ক্লান্ত হয়ে পড়ছে সেটা বেশী বলা নয়। আমাদের কিন্তু এ না করে উপায় নেই, নতুবা এতটা কষ্ট করে আসাই বিফল হয়ে যায়।

আমাদের প্রথম সম্ভবা স্থান টিবেলো; ২০শে নভেম্বরের মধ্যেই আমরা পৌঁছে গেলুম সেখানে।

এই জায়গার পরে উটের খাদ্য বা জল আর কোথাও পাওয়া যাবে না, যতক্ষণ আমরা দশদিনের পথ দূরবর্ত্তী ফাচি নামক স্থানে না পৌঁছাই।

এখানে আমরা দুটি ছাগল ক্রয় করি। টিনে বন্ধ মাংস ও তরকারী খেয়ে খেয়ে আমাদের অরুচি ধরে গিয়েছিল।

টিবেলোতে এক রাত্রির বেশী আমরা থাকতে পারলাম না। তার পর ক'দিন অনবরত হাঁটবার পরে ২০শে নভেম্বর তারিখে আমরা ফাচি পৌঁছে গেলাম। এখানে এসেও যে আমরা যথেষ্ট বিশ্রামের অবকাশ পেয়েছিলাম, তা নয়।

আমাদের এই কঠিন পরিশ্রমজনক ভ্রমণের ফলে টিবেলো থেকে ফাচির মধ্যে তিনটি উট মারা পড়ল এবং ফাচি ত্যাগ করবার সময়ে একটি উটকে পেছনে ফেলে যেতে হল।

ফাচি সহরের অধিবাসীরা আমাদের সাদরে অভ্যর্থনা করল। আমরা এখানে পৌঁছবার আগের দিন তিন বছর পরে এখানে প্রথম বৃষ্টি পড়েছিল, ওরা ধরে নিলে আমাদের শুভাগমনের ফলেই এরূপ ঘটেছে।

ফাচি অত্যন্ত অদ্ভুত সহর। ঠিক সহর একে বলা যায় না। গ্রাম বললেই হয়, কিন্তু এই সহরের বাড়ী-ঘর ও দেওয়াল লবণের তৈরী। বহু কালের ধুলো জমে তাদের রং দেখতে কালো হয়ে গিয়েছে বটে এবং খুব শক্ত পাথরের মত হয়ে গিয়েছে বটে, কিন্তু সেগুলো যে লবণের এ বিষয়ে ভুল নেই।

সহরের গলিঘুঁজি এত গোলমেলে, একবার পথ হারিয়ে ফেলে সে গোলকধাঁধার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসাই শক্ত।

ফাচি সহরের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, এখানে খাদ্যদ্রব্য খুব বেশী মেলে না। একে তো এর চারিদিকে ভীষণ জলহীন মরু, ক্ষুদ্র যে মরুদ্বীপে ফাচি অবস্থিত, তার মধ্যে কতকগুলো খেজুরগাছ ছাড়া অন্য কিছু জন্মায় না। লোকগুলোকে দেখে বেশ মনে হয় এরা পেট ভরে কখনও খেতে পায় না। বিদেশীদের দিকে এরা যে ভাবে লোলুপ দৃষ্টিতে চায়, তাতে আমি তো কখন একা বা অন্ধকারে নির্জ্জন স্থানে এদের সম্মুখীন হওয়া নিরাপদ মনে করি না।

দামামা-বাদক: সাহারা অঞ্চলে সকল শ্রমিক দামামার তালে তালে কাজ করে।

এরা লুঠতরাজ ছাড়া আর কি ভাবে জীবিকানির্ব্বাহ করতে পারে, তা আমার ধারণার অতীত। অন্য কোন্ ব্যবসা এই ভীষণ মরুভূমি অঞ্চলে চলবে!

প্রকৃতপক্ষে এক সময়ে লুঠতরাজ বা ডাকাতি সাহারা অঞ্চলের প্রধান ব্যবসা ছিল, এখন ফরাসী গবর্ণমেণ্টের কড়া শাসনে যদিও তা কিছু কমেছে, তবুও একেবারে বন্ধ হয় নি।

শাসনের শৃঙ্খল যেখানেই কিছুমাত্র শিথিল, ডাকাতি সেখানে নিজ মূর্ত্তিতে প্রকট।

এদের লুঠতরাজের প্রধান উদ্দেশ্য দুটি—স্ত্রীলোক ও উট

সংগ্রহ করা। যে গ্রাম যেদিন আক্রান্ত হবে, সে স্থান হতে ডাকাতের দলের সম্মেলন স্থান থেকে কয়েক শত মাইল ঘুরে, কিন্তু এই জলহীন মরুভূমি পাড়ি দিয়ে ডাকাতের দল ঠিক সেখানে গিয়ে পৌঁছবে। পুরুষানুক্রমে এদের এই ব্যবসা। তা ছাড়া এ দেশে সবাই ডাকাত, সুযোগ পেলে কেউ লুঠতরাজ করতে ছাড়ে না। ডাকাতি করে অপরের স্ত্রী কন্যা বা ধন-সম্পত্তি ছিনিয়ে আনা সেখানে গৌরবের কাজ বলে গণ্য, সেখানে ত এমন হবেই।

একবার রওনা হয়ে ডাকাতের দল খুব দ্রুত চলে এবং ভোর বেলা গিয়ে নির্দিষ্ট গ্রামে পৌঁছে গ্রাম আক্রমণ করে। ভোর বেলায় সবাই থাকে ঘুমিয়ে, সে সময় হঠাৎ আক্রমণ করলে অধিবাসীরা বাধা দেওয়ার পূর্বেই লুণ্ঠিত দ্রব্য সংগ্রহ করে পালাবার সুযোগ পাওয়া যায়।

লবণবাহী বণিকদলের উৎপত্তির একটা প্রধান কারণ সাহারা অঞ্চলের এই ডাকাতির ভয়। বছরের মধ্যে একবার বিভিন্ন দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধজাতিরা একত্র হয়ে দল বাঁধে সুদূর বিল্মা ও কাঁচি থেকে লবণ সংগ্রহ করে আনবার জন্য। লবণ সাহারার মুদ্রা। লবণখণ্ডের পরিবর্তে এখানে উট, এমন কি স্ত্রীলোকও কিনতে পাওয়া যায়, যদিও ফরাসী গবর্ণমেণ্টের কড়াকড়িতে মানুষ বেচাকেনার প্রথা প্রায় লোপ পেয়েছে।

১লা ডিসেম্বর আমরা কাঁচি ত্যাগ করলাম। কিছুদূর এসে মরুভূমির পুলিসবাহিনীর সঙ্গে দেখা। তাদের মুখে শোনা গেল লবণবাহী বণিকদলের উট এখান থেকে ফিরে গিয়েছে। আমরা খুব আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। বারো হাজার উট আমাদের আসবার সময়ে মরুভূমির মধ্য দিয়ে গিয়েছে আমাদের বিপরীত দিকে, অথচ আমরা তার সাড়াসন্ধানই পাই নি।

এখানে একজন গাইডের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তার বয়েস ৭২ বছর, সে এই দুস্তর মরুভূমি না কি একাত্তর বার পার হয়েছে। তার তিনটী স্ত্রী বর্ত্তমান।

মরুভূমির মধ্যে দিয়ে যেতে না যেতে ভীষণ বালির ঝড় উঠলো। আমাদের উট দল কিছুতেই অগ্রসর হতে চাইলে না। আমরা বালির মধ্যে গর্ত্ত খুঁড়ে চারিধারে বাক্স সাজিয়ে দেওয়াল রচনা করে তার আড়ালে আশ্রয় নিলাম। ঝড়ের ভীষণ বেগ যখন একটু থামল তখন দু' রাত্রি মরুভূমিতে যাপন করবার পরে আমরা আবার কাঁচিতে ফিরলাম। এর পরে দুদিন কাঁচিতে আটকে বসে রইলাম, ঝড়ের থামবার নামও নেই। কাঁচি সহরটা খুব ছোট। এখানে একটী ফরাসী দুর্গ ও একজন ফরাসী সামরিক কর্ম্মচারী আছে। কাঁচির কিছু দূরে বিখ্যাত লবণের খনি। বহু প্রাচীনকাল থেকে এ লবণ-খনির কাজ হচ্ছে। পূর্ব্বে ভূমধ্যসাগরের উপকূল থেকে বণিকদল এখানে লবণ সংগ্রহ করতে আসত, এখন ব্যবসা চলে শুধু দক্ষিণ অঞ্চলের সঙ্গে।

লবণ-খনি থেকে লম্বা হাতলবিশিষ্ট কোদালের সাহায্যে লবণ তোলা হয়। খনিতে যারা কাজ করে, তাদের এক হাঁটু লবণাক্ত জলে দাঁড়িয়ে লবণ তুলতে হয়। এ কাজ খুব অস্বাস্থ্যকর। যে ক্রীতদাসেরা এ কাজে নিযুক্ত থাকে, তারা বেশীদিন বাঁচে না। মাস দুইয়ের মধ্যেই এদের শরীরে একপ্রকার ক্ষত উৎপন্ন হয়, তাতেই ওরা শেষ পর্য্যন্ত মারা পড়ে।

খনি থেকে লবণখণ্ড তুলে কুলীরা তা পাশে মেড়ে তা থেকে ধুলো তফাৎ করে। তার পর মোচার আকারের ছাঁচে ফেলে কিছুদিন ফেলে রেখে ছাঁচ থেকে খুলে নিলে মোচার মত বড় বড় লবণখণ্ড তৈরী হয়। এগুলি রৌদ্রে শুকিয়ে নিতে হয়।

এই লবণখণ্ড এখানে খুব সস্তা। বণিক্ দলের কাছে এক এক খণ্ড লবণ ২৫ সেন্টিম অর্থাৎ দু' পেন্স মাত্র দামে বিক্রী হয়। যত দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হওয়া যায় তত এর দাম বাড়ে। হাউসালাঁতে এখনও লবণের দাম (যার ওজন প্রায় ৫৫ পাউণ্ড) বেশ চড়া, টেলোয়াতে ৮ শিলিং এবং কানো সহরে দশ শিলিং দামে বিক্রী হয়। প্রত্যেক উট চারিটী থেকে ছ'টী এইরকম লবণখণ্ড বইতে পারে।

আশ্চর্য্যের বিষয় বিল্মা ও কাঁচিতে যে সব কূপ বা ঝরণা আছে, তাদের জল আদৌ লবণাক্ত নয়। এমন কি লবণ-খনির অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী কূপগুলির জলও লবণাক্ত নয়। স্থানীয় লোকের পক্ষে এ ব্যাপার ভগবানের আশীর্ব্বাদস্বরূপ, কারণ জল এখানে অতীব দুষ্প্রাপ্য। বছরে এসব স্থানে সাত আট দিন মাত্র সামান্য বৃষ্টিপাত হয়।

ফরাসী গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেক মানুষ পিছু দশ ফ্রাঁ এবং উট

পিছু পাঁচ ক্রোশ করে আবার করেন। এর বদলে তাঁরা প্রত্যেক লবণবাহী বণিক্-দলের সঙ্গে সশস্ত্র রক্ষীসৈন্য দিয়ে থাকেন, তাদের মরুভূমির ডাকাতদের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য।

দুদিন কাচি সহরে অপেক্ষা করবার পরে বড় একটু কমে গেল। আমরা আবার বণিক্-দলের সন্ধানে বার হই। এবার আমরা তাদের দেখতে পেলাম কাচি থেকে কিছু দূরে একটা মরুভূমির মধ্যে। সে একটা অদ্ভুত দৃশ্য। হাজার হাজার উট সারি বেঁধে চলেছে বহু মাইল দীর্ঘ এক শোভাযাত্রা রচনা করে। এখানে একটা ক্ষুদ্র বিরিঞ্চির মধ্যে আমরা এই উটের দলের কয়েকখানি ভাল ছবি তুললাম।

১৪ই ডিসেম্বর আমরা বণিক্-দলের সঙ্গেই টিবেলো পৌঁছলাম। এখান থেকে উটের দল বিভিন্ন দিকে চলে গেল। বড়দিনের দিন আমরা পৌঁছে গেলাম আগাদিস সহরে। সভ্যজগতের সাথে কতদিন যোগ ছিল না।

এখানে এসে আমরা অষ্টম এডওয়ার্ডের সিংহাসন পরিত্যাগের খবর পেয়ে আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম।

পৌত্তলিক

—শ্রীহরিপদ দত্ত

চলিছে নির্দ্দিষ্ট পথে সূর্য্য, চন্দ্র, তারা,
গ্রহ, উপগ্রহ আদি নির্দ্দিষ্ট সময়ে
যাঁহার আদেশমত, ঢালে বারিধারা
বারিদ ধরণিবক্ষে, চলিয়াছে ব'য়ে
তটিনী সাগরপানে, সিন্ধু অনন্তের.
ধরার পর্য্যায়ক্রমে ঋতুর উদয়,
সজ্জিত কুসুমরাগে কণ্ঠ ধরণীর,
কৈশোর যৌবন জরা ভুঞ্জে জীবচয়,
যথাকালে শুষ্কলতা করে ফলদান
নির্দ্দেশে যাহার, কহ কে তুমি মহান্!

কেহ কহে পিতা তুমি, কোন কহে মাতা,
কেহ কহে "নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ",
শিব শক্তি একাধারে একই দেবতা,
প্রকৃতির রূপে কেহ হেরে তব রূপ;
দেবতা তেত্রিশ কোটী কাহারো হিসাবে—
বিবিধ কল্পিত রূপে গড়িয়া মূরতি
করে নানা উপচারে পূজা ভক্তিভাবে,
পৌত্তলিক বলি, তারা লভিল অখ্যাতি।
কেহ পরব্রহ্ম বলি' অন্তরনিহিত
নিরন্তর তোমার সেবানে নিমজ্জিত।

আদিলেও নিরাকার, অথবা সাকার,
বিশ্বাসে সবার তুমি প্রাপ্ত চরাচরে।
নহে যা'রা পক্ষপাতী মূরতি পূজার,
কুঞ্চিত যা'দের নাসা অবজ্ঞার ভরে
হেরি' দেবতার মূর্ত্তি মানব গঠিত,
না পারি বুঝিতে করে ধারণা কেমনে,
হে অসীম, তোমারে ক্ষুদ্রতায়—জানাইতে
তুমি দেব জানে ত সকলে মনে মনে।
সীমাবদ্ধ মানবের ধারণাশকতি,
তাই তব পূজাতেতু গঠিত মূরতি।

অধম যদিও আমি, করিনু বসতি
অন্তরে আমার নিত্য এ ঘোর বিশ্বাসে।
করি ধ্যান মনে তব, একটি মূরতি
হয় নয়নের 'পরে স্বতঃই বিকাশ।
কে দিবে বলিয়া মোরে কি তপস্যাফলে
নিরাকার সত্তা হবে মূর্ত্তির গোচর?
পূজ্যতম মাতাপিতা মানবমণ্ডলে,
যেখানে সন্তানে পালেন নিরন্তর,—
পূর্ণ শক্তি তব গড়ি মূর্ত্তি মাতৃসম,
বিশ্বপিতে পিতৃভাবে তব পূজা মম।

নদীয়ার কথা

—শ্রীবীরেন্দ্রমোহন আচার্য্য,

দেশের অবস্থা

নদীয়ার সমাজনৈতিক বিবরণপ্রসঙ্গে দেখাইয়াছি, খৃষ্ট অষ্টাদশকালের দ্বিতীয়-ভাগের পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ বিভিন্ন প্রকারের সামাজিক আইন-কানুন ও বিধি-নিষেধের অনুশাসনে জাতীয় জীবনের বিশুদ্ধি রক্ষা করিবার প্রচেষ্টা কিরূপভাবে চলিয়াছে। বর্ত্তমানে আমরা দেখিব, সেই অনুশাসনের ফলে নদীয়ার বুকে কি ভাবে কতখানি পরিবর্ত্তন ঘটিল। রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রাজা-রাজড়ার উত্থান-পতনের ইতিহাসই লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তেমনি সমাজনৈতিক ইতিহাসেও সমাজকর্ত্তাদের বিভিন্ন প্রকার সমাজশাসন-পদ্ধতিই দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু দেশের প্রকৃত সুখদুঃখের কথা, অসংখ্য জনসাধারণের রীতি-নীতি ও রুচির কথা, সামাজিক প্রথার কথা না জানিলে দেশের প্রকৃত অবস্থা জানা সম্ভব নহে।

অতি প্রাচীন সেন-রাজাদের আমলের ইতিহাসের অধিকাংশই আজ বিস্মৃতির অন্ধকারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ইতস্ততঃবিক্ষিপ্ত খোটাকতক কিম্বদন্তী, বিভিন্ন কুলজীগ্রন্থে ও সাহিত্যে অসামঞ্জস্যপূর্ণ শ্লোকাবলী, পরবর্ত্তী কালের ঐতিহাসিক-লিখিত কতকার ইসান দেওয়া বিকৃত ও অসঙ্গত কাহিনী ও খানকতক লুপ্তপ্রায় তাম্রশাসনের অস্পষ্ট ইঙ্গিত অবলম্বনে অতীতের দুরধিগম্য অন্ধকার অতিরঞ্জিত করিয়া ষষ্ঠ শতাব্দীক বৎসর পূর্ব্বেকার একটা আনুমানিক চিত্র আঁকিয়া লইয়াছি মাত্র। ইহাতে অবশ্য বড় বড় রাষ্ট্রনৈতিক ও সমাজনৈতিক মূল ঘটনাগুলি কিছু কিছু জানা যায়—জনসাধারণের নিত্য-নৈমিত্তিক ঘর-করনা কথা,সুখ-দুঃখের কথা একেবারেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তবে সাহিত্য-রস রসিক বর্দ্ধমান হিন্দু নরপতির প্রধান কেন্দ্র হওয়ায়, নবদ্বীপ ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে যে যথোচিত সংস্কৃত-শিক্ষা ও ধর্ম্ম-চর্চ্চার প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

এই সময়ে হিন্দু-রাজত্বের শাসনপ্রণালী কিরূপ ছিল,—রাজাদের রাজসভা হইতে বিভিন্নতম প্রজার গৃহপর্য্যন্ত কি ভাবে শাসিত হইত, জনসাধারণের প্রাত্যহিক অভাব অভিযোগের কথা কি উপায়ে পাত্র-মিত্র-পরিবেষ্টিত রাজ-সমীপে নীত হইত, তাহার কোন বিবরণই আজ পাওয়া যায় না,—তবে তাম্র-শাসনোল্লিখিত রাজ-কর্ম্মচারীদের নাম, উপাধি, সংখ্যা ও প্রাচীন পুঁথিপত্রে হইতে আমরা অনুমান করিতে পারি—দেশে তখন সুশাসনের অভাব ছিল না। বিভিন্ন উপাধিধারী রাজকর্ম্মচারিগণ দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তি ও সুখলা রক্ষার্থে সদাসর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিতেন। বিচার-বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারীর নাম ছিল মহাক্ষপটলিক ও মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ। কৌষলাধ্যক্ষ বিভাগে বৃহদুপরিক ও মণ্ডলাধ্যক্ষ, কোষাগার কার্য্যে মহাভোগিক, শান্তি, রক্ষায় দণ্ডপাশিক, নগর রক্ষার বৈশালাধিষ্ঠানিক প্রভৃতি বিভিন্ন উপাধিধারী রাজকর্ম্মচারিগণ নিযুক্ত থাকিতেন। রাজকীয় যুদ্ধ ব্যাপারে মহাসন্ধিবিগ্রহিক, মহাসেনাপতি, দণ্ডনায়কবিষয়িক প্রভৃতি যুদ্ধোপযোগী কর্ম্মচারী যথাস্থানে ও যথাকালে স্ব স্ব গৌরব গৌরবে পরিচয় প্রদান করিতে ত্রুটি করিতেন না। ইহা ছাড়া মহাশ্বপতি, মহাশ্বেতিহার, মহাপীলপতি, গৌল্মিক প্রভৃতি বিভিন্ন পদবিশিষ্ট বহু কর্ম্মচারীর কথা সেনরাজদের তাম্র-শাসন ও পুঁথিপত্র হইতে জানা যায়।

ধরণের ও তুরান তখন রাজস্বের একটী অবশ্যকরণীয় কার্য্য বলিয়া গণ্য হইত, এবং ভূমিব্যবস্থার ভূসম্পত্তি দান করিয়া দানপত্র তাম্রফলকে লিপিবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইত—ইহাই তাম্র-শাসন। সেনরাজদের অনেকগুলি তাম্রশাসন বাঙ্গলা দেশের নানাস্থান হইতে পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে চারখানি লক্ষ্মণসেনদেবের। রাণাঘাটের নিকটবর্ত্তী আনুলিয়া গ্রামে একখানি লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। সাহিত্যরসিক লক্ষ্মণসেনের রাজসভায় সাহিত্য ও সঙ্গীত প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার কলাবিদ্যারই যথেষ্ট চর্চ্চা হইত। কবি জয়দেব, উমাপতিধর, শরণ, গোবর্দ্ধন ও শোবর্দ্ধনাচার্য্য এই পঞ্চরত্নে অলঙ্কৃত রাজসভা তৎকালে প্রাচ্য ভারতের সর্ব্বপ্রকার সভ্যতা ও কৃষ্টি বিকিরণের কেন্দ্র ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। উমাপতিধর-রচিত লক্ষ্মণসেন মহারাজের সভায় বর্ণনা তাঁহাকে নিখিল কলার পরিষৎ ও অসংখ্য বাহিনী ও রণতরীর অধিপতি বলিয়া জানা যায়। এই পঞ্চরত্নের সকলেই শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন, তন্মধ্যে জয়দেব কবির কোমল-কান্ত পদাবলীর কথা আর বেশী করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। রাজসাহিত্যের এক প্রান্ত হইতে তাঁহার বংশের অনুপম বাক্-বাধুরী সমগ্র দেশ ও কাল অনুপ্লাবিত করিয়া তুলিয়াছে। দেশে স্ত্রী-শিক্ষা এমন কি স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে নৃত্যগীতের প্রচলনও যথেষ্ট পরিমাণে ছিল বলিয়া অনুমান হয়। কবি জয়দেবের স্ত্রী পদ্মাবতী বিশেষ নৃত্যগীত-নিপুণা ছিলেন বলিয়া জানা যায়। ইহার পর নদীয়ার মুসলমান যুগের প্রারম্ভে দেশ কিছুকাল ধরিয়া রাষ্ট্রবিপ্লবের হাঙ্গামা চলে, সুতরাং এই সময়ের মধ্যে দেশের কথা, জনসাধারণের রীতি-নীতির কথা সম্বলিত কোনও নিদর্শনই বিশেষ কোথাও পাওয়া সম্ভব নহে।

এই সময়ের কিছু পরেই নদীয়ায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অভ্যুদয় ঘটে এবং তাঁহার আবির্ভাবের কিছু পর হইতেই সমগ্র দেশে পুনর্জ্জাগরণের সাড়া পড়িয়া যায়। এই রেনেসাঁস সভ্যতার পূর্ণ পরশ লাভ করিয়া সমগ্র বাঙ্গলায় সর্ব্বপ্রকার আধ্যাত্মিক অবোধতি ও সামাজিক বিপ্লবনতা-

বিবাহের-প্রচেষ্টা কি দুনিয়ার তাবে চলিতে থাকে যথাস্থানে তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রদান করিবার চেষ্টা করিব। এই সূত্রে লিখিত বৈষ্ণব-সাহিত্যের বহু গ্রন্থাদি হইতে তাৎকালিক দেশের অবস্থানুযায়ী অবস্থার কথা বহুল পরিমাণে জ্ঞাত হওয়া যায়। দেশে দুধ-পানির অভাব তখন ছিল না—গৃহস্থালীর অবস্থাও বেশ সচ্ছল ছিল বলিয়া অনুমান হয়। অতি সামান্য গৃহস্থের বাড়ি হইতেও অতিথি বিমুখ না হয় অতিথি বিমুখ করা সামাজিক অপরাধের মধ্যেই গণ্য হইত। ঘরে-ঘরে, গুরি-তরকারী ও দধি, দুগ্ধ, ঘৃত তখন প্রায় সকল গৃহেই যথেষ্ট পরিমাণে মজুত থাকিত। কবিরাজ গোস্বামী, চরিতামৃতে অদ্বৈত-ভবনে মহাপ্রভুর আগমন উপলক্ষে ছয়মের যে তালিকা দিয়াছেন, তাহা অতিরঞ্জন দোষ-দুষ্ট হইলেও তাহা হইতে একটা আঁচ করিয়া লইতে পারি।

নানা শীত ঘৃত-সিক্ত পায়সের স্তূপ
চারিদিকে বাস্তুক ভোজ্য আর মূলসেপ
বাস্তুক-শাক-পাক বিবিধপ্রকার
পটোল কুষ্মাণ্ড বড়ী মানকচু আর
চই মরীচ সূক্তা দিয়া সব কল ঘৃতে
অমৃত নিম্বক পঞ্চবিধ তিক্ত ঝালে
কোমল বিবপত্র সহ ভাজা বার্ত্তাকী
পটোল মূলবড়ী ভাজা কুষ্মাণ্ড মানচাকী
মাষমুদ্গসূপ দ্বারা পর্পটা মধুর
ঘোটা-অন্ত ঘৃত কুষ্মাণ্ড সকল প্রচুর।

ইহা ছাড়া আরও নানা স্থানে বিভিন্ন প্রকারের রসনা-লোলুপকারী চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় খাদ্যবস্তুর সুদীর্ঘ তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। মহাপ্রভুর পায়স-মিষ্টান্নাদি তখন ঘরে ঘরে প্রস্তুত হইত। পথে পথে ভাজা-মিষ্টান্নের ভাণ্ডার স্থাপিত হইয়া দুনিয়াদিগের অত্যাবশ্যক খাদ্য-বিক্রয়ের ব্যবস্থা তখনও হয় নাই। পদকল্পতরুতে শ্রীবাসের রন্ধনবিষয়ক পেশ্বরের একটি পদে যতপ্রকার পিষ্টকাদির বর্ণনা দেওয়া আছে তাহার অধিকাংশই আজ অপ্রচলিত।

কর্পূর বালতী, কদলী সুবতী, মনোলোভা মনোহরা।
কদলা কদলা বেটেরী পদ্মপত্র বহিছুর সুবসুরা।
অমৃত কেলিকা, বিবিধ পাতুকা চাকিবত পদ্মচিনি।
ভাজা খাজা পেড়া, চানা চক্রচুড়া, মিছরি মাখিয়া ক্ষেনি।
লুচি পুরি কচি, রস পাকে ভরি, সরভাজা সরপুরি।
মাটিয়া পাকরা রসপুরি খরা কদল অমৃত কুণ্ডী।

কৃষ্ণনগরের সরপুরিয়া সরভাজার প্রাচীনত্ব ইহা হইতেই অনুমান করা যায়।

বৈষ্ণব যুগে সম্ভবতঃ বিলাসিব বাস্তুবাদি বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। শাক-সূক্তা হইতে আরম্ভ করিয়া দধি-দুগ্ধ, পায়স-মিষ্টান্নের যাবাই চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়ের 'মিক্স কটোরা'র ব্যবস্থা হইত। পরবর্ত্তী যুগে মুসলমান সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া দেশের সাধারণ রীতি-নীতি ও বেশভূষায় যেমন আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল, আহার-ব্যবহারেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। বিলাসিতা বাহুল্যের ব্যবস্থা দিয়া আমির ওমরাহের তালিকা ক্রমশঃ সুদীর্ঘতর হইয়া চলিল। বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন প্রকার বাস্তুবের একটি তুলনা-আকর্ষক সুদীর্ঘ তালিকা অত্যাবশ্যক হইতে উদ্ধৃত করিলাম।

কাঁচলা ছেঁচকি কই কাল ছাপা ঝোল
শিক পোড়া বুড়ি কাঁটালের বীচি ঝোল
কাল ঝোল ঝাড়া মাছে চিতল মলই
কই মাগুরের ঝোল ছির চাপে কই
মাগো ঝোল বড়কাঁই ঝোল ঝালে সার
তিমড়ীর কাল বাগা অমৃতের তার
ভাঙ্গ ভাবি চাঁপে কই কাঁচলার মুড়া
চিত বিয়া ভাজা মাছে চাঁপিলেক গুঁড়া
আর বিয়া ঝোল মাছ ঝোল চড়চড়ী
আড়ি মাছে আমাদের বিয়া মুগবড়ী
কই কাঁচলার ঝৈলে মাছে ঝেল পাক
মাছের ডিমের বড়া ঘৃতে ঝেল ঢাক

৮

কচি চাল ঘৃত মাখে কলে ঝোল চলা
কালিয়া কোলমা বাগা দেওটি সমবা
অন্ত মাংস শীক ভাজা কাবাব করিয়া
ঢাকিলেক মুড়া আগে মশলা পুরিয়া।

মুসলমানী প্রভাব তখন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, এত বিপুল আমির বাহুল্যের বর্ণনাতেও পক্ষী-ডিমের উল্লেখ কোথাও নাই। মুসলমানী যুগে শত শত বৎসর যাবৎ ব্যবহার শিখিলেও সম্ভবতঃ ভক্ষণব্যবহার বিধি নাই—সেই শিখিয়াছি পাশ্চাত্য জাতির সংস্পর্শে আসিয়া। এখন আমরা সকলভুক্।

এইবার দেকালের বেশভূষার কথা। পাটের পাছড়া ঘুনিয়া এক প্রকার মহার্ঘ বস্ত্র প্রাচীন কালে প্রচলিত ছিল। কবি কৃত্তিবাস গৌড়েশ্বরকে স্বীয় কাব্যপ্রতিভায় চমৎকৃত করিয়া পাটের পাছড়া লাভ করিয়াছিলেন। (রাজা গৌড়েশ্বর দিল পাটের পাছড়া—কৃত্তিবাস)। ধনী স্ত্রীলোকেরা বেতের বসন মধ্যে এক প্রকার সূক্ষ্ম বেসমী বস্ত্র পরিধান করিতেন এবং দরিদ্র ব্যক্তিদের ব্যবহৃত মোটা বস্ত্রের নাম ছিল 'খুকা'। প্রাচীন সাহিত্যের বহুস্থলেই এই বেত ও খুকার উল্লেখ আছে। সাধারণের ব্যবহারযোগ্য মোটা কাপড় তখন এখনকার মত ১২।১৪ হাত করিয়া বোনা সম্ভব হইত না, তাই স্ত্রীলোকেরা সাধারণতঃ এক টুকরা কাপড় পরিধান করিতেন ও আর এক টুকরায় বেত জড়াইয়া ঘাঘরের কাজ হইত।* নদীয়ার বিভিন্ন গ্রামে

* একখানা কাটিয়া পিন্ধে, আর একখানা বান্ধয়ে মাথে। বিজয় গুপ্ত।

বস্ত্র অলঙ্কার এই বস্তুনির্মাণ-কার্যে নৈপুণ্য দেখাইত। তন্মধ্যে শান্তিপুরের বস্ত্রশিল্প সমস্ত বাংলার মধ্যে যে কতখানি উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তবিষ্যতে নবীনার শিল্প পরিচ্ছেদে তাহার বর্ণনা করা যাইবে। শান্তিপুরই ছিল তখনকার বাংলার Fashion maker। শান্তিপুরবাসিনীগণের সৌন্দর্যপ্রিয়তা ও বেশভূষার বাহুল্য তখন অন্যান্য দেশের কুলবধূগণের অনুকরণীয়।

স্ত্রীলোকদিগের অলঙ্কার অতি প্রাচীন যুগে অধিকাংশই লৌহনির্মিত হইত। পরে সম্পন্ন ঘরগুলির মধ্যে স্বর্ণের ব্যবহার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কর্ণে মকর কড়ি, নথ, কুণ্ডল, কুসুমফুল বাউটি, বলয়, বাজু, কণ্ঠে হার, স্বর্ণমণ্ডিত মাথা-নল, কটিতে চন্দ্রহার, পায়ে হাঁসুলি, নূপুর প্রভৃতি অলঙ্কার সুন্দরীদের অঙ্গশোভা বর্দ্ধন করিত।

অদ্বৈত গৃহিণী সীতাঠাকুরাণী শিশু গৌরাঙ্গকে দেখিতে শান্তিপুর হইতে যে বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিতা হইয়া আসিয়াছিলেন, চৈতন্যচরিতামৃতে তাহার বিস্তৃত বর্ণনা আছে, তাহা হইতে তাৎকালিক সম্পন্ন ঘরগুলির সৌখীন বেশ-ভূষার পরিচয় পাওয়া যায়।

স্বর্ণের কড়ি বৌলি রত্নচূড়া পাতলি
স্বর্ণের অঙ্গদ কঙ্কণ।
দুঁহাতে দিব্য শঙ্খ রত্নের বলয় বহু
স্বর্ণমুদ্রা নানা হারগণ।
রত্নবন্ধ হেম ঝুড়ি কটি-পট্টসূত্র ডোরী
রত্ন পদের যত আভরণ।
চিত্রবর্ণ পট্টশাড়ী কুঙ্কুম-কোঠা
স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রা বহুধন।

পুরুষেরাও বহুল পরিমাণে স্বর্ণালঙ্কার ব্যবহার করিতেন। কর্ণে দুল ও বাহুতে অঙ্গদ বলয় বাঁধিয়া বাবরিকাটা বহুমেহে রঞ্জিত গামছা জড়াইয়া, স্কন্ধ-বিলম্বিত সুদীর্ঘ বাবরী চুলে কাঠের চিরুণী গুঁজিয়া তাঁহারা যখন রাজপথে বাহির হইতেন, তখন তাঁহাদের সুগঠিত দেহযষ্টিতে ও অনাবিল হাস্যোল্লাসে পল্লীগৃহ মুখরিত হইয়া উঠিত। পুরুষদের সুদীর্ঘ কেশ রাখা তখন ছিল সৌখীনতার অঙ্গ। শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাসের সময়ে তাঁহার চাঁচর-চিকুর ছেদন-ঘটনা বহু পদে অতি মর্ম্মান্তিক ভাবেই বর্ণিত হইয়াছে।

বিবাহোদি সামাজিক ক্রিয়াকর্ম, অবস্থা ও সাধ্যমত জাঁকজমকের সঙ্গেই সম্পন্ন হইত। বালিকার জন্মাসন্নবর্ষ-প্রথা সেই সময়েও প্রচলিত ছিল, তবে বয়স্থের নিয়মিত পেষণে কন্যার পিতার চিন্তা যুচু চরাইবার ব্যবস্থা তখন ছিল না। বিবাহে পণ হিসাবে পাঁচটি গ্রন্থিতন্ত্রী প্রথাই সাধারণ ভাবে চলিত। মহাপ্রভুর প্রথম বিবাহ এই ভাবেই সম্পন্ন হয়। কিন্তু তাঁহার দ্বিতীয়বারের বিবাহ মর্য্যাদোচিত ঘুমধামের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল বলিয়া বৃন্দাবন দাস ও লোচন দাস মহা উৎসাহে বর্ণনা করিয়াছেন।

বুদ্ধিমন্ত খান কৈল সব সজ্জা তাই।
যাবনিকার মত এ বিবাহে কিছু নাই।
এ বিবাহে পণ্ডিতের করাইল হেন।
রাজকুমারের মত লোকে দেখে যেন।

কিন্তু এই রাজকুমারের মত বিবাহের যে বর্ণনা আছে, তাহাতে আজ-কালকার অতি অসাধারণ ব্যক্তিদের পিতারও ঘুমাইয়া মুখ ফিরাইবেন।

সবারে তাম্বুল মালা দেহ তিন বার।
ভিন্না বাহি কার কত যে ইচ্ছা যাহার॥

সুগন্ধি চন্দন মালা ব্রাহ্মণেরে দিল।
ঘন ঘন তাম্বুল লবঙ্গ ছুই কৈল॥ চৈঃ ভাঃ।

ইহাতেই নবীনার বক্ষ খণ্ড পড়িয়া গেল—এমন করিয়া মালা-চন্দন ও তাম্বুলের ঘৃণ্যা ব্যবহার লক্ষ্যেরাও করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ।

লক্ষেশ্বরো নেখিয়াছি এই নবদ্বীপে।
হেন অবিশ্বাস নাহি করে কারো বংশে॥
এমত চন্দন মালা দিয়া গুয়া পানে।
অন্যান্তরে কেহ কারে নাহি করে দানে॥ চৈঃ ভাঃ।

এই মহামূল্য উপঢৌকনের লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া অনেক লোভাতুর ব্রাহ্মণ ভিন চারিবার করিয়া মালা-চন্দন, গুবাক কাঁকি দিয়া লইয়া গিয়াছেন বলিয়া বৃন্দাবন দাস অনুযোগ করিয়াছেন।

তথি মধ্যে লোভিষ্ঠ অনেক জন আছে।
একবার লইয়া পুনঃ আইসয়ে পাছে॥
আইসয়ে ফিরিয়া পুনঃ লোকের গহনে।
চন্দন গুবাক মালা নিঞা নিঞা চলে॥

বাসরঘর ও স্ত্রীআচার প্রভৃতি এখনকার মতই জাঁকজমকপূর্ণ ছিল। পূর্বেই লিখিয়াছি, বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে কুলস্ত্রীগণের মধ্যে তখন নাচের প্রচলন ছিল। বিবাহাদি উৎসব ব্যাপারে বয়স্থারা লইয়া বা পূর্ণযুবতী কক্ষে বর্ষীয়সী কুলস্ত্রীগণ অবগুণ্ঠনবতী হইয়া ঢোলের তালে তালে নৃত্য করিতেন। অন্তঃপুরিকাদের মধ্যে এই নৃত্যপ্রথা অধিকদিন অপ্রচলিত হয় নাই। বর্তমানে গ্রামস্থ বৃদ্ধাদের মুখে এই নৃত্যের গল্প আমি শুনিয়াছি। গ্রামের সুখ-শান্তিপূর্ণ সরল অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা ও আনন্দময় সজ্জন অবস্থার সহিত সহরবাসিদের সঙ্গে সঙ্গে ইহাও লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

স্ত্রীলোকেরা সাড়ীর সঙ্গে বিচিত্র সূচীকর্ম-শোভিত কাঁচুলি ও ওড়না বা কোতা ব্যবহার করিতেন।* কবিকঙ্কণ চণ্ডীমোদীর কাঁচুলিতে সূচী-কার্যের যে বহুল বর্ণনা আছে, তাহাতে ইহা তাৎকালিক রমণীগণের একটি প্রিয় কর্ম ছিল বলিয়া মনে হয়। অন্যান্য শিল্পকলার মধ্যে চরকার অতি সূক্ষ্ম সূত্র উৎপাদন ও কেনে মাঙ্গলিক কার্যোপলক্ষে অতি সুচারু আলিম্পন অঙ্কনের প্রতিযোগিতা হইত। ইহা ছাড়া বিভিন্ন প্রকার মিষ্টান্ন প্রস্তুত ও রন্ধনকলার প্রতিযোগিতা ত ছিলই।

---

* (কুরুক্ষেত্রের) রাজ্ঞী ও রাজবধূ এবং রাজকন্যারা কাপাস ও কৌষেয় শাটী পরিতেন, কিন্তু প্রায় সমস্ত শুভকর্মোপলক্ষে পশ্চিমোত্তর-দেশীয় সম্ভ্রান্ত মহিলাগণের ন্যায় কাঁচুলি, ঘাঘরা ও ওড়না ব্যবহার করিতেন।—(কিরীটী কুণ্ডলকলী চরিত—পৃঃ ৩৪)

স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় পুরুষেরও বেশ-বিন্যাসের বাহুল্য কম ছিল না। ভদ্রাভদ্রলোকের মধ্যে পুথক্ চিহ্ন তখন বিশেষরূপ, মালাধারণ ও নখনে কজ্জল তখন সৌখীনতার পরিচায়ক ছিল। এই সূত্রে শ্রীচৈতন্যদেবের বাল্যকালের বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়া তাৎকালিক বাবুসজ্জার কথঞ্চিৎ আভাস দিবার চেষ্টা করিলাম।

চন্দনে লেপিত করি সকল শ্রীঅঙ্গ।
মধ্যে মধ্যে শোভয়ে তিলক মনোরঙ্গ।
অষ্টগন্ধাকৃতি করি ললাটে চন্দন।
তদি মধ্যে অতের তিলক সুশোভন।
সুপক্কি মালার পূর্ণ হৈল কলেবর।
অদ্ভুত মুকুট শোভে শ্রীশির উপর।
দিব্য সূক্ষ্ম পীতবস্ত্র বিচিত্র বিধানে।
পরাইয়া কজ্জল দিলেন নয়নে।

সুবর্ণ কুণ্ডল দুই শ্রুতিমূল দোলে।
নানা রত্নহার শোভিলেন বাহুমূলে। চৈঃ ভাঃ।

পরবর্ত্তী কালে ক্রমশঃ সহরবাসিকদের সরল অনাড়ম্ব জীবনযাত্রার ধারায় বেশভূষার বিন্যাসিতা, রুচিবিকার ও নৈতিক চরিত্রের দৌর্ব্বল্য পরিস্ফুট হইয়া উঠে। কাণা, জোব্বা, তাজ প্রভৃতি বিচিত্র পোষাক তখন ধনবানী পোষাক। আচকান, চাপকান, শিরপেঁচ, চুড়িদার পায়জামা প্রভৃতি ভদ্র যুবকের তখন সৌখীনতার পরিচায়ক। অঙ্গ-সজ্জার বিবিধ উপকরণ ও আতর, ফুলুস, কস্তুরী প্রভৃতি গন্ধ দ্রব্যাদির ব্যবহারও ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ইংরাজ নিবাসী দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায় গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিনীতে এই সময়কার স্ত্রীলোকদিগের বেশভূষার যে সুদীর্ঘ বর্ণনা দিয়াছেন তাহা হইতেই এই সময়কার বিলাসবাহুল্য অনুমিত হইবে।

ঢেঁড়ি, চাঁপি, মাকড়ি, কর্ণেত কর্ণফুল
কেহ পরে হীরার কমল বহে দুল
বালিকারে নথ কারো মুক্তা চুনী তাল
নকল বেসরে কার মুখ করে আলো

পরিল গলায় কেহ হেমময় সোণারে
ঝুমঝুমি জড়াও পরে কারো পরে
বুকবুকি জড়াও পরে কারো পরে
সোণায় কতক কারো পদ্মের লহরে
পতির আকৃতি চিহ্ন সোণার মাঝারে
গলায় বাঁধান সোণা সকলের হাতে
পতাবন পাছলি আংটি দিয়া পায়
তাবজী পঞ্চম আর সোণা কিবা তায়

চৈতন্যযুগের সাহিত্যে স্ত্রীলোকদিগের অবরোধপ্রথার কঠোরতা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু উল্লেখ নাই, বরং সম্ভ্রান্ত মহিলারা স্নানের ঘাট ও এপাড়া ওপাড়া সম্বন্ধেই যাতায়াত করিতেছেন দেখিতে পাই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ পুরুষশ্রী মুখে এই অবরোধ-প্রথা বা পর্দ্দাপ্রথার কঠোরতা অনুমান বৃদ্ধি পায়।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি—আর্ত্ত রঘুনন্দনের সময় হইতে হিন্দু বিধবাগণের জীবনযাত্রা অতি কঠোর সংযমের অনুশাসনে বিধি-নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, উপরন্তু তিনি বিধবার সহমরণে প্রথার উৎসাহ দান করিয়া সমস্ত বেশপারিপাট্য ও ভোগবিলাসের বস্তুসমূহের সুচনা করিয়া যান। ইহার ফলে কৌলীন্য দুষ্ট কত-শত সন্তবিধবা যেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় বলপূর্ব্বক মৃত স্বামীর চিতার আরোহি প্রবৃত্ত হইতে লাগিল তাহার ইয়ত্তা নাই। পুরুষের এই অমানুষিক ঘটনার কোনই বাস্তবিক বিবরণ নাই, তবে পুলিশ-সাময়িকীর পৃষ্ঠা হইতে সরকারী বস্তুর ইতস্ততঃ দুই-চারিটা যে বিবরণ পাই তাহাতেই প্রাণ কাঁপিয়া যায়। প্রথম প্রথম গবর্ণমেণ্ট এই ঘটনায় প্রতিরোধ করিতে সাহসী হন নাই। সেই সময়ে বৎসরে অন্ততঃ পক্ষে পাঁচ শতাধিক করিয়া সহীদাহ হইত বলিয়া উল্লিখিত আছে। *

পরে অবশ্য লর্ড বেণ্টিঙ্ক ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে আইন করিয়া এই নিষ্ঠুর প্রথা বন্ধ করিয়া দেন। নদীয়া জেলায় সহীদাহের অনুষ্ঠান সাধারণতঃ শান্তিপুর, নবদ্বীপ, চাকদা প্রভৃতি গঙ্গাতীরবর্ত্তী স্থানগুলিতেই অধিকতর সংঘটিত হইত। সরকারী বস্তুর হইতে জানা যায়, এই একটি জেলাতেই ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে ৫৬ জন, ১৮১৭ খৃঃ ৮৮ জন, ১৮১৮ খৃঃ ৮০ জন ও ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে ৫৭ জন সহীর বলিদান হইয়াছিল।

এই পুরুষ হইতেই পুরুষের বহু বিবাহ করিবার রীতি প্রচলিত হইয়াছিল, ফলে এক একজন পুরুষের মৃত্যুতেই অনেকগুলি করিয়া বিধবার নির্দ্দয় ভাবে প্রাণনাশ হইত। নদীয়া-কাহিনীতে গোটাকতক ঘটনার উল্লেখ আছে, স্থানাভাব বশতঃ মাত্র ২।৩টি এখানে উল্লেখ করিলাম।§ জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ হইবার ভয়ে কোন সদ্য-বিধবা সহীদাহে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে জোর করিয়া তাহাকে কিভাবে অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হইত, কোন্

---

* Speaking roundly more than 500 women were allowed to immolate themselves every year between 1814 and 1826, while the British Government patronized the show.—*The Good Old Age of Honble. John Company*—W. H. Carrey

§ A Kulin Chandra Bandopadhya was killed here 30 years ago, he was married to 100 wives... 80 of his wives performed Suttee on his Funeral pyre. In 1709 at Bagnapara 37 widows were burnt with their husband, the fire was burning 3 days: on the first day 3 were burnt, on the second 15, and on the third day 19; the deceased had over 100 wives. *Calcutta Review* Vol VI. XI. & XII

ষ্টীমিলস কলেজের পণ্ডিত রামরাম ঈশান তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া স্বর্গীয়ক বর্ণনা করিয়াছেন। যাহারা ভয়ে তাহা আর উচ্চারণ করিলাম না।

যমপোকুর গ্রামের গঙ্গাযাত্রী বা সন্তানদের বিসর্জন-প্রথাও নদীয়ায় বিশেষ ভাবে প্রচলিত ছিল।* মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে মুমূর্ষু ব্যক্তিগণকে ঘর হইতে বাহির করিয়া গঙ্গাতীরে উপস্থিত করা হইত। মৃত্যুর পীড়ন ভোগে যাহারা টিকে থাকিত, তাহারা মরিয়া ভূতাইত, কিন্তু এত কষ্ট সহিবার পরও যাহারা মরিয়া উঠিত তাহাদের দুর্দশার সীমা থাকিত না। গঙ্গাযাত্রা করিয়া ঘরে ফিরিবার উপায় নাই, বাধ্য হইয়া গঙ্গাতীরেই আশ্রয় অন্বিষ্টত ও স্বজন-পরিত্যক্ত অবস্থায় বসবাস করিতে হইত।† হ্যামিল্টনের মতে পাঞ্জিপুরের জনসংখ্যার অধিকাংশই না কি এই ভাবে গঠিত।**

নদীয়ায় বহু-স্থলে দণ্ডীভূতী প্রথা প্রবর্তিত হয়। গ্রামের প্রধান প্রধান দশজন ব্যক্তি একত্রিত হইয়া গ্রামস্থ সকলপ্রকার ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিবাদ-বিসম্বাদের নিষ্পত্তি করিয়া দিতেন। অবিশ্য পূর্ব্বাপেক্ষা সমাজ শাসন এই সময়ে অনেকটা শিথিল হইয়া আসিয়াছিল, তথাপি সমাজ-কর্ত্তারা অপরাধী ব্যক্তিকে সামাজিক শাসনের ভয় দেখাইয়াই বিরত করিয়া রাখিতে পারিতেন। ইংরাজেরাও প্রথম আমলে এই দণ্ডীভূতী বিচার-প্রথা বিশেষভাবে মানিয়া লইতেন।* দেশে তখন চুরি-ডাকাতি অত্যাচার অনাচারের অভাব ছিল না, কিন্তু তাই বলিয়া বিশেষ গুরুতর দোষ সপ্রমাণের পর খানা ও বাটী কলিতে করিতে সর্ব্বস্বান্ত হইত না। লাঠি, সড়কি, ঢাল, তরবারি ঘুরাইয়া গ্রামবাসীরাই হৈ হৈ করিয়া অপরাধী গ্রেপ্তার করিয়া বাহির হইয়া পড়িত ও ধরা পড়িলে গাঁয়ের দশজন মিলিয়া যা হোক একটা দাণ্ড ব্যবস্থা করিয়া দিত—এখনকার মত আদালতের সিভিলিকাটিকে এখনি সন্তুষ্ট করিয়া মুক্ত বিহার ক্রয় করিবার শোচনীয় ব্যবস্থা তখন ছিল না। দেশে আর্থিক অসচ্ছলতা ছিল, কিন্তু জিনিষপত্র ছিল সহজ-লভ্য। ঘট, কড়ি, ধান প্রভৃতি অল্পমূল্যের মুদ্রা এবং দ্রব্য-বিনিময় প্রথাই তখন দেশের মধ্যে বিশেষ প্রচলিত। সমাজে ধনিব্যক্তির আধিক্য না থাকিলেও সচ্ছল সমৃদ্ধির ছিল সদ্ভাব।

নদীয়ার হাটে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশজাত বিভিন্ন দ্রব্যাদির বিকি-কিনি হইত বলিয়া ভারেন্স বার্ড উল্লেখ করিয়াছেন। গ্রামে গ্রামে যার যাতে তেজ পার্শ্বণ লাগিয়াই ছিল। সন্ধ্যাকালে শঙ্খ-ঘণ্টাধ্বনিতে পল্লীপ্রাঙ্গণ যাত্রা-কথকতায় মুখর হইয়া উঠিত। পূর্ব্বকোণে বসিয়া নদীয়ার শিল্পী, কারিকর, তাহার স্ব স্ব নৈপুণ্যের পরিচয় প্রদানে করিলে গ্রামস্থ সৌখীন ধনী সম্প্রদায় তাহাকে যথোচিত উৎসাহ প্রদানে ত্রুটি করিতেন না। পল্লী-বাসীর শান্ত নিরুদ্বিগ্ন জীবনযাত্রা আমোদে-আহ্লাদে হাসিয়া খেলিয়া কাটিয়া যাইত, বিচা অভাব-ক্লিষ্ট ও বিচিত্র সমস্যাপীড়িত পোচনীয় অবিচলের বিভীষিকা তাহা ম্লান করিতে পারে নাই। সমাজের ধনিব্যক্তিরা যাহাতে উপার্জ্জন করিতেন তার খরচ করিবার জন্যই। জলদান, ভূমিদান, ষোল ভূতোৎসর্গ প্রভৃতি অবশ্যকরণীয় পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠানে গ্রামের প্রত্যেকেই তাঁহাদের উপার্জ্জনের ভাগ পাইত। সৌখীনতার উপকরণবাহুল্য তখন ছিল না, সভ্যতাবোধও ছিল না। কবি রঙ্গলালের ভাষায় তাৎকালিক নদীয়ার চিত্র—

নানা চিত্রে বাটী বিচিত্র নগরী নানা জাতি বৈসে তথা।
চূর্ণে বিলেপিত হেউল দেহারা নানা বর্ণে রঞ্জিত লতা॥

প্রতি ঘরের উপর বিচিত্র কলস চক্রে পতাকা উড়ে।
পূর্ব্বে যেন ছিল অযোধ্যা নগরী বিষ্ণুর ছটাক পড়ে॥
বাটী পাঠশালা যাহি সরোবর কূপ ওড়ার সোপান।
মাঝে মাঝে বৃক্ষবিত চত্বর মূলে তুলসী অরোপণ॥
প্রতি দ্বারে লোহে অতি বিচিত্র কপাট।
প্রতি ঘরে নৃত্যগীত আনন্দ প্রতি ঘরে বেদ পাঠ॥

একালের তুলনায় সেকালে তখন সুখ ছিল কি না জানি না, তবে শান্তি ছিল।

---

* In 1811 two women cast their children into the river, but the fathers took them out again and paid a certain sum of money to the Brambins as their ransom. People from Dacca & Jessore used to throw their children to the Ganges here (Nadiya)

Cal, Review, Vol VI

† Chogdah has been notorious for ghat murders, there are various persons now living there, who have been taken to river to die, but have recovered and are outcast s.

** When a patient thus situated, happens to recover ... never returns to the dwelling in which he had formerly resided, but wanders down the Ganges, until he arrives at Santipore near Calcutta, where he settle himself and it is a curious fact, that the whole population of Santipore is composed of such persons

Hemigberger

* In 1833 a Dharmashova was established called that of the ten thakurs, they punished offenders by excluding them from caste.——they transgressed Krishnagar the Regulations to the Magistrate of

or by prohibiting midwives attending their wives in confinement.

ঘড়ি ও মনিব্যাগ

—শ্রীপ্রফুল্লকুমার মণ্ডল

কি আশ্চর্য্য! পাঁচ টাকার নোট-সমেত ছোট্ট মনিব্যাগটা যে কোথায় রাখিয়াছে, নরেশ তাহা মাথা খুঁড়িয়াও মনে করিতে পারিতেছে না। চারটা টাকার শোকই তো যথেষ্ট, তার উপর আবার ঐ ছোট্ট সৌখীন মনিব্যাগটা তাহার এক বন্ধু উপহার দিয়াছিল, তাহার বিরহ তার চেয়ে কম ত নহেই, বরং আরও বেশী!

বাড়ীতে উপস্থিত সে একা এবং চাকর বৃন্দাবন। বৃন্দাবন আজ প্রায় বছর দশেক এ-বাড়ীতে চাকরী করিতেছে। বিশ্বাসী এবং চাকর হিসাবেও সুনাম যে আছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তবু, কে বলিতে পারে, মানুষ কখন কি করিয়া বসে! হয় ত হতভাগার এখন খরচা বাড়িয়াছে, সুতরাং মনিবের মনিব্যাগে পর্য্যন্ত টান ধরিতে সুরু করিয়াছে! মানুষ কিছু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই চোর বা সাধু হইয়া জন্মায় না। সুতরাং—

এম্‌নি নানা কথা নরেশের মাথায় আসা-যাওয়া করে। বৃন্দাবনের মুখের পানে সে বারংবার আড়চোখে চাহিয়া দেখে। এক একবার মনে হয়, ও যেন আজ একটু বেশী মাত্রায় মনোযোগী হইয়া কাজ করিতেছে। এতখানি মনোযোগিতার কোন সঙ্গত কারণই ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না. একটু তীক্ষ্ণ ভাবে খুঁজিতে গেলে ঐ মনিব্যাগের কথাটাই আসিয়া পড়ে না কি? আবার এক একবার মনে হয়, না না, বৃন্দাবন চুরি করিতেই পারে না, তাহার ব্যবহারে কোথাও এতটুকু গলদ পাইবার যো নাই।

নাঃ, লোকটা হয় পাকা চোর, নয় ত একেবারেই নির্দ্দোষ! কিন্তু, যাহাই হক্, কিছু বলাও ত তাহাকে চলে না। ব্যাগটা যে ঠিক কোথায় রাখিয়াছিল, আসলে সেইটাই সে স্থির করিতে পারিতেছে না। এমনও ত হইতে পারে যে, রাস্তায় পড়িয়া গেছে, কিংবা চায়ের দোকানে ফেলিয়া আসিয়াছে। বাড়ীর ভিতর হইতেই যে হারাইয়াছে, এটুকু বুঝিতে পারিলে নিশ্চয় সে বৃন্দাবনকে ধরিত, কারণ তখন তৃতীয় প্রাণী এ-বাড়ীতে আসে নাই!

সুতরাং, মনের ভিতর যাহাই হউক্, মুখ ফুটিয়া বৃন্দাবনকে কিছু বলা চলিল না। সেদিন সন্ধ্যার আগে বৃন্দাবন বাবুর সামনে আসিয়া কাঁচু-মাচু হইয়া দাঁড়াইতে নরেশ বলিল, 'কি রে?'

বৃন্দাবন জানাইল, আজ একটু সকাল-সকাল সে ছুটী চায়। বায়স্কোপ দেখিতে যাইবে এবং ইহাও জানাইল, বাবুর খাবার সে ইতিমধ্যেই প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং নরেশ বিনা দ্বিধায় তাহাকে ছুটী দিল। কিন্তু বৃন্দাবন চলিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার মনে হইতে লাগিল, এবার শ্বশুর বাপের বাড়ী যাওয়ার পর হইতে বৃন্দাবনের বায়স্কোপ দেখার মাত্রাটা যেন অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। টাকা পাইতেছে কোথা, কে জানে! হতভাগার বাবুগিরি যে রোজ-রোজ বাড়িতেছে, এ-সম্বন্ধে সন্দেহ করাই চলে না। ঐ সুটকেশের ভিতর কত রকমারি জিনিষ যে জড় করিয়াছে! মনিব্যাগটাও বোধ হয় ঐ সুটকেশ খুঁজিলেই পাওয়া যায়! তখনই আবার মনে হয়, অসম্ভব। এখানে সেখানে ওর মলের কত লোক আছে, তাহাদের কাহারও কাছে রাখিয়া দিয়াছে। চুরি করিয়া ঘরে রাখিতে যাইবে কেন?

এই ধূমায়মান সন্দেহটা একেবারে স্থির বিশ্বাসে পরিণতি লাভ করিল ইহারই কয়েকদিন পরে, যেদিন নরেশের হাত-ঘড়িটা সে খুঁজিয়া পাইল না। বেশ মনে পড়ে, সেদিন তাড়াতাড়িতে হাত হইতে ঘড়িটী খুলিয়া কোথায় না-জানি রাখিয়াছিল; হয় জামার বুক-পকেটে, নয় ত বাক্সের ভিতর, নয় ত ঐ সেল্‌ফের উপর। সেখানেই হউক্, বাড়ীর ভিতর পর্য্যন্ত যে ঘড়িটা আসিয়াছিল, সে-সম্বন্ধে তার একেবারেই সন্দেহ নাই। অথচ, বাড়ীর ভিতর হইতে কোথায় গেল? সুতরাং ঐ বৃন্দাবন ছাড়া আর কেউ নয়।

নরেশ রীতিমত উত্তেজিত ভাবে ঘরের এখানে-সেখানে ঘড়িটাও খোঁজ করিতে লাগিল। এবং অনুসন্ধান যতই ব্যর্থ হইল, ততই ঐ বৃন্দাবনের উপর রোষের মাত্রাটা বাড়িল। এক-একবার মনে হইতেছিল, ঐ যে ঘরের বাহিরে বসিয়া বৃন্দাবন কাজ করিতেছে, সটান গিয়া ঐ ছুঁড়িটা দিয়া তাহার পিঠে জোরে ঘা-কতক বসাইয়া দেয়! নাঃ, শাস্ত্রই উহার মাথা খাইয়াছে।……পুরাণ লোক! পুরাণ লোক কেবল চুরি করিবারই লাইসেন্স পায়, আর কিছু না, আর কিছু না!

চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে ভাবিতে সে এক সময় বুঝিল, বৃন্দাবন উঠিয়া কোথায় বাহিরে যাইতেছে। কে জানে ব্যাটা সরিয়া পড়িতেছে কি না! নাঃ, আর দেরী করা কাজের কথা নয়।

নরেশ তাড়াতাড়ি ঘরের বাহিরে আসিয়া বজ্র-কঠোর কণ্ঠে হাঁকিল, 'এই বিন্দে!'

'আজ্ঞে', বলিয়া বৃন্দাবন সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।

'এই! আমার হাত-ঘড়িটা কোথায়?'

বৃন্দাবন যেন আকাশ হইতে পড়িল। চোখ কপালে তুলিয়া বলিল, 'ঘড়ি? হারিয়েছে না কি?'

নরেশের মাথার ভিতর তখন আগুন ছুটিতেছিল। চীৎকার করিয়া বলিল, 'হারায় নি, হারায় নি। তুমি নিয়েছ। ন্যাকামীর আর জায়গা পাও নি, নয়?'

বৃন্দাবনের মুখখানা যেন এতটুকু হইয়া গেল। সে কোন রকমে শুধু বলিতে পারিল, 'আমি নিয়েছি?'

'হুঁ। ওই লোভা জিনিষটা আমি বুঝতে পারছি, আর তুমি বুঝতে পারছ না?'

বৃন্দাবনের মুখে হঠাৎ আর কথা সরিল না। নরেশ হুঙ্কার দিয়া বলিল, 'ও-সব চালাকী আমি ঢের বুঝি। ভাল মানুষের মত সুড় সুড় করে বের করে' দে আমার ঘড়ি। এই সেদিন আমার মনিব্যাগে পাঁচটা টাকা ছিল, লোপাট করেছ: তাই থেকে বারোআনা দেখছ আর ফুর্ত্তি চলছে। আমি কিছু বুঝিনে মনে করেছ, না?'

বৃন্দাবন বলিল, 'আমি কিন্তু নিইনি বাবু।' তাহার মুখের চেহারায় যেন খানিকটা দৃপ্ত ভাব মেশান। নরেশ তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল। বলিল, 'ও, তুমি নাও নি, বটে! বাড়ীর মধ্যে শুধু তুমি আর আমি, বাড়ী থেকে জিনিষ চালান, আর নিলে এসে পাঁচক্রোশ দূরের রাঘা জামা? তুই আমায় একেবারে ঘাড়োল ঠাউরেছিস, না?'

বৃন্দাবন বেশ জোরাল সুরে বলিল, 'আপনার পা-ছুঁয়ে দিব্যি করে বলতে পারি যে, ঘড়ি বা টাকার কথা একে-বারেই আমি জানি নে!'

দিন দুই পরে সেদিন সন্ধ্যার সময় হইতেই ফিন্‌ফিনে বৃষ্টি সুরু হইয়া হঠাৎ বেশ জোরে একপশলা হইয়া গেল। অগ্রহায়ণের শেষ হইয়া আসিয়াছে। শীতটা কয়দিন হইতে কমিয়াছিল, এবার আবার রীতিমত উগ্র হইয়া দেখা দিবে।

গায়ের আলোয়ানে পায়ের তলা পর্য্যন্ত ঢাকিয়া গলা পর্য্যন্ত টানিয়া লইয়া নরেশ বিছানায় শুইয়া শুইয়া কি একখানা বই পড়িতে-ছিল। বাড়ীর মধ্যে সে একা। ঘড়ি ও মনিব্যাগের কিনারা করিতে না পারিয়া সে শেষে বৃন্দাবনকে বিদায় করিয়া দিয়াছে। আজ বৈকালে নূতন একটা লোক আসি-বার কথা ছিল, কিন্তু কৈ, এখনও ত তার দেখা নাই! হঠাৎ এই জোরে বৃষ্টি নামিয়া পড়ায় অভ্যাসতে তিনি বোধ হয় আর আসিতে পারিলেন না। নরেশের নিজের মনে বিরক্তির পরিসীমা রহিল না। দেশটায় কি দুর্দ্দিনই না চলিয়াছে! চাকরেরা আজকাল যে রকম 'বাবু' বনিয়া গিয়াছে, তাহাতে হয় ত কোন্‌দিন তাহারা দাবী জানাইবে যে, শীত এবং বর্ষার দিনগুলিতে তাহাদের বিনা কাজে মাহিনা চাই!

কাজের একটা মেসে ও-বেলা দুটি ভাত খাইয়াছে। কি অবজ্ঞ ওদের ব্যবস্থা! এখনও মনে পড়িলে গা ঘিন্ ঘিন্ করিয়া ওঠে। ওখানে খাওয়ার চেয়ে উপবাসী থাকা অনেক ভাল।

…নাঃ নূতন চাকরটা আসিল না। বৃন্দাবনটা থাকিতে এ-দিক দিয়া পরম নিশ্চিন্ত থাকা গিয়াছিল। অনেকদিন হইতে কাজ করিতেছে, সুতরাং যখন যেটি দরকার, সব বুঝিত। কিন্তু উপায় কি? জানিয়া শুনিয়া ত আর ঘরে চোর পোষা চলে না! আজ মনিব্যাগ আর ঘড়ির উপর দিয়া গেল, কাল হয় ত গোটাশুটি ক্যাশবাক্সটা লইয়া উধাও করিয়া দিত।

ঘড়িতে ৭৮০টা বাজিয়া গেল। নাঃ, আর নিশ্চিন্ত থাকা চলে না। এখন হইতে কুয়ার উদ্রেক হইতেছে, সুতরাং ও-বিষয়ে মনোযোগ হওয়া একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

নরেশ উঠিয়া ষ্টোভ জ্বালিল। বাঃ, ঘরে চাল-ডাল দুই'তো রহিয়াছে। সুতরাং নির্ভাবনায় সে এলুমিনিয়মের বাটীতে করিয়া চাল-ডাল ষ্টোভের উপর চাপাইয়া দিল।

বই লইয়া আবার পড়িতে সুরু করিয়াছে এবং বইয়ের ভিতরকার গল্পের ভিতর একটু বেশী মাত্রায় তন্ময় হইয়া পড়িয়াছে। এমন সময় হঠাৎ নাকে একটা দুর্গন্ধ লাগিতে চোখ তুলিয়া দেখিল,—কি সর্ব্বনাশ! বাটীর চাল-ডাল ঠেলিয়া-ফুলিয়া বাটী ছাপাইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, এবং ষ্টোভটা কখন নিবিয়া গিয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া ধোঁয়া উঠিতেছে।

এক লাফে তক্তপোষ হইতে নামিয়া আসিয়া হঠাৎ কি-যে করিবে কিছুই ভাবিয়া পাইল না। তারপর মনে পড়িল, হাঁা, সর্ব্বাগ্রে দিয়াশলাই লইয়া ষ্টোভটা জ্বালিয়া দেওয়া দরকার। উঃ কি দুর্গন্ধ!

দিয়াশলাইটাই বা কোথায় গেল! এইমাত্র ষ্টোভ জ্বালিয়া কোথায় যে রাখিয়াছে, কিছুতেই মনে পড়িতেছে না।

চারিদিকে হাতু-পাতু করিয়া সে দিয়াশলাই খুঁজিতেছে, এমন সময় বাহিরের দরজায় ঘন ঘন ধাক্কা পড়িল। নরেশ বুঝিল, নিশ্চয় সেই নূতন চাকরটা এতক্ষণে আসিয়াছে। পাজী বদ্‌মায়েস কোথাকার!

দিয়াশলাইয়ের সন্ধান ছাড়িয়া নরেশ দরজা খুলিতে ছুটিল। বাহিরে তখনও রীতিমত বৃষ্টি পড়িতেছে। ছাতাটা মাথায় দিয়া দরজার খিল্ খুলিতে খুলিতে সে রীতিমত উষ্মার সহিত বলিল,—'তোমার বলিহারী আক্কেল ত হে! চাকরি না করলে যদি চলে, তা হ'লে তোমরা'—

কিন্তু, দরজা খোলার সঙ্গে-সঙ্গে যে লোকটি অবরুদ্ধ জলোচ্ছ্বাসের মত বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া পড়িল, তাহার মুখের পানে চাহিয়াই সে স্তব্ধ হইয়া গেল। লোকটা একটা প্রবল নিশ্বাস টানিয়া ছাতার ভিতর ঢুকিয়া পড়িয়া বলিল,—চাকরি না করলে যদিও বা চলে, আপাততঃ কিন্তু একটা আশ্রয় না-পেলে একেবারেই চলছে না! এই শীতের দিনে আপাদমস্তক ভিজেগেছে, কোলাপ্‌স্ করতে আর খুব বেশী দেরী নেই। ঈশ্বরের চল ঘরের ভিতর—

সেই আবছায়া অন্ধকারে নরেশ তাহার বন্ধু বীরেনকে চিনিল।

'আরে, তুই? আমি ভাবলুম—'

ঘেরা দালানের ভিতরে ঢুকিয়াই তাহার বন্ধু বলিল,—'আরে বাপ রে, কি ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধ! কেরোসিনের এজেন্সী নিয়েছিস্ না কি রে?'

নরেশের এতক্ষণে যেন চেতনা হইল। সে প্রথমটা একটু ভ্যাবাচাকা খাইয়া দাঁড়াইয়া পরে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া বলিল,—'তাইত, সর্ব্বনাশ করলে ত! তোর কাছে দেয়াশলাই আছে?'

বন্ধু তাহার ভিজা জামাকাপড় দেখাইয়া বলিল,—'আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু তার আর কোনো রকম দাহিকা শক্তি যে নেই, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। তোমার ঘরে বুঝি দেশলাই পর্য্যন্ত বারুদ?'

'আর বলিস্ কেন ভাই? এইমাত্র কোথায় যে রাখলুম, কিছুতেই আর খুঁজে পাচ্ছি নে।'

'দরকার নেই আর খুঁজে পেয়ে। সব গোলযোগ আমি মিটিয়ে দিচ্ছি।' বলিয়া বন্ধু ষ্টোভের ঢাপারটা টিপিয়া দিল। নরেশ বিস্ময়ের কণ্ঠে বলিল, 'আশ্চর্য্য বটে! এই সোজা কথাটা আর এতক্ষণ মাথায় আস্‌ছিল না!'

বন্ধু বলিল, 'তুই ত সেই নরেশ, যে সেবার ট্রেনে উঠে বইকে পাশে বসিয়ে রেখে প্ল্যাটফরম্-ময় খুঁজে বেড়িয়েছিলি!'

নরেশ বলিল, 'দূর্, কি যে বলিস!··· হাঁা, তারপর, কি ব্যাপার বল দেখি! ইস্, ভিজে যে একেবারে যাচ্ছেতাই হয়ে গেছিস। গিয়েছিলি কোথায়?'

বন্ধু বলিল, 'এই ভাখ, তুই কত বড় unpractical! কোনও কথার আগে তোর উচিত হচ্ছে আমাকে একখানা শুকনো কাপড় আর জামা বের করে দেওয়া। তারপর অন্য কথা।'

ট্রাঙ্কের উপর কয়খানা ধোপদস্ত কাপড়-জামা-প্যাণ্ট ছিল। দিন সাতেক হইল তাহারা ধোপার বাড়ী হইতে আসিয়াছে এবং তদবধি ট্রাঙ্কের ভিতরে আশ্রয় না-পাইয়া

বাহিরেই পড়িয়া আছে। তাহার ভিতর হইতে একখানা কাপড় ও একটা পাট টানিয়া লইয়া নরেশ বন্ধুকে দিল।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই শুকনা কাপড়-জামা পরিয়া বন্ধু বলিল,—'তারপর? তোর ব্যাপার কি বল ত? বউ কোথায়!'

নরেশ বলিল, 'আর বল কেন ভাই! চাকরটা নিয়ে ইস্তক এমনি মুস্কিলে পড়ে গেছি। এক মাসের একটা কড়ি ছেলেকে নিয়ে কি করেই বা একে নিয়ে আসি!'

'ও, তাই খুলে বল! তা, চাকরের হল কি?

'তাড়িয়ে দিয়েছি। ভীষণ চোর হয়েছিল।'

'বেশ করেছিস। আমার কি প্রিন্সিপল জানিস? সংসারে কোন জিনিষে খরচে ধরতে দিতে নাই। বউকেও যেমন মাঝে মাঝে বাড়ী পাঠিয়ে দিতে হয়, চাকরকেও মাঝে মাঝে ডিসমিস করতে হয়।'

নরেশ হাসিয়া বলিল, 'কি-যে বলিস! বউয়ের সঙ্গে চাকরের তুলনা?'

'নয়ই বা কেন? তফাৎ এই যে একজন নাইনে পায় আর একজন তা পায় না। তা, সে কথা যাক! কিন্তু তোর খাওয়ার দফা ত ইতি। ঘরে আর চাল-ডাল আছে? তা হলে না হয় আজকের মত আমিই তোর রাঁধুনীর কাজটা চালিয়ে দিই। আর এদিকে যে রকম বৃষ্টির গতিক, তাতে এখন ফেরাই বা যায় কি করে!'

পুনরায় ঠোঙ্গা আনিয়া বীরেন রান্নার যোগাড় করিতে বসিয়া গেল।

কয়েকদিন পরে নরেশ তার স্ত্রীর একখানা চিঠি পড়িতেছিল।

শান্তা লিখিয়াছিল, 'তোমার মাথা খারাপ হতে আর দেরী নেই। বৃন্দাবন আজ এই দশ বছর কাজ করছিল, কখনও একটা পয়সা গোলমাল করে ও নেয় নি, আর সে কি না তোমার টাকা আর ঘড়ি চুরি করতে গেল! এত বড় দুর্গতি কখ্খনো তার হবে না। তোমারই বরং দিন দিন মাথার দোষ ঘটছে! আমার যাবার উপায় নেই, তাই, নইলে এই দণ্ডে চলে যেতুম সেখানে।—'

তাহা হইলে, শান্তারও অটল বিশ্বাস যে, বৃন্দাবন নিরপরাধ। আশ্চর্য্য! ইহাদের ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া নরেশের নিজেরই যেন মনে হইতেছে, বুঝি তার ঘড়ি আর মনিব্যাগ সত্যই চুরি যায় নাই, বুঝি সত্যই তাহারা তাহার বাক্সের ভিতর নিশ্চিন্ত আরামে আত্মগুপ্ত হইয়া আছে। আবার একবার সে উঠ উঠ করিয়া চারিদিক খুঁজিতে শুরু করিল। বাক্স তোরঙ্গের জিনিষপত্র আলুথালু করিয়া, বিছানা উল্টাইয়া, দেলফের বইগুলা টানিয়া-ছড়াইয়া শেষে যখন ব্যর্থ হইয়া সে তার ইজিচেয়ারের উপর এলাইয়া পড়িয়া দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িল, তখন ঘর দ্বারের চেহারা দেখিলে প্রথমেই মনে হয়, এইমাত্র এ-বাড়ীতে পুলিশের লোক আসিয়া খানাতল্লাসী করিয়া গেলে। নরেশের প্রথমটা খুব বেশী রাগ হইতে লাগিল, স্ত্রীর উপর। না জানিয়া-বুঝিয়া উপর চাল দেওয়া স্ত্রীদের ভয়ানক কু-অভ্যাস। বৃন্দাবনটাকে প্রশ্রয় দিয়া দিয়া চোর গড়িয়া তোলার জন্য দায়ী ত ঐ শান্তাই। কি বুদ্ধি! একদিন যে চুরি করে নাই, সে আর কোনদিন চুরি করিতে পারে না! এই বুদ্ধি লইয়া আসেন কি না আমার উপর চাল দিতে! মানুষ চিনিবার ক্ষমতাই যদি না থাকিবে, তবে আর আমার এতটা লেখাপড়া শিখিবার কি প্রয়োজন ছিল!

নাঃ, বৃন্দাবনকে পুলিশের হাতে দেওয়াই উচিত ছিল। পুলিশে দিব বলিলেই সে হাতে পায়ে ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে স্যুটকেশ খুলিয়া চোরাই মাল বাহির করিয়া দিতে পথ পাইত না। সংসারে ভালমানুষী করিতে যাওয়াই ত যত অনর্থের মূল।

নূতন চাকর নকড়ি আসিয়া দাঁড়াইল। বাজারের পয়সা চাই।

নরেশ টাকা বাহির করিতে গিয়া হঠাৎ থামিয়া বলিল, 'সে কি হে! কাল যে সন্ধ্যের সময় একটা টাকা দিলুম, এরি মধ্যে ফাবার হয়ে গেল?'

নকড়ি দিব্যি সহজ গলায় বলিল, 'নিন্ না বাবু, হিসেব। চাল, ডাল, নুন, তেল, ঘি—সংসারের সবই যে আনতে হল। টাকা আর কতক্ষণ। আচ্ছা, এখন দিন পয়সাটা, আর দেরী করলে আপিসের ভাত দিতে পারব নি। ও বেলা তখন পাই পয়সাটির পর্য্যন্ত হিসেব বুঝিয়ে দেব।'

নরেশ তাহার হাতে একটা টাকা দিল। নকড়ি চলিয়া যাইতেছিল। কি একটা কথা মনে পড়িতে নরেশ হাঁকিয়া বলিল, 'বলি হাঁা হে নকড়ি, ঘি পরশু আন্‌লে না ?'

নকড়ি হাসিয়া বলিল, 'পরশু কোথায় বাবু! তারও দুদিন আগে। তয় নেই, আপনার একটি আধলা পয়সা আমি চুরি করব নি। সে বংশে আমার জন্ম নয় বাবু। নন্দীপুরের ঘোষ-বংশের নাম শোনে নি, এমন লোক এ-তল্লাটে কম খুঁজে পাবেন। মিতান্ত হাতে পড়েই না —'

বলিতে বলিতে নকড়ি ঘোষ বাজারের থলিটা লইয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

ইজিচেয়ারে পড়িয়া পড়িয়া নরেশ ভাবিতে লাগিল, নাঃ, কথাগুলো বলা হয় ত উচিত হয় নাই! বেলশুদ্ধ লোককে চোর বলিয়া সন্দেহ করা অন্যায় বৈ কি। ওদিক দিয়া শান্তা মিথ্যা লেখে নাই। সংসারে সন্দেহ করা যত সোজা চুরি করা তত সোজা নয়। আর লোকজনের কাছে এটা জানতে দেওয়া একেবারেই উচিত নয় যে, মন আমার বড় বেশী সন্দেহপরায়ণ, সংসারের কোন লোককেই আমি সরলভাবে বিশ্বাস করিতে পারি না।

সুতরাং, বৈকালের দিকে নরেশের ইচ্ছা থাকিলেও সে আর হিসাবের কথাটা তুলিতে পারিল না এবং নকড়িও হিসাব দিতে ভুলিয়া গেল।

আরও দিন পনের কাটিয়া গেল। ঘড়ি ও মনিব্যাগের কিনারা ত হইলই না, উপরন্তু সংসারের আরও অনেক খুঁটি-নাটি জিনিষ ইতিমধ্যে অদৃশ্য হইতে সুরু করিয়াছে। তার অধিকাংশই যদিও নরেশের নজরে পড়ে না, তবু যেটুক পড়ে তাতেই যেন ভাবিয়া কিনারা খুঁজিয়া পায় না। সে ভাবে, তার নিজেরই হয়ত কোথায় ভুল হইয়াছে। এক একবার নকড়ির উপর ভয়ানক রাগ হয়, কিন্তু তখনই মনে হয়, কোন কিছু না জানিয়া উহাকে বলাই বা যায় কি হিসাবে। বৃন্দাবন যে চুরি করিয়াছে এ সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও যখন মনে ধোঁকা জাগিতেছে, তখন আর নকড়িকেই বা কেমন করিয়া সন্দেহ করা যায় ?

কোন কিছু ভাবিয়া না পাইয়া সে নিজের উপরেই বিরক্ত হইয়া পড়ে, এবং বিরক্ত হয় শান্তার উপর। তাহাকে বিপদে ফেলিয়া নিশ্চিন্তে বাপের বাড়ী বসিয়া থাকার তার কোন অধিকারই নাই। সেদিন রাত্রে সে শান্তাকে এক সুদীর্ঘ পত্র লিখিল এবং উপসংহারে জানাইল যে, আগামী ২৬শে তারিখ সে তাহাকে লইয়া আসিবে। ইহার যেন কোনরকম নড়চড় না হয়।

স্ত্রীকে ঘরে আনিয়া নরেশের প্রথমটা মনে হইল, সে ফাঁক ছাড়িয়া বাঁচিয়াছে। কিন্তু দুই দিন যাইতে না যাইতেই শান্তার অনুযোগ-ভরা প্রশ্নের ঠেলায় অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। বাসনগুলা ভাঙিয়া চুরিয়া তছনছ হইয়া গেছে, তা ছাড়া একখানা থালা ও দুইটা বাটি খুঁজিয়া মিলিতেছে না, সমস্ত ঘর-দ্বার এখন অগোছাল হইয়া আছে যে, মনে হইতেছে, এ-বাড়ীতে মানুষের বদলে ভূতে বাস করিত ইত্যাদি।

নরেশ রসিকতা করিয়া একটা জবাব দিতে যাইত, শান্তা বলিত, 'ও সব রঙ্গ রাখ। সত্যি বলছি কোথেকে একটা চোরকে এনে বাড়ীতে ঢুকিয়েছ, ওটাকে আমি এই মাসেই যদি বিদেয় না করি ত কি বলেছি! আমার থালা-বাসন সব—'

নরেশ বলিল, 'তা কি করে জানব বল, বিশ্বে বেটা ত ঘড়ি আর ব্যাগ সরালে, হাতে-নাতে ধরাও পড়ল—'

স্ত্রী বলিল, 'কখ্খনো না, তোমার ঘড়ি আর ব্যাগ এই নকড়িই নিয়েছে।'

নরেশ হতবুদ্ধির মত স্ত্রীর মুখের পানে চাহিল। পরে বলিল, 'যাঃ তা কি করে হবে! তখন যে নকড়ি আসেই নি।'

শান্তা বলিল, 'নাই বা এল। তুমি যে রকম আল্‌গা মানুষ, হয় ত ভুলে কোথাও রেখেছিলে, তার পর সত্যি সত্যি চুরি করলে তোমার ঐ নকড়ি।'

তাহার কথায় নরেশের প্রথমটা হাসি আসিল। তার পর মনে হইল, তা হাসিবারই বা কি আছে। কে বলিতে পারে যে শান্তা যাহা বলিতেছে, তাহা সত্য নয়? সংসারে কত ব্যাপার কত ভাবেই যে ঘটিতেছে।

দিনদশেক পরে নরেশ তার কর্মস্থান হইতে ফিরিবার পর শান্তা খবর দিল, তোমার বন্ধু ধীরেন বাবুর ভাই আজ

তোমার জামা-কাপড়, ঘড়ি আর মনিব্যাগ ফেলে দিয়ে গেছে।

নরেশ চা খাইতে-খাইতে স্ত্রীর মুখের পানে নির্বাক্ দৃষ্টিতে চাহিল এবং ইতাবসরে হাতের প্লেট কাৎ হইয়া খানিকটা গরম চা তাহার কাপড়ের উপর পড়িয়া গেল।

শান্তা হাসিয়া বলিল, 'চা-টা খেয়ে নাও না! তুমি অমন চমকে উঠ, আমার এতে একেবারে আশ্চর্য্য লাগে নি।'

নরেশ বলিল, 'কৈ দেখি সে চিঠি!'

শান্তা ঘড়ি ও ব্যাগ বাহির করিয়া তাহার সামনে রাখিল। নরেশ উল্টাইয়া পাল্টাইয়া তাহাদের দেখিতে লাগিল। ছোট ব্যাগের ভিতর সেই পাঁচ টাকার নোটখানি পর্য্যন্ত ঠিক আছে।

সে বলিল, 'তা সে হতভাগা কোত্থেকে পেলে আমার ঘড়ি আর ব্যাগ?'

'সে কথা কিছু বলে পাঠায় নি শুধু চাইকে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি।'

নরেশ বলিল, 'অবাক্ করলে! এ যে সত্যিই আমি একটা আস্ত গাধা বনে গেলুম! একদিন জলে-কড়ে ভিজতে ভিজতে ক'ঘণ্টার জন্যে ধীরেন এখানে এসেছিল তারি মধ্যে কোত্থেকে—।'

শান্তা বলিল, 'একেবারেই আশ্চর্য্য নয়। তোমার পক্ষে সবই সম্ভব! চোখের সামনে জিনিষ রেখেও তুমি দেখতে পাও না! আর, এরই জন্যে বৃন্দাবনকে চোর বদনাম দিয়ে বিদেয় করলে এবং তার বদলে যাকে ঘরে ঢোকালে, সে একটি পুরোপুরি চোর।'

নরেশ স্তব্ধের মত বসিয়া রহিল। শান্তার কথার প্রথমটা তার একটু রাগ হইতেছিল এবং যা হক একটা সর্ত্ত রকমের জবাব দিবার জন্য সে প্রস্তুত হইতেছিল। কিন্তু বৃন্দাবনের প্রসঙ্গটা উঠিয়া পড়িতেই মনে মনে কুণ্ঠার পরিসীমা রহিল না।

বন্ধুর উপর বিরক্তিটা ক্রমশঃই বাড়িতে লাগিল। ঘর হইতে ঘড়ি আর ব্যাগ সরাইয়া বাড়ী লইয়া যাওয়া আবার কোন্ শ্রেণী রসিকতা? মূর্খের নানান্ ছল। যখন তখন যা-খুসী তাই একটা রসিকতা করিলেই হইল! এদিকে, ওই ঘড়ি আর ব্যাগের জন্য তাহাকে কি নাস্তানাবুদই না হইতে হইয়াছে! বৃন্দাবনকে তাড়াইয়া দিবার পর হইতে তাহার সংসার যে কিরূপ অচল হইবার উপক্রম হইয়াছে, মুখে না বলিলেও সেটা নরেশ নিজের মনে ত বুঝিতেছে! হতভাগা ধীরেনটা যে ঐ ছুটো পাইয়াছে, তাহা যদি আগে বলিত, তাহা হইলেও হয় ত চিঠি লিখিয়া বৃন্দাবনের খোঁজ করা চলিত! কিন্তু, এতদিনে সে হয় ত আবার অন্য কোথাও কাজে লাগিয়াছে। সুতরাং—

তার উপর শান্তার টিটকারী। ছেলেমেয়েদের সাম্নেই যে-ভাবে সে কথাটা রং চড়াইয়া বলিতেছে, ভিতরে-ভিতরে লজ্জায় আর শেষ থাকিতেছে না।

সেই দিনেই সে ধীরেনের বাড়ীতে খোঁজ লইল। দেখিল, বাড়ীতে তালা বন্ধ। পাশের বাড়ীর এক ভদ্রলোক বলিলেন, 'ধীরেন বাবু ত এখানে নেই। আছে তাঁর ছোট ভাই, সেও এখন কোথায় বাহিরে গিয়াছে।'

কয়েক দিন পরে সে দিন সন্ধ্যার সময় স্বশরীরে ধীরেন নরেশের বাড়ীতে আসিয়া হাজির। সে লক্ষ্য করিল, নরেশের মুখে কেমন একটা অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য।

বন্ধু বলিল, 'তারপর, তোর খবর সব ভাল ত?'

নরেশ জবাব দিল, 'হাঁ।'

'তবে? মুখখানা ও-রকম হাঁড়ির মত করে আছিস্ যে? ব্যাপার কি? বৌদিও তো এখানে এসে পড়েছেন দেখছি! সুতরাং, ছোঁড়া ছেলে খিচুড়ি-রাঁধার ট্র্যাজেডিটা ত আর ভুগতে হচ্ছে না!'

দরজার আড়ালে চুড়ির ঠন্‌ঠনের সঙ্গে শাড়ীর মৃদু খস্‌খসানি শোনা গেল।

ধীরেন হাঁকিয়া বলিল, 'উঃ সে কি মহামারী কাণ্ড, জানেন বৌদি? চাল-ডাল ফুলে-ফেঁপে উঠছে, ছোঁড়ার গ্যাসে ঘর খানা কাহুনের মত উড়ে যাবার যোগাড়, নিতান্ত জড় পদার্থ দেশলাইটা হঠাৎ সজীব হয়ে বন্ধুর সঙ্গে এমনি লুকোচুরি খেলতে সুরু করেছে, সে যদি আপনি দেখতেন'—

নরেশ বলিল, 'তুমি একটা হাস্তেল। তুমি সে দিন আমার ঘড়ি আর মনিব্যাগ নিয়ে গিয়ে আমাকে কি ভোগানটাই না ভুগিয়েছ।—'

ধীরেন উত্তেজনার কণ্ঠে বলিল, 'কি রকম! বাড়ীতে বসে' ডিফামেশন্! বৌদি, আপনি সাক্ষী, ও আমাকে চোর বলেছে—'

নরেশ বলিল, 'তা, নালিশ করিস, আদালতে দাঁড়িয়েও আমি ঐ কথাই বলে আসব। ঐ ঘড়ি আর ব্যাগের জন্যে—'

ধীরেন হঠাৎ এত জোরে হাসিয়া উঠিল যে, ঘরের দরজা জানালাগুলো পর্য্যন্ত যেন ঝন্ ঝন্ করিতে লাগিল।

নরেশ বলিল, 'গর্দ্দভের মত হাসচিস যে?'

'হাসব না? তোর ঘড়ি আর ব্যাগ আমি নিয়ে গিয়েছিলুম, না ওরা আমার পিছু পিছু ধাওয়া করেছিল? জানেন বৌদি, সে কি অদ্ভুত ব্যাপার! সে দিন রাত্রে ফেরবার সময় ওর যে সার্জ্জের কোটটা আমি গায়ে দিয়ে গিয়েছিলুম, ক'দিন বাদে এইটে পরেই শ্বশুরবাড়ী গিয়েছিলুম। সে দিন কি জন্যে জামার পকেট হাতড়াতে গিয়ে বৌ দেখতে পায় যে, ওর বুক-পকেটের তলাটায় একেবারেই সেলাই পড়ে নি। সে তাই সেটাকে সেলাই করতে গিয়ে আরও আবিষ্কার করলে যে, জামাটার বা-দিকের কোণে কি-যেন জড় হয়ে রয়েছে। আরও সূক্ষ্ম তল্লাসীতে জানা গেল যে, সেখানে লুকিয়ে আছে তোমার ঘড়ি আর মনিব্যাগ। তুই রাগ করছিস, কিন্তু তোর উচিত হচ্ছে, আমার গৃহিণীকে মোটাগোছের পুরস্কার দেওয়া।'

নরেশ এতক্ষণে হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, 'বলিস কি রে! জামাটা যে নতুন তৈরী করা! তা হলে দরজী বেটা'—

ধীরেন গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, 'উঁহু! তার দোষ দিতে যেয়ো না। কারণ, সে হয় ত এই বলে' পাল্টা জবাব দিতে পারে যে, 'আরে মশাই, আপনার ঘড়ি আর ব্যাগ তো গিয়েছিলই! ভাগ্যিস্ আমি ঐ কায়দাটুকু করে রেখেছিলুম, তাই তো তাদের ফিরিয়ে পেলেন!··· ওখন আর তোর সত্যি করে জবাব দেবার একেবারেই কিছু থাকবে না।'

রোগ-শয্যায়

—শ্রীজগদানন্দ বিশ্বাস

রোগে ভুগে ভুগে দুর্ব্বল দেহ
শয্যায় শুয়ে থাকি ;
গৃহ-কোণে দীপ জ্বলে টিপ টিপ
নিদহারা মোর আঁখি।
ছোট ছেলেগুলি আসিয়া দাঁড়ায়ে
কপালেতে দেয় হাত ;
শিয়রে প্রেয়সী জাগিয়া কাটায়
একভাবে সারারাত।
অর্থ-অভাবে পথ্য জোটে না
ঔষধও দেছি ছাড়ি ;
কবিরাজেরও কবিরাজ যিনি
ভরসায় আছি তাঁরি।
দীন জেবে দয়া অনেকে দেখাতে
এসেছে আমার কাছে ;
সে দান গ্রহণ করিতে পারিনি
জানায়েছি সব আছে।
পাছে তারা বুকে ব্যথা পাবে ভাবি'—
হাসায়েছি কত ছলে ;
বৈদ্য-দুঃখ গোপনে সয়েছি—
তাহারা যাইলে চলে।
সম্মানে পার কর এইবার—
ডাকি, ওহে ভগবান
বাধা ক'রো না ধন-গর্ব্বিত—
বন্ধুর নিতে দান।
হীন কারো না ক বন-টগরেরে—
গরবী গোলাপ কাছে ;
থাকুক ক'রো না 'শাইলক্' সম
মহাজন যারা আছে।
এক নিমেষেতে সিংহের মত—
নিয়ে যেও প্রাণ হরি ;—
হাসি মুখে তাগা লইব বরিয়া—
মৃত্যুকে নাহি ডরি।
বহুদিন-এ' তরুর প্রাণের
সব আশা গত প্রায় ;
প্রতিটি শাখায় পাপড়ি ও পাতা
ঝরিতে যেতে চায়।

ভারতীয় মৎস্য

—শ্রীক্ষেত্রগোপাল মুখোপাধ্যায়

ভারতের মিষ্ট জলাশয়াদি ও নদ-নদীতে যেমন অসংখ্য প্রকার ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নানাজাতীয় মৎস্য দেখিতে পাওয়া যায়, ইউরোপ ও আমেরিকার জলাশয়াদিতেও সেই প্রকার অজস্র মৎস্যাদি দেখা যায়।* ইউরোপ প্রভৃতি মহাদেশে যে সকল মৎস্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে সকলগুলিকে না হইলেও দুই চারিটি জাতির মৎস্যকে আমাদের দেশের জলাশয়াদিতে বিচরণ করিতে দেখা যায়। এই সকল ভারতীয় মৎস্যাদির আকার-প্রকার, জীবন-যাত্রাদি দেখিয়া সহজেই অনুমিত হয় যে, ভারতীয় অনেক বিশিষ্ট মৎস্য ইউরোপীয় মৎস্যদের সগোত্র ও সাক্ষাৎ জ্ঞাতি। তবে দেশ-কাল-পাত্র হিসাবে, শীতপ্রধান ও গ্রীষ্মমণ্ডল মধ্যবর্তী দেশসমূহের পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার গুণে, উপরে উক্ত মৎস্যদের প্রকৃতিগত, দৈহিক ও জীবনযাত্রার সামান্য সামান্য পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে।

নিম্নলিখিত মৎস্যগুলি ইউরোপ ও আমেরিকার জলাশয়াদিতে দেখিতে পাওয়া যায়; এইগুলির সহিত ভারতীয় মৎস্যাদির সাক্ষাৎ জ্ঞাতির সম্বন্ধ দৃষ্ট হইয়া থাকে। যথা :—

(১) Goggle fish (২) Cat fish (৩) Piko (৪) Sobies (৫) Bowfin (৬) Dace (৭) Creek Chub (৮) Shiner (৯) Black Bass (১০) Mullet (১১) Carp (১২) Minnow (১৩) Stickle-back (১৪) Brill (১৫) Herring (১৬) Pilchard (১৭) Shad (১৮) Anchovy (১৯) Pumpkin seed (২০) Sturgeon (২১) Trout (২২) Salmon.

(১) গগ্‌ল্ (Goggle Fish) জাতীয় মাছ যখন তার ভার দেহ লইয়া মন্থর গতিতে শিকারের দিকে অগ্রসর হয়, তখন আমাদের দেশের গজার মাছের কথাই মনে পড়ে। আমাদের দেশের জলাশয়ে যদিও গগ্‌ল্ মাছ দেখা যায় না, তথাপি তাহার প্রকৃতি ও আকৃতিগত সামঞ্জস্যের জন্য, গজার বা শাল জাতির সঙ্গে অনেকটা সাদৃশ্য দেখা যায়। গগ্‌ল্ মাছ স্বল্পজলের গুল্মাদিতে বাস করে এবং শিকার ধরিবার নিমিত্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষার্থ, তাহার দেহবর্ণ হইয়াছে চতুর্দ্দিকের জলজ-গুল্মাদির ন্যায়, আলোছায়ার মিশ্রিত বর্ণ। গজার মাছের বর্ণও তদ্রূপ জলজ-শৈবাল ও গুল্মাদির ন্যায়। এইপ্রকার বর্ণ হওয়ায় জন্য তাহাদের শত্রু বা শিকার সহজে তাহাদের সান্নিধ্য বুঝিতে পারে না। জেব্রা, সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি চতুষ্পদ প্রাণীদের মধ্যেও ঐ প্রকার স্বাভাবিক বর্ণ দেখা যায়।

মৌলা Minnow।

(২) ক্যাট্ ফিশ (Cat fish) জাতীয় মৎস্যগণের বড় বড় গুম্ফ আছে, উহারা খুব গভীর জলদেশে ও অনেক সময় নদীর ঘোলাজলে বাস করে বলিয়া তাহাদের চক্ষুর ব্যবহার খুব অল্প এবং সেই জন্যই, বড় গুম্ফ বা স্পর্শেন্দ্রিয় তাহাদের দৃষ্টিশক্তির অভাব মোচন করিয়াছে। গুম্ফ দ্বারা উহারা দ্রব্যাদি স্পর্শ করিয়া বুঝিতে পারে উহা তাহাদের পক্ষে উপযোগী কি না। গভীর অন্ধকারের মধ্যে মানুষেরও চক্ষুর ক্রিয়া আদৌ থাকে না বলিলেই হয়। অন্ধকারের মধ্যে মানুষের হস্তপদ প্রভৃতি চক্ষুর ক্রিয়ার অভাব সহজেই পূরণ করিয়া থাকে। আমাদের দেশের ট্যাংরা, বোয়াল, তপসে, গুড়জাওলী, শিঙ্গি, মাগুর প্রভৃতি মৎস্য জাতির এই প্রকার বড় গুম্ফ ও ক্ষুদ্র চক্ষু দেখিতে পাওয়া যায়।

সাকার্ (Sucker) মৎস্য জলাশয়ের পাঁকের উপর বিচরণ করে এবং ইহারা পাখনার সাহায্যে পাঁক ছানিয়া

* এখানে যার সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছিল।

খাদ্য সংগ্রহ করে। আকৃতি-প্রকৃতিতে আমাদের দেশের মিরগেল্ মাছের সঙ্গে ইহাদের খুব মিল দেখা যায়। মিরগেল্ মাছের সংস্কৃত নাম - মৃগিল ; সেইহেতু ইহারা জলের তলে পাঁক ছানিয়া আহার সংগ্রহ করে।

(৩) পাইক্ (Pike) মৎস্য খুব দুর্দান্ত প্রকৃতির হইয়া থাকে। যে জলাশয়ে পাইক্ থাকে, সেই জলাশয়ের অন্যান্য মৎস্যকুল প্রায় নিঃশেষ হইয়া যায়, কারণ ইহারা অত্যন্ত হিংস্র ও খুব মৎস্যাশী। ক্ষুদ্র-বৃহৎ নির্বিশেষে সমস্ত মৎস্য ইহারা বধ করিয়া থাকে। ইহাদের মুখের দিক একটু চ্যাপ্টা ও অগ্র সরু, দেহ স্থূল ও গোলাকার এবং ইহাদের গাত্রবর্ণ তরঙ্গের উপর আলোছায়ার বর্ণসম্পাতের ন্যায়। জলের মধ্যে বিচরণ করিলে সহজে ইহাদের দেখা যায় না। জলাশয়ে যে কোন মৎস্য দেখিলে ইহারা তাহাকে আক্রমণ করিয়া থাকে। ইউরোপে অনেকে ইহাদের Pirate fish বা ডাকাতে মাছ বলিয়া থাকে। আমাদের দেশের শাল, শোল প্রভৃতির সঙ্গে ইহাদের খুব সাদৃশ্য দেখা যায়। ইহাদিগকে তাহাদের নিকট জ্ঞাতি বলিয়া বোধ হয়।

(৪) সবিস্ (Sobies বা Mudskipper) নামে এক প্রকার অদ্ভুত মাছ বিলাতের কর্ণওয়াল, ওয়েলস প্রভৃতি স্থানে সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা খুব অল্প জলে কাদার মধ্যে বাস করিয়া থাকে। ইহাদের চক্ষু বৃহৎ, দুই পার্শ্বের পাখনা দুটি খুব প্রকাণ্ড। উহারা ঐ পাখনার সাহায্যে কাদার মধ্যে ব্যাংয়ের মত লাফাইয়া চলে এবং অনেক সময় জলের ধারে হেলান বৃক্ষের উপর পাখনার সাহায্যে উঠিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গ ধরিয়া খায়। এই মৎস্য জাতি বহু বৎসর যাবৎ কাদার মধ্যে বাস করিয়া অন্যান্য মৎস্যের ন্যায় সাঁতার দিতে ভুলিয়া গিয়াছে। বহু বৎসরব্যাপী বিবর্তনের ফলে ইহাদের পার্শ্বের পাখনা দুটি ক্রমশঃ বড় হইয়া পদের ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে এবং তদুপরি প্রকৃতির অবদানে অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র সৃষ্টি হওয়ায় ইহারা স্বচ্ছন্দে কই ও গড়ুই মাছের মত স্থলের উপরের বায়ুতে শ্বাস-প্রশ্বাস লইয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে। আরব সাগরের উড়ুক্কু মাছের (flying fish) জীবনী অনেকটা উক্ত সবিস্ মৎস্যের অনুরূপ। সাগরের মধ্যে একপ্রকার শার্ক মাছ (Dog fish) আছে, তাহারা এই উড়ুক্কু মৎস্য দেখিতে পাইলেই আক্রমণ করিয়া থাকে। তাহাদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য উড়ুক্কু মৎস্য জলের উপরে লম্ফ দিয়া আকাশে উড়িতে থাকে। প্রায় এক শত হস্ত পরিমিত দূরবর্ত্তী স্থান পর্য্যন্ত উড়িয়া ইহারা আবার জলে পড়িয়া সন্তরণ দিতে থাকে। বহু

ভারতীয় ট্রাউট Indian Trout।

বৎসর এই প্রকার জল ছাড়িয়া উর্দ্ধে লম্ফ প্রদান করার জন্য, প্রকৃতির বরে ইহাদের সম্মুখের দুই পার্শ্বের পাখনা দুটি ক্রমে বড় ও শক্তিশালী হইয়া পাখীর ডানার মত ইহাদের আকাশ-মার্গে উড়িবার সহায়তা করে। সবিসের অতি নিকট জ্ঞাতি আমরা বাংলাদেশে মাত্র দুই জাতীয় মৎস্যে দেখিতে পাই ; একটি কাদাবেলে ও অপরটি গোগরা (frog fish) বা সপাদ্ মৎস্য। কাদাবেলে বাংলার দক্ষিণ ভাগে ও চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত ক্যানিং টাউনের নিকটে বহু পরিমাণে দেখা যায়। ইহারা দলে দলে গাছের উপর উঠিয়া বসিয়া থাকে। গোগরা বা সপাদ্ মৎস্য ঠিক ব্যাঙের মত লাফাইয়া চলে ; ইহাদের সম্মুখের দুইটি পাখনা রূপান্তরিত হইয়া ব্যাঙের পশ্চাদ্দিকের পদের আকার ধারণ করিয়াছে। ইহারা পুচ্ছের উপর ভর করিয়া পদের সাহায্যে লাফাইয়া চলে।

ছোট কাঠালী Pumpkin Seed।

ইহাদের বড় বড় উন্নত চক্ষু ও ব্যাংয়ের মত পা দেখিয়া অনেকে ইহাদিগকে ঠিক একপ্রকার ব্যাঙ মনে করিয়া থাকেন—মৎস্য বলিয়া সহজে কেহ ভাবিতে পারেন না। চব্বিশ পরগণার ডায়মণ্ড হারবার মহকুমার অন্তর্গত বহু স্থানের জলাভূমিতে এই গোগরা মৎস্য দেখিতে পাওয়া যায়।

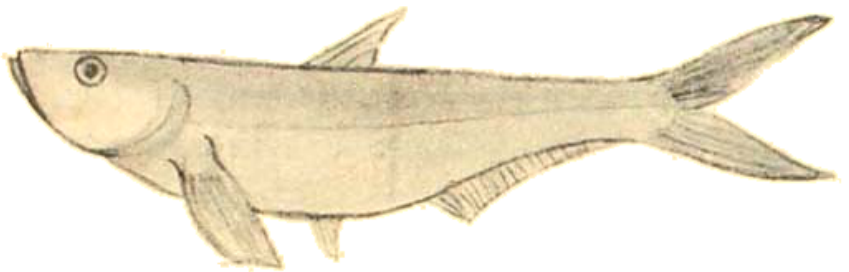

কৈলা Anchovy।

(৪) বোফিন্ (Bowfin) মৎস্যের খুব নিকট জ্ঞাতি হইতেছে আমাদের দেশের লাঠা, চ্যাং, গড়ুই বা উহা মৎস্যাদি। লাঠা প্রভৃতি ন্যায় ইহারাও ছোট মৎস্যাদি, চিংড়ি ও কীট-পতঙ্গ আহার করিয়া থাকে এবং আকৃতি-প্রকৃতিও প্রায় হুবহু উহাদেরই মত। বোফিন্ মৎস্যও আমাদের দেশের শোল, লাঠা প্রভৃতির ন্যায় পোনা চরাইয়া থাকে ও পোনাগুলি যতদিন না একটু বর্দ্ধিত হইয়া, স্বাধীনভাবে চলাফেরা ও আহার সংগ্রহ করিতে পারে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহারা পোনাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে।

(৬) ডেস্ (Dace) মৎস্য ইউরোপের মিষ্ট জলের মৎস্য। ইহারা আকৃতিতে খুব ছোট, ইহাদের দেহ আঁশ-যুক্ত ও চক্ষু বৃহৎ। আমাদের দেশের ডানকোনা, দাঁড়কে ও ধানি মৎস্য ইহাদের নিকট জ্ঞাতি বলিয়াই বোধ হয়।

(৭) ক্রীক চাব (Creek chub) মৎস্যও আকৃতিতে ডেস্ জাতির ন্যায়। অতি ক্ষুদ্র জাতির মৎস্য না হইলেও ইহারা দৈর্ঘ্যে তিন চারি ইঞ্চের বেশী বড় হয় না। আকৃতি-প্রকৃতিতে ইহারা আমাদের দেশের ছোট বাচা-জাতির (বায়চারী ও টাট্‌কিনি) খুব নিকট আত্মীয় বলিয়া মনে হয়। ইহারা মিষ্ট জলের অধিবাসী।

(৮) শাইনার (Shiner) মৎস্যও ইউরোপের মিষ্টজলে বাস করে, আকৃতি-প্রকৃতিতে ইহাদের সহিত আমাদের দেশের খড়কে বাটার খুব সাদৃশ্য দেখা যায়।

(৯) ব্যাস্ (Black Bass) মৎস্যও মিষ্টজলের অধিবাসী। আমাদের দেশের জাদোস মাছ ইহাদের অতি নিকট জ্ঞাতি।

(১০) মুলেট্ (Mullet) মৎস্য মিষ্টজলে বাস করে। ইহাদের চক্ষু বৃহৎ, দেহ গোলাকার ও আঁশযুক্ত : সাঁতার দিবার সময় ইহাদের চক্ষু জলের উপরিভাগে জাগিয়া থাকে। দৈর্ঘ্যে ইহারা ১২ হইতে ১৮ ইঞ্চি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ইউরোপে সাধারণতঃ দুই জাতির মুলেট মৎস্য দেখিতে পাওয়া যায়,—ধূসর মুলেট ও রক্ত-মুলেট। এই মুলেট জাতির অতি নিকট জ্ঞাতি ভারতের ন্যায় উষ্ণপ্রধান দেশেও বাস করিয়া থাকে। আমাদের দেশের খরমুলা, ভাঙ্গন ও পারসে মৎস্যগণই প্রকৃত মুলেট জাতি বলিয়া মনে হয়। এ দেশের খরমুলা ও পারসে মৎস্যগণকে ধূসর মুলেট (Grey mullet) ও ভাঙ্গনকে রক্ত মুলেট (Red mullet) বলা যাইতে পারে। রক্ত মুলেট মৎস্য অনেক সময় নোনা জলে বাস করে দেখা যায়। এই রক্ত মুলেট খাইতে খুব সুস্বাদু।

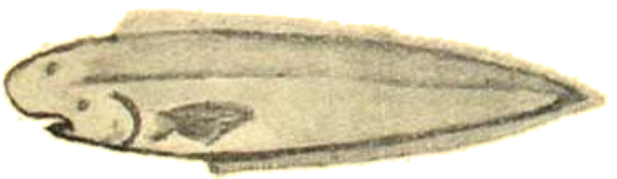

ঝলসাত্ Brill।

(১১) কার্প (Carp), সমস্ত মিষ্টজলের মৎস্যকুলের মধ্যে কার্প গোষ্ঠীই খুব বিস্তৃত ও অনেক অধিক শ্রেণীতে বিভক্ত। ইউরোপে উষ্ণপ্রধান দেশের মত নানা জাতি কার্প মৎস্য দেখিতে পাওয়া যায় না। সেই স্থানের জলাশয়াদিতে যে দুই চারি জাতি কার্প মৎস্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা তাহাদের উষ্ণদেশের জ্ঞাতিগণের অপেক্ষা আকারে বৃহৎ ও বলশালী হয় না। জার্ম্মানী, ফ্রান্স ও ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের কার্প মৎস্যকে দশ পাউণ্ড ওজনের

অধিক বৃহৎ প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু আফ্রিকা, এসিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকার কার্প আকারে যেমন বড় ও গুরু হইয়া থাকে, আস্বাদনেও সেইরূপ খুব সুস্বাদু হইয়া থাকে। ভারতীয় কার্পের মধ্যে নানা শ্রেণী আছে, যথা—(১) রুই, (২) কাতলা, (৩) মিরগেল, (৪) কালবোস্, (৫) বাটা, (৬) পুঁটী, (৭) মহাশীর, (৮) ভুল্যা, (৯) গোরিয়া প্রভৃতি। বাংলার পাকাও কাতলা ও রুই মৎস্যের ন্যায় বৃহৎ কার্প মৎস্য

লেবু Bowfin।

পৃথিবীর অন্যত্র বিরল। ভারতীয় রুই জাতির মধ্যে গঙ্গা ও সিন্ধুজাত রুই খুব সুন্দর আস্বাদনযুক্ত হইয়া থাকে। তবে সিন্ধুনদীর রুই মৎস্য আকারে বাংলার রুই মৎস্য অপেক্ষা ছোট হইয়া থাকে, কিন্তু গুণ হিসাবে সিন্ধুজাত রুই মৎস্য বাংলা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে; যেহেতু যথার্থ রক্তমুখ, রক্তোদর ও রক্তপুচ্ছ রুই বাংলায় খুব অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। কার্পগোষ্ঠীর মধ্যে শফরী অধিশ্রেণীয় "সোনালী মৎস্য" (Golden Carp) পূর্বে ইউরোপ ও আমেরিকায় ছিল না। উহারা প্রকৃতপক্ষে চীন ও জাপানের অধিবাসী। গত শতাব্দীতে প্রথমে ইউরোপে জাপান হইতে ইহা চালান যায় এবং পরে ইউরোপ হইতে আমেরিকায় লইয়া যাওয়া হয়। সৌখীন সমাজে এই জাতীয় সুদৃশ্য কার্পের খুবই আদর দেখা যায়। ভারতে প্রকৃত সোনালী কার্প না থাকিলেও, লোহিত, কৃষ্ণ, ও কৃষ্ণবিন্দু-শোভিত নিম্নভূমি-শফর প্রভৃতি পার্ব্বত্য নদী-জাত অন্যান্য সুদৃশ্য কার্প মৎস্যের অভাব পূর্বে কখনও হয় নাই। অনেকে কৃত্রিম উপায়ে এই সুদৃশ্য কার্প বা শফরজাতীয় মাছ পালন করিয়া ব্যবসায় করে। বাজারে এই মাছের চাহিদা ও মূল্য খুবই অধিক। ধনী সৌখীন ব্যক্তিগণ আদরের সহিত এই মৎস্য শোভাবর্দ্ধনের জন্য প্রতিপালন করিয়া থাকেন।

(১২) মিনো (Minnow) জাতীয় মৎস্য খুব ক্ষুদ্র ও ইহারা সাধারণতঃ পুকুর ও নরদার জলে বাস করে। আমাদের দেশের নৌবলা ও সোনা খড়কের ইহারা খুব নিকট জ্ঞাতি বলিয়া মনে হয়। উল্লিখিত ক্রীক্ চাব, পাইনার, মিনো ও সাকার, এই চারিটি জাতি কার্পগোষ্ঠীর অন্তর্গত বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়। বিলাতী কার্পজাতি সাধারণতঃ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা—(১) সাধারণ কার্প (Common Carp) ইহাদের সমগ্রদেহ আঁশে আবৃত, (২) মিরর কার্প (Mirror Carp) ইহাদের দেহের পৃষ্ঠভাগ মাত্র আঁশে আবৃত, (৩) লেদার কার্প (Leather Carp) ইহাদের দেহে আদৌ আঁশ নাই, টেংরার ন্যায় উহাদের দেহ আঁশশূন্য। পাঞ্জাবের সিন্ধু নদীতে মিরর্ কার্প-জাতির মৎস্য দেখিতে পাওয়া যায় এবং কাবুল নদীতে লেদার কার্প জাতি অসংখ্য দৃষ্ট হয়।

(১৩) ইউরোপীয় ষ্টীক্ল্ ব্যাক্ (Stickle back) মৎস্য ও আমাদের দেশের চ্যালা-চাঁদা মৎস্য একই গোত্রের অন্তর্গত বলিয়া বোধ হয়। উহারা মিষ্ট ও নোনা উভয় প্রকার জলে বাস করিয়া থাকে। সকল প্রকার আবহাওয়ায় ইহাদের জীবনীশক্তি অটুট থাকে। ইহারা অল্প জলে লতা-গুল্মাদি-যুক্ত স্থানে বাস করিয়া থাকে। ডিম্ব প্রসবের সময়ে ইহাদের পুংজাতীয় মৎস্যেরা নরম শৈবাল

পাইক Pike।

দ্বারা প্রস্তরগাত্রে পাখীর মত বাসা প্রস্তুত করিয়া থাকে। ঐ বাসায় স্ত্রীমৎস্যেরা ডিম্ব প্রসব করিয়া চলিয়া যায়, প্রসূত ডিম্বের প্রতি তাহারা আর লক্ষ্য করে না। কিন্তু পুংজাতীয় মৎস্যেরা ঐ ডিম্বপূর্ণ বাসা দিবা রাত্র রক্ষা করে। যতদিন না ডিম্ব ফুটিয়া শাবক বাহির হইয়াও স্বাধীন ভাবে তাহারা আত্মরক্ষা ও আহার সংগ্রহ করিতে শিক্ষা করে, ততদিন পর্য্যন্ত খুব সতর্ক ভাবে পুংমৎস্যগুলি শাবকগণকে রক্ষা করে। শাবকগণ স্বাধীন ভাব প্রাপ্ত হইলে পুংমৎস্যগণ অতিরিক্ত পরিশ্রম ও জীবনীশক্তির

অপচয় বশতঃ শীঘ্রই অকালে মারা যায়। এরূপ কর্ত্তব্য-পরায়ণতা ও সন্তান-স্নেহ এক চতুষ্পদ প্রাণী ও মানুষ ভিন্ন অন্য প্রাণীর মধ্যে একান্ত বিরল।

(১৪) ব্রিল জাতীয় (Brill) মৎস্য মিষ্ট ও নোনা উভয়-বিধ জলেই বাস করে। আকারে ইহারা ক্ষুদ্র, ৮।১০ ইঞ্চি

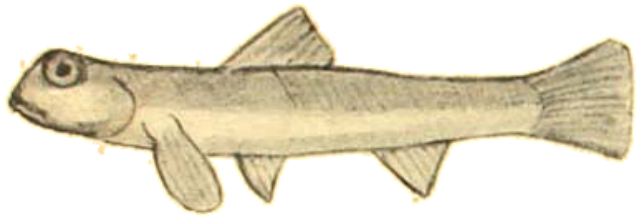

খয়রা, জয়েনজাতি Mullet।

পর্য্যন্ত দীর্ঘ হইয়া থাকে। ইহারা গভীর জলের তলায় পাঁকের উপর বাস করে বলিয়া ইহাদের দেহ বৃক্ষ-পত্রের ন্যায় পাতলা ও চেপটা হইয়া থাকে। অন্যান্য মৎস্যগণের ন্যায় উহাদের চক্ষু ও পাখনা শরীরের দুই পার্শ্বে যুক্ত না থাকিয়া দেহের উপরিভাগের অংশে অবস্থিত দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশের বাশ-পাতা মাছ ইহার অতি নিকট জ্ঞাতি বলিয়া বোধ হয়। সমুদ্রবাসী হ্যালিবাট্ (Halibut) ও ফ্লাউন্ডার (Flounder) নামক বিশালদেহী মৎস্যদ্বয় এই ব্রিলজাতির

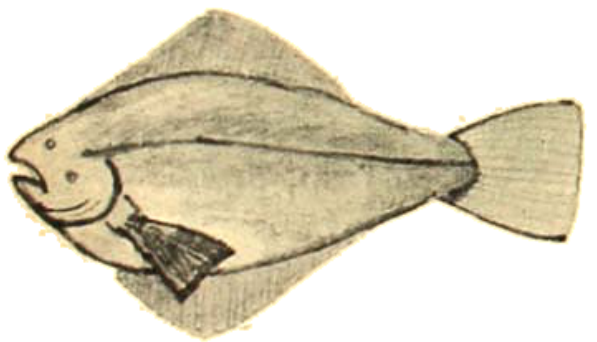

হ্যালিবাট Halibut।

সাক্ষাৎ জ্ঞাতি না হইলেও উহাদের মধ্যে আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে। সামুদ্রিক হ্যালিবাট্ মৎস্য কড মাছের অপেক্ষাও অধিকতর উপকারী ও স্বাস্থ্যপ্রদ বলিয়া, ইহার যকৃৎ-তৈল অধুনা নানাপ্রকার ক্ষয় রোগে শক্তিমান ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ব্রিল জাতি মৎস্য খাইতে খুব সুস্বাদু।

(১৫) হেরিং (Herring) মৎস্য আকারে ক্ষুদ্র ও খুব সুস্বাদু বলিয়া বিখ্যাত। ইহারা সমুদ্রবাসী হইলেও মিষ্ট জলের নদীতে বিচরণ করিয়া থাকে। হেরিং ও শিদ্ শাড্ মৎস্য প্রায় একই প্রকারের দেখিতে বলিয়া, ইহাদের পার্থক্য নির্ণয় করা অনেক সময় কঠিন হয়। বাজারে যে Sardin সার্ডিন নামক টিনে ভরা মৎস্য বিদেশ হইতে আমদানি হইয়া থাকে, তাহা এই হেরিং শাড্ ও পিলচার্ড নামক মৎস্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমাদের দেশের খরয়া বা চাপলে মাছ হেরিং মৎস্যের অতি নিকট জ্ঞাতি।

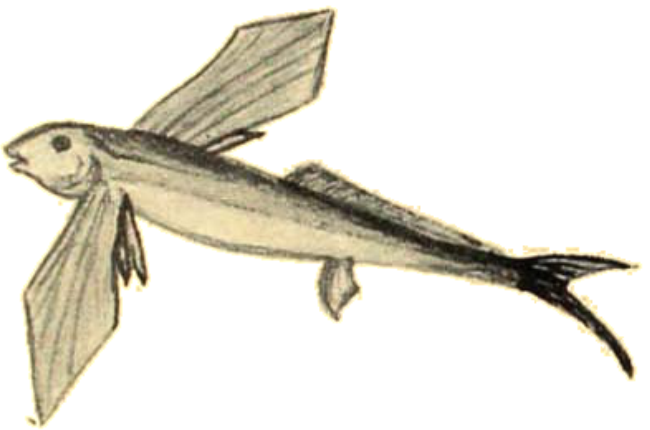

উড়ুক্কু মৎস্য Flying Fish।

(১৬) পিলচার্ড (Pilchard) মৎস্যও হেরিং-এর মত ছোট মৎস্য, তবে ইহা খুব কাঁটাশূন্য ও স্বাদু বলিয়া বাজারে ইহার চাহিদা অধিক। মিষ্টজলের নদীতে ইহাদের অনেক সময় দেখা যায়। কানাডিয়ান সার্ডিন্ এই পিল্চার্ড মৎস্য হইতেই অধিকাংশ প্রস্তুত হইয়া থাকে। আমাদের দেশের চেলা ও শির্দে মাছ পিল্চার্ড মৎস্যের সাক্ষাৎ জ্ঞাতি।

(১৭) শাড্ (Shad) মৎস্যও সমুদ্রের অধিবাসী, কিন্তু ইহারা বসন্ত কালে মিষ্টজলের নদীতে প্রবেশ করিয়া থাকে। জুন ও জুলাই মাসে সাধারণতঃ ইহারা ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে। নদীপথে ইহারা প্রায় ৪।৫ শত মাইল পর্য্যন্ত অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া থাকে। ইহারা খুব সুস্বাদু মৎস্য বলিয়া বিখ্যাত। ভারতীয় ইলিস,

চখনা ও আমলেট্ মৎস্য স্যাড্ জাতির অন্তর্গত। হ্যারিং মৎস্যের মত ইহারা ডিম প্রসবের পূর্ব্বে নদীমধ্যে কিছুই আহার করে না এবং প্রসবান্তে ইহারা সদলে লবণাম্বুমুখে পুনরভিযান করিয়া থাকে। গঙ্গার ইলিস সমগ্র ভারতের মধ্যে মৎস্য শ্রেষ্ঠ ও স্বাদে অতুলনীয় বলিয়া বিখ্যাত।

(১৮) অ্যান্‌কোভী (Anchovy) মৎস্য মিষ্ট ও নোনা উভয়বিধ জলেই বাস করিয়া থাকে। সিলাভী

ডনকোনা ও ডোরাকাটি Dace।

গৃহিণীরা এই মৎস্য চট্‌কাইয়া বোতলে তৈলের মধ্যে ফেলিয়া আচারের মত গৃহে রক্ষা করেন। এই প্রকার রক্ষিত অ্যান্‌কোভী মৎস্য ইংরাজদিগের প্রিয় খাদ্য। এদেশের ফ্যাসা ও পেটো-ফ্যাসা এ্যান্‌কোভী মৎস্যের নিকট আত্মীয়।

(১৯) পামকিন্ সিড্ (Pumpkin seed) নামক মৎস্য ইউরোপের মিষ্টজলের অধিবাসী। ছোট নদী ও পুষ্করিণী প্রভৃতিতে ইহারা অসংখ্য বাস করিয়া থাকে। ইহাদের চক্ষু বৃহৎ, দেহ গোলাকার ও ক্ষুদ্র এবং ইহাদের আঁশশূন্য ত্বক্ এরূপ স্বচ্ছ যে উহাদের দেহস্থ কাঁটা ও শিরা প্রভৃতি বাহির হইতে দেখা যায়। আমাদের দেশে ছোট বা খানিকাঠ চাঁদা ইহাদের সাক্ষাৎ জ্ঞাতি বলিয়া বোধ হয়। সিলাতে অনেকে ইহাদের গ্লাসফিশ্‌ও (Glass fish) বলিয়া থাকে।

(২০) ষ্টারজন্ (Sturgeon) মৎস্য প্রাগৈতিহাসিক যুগের কঠিন বর্ম্মাবৃত মৎস্যের বংশধর বলিয়া কথিত। বর্ত্তমানে ষ্টারজন্ মৎস্যের দেহের উপর এখনও কঠিন কণ্টকাবৃত বর্ম্মের ন্যায় আবরণ দৃষ্ট হয়। প্রথম দৃষ্টে ষ্টারজন মৎস্যের আকৃতি অনুযায়ী ইহাকে মৎস্য বলিয়া মনে করা কঠিন। এসিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকা, এই তিন মহাদেশে ষ্টারজন্ মৎস্য যথেষ্ট দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইউরোপের ভল্‌গা নদীর ষ্টারজন্ দন্তহীন হইয়া থাকে এবং এসিয়ার মধ্যে চীনের ইয়াংসী নদীর ষ্টারজনের ঠোঁট তরোয়ালের মত ও আমেরিকায় মিসিসিপি নদীর ষ্টারজনের ঠোঁট চামচের মত হইয়া থাকে। এই মৎস্যের চাহিদা ইউরোপে খুব অধিক। একমাত্র ভল্‌গা নদীতে গ্রীষ্মকালে প্রত্যেক 'ফিশিং ষ্টেশনে' প্রত্যহ ১৫,২০ হাজার ষ্টারজন্ মৎস্য ধৃত হয়। রুশিয়ায় ষ্টারজন মৎস্যের অন্ত্রে Isinglass বা জানালার শীতাবরোধ-পর্দা প্রস্তুত হয় এবং ইহার ডিম্ব খুব উচ্চ মূল্যে বাজারে বিক্রীত হইয়া থাকে। ভারতে ষ্টারজন্ মৎস্য নাই। কিন্তু ইহার জীবনযাত্রা ও পার্থক্য প্রদেশে ডিম্ব প্রসব প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করিলে, আমাদের দেশের ব্রহ্মপুত্রের মহাশীর, আসামের পার্ব্বত্য নদীর ছুংখা ও গোরিয়া নামক মৎস্যাদির সহিত ইহাদের কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়।

(২১) ট্রাউট্ (Trout) মৎস্য বিলাতে খুব অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা নানা শ্রেণীতে বিভক্ত এবং মিষ্ট ও নোনা উভয়বিধ জলেই বাস করিয়া থাকে। শ্রেণীভেদে ইহাদের নানাপ্রকার নাম হইয়া থাকে যথা— Brown trout, Sea trout, Salmon trout, Lake trout, River trout, Sunapee trout, Dolly raden

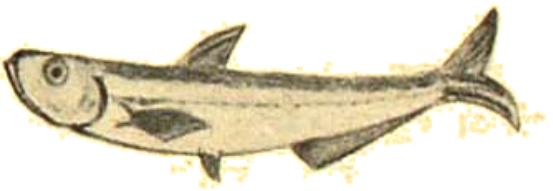

ওরফে Pilchard।

trout, Sabling trout ইত্যাদি। সমুদ্রে যে-সকল ট্রাউট্ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের ওজন অনেক সময় ৩৪ পাউণ্ড হইতে দেখা গিয়াছে। মিষ্টজলের ট্রাউট্ মৎস্য কদাচ ৮।১০ পাউণ্ডের অধিক হয়, কিন্তু ইউরোপীয় মিষ্ট জলের সাধারণ ট্রাউট্ সচরাচর ২।৩ পাউণ্ড পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ইহারা মৎস্যাশী হইলেও পাইক মৎস্যের মত ইন্দুর, ব্যাঙ, পোকা, মাকড় প্রভৃতি যাহা পায়, তাহাই খাইয়া থাকে। জলের তরঙ্গের মত অনেক সময় ইহাদের বর্ণ হইয়া থাকে বলিয়া সহজে ইহাদের দেখা যায় না। ইহার কাঁটা খুব কম বলিয়া অনেকে

ইহার নরম মাংস খাইতে খুব ভালবাসে। আস্বাদনে ইহা অনেকটা ভোলা মাছের মত। ইহাদের নিকট জাতি হইতেছে আমাদের দেশের বেলে মাছ। বাংলা দেশেও শ্রেণীভেদে নানাপ্রকার বেলে দেখিতে পাওয়া যায়, তবে এদেশে বেলে জাতির মধ্যে বাঘা বেলে, দুর্গা বেলে, ছুঁচো বেলে সর্বাধিক প্রকাণ্ডকায় বলিয়া বিখ্যাত। বাঘা বেলে এদেশে প্রায় ১॥ পাউণ্ড পর্য্যন্ত হইয়া থাকে এবং দুর্গা (মাডান) ও ছুঁচো বেলে ৩।৪ পাউণ্ড পর্য্যন্ত দেখা যায়।

(২২) স্যামন্ (Salmon) জাতির মৎস্য ইউরোপের

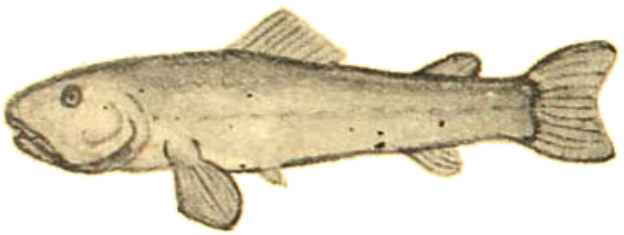

ব্রাউনট্রাউট Brown Trout।

খুব প্রসিদ্ধ মৎস্য। ইহা খুব স্বাদু ও কাঁটাহীন বলিয়া লোকে খুব পছন্দ করিয়া থাকে। এদেশেও বিলাতী স্যামন্ মৎস্য অর্দ্ধসিদ্ধ তৈলসিক্ত অবস্থায় টিনে করিয়া রক্ষিত খাদ্য হিসাবে চালান আসিয়া থাকে। এদেশের অনেক ভোজন-বিলাসী এই স্যামন মৎস্য খাইতে ভালবাসেন। ইহারা ইলিশ জাতির ন্যায় সমুদ্রের অধিবাসী, কিন্তু ডিম্বপ্রসবের সময়ে মিষ্ট জলের নদীতে আসিয়া থাকে। বৎসরে প্রায় ৪ মাস কাল ইহারা মিষ্ট জলে বাস করে। অনেক সময় ইহারা নদীপথে অন্তর্দ্দেশের ৫।৭ শত মাইল পর্য্যন্ত গমন করিয়া থাকে। নদীর মধ্যে মধ্যে প্রস্তর ও উপলবহুল স্থানে ইহারা ডিম পাড়িয়া থাকে। ডিম পাড়িবার সময় পুং-স্যামন (অনেক সময় স্ত্রী-স্যামন মৎস্যেরও) মৎস্যের ওষ্ঠাগ্রে শৃঙ্গের মত একটি উদ্ভেদ বাহির হইয়া থাকে, উহার দ্বারা উহারা জলতলে গর্ত্ত করিয়া প্রস্তরাদির পার্শ্বে ডিম্ব প্রসব করিবার স্থান প্রস্তুত করে বলিয়া অনেকে মনে করেন। সমুদ্র হইতে নদীপথে আসিবার সময়, নদীর গর্ভ সমুদ্রগর্ভ হইতে উচ্চ হইলে ইহারা ক্রমাগত লম্ফ প্রদান করিয়া উপরে নদীপথে প্রবেশ করিয়া থাকে। স্যামন মৎস্যের এই প্রক্রিয়াকে Salmon Ladder বলে। ডিম্ব প্রসবকাল অবধি ইহারা নদীর মধ্যে কিছুই আহার করে না। অনেক বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত এ বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন যে, এই সময় উহাদের বধ করিয়া উহাদের পাকস্থলীতে কোন প্রকার খাদ্যদ্রব্যাদি পাওয়া যায় না এবং নদীপথে উহাদের প্রথম আগমন-কালে উহাদের বর্ণ যেমন উজ্জ্বল রৌপ্যের মত ও দেহ খুব পুষ্ট দেখাইয়া থাকে। ডিম্ব প্রসবের পর উহারা যখন পুনরায় সমুদ্রাভিমুখে ফিরিয়া যায়, তখন উহাদের শীর্ণ ও দেহবর্ণ হরিদ্রাভ দেখায়। সমুদ্রে ফিরিবার সময় উহারা আগ্রহের সহিত ছিপের টোপ ভক্ষণ করিয়া থাকে; এই সময়ে বিলাতে স্যামন্ মৎস্য ধরিবার প্রকৃত মরশুম উপস্থিত হয়। ডিম্ব প্রসবের পূর্ব্বে স্যামন্ মৎস্য ছিপের টোপ বা অন্য খাদ্যদ্রব্য কিছুই আহার করে না। ডিম্ব প্রসব হইবার পর সমুদ্রে স্ত্রী-মৎস্যগণই প্রায় ফিরিয়া যায়, শাবকগণ একটু বড় না হওয়া পর্য্যন্ত নদীতে বাস করে এবং পুং-মৎস্যগণ বহু ডিম্ব নিষেক (fertilize) করিবার জন্যও অত্যধিক পরিশ্রম বশতঃ জীবনীশক্তির ক্ষয়ের ফলে অকালে নদীগর্ভেই মারা যায়। শাবকগণের বিভিন্ন বর্দ্ধন অবস্থায় বিভিন্ন নাম হইয়া থাকে। যথা—পার্

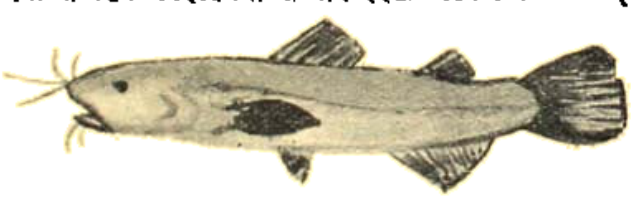

চিংড়ি Cat Fish।

(খুব ছোট), স্মোল্ট (মাঝারী) ও গ্রিল্‌স্ (যৌবন) প্রভৃতি বিভিন্ন অবস্থায় মৎস্য। ডিম্ব প্রসবের সময়ে স্যামনের নিম্ন দেহের চর্ব্বিই তাহার দেহপুষ্টির খাদ্যস্বরূপ তাহাদের জীবন রক্ষা করে। আমাদের দেশের ভোলা বা পোয়া মৎস্য স্যামনের অতি নিকটজাতি বলিয়া মনে হয়। আসাম ও চট্টগ্রাম প্রভৃতি পার্ব্বত্য প্রদেশের নদীতে যে বৃহৎ পোয়া মৎস্য দৃষ্ট হয়, তাহাদের Rock Salmon বলে। সামুদ্রিক স্যামন্ বা পোয়া ওজনে ৮।১০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত হইয়া থাকে, নদীর পোয়া ৫।৬ পাউণ্ড পর্য্যন্ত সচরাচর হইয়া থাকে। ইহারা ছোট মৎস্য ও চিংড়ি প্রভৃতি আহার করিয়া থাকে।

স্থিতি ও গতি

—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ

"হালো রবীন!"

"কে, মিষ্টার মোকার্জ্জি! গুড্ ইভনিং!"

বলিতে বলিতে রবীন গিয়া সুদৃশ্য ও বৃহৎ একখানি মোটরের কাছে দাঁড়াইল। মোটরের মধ্যে হাটকোট পরা মধ্যবয়স্ক একটি ভদ্রলোক উপবিষ্ট, পাশেই সুবেশ-ভূষা সুস্মিতা সুন্দরী একটি যুবতী। যুবতীর দিকে দৃষ্টি পড়িবা মাত্র যেন কিছু বিস্মিত মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া রবীন কহিল, "এই যে বাঃ? আপনি—"

হাসিয়া যুবতী উত্তর করিল, "কি, আমি কি? কেন চিনতে পারছেন না না কি!"

রবীন থতমত খাইয়া বলিল, "মাফ ক'রবেন মিস্ মোকার্জ্জি, চিনতে পেরেছি বই কি? তবে আপনি—"

"আবার আপনি? কেন আমি কি হ'য়েছি? আপনার যেন ধাঁধাঁ লেগে গেছে! কেন, কি হ'য়েছে বলুন ত?"

হাসিয়া কন্যার পিঠ চাপড়াইয়া মিষ্টার মোকার্জ্জি কহিলেন, "ধাঁধাঁ লাগবে না? ওরে পাগলী, এই বছর দুইয়ের ভেতর তুই যে কি হ'য়ে উঠেছিস, আরশীতেও চোখে পড়ে না রে? আমি ধরের লোক, আমিই চেয়ে চেয়ে দেখি আর অবাক্ হ'য়ে যাই! একেবারে দ্বিতীয় একজন ভেনাস্ হ'য়ে উঠেছিস যে! রবীনের মত যুবক কারু না চক্ষু ধেঁধেঁ যাবে রে? হাঃ হাঃ হাঃ!'

রবীন ও মীনা দুই জনেরই মুখ লাল হইয়া উঠিল। চকিতে একবার দুইজনে দুইজনের দিকে চাহিয়াই মুখ ফিরাইল—বড় মধুর লালিম হাসি সঙ্গে সঙ্গে ফুটিয়া উঠিল।

"বাঃ বাঃ! একেবারে Love at first sight! হাঃ! হাঃ! হাঃ!"

মিষ্টার মোকার্জ্জি আবার উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। রবীন একটু আমতা আমতা করিয়া কহিল, "হাঁ, অনেক-দিন মিস্ মোকার্জ্জিকে দেখি নি কি না- এর ভেতর অনেক বড় হ'য়ে উঠেছেন উনি। তা—তা—"

"তা—তা আবার কি হে? সোজাই বলে ফেল না—অত sheepish কেন হে তুমি! একদম coy like a maiden! তা এস—এস, আমরা দীপক সিনেমায় যাচ্ছি—খাসা একটা ন্যাটিনি প্রোগ্রাম সেখায় আছে। তা এস উঠে পড়। কোনও engagement নেই ত?"

"আজ্ঞে না, কিছু না। আমিও ভাবছিলাম, ঐ রকম কোথাও যাব, একটু ফুর্ত্তিতে সন্ধ্যাটা কাটিয়ে আসব।" বলিতে বলিতে রবীন গিয়া গাড়ীতে উঠিল।

"বস্! তবে আর কি? চল, খাসা ফুর্ত্তিতে কাটিয়ে আসা যাবে। আজকার প্রোগ্রাম জান ত? শকুন্তলা। খাসা রোমান্স বটে, সেদিন জোন্সের অনুবাদটা দেখে-ছিলাম। ভূমিকাটায় খাসা লিখেছে! এ রকম রোমান্স —ওরা ত বলে পৃথিবীর সাহিত্যেই কম আছে।"

রবীন কহিল, "হাঁ, অনেকে ত কালিদাসকে একেবারে ভারতের সেক্সপিয়ার বলেই সুখ্যাতি করে থাকেন।"

"হাঁ, তাও পড়েছি, অতটা উঁচু বলে আমি মনে করতে পারি নে, সেক্সপিয়ার—তাঁর কি আর তুলনা কোথাও মিলতে পারে? তবে এমন চমৎকার স্বাভাবিক অবাধ প্রেমের লীলা কালিদাস দেখিয়েছে—যাতে কোনও সঙ্কোচ নেই, কোনও জড়তা নেই, কোনও convention-এর, চলতি কায়দার দাসত্ব নেই, একেবারে যেন মুক্ত হাওয়ার মত সটান আপন পথে চলেছে! অবাক্ হয়ে গেলাম যে, এদেশের কোনও কবি এমন একটা প্রেমের আদর্শ কল্পনাও করতে পেরেছে।"

"কিরে পাগলী, একেবারে এতটুকু হ'য়ে চুপটি মেরে রইলি যে? Chattering magpie একেবারে বোবা হয়ে গেলি যে!"

হাসিয়া রবীন কহিল, "আপনার মুখে এই প্রেমের আদর্শের ব্যাখ্যা শুনে মিস্ মোকার্জ্জি বোধ হয় লজ্জা পাচ্ছেন।"

"না, না, সে সব কিছু না! তের এমন আলোচনা আমি করে থাকি ওর কাছে। কেন করব না? মেয়ের সামনে বাবা এ বলবে না, ও বলবে না convention আমি মানি না। ও বড় হয়ে উঠেছে, সব বোঝে। বন্ধুর মত কেন আমরা খোলাখুলি সব কথার আলোচনা করব না? কি জান, কোনও রকম hot house breeding-এর পক্ষপাতী আমি নই। এতে পাছে দোষ হয়, ওতে পাছে দোষ হয়, এই বলে পায়ে পায়ে কেবল কৃত্রিম সঙ্কোচের বাধা, কেবল আব্রু দিয়া ঢাকা, ওতে মনুষ্যত্বের সুস্থ স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তিই নষ্ট হয়ে যায়।"

অতি উৎফুল্ল ভাবে রবীন কহিল, "হাঁ, ঠিক বলেছেন, আমারও ঠিক এই মত। মানুষ স্বাধীন, মুক্ত, সকল বৃত্তির অবাধ স্ফূর্ত্তিতে তার জন্মগত অধিকার! কেন বাজে কতক-গুলো convention-এর বেড়ী দিয়ে এই অধিকারে তাকে বঞ্চিত রাখা হবে?"

"(সানন্দে পিঠ চাপড়াইয়া) বেশ্ভো, রবীন, বেশ্ভো। হাঁ, এই ত চাই! খাসা ছেলে তুমি, তোমার বাপের ঘরে কি করে এমন উন্নত উদার বুদ্ধির বিকাশ তোমার হল?"

হাসিয়া রবীন উত্তর করিল, "বাবা তাঁর নিজের মতে নিজে চলেন, আমাকে বিশেষ বাধা-টাধা কিছুতে দেন নি। পড়াশুনার অবহেলা কখনও করি নি, কেন করব? এতেই তিনি খুসী ছিলেন। মতামত কি পোষণ করি, অন্য কাজে কি ভাবে চলি ফিরি, এ নিয়ে কোনও গোলমাল কখনও তিনি করেন নি।" বলিতে বলিতে রবীন হঠাৎ থামিয়া গেল। হঠাৎ মনে পড়িল, বিবাহ বিষয়ে পিতার সেই ভয়ঙ্কর দুঃসহ জবরদস্তীর কথা। মুখখানাও কেমন একটু আঁধার হইয়া উঠিল, একটু উঠিতে না উঠিতে রবীন তাহা চাপিয়া ফেলিল।

লক্ষ্য করিয়া মোকার্জ্জি কহিলেন, "কি হে, তা হলে বল গোলমালও বেশ কিছু করেছেন? কি হে, সেটা কি?"

একটু সামলাইয়া লইয়া হাসিয়া রবীন উত্তর করিল, "না না, এমন কিছু নয়। সামান্য দুই একটা কাজে গোলমাল কি জবরদস্তী, সে সব বাপেই করে থাকেন। আপনি কি করেন না?"

"না, কক্ষণও না। বল ত পাগলী, কোনও গোলমাল কি জবরদস্তী কিছু নিয়ে তোর ওপর করে থাকি কখনও?"

হাসিয়া মীনা কহিল, "না, কর না? খুব কর? খিদে না পেলেও বল খেতে হবে। সামান্য একটু অসুখ বিসুখ কিছু হলেও জোর করে অমনি ডাক্তার এনে দেখাও, তেতো ঝাঁঝাল ওষুধগুলো এনে খাওয়াও। এই ত আসতে আজ ইচ্ছেই ছিল না আমার, অরুদের ওখানে যাব ভেবেছিলাম।"

"ওরে, এ সব হচ্ছে স্নেহের আবদার—স্নেহের জুলুম। তুইও করিস, আমিও করি। আজকে যে জোর করে নিয়ে এলাম—অরুণাদের ওখানে, সে কাল গেলেও ত চলবে। এই যে প্লেটা তোরা করবি, দীপকে একবার দেখে গেলে—"

"প্লে?"

মোকার্জ্জি কহিলেন, "ওরা যে শকুন্তলা প্লে করছে—অবিশ্যি modernized (আধুনিক রুচি অনুযায়ী রূপান্তরিত) শকুন্তলা—এই নানা রকম গান modern love songs, oriental dances ওতে যোগ ক'রে যাতে আধুনিক রুচির সঙ্গে মানায়, আর লোকের বেশ প্রীতিকর হয়। দীপকেও অনেকটা সেই ধরণে প্লটটাকে নতুন ছাঁচে ঢেলে নিয়েছে। এটা একটা charity performance —নর্থ বেঙ্গলে যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে তাহারই সাহায্যের জন্যে। এই যে দীপকে এসে পৌঁছলাম, আচ্ছা, ব'লব তোমাকে সব—হাঁ, দরকারী কথাও আছে, হঠাৎ মনে হল। ফিরে একেবারে ডিনার খেয়ে আমাদের ওখান থেকে যাবে, তখন সব বলা হবে।"

ফিরিবার পথে মোকার্জ্জি মীনাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রে পাগলী, কেমন দেখলি বল ত আজ এই শকুন্তলার ছবি?"

"তা হয়েছে এক রকম" বলিয়া মুখ টিপিয়া মীনা একটু হাসিল।

"কি হাসছিস্ যে বড়? ভাবছিস কি? ওদের শকুন্তলার চাইতে ভাল শকুন্তলা দেখাতে পারবি তুই?"

"সে—আমি কি বলতে যাব? তুমিই বল না?"

মোকার্জ্জি কহিলেন, "বলব তবে? হাঁ, তুই যা ভাবছিস্ ঠিক। অনেক ভাল শকুন্তলা দেখাতে পারবি তুই—একেবারে জীবন্ত, full of life! কি বল রবীন, পারবে না?"

রবীন উত্তর করিল, "ওদের রিহার্সাল আমি দেখি নি। তবে—" বলিতে বলিতে রবীন থামিয়া গেল, মীনার মুখের দিকে চাহিয়া বড় মধুর একটু হাসিল।

"তবে—কি হে? কি বলতে বলতে লজ্জায় থেমে গেলে? ওদের শকুন্তলার চাইতে মীনা অনেক সুন্দর—তাই?"

হাসিয়া রবীন কহিল, "কেবল সুন্দর বললেই বলা ঠিক হল না। সুন্দর অনেক আছে যার মধ্যে খুঁৎ বড় ধরা যায় না; অথচ তাতে ভেতরকার এমন বড় একটা জিনিষের অভাব আছে, যাতে করে সেই সৌন্দর্য্যটাকে কেমন প্রাণহীন ব'লে মনে হয়—যেমন না কি একটা ষ্ট্যাচু (statue), সুন্দর যতই হ'ক তবু সেটা ষ্ট্যাচু (statue), ঠিক জীবন্ত মানুষ নয়। লোকে দেখে সমালোচনা করতে পারে, আদর্শের মাপকাঠি দিয়ে মিলিয়ে দেখে বলতে পারে হাঁ, ঠিক আছে, খুঁৎ কোথাও কিছু নেই। কিন্তু চিত্তকে তার সেই সৌন্দর্য্যের প্রাণ গিয়ে স্পর্শ করে না, সেই স্পর্শ পেয়ে সৌন্দর্য্যের মাধুরীতে তা এমন তলিয়ে ডুবে যায় না, যখন সৌন্দর্য্যের অবয়বগুলো তার সব রেখার টানে রক্তের আলোছায়ায় তার মনের পটে ভেসে ওঠে না, প্রাণ ভরে বাজে কেবল সেই সৌন্দর্য্যের একটা মোহন মধুর সুর—যার নেশাতেই সে বিভোর হয়ে থাকে।"

"ব্র্যাভো ব্র্যাভো রবীন! একেবারে খাঁটি একজন কবি যে তুমি! খাসা বলেছ! ওর চাইতে ভাল করে ও কথাটা বলা যায় না! তা হ'লে তোমার কথা এই, ওদের শকুন্তলা—হাঁ, হিসেব করে দেখতে গেলে সুন্দর বটে, তবে সৌন্দর্য্য ত একটা হিসেবের বস্তু নয়—ঐ যা বললে, ভেতরকার প্রাণটা তাতে নেই। মনটা যাতে আপনি টেনে নেয় এমন একটা রস ফলানো তাতে নেই। প্রাণটা আপনা থেকেই ভরপুর হয়ে ওঠে, এ যেন মধুর ছন্দে একটা সুর তার ভেতর বেজে উঠছে না।"

"হাঁ।"

"তা হ'লে—এটাও তুমি বলতে চাও, সেই বস্তুটা মীনার সৌন্দর্য্যে আছে? (পিঠ চাপড়াইয়া) আ রে, লজ্জা কেন পাচ্ছ হে? ইয়ংম্যান, খোলা ভাবে মনের কথা বলবে এই ত চাই, লজ্জা কি? হুঃ! আর মীনী যে একেবারে লাল গোলাপটি হয়ে উঠল—হাঃ হাঃ হাঃ! —এই যে এসে পড়লাম। এস, তবে নামা যাক্, খেতে খেতে তখন সব কথা হবে।"

ধর্ম্মাবতার প্রস্তুত হইয়া তিনজনে ডিনার টেবিলে আসিয়া বসিলেন। মোকার্জ্জি আরম্ভ করিলেন, "হাঁ, যা বলছিলাম, ওদের প্লে-তে শকুন্তলায় মীনীকে বেশ মানাবে। কেবল চেহারায় নয়, অভিনয়ের হাব-ভাবও ওর অতি চমৎকার হ'চ্ছে। আর নাচ-গানগুলোয়—"

"নাচ-গান? শকুন্তলার পার্টে?"

"হাঁ, বলিনি বুঝি, বইটাকে modernize করে নেওয়া হয়েছে। নাচ-গান ছাড়া ও সব রোমান্সের নাটক আজ-কাল চলে না। নাচের সঙ্গে কোরাসের গান কটা দেওয়া হয়েছে—এই যেমন মুনিকন্যাদের, অপ্সরাদের, তাপসী-দের, রাজবাড়ীর সখী-টখীদের—সব ওরিয়েন্টাল ড্যান্স—ভাবগুলো সব গানের সঙ্গে, কখনও বা শুধু বাজনার সঙ্গে নাচেই কোটাবার চেষ্টা হয়েছে—ফুটছেও খাসা।"

"বটে! খুব চমৎকার হবে ত!"

'হবে না? একেবারে জম-জম করবে। দু'তিনটে performance করা হবে, প্রথম রাতটার সুখ্যাতি বেরোলে—পর পর দিন লোক একেবারে ভেঙ্গে পড়বে, হাজার হাজার টাকা উঠবে। তার পর ঐ মীনীর শকুন্তলা, ওরিয়াণ্টাল ড্যান্সিং-এ ও যে first class একজন artiste হয়ে দাঁড়িয়েছে—এই performance গুলো হয়ে যাক্, দেখো সকলের fame-কেও eclipse করে ফেলবে! তাই না কয়েকটা নাচ ওকেও দেওয়া হয়েছে। First appearanceই ওর হবে

সখীদের সঙ্গে ওরিয়াণ্টাল ড্যান্সিংএ আর ঐ love episode টুকু, গানের সঙ্গে খাসা একটু নাচে সেটা expression দেওয়া হচ্ছে! আর শকুন্তলার বিরহ-মিলন—স্বামীগৃহে যাত্রা- সবটার expression দেওয়া হয়েছে নাচে, খাসা সব নাচ, একেবারে incomparable হচ্ছে! আর শেষ অঙ্কে ঐ মুনির আশ্রমে—হাঁ, কি নামটা রে—মুনির—মীনী, বলে হচ্ছে না।"

"কণ্ণপ।"

"হাঁ, হাঁ, কণ্ণপ, কণ্ণপ। সেখানেও তাপসীদের একটা নাচ lead করবে ও! আজ যে সিনেমাটা দেখে এলে, ওদের প্রোডিউসার এসব conceiveই করতে পারে নি। দেখে সবার তাক লেগে যাবে। হয় ত কোনও সিনেমা কোম্পানী ওদের এই প্লে-টাকে ছবিতে তুলে নেবার জন্যে offer দেবে।"

"তা বেশ ত। যদি টাকা মেলাই দেয় পাবলিক কোনও চ্যারিটী ফণ্ডে—তাঁদের offerটা accept করলেই বা দোষ কি?"

"হাঁ, আমরাও সেটা ভাবছি।"

একটু হাসিয়া মীনা কহিল, "কিন্তু বড় লজ্জা করে। ছবিতে ঐ নাচ-টাচগুলো যেখানে সেখানে মিয়ে দেখাবে।"

রবীন কহিল, "তা দোষ কি? এত বড় একজন artiste হয়ে সবাইকে এমন entertain করতে পারা, সে ত বড় একটা ভাগ্যের কথা। এই সব পার্টে সত্যি যদি এত দখল কারও থাকে সেটার আনন্দ যত বেশী লোককে দেওয়া যায়, ততই তার সার্থকতা বেশী হয়। সিনেমার মত এত বেশী লোকের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া আর কোনও উপায়ে সম্ভবই হয় না। লজ্জা—ওত একটা false and irrational sense of conventional delicacy, আর তার দাসত্ব স্বীকার করে—যদি পারেন মিস মোকার্জি—এত বড় একটা আনন্দ থেকে জগতের লোককে বঞ্চিত করবেন এ অধিকার বোধ হয় ওঁর নেই।"

"তা—"

"আচ্ছা, সে পরে তখন বোঝা যাবে রে পাগলী, পরে তখন বোঝা যাবে। আজই ত একটা agreement কারও সঙ্গে হয়ে যাচ্ছে না? এই প্লে-টার brilliant successএর পর, offer যদি সত্যিকারও আসে, নিজেই তখন পাগল হয়ে উঠবি ছবি দিতে।"

"কক্ষণও না।"

"কিন্তু সবাই যদি বলে এক্ষুণি হাঁ?"

হাসিয়া রবীন এই প্রশ্ন তুলিল।

মোকার্জি কহিলেন, "থাক ওসব কথা এখন। যখন বলে, আর বলবার সুযোগ উপস্থিত হয় বোঝা যাবে। আর ছবি কেবল একলা শকুন্তলার ছবি হবে না। Co-actorরাও, সব সমান সমান হওয়া চাইত। অরুণার অনসূয়া, লিলীর প্রিয়ম্বদা আর জুলীর গৌতমী, এগুলোও খাসা হচ্ছে। নীরদের বিদূষক বেশ ওৎরাবে, কথ টথগুলো—তাও মানানসই হচ্ছে। ঐযে কমিক সিনটা জেলের আংটি নিয়ে—অতি চমৎকার ফুটছে। আমাদের সুখেন্দু খাসা জেলের পার্টটা করছে, original—অর্থাৎ কি না ঐ original অনুবাদটা পড়ে দেখলাম, ঠিক যেন modern life-এর একটা scene, আর করছেও ওরা খাসা। কিন্তু সব মাটি করে দিচ্ছে ঐ দুষ্মন্ত। কি রে, তোদের দুষ্মন্ত তোর কেমন লাগছে রে মীনী?"

একটু হাসিয়া মীনা কহিল, "সে আর কি করবে বাবা? আর কারও ত সুবিধে তেমন হল না।"

"কিন্তু ওরও ত সুবিধে কিছু হচ্ছে না। লাভের মধ্যে তোর hero—কতকগুলো খাসা scene তোর সঙ্গে রয়েছে তোর অমন সব expression গুলোও যে flat হয়ে পড়ছে।"

রবীন বলিয়া উঠিল, "সে ত হ'তে বাধ্য। Co-actor যদি না সমান সমান respond করতে পারে।"

একটু হাসিয়া মীনা কহিল, "সে পারছেও না, পারবেও না। কি আর করব? ঐ সিনগুলো কেমন যেন একটু চিমে-চিমেই হয়ে যাচ্ছে।"

"তা হলে ত সব প্লে-টাই মাটি হ'য়ে যাবে।"

"তার চাইতে সত্যি এক একবার মনে হয় প্লে-টা ছেড়ে দিলেই বোধহয় ভাল হত।"

"প্লে ছেড়ে দেব! বলে কি পাগল। এদ্দিন তবে এ তাবাদা করা হ'ল কেন? পরচও ত কম এ লাগাং করা হয় নি! ঐ সিনটিন গুলো—"

"কেন, তখনি ত বলেছিলাম, সুবিধে বোধ হয় হবে না—দুষ্মন্ত পাওয়া যাচ্ছে না—আরও কিছু চাঁদা তুলে টাকাগুলো সব দুর্ভিক্ষে দিয়ে দাও।"

"আরে, চাঁদা কি কেউ অমনি দিতে চায় রে পাগলী? সিটিং কল করলেও কেউ আসবে না, বাড়ী বাড়ী ঘুরে আজ সই করাও কাল আদায় কর—ওয়াদার পর ওয়াদা—কে অত হাঙ্গামা করে? আর এ খালা একটা আমোদ নিজেদের হচ্ছে—এত বড় একটা আর্টের ব্যাল-চার—লোকে এনজয় করবে, তারিফ করবে—টাকাও ঝর ঝর এসে পড়বে। তাইত আজকাল থিয়েটের দরকার যখন হয়, লোকে এই রকম সব entertainment-এর বন্দোবস্ত করে। আর আমরাও ত সত্যি professional নই, আমাদের এই সব আমোদ-আহ্লাদ কিছু করতে হলে এই রকম কিছু একটা উপলক্ষ্য ধরেই করতে হবে। অন্যের কথা কি বলব, স্বয়ং যে রবিবাবু, তিনি তাঁর বিশ্বভারতীর জন্যে নাটক করে ক'রে টাকা তুলেন।"

"তাঁর বাই! নইলে তিনি তেমন চেষ্টা করলে বিশ্ব ভারতীর টাকা হয় না? মালবা যে অতবড় ইউনিভার্সিটি করলেন, কোটি টাকা বোধ হয় উঠেছে—নাচঘানের নাটক একটাও কোথাও তাঁকে করতে হয়েছে?"

হাসিয়া রবীন কহিল, "তা রথ দেখা কলা বেচা দুই-ই যদি একসঙ্গে হয় ক্ষতি কি?"

"হাঃ হাঃ হাঃ! ঠিক বলেছ রবীন, আমাদেরও সেই রথ দেখার সঙ্গে কলা বেচা যদি হয়—ছাড়ব কেন!"

একটু হাসিয়া মীনা কহিল, "কিন্তু হ'লে ত?"

"হবে, হবে, কেন হবে না—তবে কি না ঐ দুষ্মন্তটা—বেশ একটু ভাবিয়েই তুলছে বটে!"

রবীন কহিল, "কিন্তু আজকার এই সিনেমার দুষ্মন্ত ত মন্দ দেখলাম না? উনি দুচার দিন গিয়ে দেখে আসুন না।"

একটু মুখ বাঁকাইয়া মাথা নাড়িয়া মোকার্জি কহিলেন, "আসতে পারে। তবে তাতেও কিছু হবে না। আসলে ওর দখলই এ বিদ্যের নেই। প্রাণটা এর ভেতর এনে ফেলতে পারে নি। শেখান যেমন হয়, কথাগুলো আউড়ে যায়, মুখভঙ্গীও করে, হাত পাও নাড়ে, কিন্তু সব যেন পুতুল-নাচের মত হয়। ভেতরকার আসল ভাবটি ফুটে উঠে না।"

একটু মুচকি হাসিয়া মীনা টিপ্পনী করিল, "ভেতরে সেটা থাকলে ত ফুটবে।"

মোকার্জি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। রবীনের মুখেও হাসি ফুটিল। টেবিলে দুইটা চাপড় দিয়া মোকার্জি কহিলেন, "হাঁ, এই ঠিক বলেছিস্ আসল কথাটা যা। রোগটা ঠিক ধরেছিস্, ও পেশাকে দিয়ে হবে না, যতই চেষ্টা করা যাক।"

রবীন কহিল, "চেষ্টা করলে কি না হয়? তা যদি অনুমতি করেন আমি দুই একদিন রিহার্সালে এসে দেখতে পারি, করে তোলা কিছু যায় কি না।"

"তুমি! হাঁ, তা পারবে, পারবে। সেই ত দেখার ইন্‌ষ্টিটিউটে কি এক খানা নাটকে—"

"জনা।"

"হাঁ, জনা, জনা! ঐ যে বীর কে ছেলেটি তার"—

"প্রবীর।"

"হাঁ, প্রবীর, প্রবীর! character টা খাসা ফুটিয়েছে বটে! তুমি সেই প্রবীর হ'য়ে ছিলে, খাসা প্লে করেছিলে, deliveryর ত কথাই নেই, তার চাইতেও তোমার expression আর movement গুলো লেগেছিল আমার অনেক ভাল। প্লে'র আসল life তাই ত, তা—তুমিই কেন দুষ্মন্ত হও না?"

"আমি? এখন সেটা"—

"কেন দোষ কি? পেশার কথা ভাবছ? ছেড়ে দিতে পারলে সে বাঁচে এখন। নিজেও বুঝছে, সুবিধে বড় হচ্ছে না, হবেও না। তাইত এখন জড়সড় হয়ে যাচ্ছে এখন যে, দিনের পর দিন আরও খারাপ হয়ে যাচ্ছে। না না, ও সব কিছু ভেব না রবীন, দুষ্মন্ত তোমাকেই হ'তে হবে। কি বলিস্ মীনা? তাই খুব ভাল হবে না?" বড় ঘন লালিম মুখখানি মীনা একটু

ফিরাইয়া লইল, কেমন একটু আমতা আমতা করিয়া কহিল, "তা ওর প্লে ত দেখি নি—"

"কালই দেখা যাবে। হুঁ, কাল তুমি আসবে ঠিক সন্ধ্যে ছটায়, জানলে? দেখা যাবে তুমি কেমন কর। করবে যে খুবই ভাল, তাতে আমার সন্দেহ মাত্র নেই। আজ ত সিনেমায় দেখে এলে বইটাও বরং নিয়ে যাও, ওরে, সে ত সেই জোন্সের অনুবাদটা এনে—"

"নিতে হবে না। আমার কাছেই আছে। Annotated original সংস্কৃত নাটকটাও বাজারে পাওয়া যাবে —বি-এর টেক্সট্ ছিল গেল বছর।"

"বাস! তবে আর কি? ভাল করে ষ্টাডী করে এস। পুরো একটা দিন সময় পাচ্ছ—প্র্যাক্‌টিস্ করেও কিছু নিতে পারবে—তবে আমাদের এটা modernize করা হয়েছে কি না অদলবদল অনেক হয়েছে। তা তাতে আটকাবে না কিছু, আসল spiritটা ওতে ভাল ধরতে পারবে। তা হ'লে ছটায় আসবে কাল, কেমন এই ঠিক রইল ত?"

"আজ্ঞে, হাঁ।"

"Thank you! খাসা ছেলে তুমি, smart যেমন হতে হয়। আর চেহারাটাও হাঁ, পেমার চাইতে দুষন্ত অনেক ভাল তোমায় দেখাবে। কেন তোমায় কথাটা আগে যে মনে হয় নি! অনেক দিন দেখিনি কি না, তাই। যা হক, বাঁচা গেল, একটা কিনারা যে হল। সত্যি বড় ভাবিত করেই তুলেছিল পেমা।"

আহারের পর মীনা অর্গ্যানের সুর-সংযোগে ঐ নাটকের কয়টা গান গাহিল। পরম আপ্যায়িত হইয়া রবীন তখন বিদায় লইয়া গৃহে ফিরিল।

"ও রবীন!"

"কি মা?"

"উনি বললেন, কাল দিন ভাল আছে, সকালেই ওঁরা আশীর্ব্বাদ করতে আসবেন।"

রবীন চমকিয়া উঠিল।

"আশীর্ব্বাদ! কিসের আশীর্ব্বাদ! কারা আসবে?"

"এই দেখ! কি যে বলে! নরেন বাবুরা আসবেন। কথাবার্ত্তা সব ঠিক হয়ে গেছে; এখন আশীর্ব্বাদটা হয়ে গেলেই—"

"ও!"

আকাশে এক মধুময় স্বপ্নরাজ্যে রবীন এতক্ষণ বিচরণ করিতেছিল। সহসা কে যেন তাহাকে কঠোর এক আঘাতে ঘন তিমিরাবৃত পৃথিবীর শক্ত মাটিতে আছড়াইয়া ফেলিয়া দিল। মুখ ভরিয়া উজ্জ্বল লালিম একটা পুলক আভা ভাসিতেছিল, মুহূর্ত্তে নিভিয়া গেল, একটা কালিমায় তাহা পরিব্যাপ্ত হইল। বিরাজমোহিনী চাহিয়া দেখিলেন, মুখ ফিরাইয়া লইলেন। বড় মর্ম্মভেদী একটা নিঃশ্বাস বুক ভরিয়া উঠিল। রবীন নীরব। ফিরিয়া বিরাজমোহিনী কহিলেন, "তা কথাবার্ত্তা যখন ঠিক হয়েই গেছে।"

"গেছে, সে কি আমার সম্মতিতেই?"

"তা শেষে তুইও ত মত এক রকম দিলিই বাবা?"

"দিলি। গলায় ফাঁস লাগিয়ে কড়া টানে আদায় করে নেওয়া হল, আর বলা হচ্ছে এখন দিলি!" বিকৃত মুখে অতি কঠোর কেমন যেন চাপা একটা বজ্র গর্জ্জনের ন্যায় কর্কশ স্বরে রবীন এই উক্তি করিল। বিরাজমোহিনী শিহরিয়া উঠিলেন; কহিলেন, "মত না দেওয়াই বুঝি ভাল ছিল। ফাঁস গলায় না পরলে কে পরাতে পারত বাবা?"

"না পরে কোথায় যাই? ঘরে রাশি রাশি টাকা রয়েছে, তবু দেবে না আমাকে, যাতে উন্নতি লাভ করতে পারি, যে আশা ধরে এতদিন চলছি, তাই পূর্ণ করবার অবসর যাতে পেতে পারি।"

বিরাজমোহিনী কহিলেন, "হাঁ—তা বড় একটা আশা করে রয়েছিস, সেটায় হঠাৎ একটা বাধা পড়লে দুঃখু অবশ্যি হতেই পারে। তবে উন্নতির কথা—সে বাবা, বিলেত না গেলেই কি উন্নতি কারও হয় না? উনি ত বিলেত যান নি, তা টাকা রোজগার ত কম করেন না!"

মুখ ভেঙচাইয়া রবীন উত্তর করিল, "টাকা রোজগার! কেবল টাকাই চিনেছ। টাকা রোজগারই যেন উন্নতির একমাত্র পরিচয়! বিলেত যার লোকে মানুষ হতে, চোখ-মুখ ফুটবে বলে, উন্নত একটা আবহাওয়া, উন্নত ভাব পাবে

বলে। এই হতভাগা দেশের পচা কাদামাটিতে পড়ে থেকে মানুষও কেবল কাদামাটির সঙ্গেই মিশিয়ে যায় বই ত নয়।"

"সে যাই হক বাবা, তার জন্যে এত অনিচ্ছের এই বিয়েতে মতটা দেওয়া তোমার ঠিক হয় নি। দেখছি বড় একটা অশান্তিরই সৃষ্টি হবে এতে।"

"তা ত হবেই। আর তার জন্যে দায়ী তোমরা!"

বিরাজমোহিনী কহিলেন, "তা বাবা, এখনও সময় আছে। দু'পক্ষের আশীর্বাদে সম্বন্ধ পাকা এখনও হয় নি।"

"বাকীও বড় নেই। উনি কি এখন ছাড়বেন?"

"কাজেই ছাড়বেন। তোমার ভাব যা দেখছি, এ বিয়ে না হওয়াই ভাল।"

"সে ভুগো বার!"

"তা হলে কি হবে? ওঁকে গিয়ে বলব, সম্বন্ধ ছেড়ে দাও?"

রবীন কেমন স্তব্ধ হইয়া গেল। একটু কি ভাবিয়া শেষে কহিল, "উনি ত খুব চটে যাবেন?"

"সে ত যাবেনই।"

"বটে, কি করবেন? বিলেত যাবার খরচ দেবেন না?"

"না।"

"আর?"

"আর কি করবেন, সে কি করে বলব বাছা? তা যাই করুন, সত্যি যদি তোমার এই রকমই থাকে, বিয়ে করো না।'

"হুঁ, হয় ত একেবারে ত্যাগই আমাকে করবেন। উইল করে"—বলিতে বলিতে রবীন দন্তে অধর দংশন করিয়া বাঁ হাতের শক্ত মুষ্টিতে মাথার চুল চাপিয়া ধরিয়া টানিতে লাগিল। বিরাজমোহিনী আবার একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া মুখ ফিরাইয়া লইলেন। রবীন কহিল, "আচ্ছা এক কায়দায় ফেলে চাপ দিচ্ছ তোমরা, সে আর কি বলব! এখন দেখছি, এগোলেও মরণ, পেছলেও মরণ!"

"আমাকে বলছ মিছে বাবা। আমার যদি হাতে কিছু থাকত।"

"হাত যে নেই, সে তোমার দুর্বলতা। এদেশের নারী জাতিই এমনি দুর্বল।"

"সে আর কি হবে বাবা? এদেশেরই নারী হয়ে জন্মেছি, ভাগ্য তার এড়াব কি করে। তা হলে এখন যা হয় একটা ঠিক করে ফেল, সময় ত আর নেই।"

"তা—তুমি কি বল মা?"

"আমার যা বলবার সে ত বলেইছি। এখন তুমি ভেবে যা হোক একটা ঠিক কর।"

হাতে মাথাটা রাখিয়া রবীন একটুকাল কি ভাবিল। ভাবিয়া অপেক্ষাকৃত একটু সংযত ভাবে কহিল, "এখন—এত দূর এগিয়ে—কাল সকালেই দিন করেছ আশীর্বাদের—তাই ত—ভাবছি, কি বলে এখন ফেরা যায়। গোড়াতেই বড় দুর্বলতা আমি করেছি—তখনই যদি সাফ না করে দিতাম। আচ্ছা মা, বিয়ে যদি কোথাও করতেই হয়, আমার মতামত আর কোথাও—ধর, আমি যদি নিজে একটু দেখে শুনে নিই—না হয় বিলেত কিছুদিন পরেই যাব—"

গভীর একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া বিরাজমোহিনী কহিলেন, "এটা যদি তখন বলতে বাবা, তাও কি হত বলতে পারিনে—তবু দেখা যেত বলে কয়ে। কিন্তু এখন তুমি কথা দিয়েছ—মেয়ে তারপর উনি পাকা-দেখা দেখে এসেছেন—কাল ওরা পাকা দেখতে আসবে, তারও দিন ঠিক করে দিয়েছেন।"

নূতন একটা আশায় কিছু উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু সে মুখখানি রবীনের আবার বিবর্ণ হইয়া গেল। ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে কহিল, "তবে আর এ কথা কেন বলছিলে যে বিয়ে ক'রো না?"

বিরাজমোহিনী উত্তর করিলেন, "সে বলছিলাম ভবিষ্যতের সব চেয়ে বড় ভালটা চেয়ে যা তোমার করা করা উচিত, তাই ভেবে। উনি চটবেন, কেলেঙ্কারীও বড় একটা হবে, তোমারও—হাঁ, তোমারও হয়ত খুব বেশী একটা ক্ষতি হবে

"তবে আর ভবিষ্যতের কি এমন ভালটাই বা দেখলে। যাতে আমার খুব ক্ষতি হবে, সেইটেই আমার করা উচিত তুমি মনে কর?"

খোলা দৃষ্টিতে পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া বিরাজ-মোহিনী কহিলেন, "রবীন! টাকার কষ্টিটাই সব চেয়ে বড় একটা কষ্টি ব'লে আমি মনে করি না। এ বিয়ে করে তুমি সুখী হবে না, যাকে বিয়ে করবে সে সুখী হবে না, বড় অধর্ম্মের ভাগী হবে।"

"হুঁ! অধর্ম্ম! তা ধর্ম্মাধর্ম্মের হিসেবে হয়ত তোমার সঙ্গে একমত আমি হব না। তবে আর যাই হোক একে-বারে পথের ভিখিরী হতে আমি রাজী নই। যাও, ওঁর মনটা বুঝে যা হয় বল। কাল তারা আসবে, এইটেই যদি তাঁর স্থির সংকল্প হয়, আসুক। বাড়ীতেই আমি থাকব, যা হবে হোক।"

রবীন একটা চুরুট হাতে করিল। বিরাজমোহিনী কহিলেন, "তুই ত বলছিস্ আর কোথাও নিজের পছন্দ মত কোনও মেয়ে—"

"ও! সে যদি সম্ভব হত দেখা যেত।"

"দেখে যদি থাকিস, মনে যদি কাউকে ধরে থাকে, খুলে বল বাবা আমাকে। দেখব, প্রাণপণ করে দেখব, কিছু করা যায় কি না। উনি ত টাকা চান, তা তারাও যদি দেয়—"

"টাকা! না না, ও সব কিছু নয়। কাকে দেখব? এরি ভেতর পছন্দ কাকে করব। তবে অবসর যদি তোমরা দিতে—"

"তা এই যে নরেনবাবুর মেয়ে বিন্দুমতী, তাকেই যে পছন্দ হবে না, আগেই সেটা কি করে ধরে নিলি?"

কঠোর স্বরে রবীন উত্তর করিল, "না, তা হবে না, হতেই পারে না।"

"কেন?"

"কেন? কেন তার কারণ, পছন্দ করে নেবার অব-সরই তোমরা আমাকে দাও নি। আগেই আমাকে বেচে সেখানে রেখেছ, আগেই ঠিক হয়ে রয়েছে তাকে আমার ঘাড়ে করে নিতেই হবে। বেছে নেবার স্বাধীনতা যেখানে নেই, বাছা সেখানে হতেই পারে না। পরের বাছা জিনিষ বাধ্য হয়েই ঘাড়ে করে নিতে হয়। হাজার ভাল কেন তা হক না, ভাল তা কারও লাগতেই পারে না।"

রুষ্ট স্বরে বিরাজমোহিনী কহিলেন, "পর কাকে বলছিস্ বাবা, এই পর যারা, তারাই ত এদেশে কনে-বর ছেলে মেয়েকে বেছে দেয়।"

রবীন উত্তর করিল, "সেয় এদেশে, আর এদেশের লোক সব অন্ধ হয়ে নির্জ্জীব জড়ের মত যে কোনও ফাঁসে গলা বাড়িয়ে দিচ্ছে, আর তাতেই সন্তুষ্ট হয়ে থাকছে। তাই বলে আমাকেও যে তাই থাকতে হবে, এমন কোনও কথা হতে পারে না। ফাঁস গলায় পরাচ্ছ, নাচার হয়ে পড়ছি, কিন্তু তাতে সুখী হব এটা কেন প্রত্যাশা করা? যাক আর কেন? পার, একবার বলে দেখ। যদি শোনেন, ভাল। না শোনেন, নাচার, যা করাবে, করতেই আমাকে হবে।"

বিরাজমোহিনী কহিলেন, "সত্যি সত্যিই যদি আর কোনও মেয়ে তুই পছন্দ করে থাকিস, আর উনি যা চান সেটা হয়, তবে এখনও বলছি রবীন—"

"না না, ওসব কিছু না, হতেই আর এখন পারে না। যাও আর দিক্ করো না। একটু ঘুমোতে দেও এখন।"

রবীন উঠিয়া দাঁড়াইল। বিরাজমোহিনী আর কিছু না বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন। রবীন তখন বসিল। বসিয়া চুরুটটি ধরাইল।

হায়, আর কিছুদিন পূর্ব্বে যদি সে মীনাকে দেখিত! দেখিয়াছিল, সেই প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে, মধ্যে মধ্যে যখন মোকার্জ্জি-ভবনে সে যাইত তার সতীর্থ বন্ধু মোকার্জ্জির পুত্র ধীরেশের সঙ্গে। ধীরেশ তখন বিলেত গেল, আর রবীন সেখানে যায় নাই। কেন যাইবে? কিন্তু সেই মীনা মাত্র দুইটি বৎসরে এই মীনা হইয়া উঠিতে পারে, এমন একটা কল্পনাও সে করিতে পারে নাই। মীনা সত্যই সে একেবারে 'ভেনাস' হইয়া উঠিয়াছে। [ক্রমশঃ

খাদ্য ও স্বাস্থ্য

—শ্রীনীলরতন কর

বিভিন্ন শারীরক্রিয়ার স্বাভাবিক গতি অক্ষুণ্ণ রাখার নিমিত্ত অল্পাধিক নির্বাচনে ও নিয়মিত ভাবে উপযুক্ত মাত্রায় খাদ্যগ্রহণ স্বাস্থ্যরক্ষার একটি অত্যাবশ্যক নীতি। স্বাস্থ্য অনেকাংশে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত আচরণের উপর নির্ভর করে। রোগবীজাণু আমাদের শরীরে নিয়তই প্রবেশ করে, কিন্তু তাদের আক্রমণ-প্রতিরোধের ক্ষমতা মানুষের আয়ত্তের বহির্ভূত নহে। খাদ্য-নির্বাচনের সহিত সুস্বাস্থ্য ও অস্বাস্থ্যের একটি মূল্য হেতু বিদ্যমান। প্রত্যেক ব্যক্তির খাদ্য প্রধানতঃ তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা, আর্থিক সামর্থ্য, অভ্যাস, রীতি-নীতি এবং রসনার তৃপ্তির ইচ্ছা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। জীব-শরীরে খাদ্যগ্রহণের উদ্দেশ্য বিবিধ; প্রথম, তাপ রক্ষা; দ্বিতীয়, দেহযন্ত্রসমূহ গঠনের উপাদান সরবরাহ করা। খাদ্যের অন্তর্গত এরূপ পর্যাপ্ত শক্তি থাকা আবশ্যক, যাতে শরীর-যন্ত্রটি অক্লেশে চালিত হতে পারে এবং তন্মধ্যে এরূপ রাসায়নিক বস্তু থাকা প্রয়োজন যদ্দ্বারা শরীরের জটিল রাসায়নিক প্রক্রিয়াসমূহ স্বাভাবিক ভাবে সংঘটিত হতে পারে।

খাদ্যের শক্তিপ্রদানের পরিমাণ হিসাবে বলতে গেলে মাঝারী মানুষের নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ার দৈনিক প্রায় তিন হাজার ক্যালরি তাপদান-ক্ষম খাদ্য আবশ্যক। পেশী-সমূহ অত্যধিক শ্রমসাধ্য কার্যে নিযুক্ত হলে এতদপেক্ষা অধিক খাদ্য প্রয়োজন হয়, কিন্তু গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে অপেক্ষাকৃত কম খাদ্যে চলে।

মোটামুটী ভাবে বলতে গেলে দেড় সের রুটি, অথবা পৌনে দু সের পনীর কিংবা শর্করা, অথবা দু সের ডিম

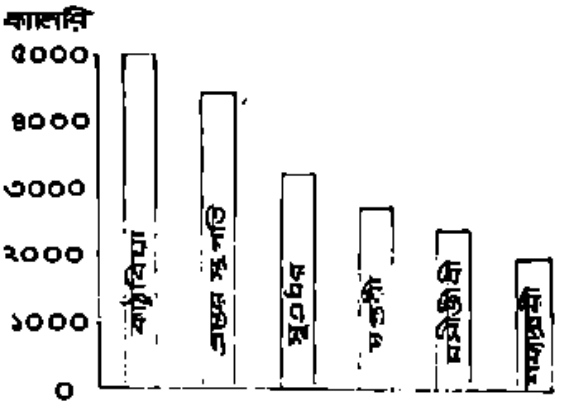

বিভিন্ন বস্তু উপজীবিকার দৈনিক (৪৪ ঘন্টায়) শক্তির প্রয়োজনীয়তা

কিংবা মাংস, অথবা আড়াইসের আপেল কিংবা সাড়েতিনসের আলু, এই তিন হাজার ক্যালরি তাপ দিতে পারে। কিন্তু কেবল খাদ্যের শক্তির পরিমাণ জেনে তার বিচার করা চলে না, কারণ খাদ্য হতে তাপ ব্যতীত শরীরনির্মাণ-মূলক উপাদান গ্রহণও প্রয়োজনীয়।

সুস্থ মানব-শরীরে এরূপ রাসায়নিক প্রক্রিয়াসমূহ নিরন্তর চলছে যে, সেই প্রক্রিয়াগুলি শাকান্ন থেকে আরম্ভ করে প্রচুর তৈলযুক্ত আমিষান্ন পর্যন্ত বহুল বৈচিত্র্যময় খাদ্য হতে শরীর-গঠনের উপযোগী জটিল যৌগিকসমূহ প্রস্তুত করে এবং জীবনের রক্ষাকল্পে যথাসাধ্য সচেষ্ট থাকে। ভারতীয় নিরামিষ ভোজীদের খাদ্যতালিকা থেকে আরম্ভ করে মেরুপ্রদেশের এস্কিমো জাতিগণের আমিষভোজ্য পর্যন্ত বিভিন্ন-

তৈল, কার্বোহাইড্রেট এবং প্রোটীন খাদ্যের এই উপাদান-ত্রয় মানব-শরীরে শক্তি সরবরাহ করে। পরিপাকের পর এই উপাদানসমূহ দুই ভাবে ব্যবহৃত হতে পারে, সেগুলি হয় বিশ্লেষিত (tissue) প্রস্তুত করে, নয় ত অক্সিডেসন্ বা দহন-ক্রিয়া দ্বারা তাপ উৎপন্ন করে। কোনও নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্য হতে যে পরিমাণ শক্তি পাওয়া যায়, তাকে বৈজ্ঞানিকগণ তাপের একক—"ক্যালরি" দ্বারা নির্দেশ করেন। খাদ্যের রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা তন্মধ্যে কত তৈল বা চর্বি, কার্বোহাইড্রেট এবং প্রোটীন আছে জানা যায় ও তা হতে সেই খাদ্যের তাপদান-যোগ্যতা নির্ণয় করা যেতে পারে। অবশ্য কোন খাদ্য শরীরকে ঠিক কতটা শক্তি দেয় তা বলতে গেলে কি পরিমাণে সেটি পরিপাক হয় জানা আবশ্যক।

দেশের অঞ্চলে মানুষের আহার-রুচির অপরিমিত বিচিত্রতা লক্ষ্য করিয়ে দেয়। প্রত্যেক মানুষ বহুপ্রকারের উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর সজীব এবং মৃত বিধানতন্তুসমূহ উদরসাৎ করে, কিন্তু অহরহ তাকে শরীরের প্রয়োজন অনুসারে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সঞ্চার ও সরবরাহের নিমিত্ত আভ্যন্তরীণ জটিল প্রক্রিয়াসমূহের উপর বিশ্বাসপূর্বক নির্ভর করে থাকতে হয়। পরিপাকক্রিয়ার কালে খাদ্যকে বহু জটিল পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে যেতে হয়, কারণ উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজ যুক্ত দ্রব্যাদি তৎক্ষণাৎ তদবস্থাতেই রক্তে সঞ্চারিত হয় না। জীবন-প্রক্রিয়া এরূপ সরল নহে যে, আহারকালে যথানির্দ্দিষ্ট হিসাবে যত ইচ্ছা, শরীর-নির্ম্মাণকারী বস্তু, জল ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক দ্রব্য গ্রহণ করা মাত্র শরীরের অঙ্গীকৃত হবে।

অবস্থাসম্পন্ন জনগণের অনেকেই বিভিন্ন প্রকার খাদ্যের মিশ্রণে ও সরবরাহে মোটের উপর শরীরের অঙ্গ-পূরণের উপযোগী উপাদানসমূহ গ্রহণ করে থাকেন। কিন্তু বিভিন্ন দেশের অপরিদ্র-শ্রেণীর মৃত্যুহারের বিবরণী পাঠে জানা যায় যে, স্বচ্ছল অবস্থাবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের অধিকাংশই পরিপাক-যন্ত্রের রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হন। পক্ষান্তরে দরিদ্রশ্রেণীর ব্যক্তিরা স্বল্পোপযুক্ত পুষ্টিকারী খাদ্যাভাবে বিভিন্ন প্রকার রোগবীজাণুর আক্রমণ-প্রতিরোধে অসামর্থ্য হেতু মৃত্যুমুখে পড়ে। যে সকল খাদ্য শরীরগঠনে সাহায্যকারী বিভিন্ন প্রকার ভাসায়নিক উপাদান প্রদান করে, এই শ্রেণীর অনেকে সেই সকল খাদ্য হতে নিজেদের বঞ্চিত রাখে।

কোনও বিশেষ ব্যক্তির পক্ষে কোন্ খাদ্য সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত, সেটি তার শরীরের ধাতু (constitution), দৈনন্দিন পরিশ্রমের মাত্রা, বয়স, প্রাকৃতিক ঋতু ও অবস্থা-বিশেষের উপর নির্ভর করে। কাজেই সর্ব্বদেশের সকল লোকের পক্ষে একেবারে ধরাবাঁধা একটা আহার্য্য-তালিকা পরিমাণগত ভাবে দেওয়া যায় না। তবে কোন্ খাদ্যের কি গুণ সে বিষয়ে সাধারণ ভাবে বিবৃত করা যেতে পারে।

খাদ্যের আলোচনায় আমরা প্রায়শঃ কার্ব্বোহাইড্রেট, তৈল ও প্রোটীনের কথা শুনে থাকি। কার্ব্বোহাইড্রেট ও তৈলের অণুসমূহ কার্ব্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পরমাণুর সন্নিবেশে গঠিত। এই যৌগিক তিনটির অনুপাতের ভিন্নতা এবং তাদের সমাবেশ ও সজ্জার পার্থক্যহেতু কার্ব্বোহাইড্রেট ও তৈলে পার্থক্য সৃষ্ট হয়। কার্ব্বোহাইড্রেট অণুর প্রত্যেক কার্ব্বন পরমাণুর নিমিত্ত দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণু ও একটি অক্সিজেন পরমাণু প্রয়োজন হয়। পক্ষান্তরে তৈল ও চর্ব্বির অণুতে অক্সিজেনের অনুপাত অপেক্ষাকৃত কম। শ্বেতসার এবং শর্করা কার্ব্বোহাইড্রেটের সুপরিচিত দৃষ্টান্ত।

কার্ব্বোহাইড্রেট ও তৈল সহজদাহ্য পদার্থ হওয়ায় খাদ্যের মধ্যে এদের আবশ্যকতা আছে; এরাই শরীরস্থের প্রধান ইন্ধন। এ ছাড়া অপরবিধ খাদ্য দ্রব্যটির নাম প্রোটীন। প্রোটীনসমূহ অতি জটিল বস্তু। এদের সঙ্গে কেবল কার্ব্বন হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন নয়, নাইট্রোজেনও আছে; আবার সেই সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে গন্ধক, লৌহ ও ফস্ফরাস্ আদি দ্রব্য বর্ত্তমান থাকে। চর্ব্বি এবং কার্ব্বোহাইড্রেটের ন্যায় প্রোটীনও ইন্ধন হিসাবে দগ্ধ হতে পারে; আমরা যে প্রোটীন গ্রহণ করি, তার অনেকটাই এই ভাবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এছাড়া প্রোটীনের আর একটি প্রধান প্রয়োজন আছে। জীবের প্রাণকোষসমূহ নির্ম্মাণে প্রধানতঃ প্রোটীন দরকার। তৈল, কার্ব্বোহাইড্রেট ও প্রোটীন, এই ত্রিবিধ খাদ্যের মধ্যে কেবল প্রোটীনই শরীরনির্ম্মাণে বা ক্ষয়-পূরণে মুখ্যভাবে সাহায্য করে। প্রোটীনসমূহ অ্যামিনো অ্যাসিড দ্বারা গঠিত জটিল যৌগিক। অ্যামিনো অ্যাসিড প্রোটীন অপেক্ষা সরল, কিন্তু জলের তুলনায় অধিকতর জটিল। অ্যামিনো অ্যাসিডের অণুতে দশ হতে কুড়িটী পর্য্যন্ত কার্ব্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও গন্ধকের পরমাণু বিভিন্ন সজ্জায় একত্র সন্নিবেশিত থাকে। এ পর্য্যন্ত একুশ প্রকার অ্যামিনো অ্যাসিডের কথা জানা গিয়েছে, কিন্তু সকলগুলিই খাদ্যে অপরিহার্য্য নহে। বিভিন্ন উৎস হতে প্রাপ্ত প্রোটীনে এই সকল বহুবিধ অ্যামিনো অ্যাসিডের অনুপাত ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের। বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিডের অণুসমূহ নানাবিধ অনুপাতে এবং বহুপ্রকার জ্যামিতিক নক্সায় সজ্জিত হয়ে বিভিন্ন রকমের প্রোটীনের অতিকায় অণুসমূহ তৈরী করে। কোন কোনও প্রোটীনের মধ্যে অ্যামিনো অ্যাসিড ব্যতীত অন্যান্য বস্তুও পাওয়া যায়। হেমোগ্লোবিন্-এর মধ্যে লৌহের অস্তিত্ব তার একটি দৃষ্টান্ত। সর্ব্বপ্রকার প্রোটীনের পুষ্টিকারিতা একরূপ নহে। কোন কোনও প্রোটীনে এরূপ কতকগুলি অ্যামিনো অ্যাসিডের

অভাব দেখা যায়, যেগুলি না থাকার জন্য তা থেকে শরীর পোষণের উপযোগী বস্তুসমূহ শরীরের মধ্যে সংশ্লেষিত হয় না।

কোনও প্রাণি-শরীরের কোষসমূহে যে আকারের প্রোটীন প্রয়োজন হয়, খাদ্যে তাকে ঠিক সেই আকারে পাওয়া যায় না। খাদ্যস্থ প্রোটীন এবং আমাদের মাংসপেশীসমূহে অবস্থিত প্রোটীন এক প্রকার নহে। প্রাণিদেহ নিজ কৌশলে খাদ্যস্থ প্রোটীনকে তার স্বীয় মাংসের অনুরূপ প্রোটীনে রূপান্তরিত করে নেয়। উদরস্থ খাদ্যের প্রোটীনগুলি প্রথমে অ্যামিনো অ্যাসিডে বিশ্লিষ্ট হয়ে যায় এবং সেই অ্যামিনো অ্যাসিড রক্তে সঞ্চারিত হয়ে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিধানতন্তুকে পরিবাহিত করে। অবশেষে জীবকোষসমূহ অ্যামিনো অ্যাসিডগুলিকে একত্র সংযোজিত করে প্রয়োজন অনুসারে প্রোটীন প্রস্তুত করে। প্রাণীর শরীরমধ্যে ভুক্ত কার্বোহাইড্রেট ও তৈলসমূহেরও প্রোটীনের অনুরূপ রূপান্তর ঘটে। ফলের রসে, বিশেষতঃ আঙ্গুরের রসে দ্রাক্ষাচিনি বা 'গ্লুকোজ' নামে পরিচিত কার্বোহাইড্রেট প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এই কার্বোহাইড্রেট আমাদের রক্তে সংবাহিত হয়। অপরাপর কার্বোহাইড্রেটগুলি, যথা ভাতের শ্বেতসার অথবা মিষ্টান্নে মিশ্রিত শর্করা অপেক্ষাকৃত জটিল বস্তু। এদের অণুগুলি শরীরে আত্মসাৎ করতে হলে প্রথমে গ্লুকোজ অণুতে বিভক্ত ঘটান আবশ্যক। সেইরূপ তৈল বা চর্বিকে আত্মসাৎ করার পূর্বে তাদের গ্লিসারিন্ ও তৈলজ অম্ল (fatty acids) ভঙ্গ করা দরকার। এক কথায় বলতে গেলে কার্বোহাইড্রেট, তৈল, ও প্রোটীন, এই ত্রিবিধ খাদ্যেরই শরীরমধ্যে একই সাধারণ কার্যপ্রণালী অনুসরণ করতে হয়। প্রথমে তারা জটিল হতে অপেক্ষাকৃত সরল উপাদানে বিশ্লিষ্ট হয়ে রক্তে মিশে যায়, তারপর বিধানতন্তুর কোষসমূহে প্রয়োজন অনুরূপ আকারসংযুক্ত ও পুনর্গঠিত হয়। মুখগহ্বর হতে আরম্ভ করে পরিপাক যন্ত্রের শেষ প্রান্ত অবধি খাদ্যের গমনকালে বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক কারিগরসমূহ তাকে নানা আকারে নূতন রূপ দান করে, এই রাসায়নিক কারিগরদের নাম এন্‌জাইম্। এক এক প্রকার এন্‌জাইম্ এক একবিধ কাযে পারদর্শী, তাদের কেউ শ্বেতসারকে ভেঙে গ্লুকোজ তৈরীর কাজে নিযুক্ত থাকে, কেউ চর্বিকে বিশ্লিষ্ট করে গ্লিসারিন্ ও তৈলজ অম্ল প্রস্তুত করে, কেউ বা প্রোটীন বিশ্লেষণ দ্বারা অ্যামিনো অ্যাসিড তৈরীর সহায়তা করে। অন্ননালী ও পরিপাক-যন্ত্রের গমনপথে বহু রস-ক্ষরণশীল গ্রন্থি আছে, সেই স্থান হতে বিভিন্ন এনজাইমসমূহ ক্ষরিত হয়ে খাদ্যে গিয়ে মেশে। এ পর্যন্ত যে সকল খাদ্য-উপাদানের কথা বলা হল, তদ্ব্যতীত বহুপ্রকার অজৈব বস্তু বা খনিজদ্রব্য খাদ্যে অত্যাবশ্যক। ক্যালসিয়ম্, ফস্‌ফরাস, ক্লোরিন, পটাসিয়ম, সোহাগ, সোডিয়ম, গন্ধক, ম্যাগনেসিয়ম, তামা, ম্যাঙ্গানিজ, দস্তা ও আয়োডিন আমাদের শরীর-পোষণে অত্যাবশ্যক। কিন্তু এই ধাতু ও খনিজদ্রব্যের সকলগুলি যে কোনও পরিমাণে এবং আকারে উদরস্থ করলে শরীর তা আত্মসাৎ করতে সমর্থ হয় না; বিভিন্ন প্রকার ধাতু ও খনিজ দ্রব্য বিশেষ বিশেষ পরিমাণে ও অনুপাতে গৃহীত হলেও তাদের অণুর সমাবেশের কোনও বিশেষ প্রকার প্রাকৃতিক অবস্থা থাকলেই মানবশরীরে তা গ্রহণক্ষম হয়। অধিকাংশ ফলের মধ্যে এই সকল মৌলিকগুলি শরীর কর্তৃক গ্রহণের অনুকূল অবস্থায় অবস্থিত থাকে। অপরাপর গুণ ব্যতীত এই কারণেও খাদ্যের মধ্যে ফল একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।

আদিম যুগের মানুষ তার তৎকালীন পরিশ্রমের সীমার মধ্যে যা কিছু ফল, মূল কন্দ, শস্য ও প্রাণী সংগ্রহ করতে পারত, নিজ সহজ সংস্কারগত রুচি অনুসারে তা থেকে নির্বাচনপূর্বক খাদ্য গ্রহণ করত। পরবর্তীকালে মানব-সমাজে দ্রুতগতি যান-বাহনের বিস্তার মানুষকে এরূপ জটিল পারিপার্শ্বিকের মধ্যে উপস্থাপিত করল যে, তন্মধ্যে অবস্থিত থেকে কোন্‌টি গ্রহণ ও কোন্‌টি পরিহার করা হবে, তা নির্ণয় করা দুর্ঘট হয়ে উঠল। বাস্তব সভ্যতার তথাকথিত প্রগতি ও আনুষঙ্গিক জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নাগরিকগণ ক্রমশঃ কৃত্রিম উপায়ে রক্ষিত খাদ্যের উপর নির্ভরশীল হতে লাগল। কিন্তু কৃত্রিম খাদ্য আমাদের স্বাস্থ্যকে কি ভাবে প্রভাবান্বিত করে, সে দিকে বহুদিন পর্যন্ত অনেকের লক্ষ্য আসে নাই। ষোড়শ শতাব্দীতে পৃথিবীর বিভিন্ন সাগরগামী নৌকা ও জাহাজের যাত্রীরা এক যন্ত্রণাদায়ক ভয়াবহ রোগে আক্রান্ত হয়; রোগটি অধুনা সুপরিচিত

স্কার্ভিরোগ। তৎকালে এই রোগের হেতু কেউ জানত না। কোন এক জাহাজের নাবিক প্রথম এই রোগাক্রান্ত হয়; প্রথমে সে দুর্বল হয়ে পড়ে, শারীরিক পরিশ্রমে অপারগ হয়, শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্টবোধ করে; তারপর অবস্থা আরও ভয়াবহ হয়: ক্রমাগত পেশীসমূহে বেদনা হতে থাকে, শারীরিক ও মানসিক অবসাদ আসে; রক্তবাহী শিরাসমূহে এরূপ গোলযোগ উপস্থিত হয় যে, মাড়ি, চক্ষু ও নাসিকা হতে রক্ত নির্গত হতে থাকে; এমন কি ত্বকের উপর মৃদু চাপ দিলে শরীরের কোষসমূহের সংযোগস্থল দিয়ে রক্ত নির্গমন হতে থাকে—লক্ষণসমূহ ক্রমেই শোচনীয় হয়, অবশেষে মৃত্যু আসে।

এই রোগ প্রসার লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে লোকের মনে এইরূপ সন্দেহ হয় যে, বোধ হয় জাহাজের সীমাবদ্ধ খাদ্যই রোগটীর হেতু। সন্দেহ ক্রমেই ঘনীভূত হয় এবং কেউ কেউ একে উপযুক্ত খাদ্যাভাব জনিত বলে অনুমান করেন। ১৫৯৩ অব্দে স্যর্ আর্. হকিন্স্ (Sir R. Hawkins) স্কার্ভিরোগাক্রান্ত এক জাহাজচালককে ভষীরস প্রদান দ্বারা আরোগ্য করেন। ক্রমে অপরাপর নাবিকেরাও এই চিকিৎসার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে। শোনা যায়, ১৬০০ অব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চারিটি লাগরগামী জাহাজের মধ্যে একটি জাহাজের নাবিক তাঁর মাক্তি-মারালের নিয়মিতভাবে গোঁড়ালেবুর রস-পানের ব্যবস্থা করেন, ফলে কেবল সেই জাহাজটি ব্যতীত অপর তিনটি জাহাজেই স্কার্ভিরোগ দেখা দেয়। অবশেষে সেই জাহাজত্রয়ের চালকগণের এরূপ দুরবস্থা হয় যে, প্রথম জাহাজ থেকে লোক গিয়ে সেই সকল ব্যক্তিকে সাহায্য করতে হয়েছিল। ফলের গুণ এরপর থেকে বিস্তৃতভাবে অনুভূত হয়। এই তথ্য জ্ঞাত হওয়ার দুই শতাব্দী পরে ১৭৯৫ অব্দে বৃটনের সরকারী নৌ-বিভাগের (British Admiralty) অধীন প্রত্যেকটি জাহাজে ভষীরস পানের বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা হয়। ১৮৬৩ অব্দে বিলাতে বোর্ড-অব-ট্রেড, বাণিজ্যপোত সমূহে এই ব্যবস্থা অবশ্য-পালনীয় বলে নিয়ম করে দেন। এখন এ কথা সুপরিজ্ঞাত যে, টাটকা ফল ও সব্জীর বিশ্লেষণে অতি অল্প পরিমাণে এরূপ উপাদানসমূহ বিদ্যমান, যেগুলি প্রাণীদের স্বাভাবিক জীবনধারণে অপরিহার্য্য। খাদ্যে তার অভাব অথবা পরিমাণ হ্রাস হলে শরীরের পুষ্টি হয় না এবং ক্রমে স্কার্ভিরোগ দেখা দেয়। রোগটি খুব বেশীদূর অগ্রসর না হলে কেবলমাত্র গোঁড়ালেবু ও কমলার রস-সাহায্যেই আরোগ্য হতে পারে।

উনবিংশ শতকের শেষার্দ্ধে প্রায় এই ধরণেরই আর একটি রোগ আবির্ভূত হয়। সে সময়ে জাপানী রণপোত-যাত্রীদের মধ্যে বেরীবেরী রোগের মহামারী উপস্থিত হয়। বেরীবেরী মূলতঃ স্নায়ুমণ্ডলীর ব্যাধি। এই রোগের খুব ধীরগতিতে সূত্রপাত হয় এবং ক্রমে স্কার্ভিরোগের মত অবসাদ ও অবসন্নতা আসে। রোগটী হৃৎপিণ্ড ও মধ্যচ্ছদার (diaphragm) সহিত সংযুক্ত স্নায়ুগুলির সোলযোগ ঘটিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস ও হৃৎস্পন্দনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। এই লক্ষণসমূহ বেশীদিন স্থায়ী হলে অনেক ক্ষেত্রে রোগীকে বাঁচান দুর্ঘট হয়ে উঠে। দেখা গিয়েছে যে, যে-সকল স্থানে জনগণের খাদ্য কৃত্রিম উপায়ে সীমাবদ্ধ হয়েছে, সেই স্থানেই এই রোগ প্রসার পেয়েছে। তৎকালীন জাপানী রণতরী-সমূহে মাজ্জিত চাউল ব্যবহার প্রচলিত ছিল। অমার্জ্জিত চাউলে যে রাসায়নিক বস্তু থাকে মাজ্জিত চাউলে তা থাকে না; এই দ্রব্যটির অভাববশতঃ জাপ রণপোতারোহিগণ বেরী-বেরীতে আক্রান্ত হয়েছিল।

এই সকল দৃষ্টান্ত থেকে সহজেই অনুভূত হবে যে, টাটকা ফল ও শাকসব্জীর অভাবে বহুপ্রকার ব্যাধি উৎপন্ন হয়। কিন্তু এ বিষয়ে স্পষ্ট অবিসংবাদিত প্রমাণ পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদের মতে পাওয়া গিয়েছে মাত্র ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে। এফ্ গোলাণ্ড হপকিন্স্ ১৯০৬—০৭ অব্দে কেম্ব্রিজে এ সম্পর্কে প্রথম যুগান্তরকারী গবেষণা করেন, ১৯১২ অব্দে তাঁর পরীক্ষিত কার্য্যফল প্রকাশিত হয়। তিনি পরীক্ষা করে দেখেন যে, তৎকালে বৈজ্ঞানিকগণ কর্ত্তৃক প্রয়োজনীয় বলে বিবৃত খাদ্য উপাদান, সর্ব্বপ্রকার প্রোটীন্, তৈল, কার্ব্বোহাইড্রেট এবং লবণ প্রভৃতি কৃত্রিম উপায়ে সংশ্লেষিত করে বিশুদ্ধ আকারে (synthetic diet) ইঁদুরদের প্রদান করা সত্ত্বেও তারা ক্রমশঃ শীর্ণতা প্রাপ্ত হয়ে স্বাভাবিক আয়ুষ্কালের অনেক পূর্ব্বেই মারা যায়। কিন্তু সেই সঙ্গে মাত্র কয়েক ফোঁটা টাটকা দুধ সংযোগ করে খাদ্য-দানে তারা স্বাভাবিক ভাবে বেঁচে থাকে ও পুষ্ট হয়। এর

কারণ কি? কয়েক ফোঁটা দুধে যেটুকু সামান্য চর্বি, প্রোটীন ও কার্বোহাইড্রেট থাকে এবং পূর্ণবয়স্ক খাদ্য অপেক্ষা যেটুকু অধিক শক্তি হিসাবে মনে পাওয়া উচিত, তাকে নগণ্য বলা যেতে পারে। তখন চপকিন্স্ অনুমান করেন যে, টাটকা দুধে অতি সামান্য পরিমাণে নিশ্চয়ই এমন কোনও পদার্থ বিদ্যমান, যা সাধারণ রাসায়নিক বিশ্লেষণে ধরা পড়ে না, কিন্তু সেটি জীবনের রক্ষাকল্পে অপরিহার্য। তাঁর মনে তখন বেরীবেরী ও স্কার্ভি রোগের দৃষ্টান্ত স্মরণ হওয়ায় তিনি পুনশ্চ পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হন। অতঃপর কোনও কোনও খাদ্য দ্রব্যে অতি-অল্প পরিমাণে বিদ্যমান এই অদৃশ্য দ্রব্যগুলি পরীক্ষায় ধরা পড়ে এবং প্রাণের প্রক্রিয়ার (vital process) জন্য আবশ্যক বলে তার নাম দেওয়া হয় ভিটামিন্। এক্ষণে পৃথিবীর নানাদেশে ভিটামিন্ নিয়ে গবেষণা চলছে, কিন্তু সমস্ত প্রকার ভিটামিনের রাসায়নিক সংগঠন এখনও জানা যায় নাই।

আধুনিক বিজ্ঞাপনসমূহ শরীরে ভিটামিনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে জনগণকে সকল সময়ে সজাগ করছে বটে, কিন্তু এই পুষ্টিকারী উপাদানের কোন্‌টি ঠিক কতটা স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য প্রয়োজন, সে বিষয়ে তারা খুব সামান্যই নির্দেশ দিয়ে থাকে। এছাড়াতীত ভিটামিন্‌সমূহ একই তালিকার অন্তর্ভুক্ত হলেও তাদের একের সহিত অপরের খুব অল্পই সাদৃশ্য দেখা যায়।

ভিটামিন্‌সমূহ জৈব যৌগিক। শরীরের বৃদ্ধি ও পুষ্টির নিমিত্ত এদের প্রয়োজন হয়। মানবশরীরের পুষ্টিকার্যে প্রত্যেক ভিটামিনের এক অথবা একাধিক বিশিষ্ট ক্রিয়া আছে। ভিটামিন্-এ xerophthalmia নামক চক্ষু-রোগের আরোগ্যসাধক। শরীরের স্বাভাবিক বৃদ্ধির নিমিত্ত এর প্রয়োজন হয়। বৈজ্ঞানিকগণের বিশ্বাস এ ভিটামিন্ শ্বাস-নালীর রোগে প্রতিরোধক হিসাবে ক্রিয়া করে। এই দ্রব্যটি চর্বি ও তৈলে দ্রবণশীল এবং অল্প উত্তাপে নষ্ট হয় না; কিন্তু উচ্চতাপমাত্রার অক্সিজেনের সহিত সম্মিলন ঘটলে নষ্ট হয়ে যায়। ভিটামিন্-বি বা বি-১ স্নায়বিক রোগের প্রতিরোধক। ভিটামিন্-সি প্রাণীদের স্কার্ভি ব্যাধি হতে রক্ষা করে। ভিটামিন্ ডি রিকেট রোগ প্রতিরোধ করে এবং দন্ত ও অস্থি সংগঠনে সহায়তা করে। ভিটামিন্-ই বন্ধ্যাত্ব ঘটতে দেয় না। ভিটামিন্ জি বা বি-২ কুষ্ঠরোগের আক্রমণ হতে রক্ষা করে। শিশুদের শরীরের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বয়স্কের স্বাভাবিক পুষ্টির নিমিত্ত এর প্রয়োজন হয়। জি-ভিটামিন্ সহজে নষ্ট হয় না। এছাড়াতীত বি-৩, বি-৪ প্রভৃতি অন্যান্য ভিটামিনের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে; কিন্তু পুষ্টিকার্যে তারা ঠিক কি ভাবে ক্রিয়া করে এবং কোন্ কোন্ খাদ্যে তারা আছে, তা এখনও বিস্তারিত জানা যায় নাই।

অত্যধিক পরিমাণে কৃত্রিম খাদ্য গ্রহণ এবং তথাকথিত মার্জিত খাদ্যের বিরুদ্ধে ভিটামিনের আবিষ্কার মানব-সমাজকে সাবধানতার বাণী প্রচার করছে। বৈজ্ঞানিক তাঁর গবেষণার ফলে এখনে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, স্বাভাবিক খাদ্য কৃত্রিম খাদ্য অপেক্ষা বহুলাংশে বাঞ্ছনীয়, যদিও এর জন্য বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রয়োজন ছিল বলে মনে হয় না। প্রচুর পরিমাণে শাক-সব্জী, টাটকা ফল এবং গোদুগ্ধ স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয়। যদি ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য কেবল সাদা রুটি, চিনির উত্তেজনাপ্রদ আকারে রক্ষিত মাংস, কেক এবং লজেন্স্ দ্বারা উদরপূর্তি করা যায়, তবে শরীরের পুষ্টির অভাবে, দুর্বলতা, রোগ-প্রতিরোধে অক্ষমতা ও অকালমৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

বর্তমান প্রবন্ধধারায় শুধু ফলের বিষয় আলোচিত হবে; তন্মধ্যে এদেশে সুলভ প্রাপ্য কদলীকেই প্রথম আলোচ্যরূপে গ্রহণ করা গেল:

কদলী

কদলী, রম্ভা, মোচা, থোড়, অংশুমৎফলা, কাণ্ডীলা প্রভৃতি—কলার একাধিক নামের উল্লেখ সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায়। উৎসবে শুভের প্রতীকরূপে, মঙ্গলকলস পার্শ্বে, বরণ-ডালায়, পূজার নৈবেদ্য এবং সর্বোপরি খাদ্য হিসাবে কদলী ভারতের সর্বত্র সুপরিচিত। কলার সহিত ভারতীয়গণের ঐতিহ্য জড়িত। মুঘলযুগীয় পর্যটকগণ কলাকে 'স্বর্গের ফল, অথবা ভারতের আঙ্গুর' নামে অভিহিত করেছেন এবং সম্ভবতঃ ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ এশিয়া কলার আদি জন্মভূমি।

কলার চাষ উত্তরে ফ্লোরিডা, ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জ, মিশর ও দক্ষিণ জাপান এবং দক্ষিণে নাটাল ও ব্রেজিল পর্যন্ত বিস্তৃত। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের গরম ভিজা আবহাওয়া কলার

চাষের পক্ষে অনুকূল। নাতিশীতোষ্ণ দেশে খাদ্য হিসাবে গোধূম ও যবের ব্যবহার যতটা ব্যাপক, গ্রীষ্মপ্রধান দেশের স্থানবিশেষে কলার প্রচলন ঈর্ষণ বললে অত্যুক্তি হয় না। পূর্ব আফ্রিকা, ওসেনিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জসমূহে প্রায় ছয় মাস কাল বর্ষা থাকে। সে সময়ে তথাকার অধিবাসীদের কলাই একমাত্র প্রধান খাদ্য। আলু অপেক্ষা কলাকে তারা বেশী পছন্দ করে, কারণ কলার চাষে তত পরিশ্রম করতে হয় না। কোন কোনও কৃষিতত্ত্ববিদ্ বলেন যে, যে-আয়তনের জমির উপর একমণ গোধূম অথবা তিনমণ আলু ফলায়, তত্তখানি জমিতে চল্লিশ মণেরও অধিক কলা ফলতে পারে।

নাতিশীতোষ্ণ দেশসমূহে অন্যান্য টাটকা ফলের মূল্য বেশ বাড়সাধ্য হলেও কলা ওসব দেশের অনেক অঞ্চলে সুলভ। ইংলণ্ডের ফল আমদানির কেন্দ্রস্থল লণ্ডনে গরীব লোকের ছেলেমেয়েরাও যথেষ্ট পরিমাণে কলা খেতে পায়। প্রতীচ্যদেশীয়দের মধ্যে কদলীপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রায় একশত ত্রিশ বৎসর পূর্বে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে কলার প্রথম আমদানি হয়। সে সময়ে কিউবা থেকে নিউইয়র্কে মাত্র ত্রিশ কাঁদি কলা চালান গিয়েছিল। আর আজকাল সেখানে প্রতি বৎসরে প্রায় সাত কোটি কাঁদি কলা আমদানি হয়। বর্তমানে আমেরিকার বাজারে সরবরাহের জন্য ওয়াষ্টইণ্ডিজ দ্বীপে, মধ্য-আমেরিকায় ও দক্ষিণ-আমেরিকায় কলার চাষ খুব প্রসার লাভ করেছে। কানারি দ্বীপপুঞ্জ, ব্রেজিল ও আফ্রিকার উপনিবেশসমূহের চাষীগণ ইয়োরোপ ও ইংলণ্ডের কলার চাহিদা মেটায়। কুইন্স্‌ল্যাণ্ড থেকে অষ্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন প্রদেশে এবং সামোয়া থেকে নিউজিল্যাণ্ডে কলা সরবরাহ হয়।

এ দেশে যে সকল সুস্বাদু ফল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে বোধ হয় আমের পরই কলাকে স্থান দেওয়া যেতে পারে। ফলটির একটি বিশেষত্ব এই যে, কোনও ঋতুতেই এর অভাব হয় না। যে সকল ঋতুতে টাটকা ফলের প্রাচুর্য কম থাকে, সে সময়েও কলা সুলভ মূল্যে প্রাপ্তব্য ফলের মধ্যে প্রধান।

উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগের প্রাচীন ভারতীয় রীতি অনুসারে কলা ওষধির অন্তর্গত। ওষধিজাতীয় উদ্ভিদ্ ফল পাকার পরে শুষ্ক হয়ে যায় এবং ওষধি বিশেষ ঔষধের উপাদান। চরক বলেন পাক, কলা স্বাদু, ঈষৎ কষায়, স্নিগ্ধ, শীতল এবং গুরু, অথচ কষায়নিঘ্ন ও সুগন্ধ বলে রুচিকারক।*

পুষ্টিকর খাদ্য হিসাবে কলাতে কার্বোহাইড্রেটের যে প্রকার আধিক্য আছে, তাতে সেটি অপর যে কোনও ফলের সমকক্ষ এবং শরীরের পুষ্টিসাধনের পক্ষে প্রয়োজনীয় খনিজ দ্রব্য ও ভিটামিনের পরিমাণ কোন কোনও মূল্যবান ফলের চেয়েও বেশী। কলাতে আঁশ একেবারে নেই বললেই চলে। আর এর মধ্যে তৈলজাতীয় পদার্থের অভাব আছে। কলার খাদ্যাংশের সহিত অপরাপর ফলের তুলনামূলক বিবরণী নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল :—

	জল	প্রোটীন্	তৈল	কার্বোহাইড্রেট	ভস্ম	প্রতি পাউণ্ডে তাপ
	শতকরা	শতকরা	শতকরা	শতকরা	শতকরা	ক্যালরি হিসাবে
কলা	৭৪·০			২২·০		৪৮০
আঙ্গুর	৭৭·৪			১৯·২		৪৫০
চেরী	৮০·১			১৬·৭		৩৪৫
আপেল	৮৪·৬			১৪·২		২৯০
কমলা	৮৮·৯			১১·৬	০·৫	২৪০
পীচ	৮৯·৪			৯·৬	০·৫	১৯০
বাবুর	৯১·৫			৯·৩	০·৯	১৮৫
ষ্ট্রবেরী	৯০·৪	১·০	০·৬	৭·৪	০·৬	১৮০

এই তালিকাটি লক্ষ্য করলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, উপরোক্ত আট প্রকার ফলের মধ্যে কলাই শ্রেষ্ঠ। কলা পুষ্ট হওয়ার বিভিন্ন অবস্থায় তার জীবাণুতাত্ত্বিক-পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, সহজ অবস্থায় কলার অভ্যন্তরবর্তী মাংস সম্পূর্ণ রূপে জীবাণুমুক্ত থাকে। কলার উপরিস্থ আবরণ জীবাণুর অনুপ্রবেশ থেকে রক্ষা করে। এমন কি বিভিন্ন রোগ-জীবাণুর 'কালচার'যুক্ত দ্রবমধ্যে নিমজ্জিত রাখার পরেও কলার অভ্যন্তরে কোনও জীবাণুর সংস্রব পাওয়া যায় নাই। কাজেই আবরণ ঠিক থাকলে যে কোনও স্থান থেকে আনীত কলা আহার্য হিসাবে নিঃসঙ্কোচচিত্তে ব্যবহার করা যেতে পারে।

---

* সংপক্কং পনসং মোচং রাজাদনফলানি চ।
বাদুমি, সর্বদোষানি স্নিগ্ধশীতগুরূণি চ।
কষায়নিঘ্নমাচ্ছ সৌগন্ধ্যাচ্ছ রুচিপ্রদম্। ২৭ অ। ১১৬
—চরকসংহিতা

অন্যান্য টাটকা ফল অপেক্ষা কলার শাঁসের পরিমাণ অধিক এবং জলীয় অংশ কম। কিন্তু প্রোটীন্ ও তৈল জাতীয় পদার্থ খুব সামান্য। কাঁচা কলার খোসা বাদদিলে শতকরা প্রায় বেড় ভাগ প্রোটীন্, ২০ হতে ২৫ ভাগ কার্বোহাইড্রেট এবং বাকী প্রায় সমস্তটা খেতসার। মোটামুটি বলতে গেলে পাকা কলার পাঁচ ভাগের এক ভাগ চিনি এবং কাঁচা কলায় পাঁচ ভাগের এক ভাগ খেতসার থাকে।

কাঁচা কলার সঙ্গে আলুর অনেকটা রাসায়নিক সাদৃশ্য আছে। উভয়ের থেকে প্রায় একই পরিমাণে তাপ পাওয়া যায়, এবং নাইট্রোজেন-ঘটিত পদার্থ, কার্বোহাইড্রেট ও ভস্ম দুইটির ভিতর প্রায় একই পরিমাণে আছে। তবে আলুর প্রোটীনের মত কলার প্রোটীন তত কার্য্যকরী নয়।

চিকিৎসকগণ কোন কোনও রোগীর খাদ্যে তেল ও প্রোটীনের পরিমাণ কম রাখতে চান, অথচ যাতে শরীরের তাপ রক্ষা হয় এরূপ কোনও অধিক তাপ-প্রদানক্ষম পথ্যের ব্যবস্থা করতে চান। সে হিসাবে কলা খুব প্রশস্ত। বৃক্কের বা কিড্‌নীর রোগের পক্ষে কলার ব্যবহার প্রশস্ত। সর্ব্বপ্রকার ফলের মধ্যে কলায় ভস্মের পরিমাণ অধিক। এই ভস্ম শরীরগঠনের পক্ষে অত্যন্ত হিতকারী। বিভিন্ন জাতীয় কলা পরীক্ষা করে দেখা গেছে তাদের মধ্যে ভস্মাংশের পরিমাণে বিশেষ পার্থক্য হয় না।

কদলী-ভস্মের মধ্যে লোহা, তামা, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি ধাতু থাকে। তামা এবং ম্যাঙ্গানিজের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকলে লোহা শরীরের রক্তে মিশবার সুবিধা পায়; এই কারণে খাদ্য হিসাবে কলার অন্যতম খনিজ দ্রব্যগুলি শরীরের বিশেষ পুষ্টি সাধন করে। রাসায়নিক বিশ্লেষণে কলার গড়ে অর্থাৎ শতকরা পৌনে একভাগের কিছু বেশী ভস্ম পাওয়া যায়। কদলীর শতকরা হিসাবে এই ভস্মে খনিজ দ্রব্যের পরিমাণ কিরূপ হয় নিম্নে উল্লিখিত হইল :

কদলীর রাসায়নিক বিশ্লেষণ।

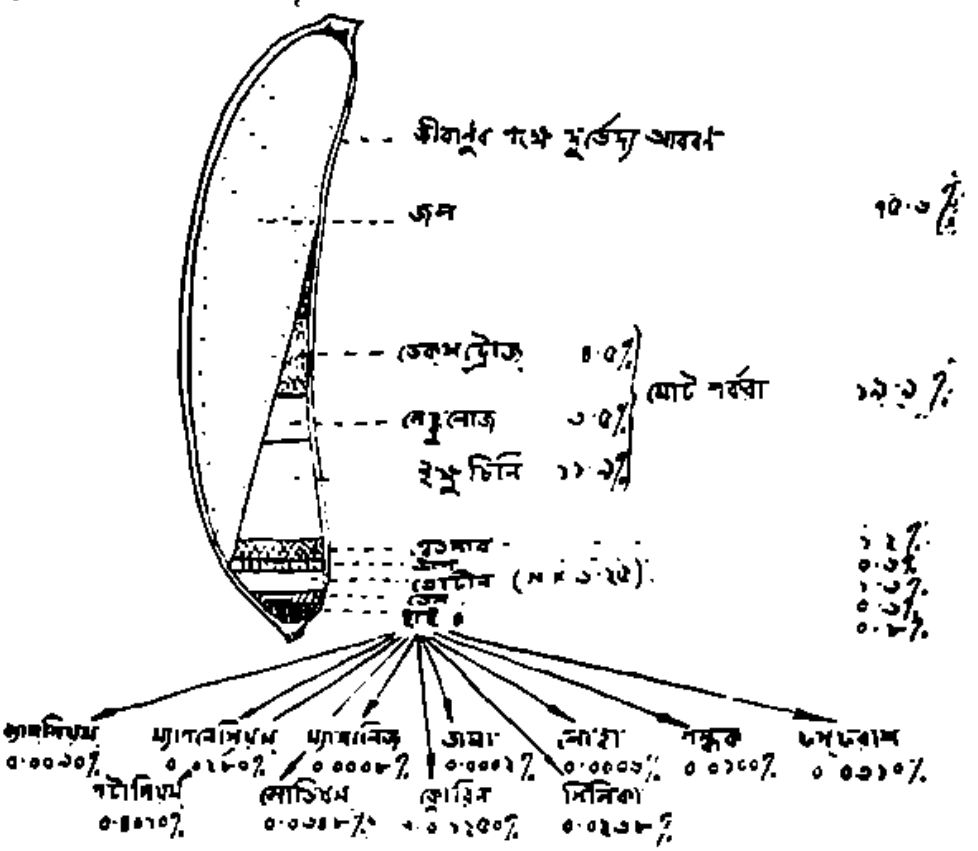

তামা
লোহা
সল্ফার
ম্যাঙ্গানিজ
ম্যাগনেসিয়ম
ক্যালসিয়ম
ফস্ফরাস
পটাসিয়ম
সিলিকা
সোডিয়ম
ক্লোরিন

কলার খনিজ দ্রব্যগুলি শরীরে রক্ত তৈরী করতে কতটা সাহায্য করে চিকিৎসকগণ বিভিন্ন শিশুর উপর তা পরীক্ষা করে দেখেছেন। তাঁরা কিছুদিন ধরে শিশুদের কলার চিনি খেতে দেওয়ার পর তাদের রক্ত পরীক্ষা ক'রে হেমোগ্লোবিনের পরিমাণে বৃদ্ধি পেতে দেখেছেন। কলার চিনিতে সামান্য মাত্রায় যে লোহা, তামা এবং ম্যাঙ্গানিজ থাকে তারই ফলে রক্তের হেমোগ্লোবিন বৃদ্ধি পায়। রাসায়নিক উপায়ে পরীক্ষা ক'রে উহা ভালোই দেখা গেছে যে, যথেষ্ট পরিমাণে তামা থাকা হেতু কলার সমস্ত লোহাটাই রক্তের মধ্যে শোষিত হয়। ফসফরাস্ অপেক্ষা ক্যালসিয়ম্ ও ম্যাগনেসিয়ম্ বেশী থাকায় কলার ছাই ক্ষারগুণযুক্ত এবং সে কারণে অম্লরোগ-নিবারক। পাকা কলার (ওজনের) শতকরা বাইশ ভাগ কার্বোহাইড্রেট থাকে। তন্মধ্যে শতকরা আঠার ভাগ পর্যন্ত reducing sugars থাকতে পারে। কলার কার্বোহাইড্রেট সমূহের মধ্যে প্রধানতঃ ইক্ষু শর্করা (sucrose) ডেক্সট্রোজ এবং লেভুলোজ থাকে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, কলার এই কার্বোহাইড্রেট পাকস্থলী ও আন্ত্রিক রোগগ্রস্ত শিশুদেরও হজমক্রিয়ার কোন ব্যাঘাত করে না। কলার বিশ্লেষণ করলে তার মধ্যে প্রাপ্তব্য কার্বোহাইড্রেটসমূহ গড়ে এইরূপ পরিমাণে পাওয়া যায় :

আঙ্গুরচিনি বা গ্লুকোজ	৫·৮২
ফলের চিনি বা ফ্রুক্টোজ	৩·৭৮
ইক্ষু চিনি বা সুক্রোজ	৬·৭৮
খেতসার বা ষ্টার্চ	৩·০২
মোট প্রাপ্তব্য কার্বোহাইড্রেট—	১৯·৫০

কাঁচাকলার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে যে খেতসার থাকে, এন্‌জাইমের ক্রিয়া দ্বারা সেটা ক্রমশঃ দ্রব হয়ে শর্করায় রূপান্তরিত হয়। কলার তখন আর কোনও কষা আস্বাদ থাকে না। পাকা কলায় যে সুগন্ধ পাওয়া যায়, তন্মধ্যে প্রধানতঃ অ্যামিল্-অ্যাসিটেট নামক দ্রব্যের বিদ্যমানতা তার হেতু।

কলার রাসায়নিক পরীক্ষায় জানা যায় যে, পাকবার সময় তার খেতসার প্রথমে ইক্ষু শর্করায় রূপান্তরিত হয়, তারপর ইক্ষু শর্করা invert sugar-এ পরিণতি লাভ করে। গাছ থেকে পেড়ে আনলেও পুষ্ট কলার অভ্যন্তরবর্তী খেতসারের শর্করায় রূপান্তর প্রায় স্বাভাবিক ভাবেই চলতে থাকে। অনুকূল তাপমাত্রা পেলে কলার ভিতরকার ইক্ষু শর্করা সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হয়ে অন্যবিধ শর্করার আকার গ্রহণ করতে পারে।

যে এন্‌জাইমের প্রভাবে কলা পাকে অর্থাৎ কলার অভ্যন্তরবর্তী খেতসার ইক্ষু শর্করায় এবং ইক্ষু শর্করা অপরাপর শর্করায় (invert sugars) পরিণত হয়, সেটি একশত পঞ্চাশ ফারেনহাইট ডিগ্রী বা ততোধিক উত্তাপে গিলে নষ্ট হয়ে যায়। কলায় ম্যালিক অ্যাসিড নামে এক প্রকার অম্ল খুব সামান্য পরিমাণে থাকে। পাকা অবস্থায় তার পরিমাণ হাজার করা সাত ভাগ।

কাঁচাকলা মিষ্টত্বহীন ও কষা এবং তার খেতসার অংশ খুব বেশী। পক্কাবস্থায় পাকাকলার কষা আস্বাদ প্রায় থাকে না, খেতসারের ভাগও খুব কমে যায় এবং চিনির অংশ উৎপন্ন হয়ে ক্রমশ বর্দ্ধিত হতে থাকে। কাঁচাকলার সহিত পাকাকলার এইটিই প্রধান পার্থক্য।

সাধারণতঃ কলা অরন্ধিত অবস্থায় খাওয়া হয়, কিন্তু কলা অর্ধাংশ অবস্থায় খেয়ে আমরা যে পরিমাণ খেতসার গলাধঃকরণ করি তা সহজে পরিপাক হয় না। একথা প্রত্যেকেরই জানা উচিত যে, কলার খোসা কুঞ্চিত হয়ে কালচে রঙ না ধরা পর্যন্ত সেটা সম্পূর্ণ পাকে না। কাঁচা খেতসার গ্রহণের ফলে মানুষের অন্ত্রবাহী নাড়ী কুপিত হয়, তা'সে খেতসার কলা, আলু অথবা অপর যে কোনও খেতসারযুক্ত খাদ্য হতে গ্রহণ করা হ'ক না কেন। অর্ধাংশ অবস্থায় আলু খেতে বড় কাউকে দেখা যায় না, অথচ অনেকেই কলার খোসার সবুজ রঙ সম্পূর্ণ হলদে হবার আগেই খেতসার বিশিষ্ট কাঁচা কলা নির্বিকারচিত্তে উদরস্থ করেন এবং সুপাচ্য প্রকৃত পাকা কলাকে পচে গিয়েছে মনে করে ফেলে দেন। খেতসার উপযুক্তরূপে শর্করায় পরিণত না হওয়া পর্যন্ত কলা কাঁচা অবস্থায় অত্যন্ত গুরুপাক। এই বিষয়ে অজ্ঞতা থাকা হেতু কলার গুণ সম্বন্ধে অনেকের ভ্রমাত্মক ধারণা জন্মে।

ট্যানিন নামক দ্রব্য থাকায় কাঁচাকলা খেতে কষা লাগে। কলা পাকলেও সেই ট্যানিনের পরিমাণ কমে যায় না, কিন্তু কাঁচা অবস্থায় যে ট্যানিন্ দ্রবণশীল ছিল,

পরিপক্ক হলে সেটি এরূপ রূপান্তর গ্রহণ করে কলার খোসার সহিত সংশ্লিষ্ট হয়ে যায় যে ভ্রূণীভূত হয় না। ট্যানিন্ অম্লবর্ণাভ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ায় পাকা কলার আমরা কষা আস্বাদ পাই না।

কলার ভিতর শর্করা একরূপ পেক্টিন্ নামক দ্রব্য আছে। এই পেক্টিন্ দ্রব্যটি কলার মধ্যে থেকে পথ্য ও ঔষধ হিসাবে মানুষের শরীরে কি ভাবে কাজ করে বিশেষজ্ঞগণ সকলে সে বিষয়ে এখনও একমত হন নাই। কারও কারও মতে এই পেক্টিন্ থাকায় শিশু এবং বয়স্কদের উদরাময় রোগে কলা উপকারী।

সিয়োরিসি বৈজ্ঞানিক (Gyorgy) কলার মধ্যে এরূপ একপ্রকার বস্তুর সন্ধান পেয়েছেন যেটি একজিমা জাতীয় রোগের প্রতিষেধক। তিনি সেই উপাদানটির নাম দিয়েছেন "H" factor.

কলার মধ্যে 'এ', 'বি', 'সি', 'ডি' এবং 'ই' ভিটামিন আছে। তন্মধ্যে 'এ' ভিটামিনের পরিমাণে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, 'বি' ভিটামিনও নিতান্ত কম নয়, কিন্তু 'ডি' ভিটামিনের অভাব আছে।

এ-ভিটামিনের প্রাচুর্য্য থাকায় কলা স্বাভাবিক ভাবে দাঁতের পুষ্টি সাধনে সাহায্য করে এবং মানুষকে দীর্ঘায়ু করার সহায়তা করে। রোগ-প্রতিরোধ করার এবং আরোগ্য করার ক্ষমতায় কলার এ-ভিটামিন খুব কার্য্যকরী। চিকিৎসকগণের মতে যে তিন বৎসর বয়স্ক শিশুর ওজন ১২।১৩ সের তাকে দৈনিক চার পাঁচটি কলা খেতে দেওয়া যেতে পারে। অবশ্য এর কম দিলেও যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়।

দুধের সঙ্গে কলা আদর্শ খাদ্য। দুধে এ-ভিটামিন্ আছে। কলার তৈল জাতীয় পদার্থ না থাকলেও চর্ব্বিতে দ্রবণযোগ্য এ-ভিটামিনের ধারক হিসাবে এই ফলটি বিশেষ কার্য্যকরী।

দুধ আবাল-বৃদ্ধ সকলের পক্ষেই প্রয়োজনীয় খাদ্য সন্দেহ নাই, কিন্তু কেবল দুধে সর্ব্বাঙ্গীন ভাবে খাদ্যের অভাব পূরীভূত হয় না। দুধে কার্ব্বোহাইড্রেটের পরিমাণ খুব কম। তাছাড়া পাস্তুরাইজ করলে দুধের সি-ভিটামিন নষ্ট হয়ে যায়, কাজেই অপর স্থান হতে সেটি সরবরাহ করা দরকার।

পাস্তুরাইজড্ দুধে কলার মিশ্রণে ভিটামিন কিভাবে বৃদ্ধি পায় নিম্নোক্ত তালিকায় সেটি দেখান হল।

	এ-ভাইটামিন	বি-ভাইটামিন	সি-ভাইটামিন
টাটকা কাঁচাদুধ	• • • •	• • •	•
পাস্তুরাইজড্ দুধ	• • • •	• •	——
পাস্তুরাইজড্ দুধ এবং কলা	• • • • •	• • •	• •

বিশেষজ্ঞগণ বলেন, টমেটোরসে যে পরিমাণ বি-ভিটামিন আছে, কলাতেও বি-ভিটামিনের পরিমাণ প্রায় তদ্রূপ। যে সকল রোগী chronic ulcerative colitis রোগে ভুগছেন তাঁদের পক্ষে ভিটামিন-সি-যুক্ত কলা, কমলালেবুর রস এবং টমেটোর রস অত্যন্ত ফলপ্রদ। এই প্রকার রোগীদের জন্য চিকিৎসকগণ দৈনিক একটি পাকাকলা, সিকি গ্লাস কমলার রস এবং দু চামচ তরকারীর সুপ ব্যবস্থা করেন। ভিটামিন সি থাকায় কলা স্কার্ভি রোগের নিরাময়ে উপকারী। জার্মান চিকিৎসক এডি এবং কেলগ্ স্কার্ভিরোগগ্রস্ত আট-মাসের শিশুকে দুধকলা দিয়ে তার রোগ আরোগ্য করেছেন। তাঁদের মতানুসারে স্কার্ভিরোগগ্রস্ত অল্পবয়স্ক শিশুদের ১৮ তোলা পাকাকলার সহিত বল দুটাক দুধ মিশিয়ে প্রতি চার-ঘণ্টা অন্তর প্রায় চৌদ্দ তোলা পরিমাণে খাওয়ানো আবশ্যক। এরূপ খাওয়ানের ফলে শিশুর হজমের কোনও গোলযোগ হয় না। পাকা কলা অথবা আংশিকভাবে পুষ্ট রক্তিত কলা শিশুরাও হজম করতে পারে। শিশুদের পানীয় দুধে কলার মিশ্রণে যে খাদ্য প্রস্তুত হয়, কলার সি ভিটামিন ও সহজ-পাচ্য চিনির জন্য তাতে মূল্যবান খাদ্যের সমাবেশ হয়। চিকিৎসক গথলিন্ বলেন যে, স্কার্ভি রোগের প্রতিষেধক হিসাবে প্রত্যহ অন্তত পক্ষে দুইটি টাটকা পাকা কলা গ্রহণ করা আবশ্যক। কোষ্ঠবদ্ধতা রোগেও কলা উপকারী।

আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্মানি ও ইংলণ্ডের বহু চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিক কলার খাদ্য ও ঔষধগুণ সম্পর্কে যে সকল বিস্তারিত বিবরণী প্রকাশ করেছেন তা থেকে একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে সর্ব্বজনপ্রিয় প্রাপ্যেয় ফল-সমূহের মধ্যে কলা অত্যন্ত পুষ্টিকর, সহজপাচ্য খাদ্য এবং স্কার্ভি, আমাশয়, উদরাময়, বহুমূত্র, আন্ত্রিক প্রদাহ প্রকৃতি রোগে অতিশয় ফলপ্রদ ঔষধ।

জন্মভূমি

—শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

বেলা শেষ হইয়া আসিতেছে!

এখনও প্রায় দুই ক্রোশ পথ—কখন সে যাইবে! সুমুখে অন্ধকার রাত্রি, বহুদিন পল্লীগ্রাম ছাড়া সে, কেমন যেন গা-ছম্‌ছম্ করিতে লাগিল। এখনও সূর্য্য অস্ত যায় নাই, কিন্তু সরু গরুর গাড়ীর পথটির দুই পার্শ্বে বৃক্ষলতার পটমণ্ডপ যেন এখনি জানাইয়া দিতেছে, এ পথে রাত্রি কি ভীষণ আকার ধারণ করে! শঙ্কর যত দ্রুত সম্ভব হাঁটিতে লাগিল। কিন্তু মানুষ ত আর ছুটিয়া দুইক্রোশ পথ যাইতে পারে না, তাই মাইল খানেক যাইতে না যাইতেই নামিয়া আসিল অন্ধকার। দুই পাশের গাছপালাগুলি যেন বিশাল অরণ্যানীর মত বোধ হইতেছে। জোনাকী জ্বলিয়া ঐ অরণ্যের ভীষণতা আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছে। শঙ্কর তথাপি হাঁটিতে লাগিল। যাইতেই হইবে তাহাকে, যেমন করিয়া হউক আজ তাহাকে পৌঁছিতে হইবে রাণীগ্রাম। না হইলে রাস্তায় ত আর গ্রাম নাই, সে থাকিবে কোথায়!

বহুদিন শঙ্কর দেশ-ছাড়া। সনের বৎসরের বালক শঙ্কর যাত্রাদলের এক অধিকারীর সঙ্গে গৃহত্যাগ করিয়াছিল। সে আজ বিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা। আপনার বলিতে কেহই তাহার ছিল না। বোধোদয় শেষ হইবার পরই গ্রাম্য পাঠশালা ছাড়িয়া বখাটে হইয়া যাইতেছিল সে। পৈত্রিক ভিটার সন্ধ্যাটা দিবারও তাহার সময় হইত না, বেলা থাকিতেই গানের আড্ডায় চলিয়া যাইত এবং সেখানে নেশা-ভাঙ করিয়া দিন কাটাইত। রাত্রি গভীর হইলে সবাই বাড়ী ফিরিত আর শঙ্কর একাই বসিয়া বসিয়া নেশার ঝোঁকে বাঁয়া-তবলা বাজাইয়া আপন মনে গান করিত। কতদিন সমস্ত রাত্রিই গান করিয়া কাটাইয়াছে সে।

সেবার দোলের সময় সহর হইতে যাত্রাপার্টি আসিয়া গান করিল। শঙ্কর মুগ্ধ হইয়া গেল। অধিকারীর নিকট গিয়া আবেদন করিল, এই দলে যদি শঙ্করকে যে কোন একটা পার্ট দিয়া রাখা হয়। অধিকারী মহাশয় তাহার চেহারা দেখিলেন, গলার স্বর শুনিলেন এবং জানিলেন যে, আপনার বলিতে তাহার কেহই নাই। এমন সুবিধার লোককে তিনি ছাড়িলেন না, শঙ্করকে লইয়া গেলেন। তদবধি শঙ্কর কলিকাতারই অধিবাসী। যাত্রাদল ছাড়িয়া সে থিয়েটারে ঢুকিয়াছে, কিছু যশ এবং অর্থও হয়ত পাইয়াছে, কিন্তু বিনিময়ে যাহা ছাড়িতে হইয়াছে তাহা তাহার জন্মভূমি। সেই শঙ্কর আজ দীর্ঘ কুড়ি বছর পরে তাহার জন্মভূমিতে ফিরিতেছে। গ্রামের যাহারা তাহাকে বিশেষরূপে চিনিত, আজ হয় ত তাহারা চিনিতেই পারিবে না। যাহাদের সঙ্গে সে সারা রাত্রি তবলা বাজাইয়াছে, আজ হয় ত তাহারা সভ্য ও বড়লোক। কে জানে কত কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে গ্রামের! তথাপি শঙ্করকে যাইতে হইবে।

অভ্যাস নাই, বহুদিন এরূপ জঙ্গলাকীর্ণ পথে চলার। টর্চ্চ একটা আনিলে খুবই ভাল হইত। কিন্তু এত কি আর মনে থাকে! শঙ্কর চলিতে লাগিল। কিছুতেই তাহার গতি আজ রুদ্ধ হইবে না। বহু আশা করিয়াই সে জন্মভূমি দর্শনে আসিয়াছে।

রাত্রি গভীর হইয়া উঠিয়াছে। দূর বনে শৃগালের প্রহর-ঘোষণার রব শুনিয়া শঙ্কর বুঝিল, গ্রামের লোক ত সকলেই এতক্ষণ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তবে সে কাহার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করিবে! তাহাকে ত কেহ দিবালোকেই চিনিবে না, এই রাত্রিকালে কে তাহাকে আশ্রয় দিবে! তাহার নিজের ভিটা কি আর বিশ বৎসর পরে বর্ত্তমান আছে! অসম্ভব।

কিন্তু এই জঙ্গলের মধ্যে ত আর থাকা যায় না, শঙ্কর গ্রামে প্রবেশ করিল।

বাবুদের কাছারীবাড়ীটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে না কি? না, এখানে ত কোন বাড়ী ছিল না, ছিল একটা পুকুর। তবে কি সেই পুকুরটা ভরাট করিয়া বাড়ী গাঁথা হইয়াছে! হইলেও বা। কিন্তু সবই যে নূতন বোধ হইতেছে, এই রাত্রে অন্ধকারে কেমন করিয়া খুঁজিয়া বাহির করিবে তাহার পরিচিত বাড়ী! দূর হউক, আজ না হয় ঐ হাটতলার চালাতেই

শুইয়া কাটাইয়া দেওয়া যাক! কাঁহাতক আর ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ানো যাইবে। শঙ্কর হাটতলার পুরাতন জীর্ণ টিনের ঘরটায় আসিয়া প্রবেশ করিল।

অত্যন্ত অপরিষ্কার। দুই তিনটা খেঁকি কুকুর শুইয়া রহিয়াছে। শঙ্কর ঢুকিবামাত্র ঘেউ ঘেউ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, তাহারা তাহাদের বাসস্থানে অনধিকার প্রবেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইতেছে। শঙ্কর সভয়ে পদযুগল পিছাইয়া আনিল।

সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে পড়িল কুড়ি বৎসর পূর্ব্বের শঙ্করের কথা—যে এমনি কয়েকটা কুকুরের সঙ্গেই শুইয়া, তবলা বাজাইয়া রাত্রি কাটাইত। আজ সে কতখানি ভয় পাইয়াছে, এই সামান্য জীব কয়টার একটু চীৎকারে! শঙ্কর মনে মনে হাসিল। হাততালি দিয়া কুকুরগুলাকে বলিল—চুপ; চুপ কর। আমাকেও একটু যায়গা দে বাবা—তোদেরই একজন আমি। কুকুরগুলা বুঝিল কি না কে জানে—তবে শঙ্কর উহাদের একপাশেই শুইয়া পড়িল।

রাত্রি ভালই কাটিল। সকালে শঙ্কর বাহির হইল গ্রামবাসীদের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিতে। সুদীর্ঘ বিশ বৎসরে গ্রামের সকলই পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, কত পুরাতন গৃহস্থের বাড়ী লোপ হইয়া গিয়াছে, কত পতিত জমিতে নূতন বাড়ী উঠিয়াছে।

শঙ্কর একাই সমস্ত গ্রামটা একচক্র ঘুরিয়া আসিতে বাহির হইল—আশ্চর্য্য! কেহই তাহাকে চিনিল না। শঙ্কর কিন্তু অনেককেই চিনিতে পারিয়াছে—তবে কাহাকেও কিছু বলে নাই। পরিচয় দিলে হয়ত তাহারা চিনিতে পারিত—শঙ্কর তাহা চাহে না—সে চায় গ্রামের লোক তাহাকে না চিনিলেই ভাল। সে শুধু গ্রামখানি একবার চক্ষু ভরিয়া দেখিয়া যাইবে। হয়ত এই জীবনে আর আসা হইয়া উঠিবে না। একটা দিন মাত্র কাহারও আতিথ্য গ্রহণ করিয়া গ্রামটি দেখিয়া চলিয়া যাইবে।

শঙ্কর আশ্চর্য্য হইতেছিল। যাহারা তাহার সহিত দুপুর রাত্রি পর্য্যন্ত হল্লা করিত হাজার রকমের দুষ্টু বুদ্ধি বাহির করিয়া গ্রামবাসীদের জ্বালাইয়া ছাড়িত, তাহারা আজ শঙ্করকে চিনিল না পর্য্যন্ত! কি এত পরিবর্ত্তন হইয়াছে শঙ্করের! হাঁ, সে একটু মোটা হইয়া গিয়াছে, আর দাড়িগোঁফ রাখিয়াছে, কিন্তু তাহাতে কি একেবারে চেনাই যায় না!

অবশ্য বয়সও হইয়াছে এবং একাদিক্রমে বিশ বৎসর তাহাকে কেহ দেখে নাই।

শঙ্কর ভাবিল যে, পরিচয় দিলে নিশ্চয়ই উহারা চিনিতে পারিবে, কিন্তু কি-ই বা প্রয়োজন! আর কতক্ষণের জন্যই বা! শঙ্কর তো আর এখানে বাস করিতে আসে নাই—মাত্র একটা দিনের জন্য জন্মভূমি দেখিতে আসিয়াছে। না—শঙ্কর কাহাকেও পরিচয় দিবে না।

গ্রামের সব লোকেই কিন্তু শঙ্করের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিতেছে। দু'-চারজন বর্ষীয়ান্ ব্যক্তি প্রশ্নও করিল—"কোথা থেকে আসা হ'চ্ছে মহাশয়ের?" শঙ্করের হাসি পাইল, ইহারাই তাহাকে কত তিরস্কার করিয়াছেন 'বকাটে ছেলে' বলিয়া, আর আজ কি না মহাশয় বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন! তবুও শঙ্কর পরিচয় দিল না—বলিল, কলিকাতা হইতে সে পায়ে হাঁটিয়া বাংলা দেশ ভ্রমণে বাহির হইয়াছে। প্রত্যেক বড় গ্রামের প্রধান প্রধান দ্রষ্টব্যগুলি সে দেখিয়া যাইবে। এবং এই বিষয়ে কাগজে প্রবন্ধ লিখিবে। শুনিয়াই গ্রামবাসীরা তাহার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া উঠিল। শঙ্করকে লইয়া ঘুরিল এবং তাহাদেরই একজনের গৃহে শঙ্করের মধ্যাহ্ন-ভোজনের ব্যবস্থা করিল।

কয়েকটি যুবক আসিয়া তাহার সঙ্গ লইল এবং বলিল "চলুন, আমাদের গ্রামের সব জিনিষ আপনাকে আমরা দেখাচ্ছি।" তাহারা চলিল শঙ্করের সঙ্গে। বুড়াশিবতলা, ধর্ম্মরাজের বটগাছ, পাষাণকালীর মন্দির—সবই তাহারা দেখাইল শঙ্করকে এবং প্রত্যেকটির সম্বন্ধে গ্রামের প্রচলিত ইতিকথাও শুনাইয়া গেল। শঙ্কর গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনিল তাহার বহুবার শ্রুত সেই ইতিহাস। তাহার মনে হইতে লাগিল—সে যেন পুনরায় শিশু হইয়া গিয়াছে, আর সকলেই তাহার অসম্ভব কৌতূহল নিবারণের জন্য সচেষ্ট হইয়াছে। দ্বিপ্রহর বেলা পর্য্যন্ত তাহারা শঙ্করকে লইয়া ঘুরিল

বেশ লাগিতেছিল শঙ্করের। এই চির-পরিচিত গ্রামে সম্পূর্ণ অপরিচিত হইয়া গিয়াছে সে আজ—আর এতগুলি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হৃদয় তাহাকে ঘিরিয়া গ্রামের গৌরব-দীপ্ত ইতিহাস বলিয়া যাইতেছে। যদি তাহারা জানিতে পারে যে, তাহাদের অঙ্গকার মাননীয় অতিথি এই গ্রামেরই একটা হতভাগা বাসিন্দা, তবে তাহাদের শ্রদ্ধা কেমন করিয়া উবিয়া যায় তাহা দেখিবার বস্তু হইয়া উঠিবে। অল্প পরিচয়ের আড়ালে মানুষ মানুষকে কেমন বিস্ময়ের চোখে দেখে, ইহা তাহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

কিন্তু শঙ্করের কোথায় যেন বেদনা বোধ হইতেছে। তাহার জন্মভূমিতে সে আজ কেহ নয়, নিতান্ত একটা অপরিচিত। সে চলিয়া গেলে ইহারা ভাবিবে, একজন মহানুভব পরিব্রাজক তাহাদের গ্রামে আসিয়াছিলেন—ইহার বেশী তাহারা আর কিছুই জানিবে না—শঙ্করের সহিত তাহাদের নাড়ীর যোগ কোথায়, তাহা ইহারা জানিবে না। শঙ্কর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

যুবকগুলির উৎসাহের অন্ত নাই। গ্রামের সব কিছুই তাহারা দেখাইবে উহাকে। অপরাহ্নে শঙ্করকে টানিয়া লইয়া চলিল তাহারা তাহাদের নব প্রতিষ্ঠিত সৎকর্মমন্দির দেখাইবার জন্য। শঙ্কর চলিল। যেখানটায় শঙ্করের বাল্যকালে ছিল একটা গাঁজা ও চরস খাইবার আড্ডা, সেই পুরাতন দুর্গা দালানটাই মেরামত করাইয়া সৎকর্মমন্দিরের প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। সেখানে আজ ক্লাব, লাইব্রেরী, কত কি! কয়েকটি যুবক ইহারই মধ্যে শঙ্করকে অভিনন্দন দিবার আয়োজন করিয়া ফেলিয়াছে। রক্তকরবী ফুলের মালাটি রাখা হইয়াছে টেবিলের উপর। সভায় গ্রামের জমিদার পৌরোহিত্য করিবেন—তিনিও আসিয়াছেন। সমস্তই ঠিক।

ধীরে ধীরে শঙ্কর আসিয়া ঢুকিল সৎকর্মমন্দিরে। চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার বাল্যস্মৃতির লেশমাত্রও অবশিষ্ট নাই। ভালই হইয়াছে—গাঁজার আড্ডায় একটা সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান হইতেছে—খুবই ভাল! তথাপি শঙ্কর যেন খুসী হইতে পারিল না—তাহার যেন মনে হইল—এই মন্দিরের সঙ্গে তাহার রক্তের কোন সম্পর্ক নাই—শঙ্কর নীরবে দাঁড়াইল সভার মধ্যে। চারিদিকে লোক ফিস ফিস করিতেছে। সভাপতি মহাশয় প্রথমেই দাঁড়াইয়া গ্রামবাসীদের সহিত শঙ্করের পরিচয় করাইয়া দিলেন—বলিলেন, "ভ্রাতৃগণ—আজ যে মহান্ অতিথি আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছেন, তাঁহার মহৎ দৃষ্টান্ত দেখে আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে,বাংলাকে ভালবাসা কাকে বলে। এই ত্যাগবীর, বাংলা-মার এই সুযোগ্য সন্তান ট্রেন-ষ্টিমার-মোটরের যুগেও পায়ে হেঁটে পল্লীগ্রাম দেখতে বেরিয়েছেন কলিকাতা থেকে। দেখুন এঁর পল্লীপ্রীতি কতখানি—কতখানি এঁর নিষ্ঠা বাংলা-মার সেবায়! আপনারা জানেন যে, পল্লীকে না চিনলে বাংলাদেশকে চেনা যায় না—ইনি তাই অসীম কষ্ট সহ্য করেও বাংলার পল্লীতে পল্লীতে ভ্রমণ করছেন, প্রত্যেক গ্রামের সুখদুঃখ অভাব-অভিযোগ স্বচক্ষে দেখছেন—হৃদয় দিয়ে অনুভব করছেন। আমরা আজ এই মহান্ পুরুষকে, বাংলা-মার এই একনিষ্ঠ সেবককে আমাদের মধ্যে পেয়ে ধন্য হয়েছি, কৃতার্থ হয়েছি। প্রার্থনা করি—ঈশ্বর এঁকে অটুট স্বাস্থ্য, অসীম শক্তি, অমরত্বের পরমায়ু দান করুন। বাংলা-মার সেবায় আত্মনিয়োগ করে এই কর্ম্মবীর যেন বঙ্গভূমির আর তাঁর বাঙ্গালী ভাইদের মুখ উজ্জ্বল করতে পারেন।

"আমরা এবার তাঁর মুখ থেকে বাংলার পল্লী-সম্বন্ধে কিছু শুনতে চাই, যাতে আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে দেশসেবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে উঠতে পারে।"

করতালিধ্বনিতে সমস্ত গৃহ পরিপূর্ণ হইয়া গেল। ছোট একটি ফুট-ফুটে মেয়ে আসিয়া শঙ্করের গলায় পরাইয়া দিল রক্তকরবীর মালা—কপালে দিল চন্দনপঙ্ক। জয়ধ্বনির মধ্যে উঠিয়া দাঁড়াইল শঙ্কর বক্তৃতা করিতে।

শঙ্কর আরম্ভ করিল, খবরের কাগজে দেশের দুঃখ-দুর্দ্দশার কথা যাহা সে পাঠ করিয়াছে তাহাই নিজ অভিজ্ঞতার কথা হিসাবে বলিয়া গেল। বলিল, প্রত্যেক গ্রামে যদি এমনি সৎকর্ম্মানুষ্ঠান হয়, এমনি উৎসাহ-প্রবণ যুবকদল গঠিত হয়, তবে দেশের দুর্দ্দিন ঘুচিতে দেরী হইবে না। সর্ব্বশেষে শঙ্কর বলিল যে, বিশেষভাবে এই গ্রামের কথা ও এই সৎকর্ম্ম-মন্দিরের কথা কলিকাতায় গিয়া সে কাগজে লিখিবে।

বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে সভা শেষ হইল।

সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। শঙ্করের মনে হইল—এখনও যে মাটিটুকুতে সে জন্মিষ্ঠ হইয়াছিল তাহা দেখা

হয় নাই। কিন্তু ইহাদের কাছে সে-কথা বলা চলে না। ভাবিল, ভোরের দিকে জ্যোৎস্না আছে—সেই সময় উঠিয়া একবার গিয়া দেখিয়া লইবে তাহার জন্মস্থানটুকু—তারপর প্রভাতে আবার যাত্রা করিবে—যেখানকার সেইখানে।

আজ আর শঙ্করকে চাটতলার টিনের চালায় যাইতে হইল না। মন্দিরের প্রেসিডেন্ট জমিদার চন্দ্রবাবুর বৈঠকখানাতেই তাহার স্থান হইল। গভীর রাত্রি পর্যন্ত গ্রামের যুবকবৃন্দ তাহার চারিপার্শ্বে বসিয়া নানা বিষয় আলোচনা করিল।

শঙ্করের শ্বাস যেন রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে। ইহারা উঠিলে সে একবার প্রাণ ভরিয়া কাঁদিয়া লইবে। একবার উন্মুক্ত আকাশতলে দাঁড়াইয়া বলিবে—জননি, জন্মভূমি আমার!

রাত্রি দ্বিপ্রহর নাগাদ সকলে চলিয়া গেল। শঙ্কর শয্যায় শুইয়া ভাবিতে লাগিল কত কথা। করবী ফুলের মালাটা তখনও বুকের উপর দুলিতেছে। ঐ বিজয়মাল্যই আজ তাহার ও গ্রামের মধ্যে তুলিয়া দিল একটা বিরাট প্রাচীর। না, ও প্রাচীর সে ভাঙিয়া ফেলিবে। সকালে উঠিয়াই সে সকলকে ডাকিয়া বলিবে,—সে কোন মহাব্রতী দেশকর্মী নয়—কোনরূপ দেশসেবার কাজ জীবনেও সে করে নাই—সে তাহাদেরই মত, তাহাদেরই একান্ত আপনার—যাহাকে তাহারা একদিন ঘৃণা করিয়াছে, লাঞ্ছনা দিয়াছে, সে সেই শঙ্কর!

ভাবিতে ভাবিতে শঙ্কর ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, কলকোলাহলে ঘুম ভাঙিয়া গেল। শুনিল ছেলেরা গাহিতেছে 'সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং' শঙ্কর উঠিয়া বাহিরে আসিল, সঙ্গে সঙ্গে সমবেত জনগণ জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল "বন্দেমাতরম্"।

শঙ্কর রাত্রির সঙ্কল্পের কথা ভুলিয়া গেল,—না—বলিতে পারিল না যে, সে তাহাদের শঙ্কর—তাহাদেরই মত নিতান্ত দীনহীন—নিতান্ত স্বার্থপর, পরানুগৃহীত শঙ্কর সে! ধীরে ধীরে আসিয়া সেও যোগ দিল সঙ্গীতে। অল্পক্ষণ মধ্যে বহুলোক আসিয়া জুটিল। শঙ্করকে, ত্যাগব্রতী দেশপ্রেমিক পরিব্রাজককে তাহারা বিদায় দিতে আসিয়াছে আজ। কেহ লইয়া আসিয়াছে ধানদূর্বা, কেহ বা পুষ্পমালা—শঙ্করের যাত্রাপথে তাহারা জানাইবে তাহাদের আশীর্বাদ—প্রার্থনা করিবে তাহার সর্বাঙ্গীন সফলতার জন্য। কি তাহাদের আকুলতা—কতখানি তাহাদের বিশ্বাস!

কিন্তু শঙ্করকে যে তাহার জন্মভিটাটুকু দেখিয়া যাইতেই হইবে। কেমন করিয়া সে ইহাদের বলিবে সেখানে যাইবার কথা! সে স্থান ত হেথায় যাইবার পথে পড়ে না। শঙ্কর চিন্তা করিল। একটু ভাবিয়া বলিল—তাহারা সকলে একবার "বন্দেমাতরম্" গান গাহিতে গাহিতে গ্রাম প্রদক্ষিণ করিবে, তারপরে গ্রামলক্ষ্মীকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইবে শঙ্কর।

সকলেই মহা-উৎসাহিত হইয়া উঠিল। কি সীমাহীন নিষ্ঠা এই দেশব্রতীর। তৎক্ষণাৎ সকলে শঙ্করকে পুরোভাগে লইয়া শোভাযাত্রা করিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

শোভাযাত্রা আসিয়া পৌঁছিল শঙ্করের ভিটার নিকটে। জমিদার চন্দ্রবাবু সকলকে লইয়া সেই স্থানটায় উঠিয়া আসিলেন এবং শঙ্করকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, এই স্থানটাতেই তাঁহাদের সৎকর্মমন্দিরের বাড়ী তৈয়ার করিবার প্রস্তাব হইয়াছে এবং টাকাও সংগ্রহ হইতেছে।

শঙ্কর চতুর্দিকে চাহিয়া দেখিল। তাহার জন্মভূমিটুকু জঙ্গল-পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। গৃহখানি বহুদিন পূর্বেই ভূমিসাৎ হইয়াছে এবং তাহার উপর গজাইয়াছে বড় বড় বন-তুলসীর ঝোপ। যে পাতকুয়াটায় শঙ্কর জল তুলিয়া রান্না করিত, তাহা বুজিয়া গিয়াছে, আর তাহারই গর্ভে জন্মিয়াছে একটা প্রকাণ্ড বজ্রডুমুরের গাছ। ওদিকে তাহার বাল্যকালে যেখানটায় গোহাল ছিল—বুধি-গাইটার পেটের তলায় বসিয়া শঙ্কর তাহাকে তাহার মাথার চুল লেহন করাইত, সেখানে পাড়ার লোক মাটি কোপাইয়া পালং শাক বুনিয়া দিয়াছে।

চারিদিক দেখিয়া শঙ্কর বলিল, 'বেশ ত, বেশ হবে, সুন্দর হবে এখানে—গ্রামের মধ্যেই অথচ বেশ ফাঁকায়—বেশ জায়গা, এইখানেই হ'ক মন্দির—কিন্তু জমিটা কি কেনা হয়েছে?'

জমিদার চন্দ্রবাবু বলিলেন, 'না, এ জমির কোন মালিক নেই। এর মালিক আজ প্রায় বিশ পঁচিশ বছর গ্রামছাড়া, সোদরও মারা গেছে।'

শঙ্কর চমকিয়া উঠিল—মারা গেছে! তৎক্ষণাৎ আত্মসংবরণ করিয়া বলিল, 'ওঃ, তা খুব ভাল কথা—তা আপনাদের মন্দির-নির্ম্মাণের জন্যে আমিও যৎকিঞ্চিৎ দিয়ে যাই দয়া করে নিন। গ্রামের সকলে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। শঙ্কর পকেট হইতে ব্যাগ বাহির করিয়া দশটাকার পাঁচখানি নোট দিল চক্রবর্ত্তীর হাতে। গ্রামের সকলে আর একবার বলিয়া উঠিল—"বন্দেমাতরম্"। গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া গ্রামলক্ষ্মীকে প্রণাম করিয়া এবং সমস্ত গ্রামবাসীদের প্রীতির অভিনন্দন লইয়া শঙ্কর যাত্রা করিল পুনর্ব্বার।

দুই পাশে নিস্তব্ধ ক্ষেতগুলি চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছে, আঁকাবাঁকা রাস্তাটির উপর দিয়া চলিতেছে একজন পথিক, করুণ তাহার মুখখানি, ক্লান্ত তাহার চরণ দুটি, তবু সে চলিতেছে আর মাঝে মাঝে পিছন ফিরিয়া দেখিতেছে। ঐ দূরে এখনও দেখা যায়—রাণীগ্রাম ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে। এখনও তাহার আম-সারির উচ্চ গাছ দেখা যায়, এখনও দেখা যায় সু-উচ্চ তালবৃক্ষের পাতায় পাতায় সূর্য্যকিরণ নাচিতেছে। সম্মুখে ঐ তরুশীর্ষ ছায়ার প্রবেশ করিলে আর হয়ত দেখা যাইবে না। আর একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লওয়া যাক—ঐ শ্যামল কুঞ্জটি, যাহার প্রত্যেক বিংশবর্ষীয় বৃক্ষলতা এই পথিককে চেনে, তাহাদিগকে আর একবার শেষ নমস্কার জানাইয়া লওয়া যাক।

দূর হইতে কান পাতিয়া আর একবার শুনিয়া লওয়া যাক ঐ গ্রামের আনন্দকল্লোল। উহার অধিবাসীরা হয়ত এখনও উৎসব করিতেছে, তাহাদের গ্রামের মৃত শঙ্করের তিটায় সৎকর্ম্ম মন্দিরের গৃহ-নির্ম্মাণ করিবার জন্য আজই একজন দেশহিত-ব্রতী মহানুভব ব্যক্তি দান করিয়া গিয়াছেন পঞ্চাশটা টাকা নগদ।

ঐ দেশসেবকের প্রতি শ্রদ্ধায় গ্রামের সকলের মাথা নুইয়া পড়িতেছে বারংবার—হাঃ! হাঃ! হাঃ! হাসিতে হাসিতে পথিকের চোখে জল আসিয়া গেল।

ব্যবধান

—শ্রীগোপাল ভৌমিক

দূরে আছ তুমি দূরেই সরিয়া থাক—
এ পথে আসার চেষ্টাও ক'রো নাকো।
আমরা চলেছি কঙ্করময় পথে—
সংশয়ী মনে দুরাশার জয় রথে।
পদতলে চলে তপ্ত ধূলির ঝড়—
মাথার উপরে প্রতপ্ত রবিকর!
সংশয়ময় মরুবালুকার বুকে—
যারা করেছি অজানার অভিমুখে।
শুনিবে না হেথা ক্লান্ত ঘুমুর রব—
চলে না এখানে শান্তির উৎসব।
এখানে প্রকৃতি শান্ত নয় ক' মোটে—
তপ্ত জীবন আছাড়ে মরুর তটে।

তুমি ত' ওখানে অলস চিত্তে বসি'—
বাতায়ন পথে দেখিছ শুভ্র শশী।
চন্দ্র দুয়ারে তোমার আকাশ ভরা—
তোমার জগতে নাই ত' কাহের ত্বরা।
আমাদের এই বিক্ষত ধরণীতে—
বিশ্রাম কেহ করে না অলস চিতে।
মাথার উপরে প্রখর সূর্য্য জ্বলে—
নীচের পৃথিবী কর্ম্মমুখর চলে।
শীত চলে যায়, বসন্ত ফিরে আসে—
অসীম জগৎ নব আনন্দে হাসে।
আমাদের এই রিক্ত জীবনে তবু—
বিরাম-শান্ত পাই না খুঁজিয়া কভু।

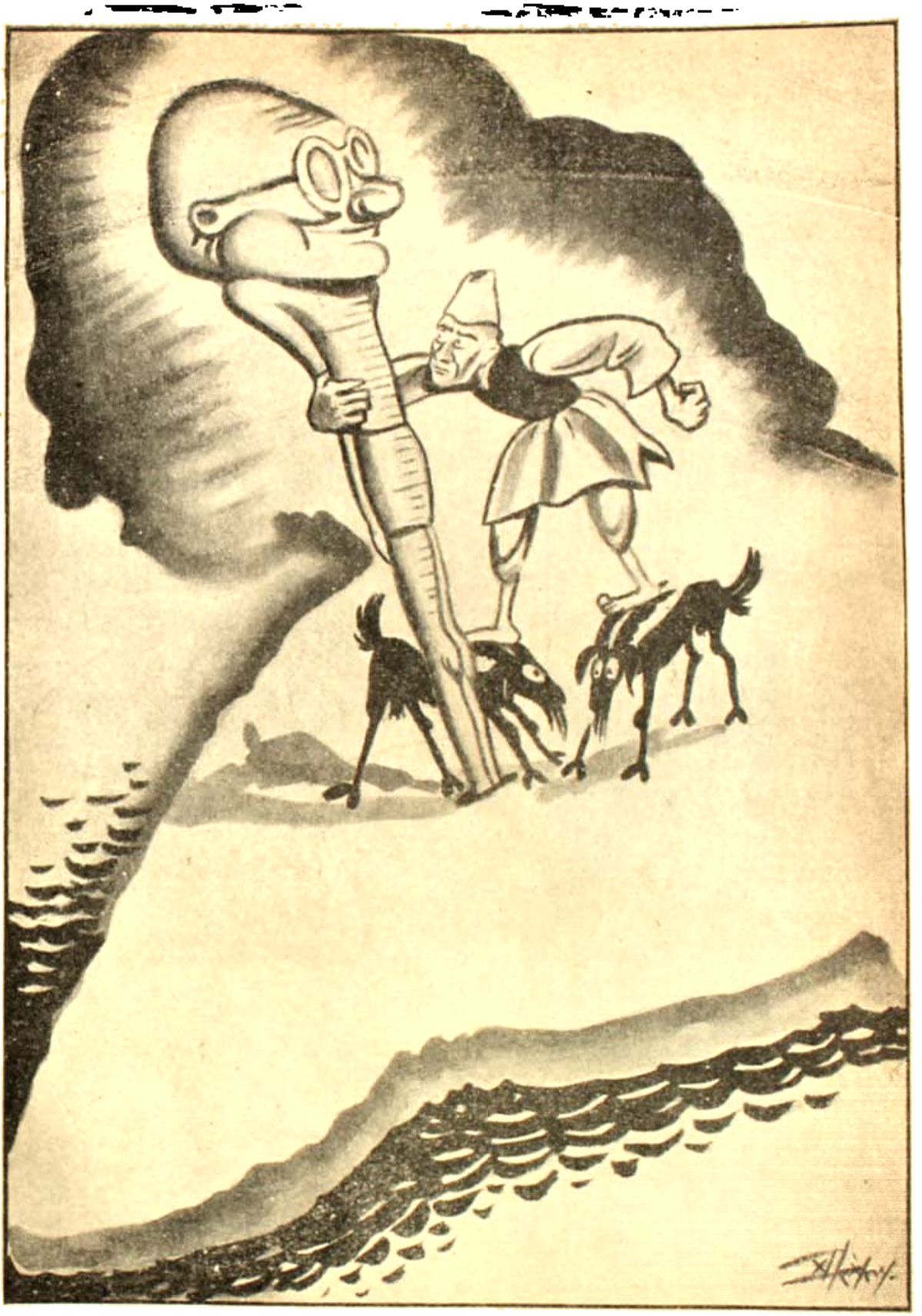

১ই ফেব্রুয়ারী এক বক্তৃতাপ্রসঙ্গে ওওহরলাল বলেন :—গান্ধীজী একটি রাজনৈতিক যা সমগ্রজাতির মেজাজ জানিতে হইলে গান্ধীজী অপেক্ষা উপযুক্ততর আর কেহ হইতে পারে না।

বিজ্ঞান জগৎ

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার বানর

—শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী

রকফেলার তহবিলের সাহায্যে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় ফ্লোরিডায় বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্য শিম্পাঞ্জীদের একটি উপ-নিবেশ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। মানুষের সহিত নানাবিষয়ে শিম্পাঞ্জীর সাদৃশ্য থাকায়, যে সকল পরীক্ষা মানুষের উপর করা সম্ভব হইতেছে না, সেই সকল পরীক্ষা শিম্পাঞ্জীর উপর করিলে নানা জটিল তথ্যের সমাধান হইবে বলিয়া এই বৈজ্ঞানিকগণ আশা করেন। ব্যাধি, আচরণ, গ্রন্থি প্রভৃতি সম্বন্ধে তথ্য আবিষ্কার করাই এই পরীক্ষাগার প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্য। প্রকাশ, ডক্টর ইয়ারকেস মানব অন্তঃকরণের সহিত শিম্পাঞ্জীর অন্তঃকরণের সাদৃশ্য দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছেন।

একটি ৪ বৎসর বয়স্ক শিম্পাঞ্জী কিছুকাল অসুস্থ থাকিবার পর ক্রমে আরোগ্য লাভ করিতেছিল। কিন্তু তাহাকে কোনরূপ কঠিন দ্রব্য আহার করিতে দিলে সে খাইত না। নানারূপ পরীক্ষা করিয়াও ইহার কারণ নির্দ্দেশ করা যায় নাই। যে ব্যক্তি ইহার তত্ত্বাবধান করিত, সে মনে করে, সম্ভবতঃ শিম্পাঞ্জীটির দাঁতে কোনরূপ ব্যথা হইয়াছে, কিন্তু পরীক্ষা করিয়া কিছুই দেখিতে পাওয়া গেল না। যখন সে চলিয়া যাইতেছিল, তখন শিম্পাঞ্জীটি তাহাকে টানিয়া আনিয়া উপরের ঠোঁট উল্টাইয়া মাড়ির একটি স্থান আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দেয়। পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে, সেই স্থানটি স্ফীত ও লাল হইয়াছে ও একটি নূতন দাঁত উঠিতেছে।

তত্ত্বাবধায়কের উপর বিশ্বাস জন্মিলে নানারূপ কষ্টসাধ্য পরীক্ষা করিতেও শিম্পাঞ্জীগুলি আপত্তি করে না। কিছুদিন শিক্ষা দিলেই মৌখিক আদেশ এবং ভাবভঙ্গী বুঝিতে ও ইঙ্গিতে তাহার উত্তর দিতে পারে।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিম্পাঞ্জীর হৃদয়ে স্নেহ এবং অন্যান্য গভীর অনুভূতিও না কি দেখা যায়। ১৯২৬ সালে এই উপ-নিবেশে একটি পুরুষ ও একটি স্ত্রী শিম্পাঞ্জী আনা হইয়াছিল। বর্ত্তমানে ঐস্থানে প্রায় ৬৬টি শিম্পাঞ্জী হইয়াছে। এইগুলিকে

মাড়ির বেদনাযুক্ত স্থানটি দেখাইয়া দিতেছে।

অতি যত্নে লালনপালন করা হয়। ইহাদের খাদ্য, ব্যায়াম, বিশ্রাম প্রভৃতি সকল বিষয়েই নির্দ্দিষ্ট নিয়ম পালন করা হয়। খাদ্যের শর্করা, স্নেহ, প্রোটীন, ভিটামিন, প্রভৃতি পরিমাপ করিয়া খাদ্য প্রয়োগ করা হয়। মানসিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধেও দৃষ্টি রাখা হয়। ইহাদিগকে কোন সময়ে বিরক্ত করা হয় না, সর্ব্বদাই সদয় ব্যবহার করা হয়।

প্রত্যেকটি পরীক্ষার ফলই লিখিয়া রাখিয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখা হয়। ডক্টর ইয়ারকেস বলেন যে, আদর্শ শিম্পাঞ্জী ছোট এবং বলিষ্ঠ হওয়া উচিত। শিম্পাঞ্জীর যৌনপরিণতা হ্রাস করিবার চেষ্টা করা উচিত। বয়স্ক শিম্পাঞ্জী পাইলে কতকগুলি পরীক্ষার পক্ষে সুবিধা হয়, বিশেষতঃ বংশগত গুণের উপর পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব পরীক্ষা করিবার সুবিধা হয়। এ পর্য্যন্ত ঐ উপনিবেশে মাত্র এক জোড়া বয়স্ক উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের সহিত আরও দুজনের মিলন ঘটাইতে পারিলে হয় ত দেড়শের অধিক উৎপন্ন করা যাইতে পারে।

এই পরীক্ষাগারে যে সকল বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করিতেছেন, তাঁহারা শিক্ষা করিবার পন্থা, বয়োবৃদ্ধির সহিত বুদ্ধির বিকাশ এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুযায়ী পরিবর্ত্তনসাধন প্রভৃতি বিষয়ে নানা তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন। অনেক বিষয়ে মানুষের আচরণের সহিত শিম্পাঞ্জীর আচরণের মূলগত কোন পার্থক্য নাই কি নাই। সুতরাং ইহাদের আচরণ পর্য্যবেক্ষণ করিলে মানুষের সম্বন্ধেও বহু তথ্য জানা যাইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। প্রজননসম্পর্কিত অনেক তথ্য এই উপায়ে সংগৃহীত হইয়াছে।

প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে ডক্টর ইয়ারকেস মনে করেন, ইঁদুর, গিনিপিগ, বানর এবং সময়ে সময়ে শিম্পাঞ্জীর উপরে পরীক্ষা করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ বহু তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন, কিন্তু এইগুলি যথেচ্ছা সংগ্রহ করা হয়, সুতরাং এই উপায়ে পরীক্ষা করিলে পরীক্ষার ফল নির্ভরযোগ্য ও সম্পূর্ণ হইতে পারে না। তিনি মনে করেন যে, এইরূপ যথেচ্ছ ভাবে সংগৃহীত জীবের উপর পরীক্ষা না করিয়া নিজ তত্ত্বাবধানে শিম্পাঞ্জী উৎপন্ন করিয়া তাহাদের সকল অবস্থা সম্যক্ পরিজ্ঞাত হইয়া তাহাদের উপর পরীক্ষা করিলে নির্ভরযোগ্য ফল লাভ করা যাইতে পারে। এই উদ্দেশ্যেই ফ্লোরিডার উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ধাতুশিল্পে নূতন পদ্ধতি

পূর্ব্বে ধাতু গলাইয়া ছাঁচে ঢালিয়া নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করা হইত। গত ২৫ বৎসর যাবৎ ধাতু না গলাইয়া গুঁড়া করিয়া উহা হইতে দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবার চেষ্টা চলিতেছিল। বর্ত্তমানে এই অভিনব পদ্ধতিতে মোটরের অংশ, বৈদ্যুতিক বাল্‌বের তার, ধাতুর চাদর, রঞ্জন রশ্মি, উৎপাদক যন্ত্রের অংশ প্রভৃতি প্রস্তুত করা হইতেছে।

কোন্ সময় হইতে যে এই নূতন পদ্ধতির উদ্ভব হইয়াছে তাহা বলা কঠিন। বৈদ্যুতিক আলোর বাল্‌বে টাংষ্টেন-এর তার ব্যবহার কিছুদিন হইতে প্রচলিত হইয়াছে। টাংষ্টেন গলাইতে প্রায় ৬১০০ ডিগ্রী ফারেনহাইট উত্তাপের প্রয়োজন, সুতরাং টাংষ্টেন গলাইবার জন্য ঐ পরিমাণ উত্তাপ সহ্য করিতে পারে, এরূপ পাত্রও প্রস্তুত করা আবশ্যক। এই সকল অসুবিধা বিবেচনা করিয়া টাংষ্টেন অক্সাইড গুঁড়া করা হয়। ইহার ভিতরে হাইড্রোজেন গ্যাস চালনা করিয়া টাংষ্টেন অক্সাইডকে টাংষ্টেন-এর গুঁড়াতে পরিণত করা হয়। এই গুঁড়া তৎপরে চাপ প্রয়োগ করিয়া ষষ্টির আকারে পরিণত করা হয় এবং উহা গরম করিয়া টানিয়া সূক্ষ্ম তার প্রস্তুত করা হয়। পদ্ধতিটি যেরূপ সহজ মনে হইতেছে কার্য্যক্ষেত্রে ঠিক ঐরূপ নহে। প্রথমতঃ অপদ্রব্য সকল পৃথক করিতে হয়, তৎপরে ধাতু-কণিকাগুলি সমান আয়তনের করা আবশ্যক। কণিকাগুলি একত্রে সংযুক্ত করিবার জন্য এরূপ পদার্থ নির্ব্বাচন করিতে হয় যে, উত্তাপ প্রয়োগে তাহা নষ্ট করা যাইতে পারে। কিরূপ চাপ প্রয়োগ করা উচিত, তাহার পরিমাণও নির্দ্ধারণ করা প্রয়োজন। টাংষ্টেন-এর সূক্ষ্ম তার প্রস্তুত করিবার প্রচেষ্টার ফলেই বৈজ্ঞানিকগণ এই অভিনব পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। টাংষ্টেন হইতে তার প্রস্তুত করিবার পর মলিবডিনাম হইতেও এই উপায়ে তার প্রস্তুত করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে সকল ধাতু এবং ধাতু-

সম্ভব হইতেই এই পদ্ধতিতে বহু প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত করা হইতেছে।

ধাতু গুঁড়া করিবার এবং বিশুষ্ক করিবার ১২টি মূল পন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ধাতু এবং উহার গুঁড়া যে উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইবে, তদনুযায়ী সর্বোৎকৃষ্ট পন্থাটী নির্ব্বাচন করিতে হয়। তরলপ্রবণ ধাতুর পক্ষে গুঁড়া করিবার যন্ত্র ব্যবহার করাই উৎকৃষ্ট, কিন্তু অপেক্ষাকৃত নরম ধাতুর পক্ষে ইহা কার্য্যকরী নহে। ধাতু গলাইয়া অতি ক্ষুদ্র ছিদ্রপথে বেগে চালনা করিয়া বাষ্প বা বায়ু প্রবাহ দ্বারা আঘাত করিলে ধাতু অতি ক্ষুদ্র গুঁড়ায় পরিণত হয় ও গুঁড়ার আয়তনও আয়ত্তাধীন রাখা যায়। ছাঁচে ঢালিয়া যে সকল দ্রব্য প্রস্তুত করিতে হয়, সেইগুলির জন্য এই পন্থা অতি উৎকৃষ্ট। যৌগিক পদার্থ হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ধাতু নিষ্কাশন করিলেও ধাতুর কণিকাগুলির আয়তন যথেচ্ছা ক্ষুদ্র বা বৃহৎ করা যায়। এই পন্থা প্রয়োগ করিতে হইলে ধাতু যে উত্তাপে গলিয়া যাইবে, তদপেক্ষা কম উত্তাপ প্রয়োগ করা উচিত। টাংষ্টেন-এর তার এই প্রকারে প্রস্তুত করা হয়।

গুঁড়া হইতে ধাতব দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবার জন্য ১ বর্গ-ইঞ্চির উপরে ১৫ হইতে ৫০ টন চাপ প্রয়োগ করা প্রয়োজন হয়। ইহাতেও নানাবিধ অসুবিধা আছে। পুরু দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে হইলে চাপ প্রয়োগেরও অসুবিধা হইয়া পড়ে, কারণ দ্রব্যের ভিতরে চাপ কম লাগিবেই। ভিন্ন ভিন্ন ধাতুর মিশ্রণ ব্যবহার করিলে অসুবিধা আরও বেশী হয়। অনেক বৈজ্ঞানিক বলিয়াছেন যে, এই সকল অসুবিধা ক্রমশঃ পরীক্ষার ফলে দূরীভূত করা যাইবে। বর্ত্তমানে যে সকল যন্ত্র প্রয়োগ করা হইতেছে, তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্রব্যাদি প্রতি মিনিটে ৪০ হইতে ১২০টি প্রস্তুত করা হইতেছে। আর অল্প সময়ে বেশী দ্রব্য প্রস্তুত করিবার জন্য যন্ত্রাদি আবিষ্কারের চেষ্টা চলিতেছে।

যে সকল ধাতুর গলনোত্তাপ অত্যন্ত বেশী বা যে ক্ষেত্রে কয়েকটি ধাতুর সংমিশ্রণ করিয়া দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে হইবে, অথচ প্রত্যেকটি ধাতুর নিজস্ব গুণের কোন তারতম্য করা উচিত নহে বা যে ক্ষেত্রে ধাতুসঙ্কর হইতে দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে হইবে, অথচ ধাতুগুলির গলনোত্তাপের পার্থক্য অত্যন্ত বেশী, সে সকল স্থলে গুঁড়া ব্যবহার করাই প্রকৃষ্ট পন্থা।

পায়রার উপর বেতার-তরঙ্গের প্রভাব

নিউ জার্সির লেকহার্ষ্ট নৌবিভাগে পায়রার উপরে বেতার-তরঙ্গের প্রভাব পরীক্ষা করা হইয়াছে। খোলা পায়রা উড়াইয়া দিলে বাড়ী ফিরিয়া আসিতে উহাদের যে সময় লাগে, ট্রান্সমিটার বা আকাশতার হইতে উহাদের উপর বেতার-তরঙ্গ লাগাইয়া উড়াইয়া দিলে ফিরিয়া আসিতে তাহা অপেক্ষা বেশী সময় লাগে।

বেতার তরঙ্গ পায়রার উপর কিরূপে ক্রিয়া করে, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য একটী ১০০ ওয়াট অসিলেটার প্রস্তুত করা হয় ও ভিন্ন ভিন্ন দৈর্ঘ্যের বেতার-তরঙ্গের ক্রিয়া

পায়রার উপর বেতার-তরঙ্গ প্রয়োগ করা হইতেছে।

পরীক্ষা করা হয়। যথেষ্ট শক্তিবিশিষ্ট ক্রিয়াক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার জন্য অসিলেটারের টাঙ্কে কয়েকগুলি বড় করা হয়। অসিলেটারটিতে ৫ হইতে ৫০ মিটার পর্য্যন্ত দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ সৃষ্টি করিবার ব্যবস্থা ছিল। ভিন্ন দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ প্রয়োগ করিয়া প্রায় ১২৪টি পায়রার উপর পরীক্ষা করা হয়। নিম্নে কয়েকটি পরীক্ষার ফল দেওয়া হইল :

(বেতার-তরঙ্গ প্রয়োগ করিয়া)

তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য মিটারে	পায়রার সংখ্যা	উড়িয়া ফিরিবার সময় মিঃ
		৩৫
		২৯
		৫৭
		৫৭
		৩১

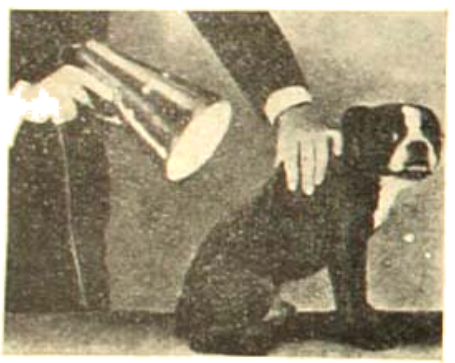

এই তালিকা হইতে দেখা যায় যে, পায়রার উপরে বেতার-তরঙ্গের প্রভাব আছে এবং ইহার প্রভাবে উড়িবার বেগ কমিয়া যায়।

এই সকল পরীক্ষার সঙ্গেই আরও কয়েকটি পরীক্ষা করা হইয়াছিল। পায়রার গলায় চুম্বক বাঁধিয়া ছাড়িয়া দিয়া দেখা গিয়াছে যে, সময়ের কোন ব্যতিক্রম হয় না, সুতরাং চুম্বকের কোন প্রভাব প্রমাণিত হয় নাই।

পায়রার কানের ভিতরে ভেসলিন দিয়া কান বন্ধ করিয়া উড়াইয়া দেখা গিয়াছে যে, স্বাভাবিক অবস্থায় গৃহে ফিরিতে যে সময় লাগে, তদপেক্ষা কম সময়ে উহারা গৃহে ফিরিয়া আসে।

ভিন্ন ভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের প্রভাবে বিশেষ পার্থক্য দৃষ্ট হয় নাই। তবে ইহা দেখা গিয়াছে যে, বেতার তরঙ্গের প্রভাবে উহারা অস্থির হইয়া উঠে এবং বিশেষ করিয়া ২০ মিটার দৈর্ঘ্যের তরঙ্গের প্রভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস ও হৃৎপিণ্ডের বেগ অন্যান্য তরঙ্গের প্রভাবে যে বেগ হয়, তাহা অপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি হয়।

দুধ হইতে মদ

ছলাণ্ডে দুধ হইতে মাখন তুলিবার পরে অবশিষ্ট অংশ নষ্ট হইত। এই অপচয় বন্ধ করিবার জন্য বহু পরীক্ষা চলিতেছিল। সম্প্রতি দুধের এই অংশ হইতে মদ প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা একটি ব্যবসায়ে পরিণত করিবার চেষ্টা হইতেছে। ছলাণ্ডের পক্ষে ইহা বিশেষ লাভজনক হইবে কারণ, দুগ্ধজাত দ্রব্যই ছলাণ্ডের প্রধান ব্যবসায় সামগ্রী।

কয়েকটি অভিনব কীটনাশক দ্রব্য

কীটনাশক রাসায়নিক দ্রব্য সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া কয়েকজন ইংরাজ বৈজ্ঞানিক বলিয়াছেন যে, অনেকগুলি রাসায়নিক দ্রব্যের এই গুণ আছে। তাঁহারা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে টেট্রামিথাইল থাইউরাম সালফাইড, মিথাইল ব্রোমাইড, ডিনোসল থাইক্যানিন এবং ডাইক্লোরো-ইথাইল ইথার নামক রাসায়নিক পদার্থগুলি কীট নাশ করে। মিথাইল ব্রোমাইড আজকাল শস্যাদি রক্ষার জন্য ব্যবহৃত হইতেছে।

কীটনাশক রশ্মি

গৃহপালিত কুকুর, বিড়াল, পক্ষী প্রভৃতির গায়ে যে সকল কীট আশ্রয় লয়, সেগুলি নাশ করিবার জন্য নানারকম সাবানের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। এখনও উহা প্রচলিত আছে; কিন্তু সাবানে সকল কীট নষ্ট হয় না, কিছু থাকিয়া যায়। বর্ত্তমানে দেখা গিয়াছে যে, ইন্‌ফ্রারেড রশ্মি কীট নাশ করে। আমেরিকায় গৃহপালিত পশুর গায়ে এই রশ্মি প্রয়োগ করিয়া কীট নাশ করা হইতেছে। বীজ, কাপড়, কাঠ প্রভৃতি যে সকল দ্রব্য কীটদষ্ট হইয়া নষ্ট হয়, সেগুলিও এই রশ্মিপ্রয়োগে নষ্ট করা যায়। ছত্রকও এই রশ্মির দ্বারা নষ্ট হয়, সুতরাং ইহাদ্বারা গাছের রোগ উৎপাদক ছত্রক নষ্ট করা যাইতে পারে ও শস্য এবং বনজ সম্পদ্ রক্ষার ব্যবস্থা হইতে পারে।

বর্ত্তমানে আমেরিকায় বনজ সম্পদ্ রক্ষার কার্য্যে এই রশ্মির ব্যাপক ব্যবহার আরম্ভ হয় নাই, কেবলমাত্র গৃহপালিত

পশুর উপরেই ইহা প্রয়োগ করা হইতেছে। একবার প্রয়োগ করিলেই যে সকল কীট নষ্ট হইবে এরূপ বলা যায় না, কারণ অনেক সময় এই কীটগুলি পর্য্যাপ্ত আহার করিয়া কিছুক্ষণের জন্য সরিয়া থাকে। এই রশ্মি প্রয়োগ করিবার সময় গায়ের লোমগুলি সরাইয়া দিতে হয়, কারণ তাহা না হইলে গায়ের চামড়ার উপরে রশ্মি পড়িবে না এবং কীটগুলি আক্রান্ত হইবে না। এই রশ্মির ক্রিয়ায় ৪।৫ সেকেণ্ডের মধ্যেই কীটগুলি ধ্বংস প্রাপ্ত হয় বলিয়া প্রকাশ।

হস্ত ও বীজাণু

জন্স হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা-বিদ্যালয়ের ডক্টর ফিলিপ প্রাইস মানুষের হাতে সাধারণতঃ কত বীজাণু বাস করে, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে, উহার সংখ্যা প্রায় ৮০ লক্ষ। ইহার সবগুলিই রোগ উৎপাদক নহে। ইহা ছাড়া অপরিষ্কার স্থানে হাত দিলে আরও বীজাণু সাময়িক ভাবে আশ্রয় গ্রহণ করে। সাময়িক ভাবে যে বীজাণুগুলি আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহাদের তাড়ান সহজ, কিন্তু যেগুলি স্থায়ী ভাবে বাস করে তাহাদের তাড়ান কঠিন।

অপরিষ্কার স্থানে হাত দিলে রোগ-উৎপাদক বীজাণুর সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ও অনবরত অপরিষ্কার দ্রব্যে হাত দিতে বাধ্য হইলে স্থায়ী ভাবে বহু রোগ-বীজাণু আশ্রয় গ্রহণ করে। সে ক্ষেত্রে হাত সম্পূর্ণ শোধন করা কঠিন। ডক্টর প্রাইস বলেন যে, অজ্ঞতাবশতঃ এই ভাবে বহু রোগ-বীজাণু ছড়ান হইয়া থাকে।

অস্ত্রচিকিৎসকগণ বহু পরিশ্রম করিয়া হাত শোধন করা সত্ত্বেও তাঁহাদের হাতে প্রায় ২ লক্ষ বীজাণু থাকিয়া যায়, সুতরাং হাত শোধন করিয়া তৎপরে রবারের দস্তানা শোধন করিয়া পরিধান করা উচিত।

স্থায়ী ভাবে যে সকল বীজাণু হাতের উপর বাস করে, তাহাদের উপর নানা প্রকার শোধক পদার্থের ক্রিয়া ডক্টর প্রাইস পরীক্ষা করিয়াছেন। কতকগুলি বেশ কার্য্যকরী, কিন্তু সেইগুলিও সমস্ত বীজাণু নাশ করিতে পারে না।

অস্ত্র-চিকিৎসায় শীতল আলোকের ব্যবহার

বর্ত্তমানে দন্ত-চিকিৎসা ও অস্ত্র-চিকিৎসার জন্য কতকগুলি নূতন যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। এইগুলির মধ্যে ঠাণ্ডা আলোক চালনার ব্যবস্থা আছে ও যেখানে আলোক প্রয়োগ করিয়া পরীক্ষা করা প্রয়োজন, সেখানে সহজেই আলোকপাত করা যায়। ঐ যন্ত্রগুলি লিউসাইট দ্বারা প্রস্তুত। লিউসাইট এক প্রকার রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ। ইহা স্বচ্ছ এবং নমনীয়। ইহা দ্বারা নল প্রস্তুত করিয়া বৈদ্যুতিক আলোর বাল্‌বের সহিত সংযোগ করিয়া দিলেই ঐ আলো ইহার ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসে। এই নলের শেষ ভাগে লিউসাইট দ্বারা প্রস্তুত যন্ত্রটি সংযুক্ত থাকে। পরীক্ষা স্থানে এই যন্ত্র প্রয়োগ করিয়া আলো আনিলেই উত্তমরূপে দেখা যায়। লিউসাইট তাপ শোষণ করিয়া লয়, সুতরাং রোগীর পক্ষে ইহাও বিশেষ সুবিধার বিষয়। অস্ত্রোপচার করিবার পর ক্ষত-স্থান ফাঁক করিয়া রাখিবার জন্য লিউসাইট নির্ম্মিত যন্ত্র

চক্ষুর ঠিক উপরের অবস্থান হইতে আলো পরীক্ষা করা হইতেছে।

বাহির হইয়াছে। ইহাতে ক্ষতস্থান পরীক্ষা করিবার সুবিধা হইয়াছে। গলার ভিতরে পরীক্ষা করিবার জন্য জিহ্বা চাপিয়া রাখিবারও একটি যন্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে।

অ্যাসিডের কারখানায় দুষ্প্রাপ্য ধাতুর ব্যবহার

টাণ্টেলাম নামক দুষ্প্রাপ্য ধাতুর অত্যধিক তাপপরিচালন ক্ষমতা দেখিয়া লবণাম্ল (হাইড্রোক্লোরিক বা মিউরিয়াটিক অ্যাসিড) প্রস্তুত করিবার কারখানায় ক্রমশঃ এই ধাতুর ব্যবহার প্রবর্ত্তিত হইতেছে। লবণাম্ল গ্যাস জলে দ্রবীভূত হইবার সময় তাপ উৎপন্ন হয়, সুতরাং যে পাত্রে জল রাখা হয়, তাহা ক্রমশঃ গরম হইয়া উঠে।

ইহাতে কিছু গ্যাস দ্রবীভূত না হইয়া গ্যাস আকারেই বাহির হইয়া যায়। জল রাখিবার পাত্রগুলি টাণ্টেলাম দ্বারা প্রস্তুত করিলে উৎপন্ন তাপ শীঘ্রই পরিচালিত হইয়া বায়ুতে চলিয়া যাইবে, সুতরাং উহা অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা থাকিবে। টাণ্টেলাম নির্ম্মিত পাত্র ব্যবহার করা প্রথমে বহু ব্যয়সাপেক্ষ বটে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত লাভজনক হয়। এই ধাতুর ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় বেলজিয়াম-এর আফ্রিকার উপনিবেশে এই ধাতু পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণে নিষ্কাশন করা হইতেছে।

বিটের পচন নিবারণ

চিনির জন্য যে বিটের চাষ করা হয়, তাহা রাখিয়া দিলে অনেক বিট পচিয়া নষ্ট হইয়া যাইত ও ইহাতে ঐ ব্যবসায়ের বহু ক্ষতি হইত। বর্ত্তমানে বৈজ্ঞানিকগণ পচন নিবারণ সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পান যে, ফসফেটযুক্ত জমিতে যে বিট জন্মায় সেগুলি কমই নষ্ট হয়। ইহা দেখিয়া তাঁহারা জমিতে ফসফেটযুক্ত সার প্রয়োগ করিয়া বিট চাষ করিতে উপদেশ দিতেছেন। এইরূপ দাবী করা হইয়াছে যে, ইহাতে ফসলের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং অপচয়ও কমিয়া গিয়াছে।

জমি পরীক্ষার সহজ প্রণালী

প্রত্যেক জমিতেই নানা প্রকারের রাসায়নিক পদার্থ থাকে। শস্য উৎপন্ন করিবার জন্য যখন বীজ বপন করা হয়, তখন এই সকল রাসায়নিক পদার্থই গাছের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয় ও গাছের বৃদ্ধির সহায়তা করে। সকল গাছই একই রাসায়নিক দ্রব্য খাদ্যরূপে ব্যবহার করে না। গাছ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য শোষিত হওয়ায় ক্রমশঃ জমি হইতে কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থ কমিয়া যায়। তখন উহা জমিতে প্রয়োগ করা প্রয়োজন। এই জন্যই সার ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কোন্ রাসায়নিক পদার্থটির পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে, তাহা জানিতে পারিলে সাধারণ সার ব্যবহার করিবার আবশ্যক হয় না, কেবল ঐ পদার্থটি প্রয়োগ করিলেই চলে। সাধারণ সারে নানাপ্রকার রাসায়নিক পদার্থ থাকে, সুতরাং যে রাসায়নিক পদার্থগুলি জমিতে যথেষ্ট পরিমাণে আছে, তাহাও সাধারণ সারের সঙ্গেই প্রয়োগ করা হয়, কিন্তু ঐগুলি অনাবশ্যক অপব্যয় ছাড়া আর কিছুই নহে। পূর্ব্বে জমিতে কোন্ কোন্ রাসায়নিক পদার্থ আছে জানিতে হইলে, পরীক্ষাগারে নানা জটিল উপায়ে পরীক্ষা করিতে হইত ও সাধারণের পক্ষে উহা করা অসম্ভব হইত। বর্ত্তমানে আমেরিকায় জমির প্রাথমিক পরীক্ষার জন্য অতি সহজ পন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা সামান্য শিক্ষিত লোকেই প্রয়োগ করিতে পারে।

সাধারণতঃ জমিতে নাইট্রোজেন, ফস্‌ফরাস এবং পটাসিয়ম-এর পরিমাণ পরীক্ষা করা আবশ্যক হয়। এইগুলি পরীক্ষা করিবার জন্য একটি থলের ভিতর কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন রাসায়নিক দ্রবণ থাকে ও কয়েকটি বর্ণ-তালিকা থাকে। সামান্য পরিমাণ জমি খনন করিয়া তুলিয়া একটি খালি পরীক্ষা-নলে রাখা হয়। তৎপরে নাইট্রোজেন, ফস্‌ফরাস অথবা পটাসিয়ম, ইহার যে পদার্থটির জন্য পরীক্ষা করিতে হইবে তাহার জন্য যে দ্রবণটি আবশ্যক, তাহা ঐ পরীক্ষা-নলে ঢালিয়া মাটির সহিত উত্তমরূপে মিশাইতে হয়। মিশ্রণটি কিছুক্ষণ রাখিয়া দিলেই মাটি পরীক্ষা-নলের নীচে পড়িয়া যায় ও তখন উপরের দ্রাবণটির বর্ণ আবশ্যকীয় বর্ণ-তালিকাটির সহিত তুলনা করিয়া দেখিলেই পরিমাণ নির্দ্দেশ করা যায় ও তৎপরে যে পদার্থ জমিতে উপযুক্ত পরিমাণে বর্ত্তমান নাই, তাহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ইহাতে ব্যয় সামান্যই হয়, কিন্তু ফসলের পরিমাণ না কি যথেষ্ট বৃদ্ধি করা যায়। বাঁধাকপি, লেটুস, ঘাস প্রভৃতি উৎপন্ন করিতে হইলে জমিতে যথেষ্ট পরিমাণে নাইট্রোজেন থাকা আবশ্যক। ফল ফুল ও খাদ্যশস্যের জন্য ফস্‌ফরাস এবং আলু প্রভৃতির বৃদ্ধির জন্য পটাসিয়ম প্রয়োজন হয় বলিয়া এই সকল বৈজ্ঞানিক প্রচার করিতেছেন।

ডাষ্টবিন্

—শ্রীসন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়

১

গলির মোড়টা ফিরিতেই ল্যাম্প-পোষ্টের কালো ছায়ার নীচে গলির যাবতীয় জঞ্জাল-আবর্জ্জনা কুক্ষিগত করে আছে ঐ ডাষ্টবিন্টা।

সেবারকার মিউনিসিপ্যাল ইলেকশনের সময় ঐ ডাষ্টবিন্টা পদ-প্রার্থীদের বিজ্ঞপ্তি প্রচারে একটী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল। সোজাসুজি গলির মধ্যভাগে একটা আস্তাবলওয়ালা-ভবনের সম্মুখে উহার স্থান প্রথমে নির্দ্দিষ্ট ছিল। ঐ বাড়ীওয়ালা মিউনিসিপ্যাল কমিশনার হওয়া অবধি যিনি তাঁহার বিরুদ্ধ-পার্টি ছিলেন, তাঁহার পুরস্কার স্বরূপ তাঁহারই ভবনের সম্মুখে ল্যাম্প-পোষ্টের বিপরীত প্রান্তে উহা অপসারিত করাইলেন। এ বিষয় লইয়া ও-অঞ্চলে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে বিশেষ আন্দোলন চলিতেছিল। পরবর্ত্তী মিউনিসিপ্যাল ইলেকশনে কমিশনারের পদপ্রার্থী হইয়া দাঁড়াইলেন আবার এই দুইজন। দুইটী আড়াআড়ি পার্টি গঠিত হইল। ভোটের দিনের নিকটবর্ত্তিতার সঙ্গে সঙ্গে সুরু হইল টাকা-পয়সার ছড়াছড়ি এবং—কবিতা করিয়া বলিতে হয়, মিষ্টিমুখের বাড়াবাড়ি ও সোডা-লেমনেডের গড়াগড়ি। শেষকালটায় আস্তাবলওয়ালা বাড়ীওয়ালার টাকার জোরে জিতিবার সুনিশ্চয়তা হইতেই কোন মধ্যবর্ত্তীর কৌশলে ডাষ্টবিন্টা এই প্রান্তে এক ভাড়াটিয়া বাড়ীর সম্মুখে ল্যাম্প-পোষ্টের নীচে ঠাঁই পাইল বটে, কিন্তু মনোমালিন্য দূর হইল না।

•

ছয় মাসের এগ্রিমেণ্ট দিয়া অমল ঐ ল্যাম্প-পোষ্টটার পাশের ভাড়াটিয়া বাসা লইয়াছে। পল্লীভবন হইতে বধূকে সহরে আনিবে, এই মিষ্ট ব্যস্ততার মধ্যে বাড়ী ভাড়া করার সময় ডাষ্টবিন্টার প্রতি তাই বড় একটা খেয়াল করে নাই। বধূ আসিল, কিন্তু নূতন ঘর-সংসার পাতিবার বিষম অন্তরায় হইল এই বিনের জঞ্জাল ও দুর্গন্ধ। ছয় মাসের এগ্রিমেণ্ট দিয়াছে। বলামাত্র উঠা দুষ্কর।

অমল মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষের নিকট সবিস্তার অভিযোগ করিল। পাড়ার অনেক লোককে তাহার পক্ষে পাইল। গলির মধ্যে আস্তাবলের সম্মুখে ঢাকা স্থানে ডাষ্টবিন্টা রাখার যুক্তি দেখাইল। কর্ত্তৃপক্ষ কোনও কথায় কর্ণপাত করিলেন না। অমলের অভিমানে আঘাত লাগিল, সে মনে মনে সঙ্কল্প করিল যেমন করিয়াই হউক, ঐ ডাষ্টবিন্টা গলির মাঝে আস্তাবলের সম্মুখে লইতে হইবে।

সম্প্রতি পাড়ায় চোরের ভারী
বড়া পাহারারও চোর ধরা পড়িতেছে না;
গলির বাসিন্দাদের কৌতী করিতে লাগিল।

অমলের স্ত্রী রমা চোরকে ভারী ভয় করিত। তাই স্বামী অমলকে বলিয়া দিয়াছে, চোরের উপদ্রব দূর না হওয়া পর্য্যন্ত যেন সে সন্ধ্যার পরপরই বাড়ী ফেরে।

একদিন অমল বাড়ী ফিরিতে দেরী করিয়া ফেলিল। বারান্দায় স্ত্রীর অপ্রসন্ন মুখখানা দেখিয়া খাইতে বসিয়া অবশেষে তাহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া রমার ভারী মুখে হাসি ফুটাইল।

আহারান্তে পান খাইতে খাইতে এ কথা সেকথা আলাপ করা তাহার অভ্যাস। পান দিতে আজ রমার কোন কারণে ভুল হইয়াছিল। সাজা-পান না পাওয়াতে অমলের মনে আবার কলহ ধূমায়মান হইয়া উঠিল। বিনা তাম্বুল-চর্ব্বণে টেবিলের সামনে ইজি-চেয়ারে বসিয়া সে সিগারেট ধরাইল।

রমা রান্নাঘরের দাওয়ায় চুকাইয়া হৃষ্টচিত্তে ঘরে প্রবেশ করিতেই অমল বলিল, "পানের দোনা কি রোজই লেগে থাকবে?"

রমা পান খাইত না। তাই মাঝে মাঝে তাহার পান সাজিতে ভুল হইত। তাম্বুল-প্রিয় অমল এটাকে মস্ত বড় দোষের ব্যাপার করিয়া তুলিত। এই লইয়া সময় সময় স্বামী-স্ত্রীতে খণ্ড-সমর বাধিত। আজও তাই হইল।

রমা হাসিয়া বলিল, "একদিন না হয় নিজে সেঁকে খেতে? তাতে আর ভাত মেলে না।"

"ভাত না গেলে সেঁকে
খেয়ে থাকবার অসুবিধা
আমি বাধছিল।

রমা অপ্রসন্ন হইয়া বলিল, "তা কে নিষেধ করেছিল? বাড়ীতে আর যাই হোক এই ঝকমারী ছিল না।" বলিতে বলিতে রমার মুখ ভারী হইল।

পরিধিবিশিষ্ট একটী কক্ষকক্ষে থাকিয়াও এই সামান্য ব্যাপারে নিমেষে উভয়ের মধ্যে উত্তর-দক্ষিণ মেরুর ব্যবধান আসিয়া পড়িল। শাস্ত্রে বহুরোগের বহু যুক্তিযুক্ত লিখিলেও সেদিন শেষটা দাঁড়াইল, একই ঘরের ভিতর দুইখানা শয্যা রচিত হইল। কোনও প্রতিবাদ না হওয়ায় রমা জানালার পাশে শয্যা লইল। না ডাকিলে কথা বলিবে না স্থির করিয়া অমল তৎক্ষণে তাহার বিছানার ওপাশ হইয়া রহিল।

নানাদূরে প্রবাসী এই দম্পতির মাঝে মাঝেই এই ভাবে মিষ্টি-সমর বাধিয়া যাইত। সে-রণে রমা প্রায়শঃই জয়ী হইত। অমল আজ কিন্তিবার বাসনা করিয়াছে। ঘড়ীর কাঁটা আগাইয়া চলিয়াছে। মাঝে মাঝে তপ্ত দীর্ঘশ্বাসের শব্দ পাওয়া যায়। রমার ঘুম হয় নাই। রমার আর এক বিপদ্ উপস্থিত হইল; তাহার মনে হইতে লাগিল, কি যেন একটা তাহার বিছানার পাশে ইতস্ততঃ চলাফেরা করিতেছে। মনে ত্রাসের সঞ্চার হইল। এমন সময়ে হঠাৎ একটা দৌড়িবার শব্দ শুনিল। শব্দটা বরাবর তাহার জানালার নীচে আসিয়া থামিল। শঙ্কিত হৃদয়ে উৎকর্ণ হইতেই "পাকড়ো" "পাকড়ো" শব্দে পাহারাওয়ালাদের ছুটিবার শব্দ পাইয়া ভীতা ও ত্রস্তা হইয়া খিড়কীর দিকে চাহিতেই রমা দেখিল, পাহারাওয়ালারা দোতালুড়ি ছুটিয়া অদৃশ্য হইতেছে। আর একটা লোক ঐ ডাষ্টবিন্‌টা হইতে আস্তে আস্তে মাথা তুলিতেছে। রমার আর বিছানায় থাকিবার সাধ রহিল না। অভিমানের উত্তাপ তখন চকিতে মিলাইল। রমা ছুটিয়া অর্দ্ধসুপ্ত অমলের পাশে আসিয়া ত্বরিত হস্তে তাহাকে নাড়িয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিল "চোর, ওগো চোর, শীঘ্র উঠ"।

ভয়-সুপ্তি-জড়িত আঁখিতে অমল বলিল, "চোর, অর্থাৎ মন-চোর?" রমা কম্পিত কণ্ঠে মৃদু মৃদু বলিল, "ঠাট্টার সময় নয়। সত্যিকারের চোর। ঐ যে—ঐ ডাষ্টবিন্‌টায়।"

অমল ঝটতি উঠিয়া বসিল। বাহিরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেই দেখিল, সত্যই একটা লোক ডাষ্টবিন্‌টা হইতে আস্তে আস্তে ছুটিয়া পালাইতেছে। উৎকণ্ঠার সহিত অমল তাহা নিরীক্ষণ করিল। হাসিয়া রমার লজ্জ চিবুকখানা ধরিয়া বলিল, "শাপে বর হল, তোমার পান সাজা থাকলে আজ এই ভাবে চোরের গুপ্তগৃহ কখনও আবিষ্কৃত হ'ত না।"

"আর তুমিও"—

সেদিনকার মত দুই দলে সন্ধি-পত্র স্বাক্ষরিত হইল।

প্রত্যূষ হইতেই অমল দিগ্বিজয়ী গোছের একটা ভাব লইয়া পুলিশের বড়-কর্ত্তার নিকট সবিস্তারে ঘটনাটা প্রকাশ করিল। তিনি ঐ অঞ্চলে চোরের উপদ্রবের বিষয় অবগত ছিলেন। চোরের গুপ্তগৃহের সন্ধান দিতেই তাঁহার আদেশে আজ ঐ ডাষ্টবিন্‌টা আস্তাবলের সম্মুখে গলির মধ্যে অপসারিত হইল।

সাম্যবাদী কে?

..."প্রত্যেক মধ্যে বিচিত্রতা ও বিভেদের মধ্যে মধ্যে", এই দুইটি কেবলমাত্র তারতম্য অনিবার্য্য নহে। চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিবার শক্তি অর্জ্জন করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, উহা জগতের প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে, প্রত্যেকটি দেশের মধ্যে অনিবার্য্য। বাহার মধ্যে বায়ু, রস এবং তেজের খেলা নাই, এমন একটিও প্রকৃতিজাত বস্তু কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যাইবে না, অথচ ঐ তিনের অদল-বদল সংযোগ (permutation and combination) সর্ব্বতোভাবে সমান রহিয়াছে, এমন দুইটি বস্তু কুত্রাপি দেখা যাইবে না। বায়ু, রস ও তেজের বিভমানতা লইয়া বস্তু, জীব ও স্থানের ঐক্য, অথবা সমানতা এবং ঐ তিনের অদল-বদল ও সংযোগের (permutation and combination) পার্থক্য লইয়া বস্তু প্রভৃতির বিচিত্রতা অথবা বৈশিষ্ট্য। এই নিয়মের ব্যতিচার কুত্রাপি নাই। মানুষকে মানুষের মত হইতে হইলে উপরোক্ত সমানতা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়া "সাম্যবাদী" হইতে হইবে।...

বেরিবেরি ও তাহার প্রাকৃতিক চিকিৎসা

—শ্রীকুলরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

১

বেরিবেরিকে গ্রীষ্মপ্রধান দেশের রোগ বলা হয়। চীন, জাপান, মালয়, ভারতবর্ষ ও পশ্চিম-অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশেই এই রোগের প্রাদুর্ভাব সর্ব্বাপেক্ষা বেশী।

পূর্ব্বে জাপান প্রভৃতি দেশে এই রোগে সহস্র সহস্র লোক প্রাণত্যাগ করিত; কিন্তু রোগের কারণ ধরা পড়িবার পর এখন মৃত্যুসংখ্যা অনেক কমিয়া গিয়াছে।

একবার জাপানের একখানা সরকারী জাহাজ বৃত্তাকারে বাহির হয়। জাহাজখানির পৃথিবী ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতে কয়েক মাস সময় লাগে। এই সময়ের মধ্যে ২৭৬ জন নাবিকের ভিতর ১৬৯ জনের বেরিবেরি হয় এবং তাহাদের মধ্যে ২৫ জন প্রাণত্যাগ করে। এই ঘটনায় জাপানের সমর-নায়কদিগের ভিতর প্রবল একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়; কারণ নাবিকগণের যদি এরূপ মৃত্যু হইতে থাকে, তবে জাপানের সামরিক শক্তিই বিপন্ন হইতে পারে। তখন ইহার প্রতিকারের জন্য বহু ডাক্তার গবেষণা-কার্য্যে নিযুক্ত হন। ইঁহাদের এক জন ডাক্তার লক্ষ্য করিলেন, জাপানী নৌ সৈন্যের সকল ব্যবস্থা ঠিক য়ুরোপের নৌ-সৈন্যদের মত; কেবল পার্থক্য এই যে, জাপানী নৌ-সৈন্যদিগকে কলে-ছাঁটা চাউল দেওয়া হয়। তখন যে-পথে পূর্ব্বের জাহাজখানি গিয়াছিল, ঠিক ঐ পথে অতগুলি লোক দিয়া আর একখানি জাহাজ পৃথিবী ঘুরিয়া আসিতে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। ঐ জাহাজখানিতে তাঁহারা কলে-ছাঁটা চাউলের পরিবর্ত্তে খোসার লাল অংশযুক্ত চাউল দিলেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে এই জাহাজ ফিরিয়া আসিলে দেখা গেল যে, মৃত্যু হওয়া তো দূরের কথা, কোন নাবিকই বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত হয় নাই।

ইহার পর জাপান গবর্ণমেণ্ট জেলগুলিতে কল-ছাঁটা চাউল প্রবর্ত্তন করিয়া দেখিলেন, যেখানে বেরিবেরিতে মৃত্যু সংখ্যা ছিল ১৩, সেখানে সামান্য মাত্র চাউলের পরিবর্ত্তনে মৃত্যুসংখ্যা শূন্যতে নামিয়া আসিয়াছে।

আমেরিকার যে সকল সৈন্যদল ফিলিপাইনে থাকিত, তাহাদের ভিতরও বেরিবেরির আক্রমণ হইত অত্যধিক। আমেরিকাও তাহাদের ভিতর কল-ছাঁটা চাউল প্রবর্ত্তন করিয়া সৈন্যদল হইতে বেরিবেরি রোগ সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত করিয়াছে।

বৈজ্ঞানিকদের মতে বেরিবেরি রোগে না কি একটা ভিটামিনের অভাবঘটিত রোগ। সময় সময় খাদ্যের আমিষ-জাতীয় পদার্থের অভাব হইতেও এই রোগ হইয়া থাকে। তাঁহারা বলেন, বি-ভিটামিনের অভাব হইতেই প্রধানতঃ এই রোগের উৎপত্তি হয়। চাউলের উপরের পর্দ্দায় ভিটামিন-বি থাকে বলে-ছাঁটা পরিষ্কার চাউলে এই ভিটামিন উড়িয়া যায়। এই জন্য কলে ছাঁটা চাউল খাইলে বেরিবেরি হয়।

ভিটামিন-বি সাধারণতঃ স্নায়ুমণ্ডলীকে সবল করে, ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে এবং পরিপাকশক্তি বৃদ্ধি করে। যদি খাদ্যের এই প্রয়োজনীয় উপাদানের দেহে অভাব ঘটে, তবে পরিপাকশক্তি হ্রাস পায় এবং হৃৎপিণ্ড ও স্নায়ুগুলি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। তাহার ফলে দেহের অপসারণ-মূলক যন্ত্রগুলির (eliminative functions) ক্ষমতা ক্ষীণ হইয়া আসে এবং দেহে বিভিন্ন জাতীয় বিষ সঞ্চিত হইতে থাকে। ঐরূপ অবস্থায় সময় সময় রোগী দুর্ব্বলতা এবং অল্প জ্বর বোধ করে, তাহার সমস্ত দেহের স্নায়ুগুলি অল্পাধিক-রূপে প্রদাহযুক্ত হয়। সঙ্গে সঙ্গে হাতে পায়ে শোথ আসে, বুক ধড়ফড় করে এবং হাতে ও পায়ে পক্ষাঘাতের মত ভাব আসে। এই অবস্থার নামই বেরিবেরি।

সাধারণতঃ কয়েক সপ্তাহের ভিতরই এই ভাবটা কাটিয়া যায় এবং রোগী ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করে। কিন্তু যদি সেরূপ অবস্থা না হয়, তাহা হইলে রোগীর হৃৎপিণ্ড

ক্রমশঃ খারাপ হইতে থাকে এবং হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

কিন্তু বহুলোকের এক সঙ্গে যে হাত-পা ফুলিয়া উঠে এবং হৃৎপিণ্ড দুর্বল হইয়া পড়ে, তাহা বেরিবেরি নয়, তাহাকে ব্যাপক শোথরোগ (epidemic dropsy) বলা চলিতে পারে। প্রধানতঃ ভেজালযুক্ত সরিষার তৈলই ইহার কারণ। ভেজাল তৈলে যে রাসায়নিক বিষ থাকে, তাহাই দেহে বিভিন্ন রোগ উৎপন্ন করে।

২

কিন্তু বেরিবেরিই হউক আর ব্যাপক শোথই হউক, দেহে কতগুলি বিষাক্ত জিনিষের সঞ্চয় ছাড়া কখনও তাহা হইতে পারে না। এই সকল রোগে রক্তের ভিতর যে বিষ স্রোত মুক্ত হয়, তাহাই দেহে বিভিন্ন রোগলক্ষণ উৎপন্ন করিয়া থাকে। সুতরাং দেহ-সঞ্চিত বিষ বাহির করিয়া দেওয়াই এই দুইটি রোগের প্রধান চিকিৎসা।

এই জন্য প্রথমেই রোগীকে একটা ভিজা চাদরের 'প্যাক' (the wet-sheet pack) দেওয়া আবশ্যক। একখানা ভিজা চাদর দ্বারা রোগীকে গলা পর্য্যন্ত আবৃত করিয়া পুনরায় তিন চারখানা লোমের কম্বল দ্বারা ঐ ভিজা চাদর ভাল করিয়া আবৃত করিলেই ভিজা চাদরের প্যাক দেওয়া হয়। এই প্যাকের ভিতর যে গুমট গরমের সঞ্চার হয়, তাহা সমস্ত লোমকূপ খুলিয়া দেয় এবং ঐ প্রসারিত লক্ষ লক্ষ দ্বারপথে বেরিবেরির যথেষ্ট বিষ দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়। সাধারণতঃ পূর্ণ একঘণ্টার জন্য এই প্যাক রাখা দরকার। প্রত্যেক সাতদিন অন্তর অথবা সপ্তাহে দুইবার এই প্যাক প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

ভিজা চাদরের প্যাক সাধারণতঃ দুর্ব্বল রোগীর পক্ষেই প্রযোজ্য। কিন্তু রোগীর অবস্থা যদি এমন হয় যে, সে যখন তখন হার্টফেল করিয়া মরিতে পারে, তবে তাহাকে ভিজা চাদরের প্যাকের পরিবর্ত্তে ভিজা কোমর পটি (the wet girdle) প্রয়োগ করা আবশ্যক। একখানা ভিজা নেকড়া নাভির চারি অঙ্গুলি উর্দ্ধ হইতে তলপেটের শেষ সীমা পর্য্যন্ত দুই তিনবার ঘুরাইয়া আনিয়া অন্য আর একখানা শুষ্ক ফ্লানেল বা আলোয়ান দ্বারা ভাল করিয়া আবৃত করিলেই ভিজা কোমর-পটি দেওয়া হয়। ইহা দুইঘণ্টা অন্তর অন্তর পরিবর্ত্তন করিয়া দিবা দিনে তিন চারবার দেওয়া আবশ্যক। রাত্রিতে আহারের পর পরিবর্ত্তন না করিয়া ইহা সমস্ত রাত্রির জন্য দেওয়া যাইতে পারে। ইহা কতকটা আংশিক ভিজা চাদরের প্যাকের মত। ইহাতেই রোগীর দেহ হইতে যথেষ্ট দূষিত পদার্থ বাহির হইয়া যায়।

কিন্তু ইহার প্রধান গুণ এই যে, তলপেট সবল ও দোষমুক্ত করিতে ইহার জুড়ি নাই। এই পটি ব্যবহারে অন্ত্র দুইটি (intestines) এরূপ সবল হয় যে, তাহারা প্রতিদিন দুই বেলা মল ঠেলিয়া বাহির করিয়া দেয় এবং উদরাময় (diarrhoea) থাকিলে তাহাও আরোগ্য করে।

দেহের যথেষ্ট বিষ দেহের নিয়ন্ত্রিকৃষ্ণিত সাধারণ নিয়মে মিশিয়া বাহির হইয়া যায়। এই জন্য কোষ্ঠ যাহাতে পরিষ্কার থাকে, তাহার নিমিত্ত প্রথমাবধি চেষ্টা করিতে হয়। রীতিমত কোষ্ঠ পরিষ্কার হইলে বেরিবেরি কখনও জোর করিতে পারে না।

বেরিবেরি রোগের প্রথম আবির্ভাবে পেটটি খারাপ হইয়া যায়। এই জন্য সবল অবস্থাতেই প্রথমাবধি এই পটি ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। রোগী যদি সবল থাকে, তবে মাঝে মাঝে তাহাকে ভিজা চাদরের প্যাক দিয়া কেবল সমস্ত রাত্রির জন্য এই পটি প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

প্রকৃতি মূত্রের সহিতও প্রচুর বিষ বাহির করিয়া দেয়। এই জন্য প্রতিদিন প্রচুর জল পান করা আবশ্যক। কিন্তু বেরিবেরি রোগীকে একসঙ্গে অনেকটা জলপান করিতে নাই। বারে বারে অল্প অল্প করিয়া তাহাকে অনেকটা জলপান করিতে দিতে হয়।

বেরিবেরি রোগে দেহের বিষ প্রধানতঃ হৃৎপিণ্ডটিকে আক্রমণ করিয়া থাকে। এই জন্য হৃৎপিণ্ডটি যাহাতে সবল থাকে, তাহার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করা আবশ্যক। রোগীকে দিনে দুইবার একঘণ্টার জন্য পায়ের প্যাক (foot pack) প্রয়োগ করিয়া ঐ সময় ১৪ মিনিট কাল হার্টের উপর পুরু করিয়া শীতল জলের পটি প্রয়োগ করিলে হার্টটি যথেষ্টরূপ সবলতা লাভ করে। হাঁটুর নীচে পর্য্যন্ত পা দুইটি একখানা ভিজা নেকড়া দ্বারা মুড়িয়া একখণ্ড ফ্লানেল দ্বারা আবৃত করিতে হয়। তাহার পর পায়ের নীচে একটা উষ্ণ জলের থলি (hot water bag) অথবা দুইটি গরম জলের বোতল

রাখিয়া গলা পর্য্যন্ত রোগীর দেহ কম্বল দিয়া ঢাকিয়া দিলেই পায়ের প্যাক দেওয়া হইয়া থাকে।

পায়ে গরম এবং হৃৎপিণ্ডের উপর ঠাণ্ডা পাইয়া বদ্ধ রক্ত নীচে নামিয়া আসে এবং নূতন টাটকা রক্ত হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশীগুলির ভিতর যায়। বার বার এইরূপ করিলে হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশীগুলির ভিতরে একটা লাফের কাজ হয় এবং হৃৎপিণ্ড যথেষ্টরূপ সবল হইয়া উঠে। প্যাক সরাইয়া লইবার পর পা দুইটি সিক্ত তোয়ালে দ্বারা মুছিয়া একটু মর্দ্দন করিয়া আবার ঢাকিয়া রাখিতে হয় এবং হাটের উপর হইতে জলপটি সরাইয়া লইয়াও ঐ স্থানটি মৃদুভাবে ঘর্ষণ করিয়া লাল ও গরম করিয়া তবে ছাড়িয়া দিতে হয়।

হার্টটি সবল করিবার সঙ্গে সঙ্গে দেহের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা (vital resistance) বৃদ্ধি করাও আবশ্যক। এই জন্য রোগীকে দিনে দুইবার স্নান করান প্রয়োজন। কিন্তু রোগী খুব দুর্ব্বল হইলে কখনও তাহাকে শীতল জলে পূর্ণস্নান প্রয়োগ করিতে নাই। তাহার মাথাটি শীতল জলে ধুইয়া লইয়া ঈষদুষ্ণ জলে তাহার সমস্ত দেহ মুছাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু স্পঞ্জবাথ যেমন রোগীর সহ্য হইয়া আসে, তেমনই স্নানের জল ক্রমশঃ শীতল করিয়া আনিতে হয় এবং ক্রমশঃ অপেক্ষাকৃত বেশী জল দিয়া স্নান করাইতে হয়। জ্বর থাকিলেও রোগীকে স্পঞ্জবাথ দিতে কখনও অন্যথা করিতে নাই।

এই রোগে স্নায়ুগুলি যে প্রদাহযুক্ত হইয়া উঠে, তাহাও এই চিকিৎসাতেই আরোগ্য লাভ করে। কারণ দেহ-সঞ্চিত যে বিষ অন্যান্য রোগ-লক্ষণ উৎপন্ন করে, তাহাই স্নায়ুগুলিকে প্রদাহ-যুক্ত করিয়া তোলে। যখন জল-চিকিৎসার এই সমস্ত বিভিন্ন পদ্ধতিদ্বারা দেহকে দোষ-মুক্ত করা হয়, তখন স্নায়ুর প্রদাহও আপনিই অন্তর্হিত হইয়া থাকে। তবে কোন সময়-বিশেষে স্নায়ুতে বেদনা যদি অত্যন্ত প্রবল হয়, তবে ঐ স্থানে একখানা পুরু ফ্লানেল দিয়া বাঁধিয়া দিলে প্রায় সর্ব্বদাই বেদনা কমিয়া যায়।

এই রোগে কিছু দিনের জন্য স্থানত্যাগে অত্যন্ত ফল হয়। নূতন স্থানের নূতন হাওয়া ও খাদ্য দেহকে দোষমুক্ত ও পুষ্ট করিতে বিশেষভাবে সাহায্য করে। অনেক সময় বেরিবেরি কেবল স্থানত্যাগেই আরোগ্য লাভ করে।

এই রোগে পথ্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ভিটামিন-বি বেরিবেরির প্রতিষেধক এবং বেরিবেরি রোগে ইহা প্রায় অব্যর্থ ফলপ্রদ। এই জন্য যে সমস্ত জিনিষে ভিটামিন-বি আছে, তাহাই বিশেষ ভাবে রোগীকে খাইতে দেওয়া উচিত।

রোগীর প্রধান পথ্যই হইবে ঢেঁকি-ছাঁটা চাউলের ভাত। ভাতের ফেন ফেলিয়া দেওয়া উচিত নয়। যাঁহারা সমর্থ, তাঁহারা ভাত রাঁধিবার জন্য একটা কুকার কিনিয়া লইতে পারেন। তাহাতে ফেন বাহির করিয়া দিবার প্রয়োজন হয় না এবং আপনি ফেন মরিয়া যায়। রোগী একবেলা ভাত খাইয়া রাত্রিতে লাল আটার রুটি ব্যবহার করিতে পারেন। তাহাতেও প্রচুর ভিটামিন-বি আছে। যুক্তির রুটি খাইতে পারিলে আরও ভাল হয়।

রোগীর প্রতিদিন প্রচুর শাক-সবজি খাওয়া আবশ্যক। পুঁই ও পালং শাকই তাঁহার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। মাঝে মাঝে কলমী, পলতা ও লেটুস শাকও খাওয়া যাইতে পারে। সবজির ভিতর ঝুলকপি, গাজর, কলাইশুঁটি, আলু, ঢ্যাঁড়স, শালগম, শিম, বিলাতী বেগুন প্রভৃতি বেরিবেরি রোগীর পক্ষে খুব ভাল।

ফলের ভিতর আনারস, পেঁপে, বাতাবি লেবু, পাকা কলা প্রভৃতি গ্রহণ করা যাইতে পারে।

অনেক সময় আমিষ-জাতীয় খাদ্যের অভাবের জন্যই বেরিবেরি হয়। এই জন্য ডিম, ছোট মাগুর বা টেংরা মাছ, রোগীর যকৃৎ, মগজ, হৃৎপিণ্ড ও মূত্রযন্ত্র, ছানা, কলাইশুঁটি এবং অড়হর, মুগ ও মটর প্রভৃতি ডাল প্রতিদিন কিছু খাওয়া কর্ত্তব্য।

কাঁচা টমেটো, লেটুস, অঙ্কুরিত ছোলা অথবা মুগ প্রভৃতিও প্রতিদিন কিছু কিছু খাওয়া আবশ্যক।

কিন্তু সরিষার তেল ও বলে ছাঁটা চাউল রোগীর বিষবৎ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। ব্যাপক শোথরোগে মরিবার তেল সম্পূর্ণ ভাবে বর্জ্জন করাই ঐ রোগ হইতে মুক্ত হইবার প্রধান উপায়। যতদিন শোথ থাকে, ততদিন লবণও কম অথবা না খাওয়া উচিত।

যখন এইভাবে অবাঞ্ছনীয় খাদ্য বর্জ্জন করিয়া খাদ্যের দ্বারা দেহের অচার পূরণ করা হয় এবং জলচিকিৎসার দ্বারা দেহকে দোষমুক্ত ও সঞ্জীবিত করা হয়, তখন রোগ আপনি আরোগ্য লাভ করে।

বাঙ্গালা সাহিত্যে অ-বাঙ্গালা শব্দ

—শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়

প্রায় তিন বৎসরের উপর হইল, আমি যেন শুনিয়াছিলাম, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কিংবা অন্য কোথাও হইতে একটা ফিন উঠিয়াছে যে, আরবী, ফার্সী ও উর্দু ভাষার কতকগুলি শব্দ বাঙ্গালা ভাষার মধ্যে প্রবেশ করাইতে হইবে। কথাটা সত্য কি মিথ্যা জানিবার বিশেষ আগ্রহ না থাকিলেও জানিলাম, কোনও ভাষার মধ্যে অন্য ভাষার শব্দ কি কারণে কি ভাবে প্রবেশ লাভ করিতে পারে। কোনও জীবিত ভাষার ভিতর অপর ভাষার শব্দ প্রবেশ করাইতে হয় না, ইচ্ছা বা আদেশ করিয়া প্রবেশ করানও যায় না। যদি কোনও ভাষায় নূতন শব্দ আবশ্যক হয়, যদি একটি কথায় ঠিক ভাবপ্রকাশের মত যথাযথ কথা আপনার না থাকে, তবে তাহারও মতামত বা আদেশ-উপদেশের কথা না রাখিয়া যে কোনও সহজলভ্য ভাষা হইতে উপযোগী প্রাঞ্জল শব্দ পাইলেই তাহা গ্রহণ করিয়া এবং যথা সম্ভব নিজ ছাঁচে ঢালিয়া, ভাষা আপনার সম্পদ্ ও সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করে। এই ভাবে সকল দেশে সকল ভাষাই সকল সময় পুষ্ট হইয়াছে এবং হইতেছে।

বাঙ্গলা ভাষা অতর্কিত ভাবে নানা ভাষা হইতে নানা শব্দ আহরণ করিয়া শব্দ-সম্ভারে সম্পদ-শালিনী হইয়াছে। বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণ নানা বিষয়ের জন্য পরিভাষা সৃষ্টি করিয়া বঙ্গভাষার যথেষ্ট উন্নতিসাধন ও অভাব মোচন করিয়াছেন ও করিতেছেন।

সে যাহা হউক, কৌতূহল হইল, যখন কথাটা কানে পৌঁছিয়াছে, অনুসন্ধান করিয়া দেখা যাউক, বঙ্গভাষা কতগুলি শব্দ কেবল আরবী, ফার্সী, উর্দু ও তুর্কী-ভাষা হইতে লইয়া গঠন করিয়াছে এবং স্বকীয় সন্ধি-সমাস-বিভক্তি-প্রত্যয়াদির সাহায্যে কতগুলি নূতন কথা গঠন করিয়াছে।

আমি সাহিত্যিক বা ভাষাবিদ্ না হইলেও মাতৃভাষাকে ভালবাসি। জীবন যুদ্ধে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া সাতাত্তর বৎসরের অবসন্ন দেহখানিকে কাজে লাগাইতে তাই বোধ হয় মন চাহিল, আমি শব্দ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম।

অনুসন্ধানের ফলে প্রায় তিনহাজার কথার সন্ধান পাইয়াছি। বাঙ্গালা ভাষার সঙ্গে এ সকল কথা ওতপ্রোত ভাবে মিশিয়া গিয়াছে। অনুসন্ধান-কার্যে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাসের "বাঙ্গালা ভাষার অভিধান", তথা স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু মহাশয়ের "চলন্তিকা" আমার বিশেষ সাহায্য করিয়াছে। বলা বাহুল্য, এই প্রায় তিন হাজার কথা আমার প্রথম অনুসন্ধানের ফলে প্রাপ্ত।

সংগৃহীত কথার মধ্যে অনেকগুলিতে উত্তমর্ণ ভাষার মূর্তি সামান্য পরিবর্তিত হইয়া ঠাট বজায় আছে। অধিকাংশ কথা চিনিতে পারিলেও বিভক্তি-প্রত্যয়াদির সংযোগে বাঙ্গলা রূপ ধারণ করিয়াছে; কতকগুলিকে চেনা যায়, বিশ্লেষণ না করিলে মূল ধরা পড়ে না। ভাষাগঠনের ইহা সনাতন নিয়ম। এই ভাবে ভারতীয় ভাষায় কতিপয় শব্দ ও ইউরোপীয় ভাষার সহিত আদান-প্রদান হইয়া গিয়াছে। "হোরা" শব্দ গ্রীক হইতে সংস্কৃতে গৃহীত; তাহাতে জ্যোতিষ কথা মিশিয়া হোরা-চক্র, হোরা-কোশ, হোরা-বিজ্ঞান কথার উদ্ভব হইয়াছে। এইরূপ আরও অনেক আছে।

অনাবশ্যক বলিয়া সংগৃহীত শব্দগুলির ব্যুৎপত্তি, প্রতিবচনের বাহুল্য অথবা প্রয়োগের উদাহরণ দিতে চেষ্টা করি নাই, কেবল কোন্ ভাষা হইতে তাহাদের উৎপত্তি, তাহারই উল্লেখ করিয়া দুই একটি প্রতিবচন দিয়া কার্য শেষ করিয়াছি।

কোনও ভাষার অভাব-পূরণের জন্য অন্য ভাষার দ্বারস্থ হইয়া তাহা হইতে গৃহীত শব্দ বা শব্দগুলির রূপ কি ভাবে দিলে শব্দ-বিন্যাসের সুবিধা হইবে, গৃহীত শব্দে আপনার ভাবটি ঠিক প্রকাশ পাইবে, তাহা উভয় ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যতীত আর কাহারও দ্বারা সম্ভবে না। আবার অনেক শব্দ রূপান্তর না করিয়াও লওয়া চলে। তাহাতেও দুইটি ভাষায় বিশেষ জ্ঞান থাকা চাই।

বহুদর্শী কৃষক যেমন ক্ষেত্রোপযোগী বিবিধ প্রকার সার প্রস্তুত করিয়া পরিমাণ মত আপন আপন ক্ষেত্রে ছিটাইয়া

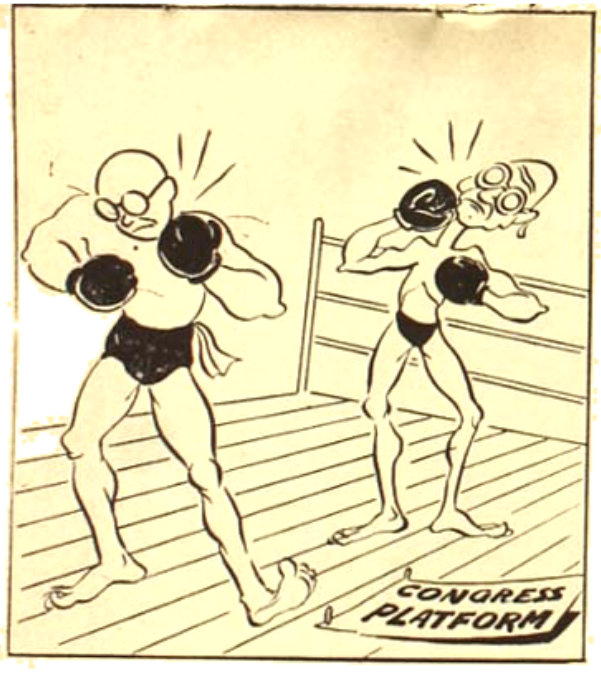

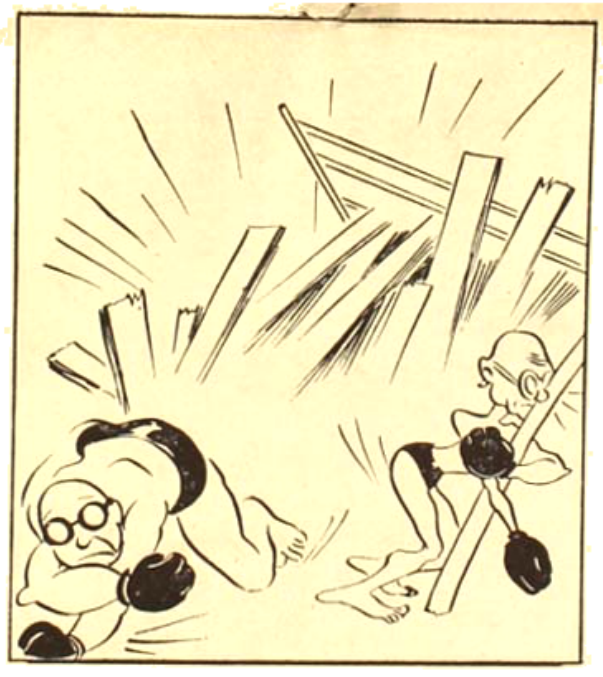

উপরে—অহিংসার বিক্রম

নিম্নে—কংগ্রেসের নাগরদোলা

দেয়, মৃত্তিকা সে সব আপনার অঙ্গীভূত করিয়া লয়, তখন যে কোনও ব্যক্তি গাছের বিষয়ে অনভিজ্ঞ হইলেও অনায়াসে তাহাতে অভিলষিত ফলন ফলাইতে পারে, সেইরূপ বহু-ভাষাবিদ্ পণ্ডিতগণ অভাবমোচনের জন্য নানা ভাষা হইতে শব্দ সংগ্রহ করিয়া তাহা কখনও লিখনোপযোগী করিয়া আপনার মাতৃভাষায় মিশাইয়া দেন, তখন সকলেই ঐ সকল নূতন কথার অর্থাপত্তি করিয়া সহজে ব্যবহার করিতে পারেন। এই ভাবেই আরবী, ফার্সী শব্দ বাঙ্গালায় মিশিয়াছে। আরও কথা আছে—দুই তিনটী জীবিত ভাষা পাশাপাশি লিখিত বা পঠিত হইতে থাকিলে, উভয়ের শব্দাবলী উভয়ের ভিতরে প্রবেশ করিবেই করিবে। বাঙ্গালা ফার্সী ভাষাতে ইহাও হইয়াছে।

অনেক আরবী ফার্সী কথা অনেকে জানে না বলিয়া বাঙ্গালা রচনায় বা চলিত কথায় তাহা অপ্রচলিত হইতেছে। সে হিসাবে অনেক বাঙ্গালা কথা বাঙ্গালা ভাষার অভিধানে থাকিলেও ক্রমে সে সকলের ব্যবহার বিরল হইতেছে। এইরূপে বাক্যের প্রচলন-অপ্রচলন সকল দেশের সকল ভাষাতেই ঘটিয়াছে এবং ঘটিতেছে। বাঙ্গালা ভাষার অবস্থা নিম্নে প্রদত্ত তালিকা হইতে দৃষ্ট হইবে, জিদ করিয়া আরবী ফার্সী শব্দ ঢুকাইবার অপেক্ষা আমাদের মাতৃভাষা রাখে ন'ই। আমার মনে হয়, হিন্দু মুসলমান উভয়েই ভাষার দিক দিয়া মাতৃভাষার উন্নতি সাধনে অগ্রসর হইলে ফল শুভই হইবে। নিম্নলিখিত কয়েকটি দৃষ্টান্ত তাহার প্রমাণ।

"সেলাম" ও "নমস্কার", এবং 'সালাম আলাইকুম" ও "শান্তিরস্তু" একার্থবাচক হইলেও স্থলবিশেষে বাঙ্গালায় প্রয়োগে প্রত্যেকের সার্থকতা আছে।

"জুলুম" ও "অত্যাচার" উভয়েই সমান অর্থ প্রকাশক বটে, কিন্তু স্থানবিশেষে "জুলুম" কথায় যেমন জোর পড়ে সেখানে "অত্যাচার" লিখিলে যেন হাল্কা ঠেকে; আবার অত্যাচারের বদলে কোথাও কোথাও "জুলুম" চলে না।

"বেকার" ও "নিষ্কর্ম্মা" দুজনেই সমান; কিন্তু "বেকারের" অন্নবস্ত্রের অভাব, পরিবারবর্গ প্রায় উপবাসী, "নিষ্কর্ম্মা"র হয় ত অন্ন সামান্য আছে, তত 'অন্ন-চিন্তা চমৎকারা' নয়। "বেকারে"র আসনে "নিষ্কর্ম্মা"কে বসান যায় না।

"তক্তা" কথার পরিবর্ত্তে "পাতলা কাষ্ঠফলক" লেখা কষ্টকর, তাহাতে ঠিক ভাব ব্যক্ত হয় না। আবার "তক্তার" সঙ্গে আবশ্যকমত বাঙ্গালা বিশেষণ সংযোগ করিলে অনেক যৌগিক শব্দের উদ্ভব হয়। কিন্তু "পাতলা কাষ্ঠ-ফলকে" বিশেষণ যোগ করা বিশেষ গোলযোগের কথা।

"তহবিল" (তবিল) ও "জমা" প্রায় এক হইলেও, চলিত কথায় "জমা" নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। আরবী-তহবিল + ফার্সী-দার + (বাঙ্গালা-বৃত্তি অর্থে-ই প্রত্যয়) = তহবিল-দারী; "কোষাধ্যক্ষের কর্ম্ম" এই-ই বটে, কিন্তু তাহাতে—

"নাও না আমার 'তহিলদারী',
শঙ্করী বলা যায় না।

পাকাচুলে অনেকে "কলপ" দেয়, "খেজাব" দেওয়া বলাও চলে। কিন্তু সংস্কৃত-রন্জ্-ধাতুর "রঙ্" কিম্বা "রঙ্গ" দেওয়া বলিলে অর্থটা পরিষ্কার হয় না, একটু টানিয়া আনিতে হয়, কটা কিম্বা কাল "রঙ্গ" বুঝাইবার জন্য একটি বিশেষণ উহ্য থাকে। "কলপ" একাই এ কাজ করিয়া দেয়।

(আরবী—আদম, ইংরাজী adam + (ফার্সী—সুমার) + (বাঙ্গালা—ই) = আদমসুমারী—ইংরাজী census, ইহার বদলে "মনুষ্য-সংখ্যা" বা "মানুষ-গণনা" কিম্বা "লোক-গণ্‌তি" বলিলে বোধহয় ভাব প্রকাশের একটু অভাব হয়, অন্ততঃ এক কথায় করা যায় না।

আরবী "কাগজের" সঙ্গে ইংরাজী paper বদল করিতে বোধ হয় কেহই রাজী হইবেন না। কাগজ বাঙ্গালার অঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। আর paper নিজেও বাঙ্গালা-সমাজে নূতন সাজে আসিতে গররাজী হইবে। পরন্তু দ্বিতীয় শব্দ নাই যে, "কাগজকে" উৎখাত করিতে পারে। "সাদা কাগজ" ভাল, সাদা পেপার কতকটা 'গুরুচণ্ডালী'র মত।

সঙ্কলিত তালিকায় আরবী, ফার্সী ও উর্দু শব্দের বিশুদ্ধ উচ্চারণ, বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিয়া বর্ণনা করিবার বিফল চেষ্টা করি নাই, উচ্চারণের লালিত্য নষ্ট হইবার ভয়ে।

আমাদের বিখ্যাত কতিপয় সাহিত্যিকের লেখায় অপূর্ব্ব ভাষার বাহুল্য দেখাইয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব।

বঙ্কিমবাবুর গ্রন্থাবলীতে (বসুমতী সংস্করণ) 'রাধারাণী' উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদে ১৭৮টি ছত্র আছে, তাহাতে তিনি আরবী-ফার্সী, উর্দু-হিন্দী ও ইংরাজী ভাষার শব্দজাত অনেক কথা ব্যবহার করিয়াছেন :—আরবী-ফার্সী-উর্দুজাত তেইশটি কথা—মোকদ্দমা, আর্জি, মোকদ্দমাটি, খরচ, ওয়াশিলাত, নগদ, দস্তুরে, তহিল না, সোরগোল, বাজারের, বাজার, দোকান, দোকানে, খোদ, কুলফার, মুনাফা, মায় এবং কাগজ ইত্যাদি—হিন্দী হইতে সাতাশটি কথা—পয়সা, ফিরিল, উঠিতেছিল, আছাড়, ফেলে, ডাকিয়া, চেনা, বেচিতে, খুঁজিতেছিলাম, বেচ, দাম, ঠেকাচে, কাটিতে, ঠুকিয়া, চেন, চেন না, চিনি, এবং ফিরিয়া ইত্যাদি।

ইংরাজী হইতে এগারটি কথা—হাইকোর্ট, প্রিবি-কাউন্সেল, আপিল, ডবল, নোট, এবং নোটখানি ইত্যাদি।

ইংরাজী ও বাঙ্গালামিশ্রিত—একটি, ডিক্রীদার, (ডিক্রী+দার)।

বিখ্যাত সাহিত্যিক ব্যারিষ্টার শ্রীযুত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের "আহুতি" হইতে পাঁচটি পৃষ্ঠার অষ্টাশীটি ছত্রের মধ্যে আরবী-ফার্সী হইতে চৌদ্দটি কথা আছে—রাস্তা, বরাবর, হাজির, আস্বাব, চেহারা, চাপকান, সর্দার, সর্দারটি, হুজুর, দেরি, সর্দারজী, হুজুরের, বেশীক্ষণ, মুরু এবং খাকা।

হিন্দী হইতে চারিটি কথা জঙ্গল, চড়বার, চড়েই এবং রুসবৎ।

ইংরাজী হইতে দশটি কথা :—ইউরোপীয়, রেলের, ট্রেন, ষ্টেসন, চাসপাতালের ডাক্তার, ক্যাসবাক্স, পোলিটি-কেল, ইকনমি, Conscience, এবং মিনিটে মিনিটে।

তন্মধ্যে রাস্তা কথাটি অভিধানে দেখিলাম, গথিক ও প্রাচীন জার্মাণ ভাষায় 'Rosta' শব্দটি আছে। সম্ভবতঃ ইহা ফার্সী 'রাস্তার' মূল।

'Rosta'—a stone erected on the public road at a certain distance in the manner of the modern mile stone. (Webster).

শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্তে' প্রথম অধ্যায়ে ৬২টি ছত্রের মধ্যে সাতটি আরবী-ফার্সী কথা আছে নস্ত, বেয়াড়া, লোক-লস্কর, খাপছাড়া, মুস্কিল, নজরে এবং বেশায়। চারিটি ইংরাজী—একজামিন, পাস, ফুটবল, ম্যাচ ইত্যাদি।

আর বৃথা প্রবন্ধ বাড়াইবার প্রয়োজন নাই। বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণের রচনা পড়িয়া ধারণা হইয়াছে যে, তাঁহারা দেশ, কাল, পাত্র, ও বিষয় বিবেচনা করিয়া, তাঁহাদের বর্ণনার বিষয়গুলি ভাববাহী করিবার জন্য বাঙ্গালা কথা থাকিতেও তাহাদের পরিবর্ত্তে সময় সময় ইচ্ছা করিয়া আরবী, ফার্সী প্রভৃতি অন্যভাষাজাত শব্দ ব্যবহার করেন।

তালিকায় ব্যবহৃত সাংকেতিক চিহ্নের অর্থ এই :—

সং	সংস্কৃতভাষা	তুল	তুলনীয়
বাং	বাঙ্গালাভাষা	বং-ভা-অ	জ্ঞানেন্দ্রমোহন
আ	আরবী		বাঙ্গের 'বাঙ্গালা
ফা	ফার্সী		ভাষার অভিধান'।
উ	উর্দু		দ্রষ্টব্য
তু	তুর্কী		
হি	হিন্দী		
ইং	ইংরাজী		

বাঙ্গালা ভাষায়—উর্দ্দু, ফারসী, আরবী ও তুর্কী শব্দের সমাবেশ

আ=আরবী। ফা=ফারসী বা পারসীক। উ=উর্দ্দু। তু=তুর্কী। সং=সংস্কৃত। বাং=বাঙ্গালা। হি=হিন্দী। ইং=ইংরেজী। প্রা=প্রাকৃত।

অ

অকর্মণ্য—(সং+আ) অলসতা, অনিচ্ছা।

অকসার—(আ) অকস্মাৎ, আকচার=প্রায়ই নজর।

অকু—(আ)=ঘটনা, কুয়াসা, অপরাধযুক্ত ঘটনা।

অকুআত—(আ+বা) অকুআৎ=অপরাধসমূহ।

অকুস্থল—(আ+সং)=অকুঘটনার স্থানে।

অকুফ
অকুব
} —(আ)=জ্ঞান, বুদ্ধি, আক্কেল।

অক্তা—(আ) আকা=মালিক, ইষ্য। তু—আক্তা=পিতা, তাহা হইতে অক্তা-পাওয়া অর্থাৎ ঈশ্বরপ্রাপ্তি, স্বর্গলাভ, প্রাণত্যাগ করা।

সংস্কৃত হইতে যে অক্তা শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে তাহার অর্থ জননী, মাতা। অক—(দুঃখ)+ক+অ স্ত্রীং আপ, যিনি সন্তানের প্রসব কাল হইতেই দুঃখ বা কষ্টদেহে শব্দ করেন।

অক্তাপ্রাপ্তি—(ফা+সং)=অক্তাপাওয়া, স্বর্গলাভ করা, মরে যাওয়া।

অক্তি—(আ. তুরস্ক ভাষায় বড় ভাই।) অভিভাবক তত্ত্বাবধায়ক।

অলি অক্তি দ্রঃ।

অক্তিয়ৎনামা—(আ+ফা) ইচ্ছাপত্র, will,

অছিলা—(সং·) ছল, ছুতা।

অজু—(আ)—প্রক্ষালনবিশেষ, তাহা হইতে ওজু, উজু, নমাজ পড়িবার পূর্বে হস্তপদ-মুখ প্রক্ষালন।

অজুহাত—(আ) ওজরআপত্তি, প্রতিবাদ।

অজুরা-আজুরা—(সং), বেতন, মজুরী।

অজুরেজা—(আ (=যোকদ্দমার জন্য লিখিত কাগজ-পত্র।

অজুহাত—(আ)—ছলনা, ওজর, ফেরু।

অজ্ঞাম—(আ)—আন্‌জাম্—আয়োজন, সরঞ্জাম-উদ্যোগ।

অজীজ—(আ) আয়্‌জীজ, বড় দুষ্কর।

অজুদান—(আ) আজুদান দ্রঃ।

অতঃবিট—(বাং+আ)-বৃদ্ধি অর্থে উপায়ধারের অভাব, প্রতিকার-চেষ্টার অভাবে, অসহায়ক।

অতল—(আ) সাবুক ; আতল। সংস্কৃত হইতে উদ্ভব অতল পদ অর্থে পাতালপুরী এবং অগাধ অর্থেও আছে। (বাং ভা. অ. দ্রঃ)

অতল-বদল—(আ+বা) বদল, পরিবর্তন, পাল্টাপাল্টি ; এক জিনিস দিয়া অন্য জিনিস লওয়া। exchange.

অতলতুমি—(অ+আ)—যে রাজা অথবা সম্রাট আদেশের প্রত্যাহার করেন। "তবে কি আমি অতলতুমি হইব।"

অনাবাদ—(বাং+আ)—অসাধ্যি, বাকী ; উশুল না হওয়া। (আবাদ শব্দ সংস্কৃত, আং পূর্বক বা ধাতু হইতেও নিষ্পন্ন হইয়াছে। আবাদ দ্রঃ)

অনাদায়ী—(বাং+ অ'+ (বাং

যাহা আদায় করা হয় নাই বা করিতে পারা যায় নাই। যাহা বাকী পড়িয়া আছে। যাহা পাওয়া যায় নাই।

অন্দর—(সং) ভিতর—অন্তঃপুর সং হইতে নিষ্পন্ন-অন্তঃপুর, প্রা—অন্তেউর অন্দেউর-ন্ত=ন্দ, (হলা পটলকে)।

সং অন্তর শব্দ বাংলাতে অন্দরূপে পৃহীত হইয়া আবার ঐরূপে বাঙ্গালা ভাষায় আসিয়াছে।

অন্দরমহল—(সং+ফা) ভিতর বাটী, অন্দরমহাল।

অন্দেশা
আন্দেশা
—(ফা) চিন্তা, ভাবনা।

অম্বরী—(আ) অম্বর জলমধ্যস্থ প্রস্তরবৎ, (amber) অম্বরযুক্ত সুগন্ধযুক্ত তামাক।

সংস্কৃত হইতে যে অম্বর শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে তাহার ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বাং, ভা. অ. দ্রঃ।

অলদে—(আ) পুত্র।

অলদান—(আ—ওয়লদ) অমুক ব্যক্তির পুত্র। Son of—

অলবলা, অলবেলা, আলবোলা (ফা) আলবোলা দ্রঃ।

অলি—(আ) অভিভাবক, রক্ষক, নাবালকের অভিভাবক।

সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন অলি শব্দের অর্থ ভ্রমর ইত্যাদি, বাং, ভা, অ. দ্রঃ।

অলিআছি—(আ) অভিভাবক, বালিকা মাতা+অভি আ ত্বণী। Guardian and administrator. তুর্কী অভি বড়রাণী, তাঁহাতে নাবালকের অভিভাবক।

অস্তর—(ফা) জামা ইত্যাদির ভিতরে যে কাপড় লাগান হয়।

(সং অন্তরুপের অপভ্রংশে অস্তর—হাতিয়ার)

অহ্‌তাল—(আ) গর্ভস্থ সন্তানের ভার বা বোঝা, ভ্রূণাধির বোঝা বহনকে যাহা ভাল (আবাদের ভাষা) ভ্রূণসম্ভার, ভিনিষপত্র।

আ

আইন—(আ) রাজবিধি।

আইনজারি—(আ+ই:) আইন প্রবর্তন করিয়া প্রচলিত করা।

আইনকানুন—(আ+আ) রাজবিধি-ব্যবস্থা।

আইন মতে—(আ+বাং) রাজবিধি-সঙ্গত।

আইনা—(ফা) দর্পণ, কাচ।

আইন মোতাবেক (আ+আ) আইন অনুসারে, রাজবিধির প্রথামত।

আইন্দা (ফা) ভবিষ্যৎ, আগামী।

আইয়াম—আয়াম দ্রঃ।

আউওল
আউয়াল
—(আ) প্রথম, উৎকৃষ্ট।

আউওল জমী—(আ+ফা) যে জমীতে সকল রকম ফসল ভাল আবাদ জন্মায়।

আউয়ব—(আ) আওয়ব দ্রঃ।

আউল
আউলো
—(আ) Wali বহুবচন—আউলিয়া।

ইসলাম-ধর্ম্মের, ধর্ম্মোপদেশক সম্প্রদায় বিশেষ, (আউলে বহুবার্থে বাতিক, পাগল)।

আউলিয়া (আ) আউলদত্বপ্রাপ্তেক।

আউল চৌ—(আ+বাং) কর্ত্তাভজা নামক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা।

আউল বাউল—(আ+বাং বাউল প্রাদেশিক সহজ পথ)। এলোমেলো—"যেই যান সেই চাউল, গিন্নী বিনে আউল-বাউল।"

আকেল্লা
আক্কেল্লা
আক্কা
(ফা) আশা, আশ্বাস করা। তা হইতে আইবা বা আসিবে, আগামী অর্থে।

আএব
আয়েব
—(আ) দোষ-ত্রুটি।

আওলা—(আ) পুরস্কার স্বরূপ মাসহারা নিষ্কর ভূমি।

আওলাদার (আ+ফা) আওলা জমীর অধিকারী বা উপস্বত্ব-ভোগী।

আওলাদারী
আয়লাদারী
—(ফা+ফা+বাং ই) আওলা জমীর ভোগস্বত্ব।

আওয়াজ—(ফা) সুরের শব্দ, ধ্বনি, শব্দ।

আওয়াজি—(ফা) ছোট তানপুরা।

আওয়ারা—(ফা) যার কোন ঠিকানা নাই, না—Vagari to wander, নির্দিষ্ট পুরঃ-সূত্র।

আওয়ারা আওয়ারা (ফা) প্রা বাং বাক্যার্থে দ্বিত্ব) গৃহহীন অবস্থায় বাড়ী বাড়ী "ভুলিয়া নিজের নিজা, ধায় ঘর চিন্তা চিন্তা
সাধে ফিরে আওয়ারা আওয়ারা।" কবিক.

আওয়ারী (আওয়ারা—প্রাদেশিক) (উ) হাবেলী বাড়ী, পথাশ্রিতিকা, হাউয়েলা।

আওরৎ
আউরৎ } —(আ) নারী, স্ত্রীলোক, পত্নী।

আওয়াউ—(আ) পুত্র, বংশ, বৃক্ষাদি স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি, ফলকর বৃক্ষ।

আওসৎ—(আ) মধ্যবর্তী, অবস্তন, বড় জমীদারীর অধীন থাকিয়া কয়া কুলস্পত্তি।

আওসৎ তালুকদারী—(আ + আ) চিরস্থায়ী জমীদারীর অধীনে জমীদারী।

আওহাল (আ) হাল (অবস্থা) শব্দের স্থলে অবস্থা।

আঁউল (আ) অগ্রগামী, সর্বপ্রথম।

আকচায়
আকরায় } —(আ—আকরহ) সচারচর, প্রায়শঃ, সর্বদা।

আকজ
আখজ
আখেজ } (আ) আক্রমণ, বিদ্বেষ, বৈরভাব (তুল-সং-আক্রোশ)।

আকজ-আকজি
আকড়া-আকড়ি } (আ + বাং ভাবে দ্বিত্ব) পরস্পর বৈরভাব, রেষারেষি।

আকর্তা
আখতা } —(ফা) বুদ্ধিহীন, পাজি।

আকাখোড়া—(ফা + বাং) যে ঘোড়ার অণ্ড কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে—Gelding.

আকলি—(ফা) মাংসযুক্ত অস্থ্যাদি পাক করিবার জন্য মসলার জল।

আকবরী—(আ) আখবর, দিল্লীর সম্রাট্। (বাং সম্বন্ধার্থে ই) সম্রাট আখবরের আমলের।

আকবরী মোহর—(আ + ফা) আখবর বাদসাহের নামাঙ্কিত স্বর্ণমুদ্রা।

আকর—(ফা) দ্রব্য-সামগ্রী।

আকরী—(ফা + বাং) আকর শব্দের বিশেষণ, দ্রব্যাদি সম্ভ্রান্ত।

সংস্কৃত হইতে যে আকর শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার ভিন্ন ভিন্ন অর্থ যথা. খা. আ. দ্রষ্টব্য।

আকর আওলাদ—(ফা + ফা) দ্রব্যাদি ও বৃক্ষাদি।

আকর্ষ ফিরত (ফা + বাং) লোকসান হইলে নিলিদপত্র ফিরত।

আকরকরা—(ফা) এক প্রকার কর, আকরকরা—সংস্কৃত হইতে—আকর্ষক। আকারকর (বৈদ্যকে)।

আকসর [আ] অনেক সময়, যখন তখন।

আকেল [আ বিচারশক্তি ও যৌক্তিক সমঝ, বিবেচনা।

আকেল খানা [আ + বাং] বিবেকহীন (বিদ্রূপাত্মক অর্থে ব্যবহার)।

আকেল গুড়ুম- [আ + বাং] বুদ্ধি লোপ হইয়া যাওয়া, স্তম্ভিত আকেল।

আকেলসেলামি
আকেলসেলামি } [আ + আ] বুদ্ধির দোষে বা কৃত অপরাধের জন্য যে দণ্ড দেওয়া যায়।

আকেল দাঁত—[আ + বাং] অতিরিক্ত দন্ত, এই দাঁত উঠিবার সময় অতিশয় যন্ত্রণা হয়।

আকেল মন্দ—[আ + বাং] বুদ্ধিমান্।

আখনি (ফা) আকনি দ্রঃ।

আখবার [আ] সংবাদ পত্র।

আখেরাট—[পর্তুগীজ] সং ছাদা-অক্রোট।

আখির
আখের } —(আ) পরবর্তী, পরিণাম, ভবিষ্যৎ।

আখিরী
আখেরী } —[আ + বাং ই] শেষ। যাদের শেষ হয়।

আখুন্দি—(ফা) শিক্ষাদাতা, প্রা—আকোন—শিক্ষক। মহম্মদীয় শিক্ষাগুরু

আখুন্দী—[আ] বিবাহ।

আগা [তু] আফগানিস্থানের অধিবাসী, কাবুলী; সংস্কৃত শব্দজ আগা শব্দের অন্য অর্থ আছে।

আচুর
আজুর } —[ফা] ছাগলতা ও ফল।

আচকান—[ফা] অঙ্গাবরণ বিশেষ, চাপকানের মত বুকে বোতাম।

আজার—(ফা) নঞর্থে যোগে আরবি আহল্, বাচ্য। সং হইতে যে আজায় শব্দ উৎপন্ন তাহার অনেক অর্থ আছে। যথা. জা. অ. দ্রঃ।

আজালতন—[আ] আসল হওয়া। যাহা যাচ্ঞা নহে। যথা যাচ্ঞাকে "আজালতন" জবাব দিতে হবে। উকীলের দ্বারা চলিবে না স্বয়ং হাজির হওয়া চাই। বর্তমানে বাঙ্গালা ভাষায় অর্থে ব্যবহৃত, যথা—আজালতন সমন্ত আজালতন চাকুরী।

আজখোদ—সং—অজ, প্রা—অজ, বাং আজ + ফা খুদ (আপন, নিজ)—আপন হতে; স্বয় আজখোদ হাজির—অর্থাৎ বিনা পরওয়ানায় উপস্থিত।

আজগবী
আজগুবী } [আ + আ] অদ্ভুত, অদৃষ্টপূর্ব, ইহা হইতে বাঙ্গালায় (আ কিন্তু নূতন বা অদ্ভুত) সম্পূর্ণ নূতন ও বিস্ময়কর।

আজতাক—[বা + আ] আজ হতে অল্প পক্ষে।

আজনদ—[আ] বহুবচন অজনাস্; নিলিদপত্র, আদায়পত্র।

আজব [আ] অদ্ভুত, আশ্চর্য্য।

আউবক [বু] উদ্ভেদ, তাহার বংশের এক শাখা (ইহাদের প্রকৃতি হয়ে) উদ্ভেদক, বিস্ফোরক, আঘাতক।

আওয়াজ - [ফা] (ধ্বনিদের তাদার মূল) আওয়াজ, ধ্বনি।

আওয়ারী—[ফা + বাং ঈ] দুষ্টি, স্বাধীনতা।

আওয়াজ - [আ] নমাজ পড়িবার জন্য সকলকে জানান দিবার আহ্বান।

আউয়া - (আ) মজুরী, পারিশ্রমিক, ভাড়া।

আওয়ান —(ক.) ধ্বনান, বসন করা, গাত্র-লেপন।

আওয়া—(ই) এক সন্তান প্রসবের পর পুনরায় অন্তঃসত্ত্বা হইবার মধ্যে যে নির্দিষ্ট ব্যবধানকাল।

সকল স্ত্রীলোকের সমান আওয়া হয় না। কাহার এক বৎসর, কাহারও পাঁচ অথবা ছয় বেশী বৎসরের আওয়া হয়। প্রায়—আঁতুর-ঘরান।

আওয়াম —(ফা) সম্পূর্ণ, নির্ভাট, অক্ষোভ্য।

আঞ্জীর—(ফা) বৃক্ষবিশেষ ডুমুরজাতীয় ফল। Ficus Carica.

আঞ্জুমান—(আ) সভা, মুসলমানে সম্ভ্রান্তদের সভাসমিতি।

আটর্নী—(ই) + নবীস (ফা)।

আটর্নীনবীস—(ই + ফা) হিসাবরক্ষক মুহুরী।

আড়তদার, আড়ৎদার—(হি + ফা) যাহারা দস্তুরী (Commission) লইয়া কাহারও মাল বিক্রয় করিয়া দেয়।

আড়তদারী - (হি + ফা + বাং ঈ) আড়তদারের দস্তুরী Commisosin.

আত—(ফা) বহুবচন বোধক প্রত্যয়, অন্য শব্দের সহিত ব্যবহৃত হইয়া অনেক ধাতুজ কথা নিষ্পন্ন করে, যথা—কায়দাত বদীলাত।

সংস্কৃত আর্ত্ত শব্দ হইতে যে আত নিষ্পন্ন হইয়াছে, তাহার অর্থ—তাপিত।

আতর—(আ) সুবাসি পুষ্পের নির্যাস।

সংস্কৃত হইতে দুইটি আতর শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। একটি অর্থ নদী পার হইবার সময় নৌকা ভাড়া, পারানি, মাশুল, অপরটির অর্থ অন্য।

আতরদান—(আ + ফা) আতর রাখিবার পাত্র।

আতলস—(আ) শাদা রেশমী কাপড়।

আতলসবিদের শ্রীবৃদ্ধির সময়ে শাদা রেশমী কাপড়ে পৃথিবীর মানচিত্র আঁকা থাকিত, তাহা হইতে Atlas পৃথিবীর মানচিত্র।

আতস—(ফা) অগ্নি, উত্তাপ।

আতসবাজি—(ফা) বারুদ দিয়া অগ্নি সংক্রান্ত খেলা।

আমোদের জন্য সোরা, গন্ধক, কয়লা মিশ্রিত নানা রকম খেলা। Firesootes.

আতশী—(ফা) আগ্নেয়, বহ্নিমান।

আতশী কাচ—(ফা + বাং) যে কাচ সূর্য্যরশ্মি কেন্দ্রীভূত করিয়া বস্তু দগ্ধ করে।

আর্তাই—(ফা) বিনা বেতনে খাটিয়া দাসত্বকর, সপ্তম পারিশ্রমিক দিবে।

আয়ার—(আ) আতর দ্রঃ।

আয়েনিক—(তু) রীতিনিষ্ঠার শুদ্ধ।

আয়াস (ফা) অতল দ্রঃ।

আয়িবিধি, আয়িবিধি—

আয়েকরকে—(ফা + বাং) সত্বর, অতি ব্যস্ততার সহিত, তাড়াতাড়ি।

আয়ার—(ফা) গন্ধ দ্রব্য আতর ইত্যাদি সুগন্ধি পদার্থ প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতা।

আয়ত্ত —(আ) অধীন, স্বভাব।

সংস্কৃত 'আয়িত' হইতে যে আয়ত্ত শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে তাহার অর্থ প্রকৃত, আয়ত্ত। বিস্তৃত আপনা হাতে আয়ত্ত, অ. দ্রঃ।

আয়েত—(আ) যাহা আদেশ করা হইয়াছে, দুষ্টান্ত।

আয়েত শব্দ সংস্কৃত হইতেও উদ্ভব।

আয়র—(আ) গণনা, সংখ্যা, ধরা।

আয়েষ—(আ) নিষ্ঠাচার, উত্তম রীতিনীতি।

আয়েষ কায়দা—(আ + আ) সভ্যসমাজের রীতি, পদ্ধতি, ভদ্রতা।

আয়েষকায়দাদুরস্ত—(আ + আ + ফা) শিষ্টাচারসম্মত।

আয়ম—(আ) (ইং) Adam খৃষ্টান ও মুসলমানদের ধর্মমতে প্রথম সৃষ্ট মানব।

আয়মখুমারী—(আ - ফা) মনুষ্যগণনা, লোক-গণতি।

আয়মি-বী—(আ) মানুষ, ব্যক্তি।

আয়মায়ার—(বাং + ফা) পূর্ব্বে লবণ প্রস্তুত হইয়া এক একটি স্তূপ হইলে তার উপর যাহারা ছাপ মারিয়া দিত।

আয়াওত—(আ) শত্রুতা, বৈরভাব।

আয়ার—(আ) প্রাপ্তি, সংগ্রহ, উদ্গম।

সংস্কৃত হইতেও আয়ার কথা নিষ্পন্ন হইয়াছে—গ্রহণ করা, গ্রহণ, আহরণ করা।

আয়লত—(আ) কিয়ালয়।

আয়োজতয়—(আ + বাং) যোগদানার্থ লিপ্ত হওয়া।

আয়োয়াজ—(আ) বাংলার শব্দ অর্থে ব্যবহার।

আয়োয়াজি—(আ + বাং ইকার) শত্রুতা।

আয়াস—স (ফা) অভিযোগ, নালিশ, নিঃস্বরস, মনের দুঃখ।

আয়ান—(ফা) বহুবচন বোধক প্রত্যয়—সমূহ, প্রভৃতি,সকীকান, বাবাসকান।

সংস্কৃত অন্ত এবং আনন্দ-অর্থদ্যোতক যে 'আন' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে তাহার ভিন্ন ভিন্ন অর্থ আছে। বাং. ভা: অ. দ্রঃ।

আয়েরাম—(বাং + ফা) সুস্থিরতার অভাব, অস্থির, চঞ্চল। "আয়েরাম করে প্রাণ"।

আয়া—(ফা) অনুকরণ, আচরণ, যথা—বাবুআয়া, বুলিআয়া।

সংস্কৃত হইতে যে আয়া শব্দ উদ্ভব হইয়াছে তাহার ভিন্ন ভিন্ন অর্থ আছে। বাং. ভা, অ, দ্রঃ।

আয়ার—[ফা] এক জাতীয় বাড়িত শস্য।

আশায়—(কা) অনুমান, অনুভব, লক্ষকারী, ক্ষেপণকারী। বাঙ্গালার তদ্ভিত প্রত্যয় সকল সংস্কৃতরূপেই চলিতেছে বলিয়াই, ভীরুতার প্রভৃতি।

আশায়ী—[কা + বাং ই] আনুমানিক, ঠিক না জেনে।

আশকেওয়াস্তে—[হি + ফা] আপনারই জন্য। এই শব্দটি হিন্দী, আরবী ও বাঙ্গালা মিশ্রিত হইয়া বাঙ্গালা ভাষায় বিভক্ত্যর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা—সং আপনার জন্য, আশকেওয়াস্তের দল, চাটুকার।

আশপাশি—[কা] আশপাশ, পার্শ্বদেশ।

আশপাশ মারা—[কা, ক্রিয়া] অনুতাপ করা।

আশপোষ, সোস—[আ] দুঃখ, সন্তাপ।

আশা, আশা করা—[আ + বাং] অনুমান, কিংবদন্তী।

আশুপুরী, খোপী—[সং + আ + বাং ই] সংস্কৃত শব্দে ব্যবহার হয়—স্বার্থপর, আত্মম্ভরি।

আশুবোধী—[সং স্বার্থবোধী।

আশেপাশে—[ফা] চারিদিকে উত্তরপশ্চিম প্রান্তে-দেশবাসী।

আশেপাশে স্থান—[কা] দেশবিশেষ।

আশ্ফালন—[আ] গর্জন বা প্রকাশ করা।

আস্ফালন—[কা] জল ছিটান বা আস্ফালন, তা হইতে জল ছড়া দিবার মতন করে, হাত পা আস্ফালন, তা হইতে বাঙ্গলাতে ক্রুদ্ধ-ক্রোধে হাত ঘুরাইয়া প্রকাশ করা। তা হইতে প্রতিকারে অসমর্থ হইয়া ক্রোধে হাত আস্ফালন।

বিশেষণে আস্ফালনি—[ফা—বাং] উপরোক্ত ভাব প্রকাশে ব্যবহৃত হয়।

বাং, তা. অ. দ্রঃ

আক্ষেপে—[কা] দুঃখ, মনস্তাপ, পরিতাপ।

আসি, আসিব, আসিয়—[আ] পোস্তা ডেঁড়ি হইতে নিষ্কাশিত নির্যাস।

সং—অহিফেন, বাং—আফিং, ই—আফিম, আ আফিয়ুন, ইং—ওপিয়ম, গ্রীক—ওপিয়ন্।

আফিমখোর—[আ + তুর্কী] যে আফিং ব্যবহার করে। [তুর্কী চী দ্রঃ]

আফিং খোর—[আ—কা] যে আফিং খায়।

আব—[কা] জল। যথা—গুল—আব—গোলাপ জল।

আবহাওয়া—(কা + কা) জলবায়ু

আবখোরা—(কা + কা) জল পান করিবার পাত্র বিশেষ, জলপাত্র। জল এই অর্থে জলের ন্যায় স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল, তাহা হইতে উজ্জ্বলা, মুক্তাদীপ্তিকান্তি প্রভৃতির উজ্জ্বলা প্রকাশক যথা।

পুরী, খোরা। সংস্কৃতের ক্ষীকৃতা, খার। সংস্কৃত হইতে যে সকল আব যথা নিষ্পন্ন হইয়াছে তাহারা নানা অর্থপ্রকাশক।

বাং, তা. অ. দ্রঃ।

আবওয়াব—(কা) রাজস্ব ব্যতীত প্রজার নিকট রাজকর্তৃক গৃহীত নানাবিধ কর। [Illegal Cess.

আবওয়াব—(কা) বহুবিস্তৃতা, বাহুল্যের প্রস্তুত-কারক।

আবকারী (কা + বাং ই) মাদক দ্রব্যের ব্যবসায়। মাদক দ্রব্যের কর বা শাসন।

আবকারী বিভাগ (কা + বাং + বাং) }
আবকারী মহাল (কা বাং + কা) } মাদক দ্রব্য প্রস্তুত করা ব্যবসায় ও

মাদকাদি নিয়ামক রাজকীয় কর্ম-বিভাগ।

আবদার—(হিন্দি হইতে) তীব্র ইচ্ছা, বায়না, এই পদ (হিন্দি + উ) বাঙ্গালার অনেক স্থলে ব্যবহৃত হয়।

আবদার—(কা + কা) উজ্জ্বল, চমকদার।

আবদারী—(কা + কা । বাং, ই) উজ্জ্বলতা, চমক।

আবরু—(কা) মস্তক উপরিভাগ, পোষাকের বহির্দেশ।

আবরু শব্দ হিন্দি হইতে নিষ্পন্ন হইলে তাহার অর্থ ধৈর্য, কিন্তুদিনে দৃষ্টি। চোখমিষে জলপড়া রোগ।

আবরু—(কা) মান-সম্ভ্রম, ইজ্জৎ, লজ্জা, পর্দা, সতীত্ব।

আবরোয়া—(কা) চাকার উৎকৃষ্ট সূক্ষ্ম মসলীন, ইহা এত সূক্ষ্ম সূতায় প্রস্তুত হইত যে, জলে ভিজিলে বস্ত্র জলে অদৃশ্য হইত।

আবসার-আওলাদ—(আ) স্বামীর অস্থাবর সম্পত্তি।

আবহাল—(আ) অবস্থা।

আবা—[আ] পলা হইতে জানুর উপর পর্যন্ত লম্বা ঢিলা এবং খোলা জামা।

আবা—[বা] অস্বীকার, অসম্মতি।

আবা দেওয়া—[আ + বাং] অস্বীকার করা। শিশুদের খেলিবার সময় যাহাকে কিছু খেলা বন্ধ রাখিবার 'আবা' শব্দে সঙ্কেত।

আবা-আবা—[সং] আহ্বান হইতে। আর্ষ আবা শব্দে আহ্বান; শিশুদের খেলিবার সময় একপ্রকার আহ্বানধ্বনি।

"আনন্দে উল্লসে করে আবা আবা ধ্বনি"।

আবাদ—[ফা] কর্ষিত জমী, চাষ, প্রজাবসান, যথা—মুরসিদাবাদ, ফাহাবাদ।

আবাবদ্দ—[কা + ফা] কর্ষণাধীন।

আবাদী—[কা + বাং ই] চাষযোগ্য; গ্রামের উপকণ্ঠ।

আবীর—[আ] সুগন্ধ চূর্ণবিশেষ।

উর্দু আবহক হইতে হিন্দী আবীর শব্দীকৃতিঘটিত রক্তবর্ণ চূর্ণ। ফাগ, ফাগ শব্দ সংস্কৃতজাত।

আব্বা—[আ] বাবা, পিতা, তাহা হইতে সম্মানের উর্দু আব্বাজান বাং বাবাজীবন।

আম—[আ] সাধারণ সর্বজনসাধারণের। যথা—আম দরবার।

সংস্কৃত হইতে দুই তিনটি আম শব্দের উদ্ভব হইয়াছে, তাহার ভিন্ন অর্থ আছে। বাং, তা. অ. দ্রঃ।

আমদরপ্ত—[কা] আমদানী-রপ্তানী।

আমদানী—[কা] যাহা বাহির হইতে আসে। ভিন্ন স্থান হইতে পণ্য আমদানী।

আমেয়াবী হুকুম—[ফা + ফা] আম-দরবার।

আম মোক্তার—[আ] বিষয় কর্মের এবং আদালতে মোকদ্দমাদির ভার-প্রাপ্ত প্রতিনিধি।

আমযোক্তার নামা—[ফা: + ফা:] ঐরূপ কার্যের ভার যে দলীলের দ্বারা কেহ এইরূপ অধিকারপ্রাপ্ত।

আমেজা—[ফা] প্রচুর, অপরিমিত, বিনা আয়াসে প্রাপ্ত।

আমদ—[আ] আগমনকাল, সময়, আসিবার কাল। ভবিষ্যৎকাল।

আমদনবীশ—[আ + ফা + ফা: প্র] আসনবহি, আসিবার তালিকা, রাজস্ব কর্মচারীর পদ।

আমদ দেওয়া—[আ + ফা:] সময় দেওয়া, অধিকার দান করা।

আমদ না দেওয়া—[আ + ফা:] নিকটে আসিতে সুযোগ না দেওয়া, গ্রহণ না করা। + কাহারও প্রার্থনায় কর্ণপাত না করা ইত্যাদি।

আমদেআনা—[আ + ফা:] কার্যের পরিণত করা। কাজ হাতে লওয়া।

আমল দস্তুক—[আ + ফা] সম্পত্তি ও অধিকারের অবস্থা জ্ঞাপক রাজকারী দলিল কিম্বা সরোয়ানা।

আমলদার—[আ + ফা] খাজনা-আদায়কারী কর্মচারী।

আমলনামা—[আ + ফা] কর্মচারীর নিয়োগপত্র। জমী কিম্বা অন্য সম্পত্তির অধিকার নির্দেশক আজ্ঞাপত্র।

আমলা—[আ] নিয়পদস্থ রাজকর্মচারী; কেরাণী। রাজস্ব-আদায়কারী কর্মচারী। বণ্ডর।

আমলা আওলাদ—[আ + আ] ইমারত ও তৎসংলগ্ন দ্রব্যাদি।

আমলাতন্ত্র—(আ + ফা:) প্রভাবশালী অধস্তন রাজকর্মচারিগণ।

আমলা-ফয়লা—(আ + আ) ছোট বড় কর্মচারিগণ। সংস্কৃত-উদ্ভব আমলা শব্দের অর্থ আমলকী ফল।

আমলে নওয়াগা—[আ + হি] অক্ষম বাদসাহী নৌবিভাগ।

আমানৎ—[আ] কোন ব্যক্তির নিকট জমারূপে সঞ্চিত দ্রব্য। সঞ্চিত ধন।

আমানা—(ফা) মুসলমান আমলে ব্যবহৃত পাল্কীবিশেষ।

আমানী—[আ] ধারহীন হওয়া, গোলকটের ঘর ও মাচানে বাঁধিবার দড়ী।

আমিন, আমেন—[আ] ঈশ্বর এইরূপই যেন করেন। অস্তি-বচন।

রামেশ্বরী সত্যনারায়ণের পুঁথির শেষে আমিন আমিন শব্দ আছে—

আমীন—[আ] যার কাছে কোন দ্রব্য জমা রাখা হয়। জরীপকারী স্থানীয় আদালত অনুসন্ধানের ভার প্রাপ্ত কর্মচারী।

আমীর—[আ] বড় লোক। সম্ভ্রান্ত বংশীয় ধনী।

আমীর ওমরা [আ + আ] আমীর ও তাঁহার সহ নিয়পদস্থ ব্যক্তি, আমীর তুল্য ব্যক্তি।

আমিরী [আ + ফা: ই] আমীরের চালচলন। বড়মানুষী করা।

আমুন আমুন [আ + আ] সকলে একত্র পরস্পর পূর্ণ হইতে চলিত।

আমেজ—(ফা) ঈষৎ প্রকাশ, অল্প মিশ্রণ।

আয়না [ফা] দর্পণ।

আয়ন্দা [ফা] আগামী, ভবিষ্যৎ।

আয়না) [ফা] দরজা বা জানালার পরদা, মুসলমানদের বিবাহ জন্মী।
আয়েনা)

আয়মাল—(আ) গ্রাম ও পরগণা।

আয়াম—(আ) ঋতু, কাল, দিন, উপযুক্ত সময়, বৈধী, ওজর।

আয়েন্দা—(ফা) আগামী, ভবিষ্যৎ।

আয়েব—(আ) দোষ, ত্রুটি।

আয়েস (আ) সুখ, আরাম, আলস্য।

আয়েসী—(আ) যাং ই আরামে প্রিয়।

আয়েস (ব) অ' + বাং বিশ্রামাগার।

সংস্কৃতে ঈস্ ধাতু হইতে যে আয়াস কথা নিষ্পন্ন হইয়াছে, তাহার অর্থ আয়েস শব্দের বিপরীত। যথা—ক্লেশ, দুঃখ, শ্রান্তি, অতিশয় শ্রম, প্রচেষ্টা ইত্যাদি।

আয়ক—(আ) বিধান, ফল।

আরবী ভাষায় উচ্চারণ 'আয়্ক্'-কিন্তু ইহা সংস্কৃত অর্থ ধাতু (প্রাপ্ত হওয়া) হইতে নিষ্পন্ন হইয়া আরবী ভাষায় 'আয়্ক্' রূপে গৃহীত হইয়াছে। (সত্যেন্দ্রনাথ।)

আয়জ—(আ) ফরিয়াদ, আবেদন, প্রার্থনা।

"তাহারে জিজ্ঞাস আমি যে করে আয়জ"

আরজী—(আ) অনুরোধ, বাদীর প্রার্থনাপত্র।

আয়জবেগী—(আ + ফা) বিচারপতির সম্মুখে যে আবেদন পত্র দাখিল করে। যে দরখাস্ত দাখিল করে।

আয়ব—(আ) আয়ব জাতি এবং বেশ।

আয়বী—(আ + বাং ই) আয়বদেশীয়।

আয়েশ—(স আ) রাজাসন, সিংহাসন।

আয়াকষ—(ফা) কারীগর, যে কারিগর কাজ করে, যে কারিগর দিয়া কাজ করে। "আয়া" শব্দটি সংস্কৃত জাত, ফারসীতে ঘুরিয়া বাঙ্গালায় আসিয়াছে—

যাং. জা. অ-ফা:।

আয়াশ—(ফা) চুপকাসের উপর অধিক ঘষিয়া মাজিয়া সৌন্দর্য বিধান করাকে আয়াশ বলে

আয়িশা—(আ) রাজকর-বাহক।

আরশ—(আ) সিংহাসন, খোদার আসন, কবি বয়রুল ইসলাম কর্তৃক ব্যবহৃত।

আর্জী—(আ) আয়জী-দ্রঃ।

আর্জীপ—(আ) লিখা, আবেদন, নালিশ, প্রার্থনা।

আলওয়ান-আলোয়ান—(আ) বর্ণাঢ্যপ্রবিষ্ট পতঙ্গলোম-জাত গাত্রবস্ত্র।

আলকাতরা—(আ)

আলখাল্লা—(আ) লম্বা ঢিলাঢালা বিশেষ।

আলটপ্‌কা—(আ) আলগা, হঠাৎ, বিনা চেষ্টায়।

আলেঠাঙাক—(আ) দিন্দুক, আলমারী ইত্যাদির কপাট বন্ধ করিয়া তালা লাগাইবার জন্য লোহা, পিতলের পাত কলা কবজা।

আলপিন—(ই), (ইং Pin) (পর্তু. Alfinete).

আলবৎ—(আ) নিশ্চয়, অবশ্য।

আলমারী—(ফা) ঘুমপাড়ানোর গীত বিশেষ, কবিতা।

আলা—(আ) সংস্কৃতোদ্ভব, সমুদ্ভূত। আলা শব্দ সং, হি, বাং, প্রা প্রভৃতি ভূরিভূরি ভাষা হইতে নিষ্পন্ন হইয়া নানা প্রকার অর্থ প্রকাশ করে।

আলাদা, আলাহিদা—(আ) ভিন্ন, পৃথক্।

আলায় কালায়—(আ) প্রাদেশিক কথায় ব্যবহৃত—ইতরের কথা, পাষণ্ডকথা।

আলামত—(আ) চিহ্ন, লক্ষণ-চিহ্ন, চিহ্ন।

আলি, আলী—(আ) উচ্চ, শ্রেষ্ঠ, উদার, অগাধ।

আলি মেহেরবান—আ + আ ঈশ্বরস্তুতি।

* সংস্কৃত তামিল, হিন্দি প্রভৃতি নানা ভাষা হইতে আলি শব্দ বাঙ্গালায় আসিয়াছে। তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ হয়।

বাং. ভা. অ. দ্রঃ।

আলুনা—(আ) অনাস্বাদ-লক্ষ, প্রাদেশিক কথায়—আলগা, বিনা চেষ্টায় যা বিনা যত্নে প্রাপ্ত।

আলুবোখরা—(ফা) এক প্রকার টক ফল বিশেষ।

আলেক্কুম, কুম—(আ) আপনাকে।

আলেকম সেলাম, সুম—(আ + আ) আপনাকে সমস্কার।

আলোয়ান—(আ) গলবিলম্বিত চাদর।

আল্লা—(আ) একেশ্বর, একমাত্র পূজ্য, কোরাণের প্রতিপাদ্য ঈশ্বর, খোদা।

আশক—(আ) প্রেম, ভালবাসা।

আশিক—প্রেমিক। মুসলমানী বাঙ্গালায় বহুল ব্যবহার, কিন্তু বহু "শ" যুক্ত আরও শব্দ সংস্কৃতজাত আসক্তি হইতে উৎপন্ন, সঙ্গ ধাতু—সঙ্গ, আ—সর্ব্বথা।

আশকারা, আস—(ফা) অনুসন্ধান বা তদারক করিয়া লয়া প্রকাশ, প্রশ্রয়, অ যথার, ছেলেকে বাইনা করতে দেওয়া।

আশকারা করা—(ফা + বাং) লয়া তথা বাহির করা।

আশনা—(ফা) বন্ধু, প্রণয়ী।

আশনাই—(ফা—বাং) প্রণয়, তাহা হইতে আবৈধ অনাধোক্তিক প্রণয়।

আশমান—(ফা) আকাশ।

এই আশমান শব্দ সংস্কৃত অশ্মন্ শব্দ হইতে উদ্ভূত হইয়া ফার্সিতে আশমান অর্থাৎ আকাশ অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে। বাং. ভা. অ. দ্রঃ।

আশমানী (ফা + বাং ই) নীলাভ বর্ণ। এই শব্দ বাংলায় নানা অর্থে প্রয়োগ হইতেছে। বাং. ভা. অ. দ্রঃ।

আশরফী—। ফা—বাং ই) আশরফ বাদশাহ কর্তৃক প্রথম প্রচলিত স্বর্ণ-মুদ্রা, মোহর।

আশা—(আ) লাঠী, সন্ন্যাসী ও ফকিরদের ব্যবহার্য দণ্ড। বাঙ্গলত।

আশাবরদার—(আ + ফা) রাজদণ্ড বাহক।

আশাবরদারী—(আ + ফা) বাং ই আশাবরদারী অর্থাৎ রাজদণ্ড বাহকের কর্ম।

আশাসোঁটা—[আ + হি] রাজদণ্ড। রাজদণ্ড-জ্ঞাপক লাঠি [সংস্কৃত শব্দময়]

সংস্কৃত হইতে যে আশা শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, তাহার নানা অর্থে প্রয়োগ হয়। যথা আকাশ, দিক, ভরসা ইত্যাদি।

আশান—
আসান—
} (ফা) অবসান, লাঘব, শান্তি, রেহাই। যজ্ঞিদের ভাষায় উচ্ছলের শেষ।

আশবাদ—[ফা] পুলিসের তদারক।

আশবাব—[আ] জিনিস সমূহ, পুরোপস্কার দ্রব্য।

আশবাবপত্র—[আ + বাং] পুরস্কারাদির দ্রব্যাদি।

আসর—[ফা] সভা, মজলিস।

আসর গরম করা—[ফা + বাং]—কথাবার্তার দ্বারা সভার সকলকে উৎসাহিত করা। সভা জমিয়ে তোলা।

আসরে নামা—[ফা + বাং] আসরে আবির্ভাব হওয়া, আসরে প্রবেশ করা।

আসল—(ফা) বিশুদ্ধ, খাঁটি, সত্য, তথ্য, প্রকৃত। ভ্রমরগুলিতে আসল শব্দ আসিল।

আসলে—[ফা + বাং বিভক্তি] প্রকৃত পক্ষে।

আসা—[আ] আশা দ্রঃ।

আসাসোঁটা—[আ + বাং] আশাসোঁটা।

আসোয়ার—[আ] অশ্বারোহী, হস্তি-অশ্বাদি বাহনারূঢ় ব্যক্তি।

আস্তানা—[ফা] আশ্রয়স্থান দ্রঃ।

আস্তান—না (ফা) আস্তা, আশ্রয়। সংস্কৃত স্থা-ধাতু হইতেও এই শব্দ উদ্ভূত।

আস্তীন (ফা) হাতা, সরপেঁচ, অনুচ্ছবাহু।

আহমাল [আ] মালপত্রের বোঝাসমূহ।

আহাম্মুক [আ] নির্বোধ।

আহাল [আ] আওয়াল, দ্রঃ।

আহেল
আহেলী
} [আ] অশের লোক, খাস যেসী লোক, সুজন।

আহেলে মামলা [আ + আ] মোকদ্দমায় বাদী-প্রতিবাদী।

আহেলকার [আ + ফা] বন্দরের কর্ম্মচারী, মুহুরি, জেলার শাসন-কর্ত্তা।

আহোয়াল [আ] বর্ত্তমান অবস্থা, দশা।

মায়ের ডাক

—অসূর্যাম্পশ্যা

বাঙ্গালী হিন্দুর মেয়ে আমি, বাঙ্গালীর ঘরের বৌ, শিক্ষিত সন্তানের জননী—জননীর শিক্ষাদর্শে তাহারা বঞ্চিত। তথাপি আমি স্বেচ্ছায় অন্তঃপুরচারিণী। ইহার জন্য আমি গর্ব্ব অনুভব করি, প্রাণে অপরিসীম শান্তি লাভ করি।

তাই বলিয়া বহির্জ্জগতের সহিত আমার সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন, কেহ বলিতে পারিবে না। আমার পিতৃ ও পতি উভয় কুলেরই আভিজাত্য ও প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের কারণে বাঙ্গালা ও বাঙ্গালার বাহিরে তাঁহাদের খ্যাতি প্রতিপত্তির অবধি নাই। কতলোক যাচিয়া আসিয়া তাঁহাদিগের সহিত আলাপ পরিচয় করেন। আগন্তুকদের মধ্যে ইউরোপীয় ও দেশীয় অহিন্দু মহিলার সংখ্যাও অল্প নহে। অন্তঃপুরে আসিয়া আমাদেরও সহিত আলাপ পরিচয় করিতে তাঁহাদের কোনও বাধা নাই। ইয়োরোপীয় মহিলাদের মধ্যে কেহ কেহ বাঙ্গালীর অন্তঃপুরের এই উদারতা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন। শুনা কথায় বাঙালীর অন্তঃপুর সম্বন্ধে ভুল ধারণা চক্ষে দেখিয়া আমূল সংশোধিত করিয়া লইয়াছেন। এই সূত্রে একজন মার্কিন মহিলাকে স্বকর্ণে বলিতে শুনিয়াছি "এমন ত' কোথাও দেখি নাই, বাঙ্গালীর অন্তঃপুর, পৃথিবীতে এ যে স্বর্গ, আর এই স্বর্গের রাণী গৃহিণী।"

লক্ষ্য করিয়াছি, এই সকল মহিলা কি সম্ভ্রমের সহিত আমাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহেন। 'পর্দ্দা'র ভিতরে তাঁহাদের কথাবার্ত্তা, চালচলন যেন সমধিক স্বচ্ছন্দতা লাভ করিয়াছে, পর্দ্দার বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ তাঁহাদিগকে কখনও করিতে শুনি নাই। দেশীয় অহিন্দু মহিলারা বাহিরে জুতা-মোজা খুলিয়া রাখিয়া তবে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছেন। বাটীর কেহ আকারে ইঙ্গিতেও জুতা খোলার কথা তুলে নাই। স্বান-বাহাদুরী হেতু আপনা হইতেই তাঁহারা এ কার্য্য করিয়াছেন। কথোপকথনকালে বেশ অনুভূত হইয়াছে তাঁহাদের অন্য 'কিন্তু'-ভাব। ব্রাহ্মণের ঘরে অব্রাহ্মণ হঠাৎ যাইয়া পড়িলে অব্রাহ্মণের যেমন বাধ-বাধ বোধ হয়, অনেকটা সেই রকমের। 'পর্দ্দা' ছাড়িলেও পর্দ্দার প্রভাব তাঁহাদিগকে ওরূপ করাইতেছে, বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। 'পর্দ্দা' সম্বন্ধে ভাল-মন্দ কোনও কথা আমাদের সম্মুখে তাঁহাদের পক্ষে অস্বাভাবিক,—উঠেও নাই।

দেশহিত-সাধনে পর্দ্দানশীনদিগকে আনয়ন করি নাই, হওয়া অনুচিত মনে করিয়াছি। কিন্তু নিজ পুত্রকে স্নেহের শোণিত দিয়া গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছি, জননী ও জন্মভূমির সম্মান যাহাতে সে অম্লান রাখিতে পারে। মাতৃপদরেণু মাথায় লইয়া সেও তাহার কর্ত্তব্য-পালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছে, বাঙ্গালার ইতিহাসের এ এক গৌরবময় অধ্যায়। বর্ত্তমান যুগে অনেকেরই ইহা অজ্ঞাত। পিতৃপিতামহের কীর্ত্তিলোপ এই ভাবেই হয় এবং তাহার পরে যাহা ঘটে সেই কথাই বলিব।

তাহার পূর্ব্বে পূর্ব্বের আরও দু' একটা কথা বলিব। বাঙালী না কি নারীর প্রতি নিষ্ঠুরতায় কালাপাহাড়! এত বড় মিথ্যা জগতের কেহ ইহার পূর্ব্বে কল্পনাতেও আনিতে পারে নাই। এই মিথ্যাবাদীর তুলনায় জগতের সমস্ত যেকালে যুধিষ্ঠির। নারী, বাঙ্গালীর ঘরের শোভা, স্ত্রী, সম্পদ, কুললক্ষ্মী তাঁহার প্রতি নিষ্ঠুরতা! বিজ্ঞান-যুগের প্রগলভ বাঙ্গালীকে জিজ্ঞাসা করি, পুরুষের নিষ্ঠুরতার পরিবর্ত্তে পুরুষের জন্য স্বেচ্ছায় নারীর বুক চিরিয়া রক্ত

দেওয়া কি বিজ্ঞানসম্মত? অজ্ঞান, অবোধ সন্তান নীচের প্ররোচনায় পিতৃনিন্দারূপ মহাপাপে তুমি লিপ্ত। আত্মস্থ হও, চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখ, যে-শিক্ষার গর্ব্বে তুমি জ্ঞানহারা, পিতৃনিন্দাও তোমার মুখে বাধে ভাল করিয়া দেখ দেখি, সেই শিক্ষার বিষময় ফলস্বরূপই নারীর উপর ঘোর নিষ্ঠুরতা তুমিই করিতেছ কি না! তোমার সহজসরলতায় মাতৃমূর্ত্তির পরিণতি ঘটাইয়াছে কি? 'মা' বুলি তোমার মুখে শুনি না কেন? যে মা চেনে না, বলে না, সে করিবে জন্মভূমির সেবা—স্পর্দ্ধা তো কম নহে!

শাস্ত্রের কথা তোমাকে আমি শুনাইব না। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরের কাহিনীও বলিব না। বলিব কলিযুগের কয়টা দিনের কথা—যাহা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। নারীর প্রতি পুরুষের নিষ্ঠুরতার কথাই শুনাইব। ঘটনা আমাদের প্রতিবেশী কাহারও কাহারও সম্পর্কে। চমকিত হইও তাহারা তোমাদের অভিধানে সুশিক্ষিত। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ সুরাপায়ী ও চরিত্রহীন। তাহাদের অসবর্ণবিবাহের কথা প্রকাশ পাইলে, 'পাড়ার লোকে' তাহাদের সঙ্গে সর্ব্ববিষয়ে অসহযোগিতা করিয়াছে—বাস উঠাইয়া দিবার ভয় দেখাইয়াছে। নাম ধরিয়া কত দৃষ্টান্ত দিতে পারি—আইনে বাধে বলিয়া নিরস্ত হইতে হইল। সেই সকল ঘটনার কথা কেনাইয়া কেনাইয়া মিস্ মেয়োর হাতে তুলিয়া দিতেও তোমাদের প্ররোচকেরা দ্বিধাবোধ করে নাই—একটা শক্তিশালী জাতির উন্নতির পথে কণ্টকস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে—সর্ব্বনাশের পথে তাহাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে।

আবার বলি চমকিত হইও না—নারীর প্রতি 'নিষ্ঠুরতা' নিবারণে যাহারা অগ্রণী, তাহাদের কেহ কেহ পূর্ব্ববর্ণিত আমাদের শিক্ষিত প্রতিবেশী। রোগী হইতে ইহারা রোজা হইয়াছে। চিকিৎসা প্রকরণ নারীদের কর্ণমূলে প্রোথিত করা। জানি না ইহা 'আর্থ ট্রিটমেণ্টের' (earth treatment) রূপান্তর কি না। উত্তেজিত অজ্ঞ সন্তান, তুমি ইহাদের সহায়। জাতির ও দেশের প্রতি এ কি নিদারুণ নিষ্ঠুরতা উপলব্ধি করিবারও শক্তি হারাইয়াছে। মা হারানো জাতির কি ভীষণ পরিণতি বুঝিতে পারিতেছ না। আপাত-চমক ও মধুরতার মাদকতায় তোমার আচরণে মা আমি কাঁদিয়া আকুল। অন্তঃপুরচারিণীর বারণে ক্রন্দনে সন্তান তুমি, তোমার কি মর্ম্ম স্পর্শ করিবে না! লোকবল, অর্থবল মায়ের সব বলই যে সন্তান। ভুলুণ্ঠিতা, মায়ের হাত ধরিয়া তোল—মাকে বাঁচাও, জাতিকে বাঁচাও, দেশকে বাঁচাও।

সন্তানের জননী আমি দুই ত্রয়োদশে। শুনিয়াছি আমার শ্বশ্রূঠাকুরাণীর প্রথম সন্তান হয় তাঁহার দ্বাদশ বৎসর বয়সে। দ্বাদশ সন্তানের তিনি জননী! তাঁহাদের প্রথম এখনও জীবিত, যুবকের ন্যায় কার্য্যক্ষম, বয়স ৮৬। আমার স্বামী সর্ব্বকনিষ্ঠ, বয়স ৬০। বালিকা-বিবাহের একটী দৃষ্টান্ত দিলাম। শিশু-বিবাহ তো দূরের কথা, বালিকা বিবাহও না কি দেশ ও জাতির বর্ত্তমান দুর্দ্দশার কারণ, সুতরাং যৌবন-বিবাহ প্রচলিত হইয়াছে। এখন ২১, ২২, ২৩ বা তদধিক বৎসরের অনূঢ়া কন্যা বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে। অনেক স্থলে ইহারা বিদ্যার্থিনী—সহশিক্ষা-ক্ষেত্রেও বিরাজমানা। উদ্দেশ্য—লেখাপড়ায় ইহাদিগকে 'আনমনা' রাখিয়া বালিকা-বিবাহ প্রথার উচ্ছেদ সাধন করা এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বাবলম্বিনী হইবার শিক্ষা ইহাদিগকে দান করা। বলিতে শুনিতে বেশ—আধুনিক শিক্ষিতের কাছে। এক ও একে কিন্তু পৌনে দুই বা সওয়া দুই করিবার সাধ্য নাই, আইন্‌ষ্টাইনের(Einstein)ও আমার দুর্ভাগ্য। কথাটা আরও খোলসা করিয়া বলা দরকার।

বাঙ্গালীর ঘরের উপরোক্ত অনূঢ়া কন্যাদিগের শতকরা ৯৯ জনকে যুবতী বলা কিছুতেই যায় না, যৌবনের মাধুর্য্যের অভাবে। বিরুদ্ধবাদিতা করার জন্য প্রকৃতি প্রথম প্রতিশোধ লয় এই ভাবে। একদিকে বিলাস, বিভ্রম ও 'টকিজ' উদ্ভাবনা। অন্যদিকে 'শরচ্চন্দ্রী' ও 'রাবীন্দ্রিক' পরিকল্পনা। ফাউ-স্বরূপ আছে মাসিক 'সাহিত্যের' অবাস্তব—গল্প, উপন্যাস কবিতা ও চিত্র। সর্ব্বোপরি মুখব্যাদনা করিয়া আছে গ্রীষ্মপ্রধান দেশের অলঙ্ঘনীয় প্রকোপ—বেচারা আইন্‌ষ্টাইন্ করিবে কি। যাহা হইবার সুতরাং তাহাই হইতেছে। আত্ম-হত্যায় জাতি অগ্রসর নির্ব্বংশ হইতে যেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কেন বলিতেছি।

হাত পিছলাইয়া বিবাহ হওয়া যদি কাহারও ভাগ্যে ঘটিল, মধুযামিনীর মধু ফুরাইতে ফুরাইতে তড়িৎ গতিতে নব অতিথি আসিবার সম্ভাবনা সূচিত হইল। সূচনা তড়িৎ গতিতে সংঘটিত হইলেও তাহার সমাপ্তি ঘটাইতে চিকিৎসকের উপস্থিতি অনিবার্য্য। তাহা সত্ত্বেও বড় যদি মেলে—ক্ষীণ, কৃশকায়, বিকৃতাঙ্গ রুগ্নের একটী জীব। অনেক ক্ষেত্রে তাহাকেও সজ্ঞানে দেখা জননীর ভাগ্যে ঘটে না। প্রসূতি-কক্ষে শিশু-মৃত্যুর ভয়াবহ তালিকা, যৌবন-বিবাহের 'হয়ত' সাফল্যের চিহ্ন। যুবক-যুবতীগণের গর্ভনিরোধের গভীর আগ্রহ দেখিয়া ইহা কাহারও মনে হওয়া অন্যায় নহে। গর্ভ-নিরোধের শত উপায় অবলম্বন করিয়াও যুবতীর 'টি-বি'র হস্ত হইতে পরিত্রাণ নাই—প্রকৃতির ভীষণ প্রতিশোধে শকুনির ন্যায় স্বার্থপর সংস্কারকদিগের উল্লাস বৃদ্ধিই বোধ হয় পায়, নতুবা 'হাতে পাঁজি' থাকিতে 'মঙ্গলবার' ঠিক করিতে তাহারা পারিতেছে না—এ কেমন কথা! একটা জাতির নাম মুছিয়া ফেলিতে তাহারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, ইহার পরে বলিবে না কে? ইয়োরোপ, আমেরিকার যৌবন-বিবাহের নজীর দেখাইয়া তাহাদের এখনও গলাবাজি—দু' কান-কাটার রীতিই এই।

যাহাদের অনুকরণে যৌবন বিবাহ-প্রথা প্রবর্ত্তিত, তাহাদেরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চক্ষুষ্মান হিটলারের অলঙ্ঘনীয় আদেশ —"go back to kitchen"—"আমি মা চাই।" 'বিলাসিনী কারফারমারী'তে, 'প্যারাসোলী, (parasole)' স্বাবলম্বনে জাতি রক্ষা, দেশ রক্ষা হয় না যে, তাই হিটলার মাতৃমূর্ত্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠার দৃঢ়পণ। স্বাবলম্বিনী রমণীর অভাব ভারতে কোনও কালে ছিল না, এখনও নাই। দরিদ্র ভীল, কোল, সাঁওতালের স্ত্রী-পুরুষে দিন-মজুরী করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করা ভারতে অভাব আছে কি? 'শিক্ষিত' বাঙ্গালী তুমি, তোমার মাতা, জায়া, সহোদরা, কন্যাকে তাহাদেরই দলে ভিড়াইতে বসিয়াছ—এত অধঃপতন তোমার হইয়াছে। যৌবন-বিবাহ ও স্বাবলম্বনের ধুয়ায় হইবার মধ্যে হইয়াছে অকালমৃত্যু ও নারী-ধর্ষণের সংখ্যাধিক্য। যে জাতির পুরুষের নারীকে ঘোর অবমাননার হস্ত হইতে রক্ষা করিবার এতটুকু শক্তি নাই, কেরাণী হইয়া সেই জাতির নারী হইবে স্বাব-লম্বিনী। যে জাতির নারী আভিজাত্যের সংস্কারে এই সেদিনও সতীত্বের অপার মহিমা দেখাইয়াছেন—খড়্গহস্তে দস্যুপতির শির দ্বিখণ্ডিত করিয়া, সেই মাকে স্বাবলম্বিনী করিতে তুমি চাও—ধাত্রী, শিক্ষয়িত্রী বা টেলিগ্রাফার করিয়া! নারীর প্রতি, মাতার প্রতি ইহার অপেক্ষা আর নির্ম্মম নিষ্ঠুরতা আর কি কল্পনা করা যাইতে পারে?

শিশু-বিবাহের স্বর্গীয় সুষমা উপভোগে তুমি অসমর্থ, জানি। সে দৌভাগ্যবান্ হইবার আশা বাঙ্গালীর আর নাই, তাহাও জানি। সুদূর-অতীতে তোমার পিতৃ-পিতামহের অজ্ঞানতা ও নিষ্ঠুরতার চিত্রের আবছায়া তবু তোমায় দেখাইব। বাঙ্গালার শিশু-বিবাহ! শিশুবধূ ঘরে আসিল, শিশুর ন্যায় প্রতিপালিত হইতে লাগিল, শিশু-স্বামী হইল তাহার খেলার সাথী, মুক্ত আকাশে, মুক্ত বাতাসে তাহাদের স্বচ্ছ হাসির রোলে আনন্দনয়ের আনন্দধ্বনি যেন প্রতি-ধ্বনিত হইতে লাগিল। বয়সের পরিণতির সঙ্গে এই যুগলের অপার্থিব আবেষ্টনে গৃহ-সংসার সর্ব্বদিক শ্রীশালিনী হইল। স্নেহ, সেবা, স্বার্থত্যাগ ও আত্মসংযমের যোগেই এই স্বর্গীয় দৃশ্য সংঘটিত হওয়া সম্ভবপর। বাঙ্গালার ঘরে ঘরে ইহার প্রাচুর্য্যের অভাব ঘটে নাই। ঘটে নাই বলিয়াই তোমরা যাঁহাকে সরস্বতীর বরপুত্র বলিয়া জান, তিনি এই সে দিনও দশম-বর্ষীয়া কন্যার বিবাহ দিয়া-ছিলেন। তাহার পরে—সে কথা আর বলিব না। পরিণীতা শিশু-বধূর বৈধব্য ঘটিলে চির জীবন তাহার ব্রহ্মচর্য্যপালনই শাস্ত্রের অমোঘ নির্দ্দেশ। দুধের শিশুর প্রতি এ ঘোর নিষ্ঠুরতা! মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়াও তোপের মুখে সৈনিককে সেনাপতির আদেশে অগ্রসর হইতে যেমন হয় শিশু-বিধবার অবস্থাও ঠিক সেই প্রকারের পরার্থে জীবন ডালি দেওয়া। আদর্শ অম্লান রাখিতে জীবন পণ মানুষেরই ধর্ম্ম। পশু-জগতের সহিত ইহার প্রভেদ এই খানে। হিন্দু তার নিষ্ঠুরতার অব্যক্ত যন্ত্রণা নীরবে সহ্য করিয়া জাতির, ধর্ম্মের কল্যাণ সাধনে অটল অচল। হিন্দু জানে ব্রহ্মচারিণী মাতৃমূর্ত্তির সন্তান-সেবার কথা। মায়ের পায়ে তাই তাহার শির লুটাইয়া পড়ে। এ আদেশ ক্ষুণ্ণ হইতে দেয় সে কোন্ প্রাণে!

অধুনা প্রণয়ে পরিণয় অনুশীলনে আগ্রহ তো খুবই। ফৌজদারী আদালতের কাজও ইহার জন্য কম নহে। জিজ্ঞাসা করি, শিশু-বিবাহের ফলে প্রণয়ের সম্ভাবনা অধিক না প্রণয়কে 'বৈজ্ঞানিক ভিত্তি'র উপর স্থাপিত করিয়া পরিণত বয়সে কামজ মিলনে অধিক? বিজ্ঞান-সম্মত একটা তালিকা দিতে কেহ পারেন?

শিশু-বিবাহের যুগ বোধ হয় আর ফিরিবার নহে।

নাই কিনক, কিন্ত যৌবন-বিবাহের প্রলয়ঙ্কর পরিণাম কয় মুহূর্ত্তে হয়, তথাকথিত সংস্কার-অভিমান, দেশের ভবিষ্যৎ আশা-ভরসা যাঁহারা, তাঁহারা সচেতন হইয়া ইহার বিরুদ্ধে অঙ্গুলী যদি হেলন করেন।

মা আমি, অন্তরে অন্তরে ইহা অনুভব করিয়াছি বলিয়াই সন্তানের কাছে ভিক্ষাপ্রার্থিনী হইয়া দাঁড়াইয়াছি। 'মা'-নামের সম্মান রক্ষা করিতে কি কেহ অগ্রসর হইবে না? মায়ের ডাক কি বৃথায় যাইবে!

কবির সমস্যা

—শ্রীইলারাণী মুখোপাধ্যায়

ছোট্ট নাতি ছুটে এসে বলে—
দাও, তোমায় বলতে হবেই আজ,
কোনো কথা শুনব নাকো আমি
যতই বল আছে তোমার কাজ,

কেমন করে বড় হোলে তুমি,
কেমন কোরে ভাঙ্গল তোমার দাঁত,
কেমন কোরে পাকল মাথার চুল,
কেমন করে ধরল পায়ে বাত।

আমি তো কই চাচ্ছি নাকো বড়
তোমার মত চাইছি হোতে যত?
ছাদে গিয়ে উঁচু হয়ে হয়ে
চেষ্টা কোরে দেখছি তো কত!

দাঁত টেনেছি কত জোরে জোরে,
নড়ে নাতো এমন শক্ত গোড়া;
পায়ে মোটেই ধরল না তো বাত,
পরলুন তো তোমার খড়ম-জোড়া;

তুমি যখন ধমক দিতে যাও
কথা তখন কয় না তো কেউ মোটে;
আজকে আমি ছোট্ট খুকীটাকে
বকেছি, তাই মা গিয়েছে চোটে।

ভুলু চাকর দুধ খাওয়াতে এলে
আজকে তাকে মেরেছিলাম ধোরে,
সে গিয়ে সেই বললে বাবার কাছে
কানটি মোলে দিলেন কত জোরে।

কবে আমি তোমার মত হব
বলতে তোমায় হবেই বাপু আজ,
হয়েই গেল ক্ষতি যতই হোক
থাকু না তোমার যতই কেন কাজ।

ঠলিয়ে মাথা দাদু হাসেন শুধু,
চোখের কোলে বাষ্পরেখা ভাসে।
মনে পড়ে যৌবনের কথা—
বাল্য কৈশোর কতই স্মৃতি আসে!

নাতিরে তাঁর বলেন বুকে টেনে—
অমন সাধ কেন মনে তোর?
কাবেন, মানুষ কেন এমন চায়
ফেলতে ছিঁড়ে কুসুম-কোমল ডোর!

ওরে অবোধ, হ'বিই বড় তুই,
অজ্ঞাতে তোর আসবে এমন দিন,
ক্রমে আলো আসবে নিবে চোখে,
জীবনগ্রন্থি আসবে হয়ে ক্ষীণ।

এ প্রভুত্ব তখন তোরে আর
দেবে না সুখ ধরার অধিকার,
বাজবে বাঁশী অন্য পূরবীতে,
জীবন-দোলা দুলবে আকাশ পার!

বাল্য তখন ধূসর ধূসর তনু,
কৈশোর তোর কেঁদে সারা হবে,
যৌবন তোর ছাড়বে দেহ মন,
চোখের উপর আসে পাশে রবে;

চাইবি তারে জীর্ণ জরার ঘাসে,
সিক্ত আঁখি অশ্রুধারায় ভাসি;
তরুণতা হাসবে তখন হায়,
ব্যঙ্গভরে মহাকালের হাসি!

আয়োজনের প্রয়োজনের ভারে
ক্ষুব্ধ হবে চিত্ত যত তোর,
ততই দ্রুত ডুববে জীবন-রবি—
ছিন্ন হবে পরিচয়ের ডোর।

তবু সে দিন আসবে বটে ঠিক
এখন যারে চাইছ মনে মনে,
চুপে চুপে চোরের মত হয়ে
মরণ প্রবেশ করবে তাহার সনে!

উঞ্ছজীবী [ফোটো— শ্রীপরিমল গোস্বামী

সিপাহী যুদ্ধের নূতন কথা

—শ্রীসুশীলপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

চক্রীর চক্র

কর্তৃপক্ষের আশ্বাসবাক্যে অবাধ্য না হইলেও তাহাতে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকা সুধাকুমারের পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। এ অবস্থায় নিশ্চিন্ত থাকা কোম্পানীর পক্ষেও স্বাভাবিক নহে। চিন্তাক্লিষ্ট সুধাকুমারের মনে উদয় হইয়াছে, "ঠকা হইবার বিশেষ কারণ বর্ত্তমানেও কোম্পানীর চক্রান্তের কোনও চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। নিত্য কলৌর কার্য্য ধীরভাবে চলিতেছে। ক্লাবে আমোদ-প্রমোদও চলিতেছে পূর্ব্ববৎ। সিপাহীদের সম্বন্ধে দৃষ্টি রাখার ব্যবস্থা কিছু হইয়াছে, বুঝা যায় না। তবে তবে যথাযথ ব্যবস্থা করিয়া কর্তৃপক্ষ বাস্তবতঃ কি উদাসীন! সম্ভবতঃ তাহাই। বিপদের সময়ে জনরীতির প্রসার ঘটিলে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা এক প্রকার অসম্ভব।"

সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে হইয়াছে, "উহাদের বন্দুক আছে, কামান আছে, হাতিয়ার আছে। আমাদের কি আছে? অন্নের তাড়নায় কত লোক দেশ ছাড়িয়া এখানে রহিয়াছে। তাহাদের মধ্যে অনেকের পুত্র-পরিবারও সঙ্গে আছে। বিপদ ঘটিলে তাহাদের অবস্থা কি হইবে, কোথায় তাহাদের আশ্রয় মিলিবে, কে তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিবে?"

ভাবনার উপর ভাবনা পিতার কারণে, আত্মীয় স্বজনের কারণে। শীঘ্রই সংবাদ পাওয়া গেল, "স্থানীয় চারিপাঁচ জনের কোর্টমার্শালের বিচারে গুপ্তচর বলিয়া প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। গাজীপুরে কোর্টমার্শাল আজ হইয়াছে, পূর্ব্বে ত শুনি নাই। অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম সংবাদ একেবারে অতিরঞ্জিত। কয়েকজন লোকের উপর কর্তৃপক্ষের সন্দেহ হওয়ায় আদালতের বিচারে গুলী ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে তাহারা আদেশপ্রাপ্ত হইয়াছে।"

এই প্রসঙ্গে দিনলিপিতে আরও পাওয়া যায়, "মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত সংবাদ প্রচার করা গভীর উদ্দেশ্যপূর্ণ কুচক্রীদিগেরই কার্য্য। লোক ক্ষেপাইতেই ইহা করা। টোটা সম্বন্ধে মিথ্যা রটনার কারণে অগ্নি প্রজ্বলিত। সে আগুন না নিভিয়া বাড়িয়া যাহাতে যায় তাহার উদ্দেশ্যে, এত মিথ্যার অবতারণা। ইহাদের সামলাইয়া কোম্পানী যদি বাঁচিয়া থাকে তাহা হইলেই আমাদের নিস্তার, নতুবা সমূহ বিপদ।"

সামলাইবার যথাসাধ্য ব্যবস্থা করিতে কোম্পানী একেবারে নিশ্চেষ্ট নহে, ইহা লোকে বুঝিতে পারায় সুধাকুমার বুঝিতে পারেন। লোকপরম্পরায় শুনিতে পাওয়া যায়, সিপাহীর কোম্পানী-বিদ্বেষের তুলনায় বাঙালী-বিদ্বেষও অল্প নহে। ডায়েরীতে সুধাকুমার বলিতেছেন, "সিপাহী ও তাহার সমর্থকদিগের ধারণা বাঙালীর সহায়তায় জন্যই কোম্পানী এ দেশে কায়েমী ভাবে বসিতে পারিয়াছে আর রাজ্যপাট চালাইতেছে এত সহজে।"

পাঞ্জাব (১৮৪৯), পেগু (১৮৫২), নাগপুর (১৮৫৩) এবং আউদ্ (১৮৫৬) কোম্পানীর রাজ্যভুক্ত হইবার কথা উল্লেখ করিয়া এবং লর্ড ডালহাউসী ও লর্ড ক্যানিং-এর শাসনকালে দেশ-জয়, শাসন-পদ্ধতি, রাজ্যভুক্তের সম্বন্ধে বিধিব্যবস্থা ও তাহার জন্য নানা স্থানে নানা জনের নানা মনোভাবের ইঙ্গিত মাত্র করিয়া কুচক্রী তাহার সুযোগ গ্রহণ করেন: "কোম্পানীর বিরুদ্ধে সাধারণের মন জাগাইবার নিয়মিত চেষ্টা বিশেষভাবে করে এবং অল্পবিস্তর সকলকালও তাহাতে হয়।"

সুধাকুমার এই কথা দিনলিপিতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পরে তিনি বলিতেছেন, "টোটার অছিলা করিয়া সিপাহীকে উত্তেজিত করা সিপাহী যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ হইলেও তাহার বহু পূর্ব্ব হইতে অসন্তোষের বীজ রোপিত যাহা হইয়াছিল তাহা ধুঁয়াইয়া ধুঁয়াইয়া এমন একটা অবস্থার উপনীত হয় যাহার ফলে টোটা সম্বন্ধে রটনা শুধুনা খড়ে সহজেই আগুন ধরাইয়া দিতে সমর্থ হয়।"

তিনি আরও বলিতেছেন, "আউদের নবাব বংশের এবং দলীপ সিং-এর জন্য কোম্পানী যে ব্যবস্থা করেন, মহারাণী ভিক্টোরিয়া স্বয়ং তাহার নিন্দা করিয়াছেন, চক্রীরা বলিয়া বেড়াইয়াছে যেখানে যেমন সুবিধা মিলিয়াছে। ক্রিমিয়ান যুদ্ধের পরে কোম্পানীকে সৈন্য-সামন্ত দিয়া ইংলণ্ডের সাহায্য

করার অসুবিধা এবং চীনযুদ্ধের কারণে ভারতবর্ষের প্রতি ইংরেজের উপযুক্ত দৃষ্টি রাখার অসম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া কোম্পানীর মনে ভবিষ্যতের অসন্তোষানল প্রজ্বলিত করে। তবুও তাহারা খুবই করে দেশীয় জনসাধারণের সহানুভূতির উপর। দেশীয় নৃপতিবৃন্দও সময়ে তাহাদের সহিত যোগদান করিবে এ ভরসাও তাহারা করে। কেমন করিয়া ইহা তাহারা করিল সঠিক জানা নাই। তবে কোথাও কোথাও ষড়যন্ত্রকারীদিগের দূত প্রেরিত হইয়াছিল কাহারও কাহারও মুখে শুনা যায়। সাক্ষাৎ ভাবে কোনও উৎসাহ কাহারও কাছে পাওয়া গিয়াছিল বলা যায় না, প্রমাণাভাবে। উৎসাহ না পাইলেও তাহাদের নিরুৎসাহ বড় কেহ করেন নাই। ইহা না করায় চক্রীদের আশা হয়, যুদ্ধারম্ভ হইয়া তাহা অগ্রসর হইলে তাঁহাদের সহানুভূতি প্রাপ্তির সম্ভাবনা খুবই আছে, অন্ততঃ তাঁহারা বিপক্ষতা করিবেন না।"

এই সকল কথার পরে সূর্য্যকুমারের দিনলিপিতে পাওয়া যায়, "বাঙালীর উপর কোনও প্রকার ভরসা রাখিতে ইঙ্গিতে যাহারা করিয়াছে তাহারা করে নাই। কোম্পানীর প্রায় সকল প্রকারের দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে বাঙালী নিযুক্ত। বাঙালী কোম্পানীর ডান হাত বলিলেও চলে। সেই বাঙালীকে হাত করিতে পারিলে ভাবনার কিছুই থাকিত না।"

সিপাহী যুদ্ধ আরম্ভ হইলে চক্রীরা বাঙালীর উপর প্রভাব বিস্তার করিবার উপায় অন্যত্র অবলম্বন করে কি না তাহার কোনও সংবাদ পাইবার পূর্ব্বে গাজীপুরে একটি ঘটনার কথা দিনলিপিতে সূর্য্যকুমার উল্লেখ করিয়াছেন, "পরিচিত স্থানীয় একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া বলেন, 'ডাক্তার সাহেব আপনি কি মনে করেন এখানকার সিপাহীরা চুপ করিয়া যেমন আছে তেমনি থাকিবে—থাকা উচিত কি?" ইঙ্গিত মারাত্মক—মুখে কোনও কথা ফুটাইল না। হাসিয়া লোকটি আবার বলিল, 'স্থানীয় সিপাহীরা আপনাদের খুবই বাধ্য, সকলেই বলে।' ষড়যন্ত্রকারীদের গুপ্ত দূতরূপেই ইহার আগমন বুঝিতে বিলম্ব হইল না। শান্ত ভাবে সিপাহীরা এখানে আছে। কোম্পানীর সতর্কতা হেতু তাহাদের মন ভাঙ্গাইবার সুযোগ না ঘটায় বাঙালীর সাহায্যে তাহাদিগকে দলে ভিড়াইয়া লইবার চেষ্টা করা এই দৌত্যের অভিসন্ধি।"

ইহার পরে ডাঃ সূর্য্যকুমার বলিতেছেন, "লোকটির হস্ত হইতে কোন রকমে নিস্তার পাইয়াও নিস্তার নাই। ভীষণ ভাবনা, কি করি! চক্রান্তের কথা কাহাকে বলি! কথা গোপন রাখা উচিত নহে, কিন্তু বলিলে অবস্থা এখন যাহা, হিতে বিপরীত হইবারও অসম্ভাবনা নাই—আমার কাছেই যে এমন লোক আসে কেন, ইহাও কেহ কেহ ভাবিতে পারে। কর্তৃপক্ষের কেহ অদূরেও মনের কোণে যদি একথা স্থান দেয়! কাশীবাবুর (গাজীপুরের মুন্সেফ পরে সাব-জজ) সহিত পরামর্শ করিতে তাঁহার বাসায় সেই দিনই যাই। সব শুনিয়া কথা প্রকাশ করা সম্বন্ধে ইতস্ততঃ ভাব দেখান তিনিও। আমি কিন্তু মিঃ বেলির কাছে গিয়া সব কথা খুলিয়া বলি। আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া তিনি জেনারল নীলের কাছে যান।"

জেনারল নীলের সাক্ষাতে কথোপকথন যাহা হয় ডায়েরীতে লিখিত তাহার একাংশ এই!

"জেনারল নীল। 'ডাঃ সর্ব্বাধিকারী, যার কথা আপনি বলছেন সে এখন আমাদের নজরবন্দী—নড়াচড়া আর বেশী করলেই গ্রেপ্তার হবে।'

"ডাঃ সর্ব্বাধিকারী। 'যাক্, কিন্তু খবর পেলেন কি করে?'

"জেঃ নীল (সহাস্যে)। 'এর চেয়ে অনেক বেশী খবর রেখেও সিপাহীদের এই অধিকাও নিবারণ করতে পারা যায় নি। সে কথা থাক, আপনাকে ধন্যবাদ এই সব কথা আমাদের বলতে আসার জন্য। আপনি আসবেন আমরা জানতুম—না এলে আশ্চর্য্য হতুম।"

['লোকটি' বলে যার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার নাম ডায়েরীতে লিখে ডাঃ সূর্য্যকুমার এমনভাবে কেটে দিয়েছেন যে নাম জানবার উপায় নেই। 'লোকটি' পরে গ্রেপ্তার হয়। তখন অকপটে সব স্বীকার করে কর্তৃপক্ষের কাছে সে ক্ষমা প্রার্থনা করে—ক্ষমা পায়ও। কৃতজ্ঞতা জানাতে প্রাণপণ শক্তিতে কোম্পানীকে নানাভাবে সাহায্য করতে সে অগ্রণী হয়। 'লোকটি' গাজীপুরের একজন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি। তার নাম লিখে কেটে দেওয়ার অর্থ সুতরাং সকলের কাছেই সহজে বোধগম্য হবে।—লেখক]

জেনারল নীলের কথাবার্তায় কোম্পানীর সম্বন্ধে ডাঃ সর্জাধিকারীর সন্দিগ্ধভাব অপনোদিত হইলেও, প্রয়োজন কালে জনসাধারণের আশ্রয়োপযোগী স্থানের ব্যবস্থা হওয়ার ঔচিত্য সম্বন্ধে তিনি জেনারল নীলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সেদৃঢ়ভাবেই তিনি বলেন, "হয়ত শেতাঙ্গ মহিলা ও বালক-বালিকার জন্য এ বিষয়ে কোনও ব্যবস্থা হইয়া আছে। দেশীয় মহিলা ও বালক-বালিকার জন্যও অনুরূপ ব্যবস্থা হইয়া আছে জানিতে পারিলে আমাদের ভাবনার লাঘব হইবে প্রভূত পরিমাণে।"

সুধাকুমারের এই কথার উত্তরে জেনারল নীল সুস্পষ্টভাবে কোনও কথা বলিয়াছিলেন কি না, দিনলিপিতে পাওয়া যায় না। সেই দিনের পরের কথা, "সুধাকুমার, বাবু কাশীনাথ বিশ্বাস ও অপর একজন ভদ্রলোকের সহিত বৈকালে গঙ্গার ধারে পাদচারণ করিতেছেন এমন সময়ে কয়েকজন সিপাহী তাঁহাদের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল অথচ কেহই তাঁহাদিগকে সেলাম (salute) করিল না। ইঁহারা তিনজনই উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, বিশেষতঃ সর্জাধিকারী মহাশয় জনসাধারণের খুব প্রিয় এবং সম্মানিত। সম্মান প্রদর্শন দূরে থাক সেদিন সিপাহীদের মধ্যে একজন কাশীনাথ বাবুকে লক্ষ্য করিয়া বিদ্রূপোক্তিতে বলিয়া উঠিল, 'আরে মুসেফোয়া আর কেয়া হোগা, বড়া সে ডিগ্রী ডিসমিস হোতা হ্যায়?" (বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী)

সুধাকুমারের ডায়েরীতে ইহার বিস্তৃত বিবরণ আছে। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস প্রণীত, 'বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী' হইতে উদ্ধৃতাংশ বর্ত্তমান অধ্যায়ের পক্ষে পর্য্যাপ্ত। এ ঘটনার কথাও ডাঃ সুধাকুমার কর্তৃপক্ষকে তৎক্ষণাৎ জানান এবং বিপদ আসন্ন এই আশঙ্কায় কাহারও মুখাপেক্ষী না হইয়া "সরকারী চিকিৎসালয়টি শত্রুর আক্রমণ হইতে' রক্ষা ও আপনাদের আশ্রয়স্থলে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে নৌকা হইতে চিনির ও ময়দার বস্তা নামাইয়া এবং বালির বস্তা সংগ্রহ করিয়া সে সকল চিকিৎসালয়ের চতুর্দ্দিকে সাজাইয়া তাহা ঘিরিয়া লইলেন।"

ডায়েরীতে প্রকাশ কর্তৃপক্ষ সুধাকুমারের কার্য্যকলাপের সংবাদ পাইয়া চিকিৎসালয়টি পরিদর্শন করিতে আসেন। সাজ-সজ্জা দেখিয়া সুধাকুমারের যথেষ্ট প্রশংসাও তাঁহারা করেন, কিন্তু তখনও তাঁহারা বলেন, "শঙ্কার বিশেষ কোনও কারণ নাই। সুধাকুমার বলেন, "ভগবানের কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি আপনাদের বাক্যই যেন সত্য হয়। সময় থাকিতে যথাসাধ্য সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছি। ইহাতে আপনারা অসন্তুষ্ট হইলে তাহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট।"

টোটা সম্বন্ধে মিথ্যা সংবাদ প্রচারে অভীপ্সিত ফললাভ শত্রুদের তখনও যে সকল স্থানে হয় নাই, গাজীপুর তাহার মধ্যে একটি। সরকারী সংবাদের আদান-প্রদানে, ডাক ও লোকচলাচলের ভীষণ অসুবিধা হেতু কোথায় কি হইতেছে সঠিক জানিবার জনসাধারণের তখন কোনও উপায় নাই। ইহার সুবিধা গ্রহণান্তর নানা উপায়ে কোম্পানীর নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচারের মিথ্যা সংবাদ প্রচার করা শত্রুপক্ষের নিয়মিত কার্য্যের মধ্যে হইয়া পড়ে—উদ্দেশ্য জনসাধারণকে কোম্পানীর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা—তাহাদের সাহায্যে লুঠতরাজ করিয়া যুদ্ধের জন্য অর্থসংস্থা যথাসম্ভব পূরণ করা। সুধাকুমার লিখিয়াছেন, "গাজীপুরের উপর বিপক্ষের শ্যেনদৃষ্টি অর্থেরই জন্য।"

এই কথা লিখিয়া সুধাকুমার বলিতেছেন, "চক্রীদিগের কোম্পানী সম্বন্ধে কুৎসা প্রচারে অবস্থা খুবই বিপজ্জনক। ভাল লোকও চক্রীদিগের ভয়ে ভীত·····দৃষ্টান্ত বিরল নহে। সব জানিয়া শুনিয়া কোম্পানী যেন নিরুপায়। দোষী ধরা পড়িলে গুরুদণ্ডে দণ্ডিত করাও কোম্পানীর রেওয়াজ নাই। প্রাণপণ শক্তিতে আগুন নিভাইবার চেষ্টা করিয়াও কোম্পানী বিফলকাম। চারি পাঁচজন ষড়যন্ত্রকারী, যাহারা ধরা পড়িয়াছে, সহজ সময়ে তাহাদের ফাঁসীও নিশ্চয়ই হইত; কিন্তু এখন তাহারা নিরাসন বন্দে নন্দিত। ইহাপেক্ষা ধীরতা সরকারে কর্তৃপক্ষের কাণে করার দৃষ্টান্ত আছে। তুঘলকসওয়ারের ঘোড়ার আস্তাবলে ঘোড়াকে বিষপ্রদানের চেষ্টায় নিযুক্ত এক সহিসকে হাতেনাতে ধরিলে অকপটে সে দোষ স্বীকার করায় এবং কুৎসনা-রটাদের নামধাম বলিয়া দেওয়ায় বিনা শাস্তিতে সে মুক্তিলাভ করিয়াছে।····· আশ্চর্য্য এই জাতি।"

অশান্তির কারণ নানাস্থানে খণ্ডযুদ্ধ :—

আরও আশ্চর্য্যজনক তাঁহার কাছে মনে হয়, "এই জাতিরই কাহারও কাহারও 'সাদা-কালো'র পার্থক্য-

জ্ঞান লাভে বদ্ধমূল করিয়া রাজ্যশাসনের অহিত করায়। রাজ্যশাসন ও ব্যবসা বিস্তারের চেষ্টা এক কোঁকে হওয়ার কারণে দরদিকে সমান দৃষ্টি রাখা কর্তৃপক্ষের পক্ষে কত কঠিন। সিপাহী-যুদ্ধই তাহার অন্যতম দৃষ্টান্ত। পদস্থ শ্বেতাঙ্গ কর্মচারী প্রভৃতির সহিত আলাপ-আলোচনায় জানিতে পারিয়াছি, তাঁহাদেরও অভিমত—সিপাহী-যুদ্ধ National Rising (জাতীয় বিদ্রোহ)। দেশীয়ের সাহায্যে এদেশে কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা ও সেই কোম্পানীর বিরুদ্ধে 'জাতীয় বিদ্রোহ'এর কারণ অনুসন্ধান যথাযথভাবে করার যথেষ্ট সময় এখন না থাকিলেও কোম্পানীর পক্ষে 'গলতি' যে কোথাও কোথাও কখনও কখনও হইয়াছে শ্বেতাঙ্গের মধ্যেও কেহ কেহ স্বীকার করেন। শুনিতে পাওয়া যাইতেছে বিলাতের পার্লামেণ্ট সভাতেও খ্যাতনামা সদস্যদের মধ্যে কোনও কোনও সদস্য এ সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন।"

এই প্রসঙ্গে ডায়েরীর কোথাও পাওয়া যায়, "রাজ্যভ্রষ্ট দেশীয় নৃপতিবৃন্দের সমর্থকদিগের ভিতরে ভিতরে আন্দোলন, রাজ্যচ্যুত একদা রাজাধিরাজের জন্য নির্দ্ধারিত সামান্য 'ভাতা'র ব্যবস্থায় সাধারণের অসন্তোষ বহ্নি ধুঁয়াইয়া ধুঁয়াইয়া কম অনিষ্টের সৃষ্টি করে না। মহারাণী ভিক্টোরিয়া স্বয়ং রাজ্যচ্যুতের দুর্দ্দশায় সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া গভর্ণর জেনারেলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন একথাও অনেকে জানিতে পারে। স্থানীয় শাসনকর্ত্তা তাহার পরে কি করেন না করেন ধৈর্য্যসহকারে তাহার জন্য কেহ কেহ অপেক্ষা করিলেও কোম্পানীর উচ্ছেদকারীরা উত্তেজনা দ্রুত পাইয়া যাইবার আশঙ্কায় ধর্ম্মের দোহাই দিয়া টোটা এবং অনুরূপ অন্যান্য আন্দোলন নিরিড়ভাবে আরম্ভ করে। বহু স্থান-ব্যাপী বিদ্রোহের বিষয় বিবেচনা করিলে আন্দোলনের ব্যাপকতার অনুমান সহজেই করা যাইবে।"

সঙ্কটকাল যখন পাটনাপুরের শিয়রে তখন কাশীর অবস্থার কথা যদুনাথের 'তীর্থভ্রমণে' যাহা পাওয়া যায় তাহা এই :

"কাশীনগরে অতিশয় ভয়যুক্ত হইয়া ধনাঢ্যগণ ধন সকল গোপন করিয়াছেন। বণিকগণের দোকান বন্ধ। সাহেবগণ ত্রাসিত হইয়া স্থানে স্থানে লুক্কায়িত, আপন আপন স্ত্রীপুত্রগণকে চণ্ডালগড় প্রেরণ করিয়া সহরে যত ফটকবন্দী চৌকিদার ছিল, তাহাদের কর্ম্মে অন্য লোক নিযুক্ত করিয়া ঐ চৌকিদারদিগকে থানার বরকন্দাজি কার্য্যে (দিয়াছে)..... .....কাশীধামের রাজা ঈশ্বরীনারায়ণ রায় বাহাদুর পাঁচশত বন্দুকধারী লইয়া স্বয়ং শিবরোলে আছেন।.....সুলতানপুর হইতে কেল্লারি সেনা আনাইয়া খাজানাখানা, বক্সীখানা পাহারাতে আছে। দানাপুর হইতে ২০০ শত গোরা আসিয়াছে। প্রতি দিবস গোরা পূর্ব্ব হইতে আসিয়াছে। শিখ সৈন্যগণ অবাধ্য হয় নাই, ইহা দেখিয়া স্থির আছে।"

ইহার পূর্ব্বের ঘটনাবিচয়—মিরাটে ঘোড়সওয়ার অশান্তি ও খণ্ডযুদ্ধ এবং কর্ণেল ফিনিশের এবং অন্যান্য কয়েকজন সেনাপতির হত হওয়া, শ্বেতাঙ্গদিগের আবাসগৃহে সিপাহী-দিগের অগ্নিপ্রদান ও তাহাতে সে সকল ভস্মীভূত হওয়া, প্রপীড়িতের আর্ত্তনাদ ও পীড়কের ঘোর কলনাদের মধ্যে দিল্লী অভিমুখে যাত্রার কথা যদুনাথের বর্ণনায় সজীব হইয়া আছে।

সেই সকল ভয়দৃপ্ত সিপাহী ও "দিল্লীতে যে তিন দল দেশীয় পদাতিক ছিল, তাহারা দিল্লীনগরে যে সকল সেনাপতি-গণ ছিলেন তাঁহাদিগকে হত করিয়া, দিল্লীশ্বরের ব্যূহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দিল্লীশ্বরের পুত্রকে সিংহাসনে উপবেশন করাইয়া দিল্লীশ্বর করিয়াছে।"

অন্যান্য স্থানের ইতিমধ্যে অবস্থা :

"বারাকপুরের ১৯ ও ৩৪ নং পদচ্যুত পদাতিকগণ রাণীগঞ্জ লুঠ করিয়াছে।"

"আলিগড়, কোয়েল, মইনপুরী, বুলন্দ, ইটাওয়া লুট হইয়াছে।"

"কানপুর, আগরা সশঙ্কিত।"

"মথুরায় বাজার দুই দিবস বন্ধ। সহরের সকল ফটক বন্ধ। ভরতপুর ও গোয়ালিয়র হইতে আগত পাঁচ-শত রাজসৈন্য ২৪টী কামান লইয়া আগরা ও মথুরা রক্ষা করিতেছে। শেঠ লছমিচাঁদ পাঁচশত মেওয়ারি পদাতিক কোম্পানীর সাহায্যার্থ দিয়াছেন।"

"চণ্ডালগড়ের বাজার কয়েকদিন বন্ধ। কেল্লার ভিতরে প্রাণভয়ে সকলে বাস করিতেছে।"

সূর্য্যকুমারের ডায়েরীতে প্রকাশ, "সূত্রের এই সকল সংক্ষিপ্ত সংবাদের সঙ্গে ভীষণ গুরুতর ঘটনার কথা লোকমুখে ফিরিতেছে। যুদ্ধ-ব্যাপকতার ব্যাপার দেখিয়া

সকলেরই অনুমান—দেশের যেখানে যত দেশীয় সৈন্য আছে তাহারা সকলেই একমত হইয়া কোম্পানীর রাজ্য নাশে বদ্ধপরিকর।"

যদুনাথের 'তীর্থভ্রমণে' প্রকাশ, "কেবল আশী বল পদাতিক এতযোগ হইয়াছে। কোন দেশের রাজা বা বাদসাহ কেহ সহযোগী হয় নাই। ইদানীন্তন জনশ্রুতিতে শ্রুত হইতেছে, নেপালাধিপতির প্রধান সেনাপতি জঙ্গ বাহাদুর ৪০০০ হাজার সৈন্য লইয়া পাহাড় হইতে নীচে আসিয়াছেন।"

অন্যান্য রাজা-রাজড়াদের সাহায্যের মধ্যে গোয়ালিয়রের কথা 'তীর্থ-ভ্রমণে' বেশী করিয়া পাওয়া যায়:

"গোয়ালিয়রের ভূতকার বাহাদুরের স্ত্রী রাজাবাই উজ্জয়িনী হইতে চল্লিশ হাজার সৈন্য সহিত গোয়ালিয়রে নিজ রাজধানীতে আসিয়া বসিয়াছেন। রাজাবাই দুই হাজার পদাতিক, এক-হাজার অশ্বারূঢ় শস্ত্রপাণি এবং বারটি কামান আগরার কেল্লাতে পাঠাইয়া কোম্পানী বাহাদুরের তরফ মদতগিরি করিয়া আগরা রক্ষা করিতেছেন। কিন্তু আপন সৈন্য ও তোপ কেল্লার ভিতর রাখিয়াছেন, গোরাদিগকে ছাউনীতে রাখা হইয়াছে।"

সুধাকুমার দিনলিপিতে লিখিতেছেন,

"রাজপুরুষ ও সেনাপতি হত্যা, শ্বেতাঙ্গের আবাস-গৃহে অগ্নিপ্রদান, খাজনা লুঠ ও জেলখেপো খালাসের ভূরি ভূরি সংবাদ প্রাপ্তির সঙ্গে শ্বেতাঙ্গের কৃষ্ণাঙ্গ-বিদ্বেষের কথাও চতুর্দিক হইতে পাওয়া যাইতেছে। জনরব খুবই প্রবল। লোকনির্বিশেষে প্রত্যেক কৃষ্ণাঙ্গই শ্বেতাঙ্গের চক্ষে শত্রু।"

ইহা লিখিয়া সুধাকুমার বলিতেছেন,

"একথা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু ইহা আংশিক ভাবেও যদি সত্য হয় কোম্পানীর পক্ষে তাহা বিষম অশুভকর হইবে। কোম্পানীর যাহারা যথার্থ বন্ধু তাঁহাদেরও "হাতপাবাঁধা'র অবস্থা হইবে—কোম্পানীর মঙ্গলার্থে কোনও কার্যে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ তাঁহাদের ঘটিবে না"।

এই সূত্রে গাজীপুরের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া সুধাকুমার বলিতেছেন, "সুখের বিষয় গাজীপুরে অবস্থিত এবং শাসনভার প্রাপ্ত রাজপুরুষগণ ও দেশীয় ভদ্র মহোদয়গণের মধ্যে মধুর মনোভাব পূর্ববৎ অটুট আছে এখনও। উভয় পক্ষের মধ্যে কাহারও কোনও প্রকারে মনোভঙ্গ না হয়, ভগবানের কাছে প্রার্থনা।"

নানা স্থানে সিপাহীদিগের ব্যর্থতার সংবাদ-প্রাপ্তির উত্তেজনা ও কোম্পানীর কুৎসা প্রচার সত্ত্বেও গাজীপুর ও সন্নিকটবর্তী স্থানে প্রকাশ্যভাবে শুরুতর গোলযোগ তখনও না ঘটার বিশেষ কারণ সুধাকুমারের মতে দেশীয় ও বিদেশীয়ের মধ্যে এই মনোরম ব্যবহার।

শিক্ষা-বিষয়ে আমাদের কর্তব্য

...বর্তমান সমাজে না আছে প্রকৃত শিক্ষক, না আছে প্রকৃত পাঠ্য-পুস্তক, অথবা প্রকৃত শিক্ষা-বিজ্ঞান। ফলে মূঢ় ও মূঢ়কী একই ভাবে শিক্ষিত হইতেছে এবং লেখা-পড়া শিখিয়াও বিশেষজ্ঞ যেমন প্রায়শঃ চরিত্রহীন ও সদসৎ কার্যে বুদ্ধিহীন হইয়া পড়িতেছেন, সেইরূপ শিক্ষাবিদগণও প্রায়শঃ বর্তন-কুর্দনে এবং খেলা-ধূলায় মত হইয়া জীবনের শিক্ষার সময়টা খেলায় কাটাইয়া দিতেছেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে মানব-সমাজের মধ্যে অবজ্ঞাপরতা, অশ্রদ্ধাভাব এবং অসততই বৃদ্ধি পাইয়া চলিতেছে।

এমতাবস্থায় শিক্ষা-বিষয়ে আমাদিগের কর্তব্য কি, তাহার আলোচনা করিতে বসিলে বলিতে হইবে যে, সর্বাগ্রে জন-সাধারণে যাহাতে যাইতে পারে, তাহার চেষ্টায় আমাদিগকে প্রবৃত্ত হইতে হইবে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে বর্তমান শিক্ষা-বিভাগের শিক্ষা প্রণালীগুলির মধ্যে আরও ব্যাপক ভাবে অন্বেষণাদি করিতে না পারে, তাহার জন্য প্রযত্নশীল হইতে হইবে। পেটের ক্ষুধা যাহাতে নিবারিত হয়, তাহার ব্যবস্থা না হইলে প্রকৃত ইচ্ছা-শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া যে সম্ভবযোগ্য নয়, ইহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে।...

শূকর-মদ্দব-সমস্যা

—শ্রীনীহারকণা রায়

বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রকে ত্রিপিটক বলে। ত্রিপিটকের অর্থ—তিনটি পেটরা। তিনটি রত্ন রাখিবার জন্য তিনটি বাক্স। শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা এই তিনটি সাধন করিবার এই তিনটি পিটক রচিত হইয়াছে। ত্রিপিটক তিনটির নাম—বিনয়, সূত্র, অভিধর্ম্ম।

(১) বিনয়-পিটকে শীল—অর্থাৎ চরিত্র গঠনের শিক্ষা; (২) সূত্র-পিটকে সমাধি—অর্থাৎ চিত্ত সংযম করিয়া ধ্যান-বিষয়ক শিক্ষা এবং (৩) অভিধর্ম্ম-পিটকে প্রজ্ঞা—অর্থাৎ ধর্ম্ম-সাধনের ফলে অলৌকিক জ্ঞান লাভ করিবার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। এক একটি ত্রিপিটকে অনেকগুলি গ্রন্থ আছে। এই সকল গ্রন্থকে অবলম্বন করিয়াই বুদ্ধদেবের জীবনী ও উপদেশ ও তত্ত্ব জানিতে পারা যায়। এই গ্রন্থগুলি প্রথমে পালি ভাষায় ও তদনন্তর সংস্কৃত ভাষায় নিবদ্ধ হইয়াছে।

বুদ্ধদেবের শেষ জীবনের ঘটনাবলী সূত্র-পিটকের অন্তর্গত "মহানির্ব্বাণ সূত্রে" লিখিত আছে। এই গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে নিম্নলিখিতরূপ বর্ণিত আছে :—

বুদ্ধদেব যখন বৈশালী নগরে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন শিষ্যগণ ও প্রিয় আত্মীয়গণকে প্রিয় শিষ্য আনন্দ সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "অদ্য হইতে তিনমাস পরে তথাগত পরিনির্ব্বাপিত হইবেন।" তথাগত শব্দের অর্থ—"যথা যথা যস্যাহিতং বিধেয়ং, তথা তথা সোঽপি গতঃ কৃপালুঃ। অশংসুতা-দোষ-বিমুক্তচেতা, দানাদিভিস্তেন তথাগতোঽহম্।"

অর্থাৎ—যিনি দানশীল, ক্ষান্তি, সমাধি ও প্রজ্ঞার দ্বারা চিত্তের কামনাদি দোষ পরিহার করিয়া জগতের মধ্যে যাহার যেরূপে ধর্ম্ম সাধনের দ্বারা হিতসাধন করিতে পারা যায়, তাহার নিকট দয়াপরবশ হইয়া উপস্থিত হইয়া তাহার সেইরূপে হিতসাধন করেন, তাঁহাকে "তথাগত" বলে।

ভগবান বুদ্ধের কার্য্যের জন্য তাঁহাকে এই আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল।

সেদিন মাঘী পূর্ণিমা। এই পূর্ণিমায় বৌদ্ধদের উৎসব হইয়া থাকে। (মহানির্ব্বাণ সূত্রের চতুর্থ অধ্যায়ের বিবরণ) সেদিন আনন্দ বলিয়াছিলেন, "অদ্য হইতে তিন মাস পূর্ণ হইতে মাত্র ৩।৪ দিন বাকী আছে। তথাগত এই সময়ে বৈশালী ত্যাগ করিয়া শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে পদব্রজে 'পাবা' নগরাভিমুখে অগ্রসর হন, পথে শিষ্যগণকে নানা-রূপ প্রাণস্পর্শী উপদেশ প্রদান করিতে করিতে তিনি 'পাবা'য় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ঘুরিতে ঘুরিতে চুন্দ নামক এক ব্যক্তির আম্র-কাননে উপস্থিত হন। চুন্দ জাতিতে কর্ম্মকার ছিলেন। কর্ম্মকার চুন্দ যখন শ্রবণ করিলেন যে, ভগবান তাঁহার আম্র-কাননে উপস্থিত হইয়াছেন, তখন তিনি আনন্দের সহিত দেখা করিয়া ভগবানকে ভিক্ষুগণ সমভিব্যাহারে পরদিন নিজ আলয়ে আহারের নিমন্ত্রণ করিলেন। ভগবান সানন্দে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

পরদিন চুন্দ সুমিষ্ট, কোমল ও কঠিন অন্ন এবং শূকর-মদ্দব রন্ধন করিলেন। সকলে আহারে বসিলেন, কিন্তু ভগবান বুদ্ধ অন্নাদি স্পর্শ করিয়াই জানিতে পারিলেন যে, চুন্দ যে শূকর-মদ্দব রন্ধন করিয়াছেন, তাহা বিষাক্ত। তখন তিনি চুন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বৎস! তুমি যে শূকর-মদ্দব রন্ধন করিয়াছ, তাহা অন্য কাহাকেও দিও না, শুধু আমাকেই দাও, আর অন্য ভিক্ষুগণকে কোমল ও সুমিষ্ট ও কঠিন অন্ন পরিবেশন কর, তাহাদের শূকর-মদ্দব দিও না। তুমিও গ্রহণ করিও না, একা আমাকেই তাহা দাও—আর বাকীটা অদূরে মৃত্তিকাতলে প্রোথিত করিয়া ফেল।" চুন্দ ভগবানের আদেশানুযায়ী কার্য্য সমাপন করিলেন। চুন্দের আতিথ্যে ভগবান বুদ্ধ অত্যন্ত প্রীত হইলেন।

কর্ম্মকার চুন্দের শূকর-মদ্দব ভোজন করায় ভগবান

বুদ্ধের অত্যন্ত কষ্টকর ও তীব্র বেদনাদায়ক আমাশয় রোগ উপস্থিত হইল। তিনি এই রোগে ভুগিয়াও স্ফূর্তিমান ও সম্প্রজ্ঞাত ভাবে ছিলেন, কোন কাতরোক্তি করেন নাই। এই অবস্থাবস্থায় তিনি ককুৎস্থা নামক নদীতীরে গমন করেন। এই সময় "পুক্কস" নামক একজন মল্লদেশীয় যুবক "পাবা" নগরে আগমন করিতেছিলেন। তিনি ভগবানের সাম্য, শান্তভাব অবলোকন করিয়া এবং ভগবান বুদ্ধের নিকট সারগর্ভ উপদেশাবলী শ্রবণ করিয়া দুইখানি সুবর্ণ-নির্ম্মিত বস্ত্র—একখানি আনন্দকে ও একখানি ভগবান বুদ্ধকে সমর্পণ করিয়া প্রস্থান করেন।

ভগবান বুদ্ধ যে রোগ-যাতনা অনুভব করিতেছিলেন, কর্ম্মকার চুন্দের অন্ন ভোজন করাই ইহার একমাত্র কারণ। তাহা তিনি পূর্ব্ব হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু শেষে চুন্দ ইহা বুঝিতে পারিয়া অনুতপ্ত হন, এই জন্য অনুগামী চুন্দকে হর্ষ প্রদান করিবার জন্য বলিলেন—"চুন্দ! তুমি যে অন্ন-ব্যঞ্জনাদি আমাকে দান করিয়াছ, তাহা মহাফলপ্রদ ও মুক্তিপ্রদ। ইহাতে তোমার পুণ্য বৃদ্ধি হইয়াছে।"

তখন ভগবান বুদ্ধ আনন্দ সহকারে এই গাথাখানি গাহিলেন—

"দদতো পুঞ্ঞং পবড্ঢতি,
সংযমতো বেরং ন চীয়তি।
কুসলো উজহাতি পাপকং
রাগদোস মোহক্খা পরিনিব্বুতো।"

অর্থাৎ "দানকারীর পুণ্য বৃদ্ধি হয়, সংযমীর শত্রু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না, কুশলকামী পাপ ত্যাগ করেন এবং রাগ, দ্বেষ, মোহ ক্ষয় হইলে পরিনির্ব্বাণ অর্থাৎ মুক্তি-লাভ করে।"

এই গাথার পরই চতুর্থ অধ্যায় শেষ হইয়াছে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে ভগবানের পরিনির্ব্বাণের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

২

ভগবান বুদ্ধ করুণার উচ্ছ্বাসে, ভাবের আবেগে যে সকল গাথা উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহা অতি গভীর ভাবাত্মক ও বিশেষ ফলপ্রদ। এই সকল গাথার একত্র সমাবেশে যে গ্রন্থ সংকলিত হইয়াছে, তাহার নাম "উদান"। উদান, সূত্র-পিটকের অন্তর্গত "খুদ্দকনিকায়" নামক যে পঞ্চদশখানি গ্রন্থ আছে, তাহারই অন্যতম। ধর্ম্মপদ, উদান, ইতিবুত্তক ঠিক এক শ্রেণীর গ্রন্থ। ইহা একখানি অতি প্রামাণিক গ্রন্থ। এই উদান গ্রন্থের একখানি অতি নির্ভুল প্রামাণিক টীকা আছে। এই টীকা রচনা করেন—সিংহলের অনুরাধাপুরের মহাবিহারের প্রধান স্থবির বিখ্যাত ধর্ম্মপাল। তিনি খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার উক্তিকে সকলেই আজকাল সম্মান সহকারে গ্রহণ করিয়া থাকেন।

উদানের অষ্টম বর্গের পঞ্চম উদানে উপরে উক্ত গাথাটীর উল্লেখ হইয়াছে। মহামতি ধর্ম্মপাল এই উদানের ব্যাখ্যার মুখবন্ধে কর্ম্মকার চুন্দের গৃহে তথাগতের ভিক্ষা-গ্রহণ ও শূকর-মদ্দব শব্দের ব্যাখ্যা স্পষ্ট করিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—

'শূকরমদ্দবন্তি ন শূকরমাংসে, শূকরোহি মদ্দিত বংশ-কলিরোতি। শূকরোহি মদ্দিতপদেসে জাতম্ আহচ্চ-কত্তব্বি অপরে পন শূকর মদ্দবম্ নাম এবং রসায়নম্ ইতি গণ হিংসু। চুন্দ কর্ম্মার পুত্তো অজ্জ ভগবা পরিনিব্বায়িস্সতিতি সুত্বা অত্তনো নাম তং পরিভুঞ্জিত্বা চিরতরং তিট্ঠন্তি সতথু চির জীবিত করনম্ অদাসিতি বদন্তি।'

অর্থাৎ,—'শূকর-মদ্দব' শব্দের অর্থ শূকরমাংস নহে। নূতন বাঁশের অতি কোমল অংশ (বাঁশের অঙ্কুর, শূকরেরা যাহা পদতলে মর্দ্দিত করে) এবং শূকরেরা যে স্থানে বিচরণ করে,—সেই সকল স্থানে যে ছত্রাক (বেঙ্গের ছাতা) উৎপন্ন হয়, তাহার মধ্যে বিষাক্ত যে ছত্রাক, তাহার নাম অহিচ্ছত্র।

বাঁশের অঙ্কুর ও বেঙ্গের ছাতা কয়েক শ্রেণীর লোক তরকারী রূপে ব্যবহার করে, কিন্তু অহিচ্ছত্র সর্পের লালা হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া উহা বিষাক্ত। এই দুই প্রকার ছত্রাকের ভেদ সহজে ধরিতে পারা যায় না। এই ছত্রাকের পরিবর্ত্তে চুন্দ বোধ হয় ভুল করিয়া অহিচ্ছত্র (বিষাক্ত) রন্ধন করিয়াছিলেন এবং বুদ্ধদেব তাহা

বুঝিতে পারিয়াই অন্য ভিক্ষুদের পাত্রে উহা পরিবেষণ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

আবার 'মহাপরিনিব্বানের' উপরিউক্ত টীকার নীচের লাইন-এর অর্থ এই যে,—"কেহ কেহ বলেন, শূকরমদ্দব একপ্রকার রসায়ন। কর্মকার পুত্র চুন্দ পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন আর্য্য ভগবান শীঘ্রই পরিনির্ব্বাণ লাভ করিবেন, যদি এই রসায়ন পান করাইলে ভগবান বেশীদিন জীবিত থাকিতে পারেন, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া চুন্দ ভগবানকে শূকর-মদ্দব রসায়ন প্রদান করিয়াছিলেন—(A kind of vegetable poison the plant *Odina Pennata*)।

পালি ভাষায় "মাংস" শব্দ প্রচলিত ভাষায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু এখানে তাহা হইলে—"মাংস"-এর পরিবর্ত্তে "মদ্দব" শব্দ কেন ব্যবহৃত হইয়াছে—তাহাই অনুধাবনের বিষয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই বিষয়টীর বিশেষ সন্ধান করেন নাই। তাঁহারা অনেকেই অনভিজ্ঞতাবশতঃ এবং কেহ কেহ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া, এইরূপ অর্থপ্রা অনুবাদ করিয়াছেন। যিনি অহিংসা-শুক্ল-ধর্ম্ম জগতে স্থাপন করিবার মানসে চিরজীবন সাধনা করিয়া গিয়াছেন এবং যাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার সময়,—"আমি কখনও প্রাণি হত্যা করিব না" এই প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হইতে হয়, তাঁহার জীবনে, তাঁহার উদ্দেশ্যের প্রতিকূল ভাব দেখাইয়া—তাঁহার ধর্ম্মের হেয়ত্ব প্রতিপন্ন করাও অনেক পাশ্চাত্য অনুবাদকের অভিপ্রায়। সেইজন্য তাঁহারা বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম্মের অনেক বিষয়ে এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন—এ অনুমান যে আমাদের মিথ্যা নহে, তাহার কয়েকটী ঘটনা ও অনুবাদ আমরা নিম্নে উল্লেখ করিলাম।

বুদ্ধদেবের জীবনী লেখকগণের মধ্যে পালিভাষাবিদ্ ইংরাজ লেখক—T. W. Rhys David, একজন প্রধান ব্যক্তি। তাঁহার এবং অন্যান্য কয়েকজন লেখকের গ্রন্থ হইতে বাঙ্গালা ভাষার লেখকগণ প্রায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের গ্রন্থে বুদ্ধদেবের জীবনী সম্বন্ধে অনেক ভ্রমপূর্ণ ঘটনা উক্ত হইয়াছে। আমাদের বাঙ্গালা ভাষায় আমরা এই সকল ভ্রম পূর্ণমাত্রায় শিক্ষা করিয়া, তাহা সত্য বলিয়া, সিদ্ধান্ত করিতেছি। যাঁহারা হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মের গ্রন্থ প্রচার ও আলোচনা করিতেছেন, তাঁহাদের অনেকেরই উদ্দেশ্য খ্রীষ্ট ধর্ম্মের উপাদেয়ত্ব ও অন্যান্য ধর্ম্মের হেয়ত্ব প্রতিপন্ন করা, সে অভিসন্ধি তাঁহাদের নিজেদের উক্তিতে প্রতিপন্ন হইয়াছে।

T. W. Rhys Davidএর *Buddhism* অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ, প্রথম শিক্ষার্থী এই গ্রন্থ প্রথম পাঠ করেন। David সাহেব ৬০ পৃষ্ঠায় লিখিতেছেন,

On reaching Pava, he is entertained by a Goldsmith of that place named Chunda who prepared for him a meal of rice and young pork.

যদিও তিনি এ বিষয়ে একটু সন্দেহ করিয়াছেন, তথাপি তিনি শূকর-মদ্দবকে শূকরমাংস বলিয়া অনুবাদ করিতে ভুলেন নাই। এই গ্রন্থখানির প্রকাশক "Society for Promoting Christian Knowledge" মিশনারীগণের প্রচারের সুবিধার জন্য অন্যান্য ধর্ম্মের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে।

Sir Monier Williams তাঁহার "Buddhism Contrasted With Christianity" গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"The story is that Gautama died from eating too much pork (or dried boar's flesh)

(গৌতমবুদ্ধ অত্যধিক পরিমাণে শূকরমাংস ভোজন করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন)।

মহাপরিনিব্বাণসুত্রের মূল অনুবাদ করিলে, তাহার ইংরাজী প্রতিশব্দ dried boar's food হয়; কিন্তু উইলিয়াম সাহেব আবার তাহার উপর অত্যধিক (too much) কথাটী প্রয়োগ করিয়াছেন। বাংলার কোন কোন অনুবাদকও এই অত্যধিক শব্দটির ব্যবহার করিয়াছেন। উইলিয়াম সাহেব উদ্দেশ্য যে খৃষ্টধর্ম্মের প্রাধান্য স্থাপন, তাহা তাঁহার পুস্তকের নামেই পরিস্ফুট রহিয়াছে। এইরূপ বহু ইংরাজ অনুবাদক ভ্রমপূর্ণ অনুবাদ করিয়াছেন।

তদনন্তর জার্ম্মানীর পণ্ডিতগণের মধ্যে—

H. Hackmann তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "Buddhism as a Religion, Its Historical Development and its Present Conditions"এ লিখিয়াছেন—"Arriving in a small place called 'Pava', he was invited to a meal by a smith, Chunda by name. This meal consisting of boar's flesh brought.

back his illness (page 5)। কিন্তু পাদটীকায় লিখিয়াছেন :

...Some scholars disagree about the meaning of the term used for that meal 'Sukar Maddamun' asserting that it was a kind of mushroom named after boars, but that is doubtful.

অন্যান্য পণ্ডিতগণ মদ্দবকে mushroom অর্থাৎ ছত্রাক বলেন, তাহা সমীচীন নহে, এই অর্থ অনিশ্চিত।

এইরূপ ভ্রমপূর্ণ অনুবাদ হইতে সকলেরই এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে যে, বুদ্ধদেব অন্তিম সময়ে অতিরিক্ত শূকরমাংস ভক্ষণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তাহার পর যখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক স্বর্গত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার "বুদ্ধদেব" নামক গ্রন্থে ও শ্রীযুক্ত ব্রজগোপাল নিয়োগী মহাশয় তাঁহার "মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্রের" বাঙ্গালা অনুবাদে শূকরমাংস শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, তখন এই ধারণা দেশবাসীর আরও দৃঢ় বদ্ধমূল হইয়াছে।

কিন্তু কোন কোন অপক্ষপাতী লেখক ঠিক অনুবাদ করিয়াছেন যথা,—বিখ্যাত Dr. Paul Carus তাঁহার "The Gospel of Buddha" নামক গ্রন্থের ২১১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

' He (Chunda) came to Buddha and respectfully invited him and the brethren to take their meal at his house. And Chunda, prepared rice, cakes and quantity of dried boar's wort"

Colonel Olcott, যিনি বৌদ্ধ-প্রধান দেশে বৌদ্ধ গ্রন্থের প্রচার ও অনুবাদ করাইয়া খৃষ্টীয় মিশনারীগণের হস্ত হইতে বুদ্ধদেবের বিমল উপদেশ ও সাধন-প্রণালী প্রচার করিয়াছেন, তিনি শূকর-মদ্দব সম্বন্ধে বলেন, শূকর শব্দের অর্থ boar এবং মদ্দব শব্দের অর্থ– delicious or sweet boar's delight, যাহা শূকরগণের অতি প্রিয় খাদ্য। এ বিষয়ে তিনি ও অন্যান্য পালিভাষাবিদ্ পণ্ডিতগণ 'শূকর-মদ্দব' শব্দের অর্থের যে অভিমত প্রচার করিয়াছেন, তাহা Journal of the Mahabodhi Society'র 1892, December, ৩৯ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে।

বিখ্যাত পণ্ডিত Max Muller তাঁহার "পূর্ব্বদেশীয় অধিবাসিগণের ধর্ম্মগ্রন্থ" (Sacred Books of the East) নামে ৪৯ খানি গ্রন্থ সম্পাদন ও প্রচার করিয়াছেন। তাহার ৩৫ খণ্ডে 'মিলিন্দ-প্রশ্ন' গ্রন্থে এই "শূকর-মদ্দব" শব্দের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। এস্থলেও "মদ্দব" শব্দ যদিও বাংস অর্থে অনুবাদিত হইয়াছে, তথাপি অনুবাদকর্ত্তা Dr. Rhys David বাধ্য হইয়া টীকাকার ধর্ম্মপালের টীকা আংশিক অনুবাদ করিয়াছেন। মদ্দব অর্থে যে, ছত্রাক (বেঙের ছাতা) তাহা স্বীকার করিয়াছেন। অনুবাদকর্ত্তা ও সম্পাদকের উদ্দেশ্য যদি সত্য প্রচার হয়, তাহা হইলে, তাঁহারা অকপট ভাবে অনুবাদ প্রচার করিবেন, কিন্তু যদি তাঁহাদের অন্য উদ্দেশ্য থাকে, তাহা হইলে সেই উদ্দেশ্যকে মুখ্য করিয়া তাঁহারা অন্যের ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিবেন, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। সেই উদ্দেশ্যে এই প্রাচ্য দেশে বিশেষতঃ ভারতবর্ষে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের প্রচার জন্য ইংলণ্ডবাসী ও অন্যান্য খ্রীষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বিগণ মিশনারি প্রেরণ করিয়া যে-চেষ্টা করিতেছেন, সেই চেষ্টায় সফলতার জন্য Max Muller জীবনব্যাপী পরিশ্রম করিয়া বেদাদি শাস্ত্র প্রচার করিয়াছেন, একথা তিনি স্বয়ং নিজের গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন যথা,—

"It should be shown to the natives of India, that the religion which the Brahmans teach is no longer the religion of the Veda, though the Veda alone is acknowledged by all as the only divine source of faith. A Hindu who believes only in the Veda would be much nearer to Christianity than those who follow the Purans or the Tantras".

Chips from a German Workshop Vol. I page 309

"Under these circumstances it was felt that nothing would be of greater assistance to the missionaries in India than an Edition of the Veda".

Chips from a German Workshop Vol. I page 309

ইহা ব্যতীত তাঁহার Physical Religion এবং Natural Religion গ্রন্থে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম-প্রচারক মিশনারিগণের সহায়তা করিবার জন্যই তিনি কঠোর পরিশ্রম করিয়া বেদ মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়াছেন।

Rockhill সাহেব তিব্বতীয় ভাষা হইতে বুদ্ধদেবের জীবনী সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহাতে শূকরমাংসের কথা কিছুমাত্র নাই।

বর্ত্তমান সময়ে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-প্রচারিত দেশে মাংসাহার প্রথা বিশেষ প্রচলিত আছে। বর্ম্মা, তিব্বত, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে পূর্ব্বে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল না। ধর্ম্মরাজ রাজা অশোক দেশে দেশে প্রচারক পাঠাইয়া এই ধর্ম্ম প্রচার করেন। সিংহল দেশে তাঁহার প্রিয় পুত্র মহেন্দ্রকে প্রচারের জন্য পাঠাইয়া দেন। কিন্তু যে-দেশে যে-আচার তাহা সমূলে পরিবর্ত্তিত হয় নাই। সেই জন্য পূর্ব্ব আচার এখনও প্রবল আছে। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের ইতিহাসে এরূপ উক্ত হইয়াছে যে, যে সকল দেশে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ শুক্লধর্ম্মে (অহিংসা ধর্ম্মের নামান্তর) প্রচার করিতে গিয়াছিলেন, সে দেশের অধিবাসিগণ নরমাংসভোজী, তাহারা অনেক ভিক্ষুকে বধ করিয়া আহার করিয়া ফেলিয়াছে, অথচ ধর্ম্মপ্রবণ ভিক্ষুগণ সেই সকল স্থানে মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়াও ধর্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন। আজ সেই জন্য মঙ্গোলিয়া, তাতার, কোরিয়া দেশেও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

সংবাদ ও মন্তব্য

মিঃ নেহরুর স্বীকারোক্তি

গত ৮ই মার্চ্চ তারিখে ত্রিপুরায় কংগ্রেস অধিবেশন সম্বন্ধে কংগ্রেস প্রধানদের আলোচনা করিয়া পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বলেন: যতদিন আমরা গ্রামবাসিগণের দুর্দ্দশা দূরীকরণ বিষয়ে চিন্তা না করিব, ততদিন ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে চিন্তা করা হইবে না। আমি নিজেকে সমাজতান্ত্রিক বলিয়া মনে করি। আমি চাই যে, যতদিন দেশে তাঁতাদের পাওয়া যাইবে, ততদিন দেশের সব বস্ত্র-পরিচালিত শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রসার হউক। কিন্তু যন্ত্র-পরিচালিত শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিষ্ঠার দ্বারা দুর্দ্দশার সমস্যা দূর হইবে না...।

*

যদি যন্ত্র-পরিচালিত শিল্প-প্রতিষ্ঠার সাহায্যে দেশবাসীর অন্নাভাব দূর করাই সম্ভব না হয়, তবে গ্রামবাসীর দুর্দ্দশা-নিবারণের ব্যাপারে উহার কোন কার্য্যকারিতা থাকিতে পারে না। গ্রামবাসীর দুর্দ্দশা-নিবারণই যখন পণ্ডিত জওহরলালজীর অভিমতে, ভারতীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার মূল কথা, তখন আজ অনশন, কাল আইন-অমান্য, পরশ্ব সত্যাগ্রহ, হরতাল এবং আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি লইয়া পায়তাড়া ভাঁজার কি সার্থকতা? আমরা কথায় বলিতে গেলে গ্রামবাসীর প্রয়োজন, দুই মুঠা অন্ন, পরিধানের বস্ত্র, স্বাস্থ্য এবং শান্তি। ভারতের গ্রামবাসীদের অধিকাংশই চাষী। সুতরাং তাহার চাষ যদি লাভজনক হয়, তবেই তাহার প্রয়োজনীয় সামগ্রীলাভের ব্যবস্থা সম্ভব। যদি মিঃ নেহরু সত্য স্বীকারে লজ্জিত না হন, তবে তাঁহাকে মানিতেই হইবে যে, কংগ্রেসের মধ্যে এমন কেহই—এমন কি তাহার বাপুজী পর্য্যন্ত—নাই, যিনি এ বিষয়ে কর্ত্তব্য কি, তাহা পরিজ্ঞাত আছেন কিংবা তাহার জন্য চিন্তা করিয়াছেন। সুতরাং মিঃ নেহরুর কথা হইতেই ধরিতে হয় যে, কংগ্রেস হইতে ভারতীয় স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করা হইতেছে না। আমরা কি অন্যায় কথা বলিলাম?

কুটিরশিল্প ও যন্ত্রশিল্পের বিরোধ সম্বন্ধে মিঃ নেহরু

ঐ একই বক্তৃতায় জওহরলাল উল্লেখ করেন: যন্ত্র-শিল্প এবং কুটীর-শিল্পে যাহাতে বিরোধ না বাধে, তাহা আমাদিগকে দেখিতে হইবে। পুঁজিবাদের অনুকূলে যন্ত্র-শিল্প গঠন করা চলিবে না, তাহাতে উপার্জ্জনের সামান্য কিছু অংশ মুষ্টিমেয় ব্যক্তির পকেটস্থ হইবে। এই মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে পুঁজি থাকিবার ফলে লক্ষ লক্ষ ব্যক্তিকে দারোদ্ঘাটন হইবেই পাশের পড়িয়া মাথায় হাত পায়ে ফেলিতে হইবে।

*

মিঃ নেহরু কথাটা বলিয়াছেন হয়তো ভালই, কিন্তু দুঃখের বিষয় উহা কার্য্যে প্রয়োগের অযোগ্য। কেন না যন্ত্র-শিল্পে ও কুটীর-শিল্পে বিরোধ বাধিবে না, এই ইচ্ছা

পোষণ করিবার কোন অর্থই হয় না। যেখানে বহু-শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইবে, সেখানেই কোন না কোন প্রকারে কুটীর-শিল্পের অবসান হইতে বাধ্য। কেবল কুটীর-শিল্পের অবসান নহে, বহু-শিল্প প্রতিষ্ঠার ফলে কৃষকের পক্ষে কৃষিকার্য্য লাভজনক হইবার অন্তরায়ও উপস্থিত হইতে বাধ্য; তাহার স্বাস্থ্য-শান্তিও বহু-শিল্পের কবলান্বিত হইয়া অন্তর্হিত হইবে। ইহাই বাস্তব সত্য। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেই ইহার সত্যতা নজরে পড়ে। মিঃ নেহরু হয় ত মনে মনে এমন একটি স্বপ্নরাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছেন, যেখানে বহু শিল্পও থাকিবে, পুঁজিবাদীও থাকিবে না এবং লক্ষ লক্ষ লোকের সুখ-শান্তি ও বজায় থাকিবে। কিন্তু ইহা রূপকথায় সম্ভব, মাটির পৃথিবীতে সম্ভব নহে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সমস্যায় বোম্বাইয়ের লাট

১লা মার্চ্চ তারিখে বোম্বাই সহরে বিশ্ববিদ্যালয় কনফারেন্সে উদ্বোধন করিয়া বোম্বাইয়ের লাট সাহেব বলেন: গত শতাব্দীর শেষ ভাগে ভারতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার দ্রুত বিস্তার হইবার ফলে দেশের মধ্যে বহু সমস্যা দেখা দিয়াছে এবং ঐ একই কালে বাহিরে পৃথিবী-বিধ্বংসকারী ঘটনাসমূহের সংঘাত উপস্থিত হওয়ায় এই সকল সমস্যা আরও জটিল এবং দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে।

●

আমেরা লাট সাহেবের এই বক্তৃতায় বর্ত্তমান বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রসূত সমস্যার অস্তিত্ব স্বীকারের কথা দেখিয়া খুসী হইয়াছি। কিন্তু আরও খুসী হইতাম, যদি তিনি যাহাকে পৃথিবী-বিধ্বংসকারী ঘটনাসমূহ বলিয়াছেন, বক্তৃতায় তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতেন। বক্তৃতায় তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন যে, বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রধানতঃ চরিত্র গঠনের প্রাথমিক সোপান এবং বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতেই লোকসমাজে ধর্ম্মাদর্শ্যাদি সূর্য্যালোকের ন্যায় সঞ্চারিত হয়। ভাল কথা। কিন্তু পৃথিবী-বিধ্বংসকারী ঘটনাসমূহ যে সব দেশে ঘটিয়াছে, বর্ত্তমান বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আদি জননী সেই সকল দেশ। তথায় লোকসমাজে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এই প্রাথমিক কার্য্যের ফল পরিলক্ষিত হইতেছে না কেন? সুতরাং মনে করা যাইতে পারে যে, বিশ্ব-বিদ্যালয় শিক্ষা-প্রসূত সমস্যা কেবল ভারতেই সীমাবদ্ধ নহে, অন্যত্রও বিদ্যমান। তাহা হইলে কি স্বীকার করিতে হইবে না যে, এই শিক্ষাটাই কু-শিক্ষা এবং ইহার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন আবশ্যক?

বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতিত্ব

১১ই মার্চ্চ তারিখে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান ভাইস-চ্যান্সেলর খাঁ বাহাদুর আজিজুল হক্ বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন সভায় সভাপতির অভিভাষণে বলেন: আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের জাতীয় জীবন ও চিন্তাধারাকে গভীর ভাবে নাড়া দিয়াছে।

তা যে দিয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় আমাদের নাই। কিন্তু ভূমিকম্প যেরূপ নাড়া দেয়, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নাড়া দিবার ভঙ্গীও আমাদের জাতীয় জীবনে ও চিন্তাধারার প্রায় অনুরূপ হইয়াছে—ইহা কি খাঁ বাহাদুর চারিদিকে চাহিয়া বুঝিতে পারিতেছেন না? দেশের সুখ-সমৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যের ভিত্তিকে ধরাশায়ী করিবার জন্যই কি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সৃষ্টি!

জ্ঞান-বিস্তারে বিশ্ববিদ্যালয়

খাঁ বাহাদুর তাঁহার ঐ বক্তৃতায় বলিয়াছেন: বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞানের পরিধি বাড়াইয়া দিয়াছে এবং ইহারই ফলে লোকে আজ সাহিত্য, কলা ও বিজ্ঞানের মর্য্যাদা দিতে শিখিয়াছে।

●

জ্ঞানের পরিধি বাড়িবার অর্থ যদি অভাবের বৃদ্ধি হয়, তবে বিশ্ব-বিদ্যালয় নিশ্চয়ই জ্ঞানের পরিধি বাড়াইয়াছে এবং 'হরিদাসের গুপ্তকথা'র পরিবর্ত্তে 'চরিত্রহীন' পাঠ করিলে, কালীঘাটের পটুয়ার পটের ও রাস্তার পাঁচালীর পরিবর্ত্তে বর্ত্তমান যুগের আধিকৃত ভারতীয় শিল্পকলা ও টকিতে অনুরাগী হইলে, মাটির পরিবর্ত্তে সাবান দ্বারা হস্তপ্রক্ষালন করিলে যদি সাহিত্য, কলা ও বিজ্ঞানের মর্য্যাদা দান করা হয়, তবে তাহা হইয়াছে নিশ্চয়ই। রুচি কিংবা ফ্যাশনের পরিবর্ত্তনকে যদি সাহিত্য, কলা ও বিজ্ঞানের মর্য্যাদা-বৃদ্ধি বলিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ চালাইতে চাহেন তাহা হইলেই কি তাহা চলিবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতা তৈয়ারী

ঐ বক্তৃতায় ঐ সাহেব আরও বলিয়াছেন: কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে রাষ্ট্রক্ষেত্রে, অর্থনীতির ক্ষেত্রে, সমাজে, শিক্ষাক্ষেত্রে

এবং বিজ্ঞানক্ষেত্রের জন্য নেতৃত্বের তৈয়ারী হইয়াছেন। সমাজে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনের আভাস যথেষ্ট দেখা দিয়াছে।

•

রাষ্ট্রক্ষেত্রের নেতা বলিতে যদি দলাদলি পাকাইবার গুরুঠাকুর, অর্থনীতি ক্ষেত্রের নেতা বলিতে যদি বিলাতী কি ভার্গানি মালের আমদানীকার, সমাজের নেতা বলিতে যদি মার্ক্সপন্থী, শিল্পক্ষেত্রের নেতা বলিতে যদি এলেন্স ও গ্রো-বিক্রেতা এবং বিজ্ঞানক্ষেত্রের নেতা বলিতে যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরীরা বুঝায়, তাহা হইলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই সমস্ত প্রকার নেতা তৈয়ারীর এক্সচেটিয়া ব্যবসায়ের গৌরব করিতে পারেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে নেতা কলের পুতুল নয়। নেতাও থাকিবে, অথচ সকল ক্ষেত্রেই সমান বিশৃঙ্খলা থাকিবে, এমন পরস্পর-বিরোধিতার রাজ্যের নায়ক কি পুতুল নহে?

দেশের সংস্কৃতি

উপসংহারে খাঁ বাহাদুর আজিজুল হক ছাত্রদের উদ্দেশে বলিয়াছেন: আজীবন গবেষণায় তোমরা মনোযোগী হও। যেন স্বকীয় ঐতিহ্য ও অতীতে সম্পূর্ণ আস্থা থাকে। যেন আমরা প্রাচ্য, তথা ভারতীয় জাতির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গৌরব বোধ করিতে পারি। যেন স্বকীয় সংস্কৃতির অমূল্য সম্পদকে না অবহেলা করি।

•

কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কনভোকেশন বক্তৃতা সাঙ্গ করিয়া এইরূপ হুঙ্কার-নিনাদ, আজ খাঁ বাহাদুর আজিজুলই প্রথম করিলেন না। ইতিপূর্বে তব আশুতোষ এবং তব পুত্র ডক্টর শ্যামাপ্রসাদও এইরূপ ভাবেই গর্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষা লাভ করিয়া এই সকল সম্বন্ধে উদ্বুদ্ধ হইয়া তদনুযায়ী কার্য করিবার ব্যক্তি আমরা চারি পার্শ্বে দেখিতে পাইতেছি না কেন, ইহাই সমস্যা এবং সেই সমস্যার সমাধানের কর্তব্যই কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলারের প্রাথমিক কর্তব্য হওয়া উচিত। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে ভারতের ঐ ঐতিহ্য রক্ষার যে ব্যবস্থা এতাবৎ হইয়াছে, তৎসত্ত্বেও কেন এই সকল শিক্ষিত ব্যক্তিই এম্-এল্-এ হইয়া বীর বিক্রমে পরস্পর পরস্পরকে গালিগালাজ করিতেছেন এবং স্বীকারের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাইতেছেন—আর কিছু না হউক, খাঁ বাহাদুর আজিজুল হক মাত্র এইদিক্ হইতে দেখিলেও আমাদের উক্তির তাৎপর্য হয়তো বুঝিতে পারিবেন।

ভারতীয় খাদ্য ও স্বাস্থ্য

গত ৭ই মার্চ তারিখে ভারতীয় সরকারের সার্জন জেনারেল মেজর-জেনারেল সি. এস. মিলস্ খাদ্য বিষয়ে একটি বক্তৃতায় বলিয়াছেন: ভারতের অনেক ব্যক্তিকে অপ্রচুর খাদ্যের উপর জীবন নির্বাহ করিতে হয়।

•

এই সমস্যার নিমিত্ত কে দায়ী তাহা সার্জন-জেনারেল উল্লেখ করেন নাই। মিলস্ সাহেব যদি সার্জন-জেনারেল না হইয়া ভারত সরকারের ফিনান্স মেম্বার, কিংবা ঐ প্রকার কার্যের দায়িত্ব পাইতেন, তাহা হইলেও কি তিনি এই কথাই বলিতেন?

আইনের ব্যাখ্যা

৭ই মার্চ তারিখে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠাকুর ল-লেকচার দিয়া অধ্যাপক মে. এচ. মর্গান বলিয়াছেন: আইন চুক্তির বিষয় মত নহে, অভিজ্ঞতার ব্যাপার মত।

•

কিন্তু কাহার অভিজ্ঞতার ব্যাপার, তাহা মর্গান সাহেব বলেন নাই, চোরের না বিচারকের?

ধর্মঘট ও বিশ্ববিদ্যালয়

৭ই মার্চ তারিখে ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন বক্তৃতা বদি করিয়া স্যর তেজ বাহাদুর সাপ্রু বলিয়াছেন: বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষায় কলেই দেশের সর্বত্র স্বাধীনতা ও উন্নতির নিশা দেখা দিয়াছে।

•

তিনি তাঁহার বক্তৃতায় দেশব্যাপী ছাত্র-ধর্মঘটের হিড়িকেরও কিছু নিন্দা করিয়াছেন। ইহাকে কিন্তু স্বাধীনতার লিপ্সার প্রয়োগ বলিয়া মার্জনা করেন নাই।

ভারতের গো-সংখ্যা

১১ই মার্চ তারিখে বাঙ্গালোর হইতে ইন্ডিয়ান কেটাইনারি রিসার্চ ইন্স্টিটিউটের এক বক্তৃতায় ডাক্তার বড়লাট বাহাদুর বলিয়াছেন: ভারত পৃথিবীর গো-সংখ্যার এক-চতুর্থাংশ এবং মহিষের দুই-তৃতীয়াংশ ধারণ করে। প্রায় ৯ কোটি ১০ লক্ষ ভেড়া ও ছাগল বর্তমান।

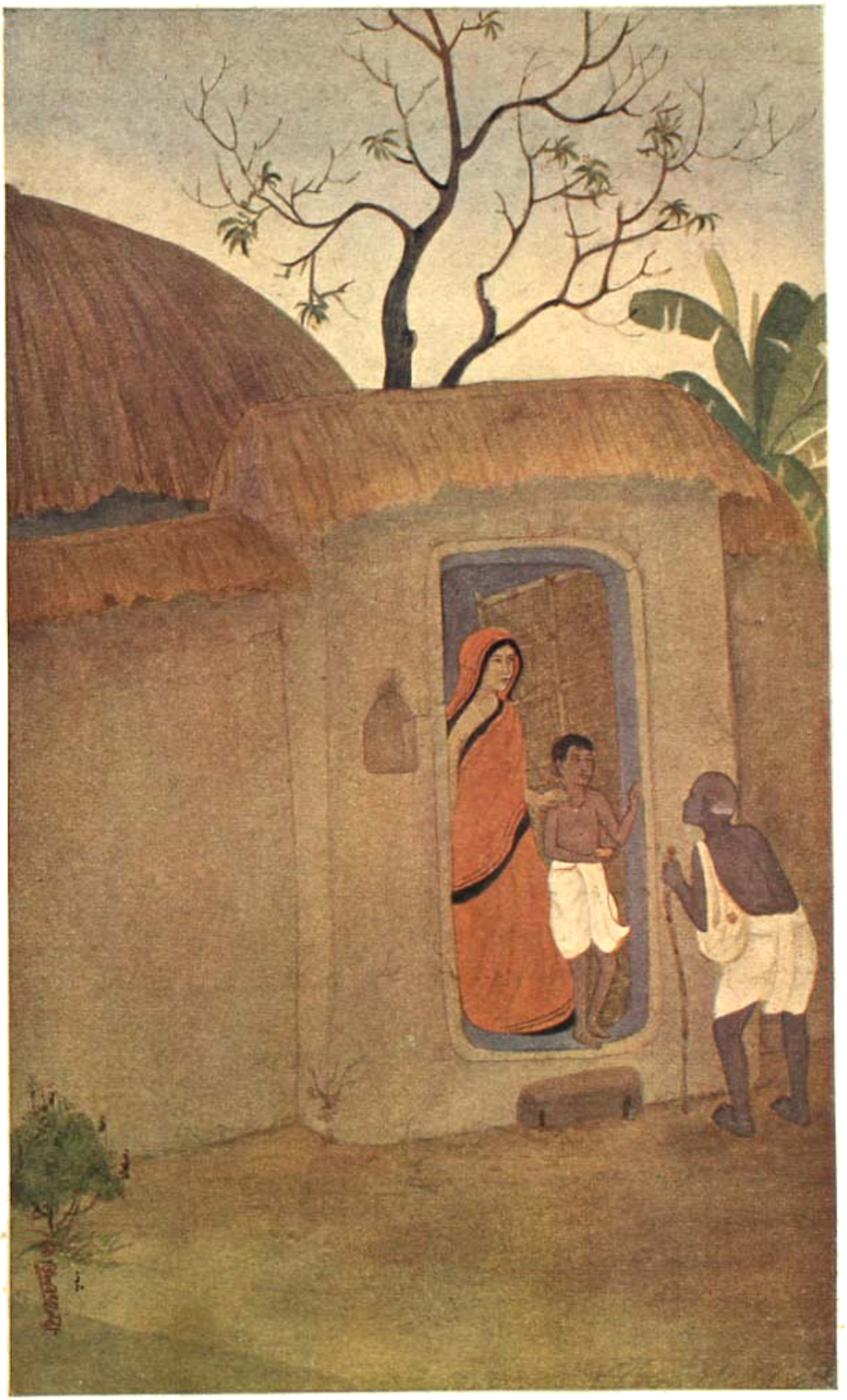

"লক্ষ্মীস্ত্বং ধান্যরূপাসি প্রাণিনা প্রাণদায়িনী"

বঙ্গশ্রী

বৈশাখ—১৩৪৬

৭ম বর্ষ, ১ম খণ্ড—৪র্থ সং

সম্পাদকীয়

—শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য

কুমিল্লা সাহিত্যসম্মেলন ও ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

গত ডিসেম্বরের অবসর-দিবসে কুমিল্লায় বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মেলনের অষ্টাদশ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই অধিবেশনের মূল সভাপতি ছিলেন ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। আচরিত নিয়মানুসারে সভাপতি একটী বক্তৃতা 'পাঠ' করিয়াছেন। সুনীতিকুমারের বক্তৃতাকে সুদীর্ঘ বলা যাইতে পারে। তিনি নিজেই তাঁহার বক্তৃতাকে যে বিষয়ে বিভক্ত করিয়াছেন তদনুসারে উহা মতের ভাগে বিভক্ত, ঐ মতের ভাগের নাম—

(১) মুখবন্ধ।

(২) উনবিংশ শতকের চতুর্থ পাদের ইংরেজী শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজ।

(৩) বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের প্রথম সাহিত্যের অবস্থা।
বাঙ্গালা ভাষার সাহিত্যের পত্তন।
মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্য।
ভারতীয় আর্য্য ভাষাসমূহের স্থান।
মানবসমাজের প্রধান বন্ধন ভাষা।
রাষ্ট্রীয় জীবনে ভাষার জাতীয়তাবোধ।
পক্ষে বাঙ্গালা।

(১০) বাঙ্গা ভাষা।

(১১) কিরূপে সমাধান।

(১২) নূতন যুগ-সন্ধি।

(১৩) সাহিত্যের প্রকৃতি, গতি ও আদর্শ।

(১৪) সুনীতি ও দুর্নীতির প্রশ্ন।

(১৫) সাধু ভাষা ও চলিত ভাষা।

(১৬) বাঙ্গালা বানানে বিশৃঙ্খলা।

(১৭) বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মেলনের সংহার।

ডক্টর সুনীতিকুমার তাঁহার বক্তৃতায় যে মতেরই বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন, আমাদিগের মতে কোনটীই তিনি আমূল ভাবে চিন্তা করেন নাই, ঐ ঐ বিষয় আমূল ভাবে চিন্তা করিতে হইলে

যে সামর্থ্যের প্রয়োজন, তাহা অর্জন করিবার দৌভাগ্য তাঁহার হয় নাই। ফলে তাঁহার বক্তৃতায় যে তথ্যগুলি প্রকাশ পাইয়াছে, উহা প্রায়শঃ ভ্রম-প্রমাদে পরিপূর্ণ এবং তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাশীল শিক্ষার্থী যুবকগণের জ্ঞানোৎপাদক আমাদিগের মন্তব্য যে যুক্তিযুক্ত, তাহা দেখাইবার জন্য উপরোক্ত সভেরটী বিষয়ে তিনি উল্লেখযোগ্য যে যে কথা বলিয়াছেন, একে একে আমরা তাহার সমালোচনা করিব।

ডক্টর সুনীতিকুমারের মুখবন্ধ

মুখবন্ধে ডক্টর সুনীতিকুমার যে যে কথা বলিয়াছেন, তাহা হইতে বুঝিতে হয় যে, যাঁহাদের "রস-সাহিত্যের দরবারে কোনও স্থান নাই, পদার্থবিদ্যা বা রসায়ন বা অন্য কোনও ফলিত বিজ্ঞানে যাহাদের প্রবেশ হয় নাই এবং ঐ বিজ্ঞানের আলোচনা যাহাদিগের ক্ষমতার বাহিরে, তাহাদিগের পক্ষে কোন সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতিত্ব না করাই সঙ্গত। তাঁহার মুখবন্ধের কথা-গুলি হইতে আরও বুঝিতে হয় যে, এতাদৃশ সভা ও সম্মেলন সাহিত্য-বিদ্যার উন্নতিপক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় এবং কোন সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতিত্ব করিতে হইলে যে যে বিদ্যা একান্ত প্রয়োজনীয় তাহা যদিও তিনি অর্জন করিতে পারেন নাই, তথাপি তিনি একজন বিদ্বান্ এবং "শিক্ষাজীবী" হিসাবে জ্ঞান বিতরণ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।

কোন সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতিত্ব করিতে হইলে কোন্ কোন্ বিদ্যা একান্ত প্রয়োজনীয়, তদ্বিষয়ে আমরা এই সন্দর্ভে কোন কথা বলিতে চাহি না, কারণ তাহা বলিতে হইলে বহুবিধ প্রসঙ্গের অবতারণা করিতে হইবে এবং তাহা এখানে সম্ভব নহে। আমা-দিগের মতে কোন সভা অথবা সম্মেলনের দ্বারা কোন বিদ্যার প্রকৃত উন্নতি করা সম্ভব হয় না। যাঁহারা কোন বিদ্যার অথবা জ্ঞানের প্রকৃত উন্নতিকামী অথবা যাঁহারা প্রকৃতপক্ষে বিদ্বান্ অথবা জ্ঞানী, তাঁহারা কখনও কোন সভা অথবা সম্মেলনে যোগদান করিতে পারেন না। পরন্তু, তাঁহারা সভা ও সম্মেলন হইতে দূরে থাকিতে বাধ্য হইয়া থাকেন। বিদ্যা অথবা জ্ঞান অর্জ্জন করিতে হইলে মুখ্যতঃ মন ও বুদ্ধির কার্য্যের প্রয়োজন হয় এবং ঐ কার্য্য কখনও লোক-কোলাহলের মধ্যে নির্ব্বাহ করা সম্ভব হয় না। এই জন্যই ব্যাসদেব তাঁহার গীতার ১৩শ অধ্যায়ের ১০ম শ্লোকে প্রকৃত জ্ঞান অর্জ্জন করিবার পন্থা নির্দ্দেশ করিতে বসিয়া "অরতির্জ্জনসংসদি" অর্থাৎ জন-সভা হইতে দূরে থাকিবার উপদেশ দিয়াছেন। ব্যাসদেব আরও বলিয়াছেন যে, যাঁহারা উহার বিপরীত আচরণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে "অজ্ঞানী" বলিতে হয়। এই হিসাবে, যদিও ডক্টর সুনীতিকুমার নিজেকে বিদ্বান্ বলিয়া প্রচার করিয়া থাকেন এবং কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কৃপায় যদিও তিনি শিক্ষাজীবী, তথাপি প্রকৃতপক্ষে তাঁহার বিদ্যা ও শিক্ষাজীবিত্বের যথার্থতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে হয়।

আজকালকার সভা-সমিতির যুগে সভা-সমিতি যে প্রকৃত বিদ্যার উন্নতির বিরোধী, তাহা শুনিলে হয়ত অনেকেই শিহরিয়া উঠিবেন। তাঁহারা হয়ত আরও বলিবেন যে, সভা-সমিতি করিয়াই তো পাশ্চাত্যগণ বিবিধ বিদ্যার এত উন্নতি করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিবার সামর্থ্য অর্জ্জন করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, পাশ্চাত্যগণ কোন বিদ্যারই প্রকৃত উন্নতি সাধন করিতে সক্ষম হন নাই, পরন্তু তাঁহারা সরল বিষয়গুলিকে জটিল করিয়া তুলিয়া-ছেন এবং গত দুই শত বৎসর হইতে বিদ্যাক্ষেত্রের প্রত্যেক শাখাটীকে অন্ধকারময় হইতে অধিকতর অন্ধকারময় করিয়া ফেলিয়াছেন। ইহারই জন্য আজ অন্নপূর্ণার বিশ্বে এত অন্নাভাব দেখা দিয়াছে এবং মুখ্যতঃ অন্নাভাবের জন্যই যে মনুষ্য-সমাজের মধ্যে এত মারামারি দেখা দিয়াছে, তাহা পর্য্যন্ত বুঝিবার ক্ষমতা পাশ্চাত্যগণ হারাইয়া ফেলিয়াছেন।

ঊনবিংশ শতকের চতুর্থ পাদে ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজ

এই প্রসঙ্গে ডক্টর সুনীতিকুমার যে যে কথা বলিয়াছেন, তাহা হইতে মুখ্যতঃ বুঝিতে হয় যে,

ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী তাহার মাতৃভাষার সাহিত্য সম্বন্ধে জাগ্রত হইয়াছে এবং ঐ জাগরণের আরম্ভ হইয়াছে উনবিংশ শতকের চতুর্থ পাদে।

"সাহিত্য" বলিতে যদি "রস-সৃষ্টি" অথবা "রসে"র নামে পান-ভোজনের এবং যৌন ব্যবহারের উচ্ছৃঙ্খলা বুঝিতে হয়, তাহা হইলে ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজে যে সাহিত্য সম্বন্ধে জাগরণ দেখা দিয়াছে, তদ্বিষয়ে অস্বীকার করা যায় না বটে, কিন্তু "রস" ও "ভাবে"র সম্বন্ধ কি, তদ্বিষয়ে মন ও বুদ্ধির জাগরণ আনয়ন করা সাহিত্যের প্রধান দায়িত্ব, ইহা স্বীকার করিয়া লইলে ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজ তো দূরের কথা, প্রকৃত সাহিত্য যে এখনও জগতের মনুষ্য-সমাজে কুত্রাপি দেখা দেয় নাই, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

"সাহিত্য" যে একটা ভাল জিনিষ এবং উহা যে মানুষের মঙ্গলপ্রদ, একমাত্র তাহা স্বীকার করিয়া লইলেই, বর্ত্তমান মনুষ্য-সমাজের কুত্রাপি যে প্রকৃত সাহিত্যের অভ্যুদয় হয় নাই, ইহা অস্বীকার করা যায় না। ইহা অস্বীকার করিতে হইলে অন্ততঃপক্ষে মনুষ্য-সমাজে যে শান্তি ও সুখ বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা প্রমাণিত করিতে হয়।

যখন পরিষ্কার দেখা যাইতেছে যে, মনুষ্য-সমাজের সুখ ও শান্তি ক্রমশঃই হ্রাস পাইতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন মানুষ আজকাল যাহাকে সাহিত্যের জাগরণ বলিয়া মনে করিতেছে তাহা যে প্রকৃত সাহিত্যের জাগরণ নহে, পরন্তু কু-সাহিত্যের জাগরণ, তাহা কোন ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত ভাবে অস্বীকার করা যায় না।

সংস্কার পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত শব্দ-বিজ্ঞানের ধারানুসারে বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, স্মরণাতীত কালে লিখিত ইতিহাসের অনেক আগে বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় একদিন প্রকৃত সাহিত্য রচিত হইয়াছিল। ঐ সাহিত্যের কোন গ্রন্থ এখন আর পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু তাই বলিয়া পুরাকালে কোন দিন বাঙ্গালা ভাষায় প্রকৃত সাহিত্য বিদ্যমান ছিল না, ইহা মনে করা চলে না। বাঙ্গালার অক্ষর-মালা এবং তাহার লিখন-প্রণালী বৈজ্ঞানিকভাবে আলোচনা করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, উহার মধ্যে অসাধারণ সাহিত্য-জ্ঞানের পরিচয় রহিয়াছে। শুধু বাঙ্গালার অক্ষরমালা এবং তাহার লিখন-প্রণালী কেন, হিন্দী, গুজরাটী, উর্দ্দু, ফারসী, ল্যাটীন, গ্রীক, জার্ম্মান, ইংরাজী প্রভৃতি যে কোন ভাষার অক্ষরমালা এবং তাহার লিখন-প্রণালী ধরা যাউক না কেন, উহার প্রত্যেকটীর মধ্যে অসাধারণ সাহিত্য-জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যাইবে এবং দেখা যাইবে যে, উহার কোনটীরই অক্ষরমালার ক্রম ও লিখন-প্রণালী আধুনিক কোন বৈজ্ঞানিকের দ্বারা আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহা ছাড়া আরও দেখা যাইবে যে, ডক্টর সুনীতিকুমার-শ্রেণীর তথাকথিত ভাষাবিদ্‌গণ অনেক রকমের অনেক আস্ফালন করিয়া থাকেন বটে এবং প্রকৃত পক্ষে পণ্ডিত না হইয়াও পাণ্ডিত্যের অভিনয় করেন বটে, কিন্তু কবে যে ঐ অক্ষরমালার ক্রম ও লিখন-প্রণালী নির্ণীত হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে আধুনিক কালের কেহই কিছু যুক্তিযুক্ত ভাবে বলিতে পারেন না এবং উহার বৈজ্ঞানিকতাও বুঝিতে সক্ষম নহেন।

ঐ বৈজ্ঞানিকতা বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, একদিন প্রত্যেক দেশের মানুষের পক্ষে ভাষার লৌকিকাংশের বিভাগ নির্দ্ধারণ করা সম্ভববোগ্য হইয়াছিল এবং উহা সম্ভববোগ্য হইয়াছিল বলিয়াই কালক্রমে সংস্কৃত ভাষার অভ্যুদয় হইতে পারিয়াছিল। পাণিনি-বার্ত্তিকের "সিদ্ধে শব্দার্থসম্বন্ধে লোকতঃ, লোকতোঽর্থপ্রযুক্তে শব্দপ্রয়োগে শাস্ত্রেণ ধর্মনিয়মঃ", এই সূত্রটী বুঝিতে পারিলে আমাদিগের উপরোক্ত কথার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভববোগ্য হইবে।

আজকালকার সাধারণ ধারণা যে, সংস্কৃত ভাষায় শব্দ-বিজ্ঞান অথবা Philology বিদ্যমান নাই। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ঐ ধারণা আদৌ সত্য নহে। সংস্কৃত ভাষায় শব্দ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ বিদ্যমান রহিয়াছে। পাণিনি, নিরুক্ত, পূর্ব্ব-মীমাংসা, উত্তর-মীমাংসা, শিক্ষা, কল্প, সাংখ্যদর্শনিক, প্রপঞ্চসার ঐ গ্রন্থসমূহের অন্যতম।

পাইয়াছে। ইহারই জন্য বোধ হয় সাহিত্যের নামে কু-সাহিত্য প্রসার লাভ করিতেছে।

"বাক্" ও "বাঙ্ময়" কাহাকে বলে তাহা জানিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, বাঙ্ময়ের জ্ঞানের অভিমান-হীন ও আত্মপ্রচারপ্রবৃত্তিহীন সেবক না হইলে কখনও "বাক্"-সম্বন্ধীয় কোন যথাযথ জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয় না।

আজ মানুষ উলটা বুঝিতেছে এবং তাহার ফলে সে উলটা ফল লাভ করিতে বাধ্য হইতেছে।

আমাদিগের শিক্ষা-দীক্ষানুসারে বাক্ ও বাঙ্ময়-সম্বন্ধীয় কথা চেঁচাইয়া বলা চলে না। উহার সেবক হইতে হইলে ঠোঁট বুজিয়া চুপ করিয়া জিহ্বা ও টাক্‌রার মধ্যবর্তী "কালী"-রূপী কার্য্যকে অনুধাবন করিতে হয়। ডক্টর সুনীতিকুমার ও তাঁহার দল উহার অনধিকারী। মনুষ্যের মস্তিষ্কে যে বস্তু সাধারণতঃ বিদ্যমান থাকে সেই বস্তু যদি অবিকৃত অবস্থায় ডক্টর সুনীতিকুমারের মস্তিষ্কে থাকিত তাহা হইলে তিনি বাক্ ও বাঙ্ময়ের কথা চেঁচাইয়া বলিবার প্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত থাকিতেন, ইহা আমাদিগের ধারণা।

এই প্রসঙ্গে ডক্টর সুনীতিকুমারের শেষ কথা—

"যে সকল স্বপতি বঙ্গবাণীর হেঁউল গড়িয়া তুলিয়াছেন, যে সকল শিল্পী ভাস্কর্য্যে, চিত্রে, অলঙ্করণে এই হেঁউলকে মহিমাময় করিয়া তুলিয়াছেন, আমার মত ভাষাতাত্ত্বিকের স্থান তাঁহাদিগের বহু নিম্নে; ভাষা-তাত্ত্বিক ভাষার মাটিকাটা মজুর মাত্র।"

আধুনিক বিজ্ঞানানুসারে যাহাকে ভাষাতত্ত্ব বলা হইয়া থাকে, এবং যে ভাষাতত্ত্বের কয়েক পৃষ্ঠা উল্টাইয়া—ডক্টর সুনীতিকুমার নিজেকে ভাষাতাত্ত্বিক বলিবার স্পর্দ্ধা পোষণ করিয়া থাকেন, সেই ভাষাতত্ত্ব যে মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান-ক্ষেত্রে বিভ্রান্তির অন্যতম প্রধান কারণ এবং উহার সাধক যে ভাষাতাত্ত্বিক তাঁহার স্থান যে অতীব ঘৃণার্হ, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই বটে, কিন্তু প্রকৃত ভাষাতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, ঐ তত্ত্ব অতীব মহিমাময় এবং মনুষ্য-সমাজের মঙ্গল-সাধন বিষয়ে উহার সেবকের স্থান সর্ব্বোচ্চ। বস্তুতঃপক্ষে ভাষাতত্ত্বে যথাযথভাবে নিপুণতা লাভ করিতে না পারিলে মানুষ কখনও ব্রাহ্মণ অথবা মুনি অথবা ঋষিপদবাচ্য হইতে পারে না—ইহা ভারতীয় ঋষিগণের সিদ্ধান্ত। চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, যথাযথভাবে ভাষাতত্ত্বের উদ্ভব না হইলে কখনও প্রকৃত সাহিত্যের উদ্ভব হইতে পারে না।

কাযেই বলিতে হয় যে, ডক্টর সুনীতিকুমারের উপরোক্ত বিনয় প্রকৃত ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার অজ্ঞতার সাক্ষ্য।

বাঙ্গালাভাষার সাহিত্যের পত্তন

এই প্রসঙ্গে ডক্টর সুনীতিকুমার যাহা যাহা বলিয়াছেন তাহার মূল কথা—

"বাঙ্গালা দেশ বিদেশী তুর্কীদের দ্বারা বিজিত হইবার কিছু পূর্ব্বে খৃষ্টীয় ১২০০ সনের পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষা জন্মগ্রহণ করিয়াছে, বাঙ্গালা ভাষার সাহিত্যের পত্তন হইয়াছে"—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতনভোগী একজন অধ্যাপক বাঙ্গালা ভাষার জন্মগ্রহণ সম্বন্ধে কি বলিতেছেন তাহা পাঠকগণ লক্ষ্য করুন।

আমাদিগকে কি বুঝিতে হইবে যে, এমন একদিন ছিল যখন বাঙ্গালা দেশ বিদ্যমান ছিল বটে এবং বাঙ্গালীও বিদ্যমান ছিল বটে, কিন্তু বাঙ্গালা ভাষা বিদ্যমান ছিল না অর্থাৎ সমস্ত বাঙ্গালী বোবা ছিল? অথবা জগতে এমন একদিন ছিল যখন বাঙ্গালা দেশ বিদ্যমান ছিল বটে, কিন্তু তথায় একজনও বাঙ্গালী ছিল না এবং উহার অধিবাসিগণ সর্ব্বতোভাবে অবাঙ্গালী ছিল?

ইহার পর যদি আমরা বলি যে, "বলিহারি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে যাঁহারা এমন মানুষকেও যুবকগণের শিক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করিতে পারেন, এবং যাহারা আনন্দবাজার পত্রিকাকে যাঁহারা এমন মানুষেরও জয়ঢাক পিটাইতে পারেন, তাহা হইলে কি আমাদিগের কোন অসঙ্গত কার্য্য হইবে?

বাঙ্গালী শিক্ষিত ও সাহিত্যিক সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা তাহার সাহিত্য-সম্মেলনের মূল সভাপতির উপরোক্ত কথা হইতে পাঠকগণ বিচার করুন। আমাদিগের মতে আধুনিক শিক্ষার ফলে ইহারা পশুবৎ লজ্জাহীন হইতে পারিয়াছেন তাই ইহারা সভা-সমিতি করিতে এবং এতাদৃশ মানুষগুলিকে সভাপতির পদে বরণ করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন না।

মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্য

এই প্রসঙ্গে ডক্টর সুনীতিকুমারের শেষ কথা—

"বাঙ্গালী আজকাল তাহার পূর্ব্বকথা জানিতে উৎসুক হইয়াছে—সাধারণ শিক্ষিত বাঙ্গালীর মন এ বিষয়ে যে অনেকটা সংস্কারমুক্ত ইহা তাহার মানসিক সংস্কৃতির পক্ষে গৌরবের কথা। তাহার জাতির উৎপত্তি, ভাষার উৎপত্তি, সাহিত্যের উৎপত্তি, ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ এসব বিষয়ে অনাবিল সত্য যাহা, তাহা উদ্‌ঘাটন করিবার মত সাহস ও সাধুতা তাহার হইয়াছে। আমার মনে হয়, এই শুভ অবসরে, আমাদিগের আত্মজ্ঞান সত্যের আধারের উপরে, যুক্তি-তর্কের ভিত্তির উপরে, সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য, বৈজ্ঞানিকের নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বাঙ্গালীর প্রাচীন সংস্কৃতি ও সাহিত্যের আলোচনা নূতন করিয়া আরম্ভ করা উচিত। এই কার্য্যে বিজ্ঞানসম্মত ভাষাতত্ত্ব যতটুকু পারিয়াছে করিয়াছে, এবং আরও সহায়তা করিবার জন্য সদা প্রস্তুত রহিয়াছে।"

বাঙ্গালীর প্রাচীন সংস্কৃতি ও সাহিত্যের আলোচনা যে বৈজ্ঞানিকের নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে নূতন করিয়া আরম্ভ করা উচিত তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই তাহা সত্য, কিন্তু ডক্টর সুনীতিকুমার এই কথাগুলি বুঝিয়া বলিয়াছেন কি না, তদ্বিষয়ে আমাদিগের সন্দেহ আছে।

বাঙ্গালীর সর্ব্বপ্রাচীন সংস্কৃতি ও সাহিত্য সম্বন্ধে সত্যের উদ্‌ঘাটন করিতে হইলে বাঙ্গালার অক্ষরমালার ক্রম ও লিখন-প্রণালীসম্বন্ধীয় বিজ্ঞান আবিষ্কার করিতে হইবে। তখন বাঙ্গালী একদিন সে কত বড় জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিকারী হইতে পারিয়াছিল এবং পরবর্ত্তী কালের যাহাদিগের গৌরবে আমরা গৌরবান্বিত বলিয়া মনে করি তাঁহারা যে ক্রমশঃ কত অধিক পতিত হইয়াছিলেন এবং আমাদিগের বর্ত্তমান গৌরবপ্রবৃত্তি যে কত অসার ও ভিত্তিহীন তাহা বুঝা যাইবে। কিন্তু এই সত্যের উদ্‌ঘাটন করিবে কে? যদি কেহ মনে করেন যে, ডক্টর সুনীতিকুমার-শ্রেণীর তথাকথিত ভাষাতাত্ত্বিক অথবা সভা-সমিতি-বিলাসী কোন সাহিত্যিক উহা করিতে পারিবেন তাহা হইলে তিনি অচিরে তাঁহার ভ্রান্তি বুঝিতে পারিবেন, ইহা আমাদিগের অভিমত। যিনি মনুষ্য-সমাজের সর্ব্ব-প্রাচীন সংস্কৃতি ও সাহিত্যসম্বন্ধীয় সত্যের উদ্‌ঘাটন করিবেন তাঁহার সৃষ্টি হইবে "কালের" হাতে। এই "কাল" যে কি বস্তু তাহা পর্য্যন্ত মানুষ এখন আর বুঝিতে পারে না, অথচ এই "কাল"ই মানুষের জন্ম, বৃদ্ধি, হ্রাস ও ক্ষয়ের মুখ্য কারণ। মানুষ তথাকথিত শিক্ষার কুফলে এতখানি অন্ধ হইয়া পড়িয়াছে। অজ্ঞতা মনুষ্য-সমাজকে সম্পূর্ণভাবে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। তথাপি মঙ্গলময়ীর মঙ্গল কার্য্যের ফলে বাগ্‌দেবী-রূপিণী "কালী"র প্রকৃত সাধকের দেখা যে অদূর ভবিষ্যতে পাওয়া যাইবে তাহা "কাল"-কে প্রত্যক্ষ করিতে পারিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে। যদি ডক্টর সুনীতিকুমার প্রভৃতি বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রাচীন সংস্কৃতি ও সাহিত্য সম্বন্ধে সত্যের উদ্‌ঘাটন করিতে সত্য সত্যই প্রয়াসী হইয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহাদিগকে তাঁহাদিগের বর্ত্তমান শিক্ষা হইতে সংপ্রাপ্ত সংস্কারগুলির পরীক্ষায় নিযুক্ত হইতে হইবে। তজ্জন্য তাঁহাদিগের আত্মপরীক্ষা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। ঐ আত্ম-পরীক্ষায় নিযুক্ত হইলে দেখিতে পাইবেন যে, তখন আর আধুনিক সভা-সমিতিতে যোগদান করিবার অথবা সভাপতিত্ব করিবার প্রবৃত্তি বিদ্যমান থাকিবে না। ইহারই জন্য আমরা বলিতেছিলাম যে ডক্টর সুনীতিকুমার তাঁহার এই প্রসঙ্গের উপরোক্ত কথাগুলি বুঝিয়া বলিয়াছেন কি না, তদ্বিষয়ে আমাদিগের সন্দেহ আছে।

ভারতীয় আর্য্যভাষাসমূহের মধ্যে বাঙ্গালীর স্থান

এই প্রসঙ্গে ডক্টর সুনীতিকুমার যে যে কথা বলিয়াছেন তাহার মধ্যে "ভারতীয় আর্য্য ভাষাসমূহের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষার স্থান" সম্বন্ধে একটিও চিন্তার যোগ্য কথা আমরা খুঁজিয়া পাই নাই। পরন্তু উহাতে প্রকৃত ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞতার সাক্ষ্য রহিয়াছে।

তিনি বলিতেছেন—

"আধুনিক ভারতীয় আর্য্যভাষাগুলির মধ্যে বাঙ্গালার স্থান অতি উচ্চে, কারণ বাঙ্গালা সংস্কৃতবহুল ভাষা। সংস্কৃত শব্দের প্রাচুর্য্য, প্রাকৃত বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃত ভাষার সৌন্দর্য্য ও শক্তি আনয়ন করিয়া দিয়াছিল।"

তাঁহার উপরোক্ত উক্তিতে দুইটী ভুল রহিয়াছে। তিনি বাঙ্গালা ভাষাকে প্রাকৃত বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ভাষার লৌকিকত্ব ও বৈদিকত্ব কাহাকে বলে এবং কি হইলে ভাষা প্রাকৃতত্ব ও সংস্কৃতত্ব লাভ করে তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, প্রাদেশিক ভাষার প্রত্যেকটীকেই এক একটী লৌকিক ভাষা বলিয়া অভিহিত করিতে হয়। উহার কোনটীকে কোনক্রমেই প্রাকৃত ভাষা বলা চলে না। অবশ্য এই ভুল তাঁহার একেলার নহে। যাঁহারা ভাষাতত্ত্বে প্রবেশ লাভ না করিয়া তাঁহার মত ভাষাতাত্ত্বিকের অভিনয় করিয়া থাকেন তাঁহাদিগের অনেকেই এতাদৃশ ভুল করিয়া আসিতেছেন।

দ্বিতীয়তঃ, সংস্কৃতবহুল ভাষা হইলেই কোন ভাষা উচ্চ স্থান লাভ করিতে পারে না। তাহা যদি পারিত তাহা হইলে হিন্দী, গুজরাটি, মারাঠী প্রভৃতি প্রত্যেক প্রাদেশিক ভাষাকেই উচ্চ-স্থানীয় বলিয়া অভিহিত করিতে হয় এবং তখন প্রাদেশিক সমস্ত ভাষাই এক স্থান লাভ করে, উচ্চ ও নীচের কোন কথা থাকে না। কারণ, প্রত্যেক প্রাদেশিক ভাষাতেই সংস্কৃত ভাষার শব্দের প্রচুর ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

পাণিনি-বার্ত্তিকের "সিদ্ধে শব্দার্থসম্বন্ধে লোকতঃ লোকতোঽর্থপ্রযুক্তে শব্দপ্রয়োগে শাস্ত্রেণ ধর্মনিয়মঃ" —এই সূত্রটী বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, লৌকিক ভাষা হইতেই সংস্কৃত ভাষার উদ্ভব হইয়া থাকে এবং প্রত্যেক প্রাদেশিক ভাষাতেই সংস্কৃত ভাষার শব্দ বহুল পরিমাণে থাকিতে বাধ্য। ভারতের প্রাদেশিক ভাষাগুলির প্রত্যেকটী পরীক্ষা করিলেই আমাদিগের কথার সত্যতা প্রতিপন্ন হইবে।

এই প্রসঙ্গে ডক্টর সুনীতিকুমার আরও বলিয়াছেন যে—

"বঙ্গ-ভঙ্গের আন্দোলনে বাঙ্গালী নিজেকে আবিষ্কার করিল, তাহার রাষ্ট্রনৈতিক আকাঙ্ক্ষাকে প্রত্যক্ষ করিল, তাহার ভাষা ও সাহিত্যকে ঘরে ও বাহিরে উভয়ত্র সংহতির এক প্রচণ্ড শক্তির আকর বলিয়া দেখিতে পাইল। ১৯১৩ সালে বঙ্গভঙ্গের আট বৎসর পরে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের দরবারে তাঁহার বাঙ্গালা কবিতার জন্যই যশের মুকুট পরিয়া আসিলেন। তাঁহার নোবেল পারিতোষিকপ্রাপ্তি দ্বারা একদিকে যেমন বঙ্গ-ভারতীর ও সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় বাঙ্ময়ের মুখ উজ্জ্বল হইল, অন্যদিকে তেমনি বাঙ্গালীর ভাষা ও সাহিত্য লইয়া গর্ব্বের ভিত্তি যেন আরও সুদৃঢ়ীকৃত হইল।"

আমাদিগের মতে ডক্টর সুনীতিকুমারের এই মতবাদও অর্থহীন। রবীন্দ্রনাথের নোবেল পারিতোষিকপ্রাপ্তি যে কোন্ যুক্তিবলে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের কোন বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষের নিদর্শন হইতে পারে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। বাঙ্গালায় কবিতা লিখিয়া রবীন্দ্রনাথ নোবেল পারিতোষিক পাইয়াছেন। অতএব বাঙ্গালাভাষা ভাষা ও সাহিত্য হিসাবে বৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত, এতাদৃশ যুক্তি ডক্টর সুনীতিকুমার ও তাঁহার অনুচরবর্গের পক্ষে শোভনীয় হইতে পারে, কিন্তু উহার মধ্যে কোন সারবত্তা আছে কি না, তাহা পাঠকবর্গ বিচার করুন। আমাদিগের মতে, বাঙ্গালা ভাষায়, ভাষা ও সাহিত্য হিসাবে কোন বৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্য না থাকিলেও কবিতার ভাব-প্রাধান্যবশতঃ, অথবা রবীন্দ্রনাথের আত্ম-প্রচার-কার্য্যের নৈপুণ্যবশতঃ, অথবা রাজনৈতিক কারণে

অথবা নোবেল পারিতোষিকের পরীক্ষকগণের পরীক্ষা-নৈপুণ্যের অভাববশতঃ রবীন্দ্রনাথের পক্ষে নোবেল পারিতোষিকপ্রাপ্তি সম্ভব হইতে পারে। যদি আবার কখনও প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিকের উদ্ভব হয় তখন দেখা যাইবে যে, নোবেল সাহেব সদিচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া নোবেল পারিতোষিক বিতরণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু যে কোন কারণেই হউক, যাঁহাদিগের লেখায় মানবসমাজ বিভ্রান্তিতে প্রণোদিত হইয়া সর্বনাশগ্রস্ত হইয়াছে, তাঁহাদিগেরই অনেকে নোবেল পারিতোষিক পাইতে সক্ষম হইয়াছেন। যেহেতু রবীন্দ্রনাথ নোবেল-পারিতোষিক পাইতে সক্ষম হইয়াছেন, অতএব তিনি একজন প্রকৃত কবি অথবা সাহিত্যিক, এতাদৃশ যুক্তিবাদও শোভনীয় কি না তাহা বিচারসাপেক্ষ।

ইহার পর ডক্টর সুনীতিকুমার বলিতেছেন যে,—

"উনবিংশ শতকে ইংরেজের অনুগামী বাঙ্গালী, ইংরেজী শিক্ষায় ভারতের গুরুস্থানীয় ছিল; বিংশ শতকের প্রারম্ভে, স্বদেশী আন্দোলনের যুগে এবং তাহার পরে, বাঙ্গালী রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়ে এবং স্বাধীনতার সংগ্রামে নিখিল-ভারতের অবিসংবাদিত নেতা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বিংশ শতকের সেই স্বল্পকাল-স্থায়ী গৌরব এখন অস্তমিত। অবস্থাগতিকে এবং তাহার নিজের বিষয়বুদ্ধির ও সংহতি-শক্তির অভাবে, বাঙ্গালীকে সব বিষয়ে হটিয়া আসিতে হইতেছে।"

"ভারতীয় আর্য্য-ভাষাসমূহের মধ্যে বাঙ্গালার স্থান" কোথায় তাহার আলোচনা-স্থলে ডক্টর সুনীতিকুমারের উপরোক্ত কথাগুলির প্রাসঙ্গিকতা যে কি তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। আমাদিগের মতে তিনি "ধান ভানিতে শিবের গীত" গাহিয়াছেন। বিচ্ছিন্ন ভাবে দেখিলে দেখা যাইবে যে, রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়ে এবং স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙ্গালী যে একদিন সর্বভারতের নেতৃত্বপদে সমাসীন হইতে পারিয়াছিল তাহা ভাবিয়া অনেক বাঙ্গালী গর্বানুভব করেন বটে, কিন্তু অনধিক কাল পরেই কেন যে বাঙ্গালীকে ঐ নেতৃত্বপদ হইতে হটিয়া আসিতে হইয়াছে তাহা ভাবিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, উহার প্রধান কারণ — যে স্বাধীনতা-বাদ ও রাষ্ট্রনীতিবাদ লইয়া বাঙ্গালী সর্বভারতের নেতৃত্বপদ পাইয়াছিল, সেই স্বাধীনতা-বাদ ও রাষ্ট্রনীতিবাদের অসারতা। বাঙ্গালী এক্ষণে বুঝুক আর না-ই বুঝুক, যে বাঙ্গালী পাশ্চাত্যের অনুকরণে এতাদৃশ অসার স্বাধীনতাবাদ ও রাষ্ট্রনীতি বাদ ভারতবর্ষে ছড়াইতে পারিয়াছে, সেই বাঙ্গালীকেই ভারতের বিপথগামিতার ও ক্রমিক দারিদ্র্যের পরোক্ষ ভাবে অন্যতম কারণ বলিয়া অভিহিত করিতে হইবে। কাযেই, এতদ্বিষয়ে বাঙ্গালীর প্রকৃতপক্ষে গর্ব করিবার কিছুই নাই। পরন্তু, অনুতপ্ত হইয়া ইংরেজের অনুকরণ না করিয়া স্বাধীন ভাবে পুনরায় তাহাকে রাষ্ট্রনীতি-ক্ষেত্রে নূতন পন্থার আবিষ্কার করিতে হইবে এবং তাহা যতদিন পর্যন্ত সে না করিতে পারিবে, ততদিন পর্যন্ত তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করিতে হইবে।

মানব-সমাজের প্রধান বন্ধন ভাষা

এই প্রসঙ্গে ডক্টর সুনীতিকুমারের মুখ্য কথা—

"প্রাচীন কালে Nationalism বা জাতীয়তা, সামাজিক জীবনে বড় স্থান পায় নাই; কিন্তু তাহাকে অবলম্বন করিয়া সম-ভাষী জনগণ ঐক্যের একটা সূত্র পাইত।.....কিন্তু ভাষাগত জাতীয়তা বরাবরই কেন্দ্রাপসারিতার দিকে কার্য্য করিয়াছে।"

ডক্টর সুনীতিকুমারের উপরোক্ত সিদ্ধান্ত একদিকে ভারতের প্রাচীনতম ইতিহাস, পদি প্রণীত সাহিত্য ও শাস্ত্র সম্বন্ধে অজ্ঞতার পরিচায়ক, অন্য দিকে পরস্পর-বিরোধী। "ভাষাকে অবলম্বন করিয়া সম-ভাষী জনগণ ঐক্যের একটা সূত্র পাইত", এই কথা বলিয়া পুনরায় "ভাষাগত জাতীয়তা বরাবরই কেন্দ্রাপসারিতার দিকে কার্য্য করিয়াছে", এতাদৃশ কথা বলিলে আমাদিগের মতে পরস্পর-বিরোধী (self contradictory) কথা বলা হয়। আমাদিগের বিশ্বাস, মস্তিষ্কে যে পদার্থ থাকিলে কোন বৈজ্ঞানিক অথবা দার্শনিক ভাব নিখুঁত ভাবে প্রকাশ করা সম্ভব হয়, সেই পদার্থ ডক্টর সুনীতি-

কুমারের নাই। কাজেই তাঁহার পক্ষে কোন দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ভাব নিখুঁত ভাবে প্রকাশ করা অথবা বুঝিয়া উঠা সম্ভব নহে। আত্মাভিমান, আত্মপ্রচার-প্রবৃত্তির প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া আত্মবিশ্লেষণের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে ডক্টর সুনীতিকুমার আমাদিগের কথা বুঝিতে পারিবেন এবং তখন অপ্রাপ্তবয়স্ক ছাত্রের মত আবার ক, খ হইতে আরম্ভ করিয়া লেখাপড়ায় প্রবৃত্ত হইলে হয় ত এই জীবনেই আবার একটা মানুষের মত মানুষ হইতে পারিবেন।

প্রাচীন কালে Nationalism বা জাতীয়তা সামাজিক জীবনে স্থান পাইয়াছে অথবা পায় নাই, এতদ্বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে ঋষিপ্রণীত সমস্ত গ্রন্থ অভিনিবেশসহকারে অধ্যয়ন করিতে হয়। ঋষিপ্রণীত গ্রন্থের কোন অনুবাদ অধ্যয়ন করিয়া মূল পুস্তকের বক্তব্য বুঝিয়া উঠা সম্ভব নহে। ঋষিপ্রণীত সমস্ত গ্রন্থ তো দূরের কথা, কোন একখানি গ্রন্থের মূলভাগ ডক্টর সুনীতিকুমার অধ্যয়ন করিয়াছেন কি? আমাদিগের বিশ্বাস, তাহা তিনি করেন নাই। যদি তাহা করিতেন তাহা হইলে "প্রাচীন কালে জাতীয়তা সামাজিক জীবনে স্থান পায় নাই", এতাদৃশ কথা তিনি বলিতে পারিতেন না। অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, কোন্ কোন্ বিষয় লইয়া এবং কোন্ কোন্ কারণে জীবের মধ্যে সমতা (অর্থাৎ জাতীয়তা) ও বৈশিষ্ট্যের (অর্থাৎ ব্যক্তিত্বের অথবা individualityর) উৎপত্তি হয় তাহা যত সবিধিক ও অকাট্য ভাবে ঋষিপ্রণীত শাস্ত্রে ও সাহিত্যে আলোচিত হইয়াছে তাদৃশভাবে আর কোনও গ্রন্থে আলোচিত হয় নাই। পাশ্চাত্যগণ এতৎসম্বন্ধে যে যে কথা বলিয়াছেন তাহা ডক্টর সুনীতিকুমার-শ্রেণীর বহুলসম্পন্ন মানুষ গলাধঃকরণ করিতে পারেন বটে, কিন্তু তাহার একটী কথাও প্রায়শঃ বিচারসহ নহে। "যথা, অর্থজাতয়ঃ সর্ব্বাঃ শব্দাকৃতিনিবন্ধনাঃ" ...অর্থাৎ "যেহেতু শব্দের আকৃতিনিবন্ধন 'অর্থ' ও 'জাতি'র অস্তিত্ব ঘটিয়া থাকে...এই কথাটি ঋষি-সাহিত্যেরই একটি বাক্য। জাতীয়তার কথা যে ঋষি-যুগেও স্থান পাইয়াছিল, ইহা তাহার প্রমাণ। ইহা ছাড়া আরও অনেক প্রমাণ আছে। তাহা এই সন্দর্ভে উদ্ধৃত করিতে হইলে অযথা ইহার কলেবর বৃদ্ধি পাইবে।

রাষ্ট্রীয় জীবনে ভাষাগত জাতীয়তা-বোধ

এই প্রসঙ্গে ডক্টর সুনীতিকুমারের উল্লেখযোগ্য অন্যতম কথা—

"আমাদিগের ভারতবর্ষে প্রাচীনকালে ভাষাগত জাতীয়তা-বোধের বিশেষ অবকাশ ছিল না। আর্য্য এবং অনার্য্য এই দুই মুখ্য ভাষা স্বীকৃত হইত।"

ডক্টর সুনীতিকুমারের উপরোক্ত কথা শুনিলে মনে হয় যেন তিনি ভারতবর্ষের সমস্ত প্রাচীন সাহিত্য ও শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং তাহা অধ্যয়ন করিয়া ভারতবর্ষে প্রাচীন কালে কি ছিল অথবা কি ছিল না তাহা স্থির করিয়াছেন। অথচ পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, ঋষি-প্রণীত শাস্ত্র ও সাহিত্য তো দূরের কথা, পরবর্ত্তী ভট্ট, আচার্য্য ও মিশ্র প্রভৃতি পণ্ডিতগণের প্রণীত যে-সমস্ত গ্রন্থ আধুনিক তীর্থ উপাধীধারী সংস্কৃত প্রবেশার্থীরা অধ্যয়ন করিয়া থাকেন তাহার একখানিও পর্য্যন্ত তিনি অধ্যয়ন করেন নাই, অথবা অধ্যয়ন করিয়া থাকিলে তাহার কোন-খানিতেই তিনি প্রবিষ্ট হইতে পারেন নাই।

ভারতবর্ষের প্রাচীন কালে ভাষাগত জাতীয়তা-বোধের অবকাশ যদি না-ই হইয়া থাকে তাহা হইলে "যথা, অর্থজাতয়ঃ সর্ব্বাঃ শব্দাকৃতিনিবন্ধনাঃ —" এতাদৃশ বাক্যের উদ্ভব হয় কি করিয়া তাহা ডক্টর সুনীতিকুমার ভাবিয়া দেখিবেন কি?

ডক্টর সুনীতিকুমারের যদি ঋষিপ্রণীত শাস্ত্র ও সাহিত্যে প্রবেশলাভ করিবার সৌভাগ্য থাকিত তাহা হইলে তিনি জানিতে পারিতেন যে, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ঐ ঋষিপ্রণীত শাস্ত্র ও সাহিত্যের অন্যতম প্রধান আলোচ্য :—

(১) জগৎ ও জীবের মূল কারণ কি?

(২) জগৎ ও জীবের মূল কারণকে প্রত্যক্ষ করিবার উপায় কি ?

(৩) এই অণু ও পরমাণুবিশিষ্ট যে জগৎ আছে, তাহা ছাড়া অণু ও পরমাণুহীন আর কোন "লোক" বিদ্যমান আছে কি না ?

(৪) অণু ও পরমাণুবিহীন আর যে চারিটী লোক (অর্থাৎ মহঃ, জন, তপ ও সত্য) বিদ্যমান আছে তাহা প্রত্যক্ষ করিবার উপায় কি ?

(৫) মুখ্যতঃ যে পাঁচটী বস্তু জগৎ ও জীবের মূল কারণ তাহার প্রত্যেকটী অণু-পরমাণুবিহীন উপরোক্ত ঐ চারিটী অথও লোকে বিদ্যমান আছে কি না ? উহা প্রত্যক্ষ করিবার উপায় কি ?

(৬) সপ্তলোকের অথবা বিশ্বের মূল কারণ কি এবং ঐ কারণকে প্রত্যক্ষ করিতে হয় কোন্ উপায়ে ?

উপরোক্ত ছয়টী বিষয়ের আলোচনায় ঋষিগণ দেখাইয়াছেন যে, সমগ্র বিশ্বের মূল কারণ "ব্যোম" এবং "ব্যোমই" যে সমগ্র বিশ্বের মূল কারণ তাহা কি করিয়া প্রত্যক্ষ করিতে হয় তাহাও তাঁহারা দেখাইয়াছেন। এইখানে মনে রাখিতে হইবে যে, ঋষিগণের ভাষায় জগৎ সমগ্র বিশ্বের একটী অংশ মাত্র এবং "ব্যোম" সর্ব্বতোভাবে আধুনিক Ether-এর অনুরূপ বস্তু নহে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ কাহাকে 'Ether' বলিতেছেন তাহা কতকাংশে ঋষিগণের ভাষায় "বায়ুর" একটী পরিণতি মাত্র। ঋষিগণের বিজ্ঞানের সাধক না হইলে ঋষিগণের ভাষানুসারে "ব্যোম" "বায়ু", "অম্বু" ও "বহ্নি" যে কি বস্তু তাহা সর্ব্বতোভাবে বুঝিতে পারা যায় না। মূলতঃ "অম্বু", "বহ্নি" ও "বায়ু"র মিলনে যাঁহার উৎপত্তি হয় তাঁহার নাম "ব্রহ্ম"। এই "ব্রহ্মকে" জগৎ ও জীবের মূল কারণ বলিয়া তাঁহারা নির্দ্দেশ দিয়াছেন এবং ঐ ব্রহ্মই যে জগৎ ও জীবের মূল কারণ তাহা কি করিয়া প্রত্যক্ষ করিতে হয় তাহাও তাঁহারা দেখাইয়াছেন।

জগৎ ও জীবের মূল কারণ যে "ব্রহ্ম" এবং সর্ব্ব বিশ্বের মূল কারণ যে "ব্যোম" অর্থাৎ "ব্যোম" হইতেই যে "ব্রহ্মে"র উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং "ব্রহ্ম" হইতেই যে অণু-পরমাণু বিশিষ্ট জগৎ ও জীবের উৎপত্তি হইয়া থাকে তাহা কি করিয়া প্রত্যক্ষ করিতে হয় তৎসম্বন্ধে নির্দ্দেশ প্রদান করিয়া, অতঃপর তাঁহারা কি করিয়া এক "ব্যোম" হইতে "ব্রহ্ম" এবং এক "ব্রহ্ম" হইতে বৈচিত্র্যময় জগৎ ও জীবের উৎপত্তি হয় তাহা এক এক করিয়া দেখাইয়াছেন এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে কোন্ বস্তুর সহিত কোন্ বস্তুর স্বাভাবিক সংহতি ও বিরোধ রহিয়াছে এবং কেনই বা ঐ সংহতির ও বিরোধের উৎপত্তি হয় তাহাও তাঁহারা দেখাইয়াছেন।

উপরোক্ত বিষয়গুলি ঋষিগণের চারিটি বেদের ও পুরাণের অন্যতম প্রধান আলোচ্য। এইখানে মনে রাখিতে হইবে যে, আরণ্যক, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ্, গৃহ্যসূত্র ও শ্রৌতসূত্র বেদেরই অংশ। তাঁহারা আরও দেখাইয়াছেন যে, শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, আত্মা, প্রকৃতি, পুরুষ এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এবং ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও আকাশ যে কি বস্তু তাহা বুঝিতে না পারিলে এবং নিজ নিজ শরীরের মধ্যে উহার প্রত্যেকটীকে প্রত্যক্ষ করিয়া শরীরাদিকে বিশেষ নিয়মবিশিষ্ট না করিতে পারিলে "বেদে"র কোন তাৎপর্য্য পর্য্যন্ত নির্ভুলভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব নহে। শরীরাদি, শব্দাদি, ক্ষিত্যাদি যে কি বস্তু তাহা সর্ব্বতোভাবে বুঝিবার জন্য তাঁহাদিগের দর্শন, মীমাংসা এবং বেদাঙ্গ আর ঐ শরীরাদি, শব্দাদি ও ক্ষিত্যাদি নিজ নিজ শরীরের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়া উহার প্রত্যেকটিকে নিয়মাবদ্ধ করিবার জন্য তাঁহাদিগের তন্ত্র।

কোন্ বস্তুর সহিত কোন্ বস্তুর স্বাভাবিক সংহতি ও বিরোধ রহিয়াছে তাহা বেদের যে যে স্থানে দেখান হইয়াছে, সেই সেই স্থানে "জাতি", "সঙ্গ" ও "বর্ণে"র কথা উত্থাপিত হইয়াছে। বেদের ঐ ঐ স্থান বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, "জাতি", "সঙ্গ" ও "বর্ণ-" সম্বন্ধীয় সমস্ত কথাই আমূল ভাবে প্রাচীন ভারতের ঋষিগণের দ্বারা আলোচিত হইয়াছিল।

ইহার পর যদি আবার পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকগণের গ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করা যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, "জাতি", "সঙ্গ" ও "বর্ণ" সম্বন্ধে ঋষিগণের কথা

যত সম্পূর্ণ ও অকাট্য তত সম্পূর্ণতা ও অকাট্যতা পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের চিন্তায় বিদ্যমান নাই, পরন্তু পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ কতকগুলি অবোধ ছেলেমানুষ মাত্র। ইহা ছাড়া আরও দেখা যাইবে যে, ঋষিগণের পরবর্ত্তী যুগের ভারতীয় ভট্ট,আচার্য্য প্রভৃতি তথাকথিত পণ্ডিতগণের বক্সরতা ও দাম্ভিকতার সহিত বর্ত্তমান পাশ্চাত্য দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণের ছেলেমানুষী মিলিত হইয়া বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজে এতাদৃশ নিঃসহায় অবস্থার উৎপত্তি সাধন করিয়াছে।

বেদের ঐ সমস্ত কথা না জানিয়া, অথবা বেদাদি গ্রন্থে যে কি কি বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে তৎসম্বন্ধে কোন যথার্থ ধারণা অর্জ্জন না করিয়া ভারতবর্ষের প্রাচীন কালে কি ছিল অথবা কি ছিল না তাহা বলিতে যাওয়া আমাদিগের মতে একদিকে যেরূপ বক্সরতা ও দাম্ভিকতার পরিচায়ক, অন্যদিকে আবার উহা কোন বিষয়ে পাণ্ডিত্য লাভ না করিয়া পণ্ডিতের নাম লওয়া-রূপ প্রতারণার পরিচায়ক।

"(প্রাচীন ভারতে) আর্য্য এবং অনার্য্য এই দুইটী মুখ্য ভাষা স্বীকৃত", ইহত এই কথাটীও প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে অজ্ঞতার পরিচায়ক।

প্রাচীন ভারতে যে "আর্য্য" এবং "অনার্য্য" নামক দুইটী মুখ্য ভাষা স্বীকৃত হইত তাহা ডক্টর সুনীতি-কুমার ঋষিপ্রণীত কোন গ্রন্থের কোন বাক্য হইতে প্রমাণিত করিতে পারিবেন কি ?

আমাদিগের মতে ঋষিপ্রণীত গ্রন্থসমূহ হইতে আরম্ভ করিয়া ভট্ট, আচার্য্য ও মিশ্রগণের গ্রন্থের সহিত পরিচিত হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, প্রাচীন ভারতে "আর্য্য" ও "শূদ্র"জাতি বর্ণ ও সঙ্কর কথা বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু কুত্রাপি আর্য্য-ভাষা অথবা অনার্য্য-ভাষার কথা বলা হয় নাই। আর্য্য ও অনার্য্য-নামক ভাষাবিভাগ সম্পূর্ণভাবে ডক্টর সুনীতি-কুমারের কল্পনাপ্রসূত। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, অধ্যাপনা-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া এবং তাহার দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করিয়াও তিনি এতাদৃশ অসত্যভাষণে সঙ্কোচ বোধ করেন না। "শিক্ষা"-নামক বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিলে দেখা যাইবে যে, ভাষা প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। ঐ দুই শ্রেণীর নাম প্রাকৃত ও সংস্কৃত। প্রত্যেক শ্রেণীর ভাষার আবার দুইটী বিভাগ আছে; একটী বিভাগের নাম "লৌকিক", আর অপর বিভাগের নাম "বৈদিক"।

"নাট্যশাস্ত্র" অধ্যয়ন করিলে দেখা যাইবে যে, ভাষার লৌকিক বিভাগ হইতে নানারকমের "ভাষে"র উৎপত্তি হয় এবং ঐ ভাষের বিভাগানুসারে ভাষার লৌকিক বিভাগকে প্রধানতঃ ষোলটী ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এতদনুসারে প্রথম-প্রবেশার্থী ছাত্রগণের বিদ্যার জন্য মোটামোটীভাবে ভাষাকে আঠার রকমে শ্রেণী-বিভক্ত করা চলে।

প্রাকৃতলক্ষেশ্বর ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিলে দেখা যাইবে যে, ঐ গ্রন্থানুসারে ভাষা অষ্টাদশ শ্রেণীতে বিভক্ত।

ইহা ছাড়া সাহিত্য-দর্পণ প্রভৃতি পরবর্ত্তী অনেক গ্রন্থে ভাষার শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে অনেক কথা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

ভারতবর্ষীয় প্রাচীন গ্রন্থসমূহে ভাষার শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে এত কথা থাকা সত্ত্বেও যদি ডক্টর সুনীতিকুমার বলেন যে, "প্রাচীন ভারতে আর্য্য ও অনার্য্য, এই দুই মুখ্য ভাষা স্বীকৃত হইত" তাহা হইলে তাঁহাকে কি মনে করিতে হয়, তাহা পাঠকবর্গ বিচার করুন।

ভারতের রাষ্ট্রভাষা হওয়ার পক্ষে বাঙ্গালা ভাষার দাবী

এতৎ-সম্বন্ধে ডক্টর সুনীতিকুমারের উল্লেখযোগ্য কথা দুইটী, যথা,—

(১) পৃথিবীর সংখ্যাকুষ্ঠি জনগণের ভাষার মধ্যে বাঙ্গালা ভাষার স্থান সপ্তম।

(২) বাঙ্গালা ভাষার গৌরব সম্বন্ধে আমরা এতটা স্থিরনিশ্চয় হইয়াছি যে, সমগ্র ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইবার জন্য বাঙ্গালার দাবী যে আর সব ভাষার আগে, একথাও মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছি।

আমাদিগের মতে ডক্টর সুনীতিকুমারের উপরোক্ত দুইটী কথাই প্রকৃত ভাষা-বিজ্ঞান সম্বন্ধে তিনি যে সম্পূর্ণ অজ্ঞ তাহার সাক্ষ্য।

পৃথিবীর সংখ্যাভূয়িষ্ঠ জনগণের ভাষার মধ্যে বাঙ্গালা ভাষার স্থান সপ্তম কি না, তাহা আমরা বলিতে পারি না এবং তৎসম্বন্ধে আমরা কোন মত-বিরোধিতা এই সম্বর্ভে দেখাইব না। আমাদিগের মতে কোন একটী দেশের অধিকাংশ লোক কোন্ ভাষার কথা কহিয়া থাকে ইহা প্রমাণিত হইলেই যে, ঐ ভাষাটীকে সমগ্র দেশের রাষ্ট্রীয় ভাষা বলিয়া ব্যবহার করিতে হইবে, ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে। দেশের প্রত্যেকে যাহাতে সুবিধা ও সাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতে পারে তদনুরূপ বন্দোবস্ত করাই প্রত্যেক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মূলনীতি হওয়া উচিত, ইহা আমাদিগের অভিমত। যে ব্যবস্থায় একজনেরও ন্যায়সঙ্গত ব্যাপারে কোনরূপ অসুবিধা অথবা অসাচ্ছন্দ্য ভোগ করিবার আশঙ্কা হইতে পারে, সেই ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয়নীতিতে সম্পূর্ণ ভাবে নিষিদ্ধ হইবার যুক্তি আছে।

বাঙ্গালা ভাষা ভারতবর্ষের অধিকাংশ অধিবাসীর কথা কহিবার ভাষারূপে ব্যবহৃত হইলেও যাঁহাদিগের মাতৃভাষা বাঙ্গালা নহে, তাঁহাদিগের পক্ষেও ঐ ভাষা রাষ্ট্রীয় ভাষারূপে ব্যবহৃত হইলে বিশেষ অসুবিধাকর হইবে, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। কাজেই, কোন প্রাদেশিক লৌকিক ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষা বলিয়া গ্রহণ করা সঙ্গত নহে। ইংরাজী ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষা বলিয়া গ্রহণ করায় কত শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান্ লোকের কত অসুবিধা ঘটিয়া থাকে এবং তজ্জন্য যাঁহাদিগের মাতৃভাষা ইংরাজী ভাষা নহে তাঁহাদিগকে কত ক্লেশ সহ্য করিয়া, জীবনের কত দীর্ঘ সময় ক্ষেপণ করিয়া ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিতে হয়, অথচ উহা শিক্ষা করিয়াও এক রাষ্ট্রক্ষেত্রে চলাফেরা করিবার কথঞ্চিৎ সুবিধা অর্জ্জন করা ছাড়া জ্ঞান-বিজ্ঞানক্ষেত্রে যে বিশেষ কিছু অর্জ্জন করা সম্ভব হয় না, তাহা সহজেই প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে।

প্রাচীন সংস্কৃত, প্রাচীন হিব্রু এবং প্রাচীন আরবী ভাষা যথাযথভাবে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে জানা যাইবে যে, সূর্য্য ও চন্দ্রের সহিত পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের অবস্থানে যে তারতম্য রহিয়াছে, তদ্বশতঃ বাক্য-প্রকাশে শব্দ-ব্যবহারের যে তারতম্য ঘটিয়া থাকে তাহা বিচার করিয়া ঋষিগণের দ্বারা ঐ তিনটি ভাষা রচিত হইয়াছিল এবং কেবলমাত্র ঐ তিনটি ভাষা পৃথিবীর তিনটি স্বাভাবিক বিভাগের সার্ব্বজনীন ভাষারূপে ব্যবহৃত হইতে পারে।

আমাদিগের উপরোক্ত কথা যে সাধারণ মানুষের পক্ষে বুঝিয়া উঠা দুরূহ তাহা আমরা স্বীকার করি। ঐ কথা বুঝিয়া উঠা যতই দুরূহ হউক না কেন, কোন প্রাদেশিক ভাষা যে কোন দেশের রাষ্ট্রীয় ভাষা হওয়া সঙ্গত নহে তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে। অধিকন্তু, যে বাঙ্গালা ভাষা এত অধিকসংখ্যক মানুষের দ্বারা মাতৃভাষারূপে ব্যবহৃত হওয়া সত্ত্বেও উহার বর্ণমালার ক্রমের ও লিখনপ্রণালীর বিজ্ঞান কেহ বুঝিতে পারেন না, সেই বাঙ্গালা-ভাষাভাষী মানুষগুলি যে প্রায়শঃ অপদার্থ তাহা অস্বীকার করা যায় না। কাজেই, এই অপদার্থ মানুষগুলি যাহাতে মানুষ হইতে চেষ্টা করে তদুদ্দেশ্যে বেত্র-হস্ত না হইয়া তাহারা যাহাতে অযথা আস্ফালন করিবার সুবিধা পায় তাহা করা কোন লোকহিতৈষী ভাবুকের সঙ্গত নহে, ইহা বলা যাইতে পারে।

ডক্টর সুনীতিকুমারের বাকী আটটী প্রসঙ্গও কতকগুলি বালকোচিত কথায় পরিপূর্ণ। স্থানাভাবে আমরা এখানে তাহার সমালোচনা করিব না।

উপসংহার

উপসংহারে আমরা ডক্টর সুনীতিকুমারকে আত্ম-পরীক্ষা দ্বারা তিনি যে কত অনভিজ্ঞ ও তাঁহার কথাগুলি যে প্রায়শঃ কত বিভ্রান্তিকর তাহা অনুভব করিতে অনুরোধ করিতেছি। তাঁহার যদি লজ্জা ও আত্ম-সম্মানজ্ঞান থাকে তাহা হইলে তাঁহার অনভিবিলম্বে এতাদৃশ সভায় সভাপতিত্ব এবং এমন কি, বক্তার কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হওয়া সঙ্গত।

ভাষা-তত্ত্ব যে কত প্রয়োজনীয় তাহা আমরা আগেই বলিয়াছি। প্রকৃত ভাষা-তত্ত্বের জ্ঞানবিজ্ঞান অর্জ্জন করিতে বসিয়া ঋষিগণকে বিভিন্ন বস্তু বিষয়ে যে সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জ্জন করিতে হইয়াছিল তদ্দ্বারা তাঁহারা, মানুষকে সর্ব্বতোভাবে সুখী করিতে হইলে সামাজিক সংগঠনে যে যে ব্যবস্থার প্রয়োজন, সেই সেই ব্যবস্থার জ্ঞান আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। উহা তাঁহারা আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন বলিয়া প্রাগৈতিহাসিক যুগে মনুষ্য-সমাজ সর্ব্বতোভাবে সুখের আগার হইয়াছিল। মানুষ এক্ষণে এই কথা বুঝুক আর না-ই বুঝুক, উহা বাস্তব সত্য। পরবর্ত্তী ভট্ট, আচার্য্য ও মিশ্র প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ঋষিগণের ভাষা না বুঝিতে পারিয়া তাঁহাদিগের বাক্যসমূহের কু-ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন এবং তাহার ফলে একদিকে যেরূপ মানব-সমাজ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে, অন্যদিকে আবার ঐ কু-ব্যাখ্যাতা ভট্ট, আচার্য্য প্রভৃতি পণ্ডিতগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্ব্বংশ ও হতশ্রী হইয়া গিয়াছেন। যে যে ক্ষেত্রে তাঁহারা নির্ব্বংশ হন নাই, সেই সেই ক্ষেত্রে তাঁহাদিগের বংশধরগণ মনুষ্যাবয়বী হইয়াও একরূপ পশুবৎ হইয়া রহিয়াছেন।

যাঁহারা সাধনা-নিরত না হইয়া ভাষা-বিজ্ঞান লইয়া খেলা করেন, তাঁহারা স্বভাবের নিয়মানুসারে উপরোক্ত ভাবের নির্ব্বংশতা ও শ্রীহীনতা প্রাপ্ত হইতে বাধ্য হইয়া থাকেন; কারণ, তাঁহারা মানুষকে বিপথগামী করিবার দোষে দুষ্ট হইয়া অনেক রকমের পাপ অর্জ্জন করিয়া থাকেন। ডক্টর সুনীতিকুমারের মত লোক আমাদিগের এই কথায় হয়ত আমাদিগকে উপহাস করিবেন, হয়ত কতক দিনের মধ্যে আমরা দেখিব যে, কোন পত্র-প্রেরকের মারফৎ আমাদিগের প্রতি কতকগুলি ব্যক্তিগত গালাগালি আনন্দবাজারের মত কোন পত্রিকায় স্থান পাইয়াছে। আমাদিগের মত নগণ্য মানুষকে ব্যক্তিগতভাবে গালাগালি করিলে মনুষ্যসমাজের কাহারও কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না, কিন্তু যাঁহারা বক্তব্যের যুক্তিযুক্ততা খণ্ডন করিতে সক্ষম না হইয়া ব্যক্তিগত গালাগালিতে নিজেরা প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, অথবা অন্তরালে থাকিয়া অপরকে প্রবৃত্ত করাইয়া থাকেন, তাঁহারা যে অতীব ঘৃণিত ও অসার, উহাই প্রমাণিত হয়। ডক্টর সুনীতিকুমার কখনও এতাদৃশ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন কি না, তাহা আমরা জানি না, তবে এইরূপ ব্যাপারও সময় সময় দেখা যায়। আমরা ডক্টর সুনীতিকুমারের বন্ধুর কার্য্যই করিতে চাই এবং তজ্জন্যই আমরা তাঁহাকে এতাদৃশ সভাপতিত্ব ও বক্তার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার আগে, যাহাতে তাঁহার কথায় মানুষ বিপথগামী না হইয়া সুপথগামী হইতে পারে, তদনুরূপভাবে অ, আ হইতে আরম্ভ করিয়া ছাত্ররূপে পুনরায় ভাষা-বিজ্ঞান শিক্ষার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিতেছি। যে কয়েক-খানা সার্টিফিকেটরূপী কাগজের আশ্রয়ে তিনি নিজেকে ভাষাতাত্ত্বিক বলিয়া অভিমান পোষণ করিতেছেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সহায়তায় যুবক ছাত্রগণের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছেন, আত্ম-পরীক্ষার দ্বারা এখনও সেই সার্টিফিকেটগুলির মূল্য নির্দ্ধারণ করুন, ইহাই তাঁহার কাছে আমাদিগের যাচ্ঞা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে আমাদিগের নিবেদন এই যে, যাঁহাকে তাঁহারা ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপনা-কার্য্যে ও বাঙ্গালাভাষার পরীক্ষার্থিগণের পরীক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া থাকেন, ভাষাবিজ্ঞান, বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত ও সাধারণ বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান কতখানি, তাহা তাঁহারা এখনও পরীক্ষা করিয়া দেখুন। এতাদৃশ অধ্যাপকের কার্য্যের ফলেই বাঙ্গালী ছাত্রগণ আজ লেখাপড়া শিখিয়াও ভিখারী ও হিতাহিত জ্ঞান-শূন্য। কোন একটা নফরগিরী পাইলে তাহারা নফরগিরীর পদমর্য্যাদায় প্রমত্ত হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যায় নিজ নিজ পেটের দুই মুঠা অন্ন পর্য্যন্ত সংস্থান করিতে সক্ষম হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই প্রহেলিকাময় শিক্ষায় মানুষ এখনও উদাসীন রহিয়াছে বটে, কিন্তু চিরদিন মানুষের পক্ষে এই ঔদাসীন্য রক্ষা করা কখনও সম্ভব হইবে না। তাই আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট আমাদিগের নিবেদন জানাইতেছি।

দর্শনশাস্ত্র ও মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী

কুমিল্লায় বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের দ্বাবিংশ অধিবেশনে দর্শন-শাখার সভাপতিত্ব করিয়াছেন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী। ইনি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের "আশুতোষ চেয়ারে" অধিষ্ঠিত। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে যোগদান করিবার আগে ইনি গোলপুরে রবীন্দ্রনাথের অধীনে কার্য্য করিতেন। ইহাঁর গুণাগুণ সম্বন্ধে আর কিছু বলিতে হইলে, ইনি কোন প্রকৃত বিদ্যার জোরে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছেন, অথবা কেবলমাত্র কর্ত্তৃপক্ষের মনোরঞ্জন-বিদ্যায় নৈপুণ্য লাভ করিয়া উচ্চপদারূঢ় হইয়াছেন, সর্ব্বপ্রথমে তদ্বিষয়ক প্রশ্ন উত্থিত হয়। প্রকৃত কোন বিদ্যা ইহাঁর হইয়াছে কি না, তাহার কষ্টিপাথর ইহাঁর বক্তৃতাবলী ও রচনা। ঐ বক্তৃতাবলী ও রচনার মধ্যে আমরা যাহা যাহা পাঠ করিয়াছি, তাহা হইতে আমাদিগের মনে হইয়াছে যে, ইনি কোন প্রকৃত বিদ্যায় কথঞ্চিৎ মাত্রাতেও "প্রবেশ" বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা করিতে পারেন নাই। ব্যক্তিগতভাবে আমরা ইহাঁর সহিত পরিচিত নহি। কাজেই, ইহাঁর সম্বন্ধীয় আমাদিগের সমস্ত ধারণা সর্ব্বতোভাবে সঠিক না-ও হইতে পারে। উহাঁর বক্তৃতা ও রচনাবলী হইতে আমরা যতদূর বুঝিতে পারি, তাহাতে আমাদিগের মনে হইয়াছে যে, কোন প্রকৃত বিদ্যায় প্রবিষ্ট হইতে হইলে স্বাভাবিক যে মানসসজ্জার প্রয়োজন, তাহাদলে সেই মানসসজ্জা ইনি জন্মের সহিত লাভ করিতে পারেন নাই।

ইহাঁর বক্তৃতায় ও রচনাবলীতে প্রকৃত কোন বিদ্যার পরিচয় কথঞ্চিৎ মাত্রাতেও পাওয়া যায় না বলিয়া স্বতঃই আমাদিগের মনে হয় যে, উচ্চপদারূঢ় হইবার ইহাঁর প্রধান উপকরণ কর্ত্তৃপক্ষের মনোরঞ্জন-বিদ্যা। সংসারক্ষেত্রে ঐ বিদ্যারও প্রয়োজন আছে তাহা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু, শিক্ষাক্ষেত্রে কেবলমাত্র ঐ মনোরঞ্জন-বিদ্যার বলেই যদি শিক্ষার দায়িত্বভার মানুষের লাভ করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে শিক্ষার্থী যুবকগণের ও সমাজের বিশেষ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। বিচারহীন শিক্ষার্থী যুবকগণ যাহা ভ্রমপ্রমাদপরিপূর্ণ তাহাকে অভ্রান্ত বলিয়া মনে করিতে বাধ্য হয়,ফলে তাহারা বিপথগামী হইয়া সমাজের সর্ব্বনাশের কারণ হইয়া থাকে। ব্যক্তিগত ভাবে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রীর প্রতি আমাদিগের কোন দ্বেষ অথবা অশ্রদ্ধার ভাব বিদ্যমান নাই এবং তিনি কোন ছাত্র-শিক্ষার দায়িত্বভার প্রাপ্ত না হইলে আমরা তাঁহার বক্তৃতা ও রচনাবলীর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে পারিতাম। কিন্তু, আমাদিগের বিশ্বাস, তিনি পরোক্ষভাবে ছাত্র-সমাজের বিশেষ অনিষ্টসাধন করিতেছেন এবং বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে প্রকৃত দায়িত্বজ্ঞান থাকিলে তাঁহাকে অনতিবিলম্বে আশুতোষ চেয়ারের শিক্ষার দায়িত্বভার হইতে অপসারিত করা একান্ত কর্ত্তব্য। আমরা তাঁহার দার্শনিক বিদ্যার অত্যন্ত অভাব দেখিতেছি বলিয়াই ঐ কথা বলিতে বাধ্য হইতেছি।

দার্শনিক বিদ্যার যে অত্যন্ত অভাব তাঁহার মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা কুমিল্লায় সাহিত্য-সম্মেলনে তিনি যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন, তাহা পরীক্ষা করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে।

এই বক্তৃতায় তিনি নিম্নলিখিত এগারটি বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন :—

১। দর্শনের সংজ্ঞা।
২। নানা দর্শনের নানা কথা।
৩। ব্যাসের ব্রহ্মসূত্র।
৪। যাহাতে যুক্তি আছে তাহাই কি সত্য।
৫। যুক্তির সন্ধানে মানুষ।
৬। চিন্তাসমূহের যুক্তিপরম্পরাই কি দর্শনশাস্ত্রের পর্য্যবসান।
৭। দর্শনশাস্ত্রের সার্থকতা।
৮। মানুষের জীবনে ভাবের স্থান।
৯। অধিকাংশ ভাবই যুক্তির সহায়ক।
কামনা-আগের অর্থ।
যাহা চোখে দেখা যায় তাহাই কি সত্য সত্য থাকে?

কোন দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে তিনি যে কোন প্রকৃত বিদ্যা লাভ করিতে সক্ষম হন নাই এবং উহা যে তাঁহার বক্তৃতা হইতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতে পারে, তাহা দেখাইবার জন্য আমরা উপরোক্ত প্রবন্ধটি বিষয়ে তিনি প্রধানতঃ যাহা যাহা বলিয়াছেন, যথাক্রমে তাহার বিচার করিব।

দর্শনের সংজ্ঞা

"দর্শন" বলিতে কি বুঝায়, তাহা বলিতে বসিয়া পণ্ডিত বিধুশেখর প্রথমেই বলিয়াছেন যে,

"দেখাও দর্শন, যাহা দেখা যায় তাহাও দর্শন, আর যাহা দিয়া দেখা যায় তাহাও দর্শন।"

তাঁহার উপরোক্ত কথাটি পরিষ্কার করিবার জন্য তিনি বলিয়াছেন :—

"তিনি (দার্শনিক) বাহিরের যাহা দেখেন তাহাতে সন্তুষ্ট হন না, ভিতরটা কি তাহা না দেখিলে তাঁহার চলে না"

অতঃপর দর্শন ও দার্শনিকের কার্য্য সম্বন্ধে তিনি নিম্নলিখিত মন্তব্য কয়েকটি প্রকাশ করিয়াছেন,—

১। তাঁহার (দার্শনিকের) একটা বিপদ্ আছে। অনেক সময়ে তাঁহার মনে কোন আগ্রহ থাকে, আর তাহাই যদি হয়, তবে তিনি নিজের সমস্ত যুক্তিকে যে কোন রকমে হউক, উহারই দিকে লইয়া চলেন। ইহা সত্যকে দেখার বাধা সৃষ্টি করে।

২। দার্শনিকেরা তত্ত্ব দেখিতে বলেন। কিন্তু বলিতে বলিতে তাঁহারা এমন এক জায়গায় গিয়া পড়েন, যেখানে তাঁহার(?) কথার তো কথাই নাই, মনও আগাইতে পারে না, ফিরিয়া আসে।

তখন বলিয়া উঠেন তত্ত্বটা হইতেছে একেবারে মৌন। প্রহেলিকার মত বলেন, যে বলে উহা জানি, সে তা জানে না, আর যে বলে জানি না সে তা জানে। আরো বলেন, উহা জানা অজানা এই দুয়েরই অতীত।

সর্ব্বশেষে এইবিষয়ক উপসংহারে তিনি বলিয়াছেন :—

"তত্ত্বের তত্ত্বটা যখন এই রকম, তখন পাগলের মত সেই দিকটাই না বাড়াইয়া বাহিরে বাহিরে থাকিয়া দুই একটা কথায় আপনাদের হুকুমটা কোনরূপে তামিল করিব (অর্থাৎ "দর্শন"সম্বন্ধীয় বক্তৃতাটি শেষ করিব)।"

দর্শন ও দার্শনিকের কার্য্য সম্বন্ধে পণ্ডিত বিধুশেখরের যে মন্তব্যগুলি উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে, সেই মন্তব্যগুলির সহিত তাঁহার এতদ্বিষয়ক উপসংহার মিলাইয়া লইয়া বিচার করিতে বসিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, পণ্ডিত বিধুশেখরের মতে দর্শন ও দার্শনিকের কার্য্য পাগলের কার্য্যের অনুরূপ। কোন্ দর্শনের ও দার্শনিকের কার্য্যে তিনি পাগলামী দেখিয়াছেন, তাহা তিনি স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। তিনি উহা স্পষ্ট করিয়া বলুন আর না-ই বলুন, তিনি যখন তাঁহার বক্তৃতায় ঋষিপ্রণীত দর্শনের কথা উঠাইয়াছেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি যখন ঐ ঋষিপ্রণীত দর্শন অধ্যাপনার কার্য্য-তত্ত্বাবধানের দায়িত্বভার প্রাপ্ত হইয়াছেন, তখন ঋষিপ্রণীত দর্শনে ও ঋষিপ্রণীত কার্য্যে পাগলামীর নিদর্শন দেখা যায় বলিয়া তিনি মনে করেন, ইহা আমরা ধরিয়া লইতেছি। আমাদিগের ধারণা সঠিক কি না তাহা পাঠকগণ বিচার করুন। আমরা ইহাতে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছি। সংসারের জ্বালায়, স্বকীয় কু-আচরণের ব্যাপার স্বারা ও শান্তিহীন হইতে থাকিলে মানুষের কেন ঐরূপ হয়, তাহা প্রাণের বেদনা লইয়া অনুসন্ধান করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, ঋষিপ্রণীত দর্শনে একটীও পাগলামীর কথা নাই, পরন্তু উহার প্রত্যেক কথাটী বাস্তব ও প্রত্যক্ষযোগ্য। পরবর্ত্তী ভট্ট, আচার্য্য প্রভৃতি ভাষ্যকারগণ ঋষির ভাষা যথাযথভাবে বুঝিতে পারেন নাই বলিয়া ঋষিপ্রণীত দর্শন যথাযথ অর্থে ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই এবং ঋষির দর্শনের সূত্রসূত্র স্বাধীনভাবে না পড়িতে পারিয়া ভট্ট ও আচার্য্যগণের ভাষ্যের সহায়তায় উহা পড়িতে গেলে ঐ দর্শন স্থানে স্থানে অন্ধকূপে প্রতিভাত হয়, তাহা সত্য, কিন্তু তজ্জন্য ঋষির "দর্শন"কে দুষ্ট বলিয়া মনে করা চলে না। ঋষিগণ তাঁহাদিগের প্রণীত অষ্টাধ্যায়ী-সূত্রপাঠ ও নিরুক্তে ভাষা বুঝিবার জন্য যে সমস্ত নির্দ্দেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা পরিজ্ঞাত হইয়া কোন অর্থ-পুস্তকের সহায়তা না লইয়া স্বাধীন ভাবে ঋষিপ্রণীত দর্শনের ও মীমাংসার মূল সূত্রগুলি অধ্যয়ন করিতে পারিলে এবং ঋষিপ্রণীত তন্ত্রের সহায়তায় ঐ সূত্রের বক্তব্যসমূহ প্রত্যক্ষ করিতে পারিলে দেখা যাইবে

যে, উহার মধ্যে কোন পাগলামী থাকা ত দূরের কথা, জগতে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য আছে,তাহা কেবলমাত্র ঋষিপ্রণীত দর্শনের সাহায্যে সঠিকভাবে জানা সম্ভবযোগ্য হইতে পারে। ঋষিগণের পরবর্ত্তী কালে মনুষ্যসমাজে ভাবুকগণের দ্বারা আর যে সমস্ত গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে, তাহার কোনখানিতেই অথবা তাহার সমগ্র ভাগের মধ্যে ঐ তথ্য পাওয়া যায় না। ঋষিপ্রণীত সমস্ত শাস্ত্র ও সাহিত্যের মূলভাগের সহিত স্বাধীনভাবে পরিচিত হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, মানুষ কি করিয়া সর্ব্বতোভাবে অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব, শান্তির অভাব, অকালবার্দ্ধক্য এবং অকালমৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে, তাহার পন্থা সম্বন্ধে ঋষিগণ আলোচনা করিয়াছেন এবং যে ব্যাবস্থায় সমাজের প্রত্যেকে ঐ অর্থাভাবাদি হইতে মুক্ত হইতে পারে, তাহার পন্থাও ঋষিগণ আবিষ্কৃত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং ঐ ব্যবস্থার মূলে রহিয়াছে ঋষিপ্রণীত "দর্শনে"র জ্ঞান। জগতের ইতিহাস সঠিকভাবে পর্য্যালোচনা করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে এমন একদিন ছিল, যখন সত্য সত্যই মনুষ্যসমাজের প্রত্যেকেই ঐ অর্থাভাবাদি হইতে সম্যক্ ভাবে মুক্ত হইতে পারিয়াছিল এবং সমাজের সর্ব্বত্র "রাম-রাজত্ব" বিরাজমান ছিল।

কার্য্য-কারণসঙ্গত ইতিহাস প্রস্তুত করিতে পারিলে আরো দেখা যাইবে যে, পরবর্ত্তী কালে ঋষিপ্রণীত দর্শনের সূত্রগুলির যথাযথ অর্থ মানুষ ভুলিয়া গিয়াছে বলিয়াই মনুষ্য-সমাজ নানাবিধ দুঃখের আগার হইয়া পড়িয়াছে।

প্রকৃত ইতিহাসের ঐ তথ্যগুলি সঠিকভাবে ধারণা করিতে পারিলে ইহাই প্রতীয়মান হইবে যে, নিজেকে ও মনুষ্য-সমাজকে বিবিধ দুঃখের হাত হইতে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিবার একমাত্র উপায় ঋষিপ্রণীত শাস্ত্র ও সাহিত্যের মর্ম্ম যথাযথভাবে পরিজ্ঞাত হওয়া এবং তদনুসারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া। ইহার জন্য সর্ব্বপ্রথমে প্রয়োজন ঋষিপ্রণীত শাস্ত্র ও সাহিত্যের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা। কাজেই, ঐ শ্রদ্ধা যাহাতে মানুষের মনে উদিত হয়, তাহা না করিয়া যাহাতে উহার প্রতি কোনরূপ অশ্রদ্ধার উদয় হয়, এমন কোন কার্য্যের অথবা কথার আশ্রয় যাঁহারা গ্রহণ করেন, তাঁহারা যে মনুষ্য-সমাজের সর্ব্বনাশকারী ঘোর শত্রু ও মহাপাপী, উহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। এই হিসাবে পণ্ডিত বিধুশেখরকে মনুষ্যত্বহীন, মানবসমাজের ঘোর শত্রু বলিয়া মনে করিতে হইবে।

"অজ্ঞাতশ্রদ্ধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।"

অর্থাৎ, যাঁহারা অজ্ঞ এবং অশ্রদ্ধাপ্রদর্শনকারী, তাঁহাদিগের কার্য্য সন্দেহজনক এবং তাঁহারাই প্রকৃত জ্ঞানের পরিপন্থী", ইহা ব্যাসদেবের কথা।

ঋষিপ্রণীত দর্শনে ও তদনুগ দার্শনিকের কার্য্যে পাগলামী আছে, এমন কথা পণ্ডিত বিধুশেখর বলিয়াছেন বটে, কিন্তু ঋষির দর্শনের কোন্ কোন্ সূত্রে তিনি ঐ পাগলামীর চিহ্ন পাইয়াছেন, তৎসম্বন্ধে একটি কথাও তিনি বলেন নাই।

ঋষিপ্রণীত দর্শনে পাগলামী আছে, এমন কোন অপবাদ প্রচার করিতে হইলে কোন্ দর্শনের কোন্ সূত্রে ঐ পাগলামীর সাক্ষ্য পাওয়া যায়, তাহা মূল সূত্র উদ্ধৃত করিয়া তিনি দেখাইয়া দিতে বাধ্য। আমরা তাঁহাকে ঐ কার্য্যে আহ্বান করিতেছি। তিনি ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে আমরা ঋষিপ্রণীত ব্যাকরণ হইতে দেখাইয়া দিব যে, পণ্ডিত বিধুশেখর ঋষিপ্রণীত সংস্কৃত ভাষার ক-খ পর্য্যন্ত অবগত নহেন এবং ঋষিপ্রণীত কোন বাক্যের যথাযথ অর্থ গ্রহণ করিতে তিনি অক্ষম। পণ্ডিত বিধুশেখর যদি কাপুরুষ ও স্ত্রীজনোচিত না হন, তাহা হইলে আমরা আশা করি, তিনি আমাদিগের আহ্বান গ্রহণ করিবেন।

বড়ই পরিতাপের বিষয় এই যে, যিনি ঋষিপ্রণীত সংস্কৃত ভাষার ক-খ অবগত নহেন এবং যিনি নিজেই ঋষিপ্রণীত দর্শনকে পাগলামীর আবাসস্থল বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, তাহা প্রকাশ করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন না, তাঁহাকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ সংস্কৃত ভাষা ও ঋষিপ্রণীত দর্শন অধ্যাপনার সর্ব্বোচ্চ পদ 'আশুতোষ চেয়ার' প্রদান করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে কোন্ শ্রেণীর কার্য্য চলিতেছে, তাহা ইহা হইতে পাঠকগণ বিচার করিতে পারিবেন।

'দর্শন' বলিতে যে কি বুঝায় এবং 'দর্শনের' মধ্যে যে কি পাওয়া উচিত, তাহা পর্য্যন্ত বুঝিবার শক্তি পণ্ডিত বিধুশেখরের নাই। আমাদিগের এই সিদ্ধান্তের প্রমাণ পণ্ডিত বিধুশেখরের 'দর্শন'-সম্বন্ধীয় সংজ্ঞা।

পণ্ডিত বিধুশেখর বলিতেছেন—

'দেখাও দর্শন, যাহা দেখা যায় তাহাও দর্শন, আর যাহা দিয়া দেখা যায় তাহাও দর্শন।'

'যাহা দেখা যায়' অথবা 'যাহা দিয়া দেখা যায়', সেই বস্তুকে যে 'দর্শন' বলা যাইতে পারে, তাহা পণ্ডিত বিধুশেখর ঋষিপ্রণীত ব্যাকরণের কোন সূত্র দ্বারা প্রমাণিত করিতে পারিবেন কি? পণ্ডিত বিধুশেখর যদি ঋষিপ্রণীত ব্যাকরণে প্রবিষ্ট হইতে পারিতেন তাহা হইলে তাঁহার জানা থাকিত যে, 'দর্শন' একটি কৃৎপ্রত্যয়ান্ত শব্দ এবং কৃৎ-প্রত্যয়ান্ত শব্দ কখনও দ্রব্যবাচক অথবা গুণ-বাচক হইতে পারে না। উহা সর্ব্বদাই কর্ম্ম, কার্য্য অথবা ক্রিয়া এই তিনটির একটীর বিশেষ বিশেষ ভাব অথবা অবস্থা বুঝাইয়া থাকে।

"ধাতোঃ কৃৎপ্রত্যয়া যোগাঃ কর্ত্রাদিত্রিতয়ার্থকে।
কৃত্যাদিকালত্রিতয়ে নিরূপ্যন্তে সমাসতঃ।"

কৃষ্ণপণ্ডিত-বিরচিত সম্বন্ধনেত্র-প্রয়োগকল্পদ্রুমের উপরোক্ত কারিকার সাহায্যে 'কৃৎ'-বিষয়ক পাণিনির সূত্রগুলি বুঝিতে পারিলে আমাদিগের উপরোক্ত কথার যথার্থতা বুঝা যাইবে। খুব সম্ভব, 'কর্ত্রাদি-ত্রিতয়' অর্থাৎ কর্ম্ম, ক্রিয়া ও কার্য্যের মধ্যে যে কি প্রভেদ, তাহা পর্য্যন্ত পণ্ডিত বিধুশেখর বিদিত নহেন। 'যাহা দিয়া দেখা যায়', তাহাকে যদি 'দর্শন' বলিয়া অভিহিত করা চলে, তাহা হইলে 'চক্ষু'কে দর্শন বলিতে হয় এবং 'যাহা দেখা যায়' তাহাকে যদি 'দর্শন' বলিতে পারা যায়, তাহা হইলে জগতের যাবতীয় বস্তুকেই 'দর্শন' বলিতে হয়।

পণ্ডিত বিধুশেখরের মস্তিষ্কে কোন্ শ্রেণীর জ্ঞানের পদার্থ থাকা সম্ভব, তাহা এক্ষণে পাঠকগণ বিচার করুন।

"যাহা দেখা যায়" অথবা যাহা দিয়া দেখা যায়", সেই দ্রব্য অথবা গুণকে পর্য্যন্ত যখন পণ্ডিত বিধুশেখর "দর্শন" বলিতে সঙ্কোচ বোধ করেন না, তখন বুঝিতে হয় যে, ঋষি-প্রণীত ব্যাকরণ বিষয়ে পণ্ডিত বিধুশেখর সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং বংশের সাহায্যে পণ্ডিত বিধুশেখরকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ সংস্কৃতাধ্যাপনার কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন।

"দেখাও দর্শন", কেবলমাত্র এইটুকু বলিলেই দর্শনের সংজ্ঞা সম্পূর্ণ হয় না। ব্যাকরণের সূত্র জানা থাকিলে দেখা যাইবে যে, "দর্শন" বলিতে বুঝায় সেই কর্ম্ম অথবা ক্রিয়া অথবা কার্য্য, যাহা জীবের কর্ণ ও জিহ্বার মধ্যে যে সংযোগ আছে, তাহা প্রত্যক্ষ করিতে প্রবৃত্ত হইলে ধারণা করা সম্ভব হয়। অথবা প্রাকৃতিক ঐ সংযোগ-বশতঃ যে যে জ্ঞান-রূপী কার্য্যের উৎপত্তি হয়, তাহার নাম দর্শন।

ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে, মানুষের কর্ণ ও জিহ্বার মধ্যে একটি বিশেষ সংযোগ বিদ্যমান আছে এবং ঐ সংযোগ প্রত্যক্ষ করিবার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে অথবা ঐ সংযোগবশতঃ যে যে করণের উদ্ভব হয়, সেই সেই করণের নাম "দর্শন"। ইহার পর প্রশ্ন হইবে যে, কর্ণ ও জিহ্বার মধ্যে যে সংযোগ বিদ্যমান আছে, তাহা প্রত্যক্ষ করিতে বলিলে কোন্ কোন্ করণের উদয় হয়। যাঁহারা ঐ প্রত্যক্ষ করিবার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহারা কোন গ্রন্থের সহায়তা না লইয়াই বুঝিতে পারিবেন যে, ঐ প্রত্যক্ষের কার্য্যে শব্দ-গ্রহণ, স্পর্শ-গ্রহণ রূপ-গ্রহণ, রস-গ্রহণ ও গন্ধ-গ্রহণরূপ পাঁচটী করণের উদ্ভব হইয়া থাকে। যাঁহারা ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হন নাই, তাঁহারা 'কুণার্ণব' নামক গ্রন্থ হইতে ঐ প্রশ্নের উত্তর পাইতে পারিবেন এবং দেখিবেন যে, শব্দ-গ্রহণ, স্পর্শ-গ্রহণ, রূপ-গ্রহণ, রস-গ্রহণ ও গন্ধ-গ্রহণের যে কোনটির নাম 'দর্শন'।

কোন গ্রন্থকে অথবা গ্রন্থসমষ্টিকে দর্শন-বিষয়ক বলিলে "সামান্য সমানের" নিয়মানুসারে বুঝিতে হয় যে, উহার মধ্যে হয় মানুষের শব্দ-জ্ঞান সম্বন্ধে, নতুবা স্পর্শ-জ্ঞান সম্বন্ধে, নতুবা রূপ জ্ঞান সম্বন্ধে, নতুবা রসজ্ঞান সম্বন্ধে, নতুবা গন্ধ-জ্ঞান সম্বন্ধে কোন না কোন কথা বলা হইয়াছে। যে গ্রন্থে এই পাঁচটী জ্ঞান-বিষয়ক কোন কথা বিদ্যমান নাই, সেই গ্রন্থকে শব্দ-বিজ্ঞানানুসারে "দর্শন" বলা চলে না। অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, এই হিসাবে এক ঋষি-প্রণীত "দর্শন বিষয়ক" গ্রন্থ ছাড়া আর কোন গ্রন্থকে যথার্থ ভাবে দর্শন বলা চলে না। পাশ্চাত্যগণ অথবা পাশ্চাত্যশিক্ষাভিমানিগণ যাহাকে "ফিলজফি" বলিয়া থাকেন, তাহা "ফিলজফি" হইলেও হইতে পারে, কিন্তু উহার কোনখানিকেই প্রকৃত প্রস্তাবে কোন "দর্শন"-বিষয়ক গ্রন্থ বলিয়া অভিহিত করা যায় না।

"বৈশেষিকসূত্র"দি দুইখানি গ্রন্থকে কেন যে "দর্শন" বলা হয় তাহা বুঝাইতে হইলে অনেক কথা লিখিতে হইবে।

এই সম্বন্ধে তাহা সম্ভববোগ্য নহে। ঐ ছয়খানি গ্রন্থের আসল বক্তব্য জানিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, উহার প্রত্যেকখানি শব্দাদি-জ্ঞান-বিষয়ক কথায় পরিপূর্ণ। অনেকে মনে করেন যে, বিভিন্ন দর্শনের বিভিন্ন মতবাদ আছে। কিন্তু ঋষি-প্রণীত ব্যাকরণে প্রবিষ্ট হইয়া স্বাধীন ভাবে কোন ভাষ্যকারের সহায়তা না লইয়া ঐ ছয়খানি দর্শন-বিষয়ক গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, উপরোক্ত মতবাদ আদৌ সত্য নহে এবং বিভিন্ন দর্শনে একই বিষয়ের আলোচনা হয় নাই এবং একই বিষয় সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ বিদ্যমান নাই। পরন্তু, শব্দ জ্ঞান, স্পর্শ-জ্ঞান, রূপ-জ্ঞান, রস-জ্ঞান ও গন্ধ-জ্ঞান সম্পূর্ণ করিতে হইলে ছয়টী বিষয় জানিবার প্রয়োজন হয় এবং ঐ ছয়টী বিষয় ছয়খানি গ্রন্থে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নিপুঁৎ করিয়া আলোচিত হইয়াছে। তন্ত্রের ভাষা বুঝিবার সক্ষমতা অর্জ্জন করিয়া কুলার্ণব তন্ত্রের নিম্নলিখিত শ্লোক দুইটী যথাযথভাবে বুঝিতে পারিলে আমাদিগের উপরোক্ত কথার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হইবে—

অন্যাহ কুলার্ণবে শিবঃ—
ষড়্দর্শনানি মেহস্যানি পাদৌ কুক্ষিঃ করৌ শিরঃ।
তেনৈ তেষু যঃ কুর্য্যাৎ ভেদমেষোহকো হি সঃ॥
এতাস্যেব কুলস্যাপি ষড়ঙ্গানি তথৈব হি।
তস্মাদ্ষড়ঙ্গকং কৌলং অঃ কৌলাত্মকঃ প্রিয়ে॥

নানা দর্শনের নানা কথা

এই প্রসঙ্গে পণ্ডিত বিধুশেখর প্রথমেই বলিয়াছেন যে, "আমাদের সামনে নানা দর্শনের নানা কথা আছে, আবার একই বিষয়ে নানা দর্শন আছে। এ সবই কি সত্যদর্শন? * * আচ্ছা, উপনিষদেরই কথা ধরা যাউক। অনেক আচার্য্য অনেক রকমে ইহা ব্যাখ্যা করিয়া দ্বৈত, অদ্বৈত ইত্যাদি কত মতের কত কথা আমাদিগকে শুনাইয়াছেন। এগুলি কি সবই সত্য?"

পণ্ডিত বিধুশেখরের উপরোক্ত বাক্যগুলি শুনিলে মনে হয় যে, তাঁহার মতে উপনিষদ্ দর্শনেরই অন্তর্গত, কারণ তাহা না হইলে দর্শনের কথা বলিতে বলিতে, তৎসম্বন্ধীয় উদাহরণ-স্বরূপ উপনিষদের কথা তিনি আনয়ন করিতেন না। আমাদিগের বিশ্বাস, উপনিষদ্ ও দর্শনের বক্তব্য বিষয় যে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং দুইটী যে একবিষয়ক নহে তাহা পণ্ডিত বিধুশেখরও বিদিত আছেন। তাহা তাঁহার জানা না থাকিলে তিনি জানিয়া রাখুন যে, ঋষি-প্রণীত দর্শন-বিষয়ক ছয়খানি সূত্র-গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য মানুষের শব্দ-জ্ঞান, স্পর্শ-জ্ঞান, রূপজ্ঞান, রস-জ্ঞান ও গন্ধ-জ্ঞান হয় কি করিয়া এবং সময় সময় উহা ভ্রম-প্রমাদপূর্ণই বা হয় কেন, তৎসম্বন্ধীয় তথ্য উদ্ঘাটন করা। আর উপনিষদের বক্তব্য:—বেদে বিভিন্ন অব্যক্ত কারণ সম্বন্ধে যে বিভিন্ন তথ্য উপলব্ধি করিবার পন্থা দেখান হইয়াছে, সেই সমস্ত অব্যক্ত-বিষয়ক তথ্যের সহিত বিভিন্ন ব্যক্তির যে সম্বন্ধ আছে, সেই সম্বন্ধ উদ্ঘাটন করা।

কাযেই, দর্শন ও উপনিষদের বক্তব্য বিষয় যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়।

ইহা সত্ত্বেও তিনি যখন দর্শন সম্বন্ধে কোন অভিমত প্রকাশ করিতে বসিয়া তাহার উদাহরণ-স্বরূপ উপনিষদ্-বিষয়ক কথা উত্থাপিত করিয়াছেন, তখন বুঝিতে হয় যে, তিনি উপনিষদেরও মর্ম্ম জানেন না এবং কোন দর্শনেরও প্রকৃত বক্তব্য বিদিত নহেন।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অথচ তিনি কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের আশুতোষ চেয়ারের অধিপতি। বলিহারি, ৺আশুতোষ-সন্তানগণের মহিমা!

পণ্ডিত বিধুশেখরের উপরোক্ত বাক্যগুলি পরীক্ষা করিলে আরও দেখা যায় যে, যেহেতু ভাষ্যকারগণ একই উপনিষদ্ বিভিন্ন অর্থে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, অথবা বিভিন্ন উপনিষদের ব্যাখ্যায় একই বিষয়ে বিভিন্ন মতবাদ উত্থাপিত করিয়াছেন, অতএব মূল উপনিষদ্-বিষয়ক এবং মূল দর্শন-বিষয়ক গ্রন্থগুলিতেও ঋষিগণ একই বিষয়ে বিভিন্ন মতবাদ প্রচার করিয়াছেন। চমৎকার এই যুক্তিবাদ! ভাষ্যকারগণ যে ঋষির ভাষা বুঝিতে ভুল করেন নাই, তাহার কোন প্রমাণ আছে কি? ঋষি-প্রণীত মূল মন্ত্র অথবা শ্রুতি অথবা সূত্র অথবা কারিকা হইতে বেদাঙ্গের নিয়মানুসারে অর্থোদ্ধার করিয়া পণ্ডিত বিধুশেখর তাঁহার মতবাদের (অর্থাৎ একই বিষয়ে দুইজন ঋষি যে দুইটী বিপরীত কথা বলিয়াছেন তাহার) সত্যতা প্রমাণিত করিতে পারেন কি? পাঠকগণের অবগতির জন্য আমরা বলিয়া রাখি যে, তাহা পণ্ডিত বিধুশেখর

কখনও পারিবেন না। কারণ, একই বিষয়ক সত্য সম্বন্ধে কোন বিপরীত মতবাদ সত্যদর্শী ঋষিগণের মধ্যে কখনও উত্থিত হইতে পারে না এবং ঋষির মূল শাস্ত্র বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, উহা কুত্রাপি হয় নাই। ইহাও পণ্ডিত বিধুশেখরের দর্শন ও উপনিষদ্ সম্বন্ধে অজ্ঞতার সাক্ষ্য।

এতাদৃশ অজ্ঞতা তাঁহার আছে বলিয়াই তিনি এই প্রসঙ্গে অতঃপর নিম্নলিখিত কথাগুলি বলিতে পারিয়াছেন :—

"আধুনিক ব্যক্তিগণের ন্যায় তখনও ঋষিদিগের কোন কোন বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন, এমন কি বিপরীত দৃষ্টি ছিল।"

ঋষিগণের রচনা না বুঝিয়া, উপলব্ধি না করিয়া যাঁহারা ঋষিগণকে এতাদৃশভাবে নিন্দা করিতে পারেন, তাঁহারা কোন্ শ্রেণীর জীব, তাহা পাঠকগণ বিচার করিবেন।

আমরা পণ্ডিত বিধুশেখরকে বলিতে চাই যে, তাঁহার এই ধৃষ্টতা আজকালকার উচ্ছৃঙ্খল যুবকগণ ও কৃতবিদ্যগণ সহ্য করিতে পারেন বটে, কিন্তু প্রকৃতির নিয়মানুসারে ইহার জন্য তাঁহাকে শাস্তি পাইতে হইবে। সত্যস্বরূপ সত্যদর্শী ঋষিগণের নিন্দার অপরার্ধ সত্যের অবমাননা ও মিথ্যার আশ্রয়। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল বংশনাশ, শ্রীহীনতা, অস্বাস্থ্য, অশান্তি, প্রিয়জনের ব্যাধি, ক্লেশ, উচ্ছৃঙ্খলা এবং মৃত্যুকালে অসহ্য যাতনা ও অনুতাপ। ও আর ২-এ যোগ করিলে যে ৫ হয়, পণ্ডিত বিধুশেখর আজ তাহা সম্ভবতঃ জন্ম না বুঝিলেও তাঁহার চলিতে পারে বটে, কিন্তু এমন সময় তাঁহার মরণের প্রাক্কালে আসিবে, যখন তিনি শত বৃশ্চিকদংশনের যাতনায় জর্জ্জরিত হইতে বাধ্য হইবেন। যে আচার্যগণ ঋষিগণের শাস্ত্র ও সাহিত্যের কু-ব্যাখ্যা করিয়া পরোক্ষভাবে তাঁহাদিগকে হাস্যাস্পদ করিয়া তুলিয়াছেন, তাঁহারা কুত্রাপি ঋষিদিগকে নিন্দা করেন নাই। অথচ, ঐ কুব্যাখ্যার ফলেই উঁহাদিগের প্রায় প্রত্যেকে বংশহীন হইতে বাধ্য হইয়াছেন।

কোন ব্যবস্থা সঠীকভাবে বুঝিতে হইলে যে শ্রেণীর মস্তিষ্কের প্রয়োজন, তাহা আজকাল প্রায়শঃ বিরল হইয়া পড়িয়াছে, তাহা সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া ঐ ব্যবস্থা অবোধ্য অথবা নিন্দনীয় হইতে পারে না।

ত্রিশ বৎসর আগে বাঙ্গালাদেশের গ্রাম সংগঠনের ব্যবস্থার যাহা দেখিতে পাওয়া যাইত, তাহা হইতে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতে পারে যে, একদিন লোকসমাজে এমন ব্যবস্থা হইয়াছিল, যাহার ফলে কোন মানুষের কোন নফরগিরীর, অথবা টাকা-আনা-পয়সার প্রয়োজন হয় নাই, অথচ অধিকাংশ মানুষই দীর্ঘ-যৌবন ও দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া সুখে ও শান্তিতে প্রাচুর্য্যের সহিত দিনযাপন করিতে পারিত। যাঁহাদের মস্তিষ্ক হইতে এতাদৃশ লোকহিতকর ব্যবস্থা আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাঁহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, উহার পরিচয় আছে ঋষিপ্রণীত সংহিতায় এবং উহা আবিষ্কৃত হইয়াছিল ঋষিগণের মস্তিষ্ক হইতে। যেরূপ মন ও বুদ্ধি হইলে এতাদৃশ ব্যবস্থা আবিষ্কৃত হইতে পারে, তাহার পন্থা দেখান হইয়াছে ঋষিপ্রণীত দর্শন, তন্ত্র, বেদ ও পুরাণে। যতদিন পর্য্যন্ত ঐ ব্যবস্থা অবিকৃত ছিল, ততদিন পর্য্যন্ত মানুষ সর্ব্বতোভাবে অর্থাভাব, অস্বাস্থ্য, অশান্তি, অনাবৃষ্টি, অকালবার্দ্ধক্য ও অকালমৃত্যু হইতে মুক্ত থাকিতে পারিয়াছিল। যেদিন হইতে মানুষ না বুঝিতে পারিয়া ঐ ঋষিপ্রণীত ব্যবস্থার বিকৃতি সাধন করিতে আরম্ভ করিয়াছে, সেই দিন হইতে মানুষের অর্থাভাবাদির সূচনা ঘটিয়াছে এবং ঐ ব্যবস্থার বিকৃতি যত অধিক পরিমাণে ঘটিতে আরম্ভ করিয়াছে, মানুষের অর্থাভাবাদি তত বৃদ্ধি পাইতেছে। যদি কাহারও প্রাণে মানুষের দুঃখের জন্য বেদনা থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকে ঋষির ব্যবস্থা পুনরায় সর্ব্বাঙ্গীনভাবে আবিষ্কার করিতে হইবে, কারণ মনুষ্যসমাজের প্রত্যেককে সর্ব্বতোভাবে সুখী করিবার অন্য কোন উপায় নাই। আমাদিগের কথা মানুষ এক্ষণে বুঝুক আর না-ই বুঝুক, অদূর-ভবিষ্যতে ওঁতার চোটে উহা অনেকেরই বুঝিতে হইবে।

যাহাতে মানুষ ঐ প্রাচীনতম ব্যবস্থা বুঝিতে পারে, যাহাতে ঐ ব্যবস্থা বুঝিবার প্রবৃত্তি মানুষের প্রাণে উত্থিত হয়, যাহাতে ঐ ব্যবস্থা-প্রণয়নকারিগণের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা অচল ও অটল হয়, তাহা করা প্রত্যেক সমাজহিতৈষিগণের একান্ত কর্ত্তব্য। তাহা না করিয়া যাঁহারা উহার বিপরীত আচরণ করেন, তাঁহারা যে সমাজের কতদূর শত্রু, তাহা অনায়াসেই বুঝা যাইবে। এমন কি, পাশ্চাত্যগণ পর্য্যন্ত প্রায়শঃ ভারতীয় ঋষিগণকে নিন্দা করিতে সাহসী হন নাই।

ইহারই জন্য আমরা বলিতেছিলাম যে, যাঁহারা অবোধ

হইয়া এতাদৃশ সত্যদর্শী ঋষিগণকে পথভ্রান্ত বলিয়া নিন্দা করিতে পারেন, তাঁহাদিগকে উচ্ছৃঙ্খলতাপ্রাপ্ত যুবকগণ ক্ষমা করিতে পারেন বটে, কিন্তু ভগবানের নিয়মের ফলে তাঁহাদিগকে এতাদৃশ অন্যায় কার্য্যের জন্য শাস্তি ভোগ করিতেই হইবে।

ব্যাসের ব্রহ্মসূত্র

এই প্রসঙ্গে পণ্ডিত বিধুশেখর প্রথমতঃ ব্রহ্মসূত্রের উদ্দেশ্য কি তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, দ্বিতীয়তঃ ব্রহ্মসূত্র বুঝিবার অসুবিধা কোথায়, তাহা দেখাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তৃতীয়তঃ সংস্কৃত ভাষার জটিলতার প্রকৃতি কি, তাহা তাঁহার অভিমতানুযায়ী বুঝাইয়াছেন।

ব্রহ্মসূত্রের উদ্দেশ্য কি, তাহা বুঝাইতে বসিয়া তিনি বলিয়াছেন—

> "নানা তত্ত্বের উল্লেখ থাকায় ও কোন কোন বাক্যের অর্থ অস্পষ্ট হওয়ায় এক সময়ে উপনিষদের কতকগুলি কথায় সন্দেহ বা অসামঞ্জস্য খুবই তীব্রভাবে অনুভূত হয়। ইহা সমাধানের জন্য ব্যাস লিখিলেন ব্রহ্মসূত্র"।

তাঁহার উপরোক্ত বাক্য হইতে বুঝিতে হয় যে, উপনিষদে নানা তত্ত্বের উল্লেখ আছে এবং উহার কোন কোন বাক্যের অর্থ অস্পষ্ট। এই কারণে উপনিষদের কতকগুলি কথায় সন্দেহ বা অসামঞ্জস্য খুবই তীব্রভাবে অনুভূত হইয়া থাকে এবং এই অসামঞ্জস্য সমাধানের জন্যই ব্যাসদেব ব্রহ্মসূত্রের রচনা করিয়াছিলেন।

উপনিষদে যে নানা তত্ত্বের উল্লেখ আছে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই বটে, কিন্তু আমাদিগের মতে, বেদের সমগ্র উপনিষদ্-ভাগ তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়াও উহার কোন স্থানে পরস্পর-বিরোধী একটি তত্ত্বেরও উল্লেখ পাওয়া যায় না। যাহারা উপনিষদের ভাষা বুঝিবার পন্থা সম্বন্ধে অজ্ঞ এবং যাহারা উপনিষদের ভাষা যথাযথ অর্থে বুঝিয়া লইতে অক্ষম, তাঁহাদিগের কাছে স্বতঃই উহার প্রায় প্রত্যেক বাক্যটি অস্পষ্ট হইয়া থাকে বটে, কিন্তু যাঁহারা উপনিষদের ভাষা বুঝিবার পন্থা পরিজ্ঞাত হইতে পারিয়াছেন তাঁহাদিগের কাছে উহার কোন বাক্যই যে কথঞ্চিৎ পরিমাণেও অস্পষ্ট হইতে পারে, তাহা আমরা স্বীকার করি না।

পণ্ডিত বিধুশেখর যে উপনিষদের বাক্যের অস্পষ্টতা ও অসামঞ্জস্যের কথা বলিয়াছেন, তাহা হইতে বুঝিতে হয় যে, তিনি উপনিষদের ভাষা বুঝিবার পন্থা সম্বন্ধে অজ্ঞ।

বাস্তবিক পক্ষে, বেদের ভাষা সম্যক্ ভাবে বুঝিতে হইলে প্রথমতঃ অন্যান্য "শব্দমাতৃকা"র সাহায্যে "অ, আ," "ক, খ" প্রভৃতি শব্দের বৈজ্ঞানিক ক্রম, প্রত্যেক শব্দের বিশেষ বিশেষ স্পর্শ-স্থান, গতি ও পরিণতি, শব্দসংযোগ ও বিয়োগের স্বাভাবিক প্রকৃতি এবং শব্দ চিহ্নিত করিবার, অর্থাৎ লিখন-প্রণালীর স্বাভাবিক পন্থা উপলব্ধি করিতে হয়। তদ্ব্যতীত উপরোক্ত পন্থা অবলম্বন করিলে অ, আ, ক, খ প্রভৃতি প্রত্যেক শব্দের ও তদ্গঠিত প্রত্যেক পদের সামঞ্জস্য কি হইতে পারে তাহা পরিজ্ঞাত হওয়া সম্ভবযোগ্য হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ, পূর্ব্ব-মীমাংসার সাহায্যে শব্দ-ধর্ম্ম অর্থাৎ স্পর্শ প্রয়ত্ন, রূপ-গ্রহণ, রস-গ্রহণ ও শব্দ-গ্রহণের তারতম্যানুসারে শব্দ গ্রহণ ও শব্দ-প্রকাশিকা শক্তির কত রকমের তারতম্য ঘটিয়া থাকে এবং কেন এত তারতম্য ঘটে, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে হয়। পূর্ব্ব মীমাংসোক্ত পদ্ধতিতে প্রবিষ্ট হইতে পারিলে অ, আ, ক, খ প্রভৃতি প্রত্যেক শব্দের কি কি বিশেষ বিশেষ অর্থ হইতে পারে এবং তদ্গঠিত বিবিধ পদের কি কি বিশেষ বিশেষ অর্থ হয়, তাহা নির্ভুলভাবে জানা সম্ভব হয়। তৃতীয়তঃ, নিরুক্ত অধ্যয়ন করিতে হয়। "নিরুক্ত" পূর্ব্ব-মীমাংসার উদাহরণ-গ্রন্থ। উহাতে প্রবিষ্ট হইতে পারিলে কোন্ পদের অর্থ কোন্ পদ্ধতিতে গ্রহণ করিতে হয়, তাহা জানা সম্ভব-যোগ্য। চতুর্থতঃ উত্তর-মীমাংসা অধ্যয়ন করিতে হয়। অভিব্যাপক, ঔপশ্লেষিক ও বৈষয়িক, এই তিন শ্রেণীর অধিকরণের যত রকম অধিকরণে মানুষ নিপতিত হয়, তাহার কোন্ অধিকরণে মানুষের কোন্ শ্রেণীর প্রত্যয়ের উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং ঐ প্রত্যয়ের সহিত মানুষের শব্দের মূল কারণের সম্বন্ধ কিরূপ তাহা উত্তর-মীমাংসায় অথবা শারীরক-মীমাংসায় দেখান হইয়াছে। উত্তর-মীমাংসায় প্রবিষ্ট হইতে পারিলে মূল ধাতুর সহিত বিভিন্ন প্রত্যয়ের যোগে বিরূপ অর্থ-পার্থক্য ঘটিয়া থাকে এবং ঐ অর্থ-পার্থক্য কেন হয় তাহা সম্যক্ ভাবে বুঝা যায়। পঞ্চমতঃ, পাণিনি-ব্যাকরণ প্রধানতঃ উত্তরমীমাংসার অনুশীলন-গ্রন্থ। উহা অধ্যয়ন করিতে

পারিলে পদ ও বাক্যের সহিত উহার অর্থের প্রাকৃতিক সম্বন্ধ কিরূপভাবে বিদ্যমান থাকে, প্রত্যেক পদ ও বাক্য দেখিয়া উহার অর্থ সম্যক্ ও নির্ভুলভাবে কিরূপভাবে গ্রহণ করিতে হয়, মনের ভাব যাহাতে একাধিক অর্থে গৃহীত না হইতে পারে, তদুদ্দেশ্যে কোন্ নিয়মে পদ ও বাক্য যোজনা করিতে হয় তাহা সম্যক্ ভাবে জানিতে পারা যায়।

বেদের শব্দ-নাতৃকা-ভাগ, পূর্ব্ব-মীমাংসা, নিরুক্ত, উত্তর-মীমাংসা ও পাণিনি যথাযথভাবে অধ্যয়ন করিলে যে উপরোক্ত বিষয়গুলি জানা যায়, তাহা সর্ব্বসাধারণকে বুঝান সম্ভব নহে। আমাদিগের কথার সত্যতার সর্ব্বাপেক্ষা বড় প্রমাণ শব্দ-মাতৃকা, পূর্ব্ব মীমাংসা, নিরুক্ত, উত্তর-মীমাংসা ও পাণিনি-ব্যাকরণে যথাযথভাবে প্রবিষ্ট হইতে চেষ্টা করা। তাহা করিতে যাঁহারা সক্ষম নহেন, তাঁহারা "শব্দ-শরীর" সম্বন্ধে ঋষিদিগের যে সমস্ত কথা আছে তাহা জানিতে পারিলেও ঋষি-প্রণীত বেদের ভাষায় প্রবিষ্ট হইতে হইলে যে যথাক্রমে শব্দ-নাতৃকা, পূর্ব্ব-মীমাংসা, নিরুক্ত, উত্তর মীমাংসা ও পাণিনি ব্যাকরণে প্রবিষ্ট হইতে হয়, তৎসম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হইতে পারিবেন।

পণ্ডিত বিধুশেখর কি উপরোক্ত ভাবে বেদের অথবা উপনিষদের ভাষায় প্রবিষ্ট হইবার চেষ্টা করিয়াছেন? আমাদিগের বিশ্বাস,তিনি তাহা করেন নাই এবং তিনি উপনিষদের মূল-ভাগের যথাযথ অর্থ বুঝিতে সক্ষম নহেন। তাঁহার এতাদৃশ অজ্ঞতা রহিয়াছে বলিয়াই তিনি উপনিষদের বাক্যে অস্পষ্টতা ও অসামঞ্জস্যের কথা বলিতে সঙ্কোচ বোধ করেন নাই।

কোন্ উপনিষদের কোন্ বাক্য অস্পষ্ট, তাহা তিনি উহার মূলভাগের অর্থোদ্ধার, ব্যাকরণের নিয়মানুসারে করিয়া দেখাইয়া দিতে পারেন কি? আমাদিগের বিশ্বাস, তাহা তিনি পারিবেন না এবং সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞতার জন্য তিনি ঋষিগণের উপর দোষারোপ করিয়াছেন।

উপনিষদে যদি কোন অসামঞ্জস্য না দেখা যায় তাহা হইলে কোন অসামঞ্জস্যের সমাধানের জন্য ব্যাসদেব ব্রহ্মসূত্র রচনা করিয়াছেন, এমন কথা বলা চলে না।

"...উপনিষদের কতকগুলি কথায় সন্দেহ বা অসামঞ্জস্য খুবই তীব্রভাবে অনুভূত হইয়া থাকে এবং এই অসামঞ্জস্যের সমাধানের জন্যই ব্যাসদেব ব্রহ্মসূত্রের রচনা করিয়াছিলেন", পণ্ডিত বিধুশেখরের এতাদৃশ কথা হইতে বুঝিতে হয় যে, উপনিষদ্‌কে ভিত্তি করিয়াই ব্রহ্মসূত্র রচিত হইয়াছে। উপনিষদের কথাগুলির অসামঞ্জস্যের সমাধান-জন্যই ব্রহ্মসূত্র, এবংবিধ মতবাদ সত্য হইলে ব্রহ্মসূত্রের মধ্যে উপনিষদের বাক্যসমূহ হুবহু বিদ্যমান থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়। সমগ্র ব্রহ্মসূত্রের কুত্রাপি কোন উপনিষদের কোন একটী বাক্যও হুবহু-ভাবে যে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা পণ্ডিত বিধুশেখর দেখাইতে পারিবেন কি? যদি তাহা না দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার মতবাদ যে সম্পূর্ণভাবে ভিত্তিহীন, তাহা প্রমাণিত হয় না কি?

বাস্তবিক পক্ষে, কোন উপনিষদ্‌কে ভিত্তি করিয়া অথবা উপনিষদের কোন বাক্যের অসামঞ্জস্যের সমাধান করিবার জন্য ব্রহ্মসূত্র রচিত হয় নাই। উপনিষদের কোন বাক্য ব্রহ্মসূত্রে হুবহু উদ্ধৃত হইয়াছে, ইহাও দেখা যাইবে না। পরন্তু ঋষির ভাষা যথাযথভাবে বুঝিবার জন্য ঋষিগণ যে সমস্ত গ্রন্থ রচনা করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম অবগত হইয়া স্বাধীনভাবে উপনিষদ্ ও ব্রহ্মসূত্র পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে দেখা যাইবে যে, উপনিষদের জ্ঞান না হইলেও ব্রহ্মসূত্রের অধ্যয়ন করা যায় বটে, কিন্তু ব্রহ্মসূত্রের জ্ঞান না হইলে উপনিষদ্ যথাযথ অর্থে বুঝা যায় না। কাযেই, কোন উপনিষদ্‌কে ভিত্তি করিয়া যে ব্রহ্মসূত্র রচিত হয় নাই, তাহা নিঃসন্দিগ্ধভাবে বলা যাইতে পারে।

আমরা আগেই বলিয়াছি যে, উপনিষদ্ রচিত হইয়াছিল বেদোক্ত অব্যক্ত ও ব্যক্ত বিষয় অথবা অবস্থাসমূহের সম্বন্ধ কি তাহা দেখাইবার জন্য। আর ব্রহ্মসূত্র রচিত হইয়াছে শব্দ-গ্রহণ, স্পর্শ-গ্রহণ, রূপ-গ্রহণ, রস-গ্রহণ ও গন্ধ-গ্রহণ-রূপী যে পাঁচটি শক্তি লইয়া মানুষের মনুষ্যত্ব সেই পাঁচটী শক্তির মূল শক্তি যে শব্দ-শক্তি, তাহার উৎপত্তির কারণ কি, এবং বিভিন্ন বাক্যাধিকরণে মানুষের যে বিভিন্ন বাক্য ও পদ ও অবস্থার উৎপত্তি হয়, তাহার বিভিন্নতার মূল কারণ ও প্রকৃতি কি তাহা দেখাইবার জন্য। উপনিষদ্ ও ব্রহ্মসূত্র যথাযথ অর্থে বুঝিতে পারিলে আমাদিগের কথার সত্যতা সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে।

ব্রহ্মই যে শব্দ-শক্তির মূল কারণ, তাহা কি করিয়া উপলব্ধি করিতে হয়, তাহা যেখান হইয়াছে তন্ত্রে। উহাই

আবার যুক্তির দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে উত্তর-মীমাংসার। ইহারই জন্য উত্তর-মীমাংসাকে ব্রহ্মসূত্র বলা হইয়া থাকে। ব্রহ্মসূত্রে প্রবিষ্ট হইতে না পারিলে, অর্থাৎ সমস্ত বাক্তির মূল যে শব্দ এবং সেই শব্দের মূলে যে অব্যক্তের খেলা রহিয়াছে, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে না পারিলে, বেদের অব্যক্ত-সম্বন্ধীয় কোন কথাই উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। অন্যপক্ষে সমস্ত বাক্তির মূলেই যে অব্যক্তের খেলা বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিলে বেদোক্ত অব্যক্ত-সম্বন্ধীয় কথাগুলি বুঝা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইয়া থাকে। এক কথায়, উত্তর-মীমাংসার বক্তব্য পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে বেদের অন্তে, অর্থাৎ মীমাংসার উপনীত হওয়া সহজসাধ্য হইয়া থাকে। ইহারই জন্য উত্তর-মীমাংসার অপর নাম হইয়াছে "বেদান্ত"।

জগতের প্রত্যেক বাক্যাধিকরণে শব্দের প্রকরণ কিরূপ ঘটিয়া থাকে ও উহা হইতে অব্যক্ত ব্রহ্মের কার্য্য কিরূপে উপলব্ধি করা যায়, তাহা ব্রহ্মসূত্রে দেখান হইয়াছে বটে, কিন্তু অব্যক্ত ব্যাপারসমূহে প্রকৃতি ও ব্রহ্মের কারণ যে কিরূপ, তাহা সম্যক্ ভাবে ব্রহ্মসূত্রে দেখান হয় নাই। উহা দেখান হইয়াছে বেদে। অব্যক্ত হইতে বিভিন্ন বাক্যাধিকরণের উৎপত্তি হইতেছে কিরূপে, তাহা দেখান হইয়াছে বেদের উপনিষদ্-ভাগে।

বাক্যাধিকরণ-সমূহ তন্ন-তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ করিলে কিরূপে প্রত্যেক বাক্যাধিকরণে অব্যক্ত ব্রহ্মের অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায়, তাহা মূল ব্রহ্মসূত্রে দেখান হইয়াছে বটে, কিন্তু অব্যক্ত হইতে কিরূপে বাক্যাধিকরণসমূহের উৎপত্তি ঘটিতেছে, তাহা মূল ব্রহ্মসূত্রে দেখান হয় নাই। অথচ আগেই বলিয়াছি যে, উহা বেদের উপনিষদ্-ভাগে দেখান হইয়াছে। মূল ব্রহ্মসূত্রে উহা দেখান হয় নাই বটে, কিন্তু শঙ্করাচার্য্য তাঁহার ভাষ্যে উপনিষদের মূল বাক্যগুলি উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার স্বকীয় সংস্কারানুযায়ী উহা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কাযেই, যদিও মূল ব্রহ্মসূত্রে উপনিষদের কোন বাক্য হুবহু উদ্ধৃত দেখা যায় না, তথাপি শঙ্কর-ভাষ্যে উহা উদ্ধৃত হইয়াছে।

আমাদিগের উপরোক্ত কথাগুলি বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, পণ্ডিত বিধুশেখর ব্রহ্মসূত্রের উদ্দেশ্য কি, তৎসম্বন্ধে বলিতে বসিয়া যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটী তিনি যে ব্রহ্মসূত্রের ও উপনিষদের মূল ভাবের সহিত এবং এমন কি, শঙ্কর-ভাষ্যের যথার্থ তাৎপর্য্যের সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত—তৎসম্বন্ধীয় সাক্ষ্য।

তথাপি তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের মহিমায় উহার আশুতোষ চেয়ারে অধিষ্ঠিত।

ব্রহ্মসূত্র বুঝিবার অসুবিধা কোথায়, তাহা দেখাইতে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি বলিতেছেন—

> "• • ব্যাসের কথায় নূতন নূতন ব্যাখ্যার সৃষ্টি হইল, এখনও হইতেছে এবং হইবে। এখন প্রশ্ন হইতেছে, ব্রহ্ম-সূত্রের এই যে দ্বৈত, অদ্বৈত ইত্যাদি ইত্যাদি, এই সবগুলিই কি ব্যাসের অভিমত?"

আমরা জিজ্ঞাসা করি যে, ব্যাসদেবের মূল-সূত্র অধ্যয়ন না করিয়া, উহা কোন্ নিয়মে অধ্যয়ন করিতে হয়, তাহা পরিজ্ঞাত না হইয়া, পণ্ডিত বিধুশেখর ভাষ্যকারের ভাষ্য অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হন কেন?

ঋষি-প্রণীত সংস্কৃতের বাক্যার্থ উদ্ধার করিবার পদ্ধতি যথাযথ ভাবে বিদিত হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, ব্যাসদেব একই অর্থে তাঁহার সূত্রগুলি রচনা করিয়াছেন। তৎসত্ত্বেও যে একই সূত্র বিভিন্ন অর্থে ব্যাখ্যাত হইতেছে এবং হইয়াছে, তাহার একমাত্র কারণ পণ্ডিত বিধুশেখর যেরূপ উহার অর্থগ্রহণ করিবার পদ্ধতি সম্বন্ধে অজ্ঞ, সেইরূপ ঐ ভাষ্যকারগণও অজ্ঞ। চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, ঐ ভাষ্যকারগণের এই অজ্ঞতার জন্যই একই ঋষির একই বাক্য লইয়া বিভিন্ন মতবাদের উৎপত্তি হইয়াছে এবং তাহার ফলে ভারতবর্ষে বিভিন্নবিষয়ক দ্বন্দ্ব-কলহের সৃষ্টি হইয়াছে ও তৎসঙ্গে সঙ্গে ঋষি-প্রণীত "মানবধর্ম্ম" লুপ্ত হইয়া বৌদ্ধ, জৈন, খ্রীষ্টান ও মুসলমান প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্ম মানব-সমাজে দেখা দিয়াছে এবং পরিশেষে "সোনার ভারত" পরাধীন হইয়া পড়িয়াছে।

কাযেই দেখা যাইতেছে যে, যাহা অতীব স্পষ্ট, তাহা পর্য্যন্ত বুঝিবার ক্ষমতা, অর্থাৎ মানুষ যাহাকে common sense বলিয়া থাকে, তাহা পর্য্যন্ত কোন কোন বিষয়ে পণ্ডিত বিধুশেখরের নাই।

তথাপি তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের অনুগ্রহাবলে আশুতোষ চেয়ারে অধিষ্ঠিত!

সংস্কৃত ভাষার জটিলতার প্রকৃতি কি তাহা বুঝাইতে বসিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে, একই শ্লোক একাধিক অর্থে গৃহীত হইয়া থাকে এবং এমন কি, একই শ্লোকের সাতটী পর্য্যন্ত অর্থ হয়।

ঋষি-প্রণীত সংস্কৃত ভাষার অর্থোদ্ধার করিবার জন্য ঋষিগণ কি নির্দ্দেশ দিয়াছেন, তাহা জানিতে পারিলে পণ্ডিত বিধুশেখর বুঝিতে পারিবেন যে, ঋষি-প্রণীত ঐ নিয়ম এতই পরিষ্কার এবং ভাষা-বিজ্ঞান সম্বন্ধে এতই আমূল জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত যে, উহার নির্দ্দেশ অনুসারে অর্থোদ্ধার করিতে পারিলে ঋষি-প্রণীত একই বাক্যের একাধিক অর্থ করা সম্ভব হয় না এবং ঐ প্রকৃত অর্থ ছাড়া যে কোন অর্থই ধরা যাউক না কেন, তাহা খণ্ডন করা সম্ভব হয়। আচার্য্যগণ যে একই বাক্যের একাধিক অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহার কারণ অর্থোদ্ধার করিবার জন্য ঋষিগণ যে নির্দ্দেশ দিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আচার্য্যগণের অজ্ঞতা। ঋষি-প্রণীত সংস্কৃত ভাষার অর্থোদ্ধার করিবার পন্থা যেরূপ বৈজ্ঞানিক ও সুস্পষ্ট, তাহা প্রাচীন টিকা ও প্রাচীন আলোচনা ছাড়া অন্য কোন ভাষায় দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রয়োজন হইলে আমাদিগের উপরোক্ত কথার সত্যতা বিস্তৃত ভাবে দেখাইয়া দিতে প্রস্তুত আছি।

কাজেই বলিতে হয়, পণ্ডিত বিধুশেখর সংস্কৃত ভাষার অর্থ-গ্রহণে যে জটিলতা দেখিতে পান, তাহা প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃত ভাষার দুষ্টতার জন্য নহে, পরন্তু তাঁহার স্বকীয় অজ্ঞতার জন্য।

যাহাতে যুক্তি আছে তাহাই কি সত্য?

এই প্রসঙ্গে পণ্ডিত বিধুশেখর যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহা অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে যে, যাহাতে যুক্তি আছে, তাহাই সত্য কি না, তাহা উদ্ঘাটন করিবার জন্য পণ্ডিতজী অনেক চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার বক্তৃতার কুত্রাপি "যুক্তি" ও "সত্য" কাহাকে বলে, তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করেন নাই। ঐ কথাগুলি অনুধাবন করিলে আরও দেখা যাইবে যে, উহার মধ্যে একটীও উল্লেখযোগ্য কথা নাই, পরন্তু "যুক্তি" ও "সত্য"র সংজ্ঞা নির্দ্ধারণ না করিয়া, অর্থাৎ ঐ দুইটী পদের যথাযথ conception কি, তাহা না দেখাইয়া একের মধ্যে অপর আছে কি না তাহার বিচার করিতে উদ্যত হওয়ায়, তৎসম্বন্ধীয় সমস্ত কথা পাগলের প্রলাপবৎ প্রতিভাত হইয়াছে, আসল কথা, "যুক্তি" ও "সত্য"র সংজ্ঞা কি, তৎসম্বন্ধে তাঁহার নিজেরই কোন স্পষ্ট ধারণা নাই। যাহা তিনি নিজে বুঝেন না, তাহা পরকে বুঝাইতে গেলে তাহার পরিণতি কি হয় অথবা হইতে পারে তাহার বিচার করিতে গেলে, যে-পাগলামী স্বতঃই ফুটিয়া বাহির হয়, এক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে।

"সত্য" ও "যুক্তি" সম্বন্ধে ঋষিগণ তাঁহাদিগের প্রণীত বিবিধ গ্রন্থের অনেক স্থলে অনেক কথাই বলিয়াছেন বটে, কিন্তু উহার সংজ্ঞা সম্বন্ধে একমাত্র অথর্ব্ববেদ ও স্কন্দপুরাণের "সত্যনারায়ণে"র প্রসঙ্গ ছাড়া আর কোথাও কিছু বলিয়াছেন বলিয়া আমাদিগের নজরে পড়ে নাই।

যাহা সর্ব্বকালে ও সর্ব্বক্ষেত্রে বিদ্যমান থাকে, তৎসম্বন্ধীয় আর্য্য ঋষিগণের ভাষানুসারে "সত্য" এবং কোন দুইটী দ্রব্য, গুণ অথবা কর্ম্মের সম্বন্ধ বিচার করিতে গেলে যে-নিয়ম অথবা হেতুবাদ-বলে ঐ দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মের মূল কারণ ও সর্ব্ববিধ পরিণতি পর্য্যন্ত ধারণা করা যায়, সেই নিয়ম অথবা হেতুবাদের নাম "যুক্তি"। যে নিয়ম অথবা হেতুবাদের আশ্রয় গ্রহণ করিলে, কোন দুইটী দ্রব্য, গুণ অথবা কর্ম্মের সম্বন্ধে কতকাংশে নির্দ্ধারণ করা সম্ভব হয় বটে, কিন্তু উহাদিগের মূল কারণ ও সর্ব্ববিধ পরিণতি সর্ব্বতোভাবে নির্দ্ধারণ করা যায় না, সেই নিয়ম ও হেতুবাদের নাম প্রকার ও ক্ষেত্রভেদে "বাধ", "ভ্রম", "বিতণ্ডা", "হেত্বাভাস" ও "ছল" হইয়া থাকে।

"সত্য" ও "যুক্তি"র সংজ্ঞা ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে পরিদৃশ্যমান জগৎ সম্বন্ধে কয়েকটী কথা মনে রাখিতে হইবে।

এই পরিদৃশ্যমান জগতের মূল কারণ একটী কর্ম্ম। ঐ একটী কর্ম্ম হইতে প্রতিনিয়ত বিবিধ কর্ম্মের উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে বিবিধ গুণ ও দ্রব্যের উৎপত্তি হয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত গুণের উৎপত্তি না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত অবয়ববিশিষ্ট কোন দ্রব্যের উৎপত্তি হইতে পারে না। গুণের উৎপত্তি হইবার সঙ্গে সঙ্গেই দ্রব্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে, কারণ গুণ দ্রব্য ছাড়া পৃথক্ ভাবে থাকিতে

পারে না এবং কোন দ্রব্যও কোন না কোনরূপ গুণযুক্ত না হইলে "দ্রব্য"-পদবাচ্য হয় না।

বিশ্ব-দুনিয়ায় এমন অনেক স্থল আছে, যেখানে কোন দ্রব্য ও গুণ বিদ্যমান নাই, অথচ কেবলমাত্র "কর্ম্ম"ই বিদ্যমান আছে। কিন্তু দুনিয়ার যে যে স্থলে কেবলমাত্র "কর্ম্ম"ই বিদ্যমান আছে, সেই সেই স্থানে কর্ম্ম হইতে কর্ম্মের, এবং 'কর্ম্মকে' অধিকরণ করিয়া অপর "কর্ম্মের" উদ্ভব হইয়া থাকে। যখনই দ্রব্য ও গুণের উৎপত্তি হয়, তখন একদিকে যেরূপ মূল কর্ম্মরূপী কারণ হইতে অপর কর্ম্মের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ দ্রব্য এবং গুণ হইতেও কর্ম্মের উৎপত্তি ঘটে।

এইরূপে মানুষ প্রভৃতি প্রত্যেক জীবের মধ্যে জগতের মূলীভূত কারণ যে "কর্ম্ম", তাহার ক্রিয়া ও কার্য্য কতক পরিমাণে বিদ্যমান থাকে, আর কতক পরিমাণে জীবের রক্ত-মাংস প্রভৃতি দ্রব্য ও গুণের কার্য্য বিদ্যমান থাকে।

জগতের মূলীভূত কারণ যে "কর্ম্ম", তাহার যে ক্রিয়া ও কার্য্য জীবের মধ্যে বিদ্যমান থাকে, এবং ঐ "কর্ম্ম" হইতে যে-সমস্ত দ্রব্য ও গুণের উৎপত্তি হয়, তৎসম্বন্ধীয় প্রত্যেক আখ্যানটী "সত্য"।

ইহা ছাড়া, জীব যদি কর্ম্মরূপী তাহার মূল কারণকে বিস্মৃত না হইয়া সজ্ঞানে জীবের রক্তমাংস প্রভৃতি দ্রব্য ও গুণের পোষণার্থ কোন অপর কর্ম্ম, দ্রব্য ও গুণের উৎপত্তি সাধন করে, তাহা হইলে এবংবিধ কর্ম্ম, দ্রব্য ও গুণসম্বন্ধীয় আখ্যানকেও "সত্য" বলা যাইতে পারে।

জীব যদি কর্ম্মরূপী তাহার মূল কারণকে বিস্মৃত হইয়া অজ্ঞানে মোহবশতঃ তাহার স্বকীয় রক্তমাংস প্রভৃতির পুষ্টির কোন কর্ম্ম, দ্রব্য ও গুণের উৎপত্তি সাধন করে, তাহা হইলে ঐ কর্ম্ম, দ্রব্য ও গুণ কখনও চিরস্থায়ী হইতে পারে না এবং ঐ-সম্বন্ধীয় আখ্যানকেও "সত্য" বলিয়া অভিহিত করা চলে না। এবংবিধ কর্ম্ম, দ্রব্য ও গুণ-সম্বন্ধীয় আখ্যানকে "অসত্য" অথবা "কল্পনা" বলা হইয়া থাকে।

এইরূপভাবে "সত্য" ও "যুক্তি"র সংজ্ঞা বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, যাহাতে আসল "যুক্তি" আছে তাহাই "সত্য"।

অবশ্য "সত্য" ও "যুক্তি" যে কি বস্তু, তাহা বুঝা সকলের পক্ষে সম্ভবযোগ্য নহে, কারণ "সত্য" ও "যুক্তি" অনুধাবন করা সাধনাসাপেক্ষ।

অপর দাবীটি বিষয়ে পণ্ডিত বিদ্যুৎপ্রভ যে সমস্ত কথা কহিয়াছেন তাহা অধিকতর নিন্দনীয়। উহার প্রায় প্রত্যেক কথাটী "অসত্য" ও বালকোচিত।

স্থানাভাবে ঐ সমস্ত কথার সমালোচনায় আমরা এই সংখ্যায় হস্তক্ষেপ করিব না। প্রয়োজন হইলে আমরা উহাতে প্রবৃত্ত হইব।

উপসংহারে আমরা পণ্ডিত বিদ্যুৎপ্রভকে ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে অবহিত হইতে অনুরোধ করিতেছি।

রাজকোট-সংঘর্ষে স্যর মরিস গইয়ারের নিষ্পত্তি

পাঠকবর্গ বিদিত আছেন যে, রাজকোট রাজ্যের একটি ঘোষণার অন্তর্গত কয়েকটি কথার অর্থ সম্পর্কে ভারতীয় কংগ্রেস এবং রাজকোটের রাজার মধ্যে মতানৈক্য ঘটে। ঘোষণাটি রাজকোট রাজ্যের সংস্কার-সমিতির নির্ব্বাচন-বিষয়ক। রাজকোটের রাজা বলেন যে, ঘোষণানুযায়ী প্রস্তাবিত সংস্কার-সমিতির দশ জন সদস্যের সাত জনকে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটীর মিঃ প্যাটেল সুপারিশ করিবেন, কিন্তু মিঃ প্যাটেল ইচ্ছানুযায়ী তাঁহাদিগকে নির্ব্বাচন করিতে পারিবেন না, তাঁহাকে কয়েকটি সর্ত্ত মানিয়া লইতে হইবে এবং মিঃ প্যাটেল কর্ত্তৃক এই ভাবে নির্দ্ধারিত সাত জন সদস্যকে মনোনীত করিবার ক্ষমতা থাকিবে রাজকোটের রাজার। রাজকোটের রাজার মত এই যে, নির্ব্বাচনে তাঁহার অনুজ্ঞাই বলবতী থাকিবে।

কিন্তু মিঃ প্যাটেল আপত্তি তুলেন যে, যদি উক্ত ঘোষণাকে যথোচিত মর্য্যাদা দান করিতে হয়, তবে প্রস্তাবিত সংস্কার-সমিতির যে সাত জন সদস্যকে মিঃ প্যাটেল সুপারিশ করিবেন,

তাঁহাদের সকলকেই রাজকোটের রাজা মনোনীত করিতে বাধ্য থাকিবেন, অবশ্য যদি রাজকোট রাজ্যের কর্মচারী কিংবা অধিবাসী নহেন, এমন ব্যক্তি তাঁহারা না হন।

পাঠকবর্গ ইহাও বিদিত আছেন যে, মিঃ গান্ধী মিঃ প্যাটেলের পক্ষ সমর্থন করিয়া, রাজকোটের রাজার স্বেচ্ছায় তাঁহার দাবীপূরণ কিংবা বড়লাট হস্তক্ষেপ না করা পর্য্যন্ত আমৃত্যু অনশন পণ করেন এবং বড়লাট শেষ পর্য্যন্ত হস্তক্ষেপ করিয়া যে সকল কথার অর্থ লইয়া মতানৈক্য ঘটে, তাহার নিষ্পত্তির ভার ভারতের প্রধান বিচারপতিকে প্রদান করেন।

গত ৩রা এপ্রিল তারিখে ভারতের প্রধান বিচারপতি স্যর মরিস গয়ার তাঁহার অভিমত প্রদান করিয়াছেন। তিনি সমস্যে নিম্নলিখিত তিনটি নথী বিচার করেন :— (১) যে ঘোষণা লইয়া মতানৈক্য ঘটে; (২) ঐ ঘোষণার খসড়া; এবং (৩) মিঃ প্যাটেলকে লিখিত রাজকোটের রাজার পরবর্ত্তী একটি পত্র।

তাঁহার অভিমত এইরূপ :—

"প্রত্যেকটি নথীর প্রকৃত ব্যাখ্যা এই যে, মিঃ বল্লভভাই প্যাটেল যাঁহাদিগকে সুপারিশ করিবেন, ঠাকুর সাহেব তাঁহাদিগকেই মনোনীত করিবার সঙ্কল্প জ্ঞাপন করেন এবং যাঁহারা তাঁহার মনোমত না হইবেন, তাঁহাদিগকে বাতিল করিবার অধিকার তিনি নিজের হাতে রাখেন নাই। সুপারিশের সমালোচনার এবং পুনর্ব্বিবেচনার জন্য কারণ প্রদর্শন করিবার অধিকার তাঁহার অবশ্যই আছে, কিন্তু সুপারিশকৃত ব্যক্তিবৃন্দের কেহ তাঁহার প্রজা অথবা কর্ম্মচারী নহেন, এমন না দেখাইতে পারিলে মিঃ বল্লভভাই প্যাটেলের সুপারিশই চূড়ান্ত হইবে।"

আমরা জানি যে, ভারতের প্রধান বিচারপতির লেখনী-নিঃসৃত রায়ের প্রতিবাদ করা আমাদের সাজে না এবং কার্য্যতঃও তাহাতে কোন ফল হইবে না, এমন কি, যদি ভারতবাসী জন-সাধারণের ইহার বিপক্ষতার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তিও থাকে, তথাপি সকল অবস্থাতেই এতদনুযায়ীই কার্য্য হইবে। কিন্তু তথাচ, ইহার সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য দুইটি কারণে প্রকাশ করা উচিত বলিয়া মনে করিতেছি; প্রথম, আমরা ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শুভার্থী এবং আমাদের মতে, এদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রধান ভিত্তি হইতেছে ব্রিটিশজাতির ন্যায়বিচারের উপর জনসাধারণের সম্পূর্ণ বিশ্বাস, এবং কোনও ভ্রান্ত বিবেচনা সেই বিশ্বাস শিথিল করিবার কারণ হইলে ঐ ভিত্তি ধ্বংস হইবার অন্যতম হেতুর সৃষ্টি হইবে। দ্বিতীয়তঃ, ভারতের প্রধান বিচারপতি যত গুণী ব্যক্তিই হউন না কেন, মোটের উপর তিনি মানুষ, সুতরাং ত্রুটি-বিচ্যুতি হইতে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত হইবেন, এইরূপ প্রত্যাশা করা যায় না।

প্রধান বিচারপতি-প্রদত্ত এই নিষ্পত্তির যুক্তিযুক্ততা-বিচারে আমরা অতঃপর অগ্রসর হইব। ইহা করিতে হইলে আমাদিগকে প্রথমতঃ এই নিষ্পত্তির মূল যে তিনটি নথী, সেইগুলির বিচার করিতে হইবে এবং দ্বিতীয়তঃ যে-চুক্তির উপর নিষ্পত্তি হইয়াছে, তাহার বিচার করিতে হইবে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, নিষ্পত্তির মূলে রহিয়াছে তিনটি নথী : (১) রাজকোট রাজ্যের ১৯৩৮ সনের ২৮শে ডিসেম্বর তারিখের ঘোষণা (১৯৩৮-৩৯ সনের ৫০ নম্বর), (২) ঐ ঘোষণার খসড়া, (৩) ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে ঠাকুর সাহেবের লিখিত মিঃ বল্লভভাই প্যাটেলের পরবর্ত্তী একটি পত্র।

এই তিনটি নথীর কোনটিরই সম্পূর্ণ বক্তব্য আমাদের জানা নাই এবং উহাদের সমগ্রাংশের সহিত আমাদের তেমন কোন সম্পর্কও নাই। এই সকল নথীর যে-সব অংশ ভারতের প্রধান বিচারপতি তাঁহার নিষ্পত্তি মীমাংসার নিমিত্ত উল্লেখ করিয়াছেন, আমাদের প্রয়োজন কেবল তাহাই লইয়া।

প্রধান বিচারপতি রাজকোটের রাজার ঘোষণার যে অংশ উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা উহার দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফে নিবদ্ধ। ইহা নিম্নলিখিত-রূপ :—

"আমরা দশজন সদস্য লইয়া একটি সমিতি-গঠন স্থির করিয়াছি। ইহাঁরা সকলেই রাজ্যের প্রজা অথবা কর্ম্মচারী হইবেন। ইহাঁদের মধ্যে তিনজন রাজ্যের কর্ম্মচারী হইবেন এবং সাতজন আমাদের রাজ্যের প্রজা হইবেন—তাঁহাদের নাম অতঃপর ঘোষণা করা হইবে। এই সমিতির সভাপতি আমাদের দ্বারা মনোনীত হইবেন।"

ঘোষণার উদ্ধৃত অংশের খসড়া এইরূপ :—

"আমরা দশজন সদস্য লইয়া একটি সমিতি-গঠন স্থির

করিয়াছি, তাঁহাদের সকলেই রাজ্যের প্রজা কিংবা কর্মচারী হইবেন, তন্মধ্যে সাতজনকে মিঃ বল্লভভাই প্যাটেল আমাদের মনোনয়নার্থ সুপারিশ করিবেন। সমিতির সভাপতি আমাদের দ্বারাই মনোনীত হইবেন, তাঁহাকে রাজ্যের দায়ত্বীয় বিষয় সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হইতে হইবে এবং তাঁহাকে আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাসের পাত্র হইতে হইবে।"

২৬শে ডিসেম্বর তারিখে ঠাকুর সাহেব মিঃ বল্লভভাই প্যাটেলকে যে পত্র লিখেন, তাহা এইরূপ :—

"স্বীকার করা হইতেছে যে, অদ্যকার তারিখের সরকারী ঘোষণার উল্লিখিত ২য় ধারা অনুযায়ী সমিতির সাতজন সদস্যকে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল সুপারিশ করিবেন এবং তাঁহারা আমাদের দ্বারা মনোনীত হইবেন।"

ভারতের প্রধান বিচারপতি আলোচ্য বিষয় স্থির করিয়া এই তিনটি নথীর তাৎপর্য সম্বন্ধে মীমাংসার উপনীত হইবার জন্য নিম্নলিখিত ভাবে অগ্রসর হইয়াছেন :—

"বিচার্য বিষয়টি সংক্ষেপে বলিতে গেলে এই : ঠাকুর সাহেব মিঃ বল্লভভাই প্যাটেলের সুপারিশ গ্রহণ করিতে বাধ্য থাকিবেন অথবা নিজ ইচ্ছা অনুসারে উহা গ্রহণ করিতে অথবা বর্জন করিতে পারিবেন। উভয় পক্ষের মধ্যে যে চুক্তি থাকা হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। এমন হইতে পারে যে, অবস্থার চাপে পড়িয়া ঠাকুর সাহেব এরূপ একটি বন্দোবস্তে সম্মতি দিতে বাধ্য হন, যাহাতে হয়তো তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল না। কিন্তু, তাই বলিয়া এমন কথা বলা যায় না যে, এক্ষেত্রে প্রতারণা বা বাধ্যতা-প্রয়োগের আশ্রয় লওয়া হইয়াছে—সকল আইনেই প্রতারণা বা বাধ্যতা-প্রয়োগ চুক্তি বাতিল করে বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

"কাহার পক্ষদ্বয় এই চুক্তির দ্বারা কি বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন, তাহা আমাকে নির্দ্ধারণ করিতে হইবে এবং আমাকে, চুক্তি-প্রকাশে যে-ভাষা ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহা হইতেই ইহা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। অবশ্য, সমস্ত বিষয়টির ঘটনা-পরম্পরা এবং কি অবস্থায় এই বন্দোবস্তের সৃষ্টি, তাহা আমার অবগত হওয়া প্রয়োজন এবং তাহা করিবার আমার অনুমোদনও আছে।

"দেখা যাইবে যে, ঘোষণার খসড়ার ভাষা এবং ২৬শে ডিসেম্বরের পত্রের ভাষায় সামান্য পার্থক্য বর্তমান। প্রথমটিতে বলা হইয়াছে, 'দশ জন সদস্য লইয়া কমিটী গঠিত হইবে, তাঁহাদের সকলেই রাজ্যের প্রজা অথবা কর্মচারী হইবেন, তন্মধ্যে সাত জনকে সর্দার বল্লভভাই আমাদের মনোনয়নার্থ সুপারিশ করিবেন'; দ্বিতীয়টিতে বলা হইয়াছে যে, 'কমিটীর সাত জন সদস্যকে সর্দার বল্লভভাই সুপারিশ করিবেন এবং আমরা মনোনীত করিব'।

"এমন কোন সাক্ষ্য নাই, যাহাতে মনে করা যাইতে পারে যে, ঘোষণার খসড়ার যাহা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা হইতে পত্রের ভাষাকে পৃথক্ করিবার জন্য চেষ্টা করা হইয়াছে, কিংবা আমি এমনও মনে করি না যে, কথার অদল-বদল হইলেও দুইটি বাক্যের অর্থ বিভিন্ন।

"আমার মতে, প্রত্যেকটি নথীর প্রকৃত ব্যাখ্যা এই যে, বল্লভভাই প্যাটেল যাঁহাদিগকে সুপারিশ করিবেন, ঠাকুর সাহেব তাঁহাদিগকেই মনোনীত করিবার সঙ্কল্প জ্ঞাপন করেন এবং যাঁহারা তাঁহার মনোমত না হইবেন, তাঁহাদিগকে বাতিল করিবার অধিকার তিনি নিজের হাতে রাখেন নাই। সুপারিশের সমালোচনার এবং পুনর্বিবেচনার জন্য কারণ প্রদর্শন করিবার অধিকার তাঁহার অবশ্যই আছে, কিন্তু সুপারিশ-কৃত ব্যক্তিদের কেহ তাঁহার প্রজা অথবা কর্মচারী নহেন, এমন না দেখাইতে পারিলে, মিঃ বল্লভভাই প্যাটেলের সুপারিশের চূড়ান্ত হইবে।

"ইহা সত্য যে সমিতির সকল সদস্যের নিয়োগই, ঠাকুর সাহেবের হাতে, এমন কি যাঁহাদিগকে মিঃ প্যাটেল সুপারিশ করিতেছেন, তাঁহাদের বেলাতেও। কিন্তু, এই শ্রেণীর সমিতি ব্যতিরেকে আর কোন পন্থাতেই গঠিত হইতে পারে না এবং ঠাকুর সাহেব কর্তৃক নিয়োগের অধিকার রক্ষা এবং অপরের সুপারিশে কয়েকটি ব্যক্তিকে নিয়োগ করিবার সঙ্কল্প-জ্ঞাপন, এই উভয়ের মধ্যে অসামঞ্জস্যও নাই।

"ঠাকুর সাহেবের পক্ষ হইতে যুক্তিস্বরূপ যে কথা লিখিয়া জানান হইয়াছে, তাহার সারাংশ সংক্ষেপে এই : স্পষ্টই বুঝা যায় যে, 'সুপারিশ' এই কথাটির মধ্যেই নিশ্চিত ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, উহা (অর্থাৎ প্রত্যেকটি নাম) বিবেচনার বিষয় হইবে এবং ঠাকুর সাহেব কারণ পাইলে তাহার যে কোন নাম বাতিল করিবারও অধিকারী, যেমন যাহাদের জন্য সুপারিশ

করা হইবে, তাঁহাদের মধ্যে যদি কেহ অযোগ্য, অক্ষম অথবা অবাঞ্ছনীয় ব্যক্তি থাকেন।

"কেবল 'সুপারিশ' কথাটির ব্যবহারের উপর জোর দিয়াই এমন যুক্তি উপস্থিত করা যায় না এবং ইহার দ্বারা তেমন কোন অর্থই বুঝিতে হইবে, ইহা বলা চলে না। বিষয়ভাগ হইতেই ইহার অর্থ বিবেচিত হইবে এবং তদনুযায়ী আলোচ্য বিষয়-সংশ্লিষ্ট সকল ব্যাপারই ধর্ত্তব্য"।

যদি স্যর মরিসের সমগ্র নিষ্পত্তিটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করা হয়, তবে দেখা যাইবে যে, তিনি নিম্নের তিনটি বিষয় আলোচ্য করিয়াছেন :—

(১) উভয় পক্ষের মধ্যে চুক্তি পাকা হইয়াছিল কি না।

(২) প্রচলিত মতে চুক্তিবাতিলকারী কোন প্রতারণা বা বাধাতামূলক প্রয়োগ ঘটিয়াছিল কি না।

ঠাকুর সাহেব মিঃ বল্লভভাই প্যাটেলের সুপারিশ-গ্রহণে বাধ্য কি না কিংবা তিনি যেরূপ ভাল বিবেচনা করিবেন, তদনুযায়ী গ্রহণ কিংবা বর্জ্জনের অধিকার তাঁহার ছিল কি না।

প্রথম এবং দ্বিতীয় বিষয়ে স্যর মরিস সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, "উভয় পক্ষের মধ্যে চুক্তি পাকা হইয়াছিল" এবং "প্রচলিত মতে চুক্তিবাতিলকারী কোন প্রতারণা বা বাধ্যতামূলক প্রয়োগ ঘটে নাই।" এই দুই বিষয় সম্পর্কে স্যর মরিস যে যুক্তি উত্থাপন করিয়াছেন, তাহা অনুধাবনে বুঝা যায় যে, তাহাতে বিধিসঙ্গতভাবে কোন আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে না।

তৃতীয় বিষয়টির সম্বন্ধে তাঁহার সিদ্ধান্ত এই যে, ঠাকুর সাহেব মিঃ বল্লভভাই প্যাটেলের সুপারিশ-গ্রহণে বাধ্য এবং নিজের ইচ্ছামত মিঃ বল্লভভাই প্যাটেলের সুপারিশ-গ্রহণে কিংবা বর্জ্জনে তাঁহার বিচারবুদ্ধি-প্রয়োগের কোন অধিকারই নাই।

তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, চুক্তির দ্বারা উভয় পক্ষের মনোগত বাসনা কি তৎ-নির্দ্ধারণে তাঁহাকে, চুক্তির প্রকাশার্থে যে-ভাষা ব্যবহার করা হইয়াছে, প্রধানতঃ তাহারই উপর নির্ভর করিতে হইবে। কিন্তু, সমগ্র নিষ্পত্তির কুত্রাপি আমরা এমন একটি উল্লেখও পাই নাই, যেখানে তিনি দেখাইয়াছেন, কি ভাবে চুক্তির ভাষা হইতে এমন অর্থ করা যাইতে পারে যে, মিঃ বল্লভভাই-ই চূড়ান্ত কথা বলিবার অধিকারী।

তিনি ইহাও স্বীকার করিয়াছেন যে, সমিতির সকল সদস্যের নিয়োগের অধিকারই একমাত্র ঠাকুর সাহেবের হাতে, এমন কি যাঁহাদিগকে মিঃ প্যাটেল সুপারিশ করিবেন, তাঁহাদের বেলাতেও, কিন্তু তথাপি তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, যাঁহারা ঠাকুর সাহেবের মনোমত না হইবেন, তাঁহাদিগকে বর্জ্জন করিবার অধিকার তিনি নিজের হাতে রাখেন নাই। এই সিদ্ধান্তের তাঁহার যুক্তি হইতেছে, "এই শ্রেণীর সমিতি তদ্ব্যতিরেকে আর কোন পন্থাতেই গঠিত হইতে পারে না।" "আর কোন পন্থা" কথা হইতে আমরা যাহা বুঝিতেছি, তাহা এই যে, "মিঃ বল্লভভাই প্যাটেল যাঁহাদিগকে সুপারিশ করিবেন, তাঁহাদিগকে গ্রহণ করা ব্যতীত ঠাকুর সাহেবের গত্যন্তর নাই"। আমরা বুঝিতে পারি না যে, যদি মিঃ বল্লভভাই প্যাটেলের সুপারিশ-গ্রহণ ব্যতীত ঠাকুর সাহেবের গত্যন্তর নাই, এমন কোন ব্যবস্থায় সমিতি-গঠন সম্ভব হইতে পারে, তবে ঠাকুর সাহেবের মনোমত সুপারিশ ব্যতীত মিঃ বল্লভভাই প্যাটেলের কোন গত্যন্তর নাই, এইরূপ ব্যবস্থায় সমিতি-গঠন সম্ভব নহে কেন।

স্যর মরিস আরও বলিয়াছেন যে, "ঠাকুর সাহেব কর্ত্তৃক নিয়োগের অধিকার রক্ষা এবং অপরের সুপারিশে কয়েকটি ব্যক্তিকে নিয়োগ করিবার সঙ্কল্প-জ্ঞাপন, এই উভয়ের মধ্যে অসামঞ্জস্যও নাই।" ইহাও আমরা বুঝিতে পারি নাই। যদি কেহ অপর কাহারও সুপারিশ অনুযায়ী কয়েকটি ব্যক্তিকে নিয়োগ করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন, তবে তাহা কি তাঁহার নিয়োগের অধিকার বর্জ্জনের এবং তাঁহার অধিকার···যিনি সুপারিশ করিতেছেন, তাঁহাকে সমর্পণের তুল্য নহে?

আমাদের বিবেচনানুযায়ী, স্যর মরিসের উপরিলিখিত অভিমত পরস্পর-বিরোধী এবং ইহা তাঁহার নিষ্পত্তিকে খণ্ডন করিতেছে।

উপরের তিনটি নগীর মূল যুক্তি মনোযোগ সহকারে অনুধাবন করিয়া আমরা বুঝিতেছি যে, প্রথমতঃ নিম্নলিখিত সর্ত্ত এবং বিধানসহ ঠাকুর সাহেব এবং সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মধ্যে একটি চুক্তির খসড়া হয়:—

(১) যে, ঠাকুর সাহেব একটি সংস্কার-সমিতি গঠন করিবেন।

(২) যে, প্রস্তাবিত সমিতিতে দশজন সদস্য গৃহীত হইবে।

(৩) যে, সমিতির এই দশজন সদস্যই হয় রাজকোট রাজ্যের প্রজা, নয় বেতনভোগী চাকুরিয়া হইবেন।

(৪) যে, কোন অবস্থাতেই প্রস্তাবিত সংস্কার-সমিতিতে এমন কোন সদস্য গৃহীত হইবেন না, যিনি রাজকোট রাজ্যের প্রজা অথবা বেতনভোগী চাকুরিয়া নহেন।

(৫) যে, প্রস্তাবিত সমিতির দশজন সদস্যই কেবল ঠাকুর সাহেব নিয়োগ করিতে পারিবেন এবং এমন কি, একটি সদস্যকেও আর কাহারও নিয়োগ করিবার চূড়ান্ত অধিকার থাকিবে না।

(৬) যে, প্রস্তাবিত সমগ্র দশজন সদস্যের মধ্যে তিন জনকে ঠাকুর সাহেবই নিজের ইচ্ছামত নির্দ্ধারণ করিবেন এবং অপর সাতজন সদস্যের ব্যাপারে, মিঃ বল্লভভাই কেবল সুপারিশ করিবেন মাত্র, কিন্তু চূড়ান্ত নিয়োগের অধিকার ঠাকুর সাহেবেরই থাকিবে।

"সুপারিশ (recommendation)" ও "মনোনয়ন (nomination)," এই দুইটি কথার অভিধানগত অর্থ হইতে আমরা বুঝিতে পারিতেছি না যে, যে-ব্যক্তি মনোনয়নের অধিকারী, তাঁহার পক্ষে কি করিয়া কোনও সুপারিশ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ বাধ্যতামূলক হইতে পারে। আমাদের মতে, যদি "সুপারিশ" কথার সহিত এই প্রকার বাধ্যতামূলকতা জড়িত করা হয়, তবে "মনোনয়ন" কথাটির অর্থের সার্থকতা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।

তদ্ভিন্ন, "আমরা দশজন সদস্য লইয়া একটি সমিতি স্থির করিয়াছি, তাঁহাদের সকলেই রাজ্যের প্রজা কিংবা কর্ম্মচারী হইবেন, তন্মধ্যে সাতজনকে মিঃ বল্লভভাই প্যাটেল আমাদের মনোনয়নার্থ সুপারিশ করিবেন", এই প্রকার বাক্য হইতে যে, কি করিয়া রাজকোটের রাজা মিঃ বল্লভভাই প্যাটেলের সুপারিশ অনুযায়ী যে-কোন ব্যক্তি নিয়োগ করিতে বাধ্য, এইরূপ সঙ্কল্প জ্ঞাপন করিয়াছেন, তাহা বলা যাইতে পারে, ইহা আমাদের বোধগম্য নহে। স্যর মরিস যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, এই প্রতিশ্রুতি যদি তদনুযায়ীই হয়, তবে বাস্তবিকপক্ষে মিঃ বল্লভভাই প্যাটেল মনোনয়নের অধিকারী, তাহাই বুঝিতে হয় এবং চুক্তির অন্তর্গত "আমাদের নিকট সুপারিশের নিমিত্ত", "মনোনয়নার্থ" ইত্যাদি কথা অর্থহীন হইয়া পড়ে।

অন্যপক্ষে যদি এই বাক্যকে এইরূপ অর্থে ধরা যায় যে, প্রস্তাবিত সমিতির সদস্য হইতে পারেন, রাজকোট রাজ্যের কর্ম্মচারী অথবা প্রজাবৃন্দের মধ্য হইতে ঠাকুর সাহেবেরই সন্তুষ্ট-মাফিক এমন সাতজনকে নির্দ্ধারণ করিবার দায়িত্ব সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল গ্রহণ করেন এবং মিঃ বল্লভভাই প্যাটেল তাঁহার নির্দ্ধারিত ব্যক্তিদের সকলেই যে স্বকীয় গুণানুযায়ী তাঁহার সুপারিশের যোগ্য, ইহা যুক্তির দ্বারা প্রমাণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ঠাকুর সাহেব যদি প্রমাণ না করিতে পারেন যে, মিঃ প্যাটেলের সুপারিশ গ্রহণের অযোগ্য, মাত্র তৎক্ষেত্রেই তিনি মিঃ প্যাটেলের সুপারিশ অনুযায়ী নিয়োগের প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছেন, তবে চুক্তির প্রত্যেকটি কথা অর্থযুক্ত হয়।

চুক্তির খসড়া তৈয়ারী হইয়া গেলে যে কারণেই হউক, দশজন সদস্যের সাতজনের সুপারিশ বিষয়ে সর্দ্দার প্যাটেলের হাত থাকিবে, এই বিষয়টি জন-সাধারণের নিকট অপ্রকাশ রাখা হয়, এবং আমাদের মনে হয়, এই নিমিত্তই ২৮শে ডিসেম্বর তারিখের সরকারী ঘোষণায় সর্দ্দার প্যাটেলের নাম উল্লেখ করা হয় নাই। সরকারী ঘোষণায় এই চুক্তি উল্লিখিত না হইলেও যে উক্ত বিষয় বলবৎ আছে, ইহা জ্ঞাপনার্থই ঠাকুর সাহেব ২৮শে ডিসেম্বর তারিখের পরবর্ত্তী পত্র লেখেন।

এই সকল ব্যবস্থাই উভয় পক্ষের মধ্যে স্বীকৃতি অনুযায়ী করা হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় এবং ২৮শে ডিসেম্বর তারিখের ব্যক্তিগত পত্রের সূচনাতেই তাই লিখিত হইয়াছে, "স্বীকার করা হইতেছে যে···।"

২৮শে ডিসেম্বর তারিখের ব্যক্তিগত পত্র সম্বন্ধে স্যর মরিস বলিয়াছেন, "কিংবা আমি এমনও মনে করি না যে, কথার অদল-বদল হইলেও দুইটি বাক্যের অর্থ বিভিন্ন।" ফলতঃ, চুক্তির খসড়া এবং ব্যক্তিগত পত্রের মধ্য একরূপ

হইতে পারে, কিন্তু কথার অদল-বদলের কোন যুক্তি নিশ্চয়ই আছে এবং ব্যক্তিগত পত্রে একই সত্য ও বিধির পুনরাবৃত্তিরও কোন প্রয়োজনীয়তা নিশ্চয়ই থাকিবে। যদি মনোবিজ্ঞানের দিক্ দিয়া দেখা যায়, তবে বুঝা যাইবে যে, এখন পর্যন্ত রাজকোট রাজ্যের প্রজাসাধারণের মধ্যে সর্দার বল্লভভাই এতখানি জনপ্রিয়তা অর্জন করিতে পারেন নাই, যদ্দ্বারা তিনি রাজকোটের রাজাকে চুক্তিবদ্ধ করিবার দাবী উপস্থিত করিতে পারেন এবং সেই জন্যই তিনি সম্ভবতঃ প্রস্তাবিত সমিতির একজনকেও চূড়ান্তভাবে নিয়োগের অধিকার বস্তুতঃ লাভ করিতে পারেন নাই। মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ফলে আমাদের মনে হয় যে, যে কোন কারণেই হউক, এই সময়ে রাজকোট রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোন গোলমাল বাধে এবং তার ফল ভাল হউক অথবা অন্যায় হউক, ঠাকুর সাহেব মিঃ বল্লভভাই প্যাটেলকে তাঁহার বন্ধু বিবেচনা করিয়া ঐ গোলমাল মিটাইবার নিমিত্ত কংগ্রেসের সাহায্য গ্রহণের চেষ্টা করেন।

উপসংহারে, আমরা বলিতে চাহি যে, আমরা কাহারও পক্ষ সমর্থন করিতেছি না এবং নিরপেক্ষ ব্যক্তি হিসাবেই আমরা উপরের আলোচনা করিয়াছি, কেননা ব্রিটিশ জাতির ন্যায়বিচারের সম্বন্ধে আমরা যথেষ্ট শ্রদ্ধা পোষণ করি।

রাজকোটের নিষ্পত্তি ও তাহার তাৎপর্য্য

রাজকোটের নিষ্পত্তিতে মিঃ গান্ধীর জয় হইয়াছে বলিতে হইবে, কেননা অত্যন্ত স্পষ্টরূপেই তিনি চাহিয়াছিলেন যে, বড়লাট এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করুন এবং ১৯৩৮ সনের ৩রা ডিসেম্বর তারিখে ঠাকুর সাহেব ও সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মধ্যে যে চুক্তি হয়, তদ্দ্বারা সর্দারেরই যে তাঁহার সুপারিশ-করা সাত জন সদস্যের নির্ব্বাচন সম্পর্কে চূড়ান্ত কথা বলিবার অধিকার, ইহাও স্বীকৃত হউক। যাহা ঘটিল, তাহা মন্দ নহে কিন্তু প্রশ্ন এই যে, ভারতীয় জনসাধারণেরও কি ইহাতে জয়ই হইয়াছে, এমন ধরিয়া লইতে হইবে?

এই নিষ্পত্তিতে ভারতীয় জন-সাধারণের কোন জয় নিহিত আছে কি না, ইহা স্থির করিতে হইলে, আমাদিগকে ঠিক করিতে হইবে, নিষ্পত্তির আশু প্রতিক্রিয়া কি দাঁড়াইবে। এ পর্য্যন্ত দেশীয় রাজ্যের কোন নৃপতি কিংবা ব্রিটীশ ভারতের কোন প্রজার পরস্পর মতানৈক্য-সম্বন্ধীয় সালিশী করিতে ব্রিটিশ বিচারপতির আশ্রয়-গ্রহণ একেবারে নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা ছিল না। রাজকোট-নিষ্পত্তির ফল এই দাঁড়াইতে পারে যে,বিচার এবং সালিশের ব্যাপারে ব্রিটিশ প্রজা ও দেশীয় রাজ্যের নৃপতিবৃন্দের অবস্থার আর বিশেষ কোন তারতম্য থাকিবে না। তদুপরি যদি মনে রাখা যায় যে, ভারতের বড়লাটের নির্দ্দেশেই এই নিষ্পত্তি করা হইয়াছে, তবে বুঝা যাইবে যে, ইহাতে দেশীয় রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বড়লাটের এ পর্য্যন্ত যে অধিকার ছিল, তাহার বিস্তারে সাহায্য করা হইয়াছে।

ইহার উপরে যদি (প্রচলিত শাসনতন্ত্রানুযায়ী) ব্রিটিশ প্রদেশসমূহের সমকক্ষ করিয়া দেশীয় রাজ্যসমূহকে ফেডারেল অ্যাসেম্‌ব্লির সদস্যপর্য্যায়ভুক্ত করিয়া ফেডারেশন আমদানীর বিষয়ে চিন্তা করা যায়, তবে সন্দেহ করিবার কারণ ঘটে যে, ফেডারেশন পরিকল্পনা চালু করিবার নেপথ্যে যে মনোভাব কার্য্য করিতেছে, তাহাকে যে পরিমাণ সাধু বলিয়া প্রচার করা হইতেছে, প্রকৃতপক্ষে উহা তাহা কি না এবং উহার দ্বারা দেশীয় রাজ্যসমূহকে পরোক্ষে ব্রিটিশ-শাসিত প্রদেশসমূহের সমকক্ষ করা হইতেছে কি না। ভারতের বর্ত্তমান শাসন-তন্ত্রের বিধিসমূহ সম্বন্ধে গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া যদি কেহ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, উহার মধ্যে সুনিপুণ কৌশলে ক্রমশঃ-বিস্তার-পরিকল্পনা সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে, তবে তাঁহার খুব অন্যায় হইবে বলিয়া মনে করিতে পারি না।

আমরা এমন কথা একেবারেই বলিতে চাহি না যে, নিষ্পত্তি সম্পর্কে নিষ্পত্তিকারীর কোন কু-অভিপ্রায় ছিল, কিন্তু অবস্থাচক্রে নিষ্পত্তির ফল এইরূপ দাঁড়াইবে যে, ইহাতে যে পক্ষ জয়ী হইয়াছেন, অতঃপর দেশীয় রাজ্যের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে তাঁহাদের আধিপত্য ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইবে। আমাদের ইহাও অভিমত যে, এই বিষয়ে যখন বড়লাট এবং

জয়ী-পক্ষের মধ্যে এক প্রকার ঐক্য দেখা যাইতেছে, তখন এতদিনে যেরূপ ছিল, ভবিষ্যতে তদপেক্ষা রাজকোটের ব্যাপারে তাঁহার কর্তৃত্ব বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা। কে জানে রাজকোট-নৃপতিই একমাত্র ভুক্তভোগী হইবেন, না, অন্যান্য দেশীয় রাজাও ক্রমশঃ দলভুক্ত হইবে?

অতঃপর, এই জয়ের ব্যাপারে ভারতীয় জনসাধারণ কি পরিমাণ লাভবান হইবেন, সেই প্রশ্নের বিচার করিতে গেলে একমাত্র উত্তর দাঁড়ায় এই যে, যদি ব্রিটিশ-শাসিত প্রদেশ-সমূহের সহিত ক্রমশঃ দেশীয় রাজ্যসমূহ সংযুক্ত হইলে তাঁহারা লাভবান্ হন, তবে তাঁহারা নিশ্চয়ই ইহাতে লাভবান্ হইবেন। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-ভারতবাসী জনসাধারণকে অধিকতর সভ্য এবং মানসিক, শারীরিক ও অর্থনৈতিক দিক্ হইতে অধিকতর সুখী করিয়াছে, ইহা যদি সত্য হয়, তবে রাজকোটের-ব্যাপারে এই জয়লাভে আমরা আনন্দিত, কেননা ইহাতে দেশীয় রাজ্যস্থ আমাদের ভ্রাতৃবৃন্দকে আমরা যে সুযোগ-সুবিধা এতদিন ভোগ করিয়া আসিতেছি, তাহা ভোগের ব্যবস্থা করিলেন 'মহাত্মা' মিঃ গান্ধী এবং তাঁহার মহারথী চেলা-চামুণ্ডারা; আমাদের এই আনন্দভোগের সুযোগ দান করায় আমরা তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতে বাধ্য।

কিন্তু, তৎসহ আমরা ইহাও বলিব যে, যাঁহারা কথায় কথায় ব্রিটিশ জাতির সহিত সম্পর্ক-ছেদের কথা প্রচার করিবার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ জাতির ক্রমশঃ আধিপত্য বিস্তারে সাহায্য করিতেছেন, তাঁহাদের প্রবীণ পাণ্ডা অনুকম্পার পাত্র এবং তাঁহার চেলা-চামুণ্ডারা নির্বোধ।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এমন একটি কূটনৈতিক অভিযান সম্বন্ধে আমাদের নিজ দায়োপিত্বসম্পন্ন প্রায় একরূপ নীরবই রহিয়া গিয়াছেন।

পরিশেষে আমরা আমাদের স্বদেশবাসী ও ব্রিটিশ ভ্রাতৃবৃন্দকে আমাদের নেতৃবৃন্দকে এখনও চিনিতে এবং তাঁহাদিগকে ঘটনাবলীর বাস্তবতা উপলব্ধি করিতে বলি।

মানবধর্ম্ম

...তদাবধিত প্রাগৈতিহাসিক যুগের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, প্রথমে ধর্ম্মের নামে মনুষ্যসমাজে আদিম অজ্ঞতা, বর্ব্বরতা, নষ্টামি, শান্তি, দীর্ঘসূত্রতা এবং দীর্ঘসূত্রতার নাশ করিতে পারিয়াছিল। অপরা, এক কথায় যাহা দ্বারা মানুষ নিজেকে সুখী মনিয়া মনে করিতে পারে, তাহা সমস্তের সমন্বয় প্রত্যেক মানুষ স্বীয় জীবনে অর্জ্জন করিতে পারিত। সমগ্র মনুষ্যজাতির জীবন যখন এবম্বিধ সুখ ও শান্তিময় ছিল, তখন মনুষ্যসমাজে হিন্দু ধর্ম্ম, অথবা বৌদ্ধ ধর্ম্ম, অথবা জৈন ধর্ম্ম, অথবা খৃষ্টান ধর্ম্ম, অথবা মুসলমান ধর্ম্ম বিদ্যমান ছিল না। তখন মানুষে মানুষে যাহা-বিদ্যমান একরূপ অন্তর্হিত হইয়াছিল এবং সমগ্র মনুষ্য-সমাজে "মানবধর্ম্ম" নামে একটী ধর্ম্ম বিদ্যমান ছিল। ঐ "মানবধর্ম্ম" মনু-সংহিতা নামক সংস্কৃত গ্রন্থে নিবিষ্ট রহিয়াছে। মানুষের হিতকর জ্ঞান-বিজ্ঞানে যিনি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারিতেন, মানবধর্ম্মানুসারে তাঁহাকে "ব্রাহ্মণ", অথবা "গুরু" অথবা "পুরোহিত" বলা হইত। যাঁহারা মানুষের হিতকারী জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমাজের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারিতেন, তাঁহাদিগকে সমাজের অন্যান্য সকলে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য করিতে বাধ্য হইতেন বটে, কিন্তু তাঁহারা নিজেদিগকে শ্রেষ্ঠ মনে করিতে পারিতেন না. পরন্তু বিবিধ প্রকারের জ্ঞান-বিজ্ঞানে বুৎপন্ন হইয়াও যিনি শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান পোষণ করিতেন, তাঁহাকে সমাজে অবজ্ঞেয় হইতে হইত— ইহাই ছিল মনু-সংহিতার মানবধর্ম্মের প্রকৃতি।...

...যখন মনুষ্যসমাজে মনু-সংহিতার প্রকৃত মানবধর্ম্ম পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল, তখন কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের বিজ্ঞান (Science) ও সংগঠনের (Organisation) দ্বারা মনুষ্যসমাজের আর্থিক স্বচ্ছলতা ও স্বাবলম্বন সাধিত হইয়াছিল।...

হেঁয়ালী

— কস্যচিদবোধস্য

না পারিনু চিনিতে তোমায়, হেঁয়ালীর মত
করিতে তোমার মর্ম্মভেদ, বুদ্ধি মোর হত।
বণিকের চক্র হিসাবের অবোধ্য আমার,
না বুঝি নদীর গতি, স্রোত অন্তঃশিলা যা'র।
ভাবে, হেরি, বহুরূপী তুমি অবস্থানুক্রমে,
বাকা, কাষা করিতে নির্ণয় পড়ি তাই ভ্রমে।
জীবনের পূর্ব্বাহ্নে, যাহার আসিলে শরণে,
দানিল সাদরে আলিঙ্গন, নাহি তা' স্মরণে?
আপন খেয়ালে বিষবীজ করিলে বপন
নবীন, উর্ব্বর ক্ষেত্রে তা'র, করিল গ্রহণ
তাহা অবিচারে, উপেক্ষিয়া প্রবীণের কথা,
ভাবি' তোমা জ্ঞানী, স্বার্থগন্ধহীন, সন্ন্যাসী সর্ব্বথা।
জনমিল যে বিপুল তরু সেই বীজ হ'তে,
কাণ্ডহীন করিলে তাহায় পুনঃ নিজ হাতে।
ছিলে ত "সাহেব" একদিন আহারে, ব্যাভারে,
কথা-বেচা ছিল ব্যবসায় জীবিকার তরে।
বিদেশকে করেছিলে দেশ, ছাড়ি' জন্মভূমি,
চেয়েছিলে লালমুখ সনে পাল্লা দিতে তুমি।
অন্তরঙ্গ করি শেষে লাভ, ফিরি মাতৃক্রোড়ে,
চাহিলে বসিতে তুমি একা সেই কোল জুড়ে।
ফিরাইলে মুখ একেবারে—ধরিলে কৌপীন,
পুষ্টি ছাগীদুগ্ধে, প্রচারিত ভাব হিংসাহীন।
পরাণরে আনন্দ তোমায়, প্রকাশ বচনে,
কিন্তু কার্য্যে হিংসাপরিচয় সবে ভাবে মনে।
আহুরে গোপাল তুমি যেন, কথায় কথায়
উপবাসে আত্মকষ্টাভাস দেখাও সবায়।
একি নহে হিংসাপ্রণোদিত, একি নহে পাপ?
জানিতে কি, করিবে বারণ আমি' 'বাপ বাপ'?
সংযোগ বুঝিয়া, বুঝি তব প্রায়োপবেশন,
"হয়" যা'র জয়ে, না দেখিতে তাহার বদন?
প্রকাণ্ড কলহদহ বাহা, ফেলিয়া চুলায়,
ধর সূত্র, লুকাইতে মুখ, সূতাকল প্রায়।
কে না বুঝে আড়ালে দাড়া'লে কল, শিশুকুল
নাচিল অঙ্কের নৃত্য মঞ্চে—কলের পুতুল।
রাম, শ্যাম করিলে যে কাজ, শাস্তির বিধান,
সেই কাজে, তোমার বেলায় আকাঙ্ক্ষিত দান!
এতদিন ছিল যা'রা স্থান মস্তক-উপরে,
বল দেখি, করিয়াছ কিবা তাহাদের তরে?
জীর্ণ, জর্জ্জরিত রোগে, শোকে, অকালমরণে,
গৃহহীন, নাহি বস্ত্রলেশ লজ্জানিবারণে;
করে ত তোমার দেহপুষ্টি ছাগীক্ষীরধার,
এক মুষ্টি অন্ন লাগি' তা'রা করে হাহাকার।
'হরিজন হরিজন' করি' কর কোলাহল,
কিন্তু, কহ, কাষাতঃ তাহারা লভিল কি ফল?
স্বাধীনতা, সাম্যবাদ আদি করিছ প্রচার,
কি করিবে শুনি' তাহা, পেটে অন্ন নাই যা'র?
দিতে মুখে ক্ষুধার্ত্ত শিশুর এক অন্নকণা,
ফেলিয়া মাথার ঘাম পায়ে, নাহি সেই জনা,
নারে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষা করিবারে,
কেমনে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ভাবিতে সে পারে?
ছিল রাজপুরুষের 'পরে যে হিংসা তোমার,
পরম প্রীতিতে এতদিনে পরিণতি তা'র।
নীরবধানে লভি' অধিকার ভাগ্যের ছলনা—
করিবারে পরিহার তাহা না হয় বাসনা।
ঘোরতর বৈরবৃত্ত তুমি, অমুজা তোমার
নীতিধর্ম্ম-বিরুদ্ধ যদ্যপি, অপালন তা'র
অলঙ্ঘ্য, অবাঞ্ছনীয় হেরি' তোমার নিকটে—
সত্য, অহিংসার পবিত্র স্পষ্ট ইহা বটে!
করিছে প্রকাশ কাষা তব, বচন বৈভব,
ভক্তশিষ্যগণের প্রলাপ, ভিন্নি' চক্ষুরব,
স্বরূপ তোমার ক্রমে ক্রমে মানব-সমাজে,
শাক দিয়ে ঢেকে রাখা মাছ কতদিন সাজে?
হেঁয়ালীর হইবে উন্মেষ অচিরে নিশ্চয়,
রচিলে যে গৃহ, নিশ্চয়ে তা' হবে ভস্মময়।

পল্লীশ্রী ।

সেকালের শিক্ষা—

—শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়

পূর্ব্বকালে শিক্ষার ব্যবস্থা কিরূপ ছিল, এখন তাহা অনেকেই জানেন না। বলা বাহুল্য, আমি এই স্থানে বৈদিক, পৌরাণিক অথবা বৌদ্ধ যুগে শিক্ষাপদ্ধতি কিরূপ ছিল, তাহা লইয়া পাশ্চাত্য ধরণের প্রত্নতাত্ত্বিকদিগের ন্যায় গবেষণা করিতে চাহি না। মুসলমান রাজত্বকালের অবসান-সময় হইতে প্রায় বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ভারতে যে শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্ত্তিত ছিল, আমি তাহারই সম্বন্ধে কতকগুলি কথা বলিব বলিয়া স্থির করিয়াছি।

এ দেশের প্রাচীন ব্যক্তিরা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতেন এবং সেজন্য তাঁহারা সমাক্ ব্যবস্থাও করিয়া রাখিয়াছিলেন। এদেশে বর্ত্তমান ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে দুই প্রকার শিক্ষা প্রবর্ত্তিত ছিল। প্রথম পাঠশালার শিক্ষা বা প্রাথমিক শিক্ষা, দ্বিতীয় টোলের শিক্ষা। প্রাথমিক শিক্ষা পাইবার অধিকার সকলেরই ছিল। প্রত্যেক গ্রামে অন্ততঃ একটি করিয়া সাধারণ পাঠশালা থাকিত, কোন কোন বড় গ্রাম একাধিক পাঠশালাও ছিল। জাতি, ধর্ম্ম এবং বর্ণ নির্ব্বিশেষে সকল পাঠশালাতে সকল ছোট ছোট ছাত্রই পড়িত। আমি বাল্যকালে এক পাঠশালায় মুসলমান এবং শৌণ্ডিক জাতির সহিত পড়িয়াছি। পাঠশালার গুরুমহাশয়রা অনেক স্থলে ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ অথবা সদ্গোপ (কৈবর্ত্ত, আধুনা মাহিষ্য) কিংবা মুসলমান হইতেন। তখন শাসনসংস্কারের স্বপ্নও কেহ দেখে নাই, সাধারণ হিন্দু-মুসলমানে বিবাদের কথা কেহ কল্পনাও করিতে পারিত না। মুসলমান 'মহাশয়'রা হিন্দুর ছেলেদিগকে আপনার ছেলে মনে করিয়া যত্নপূর্ব্বক পড়াইতেন। গুরুমহাশয়দিগকে অনেকস্থলে—'মহাশয়' বলা হইত। এরা 'মহাশয়'রা সাধারণের বিশেষ সম্মানের পাত্র ছিলেন।

পাঠশালার প্রথমতঃ ছাত্রদিগকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হইত। প্রথম যাহারা তাল-পাতায় লিখিত। তাহাদের ছিল সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীর, তাহার পরবর্ত্তী শ্রেণীর ছাত্রদের চিল্‌তে লেখার শ্রেণী নামে অভিহিত হইত। তৃতীয় বা উচ্চতম শ্রেণীর ছাত্রেরা কাগজ-লেখা ছাত্র ছিল, তাহারা কাগজে হাত মক্স করিত। উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদিগকে নিম্ন-শ্রেণীর ছাত্রেরা শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিত। যাহারা তালপাতায় লিখিত, তাহারা হাঁড়ি মালসা লেখা হইতে আরম্ভ করিয়া কড়াকে, শটকে, বুড়কে, পুণকে প্রভৃতি সুর করিয়া তাল পাতায় লিখিত। গুরুমহাশয় কাণ দিয়া সমস্তই শুনিতেন। তদ্ভিন্ন কাগজ-লেখার ছাত্র হইতে এক একজন সর্দ্দার পড়ুয়া নির্ব্বাচিত হইত। এই সর্দ্দার পড়ুয়াও অনেক সময় তাল-পাতায় পড়ুয়াদিগের পাঠ ও লেখা দেখিত। বিশেষ ওয়াকিবহাল ছেলে না হইলে গুরুমহাশয়রা কাহাকেও সর্দ্দার পড়ুয়া করিতেন না। প্রথমতঃ তালপাতার ছাত্ররা তালপাতে হাঁড়ি মালসা লিখিত, অর্থাৎ লিখিবার জন্য কলম ধরিতে শিখিত। তাহার পর বর্ণমালা, কড়াকে, শটকে (শতকিয়া) বুড়কে, পুণকে প্রভৃতি মানদাঙ্ক ও ধারাপাতের কথা পড়িয়া পড়িয়া লিখিত। তাহার পর সেই শ্রেণী হইতে যখন 'চিল্‌তে' লেখার শ্রেণীতে উন্নীত হইত, তখন কলার পাতে, চিক (সতলন) জমা-খরচ (ব্যাবকষন), গুণ, ভাগ প্রভৃতি কষিতে শিখিত। এই শ্রেণীতে কাঠাকালি, বিঘাকালি, জমাবন্দী, দলকষা, মাসকষা, পুকুরকালি, পাঞ্জাকালি—প্রভৃতি এবং মোটামুটি পত্রাদিও লিখিতে শিখিত। ভগ্নাংশের বা দশমিকের হাঙ্গামা পাঠশালার বিদ্যায় একেবারেই ছিল না। কড়া, ক্রান্তি, কাক, তিল প্রভৃতির সাহায্যে ভগ্নাংশের হিসাব অতি সুন্দরভাবে নির্ব্বাহিত হইত। এ বিষয়ে জ্ঞান বিশেষ practical হইত। এখনও অঙ্কশাস্ত্রের অনেক এম. এ. বাজারে সাধারণ গুরুকরী জানা ছাত্রের হিসাব-নৈপুণ্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়া থাকেন। যাহারা কাগজে লিখিত, তাহারা পত্র লিখিতে, পাঠাপাঠ লিখিতে, খাতা লিখিতে এবং দলিল দস্তাবেজ লিখিতে অভ্যস্ত হইত। ফলে তখনকার

পাঠশালায় পড়িয়া ছাত্রেরা সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিবার পক্ষে অনেক সময় প্রায়ই লাভ করিত। বর্ত্তমানের মত ভুলিয়া যাইবার জন্য কিছু শিখিত না।

এই বিদ্যাশিক্ষায় বিশেষ ব্যয়ও ছিল না। ছাত্রেরা গুরু-মহাশয়কে মাসিক দুই আনা কি চারি আনা করিয়া বেতন দিত এবং প্রত্যেক ছাত্রকে পর্য্যায়ক্রমে দুই মাস কিংবা তিন মাস অন্তর গুরুমহাশয়কে একটি করিয়া সিধা দিতে হইত। পাঠশালায় যদি ২০ জন ছাত্র থাকিত, তাহা হইলে প্রত্যেক দুই মাস অন্তর গুরুমহাশয়কে একটি করিয়া সিধা দিতে হইত। প্রত্যেক সিধাতে অবস্থা বুঝিয়া দুইজনের ভোজনের উপযুক্ত চাউল দাইল ইত্যাদি দেওয়া উচিত। ইহাই ছিল সাধারণ শিক্ষার ব্যয়। তখনকার লোকের এত অভাব ছিল না, সেইজন্য ইহা দিতে কাহারও বড় কষ্ট হইত না। অনেকে আগ্রহ সহকারে সিধা দিত। পাঠশালায় শিক্ষা সমাপন হইলে সকলে দোকান প্রভৃতির কাজ চালাইবার মত জ্ঞান অর্জ্জন করিত। প্রায় ১৪ বৎসর বয়সে ছাত্রদিগের পাঠশালার বিদ্যা শেষ হইত।

টোলের শিক্ষা

টোলই ছিল তখনকার উচ্চশিক্ষার মন্দির। আমরা তক্ষশীলার বা নালন্দার উচ্চশিক্ষাপদ্ধতির কথা জানি না; কিন্তু টোলের শিক্ষা যেরূপ ছিল, তাহার কিছু কিছু অংশের দেখিয়াছি। টোলের শিক্ষা ছিল সম্পূর্ণ অবৈতনিক। তবে শুনিয়াছি, তক্ষশীলার এবং নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয়ে এক একজন আচার্য্যের নিকট পাঁচ ছয়শত ছাত্র অধ্যয়ন করিতেন। আচার্য্য প্রাতঃসন্ধ্যা প্রভৃতি সমাপন করিয়া কুশাসনে বসিয়া পূর্ব্বাহ্নে পাঁচজন, অপরাহ্নে পাঁচজন এবং সায়ংসন্ধ্যা সমাপনান্তে প্রথম রাত্রে পাঁচজন ছাত্রকে পাঠ দিতেন। উহারা ছিল উচ্চ শ্রেণীর ছাত্র। উহারা সর্দ্দার পড়ুয়া নামে অভিহিত ছিল। প্রত্যেক সর্দ্দার পড়ুয়া আবার পাঁচজন করিয়া নিম্ন-শ্রেণীর ছাত্রদিগকে পাঠ দিতেন। এইরূপে বড় বড় টোলের এবং সম্ভবতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য নির্ব্বাহিত হইত। ছাত্রগণ কৃতবিদ্য হইয়া নিজ নিজ গ্রামে যাইয়া আবার তথায় টোল খুলিতেন। এই সকল বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-দিগের আহারাদি ব্যয়-নির্ব্বাহ রাজদত্ত সম্পত্তি হইতেই নির্ব্বাহিত হইত।

আমি যে সকল টোল দেখিয়াছি, তাহাতে দশজন হইতে পঁচিশ বিশজন পর্য্যন্ত ছাত্র অধ্যয়ন করিত। আচার্য্যই তাহাদের অনেকের গ্রাসাচ্ছাদনের ভার লইতেন। এই সকল টোলে কেহ ব্যাকরণ, কেহ সাহিত্য, কেহ স্মৃতি এবং কেহ দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যেতারা ব্যাকরণ এবং সাহিত্য-শ্রেণীর ছাত্রদিগকে পাঠ দিতেন, এবং যে টোলে ছাত্রসংখ্যা অল্প সে টোলে আচার্য্যও অনেক সময় উহাদিগকে পাঠ দিতেন। তবে উচ্চশ্রেণীর ছাত্র বা নিম্ন-শ্রেণীর ছাত্রদিগকে পাঠ দিবার ব্যবস্থা থাকায় উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদিগের ব্যাকরণ এবং সাহিত্যের বেশ চর্চ্চা থাকিত। আচার্য্যগণ ছাত্রের যোগ্যতা বিবেচনা করিয়া সে কোন্ বিষয় শিক্ষা করিবে, তাহা বলিয়া দিতেন। যাহার বুদ্ধি দার্শনিক ব্যাপারে স্ফূর্ত্তি পাইবে না, সে স্মৃতি পড়িত। যাহার বুদ্ধি দর্শন-শাস্ত্র অনুশীলনের অনুকূল, সে দর্শনশাস্ত্র পাঠ করিত। অনেক টোলে কেবল স্মৃতিরই অধ্যাপনা হইত। অনেক টোলে কেবল দর্শনশাস্ত্রই শিক্ষা দেওয়া হইত। কিন্তু অধিকাংশ টোলেই ব্যাকরণ এবং সাহিত্য শিক্ষা দেওয়া হইত। ছাত্রগণ ঐ সকল টোলে অধ্যয়ন শেষ করিয়া ভিন্ন টোলে ভিন্ন আচার্য্যের নিকট দর্শন পড়িতে যাইতেন। স্মৃতির টোলে প্রায়ই ব্যাকরণ ও সাহিত্যও শিক্ষা দেওয়া হইত। সকল টোলেই তাহা শিক্ষা দেওয়া হইত, এমন নহে। যাঁহারা ন্যায়দর্শনের অধ্যাপনা করিতেন, তাঁহারা প্রায়ই অন্য শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন না। কারণ ন্যায়শাস্ত্রটি এমনই জটিল যে, উহার চর্চ্চা একটু ত্যাগ করিলেই উহা ভুলিয়া যাইতে হয়। 'ক্ষণাদূর্দ্ধমতাত্ত্বিকঃ', অর্থাৎ ক্ষণকালের ঊর্দ্ধকাল ঐ শাস্ত্রের চিন্তা ত্যাগ করিলে অতাত্ত্বিক হইয়া যাইতে হয়। সেই জন্য বহু নৈয়ায়িক প্রায় অন্য শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন না। কিন্তু ন্যায়দর্শনে ব্যুৎপত্তি লাভ করিলে অন্যান্য দর্শনে সহজে অধিকার জন্মে, সেই জন্য কোন কোন অধ্যাপক ন্যায়দর্শন পাঠ করাইয়া বেদান্ত, বৈশেষিক প্রভৃতি দর্শনেরও অধ্যাপনা করিতেন।

সেকালে গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ অতি মধুর ছিল। শিষ্য গুরুকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতেন। ছাত্র প্রাতঃস্নান করিয়া সন্ধ্যা-বন্দনাদি শেষ করিতেন। তাহার পর আচার্য্যের পদধূলি গ্রহণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে গুরুর নিকট পাঠ

চাহিতেন। পাঠ-গ্রহণান্তে আবার গুরুর পদধূলি লইয়া উঠিতেন। ইদানীং সে ভাবের কিছু বিপর্যয় ঘটিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা হইলেও টোলের শিক্ষায় উহা এখনও যতটা আছে, অন্য কুত্রাপি তাহা নাই। এই গুরু-ভক্তির জন্য ছাত্ররা তখন যেরূপ কৃতবিদ্য হইতেন, এখন তাহা হন না। আমাদের দেশের লোকের মানস ক্ষেত্র বাস্তিকতার কুহেলিকায় সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছে। কাজেই শিক্ষার বিস্তার এবং বিদ্যার (literacy) বাড়িলেও প্রকৃত প্রজ্ঞা (wisdom) বাড়ে নাই। একজন ইংরাজ কবি বলিয়াছেন—

'Knowledge is proud that he has learned
Wisdom is humble that he knows no more'.

প্রকৃত পক্ষে অপরিপক্ক জ্ঞানের ফলে মানুষের মনে দম্ভের সঞ্চার হয়, কিন্তু প্রকৃত প্রজ্ঞা মানুষকে বিনীত করে। কতকগুলি বিক্ষিপ্তভাবে গৃহীত তথ্যসম্বন্ধীয় জ্ঞান মানুষকে বাস্তিক করে, ইহা একালের শিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে দেখিলেই বুঝা যায়; প্রকৃত সুসম্বদ্ধ জ্ঞান মানুষকে কিরূপ বিনীত করে, তাহা সেকালের কোন কোন ছাত্রকে দেখিলেই বুঝা যাইত। এখনও তাঁহাদের যে দুই একজন অবশেষ আছেন, তাঁহাদিগকে দেখিলেও তাহা বুঝা যায়। তবে একথা সত্য যে, আধুনিক যুগের শিক্ষিত মূর্খদিগের সহিত ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হইয়া সেকালের পণ্ডিত মহাশয়রাও অনেকটা অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছেন।

যাঁহারা কবিরাজী প্রভৃতি অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা করিতেন, তাঁহারা এক একজন খ্যাতনামা কবিরাজের নিকট থাকিয়া আয়ুর্বেদ প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিতেন। শুনিয়াছি বহু পূর্বে অনেক টোলের পণ্ডিত ছাত্রদিগকে শুশ্রুত, ভাবপ্রকাশ প্রভৃতি পড়াইতেন। ছাত্রগণ কবিরাজ মহাশয়ের গৃহে থাকিয়া ঔষধ-প্রস্তুত-প্রণালী প্রভৃতি শিক্ষা করিতেন; অনেক কবিরাজ ছাত্রদিগকে ব্যাকরণ ও কাব্য শিক্ষা দিতেন। কবিরাজদিগেরও টোল ছিল। তথায় কবিরাজ মহাশয়রা যেমন চিকিৎসাশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন, তেমনই তাহাদিগকে হাতে-নাতে ঔষধ-প্রস্তুত-প্রণালী শিক্ষা দিতেন। ব্রাহ্মণ এবং বৈদ্য অধ্যাপক মহাশয়রা তাঁহাদের ছাত্রদিগকে খাইতে দিতেন এবং গৃহেই রাখিতেন। ছাত্ররা সন্তানতুল্য ছিল। অবশ্য সকল ছাত্রকেই যে সকল অধ্যাপক খাইতে দিতে পারিতেন তাহা নহে। কোন কোন শিষ্য স্বগৃহ হইতে প্রত্যহ আসিয়া আচার্যের নিকট হইতে পাঠ লইয়া যাইতেন। সাধারণ টোলের অধ্যাপকরা প্রায়ই দশ পনরটির অধিক শিষ্যের ভরণ-পোষণের ভার লইতে পারিতেন না। অন্যান্য শিষ্যরা গৃহ হইতে অথবা নিকটস্থ আত্মীয়-গৃহ হইতে পাঠ লইতে আসিতেন। যে সকল অধ্যাপকের কিছু অধিক ভূসম্পত্তি ছিল, তাঁহারা অধিক ছাত্র রাখিতেন। অধিকাংশ অধ্যাপকই বিবাহ, উপনয়ন, বিশেষতঃ শ্রাদ্ধ-সভায় বিচার করিয়া যে বিদায় পাইতেন তাহাতেই ছাত্র প্রতিপালন করিতেন। শিক্ষা, বিশেষতঃ উচ্চশিক্ষা কখনও এই দেশে বৈষয়িক ছিল না। গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ সেকালে বিশেষ স্থায়ী হইত। শিষ্যের বিপদে আপদে গুরুও শিষ্যের নিকট আসিতেন, আবার গুরুর বিপৎকালে শিষ্য যেখানেই থাকুন না কেন, গুরুর নিকট আসিয়া হাজির হইতেন। ইহা তাঁহারা অবশ্যকর্তব্য বলিয়া মনে করিতেন।

পাঠ শেষ করিবার পর সমাবর্তন—অর্থাৎ শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ। টোল ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার সময় আচার্য শিষ্যদিগকে কতকগুলি উপদেশ দিতেন। সে উপদেশ এখনকার Convocationএর উপদেশের ন্যায় বিদ্যা দেখাইবার অবসর নহে, সে উপদেশ শিষ্যকে গৃহধর্ম বিশেষভাবে নির্বাহ করিতে পারিবার মত উপদেশ। শিষ্য যখন গুরুর পদে বন্দনা করিয়া বিদায় লইতে যাইত, তখন গুরু এই মর্মে শিষ্যকে উপদেশ করিতেন —"আমি অনুমতি করিতেছি যে, তুমি গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট হও। জানিও গৃহস্থাশ্রম যেমন সকল আশ্রমের উপর, তেমনই ইহার নিয়মগুলি পালন করা বড় কঠিন। সংসারী হইয়া তোমরা একমাত্র ধর্মকে অবলম্বন করিবে। কখনও ধর্মকে ভুলিও না। সত্যাশ্রয়ী হইবে। বিপন্ন হইলেও কখনও ধর্মকে এবং সত্যকে ত্যাগ করিও না। পাপীর প্রতি বিরাগ ও পুণ্যবানের প্রতি অনুরাগ দেখাইবে না, কারণ সংসারে কেহ ইচ্ছা করিয়া পাপী হয় না। সঙ্গদোষেই উপযুক্ত উপদেশ এবং দৃষ্টান্তের অভাবে অধিকাংশ মানুষ পাপী হয়। নদী যখন প্রথম পর্বত হইতে নামিয়া আসে, তখন তাহাতে হাঙ্গর, কুম্ভীর, জলৌকা প্রভৃতি থাকে না। সঙ্গদোষে, সংযমের অভাবে এবং শিক্ষার দোষে মানুষ পাপপথে যায়।

অতএব পুণ্যশীলকে পুণ্য কার্য্য করিতে উৎসাহ দিবে, পাপীকে পাপ কার্য্য করিতে নিষেধ করিবে। নিজে কখনও মনের ভিতরে পাপের চিন্তাকে স্থান দিও না। সংযমী এবং স্বাবলম্বী হইবে, নতুবা সংসারে কোন মতেই উন্নতি করিতে পারিবে না। জানিও, ধর্ম্মজ্ঞানই মনুষ্যজীবনের প্রধান অবলম্বন। সংসারে তোমাদের সম্মুখে অনেক প্রলোভন আসিয়া পড়িবে। কিন্তু কোনরূপ প্রলোভনে পড়িয়া ধর্ম্মকে কখনও পরিত্যাগ করিবে না।" ইত্যাদি। কৃতবিদ্য শিষ্যরা সাধারণতঃ গুরুর এই সকল উপদেশ স্মরণ করিয়া কখনই পাপপথে যাইতে প্রস্তুত হইতেন না। এই উপদেশ স্মরণ করিয়াই তাঁহারা গভীর দারিদ্র্যকে বরণ করিয়া লইয়া সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন। তাঁহারা জীবনের মানদণ্ড বাড়াইবার জন্য ব্যাকুল হইতেন না এবং ইহকালসর্ব্বস্বতাকে সার করিয়া বিলাসে গা ভাসাইতেন না। ইঁহারা সুখী এবং দীর্ঘজীবী ছিলেন। এখনও প্রাচীন-পন্থীদিগের মধ্যে অনেকেই দীর্ঘজীবী রহিয়াছেন। তাঁহাদের মনের আনন্দই তাঁহাদিগকে দীর্ঘজীবন প্রদান করিত এবং এখনও করে। তাঁহাদের ধর্ম্মনিষ্ঠাই তাঁহাদিগের মনকে আনন্দিত করে। আজ আমরা কুশিক্ষায় অতিমাত্র বিভ্রান্ত হইয়া সেই প্রাচীন শিক্ষা-পদ্ধতিকে তাচ্ছিল্য এবং প্রাচীন জীবন-যাত্রা-নির্ব্বাহের পদ্ধতিকে অবজ্ঞা করিতেছি। জীবনের মানদণ্ড বৃদ্ধি করিবার প্রলোভনে অভাবের অনলকুণ্ডে স্বল্প প্রদান করিয়া দগ্ধ হইয়া মরিতেছি এবং ধর্ম্ম এবং সন্তোষকে নির্ব্বাসিত করিয়া জীবনকে মরুভূমিবৎ শুষ্ক ও নীরস করিয়া তুলিতেছি। কিন্তু আমাদের প্রাচীন শিক্ষা-পদ্ধতি যে কেবল আমাদের জাতীয় জীবনকে বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছিল তাহা নহে,—উহা আমাদের জীবনকে সরল করিয়া আমাদিগকে দীর্ঘজীবী করিয়া রাখিয়াছিল। আমরা যদি নিষ্ক্রোধ পক্ষীবিশেষের ন্যায় বালুকার মধ্যে মুখ প্রবিষ্ট করাইয়া ভালমন্দ না দেখি, তাহা হইলে যে আমরা দুঃখের অকূপারে পড়িয়া নরক যন্ত্রণা ভোগ করিব, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে?

বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির দোষ দেখিয়াই স্বর্গীয় ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতি বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার উপার্জ্জিত সমস্ত অর্থই দান করিয়া গিয়াছেন। লর্ড কর্জ্জনও টোলের শিক্ষাপদ্ধতি বজায় রাখিবার জন্য অধ্যাপকদিগকে বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু সরকারী সাহায্যের সহিত সরকারী পরিদর্শন এবং ব্যবস্থা আসিয়া উহার মৌলিকতা নষ্ট করিয়া দিতেছে। পূর্ব্বে টোলের অধ্যাপকগণ কাহারও নিয়ন্ত্রণাধীন ছিলেন না। সাধারণের নিকট বিদায় প্রভৃতি পাইয়াই তাঁহাদের সংসার চলিত এবং ছাত্রগণকে পড়াইতেন। অধ্যাপকদিগের স্বাধীনতার এবং তাঁহাদের শিক্ষাপদ্ধতির বৈশিষ্ট্যে কেহ হাত দিতে পারিত না। তাই সেই শিক্ষা মানুষকে আত্মবল করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

যে শিক্ষাপদ্ধতি বিশাল বটবৃক্ষের ন্যায় যুগ-যুগান্তর ধরিয়া ভারতে জ্ঞানের জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া ভারতীয় সভ্যতাকে সমস্ত জগতের আদর্শ সভ্যতায় পরিণত করিয়াছিল, সে শিক্ষাপদ্ধতি পরিহার করা যে নিতান্ত নির্ব্বোধের মত কাজ হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। হয় তো অনবধানে তাহার স্বচ্ছতা নষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু আধুনিক কলুষভাবের শিক্ষার ফলে সেই সভ্যতা পঙ্কিল ও দুর্গন্ধময় হইয়া উঠিয়াছে। যে শিক্ষার বলে পণ্ডিত-প্রবর ঘুনো রামনাথের পত্নী দারুণ দারিদ্র্যবশে সামান্য অলঙ্কারের অভাবে এয়োতি রক্ষার চিহ্নস্বরূপ লালসুতা মণিবন্ধে বাঁধিতে বাধ্য হইতেন, তিনিও ত্রিবেণীর ঘাটে কৃষ্ণনগরের রাজমহিষীর আগ্রহের সহিত প্রদত্ত বহু সহস্র টাকার মণিরত্নময় অলঙ্কার প্রত্যাখ্যান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সে শিক্ষা, সে চরিত্র-বল এখনকার বিদ্যামন্দিরে শিক্ষিত ছাত্রদিগের মধ্যে কুত্রাপি লক্ষিত হয় কি? তাহা হয় না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। কিন্তু ইহা দেখিয়াও ও আমাদের চৈতন্য হইতেছে না। কালের গতি অমোঘ। কালেরও পরিবর্ত্তন হইতেছে। তাহা হইলেও অতীতের সহিত সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কালোপযোগী ব্যবস্থা যে করা যায় না, ইহা মনে করা ভুল। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার লক্ষ্য হইতেছে, জড় জগতের তথ্যসমূহে এবং তাহাদের কার্য্যকারণ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ এবং বাহ্য জগতের উপর প্রভাব বিস্তার করিবার জন্য ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তাহার বিনিয়োগ। ইহাই হইল পাশ্চাত্ত্য science বা বিজ্ঞানের লক্ষ্য এবং ইহার উপরই পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত। পক্ষান্তরে ভারতীয় শিক্ষার লক্ষ্য অন্তর্মুখ। আধ্যাত্মিক তথ্য এবং তাহার

স্বীকারোক্তি

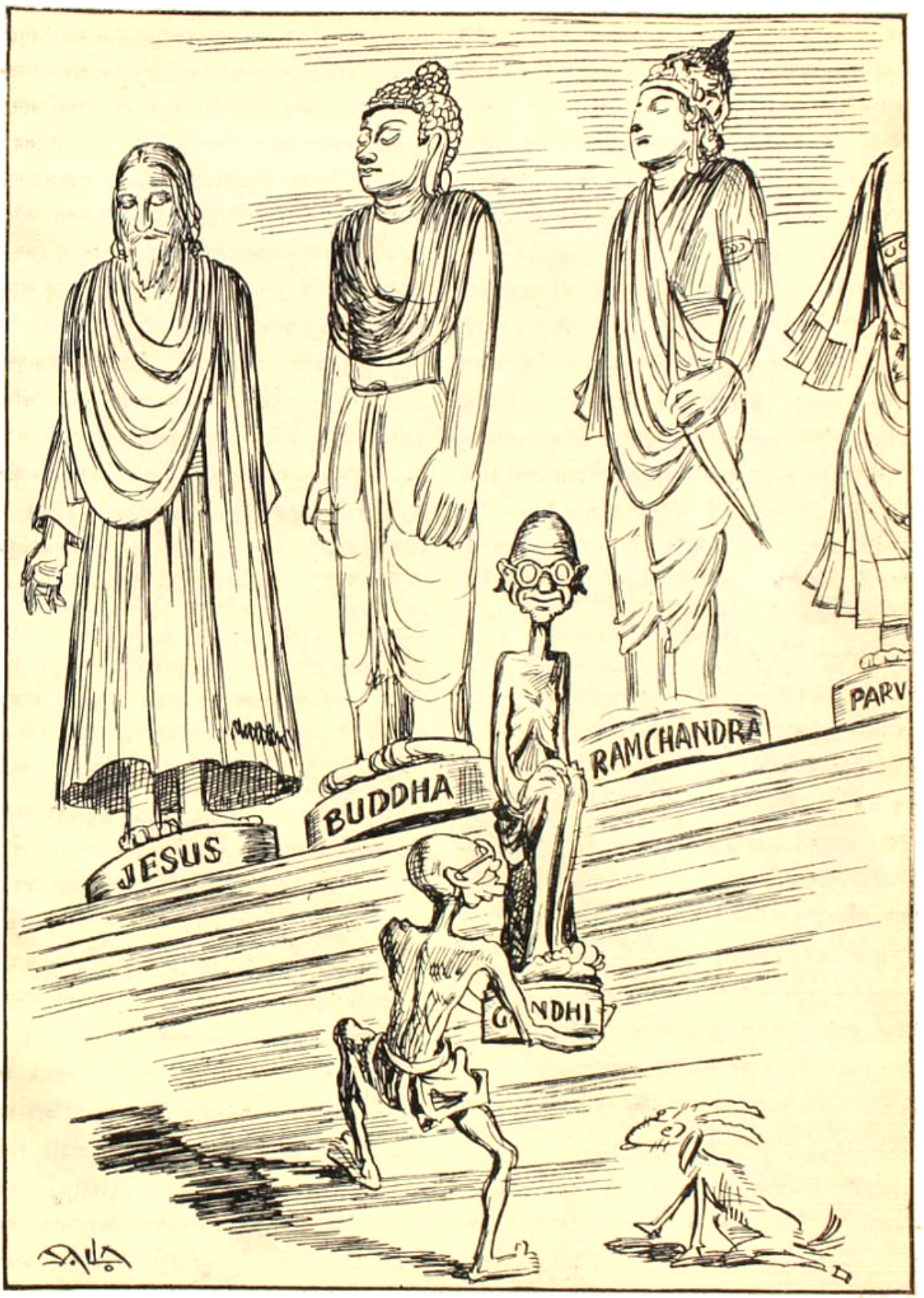

[বিজনের ১৫ই মার্চ তারিখের সংখ্যায় গান্ধীজী লিখিয়াছেন :—বুদ্ধ, যীশু, মহম্মদ ঈশ্বর-সাক্ষাতের জন্য উপবাস করিয়াছেন। রামচন্দ্র তাঁহার বানর-সেনার জন্য সমুদ্রকে তুষ্ট করিতে উপবাস করিয়াছিলেন। পার্শ্বেতী মহাশয়ের লাভের

সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সেই জ্ঞানের বিনিয়োগেই ভারতীয় শিক্ষার লক্ষ্য। তাহারই উপর ভারতীয় মনীষীরা তাঁহাদের সভ্যতার সমুন্নত সৌধ গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার কামনা পার্থিব ঐশ্বর্যে। ভারতীয় সভ্যতার দান, মনের শান্তি ও আধ্যাত্মিক শক্তি। সেই জন্য কৌপিনবন্ত সন্ন্যাসীকে দেখিয়া অতুল পার্থিব সম্পদের অধিকারী আলেকজাণ্ডারকে বিস্ময়ে বিভোর হইয়া পড়িতে হইয়াছিল। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার নিকট হইতে পাশ্চাত্ত্য জাতিরা দৈহিক শক্তি এবং ভোগার্থ বিবিধ ঐশ্বর্য পাইয়াছে, কিন্তু মনের শান্তি পায় নাই। অশান্তির জ্বালা তাহাদিগকে কিরূপভাবে দগ্ধ করিতেছে, তাহা পাশ্চাত্ত্য সমাজের সামাজিক, আর্থিক এবং রাজনীতিক পরিস্থিতির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই সহজে বুঝা যাইবে। কিন্তু ভারতীয় সভ্যতা অবশ্য পার্থিব শক্তি এবং সম্পদকে একেবারে অগ্রাহ্য করে নাই। তবে ঐ পার্থিব সাধনার উপর আধ্যাত্মিক সাধনাকে—আধ্যাত্মিক সম্পদকে উচ্চতর স্থান দিয়াছিল। যাহারা কণারকের মন্দির, ভুবনেশ্বরের মন্দির এবং দাক্ষিণাত্যের বহু মন্দির গড়িয়া তুলিয়াছিল, তাহারা যে পার্থিব জ্ঞানবিজ্ঞানে অজ্ঞ ছিলেন, তাহা নিতান্ত মূর্খ ভিন্ন অন্য কেহ বলিতে পারে না বিশ্বাস করিতে পারে না। কিন্তু তাহা হইলেও মাত্র জড়-জ্ঞানকেই ভারতীয় মহর্ষিরা উচ্চ স্থান দেন নাই। কালসহকারে ভারতীয় সেই সভ্যতার অধোগতি হইয়াছে। কিন্তু সেই শিক্ষা-জনিত আধ্যাত্মিক শক্তির কিঞ্চিৎ অবশেষ ছিল বলিয়া ভারতীয় সভ্যতা আজও প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে মস্তক উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এত প্রতিকূল আবেষ্টনের মধ্যে পড়িয়াও এখনও ভারতবাসী আত্মহারা হয় নাই। সুতরাং শিক্ষাপদ্ধতির উৎকর্ষ এবং অপকর্ষ বিচার করিয়া কোন্ শিক্ষাপদ্ধতি গ্রহণীয় এবং কোন্ শিক্ষা-পদ্ধতি বর্জনীয়, তাহা বুঝিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় না।

অবশ্য আজকাল টোলের শিক্ষার যেরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা দোষশূন্য বলিয়া আমাদের মনে হয় না। একজন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতকে উনিশ সিকা মুগের মণ হইলে সাড়ে বার সের মুগের দাম কত তাহা ঠিক করিতে প্রশ্নপত্রে দিতে দেখিয়াছি। ইহার কারণ তাঁহারা অঙ্ক শাস্ত্র ভাল করিয়া শিখেন না এবং চর্চার অভাবে ভুলিয়াও যান। ইহার ছাত্রটি দেখিলাম সে বিষয়ে খুব চালাক। আধুনিক টোলের পণ্ডিতরা ঠিক ঐরূপ নহেন। তাঁহাদের লাংসারিক জ্ঞান অনেকের থাকে। নৈয়ায়িক পণ্ডিতরা এক বিষয়ে অধিক অবহিত বলিয়া প্রায়ই অন্য বিষয় একেবারে ভুলিয়া যান। আজ কাল দশকর্মান্বিত ব্রাহ্মণদিগকে দেখিয়া অনেক লোক টোলের বিদ্যার পরিমাপ করিয়া থাকেন। সেটা তাহাদের মস্ত ভুল। টোলের পণ্ডিতদিগের মধ্যে যিনি যে বিষয়ে পণ্ডিত, তাঁহার সে বিষয়ে নিশ্চয় ব্যুৎপত্তি থাকে।

এখন অনেক লোক টোলের অধ্যাপনা প্রভৃতি দেখিয়া মনে করেন যে, ইহার শিক্ষিতব্য বিষয়ের বিস্তার অধিক ছিল না। যথা স্থাপত্য, চিত্রবিদ্যা, তক্ষণবিদ্যা, অঙ্কশাস্ত্র প্রভৃতি টোলে বা কোন বিদ্যা-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা দেওয়া হইত না। ইহা মনে করার মত ভুল আর নাই। যাহারা ভুবনেশ্বরের মন্দির গড়িয়াছিল, কণারকের মন্দির নির্মাণ করিয়াছিল, জগন্নাথের মন্দির রচিয়াছিল, তাহাদের স্থাপত্য-শিল্প শিক্ষার প্রতিষ্ঠান ছিল না, ইহা পাগল ভিন্ন অন্য কেহ মনে করিতে পারে না। যাহারা অতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর অতি উচ্চে মন্দির-শীর্ষে তুলিয়াছিল, তাহাদের উহা তুলিবার যে কোন যন্ত্রাদি ছিল না, তাহা মনে করা যায় কি করিয়া? প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বের সারনাথের যে সকল ভাস্কর-কীর্তি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া কি মনে হয় যে, উহা মানুষের অশিক্ষিত পটুত্বের প্রকাশ? অশোক-স্তম্ভের শীর্ষ-দেশে যে সিংহ চতুষ্টয়ের মূর্তি ছিল, যাহা দেখিয়া ভিন্সেণ্ট স্মিথকে বিস্মিত হইতে হইয়াছিল, তাহা কি অশিক্ষিত পটুত্বের প্রকাশ? চিত্র-বিদ্যা সম্বন্ধে একটু কথা আছে। ভারতীয় চিত্র ভাব-প্রধান—অর্থাৎ চিত্রিত ব্যক্তি বা বস্তুর অন্তরঙ্গ ভাবেরই প্রকাশক। উহাতে দৈহিক সৌষ্ঠব (symmetry) একেবারেই চিত্রিত হয় না। বিশেষ দেবতার মূর্তি মানুষের মূর্তির ন্যায় চিত্রিত করা চিত্র-শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। কারণ দেবতারা অশরীরিক। তবে ভাবপ্রকাশের জন্য তাঁহাদের শরীর কল্পনা করিয়া লইতে হয়। সেই জন্য গ্রীক চিত্রে, তথা পাশ্চাত্ত্য চিত্রে যেরূপ অঙ্গসৌষ্ঠব অঙ্কিত হয়, ভারতীয় চিত্রে তাহা হয় না। তক্ষণশিল্পে দেবতার চক্ষু ও গতি মানুষের চক্ষু মানুষের চক্ষুর ন্যায় করা হইত না, কারণ দেবতা মানুষ নহে। সুতরাং ঐ সকল বিষয় যে ভারতে শিক্ষা দেওয়া হইত না, ইহা ভুল। ভারতবাসী বস্ত্রাদি শিল্পের জন্য যেরূপ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, তাহাতে বেশ মনে হয় যে, প্রাচীন ভারতে উহা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা ছিল, নানা বিপ্লবের ফলে তাহা লোপ পাইয়াছে। সে কথা বর্তমান প্রবন্ধে আলোচ্য নহে।

নদীয়ার কথা

—শ্রীবীরেন্দ্রমোহন আচার্য্য

ধর্ম্ম

সমগ্র ভারতের কৃষ্টি ও সভ্যতার ঐতিহ্য পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, যে একটি মাত্র উৎসমুখে এই দেশের সমুদায় কর্ম্ম-প্রচেষ্টা ও চিন্তাধারা উৎসারিত হইয়া তাহাকে যুগে যুগে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহা ধর্ম্মের উৎস। ধর্ম্ম-চর্চ্চার ক্ষেত্রপটে এই দেশের সাহিত্য, শিল্প ও সমাজ-ব্যবস্থার গতি নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে। এই ধর্ম্ম-চর্চ্চায় শিক্ষা বিষয়ে নদীয়ার খ্যাতি চিরস্মরণীয়। নদীয়াই বাঙ্গলার ধর্ম্মানুশীলন ও আধ্যাত্ম-চর্চ্চার একমাত্র কেন্দ্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিভিন্ন কালে ও বিভিন্ন পথে নদীয়ার গৌরবময় ধর্ম্ম-সাধনার কাহিনী রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক ইতিহাস সঙ্কলন করিতে গিয়া প্রসঙ্গতঃ কথঞ্চিৎ আলোচনা করা হইয়াছে। বাঙ্গলার ইতিহাসের তীর্থরাজ মালদহ প্রথম কয়েক পাতা উল্টাইয়া আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, বিস্মৃতপ্রায় সুদূর অতীতে সমগ্র বাঙ্গলা বৌদ্ধ ধর্ম্মে প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল। যে সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্মের বিজয়-দুন্দুভি সগর্ব্বে ঘোষিত হইয়া ফিরিতেছিল, বাঙ্গলার আকাশে বাতাসেও তাহার প্রবল প্রতিধ্বনি উঠিয়াছিল। এমন কি বাঙ্গলার বাহিরে সমগ্র দেশে যখন বৌদ্ধধর্ম্ম ক্রমশঃ হীনপ্রভ হইয়া পড়িল, বাঙ্গলায় তখনও তাহা উজ্জ্বল কিরণে দীপ্যমান। এই বৌদ্ধ ধর্ম্মের উত্থান-পতনের ইতিহাস আজ বিস্মৃতির কুহেলীসমাচ্ছন্ন হইয়া রহিলেও নদীয়ার বক্ষে ইতস্ততঃবিক্ষিপ্ত খোটাকতক প্রাগৈতিহাসিক চিহ্ন একেবারে লুপ্ত হইয়া যায় নাই। হিন্দু ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ের ফলে বহু বৌদ্ধ কীর্ত্তিকলাপ, পূজাপদ্ধতি ও ধর্ম্মোৎসব হিন্দু ধর্ম্মের সহিত ওতঃপ্রোতভাবে মিলিয়া এক অদ্ভুত আকার ধারণ করিয়াছে। ধর্ম্মপূজা, শিবায়নের প্রভৃতি বহু ধর্ম্মানুষ্ঠান বৌদ্ধধর্ম্মের বর্ত্তমান হিন্দু সংস্করণ মাত্র বলিয়া বিশেষজ্ঞগণের অভিমত। এই ধর্ম্মপূজা আজিও নদীয়ায় বিশেষভাবে প্রচলিত এবং এই অনুষ্ঠান দুইটি নদীয়ার বহু স্থানে অতি সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া থাকে।

তথাগত বুদ্ধের পরবর্ত্তীকালে তাঁহার প্রচারিত শুদ্ধ নিরীশ্বরবাদ ক্রমে দৈব যোগপদ্ধতি ও শাক্ত তান্ত্রিকতার সংমিশ্রণে বিকৃত হইয়া হীনযান, মহাযান, সহজযান প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া যায় ও নিরীশ্বর-বাদিতার স্থলে অদ্ভুত নাম ও আকৃতি-বিশিষ্ট সহস্রাধিক দেবমূর্ত্তি কল্পিত হইতে থাকে। বিশেষজ্ঞগণ হিন্দুর ষড় দর্শন-বিদ্যায় ও দেবদেবীতত্ত্বে উক্ত বিকৃত বৌদ্ধ ধর্ম্মের বহু প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব আবিষ্কার করিয়াছেন। ইচ্ছাই, মনসা, বাসলী, চণ্ডী, ধর্ম্ম প্রভৃতি বিগ্রহাদির নাম এই স্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে। বৃন্দাবন দাস নদীয়ার প্রাক্‌চৈতন্যযুগের ধর্ম্মহীনতার উল্লেখ করিতে গিয়া বেলে মঙ্গলাদি সহকারে বাসলী, ধর্ম্ম, বিষহরি প্রভৃতি দেবদেবীর মহা সমারোহে পূজা করা হইত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কলাই ষষ্ঠীতলা, এইগুলি সমস্তই বিকৃত বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার দৃষ্টান্ত। রাণাঘাটের সন্নিকটস্থ আমুলিয়া গ্রামের সুবিখ্যাত ধর্ম্মগাজন উৎসব, ইলা বীরনগরের উলুইচণ্ডী, কৃষ্ণনগরের পাঁচু ঠাকুর প্রভৃতি সমস্তই প্রায় বিকৃত বৌদ্ধ ধর্ম্মানুষ্ঠানের নামান্তর মাত্র বলিয়া মনে হয়।

কৃষ্ণনগরের নিকটে বে'পাড়া বা বেতপল্লী নামে সুবিখ্যাত নৃসিংহ ঠাকুরের কথাও এই সূত্রে উল্লেখ করিতে পারি। বিগ্রহটি কৃষ্ণবর্ণ পাথরে খোদাই দ্বিহস্তাকল্পিত-বরাভয় নৃসিংহ ঠাকুরের মূর্ত্তি এবং সচরাচর বলিয়া প্রচলিত। বর্ত্তমানে মূর্ত্তিটির উপরে একটি ছোট মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে ও সেবাপূজার জন্যে নিযুক্ত ব্যবস্থাও হইয়াছে। পার্শ্ববর্ত্তী ভূমির তুলনায় বিগ্রহটি একটি উচ্চভূমি বা অতিবৃহৎ স্তূপের উপর অবস্থিত এবং মন্দির-পার্শ্বে বিভিন্ন আকারের বিস্তর পাথরের টুকরা বিক্ষিপ্ত দেখা যায় (যদিও মন্দিরের ত্রিসীমার মধ্যে পাথরের কাজ কোথাও কিছু মাত্র নাই)। মৃত্তিকাভ্যন্তর হইতে মাঝে মাঝে অদ্ভুত আকারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্ত্তি বাহির হয়। সম্প্রতি এই প্রকার স্তূপ হইতে বৌদ্ধ বেদীমূর্ত্তির ন্যায় একটি ক্ষুদ্রকায় খোদিত মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছিল (অবশ্য মন্দিরের হিন্দু পুরোহিত সেটিকে যথারীতি সিন্দুর-চর্চ্চিত করিয়া হিন্দুবিগ্রহে রূপান্তরিত করিতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই)। সম্ভবতঃ কোন প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দির ধ্বংস হইয়া গেলে কালে হিন্দু ধর্ম্মের প্রভাবে পড়িয়া বৌদ্ধবিগ্রহ নৃসিংহ ঠাকুরে রূপান্তরিত হইয়া গিয়া থাকিবেন। এই স্তূপ খনন করা হইলে উক্ত সংশয়ের সমর্থক প্রমাণাদির সন্ধান হয়ত মিলিতে পারে। বর্ত্তমানে ইহা অনুমান মাত্র। অপুত্রক ব্যক্তি পুত্র কামনায় এইখানকার মন্দির-পার্শ্বে ছেলা বাঁধিয়া দিলে অচিরেই মনস্কামনা সিদ্ধ হয় বলিয়া প্রবাদ আছে। ফলে মন্দিরপ্রাঙ্গণস্থ বৃক্ষগুলি অসংখ্য ছিন্নুক-ভারে অবনত হইয়া পড়িয়াছে। কথিত আছে, পূর্ব্বে নৃসিংহ ঠাকুরের ললাটে একটি উজ্জ্বল মণি সন্নিবেশিত ছিল। জনৈক সাধু বিগ্রহ হইতে মণিটি খুলিয়া লইতে অকৃতকার্য্য চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া বিগ্রহে অগ্নি প্রদান করে। ইহাতেও লোভীর মনস্কামনা পূর্ণ হয় নাই, মণিটি খুলিয়া সম্মুখস্থ সরোবরে পড়িয়া হারাইয়া যায় এবং বিগ্রহটি সেই হইতে কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গিয়াছে। এই প্রবাদের সত্যাসত্য সম্বন্ধে কোন আলোচনার প্রয়োজন নাই। দেবদেবীর রাজা-রাণীদের মূলেও ইহারই অনুরূপ একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে বলিয়া নদীয়া-কাহিনীতে উল্লেখ করা হইয়াছে। ভারতের প্রায় সমুদয় প্রাচীন মঠ, মন্দির, বিগ্রহ সম্বন্ধেই কিছু না কিছু অলৌকিক উপাখ্যান জড়িত হইয়া আছে—তাহার সত্যতা সম্বন্ধে আলোচনা করা বর্ত্তমান প্রসঙ্গের উপেক্ষ্য-বহির্ভূত। কারণ নিরপেক্ষ ইতিহাস পর্য্যালোচনায় এই প্রকার জনশ্রুতিমূলক অলৌকিক গল্পের বহুল বর্ণনা অনাবশ্যক।

বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব হইতে বাঙ্গলা দেশকে মুক্ত করিয়া হিন্দু পুনরভ্যুদয়ের সূচনা করেন সেন রাজবংশ। পুরুষানুক্রমে প্রবল প্রতিক্রিয়ায় হিন্দুর বিচিত্র দেবদেবী ও বিচিত্র ধর্মোপাখ্যান প্রচলিত হইয়া হিন্দু ধর্মের মায়াজাল ঘোরালো মূর্তি ধরিয়া উঠিল, এবং বৌদ্ধের প্রতিক্রিয়ার বৈষম্য সত্ত্বেও বোধ হয় সর্বপ্রথম অন্তরঙ্গ উদ্যোগ করিয়াছিল। সেন রাজবংশ ছিলেন শৈব। লক্ষ্মণ সেন দেবের সময়েই বাঙ্গালায় হিন্দু পুনর্জাগরণ সম্পূর্ণরূপে সফলতা লাভ করিয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। হিন্দু সভাসদ, হিন্দু কর্মচারী, হিন্দু কবি, ধার্মিক প্রভৃতি পরিশোভিত নদীয়ার হিন্দু রাজারা সমস্ত দেশে হিন্দুর সমাজ-ব্যবস্থা-বিষয়ক ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম-প্রচারে যে কতখানি সাহায্য করিয়াছিলেন তাহা আর বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই।

এই সময়ের পর হইতেই অর্থাৎ লক্ষ্মণ সেন দেবের পতনের পর হইতেই রাজশক্তির অভাবে হিন্দুসমাজে পুনরায় বিশৃঙ্খলা ও স্বেচ্ছাচারিতা দেখা দিতে লাগিল। হিন্দু ধর্মের ভিতরে ভিতরে বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার গোপন স্রোত দেশের মধ্যে তখনও প্রবাহিত হয় নাই, বরং বাহিরে হিন্দুধর্মের আবরণে সংগুপ্ত হইয়া বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার অনেক বিকৃত ক্রিয়া-কর্ম হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িল। এই সময় হইতেই ইসলামধর্ম রাজধর্ম হইয়া উঠায় সমাজের নৈতিক ও ধর্মগত পরিবর্তিত হইয়া হিন্দু সমাজে কিরূপ বিপ্লব আনয়ন করিয়াছিল, সমাজনৈতিক বিষয়ে তাহা যথোচিত উল্লেখ করিয়াছি।

অতি সহজেই লোকবিভূতি, ও তান্ত্রিক সিদ্ধাই লাভ করিবার জন্য তন্ত্রের যামাচারী, পশ্বাচারী প্রভৃতি পন্থার প্রচলনে দেশের মদ্যমাংস ও ইন্দ্রিয়সেবার কলুষপঙ্কিল আবহাওয়ার সৃষ্টি করিল। তন্ত্রের বেহাই দিয়া স্বেচ্ছাচারিতার ফলে শাক্তধর্ম ও তন্ত্রচর্চা তখন এ দেশে উচ্ছৃঙ্খলতার নামান্তর মাত্র হইয়া পড়িয়াছিল, সেই সময়েই তান্ত্রিকতা পুনরুজ্জীবিত করিতে তান্ত্রিক সাধক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ নদীয়ার আবির্ভূত হইলেন। আগমবাগীশ ও মহাপ্রভু সমসাময়িক এবং এই দুই মহাপুরুষ কর্তৃক শাক্ত ধর্ম ও বৈষ্ণব ধর্মের বাঙ্গালায় পুনঃপ্রচলন ঘটিল। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ প্রচলিত তন্ত্রগুলি হইতে বেদ, কাল ও পাত্র উপযোগী সারাংশ সংগ্রহ করিয়া 'তন্ত্রসার' নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ সঙ্কলন করেন, এবং তিনিই প্রথমে তন্ত্রোক্ত দেবীমূর্তিগুলির সাকার পূজা প্রবর্তন করেন। বর্তমান সময়ে সমস্ত হিন্দুসমাজে প্রতিমাপূজায় যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হইয়া থাকে, কৃষ্ণানন্দই তাহার প্রথম প্রবর্তক এবং প্রচলিত প্রতিমামূর্তির কল্পনাও কৃষ্ণানন্দের নিজস্ব। এই মূর্তির কল্পনা সম্বন্ধেও একটি সুন্দর প্রবাদ প্রচলিত আছে, বাহুল্যভয়ে এখানে উল্লেখ করিলাম না।

পরবর্তী কালে এই তন্ত্র-সাধনার সর্বশ্রেষ্ঠ সাধক হিসাবে নাম করিতে পারি কৃষ্ণানন্দের শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব ভট্টাচার্যের। ইনি অন্ত্রজন উড়ফ সাহেবের গুরু ছিলেন এবং তখনকার দিনে শাক্তজ্ঞানেও ইনি অদ্বিতীয় ছিলেন বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না।

যাহা হউক এইভাবে সমস্ত বাঙ্গলার কর্মজীবনে যে সময়ে পৌরুষের সর্বনাশের তামসী রজনী ঘনাইয়া উঠিয়াছিল, সেই সময়ে নবদ্বীপ-চন্দ্রের আবির্ভাব। তাঁহার জীবনকালে বাঙ্গালার সমাজে, ধর্মে ও সাহিত্যে আলোড়ন উপস্থিত হয়। প্রায় সাড়ে চারিশত বৎসর পূর্বে নবদ্বীপে জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে যে শিশুটি জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, পরবর্তী কালের কবিদের তাঁহাদের সকল বকমের ইমন নিংশেষিত করিয়াও সেই চিত্র ঐতিহাসিক তৃপ্ত হন নাই। প্রেম ও করুণার মূর্তবিগ্রহ বলিয়াও যেন সমস্যার শেষ হয় নাই। শ্রীচৈতন্যদেবের সংস্পর্শে আসিয়াই বাঙ্গালার প্রাঙ্গণে বাঙ্গালা আবার নূতন আসন অলঙ্কৃত করে। জনৈক লেখক বলিয়াছেন—"চৈতন্য বঙ্গ বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তদনুরূপ বাঙ্গালীর প্রভাব যোলপূর্ণ রূপে একবার চৈতন্যদেবের প্রভাবে নূতন করিয়া বাড়িয়াছিল।" ... চৈতন্যদেবের বিদ্যায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা হইল। বাঙ্গালী পুনঃ গেল, বৃন্দাবনের তীর্থগুলি উদ্ধার করিল, বৃন্দাবনকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের চিন্তা ও দর্শনের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র করিয়া তুলিল। বিশ্বরূপের পরে আবার বঙ্গের বাহিরে গৌড়বঙ্গের কবীর গমন ও অধিষ্ঠান হইল।" ভারতের দার্শনিক চিন্তাধারায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবের অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব বর্তমান কালের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান বলিয়া অনেকে মনে করেন। এই হিসাবে মহাপ্রভু শুধু বাঙ্গালীর নহেন, তিনি ভারতবাসীর, তিনি সকলের।

বাঙ্গালীর বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে ধর্ম, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের দিক্ দিয়া এই গৌড়ীয় বৈষ্ণবের দানের কথা বাড়িয়া দিয়েও তাৎকালিক কর্তার সমাজ-বন্ধন-প্রতিষ্ঠিত জনসংঘের উপর এই নবধর্ম যে কতখানি শান্তিপ্রলেপ প্রদান করিয়াছিল, তাহা চিন্তা করিলেও বিস্মিত হইতে হয়। "হরিনামে যার দুঃখ হরে অনায়াসে। সেই জন হয় প্রেম ভক্তির নিবাস।" এই প্রচণ্ড নাম-মাহাত্ম্য ও নামশক্তি-বিশ্বাসী বৈষ্ণবাচারোদ্দীপ্ত বাঙ্গালার ধর্মজগতে যুগান্তর আনয়ন করিলেন। যাগ, যজ্ঞ, ব্রত, দান, নিয়ম অপেক্ষা "নাম সাধন" শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলিয়া ঘোষিত হওয়ায় ব্রাহ্মণজীবী ব্রাহ্মণগণের বৃত্তি, এমন কি সম্মানলোপের উপক্রম হইয়া উঠিল। ব্রাহ্মণগণই এতদিন কাল হিন্দুসমাজে ধর্ম ও সমাজ জীবনে একচ্ছত্র প্রভুত্ব করিতেছিলেন, নবধর্মের অনুসরণে প্রচারিত হইল—যে ভক্ত সেই পূজ্য। ভক্ত যদি চণ্ডালও হয়, তথাপি ভক্তিহীন ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কাজেই চিরাচরিত প্রথা-রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ-সমাজে মহা গণ্ডগোলের উদ্ভব হইল। ইহার পর আসরে যখন ব্রাহ্মণেতর জাতি গৌরাঙ্গের আসনে বসিয়া উচ্চবর্ণকেও মন্ত্র দিতে আরম্ভ করিলেন, তখন দেশের মধ্যে মহা গণ্ডগোল বাধিয়া গেল। কুঁইয়ালী বসু ঠাকুর বৈষ্ণব হইয়া সকলের পূজ্য হইয়া উঠিলেন, নরোত্তম ঠাকুর কায়স্থ, ওঝার নিকটে অধিষ্ঠিত পণ্ডিত গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী, বলরাম মিশ্র প্রভৃতি বেদপূজা ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। কইবাস মুচি, মুরারীদাস চামার, হরিদাস যবন-সমাজে বৈষ্ণবাগ্রণী বলিয়া সম্মানিত হইলেন। কুঁইয়ালী, মুচির প্রসাদ বৈষ্ণব প্রসাদ বলিয়া সমাদরে সাদরে গৃহীত

হইল। ব্রাহ্মণদের গুরু বৈষ্ণবদের ঠাকুর, গোস্বামী প্রভৃতি ব্রাহ্মণদের একচেটিয়া উপাধি গ্রহণ করিলেন। এমনি ভাবে ব্রাহ্মণদের কর্তৃত্ব বজায় রাখিয়া 'হরিজন'-সমস্যার সমাধান হইল। স্বার্থ লইয়া যেখানে বিরোধ, প্রতিযোগিতা সেখানে অবশ্যম্ভাবী। এই জন্যই বোধহয় নবদ্বীপের স্মার্ত ভট্টাচার্যগণ এই নবধর্মমতকে গ্রহণ করিতে পারিলেন না বরং এই বিধর্মীকে উহার বক্ষ হইতে আকর্ষণ করিতে গিয়া সদৈর্ঘ আঘাতে আহত হইয়া পড়িলেন।

পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ লক্ষ করিলে দেখা যায় যে, সকল ধর্মই মূল হইতে ক্রমশঃ দেশ কাল ও পাত্রভেদে পরিবর্তিত ও বিকৃত হইয়া পড়ে। মহাপ্রভু-প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মও এই বিকৃতির হাত হইতে নিস্তার পায় নাই। সাধন-প্রণালী অনুযায়ী তাহা করিয়া দেখিলে আজ কাল বৈষ্ণব ধর্মকে সাধারণতঃ চার ভাগে বিভক্ত করিয়া দেখা যাইতে পারে।

(১) পুরাণাদি ধর্ম-শাস্ত্র অনুমোদিত ভাবে বিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণের ভজন। সাধারণতঃ ইঁহাদের স্মার্ত বৈষ্ণব বলা হইয়া থাকে। মহাপ্রভুর সহিত ইঁহাদের কোনও সম্বন্ধ নাই বা ইঁহারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্তও নহেন।

(২) মহাপ্রভু-নির্দেশিত পন্থায় শ্রীকৃষ্ণ-ভজন। ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণকে একমাত্র মূল পুরুষ জানিয়া মধুর ভাবে গোপীভাব অঙ্গীকারপূর্বক ব্রজ-ভাবীয়া আনন্দের তথায়ত আস্বাদন করিতে পারাই ইঁহাদের পরম পুরুষার্থ। সুতরাংই ইঁহাদের পরম ধাম ও ধামাধীশ যুগলমিলন প্রত্যক্ষই পরম প্রাপ্তি।

(৩) মহাপ্রভুকেই সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ মানিয়া তাঁহাকেই ইষ্টদেবরূপে উপাসনা। ইঁহাদের মতে কলিতে যুগধর্মোচিত হরিনাম মহা প্রচারের জন্যই 'রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত' শ্রীকৃষ্ণ নবদ্বীপ ধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। (এই ও ৩য় শ্রেণীর বৈষ্ণবগণকেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত বলা যায়। ইঁহাদের মধ্যে ইষ্টমন্ত্র ছাড়া সাধনপ্রণালী বা সামাজিক রীতিনীতির কোনও পার্থক্য নাই। সর্বত্রই গোস্বামীর স্মৃতিশক্তি বিধান মতেই ধর্মানুষ্ঠান ও সামাজিক ক্রিয়া-কর্মাদি নির্বাহ হইয়া থাকে। ইঁহাদের মধ্যে বর্ণাশ্রমের ব্যবস্থা রক্ষিত হইলেও জাতিভেদের কঠোরতা অবশ্য পরিমাণে শিথিল। ইঁহারা অধিকাংশই নিরামিষাশী, নিরীহ, শুদ্ধাচারী ও সৎস্বভাবসম্পন্ন।)

(৪) নামে মাত্র মহাপ্রভুর দোহাই দিলেও মহাপ্রভু-প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মের সহিত ইঁহাদের কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই। পূর্বেরতী সামাজিক বিবরণ প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছি—এই দেশের অগণ্য বৌদ্ধ বেচারেড়ী হিন্দু সমাজে কোনই সম্মানজনক স্থান না পাইয়া পরিত্রাণ করিতে করিতে মহাপ্রভুর প্রচারিত প্রেমধর্মের শান্ত শীতল ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিয়া ছিল। ইহারা নামে মাত্র বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেও কার্যতঃ ইহাদের পূর্বাচরিত বহুত্ব ব্যবহার ত্যাগ করে নাই। বর্তমানে ইহাদের বেকারত্বী সংখ্যাধিক্য বৈষ্ণব বলা হয়। সামাজিক রীতিনীতি ও আচার-অনুষ্ঠানে শুদ্ধ বৈষ্ণব হইতে ইহারা একেবারেই বিভিন্ন। বিধবা-বিবাহ বা বহুবিবাহ ইহাদের মধ্যে বিশেষ ভাবে প্রচলিত আছে এবং মৎস্যাদি আহারেও অরুচি নাই। ইহাদের ব্যভিচার ও কদাচারের ফলে শুদ্ধ বৈষ্ণব সম্প্রদায় লোকচক্ষে হেয় হইয়া পড়িতেছে।

এই সকল বৈষ্ণব নামধারী ব্যক্তিগণ বাহিরে বৈষ্ণব-চিহ্ন ধারণ করিলেও আভ্যন্তরিক ক্রিয়া-কলাপ ও ভজনপ্রণালীর দিক্ দিয়া বিভিন্ন উপ-সম্প্রদায়ে বিভক্ত এবং এই শেষ শ্রেণীর বৈরাগী-বৈষ্ণবের সংখ্যাই সর্বাপেক্ষা অধিক।

এই উপসম্প্রদায়গুলির কথা বলিতে গিয়া সর্ব প্রথমেই আমরা লক্ষ্য করিব যে, বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম যেমন নবদ্বীপের দান, এই সকল উপসম্প্রদায়গুলিও অধিকাংশই নবদ্বীপ হইতে উদ্ভূত এবং ইহাদের প্রবর্তকগণও প্রায়ই নবদ্বীপের নিম্ন শ্রেণীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

উপসম্প্রদায়গুলির মধ্যে নবদ্বীপের কর্তাভজা দলই সর্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য এবং লোকসংখ্যায় এই দলই সর্বাপেক্ষা অধিক (পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের প্রায় তিন গুণ সংখ্যাধিক্য)। সমাজের নিম্নশ্রেণীতে ইহার প্রসার সর্বাধিক হইলেও কলিকাতার বহু উচ্চবর্ণ ও সম্পন্ন গৃহস্থের মধ্যেও অনেকে গোপনে এই মতাবলম্বী।

এই দলের মূল পুরুষ আউল চাঁদ। সম্প্রদায়ের গুরুগণ ইঁহাকে স্বয়ং ঈশ্বরের অবতার বলিয়া স্বীকার করেন। তাঁহাদের মতে শ্রীচৈতন্য প্রভু পুরীতে অন্তর্হিত হইয়া ১৬১৬ শকে ফাল্গুন মাসে নবদ্বীপ উলাগ্রামে মহাদেব বাড়ুইর পানের বরোজে অষ্টভুজা দিব্যকান্তি বালকরূপে দেখা দেন। এই প্রকারের বহু অলৌকিক কাহিনীতে তাঁহার জন্ম ও কর্ম পরিপূর্ণ—বর্তমানে তাহার আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রামশরণ পাল নামক একজন সদ্গোপ এই কর্তাভজা মতের প্রবর্তন করেন এবং ইঁহার পুত্র রামদুলাল বা দুলাল চাঁদের আমলে সম্প্রদায়ের প্রসার প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা বহু গুণ বিস্তৃত হয়। কাঁচড়াপাড়া হইতে ৩ মাইল দূরে বোষপাড়া নামক স্থান এই কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রধান কেন্দ্র ও পীঠ। রামশরণের পৌত্র ঈশ্বরচন্দ্রের সময়েই কর্তাভজারা চারি ভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে এবং এই হিসাবে সমাজের ঐক্যবন্ধনও অনেকাংশে কমিয়া গিয়াছে।

ইহাদের ধর্মের মূলনীতি অতি সরল আদর্শ ও সত্যনিষ্ঠপূর্ণ। যথা—"গুরুসত্য—"কর্তা আউলে মহাপ্রভু, আমি তোমার মুখে চলিফিরি, যা বলাও তাই বলি, যা খাওয়াও তাই খাই, তোমা ছাড়া তিলার্ধ নই—গুরু সত্য বিশ্ব মিথ্যা—"। ভজনসাধনে ইহাদের অনেক সাংকেতিক শব্দ আছে; যথা মন্ত্রের নাম 'খেলে আনা,' গুরু 'মহাশয়', শিষ্য 'বয়াতি', সম্প্রদায়ের লোক 'ভগবজ্জন,' কাজ অবস্থায় 'প্রবর্তক'—'সাধক', 'সিদ্ধ', 'সিদ্ধের সিদ্ধ', গৃহ 'বাসা' ইত্যাদি। সমাজের মধ্যে ইহাদের কোন আভিজাত্য বা অস্পৃশ্যবিচার নাই, তবে বাহিরে কুলাচার মানিয়া চলে।

সোমপাড়ায় মেলা ও রসোৎসব প্রকাশ্য মেলা হয় এবং মহেন্দ্রলালের বাৎসরিক স্মৃত্যুতিথিতে মহামহোৎসবের উৎসব হয়।

সাহেবধনী—ইহা কর্ত্তাভজারই একটী শাখা। সাহেব ধনী নামক কোনও উদাসী মুসলমান সাধকের নিকটে মন্ত্র লইয়া নদীয়ার মেহেরপুরিয়া নিবাসী গুরুচাঁদ পাল, হরুরাম দাস প্রভৃতি কয়েক জন ভক্ত এই মতের প্রবর্ত্তন করেন। এই মতে হিন্দু ও মুসলমানের তুল্য অধিকার। চৈত্রমাসে অষ্টমীতে ইহাদের মহোৎসব হইয়া থাকে।

আউল—ইহারও উৎপত্তি নদীয়ায়। হরিগুরু, বসন্তরাম, মেলা কমলিনী ও অখিলচাঁদ এই চারিজন সাধক হইতে এই মতের উদ্ভব। ইহাদের মধ্যে কিছু কিছু নিকৃষ্টাচারীর যোগসাধার প্রচলন আছে। বহু-দেবতাকে ব্রহ্মের সহিত তুলনা করিয়া সহজে কৃষ্ণলীলা নিজ দেহমধ্যে সংঘটিত হইতেছে বলিয়া ইহারা মানিয়া করেন। স্ত্রী-পুরুষের যুগল মিলন ও গোপন সাধন-প্রণালী এই মতের বৈশিষ্ট্য।

আউল—ইহাও একটী শাখা। আচারের একেবারেই নাই এবং প্রকৃতি লইয়া তন্ত্রমন্ত্র ইহাদের বিশেষত্ব।

বলরাম ভজা—নদীয়ার মেহেরপুর গ্রামে বলরাম বাড়ৈ নামক জনৈক ব্যক্তি সমাজে উৎপীড়িত হইয়া দেশত্যাগ করেন; এবং পরে যৌগযোগ-সাধন প্রণালীতে যোগবিভূতি লাভ করিয়া এই মতের প্রবর্ত্তন করেন। বলরাম নিজেকে স্বয়ং ঈশ্বর বলিয়া প্রচার করিতেন এবং ঘোর উৎসবে স্বয়ং বিগ্রহ সাজিয়া পূজা গ্রহণ করিতেন। এই মতের বিশেষ সমৃদ্ধি ও পরিপুষ্টি না থাকিলেও এখনও মেহেরপুরে বলরামের ঘোল উৎসব এক হে জনসমাগম হয়।

ইহা ছাড়া সমগ্র বেগে অবধূত, ত্রিশোত্রীভজন, ত্রিভঙ্গবাসী, গৌরাঙ্গী, হরিবোলা, সখীভাবী, ভাড়া, দরবেশ, সাঁই, ফকির প্রভৃতি অনেক ছোটখাট মত বা মতের অভাব নাই। কুমারখালির লালন সাঁই ফকিরের নাম এই সূত্রে উল্লেখ করিতে পারি। ইহাদের ধার্শনিক তত্ত্বপূর্ণ সঙ্গীতাবলীতে যে গূঢ় ভজন-সাধনের ও ধর্মকথার সন্ধান পাওয়া যায়, তাহার তুলনা পৃথিবীর যে কোনও ধর্মতত্ত্ব অপেক্ষা ন্যূন নহে। এদেশে প্রচলিত বৈষ্ণব ও শাক্তধর্ম, যোগপদ্ধতি, বৌদ্ধতান্ত্রিকতা, মুসলমান ধর্ম প্রভৃতি সকলের সংমিশ্রণে এই নদীয়ার অধিবাসী জনসাধারণের স্বাভাবিক ধর্মপিপাসাতৃপ্তিতে এগুলির উদ্ভব হইয়াছে। স্বতন্ত্রভাবে ইহাদের আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। তবে এ সম্বন্ধে এইটুকু বলিতে পারা যায় যে, ধার্শনিকতা, আত্মিকতা বা নৈতিক বিশুদ্ধির দিক্ দিয়া ইহাদের অনেকগুলিই যে প্রশিধানযোগ্য তাহাতে সন্দেহ নাই।

বিভিন্ন ধর্মমতবাদের উৎপত্তি ছাড়া ধর্মকলহও নদীয়ার কম হয় নাই—বিশেষতঃ শক্তি-বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব। নদীয়ার তাহা শক্তিসম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া নদীয়ার বৈষ্ণব ধর্মচর্চ্চার প্রসার ও প্রতিপত্তিতে অযাচিত বাধা দান করিতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, নবদ্বীপে চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব অনুষ্ঠান হইলেও তাহাদেশে শক্তি মতোৎসবের পরিপাঠ হইয়াছে। যাহা হউক, বর্তমানে এই দ্বন্দ্বভাব আর নাই, সুতরাং এ আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক।

নদীয়ার মুসলমান ধর্মের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বলিতে হয়, এইখানকার মুসলমানগণ অধিকাংশই সুশিক্ষাসম্পন্ন ধনিক কৃষিজীবী। কিন্তু একসময়ে এখানে ফরাজী সম্প্রদায়ের বিশেষ প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে তিতু মিঞা নামে জনৈক বেহারা অধিনায়কত্বে নদীয়ার এই ফরাজী সম্প্রদায় এত বেশী শক্তিশালী, সংঘবদ্ধ ও দুর্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছিল যে, ইহারা গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধেও তাহারা কিয়ৎকাল ঘোষণা করিতে পশ্চাৎপদ হয় নাই।* এখন আর ফরাজী সম্প্রদায়ের সে প্রতিপত্তি আর নাই। নদীয়ার মুসলমানের উল্লেখযোগ্য কোন বৃহৎ প্রাচীন মসজিদ বা থাকিলেও ইহার সর্বত্রই অসংখ্য ছোটখাট মসজিদ, পীর দরগা বিরাজিত। হিন্দু মুসলমানের আন্তরিক সম্প্রীতি এই জেলার গৌরবের বস্তু। আজও সহরের পার্শ্বকোলাহল হইতে বহু দূরে পল্লীতে পল্লীতে, বস্তিতে, মসজিদে, আখড়ায়, বারোয়ারীতলায় হিন্দু মুসলমান সমভাবে পূজা মানসিক ভিন্না অনুষ্ঠান ভক্তি নিবেদন করিয়া আসিতেছে। অবশ্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অতি উৎসাহী প্রচারকগণের অত্যাচার পরিচয় দেখিয়া কখন কখন অধিক দিন দুরত তাঁহারা এই সম্প্রীতি থাকিতে দিবেন না।

খৃষ্টানধর্মাবলম্বীদের সংখ্যাও এখানে কম নহে। রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্টাণ্ট এই উভয় সম্প্রদায়ই এখানে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী। নদীয়ার ইহাদের অভ্যুদয় সাধারণতঃ কৃষ্ণনগর, কাশীদাঙ্গা, রাণাঘাট, মেহেরপুর, চাপড়াবাজারাটি, বেতপুর, শিকারপুর, হলুদবাড়িয়া প্রভৃতি স্থানে। মিশনারী সাহেবগণ এদেশে ধর্মপ্রচার করিতে আসিয়া বহু জনহিতকর অনুষ্ঠান স্থাপন পূর্বক জনসাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া লন। কৃষ্ণনগর, রাণাঘাট, শান্তিপুর প্রভৃতি বহু স্থানে দাতব্য চিকিৎসালয়, বিদ্যালয়, বোর্ডিং মিশন প্রভৃতি ইহাদের এই সদনুষ্ঠানের জ্বলন্ত উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ব্রাহ্মধর্মের প্রতিপত্তি আজকাল বিশেষ না থাকিলেও একসময় কৃষ্ণনগর ব্রাহ্মধর্মপ্রচারের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল। কৃষ্ণনগরে ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্মধর্মের আদিগুরু স্থাপিত এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথপ্রমুখ আচার্যগণ এখানে আসিয়া এই মত প্রবর্ত্তনের বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন। শান্তিপুরের বিখ্যাত যোগাদ্যা মহাশয়ের নাম এই সূত্রে উল্লেখ করিতে পারি। এই আজন্মদীক্ষিত সাধকপ্রবরকে কেবলমাত্র ব্রাহ্মধর্মের প্রচারক হিসাবে দেখিলে ভুল হইবে। শেষ জীবনে তিনি বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করিয়া যে বিরক্তি ও একনিষ্ঠা দেখাইয়াছেন তাহার তুলনা নাই। রামতনু লাহিড়ী মহাশয়কেও অনেক গ্রন্থকার ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী বিশেষ বলিয়া ভুল করিয়াছেন। তিনি লৌকিকধর্মের আচার-অনুষ্ঠানের বড় ভক্ত ছিলেন। মানুষের যাহাতে মঙ্গল, চিত্তের যাহাতে প্রসন্নতা, মনের যাহাতে পূর্ণ বিকাশ, তাহাই ছিল তাঁহার ধর্ম।

---

*"Titu Mian, found in Nadia a sufficient body of disaffected Faraizi husbandmen as to lead him to set up the standard of revolt and for a short time to defy the British Government—" *Statistical Account of Nadia*—Hunter.

নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ

—শ্রীকিরণেন্দু বাগচী

পরিচয়

দক্ষিণাত্যের বুরহানপুরে বাস করিতেন জনৈক কুলীন ব্রাহ্মণ, সম্ভ্রান্ত কুলোদ্ভব হইলেও তাঁহার অবস্থা শেষ পর্যন্ত অতি হীন হইয়া পড়িয়াছিল। নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ এই ব্রাহ্মণের একমাত্র পুত্র।

মুর্শিদের অতি শৈশবে হাজি সাফি নামে এক পারসী বণিক্ ইস্পাহান হইতে এদেশে বাণিজ্য করিতে আসিয়া ঐ গরীব ব্রাহ্মণের নিকট হইতে তাঁহাকে (মুর্শিদকে) ক্রীতদাস রূপে ক্রয় করিয়া দেশে লইয়া যান এবং সেখানে মুসলমানধর্মে দীক্ষিত করিয়া এবং নাম রাখেন

[illegible] বালক দাসীর বুদ্ধির প্রখরতা ও বিদ্যানুরাগ দর্শনে বণিক্ ব্যবসা-বাণিজ্যে সন্তুষ্ট হন, পরে ছেলেটির বিশেষ বিদ্যালাভের ব্যবস্থা করেন। বাল্যজীবনে এ প্রকার সুযোগ ঘটিয়া উঠায় দাসীও লেখা পড়ায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিতে সমর্থ হন।

স্বদেশে প্রত্যাবর্তন ও দেওয়ানী

হাজি সাফির মৃত্যুর পর তাঁহার পরিজনেরা মহম্মদ দাসীকে দাসত্ব হইতে মুক্তি দেন। দাসী স্বদেশে (দাক্ষিণাত্যে) ফিরিয়া আসেন, কিন্তু এখানে হিন্দুসমাজে তাঁহার একেবারেই স্থান হয় না। অবশেষে নিরুপায় হইয়া তিনি বেরার অভিমুখে যাত্রা করেন। ভগবানের আশীর্বাদে বেরারেই মহম্মদ দাসীর ভবিষ্যৎ জীবনের প্রথম অরুণালোক দেখা দেয়। বলা বাহুল্য, বেরারে পৌঁছিয়াই সেই প্রদেশের রাজস্ব-সংগ্রাহক আজমের অধীনে দাসী একটি চাকরী পান এবং বিশেষ মনোনিবেশ সহকারে কার্যে ব্রতী হন।

অনতিবিলম্বে দাসীর কর্মতৎপরতা ভারতসম্রাট্ আওরঙ্গজেবের দৃষ্টিগোচর হওয়ায় দিল্লীশ্বর তাঁহাকে হায়দ্রাবাদের দেওয়ানী পদ প্রদান করেন। দিনে দিনে দেওয়ান দাসীর কর্মকুশলতা সম্রাটের মনোবিমোহন করে। দেওয়ানজীর পুরস্কার স্বরূপ সম্রাট্ তাঁহাকে 'কয়তলব খাঁ' উপাধিতে ভূষিত করিয়া, ১৭০১ খৃষ্টাব্দে (১১১৩ হিজরী) বঙ্গের দেওয়ান পদে প্রতিষ্ঠিত করেন।

বাংলা—শস্য-শ্যামলা লক্ষ্মী-বিরাজিতা বাংলা মোগল বাদসাহদের রাজত্বকালে দিল্লীর সম্রাটের করায়ত্ত ছিল। ঢাকা বা জাহাঙ্গীরনগর ছিল তখন বাংলার রাজধানী। দিল্লীর বাদসাহই বাংলার মসনদে নিয়মিতরূপে একজন শাসনকর্তা (সুবেদার) নিযুক্ত করিয়া পাঠাইতেন। সেই সময় বেহার উড়িষ্যাও বাংলার সুবেদারের শাসনাধীন ছিল, বঙ্গের অফুরন্ত লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বাদসাহী আমলে হইতে প্রচুর অর্থ দিল্লীর রাজকোষে প্রেরিত হইত। সম্রাট্ সাজাহানের দ্বিতীয় পুত্র সুজাও নাকি এই বাংলার সুবেদারপদে নিযুক্ত হওয়ায় নিজেকে একদিন ধন্য মনে করিয়াছিলেন।

আওরঙ্গজেব দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিয়া পৌত্র আজিমওশানকে। বাংলা শাসনের ভার দেন।

মহম্মদ দাসী যখন বঙ্গের দেওয়ানী প্রাপ্ত হন, নবাব আজিমওশান তখন বাংলা, বেহার, উড়িষ্যার সুবেদার।

বাংলার রাজস্ব আদায়ের ভার প্রাপ্ত হইয়া কয়তলব খাঁ অধিকতর তৎপরতার সঙ্গে কার্য আরম্ভ করেন, কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াই কানুনগো* দর্পনারায়ণ ও জমিদারের নিকট হইতে জমিদারীর সমস্ত কাগজপত্র তলব করেন; বাংলার আয়-ব্যয়ের বিষয় বিশেষভাবে তত্ত্বাবধানের পর কয়তলব খাঁ দেখিলেন, এখানকার প্রাপ্য রাজস্বের অধিকাংশই সম্রাটের

---

* নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর চরিত্রাবলি সম্বন্ধে কোন সঠিক প্রমাণ পাওয়া যায় না।

আজিমওশান—সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র কামবক্স শাসন কর্তা শাহজাদার দ্বিতীয় পুত্র।

* কানুনগো কাজ—জমীর পরিমাণ, চতুর্দ্দ, নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব আবওয়াব এবং খাস, নাধরাজ, আয়মীর প্রভৃতি জমীর সীমা সম্বন্ধীয় কাগজপত্র আদায় অনাদায় প্রভৃতি ঠিক রাখা।

উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা নিজ বিলাসিতা ও অযথা কার্যে ব্যয় করেন এবং জমিদারের প্রাপ্য উপযুক্তরূপ খাজনা তাঁহারা দেন না, কাজেই সম্রাটের নিকট বাংলার রাজস্ব পাঠান হয় অতি অল্পপরিমাণ। নানা প্রকার বিবেচনার পর কয়তলব খাঁ পূর্বতন অধিকাংশ কর্মচারীদের পদচ্যুত করিয়া সেই সকল স্থানে নিজের বিশ্বাসী তহশীলদার প্রভৃতি নিযুক্ত করেন। ক্রমে বাদশাহের নিকট হইতে অনুমতি আনিয়া বাংলার বাবতীয় জায়গীর পুনঃ গ্রহণ করেন এবং সেই সকল জমীর নূতন বন্দোবস্ত করিয়া জমিদারদের খাজনা বৃদ্ধি করেন।

ইতিপূর্বে দেওয়ানদের সময় যে বাংলা অতি অসুবিধার ও অস্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া সম্রাটের বিদিত ছিল, সামান্য কিছুদিন দেওয়ানী কার্যপরিচালনার পরই তিনি সেই বাংলা দেশ হইতে বৎসরে এক কোটী টাকা রাজস্ব সম্রাটসমীপে পাঠাইতে সুরু করেন। দেওয়ানজীর এই কৃতিত্ব দর্শনে সম্রাট্ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বঙ্গের রাজস্ব আদায়ের সম্পূর্ণ ভার ও তাঁহার উপর অর্পণ করেন। কয়তলব খাঁ এরূপ ক্ষমতা প্রাপ্ত হন যে, নিজ বেতন ব্যতিরেকে নবাব নাজিম পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট এক কপর্দ্দকও দাবী করিতে পারিবেন না। রাজকার্য্য বিষয়ে অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হইলে উভয়ের পরামর্শে খরচ করা হইবে।

দেওয়ানের কর্মদক্ষতা সম্রাটকে এরূপ করতলগত করায়, বিশেষতঃ নবাবের বিশেষ বিশেষ কার্যে সামান্য একজন কর্মচারীর কর্তৃত্ব থাকা সম্রাটসৌধ সাহজাদা ওয়ানের পক্ষে বড়ই লজ্জাকর বিবেচিত হয়। অবশেষে নবাব ওয়ান এই অপমানের হাত হইতে পরিত্রাণের নিমিত্ত গোপনে দেওয়ানের প্রতি শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হন। ক্রমে ওয়ানের পক্ষে এক বিশেষ সুযোগ উপস্থিত হয়। আব্দুল ওয়াহেব নামে সম্রাটের বঙ্গদেশবাসী একজন নগণ্য সৈন্যের সেনাপতির সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া দেওয়ান হাজীকে সেই শত্রুর কৃপাণে শমনভবনে পাঠাইতে নবাব সচেষ্ট হন। এই ভীষণ ষড়যন্ত্রজাল বিস্তৃত হওয়ার কিছুদিন পরে, একদিন দেওয়ানের নবাবসকাশে গমনকালে পথিমধ্যে আব্দুল ওয়াহেব সদলবলে দেওয়ানকে আক্রমণ করে, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে অনুচর-পরিবেষ্টিত থাকায় তিনি সেদিন শত্রুর কবল হইতে নিষ্কৃতি পান। অতিবিলম্বে আজিম ওয়ানের এই চক্রান্তের কথা দেওয়ানের কর্ণগোচর হইতে বাকি থাকিল না। দেওয়ান অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া নবাবকে তাঁর অবিমৃষ্যকারিতার জন্য যৎপরোনাস্তি কটুবাক্যে অপমানিত করিলেন। কিন্তু ইহাতেও যেন তিনি শান্ত হইতে পারিলেন না, পরে উপরোক্ত ঘটনার সকল বিবরণগুলি একত্র লিপিবদ্ধ করিয়া কয়েকজন প্রধান কর্মচারীর স্বাক্ষরসহ দিল্লীশ্বরের নিকট প্রেরণ করেন, এবং সম্রাটের কাছে আবেদন জানান, এই অবস্থায় সাহজাদার সঙ্গে কাজ করা তাঁর পক্ষে অতীব দুরূহ ব্যাপার এবং উক্ত পত্রেই তিনি ঢাকা হইতে মুর্শিদাবাদে দেওয়ানী কার্যালয় স্থানান্তরের অনুমতি প্রার্থনা করেন।

মুর্শিদ-পত্নী জেবুন্নেসা বেগমের সমাধি [লেখক

বলা নিষ্প্রয়োজন, প্রিয় কয়তলব খাঁর পত্র পাওয়া মাত্র সম্রাট্ আওরঙ্গজেব নবাব ওয়ানকে মুহূর্তমাত্র কাল বিলম্ব না করিয়া বাংলায় মাথা কাটাইয়া যেকোরে রাজধানী স্থাপনের আদেশ দেন। ওয়ান প্রথমে রাজমহল এবং পরে পাটনায় রাজধানী স্থাপন করেন।

বিশেষ কয়েকটি সুবিধার জন্য কয়তলব খাঁ হাজী বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া মুখসুদাবাদেই দেওয়ানখানা নির্মাণের উপযুক্ত স্থান বিবেচনা করেন, কারণ—প্রথমতঃ

জায়গাটি অতি স্বাস্থ্যকর, দ্বিতীয়তঃ কলনাদ-মুখরিতা স্নিগ্ধ-সলিলা ভাগীরথীর মনোমুগ্ধকর নৃত্যভঙ্গী, তৃতীয়তঃ বঙ্গপ্রদেশের মধ্যস্থলে ও বেহার-উড়িষ্যার অতি নিকটে, চতুর্থতঃ মুখ্-সুদাবাদ বঙ্গের একটি বিশিষ্ট বাণিজ্যস্থান—অধিকন্তু ইহার অন্তর্গত কাশীমবাজার য়ুরোপীয় বণিকদের একটি প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র, পঞ্চমতঃ ঐ সব য়ুরোপীয় বণিকেরা কাশীম-বাজারে বাণিজ্যকুঠি নির্ম্মাণ করায় তাহাদের গতিবিধির তত্ত্বাবধান প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছিল।

মুখসুদাবাদে আগমন

সম্রাটের অনুমতিপত্রের জন্য আবেদন করিয়া করতলব খাঁ, কাননগো, মাণিক চাঁদ * ও রাজস্ববিভাগের অন্যান্য কর্ম্মচারীদের সঙ্গে লইয়া ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে মুখসুদাবাদের কুলেরিয়াতে † আসিয়া উপস্থিত হন। পরে এই পরিত মৌজায় মহলসরা ও দেওয়ানখানা প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া স্বাধীনভাবে ও নিরুপদ্রবে দেওয়ানী কার্য্য পরিচালনায় মন দেন।

মুর্শিদাবাদ :—আদি ইতিহাস—খৃষ্টজন্মের ৪৫৯ বৎসর পূর্ব্বে বুদ্ধের দেহত্যাগের কিছু দিন পরে যখন ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিশেষ প্রচারকার্য্য সুরু হয়, সেই সময়ের ইতিহাস হইতে মুর্শিদাবাদের স্থাপিত্বের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। ইহার পর হিউয়েনসাঙের সময়ে ইহার পরিচয়টা কিঞ্চিৎ স্পষ্ট হইয়া উঠে, ইহা ছাড়া মুর্শিদাবাদের বিশেষ কিছু পূর্ব্ব পরিচয় নাই।

একালের ইতিহাস—খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে গৌড়েশ্বর হোসেনসাহের রাজত্বকালে ভাগীরথীর উত্তর তটভূমি গভীর অরণ্যে পরিপূর্ণ ছিল। সেই সময় মুকুন্দরনদা নামে জনৈক নানকপন্থী সাধু বাদসা হোসেন সাহকে কোন কঠিন পীড়ার হাত হইতে রক্ষা করায় এই স্থান জাথরাজ রূপে প্রাপ্ত হন। পরে এই দেশে আসিয়া ভাগীরথীর পূর্ব্ব তটভূমির কিয়ৎ পরিমাণ জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া নির্জ্জনে ভগবৎ-চিন্তার অভি-প্রায়ে এই জনবিরল স্থানে এক আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। ক্রমে বাদসা হোসেনের অনুকূলে উত্তরকালে এই সাধুর আশ্রম একটি সুন্দর পল্লীতে পরিবর্ত্তিত হয়, সেই নানকপন্থী সাধুর নামানুসারেই প্রথমে মুর্শিদাবাদের নাম হয় 'মুকসুদাবাদ'। তাহার পর আজ হইতে প্রায় সাড়ে চারি শত বছর আগে মুরশুদ আলী খাঁ নামে চুলখালির এক জমিদার 'মুকসুদাবাদ'-নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া স্বীয় নামানুযায়ী এই স্থানের নাম রাখেন 'মুখসুদাবাদ'; কিন্তু আবার—মুর্শিদকুলী খাঁ আসিয়া এ নামেরও ধ্বংস সাধন করিয়া নিজ নামের বৈশিষ্ট্যকল্পে "মুর্শিদাবাদ" নামের সৃষ্টি করেন। তদবধি এই স্থান আজও মুর্শিদাবাদ নামেই পরিচিত।

বৎসরকাল মুখসুদাবাদে বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে কার্য্য পরিচালনা করিয়া বঙ্গরাজস্বের বর্দ্ধিত আয় সম্রাটকে দেখাইবার অভিপ্রায়ে জমিদারীর প্রয়োজনীয় হিসাবপত্র সঙ্গে লইয়া বৎসরান্তে দেওয়ানজী দাক্ষিণাত্যে সম্রাট্‌শিবিরে উপস্থিত হন, কিন্তু দাক্ষিণাত্যে যাওয়ার অব্যবহিত পূর্ব্বেই কাগজপত্র স্বাক্ষর করা লইয়া কাননগো দর্পনারায়ণের সঙ্গে করতলব খাঁকে কিঞ্চিৎ বেগ পাইতে হইয়াছিল।

দাক্ষিণাত্যে বাদসাহশিবিরে উপস্থিত হইয়া তিনি দিল্লীশ্বরের সন্তোষবিধানার্থ বহু অর্থ এবং নানা প্রকার উপঢৌকনাদি সেলামি দেন,—(১) দুশ' গো-যান, তিনশ' অশ্বারোহী, পাঁচ শ' পদাতিক এবং একজন দারোগার অধীনে আনীত এক কোটি তিরিশ লক্ষ টাকা, (২) জায়গীর ও খালসবিশীর টাকা স্বতন্ত্রভাবে, (৩) হাতী, (৪) ঘোড়ার টাঙা, (৫) তুর্ক (একজাতীয় পার্ব্বত্য অশ্ব), (৬) মহিষ, (৭) হরিণ, (৮) বাজপাখী, (৯) সম্রাটের ব্যবহার্য্য চাকাই মসলিন, (১০) গণ্ডারচর্ম্মের ঢাল, (১১) স্বর্ণ ও গজদন্তে প্রস্তুত শ্রীযষ্টি ও মুর্শিদাবাদের পাটী, (১২) মৃগনাভি, (১৩) আলাখী কাপড় (এণ্ডী), (১৪) তরবারির ফলক প্রভৃতি। এ ছাড়া তিনি সম্রাটের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীদের অনেক মূল্যবান্ দ্রব্যাদিও উপহার দেন।

নায়েব নাজিমী

দেওয়ানজীর হিসাবপত্রে মুগ্ধ হইয়া সম্রাট্ তাঁহাকে (করতলব খাঁকে) মুর্শিদকুলী মতিমনউদ্দৌলা আলাউদ্দৌলা

---

* জগৎশেঠ বংশের আদি পুরুষ। এঁর পিতা হীরানন্দ সাহোরেরীর কারবার ছিল। বাণিজ্যের মুর্শিদের প্রিয় পাত্র ছিলেন। মুর্শিদাবাদের ধনীপুরে সরার পুরু টাঁরে জগৎশেঠের আদি আবাসস্থানের ভগ্নাবশেষ এখনও দৃষ্ট হয়।

† নবাব কয়াবুল্লা নির্ম্মিত বর্ত্তমান কাছারি বাড়ীর দেউড়ী আসান মুর্শিদাবাদের যে স্থানে অবস্থিত, এই স্থানটি না কি পূর্ব্বে কুলেরিয়া নাম ধারণ করিত।

জাফর খাঁ নাসিরী নাসিরজঙ্গ আখ্যা প্রদান করিয়া বাংলা বেহার, উড়িষ্যার নায়েব নাজিম পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহা ছাড়া নিজ (সম্রাটের) সন্তোষের চিহ্নস্বরূপ দেওয়ানজীকে একটি মূল্যবান্ পোষাক, এক জোড়া নাগরা, একখানি তরবারি, একটি ঢালতরা ও একখানি বিজয়কেতন উপহার দেন।

দাক্ষিণাত্য হইতে ফিরিয়া মুর্শিদকুলী মুখসুদাবাদ নাম উচ্ছেদ করিয়া নিজ নামানুসারে "মুর্শিদাবাদে" পরিবর্ত্তিত করেন। এইবার তিনি নিজ বাসভবন নির্ম্মাণে ও মুর্শিদাবাদের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে মনোযোগ দেন; কুলোরিয়াতে ভাগীরথীর কোলে কারুকার্য্যশোভিত চত্বারিংশৎ স্তম্ভসমন্বিত সুরম্য "চেহেল সেতুন"* প্রাসাদ নির্ম্মিত হয়, তন্নিকটে টাঁকশাল† ও অন্যান্য দপ্তরখানা নির্ম্মিত হয়, গভীর জঙ্গলাকীর্ণ মুর্শিদাবাদ ক্রমে ভাগীরথীর উভয় পার্শ্বকে পরিব্যাপ্ত করিয়া অসংখ্য সৌধমালায় বিভূষিত হইয়া এক অতি সুদৃশ্য মহানগরীতে পরিণত হয়। তখন সহরে সীমানা হয় প্রায় চার ক্রোশ, ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরে উত্তরে বর্ত্তমান সাধক বাগ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে মতিঝিল পর্য্যন্ত এবং পশ্চিম তটভূমিতে দক্ষিণে খোসবাগ (এই স্থানে নবাব আলীবর্দ্দী খাঁ, নবাব সিরাজদ্দৌলাহ ও তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী লুৎফুন্নেসার সমাধি-ভবন আজিও দৃষ্ট হয়) হইতে উত্তরে বড়নগর পর্য্যন্ত।

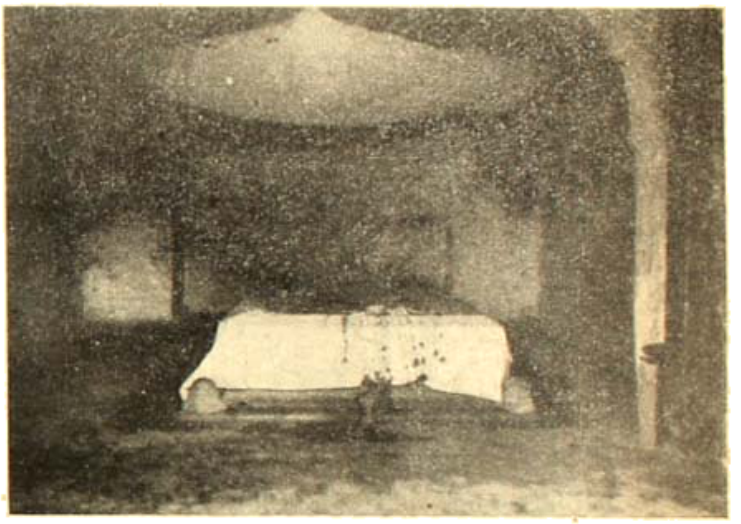

নবাব মুর্শিকুলী খাঁর সমাধি

ইংরেজ কোম্পানীর মুর্শিদের নিকট হইতে বাণিজ্যাধিকার প্রাপ্তি

মুখসুদাবাদে আত্মপ্রকাশের অব্যবহিত পরেই করতলব খাঁ ইংরেজ কোম্পানীর নিকটে বাণিজ্য-শুল্ক ‡ হিসাবে কুড়ি হাজার টাকা দাবী করেন। অতঃপর ১৭০০ খৃষ্টাব্দে বিনা শুল্কে নবাব ওসমানের নিকট হইতে বাণিজ্যাদেশ প্রাপ্ত হওয়ায় সময় ইংরাজেরা দেওয়ানের দাবীপূরণে অস্বীকৃত হয়, ফলে দেওয়ান অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া য়ুরোপীয় সমস্ত কোম্পানীর নিকট হইতে পূর্ব্বপ্রদত্ত বাণিজ্য ও বাণিজ্যনিশান তলব করেন। ওলন্দাজ ও ফরাসীরা সাহ সুজার নিকট হইতে প্রাপ্ত নিশান দেওয়ানজীর সম্মুখে হাজির করেন। ইংরাজরা নিশান উপস্থিত করিতে অক্ষম হইয়া নানা কৌশলে দেওয়ানের কর্ম্মচারীদের সন্তুষ্ট করিয়া যদিও কোন রকমে তাঁহার কোপদৃষ্টি এড়াইতে নিষ্কৃতি পান, কিন্তু তথাপি দেওয়ানজীর অসন্তোষভাজন হওয়ায় তাঁহাদের বাণিজ্যে বিশেষ ক্ষতি হয়। পরে ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ কোম্পানীর অধিনায়কেরা দেওয়ান মুর্শিদকুলী খাঁর নিকট হইতে সনন্দ লাভের বিশেষ চেষ্টা করেন। এই সময় মুর্শিদকুলী খাঁ ওলন্দাজদের নিকট হইতে ত্রিশ হাজার টাকা প্রাপ্ত হন। ইংরাজেরা প্রথম হইতেই দেওয়ানের দাবী অনুযায়ী টাকা দিতে অসম্মত। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদ ইংরেজদের জানাইলেন যে ২৫ হাজার টাকা পাইলেই তিনি উক্ত কোম্পানীকে অবাধ বাণিজ্যের অনুমতি দিবেন। কোম্পানী সম্মত হইয়া কীক ও বয়ডেন সাহেবকে সেই টাকা দিয়া কলিকাতা হইতে কাশিমবাজার কুঠিতে পাঠাইলেন, কিন্তু সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া কোম্পানী উক্ত কর্ম্মচারীদ্বয়কে প্রত্যাগমনের আদেশ দেন।

* ৩৮ টি বৃহদাকার থামে সুশোভিত ছিল বলিয়া ইহার নাম 'চেহেল সেতুন'। এই প্রাসাদের বর্ত্তমানে চিহ্ন মাত্রও নাই, তবে শোনা যায় ইহা বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদ কেল্লার সীমানার মধ্যেই অবস্থিত ছিল।

† টাকা থেকে আরম্ভ যাড়োয়ারী মহাজন মাণিক চাঁদের পরামর্শে এই টাঁকশাল নির্ম্মিত হয়, মহিলাসুরের পরামর্শে ভাগীরথীর পশ্চিম কূলে টাঁকশাল নির্ম্মিত হয় ও মাণিক চাঁদ তার জায়গীর প্রাপ্ত হন।

‡ ইংরেজ কোম্পানী প্রধানতঃ লোহা, লবণ, রেশম, নীল প্রভৃতি বস্তুর বাণিজ্য করিতেন।

সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর ইংরাজেরা কলিকাতার "ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ"* বিশেষ ভাবে সুদৃঢ় করিতে তৎপর হন, কিন্তু কিছুদিন পরেই খবর পান, নবীন সম্রাট বাহাদুর শাহ (শাহ-আলম) মুর্শিদকুলী খাঁকেই পূর্ণপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই সংবাদে ইংরাজেরা কিঞ্চিৎ ভীত হন; অতঃপর কুড়ি হাজার টাকা দিবার মনস্থ করিয়া উকিল শিবচরণকে মুর্শিদ-সকাশে প্রেরণ করেন। শিবচরণ কোম্পানীর পক্ষ হইতে ৩৮ হাজার টাকা দিতে অঙ্গীকৃত হইয়া কোম্পানীর নিকট খবর পাঠান। উকিলের যথেচ্ছাচারে কোম্পানী ক্রুদ্ধ হইয়া ফরল মহম্মদকে সঠিক সংবাদ আনিবার জন্য পাঠান। ফরল প্রত্যাবৃত্ত হইয়া জানান, "দেওয়ান ৫০ হাজার টাকার দাবী করেন, এ ছাড়াও সুরাটের জন্য এক লক্ষ টাকা দাবী করেন।"

মাঝে ১৭০৯ সালে বিশেষ কারণে মুর্শিদকে দিল্লী যাইতে হওয়ায় কোম্পানীর কিছুদিনের জন্য বাণিজ্যে বিশেষ সুবিধা হয়। দিল্লীর ভাণ্ডারের দারোগা করতলব উপকূলের সেনাপতি জিয়াউদ্দিন খাঁ হুগলীতে আসায় তাঁহাকে লইয়া ভারতীয় বাণিজ্যে ইংরাজদের একচেটিয়া সুযোগ ঘটিয়াছিল। ১৭১০ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদকুলী খাঁ মুর্শিদাবাদে প্রত্যাবৃত্ত হন। রবার্ট হেজেস এ সময় কাশীম বাজার ইংরাজ কুঠির অধ্যক্ষ। যদিও মুর্শিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তিনি বিশেষ সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই, তথাপি নবাব ওয়ানকে করায়ত্ত করিবার তিনি কিঞ্চিৎ সুযোগ পাইয়াছিলেন। মুর্শিদ ইহাতে দৃক্‌পাতও করেন নাই, তিনি কোম্পানীকে স্পষ্ট জানান, যদি তাঁহারা সাহজাদা আজীম ওয়ানকে ৪৫ হাজার টাকা এবং তাঁহাকে ১৫ হাজার টাকা না দেন, তাহা হইলে তাঁহারা (ইংরেজরা) কোন প্রকারেই সনন্দ পাইবেন না। কোম্পানী আজীম ওয়ানের সাহায্যে অনুগ্রহভাজন হওয়ায় দেওয়ানকে তয়প্রদর্শন করেন। দেওয়ান পরোক্ষ ভাবে ইংরাজদের ক্ষতি করেন; অতঃপর ১৭১১ খৃষ্টাব্দে হুগলী বন্দর প্রভৃতি দেওয়ানের হস্তগত হওয়ায় বাধ্য হইয়া দেওয়ানজীর দেয়ের দাবী অনুযায়ী অক্টোবর মাসে কোম্পানী মুর্শিদকুলী খাঁর ছাড়পত্রের জন্য ৩০ হাজার টাকা এবং ফারমানের জন্য সাতে বাইশ হাজার টাকা (নিজা) মুর্শিদকে দিয়া কোন রকমে বাণিজ্যাদেশ প্রাপ্ত হন।

১৭০৭ খৃষ্টাব্দে সম্রাট আওরঙ্গজেব ইহধাম পরিত্যাগ করেন। পিতার সিংহাসন (ময়ূর সিংহাসন?) লইয়া পুত্রদের মধ্যে বিশেষ গোলযোগ উপস্থিত হয়। পরলোকগত সম্রাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহআলম (বাহাদুর শাহ) স্বীয় পুত্র আজীম ওয়ানের বিশেষ সাহায্য লাভ করায় ঐ বৎসর জুন মাসে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিতে সক্ষম হন। বাহাদুর শাহের সিংহাসনপ্রাপ্তির পর বিদ্রোহদমনের নিমিত্ত রাজসাজারা ওয়ানকে পিতার নিকট কিছুদিনের জন্য অবস্থান করিতে হয়। এই সময় ওয়ান সম্রাটের আদেশ লইয়া ফরকসেয়রকে নাম মাত্র প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া মুর্শিদকুলী খাঁকে বাংলা, উড়িষ্যার নায়েব নাজিম ও বাংলা, বেহার, উড়িষ্যার দেওয়ান পদে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং সৈয়দ হোসেন খাঁকে বেহারের এবং সৈয়দ আবদুল্লাকে এলাহাবাদের নায়েব নাজিমী দিয়া যান। বাহাদুর শাহকে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিতে সাহায্য করার পুরস্কারস্বরূপ ওয়ান এলাহাবাদেরও শাসনভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

স্বাধীনতা

নবাব ওয়ানের বেহার পরিত্যাগের পর ফরকসেয়রকে বিশেষ আমল না দিয়া মুর্শিদকুলী খাঁ নাজিমী ও দেওয়ানী উভয় কাজই নিজহস্তে গ্রহণ করেন। এই সময় তিনি মেদিনীপুরকে উড়িষ্যা হইতে বাঙ্গালার অন্তর্ভুক্ত করেন; মুর্শিদাবাদ টাঁকশালের মুদ্রিত টাকাতে মুর্শিদাবাদ ছাপ দিতে আরম্ভ করেন এবং যেজ্জার কৃপতি রায়কে কোষাধ্যক্ষ ও কিশোরী রায়কে মুন্সীর (Private Secretary) পদ প্রদান করেন। রায়েরা উভয়েই ব্রাহ্মণ। স্বাধীন কার্য পরিচালনার সুযোগ ঘটায় মুর্শিদ এক্রাম খাঁকে বাঙ্গালার এবং জামাতা সুজাউদ্দিনকে (হায়দ্রাবাদের দেওয়ানী প্রাপ্ত হওয়ার

* ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা এবং অন্যান্য স্থানের ইংরেজ কুঠির চতুঃপার্শ্বে প্রাচীর নির্মিত হয়, পরে ১৭০০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের তৃতীয় রাজা উইলিয়মের নামানুসারে কলিকাতা ইংরেজ কুঠির নাম "ফোর্ট উইলিয়ম" হয় এবং ইহার কলেবর বর্দ্ধিত হয়।

সম্রাট সাজাহান নির্মিত ময়ূর সিংহাসনের মূল্য—প্রসিদ্ধ পর্যটক তাভার্নিয়ের মতে ৯ কোটী ৮০ লক্ষ টাকা।

অব্যবহিত পরেই মুর্শিদ দাক্ষিণাত্যবাসী সুজাউদ্দিনের সহিত কন্যা জিন্নতুন্নেসা বেগমের বিবাহ দেন। উড়িষ্যার নায়েব দেওয়ান ও নায়েব নাজিম নিযুক্ত করেন। ইহার পর বাঙ্গালার জমিদারদের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং তিনি তাঁহাদের নিকট হইতে অধিক রাজস্বের দাবী করিয়া বসেন এবং সেই রাজস্ব প্রাপ্তির জন্য নানারূপ উৎপীড়ন সুরু করেন। প্রায় সকল জমিদারই অম্লানবদনে উৎপীড়ন সহ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু করেন নাই মাত্র দুই জন—আলাগাদ আলাবক্সা বীরভূমের জমিদার আর রাজা কৃষ্ণজীবন সিংহ বিষ্ণুপুরের জমিদার। ধার্ম্মিক নাম আলাবক্সার রক্ষাকবচ হয়, আর বিষ্ণুপুর পরিত্যক্ত হয়, অনুর্ব্বর বলিয়া। মুর্শিদের দেশজয়ের লালসা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায় এবং তিনি একে একে আসাম, কোচবিহার ও ত্রিপুরাকে করতলগত করেন এবং এই তিন রাজ্যের নিকট হইতে বশ্যতা স্বীকারের চিহ্নস্বরূপ বহু উপঢৌকনাদি প্রাপ্ত হন।

১৭১২খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীতে লাহোরে বাহাদুর সাহ মারা যান। আজীম ওখান পিতৃসিংহাসন লাভের মানসে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মৈজুদ্দীনের (জাহান্দার সাহ) সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। ওখান যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। ওখানের মৃত্যুর পর ফরকসের নিজেকে পাটনার সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করেন এবং দিল্লীর সিংহাসন অধিকারে অগ্রসর হন। এই সময় তিনি মুর্শিদকুলী খাঁর সাহায্য চান, কিন্তু মুর্শিদ তাঁহাকে জানান যে, সম্রাট্ জাহান্দার সাহের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। মুর্শিদের এই প্রকার উক্তিতে ফরক অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং মির্জ্জা জাফর ও মির্জ্জা মহম্মদ বেগকে এক দল সৈন্য সহ তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন, মুর্শিদকে বন্দী ও নিহত করিতে আদেশ দেন এবং ইংরাজদেরও কলিকাতা-কুঠীতে আদেশ পাঠান, মির্জ্জাদের সাহায্য করিতে। এ যুদ্ধে রসিদ খাঁ ফরকের পক্ষে নায়ক ছিলেন। মুর্শিদাবাদের তিন ক্রোশ দূরে যুদ্ধ হয়, রসিদ নিহত ও মুর্শিদ জয়ী হন। ফলে মুর্শিদের বিক্রম অধিক মাত্রায় বর্দ্ধিত হয়। যাহা হউক, মুর্শিদের সাহায্য না পাইয়াও বাহাদুর সৈয়দেরা ১৭১৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীতে জাহান্দার সাহকে নিহত করিয়া ফরকসেয়রকে দিল্লীর সিংহাসনে অধিরূঢ় করেন।

নাজিমী

মুর্শিদকুলী খাঁ ছিলেন প্রত্যুৎপন্নমতি ও একান্ত সুবিধাবাদী লোক। ফরকসেয়রকে বারম্বার হইতে দেখিয়াই তিনি তাঁহাকে বহু নজরানার দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া বাংলা উড়িষ্যার সুবেদারী ও ঐ তিন প্রদেশের দেওয়ানী হস্তগত করিয়া ফেলেন। এইরূপে বাংলা, উড়িষ্যার স্বাধীন ভার প্রাপ্ত হইয়া তিনি অমিত বিক্রমে রাজ্যশাসন আরম্ভ করেন। মুর্শিদের অর্থলালসা প্রবলাকার

মুর্শিদ কন্যা জিন্নতুন্নেসা বেগমের সমাধি [ফটো—লেখক

ধারণ করে, জমিদারের প্রতি অতিরিক্ত অত্যাচার সুরু হয়, (মুসলমান ঐতিহাসিকেরা এই অত্যাচারের অতিরঞ্জিত বর্ণনা করিয়া থাকেন)। বাদসাহ হওয়ার কিয়ৎকাল পরে ফরকসের মুর্শিদকে আওরঙ্গজেব-প্রদত্ত নাসিরজঙ্গ উপাধির পরিবর্ত্তে অন্য উপাধি দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু নির্ভীক মুর্শিদ উত্তরে বলেন, "সম্রাট্ আওরঙ্গজেব-প্রদত্ত উপাধি জীবন থাকিতে পরিত্যাগ করিতে পারিব না।"

ক্রমে হস্তগতি মুর্শিদ আপন আত্মীয়-স্বজনকে রাজ্যের বহু প্রধান প্রধান কার্য্যে নিয়োজিত করেন। জামাতা সুজাউদ্দিনকে উড়িষ্যার নায়েব-দেওয়ানীর সঙ্গে নায়েব নাজিমীও প্রদান

করেন। কন্যা জানাতা সৈয়দ রেজাখাঁকে (মুর্শিদ-কৌষিকী নাকিসা বেগমের স্বামী) ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে বাংলার নায়েব দেওয়ানী দেন। রেজাখাঁর মৃত্যুর পর কৌষিক মিজা আসান মাতামহের আনুকূল্যে ঐ পদ ও সংজ্ঞাদ্বয় উপাধি প্রাপ্ত হন এবং চুনখালির সমস্ত জমিদারী আসাদনগর নামে মাতামহের নিকট হইতে লাভ করেন। মুর্শিদ দ্বিতীয় কৌষিকীপতি সুজাউল্লাকে ঢাকার নায়েব-নাজিমী প্রদান করেন। মুর্শিদের প্রিয়পাত্র নাজির আহম্মদ নবাব সৈন্যের এক প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হন। নাজির আহম্মদ ও রেজাখাঁ সুবর্ণ সুযোগ বুঝিয়া জমিদারদের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার সুরু করেন। যে সকল জমিদারেরা সময় মত নবাবের খাজনা দিতে অক্ষমতা প্রকাশ করিতেন, তাঁহাদিগকে তাঁহারা বন্দী করিতেন। বন্দী অবস্থায় আহারে অভক্ষ্য দেওয়া, বৃশ্চিকের দ্বারা প্রহার করা, তেকাঠির পা বাঁধিয়া ঝুলাইয়া রাখা, গরম পানিতে জামার ভিতর বরফের জল ঢালিয়া দেওয়া, টিলে পায়জামার ভিতর বিড়াল ছাড়িয়া দেওয়া, রৌদ্রের নিদারুণ মাঠের মধ্যে বাঁধিয়া রাখিয়া শাস্তি প্রদান করা আরম্ভ হয়। ইহাতেও ইঁহারা খুসী হইতেন না, প্রকাশ জমিদারদের মধ্যে যাঁহারা অধিক অপরাধী বিবেচিত হইতেন, তাঁহাদের বিষ্ঠা-পরিপূর্ণ গর্ত্তে নামাইয়া দিয়ে 'বৈকুণ্ঠ' দর্শন করান হইত। কোন কোন মুসলমান ঐতিহাসিক বলেন, তখন এই প্রকার চীন কায় হইত সত্য, কিন্তু নবাবের অজ্ঞাতে। এই উক্তি সত্য বলিয়াই মনে হয়। কারণ মুর্শিদের সময় চরিত্র পর্য্যালোচনায় আমরা যাহা পাইয়া থাকি, তাহাতে তিনি রাজস্ব আদায় বিষয়ে বিশেষ কঠোর হইলেও কদাচারী ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয় না।

বিদ্রোহ

মুর্শিদের কঠোর নীতি সব জমিদারই যে অনুমোদন করিয়াছিলেন, তাহা নহে। ভূষণা পরগণা ও মহম্মদপুরের স্বাধীন ভূপতি রাজা সীতারাম রায় (উত্তররাঢ়ী কায়স্থ) আর রাজা উদয়নারায়ণ (রাঢ়ীশ্রেণী ব্রাহ্মণ) মুর্শিদকুলী খাঁর শাসন কিছুতেই মানিয়া লন নাই। রাজা উদয়নারায়ণের জমিদারী ছিল রাজসাহী পরগণা (সাঁওতাল পরগণা—বীরভূম-রাজসাহী ও মুর্শিদাবাদের কতকাংশ লইয়া) এবং তাঁহার রাজধানী ছিল মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত বড় নগর*। রাজা সীতারাম এবং উদয়নারায়ণের এই মুর্শিদাবাদেই জন্ম হয়।

রাজা সীতারাম—নবাব মুর্শিদ সীতারামের ঐশ্বর্য্যে ঈর্ষান্বিত হইয়া ভূষণার ফৌজদার আবুতোরাপকে স্বাধীনতা প্রয়াসী সীতারামের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। আবুতোরাপ পরাজিত ও নিহত হন। দ্বিতীয় যুদ্ধে সেনাপতি হসনআলি ও সীতারামের নিকট পরাস্ত হইয়া পলায়ন করেন। তৃতীয় বারে নবাব রঘুরামকে (বর্ত্তমান দিঘাপতিয়া-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা) এবং দুপর সেনাপতি সিংহরামকে সৈন্যসহ সীতারামের বিনাশার্থ প্রেরণ করেন। মহম্মদপুরে (যশোহর ও ফরিদপুর জেলার সীমান্তে) উভয়দলে তুমুল সংঘর্ষ হয়। সীতারাম পরাজিত ও বন্দী হন। পরে মুর্শিদাবাদেই ১৭১৯ খৃষ্টাব্দে বন্দী অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

রাজা উদয়নারায়ণ—গোলাম মহম্মদের সাহায্যে রাজা উদয়নারায়ণ অত্যন্ত প্রতাপশালী হইয়া উঠেন। ফলে মুর্শিদ যারপরনাই ক্রুদ্ধ হইয়া উদয়নারায়ণের দমনার্থ রঘুনন্দনকে (বর্ত্তমান নাটোর রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ) সৈন্যসহ প্রেরণ করেন। সাঁওতাল পরগণার অন্তঃপাতী উদয়নারায়ণের বীরকীর্ত্তি স্মরণে উভয় পক্ষে সংগ্রাম সুরু হয়। উদয়নারায়ণের মিত্র গোলাম মহম্মদ ও পুত্র দাহেবরাম সৈন্যসহ নবাবসৈন্যকে বাধা দেন। যুদ্ধে গোলাম মহম্মদ নিহত হন, উদয়নারায়ণ পলায়ন করেন। অতঃপর বন্দী অবস্থায় মুর্শিদাবাদের কারাগারেই ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রাণবিয়োগ ঘটে। উদয়নারায়ণের মৃত্যুর পর রঘুনন্দনের ভ্রাতা রামজীবন রাজসাহী পরগণা প্রাপ্ত হন।

রঘুনন্দনের কর্ম্মদক্ষতায় মুর্শিদকুলী খাঁ সন্তুষ্ট হইয়া ঐ বংশের অনেককেই নবাব সরকারের উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। শেষ পর্য্যন্ত তিনি রঘুনন্দনকে বঙ্গের বহু জমিদারী প্রদান করেন। উত্তরকালে এই বংশ বাঙ্গালার জমিদারদের ভিতর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হয়। মুর্শিদকুলী খাঁর

* মুর্শিদাবাদের [কান্দীর] আট মাইল উত্তরে ময়ূরাক্ষীর পশ্চিম পারে অবস্থিত। রাণী ভবানীর বহু সুন্দর সুন্দর কীর্ত্তি এখনও এখানে দেখা যায়।

† মুর্শিদের জামাতা [সালিকার স্বামী]।

মুর্শিদাবাদে আগমনের কিছুকাল পরে তিনি তদুনন্তনের কর্মকুশলতা দেখিয়া বঙ্গাধিকারী * প্রধান কাননগো স্বর্ণনারায়ণের অধীনে নায়েব-কাননগো মনোনীত করেন।

১৭১৫ খৃষ্টাব্দে কোষাধ্যক্ষ মাণিকচাঁদের কর্মতৎপরতায় মুগ্ধ হইয়া মুর্শিদ বাদসাহের নিকট হইতে তাঁহাকে 'শেঠ' (ধনকুবের) উপাধি ও ফার্মান আনিয়া দেন। মাণিকচাঁদের পুত্রসন্তান না থাকায় মৃত্যুর পর তাঁহার ভাগিনেয় ফতেচাঁদ মাতুলের গদী প্রাপ্ত হন। ইঁহাকেও পূর্বানুরূপ উপায় অবলম্বনের দ্বারা মুর্শিদ শেঠ উপাধিতে ভূষিত করিয়া ফার্মান আনিয়া দেন। পরে এই নবাবের সাহায্যেই শেঠজী বাদসাহের নিকট হইতে বাঙ্গালার পোদ্দারীও লাভ করেন। (শেঠরা মুর্শিদের পরবর্তী নবাবদের রাজত্বকালেও নবাবের কোষাধ্যক্ষ ও টাঁকশালের ভারপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।)

কোম্পানীর সঙ্গে মনোমালিন্য

১৭৭২ খৃষ্টাব্দ হইতেই ইংরাজ কোম্পানীর সঙ্গে মুর্শিদের মনোমালিন্যের সূত্রপাত হয়। বাণিজ্য-সনন্দ তদবধি আপনাদের হস্তগত না হওয়ায় কোম্পানীকে বিশেষ বিপদে পড়িতে হয়। তবুও ছলে বলে কৌশলে ইংরাজেরা তুমীরকে খোঁচা দিতে সুরু করেন। নবাবকে ডিঙ্গাইয়া তাঁহারা বাদসাহকে সন্তুষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হন। জাহাঙ্গীর সাহের পরবর্তী ফরুকসেরকে বাইশ হাজার টাকা এবং কিছু স্বর্ণমুদ্রাদি সেলামি দিয়া তাঁহার (বাদসার) কোপদৃষ্টি হইতে মুক্তি পান। ইংরাজদের নিকট এই সেলামী প্রাপ্ত হওয়ায় ১৭১৬ খৃষ্টাব্দে ফরুকসের কোম্পানীর বাণিজ্যাদেশ "এজলহুকুম" মুর্শিদকে প্রেরণ করেন। বাদসাহের নিকট হইতে উক্ত আদেশ প্রাপ্ত হওয়ার পর ইংরাজদের কূটনীতিতে নবাব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন, ফলে অন্য পথা অবলম্বনে তিনি কোম্পানীর ব্যবসায়ে বিশেষ বাধা প্রদান করেন। এই সময় পুনরায় কোম্পানী সম্রাটসমীপে তিন লক্ষ টাকা উপঢৌকন পাঠান, কিন্তু বিশেষ কোন ফল হয় না। অবশেষে নবাবের দ্বারা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া অন্য কোন উপায় নাই দেখিয়া ১৭১৮ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী মুর্শিদের সন্তোষবিধানার্থ পঁচিশ হাজার টাকা নজরানা দেন। কোম্পানীর নজরানা পাওয়ার পরও নবাব সেই চেষ্টা করেন। কিন্তু এই সময়ে ইংরাজপক্ষে এক সুযোগ উপস্থিত হয়; বাদসার বিশেষ অসুস্থ

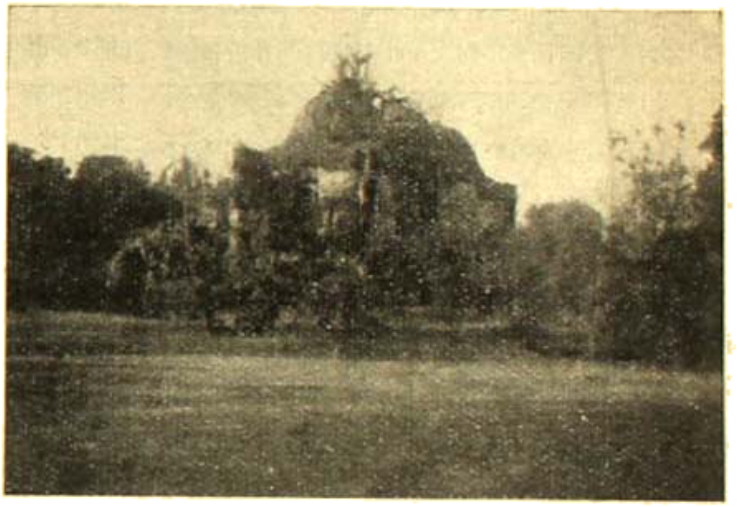

মুর্শিদ-জামোরা নবাব সুজাউদ্দীনের সমাধি [ফটো—লেখক

হইয়া পড়ায় কোম্পানীর ডাক্তার হ্যামিল্টন সাহেবের চিকিৎসার দ্বারা তাঁহার ব্যাধি আরোগ্য হয়। এই সূত্রে ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী বাদসাহী ফার্মান লাভে সমর্থ হন; অগত্যা নবাবকেও বাধ্য হইয়া বিনাশুল্কে ইংরাজ কোম্পানীকে অবাধ বাণিজ্যাদেশ দিতে হয়। বলা বাহুল্য, এই আদেশপ্রাপ্তির পর হইতেই ক্রমে ক্রমে য়ুরোপীয়দের বাণিজ্য এদেশে প্রসার লাভ করে।

মুর্শিদের বন্দোবস্ত

বঙ্গ-মসনদ অধিকারী মুর্শিদকুলী খাঁ ১৭১২ খৃষ্টাব্দে নিজ রাজত্ব বাংলা, বেহার, উড়িষ্যাকে ত্রয়োদশ চাকলায় বিভক্ত করেন;—গঙ্গার পূর্বতীরে ছয়টি, পশ্চিমে পাঁচটি এবং

* বঙ্গাধিকারী—এই পদে পুরুষানুক্রমে বাংলার নবাবসরকারে প্রধান কাননগোর পদে নিযুক্ত থাকায় আলবর বাদসাহের আমল হইতেই নিজেদের কর্মকুশলতার গুণে "বঙ্গাধিকারী" নাম গ্রহণের সামর্থ্য লাভ করেন। মুর্শিদাবাদের (লালবাগের) পরপারে ভাগীরথীর পশ্চিম তটভূমিতে ডাহাপাড়ার (চাকাপাড়ার) এখনও বঙ্গাধিকারী পরিবারের বসতি ও সেই আমলের পুরাতন বাড়ীগুলির ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, তবে এই পরিবারের অবস্থা পূর্বাপেক্ষা অনেক হীন হইয়া পড়িয়াছে।

উড়িষ্যার চাকলা। মুর্শিদাবাদ এই তেরটির মধ্যে অন্যতম। ইহা ছাড়া ইনি বঙ্গদেশ হইতে আরও কতকগুলি আয়তনে অংশ বাছিয়া লইয়া নিয়মিতরূপে রাজস্ব আদায়ের জন্য রাজসাহী, দিনাজপুর, নদীয়া, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জমিদারী বিভিন্ন জমিদারদের হস্তে প্রদান করেন। এই সময় পরগণার সংখ্যা হয় ১৬৬০টি। উল্লিখিত বৎসরেই নবাব বাংলার রাজস্বের তৃতীয় খতিয়ান প্রস্তুত করেন। নাম হয় "জমাকামেলতুমারী"। ইহার এই খতিয়ান প্রস্তুতে বঙ্গাধিকারী দর্পনারায়ণ (প্রধান কানুনগো) নবাব মুর্শিদকে সাহায্য করেন। কিন্তু বাদসাহের নিকট গমনকালে সেই পূর্ব্বোক্ত কারণবশতঃ মুর্শিদ দর্পনারায়ণের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করিতেন; তাহারই ফলে দর্পনারায়ণের শেষ জীবনে তাঁহাকে বন্দী করেন। বন্দী অবস্থায় দর্পনারায়ণের মৃত্যু হয়। জমাকামেলতুমারীতে বাৎসরিক আদায়ের পরিমাণ হয় ১,৪২,৮৮,০০০৲ টাকা। সংগৃহীত রাজস্বের মধ্যে মাত্র ৩১,০০,০০০৲টাকা বাঙ্গালার জন্য ব্যয় করা হইত, বাকি ১,১১,৮৮,০০০৲ টাকার অধিকাংশই দিল্লীতে সম্রাটের নিকট রাজস্ব হিসাবে পাঠান হইত; খতিয়ান প্রস্তুতে বঙ্গরাজস্বের আয় এগার লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পায়। যদিও মুর্শিদ রাজস্ব আদায়ে জমিদারদের প্রতি বিশেষ কঠোরতা অবলম্বন করিতেন, তথাপি প্রজাশাসনের ভার আংশিক তাঁহাদেরই উপর অর্পণ করেন।

বেহারের সুবেদারী প্রাপ্তি

সম্রাট ফরুকের রাজত্বের শেষ অধ্যায়ে ১৭১৮ খৃষ্টাব্দেই মুর্শিদকুলী বেহারের সুবেদারী প্রাপ্ত হন। এইবার তিনি বঙ্গ, বেহার, উড়িষ্যার একছত্রাধিপতি নাম ধারণ করেন। [১৭১৮ হইতে নবাবী নসরতের গৌরবরবি অস্তমিত হওয়া পর্য্যন্ত (১৭৫৭ সালে পলাশীযুদ্ধে) মুর্শিদ-নির্ম্মিত ইস্পাঞ্জাদিত মুর্শিদাবাদই ছিল বাংলা, বেহার, উড়িষ্যার রাজধানী], ১৭১৯ খৃষ্টাব্দে সম্রাট ফরুকসের নিহত হন, ফরুকের পর রফিউদ্দরজাৎ ও রফিউদ্দৌলা অল্প দিনের জন্য দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছিলেন। বাদসাহদ্বয়ের মৃত্যুর পর ১৭১৯ সালে বাহাদুর সাহের পৌত্র রোসেন আখতার আঠার বৎসর বয়সে মহম্মদশাহ নাম ধারণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। সুচতুর মুর্শিদ পূর্ব্বপ্রথামত তরুণ বাদসাহসমীপে বাংলার রাজস্বের সঙ্গে বহু মূল্যবান্ উপঢৌকনাদি প্রেরণ করিয়া তাঁহার বিশেষ অনুগ্রহভাজন হন এবং সুবেদারীতে পাকা বন্দোবস্ত লাভ করেন।

চরিত্র

নবাব মুর্শিদ বেগম সাহেবা নামে একজাদীকে বিবাহ করিয়া তাঁহাকেই মনে-প্রাণে-ভাল বেসেছিলেন। অন্যান্য নবাবের ন্যায় তাঁহার বহু বেগম ছিল না। খোজাদের তিনি কোন দিন অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশাধিকার দেন নাই। তিনিই ছিলেন একজন চরিত্রবান্, বিদ্যানুরাগী, সত্যনিষ্ঠ, প্রজাবৎসল, ন্যায়পরায়ণ, কর্ম্মদক্ষ, মিতব্যয়ী, গোঁড়া মুসলমান। সাহিত্যে এবং গণিতশাস্ত্রে তাঁর প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল বলিয়া তিনি বহু বিদ্যোৎসাহী গরীব ছাত্রের শিক্ষার বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত সত্যনিষ্ঠ ছিলেন; কখনও কোন কাযে সত্যের অপলাপ করিতেন না। যদিও তিনি রাজস্ব বিষয়ে জমিদারদের বিশেষ উৎপীড়ন করিতেন, তথাপি প্রজাদের অত্যন্ত স্নেহের চক্ষে দেখিতেন; আবার ইহাও দেখা যায় যে, তিনি জমিদারদের নিজ নিজ জমিদারী শাসনের অধিকার দিয়াছিলেন। মুর্শিদকুলী খাঁর রাজত্বসময়ে প্রজা-সাধারণের কোনরূপ অসন্তোষ ছিল না; সে সময় টাকায় চার পাঁচ মন চাউল পাওয়া যাইত। দেশের উৎপন্ন শস্যাদি তিনি কখনও বিদেশে রপ্তানী হইতে দিতেন না। সাধারণ গৃহস্থ নাকি সে সময় মাসিক মাত্র এক টাকা আয়ে বেশ স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিত। তাঁহার ন্যায়ের পূজা দেখিয়া বিস্ময়মুগ্ধ হইতে হয়; তিনি ছিলেন একমাত্র পুত্রের পিতা, কিন্তু সেই পুত্র একটি বিবাহিতা যুবতীর সতীত্ব নষ্ট করায় পক্ষপাতশূন্য নবাব বিচারাসনে অপত্যস্নেহ ভুলিয়া হৃদয়কে বজ্রাদপি কঠোর করিয়া পুত্রের কলঙ্কিত দেহ হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন করিবার আদেশ দিতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই। তাঁহার সুশাসনে দেশে চোরডাকাতের উপদ্রব ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। রাজনৈতিক বিষয়ে দূরদর্শিতা সুচারুরূপে রাজ্যশাসনের একটি প্রধান সম্পদ্। হিন্দুপক্ষ হইতে যাহাতে কোন প্রকার গোলযোগের সৃষ্টি না

হয় এই বিবেচনায় তিনি পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, কর্ম্মপটু হিন্দুদেরও রাজ্যের প্রধান প্রধান কার্য্যে নিয়োজিত করিতেন। দেশশাসনের জন্য অধিক সৈন্য রাখা তিনি প্রয়োজন মনে করিতেন না, এই কারণে সৈন্য বিভাগের ব্যয় তিনি যথেষ্ট হ্রাস করেন। তাঁহার শাসনকালে রাজ্যে মাত্র চারি হাজার পদাতিক ও দুইহাজার অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। বিলাসিতাকে তিনি কোন দিনই বরদাস্ত করিতেন না। স্বধর্ম্মে মুর্শিদের অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল।

চরিত্র সমালোচনা—মুর্শিদকুলী খাঁ নানা সদ্‌গুণে বিভূষিত হইলেও তাঁহার চরিত্রে যে বিন্দুমাত্রও কলঙ্ক ছিল না, তাহা নহে। যদিও তিনি আপনার ভোগ-বিলাসে রাজকোষের এক কপর্দ্দকও খরচ করিতেন না, তথাপি জমিদারদের উৎপীড়ন করিয়া যথাসাধ্য রাজস্ব বা আবওয়াব আদায় করিয়া বঙ্গ অক্ষরের শালসায় দিল্লীশ্বরের চরণ-পূজার কোন দিন ত্রুটি করেন নাই। বঙ্গ মনসবদের অধিকাংশ রাজস্বই নাকি সে সময় বঙ্গাধিপতিকর্ত্তৃক সম্রাটের মনস্তুষ্টির জন্য দিল্লীতে প্রেরিত হইত। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বাংলা হইতে প্রতি বৎসরের সংগৃহীত ১,৪২,৮৮,০০০৲ টাকা আবওয়াবের মাত্র ৫০,০০,০০০৲ টাকা বাংলার জন্য ব্যয় করা হইত, বাকি ১,০২,৮৮,০০০৲ টাকার প্রায় সমস্তই সম্রাটদরবারে প্রেরিত হইত।

আদালত—নবাব মুর্শিদের রাজত্বকালে আদালত ছিল চারশ্রেণীর—নিজামত আদালত (নবাব মুর্শিদ সপ্তাহে দুই দিন মাত্র নিজামত আদালতে বিচারার্থ আসন গ্রহণ করিতেন), দেওয়ানী আদালত, ফৌজী আদালত ও ফৌজদারী আদালত।

সন ১৩৪৬ সাল

—শ্রীমনুজচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী

রবির কিরণ তপ্ত হয়েছে, বর্ষ হইল শেষ
সঙ্গে সঙ্গে হল সমাপ্ত ত্রিপুরীর কংগ্রেস।
ষ্ট্রেচারে করিয়া ফেরে সভাপতি, ষ্ট্রেচারে 'আজাদ' ফেরে
কেহ গেছে এল কলকী—কারেও ঘোমাতেই দিল ফেরে।

হালখাতা নিয়ে মহাজনগুলি হল পাগলের প্রায়
ধন সালিশীর বোর্ডের চালে বাজি মাত হয়ে যায়।
জমিদার আর প্রজার এবং হিন্দু-মুসলমানে
জানিতে জানিতে ধান ক্রমে যাতে শিবের গাজন গানে।

'ইন্‌ক্‌লাব্ ইন্‌ক্‌লাব্' মহারবে শত কম্‌রেড ভূঁইফোড়
ঝাণ্ডা তুলিয়া ঠাণ্ডা হবার করিতেছে তোড়জোড়
নিখিল ভারত মহিলা সমিতি—বিশ্ব-টিশ্ব রবে
বিয়ে-বিচ্ছের বিলের ঘায়ায় এবার মুক্ত হবে।

শুধু হবে নাক' ভারতবর্ষে মিলনের কোনো রীতি
এ নববর্ষে কেবল চলিবে শুধু বিচ্ছেদ-ভীতি
চলিবে চলিবে নবমতবাদ—'মার্কস্', 'নীটশের' বুলি
শুধু হবে নাক' মানুষের সাথে, মানুষের কোলাকুলি!

রাজধর্ম্ম-কৌস্তভের শিক্ষণীয় বিষয়

—শ্রীমতিলাল দাশ

গায়োকোয়াড প্রাচ্যগ্রন্থাবলীতে মহামহোপাধ্যায় কমলাকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ রাজধর্ম্মকৌস্তভ নামক পুস্তক সম্পাদন করিয়াছেন।

বইটি মহারাষ্ট্র দেশীয় স্মার্ত্ত অনন্তদেব বিরচিত এবং সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে লেখা। বইটি চারিটি দীধিতিতে ভাগ করা—শেষ দীধিতিতে প্রজাপালনের কথায় ব্যবহারের কথা বলা হইয়াছে।

আদালত পূর্ব্বমুখী করা হইত এবং ছায়াবৃক্ষ ও জল রাখিবার ব্যবস্থা করা হইত। বৃহস্পতির বচন তোলা হইয়াছে :—

দুর্বলো বৃদ্ধ কৃত্যাস্তলক্ষাধিষ্ঠঃ পৃথক্।
প্রাঙ্মুখি প্রাঙ্মুখী তত্র লক্ষ্যাং কুর্য্যাৎ সভাং।
তত্রাসনমধিষ্ঠায় সংবীতাঙ্গঃ সমাহিতঃ।
প্রণম্য লোকপালেভ্যঃ কার্য্যদর্শনমারভেৎ।

রাজা যদি নিজে বিচার না করেন, তবে অন্য পণ্ডিত ব্রাহ্মণ বিচারক নিযুক্ত করিবেন। বিচারকের বিনীত-বেশভূষণ হওয়া উচিত। বর্ত্তমানে বিচারক ও ব্যবহার-জীবীদের কালো কোট এবং কালো গাউন পরিতে হয় - এই বেশ আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশের স্বাস্থ্যের একান্ত প্রতিকূল, ইহা ভারতীয় রূপসজ্জার দিক্ দিয়াও একান্ত সৌষ্ঠবহীন। আশা করি, বর্ত্তমান স্বাদেশিকতার দিনে আমাদের দেশোপযোগী বিনীত বেশের আয়োজন হইবে।

নালিশ দুই রকম—তত্ত্বাভিযোগ ও শঙ্কাভিযোগ। শঙ্কাভিযোগ তখন হয়, যখন সৎ ব্যক্তি কুলোক হইতে আক্রমণ আশঙ্কায় নালিশ করেন—এবং বাদীর নালিশে তত্ত্বাভিযোগ হয়। তত্ত্বাভিযোগের আবার দুইটি ভাগ—একটি বিধি, অপরটি প্রতিষেধ।

সভাসীন রাজা তখন বাদীকে প্রশ্নাদি করিবেন, তাহার নিয়ম কাত্যায়ন হইতে দিয়াছেন :—

কালে কার্য্যার্থিনঃ পৃষ্ঠ্বং প্রাহঃ পুরঃ স্থিতঃ।
কিং কার্য্যং কা চ তে পীড়া যা তেঽভীষ্টং হি মানব।
কেন কস্মিন্ কথা কস্মাৎ পৃচ্ছ্যমেবং সভাগতঃ।
এবং পৃষ্টঃ স তৎ ব্রূয়াৎ যৎ সত্যোত্তরমেবং সহ।
বিদুষ কার্য্যং জ্ঞাপকেনাবেদ্যার্থমতঃ পরম্।
মুদ্রাং বা নিক্ষিপেত্তস্মিন্ পুরুষং বা সমাদিশেৎ।
অকরণাদ্বিধিং বিদ্যাৎ—ক্রিয়াকুলম্।
কার্য্যাতিপাতি-ব্যসনি-নৃপকার্য্যোপসেবাকুলান্।
মত্তোন্মত্তশ্রমার্ত্তভৃত্যাগারোদরেষু পঃ।
ন যোনপক্ষাং যুবতীং কুলে জাতাং প্রসূতিকাম্।
সর্ব্বধর্ম্মেষু কন্যাং তাং জাতিপ্রকৃতিং স্মৃতাঃ।
তদ্বদ্বীনদুঃখিতং স্ত্রৈণিপো গণিকাদেবা।
নিপুণা যাস্ত পঠিতা'স্তাসামাহ্বানমিষ্যতে॥
কালদেশৌ চ বিজ্ঞায় কার্য্যোপায় বলাবলম্।
অকল্যাদীনপি পরৈঃ পৌরান্ ধনবতঃ পুনঃ।
জ্ঞাত্বাভিযোগং যেঽপি স্যুর্যানযুগ্যাভিযোগিনঃ।
তানপ্যাহ্বাময়েদ্রাজা গুরুকার্য্যেষু গোপনম্।

আবেদক রাজার সম্মুখে প্রণত হইয়া দাঁড়াইত। রাজা প্রশ্ন করিতেন, ভয় নাই, বল তোমার কি কাজ? কে কখন এবং কোথায় তোমাকে পীড়া দিয়াছে? কি উদ্দেশ্যে তোমায় পীড়া দিয়াছে? ইহার উত্তরে আবেদক যাহা বলিত তাহা ন্যায্য কি অন্যায়, তাহা বিবেচনা করিয়া রাজা মুদ্রাঙ্কিত 'সমন' পক্ষকে দিতেন কিংবা রাজপুরুষের দ্বারা সমন জারি করিতেন। বর্ত্তমানে ফরিয়াদী আসিলে একই রূপ হয়। বিচারক অভিযোগ লেখেন, তারপর যদি সত্যতায় বিশ্বাসী হন তবে সমন দিতে পারেন, কিংবা ওয়ারেণ্ট দেন।

কিন্তু যাকে তাকে সমন করা উচিত নয়। তার জন্য বিধান ছিল, রাজা বালক, অসুস্থ ব্যক্তি, স্থবির, দুর্গতি-গ্রস্ত, ধর্ম্মক্রিয়াব্যাপৃত ব্যক্তিকে সমন করিবেন না। যার কার্য্য নষ্ট হয় তাকেও ডাকিবেন না, রাজ-কার্য্য-নিযুক্ত ব্যক্তি, উৎসবকারী, মত্ত, উন্মত্ত, প্রমত্ত, আর্ত্ত, ভৃত্য

দড়ি-বাজী

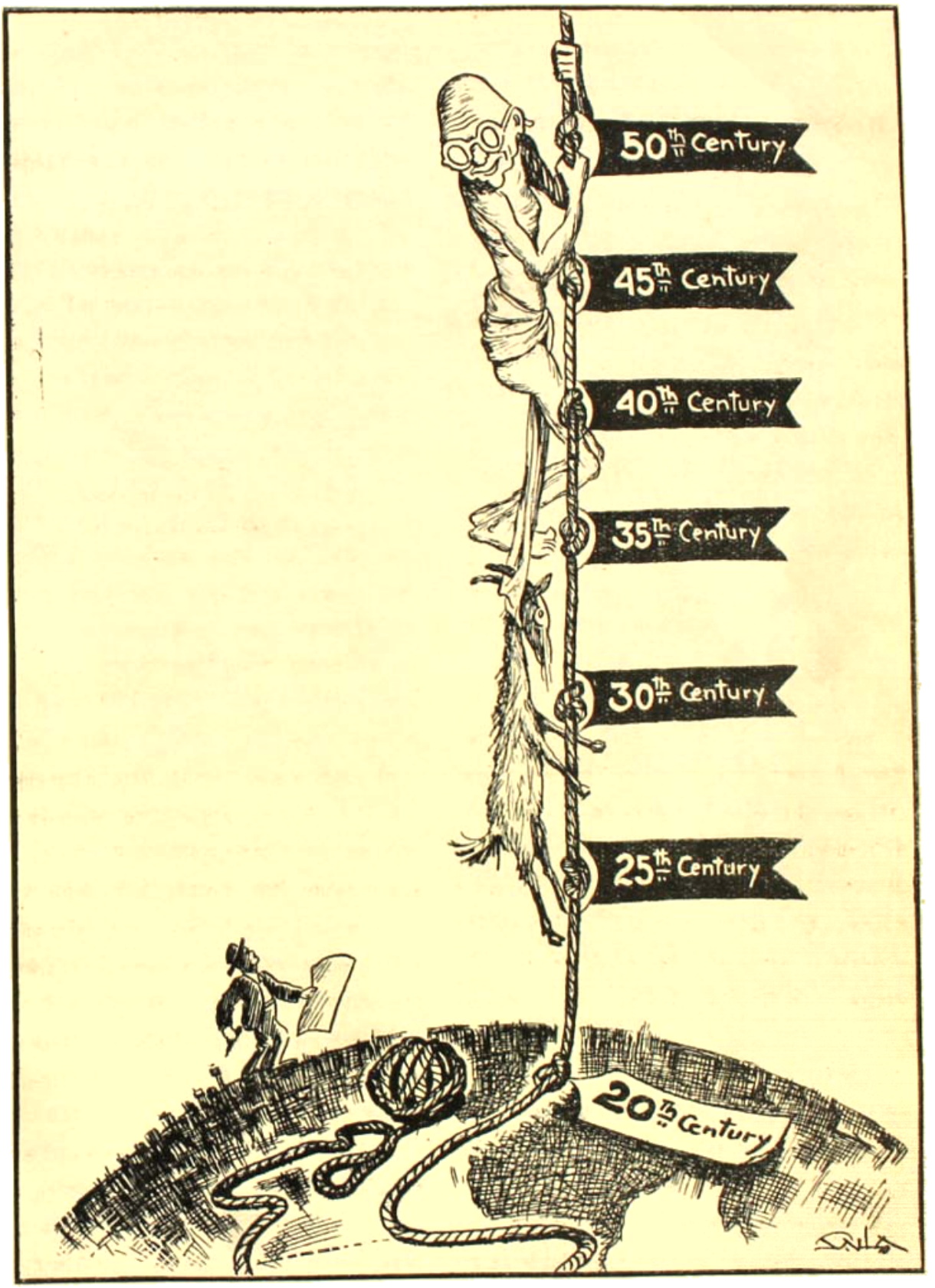

২৫শে মার্চ্চ তারিখে গান্ধীজী নয়া দিল্লীতে জনৈক মার্কিন সাংবাদিককে বলিয়াছেন :—হয়তো আমার যখন জন্মগ্রহণ করা উচিত ছিল, আমি তাহার অনেক পূর্ব্বে জন্মাইয়াছি। আমার চারিদিকে আমি এমন অবস্থা দেখি না, যাহাতে

কিংবা ব্যসনীকে আহ্বান করিবেন না। জ্ঞাতিবন্ধুহীনা স্ত্রী, সম্ভ্রান্তবংশীয়া, প্রসূতি, বর্ণশ্রেষ্ঠের কন্যাকে আহ্বান করিবেন না। মেয়েরা সাধারণত আশ্রিত, সেই জন্য প্রতিপালককে ডাকিলেই চলে। কিন্তু যারা কুটুম্বের অধীন নয়, স্বৈরিণী, গণিকা, হীনকুলজাতা ও পতিতাকে আহ্বান করিবেন।

কিন্তু যদি প্রয়োজন হয়, তবে কাল, দেশ, কার্য্যের বলাবল জানিয়া রাজা উপরের সকলকেই ডাকিবেন। যারা অভিযোগের কথা শুনিয়া বনে প্রব্রজিত হয়, রাজা তাহাদিগকেও সমন করিবেন। বিচারের চারিটি অংশ, পূর্ব্বপক্ষ বা আরজি, প্রতিপক্ষ বা জবাব, সাক্ষ্য, নির্ণয় বা বিচার। বিবাদী আসিলে তাহাকে অভিযোগ শোনান হইত এবং বর্ষ ও মাস ও তারিখ দিয়া বাদীর বর্ণনা বিবাদীর সম্মুখে লেখা হইত।

আরজিতে কাল দিতে কোন্ বর্ষ, কোন্ মাস, কোন্ পক্ষ কোন্ তিথি তাহা দিতে হইত। দেশ, গ্রাম, স্থান, জাতি, আকৃতি, বয়স, প্রভৃতি লিখিতে হইত। সাধ্য, প্রমাণ, দ্রব্য, সংখ্যা রাজার নাম এবং বিবাদীর ঠিকানা দিতে হইত। স্থাবর সম্পত্তির মামলার দশটি জিনিষ থাকাই চাই—সে দশটি :—দেশ, নগরাদি, সন্নিবেশ, জাতি, সংজ্ঞা, নিবাস, ক্ষেত্র ও প্রমাণ, পিতৃ-পিতামহের পরিচয় ও পূর্ব্ব রাজানুকথন।

আরজি যখন তখন সংশোধন করিতে দেওয়া হইত না। বিবাদীর উত্তর দেওয়ার পরে amendment করা হইত না।

উত্তর চতুর্ব্বিধ ছিল—স্বীকার, মিথ্যা বলা, Res Judica বলা, এবং কারণোত্তর। চতুর্থ জবাবে বাদীর কথা স্বীকার করিয়া অন্য কারণে বাদ চলে না, তাহাই বলা হইত। বাদীকে আপন অভিযোগ প্রমাণ করিতে হইত। প্রথম জবাবে কোনও প্রমাণের দরকার হইত না। দ্বিতীয় জবাবের উত্তরে বাদীর সাক্ষ্য দিতে হইত, তৃতীয়ে বিবাদীর উপর প্রমাণের ভার পড়িত, চতুর্থেও বিবাদীর প্রমাণ লওয়া হইত।

প্রমাণ করিবার জন্য দলিল, উক্তি এবং সাক্ষী নেওয়া হইত।

তদভাবে কোথাও কোথাও দিব্য গ্রহণ করা হইত। তবে দিব্য খুব কম সময়েই নেওয়া হইত।

মানুষী প্রমাণ পাওয়া গেলে দৈব প্রমাণ গৃহীত হইত না, যেখানে তাহার অভাব কেবল সেখানেই দিব্যের প্রচলন ছিল।

বাস্তুপ্রকরণে বাড়ী তৈয়ারী করিবার স্থানের কথা পাই। ভূপরীক্ষা করিয়া বাড়ী বাঁধিতে হইত। ভূ-পরীক্ষায় মৃত্তিকার গন্ধ, বর্ণ, রস, স্পর্শ বা নিম্নতা দেখিতে হইত। মহাকপিল পঞ্চরাত্রের বচন তোলা হইয়াছে—

> খাতিতা চ দশপদা চ কলীকা রোহিণী তথা।
> পূরতঃ পরিবর্জ্যা হ্যঃ কর্ত্তুরাধর্ষকারিণী।
> খাতিত্বা যত্নতঃ ভূম্যাং হ্যংঘটা ঘনবারিণী।
> দশপদা ক্রোশমিতা নিত্যং বল্মীকা পরিতো হয়ম্।
> ব্রাহ্মণী মৃত্তিকা গ্রাহ্যা ক্ষত্রিয়া মাংসগন্ধিনী।
> ক্ষারগন্ধা তু বৈশ্যা স্যাৎ পূয়া বিড্‌গন্ধিনী ক্ষিতিঃ।
> মধুরা ব্রাহ্মণী ভূমিঃ কষায়া ক্ষত্রিয়া তথা।
> বৈশ্যা তিক্তাথ বিজ্ঞেয়া, পূয়া স্যাৎ কটুকা মহী।
> ঈশকোণগতা সা চ কর্ত্তুঃ শ্রীদা সুনিশ্চিতম্।
> পূর্ব্বপ্লবা বৃদ্ধিকরী বহ্না দুরাবহা।
> বিদেহং মারণং যাতি ভূমাবগ্নিপ্লবা সতী।

যে মাটি ফাটা, যে মাটি কাঁটাগাছে ভরা, যেখানে উই মাটি, সে মাটি ভাল নয়। মৃতগন্ধ মাটি ভাল, মাংসগন্ধ, ক্ষারগন্ধ, বিষ্টগন্ধ মাটি পর পর মন্দ। মধুরসের ভূমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তারপর কষায়, তিক্ত ও কটুভূমি। যে জমির ঈশান কোণ প্লাবিত হয় সেটি শ্রীদ, পূর্ব্বপ্লবা ভূমি বৃদ্ধিকরী, উত্তরপ্লবাও ভাল। কিন্তু যে জমির অগ্নি কোণ ডোবে, সে জমি ব্যাধিজনক।

কুশকাশবতী ভূমি সকলের চেয়ে ভাল, তারপর দূর্ব্বা-বনাবৃতা, তারপর ফলপুষ্পাবৃতা, তারপর বহুতৃণা ভূমি। মাটির মধ্যে সাদা, রক্ত, পীত এবং কৃষ্ণবর্ণ মাটি পর পর ভাল।

ভূপরীক্ষার জন্য নারদপঞ্চরাত্রে বিধান দিয়াছেন যে:—হাতপ্রমাণ গর্ত্ত কর—তারপর খনিত গর্ত্তে তোলা মাটি আবার ভরিয়া দাও—যদি মাটি গর্ত্তের চেয়ে বেশী হয়,

তবে মাটি প্রথম, যদি সমান হয় তবে মধ্যম, যদি কম হয় তবে অধম জানিবে। অধম জমি ত্যাগ করিবে।

ভূপরীক্ষার পর চৌকস জমি লইয়া সেখানে বীজ বপন করিবে, শস্য উৎপন্ন হইলে সেখানে গরু চরাইবে—গোমূত্রে এবং গোবরে জমি পবিত্র হইবে। তারপর ভূমিতে ঢুকিয়া নিম্ন মন্ত্র পড়িতে হইবে :—

ওঁকারঃ পিশাচো বাধাশ্চ যেচ্ছে তিষ্ঠন্তি সর্ব্বদা।
সর্ব্বে প্রযান্তু তেঽন্যত্র বিলোঽয়ানং করোম্যহম্॥

মন্ত্রপাঠের পর পুরোহিত ভূমি কর্ষণ করাইবেন। বলীবর্দ্দের পা ধুইয়া সাতবার হল চাষ করা হইবে।

তারপর জমির দিক্ সাধন করিতে হইত। হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে শ্লোকে পাই :—

যবেনাঙ্গুলমাত্রেণ তত্র বৃত্তং তু কারয়েৎ।
মধ্যে নিখনেৎ শঙ্কুং তাপা ছায়াং নিরীক্ষয়েৎ।
প্রক্ষেপে নিশ্চিনে তস্মাৎ শঙ্কুচ্ছায়াং নিরূপয়েৎ।
শঙ্কুচ্ছায়াপ্রমিতাভ্যাং প্রাক্প্রতীচৌ প্রসাধয়েৎ।
প্রাক্প্রতীচীগতে সূত্রে উদক্‌যাম্যে প্রসাধয়েৎ।

মৃত্তিকার উপর একটি শঙ্কু স্থাপন করিতে হইবে, তারপর যবপরিমাণ ব্যাস লইয়া একটি বৃত্ত আঁকিতে হইবে। এবং শঙ্কুর ছায়া দেখিয়া পূর্ব্ব ও পশ্চিম ঠিক করিবে।

আজকাল নগর-পরিকল্পনা বা town-planning লইয়া আলোচনা চলিতেছে। গ্রামাদি প্রতিষ্ঠার বিধি তুলিতেছি।

বিপ্র ও শূদ্র যেখানে বাস করে তাকে গ্রাম বলে। ক্ষত্রিয়স্থলীকে পুরী বলিত। যেখানে বণিগালয় আছে, অভিষিক্ত ক্ষত্রিয় আছে, তাহাকে পত্তন বলে। যেখানে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বাস করে এবং কৃষিকাজ করে তাকে খেট বলে। খেটের চারগুণ বড় এবং সর্ব্বজাতির বাসস্থানকে নগর বলে। ধর্ম্মার্থ আলয়কে সভা বলিত, অভিষিক্ত দেবতার আলয়কে মণ্ডপ বলিত। দ্বিজাতির ধর্ম্মকারণ কূটী (চিলে কোঠা) প্রপা (উৎস) এবং চত্বর রাখা হইত।

রাজা সিকতার নিকট মধুরাস্বাদ ভূতলে বিপ্রদের জন্য গ্রাম নির্ম্মাণ করিবেন। ক্ষত্রিয়দের পুরী লোহিত মধুরাস্বাদ ভূমিতে হইবে। পীতবর্ণ মধুরাস্বাদ ভূমিতে বৈশ্যের গ্রাম হইবে।

বিধানমার্গেণাধাদিক্ষীরকণ্টকপাদপান্।
ইক্ষুলোষ্ঠালঙ্কেরমাত্রভাগাৎ পরিত্যজেৎ বুধঃ।
অনুসরে সবে দেশে প্রাগুদক্‌সমতলেঽপি বা।
গ্রামাদীন্ স্থাপয়েদ্রাজা, অন্যথাবিধবস্ততে।
সপ্তপ্রদক্ষিণং কৃত্বা লোষ্ট্রাদি-শকলানি চ।
ঈষান্তে তাপ একস্মিন্ অধিবাসো অবেদ্বধি।
পঞ্চগব্যেন ভূতাপঃ প্রোক্ষয়েদ্রিঃ প্রদক্ষিণম্।
শমীমুদুম্বরশাখাভ্যাং সংবর্ত্তীভিঃ পরিক্রমন্।
ওঁপৃথিব্যৈ স্বাহেতি শঙ্কুং হিরণ্যেনাভিমন্ত্রয়েৎ॥
পুণ্যাহং বাচয়েত্তস্মিন্ ব্রাহ্মণৈর্বেদপারগৈঃ।
চতুরস্রং ধনুঃশতং সমং বাপ্যথবা ভবেৎ॥
গ্রামাদীন্ বৃত্তিতন্ত্রজ্ঞঃ স্থাপয়েত্তদনন্তরম্।
মার্গবন্তি পুরাণীনি বিপ্রাণীনাং প্রকল্পয়েৎ॥
গ্রামাণীনাং যথা এব পুরং বিপ্রেষ্বিতঃ।
অস্মিন্ত্রয় পত্তনকুটকপাণীনি কল্পয়েৎ।
ত্রী-ভূ-সরস্বতীনাঞ্চ গৃহং সপ্তপতেরপি।
প্রাচ্যাদিদ্বারপুরং কার্য্যং ধনিপতাং ধনালয়ম্।
প্রতীচ্যাং বারুণং বেশ্ম উদীচ্যাং সৌম্যমালয়ম্।
প্রাগ্দক্ষিণায়ামাগ্নেয়ং নৈঋতং দক্ষপশ্চিমে।
বায়োঃ প্রত্যগুদক্‌পার্শ্বে প্রাগুদীচ্যাং শিবালয়ম্।
সর্ব্বাসাং দেবপত্নীনাং হৈঃ সংবেশালয়ং ভবেৎ।
পরিহঃ পালবার্থায় প্রাকারঃ কারয়েন্নৃপঃ।
দ্বাদশদণ্ড চ পূর্ণায়া আলয়ঃ সংপ্রকল্পয়েৎ।

এই সমস্ত পড়িলে বুঝি, নগরনির্ম্মাণে হিন্দুদের চিন্তা বেশ তীক্ষ্ণ ছিল। অবশ্য দেবতা-পূজা ও দেব-মূর্ত্তিস্থাপন হিন্দুধর্ম্মানুরাগের চিহ্ন, কিন্তু অপর বিধানগুলি অর্থ নৈতিক এবং কল্যাণ-বুদ্ধির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

বেল, আপাং গাছ, যে সব গাছের ডাল ভাঙ্গিলে আঠা গলে (শাখাদিক্ষীর) এবং কাঁটা গাছ তুলিয়া ফেলিবে। যে ভূমি সমান, কিংবা যার পূর্ব্বদিক একটু ঢালু এবং যে ভূমি অতি কঠিন নয়, সে খানে গ্রাম বসাইবে। বার বার হলকর্ষণ করিয়া লোষ্ট্রাদি দূর করিবে তারপর ভূমির অধিবাস করিবে। তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া পঞ্চগব্যে শোধন করিবে। শমী এবং ডুমুরশাখা লইয়া প্রদক্ষিণ করিবে।

তারপর পুণ্যদিন দেখিয়া ওঁকারমন্ত্রাদি উচ্চারণ করিয়া জল ছিটাইবে। তারপর চারিদিকে পথ প্রস্তুত করিবে। তারপর গ্রামের স্থানে স্থানে দেবমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিবে।

জ্ঞান সংস্থাপন করিবার নৃত্য-গীতবাদ্যে জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করা হইত। সে ছিল এক বিরাট উৎসব।

রাজ্যপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে রাজপুরীর হিতের জন্য রাজার পুরোহিত নির্ব্বাচন করা হইত। পুরোহিত ছিলেন রাজার পারত্রিক কল্যাণের কারক। পুরোহিতের পরই ছিল জ্যোতির্ব্বিদের আসন।

দৈবজ্ঞ ও পঞ্জিকা বহুশতাব্দী ধরিয়া আমাদিগকে শাসন করিয়াছে। অবশ্য পঞ্জিকা আমাদের জাতীয় জীবনে পঙ্গু অড়েষ্টতা এবং দুর্ব্বল ভীরুতা জাগাইয়াছে, কিন্তু রাজা যে জ্যোতির্ব্বিদ্ রাখিতেন তাঁহাদের আদর্শ ছিল অন্যরূপ।

সর্ব্বলক্ষণসম্পন্নং বিনীতং প্রিয়দর্শনম্।
পুরুষং বেদসম্পন্নং নিত্যমূর্জ্জিতসর্ব্বম্।
প্রজ্ঞাতত্ত্বাধিনং ধীরং ধর্ম্মবিদং জিতেন্দ্রিয়ম্।
ত্রিষষ্ঠং জ্ঞানকুশলং যাবশাস্ত্রপারগম্।
অযজ্বানং নাধিকারে বেদবেদাঙ্গপারগম্।
চতুঃষষ্টিকলজ্ঞঞ্চ মুহূর্ত্তজ্যোতিষাগমম্।

জ্যোতির্ব্বিদকে হোরা, গণিত এবং সংহিতা এই তিন বিষয় জানিতে হইত। মেষাদি দ্বাদশরাশির অবস্থানাদি বিষয়ে তার অভিজ্ঞতার প্রয়োজন থাকিত এবং ভাবগণনায় দক্ষ থাকিতে হইত।

জ্যোতিষের ছিল ৬৪ অঙ্গ। তার মধ্যে ২৪টি অঙ্গ, ৪০টি উপাঙ্গ। তাদের নাম গর্গ দিয়াছেন :—

বেদাঙ্গে কর্ম্মগুণজ্ঞমার্গবস্তুম্।
নক্ষত্রকেন্দ্রতঃ তৈব দিবসঃ প্রথমঃ স্মৃতঃ।
রাহুঃ বৃহস্পতৌ শুক্রে ধূমকেতৌ শনৈশ্চরে।
অঙ্গারকে বুধেদর্কে চ দাহনেষ্ট্রী ততঃ পরং।
চন্দ্রস্যস্তরক্ষঞ্চ বৃগচক্রং তথৈব চ।
তন্ত্রং যাচ্চক্রং চক্রাঙ্কে চতুষ্টয়ম্।
বাস্তুবিদ্যাবিদ্যা চ যাত্রানাং তথৈব চ।
জ্যোতিশ্চক্র বিদ্যাশ্চ বৃহদ্গর্গমতাঃ শুভাঃ।
যাত্রিযোগমযাযাত্রারোহিণীযোগমেব চ।
কৃত্যনেতান্ বিদ্যানীয়াৎ যোগাংশ্চৈব বিশেষতঃ।
অপস্তিযাত্রিনপথং চাঙ্ক দলিলং ততঃ।
ত্রয়ঞ্চ চেতসজ্ঞানাং চতুর্বিংশতিরিত্যপি।

আর উপাঙ্গ এইগুলি :—

গ্রহকোশে গ্রহযুদ্ধং গ্রহযুদ্ধাটকং ততঃ।
কুত্যং গ্রহস্যযাগঞ্চ গ্রহ-পাকান্তথৈব চ।
নৃপযাত্রাদ্রিবর্ষঞ্চ সেবাদ্যাংস্তথৈব চ।
নমুচিত্রোপদিষ্টং উপাঙ্গঞ্চ পাঞ্চকং।
উৎপাতিকতুলাকোশৌ তথাস্তোপশমাবপি।
সর্ব্বভদ্রচক্রঞ্চৈব তথা পুষ্পলতা বিদুঃ।
উপাঙ্গমেতাদৃশা জ্ঞেয়া ধরাদেবস্তথৈব চ।
কৃৎস্নং ভুবনকোষঞ্চ গর্গাদ্যৈরেবমগদৈঃ।
নির্ণয়ো ভূমিকম্পস্য পরিবেশস্তথৈব চ।
ধরুবজাপাঃ সন্ধ্যা চ তথাস্যাস্তোপশমাবপি।

জ্যোতিষীর প্রথম জানা চাই কর্ম্মগুণ, তিথি, নক্ষত্র, করণমুহূর্ত্ত, এই চতুর্ব্বর্গের জ্ঞানকে কর্ম্মজ্ঞান বলে। তারপর চন্দ্রমার্গ জানিতে হইবে। আকাশে নক্ষত্রের পরিচয়, গ্রহগণের প্রভাব ইত্যাদির জ্ঞান ও শাকুনী বিদ্যা না জানিলে জ্যোতিষী হওয়া চলিত না। জ্যোতিষীর কোথায় বাড়ী হইবে তাহা জানিতে হইত, বয়স প্রভৃতির ধ্বনিফল নির্ণয় করিতে হইত। তাহা ছাড়া নক্ষত্রের শুভাশুভ যোগের খবর করিতে হইত। যাতে দিগ্দেশে জাত সংক্রামক ব্যাধি রাজ্যকে উৎপীড়িত না করে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইত। জলের গুণাগুণ ঠিক করিতে হইত।

দেখা যাইতেছে যে, জ্যোতিষীকে তখনকার দিনে Health-officer রূপে কাজ করিতে হইত।

উপাঙ্গ হিসাবে গ্রহকোষ জানিতে হইত। গ্রহদিগের উৎপত্তি, বর্ণ, শুভাশুভ ফল-কথনকে গ্রহকোষ বলে। ভৌমাদি পঞ্চক গ্রহসংযোগকে গ্রহযুদ্ধ বলিত। গ্রহদিগের উৎপত্তি, বর্ণ, সংস্থান, রাশি প্রভৃতির দ্বারা শুভাশুভ নির্দ্দেশকে গ্রহযুদ্ধাটক বলিত, গ্রহজন্মনির্ব্বাচনকে গ্রহেশ্বর-কৃত্য বলিত, গ্রহদিগের সময়বিশেষে ফলদাতৃত্বকে গ্রহপাক বলে। রাজার যুদ্ধযাত্রার শুভ সময় জ্যোতিষীই ঠিক করিতেন, হোমকালে অগ্নির বর্ণ দেখিয়া যজ্ঞের ফলাফল ঠিক করিতে হইত। সেনা-সন্নিবেশের শুভাশুভ কাল স্থির করিতে হইত। গ্রহোৎপাতকে নমুচিত্র বলে। ভুবন-পরিমাণ গ্রহনক্ষত্র গতির নাম ছিল উপনিষদ্। বলি ঠিক করিতে হইত, দোষ ও উৎপাতশান্তির ব্যবস্থা করিতে হইত। নদী, বৃক্ষ, বায়ু প্রভৃতি দৈবদুর্ব্বিপাকের খোঁজ রাখিতে হইত। তুলাকোষ জানিতে হইত, ভূত-ভবিষ্য যুগধর্ম্মাদি বলিতে হইত। শিবদূত সংবাদ বলিতে হইত। হরপার্ব্বতী-সংবাদের বদলে কি সেকালে শিবদূত সংবাদ চলিতেছিল?

প্রাণিদিগের ডাক চিনিতে হইত, পুষ্পলতা-বিশারদ হইতে হইত, উপানহ ও বস্ত্র প্রভৃতি ছেদের কলাকৌশল বলিতে হইত।

ইন্দ্রধনু, মেঘ, গন্ধ, পুংস্ত্রী-লক্ষণপ্রভৃতি জ্ঞানকে ভুবনকোষ বলিত। বৃষ্টিবিচারের জন্য গর্ভজ্ঞান দরকার। জলের বৃদ্ধি বা ক্ষয়হেতু সুভিক্ষ অথবা দুর্ভিক্ষ হইবে তাহা ঠিক করিতে হইত। নির্ঘাত, ভূমিকম্প, পরিবেশ, ধূমকেতু প্রভৃতি বিষয় জানিতে হইত।

অবাক্ বিস্ময়ে ভাবি, এই ধরণের জ্ঞান ও আগন্তিক বুদ্ধিসম্পন্ন সকল জ্যোতিষশাস্ত্র আজ কেন কেবল বুজরুকি বিদ্যায় পরিণত হইয়াছে।

অতীত ভারতবর্ষের বিদ্যা কেবল দর্শনে নহে, কেবল ধর্মসাধনায় নহে। সে বিদ্যা ছিল সর্বতোমুখী—জীবনের সকলপ্রয়োজনকে উপেক্ষা করিয়া দুর্বল ভিক্ষুক সাজিতেই সে বিদ্যার সাধনা ছিল না। ভারতীয় সে বিদ্যা মানুষের প্রতিদিনের জীবন-যাত্রাকে সফল করিতে সার্থক করিতে সর্বদা সচেষ্ট ছিল।

এই সমস্ত বিদ্যার পুঁথি এখনও দাক্ষিণাত্যে, নেপালে, কাশ্মীরে—সুদূর তিব্বতী চীনা ভাষায় আত্মগোপন করিয়া আছে—ভাবী গৌরবের স্বপ্ন দেখেন যে সব যুবক, তাঁহারা কেবল বিরংসার সাহিত্য পাঠে এবং সাহিত্য-কণ্ডুয়নে আত্মনিয়োগ না করিয়া এই অতীত রত্নোদ্ধারে প্রবৃত্ত হউন, তাহা হইলে নিজের, জাতির ও মানবের প্রকৃত কল্যাণ-সাধন হইবে।

মা

—শ্রীহরিপদ দত্ত

প্রথম প্রবেশ যবে ধরার আলোকে,
মানবের অন্ধকার মাতৃগর্ভ থেকে,
অবস্থিতা সন্ধিস্থলে জননী তাহার
জীবন-মৃত্যুর—এই বিধি বিধাতার।
শৈশবে কাঁদিলে শুত যে কোন কারণে
লুকায় হরষরেখা মাতার আননে।
কৈশোরে নন্দন যবে যায় বিদ্যালয়ে,
উদ্বেগ-আশঙ্কাভরে রহে পথ চেয়ে
সারাটি দিবস মাতা। পুত্রের উষাহে
বহে পুলকের ধারা প্রবল প্রবাহে
স্নেহময়ী জননী-অন্তরে—যান ভুলি'
বর্ষকর পরে ল'বে নিজকরে তুলি'
পুত্রবধূ যাবতীয় সংসারের ভার,
নহিবে হৃদয় তাঁর পরাধীনতার
দুখানলে, সার শুধু হবে অশ্রুজল,
পৌত্রপৌত্রীমুখ সুখ-আকর কেবল।
রোগের কবলে যদি সন্তান কখন,
জননী আহার নিদ্রা করিয়া বর্জন
নিযুক্তা দিবস-নিশা রোগীর সেবায়,
কল্যাণে তাহার কিম্বা দেবের পূজায়।
অমৃতের ধারা সম স্নেহ জননীর
নহে স্বার্থ-বিজড়িত, সুবিমল নীর
বরষে বারিদ যথা বসুন্ধরা 'পরে—
নহে প্রতিদান-আশে, আবেগের ভরে।
প্রত্যক্ষ কমলা মাতা, প্রত্যক্ষ দেবতা,
মাতার অভাব রবে অপূর্ণ সর্বথা।
ছানিয়া চাঁদের সুধা অতি ধীর করে
রচিয়া বিধাতা বুঝি একান্ত অন্তরে
করিলেন করুণায় দান নরকুলে
"মা"-শব্দ মধুর এই তিক্ত ধরাতলে।
মানব হৃদয়ে যবে যাতনা বিষম
মা বলে' ডাকিলে তা'র হয় উপশম।
অস্পষ্ট যদিও বাণী, দুর্মিষ্ট যখনি
কাঁদে "মা" বলিয়া শিশু। দিবস রজনী
মার কাছে অনুযোগ, অভিযোগ যত,
অভিমানে মাতৃবক্ষ আশ্রয় সতত।
মাতৃহারা জন্মমাত্র যে জন, ধরার
ঐশ্বর্য্য পরম, শ্রেষ্ঠ দান বিধাতার
না বুঝিল—না ডাকিল মা বলিয়া মায়
পবিত্রতা মিষ্টতায় সমষ্টি ধরায়।

স্থিতি ও গতি

—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ

দৈবাৎ আজ সাক্ষাৎ হইল। কিন্তু এই সাক্ষাৎটা দৈবাৎ আর কিছুদিন পূর্ব্বে কেন হইল না? যদি হইত, সে ধনীর সন্তান, নিজে কৃতী, মোকার্জ্জি তার হাতে কন্যা দিতে আপত্তি করিতেন না। কিন্তু এখন—না, সহসা কিছুই হয় না। হঠাৎ আজ একদিন দেখা হইল, আর কালই সে গিয়া বিবাহের প্রস্তাব করিতে পারে না। পাত্রকে আগে কন্যার প্রেমের অধিকারী হইতে হইবে, তবে বিবাহের কথা উঠিতে পারে। তার পর টাকা। রাত্রি প্রভাতেই যে তাকে নিশ্চিত করিয়া বলিতে হইবে, অমুকের এই কন্যা আর এত টাকা দিবে। তবে ত পিতা সন্তুষ্ট হইবেন। মোকার্জ্জিও অবশ্য ধনী, টাকা হয় ত অনেক দিবেন। কিন্তু সে পরে, কন্যার যৌতুক স্বরূপ। আর তা দিবেন অযাচিতভাবে, পাত্রপক্ষের দাবীতে নয়। আজই কি সেই টাকার কথা সে গিয়া তুলিতে পারে? আরে রাম! সে ত প্রেমিকের মত কাজ হয় না। তার পর মোকার্জ্জিরা হইলেন একেবারে ইজ্জত কাদার পরিবার। পিতা হিন্দুসমাজভুক্ত, হিন্দুয়ানী আদবকায়দাই সব মানিয়া চলেন, সম্ভাবনা থাকিলেও বিবাহে আদৌ তাঁর সম্মতিই হইত কি না সন্দেহ। তবে সে প্রাপ্তবয়স্ক, পিতাকে উপেক্ষা করিয়া নিজের কর্ত্তৃত্বে বিবাহ করিতে পারে। কিন্তু পিতা কিছুতেই সে অপরাধ তাহার ক্ষমা করিবেন না, পিতৃধনেই সে বঞ্চিত হইবে। তার দর কমিয়া যাইবে। তখন কি আর মোকার্জ্জি তার কদর কিছু করিবেন? অসাধারণ এমন আর কি তাহাতে আছে যে, মোকার্জ্জি বিলাত পাঠাইয়া তাহাকে মানুষ করিয়া আনিয়া তাহাকে কন্যা দান করিবেন, অথবা করিয়া পরে তাহাকে বিলাত পাঠাইবেন? বিলাত-প্রত্যাগত সুকৃতী বহু ধনিসন্তান যাচিয়া মীনাকে বিবাহ করিতে আসিবে। না, পিতার অধীন, পিতার উপরে নির্ভরশীল সে যতদিন আছে, মোকার্জ্জি-কন্যাকে বিবাহ করিবার আশা দুরাশামাত্র।

কিন্তু সে ভাল বাসিয়াছে। কেবল সে নয়, মীনাও—হাঁ, তাহাকে ভালই বাসিয়াছে। সত্যই প্রথম সেই শুভদৃষ্টিতে তাহারা প্রেমে পড়িয়াছে, love at first sight মোকার্জ্জি যে বলিয়াছেন, সত্যই বলিয়াছেন। প্রায় প্রত্যহ এখন মোকার্জ্জির গৃহে সে যাইবে। নাটকে মীনা শকুন্তলা, আর সে দুষ্মন্ত। তাহার সমস্ত দেহ ভরিয়া অননুভূতপূর্ব্ব একটা পুলকোচ্ছ্বাস উঠিল, উষ্ণ শোণিত চঞ্চল প্রবাহে শিরায় শিরায় ছুটিল। প্রেমবিহ্বল সেই দৃষ্টিতে সেই অতি মধুর রস-রসাল সেই প্রেমসম্ভাষণে, প্রেমনিবেদনে—মোহন সঙ্গীতে, মোহন নৃত্য-ছন্দে প্রেমের অভিব্যঞ্জনায়, নিভৃত কুঞ্জে পরস্পরের সেই রোমাঞ্চকর অঙ্গ-স্পর্শে—সে দুষ্মন্ত আর মীনা শকুন্তলা! আহা, কেবল অভিনয় ত নয়, সে যে সত্যই হইবে প্রেমে তাদের মধুময় মিলন! কিন্তু তবু—মাত্র সেই রঙ্গমঞ্চে একটি মাত্র রাত্রির অভিনয়ের ছলে! হায়, সত্যের এই আভাসটুকু তাদের জীবনব্যাপী একটা বাস্তব সত্যে পরিণত হয় না! নহিলে যে কেবল তৃষ্ণাই বাড়িবে, তৃপ্তি ত হইবে না?

হয় না কি? কিছুতেই হয় না। এই যে একটা বিবাহের ছলে একান্ত অনিচ্ছায় তাহাকে বাধা করা হইতেছে, ইহার বাহ্যিক বন্ধনে চিরজীবন তাহাকে বদ্ধ হইয়া থাকিতে হইবে।—কিন্তু কেন হইবে? নরনারীর স্বতঃপ্রণোদিত যে প্রেমের মিলন তাহাই ত প্রকৃত বিবাহ। তথাকথিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান প্রাচীন সব জীর্ণ পুঁথির অর্থহীন প্রাণহীন দুর্ব্বোধ্য কয়েকটা বুলি, আইনের লেখাপড়া, এসব ত বাজে convention মাত্র! তবু যেখানে প্রেম এই সব conventional অনুষ্ঠানের প্রেরণা সেখানে তার একটা মর্য্যাদা স্বেচ্ছায় নরনারী মানে ত মানিতে পারে। কিন্তু প্রেম যেখানে নাই, হইতে পারে না, অপ্রতিবাধ্য

ঘটনাচক্রেই নারী এরূপ কোনও অনুষ্ঠানে মানুষকে বাধ্য করে, সেখানে এসব ত একেবারেই একটা বাজে বেলা। তার পরিচয় যে স্বীকার করিয়া লয়, তার বাহ্যিক বন্ধনে যে বন্ধ বলিয়া আপনাকে মনে করে, মানবত্বের ন্যায়সঙ্গত অধিকারে সে তাহাকে বঞ্চিত করে, মানব নামের অযোগ্য সে। না, বাধ্য হইয়া আজ যদি তাহাকে এই বিবাহ স্বীকার করিতেই হয়, কয়েকটা দিন যেরূপ সম্বন্ধই সেই নারীর সঙ্গে ঘটুক, চিরটা জীবন এই শৃঙ্খলে সে আপনাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে না। চিত্ত যাহার বিরুদ্ধে নিয়ত বিদ্রোহী হইয়া উঠিবে, কতদিন কে তাহা স্বেচ্ছায় শিরে ধরিয়া চলিতে পারে। যদি এরূপ কিছুতে বাধ্য হইয়া থাকিতে হয়, সে ত দুঃসহ একটা দাসত্বের ভার বহন করা হয় মাত্র। পিতার একটা খেয়ালে কি এইরূপ একটা দাসত্ব সে স্বীকার করিয়া লইবে?

তা লইবে না, লইতে পারে না, আর সত্য বাধ্য করিয়াও কেহ তাহাকে ইহা স্বীকার করাইতে পারে না।

কিন্তু মিষ্টার মোকার্জি আর মীনা? সে নিজে এই convention এর—প্রাণহীন সামাজিক রীতির—বন্ধনের অতীত হইয়া চলিতে পারিবে। কিন্তু তাঁহারাও কি তাহা পারিবেন? বলা শক্ত। তবে ইতিমধ্যে মীনা যদি তারই মত সত্যই তার প্রেমে একবারে ভরপুর হইয়া ওঠে—ভাল দেখাই থাক না, কি হয়।

কিন্তু আপাততঃ এটা একান্ত আবশ্যক যে, তাহার এই বিবাহের কথা মীনা কি তাহার পিতা কিছু জানিতে না পারেন। অন্যায় হইবে? কিসের অন্যায়? কি অন্যায়? ন্যায়-অন্যায় বলিয়া কতকগুলি বাজে কথা লোকে সৃষ্টি করিয়াছে! এসবও convention মাত্র। জীবনের লক্ষ্য হইতেছে সুখ। সেই সুখ সে চায়। কেন চাহিবে না? কে না চায়? লোকে যে ধনোপার্জন করে, ন্যায়-অন্যায়ের হিসাব কয়জনে করিয়া থাকে? ধনে যে সুখ হয়, প্রেমে সুখ হয় তার চাইতে অনেক বেশী। ধনের বেলায় যদি ন্যায়-অন্যায়ের হিসাব লোকে না করে, প্রেমের বেলায় কেন করিবে? Nothing is unfair in love and war (ন্যায়-অন্যায় নাই কিছু প্রেমে কিংবা যুদ্ধে) এই যে প্রবাদটি ইংরেজীতে আছে, খাসা প্রবাদ, একেবারেই খাঁটি কথা। ইহার বড় জ্ঞানগর্ভ একটা কথা কোনও দেশের কোনও ভাষায় নাই। কিন্তু মীনাকে সে ভাল বাসিয়াছে। তার উপরে—আবার অন্যায়? কি মূঢ় সে! কিসের অন্যায়? কি অন্যায়! সে সুখী হইবে, মীনা সুখী হইবে। সুখই ন্যায়-অন্যায়ের একমাত্র মাপকাঠি। কি ক্ষতি তার হইবে? লোকে যে ক্ষতি দেখাইবে, সেও ত একটা convention-এর কথা মাত্র! একটিবার যদি মীনাকে সে তার প্রেমের মিলনে বাঁধিয়া ফেলিতে পারে, তখন—কে কি করিবে? সুখে তাদের কি বলিয়া কি করিয়া কে বাধা ঘটাইতে পারিবে—যদি না তাহাদেরই কাহারও মনে কোনও খুঁৎখুঁতি আসিয়া বাধা কিছু ঘটায়! এ খুঁৎখুঁতি তার কখনও হইবে না। তবে মীনার—হইতেও বা কিছু পারে। কিন্তু। তাহা কি সে প্রেমের বলে দূর করিতে পারিবে না? যদিই না পারে—দূর হ'ক ছাই, আর সে ভাবিতে পারে না। যাহাই ঘটুক, হাল সে এখনই ছাড়িবে না, ছাড়িতে পারে না। সুখের পথ যদি পাইয়াছে, সব বাধা দূর করিতে প্রাণপণ চেষ্টা সে করিবে। তবু যদি না হয়, একটা যা হউক সান্ত্বনা তার ত থাকিবে, বুঝিবে, এ জীবনে সুখ তার ভাগ্যে নাই; কিন্তু কেন এমন হইবে? কেন এমন হয়? সুখ লোকে চায়, কেন সকলে পায় না, কোন্ অজ্ঞেয় শক্তি অদৃষ্ট অলঙ্ঘনীয় বাধা আনিয়া পথ রুদ্ধ করে? কেন করে?

রবীন অনেক ভাবিল। কিন্তু এই সমস্যার কোনও উত্তর সে খুঁজিয়া পাইল না। অনেক বই সে পড়িয়াছে, অনেক বিদ্যা শিখিয়াছে, যুক্তিতর্কের অধিকারও অনেক লাভ করিয়াছে। কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর পাইতে পারে, পাইয়া শান্তচিত্তে নিয়তিকে গ্রহণ করিতে পারে—সে শিক্ষা কোথাও লাভ করে নাই। পিতার গৃহে হয় নাই, বিশ্ববিদ্যালয়ে হয় নাই, আর কোথাও কোনও উপায়ে হয় নাই। অনেকক্ষণ বসিয়া ভাবিল। হঠাৎ ঘড়ীর দিকে চাহিয়া দেখিল রাত্রি তখন একটা। তখন গিয়া সে শুইল। কিন্তু চিত্ত যারপরনাই অশান্ত, মস্তিষ্ক অত্যুষ্ণ, সুনিদ্রা হইল না।

রাত্রি প্রভাতে মাতার সঙ্গে যখন সাক্ষাৎ হইল, রবীন জিজ্ঞাসা করিল, "কি মা, ঐ যে আশীর্ব্বাদ না কি তোমরা বল, আজ তা তবে সত্যিই হবে।"

একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া বিরাজমোহিনী কহিলেন, "হাঁ, বাবা, আসতে তাদের বলে দিয়েছেন—"

"বেশ, হ'ক তবে?"

মাতা নীরব। রবীন কহিল, "কিন্তু একটা কথা আমার—"

"কি বাবা?"

"বিয়ের দিন ঠিক করবে, যখন আমি বলব। আর কোনও আড়ম্বর কিছু করতে পারবে না। যা হবে, যখন হয়, চুপচাপ হয়ে যাবে। সোরগোল যেন একটা না ওঠে।"

গম্ভীর ভাবে বিরাজমোহিনী কহিলেন, "রবীন! এখনও বলছি ফের। উনি চটবেন, চটুন। চটে যাই করুন, বিয়ে তুই করিস নি!"

"না, ফেরা এখন আর সম্ভব নয়! হোক না, ক্ষতি কি?"

একটু কাল চুপ করিয়া থাকিয়া বিরাজমোহিনী বাহির হইয়া গেলেন।

৬

"বলেন কি অতীন্ দা? এই 'আর' রায় (R. Roy)ই কি আমাদের নতুন জামাই বাবু?"

"হাঁ, এই 'আর' রায়ই তোমাদের নতুন হবু জামাই বাবু রবীন বটে।"

"বাঃ! ভারী মজা তবে! এ ত দেখতে যেতেই হবে। একটা বক্স (box) আজই ভাড়া করব। ভাড়া কত? পঞ্চাশ? আচ্ছা, সে বাবা না দেন, মার ঠেঁয়ে চেয়ে নেব। দেখতে এ যেতেই হবে। বিন্দুকেও নিয়ে যাব। আর দিদি যদি যায় হাঁ দিদি, যাবে?"

"কি রে মণি? কোথায় যেতে হবে?" বলিতে বলিতে বিন্দুমতীর জ্যেষ্ঠা ভগ্নী বিধবা শৈলবতী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। অতীন এই শৈলবতীর এক পিসতুত দেবর। শৈলবতী পিত্রালয়েও অনেক সময় আসিয়া থাকিত, এবং যখন থাকিত, অতীনও সদা-সর্ব্বদা আসিত। একে কুটুম্ব-পুত্র, তায় আবার সদা-সর্ব্বদা এরূপ যাতায়াত, তাই এই পরিবারের সঙ্গে মণির একটা বান্ধবতার সম্বন্ধই তার হইয়াছিল। শৈলবতী না থাকিলেও মধ্যে মধ্যে আসিত, মণির সঙ্গে, বিন্দুমতী উপস্থিত থাকিলে তার সঙ্গেও বসিয়া গল্প করিত, গান করিত, নূতন সুরের নূতন গান দুই একটা বিন্দুমতীকেও কখনও শিখাইত। সঙ্গীত-বিদ্যায় বেশ একটু খ্যাতিই তাহার ছিল।

অতি সুদৃশ্য একখানি বিজ্ঞাপন-পত্র দিদির সম্মুখে ধরিয়া মণি কহিল, "এই দেখ, দেখেছ? এই 'আর' রায়কে জান? আমাদের নতুন জামাই বাবু রবীন রায়।"

"ওটা কি?"

"প্লে, প্লে,—Modernised শকুন্তলা। Songs and oriental dances! Whole drama—all emotions and actions interpreted in melodious songs and charming dances—all oriental yet suited to modern taste. Old romance of Kalidas presented in a modern artistic setting by a new set of talented artistes—a surprise unprecedented in its pleasant thrills from start to finish."

শৈলবতী কহিল, "মেলাই ত ব'কে গেলি এক নিশ্বেসে, তা কথাটা কি হ'ল, বুঝিয়ে বল্ শুনি।"

মণি উত্তর করিল, "এই—এই, 'শকুন্তলা'র একটা প্লে হবে, নতুন ধরণে বইখানাকে একদম নতুন ছাঁচে ঢেলে আধুনিক রুচির মত ক'রে নিয়ে। মেলাই নাচ গান থাকবে, আগাগোড়া নাচ-গান,—কথাও অবিশ্যি থাকবে, বেশীর ভাগ নাচ-গানেই। কাব্যটাকে expression দেওয়া—অর্থাৎ কি না ফুটিয়ে তোলা হবে।"

একটু হাসিয়া শৈলবতী কহিল, "তাই না কি? কিন্তু কালিদাসের যে মূল নাটক তাতে ত নাচ-গান কিছু নেই। কেবল একটি অপ্সরার একটা নাচ আছে, কি এক ভঙ্গীতে নাচতে নাচতে আকাশ-পথে সে উঠে গেল।"

অতীন কহিল, "সেই—সেই ত বই-এর মস্ত একটা ত্রুটি, আজকাল ষ্টেজে জমে না। সেই ত্রুটি শোধরাবার জন্যেই নাচ-গান দিয়ে নতুন ছাঁচে বইটাকে এঁরা ঢেলে নিয়েছেন।"

"তা হ'লে বল বইটা কালিদাসের শকুন্তলা আর রইল

না, নতুন একটা বই হল পুরোন সেই বইটার গল্পটা নিয়ে।"

"হ'ল, হ'ল। ক্ষতি কি? পুরোণ একটা গল্প নিয়ে ভাল একখানা নাটক যদি হয়, যা না কি কালিদাসের শকুন্তলাকেও নীচে ফেলে দেবে।"

"ও বাবা! নাটকওয়ালার দুরাশাও ত কম নয়?"

একটু হাসিয়া অতীন কহিল, "ঐ ত তোমাদের দোষ বৌদি, পুরোনটাকেই অতি বড় ক'রে দেখ, নতুন কিছু যে পুরোণাকেও ছাড়িয়ে অনেক উপরে উঠতে পারে, এটা মেনে নিতেই কখনও চাও না।"

"ছাড়িয়ে সত্যি যদি কিছু ওঠে, কেন মেব না ভাই? তবে কালিদাসের শকুন্তলা—"

"কালিদাসের শকুন্তলা—তবেই আর কি? ঐ একখানা নাটক লিখে সেই কোন্ আজিকালের কালিদাস সারা দুনিয়াকে যেন কিনে রেখেছেন।"

"তা রেখেছেন বই কি! শুনতে ত পাই, তোমরা যাকে দুনিয়া বল, সেই দুনিয়ার সকল দেশেই ঐ একখানি নাটকে কালিদাসের জয়জয়কার উঠেছে, একেবারে অমর ক'রে তাঁকে রেখেছে।"

"হাঁ, শুনেছি অনুবাদ কোথাও কোথাও হ'য়েছে, আর কাব্য-রসিকরাও না কি তারিফ কিছু ক'রে থাকেন—সেকেলে কোনও কাব্যকে একালের লোকে যতটুকু ক'রতে পারে। তা প'ড়েছি ত বইটা। সে কালের রুচি, সে কালে যা ছিল ছিল। নাটক হিসেবে এ কালের ষ্টেজে থাক, যাত্রার আসরেও বইটা একদম অচল।"

"ও! তাই বুঝি চরিত্রগুলিকে নাচিয়ে এঁরা বইটাকে সচল করে তুলতে চাইছেন?"

"তা মন্দ কি? কতকগুলি নাচে যদি অচল বইটা সচল হয়, কেন চাইবে না? আর কেবল নাচই নয়, গানও অনেক আছে। দৃশ্যগুলির প্রয়োজনাও নিশ্চয়ই আধুনিক কায়দায় করা হ'য়েছে।"

একটু হাসিয়া শৈলবতী কহিল, "কেবল তাতেই এই নাটকটা কালিদাসের শকুন্তলাকে ছাড়িয়ে উঠবে?"

মণি বলিয়া উঠিল, "আঃ! কি সব বাজে তর্ক জুড়ে দিয়েছ, অভিনয় ত হ'চ্ছে, বেশ ত গিয়ে একটিবার দেখই না? তখনই ঠিক বুঝতে পারবে, সেই সেকেলে পুরোণ পচা কালিদাসের শকুন্তলা আর নাচগানে রঙ-চঙানো নতুন এই নাটকটা, কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা আজকালকার শিক্ষিত পরিমার্জ্জিত শ্রোতাদের সাম্‌নে উপস্থিত করবার বেশী যোগ্য।"

"নাটকটা কোথায় হচ্ছে? কোন্ থিয়েটারে?"

"ও! শোন নি বুঝি? কোনও থিয়েটারে নয়। তাদের মাথায় এমন কল্পনাও কখনও উঠবে? এত বড় সাহসও হবে কালিদাসের শকুন্তলাকে নতুন একটা রূপ দিয়ে লোকের সাম্‌নে উপস্থিত করবে? যা হ'ক, বড় একটা নাম ত দাঁড়িয়ে গেছে।"

"কাদের মাথায় তবে এই কল্পনাটা উঠল? এত বড় সাহসটাই বা কাদের হ'ল?"

"যাদের হ'তে পারে! এই সব থিয়েটারওয়ালাদের চাইতে অনেক বড় মাথা, বড় বুকের পাটা যাদের আছে।"

"বলি" তারা কে খুলেই বল্ না হতভাগা!"

"এই আমাদের রবীন বাবু-টাবু ওরা, একটা এমেচার পার্টি ক'রে"—

"রবীন! কে রবীন? এই বিন্দুর সঙ্গে যার বিয়ের সম্বন্ধ হ'চ্ছে?"

"হাঁ, হাঁ, সেই বটে; সেই ত দলের মোড়ল, দুষ্মন্তের পার্ট নিয়েছে, নইলে ব'লছি কি? বিজ্ঞাপনটা এত আহ্লাদ ক'রে এনে তোমাকে দেখাচ্ছি, কেবল কি শকুন্তলার একটা modernised play হবে তাই? রবীনরা নাটক ক'রছে, সে নিজে হবে দুষ্মন্ত, তাই না এতটা মেতে গেছি আমরা! এই দ্যাখ না, বড় বড় অক্ষরে তার নাম র'য়েছে আগুতে।" বলিয়া বিজ্ঞাপন-পত্রখানি শৈলবতীর সম্মুখে ধরিল।

সেদিকে একটিবার চক্ষু দিয়া কেমন যেন একটু বিস্মিত ভাবে কহিল, "রবীনরা নাটক ক'রছে। ও সব, কেন?"

"কেন? সখ হ'য়েছে, ক'রবে না কেন? এত বড় একটা আমোদ, কত লোকেই আজকাল করে, আমোদ-প্রমোদও ত লোকের চাই!"

অতীন কহিল, "তার পরে এত বড় আর্ট তার চর্চ্চায় যে অতি বড় একটা আনন্দ যে লোকে পায়—নিজেরা পায়, অন্যকে দেয়—"

শৈলবতী কহিল, "হাঁ ঠাকুর-পো! ঐ আর্ট কথাটায় কি বাঙ্গালা কিছু নেই?"

"নেই ঠিক কিছু। তবে ধর 'কলা' কি 'সুকুমার কলা' নামও ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে এই 'আর্ট' কথাটার বস্তুটার স্বরূপ যেমন প্রকাশ পায়, কলা-টলা কোনও কথাতেই তা পায় না।"

"পায় না তার কারণ তোমরা পাওয়াও না। নইলে ছোট্ট ঐ 'আর্ট' কথাটার মধ্যেই বা কি এমন তত্ত্ব আছে, যা না কি 'কলা' কথাটায় বোঝান যায় না—যদি বোঝাতেই তোমরা চাও।"

বিন্দুমতী আসিয়া তখন নিকটে দাঁড়াইয়াছিল। কহিল, "হাঁ ঐ এক ধরণ আমাদের দেশের হ'য়েছে, মাসিক পত্রে সর্ব্বদাই ঐ 'আর্ট' কথাটা দেখি। অথচ ঐ 'কলা' কি 'সুকুমার কলা' কথাটাও বেশ ব্যবহার করা যায়, কেউ কেউ ক'রেও থাকেন। আগেকার মানেতে যাই তফাৎ থাক, ব্যবহার ক'রতে ক'রতে এই মানেটাও ধ'রে যাবে, যেমন না কি 'আর্ট' কথাটাও ধ'রেছে।"

শৈলবতী কহিল, "সে থাকগে। তাহ'লে রবীনরাই নাটকটা ক'রছে। তা অত বড় একটা জাঁকাল বিজ্ঞাপন বের ক'রেছে, কেন, টিকিট বিক্রীও ক'রবে না কি?"

হাসিয়া অতীন কহিল, "তা ক'রবে বই কি? এ-সব নাটক-টাটক করে অবিশ্যি আসলে সখ মেটাতে, তবে উপলক্ষ বা ছুঁতোও একটা থাকে যা দেখিয়ে টিকিট বিক্রী করে টাকাও ঢের তোলে। খরচটা উঠে যায়; তার পর টাকা যেটা বেশী থাকে, ভাল কোনও কাজে দিয়ে দেয়।"

"এদের সেই উপলক্ষটা তবে কি?"

"দুর্ভিক্ষের সাহায্যে বড় একটা বন্যে হ'য়ে উড়িষ্যায় বড় একটা দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে কি না, তারই সাহায্যে টাকা তুলবে এরা।"

"ও! তা সখ মেটাতে হয় মেটাক গে। এ সব ছুতো আবার কেন! দুর্ভিক্ষের সাহায্যে কি একটা নাটক ছাড়া করা যায় না? যারা ক'রছে তাদের ঘরে কি টাকা নেই যে দান কিছু ক'রতে পারে? রবীন নিজেও ত খুব বড়-লোকের ছেলে।"

"তার এমন পরিচয় কি পাওয়া যাচ্ছে বৌ-দি? এত গুলো টাকা তোমার বাবার ঠেঙ্গে নিচ্ছে।"

সলজ্জ ভাবে বিন্দুমতী বাহির হইয়া গেল। একবার চাহিয়া দেখিয়া একটু হাসিয়া শৈলবতী কহিল, "বড়লোক ব'লেই নিচ্ছে। গরীব হ'লে অত নিত না, পেত না, চাইতও না। বড়লোকের খাঁই গরীবের চাইতে অনেক বেশী। যারা টাকা দেয়, বড়লোককেই বেশী দেয়, গরীবকে এমন দেয় না।"

"ঠিক! সুতরাং দান ক'রতেও বড়লোকেরা কুণ্ঠিত হ'তে পারে। পরের ঠেঙ্গে নিতে পারলে আর ঘর-থেকে কেন দেবে? আরও এতবড় একটা সখ মেটানও হ'চ্ছে।"

"তা হ'লে সবাই এরা তবে বড়লোক?"

"হাঁ, তা বেশীর ভাগই বটে। কেবল টাকায় বড়লোক নয়, নামজাদা লোকও বটে! নইলে সাধারণ গরীব গেরস্ত ঘরের ছেলে-মেয়েরা—"

"মেয়েরা! মেয়েরাও নাটক ক'রবে? ভদ্রলোকের মেয়েরা?"

অতি বিস্ময়ে শৈলবতী চাহিয়া রহিল।

হাসিয়া অতীন কহিল, "কেবল ভদ্রলোক ব'লতে সোজাসুজি তোমরা যাঁদের বোঝ, এঁরা তার অনেক উপরে। এঁরা হ'চ্ছেন সুসভ্য, পরিমার্জ্জিত, সেকেলে যত কুসংস্কার—তার অতীত, উচ্চতর আলোকপ্রাপ্ত এক সম্প্রদায়-ভুক্ত লোক।"

"ও, সব সাহেবী কায়দার বড়লোক বুঝি?"

"হাঁ। সুতরাং তোমাদের সেকেলে আদর্শ ধ'রে এদের কাজ-কর্ম্মের বিচার করা চলে না।"

শৈলবতী কহিল, "কে ক'রতে চাই ভাই? তবে আমাদের ভাল লাগে না। লাগে না, তার কি ক'রব? হাজার তর্ক-যুক্তি দিয়েও ভাল লাগাতে পারবে না।"

হাসিয়া অতীন উত্তর করিল, "না, তা পারব না জানি। একেবারে ঘন অন্ধকারের পর্দ্দা টাঙ্গিয়ে তার ভেতর আছ

কি ভাই এ সব আলোকের কোনও আভাসই তোমাদের কাছে পৌঁছোয় না।"

"থাক্, ওসব আলোতে আমাদের কাজ নেই ভাই। ওই অন্ধকারই আমাদের চমৎকার আলো। এতেই আমরা বেশ আছি।"

অতীন উত্তর করিল, "তুমি আছ, থাক, থাকতে পার। কিন্তু তোমার ভগ্নী বিন্দুকে ত ঐ আলোতেই যেতে হ'চ্ছে। তৈরীও তেমনি ভাবে হ'তে হবে।"

"হুঁ! তা রবীন যে ভাবে খুসী চ'লছে চ'লতে তাই ব'লে বিন্দুকেও যে ঠিক তেম্‌নি ভাবে চ'লতে হবে, এমন কি কথা আছে?"

"বল কি বৌ-দি! সর্ব্বতোভাবে স্বামীর অনুবর্ত্তন করাই নারীর ধর্ম্ম ব'লে তোমরা মেনে থাক না? নারীকে ত তোমাদের মতে হ'তে হবে একেবারে পতিগতা, সম্পূর্ণ রূপে স্বামীতে আত্মসমর্পিতা!"

একটু হাসিয়া শৈলবতী কহিল, "তার মানে এ নয় যে স্বামীর সকল অনাচারেও সে আত্মসমর্পণ ক'রবে।"

"তা হ'লে পতিগতা সে কি ক'রে হ'তে পারে?"

"স্বামীর সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হ'য়ে প্রাণ দিয়ে স্বামীর সেবা ক'রবে, তাকেই ব'লে পতিগতা বা পতিব্রতা। সেটা হ'তে স্বামীর অনাচারে অনাচারী মেয়েরাই পারে না। পারে, যারা সে অনাচার থেকে আপনাদের আড়াল রাখতে পারে।"

অতীন কহিল, "সেবা যার ক'রবে, তাকে শ্রদ্ধা ত ক'রতে হবে, পতি-ভক্তির কথাটাও তোমরা ব'লে থাক। অতি অনাচারী জেনেও সে স্বামীকে কি সদাচারী কোনও মেয়ে, ভক্তি দূরে থাক, শ্রদ্ধাও এতটুকু ক'রতে পারে?"

টেবিলটা চাপড়াইয়া মণি বলিয়া উঠিল, "ব্রাভো। ব্রাভো অতীন বাবু! হাঁ, এইবার কি জবাব দেবে দিদি?"

ভ্রাতার এই আস্ফালনের দিকে কোনও মনোযোগ না দিয়া সহজ ভাবে শৈলবতী কহিল, "অনাচারটা হ'ল বাইরের জঞ্জাল। এ জঞ্জাল যত বড়, যত ঘনই হক, তার ভেতরে আসল মানুষটি যে দেবতা, তিনি সব মানুষেই আছেন। এই জঞ্জাল ভেদ ক'রে ভেতরের সেই দেবতাকে যে দেখতে পায়, সে মেয়ে অনাচারী স্বামীকেও ভক্তি শ্রদ্ধা করতে পারে।"

মণি কহিল, "যে তা দেখতে পায় না?"

অতীনও সঙ্গে সঙ্গে কহিল, "হাঁ, এত বড় অনাচারী ভের লোক আছে, যার সে অনাচার ভেদ ক'রে দেবতাই যদি বল, সেই দেবতা অবধি দৃষ্টি অতি কম মেয়েরই পৌঁছুতে পারে।"

অতি ধীর মৃদু একটু হাসির রেখা শৈলবতীর মুখে ফুটিল; কহিল, "তবু মমতাও ত একটা আছে। সেটার টানও বড় কম নয়; শ্রদ্ধা-ভক্তির চাইতে বেশীই বরং হবে।"

মণি বলিয়া উঠিল, "মমতা! কোত্থেকে আসবে সেটা? মা বাপ, ভাই বোন এদের ওপর স্বাভাবিক একটা মমতার টান আছে। সবারই অল্প-বিস্তর থাকে। ভাল হ'ক, মন্দ হ'ক, এড়াতে বড় সেটা কেউ পারে না। কিন্তু হঠাৎ একদিন বিয়ের মন্ত্র প'ড়ে একটা লোকের হাতে হাত বেঁধে দেওয়া হ'ল—"

"হঠাৎ হ'ল ঐটিই ত তোরা ভুল বুঝিস ভাই। বাপ মার ঘরে সন্তান আসে যেমন জন্ম-জন্মান্তরের টানে, মন্ত্রে স্বামী-স্ত্রীর হাতে হাত বাঁধা প'ড়েও তেমনি জন্ম-জন্মান্তরের টানে।"

"ও, একেবারে এই পৃথিবীটাই ছেড়ে গেলে বৌদি! এর আর জবাব কি দেব?"

একটু হাসিয়া অতীন এই মন্তব্য করিল।

শৈলবতী কহিল, "এই পৃথিবীটা যে বড় ছোট ঠাকুর-পো শুধু এতেই সামান্য একটা জন্ম-মৃত্যুর সীমার মধ্যে আর তার কি মানুষের জীবনটাকে পুরে রাখা যায়?"

"তার বাইরে এ ধারে কি ও ধারে—কিছুরই কোনও হদিস যে পাওয়া যায় না বৌদি।"

"চক্ষু নেই, সে মন নেই, তাই পাও না।"

"তোমার যদি থাকে আর পেয়ে থাক, ভালই।"

"সে চক্ষু আছে, দেখতে ঠিক পাই, অতবড় বড়াই করতে পারিনে ঠাকুর-পো। তবে মনটায়, তা সে যেমনই হক, বড় সেই বাইরেটার সাড়া যে এসে কিছু না লাগে তা

নয়। অন্ততঃ সাড়াটা পেতে চাই ; যেটুকু পাই, মনে অতি আগ্রহে আঁকড়ে ধরেও রাখতে চাই।"

বলিতে বলিতে শৈলবতী চাপিয়া একটি নিশ্বাস ছাড়িল।

অতীন কহিল, 'তা সেই জন্ম-জন্মান্তরের টানে মমতাটা কি কেবল মেয়েদের মনেই এসে জোর দেবে ? পুরুষের কি সেটা অনুভব করতে নেই।"

"থাকবে না কেন ? তারাও করে, অনেকে করে। আবার মেয়েও অনেকে করে না। আসল কথা করবার ভাগ্যি যার আছে সেই করে। যার নেই সে করে না।"

মণি তখন বলিয়া উঠিল, "যাক, যাক, ও সব বাজে কথা এখন রেখে দেও দিদি। বিন্দু যা হবে তা হবে। ও সব নিয়ে আমাদের এখুনি মাথা ঘামাবার দরকার কিছু পড়ে নি। এখন ঠিক ক'রতে হ'চ্ছে, এই নাটকে কে আমরা যাব।"

একটু হাসিয়া শৈলবতী কহিল, "যাসি, তোদের খুসী যাদের হয় যা না ? তা নিয়েই বা এত মাথা ঘামাবার দরকার কি এখন পড়েছে ?"

"তা ত যাবই। আমি যাব, অতীনরা যাবেন, বিন্দু যাবে—"

"বিন্দু যাবে !"

"যাবে না ! বাঃ ! রবীনবাবুরা নাটক করছে, আর বিন্দু একটিবার দেখতে যাবে না ?"

শৈলবতী কহিল, "তা বিয়ের সম্বন্ধ, পাকা দেখা, সব হয়ে গেছে। এখন সেই শুভলগ্নে শুভদৃষ্টির আগে—"

"আর রেখে দেও, রেখে দেও তোমার শুভদৃষ্টি ! বিয়ের সম্বন্ধ পাকা দেখার পর ছেলেমেয়েরা আজকাল কত দেখাশুনা ক'রছে, একসঙ্গে সিনেমা থিয়েটারে যাচ্ছে—"

"সে যার যারা যায় ! কিন্তু আমাদের এ ঘরে—"

"না না, সে হবে না দিদি। আমাদের এ ঘরটা আজকাল এই প্রগতির যুগে একেবারে পিছিয়ে সেই সব পুরোণ পচা-ডোবার পারে ঝোড়জঙ্গলের আঁধারে আলগা হয়ে থাকতে পারে না। বিন্দুকে যেতেই হবে। শুভদৃষ্টি —তা সেই নাটকের প্রেক্ষাগারে বিন্দুর অন্ততঃ হ'য়ে যাক্ না ? ষ্টেজের সেই দৃশ্যপটের রূপে—খাসা দেখবে !"

হাসিয়া শৈলবতী কহিল, আড়াল দেবার আছে রে !"

"আছে সে শকুন্তলা এক রাত্তিরের দাওান শকুন্তলা, যাক। আর সে ত আগাগোড়াই তাকে আড়াল ক'রে দাঁড়িয়ে থাকবে না ?"

"তা মা বাবা যদি ব'লেন, আর নিজে সে যেতে চায়, যাবে।"

"তা মা বাবাকে ব'লে ক'য়ে তোমাকে রাজি করিয়ে দিতে হবে। বিন্দু নিজে—সে চাইবে বই কি ? না চেয়ে পারে ? তবে লজ্জার খাতিরে মুখে খানিকটা না না ক'রবে। রাজি শেষে হবেই। সেটা আমি দেখব। তবে মা বাবাকে ব'লে ক'য়ে রাজি করিয়ে কিন্তু তোমাকে দিতে হবে।"

"সে দেখা যাবে তখন, সেতে যদি সে সত্যিই চায়।"

বেশ একটু খুসী হইয়াই মণি তখন কহিল, "তোমা-কেও যেতে হবে কিন্তু !"

"আমাকে ? পাগল হয়েছিস মণি ? আমি কোথায় যাব রে ?"

অতীন কহিল, "কেন, আপত্তি কি বৌদি ? বেশ ত যাবে, দেখে আসবে। যাও না ত কখনও কোথাও। তা নতুন ধরণের একটা 'প্লে' হচ্ছে, আরও রবীনরা করছে।"

"তা করুক। তোমরা গিয়ে সবাই দেখ—আর বিন্দু যদি যায় সেই ঢের হবে।"

"তা এত তর্ক করছিলে, বেশ ত, নিজের চোখে গিয়ে একটি বার দেখই না—কালিদাসের সেই পুরোণো শকুন্তলা আর তার এই নব্য রূপটা কোন্‌টা বেশী চিত্তাকর্ষক হবে।"

একটু হাসিয়া শৈলবতী কহিল, "চিত্তাকর্ষক যে এটা তোমাদের অনেক বেশী হবে, সেটা আমি না দেখেও নিজে এখানে দাঁড়িয়ে বলে দিতে পারি।"

"সে আমরা সব হালকা লোক, হতেও বা পারে। কিন্তু তোমার মত ধীরবুদ্ধি একজন বিচারক—"

"আমি আর কি একজন বিচারক ভাই ! আর আমার বিচারে এসে যায়ই বা কি। কত অমন লোক ত যাবে। তারাই গুণাগুণ সব বিচার করবে, সবাইকে জানাবে।"

"তা সে বিচার-টিচারের কথা নাই ধরলাম। এমনি কেবল দেখতেই না হয় একটি দিন গেলে। সকল রকম আনন্দে আপনাকে একেবারে বঞ্চিত করেই রাখতে হবে, এমনই কি কথা আছে?"

শৈলবতী একটু হাসিল, বড় মধুর অমৃতময় হাসিয়া কহিল, "কই আনন্দে ত আপনাকে বঞ্চিত করে রাখিনি ঠাকুরপো। একটি দিনও আনন্দে বই নিরানন্দে ত আমার যায় না ভাই।"

"হাঁ, কেবল ব্রত-উপোস, জপ-তপ আর শিব-পুজো! আনন্দ ত কত।"

"সে ভাই যার যেমন ভাল লাগে। তোমরা থিয়েটার দেখে, সিনেমা দেখে খুব সুখ পাও, আর আমি ঘর সেই সুখ ব্রতপুজো করেই পাই। কার কি লোকসান আছে তাতে?"

"লোকসান আর কারও কিছু বড় নেই। লোল আনা তোমারই!"

"আর আমি যদি পাল্টা বলি লোকসান তোমাদেরই হচ্ছে।"

"সে বলবে গায়ের জোরে। মানুষ এই পৃথিবীতে জন্মেছে একটু সুখের তরে যা এই পৃথিবীতে মেলে'—"

"ঠিক কথা! তবে সেই সুখের অবলম্বন লোকের আলাদা রকম হতে পারে।"

অতীন উত্তর করিল, "তা পারে। কিন্তু তাই বলে কি কেবল ব্রত-পুজো নিয়েই থাকতে হবে? আর কি কোনও কাজ নেই জীবনে?"

"থাকবে না কেন? ঢের আছে। আর আমি কি কেবল ব্রত-পুজো নিয়েই দিন কাটাই? ঐটে তোমরা ভুল বোঝ ঠাকুর-পো। কাজেও যে ঢের করি।"

নলি বলিয়া উঠিল "সে ত কর এই সংসারের যত বাজে কাজ, সে গুলো সুখের কি সখের কিছুই নয়।"

হাসিয়া শৈলবতী কহিল, "কোনটাই বাদ দিলে চলে না যে পাগল। সুখ-দুঃখ সবই এতে আছে। তোরা ত বুঝবি নি, বেঝে মানুষের অপার আনন্দ এই সব কাজে।"

"এই যেমন কীটের আনন্দ ময়লায়। তুলে তাকে ঝেড়ে মুছে সাফ কোনও যায়গায় নিয়ে রাখ, ময়লা সে আবার খুঁজে নেবেই।"

"তোদের ময়লা, কিন্তু আমাদের এই-ই ফুল চন্দন।"

"যেমন বুঝি! তা তোমাদের এই ফুল-চন্দন ত আমরা কেড়ে নিচ্ছি না। থাকতে পায়, এই নিয়েই থাক না? তাই বলে একটি দিন একটু আমাদের সঙ্গে বেড়িয়ে এলে তোমার এই ফুল-চন্দন সব পচে যাবে?"

"না, তাও যাবে না। তবে দরকারই বা কি? তোদের সখ, বেশ ত যাবি, যা,—আমার ভাল লাগে না, যাব না।"

"তুমি গেলে আমাদের খুব ভাল লাগবে।

"কেন?"

"কেন, তার কৈফিয়ৎ এখন দিতে পারব না। বলছি লাগবে, এই ঢের। আমাদের খাতিরে না হয় একদিন গেলেই। এতেই কি তোমার ব্রত ভঙ্গ হয়ে যাবে একেবারে?"

অনুনয়ের স্বরে শৈলবতী তখন কহিল, "কেন মণি অত করে বলছিস? মোটেই ভাল লাগে না আমার। কেন টেনে নিয়ে যাবি? হাঁ, যদি দুঃখু পাস, পেড়াপিড়ী করিস যাব, না গিয়ে পারব না, কিন্তু—"

কথাগুলি মণির প্রাণে গিয়া তীব্র একটা আঘাত দিল। বড় করুণ একটা বেদনা বাজিয়া উঠিল। একটু হাসিয়া সে কহিল, "দোহাই তোমার—একেবারে কেঁদেই ফেলো না দিদি। আচ্ছা, যেতে নেহাৎ নাই চাও, যেও না তুমি। তবে বিন্নু যাতে যেতে পারে, তা কিন্তু তোমাকে করে দিতেই হবে, জানলে?"

শৈলবতীর চক্ষে সত্যই একটা অশ্রুর উচ্ছ্বাস উঠিল। কিন্তু মুখখানি ভরিয়া তার মধ্যে বড় মধুর একটু হাসিও ফুটিল।

"বাচালি ভাই! আর বিন্নুর কথা—সে ত বললামই, সেতে যদি সে চায়, মা বাবাকে বলে কয়ে রাজি করিয়ে দেব।"

"আবার একটা 'যদি' রাখলে। বিন্নুকেও চাওয়াতে হবে। কে জানে সে ভঙ্গী তোমাদের—সেই হয় ত বেঁকে

বসবে, শক্ত হয়ে! মনে মনে সখ থাকলেও লজ্জার খাতিরে হয় ত বলবে, না, যাব না।"

"আচ্ছা, তাকেও রাজি করিয়ে নেব। তা কি বকসিস দিবি আমাকে বল।"

"বকসিস্? আচ্ছা, মার্কেট থেকে খুব ভাল এক ঝুড়ি ফুল এনে দেব তোমাকে কাল খুব সকালে।"

"লক্ষ্মীশ্বর হয়ে বেঁচে থাক্ ভাই। তোর বকসিস্ আমি মাথায় তুলে নিলাম।"

"এনে আগে দিই, তবে ত মাথায় তুলে নেবে।"

"দিবি ব'লেছিস, ঐ যে দেওয়া হ'য়ে গেছে ভাই!"

অতীন তখন কহিল, "তা তোমরা ভাই বোনে যাই আলোচনা কর, আমি কিন্তু তাতে রাজি নই। আমার কথা রইল, মনটা তৈরী ক'রে যদি খেতে পার, তাহলে খুসী হব। তা হ'লে উঠি এখন বৌদি, বেলা হ'য়ে গেল।"

শৈলবতী কহিল, "তা নেই গেলে ঠাকুর-পো। আজ ত রবিবার। একেবারে খাওয়া দাওয়া ক'রেই যাবে।"

"খেয়ে যেতে হ'বে? তা রেঁধে রেখে ত তুমি নিজের হাতে?"

"তাই দেব।"

"ব্যস্! তবে এই জমি নিলাম আবার।" বলিয়া অতীন আবার বসিল। শৈলবতী তাড়াতাড়ি করিয়া রন্ধনের উদ্যোগে গেল। [ক্রমশঃ

ফিরে চল

—শ্রীমোহিনী চৌধুরী

পল্লীমায়ের নয়নের জল দেখেছ বন্ধু তুমি?
শুনেছ কখন মর্ম্মরি' কাঁদে ছায়াঘেরা বনভূমি?
বাতাসে কাহার দীর্ঘনিশ্বাস তোমার মর্ম্মে লাগে?
পল্লীর কথা ভেবেছ কি প্রিয় ব্যথাভরা অনুরাগে?
পল্লী-আকাশ পাণ্ডুর হ'ল গহীন বিষাদে আজি;
বনবীথিকার ধূসায় ঝরিছে জীর্ণ মুকুলরাজি,
হাহাকার শুধু বাউলের মত পথে পথে ফেরে একা;
পল্লীর বুকে দেখেছ বন্ধু প্রাণের রক্তলেখা?
ছোট ছোট ওই কুঁড়েঘরগুলি ভীরু ভিখারীর মত
নিঃস্বতা দিয়ে ঢেকে রাখে যেন বুকের ব্যথার ক্ষত,
মাঠগুলি আজ মাতালের মত মেতেছে সর্ব্বহারা;
তবুও কি তাই তোমার নয়নে নামে নি অশ্রুধারা?
তবুও কি তুমি হ'বে উদাসীন নগরীর প্রেমে মাতি?
দুঃখের ঝড়ে রিক্তা মায়ের হবে না ব্যথার সাথী?

একদিন মোরা পল্লীমায়ের স্নেহাচল তলে ছিনু—
আজি পুনঃ সেই স্নিগ্ধ-শান্তি স্মরণ করায়ে দিনু।
যদি পার ভাই, চল যাই মোরা পল্লীর পথে ফিরে,
নীড় বাঁধি গিয়ে পল্লীদেবীর জীর্ণ নেউল ঘিরে;
মোদের মুখর কাকলীকথায় দেবীরে জাগায়ে তুলি,
বুক হ'তে তাঁর ঝেড়ে মুছে ফেলি হেলাসঞ্চিত ধূলি;
ধুয়ে ফেলি তাঁর আঙিনাখানিরে পুরান দীঘির জলে,
পুরাণ প্রদীপ আলি পুনরায় পুরানো তুলসীতলে;
পুরাণমন্ত্রে বন্দনা ক'রে দেবীরওপথানি
মধুর অতীত দিনগুলি মোরা আবার ফিরায়ে আনি।
বিজলীর বাতি চাই না মোদের, বিলাতি মাটির বেদী,
যন্ত্রযানবহুঙ্কারধ্বনি ঘরণ মর্ম্মভেদী,
বিলাস-বাসনে পল্লীমায়েরে সাজায়ে মোহিনী-বেশে
চাই না মেটাতে কামুক মনের নগরীনটীর নেশা।

শ্রী--

নারী আর পুরুষ মিলিয়া রচনা করে সংসার। পুরুষের বহির্মুখী মন সংসারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন্ধনে বন্দী হইতে চাহে না, কিন্তু মোহিনী নারী গৃহিণী হইয়া তাহাকে স্থিত করে গৃহের মধ্যে; তথাপি পুরুষ তাহার গৃহকে গৃহিণীর মত ভাল বাসিতে পারে না—হয় ত বা ভাল বাসে, কিন্তু ইহার সঙ্গে সে বহিঃপ্রকৃতিকে ভালবাসে আরও নিবিড় ভাবে; ছড়াইয়া দিতে চায় আপনাকে বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে, আহরণ করিতে চায় বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সৌন্দর্য্য-সম্ভার, কিন্তু এখানেও তাহার বিক্ষিপ্ত মনকে কেন্দ্রীভূত করিয়া সংহত করিয়া রাখে তাহার প্রিয়তম নারীর হৃদয়—নারী তাই গৃহের এবং সমাজের কল্যাণী।

সৃষ্টি স্রোতে পুরুষ হয় ত কোন দিনই কূলে আসিয়া লাগিতে পারিত না, যদি না নারী-হৃদয় তাহাকে সবলে আকর্ষণ করিয়া কূলে ভিড়াইত। নারী-হৃদয়ের সমস্ত ঐকান্তিকতা, তাই অন্তর্মুখী—অন্তঃপুরের দিকে! আধুনিক নারী যে বাহিরের দিকে ক্রমশঃ ছুটিয়া চলিতেছে উহা তাহার স্বভাবসিদ্ধ গতি নহে, স্বভাবের বিরুদ্ধে যুগের হাওয়া তাহাকে বিপথগামী করিতেছে। যুগ-যুগান্ত ধরিয়া সর্ব্ব-দেশের মানব-সভ্যতা নারীকে অন্তঃপুরের আসন ছাড়িয়া দিয়াছে এবং বহু বিপ্লব ও শান্তির মধ্য দিয়া নিঃসংশয়রূপে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে যে, নারীর আসন প্রধানতঃ অন্তঃপুরে। ভারতের আর্য্য সংস্কৃতি নারীকে অন্তঃপুরের আসনে সুপ্রতিষ্ঠ করিয়া বাহিরেও স্বামী-পুত্রের পার্শ্বে তাহার স্থান করিয়া দিয়াছিল, কিন্তু অন্তঃপুরকে ত্যাগ করিয়া নহে, অন্তঃপুরের সহিত সংযোগ রাখিয়াই। অতএব নারীর প্রধান স্থান ও তৎসম্বন্ধে করণীয় বিষয়গুলি সম্বন্ধে আমরা এই প্রবন্ধটিতে ক্রমশঃ আলোচনা করিব। পল্লীগ্রাম লইয়াই বাংলাদেশ, সেই জন্য এই প্রবন্ধে সাধারণতঃ পল্লীগ্রামের মধ্যবিত্ত পরিবারের অন্তঃপুর সম্বন্ধে আলোচনা হওয়াই সমীচীন।

আধুনিক ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে এবং সর্দ্দা-আইনের ফলে আজকাল মেয়েদের বিবাহ একটু বেশী বয়সেই (চৌদ্দ হইতে আঠার) দেওয়া হইতেছে। অবশ্য সহরে যাহারা বি-এ, এম-এ পড়েন, আমি তাঁহাদের কথা বলিতেছি না। বিবাহের পর দ্বিরাগমনে মেয়েটি শ্বশুরবাড়ী আসে এবং স্বামীর সংসারে আপনাকে মিলাইয়া এক করিয়া লয়। স্বামীর সংসারকে নিজের সংসার বলিয়া ভাবিতে শিখা এবং সেখানকার দেবর ননদ ইত্যাদির সহিত নিজেকে মিলাইয়া লওয়ার শিক্ষা মেয়ের পিতামাতা তাহাকে দিবেন ইহাই বাংলাদেশে স্বাভাবিক। সৌভাগ্যের বিষয়, এ দেশে মেয়েরা উহা সহজেই শিখিয়া লইতে পারে।

স্বামীর সংসারে আসিলে প্রথম প্রথম বধূকে বিশেষ কোন শক্ত কাজ করিতে দেওয়া হয় না। পান সাজা, জল দেওয়া, বিছানা পাতা, বড় জোর শ্বশুর বা শাশুড়ীর পায়ে একটু তেল মালিশ করিয়া দেওয়া—ইহাই হইল তাহার স্বামীগৃহের প্রথম ভাগ পড়ার কাজ। কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই সে স্বামিগৃহের পারিপার্শ্বিক অবস্থাটা দেখিয়া লয়, সকলের মনের গতি বুঝিয়া লয় এবং গৃহস্থের অন্যান্য অবশ্য-করণীয় বিষয়গুলি শিখিয়া লইতে পারে। সৌভাগ্যক্রমে যাহারা স্নেহশীলা শাশুড়ী-ননদ পায়, তাহাদের এই সব কাজ শিখিতে কিছুমাত্র দেরি হয় না। অনেকেই বাপের বাড়ী হইতে ভাল ভাবেই ইহা শিখিয়া আসে, এবং অচিরে স্বামিগৃহের সকলের প্রিয় হইতে পারে। কিন্তু যাহারা শিখিয়া আসে না বা যাহারা আরও ভাল ভাবে শিখিতে চায়, তাহারা এই প্রবন্ধ

হইতে উপকার পাইতে পারে, এই আশাতেই ইহার আলোচনা করা যাইতেছে।

বধূর প্রথম কর্ত্তব্য হইতেছে, স্বামিগৃহের সকলের সেবাদ্বারা তাঁহাদের মন আকর্ষণ করা। বাড়ীর ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা নববধূকে পাইলেই গল্প শুনিতে চায়, তাহাদের মনোরঞ্জন করিবার জন্য বধূর শিশুদের উপযোগী নীতিমূলক ছোট ছোট গল্প কিছু শিখিয়া রাখা দরকার। ইহাতে ছেলেমেয়েদের মনকে সে বশীভূত করিতে পারে। নববধূ লজ্জাবশতঃ প্রথম প্রথম কাহারও সহিত কথা বলিতে পারে না। যদি বাড়ীর ছোট দুই একটি ছেলেমেয়ে তাহার হাতের কাছে থাকে, তবে সে তাহাদের মারফৎ অনেক কথা গুরুজনদের বলাইয়া লইতে পারে। বাহিরের কোন বস্তু আবশ্যক হইলে উহাদের দ্বারা আনাইতে পারে এবং ছেলেদের প্রিয় বলিয়া ছেলেদের মাতাপিতাও বধূর উপর খুসী থাকেন। বধূদের শিক্ষণীয় দুই চারিটি ছোট গল্প ভবিষ্যতে দিবার ইচ্ছা থাকিল, কিন্তু এখানে তাহা পারিয়া উঠিলাম না।

বৃদ্ধা দিদিশাশুড়ী বা শাশুড়ী থাকিলে অবসরসময়ে তাঁহাদের নিকট বসিয়া রামায়ণ-মহাভারত প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ বাঙ্গালী বধূজীবনের অবশ্য-করণীয় কার্য্য। ইহাতে গুরুজনরা সকলেই প্রীত থাকেন এবং বধূরও অবসর সময় অনেকে কাটিয়া যায়।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত যাহা বলিলাম, তাহা শ্বশুরগৃহে বধূর অতি সাধারণ জীবনের কথা এবং সকল বাঙ্গালী মেয়েই স্বভাবতঃ এই সমস্ত গুণে গুণী। কিন্তু শ্বশুরগৃহে সকলের মন আকর্ষণ করিবার জন্য বধূকে কয়েকটি বিশেষ বিদ্যায় পারদর্শিনী হইতে হইবে।

পান-সাজা

পল্লীগ্রামে সকলেই প্রায় পান খায়, দুই বেলা আহারান্তে পান ও অপরিহার্য্য। নববধূকে শ্বশুরঘরে প্রথমে এই পান-সাজার কার্য্য করিতে দেওয়া হয়। পান নানাবিধ মশলা সংযোগে নানারূপ আকৃতিতে তৈয়ারী হইতে পারে। সাধারণতঃ যাহা যাহা দরকার তাহাই লিখিত হইল। পাঠিকাদের মধ্যে কাহারও বিশেষরূপ পান-সাজা জানা থাকিলে, 'বঙ্গশ্রীর' ঠিকানায় এই বিভাগে জানাইলে কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহার নাম স্বীকৃত হইবে।

পান সাজিবার জন্য প্রয়োজন, এক গুচ্ছ পান; কয়েকটি সুপারী, খয়ের ও চুণ, একগাছি জাঁতি, চুণ দিবার জন্য একটি বাঁশের ছিপা, খয়ের তুলিবার জন্য একটি ছোট চামচের আকারের বস্তু এবং পানগুলি সরস রাখিবার জন্য এক টুকরা ভিজা ন্যাকড়া। ইহা ছাড়া অন্য নানারূপ মশলা, যথা বড় এলাইচ, লবঙ্গ, কর্পূর, পিপারমেন্ট, মোরান, মউরী, বৈত্রী, গোলাপী আতর, গোলাপ জল, কিমাম, সেন্তা প্রভৃতি। কিন্তু সাধারণ পান সাজিবার জন্য এই সব মশলার প্রয়োজন হয় না, এবং সাধারণ পানকে উপাদেয় করিয়া সাজার মধ্যেই বাহাদুরী বেশি।

পান সাজিবার পূর্ব্বে সুপারীগুলি কুচাইয়া লইতে হয়। গোটা সুপারী কাটিয়া আধখানা করিয়া সন্ধ্যার সময় জলে ভিজাইয়া রাখিলে পরদিন বেশ নরম হইয়া উঠে এবং সরু চিঁড়ার মত আকারে কাটা যাইতে পারে। পূর্ব্বে আমাদের দেশে কে কতখানি সূক্ষ্ম সুপারী কাটিতে পারে, তাহা লইয়া প্রতিযোগিতা চলিত। এখনও পল্লীগ্রামে মেয়েরা চুলের মত সরু সুপারী কাটিতে পারে। আধুনিক শিক্ষার মোহে আমরা ক্রমশঃ ইহা ভুলিয়া যাইতেছি এবং আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ যোগান দিবার ভার দিতেছি স্থানীয় বাজারের উপর। কত কুৎসিত সুপারী কতখানি মোটা ভাবে কাটা হইয়া যে বাজারের সুদৃশ্য ঠোঙায় রক্ষিত হয়, তাহার হিসাব রাখি কয় জন। থাক সে কথা। সুপারীগুলি কুচাইয়া একটি ঢাকনাযুক্ত টিনের কৌটায় রাখিতে হয়, ঢাকনা না থাকিলে উহা শুকাইয়া শক্ত ও বিস্বাদ হইয়া উঠে। জাঁতি ধরিতে ভালরূপে অভ্যাস করা উচিত। ঐ সুপারীর টিনের মধ্যে সাধ্য থাকিলে ন্যাকড়ার পুটুলিতে বাঁধিয়া একটি মৃগনাভির দানা রাখিয়া দিলে পানে আর কোন মশলার আবশ্যক হয় না। সুপারীর গন্ধ আকর্ষণ করিবার শক্তি খুবই বেশি, মৃগনাভির গন্ধটি একদিনেই সুপারী নিজস্ব করিয়া লয়।

তাহার পর স্বতন্ত্র একটি পাত্রে খয়েরগুলি গুঁড়া করিয়া রাখিতে হইবে। খয়ের ভিজাইয়া মাটির ভাঁড়েও রাখা যাইতে পারে, যাহার যেমন সুবিধা করিতে পারেন, তবে বেশী

পান সাজিতে হইলে জিভা খয়েরেই সাজা ভাল, কারণ ইহাতে অপব্যয় হয় না এবং পরিমাণও ঠিক করা সহজ হয়।

অন্য একটি পাত্রে চুণ রাখিতে হইবে। চুণ টাটকা হইলে তাহার তেজ খুব বেশী থাকে, সামান্য মাত্রা বেশী হইলে জিভ পুড়িয়া যায়, এরূপ টাটকা চুণ অতি সাবধানে কম মাত্রায় ব্যবহার করা উচিত। পান, চুণ, খয়ের ও সুপারী মোটামুটি ইহাই হইল পানের সাজ।

সাজিবার পূর্ব্বে পানগুলিকে পরিষ্কার জলে একটি একটি করিয়া ধুইয়া লইতে হইবে। কোন স্থান পচিয়া গেলে সাবধানে তাহা কাঁচি দিয়া কাটিয়া ফেলিতে হয়। কাটিয়া না দিলে ঐ পানটির বাকি অংশও শীঘ্র পচিয়া যায়। ধোয়া পানগুলির এক একটি মাঝখানে ভাঁজ করিয়া বোঁটা ধরিয়া চিরিয়া ফেলিবে। যতগুলি সাজা পানের দরকার ততগুলিই চিরিবে। সাধারণতঃ বেড়খানি পানে দুইটি খিলি তৈরী হইতে পারে, তবে ইহাতে পান একটু পাতলা হয়। এক একটি পানের পাতায় এক একটি খিলি তৈরী করা ভাল, তবে যাঁহারা একসঙ্গে দুই খিলি পান মুখে দেন-তাঁহাদের জন্য পাতলা পান তৈয়ারী করাই উচিত।

একটি বড় ট্রেতে বা থালায় কিংবা কলাপাতায় পানগুলি চিরিয়া এক একটি ফালি উল্টা করিয়া রাখিবে, যেন তাহার খসখসে দিকটা উপরে থাকে, তার পর অন্য একটি ফালি লইয়া তাহার আধখানি প্রথমে রাখা ফালির উপর এরূপ ভাবে দিবে, যেন তাহার মসৃণ দিকটি উপরে থাকে। ইহাতে চুণ লাগাইবার সুবিধা হয়। পানগুলি সব থালায় সাজান হইলে তাহার উপর পরিমাণ মত (পরিমাণ না জানিলে খুব কম করিয়া) চুণ দিবে চুণ দিবার বাঁশের ছিলাটিতে করিয়া। আঙ্গুলে করিয়া চুণ দিলে হাতে বিশ্রী দাগ হয়, দু'একদিন অভ্যাস করিলেই বাঁশের ছিলায় চুণ দেওয়া যায়। চুণ দিয়া পরিমাণ মত খয়ের গুঁড়া বা গোলা খয়ের দিবে ও তাহার পর খুব অল্প পরিমাণ সুপারী কুচা দিবে। সাধারণ পানে ইহার বেশী কিছু দিবার দরকার নাই, ইচ্ছা হইলে বড় এলাইচের দানা দু'একটি, এবং খুব অল্প কৈত্রী দিতে পারা যায়।

এইবার পানগুলি গুটাইয়া খিলি করিতে হইবে, খিলি করা শেখা দরকার। পল্লীগ্রামের মেয়েরা অশ্বত্থ পাতার খিলি করা প্রথমে উহা শিখিয়া লয়। একটি অশ্বত্থ পাতায় দুইটি জোড়া খিলি করিয়া উহারা পুতুল খেলার পান সাজে। যাহা হউক, পানগুলি খিলি করিয়া একটি লবঙ্গ ফুঁড়িয়া দিতে পার। ইহাতে খিলি সহজে খোলে না, দেখিতেও সুন্দর হয় এবং উহার আস্বাদও ভাল হয়। সব খিলিগুলি তৈয়ারী হইলে একটি ঢাকনাযুক্ত পাত্রে রাখিয়া একটি ভিজা ন্যাকড়া উহার উপর চাপা দিয়া ঢাকা দিবে। সম্ভব হইলে দু'চার ফোঁটা গোলাপজল ছিটাইয়া দিলে পানের গন্ধটি চমৎকার হইবে। ইহাই হইল সাধারণ পান সাজা। বেশীক্ষণ সাজা থাকিলে পানের আস্বাদ নষ্ট হইয়া যায়—কাজেই প্রয়োজনের অতিরিক্ত উহা কখন সাজিবে না।

পাঠিকাদের মধ্যে অনেকেই হয়ত মনে করিতে পারেন যে সামান্য পান সাজা—তাহা বাংলার সকল মেয়েই জানে, তাহা লইয়া আমরা কেন এতখানি সময় নষ্ট করিলাম—কিন্তু তাঁহাদের বোঝা উচিত যে, বালিকা-বধূ শ্বশুরগৃহে অতি সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য অতি নির্দ্দয়ভাবে সমালোচিত, কখনও বা নিন্দিত এবং নির্য্যাতিত হয়। কাজেই তুচ্ছ হইলেও ব্যাপারটা তাহার খুব ভালরূপে জানিয়া রাখা উচিত।

পান সাজার প্রকারভেদ সম্বন্ধে আমরা পরবর্ত্তী সংখ্যায় আলোচনা করিব।

জল দেওয়া

নববধূকে শ্বশুর, শাশুড়ী, দেবর, ননদকে জল দিতে হয়। ইহাও শিক্ষা করা উচিত।

যদিও পল্লীর প্রত্যেক মেয়ে এ সব কাজ বাপের বাড়ী হইতে শিখিয়া আসে, তবুও খুঁটিনাটি বিষয়গুলির আলোচনা তাহাদের অনেক কাজে লাগিতে পারে।

প্রথমতঃ জল আনা। পুকুরের বা নদীর জল পানের জন্য বধূকে কলসীতে করিয়া তুলিয়া আনিতে হয়। নদীর স্রোতের জল হইলে তাহা কলসীতে ভরিবার কৌশলটি শিক্ষা করা দরকার। স্রোতের উপরে অনেক ময়লা ভাসে, সে জল না তুলিয়া কলসীটির মুখ ঢাকিয়া জলের মধ্যে ডুবাইবে এবং ডুবান কলসীর মুখ খুলিয়া দিয়া জল ভর্ত্তি করিবে, তারপর তাহা জলের উপর তুলিয়া বাড়ী আনিবে। পুকুরের জলও ঐরূপ ভাবে তুলিয়া আনা উচিত। ইহাতে জলে ময়লা আসিতে পারে না। গৃহে আনিয়া কলসীটি একস্থানে

রাখিয়া দিবে, দুই-তিন ঘণ্টা পরে উহা নিতাইয়া গেলে অল্প একটি কুঁজা বা বালিমাটির কলসীতে ঐ জল আস্তে আস্তে ঢালিয়া লইবে। ঢালিবার সময় একখণ্ড সুপরিষ্কার কাপড় কলসীর মুখে দিয়া জলটি ছাঁকিয়া লইবে। অতি সামান্য পরিমাণ ফিট্‌কিরি প্রথমেই জলের মধ্যে ফেলিয়া দিলে জলের ময়লা অতি শীঘ্র নীচে বিসিয়া যায়। যাঁহারা ফিল্‌টার ব্যবহার করেন, তাঁহাদের জন্য এ প্রবন্ধ লেখা হইতেছে না। দরিদ্র মধ্যবিত্ত গৃহস্থদের কন্যাবধূর জন্যই ইহা লেখা হইতেছে।

জলটি ছাঁকিয়া কলসীতে করা হইলে উহা একটি খড়ের বিড়ায় বসাইয়া সযত্নে ঢাকিয়া রাখিবে। জলের কলসী কোন সময় যেন খোলা না থাকে।

গ্রীষ্মকালে জল ঠাণ্ডা করিবার জন্য বহুবিধ উপায় প্রচলিত আছে। কয়েকটি নিম্নে দেওয়া হইল।

পুরাতন পুদুরের পাকনাটি কলসীর গায়ে লেপিয়া দিলে জল অল্পকাল মধ্যেই ঠাণ্ডা হয়—কিন্তু এই উপায় সকলের পক্ষে সুবিধাজনক নহে।

কলসীর মুখে ভিজা কাপড় দিয়া বৈকালে আকাশের তলে ঝুলাইয়া রাখিলে জল বেশ ঠাণ্ডা হয়। আর একটি সহজ উপায়—দুপুরের রৌদ্রে জলের কুঁজাটি মুখ চাকিয়া রাখিয়া দিলে বেলা পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে উহা ঠাণ্ডা হইয়া যায়, সেই শীতল জল সত্যই উপাদেয়। রাত্রে কলসের কুঁজার মুখ পরিষ্কার ভিজা ন্যাকড়ায় বাঁধিয়া আকাশের তলে রাখিয়া দিলে সকালে উহা সুশীতল হইয়া যায়—সারাদিন ঐ জল ব্যবহার করা চলে। জল ঠাণ্ডা করিবার আরও নানারূপ উপায় আছে—সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধার উপায় কলসীর চারিদিকে বরফ দিয়া রাখা, জলের কলসীর ভিতর বরফ দেওয়া কখনই উচিত নয়, উহাতে জল ঠাণ্ডা হইলেও অসুবিধ বহু দোষ ঘটিয়া থাকে।

নববধূকে স্বামিগৃহের সকলের জন্য খাবার জল, পান চা ইত্যাদি পরিবেশন করিতে হয়। জল পরিবেশনের সময় খুব ভালরূপে মনে রাখিতে হইবে, যে-পাত্রে উহা পরিবেশিত হইতেছে, তাহার পরিচ্ছন্নতার কথা। কদাচ যেন গ্লাসে কোনরূপ ময়লা না থাকে—সামান্য ময়লা গ্লাসে লাগিয়া থাকিলেই বধূকে বিস্তর তিরস্কার সহ্য করিতে হয়—কারণ সে বাড়ীর বধূ, পরিজনের সেবা-পরিচর্য্যা তাহারই দায়িত্ব। ঐ জল তাহার ননদ পরিবেশন করিলে হয়ত কিছুই গোলযোগ হইত না, কিন্তু বধূর বেলায় উহা গুরুতর অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।

অবশ্য স্বাস্থ্যের দিকটাও এক্ষেত্রে চিন্তনীয়। বধূ তাহার কাজগুলি যতই নিপুণ হস্তে সুপরিচ্ছন্ন ভাবে করিতে পারিবে, ততই তাহার সুনাম বৃদ্ধি হইবে এবং সে সকলের প্রিয় হইয়া উঠিবে।

কাচের গ্লাসে জল পরিবেশন বিশেষ সুবিধাজনক, কারণ ইহা স্বচ্ছ ও পরিষ্কার; কিন্তু পল্লীগ্রামে এখনো কাচের গ্লাসের চলন হয় নাই, কাঁসার গ্লাসই সেখানে প্রচলিত। কাঁসার গ্লাসের প্রধান দোষ এই যে, যথাসময়ে না মাজিলে উহার ভেতরটা দুর্গন্ধযুক্ত হইয়া যায়। ঐরূপ গন্ধযুক্ত গ্লাসে জল দিলে যিনি জল খাইবেন, তাঁহার নাক ও মুখ কুঞ্চিত হইয়া উঠিবে এবং বধূ তিরস্কৃত হইবে।

গ্লাসে জল গড়াইয়া উহা এমনভাবে ধরিবে, জলে হাতের আঙ্গুলের স্পর্শ না লাগে। জল গড়াইয়া গ্লাসের ভিতর তাকাইয়া একবার দেখিয়া লইবে জলে কোনরূপ কিছু পড়িয়াছে কি না—না দেখিয়া জল কখনও খাইতে দিবে না। কয়েকদিন একটু ধৈর্য্য ধরিয়া অভ্যাস করিলে জল গড়াইয়া দেওয়া একটা অভ্যাসে পরিণত হইয়া যাইবে। জল দিবার সময় লক্ষ্য করা উচিত, যেন উহা চলকিয়া নিজের বা অন্য কাহারও কাপড়-জামা ভিজাইয়া না দেয়। অতি সাবধানে উহা জলপানেচ্ছুর সম্মুখে ধরিতে হইবে। এই অতি সাধারণ কথাগুলি এত বিশদ করিয়া লিখিলাম এই জন্য যে, বালিকাবধূরা, বিশেষ আধুনিক লেখাপড়া-জানা মেয়েদের, এই সমস্ত অতিতুচ্ছ ব্যাপারকে উপেক্ষা করার জন্য প্রায়ই ভুল হইয়া যায় এবং শ্বশুরবাড়ীর লোকের অপ্রিয় হইতে হয়।

চা তৈয়ারী করা

ভালই হউক আর মন্দই হউক বাঙ্গালীর সংসারে চা এখন সর্ব্বত্রই ঢুকিয়াছে। নববধূকে চা তৈয়ারী ও পরিবেশন করিবার ভার দেওয়া হয়। বাপের বাড়ী হইতে বিবাহের পূর্ব্বেই বধূর ইহা শিখিয়া আসা উচিত। চা তৈয়ারী অতি সহজ কার্য্য হইলেও ঠিকমত চায়ের মুতার ফুটাইয়া

তোলা খুবই কঠিন। এই বিষয়ে কতকগুলি জিনিষের দিকে বিশেষ নজর দিতে হয়। চা তৈয়ারীর জন্য দরকার, কিছু ভাল পাতা বা গুঁড়া চা জল গরম করিবার জন্য কেটলী, ছাঁকিবার জন্য ছাঁকনী, রাখিবার জন্য টি-পট, দুধ, চিনি, চামচ ও পেয়ালাপিরিচ।

সর্ব্বপ্রথম জানিয়া রাখা উচিত যে, চায়ের জন্য জল ফুটন্ত গরম হওয়া চাই—আবার যে জল বেশীক্ষণ ফুটিতেছে, তাহাতে চায়ের স্বাদ ভাল হয় না। কুয়া বা ইঁদারার জলে চায়ের স্বাদ খারাপ হয় এবং মুখখোলা পাত্রে জল গরম করিলে চা ভাল হয় না। কেটলীতে যখন জল ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন প্রত্যেক সাধারণ পেয়ালার জন্য চা-চামচের একচামচ ও বাড়তি একচামচ ভাল পাতা চা টি-পটে দিবে এবং কেটলী হইতে ফুটন্ত গরম জল টি-পটে ঢালিয়া দিবে। যত চামচ চা দেওয়া হইয়াছে, জলের পরিমাণ তত কাপ না হইয়া এক কাপ কম হইবে। জল ঢালিয়াই টি-পটের মুখ বন্ধ করিয়া দিবে। তিন মিনিট হইতে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই লিকার তৈয়ারী হইয়া যায়—অবশ্য চায়ের গুণাগুণ অনুযায়ী সামান্য ইতরবিশেষ হইতে পারে, তাহা একদিনেই বোঝা যাইবে।

ইতিমধ্যে কাপে কাপে এক চামচ করিয়া খাঁটি গরম দুধ ও দেড় চামচ করিয়া সাদা চিনি দিয়া রাখিবে। লিকার তৈয়ারী হইলে টি-পটের মুখনলে ছাকনী দিয়া উহা প্রত্যেক কাপে ঢালিয়া দিবে এবং চামচ দিয়া নাড়িয়া দুধ চিনি মিশাইয়া দিবে। চায়ের সুগন্ধটি বাহির না হইলে চা তৈয়ারী ঠিক হইল না বুঝিতে হইবে।

আজকালকার দিনে চা তৈয়ারী করিতে না পারা একটা অপরাধ এবং ভাল চা তৈয়ারী করিতে পারার মধ্যে একটা তৃপ্তি আছে। উহা এখন আপামরসাধারণের দৈনিক খাদ্য-তালিকার অন্তর্ভুক্ত। অতএব সযত্নে উহার প্রস্তুত-প্রণালী শিক্ষা করা উচিত।

মহামানব

—শ্রীঅমিয়কৃষ্ণ রায়চৌধুরী

আবির্ভাব কবে তব, কবে হায় হ'ল তিরোধান—
মোরা তো জানি না কিছু, পাইনি কো তাহার সন্ধান!
কোষ্ঠীহারা গোষ্ঠীহারা জীবনের তব পরিচয়,
কোন ইতিহাস তুলি' রাখেনি কো করিয়া অক্ষয়!

কেবা ছিল পিতামাতা, কে বা বধূ, কে বা তব গুরু?
হে মহীমান! কি প্রথায় আরাধনা করেছিলে সুরু?
কেমনে বলিব হায়, কি বা ছিল আহার-বিহার,
ভাবি তাই, বুঝি তুমি মানস-সন্তান বিধাতার।

করিতে কাহার পূজা, কোন্ শাস্ত্র পড়িতে মহীমান?
সে কোন্ আসনে বসি, কারে স্মরি করিতে ধেয়ান?
গৃহী কি বৈরাগী ছিলে, কোন্ ধর্ম্মে ছিলে নাহি জানি!
এই মাত্র জানি মোরা—তোমার অমৃতময় বাণী—

বৃথা নাহি হ'ল হারা—তব বাণী মধুময় হ'য়ে—
পড়েছিল স্বর্গধারা, সবাকার হৃদয়ে হৃদয়ে!
আপন সৃজিত ধর্ম্মে বেঁধেছিলে সব সম্প্রদায়;
জাতিহারা, ধর্ম্মহারা, কেহ কভু ভাবেনি তোমায়!

তোমার আঙ্গিনা তলে, রাজাপ্রজা হ'ল একাকার,
ধূলির আসনে তারা দিবাজ্ঞান লভিল অপার।
তব শুভ শঙ্খনাদ পশেছিল সবার অন্তরে।
মিথ্যা ধর্ম্ম অভিমান, দূর হ'ল তব শুভ বরে!

কিন্তু হায়! তব বাণী মিলায়েছে সুদূরের প্রান্তরে।
অশান্তি অনল শিখা করে স্পর্শ সবার অন্তরে।
অনাচার অবিচার ছায় আজি ভুবন গগন;
হে মহান্! কোথা তুমি, কবে পুনঃ হবে আগমন।

বৈষ্ণবকবি লোচনদাস

—শ্রীরামপদী কর্ম্মকার

'চৈতন্যমঙ্গল'-রচয়িতা লোচনদাসের কয়েকটি গ্রন্থ পুথীর আকারে আমাদের হস্তগত হইয়াছে। পুথীগুলি বড় নহে, তবে কিছু প্রাচীন বটে। 'আনন্দলতিকা'-নামক পুথীটির পত্র-সংখ্যা ১৬। ইহার নকলের তারিখ সন ১০৮০, ৮ই ভাদ্র অর্থাৎ ইংরাজি ১৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দ। 'দুর্ল্লভসার'-নামক পুথীর পত্রসংখ্যা ২৩, নকলের তারিখ সন ১০৫৭, ৮ই ফাল্গুন, অর্থাৎ ইং ১৬৫১,-ফেব্রুয়ারী। 'বস্তুতত্ত্বসার' পুথীখানি খুব ছোট, পত্রসংখ্যা মোট ৪; নকলের তারিখ সন ১২৩৪, ২৯শে জ্যৈষ্ঠ, অর্থাৎ ১৮২৭ খৃষ্টাব্দ। 'শিবদুর্গা সংবাদ' নামে দুইটি পুথী পাইয়াছি। দুঃখের বিষয় কোনটির তারিখ নাই। প্রথমটি ১৩ পাতায় সম্পূর্ণ। দ্বিতীয়টি ১২ পাতায়; তন্মধ্যে ২য় ও ৩য় পত্র নাই।

এই গ্রন্থগুলি যে একই লোচনদাসের রচিত, তাহার অন্যান্য নিদর্শনের মধ্যে বন্দনাকবিতাটি প্রধান বলিয়া মনে হয়।

'বস্তুতত্ত্বসারে'র অংশবিশেষ আমি ইতিপূর্ব্বে মৎপ্রণীত 'কলিবিদ্যাপতি' পুস্তিকায় প্রকাশ করিয়াছি। এই গ্রন্থে চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি আচরিত সাধন-ভজনতত্ত্বের উল্লেখ আছে। আর আছে বিদ্যাপতির জীবনী।

'বিদ্যাপতি ঠাকুরের শুন বিবরণ।
লছিমা সহিত তাঁর যেরূপে মিলন॥'

চণ্ডীদাসের রামী-মিলন যেরূপে দৈব-প্রেরণায় ঘটে, এই গ্রন্থে বিদ্যাপতির লছিমা-সমাগমও যে সেরূপায় ঘটিয়াছিল, তাহা বর্ণিত হইয়াছে। বেশ কৌতুকপ্রদ।

'শিবদুর্গা-সংবাদে' রাধাকৃষ্ণের তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে, তাহা অশৌক্ষিতের অবোধ্য বলিয়া মনে হয়। সৃষ্টিতত্ত্ব, এবং রাধা ও চন্দ্রাবলীর শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্তির কারণ নির্দ্দিষ্ট আছে। গ্রন্থান্তে লেখক বলিতেছেন—

'শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্ম করি আশা।
এ পদ্য পুরাণ তত্ত্বসার উদ্দেশ॥
রাধাকৃষ্ণ-পাদপদ্ম দৃঢ়নতজন।
লোক ভাবাক্ষরে মহাভাবত-বচন॥
চতুর্থোদী প্রহরের নিকৈলাসে বসে।
অপার প্রসঙ্গে ভণে এ লোচন দাস॥

উপরিলিখিত পদ্যাংশে মহাভারতের উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাভারতে রাধাতত্ত্ব আছে কি? না। 'দুর্ল্লভসার' গ্রন্থখানি অনেক তত্ত্বের আকর। ইহাতে কবির আত্মবিবরণীও আছে। অবশ্য 'চৈতন্যমঙ্গলে' কবি ইতিপূর্ব্বেই নিজের জীবন-বৃত্তান্ত দিয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থে কবি লিখিতেছেন—

'মুরারিগুপ্ত প্রভুর অবতরিল।
তাঁর প্রসাদে মোর পরম চিত্ত॥
পাতালি প্রবন্ধে আমি রচিল এবং।

•

'চারিখণ্ড পুথি সার করিল প্রকাশ।
বৈদ্যকুলে জন্ম মোর যো গ্রামে নিবাস।
মাতা শুদ্ধমতি পরায়ণি নাম।
যাহার উদরে জন্মি কবি কৃষ্ণ নাম।
কমলাকর দাস মোর বিদ্যাতিলোত্তমা।
তাহার প্রসাদে মুনি পৌর গুণ গাথা।
সংসারে জন্ম যিহ সেই মাতাপিতা।
নবহরি দাস মোর বিদ্যাতিলোত্তমা।
তাহার প্রসাদে যে সুনীল প্রকাশ।
আনন্দে গাহিল গুণ এ লোচন দাস॥
মাতামহাকুল মোর করো কীর্ত্তি কথা।
মোর অভিপ্রতিকুল অধ্যাপক কর্ত্তা।
মাতৃকুল পিতৃকুল বৈসনি এক গ্রামে।
বহু যাতায়হি সে অম্বরাগাদি নামে।
মাতামহো নাম শ্রীপুরুষোত্তম গুপ্ত।
নানাতীর্থপুত তেহোঁ তপস্যাএ তৃপ্ত॥
মাতৃকুলে পিতৃকুলে আমি একাদায়।
সম্বন্ধের নাহি যে মাতামহের পুত্র।
থাকা থাকো যদি আমি না থাকিএ ঘরে।
ত্রিদিন লাগিয়া কেহো পাসরিবে নারে॥

বাহিরা বহিকা মোরে শিখাইল আখর।
নরহরি দাস মোর প্রাণের ঈশ্বর॥'

প্রথম পংক্তির 'অনঙ্গবিণ' শব্দ দুরোধ্য। শেষ দিকের 'দুর্শিল' শব্দ স্থানে চৈতন্যমঙ্গলে 'দুর্লভ' পাঠ মানবীয় দেন মহাশয় উদ্ধার করিয়াছেন। 'দুর্লভ' মানে 'আদুরে,' কিন্তু 'দুর্শিল' মানে 'ঝগড়াটে'।

ছন্দ হিসাবে 'বৈষ্ণব' শব্দ 'বৈষ্ণব' রূপে লিখিত হইয়াছে; অবশ্য অর্থের অবংপতন ঘটে নাই। এই গ্রন্থের প্রথম পাতার অনুসারে গরুড়পুরাণে চৈতন্যদেবের নির্দেশ আছে।

আনন্দলতিকায় কবি লিখিতেছেন—

'নিজকুলে জন্ম মোর দুঃখি নিরবধি।
মো সম পাপিষ্ঠ কেহো নাহি ত্রিভুবন॥
সদা নিরুপমা মোর নিচ ব্যবহার।
সদা নিচ সঙ্গে হয় মুক্তি দুরাচার॥
কাম ক্রোধ লোভ মোহে সদা মুক্ত হঞা।
সংসারে রহিনু পড়ি প্রভু না ভজিঞা॥
বানক তরুণ বৃদ্ধকাল মোর গেল।
চৈতন্য চরণে তবু মন না হইল॥' (পৃঃ ১০খ)

এই স্থানে নিজের বংশেরও নীচত্ব প্রখ্যাপন বৈষ্ণবীয় 'তৃণাদপি সুনীচেন' নীতির অন্যতম উদাহরণ বলিয়া মনে হয়। আর এক কথা। দীনেশ বাবু, লোচনদাসের ১৪ বৎসর বয়সে গুরুর আদেশে চৈতন্যমঙ্গল রচনার প্রবাদ ভিত্তিহীন বলিয়া, দেখাইয়াছেন যে, কবি প্রৌঢ় বয়সে গ্রন্থ রচনা করেন। 'আনন্দলতিকা' এই মতের সমর্থন করিতেছে।

'আনন্দলতিকা' গ্রন্থখানি ঐতিহাসিকের নিকট মূল্যবান বলিয়া মনে হয়। 'চৈতন্যচরিতামৃতের' মধ্যখণ্ডে ১ম পরিচ্ছেদের প্রায় অর্দ্ধেক, 'আনন্দলতিকায়' রহিয়াছে। 'প্রত্যহ আসিবে সভে শুতিচা দেখিবারে' পঙ্‌ক্তি হইতে 'রাত্রি দিবা কৃষ্ণ কথা রামানন্দ সনে' পর্য্যন্ত মনে হয় চরিতামৃতকার 'আনন্দলতিকা' হইতে গ্রহণ করিয়াছেন।

'চৈতন্যমঙ্গল' নাম লইয়া বৃন্দাবন দাসের সঙ্গে লোচনদাসের বিবাদের প্রবাদেও দীনেশ বাবুর কোন আস্থা নাই। আমাদেরও বিশেষ সন্দেহ জন্মিতেছে।

আনন্দলতিকায় (১ম পৃষ্ঠা) লোচন বলিতেছেন—

'এ সব বৃত্তান্ত গোসাঞি গাপকুমারে।
চৈতন্য ভাগবতে সব করিল রচন॥
পুনরুক্তি দিবি তবে হান আছা পাঞা।
কেমনে করিল দয়া মোরে আজ্ঞা দিঞা॥'

পুনশ্চ ১৪শ পাতায় উক্ত হইয়াছে—

'চরিতক্তি কহনারে গোসাঞি বৃন্দাবন।
যাহা অতঃকথা তিহো করিল রচন॥
চৈতন্যের অন্তকথা গোসাঞি বৃন্দাবন।
চৈতন্য ভাগবতে সব করিল বর্ণন॥'

'চৈতন্যচরিতামৃতে' কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থকে 'মঙ্গল' নামে অভিহিত করিলেও তাহার বহুপূর্ব্বে রচিত গ্রন্থে লোচনদাস 'চৈতন্যভাগবত' নামই স্বীকার করিয়াছেন। আরও দেখা গেল, বৃন্দাবনের প্রতি লোচনের যেরূপ সম্ভ্রম দৃষ্টি রহিয়াছে, তাহাতে উভয়ের মধ্যে বিবাদ অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয়। 'আনন্দলতিকা'র ১৩ক পাতায় উক্ত আছে, লোচনদাস বৃন্দাবনের পথে কাশী গ্রামের চন্দ্রশেখরের গৃহে উপস্থিত হন এবং তাঁহার উপদেশেই চৈতন্য-চরিত্র রচনায় ব্রতী হন।

গৌরীদাস পণ্ডিতের চৈতন্য বিগ্রহ স্থাপনের একটা বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস এখানে পাওয়া যায়। পণ্ডিতের বিগ্রহস্থাপন বৃত্তান্ত 'চরিতামৃতে' নাই। সন্ন্যাসের পর শ্রীচৈতন্য কিছুদিন আচার্য্য অদ্বৈতের গৃহে অবস্থান করেন; গোবিন্দদাসের কড়চার ১২—১৩ পৃষ্ঠায়ও সেই কথাই আছে। কিন্তু 'গৌরাঙ্গ লীলা সারাবলী' প্রভৃতি গ্রন্থে গৌরীদাসের চৈতন্য বিগ্রহ স্থাপনের অদ্ভুত অদ্ভুত আখ্যান উক্ত আছে। 'আনন্দলতিকার' ১ম পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে—

'সন্ন্যাস করিঞা তবে পণ্ডিতের ঘরে।
দুই ভাই তান ঘরে রহে একত্রে॥'

কয়েক দিন পরে শ্রীগৌরাঙ্গ—

'পণ্ডিতে ডাকিঞা বলে শুন গৌরিদাস।
গৃহে রহি উচিত নহে করিঞা সন্ন্যাস॥'

চৈতন্যের বিদায়-বার্ত্তা শুনিয়া পণ্ডিত 'হা চৈতন্য' বলিয়া আছাড় খাইয়া ভূমে পড়িয়া যান এবং সংজ্ঞা হারান। পরে চেতনা পাইয়া বলেন—

'তোমাকারে আনে প্রভু এড়িয়া কিঙ্কর।
কিঙ্কর মরিলে বধ তোমারে লাগিবা।
কিঙ্কর তোমার পদ কেমনে ছাড়িবা॥

কিছু দুই ভাই প্রভু ছাড়িয়া না দিব।
বলাৎকারে কৈলে প্রাণ এখনি ছেড়িব।'

তখন শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দের সহিত পরামর্শ করিয়া পণ্ডিত গৌরীদাসকে 'বিগ্রহ প্রকাশ কর' বলিয়া আজ্ঞা দিলেন।

পণ্ডিত বহু যত্নে শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের বিগ্রহদ্বয় নির্ম্মাণ করাইলেন, এবং বলিলেন—

'খাওয়াইলে খাবে প্রভু করি নিবেদন।
চালাইলে চলিবে প্রভু এই মোর মন।'

পণ্ডিত আরও একটু আবদার করিলেন, বলিলেন—

'আসনে থাকিবে প্রভু লয় মোর মনে।
এ দুঁহা পাঠাবে প্রভু লোক নিজাশ্রমে।'

পণ্ডিতের এরূপ আবদার অবৈষ্ণবের কর্ণে অদ্ভুত শুনাইলেও বৈষ্ণবের নিকট ইহা ভক্তির পরাকাষ্ঠার নিদর্শন। ভক্তের জন্য বৃন্দাবন হইতে বিগ্রহ সাধে হাঁটিয়া উড়িষ্যায় আসিতে পারিয়াছেন, সভামধ্যে সাক্ষী দিতেও কুণ্ঠিত হন নাই, আর এ আবদারটুকু প্রভু স্বয়ং রক্ষা করিবেন না কেন? তিনি পণ্ডিতের ইচ্ছা পূর্ণ করিলেন।

'পণ্ডিতের বাক্য প্রভু অঙ্গীকার কৈলা।
তাঁরে পাঠাইয়া প্রভু আপনি রহিলা।'

লোচনদাসের পুস্তক হইতে পরাংশ অপরা করিতাংশ ছাঁকিয়া ফেলিয়া নির্ম্মল সত্যাংশ গ্রহণ করা একরূপ অসম্ভব বলিয়া দীনেশবাবু যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বর্ত্তমান ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সমর্থিত হইয়াছে।

শ্মশান-সাধনা

—শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

তর্পণের পুণ্যতীর্থ, দেবতার পবিত্রমন্দির
ধ্বংস হয়ে যায় নিত্য বিশ্বমাঝে। পৃথ্বল বন্ধীর
বেজে ওঠে বেদনায় প্রহরের প্রহরী সম্মুখে
দানবীয় সভ্যতার তীব্র বিষবাষ্পের কৌতুকে,
ধূলিসাৎ হয় কত কীর্ত্তিচিহ্ন, কত পুষ্প-প্রাণ
দলের রথচক্রে একে একে করে আত্মদান।
লক্ষ লক্ষ তারকারা কাঁদে
আমি কাঁদি তাহাদের পানে চাহি ছায়াচ্ছন্ন রাতে।

অতীত ও ভবিষ্যৎ মধ্যবর্ত্তী আলোকের সেতু
ভগ্ন আজি, কোন গুপ্ত নাহি আর মিলনের কেতু!
বিশ্বমানবের পথ অন্ধকারে ফেলে অশ্রুজল,
দুঃখ আর দুর্দ্দশায় বিহঙ্গেরা নীরব—নিশ্চল।
নিষ্প্রাণ কঙ্কালস্তূপে যুগধাত্রী ফেলি দীর্ঘশ্বাস
জীবনের যবনিকা দেয় টানি'। করি' উপবাস
যুগধাত্রী মূর্চ্ছাহত প্রায়,
বন্দিনী জানকীসম এ পৃথিবী আজি নিঃসহায়।

মনুষ্যত্ব লুণ্ঠিত ধনে লক্ষ লক্ষ হতেছে প্রাণায়
মনুষ্যত্ব দাপটে কাঁপে অধিপ্রান্ত গণিয়া প্রমাদ,
ঐশ্বর্য্যের সিংহদ্বার ভগ্ন গৃহে জীর্ণ কঙ্কে কাঁপে
দরিদ্রের ভগবান্। অন্তরের চিন্তার উদ্বাপে
দগ্ধপ্রায় মানবের সুখশান্তি আশার প্রদীপ
নাহি জ্বলে জীবনের দেবালয়ে। নিষ্ঠুর অ-শিব
ভস্ম করে শিবের আসন,
হেরি তার গর্ব্বোদ্ধত অভিযানে মিথ্যার ভাষণ।

সহস্র বৎসর পরে যে শতাব্দী সম্মুখে আমার
আনিয়াছে আর্ত্তনাদ, দুর্ভিক্ষের তীব্র হাহাকার,
প্রাণের পরম সত্য যে শতাব্দী দিল বিসর্জ্জন,
ধরিত্রীর অভিশাপ দিনে দিনে করিছে অর্জ্জন,
শাশ্বত কালের স্রষ্টা আমি কবি তার মৃত্যু লাগি
শ্মশান-সাধনা করি শব-বক্ষে শর্ব্বরীতে জাগি
সর্ব্বনাশী রুদ্র অভিযানে
আমার আরাধ্যা দেবি! মহাশক্তি! এস মোর প্রাণে।

নীড়

—শ্রীজগদীশ বসু

মানুষ হইলে বাড়ীটীকে লোকে 'সৌভাগ্যবান্' বলিত। কারণ গুটিকতক নিজস্ব গুণের জন্য ভাড়াটে আকর্ষণ করার ক্ষমতা উহার আছে। মোড়ের মাথায় একটু ফাঁকা দেখিয়া সে জায়গা করিয়া লইয়াছে। নিজের নিঃশ্বাস ঠিক নিজের গায়েই ফেলিতে হয় না। সামনের বড় রাস্তা আর পাশের এক স্কালি রেলিং-ঘেরা মাঠ তাহার মর্য্যাদা কিছু বাড়াইয়া-দিয়াছে। ইহাদেরই কৃপায় ভাড়াটে-মহলে বাড়ীটির এত প্রতিপত্তি। তাহা না হইলে কি বিজনের মত সাহিত্যিক এত গিন্নি পাড়ায় বাড়ী ভাড়া করে। দোতলার ঘরের জানালা দিয়া নীলাকাশের মুখদর্শন, কর্পোরেশনের রেলিং-ঘেরা-মাঠে উড়ে-মালীর পোতা রজনীগন্ধার তরল সুবাসের নৈশ অভি-সার প্রভৃতি গুটিকতক সাহিত্যিক-মনোচিত আবহাওয়া সে উপেক্ষা করিতে পারে নাই। স্ত্রীকে লইয়া তাই সে আজ এ বাড়ীতে উঠিয়া আসিয়াছে।

বিজনের মনটী যে অনুপাতে ভাবাল্, প্রকৃতি-প্রেমিক ও মুক্তি-পিপাসু, তাহার আর্থিক অবস্থাটি কিন্তু সে অনুপাতে স্বচ্ছল নহে। তাই ভাল বাড়ীর ভাল ভাড়া বিজনের অস্বচ্ছলতার উপর যেটুকু ভার চাপাইয়াছে সেটুকু ভার বিজনকে নামাইতে হইয়াছে রাঁধুনী বামুনটিকে বিদায় দিয়া। অবশ্য এ বিষয়ে স্ত্রী মিনতির আগ্রহও ছিল যথেষ্ট। কিন্তু তবু বামুনটাকে বিদায় করিয়া বিজন যেন একটু দুঃখিত। স্ত্রীকে রাঁধিতে হয়। স্ত্রীর এই রাঁধুনীবৃত্তি তাহার পৌরুষে আঘাত দেয়। নিজের অক্ষমতা নিজের কাছেই যেন নূতন করিয়া ফুটিয়া উঠে। কিন্তু মিনতি বড় একগুঁয়ে। পুনরায় বামুন রাখার কথায় সে কান দেয় না। নিজেই হাঁড়ি কুঁড়ি নাড়িবে; এইটাই যেন তার মনোগত ইচ্ছা। রন্ধনের উপর মিনতির এই অকারণ ঝোঁকের মাঝে যে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত মাঝে মাঝে উঁকি ঝুঁকি মারে, বিজন তাহা বোঝে। তাহার নারীত্ব স্বামীর উপর যে অধিকার চায়, বিজন তাহা ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই। তাই নিজের পৌরুষকে নিজেই অপ-মানিত করিয়া দু'বেলা স্ত্রীকে রাঁধিতে দেখে। কিন্তু মিনতি ভারী খুসী। সারাদিন ছুটাছুটি করিয়া স্বামীর সেবা গান-গুলি গাহিতে গাহিতে রান্না করিয়া স্বামীকে খাইতে দেয়। কত সময় অফারণেই ব্যস্ত হইয়া উঠে। সারাদেহে হাসির চপল ছন্দটি থামিয়া যায়। মুখে কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের রেখা পড়ে। স্বামী তাহার কর্ম্মপটুতা দেখুক, এইটাই সে চায়। কিন্তু বিজনের প্রকৃত কষ্ট হয় তখন। খেলার ছলে সে স্ত্রীকে রাঁধিতে দিতে পারে, কিন্তু মিনতির কর্ম্ম-কঠোর মূর্ত্তি তাহার পৌরুষে আঘাত দেয়। সে ব্যস্ত হইয়া বলে, "থাক্ গো, অত তাড়াতাড়ি করতে হবে না। আমার আফিসের বেলা হবে না। তুমি একটু ধীরে-সুস্থে ভাতের হাঁড়ী নামাও দেখি, হাতে গরম ফেন ফেলে কাণ্ড বাধিও না।"

মিনতি হাঁড়ি নামাইতে নামাইতে গম্ভীরভাবে বলে, —"কি যে বল? তাড়াতাড়ি করব না ত' কি? কত কাজ!"

বলিয়া, কাজের হিসাব দিতে বসে। "কিন্তু তোমার আফিস"—বলিয়া থামিয়া যায়। ব্যস্ত হইবার কারণ আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। মনটা একটু কাঁদিয়া উঠে। আহা! যদি বলা যাইত, তোমার আফিস, খোকার কলেজ, খুকুর স্কুল—। কিন্তু নাঃ! সে কি করিয়া সম্ভব? মনটা চমকাইয়া উঠে। বুকটা যেন ফাঁকা ঠেকে। গানের সুরে, রান্না করায়, ঘর গোছানতে, চাকরকে বকুনি দেওয়াতে, স্বামীর কাছে সোহাগ আদায় করাতে এতকাল ধরিয়া যেন এক বিরাট অসম্পূর্ণতা লুকাইয়া ছিল। কতদিন অন্যমনস্ক-ভাবে ঘুম-পাড়ানী গান সে গাহিয়াছে। কিন্তু ঘুম-পাড়ানোর লোকই যে তাহার নাই। সত্য বড় নিষ্ঠুর। শূন্যতা বড় বিশ্রী!

কিন্তু মুখে লজ্জিত মিনতি অপ্রস্তুতের সুরে বলে,—"তুমি ত' আর সংসারের খুঁটিনাটী জান না। কত হাত চালিয়ে কাজ করতে হয়।"

একটু বাদে বিজন খাইতে আসে। ভাত, ডাল, ঝোল আর একটা ভাজা। রন্ধনের অনাড়ম্বরতা, সব দীনতা মিনতির আদর-যত্নে ঢাকা পড়িয়া যায়। এই চারটি জিনিষের মধ্যেই সে বার বার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া স্বামীকে প্রশ্ন করে—"ওগো, আর ত'টি আলুভাজা দেব? নাও না! কম পড়বার ভয় নেই।"

অপ্রয়োজনের অস্ফুট ইঙ্গিত করিয়া বিজন জলের গেলাসটির দিকে হাত বাড়ায়। মিনতি আবার ব্যস্ত হইয়া বলে,—"ও কি? উঠে পড়ছ নাকি? লক্ষ্মীটি! ঐ ক'টা ত' ভাত, খেয়ে ফেল!"

বিজন মিনতির পানে তুলিয়া ধরে পূর্ণ, কৃতজ্ঞ দৃষ্টি। মুহূর্তের জন্য আঁখির মুকুরে দু'জনের সৃষ্টি ফুটিয়া উঠে। মিনতি চোখ নামাইয়া লয়। বিজন আবার খাইতে আরম্ভ করে। ইচ্ছা না থাকিলেও জোর করিয়াই আলুভাজাগুলি খায়, ভাতক'টিও গাইয়া ফেলে, পাছে মিনতি মনে করে রান্না ভাল হইতেছে না, স্বামীর খাওয়ার কষ্ট হইতেছে।

খানিকক্ষণ চলে নিঃস্তব্ধতার পালা। বিজন নিঃশব্দে খাইতে থাকে। মিনতি হাতের চুড়িগুলি নাড়িতে নাড়িতে স্বামীকে প্রশ্ন করে,…"হ্যাগো, কালকের ঝোলে যে নুন দিতে ভুলেছিলুম, তা' তুমি ত' কিছু বললে না? আজকে দিয়েছি কি না দেখ। খাওয়ার সময় মন তোমার কোথায় থাকে, তা'র ঠিক নেই!"

আসলে খাওয়ার সময় বিজনের মন ঠিক খাওয়াতেই থাকে। কিন্তু স্ত্রীর এত আগ্রহ, এত উৎসাহ সমালোচনা করিয়া সে নষ্ট করিতে চায় না; রান্নার-মাঝে সে রন্ধন-পটুতা খোঁজে না, খোঁজে মিনতির মনের পরিচয়টিকে। সে চায় মিনতির শত অপটুতাকে ঢাকিয়া দিক তাহার আদর, উৎসাহ, একাগ্রতা আর বিজনেরই লেখা একটি গানের দিবা রাত্রি গুন্‌গুনানি…"ভুলিবে আমায়, ভুলতে কি গো পার?" সে চায়, মিনতির সরলতা, চপলতা, গান গাহিবার ক্ষমতা বাঁচিয়া থাকুক। চুলার ধোঁয়ে যাক্ জ্বালা! না হয় তাহারা দোকানের খাবার খাইবে। রান্নার ভাল মন্দর জন্য মিনতির গানকে সে মরিতে দিতে পারে না। তাহার সেই প্রিয় গান "ভুলিবে আমায়, ভুলতে কি গো পার?" বাঁচিয়া থাকুক; না হয় বিজন আলোনা ঝোলই খাইবে।

বিজন আফিস্ চলিয়া যায়। চাকরটাকে দরজা বন্ধ করিতে বলিয়া মিনতি ইচ্ছা করিয়াই স্বামীর পাতে খাইতে বসে। চাকরটা আপনার ভাত আপনি বাড়িয়া লয়।

ভাত-খাওয়ার পর একটু বয়দোর-গোছানর পালা। স্বামীর লিখিবার টেবিলের জিনিষগুলি নিতান্ত ভূমিকম্প-বিধ্বস্ত লণ্ডনের বাড়ীগুলির মত হইয়া উঠে। সেগুলিকে যথাস্থানে রাখিয়া একটু শুইয়া পড়ে, কোনদিন বা বই পড়ে, আবার কোনদিন স্বামীর লেখা গল্প প্রবন্ধগুলি কপি করিয়া দেয়। এমনি সরল সহজ অনাড়ম্বর দিনের শোভাযাত্রা চলিয়াছে তাহাদের কালেণ্ডারের বুকের উপর দিয়া।

বছর দেড়েক পরের কথা। বিজন ও মিনতির ছোট সংসারটি এখনও সেই বাড়ীটিকে আশ্রয় করিয়া আছে। কর্পোরেশানের পার্কের রজনীগন্ধার ঝাড় গরুতে মুড়াইয়া দিয়াছে। আর তাহাতে ফুল ফুটে না, ফুটিবার আশাও নাই। সে-স্থানটা এখন দখল করিয়াছে গোটাকয়েক বিলাতী পাম্। বিজন একটু ক্ষুণ্ণ। পামের পাতায় জ্যোৎস্নার নূতন দেখিয়া তাহাকে তৃপ্তি পাইতে হয়। রজনীগন্ধার গন্ধের মত চুরি করিয়া আর কেহ ঘরে প্রবেশ করে না। দেড়টি বছর মিনতির মাঝেও কিছু পরিবর্তন আনিতে পারে নাই—এখনও সেই রকম ছাত্রচপল। রান্নাঘরে কলের ঘরে এখনও সেই রকম দিন রাত গুন্‌গুনানি গান…"ভুলিবে আমায়, ভুলতে কি গো পার?" আরও যেন আত্মহারা হইয়া গান করে। গাহিতে গাহিতে অন্যমনস্ক হইয়া পড়ে। কতক্ষণ যে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে তাহা নিজেই বুঝিতে পারে না। চপল, গীতিমুখর মিনতির মনে কী একটা ভাবনা জাগিয়াছে।

বিজন লক্ষ্য করিয়াছে, গানটির উপর মিনতির টান যেন অধুনা কিছু বাড়িয়াছে। আজকাল যেন গানটিকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া আরও বরদ দিয়া গায়। বিজন ভাবে, গানের মাঝে মিনতি কিছু বলিতে চায় বোধ হয়। আবার ভাবে,—"নাঃ! ও হয় ত' এমনি!" অথচ এমন সুন্দর ভাবে প্রাণ দিয়া গায়, তাহাতে মনে হয়, যেন সত্যিই কিছু বলিতেছে। কি বলিবে? বিজন যে মিনতিকে ভুলিবে না সেই সম্বন্ধে আশার কথা? নাঃ! বিজন মিনতিকে ভুলাক

বা না তুলাক, মিনতিকে সে কখনও ভুলিবে না। বিজন যে ফুল, মিনতি সুরভি, ফুল কি তার সুরভিকে ভুলিতে পারে?

সেটি একটি সন্ধ্যাবেলার কথা। মিনতি রাঁধিবার জোগাড় করিতেছে, কারণ বামুন ঠাকুর সে নিজেই রাখিতে দেয় নাই। এটা তা'র ঝোঁক। তবু বিজন তাহাকে আজ-কাল দু'বেলা রাঁধিতে বারণ করে। কি এক অজানা সম্ভাবনার জন্য তাহার স্বাস্থ্য অধুনা ভাল থাকা দরকার বলিয়া মন্তব্য করে। কিন্তু বিজন আফিস হইতে ফিরিয়া নিত্যই রান্নাঘরে মিনতির গুন্‌গুনানির আওয়াজ পায়। সেখানে গিয়া দেখে, মহানন্দে রান্নার জোগাড় হইতেছে। চাকর বৃন্দাবন বাটনা বাটিতে বসিয়াছে। কাঁসার বাসনগুলি ঘরময় ছড়ানো। মিনতি সেইগুলি গুছাইতেছে। তোলা উনুনটা রান্নাঘরের দাওয়ায় জ্বলিতেছে।

বিজন ব্যস্ত হইয়া বলে,…"আচ্ছা, একটা কাজ করবে? রান্নাটা দু'দিন না হয় বন্ধ থেল! অন্ততঃ এ ক'টা দিন শরীরের উপর একটু যত্ন নাও!"

মিনতি লজ্জায় রাঙিয়া অপরাধীর মত সঙ্কুচিত হইয়া উঠে। নিত্যই স্বামীর বিরুদ্ধে যায়, আবার নিত্যই ধরা পড়ে। শুকনা হাতদু'টি অকারণে আঁচলে মুছিতে মুছিতে বলে,…"বোজ আর কত দোকানের খাবার খাবে!"

বিজন গম্ভীর হইয়া বলে, "না, দোকানের খাবারই খাব। তোমাকে এখন রাঁধতে হবে না।" বলিয়া স্ত্রীর দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া বলে, "উঁহু, দেখ দিকি, কি রকম ঘেমেছ? উপরে গিয়ে একটু হাওয়ায় বসো দেখি!"

সিঁড়ি দিয়া উঠিতে উঠিতে মিনতি পাশের দেয়ালে বলে, "তুমি ভারী হয়ে হচ্ছ আজকাল। চাকর বাকরের সামনে কেন ও কথা বল? ওরা বুঝি বুঝতে পারে না!" বলিতে বলিতে লজ্জায় রাঙিয়া উঠে। রাঙিলে মিনতিকে বড় সুন্দর দেখায়। মা হওয়ার গাম্ভীর্য আর তরুণীর চাপলা ভারী সুন্দর ভাবে মেলে লজ্জার সূর্যোদয়ের সাথে।

বিজন হাসিয়া বলে, "বুঝতে পারবে কে? বিদ্যে? তুমি ভেবো না! ও ছোঁড়া কিছু জানে না।"

আসলে মিনতি চায় স্বামী তাহাকে নির্ভাবনায় আদর করুক। বিজন এটা বোঝে। তাহার আদর মিনতির নারীত্বের একটি সম্পদ্—এটাও সে বোঝে।

উপরে উঠিয়া ঘরের জানালা কয়টা খুলিয়া দিয়া বিজন স্ত্রীকে হাওয়ায় বসিতে বলে। এমনি করিয়া সে রোজ মিনতিকে রান্নাঘর হইতে উপরে উঠায়। এমনি করিয়াই প্রতি রাত্রে মিনতির স্বাস্থ্য বজায় থাকে আর দোকান হইতে বৃন্দাবন খাবার কিনিয়া আনে।

রাত্রে একদিন বিজন মিনতিকে প্রশ্ন করে—"আচ্ছা ও গানটা আজকাল এত সুন্দর করে' গাও কেন বল ত'? কী যেন বলতে চাও! গানের সুরের কাতরতায় সেটা প্রকাশ পায়।"

মিনতি জানে কোন্ গানটার কথা স্বামী বলিতেছে।

তবু প্রশ্ন করে,…"কোন্ গানটা বল ত'?"

বিজন বলে,…"ঐ সেই, ভুলিয়ে আমায়, ভুলতে কি গো পার?" বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা করে।

বিজন মিনতির হাতের আঙুলগুলি নাড়িতে নাড়িতে "কৈ? কিছু বললে না যে?"

মিনতি একটু রাঙিয়া উঠে। অপ্রস্তুতের স্বরে বলে,… "না! বলব আর কি? এই গানটা বেশ ভাল লাগে।"

বিজন বুঝিতেছিল মিনতি তাহাকে লুকাইতেছে। কিন্তু একটা নিশ্চয়ই সে বলিতে চায়। সে কথাটি নিশ্চয়ই হৃদয়ের একান্ত কোণের। কিন্তু এত গোপন যে স্বামীকেও বলা যায় না! এত মৃদু যে সাধারণ কথাবার্তার কর্কশতা সে সহিতে পারে না, গানের সুরে গুমরিয়া মরে!

বিজন আর কিছু বলে না। কিন্তু মিনতির উপর অভিমানও করে না। মিনতির উড়ন্ত চুলগুলি সাজাইতে সাজাইতে অনুরোধ করে…"আচ্ছা, গানটা একবার গাও না!"

একটু হাসিয়া, শুধু গলায় মিনতি পুরা গানটিই গায়। সেই রকম গম্ভীর কণ্ঠে, সেই রকম আত্মহারা হইয়া,— "ভুলিয়ে আমায়, ভুলতে কি গো পার?"

বিজন ভাবিতে থাকে, আশা কত গভীর, বিশ্বাস কত দৃঢ়, বেদনা কত সুন্দর হইয়া মূর্ত হইয়াছে গানের সুরে! হঠাৎ মনে পড়ে বিয়ের আগে মিনতি কাহাকেও ভালবাসে নাই ত'! তাহার জন্য মিনতির হৃদয়ের সমস্ত অনুভূতি গানের সুরে মিশিয়া আকাশে বাতাসে কহিতেছে না ত'— "ভুলিয়ে আমায়, ভুলতে কি গো পার?" বিজনের মনটা

পণ্ডিত বনাম পণ্ডিতে লাগে

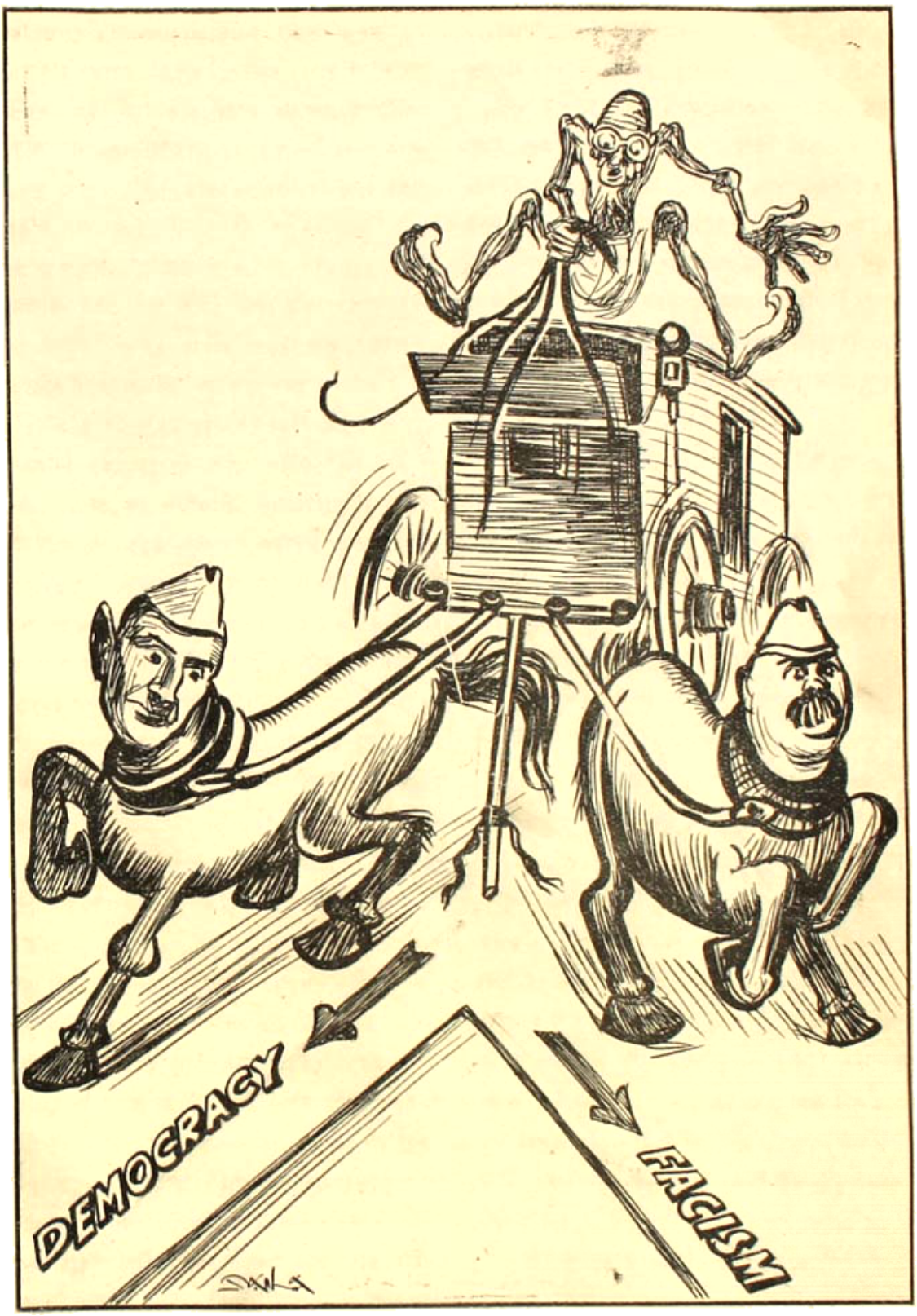

ত্রিপুরীতে পণ্ডিত পন্থের উক্তি :—একনায়কত্ব ব্যতিরেকে জাতির উন্নতি হয় না।

'ন্যাশনাল হেরাল্ড' পত্রিকায় পণ্ডিত :—গণতন্ত্র ও স্বাধীনতাবাদের সহিত আমাদের অদৃষ্ট একসূত্রে গ্রথিত।

ছ্যাঁৎ করিয়া উঠে। ভাল করিয়া মিনতির মুখের পানে তাকায়।

প্রশান্ত, স্নিগ্ধ, ভাবময় চোখে ভাবের আবেগে ও' এক ফোঁটা অশ্রু জমিয়া উঠিয়াছে। কৈ? সেখানে ত' কোন চিহ্নই নাই। সেখানে যেন বিজনের উপর একান্ত নির্ভরতা।

ঘরের মধ্যে খানিকটা জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িয়াছে। এক ফালি জ্যোৎস্না মিনতির মুখের উপর ঘুমিতেছে। বেশী রাত্রি হয় নাই। পাশের বাড়ীর একটা কচি ছেলে একটু কাঁদিয়া উঠিল। বোধ হয় খাইবার সময় হইয়াছে। মা হয়ত' সারাদিনের পরিশ্রমের পর একটু ঘুমাইয়াছে। পিছন দিকের বাড়ীর একটা ছেলে আজ কয়েক দিন যাবৎ খুব পড়িতেছে। বোধ হয় পরীক্ষা। ছাত্রজীবনে ঐ ওদের মত ভুল! সারা বছর ঘুরিয়া বেড়াইয়া পরীক্ষার সময় প্রাণান্ত পরিশ্রম। অকস্মাৎ খাটটা কাঁপিয়া উঠে। নিশ্চয়ই বড় রাস্তা দিয়া কোন ভারী গাড়ী যাইতেছে। আশ্চর্য! মানুষ নিজের সৃষ্টির দাপটেই কাঁপিয়া উঠে। বেয়ারের গায়ে গায়ের পাতার ছায়াগুলি কাঁপিতেছে। আর ঘরের মাঝে বিজনের গানের বাণী ঘিরিয়া, আবেগময় শুর মিনতির বুকের আবেগ মাখিয়া গুমরাইতেছে। বেশ ভাল করিয়া বিজন মিনতির মুখের পানে আর একবার তাকাইল। কিছু হারানোর আবেগময় বেদনা এ ত' নয়; কিছু চাহিবার, কিছু পাইবার আকুল মিনতি মিনতির মিনতিমাখা কণ্ঠে বাজিতেছে।

খানিকক্ষণ বাদে গানটি থামিয়া গেল। মৌন শুর যেন ঘরের ম্লান আলোর কানে মিনতির মনের কথা কহিতে লাগিল। খানিকক্ষণ ধরিয়া গভীর নিস্তব্ধতা। ঘরের ম্লান আলোর কোলে মরিতে লাগিল মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত। মিনতি আরও স্বামীর কাছে সরিয়া আসে। মৃদুকণ্ঠে বলে, "হাঁগো র‍্যাফেলের আঁকা, যীশুকে কোলে-করা, মাডোনার সেই ছবিটির একটা ছাপান কপি আমায় কিনে দেবে?"

বিজন একটু হাসিয়া বলে,…"তা' দোব এখন। কিন্তু হঠাৎ ঘরের পাশের কালী, দুর্গা, বগলা ছেড়ে মাডোনার দিকে ঝোঁক?"

একটু লজ্জিত হইয়া মিনতি বলে,…"না, ছবিটি বেশ!"

বিজন আশ্চর্য্য হইয়া বলে…"কোথায়?"

মিনতি উত্তর দেয়…"ঐ সেদিন মিস্ রায় তাদের বাড়ী জোর করে নিয়ে গেলেন, সেই দিনই ওঁদের বাড়ী ছবিটি দেখলুম। এত সুন্দর মায়ের মনটি ফুটেছে! যীশুর সরলতা মাখা মুখখানি বড় সুন্দর!"

বলিতে বলিতে মিনতির গলার স্বর ভারী হইয়া উঠে। নিজের মনের অবস্থান্তরটি লুকাইবার জন্য পাশ ফিরিতে চায় কিন্তু বিজন তাকে আদর করিয়া কাছে টানিয়া লইয়া বলে,…"দু' দিন বাদে তুমিও ত' মা হবে। সেই জন্যই ত' তোমায় অত রান্না বান্না করতে বারণ করি।"

শান্ত, লজ্জাজড়িতকণ্ঠে মিনতি বলে,…"তা, জানি গো।"

তারপর একটু থামে। ঘরের এবং বাহিরের স্তব্ধতা আবার ফুটিয়া উঠে। কয়েকটি মুহূর্ত্ত পরিয়া যায়। অস্ফুট কণ্ঠে মিনতি আবার বলে,…"হাঁগো, তখন নতুন ঘুম-পাড়ানী গান লিখে দেবে তো?"

রহস্য করিয়া বিজন বলে,…"কখন? কার জন্য?"

মিনতি বুঝিতে পারে স্বামী তার কারণেই করিতেছে। স্বামী যে প্রশ্ন আজ করিয়াছে তাহার উত্তর দু'জনারই একান্তভাবে জানা। তাই শাসনের কণ্ঠে বলে,…"আবার দুষ্টুমি! জান না যেন!" ঠোঁটে একটুখানি লজ্জার হাসি ভাসিয়া উঠে। গলার স্বরটী আবার নত হইয়া আসে। কিন্তু বিজন ছাড়িবার পাত্র নয়। মিনতির মুখ হইতেই কথাটী শুনিবে। আবার মিনতিও গো ধরিয়া বসে। নিরুপায় বিজন হতাশকণ্ঠে বলে,…"তা' হ'লে আর কি করে গান লেখা হবে? বিশেষতঃ কার জন্যে লিখতে হ'বে, তাই যখন জানলুম না।"

মিনতির গো ভাঙ্গিয়া যায়। জানে, না বলিয়া উপায় নাই। এই প্রশ্ন এবং ইহার উত্তর খেলার মত প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে।

তাই লজ্জাজড়িত কণ্ঠে মিনতি বলে,…
খোকা হবে।"

বিজন একটু উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া ফেলে। ঘরের স্তব্ধতা যেন চমকাইয়া উঠে। মিনতি কেমন একটু ঘামিয়া

যায়। কিন্তু বিজন হাসি একটু চাপিয়া বলে,…"এই ত, এবার ত' বললে, তবে কেন এতক্ষণ চুপ্‌টি করছিলে?"

লজ্জায় মিনতি আড়ষ্ট হইয়া উঠে। আসলে তাহাদের যে খোকা হইবে, এ-কথা জানা সত্ত্বেও বার বার শুনিবার ইচ্ছা বিজনেরও আছে। এটা তা'র পিতৃ-হৃদয়ের পরিচয়। কিন্তু পুরুষ বলিয়াই প্রকাশ করিতে পারে না; মিনতিকে দিয়া বলাইয়া লয়। এ কথা মিনতি বোঝে এবং তাহারও বলিতে ভাল লাগে। সেও চায় স্বামী তাহাকে দিয়া খোকার কথা বলাইয়া লউক। কিন্তু স্বামীকে ভাবী সন্তানের প্রতি আরও তৃষিত করার জন্য মাঝে মাঝে না বলার ভান করে। এ যেন মিলনকে সুন্দর করার জন্য ইচ্ছা করিয়া বিরহের অবতারণা।

বছর দশেক পরের কথা। একটী খোকা ও একটী খুকু মিনতির কোল জুড়িয়া বসিয়াছে। তাহাদের কোলে লইয়া সে ম্যাডোনার মত একটী ছবিও তুলাইয়াছে। পার্কের বিলাতী পামগুলির উপর বাজ পড়িয়াছিল। কয়েকটা দেশী ঝাউ গাছ এখন জায়গাটা ভোগ দখল করিতেছে। এই রকমই হয়। একজন চলিয়া যায় আর একজন আসে, আবার সেও চলিয়া যায়। মাঝে একবার বৃন্দাবন চাকরটা পলাইয়াছিল বিজনের বকুনি খাইয়া, কিন্তু মিনতি স্বামীকে বলিয়াছিল,…"দু' দিনকাল, কোথাকার কোন অচেনা লোক এসে জুটবে, বাড়ীতে আমি একলা।" আসলে বৃন্দাবনের উপর মিনতির একটু মায়া পড়িয়াছিল। ফলে দু' একদিন রাস্তায় ঘোরার পর বৃন্দাবনকে আবার এ-বাড়ীতে দেখা গেল। পাশের বাড়ীর ছেলেটা অত পড়িয়াও পাশ করিতে পারে নাই। পড়া ছাড়িয়া দিয়াছে! এখন কি একটা মার্চেন্ট অফিসে কম মাহিনার চাকরী করে। সে-রাত্রে যে-ছেলেটী কাঁদিয়াছিল, সে মারা গিয়াছে। ডিপ্‌থিরিয়া হইয়াছিল, তবে অপারেশন করায় নাই। এমনি করিয়া দশটি বছর সবেতেই কিছু না কিছু পরিবর্তন আনিয়াছে। কিন্তু মিনতির রাঁধুনীবৃত্তি চলিয়াছে সমান উদ্যমে। আজ কাল 'রন্ধন-প্রণালী' দেখিয়া সে চপ্‌ কাটলেট ভাজে, সেই রকম গান গাহিতে গাহিতে ভাত বাড়ে। কিন্তু সে একটা অন্য গান। এ গানটী যেন কামনার ধন পাওয়ার পর একটী স্বস্তির নিঃশ্বাস। যেন দৃঢ়কণ্ঠে গায়…

"জানি তুমি আসবে বঁধু আসবে
মোর বেদনায় গাহে।"

বিজন ভাবিয়া দেখে। আগের গানটীতে মিনতি যাহা চাহিয়াছে আকুলভাবে তাহাই পাইয়া যেন এ গানটী গাহিতেছে, তাই একটী তৃপ্তির সুর গানটীতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। মিনতির আগেকার সমস্ত আচরণগুলির সাথে আগেকার গানটির প্রতি তাহার আকর্ষণের কি এক যোগ রহিয়াছে। সত্যই কিছু বোধ হয় মিনতি বলিতেছিল। কিন্তু স্বামীকে বলে নাই। হয়ত' লজ্জায়। তবে কি বেদনা বার্থ নারীত্বের? এখন মিনতি মা হইয়াছে। তাই একটী পরম তৃপ্তির সুরে দিন রাত গানটীকে গায়। বিজনের কাছে সমস্ত ব্যাপারটী যেন সরল হইয়া আসে। নিজেও যেন তৃপ্তি বোধ করে।

কয়েকদিন পরের কথা। সেদিনের সকালটীও বছর দশ বার আগের এক সকালের মত। সেইরকম কোলাহল-মুখর, সেই রকম কর্মচঞ্চল। মিনতি রান্নাঘরে স্বামীর অফিসের দেরী হওয়ার ভয়ে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। মাছের নোংরা ন্যাকড়াটা হাতে করিয়া বৃন্দাবন বাড়ী ঢুকিল। তাহাকে দেখিয়াই মিনতি রান্নাঘর হইতে ঝঙ্কার দিয়া উঠে,…"হাঁরে কখন বেরিয়েছিলি আর কখন বাড়ী ঢুকলি? কানের পিঠে বাজার, এত দেরী করলে কি করে চলে?" তারপর একটু কণ্ঠ নামাইয়া বলে,…"নে, এখন চট করে মাছগুলো কুটে দে দিখি।"

বাজারের ভিড়ের অসম্ভাব্যতা ও মাছের মহার্ঘতা বর্ণনা করিতে করিতে বৃন্দাবন মাছ কুটিতে বসে।

একটু বাদে বিজন গুন্ গুন্ করিতে করিতে রান্নাঘরে ঢোকে। স্বামীকে দেখিয়া মিনতির ব্যস্ততা অকারণেই বাড়ীতে থাকে।

বিজন ব্যস্ত হইয়া বলে,…"থাক্, থাক্, ব্যস্ত হচ্ছ কেন?"

উপর হইতে খোকা হাঁক পাড়ে…"মা, আমার ভাতটা বাড়।" খুকুও আগে হইতেই একটা আসন যোগাড় করিয়া বসিয়া আছে। তখনই তাহার স্কুলের বাস্ আসিবে।

একগাল আনন্দের হাসি ঠোঁটে আঁকিয়া, মিনতি স্বামীকে বলে,…"তুমি শুধু আমার স্বাস্থ্য নিয়ে ব্যস্ত। দেখছ ত' কত খুঁটিনাটী কাজ! তোমার অফিস, খোকার স্কুল, খুকুর স্কুল, তাড়াতাড়ি না করে' উপায় কি?

কথাগুলি এক নিঃশ্বাসে বলিয়া যায়। সারা বুকটা প্রসন্নতায় ভরিয়া উঠে। সারা বাড়ীটা যেন পরিপূর্ণ! অনেক দিন আগে যে অসম্পূর্ণতা সব জিনিষের মাঝেই লুকাইয়াছিল, যে অসম্পূর্ণতা ধরা পড়িয়াছিল বছর দশ বার আগের এমনি এক কর্মব্যস্ততার মাঝে, সে অসম্পূর্ণতা আজ যেন আর বুকে বাজে না। নিষ্ঠুর সত্য যেন সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে।

চীন-জাপান যুদ্ধের ভূমিকা

—শ্রীরামকৃষ্ণশরণ দেব

বর্ত্তমান যুগের জাপান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শক্তিগণের অন্যতম, পাশ্চাত্যের পীত-ভীতি (yellow peril) ও প্রাচ্যের অভিকায় দৈত্যরূপে খ্যাত। জাপান এই যুগশক্তি ও কাম্য স্তরের অধিকারী হয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে। জাপান নিজের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল বহুদিন, নিজের কৃষ্টি ও সভ্যতাই তার কাছে ছিল সব চেয়ে প্রিয় ও শ্রেষ্ঠ; বাহিরের বৃহত্তর জগতের সহিত তাহার বিশেষ আদান-প্রদান ছিল না—বিশেষ করিয়া পাশ্চাত্যকে দূরে ঠেলিয়া রাখিতে সে সর্ব্বদাই সচেষ্ট ছিল। কিন্তু জাপানের এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া একদিন আমেরিকার রণতরী 'ইয়াকোহামার' বন্দরে দেখা দিল; অনিচ্ছুক জাপানকে বিদেশীর কামান-গর্জ্জনের মুখে আত্মসমর্পণ করিতে হইল। ১৮৪০ সালে যে বিদেশীর সঙ্গ ও বন্ধুত্ব তাহাকে মানিয়া লইতে হইল, সেই সঙ্গ ও বন্ধুত্বেরই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি বর্ত্তমান জাপান। প্রথমে জাপানের এই বিদেশী-বিদ্বেষ ছিল না। এশিয়ার অন্যান্য দেশের ন্যায় জাপানে সর্ব্বপ্রথম পদার্পণ করে পর্ত্তুগীজগণ, তার পর আসে ইউরোপের অপরাপর জাতিসমূহ। জাপান তাহার পূর্ব্বের স্বভাবসিদ্ধ আতিথেয়তা সহকারে সকলকেই অভ্যর্থনা করিয়াছিল; কিন্তু বিদেশীগণ জাপানের আতিথেয়তার সুযোগ লইয়া তাহার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে কুণ্ঠা বোধ করিল না, বিদেশী ধর্ম্মযাজকগণ ধর্ম্মের ধ্বজা করিয়া দেশীয় খৃষ্টানগণকে বিদ্রোহে উৎসাহিত করিতে লাগিল—পোপ জাপানসম্রাটের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দেখা দিলেন। জাপান সভয়ে স্বীয় রাজ্যের মধ্যে পোপের রাজ্যের আভাস পাইয়া শঙ্কিত হইয়া উঠিল। ভারত ও চীন প্রভৃতি দেশে বিদেশীর অভিযান-কাহিনী জাপানের প্রাণে অধিকতর ভয়ের সঞ্চার করিল। জাপান বিদেশীর বন্ধুত্বে ও ধর্ম্ম-প্রচারে আস্থা হারাইল। ইউরোপীয় ধর্ম্মযাজকগণ পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের অগ্রদূতরূপে প্রতিভাত হইল। *

জাপান তাহার দ্বারের পুনরায় অর্গলাবদ্ধ করিল। এমন করিয়া বাহিরের জগতের আলোক হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া জাপান তাহার জীবনের এক অন্ধকারময় যুগের প্রায় তিনশত বৎসর দীর্ঘসূত্রের ন্যায় অতিবাহিত করিল, এশিয়ার ঘনতম অন্ধকার জাপানকে গ্রাস করিল।

নবা জাপানের অভ্যুত্থান

জাপানের এই দুর্দ্দিনে নৌ-সেনাপতি পেরী তাঁহার বাণী লইয়া ইয়াকোহামার বন্দরে উপস্থিত হইলেন এবং সন্ধির চুক্তি স্বাক্ষর না হওয়া পর্য্যন্ত বন্দর পরিত্যাগ করিতে অস্বীকার করিলেন। জাপান আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। একটি বিজাতীয় শক্তি কোন্ দাবীতে তাহার উপর এই অযাচিত বন্ধুত্ব ও ব্যবসা চাপাইতে চাহে?* টকুগাওয়া (Tokugawa) শগুনগণের চমক ভাঙ্গিল। জাতীয় দুর্দ্দিনে দেশময় জাগরণের সাড়া পড়িল। 'জোহি' 'জোহি' (বিদেশী-দিগকে তাড়াও) রবে ক্ষুদ্র দ্বীপের আকাশ-বাতাস কম্পিত হইতে লাগিল। দিকে দিকে বিপদ্-সূচক ঘণ্টাধ্বনি হইতে লাগিল। জাতীয় পুরোহিতগণ মন্দিরে মন্দিরে দেবতার অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। প্রকৃত পক্ষে জাপানের জনসাধারণের মধ্যে এরূপ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল যে, মাতৃগণ তাঁহাদের শিশু সন্তান ক্রোড়ে করিয়া ও সন্তানগণ বৃদ্ধ মাতা-পিতাকে পৃষ্ঠে করিয়া রাস্তায় রাস্তায় ছুটিয়া বেড়াইতে

* To most of the Eastern nations the advent of the Western has been by no means an unmixed blessing. Thinking to welcome the increased benefits of commerce they have become the victims of modern imperialism, believing in the philanthropic aims of the Christian missionaries they have bowed before the messengers of military aggression.

Okakura Kakuzo's Awakening of Japan.

* Tokugowa Shaguns। এই সময়ে জাপানে প্রকৃত পক্ষে দুই জন শাসনকর্ত্তা ছিলেন, একজন বংশানুক্রমিক রাজা মিকাডো অপর জন মিকাডোর মন্ত্রী বা শগুন। ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে টকুগাওয়া শগুনেরা প্রবল ছিলেন এবং তাঁহাদের হস্তেই সমস্ত ক্ষমতা ন্যস্ত ছিল।

লাগিলেন। জাপানে যুদ্ধের সাড়া পড়িল, কিন্তু দুর্ভাগ্য জাপান তখন বুঝিতে পারে নাই যে, তাহার পুরাতন অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্যচালনা বর্ত্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক অস্ত্রাদির নিকট অতি নগণ্য। এই দুঃখপূর্ণ উপলব্ধি আসিল কিয়ৎপরে; যখন ১৮৬৩ সালে বৃটিশ কামানের গোলাবর্ষণে 'কাগোশীমা' (Kagoshima) দুর্গের পতন হইল।

জাপান তাহার অসহায় অবস্থা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিল। সে পাশ্চাত্যের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইতে বাধ্য হইল। জাপানের জাতীয় জীবনের স্পন্দন দ্রুত হইতে দ্রুততর হইল—পাশ্চাত্যের অনুকরণে বাহ্যত যদি স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখা অসম্ভব, ইহাই হইল তাহার মজ্জাগত প্রতীতি।*

সমগ্র জাপান তাহার অন্তর্বিরোধ বিস্মৃত হইয়া মিকাডোর পতাকাতলে সমবেত হইল। সামুরাই (যোদ্ধা) ও ডাইমাইয়ো (ভূস্বামীগণ) তাঁহাদের স্বীয় ক্ষমতা খর্ব্ব করিয়া মিকাডোর কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিল; এমন কি তাহার সংশয়ক্রমিক দাসীকে স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিল। মিকাডোর পদতলে সমগ্র জাপান জাতীয় জীবনের প্রথম স্পন্দন অনুভব করিল। পশ্চিম সূর্য্যের রক্ত কিরণচ্ছটায় প্রাচ্যের "ঘনতম অন্ধকার" অপসারিত হইল। জাপান জাগিয়া উঠিল।

সংস্কার ও আধুনিক সভ্যতার প্রবর্ত্তন

জাপানকে তাহার এশিয়ার ঘুম হইতে চেতনা লাভ করিতে পাশ্চাত্যের ভাবধারা ও কার্য্যের প্রভাব মানিয়া লইতে হইল। দেশব্যাপী পরিবর্ত্তনের সাড়া পড়িল। শিন্‌টো ধর্ম্মকে (Shintoism) জাতীয় ধর্ম্মরূপে ঘোষণা করা হইল, কিন্তু ব্যক্তিগত ধর্ম্ম-বিশ্বাসের উপর হস্তক্ষেপ করা হইল না। সামন্ত প্রথার (Feudalism) উচ্ছেদ সাধিত হইল, উন্নত ও অনুন্নত শ্রেণীর বৈষম্য উঠিয়া গেল। ডিমিও ইয়েটা (yettas) হইতে আরম্ভ করিয়া রাজরাজড়ারা পর্য্যন্ত আইনের চক্ষে সমান প্রতিপন্ন হইল এবং রাজ্যের প্রধান প্রধান পদ সর্ব্বজাতির প্রতি উন্মুক্ত হইল। জাপানের বর্ত্তমান জাতীয় জাগরণের চারিটি প্রধান কারণ:—(ক) উন্নত রাজশাসন প্রণালী, (খ) উন্নতনৈতিক শিক্ষাপদ্ধতি, (গ) বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা (ঘ) নারী শিক্ষা এবং সংগঠন।

জাপানের শিক্ষিত যুবকগণ ও শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ্‌গণ পাশ্চাত্য সভ্যতা ও পাশ্চাত্য রাজশাসন প্রণালীর মূল সূত্রগুলির সন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। সমস্তনিম্ন বিদ্যালয় ব্যতীত সমস্ত বিদ্যালয়েই একটি না একটি পাশ্চাত্য ভাষা বাধ্যতামূলক শিক্ষা-বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হইল। স্ত্রী-শিক্ষার সুব্যবস্থা হইল এবং পুঁথিগত শিক্ষার সহিত গৃহকর্ম্ম-শিক্ষা স্ত্রী-শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গরূপে পরিগণিত হইল। জাপানের সমুদয় সামরিক বিভাগের আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হইল। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নির্দ্দিষ্ট উচ্চাঙ্গের অস্ত্রশস্ত্রের প্রবর্ত্তন হইল, বিদেশী যুদ্ধ-বিশারদগণের তত্ত্বাবধানে জাপানের জাতীয় সেনা আধুনিক সামরিক শিক্ষা লাভ করিতে লাগিল। জাপানের শিক্ষা-নবিশগণ লণ্ডন ও অন্যান্য স্থানে যুদ্ধ-জাহাজ নির্ম্মাণ-প্রণালী শিক্ষা করিতে লাগিল। সংবাদপত্র, ব্যাঙ্ক, টেলিগ্রাফ, রেলরাস্তা প্রভৃতির দ্রুত প্রবর্ত্তন হইল। গভর্ণমেণ্টের অর্থ-সাহায্যে দেশময় আধুনিক যন্ত্রাদি সহ কলকারখানা স্থাপিত হইল। জাপানের বয়ন-শিল্প ও অন্যান্য শিল্পের প্রকৃত বিস্তার আরম্ভ হইল ১৮২৮ সালের চীন ও জাপানের যুদ্ধের সময় হইতে। বিগত মহাযুদ্ধের সময় হইতে জাপান প্রাচ্যের বাণিজ্য-জগতে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আসিতেছে এবং গত কয়েক বৎসর হইতে জাপান পৃথিবীর বয়ন-শিল্পে সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়া আছে। কিন্তু এই বাধ্যতামূলক পাশ্চাত্যের অনুকরণ সত্ত্বেও জাপান জাতীয় জীবনের স্বকীয় বিশেষত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবারও চেষ্টা করিয়াছে।

বিদেশী ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, পুরাতন জাপানের সম্পূর্ণ বিলোপ হইয়াছে; কিন্তু ইহা নিভুল সত্য নহে। জাপান তাহার বৌদ্ধধর্ম্ম ও শিন্‌টোধর্ম্ম অতি সতর্কতা সহকারে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। তাহার পূর্ব্বপুরুষ পূজা পদ্ধতি (ancestor worship) আজিও আড়ম্বর সহকারে অনুষ্ঠিত হইতেছে; জাপানের জাতীয় জীবনের বৈচিত্র্য বিদেশীয় ভাবধারার স্রোতে বিলুপ্ত হয় নাই। মিকাডো আজিও ঈশ্বররূপে পূজিত ও জাতীয় জীবনের ঐক্যের মূলসূত্ররূপে পরিগণিত হন। জাপান বিজাতীয় ভাবধারার ও কর্ম্মপদ্ধতির মধ্যে সেগুলি প্রয়োজনীয়

* Japan has saved herself from the common fate of her unhappy neighbours, because she was quick enough to see that the only way to win the respect of the aggressive occident was to beat it at its own game.

ও স্বীয় জাতীয় জীবনের অনুকূল, তাহাই নির্বিকার চিত্তে গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু সে তাহার নিজের সম্পদকে বিসর্জন দেয় নাই।

জাপানের সাম্রাজ্যবাদ ও কোরিয়া জয়

যদিও মুৎ-জাপানের পূর্ণ পরিবর্তনের কার্য্য বহুদিন পর্য্যন্ত অসমাপ্ত ছিল, তথাপি ১৮৬৮ সালে পরিবর্ত্তনের বিপৎসঙ্কুল অবস্থার পরিসমাপ্তি হইয়াছিল এবং তখন হইতেই নব্য জাপান সাম্রাজ্য বিস্তার ও জগতের শক্তিসমূহের বৈঠকে বসিবার যোগ্যতা অর্জ্জনে প্রবৃত্ত হয়। বাণিজ্য ও রাজ্যবিস্তারে শীঘ্রই জাপান তাহার পাশ্চাত্য শিক্ষাগুরুদিগকে অতিক্রম করিতে আরম্ভ করিল। জাপানের কর্ম্মকুশলতা ও শ্রমিকগণের স্বল্পে তুষ্টি শীঘ্রই পাশ্চাত্য বাণিজ্যকে পরাজিত করিয়া প্রাচ্যে জাপানের বাণিজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিল। পাশ্চাত্যের যুদ্ধ-প্রণালী, জাপানী সৈন্যের অসাধারণ বীরত্ব ও স্বদেশপ্রীতি মিলিত হইয়া জাপানের সামরিক শক্তি অতি প্রবল হইয়া উঠিল। জাপানের সামরিক শক্তির প্রথম বিকাশ তাহার কোরিয়া বিজয়ে। প্রায় ষোড়শ শতাব্দী হইতে জাপান কোরিয়ার উপর জেনদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আসিতেছিল। জাপান কোরিয়া আক্রমণের দুইটি যুক্তি উত্থাপন করিল—প্রথমতঃ কোরিয়া একটি শাণিত ছুরির ন্যায় জাপানের অন্তঃস্থল লক্ষ্য করিয়া আছে এবং কোন বিজাতীয় শক্তি কোরিয়া অধিকার করিলে অতি সহজেই জাপানের নিরাপত্তা নষ্ট হইবে; দ্বিতীয়তঃ তাহার বাণিজ্যের জন্য কাঁচামাল ও তাহার উৎপন্ন পণ্যের বিক্রয়ের জন্য কোরিয়ার অধিকার একান্ত প্রয়োজন।

হতভাগ্য কোরিয়া বিজয়ের ইতিহাস তিনটী অংশে বিভক্ত। প্রথমে জাপান লি-ইটো চুক্তির (Li-to Convention) সর্ত্তভঙ্গের অজুহাতে কোরিয়ায় একদল সৈন্য প্রেরণ করিয়া কোরিয়াকে চীন সাম্রাজ্য হইতে পৃথক্ করিয়া উহার স্বাধীনতা ঘোষণা করিল। তাহার পর ১৯০৪ সালে রুষ-জাপান যুদ্ধের পর কোরিয়াকে জাপানের সর্ব্বপ্রথম "রক্ষিত রাজ্য" রূপে গণ্য করা হয় এবং ১৯১০ খৃষ্টাব্দে কোরিয়াকে জাপান-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সিমন সেকীর (১৮৯৪ সাল) সন্ধিতে চীন-জাপান বিরোধের মীমাংসা হইল এবং জাপান বিজেতা শক্তি হিসাবে চীনের নিকট হইতে লিয়াওটুঙ্গ উপদ্বীপ, ফরমোসা ও পেস্কাডোর দ্বীপপুঞ্জে প্রভুত্ব পাইল। জাপানের মর্য্যাদা বৃদ্ধি পাইল ও জাপান অন্যান্য জাতিসমূহের সহিত তুল্যমূল্য চুক্তিতে নূতন সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইল।

ইঙ্গ-জাপান চুক্তি ও রুষিয়ার সহিত যুদ্ধ

জাপানের আধুনিক জীবন-ইতিহাসের এক গৌরবময় পৃষ্ঠা ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ইঙ্গ-জাপান চুক্তি (১৯০২)। একটী প্রাচ্য রাজ্য ইউরোপের একটী প্রথমশ্রেণীর শক্তির সহিত সমসূত্রে সন্ধি করিল; আগ্রহ জাপানের যুদ্ধশক্তির মর্য্যাদা পাশ্চাত্য জগৎ মানিয়া লইল। প্রায় বিশ বৎসর এই সন্ধি প্রাচ্যের রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে। জাপানের কোন রাজনীতিবিদ্ বলিয়াছেন, প্রায় কুড়ি বৎসর ধরিয়া জাপানের বৈদেশিক নীতির ইহাই ছিল প্রধান উদ্দেশ্য। †

কোরিয়া বিজয়ের পর হইতে রুষিয়া জাপানের সর্ব্বপ্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিল। রুষিয়া, ফ্রান্স ও জার্ম্মাণী মিলিত হইয়া জাপানকে তাহার যুদ্ধে বিজিত লিয়াওটুঙ্গ উপদ্বীপ পরিত্যাগ করিবার জন্য চাপ দিতে লাগিল। মিলিত শক্তিগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধকার্য্যে জাপানকে হটিয়া যাইতে হইল। রুষিয়ার ভানের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সুদূর মহাসাগরে একটী তুষারমুক্ত বন্দর অধিকার করা এবং অবিলম্বেই রুষিয়া চীনের নিকট হইতে পোর্ট আর্থার লীজ লইল। রুষিয়া তাহার বাণিজ্য ও অন্যান্য স্বার্থ সুরক্ষিত করিবার অছিলায় জাপানের পুনঃ পুনঃ আপত্তি সত্ত্বেও মাঞ্চুরিয়ায় সৈন্য সমাবেশ করিতে লাগিল। পোর্ট আর্থারে উত্তমরূপে দুর্গাদি নির্ম্মিত হইল। কোরিয়ার রুষ-প্রভাবের আশঙ্কায় জাপান ভীত হইয়া উঠিল। ইহার পরিণতি হইল ১৯০৪ সালের রুষ-জাপান যুদ্ধে। রুষিয়ার প্রবল নৌবাহিনী সুসীমার যুদ্ধে

---

* Anglo Japanese Alliance, প্রকৃতপক্ষে তিনটী ভিন্ন ভিন্ন চুক্তি তিনবার স্বাক্ষরিত হয়। ১৯০২, ১৯০৫ ও ১৯১১ সালে। *Shi Gang Cheng, Problem of China.*

† Was the sheet anchor of Japanese foreign policy for nearly two decades. *Treacher's History of the Far East in Modern Times.* এই চুক্তির বলেই জাপান ১৯০৪ সালে রুষিয়ার সঙ্গে একটী বিরাট শক্তির সহিত যুদ্ধ করিতে সাহসী হইয়াছিল।

সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইল ও পোর্ট আর্থার জাপানীদিগের হস্তগত হইল।

পোর্টস্‌মাথের সন্ধিতে জাপান দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ার রেলরাস্তা, লিয়াওটুঙ্গ উপদ্বীপের নির্দ্দিষ্টকালের লীজ ও মাঞ্চুরিয়ার কয়লার খাঁটীসমূহ পাইল। রুষ-জাপান যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী জাপানের জীবনের দ্বিতীয় গৌরবময় অধ্যায়।

জাপানের রাজ্যবিস্তারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুযোগ আসিল মহাযুদ্ধের সময়। চীনের অন্তর্বিপ্লবের সুযোগ লইয়া সে অসহায় চীনের উপর তাহার বিখ্যাত একুশদফা দাবী (Twentyone demands) পূরণের জন্য চাপ দিতে লাগিল; বৃটেনের সহিত বন্ধুত্বের খাতিরে শীঘ্র অব নেশন্স (জেনেভার আন্তর্জ্জাতিক মহাসভা) হইতে জাপানকে বিষুবরেখার (Equator) উপরিস্থিত প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপসমূহ শাসনের অধিকার দেওয়া হয়। বর্ত্তমানে জাপান লীগের সদস্য না হইলেও ঐ দ্বীপগুলি এখনও দখল করিয়া আসিতেছে।

জাপান ও চীন

তথাকথিত আত্মরক্ষার নীতি পরিত্যাগ করিয়া জাপান এশিয়া বিজয়ের একটী কাল্পনিক নক্সা প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইল। বারন টানাকা এশিয়া বিজয়ের একটি কাল্পনিক নক্সা প্রস্তুত করিলেন। ইহাই বিখ্যাত টানাকা মেমোরিয়াল। জাপানের রাজনীতিক গুরুদেবরা বলেন যে, জাপান সংহত ও শক্তিমান চীনের প্রবর্দ্ধন চাহে, কারণ দুর্ব্বল চীনকে যে-কোন শক্তি গ্রাস করিয়া বিপদ্‌গ্রস্ত করিতে পারে। কিন্তু সত্যই কি জাপান সুগঠিত চীনরাজ্যের প্রতিষ্ঠা পছন্দ করে? নিশ্চয়ই নয়। চীনের দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া সে ১৯৩২ সালে মাঞ্চুরিয়া দখল করিয়া একজন নাম মাত্র রাজা খাড়া করিল; ১৯৩৩ সালে জাপান জিহোল প্রদেশ অধিকার করিল। একটা না একটা ছুঁতা বা ধুয়া ধরিয়া জাপান ক্রমশই দুর্ভাগা চীনের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

জাপানের দাবীগুলির মূলমর্ম্ম তিনটি:—(ক) চীন কর্ত্তৃক জাপানের প্রতি সর্ব্বপ্রকার বিদ্বেষের ভাব ও কার্য্য পরিহার করিতে হইবে এবং জাপানের সহিত বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার সূত্রে আবদ্ধ হইতে হইবে; (খ) চীনকে মাঞ্চুকুয়োর স্বাধীন রাজা মানিয়া লইতে হইবে এবং উক্ত রাজ্যের সহিত স্বতন্ত্রভাবে রাজনৈতিক যোগসূত্র স্থাপন করিতে হইবে; (গ) চীন হইতে কম্যুনিষ্ট আন্দোলন দূরীকৃত করিতে হইবে এবং জাপানকে এই কার্য্যে সহায়তা করিতে হইবে।

জাপানের এশিয়া-নীতি ও রুষিয়া

সুদূর প্রাচ্যে জাপানের প্রাধান্য হিটলারের মতই সত্য; কিন্তু ইহাতেও জাপান সন্তুষ্ট নহে। জাপান আমেরিকার ন্যায় এশিয়ার জন্য একটী মনরো-নীতির স্থাপনা করিতে চাহে, যাহাদ্বারা আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্রের ন্যায় এশিয়ার রাজনীতিক্ষেত্রে জাপান সর্ব্বময় কর্ত্তা হইতে পারে। তাহার নীতি এশিয়াবাসিগণের জন্য। ইউরোপের শক্তিসমূহ এশিয়ার যে সমস্ত স্থান অধিকার করিয়াছে, তাহা এশিয়াবাসীর জন্য পরিত্যাগ করিয়া যাউক—এই নীতির অনুসরণ করিতে হইলে জাপান ও ইংলণ্ডের মধ্যে যুদ্ধ অনিবার্য্য। একজন জাপানী লেখক* বলেন যে, ইংলণ্ডের সহিত ভাবী যুদ্ধে জাপানেরই জয়ের সম্ভাবনা অধিক এবং হয়ত, ইংলণ্ডকে তাহার ভারত সাম্রাজ্য পর্য্যন্ত হারাইতে হইতে পারে। যাহা হউক, বর্ত্তমানে ইংলণ্ডের সহিত আসন্ন সংঘর্ষের কোন সম্ভাবনা নাই; পরন্তু সোভিয়েটের সহিত লড়িতে হইলে ইংলণ্ডের সহিত সদ্ভাবই তাহার কাম্য। মাঞ্চুরিয়ার নিরাপত্তার জন্য জাপান রুষিয়া ও মাঞ্চুরিয়ার মধ্যে একটী মধ্যবর্ত্তী (buffer) রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিতে চাহে; কিন্তু এক্ষেত্রে রুষ-জাপান সংঘর্ষ অনিবার্য্য এবং বহির্মঙ্গোলিয়ায় রুষিয়ার আধিপত্য জাপান হইতে অনেক বেশী। রুষ-জাপান সীমান্তে ছোট-খাট সংঘর্ষ প্রায়ই লাগিয়া রহিয়াছে এবং যে কোন মুহূর্ত্তে দুই জাতির মধ্যে যুদ্ধ আসন্ন হইতে পারে। জাপানের এই রুষিয়া-নীতি জাপানকে কিঞ্চিৎ পরিমাণে খর্ব্ব করিয়া রাখিয়াছে। ১৯০৪ সালের রুষিয়ার সহিত সংঘর্ষে অন্য কোন জাতি রুষিয়ার পক্ষে যোগ দিলে জাপান ইঙ্গ-বৃটিশ চুক্তির বলে বৃটেনের সাহায্যের উপর নির্ভর করিতে পারিত, কিন্তু রুষিয়ার সহিত ভাবী যুদ্ধে জাপান কাহার সাহায্য পাইবে? বৃটেনের সহিত তাহার প্রথম বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ নাই; আমেরিকা ও বৃটেনের সহিত বাগ্‌বিতণ্ডা করিয়া জাপান

* Tota Ishimari—*Japan must fight Britain.*

১৯৩৬ সালের নৌ-বৈঠক হইতে চলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু জাপান রুষিয়ার বিরুদ্ধে নিতান্ত অসহায় নহে। ১৯৩৬ সালের জাপান ও নাৎসী জার্মানী তাহাদের উভয়ের শত্রু কম্যুনিষ্ট রুষিয়ার বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হইয়াছে এবং বর্ত্তমানের জাপ-জার্মান চুক্তি পূর্ব্বের ইঙ্গ-জাপান চুক্তির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। রুষিয়া ও পূর্ব্বের মিত্র ফ্রান্সের উপর নির্ভর করিতে পারিবে।

সুদূর প্রাচ্যের বর্ত্তমান আবহাওয়া

মাঞ্চুরিয়া জয়ের পর জাপান উত্তর-চীনে তথাকথিত স্বাধীনতা-আন্দোলন শুরু করিয়াছে, এবং বর্ত্তমান চীন-জাপান যুদ্ধ তাহারই ফল। বর্ত্তমানে চীন চিয়াং কাই-শেকের অধিনায়কত্বে কতক পরিমাণে একতাবদ্ধ হইলেও, জাপানের সহিত অন্তের সাহায্য ব্যতীত আঁটিয়া উঠিতে পারিবে বলিয়া অনুমান হয় না। স্পেনের গৃহ-যুদ্ধ এবং চেকোশ্লোভাকিয়ার ব্যাপারে ইউরোপ লিপ্ত আছে। চীন ও রুষিয়ার মধ্যে সন্ধি হইয়াছে এবং রুষিয়া চীনকে বিমানপোত ইত্যাদির দ্বারা সাহায্যও করিতেছে। স্পেনের সমাজতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্টের পতনে ফ্রান্স ও রুষিয়ার অবস্থা ইউরোপে খারাপ হইয়া দাঁড়াইবে এবং জার্ম্মানী ও জাপানের সহিত সমভাবে প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে যুদ্ধ পরিচালনা করা রুষিয়ার পক্ষে দুরূহ হইয়া উঠিবে। বস্তুতঃ ঘটনা যে কি দাঁড়াইবে তাহা বলা কঠিন, তবে ইহা নিঃসন্দেহ যে, সুদূর প্রাচ্যের চীন-জাপান যুদ্ধকে কেন্দ্র করিয়া এক বিরাট যুগ-বিপ্লব আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে এবং বিগত মহাযুদ্ধেও জার্ম্মানীর হাতে জাপানকে এই বিপ্লবের নাটকের সর্ব্বপ্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতে হইবে। অস্ত্র-শিল্পে অভূতপূর্ব্ব উন্নতি চীন তিল তিল করিয়া জাপানের সাম্রাজ্যবাদের নিকট আত্মবলি দিতেছে; পৃথিবীর দুর্ব্বল ও অসহায় জাতিসমূহ সাম্রাজ্যবাদী জাপানের উগ্র মূর্ত্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছে; তাহাদের চিত্ত চীনের প্রতি সহানুভূতি ও সমবেদনায় ভরিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে সহানুভূতির স্থান কোথায়?

অগ্নি-শিশু

—শ্রীমণীন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ

জাগিয়াছ রুদ্র তেজে অগ্নি-শিশু বিংশ শতাব্দীর।
দুহাতেও নিয়া করে মোহাইতে অভাবের শির॥
অমৃতের পুত্র আজি চিনিয়াছ নিজে আপনারে।
সুধায় বঞ্চিত হ'য়ে ছুটিয়াছ বিশ্ব আসিবারে॥
সাগরের তটপ্রান্তে নটরাজ নর্ত্তনে তোমার।
উদ্বেলিত সিন্ধুবক্ষ তরঙ্গের শঙ্খ ঘোর মার॥
উত্তরে দক্ষিণে পূর্ব্বে ধরণীর বক্ষ চিরে চিরে।
বেদনার তপ্তশ্বাসে প্রভঞ্জন বহে ঘুরে ফিরে॥
শত শিল্প পদাঘাতে চূর্ণ হয়ে পড়িতেছে ঝরি,
গড়িতে নূতন সৃষ্টি ছুটিয়াছ জয়যাত্রা করি॥
অশান্ত অবাধ গতি সৃজনের বিপুল প্রয়াস।
মিথ্যার দলিত শিরে চির সত্য করিতে প্রকাশ॥
সাহারার মরীচিকা জ্বালাময় দীপ্ত দু'নয়ন।
দয়াহীন বক্ষ বুকে কর্ত্তব্যের কঠিন বাঁধন।
অগ্রদূত ধ্বংসলীলা পুরোভাগে সঙ্গিনী তোমার।
কণ্ঠচ্যুত সুকোমল পঞ্চমীর দুঃখ-সত্তা হায়॥
অনশনে অনিদ্রায় রক্তরোষে চলেছ দুর্ব্বার।
আত্মহারা একনিষ্ঠ পুরাইতে প্রাণের পিপাসা॥
অত্যাচারে অবিচারে জাগিয়াছে চিরাগ্রাধ্য ধ্যান।
জাগিয়াছ অগ্নি-শিশু দিতে আজি ভাবি প্রতিদান॥
বিনাশের অন্তরালে লুক্কায়িত সুন্দরের ছবি।
তারি রূপে আত্মহারা মাতোয়ারা হে তেজস্বী কবি।
গর্জ্জি উঠ হে জাগ্রত অসহিষ্ণু অগ্নি-সিংহশিশু!
নহ তুমি প্রপীড়িত ক্ষমাশীল ক্রুশ-বিদ্ধ যীশু॥

ইডেন গার্ডেনের প্যাগোডার কাহিনী

—শ্রীললিতমোহন হাজরা

সন্ধ্যাবেলায় ইডেন গার্ডেনে বেড়াইতে গিয়া নানা দিক্ পরিদর্শন করিতে করিতে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ব্রহ্মদেশীয় দারু-শিল্পের শ্রেষ্ঠ অবদান 'প্যাগোডা'। প্যাগোডা সমগ্র উদ্যানের সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে বলিলে কোনরূপ অত্যুক্তি করা হয় না। ইহা না থাকিলে হয় ত' কেহ বাগানটি পরিদর্শন করিত কি না, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের কারণ আছে। উদ্যানের অতীব রমণীয় স্থানে ইহা স্থাপিত হইয়াছে। পাশেই কৃত্রিম হ্রদ এবং দুই চারিটি নানা জাতীয় কুদ্র অপেক্ষাকৃত বৃহৎ বৃক্ষ।

হ্রদ হইতে প্যাগোডার দৃশ্য।

শুভ্র জ্যোৎস্নায় যখন ধরণীতল প্লাবিত হয়, তখন এই পবিত্র প্যাগোডার মূর্ত্তি কৃত্রিম হ্রদের জলে প্রতিবিম্বিত হইয়া এক অপূর্ব্ব পবিত্র এবং রমণীয় সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করে। যিনি না স্বচক্ষে উপভোগ করিয়াছেন, তাঁহার নিকট এই লিখিত সৌন্দর্য্য একেবারেই উপভোগ্য হইবে না। ব্রহ্মদেশীয় এই দারু-শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনের পশ্চাতে যে ইতিহাস রহিয়াছে, তাহাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য। প্যাগোডার বংসামান্য কাহিনী প্যাগোডার ভিতরেই প্রত্যেক দর্শক মাত্রেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। সেই কাহিনী হইল :

"The above specimen of Burmese ornamental architecture was removed from the city of Prome in the months of August and September, 1854, and reconstructed on the site in the months of October, November and December, 1856." এই বংসামান্য ইতিবৃত্ত ব্যতীত ইহার পশ্চাতে যে এক বৃহৎ ইতিহাস রহিয়াছে, তাহা একরূপ লোকচক্ষুর অন্তরালেই রহিয়া গিয়াছে।

১৮৫২ খৃষ্টাব্দে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ প্রোম নগরীতে "প্রোম, শোয়ার-ডোঙ্গ এবং তারোকম্"-(১)-এর শাসনকর্ত্তা 'সঙ্ হনোন্'এর মহিষী প্রাতঃস্মরণীয়া মা কিঙ্ এই প্যাগোডা স্থাপন করেন। রাণী মা কিঙ্ ব্রহ্মদেশে উন্ ক্যাডও (Woon Kaddaw) নামে অভিহিত হইতেন। এই সময়ে উন্ ক্যাডওর বয়স প্রায় চল্লিশ বৎসর হইয়াছিল। তিনি তাঁহার স্বামী উন্ অপেক্ষা দুই বৎসরের জ্যেষ্ঠা ছিলেন। মা কিঙ্-এর পিতার নাম মোঙ্ শোয়ার লু। মা উন্ ছিলেন মা কিঙ্-এর জননী।

প্যাগোডা নির্ম্মাণ করিতে দুই দশ বৎসর সময় লাগে নাই; মাত্র সাত মাসের মধ্যেই নির্ম্মিত হইয়াছিল। মোঙ্ হিঙ আম্বেন মাত্র দশজন সূত্রধরের সাহায্যে এই অল্প সময়ের মধ্যেই প্যাগোডা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। প্যাগোডার দারুশিল্প কার্য্যের জন্য ব্যয় হইয়াছিল ১৪ লিঙ্ রৌপ্যমুদ্রা (২)। ইহার অভ্যন্তরে 'গন্ধমে'র এক সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি ছিল। সম্ভবতঃ ব্রহ্মদেশীয়গণ গৌতমকে

১। ব্রহ্মদেশীয়গণ ইহাকে সাধারণতঃ বলিয়া থাকেন 'শোয়ে দোঙ্-ঊন' (Shoay-Doung-Woong)

২। এক লিঙ্ রৌপ্যমুদ্রার মূল্য ১০০৲ টাকা।

গম্বম নামে অভিহিত করেন। এই প্রতিমূর্ত্তির কপোল নানাবিধ বহুমূল্য প্রস্তরে রচিত ছিল। এই নিমিত্ত আরও ১০ লিং রৌপ্যমুদ্রা ব্যয় হয়। সুতরাং প্যাগোডার নিমিত্ত সর্ব্বশুদ্ধ ২৪ লিং রৌপ্য মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল বলিলে ঠিক হয় কিন্তু তাহা বলা হয় না। প্রোমনগরীর 'কেট্-থ্যান গিঙ-ক্যাউন'এর নিকট প্যাগোডা স্থাপিত হয়। এই জাতীয় মন্দিরাভ্যন্তরে বৌদ্ধ মন্দিরের পুরোহিতগণই যে উপাসনা করেন তাহা নহে। যাঁহারা সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিতেন, তাঁহারাও ইহার অভ্যন্তরে উপাসনা করিতেন।

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে লর্ড ডালহৌসি যখন প্রোমনগরীতে আসেন, তখন প্যাগোডা দেখিয়া মনস্থ করেন যে, এই প্যাগোডা তিনি কলিকাতায় স্থানান্তরিত করিবেন। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে সপার্ষদ গভর্ণর-জেনারেল মহোদয়ের আদেশানুসারে মাননীয় কোম্পানীর "শানঘগঞ্জ" নামক জাহাজে ইহা কলিকাতায় আনীত হয়। কলিকাতায় আনিয়া ইহাকে 'মাদ্রাজ গোলন্দাজ'-এর লেফটেন্যাণ্ট ব্লেয়ারের তত্ত্বাবধানে রাখা হয়। কিন্তু কলিকাতা মহানগরীর কোন্ স্থানে ইহাকে স্থাপন করা হইবে, ইহা লইয়া যথেষ্ট মতভেদের সৃষ্টি হয়। সেই জন্য সপার্ষদ গভর্ণর-জেনারেল বাহাদুর আপাততঃ প্যাগোডার কতকগুলি অংশ লেফটেন্যাণ্ট ব্লেয়ারের তত্ত্বাবধানে ফোর্ট উইলিয়ামের অস্ত্রাগারে প্রেরণ করিবার আদেশ দিলেন। অবশেষে লর্ড ডালহৌসি ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ২২শে ফেব্রুয়ারী ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিবার প্রাক্কালে লিখিয়া যান :—

"Before I go, I would propose to ask the Lieutenant-Governor whether there is now any objection to the erection of buildings in the Auckland Gardens, if it should be resolved to set it up, workmen for the purpose had better be got, indeed they must be got from Rangoon, as well as some one to superintend the work. Communication with the Court Major, Pegu, will readily procure all that is required."

লর্ড ডালহৌসির এই উক্তির পরে গভর্ণরের অকল্যাণ্ড গার্ডেনে ইহার পুনঃ-স্থাপনের কোন আপত্তি রহিল না। তিনি ব্লেয়ারকে আদেশ দিলেন। ব্লেয়ারের তত্ত্বাবধানে মাত্র তিন মাসের মধ্যেই অকল্যাণ্ড গার্ডেনে ইহা স্থাপিত হয়। এই সময়ে ব্লেয়ারকে ফোর্ট উইলিয়ামে বাস করিবার জন্য একটি কোয়ার্টার দেওয়া হয় এবং মাসিক ২০০৲ টাকা হিসাবে তিনি বেতন পাইতেন। কলিকাতায় প্যাগোডা পুনঃ-স্থাপনের জন্য ৮০০০ টাকা ব্যয় হয়।

ভারতীয় স্থাপত্য

বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টের কার্য্য পর্য্যালোচনা করিলে তাহার কর্ম্মচারিগণ যে ভারতীয় "নিজস্ব" শিল্পধারার নাশে বদ্ধপরিকর, তাহা স্বীকার করিতে হয়। ভারতের প্রকৃত উন্নতির মূলের দিকে লক্ষ্য নির্দ্ধারণ করিতে হইলে, অবশ্যই মূলের ধারাও জানিবার প্রয়োজন হয়। সেই হিসাবে, সংক্ষেপার্থ অবশ্য ভারতের কার্য্যের নিরপেক্ষ বিশ্লেষণে যদিও মূলে সমস্ত বটে এবং তজ্জন্য গভর্ণমেণ্ট জনসাধারণের ধন্যবাদভাজনও বটে, কিন্তু ভারতের কলকব্জা বল প্রয়োগের সহায়তা করা গভর্ণমেণ্টের অনুধাবনিতা পরিচয়। কয়েকজনী অনধিক কতকগুলি দেশীয় লোকের প্রলোভনে মোহমুগ্ধ দেশের জনসাধারণ আজ ইহাকে শুভকার্য্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে বটে, কিন্তু ভারতে যে হাওয়া উঠিয়াছে, তাহাতে দেশের জনসাধারণের মোহ অচিরে বিদূরিত হইবে বলিয়া আশা করা যায় এবং তখন ঐ জনসাধারণ এই ভারতীয় কার্য্যে, দেশীয় অনধিক লোকের সহায়তাকারক, তাহা বুঝিতে পারিবে এবং গভর্ণমেণ্টের ইংরাজ কর্ম্মচারিগণকে ইহার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী করিয়া দুইটি জাতির মনোমালিন্যের প্রসারতা বাড়াইয়া তুলিবে।

শিক্ষার অরাজকতা

—শ্রীচুণীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

হিন্দু রাজত্বে দেশের ভিতরে এই রকমের শাসন প্রচলিত ছিল; যথা রাষ্ট্রীয় শাসন ও সামাজিক শাসন। রাষ্ট্রীয় শাসন ছিল সরকারী বিভাগ, সামাজিক শাসন ছিল বেসরকারী বিভাগ। রাজা স্বয়ং তাঁহার মন্ত্রী-পরিষদ্-সহ রাষ্ট্রীয় শাসন-কার্য্য পরিচালনা করিতেন। আর সামাজিক শাসন সম্পূর্ণরূপে বেসরকারী ব্রাহ্মণদের হস্তে অর্পিত ছিল। বিচার-বিভাগ, শিক্ষা-বিভাগ, সামাজিক রীতি-নীতি, ধর্ম্ম-কর্ম্ম, অর্থনীতি, কৃষি, বাণিজ্য, বর্ণাধিকার, উত্তরাধিকার প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় ছিল সামাজিক শাসনের অন্তর্গত। ব্রাহ্মণেরা দেশের ধর্ম্মশাস্ত্র ও স্মৃতিশাস্ত্রের ব্যবস্থা অনুসারে সেই সকল কার্য্য বেসরকারীভাবে পরিচালনা করিয়া রাষ্ট্রের সাহায্য করিতেন। রাষ্ট্রও ব্রাহ্মণদের সামাজিক সকল ব্যবস্থাই মানিয়া লইতেন। তখনকার দিনে ব্রাহ্মণেরা ছিলেন সমাজের সর্ব্বময় কর্ত্তা।

এক কথায় সমাজ হাইকোর্টের জজ। এই সকল কার্য্যের বিনিময়ে তাঁহারা বেতন গ্রহণ করিতেন না। কেন না তাঁহারা জানিতেন যে, বেতন গ্রহণ করিয়া কোন কার্য্য করিতে গেলেই মানুষের স্বাধীন মতামত সকল ক্ষেত্রে রক্ষা করা যায় না। তাই দেখা যায় যে, সেই সময়ে বিচার, শিক্ষা, শান্তি, শৃঙ্খলা, আইন প্রভৃতি রাষ্ট্রের গুদামঘর হইতে মানুষকে ক্রয় করিতে হইত না। ঐ সকল কার্য্য সম্পাদন করা ছিল রাজার রাজধর্ম্ম। এই রাজধর্ম্ম তখনকার দিনে অবশ্য-করণীয় পুণ্যকর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হইত। ইহার জন্য রাজা দেশের উৎপন্ন শস্যের এক ষষ্ঠাংশ রাজকর বলিয়া গ্রহণ করিতেন, কিন্তু বর্ত্তমান যুগটা হইল বৈশ্য-যুগ। তাই এ যুগে মানুষকে রাষ্ট্রের দোকান ঘর হইতে সকল দ্রব্যই উচ্চ মূল্যে ক্রয় করিতে হয়। দেশের বিচারালয়গুলি যেমন বিচার বিক্রয়ের পণ্যশালা, দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ও তেমনি বিদ্যা বিদ্যা-বিক্রয়ের পণ্যশালা। হোয়াইট্ অ্যাওয়ে লেড্-ল কোম্পানী যে উদ্দেশ্য লইয়া কলিকাতায় সুরম্য সৌধ নির্ম্মাণ করতঃ বিদ্যাতী পণ্য সাজাইয়া বসিয়া আছেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও একই উদ্দেশ্যে ভিন্ন ভিন্ন মূল্যের বিদ্যা, ভিন্ন ভিন্ন মূল্যের ডিগ্রি সাজাইয়া ক্রেতার অপেক্ষায় বসিয়া আছেন।

বর্ত্তমান যুগে পয়সা দিয়া সকলেই বিদ্যা ক্রয় করিতে পারেন মানুষ যেমন বাবুগিরি করিবার জন্য চশমা কিনে, মেয়েরা যেমন গহনা কিনে, ছাতা কিনে। তখনকার দিনে বিদ্যা এরূপ ফ্যাশী জিনিষ ছিল না। বিনা ব্যয়ে বিদ্যাদানের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও বিদ্যা এরূপ সর্ব্বজনসুলভ ছিল না। এক কথায় শিক্ষার বাড়িচার ছিল না। বিদ্যায় তখন ধর্ম্ম ছিল সতীধর্ম্ম। সুতরাং সে তখন সমাজের কল্যাণপ্রদ ছিল, স্বাস্থ্য-প্রদ ছিল, আনন্দপ্রদ ছিল। এখনকার মত সে বাজারের মাল ছিল না। জলের অতিপ্লাবনও যেমন ধ্বংসের অগ্রদূত হইয়া সমাজে প্রকাশিত হয়, শিক্ষার অতিপ্লাবনও সামাজিক বিপ্লব হইয়া সমাজকে ধ্বংসের পথে টানিয়া নেয়। তাই সেই সময়ে ব্রাহ্মণেরা দেশের আবশ্যকতা অনুসারে পাত্রা-পাত্র বিবেচনা করিয়া বিদ্যা বিনামূল্যে দান করিতেন।

যে বিদ্যার বিনিময়ে মানুষ ডাল-ভাতের সংস্থান করিয়া বাঁচিয়া থাকে, সেই ব্যবহারিক বিদ্যা, বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থার ভিতর দিয়া সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। সেই ব্যবহারিক বিদ্যা শ্রম-বিভাগের নিয়ম অনুসারে সমাজের ভিতরে বিনাব্যয়ে বাধ্যতা-মূলক ছিল। যিনি যে প্রকৃতির লোক ছিলেন, তিনি সেই প্রকৃতির কর্ম্মের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ শূদ্রকে চাষবাস করিতেই হইত, বৈশ্যকে ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে হইত। শূদ্রের প্রকৃতি অনুসারে চাষ করাই ছিল তাহার স্বধর্ম্ম, বৈশ্যের প্রকৃতি অনুসারে বাণিজ্য করাই ছিল তাহার স্বধর্ম্ম। মানব-প্রকৃতির এই রুচিগত বৈষম্য অভিজ্ঞ চিকিৎসকের মত একেবারে নাড়ী ধরিয়া স্থির করা হইয়াছিল। তার পর সেই সেই প্রকৃতি অনুসারে শ্রমের বিভাগ-কার্য্য সম্পাদন করা হইয়াছিল এবং এই সকল ব্যবহারিক বিদ্যা সমাজ-বিদ্যালয়ে বাধ্যতামূলক ছিল। সমাজ-বিশ্ব-

বিদ্যালয়ে সার্ব্বজনীন এমন চমৎকার ব্যবস্থা ছিল যে, উহার ভিতরে যিনিই বাস করিতেন, তাঁহাকেই কোন না কোন রুচিকর অর্থনৈতিক ব্যবহারিক বিদ্যা অর্জ্জন করিতে হইত। সেই সেই প্রকৃতিগত রুচিকর কর্ম্মই ছিল তাঁহাদের আনন্দ-প্রদ, স্বাস্থ্যপ্রদ নিত্যকর্ম্ম। সুতরাং তখনকার সামাজিক ব্যবস্থায় সমাজের ভিতরে বেকার সৃষ্টি হইবার কোন কারণই ছিল না।

এমনি করিয়া তখনকার সামাজিক ব্যবস্থায় শূদ্র কৃষিকর্ম্ম করিতেন, বৈশ্য ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেন, ক্ষত্রিয় দেশ শাসন ও দেশ রক্ষা করিতেন, আর ব্রাহ্মণেরা সকল রকম পুথিগত বিদ্যা শিক্ষা করিয়া বিনামূল্যে বিদ্যাদান করিতেন এবং সমস্ত জীবন বিদ্যা-চর্চ্চা করিয়া, বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিয়া জ্ঞান বিজ্ঞানের নূতন নূতন সত্য আবিষ্কার করিতেন। তখনকার দিনে পুথিগত, আক্ষরিক বিদ্যা অর্থোপার্জ্জনের জন্য মানুষ বিদ্যা লাভ করিতেন না। সমাজে সেরূপ গোলামীর ব্যবস্থাই ছিল না। তখন ব্যবহারিক বিদ্যা যেমন বংশপরম্পরা বিদ্যা ছিল, পুথিগত আক্ষরিক বিদ্যাও তাহাই ছিল। বংশক্রমের (heridityর) আশ্চর্য্য প্রভাব তখনকার সমাজের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ বিলক্ষণ বুঝিতেন। তাই সেই সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির গৃহই ছিল ব্যবহারিক বিদ্যা-শিক্ষার ইউনিভার্সিটি। জন্ম হইতেই প্রত্যেক মানুষ ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষার আবেষ্টনের ভিতর দিয়া লালিত পালিত হইতেন। তাই পুথিগত আক্ষরিক বিদ্যায় নিরক্ষর হইয়াও নিজ নিজ বংশগত ব্যবহারিক বিদ্যার ক্ষেত্রে তাঁহাদের মধ্যে আশ্চর্য্য প্রতিভা ফুটিয়া উঠিত। সেই সকল প্রতিভার সচল বিগ্রহ কৃষকগণ, শিল্পিগণ, বণিকগণই ছিলেন সমাজের স্তম্ভস্বরূপ, সমাজের প্রাণ-প্রদ আনন্দ-প্রদ 'ভিটামিন'। ব্রাহ্মণেরা শুধু জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন শাখায় চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়া সেই অর্জ্জিত তত্ত্ব সকল পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। এমনি করিয়া ব্রাহ্মণেরা বিশ্বের জ্ঞান-ভাণ্ডারকে অমূল্য গ্রন্থসকল দান করিয়া চিরকালের অফুরন্ত সম্পদ্ দান করিয়া গিয়াছেন। এই ব্রাহ্মণগণ যেমন এক দিকে অধ্যয়ন-অধ্যাপনা, ধ্যান-ধারণা, পূজার্চ্চনা, তপস্যা দ্বারা আধ্যাত্মিক চর্চ্চা করিতেন, অপর দিকে সমাজের সকল বর্ণের মানুষকে তাহাদের নিজ নিজ কর্ম্মসম্বন্ধে অর্জ্জিত সদুপদেশ দান করিতেন ও কেহ যেন নিজ অধিকারের নিত্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অপরের কর্ম্মে অনধিকারপ্রবেশ না করে, সে-দিকে কঠোর দৃষ্টি রাখিতেন। তাঁহারা ইহা ভালই জানিতেন যে, চোর চুরি করিয়া যেমন সামাজিক আইন ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে, ও তাহার ফলে দেশে অরাজকতার সৃষ্টি হয়; অনধিকার কর্ম্মদ্বারাও সমাজের ভিতরে কর্ম্ম-সঙ্কর বলিয়া কর্ম্মের অরাজকতারই সৃষ্টি হয়। সুতরাং ইহা সামাজিক আইন ও শৃঙ্খলা-বিরোধী কর্ম্ম। এইরূপ কর্ম্ম-বিপ্লবকে সমাজের স্থায়ী মঙ্গলের জন্য, বহুজনের হিতের জন্য (for greater good) তাঁহারা কঠিন হস্তে দমন করিতেন।

তখনকার দিনে সকলের জীবনেরই চরম লক্ষ্য ছিল ব্রহ্ম-জ্ঞানের অর্জ্জন। সমাজের সকল সম্প্রদায়ের মানুষেরই নিজ নিজ কর্ম্মের ভিতর দিয়া ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভ সম্ভব ছিল। ভারতের বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের ব্যবস্থায় জীবনের প্রতি কর্ম্মই ছিল ভাগবত কর্ম্ম। ইহারই নাম কর্ম্মযোগ। ব্রাহ্মণ যেমন ধ্যান ধারণা, পূজা, তপস্যা-কর্ম্ম দ্বারা ব্রহ্ম-জ্ঞানলাভের চেষ্টা করিতেন, শূদ্রও কৃষিকর্ম্মের ভিতর দিয়াই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের যোগ্যতা অর্জ্জন করিতেন। বৈশ্য-শিল্প সৃষ্টির ভিতর দিয়া যে আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য-জ্ঞান লাভ করিতেন, তাহার ফলেই তাঁহার জীবনের বন্ধ দুয়ার খুলিয়া যাইত। ক্ষত্রিয় দেশরক্ষার জন্য যুদ্ধ করিয়া ব্রহ্ম জ্ঞান লাভার্থ উদ্যোগী হইতেন। কর্ম্মের ভিতরে ব্রহ্ম-জ্ঞানলাভের এমন আশ্চর্য্য কৌশল সে যুগে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। মানুষের প্রতি অহিংস কর্ম্ম সুন্দরের স্পর্শে সুন্দর হইয়া ফুটিয়া উঠিত।

তাই সমাজে কাহারও কর্ম্ম ছোট বড় ছিল না। সুতরাং তখনকার দিনে জীবনের উচ্চ আদর্শলাভের সাথে মানুষের পৃথক্ পৃথক্ সামাজিক কর্ম্মের সঙ্গে কর্ম্মের সংঘাত লাগিত না। কিন্তু বর্ত্তমানে মানব-জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হইল টাকা সংগ্রহ করা, স্তূপীকৃত বস্তু সংগ্রহ করা, ছলে, বলে, কলে, কৌশলে ধনী হওয়া। তাই বর্ত্তমান যুগে বস্তুর সঙ্গে বস্তুর তীব্র সংঘর্ষ অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। এই সংঘর্ষকে ডারউইন জীবন-সংগ্রাম বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা উলঙ্গ লোভের সঙ্গে লোভের সংঘর্ষ। ভারতের সামাজিক ব্যবস্থায় লোভের স্থান ছিল না বলিয়াই জীবন-সংগ্রাম ছিল না, কুৎসিত সংগ্রাম হইয়া উঠিত না, অথচ নির্লোভ প্রতি

যোগিতারও সুন্দর ব্যবস্থা ছিল। এমনি করিয়া ভারতের সামাজিক জীবন ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মের ভিতর দিয়া এক আশ্চর্য্য সমন্বয় লাভ করিয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গে দেশও সমৃদ্ধি ও সম্ভোগ লাভ করিয়াছিল।

সমাজকে সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি স্থির করিয়া উহার ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য শ্রমের বিভাগ করা হইয়াছিল এবং সমাজে শ্রমজাত শিল্প ও কর্ম্মের উৎকর্ষ লাভের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মকে বংশগত করা হইয়াছিল। ইহারই ফলে আমাদের ভিতরে জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল। প্রকৃতিগত ভিন্ন ভিন্ন রুচিকর কর্ম্ম সম্পাদনের জন্যই তদানীন্তন সমাজে বর্ণভেদ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। মানুষকে ছোট বড় করিবার জন্য এই ভেদের সৃষ্টি হয় নাই। কেন না, কর্ম্মেরও যেমন জাতিভেদ ছিল না, সামাজিক সকল কর্ম্মই কর্ম্ম, সকল কর্ম্মই গৌরবের, তেমনি সমাজের সকল মানুষই মানুষ, সকল মানুষই সম্মানের, ইহাই ছিল ভারতীয় সমাজ-গঠনের গোড়ার কথা। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ছোট বড় প্রায় সকলের মুখেই ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে একটি সার্ব্বজনীন অভিযোগ শোনা যায়। সামাজিক আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য ব্রাহ্মণেরা পুথিগত বিদ্যা সর্ব্বসাধারণকে দান করিতেন না। দেশের লোক-সংখ্যা, আয়, ব্যয়, ভৌগোলিক অবস্থা, পাত্রাপাত্র, প্রকৃতিগত বৈষম্য, বংশক্রম ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় বিচার করিয়া বিদ্যা দান করিতেন। বর্ত্তমান সময়ের মত তখন 'পাশে' ছিল না, 'পাশের' এমন 'হরিলুটও' ছিল না। আর তাহারই ফলে সে সময়ে শিক্ষার অরাজকতা ছিল না, শিক্ষার বাহুল্যও ছিল না। আজ বিদ্যাকে সার্ব্বজনীন করার ফলে দেশের ভিতরে ভয়াবহ শিক্ষার অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছে। শিক্ষার এইরূপ অরাজকতা রাষ্ট্রবিপ্লবের অপেক্ষাও ভয়াবহ। আজ পাশ্চাত্য দেশের বণিকগণ যেমন অতি লোভের বশবর্ত্তী হইয়া বৈজ্ঞানিক কলের সাহায্যে যেন যাদুমন্ত্রে পর্ব্বতপ্রমাণ শিল্প-সম্ভার প্রস্তুত করিয়া নিজ নিজ দেশের উপনিবেশসমূহে চোর করিয়া পাঠাইয়া দেন এবং সেই সেই দেশের প্রয়োজনেরও দশ বারগুণ অতিরিক্ত জিনিষ বিক্রয়ের আশায় গুদামজাত করিয়া রাখেন, তার পর অতি সস্তায় মাল বিক্রাইয়াও যখন বাজারে চাহিদা না থাকায় শুধু গুদাম খালি করিবার জন্য সেই সকল শিল্প-দ্রব্য পোড়াইয়া ফেলিতে বাধ্য হন, সেইরূপ আমাদের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দোকান-ঘর হইতেও এত অধিক সংখ্যক কলের তৈয়ারী বিদ্যা, বিলাতী ট্রেড-মার্ক 'পাশ' দেশের গুদামে গুদামে গুদামজাত হইয়া আছে যে, বাজারে অতি সস্তা দরে বিকাইয়াও আর উহাদের চাহিদা নাই। ইহারই নাম শিক্ষার অরাজকতা। শৈশবে বর্ণ-পরিচয় পুস্তকে পড়িয়াছিলাম :—

খেলা-পড়া করে যেই
গাড়ী-ঘোড়া চড়ে সেই।

বর্ত্তমান যুগের আধুনিক সংস্করণের বর্ণ-পরিচয়ে ঐ লাইন দুইটা কাটিয়া নূতন লাইন লিখিতে হইবে :—

খেলা-পড়া করে যেই
ঘোরে ফিরে মরে সেই।

বিদ্যাকে এইরূপ যথেচ্ছ ভাবে সর্ব্বত্র ছড়াইয়া দিয়া দেশে বিদ্যার অরাজকতা না আসিতে পারে, সমাজে সামাজিক বিপ্লব ঘনাইয়া না ওঠে, সেই জন্য প্রখর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ মণীষিগণ আক্ষরিক বিদ্যাকে নাড়ী ধরিয়া মাত্রামত দান করিতেন। অতি মাত্রায় দান করিয়া দেশের কর্ম্মীদিগকে কর্ম্মস্থান হইতে চ্যুত হইবার মত অবস্থার সৃষ্টি করিতেন না। আজ দেশের ভিতরে আক্ষরিক বিদ্যার সঙ্গে ব্যবহারিক বিদ্যার ভয়াবহ সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে, আর তাহারই ফলে ভারতের প্রাচীন সমাজ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

ব্রাহ্মণেরা বড় হইয়াছিলেন মানুষকে ছোট করিয়া নয়—মানুষকে বড় করিয়া, মানুষের সেবা করিয়া। সমাজে সামাজিক ব্রাহ্মণই ছিলেন সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্র। তাঁহাদের জীবিকাই ছিল সমাজের অপর তিন বর্ণের সেবা। সমাজও এই সেবার বিনিময়ে ব্রাহ্মণকে বৃত্তি, ব্রহ্মোত্তর দান করিতেন এবং সেই জন্যই যে কোন সামাজিক কর্ম্মে ব্রাহ্মণ-ভোজন প্রশস্ত বলিয়া প্রচলিত ছিল। সমাজের অপর তিন বর্ণ ব্রাহ্মণকে তাঁহাদের নিজ নিজ সংসারভুক্ত করিয়া লইয়াছিল। সেবার বিনিময়ে কোন কিছু গ্রহণ করা ভিক্ষা নয়, ইহার নাম উঞ্ছবৃত্তি। এই বৃত্তিই ছিল ব্রাহ্মণদের জীবিকা নির্ব্বাহের অবলম্বন। ব্রাহ্মণেরাই প্রথম সামাজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাণী 'যত্র জীব তত্র শিব' আবিষ্কার করিয়াছিলেন। 'বসুধৈব কুটুম্বকম' মন্ত্র তাঁহাদেরই মন্ত্র। ইহা তাঁহাদের পুথির কথা নয়, মনোযোগানো মুখ-রোচক বাক্য নয়, ইহা তাঁহাদের

আত্ম-দর্শনের স্বতঃসিদ্ধ ফল। উহা ভাব-বিলাসিতা নহে বা নৌখীন পোষাকী বাক্য মাত্র নহে। উহা তাঁহাদের বেদনা-বিদীর্ণ মর্ম্মবাণী, ভাগ্যহত জীবনের প্রদীপশিখা, অগ্নিবন্ধ অনুভূতি, পরম সত্তার স্ফুলিঙ্গ। দেশের জ্ঞানকে খর্ব্ব করিয়া পঙ্গু করিয়া নিজ নিজ প্রাধান্য সমাজে চিরস্থায়ী করিয়া রাখিবার জন্য সমাজ-বিজ্ঞানে ঐরূপ ব্যবস্থা প্রচলিত করেন নাই। তাঁহারা জানিতেন বিদ্যা-দানের অপব্যবহারে ও অতিব্যবহারে বিদ্যা অবিদ্যা হয়, অক্ষমতা হয়, বন্ধ্যা হয়, সমাজ-দেহে প্লেগের মত মহামারীরূপে প্রকাশিত হয়। অথচ ধর্ম্মতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, কৃষিতত্ত্ব, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, বিজ্ঞানের তত্ত্ব, দার্শনিক তত্ত্ব, বাণিজ্যতত্ত্ব, প্রভৃতি মানবজীবনের মোটামুটি সকল কথাই ব্রাহ্মণের যাত্রা, কথকতা দ্বারা সার্ব্বজনীন মেলার ভিতর দিয়া, সভা-সমিতির ভিতর দিয়া দেশের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া দিতেন। ভারতের অতি বড় মূর্খও আঙ্গুল দিয়া কচি ফল দেখায় না। গ্রামের সাধারণ কৃষকেরাও কেমন সুন্দররূপে চন্দ্রগ্রহণ গণনা করিতেন দেখুন :—

যে যে মাসে যে যে রাশি
তার সম্মুখে থাকে শশী
সে দিন যদি হয় পৌর্ণমাসী
অবশ্য তার গ্রাসে শশী।

তখনকার কৃষকেরা জানিতেন :—

"আমহি বলদ আমহি চাষ
আমি বলে তাহার বিশ্বাস।"
• • •
"আমহি বলতি আমহি মোয়ালি
হেন বলদের কি বাটনি।"

এ দেশের নিরক্ষর নৌকার মাঝি নদীর বাঁকে বাঁকে অন্ধকার আকাশকে বেদনাতুর করিয়া আজিও গাহিয়া যায় :—

"সময়াছি তুই যৌ যে যে...আমি আর যাইতে পারলাম না।
যাইতে যাইতে জনম গেল···তবু কূলের নাগাল পাইলাম না।"

বর্ত্তমান জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণও এমনি করিয়া আজীবন না পাওয়ার বেদনায় কাঁদিয়া যান। ভারতের নিরক্ষর মাঝির বেদনা ও এযুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণের বেদনা একই বিন্দুতে আসিয়া মিলিত হইয়াছে; এক কথায় ভারতের নিরক্ষর মাঝি সারাজীবনে নৌকা বাহিয়া বাহিয়া যে তত্ত্ব লাভ করিয়াছেন, বর্ত্তমান পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণও সমস্ত জীবন বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিয়া তাহাই লাভ করিয়া গিয়াছেন।

শিক্ষা মানুষের শরীর-বিধানের একটি স্বাভাবিক কার্য্য। মানুষ যেমন কোন কিছু না শিখিয়াও শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করে, সেইরূপ স্বভাবতঃই সে শিক্ষা করে। মানব-চিত্তের এই স্বাভাবিক শিক্ষা-প্রবণতাই তাহাকে শিক্ষিত করে। পরাধীনতা—এই অবস্থাটিই বিকৃত অবস্থা। ইহার ব্যবস্থা যত সুন্দর, যত নিখুঁত হউক না কেন, মানুষের ইহা প্রকৃতিগত প্রকৃতি নহে। এই হিসাবে বিচার করিলে দেখা যায় যে, ভারতের প্রত্যেকটি মানুষ আজ বিকৃত, প্রত্যেকটি মানুষ আজ রুগ্ন। রুগ্ন মানুষের ব্যবস্থাও রুগ্ন। সে ব্যবস্থায় মানুষ সোজাই হয়—বলশালী হইতে পারে না। কেন না সে ব্যবস্থায় প্রাণ থাকে না। তাই দেখিতে পাই, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় দেশের শিক্ষার নামে যে ব্যবস্থা প্রচলিত করিয়াছেন, তাহার অপব্যবহারে ও অতিব্যবহারে আজ দেশের ঘরে ঘরে যে বালক-বালিকা-মেধ যজ্ঞের অভিনয় প্রতিদিন চলিতেছে—ইহা ভাবিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়। এই আনন্দহীন, লবণ-হীন, নৈরাশ্যময় শিক্ষার অভিভারে দেশের ভবিষ্যৎ আশা-ভরসার স্থল বালক-বালিকার জীবন, মুকুলিত জীবনের অঙ্কুরিত প্রভাতেই ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। সামাজিক সম্পদের যে ভয়াবহ অপচয় শিক্ষার ভিতর প্রতিদিন সাধিত হইতেছে তাহার আর পূরণ নাই, they are simply the damaged goods of our national wealth. এই বিকৃত শিক্ষার সংস্পর্শ যিনিই লাভ করিয়াছেন, তাঁহার স্বাস্থ্যই কোন না কোন রকমে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

লেখা পড়া করে যেই
ঘোড়ায় চড়ে মরে সেই·····

এই বাক্য সমাজে আজ প্রায় প্রবাদে পরিণত হইয়াছে। দেশের এই বালকগণ যদি মূর্খ থাকিত, তবে হয়ত পূর্ণ স্বাস্থ্যের আনন্দ উপভোগ করিতে পারিত। শারীরিক পরিশ্রম করিয়াও ডাল-ভাতের সংস্থান করিতে পারিত। কিন্তু আজ লেখা-পড়া শিখিয়া ইহারা বাঁচিয়া থাকিবার প্রকৃতি-প্রদত্ত সেই স্বাভাবিক শক্তিটুকুও হারাইয়া ফেলিয়া সমাজে ভাসা মাল

হইয়া, damaged goods হইয়া আছে। ইহারই নাম শিক্ষার অব্যবস্থা।

নারীজীবনে গার্হস্থ্যধর্ম্ম শিক্ষার কি উপায়ের ব্যবস্থাই না তখনকার সমাজে প্রচলিত ছিল। নিজ নিজ গৃহে বসিয়া শুধু ব্রত-নিয়মের ভিতর দিয়া মেয়েরা ঘরকন্নার সকল রকম শিক্ষাই শিক্ষা করিত। এই প্রাণপর আনন্দময় শিক্ষার ব্যবস্থার ভিতরেই ছিল নারী-শিক্ষার বৈশিষ্ট্য। একটি সংসার সুন্দররূপে চালাইবার জন্য যে শিক্ষা, যে স্নেহ-মমতা, যে সংযম, যে পবিত্রতা, যে মধুর লজ্জাশীলতা, যে উন্নত চরিত্র একান্ত আবশ্যক, ঐ সকল ব্রত-নিয়মের ভিতর দিয়া বালিকারা জীবনের প্রথম প্রভাতে শুধু হাসিয়া খেলিয়া একেবারে হাতে-নাতে শিক্ষা করিয়া ফেলিত। ঐ ব্রতগুলি ছিল বাধ্যতামূলক (compulsory)। বাধ্যতা-মূলক ছিল বলিয়া উহা কর্কশ ছিল না। একটি সাম্রাজ্য সুচারুরূপে শাসন করিতেও যাহা যাহা দরকার, একটি সংসার চালাইতেও তাহাই দরকার। যে একান্ত ধৈর্য্য, যে পর্য্যবেক্ষণশক্তি, যে দূরদৃষ্টি, যে পারিপার্শ্বিক ধারাবাহিক অভিজ্ঞতা প্রধান-মন্ত্রীর পক্ষে একান্ত প্রয়োজন, একটি গৃহের গৃহিণীরও তাহাই প্রয়োজন। রাষ্ট্র-শাসনের আইন মানুষের নিকট কর্কশ বলিয়া মনে হয়, পক্ষান্তরে গৃহের অত্যোধিক নীরস ও কর্কশ ব্যবস্থাও শুধু নারীর স্নেহ-মাধুর্য্যে মধুময় হইয়া উঠে। নারীর গৃহ-শাসনের বৈশিষ্ট্য হইল এইখানে। এই বৈশিষ্ট্য নারী তাহার হৃদয় দিয়া রচনা করে। নারীহৃদয়ের এই স্নেহের সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ, এই একান্ত বিগলিত-মমতা ব্রত-নিয়মগুলির ভিতর দিয়া তাহাদের জীবনে শতদল পদ্মের মত অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে বিকশিত হইয়া উঠিত। এই সকল ছোট ছোট ব্রত-কথার ভিতর দিয়া মেয়েদের নিকট জীবনের যে বড় বড় দার্শনিক সত্য শুধু স্বচ্ছন্দে প্রকাশ করা হইত, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা এই কথার সত্যতা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব।

এক যে গয়লানী···

তার নাম সুখী গয়লানী। সুখীর সাত ছেলে। সাত ছেলের সাত বউ। সাত বউয়ের আবার ঘর-ভরা ছেলেমেয়ে। সুখীর গোয়াল-ভরা গরু, গোলা-ভরা ধান, পুকুর-ভরা মাছ, মালক ভরা তরকারী। সুখী সুখে থাকে, দৈন্যে কাঁচায়।

সুখ সুখ সুখ···

সুখীর কেবলই সুখ। দুঃখ কি তা সে জানে না। সুখীর এক সই ছিল। পাশের বাটীর একটি মেয়েকে কাঁদিতে দেখিয়া সুখী তার সইকে জিজ্ঞাসা করিল—'সই ও কি করে?'···

সই—'ও কাঁদে।'

সুখী—'কান্না বুঝি খুব মিষ্টি! নইলে কাঁদে কেন?'

সই—'কান্না মিষ্টি নয়। কান্না বড় জ্বালায়, বড় দুঃখের।'

সুখী—'আমার কাঁদতে ইচ্ছা করে সই। আমি সুখ চাই না সুখ চাই না। আমি কাঁদতে চাই। আমার দুঃখহীন সুখ আলুনী হয়ে গেছে। সুখে সুখ নাই, স্বাদ নাই। আমি কেঁদে সুখী হতে চাই।'

তারপর যাহা হইল সকলেই জানেন। সুখী জীবনে কাঁদে নাই, এইবার সে প্রথম প্রাণ ভরিয়া কাঁদিয়া সত্যিকার সুখকে আস্বাদন করিল। জীবনের পূর্ণ প্রকাশ যে শুধু সুখে নয়, শুধু দুঃখেও নয়, এই গভীর দার্শনিক সত্যটি কি সুন্দর রূপেই না ঐ ব্রত-কথাটির ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ইহাই ছিল বিনাব্যয়ে বাধ্যতামূলক পল্লী-শিক্ষার ভারতীয় ব্যবস্থা। ইহার অপেক্ষা নারী-শিক্ষার কি উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা হইতে পারে, জানি না। আজ আমরা বিলাতী নাগরিক জীবনের শিক্ষার ও সভ্যতার বাহ্য চাকচিক্যে সব হারাইয়া ফেলিয়াছি। বড় দুঃখ, আমাদের গৃহের ব্রত-নিয়মগুলিও মরিয়া গিয়াছে। আর তাহারই ফলে আমাদের পল্লী-জীবনের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আনন্দ সবই মরিয়া গিয়াছে। আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীর ভিতরে মারাত্মক ভুল এই যে, পল্লী-জীবন বিকাশের শিক্ষা ও নাগরিক জীবন বিকাশের শিক্ষা একরূপ ব্যবস্থারই সম্পন্ন হইতেছে। বর্ত্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থায় নাগরিক জীবনযাপনের শিক্ষাই দেওয়া হয়। তাহার সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষিত ব্যক্তির মনে নাগরিক জীবনযাপনের ইচ্ছাই বলবতী হইয়া উঠে, পল্লীজীবন তার নিকট আর রুচিকর হয় না। ইহারই ফলে পল্লী আজ জনশূন্য শ্মশানে

পরিণত হইতে চলিয়াছে। অথচ একদিন পল্লী-সমাজের এইরূপ আনন্দময় পবিত্র আবেষ্টনের ভিতর দিয়া তখনকার নারী-সমাজে প্রতিভাশালিনী নারীর জন্ম সম্ভবপর হইয়াছিল। আমাদের গৃহগুলিই ছিল বিনয়, চরিত্র, মনুষ্যত্ব ও মহত্ব অর্জ্জনের সামাজিক ল্যাবরেটরী।

আমাদের সবই ভিতরে আছে, শুধু স্থানচ্যুত হইয়া অচল হইয়া আছে। ঘড়ী বন্ধ হইলে যেমন দম দিয়া দিলেই আবার সে চলিতে থাকে—আমাদের জাতীয় জীবনের ঘড়ীটীও বহুদিনের অব্যবহারে ও অপব্যবহারে শুধু অচল হইয়া আছে। বর্ত্তমান সময়ের অবস্থা বিচার করিয়া রাষ্ট্রনৈতিক পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সামঞ্জস্য ঠিক রাখিয়া দেশের আবশ্যকমত পল্লী-জাত শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেই আবার আমাদের জাতীয় জীবনের ঘড়ী চলিতে থাকিবে। আমাদের বাংলার পরিবর্ত্তনের গোড়ার কথা হইল হিন্দু মুসলমানের রাজনৈতিক পাল্টী নয়, আন্তরিক মিলন। সেই মিলনের ক্ষেত্র নগরে নয়, সহরে নয়, সভায় নয়; সে মিলনের চিরন্তন ক্ষেত্র বাঙ্গালার শ্যামল পল্লীর স্নেহচ্ছায়া-সুশীতল কোলে, সেই শস্য-ক্ষেত্রে, গোচারণের সবুজ মাঠে, ঘন ছায়ায় ঘেরা বটের তলে, সান্ধ্যকালীন মেলায়, নৌকা-বাইচে, লাঠি-খেলায়, যাত্রা, কথকতায়; প্রতি দিবসের কর্ম্মে, প্রতি-দিবসের সুখদুঃখে, প্রতি দিবসের আনন্দ-উৎসবে।

হিন্দু মুসলমানের মিলিত শক্তি সংসারে কি করিতে পারে, তাহাদের নীরব সাক্ষ্য হইয়া আজিও যমুনা নদীর তীরে দাঁড়াইয়া আছে। আজ দেশের বড় দুর্দ্দিন। হিন্দুর দুর্দ্দিন, মুসলমানের দুর্দ্দিন। এতবড় দুর্দ্দিন এদেশে বুঝি আর কখনও দেখা দেয় নাই। দেশের মানুষ আজ damaged goods, সমস্ত দেশ আজ ক্ষুব্ধিত, ক্ষুধার আগুন দেশের ঘরে ঘরে চিতার আগুনের মত জ্বলিতেছে। আজিও যদি আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থে অন্ধ হইয়া মিলিতে না পারি, তবে বুঝিতে হইবে আমরা বাঁচিবার অযোগ্য, সংসারে আমাদের বাঁচিয়া থাকিবার ন্যায়সঙ্গত কোন অধিকার নাই; কেন না অযোগ্যের স্থান সংসারে নাই। ইহাই বিশ্বসৃষ্টির গোড়ার কথা। পৃথিবীর অতীত ইতিহাস নীরবে সেই সত্য কথা প্রতিদিন আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিতেছে। জগতের এতবড় অভিজ্ঞতাকে আজও যদি আমরা স্বার্থান্ধ হইয়া উপেক্ষা করি, তবে এই মৃত্যু-মৃত্যুর হাত হইতে কে আমাদিগকে বাঁচাইবে? আত্মঘাতীকে কে রক্ষা করিবে?

এখনও সময় আছে! এখনও যদি আমরা না ফিরিতে পারি পল্লীমায়ের স্নেহের কোলে, হিন্দু-মুসলমান আমরা এখনও যদি ভাই-ভাই হইয়া মিলিতে না পারি, তবে পল্লীর মর্ম্মবেদনার চোখের জল ফেলিয়া এ কথা আজ আমাদিগকে বলিতেই হইবে যে, আমাদের পোড়া কপালে :—

"ঐ আছে রসাতল ভাই।

বিশ্ব-দুনিয়া

...বিশ্ব-দুনিয়ার সাধারণ বিভাগের কোন্‌টী কোন্‌রূপে কতখানি বিস্তৃত তাহা সংক্ষেপতঃ বুঝিতে হইলে মানুষের মাথার কেশ, কর্ণের বহির্ভাগ, হস্তাগ্র, লিঙ্গ ও পায়ুদেশ বাদ দিলে বাহির হইতে মানুষ কি রকম দেখায়, তাহা একবার ধারণা করিতে হইবে তাহার পর মানুষের অন্তর কত ভাগে বিভক্ত তাহা বুঝিয়া লইতে হইবে এবং যে কয় ভাগে বিভক্ত, তাহা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ধারণা করিতে হইবে

...মানুষের অন্তর কত ভাগে বিভক্ত, তাহা বুঝিতে হইলে "অন্তর" বলিতে কি বুঝায়, তাহা সর্ব্বাগ্রে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। অস্থি-মাংসে মানুষের মাংস ও রক্ত প্রভৃতি যেরূপ "অন্তরে"র অন্তর্গত, সেইরূপ তাহার ইন্দ্রিয়শক্তি, মন ও বুদ্ধি প্রভৃতিও অন্তরের অন্তর্গত। অধিকাংশ লোকের ইন্দ্রিয়-শক্তি, মন ও বুদ্ধি প্রভৃতিকে অন্তরের শক্তি বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু উহাদিগকে অন্তর বলা হয় নাই। মানুষের মানসিক আকার যাহা হইতে উদ্ভাবিত ও বিকশিত হয়, তাহার সংস্কৃত আখ্যানুসারে তাহাদিগের নাম "অন্তর"।...

ট্রান্সভাল

----শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ

ট্রান্সভাল দক্ষিণ-আফ্রিকা ইউনিয়ন বা যুক্তরাষ্ট্রের সর্ব্বোত্তর প্রদেশ। ইহা লিম্পোপো নদের দক্ষিণে বিরাজিত। ইহার আয়তন ১ লক্ষ ১০ হাজার ৪ শত ৫০ বর্গ মাইল। অধিবাসী-সংখ্যা ১৫ লক্ষ হইতে পারে। ইহাকে বোয়ারদিগের দেশ বলা চলে। বোয়ারগণ ওলন্দাজ উপনিবেশিকদিগের বংশধর। ভিক্টোরিয়ান যুগের শেষ ভাগে এই দেশ বিশ্ববিখ্যাত বোয়ার যুদ্ধের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে।

লিম্পোপো বা কুম্ভীর-নদ ট্রান্সভালের বক্ষঃস্থল হইতে বাহির হইয়া এই দেশের উত্তরে প্রায় ২৫০ মাইল অতিক্রম করিয়া পূর্ব্বমুখে বহিয়া গিয়াছে। এই নদের মধ্যাংশ এই প্রদেশের উত্তর সীমাকে আলিঙ্গন করিয়াছে বলিলে ভুল হয় না। তদনন্তর এই নদ পূর্ব্বদিক্ পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণ দিকে ফিরিয়া লরেঞ্জো মার্কুয়েজ নামক প্রদেশে প্রবেশপূর্ব্বক প্রধান করদ নদ লিপালুলেকে গ্রহণ করিয়াছে। লিপালুলের অপর নাম হস্তী-নদ (এলিফ্যান্টস রিভার)। এই নদও লিম্পোপো বা কুম্ভীর নদের (ক্রোকোডাইল রিভার) ন্যায় ট্রান্সভাল প্রদেশের মধ্যস্থল হইতে বাহির হইয়াছে। লিম্পোপোর দক্ষিণ তীরের অপর করদ-নদীগুলিও ঐ স্থান হইতেই বহির্গত। এই সকল নদের একটীকে বোয়ারগণ ভ্রান্তিবশতঃ নাল্টুকুস্ নামকরণ করিয়াছিল। তাহারা ইহাকে নীলনদের উৎপত্তি-উৎস বলিয়া মনে করিয়াছিল। লিম্পোপোর বাম পার্শ্বের নদীগুলি মাটাবেলেল্যাণ্ড নামক প্রদেশের পর্ব্বতশ্রেণী হইতে প্রবাহিত হইয়াছে।

ট্রান্সভালের আকার ফ্রান্সের অষ্টাংশ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বৃহত্তর। শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীদিগের সংখ্যা প্রায় আড়াই লক্ষ। আদিম অধিবাসীদিগের সংখ্যা শ্বেতাঙ্গদিগের তিন গুণ বলিয়া জানা যায়। বোয়ারগণ ঘনসন্নিবিষ্টভাবে বাস না করিয়া বিস্তৃত স্থানে পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে বাস করিতে ভালবাসে। কৃষক ও পশুপালক জাতির পক্ষে এইরূপই স্বাভাবিক। প্রায় ৬ হাজার একর জমি লইয়া এক একজন বোয়ার বাস করে। ইহাদিগের অভিজাত ব্যক্তিবর্গ বা জমিদারগণ "ল্যাণ্ডড্রস্টস্" এবং "তেলদ্‌ং বর্ণেটস্" আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকে। এই সকল জমিদারের হস্তে এক প্রকার শাসনভার ন্যস্ত থাকে। আইন-কানুন ব্যাপারে ইহাদিগের কিছু কর্ত্তৃত্ব থাকিলেও বোয়ার কৃষকগণ যে বহু বিষয়ে স্বাধীন, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। তবে একটি বিষয়ে দিগের কোন স্বাধীনতা নাই। কোন কাফির বা অপর সম্প্রদায় বৃটিশদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ উদ্যত হইলে তাহাদিগকে বোদ্ধারূপে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে যাইতে হয়।

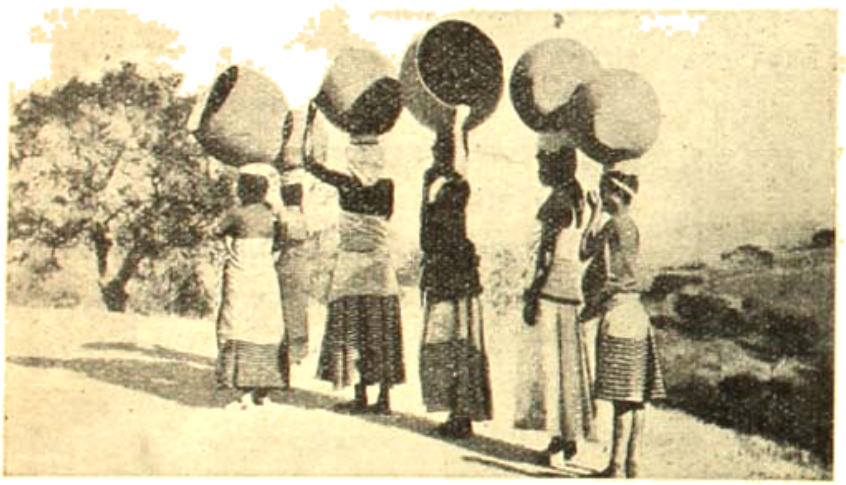

বেল্ডের বাহির হল।

বোয়ার বাথারগণের বাসগৃহ তেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নহে। তবে প্রয়োজনীয় পদার্থের প্রাচুর্য্য গৃহগুলিতে দেখা যায়। এক একটি বোয়ার বাসগৃহে বহু বালকবালিকা দৃষ্ট হয়। ইহা হইতে প্রমাণিত হয়, প্রায় প্রত্যেক গৃহস্বামীই বহু পুরুষকারের জনক। ব্যবহার দেখিয়া ইহাদিগকে ধর্ম্মভীরু বলিয়া মনে হয়। মধ্যে মধ্যে দলবদ্ধ হইয়া শিকার করিতে যাওয়ার প্রথা বোয়ারদিগের মধ্যে প্রচলিত। ইহাদিগের

গৃহে পথিক (কৃষক) অতিথিরূপে প্রায়ই আসিয়া থাকে। ইহা হইতে মনে হয়, ইহারা অতিথিবৎসলও বটে। অবশ্য স্বজাতি অতিথিদিগের প্রতিই প্রীতি পরিলক্ষিত হয়।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বোয়ারগণ পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে বাস করিয়া থাকে। অনেকে উপাসনাগার বা গীর্জ্জা-গৃহ হইতে বহু দূরে অবস্থান করে বলিয়া প্রত্যেক রবিবারে প্রার্থনাগারে যাওয়া তাহাদিগের পক্ষে সহজ হয় না। এই জন্য ইহারা সাধারণতঃ বৎসরে চারিবার দূরবর্ত্তী গীর্জ্জার উপাসনায় যোগ দিবার জন্য সপরিবারে গমন করিয়া থাকে। এই সময় গীর্জ্জা গৃহকে কেন্দ্র করিয়া এক একটি "গোলি ফেয়ার" বা পবিত্র মেলা বসিয়া থাকে।

বোয়ার বার্ঘারগণের অন্তরে জনপূর্ণ নগর সম্বন্ধে একটা সঙ্কোচ বা ভীতির ভাব বিদ্যমান বলিয়া বিশ্বাস। বিশেষ প্রয়োজন না হইলে ইহারা নগরে গমন করে না। ইংরেজ, ওলন্দাজ এবং অন্যান্য বিদেশীয়গণ ত্রান্সভালের বক্ষে বিক্ষিপ্তভাবে বিরাজিত নগরগুলিতে বাস করে। এই সকল নগরের নামগুলি বিচিত্র। কোন নামের অর্থ "সমর্থ বা সংগ্রাম", কোন নামের মর্ম্ম "হত্যাকাণ্ড"; "দুঃখ", "অশ্রু" প্রভৃতি আখ্যাধারী নগরও দেখা যায়। অতীতে অনুষ্ঠিত কোন শোচনীয় বা অবাঞ্ছনীয় ব্যাপার এইরূপ নামের কারণ, সে বিষয়ে সংশয় থাকিতে পারে না।

টুকরী-বিক্রেতা।

ত্রান্সভালের দক্ষিণ-পূর্ব্ব প্রান্তে অবস্থিত একটি হ্রদাবলী-মণ্ডিত ও পর্ব্বতপুঞ্জপূর্ণ জিলা পূর্ব্বে "নিউ ক্যাটল্যাণ্ড" আখ্যায় অভিহিত হইত। প্রথমে বহু স্কচ এই অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল বলিয়াই এইরূপ নাম প্রদত্ত হইয়াছিল। অবশ্য ক্যাটল্যাণ্ডের পর্ব্বতবহুল প্রকৃতির সহিত এই প্রদেশের নৈসর্গিক দৃশ্যাবলীর সাদৃশ্যও অস্বীকার করা যায় না। এই জিলার একটি নগরের নাম "ম্যাক-ম্যাক"। এই নামটিও স্কটল্যাণ্ডের স্মৃতি উদ্দীপিত করিতেছে। বোয়ার-যুদ্ধের সময় এই প্রদেশের অধিবাসী বহু বৃটনকে স্বজাতির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে হইয়াছিল। তবে এই অঞ্চলের অধিকাংশ অধিবাসী ডাচ বা ওলন্দাজ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং ইহারা ওলন্দাজদিগের প্রতি সহানুভূতিশীল হইলে তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই থাকে না। ইহারা এক প্রকার বিকৃত ডাচ ভাষায় কথা কহে। এই ভাষা "তাগাল" আখ্যায় অভিহিত। এই সকল ওলন্দাজ পরস্পর বিদ্বেষভাবাপন্ন বা কলহ-পরায়ণ হইলেও বৃটিশদিগের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিবার সময় সকলে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া থাকে।

এক সময় ত্রান্সভালের রাজধানী পোচেফ্‌ষ্ট্রুম নামক স্থানে স্থাপিত ছিল, পরে উহা প্রিটোরিয়ায় স্থানান্তরিত হয়। অপেক্ষাকৃত মধ্যস্থলে অবস্থিত বলিয়া প্রিটোরিয়া রাজধানী হইবার পক্ষে যোগ্যতর বিবেচিত হইয়াছে। আদিম বার্ঘার-নেতা-সংগ্রামের নিঃশঙ্ক নেতা প্রিটোরিয়াসের নাম হইতে এই নগর প্রিটোরিয়া নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। শ্যামসুন্দর শৈলমালা এবং মহান্ মহীরুহসমূহে মণ্ডিত, শ্যামা বনভূমিতে বেষ্টিত বলিয়া এই নগর প্রত্যেক পর্য্যটকের প্রশংসা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অনেকে ইহাকে দক্ষিণ আফ্রিকার নগর-সমূহের মধ্যে সুন্দরতম বলিয়া মনে করেন। রক্তরাগরঞ্জিত এবং শুভ্র সৌধসমূহ এবং তাহাদিগের চতুর্দ্দিকে বিরাজিত মঞ্জুল কুঞ্জ-কানন এবং প্রস্ফুটিত পুষ্পপূর্ণ গোলাপের গাছগুলি একান্ত নয়নরঞ্জন। উদ্যানাবলী এবং ইউক্যালিপ্‌টাস বৃক্ষ-বীথি মধ্যে মধ্যে বিদ্যমান রহিয়া এই নগরের চিত্তাকর্ষক বৈচিত্র্য বাড়াইয়া তুলিয়াছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রাসাদে মণ্ডিত বিশাল নগর হইলেও ইহার পল্লীগ্রামসুলভ প্রকৃতি

অস্বীকার করা যায় না। কলকলনাদে এবং তরতর বেগে প্রবহমান স্রোতস্বিনীসমূহ প্রিটোরিয়া সহরের আর একটি প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য। মোটের উপর কৃত্রিম কমনীয়তার সহিত স্বভাব-শোভার সম্মেলন এই নগরকে দক্ষিণ আফ্রিকার সুন্দরতম সহরে পরিণত করিয়াছে।

প্রিটোরিয়ার লোকসংখ্যা ৩০ হাজারের কম নহে। বোয়ার যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে যে লোক-সংখ্যা ছিল, একণে

বার্ব্বারটনের বৃক্ষবাহিবেষ্টিত পথ।

তদপেক্ষা তিনগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। প্রিটোরিয়ার ৩০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে জোহানেসবার্গ নামক নগর বিরাজিত। এই জোহানেসবার্গ নগর যেরূপ অকস্মাৎ গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাকে বিস্ময়কর ব্যাপার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যেমন আলাদীনের ঐন্দ্রজালিক প্রদীপের প্রভাবে প্রকাণ্ড প্রাসাদ একটিমাত্র রাত্রির মধ্যে গড়িয়া উঠিত, তেমনই অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে এই নগর সমুৎপন্ন ও সমৃদ্ধিশালী হইয়া পড়িয়াছে। এক শতাব্দী পূর্বে ট্রান্সভাল প্রদেশে স্বর্ণখনি আবিষ্কৃত হইবার সংবাদ ইউরোপে প্রথম প্রবেশ করিয়া অনেকের অন্তরে লালসার অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছিল। তবে তখন ঐ স্বর্ণখনিসমূহের কার্য্য বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। যাহারা স্বর্ণের সন্ধানে প্রথম গিয়াছিল, তাহারা ট্রান্সভালের পর্ব্বতবহুর পূর্বসীমান্তে অবস্থিত বার্ব্বারটন নামক স্থানে উপনীত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। এখনও বার্ব্বারটন এবং ট্রান্সভালের অপর কয়েকটি স্থানে স্বর্ণ-খনির কার্য্য চলিতেছে। কিন্তু দক্ষিণ-আফ্রিকার স্বর্ণখনিসমূহের মধ্যে যাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহা উইটওয়াটারস্র্যাণ্ড নামক স্থানে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হয়। এই ওলন্দাজ নামটির ইংরেজী মর্ম্ম "হোয়াইট ওয়াটার্স রীজ"। দীর্ঘ আখ্যাটির পরিবর্ত্তে সংক্ষিপ্ত "র‍্যাণ্ড" নাম ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

এই স্থানের গিরিপ্রান্তে ১ শত ৩০ মাইল ব্যাপিয়া স্বর্ণপূর্ণ স্থান অবস্থিত। প্রস্থে এই স্থান প্রায় ৩০ মাইল। জোহানেসবার্গ নগরের দুই দিকেই কিছুদূর পর্য্যন্ত স্বর্ণসংগ্রহের চেষ্টা অনুষ্ঠিত হইয়া এই জনপদটিকে স্বর্ণসংগ্রহ ব্যাপারে অন্যতম প্রধান কেন্দ্র করিয়া তুলিয়াছে। ইহাকে সর্ব্বাধিক স্বর্ণপ্রসূ প্রদেশের কেন্দ্রস্থল বলা চলে। যে প্রদেশে ইহা অপেক্ষা স্বল্প পরিমাণ স্বর্ণ পাওয়া যায় উহার কেন্দ্রস্থল হীডেলবার্গ নামক নগর। ইহাও ট্রান্সভালের পূর্ব্ব প্রান্তে বিরাজিত। স্বর্ণখনির কার্য্যে বিপুল মূলধন এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীর প্রচুর যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক প্রক্রিয়া প্রযোজন। স্বর্ণ কোথায় এবং কি পরিমাণ রহিয়াছে তাহা কতিপয় প্রস্তর-বিশেষের বিদ্যমানতার দ্বারা বিশেষজ্ঞগণ বুঝিতে পারেন।

এ বিষয়ে সংশয় নাই যে, জোহানেসবার্গের বিস্ময়কর আকস্মিক সমৃদ্ধির কারণ, কমনীয়-কান্তি কাঞ্চন। পত্তন বা স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে বিশেষজ্ঞগণ, এঞ্জিনীয়ারের দল এবং ভাবী লক্ষপতিদিগের দ্বারা ইহার বক্ষ পূর্ণ হইয়াছিল। অবশ্য

স্বর্ণসংগ্রহ ব্যাপারের সহায়ক কর্ম্মী ও শ্রমিকদল ত আদিয়াই ছিল। আর আদিয়াছিল কল্পনাবিলাসী "স্পেকুলেটরে"র দল এবং এক শ্রেণীর প্রবঞ্চনা-পরায়ণ ব্যক্তিগণ, যাহারা জটিল জাল ফেলিয়া সরল-হৃদয় ব্যক্তিদের সর্ব্বনাশ সাধন করে। আদিম অধিবাসী কাফ্রীরাও শ্রমিকের কার্য্য করিবার জন্য আসিয়া থাকে এবং ফিরিবার কালে নানাপ্রকার বিচিত্র বিচিত্র পরিচ্ছদ পরিয়া গৃহে ফিরিয়া যায়। এমন কি দূর আফ্রিকার নদীর তীর হইতেও কাফ্রীরা জোহানেসবার্গ এবং

এই সমস্যা-সমুত্থিত সহর ক্রমশঃ বিলাতী সহরের প্রকৃতি প্রাপ্ত হইতেছে, বহু পর্য্যটক এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন। যে সার্ব্বভৌম ভাব এই নগরে পূর্ব্বে দেখা যাইত, এখন আর তাহা দৃষ্ট হয় না, বলিলে চলিতে পারে। পূর্ব্বে ইহা "নিউ জেরুজালেম" বা নব জেরুজালেম এবং "জোহানেস্‌বার্গ দি গোল্ডেন" বা স্বর্ণময়ী জোহানেস্‌বার্গ প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত হইত। ইহা দক্ষিণ-আফ্রিকার বৃহত্তম জনপদ, সে বিষয়ে সংশয় থাকিতে পারে না। ১ লক্ষ ২০ হাজার

ট্রান্সভাল-নদী পার হইবার দৃশ্য।

তাহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহে কর্ম্মের সন্ধানে আগমন করে। নিয়োক্তারা এই সকল কাফ্রী শ্রমিককে দেয় অধিক পারিশ্রমিক সম্বন্ধে অনেক সময় অভিযোগ আনয়ন করেন বটে, কিন্তু তাহাদের পরিশ্রমের উপরে তাঁহাদিগের সম্পদ্ বা সমৃদ্ধির সৌধ প্রতিষ্ঠিত, এই সত্য তাঁহারা বিস্মৃত হন। আজকাল অন্যান্য স্থানের শ্রমিকদের মত কাফ্রী শ্রমিকরাও অধিক পারিশ্রমিক পাইবার জন্য ধর্ম্মঘট প্রভৃতি উপায়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। কাফ্রীরাও ক্রমশঃ আধুনিক সভ্য সমাজসুলভ কুটিল কৌশলসমূহে অভ্যস্ত হইয়া পড়িতেছে।

শ্বেতাঙ্গ স্বর্ণপ্রসূ প্রদেশের কেন্দ্রস্বরূপ এই নগরে বাস করে। অন্যান্য বর্ণবিশিষ্ট অধিবাসীর সংখ্যা শ্বেতাঙ্গের সমান হইবে। সমতল প্রান্তর-বক্ষে অবস্থিত একটি পার্ব্বত্য প্রদেশের উপর এই নগর বর্ত্তমান। এই প্রদেশটি সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৬ হাজার ফিট উচ্চ। এই প্রদেশের আকাশ ও বাতাস তীব্র রৌদ্রতপ্ত এবং প্রবল বায়ু-বিক্ষুব্ধ এবং ধূলিমলিন হইলেও বিশেষ স্বাস্থ্যকর।

নগরের রাস্তাগুলি সুগঠিত ও সুবিন্যস্ত। প্রথমাগত-দিগের টিনের ছাউনি এবং দেশীয়দিগের কুটীরাবলীর উর্দ্ধে

অম্বরচুম্বী ধূমোদ্গারী দীর্ঘদেহ চিমনিসমূহ। ঠিক এই ধরণের দৃশ্য দক্ষিণ-আফ্রিকার অন্যত্র বিরল। প্রধান পথটির নাম রেল্‌ফ্ ষ্ট্রীট। বহু শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া এই প্রধান পথ সকলাপেক্ষা কর্মব্যস্ত পল্লীর উপর দিয়া অগ্রসর হইয়াছে। পথের দুই ধারে সমুন্নত সৌধশ্রেণী। নগরটি উপকণ্ঠসমূহের বিস্তৃত বক্ষদেশ পর্য্যন্ত প্রসারিত। এই সকল উপকণ্ঠ উদ্যানাবলীর দ্বারা ভূষিত হইয়া বিশেষ শোভাসম্পন্ন। নগরের প্রান্তে আবর্জ্জনার স্তূপ এবং স্বর্ণখনির কার্য্যের জন্য প্রস্তুত গালভানাইজড্ লৌহের গৃহাবলী। ভূমির নিম্নে মধুচক্রের মত বহু বহু বৃহদ্ব্যাপী সুড়ঙ্গসমূহ। এই সকল সুড়ঙ্গ বৈদ্যুতিক আলোকে সর্ব্বদা উদ্ভাসিত। সুড়ঙ্গের দুই পার্শ্বে কৃষ্ণকায় প্রস্তর-প্রাচীর অসংখ্য অট্টালিকা বক্ষে ধরিয়া

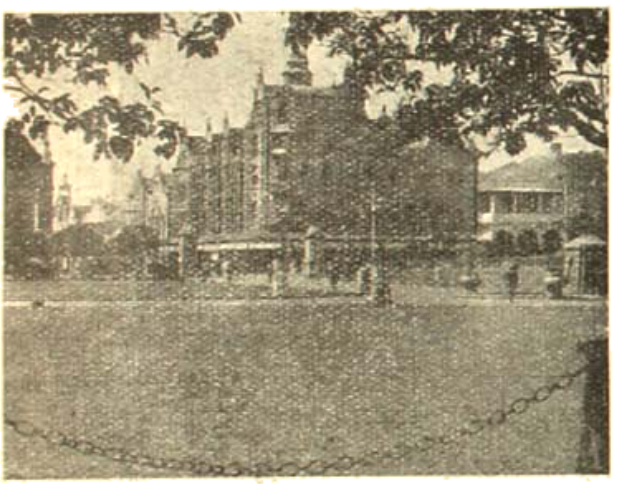

প্রিটোরিয়া—চার্চ্চ স্কোয়ার।

নীরবে দাঁড়াইয়া। ইহারাই দক্ষিণ আফ্রিকার সুবিখ্যাত স্বর্ণখনি, যাহার জন্য লক্ষ লক্ষ লোক বাসনাবিক্ষুব্ধ বক্ষে ছুটিয়া আসিয়াছে; যাহার জন্য ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বহু যুদ্ধ বা সঙ্ঘর্ষ সংঘটিত হইয়াছে; যাহার জন্য অগণ্য সৈন্য যুদ্ধ-ক্ষেত্রে মরণ বরণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। হোটেল, দোকান, ক্লাব, থিয়েটার, বায়োস্কোপ প্রভৃতি আধুনিক নাগরিক জীবনের শত শত প্রয়োজন ইহাদিগকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠিয়া জোহানেসবার্গকে দক্ষিণ-আফ্রিকার বৃহত্তম ও বিচিত্রতম জনপদে পরিণত করিয়াছে।

চারিদিকে অনুর্ব্বর প্রদেশ বিষ্ঠাবেষ্টিত বলিয়া জোহানেসবার্গে আহার্য্যদ্রব্য বিশেষ মহার্ঘ্য। ইংলণ্ডে রুটি ও মাংস যে মূল্যে বিক্রীত হয়, এখানে তদপেক্ষা দ্বিগুণ দাম দিয়া এই খাদ্য দ্রব্যাদির ক্রয় করিতে হয়। দুগ্ধের দাম ছয় গুণ অধিক। বাড়ীর ভাড়া সাত গুণ বেশী। শাক-সব্জী মিলে না বলিলেও চলিতে পারে। মসলা-জাতি বা মুদীর দোকানে প্রাপ্য জিনিষগুলি সোণার দামে বিক্রীত হয় বলিলেও অতিরঞ্জন হয় না। স্বর্ণপ্রস্তর বা সোণার ওরের (gold ore) সহিত এই সকল জিনিষ সম ওজনে বিক্রীত হয় শুনিয়া অনেকে বিশেষ বিস্মিত হইবেন। বোয়ার-যুদ্ধের অব্যবহিত পরবর্ত্তী সময় হইতে প্রত্যেক প্রয়োজনীয় পদার্থের মূল্য এইরূপ বিস্ময়কর বৃদ্ধি লাভ করে। এই মূল্যবৃদ্ধি এবং ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ক বিশৃঙ্খলার জন্য অনেকে বেকার অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সোণার খনিগুলিতে কর্ম্মের সন্ধানে ব্যাকুল ভাবে ফিরিতে লাগিল। এই স্থানে বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, খনির কাজ খোঁড়াই এবং কুকাজ উভয়ের পক্ষেই স্বাস্থ্যের দিক্ দিয়া বিশেষ অনিষ্টকর, এমন কি অবস্থাবিশেষে মারাত্মক বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। প্রস্তর কাটিবার সময় যে ধূলি নির্গত হয়, তাহা নাসাপথে প্রবেশপূর্ব্বক শ্বাসযন্ত্র-সম্পর্কীয় ব্যাধি উৎপাদন করে। সুতরাং শত শত লোকের স্বাস্থ্যের বা জীবনের বিনিময়ে স্বর্ণখনির মালিকরা অতুল ঐশ্বর্য্য সঞ্চয় করিতে সমর্থ হন, এই সত্য সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

বোয়ার যুদ্ধের অবসানে খনিসমূহের অধিকারী বা খনির মালিকরা কাফ্রী শ্রমিকদিগের অধিক পারিশ্রমিক দাবীর বিরুদ্ধে অনুযোগ উত্থাপন করিতে লাগিলেন। এই অবস্থা হইতে অব্যাহতি বা উদ্ধারলাভের জন্য চৈনিক শ্রমিক আনিবার ব্যবস্থা করা হইল। চৈনিক শ্রমিকগণ নৈতিক দিক্ দিয়া যতই হীন হউক, তাহারা কাফ্রী অপেক্ষা বহুগুণ পরিশ্রমপরায়ণ ও কার্য্যদক্ষ সন্দেহ নাই। চীনা শ্রমিকদিগের আগমন আশঙ্কায় এবং অন্যান্য উপনিবেশের শ্রমিকদলের মধ্যে অসন্তোষ ও রোষ উৎপাদন করিল। এবিষয়ে বৃটেনেও আন্দোলন চলিতে লাগিল। কয়েকজন চৈনিকের নৈতিক হীনতা এই অসন্তোষ ও আন্দোলন বৃদ্ধি হইবার হেতু হইল। শুধু এই সকল অন্যায়কারী চীনার প্রতি কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হইল, তাহা নহে, প্রত্যেক চীনাকে নানা প্রকার বিধি-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে হইল। বোয়ার-যুদ্ধ

সম্পাদিত হইবার কালে কর্তৃপক্ষ বিদেশ হইতে আগত শ্রমিকদিগের সম্বন্ধে অনুকূল আইন-কানুন প্রণয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু পরবর্তী মন্ত্রিমণ্ডল ট্রান্সভালকে স্বতন্ত্র উপনিবেশে পরিণত করিবার আকাঙ্ক্ষায় চীনা প্রভৃতি বিদেশীয় শ্রমিকদিগের আগমন বন্ধ করিতে প্রয়াস করিলেন। যেমন অষ্ট্রেলিয়া হইতে কানাকাদিগকে বহিষ্কৃত করিবার চেষ্টা চলিয়াছিল, তেমনই ট্রান্সভাল হইতে চীনাদিগকে তাড়াইবার চেষ্টা চলিতে লাগিল। ইহার পর র‍্যাণ্ডের (Rand) খনি অধিকারী খনিকদিগকে প্রধানতঃ কাফ্রী কুলিদিগের উপর নির্ভর করিয়াই খনির কার্য্য পরিচালন করিতে হইল। অনেকে পূর্ব্ব-আফ্রিকার পর্ত্তুগীজ অধিকৃত-প্রদেশ হইতে দেশীয় শ্রমিক আমদানি করিতে বাধ্য হইলেন।

এ বিষয়ে সংশয় নাই যে, জোহানেসবার্গের স্বর্ণখনিসমূহের স্বর্ণ-প্রসবিনী শক্তি ক্রমশঃ ক্ষয় হইয়া আসিতেছে। সেই দিন আসিতে আর বড় দেরী নাই, যে দিন জোহানেসবার্গের পার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বত শ্রেণীর বক্ষে লুক্কায়িত স্বর্ণরাশির একখণ্ডও অবশেষ রহিবে না। দক্ষিণ আফ্রিকার বাবিলন স্বরূপ যে সহর অতর্কিতভাবে অলোকিক মায়ার মত বা ঐন্দ্রজালিক ব্যাপারের ন্যায় অকস্মাৎ আবির্ভূত হইয়াছিল, সেদিন তাহা স্বপ্নের মত সহসা কালের কোলে বিলীন হইতে পারে। বোয়ার-যুদ্ধ সমাপ্ত হইবার পরবর্ত্তী বৎসরে প্রায় এক কোটি মুদ্রা (পাউণ্ড) মূল্যের স্বর্ণ এই পার্ব্বত্য প্রদেশে পাওয়া গিয়াছিল। ইহার পর অধিকতর স্বর্ণখনিসমূহ হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল বলিয়া আমরা অবগত হই।

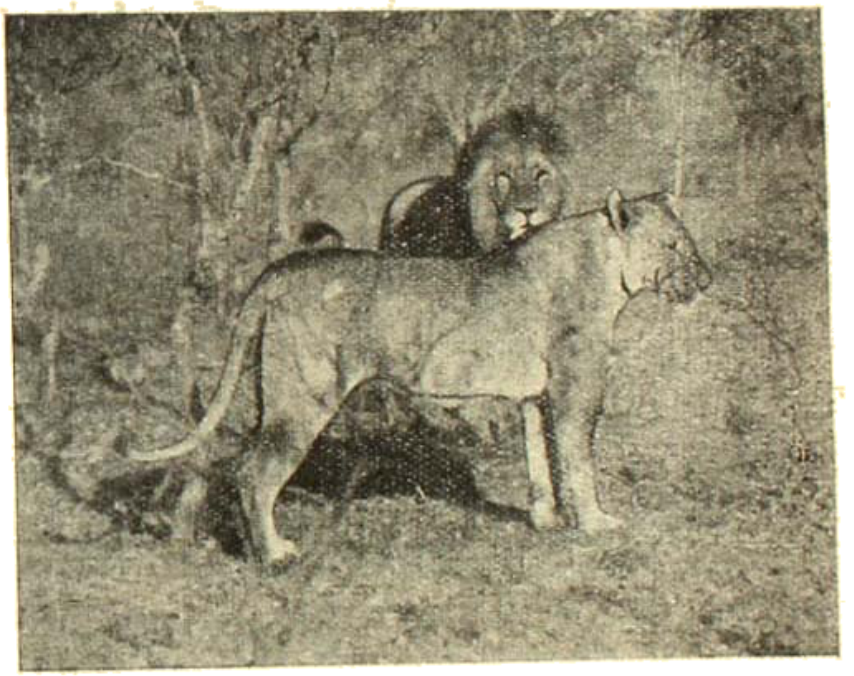

কুগার ন্যাশনাল পার্কে সিংহ-সিংহী।

প্রিটোরিয়া এবং জোহানেসবার্গ হইতে কতিপয় শাখা রেলপথ বিভিন্ন দিকে অগ্রসর হইয়া গমনাগমন বা আদান-প্রদানের সুবিধা করিয়া দিয়াছে। ট্রান্সভালের এই প্রধান স্থানদ্বয় হইতে একটি রেলপথ নীলষ্ট্রুমের (Nylstroom) পার্শ্ব দিয়া পিটার্সবার্গ পর্য্যন্ত গিয়াছে এবং তথা হইতে উহা আরও উত্তরে অগ্রসর হইয়া রোডেসিয়ার সালদানা বে বন্দরে উপনীত হইয়াছে। পর্ব্বতসঙ্কুল প্রদেশের উপর দিয়া প্রসারিত আরও কতিপয় পথ ষ্টাকেনবার্গ শৈলমালার সন্নিকট লিম্পোপো নদের মিলনস্থলে উপস্থিত হইয়াছে। লোরেঞ্জো মার্কুয়েজ রেল-লাইন পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইয়া, মিডলবার্গ ও রেলকাটের পার্শ্ব এবং লিডেনবার্গ ও বার্ক্লীবটনের মধ্যবর্ত্তী স্বর্ণপূর্ণ পার্ব্বত্য প্রদেশের উপর দিয়া গিয়াছে। একটি শাখা রেলরাস্তা বার্ক্লীবটন পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে। আমরা যখন ট্রান্সভাল গিয়াছিলাম, তখন একটি শাখাপথ লিডেনবার্গ পর্য্যন্ত সদ্যঃ প্রস্তুত হইয়াছিল।

খনির সম্পদের মধ্যে স্বর্ণই ট্রান্সভালের একমাত্র আকর্ষণ ইহা বলিলে সম্পূর্ণ সত্য বলা হয় না। অন্যান্য খনিজ সম্পদেও এই দেশ সমৃদ্ধ। প্রিটোরিয়া হইতে অনতিদূরে কতিপয় হীরকখনির কার্য্য চলিবার কথা আমরা অবগত আছি। এই সকল খনিকে কিম্বার্লির বিশ্ববিখ্যাত হীরকখনি-সমূহের সহিত তুলনা করা চলে। এই প্রদেশের অপর অংশেও হীরক ও নীলকান্তমণি আবিষ্কৃত হইবার সংবাদ জানা গিয়াছে।

ট্রান্সভালে পাথুরিয়া কয়লার খনিও আবিষ্কৃত হইয়াছে। অন্যান্য ধাতুর মধ্যে লৌহ, সীসা, তাম্র প্রভৃতিও এই প্রদেশে বিদ্যমান। বহুদূর-ব্যাপী বিশাল বনানীগুলিও এই দেশের অন্যতম সম্পদ্। এই দেশের মৃত্তিকার রঙ কোথাও লাল, কোথাও কাল। এই মৃত্তিকার শস্যোৎপাদিকা শক্তি সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারে না। প্রয়ত্ন করিলে এই লাল ও কাল মাটিতে বহু ফলিতে পারে। অবশ্য বোয়ার-যুদ্ধের সমাপ্তির পর হইতে এই বিষয়ে প্রচেষ্টা অনুষ্ঠিত হইতেছে।

আমরা এই স্থানে বোয়ার-যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত প্রদান করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এই যুদ্ধে ওলন্দাজদিগের বংশধর বোয়ারগণ এক পক্ষে এবং অপর পক্ষে বৃটিশগণ দণ্ডায়মান হইয়াছিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় উপনিবেশ স্থাপনকারী উভয় জাতির মধ্যে প্রতিযোগিতা বহুদিন হইতেই চলিয়া আসিতেছিল। অবশ্য ডাচ বা ওলন্দাজরাই এই দেশে সর্ব্বাগ্রে আগমন করিয়াছিল। বার্গস্, ভেল্ড্‌শুন, কোপজিস, ব্লুকস্, ক্রিপ্স প্রভৃতি শব্দকে ওলন্দাজ প্রভাবের পরিচয়-চিহ্ন বলা চলে। বোয়ারগণ সহিত ওলন্দাজ জাতির আধিপত্য দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রতিষ্ঠিত হইবে। অন্য দিকে বৃটিশগণ আপনাদিগের প্রাধান্য প্রসারিত করিবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিত। ট্রান্সভালের বক্ষে স্বর্ণখনির আবিষ্কার এই প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে প্রবলতর করিয়া তুলিল।

এ বিষয়ে সংশয় নাই যে, বোয়ারগণ স্বভাবতঃ শান্তিপ্রিয়, কৃষিকার্য্য-পরায়ণ এবং প্রাচীন পন্থায় জীবন যাপনে অভ্যস্ত জাতি। বাণিজ্য-ব্যাপারে বা খনিজসম্পদ্-সম্পর্কীয় কার্য্যসমূহে বৃটিশদিগের ন্যায় অনুরাগ বা অধ্যবসায় তাহাদের নাই। সুতরাং বৃটিশ জাতি আসিয়া খনির কার্য্যে এবং বাণিজ্য-ব্যাপারে শীঘ্রই অগ্রবর্ত্তী হইয়া পড়িয়া বোয়ারদিগের অন্তরে অসন্তোষ জাগাইয়া তুলিল। বোয়ারগণ বৃটিশ প্রভৃতি বিদেশীয়দিগকে "আউটল্যাণ্ডার" আখ্যা প্রদান করিত। আউটল্যাণ্ডারদিগের সংখ্যা ও প্রভাব দিন দিন বৃদ্ধি হওয়া বোয়ারদিগের পক্ষে বিশেষ বিদ্বেষ ও উদ্বেগের কারণ হইয়া পড়িল। স্বজাতীয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্য ট্রান্সভালের কর্তৃপক্ষ হল্যাণ্ড হইতে বহু ওলন্দাজকে আনাইবার সঙ্কল্প করিলেন। এই সঙ্কল্পও বোয়ারদিগের মনঃপূত হইল না। কর্তৃপক্ষের ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া বহু বোয়ার ট্রান্সভাল পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপর প্রদেশে গমন করিল।

উভয় পক্ষই সহিষ্ণু হইলে এই সংগ্রাম কখনও সঙ্ঘটিত হইত না। তাহা ছাড়া যিনি তখন বোয়ার জাতির নেতা ছিলেন, তিনি দূরদর্শী রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ ছিলেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না। এই নেতার নাম ক্রুগার। অবশ্য এই ব্যাপারে কেবল বোয়ারদিগকে দোষী মনে করিলে চলিবে না, প্রতিপক্ষ বৃটিশগণও অনেক বিষয়ে হঠকারিতা দেখাইয়াছিলেন, দূরদর্শিতা দেখাইতে পারেন নাই। এই অদূরদর্শিতার দৃষ্টান্ত "জেমসন রেড" (Jameson Raid) বা "জেমসন-আক্রমণ" নামক বিখ্যাত শোচনীয় ব্যাপার। সার ষ্টার জেমসন সসৈন্যে রোডেসিয়া হইতে আসিয়া এই একান্ত অবাঞ্ছনীয় গর্হিত কার্য্য করিয়াছিলেন। যেমন শুষ্ক তৃণরাশিতে অগ্নিকণা পতিত হইলে তাহা প্রচণ্ড বেগে জ্বলিয়া উঠে, তেমনই জেমসনের কৃত কদর্য্য কার্য্য বোয়ারদিগের উত্তেজনা পক্ষ শুণ বাড়াইয়া তুলিল। শান্তি স্থাপিত হইবার আশা আর রহিল না।

অবশেষে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের শরৎকালে সংগ্রাম আরম্ভ হইল। অরেঞ্জ ফ্রি-ষ্টেটের পক্ষে বৃটিশদিগের সহিত কলহ করিবার কোন কারণ না থাকিলেও, ঐ দেশ ট্রান্সভালের পক্ষ অবলম্বন করিয়া বৃটিশদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। বৃটিশ সংবাদপত্রসমূহ সগর্ব্বে ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করিল, আমাদিগের জয় অবশ্যম্ভাবী। অন্য দিকে বৃটিশদিগের সুবিস্তৃত সাম্রাজ্যদর্শনে ঈর্ষান্বিত য়ুরোপের অন্যান্য জাতি উচ্চ কণ্ঠে বৃটিশ জাতির অধঃপতনের কথা ঘোষণা করিতে লাগিল। শুধু বৃটেন হইতে নয়, প্রত্যেক বৃটিশ উপনিবেশ হইতে প্রচুর সাহায্য বৃটিশ বোদ্ধারা প্রাপ্ত হইয়াছিল। যিনি বৃটিশ সৈন্যসঙ্ঘ পরিচালন করিতে লাগিলেন, তাঁহার বিস্ময়কর সাহস ও দক্ষতা সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। বৃটিশ সৈন্যের সৌভাগ্য তাহারা লর্ড রবার্টসের ন্যায় নেতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। প্রথম প্রথম বোয়ারগণ যুদ্ধে বিজয়ী হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাদিগের কৃতকার্য্যতা আদৌ স্থায়ী হয় নাই। এই যুদ্ধ প্রমাণ করিয়াছিল যে, বোয়ারগণ আত্মরক্ষা কার্য্যে যেরূপ দক্ষ, আক্রমণ ব্যাপারে সেইরূপ নৈপুণ্য তাহাদিগের ছিল না। পরিশেষে লর্ড রবার্টসের পরিচালিত বৃটিশ

সৈন্য বার বার অগ্রসর করিতে লাগিল এবং তিনি বিজয়-বাহিনীসহ উত্তর রাজ্যের রাজধানী প্রিটোরিয়া এবং ব্রুবফটিন পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে সমর্থ হইলেন। ক্রুগার ট্রান্সভাল হইতে পলায়ন করিয়া ইউরোপে গমন করিলেন এবং তথায় সকলকে বৃটিশদিগের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে চেষ্টিত হইলেন।

বহু বোয়ার এই যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল, এই যুদ্ধের ফলে তাহারা ধনে ও প্রাণে বিনষ্ট হইয়াছিল বলিলে ভুল বলা হয় না। এই যুদ্ধে যোগদানকারী বৃটিশ সৈন্যের সংখ্যা ৪ লক্ষ ৫০ হাজার। তন্মধ্যে ২০ হাজার সৈন্য মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল।

দ্বৎসরব্যাপী যুদ্ধের পর লর্ড রবার্টস উত্তর রাজ্যকে বৃটিশ অধিকারভুক্ত বলিয়া ঘোষণা করিলেন বটে, কিন্তু বোয়ারগণ তখনও বশ্যতা স্বীকার করিল না। সম্মুখ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তাহারা তখন "গরিলা যুদ্ধ" চালাইতে লাগিল। পরিশেষে পরিশ্রান্ত হইয়া তাহারা ১৯০২ খৃষ্টাব্দের মে মাসে তৎকালীন সেনাধ্যক্ষ লর্ড কিচেনারের নিকট আত্মসমর্পণে বাধ্য হইল। ইহার অল্পকাল পরেই রোডেসিয়া ছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকার অন্যান্য রাজ্যগুলি "ইউনিয়ন অফ সাউথ আফ্রিকা" আখ্যাধারী যুক্তরাষ্ট্রতন্ত্রে সম্মিলিত হইল।

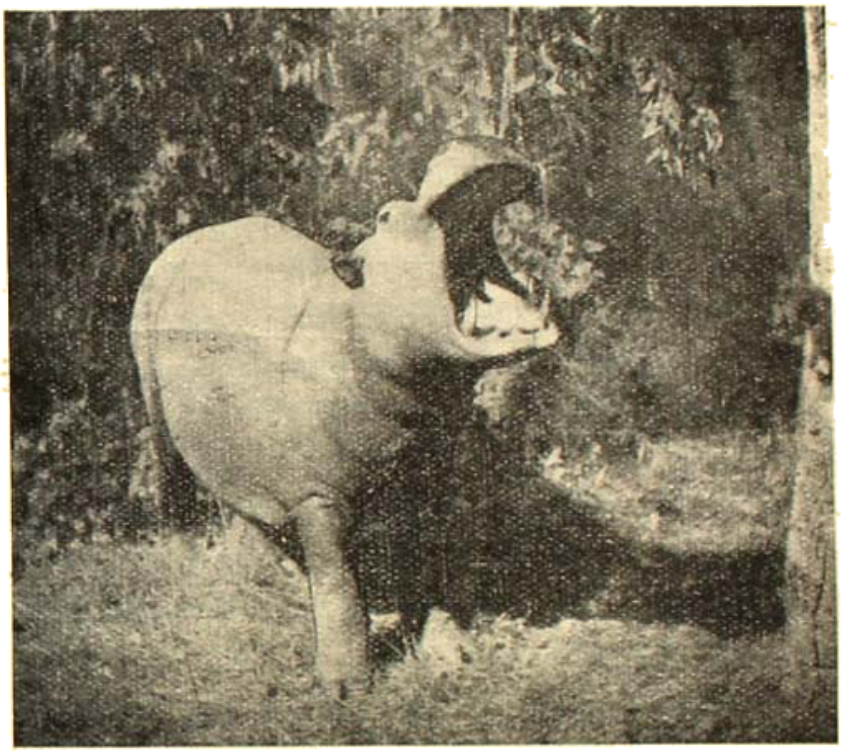

প্রিটোরিয়ার পথঘাটের দৃশ্যাবলী।

আমরা কিছুকাল পূর্ব্বের কথা বলিতেছি। তখন ট্রান্সভালের শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীর সংখ্যা ছিল ৪ লক্ষ। ৪ লক্ষের মধ্যে ওলন্দাজ জাতির সংখ্যা বৃটিশ অপেক্ষা স্বল্পতর ছিল বলিয়া আমরা জানিতে পারিয়াছি। যখন ট্রান্সভালে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হয় বা উহা স্বতন্ত্র উপনিবেশে পরিণত হয়, তখন ৬ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড ঋণ প্রতিবেশী অরেঞ্জ ষ্টেটের নিকট দেয় ছিল। ইহা হইতে উপলব্ধি হয় যে, বোয়ার-যুদ্ধের দ্বারা কিরূপ আর্থিক অনর্থ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। স্বতন্ত্র উপনিবেশে পরিণতি পাইলে ব্যবস্থাপরিষদ প্রস্তুত করিবার জন্য একটি নির্ব্বাচিত "লোয়ার হাউস" এবং মনোনীত "আপার হাউস" গঠিত করা হয়। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে প্রথম নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই নির্ব্বাচনের ফলে জেনারেল বোথা প্রধান-মন্ত্রীর পদ প্রাপ্ত হন।

আমরা ট্রান্সভালের অন্তর্গত দুই একটি স্বতাবশোভার সমৃদ্ধ স্বাস্থ্যকর স্থানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। পূর্ব্ব-ট্রান্সভালের বাস্বারটন নামক নগর সুন্দরতম সহরসমূহের অন্যতম। ইহার পরম শ্রীতিপদ প্রাকৃতিক পারিপার্শ্বিককে অপরূপ রূপরাজ্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পার্ব্বত্য ও আরণ্য প্রকৃতির এরূপ মনোমদ মূর্ত্তি অধিক দেখা যায় না। এই নাতি-উচ্চ ও নাতি-নিম্ন স্থানের আবহাওয়া বিশেষ শ্রীতিকর ও স্বাস্থ্যপ্রদায়ক। যাঁহারা শান্তি ও কান্তিময় নিভৃত নির্জ্জনতার বক্ষে বাস করিয়া স্বাস্থ্যলাভ করিতে চাহেন,

তাঁহাদের বক্ষে বার্কারটন বিশেষ উপযোগী। লার্ড পার্সি কিলপ্যাট্রিক তাঁহার "অন অফ দি বুশভেল্ড" নামক পুস্তকে বার্কারটনের গুণগরিমা গান করিয়াছেন।

প্রিটোরিয়া হইতে লরেঞ্জো মার্কুয়েজ পর্যন্ত প্রসারিত রেলপথের একটি শাখা বার্কারটন পর্যন্ত বিস্তৃত আছে। রাজধানী প্রিটোরিয়া হইতে ইহার দূরত্ব প্রায় ২ শত ৮৩ মাইল। এই শাখা রেলপথে ভ্রমণ করিবার কালে বিশেষ ওয়াচারক্যাল গোর্জের এবং বার্কারটন ষ্টেশনের মধ্যস্থলে যে নৈসর্গিক ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্য্য দর্শকের দৃষ্টিপথে পতিত হয়, তাহাকে অতুলনীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ওয়াটার গোর্জের ষ্টেশনের সন্নিকটে ট্রেণখানি যখন আঁকিয়া বাঁকিয়া শৈলসানুর বক্ষে অগ্রসর হইতে থাকে, তখন দুই দিকের দৃশ্যাবলী বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে না দেখিয়া থাকা যায় না। ক্রোকোডাইল পুট নামক পর্ব্বতের প্রকাণ্ডকায় প্রাকারতুল্য অধরচুম্বী পার্শ্ব যে গম্ভীর দৃশ্য অভিব্যক্ত করে, দক্ষিণ আফ্রিকার বক্ষে অন্যত্র তাহা দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। পর্ব্বতপার্শ্বের ধাপ্তীয়ামণ্ডিত অভ্রভেদী বিশালতা দর্শনে দর্শক নিসর্গের নিকট দৈহিক ক্ষুদ্রতার পরিমাণ উপলব্ধি করেন সন্দেহ নাই। দৈহিক বলিলাম, কারণ মানসিক ও আধ্যাত্মিক সত্তার দিক দিয়া বিচার করিলে মানুষ বোধ হয় বিশালত্বে হিমাদ্রিকেও অতিক্রম করে।

বার্কারটন গমন করিবার কালে বাষ্পরথের বাতায়নপথে চাহিয়া যে চিত্তচমৎকারী বিচিত্র চিত্র আমরা বিস্ময়চকিত চক্ষুতে দেখিয়াছিলাম, তাহা চিরদিন বক্ষপটে রক্ষিত হইবে। পর্ব্বতের গাত্রে প্রতিফলিত ছায়াছবির মত উহা পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া অধিকতর চমৎকৃত করিয়া তুলিতেছিল। ভ্রু-কাপ নামক উপত্যকার শীর্ষদেশে অবস্থিত পর্ব্বতশ্রেণীর ক্রমনিম্ন গাত্রে বার্কারটন ধাত্রীক্রোড়ে শোভমান শিশুর মত বিরাজিত। সমস্থর সুমধুর সঙ্গীতের মত পার্শ্বে প্রসারিত পার্ব্বত্য প্রকৃতির অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সহিত ইহার চমৎকার সাম্য ভ্রমণকারীর মনকে বিশেষ মুগ্ধ করে।

বার্কারটনকে প্রথম দর্শনে পর্ব্বতপার্শ্বে প্রস্তুত মায়াপুরী বলিয়া মনে হয়। এই সুন্দর গিরি-নগর হইতে একটি মনোহর পথ পার্ব্বত্য প্রকৃতির বুকের উপর দিয়া ক্রুগার ন্যাশনাল পার্ক নামক স্থান পর্য্যন্ত গিয়াছে। প্রকৃতি মাতার শ্যামসুন্দর অঙ্কলের উপর দিয়া প্রসারিত এই পঞ্চাশ মাইল-ব্যাপী পথটিকে একখানি অপূর্ব্ব কবিত্বমণ্ডিত খণ্ডকাব্য বলিলেও অতিরঞ্জন হয় না। তার পর পথের শেষে যখন ক্রুগার ন্যাশন্যাল পার্কে পৌঁছান যায়, তখন মনে হয়, সত্যই এমন একটি স্থানে আসিয়াছি, যাহা না দেখিলে আফ্রিকা-ভ্রমণ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। এক্ষণে এই পার্ক বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে। আফ্রিকা-সুলভ বহু বিচিত্র প্রাণী এই পার্কের বক্ষে যত্নে রক্ষিত রহিয়া ইহাকে বিস্ময়কর দৃশ্যে পরিণত করিয়াছে। শুধু সুন্দর নহে, বার্কারটন স্বাস্থ্যকর স্থানও বটে। এই সহরের রাস্তাঘাট, ঘর-বাড়ী, উদ্যান-ময়দান সমস্তই চিত্তাকর্ষক। এই নগরের একটি উল্লেখযোগ্য বিশিষ্ট ও উৎকৃষ্ট প্রতিষ্ঠান কার্ণেজি সাধারণ গ্রন্থাগার ও পাঠাগার। বহু বহুমূল্য গ্রন্থ এই গ্রন্থাগারে রক্ষিত রহিয়াছে এবং বহু ম্যাগাজিন ও সংবাদপত্র এখানে আসিয়া থাকে। জনসাধারণ বিনামূল্যে এই সকল পত্র-পত্রিকা পড়িতে পায়। ফলের সহায়তায় পার্শ্ববর্ত্তী লোমাতী নদী হইতে নগরে জল সরবরাহ করা হয়। বার্কারটনে বৈদ্যুতিক আলোকের ব্যবস্থাও বিদ্যমান।

বাসনা

—শ্রীসুধীর চন্দ্র রাহা

বিধাতার মনে কি ছিল জানিনে—শেষে কালনার অম্বিকাচরণ হাই স্কুলেই চাকরী পেলাম। কাশী, এলাহাবাদ, ত্রিপুরা প্রভৃতি স্কুলের মাষ্টারীর একটী চাকরীর জন্য দরখাস্ত পাঠিয়েছিলাম। ঐ সঙ্গে সঙ্গে কালনাতেও অম্বিকাচরণ হাইস্কুলে দরখাস্ত দিয়েছিলাম। মনে মনে আশা ছিল, হয় কাশী কিংবা এলাহাবাদে চাকরী নিশ্চয়ই পাব। নূতন দেশে গিয়ে মনের জড়তা কাটবে এবং সঙ্গে সঙ্গে দেহেরও বিশেষ উন্নতি হবে, এ ছাড়া আরও অনেক স্বপ্ন গড়ে তুলেছিলাম। কিন্তু তা সফল হ'ল না, আশা নিরাশায় পরিণত হ'ল। বিধাতার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক, এই কথা স্মরণ করে, যাত্রার আয়োজন করতে লাগলাম। আজ বহুদিন এবং বহু চেষ্টার পর, এতদিনে, বুঝি বিধাতা মুখ তুলে চাইলেন। এই চল্লিশ টাকার চাকরী যোগাবার জন্য কি আপ্রাণ পরিশ্রমই না করেছি! গোটা দুই বৎসর দেনা করে, কলকাতায় থেকে, সকাল হ'তে সন্ধ্যা, শ্যামবাজার আর বালীগঞ্জ পর্য্যন্ত হেঁটে, সারা কলকাতা চষে ফেলেছি। রোদ—ঝড়—জল কিছুই দৃকপাত করিনি—সামান্য অর কিংবা মাথাধরাকে রীতিমত অগ্রাহ্য করেছি। আজ চাকরী পাবার পর মনে হ'তে লাগল,—গত দুই বৎসরের সাধনার যে সিদ্ধিলাভ করলাম—পুরাকালের কোন তাপসের কঠোর সাধনার সঙ্গে তুলনা করলে, আমার এই চাকরীপ্রাপ্তির তপস্যা হয় তো কোন অংশে নিন্দনীয় নহে।

যাহা হউক—দুর্গানাম স্মরণ করে, বাড়ীতে মাকে এবং উদ্‌গ্রীবা উৎকণ্ঠিতা প্রিয়াকে, আমার এই অপ্রত্যাশিত সুখ-সৌভাগ্য, চল্লিশ টাকার চাকুরী-প্রাপ্তির সংবাদ পৌছে দিলাম। প্রিয়া আনন্দিত হবে—আমার চাকুরী-প্রাপ্তিতে গোপনে আর একবার পত্রখানি নিশীথে রুদ্ধ ঘরে পড়ে,—আমার স্বাক্ষরের নিম্নে গাঢ় চুম্বন দিবে। ইহা মনে মনে প্রত্যক্ষ করে, ট্রেণের থার্ডক্লাস কামরায়, বহুদিন পর অতি আনন্দে একটি সিগারেট ধরিয়ে শূন্যে ধোঁয়া ছাড়লাম।

আমার কামরা একরূপ লোকশূন্য—তাই সতরঞ্চখানি ভালভাবে বিছিয়ে, লম্বা হয়ে শুয়ে, সিগারেট টানতে টানতে ভাবতে লাগলাম। সংসারে বাসীকৃত দেনা—বাড়ীখানি সংস্কার না করলে নয়—ভাইদের স্কুলের মাহিনা বাকী—সকলের জামা-কাপড় প্রয়োজন। সংসার-খরচও কিছু পাঠান দরকার—আর তা ছাড়া শিবানীর বুঝি পাঁচ মাস যাচ্ছে। মনে মনে হাসলাম—চিঠি লিখলে ঐ কথাটা লজ্জায় চেপে যায়। শিবানী এখন কি করছে? ঘড়িতে এইত মোট রাত আটটা—না এখনও রাতের খাওয়া-দাওয়া শেষ হয়নি—এখনও কিছু দেরী বোধ হয়। আর পাঁচমাস পরে, আর একটী নূতন অতিথি আসবে। এখন তার কোন অস্তিত্ব নেই—এখনও তার কোন অবয়ব নেই। অন্ততঃ এখন আমরা তাকে চোখে দেখতে পাচ্ছি না—কিন্তু সে আসছে। এক অন্ধকার নীরন্ধ্র আলোকহীন ঠাণ্ডার ঘরে, তিল তিল করে, দিন দিন সে বাড়ছে। এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। একদিন ঠিক, আমাদের মত এই আলোর নীচে—এই পৃথিবীর মাঝখানে—সূর্য্যের নীচে এসে সে দাঁড়াবে। এক জীবন হতে আর এক জীবনের সৃষ্টি হচ্ছে। সেই পৃথিবীর প্রথম প্রভাত হ'তে—সেই আদিম যুগ হ'তে, জীবনের গতি একই ভাবে চলে আসছে। দার্শনিকরা বোধ হয়, এই মনে করেই বলে গেছেন, জীবনে মৃত্যু নেই—আত্মা অমর—আত্মা শাশ্বত। ভাবলেও আশ্চর্য্য হ'তে হয়—সত্যই জীবনের কখনও মৃত্যু আজ পর্য্যন্ত হয় নি। আদিম যুগের গুহাবাসী মানুষের জীবনধারা আমার ভেতর বইছে—তাদের রক্তধারা আমার শিরায় শিরায় বইছে—এক দেহ থেকে আর এক দেহে, এমনি করে, আমরা জীবনের মালা গাঁথা চলেছি। এক জীবনের আলো আর এক জীবনে জ্বালিয়ে, সৃষ্টি করতে করতে আমরা ছুটে চলেছি। কিন্তু কোথায় এর পরিসমাপ্তি হবে কি

হবে না—'ও জীবনের উদ্দেশ্য? এই মৃত্যু—এই জীবন—এই আলো—এই অন্ধকার—এই গাছ লতাপাতা—এই অগণ্য অসংখ্য জীবন, এ সবের পরিণতি কোথায়?

বড্ড গোলমেলে ব্যাপার। আমি উঠে বসলাম, ৬' আঙুলের ফাঁকে সিগারেট জ্বলতে জ্বলতে প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, সস্তা কেনা সস্তা একখানি গল্পের বই তুলে চোখের কাছে ধরলাম। রাত্রিকে দু'টুকরো করে চিরে রেলগাড়ী ছুটছে। চারদিকে অন্ধকার, ঘন জমাট অন্ধকার—মাঝে মাঝে গাছের ফাঁকে ফাঁকে সবুজ জোনাকীপুঞ্জ দেখা যাচ্ছে। কখন বা এঞ্জিনের অগ্নিগহ্বর হ'তে লাল কয়লার আগুন, চারদিকে আতসবাজীর মত ছড়িয়ে পড়ছে। এঞ্জিনের বিকট গর্জ্জনে, চাকার আর রেলপাটীর ঘর্ষণে, রাত্রিকে বিদীর্ণ, বিধ্বস্ত ও আহত করতে করতে গাড়ী ছুটে চলেছে। জানালা দিয়ে হু হু করে, হাওয়া আসছে—মাঠ পার হয়ে - পুল পেরিয়ে—বন ছাড়িয়ে, সবকে পিছনে ফেলে অন্ধকারকে দলিত মথিত করে, চটকাতে চটকাতে ট্রেণ উর্দ্ধশ্বাসে ছুটছে। আর একটা সিগারেট ধরিয়ে নিলাম—সিগারেটের নীল ধোঁয়া বাতাসের মাঝে কোথায় যেন হারিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। ঠাণ্ডা বরফ হাওয়া, আমার চোখে লাগছে—মুখে লাগছে—সর্ব্বাঙ্গের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। সস্তাকেনা বইখানির এক পৃষ্ঠাও শেষ করতে পারিনি—বইখানাকে একপাশে রেখে দিলাম।

রাত নটা—নিশ্চয়ই শিবাণী এখন ঘরে এসেছে—চিঠিখানা পড়ছে না কি? হয়তো জানালা খুলে কিছু ভাবছে। শিবাণি কি ভাবছে—অনাগত শিশুকে না—আমাকে! খোলা জানালার উপর মাথা রেখে, ট্রেণের গতি অনুভব করতে লাগলাম। রাত্রির বুক চিরে অন্ধকারকে ছিন্ন-ভিন্ন করে উর্দ্ধশ্বাসে গর্জ্জাতে গর্জ্জাতে ট্রেণ ছুটছে। কী এর গতি—কী এর প্রাণশক্তি। কিন্তু আমার গতি—আমার প্রাণশক্তি কালনার অম্বিকাচরণ হাইস্কুলেই রুদ্ধ হয়ে জমাট বেঁধে যাবে। রোজ নিয়মিত রুটীন বাঁধা—ঘড়ির কাঁটার মত জীবনের প্রতিটী ঘণ্টা একই কাজে—একই চেনালোকের মাঝে ঘুরে ঘুরে আসবে। এই ৩'বছর আমার গতি ছিল—জীবনের অবিশ্রান্ত বুদ্বুদ ফুটে উঠেছিল। জীবনের নিরবিচ্ছিন্ন স্রোত চারদিকে ফুলে ফেঁপে ছাপিয়ে পড়ছিল। কিন্তু আজ তার পরিসমাপ্তির সময় আসছে। ইতিহাসের মৃত রাজারাজড়াদের জীবনকাহিনী পুনরাবৃত্তি করে—পরীক্ষার খাতা উল্টেপাল্টে দেখে, জীবনের নিরবিচ্ছিন্ন স্রোত—উদ্দাম বিদ্যুৎগতি সমস্ত রুদ্ধ হয়ে মরে যাবে।

জীবনের কি এই পরিণাম—এই কি উদ্দেশ্য? আমি বড় বৈজ্ঞানিক হ'তে পারতাম—মস্ত বড় কবি হ'তে পারতাম—এভারেষ্টের চূড়োয় উঠতে পারতাম—অদ্ভুত অদ্ভুত বই লিখতে পারতাম। আমার কি প্রতিভা নেই? আমি ছুটে চলেছি কোথায়—আরামের গর্ত্তে, নিশ্চিন্ত জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে। আমরা ভীরু—স্বভাবতঃ আমরা শান্তি-প্রিয়—নিজেকে আমরা ভয় পাই। সত্য কথা বলতে যেমন ভয় পাই—তেমনি জীবনের গতিকে আমরা ভয় করি। ঝড়ের মতন উন্মত্ত, দুর্দ্দম জীবনের বিকাশকে চেপে রেখে, নিজস্ব গর্ত্তের মধ্যে, হাত পা নিশ্চিন্ত আরামে মেলে শুয়ে থাকতে ভালবাসি। ট্রেণ ছুটছে—বায়ুমণ্ডলকে ছিন্ন ভিন্ন করে—আকাশের জমাট নক্ষত্রকে পিছনে ফেলে—আকাশের অন্তহীন প্রসারের মধ্য দিয়ে, বিদ্যুৎ গতিতে ট্রেণ ছুটছে।

•

কালনায় এসে, স্কুলের বোর্ডিংএ উঠেছিলাম।

আমার কপাল সুপ্রসন্নই বলতে হবে। কাজে 'জয়েন' করার পূর্ব্বে, স্কুলের সেক্রেটারী আশুবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। আশুবাবু মস্ত উকীল। পসার-প্রতিপত্তি, মান-সম্ভ্রম, অর্থ, ঐশ্বর্য্য সমস্তই যেন ভগবান্ দু'হাতে দান করেছেন। প্রাসাদসদৃশ বৃহৎ দ্বিতল অট্টালিকা, একাধিক মোটর গাড়ী, বিরাট পরিবার, এ ছাড়া চাকর-বাকর, বয়-খানসামা, মালি অগুণতি। এদের প্রত্যেকের আয়ু যেমন অপরিমিত, বিত্তও তেমনি প্রচুর।

আশুবাবু কি চোখে আমায় দেখলেন, জানিনে।

গম্ভীর কণ্ঠে, মক্কেলের রাশীকৃত কাগজপত্রের মধ্য হ'তে দুই চোখ তুলে বললেন, বোর্ডিংএ থাকার দরকার কি? আমাদের ছেলেদের একজন মাষ্টারে বেশ সুবিধে হচ্ছে না। আপনি আমার বাড়ীতেই থাকুন, ছেলেদের পড়াবেন, কি বলুন?

তখনি রাজী হলাম, আর কেনই বা হব না। বোর্ডিংএ থাকার খরচটা বেঁচে গেল।

বোর্ডিংএ দশ বার টাকা লাগতো, এই দশ বারটা টাকা বেঁচে গেল। আমার মত চল্লিশ টাকার মাষ্টারের পক্ষে ওটা অপর্য্যাপ্ত। ঐ দশ বারটা টাকায় কি না হ'তে পারে। মাসে মাসে জমাতে পারি, অনাগত পুত্র বা কন্যার নামে পোষ্ট-আফিসে একটা 'একাউণ্ট' খুলতে পারি। কিন্তু এই চল্লিশ টাকার উপর আমার আরও কিছু চাই,সে সমাধানও আশুবাবু করেছেন। ভদ্রলোক উদার মহৎ ব্যক্তি, এ কথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে। ছেলে পড়ানর মূল্য বাবদ আহার ও বাসস্থানই, বোধ হয় আজকালকার বাজার হিসাবে যথেষ্ট। কিন্তু আশুবাবু অবিবেচক লোক নন, উনি হৃদয়হীন, নীরস উকীল নন। ওঁর রস-বোধ আছে হৃদয় আছে, প্রাণ আছে। অভাবীর অভাব বোঝবার সূক্ষ্ম মন আছে। আমার মাসে খাওয়া-থাকা ছাড়াও, আরও কয়টি টাকা দেবেন।

কালনায় এসে অন্য কারুর সঙ্গে ভালভাবে বন্ধুত্ব হয়ে উঠেনি। স্কুলের শিক্ষকদের সঙ্গে মাত্র আলাপ হয়েছে, কিন্তু বন্ধুত্ব হয়নি। ভবিষ্যতে কখন গভীরতর বন্ধুত্ব হবে কি না সন্দেহ। একমাত্র, কি জানি, এই অল্পদিনে, মণি-বাবুর সঙ্গেই, যেন আমার আলাপটা গভীরতর হয়ে উঠেছে। মনে হয়, আমার মতের সঙ্গে, আমার চরিত্রের কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে, মণিবাবুর যেন কিছু মিল আছে। তাই প্রথম দিনেই গঙ্গার ধারে বেড়াতে বেড়াতে, ভালবাসার প্রথম দর্শনের মত, মণিবাবুর সঙ্গে আলাপ ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হ'ল।

মণিবাবু উকীল, নব্য উকীল। পোষাক-পরিচ্ছদ টাটকা আনকোরা। মণিবাবুর ওকালতি না করলেও চলে, পিতার অগাধ সম্পত্তি। কালনার উপর অন্ততঃ খান বার দ্বিতল অট্টালিকা সবগুলিই মোটা টাকার ভাড়া খাটছে। আর জনবহুল বাজারের মধ্যে, বিরাট খানচালের আড়ৎ, খান কয় কাপড়ের আর মনোহারীর দোকান। জমিদারী, তেজারতী, গহনা-বন্ধকের ব্যবসায় কনট্রাক্টরী কাজে, মণিবাবুর পিতা লক্ষপতি, বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী।

তাঁরই একমাত্র পুত্র মণিবাবুর আর ভাবনা কি? কিন্তু তবুও মণিবাবুকে নিয়মিত কোর্টে হাজিরা দিতে হয়, মক্কেল অথবা মোকদ্দমা থাকে কি না, জানি না।

বৈকালে গঙ্গার ধারে বেড়াতে যাচ্ছিলাম, কি মনে হ'ল একটা রাস্তা ঘুরে মণিবাবুর বাড়ীতে হাজির হ'লাম।

"আরে আসুন আসুন। বেড়াতে বের হয়েছেন না কি? বেশ আমিও যাব। একটু চা খেয়ে যাওয়া যাক্, কি বলেন।"

আপত্তি নেই। মণিবাবুর ঘরে আসি—ঘর নয়তো যেন মিউজিয়ম। ঐশ্বর্য্য আর প্রাচুর্য্যের তীক্ষ্ণ প্রখরতা। ছাদ হ'তে মেজে পর্য্যন্ত, সব ঝক্ ঝক্ করছে। কাশ্মীর হ'তে বর্ম্মা, এবং আমেরিকা হ'তে য়ুরুপ আইসল্যাণ্ডের যত রকম যত বিভিন্ন নামের এবং উচ্চ দামের আসবাব থাকতে পারে, তা সবই যেন এই ঘরে জমায়েৎ হয়েছে। মেহগনী কাঠের দামী ডিজাইনের টেবিলের উপর, শালের টেবিলক্লথ। চাকরে নানাবিধ খাবার আর চা টেবিলের উপর রেখে গেল, মণি-বাবু দামী সিগারেটের বাক্স খুলে দিলেন।

আমি আপত্তি করলাম না, কয়দিন পর ভাল দামী আসবাব বুভুক্ষিত অনাহারীর মত গিলতে লাগলাম। মণিবাবু একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, "আমায় একটা চাকরী জুটিয়ে দিতে পারেন, অজয়বাবু?"

আমি আকাশ থেকে পড়লাম—বাদামী বরফী গলায় আটকে গেল।

হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম।

মণিবাবু বলে যেতে লাগলেন, "ভাল লাগে না, এ সব ভাল লাগে না। তিনবার ঘায়েল হ'য়ে, তবে ল-এর সিংহ-দ্বার অতিক্রম করেছি। কিন্তু আমার ভাল লাগে না, বাবা বলেন, পসার করতে পারিনে। আর সবাই পারে, তুই পারিনে কেন? স্ত্রী তাড়া দেয়, বলে, 'কেন তোমার মক্কেল আসে না। তুমি অকর্ম্মা—তুমি অপদে, অকর্ম্মণ্য।" অজয়বাবু, তার অপমান আর সইতে পারিনে। কিন্তু অজয়বাবু আমি চেষ্টার ত্রুটি করিনে, আরে মক্কেল আসবে কোত্থেকে? লোকের কি টাকা আছে, লোকে খেতে পায় না, তা মামলা করবে কোত্থেকে। নূতন উকীলের কি এই বাজারে কখনও পসার হয়, বলুন। কিন্তু এরা তা বোঝে না। আমি কেবল পড়তে চাই—একটা চাকরী নিয়ে কোথাও চলে যেতে চাই—আর।"

বিস্মিত কণ্ঠে বললাম, "বলেন কি মণিবাবু!"

"সত্যই বলছি। সব ছেড়ে ছুঁড়ে শেষে সন্ন্যাসই নিতে হবে। আমার বিতৃষ্ণা এসে গেছে। ঠিক বৈরাগ্যই এসেছে বুদ্ধদেবের মত, খ্রীচৈতন্যের মত সব ছুঁড়ে ফেলে এক দিকে চলে যেতে ইচ্ছে। এই কালিমা, পোলাও, ক্ষীর, ছানা আমার গলা দিয়ে নামতে চায় না। পবিত্রতা করে দিনান্তে দু'মুঠো ভাত তাও জানি। কেউ নেই আমার বুঝলেন অজয়-বাবু, কেউ নেই আমার। শুধু আমি আর আমার অনন্ত ভবিষ্যৎ, ব্যস্।"

মণিবাবু বলে যেতে লাগলেন, আমার যেন ঘরে গিয়েছে, মানুষের সঙ্গে শুধু কি অর্থেরই সম্বন্ধ। হৃদয়ের, ভালবাসার, স্নেহ প্রেম দয়া মায়া এগুলো কি কিছুই নয়। আমি রোজই দেখি, ধনুর মৃত্যুতে পরানের চয়। তাঁর মৃত্যুর পর, এই বিপুল সম্পত্তি, চিরকাল কি প্রকারে অটুট থাকবে এই ভেবে ভেবে তাঁদের চিন্তার অবধি নেই। সে কথা বলে না, বাবা গম্ভীর হয়ে থাকেন। মায়ের মামেদাদের কাছে শুনতে পাই, বাবা নাকেমাই বলেন, 'আমি চোখ বুজলে মণে কিছুই রাখতে পারবে না।' মানুষের এই স্বরূপ, এই তীক্ষ্ণ স্বার্থবোধ আমায় একদম শান্তি দিচ্ছে না। যেমন অজয়বাবু, যে কোন একটা চাকরী,—"

মণিবাবু নিতান্ত অসহায় করুণ চক্ষে দীন দরিদ্র ভিক্ষুকের মত আমার কাছে হাত পাতলেন। যেন আমি সমস্ত চাকরী বাকরীর একমাত্র মালিক। আমি হাসলাম, হেসে বললাম, "মণিবাবু নিরুদ্যম কোথাও ঘুরে আসুন। দেখবেন আপনি আপনার শক্তির উপর নির্ভর করে, নিজের আত্মশক্তিকে বিশ্বাস করুন। এতবড় বিশ্বে নিজের হাতে, মনোমত করে ভবিষ্যৎ গড়ে তুলুন। এই পচা কলিকাতা সহরে ওকালতী ভাল না লাগে, তাতে ক্ষতি কি? আপনাদের ঐশ্বর্য্য অপার আর বিপুলা পৃথ্বী, কাল নিরবধি। বিশ্বাস করুন নিজের শক্তিকে, মনোমত করে গড়ে তুলুন ভবিষ্যৎকে। সত্যি এ ভাবে আপনার পড়ে থাকার কোন মানে হয় না।" টেবিলের উপর সিগারেট ঠুকতে ঠুকতে, মণিবাবু বললেন, "সবই সত্যি, কিন্তু অজয়বাবু নিজের উপর বিশ্বাস হারিয়েছি। তা ছাড়া আমি বড্ড ভীতু, একলা কোথাও যেতে পারিনে। না ও অসম্ভব। আমি কোথাও যেতে চাইনে, এই বাংলা দেশে কোন পাড়া-গেঁয়ে সবুজ মাঠের মধ্যে অথবা নামহীন অখ্যাত নদীর ধারে ছোট একটা বাংলোর মতন ঘর, সম্মুখে ফুলের বাগান। পাশে সবুজ সবুজ ছোট ছোট ধানের ক্ষেত, সুদূর নীলাকাশের সঙ্গে মিশিয়ে থাকবে। আমি যেন স্বপ্ন দেখছি অজয়বাবু, সেই অনাড়ম্বর, ভূষণহীন ঘরখানির কথা ভেবে, ঐ সুদূর সুনীল আকাশখানির মত, এই চিন্তা আমার মনে পরম রমণীয়তা ছড়াচ্ছে। একটা পরম পবিত্রতায়, স্নিগ্ধ নিশ্চলতায় আমার স্বপ্নখানি যেন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গোলাপ পুষ্পের মতই সৌরভময়, রূপময়।"

চাটুটু শেষ করে একটা সিগারেট ধরিয়ে বললাম, "এবে কবিতার কথা বলছেন—চলুন, কবিতা আর নয়, বেড়াতে চলুন।"

মণিবাবুর কথা শুনতে শুনতে পথ চলি। সকল কথায় সায় দিতে যাই। বিলাসের প্রাচুর্য্য আর আড়ম্বরের কৃত্রিমতার মাঝে এদের দুঃখকে ছোঁয়া যায় না। মনে হয়, দুঃখটা এদের ভাবরচনা ছাড়া আর কিছুই নয়। স্বার্থপর সঙ্কীর্ণচিত্ততার মাঝে, নানা অসম্ভব স্বপ্ন-বিলাসী আকাঙ্ক্ষায় মণিবাবুর হৃদয় দুলছে। হয়ত চিরকালই, চিরজীবনই এই আকাঙ্ক্ষায়, এই সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতায় সকল মানুষের মন নিয়ত চঞ্চল, নিয়ত অস্থির।

•

নিয়মিত স্কুলে যাচ্ছি। সকালবেলায় আশুবাবুর ছেলেদের নিয়ে ঘণ্টা দুই পড়িয়ে কাটিয়ে দিই। তারপর বেলা এগারটার থেকে চারটা পর্য্যন্ত, সেই একটানা ক্লান্তি-বাঁধা কাজ। পড়াতে পড়াতে অন্যমনস্ক হয়ে যাই বাড়ীর কথা মনে হয়, বিবাগী এই তপ্ত উদাস দুপুরে কি করছে। হয়তো খাওয়া দাওয়া সেরে, দ্বিপ্রহরের অবসর অবসরে তন্দ্রা-জড়িত নয়নে, কোন বইয়ের পাতা উল্টাচ্ছে।

কখন কখন জানালা দিয়ে, বাইরের মাঠের দিকে তাকিয়ে থাকি। গন্ধভারাতুর আম্রমুকুলের মৃদু সুবাস, দুপুরের উষ্ণ বাতাসের সাথে ভেসে আসে। দু'একটা ঘুঘু পাখী বা পায়রা সম্মুখের ছায়াশীতল গাছের তলায় খেলা করে। ফাল্গুন মাস, নব বসন্ত এসেছে। গাছে গাছে কচি কচি লাল লাল পাতা, উষ্ণ দক্ষিণের খাতাল বাতাস, আম্রমুকুলের মৃদু গন্ধ মনকে উন্মনা করে।

হাত হ'তে জ্যামিতির বইখানা পড়ে পড়ে যায়, ছেলেরা

অনাথ। [ফটোগ্রাফ

আপন মনে গল্প করে। জানালার বাইরে নব বসন্ত, দূর হ'তে কোকিলের ডাক ভেসে আসে। আমি উন্মনা হ'য়ে, বাইরে তাকিয়ে বসে থাকি, ভাবি এ কি বসন্ত এসেছে যে—

সামান্যরূপের জন্য প্রকৃতির নবরূপে বসন্তের আহ্বানে সব ভুলে যাই। আমার বর্ত্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ, আমার বিকৃত, নিদারুণ দারিদ্র্যময়, দুর্ভিক্ষপীড়িত জীবন, আমার অভাব-অভিযোগ, শত সহস্র আশা-আকাঙ্ক্ষা, সব বসন্তের আহ্বানে ক্ষণকালের মত নিশ্চিহ্ন, বিলুপ্ত, একাকার হয়ে যায়।

সেদিন কি এক পর্ব্ব উপলক্ষে স্কুল বন্ধ ছিল। কদিন হ'ল পিতাজীর পত্র এসেছে, কটা টাকা বিশেষ প্রয়োজন, না পাঠালেই নয়। কিন্তু এদিকে স্কুলে মাইনে পেতে এখনও এক সপ্তাহ দেরী, হেড মাষ্টার মশায়ের কাছে দশটি টাকা ধার করে, তাই মণি অর্ডার করে ফিরছিলাম।

আনমনে রাস্তায় হাঁটছি, হঠাৎ কে যেন ডাকল, "শুনছেন, ও মশাই—"

তাকিয়ে দেখি, জীর্ণশীর্ণ একটি ভদ্রলোক, একখানা খ্রীহীন একতলা বাড়ীর দোরাকে দাঁড়িয়ে ডাকছেন।

আস্তে আস্তে ফিরে দোরাকে উঠলাম।

ভদ্রলোক বললেন, "আসুন, আসুন। কদিন হ'তে ভাবছি, মশায়ের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করবো। কিন্তু তা কি যো আছে অসুখে বিসুখে—"

ঘরের মধ্যে বসলাম। ভদ্রলোক বলতে লাগলেন, "আমার নাম কার্ত্তিক মুখুয্যে, নাম শুনে থাকবেন বোধ করি। ঐ অম্বিকাচরণ স্কুলেই, মাষ্টার ছিলাম মশা'র, আমার জায়গাতেই আপনি এখন কাজ করছেন বুঝছেন তো—"

দুই হাত তুলে নমস্কার করলাম।"

"আপনি নূতন লোক। আদি মশায় এখানে আজ চল্লিশ বছর বাস করছি, আর ঐ স্কুলেই এ যাবৎ পড়িয়ে এসেছি। আচ্ছা বলুন তো, কাজে ভুল-চুক কার না হয়?" ভদ্রলোক তাঁর রক্তহীন ভাবলেশশূন্য দুই চক্ষুকে তীক্ষ্ণ করে, আমার দিকে তাকালেন।

একটু অবাক্ হয়ে বললাম, "তা সকলেরই হয়।"

"হয় তো সকলের। কিন্তু বিবেচনাটা দেখুন, সেক্রেটারী বাবু আমায় সেই দোষে, স্কুল থেকে তাড়ালেন। কিন্তু আমি মুখুয্যের ছেলে, দেখে নেবো, দেখে নেবো আশুবাবুকে। কাজ করছেন করুন কিন্তু খুব সাবধান। লোক মোটেই ভাল নয় মশায়, মনযুগিয়ে না চললেন তো বাস্ চাকরী খতম্। তা বোর্ডিংএ থাকেন বোধ করি।"

সবিনয়ে বললাম, "আজ্ঞে না আশুবাবুর ওখানেই আছি।"

"আশুবাবুর ওখানেই আছেন। তা দেখুন কথাটা যেন—আচ্ছা হাজার হোক আপনি বয়সে আমার চেয়ে অনেক ছোট আর আপনি বলছিনে—বুঝলে বাবাজী। রাগ করবে না তো—"

"না—না—রাগ করব কেন।" হেসেই কথাটা বললাম।

"বেশ—বেশ! তোমরা সব নব্য ছোকরা, এতে আপত্তি না হ'বে কেন। তবে কথাটা যেন আশু বাবুর কানে না উঠে বুঝলে বাবাজী। কিন্তু খুব সাবধান বাবাজী—একটু এদিক ওদিক হলেই চাকরী থাকবে না—ওরে ভুলো—ভুলো।"

বাড়ীর ভেতর হ'তে উলঙ্গ, অর্দ্ধ উলঙ্গ জীর্ণ শীর্ণ গুটী পাঁচ ছেলে, লাফাতে লাফাতে, ঘরে ঢুকে আমার দিকে তাকিয়ে হাঁ করে, দাঁড়িয়ে রইল। তাদের একজনকে উদ্দেশ করে, কার্ত্তিকবাবু বললেন, "যা তো তোর মাকে একটু চা করতে বলগে—"

ছেলেটী লাফাতে লাফাতে চলে গেল। কিন্তু এক মিনিটের মধ্যে ফিরে এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। কার্ত্তিকবাবু বললেন, "বলেছিস্?"

কিন্তু ছেলেটীকে কোন কথা বলতে হল না। ভেতর হ'তে কার্ত্তিকবাবুর গৃহিণীর স্পষ্ট কণ্ঠস্বর ভেসে এল—"কোন্ লাট সাহেব এসেছে—এক্ষুণি চা করতে হবে। বাড়ীতে, চা, চিনি, দুধ আছে কি না—যদি সব থাকে তবে তোর বাবাকে বল ভুলো—চা, চিনি কিনে এনে দিক্।"

ভদ্রলোক শুষ্ক চোখে, অপ্রস্তুতের হাসি হেসে বললেন—"বড়মেয়েটী মারা যাবার পর, গিন্নীর একটু মাথা খারাপ হয়েছে কিছু মনে করো না বাবাজী, তা বুঝলে কি না—"

আমি বললাম, "চায়ের কোন দরকার নেই—বাজার হ'তে এই মাত্র চা খেয়ে আসছি—"

কার্ত্তিকবাবু বলে যেতে লাগলেন, "আর, ধারিনে

বাবাজী। আর নেই এক পয়সা, এদিকে পোষ্য কম নয়। চারদিকে দেনা—দেনা করেই এক রকম চলছে। কিন্তু আর ধারও পাওয়া যাচ্ছে না। এই বাড়ীখানা আর সামনের বাগানটার উপর তিনটে মটগেজ। বড় মেয়েটী মারা গেল—তারপর আবার ছোটটীর বিয়ে আছে—কিন্তু বাবাজী। বিয়ের সময় মোটা যৌতুক, ভাল দান-সামগ্রী, আর নগদ টাকা দিতে পারব না। পাত্রপক্ষ সাফ্ কথায় দেয়, টাকা না পেলে মেয়ের বিয়ে হ'বে না। আচ্ছা বাবাজী—বিনে টাকায় মেয়ের বিয়ে দেওয়া চলে না? বাবাজী, মনের কথা মনেই চেপেই থাকি। কী দুঃখে কষ্টে দিন কাটাচ্ছি, তা একমাত্র ভগবানই জানেন। ভাবি মরণ হলেও তো বাঁচি—কিন্তু তাও হয় না—'

কার্ত্তিকবাবুর কথা বন্ধ হয়ে গেল—দুই হাতে দুই কাপ চা নিয়ে, একটী সুশ্রী সুন্দরী মেয়ে সলজ্জভাবে ঘরে ঢুকলো। "চা করেছিল—বেশ মা! সে অভয়বাবুকে দে বাবাজী এই মেয়ে—এমন লক্ষ্মী মেয়ের অদৃষ্টেও এমনি হয়? মা আমার লক্ষ্মী—মুখে কথা নেই। দিনরাত খেটেই যাচ্ছে। বাপ হয়ে কিছুই করতে পারলাম না—উপস্থিত যা ছিল সবই বিক্রী করে পেট চালাচ্ছি।"

দোরের কাছ থেকে শব্দ এল 'বাবা'।

কার্ত্তিকবাবু সচকিতে চুপ করে একান্ত নিবিষ্টমনে চা খেতে লাগলেন। হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বললেন, "বাবাজী তুমি দেখে নিয়ো মেয়ের যদি ভাল বিয়ে না দিই, তবে আমি কার্ত্তিক মুখুয্যেই নই। বিয়ে নিশ্চয়ই দেবো—ভাল পাত্রের সন্ধান আছে বাবাজী? যারা আমার অবস্থা জেনে শুনে বিয়ে করতে স্বীকার হয়—এমন পাত্র?"

বেলা হচ্ছিল—উঠে দাঁড়ালাম।

আমার সঙ্গে সঙ্গে কার্ত্তিকবাবু বাইরে এসে বললেন, "বাবাজী একটা ভাল পাত্রের সন্ধান রেখো বাবাজী। যে কোন জাতের ছেলে হোক দুমুঠো খেতে পরতে পায়, সুখে থাকে, এমন দেখে যে কোন জাতের ছেলের হাতে আমার মেয়েকে দিয়ে দেব। আর পারিনে বুঝলে বাবাজী, গহনা বিক্রীর টাকা, তাও দুচারটে আছে, সে কটা ফুরলে, কচি-কাচা নিয়ে চারা উপোস দিতে হবে। এতো চোখে দেখতে পারব না, বাবাজী একটু খোঁজ রেখো, যে কোন জাতের ছেলে হোক, আমার দুএকশো দিক, তাকে দিয়ে দেব।"

লজ্জিত হয়ে বললাম, "ছিঃ একথা মুখে আনতে নেই।" 'কেন নেই বাবাজী? সমাজ আমার কি দুর্দ্দশা দেখছে? কিছু না। আমি ছেলে মেয়ে নিয়ে উপোস দিচ্ছি, সমাজ দেখছে? এ পোড়া সমাজের মাথায় ঝাঁটা মেরে মেয়ের বিয়ে দেব, সে যে জাতেরই হোক। বাবাজী চাকরীটা গিয়ে দুবেলা খেতে পাইনে।" ভদ্রলোক কেঁদে ফেললেন।

কিন্তু আমি কি করতে পারি? তবুও আজ কার্ত্তিক বাবুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে নিজেকে মহা অপরাধী বলে মনে হ'তে লাগল।

বেলা হয়েছিল, আপন মনে হাঁটতে লাগলাম।

কার্ত্তিকবাবুর কথাগুলি মন হতে ঝেড়ে ফেলতে পারলাম না। অমন সুশ্রী মেয়েটীর অদৃষ্টে এত লাঞ্ছনা। কিন্তু মেয়েটীর কি দোষ, দরিদ্র পিতা পাত্রপক্ষের সব দাবী মেটাতে পারবে না বলে, এ কোন্ ন্যায় বিচার? সত্যই সমাজ আজ অন্ধ। স্বর্ণের কাছে, স্নেহ, দয়া, মায়া, বুঝি সবই নগণ্য। বহুদিন আগে, পৃথিবীকে অতিরিক্ত সুন্দর মনে হ'ত। মনে হ'ত পৃথিবীতে মানুষ হয়ে জন্মে ধন্য হয়ে গেছি। তখন যেদিকে তাকিয়েছি, সেই দিকেই দেখেছি, সব যেন রঙে রঙে রঙ্গিন। কিন্তু আজ সে রঙের বিন্দুমাত্র ফোঁটাও কোথাও দেখি না। সব আলো, সব শোভা, সকল রঙ ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন নিঃশেষ হয়ে গেছে। চারিদিকে শুধু জীবনের রূঢ় বাস্তব ছবি। নূতনত্ব নেই, আলো নেই, রঙ নেই। এ পৃথিবী যেন বারংবার পড়া পুরাতন পুঁথির পাতার মতই আকর্ষণহীন এবং পুরাতন। এখানে স্নেহ, প্রেম, দয়া, মায়া, ভালবাসা, স্বপ্ন, কবিতা কিছুই নেই, আছে শুধু ধূলিরুক্ষ, কঠিন কর্ম্ম-পথ।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর একটু গা গড়িয়ে নিচ্ছিলাম। অভয়বাবুর ছোট ছেলেটী একখানি চিঠি হাতে দিয়ে বলল, "মাষ্টার মশায়, অনাদিবাবু একবার ডেকেছেন।" অনাদিবাবু এই পাড়ারই লোক। ভদ্রলোক কোর্টে কি যেন একটা কাজ করেন। পত্রে লিখেছেন, আজ শরীর খারাপ, তাই

কোটে যাইনি। ভাল লাগছে না, বেড়াতে আসবেন। বেলা প্রায় তিনটে, নিজেরও শুয়ে থাকতে ভাল লাগছে না। জামাটা গায়ে দিয়ে, ঘর হতে বেরিয়ে পড়লাম। কাছেই অনাদিবাবুর বাড়ী, দেখলাম বাইরের দরজা খোলা।

কোনরূপ শব্দ না করে, ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। বাড়ীর ভেতর অনাদিবাবু যেন কাকে কি বলছেন!

"বলি, কথাটা কানেই যাচ্ছে না, না। মাথাটা টন্ টন্ করছে, একটু চাও বসিয়ে দেবে, না হয় একটু বাতাস কর। তা নয় খালি বই পড়া। ওগো শুনছ? বা রে আবার পড়তে লাগলে।" বুঝলাম গৃহিণীর সঙ্গে কথা হচ্ছে।

"ওগো একটু চা করে দাও না। দাও লক্ষ্মীটী, হলই বা বেলা তিনটে, না হয় আমিই ষ্টোভ ধরাচ্ছি, ওঠ, ওঠ। বলি অঞ্জু কি কথা বলবে না? আহা রাগ করে না, লক্ষ্মী মাণিক, সোণা আমার।"

নিজেই লজ্জিত হলাম—উচ্চকণ্ঠে ডাকলাম, "অনাদি বাবু!"

"কে-ও অজয় বাবু না কি? আসে, বসুন, বসুন।"

খালি পায়ে অনাদি বাবু ঘরে এলেন, "যাক বাঁচা গেল, কাঁহাতক আর চুপ করে শুয়ে থাকা যায় বলুন তো।"

বললাম, "কেন বেশ ত গল্প করছিলেন।"

গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে অনাদি বাবু বললেন, "বলেন কেন, গিন্নীর আমার রাগ হয়েছে সকাল থেকে। সেই যে বই নিয়ে শুয়েছেন আর উঠবার নাম নেই। সামান্য কথা বুঝলেন অজয় বাবু—সামান্য কথাতেই রাগ—এতো ভারী মুস্কিল। হায়—হায় এখনও ভারী ছেলে মানুষ—আমি বলি, অজয় বাবুর সাক্ষাতে বেরুতে লজ্জা কি? ছেলেপুলে হলে পাঁচ ছেলের মা হতে যে! এখন তো আর কনে বৌ নও। আমার বয়স এই প্রায় আটচল্লিশ হতে চলল। কিন্তু কে কার কথা শোনে মশাই, উনি ভারী লাজুক। কিন্তু কাজে কর্ম্মে শিল্পকাজে রান্নাবান্নায় ভারী হাত। একদিন খাইয়ে দেব, তখন বুঝবেন কেমন রান্না। বসুন আপনি আমি চায়ের ব্যাপারটা এখানেই নিয়ে আসি। উনি যখন পণ করেছেন ও মশায় বহুকালের পণ। ষ্টোভ নিয়ে এসে, নিজেরাই চা করে নিই।"

অনাদি বাবু ঘর হতে চায়ের সরঞ্জাম এনে ষ্টোভে জল বসিয়ে দিলেন।

"বুঝলেন অজয় বাবু রাত্রে 'দেহিপদপল্লবমুদারম্' না করলে আর মান ভাঙ্গবে না—হায়—হায়।"

আমি হাসতে লাগলাম।

চা খেতে খেতে অনাদি বাবু বললেন, "আচ্ছা অজয় বাবু, একটা কাজ করুন না কেন—আপনি কেন পরের বাড়ীতে পড়ে থাকেন। আমার পাশে খালি বাড়ী একখানা রয়েছে গৃহিণীকে নিয়ে আসুন। উনিও একা একা। পাশা পাশি বাড়ীতে বেশ থাকা যাবে।"

বললাম, "আমার কোথেকে অনাদি বাবু। এই চল্লিশ টাকা মাইনের বাসা করে থাকা কি সম্ভব। তা ছাড়া সেখানে যা হোক দু এক বিঘে জমি, বাগান, পুকুর আছে। সব চলে এলে তা বার ভূতেই লুটে খাবে, বাড়ীর আশেপাশে খালি চোরের বাস।"

"তা বটে, তবে কি না—"

চা খাওয়া শেষ হয়েছিল। অনাদি বাবু ঘর হতেই হাকলেন, "ওগো দুটো পান সাজতো। আর কলকেটায় একটু আগুন দিয়ে দাও—না ঝি-বেটীর জন্যে আর সারা গেল না। বেটী রোজই সন্ধ্যে করে আসবে। কই গো হল?" অনাদি বাবু উঠে গেলেন। কিছুক্ষণ পর কলকেয় ফুঁ দিতে দিতে আমার সম্মুখে পান রাখলেন। ওঁর সারা আঙ্গুলে চুণের দাগ। বললাম, "কি নিজেই সাজলেন না কি?"

"আর বলেন কেন? গিন্নী আজ ধনুকভঙ্গ করেছেন। নিজেই সাজলাম, ভারী রাগ, ভারী অভিমান।"

শিবানীর একখানা চিঠি পেয়েছি। নানা অভাব-অভিযোগ জানিয়ে টাকা পাঠাবার জন্য লিখেছে—আর প্রফুল্ল বাবু উকিলের বাড়ীতে আমায় অধিষ্ঠিত করে যেতে বলেছে। কবে কোন কালে কলকাতায় স্কুলজীবনে প্রফুল্ল বাবুর খেতের সঙ্গে সই পাতিয়েছিল। তার পর দীর্ঘ কয়েকবৎসর পর শিবানী তার 'মকর সই'য়ের কাছ হতে চিঠি পেয়েছে। আজ পত্রবাহক হয়ে, শিবানীর চিঠি নিয়ে, তার 'মকর সই'য়ের, বাড়ীতে যাচ্ছিলাম। রাস্তায় মণি বাবুর সঙ্গে দেখা। মণি খুব ব্যস্ত হয়ে হাঁটছিলেন। আমায় দেখে কাছে এসে বললেন,

"কি রকম, কাল ছিলেন কোথায়? আজ বিকেলের গাড়ীতে কালনা ছাড়ছি।"

সবিস্ময়ে বললাম, "বলেন কি? যাচ্ছেন কোথায়?"

"চাকরী নিয়ে দিল্লী যাচ্ছি। মাসে ষাট টাকা দেবে। এ জীবন আর ভাল লাগে না. একঘেয়ে, মনোটনাস, দিন রাত বৌ আর বাবার বকুনি ভাল লাগে না তাই ভেসে পড়ছি। বুঝলেন ব্যাঙ্কের একটা চাকরী নিয়ে যাচ্ছি। কাল আপনাকে কত খুঁজলাম, ছিলেন কোথায়?"

"কাল অনাদি বাবুর ওখানে ছিলাম।"

"অনাদি বাবু? আপনাদের পাড়ার অনাদি বোসের ওখানে, কেন?"

"এমনি ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। কাল ডেকে পাঠালেন গল্প করার জন্যে। আজও যেতে বলেছেন বৌয়ের হাতের রান্না খাইয়ে দেবেন।"

দুই চোখ কপালে তুলে মণি বাবু বললেন, "বলেন কি মশায়? অনাদি বোসের বৌ, আশ্চর্য্য ব্যাপার! ও ভদ্রলোকের বিয়ে করে হল, তা বৌ আসবে কোত্থেকে?"

"আশ্চর্য্য হয়ে বললাম, বলেন কি? বিয়ে হয় নি—না মণি বাবু আপনি ঠাট্টা করছেন।"

'ঠাট্টা করছি। সত্যিই, অনাদি বাবুর বিয়ে হয় নি। আমার কথা যদি অবিশ্বাস করেন, তবে পাড়ার লোককে জিজ্ঞাসা করবেন। অনাদি বোসের বিয়ে হয় নি, কেন হয় নি, সে অনেক কথা।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, "কিন্তু মণি বাবু আমি নিজের কানে, ওঁর যে সব কথা শুনেছি, সে সব কথা বৌ ভিন্ন আর কার সাথে হতে পারে?"

হাঃ হাঃ করে হেসে মণি বাবু বলেন, "কেন মশায় বিয়ে-করা বৌ ছাড়া দুনিয়ায় আর কি মেয়েলোক থাকতে পারে না।"

' তা সম্ভব, তা বটে।" মণি বাবু ব্যস্ত হয়ে ঘড়ী দেখে বললেন, "আমি আর দাঁড়াতে পাচ্ছি না অনেক কাজ। দুপুরে একবার অবিশ্যি আসবেন।" মণি বাবু চলে গেলেন।

স্কুল হতে ফিরে এসে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ি। সারাদিনের পরিশ্রমে শরীরের সমস্ত রক্ত যেন বিকল হয়ে থাকে। কিন্তু শুয়ে থাকলে চলে না ছেলেদের পড়াতে হয়। বিছানায় কাৎ হয়ে একটা অঙ্ক দেখিয়ে দিচ্ছিলাম, হঠাৎ ঘরের মধ্যে আশু বাবু এসে দাঁড়ালেন। আশু বাবুর এই আগমন অভাবনীয়। কোনদিনই তিনি আমার ঘরে আসেন না, তাঁর সময় কোথায়?

আশু বাবু বোধ হয় ক্লাবের দিকে যাচ্ছিলেন, আমি তাড়াতাড়ি চৌকী হতে নেমে এলাম।

আশু বাবু বললেন, "কার্ত্তিক মুখুয্যের সঙ্গে আপনার আলাপ হয়েছে?"

"আজ্ঞে হাঁ, হয়েছে।"

"ওর বাড়ীতে দু একদিন গিয়েছিলেন, না?"

"আজ্ঞে দুদিন গিয়েছিলাম, ভদ্রলোক ডাকলেন কি না তাই"—তাঁর মোটা হাতখানি তুলে আশু বাবু বললেন, "বেশ আর যাবেন না।" আশু বাবু চলে গেলেন।

ঘাড় হেঁট করে আশু বাবুর কথা শুনলাম। তাঁর স্পষ্ট এবং গম্ভীর কণ্ঠস্বর এখনও যেন ঘরের মধ্যে গম্ গম্ করছে।

আজ আর পড়াতে মন বসল না। ঘরের বাতাসে যেন দম আটকে আসতে লাগল। চাকরী—উদরান্নের জন্য কত অপমান, কত লাঞ্ছনাই না সহ্য করতে হয়। কাহারও সঙ্গে কথা বলা, কাহারও সঙ্গে বন্ধুত্ব করারও যেন আমার স্বাধীনতা নেই। কিন্তু আশ্চর্য্য, আশু বাবু এ সব খোঁজ কার কাছে পেলেন—তা ছাড়া কার্ত্তিক বাবুর উপর এত রাগ কেন? আমি নিঃশ্বাস ফেলি, ভাবি চিরকালই কি এই ভাবে দুই মুঠা অন্নের কাছে মানুষ তার সকল স্বাধীনতার বলি দিয়ে এসেছে?

অন্য দিনের মত খাওয়া-দাওয়া সেরে বিছানায় আশ্রয় নিলাম না। চাকরী করা জীবনে এই প্রথম, তাই এখনও পূর্ব্বের মান অপমানের কিছুটা কাঁটা অবশিষ্ট রয়েছে। একটা বিড়ি টানতে টানতে রাস্তায় নেমে এলাম। অন্যমনে চলতে চলতে হঠাৎ এক সময় থেমে পড়ি—এ কি অনাদি বাবুর বাসার কাছে এসে পড়েছি যে। অনাদি বাবু সম্বন্ধে কৌতূহল জাগে।

সদর দরজা ঠেলতেই দরজা খুলে যায়। নিঃশব্দে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে দেখি ঘরের দরজা খোলা। অনাদি বাবু একজন পরমাসুন্দরী স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা বলছেন।

অনাদি বাবুর কথা পূর্ব্বের মতন। মান-অভিমানের, নানা হাসির কথা। অনাদি বাবু বলছেন, "কি গো, আজকেও কথা বলবে না কেন, কি দোষ করলাম?"

আমি জানালার কাছে সরে এসে স্ত্রীলোকটিকে দেখতে লাগলাম, হঠাৎ আমার মুখ দিয়ে বের হয়ে গেল—"আশ্চর্য্য!" অনাদি বাবু ফিরে তাকিয়ে বললেন, "কে? ওঃ অজয় বাবু," অনাদি বাবুর মুখে অপ্রতিভের হাসি মুখ ছাইয়ের মত পাংশু শুষ্ক।

"হাঃ হাঃ তা কখন এলেন। বাইরের দরজা খোলা ছিল বুঝি। তা ডাকলেন না কেন?"

আমি তাকিয়ে দেখতে লাগলাম, একটি অপূর্ব্ব নিখুঁত মাটির পুতুলকে ভাল দামী কাপড় আর গহনা পরিয়ে অবিকল একটি তরুণীর মতন দেখাচ্ছে। সমস্ত রহস্য পরিষ্কার হয়ে গেল।

আমার দিকে তাকিয়ে অনাদি বাবু বললেন, "দেখেছেন? বলুন তো। অবিকল মানুষের মত নয় কি? বুঝলেন কেষ্টনগর থেকে অনেক পয়সা খরচ করে—বুঝলেন। চলুন যাই বসিগে।"

"না আর একদিন আসবো।"

রাস্তায় নেমে আসি। পিছন হতে অনাদি বাবুর ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শুনতে পাই, "বললেন না একটু!"

রাস্তায় চলতে চলতে ভাবি আশ্চর্য্য, এই পৃথিবী আর আশ্চর্য্য এই মানুষের মন। বেচারা অনাদি বাবু একটা মাটির পুতুলকে স্ত্রী সাজিয়ে তার সঙ্গে মান অভিমান করেই সুখী, সবই আশ্চর্য্য।

পরের দিন স্কুল হতে ফিরবার মুখে দেখি রোয়াকে কার্ত্তিক বাবু, দাঁড়িয়ে।

"অজয় বাবু ও অজয় বাবু।"

আশু বাবুর কথা মনে পড়ে গেল, তাই রাস্তা থেকেই বললাম, "আমার এখন বড়ই তাড়াতাড়ি, আসুন এখানে।"

কার্ত্তিক বাবু লম্বা লম্বা পা ফেলে কাছে এসে দাঁড়ালেন। "বাবাজী বড়ই মুস্কিলে পড়েছি। কাল আশু বাবুর ওখানে গিয়েছিলাম যদি দু একটা টাকা পাই। তা বুঝলে বাবাজী ভারী কৃপণ, ভারী—"

বাধা দিয়ে গম্ভীর হয়ে বললাম, "ওসব কথা থাক কার্ত্তিক বাবু। কি দরকার, তাই বলুন।"

দুই হাত কচলাতে কচলাতে কার্ত্তিক বাবু বললেন, "সকাল থেকে বুঝলে বাবাজী বাড়ীশুদ্ধ সব একরকম উপোসী। একটা টাকা।"

"একটা টাকা দেওয়া এখন সম্ভব নয়, এই আট আনা নিন।" পয়সা আট আনা হাতে করে, কার্ত্তিক বাবু বলতে লাগলেন, "বেঁচে থাক বাবাজী, ভগবান অক্ষয় পরমায়ু দিন। কিন্তু বাবাজী ঐ আশু বাবুকে এখনও চিনলে না, বেটা ভারী পাজী, ভারী নচ্ছার, কোন্ দিন হুট করে বলবে, 'চাকরী খতম'। খুব সাবধানে বাবাজী, খুব সাবধান।"

আমি তখন হাঁটতে সুরু করেছি।

নানা কারণে মনটা বড়ই খারাপ।

শিবানীর পত্রের এখনও জবাব দিতে পারিনি। টাকা এখনও পাওয়া সম্ভব নয়, মাইনে পেতে আরও দিন সাতেক দেরী। তবু তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য পোষ্টকার্ডখানা লিখছিলাম, হঠাৎ কানে কোন অতি পরিচিত লোকের কথা এল, আমার নামটা শুনে আরও কৌতূহল হ'ল।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে, আশুবাবুর ঘরের সমস্ত দৃশ্য নজরে এল। আশুবাবু গম্ভীর হয়ে বসে আছেন আর সম্মুখে দাঁড়িয়ে কার্ত্তিকবাবু।

কার্ত্তিকবাবু দুই হাত যোড় করে, কখনও জোরে কখনও অত্যন্ত চুপি চুপি আশুবাবুকে কি যেন বলছেন।

শুনতে পেলাম কার্ত্তিকবাবু বলছেন, "সেদিন অজয়বাবু কত কথাই বললেন, সে সব কথা মুখে উচ্চারণ করতে লজ্জা লাগে, তবুও আপনি শুনিব। অজয়বাবু বললেন, দু'বেলা দুটো ভাল ভাত যেন, তাতে খাটিয়ে নেন খাদার মতন। এটা কর সেটা কর, পাঁচশো বার বাজার যেতে হয়, যেন আমি একটা চাকর।"

"বটে বটে এতদূর!" ক্রোধে আশুবাবুর মুখ ফুলে উঠল।

"আর চামার, চসমখোর পাজী এই সব।"

দেখলাম রাগে আশুবাবু কাঁপছেন। আমি স্থান-কাল ভুলে বিস্ময়ে চেয়ে রইলাম। মানুষ এতবড় মিথ্যাবাদী, এত নীচ হ'তে পারে। ঠুং করে শব্দ হ'ল, দেখি দুটি টাকা হাতে নিয়ে ভক্তিভরে কার্ত্তিক মুখুয্যে প্রণাম করছে, আমি সরে এলাম। ঘর হতেই আশুবাবুর ঘরের দরজা খোলার শব্দ পেলাম, তারপর কার্ত্তিকবাবুর পদশব্দ দূরে ক্ষীণ হয়ে মিলিয়ে গেল।

"মাষ্টার মশায়।" আশুবাবুর স্পষ্ট, তীক্ষ্ণ স্বর বাতাসে ভেসে এল।

আমি আমার ভবিষ্যৎ দিনের আলোর মত স্পষ্ট দেখতে পেলাম।

নিভীক ভাবে আতবাবুর সম্মুখে উপস্থিত হলাম।

"মাস শেষ হ'তে এখনও দিনকয়েক দেরী আছে, তা হোক। কালই আপনার মাইনে পাবেন। এ স্কুলে আপনাকে আর রাখা গেল না।"

চাকুরীগত প্রাণ আমার, তাই একবার শেষ চেষ্টা করে বললাম, "আমার কি দোষ ত্রুটী জানতে পারি কি?"

"না কোন কথা শোনার দরকার নেই, যান।" ঘর হ'তে বেরিয়ে এলাম।

• • •

আবার সেই পথ, সেই ধূলিরুক্ষ, কঠিন রাজপথ, সেই বিনিদ্র দীর্ঘ রজনী, দিবারাত্রি নিষ্ঠুর সংগ্রাম একমুঠো অন্নের জন্য, একটা বাসস্থানের জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম। আমার মুখের দিকে চেয়ে এক নির্জ্জন পল্লীপ্রান্তে আমার বৃদ্ধ বাপ-মা, ভাইবোন আর শিশুরী এই পৃথিবীতে একান্ত ভরসার চেয়ে রয়েছে।

তাদের কোন্ ভাষায় সান্ত্বনা দেবো। নিঃশব্দে সকলের অলক্ষ্যে চোখের জল মুছে, উঠে বসলাম।

ফৌত্ ভিটে

—শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারী

ফৌত্ ভিটে, ফৌত্ ভিটে, ক'রছ খাঁ খাঁ দুপুর রোদে,
তোমার বুকে শেয়াল কুকুর বেড়ায় ঘুরে কি আমোদে!
কোথাও তোমার শূন্যে হাসে, কোথাও কাঁদে ডাঁটীর বন,
পথিক চলে পাশটী দিয়ে নীরবে চায় অনুক্ষণ।
—কয় না কথা, মাথা দোলায়, বুঝি তারা সুধায় তাই—
ভিটের মালিক কোন্ শ্মশানে চিতের পুড়ে হ'ল ছাই!
শূন্য-ভিটা! তোমার বুকে ব'লতে পার কারা ছিল?
কান্নাহাসির সুখ মিটায়ে তারা সবাই কোথায় গেল?
বছর দশেক্ আগে যারা তোমার বুকে মাথা রেখে
কত আশায় বাঁধ্‌ল রে বুক—তোমার ধূলো অঙ্গে মেখে,।
তোমার বুকে তাদের শিশু দিয়েছিল হামাগুড়ি
কোন্ গৃহিণী শুয়েছিল 'দিয়ে সুখে চরণ মুড়ি,'
ভালবেসে স্নেহের তাপে তোমায় আদর করেছি'ল,
শুকনো গোময় দিয়ে কোমল হ'তে নিকিয়েছিল।
তোমার বুকে বেলপাতা দুল তুলসী কতই খেত চুমো,
নিপুণ হাতের আলিপনায় কতই দীপ আর কতই ধূপো!
সে গৃহস্থের দেবদেবী সব তোমার বুকে পুজো নিল,
তোমার বুকে মাথা কুটে সেই পরিবার আশিস্ পেল!
তোমারই বুক শাঁখলিতে কত সাধে খড়ের চাল্
সেই গৃহস্থ ভুলেছিল দুখে বেঁধে লাঙ্গল হাল্:
তবু তোমার বুকে তারা পেয়েছিল স্বর্গসুখ!
তোমার কোলে আজ সেখানে তাদেরই সেই হাসিমুখ।

তোমার বুকে ঘুণ্ চরে আজকে গেয়ে করুণ গান,
শেয়াল কুকুর বিষ্ঠা ফেলে। হায় কি তোমার অপমান!
তোমার বুকে ঘোছনা রাতে যে সম্পতি সঙ্গোপনে,
জাগ্‌ত বাসর রঙীন চোখে আলিঙ্গনে আলাপনে!
তোমার বুকে হাস্‌ত সুখে বধূর আলা সন্ধ্যাদীপ!
হায়রে সেথায় মাটী খোঁড়ে আজকে কত বন্য জীব!
চোখ জুড়াত তোমায় দেখে মন ভুলাত তোমার ছবি
তোমায় ঘিরে নাচ্‌ত যেন আরাম, বিরাম, শান্তি,—সবই!
গৃহীর কাছে মাটীর স্বর্গ,—পুণ্যে ভরা বাস্তুভিটে!
প্রবাস-দুখে তোমার ছবি—তোমার মায়া কতই মিঠে!
তোমার বুকে পাতা ছিল লক্ষ্মীমায়ের আসনখানি,
তোমাকেই তো সে গৃহস্থ মহাতীর্থ নেছে মানি'!
গৃহীর পুণ্য সাধনপীঠ,—জন্ম মৃত্যু তোমার কোলে—
স্বামীর ভিটা শ্বশুর-ভিটা—বাপ-পিতামোর ভিটা ব'লে!

তোমার বুকে অন্ন কত ছড়িয়ে ছিল সোনার দানা,
অন্নপূর্ণা উঠত হেসে গন্ধে আর ব্যঞ্জনে নানা।
ঝড়-বাদলে বৃষ্টিধারা আজকে তোমার বুকে বেঁধে!
তোমায় ফেলে তোমার গৃহী কোথায় গেল কেঁদে কেঁদে!
তোমার বুকের ফুটাটুকু হঠাৎ আসা কাদামাটী
সে গৃহিণী পা'রত যে হাত দিতে তাহার জিভে চাটি'!
তোমায় দেখে কান্না যে পায়,—হায়রে তুমি লক্ষ্মীছাড়া!
স্মৃতির বোঝা নিয়ে মাথায় আজো তুমি আছ খাড়া?
হায় জননী পল্লীরাণী! শূন্য ভিটাই তোমার শোভা!
নগরবাসী! দেখেছো তাই এর চেয়ে আর মনোলোভা?
—হয়তো তুমি, নয়তো শমন—করেছ' তার মনে হেন!
কষ্ট ক'রে গাঁয়ে এসে' ফৌত্ ভিটে দে'খো যেন'।
চোখে যদি অশ্রু আসে? একটু ফেলে রেখায় এসে,
একটুকু দীর্ঘনিশাস ফেলে বন্ধু রেখায় ব'সে।

চন্দ্র

—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ রায়

শিশুকাল হইতেই মানুষ চন্দ্রের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকে। উহার স্নিগ্ধ, উজ্জ্বল আলোকই এই আকর্ষণের প্রধান কারণ।

জ্যোতির্বিদ্‌গণ মনে করেন, সূর্য্য হইতে যেরূপে পৃথিবীর জন্ম হইয়াছিল, পৃথিবী হইতেও সেইরূপে চন্দ্রের উৎপত্তি হইয়াছে।* উহা পৃথিবীর ন্যায়ই গোলাকার জড়পিণ্ড বিশেষ। উহার ব্যাস ২১৬০ মাইল, অর্থাৎ পৃথিবীর ব্যাসের প্রায় এক-চতুর্থাংশ মাত্র। উহা আমাদের নিকট হইতে প্রায় ২ লক্ষ ৫৮ হাজার মাইল দূরে থাকিয়া পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে।

পৃথিবীর ন্যায় চন্দ্রের পৃষ্ঠদেশেও বহুসংখ্যক মৃত আগ্নেয়-গিরি রহিয়াছে। উহাদের কোন কোনটি ২০,০০০ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ। এক একটির গহ্বর অত্যন্ত প্রশস্ত। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় অনেকগুলি বড় বড় মৃত আগ্নেয়গিরি দেখা যায়, কিন্তু উহাদের আলামুখগুলি এত বিরাট নহে। পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিদ্‌গণ প্রাচীন বিখ্যাত জ্যোতিষীদিগের নাম অনুসারে উহাদের নামকরণ করিয়াছেন। একটির নাম রাখা হইয়াছে এরাটোস্থেনিস। এই অতি প্রাচীন গ্রীক জ্যোতির্বিদ্ (২৭৬-১৯৪ খৃঃ পূঃ) জ্যামিতির সাহায্যে পৃথিবীর পরিধি নির্ণয় করিয়াছিলেন। অপর একটির নাম রাখা হইয়াছে গ্রামলডী। এতদ্ব্যতীত নিল্লী, ক্রুগার, ষ্টিফিনাস, হেলিয়াস্ ইত্যাদি নামে অভিহিত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অনেকগুলি আলামুখ বিদ্যমান রহিয়াছে। বলা বাহুল্য, আলামুখ দিয়া আগ্নেয়গিরি হইতে সময় সময় ধূম, অগ্নিশিখা, উত্তপ্ত লাভা ও জলীয় বাষ্পাদি ঊর্দ্ধাকাশে উৎক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। ভারতের পশ্চিম-ঘাট পর্ব্বতমালার মত আগ্নেয়গিরি অঙ্গ একটি উদাহরণ; তবে উহাতে এখন কোন আলামুখ দেখা যায় না। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের অত্যুন্নত কৃষ্ণমৃত্তিকা, যাহাতে প্রচুর পরিমাণে কার্পাস উৎপন্ন হইয়া থাকে, প্রাচীন লাভারই ধ্বংসাবশেষ মাত্র। যুগ যুগান্তর ধরিয়া রৌদ্র, বৃষ্টি ও ঝড়ের প্রভাবে সুকঠিন লাভাপিণ্ডও চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া কৃষ্ণমৃত্তিকার রূপ ধারণ করিয়াছে। আর লাভা ও ভস্মরাশি স্তূপীকৃত হইয়া দক্ষিণ ভারতকে উচ্চ মালভূমিতে রূপান্তরিত করিয়াছে। চন্দ্রের পৃষ্ঠেও যে এইরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে নাই, তাহা কে বলিতে পারে?

পৃথিবীর উপরে যেমন প্রশান্ত, ভারত ও আটলান্টিক মহাসাগর, ভূমধ্য ও আরব সাগর রহিয়াছে, জ্যোতিষীরা চন্দ্র-পৃষ্ঠে সেই রকম কতকগুলি স্থানকে অদ্ভুত অদ্ভুত নাম দিয়াছেন, যথা—বড় মহাসাগর (Hurricane Ocean), স্থির সমুদ্র (Serene Sea), বৃষ্টি সমুদ্র (The Rainy Sea) ইত্যাদি। হ্রদের নাম রাখিতেও ত্রুটি করেন নাই; একটির নাম রাখিয়াছেন মৃত্যু হ্রদ (The Lake of Death)। খৃষ্টানদিগের পবিত্র নদী জর্ডান যে হ্রদে পড়িয়াছে, উহার জল এত লবণাক্ত ও গন্ধকময় যে, উহার তীর-ভূমিতে কোন গাছ জন্মিতে পারে না। আবার জল এত সরবতের মত গাঢ় যে উহাতে কোন জীবদেহ ডুবিয়া থাকিতে পারে না। পৃথিবীস্থিত এই মরুহ্রদটির (The Dead Sea) কথা স্মরণে রাখিয়াই হয় ত জ্যোতিষীরা উপরোক্ত মৃত্যু হ্রদটির নামকরণ করিয়া থাকিবেন। এখানে বলা আবশ্যক যে, এই সকল নাম সম্পূর্ণ কাল্পনিক। কারণ পরবর্ত্তী জ্যোতিষীরাই প্রমাণ

---

* এই সম্বন্ধে বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণ চন্দ্র সম্বন্ধে যে মতামত পোষণ করেন তাহাই সন্নিবেশিত হইয়াছে। 'মঞ্জরী'র পাঠকবর্গ জানত আছেন, বর্ত্তমান বিজ্ঞানের এই মতামত সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ বর্ত্তমান, কেন না, আমাদের জ্ঞাত কোন বিষয়ের সম্যগ্‌রূপে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ধারণা না হইলে তাহার অসম্ভিত্বের সম্বন্ধে কোন ধারণা বিশ্লেষণযোগ্য হইতে পারে না। আধুনিক বিজ্ঞানে বিশ্ব-জগৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ধারণালাভে অক্ষম হইয়াছে। সুতরাং চন্দ্র সম্বন্ধেও তাহার কোনো বিশ্লেষণযোগ্য হইতে পারে না। বিশ্ব-জগৎ সম্বন্ধে ধারণার আভাস গত পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত সম্পাদকীয় প্রবন্ধে (সম্পাদকের বাঙ্গালা ভাষাজ্ঞানের নমুনা ও আধুনিক বিজ্ঞানের ৭৯০ পৃষ্ঠা হইতে ৭৯১ পৃষ্ঠা) পাওয়া যাইবে। ঃ সঃ।

করিয়াছেন যে, চন্দ্রের পৃষ্ঠে কোন সমুদ্র বা হ্রদ এখন নাই : বায়ু নাই বলিলেই চলে। সুতরাং জলের সম্ভাবনা কোথায়? এখানে বাতাসের সঙ্গে ধূলা উড়ে না, সমুদ্র হইতে বাষ্প উঠিয়া মেঘ হয় না বা পর্ব্বতমাত্রকে সিক্ত করে না : অতএব চন্দ্রে কোন নদীরও অস্তিত্ব থাকিতে পারে না।

দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে চন্দ্রকে দেখিতে কিন্তু মন্দ লাগে না। চন্দ্রের নিজের আলোক নাই। উচ্চ উচ্চ গিরিপুঞ্জের বন্ধুর উন্মুক্ত বক্ষের উপরে সূর্য্যকিরণ পতিত হইয়া উজ্জ্বল রূপে প্রতিফলিত হয়। তজ্জন্যই আমরা চাঁদকে দেখিতে সমর্থ হই। চন্দ্রমণ্ডলে বায়ু একরূপ না থাকায় সূর্য্য-কিরণ ওখানে বিনা বাধায় অতি দ্রুত বেগে যেরূপ সহসা আপতন করে, আবার সেই রূপ চক্ষুর নিমেষের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া পড়ে।

চন্দ্রের যখন নদী, হ্রদ, সমুদ্র ও বাতাস নাই, তখন সেখানে কি সবই চির-স্থির? না, তাহা নহে। সময়ে সময়ে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পর্ব্বতগাত্র স্খলিত হইয়া চন্দ্রের পৃষ্ঠের স্থানে স্থানে গভীর সুদীর্ঘ খাতের উৎপত্তি ঘটাইয়া থাকে। বৃষ্টির একান্ত অভাব না হইলে ঐ সকল খাত জলপূর্ণ হইয়া গঙ্গা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্রাদির ন্যায় বড় বড় নদীর আকার ধারণ করিতে পারিত।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি চন্দ্রের নিজস্ব আলোক নাই। উহা সূর্য্যের কিরণে উদ্ভাসিত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন উহার পৃষ্ঠে বায়ুরও অভাব। এই সব কারণে সূর্য্যাস্তের সময়ে পৃথিবীতে আকাশমণ্ডল যেরূপ বিচিত্র বর্ণের মেঘমালায় সুশোভিত হয়, চন্দ্র-মণ্ডলে সেরূপ মনোরম শোভা ঘটা একান্ত অসম্ভব।

পৃথিবীর ন্যায় চন্দ্রেরও যখন নিজস্ব আলোক নাই, তখন উহা কি পৃথিবীর ন্যায় মোটামুটি সুখশীতল? না, তাহা নহে। যে কোনও দুই নক্ষত্রের মধ্যবর্ত্তী মহাকাশ যেরূপ ভীষণ শীতল, চন্দ্রমণ্ডলও সেইরূপ স্বভাবতঃ প্রচণ্ড শৈত্যপূর্ণ।

যে সময়ে চন্দ্র আপন মেরুদণ্ডের উপরে একবার মাত্র আবর্ত্তন করে, ঠিক সেই পরিমাণ সময়ের মধ্যেই উহা পৃথিবীকেও একবার পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। ইহার ফলে আমরা চিরকাল ধরিয়া চন্দ্রের একটি মাত্র পৃষ্ঠদেশই দেখিয়া থাকি, সমগ্রটা নহে।

চন্দ্র-মণ্ডলে ক্রমাগত ১৪ দিন ব্যাপী একটি মাত্র দিবা এবং পরবর্ত্তী ১৪ দিন ধরিয়া একটি মাত্র রাত্রি হয়। ইহা অপেক্ষাও আশ্চর্য্য ঘটনা আমাদের এই পৃথিবীতেই ঘটিয়া থাকে। আমরা প্রত্যহ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে একটি দিবা ও একটি রাত্রি হয় দেখিয়া মনে করি, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই বুঝি এইরূপই হয়; কিন্তু তাহা প্রকৃত নহে। মেরুপ্রদেশে দিবা ও রাত্রির পরিমাণ ২৪ ঘণ্টার অনেক বেশী। বিষুব-রেখার উপরে অবস্থিত দেশ সকলের ১২ ঘণ্টায় দিবা ও ১২ ঘণ্টায় সর্ব্বদা রাত্রি হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ রেখা হইতে যে দেশ যত দূরে অবস্থিত, উহার দিবা ও রাত্রির পার্থক্য তত অধিক। ইংলণ্ডে শীতকালে মাত্র ৮ ঘণ্টা আলোময় দিন এবং প্রায় ১৬ ঘণ্টা রাত্রি হয়। কিন্তু গ্রীষ্ম ঋতুতে ঠিক উল্টা হইয়া থাকে। ইংলণ্ড অবশ্য উত্তর, নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের অন্তর্গত। আরো উত্তরে দিবা ও রাত্রির পার্থক্য আরও অধিক। নরওয়ে দেশের উত্তরাংশ উত্তর হিম-মণ্ডলের মধ্যে অবস্থিত। এখানে তীব্র শীত হইবার কথা। কিন্তু গ্রীষ্ম-মণ্ডলস্থ মেক্সিকো উপসাগর হইতে যে উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোত পৃথিবীর পূর্ব্বাভিমুখী আহ্নিকগতির ফলে উত্তর-পূর্ব্বাভিমুখে চলিয়া থাকে, উহা বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ ও নরওয়ের পার্শ্ববর্ত্তী সমুদ্র দিয়া প্রবাহিত হয়। আবার দক্ষিণ-পশ্চিম উষ্ণ বিপরীত বাণিজ্য-বায়ুপ্রবাহও ঐ সকল দেশের উপকূলের উপর দিয়া চলে। এই দুই কারণে এই অঞ্চলের সমুদ্রজল শীতে জমিয়া বরফে রূপান্তরিত হইতে পারে না। সম অক্ষ-রেখার মধ্যে অবস্থিত লাব্রাডর উপদ্বীপের উপকূলস্থিত সমুদ্র বরফাবৃত হওয়ায় নৌচলাচলের পক্ষে অযোগ্য হইলেও, ইংলণ্ড ও নরওয়ের নিকটস্থ সাগরে কি গ্রীষ্ম কি শীত, সকল সময়েই জাহাজ চলাচল করিতে পারে। নরওয়ের উত্তর অঞ্চলে যে সকল নগর রহিয়াছে, উহাদের মধ্যে হামারফেষ্ট সহর অন্যতম। ইহা উত্তর হিমমণ্ডলের মধ্যে অবস্থিত। কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি নানাদেশ হইতে বহুসংখ্যক ভ্রমণকারী "নিশীথ সূর্য্য" (midnight Sun) দেখিবার জন্য এই সহরে প্রতি বৎসর গ্রীষ্মকালে আসিয়া থাকেন। এখানে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সূর্য্য অস্ত যায় না। সুতরাং আমাদের হিসাবে যখন মধ্য রাত্র হইবার কথা, তখনও ঐ সহরে সূর্য্য দেখা যায়। উত্তর মেরুতে ২১শে মার্চ্চ তারিখে সূর্য্য দিক্-

চক্রে (horizon) উদিত হইয়া ঊর্দ্ধাকাশে উঠিবার চেষ্টা করে না, বরং পূর্ব্বদিক্ হইতে ক্রমশঃ দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর দিক্ দিয়া মাটি ঘেঁষিয়া একটা পাক দিয়া চলে এবং ২৪ ঘণ্টায় অর্থাৎ ২২শে মার্চ্চ তারিখে যথাস্থানে (পূর্ব্ব দিক্‌বিন্দুতে) আসিয়া উপস্থিত হয়। পরদিন আবার আকাশে ঐরূপ একটা পাক দিয়া থাকে। এইরূপে ২১শে মার্চ্চ হইতে জুন পর্য্যন্ত ৩ মাস ধরিয়া সূর্য্য নিয়তঃ পাক দিতে দিতে ক্রমাগতঃ উপরের দিকে উঠে। বেলা ৭॥ ঘটিকার সময় সূর্য্য আষাঢ়ের শেষে যত উচ্চ (২৩½°) হয়, উহার অধিক নহে। ক্ষুদ্র একটি সূত্র বা পাঁচ ধরিয়া যদি কেহ সূর্য্যকে নিয়তঃ পাক দিতে চেষ্টা করে, তবে উহা যেরূপ প্রতি পাকের সঙ্গে একটু একটু করিয়া উপরের দিকে উঠিতে বাধ্য হয়, সূর্য্যও ঠিক সেইরূপেই ঊর্দ্ধ আকাশে পাক দিতে দিতে অগ্রসর হয়। ২২শে জুন উহা আবার নিম্নের দিকে পাক দিতে দিতে নামিতে বাধ্য হয়। ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে সূর্য্য ২২শে মার্চ্চের ন্যায় পুনরায় দিক্-চক্রের সহিত মিশিয়া যায়। সুতরাং ২১শে মার্চ্চ হইতে ২৩শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত দীর্ঘ ৬ মাস ব্যাপিয়া উত্তর-মেরুতে লোকে নিয়ত সূর্য্যকে দেখিয়া থাকে। অতএব সেখানে নিশীথসূর্য্য দেখা আশ্চর্য্য নহে। আবার ২৩শে সেপ্টেম্বর হইতে পরবর্ত্তী ২০শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ৬ মাস ধরিয়া ঐ স্থানে সূর্য্যকে আদৌ দেখা যায় না। অর্থাৎ উত্তর-মেরুতে বৎসরে ৬-মাস-ব্যাপী একটি মাত্র দিবা ও ৬-মাস-দীর্ঘ একটি মাত্র রাত্রি হইয়া থাকে। প্রাচীন কালে বোধ হয় ইহাকেই ব্রহ্মার দিবা ও রাত্রি নাম দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা উত্তর-মেরু অঞ্চলে বসবাস করিতেন, তাঁহারা এইরূপ ঘটনা প্রত্যক্ষ যে করিয়াছিলেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। কেবলমাত্র উত্তর-মেরুতেই যে এইরূপ ৬ মাস ব্যাপী দিবা ও রাত্রি দেখা যায়, তাহা নহে, দক্ষিণ-মেরুতেও এইরূপ দেখা যায়। তবে যে সময় উত্তর মেরুতে দিবা থাকে, সে সময় দক্ষিণ-মেরুতে দীর্ঘ রাত্রি দেখা যায়; আর উত্তর-মেরুতে যখন দীর্ঘরাত্রি আরম্ভ হয়, দক্ষিণ-মেরুতে তখন দীর্ঘদিবার সূত্রপাত ঘটে। পৃথিবীর বার্ষিক গতিই এই অত্যদ্ভুত ঘটনার প্রধান কারণ বুঝিতে হইবে। *

* পৃথিবীর সকল অক্ষাংশে দিবার পরিমাণ সমান নহে যথা :—

ভূপৃষ্ঠে উত্তর গোলার্দ্ধে ৭০° অক্ষাংশে যদি নিয়ত ৮৬ দিন ধরিয়া সকালে সূর্য্যকে দেখা যায় এবং উত্তর-মেরুতে ১৮৬ দিবস ধরিয়া যদি উহার আলো অস্ত না যাওয়া সম্ভব হয়, তবে চন্দ্রমণ্ডলে ১৪ দিবস ব্যাপী একটি দিবা এবং পরবর্ত্তী ১৪ দিবস দীর্ঘ একটি রাত্রি হয় বলিলে আশ্চর্য্য হইবার মত কিছুই থাকিতে পারে না।

পৃথিবী সুগভীর বায়ুমণ্ডল দ্বারা আবৃত থাকায় উদয়ের পূর্ব্বেই সূর্য্যরশ্মি পূর্ব্বাকাশকে রঞ্জিত করিয়া ফেলে। ঊর্দ্ধাকাশের বায়ুস্তরের ভিতর দিয়া সরলপথে চলিবার সময় সৌর কিরণকে বাঁকিয়া ভূপৃষ্ঠের দিকে আসিতে হয়। ইহারই ফলে উষার আলোক আবির্ভূত হয়। ফলতঃ সূর্য্যোদয়ের কয়েক মিনিট পূর্ব্বেই আমরা উহাকে দিক্-চক্রের উপরে দেখিয়া থাকি। বায়ুর কল্যাণেই সূর্য্যাস্তের অনেকক্ষণ পর পর্য্যন্ত পশ্চিম আকাশে বিচিত্রবর্ণের মেঘের খেলা দেখা যায়। আবার বায়ুরাশিতে ভাসমান ধূলিকণা সমূহ ও জলীয় বাষ্প সূর্য্যরশ্মি হইতে অনেকটা

অক্ষাংশ	দীর্ঘতম দিবা পরিমাণ	ক্ষুদ্রতম দিবা পরিমাণ
	১২ ঘণ্টা	১২ ঘণ্টা
	১৪ ঘণ্টা ৫৩ মিঃ	১১ ঘণ্টা ৭ মিঃ
	১৩ ঘণ্টা ৫৪ মিঃ	১০ ঘণ্টা ৬ মিঃ
	১৪ ঘণ্টা ২০ মিঃ	৮ ঘণ্টা ৩৪ মিঃ
	১৮ ঘণ্টা ৩০ মিঃ	৪ ঘণ্টা ৩০ মিঃ
৬৬½°	২৪ ঘণ্টা ০ মিঃ	০ ঘণ্টা ০ মিঃ

সকল অক্ষাংশে ক্রমাগত দিবার পরিমাণও সমান নয়; যথা :—

দীর্ঘস্থায়ক দিবমান (Continuous daylight)

অক্ষাংশ	উত্তর গোলার্দ্ধে	দক্ষিণ গোলার্দ্ধে
৭০°	৬৫ দিবস	৬০ দিবস
৮০°	১৩৪ দিবস	১২৭ দিবস
	১৮৬ দিবস	১১৯ দিবস।

পৃথিবীর কক্ষ ঠিক গোলাকার নহে, অনেকটা ডিম্বাকৃতি বিশিষ্ট। এই কক্ষে চলিতে চলিতে ইহা যতই সূর্য্যের নিকটস্থ হইতে থাকে, ততই উহার গতিবেগ বৃদ্ধি পায়। এই জন্য পৃথিবী অধিকতর তাড়াতাড়ি নির্দ্দিষ্ট পথ অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়। ডিসেম্বর মাসে পৃথিবী জুন মাসের অবস্থান অপেক্ষা অনেকটা সূর্য্যের কাছে পৌঁছে। এইজন্য দক্ষিণ গোলার্দ্ধের গ্রীষ্মকাল উত্তর গোলার্দ্ধের গ্রীষ্মকাল অপেক্ষা ৭ দিন কম স্থায়ী হয়।

তাপ অপহরণ করিয়া লয়; সমুদায় সৌরতাপকে ভূপৃষ্ঠে পড়িতে দেয় না। এই সব কারণে ভূপৃষ্ঠ সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে অত্যুত্তপ্ত হইতে পারে না। কিন্তু চন্দ্রমণ্ডলের বায়ুরাশির বিশেষ অভাব বশতঃ সেখানে সূর্য্যরশ্মি বিনা বাধায় হঠাৎ তীব্রভাবে পতিত হয় এবং অল্প সময়ের মধ্যেই চন্দ্রপৃষ্ঠকে প্রচণ্ডরূপে উত্তপ্ত করিয়া ফেলে। প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী স্যর জেম্‌স্ জীন্‌স্ (Sir James Jeans) প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে ২-সপ্তাহ-ব্যাপী দীর্ঘ চান্দ্র দিবাভাগে চন্দ্র-মণ্ডলে তাপের মাত্রা এত অধিক হয় যে, ঐ উত্তাপে জল বাষ্পাকার ধারণ করিতে বাধ্য হয়। আবার পরবর্ত্তী সুদীর্ঘ রাত্রিতে ঐ উত্তাপ তাপমান যন্ত্রের শূন্য বিন্দুর শত শত ডিগ্রী নিম্নে নামিতে পারে। উত্তাপ ও শৈত্যের এত অধিক পার্থক্য ভূপৃষ্ঠে দেখা যায় না।

অনেকে জানেন যে, লৌহ ও তাম্রাদি ধাতু, বালুকা ও প্রস্তর প্রভৃতি শিলারাশি সাহারা ও রাজপুতানার মরুপ্রান্তরে দিবাভাগে যেরূপ অতিশীঘ্র ভীষণরূপ উত্তপ্ত হইয়া থাকে, রাত্রিকালে কিন্তু সেই পরিমাণে অতি দ্রুতবেগে প্রচণ্ড শীতল হইয়া পড়ে। একবার জুন মাসের শেষে আমি আগ্রায় গিয়াছিলাম। মধ্যাহ্নকালে যাহাতে গ্রীষ্মাধিক্যের দরুণ আমার কষ্ট না হয়, সেই জন্য আমার বন্ধু নীচের তলায় একটা ক্ষুদ্র অন্ধকারময় ঘরের মধ্যে আমার থাকার ব্যবস্থা করেন। দুয়ার ও জানালাগুলি বন্ধ করিয়া উহাদের গায়ে খস্‌খসের টাটি ঝুলাইয়া সর্ব্বদা জলদ্বারা ভিজাইয়া রাখিবারও আয়োজন করিয়া দেন। অধিকন্তু ঘরের এক কোণে একটা কেরোসিন টিনের মধ্যে বরফখণ্ড রাখেন। এত করিয়াও তিনি আমাকে গ্রীষ্মের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারেন নাই। সিমলা পাহাড় হইতে নামিয়াছিলাম বলিয়াই আমার আরও অধিক গরম বোধ হইয়াছিল।

একটি চাকর সন্ধ্যার সময় দোতালার ছাদের নালী বন্ধ করিয়া জল ঢালে। ঘণ্টাখানেক পরে জল ছাড়িয়া দিয়া আমাদের বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হয়। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তথায় দুই বন্ধুতে বিশ্রাম করি। রাত্রিতে ঐস্থানে আমার শয়নের ব্যবস্থা হওয়ায় দিয়া যেদি বন্ধুর ভৃত্যটি বিছানার উপরে একটি লেপ রাখিয়া গিয়াছে। ঐ ভৃত্যটির বুদ্ধির অতি প্রাখর্য্য চিন্তা করিয়া হাস্য সংবরণ করিতে পারি নাই। কিন্তু মধ্যরাত্রিতে হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে বিষম শীত বোধ করি এবং সেচারা চাকরটিকে ধন্যবাদ দিয়া লেপের আশ্রয় লইয়া বাঁচি। চন্দ্রমণ্ডলের শীতাতপের আধিক্য যে কত তীব্র হইবে, তাহা অনেকটা অনুমান করা যায়।

সূর্য্য উঠিলে চন্দ্রের পৃষ্ঠদেশে যে সকল স্থানে উচ্চ পাহাড়ের ছায়া পড়ে, সেই সকল স্থানকে অনুজ্জ্বল বা কৃষ্ণবর্ণ দেখায়। ঐ সকল ছায়াযুক্ত কৃষ্ণবর্ণ স্থানগুলিকে লোকে চাঁদের কলঙ্ক (lunar spots) বলে। সচরাচর যাহাকে বালক-বালিকারা অশ্বত্থগাছ বলিয়া থাকে, আর যাহার নীচে তাহাদের বুড়ি বাস করে, উহা ঐ কলঙ্ক ভিন্ন অন্য কিছুই নহে।

সূর্য্য চন্দ্র হইতে বহুদূরে বিদ্যমান থাকায় সূর্য্যরশ্মিগুলি যেন সমান্তরাল ভাবে আসিয়া চন্দ্রের পৃষ্ঠে পড়ে। ইহার ফলে চন্দ্রের ঠিক অর্দ্ধাংশ মাত্র এক সময়ে আলোকিত হয়। পৃথিবী সূর্য্যকে, আবার চন্দ্র পৃথিবীকে নির্দ্দিষ্ট পথে বা কক্ষে পরিভ্রমণ করে। উহাদের পরস্পরের দৈনিক অবস্থানের অনুপাতের উপরে চন্দ্রের আলোকিত অংশ বা কলার হ্রাস বৃদ্ধি নির্ভর করিয়া থাকে। অমাবস্যার পর হইতে অর্থাৎ শুক্লপক্ষে চন্দ্রকলার পরিমাণ প্রতিদিন বৃদ্ধি পায়। অবশেষে পূর্ণিমা তিথিতে সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বাকাশে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইয়া থাকে। ঐ দিন সূর্য্য ও চন্দ্রের মধ্যে পৃথিবী অবস্থান করে। ঐরূপে পূর্ণিমার পর প্রত্যহ চন্দ্রোদয়ের সময় পিছাইতে পিছাইতে অমাবস্যার দিন চন্দ্র ও সূর্য্য একসঙ্গে একই দিকে উদিত হয়। ঐদিন পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যে চন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হয়। আর চন্দ্রের আড়ালের জন্যে আমরা সে রাত্রিতে চন্দ্রকে আদৌ দেখিতে পাই না। কারণ চন্দ্রের আলোকিত পৃষ্ঠদেশ পৃথিবীর অভিমুখে না থাকিয়া উহার বিপরীত দিকে থাকে।

পৃথিবী সূর্য্যকে ৩৬০দিন ও প্রায় ৬ ঘণ্টায় একবার প্রদক্ষিণ করে। কিন্তু চন্দ্র পৃথিবীকে কেবলমাত্র ২৭·৩ দিনে এক পাক ঘুরিয়া আসে, অর্থাৎ চন্দ্র আজ আকাশে যে রাশির যে স্থানে রহিয়াছে, ২৭·৩ দিন পরে উহা সেই রাশির ঠিক সেই স্থানেই আসিয়া উপস্থিত হয়। সূর্য্য আপাতভাবে স্থির;

কিন্তু বার্ষিক গতির ফলে উহাকেও গতিশীল বলিয়া ভ্রম হয়। মনে হয়, সূর্য্য যেন প্রত্যহ পূর্ব্বদিকে একটু একটু করিয়া অগ্রসর হয়। সেই কারণে অমাবস্যার দিন আকাশের যে স্থানে সূর্য্য থাকে, ২৭·৩ দিন পরে উহা ঠিক সেই স্থানে থাকিতে পারে না; পূর্ব্বদিকে যেন খানিকটা সরিয়া যায়। এইজন্য নভোমণ্ডলে সূর্য্যের সহিত একত্র হইতে চন্দ্রের পক্ষে আরও কিছু সময়—দুই দিনের কিছু বেশী—দরকার হয়। এইজন্য এক অমাবস্যা হইতে ঠিক পরবর্ত্তী অমাবস্যা পর্য্যন্ত ২৯·৫ অর্থাৎ সাড়ে উনত্রিশ দিন লাগে। এই সময়কে চান্দ্রমাস বলে।

আমরা মধ্যে মধ্যে কোন কোন অমাবস্যার দিন সূর্য্য-গ্রহণ হইতে দেখি, আর কোন কোন পূর্ণিমা তিথিতে চন্দ্র-গ্রহণ দৃষ্ট হয়। পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে ঘুরিতে চন্দ্র যে অমাবস্যার সময়ে অবস্থান করার ফলে সূর্য্যকে আড়াল করে, সেই অমাবস্যায় সূর্য্যগ্রহণ হয়, আর যে পূর্ণিমা তিথিতে পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রের উপরে পড়ে, সেই পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ হইয়া থাকে। ফলতঃ চন্দ্রের আড়ালের ফলে সূর্য্যগ্রহণ এবং পৃথিবীর আড়ালের ফলে চন্দ্রগ্রহণ হয়। তবে প্রতি অমা-বস্যায় সূর্য্যগ্রহণ বা প্রত্যেক পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ না হওয়ার কারণ কি?

চন্দ্র ও পৃথিবীর কক্ষ একই সমতলে অবস্থিত নহে। পরন্তু উহাদের মধ্যে ৫° কোণের ব্যবধান রহিয়াছে। চন্দ্রের কক্ষ পৃথিবীর কক্ষকে দুই বিপরীত বিন্দুতে ছেদ করে। চন্দ্র যখন ঐ দুই বিন্দুর কোন একটিতে অথবা উহার খুব নিকটে থাকে, তখন যদি অমাবস্যা হয়, তাহা হইলে সেদিন চন্দ্রগ্রহণ হয়। আর যদি ঐ দিন পূর্ণিমা হয়, তবে সেদিন চন্দ্রগ্রহণ হইয়া থাকে। প্রতি অমাবস্যা বা প্রত্যেক পূর্ণিমাতে ত চন্দ্র ঐ দুই বিন্দুর নিকটে থাকিতে পারে না। এই জন্য প্রতি অমাবস্যা বা প্রতি পূর্ণিমায় গ্রহণ দেখা যায় না।

সূর্য্য ও চন্দ্রের আকর্ষণের ফলে মহাসমুদ্রে জোয়ার হইয়া থাকে। সূর্য্যের তুলনায় চন্দ্র অতি ক্ষুদ্র হইলেও, উহা পৃথিবীর অতি নিকটে থাকায় উহার আকর্ষণই অধিকতর কার্য্যকরী। জোয়ারের সময় অনেক বড় নদীও জলে পূর্ণ হইয়া পড়ে। তাহাতে ব্যবসায়-বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা ঘটে। চন্দ্র যে স্নিগ্ধ আলোক প্রধানতঃ আবালবৃদ্ধ-বণিতার কেবল মন হরণ করে, তাহা নহে, উহা নৌ চলাচলের পক্ষে সহায়তা করিয়া দেশের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়া দেয়।

শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও পাশ্চাত্য জ্যোতি-র্ব্বিদগণ চন্দ্রমণ্ডলে মেঘের খেলা লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। সেইজন্য তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, চন্দ্রের পৃষ্ঠে জল বা বায়ু নাই, থাকিলেও উহা নগণ্য বলিতে হইবে। রৌদ্র, জল ও বায়ু ব্যতীত উদ্ভিদ্ জন্মিতে পারে না, অথবা কোন জীবও বাঁচিতে পারে না। সুতরাং জল ও বায়ুর অভাবের ফলে চন্দ্রে পৃথিবীর কোন প্রকার জীব ও উদ্ভিদের অনুরূপ জীবজন্তু বা গাছপালা থাকা আদৌ সম্ভবপর নহে। কিন্তু এ সম্বন্ধে সম্প্রতি কোন কোন জ্যোতিষীর মনে সন্দেহ দেখা দিয়াছে। চন্দ্র সম্বন্ধে যিনি শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত জ্যামেইকা দ্বীপের সেই জ্যোতির্ব্বিদ অধ্যাপক পিকারিং (W. H. Pickering) এইরূপ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি ৪০ বৎসর ধরিয়া চন্দ্রমণ্ডলের ফটোগ্রাফ লইয়া আসিতেছেন। সুতরাং তাঁহার কথার মূল্য আছে। তাঁহার গৃহীত অনেকগুলি ফটোগ্রাফের প্লেট অন্যান্য জ্যোতিষীদেরও বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে।

পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিদগণের একটি সমিতি আছে। প্রতি ৫ বৎসর অন্তর অন্তর উহার অধিবেশন হয়। আমরা চন্দ্রের যে পৃষ্ঠদেশকে দেখিতে পাই, উহাকে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করিয়া এক এক খণ্ড এক এক জ্যোতিষীকে পর্য্যবেক্ষণ করিতে দেওয়া হয়। প্রতি অধিবেশনে ফলাফল আলোচিত হইয়া থাকে। অধ্যাপক পিকারিং তাঁহার পক্ষে নির্দ্দিষ্ট অংশটিকে সম্যক পর্য্যবেক্ষণ করিয়া চন্দ্রের উপরে উদ্ভিদের অস্তিত্ব অনুমান করিয়াছেন ঐ সভার বিগত অধি-বেশনে তিনি ঘোষণা করিয়াছেন যে, এরাটোস্থেনিস গিরির আলামুখের তলদেশে যে উদ্ভিদের অস্তিত্ব রহিয়াছে, এ বিষয়ে তাঁহার কোনরূপ সন্দেহ নাই। তাঁহার ঐরূপ অনুমানের কারণ এই যে, চন্দ্রমণ্ডলে নিয়মিতভাবে কতকগুলি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হইয়া থাকে। এরাটোস্থেনিসের ন্যায় প্রীমলডি আলামুখের তলদেশেও সময়ে সময়ে বিভিন্ন প্রকার বর্ণ দেখা যায়। উহার গহ্বরের মধ্যে যখন প্রথম সূর্য্য-কিরণ প্রবেশ করে, তখন উহার তলদেশ ধূসর দেখায়। দুইদিন পরে কিন্তু উহাকেই ঈষৎ সবুজ বলিয়া মনে হয়। তিন চারিদিন

পরে আবার উহা ধূসর হইয়া পড়ে আর সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত উহা ঐরূপই থাকে। কিন্তু পার্শ্ববর্ত্তী অপর দুইটি আলামুখের তলদেশ শ্রীমলতীর অপেক্ষা অনেক বেশী ধোঁয়াটে দেখায়। বর্ণ দুইটির পার্থক্যের ফলে শ্রীমলতীর সবুজ বর্ণ যেন অধিকতর ফুটিয়া উঠে। আবার হেলিনাসের তলদেশে সূর্য্য কিরণ পৌঁছিবার ১ ঘণ্টা পূর্ব্বে উহা উজ্জ্বল হইতে আরম্ভ করে এবং ক্রমশঃ বর্ণ পরিবর্ত্তন করিতে থাকে। যখন সূর্য্যরশ্মি আলামুখের প্রান্ত দিয়া চলিতে আরম্ভ করে, তখন তলদেশ রক্তিমাভ ধূসর বর্ণ ধারণ করিয়া থাকে। কিন্তু সূর্য্য মস্তকোপরি আগমন করিলে, উহা বিবর্ণ হইয়া যায়। তবে হেলিয়াস্ আলামুখকে সর্ব্বদাই কৃষ্ণবর্ণ দেখায়। আলামুখগুলির মধ্যস্থ ধাতুসমূহের পরিবর্ত্তনের ফলে ঐরূপ বর্ণ-বৈষম্য ঘটে না। অধ্যাপক পিকারিং মনে করেন, ঐ সকল আলামুখের মধ্যে তীব্র সূর্য্য-রশ্মির প্রভাবে দীর্ঘকালব্যাপী চান্দ্র দিবসে উদ্ভিদের আবির্ভাব ঘটে। আর যখন দীর্ঘ রাত্রির আরম্ভ হয়, তখন প্রচণ্ড শৈত্যের ফলে ঐ সকল উদ্ভিদ্ মারা পড়ে। পুনরায় সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে উহা আবার দেখা দেয়।

প্রচণ্ড শীত ও গ্রীষ্ম সম্বলিত চন্দ্রমণ্ডলে পৃথিবীস্থিত উদ্ভিদের ন্যায় উদ্ভিদের সহসা আবির্ভাব ও বর্দ্ধিতি তিরোভাব স্বীকার করা বাস্তবিক পক্ষেই অতি কঠিন। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে শত সহস্র ফুট উর্দ্ধে অবস্থিত বায়ুরাশিতে অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম উদ্ভিদ বীজাণুকে ভাসিতে দেখা যায়। এখানে বায়ুর শৈত্য যে অতি বেশী তাহা বলা বাহুল্য। অন্ধকারময় রাত্রিতে কখন কখন "তারা খসিতে" দেখা যায়। ঐগুলি তারা অর্থাৎ নক্ষত্র নহে, পরন্তু উল্কাপিণ্ড মাত্র। পৃথিবীর ন্যায় উহারাও সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। কোন কারণে কক্ষভ্রষ্ট হইলে পৃথিবীর প্রবল আকর্ষণের ফলে উহারা ভূকেন্দ্রের দিকে আকৃষ্ট হয়। ঐগুলি যখন পৃথিবী বেষ্টনকারী বায়ুমণ্ডলের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন বায়ুর সহিত ঘর্ষণের ফলে উহারা উত্তপ্ত হইয়া জ্বলিতে বাধ্য হয়। কোন কোনটি ভূপৃষ্ঠে পড়িবার পূর্ব্বেই ভস্ম হইয়া যায়; কোন কোনটির বাকী অংশ মাটিতে পড়িয়া থাকে। কলিকাতার বাদুঘরে অনেকগুলি উল্কাপিণ্ড রাখা হইয়াছে। অনেক উল্কাপিণ্ডকে তীব্র অণুবীক্ষণের সাহায্যে উত্তমরূপে ধৌত করিয়া দেখা গিয়াছে যে, উহাদের অভ্যন্তরে সজীব বীজাণু বিদ্যমান রহিয়াছে। যে সব জগতে উহারা বিচরণ করিত, অথবা যাহাদের মধ্য দিয়া উহারা ভূপৃষ্ঠে আসিয়া পড়িয়াছে, সেই সকল জগতে জীবের অস্তিত্ব অবশ্যই রহিয়াছে স্বীকার করিতে হইবে। বেডের ছাতার বীজাণুকে তরল হেলিয়াম গ্যাসের মধ্যে রাখিয়া দেখা গিয়াছে যে উহারা মারা যায় নাই। বলা বাহুল্য, ঐ গ্যাসকে তরল অবস্থায় আনয়ন করিতে হইলে যে পরিমাণ প্রচণ্ড শৈত্যের প্রয়োজন হয়, সেই পরিমাণ শৈত্য কেবল পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বহির্স্থ মহাকাশেই দেখিতে পাওয়া যায়। চন্দ্রমণ্ডলেও অনুরূপ শৈত্য দৃষ্ট হয়।

অধ্যাপক পিকারিং বেডের ছাতা, শৈবাল প্রভৃতি নানাবিধ উদ্ভিদ্‌কে পর পর প্রচণ্ড শৈত্য ও উত্তাপের মধ্যে রাখিয়া উহাদের আচরণ পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন। তাঁহার পরীক্ষা সফল হইলে চন্দ্রমণ্ডলে যে সজীব উদ্ভিদের আবাসভূমি ইহা হয়ত স্বীকৃত হইবে। কোন একজন কবি চন্দ্রকে পৃথিবীর কন্যা বলিয়াছেন। অধ্যাপক মহাশয়ের পরীক্ষা সুফল প্রসব করিলে, পৃথিবীর সেই একমাত্র কন্যাও যে বন্ধ্যা নহে, তাহা প্রমাণিত হওয়া অসম্ভব নহে।

সারার্থ :—

চন্দ্রের সহিত মানুষ আবাল্য সুপরিচিত। উহার পৃষ্ঠদেশে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অনেকগুলি মৃত আগ্নেয়-গিরি রহিয়াছে। চন্দ্রে জল নাই; বায়ুও নাই বলিলেই চলে। চন্দ্রের নিজ তাপ নাই। উহা স্বভাবতঃ অতীব শীতল। কিন্তু দীর্ঘ দিবাভাগে উত্তাপের মাত্রা অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। চন্দ্রমণ্ডলে ১৪-দিন-ব্যাপী একটি দিবা ও পরবর্ত্তী ১৪-দিন-দীর্ঘ একটি রাত্রি দেখা যায়। পৃথিবীর মেরুপ্রদেশে এইরূপ কেন, ইহা অপেক্ষাও দীর্ঘ দিবা ও রাত্রি হইয়া থাকে। পর্ব্বত শিখরের ছায়াযুক্ত স্থানগুলিকে চন্দ্রের কলঙ্ক বলা হয়। চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। পূর্ণিমা তিথিতে চন্দ্রের পুরা এক পৃষ্ঠই দেখা যায়, কিন্তু অমাবস্যার দিন চন্দ্রের বিপরীত পৃষ্ঠ সূর্য্যকিরণে আলোকিত হয় বলিয়া ঐ দিন উহাকে দেখা যায় না। চন্দ্রের আড়ালের ফলে সূর্য্যগ্রহণ আর পৃথিবীর ছায়ার জন্য চন্দ্রগ্রহণ হয়। পৃথিবী ও চন্দ্রের কক্ষ দুইটি একই সমতলে অবস্থিত নাই বলিয়া প্রতি অমাবস্যায় বা পূর্ণিমাতে গ্রহণ হইতে পারে না। জোয়ারের প্রধান কারণ চন্দ্রের আকর্ষণ। পূর্ব্বে পণ্ডিতেরা মনে করিতেন যে, চন্দ্রে জীব বা উদ্ভিদ্ নাই। অধ্যাপক পিকারিং বলিতেছেন যে, চন্দ্রে এক প্রকার অল্পকাল স্থায়ী উদ্ভিদ্ জন্মিয়া থাকে। অনেকগুলি আলামুখের তলদেশের সবুজ বর্ণ দেখিয়া তিনি ঐরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

কল্যাণী

—শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য্য

অনেক দিন হইতেই ইচ্ছা ছিল এবার পূজার ছুটিতে দেশে আসিয়া বসিয়া বসিয়া নিশ্চিন্তমনে একটি গল্প লিখিব। সর্বপ্রকার বাহুল্যবর্জ্জিত অনাড়ম্বর একটি কাহিনী, হয়ত একটি উপেক্ষিতা পল্লীবধূ শাশুড়ী-ননদের গঞ্জনা শুনিতে শুনিতে সারাদিন মুখটি বুজিয়া সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম করিয়া যায়, আর রাত্রে সমগ্র পরিবারটিকে সন্তর্পণে আড়াল করিয়া অপ্রচুর প্রদীপের আলোয় প্রবাসী স্বামীকে চিঠি লিখিতে বসে। এমনিতর একটি বেদনা-ব্যথাতুর জীবনের অনুরূপ ইতিহাস, সকল সময়ে যাহা চোখে পড়ে না, অথচ মন যাহাতে অনন্তকালের রস সার দেয়, তাহারই একটি বিকৃত বিবরণ কালীকলমে লিপিবদ্ধ করিয়া যাওয়া—অনুরূপ একটি অভিলাষ অনেক দিন হইতেই আমার মনের মধ্যে বাসা বাঁধিয়াছিল।

সেদিন ষষ্ঠী, বাড়ীর সম্মুখে প্রাচীন অশথগাছটার নীচে মাদুর বিছাইয়া বসিয়া এমনিতর একটি অদ্ভুত ভাবকল্পনায় বিভোর হইয়া ছিলাম, এমন সময় একটি পরিচিত কণ্ঠের আহ্বানে মুখ তুলিয়া দেখি, আধসেরি একটা ঘটি হাতে করিয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া মাঝের পাড়ার অঘোর-পিসী। অঘোর-পিসীর ছেলে গোষ্ঠ ছিল বাল্যকালে আমার পাঠশালার সহপাঠী, সেই সুবাদে আমি দেশে আসিলেই সে আমাকে এক ঘটি করিয়া দুধ দিয়া যায়।

ঘটিটা আমার সম্মুখে বসাইয়া রাখিয়া অঘোর-পিসী বলিল, "বাবাকে যে বড্ড রোগা দেখাচ্ছে এবারে?"

বয়স হইয়াছে বলিয়া হয়ত অঘোর-পিসীর চোখে ছানি পড়িয়াছে, তাই আমার এই সবল পরিপুষ্ট চেহারাখানিকে দেখিয়া অঘোর-পিসী রোগা ঠাওরাইতেছে, কিন্তু তবুও তাহার কথার সুরে এমন একটি আন্তরিকতার টান ছিল, যাহা শুনিলে সাধারণতঃ মানুষের মন একটুখানি সহানুভূতি লাভের আশায় ব্যাকুল হইয়া উঠে। কতকটা অভিমানের সহিত বলিলাম, "আর যা খাটুনি পড়েছে পিসী।"

আমার কথাটার পূর্ণানুবৃত্তি করিয়া অঘোর-পিসী বলিল, "তার ওপর আবার বারমাস হোটেলে খাওয়া, এ কি আর ভদ্দরলোকের শরীরে সয় বা?"

মেসে থাকিয়া কলিকাতায় আমি স্কুলমাষ্টারী করি। অঘোর-পিসী পল্লীগ্রামের লোক, "মেস" শব্দের প্রকৃত অর্থ তাহার জানা নাই। তাহাকে বুঝাইয়া বলিলাম যে আমি যেখানে থাকি সেখানকার খাওয়া-দাওয়া বাড়ী অপেক্ষা ভাল হয়। কথাটা অঘোর-পিসী বিশ্বাস করিল কি না জানি না, একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিল, "হাঁগা বাবা, তুমিও ত কলকেতায় থাক, আমাদের গোষ্ঠর সঙ্গে দেখা হয় না?"

শুনিয়াছিলাম বটে, কালীঘাট অঞ্চলে ঐ দিকে কোথায় গোষ্ঠর শ্বশুরবাড়ী। শাশুড়ী-বৌএ বনিবনাও হয় না, গোষ্ঠর স্ত্রী চিরকাল বাপের বাড়ীতেই থাকে। প্রথম প্রথম গোষ্ঠ দেশের বাড়ীতেই থাকিত। সম্প্রতি মাস আষ্টেক হইল সেইখানকার একটী ঢালাইয়ের কারখানায় তাহার চাকরী হওয়ায়, সেও শ্বশুর-বাড়ীতে গিয়া বাস করিতেছে।

অঘোর-পিসীকে জানাইলাম যে, গোষ্ঠর সঙ্গে আমার দেখা হয় না বটে, তবে ঠিকানা দিলে সময়মত একদিন গিয়া না হয় দেখা করিয়া আসিতে পারি। অত্যন্ত আগ্রহের সহিত অঘোর-পিসী বলিল, "সেই যে গো বাবা বাজারের কাছে হলদে রঙের বাড়ীখানা, একেবারে বড় রাস্তার ওপরে বল্লেই হয়।"

অঘোর-পিসীর মত লোক—জীবনে যাহারা কদাচিৎ সহরের মুখ দেখিয়াছে, সহরের পথঘাট সম্বন্ধে তাহাদের ইঙ্গিত একেবারে অস্বাভাবিক নয়। একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া স্মিতমুখে অঘোর-পিসী বলিল, "সেবারে কালীঘাটে মাকে দর্শন করতে গিয়ে ওদের বাড়ী ছিলুম কি না এক রাত্তির।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "তা রাস্তাটার নাম কি?"

নিঃসংশয়ে অঘোর-পিসী বলিল, "কালীঘাট বাজারের রাস্তা, সে তুমি সেখানে গেলেই দেখতে পাবে বাবা, হলদে রঙের দোতালা বাড়ী, সামনেই দেখবে একটা কালো ষাঁড় শুয়ে আছে।"

কি খেয়াল গেল জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা পিসী, গোষ্ঠ কি ঘর-বাড়ী ছেড়ে চিরকাল শ্বশুর-বাড়ীতেই বাস করবে?"

উদাস কণ্ঠে অঘোর-পিসী বলিল, "কি জানি বাবা, ছেলেমানুষটী ত নয়, যে বুঝিয়ে বলব?" কথাটা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার চোখের কোণে দুই বিন্দু অশ্রু মুক্তার মত দানা বাঁধিয়া উঠিল। ঈষৎ বিকৃত স্বরে বলিল, "মা হয়ে আমি কি কখনও থাকতে পারি গা বাবা, এমন করে?"

অঘোর-পিসীর তিনটী সন্তানের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ গোষ্ঠই যা এখন জীবিত। প্রথম দুইটীর একটীকে ষোল বছরের ও অপরটীকে বার বছরেরটী করিয়া নিরুপায়ের মত তাহাদের সে যমের হাতে তুলিয়া দিয়াছে। বিধবা হইবার পর গরু পুষিয়া লোকের বাড়ী বাড়ী দুধ বিক্রয় করিয়া অতি কষ্টে অঘোর-পিসী নাবালক গোষ্ঠকে মানুষ করিয়াছিল, বড় হইয়া সেও এখন পরের মত বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে। স্ত্রীর সহিত নাকি বনিবনাও হয় না বলিয়া গোষ্ঠর মা হইয়াছে পর, আর শ্বশুর-শাশুড়ী হইয়াছে আপন। অঘোর-পিসীকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলাম, "কিছু ভেব না পিসী, গোষ্ঠ তোমার ভালই আছে।" অকূল-প্রান্তে চক্ষু মুদিয়া অঘোর-পিসী বলিল, "হতভাগাটা যদি মাকে মাঝে একখানা করে চিঠিও দেয়, তাহলে আমাকে আর এমন করে পথে পথে কেঁদে বেড়াতে হয় না। চার চারখানা চিঠি দিলুম গা বাবা, তার একখানারও কি জবাব দিতে নেই?"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোন্ ঠিকানায় চিঠি দিয়েছিলে?"

"কেন, কালীঘাট বাজারের রাস্তা, গোষ্ঠর শ্বশুরের নামে, সে সব ঠিকই লিখেছিলুম শুধু—আমার এইখানটা", এই বলিয়া সে হাত দিয়া নিজের কপালখানা আমায় দেখাইয়া দিল।

ঠিকানা ভুল হইয়াছে বলিয়াই হয়ত অঘোর-পিসীর চিঠি গোষ্ঠর নিকটে গিয়া পৌঁছায় নাই, কিন্তু গোষ্ঠর ত আর ঠিকানা ভুল হইবার কথা নয়, ইচ্ছা করিলে সে কি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মাঝে একখানা চিঠি লিখিতে পারে না?

একথা সেকথা কহিয়া কিয়ৎক্ষণ পরে অঘোর-পিসী বিদায় লইল। পুনরায় আমি গল্প লেখায় মনঃসংযোগ করিলাম। কিন্তু যত বারই আমি মনের মধ্যে সেই কল্পচারিণী গ্রাম্য বধূটীর ছবি পরিকল্পনা করিবার চেষ্টা করিলাম, ততবারই আমার মনে শুধু পড়িল অঘোর-পিসীর সেই ব্যথিত পাণ্ডুর মুখখানি—তাহার বেদনাবিচলিত কণ্ঠস্বর, "মা হয়ে কি আমি থাকতে পারি গা বাবা এমন করে?" আমার সৌখীন কল্পনা-বিলাস যেন সত্যকারের আলো-বাতাস ও পৃথিবীর স্পর্শ পাইয়া বিভিন্নভাবে এক গোচরীভূত বাস্তবে রূপান্তরিত হইয়া গেল।

দিন চার পাঁচ পরের কথা। আহারাদির পর সেদিন দুপুর বেলায় ঘরের মধ্যে শুইয়া পুরাতন একখানা ইংরাজী পত্রিকার পাতা উল্টাইতেছিলাম, এমন সময় খোলা দরজা দিয়া অঘোর-পিসী আসিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। এরূপ অসময়ে তাহাকে হঠাৎ আসিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি গা পিসী?" ঈষৎ হাসিয়া অঘোর-পিসী বলিল, "এত দিনে বুঝি ছেলের আমার মনে পড়ল মাকে," এই বলিয়া সে কাপড়ের ভিতর হইতে একখানা পোষ্টকার্ডের চিঠি বাহির করিয়া আমার হাতে দিয়া বলিল "পড়ত গা বাবা, হতভাগাটা কি লিখেছে।"

চিঠিখানা পড়িয়া দেখিলাম, গোষ্ঠর চিঠি নয়। বছর দুই পূর্ব্বে সে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের কোনৈক জাকরার নিকট ধারে কয়েকখানি গহনা গড়াইয়াছিল, তাহারই দরুণ সে এখনও গোষ্ঠর কাছে কিছু পায়, উক্ত টাকার তাগাদা করিয়া অত্র চিঠিতে সেই জাকরাটী লিখিয়াছে যে, চিঠি পাওয়ার সাত দিনের মধ্যে টাকা শোধ না দিলে সে নালিশ করিয়া তাহার পাওনা টাকা আদায়ের ব্যবস্থা করিবে। চিঠিখানা আপাদোড়া অঘোর-পিসীকে পড়িয়া শুনাইলাম। ইতিপূর্ব্বে চিঠিখানা পাইয়া তাহার মুখে যে একটুখানি আনন্দের হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছিল, চিঠির বক্তব্য শুনিয়া সেই হাসিটুকু যেন অপরাহ্নের হঠাৎ মিলাইয়া যাওয়া শেষ রৌদ্রের মত এক নিমেষে কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল। বিস্মিত সুরে অঘোর-পিসী বলিল, "ওমা দেখেছ ভলে তলে বৌএর গহনা গড়ান হয়েছে, বোঝ এবার দেখে'শুনে ওরা নালিশ ঠুকে।" বলিলাম "কাউকে দিয়ে চিঠিখানা গোষ্ঠর কাছে পাঠিয়ে দিলে হয় না পিসী?"

"কার খোসামোদ করতে যাব বাবা, যাকরণে যেমন কর্ম তেমন ফল", এই বলিয়া সে অনেকটা উদ্‌ভ্রান্তের মত পথ হইতে বাহির হইয়া গেল।

সন্ধ্যার পর ঘরের রোয়াকে বসিয়া ঊর্দ্ধমুখে আকাশের দিকে চাহিয়া গল্পের প্লট চিন্তা করিতেছিলাম, এমন সময় খিড়কীর দরজা ঠেলিয়া অঘোর-পিসী আসিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। রোয়াকের নীচে দাঁড়াইয়া আঁচলের গেরো হইতে একটুকরো ভাঁজ-করা কাগজ বাহির করিয়া বলিল, "দেখত বাবা, লেখাটা ঠিক হয়েছে কি না?" তাহার হাত হইতে কাগজখানা লইয়া ভাঁজ খুলিয়া পড়িয়া দেখিলাম, পার্শ্ববর্তী সেই ভাকরাটী তাহার পাওনা টাকা সমস্ত বুঝিয়া পাইয়া রসিদ লিখিয়া দিয়াছে। অঘোর-পিসীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি বুঝি টাকাটা দিয়ে এলে?"

"না দিয়েই বা থাকি কি করে বল, পেটে যখন ধরেছি···।" অঘোর-পিসীর অশ্রুসিক্ত কণ্ঠস্বর যেন অন্তরের এক অপরিহার্য্য বেদনায় ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। পেটে না খাইয়া দৈহিক নানারূপ দুর্ভোগ সহ্য করিয়া অতি কষ্টে বুড়ী হয়ত ঐ টাকা কয়টী তাহার অসময়ের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু সন্তানের এই সামান্য বিপদের কথা শুনিবা মাত্র অস্থির হইয়া সে তাহার দারিদ্র্যাঙ্কিত অর্থগুলি সব পুত্রবধূর অশ্রুস্রোতের বিলাস-হ্রদে আহুতি দিয়া নিশ্চিন্তমনে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। মা সন্তানকে শুধু স্নেহ দিয়া মানুষ করে বলিয়াই নয়, সন্তানের সর্ব্বপ্রকার অমঙ্গলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া এমনি করিয়া বুক পাতিয়া ঢের বলিয়াই, মায়ের গৌরবগাথা সমগ্র জনমনের বার্ত্তায় ব্যক্ত। কাগজখানা অঘোর-পিসীর হাতে ফিরাইয়া বলিলাম "একদিন কালীঘাটে গিয়ে গোষ্ঠকে কেন দেখে এস না পিসী।' অঘোর-পিসী জবাব দিল, "কার সঙ্গে যাব বাবা, সহরের পথ ঘাট ত আমার চেনা নেই।"

"আমি তোমায় নিয়ে যেতে পারি পিসী, এখানে ত আমার বিশেষ কোন কাজ নেই।"

অধীর আনন্দে অঘোর-পিসী বলিল, "তা হ'লে কালই কেন চল না বাবা, আহা বাছাকে আমার কতদিন দেখিনি।"

বলিলাম, "বেশ তাই চল।"

কিন্তু দুর্ভাগ্য অঘোর-পিসীর। পরদিন কালীঘাটে গোষ্ঠের শ্বশুর-বাড়ী গিয়া তাহাদের বাড়ীর নীচেকার ভাড়াটেদের কাছে জানা গেল, পূজার ছুটীতে গোষ্ঠ তাহার শ্বশুর-শাশুড়ীকে লইয়া কাশী বেড়াইতে গিয়াছে, কবে ফিরিবে তাহা সঠিক তাহারা বলিতে পারে না।

ফিরিয়া আসিতে আসিতে অঘোর-পিসীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "চিড়িয়াখানা দেখতে যাবে পিসী?"

নির্লিপ্ত কণ্ঠে অঘোর-পিসী বলিল, "না থাক্‌গে, সেবার এসে সব দেখে গেছি।"

তাহার কাছে কলিকাতার দেখিবার মত আরও গোটা কয়েক বস্তুর নাম করিলাম, কিন্তু কোনটাতেই সে তেমন আগ্রহ দেখাইল না। অবশেষে বলিল, "তোমার যদি দেখবার ইচ্ছে হয়ে থাকে বাবা, তুমি যাও না যেন, আমি ততক্ষণ মন্দিরে বসে একটু জপ করি।" হাসিয়া তাহাকে জানাইলাম যে, আমার নিজের সে ইচ্ছা নাই, কলিকাতার ঐ সব দ্রষ্টব্যগুলি আমার নিত্য দেখার সামিল হইয়া গিয়াছে।

ফিরিবার পথে হাওড়ার ষ্টেশনে আসিয়া মুখগামী একখানা ট্রেণে একদল যাত্রীকে বাক্স-বিছানা লইয়া ওঠা নামা করিতে দেখিয়া অঘোর-পিসী জিজ্ঞাসা করিল "ওখানা বুঝি কাশীর গাড়ী।"

অঘোর-পিসীর মুখে কাশীর নামটা শুনিয়া তাহার উপর আমার কেমন একটা অদ্ভুত মনস্তত্ত্বের সৃষ্টি হইল। তাহার পেটের ছেলে গোষ্ঠ গেল শ্বশুর শাশুড়ীকে লইয়া তাহাদের তীর্থধর্ম্ম করাইতে, আর বুড়ী মা যে তাহাকে এত করিয়া মানুষ করিল, সে মৃত কি জীবিত তাহারও একটা খোঁজ-খবর লইবার প্রয়োজন মনে করে না।

জিজ্ঞাসা করিলাম "পিসী, তুমি যাবে একবার কাশীতে?"

ম্লান হাসিয়া অঘোর-পিসী বলিল, "বুড়ো মানুষ পেয়ে বাবার বুঝি ঠাট্টা হচ্ছে?" "না পিসী ঠাট্টা নয়, সত্যি বলছি, আমার ত এখনও অনেক ছুট রয়েছে, চল না কাশী বেড়িয়ে আসা যাক।"

একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া অঘোর-পিসী বলিল, "বাবা আমরা গরীব মানুষ, ঘুর বেশে গিয়ে তীর্থ-ধর্ম্ম করবার মত ক্ষেমতা আমাদের নেই, শশুরের ভিটেই আমার কাশী-বৃন্দাবন, সেই ভিটেতে যোগ সন্ধে বেলায় সন্ধে দেখানেই আমাদের সব চেয়ে বড় ধর্ম্ম।"

অঘোর-পিসীর কথা শুনিয়া আমার চোখের সম্মুখে গোটা ভারতবর্ষের একখানি নিখুঁত ছবি ফুটিয়া উঠিল। অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, তারা সংস্কৃতি পুরাণশীলা মহিমময়ী নারীগণ আজ এ পৃথিবীতে বাঁচিয়া না থাকিলেও, বিস্মৃত বহু শতাব্দী পূর্বে এই ভারতের মাটীতে একদিন তাঁহারা যে বীজ ছড়াইয়া গিয়াছেন, যুগ যুগ ধরিয়া তাহারই অঙ্কুর গজাইতেছে অঘোর-পিসীর মত তাহাদের শত শত বংশধরগণের নিকট হইতে।

ইহার মাসখানেক পরে কলিকাতায় একদিন আকস্মিক গোষ্ঠর সঙ্গে দেখা। ভবানীপুরের দিকে এক বন্ধুর বাড়ী নিমন্ত্রণে যাইতেছিলাম, হঠাৎ পিছন হইতে কাহাকে আমার নাম ধরিয়া দাদা দাদা করিয়া ডাকিতে শুনিয়া মুখ ফিরাইয়া দেখি অঘোর পিসীর ছেলে গোষ্ঠ। হাতে তাহার একটা সিএর টিন, পিছনে মুটের মাথায় এক ঝুড়ি তরি-তরকারি। জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি খবর হে গোষ্ঠ? খুব যে বাজার করেছিস দেখছি।"

"এই যে দাদা, বাড়ীতে বামুন-ভোজন আছে কি না—

"বামুন-ভোজন কিসের রে, কারও শ্রাদ্ধ না কি?"

হাসিয়া গোষ্ঠ বলিল, "না শ্রাদ্ধ নয়, শ্বশুর-শাশুড়ী কাশী-গয়া করে এলেন কি না, তাই বাড়ীতে কাল বাবটি বামুন খাবে।"

তাহাকে তাহার মায়ের সম্বন্ধে সকল কথা বলিয়া দেশে গিয়া একবার বুড়ী মাকে দেখা দিয়া আসিতে বলিলাম। বাড়ী যাইতে সম্মত হইয়া গোষ্ঠ বলিল, "আমার কি আর অসাধ দাদা যে বাপ-পিতেমর ভিটেতে গিয়ে বাস করি, কিন্তু কি করব বল, ঐ একটা মাত্তর বৌ, মা আমার তাকে নিয়ে দুদিন ঘর করতে পারলে না।" এই বলিয়া একটুখানি থামিয়া আবার বলিল, "তাও বলছি দিন কতক না হয় এখানে এসেই থাক। আমার শ্বশুর-শাশুড়ী খুব অমায়িক লোক, কোন কষ্ট হবে না। তা মা আমার তার শ্বশুরের ভিটে ছেড়ে কোথাও থাকতে রাজি নয়। আমি আমি আর কি করব বল?"

গোষ্ঠকে বলিলাম যে, তাহাকে বিশেষ কিছু করিতে হইবে না। শুধু যেন সে মাঝে মাঝে বাড়ী গিয়া বুড়ী মাকে একবার করিয়া দেখা দিয়া আসে।

ইহার দিন কয়েক পরে একদিন শনিবারে বেলের ষ্টেশনে নামিয়া গ্রামের পথ ধরিয়া যাইতে যাইতে অঘোর-পিসীর বাড়ীর নিকট আসিয়া কি খেয়াল গেল, তাহার বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম। উঠানে দাঁড়াইয়া অঘোর-পিসীর নাম ধরিয়া ডাকিতে ঘরের মধ্য হইতে সাড়া আসিল, "কে গা?" "আমি গো পিসী" বলিয়া তাহার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখি মেঝের উপর খান কয়েক খলে বিছাইয়া অঘোর-পিসী আপাদমস্তক একখানা কাঁথা মুড়ি দিয়া পড়িয়া আছে। আমাকে দেখিয়া বলিল, "এস এস বাবা, জ্বরটা আজ যেন একটু বেশী হয়েছে, কিছুতেই আর বসতে পারলুম না।" তাহার ললাট স্পর্শ করিয়া দেখিলাম জ্বরে গা পুড়িয়া যাইতেছে। মাথার উপর আলগা করিয়া হাত বুলাইতে বুলাইতে জিজ্ঞাসা করিলাম "ওষুধ-পটী দেব পিসী?"

"না বাবা, ও ম্যালেরিয়া জ্বর আপনিই সেরে যাবে", এই বলিয়া সে ধীরে ধীরে চক্ষু মুদ্রিত করিল।

একথা সেকথা কহিতে কহিতে গোষ্ঠর কথা উঠিলে জিজ্ঞাসা করিলাম "গোষ্ঠ এসেছিল না কি?"

ব্যগ্রভাবে অঘোর-পিসী বলিল "কৈ না, তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল বুঝি?"

বলিলাম "হ্যাঁ"।

"কি বললে?"

"বলেছিল শীগ্‌গিরই সে আসবে।"

"তা বলে সে নিশ্চয়ই আসবে, ছেলে সেলায় গোষ্ঠর আমার মা-অন্ত প্রাণ ছিল।" তাহার পর ঈষৎ থামিয়া অত্যন্ত খাটো গলায় অঘোর-পিসী জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ গা বাবা বৌমার পেটে কিছু হয়েছে শুনলে?" হাসিয়া বলিলাম, "না তা কিছু জিজ্ঞাসা করিনি, গোষ্ঠর ছেলে পুলে কি?"

কতকটা আক্ষেপের সুরে অঘোর-পিসী বলিল, "পোড়া কপাল, ছেলেপুলে! আজ পাঁচ বছর হতে চলল বাবা বে দিয়েছি, ছেলেপুলে হবার নামটি নেই এখনও পর্য্যন্ত। সেবার কত করে বাবা পঞ্চাননের ফুল কাড়িয়ে মাদুলী করে দিলুম, তা বৌমা আমার এমন লক্ষীছাড়া-ঘরের মেয়ে যে, দুদিন পরতে না পরতেই কোথায় খুইয়ে এল।"

অঘোর-পিসীকে বলিলাম, "তোমার বোজ এই রকম জ্বর হচ্ছে পিসী, দিনকতক না হয় গোষ্টর কাছে গিয়ে—"

আমার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই অত্যন্ত উত্তেজিত কণ্ঠে অঘোর-পিসী বলিল, "খেপেছ বাবা, তার বৌ-এর মুখনাড়া খেতে তার শ্বশুরবাড়ী গিয়ে থাকব আমি? আমার যা করে ঐ বাবা পঞ্চানন্দ।" এই বলিয়া সে যুক্তকর কপালে ঠেকাইয়া গ্রামের দেবতা বাবা পঞ্চাননের উদ্দেশে বার বার নমস্কার করিতে লাগিল।

তখন নূতন কমলালেবু উঠিয়াছিল। খাইবার জন্য গোটাকয়েক আমি সঙ্গে আনিয়াছিলাম। পুঁটলী হইতে তাহার একটা বাহির করিয়া খোসা ছাড়াইয়া অঘোর-পিসীর মুখের কাছে এক কোয়া ধরিয়া বলিলাম, "নেবু খাও পিসী, খুব মিষ্টি নেবু।"

আমার হাতের দিকে চাহিয়া স্মিতহাস্যে অঘোর-পিসী বলিল, "কমলানেবু বুঝি? কিন্তু ও ত আমার খাওয়া চলবে না বাবা। কি বছর নবান্নের সময় নৈমিত্তিতে নতুন চালের সঙ্গে পাঁচ রকম নতুন ফল ঠাকুরকে দিয়ে তবে আমি খাই। অসুখ-বিসুখে এবছরে এখনও আমার নবান্ন করা হল না।" এই বলিয়া সে অতি সন্তর্পণে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।

সন্ধ্যা তখন গড়াইয়া আসিতেছিল। পাশের বাড়ীতে শাঁখ বাজিয়া উঠিলে অঘোর-পিসী বলিল, "অন্ধকার হয়ে এল, যাই সন্ধে-টা দেখিয়ে আসি।"

বাধা দিয়া বলিলাম, "থাক পিসী উঠো না, আলোটা আমিই জ্বেলে দিচ্ছি।"

"শুধু আলো জ্বাললেই ত হবে না বাবা, হিঁদুর ঘরে গেরস্থর মঙ্গলের জন্য সকাল-সন্ধের ছড়াজল দেওয়া আছে, যে কটা দিন বাঁচি দিয়ে যাই এমনি করে।" এই বলিয়া সে টলিতে টলিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। পথে আসিতে আসিতে বার বার আমার মনে হইতে লাগিল, ভালবাসাটাই সংসারে সর্ব্বাপেক্ষা বড় নয়, তাহার সঙ্গে থাকা চাই এমনি-তর একটি কল্যাণবোধ। তাহা সেখানে নাই, ভালবাসা সেখানে শুধু মনের একটা উচ্ছ্বাস, একটি দুর্দ্দমনীয় আবেগ মাত্র।

তাহার পর মাস চার পাঁচ কাটিয়া গিয়াছে। কাজের ঝঞ্ঝাটে এ কয়মাস আর বাড়ী যাওয়া ঘটিয়া উঠে নাই। সেবার গ্রীষ্মের ছুটিতে দেশে আসিয়া শুনিলাম, প্রায় মাসখানেক হইল গোষ্ঠ সস্ত্রীক দেশে আসিয়াছে।

অঘোর-পিসীর সহিত দেখা হইলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি গো পিসী, বৌ কেমন ঘর-কন্না করছে?"

এদিক ওদিক চাহিয়া ঈষৎ নিম্নকণ্ঠে অঘোরপিসী বলিল, "বাড়ীর বউ যদি অত বাবু হয়, তা হলে তাকে নিয়ে কি আর ঘর-কন্না করা চলে গা বাবা? বৌমা আমার জলটি পর্য্যন্ত তুলে খেতে পারবে না, একটা ঝি রাখতে হয়েছে। আমাদের গেরস্থর ঘরে কি আর ওসব চলে?"

অঘোর-পিসী সংসারের আরও অনেক কথা বলিল। বুঝিলাম পুত্রবধূ সহিত তাহার আজও তেমন বনিবনাও হয় নাই।

সেদিন সকাল বেলায় বসিয়া বসিয়া সদ্যঃপ্রাপ্ত খবরের কাগজখানার পাতা উল্টাইতেছিলাম, এমন সময় কাপড়ের একটা পুঁটুলী বগলে করিয়া অঘোর-পিসী আসিয়া বলিল, "চললুম গো বাবা।"

বিস্মিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোথা পিসী?"

"কাশীতে, সেখানে আমার এক বোনঝি-জামাই আছে কি না।"

শুনিয়াছিলাম বটে, কাশীতে তাহার ঐ রকম কে একজন দূর সম্পর্কের আত্মীয় আছে, কিন্তু হঠাৎ আজ অঘোর-পিসীকে পোটলা-পুঁটুলী লইয়া কাশী যাইতে দেখিয়া আশ্চর্য্য না হইয়া থাকিতে পারিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম, "হঠাৎ সেখানে যে বড়?"

ঝলিত কণ্ঠে অঘোর-পিসী বলিল, "আর কি বাবা, যাদের ঘর-কন্না তাদের হাতে সব বুঝিয়ে দিয়েছি, এবার আমার ছুটি।"

তাহার কথার ইঙ্গিতে বুঝিতে পারিলাম, নিশ্চয়ই বাড়ীতে একটা কিছু হইয়াছে, তাই অঘোরপিসী রাগ করিয়া কাশী চলিয়া যাইতেছে। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "কার সঙ্গে যাচ্ছ পিসী?"

"সঙ্গে কারও যাবার দরকার নেই, হাওড়ার ইষ্টিশনে গোষ্ঠ কাশীর গাড়ীতে তুলে দিয়ে সেখানে বোনঝি-জামাইকে

একখানা টেলিগ্রাফ করে দেবেখন, সে ইষ্টিশনে এসে নামিয়ে নেবে।"

"আবার কবে আসবে পিসী?"

"আসবার কথা আর বল না বাবা, তোমাদের পাঁচজনের কল্যাণে হাড় ক'খানা যেন বাবা বিশ্বনাথের চরণে রেখে আসতে পারি।"

সেইদিনই দুপুরের গাড়ীতে অঘোর-পিসী কাশীতে চলিয়া গেল।

দিন পনের পরের কথা। স্কুলের ছুটি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। ঘরের জোয়াকে মাদুর পাতিয়া শুইয়া একখানা বই পড়িতে পড়িতে মধ্যাহ্নের অলস-আমেজে একটুখানি তন্দ্রার মত আসিয়াছিল। হঠাৎ যেন মনে হইল অঘোর-পিসী আমার ডাকাডাকি করিতেছে। ধড়মড় করিয়া উঠিয়া চক্ষু রগড়াইতে রগড়াইতে দেখি, সত্য সত্যই আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া মায়ের পাড়ার অঘোর-পিসী। তাহাকে হঠাৎ ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া বিস্ময়ের মত আমি তাহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম। আঁচলের গেরোটা খুলিতে খুলিতে অঘোরপিসী বলিল, "মা অন্নপূর্ণার পেসাদ, আসবার সময় মার পুজো দিয়ে এলুম কি না।"

তাহার হাত হইতে প্রসাদের খুরিখানা লইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "হঠাৎ ফিরে এলে যে পিসী।"

মুখ ফিরাইয়া একবার এদিক ওদিক চাহিয়া খাটো গলায় অঘোর-পিসী বলিল, "সেখানে বোনঝির মুখে শুনলুম কাশীর বীরেশ্বর ঠাকুর না কি খুব জাগ্রত দেবতা, তাঁর ফুল-কাড়ান মাদুলী ধারণ করে অনেক মেয়ের না কি ছেলেপুলে হয়েছে, তাই ভাবলুম দি নিয়ে দিয়ে বৌটাকে, বাবার দয়ায় যদি কিছু হয়।"

কাশীর কথা লইয়া কিয়ৎক্ষণ গল্পগুজব করার পর অঘোর-পিসী সেদিনকার মত উঠিয়া গেল। সে চলিয়া গেলে অনেকদিনের পর পুনরায় আমি গল্প লিখিতে বসিলাম। এবার আমার গল্পের বিষয়বস্তু হইল আমার নিত্য দেখা অঘোর-পিসীর জীবননাট্যের একটি খণ্ডকাহিনী। গল্পের নাম দিলাম "কল্যাণী"।

প্রিয় ব্যঞ্জন

—শ্রীজগদানন্দ বিশ্বাস

জিহ্বাতে সুস্বাদ
ঠেকে নাকে ব্যঞ্জন;
বাঙালীর গৃহিণীর
রান্নায় নাই মন।

পড়ে 'উড়ে', 'পশ্চিমে'
রাঁধুনির পাল্লায়;
বাঙালীর বাবু সব
কুমীরের মত খায়।

'পালঙে'র শাক আর
'বার্ত্তাকু' এক সাথে,
রন্ধন করিলে যে
পড়ে থাকে নাকো পাতেতে।

'লনকা'র শাক সাথে
'বড়ি' ভাল মিশ খায়;
ছেলে বুড়ো আহ্লাদে
দশ গাঁহি পুন চায়।

'লাউ'য়ের ব্যঞ্জনে
মৎস্যের মুড়া কাঁটা,
পড়ে যদি রাঁধুনির
সার্থক চর্ব্ব্য চাটা।

পাকা মেঠো 'কুমড়া'র
সাথে 'কচু' ভাল লাগে;
মানভূমে, বীরভূমে
চেয়ে খায় অনুরাগে।

'আলু' ঝোলে ঝালে মিশে
মনের তো কথা নাই;
টকেতেও মন্দ ভাল
সকলের প্রিয় তাই।

'পটলে'র ভাজা ভাল
নাই কোন খটাট;
'বাঁধা কপি' রাঁধে যদি
এনো মাছ খুঁজে হাট।

'আলুবখ্‌রা'র টকে
দরকার নাই নাই;
'আমড়া'তে সরিষাতে
টক যদি রাঁধা পাই।

বাঙালীর গৃহিণীরা
ভুলে গেছে রান্নায়,
সেই ভুলে ব্যঞ্জনে
প্রকাশিছ কবিতায়।

কবি বিহারীলাল

—শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায়

আধুনিক বাংলা গীতিকবিতার ইতিহাস কবিগুরু বিহারীলাল চক্রবর্তীর কথা লইয়াই আরম্ভ করিতে হয়। গীতি-কবিতাই বঙ্গসাহিত্যের প্রধান গৌরবস্থল। এই গীতি-কবিতার সুরলহরী প্রাচীনতম যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া —অর্থাৎ চণ্ডীদাস হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতচন্দ্র পর্যন্ত অব্যাহত ভাবেই চলিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু বঙ্গসাহিত্যে ইংরেজী কাব্যসাহিত্যের প্রথম প্রভাব সূচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই গীতিকাব্যের ধ্বনি খানিকটা ব্যাহত হইয়াছিল। কারণ, ইংরেজি কাব্যরসে দীক্ষিত রঙ্গলাল, মাইকেল, হেম, নবীন প্রভৃতির আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গসাহিত্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজি আদর্শে Verse Tale ও মহাকাব্য রচনার সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। ঠিক সেই মহাকাব্য ও Verse Tale রচনার যুগেই অর্থাৎ রঙ্গলাল, মাইকেল প্রভৃতির সমকালেই কবি বিহারীলাল তাঁহার নিজের মনের কথা কাব্যে প্রকাশ করিলেন একান্তই নিজের ভাবে ও নিজের ছন্দে। মহাকাব্য রচনার উৎসাহে গীতিকাব্যের যে সুরটি গুঞ্জন হইয়া পড়িয়াছিল, বিহারীলাল সেই সুরটিকে একেবারে নিজস্ব করিয়া বঙ্গভারতীর বীণায় আবার নূতন করিয়া বাজাইলেন। গীতিকাব্যের এ সুর যে একেবারে নূতন তাহা নহে। ইহা সেই পুরাতন সুরেরই নূতন এবং সুসংস্কৃত অনুকরণ। মাইকেল, হেম, নবীন প্রভৃতি মহা-কাব্য রচনা করিলেও তাঁহাদের কাব্যের 'ক্ল্যাসিক' আবরণ ভেদ করিয়া 'লিরিক' স্বরূপ উঁকি দিয়াছে। কিন্তু বিহারীলালের কাব্যই নিছক লিরিক উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ। এই-খানে বিহারীলালের সহিত তাঁহার সমসাময়িক অন্যান্য কবি-দের প্রতিভার পার্থক্য।

বিহারীলাল তাঁহার নিজের প্রাণের কথা—নিজের আশা, আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শের কথা সরল এবং স্বচ্ছ ভাষায় ঠিক যেমনটি অনুভব করিয়াছেন, তেমনি ভাবেই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। নিজের সুখ-দুঃখের কাহিনী নিজের সুরেই গাহিয়াছেন। প্রাচীন কবিদের মত কোন নায়ক অথবা নায়িকার মুখ দিয়া তিনি তাঁহার আপন ভাব ও ভাবনা প্রকাশ করিতে প্রয়াসী হন নাই, অথবা বৈষ্ণবকবিদের মত রাধার সেনানী তাঁহার প্রেম ও প্রীতির উচ্ছ্বাস উৎসা-রিত হয় নাই। নিজস্ব সুরে নিজের অনুভূতিকে তিনি নিজেই প্রকাশ করিয়াছেন। সে যুগে এই শ্রেণীর কাব্যরস জনপ্রিয় হয় নাই বটে, এবং আধুনিক যুগেও বিহারীলালের কাব্যের রসপাত্র আস্বাদন করিয়াছেন এরূপ জনসংখ্যা অতি অল্প ; কিন্তু এই বিহারীলালই বাংলা গীতিকবিতার একটি নূতন পন্থা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। আধুনিক যুগের বাংলা গীতিকবিতা যে তাঁহার কাছে কতখানি ঋণী তাহা আমরা বর্তমানের তিনজন শ্রেষ্ঠ কবির রচনা অনুশীলন করিয়া জানিতে পারি। ইঁহারা হইতেছেন— অক্ষয়কুমার বড়াল, দেবেন্দ্রনাথ সেন ও রবীন্দ্রনাথ। এই তিনজন কবির কল্পনা বিহারীলালের প্রদর্শিত পথেই প্রসারিত হইয়াছে।

অক্ষয়কুমার বড়াল প্রকাশ্যভাবে বিহারীলালকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন :—

> যাও, গুরো, যাও, বুঝিয়াছি হিয়
> মানব-হৃদয় কতই গভীর,
> বুঝেছি কল্পনা কতই মদির,
> কি মিষ্টময় প্রেমপথ !
> কেন বাঁশীস্বরে রাধে নিজ পিয়,
> নিজ পায়ে পড়ে-মত।
>
> বুঝিয়াছি, গুরো, কত তুচ্ছ ধন,
> কি রূপা কবিতা—কত সুধারস,
> প্রেম কত ত্যাগী—কত সরল,
> নারী কত মহীয়সী :
> সুত মহত্তায় মুগ্ধ দিক্ দশ,
> তাহা কিবা মহীয়সী।
>
> বুঝিয়াছি গুরো, কোথা সুখ মিলে
> আপনার হৃদে আপনি মরিলে !

ছেন তাহার তুলনায় তাঁহার নিজেরই সৌন্দর্যকল্পনা এত বড় যে, এই উভয়ের মধ্যে যোগসূত্রটি তিনি আবিষ্কার করিতে পারেন না। সেই জন্য তাঁহার মনে মাঝে মাঝে বিস্ময় ও সংশয় পুঞ্জীভূত হইয়া উঠে :—

তবে কি সকলি ভুল ?
নাই কি প্রেমের মূল ?
বিচিত্র স্বপন-ভুল কল্পনা লতায় ?
মন কেন হসে ভাসে
প্রাণ কেন ভালবাসে
আঁধারে পরিতে খালে সেই ভুলগুলি ?—সাধনাসঙ্গীত, ৩য় সর্গ

ইহার উত্তর নাই। উত্তরে কবির কেবল মনে হয় :—

এ ভুল প্রাণের ভুল,
মর্মে বিজড়িত দুল,
জীবনের সঙ্গীতের অমৃত-লহরী
এ এক খেলার ভুল,
অন্তরাত্মা নিয়াকুল,
স্বপনে বিচিত্ররূপা দেবী যোগেশ্বরী।—সাধনাসঙ্গীত, ৩য় সর্গ

কবি বিহারীলালের সকল কাব্যেই এইরূপ বাস্তব ও অবাস্তবের দ্বন্দ্ব—এই স্বপ্ন ও সত্যের অপূর্ব সংমিশ্রণ দেখিতে পাই। অক্ষয়কুমারের কাব্যেও এইরূপ বাস্তব ও অবাস্তবের দ্বন্দ্ব দেখা যায়। কখনও তিনি কল্পনার উল্লাসে উৎফুল্ল, আবার কখনও বা বাস্তবের জন্য তাঁহার প্রাণ আকুল হইয়াছে। অক্ষয়কুমারও বিহারীলালের মত একান্ত কল্পনা-প্রবণ ও ভাবপ্রবণ কবি। এই কল্পনাবিলাস ও ভাবোন্মত্ততার জন্য তিনি বিহারীলালের মতই আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন—

অহেনা জগৎ-সুখে অবশেষ দুখে-দুখে
কত ভুল করিয়াছি, কত ভুলে ভুলিয়া !
না পা'য়ে কিছুই তত্ত্ব, আপনার ভাবে মত্ত
খেলেছি, খাটিকা মত, না জানি কি ভুলিয়া !
হরি, এও কি হয়েছে ভুল, এত ভুলে ভুলিয়া ?
—ভুল

নিছক কল্পনাবিলাসে ক্লান্ত হইয়া বিহারীলাল বলিয়াছিলেন :—

হয়ত ভেঙ্গিতে তব আর আমি যাব না।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত রহস্যকেই তিনি বরণ করিয়া লইয়াছিলেন।—

তাই হোক হোক। অনন্ত স্বপনে
ভেসে যাক চির বাসীর চরণে,
বাসনাবিহীন প্রেমে শুদ্ধমনে
চরণ-দুখানি সেবি'।
কল্পনাময়ীর কল্প নয়নে
সকরুণ প্রেম হেরি।
তাই হোক্ তাই হোক্। চির কবি-ব্রত
ভরিয়া রাখুক সে সরল বুক,
প্রণতে থাকুক প্রণতা দুখে
অন্তরে বিসংবাদ।
পিপাসা থাকুক, জ্বালা বাড়ুক,
মিটুক কল্পনা-সাধ।
—কনকাঞ্জলি, উৎসর্গপত্র

উদ্ধৃতিত অংশে অক্ষয়কুমার তাঁহার কবিগুরু বিহারীলালের কবিপ্রতিভার যে সকল বিশিষ্টতা লক্ষ্য করিয়াছেন, সে সবই তাঁহার নিজের কাব্যে বর্তমান। কল্পনাবিলাস, প্রীতিবিভোরতা প্রভৃতি বিহারীলালের কাব্যের আদর্শ। সেই আদর্শ অক্ষয়কুমারের কাব্যেও সুপরিস্ফুট। বিহারীলালের কাব্যের বিষয় প্রেম ও সৌন্দর্য। সেই প্রেম ও সৌন্দর্যই অক্ষয়কুমারের কবিতার ভাববস্তু।

রূপ অপেক্ষা ভাবের প্রাধান্য বিহারীলালের কবিতার বিশিষ্ট লক্ষণ। অক্ষয়কুমারের কবিকল্পনাও কখনও বা রূপকে আশ্রয় করিয়াছে, আবার কখনও শুধু ভাবকে আশ্রয় করিয়াছে। বিহারীলালের কবিহৃদয় বাস্তবের সমগ্রতা উপলব্ধি করিতে পারে নাই। এই জন্য তিনি শুধু প্রীতি-প্রেমকে বরণ করিয়া বাস্তবের সঙ্গে যেটুকু যোগ রক্ষা করিয়া-

বোঝার উপর
শাকের আঁটি

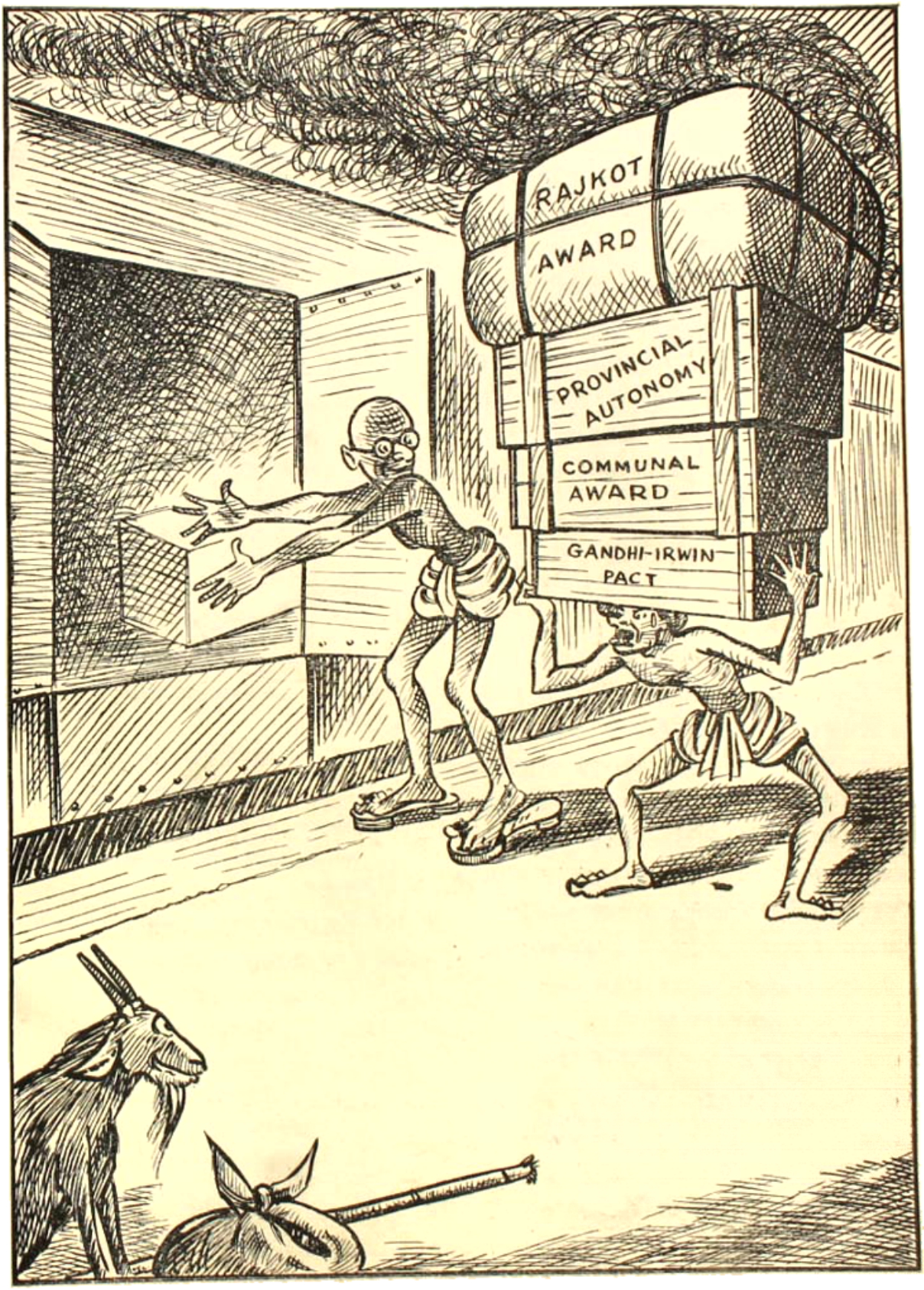

মরত মাধুরীমাখা,
অরুণ রঙের ছোপা,—
মহুয়া কাননে-বালা
খেলা করে মাঝার ভিতরে,
চন্দ্রমা স্বচ্ছ সরোবরে!
কবিরা দেখেছে তারে বেণার বনেতে,
যোগীরা দেখেছে তারে যোগের সাধনে।
—সারদা মঙ্গল, ১ম সর্গ

বিহারীলালের মত অক্ষয়কুমার তাঁহার ভাবোন্মত্ততার জন্য আক্ষেপ করিলেও সেই কল্পনার স্বপ্ন তাঁহার কাছে মধুর বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন :—

ঘুমঘোরে প্রায় ভোর বাঁশীর গানটি যেন
ধরি ধরি না ধরিতে ভেঙে গেল রে।
একটি অমল সুখ, একটি অমল দুখ,
একটি স্বপন, প্রাণ দেয়ে গেল রে!
—সুরদাস

প্রত্যক্ষ মিথ্যা। সেই জন্য কবি প্রত্যক্ষকে ঢাকা থাকিতে বলিয়াছেন :—

ফুটো না ফুটো না রবি থাক মোর ঘোর ছবি
ঘুমা যেন ঘুমি-ঘুমি মরিয়া মধুর!
নাহি লোক, নাহি ত্রাস, নাহি মোহ, নাহি পাশ,
কেটো না এ আধ্‌খা জাল, প্রত্যক্ষ মিথ্যা!
—প্রবীণ, পৃঃ ৬৩

কবি বাস্তব-জগৎ হইতে দূরে কল্পনার মেঘপুরে ছায়া ও স্বপ্নের মধ্যে বাস করিতে উৎসুক :—

জগতের ফুল—তোর মেঘপুরে নিয়ে যা আমায়।
তোর ছায়া সব স্বপ্ন মায়া মত কাজে যে আমায়!
—কনকাঞ্জলি, পৃঃ ৬৮

কিন্তু এই স্বপ্নলোকে অধিকক্ষণ থাকিয়া কবি তৃপ্তি পান না—তাঁহার অতৃপ্ত মন বাস্তবের আকুলতায় বলিয়া উঠে :—

কাটে না সো দিন কল্পনায় ভেসে
আশায় আশায় বসি',
ওকুল ওকায় নদীর কূলেতে
কূলেতে কুসুম রাশি',
কাটে না সো দিন বাজায়ে বাঁশরী
আপনার মনে গেয়ে,
আকাশের পানে সাগরের পানে
দিনমান চেয়ে চেয়ে!
—কনকাঞ্জলি, পৃঃ ১১৬

কবিগুরু বিহারীলালের কাব্যমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া অক্ষয়-কুমার কাব্যের স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া কখনও বা কল্পনার জগতে স্বপ্নের মেঘলোকে গিয়া পৌঁছিয়াছেন। আবার কখনও বাস্তবের মধ্যে প্রত্যাবর্তনের ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়াছেন। অক্ষয়কুমারের কাব্যে এই ধরণের ভাব ও কল্পনার মূলে বিহারীলালের স্পষ্ট প্রভাব রহিয়াছে।

কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন বিহারীলালকে প্রকাশ্যভাবে গুরু বলিয়া স্বীকার না করিলেও, তাঁহার কাব্যে বিহারীলালের আত্মভাব-বিভোরতার আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়। দেবেন্দ্র-নাথ ও অক্ষয়কুমারের কল্পনার সাদৃশ্য দেখিয়া মনে হয় যে, দেবেন্দ্রনাথও অক্ষয়কুমারের মত বিহারীলালের কাব্যমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। যে আনন্দময়তা ও প্রীতিবিভোরতা বিহারীলালের কাব্যের মূল কথা, উহা খুব বেশী পরিমাণে ফুটিয়া উঠিয়াছে দেবেন্দ্রনাথের কাব্যে।

এ ভাঙা দেহমাঝে এ কি গো আমার!
ঢালিয়াছ একবার প্রীতি আপনার।
কবিদের অতীত যাহে না চুমায়,
আমিত্ব ডুবিয়া যেন প্রীতি-পারাবারে।

বিহারীলালে যে প্রীতিকল্পনার উন্মেষ হইয়াছিল, দেবেন্দ্র-নাথের কাব্যে তাহার পূর্ণ পরিণতি হইয়াছিল। খুব সম্ভবতঃ বিহারীলালের মতোনেই দেবেন্দ্রনাথের কবিতাতে ভাব-বিলাসিতার আধিক্য ঘটিয়াছে এবং বিহারীলালের মত তাঁহার কল্পনাবিলাসী মন বাস্তব হইতে বিমুখ হইয়া পড়িয়াছে। বিহারীলালের কাব্যে যে মৌখিকতাবিভোরতা আছে, দেবেন্দ্র-নাথের কাব্যেও সেই বিহ্বলতা দেখিতে পাই। কল্পনার সঞ্চারে কবির চিত্তে যে ভাবসমাবেশ হয়, তাহা বর্ণনা করিয়া কবি বলিয়াছেন :—

অন্তরে চিরদিন ধীরে ফোটে ফুল—
ছিল যাহা পরাণের রেণু,
রবি-কর পিয়ে নিয়ে, হয়ে সে মুকুল,
হৃদয়ে প্রকাশে ফুল-তনু।
হায় কিন্তু মোর চিতে, হিমাদ্রি শিখরে যেন
অকস্মাৎ বসন্ত-সঞ্চার!
পরাণ, মুকুল, ফুলে পূরে পড়ে চঞ্চলতা!
মুহূর্তে একি গো রঙ্গ! ধর্ম মোরা তার!
—গোলাপগুচ্ছ, কল্পনার প্রতি কবির উক্তি

এইরূপ সৌকুমার্য-বিভোরতার মূলে, এইরূপ প্রীতিমণ্ডিত সৌন্দর্য্য উপভোগের মূলে—বিহারীলালের প্রভাব ছিল বলিয়াই মনে হয়। কবির আরও অনেক কবিতাতেই এই-রূপ ভাববিহ্বলতার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। চন্দ্রের শোভায় মুগ্ধ হইয়া কবি বলিতেছেন :—

আহা কি মধুর রূপ! এই দেখে, ধরি,
এস নিত্য এ চিত্ত-আকাশে!
হৃদয়ের অন্ধকার যেন সব সরি',
তোমার ও সাদা-প্রকাশে।
পাগল চকোর সম, উষাও হইয়া,
শিব আমি, শিব আমি, স্বরূপ-অমিয়া!

—গোলাপগুচ্ছ, চাঁদ

সাঁঝের প্রদীপ দেখিয়া কবির মনে যে সৌন্দর্য্য-বিভোরতা সঞ্চারিত হইয়াছে, তাহা বর্ণনা করিয়া কবি বলিতেছেন:—

হেসে হাসি, হেসে দীপ, এস গো রূপসী!
হৃদ মোর পদ্মাসন, সুখ-কল্পনার,
হেসে হেস নিশিদিন চিত্তের মহসী!
হেস হেস, হাসি হাসি, দিব মোর কাছে আসি,
এক রাশি ফুলরাশি কল্পনা-রূপসী:
অবশ পাখনা তব, পুলোয় হইল জড়,
হেরি শশি নিশিমুখে তব মুখশশী:

—গোলাপগুচ্ছ, সাঁঝের প্রদীপ

এখানে শুধু সৌন্দর্য্যপিপাসার ধরণে নয়, ভাষাতেও বিহারীলালের সহিত আশ্চর্য্য সাদৃশ্য লক্ষিত হয়।

দেবেন্দ্রনাথ সর্ব্ব বস্তুতে যে সৌন্দর্য্য দেখিয়াছেন, তাহা বস্তুগত সৌন্দর্য্য নয়—বাস্তব সর্ব্বত্রই তাঁহার কাব্যে অবাস্তব-মনোহর হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার প্রীতির উৎসমুখে সর্ব্ব বস্তুই সুন্দর। প্রীতি-সৌন্দর্য্যের এইরূপ মিলিত আবেশ—বাস্তবকে অবাস্তব-মনোহর কল্পনার রসমণ্ডিত করিয়া দেখা—ইহা বিহারীলাল ও দেবেন্দ্রনাথ উভয় কবিতেই বর্ত্তমান। সৌন্দর্য্য-উপলব্ধিতে পূজার একাগ্রভাব উভয় কবির কাব্যেই দেখা যায়। তবে এই দুইজন কবির কল্পনার মধ্যে বৈসাদৃশ্য শুধু এই-টুকু যে, সেই প্রীতি-সৌন্দর্য্যের মিলিত আবেশ বিহারীলালের ধ্যানকল্পনায় শান্ত রস হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু উহা দেবেন্দ্র-নাথের সর্ব্বেন্দ্রিয় বিবশ করিয়াছে। এ সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথের "অশোকতরু" "অশোকফুল" প্রভৃতি কবিতা দ্রষ্টব্য।

বিহারীলালের মৃত্যুর পরে রবীন্দ্রনাথও তাঁহাকে কবি-গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের 'আধুনিক সাহিত্যে' 'বিহারীলাল' শীর্ষক প্রবন্ধ ইহার সাক্ষ্য দিতেছে। উক্ত প্রবন্ধে তিনি বলিতেছেন :—

"বর্ত্তমান সমালোচক এককালে বঙ্গসুন্দরী ও সারদা-মঙ্গলের কবির নিকট হইতে কাব্যশিক্ষার চেষ্টা করিয়াছিল, কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছে বলা যায় না, কিন্তু এই শিক্ষাটি স্থায়ীভাবে হৃদয়ে মুদ্রিত হইয়াছে যে, সুন্দর ভাষা কাব্য-সৌন্দর্য্যের একটি প্রধান অঙ্গ, ছন্দে এবং ভাষায় সর্ব্বপ্রকার শৈথিল্য কবিতার পক্ষে সাংঘাতিক। এই প্রসঙ্গে আমার সেই কাব্যগুরুর কাছে আর একটি ঋণ স্বীকার করিয়া লই। বাল্যকালে বাল্মীকিপ্রতিভা নামক একটি গীতিনাট্য রচনা করিয়া 'বিদ্বজ্জন-সমাগম' নামক সম্মিলন উপলক্ষে অভিনয় করিয়াছিলাম। বঙ্কিমচন্দ্র এবং অন্যান্য অনেক রসজ্ঞ লোকের নিকট সেই ক্ষুদ্র নাটিকাটি প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল। সেই নাটকের মূল ভাবটি, এমন কি স্থানে স্থানে তাহার ভাষা পর্য্যন্ত বিহারীলালের সারদামঙ্গলের আরম্ভভাগ হইতে গৃহীত।"

সারদামঙ্গলের প্রথম সর্গে দেবী সরস্বতীর যে বর্ণনা আছে, তাহার সহিত রবীন্দ্রনাথের বাল্মীকি-প্রতিভার সরস্বতীর বর্ণনার আশ্চর্য্য সাদৃশ্য আছে।—

হৃদয়ে রাখ গো দেবি, চরণ তোমার।
এস, মা কমলাসনে, ও বিধু-বদন খানি
হেরি হেরি আঁখি ভরি হেরিব আবার।
এস আদেরিণী বাণী সম্মুখে আমার।
মৃদু মৃদু হাসি হাসি, বিলাও অমৃত রাশি,
আলোয় জগৎ আলো, জ্যোতি-প্রতিমা,
তুমি গো সাধনা-লতা, মূর্ত্তি মধুরিমা।

—বাল্মীকি-প্রতিভা

রবীন্দ্রনাথের এই বর্ণনার সহিত কবি বিহারীলালের নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনা তুলনীয় :—

এস মা উষার সনে
বীণাপাণি শুভ্রাসনে,
রাঙা চরণ দু'খানি রাখ হৃদয়কমলে।

—সারদামঙ্গল, ১ম সর্গ গীত

অন্যত্র :

এস মা কমলাসনে,
ও বিশ্ব-রমন-খনি
হেরি হেরি আঁখি ভরি হেরি গো আমায়,
তবে সে উষার কথা
ফুরাক মনের ব্যথা,
এস আবরিণী বাণী সমুখে আমার।'—সারদামঙ্গল, ১ম সর্গ

"বাল্মীকি-প্রতিভায়" বাল্মীকি একস্থানে বলিতেছেন :—

যাও লক্ষ্মী অমরায়, যাও লক্ষ্মী অমরায়,
এ জনে এসনা এসনা,
এসনা এ বীণাবন ফুটিবে '
যে বীণা শুনেছি কানে, যন প্রাণ মজে আছে তোর,
আর কিছু চাহি না চাহি না :

এই উক্তির সহিত কবি বিহারীলালের ভাব ও ভাষার মিল লক্ষ্য করিবার বিষয়। বিহারীলালও দেবীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন :—

যাও লক্ষ্মী অমরায়,
যাও লক্ষ্মী অমরায়,
এস না এ যোগি-জন তপোবন-স্থলে :—সারদামঙ্গল, ১ম সর্গ

সারদামঙ্গলের দ্বিতীয় সর্গে প্রেমিকের নিবিড় ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইয়াছে—সরস্বতীর প্রতি কবি তাঁহার বিবিধ অনুভূতি পর পর প্রকাশ করিয়াছেন। কখনও অভিমান, কখনও বিরহ, কখনও আনন্দ, কখনও ভর্ৎসনা, কখনও স্তব। কবি কখনও তাঁহাকে পাইয়াছেন, আবার কখনও তাঁহাকে হারাইতেছেন। এই প্রীতি-বিরহে প্রেমসীরূপিণী সারদা প্রেমিক কবির হৃদয়ে বিচিত্র সুখ-দুঃখের শতধারায় যে-সঙ্গীত উৎসারিত করিয়া তুলিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার ভোগের অতৃপ্তি ও ত্যাগের ব্যর্থ আকাঙ্ক্ষা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে :—

কেমনে বা তোমা বিনে দীর্ঘ দীর্ঘ যায় দিনে
সুদীর্ঘ জীবন-আশা সব অকাতরে,
আর কার মুখ চেয়ে অবিশ্রাম বয় বেয়ে,
তাপায়ে তনুর তন্ত্রী অকূল সাগর।

রবীন্দ্রনাথের "বাল্মীকি-প্রতিভা"তেও সরস্বতী-বিরহের আশঙ্কায় বাল্মীকি যে উক্তি করিয়াছেন, সেই অনুভূতিই বিহারীলালের কাব্যে ধ্বনিত হইয়াছে :—

অবশেষে হলে তুমি তাজি লোকালয়ভূমি
অভাগা বেড়াবে কেঁদে গহনে গহনে,
যেদে মোছে অশ্রুজল, বিষাদে কবে না কথা
বিষণ্ণ কুসুমফুল বনফুল-বনে।
"হা দেবী, হা দেবী" বলি, শুন্যেরে ডাকিবে ধ্বনি,
প্রতিধ্বনি ফুলে চেয়ে লিখিবে আলাপ,
হেরিয়ে জগত শূন্য আঁধার আঁধার
—বাল্মীকি-প্রতিভা

এইরূপে দেখা যায় যে, "সন্ধ্যাসঙ্গীত" পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের ভাব, ভাষা ও ছন্দের উপর বিহারীলালের অসীম প্রভাব ছিল। "সন্ধ্যাসঙ্গীত" হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্তী সকল কাব্যেই রবীন্দ্রনাথ নিজস্ব ভাব অনুযায়ী কাব্য রচনা করিলেও "কড়ি ও কোমল" পর্যন্ত তিনি বিহারীলালের ভাষা ও ছন্দের প্রভাব হইতে নিজেকে একেবারে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করিতে পারেন নাই। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁহার কাব্য-রচনায় নিজস্ব ভাব ও ভঙ্গী আয়ত্ত করিয়াছেন, তখনও বিহারীলালের কল্পনা ও ছন্দ মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে বর্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। বিহারীলাল রচিত "বঙ্গসুন্দরী"র—

অথবা—

"একদিন যবে তরুণ তপন
হেরিলেন দূর-নভের ধার
অপরূপ এক কুমারীরতন
খেলা করে বীণ নলিনীদলে।"

এই ছন্দ মিশ্র-মাত্রামূলক। ইহার প্রথম প্রবর্তক কবি বিহারীলাল। এই ছন্দের সহিত রবীন্দ্রনাথের পতিতা কবিতার ছন্দ তুলনীয় :—

শত তোমারে যে মারিলা
তবপথে নবযুবা।
লও চিরে তব পুরস্কার।
লও চিরে তব পুরস্কার।

এই ছন্দের ব্যবহার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবন-স্মৃতিতে বলিয়াছেন, "একদা এই ছন্দটাই আমি বেশী করিয়া ব্যবহার করিতাম। ইহা যেন দুই পায়ে চলা নহে, ইহা

যেন বাইসিকিলে ধাবমান হওয়ার মত।" এই ছন্দসৃষ্টির প্রেরণা রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কবিবন্ধু বিহারীলালের কাছ হইতে পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর ঐ ছন্দের সৌষ্ঠব সাধন করিয়াছেন। "সারদামঙ্গলে" বিহারীলাল মধ্যমাধ্য যুক্তাক্ষর বর্জন করিয়া এই ছন্দের মাধুর্য্য ও বেগবান্ গতির মূল্য বজায় রাখিয়াছেন। যুক্তাক্ষর ব্যবহার করিতে গিয়াই তিনি দোষে পড়িয়াছেন—তাঁহার ছন্দঃপতন হইয়াছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই ছন্দ যখনই ব্যবহার করিয়াছেন তখনই যুক্তাক্ষরের পূর্ব্ববর্ণকে দুই মাত্রা ধরিয়া কাজ চালনা করিয়াছেন। এই কারণে যুক্তাক্ষর থাকা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের কাব্যে কখনও ছন্দঃপতন হয় নাই—ছন্দ সর্ব্বত্রই বেগবান্ গতির নূতন বজায় রাখিয়া যেন ঘন ঘন ঝঙ্কারে নূপুর বাজাইয়া প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে।

বিহারীলালের কল্পনা অনেক স্থলেই রবীন্দ্রনাথকে তাঁহার কল্পনার সূত্র ধরাইয়া দিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতা "সোনার তরী"র মূলে বিহারীলালের কল্পনা উৎস জোগাইয়াছিল। এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ গুপ্ত মহাশয় লিখিতেছেন, "খুব ছোটবেলা কবি তাঁহার অগ্রজপ্রতিম বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর নিকটে যাইতেন। বিহারীলাল গান রচনা করিতেন কিন্তু সুর দিতে পারিতেন না। রবীন্দ্রনাথ তাহাতে সুর যোজনা করিয়া বিহারীলালকে গাহিয়া শুনাইতেন। বিহারীলালের একটি গান রবীন্দ্রনাথের খুব ভাল লাগিয়াছিল—রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সোনার তরীর আইডিয়া সেই গানটি হইতে পাইয়াছিলেন—

"সোনার তরী যখনে যাহে যাহে।
পা না দিতে দিতে ডুবে যে আচম্বিতে।"

বাকী পদ রবীন্দ্রনাথের এখন আর মনে নাই। সেই গানটি হইতে রবীন্দ্রনাথের মনে যে অস্পষ্ট আইডিয়া জাগিয়াছিল, সেটি এমন একটি আদর্শ, যাহাতে পা দিতে না দিতেই তাহা আচম্বিতে ডুবিয়া যায়, তাহার উপরে আমাদের পার্থিব জীবনের চাপ মোটেই চাপান যায় না, অথচ তাহাকে না পাইলেও আমাদের প্রাণ বাঁচে না।

কবি যখন কয়া পদ্মার কাঁচা খাদে বোঝাই নৌকার ছবি দেখেন তখন তাঁহার মনে পড়ে সেই ছেলেবেলাকার সোনার তরীর কথা। সেই চোখে-দেখা ছবিকে সেতু করিয়া তাহার মধ্যে তিনি কানে-শোনা ভাবের প্রাণ সঞ্চার করিয়া দেন, এবং তাহারই ফলে জন্মলাভ করিয়াছে তাঁহার অপূর্ব্ব সুন্দর কবিতা সোনার তরী।" *

আত্মভাব-বিভোর কবি বিহারীলাল তাঁহার নিজের কবি-শক্তি সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—

না জানি কি ফুল বিদ্যা
ধরা এ আমার বিদ্যা,
আপনসৌরভে কেন আপনি পাগলপ্রায়।
কি করি কেমনে! —সাধের আসন

ইহার সহিত রবীন্দ্রনাথের 'উৎসর্গ' কাব্যের 'মরীচিকা' কবিতার ("পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি আপন গন্ধে মম—কস্তুরী মৃগসম।")—ভাবসাদৃশ্য লক্ষ্য করিবার বিষয়। কবি যখন নিজের অন্তরলোকের সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিবার উপযোগী ভাষা ও সুর খুঁজিয়া না পান, তখন তিনি পাগল হইয়া উঠেন। কবির সবচেয়ে বড় ব্যথা তাঁহার অন্তরলোকের ভাবসম্ভার প্রকাশ করার ব্যথা। উপলব্ধির যে আনন্দ কবির মনকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলে, অন্তরের সেই ভাব-সম্পদকে সকলের গোচর করাই কবিজীবনের সাধনা। এই আনন্দ ব্যক্ত করিতে না পারিয়া কবি নিজেকে নাভিগন্ধে পাগল কস্তুরী-মৃগের সহিত তুলনা করিয়াছেন। এখানেও দেখা যাইতেছে যে, কল্পনা-ভঙ্গীতে বিহারীলাল ও রবীন্দ্রনাথ দুইজনেই সমধর্ম্মী কবি।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য

* সোনার তরী—শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত—ভারতবর্ষ, ১৩৩১ আষাঢ়।

ইউরোপ হইতে বিদায়

—শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন

প্রায় ছয়বৎসর পরে বিদেশ হইতে বিদায় লইয়া স্বদেশ অভিমুখে চলিয়াছি। গত সেপ্টেম্বরের আন্তর্জাতিক সমস্যার সময় পোঁটলা-পুঁটলি বাঁধিয়া জার্মানি ত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইয়াছিল। এদিকে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ চেম্বারলেন নিজ দেশের ও মিত্রপক্ষের শক্তিহীনতার রথে শান্তিকামিতের ধ্বজাধ্বজা উড়াইয়া বের্গটেসগাডেন, গোডেসবের্গ, মিউনিকে উড়াউড়ি করিয়া আমাদের বিদেশ-বাসের মেয়াদটা কিছুদিন বাড়াইয়া দিলেন।

ইউরোপ প্রবাসে হামবুর্গ প্রায় নিজের বাড়ীর মত হইয়াছিল। ইউরোপের কত দেশ ঘুরিয়া বেড়াইলাম, কিন্তু ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার সেই হামবুর্গেই বার বার আসিতে হইয়াছে। আগে কতবার হামবুর্গ ছাড়িবার সময় পরিচিত সমাজের কাছে হাসিমুখে বিদায় লইয়াছি, মনে হইয়াছে আবার অন্ততঃ একবার ত' আসিবই নিশ্চয়! এবার কিন্তু বাস্তবিক বিদায়ের ভাব মনে আসিল। শুধু হামবুর্গ হইতে নয়, এ যাত্রা ইউরোপ হইতে বিদায়ের যাত্রা, এ কথা স্মরণ করিয়া মন বিষাদসিক্ত হইল। বিদায়পর্বের শেষ মুহূর্তে গাড়ী হামবুর্গ ষ্টেশনের প্লাটফর্ম ছাড়িয়া মোড় ঘুরিতে জানালা হইতে মুখ বাহির করিয়া দেখিলাম প্রোফেসার মুস্ত্রি ভারতীয় প্রথায় যুক্তকরে যাত্রীর উদ্দেশে নমস্কার করিতেছেন। চিত্তে বেদনা বোধ হইল। প্রবাসে এ ছয় বৎসর কত অজানাকে জানিলাম, কত ঘরে ঠাঁই পাইলাম, দূরকে নিকট-বন্ধু ও পরকে ভাইয়ের মত পাইলাম। দেশ হইতে আসিবার সময় মনে কোন কষ্ট হয় নাই, ভাবিয়াছি আমারই দেশ, এতদিন এখানে থাকিয়াছি আবার ফিরিয়া চিরজীবন এখানেই কাটাইতে হইবে। কিন্তু, ইউরোপ ছাড়িবার সময় "পুরাণ আবাস ছেড়ে যাই যবে"র মত ঠেকিল।

হামবুর্গ হইতে ব্রেমেনে আসিলাম। ব্রেমেন জার্মানির দ্বিতীয় বন্দর। সহরের কেন্দ্রস্থলে টাউনহল প্রভৃতি বাড়ী-গুলিতে মধ্যযুগের স্থাপত্য দেখা যায়। ব্রেমেন হইতে জাহাজে উঠিলাম। "ওরাগে" বা হামবুর্গ—আমেরিকা লাইনের একটি বৃহৎ জাহাজ। স্বনামধন্য জার্মান রাষ্ট্রপতি ইহার ধর্মপিতারূপে নামকরণ করিয়াছিলেন বলিয়া নাম "হিণ্ডেনবুর্গ"; হামবুর্গ হইতে পূর্ব-এশিয়ার বন্দরগুলিতে স্বল্পসংখ্যক-যাত্রী ও মালবাহী লাইনার। এবারে যাত্রী আমি একা। একটি সিংগল-বার্থ ক্যাবিন পাইয়াছি। একটি বিছানা, একটি সোফা, একটী চেয়ার ও টেবিল, বস্ত্রাদি রাখিবার একটি আলমারি, জলের কল ও ফোল্ডিং ওয়াশ ষ্ট্যাণ্ড। সেন্ট্রাল হীটিংও আছে। পাশের কামরাটি "সেলুন" ও কাছে কয়েকটি অফিসারদের ক্যাবিন। আমি দোতলায় আছি, এটা জাহাজের ঠিক মাঝখানে। ইহার সামনে ও পিছনে একতলার সুদীর্ঘ খোলা ডেক, তাহার নীচে মাল বোঝাই হয়। জাহাজের মাথার দিকে, একতলার ডেকের প্রান্তভাগে জার্মান নাবিকদের বাসস্থান ও পিছনের একতলার ডেকের শেষপ্রান্তে চীনা খালাসীদের বাসস্থান।

আমার ক্যাবিন দোতলার সামনের দিকে। এই তলার পিছনের দিকে কয়েকটি অফিসারে, ইঞ্জিনিয়ার ও অন্যান্য কর্মচারিদের ক্যাবিন এবং ডাইনিং রুম। ক্যাপ্টেন ছাড়া আরও চারজন অফিসার ও চারজন ইঞ্জিনিয়ার লইয়া জাহাজের কর্তৃপক্ষ। আমাদের মাথার উপর তেতলায় সামনের দিকে ক্যাপ্টেনের ও ফার্ষ্ট অফিসারের ক্যাবিন ও পিছনের দিকে বেতার-যন্ত্রের কামরা ও বেতার-অপারেটারের ক্যাবিন। যাত্রী জাহাজে স্বতন্ত্র বেতার-অপারেটার থাকে। আমাদের জাহাজে অফিসারদের মধ্যে একজন বেতারের কাজও দেখেন; বেতার-ঘরের সংলগ্ন অপারেটারের ক্যাবিনেই থাকেন বলিয়া ইঁহার নিজস্ব ক্যাবিনে আমার জায়গা করা হইয়াছে।

চৌতলায় ৫'টি মাত্র ছোট ঘর, সামনেরটীতে ষ্টীয়ারিং রুম, কম্পাস্ সামনে করিয়া একটি নাবিক হালের চাকা ধরিয়া জাহাজের গতি-দিক্ নিয়ন্ত্রিত করে। এঘরের অন্যান্য অংশে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, নীচে ইঞ্জিন-রুমে হুকুম পাঠাইবার

ঘর, জলযন্ত্রাদি ও সেই সম্পর্কীয় সঙ্কেতাদি শুনিবার ঘর এবং ক্যাপ্‌টেনের সঙ্গে কথা বলিবার পাইপ প্রভৃতি। হীয়ারিং-রুমের দুই পাশে আড়াআড়ি ভাবে দু'টি বারান্দা, ইহার নাম "ব্রিজ", এখানে দাঁড়াইয়া অফিসাররা গতিপথ পর্যবেক্ষণ করেন, নীচের মাঝিমাল্লাদের হুকুম করেন এবং নিকটস্থ ঘণ্টার দড়ি ঘুরাইয়া ইঞ্জিন-রুমে গতিবেগ-নিয়ন্ত্রণের আদেশাদি পাঠান। দ্বিতীয় কামরাটি হীয়ারিং-রুমের পিছনে; ইহাতে একটি প্রকাণ্ড মাপের বাক্স, টেবিলের উপর যাত্রাপথের ম্যাপ, বিভিন্ন যাত্রাপথ, নৌবিদ্যা-সম্বন্ধীয় বই ও পুস্তকাদি, ও পাশে ক্রনমিটার ঘড়ি। চৌতলার ছাদে খোলা জায়গায় বৃহৎ আর একটি কম্পাস।

ক্যাপ্‌টেনের কামরায় রক্ষিত লিখা বাবেন্দ্র অঙ্কিত প্রসিদ্ধ চিত্র "কৃষ্ণ" হইতে অবতরণ।

১০ই মার্চ্চ চানবুর্গ হইতে রওনা হইয়াছিলাম। জ্যোতিষ-শাস্ত্রে আগ্রহবানের কাছে হয়ত ইহা উল্লেখযোগ্য হইবে যে, আমার জন্মদিনও ইংরেজি একটা মাসের ১০ই, এবং দেশ হইতে যাত্রার সময় কলিকাতা হইতে রওনা হইয়াছিলামও আর একটা ইংরেজি মাসের ১০ই। গ্রহনক্ষত্রাদির সংযোগের কি ফলাফলে এইরূপ দিনসাম্য হয় জানি না। ১১ই মার্চ্চ শনিবারের বারবেলায় ব্রেমেন হইতে জাহাজ ছাড়িল। প্রথম গন্তব্য স্থান অ্যান্টওয়ার্প।

সুপরিচিত চানবুর্গ ছাড়িবার সময় মনকে প্রবোধ দিয়াছিলাম যে, এখনও জার্ম্মানি ছাড়ি নাই। ব্রেমেন ছাড়িবার সময় সন্ধ্যার অন্ধালোকে একাকী নিঃসঙ্গ ডেকের উপর দাঁড়াইয়া জার্ম্মানির কাছে বিদায় লইলাম। বন্দরে আমাদের জাহাজের পাশেই দাঁড়াইয়া ছিল একখানা ডাচ্ জাহাজ, মাল ও যাত্রী দুইই লইয়াছে, যাইবে আমাদেরই মত প্রথম অ্যান্টওয়ার্প ও পরে দূর সুমাত্রা-বলী-ববদ্বীপে। আমাদের অব্যবহিত পরেই ছাড়িবে বলিয়া এ জাহাজের ডেকে যাত্রীরা ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, আমাকে ডেকে একা-যাত্রী দেখিয়া এদের সহানুভূতি হইল, প্রথমে কয়েকটি মহিলা ও পরে তাঁহাদের দেখাদেখি জাহাজশুদ্ধ যাত্রী মহোৎসাহে হাত নাড়িয়া আমাকে বিদায়-অভিনন্দন জানাইলেন!

জাহাজ কোন বন্দর ছাড়িবার আগে অনেকগুলা নিশান উড়ায়। প্রথম যে দেশের জাহাজ সে দেশের জাতীয় পতাকা, দ্বিতীয় যে কোম্পানীর জাহাজ সে কোম্পানীর নিশান, তৃতীয় যে নগরে এই কোম্পানীর অফিস সেই নগরের পতাকা, চতুর্থ যে বন্দরে জাহাজ প্রথমে আসিবে সে দেশের জাতীয় পতাকা, এবং পঞ্চম একটি বিশিষ্ট নিশান, ইহা জাহাজ ছাড়িবার ২৪ ঘণ্টা আগে হইতে উড়াইতে হয়। এসব দেখিয়া সহজেই সবাই বুঝিতে পারে—জাহাজের জাতি-কুল কি, কোথায় গন্তব্যস্থান। শেষোক্ত নিশানটির উদ্ভব হইয়াছিল পাওনাদারদের জানাইবার জন্য। অনেক বিদেশী সওদাগরী জাহাজ পূর্ব্বকালে পাওনাদারদের ফাঁকি দিবার জন্য গোপনে বন্দর ছাড়িয়া যাইত, সেজন্য প্রথা হয় যে, ছাড়িবার ২৪ ঘণ্টা আগে ঐ নিশানটি উড়াইতে হইবে যাহাতে পাওনাদাররা জানিতে পারে। জাহাজ ছাড়িবার আগে ক্যাপ্‌টেন ও ফার্ষ্ট অফিসারের স্ত্রীরা কিছুক্ষণ জাহাজে ছিলেন। আলাপের সময় বলিলেন জাহাজে ঐ পঞ্চম নিশানটী উড়িতে দেখিলেই তাঁহাদের মন খারাপ হয়। পিছনদিকে একটি জাতীয় পতাকা ছাড়া জাহাজ মুক্ত সমুদ্রে আর কোন নিশান উড়ায় না। অন্য জাহাজকে অভিবাদনের জন্য পিছনের জাতীয় পতাকাটি একবার নামাইয়া জাহাজ পার হইয়া গেলেই সে পতাকা আবার উঠান হয়' ইহাকে 'dip' করা বলে। আমাদের জাহাজের ক্যাপ্‌টেন জার্ম্মান নৌ-বাহিনীর রিজার্ভ-অফিসার বলিয়া এ জাহাজের পিছনের জার্ম্মান পতাকাটিতে একটি বিশেষ চৌতলা-চিহ্ন আছে।

পাইলট জাহাজে উঠিলে দুটা টাগ-বোট জাহাজের দুই প্রান্ত টানিয়া জাহাজকে ঘাট হইতে বাহির করিয়া বন্দরের মুখ পর্য্যন্ত কিছুদূর টানিয়া লইয়া যায়। ইতিমধ্যে জল যথেষ্ট গভীর হইলে জাহাজ নিজের ইঞ্জিনে চলিতে আরম্ভ করে। নদী বা বন্দর ছাড়িয়া সাগরে প্রবেশ করিলে পাইলট বিদায় লন। বন্দর বা নদীতে প্রবেশের সময়ও এই রীতি। হামবুর্গ-লণ্ডন ও হামবুর্গ-হেলিগোল্যাণ্ড যাতায়াতের সময় এলবে নদী হইতে সাগর চারবার ও টেম্‌স্ নদী হইতে সাগর দুইবার—উত্তর দিক্ হইতে গতায়াত করিবার সময় দেখিয়াছি যে, নদী বাহিয়া সাগরে পড়িবার সময় বা সাগর হইতে নদী বাহিয়া আসিতে বিশেষ উল্লেখযোগ্য দ্রষ্টব্য কিছু দেখা যায় না। খালি জাহাজ, নৌকা, ঘাট, ও বিস্তীর্ণ নদী।

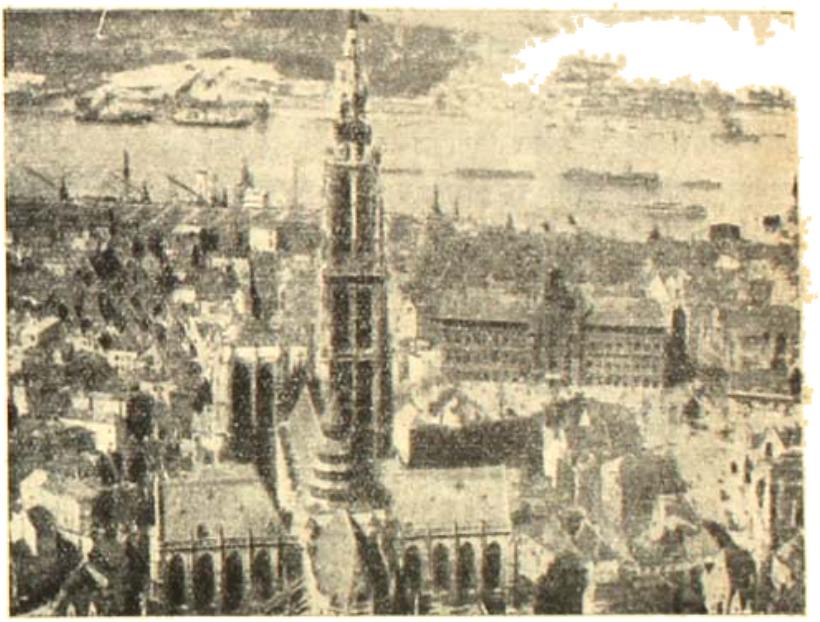

আকাশ হইতে আন্টওয়ার্প বন্দর ও প্রাচীন ক্যাথিড্রেল।

রাত্রে ডিনারের সময় দেখিলাম তরুণ অফিসারদের ডাইনিংহল দোতলারপিছন দিকে। ক্যাপ্‌টেন, চীফ অফিসার ও চীফ ইঞ্জিনিয়ার এই তিনজন প্রবীণ আহার করেন "সেলুনে", আমাদের স্থান হইয়াছে ইঁহাদের টেবিলে। সকাল ৮ ৩০টায় ব্রেকফাষ্ট, ১২-৩০ টায় লাঞ্চ, বৈকাল ৪টায় কফি (ষ্টুয়ার্ড ক্যাবিনে দিয়া যায়) ও সন্ধ্যা ৬টায় ডিনার। খাবার বেশ ভালই। রান্না ও উপকরণ দুইই প্রশংসনীয়, প্রকার ও পরিমাণেও বহু। দুইটা জিনিষ জাহাজে প্রচুর পাওয়া যাইতেছে, যাহা জার্ম্মানিতে ইদানিং অল্পই মিলিত, মাখন ও কফি। প্রায় দুই বৎসর হইতে জার্ম্মানিতে প্রত্যেক লোকের মাখনের টিকিট লইতে হয়, সপ্তাহে একবার জনপিছু ১৫০।১৭০ গ্রাম মাখন কিনিতে পারা যায়। বড়দিনের পর হইতে কফিও দুষ্প্রাপ্য হইয়াছিল, ৫০ বা বড় জোর ১০০ গ্রামের বেশি একবারে কেনা যাইত না।

ক্যাপ্‌টেন ও তাঁহার সহকর্ম্মিবর্গ সকলেই একটু বয়স্ক লোক। টেবিলে কথাবার্ত্তার প্রধান বিষয় ইঁহাদের জাহাজী ব্যাপার লইয়া, নয় ত পারিবারিক খাঁপুত্রের কথা, স্ত্রী সেদিন কি রান্না করিয়াছিলেন, বড় মেয়েটি কি বলিল, এই সব। স্ত্রীপুত্রের সঙ্গে সুদীর্ঘ বিরহের পর বৎসরে কয়েকবার মাত্র দেখা সাক্ষাৎ হওয়ায় দূর দুরান্তের সাগর সঙ্গম করিয়াও মনটা এঁদের স্বভাবতই পরিবারের সঙ্গে থাকে। ক্যাপ্‌টেন হার্ম্মবীটম্‌কি দেখিতে ভয়ঙ্কর কিন্তু আমোদে লোক; ফার্ষ্ট অফিসারটি আবার গম্ভীর লোক, বর্ত্তুলাকৃতি বুড়া চীফ-ইঞ্জিনিয়ারের মেয়েটী রিউমিকে অপেরা-গায়িকা।

রোমেন ছাড়িয়া পরদিন বেশ রোদ ও শান্ত সমুদ্র পাওয়া গেল। ১৩ই মার্চ্চ ব্রেকফাষ্টের আগেই জাহাজ আন্টওয়ার্পের বন্দরে বাঁধা হইয়া মাল উঠাই-নামাই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। জাহাজ-ঘাট হইতে আন্টওয়ার্প সহর ৪ মিনিটের পথ। এখানকার সুবিখ্যাত প্রাচীন ক্যাথিড্রেলটি নদীর খুব কাছে, ইহারই অতি সান্নিধ্যে জাহাজ দাঁড়াইয়াছে। জাহাজ আন্টওয়ার্পে দেড়দিন দাঁড়াইবে। পরে এখান হইতে লম্বা পাড়ি দিয়া পোর্ট সৈদ। জাহাজের সামনে, পিছনে, পাশে অনেকগুলা ক্রেন মহাকলরবে ভীষণ ব্যস্ততার সঙ্গে কাজে লাগিয়া গিয়াছে।

ব্রেকফাষ্টের পরই জাহাজ ছাড়িয়া সহরে বাহির হইয়া

পড়িলাম। প্রথমে পুরাতন নগর-চত্বরের মধ্যযুগের বাড়ী-গুলি দেখিয়া ক্যাথিড্রেলে গেলাম। সেখান হইতে সহরের প্রধান রাস্তা বাহিয়া ষ্টেশনে গেলাম, পথে একটি ব্যাংকে পয়সা ভাঙাইয়া লইলাম। জার্ম্মানি হইতে ১০ মার্কের বেশী সঙ্গে আনিবার নিয়ম নাই। যদিও মার্কের সরকারি বাজার-দর ১ পাউণ্ড = প্রায় ১৩ মার্ক, কিন্তু আসলে জার্ম্মানির বাহিরে জার্ম্মান মার্কের দাম অতি অল্প। রূপার মার্কের খা-ও বা একটু কদর আছে, নোটের তাহাও নাই। পাউণ্ডের দর এখানে ১০২ ফ্রাঁ (বেলজিয়ান)।

হামবুর্গের পরিচিত একটি অ্যান্টওয়ার্পবাসী বেলজিয়ান যুবকের ঠিকানা ছিল, যুবককে আগে চিঠি লিখিয়াও জানাইয়াছিলাম যে, অ্যান্টওয়ার্প আসিতেছি। ষ্টেশন হইতে তাহার বাসায় ফোন করিয়া কোন উত্তর পাইলাম না। ট্রামে চড়িয়া তাহার বাসায় উপস্থিত হইলাম। সহরের অনেকটা বাহিরে একটা বড় রাস্তার উপর প্রকাণ্ড বাগান-ঘেরা একটা প্রাসাদ তাহার বাড়ীর নম্বর। মনে করিলাম বোধ হয় পুরাণ আমলের প্রাসাদ, এখন বহু ফ্ল্যাটে ভাড়া দেওয়া হয়। ভিতরে গিয়া দেখিলাম বাড়ীর সামনে মাত্র দু'টি নাম, তার মধ্যে একটি আমার আলাপী যুবকের। ঢুকিবার উদ্যোগ করিতেছি এমন সময় একতলার একটী ব্যালকনিতে একটি ভদ্রমহিলাকে দেখিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। প্রকাশ হইল তিনি যুবকের বড় বোন। আমাকে ভিতরে লইয়া গেলেন। মূল্যবান্ কার্পেট ও ভারি সাবেকি আসবাবে সুসজ্জিত কয়েকটা হল ও কামরা পার হইয়া একটা বসিবার ঘরে উপস্থিত হইলাম। বোন বলিলেন তাঁহার মা ও ভাই উপরের দুই তলায় থাকেন, ভাইটি এখন মিউনিকে গিয়াছে, নীচের তলায় তিনি স্বামী ও একটি পুত্র সহ বাস করেন। বেলজিয়ামের খবর তাঁহার কাছে জিজ্ঞাসা করিলাম, আমি পলিটিক্যাল খবরে আগ্রহবান্ শুনিয়া তিনি ভড়্কাইয়া গেলেন, বলিলেন তিনি পলিটিক্সের অল্পই বুঝেন, প্রধান ঝোঁক তাঁহার স্পোর্টের উপর। কিছুক্ষণ পরে তাঁহার স্বামীও বাসায় ফিরিলেন। ইনি ইনসিওরেন্সের দালাল। বোনটি যুদ্ধের সময় বিলাতে স্কুলে পড়িতেন, পরে আমেরিকায় ছিলেন অনেক দিন। বাড়ী, ঘর, আসবাব ইত্যাদি দেখিয়া বুঝিলাম খুবই ধনী লোক ইঁহারা। দোনটি দিন-কয়েক পরে হামবুর্গ যাইতেছেন, জার্ম্মানীর সঙ্গে বেলজিয়ামের মেয়েদের হকি-ম্যাচে ইনি স্বদেশের টীমে খেলিবেন।

ইঁহাদের বাসা হইতে সোজা ফিরিলাম ষ্টেশনে ও চলিলাম বেলজিয়মের রাজধানী ব্রাসেল্‌সে। অ্যান্টওয়ার্প হইতে ব্রাসেল্‌সে প্রতি ১০ মিনিট অন্তর ইলেকট্রিক ট্রেন, মাত্র আধ ঘণ্টার পথ। ব্রাসেল্‌স্ পৌঁছিয়া একটা সস্তার জায়গায় লাঞ্চ সারিয়া সহরে ঘুরিলাম। এখানকারও প্রধান দ্রষ্টব্য পুরাণ নগর-চত্বরের মধ্যযুগের টাউনহল, গির্জা ও অন্যান্য বাড়ী, রাজবাড়ী, পার্লামেণ্ট-ভবন ও বিচারালয়। শেষোক্ত Place of Justiceটি সহরের একটু উচ্চাংশে, এখান হইতে নীচে সহরের অনেকটা অংশ বেশ দেখা যায়, এবং এই বাড়ীটি সুঠাম ও দৃঢ় স্থাপত্য-কৌশলের জন্য ইউরোপে প্রসিদ্ধ। ব্রাসেল্‌স সহরটি বেশ লাগিল। অনতিবৃহৎ, কিন্তু বহুলোকপূর্ণ, বাড়ীঘর, রাস্তাঘাট একটু সেকেলে ভাবের কিন্তু লোকগুলি খুব মডার্ণ, মেয়েদের বেশবিন্যাস ও রকম-সকম খুব স্মার্ট। সহরে কর্ম্মস্রোত ও জীবনপ্রবাহ বেশ স্পষ্ট হয়।

বেলজিয়মের প্রায় সব লোকই ফ্লেক বুকে, এক অংশের লোকের মাতৃভাষা ফ্লেক। ফ্লেমিশ ভাষার সঙ্গে জার্ম্মানের জ্ঞাতি-সম্বন্ধ। দেশ খুব সভ্য, কৃষি ও বাণিজ্য কারখানা-কারবার প্রভৃতিতে খুব সমৃদ্ধ। এখন অবশ্য অন্য সর্ব্বত্রের মত এখানেও বেকার-সমস্যা প্রবল। পলিটিক্যাল জীবনে সম্প্রতি খুব যোগাযোগ চলিতেছে, রাজা বিভিন্ন দলের দ্বন্দ্ব মিটাইয়া সবল জাতীয় গবর্ণমেণ্ট নির্ম্মাণের চেষ্টায় ব্যাপৃত আছেন। ইংলণ্ডের সঙ্গে রাজনৈতিক জীবন নিকট ও অন্তরঙ্গসূত্রে আবদ্ধ হইলেও সামাজিক ও কাল-চারাল জীবনে এখানে প্যারিসেরই প্রবল প্রভাব। বিশেষ উল্লেখযোগ্য বেলজিয়াম সম্পর্কে এই যে, ব্রাসেল্‌স্ এবং বিশেষত অ্যান্টওয়ার্পের মত সস্তায় পশ্চিম বা মধ্য ইউরোপের অন্য কোথায়ও বাস করা যায় না। মধ্য ইউরোপে প্রাগ্, সবচেয়ে সস্তা বলিয়া খ্যাত, অ্যান্টওয়ার্প দেখিলাম প্রায় প্রাগের মত—বোধ হয় তার চেয়েও একটু সস্তা। এখানকার সস্তা খাদ্যসামগ্রীর মধ্যে রাস্তায় চোখে পড়ে শামুক-ওয়ালা অর্দ্ধোন্মুক্ত গুগ্‌লি শামুক ও অইস্টারের রাশি।

সন্ধ্যার সময় অ্যান্টওয়ার্প ফিরিয়া জাহাজে আশ্রয় লইলাম।

পরদিন সকালে আবার সহরে বাহির হইলাম। ক্যাপ্টেনও সহরে যাইতেছিলেন, অনেকটা পথ একত্র চলিলাম। আজ ইউরোপে আমার শেষ দিন। ডাকঘরে বসিয়া ইউরোপ-ত্যাগের প্রাক্কালে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের বন্ধুসমাজের কাছে বিদায়-পত্র লিখিলাম। দুপুরে জাহাজে ফিরিয়া লাঞ্চ খাইয়া আবার সহরে ছুটিলাম, ইউরোপ-বাসের অন্তিম ঘণ্টা-কয়েকটা পূর্ণভাবে ভোগ করিবার জন্য। একটা একজিবিশনে চিত্রাদির সাহায্যে বেলজিয়মের প্রত্যেক অংশের স্বাভাবিক দৃশ্য, বাণীঘর, উৎপন্ন সামগ্রী প্রভৃতি দেখান হয়, সমস্ত দেশটার একটা মোটামুটি ধারণা হয়। এটি দেখিলাম। বড় রাস্তা বাহিয়া শেষ পর্যন্ত গিয়া আবার ফিরিলাম, একটা Nonstop সিনেমায় ঢুকিয়া বেড় ঘণ্টা এটা ওটা ছবি দেখিলাম। নূতন পোপের নির্বাচন-জ্ঞাপক ভ্যাটিকানের চিমনী হইতে উত্থিত সাদা ধূম, পোপের নির্বাচন-ঘোষণা প্রভৃতির ছবি দেখান হইল। এখান হইতে বাহির হইয়া একটা অটোম্যাটে কফি খাইলাম, আবার সহর বাহিয়া ক্যাপিট্রোলে আসিলাম, ক্যাপিট্রোলের ভিতর আবার প্রদক্ষিণ করিলাম। দেবগৃহের অন্তরবাসী দেবতার উদ্দেশে নমস্কার জানাইয়া বাকী পথটুকুতে ইউরোপের জীবনের শেষ ছবিটি দেখিতে দেখিতে ঘণ্টার অনতিপূর্বে জাহাজে ফিরিয়া আসিলাম। জাহাজ ঘণ্টায় ছাড়িবার কথা ছিল।

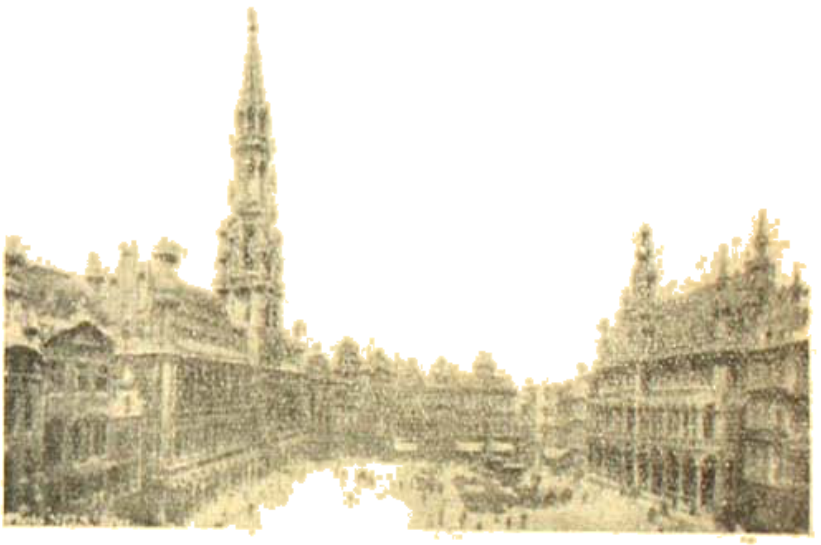

ব্রাসেলসের প্রাচীন নগরচত্বর—বামের চূড়াটি টাউনহলের।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও কিন্তু জাহাজ ছাড়িবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। ইয়ার্ড বলিল মাল বোঝাই হইয়া জাহাজ না কি কিছুটা তলাইয়া গিয়াছে, এখন ভাঁটা, জোয়ার না আসিলে জাহাজ বন্দর হইতে বাহির হইতে পারিবে না। ডিনারের সময় ক্যাপ্টেন বলিলেন, একটা মাল এখনও পৌঁছায় নাই, তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া, জাহাজ ৮টার সময় ছাড়িবে। ডিনার সারিয়াই ইচ্ছা হইল আরও একটু ইউরোপের জীবনস্রোত দেখিয়া লই। আবার সহরে ছুটিলাম। ক্যাপ্টেন ভয় দেখাইয়া দিলেন ৮টার পর ফিরিলে কিন্তু তিনি আমার জন্য অপেক্ষা না করিয়া জাহাজ ছাড়িয়া দিবেন।

ক্যাপিট্রোল পার হইয়া বড় রাস্তা ধরিয়া আবার ষ্টেশন পর্যন্ত ছুটিলাম। সারাদিন চেষ্টা করিয়া ইংরেজি কাগজ কিনিতে পারি নাই, এতক্ষণে সেদিনকার ইংরেজি কাগজ আসিয়া পৌঁছাইয়াছে, টাইমস্, ডেলি টেলিগ্রাফ, সানডে অবজার্ভার ও ডেলি এক্সপ্রেস কিনিয়া লইলাম। এখানে পৌঁছান অবধি দারুণ ঠাণ্ডা ও হাওয়া চলিয়াছে, আজ আবার প্রায়ই বৃষ্টি হইতেছে। রাস্তায় লোকজন কম হইয়া গিয়াছে। এই দুর্যোগে ও জনবিরল পথে ইউরোপের মূর্তি, তাহার

ব্রাসেলসের প্রাচীন নগরচত্বর—বামের চূড়াটি টাউনহলের।

বৈষয়িক কর্মপ্রবাহের অবসানে সাংস্কৃতিক-উপভোগের ক্ষীণ ছবিটি দেখিতে দেখিতে জাহাজে ফিরিয়া আসিলাম। আবার ক্যাপিট্রোলটিকে প্রদক্ষিণ করিতে হইল। সাড়ে আটটায় জাহাজ ছাড়িয়া গেল। ডেকে দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ ক্যাপিট্রোলটি দেখা গেল। এই বেলজিয়মের সমুজ্জ্বল স্বল্পটি বাদলা ও অন্ধকার অগ্রাহ্য করিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া আমার বিদায়ের মূক সাক্ষী হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

পরদিন সকালে উঠিয়া দেখিলাম জাহাজ খুব দুলিতেছে, নর্থ সীর অবস্থা ভাল নয়। ব্রেকফাষ্টে বেশী খাইতে প্রবৃত্তি

হইল না। অমনই খাইব শুনিয়া ক্যাপ্টেন হাঁ হাঁ করিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "কেন, কি হইয়াছে?"

আমি বলিলাম, "অবস্থা যেরূপ দেখিতেছি তাহাতে আহার্য্য ত পেটে বেশীক্ষণ থাকিবে বলিয়া মনে হইতেছে না।" ক্যাপ্টেন বলিলেন, "তাহাতে কি? মাছগুলারও ত কিছু খাবার চাই! কাল অ্যাটওয়ার্পে লাকের সময় দেখিলেন ত কেমন সুপুষ্ট তেলাল চাঁদা মাছ! খাবার না পাইলে উহারা অমন মোটা হইবে কি করিয়া?"

রসনপুষ্ট মৎস্য-ভোজনের কথা ভাবিয়া ক্যাপ্টেনের রসিকতায় আমার বিরক্তি বাড়িয়া গেল। ক্যাবিনে গিয়া শুইয়া পড়িলাম। সামুদ্রিক পীড়ার অভিজ্ঞতায় দেখিয়াছি গুরু ভোজন ও যতক্ষণ সম্ভব মুক্ত বাতাসে চলাফেরা করিলে শরীর ভাল থাকে, শরীর বেই খারাপ বোধ হয় অমনি একেবারে লম্বা হইয়া পড়িয়া থাকাই শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

সৌভাগ্যের বিষয় লাকের আগে জাহাজ নর্থ সী ছাড়াইয়া ইংলিশ চ্যানেলে আসিয়া পড়িয়াছে, ইংলিশ উপকূলে ধাক্কা খাইয়া ঢেউএর প্রকোপ কম হইয়াছে। ১৬ই মার্চ্চ ডুপুরে বে অভ বিস্কেতে প্রবেশ করিলাম। ১৭ই মার্চ্চ বৈকালে অ্যাটলান্টিকে প্রবেশ করিলাম। দক্ষিণে ইংলিশ উপকূলের ও বামে স্প্যানিশ উপকূলের ক্ষীণ রেখা ছাড়া আর কিছুই পথে দৃষ্টিগোচর হয় না, অবশ্য রাত্রে লাইটহাউসের ঘূর্ণ্যমান আলোক বা অন্য জাহাজের আলোক ও দিনের বেলায় অন্য জাহাজ ছাড়া।

এ জাহাজের গতি ১২ নট (ঘণ্টায় প্রায় ১৪ মাইল)। ব্রেমেন ছাড়ার পর ঘড়িতে সেন্ট্রাল ইউরোপীয় টাইম হইতে এক ঘণ্টা আগাইয়া গ্রীনউইচ মীন টাইম করা হইল। তারপর যেদিন জাহাজ দক্ষিণপশ্চিমে বা দক্ষিণপূর্ব্বে চলিয়াছে সেই অনুসারে প্রতিদিন ভোর চারটার সময় জাহাজ যত ডিগ্রি লংগিটুড পশ্চিমে বা পূর্ব্বে গিয়াছে সেই অনুসারে সময় হিসাব করিয়া ঘড়ি পিছাইয়া বা আগাইয়া দেওয়া হইতেছে। মেডিটেরেনিয়ানে ও ভারত মহাসমুদ্রে প্রবেশ করার পর ক্রমাগত পূর্ব্বদিকে চলায় ঘড়ি প্রতিদিন প্রায় ১৬ হইতে ২০ মিনিট আগাইয়া দেওয়া হইত।

জাহাজের আনোপান্ত ঘুরিয়া দেখিলাম। যখন রোদ থাকে ও হাওয়া বেশী না থাকে তখন দোতলার ক্যাবিনগুলির চারিপাশের বারান্দায় বা একতলার লম্বা ডেকটিতে পাদচারণা করিয়া বেড়াই। ব্রীজে ও ষ্টিয়ারিং-রুমে নৌ-চালন-বিদ্যা দেখিলাম। সাগরের প্রতি অংশের লম্বা লম্বা ম্যাপ থাকে। এই ম্যাপে কোথায় জলের গভীরতা কত; তলায় মাটি, বালি বা পাথর কি আছে; কোথায় জলস্রোত আছে কি না; লাইটহাউস, দ্বীপ ও নিকটবর্ত্তী উপকূলের নামাদি, সব খবর এই ম্যাপগুলিতে থাকে। এই ম্যাপ দেখিয়া যাত্রা-পথ অনুসারে লাটিট্যুড-লঙিট্যুড হিসাব করিয়া দুটি বিন্দু নির্দ্দেশ করিয়া, এই বিন্দুদ্বয়কে একটি সরল রেখায় যোজনা করিয়া, এই রেখা-পথ কম্পাসের যে দিকের বত ডিগ্রিতে পড়ে ঢেউ, হাওয়া ও জলস্রোত প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া ঠিক সেই পথে জাহাজ চালান হয়। অহোরাত্র পালা করিয়া অফিসারদের একজনকে ব্রীজে থাকিতে হয়। দূরবীণ ও টেলিস্কোপে সর্ব্বদা সাগরের সর্ব্বত্র এই অফিসার পর্য্যবেক্ষণ করেন। দিনের বেলায় দিক্‌চক্র-রেখা হইতে সূর্য্যের উচ্চতা সেক্সটান্ট-যন্ত্রে মাপিয়া পরে ক্রনমিটারে সময় দেখিয়া তদনুসারে নাবিকদের টেবিল্ হইতে অঙ্ক কষিয়া লাটিট্যুড-লঙিট্যুড নির্দ্ধারণ করা হয়। এ ছাড়া আরও অনেকরকম যন্ত্রে অনেক মাপ-জোপ করা হয়। অন্য জাহাজকে দিনের বেলায় নিশান "dip" করিয়া সেলাম করা বা রাত্রে তাহার সঙ্গে Morse আলোক সিগন্যালে কথাবার্ত্তা বলাও দ্বীতীয় অফিসারের কাজ। সন্ধ্যার পর হইতে সারা রাত পালা করিয়া একজন নাবিক জাহাজের সামনে হইতে তাহাকে পাহারা রাখে। যে নাবিক ষ্টিয়ারিং-রুমে কম্পাস সামনে করিয়া হালের চাকা ধরিয়া থাকে, তাহার দিনের বেলায় দু'ঘণ্টা ও রাত্রে এক ঘণ্টা অন্তর পালা বদল হয়। ম্যাপ ও যন্ত্রাদি ছাড়া গন্তব্য পথের জল-হাওয়া ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্যাদি যুক্ত সরকারী বইও অফিসারকে সর্ব্বদা দেখিতে হয়।

বেতার-ঘরে গিয়া বেতার যন্ত্র দেখিলাম। সব রকমের শর্ট-ওয়েভ ও লং-ওয়েভে বেতার বার্ত্তা পাঠাইবার বা ধরিবার ব্যবস্থা আছে। প্রতিদিন গ্রীনউঃ মীন টাইমে রাত ৯টা ও বারটার সময় জার্ম্মানীর একটি উচ্চ-শক্তির বেতার-ষ্টেশন হইতে Transocean Copyright নামে সেদিনকার খবরাদি পাঠান হয়। পরদিন সকালে টাইপ করা এই খবর সেলুনের

টেবিলে পড়া যায়। আটওয়ার্পে কেনা কাগজে হিটলারের চেকোশ্লোভাকিয়াকে আল্টিমেটাম্ পাঠানর খবর পাইলাম। টেবিলে একথা জানাইলে উহারা বিশ্বাস করিলেন না, বলিলেন ওসব ইংরেজদের জার্মানবিদ্বেষী প্রোপাগাণ্ডা! পরদিন সকালে বেতারে Transocean Copyright খবর দিল যে, হিটলার প্রাগের প্রাচীন রাজপ্রাসাদ "হ্রাদচিনে" সশরীরে উপস্থিত হইয়াছেন। ক্যাপ্টেন তখন বলিলেন, "হাঁ, কাল রাত্রে আমার রেডিওতে ঐ রকম কি একটা শুনিতেছিলাম যেন জার্মান সেনা চেকোশ্লোভাকিয়ায় প্রবেশ করিতেছে!" ক্যাপ্টেনের কামরায় প্রায়ই সন্ধ্যায় রেডিও শুনিতে যাই। তাঁহার যন্ত্রটি আমেরিকান, ছোট কিন্তু শক্তিশালী। তবে দুঃখের বিষয় সমুদ্রের উপর কোন ষ্টেশনই পরিষ্কার শুনিতে পাওয়া গেল না। কাছাকাছি সব ষ্টেশনের আওয়াজ যন্ত্রে ধ্বনিত হইল। ইংরেজি বা জার্মানি খবর শুনিতে বসিলে সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী, স্পানিশ, ইটালিয়ান প্রভৃতি নানা ভাষার নানা আওয়াজ পরস্পরের সঙ্গে একত্র ধ্বনিত হইল।

১৮ই মার্চ্চ রাত্রে সিল্‌বন অতিক্রম করা গেল। হাওয়ার বেগ বাড়িয়া সাগর চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু জাহাজ বড় ও তাহার প্রায় মাঝখানে আছি বলিয়া এখনও বিশেষ কষ্ট বোধ হইল না।

১৯শে মার্চ্চ দুপুর রাত্রে আটলান্টিক ছাড়িয়া জিব্রাল্টার পার হইয়া মেডিটেরেনিয়ানে পড়িলাম। পরদিন ক্যাপ্টেন বলিলেন রাত্রে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর একখানি পাগারাধার গানবোট আমাদের জাহাজের নাম দাবী করিয়াছিল। হাওয়ার জোর ও ঢেউ বাড়িয়া চলিয়াছে, কিন্তু আকাশ পরিষ্কার। ২১শে মার্চ্চ সকাল বেলায় বাইনকুলারে আলজিরিয়ার পাহাড়-গুলির মাথায় বরফ দেখা গেল। এদিকে কিন্তু সাগর বক্ষে শীত অনেকটা কমিয়া গিয়াছে, ওদিকে বেতারের রিপোর্টে দেখিতেছি বার্সিলোনা স্পেনিশ খার্ষমিটার জমাট-বিন্দুর নীচে পড়িয়াছে।

সামুদ্রিক জীবন একঘেয়ে বোধ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। হাওয়ার বৃদ্ধিতে ডেকে বেড়াইবার উপায় নাই। বইপত্র বা সঙ্গে ছিল সব পড়া শেষ হইয়া গেল। সময় আর কাটে না। জীবে গিয়া দূরবীণ লাগাইয়াও চারিদিকে জল ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। স্থল বা পাহাড়ের সংস্পর্শহীন জলের বিস্তৃতিতে বৈচিত্র্যের বড়ই অভাব। কাজের মধ্যে, আহার ও ক্যাবিনে শুইয়া থাকা। ক্যাপ্টেনকে নৌবিদ্যা বা সামুদ্রিক বিষয় সম্বন্ধে মধ্যে মধ্যে প্রশ্নাদি করি। ইঁহারা জলচর জাতীয় হইয়া গিয়াছেন, তাঁহার লোকের অনভিজ্ঞ কৌতূহলে আমোদ অনুভব করেন। ক্যাপ্টেন ও অফিসারদের খুব সপ্রতিভ ও আত্মপ্রত্যয়ী ভাব। হাওয়া বা ঢেউ বাড়িলে ইঁহাদের উৎসাহ আরও বাড়ে। ডাক্তার কিন্তু আগে যেসব নাবা লোকের সঙ্গে আলাপ হইয়াছে, তাহাতে দেখিয়াছি ডাক্তার ইঁহাদের একটু ভীতু ভাব। জল-হাওয়ার সঙ্গে বিরুদ্ধ সংগ্রামে ব্যাপৃত ও মস্ত বড় একটা যান্ত্রিক পদার্থকে চালনাতে নিযুক্ত না থাকিলে ইঁহারা অভ্যাস-বশে একটু out of element বোধ করেন। আমার কিন্তু প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া উঠিয়াছে—"ধরি ধরি, কি উহা দৈব দুরাশা! সিন্ধু নিকটে যদি কণ্ঠ শুকায়ব, কে দূর করব পিপাসা?"

আশে-পাশের তরুণ অফিসারদের ক্যাবিন হইতে মধ্যে মধ্যে গ্রামোফোনের সুর কানে আসে, প্রায়ই পরিচিত বাজনা বা নাচের সুর, আর তার মধ্যে সেই "গর্দ্দভ-গজল" Donkey Serenade "কাম্বার-ক্লাই" নামক ফিল্মে প্রথম গীত হইয়া এ সুরটা এ দেশে এত অনপ্রিয় "হিট্" হইয়া পড়ে যে, সপ্তাহ কয়েক রেস্তরাঁ, ক্যাফে, বারে, যেখানে যাওয়া যায়, রেডিওতে যে ষ্টেশনই শুনা যায়, গৃহস্থগৃহের গ্রামোফোনে বা পিয়ানোতে, সর্ব্বত্র এই বাজনাটা বাজিয়াছে। হাস্যকুর্ণ-রেডিও একদিন বলিলেন তাঁহারা ঐ সুরটা সেদিন লইয়া ৪৬ বার বাজাইয়াছেন।

২২শে মার্চ্চ এদেশে সরকারিভাবে বসন্তারম্ভের তারিখ। এ রাত্রে সাগরে ভীষণ ঝড় উঠিল। ২৩শে সারা দিনরাত সমুদ্র তোলপাড় হইয়া থাকিল। জাহাজ পাশে ও সামনে এত দুলিতেছে যে দৈর্ঘ্য রক্ষা করা অসম্ভব। ষ্টুয়ার্ডের ঘরে বাসনপত্র পড়িয়া ভাঙ্গিবার শব্দ প্রায়ই কানে আসিতেছে। ক্যাবিনের চেয়ার উল্টাইয়া পড়িয়াছে, সুটকেসগুলি ছিটকাইয়া পড়িয়াছে, টেবিলের উপরের বইটই সব সোফার উপর গড়াগড়ি খাইতেছে। খাবারে নামমাত্র রুচি, কোন-ক্রমে শীঘ্র সারিয়া আসিয়া সোফায় লম্বা হই। ষ্টুয়ার্ড বলিল হেলাল ডিশ ও মিষ্ট জিনিষ যেন বেশী না খাই।

ক্যাপ্টেন কিন্তু বলিলেন নাবিকদের প্রিয় খাদ্যই হইতেছে ঢেউয়ের সময় খুব ফ্যাটযুক্ত খাদ্য। বিভিন্ন লোকের উপর সামুদ্রিক পীড়ার ক্রিয়া বোধ হয় বিভিন্ন প্রকারের হয়, তা ছাড়া অভ্যাস হইয়া গেলে বোধ হয় সবই সহ্য হয়। লাঞ্চের সময় হঠাৎ ফার্ষ্ট অফিসার চেয়ারশুদ্ধ পট্ করিয়া সেলুনের অপর প্রান্তে ছিটকাইয়া পড়িয়া একটা টেবিলে ধাক্কা খাইয়া সেই টেবিল ঝাঁকড়াইয়া মেঝে হইতে উঠিলেন, তাঁহার সামনের প্লেট ও আমার কফির পেয়ালা মেঝেয় গড়াইল। চীফ ইঞ্জিনিয়ার একটু সুযোগ পাইলেই দুই হাতে টেবিল ঝাঁকড়াইয়া থাকিতেছেন ও মধ্যে মধ্যে পরখ করিতেছেন তাঁহার অবলম্বন-স্থল টেবিলটার পায়াগুলি সত্যই মেঝেতে সমকোণে লোহবদ্ধ কিনা। ডিনারের সময় সূপ খাইবার একহাতে প্লেট উঁচা করিয়া ধরিয়া ও অন্য হাতে চামচ লইয়া। এই রাত্রে জাহাজ আবার হামবুর্গের লংসিট্যুডের উপর দিয়া গেল।

২৮শে মার্চ্চ কড় কাটিয়া গেল কিন্তু হাওয়া ও ঢেউ আরও দুদিন চলিল, যদিও অতটা দুর্দ্ধান্তভাবে নয়। এদিন বেতারের খবর পাওয়া গেল না, atmospherics এর এতই বিপদ্বায় হইয়াছে। ২৯শে আবার সূর্য্য দেখা গেল কিন্তু হাওয়া প্রবল। ২৯শে হাওয়া আবার শান্ত হইল। ৩'দিন পশ্চিমদিগন্তে সূর্য্যাস্ত দেখিলাম। অস্তগমনের সময় রক্তজ্যোতিঃ রক্তবর্ণ সূর্য্যবিম্ব ধীরে ধীরে চক্রাকারের পিছনে অন্তর্ধান করে। ২৮শে বেশ গরম বোধ হইতে আরম্ভ হইল।

রাত্রে বলিয়া রাখার ২৭শে ভোরে ইুয়ার্ড জাগাইয়া গেল। ক্যাবিনের বাহিরে গিয়া দেখিলাম মেঘনির্ম্মুক্ত উষালোকে ঈষৎ বায়ু-তাড়িত মেডিটেরেনিয়ানের বৃহৎ বীচিবিক্ষোভ-শোভা। আকাশে মাত্র পূর্ব্বগগনে একক শুকতারাটি জ্বলজ্বল্ করিতেছে। অচিরেই পূর্ব্বাকাশে লালিমা প্রকাশ হইল, এটা ৫৫ মিনিটে দিগন্তে একটি রক্ত-রেখা আবির্ভূত হইয়া সত্বর বর্দ্ধমান হইয়া বৌদ্ধস্তূপের আকারের পিণ্ডরূপ ধারণ করিল। সৌরবিম্বের অধঃসীমা দিগন্তরেখা ছাড়িয়া উঠিবার পূর্ব্বমুহূর্ত্তে জ্যোতিঃপিণ্ডের আকৃতি দেখিতে লাটিমের মত মনে হইল। তারপর দুই মিনিটের মধ্যে জ্যোতিবৃদ্ধি হইয়া পূর্ণ প্রভাতরবি কিরণ-বিস্তার আরম্ভ করিলেন।

এইদিন ২৭শে আমাদের পোর্ট সৈদ পৌঁছিবার কথা। বারে বারে ডেকে বাহির হইয়া ও ব্রিজে গিয়া দেখিতেছি তীর দেখা যায় কি না। সীমাহীন সমুদ্রে আমার বিরক্তি ও ডাঙ্গা দেখিবার জন্য অধৈর্য্যের কথা ক্যাপ্টেন জানিতেন তাহা লইয়া ঠাট্টাও করিতেন অনেক। এদিন লাঞ্চের পর একবার দেখা হওয়ায় বলিলেন, "দেখিয়াছেন ত সামনে ডাঙ্গার, গোটাকতক উঁচা স্তম্ভ দেখা যাইতেছে?" আমি বলিলাম, "আমিও ভাবিয়াছিলাম তাই, কিন্তু আপনার ব্রিজে উঠিয়া দূরবীণে দেখিলাম স্তম্ভগুলা পালতোলা মাছের নৌকা আর যেটাকে গাছপালা ও বন মনে করিয়াছিলাম সেটা দেখিলাম একটা প্রকাণ্ড জাহাজ।" ঠকাইতে না পারিয়া ক্যাপটেন ফার্ষ্ট অফিসারের সঙ্গে দুষ্টামির চাপা হাসি বিনিময় করিয়া বলিলেন, "দেখিতেছি তবে আমাদেরই ভুল হইয়াছে।" গোরুকে ঠকাইতে দেখিয়া পোড়া খুঁটের হাসি পাওয়াতে আশ্চর্য্য কিছু নাই।

কিন্তু ঘণ্টা দুইএর মধ্যে তটভূমি সত্যই দৃষ্টিগোচর হইল। সুদীর্ঘ মেডিটেরেনিয়ান এতদিনে বাস্তবিকই শেষ হইয়াছে বুঝিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। জাহাজে বাস্তবার চিহ্ন দেখা দিল, মাস্তুলে মাস্তুলে নিশান চড়ান হইল, মিশরের, অষ্ট্রোনির, হামবুর্গের ও 'হাপ্সগে'র। এ ছাড়া আরও দু'টি নিশান উঠিল, প্রথমটির অর্থ "আমরা বন্দরে প্রবেশ করিব, পাইলট চাই", দ্বিতীয়টির অর্থ "আমাদের জাহাজ হইতে ডাঙ্গায় লোক যাইবে, কোয়ারান্টিনের ডাক্তার চাই"। জাহাজের পাশে দুটি সিঁড়ি নামাইয়া দেওয়া হইল। ব্রিজ হইতে ক্যাপ্টেন দূরবীণে দেখাইলেন "ঐ যে জাহাজটা দেখিতেছেন ওটা একটা ড্রেজার, উহার পিছনে যে বয়াটা দেখিতেছেন ঐ বয়া হইতে এলাকা-জলের (territo-rial waters) আরম্ভ; ঐ যে মোটর-লঞ্চটি আমাদের দিকে আসিতেছে উহার পিছনে বাঁধা নৌকায় পাইলট বসিয়া আছেন।" অল্পসময়ের মধ্যে পাইলটের বোট আসিয়া জাহাজের গায়ে লাগিল, পাইলট সিঁড়ি বাহিয়া উঠিয়া জাহাজের একজন অফিসার পুরঃসর হইয়া ব্রিজে গেলেন। ব্রিজ হইতে হুইসিলের হুকুমে "পাইলট চাই"এর নিশান মাস্তুল হইতে নামিয়া তাহার জায়গায় আর একটা নিশান উঠান হইল, ইহার অর্থ "জাহাজে মেল আছে, ডাকবিভাগের

লোক চাই।" আমাদের জাহাজ ব্রেমেন ও অ্যান্টওয়ার্প হইতে পোর্ট সৈদ, কায়রো, আলেকজান্দ্রিয়া, সিঙ্গাপুর, পেনাং প্রভৃতির জন্য পার্শেল-পোষ্ট বহন করিতেছিল।

ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া সুয়েজখালের মুখে খাল নির্ম্মাতা ফরাসি ইঞ্জিনিয়ার ডি লেসেপ্সের প্রতিমূর্ত্তি অতিক্রম করিয়া জাহাজ সুয়েজখালে প্রবেশ করিয়া পোর্টসৈদ বন্দরের পাশে দাঁড়াইল। ক্রমে ডাক্তার, পুলিশ "এপাগেঃ" এজেন্টের লোক, ইজিপশিয়ান ডাকের লোক প্রভৃতি একে একে আসিয়া স্ব স্ব কর্ত্তব্য সমাধা করিয়া গেলেন। এজেন্টের লোক আমাদের ডাক আনিল, হামবুর্গ হইতে খান কয়েক চিঠি, পাওয়া গেল। এ ডাকগুলি এজেন্টদের কেয়ারে আসিয়াছিল। অ্যান্টওয়ার্পে জাহাজে বসিয়া একটি চিঠি পাইয়াছিলাম, একটি ইংরেজ বন্ধু কেমব্রিজ হইতে লিখিয়াছিলেন, সেলসিয়ান এজেন্টদের নাম ঠিকানা তাঁহার জানা ছিল না, মাত্র তারিখ হিসাব করিয়া ফরাসিতে ঠিকানা লিখিয়াছিলেন "অমুক কোম্পানীর অমুক জাহাজের যাত্রী, বর্ত্তমানে অ্যান্টওয়ার্পে।"

"এলাকা-তলে" প্রবেশের আগে পালতোলা নৌকাগুলির ইজিপশিয়ান খালাসদের দেখিয়া ভিক্টোরেটের সঙ্গে যে পুনঃ পরিচয়ের আরম্ভ হইয়াছিল তাহার সম্পূর্ণতা হইল ডেক হইতে বন্দরে তাকাইয়া। জাহাজ পোর্টসৈদে অল্পক্ষণ দাঁড়াইবে, তবু নৌকায় করিয়া ডাঙ্গায় গেলাম। ব্যাঙ্কে পয়সা ভাঙ্গান, ডাকঘরে চিঠি দেওয়া প্রভৃতি সারিয়া দোকানে কিছু কেনা-কাটা করিয়া সন্ধ্যে ও দেশী পাড়ার বাজারে ঘুরিয়া জাহাজে ফিরিয়া আসিলাম। সেবারে কায়রো হইতে ফিরিয়া রাত্রে পোর্টসৈদ একটু দেখিয়াছিলাম, এবার দিনের বেলায় দেখিলাম। ইজিপ্ট ও নিয়ার ইষ্টের সম্বন্ধে ইউরোপ-প্রভাবান্বিত এই অদ্ভুত সহরটির কথা আর কি বলিব? কিন্তু ১৪ই অ্যান্টওয়ার্প ছাড়িয়া ১৫ দিন ধরিয়া জলপথে ইউরোপকে বামাবর্ত্তে প্রদক্ষিণ করিবার পর আজ আবার পদতলে পৃথ্বীস্পর্শে বড় আনন্দ পাইলাম।

যে "ইউরোপে আজি ঘুচিয়াছে যার, দেখা হ'তে সবে আনে উপহার" সে ইউরোপ এখন পিছনে পড়িয়া রহিল। এই উন্মুক্ত দ্বার উপহার প্রদাতা ঘুসনেতা মহাদেশকে ছয় বৎসর ত' নানা মূর্ত্তিতে বহুভাবে দেখিলাম, কিন্তু ফল কি কিছু হইল? নিজেকে আজ জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইতেছে যে, সত্যই কি কিছুটা পশ্চিমাংশে আজ "নয়নের দৃষ্টি হ'তে ঘুচিবে কালো, যেখানে পড়িবে সেথায় যেখানে আলো"?

আর্য্য ও শূদ্র

..."আর্য্য" শব্দের বিপরীত শব্দ "শূদ্র"। আর্য্য বলিতে যেমন বুদ্ধিজীবী মানুষকে বুঝায়, সেইরূপ তাহাদের বুদ্ধি সুস্পষ্টভাবে পরিমার্জ্জিত হয় নাই বলিয়া কায়িক শ্রমের দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিতে বাধ্য হয়, তাহাদিগকে শ্রমজীবী অথবা শূদ্র বলিতে হয়। এই শ্রমজীবীদিগকে আবার কোন কোন ভাবে বর্ণনাও করা যাইতে পারে।

আর্য্য শব্দের অর্থ বুদ্ধিজীবী. ইহা স্বীকার করিয়া লইলে, কোন একটী স্থানে কেবল আর্য্যগণই বাস করিতেন, ইহা বলিলে, সেই স্থানে কেবলমাত্র বুদ্ধিজীবী মানুষই বসবাস করিত এবং সেখানে কোন শ্রমজীবী মানুষ ছিল না, এমনটির ভাবের প্রকাশ পাইয়া থাকে। বাস্তবজগতে এমন কোন স্থান দেখা যাইবে না, যেখানে কোন শ্রমজীবী পাওয়া যাইবে না এবং কেবল মাত্র বুদ্ধিজীবীদিগকেই দেখা যাইবে। প্রকৃতির বিধি যাঁহারা পরিজ্ঞাত আছেন, তাঁহারা স্বীকার করিবেন যে, জগতে এমন কোন স্থান থাকিতে পারে না, যেখানে শ্রমজীবীহীন বুদ্ধিজীবী অথবা বুদ্ধিজীবীহীন শ্রমজীবী থাকিতে পারে। কাযেই আর্য্যগণ কেবলমাত্র প্রাচীন পারস্যের পূর্ব্বদিকে বসবাস করিতেন এবং তাঁহারা পরবর্ত্তী কালে দলে-দলে ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন —বর্ত্তমান ঐতিহাসিকগণের এই যে মতবাদ, ইহা যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। যাঁহারা এই মত-বাদ পোষণ করেন, তাঁহারা বিচারবুদ্ধিহীন, ইহা বলিতে হইবে।...

আদর্শের বিপর্য্যয়

—শ্রীমেঘেন্দ্রলাল রায়

অরুণ বিষণ্ণ মনে বেহার হইতে এক তাড়া চিঠি বাহির করিয়া পড়িতে বসিয়াছিল। চিঠিগুলি সব সুন্দর লাল ফিতা দিয়া বাঁধা। কি ঘরে একটি কুমীরের চামড়ার ছোট এ্যাটাচী কেসে রক্ষিত! সেই পত্রাবলী এক এক করিয়া সে পাঠ করিল। পত্রাবলী তাহার সহপাঠী ও বান্ধবী তটিনীর পত্র। তটিনী তাহার এম-এ ক্লাসের সহাধ্যায়ী, তাহারই সহিত এম-এ পাশ করিয়াছে। বহু পত্রে তটিনী বহুবার লিখিয়াছে যে, অরুণকেই সে বিবাহ করিবে। অরুণ ব্যতীত আর কাহাকেও সে স্বামীপদে বরণ করিবে না। তটিনী দেখিতে সুন্দরী, তটিনী শিক্ষিতা। তটিনী প্রতিশ্রুতি দিয়াছে, সে বাগ্‌দত্তা।

তটিনীর কথা ভাবিতে ভাবিতে অরুণ যেন কোন স্বপ্নরাজ্যে চলিয়া যায়। সে রাজ্যের আকাশে কেবল মলয়-বাতাস তটিনীর অঙ্গরাগে তাহার কর্ণকুহরে ধ্বনিত করে, তাহার মর্ম্মমুকুরে দূর হইতে তটিনীর অপরূপ মাধুরী ছায়ার ন্যায় উপস্থিত হয়।

তটিনীকে লইয়া কত স্বপ্ন বুদ্বুদমতী হইয়া দেখা দেয় তাহার মানসমন্দিরে। তটিনীর স্মৃতির কোয়ারে অরুণ ভাসিয়া যায় অতি দূরে—সেই তটিনীরই দ্বারদেশে।

সবই সত্য, কিন্তু ইহা তো সত্য যে, তটিনীর সহিত তাহার দীর্ঘকাল সাক্ষাৎ হয় নাই। তটিনীকে সে পত্র বহুবার লিখিয়াছে কিন্তু কোন উত্তর আসে নাই।

কেন তটিনী এরূপ ব্যবহার করিতেছে, তটিনী কি তবে অরুণকে বঞ্চনা করিবে? তাহা কি সম্ভব? অরুণ বার বার তটিনীর পত্রাবলী পাঠ করে ও মনকে প্রবোধ দেয়। যে এমন সুন্দর পত্র লিখিয়াছে, যাহার প্রত্যেক ছত্রে হৃদয়ের ভালবাসা, আন্তরিকতা জল্ জল্ করিতেছে, সেই তটিনী তাহাকে প্রতারণা করিবে? না না তা সম্ভব নয়। তবে তটিনী প্রায় ছই বৎসরের কাছাকাছি কোন পত্র দেয় না কেন? নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে।

অরুণের কর্ম্মজীবন আরম্ভ হইতে আর বেশী দিন নাই। অরুণ এম-এ পাশ করিয়া বেহারে কাজ পাইয়াছে। অরুণের পিতা বেহারে বড় ঠাকুরে ছিলেন, পুত্রের তালই ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। সে বেহারে ইন্‌কম্-ট্যাক্স অফিসারে চটিয়াছে। তাহাকে এক মাসের মধ্যেই কর্ম্মস্থলে যাইতে হইবে। সে কথাও তো অরুণ তটিনীকে জানাইয়াছে, তবু পত্রের উত্তর নাই কেন? তবে কি অরুণ অপেক্ষা করিবে? কেন অপেক্ষা করিবে না? সে কি পাঠ করে নাই, কত দরদী বিরহী প্রেমিক প্রিয়ার প্রতীক্ষায় যুগ কাটাইয়া দিয়াছেন? তবে সে কেন প্রতীক্ষা করিতে ভীত হইবে? প্রতীক্ষাই সত্য প্রেমের একমাত্র কঠোর পরীক্ষা। হয় তো তটিনী সেই পরীক্ষার মধ্যেই অরুণকে ফেলিয়াছে। অরুণকে সে পত্রে বহুবার বিবাহের প্রতিশ্রুতি দিয়াছে, এখনও তাহার সন্দেহ! সে নিজের মনকে আশ্বাস দেয়; পত্রাবলী পাঠ করে।

কিন্তু অরুণ যে এখনও যুবক, সে আকাশকে বড়ই বেশী নীল দেখিয়া থাকে, চাঁদের আলোয় মনে কত স্বপ্নের মালা গাঁথে, কোকিলের কুহুতানে হৃদয় তাহার স্পন্দিত হয়, কঠোর বাস্তব তাহার নিকটে এখনও অজ্ঞাত। সে জানে না পত্রের ছায় এমন ভীষণ ভয়াত কঠোর পরিহাস এ সংসারে আর কিছু আছে কিনা?

অরুণের মাতা ভগবতীর ইচ্ছা যে, পুরাতন প্রথা অনুসারেই তাঁহার নির্ব্বাচিত মনোমত অল্পশিক্ষিতা, অল্প-বয়স্কা কিন্তু বিশেষ সুন্দরী কোন গৃহস্থকন্যার সহিত অরুণের বিবাহ হয়। পাত্রী তো ঠিক আছে। অরুণের পিতা মৃত্যুর পূর্ব্বে এই বিবাহ ঠিক করিয়া দিয়াছেন।

অরুণের ইচ্ছা কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত। সে এই গতানুগতিক প্রচলিত হিন্দু প্রথা অনুসারে বিবাহ করিতে সম্মত নহে। সে তটিনীকে বিবাহ করিবে স্থির করিয়াছে—যদি প্রয়োজন হয় তটিনীর জন্য সে দীর্ঘ দিন অপেক্ষা করিবে। পিতার স্থিরীকৃত সম্বন্ধকে সে কোন মূল্য দেয় না। বিবাহ-ব্যাপারে পিতামাতার নির্ব্বাচন সে আদৌ পছন্দ করে না—

সে নিশ্চিন্ত পাত্রী নীহারিকাকে বিবাহ করিবে না। অথচ কলেজেতে প্রবেশ করিবার পূর্বেই যে বিবাহ হওয়া বাঞ্ছনীয় তাহা অরুণও বোঝে। জগত্তারিণীর ইচ্ছাও তদ্রূপ। জগত্তারিণী পুত্রের বিবাহ দিতে বিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

জগত্তারিণী অরুণের ভাবগতিকে চকিত দেখিয়া চিন্তাকুল হইয়াছেন—তাঁহার বিশ্বাস বালীগঞ্জে আবহাওয়াতেই অরুণের এই ভাবপরিবর্তন ঘটিয়াছে।

অরুণের মাতা যে বালীগঞ্জে বাড়ী করিয়া ভাল করেন নাই তাহা বুঝিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারই বা দোষ কি? স্বামী মৃত্যুর বহু পূর্বে জমি ক্রয় করিয়া রাখিয়াছিলেন। অরুণেরও বিশেষ ঝোঁক ছিল বালীগঞ্জে বাড়ী করা।

অরুণের মার মনে এ প্রশ্ন সর্বদাই আসে যে, নীহারিকাকে কেন অরুণ বিবাহ করিবে না? নীহারিকা সুন্দরী, গৃহস্থালীর কার্যে তুলনাহীন, সর্বলক্ষণসম্পন্না কল্যাণময়ী নীহারিকার কি দোষ অরুণ আবিষ্কার করিয়াছে?

অরুণের নিকট নীহারিকার যে প্রচুর দোষ বর্তমান তাহা জগত্তারিণীর মনে আসে না।

নীহারিকার পিতা সামান্য চাকুরী করেন দিন তাঁহার কোন রকমে চলে। যে ফ্যাশনের পক্ষপাতী হইয়া কলিকাতার অধিকাংশ বাঙ্গালী, কন্যাদের স্কুলে কলেজে প্রেরণ করিয়া কন্যাদের মধ্যে বিবিয়ানা আমদানী করিয়াছেন, নীহারিকার মধ্যে তাহা একেবারে নাই। আধুনিক ভাবের তাহার মধ্যে 'আপীল' নাই—সে নিতান্ত গৃহস্থবাড়ীর তুলসীলতা, তাহার মধ্যে মাদ্রোলিয়ার অপরূপ রহস্য নাই।

নীহারিকা অরুণের পিতার বিশেষ বন্ধুর নাতনী। অতি সুন্দরী। সাধারণের নিকট তটিনী সুন্দরী হইলেও নীহারিকার নিকটে বিশেষ সুন্দরী নয়। কিন্তু, সুন্দরী হইলে তবু তো চলিবে না—হোক সর্বাঙ্গসুন্দরী, হোক পিতৃবন্ধুর নাতনী। কিন্তু, সে শিক্ষিত যুবক। যে নারী লেখাপড়া জানে না, দিবস-রাত্রির পরিবর্তনের সামঞ্জস্যে বিচিত্র বেশভূষা, শাড়ী ও ব্লাউজ পরার কায়দা-কানুন জ্ঞাত নহে, মাঝে মাঝে ভাঙ্গা ইংরাজী এবং হয়তো ভুল ফরাসী বুলী বলিতে পারে না, কবে কবি শেলী জলে ডুবিয়া কোথায় প্রাণ বিসর্জন দিয়াছেন বা কবি বাইরণ পেটের ব্যথাতে কয়টা বিস্কুট খাইয়াছিলেন সব কথা যে নারী জানে না তাহাকে অরুণ বিবাহ করিবে?

স্বীয় গর্ভধারিণীর সম্বন্ধে অরুণ চিন্তা করে। মা এতদিন বালীগঞ্জে রহিলেন। রাসবিহারী অ্যাভিনিউ-এ অনেক বৃদ্ধা ঝুঁকে ঝাঁতাল পরিয়া মুখে রঙ মাখিয়া স্বামীর হাত ধরিয়া বেড়াইতে বহুবার দেখিলেন, লেকের ধারে দলে দলে পুরুষ-নারীর সান্ধ্য-ভ্রমণ, পথে ঘাটে নারীর লক্ষ্যহীন খাপছাড়া মেলামেশা দেখিলেন, কিন্তু তাঁহার রীতিনীতির কোন বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইল না? পারিপার্শ্বিক প্রভাব সবই তাঁহার পক্ষে বৃথা হইল?

মাহার সেই সাবেক আমলের প্রত্যেক বৃহস্পতিবারে ঘটা করিয়া লক্ষ্মীপূজা ও সত্যনারায়ণপূজা সমানে চলিতেছে। অরুণ ম্যাকেন্‌জি সাহেবের সেল হইতে লক্ষ্মীর খুব ভাল ডাইনিং টেবিল লইয়া আসিল, তাহা মাতা জোর করিয়া পার্শ্বের বাটীতে ব্যারিষ্টার মিঃ চক্রবর্তীর স্ত্রীর নিকটে দশ টাকা কমে বিক্রয় করিয়া দিলেন। মাকে সে কিছুতেই 'আপ-টু-ডেট' করিতে সক্ষম হইল না।

সে দিন সন্ধ্যায় বিহঙ্গবনে তটিনীর পত্রপাঠ শেষ করিয়া একাকী ঘরে সে খাইতেছিল, অরুণের মা তাহার কক্ষে উপস্থিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ এ কথা সে কথা হইবার পর সামান্যকাল চুপ করিয়া পরে তিনি বলিলেন, "খোকা নীরুর মা বাবা আবার চিঠি লিখেছেন। দেখ না বাবা।"

অরুণ বলিল, "চিঠি দেখে কি হবে মা? নীরুকে আমি বিয়ে করবো না সে তো তোমায় অনেক বার বলেছি—আবার সে কথা কেন?"

অরুণের মাতা বলিলেন, "খোকা, উনি আজ বেঁচে নেই, তাই তুই এই রকমভাবে কথা বলছিস। উনি বেঁচে থাকলে—" মার চোখ জলে ভরিয়া গেল। তিনি চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। কুসংস্কার ত্যাগ করিলেও মায়ের চোখের জল দেখিলে অরুণ স্থির থাকিতে পারে না। সে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছে, ইহা তাহার নিছক 'সেন্টিমেন্টালিটি,' কিন্তু যুক্তিতর্ক দিয়া ইহা সে আজিও দূর করিতে পারে নাই। নিজেকে সে এই বিষয়ে 'ইন্যাশনাল র‍্যাশনেলিষ্ট' মনে করিয়া সান্ত্বনা পায়। মা চলিয়া গেলেন।

অরুণ একবার ডাকিল "মা মা!"

মা সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতেছিলেন, অরুণ অপরাধীর ন্যায় সিঁড়ির নিকটে গিয়া দাঁড়াইল।

চোখের জল মুছিয়া অরুণকে জগত্তারিণী বলিলেন, "বুড়ী মাকে কাঁদাতে বড় ভাল লাগে, না রে।" অরুণ মার পশ্চাতে পশ্চাতে চলিল। মা উপরে গিয়া পুরুত ঠাকুরের পূজার সব আয়োজন করিতে বসিলেন। অরুণ দূরে দাঁড়াইয়া থাকিল। পূজার আয়োজন করিতে করিতে বলিলেন, "খোকা, এই পুজো আরম্ভ হ'লে এখানে একটু এসে একটু দাঁড়াস্ ঠাকুরের দয়া তোর দরকার।" মা পূজার ঘরের মধ্যে চলিয়া গেলেন।

অরুণ চিন্তাক্লিষ্ট হৃদয়ে ছাদে পায়চারী করিতেছিল। অরুণের মা যথেষ্ট জমী হাবিয়া সুন্দর মাঝারি গোছের বাড়ী করিয়াছেন। কারণ, তাঁহার এক পুত্র ও কন্যা ছাড়া এ সংসারে আর কেহ নাই। কন্যা প্রতিমার বিবাহ হইয়াছে। জামাতা বিবাহের পর বিলাত হইতে বিজ্ঞানের ডাক্তার হইয়া আসিয়াছেন—আগ্রাতে অধ্যাপনা করেন—কন্যাও বড় আসে না - বাড়ীর বিশেষ প্রয়োজন নাই। নির্মেঘ আকাশে বড় বড় তারা গাছের মধ্য দিয়া চাঁদের আলো আসিয়া অরুণের ছাদে পড়িয়াছে। তাহাদের বাড়ী যেখানে সে স্থান এখনও প্রচুর ফাঁকা।

অরুণ দেখিল পার্শ্বের বাড়ী হইতে মিস শেফালী ও মিস্ যূথিকা সরকার মোটর গাড়ীতে তাহাদের কলেজের সহপাঠী মিঃ গুপ্ত ও মিঃ দস্তিদারের সহিত বায়োস্কোপে চলিয়াছে। তাহারাও অরুণকে দেখিয়াছিল। শেফালী উচ্চ কণ্ঠে বলিল, "অরুণদা মাঠে বায়োস্কোপে চল না, দাঁড়িয়ে দেখছ কি?"

অরুণ বলিল, "তোমরা যাও আজ"। শেফালী হাসিয়া বলিল, "ও বাড়ীতে আজ পুজো আছে।" অরুণের মায়ের পূজার কথা লইয়া তাহার বন্ধু-বান্ধবী মহলে একটা চাপা হাসি-ঠাট্টার রোল চলে, তাহাও অরুণ জানে। কিন্তু, এ হাসি তো তাহাকে বিদ্রূপ করা নহে, তাহার মাতার কার্যকলাপের সমালোচনা। কিন্তু, তাহাদের রুচিজ্ঞানে কাহারও মায়ের কার্যকলাপের সমালোচনা করিতে বাধে না। অরুণ বিরক্ত হইল। কিন্তু, তাহাদের সহিত বায়োস্কোপে না যাওয়ার দোষ আছে। সে ভগিনীর সহিত কত দিন মোটরে এক সময়ে ঘুরিয়াছে। সে কথা তো কাহারও অবিদিত নাই।

সে চিন্তামগ্ন হইয়া একদৃষ্টে কতক্ষণ তারার দিকে চাহিয়াছিল জানে না, কখন পূজা শেষ হইয়াছে, কখন পুরুত ঠাকুর চলিয়া গিয়াছেন তাহাও জানে না। জগত্তারিণীর "খোকা" ডাক তাহাকে বাস্তব জগতে টানিয়া আনিল। মাতা ভক্তিভাবে ঠাকুরের প্রসাদী বাতাসা পুত্রের মাথায় স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "ঠাকুর, খোকাকে আমার সৎ বুদ্ধি দাও—"

অরুণ হাসিয়া বাতাসা মাথায় ঠেকাইয়া মুখে পুরিল এবং মাতার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দ্বিতলের ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল।

ঘরে গিয়া দেখে বসিয়াছে, ঠাকুর আসিয়া একটি টেলিগ্রাম দিল। অরুণের সে টেলিগ্রাম পাইয়া ভগিনীর কথা মনে হয় নাই তাহা নহে, তবে টেলিগ্রাম আসিয়াছে শুনিয়া জগত্তারিণী হাঁফাইতে হাঁফাইতে ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "কি টেলিগ্রাম খোকা"—খোকা কাগজে সই করিয়া টেলিগ্রাম খুলিয়া পাঠ করিল। তাহার ভগ্নীর টেলিগ্রাম, আগ্রা হইতে আসিয়াছে। অরুণ বলিল, "মা কাল হাবী, হীরুদা, বাটুলে সব আসছে। ভালই আছে। সকালে হাওড়াতে যেতে হবে।"

জগত্তারিণী বলিলেন, "বা, ড্রাইভারকে বলে দে গাড়ী নিয়ে ঠিক সকালে প্রস্তুত থাকে, ওরা এলে তারপর না হয় কাল গঙ্গাস্নানে যাব।"

নীলাম্বর সেদিন সকাল সকাল আফিস হইতে বাহির হইয়াছেন। ছেলে মেয়ে বেশ বড় গলদা চিংড়ি খাইতে চাহিয়াছে। বড়বাজার হইতে গলদা চিংড়ি কিনিয়া হাওড়া ষ্টেশনে যাইবেন। শ্রীরামপুর হইতে নীলাম্বর রোজই ডেলী প্যাসেঞ্জারী করিয়া আসিতেছেন এই দীর্ঘ বাইশ বৎসর। নীলাম্বর আগে ট্রেনে এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে যাহাতে এক বাজী তাস খেলা হয় তাহার প্রধান পাণ্ডা ছিলেন। ডেলি প্যাসেঞ্জারের পক্ষে শনিবার বা রবিবার যে কি, তাহা নিজে যে ডেলী প্যাসেঞ্জার নহে তাহার পক্ষে কল্পনা করা কঠিন।

ট্রেনে উঠিয়া নীলাম্বর একপাশে গলদা চিংড়ি রাখিয়া বিমর্ষ হইয়া বসিয়া আছেন। শ্রীরামপুরের আর চারি জন সহযাত্রী, যুবক হইলেও নীলাম্বরের বন্ধু। তাহারা সকলেই

তাস খেলিতে নীলাম্বরকে ডাকিল। নীলাম্বর বলিলেন, "ভাই রমেশ, তোমরাই খেলো—আমি বড় পরিশ্রান্ত"; রমেশ বলিল, "ওই যে নীলাম্বর দা—তোমার ঐ রোগতো গেল না, ছেলে-পিলেরা গলদা চিংড়ি খেতে চায়—আর কি হুজুর হোক বৃষ্টি হোক, তোমার আনা চাই।"

নীলাম্বর কিছু বলিলেন না। মনে মনে খুশী হইলেন যে, রমেশ তবুও ভাবে যে পুত্র-কন্যার জন্য এখনও নীলাম্বর ভাবে; তাঁহার আত্মীয়বর্গ, বন্ধু, বন্ধুর স্ত্রী নীলাম্বরকে স্বার্থপর ভাবে; কেহ ভাবে দায়িত্বজ্ঞানহীন, কেহ অনেকে কিছু ভাবে, যে-হেতু নীলাম্বরের কন্যা নীহারিকার বয়স পনেরো পার হইয়া ষোল হইয়াছে, তবু তাহার বিবাহ এখনও দিতে পারে নাই।

আত্মীয়ের তো সহানুভূতির অভাব নাই, কেবল টিট্‌কিরী ও রোষারোপ করাতেই তথাকথিত আত্মীয়দের আনন্দ। কেহ হয়তো পাত্রের জন্য এক পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতেই মনে করিতেছেন, নীলাম্বরের মস্তক তাঁহার নিকটে সারা জীবনের জন্য বিক্রীত থাকিল।

নীলাম্বর কিন্তু কন্যার বিবাহের চিন্তায় দিনের পর দিন কাটাইতেছেন। কি সে চিন্তা তাহা জানেন একমাত্র তাঁহার স্ত্রী সৌদামিনী। এই জন্যই এত লাভের তাস-খেলায় তাঁহার রুচি চলিয়া গিয়াছে।

নীলাম্বর বিষণ্ণবদনে গলদা চিংড়ি লইয়া শ্রীরামপুর ষ্টেশনে নামিলেন। ধীরে ধীরে বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলেন। নিতাইদা বাড়ীর বারান্দায় বসিয়া খেলো হুঁকাতে তামাক খাইতেছিলেন। নীলাম্বর তাঁহাকে দেখিয়া কহিলেন, "নিতাইদা কিছু খবর এনেছেন নিশ্চয়ই ?"

নিতাইদা বলিলেন, "নিতাই পর্শু যখন গেছে, খবর আনেনি। যাও তুমি হাত মুখ ধুয়ে এস।" নীলাম্বর বলিল, "চা খাওয়া হয়েছে ?"—নিতাইদা বলিলেন, "না তুমি এলেই খাব, বৌমাকে তাই বলে পাঠিয়েছি।"

বাড়ী আসিয়া নীলাম্বর হাত মুখ ধুইয়া গলদা চিংড়ি নীহারিকার হস্তে দিয়া বাহিরে আসিলেন। ইতিমধ্যে নিতাইদা বাহিরে আসিয়া জুটিয়াছিলেন। নিতাইদা বলিলেন, "চরণ ঘটক এক নম্বরের ধাপ্পাবাজ কমিশন-খোর, কোন কথাটা ঠিক নেই—তুমি ঠিক বলেছিলে।" নীলাম্বর বলিলেন "কেন ?"

"আমি আফিস থেকে ফিরবার সময় খবর নিয়ে এসেছি—এক পাত্রের মাইনে বলেছিল আশী টাকা মাসে কিন্তু সে ত্রিশ টাকা পায় আর বাড়ী আছে বটে কলকাতায় কিন্তু তা তিন-বার বন্ধক পড়েছে আর নগদ তিন হাজার দিতে হবে। আর একজন সে মাইনে পায় সত্যিকারের একশো পাঁচ টাকা, বরানগরে এক ছোট ভাঙ্গা বাড়ী আছে, নগদ পাঁচ হাজার দিতে হবে তা বাবড়ো না বীনু, খোঁজে আছি।" চা পান করিয়া দুটি পান লইয়া নিতাইদা প্রস্থান করিলেন।

কথায়-বার্ত্তায় রাত্রি হইয়া গেল। নীলাম্বর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া উপরে গেলেন। সৌদামিনী দরজার পাশ হইতে সব শুনিয়াছেন—তাঁহার চক্ষু সজল হইয়া আসিল।

নীলাম্বরের পিতার এক দিন ভাল অবস্থাই ছিল, পশারে উকীল ছিলেন, টাকাকড়িও বেশ ছিল, কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে জনকতক ধাপ্পাবাজের পরামর্শে ব্যবসাতে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হন। কি কুক্ষণে নীলাম্বরের মা মারা যান, পিতাকে বাধা দিবার কেহ লোক ছিল না।

নীলাম্বর বড় আশা করিয়াছিলেন যে, অরুণের মাতা অগত্যারিণী অনুগ্রহ করিয়া নীহারিকাকে গ্রহণ করিবেন। তিনি বালিগঞ্জে দুই একবার গিয়াছিলেন, কিন্তু অরুণের হাব-ভাবে বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহার আগমন অরুণের নিকটে মোটেই প্রীতিকর নহে—তবুও যাইতেন। কিন্তু, সেদিন অরুণের তরুণী ব্যঙ্কবী হঠাৎ নীলাম্বরকে দেখিয়া "Who is that old man ?" প্রশ্ন করেন, ওজাদাদে পীড়িত হইলেও আর সেইদিন হইতে তিনি অরুণের বাড়ীতে পদার্পণ করেন নাই। তবে সংবাদ রাখিতেন যে, অরুণের বিবাহ এখনও হয় নাই।

স্বামী-স্ত্রী উভয়েই অনেক কাকুতি-মিনতি করিয়া অগ-ত্যারিণীকে পত্র লিখিয়াছেন, কিন্তু প্রায় পনেরো দিন গত হইয়াছে, কোন উত্তর আসে নাই। পাত্রের যে সংবাদ বৃদ্ধ নিতাইদা দিলেন, তাহাতে তাঁহার ন্যায় লোকের সে সব পাত্রের সংবাদ লওয়া অবিমিশ্র উন্মত্ততা। তবুও নীহারিকা অপরূপ সুন্দরী; যাহাদের কন্যা দেখিতে বিশেষ সুবিধা নহে এবং তাহার উপরে এমন অথও নাই যে, এক কথায় এমন কি বেড় দুই হাজার টাকা বাহির করিতে পারেন - তাঁহাদের অবস্থা অনেকটা গোদের উপর বিষফোড়ার সামিল। অথচ

এই গোলের উপর বিবেকোড়ার মামিল কন্যার পিতাই আমাদের সমাজে শতকরা নিরানব্বই জন।

নীলাম্বরের অবস্থা তাহাদের অপেক্ষা অনেক ভাল—কিন্তু কই তিনি তো তাহা বুঝিতে পারেন না। তাঁহার মনে হইল, হায়! এ বঙ্গদেশে কেন কন্যা জন্মগ্রহণ করে, যদি জন্মগ্রহণই করে তবে মঙ্গলময়ীর বেশে কেন তাদের এ কষ্ট—দেশের হিতে, সমাজের কল্যাণে অনেক বড় বড় সভা হয়, বক্তৃতা হয়, কিন্তু আমাদের যাহা বিশেষত্ব—সমস্যা উপস্থিত করা হয়, কিন্তু তাহার সমাধান হয় না। তাহা এখনও সমানভাবেই অটুট রহিয়াছে।

নীহারিকা দেখিতে অতি সুন্দরী। তবে কলিকাতার হিসাবে সে পল্লীবালা—গো সেবা করে, পূজা অর্চনা করে—হিন্দু পরিবারের যাহা বিশেষত্ব সেই রন্ধনকার্য্য যাহাতে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার সহিত সম্পাদিত হয়, তাহা বেশ জানে, কি করিয়া চাল হইতে খই-মুড়ী ভাজিতে হয় তাহাও অত্যন্ত ভাল পারে, বাড়ীতে সন্দেশ এমন কি খাজা পর্য্যন্ত তৈয়ারী করিতে পারে, পুকুরে প্রত্যহ স্নান করে। ঘর ঝাঁট দেয়, মশলাও বাটে। বাড়ীতে সাবেক আমল হইতে গরু রাখার ব্যবস্থা থাকাতে গরুর দুধও প্রচুর হয়, নীলাম্বর অনেক কষ্টে পিতৃ-আমলের এই সাবেকী চাল বজায় রাখিয়াছেন, যদিও তাহাতে কন্যাদায়ে অর্থাভাব বেশীই পরিলক্ষিত হয়।

নীহারিকা স্বাস্থ্যবতী, গৌরাঙ্গী, সুকেশা—মুখের কোন খুঁৎ নাই—অঙ্গ-সৌষ্ঠবও সুন্দর—কিন্তু তবুও নীলাম্বরের কন্যা লইয়া চিন্তার অবধি নাই। কিন্তু, এই সব গুণ আজ আর আমাদের যুবকদের আকৃষ্ট করে না। তাঁহারা শিক্ষিতা স্ত্রী চাহেন।

কলিকাতার তথাকথিত শিক্ষার কেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে নারীশিক্ষার প্রসার দিন দিন বাড়িতেছে—কলেজের গেটের এদিক্ ওদিক্ বা ইস্কুলের গেটের কিছু দূরে অনেক ছাত্র দাঁড়াইয়া থাকে। যে সব বালিকা বা তরুণীর পিতাদের এমন পয়সা নাই যে, মাসিক মাহিনা ছাড়া বাস্-ভাড়া দিতে পারেন বা বিদ্যালয় হইতে বাড়ী, বাসা বেশী দূরে নয়, এই সব ছাত্রীদের সহিত ছাত্রদের বন্ধুত্ব ও মেলা-মেশা চলে, কিন্তু বিদ্যালয়ে বিভিন্ন সময়ে ক্লাস করিলেই এ ব্যাপার বন্ধ হইতে পারে না, যদি কন্যার পিতারা এ বিষয়ে সচেতন না থাকেন। কিন্তু, আমরা কি আজ সচেতন আছি? বোধ হয় পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহ আমাদের বুদ্ধি, বিদ্যা সবই ম্লান করিয়া অচেতন অবস্থায় পৌঁছাইয়া দিয়াছে। জনৈক বলিতেছেন বটে, "জাগো"—কিন্তু কেহ কিন্তু রাত্রি কিংবা দিন।

সকলেই দিশাহারা হইয়া পতঙ্গের ন্যায় ছুটিয়াছেন অনন্ত অন্ধকারের দিকে, দেশময় বাঙ্গালী জাতির পিপীলিকার ন্যায় পাখা গজাইয়াছে, ছুটিয়াছে বিভ্রান্ত হইয়া আলোকের দিকে, কিন্তু এ আলোক কি করিবে? সমগ্র জাতির বৈশিষ্ট্য নষ্ট করিয়া তাহাকে পিপীলিকার ন্যায় ক্ষণস্থায়ী পরিণত করিবে মাত্র।

যে সব কথা খবরের কাগজে লেখা হয় এবং হয় না, এমন অনেক কথাই নীলাম্বরের মনে হয়। তিনি নিতাইদার নিকটে কিছু সুসংবাদ পাইবেন মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু সুসংবাদের পরিবর্ত্তে নিরাশার মেঘ তাঁহার হৃদয়াকাশে যে আরও ঘনীভূত হইয়া উপস্থিত হইবে, তাহা তিনি ভাবেন নাই।

বিষণ্ণমনে নীলাম্বর আহারে বসিয়াছেন—কি সুন্দর বড় বড় গলদা চিংড়ি আর কি সুন্দর রন্ধন করিয়াছে নীহারিকা। তাহার পিতা আহ্নিকের পর ছেলেপিলের আগ্রহে স্বর্গাত কলেবরে এই গলদা চিংড়ি আনিয়াছেন। সে পিতার নিকটে বসিয়া বাতাস করিতেছে। নীলাম্বর বিষণ্ণমনে আহার করিতেছিলেন, নীহারিকাকে বলিলেন, "নীরু কি সুন্দর মাছের কোর্ম্মা রেঁধেছিস্, পুদিনা দিয়ে এত সুন্দর মাছের কোর্ম্মা তোর মা-ও রাঁধতে পারেন না। যে মুহূর্ত্তে এই বাণী উচ্চারিত হইয়াছে সেই মুহূর্ত্তে এক স্থূলাঙ্গী মহিলা ঘরে সশব্দে প্রবেশ করিলেন। কন্যার মাতাকে দেখিয়া নীলাম্বর একটু অপ্রস্তুত হইলেন। তিনি চিন্তা করিতে পারেন নাই যে, তাঁহার স্ত্রী এত নিকটেই ছিলেন। সৌদামিনী হাসিয়া বলিলেন, "তোমার মেয়েকে কোর্ম্মা পুদিনা দিয়ে রাঁধতে শেখাল কে"?

নীলাম্বর বলিলেন, "তুমি শিখিয়েছ না কি?

সৌদামিনী উত্তর দিলেন, "আমি নয় তো কি গদাধরের পিসী?" নীহারিকা হাসিয়া বলিল, "বাবা আমি যা রাঁধি তাই বলেন খুব ভাল হয়েছে।"

আহার শেষ হওয়ার পর নীলাম্বর ছাদে মাদুরের উপর শয়ন করিলেন। আকাশে চাঁদের আলো ম্লান করিয়া কাল মেঘ আসিয়া চন্দ্রমাকে ঢাকিয়া ফেলিল।

সেই কাল মেঘ আজ নীলাম্বরের হৃদয়েও বিরাজ করিতেছে। নীহারিকা পান লইয়া আসিল। মধুরকণ্ঠে ডাকিল "বাবা"।

তিনি পান লইয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাসের মধ্যে বলিলেন, "কে, নীরু?"

নীহারিকা বলিল, "হাঁ, বাবা। বাবা, তুমি আমাকে ইংরাজী তো আর পড়াও না?"

নীলাম্বর বলিলেন, "সময় পাই নে মা—পড়াব, পড়াব। তুই খুব শীগ্‌গির শিখতে পারিস্।" জ্যেষ্ঠ পুত্র পাচু ছাদে আসিয়া উপস্থিত হইল। পাচু তৃতীয় শ্রেণীতে (পুরাতন মতে) পড়ে। এক দৌড়ে পিতার নিকটে আসিয়া সে বলিয়া বসিল, "বাবা, বাবা, দিদি কি করেছে জান?"

নীলাম্বর বলিলেন, "কি?"

নীহারিকা ধমক দিয়া বলিল, "চুপ কর বড় খোকা।"

কিন্তু, পাচু নাছোড়বান্দা, বলিবেই—সে বলিল, "বাবা, আমার সে ট্রান্সলেশন ঠিক করে দিয়েছে। আলকাবরার ঝাঁক করে যেন—আর—"

নীলাম্বর বলিলেন, "বলিস্ কি বড় খোকা! ও সব শিখলো কবে?" এই সময় মেজ খোকাও আসিয়া দাঁড়াইল। নীলাম্বরের এই ছেলেটি এক বৎসরের পাকী কিন্তু ভারী বুদ্ধিমান্, নাম ইন্দুর। একলম্ফে পিতার নিকটে আসিয়া বলিল, "বাবা, কথা আছে।"

নীলাম্বর বলিলেন, "কি কথা রে?"

ইন্দুর বলিল, "দিদির চালাকী আছে—বুঝেছ বাবা।"

নীলাম্বর বলিলেন, "এখনো বুঝি নি, বল্।"

ইন্দুর বলিল, "দিদি দাদাকে সন্দেশ, পর দুধ বেশী দিয়ে হাত করে ওর কাছে আগে পড়া শিখতো এখন দাদার চেয়ে সব বেশী শিখে ফেলেছে।"

কাজকর্ম্ম শেষ করিয়া সৌদামিনী স্বামীর কাছে আসিয়া বলিলেন, "পালা এখান থেকে। ইন্দুকে আমি দেখতে পারি নে—এক রত্তি ছেলে আবার কথা কি পাকা পাকা। যা এখান থেকে।"

নীলাম্বর বলিলেন, "তুমি ও রকম করছ কেন বউ—ওর কথা আমার বড় ভাল লাগে।"

গৃহিণী চটিয়া বলিলেন, "তা তো ভাল লাগবেই। ও তোমার চায়ের কাপ, কাঁচের গেলাস, পাড়ার কাঁচ ভেঙ্গে পরমাণ করে দিচ্ছে—সেই তোমার প্রিয়।"

নীলাম্বর হাসিয়া বলিলেন, "বড় বৌ, ওর মধ্যে আমি দেখি নিজেকে। আমি ঠিক ছিলাম ঐ রকম ছেলে-বেলায়।"

সৌদামিনী বলিলেন, "ছেলেগুলোর মাথা খাচ্ছ ঐ রকম করে।"

নীলাম্বর আর কিছু বলিলেন না। নীহারিকা এই কথার মধ্যে চলিয়া গিয়াছে। দুই পুত্রও উঠিতেছে। নীলাম্বর বলিলেন, "পালোঞ্জিস্ কেন তোরা।" নীলাম্বর কেন এই কথাবার্ত্তার মধ্যে নিজের চিত্তাকে দূর করিতে চেষ্টা করিতেছেন। সৌদামিনী বলিলেন, "না না ওরা নীচে থাক। সমস্তদিন খাটুনী তোমার, তারপর রাত সাড়ে দশটা, এখন ওরা সব গলর গলর করে এসেছে, যা সব।"

তাহারা চলিয়া গেল। নীলাম্বর খানিক পরে বলিলেন, "বড় বৌ, যাব না কি অরুণের বাড়ীতেই, কিন্তু বড় অপমান করছিল, অরুণের সঙ্গে পড়তো যে মেয়েটি, তার বাবাকে, শুধু বাবাকে নয়, হয়তো ওকেই—"

সৌদামিনী সকল কথাই শুনিয়াছিলেন। সেই শোনা কথা লইয়া স্বামী-স্ত্রীতে আলোচনা করিয়া বহু রাত্রি যেমন যাপন করিয়াছেন, আজও তেমনি করিলেন।

তারপর চাঁদ যখন আকাশে অনেকখানি উঠিল, তখন দু'জনে নীচে নামিয়া আসিলেন।

নীহারিকা তখনও আলো জ্বালাইয়া বাবার শিক্ষিকা হইবার সাধনায় রত। সে জানে, বাবা-মা তাহারই কথা লইয়া উপরে দুশ্চিন্তা করিতেছেন। সাধ্যমত নীরবে সে সেই দুশ্চিন্তার সহযোগিতা করিয়া যায়।

[ক্রমশঃ

সংবাদ ও মন্তব্য

আসুরী শক্তি

৩রা বৈশাখ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকায় সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখিত হইয়াছে: মানুষ বুদ্ধি ও প্রতিভার বলে প্রকৃতির যে নিগূঢ় রহস্য, অন্তর্নিহিত অপরিমেয় শক্তির সন্ধান পাইয়াছিল, তাহাই আজ তাহার আত্মহত্যার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিজ্ঞানে মানুষের দৈবীশক্তির বিকাশে যতটা সাহায্য করিয়াছে, তাহার চেয়ে বেশী সহায়তা করিয়াছে তাহার আসুরী শক্তির বিস্ফোরণে।

"তাহে তবু মহত্ত্বার না"—আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় স্বীকৃতির উল্লিখিত সাক্ষ্য দেখিয়া আমাদের এই প্রবাদ-বাক্য মনে পড়িতেছে। "বুদ্ধি ও প্রতিভার বল মানুষের আত্মহত্যার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে"—এমন আশ্চর্য-রূপে পরস্পর-বিরোধী চিন্তা করিতে বাধিল না? যদি প্রকৃত প্রস্তাবে মনুষ্য প্রকৃতির নিগূঢ় রহস্যের সন্ধান লাভ করিতে পারিত, তাহা হইলে কি তাহা আত্মহত্যার কারণ হইতে পারিত? আধুনিক বিজ্ঞান কি প্রকৃতির রহস্যের সন্ধান পাইয়াছে? সন্ধান পাইলে প্রতিনিয়ত প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মনুষ্য জাতিকে আজ বিধ্বস্ত হইতে হইতেছে কেন? কেন আজিও এক-পর মনুষ্য জাতি ভূমিকম্প কিংবা বন্যার হাত হইতে রক্ষা পাইবার উপায়ের সন্ধান পাইল না? মনুষ্যজাতির চিকিৎসা-শাস্ত্র আজিও হাজারো রকমে অনির্দেশ্য অন্ধকূপে নিপতিত কেন? কেন আজিও প্রতি দেশের অধিবাসীর শতকরা আশী নব্বই জনই অজ্ঞাতসারে অন্যায়ে মৃতপ্রায়, যাহারা তাহা নহে, তাহারা অশান্তি ও অনবস্থিতে ক্ষিপ্তপ্রায় কেন? প্রকৃতির নিগূঢ় রহস্যের এবং অপরিমেয় শক্তির পাইয়াছে বলিয়াই কি এই-রূপটি হইয়াছে? আনন্দবাজার ভাবিয়াছেন বটে, কিন্তু আজিও মতকান নাই। তাই বিজ্ঞান যতটা দৈবীশক্তির বিকাশ করিয়াছে, তাহাকেই ঝাঁকড়াইয়া ধরিতে চাহিতেছেন, অথচ ইহাও বলিতেছেন যে, উহা তদপেক্ষা অধিক আসুরী শক্তির বিস্ফোরণ করিয়াছে। এই শ্রেণীর পরস্পর-বিরোধী কথা বলিবার রীতিও আধুনিক বিজ্ঞানেরই অন্যতম কেরা-মতি। গল্পে শুনিয়াছিলাম, কে একজন বৃদ্ধা প্রতিবেশীর পুত্রের দুরবস্থা দর্শনে সান্ত্বনা দান করিয়া বলিয়াছিল, "মরিয়াছে বটে, কিন্তু ভাগ্য ভাল চক্ষু বাঁচিয়াছে।" দৈবীশক্তি বনাম আসুরী শক্তির লড়াইয়ে মনুষ্যজাতির আজ সেই অবস্থা। কিন্তু আনন্দবাজারের ইংরেজী শিক্ষিত(?) সম্পাদকমণ্ডলী স্বীকার করুন আর নাই করুন, যাহারা এই বিজ্ঞানের আবিষ্কর্তা, তাহাদের টনক নড়িয়াছে—নিম্নে তার নিদর্শন মিলিবে।

ষ্টেটসম্যানের স্বীকারোক্তি

২৫শে চৈত্র অর্থাৎ ৮ই এপ্রিল তারিখের সম্পাদকীয় স্তম্ভে ষ্টেটসম্যান পত্রিকা লিখিয়াছেন: বাঙ্গালার নদ-নদীর কাণ্ড-কারখানা দেখিলে তাহাদিগকে বেঈমান বলিতে বাধা হইতে হয়। যদি তাহা-দিগকে মনুষ্যজাতির হিতের জন্য একটি কোর্টে দাঁড় করান যায়, অমনই তাহারা অপরাধকে প্রচুর অধিক সাক্ষ্য দিবে। তাহাদিগকে হয় তো কৃষকের কৃষিক্ষেত্রে লাগান গেল, কিন্তু তাহারা কৃষকের ধান্যের সর্বনাশ করিয়া বসিল। যদি তাহাদিগকে গ্রাম কিংবা ফসলের ক্ষেত ডুবাইবার কাজ হইতে নিরস্ত করা হইল, অমনই তাহারা বাণিজ্য এবং নৌ-চলাচলের পথে বিঘ্ন উপস্থিত করিল। তাহাদিগকে বাঁধ দিয়া সঙ্কীর্ণ করা গেল, অমনই তাহারা জমির উর্বরতা সাধনে লাগিয়া গেল। যদি তাহাদের বন্যা-প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা হয়, তাহারা জমীকে হয় তো সরস করিল, কিন্তু বন্যার প্রাবনে জনপদবাসীকে বিব্রত করিয়া তুলিল। যাঁহারা প্রকৃতিকে মানুষের কাজে লাগাইতে চাহেন, তাঁহাদিগকে বিজ্ঞ ও বিনয়ী হইতে হইবে।

ষ্টেটসম্যান বাঙ্গালার নদ নদীর উল্লেখে যাহা বলিয়াছেন, তাহা যে কেবল বাঙ্গালার নদ-নদী সম্বন্ধেই প্রযুক্য, এমন কথা নহে, পৃথিবীব্যাপী নদ-নদীর সম্বন্ধেও ঐ একই কথা খাটে এবং আজ যাঁহারা প্রকৃতিকে মনুষ্যের কার্যে লাগাইতে উৎসাহী হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই বিজ্ঞ ও বিনয়ী হইবার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে। প্রকৃতি মনুষ্য-রচিত কলের পুতুল নহে যে, তাহাকে যাহা বলা যাইবে, তাহাই করিবে। প্রকৃতির বিধি-নিষেধ জানিলে তবেই তাহাকে কার্যে লাগান যাইতে পারে—আধুনিক বিজ্ঞান প্রকৃতির কোন বিধি-নিষেধই অদ্যাবধি আবিষ্কার করিয়া উঠিতে পারে

নাই বলিয়াই প্রকৃতির হস্তে মনুষ্যজাতির আজ নিষ্কৃতির অন্ত নাই। আনন্দবাজারের সম্পাদক-মণ্ডলী জানিয়া রাখুন, আজ হউক কাল হউক, মনুষ্যকে প্রকৃতির এই নিয়ম-কানুনের সন্ধান পাইতেই হইবে। তাহার একমাত্র উপায় হইতেছে, যাহাকে আমরা বলিতেছি স্বধ-বিজ্ঞানের সন্ধানলাভ। মনুষ্যদেহের শব্দের উন্মেষ, বিকাশ, বৃদ্ধি ও লয়ের বিজ্ঞানের জ্ঞানই ইহার একমাত্র উপায়। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত বস্তাদি সাহায্যে তাহা হইবার উপায় নাই। উহার বিজ্ঞান অর্জ্জনের জন্ত অন্তর্মুখী সাধনার প্রয়োজন। মনুষ্যদেহকে লাবরেটরি জ্ঞান করিয়া তাহার পরীক্ষায় সিদ্ধ হইলেই তবে উহার জ্ঞানলাভ সম্ভব। সেই জ্ঞানলাভের দ্বারা বিশ্ব-জগতের আজন্তের নিয়ম-কানুনের উপলব্ধি সম্ভব। সেই জ্ঞানলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়াই ভারতীয় ঋষি তাঁহাদের গবেষণার দ্বারা এমন সমাজ-রচনা করিয়া গিয়াছিলেন, যাহা লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া পৃথিবীর নরনারীকে সুখ-সমৃদ্ধ রাখিয়াছিল। ইহা আজ উপকথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং আমাদের এই উক্তিকে আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তি "কুসংস্কার" বলিতেছেন, কিন্তু আমরা তাঁহাদিগকে আরও কিছুকাল অপেক্ষা করিতে বলি। যখন বস্তা-ভর্ত্তি আধুনিক বিজ্ঞান উজাড় করিয়া দিলেও দুই বেলা দুই মুষ্টি অন্নের সংস্থান হইবে না, তখন আমাদের কথা তাঁহাদের উপলব্ধি হইবে।

অমৃতবাজারী স্বরাজ

২১শে চৈত্র অর্থাৎ ৩রা এপ্রিলের সংখ্যায় অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে: পুলিশ কনষ্টেবলকে যদি চুলি পরাইলে স্বরাজ লাভ হইল বলিয়া আমরা মনে করি না। যে নৈতিক শক্তি আমাদিগের বন্ধন মোচন করিবার সামর্থ্য এবং সাহসবান করিবে, তাহা আমরা সকল বিষয়ে স্বাবলম্বী হইয়া জ্ঞান লাভ করিলে এবং দেশবাসী সকলের সহিত ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হইতে পারিলে লাভ করিব।

০

কি করিয়া আমরা সকল বিষয়ে স্বাবলম্বী হইব এবং দেশবাসী সকলের সহিত ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হইতে পারিব, যাহা না হইলে আমাদের এই নৈতিক শক্তি লাভ হইবে না, তাহা কিন্তু সম্পাদক মহাশয় না বলিলেই তাঁহার কর্ত্তব্য লাভ করিয়াছেন। সকল বিষয়ে স্বাবলম্বী হওয়া এবং দেশবাসীর সহিত ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হওয়ার ব্যাপার সম্বন্ধে আমরা সকলেই একমত, কিন্তু কার্য্যকালে কি হইতেছে? অমৃতবাজার পত্রিকা কার্য্যকালে কি রীতি অনুযায়ী চলেন, তাহা দেখাইবার নিমিত্ত নিম্নে তাঁহাদের অদ্য ও ই দিনের সম্পাদকীয় মন্তব্যের সঙ্কলন করিলাম।

ঐক্যসাধনের পন্থা

২২শে চৈত্র তারিখে অমৃতবাজার পত্রিকা লিখিয়াছে: মিঃ জিন্না বলিয়া রাখুন যে, প্রয়োজন হইলে ভারতবাসী ২২ কোটি হিন্দুই স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিবে ...

০

ঐক্যসাধনের এইরূপ অদ্ভুত পন্থার বিশ্বাসী বলিয়াই কংগ্রেস হইতে বেশ বর্ত্তমান ঐক্যসাধনের যে চেষ্টা চলিতেছে, তাহার ফল দাঁড়াইয়াছে দেশবাসী জনসাধারণের শতধাবিভিন্নতা। আমরা বহুবার বলিয়াছি এবং আবার বলিতেছি যে, যে-চেষ্টাকে দেশবাসী জনসাধারণের একজনও স্বার্থবিরোধী বলিয়া মনে করিবে, সে চেষ্টায় কখনও দেশবাসীর ঐক্য সাধিত হইবে না। ইহারই জন্ত আমরা বারংবার বলিতেছি, দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় ঐক্যসাধনের পন্থা হইতেছে দুইটি, (১) রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আন্দোলন বর্জ্জন এবং কায়মনোবাক্যে ইংরাজ জাতির বিরোধিতা ত্যাগ, ও (২) আর্থিক স্বাধীনতার কার্য্যগ্রহণ। এই কার্য্যে অগ্রসর হইলে মিঃ জিন্নারও বলিবার তাহার বিরুদ্ধে কিছু বলিবার থাকিবে না, তেমনই কোন তৃতীয় পক্ষের অন্তরায়ে সন্ধিগ্ধ হইবার কারণ উপস্থিত হইবে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ঐক্য সাধনের কথা বলিলেও অমৃতবাজার কার্য্যতঃ তাহার বিরোধিতাই সাধন করিতেছেন।

স্বাধীন হইবার পন্থা

২৩শে চৈত্র তারিখে অমৃতবাজার পত্রিকায় লিখিত হইয়াছে, যদি বাঙ্গালার সরকারে মুসলমান সম্প্রদায়ের অন্ত পনরটা চাকুরী নির্দ্দিষ্ট রাখিতে চাহেন, তাহাতে হিন্দু সম্প্রদায়ের ক্ষুব্ধ হওয়া উচিত হইবে।

০

আমরা দেখিয়াছি, অমৃতবাজার পত্রিকা দেশবাসীকে স্বাবলম্বনে উদ্বুদ্ধ করিয়া নৈতিক শক্তি অর্জ্জনের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু আবার স্ব-সম্প্রদায়ের অন্ত চাকুরী

বজায় থাকিল না বলিয়া 'হায়-হায়'ও করিতেছেন। চাকুরীর দ্বারা যে স্বাবলম্বী হওয়া যায় না, ইহা কয়েক শত বৎসরের অভিজ্ঞতাতেও কি শিক্ষা হইল না? স্বাবলম্বনের বাণী প্রচার এবং তদনুযায়ী কার্য্য করা, এই দুইটী বিষয় স্বতন্ত্র। মুখের কথা এবং বাস্তব কার্য্য, এই দুইটীর পার্থক্য সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় হইলে বুঝা যাইবে যে, আমাদের জাতীয় জীবনে আজ যে-সকল কথা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, তাহারাই প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের সকল উন্নতির বিরোধী হইয়া উঠিয়াছে। স্বাধীনতা এবং স্বাবলম্বনের কথা যত বলা হইতেছে, ততই উহাদের পথে বাধা উপস্থিত করা হইতেছে।

আনন্দবাজারের স্বীকারোক্তি

"দুঃখের ঘন অন্ধকারে" শীর্ষক যে সম্পাদকীয় গত বৈশাখ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকায় সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখিত হইয়াছে: বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কবল হইতে মুক্তিলাভের জন্য আমরা যে স্বাধীনতা আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিলাম, আজ তাহার পরিণতি কোথায় গিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা চিন্তা করিলে মন বিষাদে ও বৈরাগ্যে পূর্ণ হইয়া উঠে। পর এক পতাকা ধরিয়া সহস্র সহস্র কর্মী যে স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য অসীম ত্যাগ ও দুঃখ বরণ করিয়াছে, গৃহ-পরিবার, আরাম-বিলাস তুচ্ছ করিয়াছে, নিন্দা ও গ্লানি মাথায় করিয়া জিলে জিলে বরণ করিয়াছে, আগুন লইয়া খেলায় মাতিয়া খেলোয়াড় ভাবে প্রাণ বিসর্জন দিয়াছে, সেই আন্দোলনের প্রতি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কূটনৈতিক চালে সাম্প্রদায়িকতার পাষাণ স্তূপ আগাইয়া রেখিয়া আজ বিরাগ্রস্ত প্রতিহত।

•

আমরা আনন্দবাজারের নিকট হইতে স্বীকারোক্তি লাভ করিয়া খুসী হইয়াছি। কিন্তু, কেন এইরূপ হইল, তাহা আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক-মণ্ডলী চিন্তা করিয়াছেন বলিয়া এই সন্দর্ভ হইতে আমরা বুঝিতে পারিলামনা। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীর চালেই এইরূপ ঘটিয়াছে, তাহা হইলেও এই আন্দোলনের সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত হইবার কিছুই থাকিতে পারে না। "ত্যাগ ও দুঃখ বরণ" এবং "আগুন লইয়া খেলা" এই দুইটি কি পরস্পর-বিরোধী নহে? যাহারা "খেলা" করে, তাহারা কি দুঃখ ও ত্যাগ বরণ করিতে পারে? দুঃখ ও ত্যাগ বরণ কি খেলা করিবার জিনিষ? প্রাণরক্ষার নিমিত্ত প্রাণ বিসর্জন দিবার যে নাটকীয় ভঙ্গিমা, তাহা প্রচলিত সাহিত্যে চালু করিবার চেষ্টা হইলেও, বাস্তবতঃ তাহা অসম্ভব। সুতরাং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কূটনীতির চালেই হউক আর নিজেদের নির্বুদ্ধিতাতেই হউক, ইহা খেলাতেই পর্য্যবসিত হইয়াছে।

নববর্ষের বাণী

ঐ সন্দর্ভেই লিখিত হইয়াছে, তাহাতে স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম বাঙ্গালী, তাহাতে একজাতীয়তার প্রথম স্বপ্ন দেখিয়াছিল বাঙ্গালী, স্বাধীনতা সংগ্রামে যাহাদাতি, লাঞ্ছনা, দুঃখবরণ, এমন কি মৃত্যুবরণ বাঙ্গালী যে ভাবে করিয়াছে, তাহার তুলনা নাই।...

তাহাতে জাতীয়তার মন্ত্র বাঙ্গালীই প্রথম দেখিয়াছিল, সুতরাং সমগ্র ভারতের সঙ্গে বাঙ্গালী কখনও তাহার যোগসূত্র ছিন্ন করিতে পারে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বাঙ্গালী জাতির আজ দুর্দিন আসিয়াছে, তাহাকে নিজের ও বিশ্বের পরিস্থিতিকে বোঝবার চেষ্টা করিয়া আত্মরক্ষার সাধনায় ব্রতী হইতে হইবে, ইহাই আজ বাঙ্গালী জাতির কাছে নববর্ষের বাণী।

•

বাঙ্গালী যাহা করিয়াছিল তাহার ফল দেখিয়াও তাহার জন্য কি আজ তাহাকেই জন্য গর্হণবোধ করিতে হইবে? একদিকে সর্ব্বভারতীয় যোগসূত্র ছিন্ন না করার অনুরোধ এবং অন্যদিকে আত্মরক্ষার সাধনার জন্য নির্দ্দেশ—ইহা কি চিন্তাশক্তির সামঞ্জস্যবিহীনতার পরিচায়ক নহে? বাঙ্গালী যাহা করিয়াছিল, তাহা ভালর জন্যই যদি করিয়া থাকে, তবে আজ আবার নূতন করিয়া তাহার কিছু করিবার জন্য নির্দ্দেশ দিবার প্রয়োজন কি? এবং যদি তাহা সুফল প্রসবই না করিয়া থাকে তবে তাহার সহিত যোগসূত্র ছিন্ন না করিবার জন্যই বা ব্যস্ততা কেন? আমরা আনন্দবাজারের সম্পাদক-মণ্ডলীকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি, জাতির এই দুর্দ্দিনে তাঁহারা চিন্তাধারার এই ফাঁকি লইয়া বাজার মাৎ করিবার চেষ্টা হইতে বিরত হউন্। দেশবাসীকে মিথ্যার বেসাতী বিক্রয় করিয়া তাহাদের দুর্দ্দশা আর যেন তাঁহারা না বাড়ান্। আমাদের অনুরোধ রক্ষা করিলে তাঁহাদের ক্ষতি কিছুই হইবে না, পরন্তু যথেষ্ট লাভ হইবে।

রবীন্দ্রনাথের উক্তি

১লা বৈশাখ সায়ংকালে স্বকীয় জন্মদিনের অনুষ্ঠানে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ যে ভাষণ দান করেন, তাহার মর্ম্ম উক্ত হইয়াছে: মানুষ প্রথমে সঙ্কীর্ণ সীমার আবদ্ধ থাকে, সে থাকে কুঁড়ির মত সঙ্কুচিত, ক্রমশঃ যখন সেই কুঁড়ির বিকাশ হয়, তখন সূর্য্য চন্দ্র গ্রহের আশীর্ব্বাদ সে লাভ করে...

•

রবীন্দ্রনাথ না কি প্রকৃতির কবি। প্রাকৃতিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে তাঁহার দৃষ্টিনিপুণতার এই পরিচয় লাভ করিয়া আমাদের কিন্তু ইহা স্বীকার করিতে বাধিতেছে। কুঁড়ির বিকাশের পূর্ব্বে সূর্য্য চন্দ্র তাহার আশীর্ব্বাদ লাভে কুঁড়ি বঞ্চিত থাকে বলিয়া আমরা জানিতাম না।

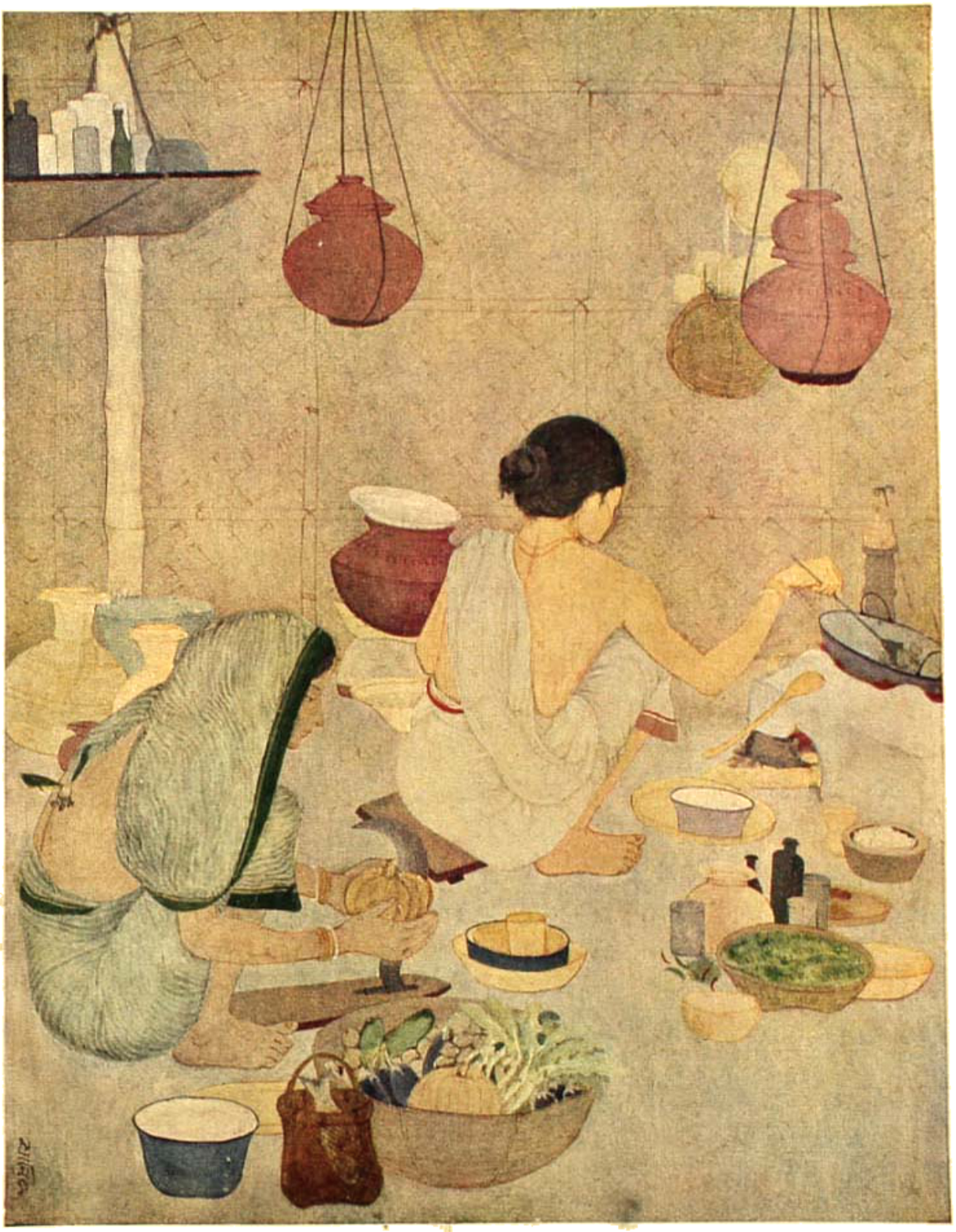

গৃহস্থালী। [শিল্পী—শ্রীমণিলাল বন্দ্যো:

"তদ্ধমীস্ত্বং ধান্যরূপাপি প্রাণেনা প্রাণদায়িনী"

বসুন্ধরা

জ্যৈষ্ঠ—১৩৪৬

৭ম বর্ষ, ১ম খণ্ড—৭ম সংখ্যা

সম্পাদকীয়

—শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য

ভারতীয় ঋষির সভ্যতা ও কৃষ্টি সম্বন্ধে আধুনিক ধারণার নমুনা

অনেকেই ভারতীয় ঋষির ধর্ম্ম, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি ও সমাজনীতি সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া থাকেন। ইহাঁদিগের মধ্যে কতকগুলি কাল্পনিক আচার প্রতিপালন করিয়া মনে করেন যে, তাঁহারা ঋষির নির্দ্ধারিত আচার প্রতিপালন করিতেছেন এবং উহাই ভারতীয় ঋষির নির্দ্ধারিত ধর্ম্ম। কেহ বা ঋষি-প্রণীত দু'একখানি গ্রন্থের সামান্যমাত্র ভাষ্য ও টীকা অধ্যয়ন করিয়া ভারতীয় ঋষির জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে সুনিপুণ (expert) হইয়া পড়িয়াছেন বলিয়া আত্ম-প্রচার করিয়া থাকেন এবং নানা রকমের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন। কেহ বা ঋষি-প্রণীত মূল গ্রন্থ তো দূরের কথা, মূল ভাষ্য ও টীকা পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া কেবলমাত্র কোন কোন সমালোচনার কয়েকখানি পাতা উল্টাইয়া ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস রচনা করিতে প্রবৃত্ত হন।

ইহাঁদিগের মধ্যে কেহ বা ভারতীয় ঋষির ধর্ম্ম ও কৃষ্টি সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করেন, কাহারও মতে ভারতীয় ঋষির জ্ঞান-বিজ্ঞানে ভাল কথাও আছে এবং

[illegible]

আধুনিক জগতের কেহই ভারতীয়

সহিত সম্যক্ নিভুলভাবে

নহেন। ইহাঁদিগের প্রত্যেকের কথাই

জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ে সত্য ও মিশ্রিত এবং

কাহারও কথা হইতে ভারতীয় ঋষির মূল

নিভুলভাবে জানা সম্ভব নহে। ইহাঁদের

ঋষির জ্ঞান-বিজ্ঞানকে মনুষ্যসমাজের আদিম

ও বর্ব্বরতার নিদর্শন বলিয়া মনে করেন, তাঁহা-দিগের কথাগুলি যেরূপ অজ্ঞতার পরিচায়ক, যাঁহারা ঐ সম্বন্ধে উচ্চতম ধারণা পোষণ করেন, তাঁহাদিগের কথাগুলিও ঠিক এই ভাবের বিরূপ উৎপাদক। আমা-দিগের উপরোক্ত ধারণা সমীচীন নহে তাহা পাঠক-বর্গকে দেখাইবার জন্য এই সন্দর্ভে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। আমাদিগের মতে জ্ঞান বিজ্ঞান সম্বন্ধে ভারতীয় ঋষিগণ

যে সমস্ত গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহা সম্যক্ ভাবে জানিতে পারিলে যাইবে যে, ঐ গ্রন্থসমূহের একমাত্র উদ্দেশ্য মানুষ কি করিয়া সর্ব্ববিধ কর্ম্মের নৈপুণ্য লাভ করিয়া ও সর্ব্ববিধ জ্ঞানের অধিকারী হইয়া সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বতোভাবে সর্ব্ববিধ দুঃখ হইতে মুক্ত হইতে পারে অথবা এক কথায় মানুষ কি করিয়া সর্ব্বসম্পন্ন নিখুঁৎ (perfect) হইতে পারে তাহার রাস্তা দেখান। আজকালকার প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের অনেকে মনে করেন যে, ভারতীয় ঋষিগণ জগতের বিভিন্ন সময়ে তাঁহাদিগের বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, এই প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের অনেকেই ঋষিগণের মূল গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন না এবং অধ্যয়ন করিতে সক্ষম নহেন। ইহাঁরা ঋষি-প্রণীত সংস্কৃত ভাষা পর্য্যন্ত পরিজ্ঞাত নহেন। যাঁহারা প্রকৃত সংস্কৃত ভাষা জানেন না এবং যাঁহারা ঋষি প্রণীত মূল গ্রন্থসমূহ যথাযথ অর্থে অধ্যয়ন করিতে সক্ষম নহেন, তাঁহাদিগের পক্ষে ঐ ঐ গ্রন্থের প্রণয়ন-কাল নির্দ্ধারণ করা কখনও সম্ভবযোগ্য হইতে পারে না। ঋষি-প্রণীত সংস্কৃত ভাষা পরিজ্ঞাত হইয়া বেদাঙ্গ, মীমাংসা, দর্শন, তন্ত্র, বেদ, পুরাণ, সংহিতামূলক স্মৃতিশাস্ত্র ও উপবেদ যথাযথ অর্থে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, ঐ সমস্ত-বিষয়ক প্রত্যেক গ্রন্থখানি মূল বক্তব্যের (অর্থাৎ মানুষ কি করিয়া সর্ব্বসম্পন্ন নিখুঁৎ হইতে পারে তদ্বিষয়ক পন্থার) এক একটী অংশ মাত্র। ঋষিগণের দ্বারা প্রণীত সর্ব্বসমেত যতগুলি গ্রন্থ আছে, তাহার কোনখানির অভাব হইলে মূল বক্তব্যের অঙ্গহানি হইয়া থাকে। কাযেই, ঋষিগণের মূল বক্তব্য পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে, তাঁহাদিগের বিভিন্ন গ্রন্থ যে বিভিন্ন সময়ে রচিত হইয়াছে, তাহা মনে করা চলে না। পরন্তু, ঋষিগণ যে তাঁহাদিগের সমস্ত গ্রন্থ একই সময়ে রচনা করিয়াছিলেন, তাহা স্বীকার করিতে হয়। আজকালকার অনেকের ধারণা যে, মানুষ কি করিয়া নিখুঁৎ হইতে পারে তাহার পন্থা কেহ নির্দ্দেশ করিতে পারেন না এবং মানুষের পক্ষে সর্ব্বতোভাবের নিখুঁৎ হওয়া সম্ভব নহে। ঋষিগণের গ্রন্থসমূহের মূলভাগের সহিত পরিচিত হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, ঐ ধারণা আদৌ সত্য নহে। সকল মানুষের পক্ষে নিখুঁৎ হওয়া যে সম্ভব নহে, তাহা সত্য বটে কিন্তু চেষ্টা করিলে কোন কোন মানুষ নিখুঁৎ হইতে পারে এবং তাহার পন্থা ঋষিগণ অতি স্পষ্ট ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ঋষিগণের সমস্ত কথা সর্ব্বতোভাবে উপলব্ধি করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, উঁহাদিগের প্রত্যেক কথাটী সমালোচনার অতীত, কারণ, তাঁহারা যে সমস্ত কথা কহিয়াছেন তাহা যতই জটিল হউক না কেন, উহার প্রত্যেকটী কি করিয়া প্রত্যক্ষ করিতে হয় তাহার পন্থা তাঁহারা দেখাইয়াছেন।

আধুনিক পণ্ডিতগণের কেহই ঋষিগণের ঐ কথাগুলি যেরূপ পরিজ্ঞাত নহেন, সেইরূপ আবার ঐ কথাগুলি প্রত্যক্ষ করিবার পন্থা সম্বন্ধেও পরিজ্ঞাত নহেন। ইহার ফলে প্রত্যেকেই প্রায়শঃ নিজ নিজ কল্পনাকে ঋষির কথা বলিয়া প্রচার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ঐ কল্পনাগুলি কাহারও কাহারও হাতে ঋষির কথার অনুরূপ হইয়াছে এবং কাহারও কাহারও হাতে উহার বিরুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপে যাহা আসলে ঋষির কথা নহে, তাহাকে ঋষির কথা মনে করায় উহার মধ্যে ভুল ও নির্ভুল এই দুই দিকই পাওয়া যায়। কিন্তু, বস্তুতঃ পক্ষে যাহা আসলে ঋষির কথা, তাহা সম্যক্ ভাবে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, উঁহাদিগের প্রত্যেক বাক্যটী সর্ব্বতোভাবে সত্য এবং কুত্রাপি অসত্য বিদ্যমান নাই।

ঋষিগণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল মানুষগণ পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের অজ্ঞতাবশতঃ কিরূপে ঋষির কথা ভ্রমপ্রমাদযুক্ত করিয়া তোলেন তাহা দেখান এই সন্দর্ভের প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যে আমরা বাঙ্গালার দুইজন সম্মানযোগ্য মানুষের দুইটী রচনার সমালোচনা করিব। একটী শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায়ের রচিত এবং অপরটী শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের রচিত। একটীর নাম "হিন্দুশাস্ত্র ও মানব প্রগতি" এবং অপরটীর নাম "মত ও পথ"। দুইটী প্রবন্ধই আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। একটী উহার গত ১৬ই

পৌষের সংখ্যায় এবং অপরটী মুদ্রিত ৮ই মাঘের সংখ্যায়।

দুইটী প্রবন্ধ পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে, দুইজন প্রবেতাই ঋষিগণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং দুইজনই ঋষিগণের কথা বলিয়া যাহা যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহার কোনটীই সর্ব্বতোভাবে ঋষিগণের কথার অনুরূপ নহে।

অনিলবরণ বাবু তাঁহার প্রবন্ধের এক অংশে বসন্তবাবুর একটী বক্তৃতার বিরুদ্ধ সমালোচনা করেন এবং বসন্তবাবু ঐ বিরুদ্ধ সমালোচনার প্রত্যুত্তর প্রদান করেন। এইরূপে উপরোক্ত দুইটী প্রবন্ধের অবতারণা সংঘটিত হইয়াছে। উপরোক্ত বাদ ও প্রতিবাদের মূল বিষয়, "বৈধব্য-জীবন পালন সম্বন্ধে হিন্দু প্রথার যৌক্তিকতা ও অযৌক্তিকতা"।

মূল বাদ ও প্রতিবাদ যথাযথ ভাবে বুঝিতে হইলে শ্রীযুক্ত অনিলবরণ বাবুর "হিন্দুশাস্ত্র ও মানব প্রগতি" নামক প্রবন্ধটীর উল্লেখযোগ্য বক্তব্য কি কি, তাহা সর্ব্বাগ্রে জানিতে হইবে। আমাদিগের মতে অনিলবরণ বাবুর প্রবন্ধে কোন কথাই সুশৃঙ্খলিত ও সুস্পষ্ট ভাবে লিপিবদ্ধ হয় নাই। ইহার প্রধান কারণ, অনিলবরণ বাবু তাঁহার প্রবন্ধে যে যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তাহার প্রত্যেকটী সম্বন্ধে তাঁহার চিন্তার অভাব এবং ঐ ঐ-বিষয়ক ঋষিপ্রণীত শাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁহার অপরিপক্কতা। শাস্ত্রের কথা বলিয়া অনিলবরণ বাবু যে সমস্ত কথা লোকসমাজে বিলাইবার চেষ্টা করিয়াছেন কোন দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন সম্পাদকের সংবাদপত্রে ঐ সমস্ত কথার স্থান হওয়া সঙ্গত নহে। ঋষিপ্রণীত শাস্ত্র সম্বন্ধে আনন্দবাজার পত্রিকার কর্তৃপক্ষগণের যদি কোন কাণ্ডজ্ঞান থাকিত এবং জনসমাজের হিত সাধন করিতে হইলে সংবাদপত্রের সম্পাদকগণের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কি কি বিধি ও নিষেধ হওয়া সঙ্গত, তৎসম্বন্ধে ঐ পত্রিকার কর্তৃপক্ষগণের কোন দায়িত্ববোধ থাকিলে আমাদিগের মতে অনিলবরণ বাবুর প্রবন্ধ আনন্দবাজার পত্রিকায় স্থান পাইতে পারিত না।

অনিলবরণ বাবুর প্রবন্ধে কোন কথাই সুশৃঙ্খলিত ও সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ হয় নাই বটে, কিন্তু তিনি যে অনেক কথাই বালকোচিত অস্পষ্টভাবে বলিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহা অস্বীকার করা যায় না।

অস্পষ্টভাবে ঐ প্রবন্ধে যাহা যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা অনুধাবন করিতে পারিলে দেখা যাইবে, অনিলবরণ বাবুর মুখ্য বক্তব্য দুইটী, যথা :—

(১) ভারতীয় সভ্যতা ও আদর্শের প্রকৃতি ;

(২) ভারতীয় সভ্যতা ও আদর্শের প্রতি ভারতীয় বহু লোকের বিরক্তির কারণ।

ভারতীয় সভ্যতা ও আদর্শের প্রকৃতি সম্বন্ধে অনিলবরণ বাবুর মতবাদ

ভারতীয় সভ্যতা ও আদর্শের প্রকৃতি কি তাহা বলিতে বলিয়া অনিলবরণ বাবু তাঁহার প্রবন্ধের প্রথম ভাগেই বলিয়াছেন, 'আজও আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজের মধ্যে এমন অনেকেই রহিয়াছেন, যাঁহারা ভারতের সনাতন আদর্শ, সনাতন ধর্ম্মের উপর শ্রদ্ধাহীন। সকল বিষয়েই তাঁহারা ভারতকে পাশ্চাত্যভাবাপন্ন করিয়া তুলিতে চাহেন, তাঁহাদিগের মতে ভারতের উদ্ধার-সাধনের ইহা ছাড়া আর অন্য পন্থা নাই।' ইহার পর তিনি পণ্ডিত জওহরলালের একটী রচনার অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করিয়াছেন। পণ্ডিত জওহরলালের রচনার ঐ অংশের ভাবার্থ—'ভারতের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থাই সত্য। ভারতের প্রাচীন গৌরব অপক্ক মস্তিষ্কের কল্পনা-বিলাস ভিন্ন আর বেশী কিছু নহে। আমাদিগের সেই তথাকথিত অমর সভ্যতা মরিয়া ভূত হইয়া গিয়াছে। তাহার স্বপ্নে বিভোর হইয়া থাকিবার সময় আর নাই। এখন আমাদের সম্মুখে জীবন্ত জাগ্রত বলিষ্ঠ আদর্শ রহিয়াছে, সোভিয়েট রুশিয়া। ভারতকে এখন তাহারই পদানুসরণ করিতে হইবে।'

পণ্ডিত জওহরলালের উপরোক্ত কথা কয়টি উদ্ধৃত করিয়া অনিলবরণ বাবু বলিয়াছেন যে, বাংলাদেশের তরুণদের মধ্যে আজ অনেকেই এই ভাবের ভাবুক।

অনিলবরণ বাবুর মতে ভারতীয় ধর্ম্ম ও ভারতীয় আদর্শের প্রতি মানুষের এতাদৃশ উপেক্ষার অন্যতম কারণ, হিন্দুর ধর্ম্ম-শাস্ত্রের অধ্যয়নের অভাব। ইহার পর তিনি হিন্দুর ধর্ম্ম ও আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মতে, হিন্দুর ধর্ম্ম ও আদর্শ যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাহার বড় প্রমাণ পাশ্চাত্যগণও হিন্দুর ধর্ম্ম ও আদর্শকে বড় বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। এই সম্বন্ধে অনিলবরণ বাবুর উক্তি—

'পাশ্চাত্য দেশেও যাঁহারা হিন্দুর শাস্ত্রসমূহ কিছুমাত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহারা মুগ্ধ হইয়াছেন, এই মহান্ ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করিয়াছেন, মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন যে, মানবজাতির প্রগতির যে-পথ হিন্দুধর্ম্ম দেখাইয়াছে তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই, সমগ্র মানব জাতিকে একদিন এই পথ ধরিতেই হইবে।'

ভারতবর্ষের ধর্ম্ম ও আদর্শ যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাহা উপরোক্তভাবে প্রমাণিত করিয়া ভারতবর্ষের ধর্ম্মের ও আদর্শের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব কোথায় তাহা দেখাইবার জন্য অনিলবরণ বাবু বলিয়াছেন—'হিন্দু শুধু অধ্যাত্ম সাধনা ও পরকালের চিন্তা লইয়া ব্যস্ত থাকে নাই, ইহকালকে কেমন করিয়া পূর্ণতমভাবে সমৃদ্ধ করিয়া তোলা যায়, ভোগ করা যায়, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সন্ধান করিয়াছে এবং রাষ্ট্রে, সমাজে, ব্যক্তির জীবনে তাঁহাদের গভীর অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানকে সর্ব্বতোমুখী ভাবে প্রয়োগ করিয়াছে।'

হিন্দুর ধর্ম্মের ও আদর্শের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব কোথায় তাহা উপরোক্তভাবে দেখাইয়া ইহকালকে কেমন করিয়া পূর্ণতমভাবে সমৃদ্ধ করিয়া তোলা যায়, ভোগ করা যায়, তাহার সন্ধানও যে হিন্দু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে করিয়াছে তাহা অনিলবরণ বাবু সপ্রমাণিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহা সপ্রমাণিত করিবার জন্য অনিলবরণ বাবু গীতার 'ভুঙ্ক্ষ রাজ্যং সমৃদ্ধং' এই বাক্যটী উদ্ধৃত করিয়াছেন।

সমাজ-সংগঠনে হিন্দুগণ যে গভীর অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য অনিলবরণ বাবু বলিয়াছেন :—'সমাজসংগঠনে হিন্দুর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় মনুসংহিতার ন্যায় স্মৃতিশাস্ত্রে। পাশ্চাত্য দার্শনিক নীট্‌শে এই মনুসংহিতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন, ইহাকে বাইবেলের উপর স্থান দিয়াছেন। তিনি যে উন্নততর মানবজাতি বিকাশের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন তাহাকে কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে মনুসংহিতার ন্যায় ধর্ম্মশাস্ত্রই উপযোগী বলিয়া তিনি মনে করিয়াছিলেন। রাষ্ট্রসংগঠনে হিন্দুগণ যে গভীর অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে বর্ণনা করিতে বসিয়া অনিলবরণ বাবু বলিয়াছেন :—

"রাষ্ট্র-সংগঠনে ভারতীয় প্রতিভার কিছু পরিচয় পাওয়া যায় কৌটিল্য-প্রণীত "অর্থশাস্ত্রে"। এ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন— '• • What a monument of political and administrative genius is the "Sukraniti" • •' অর্থাৎ রাজনৈতিক ও রাজ্যপরিচালনা-সম্বন্ধীয় প্রতিভার কি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত 'শুক্রনীতি'।"

ভারতীয় সভ্যতা ও আদর্শের প্রকৃতি সম্বন্ধীয় কথাগুলির উপসংহারে অনিলবরণ বাবু বলিয়াছেন—

"পাশ্চাত্য জাতি জড়বিজ্ঞানে আশ্চর্য্য উন্নতি করিয়াছে, প্রাকৃতিক শক্তি সকলকে ইচ্ছামত পরিচালিত করিয়া বাহ্য জগতে অসাধ্য সাধন করিতেছে। কিন্তু ইহা তাহাদিগের পক্ষে বর না হইয়া শাপে পরিণত হইয়াছে, বিজ্ঞানের সাহায্যে আজ তাহারা পরস্পরকে ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছে—যেমন জড়বিজ্ঞানের উন্নতি হইয়াছে, তেমনই মনোবিজ্ঞানের উন্নতি যতদিন না হইবে, বাহ্যজগৎকে পরিবর্ত্তন করা যেমন সম্ভব হইয়াছে, তেমনই অন্তর্জগৎকে, মানুষের হৃদয়, মন, ইন্দ্রিয়সকলকে, তাহার মনোবৃত্তি, চিত্তবৃত্তিসকলকে তেমনই পরিবর্ত্তিত, সংশোধিত, রূপান্তরিত করা সম্ভব না হইবে ততদিন মানব-সমাজের কোন সমস্যারই সমাধান হইতে পারে না। • • মানব-প্রকৃতির নিগূঢ় পরিবর্ত্তন কেমন করিয়া সংসাধিত হইবে তাহার সন্ধান ভারতই দিতে পারে, কারণ যুগ-

যুগান্তর ধরিয়া ভারত বিশেষ ভাবে এই দিকেই সন্ধান করিয়াছে, সাধনা করিয়াছে। *

এই প্রসঙ্গের সর্ব্বশেষে অনিলবরণ বাবু বলিয়াছেন—

"ভারতের সভ্যতা বাস্তবিকই অমর, তাহা আজিও মরিয়া ভূত হইয়া যায় নাই। তাহাই মৃত্যুরোগগ্রস্ত আধুনিক মানব-সমাজের জন্য, মৃতসঞ্জীবনী সুধা আনিয়া দিতে পারে এবং দিবে।"

শ্রীযুক্ত অনিলবরণ বাবুর উপরোক্ত বিভিন্ন-বিষয়ক কথাগুলির প্রাসঙ্গিকতা কি তাহা চিন্তা করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, পণ্ডিত জওহরলালজীর রচনার যে যে কথাগুলি তাঁহার প্রবন্ধের প্রথম অংশে উদ্ধৃত হইয়াছে সেই কথাগুলির প্রত্যুত্তর প্রদান করা তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য।

আমরা আমাদিগের সমালোচনায় নিম্নলিখিত দুইটী বিষয় দেখাইব, যথা :—

(১) পণ্ডিত জওহরলাল ভারতের প্রাচীন সভ্যতা সম্বন্ধে যে যে উক্তি করিয়াছেন, তাহা যেরূপ ভ্রম-প্রমাদ-পরিপূর্ণ, অনিলবরণ বাবু তদুত্তরে যাহা যাহা বলিয়াছেন তাহাও সেইরূপ ভ্রম-প্রমাদে পরিপূর্ণ।

(২) ভারতের প্রাচীন সভ্যতার উচ্চতা প্রতিপন্ন করিতে বসিয়া, অনিলবরণ বাবু ঋষি-প্রণীত শাস্ত্র সম্বন্ধে যে যে কথা বলিয়াছেন, উহা তাঁহার ঐ সম্বন্ধে অজ্ঞতার পরিচায়ক।

পণ্ডিত জওহরলালজী ভারতীয় বর্ত্তমান অবস্থা ও প্রাচীন সভ্যতা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত তিনটী কথা বলিয়াছেন :—

(১) ভারতের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থাই সত্য।

(২) ভারতের প্রাচীন গৌরব অপক্ক মস্তিষ্কের কল্পনা-বিলাস ভিন্ন আর বেশী কিছু নহে।

(৩) আমাদিগের তথাকথিত অমর সভ্যতা মরিয়া ভূত হইয়া গিয়াছে।

জওহরলালজীর এই তিনটী কথার মধ্যে প্রথম কথাটীর কোন উত্তর সাক্ষাৎ ভাবে শ্রীযুক্ত অনিলবরণ বাবুর প্রবন্ধে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ভারতের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থা সত্য অথবা মিথ্যা তৎসম্বন্ধে কোন কথা শ্রীযুক্ত অনিলবরণ বাবুর প্রবন্ধে সাক্ষাৎ ভাবে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু "ভারতের সভ্যতা বাস্তবিকই অমর, তাহা আজও মরিয়া ভূত হইয়া যায় নাই" এবংবিধ কথা ও তৎসঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতার উচ্চতার কথা লক্ষ্য করিলে মনে করিতে হয় যে, অনিলবরণ বাবুর মতে ভারতের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থা সত্য নহে। কারণ, ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা যে শোচনীয়, তাহা স্বীকার করিতে হইলে ভারতের সভ্যতা যে মরিয়া ভূত হইয়া গিয়াছে তাহা স্বীকার করিতে হয়। যখন পরিষ্কার দেখা যাইতেছে যে, ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা অতীব শোচনীয়, তখন আমাদিগের প্রাচীন সভ্যতা, যাহা আদর্শের যোগ্য, তাহা যে মরিয়া ভূত হইয়া গিয়াছে, ইহা অস্বীকার করা যায় না। কাজেই বলিতে হইবে যে, এ সম্বন্ধে পণ্ডিত জওহরলালজী যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য এবং শ্রীযুক্ত অনিলবরণ বাবুর কথা অযৌক্তিক ও বালকোচিত।

পণ্ডিত জওহরলালজীর দ্বিতীয় কথা,
প্রাচীন গৌরব অপক্ক মস্তিষ্কের কল্পনা-বিলাস
বেশী কিছু নহে।"

এই কথার প্রত্যুত্তরে, ভারতের প্রাচীন গৌরব যে অপক্ক মস্তিষ্কের কল্পনা-বিলাস নহে, পরন্তু উহা যে বাস্তব, তাহা দেখাইবার জন্য অনিলবরণ বাবু পাশ্চাত্যগণের মতবাদের দোহাই দিয়াছেন। ইহা ছাড়া ভারতীয় গৌরবময় সভ্যতার অপর কোন জীবন্ত প্রমাণ তিনি উপস্থিত করিতে পারেন নাই। ভারতবর্ষকে পাশ্চাত্যভাবাপন্ন করিয়া তোলা যে সমীচীন নহে, তাহা অনিলবরণ বাবু স্পষ্ট ভাবে স্বীকার করিয়াও, কেন যে আবার পাশ্চাত্য ভাবধারাকেই তাঁহার প্রমাণের উপকরণ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন, ইহা আমরা বুঝিতে পারি না। পাশ্চাত্য ভাবধারাকে কোন প্রমাণের উপকরণ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলে কি উহার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া লওয়া হয় না? এবং তাহার

হলে কি পরোক্ষভাবে ঐ ভাবধারার বক্তাপত্র হইয়া উঠিতে হয় না? আমাদিগের মতে, এতাদৃশ আচরণ ভারতবর্ষের খ্যাতিপ্রাপ্ত মানুষগুলির মধ্যে সংক্রামকতা লাভ করিয়াছে। ইহাঁরা প্রায়শঃ যে-মুখে পাশ্চাত্ত্য ভাবগুলির বিরুদ্ধে কথা কহিয়া থাকেন, আবার সেই মুখেই পাশ্চাত্ত্য মতবাদগুলির প্রামাণিকতা স্বীকার করিয়া লইয়া থাকেন। অনিলবরণ বাবুর মধ্যেও এই সংক্রামকতার ব্যতিচার দেখা যায় না।

ভারতের প্রাচীন গৌরব যে অপক মস্তিষ্কের কল্পনা-বিলাস নহে, পরন্তু উহা যে সম্পূর্ণ বাস্তব, তাহার অলন্ত প্রমাণ রহিয়াছে ভারতীয় গ্রামের সংগঠনে ও ভারতীয় অধিকাংশ লোকের চালচলনে।

কোন দেশে ঈপ্সিত সভ্যতা কোন দিন বিদ্যমান ছিল অথবা আছে কি না তৎসম্বন্ধে যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে কি হইলে কোন দেশকে অথবা জাতিকে সভ্য বলা যাইতে পারে, তাহা স্থির করিয়া লইতে হয়।

সভ্যতা অথবা civilization যে দ্বন্দ্বকলহ-প্রিয়তা অথবা militarism-এর বিরুদ্ধ কথা, তাহা যুক্তিসঙ্গত ভাবে অস্বীকার করা যায় না। যে মানুষটী কলহপ্রিয় এবং কপটতাময়, তাহাকে আধুনিক রীতি অনুসারে সভ্য বলিলেও বলা যাইতে পারে বটে, কিন্তু মানুষের এতাদৃশ আচরণ কখনও মনুষ্য-সমাজের বাঞ্ছিত নহে এবং ঐ আচরণযুক্ত মানুষকে কখনও কেহ প্রাণ হইতে পছন্দ করিতে পারে না ও করে না এবং ঐ মানুষ অসভ্য বলিয়া পরিগণিত হয়।

কাযেই বলিতে হয় যে, সভ্যতার প্রধান অঙ্গ দ্বন্দ্ব-কলহের প্রবৃত্তিহীনতা এবং শান্তিপ্রিয়তা।

সভ্যতার অভিব্যক্তি হয় মানুষের আর্থিক স্বাচ্ছল্যে, পরমুখাপেক্ষিতার অভাবে এবং ব্যক্তিগত স্বাবলম্বনের উদ্ভবে।

মঙ্গলময় ভগবান্ অথবা প্রকৃতির কার্য্য কি, তাহা বিশ্লেষণ করিবার সক্ষমতা অর্জ্জন করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, সর্ব্বতোভাবে দ্বন্দ্ব-কলহের প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া শান্তিপ্রিয়তা অভ্যাস করিতে পারিলে মানুষ ও জাতি আপনা হইতেই পরমুখাপেক্ষিতার বিরক্ত, স্বাবলম্বনপ্রিয় এবং আর্থিক অভাবপরিশূন্য হইয়া থাকে।

একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই দেখা যাইবে, যে মানুষকে উদরান্নের জন্য পরের দাস্য স্বীকার করিতে হয় অথবা যে-জাতিকে উদরান্নের জন্য অন্য জাতির মুখাপেক্ষী হইতে হয় এবং হিংসা, খলতা, কপটতা ও পাশবিক বলের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, সেই মানুষ অথবা সেই জাতিকে কখনও যুক্তিসঙ্গত ভাবে সভ্য বলা চলে না। উদরান্নের জন্য পরমুখাপেক্ষী হইলেই যে মানুষ অথবা জাতি অসভ্য হইয়া যায়, তাহা বলা চলে না বটে, কিন্তু পরমুখাপেক্ষী হইয়াও যদি একমাত্র কৃতজ্ঞতার সহায়তা ছাড়া উদরান্নের জন্য হিংসা, খলতা, কপটতা ও পাশবিক বলের আশ্রয় লওয়া হয়, তাহা হইলে যে, অসভ্যতার পরিচয় দেওয়া হইয়া থাকে, ইহা নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে।

কাযেই বলিতে হয়, সভ্যতার প্রধান অভিব্যক্তি হয় মানুষের তিন শ্রেণীর অবস্থায়—

(১) দ্বন্দ্ব-কলহের প্রবৃত্তিহীনতা ও শান্তিপ্রিয়তা।
(২) পরমুখাপেক্ষিতায় বিরক্তি, স্বাবলম্বন-প্রিয়তা ও আর্থিক অভাবের পরিশূন্যতা।
(৩) উদরান্নের জন্য পরমুখাপেক্ষী হইতে হইলেও তজ্জন্য হিংসা, খলতা, কপটতা ও পাশবিক বলপ্রয়োগে বিমুখতা।

সভ্যতার উপরোক্ত আদর্শের মাপকাঠি লইয়া ভারতবাসিগণের মধ্যে সভ্যতা ছিল কি না, তাহা স্থির করিবার জন্য ভারতবর্ষের পল্লীগ্রামের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, ভারতবাসী মধ্যবিত্তগণ (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি চাকুরী-জীবিগণ) অনেক দিন হইতেই সভ্যতার প্রকৃত মাপ-কাঠি অনুসারে অসভ্য হইয়া পড়িয়াছেন তাহা সত্য বটে, কিন্তু ত্রিশ বৎসর আগেও ভারতবর্ষের শ্রমজীবি-বৃন্দের মধ্যে প্রকৃত সভ্যতা প্রায়শঃ উজ্জ্বলভাবে বিদ্যমান ছিল। প্রাচীন গ্রামে মধ্যবিত্তগণের মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহ ও দলাদলির প্রবৃত্তি বিদ্যমান ছিল বটে, কিন্তু শ্রমজীবি-

গণের মধ্যে ঐ প্রবৃত্তি প্রায়শঃ বিদ্যমান ছিল না। মধ্যবিত্তগণ অনেক দিন হইতেই বেতনভোগী নফর-প্রবৃত্তিসম্পন্ন, অর্থাভাবে জর্জ্জরিত ও ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন বটে, কিন্তু শ্রমজীবিগণ সত্তর বৎসর আগেও প্রায়শঃ বেতন-ভোগী নফরগিরিকে ঘৃণার চক্ষে অবলোকন করিত এবং তাহাদিগের মধ্যে ঋণগ্রস্ততা প্রায়শঃ অপরিজ্ঞাত ছিল। মধ্যবিত্তগণের মধ্যে উদরান্নের জন্য হিংসা, ধলতা, কপটতা ও পাশবিক বল প্রয়োগের প্রতি বিরক্তিহীনতা অনেক দিন হইতেই দেখা দিয়াছে বটে, কিন্তু পঞ্চাশ বৎসর আগেও শ্রমজীবিগণের মধ্যে প্রায়শঃ এতাদৃশ অসভ্য ব্যবহার দেখা যায় নাই। সমগ্র জাতি হিসাবে ভারতবাসিগণকে পাঁচ ছয় বৎসর আগেও উদরান্নের জন্য কোন জাতির মুখাপেক্ষী হইতে হয় নাই। মনে রাখিতে হইবে যে, মধ্যবিত্তগণ সমগ্র জাতির শতকরা তিনজনেরও অনধিক। মধ্যবিত্তগণের মধ্যে অসভ্যতার সাক্ষ্য পাওয়া গেলেও সমগ্র জাতির মধ্যে সভ্যতার কোন নিদর্শন ছিল না অথবা ভারতের প্রাচীন গৌরব অপক্ক মস্তিষ্কের কল্পনা-বিলাস ভিন্ন আর কিছুই নহে, ইহা বলা চলে না। অন্য পক্ষে, যখন পরিষ্কার দেখা যাইতেছে যে, ভারতবর্ষের শতকরা আশী জনের মধ্যেই উচ্চতম সভ্যতার অনন্যসাধারণ নিদর্শন পঞ্চাশ বৎসর আগেও দেখিতে পাওয়া যাইত, তখন ভারতবর্ষে একদিন যে একটী আদর্শ-স্থানীয় সভ্যতা ও কৃষ্টি বিদ্যমান ছিল, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার ও কৃষ্টির এতাদৃশ সাক্ষ্যের বিদ্যমানতা থাকা সত্ত্বেও উহা প্রমাণিত করিবার জন্য অনিলবরণ বাবুকে যে পাশ্চাত্ত্য মতবাদের দোহাই দিতে হইয়াছে, তাহার প্রধান কারণ, তাঁহার বহুদর্শিতার অভাব এবং মজ্জাগত পাশ্চাত্ত্যপ্রিয়তা। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ফলে মনুষ্য-সমাজের মধ্যে যাহা অসভ্যতার পরিচায়ক, তাহাকে যে আমরা সভ্যতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে শিখিয়াছি, যাহা কুজ্ঞানের আধার তাহাকে যে আমরা বিজ্ঞান বলিতে অভ্যস্ত হইয়াছি এবং এতাদৃশ বিপরীতগামিতারূপ পাপের ফলে মনুষ্য-সমাজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত যে টলটলায়মান হইয়া পড়িয়াছে, তাহা আমরা এখনও বুঝিতে না পারিলে, আমাদিগের সর্ব্বনাশের পরিসমাপ্তি অপরিহার্য্য, ইহা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে।

আমাদিগের প্রাচীন সভ্যতা ও কৃষ্টির জীবন্ত সাক্ষ্য যে কোথায়, তাহা দেখাইতে না পারায় অনিলবরণ বাবুকে যে-রূপ বহুদর্শিতার অভাবযুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হইবে, সেইরূপ এতাদৃশ জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত থাকা সত্ত্বেও পণ্ডিত জওহরলাল ভারতের প্রাচীন গৌরবকে অপরিপক্ক মস্তিষ্কের কল্পনা-বিলাস বলিয়া অভিহিত করিতে যে সঙ্কোচ বোধ করেন নাই, তাহা হইতে বুঝিতে হয় যে, পণ্ডিত জওহরলাল নিজেই অপরিপক্ক মস্তিষ্কযুক্ত।

কাযেই বলিতে পারা যায় যে, পণ্ডিত জওহরলাল ভারতের প্রাচীন সভ্যতা সম্বন্ধে যে যে উক্তি করিয়াছেন তাহা যেরূপ ভ্রম-প্রমাদ-পরিপূর্ণ, অনিলবরণ বাবু তদুত্তরে যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহাও সেইরূপ ভ্রম-প্রমাদে পরিপূর্ণ।

ভারতবর্ষের ধর্ম্মের ও আদর্শের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব কোথায় তাহা দেখাইবার জন্য অনিলবরণ বাবু বলিয়াছেন—

"হিন্দু শুধু অধ্যাত্ম সাধনা ও পরকালের চিন্তা লইয়া ব্যস্ত থাকে নাই, ইহকালকে কেমন করিয়া পূর্ণতম ভাবে সমৃদ্ধ করিয়া তোলা যায়, ভোগ করা যায়, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে সন্ধান করিয়াছে…"

অনিলবরণ বাবুর উপরোক্ত কথা হইতে ভারতবর্ষের ধর্ম্ম ও আদর্শ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত তিনটী বিষয় বুঝিতে হয় :—

(১) ভারতীয় ঋষিগণ একদিন অধ্যাত্ম-সাধনার পরাকাষ্ঠা লাভ করিবার জন্যই মানুষকে অধ্যাত্ম-সাধনার পন্থা দেখাইয়াছিলেন ;

(২) ভারতীয় ঋষিগণ একদিন মানুষের পারলৌকিক মঙ্গলের জন্যই মানুষকে পরকালের চিন্তায় ব্যাপৃত থাকিবার জন্য উপদেশ দিয়াছিলেন ;

(৩) ভারতীয় ঋষিগণ একদিন মানুষের ভোগ-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্যই ইহকালকে কেমন

করিয়া সমৃদ্ধ করিতে হয় তাহার উপদেশ মানুষকে প্রদান করিয়াছিলেন।

অধ্যাত্ম-সাধনার পরাকাষ্ঠা লাভ করিবার জন্যই যে অধ্যাত্ম-সাধনার প্রয়োজন অথবা পারলৌকিক মঙ্গলের জন্যই যে পরকালের চিন্তার প্রয়োজন, অথবা ভোগ-তৃপ্তি চরিতার্থ করিবার জন্যই যে ইহকালের সমৃদ্ধির প্রয়োজন, এতাদৃশ মতবাদ যে ঋষিগণ পোষণ করিতেন, তাহা তাঁহাদিগের প্রণীত কোন গ্রন্থের মূল-ভাগ উদ্ধৃত করিয়া অনিলবরণ বাবু সপ্রমাণিত করিতে পারেন কি? আমাদিগের সিদ্ধান্ত—অনিলবরণ বাবু ও তাঁহার সম্প্রদায় ঋষি-প্রণীত কাব্য, সাহিত্য ও শাস্ত্র সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ বলিয়া ভারতীয় ধর্ম্মের দোহাই দিয়া এতাদৃশ মতবাদ প্রচার করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। অনিলবরণ বাবুর সম্প্রদায় আত্ম-প্রতারিত ও ঋষি-প্রণীত মানব-ধর্ম্মের ব্যভিচারী বলিয়াই, যখন মনুষ্য-সমাজের শতকরা নিরানব্বুই জন মানুষ নানারূপ দুঃখ-দুর্দ্দশায় জর্জ্জরিত, তখন মানুষের বাস্তব দুঃখ ও দুর্দ্দশা কিরূপে তিরোহিত হইবে তাহার চিন্তায় ও কার্য্যে ব্যাপৃত না থাকিয়া মুষ্টিমেয় ভোগ-তপস্বীর ভানে নিমগ্ন থাকিতে এবং উহার উৎকর্ষের কথা প্রচার করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন না।

ঋষি-প্রণীত মানব-ধর্ম্মের আদর্শ অথবা উদ্দেশ্য কি এবং উহার শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়, তাহা জানিতে হইলে, ঋষি-প্রণীত মন্বাদি সংহিতাসমূহ আমূল ভাবে অধ্যয়ন করিতে হয় এবং উহা অধ্যয়ন করিতে হইলে বেদের শ্রৌতসূত্র ও গৃহ্যসূত্রের অভ্যাসের সহিত সম্যক্ ভাবে পরিচিত হইতে হয়। বেদের শ্রৌতসূত্র ও গৃহ্যসূত্রের অভ্যাসের সহিত সম্যক্ ভাবে পরিচিত হইয়া মন্বাদি সংহিতাসমূহে প্রবেশ লাভ করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, ঋষি-প্রণীত মানব-ধর্ম্মের একমাত্র উদ্দেশ্য, সমগ্র মনুষ্য-সমাজের প্রত্যেক শ্রেণীর প্রত্যেক মানুষটী কি করিয়া সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বতোভাবে সর্ব্ববিধ দুঃখ হইতে মুক্ত হইতে পারে, তাহার পন্থা দেখান। ঋষিগণের সিদ্ধান্ত অনুসারে সমগ্র মনুষ্য-সমাজের প্রত্যেক শ্রেণীর প্রত্যেক মানুষটী যাহাতে সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বতোভাবে সর্ব্ববিধ দুঃখ হইতে মুক্ত হইতে পারে, তাহা করিতে হইলে নিম্নলিখিত দুই শ্রেণীর ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়:—

(১) ব্যক্তিগত ভাবে মানুষ যাহাতে বহির্ম্মুখিতা সংযত করিয়া ক্রমে ক্রমে সর্ব্বতোভাবে অন্তর্ম্মুখী হইতে পারে, এবং যাহাতে রাগ-দ্বেষপ্রবৃত্তি অথবা যাহাতে উপভোগ ও দম্ভ-কলহপ্রবৃত্তি সংযত করিয়া সম্যক্ ভাবের কর্ত্তব্য-জ্ঞানে যাবতীয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাদৃশ ব্যক্তিগত শিক্ষার ব্যবস্থা করা;

(২) জগতে বায়ু, তেজ, রস, জল, স্থল, অচর ও চর জীব প্রভৃতি যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার কোনটি যাহাতে কোন মানুষের কোনরূপ অহিতকারী না হইয়া সর্ব্বতোভাবে মানুষের হিতকারী হইতে পারে, সঙ্ঘগতভাবে তাদৃশ সামাজিক ব্যবস্থার প্রণয়ন করা।

"আধ্যাত্মিক," "আধিদৈবিক" ও "আধিভৌতিক" এই তিনটী শব্দের প্রকৃত মর্ম্ম কি তাহা সম্যক্ ভাবে ধারণা করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, কোন্ উপায়ে উপরোক্ত সঙ্ঘগত সামাজিক ব্যবস্থা প্রণীত হইতে পারে, তাহা স্থির করিতে হইলে জগতের প্রত্যেক বস্তুর আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক তথ্য পরিজ্ঞানের প্রয়োজন হয়। সঙ্ঘগত সামাজিক এই ব্যবস্থার জন্যই পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব-সংবলিত আত্ম-তত্ত্ব উপলব্ধি করিবার প্রয়োজন হয়, কারণ যাহা যাহা লইয়া মানুষ তাহার মনুষ্যত্বরত্ন ও মনুষ্যত্ব লাভ করে, তাহার প্রত্যেকটীর প্রকৃতি ও বিভিন্ন স্বভাব উপলব্ধি করিতে না পারিলে, কোন্ বস্তুর কোন্ অবস্থা মানুষের পক্ষে হিতকারী ও অহিতকারী হইতে পারে, তাহা নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। এই আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিবার সহায়তার জন্যই ঋষিগণ তাঁহাদিগের তন্ত্র-শাস্ত্রের প্রণয়ন করিয়াছিলেন। উপরোক্ত সঙ্ঘগত সামাজিক ব্যবস্থার জন্য এক দিকে যেরূপ মানুষের আত্মতত্ত্ব সঠিক ভাবে উপলব্ধি করিবার প্রয়োজন হয়, অন্যদিকে আবার বায়ু, তেজ, রস, জল, স্থল, অচর ও চর জীবের প্রত্যেকের প্রকৃতি ও বিবিধ স্বভাব কি এবং ঐ প্রকৃতি ও

স্বভাবের মূল কারণ কি তাহাও জানিবার প্রয়োজন হয়, কারণ তাহা না জানা থাকিলে কোন্ বস্তুর কোন্ অবস্থা মানুষের পক্ষে হিতকারী, অথবা অহিতকারী তাহা নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। ঋষি-প্রণীত শাস্ত্র অনুসন্ধান করিতে পারিলে জানা যাইবে যে, উপরোক্ত বায়ু, তেজ, রস, জল, স্থল, অচর ও চর জীবের প্রত্যেকের প্রকৃতি ও বিবিধ স্বভাব কি এবং ঐ প্রকৃতি ও স্বভাবের মূল কারণ কি, তাহা জানিবার সৌকর্য্যার্থেই বিবিধ বেদ, পুরাণ ও উপ-পুরাণ রচিত হইয়াছিল। এইরূপ ভাবে জগতে বায়ু, তেজ, রস, জল, স্থল, অচর ও চরজীব প্রভৃতি যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার কোনটী যাহাতে কোন মানুষের কোনরূপ অহিতকারী না হইয়া সর্ব্বতোভাবে মানুষের হিতকারী হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য যে আত্মতত্ত্ব ও বস্তুতত্ত্বের প্রয়োজন হয়, সেই আত্মতত্ত্ব ও বস্তুতত্ত্ব তন্ত্র, বেদ ও পুরাণের সহায়তায় পরিজ্ঞাত হওয়া সম্ভবযোগ্য হয় বটে; কিন্তু তন্ত্র, বেদ ও পুরাণ কোন্ উপায়ে লিখিত হইয়াছে এবং উহার প্রত্যেকের অর্থ সম্বন্ধে কিরূপ স্থিরনিশ্চয় হওয়া সম্ভব হইতে পারে, তাহা না জানা থাকিলে তন্ত্র, বেদ ও পুরাণের দ্বারা মানুষের কোন প্রয়োজনই সাধন করা সম্ভব হয় না। তন্ত্র, বেদ ও পুরাণ অধ্যয়ন ও অভ্যাসের সহায়তার জন্য ঋষিগণ তাঁহাদিগের শব্দ-শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। বেদাঙ্গ, দুইটী মীমাংসা এবং চারিটী দর্শন ঋষি-প্রণীত শব্দশাস্ত্রের অন্তর্গত।

বেদের গৃহ্যসূত্র ও শ্রৌতসূত্রে সম্যক্ ভাবে প্রবিষ্ট হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, দশবিধ সংস্কারের প্রধান উদ্দেশ্য, মানুষ যাহাতে ব্যক্তিগতভাবে বহির্মুখিতা সংযত করিয়া অন্তর্মুখী হইতে পারে এবং যাহাতে রাগদ্বেষপ্রবৃত্তি অথবা যাহাতে উপভোগ ও দ্বন্দ্ব-কলহপ্রবৃত্তি সংযত করিয়া সম্যক্ ভাবের কর্ত্তব্য জ্ঞানে যাবতীয় ঐহিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় তাহা শিক্ষার সমাপ্তি করা।

প্রাচীন গ্রন্থগুলি যথাযথ ভাবে অধ্যয়ন করিয়া মানবজাতির ইতিহাস নির্দ্ধারণ করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, একদিন ঋষিগণের উপরোক্ত দুইটী ব্যবস্থা মনুষ্য-সমাজের সর্ব্বত্রই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল এবং প্রত্যেক শ্রেণীর প্রায় প্রত্যেক মানুষটী সর্ব্বতোভাবে সর্ব্ববিধ দুঃখ হইতে মুক্ত হইতে পারিয়াছিল এবং বহু সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত মনুষ্য-সমাজ সম্পূর্ণ সুখের আগার হইয়াছিল। কালক্রমে যাঁহাদিগের হস্তে ঐ দুইটী ব্যবস্থার জ্ঞান-বিজ্ঞান রক্ষা করিবার দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছিল তাঁহারা বিলাসী হইয়া পড়েন ও ঐ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিলুপ্তি ঘটে এবং এমন কি, যে শব্দশাস্ত্রের দ্বারা ঐ জ্ঞান-বিজ্ঞানের যথাযথ মর্ম্ম উপলব্ধি করা সম্ভব হয়, সেই শব্দ-শাস্ত্র পর্য্যন্ত বিস্মৃতির গর্ভে লুক্কায়িত হইয়া পড়িয়াছে। ইহারই ফলে ঐ দুইটী ব্যবস্থা পর্য্যন্ত বিকৃতি লাভ করিয়াছে এবং মানুষের ভাগ্যে আবার দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে। তদবধি মনুষ্য-সমাজের অনেকেই মানুষের বিবিধ দুঃখ দূর করিবার জন্য নানারূপ চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু কেহই আর নিখুঁৎ পন্থার আবিষ্কার করিতে সক্ষম হন নাই।

শব্দ-শাস্ত্র, তন্ত্র, বেদ, পুরাণ ও মন্বাদি সংহিতা-সমূহের মূলভাগের সহিত সম্যক্ ভাবে পরিচিত হইয়া চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলে দেখা যাইবে যে, মানুষকে সর্ব্বতোভাবে সর্ব্ববিধ দুঃখ হইতে মুক্ত করিবার জন্য ঋষিগণ যে-পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাই একমাত্র পন্থা। ঐ পন্থা বুঝিয়া লইয়া তাহা অবলম্বন করিতে পারিলে মানুষ যেরূপ সর্ব্বতোভাবে সর্ব্ববিধ দুঃখ হইতে মুক্ত হইতে পারে, সেইরূপ আবার সর্ব্ববিধ বস্তু-বিজ্ঞানে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিতে পারে এবং কি করিয়া মনুষ্য হিসাবে নিখুঁৎ হইতে পারে তাহাও পরিজ্ঞাত হইতে পারে। এক দিন মানুষ ঋষি-প্রণীত ঐ গ্রন্থসমূহ যথাযথ অর্থে বুঝিতে পারিত এবং উহা অনুসরণ করিত বলিয়াই মনুষ্য-সমাজ যেরূপ সর্ব্বতোভাবে সর্ব্ববিধ দুঃখ হইতে মুক্ত হইতে পারিয়াছিল, সেইরূপ মানুষের বস্তু-বিজ্ঞানও সম্পূর্ণ হইয়াছিল এবং মানুষের মধ্যে সর্ব্বতোভাবের নিখুঁৎ মানুষও দেখা যাইত। আধুনিক কোন মানুষ ঋষি-প্রণীত ঐ গ্রন্থসমূহ ও তদন্তর্গত পন্থা বুঝিতে পারেন

না বলিয়াই আধুনিক তথাকথিত বিজ্ঞান কিম্ভূতকিমাকার ধারণ করিয়াছে এবং এমন কি, মানুষ বলিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, মনুষ্যসমাজ সর্ব্বতোভাবে সর্ব্ববিধ দুঃখ হইতে মুক্ত হইতে পারে না, মানুষ নিখুঁৎ হইতে পারে না; মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পূর্ণ হইতে পারে পারে না। মানুষের এতাদৃশ মতবাদ তাহার মূঢ়তা ও অজ্ঞতার পরিচায়ক।

শব্দ-শাস্ত্র, তন্ত্র, বেদ, পুরাণ ও মন্বাদি সংহিতাসমূহের সহিত যথাযথ অর্থে পরিচিত হইতে না পারিলে ঋষি-প্রণীত মানব-ধর্ম্মের প্রধান লক্ষ্য যে কি ছিল এবং ঐ লক্ষ্যের প্রধানত্ব যে কোথায় তাহা স্থির করা সম্ভব হয় না। অনিলবরণ বাবু ঋষি-প্রণীত কোন শাস্ত্রের সহিত যথাযথ অর্থে পরিচিত নহেন বলিয়াই কাল্পনিক ভাবে প্রাচীন ভারতের ধর্ম্মের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আবোল-তাবোল বকিয়াছেন এবং তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাশীল মানুষগণের বিপথগামিতার সহায়তা-পাপে লিপ্ত হইয়াছেন।

ইহকালকে কেমন করিয়া পূর্ণতমভাবে সমৃদ্ধ করিয়া তোলা যায়, ভোগ করা যায়, তাহার সন্ধান যে ঋষিগণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে করিয়াছেন ইহা সপ্রমাণিত করিবার জন্য অনিলবরণ বাবু গীতার "ভুঙ্ক্ষ রাজ্যং সমৃদ্ধং" এই বাক্যটী উদ্ধৃত করিয়াছেন। অনিলবরণ বাবুর কথায় বুঝিতে হয় যে, গীতার উপরোক্ত বাক্যটীর অর্থ 'সমৃদ্ধ রাজ্য ভোগ কর' এবং যেহেতু ভগবানের মুখ হইতে "সমৃদ্ধ রাজ্য-ভোগের" কথা নির্গত হইয়াছে তখন নিশ্চয়ই কেমন করিয়া ইহকালকে পূর্ণতমভাবে সমৃদ্ধ করিয়া তোলা যায় এবং মানুষের পক্ষে উহা কেমন করিয়া উপভোগযোগ্য করা যায়, তাহার চিন্তা ভারতীয় ঋষিগণ করিয়াছেন। গীতার আদ্যোপান্ত যথাযথ অর্থে অধ্যয়ন করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, মানুষ যাহাতে রাগপরবশ অথবা উপভোগনিরত না হয় তাহাই মানুষের প্রতি ব্যাসদেবের অন্যতম উপদেশ। অথচ, সেই ব্যাসদেবই আবার অর্জ্জুনকে সমৃদ্ধ রাজ্য ভোগ করিবার উপদেশ দিতেছেন তাহা ধরিয়া লইলে ব্যাসদেবের মস্তিষ্কে কিছু গণ্ডগোল ছিল, ইহা বুঝিতে হয়। বস্তুতঃ পক্ষে ঋষিপ্রণীত শব্দশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, গীতা সাধারণ ভাবে যে যে অর্থে ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে, তাহার কোনটীই শব্দশাস্ত্রসম্মত নহে। "তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব, জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ রাজ্যং সমৃদ্ধং" এই বাক্যটি ঋষি-প্রণীত শব্দশাস্ত্রানুসারে ব্যাখ্যা করিলে দেখা যাইবে যে, উহার সঙ্গত অর্থ—

'কাল কি বস্তু তাহা উপলব্ধি করিয়া কালের সহায়তায় তোমার বিভিন্ন অঙ্গের ও ভাবের বিকাশ ও ক্ষয় কিরূপে হইতেছে এবং তোমার অন্তরস্থিত বায়ু ও কর্ম্ম-শক্তি কিরূপে কার্য্য করিতেছে তাহা ধারণা করিবার চেষ্টা কর। ঐ চেষ্টায় সফল হইলে, তোমার পক্ষে বিকৃতিকে সংযত করিয়া মূল সত্তার সহিত তোমার বিকাশের কি সম্বন্ধ তাহা জানা সম্ভবযোগ্য হইবে এবং তখন জীবের বিকাশের সহিত বিশ্বরূপের কি সম্বন্ধ তাহার সঠিক জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে'।

ছোট্ট এক লাইনের সংস্কৃত বাক্য হইতে এত কথা কিরূপে আইসে তাহা বুঝাইতে হইলে আমাদিগকে ঋষিপ্রণীত শব্দশাস্ত্র সম্বন্ধে অনেক কথা বলিতে হইবে। তাহা এই প্রবন্ধে সম্ভবযোগ্য নহে। যাঁহারা অনুসন্ধিৎসু হইবেন, তাঁহাদিগের প্রবৃত্তি আমরা পৃথক্ ভাবে চরিতার্থ করিবার চেষ্টা করিতে সম্মত আছি।

মোটের উপর বুঝিতে হইবে, ব্যাসদেবের কথায় আজকাল যে পরস্পরবিরোধিতা (self-contradiction) দেখা যায়, তাহা ব্যাসদেবের কথার জন্য নহে, পরন্তু ব্যাখ্যাকারিগণের শব্দ-শাস্ত্রজ্ঞানের অভাবের জন্য।

অনিলবাবুর পক্ষে যে গীতা যথাযথ অর্থে বুঝা সম্ভব নহে, তাঁহার উপরোক্ত উক্তি উহার নিদর্শন।

সমাজ-সংগঠনে প্রাচীন ভারতীয়গণ যে গভীরতম অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য অনিলবরণ বাবু বলিয়াছেন—

'সমাজ-সংগঠনে হিন্দুর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় মনুসংহিতার ন্যায় স্মৃতিশাস্ত্রে'। অনিলবরণ বাবুর

এই কথাটি খুবই ঠিক, কিন্তু মনুসংহিতার কোন্ কোন্ স্থান যে সমাজ-সংগঠনবিদ্যার প্রতিভার পরিচায়ক, তাহা অনিলবরণবাবু বুঝিতে পারেন কি না, তদ্বিষয়ে আমাদের ঘোর সন্দেহ আছে। আমাদিগের বিশ্বাস, যদি তিনি উহা বুঝিতে পারিতেন, তাহা হইলে তিনি দরিদ্র লোকসমাজের দুরে পণ্ডিচেরীতে কালাতিপাত করিতে পারিতেন না এবং পৃথক্ ভাবে রাষ্ট্রসংগঠন-বিদ্যার কথা উল্লেখ করিতে পারিতেন না, কারণ ঋষিগণের সিদ্ধান্তানুসারে সমাজ-সংগঠনবিদ্যা ও রাষ্ট্র-সংগঠনবিদ্যা দুইটি পৃথক্ নহে। আজকাল যাহাকে সমাজ-সংগঠন ও রাষ্ট্রসংগঠন বলা হইয়া থাকে, তাহার দুই-এরই কথা মনুসংহিতায় পাওয়া যায়। অর্থ-শাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্র সম্বন্ধে আর যে-সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থ পাওয়া যায়, তাহা আমূল ভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে, উহার প্রত্যেকখানি প্রায়শঃ মন্বাদি সংহিতাসমূহের ভাষ্য-বিশেষ মাত্র। মনুসংহিতার কোন্ কোন্ স্থানে সমাজ-সংগঠনবিদ্যা সম্বন্ধে প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার গবেষণায় প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, মনুসংহিতায় ঐ বিদ্যা সম্বন্ধে প্রতিভার পরিচয় আছে বটে, কিন্তু তদপেক্ষা অধিক প্রতিভার পরিচয় রহিয়াছে অথর্ববেদে এবং ততোধিক প্রতিভার পরিচয় রহিয়াছে ঋক্, সাম, যজুঃ এই তিনটী বেদে, পুরাণে এবং তন্ত্রে।

আমরা অনিলবরণ বাবুকে বলিতে চাই যে, মূল শাস্ত্রঅধ্যয়ন না করিয়া জ্যোঠামী করিতে গেলে মানুষকে বিপথগামী করিবার পাপে লিপ্ত হইতে হয় এবং তাহার ফলে সর্ব্বনাশ-গ্রস্ত হওয়া অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। বিবিধ ভাষ্যপ্রণেতা ব্রাহ্মণগণ ইহার সর্ব্বাপেক্ষা জলন্ত দৃষ্টান্ত। অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, ঐ ভাষ্য-কারগণ প্রায়শঃ বংশহীন হইয়াছেন এবং যাঁহার বংশ লুপ্ত হয় নাই তাঁহার বংশধরগণ অকথনীয় ভাবে হতশ্রী প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমরা অনিলবরণ বাবুর শ্রেণীর মানুষকে সতর্কতা অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিতেছি।

রাষ্ট্র-সংগঠনে প্রাচীন ভারতীয়গণ যে গভীর অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে বর্ণনা করিতে বসিয়া অনিলবরণ বাবু বলিয়াছেন—

"রাষ্ট্র-সংগঠনে ভারতীয় প্রতিভার কিছু পরিচয় পাওয়া যায় কৌটিল্য-প্রণীত অর্থ-শাস্ত্রে।" ইহার অব্যবহিত পরেই অরবিন্দ বাবু "শুক্র-নীতি" সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহা হইতে মনে হয় যে, অনিলবরণ বাবুর মতে "কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র" এবং "শুক্র-নীতি" একই গ্রন্থ। বাস্তবিক পক্ষে ঐ দুই-খানি গ্রন্থ এক নহে। পরন্তু, সম্পূর্ণ পৃথক্ পৃথক্। ঐ দুইখানি গ্রন্থ সম্যক্ ভাবে আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, উহার প্রত্যেকখানির মধ্যেই সমাজ-সংগঠনবিদ্যা সম্বন্ধে প্রতিভার পরিচয় আছে বটে, কিন্তু উহার কোনখানিই ঋষিপ্রণীত নহে এবং কোনখানিতেই মনুসংহিতার আদর্শ প্রতিভার সম্যক্ নিদর্শন পাওয়া যায় না। পরন্তু, উহার প্রত্যেক-খানিতেই অল্প-বিস্তর বেদ-বিরুদ্ধ কথা রহিয়াছে।

এই প্রসঙ্গের উপসংহারে অনিলবরণ বাবু যে যে কথা বলিয়াছেন তাহা হইতে বুঝিতে হয় যে, পাশ্চাত্য-গণ জড়-বিজ্ঞানের উন্নতি সাধন করিতে সক্ষম হইয়াছেন ও জড়-বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে বাহ্য জগৎকে পরিবর্ত্তন করা সম্ভব হইয়াছে। জড়-বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে বাহ্য জগৎকে পরিবর্ত্তন করা যেমন সম্ভব হইয়াছে, মানব-সমাজের সমস্যাসমূহের সমাধান করিতে হইলে অন্তর্জ্জগৎকে, মানুষের হৃদয়, মন, ইন্দ্রিয় সকলকে তাহার মনোবৃত্তি, চিত্তবৃত্তি সকলকে তেমনই পরিবর্ত্তিত, সংশোধিত ও রূপান্তরিত করা সম্ভবযোগ্য করিতে হইবে।

অনিলবরণ বাবুর এই কথাগুলি আমাদিগের অবোধ্য। শব্দ-শাস্ত্রানুসারে "জড়" ও "তাহার বিজ্ঞান" বলিতে যাহা বুঝায় তাহাতে জড় সম্বন্ধে বিজ্ঞানের উন্নতি হইলে জড়ের অব্যক্ত কারণ যে "আত্মা" তদ্বিষয়ক বিদ্যার অর্থাৎ অধ্যাত্মবিদ্যার উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে। অধ্যাত্ম-বিদ্যার উন্নতি সাধিত হইলে জল, স্থল, চর ও অচর জীবে যে জড়াংশ বিদ্যমান আছে, সেই জড়াংশের উৎপত্তি হয় কোন্ কোন্ কারণে ও কেমন করিয়া, তাহা নিখুঁৎ ভাবে পরিজ্ঞাত হওয়া সম্ভব হয়-এবং তখন মানুষের পক্ষে অনায়াসে জমীর উর্ব্বরাশক্তি,

মানুষের বুদ্ধিশক্তি প্রভৃতির উন্নতি সাধন করা সম্ভব হইয়া থাকে। পাশ্চাত্যগণ এমন কোন বিদ্যার অথবা বিজ্ঞানের উন্নতি সাধন করিতে পারিয়াছেন বলিয়া কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এমন কোন বিদ্যার উন্নতি সাধন করিতে পারিলে, তাঁহাদিগকে বেকার ও অনাহার-যাতনায় জর্জ্জরিত হইতে হইত না।

জড়-বিজ্ঞানানুসারে "জড় বিজ্ঞান" বলিতে যাহা বুঝায়, তাহার কোন উন্নতি পাশ্চাত্যগণ করিতে পারেন নাই, ইহা নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে বলা যাইতে পারে। দুইশত বৎসরব্যাপী চেষ্টায় "জড়-বিজ্ঞানে"র উন্নতির নামে তাঁহারা যাহা করিয়াছেন তাহা বাস্তবিক পক্ষে "জড়-স্বভাব" সম্বন্ধে জ্ঞান-বিস্তার। জড় স্বভাব সম্বন্ধে পাশ্চাত্যগণ তাঁহাদিগের জ্ঞানের যতটুকু বিস্তৃতি সাধন করিতে পারিয়াছেন তাহার ফলে বাহ্য জগতের কোন পরিবর্ত্তন সাধন করা সম্ভবযোগ্য হইয়াছে বলিয়া আমরা বিদিত নহি। বাহ্যজগতে রেল, ষ্টীমার, মোটর-গাড়ী, এ্যারোপ্লেন, রেডিও, বৈদ্যুতিক আলো, বৈদ্যুতিক পাখা প্রভৃতির প্রবর্ত্তন করা সম্ভব হইয়াছে বটে এবং তাহাতে যাতায়াত প্রভৃতির কতক সুবিধাও সাধিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা বাহ্যজগতের প্রকৃতির কোন পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে বলিয়া আমরা পরিজ্ঞাত নই। আমাদিগের মতে পাশ্চাত্যগণ জড়বিজ্ঞানের উন্নতি সাধন করিতে পারিয়াছেন, অথবা জড়বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে বাহ্যজগতের পরিবর্ত্তন সম্ভবযোগ্য হইয়াছে এবংবিধ মতবাদ পোষণ করা জড়-বিজ্ঞান সম্বন্ধে অজ্ঞতার পরিচায়ক। অন্তর্জ্জগৎকে রূপান্তরিত করার কথায় যে, অনিলবরণ বাবু কি বুঝাইতে চাহিয়াছেন তাহাও আমরা ধারণা করিতে পারি নাই। মানুষের ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, লইয়া যে অন্তর্জগৎ তাহার পরিবর্ত্তন ও রূপান্তর তো প্রতিমুহূর্ত্তেই প্রকৃতির ও বিকৃতির কার্য্যের ফলে সাধিত হইতেছে। অন্তর্জগতের পরিবর্ত্তন ও রূপান্তর হইলেই যদি মানবসমাজের বিবিধ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে উহা হইতেছে না কেন, তাহা অনিলবরণ বাবু লোক-সমাজকে বুঝাইয়া দিবেন কি?

অনিলবরণ বাবু কি যে সোনার পাথরের বাটীর কথা বলিয়াছেন, তাহা খুব সম্ভব তিনি নিজেই বুঝেন না। বলিহারি এতাদৃশ বিদ্যাবত্তাকে! বঙ্কিম বাবুর "মুচিরাম গুড়"ই ধন্য!

কি করিলে সমগ্র মনুষ্য-সমাজের, তথা ভারতবর্ষের সমস্যাসমূহের সমাধান হইতে পারে তৎসম্বন্ধে আমরা অনেক বার বলিয়াছি। কাযেই, এ সম্বন্ধে আর তাহার আলোচনা করিব না।

ভারতীয় সভ্যতা ও আদর্শের প্রতি ভারতীয় বহু লোকের বিরক্তির কারণ সম্বন্ধে অনিলবরণ বাবুর মতবাদ

ভারতীয় সভ্যতা ও আদর্শের প্রতি ভারতেরই বহু লোক কেন এত বিরূপ হইয়া পড়িয়াছে এই প্রশ্নের মীমাংসায় অনিলবরণ বাবু যে যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা প্রধানতঃ তিনটী। তাঁহার মতে, প্রথমতঃ, জীবন-যুদ্ধে ভারতের পরাজয়, দ্বিতীয়তঃ, ইংরাজী শিক্ষা, তৃতীয়তঃ, হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে সনাতনী ভ্রাতাগণের বিকৃত ব্যাখ্যা—এই তিনটী ভারতীয় সভ্যতা ও আদর্শের প্রতি ভারতীয় বহু লোকের বিরক্তির কারণ। আমাদিগের মতে অনিলবরণ বাবুর এতদ্বিষয়ক কথাগুলি ভ্রমপ্রমাদ-পরিপূর্ণ।

চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, ভারতীয় সভ্যতা ও আদর্শের প্রতি মানুষের বিরক্তি আধুনিক সূচনা নহে। উহা কয়েক সহস্র বৎসর হইতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রাচীন গ্রন্থসমূহ আলোচনা করিয়া মনুষ্যসমাজের প্রাচীনতম অবস্থা স্থির করিতে পারিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, একদিন সমগ্র মনুষ্যসমাজ প্রত্যক্ষভাবে ভারতীয় সভ্যতা ও আদর্শ সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করিয়াছিল এবং তখন সমগ্র জগতে ধর্ম্মের নামে একমাত্র ভারতীয় ঋষির মানবধর্ম্ম বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। প্রাচীন গ্রন্থসমূহ পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে, গত আড়াই হাজার বৎসরের আগে ভারতীয় ঋষির মানবধর্ম্ম ছাড়া বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও মুসলমান ধর্ম্ম মানবসমাজে স্থান পায় নাই। ইহা ছাড়া আরও দেখা যাইবে যে, জৈন ও আবেস্তা-কথিত ধর্ম্ম

প্রভৃতি ঋষি-প্রণীত মানবধর্মেরই অঙ্গবিশেষ এবং এই সমস্ত ধর্ম ঋষিপ্রণীত মানবধর্মেরই অল্প-বিস্তর রূপান্তর।

যে মানব-সমাজ একদিন একমাত্র "মানব-ধর্ম"কেই ধর্মরূপে গ্রহণ করিয়াছিল, সেই মানবসমাজে অন্যান্য ধর্ম স্থান পায় কেন, তাহা চিন্তা করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, একদিন মানবধর্ম নিখুঁৎ ছিল বলিয়া উহা সমগ্র মানব-সমাজের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিল এবং পরবর্তী কালে উহার মধ্যে ভ্রমপ্রমাদ প্রবিষ্ট হইয়াছিল বলিয়া সমগ্র মনুষ্য-সমাজ উহাতে সন্তুষ্ট থাকিতে পারে নাই এবং কালক্রমে মানুষের চেষ্টার ফলে অন্যান্য ধর্মের অভ্যুদয় ঘটিয়াছে। কাজেই বলিতে হয় যে, ভারতীয় সভ্যতা ও আদর্শের প্রতি মানুষ যে, বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহা আধুনিক নহে, পরন্তু এই বিরক্তিভাব আড়াই হাজার বৎসরেরও অধিক-কালব্যাপী। যে মানবধর্ম একদিন নিখুঁৎ ছিল, সেই মানবধর্মে ভ্রমপ্রমাদ প্রবিষ্ট হয় কি করিয়া, তৎসম্বন্ধে চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলে দেখা যাইবে যে, উহার একমাত্র কারণ মানবধর্মসম্বন্ধীয় গ্রন্থসমূহের বিকৃত ব্যাখ্যা। যতদিন পর্যন্ত মানুষ ঋষিপ্রণীত সংস্কৃতভাষা সম্পূর্ণ সঠিকভাবে বুঝিতে পারিত, ততদিন পর্যন্ত "মানব-ধর্ম"-সম্বন্ধীয় গ্রন্থসমূহ বুঝিবার জন্য প্রায়শঃ কোন ভাষ্যের প্রয়োজন হয় নাই এবং ততদিন পর্যন্ত যাহা কিছু "ভাষ্য" হইয়াছিল তাহা সমস্তই একভাষ্যাত্মক। পরবর্তী কালে যে কোন কারণেই হউক, ঋষি-প্রণীত সংস্কৃত ভাষা সম্পূর্ণ সঠিকভাবে বুঝিবার ক্ষমতা মনুষ্য-সমাজ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে এবং ঋষি-প্রণীত একই গ্রন্থের বিভিন্ন রকমের ভাষ্য প্রণীত হইয়াছে। এই বিভিন্ন ভাষ্যসমূহের প্রত্যেক-খানি সঠিক হইতে পারে না, কারণ, প্রত্যেকখানি সঠিক হইলে ইহাদের মধ্যে মতভেদ দেখা সম্ভব হইত না। কি করিয়া মূল গ্রন্থের ব্যাখ্যা করিতে হয়, তাহা ঋষিপ্রণীত শব্দশাস্ত্রের সাহায্যে সঠিকভাবে পরিজ্ঞাত হইয়া উপরোক্ত বিভিন্ন ভাষ্যসমূহের পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, উহার প্রত্যেকখানি ভ্রমপ্রমাদে পরিপূর্ণ। এতাদৃশ ভ্রমপ্রমাদপরিপূর্ণ ভাষ্যগুলি রচিত হইবার পূর্ব হইতেই মনুষ্যসমাজ "মানবধর্মে"র সঠিক কথাগুলি ভুলিতে আরম্ভ করিয়াছিল এবং বিভিন্ন মতবাদের উদ্ভব ঘটিয়াছিল। এই বিভিন্ন মতবাদের উদ্ভব হওয়াই ভারতের প্রাচীনতম সভ্যতা ও আদর্শের প্রতি মানুষের বিরক্তির মূল কারণ। চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, ঋষি-প্রণীত গ্রন্থ-সমূহের সর্বতোভাবে সঠিক অর্থ গ্রহণ করিবার পদ্ধতি জানা থাকিলে, একই গ্রন্থের তাৎপর্য লইয়া বিভিন্ন মত-বাদের উদ্ভব হইতে পারিত না, একই গ্রন্থের তাৎপর্য লইয়া বিভিন্ন মতবাদের উদ্ভব না হইলে, মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহের উদ্ভব হইতে পারিত না, মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহের উদ্ভব না হইলে, কোন জাতিকেই জীবনযুদ্ধে পরাজিত হইতে হইত না এবং বিভিন্ন ধর্মেরও উদ্ভব ঘটিতে পারিত না। তখন ভারতবর্ষের পরাধীনতার ইতিহাসও দেখা সম্ভব হইত না।

কাজেই বলিতে হইবে যে, যে-ভারতীয় সভ্যতা ও ও আদর্শ একদিন সমগ্র মনুষ্য-সমাজ শ্রদ্ধাভরে গ্রহণ করিয়াছিল, সেই ভারতীয় সভ্যতা ও আদর্শ যে আজ ভারতীয়গণেরই বিরক্তিকর হইয়া পড়িয়াছে তাহার একমাত্র কারণ আদর্শস্থানীয় ঐ সভ্যতা আজ মানুষ বিস্মৃত হইয়াছে এবং ভারতীয় সভ্যতা ও আদর্শের নামে আজ যাহা ভারতবর্ষে প্রচলিত রহিয়াছে তাহা উহার কঙ্কালাবশেষ মাত্র। এই বিস্মৃতির মূল কারণ, ঋষিপ্রণীত সংস্কৃত ভাষা সঠিকভাবে বুঝিবার জন্য ঋষিগণ যে শব্দশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, সেই শব্দশাস্ত্রের বিলুপ্তি।

ছুঁৎমার্গ সম্বন্ধে অনিলবরণ বাবুর মতবাদ

ভারতীয় সভ্যতা ও আদর্শের প্রতি ভারতের বহু লোক এত বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছে কেন, তাহার মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়া, "ধর্ম সম্বন্ধে সনাতনী ভ্রাতাগণের বিকৃত ব্যাখ্যা" উহার অন্যতম কারণ বলিয়া অনিলবরণ বাবু নির্দেশ করিয়াছেন। ইহা আমরা আগেই দেখাইয়াছি। সনাতনী ভ্রাতাগণের বিকৃত ব্যাখ্যা যে ভারতীয় ঋষির ধর্মের বিকৃতির প্রধান কারণ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই বটে, কিন্তু উহাকে মূল কারণ বলা চলে না। কারণ, সনাতনী ভ্রাতাগণ ঋষি-প্রণীত ধর্মের অথবা ধর্ম-গ্রন্থের বিকৃত

ব্যাখ্যা করেন কেন, তাহার চিন্তায় প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, সনাতনী ভ্রাতাগণ ইচ্ছা করিয়া ঐরূপ করেন না। উঁহাদিগকে ঋষির বাক্য যেরূপ ভাবে ভাষ্যকারগণ বুঝাইয়াছেন, উঁহারা প্রায়শঃ সেইরূপ ভাবেই লোক-সমাজকে উহা বুঝাইয়া থাকেন। উঁহাদের দোষ এই যে, উঁহারা মনুষ্যাবয়বী হইয়াও মানুষের মস্তিষ্কহীন এবং উঁহাদিগের ব্যাখ্যা যে পরস্পর-বিরোধী, কার্য্য-কারণ-সঙ্গতিহীন, এবং "বিষয়ত্ব-অনাপন্ন" হইয়া থাকে তাহা উঁহারা বুঝিতে পারেন না। সনাতনী ভ্রাতাগণ যে ঐরূপ ভু-ব্যাখ্যা করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন না, তাহার প্রধান কারণ, ঋষি-প্রণীত সংস্কৃত ভাষা সম্বন্ধে তাঁহাদিগের অজ্ঞতা। মস্তিষ্কের মধ্যে যে "গুরু"র কার্য্য বিদ্যমান রহিয়াছে তাহার সহায়তায় অষ্টাধ্যায়ী সূত্র-পাঠের "মহেশ্বর-সূত্রে"র প্রকৃত অর্থ পরিজ্ঞাত হইয়া সংস্কৃত ভাষার বিবিধ ব্যাকরণের পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, ঐ সমস্ত ব্যাকরণের প্রত্যেকখানির সূত্র ও বৃত্তি প্রায়শঃ সঠিক, কিন্তু কোনখানির ভাষ্য ও টীকা ভ্রম-প্রমাদহীন নহে। সনাতনী ভ্রাতাগণ যে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া থাকেন তাহা ব্যাকরণের ঐ ভাষ্য ও টীকার সাহায্যে। তদ্দ্বারা ঋষি-প্রণীত সংস্কৃত বাক্যের সঠিক ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় না।

কাযেই, ঋষি-প্রণীত সংস্কৃত ভাষা বুঝিবার অক্ষমতাকেই ভারতীয় সভ্যতার ও আদর্শের প্রতি মানুষের বিরক্তি ও উদাসীন্যের মূল কারণ বলিয়া স্থির করিতে হইবে।

অনিলবরণ বাবুর কথানুসারে, "সনাতনী ভ্রাতাগণের ভু-ব্যাখ্যার ফলেই ভারতীয় ঋষির ধর্ম্মে "ছুঁৎমার্গ" আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে এবং ঐ "ছুঁৎমার্গ" অতীব নিন্দনীয়"। আধুনিক হিন্দুগণের মধ্যে "ছুঁৎমার্গের" যেরূপ বাড়াবাড়ি দেখা যায়, তাহা কখনও প্রশংসনীয় নহে এবং তাহা যে ঋষির ধর্ম্মের বিরুদ্ধ তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই বটে, কিন্তু অবস্থাবিশেষে অনিলবরণ বাবুকে জানিতে হইবে যে, "ছুঁৎ-মার্গ" ঋষির ধর্ম্মসম্মত এবং উহা নিতান্ত আবশ্যকীয়। তন্ত্র ও বেদের অভ্যাসকালে যে যে নিয়ম পালন করিতে হয়, তৎসম্বন্ধে ঋষিগণ যাহা বলিয়াছেন তৎপ্রতি লক্ষ্য করিলে আমাদিগের কথার সাক্ষ্য পাওয়া যাইবে। তন্ত্র ও বেদের অভ্যাসকালে স্বকীয় অন্তরস্থ শরীর-গঠনের অতীব সূক্ষ্মতম অংশগুলি, শরীর-বিধানের সূক্ষ্মতম কর্ম্মগুলি এবং বায়ুমণ্ডলস্থ ব্যোম, বায়ু, অপ্ ও বহ্নির সূক্ষ্মতম বিধান-গুলি স্পর্শ করিতে হয়। ঐ সময়ে স্বকীয় শরীর একমাত্র সমভাবাপন্ন স্ত্রী ব্যতীত অপর কাহারও দ্বারা স্পৃষ্ট হইলে, উপরোক্ত সূক্ষ্মতম স্পর্শগুলি লাভ করা কোন ক্রমেই সম্ভব হয় না এবং ঐ স্পর্শ-গুলি লাভ করিতে না পারিলে একদিকে যেরূপ তন্ত্র ও বেদের অভ্যাস সার্থক হয় না, অন্য দিকে আবার জল, স্থল, বায়ু, তেজ, রস, চয় ও অচর-জীবনরক্ষার মূল বিজ্ঞান প্রত্যক্ষ করা যায় না। কাযেই, অবস্থা-বিশেষে "ছুঁৎমার্গ" যে নিতান্ত প্রয়োজনীয় তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। যাঁহারা "ছুঁৎমার্গে"র নাম শুনিলেই শিহরিয়া উঠেন তাঁহারা আজকালকার জগতে যতই খ্যাতিপন্ন হউন না কেন, ভারতীয় ঋষির ধর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে পরিজ্ঞাত নহেন, ইহা বুঝিতে হইবে।

বিধবাদিগের সম্বন্ধে হিন্দু শাস্ত্রের ব্যবস্থা বিষয়ে অনিলবরণ বাবুর মতবাদ

সনাতনী ভ্রাতারা কি ভাবে হিন্দু আদর্শকে বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া হিন্দু সমাজের ঘোরতর অনিষ্ট সাধন করিতেছেন তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ অনিলবরণ বাবু হিন্দু বিধবাদিগের বৈধব্য পালনের ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার এই-বিষয়ক সন্দর্ভের প্রথম ভাগেই শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের একটী বক্তৃতার কতকাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বক্তৃতার উপরোক্ত অংশের উল্লেখযোগ্য কথা নিম্নলিখিত চারিটী :—

(১) স্বামীর মৃত্যু হইলে বিধবা অপর স্বামীর কথা মনেও চিন্তা করিবে না।

(২) বিধবাকে যে কেবলমাত্র সকল প্রকার বিলাস বর্জ্জন করিতে হইবে তাহা নহে ; তাহার বেশ-ভূষা প্রভৃতি বিষয়ে যে সকল বস্তু সচরাচর

প্রয়োজন তাহা হইতেও তাহাদিগকে বঞ্চিত করিতে হইবে।

(৩) পূর্ব্বজন্মকৃত গুরু অপরাধের ফলেই রমণী বৈধব্য লাভ করে।

(৪) বিধাতার লঙ্ঘনীয় নিয়ম এই যে, অন্যায় করিলে দুঃখ-ভোগ অবশ্য করিতে হইবে। কিন্তু, যাহাতে দুঃখভোগ শীঘ্র সমাপ্ত হয়, এজন্য মনু ব্যবস্থা দিয়াছেন বিধবা স্বেচ্ছায় আরও অধিক দুঃখ বরণ করিয়া লইবে।

বৈধব্য-ব্যবস্থা সম্বন্ধে বসন্তকুমার বাবুর উপরোক্ত মতবাদ সমালোচনা করিতে বসিয়া অনিলবরণ বাবু যাহা যাহা বলিয়াছেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কথা নিম্নলিখিত নয়টী :—

(১) পূর্ব্বজন্মে কেহ কোন অপরাধ করিলে তাহার জন্য এজন্মে তাহাকে শাস্তি দেওয়ার কোনই সার্থকতা নাই।

(২) মানুষের প্রকৃতি, মানুষের চরিত্র তাহার কর্ম্মের দ্বারাই গঠিত হয়।

(৩) হিন্দু দর্শনের মতে ভগবান্ কাহাকেও তাহার কর্ম্মের জন্য সুখদুঃখ কোন প্রকার ফল প্রদান করেন না। তাহার প্রমাণ, গীতার ৫ম অধ্যায়ের ১৪শ শ্লোক—

"ন কর্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥"

(৪) প্রত্যেক জীব হইতেছে ভগবানের অংশ, প্রত্যেকেই ভগবানের একটী বিশেষ শক্তি, একটী বিশেষ ভাব প্রকট করিবার জন্য জগৎলীলায় আবির্ভূত হইয়াছে, উহাই তাহার "স্বভাব"। এই স্বভাবই তাহার অদৃষ্ট। জন্মজন্মান্তরের ভিতর দিয়া, নানা সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যুর ভিতর দিয়া জীব তাহার এই অন্তর্নিহিত ভাগবত ভাবের বিকাশ করিতেছে। এক জন্মে সে তাহার কর্ম্মের দ্বারা বিকাশের যে অবস্থায় উপনীত হইতেছে, তাহার দ্বারাই তাহার পর জন্মের জীবন ও কর্ম্মধারা নির্দ্ধারিত হইতেছে। এই ভাবেই সে পূর্ণ ভাগবত জীবনের দিকে অগ্রসর হইতেছে। অনেক সময়ে দুঃখ-ভোগের ভিতর দিয়াই আত্মবিকাশের সহায় হয়। তাই সে দুঃখ পাইতেছে। তাহার কৃতকর্ম্মের সাজার জন্য কেহ তাহাকে দুঃখ দিতেছে না। তাহার স্বভাবের বিকাশের প্রয়োজনেই সে কখনও দুঃখ, কখনও সুখ ভোগ করিতেছে। এই ভাবে সকল সুখ-দুঃখের ঊর্দ্ধে পরম আনন্দময় দিব্যজীবনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিয়া তুলিতেছে।

ইহাই হিন্দুর কর্ম্মবাদ ও জন্মান্তর-বাদের মূলতত্ত্ব।

(৫) তাহা হইলে (অর্থাৎ ৪র্থ দফা-কথিত কারণ বশতঃ) কোন রমণী বিধবা হইলেই তাহার উপর আরও দুঃখ চাপাইয়া দিতে হইবে ইহার সার্থকতা কি? দুঃখই যদি তাহার পক্ষে প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে ঐ স্বামি-বিয়োগ-দুঃখেই যে সে প্রয়োজন সিদ্ধ হইল না, তাহা কে বলিবে?

(৬) বিধবাদের যে নিরতিশয় কঠোরভাবে জীবন-যাপন করিতে বাধ্য করা হয় ইহাও হিন্দুর শাস্ত্রবিরুদ্ধ অন্ধ গতানুগতিক বেশাচার মাত্র। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় স্পষ্ট বলিয়াছেন, যাহারা শরীরকে পীড়ন করে তাহারা আসুরিক, তাহারা শরীরের মধ্যে অবস্থিত ভগবান্‌কেই পীড়া দেয়।

(৭) বিধবা পুনর্ব্বার বিবাহ করিবে কি না···তাহা সে নির্দ্ধারণ করিবে নিজে, অপরে নহে।

(৮) হিন্দু-শাস্ত্রে বিধবাগণকে এই স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছিল,—শুধু বিধবারা নহে, 'নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ'—স্বামী দুশ্চরিত্র, মৃত, সন্ন্যাসী, ক্লীব বা পতিত হইলে নারী অন্য পতি গ্রহণ করিতে পারে, এ ব্যবস্থা মনুসংহিতাতেই আছে।

(৯) হিন্দু বিধবারা স্বেচ্ছায় ব্রহ্মচর্য্য-পালনে ব্রতী হইলে সমাজে তাহারা বিশেষ সম্মান লাভ

করিত, তাই বিধবার ব্রহ্মচর্য্য শিষ্টাচার, দেশাচার হইয়া পড়ে। এখন ইহা গতানুগতিক হইয়া পড়িয়াছে।...

অনিলবরণ বাবুর উপরোক্ত কথা কয়টীর প্রতিবাদে বসন্তকুমার বাবু ৮ই মাঘ সংখ্যার আনন্দবাজার পত্রিকায় "মত ও পথ"-শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

এই প্রবন্ধে বসন্তবাবু যাহা যাহা বলিয়াছেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কথা নিম্নলিখিত নয়টী।

(১) বিধবার ব্রহ্মচর্য্য এবং কৃচ্ছ্রসাধন হিন্দু-শাস্ত্রেই আছে। প্রমাণ, মনুসংহিতার ৫ম অধ্যায়ের ১৫৭, ১৫৮ ও ১৬০ শ্লোক এবং ৯ম অধ্যায়ের ৬৫, ৭১ ও ৭৭ শ্লোক।

(২) ঈশ্বর জীবকে কর্ম্ম অনুসারে সুখ-দুঃখ প্রদান করেন, অনিলবরণ বাবু এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু, "ফলং অত উপপত্তেঃ" (ব্রহ্মসূত্র, ৩.২।৩৮) এই সূত্রে মহর্ষি বেদব্যাস এই সিদ্ধান্তই স্থাপন করিয়াছেন এবং আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ উভয়েই ইহাকে বৈদিক সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এই সূত্রের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য এই মতের সমর্থনে দুইটী উপনিষদ্-বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং গীতার ৭।২২ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন,: যেখানে ভগবান্ বলিয়াছেন যে, লোকে অন্য দেবতার উপাসনা করিয়া যে অভীষ্ট ফল লাভ করে, তাহাও ভগবানের প্রদত্ত ফল।

(৩) ব্রহ্মসূত্র ২-১-৩৪ "বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথাহি দর্শয়তি" এই সূত্রে বেদব্যাস বলিয়াছেন যে, ঈশ্বর কর্ম্ম অনুসারে সুখ ও দুঃখ প্রদান করেন।

(৪) ঈশ্বর কর্ম্মফল প্রদান করেন না, এই মত সমর্থন করিবার জন্য অনিলবরণ বাবু গীতা ৫।১৪ উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহার প্রকৃত অর্থ এই যে, আত্মা আনন্দস্বরূপ, কর্ম্মফল, সুখ-দুঃখ আত্মাকে স্পর্শ করে না, অজ্ঞান-হেতু জীব নিজকে সুখী বা দুঃখী মনে করে।

ছান্দোগ্য উপনিষদে (৫।১০।৭) বলা হইয়াছে যে, যাহারা উৎকৃষ্ট কর্ম্ম করে তাহারা ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উত্তম যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে, যাহারা নিকৃষ্ট কর্ম্ম করে তাহারা চণ্ডাল প্রভৃতি নীচ যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে।

কঠোপনিষদ্ (৫।৭) শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, জীব কর্ম্মানুসারে স্থাবর বা অস্থাবর যোনি প্রাপ্ত হয়।

গীতা ১৬।১৯ শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন যে, দুষ্ট প্রকৃতির লোককে তিনি আসুর যোনিতে নিক্ষেপ করেন।

(৮) সুতরাং (অর্থাৎ ৫, ৬, ৭ দফার প্রমাণানুসারে) ভগবান্ জীবকে এক জন্মের কর্ম্মের ফল পর জন্মে ভোগ করান, ইহাই গীতা ও উপনিষদের মত।

(৯) অনিল বাবু বিধবা বিবাহ সমর্থন করিয়া নিম্ন লিখিত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন—

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ

ইত্যাদি।

এই শ্লোকে "পতি" শব্দের অর্থে যদি বিবাহিতা পতি গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে মনুসংহিতার পূর্ব্বোদ্ধৃত বাক্যগুলির সহিত বিরোধ হয়।

মনুসংহিতার সহিত বিরোধ পরিহার করিবার জন্য পরাশর-সংহিতার এই বাক্যে 'পতি' শব্দের অর্থ 'বাগ্‌দত্ত পতি' বলিয়া গ্রহণ করা হয়। অন্য কোন উপায়ে মনু ও পরাশর-বাক্যগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করা যায় না।

ভারতীয় ঋষির বৈধব্য-পালন-ব্যবস্থা লইয়া অনিলবরণ বাবু ও বসন্ত বাবুর মধ্যে যে বাদ-প্রতিবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মীমাংসা করিতে হইলে আমাদিগকে নিম্নলিখিত তিনটী বিষয়ের বিচার করিতে হইবে :—

(১) ভারতীয় ঋষির শাস্ত্রানুসারে বৈধব্য-পালন বাধ্যতামূলক অথবা স্বেচ্ছামূলক অথবা বৈধব্য ত্যাগ বাধ্যতামূলক, অথবা আর কিছু।-

(৫) বৈধব্যপালন কি রমণীর পক্ষে শাস্তি অথবা কর্ত্তব্যপালন ?

ভারতীয় ঋষির শাস্ত্রানুসারে ঈশ্বর জীবকে তাহার কর্ম্মানুসারে সুখ দুঃখপ্রদান করেন, অথবা জীব তাহার কর্ম্মানুসারে সুখদুঃখ ভোগ করিয়া থাকে, অথবা আর কিছুর জন্য জীবের সুখ ও দুঃখের ভোগ হইয়া থাকে।

এবার আমাদিগের স্থানাভাব হইয়াছে। আগামী বারে আমরা এই তিনটি বিষয়ের বিচার করিব।

বিশ্ব-শান্তি ও গ্রেট বৃটেনের দায়িত্ব

সংপ্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট, ইংলণ্ডের প্রধান-মন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেন এবং জার্ম্মানীর একচ্ছত্র নায়ক হের হিটলার যে বক্তৃতা, বিবৃতি ও প্রতি-বিবৃতি দান করিয়াছেন, বিশ্ব-শান্তিসম্বন্ধীয় কোন আলোচনায়, ঐ সকল বক্তৃতা, বিবৃতি ও প্রতি-বিবৃতি উল্লেখযোগ্য। আমরা ভুলিয়াও এরূপ ভাবিতেছি না যে, উহাদের একটির অন্তরালেও সামান্য মাত্র আন্তরিকতা বর্ত্তমান কিংবা এই সকল রাষ্ট্র-ধুরন্ধরদের কেহ পৃথিবীব্যাপী সম্পূর্ণ শান্তির জন্য প্রকৃতপক্ষে ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। প্রত্যেক দেশের অধিকাংশ ব্যক্তিকে যে-অবস্থায় দিন যাপন করিতে হইতেছে, তাহাতেই যে তাঁহারা বিশ্ব-শান্তির কথা বলিতে বাধ্য হইয়াছেন, ইহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি। হইতে পারে যে, বিশ্ব শান্তি ব্যবস্থিত করিতে যে আন্তরিকতা ও ব্যাকুলতার অবশ্য প্রয়োজন, তাহা আজিও পর্য্যন্ত রাষ্ট্র-ধুরন্ধরগণের কাহারও মধ্যে দেখা যাইতেছে না, কিন্তু আমাদের মতে, সে দিনের বিলম্ব নাই, যখন হয়, প্রত্যেক দেশের নেতৃবৃন্দ তাঁহাদের নেতৃত্ব বর্জ্জনে বাধ্য হইবেন, নতুবা, শান্তি-প্রতিষ্ঠার প্রকৃত পন্থানুসরণার্থ কপটতা পরিহার করিয়া তাঁহারা প্রকৃত সাধুতা এবং সততার অনুগামী হইবেন। আমাদের এই কথা বলিবার অর্থ এই যে, ইহা বাস্তব সত্য, যতদিন পর্য্যন্ত প্রত্যেক দেশের অধিকাংশ জন-সাধারণের আহার্য্যের কথঞ্চিৎ সঙ্কুলান থাকে, ততদিন পর্য্যন্তই কূটনীতি ও শঠতা কার্য্যকরী হইতে পারে। কিন্তু, যে-সময়ে প্রত্যেক দেশের অধিকাংশ ব্যক্তি হয় অনশনে, নয় অর্দ্ধাশনে প্রপীড়িত হইতে থাকে, তখন আর কূটনৈতিক বিবৃতি এবং মিষ্ট কথাতেই বাঞ্ছিত শান্তি ও সন্তুষ্টি ব্যবস্থিত হইতে পারে।

বর্ত্তমান কালের ন্যায় দুর্দ্দিন লিখিত ইতিহাসে মনুষ্য-সমাজে আর দেখা যায় নাই, ইহা সত্য। ইতিহাসের এই ঘটনা হইতে এমন সিদ্ধান্তেও উপনীত হওয়া যায় যে, কোন দেশের অধিকাংশ ব্যক্তি প্রয়োজনীয় খাদ্যাভাবে প্রপীড়িত হইতে পারে না, ইহাও হয়তো সত্য কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, যদি আগামী দুই বৎসর কালের মধ্যে নদীস্রোতের বাঁধসমূহ সম্পূর্ণভাবে অপসারিত না হয়, তবে সমস্ত পৃথিবীর স্থল-ভাগ যতদূর সম্ভব অনুর্ব্বর হইয়া পড়িবে এবং প্রত্যেক দেশে মনুষ্যজাতির অধিকাংশকেই হয় অনশন, নয় অর্দ্ধাশন ভোগ করিতে হইবে। যখন সমগ্র পৃথিবীর মনুষ্য-সমাজে এই অবস্থা দেখা দিবে, তখন অন্তরে অন্তরে অনুভব না করিয়া কেবল শান্তির কথা মুখে বলিলে চলিবে না, সে-কথার পশ্চাতে আন্তরিকতা প্রয়োজন হইবে।

সুতরাং স্বতঃই প্রশ্ন দাঁড়াইতেছে এই যে, কি ভাবে পৃথিবীব্যাপী প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। প্রথমে এই প্রশ্ন অত্যন্ত কঠিন বলিয়া মনে হইতে পারে এবং মনুষ্য-সমাজের বর্ত্তমান নেতৃবৃন্দ মনে করিতে পারেন যে, বাঞ্ছিত শান্তি-প্রতিষ্ঠার বহুবিধ পন্থা আছে। আমাদের মত এই যে, মনুষ্যজাতির বর্ত্তমান অবস্থায় সর্ব্বব্যাপক শান্তির প্রতিষ্ঠা দুঃসাধ্য ইহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু অসাধ্য নহে এবং তৎকল্পে ব্যবস্থা একটির বেশী দুইটি নহে।

মিঃ রুজভেল্ট মনে করিতেছেন যে, বিপত্তির মূলে যাঁহারা রহিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে মিলন সংস্থাপনার্থ, পৃথিবীর সমস্ত জাতির দায়িত্ব-বাহক প্রতিনিধিবৃন্দের সম্মেলন-সাহায্যেই বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। তাঁহার মতে, জার্ম্মান ও ইতালীয়, এই দুই জাতিই তাঁহাদের রাজ্য-বিস্তার-লিপ্সায় মনুষ্যজাতির

শান্তিতে বাধা উপস্থিত করিয়াছেন এবং তাঁহাদিগকে যদি তাঁহাদিগের এই কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করা যায়, তবে পৃথিবীতে অচিরাৎ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে।

মিঃ নেভিল চেম্বারলেনের আচরণে মনে হয় যে, তিনি মনে করেন যে, যদি এই দুই বিশ্ব-উপদ্রবকারক জাতিকে তাহাদের অপেক্ষা অধিক অস্ত্রশস্ত্র ও রণসজ্জার ভয় দেখাইয়া থামাইয়া রাখা যায়, তাহা হইলেই বাঞ্ছিত বিশ্ব-শান্তিপ্রতিষ্ঠায় কোন বাধা উপস্থিত হইবে না।

হের হিটলার যুক্তি দেখাইয়াছেন যে, বিশ্ব-শান্তির পথে বাধা উপস্থিত করিবার দায়িত্ব জার্ম্মানী কিংবা ইতালী কাহারও স্কন্ধে আরোপ করা যায় না, পরন্তু ইহার জন্য প্রধানতঃ গ্রেটবৃটেনই দায়ী।

আমরা মনে করি যে, মিঃ রুজভেল্টের শান্তিমূলক সম্মেলন, কিংবা মিঃ নেভিল চেম্বারলেনের সশস্ত্র ভীতি-প্রদর্শন, উভয় পরিকল্পনার কোনটিই বাঞ্ছিত শান্তি প্রতিষ্ঠার সহায়ক হইবে না। যদি ভীতি-প্রদর্শন দ্বারা জার্ম্মানী কিংবা ইতালীকে ইংলণ্ড কর্ত্তৃক এরূপ ভাবে নিরস্ত্র রাখা সম্ভবও হয়, যাহাতে সাময়িক ভাবে তাহাদের রণসজ্জা-বৃদ্ধি এবং যুযুৎসা স্থগিত থাকে, তথাপি উহা চিরস্থায়ী হইবে না, কেন না, যে সকল স্থান ইতিমধ্যেই তাহারা অধিকার করিয়াছে, সেই সকল স্থান হইতে যদি তাহারা আর্থিক প্রয়োজন পূরণে ব্যর্থকাম হয়, তবে শেষ পর্য্যন্ত তাহারা বে-পরোয়া হইয়া পড়িতে বাধ্য। মিঃ রুজভেল্টের পরিকল্পনার পরিণতিও শেষ পর্য্যন্ত এই একই দাঁড়াইবে। তর্কের খাতিরে যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, মিঃ রুজভেল্টের নৈতিক ও দার্শনিক বক্তৃতা জার্ম্মান ও ইতালীয় জাতিকে তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী চুক্তি-বন্ধনের মধ্যে আনিবার প্রেরণা দান করিবে, কিন্তু ক্ষুধা-তৃষ্ণার অনল নৈতিক কিংবা দার্শনিক সূত্রালোচনার দ্বারা নির্ব্বাপিত হইতে পারে না।

এই সকল আলোচনা যদি আন্তরিক ব্যাকুলতা দ্বারা সমর্থিত হয় তবে মনুষ্য-সমাজের নেতৃবৃন্দকে প্রথমতঃ সন্ধান করিতে হইবে, বর্ত্তমান সর্ব্বব্যাপক অশান্তির মূল কারণ কি। দ্বিতীয়তঃ সন্ধান করিতে হইবে, কোন্ কোন্ দেশ কিংবা জাতির এই সকল কারণ বিদূরিত করিবার প্রকৃত সামর্থ্য আছে এবং তৃতীয়তঃ তাঁহাদিগকে এই সকল দেশ ও জাতিকে ঐ সকল কারণ দূরীকরণে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে।

বর্ত্তমান অশান্তির মূলে কি কারণ বিদ্যমান, তাহার সন্ধানার্থ প্রকৃত প্রস্তাবে প্রয়াসী হইতে হইলে মনুষ্য-সমাজের নেতৃবৃন্দকে হের হিটলার তাঁহার বিবৃতির যে অংশে তাঁহার উপনিবেশসমূহ ফিরিয়া চাহিবার কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন, সমনোযোগে উহার বিচার করিতে হইবে। হের হিটলার স্পষ্টভাবে একাধিকবার প্রকাশ করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান জার্ম্মানী সমগ্র জার্ম্মান অধিবাসীর উপযোগী আহার্য্য এবং কাঁচামালের উৎপাদনপক্ষে যথেষ্ট প্রশস্ত নহে, এবং এই নিমিত্তই তিনি জার্ম্মান রাজ্যের বিস্তারার্থ উদ্গ্রীব হইয়াছেন। কেবল রাজ্য বিস্তার লাভ করিলেই জার্ম্মান জাতির সমস্যার সমাধান হইতে পারে কি না, এখানে উহা আমাদের আলোচ্য নহে, কিন্তু ইহা নিশ্চয় বলিয়া ধরিতে হইবে যে, জার্ম্মান জাতির আহার্য্য ও কাঁচামালের অভাব ঘটিয়াছে এবং যতদিন তাহারা যথেষ্ট আহার্য্য ও কাঁচামাল না পাইবে, ততদিন তাহারা রাজ্যবিস্তার-লিপ্সা পরিহার করিতে পারিবে না।

সুতরাং যুক্তিসঙ্গত ভাবে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় যে, জার্ম্মান জাতির আর্থিক অস্বচ্ছলতা (অর্থাৎ আহার্য্য ও কাঁচামালের অসংস্থান) জার্ম্মানীর যুদ্ধলিপ্সা এবং রাজ্যবিস্তার-পরিকল্পনার মূল। এইভাবে যদি বর্ত্তমান পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশ ও জাতির অবস্থা পর্য্যালোচনা করা যায়, তবে দেখা যাইবে যে, কেবল একাকী জার্ম্মানী কিংবা জার্ম্মান জাতিই যে আহার্য্য ও কাঁচামালের অভাব ভোগ করিতেছে তাহা নহে, প্রত্যেকটি দেশ ও জাতিই এই কষ্ট ভোগ করিতেছে। ইহাও দেখা যাইবে যে, যেমন প্রত্যেকটি দেশ ও প্রত্যেকটি জাতি এই কষ্ট ভোগ করিতেছে, তেমনই কলহ ও দ্বন্দ্ব-লিপ্সায়, যাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম যুদ্ধ, প্রত্যেক দেশ ও প্রত্যেক জাতি বিপর্য্যস্ত।

সুতরাং অবিসংবাদিত সিদ্ধান্ত এই যে, বর্ত্তমান জগতের অশান্তির মূল কারণ আহার্য্য এবং কাঁচামালের

অনটন। এই সিদ্ধান্ত প্রকৃত কি না, ইহা পরীক্ষার্থ পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, প্রায় প্রত্যেক দেশে ঐ দেশের সমগ্র অধিবাসীর সন্তুষ্টমনে সুখ জীবন-যাপনের পক্ষে যে পরিমাণ খাদ্য-শস্যের প্রয়োজন, তদপেক্ষা কম শস্য উৎপন্ন হইতেছে। জনসাধারণ খাদ্য-শস্য হ্রাসের এই বিষয় বুঝিয়া উঠিতে পারে না, কেন না প্রয়োজনীয় খাদ্য শস্য ক্রয়ের নিমিত্ত ধাতু ও কাগজ-নির্ম্মিত যে পরিমাণ মুদ্রার প্রয়োজন, অধিকাংশই তাহা হইতে বঞ্চিত। সমাজের প্রত্যেকে যাহাতে তাহার ন্যূনতম প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়ের মূল্য লাভ করে, মুদ্রা-বিতরণের এইরূপ কোন ব্যবস্থা গৃহীত হইলে উপরে যে খাদ্যশস্য-হ্রাসের কথা বলা হইয়াছে, উহা অচিরাৎ উপলব্ধ হইবে।

গত কিছুকাল ধরিয়াই মনুষ্য-সমাজ খাদ্য-শস্যাভাবের মধ্য দিয়া চলিয়া আসিতেছে। তথাপি ১৯৩৩ সন পর্য্যন্ত জন-সাধারণের অধিকাংশের প্রয়োজনপূরণোপ-যোগী উৎপাদনের হ্রাস ঘটে নাই। কিন্তু, ১৯৩৩ সন হইতে এই হ্রাস এমতাবস্থায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে যে, তখন হইতে জন-সাধারণের অধিকাংশকেই ইহার জন্য কষ্ট পাইতে হইতেছে, অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই তাঁহাদের প্রয়োজন পূরণ করিয়া জীবনাতিবাহিত করিতে পারিতে-ছেন। এই জন্যই গত ১৯৩৩ সন হইতেই অশান্তির প্রকোপ অধিকতর মাত্রায় দেখা দিয়াছে। খাদ্যশস্যের এই হ্রাসপূরণের জন্য মনুষ্যসমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবৃন্দ ব্যবহার্য্য দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির নিমিত্ত প্রয়াসী হইয়াছেন, কিন্তু খাদ্যশস্যের উৎপাদন-হ্রাস যে দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির দ্বারা সমাধান সম্ভব নহে, ইহা তাঁহারা বিস্মৃত হইয়াছেন। খাদ্যশস্য খাইয়াই মানুষকে জীবন ধারণ করিতে হয়, ধাতু ও কাগজনির্ম্মিত গাদা গাদা পাউণ্ড-শিলিং-পেন্স কিংবা টাকা-আনা-পাই চিবাইয়া খাইলে মানুষ বাঁচিতে পারে না।

সুতরাং ইহা নিশ্চিত ভাবে বলা যাইতে পারে যে, আহার্য্য ও কাঁচামালের হ্রাসই বর্ত্তমান কালে মনুষ্যসমাজের বিপর্য্যয় ও অশান্তির মূল এবং এই হ্রাস দূরীকরণের ব্যবস্থা গৃহীত না হইলে অন্য কোন উপায়েই সমগ্র মনুষ্যসমাজের শান্তি ব্যবস্থিত হইতে পারে না।

আহার্য্য ও কাঁচামালের ঘাটতিই বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজের সর্ব্ব অশান্তির কারণ, ইহা বলিবার অর্থ এই যে, ইহাই প্রধান কারণ, কিন্তু সংশ্লিষ্ট অপরাপর কারণও অবশ্য এই অবস্থার জন্য দায়ী। অপর কারণের মধ্যে ভ্রান্ত মর্য্যাদা-বোধ এবং রিপুপরবশতাও পৃথিবীব্যাপী বর্ত্তমান অশান্তির মূলে বিদ্যমান। এই ভ্রান্ত মর্য্যাদাবোধ এবং রিপুপরবশতা আবার পৃথিবীব্যাপী বর্ত্তমানে যে কুশিক্ষা ও কুসভ্যতা প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহার ফল।

অতএব, বর্ত্তমান অশান্তির প্রকৃত কারণ কি, মোটামুটি ভাবে তাহা বলিতে গেলে আমাদিগকে বলিতে হইবে উহার কারণ দুইটি :—

(১) খাদ্যশস্যের উৎপাদনের ঘাটতি ;

(২) কু-শিক্ষা ও কু-সভ্যতা।

গভীর ভাবে বিচারক্ষম ব্যক্তির নিকট সুপরিস্ফুট হইবে যে, যদি সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির প্রয়োজন পূরণার্থ যথেষ্ট খাদ্যশস্য উৎপাদনের ব্যবস্থা না করা যায়, কিংবা মিথ্যা মর্য্যাদাবোধের দমনমূলক এবং রাগদ্বেষবিমুক্ত হইবার শিক্ষার ব্যবস্থা না করা যায়, তবে শান্তি-সম্মেলনই হউক, কিংবা জাতি-প্রদর্শনই হউক, কোন কিছুর সাহায্যেই মনুষ্যসমাজে কাম্য শান্তির প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইবে না। এই দুইটি ব্যবস্থার মধ্যে, আবার খাদ্যশস্যের যথেষ্ট উৎপাদন-ব্যবস্থা প্রথম এবং অগ্রগণ্য।

কোন্ কোন্ জাতি এবং দেশের এমন ব্যবস্থা করিবার প্রকৃত সামর্থ্য আছে, যাহাতে প্রচুর খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইতে পারে, এই আলোচনায় অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে এই ব্যবস্থা কিরূপে হইতে পারে তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞানের প্রয়োজন। আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, পৃথিবীর প্রত্যেক দেশেই এই সকল ব্যবস্থা করা সম্ভব, কিন্তু স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তিসম্পন্ন দেশের পক্ষে উহা যত দ্রুত করা সম্ভব, স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তিবিহীন দেশের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। এই দিক্ হইতে ভারতবর্ষই একমাত্র দেশ, যাহা অচিরাৎ মনুষ্যসমাজের অশান্তি-সমস্যার সমাধান করিতে পারে, কেন না, ভারতের মাটির স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি সর্ব্বাধিক, যদি অবশ্য অচিরে তদনুযায়ী ব্যবস্থা গৃহীত হয়।

সুতরাং ভারতবর্ষই একমাত্র দেশ, যাহার সমগ্র পৃথিবীর অশান্তির সমস্যা-সমাধানের প্রকৃত সামর্থ্য বিদ্যমান এবং পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থায় বৃটিশ জাতিই একমাত্র জাতি, যাহা অনতিবিলম্বে উহা সাধন করিতে পারে।

যদি মাটির উর্ব্বরাশক্তির বিজ্ঞান-সম্মতির সম্পূর্ণ গবেষণা করা যায় এবং উর্ব্বরাশক্তির দিক্ হইতে সমগ্র পৃথিবীর মাটির জরিপ করা যায়, তবে দেখা যাইবে যে, আগামী দশ বৎসর কালের মধ্যে ভারতের নদীসমূহের স্বাভাবিক স্রোতের বাধা-স্বরূপ রেল ও রাস্তার যে-সকল সেতু, বাঁধ, পুল ইত্যাদি রহিয়াছে, তাহা অপসৃত হইলে ভারতের মাটির স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি এমন পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে যে, একমাত্র ভারতই সমগ্র পৃথিবীর মনুষ্য-জাতির প্রয়োজনানুরূপ খাদ্যশস্য সরবরাহ করিতে পারিবে। অন্যপক্ষে অপর কোন দেশকে ৫০ বৎসরের কমে স্বকীয় প্রয়োজন-পূরণের উপযোগী পর্য্যাপ্ত করিয়া তুলা সম্ভব নহে। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণের ইহা বিদিত না থাকিতে পারে, কিন্তু তথাপি ইহা সত্য যে, উর্ব্বরাশক্তির প্রধান উপাদান যে তেজ ও রস, তাহার উৎপাদক সূর্য্য ও চন্দ্রের সম্পর্কে ভারতবর্ষ এমন অবস্থান অধিকার করিয়া আছে যে, মাটির স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি বিষয়ে ভারতই ঈর্ষণীয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

যদি একবার খাদ্যশস্যের এই ঘাটতি পূরণ করা যায়, তবে শিক্ষার প্রকৃত ব্যবস্থার সন্ধান কঠিন হইবে না—যে-শিক্ষায় মনুষ্য-জাতি মিথ্যা মর্য্যাদাজ্ঞান ও রাগদ্বেষ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে। কিন্তু, যদি সমাজের প্রত্যেকের জন্য সুস্থ জীবনধারণোপযোগী প্রচুর খাদ্য ও কাঁচামালের ব্যবস্থা সাধন না করা যায়, তবে শিক্ষাসংস্কারের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইবে, কেন না, প্রকৃত শিক্ষার জন্য শিক্ষক ও ছাত্রের উভয়েরই স্বাস্থ্যের অবস্থা যেরূপ হওয়া প্রয়োজন, তাহা সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তির নিমিত্ত সুস্থ জীবনধারণোপযোগী খাদ্য-ব্যবস্থা সাধিত না হইলে সম্ভব নহে এবং মাটির স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি বজায় না থাকিলে সমাজের প্রত্যেকের নিমিত্ত সুস্থ জীবনধারণোপযোগী খাদ্য ব্যবস্থিত হইতে পারে না। সুস্থ জীবনধারণোপযোগী যথাযোগ্য আহার্য্যের অভাবেই বর্ত্তমান সমাজের শিক্ষক ও ছাত্র যে শিক্ষা লাভ করিয়া থাকেন, তাহার স্বরূপ বুঝিয়া উঠিতে পারেন না—তাঁহারা বুঝেন না যে, এই শিক্ষার নিমিত্তই তাঁহাদের প্রায় প্রত্যেকেই রিপুপরবশ, সদসৎ-বিচার-বুদ্ধিহীন, চরিত্রহীন এবং অসত্যপরায়ণ হইয়া পড়িয়াছেন। বৈজ্ঞানিকগণ ধুয়া উঠাইতে পারেন যে, বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থার দ্বারাও যথেষ্ট খাদ্য-শস্য উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু আমাদের মতে ইহা সম্ভব নহে। যদি ইহা সম্ভব হইত, তবে খাদ্যশস্যের এই ঘাটতি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইতে পারিত না এবং মনুষ্য-জাতির অধিকাংশ হয় অনশনের, নয় অর্দ্ধাশনের কষ্ট ভোগ করিতে বাধ্য হইত না। বিজ্ঞানের সাহায্যে যথেষ্ট খাদ্য-শস্য উৎপাদন দূরে থাক, আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা যাহা জানেন না, অথচ যাহা সত্য যে, আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে খাদ্য-শস্যের নাম দিয়া যে-সকল শাক-সব্জী এবং ফল উৎপন্ন হয়, তাহাতে জীবনধারণোপযোগী সার পদার্থ অপেক্ষা বিষের পরিমাণ অধিক এবং তাহা মনুষ্য-বুদ্ধির উন্নয়ন অপেক্ষা অধিক সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া থাকে।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, মনুষ্য-সমাজের অশান্তির আমূল উচ্ছেদ-সাধনার্থ ভারতের মাটির স্বাভাবিক উর্ব্বরা-শক্তিবৃদ্ধির নিমিত্ত কি ব্যবস্থা গৃহীত হইতে পারে।

আমরা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ইহার একমাত্র উপায় হইতেছে, রেল ও নদীর বাঁধ ও সেতুসমূহ অপসৃত করিয়া নদী-স্রোতের স্বাভাবিক গতির বাধা দূর করা। এই ব্যবস্থাকে অত্যন্ত বাড়াবাড়ি বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু ইহাই একমাত্র ব্যবস্থা এবং যদি আন্তরিক ভাবে ইহার ব্যবস্থা সাধনে অগ্রসর হওয়া যায়, তবে দেখা যাইবে যে, শেষ পর্য্যন্ত ইহা কাহারও কোন প্রকার অপকার করিবে না, পরন্তু প্রত্যেকেরই উপকার করিবে।

অদূর-ভবিষ্যতে জনসাধারণ উপলব্ধি করিবে যে, হয় তাহাদিগকে অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে, নয় প্রথম প্রথম অত্যন্ত বাড়াবাড়ি বলিয়া মনে হইলেও, এই পন্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

মনুষ্যজাতির প্রকৃত মুক্তির পন্থার প্রধান প্রতিবন্ধক হইতেছে বর্ত্তমান কালের বৈজ্ঞানিক, শাসক এবং রাষ্ট্র-ধুরন্ধরগণের স্বার্থবোধ ও দাম্ভিকতা। সমগ্র পৃথিবীর

শান্তি-সাধনের উপযোগী পন্থার সন্ধান করিতে হইলে শিক্ষার ও বুদ্ধির যে উৎকর্ষ প্রয়োজন, তাহা তাঁহাদের কাহারও নাই। সমগ্র পৃথিবীর শান্তি-ব্যবস্থার সন্ধান দূরের কথা, তাঁহাদের কেহই ব্যক্তিগত ভাবে এবং স্বকীয় পরিবারের সন্তুষ্টি-বিধান কিরূপে করিতে হয়, তাহারও বিধান অবগত নহেন। আশ্চর্য্য এই যে, তথাপি তাঁহারা বিশ্ব-শান্তির বক্তৃতা দান করেন এবং জন সাধারণ নির্ব্বিবাদে তাহা গলাধঃকরণ করে!

আমাদের মত সুতরাং এই যে, যতদিন পর্য্যন্ত আধুনিক বৈজ্ঞানিক, শাসক এবং রাষ্ট্র-নেতাগণকে তাঁহারা যে পন্থানুসরণ করিতেছেন, সেই পন্থায় চলিতে দেওয়া হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত সমগ্র পৃথিবীর মনুষ্য-জাতির শান্তি ব্যবস্থিত হওয়া সম্ভব হইবে না। অতএব প্রয়োজন এই যে, হয় তাঁহাদিগকে বাধ্য করিয়া তাঁহাদিগের কার্য্যক্রমের পরিবর্ত্তন সাধন করাইতে হইবে, নয় তাঁহাদের প্রত্যেককে কার্য্যক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত করিতে হইবে। এই দুর্দ্দিনে যদি গ্রেট বৃটেনের এবং ভারতের জনসাধারণ তাঁহাদের অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া পরস্পর মৈত্রী-সূত্রে আবদ্ধ হন, তবেই ইহা সম্ভব। যিনি রাগ-দ্বেষ-যুক্ত ও সকল কূটনীতির উর্দ্ধে, মনুষ্য-সমাজ যদি তাহার প্রকৃত কল্যাণকামী এমন কোন ব্যক্তির সন্ধান পাইবার সৌভাগ্য লাভ করে, তবে জন সাধারণকে শান্ত রাখিয়াই এইরূপ সচেতন করা সম্ভব। এই ব্যক্তির সন্ধান কোথায়?

কলিকাতায় নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশন এবং ভেদনীতিমূলক শাসন-ব্যবস্থার কৃতকার্য্যতা

কলিকাতায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশন হইয়া গেল। আমাদের মতে, কংগ্রেসের বর্ত্তমান নেতৃবৃন্দের পরিচালনায় ভারতবাসীর সম্ভাব্য পরিণাম কি দাঁড়াইবে, ইহার পর্য্যালোচনার্থ যাঁহারা একাগ্র হইয়া ঘটনাপ্রবাহ লক্ষ্য করিতেছেন, রাষ্ট্রনীতির সেই শ্রেণীর শিক্ষার্থীর পক্ষে নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটীর বর্ত্তমান কলিকাতা অধিবেশনে রাষ্ট্র-নীতির দিক্ দিয়া বিশেষ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিয়াছে। আমাদের বর্ত্তমান সন্দর্ভের উদ্দেশ্য, এই উল্লেখ-যোগ্য কয়েকটি ঘটনার আলোচনা করিয়া দেখান, আমাদের অতীব সম্মানিত নেতৃবৃন্দের পরিচালনায় ভারতবাসী জন-সাধারণের কোন্ অবস্থায় উপনীত হইবার সম্ভাবনা।

আমাদের মতে, নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটীর বিগত অধিবেশনের নিম্নলিখিত ঘটনাগুলি উল্লেখযোগ্য :

(১) সম্মিলিত ওয়ার্কিং কমিটী গঠন করিয়া কংগ্রেসের সর্ব্বদল-সম্মেলনের জন্য মিঃ গান্ধীকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুর প্রয়াস।

(২) পুরাতন একমতাবলম্বী ওয়ার্কিং কমিটী ব্যতিরেকে আর কোন কমিটী গ্রাহ্য না করা সম্বন্ধে মিঃ গান্ধীর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা এবং তদুদ্দেশ্যে মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুর উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিবার নিমিত্ত পরস্পর-বিরোধী উক্তি-পরিপূর্ণ পত্রের কৌশলগ্রহণ।

(৩) মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুর মনোনীত ওয়ার্কিং কমিটীর সহিত সহযোগিতায় মিঃ গান্ধীর সম্মতি-লাভের চেষ্টায় ব্যর্থ হইয়া মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুর পদত্যাগ।

(৪) পণ্ডিত জওহরলাল-আনীত মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুকে পদত্যাগ-প্রত্যাহারার্থ এবং পুরাতন ওয়ার্কিং কমিটীকে পুনর্ম্মনোনীত করিবার প্রস্তাব।

(৫) সম্মিলিত ওয়ার্কিং কমিটী মনোনয়নের অনুমতি ব্যতিরেকে মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক পদত্যাগ-পত্র প্রত্যাহারের অস্বীকার এবং মিসেস্ সরোজিনী নাইডুর সভাপতিত্বে মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুর পদত্যাগ বিধিসঙ্গত ভাবে মঞ্জুর না করাইয়া তাঁহার স্থলে ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদকে কংগ্রেসের সভাপতি বলিয়া ঘোষণা।

কংগ্রেসের প্রতিনিধিবৃন্দের সহিত আলোচনা না করিয়াই নির্ব্বাচিত সভাপতি মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুর

স্থলে ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদের সভাপতি মনোনয়ন বিষয়ে মিঃ নরীম্যান কর্তৃক আপত্তি এবং মিসেস সরোজিনী নাইডু কর্তৃক তাঁহার কার্যের বিধি-বহির্ভূততা স্বীকার।

(৭) বিভিন্ন পক্ষ হইতে প্রতিবাদ সত্ত্বেও এবং ঐ সকল প্রতিবাদের সত্যতা আলোচনার সুযোগ দান না করিয়া ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদের সভাপতিত্ব-গ্রহণ।

(৮) পুরাতন ওয়ার্কিং কমিটীর অধিকাংশ সদস্যের সহিত ডক্টর বি. সি. রায় ও ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষকে লইয়া ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ কর্তৃক নূতন ওয়ার্কিং কমিটী-গঠন।

(৯) বিভিন্ন পক্ষ হইতে প্রতিবাদ সত্ত্বেও ডক্টর বি. সি. রায় এবং ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্যভার গ্রহণ এবং মিসেস্ সরোজিনী নাইডু কর্তৃক ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদকে কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত করায় সুস্পষ্ট বিধিবহির্ভূততা।

(১০) সমাগত ব্যক্তিবৃন্দ ও স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দের মারামারি, ফলে কয়েকজন নেতার আঘাতপ্রাপ্তি এবং মারামারি থামাইতে মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুর প্রশংসনীয় প্রয়াস।

(১১) ইউরোপে যুদ্ধ বাধিলে ভারতবর্ষ যাহাতে ইংলণ্ডের সহযোগিতা না করে, তৎকল্পে আনীত মিঃ জওহরলাল নেহেরুর প্রস্তাব।

উল্লেখযোগ্য ঘটনা হিসাবে উদ্ধৃত ১ম, ২য়, ৫ম ও ১০ম দফায় যাহা কথিত হইয়াছে, তদনুযায়ী মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুর কার্যকলাপে প্রমাণিত হয় যে, তিনি গণতন্ত্র সম্বন্ধে যথেষ্ট আস্থাসম্পন্ন এবং উত্তেজনার ক্ষেত্রেও তাঁহার অবিচলিত ও স্থির থাকিবার সামর্থ্য আছে।

উদ্ধৃত উল্লেখযোগ্য ঘটনাসমূহের ১ম ও ২য় দফায় যাহা প্রকাশ পাইয়াছে, তদনুযায়ী মিঃ গান্ধীর কার্যকলাপে প্রমাণিত হয় যে, তাঁহার গণতন্ত্র কিংবা যৌক্তিকতা, কিছুরই উপর আস্থা নাই এবং তিনি তাঁহার স্বীয় খেয়ালের পূরণ ব্যতীত আর কিছুই চাহেন না। উহার দ্বারা আরও প্রমাণিত হয় যে, এই খেয়াল-পূরণের নিমিত্ত তিনি যে-কোন কৌশল-প্রয়োগেও পশ্চাদপদ নহেন এবং তিনি মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুকে সভাপতিত্ব হইতে বিতাড়িত করিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন—ইহার ফল মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুর উপর ভাল কি মন্দ দাঁড়াইবে তাহারও তিনি বিচার করেন নাই।

উল্লেখযোগ্য ঘটনাসমূহের ৫ম ও ৭ম দফায় যাহা কথিত হইয়াছে, তদনুযায়ী মিসেস্ সরোজিনী নাইডু এবং ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদের কার্যকলাপে যাহা প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে প্রমাণিত হয় যে, মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুকে পরাজিত করিবার নিমিত্ত মিঃ গান্ধীর নেতৃত্বে যে দুষ্কৃতদল গঠিত হইয়াছিল, তাঁহারা সেই দলের অন্তর্ভুক্ত হিসাবে অন্ধের ভূমিকা অভিনয় করিয়াছেন মাত্র এবং তাঁহারা গণতন্ত্রের উপরও যেমন আস্থা রাখেন, ভারতবাসী জন-সাধারণের স্বার্থের সম্বন্ধেও তেমনই ব্যাকুলতা পোষণ করেন। তাঁহারা কেবল মিঃ গান্ধীকেই খুসী করিতে ব্যাপৃত। তাঁহাদের কার্যকলাপে প্রমাণিত হয় যে, মস্তিষ্কের বালাই তাঁহাদের বিন্দুমাত্র নাই।

উল্লেখযোগ্য ঘটনাসমূহের ৮ম দফায় যাহা কথিত হইয়াছে, তাহাতে ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদের কার্যকলাপে প্রমাণিত হয় যে, তাঁহার দল বাঙ্গালার নেতৃবৃন্দের মধ্যে ভীষণ বিবাদের সৃষ্টি করিতে মনস্থ করিয়াছেন এবং জনসাধারণের স্বার্থের অপেক্ষা তাঁহারা নিজেদের খেয়াল-পূরণেই অতিমাত্রায় ব্যাপৃত।

উল্লেখযোগ্য ঘটনাসমূহের ৪র্থ দফায় পণ্ডিত জওহরলালের যে-কার্যকলাপ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে প্রমাণিত হয় যে, তাঁহার মস্তিষ্ক কিঞ্চিৎ বিকৃত এবং এই জন্যই তিনি অসম্ভব একটি প্রস্তাব উপস্থিত করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। জওহরলালের উন্মাদোচিত এবং বিদূষক-সুলভ প্রস্তাবে কর্ণপাত করিবার এবং তাঁহাকে তাঁহার বক্তৃতাদানের অবসর দান করিবার ধৈর্য্য প্রদর্শন করিয়া সমাগত শ্রোতৃবৃন্দ প্রমাণিত করিয়াছেন যে, তাঁহারাও প্রকৃতপক্ষে সুস্থ নহেন।

উল্লেখযোগ্য ঘটনাসমূহের ১১শ দফায় পণ্ডিত জওহরলালের কার্যকলাপের যে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে প্রমাণিত হয় যে, রাষ্ট্রনীতি-ক্ষেত্রে তিনি পাঠশালার পড়ুয়া ব্যতীত আর কিছুই নহেন, এবং যদিও তিনি প্রতিনিয়ত ইউরোপীয় ঘটনার এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির নজির দান করেন, ইউরোপীয় ঘটনাসমূহ গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করিবার জন্য যে-

মস্তিষ্ক শক্তির প্রয়োজন, তাঁহার তাহা যৎসামান্য মাত্রাতেও নাই।

উল্লেখযোগ্য ঘটনাসমূহের ৯ম দফায় ডক্টর বি. সি. রায় এবং ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের যে-কার্য্যকলাপ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে প্রমাণ হয় যে, হয় তাঁহারা বিচারবুদ্ধিহীন ভাবক মাত্র, নয়, দেশের জনসাধারণের স্বার্থপূরণ অপেক্ষা নিজেদের ক্ষু-মতলবসিদ্ধির উদ্দেশ্যই তাঁহাদের অধিক।

উল্লেখযোগ্য ঘটনাসমূহের ৬ষ্ঠ দফায় মিঃ নরীম্যানের যে কার্য্যকলাপ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বিধি ও বিধান সম্বন্ধে যথেষ্ট শ্রদ্ধা পোষণ করেন এবং কেহ যদি এমন কিছু করেন, যাহার ফলে কংগ্রেসের সুনাম নষ্ট হইতে পারে, তাহাতে তিনি আহত হন। তাঁহার ব্যবহারে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তিনি দলাদলি অপেক্ষা বিধিসঙ্গতির উপর অধিক আস্থাসম্পন্ন। এক কথায়, কলিকাতায় নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশনে যে-সব মহারথী উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের সকলের অপেক্ষা তিনি দেশভক্ত, ইহার প্রমাণ তিনি তাঁহার আচরণে দান করিয়াছেন।

১০ম দফায় প্রকাশ পাইয়াছে যে, ভারতের কংগ্রেস-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দের মধ্যে বর্ত্তমানে গভীর ফাটল দেখা দিয়াছে।

মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক সম্মিলিত ওয়ার্কিং কমিটী গঠনের প্রয়াস এবং তাহাতে ব্যর্থ হইয়া অবশেষে তাঁহার পদত্যাগ দ্বারাই তাঁহার সম্বন্ধে আমাদের মতবাদের যাথার্থ্য সুপরিস্ফুট হয়। তিনি যদি গণতন্ত্র সম্বন্ধে আস্থাশীলতার মনোবৃত্তি হইতে কার্য্য না করিতেন, তবে সম্মিলিত ওয়ার্কিং কমিটী গঠনের ব্যাপারে পদত্যাগ করিতেন না, কিংবা পদত্যাগ-প্রত্যাহারে গররাজী হইতেন না। সমাগত ব্যক্তিবৃন্দ ও স্বেচ্ছাসেবকের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে তিনি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে সুস্পষ্ট প্রকাশ যে, উত্তেজনার ক্ষেত্রেও তিনি অবিচলিত এবং স্থির থাকিতে পারেন।

আমাদের মতে, মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু এইবার দেশবাসীর নিকট প্রমাণ করিয়াছেন যে, সহকারী নেতা হইবার জন্য যে গুণাবলীর প্রয়োজন, তিনি তাহার অধিকারী। আমাদের বক্তব্য এই যে, সহকারী নেতা হইবার সামর্থ্য থাকিলেও একচ্ছত্র নেতা হইবার সামর্থ্য তাঁহার নাই। যদি একচ্ছত্র নেতা হইবার গুণাবলীর তিনি অধিকারী হইতেন, তবে তিনি সম্মিলিত ব্যক্তিবৃন্দের সম্মুখে অবিলম্বে এমন কার্য্যপন্থা উপস্থাপিত করিতে পারিতেন, যাহা প্রত্যেকের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হইত এবং সকল দলাদলির অবসান ঘটাইতে পারিত। বিন্দুমাত্র উত্তেজনা না দেখাইয়া তিনি প্রমাণ করিতে পারিতেন যে, দেশের বর্ত্তমান অবস্থায়, দেশের জনসাধারণের সকলের স্বার্থের দিক্ হইতে বিচার করিলে, বর্ত্তমানে যে সকল কার্য্যপন্থানুযায়ী দেশের মধ্যে কার্য্য চলিতেছে, তাহার প্রত্যেকটি অপেক্ষা তাঁহার কার্য্যপন্থা শ্রেষ্ঠ। একচ্ছত্র নায়ক হইবার নিমিত্ত যে সাহস ও রাষ্ট্রনৈতিক বিচক্ষণতার অবশ্য-প্রয়োজন, তাহা তাঁহার থাকিলে তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে হইত না এবং তিনি বিন্দুমাত্র উত্তেজনার সৃষ্টি না করিয়া সমগ্র সভ্যমণ্ডলীর সম্মুখে প্রমাণ করিতে পারিতেন যে, তাঁহার বিরুদ্ধ পক্ষ কি পরিমাণ নীচ ও স্বার্থলিপ্সু এবং পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাব দ্বারা কংগ্রেসের বিধি ও বিধানের প্রতি যে অবিচার করা হইয়াছে, তাহা তিনি নৈতিক সৃষ্টি না করিয়াই তাঁহাদিগের দ্বারাই বাতিল করিয়া লইতে পারিতেন। ভারতের একচ্ছত্র নায়কের পক্ষে যে রাষ্ট্রনৈতিক বিচক্ষণতার বর্ত্তমানে অতিশয় প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে, তাহা যদি তাঁহার থাকিত, তবে তিনি উপলব্ধি করিতে পারিতেন এবং প্রমাণ করিতে সমর্থ হইতেন যে, দেশের এই দুর্দ্দিনে গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা বলিতে যাহা বুঝা যায়, তাহার অত্যন্ত প্রয়োজন বটে, কিন্তু তাই বলিয়া সংখ্যাগুরুর শাসনের প্রয়োজন নাই। জনসাধারণের অভিমত ও প্রয়োজন কি, তাহা জানিয়া লইবার জন্য, জন-সাধারণের প্রতিনিধিবর্গের সহিত সম্রদ্ধ আলোচনার অত্যন্ত প্রয়োজন এবং এই দিক্ হইতে গণতন্ত্রের প্রতি আস্থাকে শ্রদ্ধা করিতে হইবে, কিন্তু নায়কের নিজের এমন গুণাবলী থাকা প্রয়োজন, যদ্দ্বারা নির্দ্ধারণ করা যায়, জন-সাধারণের প্রয়োজন-পূরণের পন্থা কি এবং জনসাধারণের প্রতিনিধিবৃন্দকে মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় তাঁহাকে বুঝাইয়া দিবার শক্তি থাকা চাই যে, তিনি কেন এক পন্থার পরিবর্ত্তে অপর পন্থার পক্ষপাতী। ইহা সত্ত্বেও আমরা মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুর বর্ত্তমান মনোভাবকে ঘৃণা দান করিতেছি এবং যদি তিনি এইরূপ রাগদ্বেষযুক্ত হইবার ভাব বজায় রাখিতে পারেন, তবে তাঁহাকে দেশের সম্পদ্

হিসাবে আমরা আমরা তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইতেছি।

মিঃ গান্ধীর সম্বন্ধে আমাদের মতবাদের যাথার্থ্য, তিনি সম্মিলিত ওয়ার্কিং কমিটীর মনোনয়ন বিষয়ে মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুর সহিত একমত হইবার অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাকে যে-পত্র লিখেন, তাহাতে স্পষ্ট হইয়াছে। তিনি যদি গণতন্ত্রের প্রতি আস্থাবান্ হইতেন, তবে কংগ্রেসের গত অধিবেশনে গৃহীত পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাব নাকচ না করিয়া, মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুকে তাঁহার স্বীয় অভিলাষ অনুযায়ী ওয়ার্কিং কমিটী মনোনয়নের কথা বলিতে পারিতেন না। কংগ্রেসের বিধি ও বিধান এবং কংগ্রেসের প্রতিনিধিবৃন্দের সম্বন্ধে তাঁহার যদি সামান্য মাত্র শ্রদ্ধা থাকিত, তাহা হইলে তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাব কি করিয়া বাতিল হইতে পারে, তাহার পন্থা দেশবাসী জন-সাধারণকে দেখাইতে পারিতেন।

ফেডারেশনপ্রতিষ্ঠার বিরোধিতায় বিপক্ষ দল যাহা করিতেছেন, তাঁহারাও সেই একই কার্য্য করিতেছেন, মিঃ গান্ধীও তাঁহার ভাগ্যাতগণ দেশের সম্মুখে তাহা সপ্রমাণ করিতে সহস্রাধিক অজুহাত উপস্থিত করিতে পারেন, কিন্তু আমরা গতসংখ্যায় দেখাইয়াছি যে, ১৯৩৫ সনের ভারতশাসন আইনের অন্তর্গত ফেডারেশনের প্রকৃত অর্থ কি এবং মিঃ গান্ধী এবং তাঁহার অনুচরবৃন্দ কি ভাবে ভারতে উহার প্রতিষ্ঠার জন্য ব্রিটিশ রাষ্ট্র-ধুরন্ধরগণের সহায়তা করিতেছেন এবং দেশীয় রাজ্যসমূহ এতাবৎ যে-সামান্য স্বাধীনতা উপভোগ করিতেছিলেন, তাহা হইতে তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করিতে উন্মুখ হইয়াছেন। আমাদের মত এই যে, মেসার্স গান্ধী-প্যাটেল এণ্ড কোং সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছেন যে, দেশবাসী কি নির্ব্বোধ এবং তাহার পূর্ণ সুযোগ লইতেছেন। যদি ভারতবাসী তাহাদের স্বীয় অবস্থা সম্পূর্ণ না বুঝিতে পারে, মেসার্স গান্ধী-প্যাটেল এণ্ড কোং নবাব মীরজাফর অপেক্ষাও নিজদিগকে নিকৃষ্টতর প্রমাণ করিবেন। আমরা মনে করি, যত শীঘ্র মেসার্স গান্ধী-প্যাটেল এণ্ড কোং ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্র হইতে বিদায় গ্রহণ করেন, ভারতের পক্ষে তত ভাল।

আমরা মিসেস্ সরোজিনী নাইডু এবং ডক্টর রাজেন্দ্র-প্রসাদ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহা হইতে দেখা যাইবে যে, আমাদের মতে, তাঁহারা মানুষ হিসাবে মন্দ নহেন, এবং অনুচর হিসাবে বরং অত্যন্ত সৎ ও বিশ্বাসযোগ্য। আমরা তাঁহাদিগকে নির্ব্বোধ বলিয়াছি এই জন্য যে, তাঁহারা তাঁহাদের কার্য্য দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, তাঁহারা মনুষ্যোচিত যে-বোধ দ্বারা কাহার অনুগামী হইতে হইবে কাহার হইতে হইবে না, স্থির করে, সে বোধ হইতে তাঁহারা বঞ্চিত। সে বোধ থাকিলে তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন যে, মিঃ গান্ধীর মধ্যে সততা এবং দেশপ্রেম অপেক্ষা কপটতা ও স্বার্থপরতা অধিক এবং তাঁহার অনুগামী হইতে ঘৃণাবোধ করিতেন। আমরা মনে করি, তাঁহারা দেশপ্রেমিক কিন্তু তাঁহাদের দেশ-প্রেম দেশবাসীর কোন কার্য্যেই লাগিতেছে না, কেন না, তাঁহারা কুনিয়ন্ত্রিত।

মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুকে পদত্যাগ প্রত্যাহার করিবার জন্য পণ্ডিত জওহরলাল যে প্রস্তাব উত্থাপন করেন, তাহা হইতেই পণ্ডিত জওহরলাল সম্বন্ধে আমরা যে-মন্তব্য করিয়াছি, তাহার যাথার্থ্য বুঝা যাইবে। সকলেই অবগত আছেন যে, সম্মিলিত ওয়ার্কিং কমিটীগঠনে মিঃ গান্ধীর সম্মতিলাভে অসমর্থ হইয়াই তিনি পদত্যাগ করেন এবং পুরাতন সদস্যদের এক-মতাবলম্বী ওয়ার্কিং কমিটীর উচ্ছেদসাধনের সংকল্প হইতেই তাঁহার এই সম্মিলিত ওয়ার্কিং কমিটী গঠনের ইচ্ছা। তথাপি পণ্ডিত জওহরলাল মিলন-সাধনের অভিনয় করিয়া মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুকে পদত্যাগ-পত্র প্রত্যাহার করিবার জন্য এবং একমতাবলম্বী ওয়ার্কিং কমিটী গ্রাহ্য করিবার জন্য একটি প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন! ইহা কি পণ্ডিতজীর মস্তিষ্ক-বিকৃতির পরিচায়ক নহে।

তিনি প্রতিনিয়তই আগামী একটি আন্তর্জ্জাতিক যুদ্ধের কথা কহিয়া থাকেন এবং এই যুদ্ধের সময় ভারত কি করিয়া স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে পারে, তাহার পরিকল্পনা করেন। যদি অদূর ভবিষ্যতে যে কোন প্রকারেই হউক, কোন আন্তর্জ্জাতিক যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা থাকে, আমরা তাঁহাকে ভবিষ্যদ্-দ্রষ্টা হিসাবে বিচক্ষণ বলিতে বাধ্য। কিন্তু, যদি অদূর ভবিষ্যতে কোন প্রকারের কোন আন্তর্জ্জাতিক যুদ্ধ বাধিবার কোন সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে তাঁহার পরি-কল্পনা কি শূন্যে সৌধনির্ম্মাণবৎ নহে? আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, অদূর ভবিষ্যতে কোন প্রকারের কোন আন্তর্জ্জাতিক যুদ্ধ বাধিবার কোন সম্ভাবনাই নাই, যদিও চারিদিকে

এই মূল্য উঠিয়াছে। পাঠক হয় ত এখনে আমাদের সহিত একমত হইবেন না, কিন্তু তাঁহারা শীঘ্রই দেখিবেন, আমরা যাহা বলিয়াছি, তাহা সত্য। এই জন্যই আমরা বলিয়াছি যে, পণ্ডিত জওহরলাল রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে পাঠশালার পড়ুয়া মাত্র এবং ইউরোপের অবস্থা গভীর ভাবে পর্য্যালোচনার নিমিত্ত যে-শ্রেণীর বুদ্ধির প্রয়োজন, তাহার লেশমাত্রও তাঁহার নাই।

ডক্টর বি. সি. রায় এবং ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ সম্বন্ধে আমাদের মতামত, মিঃ গান্ধীর একনায়কত্বে কংগ্রেসের পুরাতন মণ্ডল কর্ত্তৃক অতীতে দেশের জনসাধারণের সেবা কিরূপ হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে তাহার সম্ভাবনা কিরূপ, তদ্বিষয়ক ঘটনাবলীর উপর গঠিত। জন-সাধারণের যথার্থ প্রয়োজন বলিতে যাহা বুঝা যায়, তাহার পূরণ যে মিঃ গান্ধীর একনায়কত্বে কিংবা সর্দ্দার প্যাটেলের সভাপতিত্বে পরিচালিত কংগ্রেসের মণ্ডল দ্বারা হইবার কোন সম্ভাবনাই নাই, তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে কয়েকবার দেখাইয়াছি। জন-সাধারণের যথার্থ প্রয়োজন বলিতে অবশ্যই তাহাদের দারিদ্র্য ও বেকার-সমস্যার সমাধান বুঝা যায়। পাঠক হয় ত বর্ত্তমানে আমাদের সহিত একমত হইতে পারিবেন না, কিন্তু দেশের বাস্তব অবস্থা যে স্থানে আসিয়া উপনীত হইয়াছে, তাহাতে শীঘ্রই প্রমাণিত হইবে যে, আমাদের উক্তি বর্ণে বর্ণে সত্য। এই জন্যই আমরা বলিয়াছি যে, যদি ডক্টর বি. সি. রায় এবং ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের অভিপ্রায় জন-সেবা হইত, তাঁহারা বিবেকের মুখ চাহিয়া মিঃ গান্ধী অথবা সর্দ্দার প্যাটেল পরিচালিত ওয়ার্কিং কমিটীতে যোগদান করিতে পারিতেন না। যদি যুক্তিসঙ্গত ভাবে সিদ্ধান্ত দাঁড়ায় এই যে, তাঁহাদের এই ওয়ার্কিং কমিটীতে যোগদানের দ্বারা জন-সাধারণের কোন প্রয়োজন পূরণ হইবে না, তবে আমরা ধরিয়া লইতে বাধ্য যে, হয় তাঁহারা কংগ্রেসের পাণ্ডাদের মস্তিষ্কহীন স্তাবক, নয় তাঁহাদের কার্য্যের পশ্চাতে কোন কু-অভিসন্ধি পূরণের ফন্দী বিদ্যমান।

কংগ্রেসের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা উপরে যে আলোচনা করিলাম, মনোযোগসহকারে তাহা বিশ্লেষণ করিলে, যুক্তিসঙ্গতভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবে যে, জনসাধারণ তাঁহাদের প্রকৃত স্বার্থসাধনের প্রত্যাশা মিঃ গান্ধী, পণ্ডিত জওহরলাল, ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ, মিসেস সরোজিনী নাইডু, ডক্টর বি. সি. রায় এবং ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ-শ্রেণীর নেতৃবৃন্দের কাহারও নিকট হইতে করিতে পারেন না। এখনও যদি তাঁহারা ইহা না বুঝিয়া থাকেন, তবে, আমরা ভরসা রাখি, অনতিবিলম্বে তাঁহারা ইহা বুঝিতে পারিবেন।

মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু ও মিঃ নারীম্যান শ্রেণীর নেতৃবৃন্দের নিকট হইতে কিঞ্চিৎ প্রত্যাশা করা যায়, কিন্তু যদি তাঁহারা অধিকতর আত্মবিশ্লেষণ-পরায়ণ হইয়া উৎকৃষ্টতর কোন আদর্শে দীক্ষিত হইতে স্বীকৃত থাকেন, তবেই তাহা সম্ভব।

কংগ্রেসের অবস্থা এই দিক্ হইতে যেমন সমুজ্জ্বল বলিয়া দেখা যায় না, অপর দিক্ তেমনই আরও মসীলিপ্ত। কংগ্রেসের জন্য যাহা অবশ্য-প্রয়োজনীয়, আমরা সেই মিলনের কথা বলিতেছি।

আমাদের মত এই যে, ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ঐক্য সৃষ্টি। কোন ব্যক্তিবিশেষকে কংগ্রেসের স্রষ্টা বলা যায় না। ইহা একদিকে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, অন্যদিকে ভারতীয় ও বৃটিশ জাতির সম্মিলিত চেষ্টার ফল। ভারতের ঐক্যের উদ্দেশ্যে ইহার সৃষ্টি—১৯০৬ সন পর্য্যন্ত সেই উদ্দেশ্য ইহার অব্যাহতও ছিল। ১৯০৬ সন হইতে এই ঐক্যসৃষ্টি দৈবতা-দানবের আস্তানায় পরিণত হইয়াছে এবং এই জন্যই ১৯০৬ সন হইতে কংগ্রেস ভারতের ঐক্যসাধনের সহায়ক না হইয়া বস্তুতঃ ভারতীয়গণের মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহের কারণ হইয়াছে। ভারতীয়গণের মধ্যে পরস্পর এই দ্বন্দ্ব কলহের সৃষ্টির দায়িত্ব অল্প-বিস্তর ভারতীয় ও বৃটিশ, উভয় জাতিরই স্কন্ধে ন্যস্ত করা যায়, কিন্তু ঘটনাবিচারে প্রমাণিত হইবে যে, এই অনৈক্যের জন্য বৃটিশ জাতি অপেক্ষা ভারতীয় নেতৃবৃন্দ অধিকতর দায়ী। আমরা ইহা একাধিকবার দেখাইয়াছি যে, ১৯০৬ সন পর্য্যন্ত বৃটিশ জাতি ভারতীয়দের মধ্যে অনৈক্যসৃষ্টির নিমিত্ত কোন নীতি গ্রহণ করিয়াছেন, এই অভিযোগ তাঁহাদের বিরুদ্ধে আনা যাইবে না। কিন্তু ১৯০৬ সনে ভারতীয়েরাই প্রথম বৃটিশ জাতিকে বিতাড়িত করিয়া স্বরাজ অর্জ্জনের মনোভাব প্রকাশ করেন এবং তদবধি বৃটিশ জাতিও ভেদ-নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতীয়েরা বৃটিশ জাতিকে বিতাড়িত করিবার ফন্দী আঁটিবে, তদুত্তরে যদি বৃটিশগণ

ভারতীয় ঐক্যকে শিথিলভিত্তি করিবার প্রয়াসী হইয়া থাকেন, তবে বৃটিশ জাতিকে কখনই ভেদনীতি প্রবর্ত্তনের জন্য দায়ী করা যায় না। আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, ১৯০৯ সন হইতে ইংলণ্ডস্থ বৃটিশ রাষ্ট্রধুরন্ধরগণ তাঁহাদের ভেদনীতির বিস্তার সাধন করিতেছেন এবং ইহার জন্য ভারত সরকার কিছুমাত্র দায়ী নহেন।

১৯৩৫ সনের ভারতশাসন বিধি ইংলণ্ডের রাষ্ট্রধুরন্ধরগণের প্রণীত এবং এতদ্বারা ইহাই ভেদনীতিমূলক শাসন ব্যবস্থার চরম উদাহরণ। "প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন" এবং "ফেডারেশনে"র নামে ইহার ফলে প্রদেশে প্রদেশে, হিন্দুতে মুসলমানে, হিন্দুতে হিন্দুতে, মুসলমানে মুসলমানে, কংগ্রেস-সঙ্গে কংগ্রেস-সঙ্গে, বণিকদের মধ্যে এবং চাকুরীজীবীদের মধ্যে ইত্যাদি সর্ব্বশ্রেণীর মধ্যে পরস্পরের দ্বন্দ্ব বাধিতে বাধ্য। সুতরাং কংগ্রেসের মধ্যে বর্ত্তমানে যে অনৈক্য দেখা দিয়াছে, তাহাকে ইংলণ্ডস্থ ব্রিটিশ রাষ্ট্রধুরন্ধরগণের ভেদনীতিমূলক শাসনপদ্ধতির কৃতকার্য্যতা বলা যায়। যদি ভারতীয় কংগ্রেসের নায়কেরা ইহা না বুঝিতে পারেন কিংবা নিজেদের মধ্যে অনৈক্য কি প্রকারে রোধ করা যায়, তাহার পন্থা কি, তাহা বুঝিয়া না উঠিতে পারেন, তজ্জন্য ব্রিটিশ রাষ্ট্রধুরন্ধরগণকে নিশ্চয়ই তাঁহারা দায়ী মনে করিতে পারেন না। ইহাতে কেবল প্রমাণিত হয় যে, ভারতীয়গণ একপাদা নির্ব্বোধ স্বার্থপরায়ণ ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত।

আশ্চর্য্য এই যে, তথাপি তাহারা তাহাদের নেতৃবৃন্দ এবং রাষ্ট্রধুরন্ধরগণ সম্বন্ধে উচ্চ প্রশংসা করিতে লজ্জিত নহে।

ফরোয়ার্ড ব্লকের গঠন কি রাষ্ট্রনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচায়ক ?

গত ৩রা মে (১৯শে বৈশাখ) তারিখে কলিকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্কে ২০,০০০ লোকের সমক্ষে এক জন-সভায় মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু দেশের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে একটি বিবৃতি দান করিয়া 'ফরোয়ার্ড ব্লক' গঠনের সংবাদ ঘোষণা করেন।

বিবৃতির প্রথমাংশে তিনি তাঁহার শ্রোতৃবৃন্দকে বুঝাইতে চাহেন যে, এই নূতন দল কোন আকস্মিক উত্তেজনাপ্রসূত নহে ; অনেক দিন হইতেই কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ নিজেদের মধ্যে এমন একটি দলের বিষয়ে আলোচনা করিতেছিলেন, যাহাতে "বামপন্থীদের আন্দোলন অনুভবযোগ্য পরিমাণে অধিকতর বল সংগ্রহ করিতে পারে (the leftist movement to gather further accession of strength to an appreciable degree) ।"

'ফরোয়ার্ড ব্লক'এর বিধি-বিধান ও মূলনীতি বর্ণনা করিয়া তিনি বলেন, সাধারণতঃ 'দল' বলিতে যাহা বুঝা যায়, 'ফরোয়ার্ড ব্লক' তাহা হইবে না, 'ব্লক'এর কর্ম্মপন্থা যাঁহারা মানিয়া লইবেন, তাঁহাদিগকে মিলিত করিবার নিমিত্ত ইহা একটি আস্তানা (platform) মাত্র। কংগ্রেসের মধ্যে প্রগতিবাদী যে-সকল উপাদান বিচ্ছিন্ন ভাবে রহিয়াছেন, তাঁহাদের ছাড়াও বর্ত্তমান বামপন্থী দলের সকলেই 'ব্লক'এ যোগদান করিতে পারেন। বস্তুতঃ তাঁহাদিগের যোগদান হৃদ্যতার সহিত অভিনন্দিত হইবে।

'ফরোয়ার্ড ব্লক'এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে বলিতে গিয়া মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু প্রকাশ করেন, 'ফরোয়ার্ড ব্লক' কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত উপদল হিসাবে কার্য্য করিবে। বর্ত্তমান কংগ্রেসের বিধি ও বিধান, কর্ম্মোদ্দেশ্য, কর্ম্মনীতি ও কর্ম্মপন্থা, সবগুলই ইহা মানিয়া লইবে। মহাত্মা গান্ধীর ব্যক্তিত্বের প্রতি ইহার শ্রদ্ধা-ভক্তি অটুট থাকিবে এবং জাতিকে 'মহাত্মা' যে উপঢৌকন প্রদান করিয়াছেন, সেই অহিংস অসহযোগের মতবাদে ইহা সম্পূর্ণ বিশ্বাসী থাকিবে, কিন্তু তদ্দ্বারা ইহা বুঝিলে চলিবে না যে, 'ফরোয়ার্ড ব্লক'কে কংগ্রেসের বর্ত্তমান 'হাই কমাণ্ডের' প্রতিও আস্থা রক্ষা করিতে হইবে।

দেশের ও কংগ্রেসের বর্ত্তমান অবস্থা লক্ষ্য করিয়া আমাদের মত দাঁড়াইয়াছে এই যে, কংগ্রেসের অন্তর্গত হইয়াই কার্য্য করিবার জন্য একটি দলের প্রয়োজন, বিপরীত উদ্দেশ্য লইয়া নহে, কিংবা কোন ব্যক্তি কি ব্যক্তি-সমষ্টির কার্য্য কি কার্য্যকলাপের প্রতিবাদ করিবার জন্যও নহে ; এই দলের কার্য্য হইবে কংগ্রেসের বর্ত্তমান কার্য্যোদ্দেশ্য, কার্য্যনীতি এবং

কার্যাপদ্ধার ভ্রান্তি প্রদর্শন এবং যাহাতে নেতৃবৃন্দ নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করিয়া প্রকৃত কার্যোদ্দেশ্য, কার্যা-নীতি এবং কার্যাপদ্ধা নির্দ্ধারণ করিতে পারেন এবং করিতে না পারিলে কংগ্রেসের কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে পারেন—এই মত প্রচার। প্রকৃত কার্যোদ্দেশ্য, কার্যানীতি এবং কার্যাপদ্ধা বলিতে আমরা বলিতে চাই, যাহার সাহায্যে আগামী ২০ বৎসরের মধ্যে সমগ্র মানব-সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকারের আর্থিক অভাব, ব্যক্তিগত নফরগিরী, শারীরিক স্বাস্থ্য, মানসিক অশান্তি, অকাল-বার্দ্ধক্য এবং অকালমৃত্যু হইতে রক্ষা পাইতে পারে। এই উদ্দেশ্যে যে দল গঠিত হইবে, তাহাকে 'ফরোয়ার্ড ব্লক' অভিহিত করিলে অতি নাই।

আমরা প্রস্তাবিত নূতন দল সম্বন্ধে যে ধারণা দিতেছি, তাহা উপলব্ধি করিতে পারিলে বুঝা যাইবে যে, ইহার মূল-নীতি অনুযায়ী 'ফরোয়ার্ড ব্লক' "সাধারণতঃ দল বলিতে যাহা বুঝা যায়, তাহা হইবে না, কেবল জাতিবর্ণ ও শ্রেণী-নির্ব্বি-শেষে যাঁহারা সর্ব্বপ্রকার আর্থিক অভাব, ব্যক্তিগত নফর-গিরী,* মানসিক অশান্তি, শারীরিক অস্বাস্থ্য, অকালবার্দ্ধক্য এবং অকালমৃত্যুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি চাহেন, তাঁহাদিগকে মিলিত করিবার একটি আস্তানা স্বরূপ হইবে।"

যে প্রকৃতির 'ফরোয়ার্ড ব্লকের' প্রস্তাব আমরা উপস্থিত করিতেছি, তাহার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করিতে হইলে আমাদিগকে বলিতে হইবে:—কংগ্রেসের অন্তর্গত উপদল হিসাবেই ফরোয়ার্ড দল কার্য্য করিবে এবং সূচনাতে ইহা কংগ্রেসের বর্ত্তমান বিধি ও বিধান মানিয়া লইবে, কিন্তু সর্ব্বান্তঃকরণে ইহার কার্যোদ্দেশ্য, কার্যানীতি এবং কার্যাপদ্ধা মানিয়া লইবে না, কংগ্রেসের বর্ত্তমান কার্যোদ্দেশ্য, কার্যানীতি ও কার্যাপদ্ধা সম্বন্ধে ফরোয়ার্ড ব্লকের উদ্দেশ্যই হইবে কংগ্রেস-সদস্যদিগের নিকট উহার ভ্রান্তি প্রদর্শন করা এবং এমন কর্ম্মোদ্দেশ্য, কর্ম্মনীতি ও কর্ম্মপদ্ধার সন্ধান দান, যদ্দ্বারা ভারতের প্রত্যেকে এবং মানবসমাজের প্রত্যেকে তাহার আর্থিক অভাব, ব্যক্তিগত নফরগিরী, অস্বাস্থ্য, মানসিক অশান্তি, অকালবার্দ্ধক্য এবং অকালমৃত্যুর কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে। যে-ব্যক্তি এমন কর্ম্মোদ্দেশ্য, কর্ম্মনীতি ও কর্ম্মপদ্ধার সন্ধান দান করিতে পারিবেন, যদ্দ্বারা মানব-সমাজের প্রত্যেকে, অন্ততঃ ভারতের প্রত্যেকে আর্থিক অভাব, ব্যক্তিগত নফরগিরী প্রভৃতি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবেন, তদ্ব্যতিরেকে আর কাহারও ব্যক্তিত্বের প্রতি ইহা শ্রদ্ধাশীল হইবে না। সুতরাং মিঃ গান্ধীর সম্বন্ধে ইহা শ্রদ্ধাশীল হইবে না এবং তাঁহাকে ইহা কোন রূপ নিয়ন্ত্রণা-ধিকারও দান করিবে না। জন-সাধারণ তাহাদের প্রত্যেকটি কার্য্যে কি করিয়া হিংসাপ্রবৃত্তি দমন করিতে পারে, ইহা সেই শিক্ষা দান করিবে। জাতি, বর্ণ ও শ্রেণীনির্ব্বিশেষে প্রত্যেকটি ব্যক্তির সহিত সহযোগ এবং আর্থিক অভাব, ব্যক্তিগত নফরগিরী ইত্যাদি হইতে নিষ্কৃতিলাভের বিষয়ে যে সকল কার্য্য বাধাস্বরূপ, কেবল তাহাদের সহিত অসহযোগ, ইহাই ব্লকের মূলমন্ত্র হইবে। অহিংস অসহযোগের বাণী প্রচার করার নির্ব্বুদ্ধিতা ও ফাঁকীকে ইহা উদ্ঘাটিত করিবে, কেন না বাস্তবক্ষেত্রে যদি ইহার কোন অর্থ থাকে, তাহা কেবল কথায় ও পরিভাষায়, কার্য্যে ইহা কখনই রূপান্তরিত হইতে পারে না। কংগ্রেসের হাই কম্যাণ্ড-সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকটি ব্যক্তির সম্বন্ধে ইহার সৌভ্রাত্র্যের বোধ থাকিবে, কিন্তু জন-সাধারণের স্বার্থের দিক্ হইতে ইহাঁদের প্রত্যেকটি কার্য্য কিরূপ স্বেচ্ছাচার ও নির্ব্বুদ্ধিমূলক, তাহা ইহা প্রদর্শন করিতে পশ্চাৎপদ্ হইবে না। আমাদের ধারণা এই যে, মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু-কথিত 'ফরোয়ার্ড ব্লক'-এর বিধি-বিধান এবং লক্ষ্যাদির সহিত আমাদের প্রস্তাবের পার্থক্য কোথায়, তাহা বুঝা কষ্টসাধ্য হইবে না। যদি বলা হয় যে, 'ফরোয়ার্ড ব্লক' কেবল তাঁহাদেরই মিলন-স্থল হইবে, যাঁহারা ইহার কর্ম্মপদ্ধা মানিয়া লইবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহার কর্ম্মপদ্ধা কোন্ মূল নীতি অনুযায়ী গঠিত হইবে, তাহার উল্লেখ না করা হয়, তবে প্রথম হইতেই ইহাতে একপ্রকার প্রভুসর্ব্বস্বতা এবং

---

* ব্যক্তিগত নফরগিরী বলিতে আমরা বুঝাইতে চাহি, ব্যক্তির অধীনে দাসত্ব। আমাদের মতে, প্রয়োজন-পূরণের জন্য, অর্থাৎ আর্থিক অভাব, শারীরিক অস্বাস্থ্য, মানসিক অশান্তি ইত্যাদি হইতে নিষ্কৃতির জন্য কাহাকেও যদি কোন রীতিনীতির আনুগত্য মানিয়া লইতে হয়, তদনুযায়ী কার্য্যে বিরক্তি বোধ করা কাহারও উচিত নহে। কিন্তু কোন ব্যক্তিকে খুশী করিবার জন্য সেই ব্যক্তির তুষ্টি যদি কাহাকেও সদাসর্ব্বদা তামিল করিতে হয়, তবে কোন অবস্থাতেই কেহ বিশেষ খুশী বোধ করিতে পারে না। এই জন্যই আমাদের অভিমত এই যে, ব্যক্তিগত নফরগিরী হইতে মনুষ্যসমাজের মুক্তির প্রয়োজন।

শেষতঃ তাহার ফলে দলাদলি ও অনৈক্য দেখা দিতে বাধ্য, কেন না উহার কর্মপন্থা দেশের বিভিন্ন-স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দের প্রত্যেকের পছন্দানুযায়ী নাও হইতে পারে। অন্যপক্ষে যদি বলা যায় যে, 'যাঁহারা সর্বপ্রকার আর্থিক অভাব, ব্যক্তিগত নফরগিরী, মানসিক অশান্তি, শারীরিক অস্বাস্থ্য, অকালবার্ধক্য এবং অকালমৃত্যুর কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন, জাতিবর্ণ প্রেণীনির্বিশেষে তাঁহাদের সকলকে মিলিত করিবার আহ্বান' এই 'ব্লক', তবে সর্বব্যাপী একতার সম্ভাবনা ঘটিবে। যদি অবশ্য কর্মপন্থা এই উদ্দেশ্যানুযায়ী কর্মপন্থা গৃহীত হয়, কেন না সমগ্র মানব-সমাজে এমন একটি ব্যক্তি নাই, যিনি না কি আর্থিক অভাব, ব্যক্তিগত নফরগিরী ইত্যাদি হইতে নিষ্কৃতি না চাহেন।

মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু 'ফরোয়ার্ড ব্লক'এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য যাহা হইবে বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, তাহা নিম্নলিখিত পাঁচটি কারণে সমর্থিত হইতে পারে না।

প্রথমতঃ, যদি ফরোয়ার্ড ব্লকের লক্ষ্য কংগ্রেসের বর্তমান কর্মোদ্দেশ্য, কর্মনীতি এবং কর্মপন্থা মানিয়া লওয়া হয়, অথচ কংগ্রেসের বর্তমান হাই কম্যাণ্ডের প্রতি আস্থা হারা না রক্ষা করিতে চাহে, তবে বর্তমান কংগ্রেস যাহা করিতেছে, দেশকে তাহা ব্যতীত আর কোন উপায়েই ইহা সেবা করিতে পারিবে না এবং সকল দিক্ দিয়াই দেশের মধ্যে যে ঐক্য-স্থাপন অত্যন্ত কাম্য, তাহারও প্রতিষ্ঠা করিতে পারে না। হাই কম্যাণ্ড-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতি অনাস্থায় তাঁহাদের সহিত কলহ অনিবার্য। অর্থাৎ ফল দাঁড়ায় এই যে, মিঃ সুভাষচন্দ্র প্রস্তাবিত ফরোয়ার্ড ব্লক কর্তৃক দেশের মধ্যে অনৈক্যসৃষ্টির আশঙ্কা ঘটিতেছে।

দ্বিতীয়তঃ, এ কথা না বলিলেও চলে এবং সকলেই স্বীকার করিবেন যে, বর্তমান কংগ্রেস দেশবাসীর প্রত্যাশানুযায়ী কার্য্য করিতে পারিতেছেন না, কেন না, বাস্তব ক্ষেত্রে দেশের প্রত্যেকটি পরিবারের আর্থিক অভাব, ব্যক্তিগত নফরগিরীর প্রয়োজনীয়তা, শারীরিক অস্বাস্থ্য, মানসিক অশান্তি, অকালবার্ধক্য এবং অকালমৃত্যু ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। যদি জন-সাধারণের সেবার জন্যই কংগ্রেসের সৃষ্টি হইয়া থাকে, তবে স্বীকার করিতে হইবে যে, ইহার বর্তমান কর্মোদ্দেশ্য, কর্মনীতি এবং কর্মপন্থায় কোন না কোন প্রকার ভ্রান্তি রহিয়াছে এবং অনতিবিলম্বে ইহার পরিবর্তন প্রয়োজন।

তৃতীয়তঃ, মিঃ গান্ধীর ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করার কোন যুক্তি থাকিতে পারে না, কেন না, যদি স্বীকৃত হয় যে, কংগ্রেসের তথাকথিত উন্নতি সত্ত্বেও ভারতের প্রত্যেকটি পরিবারের দুঃখকষ্ট বাড়িয়া চলিয়াছে, তবে অতি অবশ্য এই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, মিঃ গান্ধীর নেতৃত্বে কোনও ত্রুটি বর্তমান এবং বিচক্ষণ নেতৃত্বের দানে তিনি কোনও অবিচক্ষণতা সাধন করিতেছেন; এক কথায় তিনি দেশকে ধাপ্পাবাজী দিতেছেন। হইতে পারে যে, মিঃ গান্ধী জানেন না যে, তিনি এই ধাপ্পাবাজী দিতেছেন এবং তাঁহার অজ্ঞতার নিমিত্তই তাঁহার নীতি ও কর্মপন্থা দেশবাসীর স্বার্থের পক্ষে হিতসাধক বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে না, কিন্তু তথাপি ইহার দায়িত্ব হইতে তাঁহাকে অব্যাহতি দানের কিংবা তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিবার কোন যুক্তি থাকিতে পারে না। শ্রদ্ধার যোগ্য কেবল তাঁহারা হইতে পারেন, যাঁহারা দেশবাসীর আর্থিক অভাব, ব্যক্তিগত নফরগিরী ইত্যাদি হইতে নিষ্কৃতিদানের উপযোগী কর্মপন্থা উপস্থিত করিতে সমর্থ।

চতুর্থতঃ, অহিংস অসহযোগে সম্পূর্ণ বিশ্বাসের কথা বাদ দিলে তাহাকে অত্যন্ত নীতিসিদ্ধ বলিয়া মনে হইতে পারে বটে, কিন্তু 'অহিংসা' বলিতে প্রকৃতপক্ষে যাহা বুঝায়, তৎসম্বন্ধে কোন ধারণা করিবার জন্য প্রয়াসী হইলে ইহা সুস্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, "অহিংস অসহযোগে"র বাণী কেবল মনুষ্য-বুদ্ধির অভাব সূচিত করে এবং ইহা শূন্যে সৌধ নির্মাণের পরিণামপ্রদাতা। বাস্তবিকপক্ষে, যদি মিঃ গান্ধীর কার্য্যাবলীর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা হয়, তবে দেখা যাইবে যে, এমন কি, তাঁহার পক্ষেও অহিংস হওয়া সম্ভব হয় নাই এবং তিনি দেশের হইয়া যে কার্য্য করেন, তাহার শতকরা নিরানব্বইটিই হিংসার পরিচায়ক।

পঞ্চমতঃ, অতিশয় আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু মিঃ গান্ধীর প্রতি পরম শ্রদ্ধা পোষণের কথা বলিয়াও, মিঃ গান্ধী যাঁহাদিগকে প্রায়শঃ অত্যন্ত প্রিয় বলিয়া মনে করেন, সেই হাই কম্যাণ্ডের প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করিতেছেন। আমাদের মতে, ইহা ভণ্ডামির পরিচায়ক—অবশ্য না জানিয়া, কিন্তু তথাপি ইহা মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুকে সাজে না। এই জন্যই আমরা বলিতেছি যে, মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু 'ফরোয়ার্ড ব্লক'এর উদ্দেশ্য বলিয়া যাহা জারী করিয়াছেন, তাহাকে সমর্থন করা চলে না।

অন্যপক্ষে যদি 'ফরোয়ার্ড ব্লক' কংগ্রেসের সদস্যদের নিকট কংগ্রেসের কর্মোদ্দেশ্য, কর্মনীতি ও কর্মপন্থার ভ্রান্তি প্রদর্শন, ইহার উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করেন এবং তৎসহিত ভারতের, তথা সমগ্র মানবসমাজের প্রত্যেকে আর্থিক অভাব, ব্যক্তিগত নফরগিরী ইত্যাদির হাত হইতে যাহাতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে, তদুপযোগী কর্মোদ্দেশ্য, কর্মনীতি ও কর্মপন্থার সন্ধান দান করিতে পারে, তবে হয়ত সুচনাতে মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু হাস্যাস্পদ হইবেন, কিন্তু এমন সময় নিশ্চয়ই আসিতে বাধ্য, যখন সমগ্র মানবসমাজ তাঁহার পদানত হইবে এবং যতদিন মনুষ্যজাতির অস্তিত্ব থাকিবে, ততদিন তাঁহার কার্য্য শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করা হইবে।

যদি 'ফরোয়ার্ড ব্লক' ইহাই তাহার লক্ষ্য হিসাবে প্রচার করে যে,—গত অষ্টাদশ বৎসর কাল অপ্রতিদ্বন্দ্বী নায়ক হইয়া থাকা সত্ত্বেও মিঃ গান্ধী, কি করিয়া ভারতবাসী তাহাদের আধিক অভাব, ব্যক্তিগত নফরগিরী, শারীরিক অস্বাস্থ্য, মানসিক অশান্তি ইত্যাদি হইতে মুক্ত হইতে পারিবে, তাহার পন্থার সন্ধান দিতে পারেন নাই এবং মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ এবং অন্যান্য বহু ত্যাগবীর যুবকবৃন্দকে বিভ্রান্ত করিয়াছেন বলিয়া—ইহা মিঃ গান্ধীর প্রতি কোন শ্রদ্ধা পোষণ করে না কিংবা তাঁহার ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের একনায়কত্বের বিরোধী, তবে হয় ত সূচনাতে ইহা অবিচক্ষণতার কার্য্য হইবে, কিন্তু অদূরভবিষ্যতে দেশবাসীর অধিকাংশকে ইহা আকৃষ্ট করিবে, কেন না, তাহারা নিরতিশয় কষ্ট ভোগ করিতেছে এবং অচিরাৎ তাহাদের কোন প্রকার উলট-পালটের প্রয়োজন হইয়াছে। কূটনীতির ফন্দীফিকির খাটাইয়া সমগ্র দেশকে মিঃ গান্ধীর অনুগামী করিতে চাহেন বলিয়া সাগর-পারের কূট-নৈতিক ধুরন্ধরগণ মিঃ গান্ধীর ব্যক্তিত্বকে খুব হোমরা-চোমরা বলিয়া জারী করিতেছেন, সুতরাং মিঃ গান্ধীর ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে শ্রদ্ধাপোষণের কথা বলা এক্ষণে বিচক্ষণতার কার্য্য হইতে পারে, কিন্তু, সে সময় অতি নিকটবর্ত্তী, যখন সত্য প্রকাশিত হইবে, এবং মিঃ গান্ধী কিরূপ পাপপরায়ণ ও চরিত্রহীন, তাহা সমগ্র পৃথিবী শ্রাদ্ধই বুঝিতে পারিবে। যদি 'ফরোয়ার্ড ব্লক' অন্তরের সহিত এই উদ্দেশ্য লইয়া কার্য্য করে যে, জন-সাধারণ যাহাতে তাহাদের প্রত্যেক কার্য্যে হিংসার ভাব সংযত করিতে পারে, তাহাদিগকে সেই শিক্ষা দান করিবে, তবে চরম শত্রুরাও ইহার মিত্রভাবাপন্ন না হইয়া পারিবে না এবং তখন, ব্রিটিশ জনসাধারণকেও যে ইহা নিজেদের স্বপক্ষে সতীর্থ হিসাবে পাইবেন, ইহা নিশ্চিত।

যদি 'ফরোয়ার্ড ব্লক'এর উদ্দেশ্য হয় যে, তাঁহারা জাতিবর্ণ-শ্রেণীনির্ব্বিশেষে সকল ব্যক্তির সহিত সহযোগিতা করিবেন, এবং কোন ব্যক্তির সহিতই অসহযোগিতা না করিয়া কেবল সেই সকল কার্য্যের সহিত অসহযোগিতা করিবেন, যাহা আধিক অভাব হইতে অব্যাহতি লাভ কিংবা ব্যক্তিগত নফরগিরী ইত্যাদির প্রতিবন্ধক, তবে হয় ত সূচনাতে বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণ, শাসকবৃন্দ এবং রাষ্ট্রনেতাগণ 'ব্লক'এর সহিত একমত হইবেন না, কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, প্রথম হইতেই জন-সাধারণ, অর্থাৎ দেশবাসী অধিকাংশই 'ব্লক'এর পক্ষ গ্রহণ করিবেন এবং যাঁহারা সূচনাতে 'ব্লক'এর কার্য্যে উপহাস করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে হয় নিন্দাভাজন হইতে, নয় 'ব্লক'এর পক্ষে আসিতে বাধ্য করিবে।

যদি 'ফরোয়ার্ড ব্লক' দেখাইতে আরম্ভ করেন যে, বাস্তব ক্ষেত্রে "অহিংস অসহযোগে"র বাণী প্রচার কতদূর অর্থহীন এবং কি পরিমাণ ধাপ্পাবাজী, তবে হয় ত মিঃ গান্ধীর জন-কয়েক নির্দ্দোষ অনুচর প্রথমে বিপক্ষতা করিবেন, কিন্তু ইহা নিশ্চিত সত্য যে, দেশবাসী অধিকাংশ ব্যক্তিরই সমর্থন অতি অল্প সময়ের মধ্যেই 'ব্লক' পাইবেন।

যদি 'ফরোয়ার্ড ব্লক' দেখাইতে কৃতসঙ্কল্প হন, বর্ত্তমান কংগ্রেসের হাই কমাণ্ড-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দের কার্য্যকলাপ কি প্রকার স্বেচ্ছাচারমূলক এবং কি পরিমাণ নির্দ্দোষ এবং তৎসহিত তাঁহাদের প্রত্যেকের প্রতি সৌভ্রাত্র্য পোষণ করিতে পারেন, তবে হয় ত এই সকল স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তি নিজেদের কার্য্য সমর্থনার্থ বহু অর্থহীন ধোঁকাবাজীর আমদানী করিবেন, কিন্তু ইহা নিশ্চিত সত্য যে, দেশের লোক অতি শীঘ্রই সে চালাকী ধরিয়া ফেলিবে এবং যাঁহারা মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের ক্ষুদ্রতা সত্ত্বেও সংচৌর-প্রবাদ বহু পোষণ করেন, তাঁহাদিগকে রীতিমত শিক্ষা দিবে।

আমরা যাহা বলিতেছি, তাহা যদি মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু বুঝিয়া থাকেন, তবে 'ফরোয়ার্ড ব্লক'কে নিম্নলিখিত পন্থায় কর্ম্মপ্রণালী ব্যবস্থিত করিতে হইবে :—

প্রথমতঃ, আমাদের প্রস্তাবিত বিধি ও বিধানের মূলনীতি যথাসাধ্য সুস্পষ্ট করিয়া প্রচার আবশ্যক।

দ্বিতীয়তঃ, 'ব্লক'এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য যতদূর সম্ভব সরল করিয়া দেশবাসীকে বুঝাইয়া দিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ, মিঃ গান্ধী, কংগ্রেস হাই কমাণ্ড, প্রাদেশিক গবর্ণরবৃন্দ এবং বড়লাট বাহাদুরের নিকট এমন কার্য্যপন্থা দাবী করিতে হইবে, যাহা মানব-সমাজের প্রত্যেককে না হইলেও, অন্ততঃ প্রত্যেক ভারতবাসীকে তাহার আধিক অভাব, ব্যক্তিগত নফরগিরী, শারীরিক অস্বাস্থ্য, মানসিক অশান্তি, অকালবার্দ্ধক্য এবং অকালমৃত্যুর হাত হইতে নিষ্কৃতি দান করিতে পারে।

চতুর্থতঃ, এরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে, যাহাতে দেশবাসীর দুরবস্থা নিবারণার্থ বড়লাট, প্রাদেশিক গবর্ণরবৃন্দ, কংগ্রেসের হাই কমাণ্ড কিংবা মিঃ গান্ধী যে সকল পন্থার কথা বলিবেন, তাহার শূন্যগর্ভতা প্রমাণিত হইতে পারে এবং দেশবাসী যাহাতে বুঝিতে পারেন যে, তাঁহারা অসার বিজ্ঞান ও সভ্যতার করতলগত হইয়াছেন বলিয়াই এই বিজ্ঞান ও সভ্যতার বিস্তার ও উন্নতি সত্ত্বেও প্রায় প্রত্যেক পরিবারের দুঃখ-কষ্ট ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে।

পঞ্চমতঃ, বৃটিশ পার্লামেণ্টের নিকট এই দাবী উপস্থিত করিতে হইবে যে, হয় তাঁহারা নিজেরা দেখাইয়া দিন কোন্ পন্থায় সমগ্র মানব সমাজ না হইলেও, অন্ততঃপক্ষে প্রত্যেক ভারতবাসী, কি করিয়া আধিক অভাব, ব্যক্তিগত নফরগিরী,

শারীরিক অসুস্থতা, মানসিক অশান্তি ইত্যাদির হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে, না হয় কংগ্রেসকে শাসন-বিভাগের প্রত্যেকটি ব্যাপারে বিঘ্নহীন ভাবে কার্য্য করিতে দিন।

আমরা মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুকে এখনও সতর্ক হইবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। যদি তিনি রাজনৈতিক দূরদর্শিতা পরিহার করিয়া এতদিন যেরূপ ভাবে চলিয়া আসিয়াছেন, সেইরূপ ভাবে চলিতে থাকেন, তবে আমরা নিশ্চিত যে, তিনি পুনরায় তাঁহার সতীর্থগণের দ্বারাই নিজের অপদার্থতা প্রতিপন্ন করিবেন।

অতীতে তাঁহার কার্য্যক্রম বিফল হইলেও তাঁহাকে আমরা দেশদোষক বিবেচনার প্রাতিভাজন মনে করি। এই জন্যই তাঁহাকে সতর্ক করিতেছি।

কংগ্রেসের সভাপতির পদত্যাগের দায়িত্ব

গত ৮ই মে (২৪শে বৈশাখ তারিখে) চম্পারণ জিলার বৃন্দাবন হইতে ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ একটি বিবৃতি জারী করিয়া বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু যে কংগ্রেসের সভাপতির পদ ত্যাগ করিয়াছেন, ইহার দায়িত্ব মিঃ গান্ধী, কিংবা হাই-কম্যাণ্ড সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তির নহে, মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু নিজেই ইহার জন্য দায়ী।

ঘটনার পর্য্যালোচনায় আমরা যাহা বুঝিতে পারিয়াছি তাহা এই যে, ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদের এই মতবাদ একেবারেই সত্য নহে। মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুর পদত্যাগের নিমিত্ত মিঃ গান্ধীই সম্পূর্ণ রূপে দায়ী। যদি মিঃ গান্ধী ইচ্ছা করিতেন, তবে তিনি মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুকে সভাপতি রাখিয়া কংগ্রেসকে অনায়াসেই সাহায্য করিতে পারিতেন। তাহা ও তিনি করেনই নাই, উপরন্তু ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ যে বিবৃতি দান করিয়াছেন, তাহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, সুভাষচন্দ্রকে সভাপতি পদ হইতে অপসারিত করিবার জন্য তিনি অত্যন্ত নীচ ভাবে দৃঢ়সংকল্প হইয়াছিলেন এবং তাঁহার অবশ্য কার্য্যাবলীর সাহায্য পুরাতন ওয়ার্কিং কমিটী ব্যতীত আর কাহারও দ্বারা ঘটিয়া উঠিবে বলিয়া তিনি ভাবিতে পারেন নাই। এই জন্যই তিনি মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুকে এরূপ ভাবে কোণঠেসা করিয়াছিলেন যে, বিবেক ও আত্মসম্মান বজায় রাখিয়া বাঁচিতে চাহিলে মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুর পদত্যাগ ব্যতীত আর গত্যন্তর ছিল না।

আমরা বলা প্রয়োজন মনে করি যে, আমরা কাহারও সাফাই গাহিতেছি না এবং ঘটনাসমূহের বিচার করিয়া আমাদের মনে হইয়াছে যে, মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুই হউন, আর মিঃ গান্ধীই হউন, কিংবা হাই কম্যাণ্ড-সংশ্লিষ্ট অপর কোন মহারথীই হউন, যে-পথে দেশবাসী আর্থিক অভাব, ব্যক্তিগত নফরগিরী, শারীরিক অসুস্থতা, মানসিক অশান্তি, অকাল-বার্দ্ধক্য এবং অকালমৃত্যুর হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে, ইহাঁদের কাহারও সে পথের সন্ধান দিবার সামর্থ্য নাই। এই সকল নেতৃবৃন্দের আচরণ দেখিয়া আমাদের সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, দেশের ভাল করা দূরে থাক, যদি গান্ধীবাদ দেশ হইতে সমূলে উৎপাটিত না হয়, তবে তাঁহারা দেশের প্রভূত অনিষ্ট সাধন করিবেন।

কাহারও সাফাই না গাহিলেও, সাংবাদিক হিসাবে দেশবাসীর নিকট ঘটনার প্রকৃত তাৎপর্য্য উপস্থিত করা আমরা আমাদের অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি।

ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদের কৈফিয়ৎ যুক্তিসঙ্গত অথবা আমরা যাহা বলিতেছি তাহাই যুক্তিসঙ্গত, ইহা দেখাইবার জন্য ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদের বিবৃতিকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখা এবং উহার সারসংগ্রহ প্রয়োজন। নিম্নে উহা করা হইল :—

(১) যখন মিঃ গান্ধী এবং মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুর পত্র ব্যবহার এবং সাক্ষাৎ আলাপের ফলে দেখা গেল উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গী এবং মতামতের পার্থক্য এত অধিক যে, মিঃ গান্ধীর পক্ষে মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুকে প্ররোচিত না করিয়া উভয় দিকের দামঞ্জস্য রক্ষা পূর্ব্বক ওয়ার্কিং কমিটী স্থির করা অসম্ভব, তখন দুইটি মাত্র উপায় থাকিল। হয় মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু, যাঁহারা তাঁহার সহিত এক কর্ম্মপন্থা ও কর্ম্মনীতিতে বিশ্বাসী, তাঁহাদের লইয়া কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গঠন করিতে পারিতেন, নয় পুরাতন ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্যবৃন্দের সহিত একজোট হইয়া যাঁহারা তাঁহার সহিত কার্য্য করিতে চাহেন, তাঁহাদের লইয়া তিনি কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গঠন করিতে পারিতেন।

(২) আমাদের মতবাদ মোটামুটি ভাবে "মহাত্মা" (?) গান্ধীর মতবাদের সহিত এক। সুতরাং প্রথম পন্থাই উৎকৃষ্টতর, ইহা অতি স্পষ্ট।

(৩) আমরা সাক্ষাৎ আলোচনার কালে মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুকে উহাই (প্রথম পন্থা) গ্রহণ করিতে জোর করিয়া বলি।

(৪) তাঁহার দিক্ হইতে, তিনি আমাদিগকে ওয়ার্কিং কমিটীর অন্তর্ভুক্ত করিতে সমুৎসুক ছিলেন।

(৫) আমরা তাঁহাকে প্রথম পন্থা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত

জোর দিবার কালে কথা দিয়াছিলাম (মিঃ গান্ধীরও ইহাতে সায় ছিল) যে, অলইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটীতে আমাদের সংখ্যাধিক্য থাকিলেও আমরা তাঁহার সহিত অসহযোগ করিব না কিংবা তাঁহার কার্য্যে কোনরূপ বাধা সৃষ্টি করিব না।

(৬) ইহাতে মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই।

(৭) আমাদিগকে ওয়ার্কিং কমিটীতে লইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিলে পুরাতন কমিটীকে যাহাতে পুনরায় মনোনীত করা হয় আমাদের ইহা অভিপ্রায় ছিল। আমরা প্রস্তাব করি যে, আগামী অধিবেশনের পূর্ব্বেই যাহাতে যে দুইটি স্থান শূন্য হইবে, তাহা আমাদের সহিত পরামর্শ করিয়া যথাপন্থা সদস্যের দ্বারা পূর্ণ হয়, সে ব্যবস্থা হইবে এবং অতঃপর ক্রমশঃ আরও আসন শূন্য করা সম্ভব হইবে। কিন্তু সে-সময় ইহার বেশী আমরা আর কিছু করিতে পারিতাম না।

এই সাতটি বিষয়কে যথাযথ ভাবে বিশ্লেষ করিতে পারিলে দেখা যায় যে, ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদের স্বকীয় বিবৃতিতেও নিম্নের কয়টি বিষয় সুস্পষ্ট :—

(১) রফা নিষ্পত্তির জন্য মিঃ গান্ধী ও মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুর মধ্যে পত্র ব্যবহার এবং সাক্ষাৎ আলাপ হয় (উপরের ১ম নম্বর দ্রষ্টব্য)।

(২) মিঃ গান্ধীর মতে, মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুর দৃষ্টিভঙ্গী ও মতামত তাঁহার হইতে বিশেষ রূপে পৃথক্। অবশ্য কোন্ কোন্ বিষয়ে মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু অন্যায় এবং অনুচিত ভাবে তাঁহার হইতে স্বতন্ত্র মত পোষণ করেন বলিয়া তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, মিঃ গান্ধী তাহা দেশবাসীর নিকট উপস্থিত করা বাধ্যতামূলক বলিয়া মনে করেন নাই (উপরের ১ম নম্বর দ্রষ্টব্য)।

(৩) এই দৃষ্টিভঙ্গী ও মতামতের পার্থক্যের জন্য মিঃ গান্ধী উভয়ের মতসামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া ওয়ার্কিং কমিটী স্থির করা সম্ভব মনে করেন নাই (উপরের ১ম নম্বর দ্রষ্টব্য)।

(৪) মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু যদি পুরাতন ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্যবৃন্দের সহিত এক-কোট হইয়া যাঁহারা তাঁহার সহিত কার্য্য করিতে রাজী, তাঁহাদের লইয়া কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা গঠন করিতেন, তবে মিঃ গান্ধী খুসী হইতেন (উপরের ১ম নম্বর দ্রষ্টব্য)।

(৫) তাহা করিতে না পারিলে মিঃ গান্ধী চাহেন যে, মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু তাঁহার স্বীয় কর্ম্মনীতি ও কর্ম্মপন্থার সহিত যাঁহারা একমত, একমাত্র তাঁহাদিগকে লইয়াই কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা গঠন করুন (উপরের ১ম নম্বর দ্রষ্টব্য)।

(৬) চাই কম্যাণ্ড-সংক্রান্ত অপর সদস্যদের এবং মিঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদকে মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু ওয়ার্কিং কমিটীর অন্তর্ভুক্ত করিতে উদ্‌গ্রীব ছিলেন।

(৭) সাক্ষাৎ আলোচনা কালে ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবং তাঁহার সতীর্থবৃন্দ মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু যাহাতে তাঁহার সহিত যাঁহারা একই কর্ম্মনীতি ও কর্ম্মপন্থায় বিশ্বাসী, তাঁহাদের লইয়া কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা গঠন করেন, তৎপ্রতি জোর দেন।

যদি এই অর্থ ও এন দফায় কথিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়, তবে দেখা যাইবে যে, মিঃ গান্ধী চাহিয়াছিলেন, হয় স্বাধীনভাবে মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু তাঁহার স্বীয় অভিপ্রায় অনুযায়ী একটি কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা গঠন করুন, নয় পুরাতন ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্যদের মতানুযায়ী কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা গঠন করুন। যদি পুরাতন ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্যদের মতানুযায়ী মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা গঠন করিতে পারিতেন, মিঃ গান্ধী অবশ্য তাহাতেই খুসী হইতেন। অন্য দিকে যদি মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু সম্পূর্ণ ভাবে স্বীয় অভিপ্রায় অনুযায়ী কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা গঠন করিতেন, তবে উহা নিশ্চয়ই মিঃ গান্ধীর সমর্থন লাভ করিত না, কেন না উহার সদস্যগণের সহিত মিঃ গান্ধীর দৃষ্টিভঙ্গী ও মতামতের বিশেষ পার্থক্য বর্ত্তমান।

৬ষ্ঠ ও ৭ম দফায় কথিত বিষয় হইতে বুঝা যায় যে, মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু পুরাতন ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্যবৃন্দকে কার্য্য-নির্ব্বাহক সভায় যোগদানার্থ চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ হইয়াছিলেন।

ইহাতে কি প্রমাণ হয় না যে, মিঃ গান্ধীকে খুসী করিবার জন্য মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু যথাসাধ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু মিঃ গান্ধী তাঁহার সহিত সহযোগিতা না করিবার জন্য কিংবা সুভাষচন্দ্র যাহাই করুন না কেন, তাহা সমর্থন না করিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প করেন? তাহাই যদি না হইত, তবে মিঃ গান্ধী পুরাতন ওয়ার্কিং কমিটীকে ইচ্ছা করিলেই সুভাষচন্দ্রের সহিত একত্র দেশবাসী জনসাধারণের স্বার্থের অনুকূলে কার্য্য-নির্ব্বাহক সভাগঠনে বাধা করিতে পারিতেন। পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাবের অন্তিত্ব বেশ ভাল ভাবে জানা সত্ত্বেও মিঃ গান্ধী যে মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুকে স্বাধীনভাবে কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা গঠনের জন্য বলেন, ইহা দেশবাসীর নিকট নিজের নির্দ্দোষিতা প্রমাণপত্র বাগে অনুষ্ঠান মাত্র। যদি তিনি বাস্তবিকই চাহিতেন যে, মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু স্বাধীন ভাবে স্বীয় অভিপ্রায়-অনুযায়ী কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গঠন করুন, তবে তিনি পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাব বাতিল করিবার উপায় নিশ্চিত খুঁজিয়া পাইতেন। কিন্তু মিঃ গান্ধী যে তাহার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার

কোন সাক্ষ্য নাই। যদি মিঃ গান্ধীর সমর্থন না পাইয়াও মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গঠন করিতেন, তাহাতে কি তাঁহার কংগ্রেসের বিরুদ্ধাচরণ করা হইত না?

উপরিলিখিত তথ্যের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মিঃ গান্ধী এমন ভাবে জাল বিস্তার করেন যে, সুভাষচন্দ্র মিঃ গান্ধীর সমর্থন লাভ করিয়া কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা গঠন করিতেও পারিবেন না এবং স্বাধীন ভাবে কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গঠন করিয়া কংগ্রেসের সভাপতিও থাকিতে পারিবেন না। পাঠক এখন বিচার করুন যে, মিঃ গান্ধী কংগ্রেসের সভাপতির পদত্যাগের জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী, ইহা বলিলে সত্য কথা বলা হয় কি না।

মিঃ গান্ধী অভিনীত এই নাটকে তাঁহার কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা না দেখাইয়া আমরা এই নিবন্ধ শেষ করিতে পারিতেছি না। ইহাতে কি প্রমাণিত হয় নাই যে, বিপক্ষকে তাঁহার "অহিংস" প্রক্রিয়ায় পরাজিত করিবার কালে মিঃ গান্ধীর পক্ষে কোন নীচতাই নীচতা নহে? তাঁহার এই কার্য্য কি অসত্য এবং সয়তানী বুদ্ধিতে পরিপূর্ণ নহে?

এমন ব্যাপারের কৈফিয়ৎ দিবার জন্য ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদের ন্যায় ব্যক্তির বাধিত না বলিয়া তাঁহাকে আমাদের অনুকম্পার পাত্র মনে হইতেছে। যদি বলা হয় যে, মিঃ গান্ধীর এই প্রকার কার্য্যেও যাঁহারা লজ্জা বোধ করেন না, তাঁহারা হয় নির্ব্বোধ, নয় মতলববাজ, তবে কি খুব অন্যায় হইবে?

দেশ কি এখনও এই সমস্ত ব্যক্তির নিকট অনেক প্রত্যাশা রাখিবে?

আমরা মিঃ গান্ধী এবং তাঁহার চেলাচামুণ্ডাদের রাজনীতি-ক্ষেত্র হইতে অবসরগ্রহণের জন্য পরামর্শ দান করি, নতুবা এখন সময় আসিতেছে, যখন ভারতের প্রত্যেকে তাঁহাদিগকে ধিক্কার দিবে। সময় থাকিতে থাকিতে এখনও আমরা তাঁহাদিগকে সরিয়া পড়িতে বলি।

উপসংহারে মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য জ্ঞাপন করিব। সন্দেহ নাই যে, মিঃ গান্ধী তাঁহার প্রতি এই ব্যাপারে অবিচার করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাকে স্মরণ করিতে বলি যে, তিনি নিজেই প্রায়শঃ নিজের প্রতি অবিচার করেন। তিনি যদি আত্ম-বিশ্লেষণ করেন, তবে দেখিবেন যে, দেশের জন্য তিনি যে ত্যাগ-স্বীকার করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার গর্ব্ববোধ করিবার কারণ আছে, কিন্তু এতাবৎ তিনি প্রমাণ করিতে সমর্থ হন নাই যে, রাজনীতির এবং অর্থনীতির অ-আ ক-খতে তাঁহার হাতে-খড়ি হইয়াছে। তিনি যদি কার্য্যে প্রয়োগযোগ্য অর্থনীতির শিক্ষা লাভ করিতেন, তবে এক মুহূর্ত্তে উপলব্ধি করিতেন যে, সমগ্র মানব-সমাজ বর্ত্তমানে অভূতপূর্ব্ব সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছে এবং এই সঙ্কটের নিমিত্ত সাম্রাজ্যবাদ কিংবা যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণ অথবা রাষ্ট্রীয় কোন কারণ দায়ী নহে। এই সঙ্কটের জন্য প্রধানতঃ দায়ী জমীর উর্ব্বরাশক্তির হ্রাস। ইহারই ফলে পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক দেশে আহার্য্য ও কাঁচামালের ঘাটতি উপস্থিত হইয়াছে। জমীর এই উর্ব্বরাশক্তির হ্রাসের ফলে প্রত্যেক দেশে স্বাধীন কৃষি ব্যবসায়ে লাভ করা প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। যদি দেশের বাস্তব অবস্থা পর্য্যালোচনার সামর্থ্য তিনি অর্জ্জন করিতে পারেন, তবে দেখিবেন যে, প্রত্যেক দেশের অধিকাংশ জনসাধারণ প্রধানতঃ এই কৃষি-ব্যবসায়ের লোকসানের জন্যই অধীর হইয়া উঠিয়াছে এবং অদূর-ভবিষ্যতে এই অবস্থার কোন উন্নতিরই বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নাই, কেন না, কৃষিকে লাভজনক করিবার চেষ্টা কুত্রাপি গৃহীত হয় নাই। অবস্থা এই বৎসরেই বেশ খারাপ বলিয়া দেখা যাইতেছে এবং আগামী বৎসরে ইহা আরও খারাপ হইবে বলিয়া আশঙ্কা করিবার সকল কারণই দেখা যাইতেছে এবং পরবর্ত্তী বৎসর তাহার অপেক্ষাও খারাপ হইবে ইহা সত্য। সুভাষচন্দ্র হয়তো অনুমান করিতে পারিবেন না যে, ইহার পরিণামে কি দাঁড়াইবে, কিন্তু আমরা তাঁহাকে ইহা নিশ্চিত জানাইতেছি যে, অদূরভবিষ্যতে যদি এই অবস্থার উন্নতির জন্য কোনও ব্যবস্থা গৃহীত না হয়, তবে মনুষ্য সমাজের টিঁকিয়া থাকা কঠিন হইবে।

আমরা তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া এত কথা বলিতেছি এই জন্য যে, যদিও তাঁহার অতীত কার্য্যাবলীতে প্রমাণ হয় না যে, তিনি এখনও পর্য্যন্ত রাজনীতি কিংবা অর্থনীতির অ-আ ক-খ-র হাতে-খড়ি পাইয়াছেন, তথাপি তাঁহার সম্বন্ধে আমরা যতদূর দেখিয়াছি, তাহা হইতে আমাদের মত দাঁড়াইয়াছে এই যে, তাঁহার মধ্যে অর্থনীতিজ্ঞ এবং রাজনীতিজ্ঞ, উভয় হইবার ন্যায়ই স্বাভাবিক উপাদান বর্ত্তমান। পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থায় ইহা অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। আমরা ভরসা রাখি যে, যদি তিনি যথার্থ ভাবে ও পথে চলেন, তবে তিনি সমগ্র মনুষ্য-সমাজের পক্ষে অলঙ্কার স্বরূপ হইবেন। আমরা তাঁহাকে তাঁহার চিন্তাহীনতা পরিহার করিতে অনুরোধ করি। তাঁহার কার্য্যধারা স্থির করিবার পূর্ব্বে তিনি যেন বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দেখেন, যাঁহারা তাঁহার স্তাবকতা করিতেছেন, তাঁহারা যে তাঁহার বন্ধু নহেন, ইহা তাঁহাকে অতি অবশ্য করিয়া বুঝিতে হইবে, কেন না, বন্ধুর অবশ্যকর্ত্তব্য হইতেছে, উন্নতির সাহায্য করিতে ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরাইয়া দেওয়া। সময় থাকিতে সুভাষচন্দ্র বিজ্ঞতর হউন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

কবি বিহারীলাল

—শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায়

বিহারীলালের ভাব ও কল্পনাদর্শের আভাস রবীন্দ্রনাথের বলাকা কাব্যের '৮কণা' কবিতাতেও পাওয়া যায়। বিহারীলাল তাঁহার 'সাধের আসনে' বলিয়াছেন যে, জগতের মধ্যে সর্বদাই পরিবর্তনের স্রোত চলিয়াছে। সমস্ত কিছুই রূপান্তর গ্রহণ করিতেছে। এই রূপান্তরের ফলেই নূতনের জন্ম হইতেছে। পরিবর্তনই এ জগতে সৌন্দর্য ও মাধুর্য বিধান করিতেছে :—

ঈষদের সঙ্গে সঙ্গে
হৃদয় খেলেছে রঙ্গে,
জীবনের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে যতন।
আপনি সরম হ'লে
সুখ চলে অস্তাচলে,
আবার সরমে হয় উষার কেমন!
মিটি মিটি তারা সব
নবীন নূতন পাখী,
কেমন প্রফুল্ল আহা কুসুম সুন্দর!
ভরে যায় পরিমল
জাগিয়া নয়ন খুলি,
আমার তেমনি ফুল ফোটে থরে থর।

বিশ্বে প্রকৃতি এই,
একেবারে স্থির নেই,
এক ধায় আর আসে
নবীন সৌন্দর্যে ভাসে।

—সাধের আসন, প্রথম সর্গ

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার '৮কণা' কবিতাতেও এই কথাই আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। কালের কোনও মুহূর্তই স্থির হইয়া নাই, পরিবর্তনের প্রবাহ অদৃশ্য বেগে নিত্য-নিরন্তরই চলিয়াছে। সেই প্রবাহ-বেগে সবই ভাসিয়া যাইতেছে। এই গতিপ্রবাহ কোনও রকমে স্থগিত হইলেই তৎক্ষণাৎ বস্তুরূপ জড় হইয়া উঠে। স্থিতিতে বস্তুর রূপ জড় হইয়া উঠিলে তাহার রূপের বিচিত্রতা ফুটিয়া উঠিবার অবকাশ হয় না। রবীন্দ্রনাথের সমস্ত 'বলাকা' কাব্যের মধ্যেই এই "অকারণ অবারণ" চলার কথা আছে।

যে মুহূর্তে পূর্ণ তুমি সে মুহূর্তে কিছু নয় নাই,
তুমি তাই
পরিপূর্ণ সদাই।
তোমার চরণস্পর্শে বিশ্বধূলি
মণিময়ী যায় তুলি'
পলকে পলকে,
মূঢ় ওঠে প্রাণ হ'য়ে ঝলকে ঝলকে।

—রবীন্দ্রনাথ, '৮কণা'

রবীন্দ্রনাথের স্বর্গ হইতে বিদায় (চিত্রা), মুক্তি (নৈবেদ্য), মরীচিকা (কড়ি ও কোমল) প্রভৃতি কবিতার মূলেও বিহারীলালের কল্পনা অনুভূত হয়। ইংরেজ কবি শেলীর মত আদর্শ সৌন্দর্যের পূজারী হইয়াও মানুষকে যাঁহারা সুন্দর দেখেন, বিহারীলাল তাঁহাদেরই একজন। কল্পনায় স্বর্গ ভ্রমণ করিয়া আসিয়াও তিনি এক বিন্দু সুধা প্রাপ্ত হন নাই :—

স্বর্গেতে অমৃত সিন্ধু
পাই নাই এক বিন্দু।

—সাধের আসন

অমৃতাধিক ধন অন্য স্বর্গে নাই বলিয়া কবি অনুশোচনা করিয়াছেন এবং সেই অশ্রুকণাটুকু পাইয়া কবির মনে অসীম তৃপ্তি আসিয়া উঠিয়াছে :—

হায় অশ্রুকণাটুকু অমৃত-অধিক ধন
পেয়ে, এ অমৃত লোকে জুড়ান জীবন।

—সাধের আসন

কল্পনায় স্বর্গের সুখচিত্র রচনা করিয়া কবি তৃপ্তি পান না। কারণ সেখানে সবই কামনাহীন। কবি বলিতেছেন :—

যে যুগে তোমরা জাগে, সকলেরি জাগরণ,
এ যুগে সকল জনে সবে ঘুমে আচেতন।
আমাদের মর্ত্যভূমে
কেহ জাগে কেহ ঘুমে,
সুখী যারে অস্তাচলে, তারে হয় চন্দ্রোদয়।
এ চির-পূর্ণিমা-নিশি তেমন সুন্দর নয়।

অমরের অপরূপ স্বপ্ন সুখ নাহি চাই।
কে বলে? "আঁধারে কবির
কালোর চাহনি আছে,
কালো কালোরূপ মূর্ত্তি
আচম্বিতে পায় স্ফূর্ত্তি,
শোক শোক সঙ্গে তার,
চতুর্দ্দিকে ধুধুমার,
হিহি হিহি অট্ট হাসে
ঝলকে বিদ্যুৎ ত্রাসে,
ঘোলাটে চক্ষু রব,
আহতে নিহত সব,
প্রলয়ে তাণ্ডব মত
কে কোথায় মনগত।"
এ সকল মিথ্যা কথা,
আকাশ-কুসুম লতা,
প্রেমের আনন্দ ধামে মরণের ভয় নাই।

—সাধের আসন, চতুর্থ সর্গ

স্বর্গের অপরিবর্ত্তনের স্রোত—সেখানকার চিরবসন্ত কাল অথবা অনন্ত সুখের মধ্যে কবির ক্লান্তি আসে :—

এ চিরবসন্ত কাল
তেমন লাগে না ভাল,
এরে যেন কেড়ে চুরে অন্য কিছু করা চাই।
অনন্ত সুখের কথা
শুনে আগে পাই ব্যথা,
অন্—অনন্ত নরকেও তবটা যন্ত্রণা নাই।

—সাধের আসন, চতুর্থ সর্গ

বিহারীলালের এই ধরণের কল্পনাভঙ্গীই আধুনিকতা।

রবীন্দ্রনাথও বৈচিত্র্যহীন ও মায়ামমতাহীন স্বর্গ হইতে বৈচিত্র্যময়ী পৃথিবীর মাতৃস্নেহক্রোড় অধিকতর লোভনীয় মনে করিয়া বলিয়াছেন :—

স্বর্গে তব বহুক অমৃত,
মর্ত্যে থাক সুখে দুঃখে অনন্ত মিশ্রিত
প্রেমধারা, অশ্রুজলে চিরশ্যাম করি'
দুইদের স্বর্গভূমিটি।

অন্যত্র—

বর্ষ লক্ষশত
যাপন করেছি স্বর্গে দেবতার মতো
দেবলোকে। আজি শেষ বিচ্ছেদের
শেষরাত্রে অপ্সরেখা স্বর্গের নয়নে
দেখে যাব এই আশা ছিল। শোকহীন
চিন্তাহীন সুখমগ্নভূমি, উদাসীন
চেয়ে আছে।

—স্বর্গ হইতে বিদায়

বিহারীলালের মত রবীন্দ্রনাথও অশ্রুহীন স্বর্গ-জীবনে বাঞ্ছিত হইয়া উঠিয়াছেন। কবি বিহারীলাল বলিয়াছেন :—

দরিদ্র ইন্দ্রত্ব লাভে
কতটুকু সুখ পাবে,
আমার সুখের সিন্ধু অনন্ত উদার,—
কবির সুখের সিন্ধু অনন্ত উদার!

—সারদামঙ্গল

রবীন্দ্রনাথের কবিচন্দ্রও কুসুমের কারাগারে বন্ধ থাকিয়া সুখশ্রান্ত হইয়া বলিয়া উঠিয়াছে :—

এসো ছেড়ে এসো, সখি, কুসুমশয়ন,
ঝরুক কঠিন মাটি চরণের তলে।
কতদিন করিবে গো বসিয়া বিরলে
আকাশ-কুসুম-বনে স্বপন-চয়ন!

—কড়ি ও কোমল, মরীচিকা

কল্পনার ভঙ্গীতে উভয় কবির কাব্যের আরও অনেক স্থলেই এইরূপ সাদৃশ্য দেখা যায়। বিহারীলালকে বিশ্বপ্রকৃতি ও বিশ্বমানব দুইই সমানভাবে আকর্ষণ করিয়াছে।

কোথা গো প্রকৃতি সতী সে রূপ তোমার।
যে রূপে নয়ন মন জুড়াতে আমার।

—সারদামঙ্গল, ৪র্থ সর্গ

মানুষ হইয়ে নাথ, দেবতার অবতার,
ব্রহ্মাণ্ডের শিরোমণি শ্রোজ্জ্বল ভূষণ!

—সঙ্গীত শতক

রবীন্দ্রনাথের কাছেও বিশ্বপ্রকৃতি এবং বিশ্বমানব এ দুইই সমান সত্য :—

মজিতে চাহি না আমি সুখের স্বপনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

—কড়ি ও কোমল, প্রাণ

রবীন্দ্রনাথের কাছে মানব-জীবন সুন্দর ও নিবিড় এবং অনন্ত অর্থপূর্ণ। বিশ্বপ্রকৃতি এবং বিশ্বমানব কবিহৃদয়কে নিবিড়ভাবে আকর্ষণ করিয়াছে। "প্রকৃতির প্রতিশোধ" নাটিকার মধ্যে এই অনুভূতিই কবির মনে জাগিয়াছে।

জগৎ, তোমারে ছেড়ে পারি নে যে যেতে,
বাহু আকর্ষণে বাঁধা আছি মোরা।

—প্রকৃতির প্রতিশোধ

"কড়ি ও কোমলে"র 'মরীচিকা' কবিতার মধ্যেও কবির এই মানবপ্রীতি প্রকাশ পাইয়াছে :—

চলো ফিরে যাই দোঁহে মানবের সাথে,
সুখে দুখে ঘরে ঘরে পাতিয়ে আসন,
হাসি কান্না ভাগ করি' ধরি' হাতে হাতে
সংসার-সাগর-বারি হইব নির্জন।

'মুক্তি' প্রভৃতি কবিতার অন্তর্নিহিত ভাবেও এই ধারণা প্রকাশ পাইয়াছে।

কবি বিহারীলালের কাব্যের অনুশীলন করিয়া রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি পরিচয়ের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছিল। যে বালক রবীন্দ্রনাথ ভৃত্যরাজতন্ত্রের কঠোর শাসন এড়াইয়া বাড়ীর গণ্ডীর বাহিরে যাইতে অক্ষম ছিলেন, সেই রবীন্দ্রনাথের হৃদয় বিহারীলালের কাব্য আস্বাদন করিয়া প্রকৃতির মাধুর্য উপলব্ধির জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের এই প্রকৃতি-পরিচয়ের মূলে বিহারীলালের কাব্যের প্রেরণা অনেকখানি প্রেরণা জোগাইয়াছিল। বালো রবীন্দ্রনাথ 'পদ্‌ বঙ্গিনী' পাঠ করিয়া পরম আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইতেন। বিশ্বপ্রকৃতি তখনও তাঁহার নিকটে অপরিচিত ছিল। সেই জন্য পদ্‌ বঙ্গিনীর সমুদ্রতটের অরণ্যদৃশ্যের বর্ণনা কবির নিকট অনির্বচনীয় সুখস্বপ্নের মত প্রতিভাত হইত। বিহারীলালের কাব্যও রবীন্দ্রনাথকে প্রকৃতির সহিত মিলনের জন্য—প্রকৃতির রহস্য উদ্‌ঘাটন করিবার জন্য ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি বলিয়াছেন :—"পদ্‌ বঙ্গিনীতে যেমন মানুষের এবং প্রকৃতির সহিত পরিচয় লাভ করিয়াছিলাম, বিহারীলালের কাব্যেও সেইরূপ একটি ঘনিষ্ঠ সঙ্গ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম।" বিহারীলালের কাব্যেও নিসর্গোদ্ভূত প্রকৃতি বর্ণনা পড়িতে পড়িতে বালক রবীন্দ্রনাথের মন ব্যাকুল হইয়া উঠিত। তিনি বিশ্ব-চরাচরময় নিজেকে পরিব্যাপ্ত করিয়া দিয়া কবি বিহারীলাল-বর্ণিত প্রকৃতির সেই মাধুর্য উপলব্ধির জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিতেন।

কভু ভাবি পল্লীগ্রামে যাই,
নামমাত্র সকল লুকাই,
চাষীদের মাঝে রহে
চাষীদের মত হ'য়ে
চাষীদের সঙ্গেতে বেড়াই।
প্রাতঃকালে মাঠের উপর,
শুদ্ধ বায়ু বহে খর্ খর্।
চারিদিক মনোরম,
আমোদে করিব ভ্রম,
সুখ স্ফূর্তি হবে কলেবর।
বাজাইবে বাঁশের বাঁশরী,
সরল চাষার সবে,
প্রমোদ-প্রফুল্ল মনে
কাটাইব আনন্দে পরাণী।

রবীন্দ্রনাথ যদিও বলিয়াছেন যে তাঁহার মনে প্রকৃতির সহিত মিলনের আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া দিয়াছিল—আদিম মানবপ্রকৃতি, কবি নহে, তথাপি কবির অন্তরে বিশ্বপ্রকৃতির রূপরস, গন্ধগান উপলব্ধি করিবার ও তাঁহার মধ্যে নিজেকে পরিব্যাপ্ত করিবার যে বাসনা সুপ্ত ছিল, তাহাকে উৎসারিত করিতে বিহারীলালের কাব্য যে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। উল্লিখিত বর্ণনার সহিত রবীন্দ্রনাথের 'বসুন্ধরা' কবিতাটির অনেক স্থলেই সাদৃশ্য আছে। বিশ্বপ্রকৃতির ও বিশ্বচরাচরের বিচিত্র বর্ণনা করিয়া রবীন্দ্রনাথের "চিত্ত অগ্রসরি' সমস্ত স্পর্শিতে চাহে।"—

সমুদ্রের তট
ছোটো ছোটো নীলবর্ণ পর্বতসমাটে
একখানি গ্রাম, তীরে শুকাইছে জাল,
জলে ভাসিতেছে তরী, চড়িতেছে পাল,
জেলে ধরিতেছে মাছ, শিরিষগাছে
সরীসৃপ বকটি চলি' আসে, কোমরতে
আঁকিয়া বাঁকিয়া। ইচ্ছা করে সে নিভৃত
শিরিষের ছায়াখানি অতিশয় নিবিড়

লোকনীড়খানি, হৃদয়ে বেষ্টিয়া ধরি
বাতায়নে। ইচ্ছা করে আপনার করি
যেখানে যা কিছু আছে।

—বসুন্ধরা

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে বিশ্বপ্রকৃতিকে উপলব্ধি করিবার ব্যাকুলতা বিহারীলাল অপেক্ষা নিবিড়তর হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু সীমার বাঁধ ভাঙিয়া অসীমের বুকে নিজেকে ব্যাপ্ত করিবার আকাঙ্ক্ষা বঙ্গসাহিত্যে বিহারীলালের কাব্যেই সর্ব্বপ্রথম ফুটিয়াছিল। উহাই রবীন্দ্রপ্রতিভার মূলে উৎসরূপে প্রেরণা জোগাইয়াছে। কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'জীবনস্মৃতি'তে তাঁহার কাব্যসাধনার একটিমাত্র ধারা বা উদ্দেশ্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন "আমার তো মনে হয়, আমার কাব্যরচনার এই একটি মাত্র পালা—সে পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে—সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত বিলন-সাধনের পালা।" এই সীমাকে উত্তীর্ণ হইয়া বৃহদাগত অসীমের সহিত মিলনের উদগ্র বাসনা—যাহা রবীন্দ্রকাব্যের মূলকথা—উহা কবি তাঁহার গুরু বিহারীলালের সদনুত্রে প্রাপ্ত হইয়াছেন। কবি নিজেই ইহা স্বীকার করিয়াছেন :—"যে ভাবের উদয়ে পরিচিত গৃহকে প্রবাস বোধ হয় এবং অপরিচিত বিশ্বের জন্য মন কেমন করিতে থাকে, বিহারীলালের ছন্দেই সেই ভাবের প্রথম প্রকাশ দেখিতে পাইয়াছিলাম।"

কভু ভাবি সমুদ্রের ধারে,
যথা যেন পর্ব্বত একেবারে
প্রলয়ের মেঘসঙ্গে,
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভঙ্গ
আস্ফালিছে গর্জ্জিয়া বেলারে।
সম্মুখেতে অসীম অপার,
জলরাশি মাঝেতে বিস্তার,
উত্তাল তরঙ্গ সব
কেনপুঞ্জে ধবধব,
গড়গোলে ছোটে অনিবার।

•

সেই মহা রণরঙ্গস্থলে
শুদ্ধ হ'য়ে রহিবে বিরলে

•

দেখিবে শুনিবে সে সকলে।

বিহারীলালের এই প্রেরণার বর্ণনা রবীন্দ্রনাথের মনে অসীমের সহিত মিলনের নিবিড় আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া দিয়াছিল।

কবি বিহারীলাল কখনও ভাবাবেগে বিহ্বল—ভাবাবেগে আত্মনিমগ্ন হইয়া গিয়াছেন। আবার কখনও বাস্তব বা রূপজগতের সম্মুখীন হইবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিয়াছেন। কবির 'সারদামঙ্গলে' রূপ হইতে ভাবে প্রত্যাবর্ত্তনের কথা অনেক স্থানেই আছে :—

রূপের ছটায় ভুলি
গেনু শতদল তুলি
আনিতে পরাতে যার সীমন্তে সবার,
তাঁরাও তাঁহারি মত
পদ্ম তুলি ফুলপত
পরাতে আসেন সবে সীমন্তে তাঁহার।
অমনি স্বপন প্রায়
বিষাদ ভাসিয়া যায়
চমকি আপন পানে চাহেন রূপসী,
চমকে গগনে তারা
ভূধরে নির্ঝর ধারা,
চমকে চরণ তলে মানস-সরসী।

অন্যত্র—

তোমারে হৃদয়ে রাখি
সদাবদ্ধ মনে থাকি,
স্বপনে অমরাবতী দু-ই ভাল লাগে।

থাক ছবি ছেপে থাক,
রূপে মন ভরে যায়,
তপোবনে যাবে থাকি এ নগর কোলাহলে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যেও এইরূপ "ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া আসার" তত্ত্ব অপূর্ব্ব রসমূর্ত্তি লাভ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের এই কল্পনাদর্শের মূলেও বিহারীলালের কল্পনা-ভঙ্গী ছিল বলিয়াই মনে হয়।

রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রা' কবিতাতে বিহারীলালের কাব্য-সাধন-রীতি অপূর্ব্ব ছন্দে বিধৃত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ উক্ত কবিতায় কবি ও কাব্য সম্বন্ধে তাঁহার মনোগত আদর্শের একটি উপলব্ধি ছন্দোবদ্ধ করিয়াছেন। 'চিত্রা'র প্রথম

স্তবকে তিনি নিখিল কাব্যকলা বা কবিকল্পনার প্রেরণা-রূপিণী সৌন্দর্যদেবতার বন্দনা করিয়াছেন :—

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিণী।
অযুত আলোকে ঝলসিছ নীল গগনে,
আকুল পুলকে উলসিছ ফুল কাননে,
ভূলোকে দ্যুলোকে বিলসিছ চল-চরণে,
তুমি চঞ্চল-গামিনী।

•

কত না অর্থ কত না অর্থ গঠিত,
কত যে ছন্দে কত সঙ্গীতে রটিত,
কত না গ্রন্থে কত না কণ্ঠে পঠিত,
তব অসংখ্য কাহিনী।

এই 'চিত্রা' কবিতাই দ্বিতীয় স্তবকে কবি এই সৌন্দর্য-দেবতাকে কাব্যকলা হইতে বিযুক্ত করিয়া, নিভৃত অন্তর-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া কবির যে ভাবাবস্থা হয় তাহারই বর্ণনা করিয়াছেন :—

অন্তরমাঝে শুধু তুমি একা একাকী
তুমি অন্তরবাসিনী।
একটি স্বপ্ন মুগ্ধ সজল-নয়নে,
একটি পদ্ম হৃদয়-বৃন্ত-শয়নে,
একটি চন্দ্র অসীম চিত্ত-গগনে,
চারিদিকে চির যামিনী।

এই দ্বিতীয় স্তবকে রবীন্দ্রনাথের কল্পনা বহির্মুখী নহে—অন্তর্মুখী। রবীন্দ্রনাথ এখানে তাঁহার কাব্যলক্ষ্মীকে যে ধ্যানমন্ত্রে আরাধনা করিয়াছেন, সে মন্ত্র একান্তভাবেই বিহারীলালের। এখানে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সৌন্দর্যকল্পনাকে বাস্তব জগৎ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্যুত করিয়া মনোজগতে অধিষ্ঠিত করিতে চাহিতেছেন। বহির্জগৎ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্যুত বলিয়া অন্তর্জগতে কোনও চঞ্চলতা নাই, আছে কেবল সৌন্দর্যবোধ, প্রীতি, মধুরতা এবং ভাবনিমগ্নতা। কবি এখানে অন্তর্মুখী কল্পনাকে বহির্মুখী কল্পনা হইতে বড় করিয়া দেখিয়াছেন। 'চিত্রা'র প্রথম স্তবকে কবি জগতের বৈচিত্র্য হইতে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে কাব্যরস অথবা সৌন্দর্য-বোধ আহরণ করিতে চাহিয়াছেন, উহা সদা-চঞ্চল, অশান্ত তাহার স্বভাব। কিন্তু দ্বিতীয় স্তবকে বাহিরের রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ প্রভৃতি অনুভূতির আনন্দ একটা স্থির শান্ত অচপল রূপ ধারণ করিয়াছে। সেখানে প্রকাশ পাইয়াছে কেবল কবির অন্তরের আনন্দের অনুভূতি। ইহা একটি ধ্যানের অবস্থা—যোগের অবস্থা—একটি পূজার একাগ্র ভাব।

কবি বিহারীলালের সারদাও আদর্শ সৌন্দর্যলক্ষ্মী। তিনি এই সৌন্দর্যলক্ষ্মীকে অন্তঃমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সাধকের মত তন্ময় হইয়া—ভাবাবেগে আত্মবিভোর হইয়া—সেই সৌন্দর্য উপলব্ধি করিয়াছেন। কবির সারদা বিশ্বব্যাপিনী অথচ অন্তরবাসিনী। বিচিত্র আকারে, বিচিত্র রূপে মনের ও বাহিরের জগতে তিনি বিকশিত হইতেছেন। কখনও তিনি জননী, কখনও কন্যা, কখনও প্রেয়সীরূপিণী। তবে বিহারীলালের কাছে সারদার অন্তরবাসিনী রূপটিই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। সারদার রূপের বিচিত্রতার দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিবার অবকাশ তাঁহার বিশেষ হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের কাব্যলক্ষ্মী শুধু "অন্তরমাঝে একা একাকী" নহেন। জগতের মাঝেও তিনি বিচিত্ররূপিণী। কিন্তু বিহারীলালের ধ্যানপরায়ণ একনিষ্ঠ হৃদয় এই বিচিত্ররূপিণীর প্রতি তেমন আকৃষ্ট হয় নাই। বিহারীলালের কাব্যলক্ষ্মী 'অন্তরবাসিনী' হইয়াই রহিলেন। বিহারীলাল আপনার চিত্তে আপনি আত্মসমাহিত। তিনি এ বিষয়ে অদ্বৈতবাদী আর রবীন্দ্রনাথ বিচিত্রতাবাদী।

বিহারীলাল সর্বত্রই তাঁহার কাব্যলক্ষ্মীকে তাঁহার অন্তর-মাঝে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেখিয়াছেন। সেখানে সাধকের যোগের অবস্থা এবং পূজার একাগ্র ভাব প্রকাশ পাইয়াছে :—

মানস-বিহারী মম আনন্দ-রূপিণী!
তুমি সাধকের ধন,
জান সাধকের মন,
এখন আমার আর কোন বেদ নাই বলে।

—সারদামঙ্গল

বিহারীলাল সারদাদেবীর বিশ্বব্যাপিনী সৌন্দর্যমূর্তিটি বিধাতার 'মানস-সরে'ই প্রকাশমান দেখিতে পান। কারণ, সৌন্দর্য-বোধ সেখানে শান্ত, অচপল রূপ ধারণ করিয়াছে :—

ব্রহ্মার মানস-সরে
ফুটে ঢলঢল করে
নীল জলে মনোহর স্বর্ণ-নলিনী,
শারদের চাঁদ তায়
হাসি হাসি ভাসি যায়
ষোড়শী রূপসী যথা পূর্ণিমা যামিনী।

—সারদামঙ্গল

সারদামঙ্গলের সর্বত্রই কাব্যলক্ষ্মীর এই 'অন্তরবাসিনী' রূপটি উপলব্ধি করিবার ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইয়াছে :—

হৃদি-কমল বাসিনী কোথারে আমার।

অন্যত্র—

হৃদয়-প্রতিমা গ'ড়ে
থাকি থাকি সুখী হ'তে,
অধিক সুখের আশা নিরাশা পরাণ,
ভক্তিভাবে সদা প্রীতি,
মনে মনে পূজা করি,
ভাবন কুসুমাঞ্জলি পদে করি দান।
বিচিত্র এ মরুলীলা,
ভাবঘরে যোগে খেলা,
হৃদয়ে উষার জ্যোতি কি বিচিত্র ছলে!

সাধের আসনেও কবি সেই কাব্যলক্ষ্মীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন :—

তোমারে হৃদয়ে রাখি,
সদাই আনন্দে থাকি,
আমার প্রাণে পূর্ণচন্দ্রের সাধা দিয়া রজনী।

বিহারীলালের কাব্যের সর্বত্রই কবি তাঁহার এই মানস-প্রতিমা কাব্য-সরস্বতীর আরাধনা করিয়াছেন তাঁহার মনোজগতে। সেইখানে তিনি তাঁহার আদর্শ সৌন্দর্যজগৎকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সেখানে কবির আনন্দানুভূতির গোপন পূজা চলিয়াছে কবি যেখানে এইরূপ বহির্মুখী চেতনা হইতে আত্মচেতনায় ফিরিয়া আসিয়াছেন, সেইখানে তাঁহার সহিত রবীন্দ্রনাথের কল্পনার সাদৃশ্য। এই ধরণের কল্পনাভঙ্গী প্রথম ফুটিয়াছিল বিহারীলালের কাব্যে। তবে রবীন্দ্রনাথ আটিষ্ট কবি—তাঁহার সদাজাগ্রত চৈতন্য রূপ-জগতের বিচিত্রতার দিকে যেমন দৃষ্টিপাত করিয়াছে, তেমনি আবার বিহারীলালের মত আপনার মনোজগতে সেই সৌন্দর্যলক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা করিয়া সেই রূপও অনুভব করিয়াছে। কিন্তু বিহারীলাল একান্তভাবেই মিষ্টিক কবি। তিনি আপনার উপলব্ধিতে আপনি মগ্ন। এইখানে দুই কবির কল্পনার প্রভেদ। বিহারীলাল কেবল সেই সৌন্দর্যলক্ষ্মীর রূপে মুগ্ধ। ঐ সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিয়া দেখাইবার ক্ষমতা তাঁহার নাই বলিয়া তিনি আক্ষেপ করিয়াছেন :—

মধুর মাধুরী ধারা,
কি উপমা করে দেখা।—
অতি অপরূপ রূপ :—
কেবল হৃদয়ে দেখি, দেখাইতে পারিনে।
—সাধের আসন

অন্যান্য গীতিকবিদের উপর বিহারীলালের প্রভাবের কথা ছাড়িয়া দিলেও কবি হিসাবে বঙ্গসাহিত্যে তিনি খুব উচ্চ স্থান অধিকার করিবেন। আধুনিক গীতিকবিতার যুগে তাঁহার কাব্যের নিরিখ নির্ণয় করা একান্ত প্রয়োজন :—বিহারীলালের কাব্যপ্রেরণা ছিল সরল এবং স্বতঃস্ফূর্ত। এ সম্বন্ধে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। "ইংরেজী সাহিত্যে পোপ কবির আবির্ভাবের পর কবিতা-সাম্রাজ্যে যে একটা পেশাদারী ভাব বদ্ধমূল হইয়া আসিতেছিল, ক্র্যাব ও কাউপারের আবির্ভাবে সেইটি খণ্ডিত হইল, পরে কীট্‌স্, বায়রণ, শেলী, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ এই পেশাদারী ভাবের খণ্ডন ব্যাপারের চূড়ান্ত করিয়া দেন।...বঙ্গ-কবিতা রাজ্যে বিহারীর আবির্ভাব কতকটা সেইরূপ। পেশাদারী কবিতার লেশমাত্র তাঁহার প্রতিভাতে ছিল না। যাহা তিনি নিজে দেখিতেন, শুনিতেন বা অনুভব করিতেন, যেন কেমন এক দুর্দ্দম প্রবৃত্তি তাঁহাকে সেইগুলি কবিতাকারে লিপিবদ্ধ করিতে প্রবর্ত্তিত করিত। যে শব্দটি তাঁহার মনের ভাবের প্রখরতা-বারক হইত এবং আপনা হইতেই তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিত, সেই শব্দটি ভাষা হউক, অপভাষা হউক, অপভ্রংশ হউক, তিনি প্রয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।"

বিহারীলাল ছিলেন গীতিকবি। কিন্তু গীতিকবি হইলেও তাঁহার কল্পনায় এমন কতকগুলি বিশিষ্টতা ছিল যে সেগুলি লক্ষ্য না করিয়া পারা যায় না। তিনি ছিলেন আত্মনিমগ্ন কবি—তাঁহার কাব্যে ভাবের ঐকান্তিকতা ও গভীরতা যতটা হৃদয়গ্রাহী, ভাবের মূর্ত্তি ততটা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে নাই। বাহিরের বস্তুকে গীতিকবি নিজস্ব ভাবকল্পনায় মণ্ডিত করিয়া যে একটি বিশেষ রূপ ও রসের সৃষ্টি করেন, গীতিকবি হইলেও তাঁহার কবি-প্রতিভা তাহা হইতেও বিভিন্ন। কবি নিজের আনন্দে, নিজের ধ্যান-কল্পনার আবেশে সর্বত্র নিছক ভাবের সাধনা করিয়াছেন। কবি বিহারীলালের কবি-প্রকৃতিতে সেধরণের উন্মাদনা—কবি কীট্‌স্ যে কবিস্বপ্নকে

Upon the night's starred face
Huge cloudy symbols of a high romance

বলিয়াছেন, সে ধরণের রূপরসের উৎকণ্ঠা তাঁহার ছিল না।

ভাবনা অপেক্ষা ভাব, কল্পনা অপেক্ষা প্রীতিবিভোরতা, যাহা নাই তাহার উদ্ভাবনা অপেক্ষা যাহা আছে তাহার দ্বারা আনন্দলোক বিরচন—ইহাই তাঁহার কাব্যের বিশিষ্টতা। কল্পনার এই বিশিষ্ট ভঙ্গী ও অভিনবত্ব প্রকাশ পাইয়াছে তাঁহার 'সারদামঙ্গল' কাব্যে ও 'সাধের আসনে'।

সারদামঙ্গল কাব্য কবি বিহারীলালের অপূর্ব্ব কবিকীর্ত্তি। সারদামঙ্গলখানিকে সমগ্র কাব্য হিসাবে পাঠ করিলে একটা সুসংলগ্ন অর্থ করা দুষ্কর হইয়া উঠে। কিন্তু ইহাকে কতকগুলি খণ্ড-কবিতার সমষ্টিরূপে দেখিলে অর্থবোধ করা দুরূহ হয় না। রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"সূর্য্যাস্তকালের সুবর্ণমণ্ডিত মেঘমালার মত সারদামঙ্গলের সোনার শ্লোকগুলি বিবিধ রূপের আভাস দেয় কিন্তু কোনও রূপকে স্থায়ীভাবে ধারণ করিয়া রাখে না, অথচ সুদূর সৌন্দর্য্যস্বর্গ হইতে একটি অপূর্ব্ব রাগিণী প্রবাহিত হইয়া অন্তরাত্মাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতে থাকে।" কবির সারদা সরস্বতী বটে—আবার নাও বটে। কারণ সরস্বতী সম্বন্ধে আমরা যে ধারণা পোষণ করি, সেই ধারণার সহিত কবি বিহারীলাল-কল্পিত সরস্বতীর সাদৃশ্য নাই। কবি সারদামঙ্গলে যে সরস্বতীর জয়গান করিয়াছেন সে সারদা কখনও জননী, কখনও বা প্রেয়সী আবার কখনও ভক্তারূপিণী। তবে এক কথায় সারদার কোনও সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতে হইলে বলিতে হয় যে তিনি হইতেছেন বিশ্বব্যাপিনী সৌন্দর্য্যলক্ষ্মী। সৌন্দর্য্যরূপে তিনি জগতের সর্ব্ববস্তুতে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছেন এবং দয়া, স্নেহ, প্রেম প্রভৃতির দ্বারা মানুষের চিত্তের কোমল বৃত্তিগুলিকে নিরন্তর বিচলিত করিতেছেন। কবির সারদা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের প্রকৃতিদেবী বিশ্বচেতনা নহে—অথবা শেলীর রূপাতীত রূপময়ী প্রেম-সৌন্দর্য্যের আদর্শ লক্ষ্মীও নহে। কবি কীটসের Principle of Beauty in all things—এই ধারণা কবি বিহারীলাল খানিকটা উপলব্ধি করিয়াছিলেন, সেইজন্য সৌন্দর্য্য তাঁহার কাছে বাস্তবাতীত বা রূপাতীত নহে—জাগতিক সকল বস্তুতেই তিনি সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীর অধিষ্ঠান দেখিয়াছেন। তাঁহার কাছে জগতের সমস্ত বস্তুর মধ্যেই প্রকাশ পাইয়াছে একটি সৌন্দর্য্যতত্ত্ব। তাঁহার সারদা মানুষের স্বাভাবিক প্রীতিপ্রেমের প্রবাহরূপিণী, বিশ্বব্যাপ্ত সৌন্দর্য্য ও মানবীয় প্রেমের সমন্বয়রূপিণী। তিনি প্রত্যক্ষে বিরাজমানা—তিনিই বিশ্বব্যাপিনী :

তুমি বিশ্বময়ী কান্তি, দীপ্তি অনুপমা,
কবির যোগীর ধ্যান
তোমা প্রেমিকের প্রাণ
মানব মনের তুমি উষার সুষমা।

'যোগীর ধ্যান' ও 'প্রেমিকের প্রাণ'—তাঁহার সারদায় এ দুইয়ের কোনও বিরোধ নাই। কারণ প্রেম ও সৌন্দর্য্য-পিপাসা তাঁহার নিকট অভিন্ন।

বিহারীলাল তাঁহার সারদাকে যে আদর্শ কল্পনার মণ্ডিত দেখিয়াছেন, তাহার সহিত শেলীর Archetypal Beautyর একটা সাদৃশ্য আছে বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু বিহারীলাল সমস্ত বস্তুজগৎকে idealise করিলেও কোথাও তাহাকে অস্বীকার করেন নাই। বরং বরাবরই বলিয়াছেন যে, সেই কান্তিদেবতা শুধুই বিশ্বের আলো নহে—তিনিই বিশ্বরূপিণী। বিহারীলাল কাব্যেরই সৌন্দর্য্যছায়ায়—প্রত্যেকেরই অপ্রত্যক্ষ মহিমায় মুগ্ধ ও চরিতার্থ হইয়াছিলেন। শেলী আইডিয়াকেই শরীরিণী দেখিতে চাহিয়াছিলেন :—

In many mortal forms I rashly sought
The shadow of that idol of my thought.

এবং পরিশেষে হতাশ হইয়া এই কায়াকে বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। তিনি বহু ও বৈচিত্র্যকে অস্বীকার করিয়া গাহিয়াছিলেন

The one remains, the many change and pass
Heaven's light for ever shines, Earth's shadows fly ;
Life, like a dome of many-coloured glass,
Stains the white radiance of Eternity,
Until Death tramples it to fragments.—Die,
If thou would'st be with that which thou dost seek.

বিহারীলাল শেলীর মত এই কায়াকে বাদ দিয়া শুধু ছায়া বা কান্তিটুকু চাহেন না। তিনি বলেন :—

মহাশ্মশানের কল
কি বিষম বিষময়,
যে পেয়ে, কান্তি যায়ে
অনুভবে আসে না !

কবি কীটস্ নিছক সৌন্দর্য্যসাধনায় ক্লান্ত হইয়া যাহাদের স্মরণ করিয়া বলিয়াছিলেন—They seek no wonder but the Human Face—কবি বিহারীলাল আদর্শ সৌন্দর্য্যের

পূজারী হইয়াও তাঁহাদেরই একজন। একান্ত কল্পনাপ্রবণ কবি হইলেও বিহারীলাল কখনও বাস্তব জীবন ও বাস্তব জগৎকে অস্বীকার করেন নাই। বাস্তবের মধ্যেই তিনি অবাস্তবের সন্ধান করিয়াছিলেন। এই খানেই শেলীর সহিত তাঁহার সৌন্দর্যসাধনার বিভিন্নতা। শেলীর ছিল transcendental idealism—অর্থাৎ তাঁহার ধারণায় কান্তি বিশ্বকে transcend করিয়া আছে। তাঁহার Hymn to Intellectual Beauty কবিতায় তিনি এইটুকু বুঝিয়াছিলেন যে, সে আদর্শ-সৌন্দর্য মানবচিত্তের চিরকাল অনায়ত্ত। কিন্তু বিহারীলাল হৃদয়ের প্রেমধর্ম দিয়া আদর্শ সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। জাগতিক বস্তুর মধ্যেই তিনি সারদার সৌন্দর্য দেখিয়াছেন। তাঁহার মতে সারদার কান্তি, মূর্তি ও শোভাসম্পদ্ সকল কিছু জাগতিক বস্তুর মধ্যেই রহিয়াছে। বিহারীলাল বুঝিয়াছিলেন যে, বাস্তবের অনুভূতির উপরেই অতীন্দ্রিয় জগতের শাশ্বত সত্য প্রতিষ্ঠিত। বিহারীলালের এই ধরণের ভাব সাধনার মূলে আছে মর্ত্য-মাধুরীলুব্ধ কবিপ্রাণ। তাঁহার কবিতায় ভাবাবেশ ও স্বপ্ন আছে—কিন্তু এই ভাবাবেশ ও স্বপ্ন কবির বাস্তব অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত। মর্ত্য-জীবনের মাধুরী পান করিবার এই আকাঙ্ক্ষা বিহারীলালের কাব্যে যে আধ্যাত্মিকতার মণ্ডিত হইয়াছে, তাহাই বাংলা গীতিকাব্যে আধুনিকতার লক্ষণ। বিহারীলালই বঙ্গসাহিত্যকে আধুনিক কল্পনার দীক্ষিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কাব্যে আধুনিকতার যে সকল লক্ষণ সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে, উহাই রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ কবিগণের কল্পনাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। তাঁহারই প্রেরণা লাভ করিয়া বঙ্গসাহিত্যে নব-গীতিকাব্যের প্রকাশ ও উদ্ভব সম্ভব হইয়াছে। গীতি-কাব্যের ভাষা হয় স্বাভাবিক—ভাবও কবির প্রাণের ভিতর হইতে উৎসারিত হয়। এই স্বাভাবিক ভাষা ও প্রাণের ভিতর হইতে উৎসারিত ভাব বিহারীলালের কাব্যেই প্রথম আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। Subjective কল্পনার উন্মেষও বিহারীলালের কাব্যেই প্রথম দৃষ্ট হয়। তাঁহার কল্পনাভঙ্গী ও বর্ণনারীতি সমস্ত মিলিয়া আধুনিক বাংলা কাব্যসাহিত্যের নব-অরুণোদয় সূচিত করিয়াছিল। [সমাপ্ত

কাব্য-রচনার উপাদান

...এই জগতে যাহা কিছু দেখা যায়, তাহার প্রত্যেকটীর মধ্যে প্রকৃতি ও স্ব-ভাবের কার্য বিদ্যমান রহিয়াছে। দুইজনের প্রেমের মধ্যে, দুই-জনের কলহের মধ্যে, নর-নারীর রূপের মধ্যে, পরস্পরের প্রবঞ্চনার মধ্যে, ফলের মধ্যে, ফুলের মধ্যে সর্বত্রই প্রকৃতি ও স্ব-ভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। কাহারও প্রেমের কথা অথবা কলহের কথা অথবা প্রবঞ্চনার কথা অথবা কাহারও রূপের কথা বর্ণনা করা হইল, অথচ উহার মধ্যে প্রকৃতি ও স্ব ভাবের যে কি খেলা, তাহা প্রস্ফুটিত করা হইল না, এরূপস্থলে এ রচনাকে "পদ্য" অথবা "গদ্য" বলা যাইতে পারে বটে, কিন্তু উহাকে "কাব্য" বলা চলে না। কোন ঘটনা অথবা রূপের মধ্যে প্রকৃতি ও স্ব-ভাবের কি খেলা আছে, তাহা দেখান হইলে ঐ রচনা কখনও মানুষকে বহির্মুখী করিতে পারে না। পরন্তু ঐ রচনার সাহায্যে মানুষ অন্তর্মুখী হইতে বাধ্য হয়। "শাস্ত্র", অর্থাৎ যাবতীয় তথ্য ও তৎ-সম্বন্ধে অনুশাসন যাঁহারা পরিজ্ঞাত নহেন, তাঁহাদিগের দ্বারা "কাব্য" রচিত হওয়া সম্ভব হয় না। "শাস্ত্রপূর্বকত্বং কাব্যস্য পূর্বং শাস্ত্রেষু অভিনিবিশেৎ"—কাব্যমীমাংসা নামক গ্রন্থের এই কথাটী বুঝা থাকিলে আমাদিগের উপরোক্ত কথার সত্যতা সহজেই প্রতীয়মান হইবে।...

মহানগরীর রূপ

—শ্রীবসুধন সেনগুপ্ত

একটি গল্প শুনবে? শোন।

মানুষের অপরূপ রহস্যময় ক্ষুধিত আত্মার, আর মহানগরীর রহস্যময় রূপ—এই লক্ষিলিত দুই রূপের সামান্য হতে সামান্যতর ইতিবৃত্তই এর মূল উপাদান। অরণ্যের ঘননিবিড় রহস্য অতি অনুকূল অবস্থাতেও বলা একেবারে অসম্ভব নয়, কারণ, সেটি বস্তুর জগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ; কিন্তু মানসিক জগতের চিন্তাসাপেক্ষ মানবের মন-অরণ্যের রহস্য বর্ণনা যে কি ভীষণ, তার পরিচয় হয় তো তোমার জীবনেও একদিন ঘটতে পারে। সেদিন এর সঙ্গে আরও বুঝবে যে, এরই মত ভীষণ বুঝি মহানগরীর রূপ, যে রূপ ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনশীল, যার ধূলা ও বাতাসে বিষ, আকাশে ঘন সুহেলীর আস্তরণ। কিন্তু তা হলেও, একটা গল্প বলব।

যান্ত্রিক যুগের জন-কর্ম-মুখর সন্ধ্যার অস্পষ্ট মহানগরী। রাত্রির আগমন সত্ত্বেও বিলাসিনীর নির্দিষ্ট রূপ তখনও সে নেয় নি। তার কারণ, সেই সবে মাত্র মহানগরীর মাথার ফ্রেমে বাঁধান ছোট্ট আকাশে ঘনিয়ে এসেছে শীতের ঘন সন্ধ্যার ছায়া। পথের ধূলো-বালি যানবাহনের চাপে সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর হয়ে বাতাসকে ধূসর করে আকাশের দিকে উদ্ধাবিত হয়ে উঠছে। এই মাত্র পথের দু'একটি প্রতীক্ষমান পথবর্তিকার চোখে দেখা দিচ্ছে আলোর চঞ্চলতা।

মহানগরীর পথজটিল আবর্তের মধ্যে কুটীর ও অট্টালিকা পারস্পরিক প্রেমহীন আলিঙ্গনে আবদ্ধ, কিন্তু তার মধ্যে আমরা একটি বিশাল অট্টালিকাকে বেছে নিলাম, যে অট্টালিকার প্রৌঢ় অধিপতিকে কেন্দ্র করে আমাদের এই গল্পের হবে সৃষ্টি। অট্টালিকার সব চেয়ে সৌখীন বৈঠকখানায় একটি ভদ্রলোক বসে আছেন। মাথার উপর প্রশস্ত একটি টাক, চোখে বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য। চেহারা বেশ মজবুত ও পেশী পরিপুষ্ট। প্রথম দৃষ্টিতে এ লোকটির দিকে তাকালেই মনে হবে, এর দেহ ও মুখের ভেতর থেকে যেন একটা নিষ্ঠুরতার আভাস বিচ্ছুরিত হচ্ছে; কিন্তু এ লোকটির সাহচর্য যারা লাভ করেছে তারা জানে, বাইরের চেহারাটি যতই কাঠখোট্টা হোক না কেন, সেটি তার আসল রূপ নয়। বরং নিত্য নূতন, দেশী ও বিদেশী বৈজ্ঞানিক তথ্যের চিন্তায় পরিপুষ্ট মাথায় যেন জগতের মধ্যে বাস করার সহজ বুদ্ধিরও অভাব বেশ পরিলক্ষিত হয়।

ভদ্রলোকটির নাম সুকান্ত সেন।

সুকান্ত বাবুকে কে না চেনে? এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক, যাঁর একটি সদ্য উদ্ভাবিত থিয়োরী এদেশ ছাড়িয়ে ওদেশের বৈজ্ঞানিকদের মধ্যেও চাঞ্চল্য এনেছে।

আজ সুকান্ত বাবুকে বেশ একটু চিন্তিত দেখা গেল, মনে হল, কার আগমনের জন্য যেন তিনি উদ্গ্রীব।

দূরে গির্জ্জার ঘড়ীতে ন'টা বাজল।

ন'টা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে ঝকঝকে সুদৃশ্য একখানা মোটর গাড়ী এসে সুকান্ত বাবুর অট্টালিকার সামনে দাঁড়াল। মোটরের দরজা খুলে ক্ষিপ্র পদে একটি লোক বেরিয়ে এল; বয়স তার আন্দাজ ত্রিশ, নাক ও চোখদুটি তীক্ষ্ণ, তার দিকে দৃষ্টিপাত করলেই মনে হবে লোকটি অত্যন্ত ধূর্ত ও চটপটে, সর্বাঙ্গে একটা সহজ সমৃদ্ধির ছাপ। পোষাক-পরিচ্ছদে তাকে অবস্থাপন্ন দেখালেও মনে হোল লোকটি এ বাড়ীতে নিতান্ত আগন্তুক নয়। সটাসটি ভিতরে ঢুকে সে সুকান্ত বাবুর মুখোমুখি এক চেয়ারে বসল।

সুকান্ত বাবু তার জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন, বললেন,—

"এত দেরী করা কিন্তু আজ তোমার উচিত হয়নি পাণ্ডে," তার পরই কাজের কথা সুরু করলেন। বাইরে রাত্রির গভীরতার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের কথোপকথনের গভীরতাও বেড়ে চলল। দামী আমেরিকান টাইমপিসের রূপোর কাঁটা দুটো ক্রমান্বয়ে এগিয়ে চলল।

সুকান্ত বাবুর পাশের টেবিলে একটি চারকোণা ইস্পাতের তৈরী টেবিল। তার ওপর চার হাত পরিমিত একটি ইলেকট্রিক মোটর। তার দু'পাশের দুটো চাকার সঙ্গে সামনের আর একটি চারকোণা ইস্পাতের তৈরী টেবিলের ওপর বসান আর একটি অদ্ভুত আকারবিশিষ্ট যন্ত্রের দুটি

চাকার সঙ্গে চামড়ার ফিতার সাহায্যে যুক্ত করা হয়েছে। এই দুটি অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের উপস্থিতি যেন ঘরের আবহাওয়াকে অপেক্ষাকৃত গম্ভীর করে তুলেছে।

হঠাৎ কথা বন্ধ করে অবাক্ হয়ে সুকান্ত বাবু পাশে টেবিলের ওপর রাখা নিজের এই উদ্ভাবিত মোটরের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন, তারপর বললেন,—

"দেখ কি সুন্দর জিনিষ, বৈজ্ঞানিকদের মাংস-পেশীর চালনার প্রয়োজন হয় না, তারা থাকে নিশ্চেষ্ট, তাদের মস্তিষ্কই সব কাজ করে দেয়। ধন্যবাদ দাও আমার এই যন্ত্র আবিষ্কারের উদ্ভাবন-শক্তিকে, পাণ্ডে!" সুকান্ত বাবু এক ঝলক হাসির সঙ্গে কথাগুলো শেষ করলেন।

"ভুল বললেন মিঃ সেন, আপনার মস্তিষ্ককে তারিফ করার সঙ্গে সঙ্গে আমার এই হাত দুটোও তারিফের যোগ্য। আমি যন্ত্রী, এই যন্ত্রের উদ্ভাবন-শক্তিকে রূপ দিয়েছি আমি। বলুন আমাদের যন্ত্র।" বাঁকা ও শাণিত হাসির ঢেউ তুলে মিঃ পাণ্ডে চুপ করলেন।

"অপরাধ স্বীকার করছি"—গম্ভীর হতে গিয়েও সদাশয় প্রৌঢ় মানুষটি হেসে ফেললেন এবং বলে চললেন, "তোমাকে যখন প্রথম দেখি, তখনই আমার মনে হয়েছিল যে, তুমি নীরস যন্ত্রী নও, তোমার মধ্যে একটা অসাধারণ ক্ষমতা আছে।" তারপর প্রসঙ্গ এড়িয়ে বললেন, "কেমন এটা মানবজাতির কল্যাণে লাগবার যোগ্য নয়?"

"শুধু মানবজাতির কল্যাণকর নয়, এর মধ্যে থেকে আসবে অজস্র অর্থ ও মান।"

"না, না, পাণ্ডে, তোমার সঙ্গে এইখানেই আমার মত-বৈধ। অর্থের দিকে বেশী ঝুঁকো না। আমরা দুজনে মিলে এমন একটি যন্ত্র সৃষ্টি করলাম, যা বিংশ শতাব্দীর যান্ত্রিক যুগের নরনারীদের অশেষ কল্যাণকর বলেই বিবেচিত হবে। অর্থ ও মান এ-সবের প্রশ্ন এখন উঠতেই পারে না। আমাদের পুরস্কার আসবে সারা মানবজাতির পক্ষ থেকে, সেই আমাদের যথেষ্ট।" সুকান্ত বাবু অধীর হয়ে উঠলেন।

মিঃ পাণ্ডে খানিকক্ষণ ভ্রূ কুঞ্চিত করে গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন। ঘরের নিস্তব্ধতা যেন গাঢ় ও ভারী হয়ে ওঠে গেল। মিঃ পাণ্ডেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন।

"আপনাদের, বৈজ্ঞানিকদের অর্থ সম্বন্ধে এই রকম যুক্তি ও উক্তি এ দুটোই চলতে পারে, কিন্তু আমি বিংশ শতাব্দীর বস্তুকার, আমার অর্থ না হলে চলতেই পারে না। কিন্তু সে কথা পরের। এ যন্ত্রের শেষ পরীক্ষা আপনার এই জন-কোলাহলমুখরিত অট্টালিকার সম্ভবপর নয়, কোন বিশেষ নির্জ্জন জায়গার প্রয়োজন। সে রকম কোন নির্জ্জন জায়গার কথা ভেবেছেন?"

সুকান্ত বাবু এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে লজ্জিত হলেন, বললেন, "ঠিক বলেছ পাণ্ডে, চরম পরীক্ষার কথাটা আমার মাথায় একদম আসে নি। নির্জ্জন জায়গা তো আমার বিশেষ কিছু নেই।"

"এ বিষয়ে আমার একটা মতলব আছে। সহর ছাড়িয়ে কিছু দূরে আমার দাদার একটা নির্জ্জন বাগান-বাড়ী আছে। উপস্থিত কিছুদিনের জন্য দাদা বাইরে গেছেন। কালই সেখানে এটাকে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখলে কি রকম হয়?" উত্তরের আশায় মিঃ পাণ্ডে সুকান্ত বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

সুকান্ত বাবু এ রকম প্রস্তাবই বোধ হয় আশা করছিলেন, বললেন, "বেশ, রাজী।"

মিঃ পাণ্ডে চেয়ার এক পাশে সরিয়ে রেখে দাঁড়িয়ে উঠলেন, তারপর বললেন, "এখন আসি, কাল বিকাল চারটার সময় আসব।"

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে অট্টালিকার বাইরে দাঁড়-করান মোটরের পাদানিতে উঠতে গিয়ে পাণ্ডে থমকে খানিক দাঁড়িয়ে পড়ল, অসংখ্য শিরা-স্নায়ু-বেষ্টিত মাথার নীচে চিন্তাতরা মুখের ওপর একটা কপট হাসি খেলে গেল।

তার কিছুক্ষণ পরেই নিঝুম রাস্তার বুকের ওপর দিয়ে পাণ্ডের মোটর ছুটে চলল।

গভীর নিদ্রিত মহানগরী। রাত্রির গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে দূরে গির্জ্জার পেটা-ঘড়িতে একটা বেজে গেল। নগর-শিখরের আকাশপ্রান্তে চন্দ্রশশির ক্ষীণ আলো যেন মজ্জমান কোনো জাহাজের স্তিমিত আলোক-শিখার মত।

কিন্তু দৃশ্যপট বদলে গেছে।

মহানগরীর জনবহুল রাজপথ। বিচিত্র জনতা, প্রখর রৌদ্র। সেখানে নিয়তই চলে কর্ম্মমুখরিত নগরীর নর-

নারীদের নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবার ব্যর্থ প্রচেষ্টা। রাত্রে সাপের চোখের মত মহানগরীর যে রহস্যময় রূপ দেখেছিলে, এখন তা নেই—শুধু যানবাহনের চলাফেরা ও কর্মব্যস্ত জনতার উত্তেজিত পায়ে চলার শব্দ।

বেলা একটা বেজে গেছে। প্রাদেশিক শাসনকর্তার অধীনে "রেজিষ্ট্রেশন" আফিসের কাজ অনেকক্ষণ সুরু হয়ে গেছে। আফিসের সামনে একটা মোটর এসে দাঁড়াল।

মোটর থেকে নেমে এল, আমাদের মিঃ পাণ্ডে। তাড়াতাড়ি সে রেজিষ্ট্রেশন আফিসের ভেতর ঢুকে পড়ল। সঙ্গে দেখা গেল, কতকগুলো নক্সা ও ছবি আঁকা একখানা বড় পার্চমেণ্ট কাগজ।

মিঃ পাণ্ডে যখন আফিস থেকে বেরিয়ে এল, আকাশের প্রখর সূর্য্যের তেজ তখন অপেক্ষাকৃত স্তিমিত হয়ে এসেছে। রাস্তার বুকের উপর তখনও মহাসমারোহে চলেছে মানুষের কল্লোলময় জীবন-সংগ্রাম।

কাল রাত্রে সুকান্ত বাবুর কাছ থেকে এসে মোটরে ওঠবার সময় তার মুখে যে রকম কুটিল হাসি দেখা গিয়েছিল, সেই রকম হাসি আজও পাণ্ডের মুখে দেখা গেল। আফিস থেকে প্রদত্ত একখানি স্বাক্ষরিত সবুজ রঙের কাগজ বুক-পকেটে রেখে সে গাড়ীতে উঠল।

সুকান্ত বাবুর বাড়ী যখন তার মোটর এসে পৌঁছুল, চারটা বাজবার অনেকক্ষণ পরে গেছে। সুকান্ত বাবু প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। তাঁর নিজের মোটরে যন্ত্রটি বড় বড় দুটি কাঠের বাক্সবন্দী করা ছিল। পাণ্ডে এসে পৌঁছুতেই তিনিও তাঁর মোটরে ছুটে দিলেন।

মিঃ পাণ্ডে ও সুকান্ত বাবু যখন তাঁদের নির্দ্দিষ্ট জায়গায় এসে পৌঁছুলেন, তখন দিনের আলো অন্ধকারের দিকে গড়িয়ে এসেছে। চমৎকার ছোট্ট একখানি বাংলো। আশে পাশে কোনো বসতি নেই। সুকান্ত বাবু মুগ্ধ হলেন, বললেন, "বাঃ এত চমৎকার জায়গা, আমি কিন্তু এতখানি আশা করি নি পাণ্ডে?"

মিঃ পাণ্ডে উত্তর দেবার পরিবর্ত্তে শুধু একটু মৃদু হাসল।

তাদের সঙ্গে আর কেউ নেই; মাত্র পাণ্ডে আর সুকান্ত বাবু। তাঁরা নিজেরাই ধরাধরি করে বাক্স দুটিকে নামিয়ে ঘরের মধ্যে রাখলেন। ঘরের ভিতরে দুটো টেবিলে যন্ত্র দুটিকে মুখোমুখী রেখে বসাবার আয়োজন করতে লাগলেন।

ঘরের ভেতর অন্ধকার ঘনিয়ে এল। টেবিলের এক কোণে একটি মোমবাতি রেখে সুকান্ত বাবু সেটিকে জ্বালালেন।

ঘরের ভেতর এই দুটি লোক তাদের উদ্ভাবিত যন্ত্রের চরম পরীক্ষা দেখবার জন্য অধীর হলেন।

"ব্যস্, ঠিক বসান হয়েছে", শেষ স্ক্রুটি টেবিলের সঙ্গে পাণ্ডে এঁটে দিয়ে উঠে পড়ল।

সুকান্ত বাবু কিছু উত্তর দিলেন না, অধীর আগ্রহে তাঁর চোখ দুটো ঝকঝক্ করে উঠল। নিজের পরিকল্পিত এই যন্ত্রটির সাফল্য দেখবার জন্য তার সমস্ত শিরায় শিরায় যেন রক্তের চাঞ্চল্য দেখা দিল।

সুকান্ত বাবু ব্যাটারির সঙ্গে মোটরের দুটি তারের যোগ করে দিয়ে, একটি বোতাম টিপে ধরলেন। বোতামের ওপর চাপ পড়া মাত্র চাকা দুটি ঘুরে উঠল। ইঞ্জিনের সশব্দ গতিতে ঘরটি যেন আর্ত্তনাদ করে উঠল। যন্ত্রের শব্দে মনে হল যেন, নির্জ্জন গতিহীন এই ঘরটি শব্দময় জগতে এসে পৌঁছেছে। যন্ত্রটি ঘুরে চলল।

তার সামনের দুটি লোক এতক্ষণ নিষ্পলক হয়ে ইঞ্জিনের কার্য্যধারা লক্ষ্য করছিল। সুকান্ত বাবু আনন্দে অধীর হয়ে উঠলেন,—

"যন্ত্র কাজ করছে, মিঃ পাণ্ডে আমাদের ইঞ্জিন যা বলছি তা করছে", সুকান্তবাবু মিঃ পাণ্ডেকে জড়িয়ে ধরলেন, "কালকেই এটাকে রেজিষ্টার্ড করে নিই কেমন?" তিনি অধীর আগ্রহে পাণ্ডের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন; পাণ্ডে তাঁর সহকর্ম্মী, এতে তার কিছুই আপত্তি থাকতে পারে না।

কিন্তু মিঃ পাণ্ডে কোন উত্তর দিল না।

যন্ত্রের একঘেয়ে শব্দ ছাড়া উপস্থিত দুটি প্রাণীর মুখে আর কোন শব্দ নেই। সুকান্ত বাবু কিছুক্ষণ অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর চিন্তিত পাণ্ডের কাঁধের ওপর সজোরে চাপড় মেরে বললেন,—

"ও কি, চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলে যে? কালকেই এটাকে 'রেজিষ্ট্রেশন্' আফিস থেকে রেজিষ্ট্রি করে নি; আর এর

নাম দেওয়া থাক, 'পাণ্ডে-সেন মোটর', উদ্ভূত হয়ে সুকান্ত বাবু তার বুকের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

আরও কিছুক্ষণ দুটি প্রাণী করাবহ ঘরের একঘেয়ে শব্দের ভেতর ডুবে রইল। সুকান্ত বাবুর সহ্যের সীমাও যেন ছাড়িয়ে যায়, তিনি চীৎকার করে বললেন, "চুপ করে কেন পাণ্ডে? এতে তোমার মত আছে না কি?"

"এটা রেজিষ্টার্ড হয়ে গেছে।"

এ জাতীয় উত্তর না হোক, যার কণ্ঠস্বর তিনি শুনতে চাচ্ছিলেন, তা তিনি পেলেন, কিন্তু এই উত্তর শুনে সুকান্ত বাবুর হৃদ্‌পিণ্ড যেন বক্ষচ্ছদ ভেদ করে নীচের দিকে নেমে এল। মিঃ পাণ্ডের এই বিকৃত গলার উত্তরে তিনি যেন স্তম্ভিত হলেন। অন্ত একটি বোতামের ওপর চাপ দিয়ে তিনি ইঞ্জিনের গতিকে বন্ধ করে দিয়ে, খানিকক্ষণ কি যেন শোনবার আশায় কান পেতে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর অস্ফুটস্বরে বার কতক 'রেজিষ্টার্ড', 'রেজিষ্টার্ড', এই কথাগুলিরই পুনরাবৃত্তি করে, বিমূঢ়ের মত তিনি বললেন,

"আমার পরিকল্পিত বধূকে কে রেজিষ্টার্ড করলে?"

"আমিই আজ বেলা ৩টার সময় রেজিষ্ট্রেশন আফিস থেকে এটিকে রেজিষ্টার্ড করে নিয়েছি।"

মিঃ পাণ্ডের কণ্ঠস্বর যেন মাটির বুক থেকে উঠে আসছে।

"আমার উদ্ভাবিত বধূ তুমি কার নামে রেজিষ্টার্ড করলে?"

"আমার নিজের নামে এটিকে করেছি, কারণ কালকের কথায় আমি বুঝলাম যে, আপনি অর্থ ও মান এ দুটোর একটারও প্রত্যাশী নন, সুতরাং···"

দুর্যোগ, সব যেন দুর্যোগ। সুকান্ত বাবুর চোখের সামনে থেকে যেন জগৎ সরে যাচ্ছে, মিঃ পাণ্ডের কাছ থেকে এরকম উত্তর তিনি আশা করেন নি। তিনি চীৎকার করে পাগলের মত বলে চললেন, "তুমি চোর, আমার আজীবনের কষ্টার্জিত তথ্য তুমি চুরি করেছ। নীঘ্র তোমার রেজিষ্টার্ড কাগজ খানা আমার হাতে দাও, না হলে তোমার গলা টিপে মেরে ফেলব", উন্মত্তপ্রায় অবস্থায় সুকান্ত বাবু তার দিকে কয়েক পা এগিয়ে এলেন।

"সাবধান আর এক পাও এগোবেন না" পকেট থেকে একখানা ছোরা বার করে মিঃ পাণ্ডে বললে, "আপনার আক্রমণের হাত থেকে বাঁচবার জন্ত এর ব্যবহারেও আমি কুণ্ঠিত হব না।"

সুকান্ত বাবু অস্ফুট আর্তনাদ করে কয়েক পা পিছিয়ে এলেন। তিনি ভীতিগ্রস্ত পাগলের মত দাঁড়িয়ে, আর তাঁর সামনে মিঃ পাণ্ডে। ঘরের ভেতর মোমবাতির নাতি-তিমিত আলো, তারই এক টুকরো আলো ছোরাটির ওপর পড়ে ঝিক্‌মিক্ করছে।

সুকান্ত বাবুর সারা দেহ যেন অজানা আতঙ্কে থেমে উঠল। পর মুহূর্তেই তিনি সামলে নিলেন, বললেন,

"মিছি মিছি তুমি আমায় ভয় দেখাচ্ছ পাণ্ডে, এখনও বলছি আমার জিনিষ আমায় ভোগ করবার অধিকার দাও।"

"মাপ করবেন, দেবার ক্ষমতা নেই।"

ঘরের এক কোণ থেকে নির্বিকার স্বরে উত্তর এল।

হঠাৎ সুকান্ত বাবু অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় মিঃ পাণ্ডের দিকে লাফিয়ে পড়লেন। মিঃ পাণ্ডে তাড়াতাড়ি সুকান্ত বাবুর অতর্কিত আক্রমণের হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে পিছন দিকে হটতে গেল। কিন্তু তাড়াতাড়িতে টেবিলের পায়ে ধাক্কা লেগে হুমড়ি খেয়ে নীচে মাটিতে পড়ে গেল। পাণ্ডের পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের ওপর থেকে বাতিটাও নিচে গিয়ে নীচে পড়ে গেল।

কিছুক্ষণের জন্ত আবার ঘরের ভেতর নেমে এল নিস্তব্ধতার ভোয়ার। মিঃ পাণ্ডেরও আর কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না।

সুকান্ত বাবু, বাতিটি নিতে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। কিন্তু এখন পাণ্ডের কোন সাড়া-শব্দ না পেয়ে বিস্মিত হলেন। ঘরের মধ্যে শুধু গাঢ় অন্ধকার আর ঘন নীরবতা।

অন্ধকারের মধ্যে থেকেই তিনি চীৎকার করে উঠলেন, "কি সাড়া দিচ্ছ না যে পাণ্ডে? এখনও করজোড়ে তোমায় মিনতি জানাচ্ছি যে, আমার জিনিষ আমায় ভোগ করবার অধিকার দাও।"

সুকান্ত বাবু কণ্ঠস্বর যেন করুণতার প্রাবল্যে স্তব্ধ হয়ে এল।

রুদ্ধ ঘরের ভিতর এই কথাগুলো যেন অন্ধকারের মধ্যে হাতড়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল। কিন্তু পাশের তরফ থেকে কোন কিছু উত্তর পাওয়া গেল না। সুকান্ত বাবু বিস্মিত হয়ে খানিকক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর নিজের নিঃশ্বাসপতনের মৃদু শব্দটুকুও যেন বেশ পরিষ্কার ভাবে শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। পকেট থেকে দেশলাই বার করে তার একটি কাঠি জ্বাললেন। দেশলাইয়ের কাঠির আলোকে তিমিত ঘরটির ভয়াবহ অন্ধকার যেন দূর হল। কিন্তু ঘরের মধ্যে আর কিছু লক্ষ্য করবার আগেই সেটি গেল নিভে। আবার আগেকার সেই অন্ধকার এল ফিরে।

সুকান্ত বাবু আবার একটি কাঠি জ্বাললেন, তারপর সেটির সাহায্যে টেবিলের তলা থেকে মোমবাতি কুড়িয়ে নিয়ে জ্বাললেন। ঘরটি এবার উজ্জ্বল আলোয় ভরে গেল। কিন্তু সামনের দৃশ্য দেখে তিনি আতঙ্কে চীৎকার করে উঠলেন। এই মর্ম্মভেদী চীৎকার যেন ঘরের কঠিন স্তব্ধতাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেললে।

দেখলেন, মিঃ পাণ্ডে টেবিলের নীচে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। উপুড় হয়ে পড়বার সময় বোধ হয় তার হাতটি তার বুকের তলায় পড়েছে, যাতে নিজেরই দেহের চাপে নিজের হাতের ছোরাটা আমূল বুকের ভেতর ঢুকে গেছে। মেঝের উপর খানিক তরল ও খানিক জমাট-বাঁধা রক্ত, মিঃ পাণ্ডের মুখের উপর মৃত্যু-কাতরতার শেষ চিহ্ন। কিছু পূর্ব্বে পাণ্ডের দেহে যে প্রাণের চাঞ্চল্য ছিল, এখনকার বিকৃত মুখ দেখে সে কথা ভুলে যেতে হয়। মানুষের ওজন-করা অনুমিত দৈহিক স্পন্দন যা এতদিন ছিল তা আজ অকস্মাৎ বন্ধ হয়ে গেছে।

তবুও শেষ চেষ্টা, সুকান্ত বাবু মিঃ পাণ্ডের দিকে এগিয়ে এলেন। তার কাছে বসে কপালে হাত দিয়ে দেখলেন, ত্বক্ শীতল, নাড়ীতে ক্ষীণতম চাঞ্চল্যেরও অভাব, দেহ স্পন্দনহীন। তার হাতের সঙ্গে আঁটা ছোরাখানা বুকের মধ্যে তেরছা ভাবে গোঁজা, তার ওপর মোমবাতির আলো ঝক্‌ঝক্ করছে।

কতক্ষণ যে মৃতদেহের পাশে সুকান্ত বাবু হাঁটু গেড়ে বসে ছিলেন, তা তাঁর খেয়াল নেই। বাড়ীর বাহিরে নিশাচর পাখীর কর্কশ ডাকে তিনি সচেতন হলেন। উঠে এসে টেবিলের এক কোণে বসলেন। এখন নিজের হৃৎস্পন্দনটুকু ও নিশ্বাসের পতনের শব্দও শুনতে পাচ্ছেন না। ঘরের স্তব্ধতা যেন পাথরের মত তার বুকের ওপর চেপে বসেছে, নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে।

যদি কেউ তাঁকে এই অবস্থায় দেখতে পায়? তিনি এই ঘরে মাত্র একলা, তাঁর পায়ের তলায় পাণ্ডের মৃতদেহ। কেই বা বিশ্বাস করবে, তিনি মিঃ পাণ্ডের হত্যাকারী নন। তাঁর কাপড়ে ও জামায় রক্ত ছিটকে এসেছে। কখন যে রক্ত লেগেছে তা তিনি নিজেও জানেন না। অথচ তিনি যে এ বিষয়ে নির্দ্দোষ এ কথা এ-অবস্থায় কেউ বিশ্বাস করবে না। তিনি ভাবলেন, অনায়াসেই নিজের নির্দ্দোষিতায় সম্পূর্ণ বিশ্বাসী হয়ে এখান থেকে চলে যেতে পারেন। কিন্তু উপস্থিত এই ঘরটির জন্য তা হওয়ার উপায় নেই।

কিছুক্ষণের জন্য আবার স্তম্ভিত হয়ে চিন্তা করতে লাগলেন। হঠাৎ তিনি এক মতলব স্থির করে ফেললেন। উঠে দাঁড়িয়ে ঘর দুটিকে নেড়ে দেখলেন যে, তার কোথাও কিছু ক্ষতি হয় নি। এই ঘরটিকে নিয়েই এত কাণ্ড, আর যেন তিনি এটাকে তাঁর চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন না। ভাবলেন, এই ঘরটির সঙ্গে এই দেহটাকে আটকে নিয়ে কোথাও লুকিয়ে ফেলবেন।

ধীর সন্তর্পণে ঘরের দরজা খুললেন। চোরের মত আস্তে আস্তে তিনি বাইরে এলেন; বাইরে আসবার সঙ্গে সঙ্গে হু হু করে হাওয়া এসে বাতিটা আবার নিভিয়ে দিল। অন্ধকার ঘর, ঘরের বাইরে ছোট অন্ধকার 'করিডর'। ধীরে ধীরে পা ফেলে তিনি অন্ধকার 'করিডর' বেয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালেন। বাইরের নীল আকাশ নক্ষত্র-ভরা। মৃদু জ্যোৎস্নায় চেউয়ে আকাশ থমথমে। বাইরের চার পাশ তিনি দেখে নিলেন। সামনে তিনি দেখতে পেলেন, অন্ধকার জামগাছের তলায় যেন এক অশরীরী ছায়া, পাণ্ডের প্রেতাত্মা কি? তিনি সভয়ে দেখতে পেলেন, সেই রকম দাঁড়াবার ভঙ্গিমা, বুকের ভেতর থেকে যেন রক্ত গড়িয়ে এসেছে। তিনি শিউরে উঠলেন, হাত, পা তাঁর ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। তিনি বাঁদিকে দৃষ্টি ফেরালেন। চারিদিকে তাকিয়ে তিনি যা আশা করেছিলেন, তা পেলেন।

গাছপালার ফাঁক দিয়ে দেখতে পাওয়া গেল, দূরে একটা খালের জল চিক্‌চিক্ করছে।

আবার তিনি অন্ধকার 'কেবিনের' ভেতরে ঘরে ঢুকলেন। বাতিটি নিভে গেছে। অন্ধকারের ভেতরেই হাতড়ে হাতড়ে তিনি পাণ্ডের মৃতদেহের কাছে এসে হাঁটু গেড়ে বসলেন; তারপর তাকে চিৎ করে শুইয়ে তার বুকের ভেতর থেকে ছোরাটা টেনে নিলেন। ছোরাটা টেনে আনার সঙ্গে সঙ্গে বুকের রক্ত যেন আরও বিগুণ বেগে ফিন্‌কি দিয়ে ছুটে এসে তাঁর জামা-কাপড় রক্তে ভিজিয়ে দিল। ছোরাটাকে আস্তে আস্তে সেখানে ফেলে রেখে পাণ্ডেকে কাঁধের ওপর তুলে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

এক জনের চলার মত সরু পথ। কত রাত্রি এখন আর বলা যায় না। পাণ্ডেকে কাঁধে নিয়ে সুকান্ত চলতে চলতে ভাবেন, পথ অনেকটা. কিন্তু ঘর থেকে খালের দূরত্ব খুবই অল্প। সুকান্ত বাবু যেন মোহাবিষ্ট হয়ে চলেছেন, কি করেছেন বা কি ঘটনা ঘটল তা তাঁর নিজের খেয়াল নেই। রক্তের স্রোতে জামা-কাপড় তাঁর ভিজে গেছে।

খালের ধারে একটি উঁচু ঢিবির ওপর পাণ্ডের মৃতদেহটিকে রেখে তিনি আবার ফিরলেন। ঘর দুটিকে আনতে হবে।

ঘরের ভেতর থেকে দুটি বস্তুকেই খালের ধারে আনলেন। একটিকে তার মধ্যে খালের জলে ফেলে অপরটি চামড়ার ফিতের সঙ্গে পাণ্ডের মৃতদেহটিকে জড়িয়ে উঁচু ঢিপি থেকে খালের গভীর জলের দিকে ফেলে দিলেন।

সুকান্ত বাবুর জামা রক্তে ভিজে গেছে, সেটিকেও খালের জলে ত্যাগ করে তিনি আবার উল্টোপথ ধরলেন।

খোলা গায়ে আলো অন্ধকারে মেশা গাছের তলা দিয়ে সুকান্ত বাবু এগিয়ে চলেছেন।

আমাদের অলক্ষিতে পেছনে ফেলে আসা মহানগরীর দুটি মানুষের অতর্কিত নিরুদ্দেশ হওয়ার এই ইতিহাস; বিশেষ করে আধুনিক জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক সুকান্ত সেনের নিরুদ্দেশ হওয়া ও মহানগরীর মোহ ছাড়িয়ে কিছু দূরের একটি গ্রামের নিভৃত বাংলোর মধ্যে একটি ছোরা ও মেঝের উপর রক্ত নিয়ে সহরের প্রতিটি সংবাদপত্র ও গোয়েন্দা মহলে যে কি রকম উৎকণ্ঠা ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল তার উল্লেখ এখানে প্রয়োজন নেই।

দীর্ঘ কালের জন্য আমাদের গল্পের নায়ক সুকান্ত বাবুকে হারিয়ে ফেলেছিলাম, কিন্তু আমরা আবার তাঁকে খুঁজে পেলাম।

তাঁর দেখা পেলাম যান্ত্রিক মহানগরীর নিষ্ঠুর মোহ ছাড়িয়ে ছোট এক পশ্চিমা সহরে। তারই নামজাদা উন্মাদ আশ্রমের সাধারণ উন্মাদের মত এক নামহীন, অজানা উন্মাদকে আমরা সুকান্ত বাবু বলে চিনতে পারি। দীর্ঘ দু'বছরের অস্পষ্ট কুয়াশা ভেদ করে হয় ত তুমি এঁকে চিনতে পারছ না, কিন্তু তাঁর মুখ তোলার সঙ্গে সঙ্গে দুজনেই ভাল করে চিনতে পারি। দৃষ্টি তাঁর সম্পূর্ণ অর্থহীন, সুন্দর সুগঠিত চেহারা হয়ে গেছে শীর্ণ, চামড়াখানি গায়ে মাত্র লেগে আছে, তাও শিথিল হয়ে একেবারে কুঁকড়ে গেছে। তার লম্বা লম্বা কালো চুলগুলো যেন কেউটে সাপের মত কিলবিল করে।

সুকান্ত বাবু এক মনে একটা নিরর্থক কলম নিয়ে এতক্ষণ কি লিখছিলেন; আমাদের দিকে দৃষ্টি পড়তেই বলে উঠলেন—

"পাণ্ডে, তুমি বড় চালাক, জানতাম তোমার মধ্যে একটা অসাধারণ ক্ষমতা আছে।"

কথাগুলি যেন সুকান্ত বাবুর দীর্ণ বক্ষপঞ্জর ভেদ করে এল।

তিনি আবার লিখে চললেন।

ও কি! তুমি কাঁদছ?

ভুল বুঝলে! মহানগরীর রহস্যই এই; যা আমরা খুঁজি তা পাই না, যা হারিয়ে গেছে তাও প্রায় পাই না, যদিও পাই তা যেন আগে রূপান্তরিত হয়ে। তার মধ্যে মহানগরীর স্বতঃসিদ্ধ বিষও যেন একটু মেশানো থাকে। আর তা ছাড়া, তোমাকে ত আগেই বলেছি যে, মানবের রহস্যময় আত্মা আর মহানগরীর রূপ,—এরা মানুষের স্বাভাবিক পাওনা, আশা, আদর্শ, সব কিছুকে ঠেলে নিজের পথ করে নেয়।

[কোনান ডয়েলের 'Brown-Pericord Motor' হইতে]

সিপাহীযুদ্ধের নূতন কথা

—শ্রীসুশীলপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

কোম্পানীর দুর্দ্দিন : কাশীর ঘটনা

গাজীপুরবাসীর 'মনের তোষ' ঠিক রাখিতে স্থানীয় বিশিষ্ট কয়েকজন ভদ্রলোক সূর্য্যকুমারের বিশেষ সহায়তায় আসেন। তাঁহাদের কয়েকজন দেশের মাথা বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। দেশবাসীর সুখ-দুঃখে তাঁহারা একাত্মা। তাঁহাদের মধ্যে গাজীপুরের সরকারী উকিল হরবংশলাল, ধনাঢ্য কুষ্টিয়াল শেঠ হনুমান দাস ও শেঠ শিব-সহায় ও জেলখানার কবিরাজ শ্রীনাথ সেনের নাম সূর্য্যকুমারের ডায়েরীতে ঘন ঘন পাওয়া যায়। ইঁহারা ব্যতীত স্থানীয় মুন্সেফ ও সাবজজ প্রভৃতি ত' ছিলেনই।

সকলের সমবেত চেষ্টায় একদিকে সাধারণ অধিবাসি-বৃন্দের, অপর দিকে রাজপুরুষদিগের অন্তরে পরস্পরের জন্য পরস্পরের প্রীতি ও সহানুভূতির ভাব অটুট থাকে, সেই অবস্থাতেও বিপদ হয় 'লড়ায়ে'-দের জন্য। ঘড়ের গাদায় কে কখন আগুন ধরাইয়া দিবে স্থিরতা নাই। এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখা সম্বন্ধে সকলে সূর্য্যকুমারের উপর নির্ভর করেন সর্ব্বতোভাবে। সূর্য্যকুমারের ডায়েরীতে প্রকাশ :—

"জন সাধারণের এই মনোভাবে আমার দায়িত্বের মাত্রা বাড়াইয়া দেয়। সরকার বাহাদুর প্রকাশ্য বিজ্ঞাপন বিজ্ঞাপিত না করিলেও স্থানীয় সিপাহীদিগের সহিত জন-সাধারণের মেলা-মেশার সুযোগ কর্তৃপক্ষ তত দিতেছেন না, বেশ দেখিতে পাইতেছি। সিপাহীরা হাটে বাজারে যাইলেও কোম্পানীর গুপ্তচর দূর হইতে তাহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছে। পল্টনের ডাক্তার বলিয়া আমার অবশ্য অবাধ গতি। তথাপি দিনকালের হিসাবে হিসাব করিয়া মেলা-মেশা করাই উচিত। উচিত মত কাজ করিতে 'ডিউটী' সারিয়াই বসিয়া থাকিতে হয়, তাহাদের উপর লক্ষ্য রাখা আর হয় না। এ এক ঘোর সমস্যা। এ অবস্থায় আমার উপর পাঁচজন ভরসা করিয়া বসিয়া থাকিলে আমি কি করিতে পারি?"

সাতপাঁচ ভাবিয়া ডাঃ সূর্য্যকুমার আপনার গতিবিধি সত্যই সংযত করেন, কিন্তু বিপৎকালে আশ্রয়প্রার্থীর আশ্রয়ের জন্য গড়টিকে দুর্ভেদ্য গড়ে পরিণত করিতে বিশেষ যত্নবান্ হন। ইহার কয়েক দিনের মধ্যে জেনারেল নীলের অনুরোধে তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন।

সাক্ষাৎ করিতে যাইবার পূর্ব্বে ডাক্তার সর্ব্বাধিকারীর ডায়েরীর বর্ণনা এই :

"অসময়ে এ অনুরোধের কারণ কি? * * * * গড় সম্বন্ধে আমার অতিরিক্ত (?) আগ্রহ বোধ হয় কর্তৃপক্ষের নিকট আপত্তিকর।"

সাক্ষাতের পরে ডায়েরীতে যাহা বর্ণিত তাহার একাংশ এই :

"জেনারেল নীল আমার শারীরিক কুশলাদি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া এবং উত্তর শুনিয়া বলেন, 'যাক আমার মনে হয়েছিল, আপনার পক্ষে বোধ হয় তত ভাল নয়, তাই কদিন ব্যারাকে আপনাকে তেমন দেখতে পাওয়া যায় নি। আপনার মত লোকের সংস্রব সিপাহীদের পক্ষে শুভ বলেই আমরা মনে করি।"

ইহা লিখিয়া ডাঃ সূর্য্যকুমার বলিতেছেন : "সোজা অনুরোধ না করিলেও এই ইঙ্গিতানুরোধ সুস্পষ্ট। ইঙ্গিতের আশ্রয় গ্রহণ বোধ হয় শাসক ও শাসিতের বাবধান রক্ষা করিতে!"

১১ই মে হইতে ৪ঠা জুন পর্য্যন্ত নানা স্থান হইতে সিপাহী-যুদ্ধের সংবাদ গাজীপুরে যাহা পৌঁছিয়াছিল, সে সকলের আভাস পাই চৈত্র সংখ্যার 'বঙ্গশ্রী'তে প্রদত্ত হইয়াছে। সংবাদ-প্রাপ্তিতে গাজীপুরের সিপাহী-মহলে চাঞ্চল্যের ভাব দেখা যায় বেশই। সূর্য্যকুমার লিখিতেছেন, "সে চাঞ্চল্যের উপশম ঘটাইয়া তাহাদিগকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনিতে কর্তৃপক্ষের কালঘাম ছুটিয়া যায়। সরকারী সংবাদ যাহা প্রকাশিত হইতেছে, তাহা বিদ্রোহী সিপাহীর নিন্দক না রাখার কথায় পরিপূর্ণ, ফুটের প্রয়োজনায় হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া পাপ-কার্য্যে তাহারা নিযুক্ত এ কথা পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত। বিশ্বস্ত

দিপাহীরা কোম্পানীর বিরুদ্ধবাদীদিগকে যে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেছে এবং তাহাদের অনিষ্টতা দমনে যে তাহারা বদ্ধপরিকর তাহার উদাহরণ স্বরূপ শিখ রেজিমেণ্টের কোম্পানীর পক্ষে দৃঢ়তা সহকারে দুর্জ্জন শাসনের কথা নানাভাবে প্রকাশিত।"

ইহাতেও গাজীপুরের 'কালা দিপাহীর' চঞ্চলতা উপশম করা কঠিন কার্য্য হয়। বে-সরকারী সংবাদ লোকের মুখে মুখে যাহা ফিরিতেছিল তাহা সরকারী সংবাদের ঠিক উল্টা। দৃষ্টান্তস্বরূপ ডাঃ গর্ণাধিকারী বলিতেছেন :

"কাশীর রাজা বাহাদুর ঈশ্বরীনারায়ণ রায়ের মধ্যস্থতায় পদাতিকগণ (কাশীতে) তোপ ও ম্যাগজিন ছাড়িয়া দিয়া নিরস্ত্র প্যারেডের মাঠে উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে ঘেরাও করিয়া গোরা পল্টন (পদাতিক) তোপ দাগিয়া হত করিতে আরম্ভ করে। নিরস্ত্র বহু সৈন্য এই ভাবে হত করা হইয়াছে। অবশিষ্ট কোনও প্রকারে পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছে।"

কাশীর ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী বহুনাথ তাঁহার 'তীর্থভ্রমণে' লিখিয়াছেন :

"বেলা দুই প্রহর চারি ঘটা পরে বারাণসীর সেনাপতিগণ দেশীয় পদাতিকগণকে অনুমতি করিলেন যে, গবর্ণমেণ্ট হইতে কিছু নূতন হুকুম আসিয়াছে তাহা সকলের গোচরার্থ প্রকাশ করিব। অতএব তোমরা প্যারেড-পথ দণ্ডায়মান হও।"

যে পদাতিক দলগুলিকে প্যারেডে উপস্থিত হইতে বলা হয়, তাহা বলিবার কারণ সম্বন্ধে বহুনাথ বলিতেছেন :

"(ইহারা) সেনাপতিগণ এবং রাজপুরুষগণকে হত করিয়া খাজনা লুটিয়া গমন চেষ্টায় ছিল। • • • (ইহাদের) প্রহরীতে তোপ এবং মেগাজিন এবং খাজনা ছিল। • • • • • • খাজনা স্থানান্তরিত করিতে রাজপুরুষগণ কহিলে পদাতিকগণ কহিলেক, 'তোপ, মেগাজিন এবং খাজনা আমরা কদাচ ছাড়িব না' • • • কাশীর রাজা ঈশ্বরীনারায়ণ রায় বাহাদুরকে পদাতিকগণকে বুঝাইবার জন্য মধ্যস্থ স্থির করায় রাজার বাক্যদ্বারা পদাতিকগণ তোপ এবং মেগাজিন ছাড়িয়া দেয়। ঐ সকল গোরাদিগের প্রহরীতে দেন। পরে ৩ জুন প্যারেডের হুকুম দেওয়াতে পশ্চিমদিকে শিখ পদাতিকগণ, দক্ষিণ দিকে সওয়ারগণ, মধ্যস্থলে বলন্টারী পদাতিক, এক পল্টনের মধ্যে দুই কোম্পানী গাজীপুর ও জৌনপুরে ছিল, তদ্ভিন্ন যত পদাতিক ছাউনীতে ছিল, সকলে বিনাস্ত্র প্যারেডে দণ্ডায়মান হইলে পর, সেনাপতিগণ সুসজ্জীভূত হইয়া গোরাপদাতিকগণকে সঙ্কেত দ্বারা তোপে পদাতিকগণকে হত করিতে অনুমতি করিলেন। • • • আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ হইতে আরম্ভ হইল। তাহাতে ভারত যুদ্ধের ন্যায় রণস্থল হইয়া, অভিমন্যু-বধের ন্যায় বলন্টারি পদাতিকগণকে বেষ্টন করিয়া আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা গোলাকৃপ বাণ নিক্ষেপ হইতে লাগিল। পদাতিকগণ রণপণ্ডিত (ও) সুশিক্ষিত। ইহাদের তুল্য দেশী পদাতিক কোনও দল নহে। যৎকালে সৈন্যগণ ভূমিতে ভূমির ন্যায় মিশাইয়া বহু সৈন্য প্রাণরক্ষা করিয়া অশ্বারোহীদিগের সহিত সহযোগে রণস্থল হইতে বরণা পার হইল।"

ইহা হইতে সংবাদ আদান-প্রদানের পার্থক্য ও অনিষ্টকারিতা অনুমান করা যায় সহজেই। কাশীতে অবস্থিত পদাতিক পল্টনের যে কোম্পানী গাজীপুরে ছিল, মূল পল্টনের নির্য্যাতন ঘটনায় সন্ত্রস্ত, উত্তেজিত ও বৈরীভাবাপন্ন হওয়া তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক। মূল দোষ কোথায়,কাহারও সে সকল বিচারের মন তখন হয় না। বিশেষতঃ চক্রীর অবিরত চক্রান্তের ফলে সাধারণের অধিকাংশই অন্ততঃ মনে মনে তখন কোম্পানীর বিরুদ্ধবাদী। এই সকল কথা আলোচনা করিয়া ডাঃ সূর্য্যকুমার বলিতেছেন :

"তথাপি গাজীপুরে অবস্থিত শাখা পদাতিকদল ঈষৎ চাঞ্চল্যের আভাসমাত্র দিয়া শান্ত ভাব দিয়া যে ধারণ করিয়া রহিয়াছে তাহা সরকারী ও বিশিষ্ট বে-সরকারী ব্যক্তিবৃন্দের আন্তরিক সহযোগিতার ফলে। পদাতিকদলের অসন্তোষ অল্পে মিটিয়া যাওয়ায় অন্যান্য পল্টনে কোনও প্রকার চাঞ্চল্য দেখা দিল না। কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থায় গোরাপল্টন নিরাস দেশীয় পল্টনের 'খানার' নিকটবর্ত্তী; প্রয়োজন হইলে গোরাপল্টন দেশীয় পল্টনের উপর নিমিষে হানা দিতে পারে এই অভিপ্রায়ে।"

গাজীপুরে বিপদের ভয় নিকটবর্ত্তী অন্যান্য স্থান অপেক্ষা অনেক কম জানিয়া যখন আশ্রয়প্রার্থীরা দূরদূরান্তর হইতে ক্রমে দলে দলে যখন গাজীপুরে আসিয়া পড়িতে লাগিল তখন আবার নূতন সমস্যার সমাধান করিতে কর্তৃপক্ষের প্রাণান্ত

হইবার উপক্রম হইল। সমাগতদের প্রায় সকলেই স্বেচ্ছাঙ্গ স্বেচ্ছাঙ্গিনী—প্রৌঢ়, প্রৌঢ়া, যুবক, যুবতী, বালক, বালিকা—নারীর সংখ্যাই অধিক। প্রাণপণকার্য অযাস ছাড়িয়া 'পরবাসে' তাহাদের আগমন, তাহা স্থানমূহে কোম্পানীর শক্তিহীনতারই পরিচায়ক—সাধারণে ইহা ধরিয়া লইবে, ইহা ত' পড়িয়া রহিয়াছে। ক্ষীণ হইলেও তখন রব উঠিয়াছে, 'কোম্পানীর শাসন লুপ্ত, দিল্লীর শাসন পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত'; কোম্পানীর বিরুদ্ধাচারী হইবার সাধারণের, বিশেষতঃ দেশীয় পল্টনের পক্ষে ইহা যথেষ্ট। কর্তৃপক্ষ (সামরিক ও অসামরিক) এ সম্বন্ধে মন্ত্রণা করিয়া যাহাই করা প্রচারপন্থ স্থানীয় কয়েকজনকে আহ্বান করেন এবং তাঁহাদের সাহায্যে জনসাধারণের মন হইতে এই ভাব দূরীকরণের প্রয়াস পান। স্থানীয় ভূস্বামিবর্গের আয়োজনে 'রক্ষক' দল গঠনের (কর্তৃপক্ষের অধিবেশনে) প্রস্তাবও আলোচিত হয়। সূর্যকুমার লিখিতেছেন :

"প্রয়োজন হইলে সমাগত ও সমাগতাদিগের স্থানে খড়ে করিয়া দিবার কথাও আলোচিত হয়। সিপাহীদের মনে কোন সন্দেহের ছায়াও না পড়ে তাহার উপায় করিবার আগ্রহের সীমা থাকে না। সামরিক উচ্চপদস্থ কর্মচারী-সমভিব্যাহারে দেশীয় পল্টন-নিবাসে যাইয়া নব অতিথিদিগের সুখ স্বচ্ছন্দতার প্রতি দৃষ্টি রাখা আমাদের কতদূর কর্তব্য সে সম্বন্ধে সৈনিকদিগের সহিত আলাপ আলোচনা আমাকে করিতে হয়। পুরুষের মধ্যে মহাযুদ্ধের বা মনান্তরে নিরীহ শিশু ও নারী এবং নির্বিরোধী পুরুষের নির্যাতন মানুষানুচিত, সিপাহীরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বলে। এ সম্বন্ধে গাজীপুর অমানুষোচিত কোনও কার্য করিবে না, সকলেই আশা করেন।"

ইহার পরে সূর্যকুমার বলিতেছেন, "এ সকলের পরে কর্তৃপক্ষের অবস্থা প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার মত বোধ হয়।"

নবাগতের মধ্যে কাহারও কাহারও চিকিৎসার ভারও ডাক্তার সূর্যকুমারকে লইতে হয়। চিকিৎসা বিষয়ে নিত্য কার্য তাঁহার ছিলই। সিপাহী যুদ্ধ-জনিত 'উপরন্তু'র অবধি রহিল না। এ সম্বন্ধে ডায়েরীতে তিনি বলিয়াছেন :

"নিত্য কার্যে অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্য কাহার আমি নহি। দেশে ভীষণ অশান্তির কারণে জেরবার করিয়া দিতেছে—সদাই সশঙ্কিত অবস্থায় থাকা। সিপাহী উপানের ভয় আছেই। শস্ত্রাস্ত্রাদির তত্ত্বাবধান ভেতু অভাবের তাড়নায় চুরি-ডাকাতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। দুঃখের 'পোয়াবারো'। কোম্পানীর সব দিক্ সাফসান যায়।"

ডায়েরীতে ইহার পরের কথা :

"এ সকলের শেষ কোথা কে জানে! চারিদিকের সম্পূর্ণ সংবাদ না পাইলেও যাহা পাওয়া যাইতেছে তাহা হইতে বেশ বুঝা যায় 'ব্যাধি সংক্রামক', অন্যে নিস্তার নাই।"

এ কথার সত্যতা সূর্যকুমার বিলাইয়া পান পরে বর্ষে বর্ষে। যুদ্ধ অবসানের বহু পরে ডায়েরীর এক অংশে যুদ্ধকালে পার্লামেন্ট সভায় যুদ্ধ সম্বন্ধে আলোচনার সার লিপিবদ্ধ আছে। তাহাতে প্রকাশ :

"Mr. Disraeli (M. P.) in moving the motion on the State of India said that the disturbances in India are due to various causes, the chief amongst them being thursting of 'improved civilization' to the unwilling. To be candid, he said, it is a national revolt and not a mere Military Mutiny."

অর্থাৎ "এ কেবল সিপাহীর বিদ্রোহ নহে, নানা কারণে বিশেষতঃ জোর করিয়া 'হালি সভ্যতা' অনিচ্ছুক ভারতবাসীর মধ্যে চালাইতে যাওয়ায় সমগ্র জাতির ঘোর অসন্তোষ-বহ্নি।"

মিষ্টার ডিজরেলীর এই ভীষণ অভিযোগ পার্লামেন্ট সভায় বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। গভর্ণমেণ্টের পক্ষে মিঃ তার্ণন স্মিথ, সার আরস্কিন্ পেরি (বোম্বাইয়ের ভূতপূর্ব প্রধান বিচারপতি) মিষ্টার ক্যাম্বেল প্রভৃতি ডিজরেলীর অভিযোগের প্রতিবাদ করেন। ডিজরেলীর সমর্থনকারীর অভাবও ঘটে নাই।

বাদ-প্রতিবাদের কথা শ্রান্ত হইয়া এবং আপনার অভিজ্ঞতার সহিত তাহা তুলনা করিয়া দেখিয়া ডাঃ সর্দাধিকারী দিনলিপিতে লিখিয়াছেন :

"দূরে থাকিয়া শোনা কথায় সিদ্ধান্তে যে দোষ ঘটে, উভয় পক্ষের সিদ্ধান্তেই তাহা বর্তমান।"

ভাইকাউন্ট পামারষ্টোন্ (ইংলণ্ডের প্রধান সচিব) স্বয়ং মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে জানান :

"The extent of the Mutiny appears to indicate some deeper cause than that which was ascribed to the first insubordination. This cause may be, as some allege, the apprehension of the Hindu priests that their religion is in danger by the progress of civilization or it may be some hostile foreign policy".

ধর্মহানির আশঙ্কা অশান্তি বপনের প্রধান বীজ, সে কথা সুধাকুমারের ডায়েরীর প্রথমেই উল্লিখিত আছে। বাকি বিশেষের কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু পুরোহিত সম্প্রদায়ের একজোটে কোম্পানীর বিরুদ্ধে কোনও আন্দোলনের ফলে এই যুদ্ধবিগ্রহ, সে কথার কোনও ভিত্তি নাই—সুধাকুমার পরিষ্কার জানাইয়াছেন। 'নূতন সভ্যতার' আলোকরশ্মি তাচ্ছিল্যভরে ভারতবাসী রুদ্ধ করিয়াছে, ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। কোথাও কোথাও মিশনারী সম্প্রদায়ের অত্যধিক আগ্রহে বিদ্বেষ গোলযোগ অবশ্য ঘটাইয়াছে। স্বল্পকাল রাজ্য-চ্যুতের তীব্র মনোবেদনা, রাজ্য পুনঃপ্রাপ্তির গোপন আকাঙ্ক্ষা, প্রবোধকের আশাবাণী, রাজ্যচ্যুতকে বৃত্তিদান সম্বন্ধে কোম্পানীর পদ্ধতি ও তদ্বিষয়ক অসন্তোষ, কোনও কোনও দেশীয়কে স্বস্থানে কোম্পানীর শত্রু পোষণ ও তাহাদের পরাস্তে 'অবিধি,' 'বিধি' বলিয়া চালান এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ও রাজ্যশাসনের তৌল সমান না রাখিতে পারা—সিপাহী যুদ্ধের বিশিষ্ট কারণ বলিয়া প্রত্যক্ষদর্শী সুধাকুমারের ডায়েরীর বিভিন্ন স্থানে উল্লিখিত আছে।

সুধাকুমারের বিশ্বাস (ডায়েরীতেও লিখিত) যুদ্ধ বাধিয়া যাইলেও ব্যাপক ভাবে ইহা সংঘটিত হইত না, যুদ্ধের কারণে যেভাবের কুফলাদি বিশেষ যে ভাবে প্রকট হইয়াছিল তাহা ঘটিত না।

গান

—শ্রীঅমূল্য সেন

বিশ্ব-গগন আবরিত আজি পূঞ্জিত কালিমায়।
সন্তান তার ক্রন্দন করে বন্ধন-যাতনায়।
আয় তোরা আয়, আয়—
ভুলে গিয়ে সব জাতি ব্যবধান,
ঘুচাতে মায়ের দুখ অপমান,
আয় সবে মিলি হয়ে একপ্রাণ জননী-চরণ-ছায়।

বাধা যদি আসে তাহে ক্ষতি নাই,
নীরবে আঘাত সহিব সবাই,
মায়ের পতাকা উত্তীত করি
চলিবে সমুখ পথে
সোনার বিজয়-রথে,
রক্ষিত যারা লাঞ্ছিত যারা নিপীড়িত বেদনায়—
তোরা আয়—তোরা আয়।

চিকিৎসা

—শ্রীঅন্নপূর্ণা দেবী

সুবালার দিন আর কাটিতেছিল না। একমাত্র সন্তান নির্ম্মলের আজ দশদিন হইল জ্বর হইয়াছে, জ্বর ক্রমশঃই বাড়িয়া বাঁকা পথে যাইতেছে। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে গ্রামের পরেশ ডাক্তার আসিয়া বলিয়া গিয়াছেন টাইফয়েড। মাথায় বরফ দিতে হইবে এবং ঔষধ-পথ্যের খরচও অনেক হইবে। তিনি না হয় বিনা ফি-তে আসিয়া দেখিয়া যাইতে পারেন, কিন্তু আনুষঙ্গিক অন্যান্য খরচ না করিলে কি করিয়া চিকিৎসা চলিবে?

নির্ম্মলের বয়স যখন এক বৎসর, তখন সুবালার স্বামীর মৃত্যু হয়। শ্বশুর-শাশুড়ীকে সুবালা দেখে নাই। শ্বশুর-গৃহে তাহার স্বামী ব্যতীত আর কেহ ছিলেন না। সুবালার স্বামী স্থানীয় স্কুলে ষাট টাকা বেতনে মাষ্টারী করিতেন। পল্লীগ্রামে এই আয়ে স্বামী-স্ত্রীর ভালই চলিত। মৃত্যুকালে সুবালার স্বামী বিশেষ কিছু রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। মৃত্যুর পর কিছুদিনের মধ্যে সঞ্চিত অর্থ যাহা ছিল ব্যয় হইয়া গেল। তারপর সুবালার যৎসামান্য সোণারূপার অলঙ্কার এবং বাড়ীর আসবাবপত্র যাহা ছিল, বিক্রয় করিয়া আজ পাঁচ বৎসর কোন প্রকারে চলিতেছে। এখন অবশিষ্ট কিছুই নাই, যাহার বিক্রয়লব্ধ অর্থে নির্ম্মলের চিকিৎসার খরচ নির্ব্বাহ হইতে পারে। সুবালা এখন কি করিবে, কি করিয়া ছেলেকে বাঁচাইবে! যাহার একবেলা অন্নসংস্থান সব দিন হইয়া উঠে না, ডাক্তারী চিকিৎসার গুরু ব্যয়ভার সে কি করিয়া বহন করিবে?

আষাঢ়ের দীর্ঘদিনের পর সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেছে। বৈকালবেলার আকাশে যে অল্প মেঘের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা এখন সমস্ত আকাশ আচ্ছন্ন করিয়াছে এবং টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে সুরু হইয়াছে। অন্ধকার ঘরে সুবালা চুপ করিয়া বসিয়া আছে। একদিন আষাঢ়-সন্ধ্যা এমনি নিবিড় করিয়া আসিয়াছিল, সুবালা গৃহে দীপ জ্বালিয়া বাহিরে বসিয়া স্বামীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল এবং একমনে মেঘের মধ্যে বিদ্যুতের ক্রীড়া দেখিতেছিল। স্বামী কখন চুপে চুপে আসিয়া চোখ চাপিয়া ধরিয়াছে। সুবালা হাসিয়া বলিল, "তুমি, ওগো তুমি, আমি চিনেছি।" "সত্যি? আচ্ছা আমার নাম বলত।" "নাম বুঝি করতে আছে? বাঃ, চোখ ছাড় না। এত দেরী করে এলে কেন? আমার বুঝি একা একা ভয় করে না। আচ্ছা বলত আকাশে ওই এত মেঘ কোথা থেকে এল?"

"তুমি না বুঝি কি করে মেঘের সৃষ্টি হয়েছে, সূর্য্যের তাপে সমুদ্র এবং নদনদীর জল বাষ্প হবে",—"থাক্ থাক্ মশাই, ওসব স্কুলের ছাত্রকে বলবেন। কেমন বিদ্যুৎ হচ্ছে দেখেছ। এবার খুব জোরে মেঘ ডাকবে।" সুবালা স্বামীর বুকে মুখ লুকাইল। আজ এই বহুদিন পরে সেই কথা মনে করিয়া সুবালার মনে সত্যই মেঘ ডাকিয়া উঠিল। নির্ম্মল ডাকিল, "মা, মা, জল।"

"এই যে বাবা", একটি দীর্ঘশ্বাস সুবালার অন্তর ভেদ করিয়া বাহির হইয়া আসিল। সুবালা নির্ম্মলকে জল খাওয়াইল।

বাহিরে প্রবলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। জীর্ণ চালের যথা দিয়া ঘরের ভিতর অনেক স্থানে জল পড়িতেছে। একটী কেরোসিনের ডিবে টিপ্ টিপ্ করিয়া জ্বলিতেছে এবং অজস্র ধূমে ঘরের অন্ধকার আরও গাঢ় করিয়া তুলিয়াছে। নির্ম্মল বিকারের ঝোঁকে বলিতেছে, "মা, মা, কে ঘরে এল?" "কেউ নয় বাবা। একটু ঘুমো দিকি, আমি কাছে রয়েছি, ভয় কি?" বলিয়া বলিয়া সুবালা ছেলের মাথায় পাখা করিতে লাগিল।

আরও একদিনের কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল। নির্ম্মল তখন মোটে আট মাসের। শীতের বাদলার সন্ধ্যা। নির্ম্মলের সামান্য সর্দ্দিজ্বর হইয়াছে। গ্রামের ডাক্তার একটু ভয় পাওয়ায় স্বামী তিনক্রোশ দূরবর্ত্তী সহরে গিয়াছেন বড় ডাক্তার আনিবার জন্য। এখনও আসিয়া পৌঁছান নাই।

নির্ম্মল তক্তাপোষের উপর পুরু বিছানায় শুইয়া আছে। গায়ে ফ্লানেলের চিলা জামা। ঘরের একপাশে টেবিলের

উপর টেবিল ল্যাম্প জ্বলিতেছে। খান দুই ভাল চেয়ার তারই পাশে, একটীতে সখী সুপর্ণা বসিয়া আছে। সামনে একটি শেল্‌ফে খানকতক বাঁধান বই। ঘরের একধারে একটি আলমারিতে কতকগুলি পুতুল ও খেলনা সাজান আছে—নির্ম্মলের খেলিবার জন্য সে গুলি সম্প্রতি কেনা হইয়াছে। জানালাগুলিতে নীল রংয়ের পুরু পর্দ্দা দেওয়া এবং ঘরের দেওয়ালে কতকগুলি ভাল ছবি টাঙ্গান আছে। ঘড়িতে সাতটা বাজিল। সুবালা সুপর্ণাকে বলিল—"এখনও ভাই এলেন না। বেলা তিনটার সময় গিয়েছেন। ডাক্তার হয়ত এই বাদলার রাতে আসতেই চাইবেন না।" সুপর্ণা বলিল, "আসবার সময় এখনও যায় নাই। আসবেন নিশ্চয়ই।" এমন সময় ঝি আসিয়া বলিল, "মা, মহদা মাখব? খাবার এখন করবেন—না, বাবু এলে হবে?" সুবালার নির্দ্দেশ দেওয়ার পূর্ব্বে সুপর্ণা বলিয়া উঠিল—"আমাদের বাড়ী থেকে খাবার পাঠিয়ে দেব। এখনি হয়ত ডাক্তার এসে পড়বে। আজ রাতে খাবার হাঙ্গামা করে দরকার নেই ভাই।" সুবালা প্রতিবাদ করিতে যাইতেছিল, এমন সময় মোটরের শব্দ পাওয়া গেল এবং মুহূর্ত্তমধ্যেই ডাক্তারকে সঙ্গে লইয়া তাহার স্বামী প্রবেশ করিলেন।

নির্ম্মল আবার বিকারের ঝোঁকে বকিতে আরম্ভ করিয়াছে। "না মা আমি যাব। ঐ, কে ওখানে দাঁড়িয়ে মা?"

"এই যে আমি। ভয় কি বাবা!"

কিন্তু মুখে ছেলেকে অভয় দিলেও নিজের মধ্যে সে অভয়বাণী খুঁজিয়া পাইতেছিল না এবং যতই রাত্রি গভীর হইতে লাগিল, আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় তাহার সমস্ত দেহমন থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। প্রাণ কেবলই হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া বলিতেছে, "ওগো কোথায় তুমি, কোথায় তুমি! এস ফিরে এস। আমি একা কি করে নির্ম্মলকে বাঁচাব?"

পাশের বাড়ী হইতে মাঝে মাঝে গানের সুর ভাসিয়া আসিতেছে। নিকট অট্টহাস্যের শব্দও মাঝে মাঝে সুবালার কর্ণদ্বয়কে পীড়িত করিতেছে। পাশের বাড়ীতে প্রায়ই গানের জলসা বসে। আজও সম্ভবতঃ তাহাই বসিয়াছে। দুপুরবেলা একবার সুবালা সে বাড়ীতে গিয়াছিল। যদি কোন প্রকারে পাঁচটা টাকা ধার পায়। নির্ম্মলের ঔষধ ও পথ্যের কিছু ব্যবস্থা তাহা হইলে করিতে পারে। সুপর্ণার সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতা একদিন নিবিড় হইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু সুবালার আর্থিক দৈন্য সে ঘনিষ্ঠতা নষ্ট করিয়াছে। সুপর্ণা বলিল, "ভাই টাকাত এখন আমার হাতে নেই। তা ছাড়া আজ অনেকগুলি টাকা খরচও হবে। সন্ধ্যায় কলকাতা থেকে একজন গানের ওস্তাদ আসছেন, তাঁকেই ত কুড়ি টাকা দিতে হবে, যাওয়া-আসার খরচ বাদে, তা ছাড়া জনকতক বন্ধু বান্ধবও আসছেন।" সুবালা সুপর্ণার হাতদুটী ধরিয়া বলিল,—"যদি দুটো টাকাও দিতে পার ভাই, নইলে নির্ম্মলকে হয়ত বাঁচাতে পারব না", বলিয়াই সুবালা মনে পড়িল যে, ফাল্গুন মাসে সে সুপর্ণার নিকট দুই টাকা ধার লইয়াছিল এবং তাহা এখনও পরিশোধ করিতে পারে নাই। সুপর্ণা বলিল—"না ভাই টাকা এখন হাতে নেই।" বলিয়া অন্য ঘরের দিকে চলিয়া গেল। সে এখন সুবালাকে এড়াইয়া চলিতে চায়।

রাত্রি গভীর হইতে গভীরতর হইতেছে। বৃষ্টির বেগও বাড়িয়া চলিয়াছে। জীর্ণ ঘরের ভিতর সমস্তই বৃষ্টির জলে ভরিয়া গিয়াছে। টেবিলের কেরোসিনের ডিবেটী কখন নিভিয়া গিয়াছে। সুবালা ছেলেকে কোলে তুলিয়া লইয়া তেমনি ভাবে বসিয়া রহিল। একবার ডাকিল "নির্ম্মল, বাবা!" ছেলে কোন সাড়া দিল না। মা মনে করিল, ছেলে ঘুমাইয়াছে।

ক্রমে ভোর হইয়া আসিল। বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে। ভাঙ্গা জানালার ফাঁক দিয়া আলো প্রবেশ করিতেছে। পাখীরা কুলায় পরিত্যাগ করিয়া আহার অন্বেষণে বাহির হইয়াছে। তাহাদের কলরবে পল্লীগ্রাম মুখরিত হইয়া উঠিল।

সুবালার একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল। সজাগ হইয়া ডাকিল—"নির্ম্মল বাবা!" সাড়া নাই। ছেলের শ্রীহীন দেহ মাতৃক্রোড়ে তেমনি পড়িয়া আছে।

বাহিরে কাহাদের সাড়া পাওয়া যাইতেছে। বোধ হয় গ্রামা যুবকগণ দল বাঁধিয়া বাহির হইয়াছে। কংগ্রেসের কে যেন আসিবেন। একটী বড় রকমের মিটিং হইবে। তাহারই হয়ত উদ্যোগ-আয়োজন চলিতেছে—"এগার হাজার দুশো টাকা কাল পর্য্যন্ত উঠেছে রে।"

সুবালা তেমনি বসিয়া আছে। দুইটা টাকার অভাবে সে ছেলের অসুখে পথ্যের যোগাড় করিতে পারে নাই। ছেলেকে ভাল করিয়া বুক জড়াইয়া ধরিয়া আবার ডাকিল—"বাবা!"

উরুভঙ্গের পর

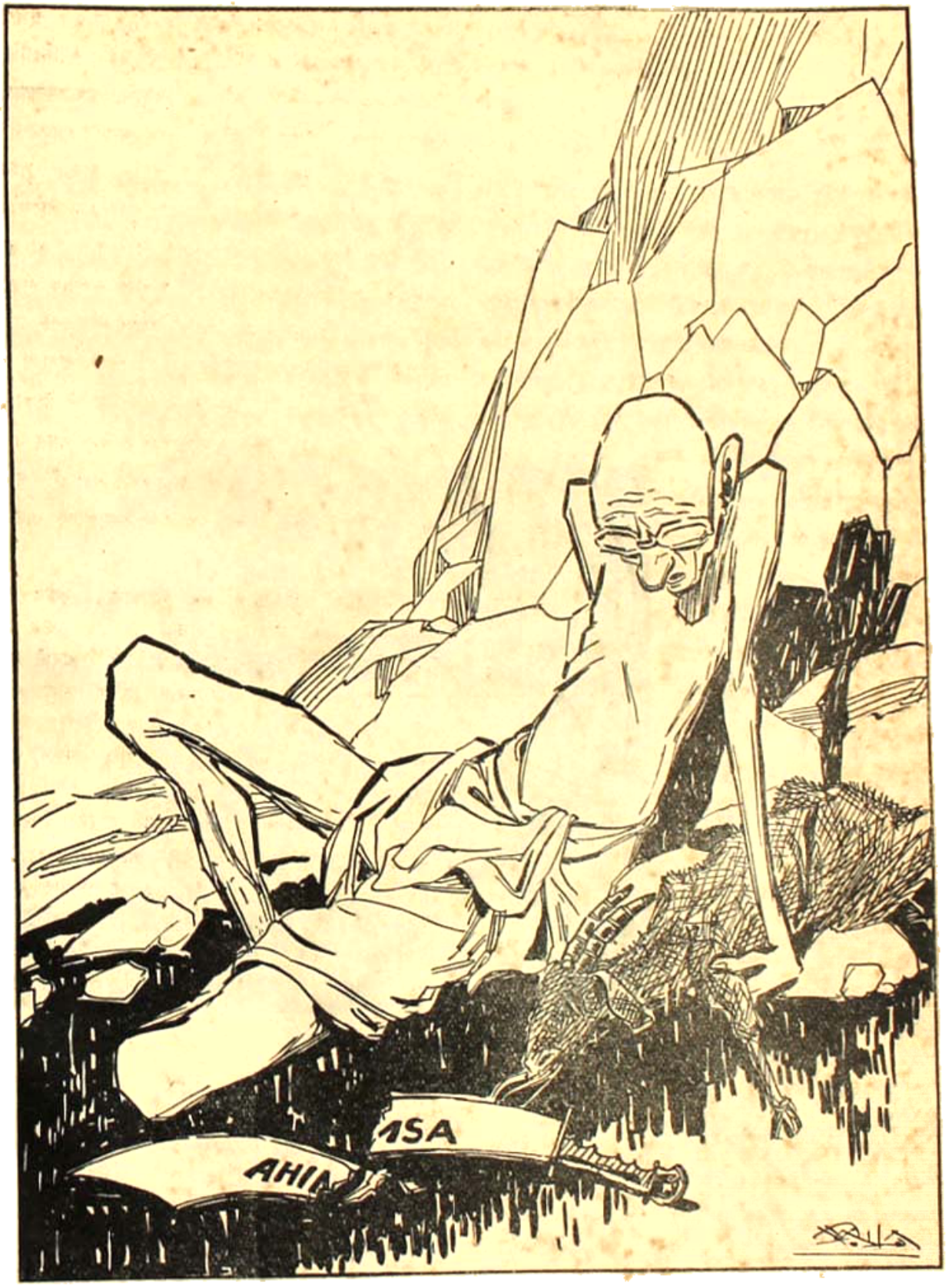

ভারতের পথে

—শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন

২৭শে মার্চ্চ সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় জাহাজ পোর্ট সৈদ ছাড়িয়া সুয়েজ-খাল বাহিয়া চলিল। জাহাজের সামনে একটা সার্চ্চ-লাইট জ্বলিতেছে। খালের ডান দিক্ দিয়া সব জাহাজকে যাইতে হয় বলিয়া বিপরীত দিক্ হইতে আগামী জাহাজকে সাবধান করিবার জন্য জাহাজের বাঁ পা বাহিয়া অনেকগুলা উজ্জ্বল ইলেক্‌ট্রিক আলো জ্বলিতেছে। বিপরীত দিক্ হইতে আগত দুই জাহাজ

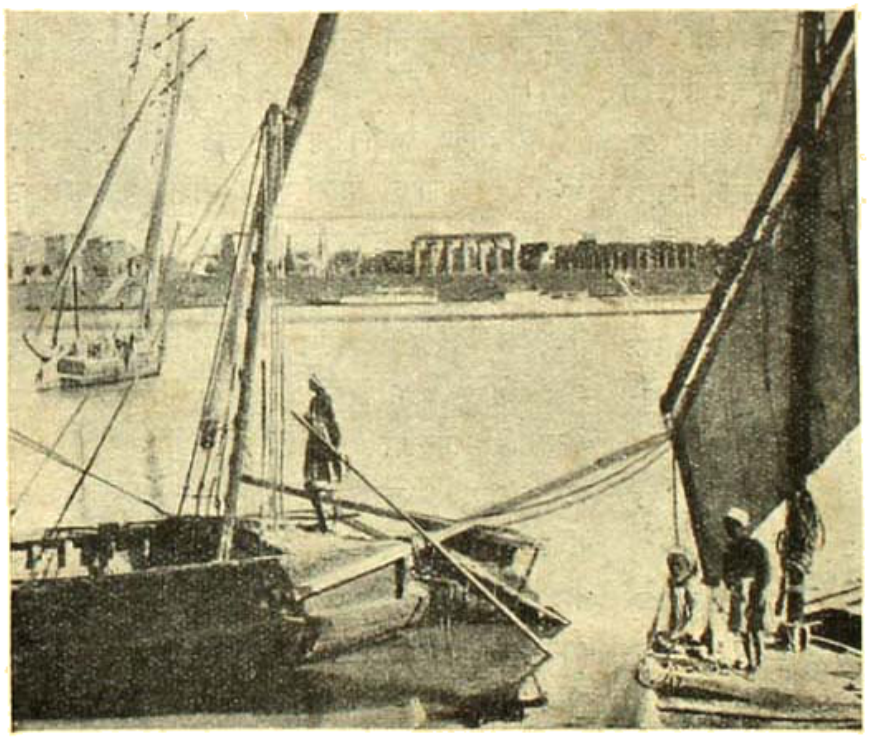

বিশ্বের বীজনদ।

কাছাকাছি হইলে একজনকে পাশে দাঁড় করাইয়া অন্যের পথ করিয়া দিতে হয়। এই siding-এর কাজের জন্য খাল কোম্পানির একজন মাল্লামাঝি দুটা বোট আমাদের ডেকে উঠাইয়া সঙ্গে যাত্রী হইল। জাহাজ সাইডিং করিবার প্রয়োজন হইলে ইহারা নৌকাসমেত নামিয়া পাড়ে উঠিয়া জাহাজ বাঁধিবার কাজ করে, অন্য জাহাজ পার হইয়া গেলে আবার নৌকাসমেত জাহাজে আসিয়া চড়ে। জাহাজ কোন বন্দরে ঢুকিবার বা বন্দর হইতে বাহির হইবার বা সুয়েজ-খাল পার হইবার সময়, কি বা দিন কি বা রাত্রি, অন্য অফিসারের পালা এবং পাইলট থাকা সত্ত্বেও প্রধান দায়িত্ব তাঁহার বলিয়া ক্যাপ্টেনকে স্বয়ং পুরাটা সময় ব্রিজে থাকিতে হয়।

রাত্রে ডিনারের পরই একবার জাহাজকে সাইডিং করিতে হইল। দুইখানা জাহাজ অন্য দিক্ হইতে পার হইয়া গেল। পর দিন সকালে শুনিলাম, মধ্যরাত্রে এক বার পাইলট বদল ও আরও তিন-বার বিভিন্ন সময়ে জাহাজকে সাইডিং করিতে হইয়াছিল।

১৮৫৯ সালে কাজ আরম্ভ হইয়া ১৮৬৯ সালে সুয়েজ-খাল খোলা হয়। খাল নির্ম্মাণে এক কোটি চল্লিশ লক্ষ পাউণ্ড খরচ হয়। কোম্পানীর মূলধন সংগ্রহ হয় শেয়ার বিক্রয় করিয়া: প্রায় অর্দ্ধেক শেয়ার ফ্রান্সে বিক্রয় হয়, বাকি অর্দ্ধেকের অধিকাংশ কেনেন মিশরের তদানীন্তন রাজপ্রতি-নিধি মহম্মদ সৈদ। ইঁহারই নামানুসারে বন্দরের "পোর্ট সৈদ" নামকরণ হয়। পরবর্ত্তী কালে মহম্মদ সৈদ তাঁহার শেয়ারগুলি বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের কাছে বিক্রয় করেন। কোম্পানীর ব্যাপারে সে জন্য ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের এত ক্ষমতা। সুয়েজ-খালের পরদারির জন্য কোম্পানীকে ইঞ্জিনিয়ার, যন্ত্রপাতি, মালমশলা, কুলিমজুর প্রভৃতির জন্য অনেক পয়সা খরচ করিতে হয়। জাহাজ

পারাপারের সময় কোন দুর্ঘটনা বা গণ্ডগোল-বিপদাদি যাহাতে না হয়, তাহার ব্যবস্থার জন্যও অনেক সাবধানতা অবলম্বন ও পয়সা খরচ করিতে হয়। এই সবেরই খরচ উঠে পারাপারী জাহাজগুলির উপর মাশুল বসাইয়া। এই মাশুল এত চড়া যে সব খরচ পোষাইয়াও গত বৎসর কোম্পানী যে লাভ করিয়াছিলেন, তাহা হইতে অংশীদারদের ২৪০% ডিভিডেণ্ড দেওয়া হইয়াছে। সুয়েজ ক্যানাল স্পেশালীর শেয়ার এমন লাভজনক জিনিষ বলিয়া বাজারে তাহা কদাচিৎ কিনিতে পাওয়া যায়। সুয়েজ খালের মত সামরিক ও বাণিজ্যিক প্রয়োজনে মূল্যবান্ পথের উপর ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের একচেটিয়া অধিকারের জন্য অন্য অনেক দেশ হিংসান্বিত। জাহাজ পারাপারের চড়া মাশুলের বিরুদ্ধেও স্বভাবতঃই অন্য অনেকের আক্রোশ, কারণ ইহাতে লাভবান্ হয় ইংরেজ ও ফরাসীরা মাত্র। সেদিন বেতারে খবর পাইলাম যে, ফাশিষ্ট দলের বিংশতিতম জয়ন্তী উপলক্ষে 'ডুচে' মহাশয় উচ্চ কণ্ঠে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ডেমোক্রাটিক দেশগুলিকে উদ্দেশ করিয়া যে দাবীগুলি ঘোষণা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে একটি হইতেছে সুয়েজ খালের মাশুল হ্রাস। খালের প্রবেশপথে ইঞ্জিনিয়ার 'দ্য লেসেপ্সে'র যে প্রতিমূর্তি দণ্ডায়মান, তাহাতে খালনির্মাতা দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করিয়া যাত্রীকে খালের পথ দেখাইতেছেন। অনেকের মতে এই প্রসারিত হাতের অর্থ "পয়সা দাও!"

সুয়েজ-খাল দৈর্ঘ্যে ৯০ মাইল এবং প্রস্থে ১০০ হইতে ১৭৫ গজ। খালে চলিবার সময় কোন জাহাজের ঘণ্টায় ৯ মাইলের বেশী বেগ নিষিদ্ধ।

পরদিন সকালে উঠিয়া দেখিলাম জাহাজ খালের প্রায় শেষ প্রান্তের "তিক্তহ্রদ Bitter Lake" নামক অংশে চলিতেছে। যে পথে খাল কাটা হইয়াছে, সে পথে আগে মধ্যে মধ্যে লবণ-হ্রদের মত আবদ্ধ জলাভূমি ছিল, ইহারই একটা বড় অংশের নাম "তিক্তহ্রদ"। আমাদের পিছনেই দেখিলাম একটা দৈত্যাকার ফরাসী প্যাসেঞ্জার জাহাজ, তাহার পিছনে একটা "ট্যাংকার" (অর্থাৎ পেট্রোল বা তদনুরূপ দাহ্য দ্রবপদার্থবাহী জাহাজ), এবং তাহারও পিছনে আর একটা জাহাজ আসিতেছে। খালে পিছনের জাহাজ অন্যকে আগাইয়া যাইতে পারে না, সকলে এক সারিতে যাইতে বাধ্য। রাত্রের মধ্যে ঐ ট্যাংকারটা আসিয়া আমাদের পিছন ধরায় আমাদের একটা উপকার হইল। সাধারণতঃ ইউরোপের যে জাহাজ হোম-পোর্টে ফিরিতেছে, তাহার জন্য প্রাচ্য-পোর্ট-গামী জাহাজকে এবং ডাক বা প্যাসেঞ্জারবাহী জাহাজের জন্য কারগো-জাহাজকে পথ ছাড়িয়া দিতে হয়, কিন্তু ট্যাংকারে বিপজ্জনক দাহ্যপদার্থ থাকার দরুণ সকলেই তাহাকে পথ ছাড়িয়া দিয়া শীঘ্র পার করাইয়া দেয়। এটা অবশ্য ওর বা কৌলীন্যের প্রতি সমাদরপ্রসূত শ্রদ্ধা নয়, দুষ্টের দ্বারা ক্ষতি হইবার ভয়জাত সাবধানতা। অনতিপশ্চাতে ট্যাংকার থাকার ফলে আমাদের আর সাইডিংএ যাইতে হইল না, অন্য খান-তিনেক জাহাজ সাইডিংএ গিয়া আমাদের পথ ছাড়িয়া দিল।

জার্মানির কাছাকাছি ও তার পর ইউরোপীয়ান জলেও দেখিয়াছি আমাদের, জাহাজ মাত্র "হাপাগ" কোম্পানীর জাহাজকে "ডিপ" করিত। এখন দেখিতেছি, সব জার্মান জাহাজই কোম্পানি-নির্বিশেষে পরস্পরকে "ডিপ" করিতেছে। বিদেশে গেলে সকলেরই স্বদেশীয়ের প্রতি প্রীতি ও আত্মীয়তা বাড়ে। ভারতীয়রা ছাড়া। এ কথাটা অনেকদিন ইউরোপে থাকিয়া 'সাহেব' হইবার ফলে নয়, পরন্তু বহু স্থলে ভারতীয়দের অভিজ্ঞতার ফলে বলিতেছি। খালে পর পর তিনটি ইটালিয়ান জাহাজ পার হইলাম, তাহার মধ্যে "কন্তে রোসসো" নামক একটি জাহাজে অনেক ভারতীয়েরা ইউরোপ গতায়াত করিয়া থাকেন। প্রথম ইটালিয়ান জাহাজ ও আমাদের জাহাজ খুব ঘটা করিয়া পরস্পরকে "ডিপ" করিল, উহাদের অফিসার ও নাবিকেরা ভীড় করিয়া ডেকের উপর জড় হইয়া দক্ষিণদেশ-সুলভ উচ্ছ্বাসের সঙ্গে তুমুল কোলাহল করিয়া হাত তুলিয়া আমাদের ফাশিষ্ট সেলাম জানাইয়া নিজেদের অর্ধ ওয়িয়েন্টাল প্রকৃতির পরিচয় দিলেন। পরে ক্যাপ্টেনকে সহজ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি জার্মানেতর জাহাজকে "ডিপ" করিলেন কেন? ক্যাপ্টেন বলিলেন, "দেখিলাম, উহারা আগে হইতেই নিশান তুলিয়া প্রস্তুত হইয়াছে, এটা বন্ধুত্বের

নিদর্শনজ্ঞাপক ; বিশেষতঃ পিছনের ঐ ফরাসি জাহাজকে দেখাইলাম যে,তাহার অত নিকট উপস্থিতি সত্ত্বেও বার্লিন-রোম অ্যাক্সিস কেমন বলবান!" ক্যাপ্টেন ও অন্য অফিসারেরাও এ জাহাজে সবাই তীব্র জাতীয়তাবাদী সোশ্যালিষ্ট, ঐ জাতীয় প্রসঙ্গ উঠিলে খুব সাবধানে আউ-ঘাট বাঁচাইয়া কথাবার্ত্তা চালাইতে হয়।

সেবারে সুয়েজ বন্দরে জাহাজ হইতে নামিয়া কায়রো দেখিতে গিয়াছিলাম বলিয়া খালের মধ্য দিয়া যাইতে না পারায় মনে দুঃখ ছিল। এবারে সে দুঃখ মিটিল। খালের দুইধারে অতি সান্নিধ্যে পাড়, তাহার উপর মধ্যে মধ্যে

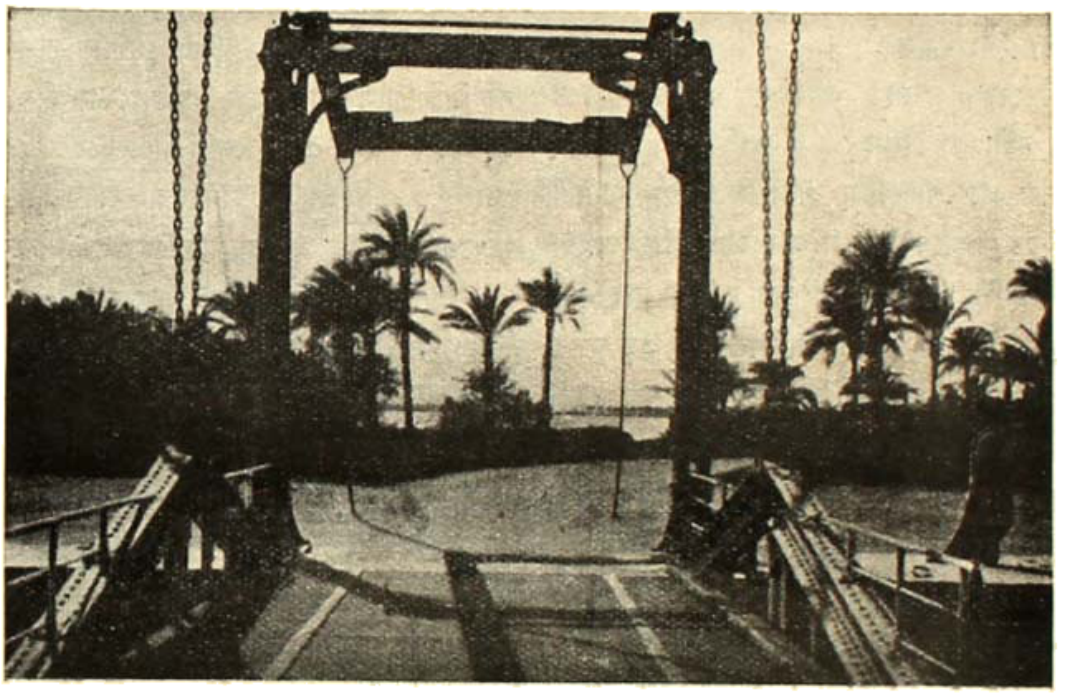

সুয়েজখালের তীরস্থ মরুভূমি। ওয়েসিস।

মোটর চলিতেছে। মরুময় ভূমির মধ্যে এখানে ওখানে একটু হরিৎ শষ্পবেষ্টিত খালের ষ্টেশনগুলি। মেডিটেরেনিয়ানের অন্তহীন জলমরুতে যে প্রাণ শুকাইয়া উঠিয়াছিল, এই শুষ্ক ভূখণ্ডের নিকট দৃষ্টিতে তাহাতে আবার সরসতার সঞ্চার হইল। বেলা সাড়ে ৬টায় সুয়েজ বন্দর পার হইলাম। এখানে জাহাজ না থামিয়া মাত্র গতিবেগ হ্রাস করিল। খাল কোম্পানীর মাল্লামাঝিদের নৌকাসমেত জলে নামাইয়া দেওয়া হইল। একটি বোটে কোম্পানীর এজেন্টের লোক আসিলেন, ডাকে দিবার চিঠিপত্রাদি জাহাজ হইতে লইয়া গেলেন, পাইলটও ঐ বোটে বিদায় লইলেন। জাহাজ সারাদিন গালফ অভ সুয়েজে চলিল। এ সাগর খর-পরিসর, উভয় তীরে বালুকাময় মরুভূমি ও গৈরিক বর্ণের পাহাড়ের রাশি। সেবারে জুলাই-এর দারুণ গ্রীষ্মে এ অংশটায় দারুণ বিরক্তি বোধ হইয়াছিল, এবারে এগুলি মেডিটেরেনিয়ানে অসীমোপলব্ধির শান্তির পর বিদিদত্ত বরের মত পরিতোষ জন্মাইল। অফিসারেরা সবই কিন্তু বলিতেছেন যে, সারাদিন বালি দেখিয়া দেখিয়া তাঁহাদের চোখ কানা হইবার মত হইয়াছে। এই জলচরীভূত দ্বিপদদের কচিৎসংশ ও প্রকৃতিবিপর্য্যয়ে ইহাদের প্রতি অনুকম্পা বোধ করিলাম।

নিরন্তর জলবিহারে সুদুর্লভ মনুষ্যজন্মের এমনই অপব্যবহার ইহারা করিয়াছেন যে, ক্যাপ্টেন বলিলেন, প্রায় ছত্রিশবার পোর্ট সৈদ পার হইলেও ডাঙ্গায় নামিয়া সহর দেখার ইচ্ছা তাঁহার হয় নাই, বলিলেন, তাঁহার একটি ভাইপো একবার ডাঙ্গায় নামিয়াছিল, তাহার মুখে শুনিয়াছেন যে ভারি পাজি জায়গা। আর একটি অফিসার বলিলেন, তিনি আঠার বার কলম্বো দিয়া গিয়াছেন,

কিন্তু নামিয়া সহর দেখেন নাই। সুদীর্ঘ সমুদ্রযাত্রায় কত দেশের কত বন্দর পার হইয়া যাইব এই আশায় জাহাজের ক্যাবিনে "সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু", কিন্তু আটলান্টিক-মেডিটেরেনিয়ানের সীমাহীন জলরাশির বিস্তারে সে আশায় 'বজ্র' পড়িয়া গেল! আমার যথেষ্ট হইয়াছে। ইহাঁরা পেনাং হাইকং যথা ইচ্ছা গিয়া মরুন, আমাকে কলম্বোতে নামাইয়া দিলে বাঁচি—

"ত্রেঃ বরঞ্চো বিভবঃ পরদর্শনাৎ অসন্দিগ্ধাৎ।"

এইবার East of Suez চলিতেছি। দুঃখের বিষয় জাহাজে ইংরেজ যাত্রী কেহ নাই, নতুবা সুয়েজ পার হইলেই তাঁহাদের যে ভাব পরিবর্ত্তনের কথাটা খ্যাত আছে, সেটা দেখা যাইত।

ক্যাপ্টেনদের কাছে একদিন কায়রোর পথে মরুভূমিতে মরীচিকা দেখার গল্প বলিয়াছিলাম। গালফ্ অভ সুয়েজে প্রবেশের কিছু পরে ক্যাপটেন আসিয়া ক্যাবিন হইতে আমাকে ডাকিয়া জাহাজের পিছনে লইয়া গিয়া দূরবীণ দিয়া আমাদের পিছনে দূরে যে জাহাজটা আসিতেছিল, সেটাকে দেখিতে বলিলেন। এত দূরের জাহাজের সাধারণতঃ মাত্র উপরের দিকের ফানেল, মাস্তুল প্রভৃতিই চক্রবাল রেখার উপর অস্পষ্ট দেখা যায়, কিন্তু এক্ষেত্রে দেখিলাম আলোকরশ্মির তির্য্যক্ গতির ফলে পুরা জাহাজটা দিগন্তরেখারও কিছু উপরে দেখা যাইতেছে।

২৮শে মার্চ্চ রাত ২টার পর জাহাজ গালফ্ অভ সুয়েজ হইতে লোহিত-সাগরে পড়িল। ২৯শে মার্চ্চ সকালে কাছাকাছি দুটী দ্বীপ দেখিলাম, ইহাদের নাম The Brothers Islands। একটা দ্বীপ বড় ও বাকিটা ছোট, বড়টার উপর একটা লাইট-হাউস আছে ও লোকজনের বাড়ী-ঘর দূরবীণে বেশ স্পষ্ট দেখা গেল। জাহাজের লোকে দূরে একটা সামান্য ছোট জিনিষ দেখিয়া পরে আগাইয়া সেটাকে বাস্তবিক একটা বৃহদাকার কিছু বলিয়া দেখিতে অভ্যস্ত। এই অভ্যাসের ফলে ছোট কিছু দেখিলেই ইহারা মনে করে, ওটা নিশ্চয় আসলে একটা বড় কিছু, দূরত্ববশতঃ ছোট দেখাইতেছে। দূরবীণে দ্বীপ দেখিতে দেখিতে ক্যাপটেন বলিলেন, "দ্বীপের পিছনে একটা এয়ারোপ্লেন যেন দেখা যাইতেছে," পরমুহূর্ত্তেই সেটা কোথায়ও আর না দেখিতে পাইয়া বলিলেন, "ওটা কি তবে একটা পাখী ছিল?" দ্বীপ-দ্বয়ের ছোটটি একেবারে সমতল ও রিক্ত, ওখানে একটা কুটীর বাঁধিয়া দিনকতক থাকিতে পারিলে বেশ হইত।

রেড-সীতে বেশ গরম বোধ হইতেছে। সবাই ইউরোপীয় শীতের কাল কাপড় ছাড়িয়া টুপিকালে সাদা কাপড় পরা গিয়াছে। পোর্টহোল খুলিয়া বায়ুসেবনের প্রয়োজন হইয়াছে। সকালে শীতল সমুদ্র-জলের শাওয়ার-বাথ লইলাম। ৩০শে মার্চ্চ ভোর বেলায় কর্কটক্রান্তি অতিক্রমের পর আরও গরম বাড়িল, নিরন্তর স্বেদনির্গম আরম্ভ হইল। সেলুনে ও ক্যাবিনে ফ্যান লাগাইয়া দিয়া গেল। পথে এ পর্য্যন্ত সামুদ্রিক গাল পাখী ছাড়া অন্য কোন জীব দৃষ্টিগোচর হয় নাই। এখন প্রায়ই জেলি-মাছের শ্রেণি দেখা যাইতেছে ও শুশুকের মত নিরন্তর লাফাইয়াই আবার ডুবিতেছে। একরূপ একদল মাছ জাহাজের সঙ্গে চলিল। এগুলার দেহটা হ্রস্ব ও পুষ্ট এবং মাথাটা ছুঁচল বলিয়া ইহার জার্ম্মান নাম "শূকর-মৎস্য।" এই দিন বেলা ৯টার সময় কলিকাতার ল্যাটিট্যুড অতিক্রম করিলাম। সন্ধ্যা ৬টার সময় জাহাজ মক্কা তীর্থের পথ জিড্ডা বন্দর পার হইল, যদিও এতটা মধ্যসাগর দিয়া আমরা যাইতেছি যে, বন্দরের কিছুই দেখা গেল না। জাহাজের লোকরা ডাঙ্গা সম্বন্ধে এমনই অজ্ঞ যে, আশ্চর্য্যের বিষয় যে, কখনও এখানে আসেন নাই বলিয়া এবং তাঁহাদের সামুদ্রিক ম্যাপে পরিষ্কারভাবে ইহার অবস্থিতি প্রদর্শিত হইলেও এমন কি ফার্ষ্ট অফিসার পর্য্যন্ত এ প্রসিদ্ধ বন্দরটার নামও জানিতেন না। ইনি অথচ একবার একটা পুরা মাস রেড-সীর উপর কাটাইয়াছিলেন।

জাহাজের অফিসার হইতে হইলে যে সব পরীক্ষা পাশ করিতে হয় সে সব পরীক্ষা বেশ কঠিন; গণিত, ফিজিক্স, নৌ-চালন বিদ্যা, বিদেশী ভাষা প্রভৃতি অনেকগুলি বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হয়। কিন্তু জার্ম্মান শিক্ষাপ্রণালীর একটা মজ্জাগত দোষ এই যে, ইহাতে বহু বিষয়ে বহু তথ্য আহরণ করিলেও ছাত্রের কিন্তু চোখ কান যেন খুলে না, মনুষ্যত্বের বিকাশ হয় না। সাধারণতঃ

এটা নির্দ্বিধায় বলা যাইতে পারে যে, একটি ইংরেজ ছাত্রের সঙ্গে সমবয়সী জার্ম্মান ছাত্রের তুলনা করিলে দেখা যায়, পুঁথিগত বিদ্যায় এবং যাহা পড়িয়াছে, বাস্তবিকই তাহাতে প্রবেশ লাভ করায় জার্ম্মান ছাত্র ইংরেজ অপেক্ষা বহু অগ্রসর, কিন্তু ইংরেজ ছাত্রের যেমন চোখ কান-খোলা, দেশকাল-পাত্রাপাত্রভেদে পারিপার্শ্বিক অনুযায়ী কর্ম্মশক্তি, নূতন অজ্ঞাতকে সহজেই পুরাতন জ্ঞাতের বলে অভিভব করিবার শক্তি, এগুলির দুরুহ জার্ম্মানদের হয় না। বহু-

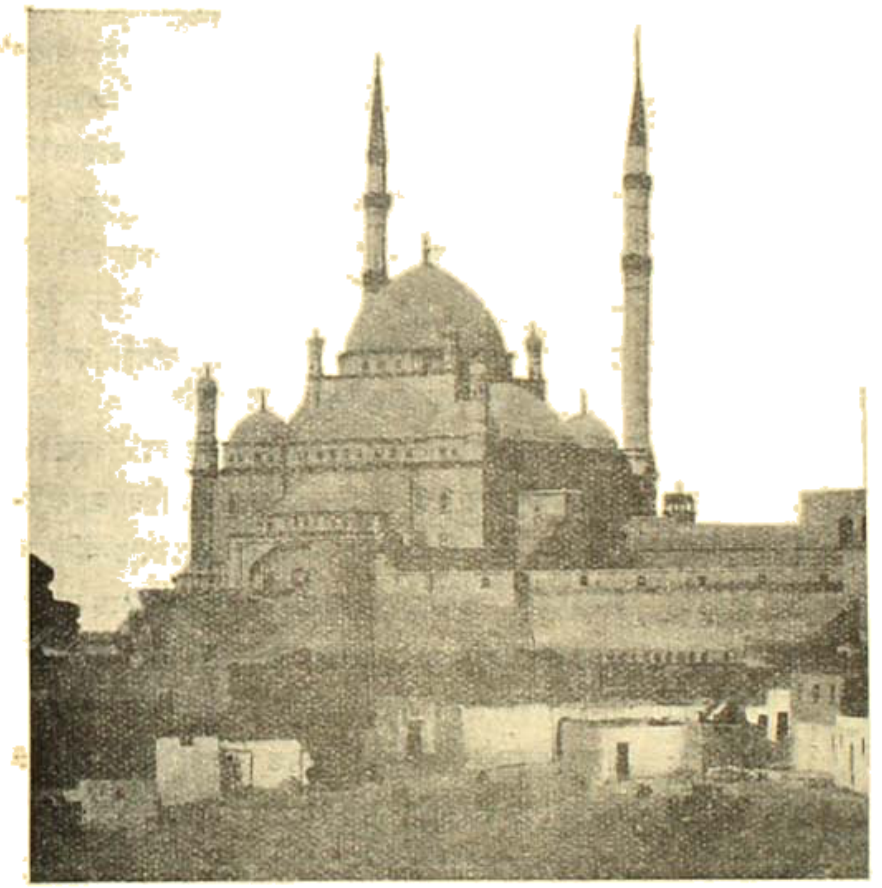

কায়রোর প্রসিদ্ধ প্রাচীন দুর্গ ও মসজিদ।

জ্ঞান লাভ করিয়াও জার্ম্মানরা অনেক বিষয়ে অবোধ বালকের মত থাকিয়া যায়, ঠিক মানুষ হয় না। যুদ্ধের পর জার্ম্মানরা তাহাদের এই ত্রুটি বিষয়ে সজাগ হইয়াছে; বিলাতি শিক্ষায় মনুষ্যত্বলাভে যে উন্মেষ হয় সেটার সূত্র আবিষ্কারে আজকাল জার্ম্মানদের খুব চেষ্টা। তারপর, খুব বুদ্ধিমান বা ভদ্রঘরের ছেলেরা নিশ্চয়ই জাহাজের চাকরিতে ঢুকে না, অন্ততঃ সওদাগরি জাহাজের কাজে নিশ্চয়ই না। জার্ম্মান নৌবাহিনীর কোন অফিসারদের সঙ্গে আলাপের সুযোগ হয় নাই। ডাবর্গে জার্ম্মান শিখিতে আসিয়াছে এমন একদিক ইংরেজ ছোকরা নেভি-অফিসারদের সঙ্গে আলাপে দেখিয়াছি তাহারা খুব চৌকস শিক্ষা পায় এবং অন্য বহু বিষয়ের মত এক্ষেত্রেও ইংরেজ জার্ম্মানের চেয়ে শ্রেয়। একটি করাসি নাম্য অফিসারের সঙ্গেও পরিচয় হইয়াছিল, দেখিলাম জ্ঞাতের পরিধিতে জার্ম্মানের চেয়ে কোন অংশে হীন নয় এবং বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য ও ক্ষিপ্রতা ইংরেজকেও হার মানায়।

মেঠো জলের মধ্যে লোকালয়-সংস্পর্শবর্জ্জিত ভাবে একটা লৌহকাঠিন্য নিকটাকার পদার্থের উপর ও শুটিকত নরপশুতুল্য নাবিকদের উপর সর্দ্দারি করিয়া জাহাজের লোকে বোধ হয় একটু কেঠো ও গোঁয়ার-প্রকৃতি হইয়া পড়ে। সওদাগরি জাহাজে যাইতেছি শুনিয়া প্রফেসার শুব্রিং গল্প করিলেন যে, বার্লিনের প্রাক্তন সংস্কৃতাধ্যাপক প্রোফেসার ল্যুডার্স ভারতে গতায়াত করিয়াছিলেন জার্ম্মান সওদাগরি জাহাজে। ফিরিবার পথে বে-অফ বিস্কে পার হইবার সময় দেখা গেল, ব্রেকফাষ্টের সময় জ্যাম রোজই কম পড়িতেছে। কয়েকদিন ইহা দেখিয়া ল্যুডার্স ও তাঁহার সঙ্গী যাত্রীরা ষ্টুয়ার্ডের দৃষ্টি এ বিষয়ে আকর্ষণ করিলে ষ্টুয়ার্ড দ্বিতীয় অফিসারকে জানাইতে বলিল। দ্বিতীয় অফিসার ফার্ষ্ট অফিসারকে ও ফার্ষ্ট অফিসার ক্যাপটেনকে জানাইতে বলিলেন। ল্যুডার্স্‌রা অতি বিনীত ও মোলায়েম ভাবে ক্যাপটেনকে বলিলেন, "হের কাপিটেন্, আমাদের দীর্ঘ জলযাত্রা তো শেষ হইয়া

আসিতেছে।" ক্যাপ্টেন একথা স্বীকার করিলে তাঁহারা বলিলেন, অনেক লক্ষণেই এটা বুঝা যাইতেছে, এবং জ্যাম কম পড়ার কথাটাও প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিলেন। ক্যাপ্টেন ইহাতে মহা রাগান্বিত হইয়া সক্রোধে গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, আমার জাহাজের বিরুদ্ধে অভিযোগ? দূর হইয়া যাও আমার জাহাজ হইতে! এখনই নামিয়া যাও জাহাজ হইতে!" সুতরাং তাঁহারা অ্যাণ্টওয়ার্পে নামিয়া পড়িয়া মক্কা জাহাজে পরে হাম্বর্গে পৌঁছিয়াছিলেন।

রেড-সীতেও একঘেয়েমির পালা সুরু হইবার উপক্রম হইয়াছে, এমন সময়ে ৩১শে মার্চ্চ বৈকালের দিক্ হইতে বায়ুবেগ প্রবলভাবে বাড়িয়া গেল। অ্যাটলাণ্টিক-মেডিটেরেনিয়ানে এই হাওয়াতে সাগর অচিরেই রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিতেন, কিন্তু স্বল্পপরিমিত রেড সীর শক্তি কম, তবুও প্রচুর লণ্ডভণ্ড-তাণ্ডবে কর্ম্মে অনিচ্ছুক অলস ও দুর্বল দাসবৃন্দের মত তরঙ্গগুলি উঠি-উঠি করিয়াও বিশেষ উৎসাহ সংগ্রহে সক্ষম হইল না, যদিও চেষ্টার ত্রুটি নাই। এদিকে বায়ুবেগ বাড়িয়াই চলিয়াছে, জাহাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ইহার তীব্র আক্রোশ নিনাদিত হইতেছে। নিরন্তর নির্দ্দয় তাড়নায় শক্তিহীনও বাঁকিয়া বসে, ১লা এপ্রিল সকালে দেখিলাম, নির্ম্মেঘ আকাশে ভাস্বল্যমান ট্রপিক্যাল সূর্য্য, আর নীচে ক্রমবর্দ্ধিতবেগ সুতীক্ষ্ণ কষাঘাতের নিষ্ঠুর কষাঘাত-লাঞ্ছিত ফেনায়িত-মুখ তরঙ্গগুলির হিংস্র পশুপালবৎ ক্ষিপ্ত রোষ। গতিমান ঢেউগুলার শীর্ষদেশ জাহাজে ধাক্কা খাইয়া যখন শতধা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে, তখন সেই শীর্ষ-প্রসারী লঘু জলকণানিচয়ের উপর সূর্য্যকিরণসম্পাতের ফলে প্রকাশিত রামধনুর ক্ষণমাত্রস্থায়ী বর্ণবিহরণ দেখিয়া বায়ু-কষাঘাত-কণ্টকিত সমুদ্র-শরীরে রোমাঞ্চ প্রকাশের উপমা মনে আসিল। হাওয়ার প্রচণ্ড প্রকোপে বাহিরে দাঁড়ান কষ্টসাধ্য, তবু ডাঙ্গার খবর পাইলেই বাহিরে ছুটিতাম। মধ্যে কয়েকটা নগ্নদেহ প্রস্তরসর্ব্বস্ব দ্বীপ দেখা গেল। হাওয়া ও ঢেউ ঠিক সামনে হইতে আসিতেছে বলিয়া জাহাজের গতি ঘণ্টায় প্রায় ৩ নট্ কম হইতেছে।

২রা এপ্রিল প্রত্যূষে জাহাজ রেড-সী হইতে গালফ্ অভ এডেনে পড়িল। এই দুই সাগরের সংযোগস্থলে "বাবেল্-মেণ্ডেবে"র কাছে পেরিম নামক দ্বীপটি বৃটিশের অধিকারে ও আগে এডেনের মত রাজনৈতিক হিসাবে ভারতের অন্তর্গত ছিল। আমাদের বড়লাট সাহেবরা এডেন হইতে রাজকীয় সেলাম পাইতে আরম্ভ করেন। ৪ঠা এপ্রিল ভোরে গালফ্ অভ এডেন হইতে ভারত মহাসাগরে পড়িলাম। এ কয়দিন যে জোর হাওয়া সামনে হইতে বহিতেছিল এখন তাহার বেগ মন্দ হইয়াছে। দুপুর বেলায় দূরে সোকোত্রা দ্বীপ দেখা গেল, ইহা এখন এডেনের অন্তর্গত। কাছে আরও অনেক দ্বীপ দেখিলাম, ইহাদের মধ্যে দুটির নাম আবার The Brothers; গুনিলাম পরস্পরের কাছাকাছি কয়েকটা প্রস্তরময় দ্বীপ থাকিলেই তাহাদের নাম সাধারণত "ব্রাতৃবৃন্দ" বা "ব্রাতৃগণ" দেওয়া হয় এবং এই নামধারী দ্বীপপুঞ্জ সব সাগরেই আছে। ভারত মহাসাগরের জল অপেক্ষাকৃত কম ঠাণ্ডা বলিয়া কাছিম, উড়ুক্কু মাছ প্রভৃতি প্রায়ই দেখা গেল।

২১শে মার্চ্চের পর হইতে মার্ত্তণ্ডদেব বিষুবরেখা হইতে ক্রমাগত কর্কট-ক্রান্তির দিকে আগাইয়া আসিতেছেন। আমরাও কর্কটক্রান্তি হইতে বিষুবরেখার অভিমুখে চলিয়াছি। সূর্য্যের সান্নিধ্য বেশ বুঝা যাইতেছে তাহার তাপ ও চারিদিকের উজ্জ্বলতা হইতে। আকাশের বর্ণ নীল ছাড়িয়া ক্রমে ধূসর হইয়া উঠিতেছে। দেশে আমরা আকাশের এই ধূসর বর্ণে অভ্যস্ত বলিয়া প্রথম ইটালির নীলাকাশ দেখিতে অত মনোরম বোধ হইয়াছিল। এখন শুক্লপক্ষ চলিতেছিল, কিন্তু পর পর কয়েক সন্ধ্যা প্রতীক্ষা করিয়াও চন্দ্রোদয়-মুহূর্ত্তটি দেখিতে পারিলাম না, কারণ সন্ধ্যাক্ষণে দিগন্তে খণ্ডমেঘযূথ সমুদ্ভূত হইয়া সদ্য-সমাগতপ্রায়া দিবাকর-মহিষীর প্রথম প্রকাশটি লোকচক্ষু হইতে সঙ্গোপনের জন্য চেড়িবৃন্দের মত চন্দ্রমামুখে অবগুণ্ঠন টানিয়া দিল। কিন্তু জ্যোৎস্নাবিধৌত আকাশে যে রাত্রে পূর্ণিমার প্রকাশ হইল, তাহা দেখিয়া নিশাকান্তের পূর্ব্ব-পরিচিত মূর্ত্তিটি মনে পড়িল, কারণ ইউরোপে তাঁহার যে মূর্ত্তিটি দেখা যায়, তাহা প্রায় কান্তিহীন।

ভারত মহাসাগর এ কয়টা দিন বেশ শান্ত থাকিলেন।

মহা-জননী এখন বৃদ্ধাবস্থিত মার্ত্তণ্ড পুরোহিতের অগ্নিমন্ত্রে দগ্ধ হইয়া "মনুষ্যত্বের" শক্তিরূপ সাধনব্রতে তপঃক্লিষ্টা; দেশ-প্রত্যাগামী অধম সন্তানকে মাতা কি উপেক্ষা করিয়া তর্জ্জন-গর্জ্জনের উপযুক্ত বোধ করিলেন না, না মাত্র নিরপেক্ষ সহিষ্ণুতা দেখাইয়া কিঞ্চিৎ অভয় প্রদান করিলেন!

৮ই এপ্রিল দুপুর রাত্রের পর লক্ষদ্বীপ ও মলয়দ্বীপের* মধ্যবর্ত্তী মিনিকে দ্বীপ পার হইলাম, যদিও লাইট-হাউসের আলোটি ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না। দেশের অনেকটা কাছে আগাইয়া আসা গিয়াছে, যদিও বাহতঃ তাহা অনুভব হইতেছে না। আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে কোনও দেশের জাহাজ যেখানেই থাকুক না কেন, সেই দেশের ভাসমান অংশ বলিয়া বিবেচিত হয়। এই বিধান অনুসারে জার্ম্মান জাহাজে বসিয়া দেশের এত কাছে বসিয়াও মনে হইতেছে যেন জার্ম্মানীতেই আছি; সঙ্গীরা জার্ম্মাণ, কথাবার্ত্তার ভাষাও জার্ম্মাণ হওয়ায় এ মোহটি আরও দৃঢ় হইতেছে এবং পারিপার্শ্বিকে এ মোহ ভাঙ্গাইবার এখনও কিছু উপস্থিত হয় নাই। ৯ই এপ্রিল ইস্টার রবিবার, ব্রেকফাষ্টে জার্ম্মান প্রথায় রং করা ডিম দেওয়া হইল।

যাত্রা শেষ হইয়া আসিতেছে। ফার্ষ্ট অফিসারকে জিজ্ঞাসা করিলাম—ব্রেমেন ছাড়ার পর জাহাজে আমরা কলম্বো পৌঁছান পর্য্যন্ত কতটা জলপথ অতিক্রম করিলাম বলিয়া ধরিব। ফার্ষ্ট অফিসার জাহাজের বইপত্র ঘাঁটিয়া একটা ফর্দ্দ লিখেন, যথা:—

ব্রেমেন হইতে "ভেজের" নদী বাহিয়া উত্তর সাগর পর্য্যন্ত	৭১ নট্
উত্তর-সাগর বাহিয়া "শেল্‌ডে" নদীর মুখ পর্য্যন্ত	২২৫ "
"শেল্‌ডে" নদী বাহিয়া অ্যান্টওয়ার্প পর্য্যন্ত	৬৮ "
অ্যান্টওয়ার্প হইতে শেল্‌ডে-নদী বাহিয়া আবার উত্তর-সাগর পর্য্যন্ত	
শেল্‌ডে-নদীর মুখ হইতে উত্তর-সাগর, ইংলিশ চ্যানেল, দে অফ্ বিস্‌কে, আটলান্টিক মহাসাগর ও মেডিটেরেনিয়ান বাহিয়া পোর্ট সৈদের পাইলট ষ্টেশন পর্য্যন্ত	৩২৩২ "
পোর্ট সৈদ পাইলট ষ্টেশন হইতে সুয়েজ-খালের মুখ পর্য্যন্ত	৯ "
পোর্ট সৈদ হইতে খাল বাহিয়া সুয়েজ পর্য্যন্ত	৮৮ "
সুয়েজ হইতে গালফ্ অভ্ সুয়েজ, রেড্-সী, গালফ্ অভ্ এডেন ও ভারত-মহাসাগর বাহিয়া কলম্বো পর্য্যন্ত	৩৩২৬
মোট	৭১৪৯ নট
বা প্রায়	৮,০০০ মাইল।

পর্টুগালের মোড় ঘুরিয়া পূর্ব্বমুখে যাত্রারম্ভের সময় ইউরোপের পশ্চিমতম সীমায় পৌঁছিয়াছিলাম, ইহা গ্রীনউইচের ১০ ডিগ্রি পশ্চিমে, আর কলম্বো হইতেছে গ্রীনউইচের ৮০ ডিগ্রী পূর্ব্বে। এই মোট ৯০ ডিগ্রীর দৈর্ঘ্য সমগ্র পৃথ্বীপৃষ্ঠের এক-চতুর্থাংশ। ৯ই এপ্রিল আমাদের কলম্বো পৌঁছিবার কথা ছিল, কিন্তু পথের ঝড়, হাওয়া ও জলস্রোতে জাহাজের গতিহানি হইয়াছে। ক্যাপ্টেন মাপ-জোখ করিয়া বলিলেন, ১০ই এপ্রিল (আবার সেই ১০ই!) বৈকালে কলম্বো ধরা যাইবে। পূর্ণ একমাস জাহাজবাস হইল। মনে পড়িতেছে, দেশ ছাড়িবার আগে অনেক জ্যোতিষী হাত দেখিয়া তোর গলায় বলিতেন, সমুদ্র যাত্রা একেবারে অসম্ভাব্য! কলম্বো হইতে ট্রেনে বাড়ী অভিমুখে অগ্রসর হইব।

দেশে পৌঁছিবার পূর্ব্বমুহূর্ত্তে আজ অনেক কথা মনে পড়িতেছে। ইউরোপে থাকিতে দেশ হইতে অনেকে ইউরোপের খাটি খবর চাহিয়া চিঠি লিখিতেন বিভিন্ন রুচি ও আগ্রহ অনুসারে কেহ রাজনৈতিক, কেহ সামাজিক সমস্যাদি সম্বন্ধে জানিতে চাহিতেন। দুঃখের বিষয় বন্ধুবর্গের এই নানা কৌতূহল মিটাইতে পারি নাই, কারণ বিশিষ্ট ও নির্দ্দিষ্টসীম প্রশ্ন ছাড়া সাধারণ ও ব্যাপকভাবে কোন বিষয়ের আলোচনা নিরর্থক, বিশেষতঃ এই জন্য যে,

* ইংরেজি বানানের প্রভাবে আমরা এই দ্বীপত্রয়কে লাকাদ্বীপ ও মালাদ্বীপ বলিতে অভ্যস্ত। ভাষাতত্ত্বের সাধারণ বানানটি যেখানে প্রথমটি শুধু এক-দ্বীপের সংজ্ঞা, সেই জন্য ইহার লক্ষদ্বীপ নাম হইয়া থাকিবে। দক্ষিণ দিকের অনেক জিনিষকেই প্রাচীনেরা "মলয়" নামে জানিতেন, যথা মলয় পর্ব্বত, মলয় বায়ু প্রভৃতি; সুমাত্রার উত্তরস্থিত যে উপদ্বীপকে আমরা মলয় বলি তাহাও মলয়, ইহার তলদেশের নগর সিঙ্গাপুর আসলে সিংহপুর।

আমাদের দেশের শিক্ষিত সাধারণের কাছে ইউরোপ একটা অত্যাশ্চর্য্যময় অদ্ভুত কিছু বলিয়া মনে হইবার কোনই কারণ নাই। বিংশ শতাব্দীর প্রায় মাঝামাঝি এই যুগে বাস করিয়া পৃথিবীটা আমাদের কাছে খুবই ছোট হইয়া দেখা দিবার কথা। রেডিও, বেতার, টেলিগ্রাফি, টেলিফোন, এয়ারোপ্লেন, সিনেমা প্রভৃতির কল্যাণে যাহা দূর ছিল, তাহা আজ অতি নিকট হইয়া পড়িয়াছে। অদৃষ্ট বা অভ্রভেদী বিশেষ কিছু থাকিবার কথা নয়। দ্বিতীয়তঃ, বৃটিশ রাজত্বের প্রভাবে ইউরোপীয় সাহিত্য-ইতিহাস প্রভৃতিতে আমাদের অগাধ প্রবেশ, ইউরোপীয় জনসমাজের সঙ্গেও আমাদের চাক্ষুষ ও সাক্ষাৎ পরিচয় দেশে বসিয়াই হইয়া থাকে। এই সব বিভিন্ন মার্গে পাশ্চাত্যের যে সংবাদ আমরা পাই, তাহা একটু বিবেচনা-মন্থনা ও বিচার-লবণ সংযোগ করিয়া গ্রহণ করিলে ইউরোপ আমাদের কাছে অপরিচিত রূপে প্রতীয়মান হইবার সম্ভাবনা খুবই কম হওয়া উচিত। বাস্তবিক আমার কাছে প্রথমাবধি ইউরোপ পরিচিতের মতই বোধ হইয়াছে। ও দেশের অনেক লোক আমাকে বলিতেন, "তোমার রকম-সকম আমাদের পরিচিত ভারতীয়দের মত নয়, তুমি ইউরোপীয়ান-ভাবাপন্ন হইয়া গিয়াছ, তোমার সঙ্গে কথা-বার্ত্তায় অ-ইউরোপীয়ান কোন আভাস পাই না!" একথা অনেকে বলিতেন বিস্ময়ে, কেহ বলিতেন সুখ্যাতিচ্ছলে, আর অতি-নিকট বন্ধু অনেকে বলিতেন শ্লেষ করিয়া। আমি উত্তর দিতাম, "আমি মোটেই ইউরোপীয়ান হইয়া যাই নাই, ভারতীয়ই আছি; আমার পক্ষে নির্দ্দোষ ভারতীয় থাকা ও তোমাদের পক্ষে স্বাধিকারপ্রমত্ত ইউরোপীয়ান থাকা দুইই নিন্দনীয়; এ যুগের আদর্শে আমাদের উভয়েরই ইণ্টারন্যাশনাল বিশ্বনাগরিক হওয়া বাঞ্ছনীয়।"

এটা আদর্শের কথা বলিলাম, অহঙ্কারের নয়। আমাদের দেশের অনেককে দেখিয়াছি, জাহাজে উঠিয়াই একেবারে সাহেব হইয়া গিয়াছেন এরূপ ভাব দেখান! ও দেশে পৌঁছিয়া [illegible] রেস্তোরেঁয়া ও দেশে পূর্ব্ব হইতে আছেন, তাঁহাদের কাছে পাছে ছোট হইয়া যাইতে হয়, এ জন্য জাহির করিতে চেষ্টা করেন যে, ইউরোপ সম্বন্ধে অজানা তাঁহাদের কিছুই নাই। বলা বাহুল্য, এটি দুষ্টবুদ্ধি ও ঈর্ষ্যা-প্রসূত। দিনকতক থাকিবার পর ইঁহাদের যখন চোখ খুলিতে আরম্ভ করে, তখন অনেকটা শীতল হইয়া বাস্তবিকই ইউরোপকে বুঝিতে ও তাহা হইতে শিক্ষালাভ করিতে আরম্ভ করেন। আমি ইউরোপে আচণ্ডালপণ্ডিত,

হুয়েন্থসাঙের মুখে থাংনির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি।

আমীর-পামর সকলের সঙ্গ করিয়াছি ও ফলে এই অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি যে, বাহির হইতে ইউরোপ সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা খুব প্রয়োজনীয়, কিন্তু সে জ্ঞান যদি সর্বজ্ঞতা ভাব ধারণ করে, তবে বহুস্থলে ঠকিতে হয়। অনেক জানা থাকা সত্ত্বেও আরও ভাল করিয়া জানিবার আকাঙ্ক্ষা ও বিনয় থাকিলে জানিবার ও শিখিবার অনেক দেখা যায়, লোকের কাছে শ্রদ্ধাও পাওয়া যায়।

যে ভারতীয়েরা ইংলণ্ডে যান, তাঁহারা বিলাতে বিশেষ পাত্তা পান না। যাঁহারা কন্টিনেন্ট যান, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে লোকের কাছে সমাদর লাভ করিয়া ও ভারতীয় দর্শনাদির সুখ্যাতি শুনিয়া মাথাটি একেবারে ঘুরিয়া যায়। আমি আজ পনর বৎসর ভারততত্ত্বের আলোচনা করিয়া বলিবার সামর্থ্য রাখি যে, প্রাচীন ভারতের জ্ঞান-গরিমার ইহাঁরা যে খবর রাখেন, সেটা সম্পূর্ণ খেয়ালি রকমের, বৈজ্ঞানিক তথ্য বা ঐতিহাসিক সত্যের সঙ্গে তাঁহাদের কোনই পরিচয় নাই, এ সব সম্বন্ধে খাঁটি কথা শুনিলে নিজ নিজ অজ্ঞতায় লজ্জিত বোধ না করিয়া তাঁহাদের স্বকল্পিত দেশ-ভক্তির আত্মাভিমানে আঘাত লাগে। ইহাঁদের সম্বন্ধে বহু অভিজ্ঞ ভারতীয় জার্গালিষ্ট মিঃ মাজিয়ার বলিতেন, "কিছুদিন পরে ইহারা এমন ভাবে কথাবার্ত্তা বলিতে আরম্ভ করে, যেন বেদ উপনিষৎ প্রভৃতি উহারা নিজেরাই লিখিয়াছিল, স্বয়ং নিজে যদি নাও লিখিয়া থাকে তবু অন্ততঃ ঐগুলির রচনায় উহাদের যেন বিশেষ হাত ছিল!" এই কন্টিনেন্টাল ভারতীয় অকাল-কুষ্মাণ্ডগুলির তুলনায় বিলাতের ভারতীয়েরা লোকের কাছে অবজ্ঞাত হইবার ফলে ও দেশের দেখিয়া অনেকটা বেশী শিক্ষা লাভ করেন, অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইয়া দেশে ফেরেন। আমার মনে হয়, প্রাচীন ভারতের মিথ্যা গৌরব এবং ইউরোপের অন্ধ অনুকরণ এই দুই অন্তিম বাঁচাইয়া যিনি চলিবেন তিনিই ইউরোপের পরিচয়ে দেশের উপকার করিতে পারিবেন।

বিদেশী আবহাওয়ায় এতদিন থাকিয়াও দেশকে ভুলিতে পারি নাই। সেমিনারের কাজে প্রাচীন ভারতের তত্ত্বালোচনায় প্রতিদিন কতগুলি ঘণ্টা কাটিত। দিবা-সন্ধ্যার বাকি প্রহরগুলিতে ইউরোপীয় সমাজের বিভিন্ন কর্ম্মস্রোতের টানে ভাসিয়াছে, কিন্তু "শ্যামাবঙ্গং, চকিতহরিণীপ্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতঃ; বক্ত্রচ্ছায়া শশিনি, শিখিনাং বর্হভারেষু কেশান" প্রিয়াবিরহীর এই দৃষ্টির মত ইউরোপীয় জীবনের সব ছবির পিছনে তাহার ভারতীয় প্রতিচ্ছবির কথাটি মনে পড়িয়া চিত্ত সমালোচনায় ব্যাপৃত হইত।

কিন্তু শেষ করি। ঐ দূরে ভারতমাতার চরণতল প্রক্ষালিত সাগর সুরসিতম সিংহল দ্বীপের তমালতালি-বনরাজিনীলা শ্যাম-তটরেখা দেখা যাইতেছে। বিদেশ-ভ্রমণ উপলক্ষ্য করিয়া নিজ দেশের সম্বন্ধে আজ অনেকদিন ধরিয়া অনেকই লিখিয়া আসিতেছি। পূর্ব্বসূরিগণ ঔদার্য্য-কারুণ্যবিশুদ্ধ-বুদ্ধি মনীষিদের কাছে স্বীয় লেখনীর দোষ ত্রুটির পরিশোধন প্রার্থনা করিয়াছিলেন। আমি আমার অক্ষম সমালোচনার বিচারভার দেশবাসীর শুভবুদ্ধির উপর সমর্পণ করিতেছি। ইতি শ্রীরুক্মার্পণমস্তু, শুভং ভবতু।

প্রমাণ

চিত্ত অথবা প্রবৃত্তি অথবা ইন্দ্রিয়ের কার্য্য যখন বুদ্ধি অথবা চৈতন্যের দ্বারা পরিচালিত না হইয়া স্বাধীনভাবে চলিতে থাকে, তখন তাহার পরিণাম হয় বিপর্য্যয়, অর্থাৎ কেবল ভ্রমাত্মক জ্ঞানলাভ, বিকল্প অর্থাৎ কেবল ভ্রমাত্মক জ্ঞান এবং নিদ্রা অর্থাৎ স্মরণশক্তির লোপ, ঝালস্য ইত্যাদি। এই অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন করিয়া মানুষ পর্য্যবসানের সম্মুখীন হইতে থাকে, আর ঐ চিত্ত যখন চৈতন্য অথবা বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হইতে থাকে, তখন তাহার পরিণাম হয় "প্রমাণ," অর্থাৎ নূতন নূতন জ্ঞান লাভ এবং স্মৃতি অর্থাৎ স্মরণ শক্তির বৃদ্ধি। কাজেই বলিতে পারা যায় যে, ইন্দ্রিয়-বৃত্তির পরিণাম হয় ভিন্ন ভিন্ন করিয়া সর্ব্বনাশ, নতুবা উন্নতির দিকে পরিবর্ত্তন।

আদর্শের বিপর্য্যয়

—শ্রীমেঘেন্দ্রলাল রায়

বাগীগঞ্জে অরুণের বাড়ীতে হৈ চৈ লাগিয়া গিয়াছে। জগত্তারিণীর একমাত্র কন্যা প্রতিমা আসিয়াছেন আজ বহুদিন পরে, জগত্তারিণীর আপশোষের সীমা নাই—ছোট নাতিকে দুধ খাওয়াইতেছেন, বড় নাতিকে প্যান্ট পরাইতেছেন (বড় হইলেও আসল বয়স তাহার দশ বছরের বেশী নহে), বিশেষ আপত্তি সত্ত্বেও দিদিমা বসিয়াছেন নাতনীর গায়ে সরষে-হলুদ মাখাইতে।

কন্যা প্রতিমা মাতার প্রাচীন পন্থায় তেমন খুসী নহেন, কিন্তু বকুনীর ভয়ে কোন মতামত প্রকাশ করিতেছেন না। যখন অরুণের মা জবরদস্ত হইয়া বড় নাতনীকে সরষে-হলুদ মাখাইতে বসিয়াছেন, পার্শ্বের বাড়ীর মিসেস্ কারফরমা আসিয়া উপস্থিত। তিনি একটু আশ্চর্য্য হইলেন, বলিলেন, "দিদি এ কি—সরষে-হলুদ মাখাচ্ছেন কেন?"

জগত্তারিণী হাসিয়া বলিলেন, "তোর কথা শুনে হাসি পায় সরলা—তোর মাকে দেখ আর তোকে দেখ, আর আমাকেও দেখতে পাবিনা। তুই চল্লিশ না পেরোতেই বুড়ী হয়ে গেলি। রঙ ভগবান্ ফরসা দিয়েছিলেন। কিন্তু ভগবান দিলে কি হবে; তোদের চেষ্টা ভগবানের ওপর কারসাজী করা—কতকগুলো বিলিতী স্নো-টো মেখে কি চেহারাই তৈরী করেছিস! খুকীও ছিল সেই চেষ্টায়, কিন্তু হীরুর তাড়ায় ঠিক আছে। হীরু ওকে সরষে-হলুদ না মাখতে বলুক, নিজে কিন্তু গায়ে খোল মাখে—"

মিসেস কারফরমা মুখের আকৃতি কুইনাইন খাইবার মত করিয়া বলিলেন, "বলেন কি? মিঃ চক্রবর্ত্তী বিলেতে ছিলেন না চার বৎসর?" দিদি বলিলেন, "এবারে যখন কলেজের কাজে আবার বিলেতে যাবে, তখন সে বলেছে যে কাঁচের বাক্স করে 'খোল' নিয়ে গিয়ে 'ভারতীয় সাবান' বলে মেমদের কাছে চালাবে।"

মিসেস্ কারফরমা বলিলেন, "বলেন কি দিদি?"

প্রতিমা হাসিয়া বলিলেন, "শাশুড়ী-জামাইয়ের সব এক রকমই মত।"

মিসেস্ কারফরমা আসিয়াছিলেন কোন নৃত্য-শিল্পীর নাচের জলসার টিকিট বিক্রয় করিতে। জগত্তারিণী তাঁহাকে পাত্তাই দিলেন না, বলিলেন, "না—আমি ধেড়ে ধেড়ে মেয়েদের নাচ, বিশেষতঃ ভদ্র ঘরের, মোটেই পছন্দ করিনে। আমার বাড়ী থেকে কেউ যাবে না।" অগত্যা মিসেস্ কারফরমা মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া প্রস্থান করিলেন।

বাহিরের ঘরে অরুণের তত্ত্বীপতি অধ্যাপক ডক্টর হীরেন চক্রবর্ত্তী প্রশান্তভাবে সিগার টানিতে টানিতে খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন, হঠাৎ তাঁহার পাঠের ব্যাঘাত করিয়া এক মহিলা ঘরে প্রবেশ করিলেন। মহিলা প্রায় যৌবনের শেষ সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। দেখিতে মন্দ নহে—কিন্তু নারীর সৌন্দর্য্য যাহা, অর্থাৎ কোমল সলজ্জ মুখ, তাহার চিহ্ন মাত্র নাই—পুরুষকে নকল করিবার ব্যর্থ প্রয়াস মুখমণ্ডলে স্পষ্ট প্রতীয়মান। ভদ্রমহিলা ঝড়ের মত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করাতে হীরেন বাবু হঠাৎ থতমত খাইয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন। মহিলা ঘরে অপরিচিত ভদ্রলোককে দেখিয়া বলিলেন, "Excuse me (ক্ষমা করবেন) অরুণদা আছেন?" "আছেন, আপনি বসুন, আমি ডেকে দিচ্ছি।" বলিয়া হীরেন ভিতরে অরুণকে সংবাদ দিলেন।

অরুণ আসিয়া মহিলাকে দেখিয়া সন্ত্রস্ত হইয়া বলিল, "লতিকা, কি খবর? এস, আগে তোমাকে হীরুদার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি।" সাহেবী প্রথায় উভয়কে উভয়ের নিকট পরিচিত করিল—"ইনি আমার বাল্যবী মিস্ লতিকা খাস্তগীর এম. এ. ইকনমিক্স্ আর ইনি আমার ভগ্নীপতি অধ্যাপক ডক্টর হীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এম. এ., ডি. এস্. সি., পি এচ. ডি. ইত্যাদি—আগ্রা কলেজের—"

লতিকা ডিগ্রীর বহর শুনিয়াই হউক, আর যে জন্যই হউক তাড়াতাড়ি করমর্দ্দন করিতে হাত বাড়াইল। কিন্তু

ডক্টর চক্রবর্তী বিরক্ত হইয়া হাত সরাইয়া লইলেন। তখন লতিকা লজ্জিত হইয়া ডাঃ চক্রবর্তীর পদধূলি গ্রহণ করিল। মুখ দেখিয়া বুঝা গেল, অরুণ তাহার ভগ্নীপতির এইরূপ ব্যবহারে লজ্জিত হইয়াছে। করমর্দনের পরিবর্তে প্রণাম দাবী করিবার মধ্যে অরুণ বিশেষ কিছু প্রশংসনীয় ভাব দেখিতে পায় না।

লতিকা কিন্তু বেশ নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিল, "কিছু মনে করবেন না ডক্টর চক্রবর্তী, আজকাল···"

হীরেন বাবু বলিলেন, "না না, আমি আপনাকে পায়ের ধুলো নিতে বলিনি, কিন্তু করমর্দনটা যাতে শোভায় না। আপনারা নমস্কার করাটা ছেড়ে দিলেন কেন? করমর্দন জিনিষটাই 'বারবারাস' (অসভ্য)। বিলেতে অনেক মেম সাহেব আমাকে নমস্কার করতে দেখে কি সুখ্যাতি করেছে আমাদের প্রথাকে। স্যার জন্ উডরফ যখন এখানে ছিলেন কি সুখী হতেন কেউ ওঁকে নমস্কার করলে। তিনি অত্যন্ত পুলী হয়ে প্রতি-নমস্কার করতেন।"

এই সময়ে হীরেনের কন্যা আসিয়া খবর দিল, "বাবা মা ডাকছেন।"

হীরেন বাবু কন্যা সহ উপরে প্রস্থান করিলেন, হীরেন বাবু চলিয়া গেলে অরুণ লতিকাকে বলিল, "এস লতিকা আমার পড়ার ঘরে—একটু চা খাবে না কি?"

লতিকা বলিল, "না, চল, বড় দরকারী কথা আছে।"

অরুণের পড়ার ঘরে গিয়া লতিকা চেয়ারে বসিল। অরুণও নিকটেই বসিল। কিছুকাল এ কথা সে কথার পর লতিকা বলিল, "ইটিনীর চিঠি পেয়েছি। অরুণ ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "চিঠি পেয়েছ?" ভাল আছে ত? কি লিখেছে?"

লতিকা বলিল, "সে অনেক কথা। তোমাকে একবার দিল্লী যেতে লিখেছে। বিশেষ দরকার।"

অরুণ বলিল, "বিশেষ দরকারটা কী?"

লতিকা হাসিয়া বলিল, "বোধ হয় বিয়ে করতে চায়? তার বাবা এক পাত্র ঠিক করেছিলেন, তাকে তার পছন্দ হয় নি। বাবা-মার সঙ্গে ঝগড়া করে সে-বিয়ে সে ভেঙ্গে দিয়েছে। তারপর দিল্লী চলে গেছে। কি বল, আজই রওনা হও?"

অরুণ একটু ভাবিয়া বলিল, "এখন কি করে যাই? কিন্তু সে ত আমাকে চিঠি লিখতে পারত, তাকে আমি অনেক চিঠি লিখেছি। কোন উত্তর পেয় না, এখন—"

লতিকা বলিল, 'তুমি ইটিনীকে ভালবাস, ইটিনী তোমায় ভালবাসে। এর মধ্যে এত চিন্তা কিসের?"

অরুণ বলিল, "চিন্তা আছে বৈ কি। আমি ব্রাহ্মণ, ইটিনী বৈদ্য। মা বাবা ও জানেন ব্রাহ্মণ, কিন্তু ইটিনীকে বিয়ে করাতে মাও রাজী নয়, আর হীরুদারও ঘোর আপত্তি। মাকে না হয়—কিন্তু হীরু-দা—"

লতিকা বলিল, "মার আপত্তির কারণ থাকতে পারে, তিনি এ কালের মানুষ নন। কিন্তু ডক্টর চক্রবর্তীর ক্ষেত্রে ত তা বলা যায় না। তিনি বিলেত ফেরৎ, প্রকাণ্ড পণ্ডিত। তিনিও 'ফ্রি লাভ্-এর (অবাধ প্রেমের) পক্ষপাতী নন?"

অরুণ বলিল, "হীরু-দা বলেন সে 'ফ্রি লাভ্-এর কোন মানে হয় না। লতিকারের লাভ যা, তা কখনও ফ্রি হ'তে পারে না। যে মুহূর্ত্তে ভাল বেসেছি সেই সময় থেকেই অজ্ঞাতে অনেক দায়ত্ব-শৃঙ্খল গলে ছুটেছে। তুমি কি বল?"

লতিকা বলিল, "আমি এটা কিছুতেই বুঝতে পারছি না অরুণ দা যে তুমি যদি বাস্তবিক ইটিনীকে বিয়ে করতে চাও ত তার মধ্যে why should your mother or brother-in law come in (তোমার মা বা ভগ্নীপতির কথা আসে কি করে)?"

অরুণ কিছু না উত্তর দিলেও, তাহার মনে হইল লতিকা ঠিকই বলিতেছে। লতিকা আবার জিজ্ঞাসা করিল, "তা হলে কি লিখব ইটিনীকে?"

অরুণ বলিল, "তাকে লেখ সব ব্যাপার জানিয়ে আমায় চিঠি লিখতে, তারপর যা হয় করব।"

লতিকা বলিল, "তুমি গেলে ভাল করতে অরুণদা।"

অরুণ আর কোন উত্তর দিল না এবং আরও দুই-চারিটি কথা হইবার পর লতিকা বিদায় গ্রহণ করিল।

লতিকা বাহির হইয়া গেলে অরুণ কিছুক্ষণ হতভম্বের ন্যায় বসিয়া থাকিল। খানিক পরে উঠিয়া অরুণ পাঞ্জাবী গায়ে দিল—ইচ্ছা ব্যাপারটা চারিদিক হইতে বুঝিয়া পরামর্শ গ্রহণের নিমিত্ত বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু পরেশের নিকটে

যাইবে। পরেশ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ-এ থাকে একত্রিশ টাকার ফ্ল্যাটে, মাসিক মাহিনা প্রায় তেত্রিশো। বিয়ে হইয়াছে, তবে পুত্র-কন্যা এখনও হয় নাই।

পরেশ অরুণকে দেখিয়া খুসী হইল, বলিল, "এস এস ভাই। কি খবর? তোমার আজকাল বড় দেখা পাওয়া যায় না কেন? মোটরগাড়ী থাকা সত্ত্বেও?"

অরুণ বলিল, "আজকাল কোথাও বড় বেরই না। আর মাস খানেকের মধ্যে বেহারে যেতে হবে চাকরী করতে। তাই যতক্ষণ পারি বাড়ীতেই থাকি মার কাছে।" পরেশ বলিল, "চাকরী ঠিক হয়ে গেছে? এমন সুখবর দিলে, খাওয়ান উচিত তোমাকে। বস। আমি চা নিয়ে আসছি।"

পরেশ অন্যত্র গেলে অরুণ মনে মনে ভাবিল যে, পরেশ বেশ আছে। সে ইচ্ছা করিয়াই ম্যাট্রিক পাশও নয় এমন মেয়েকে বিবাহ করিয়াছে। বিবাহের পূর্বে নিজে সে ভাবী স্ত্রীকে দেখে নাই। মা ও পিসীমা গিয়া দেখিয়া আসিয়াছিলেন। এরূপ বিবাহ করিয়াও পরেশ বেশ শান্তিতেই জীবন যাপন করিতেছে। বাড়ীর ভিতর হইতে চা, নারিকেল নাড়ু, নারিকেল-কোরা, বাড়ীর নিমকী ও দুই খণ্ড শশা লইয়া পরেশ উপস্থিত হইল।

একটু লজ্জিত হইয়াই পরেশ বলিল, "ভাই ডিম-মাংসের বড় সুবিধা হয় না, মা আছেন, যে দিন ইচ্ছা হয়, বাইরে থেকে খেয়ে আসি।"

দুইজনে চা পান করিতে করিতে কথাবার্ত্তা হইতেছে। অরুণ যেই লতিকা খাস্তগীরের নাম করিয়াছে, পরেশ বিরক্ত হইয়া বলিল "তোমার কাছে কি যত ঐ সব ভোটে!" অরুণ বলিল "কেন?"

পরেশ বলিল, "এ পাড়ার সকলে জানে যে, লতিকা ও তার মা লতিকার ঠাকুমাকে কি যন্ত্রণা দেন। মিঃ খাস্তগীর একদিন দুঃখিত হয়ে প্রায় কেঁদে ফেললেন মতি বাবুর কাছে। হাজার হলেও ছেলে ত—কিন্তু power-less (নিরুপায়)—"

অরুণ বলিল "বল কি?"

পরেশ বলিল, "Unheard of (অশ্রুতপূর্ব্ব), নভেলে নাটকে আমাদের দেশে কেবল বধূ-নির্য্যাতনের কথাই পড়া যায়, কিন্তু শাশুড়ী-নির্য্যাতন যে কি ভয়াবহ আকারে প্রগতিশীল সমাজে প্রবেশ করেছে, তা কেউ চিন্তা করবে না, লিখবেও না। লতিকার ঠাকুমার বয়স প্রায় সত্তর হবে, রাত্রির চোখে দেখতে পান না। দরকার হ'লে কেউ রাত্রে ঘরে বাথরুমে নিয়ে যাবে বলে একটা কি রাখতে চেয়েছিলেন; কেন না লতিকাকে ডাকলে ওঠে না। এই ব্যাপার নিয়ে লতিকা আর লতিকার মা বৃদ্ধাকে কি অপমানই করেছেন।"

অরুণ আবার বলিল, "বল কি?"

পরেশ বলিল "খাস্তগীর নিজে ম্যাজিষ্ট্রেট। মিসেস্ খাস্তগীর বড়া মেম-সাহেব; মিস্ খাস্তগীর ছোট মেম-সাহেব আর ম্যাজিষ্ট্রেটের মা old faithful super-annuated (বৃদ্ধ, বিশ্বাসী, অশক্ত) ঝি, খাবেন-দাবেন, চুপচাপ পড়ে থাকবেন, গোলমাল কোন রকম করতে পাবেন না। মতি বাবু সব বলছিলেন সেদিন। সেই লতিকার বন্ধু তটিনীকে করবে বিয়ে? বিয়েটাকে এরা অ্যাডভেঞ্চারের পর্য্যায়ভুক্ত করে ফেলেছে। কখনও বলে, 'বিয়ে করবে না,' কখনও বলে 'বে করব'। একবার এক আই. সি. এস্.-কে পাকড়াও করলে—ঘরে গেল, এখন নানান দিকে টোপ ফেলছে, কোন মাছই চারে আসছে না, take care (সাবধান)। ওদের সঙ্গে মেশা dangerous (বিপজ্জনক)।"

পরেশ বলিল, "বলব আর কি, লেকে মোটরগাড়ীতে করে হাওয়া খেতে যাও, মেয়েরা সব ডোগর ভাগর—বেশ কথা বলতে বলতে যায় যখন লেকের ধারে চাঁদের আলোতে, বেশ লাগে—না? একটু আবছায়া অন্ধকারের মধ্যে যখন 'অরুণ দা,' বলে এ মেয়ে, ও-মেয়ে, সে মেয়ে ডাকে, তখন প্রাণে তোমার শিহরণ দিলেও ও মিথ্যা প্রবঞ্চনা। আমিও ত বড় কম দিন নেই এই বালীগঞ্জে-এখনও তো একটা মেয়েরও 'পরেশ দা' হ'তে পারলাম না। আমায় তো কেউ ডাকে না। জানে ত্রিশ টাকার ফ্ল্যাটে থাকি, গাড়ী নেই, বাড়ী নেই, টেলিফোন নেই, তার ওপর আবার বিয়ে করেছি আর বুড়ী মা নিয়ে—hopeless (অপদার্থ) বেশ আছি, কেউ ঘেঁষে না, বেঁচে গেছি ভাই।"

অরুণ বলিল, "তোমার সঙ্গে আমার একটা বিশেষ দরকারী কথা আছে।"

পরেশ হাসিয়া বলিল, 'সেই blessed (ছাই) তটিনীর affair (ব্যাপার) ত?"

অরুণ বলিল, "হুঁ, তটিনী লিখেছে আমাকে দিল্লীতে যেতে।"

পরেশ বলিল, "Never (কখনো না), সে দিল্লীতে তোমাকে পেলেই তোর ভার করে সিভিল ম্যারেজ করাবে, নয়তো বিপদে পড়বে—কখনও যেও না। Give up that iden altogether (ও ধারণা একদম ছেড়ে দাও)।"

অরুণ বলিল, "কেন ?"

পরেশ হাসিয়া বলিল, "Excuse me (মাপ কর), অরুণ, তোমাদের বারেন্দ্রের কথা আর বল না—এ বিষয়ে রাঢ়ীয়া এখনও অনেক পিছিয়ে আছে। নাপতিনী খোপানী থেকে আরম্ভ করে Bulgarian, Hungarian, Italian, German, Russian (বুলগেরীয়, হাঙ্গেরীয়, ইতালীয়, জার্মান, রুশ) কোন মেয়ে বিয়ে করতে বাদ রাখনি ভাই তোমরা!—Take care (হুঁশিয়ার)—"

অরুণ বলিল, "মেম বিয়েতে দোষের কি দেখছ ? Eugenics (সুপ্রজনন) এর দিক থেকে ?"

পরেশ হাসিয়া বলিল, "অনেকদিন আগে জাপানীদের মধ্যে এই ধুয়ো উঠেছিল—বিদেশী মেম বিয়ে করা। তাতে বুড় হার্বার্ট স্পেন্সার কি বলেছিলেন তা পড় নি ?"

অরুণ বলিল, "কি বলেছিলেন ?"

পরেশ বলিল, "সে কথা বলতে গেলে এখন দু'ঘণ্টা লেগে যাবে। মোদ্দা কথা মোটেই সমর্থন করেন নি—চল এখন বেরিয়ে পড়া যাক"—উভয়ে বাহির হইয়া পড়িল, অরুণের মোটর গাড়ীতে।

অরুণ বলিল, "চল লেকে বেড়িয়ে আসি।"

পরেশ বলিল, "আমি কিন্তু ভাই গাড়ীতে হাওয়া খাব না, হন্টন"—

অরুণ বলিল, "আমি কিন্তু ভাই বেশী হাঁটতে পারব না।"

পরেশ বলিল, "তা পারবে কেন, খাবে বেশ ভাল করে আর সোডি বাইকার্ব আছে—ভাবনা কি ? কিন্তু কত দিন চালাবে এ করে ?"

অরুণ বলিল, "চল নেবে লেকের ধারে বসি—"

পরেশ বলিল, "হাঁটাই না—গল্প করতে করতে টের পাবে না যে হাঁটছ। আমরা তো হাঁটি, যেহেতু গাড়ী নেই কিন্তু যাদের গাড়ী আছে, তাঁদের যে হাঁটা বিশেষ দরকার সেটা তাঁরা একেবারে ভোলেন না অথচ তাঁরা otherwise (অন্যদিকে) খুব বুদ্ধিমান লোক।"

লেকের ধারে তাহারা বসিল। অরুণ তটিনী সম্বন্ধে আবার কথা পাড়িল। পরেশ বলিল, "ও কথা বাদ দাও —the less is spoken of her the better (এ সম্বন্ধে যত কম বলা যায় ততই ভাল)।"

অরুণ বলিল, "লতিকা এসে বললে তটিনী তাকে লিখেছে—"

পরেশ বলিল, "তোমার কি বুদ্ধি-শুদ্ধি সব লোপ পেল অরুণ ? সে চিঠি ত লতিকা তোমায় দেখাতে পারত, নিশ্চয়ই এমন কিছু ছিল যা দেখালে তুমি সুখী হবে না, তাই সে চিঠি তোমাকে দেখায় নি।"

অরুণ চুপ করিয়া রহিল।

পরেশ অনেক উপদেশ দিয়াছে বটে, কিন্তু অরুণের মনে হইতেছে যে, পরেশ অথবা তটিনীর উপরে দোষারোপ করিতেছে। খানিক পরে পরেশ বলিল, "কি ভাবছ ? তটিনীর কথাই ; কিন্তু সে কি ভাবছে, জান ?" অরুণ বলিল, "কি ?" পরেশ বলিল, "অন্ততঃ তোমাকে মোটেই ভাবছে না।" অরুণ বলিল, "তবে ?" পরেশ হাসিয়া বলিল, "তোমার টাকার কথা, বুঝেছ ?"

অরুণ কিছু বলিল না। সে ভাবিল, তটিনী যদি তাহার টাকার কথাই ভাবিয়া থাকে ত কি এমন দোষ করিয়াছে। সকল স্ত্রীই চায় যে, তাহার স্বামী অর্থবান হয় ; কে আর নিঃস্ব স্বামী কামনা করে ?

কিন্তু সে পরেশের কথা ঠিক বুঝিতে পারে নাই। পরেশ বলিল, "চল অরুণ ; রাত বেশী হয়ে গেল, আমার স্ত্রী বাচ্চা কৌ হলে কি হবে, ভারী স্ট্রিক্ট গার্ডিয়ান (কড়া অভিভাবক) ; মার চেয়ে বেশী। সেই রকম তোমার একটা—"

অরুণ ও পরেশ গাড়ীতে গিয়া উঠিল।

৪

প্রায় দিন দশেক পরে শ্রীরামপুরে নীলাম্বরের বাড়ীতে ছাদের উপরে স্বামী-স্ত্রীতে নীহারিকার বিবাহ সম্বন্ধে কথা

হইতেছিল। সৌদামিনী বলিলেন, "যখন অরুণের মা লিখেছেন যে, খুকীকে ওখানে কিছুদিন রাখতে, রাখই না। ওরা তো আমাদের পর নয়।"

নীলাম্বর বলিলেন, "যার সঙ্গে বিয়ে হবার কথা হচ্ছে, তার বাড়ীতে ত আর রাখা যায় না। পাশে একটা বাড়ী ভাড়া করে রাখতে হয়, এইটেই ঘুরিয়ে লিখেছেন, কিন্তু তা কি করে সম্ভব?"

নীহারিকা বোতাম-লাগান সিঁড়িতে কি কার্য্যে যাইতেছিল, তাহার কানে পিতার এই কথা পৌঁছাইল। সে মনে করিল, হায়! কেন তাহার জন্ম হইয়াছিল! পিতা-মাতার কথোপকথন শুনিয়া তাহার চক্ষু সজল হইয়া আসিল। সে মনে মনে ভাবিল যে, তাহার পিতা-মাতা তাহাকে ও তাহাদের লইয়া কি সুখেই জীবন অতিবাহিত করিতে পারিতেন, যদি পিতা কিছু অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিতেন, বা পিতামহ ব্যবসায়ে টাকা নষ্ট না করিতেন। সে মনে-প্রাণে ভগবানকে ডাকিয়াছে যে, যেন তার মৃত্যু হয়। পিতা-মাতা আর কত কাল তাহার বিবাহচিন্তায় নরক-যন্ত্রণার কষ্ট পাইবেন? অনেক বুদ্ধিহীনা কন্যার মধ্যে যারা দুষ্ট হয় তাহার মতি-গতি সে রকম ছিল না,। তাহারা ফ্যাশন বজায় রাখিতে বিদ্যালয়ে যায়, ইংরাজী বুলি কিছু বলিতে পারে, শাড়ী-ব্লাউজ কায়দা মত পরিতে পারে, সিনেমা-অভিনেত্রীদের খবর রাখে, অথচ—পাঠে মন নাই; বিবাহে সম্পূর্ণ ইচ্ছা অথচ পিতার অবস্থার দিকে দৃষ্টি নাই; পিতাকে মাতাকে টিট্‌কারী দিতেও ছাড়ে না বিবাহ হইতেছে না বলিয়া, অথচ বাড়ীতে নিজে কাজ-কর্ম্ম করিয়া চাকর-বাকর কমাইয়া পিতা-মাতার খরচের ধাক্কাতে লাঘব হয় সেরূপ চেষ্টা নাই; যাহাতে পিতা-মাতা অর্থসঞ্চয় করিয়া বিবাহ দিতে পারেন, সে দিকেও দৃষ্টি নাই—এইরূপ হৃদয়হীনা, বুদ্ধিহীনা ফ্যাশন-প্রিয় কন্যা আজ হতভাগা বঙ্গদেশে বৃদ্ধি পাইলেও নীহারিকা সে শ্রেণীর কন্যা ছিল না।

স্বামী-স্ত্রীতে অনেক কথার পর স্থির হইল, নীলাম্বরের মাসীমার বাড়ী জামবাজারে নীহারিকাকে কিছু দিনের জন্য রাখা হইবে।

প্রায় সাত আট বৎসর পরে নীহারিকা কলিকাতায় যাইতেছে। যখন সে আগে ছোট ছিল, পিতার সহিত কলিকাতায় যাইত, অনেক সময়ে যায়নাও ঘটিত; কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি হইতেই বুঝিতে পারিল যে, ঘন ঘন কলিকাতায় লইয়া যাওয়া তাহার পিতার অবস্থার বাহিরে। তাহাই বা কয়জন কন্যা বুঝে আজকাল? কিন্তু কলিকাতা যাইতে সকলেরই আনন্দ। হায় কলিকাতা, এই বিরাট ঐশ্বর্য্যপূর্ণ নগরের হৃদয়-হীন আলোকচ্ছটা কত দরিদ্রের, পীড়িতের, হতাশার স্থানে পূর্ণ. এই হাস্যময় নগরী কত পরিবারের শ্মশানক্ষেত্র, এই অর্থহীন বিলাসের প্রাচুর্য্যে আজ বাঙ্গালী কতই নিঃস্ব! বৃহৎ বৃহৎ সুরম্য অট্টালিকা-শোভিত এই নগরী, যারা আজ পনের কি কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালীর বলিয়া গর্ব্ব করিবার বস্তু ছিল, তাহা কি আজও বাঙ্গালীর আছে, না বাঙ্গালীর থাকিবে? বাঙ্গালী আজ বেনার রাজে, অর্থাভাবে বাড়ী বন্ধক রাখিয়া বিলাসের স্রোতে উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়াছে। ধীরে ধীরে 'বাঙ্গালীর কলিকাতা' অন্তর্হীন হইবে।

বঙ্গশ্রী—পত্নী। কিন্তু যেখানে থাকিতে আমরা প্রস্তুত নহি। দলে দলে ডাক্তার কবিরাজ কলিকাতায় আসিয়া বসিবেন, কিন্তু দেশস্থ পল্লীতে যাইবেন না, তাহাতে যদি অনশনে মরিতে হয় তবুও কলিকাতাই ভাল; কলিকাতার এমনই মোহ!

নীরুকে লইয়া নীলাম্বর কলিকাতায় রওনা হইবেন। সৌদামিনী বলিলেন, "নীরু যাচ্ছে তো—কিন্তু ওর কাপড়-চোপড় নেই একেবারে, তুমি গিয়ে কিছু কিনে দিও।" সৌদামিনীর যে পুরাতন বেনারসী আছে তাহা পুরাতন হইলেও ভাল অবস্থাতে আছে, সেই বেনারসী ও তাঁহার কয়খানা ভাল শাড়ী দিলেন। বাড়ীতে সম্প্রতি যে নূতন রঙীন ব্লাউজ ও পেটিকোট তৈয়ারী হইয়াছে তাহা দিলেন। পাঁচুর পায়ের এক জোড়া স্যাণ্ডেল পায়ে দিতে বলিলেন, একটু up-to date (আধুনিক) হইয়া যাওয়া প্রয়োজন; মহিলার নয়নপথে যাওয়া out-of-date (যুগোপযোগী নহে)।

কন্যাকে লইয়া নীলাম্বর মাসীমার বাড়ীতে গেলেন। মাসীমা জীবিত নাই, মাতৃত ভাইয়েরা বড় সম্বন্ধ রাখেন না। নীলাম্বর অনেকবার তাহাদের বাটীতে যাইলেও তাঁহারা কষ্ট করিয়া নীলাম্বরের বাটীতে যাইতেন না। অথচ চুঁচুড়াতে তাঁহাদের কে রাণী বোন আছেন, যদিও দূর-সম্পর্কীয়া,

তাহাদের ওখানে কলিকাতা হইতে ছুটি পাইলেই বা শনিবারের রাত্রিতেও বড় মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে ধন্য হইবেন, এই আশায় তারকেশ্বরে হত্যা দেওয়ার ন্যায় সেখানে হত্যা দিয়া থাকেন। নীলাম্বর তাহাতে মাস্তুত ভাইয়েদের দোষ দেন না। জগতের নিয়মের ব্যতিক্রম কি করিয়া হইবে?

নীলাম্বর সোমবার প্রাতে শ্যামবাজারে ভ্রাতাদের নিকটে আসিলেন। সকলেই নীলাম্বর অপেক্ষা বয়সে ছোট। বড় ভাই শশধর তিন বার আই. এ. ফেল করিয়া বরাতের জোরে কোন সওদাগরী আফিসে তিনশ টাকা মাসিক মাহিনায় কাজ করেন। নীলাম্বরের মাহিনা মাসে একশ পঁচিশ টাকা; সুতরাং সে যে শশধরের নিকটে মহামূর্খ, তাহা কলিকাতা সহরে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। যখন শশধর তামাক টানিতে টানিতে শুধু সাংসারিক বিষয়ে নহে, যাবতীয় বিষয় সম্বন্ধে অমূল্য তত্ত্ব নীলাম্বরকে জ্ঞাপন করে, নীলাম্বর ভক্তি সহকারে শোনে, কারণ সে যে মহা মূর্খ, তাহা অকাট্য ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাতেও নীলাম্বর জগতের নিয়ম বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন।

নীলাম্বর সকন্যা আসিতেই শশধর আনন্দে বলিয়া উঠিল, "এই যে নীলু-দা—ওরে এ যে নীরু!" শশধর চীৎকার করিয়া আনন্দে ভ্রাতাদের ডাকিল। ভ্রাতৃবধূরা, শশধরের স্ত্রী আসিলেন। নীহারিকার বড়ই ভাল লাগিল। সকলকেই সে প্রণাম করিল। মেজ বৌ আস্তে আস্তে বলিলেন, "কি সুন্দর দেখতে হয়েছে নীরু, এই মেয়ের বিয়ের ভাবনা?"

নীরুকে লইয়া মহিলারা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

শশধর বলিল, "নীলুদা, যা হক, তোমার বুদ্ধি হয়েছে দেখছি। কলকাতায় কিছুদিন মেয়ে রাখ, দেখি চেষ্টা করে।"

নীলাম্বর বলিলেন, "আমরা ত ভাই গেঁয়ো লোক। কলকাতায় দামান্য চাকুরী করি, ডেলি প্যাসেঞ্জার, কাকেই বা চিনি? তোমার কম জানা-শোনা নেই, একটা অত বড় সওদাগরী আফিস চালাচ্ছ, সাহেবের right hand (দক্ষিণ হস্ত)।" শশধর বলিল, "নীলু দা no joke, (ঠাট্টা নয়) সওদাগরী আফিস চালাচ্ছি, এই বাজারে three hundred chips (তিনশখানি মুদ্রা, চালাকি নয়), নীলুদা no joke কি বল?"

নীলাম্বর বলিলেন, 'নিশ্চয়ই।'

শশধর বলিল, "নীলুদা, নাও তাড়াতাড়ি স্নান সারি, খেয়ে দেয়ে বেরতে হবে ত? কোন চিন্তা নেই নীলুদা, নীরুর বিয়ের আমি সাগগিরই যোগাড় করব, অত মোয়োস্, বিষণ্ণ হয়ে থেক না।'

নীলাম্বর জানিতেন যে, কলিকাতা সমাজের যে polish (বাহ্যিক চাকচিক্য) তাহা মাস্তুত ভাইয়েরা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়াছে। ভিতরে এতটুকু আন্তরিকতা থাকুক বা না থাকুক, বাহির দেখিয়া বলা যায় না যে, শশধর নীলাম্বরের জন্য প্রয়োজন হইলে প্রাণ দিতে দ্বিধা বোধ করিবে।

জগতে এই polish-এর দাম বেশী, তাই শশধর আজ অবস্থার উচ্চতর সোপানে, আর নীলাম্বর নীচেই পড়িয়া আছেন।

নীলাম্বর ইহাও জগতের নিয়ম বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন এবং তিনি যে নিজে ইহা পারেন না, সেটা তাঁহার দোষ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

নীলাম্বর ও তাঁহার মাস্তুত ভাইয়েরা খাওয়া-দাওয়া মিটাইয়া আফিস যাত্রা করিলেন।

শশধরের স্ত্রী নীহারিকাকে লইয়া বসিলেন। সাবান দিয়া পায়ের ময়লা সাফ্ করিলেন। খুব যত্নের সহিত নীহারিকাকে খাইতে দিলেন।

নীলাম্বর আফিস হইতে ফিরিবার পথে কন্যাকে দেখিয়া রাত্রে শ্রীরামপুর ফিরিলেন।

বাড়ী ফিরিয়া দেখিলেন, সমগ্র বাড়ী যেন হতশ্রী হইয়াছে। যে নীহারিকা প্রস্ফুটিত কুসুমের ন্যায় তাহার হৃদয়ের সৌরভে সমগ্র বাড়ীকে আমোদিত করিত, সেই নীহারিকা আজ বাড়ীতে নাই।

সৌদামিনী ম্লান মুখে বসিয়া আছেন। পাঁচু, ইঁদুর সব ছুটিয়া আসিল। সকলেই বলিল, "দিদি কবে আসবে বাবা?" দিদি না হইলে কে তাহাদের লইয়া বসিবে? কে তাহাদের ভূতের গল্প বলিবে, কে রাত্রে তাহাদের ঠাণ্ডা লাগিবে এই ভয়ে গায়ে কাপড় দিয়া দিবে, জানালা বন্ধ করিবে শেষ রাত্রে, কে ইস্কুলের পরে চা ও নারিকেলের নাড়ু খাইতে দিবে। মা সবই করিবেন সত্য, কিন্তু দেরী হইবে। দিদি, দিদি, দিদি, দিদিময় তাহাদের প্রাণ।

সৌদামিনীকে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে দেখিয়া নীলাম্বর বলিলেন, "খুকী বেশ আছে। তাকে খুব যত্ন করবে শশধরের স্ত্রী, তুমি ভাবছ কেন?'

সৌদামিনী বলিলেন, "তা ত ঠিক। কিন্তু খুকী তো আমাদের ছেড়ে কখনও থাকে নি।"

নীলাম্বর বলিলেন, "সে জন্যে তোমার কোন চিন্তা নেই। কলকাতা সহর, এ কি শ্রীরামপুর, একটা না একটা হুজুগ লেগেই আছে। খুকী বেশ থাকবে। এস খাবার দাও।" তিনি হাত-মুখ ধুইয়া আহারের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

[ক্রমশঃ

নদীয়ার কথা

—শ্রীবীরেন্দ্রমোহন আচার্য্য

শ্রীচৈতন্যদেব : জীবনী ও প্রভাব

নদীয়ার কয়েক যুগের ইতিহাস সঙ্কলন করিতে গিয়া নবদ্বীপ-বিহারের অলৌকিক লীলার কয়েকটি মূল ঘটনা উল্লেখ করা প্রয়োজন অনুভব করিতেছি। মহাপ্রভুর পরবর্ত্তীকালের বৈষ্ণব কবিবৃন্দ তাঁহাদের উপাস্য দেবতার যে চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, সাম্প্রদায়িক নিষ্ঠার আতিশয্যে তাহা অনেক স্থলেই অলৌকিকতার কুহেলী-সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। যাঁহাকে লোকোত্তর বলিয়া মানিয়াছেন, তাঁহাকে লৌকিক ক্ষমতার সীমা-রেখায় বাঁধিতে প্রাণ চাহে নাই। ষড়ভুজ মূর্ত্তি প্রকাশ, আজানুলম্বিত ভুবনমোহন চক্রের আবির্ভাব, গোপনস্নানে জলতরঙ্গসহ আত্ম-মুক্তির উৎপত্তি, শ্রীবাসের মৃত পুত্রের সহিত কথোপকথন, কুষ্ঠরোগীকে দিয়া কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ, সর্পদষ্ট কুটুম্বাদি নিমাইর প্রকৃতি স্পর্শের অলৌকিক ক্রিয়া-কলাপে তাঁহার লীলাকে কণ্টকিত। এই সকল অলৌকিক কাহিনীর সত্যাসত্য বিচার করিবার প্রয়োজন এখানে নাই। তবে এই মাত্র মনে হয় যে, শত অলৌকিক কথা অপেক্ষা ভুবনবিদিত নবদ্বীপ-মুকুলের একটিমাত্র প্রেমাশ্রুর মূল্য অনেক বেশী। দৈব শক্তি অপেক্ষা বিকশিত কবি-চেতনার স্থায় পুলক-কম্পিত দেহের একটি আকুল আলিঙ্গন অনেক বেশী আশ্বাস দানে করিতে পারে। মানুষের মাঝে মানুষ হইয়া জন্মিয়া শত বন্ধন, শত অক্ষমতার অন্তরিত মানুষকে ভালবাসিয়া, কাঁদিয়া, কাঁদাইয়া তিনি আমাদের আপনার জন হইয়া গিয়াছেন। সাম্প্রদায়িকতার মূঢ় ভক্তি তাহাতে দৈবত্ব আরোপ করিয়া মন্দিরের বিগ্রহের মত তাঁহাকে বেদ পর করিয়া তোলে।

সকল দেশের সকল জাতির ধর্মপ্রবর্ত্তক ও ধর্মাচার্য্যদের জীবনী অলৌকিক লীলা-সমাকীর্ণ। শ্রীচৈতন্যের বেলাতেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। কিন্তু চৈতন্যদেব তাঁহার ভক্ত-পরিকর-কুলের অতিভক্তির আতিশয্য হইতে সতত আত্মরক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেন। তাঁহার ভক্ত শিরোমণি তাঁহাকে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ জানিয়া ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করিতে আসিলে, বার বার তিনি কুণ্ঠ বিরক্তি জ্ঞাপন করিয়াছেন। পরমভক্ত রায় রামানন্দ তাঁহাকে স্বয়ং ঈশ্বর বুঝি করাতে 'কুষ্ঠ দৈন্য'—

> "প্রভু কহে, আমি মানুষ আশ্রমে সন্ন্যাসী।
> ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসী আমার ভ্রম বাসি॥
> শুদ্রবুদ্ধে নমস্কিনু কৈছ না যুয়ায়।
> সন্ন্যাসীর অল্পচিত্ত লোকে ধৈর্য্য নারে পায়॥ (চৈঃ চ)

গোদাবরীর জলপথে পার হইয়া নীলাচলে ফিরিয়া আসিলে বাসুদেব সার্ব্বভৌম ভক্তি-গদ্গদকণ্ঠে কৃতাঞ্জলিপুটে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলিয়া স্তব আরম্ভ করিলে বিরক্ত হইয়া—

> প্রভু কহে, সার্ব্বভৌম আর কথা কহ।
> আমাসে পাপিষ্ঠে কথা কেন বা জুয়ায়॥ (চৈঃ চ)

শুচিতা পূত অর্চ্চনার সময়ে জনৈক সরল-গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ পুষ্পার্চ্চনা। ছলে মহাপ্রভুর পায়ে জল ঢালিয়া পাদোদক পান করিয়াছিল সেই অপরাধে—

> তার ঘাড়ে হাত দিয়া। ঠেকা মারি পুরীর বাহির কৈল লৈয়া॥ (চৈঃ চঃ)

শ্রীবাস আঙ্গিনায় একদিন সংকীর্ত্তনের সময়ে বৃদ্ধ অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর পদধূলি গ্রহণ করার আবেগের পরে বার বার মাথা ঘষিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত করেন। দৈবত্ব আরোপে তিনি কতখানি বিরক্ত হইতেন, তাহা এইরূপ আর দৃষ্টান্ত তুলিয়া দেখান যাইতে পারে। তাঁহার প্রতীপ্ত প্রতিভার প্রাবল্য সুস্নিগ্ধ বিনয়ের আবরণে আত্মগোপিত হইয়া যে অপূর্ব্ব মনোহর মূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইয়াছিল, দৈবত্ব আরোপে বোধ হয় তাহা আর অধিকতর উজ্জ্বল হয় নাই।

যাহা হউক শ্রীচৈতন্যদেবের লোকোত্তর জীবনী-কথার সামান্যতম একটা মূল ঘটনার রেখা পাত মাত্র করিয়া বাঙ্গলার সেই মহামী নিবন্ধের যৎকিঞ্চিৎ আভাস দিবার চেষ্টা করিব।

শ্রীচৈতন্যদেব ১৪০৭ শকে (১৪৮৬ খৃঃ) ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে সন্ধ্যার সময় নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। এই সময়ে নবদ্বীপের সমৃদ্ধি ও খ্যাতির কথা বৈষ্ণব কবিরা বহুল ভাবেই বর্ণনা করিয়াছেন। (মহাপ্রভুর প্রকৃত জন্মস্থান ও লীলাক্ষেত্র নবদ্বীপের কোন্ স্থানে তাহা লইয়া আজ বাদানুবাদের অন্ত নাই। গৌড়ীয় মঠ সম্প্রদায় ও অনেক ভক্ত বৈষ্ণবের মতে নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী মায়াপুর গ্রামই মহাপ্রভু-অধ্যুষিত প্রাচীন নবদ্বীপ, গঙ্গার অনেকের মতে তাহা গঙ্গাগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। উভয় দলই যথাশক্তি প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়াছেন, বারান্তরে তাহার যৎসামান্য বিবরণ দিবার চেষ্টা করিব।) জগন্নাথ মিশ্র মহাশয় পূর্ব্বে শ্রীহট্টের অধিবাসী ছিলেন, পরে বিদ্যালাভার্থে নবদ্বীপে আগমন করেন এবং নবদ্বীপের নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর কন্যা শচীদেবীকে বিবাহ করিয়া নবদ্বীপেই বসতি স্থাপন করেন। মিশ্র মহাশয় পাণ্ডিত্যে বৈদিক ও দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। ইঁহার স্বহস্তে লিখিত একখানি মহাভারতের আদিপর্ব্ব দেখিয়াছি। পুঁথিখানির লিপিকাল ১০৯০ শক, অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মের প্রায় ১১ বৎসর পূর্ব্বে ইহা লিখিত হইয়াছিল। অক্ষরগুলি সুন্দর ও সুগঠিত, তবে সর্ব্বশেষের পুষ্পিকা-পত্রখানি হাতে হাতে মলিন হইয়া পড়ায় লেখা অস্পষ্ট হইয়া পড়িতেছে। ঐতিহাসিকতার দিক্ দিয়া গ্রন্থখানির মূল্য যে সামান্য নহে, তাহা বলাই বাহুল্য। শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্ব্বে মিশ্র মহাশয়ের ৮ কন্যা ও ২টি পুত্র জন্মিয়াছিল।

কন্যা সব কয়টিই শৈশবে মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং পুত্র বিশ্বরূপ নিরন্তর শাস্ত্রানুশীলন ও জ্ঞানচর্চ্চায় সংসার-নিস্পৃহ হইয়া ১৬ বৎসর বয়সেই সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক গৃহত্যাগ করেন।

তাই পুত্রশোকাতুর বৃদ্ধ মিশ্রমহাশয় নিজে সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়াও কনিষ্ঠ পুত্রটির লেখাপড়া বন্ধ করিয়া দিলেন। মনে মনে যুক্তি করিলেন—

"এহি যদি সর্ব্বশাস্ত্রে হবে গুণবান।
ছাড়িয়া সংসার সুখ করিবে পয়ান॥"

অতএব ইহার পড়িয়া কাজ নাই।

"মূর্খ হইয়া ঘরে মোর থাকুক নিমাঞি॥"

শিশুকাল হইতেই নিমাইয়ের দৌরাত্ম্যের সীমা ছিল না। নবদ্বীপের ঘরে ঘরে, বিশেষতঃ গঙ্গার ঘাটে মিশ্রমহাশয়ের দিগ্বিজয়ী তনয় শিশুটির উৎপীড়নে সকলে অস্থির হইয়া পড়িত। নিমাই-স্বভাব ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের অথবা উহাকে করিয়া কৌতুকপ্রিয় বালক ছাড়া আর কেহই—তাহারা অনন্যোপায় না হইয়া মিশ্রমহাশয়ের কাছে গিয়া নালিশ করিত—

"ঘর করিবারে যত আনি ফুল ফল।
ছড়াইয়া ফেলে সব করিয়া সকল॥
স্নান করি উঠিলে গামছা নেয় অঙ্গে।
যতেক চঞ্চল শিশু সব তার সঙ্গে॥
অগ্নিহোত্রে আনি কর্ম্ম নেয় ছড় বোল।
কেহ বলে মোর মুখে দিলেক কুয়োল॥"

—চৈঃ ভাঃ

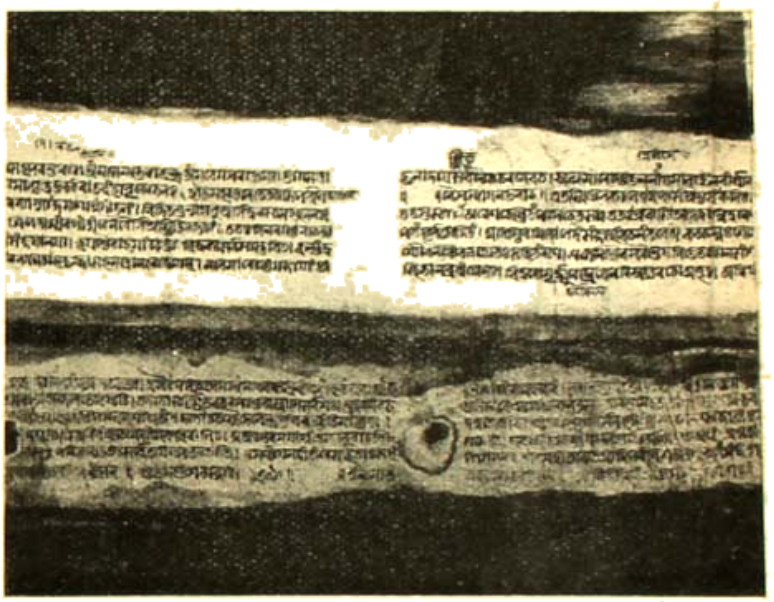

অপরাধ মিশ্রের অবশ্য লিখিত (মহাভারত আদিপর্ব্ব) পুঁথির দুইখানি পত্র। বাঁয়ের পত্রিকর পত্রখানিতে লিপিকাল ১৩৯০ শকাব্দ স্পষ্ট আছে। লিখিত ঐশ্বরূপ পর্যন্ত ইহার শেষাংশটুকু অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে।

দুইচারি মাত্রা দিন নিমাই বাড়িয়া চলিল। মায়ের ছেলেকে রূপে রাখিতে না পারিয়া অগত্যা মিশ্র পুত্রটিকে গঙ্গাবাস পণ্ডিতের টোলে পড়িতে পাঠাইলেন। পড়িতে পাইয়া দুরন্ত বালকের সকল দুরন্তপনা শান্ত হইয়া গেল। যে দুর্নিবার আগ্রহে তিনি পাড়ায় পাড়ায় দৌরাত্ম্য করিয়া বেড়াইতেন, বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইয়া তাহাই তাঁহাকে শাস্ত্রানুশীলনে তন্ময় করিয়া তুলিল।

"বেলা সমধি প্রভু বসি পড়ে।
তিলার্দ্ধেক পুস্তক ছাড়িয়া না নড়ে॥
একবার যে সূত্র প্রভু পড়ি যায়।
আর বার উলটিয়া সবারে ঠকায়॥" —চৈঃ ভাঃ

এইরূপে অল্প কালের মধ্যেই তিনি ব্যাকরণ শাস্ত্রে অধিতীয় হইয়া উঠিলেন। সর্ব্বদা শাস্ত্র চর্চ্চা করিতে করিতে বালোর চাপল্য আবার অন্যভাবে প্রকাশিত হইতে লাগিল। যাহাকে পান তাহাকেই তর্কযুদ্ধে আহ্বান করিয়া প্রতিপক্ষের যুক্তিজাল ছিন্নভিন্ন করিয়া দেওয়া খেলায় দাঁড়াইল। পূর্ব্বনবীপের উচ্চারণ-বিকৃতি লইয়া ব্যঙ্গ করেন, কেহ তাঁহাকে সাগ্রহে শাস্ত্র উপদেশ দিতে আসিলে ব্যাকরণের ভুল ধরিয়া অপদস্থ করিয়া দেন।

"প্রভু কহে এ বাতুল আজুকেপলা নয়॥"

ভক্তবিনোদিনী পণ্ডিত মুরারি গুপ্তের শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনিয়া হেয় করেন—

"প্রভু কহে বৈদ্য তুমি ইহা কেন পড়।
লতাপাতা নিয়া যাহ রোগী যদি মর॥
ব্যাকরণ শাস্ত্র ইহা বিষম অবধি।
কফ পিত্ত অজীর্ণ ব্যবস্থা নাহি ইথি॥" চৈঃ ভাঃ

এই সময়ে তিনি নবদ্বীপে ব্যাকরণের টোল খুলেন এবং এই অধ্যাপকের খ্যাতি ক্রমশঃ চারিদিকে এতই ছড়াইয়া পড়ে যে, নানা দেশ দেশান্তর হইতে ছাত্র আসিয়া তাঁহার টোলে ভর্ত্তি হইতে লাগিল। নবদ্বীপে এই সময়ে এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত আসিয়া সমস্ত পণ্ডিতমণ্ডলীকে পরাস্ত করিবার পর এই কিশোর পণ্ডিতের কাছে কি শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইয়াছিলেন তাহা আর বলিবার নয়।

এইভাবে বিদ্যাবত্তা ও শাস্ত্রবিচারে মহাপ্রভু অপরাজেয় হইয়া উঠিলেন। উপাধি সম্বেত এই নবীন অধ্যাপকের পূর্ণ নাম তখন দাঁড়াইয়াছিল—'শ্রীবিশ্বম্ভর মিশ্র বিদ্যাসাগর বাগীশ্বরঃ'। এই সময়ে বিদ্যাসাগরী টীকা নামে নিমাই পণ্ডিত একখানি ব্যাকরণের টীকা প্রণয়ন করেন বলিয়া জানা যায়।

বিদ্যাসাগর উপাধিক নিমাই পণ্ডিত।
বিদ্যাসাগর নামে টীকা যাহার রচিত। (অদ্বৈত প্রকাশ)

পূর্ব্বনবদ্বীপের টোলে ঐ টীকার পঠন-পাঠন হইত বলিয়া চৈতন্য ভাগবতে উল্লেখ আছে।

ইহাদের আমরা সবে তোমার ঈশ্বরী।
পাই পড়ি পড়াই তনয় তনয়ারি।

তবে এই টীকার কোনওরূপ বিবরণ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

যৌবনের সীমায় পদার্পণ করিয়া বিশ্বরূপ বয়স্কাচারোধে সর্বগুণসম্পন্না কন্যা শ্রীমতী লক্ষ্মীদেবীকে বিবাহ করেন। বিবাহের পূর্বেই গঙ্গার ঘাটে দেখিয়া উভয়ের মধ্যেই প্রণয়ের সঞ্চার হয় এবং নিজে উপযাচক হইয়া মাতার নিকট নিমাই এই বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। ইতিপূর্বেই জগন্নাথ মিশ্র মহাশয় মারা গিয়াছেন। শচীদেবী একা বহুদের পুত্রটী পুত্র ও পুত্রবধূ লইয়া বড় সুখেই দিন কাটাইতেছিলেন। কিন্তু শচীদেবীর এ সুখ বেশী দিন সহিল না। দুরন্তর কলাপে ও ঈশ্বরের প্রয়োজনে তাঁহার সুখময় পারিবারিক জীবনশান্তি উৎসর্গ করিতে হইল।

চারিদিক খেলিয়া লাহুড়ম্বা করিয়া নবদ্বীপে হৈচৈয়ের দিন কাটিতেছিল। এমন সময়ে নবীন অধ্যাপক পূর্ববঙ্গ ভ্রমণে বাহির হইলেন। বিভিন্নস্থানে ও বিভিন্ন জনসমাজে পরিভ্রমণ করিয়া বহু খ্যাতি প্রতিষ্ঠা ও অভিনন্দন লাভ করিয়া যখন আনন্দোৎফুল্লিত হৃদয়ে নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিলেন, তখন জানিতেন না, দুঃখে তাঁহার জন্য বজ্রাঘাতের তুলা কি গুরুতর সংবাদ অপেক্ষা করিয়া আছে। আসিয়া শুনিলেন, সর্পাঘাতে লক্ষ্মীদেবীর মৃত্যু ঘটিয়াছে; শচীদেবী শোকে মুহ্যমান। যে লক্ষ্মীদেবীকে তরুণ বয়সে গঙ্গার ঘাটে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া জনকয়েকের মধ্যে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাঁহার এই শোকাবহ মৃত্যুতে তিনি কতখানি আঘাত পাইলেন, বাহির হইতে তাহার কিছুই অনুমান করা গেল না। অগ্নিগর্ভ বজ্রশক্তির মত বাহিরে গম্ভীর অবিচলিত ভাব দেখাইয়া সকলকে সান্ত্বনাদান করিতে লাগিলেন এবং পরে পুনরায় বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে বিবাহ করিয়া শোকোদ্বিগ্ন মাতাকে শান্ত করিলেন। কিন্তু নিজে বোধ হয় শান্তি পান নাই। লক্ষ্মীপ্রিয়ার বিরহকাতরা তাঁহার অন্তরের অন্তস্তলে যে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করিয়াছিল, মায়ের মুখ চাহিয়া, সংসারের মুখ চাহিয়া পুনরায় বিবাহ করিলেও তাহাতে শান্তিপ্রলেপ পড়িল না। পত্নীভাবে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর মধ্যেও তিনি কখনও প্রাণ খুলিয়া আলাপ করিতে পারেন নাই। সেই হইতেই যেমন যেন উদাসী হইয়া পড়িলেন। সদাহাস্যময়, চপলচিত্ত, পরিহাসরসিক বৃত্তি তাঁহার চিরদিনের মত পরিবর্তিত হইয়া গেল। বুঝি শান্তি পাইতেছিলেন না বলিয়াই বোধ হয় পিতৃকার্য করিবার মানসে আবার গয়ার পথে বাহির হইয়া পড়িলেন। জীবনধারা এই হইতে নূতন খাতে বহিতে আরম্ভ করিল।

পিণ্ডদান করিতে গিয়া গদাধরের পাদপদ্মের সামনে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। এই অপূর্ব দৃশ্য বৈষ্ণব কবিদের আখরে অঙ্কিত হইয়া চির উজ্জ্বল হইয়া বিরাজ করিতেছে। বিরহক্লান্তের চিরতাপদগ্ধ জীব শান্তির আশায় যে চরণ খানি করিয়া খালা জুড়ায়, সেই চরণের দিকে চাহিয়া চাহিয়া কি দেখিলেন, কি বুঝিলেন তিনিই জানেন। সমস্ত দেহ পুলকে রোমাঞ্চিত হইল, নয়নে অশ্রুপ্রবাহ প্রবাহিত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে আর দেখিতে পারিলেন না, মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

কি যে দেখিয়াছেন, কাহারও বলিতে পারেন নাই। কণ্ঠ বাক্যরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, বলিতে পারেন নাই। আত্মীয় বন্ধুদের নিকটে কাঁদিয়া বিদায় লইয়া শ্রীবৃন্দাবনের উদ্দেশে অকূলে পা বাড়াইলেন। অবিলম্বে তাঁহাকে ধরিয়া নবদ্বীপে লইয়া আসা হইল। কিন্তু তখন তাঁহার অর্দ্ধোন্মাদ অবস্থা। পতিদেবী পুত্রের ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, কিশোরী নববধূর রূপে ভুলাইয়া সংসারে বাঁধিয়া রাখিতে চাহিলেন, কিন্তু—

বৃন্দাবন করিয়াও প্রভু নাহি চায়।
কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ বলে অনুক্ষণ।
দিবানিশি প্রেমে পড়ি কান্দিয়া বিভোর। চৈঃ ভাঃ

বৈষ্ণব কাব্যের চিরউপেক্ষিতা এই বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী। যেদিন তিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবতার সিংহাসনে বসিয়া নিজের কণ্ঠে বরমালা বিরাজিলেন, সেদিন তাঁহার মত সৌভাগ্যবতী আর কে ছিল, তাঁহার মত এমন দুর্ভাগ্যকেই বা কে অজ্ঞাতে বরণ করিয়া লইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমধারায় যেদিন সমস্ত প্রাচ্য ভারত উদ্বেলিত, তাঁহারই বালিকা বধূ সেদিন নবদ্বীপের গৃহাভ্যন্তরে মুখ লুকাইয়া প্রভুর অমঙ্গল আশঙ্কায় অশ্রুরোধ করিবার ব্যর্থ প্রয়াস পাইতেছেন। প্রভুর সন্ন্যাসের সময়ে নবীন কবির লেখনী মুখে একবার মাত্র সেই বাধাকরুণ চিত্র ফুটিয়া উঠিতে উঠিতে মুছিয়া গেল, আর দেখা গেল না।

নবদ্বীপে এই সময়ে তান্ত্রিকতার আধিক্য ও বর্ণবৈচিত্র্যিক অবংপতনের কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। কতকগুলি নিরীহ ভক্ত সাধু প্রেমধর্মের উচ্চ আদর্শের মৌলিকতা প্রপীড়িত হইয়া অবিশ্বাসের আলোয় কোন প্রকারে প্রাণধারণ করিয়াছিলেন। এইবার মহাপ্রভুকে কেন্দ্র করিয়া সেই ভক্ত গোষ্ঠি একত্রীভূত হইয়া পরিপুষ্টি লাভ করিতে লাগিল। শান্তিপুরের অদ্বৈতাচার্য, নবদ্বীপে শ্রীবাস, মুরারি গুপ্ত, শ্রীধর, বৃন্দাবনের হরিদাস, রাঢ়ের নিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। গৌরহরি এই সমস্ত ভক্ত-পরিকর লইয়া দিবারাত্র হরিনাম-কীর্তনে বিভোর হইয়া পড়িলেন। টোলের পঠন-পাঠন আর তাঁহার দ্বারা সম্ভব হইল না। কৃষ্ণপ্রেমাবেশে তন্ময় হইয়াই তাঁহার দিন চলিয়া যাইত। চোখের জলে পুঁথির আখর অস্পষ্ট হইয়া পড়িত। ভক্তবৃন্দের প্রতি প্রভুর আদেশ—

দিশা দেখাইয়া প্রভু হাতে তালি দিয়া।
আপনে কীর্তন করে শিষ্যগণ লৈয়া। চৈঃ ভাঃ

কলেজ ঘর তাঁহার অধ্যাপনার শুষ্ক পুঁথিতে ভরি পড়িল।

কোথায় গেল সেই পাণ্ডিত্যাভিমানী কূট তার্কিক, বহুতর্কপ্রিয়, তরুণ অধ্যাপক। তাহার স্থলে দেখিতে পাই, অতি বিনয়ে সকলের চরণ ধরিয়া তিনি অশ্রুনয়নে কৃষ্ণভক্তি আশীর্বাদে ভিক্ষা করিতেছেন। প্রেমের দ্বারা লোককে, অশ্রুবিন্দুর দ্বারা পাষণ্ডদলকে জয় করিতেছেন। সকল প্রকার অত্যাচার, অনাচার, উৎপীড়ন আত্মিক শক্তির দ্বারা, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের দ্বারা জয় করিতেছেন। তথাই যবনাই উদ্ধার বা চাঁদ কাজী দমন অভিনব সত্যাগ্রহের অপূর্ব দৃষ্টান্ত।

তিনি এই ভাবে কিছুকাল নবদ্বীপে কীর্তনানন্দে কাটাইবার পর অকস্মাৎ একদিন উত্তরাপথ সংস্কারের গুরুত্বে ২৫ বৎসর বয়সে পুরীধামে কাটোয়ার কেশবভারতী বোধায়ীর নিকটে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। এই সন্ন্যাসের নাম হয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। নবদ্বীপচন্দ্রের এই জগতের মত নবদ্বীপ পরিত্যাগ কাহিনী অতি মর্মান্তিক ভাবেই বৈষ্ণব কবিরা বর্ণনা করিয়াছেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর শ্রীচৈতন্যদেব নীলাচলে গিয়া বাস করিতে থাকেন। এই সময়ে পরমহংস দক্ষিণাত্যের ও উত্তর ভারতের প্রধান প্রধান তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করিয়া তিনি তাঁহার অলৌকিক প্রেমধর্ম প্রচার করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। যে তাঁহাকে দেখিয়াছে সেই পাগল হইয়াছে, শত শত যাত্রীর প্রশ্নের যে পরম প্রশ্নের উত্তর মিলে নাই, মহাপ্রভুর প্রেমাশ্রুসিক্ত মুখপদ্ম দেখিয়াই তাহার সমাধান হইয়াছে। সমগ্র দেশ সে সময়ে বৌদ্ধ নিরীশ্বরবাদ ও শঙ্করের অদ্বৈত ব্রহ্মবাদের জ্ঞানমার্গী শাস্ত্রতর্কের কোলাহলে মুখর। সুতরাং অহৈতুকী পরাভক্তি মত প্রতিষ্ঠা ও প্রচার করিতে গিয়া তাঁহাকেই সর্বত্র কায়ক্লেশে পড়িতে হইয়াছে। ভারতের বিভিন্নমুখী বৈদান্তিকগণের সহিত সুদীর্ঘকাল ধরিয়া কূট শাস্ত্র বিচারে তাঁহাকে পরাস্ত করিতে হইয়াছে। প্রতিপক্ষের কঠিন যুক্তিজাল অতি অনায়াসে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়া ভক্তিপরবশ কণ্ঠে প্রেমনামের গান করিতে করিতে যখন তিনি আত্মহারা হইয়া পড়িতেন, শুষ্ক জ্ঞানমার্গীর বিতর্ক-দগ্ধ তখন প্রেমধর্মের পীযূষ-ধারায় উজ্জীবিত হইয়া উঠিত, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শাস্ত্রযুক্তি প্রদর্শনের প্রয়োজন হয় নাই। প্রেমাশ্রুসিক্ত দেবমূর্তির দিকে একবার চাহিয়াই শত যুক্তিজাল ছিন্ন করিয়া তাহারা চরণে বিকাইয়াছে। জোশী তপস্বী হইয়াছে, রত্না সাধু হইয়াছে। দক্ষিণাত্য ভ্রমণের সময়ে যে যে স্থানে তিনি গিয়াছেন, প্রেমের অমিয়ধারায় তাহা প্লাবিত হইয়া গিয়াছে। শ্রীরঙ্গমের বিরহে পাগলের মত সকল তীর্থে, সকল মন্দিরে সকল দেবদ্বারে আকুল হইয়া মূর্ছিত হইয়াছেন।

এই দেশ পরিভ্রমণে তিনি যত তাপদিগ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন বলিয়া গোবিন্দদাস কড়চায় উল্লেখ করিয়াছেন—

এই দেশে ভ্রমি' বহুকাল।
সকলের তাপ মুক্ত শচির দুলাল॥

উড়িষ্যা, তামিল, তেলেগু, মালয়ালম প্রভৃতি দক্ষিণাত্যের সমস্ত ভাষাতেই তিনি কথাযোগ্য না করুণা করিতে পারিতেন বলিয়া কড়চায় উল্লিখিত আছে। এইরূপে সমগ্র দক্ষিণাত্য জয় করিয়া, কাশীতে ভক্তিস্রোত বহাইয়া, মুক্ত মুক্তাবন উদ্ধার করিয়া, উড়িষ্যায় রাজাদের প্রেমধর্মে প্রাণবন্ত প্রতিষ্ঠা করিয়া সমগ্র ভারতের কৃষ্টির দিক দিয়া কি অপরিসীম কাজ তিনি ঘটাইয়াছিলেন তাহাকে সত্যই বিস্মিত হইতে হয়।

মহাপ্রভু যে সকল পরিকরকে পরিবৃত হইয়া ধর্মপ্রচার লীলা প্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহারাও বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থানে আগে পিছে জন্মগ্রহণ করিয়া যথাসময়ে সঙ্গী হইয়াছিলেন। তাপ, কঠোরতা, মনীষা ও প্রতিভায় অসাধারণত্বে তাঁহারা কেহই কিছুমাত্র ন্যূন ছিলেন না বলিলেই যথেষ্ট। ভারতের ইতিহাসে যদীয় দুলাল জনসমুদ্রের মায়ামোহ অক্লেশে ছিন্ন করিয়া অতীন্দ্রিয়ের সাধনায় তাপের কঠিন পথে বাহির হওয়ার উপাখ্যান নূতন নহে, কিন্তু মহাপ্রভুর পুণ্যপাদ লাভ করিয়া তৎকালে বাঙ্গলার একসাথে যত রাজতপস্বী উদ্ভব হইয়াছিল, এমন আর কোন কালেই হয় নাই। অদ্বৈতাচার্য, নিত্যানন্দ, রাঘ রামানন্দ, বাসুদেব সার্বভৌম, মুরারী গুপ্ত, রূপ, সনাতন, গোপাল ভট্ট, শ্রীজীব, রঘুনাথ দাস প্রভৃতি মনীষিগণের প্রদীপ্ত প্রতিভালোকে বাঙ্গলার গগন চিরকাল উদ্ভাসিত হইয়া রহিবে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতে গেলে—"ইঁহারা বীপশলাকা—কিন্তু চৈতন্যদেব বীপ; চৈতন্যের আবির্ভাব না হইলে ইঁহারা জ্বলিতে পারিতেন কি না কে বলিতে?" মহাপ্রভুর পরবর্তীকালে উক্ত বীপশলাকাগুলি প্রদীপ্ত হইয়া আরো বহু শত সূত্র শিখা প্রজ্বলিত করিয়া সমগ্রদেশে

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব : প্রাচীন চৈতন্যচরিত হইতে গৃহীত প্রামাণিক প্রতিলিপি।

আলোকের বন্যা বহাইলেন। বাঙ্গলার, তথা ভারতের কৃষ্টির ইতিহাসে এই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের দান আজিও আলোচিত হয় নাই।

প্রেমিক বিহ্বলটির বিরহবেদনাসিক্ত কুসুমাদপি কোমল হৃদয়ের অপর একটা মহাবলি কঠোর দিক ছিল—তাহা বৈরাগ্যের দিক, বিশুদ্ধির দিক। তাঁহার পরিকরবৃন্দের মধ্যে সুকঠিন নৈতিক বিশুদ্ধি ও অনুশাসনের কঠোরতার বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। তাঁহার পরমপ্রিয় ছোট হরিদাস ভিক্ষালব্ধ মোটা চাউলে প্রভুর সেবার কষ্ট হইবে ভাবিয়া, ভগবান আচার্যের প্রয়োচনায় সিন্ধি মাহিতীর ভগ্নী পরমভক্ত বৃদ্ধা মাধবীর নিকট হইতে ধরনাইয়া সরু চাউল লইয়াছিলেন বলিয়া মহাপ্রভু পতনের শত অনুরোধ সত্ত্বেও আর তাঁহার মুখ দর্শন করেন নাই। প্রভুর দারুণ বিরহজ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া হরিদাস প্রয়াগে গিয়া যমুনার জলে আত্মহত্যা করিলেন—

যদি হাসি প্রভু করে মুখপদ্ম চিত্র।
প্রকৃতি দর্শন হৈলে এই প্রাপ্তিসিদ্ধ।

তাঁহার কুসুমকোমল দেহখানি শয়নকালে উপাধানবিহীন অবস্থায় ভূমে লুটাইত। জগন্নানন্দ এই দৃশ্য দেখিতে না পারিয়া একটি সাবাস তুলোর বালিশ তাঁহার জন্য রাখিয়াছিলেন বলিয়া বহুবার স্নেহ করিলেন—

জগন্নানন্দ চাহে মোরে বিষয় ভুঞ্জাইতে।

অতুল ঐশ্বর্যশালী রাজপুত্র যখন সন্ন্যাসের বেশ ধারণ করিয়া তাঁহার চরণে শরণ লইতে আসিলেন, তখন সামান্য তিন টাকা তুলোর ছোট কম্বল পায়ে দিয়া বসিয়া সন্তুষ্ট দৃষ্টিতে

ছোট কম্বলের পানে প্রভু চাহে বারে বারে।

ছোট কম্বল ছাড়িয়া দীর্ঘ বসন পরিয়া আসিলে তবে তাঁহার সহিত প্রাণ খুলিয়া আলাপ করিলেন। রাজার দুলাল রঘুনাথ প্রভুর মোহে পাগল হইয়া তীব্র বৈরাগ্যের সুর ছাড়িয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে—

মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হৈয়া।

বলিয়া ফিরাইয়া দিলেন। তাঁর প্রত্যাগমন মহাপ্রভুর চরণে বিজাতীয় হইলেও বিসদৃশভাগী বলিয়া প্রথমে কৃপা লাভ করিতে পারেন নাই। লৌকিক ঘোর আবহাওয়া হইতেকী দিয়া অপরাধে পরের হিতের জন্য রাখিয়া দিয়াছিল। সকলশুদ্ধি হইয়াছে বলিয়া প্রভু বৈরাগ্যের কঠোর পথ হইতে শত অনুরোধ সত্ত্বেও তাঁহাকে ফিরাইয়া দিলেন। প্রভুর সপার্ষদে পুরীধামে অবস্থানের সময় জগন্নানন্দ বাঙ্গালা হইতে অতি কষ্টে একহাঁড়ি খুসকি তৈল নীলাচলে বহিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। প্রভু তাঁহাকে সেই তৈলে জগন্নাথদেবের মন্দিরে আরতির প্রদীপ সাজাইতে বলিলে তিনি অভিমানে তাঁহার তৈলের হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। প্রভু বিক্ষুব্ধও বিচলিত হইলেন না। এইরূপ শত শত বৃত্তান্তে সেই প্রেমিক-পাগলের কুসুমকোমল চরিত্রে বজ্রকঠিন দৃঢ়তা ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার দৃঢ় সঙ্কল্প পূরণে পৃথিবীর কোন বাধাই প্রতিবন্ধক হয় নাই। প্রেয়সীর ভালবাসা, জননীর লক্ষ লক্ষ স্নেহ, গৃহের মায়া, খ্যাতির মোহ, বন্ধুজনের অকৃত্রিম অনুরাগের বন্ধন কিছুই তাঁহাকে সন্ন্যাসগ্রহণের সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই।

দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সময়ে তাঁহার পঠ পঠ প্রণেতার ভক্তগোষ্ঠীর কাতর অনুনয় উপেক্ষা করিয়া একমাত্র ভৃত্য সঙ্গে লইয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

মহাপ্রভু প্রেমের ধর্ম, করুণার ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পশ্চাতে ছিল বৈরাগ্যের ঐ কঠোরতর অনুশাসন, সন্ন্যাসের ঐ প্রবলতম দৃঢ়তা। বাঙ্গালী তাঁহার প্রেমধর্মের বড়াই করে, কিন্তু সেই নৈতিক বিশুদ্ধির কঠোরতা সে ভুলিয়াছে। বাঙ্গালী পূজা করিল শ্রীচৈতন্যদেবের রাজবেশ। যিনি অর্ধখানি ছিলতন্ত্রী সঙ্গের অপরাধে ভক্ত ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে ভোগে সম্ভোগে ডুবাইয়া মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিল। তবের ছিপ্ ছিপা অবশ্য তাঁহারা বিলাসমূর্তির নিতান্ত প্রয়োগ করিয়া বলিলেন, সন্ন্যাসের পরমার্থকালের আচরণ নিত্য শুদ্ধসত্ত্বের নহে, লোকশিক্ষার স্বরূপ মাত্র। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মনে হয়, বাঙ্গালী যদি তাহার চোখের সম্মুখে বিলাসবৈভব-পরিবৃত নটবর মূর্তি না রাখিয়া সেই কুসুম-কোমল অথচ বজ্রগভীর, করুণার উৎস অথচ কালাকালে কুলিশ-কঠোর, কৌপীন মাত্র সার বিরাগীর মূর্তিখণ্ড আদর্শ রাখিত, তাহা হইলে বাঙ্গালীর জাতীয় চরিত্র হয় ত এত শিথিল হইয়া পড়িত না।

এমনি করিয়া মহাপ্রভুর জীবনের শেষার্ধ নীলাচলে অতিবাহিত হয়। সন্ন্যাসজীবনের ছয় বৎসর দাক্ষিণাত্য কাশীবৃন্দাবনাদি পর্যটনে কাটিয়া যায়। ১৮ বৎসর নীলাচলে বাস করিবার পর ৪৮ বৎসর বয়সে ১৪৩৩ খৃষ্টাব্দে আষাঢ় মাসে রথযাত্রা সম্মুখে তিথিতে তাঁহার অলৌকিক লীলার পরিসমাপ্তি ঘটে। নীলাচলে তাঁহার জীবনের শেষ ছয় বৎসর যে ভাবে কাটিয়াছে, তাহা বর্ণনা করিবার ভাষা নাই। বৈষ্ণব কবিরা তাঁহাকে দিব্যোন্মাদ নাম দিয়াছেন। অধিকাংশ সময়েই তাঁহার বাহ্যজ্ঞান থাকিত না, আকাঙ্ক্ষা ও আকাঙ্ক্ষিত এক হইয়া অলৌকিক দিব্য তন্ময়তার ডুবিয়া থাকিতেন। শেষে এমন হইয়াছিল যে, জগন্নাথ মূর্তি দর্শন করিতে যাওয়াও তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল, দেখিলেই আত্মসম্বরণ করিতে না পারিয়া উন্মত্তবৎ আলিঙ্গন করিতে ছুটিতেন। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গজ্যোতি দেখিয়া একবার সমুদ্রে নদী প্রমান করিয়াছিলেন, অতি কষ্টে সেবায় তাঁহাকে উদ্ধার করা হয়। এই সময়ে তাঁহার তীব্র বিরহের মর্মন্তুদ অভিব্যক্তির কথা বৈষ্ণব কবিরা বর্ণনা করিতে গিয়া ভাষা খুঁজিয়া পান নাই, সমস্ত কবের তাহা অনুভূতি-গ্রাহ্য মাত্র।

অতঃপর এই লোকোত্তর জীবনলীলার অকস্মাৎ পরিসমাপ্তি ঘটিল কি করিয়া সে সম্বন্ধে বৈষ্ণব কবিরা সকলেই প্রায় নীরব। লোচনদাস চৈতন্য-মঙ্গলে সেই লৌকিক দেহের অলৌকিক ভাবে পরিসমাপ্তি ঘটাইতে গিয়া জগন্নাথদেবের বক্ষের মূর্তিতে লীন হইয়া যাওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এ ছাড়া তাঁহার তিরোভাবের সাধক হিসাবে কোনও তিথি বা নীলাচলের কোনও স্থান চিহ্নিত নাই। যাঁহারা অলৌকিকত্বে বিশ্বাস করেন তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র, তবে লৌকিক দেহের লৌকিক সমাপ্তিতে যাঁহারা বিশ্বাসী তাঁহাদের কাছে ইহা একটি করুণ প্রহেলিকা সন্দেহ নাই। জয়ানন্দ তাঁহার চৈতন্যমঙ্গল এই বিষয়ে কিছু আলোক নিক্ষেপ করে—

আষাঢ় অষ্টমী (?) দশ দিগলা বাহিতে।
উটাল বাজিল রথ পাহে আচম্বিতে।

চারণে বেদন বড় বাঢ়ি গেলা দিনে।
সেই লক্ষ্যে টোটায় পরন অবশেষে।

মায়া শরীর তথা রহিল যে পড়ি।
চৈতন্য বৈকুণ্ঠ গেলা অমূল্য হাড়ি।

এই মায়া শরীর শেষে কি হইল তাহা অন্বেষণাপেক্ষ। লোচনদাস অন্যান্য কথা উল্লেখ না করিয়া লিখিয়াছেন কাশীমিশ্রের ঘরে থাকিতে থাকিতে—

প্রাতে উঠিলা জগন্নাথ দেখিবারে।
ক্রমে ক্রমে গিয়া উত্তরিলা সিংহদ্বারে।

নিয়ড়ে যখন প্রভু দেখিতে না পায়।
সেইখানে মনে প্রভু চিন্তিল উপায়।
তখনে দুয়ারে নিম্ন লাগিল কপাট।
সত্বরে চলিয়া গেল অন্তরে উচাট।

সম্ভবতঃ মহাপ্রভু শরীরে কাশীমিশ্রের ঘর হইতে অন্তের অলক্ষ্যে একাকী গুণ্ডিচাগৃহে জগন্নাথ দর্শনে গিয়াছিলেন এবং সেইখানেই ভাবাবেশে মূর্তি আলিঙ্গন করিতে গিয়া সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়েন। ইতিমধ্যে মন্দিরের বাহির দুয়ারে কপাট পড়িয়া গিয়াছিল। সম্ভবতঃ মন্দির-প্রাঙ্গণেই তখন মহাপ্রভুকে সমাহিত করিয়া বাহিরের উৎসুক ভক্তমণ্ডলীকে জগন্নাথে লীন হওয়ার সংবাদ প্রচার করিয়া দেওয়া হয়। জনসাধারণ অলৌকিকেই অতি বিশ্বাসী, তাই সহজেই এই উক্তি প্রবাদে দাঁড়াইয়া গেল। বীরেশ্বরবাবু ও নলিনী ভট্টশালী মহাশয়ের মতে গুণ্ডিচাবাড়ীতে মহাপ্রভুর চরণচিহ্ন-অঙ্কিত প্রস্তরখানিই সম্ভবতঃ শ্রীচৈতন্যদেবের নিভৃত সমাধির নিদর্শন।

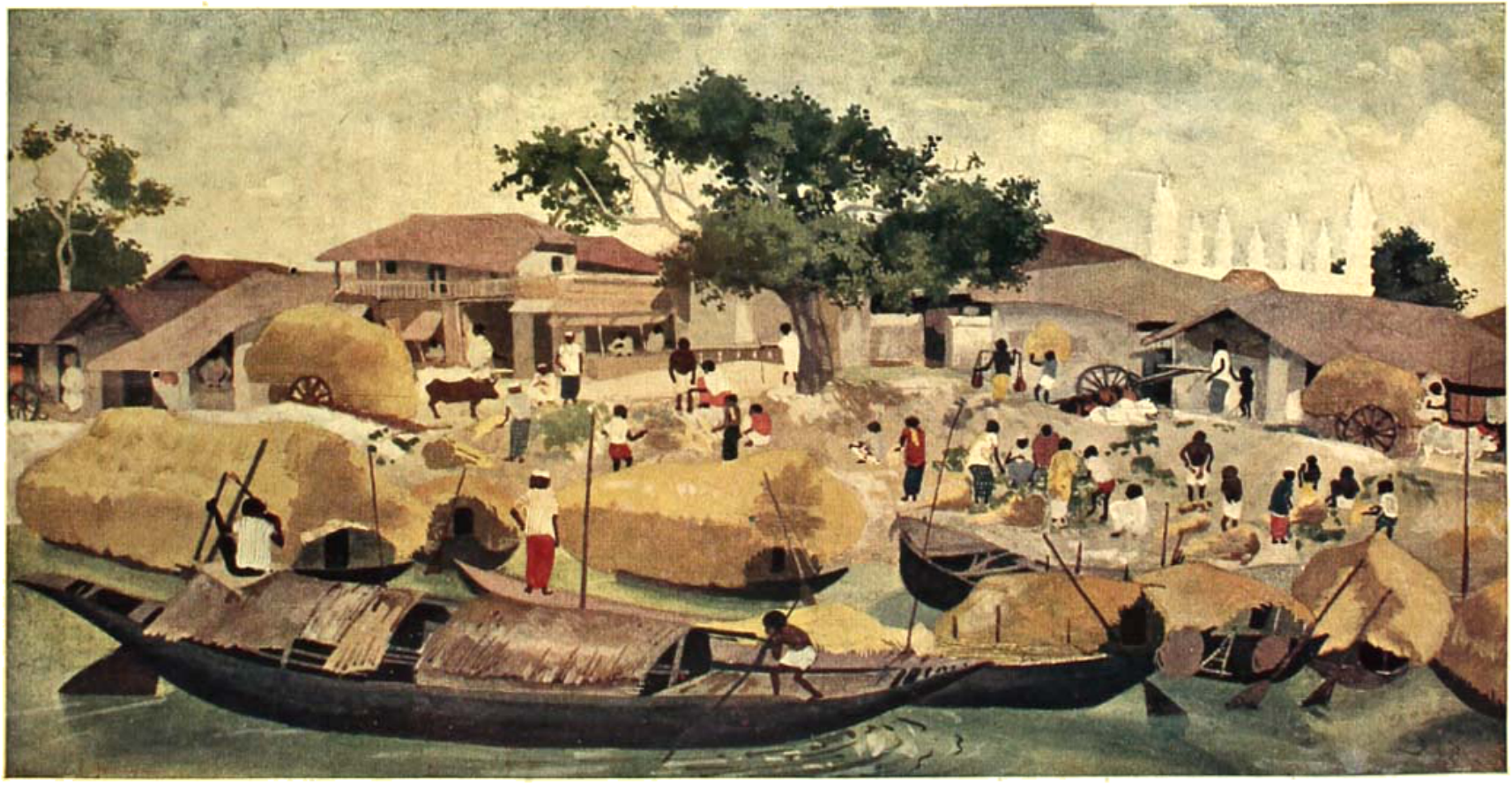

ধানের নৌকা। [শিল্পী—শ্রীমাণিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

বুভুক্ষু সভ্যতা

—শ্রীসুধীরচন্দ্র ধর

সভ্যতার রূপ কিংবা রুচি কি, বর্ত্তমান সমাজ তাহা বলিতে পারেন কি না জানি না। সভ্যতার কোনও রূপ আছে কি না, তাহা আমারও জানা নেই। কিন্তু বুভুক্ষু সভ্যতার যে মূর্ত্তি আজ পৃথিবীর সর্ব্বত্রই প্রকটিত হইয়াছে, তাহার যে একটা বিশেষ রূপ ও রুচি আছে তাহা আজ মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি সকলেই করিতেছেন; যাঁহার এই সভ্য নামের অধিকারী হইবার সৌভাগ্য হয় নাই, বিংশ শতাব্দীতে বাস করা তাঁহার পক্ষে বিড়ম্বনার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। সভ্যতার ছদ্মবেশ পরিয়া আজ যে বর্ব্বরতা পৃথিবীর সর্ব্বত্রই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহার রূঢ় মূর্ত্তি দেখিয়া কম্পিত হইয়াছে—এক নিরন্ন সমাজ, যাহাদের 'সিভিলাইজড্' বা সভ্য নামে অভিহিত করা হয় না। তাহারা নিরক্ষর পাড়াগেঁয়ে কৃষক অথবা মজুর—তাহাদের সংসারে আজ বাঁচিয়া থাকার প্রয়োজন শুধু এক বুভুক্ষু ও কঙ্কালসার সভ্য সমাজকে নিশ্চিহ্ন সংস্রাবহীন অসভ্যতার ছোঁয়াচ হইতে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য। তাহাদের প্রয়োজন শুধু পঠনের জন্য, পরিণতি বা ফল লাভের জন্য নয়।

বস্ত্রাবৃত বাঙ্গালার কঙ্কালসার সভ্যতাকে অসভ্য বলিবার উপায় মোটেই নাই। কেন না, মা-সরস্বতীর ভাষা-ভাণ্ডার প্রায় একরূপ তাহাদের দখলে আসিয়াছে। লক্ষ্মীর কৃপা হইতে বঞ্চিত হইলেও ভগ্নী সরস্বতী তাহাদের বঞ্চিত করেন নাই। যৌবনেই অর্দ্ধপক্ক কেশের উপর 'হেয়ার লোশন' মাখাইয়া, কোটর-গত চোখের উপর চশমা তুলিয়া দিয়া, শূন্য পেটের উপর জাপানী 'রেয়নের' পাঞ্জাবীটি টানিয়া দিয়া, 'চাইনিস্' স্লিপার পায়ে পরিয়া 'সভ্যতা' যখন নগরীর জনস্রোত পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ান, বাসা সঙ্গে লইয়া অর্দ্ধ-ইংরাজী ও অর্দ্ধ-বাঙ্গালায় বামাকণ্ঠে কথা কন, তাঁহাকে সভ্য বলিয়া নমস্কার না করিলে, অসভ্য নামের অধিকারী হইতে হইবে। অন্তর শুষ্ক হউক, কিন্তু যতদিন চলে বাহির বাঁচাইয়া রাখিতেই হইবে, কেন না উহা বুভুক্ষু সভ্যতার 'পথের বাণী।'

বুভুক্ষু সভ্যতার রূপ বহু। বহুরূপী বুভুক্ষু সভ্যতা ইশপের গল্পের নেকড়ে বাঘ ও মেষশাবকের গল্পটি কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছে। প্রয়োজনানুরোধে গোঁফ কামাইয়া সখী সাজিতে পারেন, আবার স্বদেশ-প্রেমের বক্তৃতা দিয়া অনর্গল অশ্রুপাত করিতেও পারেন। তাঁরা যে তার প্রকাশ ও গোপনের জন্য এ কথা ত' আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই!

এই মেকী জীবন লইয়া বাংলার সমাজ আজ হাঁফাইয়া উঠিয়াছেন, কিন্তু এমনই মজা, ছাড়িতে চাহিলেও ইহাকে ছাড়িবার জো নাই। আবার জোর করিয়া ছাড়িলেও ময়ূরপুচ্ছ কাকের অবস্থায় পড়িতে হয়। এ যেন 'হেমলকে'র ক্রিয়া, অবধারিত মৃত্যু জানিয়াও হাসিতে হইবে, কাঁদিয়া লাভ নাই।

বাল্য হইতে সুখের স্বপ্ন দেখিয়া হঠাৎ বিশ কিংবা বাইশ বৎসর পরে বিশ্ব-বিদ্যালয়-প্রদত্ত খেতাবের বোঝা ঘাড়ে চাপাইয়া বুভুক্ষু সভ্যতার দ্বারে আসিয়া কড়া নাড়িতে হয়, সেই দিনই হৃদয়ঙ্গম হয় মিল্টনের 'প্যারাডাইস লষ্টে'র অর্থ, কিন্তু 'ইকনমিক্স' বা তথাকথিত অর্থবিজ্ঞানের 'ডিম্যাণ্ডের' অর্থ ঘোলাটে হইয়া উঠে। বার বারই কেবল মনে হয় 'দাবী'। বাবার দাবী, মা'র দাবী, ভাই-বোনের দাবী, প্রেমিকার দাবী, দাবীর অন্ত নাই। আঘাতের প্রতিঘাত, ধ্বনির প্রতিধ্বনি আছে—কেহই ছাড়িয়া কথা কহিবে না। সকলেই চাহিবে তার ন্যায়সঙ্গত দাবী কড়ায়গণ্ডায় বুঝিয়া লইতে, কিন্তু এত 'সাপ্লাই' কোথায়? সভ্যতা তখন পেটের জ্বালায় অহিফেন কিংবা পটাসিয়াম সাইয়নাইড্ খাইয়া আত্মরক্ষা করে।

সভ্য মরিয়া যায়, সভ্যতা মরে না। সভ্যতা তখন জোর গলায় বলিতে থাকেন 'ওটা ভীরুতা'। ভীরুতা কি

সাহসিকতা আমি না, তবে বুভুক্ষু সভ্যতার ইহা যে একটা লক্ষণ তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতে পারি।

দাবীর জোরে টিকিয়া যান, তাঁহারাই বাহিরের দারোয়ানীর অধিকারী, কিন্তু অন্তর তাঁহাদেরও শুষ্ক। নতুবা মোটা টাকা মাহিনা পাইয়াও অফিসের দারোয়ান কিংবা কাবুলীর শরণাপন্ন হইতে হয় কেন? যে অফিসের দারোয়ান কিংবা কাবুলের শরণাপন্ন হয় না, তাহার বেশীদিন সত্তা থাকা চলে না—হয় ত সে বাঁচিয়া থাকে অনেক দিন; জীবনের পুঁজি দিয়া বাড়ী কেনে, সভ্যতার খোরাক পরযুগযাত্রীদের জন্য সঞ্চিত রাখিয়া যায়। ভিক্ষা করা পৌরুষের নয়, হয়ত তাহাতে দাতার সন্মান যথেষ্টই থাকে, কিন্তু গ্রাহকের চিরদিনই অশান্তিকর। বুভুক্ষু সভ্যতার আইনের পুঁথিতে এর জন্য একটা clauseএর আছে। 'ভিক্ষা' শব্দের পরিবর্ত্তে "ডোনেশন" কিংবা "ঋণ" যাহা আর ফেরত দিতে হইবে না প্রভৃতি শব্দ যদি ব্যবহৃত হয় তাহাতে সভ্যতা বজায় থাকে, কেন না এটা 'ক্রেডিট সিষ্টেম'এর যুগ। এ যুক্তি মানিয়া লইতেই হইবে, তাহাতে ক্রেডিটের 'থিসিস্' থাকুক আর নাই থাকুক।

অর্থহীন হাসি মুমূর্ষুর হাসির মত, 'টি-পার্টি'র আমন্ত্রণ যেন শৃগালের বাড়ীতে বকের নিমন্ত্রণ—হ্যাভেলক্ বা কয়-মর্দ্দন যেন কালনেমির বিশলাকরণী-প্রার্থী হনুমানের অভ্যর্থনা—ঐসব বুভুক্ষু সভ্যতার খোরাক—অভাব হইলে বুভুক্ষু সভ্যতা নিজে হইয়া মারা পড়িবে। পুড়াইবার জন্য সৎকার সমিতিতে খবর দিতে হইবে। দারিদ্র্যকে ছাড়তায় মোড়ক করিয়া রূপা বলিয়া কথার কৌশলে চালাইতে না পারিলে তাহাকে এই সভ্য সমাজের সীমার বাহিরে থাকিতে হইবে।

যে দিন হইতে মানব সমাজ এই বুভুক্ষু সভ্যতার আশ্রয় লইয়াছে, সেইদিন হইতে ঘর হইতে বাহিরের মর্য্যাদা হইয়াছে অনেক বেশী। মানব সমাজ আজ নিজের দুর্ব্বলতাকে পরের ঘাড়ে চাপাইয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের আবরণে নিজেকে ঢাকিয়া, পৃথিবীর দূরদর্শী ও ভূয়োদর্শী কর্ণধারগণের গুণকীর্ত্তনে পঞ্চমুখ হইয়া এই সভ্যতার অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া বসিয়া-ছেন;—কোন্ শ্মশানে যাইয়া যে সেই অর্ণবপোত আশ্রয় লইবে জানেন তাহা শ্মশানবাসিনী, দুর্গতি-নাশিনী মা দুর্গা!

কাব্যের উদ্দেশ্য

...বায়ু, তেজ ও ব্যোম অর্থ-বর্ণের ও সংযোগের (permutation and combination এর) তারতম্যানুসারে মনুষ্য-শরীরে সর্ব্বসাকুল্যে আটটি রস বিদ্যমান থাকে এবং তাহার শিক্ষা ও সাধনার তারতম্যানুসারে সর্ব্বসমেত উক্ত-পরিমাণে ভাবের উদয় হইয়া থাকে। মানুষের শরীরে রস বিদ্যমান থাকে বলিয়াই তাহার ভাবের উদয় হয়। রস না থাকিলে মানুষ শুষ্ক হইয়া এমন কি মৃত্যুমুখে পর্য্যন্ত নিপতিত হয়। "রস" প্রকৃতিজাত এবং "ভাব" মানুষের স্বভাবজাত। মানুষের সমস্ত ভাব কখনও পূর্ণমাত্রায় উদিত হয় না। শিক্ষা ও সাধনার তারতম্য-বশতঃ মন, ইন্দ্রিয় ও শরীরের পটুতা বিভিন্নাকার ধারণ করিয়া থাকে এবং ঐ পটুতার বিভিন্নতার জন্য বিভিন্ন বিষয়ের সংযোগে বিভিন্ন রকমের ভাবের উৎপত্তি হয়। ভাবের বিভিন্নতার সহিত মূল আটটী রসের সম্বন্ধ বিভিন্নাকার ধারণ করে। তুলিকা ও সুসাধনার দ্বারা পরিমার্জ্জিত না হইলে মানুষ সাধারণতঃ তাহার ভাবের সহিত অন্তর্নিহিত মূল রসের যে কি সম্বন্ধ, তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না।

ঐ সম্বন্ধ প্রস্ফুটিত করিয়া সাধারণের পক্ষে উপলব্ধিযোগ্য করা কাব্যের অন্যতম উদ্দেশ্য।...

হেঁয়ালী নং ২

—কস্যচিদবোধস্য

ঈশান কোণেতে ওই পৃথিবীর তব
হেরিছ যে কাল মেঘে,
উঠিবেক তাহা হ'তে, বুঝ কি, অচিরে
কটিকা প্রবল বেগে ?
শুষ্ক তৃণ, যাহে তব আচ্ছাদিত গৃহ,
যাইবে উড়িয়া কোথা।
অনল অজস্র ধারা বরষিবে যবে,
কোথায় রাখিবে মাথা ?
বাঁচাইতে নিজ শির পলাইবে দ্রুত
ভক্ত আর অনুচর,
তিতিবে কৌপীন, অর্দ্ধনগ্ন দেহ শীতে
কাঁপিবেক থর থর।
উৎকণ্ঠা, ছাগীর দুগ্ধে আহরিত যাহা,
হ'বে ধরা বিসূরিত,
দগ্ধ হিয়া অনুতাপে, করি' অনুভব
কর্ম্মফল বিগর্হিত।

নাহি বুঝি বৈরবৃত্তি কিম্বা স্বার্থজ্ঞানে
এ বিপত্তি-অভ্যুদয়,
বহনে অথবা কার্য্যে নাহি পাই আর
অহিংসার পরিচয়।
সর্ব্ববিধ অধিকার লাভের বাসনা,
ক্ষমতার তীব্র লোভ,
একছত্র রাষ্ট্রপতিত্বের অভিলাষ
ঘুরিল কি সর্ব্ব ক্ষোভ,
করুণা, মহানুভূতি, সুপ্রবৃত্তিচয়
সমূলে অন্তর হতে—
উঠাবে বসাবে সবে তর্জ্জনী-হেলনে,
দলি' পায়ে লোকমতে ?
এ শুষ্ক বাসনা মোহ প্রজ্ঞা-আঁখি তব
করিল কি অন্ধপ্রায় ?
হেরি ঘোর প্রহেলিকা স্বপ্নাবেশে যেন—
কিছু নাহি বুঝা যায়।

বুঝিয়াছি এই মাত্র—এক পরিবার
আছিল যে প্রতিষ্ঠান,
এক-তন্ত্র, এক-বক্ষ নাহি হ'লে, যা'র
নহে কার্য্য সমাধান,
করেছ তাহার মাঝে প্রভেদ সন্ধান
নিজ কূট-বুদ্ধি বলে,
দ্বন্দ্ব ঘোরতর তেঁতো আজ ছাতুখোরে—
বাঁধিয়াছে তুই দলে।
ভুল হ'ল হায় ! ছাতুখোরের শিরায়
আছে এক মহাজন,
বহিয়া ছাতির বংশে, করে শুদ্ধ তা'র
খাদ্যাভাব সম্পূরণ।
ভাবে তাহা স্বল্পভাবে নাড়িয়া চুঁড়িয়া
পুষ্ট ছাগশিশু যথা
কতিপয়, তুষ্ট তেঁতো নর্ত্তনে কুর্দ্দনে—
এই ত তেঁতোর প্রথা !

গন্ধভীর দুগ্ধপানে, কহে কেহ ঃ
যে শিশু রক্ষিত, পুষ্ট,
ধরে গন্ধভের বুদ্ধি বয়স্ক যখন।
—হবে না আমারে কভু,
বুদ্ধিহীন আমি—তাই চাই শুধাইতে
ছাগ-দুগ্ধে পুষ্ট যা'রা,
হয় কি হে বুদ্ধিবৃত্তি, প্রবৃত্তিনিচয়
অন্যের মতন তা'র ?
জানি না বুঝেছ কি না, ঘেরিছে ক্রমশঃ
চৌদিকে নিবিড় জাল,
করিয়া ক্ষেপণ যারা, আছে সূত্র ধরি'
বসিয়া নিয়ত কাল।
ধন্য ভাগ্য—সংঘটিত না হয় বিপদ
যদি রাখো দেবতার,
পড়িলে দানার হাতে, কি ঘটে বরাতে
নিশ্চয়তা কিবা তা'র ?

নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ

—শ্রীকিরণেন্দু বাগচী

মুর্শিদের কীর্ত্তি

তোপখানা :—মুর্শিদাবাদে নগর সংস্থাপনে প্রবৃত্ত হইয়া মুর্শিদ একটি সুরক্ষিত অস্ত্রাগার নির্ম্মাণে সচেষ্ট হন। ভাগীরথীর একটি শাখার (যা বর্ত্তমানে গোরস্থানালা ও ভাণ্ডারদহ বিল নামে পরিচিত) পশ্চিম তীরে তোপখানা নামে নবাবের এক অস্ত্রাগার নির্ম্মিত হয়। বর্ত্তমান নবাব-প্রাসাদের প্রায় মাইল খানেক পূর্ব্বে এই তোপখানা দৃষ্ট হয়। সে সময় অস্ত্রাগারটি নানা প্রকার কামান-বন্দুকে সজ্জিত থাকিত। এখন আর সেই গরিমাময় তোপখানার বিশেষ কোন চিহ্ন নাই, তবে আজিও অস্ত্রাগারের জানালার মধ্যে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের কাণ্ডের উপর একটি সুবৃহৎ তোপ স্থায়ী অবস্থায় দেখা যায়। শুনিতে পাওয়া যায়, তোপখানা হইতে অস্ত্রাদি অন্যত্র নীত হওয়ার পর কামানটির পাশ হইতে এক অশ্বত্থ বৃক্ষ আবির্ভূত হইয়া ভূতলে পতিত নিরাশ্রয় তোপটিকে বক্ষে আশ্রয় দেয়। বৃক্ষ বক্ষে কামানটি বর্ত্তমানে এমনভাবেই শায়িত যে তা দৃষ্টে ভ্রম হয়—যা যেন তাঁহার তরুণ স্বপ্ন-পরিত্যক্ত শিশুটিকে বক্ষে আশ্রয় দান করিয়াছেন।

তোপটি দৈর্ঘ্যে ১৭ ফুট ২ ইঞ্চি, বেড়ে ৪ ফুট, মুখের বেড় ১৷৷ ফুট, অগ্নি-সংযোগের ছিদ্রের ব্যাস ১৷৷ ইঞ্চি এবং ইহার ওজন ২১২ মণ। প্রত্যেকবার ব্যবহারে কামানটিতে ২৮ সের বারুদের প্রয়োজন হইত। জনশ্রুতি তোপটি অষ্ট-ধাতুর নির্ম্মিত।

কামানটির গায়ে পিতল-ফলকে ফারসী ভাষায় লেখা আছে : "এই 'জাহান কোষা' জয়বিজয়ী তোপ বঙ্গের শাসন-কর্ত্তা ইসলাম খাঁর সময়ে যখন সম্রাট সাজাহান দিল্লীর বাদশাহ সেই সময় জাহাঙ্গীরনগরে দারোগা শের মহম্মদের উপদেশানুযায়ী হয়বতখত দাসের তত্ত্বাবধানে জনার্দ্দন কর্ম্মকার কর্ত্তৃক ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে (১০৪৭ হিজরী ১১ই জমাদিয়সসানি মাসে) তৈয়ারী হয়।"

বর্ত্তমানে দেখা যায়, হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ভুক্ত নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা তৈল, সিন্দুর ও পুষ্পাদির দ্বারা 'জাহান-কোষার' পূজা করে। (মুর্শিদাবাদের নবাবের "হাজার-দেউড়ী" প্রাসাদের অস্ত্রাগারে এখনও যে সকল অস্ত্রাদি সংরক্ষিত আছে, এই সকলের ভিতর মুর্শিদের স্মৃতি-চর্চ্চিত অস্ত্রাদিও আছে বলিয়া শ্রুত হওয়া যায়)।

কাটরা মসজেদ :—মুর্শিদের প্রধান কীর্ত্তি "কাটরা মসজেদ" আজও তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দেয়, মসজেদটির নির্ম্মাণ-কুশলতা বাস্তবিকই স্তম্ভিত হইয়া দেখিতে হয়। ১০০৪ সালের ভূমিকম্পের নির্ম্মম অত্যাচার ইহাকে বিশেষভাবে জর্জ্জরিত করিয়া দিয়াছে, এমন কি গত ১৩৪০ সালের ভূমিকম্পের প্রবল আঘাত পর্য্যন্ত সহ্য করিয়া যে কাটরা মসজেদ আজও কি ভাবে দাঁড়াইয়া আছে তাহা বাস্তবিকই আশ্চর্য্যের বিষয়। চেহেল সুতুনের এক মাইল পূর্ব্বে একটি বড় বাজার ছিল। বাজারের ফারসী নাম 'কাটরা'। এই কাটরার ভিতর মুর্শিদের বৃহৎ মসজেদ নির্ম্মিত হয় বলিয়া ইহার নাম হয় কাটরা মসজেদ। মসজেদটি তোপখানা হইতে আধ মাইল উত্তরে। মুর্শিদকুলী খাঁ নিজের বাঞ্ছিত উপস্থিত দেখিয়া আদেশ দেন, একটি বাজার বা গঞ্জ তৈয়ারী করিয়া তাহার মাঝে নিজ সমাধি মন্দির নির্ম্মাণ করিবার। মৃত্যুর পরও অবশ্য নবাব মুর্শিদকুলী জাফর খাঁর নশ্বর দেহকে তাঁর পূর্ব্বাভিপ্রায় অনুযায়ী ঐ সমাধি-মন্দিরেই সমাহিত করা হয়। নগরের পূর্ব্ব দিকে খাস তালুকের ভিতর নবাব কর্ত্তৃক নিজ সমাধি-মন্দির এবং কাটরা নির্ম্মাণের স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। মোরাদ ফরাস নামে একজন বিচক্ষণ কর্ম্মচারীকে এই কাজের তত্ত্বাবধানের ভার দেওয়া হয়। ষ্টুয়ার্ট প্রভৃতি ঐতিহাসিকেরা বলেন, "মোরাদ মুর্শিদাবাদের সন্নিকটস্থ হিন্দু মন্দির সকল ধ্বংস করিয়া তাহারই উপকরণাদি সাহায্যে এই সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ করে।" কিন্তু বেভারিজ সাহেব রিয়াজুস সালাতিনের "তারিখ বাংলা" মন্দির ভঙ্গের কথা মানিয়া লন নাই। বেভারিজ বলেন, "যদি হিন্দু মন্দিরই ভাঙ্গা হইবে তাহা হইলে মুর্শিদাবাদের তিন

মাইল পশ্চিমে কিরীটেশ্বরীর * মন্দিরে কেন হস্তক্ষেপ করা হয় নাই।" আবার কোন কোন ঐতিহাসিক ইহার উত্তরে বলেন, "তৎকালে রাজস্ব বিভাগের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীরা হিন্দু ছিলেন বলিয়া, বিশেষতঃ বঙ্গাধিকারী দর্পনারায়ণ কিরীটেশ্বরীর প্রধান উপাসক হওয়ায় হিন্দুদের পক্ষে ঐ সময়কার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান কিরীটেশ্বরী মন্দিরে মোগল ফরাসের ন্যায় সামান্য কর্ম্মচারীর পক্ষে হস্তক্ষেপ করা কঠিন হইয়া পড়ে।" ইতিহাসে বর্ণিত আছে নবাব মোরাদকে বৎসরকাল মধ্যে (লংহার্ষ্টার সাহেব মুসলমান ঐতিহাসিকদের হস্তলিখিত পুঁথির সাহায্য গ্রহণ করিয়া বলেন, "ছয়মাসের মধ্যে") কাটরা মসজেদের নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ করিবার আদেশ দিলে মোরাদ অনুমতি চাহে যে, কার্য্য শেষ হওয়ার পূর্ব্বে মসজেদ নির্ম্মাণ বিষয় শাহজাদা তাঁহাকে কোনরূপ বাধা দিতে পারিবেন না। মোরাদের পক্ষে নূতন ইষ্টকাদির দ্বারা এক বৎসর বা ছয় মাসের মধ্যে ঐ প্রকার সুবৃহৎ মসজেদ নির্ম্মাণ করা সম্ভবপর না হওয়ায় নিকটবর্ত্তী মন্দির এবং গৃহগুলি তাহার দ্বারা ধ্বংস প্রাপ্ত হওয়া নিছক অমূলক নাও হইতে পারে। মোরাদ এতই অত্যাচারী ছিল যে, নবাব সুজাউদ্দিন (মুর্শিদকুলী খাঁর জামাতা এবং পরবর্ত্তী নবাব) তাঁহার ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া শেষ পর্য্যন্ত এই অত্যাচারীর প্রাণ-দণ্ডের আদেশ দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। হয়ত মুর্শিদকুলী খাঁ মোরাদের কাছে দৃষ্টি দিবার সুযোগ পান নাই। নবাব মুর্শিদকে আমরা হিন্দু-বিদ্বেষী বলিতে পারি না। তিনি প্রকৃত ধর্ম্মোপাসক ছিলেন বলিয়াই মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি অধিক আকর্ষণ থাকা তাঁহার পক্ষে অনুচিত বলে মনে হয় না, অপর দিকে তাঁহার চরিত্রের কোন প্রতিবাদ করা চলে না, কারণ যে সমাজ তাঁকে একদিন তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া দূরে সরাইয়া দিয়াছিল তাহার প্রতি যে তিনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বিশেষ বিরাগভাজন হন নাই, ইহাই যথেষ্ট। মুর্শিদের আদেশে মন্দির ভাঙ্গার কথা সম্পূর্ণ অবিশ্বাসযোগ্য।

শুনা যায়, মুর্শিদকুলী খাঁ মক্কার প্রসিদ্ধ মসজেদের অনুকরণে এই মসজেদ নির্ম্মাণ করান। ইং ১৭০৩-২৪ খৃষ্টাব্দে

হিজরী ১১০৭ অব্দে মসজেদ তৈয়ারী শেষ হয়। উক্ত মসজেদের নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হওয়ার পর বহুদিবস কাল মুর্শিদকুলী খাঁ জীবিত ছিলেন। মসজেদের পূর্ব্বদিকে প্রবেশ-দ্বারের উপর ছিল নহবৎখানা, দুই পার্শ্বে প্রহরীদের থাকিবার জন্য দুইটি ঘর। সিংহদ্বার-পথে চৌদ্দটি সিঁড়ি; এই সোপানরাজির অন্তঃস্থলে ক্ষুদ্র একটি প্রকোষ্ঠে নবাব মুর্শিদ সমাধি-মন্দিরের নিরালা বক্ষে চির বিশ্রাম লাভে অভিভূত। এত বড় নবাবের দেহ সাধারণের পদধূলির তলে সমাহিত হওয়া বাস্তবিকই আশ্চর্য্যের বিষয়। ইহার কারণ মুর্শিদ মৃত্যুকালে বলিয়াছিলেন, "ধার্ম্মিক লোকের পদধূলিই পরলোকে আমার মুক্তির সাহায্য করিবে।" ইহার দ্বারাই প্রমাণ পাওয়া

---

* দক্ষযজ্ঞের বিষয় কালে সতী দেহত্যাগ করিলে শিব যখন উন্মত্তের ন্যায় সতীর মৃতদেহ স্কন্ধে লইয়া বেগে বেগে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন তখন নারায়ণ সুদর্শন চক্রের সাহায্যে সতীর পতিত অঙ্গকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ৫২টি স্থানে নিক্ষেপ করেন। তাহাতে সেই ৫২টি স্থান ৫২টি পীঠ-স্থান নামে হিন্দু তন্ত্রের দ্বারা পূজিত হয়। কিরীটেশ্বরী এই গুলির অন্যতম। এই স্থানে "কিরীটকণার" শিবানী সতীর কিরীটের কণা পতিত হয়। মন্দিরটি ভাগীরথীর অপর পারে ভাগীরথী হইতে প্রায় তিন মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। বর্ত্তমানে স্থানটি ঈশানকোর্ণ, পৌষ মাসের প্রতি পুণ্য-মঙ্গলবারে এই মন্দিরে দেবী পূজার্চ্চনাদি বিশেষ সমারোহে সুসম্পন্ন হয়। পৌষ মাসের ঐ দিন গুলিতে "কিরীটেশ্বরী"তে বিরাট মেলা হয়।

যায় যে, অহঙ্কার তাঁহার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই।

সিংহদ্বারের পর এক বিশাল প্রাঙ্গণ—প্রাঙ্গণের পশ্চিম শিয়রে তোরণের ৮০ হাত দূরে তিনটি গম্বুজসমন্বিত বিশাল মসজেদ (ধাতুনির্ম্মিত চূড়া তিনটি ছাড়া গম্বুজের পার্শ্বদেশগুলি প্রায় স্থানে স্থানে ভগ্ন)। বাঙ্গালা ইটের খিলানের উপর এই বৃহৎ কাটি তৈয়ারী মসজিদের উত্তর-দক্ষিণে কারুকার্য্য-শোভিত দুটি জানালা—উপাসনা-গৃহটি দৈর্ঘ্যে প্রস্থে আনুমানিক ৮৭×১৬ হাত হইবে—ইহার মধ্যেকার দরজার চৌকাঠটি কাল পাথরের তৈয়ারী—এই দরজার উপর কষ্টিপাথরের একটি ফলকে ফারসী ভাষায় লেখা আছে,

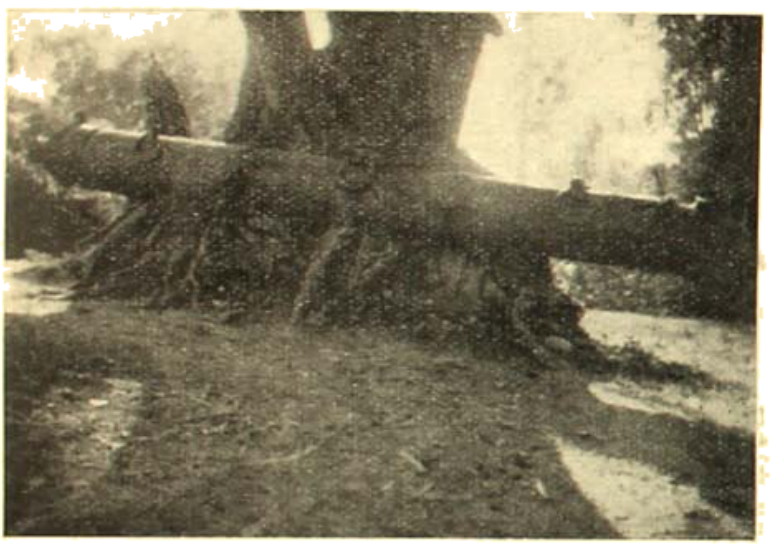

...লেখক

"আরবের মহম্মদ স্বর্গ মর্ত্ত উভয় লোকের গৌরব, তাঁহার জয় হউক",—সমাধি মন্দিরের উত্তর-পশ্চিমে ও দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে দুটি অষ্টকোণ বিশিষ্ট অত্যুচ্চ মিনার নির্ম্মিত—মিনারের উচ্চতা আনুমানিক ৪০ হাত হইবে—ইহার উপরে উঠিবার জন্যে চক্রাকারে ৬৭টি সিঁড়ি আছে—মিনারের মস্তকে একটি ছাদহীন কক্ষ নির্ম্মিত—মস্তকহীন ঘরটির আট কোণে আটটি গবাক্ষ—মসজেদ প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে কোরাণপাঠী এবং অতিথিদের থাকিবার খিলানের ঘর।

মসজেদের পশ্চাতে সুদীর্ঘ রাজপথ;—দক্ষিণ সীমানা পার্শ্বে মসজেদ গমনের রাস্তা।

শেষ অভিপ্রায় ও তিরোধান :—মুর্শিদকুলী খাঁর রাজত্বের শেষ অধ্যায়ে দেখা যায় যে, মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল—দৌহিত্র সরফরাজ তাঁহার অবর্ত্তমানে বঙ্গ-মসনদের অধিকারী হন। নবাব মুর্শিদ ১৭০৩ হইতে ২২ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়া ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে (হিজরী ১১৩৯ অব্দে) প্রিয়তমা মহিষী নসেরুন্নেসা, কন্যা জিন্নতেন্নেসা ও দৌহিত্র সরফরাজকে সংসারে রাখিয়া ইহধাম পরিত্যাগ করেন। মৃত্যুর পর নবাবকে কাটরার সমাধিক্ষেত্রেই সমাহিত করা হয়। কবরের বেদীটি বর্ত্তমানে কেবলমাত্র একখানি শুভ্র বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত দেখা যায়—প্রতি সন্ধ্যায় একব্যক্তি বেদীর কোলে সেই নিরালা কক্ষে একটিমাত্র প্রদীপ উদ্দীপিত করে, সামান্য কয়েকটি শ্বেতপুষ্পে বেদীটিকে সজ্জিত করে—বাঙ্গালার মসনদের আজ এই মর্ম্মব্যথা!

উপাধি :—দেওয়ানী অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত মুর্শিদকুলী দিল্লীর সম্রাটের কাছ হইতে এক অতি সুবৃহৎ উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন;—তাঁহার নাম এবং উপাধি হইয়াছিল, নবাব নাজিম মুর্শিদকুলী জাফরখাঁ মোতামান-উল্-মুল্‌ক (দেশের কর্ত্তা) আলাউদ্দৌলা (রাজ্যের উন্নতিকারী) নাসিরজঙ্গ নাসিরী (যোদ্ধা এবং প্রজাপালক) প্রভৃতি।

সামান্য অবস্থা হইতে মুর্শিদের যেমন ভাগ্যোদয় ঘোষ হইয়াছিল, আর কোন নবাবের পক্ষে এমনটি ঘটিয়া উঠে নাই। আকবর বাদশাহের রাজত্বকাল হইতে মোগলাধিকারের মধ্যে মুর্শিদের ন্যায় পদমর্য্যাদা আর কোন নবাবই প্রাপ্ত হন নাই।

মানবের ইচ্ছাই সকল ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হয় না। মুর্শিদের মৃত্যুর পর তদীয় জামাতা সুজাউদ্দিন দিল্লীর দরবারের প্রধান কর্ম্মচারীর সাহায্য লইয়া তদানীন্তন সম্রাট মহম্মদ শাহের নিকট হইতে বঙ্গ-মসনদের অধিকার লাভ করেন। সুজাউদ্দিন ১৭২৫ হইতে ১৭৩৯ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। পিতা সুজাউদ্দিনের রাজত্বকাল শেষ হইলে পুত্র

সরফরাজ খাঁ বাঙ্গালার মসনদে প্রতিষ্ঠিত হন। সরফরাজ খাঁ মাত্র ১৩ মাস রাজত্ব করিবার পর ১৭৪১ সালে শত্রুহস্তে যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন।

মুর্শিদকুলী খাঁর রাজধানীর বর্ত্তমান অবস্থা :—জগতে এমন কোন বস্তু নাই, যাহাকে মহাকালের দুর্দ্দমনীয় শক্তির কবলে পরাজয় স্বীকার করিতে হয় নাই। মুর্শিদের স্বহস্ত-নির্ম্মিত সুরম্য মহানগরী আজ কোথায়? আজ ভাগীরথীর উত্তর কূল পরিবেষ্টিত অট্টালিকাশ্রেণী নাই—কোথায় বা সেই কলনাদিনী ভাগীরথীর কোল অধিকার করা মুর্শিদের সাধের চেহেলসুতুন—এমতাজমহাল—মহালসরাই। বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদের অবস্থা দেখিলে কিছুতেই অনুমান করিতে পারা যায় না যে, একদিন এই হতভাগা এতখানি সুখ সমৃদ্ধি ভোগ করিয়াছে; তবে এখনও কালের শত অত্যাচার সহ্য করিয়াও মাত্র দু-একটি প্রাচীন নিদর্শন জরাজীর্ণ দেহ লইয়া মুর্শিদপরিবারের পরিচয়ের সাক্ষ্য দিতে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সর্ব্বগ্রাসী মহাকাল যে অচিরে এ সামান্য সাক্ষ্য কয়টিকেও বিলুপ্ত করিবে, সে বিষয়ে আর কি সন্দেহ থাকিতে পারে!

(ক) কাটরার মসজেদ।

(খ) তোপখানা (জাহানকোষা তোপ)।

(গ) নসেরুন্নেসা বেগমের সমাধি :—ইন্দ্রিয়নিগ্রহশীল চরিত্রবান মুর্শিদের একমাত্র পত্নী নসেরুন্নেসা বেগমের পরলোক গমনের পর তাঁহার নশ্বর দেহকে নবাব মুর্শিদের অতিপ্রিয় চেহেলসুতুন প্রাসাদের একাংশে মসজেদের পূর্ব্বস্থ প্রাঙ্গণের সম্মুখে সোপান-নিম্নে ১৭৩১ খৃষ্টাব্দে (১১৪৫ হিজরী রবিউসসালাতিন মাসে) সমাহিত করা হয়।

বর্ত্তমানে নসেরুন্নেসার নামাঙ্কিত উপাসনা-গৃহটির যে অবস্থা পরিলক্ষিত হয়, তাহাতে অনুমান হয়, এই প্রাচীন স্মৃতি-মন্দিরটি নিজের জীবনী-শক্তিবলে মহাকালের সঙ্গে এখনও বহুদিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সক্ষম হইবে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, বেগমসাহেবার সমাধিকক্ষটির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। অনুমান হয়, অতি নিকট ভবিষ্যতেই ঘরটির চিহ্নমাত্রও পাওয়া যাইবে না। মসজেদের পূর্ব্ব-সীমানার প্রবেশ-পথ অবরুদ্ধপ্রায়।

"হাজারদেউড়ী"র পূর্ব্ব ভাগে নসেরুন্নেসা বেগমের সমাধি-ভবন—প্রাসাদ এবং মসজেদের কোলকোড়া উত্তর-দক্ষিণ দিগন্তব্যাপী প্রশস্ত রাজপথ—"লক্করিখালি ফাঁড়ি"র ঠিক উত্তরে একটি বৃহৎ প্রবেশ-দ্বার—এই পথে আসিলেই অদূরে বামপার্শ্বে উক্ত সমাধি-মন্দিরে উপস্থিত হওয়া যায়।

(ঘ) জিন্নতেছেসা বেগমের সমাধি :—নবাব মুর্শিদের একমাত্র কন্যা জিন্নতেছেসা বেগমের সমাধি বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদ নবাব-প্রাসাদের এক মাইল উত্তরে "জাফরাগঞ্জ"* ফাঁড়ির (পুলিস ষ্টেশনের) ঠিক সম্মুখে রাস্তার পশ্চিম পার্শ্বে দৃষ্ট হয়। নবাব-দুহিতা এই স্থানে পিতামাতার ন্যায় অনুরূপ সোপানান্তরালে সমাহিত হইয়াছেন। সমাধি-কক্ষ ব্যতিরেকে এই স্থানের অন্য সকল কীর্ত্তিই ভগ্নাবস্থায়।

(ঙ) কৌতি মসজেদ :—মুর্শিদকুলী খাঁর দৌহিত্র নবাব সরফরাজ খাঁ এই মসজেদের নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু আলিবর্দ্দী খাঁর সঙ্গে যুদ্ধার্থে গিরিয়া গমন করায় মসজেদ অর্দ্ধসমাপ্ত অবস্থায় থাকিয়া যায়। গিরিয়া প্রান্তরেই সরফরাজ খাঁ নিহত হন। কৌতি মসজেদ কাটরা মসজেদের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে মুর্শিদাবাদে রেল ষ্টেশনের অতি নিকটে এক জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে এখনও ভগ্নাবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়।

নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর রাজত্বের ইতিহাস প্রণয়নে যে সকল ইতিহাসের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি, সেই সকল ঐতিহাসিকদের এবং যে সকল সুহৃদ্বর্গের বিশেষ সাহায্য লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছি তাঁহাদের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ এবং আমি তাঁহাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

---

* এই জাফরাগঞ্জেই বর্ত্তমান জাফরাগঞ্জ নবাব (মীরনের বংশধর) প্রাসাদের পূর্ব্বাংশে এক নিম্নভূতলে একটি কক্ষ-মধ্যে বন্ধ, বেহার, চট্টগ্রামের স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলা তাঁহার অনুজাদ মহম্মদি বেগ কর্ত্তৃক ১৭৬৭ সালে নিহত হন। বর্ত্তমানে ঐ নিমকহারামী প্রকোষ্ঠটির চিহ্ন মাত্র নাই। তবে নিমকহারাম কাওটির শেষ অংশ এখনও বহরীর বক্ষপটে বীর মহম্মদ জাফরখাঁর বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দিতে জাগ্রত আছে, বৎসর কাল মধ্যে বোধ হয় এ চিহ্নটুকুও লুপ্ত হইবে। স্থানটি ঐ মীরজাফরের নামানুসারেই "জাফরাগঞ্জ" নামে খ্যাত হয়।

স্থিতি ও গতি

—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ

১

"কেমন দেখলি বিন্নু? কেমন লাগল?"

ঈষৎ আরক্ত মুখখানি তুলিয়া অতি মৃদু, মধুর, অথচ ম্লান একটু হাসি ফুটিয়া উঠিল। শৈলবতীর প্রশ্নের সোজা কোনও উত্তর না দিয়া ধীরে ধীরে বিন্নুমতী কহিল, "শকুন্তলা হ'য়েছিল আমাদের মীনা।"

"মীনা! কে মীনা?"

"এক সঙ্গেই আমরা প'ড়তাম কলেজে। কেন, বলি নি তোমাকে মীনার কথা?"

"ও, মনে প'ড়েছে বটে। খুব বড়লোকের মেয়ে বুঝি?"

"হাঁ, বাপ খুব বড়লোকই বটে। কলেজেও আসত যেত বাপের মোটরে। বিজ্ঞাপনে মিস্ মোকার্জি নাম রেখে আমারও মনে হয়েছিল মীনাই বুঝি হবে। দেখলাম সত্যিই সে।"

বলিতে বলিতে চাপিয়া বিন্নুমতী একটি নিঃশ্বাস ছাড়িল। শৈলবতী লক্ষ্য করিল। তাহারও বুক ভরিয়া একটি নিঃশ্বাস উঠিল। ধীরে ধীরে কহিল, "কেন, মীনা তোকে বলে নি যে এই নাটক তারা ক'রবে?"

"আমি ত আর কলেজে যাই না এখন। বেড় মাসের ওপর তার সঙ্গে দেখা হয় না। নাটকের বন্দোবস্ত হয় ত হ'য়েছে তার পরে। নইলে সে আমায় ব'লত।"

"হুঁ—খুব সুন্দর মেয়ে বুঝি?"

"খুব সুন্দর। আর খুব চটপটে। বেশ হাসিখুসী মিলুয়ে-মিশুয়েও বটে। বড়লোক ব'লে দেমাক কিছু নেই। মনটিও বেশ সরল। তবে ওরা নাস্তিক, কোনও ধর্ম্ম-টর্ম্ম মানে না।"

শৈলবতী যেন শিহরিয়া উঠিল। অবাক্ হইয়া বিন্নুর মুখপানে চাহিল। শেষে বলিয়া উঠিল, "নাস্তিক! ও মা, সে কি? হাঁ, ঐ যে বেহ্মজ্ঞানীরা আছে, দেবতাবোষুন, আচার-নিয়ম কিছু মানে না, ব্রত-পুজো কিছু করে না—

"তা না করুক, মেলাই ঠাকুর-দেবতা কিছু না মানুক, এক ঈশ্বরকে মানে, উপাসনাও করে। কিন্তু ওরা কিছু মানে না।"

"কিছু মানে না? ধর্ম্মাধর্ম্ম তবে ওদের কি?"

"বলে ও সব কিছু নেই। মানুষ যা ভাল বুঝবে, যা তার ভাল লাগবে, তাই ক'রবে।"

"কি সর্ব্বনাশ! এ যে বড় দুঃসাহসের কথা! কি ক'রে মানুষ এমন কথা ভাবতেও পারে! তা তুই ব'ললি না মেয়েটি খুব ভাল?"

"এমনি ত খুব ভাল। খুবই ভাল লাগত আমার তাকে। আমাকেও বড্ড ভালবাসত। নিজে বোধ হয় অতশত কিছু ভাবে না, বুঝতেও কিছু চায় না। বাপ যেমন শিখিয়েছে, আর এই রকম সস বইতে যা লেখে, তাই বলে।"

"হুঁ—বাপও খুব বড়লোক বটে। ঢের টাকা আছে। আর থাকেও বুঝি একেবারে সৌখিন সাহেবী কায়দায়?"

"হাঁ, তাই থাকে।"

"হুঁ—নইলে পুরুষ-মেয়েতে মিলে এই রকম নাটক করে? আবার নাচ-গানও না কি দিয়েছে মেলাই। এতগুলো মানুষের সামনে কি ক'রে পারল! ভাবতেও লজ্জায় ম'রে যাই। তা শকুন্তলা হ'য়েছিল মীনা? আর রবীন হ'য়েছিল দুষ্মন্ত?"

"হাঁ।"

শৈলবতী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। ধীরে ধীরে শেষে কহিল, "হুঁ—তা কেমন করেছিল ওরা? কেমন লাগল?"

"চমৎকার। মনে হচ্ছিল সত্যিই ওরা দুজনে দুষ্মন্ত আর শকুন্তলা। তবে অত নাচ-টাচগুলো কেমন যেন বেখাপ্পা লাগল। কলেজে শকুন্তলা পড়েছি। তা সে হ'ল এক জিনিস। আর এ যেন নতুন একটা বই। তবু

ঐ দুষ্মন্ত আর শকুন্তলা, আর তা বেশ বেখিয়েছিল ; আর মানিয়ে ছিলও খাসা।"

বলিতে বলিতে বিন্দুমতী কেমন যেন আনমনা হইয়া পড়িল। শৈলবতীও নীরবে কিছুক্ষণ কি ভাবিল। তারপর ধীরে ধীরে কহিল, "হুঁ—তা রবীনের সঙ্গে বুঝি ওদের ভাবসাব খুব আছে ?"

"আছে বই কি ? নইলে একত্র হ'য়ে এই রকম নাটক করে ? অতীন বাবুও তাই বলছিলেন।"

শৈলবতীর মুখখানি বড় গম্ভীর হইয়া উঠিল। দেখিয়া বিন্দুমতী একটু হাসিল। ম্লান হইলেও হাসিই বটে। কহিল, "কি ভাবছ দিদি ?"

"কি ভাবছি—কি যে ভাবছি, সে আর মুখ ফুটে তোকে বলতে পারব না বিন্দু।"

"কেন পারবে না ? আমি তবে বলব ?"

"কি বলবি রে পাগলী ?"

নতমুখে একটু কাল নীরব থাকিয়া মুখ তুলিয়া শেষে স্থির দৃষ্টিতে বিন্দু চাহিল ; ধীর স্বরে কহিল, "দেখছিলাম আর মনে হচ্ছিল, সত্যিই ওরা দুটিতে দুষ্মন্ত আর শকুন্তলা। কেবল অভিনয় করছে না, মনেপ্রাণেও দুষ্মন্ত আর শকুন্তলার মত মিলেছে। ষ্টেজে যে বিয়ে হ'ল, যেন সত্যিই হ'ল। সেই সত্যিটা বাইরেও সত্যি হ'লে ঠিক হ'ত।"

"আর তাই তুই অমনি সোজা মন খুলে বলছিস ?"

বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে শৈলবতী চাহিয়া রহিল।

বিন্দু কহিল, "তা সত্যি ব'লে যা বুঝিছি, মন খুলেই বা কেন তা ব'লব না ?"

শৈলবতী উত্তর করিল, "না না, ও সব কিছু নয় বিন্দু ! ঐ একটা খেয়াল তোর মনে ঢুকেছে।—ভাল অভিনয় শুনেছি ঠিক সত্যিকারের মতই না কি লাগে।"

"সত্যিকারের মত লাগতে পারে, কিন্তু ঠিক সত্যি না। সত্যিকারের মত, আর ঠিক সত্যি, এ দুটোয় যে ঢের তফাৎ দিদি। আর সে তফাৎটা যে কেউ ধরতে না পারে, তাও নয়।"

"তুই কি তবে সত্যিই মনে করিস্—"

"হাঁ, এই সত্যিটাকে সত্যি বলেই মনে করি। কেবল মনে করি বললেই ঠিক হয় না দিদি। মনের চোখে এই সত্য আমি দেখেছি।"

"না না ! সে হতেই পারে না। যদি মীনাকে ভালবাসত, কচি খোকা ত আর নয়, তাকেই বিয়ে করত। এ বিয়েতে রাজি হ'ত না।"

"রাজি যে কেন হ'ল, সেইটাই বুঝতে পারছি নি দিদি।"

"মীনার সঙ্গে বিয়েতে এমন বাধা কি থাকতে পারে ?"

"জানি না।"

শৈলবতী কহিল, "বাধা ত দেখতে পাই, একজাত ওরা নয়, আর বলছিস ধর্ম্মটর্ম্ম কিছু ওরা মানে না—সমাজও একটা আলাদা ধরণের, রবীনের বাবা হয়ত রাজি হ'তেন না।"

"সেইটেই হয়ত বাধা ?"

"তা সেই বাধাতেই কি বিয়ে আটকাত, সত্যি যদি রবীনের এমনই একটা টান মীনার ওপরে গিয়ে পড়ত, আর মীনার বাপ বিয়ে দিত ? রবীনের বাপই কি আটকাতে পারত ?"

"জানি না।"

"অন্ততঃ তোর সঙ্গে এই বিয়ের সম্বন্ধে আপত্তি রবীন করত।"

"করেছে কি না, কে জানে ?"

"তা হলে কি আর তার বাবা এসে অত ঘটা ক'রে পাকা দেখে তোকে আশীর্ব্বাদ করে যেতেন ? বাবাও ত সেদিন পাকা দেখে তাকে আশীর্ব্বাদ করে এলেন। সে ত আর নকল রবীন কেও এসে সামনে বসেছিল না ?"

"না ! সেইটেই হচ্ছে রহস্য যা বুঝতে পারছি নি, পরে হয়ত পারব।"

"তখন বুঝে আর কি হবে বিন্দু ? তার চাইতে—"

"তার চাইতে—কি ? সম্বন্ধ ভেঙ্গে দেবার কথা ভাবছ ?"

"তুই যা বলছিস যদি সত্যিই হয়, তাই তবে এখন ভাল হবে না বিন্দু ?"

একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া বিন্দুমতী উত্তর করিল; "ভাল

মন্দ যাই হক দিদি, তোমার আমার কথায় এ সম্বন্ধ এখন ভাঙতে পারে না। বাগ্‌দান হয়ে গেছে।"

"বাগ্‌দান আজ কাল কত হয়, কত আবার ফিরে যায়। বিয়ের আসরে দেনাপাওনার খুঁটিনাটি নিয়েও কত সম্বন্ধ ভেঙে যাচ্ছে। সেই আসরে সেই রাত্রিতেই আবার ঘরে-আনা নতুন বরের সঙ্গেও মেয়ের বিয়ে কোথাও কোথাও হয়েছে বলে শুনেছি। বাগ্‌দান ত বাপেই করে, আবার বাপেই ফিরিয়ে নেয়।"

বিন্দু উত্তর করিল "হাতে হাতে শেষে বিয়ের দানও বাপে করে। তা কি আবার ফিরিয়ে কেউ নিতে পারে?"

"সে হল আলাদা কথা, একেবারে বিয়ে হওয়া। আর এ হল বিয়ের কথা দেওয়া।"

বিন্দু কি ভাবিতে ভাবিতে উত্তর করিল "শুনেছি দিদি, মনে কোনও সংকল্প করলেই সে কাজটা হয়ে গেল বলেই ধরে নিতে হয়। তা সে যাই হক দিদি, দুদিন আগে যদি কোনও কারণে ভাঙত এত কথা বোধ হয় মনে উঠত না।"

"দুদিন পরেই বা তফাৎ এমন হ'ল কিসে? তাহলে কি বলতে চাস, কাল একটি বার দেখেই—" বলিতে বলিতে শৈলবতী থামিয়া গেল। যে কথাটা মনে হইয়াছিল, মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিল না।

বিন্দু একটু হাসিয়া কহিল, "একটি বার দেখেই—কি দিদি? নতুন এক শকুন্তলার মত আড়াল থেকে তাকে ভাল বেসেছি কি না তাই? না দিদি, ভালবাসা-টাসা কিছু বুঝি না, তবে—তবে—দেখেই এই কথাটা মনে হয়েছিল, বাবা ওঁর হাতেই আমাকে দান করেছেন, উনিই—তা সে যাই হক দিদি, ভালবাসা-বাসি ও সব নাটুকে কথা নিয়ে কোনও আলোচনা করবার দরকার কিছু দেখি নে। এই যা আমার মনে হয়েছিল, এখনও হচ্ছে, তাই কি যথেষ্ট নয় দিদি? এর পর কি অন্য রকম কিছু হতে পারে?"

"কিন্তু তুই যে সুখী হবি না বিন্দু।"

"সুখটাই ত জীবনের একমাত্র লক্ষ্য নয় দিদি।"

"না তা নয়। মোটেই নয়। জীবনের লক্ষ্য একমাত্র ধর্ম্ম।"

"আশীর্ব্বাদ ক'রো দিদি, সেই ধর্ম্ম যেন আমি পাল করতে পারি।"

"এর বড় আশীর্ব্বাদ আর আমার নেই বিন্দু। কিন্তু ধর্ম্মপালনের সঙ্গে সুখের ত এমন একটা বিরোধ নেই কিছু।"

"না সর্ব্বদা নেই, তবে কখনও কখনও ঘটে বই কি? যখন ঘটে, সুখ ছেড়ে ধর্ম্মকেই মাথায় তুলে নিতে হবে। আর তাতে যে মানুষ সত্যিই একেবারে অসুখী হয়, তাও নয়। এই ত লোকে যাকে সুখ বলে, তোমার ভাগ্যে তা ঘটে নি। কিন্তু তাই বলে কি সত্যি তুমি অসুখী দিদি?"

অতি মধুর উজ্জ্বল এক দীপ্তিতে শৈলবতীর মুখখানি তখন ভাসিয়া উঠিল। কহিল, "অসুখী? না না, কে বলে আমি অসুখী? বরং অতি বড় সুখী আমি। অবিরত সুখী! পৃথিবীতে এমন কিছু নাই যা না কি এ সুখে আমার এতটুকু আঁধার ছায়া ফেলতে পারে।"

চক্ষু দুটি ভরিয়া অশ্রুর একটা উচ্ছ্বাস উঠিল। মুগ্ধ দৃষ্টিতে বিন্দুবতী ভগ্নীর মুখপানে চাহিয়া রহিল। একটু সামলাইয়া অঞ্চলপ্রান্তে অশ্রু মার্জ্জনা করিয়া শৈলবতী আবার কহিল, "যাকে লোকে সুখ বলে তা হারিয়ে অনেক বড় এক সুখ আমি পেয়েছি বিন্দু। ছোট এ জীবনটা অনেক বড় আমার হয়ে গেছে। ছোট এ জীবনটার বাইরে—যা লোকে হয়ত দেখে না—অনেক বড়, অনেক সুন্দর, অনেক বেশী সুখের যে জীবনটা রয়েছে—একটা জন্ম-মৃত্যুর মধ্যে যাকে ধরে রাখা যায় না—তার বাইরে কোথায় এর আদি, কোথায় অন্ত, সন্ধানও কেউ বড় পায় না,—মনে আমার কি হয় জানিস্, বিন্দু? মনে হয়, সত্যি মনে হয়, যেন, যেন দেখতেই পাই, ছোট এই জীবন আমার তার সঙ্গে এক হয়ে মিলে গেছে। সেই সুখ—আহা তার তুলনা হয় এই পৃথিবীর একটি জীবনের কোন্ ভাগ্যে কার মিলতে পারে বিন্দু?"

বিন্দু উত্তর করিল, "না, তা পারে না। পারে না বলেই এ জীবনে কি ভাগ্যে আমার ঘটে, তার জন্যে কিছু ভাবি না। ভাবি যে ভাগ্যই হক, ধর্ম্মে স্থির থেকে

তাতে আমার করবার যা তাই যেন করতে পারি, ক'রে সত্যিকার সেই বড় সুখে যেন সুখী হতে পারি।"

নীরবে স্থিরদৃষ্টিতে শৈলবতী বিন্দুর মুখ পানে চাহিয়া রহিল। একটু হাসিয়া বিন্দু কহিল, "কি ভাবছ দিদি? একা তুমিই কি এমন পুণ্যির জোর নিয়ে পৃথিবীতে এসেছিলে, যে সেই বড় সুখটায় সুখী হতে পেরেছে, আর কেউ পারবে না?"

শৈলবতীও হাসিয়া উঠিল। একটু যেন লজ্জা পাইয়াই কহিল, "না, না, ছি! কি বলছিস বিন্দু? তাও কি হয় কখনও? অত বড় স্পর্দ্ধা কে করতে পারে? যে করে, পুণ্যি কিছু থাকলেও তখনই তা থেকে সে ভ্রষ্ট হয়। আর পুণ্যির জোরের কি বড়াই করতে আছে বোন? সব সেই মহাদেবের দয়া!"

আবার তেমনই একটু মৃদু হাসিয়া বিন্দু কহিল, "তা সে দয়াও কি একলা তুমি পেয়েছ দিদি? আর কেউ পেতে পারে না?"

"দয়াল ঠাকুরের দয়ায় কেউ বঞ্চিত নয় বোন। যে চায় সেই পায়। আশীর্ব্বাদ করি, তুই যেন চাইতে পারিস্, আর চেয়ে পাস্।"

বলিতে গভীর একটি নিঃশ্বাস শৈলবতীর বুক ভরিয়া উঠিল, চাপিয়া চাপিয়া তাহা সে ত্যাগ করিল। বিন্দুও হঠাৎ কেমন গম্ভীর হইয়া উঠিল। কহিল, "সেই আশীর্ব্বাদই আজ কর দিদি। সত্যি যেন সেই দয়া চাইতে পারি, আর চেয়ে পাই। যাই বলি দিদি, বড়াই কিছুরই করতে পারি না। দর্পহারী নারায়ণ তিনি, হাতে গদা। সেই গদার আঘাতে সব দর্প চূর্ণ করেন। মন আমার বড় দুর্ব্বল, ভয়ও বড় পাচ্ছি, দমেও এক একবার যাচ্ছি। তবু তিনি না কি বড় দয়াল, আশীর্ব্বাদ কর দিদি তার সে দয়া যেন পাই।"

"পাবি, পাবি। কেন পাবি না? এমন করে যে চায়, সে পায়। না পেয়েই পারে না। কিন্তু—"

"আবার কিন্তু কি দিদি?"

"তোর নিজের কথাটাই ভাবছিস্। কিন্তু তার ধর্ম্ম, তার সুখ—সত্যিই যদি মীনার উপরে তার মনের টান গিয়ে পড়ে থাকে—"

"সেটা আজ আমার ভাববার কি অধিকার আছে দিদি? যাঁরা তার হাতে আমাকে দানদান করেছেন, নিতে সে আপত্তি করছে না। তার সুখ, তার ধর্ম্ম সে জানে, আমি কে দিদি?"

"তার ভাবী স্ত্রী। সেটা কি তোকেও জানতে হয় না?"

"যখন হবে, জানব, জানতে চেষ্টা অন্ততঃ করব। কিন্তু আজ সে অধিকার আমার নেই। এই পর্য্যন্ত আজ জানি, তার সুখের পথে কখনও কাঁটা হয়ে দাঁড়াব না। তার ধর্ম্ম? নিজেকে আজ এত বড় কেন করব দিদি, যে তার ধর্ম্মাধর্ম্মের দায়ী তার চাইতেও আমি বেশী।"

বলিয়াই বিন্দুবতী বাহির হইয়া গেল। শৈলবতী ডাকিল না, ডাকিয়া ফিরাইয়া কি করিবে? কি উত্তর ইহার দিবে? কিন্তু—না, ভাবনা চিন্তা বৃথা। মহাদেব মাথার উপরে আছেন, তিনি যা করেন।

ভূ-নতা হইয়া গলবস্ত্রে সেই মহাদেবের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া শৈলবতী নিজের কাজে চলিয়া গেল।

৮

বহু নৃত্যগীতাদিতে সুরলাল নূতন ছাঁচে ঢালা নব্য এই শকুন্তলার অভিনয় নব্য সমাজের সত্যই অতি চিত্তগ্রাহী হইয়াছিল। দুই একদিন বাদে বাদে তিন রাত্রি অভিনয় হইল এবং প্রত্যেক রাত্রিতেই দর্শকের ভিড়ে প্রেক্ষাগৃহ পরিপূর্ণ হইয়া যাইত। দৃশ্য-স্থানগুলির পরিকল্পনা হইয়াছিল অতি সুন্দর, নৃত্যগীতে অভিনয়ও সকলকে যারপরনাই মুগ্ধ করিয়াছিল। আবার অভিনেতৃবর্গ সকলেই সম্ভ্রান্ত পরিবারের অতি সুশ্রী সব তরুণ তরুণী। আর দুষ্মন্ত-শকুন্তলা—কাব্যের অপূর্ব্ব দুইটি সৃষ্টি—সত্যই যেন বাস্তব রূপ ধরিয়া রঙ্গমঞ্চে—না, সত্যকার সেই তপোবনে, রাজসভায়, অপ্সরা তীর্থে, কণ্বের আশ্রমে অবতীর্ণ হইয়াছিল! সিনেমা কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষও কেহ কেহ অভিনয়ে উপস্থিত ছিলেন। আহা, ঐ দুষ্মন্ত শকুন্তলা, ঐ অনসূয়া প্রিয়ম্বদা, ঐ অপ্সরা বিশ্রকেশী—ইহাদের অতি মোহন মধুর নৃত্যগীত আকাশপথে বাতলিচালিত রথ হইতে হেমকূট শিখরের অপূর্ব্ব দৃশ্য, সেই শিখরস্থিত আশ্রমে

দুষ্মন্তের অবতরণ, সিংহ-শাবক-পীড়ক বীর বালক ভরত আর সুদীর্ঘ বিরহের পর দুষ্মন্ত-শকুন্তলার মিলন—আহা, ছবিতে এই নাটকখানি তুলিয়া লইতে পারিলে—সমগ্র কলিকাতা আসিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িবে, দিনের পর দিন—ছইবার তিনবার চিত্র প্রদর্শনেও অজস্র টিকিট বিক্রয় হইবে। এমন সুযোগ সচরাচর জোটে না, যদি একবার ছুটিয়াছে ত্যাগ করিতে নাই। সম্পন্ন কোনও কোম্পানীর মালিক অবিলম্বে আসিয়া মোকার্জি সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন, বহু টাকা দিয়া নাটকখানির ছবি তুলিয়া লইবার প্রস্তাব করিলেন। অভিনয়ের সাফল্যের গৌরবে দলের সকলেই তখন অমিত একটা আনন্দের নেশায় ভরপুর। অবিলম্বে বন্দোবস্ত সব হইল, পনের কুড়ি দিনের মধ্যেই নাটকখানির ছবি তুলিয়া লওয়া হইল। ছবির ঘর, ঘরের সম্মুখস্থ রাজপথ, লোকের ভিড়ে জম্ জম্ করিতে লাগিল।

বিচিত্র অবস্থানে দুষ্মন্ত-শকুন্তলার নয়নাভিরাম কত চিত্র পথে পথে কলিকাতার সব প্রাচীরগাত্রে দেখা দিল; হ্যাণ্ডবিলেও মুদ্রিত হইল। আর নাটকের কথা, দুষ্মন্ত-শকুন্তলার কথা সর্ব্বত্র সকলের মুখে মুখে চলিতে থাকিল, পার্কে, ময়দানে, বাস-ট্রামে, বিদ্যালয় প্রাঙ্গন হইতে অলি-গলির সব গৃহকোণ পর্য্যন্ত মুখরিত হইয়া উঠিল!

বিন্দুবতীর পিতা নরেন বাবু সব শুনিলেন, প্রাচীরগাত্রে লম্বিত চিত্রগুলি সব দেখিলেন, হ্যাণ্ডবিলও কত হাতে পড়িল, একদিন গিয়া শেষে সিনেমায় অভিনয়ও দেখিয়া আসিলেন। মনটা তাঁহার বড় দমিয়া গেল। ঐ শকুন্তলার সঙ্গে মিলিত ঐ দুষ্মন্ত—ধিক্! তার হাতে তিনি তাঁহার বিন্দুকে সঁপিয়া দিবেন! বিষমাখা একটি কাঁটা তাঁহার বুকে বিঁধিয়া রহিয়াছে, শৈলবতী। তীব্রতর আরও বড় বিষের আর একটা কাঁটা বিঁধাইবেন বিন্দুমতীকে? দুই পক্ষের আশীর্ব্বাদ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তবু—তবু—ফিরিবার উপায় কি কিছু হইতে পারে না? নিভৃতে একদিন শৈলবতীকে ডাকিয়া তিনি সব কথা বলিলেন। একটি নিঃশ্বাস চাপিয়া ধীরে ধীরে শৈলবতী কহিল "সম্বন্ধ কি এখন আর ভাঙ্গতে পার বাবা?"

"কেন পারব না? পাকা সম্বন্ধও কত আজকাল এমন ভাঙ্গে। তবে টাকা কতক দিয়ে ফেলেছি অখিল বাবুকে।"

"টাকার কথা ত কিছু ভাবছি নি বাবা। ওর ভালর চাইতে টাকা কিছু আর বড় নয়। তবে—"

"তবে আর কি? হাঁ, বাগ্‌দানটা হয়ে তোর মনে একটা খট্‌কা—"

একটু হাসিয়া শৈলবতী কহিল, "না না বাবা, তা কিছু নয়। খট্‌কা সে আমার মনে যদি কিছু ওঠেও, তোমার তাতে এমন আটকাবে কি, যদি না নিজের মনেই খট্‌কা কিছু ওঠে?"

নরেন বাবু উত্তরে কহিলেন, "জামাই বলে তাকে আশীর্ব্বাদ করে এসেছি, না মেয়ে তার হাতে দেব এই সত্যই করে এসেছি। তবে সে সত্য আমার, দায়ী হব তার আমি। বিন্দুর কি?"

"বিন্দু তোমার মেয়ে। কারও হাতে তাকে দেওয়ার কর্ত্তা যে তুমি।"

"মন্তর পড়ে অগ্নি-শালগ্রাম সাক্ষী করে দিইনি ত এখনও। দেব এই সত্য কেবল করেছি। সত্য যদি আমি এখন ভাঙ্গি, প্রত্যবায়ের ভাগী হলে হব আমি। বিন্দু নিজে ত এখন সত্য কিছু করে নি।"

"তোমার এই সত্যে কি সে বাঁধা পড়ে নি?"

"পড়ে থাকলে, পড়িয়েছি আমি, আমার সত্যে। তা আমিই যদি ভেঙ্গে এখন ফিরি, তার বাঁধন আর কিসে থাকবে?"

"কিন্তু তারাও ত' তাকে আশীর্ব্বাদ করে গেছে।"

"গেছে তার মানে আমার কাছে এই সত্য তারা করে গেছে, ওকে বধূ বলে গ্রহণ করবে।"

"কিন্তু বিন্দু নিজেও যদি সেই বধূত্ব তার মনে স্বীকার করে নিয়ে থাকে? আশীর্ব্বাদের তিলকটা কপালে নিয়েছে, কণ্ঠমালাটাও গলায় পরেছে, আর তার সঙ্গে কোনও দাগ তার মনে পড়ে নি?"

নরেন্দ্র বাবু উত্তরে কহিলেন, "হাঁ, বড় সড় হয়েছে, বুদ্ধিমতী মেয়ে, এই আশীর্ব্বাদের গুরুত্বটা সে কিছু উপলব্ধি করতে পারে বই কি মা? কিন্তু তাই বলে—তা সে যাই হক মা, যুবীনের সঙ্গে ত আর তার দেখাশুনো হয় নি, যাতে ক'রে মা কি—"

"তাও যে না হয়েছে তা নয়।"

"হয়েছে? কি করে? কোথায়? আমরা ত—"

"ওদের সেই নাটক সেদিন হয়, দেখতে গিয়েছিল মণির সঙ্গে।"

"ও! তা সেই নাটকে—হাঁ, বিনু কি বলেছে কিছু তোকে?"

একটু ইতস্তত করিয়া সঙ্কুচিত ভাবে শৈলবতী কহিল, "ও সব কথা আর শুধোও কেন বাবা? কথা কিছু হলেও তাই কি তোমায় বলতে পারি কিছু? তবে এই সম্বন্ধ ভেঙ্গে আর কোথাও বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করাটা এখন বোধ হয় ঠিক হবে না বাবা। এক যদি বিয়ে না দিয়ে রাখতে পার—"

"তাও কি হয় মা? হিন্দুর ঘরের মেয়ে, একটা সমাজ আছে, ধর্ম্ম আছে—"

ভিতর দিককার বারান্দা হইতে মা তখন ডাকিলেন, "নলি, ও শৈল!"

"যাই মা! আসি তবে বাবা, মা কেন ডাকছেন।"

"আচ্ছা তবে, দেখি ভেবে চিন্তে কি করা যায়।"

কতক্ষণ একা বসিয়া ভাবিতে ভাবিতে নরেন্দ্র বাবুর মনে হইল, অখিল বাবুর সঙ্গে গিয়া একবার আলাপ করিয়া দেখিতে পারেন। কিন্তু কি ফল তাহাতে হইবে? সম্বন্ধটা—না, এখন আর বোধ হয় ছাড়িয়া দিতে পারিবেন না। তবে তাঁহার দৃষ্টি যে ছেলের এই আচরণের দিকে পড়িয়াছে, আর তিনি ইহা অতি অসঙ্গত, ভদ্রসমাজের শিষ্টনীতিবিরুদ্ধ বলিয়া মনে করিতেছেন, এ কথাটা তাঁহাকে জানান মন্দ নয়। একটু সুবিধা পাইবেন। অতি আকাঙ্ক্ষিত এই সম্বন্ধভঙ্গের ভয়ও কিছু করিতে পারেন। ছেলেকে একটু রাশ টানিয়া রাখিবার চেষ্টাও হয় ত করিবেন। যত দূর যা হইবার হইয়াছে, এখনও যদি—কিন্তু ঐ সিনেমায় নাটক যে চলিতেছে, বহুদিন আরও চলিবে, রাস্তায় রাস্তায় ঐ সব ছবিও বাহির হইবে। সম্ভ্রান্ত সমাজে তাঁহার মাথা হেঁট হইবে। তবু যদি ঐ মেয়েটার সঙ্গে যদি সম্বন্ধ আর কিছু না থাকে, সেটাও এখন মন্দের ভাল বলিতে হইবে। কিন্তু সেই রাশ টানিয়া রাখিতেই তিনি পারিবেন কি? ভদ্রঘরের ছেলে হইয়া এই কাণ্ডটা যে গিন্না করিতে পারিল, স্পষ্টই ইহাতে বুঝা যাইতেছে, রাশ টানিয়া কখনও রাখিতে চেষ্টাই কিছু করেন নাই, অথবা পারেন নাই। অনেক বাপই আজকাল পারে না, চেষ্টাও তেমন কিছু সকলে করে না। অখিল বাবুই কি এখন পারিবেন? চেষ্টাও কি এই অসময়ে তেমন কিছু করিতে চাহিবেন? গোড়াতেই বড় ভুল তিনি করিয়াছেন। বিবাহ সম্বন্ধে যেমন বর, তেমন বরও দেখিতে হয়। কেবল ঘরই তিনি দেখিয়াছেন, কিন্তু বর—যা দেখিয়াছেন, দেখার মত দেখা কিছু নয়। সম্পন্ন ও সম্ভ্রান্ত পিতার পুত্র, প্রতিভাবান্ ছাত্র, বিলাত যাইবে, উচ্চ পদের যোগ্যতা লাভ করিয়া আসিবে, স্বাস্থ্যে ও রূপে সুপুরুষ। কিন্তু স্বভাব-চরিত্র ও আচার-ব্যবহার কিরূপ, জীবন-নীতি সম্বন্ধে কি মত পোষণ করে, বান্ধব-সংসর্গাদি কি জাতীয়, কি ভাবেই বা তাহাদের সঙ্গে চলাফেরা করে, কি সব প্রমোদে চিত্তবিনোদন করিতে চায়, এ সব কিছুরই অনুসন্ধান তিনি করেন নাই, অথচ ইহারই উপরে কন্যার সুখশান্তি সব নির্ভর করিতেছে! আরও আজকালকার ছেলে—ভদ্রতায় শিষ্ট সমাজের অনুমোদিত কোনও নীতির আদর্শ মানিয়া চলিতে চায় না, বরং তাহাকে অবজ্ঞা করিয়া বিদ্রূপ করিয়া যে যার খোস-খেয়ালেই চলে, আবার প্রগতি বলিয়া তাহারাই বাহাদুরী করে, বাহবাও পায়, দরিদ্রের ঘরে সংযম আছে, সঙ্কোচ আছে; ধনীর ঘরে তাও বড় নাই, যদি না অভিভাবকবর্গ দৈনন্দিন জীবনে সদাচার-পরায়ণ হন, আর সেই সদাচারের একটা প্রতিষ্ঠা কঠোর নিয়মে গৃহ-ধর্ম্মের সকল কর্ম্মে সকল ব্যবহারে না বজায় রাখেন। সবই ত তিনি জানেন, অথচ কি মোহেই তখন আবিষ্ট হইয়াছিলেন, কিছুই মনে হইল না, কোনও খোঁজ-খবরই নিলেন না। সম্বন্ধটা করিয়া ফেলিলেন, পাকা দেখা-দেখিও তখনই হইয়া গেল। মনে পড়িল, অখিলবাবুও যেন বড় তাড়া-হুড়া করিয়া এটা ঘটাইলেন। কেন? কিসের গরজে? ছেলের মতি-গতি তিনি জানিতেন, আরও গুরু একটা কিছুর সম্ভাবনা আশঙ্কা করিয়া ঘরের একটা টানে তাড়াতাড়ি ছেলেকে বাঁধিয়া ফেলিতে চান, তাই কি? কিন্তু বাঁধা এই টানে পড়িবে কি? যদি না পড়ে? দূর হউক ছাই! মনে মনে এ সব তোলা-পাড়া করিয়া এখন লাভ কি? বিবাহ সম্বন্ধ—না, সত্যই তিনি এখন আর ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারেন না। হয় ত পারিতেন: কিন্তু শৈলবতী যে সব কথা বলিয়া গেল, তার পর আর সম্ভব নয়। বড় একটা জটিল সমস্যারই সৃষ্টি হইল। তবু অখিল বাবুর সঙ্গে একটা আলোচনা এ সম্বন্ধে তিনি করিতে পারেন। জানিতে বড় ইচ্ছা হয়, অখিল বাবুই বা কি ভাবিতেছেন, কি তাঁহাকে বলেন, হয় ত আশারও এমন একটা অবলম্বন কিছু পাইতে পারেন, যাহাতে মনটা কিছু শান্ত হইতে পারে।

[ক্রমশঃ

শ্রী.....

[এই সংখ্যায় আমরা অন্তঃপুর-সম্বন্ধীয় আলোচনায় যে কয়েকটি কথা বলিয়াছি, তাহা পাঠ করিয়া বাঙ্গলার কোন অন্তঃপুরিকার কিছু সাহায্য হইয়াছে কি না জানিতে আমরা ইচ্ছুক। নিয়ম মত ও প্রচলিত সংস্কারাদি সম্বন্ধে জানিলে উহা সকলের আলোচিত ও প্রয়োজনমত সকলের নিকট প্রচারিত হইবে। আশা করি, আমাদের এই আহ্বানে কেহই আত্মগোপনের সাড়া দিতে কার্পণ্য করিবেন না।]

নববধূকে প্রথম শ্বশুরালয়ে গিয়া আরও কয়েকটি ছোট-খাট কার্য্য করিতে হয়, তাহার সম্বন্ধে এইবার যৎকিঞ্চিৎ লিখিত হইল। পরবর্ত্তী সংখ্যায় বধূর কর্ত্তিনতন কার্য্যগুলি লিখিত হইবে।

গৃহমার্জ্জন :—অতি প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করা নববধূর পক্ষে অবশ্যকর্ত্তব্য। গৃহের অন্য সকলের উঠিবার পূর্ব্বেই সে শয্যা ত্যাগ করিয়া গোপালকের সাহায্যে গোশালা মুক্ত করিবে। নববধূর পক্ষে গোশালা মুক্ত করা সব ক্ষেত্রে হয় না—কারণ পল্লীগ্রামে সাধারণতঃ গোশালা একটু দূরে থাকে এবং গরুকে ভয় করার জন্যও নববধূ অনেক সময় গোহালে যাইতে পারে না। গোরক্ষক থাকিলে সেই গরুগুলি বাহির করিয়া গোময় ইত্যাদি পরিষ্কার করিয়া দিবে। তথাপি বধূর উচিত অন্ততঃ গোহালের সামান্য অংশ স্বহস্তে পরিষ্কার করা। ইহা হিন্দুর ধর্ম্মকার্য্যেরও অন্তর্গত।

সামান্য গোবর লইয়া উহা জলে গুলিয়া বধূ প্রথমতঃ অঙ্গনের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া দিয়া গৃহাঙ্গন পবিত্র করিবে। গোময় হিন্দুর নিকট চিরদিন পবিত্র। উহার স্পর্শে সর্ব্বদ্রব্য পবিত্র হয়, এই বিশ্বাস আমরা যুগযুগান্ত করিয়া আসিতেছি। আধুনিক বিজ্ঞান হয়ত ইহাতে নাক সিঁটকাইবেন, কিন্তু আমাদের পূজ্যপাদ ঋষিগণের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান যে আধুনিক জ্ঞান অপেক্ষা বহু সহস্রগুণ বেশী ছিল তাহা নিত্যই প্রমাণিত হইতেছে। যাহা হউক বধূ গোবর-জল দিয়া গৃহাঙ্গন পবিত্র করিয়া ঝাঁটা দিয়া গৃহের অভ্যন্তর এবং অঙ্গন পরিষ্কার করিবে। গৃহের জন্য এবং অঙ্গনের জন্য পৃথক্ ঝাঁটা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। সাধারণতঃ আদরিণী নববধূকে ঝাঁটা হাতে করিতে দেওয়া হয় না। কিন্তু শ্বশুর-শাশুড়ী বারণ করিলেও বধূর গৃহমার্জ্জনে তাঁহারা সুখীই হন, দেখা যায়। ঝাঁটা দিয়া আবর্জ্জনা একস্থানে জমা করিয়া বধূ একটি পাত্রে জল ও গোবর গুলিয়া লইয়া ন্যাকড়া দিয়া গৃহের সর্ব্বত্র বুলাইবে। যাহাদের পাকা মেঝে আছে তাহাদের গোবর লেপিবার প্রয়োজন নাই। মাটির মেঝেতে গোবর লেপা অতি সুন্দর প্রথা। ইহাতে মেঝেটি শুকাইলে তক্‌তকে ঝকঝকে হয় এবং ঝাঁট দিলে শান-বাঁধান মেঝে অপেক্ষাও দেখিতে সুন্দর হয়। বাড়ীর সর্ব্বত্র শান-বাঁধান থাকিলেও বধূ তুলসীমঞ্চের নিম্নে চতুষ্কোণ বা মণ্ডলাকার একটু স্থান অবশ্য গোময়লিপ্ত করিবে। পল্লীর প্রত্যেক গৃহস্থ-বাটীতেই এই প্রথা প্রচলিত আছে।

গৃহ-মার্জ্জনের পরে বধূ ঝি না থাকিলে শয়নগৃহের উচ্ছিষ্ট বাসনগুলি লইয়া খিড়কীর পুকুরে গিয়া ভালরূপে মাজিয়া আনিবে এবং সেই সময় নিজের প্রাতঃকৃত্য হাত-মুখ ধোওয়া সারিয়া আসিবে। গৃহের পরিজনবর্গ উঠিবার পূর্ব্বেই বধূর এতগুলি কাজ শেষ করা উচিত। সমবয়সী বা ছোট ননদ বা যা থাকিলে তাহাকে সঙ্গে লইয়া বধূর এই সব কাজ করা উচিত। ইহাতে তাহার একাকী বোধ হইবে না এবং ননদটীরও শিক্ষা হইবে।

ইতিমধ্যে গৃহের ছোট ছোট ছেলেমেয়ে উঠিলে তাহাদের হাতমুখ ধোয়াইয়া দিবে। তাহাদিগকে খাইতে দেওয়া সাধারণতঃ নববধূর কার্য্যের তালিকায় পড়ে না। যাহা হউক এ সম্বন্ধে অন্যবার আলোচনা করা যাইবে।

প্রাতঃকাল এবং সন্ধ্যার মধ্যে নববধূর অন্য সকলকে সাহায্য করা ছাড়া বড় কিছু সংসারের কাজ থাকে না। এই সাহায্য করা কাজটিতেই তাহার কর্মনৈপুণ্য প্রকাশ পায়। আমরা আগামী সংখ্যার জন্য সেই বিষয় রাখিয়া নববধূর অন্য কর্তব্যগুলিই সম্বন্ধে এবার বলিতেছি।

সন্ধ্যাপ্রদীপ :—সাধারণতঃ শ্বশুর-গৃহে গমনের দুই চার দিন পর হইতেই, কোথাও বা প্রথম দিন হইতেই সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালিবার ভার বধূর উপর পড়ে। ইহা একটি অতি প্রাচীন প্রথা এবং ইহাতে যে অপরিসীম সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়, তাহা পৃথিবীর অন্য কোন কোন দেশে আছে কি না সন্দেহ। আমার মনে হয়, প্রত্যেক বাঙ্গালী মেয়ের এই প্রথাটিকে প্রাণ ভরিয়া শ্রদ্ধা করা উচিত। ইহাতে দিনান্তে একবার জগৎপতিকে স্মরণ করার সঙ্গে সঙ্গে আত্মসমর্পণের যে পুলক-শিহরণ আজিও বাংলার প্রতি নারীর বক্ষে জাগিয়া উঠে, তাহাই তাহাকে শিখাইয়া দেয় পত্নীত্ব এবং মাতৃত্ব।

প্রতি সন্ধ্যায় দেবমন্দিরে, তুলসীমঞ্চে এবং বাসগৃহগর্ভে প্রদীপ জ্বালা ও শঙ্খধ্বনি করা কর্তব্য। যাঁহাদের গৃহে দেবমন্দির নাই, তাঁহারা তুলসীমঞ্চে এবং গৃহগর্ভে সন্ধ্যাপ্রদীপ ও ধূপ জ্বালিয়া শঙ্খধ্বনি করিবেন। তুলসী-তলা প্রত্যেক গৃহস্থ-বাড়ীতেই আছে, এমন কি পল্লী হইতে আগতা সহর-বাসিনীদের দোতালার বারান্দায়ও ক্ষুদ্র মাটির টবে তুলসী গাছ দেখিতে পাওয়া যায় এবং সেই গৃহের বধূটিকে প্রাতে বৃক্ষমূলে জলদান ও সন্ধ্যায় প্রদীপ দান করিতে হয়। আধুনিক 'শিক্ষিতা' তরুণীগণ হয় ত এই প্রথাকে কুসংস্কার মনে করিতে পারেন, কিন্তু বিশাল বাংলার নারীগণের তুলনায় তাঁহাদের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য।

প্রদীপ মাটির বা পাথরের, অনেক স্থলে পিতলের একরূপ পঞ্চপ্রদীপ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা প্রত্যেক গৃহস্থ-বাটীতেই থাকে। প্রদীপটি বসাইবার জন্য মাটির বা কাঠের 'দেরকো' অথবা পিতলের পিলসুজ থাকে। প্রদীপ ভূমিতে রাখিতে নাই, এইরূপ একটি সুন্দর সংস্কার আছে। প্রদীপ জ্বালিবার জন্য ঘৃত বা তৈল এবং পলিতার (সলিতা) প্রয়োজন। সলিতা অবসর সময়ে তৈরী করিয়া রাখিলে ভাল হয়। সাধারণতঃ কার্পাস তুলা হাতে বা কাঠের যন্ত্রে পিজিয়া সলিতা পাকাইতে হয়, তুলার অভাবে পরিষ্কার ধৌত ন্যাকড়া ব্যবহার করা যাইতে পারে। সলিতা পাকাইতে একটু অভ্যাস করা প্রয়োজন। বালিকা-বধূ যদি বাপের বাড়ীতে ইহা না শিখিয়া যায়, তবে শ্বশুরবাড়ীতে তাহাকে কথা শুনিতে হইতে পারে। তথাপি বধূ চতুর হইলে শাশুড়ী বা ননদের নিকট কিংবা কোন প্রতিবেশিনীর নিকট উহা একদিনেই শিখিয়া লইতে পারে।

সলিতাগুলি পাকাইয়া উহা কোন শুষ্ক পবিত্র স্থানে রক্ষা করিয়া রাখিয়া দিতে হয়। সলিতা বেশী মোটা পাকাইতে নাই, তাহাতে বেশী ঘৃত বা তৈল পুড়িবে। অনেক সময় কোজাগরী ইত্যাদি পর্বে গৃহস্থকে সমস্ত রাত্রি সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালাইতে হয়। ইহার জন্য একই মোটা সলিতা পৃথক্ ভাবে পাকাইয়া লওয়া দরকার। সূর্যাস্তের পরেই সন্ধ্যা। সেই সময় সকালের মাজিয়া রাখা প্রদীপটিতে ঘৃত বা তৈল দিয়া উহাতে একটি লম্বা ভাবে এবং একটি আড়াআড়ি ভাবে সলিতা দিবে। ঘৃত জমিয়া থাকিলে উহা গলাইয়া দেওয়া উচিত নতুবা ভালরূপে প্রদীপ জ্বলিবে না। সন্ধ্যা-প্রদীপ অল্পক্ষণের মধ্যে নিবিয়া যাওয়া গৃহস্থের অমঙ্গল সূচনা করে। ঘৃত বা তৈল একটু বেশী (সামর্থ্যানুযায়ী) দিতে হয়, যাহাতে একটু পরেই স্নেহদ্রব্য ফুরাইয়া গিয়া প্রদীপের গর্ভ পুড়িয়া না যায়। ঐরূপ গর্ভ পুড়িবার পূর্বে প্রদীপ নিবাইয়া দিতে হয়। সন্ধ্যা-প্রদীপ "নিবাইয়া দাও" একথা বলিতে নাই। বলিতে হয় "প্রদীপটা শীতল করিয়া দাও"। বধূ যেন এই সব কথা ভালরূপে শিখিয়া রাখে, নতুবা তাহাকে অসুবিধায় পড়িতে হইতে পারে।

সাজান প্রদীপটি জ্বালিয়া বাম হাতে এবং ধূপ-দানীতে ধূপ জ্বালিয়া দক্ষিণ হাতে লইয়া বধূ ধীরে ধীরে দেবালয়ের দিকে অথবা তুলসীমঞ্চের দিকে অগ্রসর হইবে। কখনো যেন পায়ে পায়ে না লাগে কিম্বা হোঁচট না খায়। বাতাসে বহিতে থাকিলে প্রদীপটি অঞ্চলের আড়ালে লওয়া কর্তব্য। বাঁশের টোকা বা ডালা ঢাকা দিয়া প্রদীপ লইয়া যাওয়া অধিকতর নিরাপদ। প্রদীপ-দানের যে ভঙ্গী ও অনুষ্ঠান আছে, তাহা এতই সুন্দর যে, বাংলার কবিগণ যুগে যুগে ইহার প্রশংসা করিয়াছেন। এই অনুষ্ঠান ও ভঙ্গীগুলি লিখিয়া বুঝান অসম্ভব। উহা পিত্রালয়ে মাতা বা পিতামহী-মাতামহীর নিকট শিখিয়া লওয়া কর্তব্য। বাংলার কন্যাগণ

শিশুকাল হইতে যে-সমস্ত ব্রত-পার্ব্বণের আচরণ করিয়া থাকেন, তাহার প্রত্যেকটিতে প্রদীপ দান করিতে হয়, সুতরাং প্রদীপ-দানের অনুষ্ঠান প্রায় প্রত্যেক বাঙ্গালী মেয়ে বিবাহের পূর্ব্বে হইতেই শিখিয়া থাকে। তথাপি এত বিস্তারিত ভাবে এই কথা লিখিলাম, কারণ এই সব অতি সুন্দর প্রথাগুলি বাংলার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। আধুনিক-গণ ইহাকে কুসংস্কার ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সময়ে সাবধান না হইলে হয়ত এই সুন্দর প্রথাগুলি বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। পবিত্র বস্ত্রে প্রদীপ ও ধূপদানী-হস্তে তুলসীমঞ্চ প্রদক্ষিণ করিয়া মঞ্চের পায়াসংলগ্ন কুলুঙ্গীতে বা মঞ্চনিম্নে প্রদীপ ও ধূপদানী স্থাপন করিয়া বধূ শঙ্খটি তুলিয়া লইবে। সাধারণতঃ শঙ্খ ঐ স্থানেই রাখা হয়। উহার অভ্যন্তরে একটু জল দিয়া ধুইয়া লইয়া বধূ তিনবার শঙ্খধ্বনি করিবে। এবং শঙ্খটি পুনরায় ধুইয়া যথাস্থানে রাখিয়া গলায় অঞ্চল জড়াইয়া ভূমিলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিবে। দেবগৃহ এবং বাসগৃহেও এইরূপ ভাবে প্রদীপদান কর্ত্তব্য। তবে দেবগৃহ বা বাসগৃহ সকলের পক্ষে প্রদক্ষিণ করা সম্ভব হয় না। সেরূপ ক্ষেত্রে প্রদীপ ও ধূপদানী দেবমূর্ত্তির সম্মুখে বা বাসগৃহে রাখিয়া শঙ্খধ্বনি ও প্রণাম করা কর্ত্তব্য। প্রদীপের মুখ সব সময় উত্তর বা পূর্ব্ব দিকে থাকিবে। কদাচ দক্ষিণ বা পশ্চিম মুখে রাখিবে না। সন্ধ্যা প্রদীপের উপর কোন কীট-পতঙ্গের উৎপাত যেন না হয়। প্রদীপে শুয়রে পোকা পড়িয়া প্রদীপ নিবাইয়া দিলে অত্যন্ত অমঙ্গল সূচিত হয়। সেরূপক্ষেত্রে গৃহস্থকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। কাজেই শুয়রে পোকা হইতে বিশেষ সাবধান হইবে।

কাজল :—কাজল মেওয়া একটি প্রাচীন এবং সুন্দর প্রথা। কাজল যে শিশুদের চক্ষুর পক্ষে কত হিতকর আধুনিক চক্ষুবিজ্ঞানও তাহা স্বীকার করিতেছে। উপকারিতা ছাড়াও ইহাতে শিশুর মুখচন্দ্রের যে অবর্ণনীয় শোভা হয় তাহা প্রত্যেক জননীর নয়নানন্দকর। কাজল বহু প্রকারের আছে, তবে সাধারণ কাজলপাড়া অতি সহজ। চক্ষু উঠা বা অন্যান্য চক্ষুরোগে সীজনলার পাতার কাজল, কোন্দা গাছের পাতার কাজল ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। মুষ্টিযোগ অধ্যায়ে আমরা এগুলি আলোচনা করিব।

নববধূ যদি বাড়ীর ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলিকে সন্ধ্যার হাতমুখ মুছাইয়া কাজল পরাইয়া দেন, তবে শাশুড়ী-ননদ বধূর উপর অত্যন্ত খুশী থাকিবেন। ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে নববধূকে রহস্যময়ী নবাগতা ভাবিয়া বা সে কাহাকেও তিরস্কার করে না জানিয়া তাহার দিকে বেশী আকৃষ্ট হয়। সাধারণতঃ ছোট ছেলেমেয়ে হাত মুখ ধুইতে এবং কাজল পরিতে নারাজ। এমতাবস্থায় যদি নতুন বৌ তাহার ছোট দেবর বা ভ্রাতুষ্পুত্র বিদ্যা ভাগিনেয়কে বশীভূত করিয়া তাহার হাত মুখ ধুয়াইয়া কাজল পরাইয়া ঘুম পাড়াইতে পারে, তবে তাহাদের মাতারা অবশ্যই বধূর গুণপনায় আকৃষ্ট হইবেন। পরন্তু বধূর নিজের সন্তানগণের জন্য পূর্ব্ব হইতে ইহা অভ্যস্ত শিখিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

পল্লীগ্রামে সাধারণতঃ লৌহের কাজললতা দেখিতে পাওয়া যায়। আধুনিকাগণ সহরে সৌখীন বা স্বর্ণের কাজল-লতা ব্যবহারের পক্ষপাতী। ইহাতে তাঁহাদের বিলাস-বাসনা চরিতার্থ হয়। কিন্তু লৌহের কাজললতা অনেক বেশী স্থায়ী, সুলভ এবং উপকারী। আমার মাতা আমাকে যে কাজল-লতায় কাজল পরাইতেন, তাহাতে এখন আমার পুত্র কাজল পরিতেছে। মা ঐ কাজললতাটি তাঁহার শাশুড়ীর নিকট পাইয়াছিলেন। মাঝখানে একটি পাতলা প্লেটের উপর দুইদিকে দুইটি ক্ষুদ্র বাটি দিয়া কাজললতা তৈয়ারী। দুইটি বাটিতেই কাজল পাড়া যায়। উহাতে শিল্পীর নানারূপ শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় থাকে। আমার মায়ের কাজললতাটি দেখিতে ঠিক মাছের মত এবং উহার উপর জাঁইল, মাছের পাখনা ইত্যাদি লাগান আছে। আমি মনে করি যে, ঐ কাজললতাটি আমার গৃহের একটি মূল্যবান্ সম্পত্তি। লৌহের হইলেও উহার শিল্পনৈপুণ্য সত্যই প্রশংসার্হ। তা ছাড়া আমাদের বংশের অন্ততঃ তিন পুরুষের ইতিহাস উহার কাল অঙ্গে মাখান আছে।

প্রদীপ হইতে স্নেহদ্রব্য (সরিষার তৈল বা গব্য ঘৃত) কাজললতার প্লেটের গায়ে এমন ভাবে লাগিয়া থাকে যে, আঙ্গুল দিয়া একটু ঠেলিলেই উহা খুলিয়া যায়। তৈল বা ঘৃত যেন বেশী পরিমাণ লাগান না হয়, কারণ তাহাতে কাজল পাতলা হইয়া যায় এবং ছেলে মেয়ের চক্ষু জ্বালা করে। অবশ্য এই চক্ষুজ্বালা একেবারেই ক্ষতিকারক নহে, বরং উপকারী। বাটির গায়ে স্নেহদ্রব্য দিয়া বাটিটি প্রদীপের শিখার উপর

একটুক্ষণ ধরিলেই শিখার কালি লাগিয়া উহা কাজলে পরিণত হইবে। কাজল তৈয়ারী হইলে কাজললতা একটি পিঁড়ির উপর বা কাগজের উপর নামাইবে। সাবধান, যেন উহাতে কোনরূপেই ধূলিকণা না পড়ে। পরে শিশুকে কোলে লইয়া ঐ কাজল ঈষৎ উষ্ণ থাকিতে থাকিতে দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী বা মধ্যমা অঙ্গুলী দ্বারা তুলিয়া শিশুর চক্ষুর দুই পাতায় ধীরে ধীরে লাগাইয়া দিবে। এই প্রক্রিয়া অভ্যাস-সাপেক্ষ। অনেক মেয়ে কাজল দিতে গিয়া শিশুর চক্ষুকে আহত করিয়া ফেলে, আবার অনেক মেয়ে এত সুন্দর কাজল দিতে পারে যে, ঘুমন্ত শিশুর ঘুম একটুও ভাঙ্গিতে হয় না। কাজল দেওয়া পিতৃগৃহে অভ্যাস করা উচিত। কাজল দিবার পূর্ব্বে যেন নিজের হাত দুইখানি খুব ভালরূপে ধৌত করা হয়। কাজল দেওয়া শেষ হইলে কাজললতাটি উঠাইয়া উহাতে একখণ্ড পরিষ্কার ন্যাকড়া জড়াইয়া রাখিতে হয়।

নজর রেখার কাজল চক্ষুর পক্ষে বেশী উপকারী হয়। অনেক সময় ছেলেমেয়ে কাজল রগড়াইয়া মুখ-চোখ বিশ্রী করিয়া বসে। সাবধানী বধূ সেদিকে লক্ষ্য রাখিবে এবং মুখ মুছাইয়া শিশুদিগকে যত্নপূর্ব্বক সাজাইয়া দিবে।

দুধ খাওয়ান :—শিশুকে দুধ খাওয়ান একটা মহা সমস্যার ব্যাপার। যতদিন সে নিতান্ত শিশু থাকে, ততদিন ন্যাকড়ার পলিতার সাহায্যে তাহাকে দুগ্ধ পান করান হয়। এ সময় বিশেষ হাঙ্গামা নাই। ন্যাকড়ার পলিতা প্রত্যহ বদলাইয়া দেওয়া উচিত। অন্ততঃ উহা প্রত্যহ দুগ্ধ-পানান্তে ভালরূপে সাবান দিয়া কাচিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইতে হয়; উহা যেন কোন ক্রমেই বাসি না হয়। পলিতা তৈয়ারী করিবার জন্য শিক্ষা একবার দেখিলেই হইয়া যায়। দুগ্ধ গরম করিয়া ঈষৎ উষ্ণ থাকিতে শিশুকে দেওয়া উচিত। খাঁটি গো-দুগ্ধ না দিয়া উহাতে সামান্য জল মিশ্রিত করিয়া লইলে শিশুর পাকস্থলীতে সহজে হজম হয়। ডাক্তারী শাস্ত্র কি বলেন, জানি না, কিন্তু আমরা এক চামচ জল মিশাইয়া ভাল ফল পাইয়াছি। মিশানের পর দুগ্ধ গরম করিবে, কদাচ গরম দুধে ঠাণ্ডা জল মিশাইবে না। অজীর্ণ রোগাক্রান্ত শিশুর জন্য দুধে দুই তিন ফোঁটা পরিষ্কার চুণের জল মিশাইয়া লইলে উপকার হয়। চুণের জল গরম দুধেই মেশান হয়।

পলিতা ছাড়িয়া শিশু যখন ঝিনুক বা চামচে দুধ খাইতে শিখে, তখনই সে নানা গণ্ডগোল বাধায়। দুরন্ত শিশুকে কিছুতেই দুধ খাওয়ান যায় না। ক্রন্দনরত ছেলেকে জোর করিয়া দুধ গিলাইলে উহা সে নিশ্চিত বমি করিয়া ফেলিবে। এ অবস্থায় স্নেহের দ্বারা তাহাকে বশীভূত করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। এই জন্য বালিকা-বধূগণকে নানারূপ ছড়া, গান ও গল্প এবং খুব-পাড়ানী গান শিখিয়া রাখিতে হয়। সংসারে সর্ব্বত্র এই ছড়া, গান ও গল্প প্রচলিত রহিয়াছে। আগামী সংখ্যায় এই সুন্দর ছড়াগানের কয়েকটি উদ্ধৃত করিয়া দিবার ইচ্ছা রহিল।

সামান্য ছেলেকে দুধ খাওয়ান বাস্তবিকই কঠিন। কাঁদিয়া কাটিয়া সে এমন অবস্থার সৃষ্টি করিবে, যাহাতে ঘরে টেকা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিবে। যিনি দুধ খাওয়াইবেন, তিনি ভাল-রূপে খাওয়াইতে না পারিলে ছেলের "বিষম" লাগিয়া যাইতে পারে। আমার ছোট বোনটি তাহার প্রথম সন্তানকে কিছুতেই দুধ খাওয়াইতে পারিত না। তাহার ছেলেকে দুধ খাওয়াইবার অপারগতা দেখিয়া বাড়ীর সকলে তাহাকে তীব্র তিরস্কার করিত। সৌভাগ্যক্রমে আমার বোন তখন শ্বশুরবাড়ীতে না থাকিয়া আমাদেরই বাড়ীতে ছিল, তাই সে তিরস্কারকে কিছুমাত্র গ্রাহ্য না করিয়া ছেলেকে তাহার দিদি বা বৌদির কোলে ফেলিয়া দিয়া পলায়ন করিত। বাপের বাড়ীতে এইরূপ আব্দার চলিতে পারে, কিন্তু শ্বশুর-বাড়ীতে ইহা একেবারেই চলিবে না। আমার ছোট বোনকে আমরা অন্য সব কাজই শিখাইয়াছিলাম, কিন্তু সে সময় বাড়ীতে ছোট ছেলে না থাকায় দুধ খাওয়ান শিখান হয় নাই। আমার মনে হয় এরূপ অবস্থায় প্রতিবেশীর ছেলেদের দুধ খাওয়াইয়া এই কাজ শেখা উচিত।

ঝিনুক বা চামচ (রূপার হউক আর সোনারই হউক) এবং বাটি প্রত্যেকবার দুধ খাওয়াইবার পূর্ব্বে গরম জল দিয়া ধুইয়া লইবে। ঈষৎ উষ্ণ দুগ্ধ উহাতে ঢালিয়া শিশুকে কোলে শোয়াইয়া আস্তে আস্তে তাহার মুখে অল্প পরিমাণে দুধ তুলিয়া দিবে এবং ছড়া বলিবে। খুব কচি শিশু, যাহারা ভাষা বোঝে না, তাহারাও ছড়ার সুরে আকৃষ্ট হইয়া আনন্দে দুধ খায় এবং হাত পা নাচাইতে থাকে। এক "ঢোক" দুধ গিলিবার পূর্ব্বে অন্য "ঢোক" কদাচ দিবে না। ইহাতে শিশুর বিষম লাগিয়া যাইতে পারে। বিষম লাগিলে শিশুকে দুধ দেওয়া বন্ধ করিয়া শান্তভাবে শোয়াইয়া রাখিবে এবং মাথায় ধীরে ধীরে ফুঁ দিবে। যতক্ষণ না শিশু চক্ষু উন্মীলন করে, ততক্ষণ আর দুধ খাওয়াইবে না। গান শুনিতে শুনিতে দুধ খাওয়া শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশু প্রায়ই ঘুমাইয়া পড়ে। তখন তাহার জন্য রচিত শয্যায় তাহাকে ধীরে ধীরে শোয়াইয়া দিবে এবং গালে ও পিঠে মৃদু চাপড় দিয়া তাহার ঘুম গভীর করিয়া দিবে। তৎপরে তাহার ছোট মশারিখানি টানিয়া বিছানার চারিদিকে ভাল করিয়া গুঁজিয়া দিবে। শিশুর হাত-পা যেন মশারির গায়ে গিয়া না পড়ে সে সম্বন্ধে সাবধান হইবে।

রোডেসিয়া

—শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ

একান্ত দক্ষিণ প্রান্তে বিরাজিত না হইলেও রোডেসিয়াকে দক্ষিণ আফ্রিকার অন্তর্গত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। ইহা দুইটি প্রধান অংশে বিভক্ত—উত্তর ও দক্ষিণ রোডেসিয়া। পূর্বে এই দুইটি অংশ পৃথক্ প্রদেশ বলিয়া গণ্য হইত। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ইহাদিগকে সংযুক্ত করা হইয়াছে।

উত্তর রোডেসিয়া বিখ্যাত জাম্বেজি নদীর উত্তরে এবং কঙ্গো টানগানিকা হ্রদের দক্ষিণে অবস্থিত। ইহার আয়তন

সেসিল জন্ রোড্স।

প্রায় ২ লক্ষ ৯১ হাজার বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা আনুমানিক ১০ লক্ষ। এই প্রদেশকে নিরবচ্ছিন্ন মালভূমি বলিয়া মনে হয়। মধ্যে মধ্যে অগভীর অরণ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। স্থানে স্থানে কৃষিকার্য্যের উপযোগী ক্ষেত্র এবং পালিত পশুপালের জীবনধারণের উপযুক্ত চারণ-ভূমিও দেখা যায়। তামাক, তুলা, শণ প্রভৃতি উদ্ভিদ্ এই সকল ক্ষেত্রে উৎপন্ন হইয়া থাকে। অরণ্যগুলি অগভীর হইলেও কার্য্যোপযোগী উৎকৃষ্ট কাষ্ঠ এবং রবার প্রভৃতি প্রয়োজনীয় পদার্থ পাওয়া যায়।

দক্ষিণ রোডেসিয়া লিম্পোপো এবং জাম্বেজি নদীর মধ্যস্থলে অবস্থিত। ইহা আকারে উত্তর রোডেসিয়া অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্রতর। ইহার আয়তন প্রায় ১ লক্ষ ৪৮ হাজার ৪ শত বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ৭ লক্ষ ৭৫ হাজারের কাছাকাছি। আকারে উত্তরস্থ প্রদেশ অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর হইলেও উৎকর্ষ বা বিকাশের দিক্ দিয়া ইহা উন্নততর।

রোডেসিয়ার প্রথম প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রনীতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য স্বতঃই আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। ইহা বৃটিশ সাউথ আফ্রিকান কোম্পানি নামক সমবায়ের দ্বারা শাসিত হইত। এই সমবায় চার্টার্ড কোম্পানি নামেও অভিহিত। কোম্পানির দ্বারা একজন করিয়া শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইত। অন্যূন তিনজন সদস্য লইয়া গঠিত একটি কার্য্যকরী সমিতি শাসনবিষয়ে ইহার সহায়তা করিত। একটি ব্যবস্থা-পরিষদও ছিল। শাসনকর্ত্তা, কোম্পানির মনোনীত ছয় জন সদস্য এবং অধিবাসীদিগের দ্বারা নির্ব্বাচিত ১২ জন সভ্য এই পরিষদে দেখা যাইত। সেক্রেটারী অফ ষ্টেটের দ্বারা মনোনীত একজন রেসিডেন্ট কমিশনরও দৃষ্ট হইত। আমরা এখানে দক্ষিণ রোডেসিয়ার অতীত শাসন-প্রণালীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিলাম। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে ইহা ক্রাউন কলোনিতে পরিণত হয়।

উত্তর রোডেসিয়াও কোম্পানি-নিযুক্ত একজন শাসনকর্ত্তার দ্বারা শাসিত হইত। পাঁচ জন সদস্যের দ্বারা গঠিত একটি পরামর্শ-পরিষদ্ ইঁহাকে সাহায্য করিত। এই পাঁচ জন সদস্য শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীদের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইত। সম্রাট্ বা সাম্রাজ্যের প্রতিনিধিরূপে একজন রেসিডেন্ট-কমিশনর এখানেও থাকিত। সময়ে সময়ে একজন কমিশনরের উপরেই উভয় প্রদেশের ভার অর্পিত হইত। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ সরকার উত্তর রোডেসিয়ার শাসনভার গ্রহণ করেন।

এই চার্টার্ড কোম্পানি ভারতের ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির মত ছিল না। রোডেসিয়াবাসীরা এই কোম্পানির শাসন স্বেচ্ছায় বা প্রীতি-সহকারে স্বীকার করিত বলিয়া মনে হয় না। অনেকে দাইপ আফ্রিকান ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হওয়াকে বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করিত। কেহ কেহ রোডেসিয়াকে স্বতন্ত্র রাষ্ট্ররূপে পরিণত করিবার পক্ষপাতী ছিল।

কোম্পানির কর্তৃকর্তারা বিখ্যাত "রোমান ডাচ" ব্যবস্থানুযায়ী বিচারাদি ব্যাপার পরিচালন করিয়া থাকে। বৃটিশ দক্ষিণ আফ্রিকার অন্যান্য দেশগুলির এইরূপ বিধানানুযায়ী পরিচালিত হয়। আপিল করিতে হইলে ইউনিয়নের হাইকোর্টের আশ্রয় লইতে হয়।

বেসীর নারীগণ পশু পরিচর্যা করিতেছে : রোডেসিয়া।

কেপটাউন হইতে একটি রেলরাস্তা উত্তরে অগ্রসর হইয়া ভাম্বেজি নদী অতিক্রম করিয়া রোডেসিয়ার বক্ষে বিস্তৃত রহিয়াছে। এই রেলপথটিকে এই দেশের মেরুদণ্ড বলিয়া অভিহিত করা চলে। এই রেলপথটি সিগন্যাল-সমন্বিত দুই

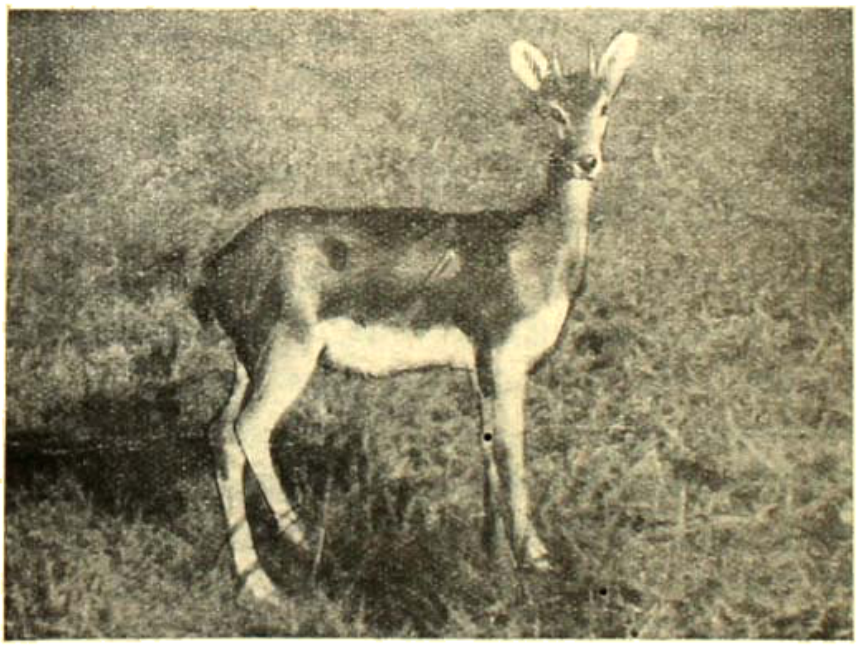

রোডেসিয়ার সর্বাপেক্ষা সুন্দর পশু ওরিবি।

প্রান্তরের উপর দিয়া এবং পিপীলিকা-নির্মিত পাহাড় ও পিপীলিকা ভক্ষক ভল্লুকগণের গঠিত গহ্বরপূর্ণ প্রদেশ অতিক্রম করিয়া উত্তরাঞ্চলের অরণ্যাবৃত প্রদেশে আরোহণ করিয়াছে। এই বনস্থান, বন্ধুর প্রদেশের স্থানে স্থানে "কোপজেস্" আখ্যায় অভিহিত লোহিত গ্রানাইট জাতীয় পাহাড়

অভিহিত। প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে একদল জুলু যোদ্ধা এই অংশে আসিয়া তথাকার সংগ্রাম সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত অনভিজ্ঞ অধিবাসীদিগকে বিধ্বস্ত করিয়া বাস করিয়াছিল। এই সকল জুলুকে "মাটাবেলে" আখ্যায় অভিহিত করা হয় বলিয়া তাহাদিগের অধুষিত এই দেশ মাটাবেলাণ্ড নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। আদিম অধিবাসীরা এখন জুলুদের দাস রূপে বাস করিতেছে। মাটাবেলে শব্দের অর্থ "যাহারা অদৃশ্য হয়"; গোলাকার বিশাল ঢালের অন্তরালে জুলু যোদ্ধাদের দেহ ঢাকিয়া যায় বলিয়াই বোধ হয় এইরূপ আখ্যা প্রদত্ত হইয়া থাকিবে।

ভাম্বেজি-বক্ষে বেহালা নয়নারী।

মাটাবেলেদিগের বাসস্থলীর উত্তরে মাশোনারা বাস করে। গিরি-গাত্রে গঠিত ইহাদিগের মধুচক্র বা মৌচাকের আকৃতি-বিশিষ্ট গৃহগুলি বিশেষ বিচিত্র দর্শন। মাটাবেলে বা জুলু যোদ্ধাদিগের আক্রমণের আশঙ্কায় ইহারা এইরূপ দুরতম গিরি গাত্রে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে। অনেক সময় দুর্দ্ধান্ত মাটাবেলেরা এইরূপ দুর্গম স্থানেও আগমন করিয়া অপেক্ষাকৃত শান্তস্বভাব মাশোনাদিগকে আক্রমণ করিয়া থাকে। এই জন্য মাটাবেলেদিগের আসিবার সংবাদ পাইলে মাশোনারা দুর্গমতর প্রদেশে প্রবেশ করিয়া প্রাণ রক্ষা করিতে প্রয়াস করে। তবে বৃটিশদিগের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে জুলুদিগের এই অত্যাচার বহুপরিমাণে হ্রাস হইয়াছে।

মাটাবেলে ও মাশোনা উভয় জাতিকেই পশুপালক বলা যাইতে পারে। প্রধানতঃ পশুপালনের সাহায্যেই ইহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। উভয় জাতির মধ্যে মাশোনারা অধিকতর শ্রমশীল ও কলা-কৌশলী। ইহারা লৌহ এবং ইস্পাতের কার্য্য করিতে পারে। ইহাদিগের প্রস্তুত লৌহ-নির্ম্মিত অস্ত্রাদিই মাটাবেলেরা ব্যবহার করে।

স্বর্ণ পাওয়া যায় এই সংবাদ অবগত হইয়া কয়েক জন দুঃসাহসী ইংরেজ ও ওলন্দাজ এই দেশে স্বর্ণের সন্ধানে আসিয়াছিল বলিয়া আমরা জানিতে পারি। স্বর্ণ লাভের আশা ও আকাঙ্ক্ষাই চার্টার্ড কোম্পানি গঠিত করিবার কারণ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই সমবায় সংগঠিত হইবার পর ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে স্বর্ণ সন্ধান-সম্পর্কীয় অভিযান মাশোনালাণ্ডের দিকে যাত্রা করিয়াছিল।

মাটাবেলে সর্দ্দার লবেঙ্গুলা গাউট বা গেঁটে বাতরোগে আক্রান্ত হইয়া অতিশয় যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন। মিঃ জেমসনের ব্যবস্থায় তিনি এই যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিলে, কৃতজ্ঞতার নিদর্শনরূপে বৃটিশদিগকে তাঁহার রাজ্যে দুর্গনির্ম্মাণের অধিকার দান করেন। এই সকল দুর্গকে রোডেসিয়ার স্থাপিত বৃটিশ প্রভাবের ভিত্তি বলা চলে। লবেঙ্গুলার লোকজন বৃটিশদিগের সম্বন্ধে যে ভাব পোষণ করিতে লাগিল, তাহা আদৌ অনুকূল নহে। সুতরাং অবিলম্বে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ সংঘটিত হইল। এই সংঘর্ষই ইতিহাসে মাটাবেলে যুদ্ধ নামে অভিহিত। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে প্রথম মাটাবেলে যুদ্ধের পরিণামস্বরূপ বৃটিশদিগের দ্বারা লবেঙ্গুলার রাজ্য অধিকৃত হয়। এই ঘটনার অল্পকাল পরেই মানসিক অশান্তির ফলে লবেঙ্গুলা পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তিনি ত্রিশটি পত্নী রাখিয়া যান। ইহাদিগের ভরণপোষণের ভার বৃটিশদিগকে লইতে হইয়াছিল।

দুই বৎসর পরে মাটাবেলে ও মাশোনা উভয় জাতিই

বৃটিশদিগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইল। ইহাদিগের পালিত পশুপাল 'রিণ্ডারপেষ্ট' রোগের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলে ইহারা ভাবিল, বৃটিশদিগের কাজে দেবতারা ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদের প্রধান সম্পত্তি পশুপালকে ধ্বংস করিতেছেন। যেমদম্ এই সময় শ্বেতাঙ্গ পুলিসদলকে লইয়া আলতালে গিয়াছিলেন বলিয়া পুরোহিতদলের দ্বারা উত্তেজিত মাটাবেলে ও মাশোনাগণ বিদ্রোহ-বহ্নি প্রজ্বলিত করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইল। যে সকল শ্বেতাঙ্গ-পরিবার পরস্পরবিচ্ছিন্ন ভাবে রোডেসিয়ায় বাস করিতেছিল, তাহাদিগকে নির্দ্দয় ভাবে হত্যা করা হইয়াছিল বলিয়া আমরা অবগত হই। অবশেষে শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশিকগণ যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইলে দেশীয়দিগকে পিছাইয়া পড়িতে হইল। দেশীয় যোদ্ধাদিগের সকলই পরাজয় ঘটিল। শেষে প্রসিদ্ধনামা সেসিল রোডসের দ্বারা শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল। এই নির্ভীক নেতার নাম হইতে এই দেশ রোডেসিয়া আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। রোডস্ সর্দ্দারদিগের সহিত সন্ধি করিবার জন্য যেরূপ সাহস সহকারে আফ্রিকার রহস্যতিমিরাবৃত বক্ষে বিরাজিত দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশে প্রবেশ করিলেন, তাহার কাহিনী স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবার উপযুক্ত। তিনি বুলাওয়াওর নিকটবর্ত্তী আরণ্য সৌন্দর্য্যপূর্ণ মাটোপোস গিরিশ্রেণীর বক্ষে গমন করিলেন। এই ভীমকান্ত শৈলমালার অন্তর্গত একটি পাহাড়ের বুকে অতুলনীয় নৈসর্গিক ঐশ্বর্য্যের মধ্যস্থলে রোডসের পার্থিব দেহ সমাধিত রহিয়াছে।

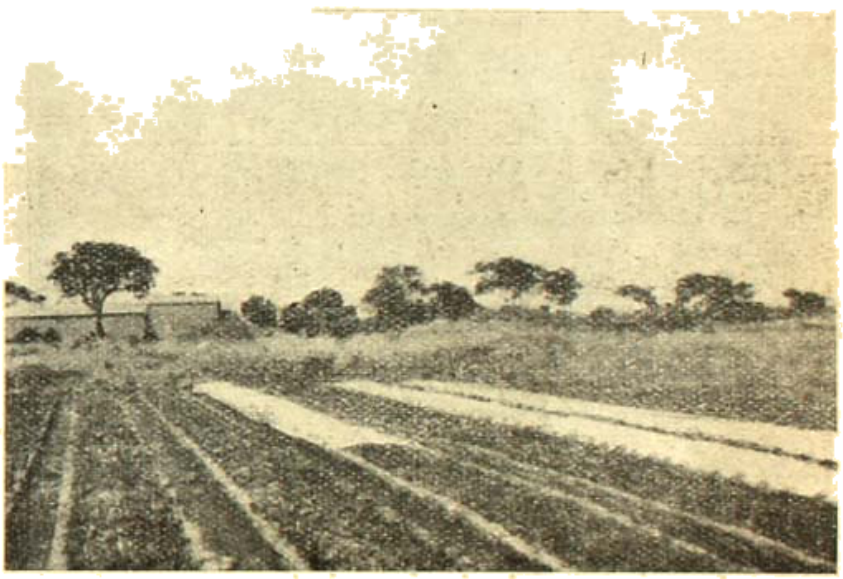

তাম্রকূট ক্ষেত্র—রোডেসিয়া।

এই সমাধিটি শ্বেতাঙ্গ সমাজের পক্ষে তীর্থস্থানে পরিণত হইয়াছে। একটি ক্ষুদ্র শাখা-রেলপথ এই স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে বলিয়া পর্য্যটকগণের আগমনের পক্ষে বিশেষ সুবিধা আছে। এই অঞ্চলে দেশীয়দিগেরও অন্যতম তীর্থক্ষেত্র বা পীঠস্থান অবস্থিত। রোডসের সমাধির সন্নিকটে আলান উইলসন ও তাঁহার সহচরগণের সমাধি বিরাজিত রহিয়াছে। ইহাঁদের প্রত্যেকেই যুদ্ধকালে লোবেঙ্গুলার অনুচরবর্গের দ্বারা নিহত হন। মাতোপোস আরণ্য শ্রেষ্ঠা দক্ষিণ আফ্রিকায় বৃটিশ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার অন্যতম কারণ, সেই বিখ্যাতনামা সার হ্যারী জেমসনের পার্থিব দেহও পরবর্ত্তী সময়ে এই স্থানে সমাধিত করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় মাটাবেলে যুদ্ধের পর রোডেসিয়ার বক্ষে বৃটিশ প্রভাবের ভিত্তি সুদৃঢ় হইয়া পড়িল। এই সময় হইতে মহাত্মা সেসিল রোডসের নাম অনুসারে এই দেশ রোডেসিয়া নাম ধারণ করিল। এই বীর-পুরুষের বিস্ময়কর সাহস আজিও সুগভীর শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করা হইয়া থাকে।

রোডেসিয়ার শ্বেতাঙ্গ অধিবাসি-সংখ্যা ৩০ হাজারের কিঞ্চিৎ অধিক হইবে। কৃষ্ণকায় জাতির সংখ্যা ৭ লক্ষের কিঞ্চিৎ অধিক হইতে পারে। এই সকল কৃষ্ণকায় আফ্রিকানদিগের মধ্যে শ্বেতাঙ্গগণ বিক্ষিপ্ত ভাবে বাস করে। শ্বেতাঙ্গদিগের মধ্যে অনেকেই উন্নতিশীল কৃষক। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শ্বেতাঙ্গ মাটাবেলেল্যাণ্ডের অন্তর্গত বুলাওয়াওতে বাস করে। পূর্ব্বে ইহা কেবল 'ক্রাল' নামক দেশীয়দিগের কুটীরে পূর্ণ ছিল। এখন বহু লালবর্ণ আধুনিক ধরণের গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। যেখানে এক সময় জুলু যোদ্ধারা রণনৃত্যে মত্ত

হইত। এখন সেখানে বৃটিশ বালকগণ ফুটবল খেলায় রত থাকে। মাটাবেলে সর্দ্দার লবেঙ্গুলার জমায়েত দরবার যে বৃক্ষতলে বসিত, তাহার চারিদিকে এখন সুদৃশ্য সৌধাবলী নির্ম্মিত হইয়াছে।

বর্ত্তমানে মাশোনালাণ্ডের অন্তর্গত সালিসবারি সরকারী কর্ম্ম-কেন্দ্র বা রাজধানী। ক্ষুদ্র জনপদ হইতে ইহা ক্রমশঃ উন্নতির পথে চলিয়াছে। দৈনিক সংবাদপত্র, হোটেল, থিয়েটার, খেলার মাঠ প্রভৃতি সমস্তই একে একে গড়িয়া উঠিয়াছে। হোডেসিয়ার রেলওয়ে-পরিচালন এই স্থানে অবস্থিত। রাউট পাহাড়ের সন্নিকটে এই সহরটি

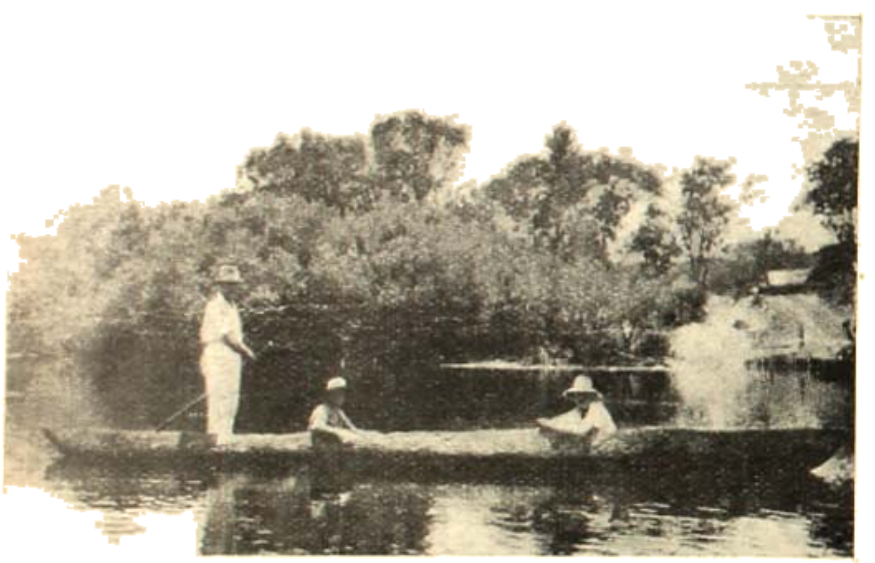

পাহাড়ওয়া।

পাহাড়টি ছোট হইলেও সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে পাঁচ সাত ফুট উচ্চে অবস্থিত। মালভূমির প্রান্ত প্রদেশে দণ্ডায়মান এই অত্যুচ্চ শৈল বিশেষ চিত্তাকর্ষক দৃশ্য প্রকাশিত করিয়াছে।

এই সকল দেশে প্রথমে 'কেপ ওয়াগণ' আখ্যায় অভিহিত শকটসমূহের সহায়তায় পর্ব্বত-বন্ধুর পথেও যাওয়া আসা করিতে হইত। বারটি হইতে কুড়িটি পর্য্যন্ত বলদ বা অশ্বতরের সাহায্যে এই সকল অদ্ভুত শকট চালিত হইত। সময়ে সময়ে তদপেক্ষা অধিক পশুও গাড়ীর সহিত জুড়িয়া দেওয়া হইত। গাড়ীকে গহ্বর হইতে টানিয়া তুলিবার জন্যই অধিকসংখ্যক পশুর প্রয়োজন হইত। এই সকল বিচিত্র শকট চালাইবার জন্য দুইজন চালক আবশ্যক হইত। একজন রশ্মি-রজ্জু বা লাগাম ধরিয়া রহিত এবং অপর ব্যক্তি সুদীর্ঘ চাবুকটি চালাইত। এতগুলি বাহনের উপর যুগপৎ চাবুক চালনা সহজ ব্যাপার নহে। পশুদিগকে উত্তেজিত করিবার জন্য উহাদের কণ্ঠ হইতে অজস্র গালি বর্ষিত হইত। প্রকৃত পথ ছিল না বলিলেও চলিতে পারে। দুরতিক্রম্য বাধারূপে প্রায়ই প্রকাণ্ড পাহাড় এবং কূলপ্লাবী নদী পথের মধ্যস্থলে পাওয়া যাইত। ইহা ছাড়া এক প্রকার মক্ষিকা tsetse fly (ৎসেৎসে ফ্লাই) পশুদিগকে কামড়াইলে তাহাদের প্রাণহানির সম্ভাবনা আছে বলিয়া সর্ব্বদা সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইত। এই জাতীয় মক্ষিকার কামড় গরু এবং ঘোড়ার পক্ষে প্রায়ই প্রাণান্তকর হইয়া থাকে। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় শূকরের পক্ষে ইহা মৃত্যুর কারণ হয় না।

পর্ত্তুগীজ-অধিকৃত উপকূল হইতে মাশোনালাণ্ডের দিকে প্রসারিত একটি পথে পশু-চালিত শকট প্রবর্ত্তিত হইবার প্রস্তাব হইয়াছিল, কিন্তু এই জাতীয় মক্ষিকা পূর্ণ প্রদেশে উপর দিয়া ঐ পথ অগ্রসর হইয়াছে বলিয়া ঐ প্রস্তাব পরিত্যাগ করা হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার উন্নতির পক্ষে এই সকল ভীষণ মক্ষিকা কিরূপ বাধা উৎপাদন করিয়াছে, তাহা তাঁহারাই জানেন, যাঁহাদের এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা রহিয়াছে। পঙ্গপাল এবং এক জাতীয় উই আফ্রিকার এই সকল অংশের বিভীষিকা। তবে পঙ্গপাল অপেক্ষা 'সেৎসে' মক্ষিকার দ্বারা অধিকতর ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। আমরা দক্ষিণ আফ্রিকার বক্ষে বিরাজিত-বিশাল বল্মীক বা উই-ঢিবিগুলি দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছি। ইহারা শুধু মূল্যবান কাষ্ঠকে নষ্ট করিয়া অপেক্ষ অনিষ্ট করিয়াছে তাহা নহে, ইহাদের আক্রমণের আশঙ্কায় মানুষকেও সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হয়। চির কল্যাণময়ী প্রকৃতি মাতা ইহাদিগকে ধ্বংস করিবার জন্য কতক জাতীয় এক প্রকার কীট সৃষ্টি করিয়াছেন যাহারা 'অ্যাণ্ট-বেয়ার' বা

পিপীলিকা-ভক্ষক তন্তুক আশ্রয়ে অতিবাহিত হয়। পিপীলিকা-ভক্ষক তন্তুক না থাকিলে অধিবাসীদিগকে আরও দুঃখভোগ করিতে হইত সন্দেহ নাই।

অনেকেই পূর্ব্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকার সংঘটিত পঙ্গপাল অত্যাচারের কাহিনী শুনিয়া থাকিবেন, কিন্তু চক্ষুতে না দেখিলে পঙ্গপালের দ্বারা কিরূপ অনিষ্ট অনুষ্ঠিত হয় তাহা উপলব্ধি করা কঠিন। বিষুবরেখার সন্নিকটবর্ত্তী বৃক্ষ-বহুল জলসিক্ত জায়গাগুলিতে পঙ্গপালের ধ্বংসকর শক্তি বা অনিষ্টকর চেষ্টা আবহাওয়ার প্রভাবে সম্পূর্ণ কার্য্যকরী হইতে পারে না। বাতাসে বিদ্যমান জলীয় বাষ্প তাহাদের পাখাগুলিকে সিক্ত করে বলিয়া উড়িবার পক্ষে বাধা জন্মিয়া থাকে। ইহার ফল এই হয় যে, ইহারা সহজেই পশু ও মানুষের খাদ্যে পরিণত হইয়া থাকে। উত্তর এবং দক্ষিণের শুষ্ক আবহাওয়াযুক্ত স্থানগুলিতে এইরূপ হয় না বলিয়া ঐ সকল অঞ্চলে পঙ্গপালের অত্যাচারে অবর্ণনীয় অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। আফ্রিকার দক্ষিণে প্রসারিত প্রদেশগুলিতে পঙ্গপালের প্রথম আবির্ভাব শত বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা। তৎপূর্ব্বে ঐ সকল অঞ্চলে পঙ্গপাল দেখা যাইত না। কিছুকাল পূর্ব্বের কথা, এক একটি সমগ্র জিলা পঙ্গপালের অত্যাচারে ধ্বংস পাইয়াছিল। ইহারা যখন আসে তখন জলদজালের ন্যায় আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া দশদিক্ অন্ধকার করে। প্রখর সূর্য্যকর ইহাদিগের দ্বারা ক্ষীণ ও মলিন হইয়া পড়ে। লালবর্ণ শিলারাশি বর্ষিত হইবার মত বিস্ময়কর দৃশ্য প্রকাশিত করিয়া ইহারা দলে দলে শূন্য হইতে ভূতলে অবতরণ করে। এই অবতরণ দৃশ্য অতি বিচিত্র। প্রথমে এখানে-সেখানে কয়েকটি করিয়া, পরে বিশ পঁচিশটির দ্বারা গঠিত একটি দল স্থানে স্থানে অবতরণ করিয়া থাকে। তদনন্তর সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ, কোটি-কোটি সংখ্যায় নামিয়া আসিয়া ইহারা বহু ক্রোশ-ব্যাপী স্থানকে রক্তবর্ণ যবনিকা জালের ন্যায় সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

ইহারা যে স্থানে অবতরণ করে, কয়েক মিনিটের মধ্যে সেই স্থানটি সম্পূর্ণরূপে সবুজশোভাশূন্য হইয়া পড়ে। শস্য ও শষ্পের, পত্র ও পুষ্পের একটি ক্ষুদ্র রা ক্ষীণ রেখাও সেখানে সম্পূর্ণ দেখা যায় না। কেহই ইহাদিগের চলিবার গতি রোধ করিতে পারে না। কোন নদী বাধা জন্মাইলে ইহারা আপনাদিগের দেহের দ্বারা যে ভাবে সেতু রচনা করিয়া উহা অতিক্রম করে, তাহা দেখিলে বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না। ইহারা চলিয়া গেলেও দুঃখ দূর হয় তাহা নহে। যাইবার সময় ইহারা যে সকল ডিম্ব রাখিয়া যায়, তাহারা শুষ্ক পঙ্গপালে পরিণত হইয়া তৃণ-তুলসির নূতন অঙ্কুরগুলিকে ভক্ষণ করে। ভূমে পক্ষীদের দ্বারা ভক্ষিত এবং

রোডেসিয়ার দৃশ্য।

ভূতলে পশুদিগের দ্বারা চর্ব্বিত হইয়াও যাহারা অবশিষ্ট থাকে, তাহাদের দ্বারা শস্যের অনিষ্ট অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। একবার অসংখ্য পঙ্গপাল বারিধি-বক্ষে পতিত হইয়া নেটালের উপকূলে ভাসিয়া গিয়াছিল। মৃত পঙ্গপালের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পূতিগন্ধপূর্ণ পিণ্ডে পরিণত হইয়া মহামারী জন্মিবার আশঙ্কা জন্মাইয়াছিল।

এই দেশে অন্যান্য এক প্রকার অতি ভয়ঙ্কর সংক্রামক রোগের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। বর্ষার শেষাংশে এই ব্যাধির বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। বিশেষ নূতন উপনিবেশগুলিতে এই রোগ অধিক প্রকাশ পায়। এইরূপ উপনিবেশে

যাইবার পথগুলির পার্শ্বে আমরা অশ্বের অস্থি-পঞ্জরের স্তূপ দেখিতে পাইয়াছি। এই দেশে অশ্ব, অশ্বতর, মহিষ এবং বলদ পরম প্রয়োজনীয়। এই চারি প্রকার পালিত পশুই 'রাইণ্ডারপেষ্ট' বা পশু মড়কের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া অধিবাসীদিগের অশেষ অসুবিধার কারণ হইত। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে এক প্রকার টীকার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর হইতে এই সকল মারাত্মক পশুরোগের প্রাবল্যতা হ্রাস পাইয়াছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রসিদ্ধ ও প্রধান নগর কেপটাউন হইতে রোডেসিয়ার বিখ্যাত স্থান বুলাওয়াওর দূরত্ব প্রায় ১০ মাইল। কেপটাউন হইতে বুলাওয়াও

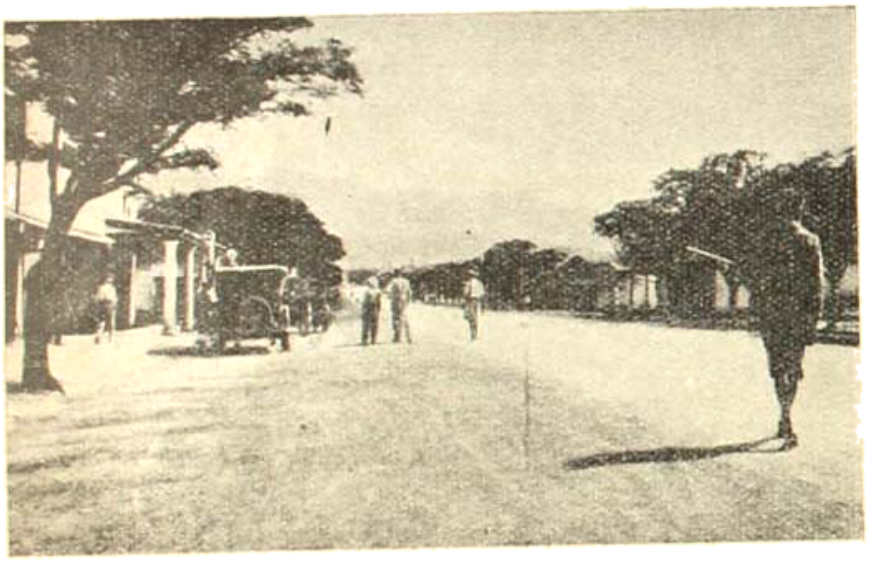

পর্য্যন্ত একটি রেল-রাস্তা বিস্তৃত হওয়ায় যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। এই রেলপথ সরকারী কর্ম্মকেন্দ্র স্যালিসবারি পর্য্যন্ত গিয়াছে। তথা হইতে আর একটি রেলপথ পর্ত্তুগিজ-অধিকৃত উপকূলে অবস্থিত নিকটবর্ত্তী বন্দর বিইরা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। খনিপূর্ণ এবং কৃষি-প্রধান জিলাগুলির দিকে প্রসারিত শাখা রেলপথসমূহের কেন্দ্রস্থল গোলো এবং স্যালিসবারি নগর। আমরা বুলাওয়াও হইতে বিস্তৃত প্রধান রেলপথটির সহায়তায় জাম্বেজি নদীর দ্বারা সৃষ্ট বিশ্ববিখ্যাত ভিক্টোরিয়া-প্রপাত দেখিতে গিয়াছিলাম। আমরা এই প্রপাতের কথা পরে বলিব। আমরা রেলরাস্তাটিকে বিন্দরের প্রধান নগর কায়রো পর্য্যন্ত বিস্তৃত করার কথা তখন শুনিয়াছিলাম। অসভ্যতম জাতি-অধ্যুষিত দুর্গম পর্ব্বতারণ্য বিদীর্ণ করিয়া এই রেলরাস্তার এইরূপ সুদূরব্যাপী বিস্তার সহজ ব্যাপার নহে। যে সময় এই রেলপথ উত্তর-পশ্চিম রোডেসিয়ার ভিতর দিয়া কঙ্গো রাজ্যের দক্ষিণাংশের কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াছিল। এই সকল রেলপথ তাম্র এবং কয়লাখনিপূর্ণ প্রদেশের উপর দিয়া প্রসারিত বলিয়া ইহাদিগের কার্য্যকারিতা আরও অধিক। আধুনিক যান্ত্রিক যুগে পাথুরিয়া-কয়লার প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত অধিক। যে স্বর্ণের জন্য য়ুরোপীয়রা লালসা-লোলুপ হইয়া এই সকল দেশে আসিয়াছিল, তাহা তুলিতে হইলে পাথুরিয়া-কয়লার প্রয়োজন আছে। চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে, তেমনই স্বর্ণলাভের লালসায় শ্বেতাঙ্গগণ দলে দলে দক্ষিণ আফ্রিকার বক্ষে ছুটিয়া আসিয়াছিল। স্বর্ণের সন্ধানে দূর অতীতে যাহারা আসিয়াছিল, তাহাদের গৃহাদির ধ্বংসাবশেষ আমরা শৈলমালার মধ্যে দেখিতে পাইয়াছিলাম। অতীতে অনুষ্ঠিত স্বর্ণ-সংগ্রহ চেষ্টার চিহ্নসমূহও আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছিল। আমরা একটি স্থানে দুইটি মরিচা-ধরা কামান দেখিতে পাইয়াছিলাম। কোন সময়ে এই স্থান পর্ত্তুগীজদিগের উপনিবেশ ছিল বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। এ বিষয়ে সংশয় নাই যে, সর্ব্বত্র পর্ত্তুগীজগণই পথিপ্রদর্শকের কার্য্য করিয়াছে। কোন কোন জায়গায় রোমান, ভীনিসিয়ান এবং স্পেনীয় মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে বলিয়া জানা যায়। সুতরাং স্বর্ণানুসন্ধানের চেষ্টা প্রাচীন কাল হইতে চলিতেছে সন্দেহ নাই।

কেহ কেহ অনুমান করেন, প্রাচীন আখ্যানে উল্লিখিত রাজা সলোমনের স্বর্ণ-খনি এই সকল স্থানেই অবস্থিত ছিল। কেহ কেহ কহেন, সলোমনের স্বর্ণখনি আরবের বক্ষে বিরাজিত ছিল। যাহাই হউক, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, প্রাচীনকালে আরবীয়গণ স্বর্ণের সন্ধানে দক্ষিণ আফ্রিকার বক্ষে আগমন করিয়া বহু স্বর্ণ স্বদেশে লইয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছিল।

বুলাওয়াওর পূর্বে অবস্থিত জিম্বাবউই নামক স্থানে বিরাজিত প্রাচীন দুর্গ-মন্দিরাদির ভগ্নাবশেষ বিস্ময় উৎপাদন করে। ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরাবলী, দুর্গসমূহ, প্রাচীরগুলি গোলক-ধাঁধার মত আঁকিয়া বাঁকিয়া প্রসারিত পথ, কোণাকৃতি বুরুজ, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড এবং নানা-

জিম্বাবউয়ের বক্ষে বিরাজিত মন্দিরাদির ভগ্নাবশেষগুলিকে এশিয়াবাসী সিরিয়গণের সৃষ্টি বলিয়া অনেকে মনে করেন। এক সময় এশিয়াবাসীরা আসিয়া এই স্থানে বাস করিয়া থাকিবে এবং পরে বান্টু (Bantu) জাতির দ্বারা তাহাদিগের বিতাড়িত হওয়া অসম্ভব নহে। বুলাওয়াও

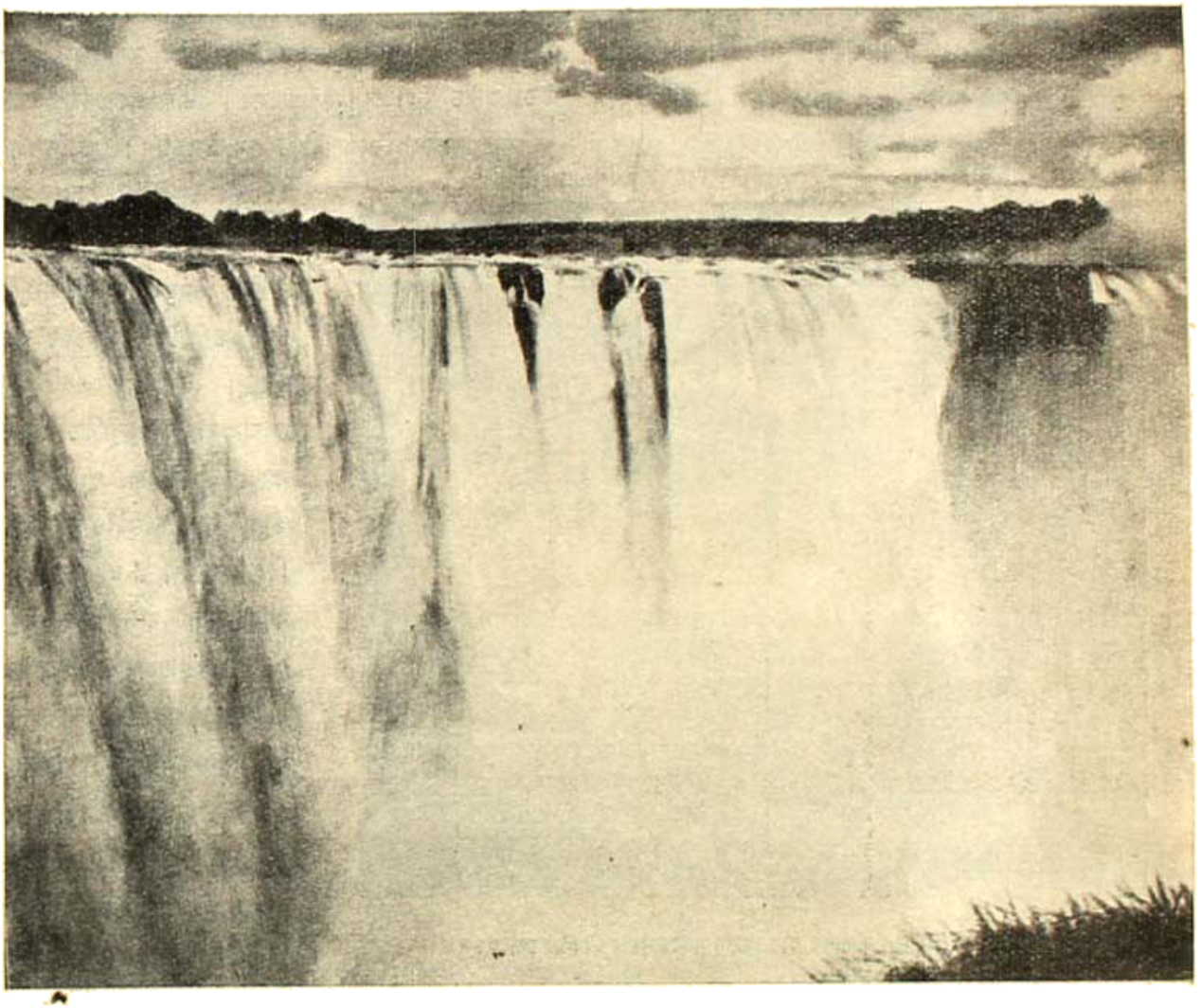

জিম্বাবউয়ে প্রদেশ—রোডেসিয়া।

প্রকার পাত্রের দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, এই স্থানে প্রাচীনকালে এমন কোন জাতি বাস করিত, যাহারা এই দেশের অধিবাসী বান্টু জাতি অপেক্ষা বহুগুণ সভ্যতর ছিল। তবে কেহ কেহ ইহাদিগকে বান্টু জাতির কীর্তি বলিয়াই মনে করেন। তাঁহাদের বিশ্বাস এই জাতি অতীতে সভ্যতর ছিল। পরে সভ্যতাসম্বন্ধে অপকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া ইহারা বর্তমান অনুন্নত অবস্থায় উপনীত হইয়াছে।

হইতে অনতিদূরবর্তী খামি নামক স্থানে এবং আরও উত্তর-পূর্বে এই ধরণের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়।

এ দেশে এখনও সামান্য মূল্যে জমি পাওয়া যায় এবং এই সকল জমিতে নানারকম ফলাই জাতীয় শস্য ও শাক-সব্জি উৎপন্ন হইতে পারে। পশুপালনের পক্ষে ভীষণ অন্তরায় রিণ্ডারপেষ্ট প্রভৃতি পশু-মড়কের কথা আমরা পূর্বে বলিয়াছি। এই সকল ব্যাধির কথা বাদ দিলে এ বিষয়ে

সংশয় নাই যে গরু, মহিষ, মেষ, ছাগ, শূকর প্রভৃতি সকল প্রকার পশুপালনের পক্ষে এ দেশে অনেক সুবিধা আছে। এখানকার গিরিগাত্র এবং পর্ব্বতপাদতলে প্রসারিত প্রান্তরগুলি প্রচুর তৃণগুল্মের দ্বারা আচ্ছন্ন। মাটাবেলেলাণ্ডেই এই সুবিধা বেশী। এ দেশে বৃষ্টি মন্দ হয় না, অপেক্ষাকৃত জলসিক্ত স্থানগুলিতে ধান্য জন্মিয়া থাকে। অন্যত্র উৎকৃষ্ট তামাক উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। আফ্রিকার অধিকাংশ প্রদেশের ন্যায় ভুট্টাই দেশীয়দিগের প্রধান ফসল। একপ্রকার বই বাঁধ ভুট্টা সাধারণ অপেক্ষাও অধিক দীর্ঘকায় হইয়া থাকে।

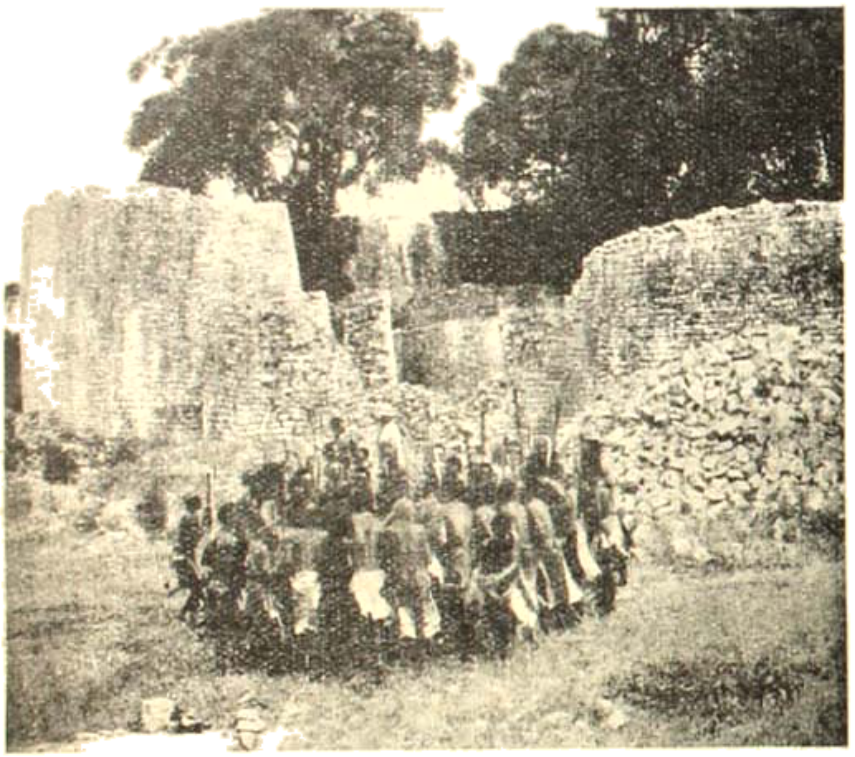

জিম্বাবুইয়ের ধ্বংসাবশেষের সম্মুখে দণ্ডায়মান দেশীয় লোকের দল।

দেশীয়গণ মিষ্ট আলু, নানারকম লিম, ধান্য এবং চীনাবাদাম জাতীয় ফসলের চাষও করিয়া থাকে। এ দেশে বন্য রেবু গাছ দেখা যায়। পর্ত্তুগীজদিগের দ্বারা এই বৃক্ষ প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকিবে। য়ুরোপীয় ফল ও ফসল এ দেশে উৎপন্ন করিবার চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। প্রায় পঞ্চাশ না ষাট রকমের ফল এ দেশের মৃত্তিকায় উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং মৃত্তিকার শস্যপ্রসূ ও ফলদা শক্তিতে কেহই সন্দেহ করিতে পারেন না। উইএর করাল কবল হইতে রক্ষা করিতে পারিলে এ দেশে উৎকৃষ্ট কাষ্ঠের দ্বারা লাভবান্ হওয়া সহজ ব্যাপার। উত্তরে জাম্বেজি-নদীর উপত্যকায় তালজাতীয় গাছ প্রচুর জন্মিতে দেখা যায়।

মাশোনালাণ্ডের (Mashonaland) পূর্ব্বপার্শ্বস্থ মালিকা মালভূমির বক্ষে স্বর্ণ বিদ্যমান। এই মালভূমি শ্বেতাঙ্গদিগের পক্ষে স্বাস্থ্যকরও বটে। এই স্বর্ণগর্ভ প্রদেশ লইয়া বৃটেন এবং পর্ত্তুগালের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ চলিয়াছিল। পরে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে মধ্যস্থতার দ্বারা উভয় জাতি ইহা ভাগ করিয়া লয়। এই প্রদেশের ইংরেজ-অধিকৃত অংশের রাজধানীর নাম উমতালি। স্যালিসবারি হইতে একটি রেলপথ সমুচ্চ মালভূমির প্রান্ত দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া উমতালি হইয়া পর্ত্তুগীজ অধিকৃত প্রদেশে অবতরণ করিয়াছে। ইহার পর এই রেলপথ সেৎসি-মক্ষিকা-অধ্যুষিত বনানীর বক্ষ ভেদ করিয়া পুংগুই নদের তীর দিয়া উহার মোহনায় বিরাজিত বীরার আগমন করিয়াছে। বালুকাগুম্ফ সমুদ্র-সৈকতে দণ্ডায়মান এই ক্ষুদ্র বন্দর ও সহরের গৃহগুলির অধিকাংশই করগেট ও লৌহের দ্বারা নির্ম্মিত। রোডেসিয়ার নিকটবর্ত্তী বন্দর বলিয়া ইহা দ্রুতগতিতে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। রোডেসিয়ার ভূতপূর্ব্ব অধিকারী চার্টার্ড কোম্পানি এখানে একটি অবতরণ-স্থান (জাহাজ হইতে) নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই বন্দর ফরাসী মজাম্বিক কোম্পানির কর্ম্মকেন্দ্র।

রোডেসিয়ার সহিত জাম্বেজি নদীর অতি নিবিড় সম্বন্ধ। সুতরাং এই নদীর বিষয় কিছু না বলিলে রোডেসিয়ার কথা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। জাম্বেজি শব্দের অর্থ "বিরাট জল"। আকার হিসাবে ইহা আফ্রিকার চতুর্থ নদী। ইহা প্রায় দুই হাজার মাইল দীর্ঘ। ইহা রোডেসিয়া এবং পর্ত্তুগীজ অধিকৃত প্রদেশের উপর দিয়া প্রবাহিত। শ্বেতাঙ্গগণ এই দেশে প্রথম

আদিয়া এই নদীতীরবর্ত্তী নিবিড় বনানী-বক্ষে যে সকল আদিম অধিবাসীদিগকে দেখিয়াছিলেন, তাহাদিগকে সম্পূর্ণ অসভ্য বা বর্ব্বর বলা চলে চলে না। প্রসিদ্ধ পর্য্যটক ও প্রচারক লিভিংষ্টোন এই নদীতীরবর্ত্তী দুর্গম প্রদেশেই প্রথম পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন।

জাম্বেজি নদীর জন্মস্থান সম্বন্ধে শেষ সিদ্ধান্ত হইয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। তবে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, জাম্বেজির উৎপত্তি-উৎসগুলি কঙ্গোনদের ওয়াটারশেড বা জলকর ভূমির দক্ষিণ হইতে নির্গত হইয়াছে। ইহা প্রথমে পূর্ব্বে, পরে দক্ষিণে বাঁকিয়া বিষুবরেখা হইতে ১৩ ডিগ্রি নিম্নবর্ত্তী স্থানে লিবা বা লিয়াম্বাই নাম ধারণ করিয়াছে। উত্তর-পশ্চিম হইতে সমাগত লুঙ্গে-বুঙ্গো এবং পূর্ব্ব হইতে প্রবাহিত কাবোম্পো নদকে সাগ্রহে গ্রহণ করিয়া ইহা জাম্বেজি নাম ধারণ পূর্ব্বক রোডেসিয়ার উত্তর-পূর্ব্ব প্রান্তকে অভিষিক্ত করিয়াছে। এই নদীর বাম তীরে বারোৎসি দেশ। এই দেশ বহু আদিম অধিবাসীর বাসস্থলী। এই জাতিরা বৃটিশ শাসন সাগ্রহে স্বীকার করিয়াছে। নিকয় কৃষ্ণকায় দেশীয় রাজা উট পক্ষীর পক্ষপ্রস্তুত মুকুট পরিত্যাগ করিয়া ফ্রক-কোট ও দীর্ঘ হ্যাট মাথায় পরিয়া সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের অভিষেকোৎসব দেখিবার জন্য বিলাত গিয়াছিলেন। ইনি পুত্রগণকেও শিক্ষার জন্য বিলাত পাঠাইয়াছেন।

এই রাজার অধীন সম্প্রদায়গণ মাশোনালাণ্ড হইতে আসিয়া এই দেশে বাস করিয়াছিল বলিয়া জানা যায়। ইহারা দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী অন্যান্য সম্প্রদায় অপেক্ষা বুদ্ধিমান ও অধ্যবসায়ী হইলেও তাহাদিগের মতই কুসংস্কারাচ্ছন্ন। আসেগাই নামক বা বর্ষা-জাতীয় একপ্রকার অস্ত্রই ইহাদের প্রধান শস্ত্র। ইহা একাধারে কোদালি, কুঠার, ছুরি ও ক্ষুরের কার্য্য করিয়া থাকে। বন্দুক থাকা সম্মানের বা সম্ভ্রান্ত বংশের নিদর্শন।

লিভিংষ্টোনের সময়ে মাকোলোলো নামক জাতির যোদ্ধৃবর্গ দক্ষিণ হইতে আসিয়া বারোৎসি-বাসীর উপর অত্যাচার করিত বলিয়া জানা যায়। লিভিংষ্টোন এই প্রদেশ হইতে পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইবার কালে উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরাই তাঁহার অনুগমন করিয়াছিল। উভয় সম্প্রদায় মাকোলোলো নামে সম্মিলিত হইয়া পূর্ব্বস্থ প্রদেশের অধিবাসীদিগের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল।

উচ্চাংশ, মধ্যাংশ ও নিম্নাংশ, জাম্বেজি নদীকে এই তিন অংশে বিভক্ত করা চলে। উৎপত্তি-উৎসসমূহ হইতে বিশ্ব বিখ্যাত ভিক্টোরিয়া প্রপাতপূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইহার উর্দ্ধাংশ। ভিক্টোরিয়া প্রপাত হইতে কেব্রা-বাসা প্রপাত পর্য্যন্ত ইহার মধ্যাংশ এবং কেব্রা-বাসা প্রপাত হইতে কারত মহাসমুদ্র পর্য্যন্ত ইহার নিম্ন বা শেষাংশ। জাম্বেজি দক্ষিণে অগ্রসর হইয়া কিছুদূর যাইবার পর সহসা পূর্ব্বে বাঁকিয়া এই বিস্ময়কর বিশ্ববিখ্যাত প্রপাতশ্রেণী সৃষ্টি করিয়াছে। প্রপাতের অব্যবহিত উর্দ্ধে নদীর প্রশস্ততা প্রায় এক মাইল। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে লিভিংষ্টোন এই প্রচণ্ড ও প্রকাণ্ডকায় প্রপাতকে ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত আখ্যা প্রদান করেন। ২৪ মাইল দূর হইতেও এই প্রপাতের বজ্রবৎ গর্জ্জননীতি শ্রুত হইয়া থাকে।

ভিক্টোরিয়া প্রপাতের পার্শ্ববর্ত্তী বিশ্রামাবাস—রোডেসিয়া।

প্রত্যক্ষ না দেখিলে কেবল বর্ণনার সাহায্যে এই প্রপাত

ও প্রচণ্ড প্রপাতের সৌন্দর্য্য, গাম্ভীর্য্য ও ঐশ্বর্য্য উপলব্ধি সম্ভব নহে। অবিশ্রান্ত সবেগে পতিত বারিরাশি জলস্তম্ভবৎ বাষ্পের সমুচ্চস্তম্ভশ্রেণী রচনা করিয়া দর্শককে বিস্ময়ে স্তম্ভিত করিতেছে। বায়ুর দ্বারা উৎক্ষিপ্ত বারিবিন্দুসমূহ রৌপ্য-শুভ্র অপরূপ রূপধারণ করিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। এই জলস্তম্ভশ্রেণী ও সলিলকণাসমূহে সৌরকর, বিশেষ সূর্য্যাস্ত সময়ের রক্তরাগ-রঞ্জিত রমণীয় রবি-রশ্মি পতিত হইয়া ইন্দ্রধনুসম ঐন্দ্রজালিক সৌন্দর্য্যজাল রচনা করিয়া দর্শককে যুগপৎ হর্ষ ও বিস্ময়-সাগরে মগ্ন করে। ইন্দ্রধনুবর্ণ-বিমণ্ডিত বিক্ষিপ্ত বারিবিন্দুসমূহের সৌন্দর্য্য বর্ণনাতীত ও কল্পনাতীত। চিরহরিৎ তীরভূমি ও দ্বীপাবলীর উপর অবিশ্রান্ত রবিত এই সৌন্দর্য্য-ধারা যেমন স্বভাবের শান্ত শোভার সংবাদ প্রচার করে, তেমনই বারিরাশির বিরাট বেগ ও গর্জ্জনশীল প্রকৃতির ভীম ভৈরব ভাব অভিব্যক্ত করিয়া তুলে। উভয়ভাব সম্মিলিত হইয়া যে দৃশ্য প্রকটিত করে, তাহাকে ভীমকান্ত বা রুদ্রসুন্দর বলা চলে।

নদী-নীর সহসা একটি ফাটলের মধ্যে প্রবেশ করায় ক্ষুব্ধ মনে হয়, সমগ্র নদীটি অকস্মাৎ মাতা বসুন্ধরার বক্ষতলে অদৃশ্য হইল। ইহার পর নদী যখন প্রচণ্ড বেগসহ প্রপাত-পুঞ্জাকারে প্রকাশিত হয়, তখন চমৎকৃত হইয়া চাহিয়া থাকিতে হয়। প্রপাতগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে বা বিভিন্ন ধারায় পতিত হইতেছে। এই প্রসিদ্ধ প্রপাত-শ্রেণীর গভীরতা ৪ শত ২০ ফুট। ইহা আকারে নায়াগ্রা অপেক্ষা বৃহত্তর। প্রপাতের নিকটে ৬ শত ৪০ ফুট দীর্ঘ একটি শৃঙ্খল-লম্বিত সেতু বা 'সাসপেন্‌শন ব্রিজ' রচিত হইয়াছে। এই সেতুর সহায়তায় কোডেলিয়ান রেলপথ জাম্বেজি অতিক্রম করিয়া দুর্গম ও অজ্ঞাত দেশের ভিতর দিয়া উত্তরে অগ্রসর হইয়াছে। পর্য্যটকদের জন্য প্রপাতের পার্শ্বে একটি হোটেল স্থাপিত হওয়ায় বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

বহির্ম্মুখীনতা ও সাহিত্য

...এখণ্ড-ব্রহ্মাণ্ড ও খণ্ড মনঃ লইয়া যে বিশ্ব দুনিয়া তাহার সর্ব্বত্র "কর্ম্ম" পরিব্যাপ্ত। আমরা সাধারণতঃ "কর্ত্তা"-মূলক "কর্ম্ম" হয় ইহা বলিয়া থাকি। কিন্তু বিশ্ব-দুনিয়ার কথা বুঝিতে হইলে "কর্ম্ম", "ক্রিয়া" ও "কার্য্যে"র মধ্যে কি কি পার্থক্য, তাহা জানিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, বিশ্ব-দুনিয়া পরিব্যাপ্ত যে "কর্ম্ম" সর্ব্বাবস্থায় ও সর্ব্বকালে একই ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার কোন "কর্ত্তা" নাই। তাহার আছে কেবলমাত্র একটী "কারণ"। ঐ "কারণের" "কারণে"র দ্বারা "কর্ম্ম" সম্পাদিত হইতেছে। ঐ "কারণের" মধ্যে আছে মানুষের "আত্মা"র "ইচ্ছা"-নামা "অণু", "রশ্মি" এবং "বোধে"র মিশ্রিত অবস্থা।...

... প্রথম অবস্থায় ঐ "কর্ম্ম" মানুষের "অ-বাহ্য মনোযোগের"। তাহার পর ঐ "কর্ম্ম" "শুণে" উন্মুখ-উন্মুখী হইয়া থাকে। "কর্ম্ম" যখন শুণের উন্মুখোন্মুখী হয়, তখন তাহার নাম হয় "ক্রিয়া"। ইহার পর যুগপৎ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য শুণের উন্মেষ না হইলে কখনও শ্রদ্ধা উৎপত্তি হইতে পারে না। তদ্রূপ তাহার বিশেষণের উৎপত্তি না হইলে কখনও বিশেষ্যের উৎপত্তি হইতে পারে না। এই কথাগুলি চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, উহা আপাত-দৃষ্টিতে বড়ই দুরূহ, কিন্তু সাহিত্যের সংজ্ঞা সম্বন্ধীয় সত্য বুঝিতে হইলে উহা বড়ই প্রয়োজনীয়। এই কথাগুলি মূলতঃ ভবিষ্যতে "কল্‌ কেলে" এবং সাধারণ-বোধ্য করিয়া লেখা হইয়াছে "বৈশেষিক দর্শনে।" অতি-মুখের পরবর্ত্তী কালের যে আলঙ্কারিক ও আচার্য্যগণ বৈশেষিক দর্শনের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঁহারা যোগাযোগ না করিয়া উহা করিয়াছেন বলিয়া মানুষকে বৈশেষিক দর্শনের কণা সম্বন্ধে বিসংবাদী করিয়া গিয়াছেন।

"শুণে"র উন্মেষ এবং "ক্রিয়া"র উৎপত্তি হইলে সর্ব্বপরিব্যাপ্ত "কর্ম্ম" যে অবস্থায় উপনীত হয়, তাহার নাম "কার্য্য"।

অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড ও খণ্ড মনঃ সর্ব্বত্রই "কর্ম্ম" পরিব্যাপ্ত বটে, কিন্তু "ক্রিয়া" ও "কার্য্য" কেবলমাত্র খণ্ড-মনঃ বিদ্যমান আছে। উহা অখণ্ড-মনঃ বিদ্যমান নাই।

"ক্রিয়া"র উৎপত্তি হইলেই জীবের "সত্তা"র উৎপত্তি হইয়া থাকে। "অণু" ও "পরমাণু" অথবা স্নেহ ও রস লইয়া জীবের "সত্তা"। "সত্তা"র উৎপত্তি হইলেই "কার্য্য" আরম্ভ হয়। কার্য্য প্রথমতঃ জীবের অন্তরে বিদ্যমান থাকে, তাহার পর ক্রমশঃ বাহিরে প্রকাশ পায়।

জীবের বাহিরের কার্য্য যে তাহার অন্তরের কার্য্য, সত্তা, ক্রিয়া ও বিশ্ব দুনিয়া-পরিব্যাপ্ত কর্ম্মের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত, ইহা যতক্ষণ পর্য্যন্ত মানুষের স্মরণ থাকে এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত মানুষ তাহার কার্য্য, সত্তা, ক্রিয়া ও কর্ম্মের সমন্বয় উপলব্ধি করিতে পারে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত মানুষ সর্ব্বতোভাবে জ্ঞানী হইয়া থাকে এবং তাহার কোনরূপ দুঃখ থাকে না।

বাহিরের কার্য্য হইতে যথাক্রমে অন্তরের কার্য্য, সত্তা, ক্রিয়া ও কর্ম্মের লক্ষ্য উপলব্ধি করিবার নাম অন্তর্ম্মুখী হওয়া।

জীবের বাহিরের কার্য্য যে তাহার অন্তরের কার্য্যের সহিত ওতপ্রোত-ভাবে জড়িত এবং এই অন্তরের কার্য্য যে যথাক্রমে সত্তা, ক্রিয়া ও কর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট, তাহা ভুলিয়া গিয়া মানুষ যখন বাহিরের কার্য্যে মুগ্ধ হইয়া পড়ে, তখন কখনও বা কোন দ্রব্যের সহিত, কখনও বা শুণের সহিত মোহ-জড়িত হয়। ইহাতে মানুষ ক্রমশঃ অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব ও শান্তির অভাবে জর্জ্জরিত হইয়া দুঃখোন্মুখী হয়। ইহারই নাম মানুষের "বহির্ম্মুখীনতা"।... যে রচনার শ্রোতা অথবা দর্শক অথবা পাঠক অন্তর্ম্মুখী হইতে বাধ্য হয়, সেই রচনার নাম "সাহিত্য"। আর যে রচনায় শ্রোতা অথবা দর্শক অথবা পাঠক অন্তর্ম্মুখী না হইয়া বহির্ম্মুখী হইয়া পড়ে, সেই রচনার নাম "কু-সাহিত্য" অথবা "সাহিত্য-বিরোধী রচনা"।

জাত-জালিয়াৎ

গত ১৪ই এপ্রিল কুম্ভকোনমে মাদ্রাজের স্বাস্থ্য-সচিব ডক্টর রাজন এক বক্তৃতায় বলেন যে, তিনি কেবল একটি মাত্র জাতিতে বিশ্বাসী—গান্ধীবাদী জাতি, যাহাদের মধ্যে জাতি বা বর্ণগত কোন বৈষম্য নাই।

বাংলা সাহিত্যে বসন্তযুগ

—শ্রীমনোমোহন ঘোষ

সমগ্র বসুন্ধরার উদ্ভিদ্ এবং প্রাণিমণ্ডলীর অন্তরে সৃষ্টির যে আবেগ বর্তমান রহিয়াছে, তাহারই প্রকাশ হয় বসন্ত ঋতুতে। তাই বসন্তকাল উৎসবের সময়। এই উৎসবের অবকাশ বৎসরে একবার করিয়া আসে এবং সেই সুযোগে ব্যক্ত হয় তৃণগুল্ম, বৃক্ষলতা ও বনস্পতিসমূহের আনন্দ—শ্যামলতার ও পত্র-পুষ্পের প্রাচুর্যে, পশুপক্ষীদের আনন্দ-কলকাকলী ও গতিভঙ্গীর বৈচিত্র্যে আর নরনারীদের আনন্দ নৃত্যগীতাদির অজস্রতায় ও প্রকারভেদে। এই সকল মিলিয়া ধরিত্রীর দিকে দিকে যে সুখবিহ্বলতার স্রোত প্রবাহিত হয়, তাহাতে নবসৃষ্টি তরঙ্গিত হইয়া উঠে। এই স্থূলতার জগতে যেমন আসে উৎসব-ক্ষণ তেমনি মনোজগতেও উপস্থিত হয় উৎসবের কাল, কিন্তু তাহার আগমন বর্ষচক্রের আবর্তনের সহিত সম্পর্কিত নয়। জাতির সংস্কৃতির গতি ও ক্রমবিকাশ অনুসারে দুই, তিন বা পাঁচ শতাব্দী পর পর একবার তাহার মনোজগতে আসিয়া থাকে উৎসবের যুগ। এই উৎসব-যুগের যথার্থ উদ্‌যাপনের ফলেই জাতির সংস্কৃতির ভাণ্ডার নূতন নূতন সৃষ্টিতে শ্রীমণ্ডিত ও সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। ষোড়শ শতাব্দীর আরম্ভকাল হইতে বাংলা সাহিত্যের জগতে এক বসন্ত উৎসবের ক্ষণ আসিয়াছিল। এখানে ঐতিহাসিক ও সমালোচকের মনোবৃত্তি লইয়া তাহাকে স্মরণ করিব। তবেই আমরা যথার্থভাবে সেই যুগের শ্রেষ্ঠ দানকে বুঝিতে পারিব এবং আমাদের সাহিত্য তাহার ফলে ভাবী বসন্তের উৎসব-সমারোহকে আরও গভীর এবং ব্যাপক করিয়া তুলিতে সক্ষম হইবে।

তুর্ক শাসনের প্রারম্ভকালরূপ হিম-ঋতুর অবসান যখন হইল তখন (১৪শ শতাব্দী) প্রকৃত প্রস্তাবে বাংলা সাহিত্যের প্রথম বসন্তের সূচনা। কিন্তু চণ্ডীদাস-কৃত্তিবাসাদি যে বসন্তের আদি কোকিল, তাহার পরিপূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল চৈতন্যাবির্ভাবের পরবর্তী যুগে (১৫০০-১৭০০)। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে আবির্ভূত হন এবং ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে ঘটে তাঁহার তিরোভাব। আধ্যাত্মিক সাধনের ক্ষেত্রে তিনি এমন নূতন আদর্শের আবিষ্কার ও নূতন পন্থার প্রবর্তন করেন, যাহার ফলে সমগ্র বাঙালী জাতির জীবন নূতন ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠে। এই ভাবধারার প্রেরণাতেই ঘটিয়াছিল, বাংলার সমাজে এবং সাহিত্যে এক অভাবনীয় যুগান্তর। বর্তমান প্রবন্ধে সাহিত্যের এই যুগ-পরিবর্তন সম্বন্ধেই সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইবে।

এই যুগের সাহিত্যের বিশেষত্ব ও মূল্যবত্তা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে একবার দৃষ্টি ফিরাইতে হইবে পূর্ববর্তী যুগের দিকে এবং সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য করা প্রয়োজন চৈতন্য-প্রবর্তিত আদর্শ ও সাধন-পদ্ধতির অভিনবত্বের প্রতি। 'সহজ যান' পন্থাবলম্বী বৌদ্ধ আচার্যগণের রচিত চর্য্যাপদ বাংলা সাহিত্যের আদিমতম রচনা। কিন্তু এই রচনার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব বহুলপরিমাণে জনসাধারণের দুর্জ্ঞেয় ছিল বলিয়া উহাকে সাহিত্য নাম খুব জোর করিয়াই দিতে হয়; লোকপ্রিয় ত উহাকে বলাই যায় না। তবু যে উহা লোক সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল, তাহার কারণ সার্বজনীন সঙ্গীতানুরাগ। সুরসংযোগসহকারে গান করা হইত বলিয়া এই চর্য্যাপদগুলি জনগণের মধ্যে সুপরিচিত হইতে পারিয়াছিল। চর্য্যাপদের যুগাবসানে আসিল চণ্ডীদাস ও কৃত্তিবাসের যুগ। চণ্ডীদাস হইলেন বাংলা গীতিকাব্যের আদি কবি। রাধাকৃষ্ণের প্রেম, ধর্মসাধনোপযোগী তত্ত্ববিশেষের রূপক হইলেও তাহা লইয়া যে গীতিকাব্য তিনি রচনা করিলেন, তাহা অতি স্বাভাবিক কারণেই লোকপ্রিয়তার দাবী করিল, কিন্তু ধর্মসাধনের প্রশ্ন উহার সহিত জড়িত ছিল বলিয়াই হয়ত এই দাবী যথার্থরূপে গ্রাহ্য হয় নাই। চণ্ডীদাসের আবির্ভাবকালে শক্তি মত ছিল বাংলাদেশে অত্যন্ত প্রবল। ইহার অন্যতম প্রমাণ চণ্ডীদাস নিজে। রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলার কাব্য রচনা করিলেও 'চণ্ডী' বা 'কালিকার দাস' নামে তিনি পরিচিত এবং বাশুলী-রূপিণী শক্তিমূর্তির তিনি উপাসক। এই শক্তি প্রভাবের জন্যই চণ্ডীদাস-প্রণীত রাধাকৃষ্ণের লীলাত্মক গীতিকাব্য বাংলা-

বেশে তেমন প্রসার লাভ করে নাই। আর ঐ লীলার মধ্যে যে 'পরকীয়া-বাদ' বর্ত্তমান ছিল, তাহাও হয়ত কৃষ্ণলীলাত্মক গীতিকাব্য প্রচারে কিয়দংশ বাধা দান করিয়াছিল। কৃত্তিবাসের কবিত্ব যে তাঁহার সমসাময়িক চণ্ডীদাস অপেক্ষা অধিক ছিল তাহা নহে, কিন্তু এক বিশুদ্ধ গার্হস্থ্য আদর্শের উৎসভূমি বলিয়া তাঁহার রচিত রামায়ণ সহজেই বাংলার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত অভূতপূর্ব্ব লোক-প্রিয়তা অর্জ্জন করিল।

চৈতন্য মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণের পর হইতে বাংলা দেশের মনোজগতে যে বিপ্লবাত্মক পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল, তাহার ফলে জনসাধারণ নানাবিধ প্রাচীন সংস্কারের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া নূতন প্রাণ ও নূতন আনন্দের আস্বাদ লাভ করিল। যে ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণের লোকে রাধাকৃষ্ণ-লীলা ও পরকীয়া তত্ত্বকে গার্হস্থ্য জীবনের বিরোধী বলিয়া দূরে ঠেকাইয়া রাখিতে ছিলেন, তাঁহাদের অনেকে এই দুইটি বস্তুকে ধর্ম্ম ও দর্শনের গঙ্গাজলে অভিষিক্ত করিয়া ধীরে ধীরে ধর্ম্মসাধনের উপযোগী বলিয়া গ্রহণ করিলেন। তাহাতেই ঘটিল রাধাকৃষ্ণের প্রেমাখ্যান-মূলক গীতিকাব্যের অভাবনীয় প্রচার। অন্যূন দেড়শত কবিকে এই শ্রেণীর গীতিকাব্যের রচয়িতারূপে পাওয়া গেল। কিন্তু গীতিকাব্যই এই যুগের সাহিত্যিক প্রচেষ্টার একমাত্র নিদর্শন নহে। মহাপুরুষদের চরিত-কাহিনী লইয়াও কাব্য রচিত হইল। পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের যে মঙ্গল-কাব্য ও ভক্তি-মূলক উপাখ্যানকাব্যের সূত্রপাত হইয়াছিল, সেই কাব্যও এই চৈতন্যযুগে বিশেষ প্রসার লাভ করিল। এতদ্ব্যতীত হইল বাংলায় মহাভারত রচনা। ব্যাসের কাব্যকে অবলম্বন করিয়া বাংলায় কুরুপাণ্ডবের চরিতমূলক মহাকাব্য প্রচারিত হইল। বাংলার বাহির হইতে হিন্দী সাহিত্যের দুই একখানি গ্রন্থও হইল এই যুগে বাংলায় ভাষান্তরিত। এই বিভিন্ন ধারায় যে পরিপুষ্টি আমাদের চোখে পড়ে, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তীযুগের সাহিত্যে একান্ত দুর্লভ ছিল। চৈতন্যযুগের সাহিত্যে যে বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য্য দেখা দিল, তাহাই উহাকে 'বসন্তকাল' আখ্যা দান করিয়াছে। এই বসন্তাগমের বিশেষ লক্ষণীয় (characteristic) প্রকাশ বাংলার তৎকালীন গীতিকাব্যে। রাধাকৃষ্ণলীলা এবং চৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা অবলম্বনে যে ষোড়শাধিক কবি বিপুল পদাবলী সাহিত্যের রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে আধুনিক যুগে সাহিত্য-চর্চ্চার যেমন বিভিন্নমুখী প্রেরণা আছে, তখনকার দিনে তাহা ছিল অবর্ত্তমান। তাই বিপুল পদাবলী-সাহিত্য দেখিয়া আমরা বিশেষ বিস্ময় অনুভব করি। এই পদাবলী-সাহিত্যের মধ্যে নূতন সৃষ্টি অবশ্য খুব বেশী নাই। কারণ হয় জয়দেব, নয় চণ্ডীদাস, নয় মৈথিল কবি বিদ্যাপতির অনুসরণ ও অনুকরণ, এই পদাবলীকারদের মধ্যে অল্পবিস্তর সুস্পষ্ট। একে একে দৃষ্টান্তগুলির উল্লেখ করা যাক্। যেমন জয়দেবের অনুপ্রাসপ্রিয়তা এবং ছন্দোমাধুর্য্য পদাবলীকে কিরূপ প্রভাবিত করিয়াছে, তাহা নিম্নোল্লিখিত আট জন পদাবলীকারের রচনার নমুনা হইতে বুঝা যাইবে।

গুরু-অলিপুঞ্জ ঝঙ্ক কুঞ্জে মধু যাচিয়া।
মরলিকলরবে কাটে মধু যামিনী।
বনীমুত মল্লীফুল পরিমল মাতায়।
কুহুকলি পুঞ্জ অলি কুঞ্জ কাঁহে নুহাতা। (গোবিন্দ)

এই বসন্তবর্ণনায় জয়দেবের অনুপ্রাস ও ছন্দ সহজেই মনে পড়ে। আর একজন কবির বসন্তবর্ণনও এই জাতীয়। তিনি লিখিতেছেন :—

মধুর মাধবী-কেলিনিকুঞ্জ
ফুটল মধুর কুসুমপুঞ্জ
গাওই মধুর ভ্রমরা ভ্রমরী
মধুর মধুরি যাচিয়া।
মধুর পবন বহই মন্দ
কুহরে কোকিল মধুর ছন্দ
মধুর রজনি পবন সুগন্ধ
নবই বিহগ পাঁচিয়া। (বলরামদাস)

কৃষ্ণের বর্ণনায় স্বনামখ্যাত গোবিন্দদাস লিখিতেছেন।—

নবনবরঞ্জন চন্দনচর্চ্চিত
গন্ধনিন্দিত অঙ্গ।
জলদমুক্তল কম্বুকণ্ঠ
নিন্দি সিন্ধুর ভঙ্গ।
প্রেমআকুল গোপগোকুল
কুলবতীমনোকান্ত।
ভুবনমোহন মধুসূদন
মুরত মদন নাম্ভ।

কবি রায়শেখরও ঠিক এই সুরে কৃষ্ণস্তুতি রচনা করিয়াছেন। সেই স্তবের আরম্ভে আছে :—

মুখনকমল কমলকচিনিন্দিত
মুখমুনীচাবিলাসী।
কুঞ্চিতকেশ কলিত কুসুমাকুল
কুলকামিনীমনোবাসী।
জয় জয়দীশ মনোযাসী।

প্রসাদদাস নামে কবিও জয়দেবের পদলালিত্য এবং অনুপ্রাসাদিতে মুগ্ধ। কৃষ্ণের বর্ণনায় তিনি বলেন:—

কুলকলিকা কলিত চূড়ে
মন্দ পবনে ধরিয়া উড়ে
কটিতটে কিবা পীত বসন
ঘরে শোভিত কণক।
হসিত ললিত বদনইন্দু
অলপে উপরে ময়ুরবিন্দু
কোলে নয়ন কমল যুগল
তারে ললিত মদনা।

যদুনন্দন দাসের রচিত ও জয়দেবের রচনার মাধুর্যাদিতে প্রভাবিত। তিনি কৃষ্ণস্তুতির আরম্ভ করিয়াছেন এইরূপ:—

ইন্দীবর বরষির সংহার
মেঘের মদের মেহ।
তাপুনবরহ-কুল বিমোহিত
অম্বরবর পরিধেয়।

জগদানন্দ দাসের রচনা শুনিলে মনে হইবে জয়দেবেরই কোন পদ শুনিতেছি। তাঁহার একটি পদের আরম্ভে আছে:—

মধুবিকচ কুসুমপুঞ্জ, মধুপলব্ধ গুঞ্জ গুঞ্জ,
কুঞ্জমতিমদন মঞ্জুল কুঞ্জবাসী।
ঘন গরজন চিকুরপুঞ্জ বারণী ফুলমালে রঞ্জ
অলসযুত কঞ্জবয়নী মঞ্জন গতি হারী।

রাইমোহন ঠাকুরের পদ শুনিলেও তাহাই মনে হইবে। তিনি লিখিয়াছেন:—

অভিনব জলধর রুচির সুদেহ।
পীতাম্বর বর তড়িত বিথ থেহ।

এরূপ আরও অনেক কবির পদাবলীতে জয়দেবের অল্পবিস্তর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

জয়দেবের পরেই পদাবলীকারদের উপর চণ্ডীদাসের প্রভাব। এই প্রভাব তত সহজে ধরা যায় না। কারণ চণ্ডীদাসের 'কৃষ্ণকীর্তন' বহুদিন যাবৎ লোকলোচনের অন্তরালে ছিল। কেবল যাঁহারা এই গ্রন্থখানি মনোযোগ দিয়া পড়িয়াছেন, তাঁহারাই পদাবলী-সাহিত্যে চণ্ডীদাসের প্রভাব বুঝিতে পারিবেন। কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণে রাধার ব্যাকুলতাকে লইয়া চণ্ডীদাস নানাপ্রকারের অনুপম চল্লিশটি পদ রচনা করিয়াছেন। তাহার মধ্য দিয়া তিনি রাধার হৃদয়াবেগের গভীরতা চিত্রিত করিয়াছেন। একটি সুপ্রসিদ্ধ পদে তিনি লিখিয়াছেন—

কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা।
দাসী হঞা তার পাএ নিশিবোঁ আপনা।

আকুল করিতে কিবা আমার মন
বাজাএ সুসর বাঁশী নাগরের লক্ষণ।
পাখি নহোঁ তার ঠাঁই উড়ি পড়ি জাঁও।
বেবনী বিআজ সেই পরিহাঁ লুকাও।

নানাভাবে এই পদটির ভাবের অনুকরণ ও প্রভাব পদাবলীসাহিত্যের উপর কতখানি তাহা লক্ষ্য করিলেই আমরা চণ্ডীদাসের প্রভাবের গুরুত্ব বুঝিতে পারিব।

একজন পদকর্তা লিখিয়াছেন:—

যে দেশের বাঁশিয়া বটে সে দেশে মানুষ নাই।
রাধারে বধিতে বাঁশী এসেছে কানাই।

চণ্ডীদাসের পদের প্রতিধ্বনি এখানে স্পষ্ট শুনিতে পাওয়া যায়। আর একজন পদাবলীকার গাহিয়াছেন:—

সখি হে শুন শুন বাঁশী কি বা বোলে।
আনন্দ আমার কিসে সে লাগে
মরিলা কুলশীলে।
বাঁশীর নিনাদ শুনিতে পরাণ
নিশাস ছাড়িতে চাহে।
লিখিল সকল ছেন কলেবর
মন সুকুরই তাহে।"

এ পদটিও চণ্ডীদাসের পদ মনে করাইয়া দেয়। অপর একজন কবি লিখিয়াছেন:—

তোমার মধুর কথা রহিতে নারিনু ঘরে
বাঁশীর নিশাদ দুনয়ান।
পরিলে যাহিনা ঘরে কুলশীল সেল দূরে
ও অবশেষে আছে মোর প্রাণ।

এই গানটিতেও চণ্ডীদাসের প্রতিধ্বনি বেশ স্পষ্ট। ঠিক এই ভাবটি অপর একজন কবিরও রচনায় ব্যক্ত হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন :—

মুরলী ডাকব কদম পরাণ
হইতে না দিল ঘরে।
অবলা পরাণে না যাব সহনে
নীতি নীতি ঐছি করে।
যে দুখ যাই কাকে সব ঠাঁই
নাম সে কেমনে জানে।
হৃদয়ে প্রবেশি চরণে লাগে দি
বাহির যেখানে প্রাণে।

এইরূপে চণ্ডীদাসের অনুকৃতি ও প্রভাবের বিস্তর দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়।

চণ্ডীদাস এবং জয়দেবের পরেই চৈতন্যযুগের বাংলা গীতিকাব্যের উপর বিদ্যাপতির প্রভাব। এই প্রভাব এত সুস্পষ্ট যে, ইহার বিস্তৃত আলোচনা বাহুল্য মনে হইবে। 'ব্রজবুলি' নামক যে মৈথিলীমিশ্রিত বাংলা ভাষায় পদাবলী সাহিত্যের অধিকাংশই রচিত, তাহা মৈথিল কবি বিদ্যাপতির প্রভাবেই সৃষ্ট হইয়াছে। বাঙ্গালী পদকর্ত্তা যে গাহিয়াছেন—

পহিলহি চাঁদ করে দিল আনি।
সাঁপল তৈল শিরহে এক পানি।
অব বিপরীত হেন দেখ সব কাল।
বাসি কুসুমে কিয়ে পাঁপই মাল।
না বোলহ সজনি না বোলই আন।
কি ফল আদরে ছেটব কান। (জ্ঞানদাস)

ইহা শুনিলে বিদ্যাপতির সুর শুনিতেছি বলিয়া মনে হয়। আর যখন শুনি অপর এক পদকর্ত্তার গীতে—

সুবদনী মাধব মৃগমদিনী নারী।
ও অতি বিলসই এ অতি গোহারী।
পরশিতে তরসি করয়ি কর ঠেলই।
হেরইতে যবহু নয়ন জল ঘরই।
হুঁ পরিরম্ভনে ঘরঘরি কাঁপ।
চুম্বনে যবহু পটাঞ্চলে ঝাঁপ। (গোবিন্দদাস)

তখন মনে হয় বিদ্যাপতিরই পদ শুনিতেছি। এরূপ বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়, কিন্তু তাহা অনাবশ্যক। পদাবলী সাহিত্যের উপর বিদ্যাপতির প্রভাব অতি সুস্পষ্ট। চৈতন্য-পরবর্ত্তী পদাবলী জয়দেব-বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের প্রভাবে ভরপুর হইলেও উহাতে মৌলিকতা নাই, অথবা সেই মৌলিকতাকে উচ্চশ্রেণীর বলা যায় না, তাহা নহে। খুব স্বল্পসংখ্যক কবি স্বল্পসংখ্যক রচনায় হইলেও ভাবচিত্র এবং বর্ণনায় উৎকর্ষ দেখাইয়াছেন। একে একে সেই সমুদয়ের উল্লেখ করা যাইতেছে।

এই যুগের শ্রেষ্ঠ পদকারদের মধ্যে গোবিন্দদাস অন্যতম। তাঁহার রচনায় জয়দেব এবং বিদ্যাপতির প্রভাব সুস্পষ্ট হইলেও তাঁহার কয়েকটি পদ বিশ্বসাহিত্যে স্থায়ী ভাণ্ডারে স্থান পাইবার যোগ্য। যেমন—সখিমুখে বৃক্ষের নিকট বাসকসজ্জিতা রাধিকার ব্যাকুলতা বর্ণনপ্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন :—

মাধব, বহুত মিনতি কহোয়া।
একলী নিকুঞ্জে বনী ভুলবহে আয় তুয়া
পন্থ নেহারত তেয়া।

তুঁহু অতি মন্থর গমন দুরন্তর
মঝু যামিনী অতি থোরি।
যো ঘর বাহির করত বিহরয়
নিমিখ মানয়ে যুগকোটি।

অথবা বিরহিণী রাধার পশ্চাত্তাপের চিত্রে রাধা যখন বলিতেছেন :—

যো মঝু চরণ পরশরসলালসে
লাখ বিনতি ফুকে গেল।
তাকর বরণন কিনে তনু ভায় ভায়
যহন পহন সব ভেল।

তাহাও কবিত্বে অতুলনীয়। আর নিম্নোদ্ধৃত বর্ষাকালীন অভিসার রজনীর চিত্রটি বেশ মনোরম। গোবিন্দদাস লিখিতেছেন :—

মন্দির বাহির কঠিন কপাট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট।
তাহি অতি দুরতর বাদল দোল।
বারি কি বারই নীল নিচোল।
...
ঘন ঘন ঝন ঝন বজর নিপাত।
শুনইতে শ্রবণ মরম জরি যাত।
দশদিশ দামিনী দহন বিথার।
হেরইতে উচকই লোচন তার।

বিরহিণী রাধিকার মুখ দিয়া গোবিন্দদাস যখন বলাইতেছেন :—

যাহা পহুঁ অরুণ চরণে চলি যাত।
তাঁহা তাঁহা ধরণী হইয়ে মঝু গাত।
যো সরোরুহে পহুঁ নিরিখি নিরিখি নাহ।
হাম তহি সলিল হোই তনি যাহ।

তখন তাহাতে রাধিকার যে গভীর অনুরাগ ব্যক্ত হইয়াছে তাহার তুলনা মেলা ভার। অপরা তাঁহার অন্য পদে রাধা যখন বলিতেছেন :—

সো মুখছবি যব মুকুরহি হেরি।
সো যমুনা জল নয়ন সমীর।
সো হিমকর হেরি লাগয়ে চন্দ।
কানু বিনে জীবন কেবল কলঙ্ক।

তাহাও অতি অপূর্ব। রসভাবগম্ভীর গোবিন্দদাসের রচনার পরেই জ্ঞানদাসের রচনা উল্লেখযোগ্য। তাঁহার একটি পদে রাধিকার নিদ্রাভঙ্গকালীন উক্তিতে আছে :—

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কাঁদে।
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বাঁধে।

এই পদে অনুরাগের যে গভীরতা ও তীব্রতা ব্যক্ত হইয়াছে, তাহার অনুরূপ কিছু সাহিত্যে বিরল। কৃষ্ণের প্রথম দর্শনের পর রাধিকার উক্তিতেও জ্ঞানদাস ভাবগম্ভীর বর্ণনা দিয়াছেন :—

রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল।
কত বা অমিয় মোর হইল অনুমান।
অধরে বিম্বে হিয়া কুরয়ে পরাণ।
চন্দন চাঁদের মাঝে মৃগমদ ধান্দা।
তার মাঝে হিয়ার পুতলী হৈল বান্ধা।

রাধিকার স্বপ্নদর্শনের যে চিত্র তিনি আঁকিয়াছেন, তাহাও অতি রসভাবে সমুজ্জ্বল। রাধা বলিতেছেন :—

রজনী শাঙন ঘন, ঘন দেয়া গরজন
রিমি ঝিমি শবদে বরিষে।
পালঙ্কে শয়ান রঙ্গে, বিগলিত চীর অঙ্গে
নিন্দ যাই মনের হরিষে।
শিথরে শিখণ্ড রোল মত্ত দাদুরী বোল
কোকিল কুহরে কুতুহলে।
ঝি ঝি ঝিনিকি বাজে ডাহুকী সে গরজে,
স্বপনে দেখিনু হেন কালে।

প্রেমবৈচিত্র্য বর্ণনায় যে ছবি জ্ঞানদাস আঁকিয়াছেন তাহাও চিত্তকে অতি সরলভাবে লক্ষিত স্পর্শ করে :—

আমার অঙ্গের বরণ লাগিয়া
পীতবাস পরে শ্যাম।
প্রাণের অধিক বাঁশের মুরলী
লইতে আমার নাম।
আমার অঙ্গের বরণ লাগিয়া
যখন যে দিকে চায়।
বাহু পসারিয়া বাঁচল হইয়া
তখন সে দিকে ধায়।

গোবিন্দদাস জ্ঞানদাসের পর যে পদাবলীকারের নাম করিতে হয়, তিনি হইতেছেন চণ্ডীদাস। ইনি কৃষ্ণকীর্তন-রচয়িতা চণ্ডীদাস হইতে পৃথক্ ব্যক্তি। লোকে ইঁহার পদ-মাধুর্যে মুগ্ধ হইয়া বহুকাল যাবৎ ইঁহাকেই চৈতন্য-পূর্ববর্তী চণ্ডীদাস মনে করিয়া আসিতেছিল, কিন্তু কৃষ্ণকীর্তনের আবিষ্কারের পর সে ভ্রম দূরীকৃত হইয়াছে। তাহা সত্ত্বেও এই দ্বিতীয় চণ্ডীদাসের সমাদর কখনও হইবে না। কারণ তাঁহার—

কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।

এলে বেলি খোঁপা নিসাড়ি নিসাড়ি
পরাণ সহিত মোর।

এবং —

ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন আপন কৈনু পর।

ইত্যাদি পদের রস ও ভাব বাঙ্গালী সাহিত্য-রসিক মাত্রেরই সুপরিচিত।

পদাবলী সাহিত্যে অনুসন্ধান করিলে এই শ্রেণীর রচনা আরও কিছু পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু সংখ্যার স্বল্পতা সত্ত্বেও এইরূপ উচ্চশ্রেণীর রচনা চৈতন্য-পরবর্তী যুগকে গৌরবে উদ্ভাসিত করিয়াছে। বাংলার কীর্তিকাব্য বর্তমান যুগে যে বিশ্বের দরবারে সমাদৃত হইয়াছে, তাহার নিঃসংশয়িত পূর্বাভাস এই পদাবলী-সাহিত্যে পাওয়া যায়। তাই, তিনজন পূর্ববর্তী কবির অনুকরণে এই যুগের মৌলিকতা ক্ষুণ্ণ হইলেও ইহার বিপুল সার্থকতা স্বীকার করিতেই হইবে। বসন্তের আম্রমুকুলের অধিকাংশই ঝরিয়া যায় এবং অল্পসংখ্যক মুকুলই আমরূপে পরিণত হইয়া রসাস্বাদনের সাহায্য করে। কিন্তু যাহারা ঝরিয়া যায় তাহাদের আবির্ভাব নিষ্ফল নহে। ঋতুলক্ষ্মীর পরিচ্ছদ ও প্রসাধনে তাহারা যে বর্ণ ও গন্ধের সমাবেশ করে, তাহাতেই তাহাদের অস্তিত্ব সার্থক। তেমনি পদকর্তাদের অনেকেরই রচনা স্থায়ী সাহিত্যের ভাণ্ডারে সঞ্চিত রাখিবার মত না হইলেও সাহিত্যের বসন্তযুগকে প্রাচুর্যের ও বৈচিত্র্যের শ্রীতে মণ্ডিত করিয়াই তাহারা সার্থক হইয়াছে।

নিতাই দাসের মেয়ে

—শ্রীকণা দত্ত

শাদা আর রাঙা শালুকফুলে ডোবাটার অর্দ্ধেকটাই ছাওয়া। পানিফল আর শুশনি শাকে বাকী অর্দ্ধেকটা। দূর থেকে হঠাৎ চেয়ে দেখলে মনে হয়, যেন, কটি সবুজ নরম গালিচাতে, কে মুঠো ভরে ছড়িয়ে দিয়েছে—একরাশ রাঙা আর শাদা ফুল। প্রচুর রসতা এবং ততোধিক দীর্ঘতায় অবনত হয়ে ঝুঁকে পড়েছে গোটাকয়েক নারকেল গাছ, ঠিক ঐ ডোবাটার পানেই। মনে তাদের ঐ পাতাঢাকা জলের বুকে, নিজেদেরই প্রতিবিম্ব দেখে নেবার আকাঙ্ক্ষা জেগেছে কি না, কে তা জানে?

কালবৈশাখীর ঝড়ে ভেঙ্গে পড়া গোটাকয়েক তালগাছের গুঁড়ি কেটে পর পর সাজিয়ে, গড়ে তোলা হয়েছে একটা ঘাট। অন্তঃপুরের মেয়েদের, সারাদিনের অর্দ্ধেক প্রায় সেখানেই কাটে; অত্যাবশ্যক বিবিধ প্রয়োজনের তাগিদে। নিতাই দাস—যার এই ডোবাটা—সে যে ইচ্ছে করলে বাঁধান ঘাট একটা না করতে পারত তা নয়। কিন্তু মেয়েদের, যারা কি না তার কাছে ঐ ডোবাটার চেয়েও অপ্রয়োজনের সামগ্রী, তাদের কোন সুখ-সুবিধার জন্য এতটুকু পয়সা বৃথা ব্যয় করতে সে রাজী নয়। যতদিন ঐ তালগাছের গুঁড়িগুলো, বৃষ্টিতে পচে না ভেঙ্গে পড়ে, ততদিন পর্য্যন্ত সে নিশ্চিন্ত মনে উদাসীন থাকবে, এই তার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

ঘরে পোষা এক পাল সাদা-কাল হাঁস, ঐ ঘন আবর্জ্জনার ভেতরেই কোন মতে করে নিয়েছে, নিজেদের বিচরণের যথোপযুক্ত ঠাঁই। তারই ভেতর কখনও ডুবে, কখনও ভেসে তাদের দিনের পর দিন কাটে। সন্ধ্যেবেলা নিজেরাই জল থেকে উঠে, গা ঝাড়তে ঝাড়তে সিক্ত দেহে গিয়ে ঢোকে নিজেদের নির্দ্দিষ্ট আশ্রয়টুকুতে। জানে, সেখানে মজুদ আছে কুঁড়ি আর জল দিয়ে মাখা ভাত একান্ত তাদেরই জন্য।

ডোবাটার ঠিক পাড়েই, আম বাগানের স্নিগ্ধ শীতল ছায়ায় নিতাই দাসের মাঠকোঠার বাড়ীখানা। রাঙচিতের গাছ কেটে কেটে বেড়া দেওয়া হয়েছে তার চারিদিকে। অজস্র নীল অপরাজিতা, রক্তরাঙ্গা তরুলতা, আর বিচিত্র বেগুনি রংএর ঝালর লাগান ঝুমকোলতায় বেড়াখানি ছেয়ে গেছে। অযত্নবর্দ্ধিত বুনো লতা, কারও তত্ত্বাবধানের প্রতীক্ষা রাখে না। আপনার মনে আপনিই বেড়ে চলেছে, অবকাশহীন দ্রুত কালের তালে তালে পা মেলে। কাল কিশোরী মেয়ের, শুভ্র নিষ্কলঙ্ক অন্তর শোভার মতই, নীল অপরাজিতাগুলির শুভ্র বুক, আর কুণ্ঠিত সলাজ দৃষ্টি। বাড়ীর চারিদিকের বাগানে, বৎসরের বেশীর ভাগ সময়ই কিছু না কিছু ফল মজুদ থাকে। বুড়ো নিতাই দাস, সমস্ত রাত অন্ধকারে প্রেতের মত ঘুরে ঘুরে সেই বাগান পাহারা দেয়। বাদুড় আর চোরের সাধ্য কি, নিতাই দাসের সেই জলন্ত জাগরিত সজাগ-দৃষ্টির এতটুকু কাছে এগোয়। কার জন্য যে এত সঞ্চয়ের আকণ্ঠ তৃষা, নিতাই তা নিজেই বোঝে না। তবু, স্বামী-স্ত্রী প্রাণপণে সঞ্চয় করে প্রতিটি বিন্দু, প্রতিটি ক্ষুদ্রতম তুচ্ছতম সামগ্রী। রাতের সীমাহীন অতল অন্ধকারে বারে বারে নিজের বাড়ীটার দিকে চেয়ে নিতাই দেখে নেয়।

তৃপ্ত শীর্ণ মুখখানি তার কি যেন এক অব্যক্ত হিংস্র আনন্দে ভরে উঠে। নীচ সে—অপরের অস্পৃশ্য না হলেও, বংশ-মর্য্যাদায় অনেক, অনেক নীচে তার স্থান তা সে জানে; তবু সে সুখী। অসহ্য গর্ব্বে বুকখানা তার ফুলে উঠে। তার পূর্ব্বতন তিন পুরুষ ধরে যে ধন সঞ্চয় করে গেছে, সে তার এতটুকু নষ্ট হতে দেয় নি, বরং প্রাণপণে খেটে সে আরও সঞ্চয় করেছে—তার দৈনিক প্রয়োজনের ঢের বেশী।

যে-চৌধুরীরা অজন্মার বছরে তাকে খুঁটির সঙ্গে পিছমোড়া করে বেঁধে রেখেছিল—অনিদ্রা-অনাহারে সারারাত, তাদের মত তিনটে চৌধুরীকে আজ নিতাই দাস এক সঙ্গে কিনে ফেলতে পারে। এমন ক্ষমতা আর এত অর্থ তার আছে।

রুপালি পাৎলা জ্যোৎস্না ঝরে ঝরে গলে পড়েছে, আমগাছের ফাঁকে ফাঁকে, তার বাড়ীর সাম্না অঙ্গনে। প্রশস্ত বাঁধান উঠানে, সারি সারি সাত আটটা নরাই বাঁধা। সম্বৎসরের মত ধান আর যাবতীয় খরিশস্য সেখানে সর্ব্বদাই মজুদ। বাড়ীর একপাশের প্রকাণ্ড খড়ো এক-খানা ঘরকে গোয়ালঘরে পরিণত করা হয়েছে। তাতে তিনটে গাইগরু, দুটো বলদ। সম্প্রতি বাছুরও হয়েছে একটা। দুটা বলদ মাঠে খাটে, আর এক জোড়া গাড়ীতে জুড়ে ভাড়ায় খাটান হয়। তা ছাড়া মুরগী, হাঁস, ছাগল এত বেশী বেড়ে গেছে যে, রাতের আঁধারে শেয়ালে দু'চারটে টেনে নিয়ে গেলেও ধরবার উপায় নেই।

চিরদিন ধরে মানুষ যা কামনা করে আসছে সবই নিতাইএর আছে, শুধু নেই—বংশে পুত্রসন্তান। একমাত্র মেয়ে সুলোচনার বিয়ে দিয়ে চিরকাল মামার অনুগ্রহের অন্নে প্রতিপালিত নীলবরণকে ঘরজামাই রূপে বরণ করে আনা হয়েছে। সুলোচনার বয়স তখন সাত আর নীলবরণের বার। তারপর কেটে গিয়েছে কত রৌদ্রদগ্ধ দীর্ঘ দিন আর কত স্নিগ্ধ রাত। সেদিনের শিশু স্বামী-স্ত্রী আজ কর্ম্মক্ষম, স্বাস্থ্য ও যৌবনের উচ্ছলতায় পরিপূর্ণ। আজ সুলোচনার কোলে সাত বৎসরের শিশুকন্যা হিরণ্ময়ী। আঙুলের ফাঁকে অনায়াসে গলে পড়া জলের মতই দিনগুলি কাটছিল অতি সহজেই। সংসারের খুঁটিনাটি ছোটবড় সব প্রয়োজনের দাবী মিটিয়ে হাতে অতি অল্প সময়ই থাকে, নীলবরণের প্রতি মন দেবার। তবু সকল কাজের ফাঁকে ফাঁকে সুলোচনা বারে বারেই কারণে অকারণে, নানা ছুতায় নীলবরণেরই কাছাকাছি ঘোরে। আজন্মের সাথী, এই লোকটার প্রতি ভালবাসার যেন তার অন্ত নাই। হোক সে ঘরজামাই! তার বাপের ঘরে প্রতিপালিত। তবু সুলোচনা আর পাঁচজনের মত নয়। নীলবরণকে সে শ্রদ্ধা করে, দেবতাজ্ঞানে পূজা করে আর সমস্ত প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। স্বামীর কর্ম্মক্লান্ত ঘর্ম্মাক্ত ললাটখানি সযত্নে আপনার আঁচলখানি দিয়ে মুছিয়ে বাতাস করে। তার পেশীবহুল সুপুষ্ট বক্ষ আর সবল কর্ম্মঠ বাহু দুটি বারে বারে প্রশংসমান নেত্রে চেয়ে চেয়ে দেখে, আর স্বামি-সৌভাগ্য অথবা স্বামিগর্ব্বে দারা অন্তর তার পুলকে আনন্দে ভরে যায়।

সেদিন কিন্তু নীলবরণ ক্ষেত থেকে আর ফেঁরে বাড়ী এল না; এল দুজন কৃষাণের কাঁধে ভর দিয়ে। হাঁটবার ক্ষমতা যেন তার ক্রমেই নিস্তেজ হয়ে আসছে। স্বামি-কল্যাণ মঙ্গল কামনায় সুলোচনা তখন দুয়ারে জল ছিটিয়ে তুলসী তলায় প্রদীপখানি রেখে, জীবন-দেবতাকে প্রাণের প্রণাম জানাচ্ছে।

স্বামীকে অসময়ে শুয়ে পড়তে দেখে, উদ্বিগ্ন মুখে কাছে এল। সে সমর্থ দেহ আজ যেন কি এক অজানা আশঙ্কায়, কি এক দারুণ নৈরাশ্যে ভেঙ্গে পড়েছে। অনেক দূর থেকে যেন শুধু কথার রেশটুকু ভেসে আসছে, এমন ক্ষীণ স্বরে নীলবরণ বলল—

"পা দু'খানি ক্রমেই যেন কেমন অবশ হয়ে আসছে রে পাগলি, কি হল কে জানে?"

যেন সূর্য্যাস্তের শেষ রশ্মিটুকুর মতই ক্লান্ত অস্ফুট স্বর দিনান্তের কোলাহলময় ধরণীর সীমাপ্রান্তে কেঁদে আছড়ে পড়ল। আলোর পৃথিবী থেকে চির-অন্ধকারের দেশে যার যারা, সেই মুমূর্ষু অভাগাদের কণ্ঠ হতেও জীবনযন্ত্রের শেষ আহুতি-মুহূর্ত্তে এমনি করুণ সর্ব্বহারানোর বেদনাময় আকুতি, এমনি অস্ফুট ব্যর্থ আর্ত্তনাদ শোনা যায়।

কিন্তু মৃত্যুই মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনা নয়! তার চেয়েও বড় দুর্ঘটনা আছে। তা জীবন্মৃত হয়ে বেঁচে থাকা। নীলবরণের অদৃষ্টেও তাই ঘটল শেষ পর্য্যন্ত। নিতাই দাস জামাই-এর জন্য যথেষ্ট অর্থ খরচ করে সহর থেকে বড় বড় ডাক্তার আনাল পর্য্যন্ত, কিন্তু সকলেই একবাক্যে পরামর্শ দিলেন, সহরের সরকারী হাসপাতালে বন্দোবস্ত করতে।

সুলোচনার চোখের জলের মিনতিকে অগ্রাহ্য করে নীলবরণকে একদিন হাসপাতালেই স্থানান্তরিত করা হল।

নারীর চোখের জল নারীর মতই তুচ্ছ অবহেলার সামগ্রী। সে মেয়েরই হোক্, আর স্ত্রীরই হোক্। নিতাই দাসের কাছে তার নিজের মতামতই সবচেয়ে দামী জিনিষ। আর কারও কোন সুখদুঃখের এতটুকু

মূল্য সে দেবে না। তিনমাস অক্লান্ত ব্যর্থ চেষ্টায়, ডাক্তাররাও শেষ পর্য্যন্ত হতাশ হয়ে পড়লেন। নীলবরণের বাড়ী যাবার হুকুমনামা এল হাসপাতালের কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে। নিতাই দাসের বাড়ীতে খবর এল।

এবার আর সুলোচনা কারুর কথা মানবে না। চিরণকে, তার মা ত্রিগুণার কাছে দিয়ে, দৃঢ় কণ্ঠে বলল—

"বাবার সঙ্গে, ওকে আমিই আনতে চললুম মা, ভজাকাকাও যাবে।"

ত্রিগুণা অবাক্ বিস্ময়ে মেয়ের তৈলসিক্ত কপাল খানার উপর প্রকাণ্ড বেটেসিন্দূরের পাটকিলে রংএর কোঁটা, আর সিঁথিতে মোটা করে লেপে দেওয়া সিন্দূর-রেখার দিকে চেয়ে রইল। অর্দ্ধমৃত স্বামীকে ফিরিয়ে আনবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যেন সেখানেই আজন্যমান।

ত্রিগুণাকে নির্ব্বাক্ দেখে, সুলোচনা আবার বলল—

"রোগা মানুষ, একটু যত্নআত্তি না করে আনলে চলবে কেন মা? বাবা, ভজকাকা ওরা পুরুষ মানুষ, ওরা ঠিকমত পারবে কেন?"

ত্রিগুণার মুখে এবার যেন প্রথম কথা ফুটল, এমনি বিস্ময়ে আপ্লুত সে স্বর—"তবু তোর যাওয়া হয় না, সুলো, সরকারী দাওয়াইখানা, বিস্তর লোকের মেলা সেখানে। আমাদের ছোটলোকের ঘরে ওতে নিলে হয় মা।"

কিন্তু সুলোচনা সে বারণ মানবে না। নাকে পর্য্যন্ত মাথার কাপড়খানি টেনে, সে সোজা গিয়ে গরুর গাড়ীতে উঠে বসল। নিতাই দাসের হাজার অনুরোধেও গাড়ী থেকে সে কিছুতেই নামবে না। অগত্যা গ্রামের ধূলিধূসরিত কাদা আর অসংস্কৃত মেঠো পথ ভেঙ্গে, গরুর গাড়ীখানি সদর হাসপাতালের প্রকাণ্ড ফটকে এসে শেষ পর্য্যন্ত থামল।

হাসপাতালের জমাদারেরা কয়েকজনে ধরাধরি করে নীলবরণকে গাড়ীতে এনে বসিয়ে দিয়ে গেল। ডাক্তারদের সম্মিলিত পরিশ্রম, নীলবরণের শরীরের উপরার্দ্ধকে এই আকস্মিক মরার হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে সত্য, কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। হাঁটু পর্য্যন্ত পা দু'টী তার একেবারে পঙ্গু, চলচ্ছক্তিহীন। সরকারী ডাক্তারবাবু গাড়ী পর্য্যন্ত এগিয়ে এলেন। লোক তিনি মন্দ নন। সুলোচনার মৃতের ন্যায় পাণ্ডুর বিবর্ণ মুখখানি আর পাথর মত অব্যক্ত যন্ত্রণামাখান আহত মৌন দৃষ্টি, তাঁর মনের কোন্ সে সূক্ষ্মতম কোমল তন্ত্রীতে আঘাত করল, কে জানে? তাড়াতাড়ি ফিরে গিয়ে, লুকিয়ে, একশিশি দামী মালিশ এনে তিনি সুলোচনার হাতে দিলেন। আশ্বাসমাখান কোমল স্বরে বললেন,—"এটা রোজ বেশ করে নীলবরণের পায়ে মালিশ করে দিও মা, ভাল হলেও হতে পারে। অনেকেই ত ভাল হয়ে যায় দেখেছি।" মুখে এ কথা তিনি বললেন বটে, কিন্তু সেকথা যে কত মিথ্যে তা শুধু তিনিই জানেন, আর জানেন তাঁর অন্তর্য্যামী।

সুলোচনার কাপসা কুয়াশাম্লান দৃষ্টি যেন অকস্মাৎ ঈষৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ডাক্তারের মুখেও তৃপ্ত প্রসন্নহাসি।

পরের দ্রব্য অপহরণ করে আর মিথ্যা কথা বলেও যে এই অভাগিনী নারীর ব্যর্থ তরুণ জীবনে তিনি সামান্য ক'টী দিনের জন্যও একটু সান্ত্বনা, একটু আশার আনন্দ এনে দিতে সক্ষম হয়েছেন, এইত তাঁর অনেক পাওয়া। তিনি জানেন অন্তর্য্যামী এ ছলনায় ক্রুদ্ধ হবেন না। জীবনদেবতা তাঁর এ চৌর্য্যবৃত্তি ক্ষমা করবেন।

নিতাই আর ভজহরি ধরাধরি করে নীলবরণকে গাড়ী থেকে নামাল। ত্রিগুণা জামাইয়ের অবস্থা দেখে চোখে আঁচল চাপা দিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠল। অদূরে দাড়ান সুলোচনার শিশুকন্যাটীও অকারণে ভয় পেয়ে চমকে কেঁদে উঠল। কিন্তু সুলোচনার দৃষ্টি নিথর নিষ্কম্প। আঁচলের তলায় ঢাকা তার মৃতসঞ্জীবনী সুধা। সতী সে। সাত বছর বয়স থেকে আজ এই পচিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত একমনে সে নীলবরণকেই ভালবেসেছে, পূজো করেছে। তার অপটু অক্ষম জীবন্মৃত স্বামীকে সে বাঁচিয়ে তুলবে; তার শ্রদ্ধায় তার সেবাযত্নে। আকাশে তেত্রিশকোটী দেবতার প্রতি, তার অখণ্ড বিশ্বাসে, অন্ধ ভক্তিতে দৃঢ় মুষ্টিতে প্রাণপণে সে চেপে ধরল হাতের শিশিটাকে; পিতার সখেদ আক্ষেপ, মায়ের অঝোর কান্না, মেয়ের অফুরন্ত আর্ত্তনাদ, কিছুই যেন আজ সুলোচনার তপস্যাকে

পারবে না টলাতে। সেই নিষ্ঠুর মহাদেবের জন্য তপঃক্লিষ্টা গৌরীর ঐকান্তিক তপস্যার তেজ যেন আজ নিতাই দাসের মেয়ে সুলোচনার চোখে জেগেছে।

কোন কিছুই আজ তার সে নির্বাক ধ্যানকে ভাঙ্গাতে পারবে না; যতক্ষণ পর্য্যন্ত চোখে তার জেগে আছে, স্বয়ং দেবতার বরাভয় মাখান প্রসন্ন হাসির আশ্বাস; আর হাতে আছে তার জীবন্মৃতকে উজ্জীবিত করে তুলবার, অমৃত-সুধা।

• •

ডোবাটার আশেপাশের বনবাদাড়গুলো ফণীমনসার ফুলে ভরে গেছে। বাড়ীর চারিদিকে বুনো আশশ্যাওড়া, আর কালকাসুন্দীর হলুদ ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে। কুরুচি আর দেঁটুফুলের উগ্র গন্ধে দখিন হাওয়া ভরপুর।

আকন্দের গাছগুলোয় অজস্র বেগুনে-সাদা ফুল—ডাঙ্গা ডালগুলো থেকে তাদের কোঁটা কোঁটা ক্ষীরের মত আঠা ঝরে ঝরে পড়ছে। কাগজিলেবু গাছেও ফুল ধরেছে। শ্যাম সবুজ পাতার বুকে ছোট্ট ছোট্ট শাদা ফুল। অন্দরমহলের প্রশস্ত উঠানটীতে তখন ত্রিগুণা, কৃষাণদের দিয়ে, গোলাগুলো ভরে সিদ্ধধানগুলো, তুলে রাখবার ব্যবস্থা করছিল। সম্প্রতি দাত বৎসরের মেয়ে হিরণীর বিয়ে দিয়ে সুলোচনা গৌরীদানের দায় থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে। তের বছরের নাতজামাই অটল, ত্রিগুণাকে সাহায্য করছে তার কাজে। ত্রিগুণাও নিতাই দাসের যোগ্য সহধর্ম্মিনী। প্রাণ থাকতে এতটুকু জিনিষ সে কাউকে ছুঁতে দেবে না। এই একটি নারী, যাকে বিধাতা তার শ্রেষ্ঠ দানগুলি নিঃশেষে উজাড় করে দিয়েও, প্রতিদানে একফোঁটা কৃতজ্ঞতা কোন দিন পান নি। ত্রিগুণা তখনও প্রাণপণে বকে চলেছে, আমনধান এবার যথেষ্ট হয়নি কেন? সরষে অড়হরই বা এত কম হল কি করে? শাকসব্জীর অর্দ্ধেকের বেশীই ত পাঁচভূতে লুটে খেল। তারও যেমন অদৃষ্ট! নইলে একচোখো দেবতারা, একটা ছেলেই বা দিল না কেন তাকে, যে কি না দরদ দিয়ে অন্ততঃ জমিজায়গাগুলো দেখাশুনো করত। আক্ষেপের তার আর বিরাম নেই, পূর্ণচ্ছেদ নেই।

অদূরে চণ্ডীমণ্ডপের উঁচু দালানটিতে বসে নীলবরণ একমনে তখন ঘরের কুসুমবাঁচি আর মটর ছোলা দিয়ে ভাজা মুড়ি, আর ঘরেরই তিরেনে তৈরী গুড় সহযোগে, সকালবেলার জলযোগটা সম্পন্ন করে নিচ্ছিল। সুলোচনা এদিক ওদিক চেয়ে দেখে চট্ করে তার আঁচলের তলা থেকে দুখানা বাসী জিলিপী বার করে স্বামীর বাটীতে ফেলে দিল। মায়ের বাক্স থেকে চুরি করা পয়সায় কেনা এ দুটী। ত্রিগুণা দেখতে পেলে আজ আর মেয়েকে আস্ত রাখবে না। অনর্থক পয়সা খরচ করা সে কোনমতেই সইতে পারে না, তা সে মেয়েই করুক আর যেই করুক।

জিলিপী দুটো দেখে নীলবরণের শীর্ণ মুখশ্রী উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আনন্দ-বিকশিত হাসিতে মুখখানা ভরে সে সুলোচনার পানে চাইল। সুলোচনা তখন সেখান থেকে সরে গেছে। আজ আর মুহূর্ত্তের জন্যও তার দাঁড়াবার অবসর নাই। ঘোষেদের বাড়ী আজ বিয়ে। সম্প্রদানের পিঁড়ী আর ঘরের মেঝেতে আল্পনা এঁকে দেবার জন্য গিন্নী তাকেই বিশেষ করে ডেকে পাঠিয়েছেন।

গোয়াল ঘরের পাশে গোয়ালা তখন বাছুরটাকে দূরে নীচু একটা পেয়ারা গাছের ডালে বেঁধে রেখে দুধ দুইবার বন্দোবস্ত করছিল। নিজের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত অশান্ত জীবটিকে হিরণী গায়ে-গলায় হাত বুলিয়ে আদর করছিল।

সুলোচনা মেয়েকে ডাকতে গিয়ে দেখল শাদা দুধের ফেনা, বালতিটা থেকে উপচে পড়বার উপক্রম করছে।

"ছিপতি কাকা, বাড়ীর জন্য আধসেরটাক দুধ রেখে বাকীটা ঘোষেদের বাড়ী পৌঁছে দিও, ওরা বলে রেখেছে।" কর্ম্মব্যস্ত ত্রিগুণার কাণেও কথাকয়টি পৌঁছিল। সেখান থেকে প্রাণপণে চীৎকার করে সে বলে উঠল—

"আর সঙ্গে সঙ্গে দামটাও চেয়ে নিও ভাই।" সুলোচনার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীপতিও হাসল, হিরণীও। এই অর্থলোভী নারীটিকে সকলেই যেন মনে মনে একটু অনুকম্পার দৃষ্টিতে দেখে। সুলোচনা হিরণীকে ডেকে নিয়ে ঘাটে চলল। মেয়ের রঙীন ডুরে শাড়ীটির এক প্রান্ত

মাটীতে লুটাচ্ছে। মাথার চুলগুলি রুক্ষ, তেলের সংস্পর্শ রহিত।

সুলোচনা আঁচল থেকে সযত্নে এক টুকরা সুগন্ধি সাবান বার করে মেয়েকে মাখাল, নিজেও একটু মাখল। তেলের বাটী থেকে অনেক করে তেল নিয়ে মেয়ের মাথায় মাখাল। দু'জনে যখন ডুব দিয়ে বাড়ী ফিরল, সারা উঠান তখন রোদে রোদে ছেয়ে গেছে। হিরণ্ময়ীকে কাপড় ছাড়তে পাঠিয়ে সে নিজের ঘরে ঢুকল।

নীলবরণ তখন বসে বসে বেতের টুকরী আর মোড়া বুনছে। সুলোচনাকে ঘরে ঢুকতে দেখেই রুক্ষ স্বরে প্রশ্ন করল, "এত বেলা অবধি ঘাটে কি করা হচ্ছিল

স্বামীর প্রশ্নের বাঁকা ধরণে সুলোচনা মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠল। অক্ষম, উত্থানশক্তি-রহিত নীলবরণ, নিজের জীবনের কুৎসিত অসহায় অবস্থার পর থেকে সুলোচনাকে কোন কাজে একটু বেশীক্ষণ দূরে থাকতে দেখলেই, নিষ্ফল আক্রোশে জ্বলতে থাকে। সজীব প্রাণের সতেজ উচ্ছলতার দিকে, তার রোগক্লান্ত অকর্মণ্য ব্যর্থ জীবন যেন ঈর্ষার চোখে চেয়ে থাকে। সুলোচনার প্রতিটি মুহূর্তের ছোট খাট হাসি, কথা আর অকারণ চঞ্চলতাকে সে আজকাল রীতিমত ঘৃণা করে, সন্দেহ করে। স্বামী যার অকালবার্দ্ধক্যে জরাগ্রস্ত, চির-শয্যাশায়ী, সে নারী যে হেসে দু'টো কথা কারুর সাথে বলবে, তার এই অসহায় স্থবির জীবনে সে তা যেন কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। যৌবনের প্রতি বার্দ্ধক্যের, শৈশবের প্রতি যৌবনেরও এই চির বুভুক্ষা। জীবনের প্রতিটি ক্ষুদ্রতম অনুভূতির পানে চেয়ে আছে মূহা তৃষাতুর নেত্রে। যে মুহূর্ত্তে একটী পরিপূর্ণ সুখী নিরবচ্ছিন্ন শান্তিভরা তৃপ্ত জীবনস্রোত লীন হয়ে মিশে যাবে তার ক্ষুধার্ত অতৃপ্ত স্রোতে,—সেই পরক্ষণে ফুটে উঠবে তার মুখে, পাণ্ডুর বিবর্ণ প্রেত-হাসি। চির আকাঙ্ক্ষার ঐ জীবনটিকে প্রাণপণ শক্তিতে সে আপনার হিমশীতল বুকে আঁকড়ে ধরবে। ম্লান, নিষ্প্রভ চোখে ফুটে উঠবে তখন উজ্জ্বল মধুর তৃপ্ত হাসি।

আকস্মিক প্রশ্নে বিপর্য্যস্ত সুলোচনা কোন মতে নীলবরণকে জানাল যে, সে আর হিরণ্ময়ী ঘোষেদের বাড়ী

নীলবরণের রাগ যেন আরও এক মাত্রা বেড়ে

"সবাই মিলে সেজেগুজে তো চললি, আর আমি যে ঘর আগলাতে পড়ে থাকব, কে আমায় খেতে দেবে শুনি?" যেন সে যে বাড়ী পড়ে থাকবে এতে সুলোচনারই দোষ সব চেয়ে বেশী। গলার স্বরটাকে আরও একটু নামিয়ে দিয়ে সুলোচনা বললে—

"মা, চোরের ভয়ে বাড়ী ছেড়ে এক পা কোথাও নড়বে না, বাবাও বাগানে ঘুরবে। মাকে আমি সব বুঝিয়ে যাব গো।"

সুলোচনা কাপড় পরতে চলে গেল। যে অকারণে অসন্তুষ্ট হয়, তাকে সন্তুষ্ট করা জীবনে সব চেয়ে কঠিন কাজ। ভিজে কাপড়খানা ছেড়ে রেখে বারোদোলের মেলা থেকে কিনে আনা, মুগা সুতোর চৌঘুরী ডুরে শাড়ীখানা আর লেস-বসান গোলাপী একখানা সেমিজ পরে ভিজে চুলগুলোর প্রান্তভাগে একটা গিট দিয়ে, মাথায় সিন্দুর রেখাটাকে আরও একটু মোটা করে দিল। যাবে দু' চারখানা যা তোলা গয়না ছিল তাও পরে নিল।

হিরণ্ময়ীর ততক্ষণে কাপড় পরা হয়ে গেছে। সুলোচনা মায়ের হাতবাক্স থেকে হিরণ্ময়ীর গয়নাগুলো বের করে পরিয়ে দিল মেয়েকে। নিজের কৌটা থেকে গোলা সিন্দুর খানিকটা বেশ করে কপাল, সিঁথি, আর হাতের গোছাখানেক মোয়ায় দিল লেপে। সুলোচনার পায়ের ধুলো নিল হিরণ্ময়ী। মনে মনে সুলোচনা মেয়েকে আশীর্বাদ করল, "সুস্থ সবল সোয়ামী নিয়ে সুখী হও মা। আমার মত ভাঙ্গা কপাল যেন তোমার না হয়।" কি একটা কাজের অজুহাতে ত্রিগুণা যেন সেদিকে এল। মেয়ে আর নাতনীর গা ভরা গয়না দেখে তার চক্ষু স্থির। তীক্ষ্ণ স্বরে মেয়েকে আক্রমণ করল—

"হাঁ রে সুলি, কেমন তোর আক্কেল বল্ ত? ওই কচি মেয়ের গায়ে অত গয়না চাপালি? দৈবে একটা যদি খোয়াই যায়?"

"যাবে ত আমারই যাবে মা, তোমার কাছে কখনও চাইব না, এ বলে দিলুম আমি।"

ক্রোধ ও বিস্ময়ে আপ্লুত চিত্তখানি গ্রাহ্য না করেই সুলোচনা মেয়ের হাত ধরে খিড়কী দরজার দিকে রওনা হল। ঘটনাকে সে এড়াতে চায়। হোক্ সে সধবা, তবু ভাল কাপড়-জামা পরে জামাইএর সামনে ঘুরে বেড়াতে যেন কেমন তার একটা বিশ্রী সঙ্কোচ লাগে। তা ছাড়া নীলবরণের কটুক্তিকেও সে মনে মনে ভয় করে।

ঘোষেদের বাড়ী যখন মা ও মেয়ে গিয়ে পৌছল বেলা তখন আর নেই। অজস্র দামী রঙীন সব কাপড়ে হালফ্যাশনের জড়োয়া মণি-মুক্তার গয়নায় আর সেন্টের উগ্র সৌরভে সে বাড়ীর আবহাওয়া ক্রমেই ভারী হয়ে উঠেছে। কিন্তু এ সবের চেয়ে, মুখরোচক খাদ্যসামগ্রীর গন্ধই সুলোচনাকে বেশী আকৃষ্ট করল যেন। কিন্তু তা নিজের জন্য নয়, একান্ত করে তার অসহায় লোভী স্বামী নীলবরণের জন্য।

বিয়ে-বাড়ীর হাঙ্গামা যখন চুকল, রাত তখন অনেক। কনের দিদি মধুমালতী হিরণীকে আগেই খাইয়ে দিয়েছিল, সুলোচনা কিন্তু কিছুতেই সেখানে বসে খেতে রাজী হল না। মধুমালতী অগত্যা একটা পরিষ্কার কাপড়ে দুজনের উপযোগী মিষ্টান্ন বেঁধে তার হাতে দিল। ঘুমে হিরণীর দুটি চোখ বুজে আসতে চায়। তাদেরই পাড়ার আর একটি মেয়ের সঙ্গে সুলোচনা হিরণীর হাত ধরে টান্‌তে টান্‌তে বাড়ী ফিরল।

কৃষ্ণ পক্ষের আঁধার রাত নয়, শুক্ল পক্ষের জ্যোৎস্না-ঝরানো নিশা। তবু শুক্‌নো বনপাতার মৃদু মর্ম্মর আর নিশাচর পাখীদের অকারণ ডানার ছটফটানিতে সুলোচনার গা শিউরে উঠল।

আবছা আলো-ছাওয়া বাগানটিতে সঙ্গীহীন প্রেতের মত নিতাই দাস একাই ঘুরে বেড়াচ্ছে। সুলোচনাকে দেখেই সে কাছে এল। কর্কশ কণ্ঠে বলল—"এত গয়নাগাটী পরে এই গভীর রাতে কি না ফিরলেই চলত না? যা বাড়ী যা, জামাই রাগ করে না খেয়েই শুয়ে পড়েছে।"

নিতাই আবার একাই লাঠিখানা ঠক্ ঠক্ করে ঘুরে বেড়াতে সুরু করল।

হিরণীকে তার শোবার ঘরে পাঠিয়ে সুলোচনা তাক থেকে সন্তর্পণে মালিশের তেলের শিশিটা পাড়ল। তার পর ধীরপদে নিজের ঘরের দিকে চলল। ঘরের কোণে স্তূপীকৃত অড়হর ওড় করা। ইঁদুরের উৎপাতে নীলবরণ মাঝে মাঝে হাতের বাঁশের লাঠিটা ঠক্ ঠক্ করে। ক্ষুদ্র প্রাণী, ততোধিক ক্ষুদ্র প্রাণটুকু নিয়ে সশঙ্কচিত্তে চঞ্চল চরণে ছুটে পালায়।

ঘরে ঢুকতেই একটা বিশ্রী তীব্র গন্ধে সুলোচনা নাকে কাপড় চাপা দিল। এ উৎকট গন্ধের সাথে তার পরিচয় আছে। তার অবর্ত্তমানে কোন কৃষাণের হাতে পায়ে ধরে নীলবরণ তাড়ী আনিয়ে পেট পুরে খেয়েছে।

সুলোচনা আস্তে আস্তে খাটের পাশে তার হাতের নেকড়ার পুঁটুলীটা রাখল। কোণের কেরোসিনের ডিবার মৃদু আলোয় দেখল তখনও নীলবরণ ঘুমায় নি। নেশার ঘোরে অর্দ্ধ-আচ্ছন্নের মত চোখ দুটি নিমীলিত করে পড়ে আছে মাত্র। অকস্মাৎ ঘরের ভিতর মানুষের শব্দ পেয়ে চোখ মেলে সুলোচনাকে দেখেই বুঝি নেশাটা তার মাথায় চড়ে গেল। হাতের পাকা বাঁশের লাঠিটাকে মুহূর্ত্তের মধ্যে সুলোচনার মাথায় দিল বসিয়ে। মাতালের অপ্রকৃতিস্থ হাতের মার, তবু কপালের কোণ কেটে ঝিন্‌ঝি দিয়ে উষ্ণ রক্তের ধারা ছুটল। নীলবরণ হাতের লাঠিটাকে আছড়ে ফেলে, তখনও অস্ফুট জড়িত কণ্ঠে বলে চলেছে—

"কোন্ ঠাঁইএ থাকা হয়েছেলো, শুনি? বাড়ীতে, খোঁড়া সোয়ামী তোর, রাত উপোস করে পড়ে আছে, আর তুই কি না রাতের অর্দ্ধেক পহর পর্য্যন্ত পরের বাড়ী বসে বসে ফুর্ত্তি করবি! ঘরে থাকতে মন লাগে না, নয়?"

পরণের শাড়ীর আঁচলখানা কপালে চেপে, সুলোচনা তখন নিষ্পলকে তার দানবের মেজেয়, টুক্‌রো টুক্‌রো শিশিটার পানে চেয়ে আছে। নীলবরণের মারকে সে গ্রাহ্যই করে না। তার সাত বৎসর বয়স থেকে এই এতখানি বয়স পর্য্যন্ত, সে যে কতবার নীলবরণের হাতে মার খেয়েছে, তার সংখ্যা নির্দ্ধারণ করা কষ্টসাধ্য। ঐ যে তার সুমুখে ভাঙ্গা শিশিটা থেকে মাটিতে পড়ে গেল সমস্ত সঞ্জীবনী সুধাটুকু। এ দুঃখ যে রাখবে

কোথায়? প্রতিদিন সে দেবতার চরণে নিয়মিত মাথা নত করেছে, এই ওষুধেই যাতে তার স্বামী সম্পূর্ণ নীরোগ হয়ে যায়। অজ্ঞ, মূর্খ, অশিক্ষিতা নারী অন্ধ-বিশ্বাসে প্রতিটি দিন আশা করেছে, একমাত্র এরই প্রভাবে সে স্বামীকে বাঁচিয়ে তুলতে সমর্থ হবে কর্ম্মময় জীবনে। সে আশার আজ হল চির অবসান। অবলুপ্ত হল সে বিশ্বাসের স্থৈর্য্য। শারীরিক যন্ত্রণার চেয়ে এই হতাশার বেদনা শতগুণ বেশী আঘাত করল তাকে; সুলোচনার সারা শরীরে, প্রতিটি রক্তবিন্দুতে যেন দুঃসহ তীব্র জ্বালাময় অনুভূতি। সীমাহীন অনন্ত আকাশের অপার পরিধির মত নিঃসঙ্গ ভয়াবহ শূন্যতা যেন ক্রমেই সুলোচনাকে গ্রাস করতে আসছে। এতদিনকার আশাকে ক্ষণভঙ্গুর কাচের বাসনের মতই অতি সহজেই চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যেতে দেখার আঘাতে, সুলোচনার শরীর মন, দুই-ই যেন, অকস্মাৎ, ভুঁয়ে বেঙ্গে পড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে চায়। আকস্মিক অবসাদে, একেবারে নিঃশেষে শেষ হয়ে যাবার দুর্নিবার আকুতিময় আকাঙ্ক্ষা জাগল তার প্রাণে। অগাধ নীলিমা হতে জ্বলন্ত একটি তারা খসে পড়ল সুলোচনার মৃত্যুব্যথা-জর্জ্জরিত মুখের পানে চেয়ে।

স্বামীর ঐ পঙ্গু পা দুইখানিতে শক্তি আনবার জন্য কি সাধনাই না সে করেছে এ ক'দিনে। চিরবন্দী ও নির্জ্জন অন্ধকার কারাগৃহে বসে এতটুকু আলোর জন্য এত উৎকণ্ঠা, এত মিনতি করে না। সবই হয়েছে তার ব্যর্থ। ঐ জীবন্মৃতকে শক্তি আর জীবনে জাগিয়ে তুলবার কোন সম্বলই আর তার রইল না।

ভোরের আলো ভাল করে ফুটতে না ফুটতেই, ঘোষগিন্নী বড় মেয়ে মধুমালতীকে পাঠিয়ে দিলেন সুলোচনাকে ডেকে আনতে।

রাত্রিজাগরণক্লান্ত নিতাই তখন চণ্ডীমণ্ডপের খাটিয়া-খানায় আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে অঘোরে ঘুমাচ্ছে। ত্রিগুণা, ঘরদরজায় গোবর জল ছিটিয়ে, হাঁসমুরগীগুলোকে ছেড়ে দেবার উদ্যোগ করছে।

মাধুমালতী তাকে গ্রাহ্যই করল না। বাড়ীতে তাদের বিস্তর কাজ পড়ে আছে। একমাত্র সুলোচনাকে তার বিশেষ প্রয়োজন, তাই ভোর না হতেই সে ছুটে এসেছে তার কাছে। স্তম্ভিত, উৎসাহিত ত্রিগুণাকে ফেলে রেখেই, সোজা সে সুলোচনার ঘরের দিকে এগোল। সুলোচনার ঘরের আনকাঠের দরজাখানা সম্পূর্ণই উন্মুক্ত।

রক্তাক্ত চোখ দু'টি অতিকষ্টে কোনমতে খুলে নীল-বরণ তখন তাদেরই বাড়ী থেকে আনা খাবারের পুঁটলীটি খুলে গোগ্রাসে খেয়ে যাচ্ছে একমনে। আর সুলোচনা, মেঝে থেকে নিঃশেষে মালিশের তেলটুকু মুছে নিয়ে, ঘুমভরা চোখে প্রাণপণে মালিশ করে চলেছে। তার কপালের খানিকটায় গাঢ় নীল আর বেগুনে কালশিরা পড়ে ফুলে উঠেছে। শুকনো কালো রক্ত তার আশে পাশে জমাট হয়ে জবে আছে। মধুমালতী সে বীভৎস দৃশ্যে নিজের মনেই শিউরে উঠল। সুলোচনাকে তার আর ডাকা হোল না। নীরবে চিন্তিত মুখে সে নিজেদের বাড়ীর পথে ফিরে চলল। নিতাই দাসের বাগান পেরিয়ে যাবার সময় হঠাৎ তার নজরে পড়ল গোটা-কয়েক বাতাবিলেবু, গাছের চারিদিক কাঁটার বেড়া দিয়ে ঘেরা। মানুষের সতৃষ্ণ দৃষ্টির গোপন আক্রমণ থেকে ফলগুলিকে সযত্নে বাঁচাবার প্রয়াস। শুকনো সুচের মত তীক্ষ্ণ কাঁটার বেড়া, তবু তাকেই আশ্রয় করে পরম নির্ভরতায় জড়িয়ে উঠবার চেষ্টা করছে, কতকগুলা নাম-না-জানা বুনো লতা। মধুমালতীর মনে হল, ওরা যেন ঠিক ঐ নিতাই দাসের মেয়ে সুলোচনারই প্রতীক। ভালবাসা পায় না, তবু ভাল বাসে, অবহেলা, লাঞ্ছনা আর অকারণ কটূক্তি লাভ করে। তবু ভক্তি করে—করে শ্রদ্ধা আর পূজা। প্রতিদানে কিছু পেল বা না পেল, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই; শুধু নিজের সব স্বত্বটুকু নিঃশেষে বিলিয়েই চিরসুখী। দুঃখে ধাঁধা অনেক আড়ম্বরে এদের প্রেম হারিয়ে যায় না। সহ্যে আর সেবায়, ধৈর্য্য আর স্নেহের প্রতিটি ক্ষুদ্র নিদর্শনে, এদের প্রেম শুভ্র হীরকখণ্ডের মতই দুঃখের আঁধারে জ্বলজ্বল্ করে জ্বলতে থাকে—চিরদিন, চিরকাল।

পরশুরামকুণ্ড-স্নান

—স্বামী ভূমানন্দ

ব্রহ্মপুত্রের তীরে, ভুবনেশ্বরী পাহাড়ের পাশে; সমতল হইতে প্রায় ৪০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত। স্থানটী বেশ স্বাস্থ্যকর, কিন্তু তথাপি বর্ষাকালে ম্যালেরিয়ার হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া দুঃসাধ্য, অসাধ্য বলিলেই হয়। সেবার দুর্গাপূজার পরই জ্বরে পড়িলাম। ডাক্তারী চিকিৎসায় জ্বর ছাড়িয়া গেল বটে, কিন্তু শরীরের দুর্ব্বলতাটা গেল না। বন্ধুবান্ধবদিগের মধ্যে কেহ বলিলেন, একটু 'চেঞ্জ' দরকার; কেহ বলিলেন, স্বাস্থ্যপরিবর্ত্তন প্রয়োজন; কেহ বা বলিলেন, একবার হাওয়া বদলাইতে যাওয়া ভাল। কিন্তু যাই কোথায় ঠিক করিতে পারিলাম না। কেহ শিলং যাইতে বলিলেন; কেহ সটান পশ্চিম যাইতে পরামর্শ দিলেন, কারণ hill station-এ এখন ক্রমেই শীত বাড়িবে। মীরাট যাওয়ার জন্যও কথা-বার্ত্তা এবং পত্র ব্যবহার পূর্ব্ব হইতেই চলিতেছিল। সব দিক্ বিবেচনা করিয়া, "অনেক চিন্তার পর করিলাম স্থির" ডিব্রুগড় যাইব।

শুনিলাম ওদিকে জ্বানক শীত। কাজেই লেপ, রাগ মোটা কম্বল প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য তৈয়ারী হইল। কাঁচা, পাকা দুইটি বিছানার বাণ্ডিল প্রস্তুত হইল। কাঁচা বাণ্ডিলে থাকিল, একখানা পাতলা কম্বল, একখানা বিছানার চাদর, একটা বালিশ ও একখানা খারোয়ালের মোটা রাগ। এ-বাণ্ডিলটা ট্রেণে উঠিয়াই খুলিয়া বিছানা পাতিয়া লইতে হইবে, অবশ্য স্থান পাইলে। পাকা বাণ্ডিলে থাকিল লেপ, তোষক, মশারী, বালিশ প্রভৃতি। এটা একেবারে ডিব্রুগড়ে পৌঁছিয়া খোলা যাইবে। পঞ্জিকা দেখিয়া পূর্ব্বেই দিন স্থির হইয়াছিল। এখন গোল বাধিল, কোন্ ষ্টেশনে ট্রেণে উঠিতে হইবে, তাহা স্থির করিতে। কারণ আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ এ. বি. রেলওয়ের কামাখ্যা ষ্টেশনটি কিছুদিন পূর্ব্বেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কাজেই ট্রেণ ধরিতে হইবে, হয় ভউনে পাণ্ডু গিয়া, না হয় আগে গৌহাটি গিয়া। উভয় ষ্টেশনই কামাখ্যা হইতে প্রায় সমদূরবর্ত্তী। আসাম মেলে যাওয়াই অবশ্য সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধা, ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ডিব্রুগড় পৌঁছান যায়, কিন্তু মেলে প্রায়ই ভীড় থাকে। কলিকাতা হইতে আসাম-মেল রোজ আদিনগা আসে ও ফেরী ষ্টীমারে ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া বেলা ৭টার সময় পাণ্ডু পৌঁছান যায়। পাণ্ডুতে উঠিতে হইলে স্নান আহার হয় না, কিন্তু মেল পৌঁছাইবার পূর্ব্বেই ষ্টেশনে গিয়া গাড়ীতে বাহ্যা দখল করিয়া যথাসম্ভব লম্বা হইয়া শুইয়া যাইবার ব্যবস্থা করা যায়। গৌহাটি হইতে মেল ছাড়ে বেলা সাড়ে ৯টায় সময়। কাজেই স্নানাহার করিয়া গৌহাটি গিয়া মেল ধরা যায় বটে, কিন্তু গাড়ীতে সুবিধামত স্থান পাওয়া সন্দেহ; তা ছাড়া গৌহাটি সহরের অনেক প্যাসেঞ্জারও প্রতিদিন মেলে যায়। উভয় দিক্ সামলাত করিবার জন্য রোজে একজনকে পাণ্ডু পাঠাইলাম। সে গৌহাটি পর্য্যন্ত একখানা ইণ্টার-ক্লাস টিকিট কিনিয়া মেল পৌঁছিবার পূর্ব্বেই গাড়ীতে লম্বা বিছানা পাতিয়া শুইয়া থাকিবে, আমি গৌহাটি গিয়া, তাহার স্থান অধিকার করিব। বেলা ৮টার সময় আমাকে গৌহাটি লইয়া যাইবার জন্য, একখানা ট্যাক্সি পাহাড়ের নীচে থাকিবে, সে ব্যবস্থাও করা হইল। এই সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া, তাড়া-তাড়ি স্নানাহার সারিয়া সাজ-সরঞ্জাম সহ রওনা হইলাম।

পাহাড় হইতে সবর রাস্তায় আসিয়া দেখি, ট্যাক্সি আসে নাই। একটু উদ্বিগ্ন হইয়া ঘড়ি দেখিলাম, ঠিক সাড়ে আটটা। চারিদিকেই তখন মোটর চলাচল আরম্ভ হইয়াছে। হর্ণ শুনিলেই মনে হয় "ওই বুঝি বাঁশী বাজে" আমাদের। কত বাঁশী বাজিল, কত গাড়ী আসিল, পাশ দিয়া ধূলি উড়াইয়া চলিয়া গেল, আমরা রাস্তায় দাঁড়াইয়া "সচকিতনয়নে" অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। ট্রেণ ফেল করিবার আশঙ্কায় বুক ধড়ফড় করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরেই Eureka! আমাদের ট্যাক্সি আসিল। তাড়াতাড়ি মোটরে উঠিয়া রওনা হইলাম। কিছুদূর যাইতেই তরুমুখ ব্রীজের নিকটে পুলিসে গাড়ী আটকাইল। Pass, licence, permission

প্রভৃতি কয়েকটি শব্দের অদল-বদল ড্রাইভারের সঙ্গে হইল; পুলিস ছাড়িয়া দিল। আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া গৌহাটি সহরের এক চৌমাথায় পুনরায় ঐ প্রসঙ্গ। ড্রাইভার বলিল, পাশ আছে ও একবার দেখাইয়াছে। এ কনষ্টেবলও ছাড়িয়া দিল। তার পর ষ্টেশনের কাছাকাছি এক চৌমাথায় যাইতেই একজন পুলিশ সব-ইন্‌সপেক্টর হুইস্‌ল দিলেন, একজন কনষ্টেবল দুই হাত উঁচু করিয়া রাস্তার মাঝখানে তাহার বিরাট বপু প্রদর্শন করিল। গাড়ী ঘর্‌র্‌র্‌ ভস্‌ শব্দ করিল, একেবারে dead stop। দারোগাবাবু বলিলেন, 'পাশ দেখি'; ড্রাইভার বলিল, 'আছে'। উত্তরে বিরক্ত হইয়া তিনি বলিলেন, 'দেখাও!' ড্রাইভার তাহার যথা-সর্বস্ব গাড়ীর পকেট হইতে বাহির করিয়া দেখাইল। Pass, licence, permit প্রভৃতি কি কি সব তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া বলিল, 'সব ঠিক আছে।' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ব্যাপার কি?' একটু হাসিয়া তিনি বলিলেন; 'আজ general raid।' বুঝিলাম ঐ দিনে সমস্ত মোটর গাড়ীর লাইসেন্স দেখিতে হইবে বলিয়া সরকারের হুকুম। বলিলাম, 'মহাশয় আমাদের একটু তাড়াতাড়ি ছাড়িয়া দিন, নতুবা গাড়ী ফেল হইবে।' জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোথায় যাইবেন?' আমি বলিলাম, 'ডিব্রুগড়।' তিনি কনষ্টেবলকে বলিলেন "জানে দেও"। হাট দিয়া মোটর চলিল। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই গৌহাটি ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। প্রয়োজনাতিরিক্ত কুলি আসিয়া বোঁচকা, গাঁটরি, চোঙ্গল, বাণ্ডিল, অধিকার করিয়া লইয়াই ষ্টেশনের প্ল্যাটফরমের দিকে চলিল, আমরাও মোটরের ভাড়া মিটাইয়া দিয়া ষ্টেশনে ঢুকিলাম।

বুকিং আফিসের নিকটে গিয়া দেখি দুইটি জানালা; একটির উপর কাঠের বোর্ডে লেখা 1st. and 2nd class (প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী), অপরটির উপর Inter & 3rd class (মধ্যম ও তৃতীয় শ্রেণী) দ্বিতীয় জানালার নিকটে টিকিট কিনিবার আশায় কয়েকটি লোক দাঁড়াইয়া আছে। ট্রেন আসিতে আর ৮।১০ মিনিট বাকি, তবুও জানালা খোলা হইল না। ধাক্কাধাক্কি, হাঁকাহাঁকিতে open sesame (চিঁচিং ফাঁক) হইল না। পরে একজন টিকিট কলেক্টারকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'মহাশয়, গাড়ী আসিবার সময় হল, টিকিট কি দেওয়া হবে না?' তিনি 'ঐ windowতে পাইবেন' বলিয়া প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জানালা দেখাইয়া দিলেন। আশ্চর্য ব্যাপার! সেখানে দিব্যি টিকিট মিলিল, একখানা ইণ্টার, দুইখানা থার্ড। মনে ভাবিলাম, এরকম ধোঁকাবাজ গোর্ড রেল কোম্পানী কেন রাখে! প্ল্যাটফরমে দাঁড়াইতেই দূরে ট্রেন দেখা গেল। একখানা গাড়ী হইতে একখানা হাত বাহির করা দেখিলাম। ট্রেন আরও নিকটে আসিতে হাতের মালিক মাথা বাড়াইয়া দিল; চিনিলাম, আমাদেরই লোক। ট্রেন থামিতেই ধরজা খুলিয়া গাড়ীতে উঠিলাম ও তাহার সেই বিছানায় লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িলাম। পরে সে আমার বিছানা পাতিয়া দিল ও তাহার বিছানা গুটাইয়া লইয়া প্রস্থান করিল, গাড়ীতে আরও কয়েকজন লোক উঠিলেন। ভীড় খুব বেশী না হইলেও মন্দ নয়। পা গুটাইয়া অর্দ্ধশায়িত ভাবে থাকিতে হইল। মনে মনে বলিলাম, এটুকুর স্বত্ব-স্বামিত্ব অধিকারে থাকিলেও কোনও রকমে রাত কাটাইতে পারিব। ব্রহ্মচারী দুইজন Royal classএ চলিল। কিছুক্ষণ পরে ঢং ঢং ঢং, ঢং ঢং ঢং গার্ড সাহেব ও ড্রাইভারের দুই রকম হুইস্‌ল, হুস্‌, হুস্‌ শব্দে গাড়ী ছাড়িল।

ষ্টেশন ছাড়িয়া ট্রেন ক্রমে পাহাড়ের ভিতর ঢুকিল। পাহাড় কাটিয়া লাইন বসান হইয়াছে; মাঝে মাঝে দুই দিকের কাটা পাহাড় বেশ উঁচু। কিছুক্ষণ পাহাড়ের ভিতরে ভিতরে চলিয়া ট্রেন মুক্ত প্রান্তরে পড়িয়া নিঃশ্বাস ছাড়িল। বিস্তৃতব্যাপী মাঠে, অধিকাংশই খাস, কাশ ও তাবাগনে পরিপূর্ণ। লাইনের নিকটের জমীতে আবাদ হইতেছে। কোথাও বা সরিষাফুলে পরিপূর্ণ, যেন কাঁচা সোনার ফুল ফুটিয়া আছে, কোনও ক্ষেতে ধান সবে পাকিয়াছে। মধ্যে মধ্যে জলাভূমি, তাহাতে নানাবিধ জলজ পুষ্প ফুটিয়া আছে। বহু প্রকারের পক্ষীও দেখিলাম। হুইস্‌ল শুনিয়া হঠাৎ বহু বক এক সঙ্গে উড়িল, সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দূরে পলায়ন করিল। মৎস্যজীবীরাও নানাবিধ উপায়ে মৎস্য ধরিতেছে। কয়েকটি ষ্টেশন পার হইয়া দ্বিপ্রহরে চাপাড়মুখ পৌঁছিলাম। চাপাড়মুখ একটি জংশন ষ্টেশন। দেখিতে বড় না হইলেও কাজে বড়। এখান হইতে নওগাঁ, শিলঘাট প্রভৃতি স্থানে যাইবার জন্য একটি ব্রাঞ্চ লাইন আরম্ভ হইয়াছে, অপর দিক্‌ হইতে মরয়াবাড়ী পর্যন্ত আর

একটি নূতন লাইন গিয়াছে। ঠিক দুপুর বেলাও দেখিলাম, ষ্টেশন প্ল্যাটফর্মে চা চা করিয়া কেরিওয়ালা হাঁকিতেছে। এক সঙ্গে দুইবার চা বলার অর্থ বোধ হয় প্যাসেঞ্জারদের বলিতে চাহে, 'চা চাও' অর্থাৎ চাহিয়া লও। অনেকেই দেখিলাম চা পান করিলেন।

আসাম প্রদেশে চা-এর চলন খুব বেশী। চা খাওয়ার সময়-অসময়, স্থান-অস্থান নাই। প্রাপ্তিমাত্রেণ ভোক্তব্যম্ই সাধারণ রীতি। চাপাড়মুখে আপ ও ডাউন ট্রেনের সাক্ষাৎ হয়। আমাদের আপ বেল যখন পৌঁছিল, তখন জানিলাম ডাউন প্যাসেঞ্জার ট্রেণের আসিতে অনেক বিলম্ব আছে। কাজেই আমরা অনেকেই ট্রেন হইতে নামিয়া প্ল্যাটফরমে বেড়াইতে লাগিলাম। আমাদের গাড়ীতে একজন সাহেব ছিলেন, তিনিও নামিয়া খাইবার জন্য রিফ্রেশমেণ্ট রুমে ঢুকিলেন। এখানে আরও কতকগুলি লোক উঠিল, দীর্ঘপথযাত্রী নয়; তাহারা নিজের নিজের মত স্থান করিয়া বসিল, আমার অধিকৃত স্থানে হানা দিল না। প্রায় ৪০ মিনিট পরে ডাউন ট্রেন আসিল। আমরা সকলেই গাড়ীতে উঠিলাম। সাহেবটিও রুমাল দিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে যথাস্থানে আসিয়া বসিলেন। পাঁচমিনিট পরেই ট্রেন ছাড়িয়া দিল।

ক্রমে সাহেবটির সঙ্গে কথাবার্তা আরম্ভ হইল। তিনি ফ্রেঞ্চ মোটরকার কোম্পানীর একজন বড় কর্মচারী। শিয়ালদহ ষ্টেশনে তাঁহার সেকেণ্ড ক্লাস টিকিট, সুটকেস প্রভৃতি সমস্তই চুরি গিয়াছে। কোন রকমে একখানা ইণ্টার ক্লাস টিকিট করিয়া যাইতেছেন, এমন কি রাত্রে ডিনারের পয়সা পর্যন্ত সঙ্গে নাই। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কোথায় যাইবেন', বলিলেন, 'ঢাক্রগড়'। আমাকে জিজ্ঞাসা করায় আমি বলিলাম 'ডিব্রুগড় যাইব'। ভাবিলাম ডিব্রুগড়ের কাছে বোধ হয় ঢাক্রগড়ও আছে। ভুল পরে ভাঙ্গিল। সাহেবটি বেলজিয়ান, ইংরাজী ভাল বলিতে পারে না, যাহা বলে তাহারও accent অত্যন্ত খারাপ অথচ বেশ তাড়াতাড়ি বলে। গাড়ীতে নানা রকম লোক নানা কথা বলিতেছে। বিড়ি-সিগারেটের ধুঁয়ায় গাড়ী ভরিয়া গেল। আমার পাশের যাত্রীরাও ক্রমে আমার দিকে ঘেঁসিয়া আসিতে লাগিলেন, বিছানা কতকটা গুটাইয়া লইয়া বসিলাম।

অন্যান্য ষ্টেশনেও লোক উঠিল, গাড়ীতে বেশ জমাট ভীড় হইল। ভীড় হওয়ার অবশ্য কারণ আছে। রেল কোম্পানী কিছুদিন পূর্বে সেকেণ্ড ক্লাস উঠাইয়া দিয়াছেন; কাজেই পূর্বের সেকেণ্ড ক্লাস প্যাসেঞ্জার অধিকাংশই এখন ইণ্টার ক্লাস আশ্রয় করিয়াছে। তা ছাড়া, রেল-কর্মচারী, তথা free pass holders, বিনা টিকিটে ভ্রমণকারী, টিটিসি-এর দল (Travelling Ticket Checker), সকলেই এই ইণ্টার ক্লাসেই অনুগ্রহ করেন ও মজলিস বসান। অথচ প্রয়োজনানুরূপ গাড়ীর সংখ্যা তখনও বাড়ান হয় নাই। কাজেই ভদ্র ভীড়টা জমাট বাঁধে এখানেই। সন্ধ্যার একটু পূর্বেই লামডিং পৌঁছিলাম। অনেক প্যাসেঞ্জার ও যাবতীয় রেল কর্মচারী নামিয়া গেলেন; নবাগতের সংখ্যা খুবই কম। মাত্র আর দুই জন সাহেব উঠিলেন। মোট কথা গাড়ী বেশ পাতলা; সিগারেট-বিড়ির ধুঁয়াও বন্ধ হইল, নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিলাম। লামডিং একটা বড় জংশন। এখান হইতে আমাদের রেলগাড়ী সোজা শেষ ষ্টেশন সিল্‌চুকিয়া যাইবে। পাশ দিয়া যে লাইন বাহির হইয়া চলিয়া গেল, তাহাতে ছিল সেকশন হইয়া শিলচর, সিলেট, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, চাঁদপুর প্রভৃতি স্থানে যাওয়া যায়। রেল কোম্পানীর বড় বড় আফিস ও ওয়ার্কশপও এখানে আছে। সন্ধ্যার সময় ট্রেণ ছাড়িল। মণিপুর রোড পৌঁছিতেই প্রায় সব লোক নামিয়া গেল, থাকিলাম আমি ও তিনজন সাহেব। সাহেবদের সঙ্গে আলাপ আরম্ভ হইল। আমরা চার রকমের চার যাত্রী—একজন খাস ইংরেজ একজন অল্পবয়স্ক অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, একজন বেলজিয়ান ও আমি খাঁটি ভারতীয় তথা বাঙ্গালী। চার জনের উচ্চারণ চার রকমের। অবশ্য তাহা হইলেও এই চার প্রবাসীদের মধ্যে পরস্পরের কথা বুঝিতে কোনও কষ্ট হইল না।

মণিপুর রোড ছাড়িতেই গোটান বিছানা লম্বা করিয়া শুইয়া পড়িলাম। গায়ে রাগ টানাইলাম; বেশ শীত। বেলজিয়ান সাহেবের রাগ নাই, তিনি ওভারকোটকেই রাগ করিলেন। গাড়ীর যে রকম ঝাঁকুনি, ঘুমান সম্ভব নয়; কাজেই আবার উঠিয়া বসিলাম। দেখিলাম, অপর সাহেব দুইটি বসিয়াই আছেন; ইংরেজটি এক

বোতল বীয়ার খুলিয়া ধীরে ধীরে পান করিতেছেন। আবার কথাবার্তা চলিল। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানটি তিনসুকিয়ায় নামিয়া ডাক বাঙ্গলায় যাইবেন। কথায় কথায় তিনসুকিয়া ডাক বাঙ্গলা সম্বন্ধে এক গল্প জুড়িয়া দিলেন। এক সময় তিনি ও আর একটি সাহেব ডাক বাঙ্গলার দুই ঘরে ছিলেন। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় গোঁ গোঁ শব্দ করিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে অপর সাহেবটি তাঁহার ঘরে ঢুকিলেন ও গলায় হাত দিয়া চাপিয়া ধরিয়া কি বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, কথা বলিতে পারিলেন না। ইনি তখন বিছানা হইতে উঠিয়া তাঁহাকে ধরিয়া নিজের বিছানায় শোয়াইয়া দিলেন ও শুশ্রূষা করিয়া ক্রমে সুস্থ করিলেন। অপর সাহেবটি বলিলেন, রাত্রে আলো নিবাইয়া দেওয়ার পর বিছানায় শুইয়া ঘরের ভিতরে মানুষ চলাচলের শব্দ পাইলেন। টর্চ দিয়া দেখিলেন ঘরে কোথাও লোক নাই। তারপর ঘুমাইয়া পড়িলেন। ঘুমন্ত অবস্থায় কে আসিয়া সজোরে তাঁহার গলা টিপিয়া ধরিল। ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে বুঝিলেন, নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতেছে, তাই চেঁচাইতে চেঁচাইতে বাহির হইয়া আসিয়াছেন। সে রাত্রে আর তিনি নিজের ঘরে যান নাই। নানা ভাব-ভঙ্গী করিয়া ভূতের গল্প শেষ করিয়া ইনিও রাগ মুড়ি দিলেন। তখন Statesmanএর colour-puzzle বাহির হইয়াছে। ইংরেজটি তাঁহার puzzle boxটি আমাকে দিয়া বলিলেন "See if you can solve it? (দেখুন এটার মীমাংসা করতে পারেন না কি?)" Colour-puzzle ব্যাপারটা কি এখন অনেকেই জানেন। কতকগুলি ছোট ছোট বিভিন্ন আকারের ও বিভিন্ন রংএর চাকতি। সেইগুলো সাজাইয়া একটা নির্দিষ্ট আকার করিতে হইবে, অথচ যেন এক রকমের রং পাশাপাশি না থাকে। সাহেব বলিলেন, তাঁহার স্ত্রী অনেক চেষ্টা করিয়াও মীমাংসা করিতে পারেন নাই এবং তিনি নিজেও একদিন সন্ধ্যা হইতে সকাল পর্যন্ত ছয় বোতল বীয়ার শেষ করিয়াও কোন কূল-কিনারা পান নাই। মাথা ঠাণ্ডা রাখিবার জন্যই তাঁহার সে রাত্রে ছয় বোতল বীয়ার দরকার হইয়াছিল এটাও বুঝাইয়া দিলেন। আমি অবাক হইয়া সাহেবের দিকে চাহিলাম। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানটি শুইয়াই চাপা গলায় বলিলেন day and night। আমি নিরাশার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া puzzle লইয়া আধ ঘণ্টা মাথা ঘামাইলাম। এত ঠাণ্ডায়ও মাথা গরম হইয়া উঠিল। একবার সেল সাজাইয়া লইলাম, ভাবিলাম বুঝি ঠিক হইল। সাহেবটি ভুল দেখাইয়া দিলেন। আমার আগ্রহ দেখিয়া তিনি আমাকে একটু উৎসাহিত করিলেন এবং লোভ দেখাইয়া বলিলেন, প্রাইজ ১০,০০০৲ টাকা পাইবেন, তাহার অর্দ্ধেক আমাকে দিবেন। উভয়েই হাসিলাম। পুনরায় চেষ্টা করিলাম, হইল না। বিরক্ত হইয়া puzzle boxটি সাহেবকে ফেরত দিলাম। সাহেব মৃদু হাসিয়া বলিলেন, 'Why not try again? (আর একবার চেষ্টা করতে দোষ কি?)' আমি বলিলাম, 'I don't want to puzzle my brain over your puzzle any more (আপনার হেঁয়ালি নিয়ে মাথা গরম করতে আমি আর রাজি নই।)' একেবারে রাগ মুড়ি দিয়া শুইলাম। সাহেবটি এক বোতল শেষ করিয়া আর এক বোতল খুলিলেন। বলিলেন, 'ঘুম পাচ্ছে?' আমি না বলিলাম। ব্যস, আর কথা বলিলাম না, কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছি জানি না।

শেষ রাত্রে ঘুম ভাঙ্গিল। দেখিলাম সকলেই জাগিয়া আছেন। বলিলাম, 'বোধ হয় আমরা তিনসুকিয়ার নিকট আসিতেছি; এবার ত গাড়ী বদল করিয়া ডিব্রুগড়িয়া লাইনের গাড়ীতে উঠিতে হইবে। ইংরেজটি বলিলেন, যে গাড়ী বরাবর ডিব্রুগড় যাইবে,নূতন নিয়ম ১লা ডিসেম্বর হইতে হইয়াছে; জানিতাম না যে, সেল বরাবর ডিব্রুগড় যায়। ভোরে কুয়াসার মধ্যে গাড়ী বদলের ঝামেলা হইতে অব্যাহতি পাইয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। খুব বেশী শীত বোধ হইতে লাগিল। রাগটা আরও চাপিয়া গায়ে জড়াইয়া লইলাম। ভোরে তিনসুকিয়া পৌঁছিলাম। এইটি আসাম-বেঙ্গল রেলের শেষ ষ্টেশন। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানটি নামিয়া গেলেন। ইংরেজটি ভূতের গল্পের মালিককে লক্ষ্য করিয়াই আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'all humbug।' দুই সাহেবের জন্য 'মর্ণিং টি' আসিল। ইংরেজটি এক চুমুক দিয়াই বলিলেন 'awful tea'! এখানে একজন মাত্র বাঙ্গালী আমাদের গাড়ীতে উঠিলেন। কিছুক্ষণ পরে ট্রেণ তিনসুকিয়া ছাড়িয়া ডিব্রুদিয়া ব্রিজওয়ে ধরিয়া বিপরীত দিকে চলিল। সাড়ে সাতটার সময় ডিব্রুগড় ষ্টেশনে পৌঁছিলাম।

পরস্পর বিদায় সম্ভাষণ করিয়া নামিয়া পড়িলাম। বুঝিলাম, মেলজিয়ান সাহেবের 'চাক্রেগড়' আমাদের এই ডিব্রুগড়ই। তিনি তাঁহাদের এজেন্টের বাড়ী চলিলেন। ইংরেজটি যাইবেন ডাকবাঙ্গলায়। যাইবার সময় একটু হাসিয়া আমাকে বলিলেন, আবার দেখা হবে?' আমিও বলিলাম, 'আশা করি'।

দেখিলাম, প্ল্যাটফরমে তাঁহার বাড়ীতে আমার উঠিবার কথা—'রায়সাহেব', তাঁহার এক নাতনী সঙ্গে করিয়া উপস্থিত আছেন। তাঁহার চাকর, বাকর আমাদের জিনিষ-পত্র নামাইয়া তাঁহার মোটরে উঠাইল। তিনি বলিলেন তাঁহার বাসা আধ মাইলের কিছু উপর হইবে। দিবারাত্রি গাড়ীতে থাকিয়া একটু মাটিতে পা দিতে ইচ্ছা হইল। জিনিষপত্র লইয়া চাকরেরা ও ব্রহ্মচারীরা মোটরে চলিয়া গেল। আমি ও রায়সাহেব গল্প করিতে করিতে ধীরে ধীরে হাঁটিয়া চলিলাম। রাস্তাটি অতি সুন্দর, পিচ দেওয়া, বেশ প্রশস্ত, দুধারে বড় বড় গাছ। এইটিই আসামের ট্রাঙ্ক রোড। এই রাস্তা ধরিয়া বরাবর শিবসাগর, জোড়হাট, নওগাঁর ভিতর দিয়া গৌহাটি যাওয়া যায়। গৌহাটি হইতে ডিব্রুগড় ৩১৫ মাইল। ১৫ মিনিট চলার পরই বাসায় আসিয়া পৌঁছিলাম। কৌতূহলবশতঃ রায়-সাহেবকে সাহেবের বীয়ার খাওয়ার কথা বলিলাম, আরও বলিলাম, 'সমস্ত রাত্রি মদ খাইয়াও সে একটুও মাতাল হয় নাই।' রায়সাহেব একটু হাসিয়া বলিলেন, 'বীয়ারটা ঠিক মদ নয়; উহাতে নেশা হয় না।'

ডিব্রুগড় নর্থ-লখিমপুর জেলার সদর। স্থানটি বেশ সুন্দর, ব্রহ্মপুত্রের উপর। ব্রহ্মপুত্র ও ডিব্রু নদী সহরের নীচেই মিলিত হইয়াছে। ব্রহ্মপুত্রের অপর পারে হিমালয়-শ্রেণী চলিয়াছে। দূরে স্থানে স্থানে বরফে ঢাকা পাহাড়ের মাথাও দেখা যায়। সহরের রাস্তাগুলি বেশ পরিষ্কার ও প্রশস্ত। একটি সুন্দর পার্ক নদীর ধারে আছে। নদী তখন বহু দূরে সরিয়া গিয়াছে, মাঝে বিরাট চর পড়িয়াছে। বর্ষাকালে যখন জল বাড়িয়া চর ডুবিয়া যায়, তখন নদী পার্কের নিকটেই আসে। পার্কটি তখন দেখিতে আরও সুন্দর হয়। সহরের বহুলোক এখানে সন্ধ্যার সময় বেড়াইতে আসেন। ডিব্রুগড়ে বহু সাহেব প্ল্যান্টার (চা-কর সাহেব) ও ব্যবসায়ী মাড়োয়ারী আছেন। ব্যবসার মধ্যে চা-ই প্রধান। বহু কাঠ ও কমলা এখান হইতে দূরদেশে চালান হয়। প্ল্যান্টারদের একটি বিরাট ক্লাব দেখিলাম।

সহরে পানীয় জলের একটু অভাবই। জলের কল নাই, নদীও বহুদূরে, কাজেই কূপোদকই একমাত্র সম্বল। দেখিলাম জল বেশ সুস্বাদু। ইলেকট্রিক লাইটের ব্যবস্থা আছে। এখানে ঘড়ি মেরামতের এক নূতন বন্দোবস্ত দেখিলাম। রাত্রি ৯টা ৪৫ মিনিটের সময় ইলেকট্রিক লাইট অল্পে অল্পে কমিয়া যায়, আবার আধ মিনিট পরেই ধীরে ধীরে বাড়িয়া পূর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই সময় সকলে ঘড়ি মিলাইয়া লয়। দুইটি হাই স্কুল, একটি মেডিক্যাল স্কুল, মেয়েদের স্কুল এবং একটি পুওর অ্যাসাইলাম আছে। বেশ বড় একটি বাজার, সেখানে শাকসব্জী প্রচুর পাওয়া যায়। মাছ মাংসের বাজার পৃথক্।

জনৈক স্বামীজীর একটি সুন্দর আশ্রম এখানে আছে। জনৈক আশ্রম-শিষ্য বিশেষ যত্ন করিয়া সমস্ত আশ্রম দেখাইলেন। স্বামীজীর সমাধি-মন্দিরটি অতি চমৎকার। একটি ছোট মিউজিয়াম দেখিলাম। তাহাতে বহুমূল্য দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যাদির সংস্থান। একটি সামান্য জিনিষ আমার খুব ভাল লাগিল—একটি সুপারি খুঁদিয়া একটি চা-এর পেয়ালা। আশ্রমেরই একটি বালিকা উহা প্রস্তুত করিয়াছে। স্বামীজীর একটি পশুশালাও ছিল। তাঁহার জীবদ্দশায় উহা বেশ ভালভাবেই রক্ষিত ছিল। এখন দেখিবার মধ্যে একটি বড় চিতাবাঘ আছে। আশ্রমে একটি পাঠশালা আছে। অনেক নিঃসহায় বালককে অন্নদান ও বিদ্যাদান হইতেছে। একটি লাইব্রেরী আছে, তাহাতে অনেক ধর্মপুস্তক ও শাস্ত্রাদি রহিয়াছে। মেয়েদের থাকার ও বিদ্যাশিক্ষার স্থান পৃথক্। ঘুরিয়া ঘুরিয়া সমস্ত দেখিতে প্রায় ২ ঘণ্টা লাগিল। পরিদর্শন শেষ হইলে প্রচুর পরিমাণে জলযোগে আমন্ত্রিত হইলাম। আমি সমস্তই পাঠশালার বালকদিগকে ভাগ করিয়া দিয়া কয়েক কোয়া কমলা খাইয়া উঠিয়া পড়িলাম। ব্রহ্মচারীরা পুখানুপুখরূপই আহার করিল।

কয়েক দিনের মধ্যেই ডিব্রুগড়ের সমস্তই দেখা হইল। একদিন রায় সাহেব বলিলেন, বহুদিনের বন্ধে তিনি

সপরিবারে পরশুরামকুণ্ডে যাইবেন ও আমাকেও সঙ্গে লইবেন। শুনিয়া প্রাণটা নাচিয়া উঠিল। পূর্ব্বে সাধু-সন্ন্যাসীদিগের নিকট শুনিয়াছিলাম, পরশুরামকুণ্ড অতি দুর্গম ও প্রাচীন তীর্থ। সেখানে যাইতে হইলে Political Officer-এর নিকট হইতে পাশ লইতে হয়। রায় সাহেব লেখা পড়া করিয়া ৫ টাকা পাঠাইয়া সব ঠিকঠাক করিলেন। একখানা একটন মোটর বাস ও ১৬ জনের পাশ আসিল।

বড়দিনের ছুটির প্রথমেই এদিকের অনেক সরকারী কর্ম্মচারী পরশুরাম দর্শনে যান, কাজেই তখন ডাকবাংলোর ভীড় হওয়ার সম্ভাবনা; তাই আমাদের রওনা হইবার দিন সাব্যস্ত হইল ২৮শে ডিসেম্বর (১৯৩৬); তিনদিন পরে ফিরিতে হইবে। গন্তব্য স্থানে জিনিষপত্র কিছুই পাওয়া যাইবে না, কাজেই ১৬ জনের স্থলে ২০ জনের ৪ দিনের উপযুক্ত রসদের লিষ্ট প্রস্তুত হইল। ক্রমে চাল, ডাল, নুন, তেল, ঘি, মসলা, তরকারী, আটা, সুজি, চা, চিনি, কনডেন্‌সড্ মিল্ক, রুটি, বাটি গেলাস, হাঁড়ি-কুড়ি প্রভৃতি ও প্রয়োজনাতিরিক্ত গরম কাপড় ও বিছানাপত্র বস্তা-বন্দী হইতে লাগিল, কতক গোল্ডলে ভরা হইল, সব ঠিকঠাক হইয়া গেল। ২৮শে আগষ্ট আহার করিয়া আমরা ১৬ জন সাত-সরঞ্জাম লইয়া মোটর বাসে রওনা হইলাম। রায় সাহেবের দুই পুত্র খোকাবাবু ও ভজুবাবু দুই কামেরা ঘাড়ে ঝুলাইয়া চলিল।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই মোটর সহর ছাড়াইয়া তিনসুকিয়ার দিকে চলিল। ডিব্রুগড় আসিবার সময় তিনসুকিয়া হইতে ডিব্রুগড় আসিয়াছিলাম, এখন বিপরীত দিকে চলিলাম। রাস্তাটি অতি সুন্দর, রেল লাইনের পাশে পাশে চলিয়াছে। রাস্তার দুই দিকেই পত্রশ্যামলা বড় বড় চা-বাগিচা। বহুদূরব্যাপী বাগানগুলি যেন ক্রমে দিগন্তরেখা স্পর্শ করিয়াছে। Pruning বা ছাঁটাই সবে সুরু হইয়াছে। যে সব বাগানের গাছ ছাঁটা হয় নাই, সেগুলি দেখিতে অতি সুন্দর। দার্জ্জিলিং ও জলপাইগুড়ি ডুয়ার্সের বড় বড় বাগান দেখিয়াছি, কিন্তু আসামের এই সমস্ত বাগানের তুলনায়, সেগুলি ক্ষুদ্র বলিয়াই মনে হয়। আসামের জঙ্গল ও কালাজ্বরের কথা পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলাম, তাই ডিব্রুগড় আসিবার পূর্ব্বে একটু ভয়ও হইয়াছিল। এখন দেখি চা-করেরা আসিয়া সমস্ত জঙ্গল কাটিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চা-রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছেন। রাস্তায় চলিতে প্রথমেই পাইলাম চালখোয়া ষ্টেশন। আরও দুই ষ্টেশন ছাড়াইয়া গিয়া চাবুয়া ষ্টেশন। চাবুয়া নামকরণের অর্থ আছে। বুয়া শব্দের অর্থ বপন করা। চা-করেরা এদিকে আসিয়া সর্ব্বপ্রথমে এই স্থানে চা বপন করেন, এই জন্য এ স্থানের নাম চা-বুয়া বা চাবুয়া। ডিব্রুগড় হইতে ইহা ১৮ মাইল। যাইতে যাইতে একখানা মোটরের সহিত দেখা হইল। তাহাতে রায় সাহেবের কয়েকজন বন্ধু ছিলেন, তাঁহারা পরশুরাম দেখিয়া ডিব্রুগড় ফিরিতেছিলেন। উভয় মোটরই পাশ কাটিয়া দাঁড়াইল। রায় সাহেব নামিয়া গিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহাদের সহিত কথা-বার্ত্তা কহিয়া পরশুরাম সম্বন্ধে কতক সংবাদ জানিয়া লইলেন। মোটর পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিল। একখানি রেলগাড়ী আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল। ছোট ছেলে-মেয়েরা ট্রেনের সঙ্গে রেস হইতেছে বলিয়া আনন্দে চীৎকার করিতে লাগিল। ট্রেন হইতে প্যাসেঞ্জারেরাও অনেকে গলা বাড়াইয়া আমাদিগকে দেখিতে লাগিল। শীঘ্রই আমরা ট্রেন পিছনে ফেলিয়া চলিলাম। কিছুদূর গিয়া দেখিলাম, একখানি মোটর বাস ও একখানি মহিষের গাড়ী পরস্পর ধাক্কা খাইয়া অচল অবস্থায় রাস্তা অবরোধ করিয়া আছে। যথাসম্ভব সাবধানে পাশ কাটাইয়া আমাদের মোটর চলিল। ডিব্রুগড় হইতে ৩০ মাইল চলিয়া আমরা তিনসুকিয়া পৌঁছিলাম।

তিনসুকিয়া এ অঞ্চলে ব্যবসায়ের একটি প্রধান কেন্দ্র। অনেক বড় বড় দোকান আছে। জিনিষপত্র ডিব্রুগড় অপেক্ষাও সস্তা। একটি ডাকবাংলা আছে, কিন্তু উহা প্রায়ই ভর্ত্তি থাকে। কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতির বড় বড় ব্যবসায়ী কোম্পানীর ও লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর এজেন্টরা সর্ব্বদাই এদিকে আসেন ও ডাকবাংলায় থাকেন। এ সময় এখানে প্রচুর পরিমাণে কমলা পাওয়া যায়, যথেষ্ট সস্তা। আমরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিলাম। কতকগুলি প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র কেনা হইল। ছেলেমেয়েদের জন্য বড় বড় কতকগুলি পাউরুটি, প্রয়োজনমত মাখনের টিন, কিছু কমলা

ও অন্যান্য দ্রব্যাদি মোটরে উঠিল। সমস্ত কাজ মিটিলে মোটর ছাড়িল। কয়েক মাইল গিয়াই মাকুম জংশন। ডি. এম. রেলের ইহা একটি বড় জংশন। মেন লাইনটি বরাবর ডিগবয় হইয়া লিডো পর্যন্ত গিয়াছে। ডিগবয়তে পেট্রলের বিরাট কারখানা। প্রত্যহ এখান হইতে একখানা করিয়া পেট্রল বোঝাই মালগাড়ী ছাড়ে। মাকুম হইতে একটা ব্রাঞ্চ লাইন, ব্রহ্মপুত্রের কিনারায় লাইকোয়াঘাট পর্যন্ত গিয়াছে। যাঁহারা বরাবর ট্রেনে আসেন, তাঁহাদিগকে পরশুরামকুণ্ড যাইতে হইলে, এই সাইকোয়াঘাটে নামিয়া ৩।৫ মাইল বালির চর ভাঙ্গিয়া নৌকায় ব্রহ্মপুত্র পার হইতে হয়। ইহার পর আর রেল লাইন নাই। মাকুম এ অঞ্চলে কমলা লেবুর একটি প্রসিদ্ধ কেন্দ্র। রাস্তার দু'ধারে স্তূপ করা কমলা দেখিলাম। বড়, মাঝারি ও ছোট হিসাবে কমলাগুলি তিন ভাগে সাজান; আপাতিরিক্ত সস্তা, আকার হিসাবে পয়সায় ৩, ৪, ৫টা। পাইকারী দর আরও সস্তা। এখান হইতে বহুস্থানে কমলা রপ্তানী হয়। আমরাও এক কুড়ি কমলা কিনিয়া মোটরে উঠাইলাম। মোটর চলিল। কিছুক্ষণ পরে আমরা তুমডুমা বাংলায় পৌঁছিলাম। তিনসুকিয়া হইতে তুমডুমা ১৫ মাইল।

এদিকের বাংলাগুলিকে চাং-বাংলা বলে। কাঠের খুঁটির উপরে কাঠের তক্তার চাং, অর্থাৎ মাচা বাঁধিয়া তাহার উপর ঘর তৈয়ারি হয় বলিয়াই এই ধরণের বাড়ীকে চাং-বাংলা বলে। সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে হয়, নীচে ফাঁকা। মধ্যে মধ্যে রাত্রে হাতী, বাঘ ও অন্যান্য জানোয়ারের উপদ্রব হয় বলিয়াই এইরূপ উঁচুতে থাকিবার ব্যবস্থা। চাকরেরা জিনিসপত্র উপরে উঠাইল। আমরাও উপরে উঠিয়া সটান আরাম-কেদারায় পড়িলাম।

বাংলাটিতে দুইটি বড় বড় ঘর, ঘরের চতুর্দ্দিকে বারান্দা, প্রত্যেক ঘরের পাশেও বাথরুম। এক ঘরে রায় সাহেব সপরিবারে ছেলেমেয়েদের লইয়া থাকিলেন, আমরা ৫।৬ জন অন্য ঘরে থাকিলাম। বিছানার বাক্সগুলি খুলিয়া ফরাস-বিছানা পাতা হইল। আমার জন্য খাটের উপরই বিছানা পড়িল। পূর্ব্বপরিচিত স্থানীয় অবস্থাপন্ন একজন ব্যবসায়ী আসিয়া রায় সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ও দুধ প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া দিলেন, অধিকন্তু পরশুরামের নিকটবর্ত্তী হেতু বাংলায় থাকিবার সময় রাত্রে চিমনীতে জ্বালাইবার জন্য এক বস্তা কয়লাও দিলেন। আমরা ইতিমধ্যে একবার তুমডুমা বাজার ও অন্যান্য স্থানগুলি দেখিয়া আসিলাম। বাজার ছোট, তবে প্রয়োজনীয় সাধারণ দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের তুমডুমা-ষ্টোর্স নামে একটি বিরাট দোকান আছে। দোকানটি সাহেবী ফ্যাশনের। চা-কর সাহেবদিগের প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্যই এখানে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে এই দোকানে খুব বেশী বিক্রয় হইত; এখন আর একটা পোলার বিক্রয় কম হইয়া গিয়াছে। ইহারই (ম্যাকটার্স ষ্টোরস) একটা branch ডিব্রুগড়ে দেখিয়াছিলাম। বাংলায় ফিরিবার সময় একটু ঝিনঝিনে বৃষ্টি নামিল; দৌড়াইতে দৌড়াইতে বাংলায় পৌঁছিলাম। রাত্রে ডাল ভাতের ব্যবস্থা হইল। আহারাদি সারিয়া শুইয়া পড়িলাম।

ভোরে উঠিয়াই সাজ-সাজ শব্দ। আবার বিছানাপত্র বাঁধা আরম্ভ হইল। এখান হইতে অপর একখানি বাস ও একখানি ট্যাক্সির বন্দোবস্ত পূর্ব্বেই হইয়াছিল। বেলা ১০টার সময় আহারাদি করিয়া রওনা। বাস্ ভারী, ধীরে যাইবে, বিশেষতঃ রাস্তায় বাসের কোনও গোলমাল হইলে আমরা গিয়া তাহার ব্যবস্থা করিতে পারিব; এই ভাবিয়া তাহাকে আগে ছাড়িয়া দেওয়া হইল, কিন্তু পরে দেখা গেল "উল্টা বুঝিলি রাম" হইল। ১৫ মিনিট পরে ট্যাক্সিতে রায় সাহেব, তাঁহার পত্নী ও বড়মেয়ে উঠিলেন। আমি ড্রাইভারের পাশে বসিলাম। ট্যাক্সি ছুটিল।

তুমডুমা হইতে কয়েক মাইল যাইবার পরই দূরে হিমালয়ের উচ্চশৃঙ্গের বরফ দেখা গেল। সকালের কুয়াসা সরিয়া গিয়াছে, পাহাড়ের উপর রোদ পড়িয়াছে, মনে হইতেছে যেন রূপার পাতে মোড়া। কিছুক্ষণ পরেই আর দেখা গেল না। এখন আর চা-বাগান নাই, রাস্তার দু'ধারে জঙ্গল, রাস্তাও ভাল নয়, সঙ্কীর্ণ, মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট গ্রাম। ক্রমে সাইকোয়াঘাট ষ্টেশন বামে ফেলিয়া আমরা ডান দিকে নদ কাঁচা রাস্তায় চলিতে লাগিলাম। গাড়ী কখনও উঁচু, কখনও নীচু, কখনও কাত হইতে লাগিল। ঝাঁকুনির অন্ত নাই। একবার গাড়ী লাফাইয়া উঠিল, পরক্ষণেই দুম্ করিয়া পড়ার শব্দ, খসরর্, খসরর্, ভদ্। গাড়ী থামিল,

আমরাও নামিলাম। গাড়ী একদিকে কাত হইয়া আছে। ড্রাইভার হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া ও রায় সাহেব নীচু হইয়া চাকার অবস্থা দেখিতে লাগিলেন। বাস পুলেই চলিয়া গিয়াছে, তাহার কোনও চিহ্ন পাইলাম না; কয়েকবার জোরে হর্ণ দেওয়া হইল, কোনও উত্তর পাওয়া গেল না।

ড্রাইভার টায়ার বদলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, আমি ও রায়সাহেব বেড়াইতে বেড়াইতে নিকটবর্ত্তী ক্ষুদ্র গ্রামটিতে প্রবেশ করিলাম। অতি দরিদ্র পল্লী। ছোট ছোট খড়ের ঘর। এক বাড়ীতে গেলাম। পুরুষেরা মাঠে গিয়াছে; বাড়ীর মেয়েরা অতি সমাদরে আমাদের বসিবার জন্য মাদুর বিছাইয়া দিল। উঠানে ধান মেলিয়া দেওয়া, এক দিকে একটা ঢেঁকি, পাশে গরু বাঁধা, গরুর পিছনে শাক, মূলা, বেগুনের ক্ষেত, বেড়ার ধারে একটা কুলগাছ, গাছটি কুলে ভরা, তখনও পাকে নাই। বাড়ীর লোকগুলি অতি নিরীহ ও সাদা-সিদে। পাড়ার আরও কয়েকজন আমাদিগকে দেখিতে আসিল। রায় সাহেব আসামী ভাষায় তাহাদের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন। গৃহকর্ত্রী আতিথ্য-স্বরূপ ক্ষেত হইতে কয়েকটি মূলা উঠাইয়া দিল। জিনিষ অতি সামান্য, কিন্তু তাহাদিগের মনের সেই আতিথেয়তার ভাবটির মূল্য অনেক, অমূল্য বলিলেই হয়। মূল্যস্বরূপ রায় সাহেব কিছু পয়সা দিতে চাহিলেন, কিন্তু তাহারা হাত জোড় করিয়া লইতে অস্বীকার করিল। ইতিমধ্যে গাড়ীর হর্ণ শোনা গেল। আমরা বাড়ীর বাহিরে আসিলাম; সঙ্গে সঙ্গে মোটর নূতন টায়ার পরিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল।

এবার মোটর ধীরে চলিল। কিছুক্ষণ পরেই ব্রহ্মপুত্রের ধারে পৌঁছিলাম। অপর পারে দরিয়া ছবির মত দেখা যাইতেছে। চর পড়ায় নদী প্রায় এক মাইল সরিয়া গিয়াছে। মোটর সাবধানে তীর হইতে চরে নামিল। আমাদের মোটর বাসের চিহ্ন পাইলাম। ধীরমন্থরগতিতে হেলিয়া দুলিয়া মোটর চলিল। মধ্যে মধ্যে বালির ভিতরে চাকা বসিয়া যাইতে লাগিল। অগম্য স্থানে চরের কাউগাছ কাটিয়া দিয়া তাহাকে পন্থা করা হইয়াছে; কোনও স্থানে বা বাঁশের ছেঁচা দেওয়া আছে, তাহার উপর দিয়া চলিয়া গাড়ী কোনও রকমে নিরাপদে খেয়াঘাটে পৌঁছিল। বাসখানা আমাদের বিলম্ব দেখিয়া আগের খেয়াতেই পার হইয়া ওপারে আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। ছেলে-মেয়েরা বালির উপর ছুটাছুটি করিতেছে। ওপার হইতে খেয়ার নৌকা আসিতে একটু বিলম্ব হইল। নদী এখানে বেশী প্রশস্ত নয়, প্রায় এক মাইল হইবে, জল ঈষৎ নীলবর্ণ, ঠিক কাক-চক্ষু। পুনরায় নরফের পাহাড় নজরে পড়িল; এবার অনেকটা নিকটেই মনে হইল। কিছুক্ষণ পরে জোড়া-নৌকা কিনারায় ভিড়িল। জোড়া-নৌকার উপর মাচা বাঁধা; তাহার উপর গাড়ী উঠাইয়া পার করা হয়। নৌকাগুলি তক্তার তৈয়ারী নয়। আস্ত গাছের গুঁড়ি খুদিয়া নৌকার আকার করা। শুধু লোক পারাপারের জন্য একক নৌকাই খেয়া দেয়। মোটর সহ আমরা নৌকায় উঠিলাম। মধ্য নদীতে গিয়া প্রাণ ভরিয়া জল খাইলাম। কি সুন্দর সেই স্রোতের জল, যেমন সুস্বাদু তেমনই পরিষ্কার ও শীতল। প্রায় আধ ঘণ্টা পরেই সরিষার পারে নামিলাম; বেলা তখন একটা। (আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

বাঙ্গালী ও ভারতীয়

...বাঙ্গালীকে মনুষ্যোচিত হইতে হইলে নিজ কার্য্যকলাপ ও কার্য্য-প্রণালীনীতির নিরূপণ করিবার জন্য স্বকীয় বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তাহাকে মনে মনে সজাগ থাকিতে হইবে বটে, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে ও কার্য্যকালে বাঙ্গালী ও ভারতীয় ভাব সম্পূর্ণভাবে বিসর্জ্জিত করিয়া মনুষ্যসমাজের একজন বলিয়া অনুপ্রাণিত না হইতে পারিলে কোন বাঙ্গালীর কর্ত্তব্য অথবা ভারতীয়ের কর্ত্তব্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দরভাবে নিষ্পন্ন করা সম্ভব হইবে না। বাঙ্গালী ভাব অথবা ভারতীয় ভাব যাহার যত ফুটিয়া উঠিবে, তত্ই মনুষ্যোচিত ভাব, অর্থাৎ সে যে সমগ্র মনুষ্য-সমাজের একজন, এই ভাব হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে।...

৪

সাম্প্রদায়িকতা

নিম্নে আমরা যে প্রবন্ধ দুইটি প্রকাশিত করিতেছি, বলাই বাহুল্য, আমরা ইহার কোনটির সহিতই একমত নহি। কিন্তু ভারতের অন্তঃপুরে, দৈনিক পত্রিকার মারফতেই হউক কিংবা আর যে কোন কারণেই হউক, রাজনৈতিক ঘটনাবলী কিরূপ প্রতিক্রিয়া আনয়ন করিতেছে, তাহারই সামান্যমাত্র নিদর্শন হিসাবে আমরা এই দুইটি রচনা নিম্নে উপস্থিত করিলাম। ইহার মধ্যে বিশেষ দ্রষ্টব্য, হিন্দু-নারীর মতামতের সাম্প্রদায়িকতা এবং মুসলমান-নারীর মতামতে ইহার যথাসম্ভব অভাব।

হিন্দু-মুসলমান ও কংগ্রেস

বর্ত্তমানে বাংলার অন্নবস্ত্রের সমস্যা, শিক্ষার সমস্যা, সংস্কৃতি সমস্যা হইতেও বড় হইয়া দেখা দিয়াছে হিন্দু-মুসলমান মিলন-সমস্যা। এ সম্বন্ধে বক্তৃতা হইয়াছে বহু, লেখনী ক্ষয় হইয়াছে অতিরিক্ত, কিন্তু মীমাংসা দূরের কথা, সমস্যা ক্রমশঃ গুরুতর আকার ধারণ করিতেছে। পূর্ব্বে ইহা দাঙ্গাটি সহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে সর্ব্বত্র, ছাত্রদের মধ্যে, এমন কি ছাত্রীদের মধ্যে পর্য্যন্ত ইহা সংক্রামিত হইয়াছে। দোষ কাহার? ইহার উত্তরে বলিতে হয়, দোষ দুই পক্ষেরই সমান। 'আমি জানি ইহা শুনিয়া একপক্ষ তাঁহাদের সবল লেখনী এবং কূট তর্কের জোরে আমার কান মলিয়া দিতে চাহিবেন এবং অন্যপক্ষ আমায় কাফের বলিয়া গালাগালি দিবেন। আপত্তি নাই। নিজেদের দোষ আমরা দেখিতে শিখি নাই, কেহ দেখাইয়া দিলে প্রতিকার ত দূরের কথা তাহার উপর চোখ রাঙাইয়া যথাসম্ভব দোষগুলি ধামাচাপা দিতে চেষ্টা করি, তাই দুর্দ্দশা আমাদের চরমে উঠিয়াছে।

দুর্য্যোধনের পণ "বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচাগ্র মেদিনী"—দুর্ভাগ্যক্রমে অপর দল ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির নয় তাই তাহারা ছুরি ও লাঠি বাগাইয়া বলিতেছে 'দেবে কি না একবার দেখে নিচ্ছি।' লোহার লোহায় ঠুকিলে আগুন জ্বলে তাই দেশে সর্ব্বত্র আজ আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে এবং সেই আগুনের ছেঁয়াচ আসিয়া লাগিয়াছে বাংলা মায়ের ভাবন অঙ্গে। তিনি তারস্বরে চীৎকার করিয়া বলিতেছেন—"ওরে হত-ভাগারা থাম থাম, আমি যে জ্বালা পুড়ে মলাম।' কিন্তু হায় রে, মায়ের সেই ক্রন্দন-ধ্বনি শুনিবে কে? আজ তাহার দুই সন্তান রণসজ্জায় সজ্জিত হইতে ব্যস্ত। পরাধীন জাতির অসি নাই কিন্তু মসী ত আছে, শক্তি নাই, বাক্য আছে, অস্ত্রের অভাব নাই।

কিন্তু এ সব কথা থাক্। আজ সত্যই চিন্তা করিবার দিন আসিয়াছে, এই দ্বন্দ্বের শেষ পরিণতি কোথায়? দেশের নেতারা একবাক্যে বলিতেছেন, সাম্প্রদায়িকতা পরিত্যাগ না করিলে দেশের মঙ্গল নাই, তবু যে সাম্প্রদায়িকতা বাড়িয়াই চলিয়াছে, ইহার কারণ কি? ইহার কারণ, মুখে আমরা যতই কিছু বলি না কেন, সত্যকারের মিলন-প্রয়াসী আমরা নই। বাংলা দেশে সত্যকারের একজন শক্তিশালী নেতা নাই, যিনি হিন্দু-মুসলমান মিলন সম্বন্ধে আন্তরিক দরদ দিয়া চিন্তা বা চেষ্টা করেন। তা যদি থাকিত, তা হইলে সাম্প্র-দায়িকতা এরূপ অপ্রতিহত গতিতে দিনের পর দিন বাড়িয়া চলিতে পারিত না। 'একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান' কংগ্রেস হইতে সাম্প্রদায়িকতা দূরীকরণের জন্য আজ পর্য্যন্ত কোনরূপ গঠনমূলক কার্য্য হইয়াছে বলিয়া জানি না। সত্যই কংগ্রেস যদি নিঃসন্দেহে বুঝিয়া থাকে যে, হিন্দু-মুসলমান মিলন না ঘটিলে দেশের মুক্তি নাই, তাহা হইলে কংগ্রেসের উচিত অনেকখানি শক্তি এদিকে ব্যয় করা। কংগ্রেসের ভিতরের অবস্থা এখন যাহাই হউক, আমরা অনুরোধ করি, দৃঢ়হস্তে এবং দৃঢ়চিত্তে এই দুর্নীতির প্রতিরোধ করিতে কংগ্রেস উঠিয়া দাঁড়ান।

আমার মতে, প্রথমতঃ কংগ্রেস হইতে এরূপ একখানি পত্রিকা বাহির করা প্রয়োজন, যাহা একেবারে সাম্প্রদায়িকতা-শূন্য, নিরপেক্ষ, সুচিন্তিত এবং যাহা প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, দরদী, উদারনৈতিক, শক্তিশালী লেখক ও দূরদর্শী একদল

লোকের দ্বারা সুপরিচালিত। যাহার উপর দেশের লোক সম্পূর্ণ নির্ভর এবং বিশ্বাস করিতে পারে। যাহা পড়িয়া দেশের লোক অবস্থার প্রতিকার এবং মঙ্গলচিন্তা করিতে শিখিবে। এই পত্রিকার বহুল প্রচারের জন্য কংগ্রেস হইতে ঘরে ঘরে প্রচারকার্য্য চালাইতে হইবে।

বর্ত্তমানে দেশে এমন একখানি পত্রিকা নাই, যাহা নিরপেক্ষ, সাম্প্রদায়িকতামুক্ত এবং যাহা কোন স্বার্থান্বেষী দলের দ্বারা পরিচালিত নয়। কিছুকাল হইতে প্রধান প্রধান কতকগুলি কাগজ দেশের লোকের সেন্টিমেণ্টে ঘা দিয়া যে-ভাবে সাম্প্রদায়িকতার বিষ উদ্গীরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহাতে দ্রুতগতিতে ঘরে-বাহিরে সাম্প্রদায়িকতার আগুন ছড়াইয়া পড়িতেছে। ফলে এই হইয়াছে যে, বাংলায় কংগ্রেসের কার্য্যক্ষেত্র ক্রমেই সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে। যদি আজিও ইহার প্রতিকারের জন্য কংগ্রেস উঠিয়া পড়িয়া না লাগে, তবে বাংলাদেশে কংগ্রেসের কাজের কিছুমাত্র উন্নতির আশা নাই। অসি হইতে মসী কম তীক্ষ্ণধার নয়। সবল লেখনী কত ইষ্ট এবং কত অনিষ্ট করিয়াছে, পৃথিবীর ইতিহাস যাঁহারা জানেন, তাঁহাদের নিকট ইহা অবিদিত নয়। সেই জন্য কংগ্রেসের উচিত, সাম্প্রদায়িক বিষদুষ্ট কাগজগুলির বিরুদ্ধে রীতিমত প্রচার-কার্য্য চালান।

কংগ্রেস হইতে আজ প্রবল গঠনমূলক কার্য্য চালান প্রয়োজন, কিন্তু ইহার জন্য চাই একদল সুশৃঙ্খল, সুশিক্ষিত ত্যাগী কর্ম্মবাহিনী। বাংলার কংগ্রেস বর্ত্তমানে নানারূপ দলাদলিতে ভারাক্রান্ত। অধিকাংশ কর্ম্মী নিরপেক্ষ এবং স্বার্থলেশশূন্য নন। প্রকৃত শিক্ষা অভাবে স্বেচ্ছাসেবকগণ বহুক্ষেত্রে যে সঙ্কীর্ণ মন এবং অনুদারতার পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে কংগ্রেসের কার্য্য প্রতিহত হইয়াছে। এই গলদগুলি কংগ্রেসকে আজ দৃঢ়হস্তে অপসারিত করিতে হইবে। আজ এমন একটি জাতীয় কর্ম্মবাহিনী গঠন করিতে হইবে, যাঁহারা প্রকৃত প্রেমিক, স্বার্থশূন্য, সঙ্কীর্ণতাবর্জ্জিত। একদল লোক বলিতেছেন, কংগ্রেসের উন্নতির প্রতিবন্ধক, স্বাধীনতার প্রতিবন্ধক বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, মুসলমান বলিতে কি কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় স্বার্থান্বেষী, গবর্ণমেণ্ট-ঘেঁষা, বুর্জ্জোয়া সম্প্রদায় মুসলমানদের বোঝায়? বাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মুসলমানের সংখ্যা শতকরা দুই তিন। ইঁহারা অনেকে কংগ্রেসে যোগদান করিয়াছেন। যাঁহারা অবশ্য বিপথগামী করিতে পারেন নাই, তাঁহারা অনেকেই কংগ্রেসের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। বাকী শতকরা ৯০ জন গ্রাম্য কৃষকশ্রেণীর লোক। জিজ্ঞাসা করি, এই শতকরা ৯০ জন কৃষকের কাণে কংগ্রেস কি তাহাদের বাণী পৌঁছাইয়া দিতে পারিয়াছে? আমরা জানি পারে নাই—৯০ জন কেন, দশজনের কাণেও ইহার বাণী পৌঁছাইয়া দিতে পারে নাই। যদি পারিত, তাহা হইলে বাংলার মন্ত্রিত্বের ইতিহাস আজ অন্যরূপ হইত। আজিও কংগ্রেস কৃষকের ষোল আনা দাবী মানিয়া লইতে পারে নাই। আজিও বাংলা কংগ্রেসের উপর জমিদারদিগের প্রভাব পুরামাত্রায় বর্ত্তমান, তাই যে দু'চারিজন কৃষক কংগ্রেসকে জানিয়াছে, তাহারাও ইহাকে পরিপূর্ণ বিশ্বাসের দৃষ্টিতে দেখিতে পারে নাই। আজ ইহাদের নিকট কংগ্রেসের বাণী পৌঁছাইয়া দিতে হইবে, বিশ্বাস আনিতে হইবে, প্রাণে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। আজ কংগ্রেসকে সত্যকারের ধরণী হইতে হইবে; কংগ্রেস সেবকমণ্ডলীকে প্রেমিক সাজিতে হইবে। ফাঁকী দিয়া জগতে আজ পর্য্যন্ত কোন বড় কাজ হয় নাই। শোলার ফুল দিয়া দেবতার পূজা হয় না।

'তুমি আমি বন্ধু হব কেমন?' এমন করিয়া কোন বন্ধুত্ব গড়িয়া উঠিতে পারে না। প্রাণে প্রাণ আসিয়া মিলিত হইলে সকলের অলক্ষ্যে কখন যে বন্ধুত্ব গড়িয়া ওঠে, মানুষ টের পায় না। ইহার মধ্যে যাহারা ব্যবসাদারী চাল চালিতে যায়, তাহাদের বুদ্ধির তারিফ করা যায় না। কে সে জিন্না? কি তাহার ক্ষমতা? কোন্ ক্ষমতাগুণে কোন্ ত্যাগের জোরে তিনি আজ ৮।৯ কোটি মুসলমানের নেতৃত্ব পদ দাবী করিতেছেন? যদি ধরিয়া লই, কংগ্রেস তাঁহার সমস্ত দাবী আজ মানিয়া লইল—শক্তি আছে তাঁহার যে এই ৮।৯ কোটি মুসলমানকে কংগ্রেসের পায়ে আনিয়া এখনই হাজির করিয়া দিবেন? আমরা জানি তাহা তিনি পারিবেন না, কারণ তিনি প্রকৃত নেতা নন। নেতা হইতে গেলে আগে ত্যাগী হইতে হইবে, ত্যাগের কষ্টিপাথরে লোকের শ্রদ্ধা ভক্তি অর্জ্জন করিতে হইবে। এই আট নয় কোটি মুসলমানের সুখ-দুঃখকে নিজের বলিয়া ভাবিতে হইবে। ভোগের উচ্চ চূড়ায় বসিয়া নেতা হওয়া হওয়া যায় না।

আমরা চাই না, কংগ্রেস এইরূপে মিলনের পথে অগ্রসর হয়, কারণ এইরূপ মিলনে প্রকৃত মিলন হইতে পারে না। ইহার ভিত্তি হইবে এত কাঁচা যে যে-কোন সময়েই ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। গঠনমূলক কার্য্যের দ্বারা কংগ্রেসকে মিলনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে প্রাণে—। বিলম্ব হইবে হয় ত সত্য, কিন্তু সে ভিত্তি হইবে এত দৃঢ় যে, আপে-পাশের স্বার্থান্বেষী হিন্দু-মুসলমানের চীৎকারে টুনকো কাচের ন্যায় ভাঙ্গিয়া যাইবে না।

বাঙ্গালার এ পর্য্যন্ত মুসলমানদিগের প্রকৃত কল্যাণকামী এরূপ কোন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে নাই,যাহা বাঙ্গালার এই বৃহৎ মুসলমান জনসঙ্ঘের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। যে মুষ্টিমেয় সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলমান প্রচারকার্য্য চালাইতেছেন, তাঁহাদের কার্য্য অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। বিশেষতঃ তাঁহাদের দ্বারা সমাজের আজ পর্য্যন্ত কিছুমাত্র উপকার সাধিত হয় নাই বলিয়া তাঁহাদের প্রতি মুসলমান জনসাধারণের আস্থা এত কম যে, কংগ্রেস যদি নিরপেক্ষ উদারতার সহিত দৃঢ় হস্তে এবং দৃঢ় চিত্তে প্রচার-কার্য্য চালান, তাহা হইলে শীঘ্রই ইহাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবেন।

উপসংহারে আর একটি কথা বলিতে চাই।

বাঙ্গালায় কোন chivalry নাই বলিয়া বোধ হয় আমরা আমাদের পুত্র-কন্যাদের আজ Rajput Chivalry পড়াইতে আরম্ভ করিয়াছি। যাহারা এইরূপ পুস্তকের পক্ষপাতী তাহাদের বলিতে চাই যে, হাজার বৎসরের পুরাণ জিনিষ লইয়া বিংশ শতাব্দীর ছাত্র-ছাত্রীদের প্রেরণা যোগাইবার মধ্যে যত বড় বৃহৎ উদ্দেশ্যই থাকুক না কেন, ইহা হিন্দু এবং মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীদের মনোবৃত্তিকে সঙ্কীর্ণ করিয়া আনিবে এবং এই সঙ্কীর্ণতা পরে হিন্দু-মুসলমান মিলনের মস্ত বড় প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইবে। কিশোরবয়স্ক বালক-বালিকাদের একবার যে মনোবৃত্তি গঠিত হইবে, পরে হাজার বক্তৃতা এবং উপদেশেও এই মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তন কখনই সম্ভব হইবে না। বর্ত্তমান ভারতে এমন মনীষীর অভাব নাই, যাঁহার লেখা পড়িয়া ছেলেরা অফুল জ্ঞান লাভ করিতে পারে। আমরা এদিকেও কংগ্রেসকে দৃষ্টি ফিরাইতে বলি। আজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এরূপ পুস্তকের প্রচলন হউক, যাহা ছাত্র-ছাত্রীদের মনোবৃত্তিকে উচু তারে বাঁধিয়া দিবে এবং প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী করিবে। মোট কথা, কংগ্রেসকে আজ সর্ব্বদিকে লক্ষ্য রাখিয়া অত্যন্ত বিবেচনার সহিত দৃঢ় পদবিক্ষেপে অগ্রসর হইতে হইবে। যাঁহারা স্বার্থান্বেষী, সামান্য যে কোনরূপ খাদ্য পাইলেই কামড়া-কামড়ি আরম্ভ করিয়া দেন, তাঁহারা তাহা করুন। সে শ্রেণীর লোক চিরদিনই বাঁচিয়া থাকিবেন,ইহারই মধ্য দিয়া কংগ্রেসকে আজ তাহার বিজয় অভিযান চালাইতে হইবে।

—দৌলতন্নেছা খাতুন

হিন্দু-মুসলমান ও পালা-পার্ব্বণ

আমাদের ভারতবর্ষে যত রকমের দুঃখ, দৈন্য কিংবা উৎসবাদি পরপর আসে, সবই হিন্দু ও মুসলমানকে জড়িত করিয়া আসে। নদীর একটি ক্ষুদ্র হাইফেন যেমন দুইটী শহরকে যোগ করে, সেইরূপ ভারতে নানা আকারের শান্তি, দুঃখ, দৈন্য ও উৎসব আবহমান কাল হইতে আসিয়া হিন্দু-মুসলমানের মাঝখানে হাইফেন হইয়া দাঁড়ায়।

হিন্দুদের দেবদেবীর পূজা লইয়া হিন্দু-মুসলমানে যেরূপ দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইতেছে ও হইয়াছে। ইহাতে উভয় পক্ষের যেমন ক্ষতি, গভর্ণমেণ্টের সেইরূপ ক্ষতি। এই হাঙ্গামা মিটাইবার জন্য সরকারকে অতিরিক্ত পুলিস, রিজার্ভ ফোর্স ইত্যাদি আমদানী করিতে হয়। তাহাতে অর্থ ব্যয় হয়। মুসলমানদের ঈদ্ বা মহরম ইত্যাদি পর্ব্বে কোন হাঙ্গার কথা শোনা যায় না। শোনা যায়, অমুক জায়গায় রথে কিম্বা দেবী-বিসর্জ্জনে খুনোখুনি হইয়া গেছে। তার জের থাকিয়া যায় অনেক দিন। মনোমালিন্য বাড়িয়া উঠে। দাঙ্গাকারীরা ভুলিয়া যায় যে, এই দেবদেবীর পূজায় জনসাধারণ কত অর্থ উপার্জ্জন করে। পূর্ব্ববঙ্গে দেখা যায়, সাধারণ বাজারে মুসলমান বিক্রেতা শতকরা নব্বই জন, হয়ত ইহার বেশীও হইতে পারে। চাল, ডাল হইতে আরম্ভ করিয়া তরকারী, মাছ পর্য্যন্ত মুসলমানরা বিক্রয় করে। হিন্দুরা নিশ্চয়ই শতকরা দশজন হিন্দু হইতেই দৈনিক প্রয়োজনের দ্রব্যাদি ক্রয় করে না? পূজায় যত ফলমূলাদি ক্রয় করা হয়, শতকরা

পঞ্চানন্দই টাকা মুসলমানেরই তহবিলে যায়। ইহা গেল ছোট-খাট পূজার ব্যাপার। কিন্তু দুর্গাপূজায় সেই অনুপাতে কত টাকা উপার্জ্জন করা হয়?

কথায় বলে হিন্দুদের বার মাসে তের পার্ব্বণ। আর মুসলমানদের সেই অনুপাতে কত কম পার্ব্বণ। সুতরাং মুসলমানদের ভাবিয়া দেখা উচিত নয় কি, যে হিন্দুদের পূজা উপলক্ষে কত মুসলমান পরিজনবর্গ ভরণপোষণ পায়, তথা উপার্জ্জন করে, সেই হিন্দুদের পূজোয় এমন দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয় কেন? একই গ্রামে, একই সহরে, একই পাড়ায়, বস্তীতে বাস করিয়া মনোমালিন্যের সৃষ্টি বর্দ্ধন করা কি বুদ্ধিমানের লক্ষণ? কৃতজ্ঞতা বলিয়া বাংলায় একটা কথা আছে, সেই কথার অর্থ কি মুসলমানরা ভুলিয়া গেলেন?

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলিলে হয়ত অন্যায় হইবে না। বন্যা-সাহায্য-ভাণ্ডারে যত হিন্দুদের নাম দেখা যায়, মুসলমানের সংখ্যা সেই অনুপাতে অনেক কম। তবে কি বাংলা-দেশের দেহদাসে মুসলমানের সংখ্যা হিন্দুদের চেয়ে কম? তাহারা কি মনে করে, বন্যা অঞ্চলে হিন্দুরাই ভাসিয়া গেল, আর মুসলমানরা বাঁচিয়া গেল? পূর্ব্ব বাংলায় মুসলমান বেশী। কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে মুসলমান বেশী। তাহারা কোন রকমে গাছে উঠিয়া বাঁচিল নাকি? আর হায়, হায় করিয়া মরিল হিন্দুরা? এই ধারণা যদি কাহারও থাকে, তাহা ভুলিয়া যাওয়া উচিত, কারণ ইহা সত্য নয়।

ইহাও দেখা গেছে শ্রাবন-পীড়িতের সাহায্যের জন্য যে ভিক্ষা-ভাণ্ড লইয়া মিছিল বাহির হয়, তাহাতে মুসলমানরা যোগ দেয় না। কেন? তাহারা যদি মনে করে, এই মিছিল কেবল হিন্দুদের এলাকায় এবং হিন্দুদেরই জন্য, তাহাও মিথ্যা; ইহা জাতিবর্ণনির্বিশেষে জনসাধারণের।

—শ্রীমতী ইলা দত্ত

স্মৃতি

—শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার নিয়োগী

একদিন এই চোখে লেগেছিল আলোর অঞ্জন,
এই দেহে এসেছিল যৌবনের ডাক,
আজি গেছে থেমে সব অন্ধকারে আকুল স্পন্দন,
অতৃপ্ত আবেগ হলো নিথর নির্ব্বাক্।

শীতকাল তরঙ্গের মোহমুগ্ধ আবেগ উচ্ছল
বনানীর শিরে শিরে শত ব্যাকুলতা,
মুক্তিস্রোতে বহে চলা তটিনীর উন্মাদ কল্লোল
চঞ্চল দখিন বায়ে মিলন-বারতা।

মর্ত্তের ধূলার 'পরে মোর লাগি স্বর্গের আসন
প্রস্ফুটিত হৃদয়ের ঐশ্বর্য্যের তলে,
পরাণের শ্রান্তিহারা তন্ময়িত প্রেম-আলাপন
যুগান্তের মৌন ভাষা নেত্র শতদলে।
একদিন ছিল সবই—জীবনের যা কিছু অমৃত
নিমেষের অন্তরীক্ষে গেল অস্ত পরিক্ত করি চিত।

বুল-ফাইট

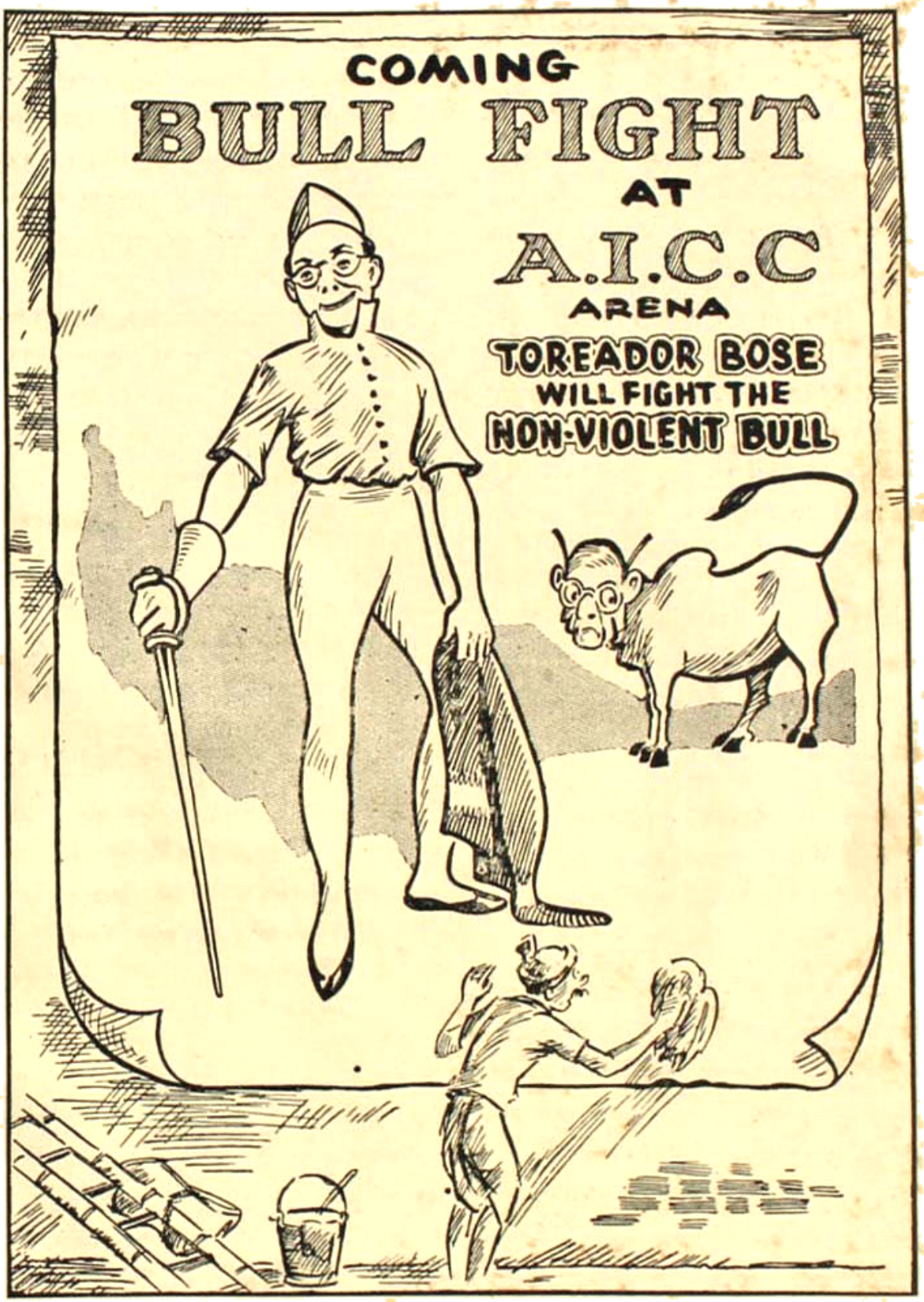
COMING
BULL FIGHT
AT
A.I.C.C
ARENA
TOREADOR BOSE
WILL FIGHT THE
NON-VIOLENT BULL

ছুটির দিন

—শ্রীপ্রভাতকুমার দেব সরকার

নানা কারণে মেজাজ বিগড়াইয়া আছে। বেলার খাটিয়া, ভুয়ো কথায় আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া, যখন-তখন ফাঁকামি করিয়া অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছি। কাহাকেও বুঝাইয়া উঠিতে পারি না, আমি কিছু চাহি না, তোমাদের মধ্যে থাকিয়া অন্তরাত্মা আমার শুষ্ক হইয়া উঠিতেছে—পাদাই-পালাই ডাক ছাড়িতেছে। কিন্তু কে শুনিবে? শুনাইলে হয় পাগল বলিবে, নয় উপহাস করিবে। সকলে যাহাতে হাসে, আমাকেও তাহাতে হাসিতে হইবে, অন্ততঃ ঠোঁটের দুই পার্শ্ব প্রসারণ করিতে হইবে। উপায় নাই! সকলে কাঁদিলে আমাকেও কাঁদিতে হইবে। কিন্তু কেন হাসিব, কেন কাঁদিব? হাসির উৎসমুখে যে বেদনা পুঞ্জীভূত রহিয়াছে, কান্নার কারণকে লইয়া যে এক বিরাট হাসির অভিনয় করা যায়, তাহাও বা কাহাকে বুঝাইব! এ পৃথিবীর প্রতি ধূলি-কণা যে আমাদের হাসি-কান্নার অভিনয়ে বিষাক্ত!

মনে হয়, ইহা অন্যায়, অত্যাচার, অপোহন!

মনে হয়, সুখ নাই, স্বস্তি নাই, শান্তি নাই; মানুষ নাই, বিচার নাই, বুদ্ধি নাই; সমাজ নাই, সভ্যতা নাই; প্রেম নাই, দয়া নাই, মায়া নাই। অথচ বাঁচিয়া আছি, হাসিতেছি, কাঁদিতেছি। 'কিছু নাই'-এর অস্তিত্বে নাক-কান বুজিয়া আছি,—খাইতেছি, ঘুমিতেছি, ঘুমাইতেছি, সুখ বোধ করি, গর্ব বোধ করি, সভ্যতার দম্ভ করি—আপাইয়া চলার গান গাই, সভ্যতার অভিযানে বিশ্বটট ভরিয়া দিই।...

স্ত্রী (নিজে অকর্মা বলিয়া তাঁহার নাম কর্মদেবী) বলিতেছিল, আমার কথাগুলো কী কানে গেল, না? একটা লোক চীৎকার করে' সারা হল, বাবুর সেদিকে খেয়াল নেই—মহাগর্বে আছেন। চিন্তায় মাথা ভরে, পেট ভরে না?

নির্লিপ্ত ভাবে কহিলাম, তোমার কথা শুনেছি, তোমার ফর্দও পকেটে পুরেছি। এর ওপর আর কী খেয়াল করব বল! চিন্তা করছিলাম—

কর্মদেবী তাড়া দিয়া উঠিল, আবার চিন্তা! আমার কথাও শোন নি, ফর্দও নাও নি, এক কথা একশ'বার বলতে পারি নে বাপু।

ম্লান হাসিয়া কহিলাম, তোমার ফর্দের কথাই ভাবছিলাম, কোন্ কোন্ দোকানে কী কী জিনিষ পাওয়া যাবে।

কপালে মৃদু আঘাত করিয়া কর্মদেবী কহিল, তবু ভাল! গরীবের কথা কানে গেছে। আচ্ছা, আর একবার শুনে মিলিয়ে নাও: খোকার সুট, খুকীর বালি, তোমলার মোজা, আমার—। কই শুনছ না? বার বার বলতে পারি নে! সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া রহিল।

জুতার ফিতা বাঁধিতে বাঁধিতে কহিলাম, বার বার বলাই তো তোমাদের অভ্যেস।

কর্মদেবী গড় গড় করিয়া ফর্দের পাতুলিপি পড়িয়া গেল। বুঝিলাম, আমি যে দিক্ দিয়া গিয়াছি, কর্মদেবী সেদিক্ একেবারে মাড়ায় নাই। বরং আমার কথায় বেশ আরাম পাইয়াছে।

রাস্তায় পা দিয়াও নিস্তার নাই, পিছন হইতে কর্মদেবী চীৎকার করিতেছে: সব যেন আসে, কিছু ভুলো না, সেদিনকার মত খুঁজতে যেন লোক পাঠাতে না হয়।

বাজারটা একটু দূর পথে। নানা অলিগলি পার হইয়া বড় রাস্তা এবং তাহারই উল্টা দিকে বাজার। বেলা দুইটা। নাগাদ বাহির হইয়াছি। ছুটির দিন, তাড়াও বিশেষ নাই। মন্থর গতিতে চলিয়াছি—রাস্তার আশে-পাশে নজর না করিতেছি এমন নয়।

এগিয়ে-চলা মানুষগুলিকে দেখিয়া চিন্তারাশি আলোড়িত হইতে লাগিল। মনে হইতেছে, ইহারা কেহ-ই সুখী নয়, ইহারা সকলেই আমার মত হাত-পা-বাঁধা—কর্তব্য কর্ম সম্বন্ধে কাহারও স্পষ্ট ধারণা নাই। আমার মত সকলেরই গৃহে কর্মদেবী অবস্থান করেন। সকলেই খায়-দায়, ঘুমায়, ছুটীর দিনে বাজার করে। রাস্তায় পরিচিত বন্ধুবান্ধবদের

সহিত সাক্ষাৎ হইলে অতি সাধারণ ভাবে আলাপ করে: এই যে! ভাল তো? তারপর?

তারপর ছেলের অসুখ, মেয়ের বিয়ে—বাজার খারাপ, কথা ফুরাইয়া যায়।

—আচ্ছা, আসি তা' হ'লে—বড্ড তাড়া—একদিন যেও না—গল্প করা যাবে।

কিন্তু উভয়েই বোঝে, গল্প তাহাদের কিছু নাই—পরস্পরের যোগ-সূত্র বহুকাল ঘুচিয়া গেছে।

হঠাৎ ধাক্কা খাইয়া চেতনা হইল। চোখ ফিরাইতে দেখি, একটি ভদ্রলোক কৃতাঞ্জলিপুটে, বস্ত্রপাটী বিকশিত করিয়া পরম বিনীতভাবে কহিতেছে: স্যর! কিছু মনে ক'রবেন না। টাল সামলাতে পারি নি, কলার ছোপায় পা পিছলে গেল।

মন-মেজাজ আরো বিগড়াইয়া গেল। আমি কি কানা, যে আমার কাছে 'স্যরি' বলিয়া দাঁত দেখাইতে হইবে? আমি কি এমনি বে আক্কেল যে, দেখিয়া-শুনিয়া কিছু মনে করিব? অবস্থা বুঝিয়া ক্ষমা করিবার মত উদারতা কি আমার নাই?

আরও খানিক দূর অগ্রসর হইয়াছি, উপায় থাকিলে সামনে বাড়িতাম। যে ভীড় কোন মতে ছুঁচ গলানও অসম্ভব। ভিড়ের প্রতি বাঙ্গালী মাত্রেরই কৌতূহল অধিক; তাই অনেকে দ্রষ্টব্য বস্তুর অগোচরে থাকিয়াও সম্মুখে খাড়া হইয়া গেছে। মারফতে খবর পাইয়া কৌতূহল নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে উপদেশ এবং মন্তব্য প্রকাশ করিতেছে। নিরুপায় ভাবে দাঁড়াইয়া আছি। অগ্রসর এবং পশ্চাদ্‌পদ হওয়া সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে সম্মুখের এবং পশ্চাতের প্রাণীগুলির উপর। এক সময় পিছন হইতে ঠেলা খাইয়া একেবারে ভিড়ের দ্রষ্টব্য বস্তুর সম্মুখীন হইলাম। যাহা দেখিলাম, তাহাতে মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত জ্বলিয়া উঠিল।

জনতার মাথা খারাপ হইয়াছে না কি? ভিড় করিয়া দাঁড়াইবার মত জিনিষ কী দুনিয়ায় আর নাই? বিচার-বুদ্ধির কথা ছাড়িয়া দিলেও হৃদয়াবেগও মানুষকে ত্যাগ করিল না কি? এমন করুণ দৃশ্যকে মানুষ উপভোগ্য করিয়া তুলিল কি করিয়া?

দেখি, একটি আবক্ষ অবগুণ্ঠনবতী রমণীর পশ্চাতে দাঁড়াইয়া গলায়-কাছা আট ন' বছরের একটি বালক ভয়ে থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। আর ঘোমটার আড়াল হইতে মেয়েটি অস্ফুটে উন্মত্ত জনতার অভিযোগে ক্রমাগত না—না করিতেছে।

পাশের একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ব্যাপার কী?

তিনি দুই চক্ষু যথাসম্ভব বিস্ফারিত করিয়া কহিলেন, ছোচ্চুরি মশাই! দিন-দুপুরে ডাকাতি! মেয়েটাও বজ্জাত, ছেলেটাও—

ভূমিকামাত্রই সময়-সাপেক্ষ। কহিলাম, আসল ঘটনা কী?

তিনি উত্তেজিত ভাবে কহিলেন, ঐ মাগী সেজেছে ঘা, আর ঐ ছোঁড়া সেজেছে ছেলে। গলায়-কাছা লাগিয়ে বাড়ী বাড়ী, দোকানে দোকানে বলছে, পিতৃ-দায়! সাক্ষী হয়েছে, ঐ ঘোমটা দেওয়া মাগটা। আসলে ওরা মাও নয়, ছেলেও নয়। ব্যাপার বড় গুরুতর মশায়!

পুরানো কাহিনী, অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলাম। মুখ দিয়া বাহির হইল, কে বললে?

তিনি মাথা চুলকাইতে লাগিলেন। আশে-পাশে আরও পাঁচ জনকে জিজ্ঞাসা করিলাম। কেহই সঠিক বলিতে পারিল না, ঠগ কে বাছিয়াছে। বুঝিলাম অনুমানের উপর এত জনতা খাড়া হইয়াছে। ঘটনা প্রকৃত হইলে না জানি আরও কত হইত!

তুমুল চীৎকারের মাঝে কাণে আসিল, উহারা যে মা ও ছেলের অভিনয় করিতেছে, তাহা ধরা পড়িয়াছে তখন, যখন ছেলেটীকে পিতৃনাম জিজ্ঞাসা করিয়া কোন উত্তর পাওয়া যায় নাই। ইহার পর মানুষ আর কি করিতে পারে? সদ্য-পিতৃহীন অষ্টম বর্ষীয় বালক যদি শোকে অভিভূত হইয়া পিতৃনাম উচ্চারণে অসমর্থ হইয়া মায়ের হাত ধরিয়া ঘোরে-দোরে সাহায্যের নিমিত্ত ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহা হইলে কর্ম্মব্যস্ত মানবের সন্দেহ করিবার কি কিছু থাকে না? জানিয়া শুনিয়া কে-ই বা প্রতারণা সহ্য করে? ধরা করিবার পূর্ব্বে ধরার পাত্রটীকে চিনিয়া লইবে না দাতা?

বোধ করি, ছেলেটীর উপর দিয়া পীড়ন হইয়া গেছে বহু পূর্ব্বে। হঠাৎ এক ব্যক্তি তাহার হাত ধরিয়া ঝাঁকানি দিতে কাঁদিয়া ফেলিল। সে যত কাঁদে, জনতা তত মার-মার করিয়া ওঠে।

চোখের সম্মুখে এত বড় অন্যায় দেখিতে হইবে। প্রতি-

বাদ করিবার মুখ নাই। কয়েক বারের অভিজ্ঞতায় বুঝিয়াছি, এ সকল ক্ষেত্রে প্রতিবাদ কতখানি দুর্বল। যুক্তি যেখানে নাই, সেখানে প্রতিবাদও চলে না—করিলে বরং উল্টা উৎপত্তি হইবার সম্ভাবনা। অন্ধ জনতা সন্দেহ করিয়া বসে, বুঝি বা তীক্ষ্ণবুদ্ধি আবিষ্কৃত জুয়াচুরীতে আমিও জড়িত। কাজে কাজেই মুখ বুজিয়া নিজের কাজে যাইতে হয়। পরের জন্য মাথা-ব্যথায় না কি স্বার্থসিদ্ধির অভিসন্ধি লুক্কায়িত রহিয়াছে!

তবুও করিলাম, মাথা ঠাণ্ডা করে মেয়েটীকে রিপোর্ট করলে হয় না?

মাথা ঠাণ্ডার কথায় ভদ্রলোক চটিয়া উঠিলেন। বস্তুর মত গরম হইয়া উত্তর করিলেন,—আরে মশাই, আপনি তো খুব মাথা-ঠাণ্ডার কথা বলছেন! আমরা মাথা গরম করে আছি না কি! যান, যান মশাই, অতো যদি গরজ নিজেই কেন রিপোর্ট করুন না!···হু, হু, নিজের মাথাকে সবাই ঠাণ্ডা রেখে!—তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমাকে দেখিয়া লইলেন, বোধ করি, সন্দেহের কিছু পাইলে আমাকেও একহাত লইতে পারেন।

আর কথা কহিলে কথা বাড়িবে বই কমিবে না। কোন মতে ভিড় ঠেলিয়া বাহিরে আসিলাম। কাছা-কাছি পাহারা-ওয়ালাকে ডাকিয়া দিয়া বাজারের দিকে অগ্রসর হইলাম। দূর হইতে দেখিলাম জনতা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। শত্রুর ভক্ত কি না লয়!···

আর একটা ছোট গলি পার হইলে বড় রাস্তায় পড়িব। কর্মদেবীর ফরমায়েসের তালিকা মাথায় কোথায় তলাইয়া গিয়াছে। মাথা হেঁট করিয়া চলিতেছি, আমার আবেষ্টনীর কথা ভাবিয়া লজ্জা ঢাকিবার স্থান পাইতেছি না। কবে এ ভারতভূমি হইতে প্রেম ও দয়া-দাক্ষিণ্যের আধিপত্য বিতাড়িত হইল? দয়ার পাত্রকে লইয়া ভারতবাসী কখন হইতে উপহাস করিতে শিখিল? মমতার পাত্রদের মধ্যে প্রবঞ্চনার স্থান পাইল কিরূপে? দানের মধ্যে যে মহৎ ভাব ছিল, সে মমত্ব বোধ ছিল, দান-করিতে-পাওয়া যাহারা পরম সৌভাগ্যের মনে করিত, তাহারা আজ কোন্ বিরুদ্ধ ভাবের সংঘাতে সেই মহত্বকে, সেই সৌভাগ্যকে, সেই মমত্ব-বোধকে জলাঞ্জলি দিয়া, রাস্তায় দাঁড়াইয়া এত বড় লজ্জাকর অভিনয় করে?···

আচমকা কানে আসিল: বিভাস দা, না?

মুখ তুলিয়া দেখি, আমাদের রাখাল। সেই যে-রাখাল আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া চাকুরী খুঁজিয়া হয়রান হইয়াছে তবু আশা ছাড়ে নাই। এখনও দেখা হইলে বলে, গাঁথতে পারলে হয় একবার! ঘুরে ঘুরে, বড়বাবুকে যখন পাকড়েছি। তারপর ভাবী চাকুরীর আশায় তবু বড়বাবুর গুণগানে সারা রাস্তা মুখরিত করিয়া তুলে।

রাখালকে দেখিলে কেমনতর আহ্লাদ হয়। ওর আশা-চিহ্নিত মুখে প্রবঞ্চক ধরণীর কোন প্রবঞ্চনা-ই খাটে নাই। এমন একখানা প্রদীপ্ত সতেজ মুখ খুব কম-ই নজরে পড়ে। আশ-পাশের দারিদ্র্যে মুখখানাকে কেন যেন এখনও শুকাইয়া তুলে নাই, তাহা-ই আশ্চর্য্যের!

হাসিয়া কহিলাম, কী খবর রাখাল? কেমন আছিস্? আর বাল-টাল না যে বড়?

রাখাল বেশ সহজ ভাবেই কহিল, কেমন আছি? তা মন্দ কি! খাই-দাই, বগল বাজাই। আর যাওয়ার কথা যদি বল তো বলতে হয়, সময় পাই না। বেকারের সময় কোথা দাদা!—হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

বলিলাম, সময় পাস নে মানে? সারাদিন কী করিস?

রাখালকে একটু চিন্তিত দেখা গেল। তারপর চট করিয়া উত্তর দিল, গরু চরাচ্ছি আজকাল—লেজ মুড়ি আর হেট্ হেট্ করি।

কথাটা এমন ভাবে বলিল, যেন সত্যই ও গরু চরাইতে আরম্ভ করিয়াছে এবং গরু-চরান ওর যোগ্য কাজ।

বলিলাম, হেঁয়ালী রাখ। চাকরি-বাকরি যোগাড় করেছিস কিছু?

হাসি টানিয়া উত্তর দিল: না, হব-হব করেছে। অনেক-গুলো বড়বাবুর সন্ধান পেয়েছি—তাঁদের কাছে হাজিরা দিতেই সময় চলে যায়।

—রোজ যাবার দরকার?

রাখাল মাথা নাড়িয়া গম্ভীর ভাবে কহিল, সে তুমি বুঝবে না বিভাস দা, কারো কাছে যদি রোজ না যাই, তিনি বলেন, এই তো। সময় মত এসি না, কাজটা হাত ছাড়া হয়ে গেল। সবারই এক কথা। কাজ কী দাদা অত গণ্ডগোলে! একটা সময় বেঁধে নিয়েছি, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে

চক্ষুকে একবার করে দর্শন দিয়ে আসি। এর পর তো আর কেউ বলতে পারবে না: রাখাল বাবু এল না বলেই আর একজনকে দিতে হল। আমার দিকে চাহিয়া রাখাল হাসিল।

বুঝিলাম, সরল রাখাল বক্র হইয়াছে। তা' রাখালেরই বা দোষ কি! প্রবঞ্চনার বাজারে প্রবঞ্চক ব্যাপারী না হইলে বেসাতিটি বা চলবে কি রূপে?

কহিলাম, তা' হ'লে তুই বড়বাবুদের বেহু মনে করিস?

রাখাল জিভ কাটিয়া দুইকর ললাটে ঠেকাইয়া কহিল,—ছি ছি, ও কথা মনেও ভাববেন না দাদা। কী বুঝিস? তাঁরা আলাদা—গো ব্রাহ্মণ যে এক-ই তিনিষ দাদা হিন্দুর কাছে!

হাসিয়া বলিলাম, আজকাল বুঝি ওজন মাফিক কথা বলিস্? যা' ব'লেছিস আমার কাছে, আর কারও কাছে বলিসনি যেন—জগতে কান-ভাঙ্গার অভাব নেই।

রাখাল মাথা নাড়িল: তা' যা বলেছ দাদা,—দাঁড়াও তোমার সামনেই প্রায়শ্চিত্ত ক'রে নেই। বলিয়া নিজের গালে নিজেই চ'ড় কষিল।

রাখালের আলাপ ক্রমশঃ বিদ্রূপাত্মক হইয়া পড়িতেছে। আর ইহার উৎপত্তি-স্থল যে কোথায় তাহাও বেশ বুঝিলাম। বার বার আশাভঙ্গ হইয়া এমনটি সম্ভব হইয়াছে।

আমার হাতঘড়িটায় নজর পড়ায় রাখাল লাফাইয়া উঠিল: অ্যাঁ, সাড়ে ছটো! এই সেরেছে! আজ আর এক-জনের কাছে যা' হক একটা হেস্ত-নেস্ত হ'বার কথা ছিল।

কৌতূহল দমন করিতে পারিলাম না, কহিলাম, আর একজন মানে? এক-ই দিনে ক'জনে তোর হেস্ত-নেস্ত করে রে রাখাল? এর আগের জন কী ক'রলে শুনি?

রাখাল পা বাড়াইয়াছিল। কহিল,—সে মহাভারত। কারণ-উপকারণের কুড়ি রে দাদা!

—তবে থাক, কিন্তু আমার পোড়ার প্রশ্নের উত্তর দিলি নে?

হাসিয়া রাখাল ঘুরিয়া দাঁড়াইল। ডান হাতের কনিষ্ঠার মাথার উপর অঙ্গুষ্ঠ রাখিয়া কহিল,—হেস্ত নাবেস করেন একজন, কিন্তু বেকারের হেস্ত-নেস্ত হয় অনেকের দ্বারা। এটা তত্ত্ব কথা। আজ আসি—

যাইতে যাইতে রাখাল কহিল,—'যা নিদাঘ'—কে ভিত্তি করে যামাগণ তোদের হয়েছিল। আমার মহাভারতের শুধু গোড়াটা শুনে রাখ: Advertisement appearing in yesterday's A—was not put according to our orders. We regret to say, we have no vacancy···so and so.পার তো মনে মনে মহাভারত বানিও।

আচমকা হাসির শব্দে চারিদিক ধ্বনিত হইল, কিন্তু রাখালকে আর দেখা গেল না। বেশ বুঝিতে পারিতে-ছিলাম, পা দুইটা আর নড়িতে চাহিতেছে না। কোথাও যেন গণ্ডগোল বাধিয়াছে। সহসা মনে হইল, রাখাল আমাকেও বিদ্রূপ করিয়া গেছে। ও সোজাসুজি ভাবে গালি পাড়িয়া গায়ের জ্বালা মিটাইতে চাহিয়াছিল, আমি বাধা দেওয়ায় গালে চড় খাইয়াছে। মনে হইল, সত্যই তো অপরাধ করিয়াছি। সরল রাখালদের অভিযোগ অস্ত্রতার দোহাই দিয়া কেবল চাপিয়াই আসিয়াছি। কিন্তু রাখালদের পুঞ্জীভূত বেদনা উপশমের কী ব্যবস্থা করিয়াছি? একটু আগে প্রবঞ্চনার ভয়ে ভীত জনতাকে অন্ধ বলিয়া, মূর্খ বলিয়া, হৃদয়হীন বলিয়া গালি দিয়াছি; কিন্তু কেন তাহারা প্রবঞ্চনা-ভীত, তাহা লইয়া কি মাথা ঘামাইয়াছি কোন দিন? ছাপার অক্ষরে বিজ্ঞাপন বাহির করিয়া যাহারা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে ঠকাইতেছে, তাহাদের ত' কিছু বলি নাই। তবে ঠেকিয়া-শেখা রাখালদের ব্যবহারে এত মাথা ঘামাই কেন? নিজের ব্যবহারে লজ্জায় মরিয়া গেলাম। ছি ছি। এটা ভুলিয়া গেলাম যে, সামন্যা রক্ষাখেট এ পৃথিবী সর্ব্বদাই উৎপন্ন। তাহার মধ্যে যেটুকু অন্যায় দেখি, তাহা ঐ ছাপার অক্ষরের পিছনে বড়বাবু-সমাজ। ইহাও মাথায় আসে না?

রাখালের কিছুদিন আগেকার কথাবার্ত্তা মনে পড়িল। বাঁকা কথার ধার ধারিত না, বিদ্রূপ কাহাকে বলে জানিত না। একপ্রকার সরলতার প্রতীক। আজ সে এমন হইয়াছে! না জানি কত বড় ছলচাতুরী এবং দারিদ্র্যের সংস্পর্শে আসিয়া তবে ওর জীবনে এতবড় পরিবর্ত্তন সম্ভব হইয়াছে! ভাবিলাম, আবাম-কেদারায় শুইয়া জগৎকে সরল দেখিবার ইচ্ছা পোষণ করা কত বড় বিড়ম্বনা। নিজে দারিদ্র্য-জ্ঞানহীন হইয়া জগৎকে দারিদ্র্যপূর্ণ করিতে চাই। লজ্জা করে না আমার?

গেল! গেল! শব্দে পিছনে তাকাইলাম। দেখি, আমারই গোড়ালীর কাছে আসিয়া একটী সাইকেল উল্টাইয়া পড়িয়াছে এবং তাহার আরোহী কিয়দ্দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। তাঁহার স্থানে স্থানে কাটিয়া রক্ত পড়িতেছে। কিন্তু তিনি তখনও নির্ব্বিকার চিত্তে ধূলা ঝাড়িতেছেন এবং তাঁহাকে চক্রাকারে বেষ্টন করিয়া জনতা হৈ-চৈ করিতেছে।

অল্পে অল্পে ব্যাপারটা পরিষ্কার হইয়া গেল। আমারই অন্যমনস্কতার জন্য ভদ্রলোকটীর ঐ দশা হইয়াছে। ভদ্রলোক পঞ্চাশবার 'বেল' দেওয়া সত্ত্বেও আমি নড়ি নাই, বাধ্য হইয়া 'ব্রেক' করিয়া ভদ্রলোক নিজের জীবন বিপন্ন করিয়াছেন। দোষ সম্পূর্ণ আমারই, কেন না, আমি যাইতেছিলাম 'হুড্-সাইডে' 'বেল' শুনিয়াও পথ ছাড়ি নাই।

পাশের একজন বলিল, খুব বরাত-জোরে বেঁচে গেছেন মশায়!

শুধু কি বরাতজোর! আমাকে না চাপা দেওয়ার ঐ ভদ্রলোকের কি কিছু কৃতিত্ব নাই? বাঁচিয়া যাওয়ার মধ্যে নিজস্ব বরাত ছাড়া ভদ্রলোকের দয়ার কোন কথাই কী আসে না! আমাকে বাঁচাইতে গিয়া নিজে রক্তারক্তি হইলেন কেন? কেন স্বজাতির প্রতি, স্বগোত্রের প্রতি এত মমত্ব, এত দরদ, এত উদারতা? আত্মপরে এতটা টান, এই পৃথিবীর, এই মানব গোষ্ঠির স্বভাবজ নিষ্ঠুরতার, অনুদারতার এবং আত্মপর-ভেদাভেদ জ্ঞান-এর সহিত ইহার মিল কোথায়? বরং সবচেয়ে বেখাপ্পা এবং বেয়াড়া। জীবনলীলার দয়া-মায়া-প্রেম-মমত্ব-মহত্ব সকলই তো বর্ত্তমানে কবিতার পর্য্যায়ভুক্ত; সেখানে যাহা সব থেকে প্রাচীন, সব থেকে বাস্তব, সেই প্রতিনিয়ত অনুষ্ঠিত অন্যায়, অবিচার, অনুদারতা, স্বার্থ-হিংসা-দ্বেষ সংকৃতি পঙ্কবৃত্তির সহিত ইহার সহযোগিতা কোথায়?

ভদ্রলোক কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, খুব চোট লেগেছে না কি?

তাড়াতাড়ি মাথা নাড়িয়া বোকার মত তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। সহসা কোন উত্তরই যোগাইল না। আমার হইয়া পাশের পাঁচজনে বলিয়া দিল: সে কি মশায়! চোট বরং আপনারই লেগেছে, ওঁর কেশাগ্রও আপনার সাইকেল স্পর্শ ক'রতে পারেনি।

ভদ্রলোক মাথা নাড়িয়া কহিলেন, না না, লাগতে পারত! সাইকেলটা আমার তেমন ভাল ছিল না।

এই উদার ভদ্রলোকের কাছে আপনাকে কেমন ছোট মনে হইল। ধন্যবাদের কোন ভাষাই খুঁজিয়া পাইলাম না। বহুকষ্টে মুখ দিয়া বাহির হইল: আমারই জন্যে আপনার অতটা কেটে গেল।

ভদ্রলোক স্নিগ্ধ হাস্যে কহিলেন, সামান্য। অমন তো দিনে পঞ্চাশবার কাটে, এ আর এমন কী!···

মনটা হাল্কা হইয়া গিয়াছে। মনে হইতেছে, এ পৃথিবীতে সবই আছে—কম আর বেশী। সমষ্টিগত পাপ, ব্যক্তিগত পুণ্যের পরশে ধুইয়া মুছিয়া যাইতেছে। যত কিছু আদর্শ, মহত্ব, সকলই ব্যক্তি-বিশেষের কীর্ত্তি; সমষ্টি তাহার অংশ লইয়া মহত্বের অধিকারী হয়। পাঁচজনকে লইয়া সমাজ-সভ্যতা, কিন্তু তাহার আদর্শ ঐ ব্যক্তিবিশেষের অনুষ্ঠিত, প্রবর্ত্তিত কার্য্যাবলীর সমষ্টি মাত্র।···

• • •

সবেমাত্র বড় রাস্তায় পা দিয়াছি, মার-মার কাট-কাট শব্দে কানে তালা লাগিবার উপক্রম হইল। চোখের সামনে যাহা দেখিলাম, তাহাতে ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া গেলাম। আস্ত বাঁশ এবং নরমুণ্ডের এমন সচরাচর চোখে পড়ে না। ফট্ ফট্ শব্দ হয়, ঝিন্‌কী দিয়া রক্ত ছোটে।

ভিড় নাই, কেবলমাত্র অসংবদ্ধ যোদ্ধৃগণ পরস্পরের মাথা লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া যায়, পিছাইয়া আসে। দেখিতে দেখিতে মানুষের রক্তে পীচের রাস্তা আবীর-রাঙ্গা হইয়া গেল। কে বা শত্রুপক্ষ, কে বা মিত্রপক্ষ, কিছুই বোঝা যায় না। সামনে অগ্রসর হইবারও কোন উপায় নাই, কারণও সঠিক জানা যায় না। সম্ভবতঃ কোন মত বা বাক্যকে উপলক্ষ্য করিয়া এই রক্তপিপাসু যুদ্ধের অবতারণা। রাজ্যজয় বা সম্পত্তি দখল লইয়া তো কোন মতেই নয়, কেন না, বর্ত্তমান যুদ্ধক্ষেত্র কলিকাতার প্রকাশ্য রাজপথ, এবং বিদ্যমান যোদ্ধৃগণ একই সরকার-আশ্রিত।

চোখের উপর দুই তিনটা ধরাশায়ী হইল। বাকিগুলি ফাটা মাথা বাম হস্তে চাপিয়া ধরিয়া তা-থৈ নৃত্যে কুঁদিয়া বেড়াইতে লাগিল। আশ-পাশের দোকানগুলির ঝাঁপ পড়িয়া গিয়াছিল। শূন্য রাস্তাটা তাহাদের দাপাদাপিতে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। মনে হইল, এই আর্ত্তনাদ মৃত্তিকার শত-

সাস্ত্র স্তর ভেদ করিয়া ইহাদের পায়ের কাছে আসিয়া আছড়াইয়া পড়িতেছে। অপ্রকৃতিস্থ রক্তপিপাসু বিরোধী মানবের কাছে সেই আর্তনাদের স্বরটা কত ক্ষীণ, কত অর্থহীন!

আপন কর্তব্য সম্বন্ধে নিশ্চেষ্ট হইয়া গেছি। চীৎকার করিতে গেলাম, স্বর বাহির হইল না। কি করিয়া এই মানুষগুলিকে বুঝাইব, রক্তারক্তি করিলে তোমাদের কেহ হয়ত রাজ্য লাভ করিবে, স্বীয় মত দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে, লঘু অপরাধের গুরু সাজা করিতে পারিবে—বড় জোর, হুজুর স্বার্থকে সাফল্য-মণ্ডিত করিতে পারিবে; কিন্তু তোমরা যে পশুত্বের পর্যায়ভুক্ত হইতেছ, তাহা হইতে কে তোমাদের মানবের আসনে অধিষ্ঠিত করিবে? যে পথ তোমরা বাঁশের সাহায্যে রুদ্ধ করিতেছে, তাহা যে শত-বৎসরের সংস্র আবেষ্টনে আর অর্গলমুক্ত হইবে না! রুদ্ধ দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া তোমাকে যে একদিন মাথা কুটিয়া মরিতে হইবে!

হাসি পাইল, নিজের ছেলেমানুষীতে। কাহার জন্য চীৎকার করিব? কাহাকে মানবতার মূল কথা শুনাইব? আমার এ ব্যাকুলতার মূল্যই বা কতটুকু!…

সময় মত সকল-ই হইল। পুলিশ আসিয়া ধরাশায়ী মানুষগুলিকে হাঁসপাতালে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিল এবং বাকিগুলিকে হাত-কড়া পরাইয়া চালান দিল। যুদ্ধ শান্ত হইবার পর দোকানগুলি আর উদ্ঘাটন করিল। মারামারির কারণ যেটুকু জানিলাম, তাহা এইরূপ :—

লতিফ্ বলিয়া এক ব্যক্তি মদ খাইয়া রাস্তা চলিতেছিল। নেশার ঘোরে সে না কি কাহার ঘাড়ে পড়িয়া যায়। তাহাতে লতিফকে বা দুই চড় কষাণ হয় এবং তাহারই ফলে তাহার ছইয়া লোক অস্ত্রশস্ত্র লইয়া এই খণ্ড প্রলয়ের অবতারণা করে।

ব্যস্, ইহাতেই রক্তপাত! কিন্তু কতটুকুই বা কারণ। মাতাল লতিফের না হয় মাথা খারাপ হইয়াছিল, কিন্তু যাহারা প্রকৃতিস্থ থাকিবার গর্ব করে, তাহাদের কি হইয়াছিল? সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, ভাই-এ ভাই-এ প্রতি-নিয়ত যে ঈর্ষা ধূমায়িত হইয়া উঠিতেছে, ইহা কী তাহার ফল নয়? কী তুচ্ছ ব্যাপার! যাহা মনুষ্য-বুদ্ধিতে মানিয়া মানাইয়া লওয়া যায়, তাহা লইয়া এত বড় কাণ্ড! এ যেন পৈশাচিক লীলা!

সব দেখিয়া শুনিয়া তো মনে হয়, বিবেকবুদ্ধি বলিয়া কোন বস্তুরই বালাই মানুষের নাই। প্রেম, মায়া, মমতা, এগুলো শুধু বানান কথা। মানুষ মারমুখী, হিংস্র, শ্বাপদ প্রাণীর সহিত তাহার পার্থক্য শুধু আকৃতির; প্রকৃতির ইতর-বিশেষ কিছু নাই।

কিন্তু এ কথাগুলি ভাবিতেও যেন অন্তর বেদনায় ভরিয়া গেল। চোখের সামনে সেই সাইকেল-চালকের আচরণ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সেই সৌম্য মুখ, সেই সহাস্য আচরণ, সেই মধুর বদান্যতা, সেই আপন করিয়া লওয়া ভাব, সকল-ই যেন আমার দৃষ্টি-শক্তিকে প্রবল বেগে আকর্ষণ করিতে লাগিল। মুহূর্তে আলোকের সন্ধান পাইলাম, পৃথিবীকে যেন নবীন মনে হইল। পরমুহূর্তে আবার মানুষের পশু-আচরণের দৃষ্টান্ত আসিয়া ফুঁ দিয়া আলো নিভাইয়া দিল। আমার চারিপাশে অসংখ্য পিশাচের নৃত্য আরম্ভ হইল। তাহারা দীর্ণ হাত বাড়াইয়া আমায় আক্রমণ করিতে ছুটিয়া আসিল। পালাইবার পথ নাই, তাহাদের অট্টহাস্যে কর্ণপটাহ ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল। প্রবল চাপে শ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হইল।…নিশ্চল হইয়া গেছি। পলাইবার পিছাইবার শক্তি লোপ পাইয়াছে। মানুষের এই অনুকূল প্রতিকূল আচরণের মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায়? মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তিই বা পাকা করিব কী দিয়া? এত বিভিন্ন মত, এত বিভিন্ন পথ, এত বিপরীত আচার-ব্যবহার; এত ছোট-বড়, এত ভাল-মন্দ, এত ইতর-মহৎ—ইহার মধ্য দিয়া জগৎ চলিয়া আসিল কিরূপে? ইহাদের ঐক্য-ই বা কোথায়? কোন্ সুনির্দিষ্ট নিয়মে, এত বড় অসংবদ্ধ, অসংযত পৃথিবীটা চলিতেছে?

* * *

বাজার সারিয়া দোর-গোড়ায় সবে পা দিয়াছি, গৃহিণী বিদ্রূপ করিয়া কহিলেন, তবু ভাল, আমার কপালগুণে ফেরা হয়েছে! কোথাও চাপা-টাপা পড় নি তো?

জামা ছাড়িতে ছাড়িতে কহিলাম, পড়ি নি, তবে পড়ব এক দিন।

যুগল ভ্রূ ঊর্ধ্বে তুলিয়া গৃহিণী কহিলেন, মরি, কী কথার ছিরি!

লুই পাস্তুর

—শ্রীনীলরতন কর

রেশমকীটের ব্যাধি বিষয়ে গবেষণাকল্পে অ্যালেতে গমন

সুরা ও মদ্যের বিকৃতি বিষয়ে অনুসন্ধানকালে পাস্তুর রেশমকীটের এক ব্যাধির হেতু নির্ণয়ে মনোনিবেশ করেন। সেই সময়ে রেশমকীট-রাজ্যে ভীষণ মড়ক উপস্থিত হইয়াছিল। সেই মহামারীর কারণ নিরূপণের জন্য ফ্রান্সের পশু-পালন বিভাগ রাজ্যের কর্তৃপক্ষদের নিকট আবেদন জানান। সেনেট-পরিচালন পরিষদের সদস্য বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, জে. বি. দ্যুমা ইহার প্রতিকারের নিমিত্ত গবেষণা করিতে পাস্তুরকে অনুরোধ করেন। তদুত্তরে পাস্তুর লিখিলেন :—"আপনি আমার উপর যে কাজের ভার দিতে চাহেন, তাহাতে আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছি। এই অনুসন্ধানের বিষয়টি অত্যন্ত লোভনীয় এবং ইহার উদ্দেশ্যও খুব মহৎ কিন্তু আমি বড় সমস্যায় পড়িয়াছি। ভাবিয়া দেখুন, এ সম্বন্ধে আমার কাজ করা ত দূরের কথা, আজ পর্যন্ত আমি কোন রেশমকীট স্পর্শও করি নাই। যদি এ প্রসঙ্গে আপনার অভিজ্ঞতার অংশমাত্রও পাই তাহা হইলে আমার দ্বিরুক্তির আর কোন কারণ থাকে না; হয়ত এই বিষয়টি আমার গবেষণার গণ্ডীর মধ্যে আসিতে পারে।

"আমার প্রতি আপনার অশেষ করুণার কথা স্মরণ করিয়া মনে হইতেছে যে এ বিষয়ে আমার অসম্মতি জানাইতে হইলে অন্তরে মর্মান্তিক বেদনা পাইব। আমার দ্বারা আপনি যথেচ্ছা খুসী কাজ করাইয়া লইতে পারেন।"

এই কার্য উপলক্ষে অ্যালেতে যাইবার আগে পাস্তুর কাত্রফাজ নামে তাঁর এক সতীর্থ কর্তৃক লিখিত রেশমকীট সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ পড়িয়া লইয়াছিলেন। তাহাতে লেখা ছিল যে, কিঞ্চিদধিক চারি হাজার বৎসর আগে চীনদেশের সম্রাজ্ঞী প্রথমে রেশমসূত্রের ব্যবহারবিধি জ্ঞাত হন। চীনারা বহুকাল যাবৎ এই মহামূল্য গুটিপোকার একচেটিয়া ব্যবসায় করিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহারা রেশমকীট ও তাহার বীজ সাম্রাজ্যের সীমা-রেখার বাহিরে লইয়া যাওয়াকে এক গর্হিত অপরাধ বলিয়া গণ্য করিতেন। ইহার দুই সহস্র বৎসর পরে এক তরুণী রাজকুমারী তাঁহার বাগ্‌দত্ত প্রিয়-পাত্রের সহিত সাক্ষাতের জন্য মধ্য-এশিয়ায় গমনকালে তাঁহার প্রীতির নিদর্শন প্রদর্শনের ইচ্ছায় ও বিবাহের পরে গমনীয় চীনাংশুকের ব্যবহারের মানসে এই নীতির লঙ্ঘন করেন। প্রায় দেড় হাজার বৎসর আগে দুইজন পারস্য-দেশীয় ভিক্ষু চীন হইতে রেশমী-পোকার বীজ অপহরণ করিয়া গুপ্তভাবে ইউরোপে লইয়া যান। সেই সামান্য পরিমাণ বীজ হইতে উৎপন্ন রেশমকীট শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বংশ বৃদ্ধি করিয়া এবং গুটি বয়ন করিয়া ফ্রান্স ও ইতালীকে উৎকৃষ্ট রেশমের জন্য প্রখ্যাত করিয়াছে। খৃষ্টীয় তিন শত অব্দে জাপানীরা কোরিয়াবাসীদিগের সাহায্যে চীনাদের নিকট হইতে রেশমকীট-পালন ও রেশমী বস্ত্র-বয়ন পদ্ধতি বিষয়ে জ্ঞাত হন। সম্ভবতঃ ইহারই কিছুকাল পরে রেশম ব্যবসায় পশ্চিমাভিমুখে সম্প্রসারিত হয় এবং রেশম-কীট চীন গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের তীরবর্তী স্থানসমূহে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সিরিয়া, পারস্য ও ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী দেশসমূহে, এবং ভারতবর্ষ, ইতালী ও ফ্রান্স পৃথিবীর মধ্যে সর্বপ্রধান রেশম উৎপাদনের কেন্দ্র ছিল। ১৮৪০ হইতে ১৮৫০ অব্দে চীনের সহিত ইয়োরোপের বাণিজ্যের সূত্রপাত হয় এবং সাংহাই ও ক্যান্টনের বন্দর হইতে বহুল পরিমাণে রেশম রপ্তানী হইতে থাকে। যে সময়ে রেশমকীটের রোগ হেতু ইয়োরোপে রেশম উৎপাদন কমিয়া গিয়াছিল, সেই সময়ে এই রপ্তানী প্রাধান্য লাভ করে। এশিয়া হইতে যে সকল রেশম ইয়োরোপে রপ্তানী হইত, তাহা ইতালী ও ফ্রান্সের রেশম অপেক্ষা দরে সুলভ থাকিলেও সেখানকার মত উৎকৃষ্ট ছিল না। ইয়োরোপের রেশম-কীটের মধ্যে মড়ক সুরু হওয়ায় এশিয়া হইতে মাঝারি ধরণের রেশম খুব বেশী পরিমাণে যাইতে আরম্ভ করে, কিন্তু উৎকৃষ্ট রেশমের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়াতে ভূমধ্যসাগরের

পূর্ব্বদিকস্থ রেশমসমূহের গুটিপোকাচাষীগণ ইয়োরোপীয়দের নিকট গুটি বিক্রয় করিতে আরম্ভ করেন এবং তাহা হইতে ইয়োরোপীয়গণ ইতালীয় পদ্ধতিতে রেশমগুটি হইতে খুব মূল্যবান রেশম প্রস্তুত করিতে থাকেন। ১৮৫৭ অব্দে জাপানী রেশমের রপ্তানী আরম্ভ হয় এবং অল্পদিনের মধ্যেই প্রতিযোগিতায় বাঙ্গলার রেশম ব্যবসায়কে সম্পূর্ণ হটাইয়া দেয়।

১৭০০-১৭৮৮ অব্দের মধ্যে ফ্রান্সে প্রতিবৎসর প্রায় ৬০,০০,০০০ কিলোগ্রাম (এক কিলোগ্রাম ২·২ পাউণ্ডের সমান, এক সের অপেক্ষা সামান্য অধিক) রেশমগুটি উৎপন্ন হইত। সাধারণ-তন্ত্রের সময় ইহার উৎপাদন প্রায় অর্দ্ধেক হইয়া যায়, কিন্তু প্রথম নাপোলেঁর চেষ্টায় ফ্রান্সের রেশম ব্যবসায় পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়া যায়। তাঁহার সময় হইতে ফ্রান্সের পলু-পালন ব্যবসায় ক্রমেই উন্নতিলাভ করিতেছিল। অবশেষে লুই ফিলিপের সময় তাহার এতদূর উন্নতি হয় যে, প্রতি বৎসরে ২,০০,০০,০০০ কিলোগ্রাম ওজনের বা ১০,০০,০০,০০০ ফ্রাঁ মূল্যের রেশমগুটি উৎপন্ন হইতে থাকে। কিন্তু এই সমৃদ্ধ দশা বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই। কোথা হইতে এক মহামারীর সংক্রমণ ছড়াইয়া পড়িল, তাহা বহুদিন পর্য্যন্ত কেহই নির্ণয় করিতে পারেন নাই। কেবল এই ব্যাপারটি অনেকের প্রত্যক্ষ হয় যে, রোগাক্রমণের পূর্ব্বে কীটের গায়ে ছোট ছোট বাদামী বা কাল রঙের দাগ দেখা যায়।

কাত্রফাঁজ রোগটির নাম রাখেন পেবৃ্রিন। ১৮৪৫-১৮৪৭ অব্দে রোগটি প্রথম আরম্ভ হয়; ক্রমে ১৮৪৯ অব্দে অত্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়া দক্ষিণ ফ্রান্সে ছড়াইয়া পড়ে। ১৮৫৩ অব্দে সেখানকার অধিবাসীরা লম্বার্দি নামক স্থান হইতে রেশমকীটের বীজ সংগ্রহ করিত। কিন্তু এক বৎসর যাইতে না যাইতে ইতালী এবং অষ্ট্রিয়ার সর্ব্বত্র সেই মড়ক আরম্ভ হইল। তখন সকলে গ্রীস এবং তুরস্ক হইতে বীজ আনাইতে লাগিল। ১৮৬৪ অব্দে এই রোগ সকল দেশেই ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। চীনদেশও বাদ যায় নাই। শেষে একমাত্র জাপান ছাড়া আর কোথাও সুস্থ রেশমবীজ পাইবার উপায় রহিল না।

এই রোগের কারণ বিষয়ে নানা লোকে নানা কথা বলিতে লাগিলেন। কেহ বলিলেন, আবহাওয়ার দোষ, কেহ বলিলেন, রেশমী পোকার জাতিরই অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছে; কেহ বা বলিলেন, তুঁতগাছের কোন রোগ হইয়াছে। নানা ব্যক্তির কথায়, লেখায়, বিবন্ধে, প্রবন্ধে কাগজপত্র ভরিয়া উঠিল। কিন্তু রোগের প্রতিকার করিতে কেহই পারিলেন না।

পাস্তার এ সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া কি ভাবে রেশমকীটের রোগের প্রতিকার করিয়াছিলেন, সে কথা আলোচনা করার পূর্ব্বে রেশমকীটের জীবন-বৃত্তান্ত সংক্ষেপে জানিয়া রাখা প্রয়োজন।

প্রজাপতি-জাতীয়, ধূসরাভ শ্বেতবর্ণ-বিশিষ্ট এক প্রকার পতঙ্গ রেশমগুটি উৎপাদন করে। তাহাদের মধ্যে পুরুষ-পতঙ্গগুলি দৈর্ঘ্যে প্রায় আড়াই ইঞ্চি এবং স্ত্রী-পতঙ্গগুলি তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ দীর্ঘকায়। সাধারণতঃ রেশম পোকা বৎসরে একবার মাত্র ডিম্ব প্রসব করে, আবার কোন কোন রেশম পতঙ্গকে বৎসরে দুই বা ততোধিক বার ডিম্ব প্রসব করিতে দেখা যায়। যাহারা বৎসরে একবার মাত্র সন্তান উৎপাদন করে, তাহাদের একচক্রী (univoltine) এবং যাহারা বৎসরে দুই বা ততোধিক বার সন্তান উৎপাদন করে, তাহাদের বহুচক্রী (multivoltine) বলে। একটি স্ত্রী-পতঙ্গ চার হইতে ছয় দিনের মধ্যে প্রায় পাঁচশত ডিম্ব প্রসব করে। সেই ডিমগুলি অত্যন্ত ক্ষুদ্রাকার, একশত ডিমের ওজন প্রায় এক গ্রেন। রেশম-পতঙ্গের ডিম ফুটিয়া যে বাচ্চা বাহির হয়,তাহাকে কীড়া (larva) বলে। তুঁত গাছের পাতা তাহাদের স্বাভাবিক খাদ্য। কীড়া তুঁতপাতা খাইয়া যখন খুব বাড়িয়া উঠে, তখন তাহাদের দৈর্ঘ্য হয় তিন বা সাড়ে তিন ইঞ্চি। এই আকার লাভ করিতে তাহাদের খুব বেশীদিন সময় লাগে না।

কোন কোন রেশমকীট কীড়া-অবস্থায় তিন বার খোলস ছাড়ে (moult), কিন্তু অধিকাংশ রেশম পোকা ডিম ফুটিবার ষষ্ঠ দিনে, দশম দিনে, পঞ্চদশ দিনে এবং ত্রয়োবিংশ দিনে খোলস ছাড়ে। প্রত্যেকবার খোলস ছাড়িবার সময় নিকটবর্ত্তী হইলে কীড়াদের অগ্নিমান্দ্য হয় এবং তাহারা আহার পরিত্যাগ করে। কীড়াগণ পরিপুষ্ট হইয়া পুত্তলি অবস্থা (pupa) প্রাপ্ত হইবার সময় কিছু কালের জন্য আহার ত্যাগ করে এবং ক্ষুদ্র পল্লবরাজির উপর আরোহণ করিয়া গুটি তৈয়ারী করিতে আরম্ভ করে।

কীড়ার শরীরের দুই পার্শ্বে দুইটি স্বচ্ছ আঠাল দ্রব্যপূর্ণ থলি আছে। সেই থলি দুটির মুখ কীড়ার চোয়ালের তলদেশে একটি ছিদ্রের নিকট মিলিত থাকে। পুত্তলি আকারে পরিবর্তনোন্মুখ কীড়া সেই ছিদ্রপথে আঠাল দ্রব্যটি নিঃসারিত করিয়া গুটি প্রস্তুত করে। এক একটি গুটি হইতে আটশত হইতে বারশত গজ রেশমসূতা পাওয়া যায়। রেশমগুটির বর্ণ শ্বেত অথবা হরিদ্রাভ ও আকার ডিম্বের ন্যায়, কোন কোনও গুটির মধ্যভাগ ঈষৎ চাপা থাকে। রেশমকীটের জাত্যাদির পার্থক্য অনুসারে তাহার গুটির আকার এবং ওজন বিভিন্ন প্রকার হয়; তবে সাধারণতঃ গুটির দৈর্ঘ্য গড়ে এক হইতে দেড় ইঞ্চি ও ব্যাস আধ হইতে এক ইঞ্চি। পুত্তলি সমেত এক একটি গুটির ওজন পনের হইতে ত্রিশ গ্রেন পর্য্যন্ত হয়। রেশমকীটেরা তিন চার দিনের মধ্যেই গুটি প্রস্তুত সম্পূর্ণ করে। গুটি প্রস্তুত হইবার দুই তিন সপ্তাহ পরে তন্মধ্যস্থ কীট স্বীয় কারা-গৃহের এক প্রান্ত ছিদ্র করিয়া পরিণত পতঙ্গের আকারে মুক্তি লাভ করে। তার অনতিকাল পরে স্ত্রী-কীটগুলি গর্ভ ধারণ করে এবং ডিম্ব প্রসবান্তর শীঘ্রই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়।

রেশমকীটের গুটি প্রস্তুত সম্পূর্ণ করিলে তাহার দুই, তিন দিন পরে রেশম-ব্যবসায়িগণ গুটি সংগ্রহ করে এবং তাহারা মধ্যস্থিত পুত্তলিকে বিনষ্ট করিয়া গুটি হইতে রেশম বাহির করে। কৃত্রিম অবস্থার মধ্যে রেশমকীটের চাষ চারি সহস্র বৎসরের অধিককাল প্রচলিত হইয়াছে; কিন্তু রেশম-চাষীদিগের কেবলমাত্র রেশম উৎপাদনের পরিমাণের উপর দৃষ্টি থাকায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে কীটের সুস্বাস্থ্য বিষয়ে লক্ষ্য পড়ে নাই; কীটগণ সাধারণত অস্বাস্থ্যকর অবস্থার মধ্যেই লালিত-পালিত হইত। এমত অবস্থায় রেশমকীটের বহুবিধ মারাত্মক রোগ হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। ফরাসী পশু-পালকগণ রেশমকীটের পেব্রিন্ রোগের জন্য ১৮৫৩ অব্দ হইতে বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠিয়াছিলেন। কীড়ার গায়ে বিন্দু বিন্দু কাল দাগ দেখা দিত, রোগাক্রান্ত পোকার ডিম্ব ফুটিত না, কিম্বা ফুটিলেও কীড়াগুলি অত্যন্ত দুর্ব্বল, বিকলাঙ্গ, মন্থর-গমন অবস্থা প্রাপ্ত হইত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহারা পরিণতি লাভের পূর্ব্বেই ধ্বংস হইয়া যাইত। যদি বা কোন কীট গুটি বুনিত, সেটি অত্যন্ত নরম ও রস থাকিত। রোগাক্রান্ত কীটের বংশানুক্রমে দুর্ব্বলতা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইত; অর্থাৎ রোগটির সংক্রমণ বংশানুক্রমে বিস্তার লাভ করিয়া ভয়ানক ভাবে রেশমকীটের মড়ক সৃষ্টি করিত। সেই রোগের কারণানুসন্ধানে ফরাসী আকাদেমী—কাত্রফাজ, ডকেন্ এবং পেলিগোর উপর ভার দেন এবং তাঁহারা দুইটি বিস্তারিত

(১) স্বাভাবিক কীড়া (২) পেব্রিন্ রোগগ্রস্ত কীটের একাংশ; (৩) অতিশয় ব্যাধিগ্রস্ত রেশমগুটক; (৪) কীড়ার চর্ম্মের উপরিস্থ পেব্রিন্ রোগের কলঙ্কচিহ্ন—অণুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে যেরূপ দেখায়, (৫) অতিশয় ব্যাধিগ্রস্ত কীড়া; (১) এবং (৫) এর মধ্যে পার্থক্য দ্রষ্টব্য।

প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন—[Etudes sur les maladies actuelles des vers a soie (১৮৫৪) এবং Nouvelles des vers a soie (১৮৮০)]। কিন্তু তাঁহাদের ব্যবস্থায় রোগের বিস্তার হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই। পাস্তুর তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান মানসে অ্যালে নামক স্থানে গমন করেন। এ সম্বন্ধে

গবেষণার পূর্বে তিনি রেশমকীটের জীবন-বৃত্তান্ত বিষয়ে কিছুই জানিতেন না। এমন কি তিনি স্বচক্ষে একটিমাত্রও রেশমগুটি দেখেন নাই। তিনি সপ্রতিভভাবে জাঁরি ফাবর-এর নিকট গমন করেন এবং রেশমগুটি পরিদর্শনের জন্য প্রার্থনা জানান। ফাবর তাঁর হাতে একটি গুটি দিলে পাস্তার সেটি কানের কাছে নাড়িয়া সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করেন —"এটার এত শব্দ হচ্ছে কেন? নিশ্চয়ই এর মধ্যে কিছু আছে।" ফাবর তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, তাহার মধ্যে পুত্তলি আছে। পাস্তার তাঁহাকে সে বিষয়ে বিশদভাবে বুঝাইয়া দিতে বলিলেন। প্রাণিতত্ত্ববিদ উত্তর করিলেন— "কীড়া পতঙ্গাকার প্রাপ্ত হবার পূর্বে গুটির মধ্যে মমীর (mummy) ন্যায় অবস্থান করে।" পাস্তার বিস্মিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন যে প্রত্যেক গুটির ভিতরেই কি পুত্তলি আছে? ফাবর বলিলেন, "সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পুত্তলিকে রক্ষা করার জন্যই কীড়া গুটি প্রস্তুত করে।"

এই ভাবে গুটিপোকার জীবন সম্বন্ধে অবহিত হইবার পর পাস্তার পর্যবেক্ষণ ও পরিশ্রমের ফলে সেই ভীষণ মড়ক নিবারণে সমর্থ হন। ফাবর-প্রমুখ প্রাণিতত্ত্ববিদেরা বহু চেষ্টা করিয়াও যে রোগের প্রতিকার চেষ্টায় ব্যর্থ হইয়াছিলেন, পাস্তারের গবেষণা-ফলেই তাহার উপায় আবিষ্কৃত হয়। এইরূপে ফ্রান্স এবং ইতালীকে তিনি যে ক্ষতির হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা একটি মহা-যুদ্ধের আর্থিক ক্ষতি অপেক্ষা কোন অংশে কম নয়।

পেবরিন্ রোগের কারণ অনুসন্ধানকালে পাস্তারের মনে কেবল এই একটি প্রশ্ন উঠিয়াছিল যে, কীটের শরীরে কাল দাগ প্রকাশিত হইবার কারণ কি? আলেতে গিয়া তিনি সেখানকার অধিবাসীদিগকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু তাহারা কোন সদুত্তর প্রদানে সমর্থ হয় নাই। তাহারা তাঁহাকে কেবল বহু অদ্ভুত ধরণের প্রতিকার-ব্যবস্থার কথা বলিয়াছিল। কোন চাষী পোকার উপর গন্ধকের গুড়া, ছাই, সর্ষেচূর্ণ অথবা কুইনাইন ছড়াইতেছিল। কেহ বা তুঁত গাছের উপর পিচকারী করিয়া নানাবিধ রস, মদ ও সুরাসার নিক্ষেপ করিয়াছিল। কেহ বলিয়াছিল ক্লোরিনের ধুম লাগাও, আলকাতরা পোড়াও, আবার অনেকে বলিয়াছিল, না, না কখনই ঐরূপ করা উচিত নয়, তাহা হইলে সমস্ত নষ্ট হইয়া যাইবে। এই প্রকার ব্যবস্থাপত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি না করিয়া পাস্তার রোগের মূল কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। তিনি দুই শ্রেণীর রেশম কীট লইয়া অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করেন। এক শ্রেণীর কীট নীরোগ, সুস্থ, হৃষ্টপুষ্ট, অপরগুলি দুর্বল, ক্ষীণদেহ ও স্বল্পাহারী। এই উভয় প্রকার কীটই জাপান হইতে আনীত হইয়াছিল। তাহাদের অণুবীক্ষণিক পরীক্ষায় পাস্তার দেখিতে পাইলেন যে, বহু সবল কীটের শরীরেও কাল দাগ দেখা দিয়াছে, অথচ অনেক ক্ষীণদেহের মধ্যেও তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে না। তাহা হইলে পেবরিন রোগের কি অপর কোন কারণ আছে?— পাস্তার ভাবিতে লাগিলেন।

যখন দেখিলেন, ভাল হৃষ্টপুষ্ট কীটের গায়েও কাল দাগ প্রকাশ পায়, অথচ অপেক্ষাকৃত ক্ষীণদেহ কীটের শরীরে কালর চিহ্ন মাত্র থাকে না, তিনি তখন তাঁহার শেষ পরিণাম জানিতে উদ্‌গ্রীব হইলেন। পরীক্ষার পর অবশেষে তাঁহার প্রত্যক্ষ হইল যে, কোন কোন কীটের গায়ে গুটি বাঁধিবার অবস্থাতেও কলঙ্ক প্রকাশ না পাইলেও পতঙ্গাকার প্রাপ্ত হইবার পূর্বে পরিপুষ্ট পুত্তলির শরীরে বহুসংখ্যক কাল চিহ্ন প্রকাশিত হয় এবং পতঙ্গাবস্থায় একটিও অদাগী থাকে না। এই দেখিয়া তিনি লিখিলেন—"(১৬ জুন ১৮৬৫)— রেশমকীট রোগাক্রান্ত হইলেই যে তাহার গায়ে কাল দাগ প্রকাশ পাবে, এমন কোন কথা নেই; এও হতে পারে যে, বাহিরে কোন চিহ্ন প্রকাশ পেল না অথচ ভিতরে রোগের বীজ সঞ্চারিত হল। রোগটি প্রধানতঃ পুত্তলি ও পতঙ্গাবস্থায় ভাল ভাবে প্রকাশ পায়; কীটের সেই অবস্থাতে রোগের অনুসন্ধান করা দরকার। পতঙ্গাবস্থাতেও যারা নিষ্কলঙ্ক থাকে, কেবল তাদের নিকট হতেই সুস্থ বীজ প্রত্যাশা করা যেতে পারে। প্রত্যেক কলঙ্কযুক্ত পতঙ্গটী রোগগ্রস্ত বীজ উৎপন্ন করে। কোন পতঙ্গের শরীরে যদি অল্পসংখ্যক দাগ থাকে, তা হলে সেই পতঙ্গপ্রসূত কীড়ার গায়ে প্রথমে কোন দাগ দেখা যায় না, কিন্তু জীবনের শেষ ভাগে কলঙ্ক-চিহ্ন নিশ্চয়ই প্রকাশিত হবে। পতঙ্গ যদি বেশী পরিমাণে রোগগ্রস্ত থাকে, তবে কীটের প্রথমাবস্থাতেই কলঙ্ক এবং অপরাপর অসুস্থতার লক্ষণ প্রকাশ পায়।"

পাস্তার শত শত রেশমকীট পরীক্ষা করিয়া দুই তিন

ভোড়া বাদে একটিকেও নিষ্কলঙ্ক পান নাই। কিন্তু সেই অপরাধী নমুনা কয়টিই স্বর্ণপ্রসূ হইয়াছিল। সে সময়ে দুই জন বাকি পাস্তুরের নিকটে কয়েকটি রেশমগুটির পরীক্ষার্থে লইয়া গিয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে তাহার মধ্যে চারিটি সুস্থ ছিল। সেই সুস্থ এবং রোগগ্রস্ত কীট হইতে যে সকল নূতন কীট জন্মাইবে, তাহাদের পরীক্ষার আশায় পাস্তুর পরবর্তী বসন্তকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু আলের প্রায় সমস্ত অধিবাসী অধৈর্য্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। সকলে এই বলিয়া অভিযোগ করিতে লাগিলেন যে, রেশমী পোকার রোগ বিষয়ে গবেষণার জন্য সরকারী বিভাগের একজন প্রাণিতত্ত্ববিদ্ নিযুক্ত করা উচিত ছিল। তাহা না করিয়া তাঁহারা নির্বাচন করিয়াছেন এক রসায়নবিদ্‌কে। পাস্তুর তাঁহাদের কেবল বলিলেন, আপনারা অত ব্যস্ত হইবেন না। তিনি অপ্রতিহতভাবে রেশমকীট জীবনের প্রত্যেকটি অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। তাঁহার কাজে ফরাসী দেশ যাহাতে ভবিষ্যতে উপকৃত হইতে পারে, এই সকল তাঁহার মধ্যে অবনা হইয়া উঠিয়াছিল।

১৮৬৮ অব্দে রোসা নামে পাস্তুরের এক ছাত্র ও রোলাঁর দুই বন্ধু পাস্তুরের সাহায্যার্থে গবেষণা-কার্যে যোগ দেন। সেই সময়ে পাস্তুর আলের নিকটবর্তী পজিয়ো নামক স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন। একটা কমলালেবুর বাগানে তাঁহাদের বীক্ষণাগার প্রস্তুত হইয়াছিল। তাঁহারা সকলে মিলিয়া অত্যন্ত গম্ভীরভাবে কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন। পাস্তুর যে সকল বিষয়ে পরীক্ষা করিতেন, সেগুলি পুনরায় তাঁহার ছাত্রদের পর্যবেক্ষণ করিতে দিতেন। রেশমকীটের রোগ ব্যতীত অন্যান্য বিষয়েও গবেষণা চলিতেছিল। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ছাড়া অপর কাজেও পাস্তুরকে সময়ক্ষেপ করিতে হইত। অভ্যাগত দর্শকদের সহিত আলোচনা, বহু ব্যক্তির সহিত চিঠি-পত্রের আদান প্রদান প্রভৃতি কার্য্য হইতে তাঁহার অব্যাহতি পাইবার উপায় ছিল না।

মৃত্যু-শোক ; লাভোয়াজিয়ের জীবনী রচনা ; কলেরা রোগের কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা ; রাজপ্রাসাদে নিমন্ত্রণ ; ক্লোদ বের্নার

আলেতে যাইবার অল্পদিন পরে পাস্তুরের গবেষণা-কার্য্য অকস্মাৎ বাধা পায়। তাঁহার পিতা আর্বোয়াতে অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই সংবাদ-সম্বলিত টেলিগ্রাম পাইয়া পাস্তুর অতিশয় উদ্বিগ্ন চিত্তে গৃহাভিমুখে যাত্রা করেন। কিন্তু তিনি যখন আর্বোয়াতে পৌঁছিলেন, তখন তাঁহার পিতা আর ইহজগতে ছিলেন না। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার প্রথমা কন্যা, জান্ টাইফয়েড্ জ্বরে মারা গিয়াছিল। সেই শোক প্রশমিত হইতে না হইতে তিনি দ্বিতীয় বার আঘাত পাইলেন। শোকাবিষ্টচিত্তে আর্বোয়ার শূন্য ঘরে বসিয়া সন্ধ্যাকালে তিনি এই পত্র লিখিলেন—"আজ সকালে জান্-এর চিরবিশ্রামের শয্যাপার্শ্বে পিতাকে রেখে এসেছি। অন্ততঃ তাঁকে একবার শেষ মুহূর্ত্তেও দেখতে পাব, একটিবারও তাঁকে আলিঙ্গন করতে পারব, এটুকু আশা করেছিলাম। কিন্তু যখন ষ্টেশনে

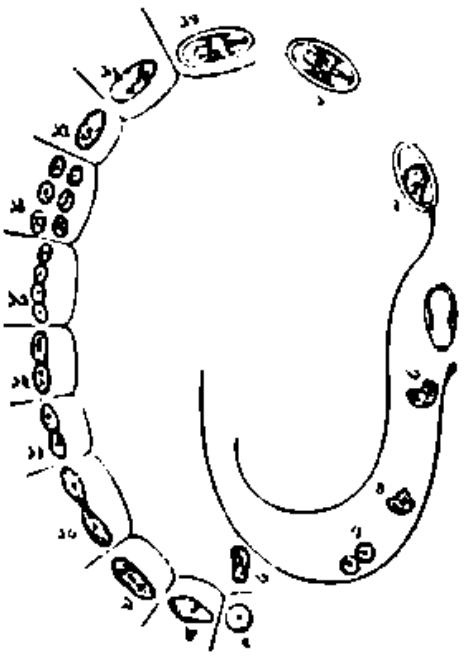

সেহ্‌দ্বি জীবাণু জীবনের বিভিন্ন অবস্থা।

পৌঁছে দেখলাম, কাল পোষাক পরিহিত জন কয়েক ব্যক্তি সার্লা হতে আসছে তখনই বুঝেছি যে, কেবল তাঁর প্রাণশূন্য দেহ সমাধিক্ষেত্রে যাবার জন্য আমার অপেক্ষা করছে··· আজ সারাদিন মনে পড়ছে, তাঁর কাছ থেকে কত স্নেহ ভালবাসা পেয়েছি। তিরিশটি বৎসর তিনি সযত্নে আমাকে বক্ষের মধ্যে ঘিরে রেখেছিলেন। আমি আমার সব কিছুর জন্য তাঁরই কাছে ঋণী। আমার বাল্যকালে তিনি আমার সকল সময় অসৎসঙ্গ হতে সরিয়ে রেখেছেন, আমার মধ্যে কর্ম্মের স্পৃহা জাগিয়ে তুলেছেন, আমার সামনে পরিপূর্ণ

জীবনের আদর্শ চিত্রিত করেছেন। তাঁর মন এবং চরিত্র তাঁর পরমধ্যানা অপেক্ষা বহু উচ্চে।

"মারী, তুমি জান না আমার পিতামাতা প্রিয় সন্তানদের জন্য, বিশেষ ক'রে আমার শিক্ষার ব্যয়ভার পরিচালনের জন্য, কি কঠোর পরিশ্রমই না করতেন। সবচেয়ে মর্মগ্রাহী ব্যাপার এই যে, তাঁদের স্নেহের মধ্যে অন্য কিছুর প্রত্যাশা ছিল না। আমার বৈজ্ঞানিক কার্যের সাফল্যে তাঁর অন্তর আনন্দে ভরে উঠেছিল। তাঁকে যদি আমি বিন্দু মাত্রও তৃপ্তি দিয়ে থাকি তা হলে নিজেকে ধন্য বলে মানবো।…

"তোমাদের দেখতে বড়ই ইচ্ছা হচ্ছে; কিন্তু আমাকে এইক্ষণে আলেতে যেতে হবে; নয়ত কয়েক দিনের বিরতির জন্য গবেষণার কাজ একেবারে এক বৎসর পিছিয়ে পড়বে।"

আলেতে প্রত্যাবর্তনের কিছুকাল পরে পাস্তারকে পুনরায় সে স্থান ত্যাগ করিতে হয়। তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা কামিল্ এর অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া তিনি পারীতে যান। সে সময়ে পাস্তার-ঠাকুরাণী সন্তানদের শিক্ষার নিমিত্ত পারীতেই অবস্থান করিতেন। পাস্তারের গবেষণাকার্য্য সেখানে যাইয়াও বন্ধ হইল না। সারাদিন তিনি রীক্ষণাগারে অতিবাহিত করিয়া অবশিষ্ট কাল শিশু-কন্যার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিতেন। যখন তাঁহার এইভাবে দিন যাইতেছে, সেই সময়ে ডুমা তাঁহাকে একটি অনুরোধপূর্ণ পত্র লেখেন। ত্রাক্যের কর্তৃপক্ষ ডুমার উপরে রসায়নবিদ্ লাভোয়াজিয়েরের জীবনী প্রকাশের ভার দেন। সেই পুস্তক রচনার নিমিত্ত ডুমা পাস্তারকে লিখিয়াছিলেন—"লাভোয়াজিয়ের প্রসঙ্গ, আর কেউ তোমার মত অত ভালভাবে জানে না। তাঁর সম্বন্ধে সুচিন্তিত প্রবন্ধ একমাত্র তোমার হাত দিয়েই লেখা হতে পারে। তাই আমি তোমাকে দিনের কয়েক ঘণ্টা সময় তাঁর জীবনী রচনায় ব্যয় করতে অনুরোধ করছি।"

পাস্তার উত্তর দিলেন—"আপনার স্নেহ-বিশ্বাসপূর্ণ কথার উপর কোন বিষয়ে 'না' বলা দুঃসাধ্য। আমি আপনাকে এ বিষয়ে লিখে পাঠাব। কিন্তু আগে আমার কথা দিন যে, আপনার ঠিক মনোমত লেখা না পেলে, আমার প্রবন্ধ দূরে ফেলে দেবেন। কারণ প্রথমতঃ আমার এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা নেই—দ্বিতীয়তঃ, প্রিয় কন্যার অসুস্থতাবশতঃ অত্যন্ত মানসিক দুশ্চিন্তা এবং কায়িক শ্রমের ভিতর দিয়ে আমার দিন কাটছে।"

লাভোয়াজিয়েরের জীবনীখানি পাস্তার তাঁর অসুখের পূর্বে দিয়া রচনা করিয়াছিলেন। সেই গ্রন্থের প্রথম দিকটা এই রকমের—

"একটা আবিষ্কার, অপর একটি আবিষ্ক্রিয়াকে যদিও চিরদিনই অতিক্রম করে চলেছে, যদিও লাভোয়াজিয়েরের পর রাসায়নিক ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অভিজ্ঞতা তাঁর কল্পনাতীত পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে, তথাপি তাঁর কার্য্যাবলী নিউটন-প্রমুখ মুষ্টিমেয় জনকয়েক অতিশয় প্রতিভাবান্ মনীষীর দানের মত চির নবীনের মধ্যে স্থান পাবে। যেমন বিভিন্ন কালের চালচলনে কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটে, এ ক্ষেত্রেও সেইরূপ কোন কোন অংশ প্রাচীনত্ব লাভ করবে সন্দেহ নেই, কিন্তু এ থেকে যে বিশেষ ভিত্তি মানুষের মনে প্রতিষ্ঠিত হবে, যে প্রথা গড়ে উঠবে, তার গৌরব কখনও ক্ষুণ্ণ হবে না, বরং দিনের পর দিন মহত্তর হতে থাকবে।"

পাস্তার-লিখিত লাভোয়াজিয়েরের জীবনী 'মনিতর' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়; প্রসিদ্ধ সাহিত্য-সমালোচক সাঁৎ বোভ্ সেই রচনার অত্যন্ত সুখ্যাতি করেন। পাস্তারের এই সকল কার্য্য, তাঁর জীবনেতিহাসের ঘটনা-পরম্পরা লক্ষ্য করিয়া বিচার করিলে বুঝা যায় যে, তাঁর কঠোর শ্রমপূর্ণ দৈনন্দিন জীবনের সহিত অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা কিরূপ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল।

১৮৬৫ অব্দের ডিসেম্বরে কামিল মারা যায়। তাহার ক্ষুদ্র দেহখানি আর্বোয়াতে রাখিয়া পাস্তার স্বীয় কার্য্যে প্রত্যাবর্তন করেন। বৎসরের শেষে তিনি আর একটি নূতন কাজে যোগদানের জন্য আহূত হন। সেই সময় ফরাসী দেশে কলেরার প্রকোপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। মৃত্যুর হাওয়া মিশর হইতে মার্সাই অতিক্রম করিয়া পারী অভিমুখে প্রবাহিত হইয়াছিল। একমাত্র পারী নগরীতেই প্রত্যহ দুই শতের অধিক লোকের কলেরায় মৃত্যু হইত। যখন হাজারকরা তেইশ জন করিয়া লোক মরিতে সুরু করিল, সকলে ভাবিল, বুঝি বা ১৮৩২ অব্দের মত মড়ক পুনরায় ফিরিয়া আসিবে।

ক্লোদ বের্নার, সাঁৎ ক্লেয়ার দেভিল এবং পাস্তার, লেরিসোয়াজিয়েরের হাসপাতালের কলেরা বিভাগে গবেষণায় প্রবৃত্ত হইলেন। পাস্তার সেখানকার বাতাস এবং রোগীর

রক্ত পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু নানা রকম পরীক্ষা করিয়াও রোগের কারণ নির্ণয়ে সমর্থ হইলেন না। এদিকে রোগও তাঁহাদের পলায়নের-কার্যে অধিক দিন সুযোগ না দিয়া শরৎকালের শেষে সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হইল।

এই পরীক্ষাকার্যের অনতিকাল পরে পাস্তুর, রাজা তৃতীয় নাপোলেঁর নিমন্ত্রণরক্ষার্থে কঁপিয়েঞ্ প্রাসাদে গমন করেন। সেখানে আরও অনেকগুলি ব্যক্তি—বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসক, সাহিত্যিক, স্থপতি এবং শিল্পী আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। রাজা তৃতীয় নাপোলেঁ বিজ্ঞানালোচনার অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। সেজন্য পাস্তুর তাঁহার অণুবীক্ষণ যন্ত্র ও নানাবিধ বিকৃত সুরার নমুনা লইয়া সেখানে গিয়াছিলেন। রাজদম্পতি এবং সমবেত ব্যক্তিগণ তাঁহার পরীক্ষাকার্য পরিদর্শন করার পর তিনি তাঁহার আবিষ্কার বিষয়ে সংক্ষেপে সরল ভাষায় বর্ণনা করেন। অতঃপর লাস্লেরিয়ে তাঁর আবিষ্কৃত নেপচুন গ্রহ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন এবং লঁজে রক্তের প্রবাহ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেন। বক্তৃতান্তরে নাপোলেঁ তাঁহাদের সঙ্গে নির্জনে সাক্ষাৎ করিয়া বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রসঙ্গে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। কথায় কথায় তিনি পাস্তুরকে প্রশ্ন করেন যে, পাস্তুর তাঁহার আবিষ্কার হইতে অর্থাগমের চেষ্টা করেন না কেন। উত্তরে পাস্তুর বলিয়াছিলেন, "এই প্রকার কাজের দ্বারা বৈজ্ঞানিকগণ নিজেদের অপদস্থ করবেন বলে মনে করি। যদি বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের সেবকগণ তাঁদের আবিষ্কারের দ্বারা অর্থ উপার্জনের দিকে ঝোঁক দেন, তা'হলে তাঁদের চিন্তাধারা অন্য দিকে চলে যায়; বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের প্রতিভা নষ্ট হয়ে যাবার ভয় থাকে। মনে করুন, আমাকে যদি ভিনিগারের ব্যবসা নিয়ে পড়ে থাকতে হয় তা' হলে এত সময় নষ্ট হবে যে, অন্য দিকে লক্ষ্য দেবার অবসর থাকবে না, তারই মধ্যে জড়িয়ে পড়তে হবে। কিন্তু আমার মন সম্পূর্ণ মুক্ত, স্বাধীন। আমি যে আগ্রহ নিয়ে ১৮৬৪ অব্দে সুরা-প্রসঙ্গে গবেষণা করেছি, আজিও সেই উদ্যমে রেশমকীটের রোগ সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে পারছি।"

১৮৬৬ অব্দের জুন মাসে পাস্তুর শিক্ষামন্ত্রী দুরুই-এর নিকট হইতে একটি পত্র পান। তাতে তিনি পাস্তুরের বৈজ্ঞানিক গবেষণার সংবাদ জানিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে সেসিল নামে পাস্তুরের আর এক কন্যা মারা যাওয়াতে পাস্তুর গবেষণাকার্যে বাধা পাওয়ায় শিক্ষামন্ত্রীকে অনেক দিন পত্র লিখিতে পারেন নাই। সেই জন্য তিনি লিখিয়াছিলেন—

"মন্ত্রী মহাশয়, আমাকে পত্র লিখিবার বিষয়ে স্মরণ করিয়ে দেওয়াতে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার কাজের সাথে সাথে দুঃখময় ঘটনা জড়িত। আপনার যে ছোট মেয়েটি লাস্লেরিয়ে মহাশয়ের বাড়ীতে অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে খেলা করত—তার বোধ হয় সেসিল পাস্তুরের কথা স্মরণ আছে। ইষ্টারের ছুটিতে আলেতে অতিবাহিত করার জন্য সেসিল তার মায়ের সঙ্গে আমার কাছে আসছিল। কিন্তু আসবার সময় শাঁবেরিতে অবস্থানকালে সে টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত হয় এবং দুই মাস রোগভোগের পর মারা গেছে। আমি তার কাছে খুব কম দিনই থেকেছি, কারণ, আমাকে এখানে পরীক্ষাকার্যে ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। আমি বৃথাই আশা করেছিলাম যে, এই মারাত্মক রোগের কবল হতে মুক্তি লাভ করবে।

"এখন নিজেকে কাজের মধ্যে ডুবিয়ে রাখাই গভীর দুঃখ হতে নিষ্কৃতি পাবার একমাত্র উপায়। আপনি আমাকে যে সকল সুযোগ সুবিধা দিয়েছেন, সে জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

"রেশমকীটের রোগ বিষয়ে কতকগুলি তথ্য আমি সংগ্রহ করতে পেরেছি। আশা করি, পশু পালন কমিশনের নিকট এরূপ কয়েকটি প্রতিকার-ব্যবস্থা জানাতে পারব যাতে অল্পকালের মধ্যেই রোগটি সম্পূর্ণ নির্মূলীকৃত হয়।

"আমি এই প্রমাণ পেয়েছি যে, রোগটির লক্ষণ কীটের পুত্তলি অবস্থায়, বিশেষতঃ পরিপুষ্ট পুত্তলিতে পতঙ্গাকার প্রাপ্ত হবার পূর্বে এবং সন্তানজননক্ষম হবার প্রাক্‌কালে প্রকাশ পায়। কীট অথবা ডিম খুব স্বাস্থ্যসম্পন্ন প্রতীয়মান হলেও রোগলক্ষণটি আণুবীক্ষণিক পরীক্ষাকে এড়াতে পারে না। গুটিপোকাদিগকে সন্তানজননোদ্দেশে রেখে দেওয়া হবে অথবা ধ্বংস করতে হবে জানতে হলে, প্রথমে শতখানেক গুটি নিয়ে তাপ-প্রয়োগ দ্বারা পতঙ্গের শরীর-লক্ষণ দ্রুতগতি পরিস্ফুট করে নিতে হয়, তারপর অণুবীক্ষণ-যন্ত্রে পরীক্ষা করলেই জ্ঞাতব্য বিষয় ধরা পড়ে। তখন তার রোগ-লক্ষণ এতই স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, যে-কোন স্ত্রীলোক কিংবা বালকও

এই ভাবে পরীক্ষা করে অনায়াসে রোগ নিরূপণে সমর্থ হয়। যদি কোন চাষী নিজে রোগ নির্ণয় করতে না পারেন, তা'হলে পতঙ্গগুলিকে ডিম প্রসবের পরে ব্রাণ্ডির মধ্যে ভরে অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছে পাঠাবেন। তিনি তা হতে কিরূপ কীট উৎপন্ন হয়েছে বলে দিতে পারেন···।"

পাস্তুরের রেশমকীটের রোগসম্বন্ধীয় গবেষণা-ফল এই সময় প্রচারিত হইতেছিল। তিনি বিজ্ঞাপিত করেন যে, পেব্‌রিন্-রোগাক্রান্ত পতঙ্গসম্ভূত বীজ কখনই ব্যবহার করা উচিত নয়। পাস্তুর পেব্‌রিন্ রোগের বিস্তার বিষয়ে পরীক্ষা করিবার জন্য রোগগ্রস্ত কীটদুষ্ট জল তুঁত পাতায় লাগাইয়া দেখিয়াছিলেন যে, সেই পাতা খাইলে সুস্থ পোকার মধ্যে রোগের সঞ্চার হয়। প্রকৃত তথ্য তাঁহার কাছে ধরা পড়িয়াছিল, কিন্তু তিনি ভাল ভাবে স্থিরনিশ্চয় হইবার জন্য, রেশমকীট জন্মাইবার পরবর্তী কতু পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়াছিলেন। এই অবসরে তিনি মদ্য-বিষয়ক গবেষণা-কার্য্য-সম্বলিত পুস্তকখানি (Etudes Sur la biere) রচনায় প্রবৃত্ত হন।

১৮৬৬ অব্দে তিনি শরীরতত্ত্ববিদ্ ক্লোদ্ বের্নারের বিষয় এক প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধটি ৭ই নভেম্বরের 'মনিতর্' পত্রিকায় এই নামে প্রকাশিত হয়—

"ক্লোদ্ বের্নার :—তাঁর শিক্ষা এবং কার্য্যাবলীর সার্থকতা।" নিম্নলিখিত ভাবে লেখাটির আরম্ভ—

"ক্লোদ্ বের্নার তাঁর শরীরতত্ত্ব-বিষয়ক গবেষণাগুলি প্রকাশ করে যশস্বী হয়েছেন। কোন কারণবশতঃ আমি তাঁর লেখাগুলি পুনর্ব্বার উত্তমরূপে অধ্যয়ন করছিলাম। তা হতে আমি অত্যন্ত তৃপ্তি পেয়েছি। তাঁর অদ্ভুত প্রতিভার কাছে আমি শ্রদ্ধায় অবনত। তাই সে সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলবার আমার আন্তরিক ইচ্ছা।

"শ্রীযুক্ত বের্নার যকৃতের গ্লাইকোজেনিক্ প্রক্রিয়াসমূহের আবিষ্কার করে ১৮৪৮ অব্দে আকাদেমী দে সিয়াঁসের সদস্য পদ প্রাপ্ত হন। যে সকল গবেষণায় বিজ্ঞান-জগতে তাঁর গৌরবদীপ্তি প্রকাশিত, এই আবিষ্কারই তাদের তুলনায় অতি নগণ্য। কিন্তু তিনি তাঁর সামান্য আবিষ্কারেই বিজ্ঞান-পরিষদের শ্রেষ্ঠ বরমাল্য পাবার যোগ্য হয়েছিলেন।"

ক্লোদ্ বের্নার বহুমূত্ররোগ বিষয়ে গবেষণা করেন। কি হেতু জীবশরীরে শর্করার প্রাচুর্য্য হয় এবং কি প্রক্রিয়ার ফলে ভুক্তদ্রব্য শর্করায় পরিণত হয়, এ সকল তথ্য তাঁহারই অনুসন্ধান ফলে প্রকাশিত হইয়াছে।

পেব্‌রিন্ ও গ্লাশেরি রোগের গবেষণা-ফল

পাস্তুরের একদিকে যেমন গবেষণার সীমারেখা ধীরে ধীরে প্রসারিত হইতেছিল, তেমনি অপরদিকে তাঁহার সামাজিক জীবনের গণ্ডী ও অন্তরঙ্গ সুহৃদের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতেছিল। তাঁহার চিন্তাধারা, ভবিষ্যৎ আশা ও কার্য্যাবলীর সঙ্গে সংযুক্ত ছিল তাঁহার ক্ষুদ্র পরিবার, তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধুবর্গ এবং তাঁহার প্রিয় ছাত্রমণ্ডলী। তিনি ১৮৬৭ অব্দে অ্যালে যাইবার পূর্ব্বে একল্ নর্ম্মালের উন্নতি-বিধানের নিমিত্ত তাহার পরিচালন-বিধির কতকগুলি পরিবর্ত্তন করেন। সে বার অ্যালেতে যাইবার সময় তাঁহার স্ত্রী-কন্যা এবং একলের দুই ছাত্র, জার্নে ও আইয়ো তাঁহার সঙ্গে যান। অ্যালেতে গিয়া তিনি সুস্থ এবং অসুস্থ পতঙ্গজাত কীড়া পরীক্ষা করিয়া তাঁহার পূর্ব্বনিরূপিত মন্তব্যের যথার্থতার বিষয়ে সাক্ষ্য পান। পাঁজিকোর এক চাষী জাপানী বীজ হইতে বেশ সুফল পাইয়াছে শুনিয়া তিনি সেই কীট পরীক্ষা করিতে যান। কিন্তু গিয়া দেখেন যে, তাহাদের মধ্যেও পেব্‌রিন্ রোগ দেখা দিয়াছে। ব্যাপার হইয়াছিল কি, চাষীটি যে ফ্রেমে করিয়া সুস্থ কীট রাখিয়াছিল, ঠিক তাহার উপরে অসুস্থ কীটপূর্ণ একটি ফ্রেম ছিল। সেই অসুস্থ কীটসমূহের মলাদি সুস্থ কীটে পতিত হওয়ায় তাহাদের পেব্‌রিন্ রোগ উৎপন্ন হইয়াছিল। পাস্তুর পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, সুস্থ এবং পেবরিন্ রোগে অসুস্থ কীট যদি একত্র অবস্থান করে, অথবা রোগগ্রস্ত কীটের মলমূত্র সুস্থ কীটের আহার্য্য স্পর্শ করে, তাহা হইলে সুস্থ কীটদের মধ্যেও পেবরিন্ রোগ জন্মে। তিনি পেবরিন্ রোগ বিষয়ে তিনটি মন্তব্য করিলেন—

(১) কণিকার ন্যায় কলঙ্কগুলি (corpuscles) পেবরিন্ রোগের বিশেষ বিশেষত্ব, এই চিহ্ন যদি রোগাক্রান্ত কীটের শরীরে তাহাদের জীবনের প্রথমাবস্থায় প্রকাশিত না হয়, তাহা হইলেও পরিপুষ্ট পতঙ্গের মধ্যে অবশ্যই প্রকাশ পাইবে।

(২) কণিকা-সদৃশ দাগগুলি কেবল মাত্র রোগের

লক্ষণসূচক নয়, রোগের কারণ; এগুলি এক প্রকার পরান্নভোজী জীব (parasites)।

(৩) এই রোগটি বংশানুক্রম দ্বারা, রোগগ্রস্ত কীটের স্পর্শ দ্বারা এবং রোগ-সম্পৃক্ত পত্রাদি আহার দ্বারা সংক্রামিত হয়।

পাস্তুর ভাবিলেন, তাঁহার রেশমকীট-সম্পর্কীয় গবেষণা প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সেই সময়ে হঠাৎ এক বিপত্তি ঘটিল। তাঁহার স্বহস্তে লালিত-পালিত যোলটি সুস্থ সবল কীটশাবক মারা গেল। তাহাদের মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া পেবরিন্ রোগের কোনও সন্ধান তিনি পাইলেন না। তিনি যৎপরোনাস্তি সন্দিগ্ধ হইয়া পড়িলেন। রেশমকীটের রোগ সম্বন্ধে অপর ব্যক্তিদের লেখা পড়িয়া অবশেষে বুঝিতে পারিলেন যে, ওটা পেবরিন্ রোগ নহে; আর একটি স্বতন্ত্র ব্যাধি, তাহার নাম ফ্লাশেরী রোগ। পাস্তুর দেখিলেন যে, অনেক সময়ে রেশমকীটেরা অকস্মাৎ ফ্লাশেরী রোগে আক্রান্ত হয়। বিশেষতঃ আবহাওয়া ও তাপমাত্রার দ্রুত পরিবর্তন ঘটিলে, অথবা জল ঝড় হইলে রোগটি প্রকাশ পাইতে থাকে, কিন্তু কীটদের এই রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করা একেবারে দুঃসাধ্য নহে। কীটসমূহের স্বাস্থ্যরক্ষার সাধারণ নিয়মাদির দিকে দৃষ্টি রাখিলে তাহারা ফ্লাশেরী রোগ হইতে অনেকটা নিষ্কৃতি পায়। যাহাতে তুঁত গাছের পাতা না পচে এবং পোকাদের লালনাগারে ধূলি ময়লা না পড়ে, সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

পাস্তুর দেখিলেন যে, তুঁত পাতার স্ফোটনক্রিয়াকারী এক প্রকার আণুবীক্ষণিক জীব ফ্লাশেরী রোগের মূল কারণ। শিশু কীড়া খুব বেশী পরিমাণে তুঁত পাতা খায় এবং তাহা খাইয়া জন্মের পর এক মাসের মধ্যেই ওজনে প্রায় পনেরো হাজার গুণ বর্দ্ধন লাভ করে। সেই সময়ে তাহারা যদি কোন দূষিত পাতা খাইয়া ফেলে, তাহা হইলে তাহাদের ফ্লাশেরী রোগে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে। ফ্লাশেরী, কলেরার ন্যায় জীবাণু দ্বারা সংঘটিত আন্ত্রিক রোগ বিশেষ। পাস্তুর, পতঙ্গের পাকস্থলীর কিয়দংশ জলে মিশ্রিত করিয়া, সেই দ্রব্য অণুবীক্ষণ-যন্ত্রে পরীক্ষা করিয়া এই জীবাণুর সন্ধান পান। তিনি বলিয়াছিলেন যে, যে সকল পতঙ্গের পাকস্থলী পরীক্ষা করিয়া ফ্লাশেরী জীবাণুর সন্ধান পাওয়া যায় না, তাহাদের সন্তানদের মধ্যে সেই রোগ সংক্রামিত হইবার বংশানুক্রমিক হেতু নাই।

পাস্তুর ফ্লাশেরী রোগের চার প্রকার জীবাণুর কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। ফরাসী গবেষকগণ সেই জীবাণুদের দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। একটি কিণ্বনক্রিয়া ঘটায়, অপরটি পচনক্রিয়া সংগঠিত করে। পাস্তুরের ধারণা ছিল যে, কীড়ার পাকস্থলীতে ভুক্ত দ্রব্য কোন কারণে পরিপাক না হইলে তুঁতপাতার স্ফোটনক্রিয়াকারী জীবাণু তন্মধ্যে বর্দ্ধন লাভ করাতে ফ্লাশেরী রোগ দেখা দেয়। রোগগ্রস্ত কীড়ার শরীর-মিশ্রিত রস সুস্থ কীড়ার ভুক্তদ্রব্যে মিশ্রিত হইয়া পাকস্থলীতে প্রবেশ করিলে এই রোগ জন্মিতে পারে।

বহু জাপানী বৈজ্ঞানিক ফ্লাশেরী রোগ বিষয়ে বিস্তারিত গবেষণা করিয়াছেন।

ফ্লাশেরী রোগ আমাদের দেশে কালশিরা নামে পরিচিত। ইয়োরোপ এবং জাপানে ফ্লাশেরি রোগের যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব দেখা গেলেও, আমাদের দেশের বহুশ্রেণী রেশম কীটের মধ্যে এই রোগের সেরূপ আধিক্য নাই। ফ্লাশেরি রোগ অপেক্ষা পেব্‌রিন্ রোগের প্রকোপ আমাদের দেশে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। পেব্‌রিন্ রোগের বাঙ্গালা নাম কটারোগ। পেবরিনের বাহ্য লক্ষণ ইয়োরোপে ও ভারতবর্ষে ঠিক একরূপ নহে, অর্থাৎ ইয়োরোপে পেব্‌রিন্ রোগগ্রস্ত পতঙ্গের গাত্রে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষ্ণবর্ণ বিন্দু বা রেখা পরিলক্ষিত হয়, আমাদের দেশে সেই লক্ষণ সচরাচর প্রকাশ পায় না। আমাদের দেশে এই রোগের যাহা প্রধান নিদর্শন, তাহা দেখিলেই ইহার নাম 'কটা' বা 'মাথাকটা' রাখা হইয়াছে। অণুবীক্ষণ-যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিলে ইয়োরোপের পেব্‌রিন্ ও আমাদের দেশের 'কটা' একরূপই দেখা যায়।

পেবরিন্ রোগ প্রোটোজোয়া-জাতীয় এক প্রকার পরান্ন-ভোজী জীবাণু (Nosema bombycis) দ্বারা উৎপন্ন হয়। রোগটি সেই জীবাণুর কোরক সাহায্যে স্বাভাবিক উপায়ে বিস্তার লাভ করে। পেব্‌রিন্ জীবাণুর কোরকের আকার ডিমের ন্যায় ও তাহার আয়তন দৈর্ঘ্যে প্রায় এক মিলিমিটরের আড়াই শত ভাগের একাংশ এবং প্রস্থে প্রায় তাহার অর্দ্ধেক। এই কোরক কোনক্রমে রেশমকীটের উদরস্থ হইলে তাহার কটারোগ জন্মাইবার সম্ভাবনা থাকে।

পাস্তুর পেব্‌রিন্ রোগের মূলক নিবারণের জন্য রেশম-

কীটের বিশুদ্ধ বীজ সংগ্রহ করিবার উপায় আবিষ্কার করেন। এইজন্য তিনি যে পরীক্ষাপ্রণালী প্রবর্তিত করেন তাহা খুবই সহজ। পর্যবেক্ষণ প্রণালীটি এইরূপ :—স্ত্রী-পতঙ্গগুলি গুটি কাটিয়া নির্গত হইবার পর গর্ভাবস্থা প্রাপ্ত হইলে, তাহাদের প্রত্যেককে এক এক টুকরা চৌকোণা বস্ত্রখণ্ডের উপরে পৃথক্ পৃথক্ রাখা হয়। তদুপরি স্ত্রী পতঙ্গেরা ডিম্ব প্রসব করে। অতঃপর তাহাদের নিজ নিজ বস্ত্রখণ্ডে পিন্‌দ্বারা সংবদ্ধ রাখা হয়। পতঙ্গগুলি মৃত হইয়া গেলে তাহাদের পৃথকভাবে উদরখণ্ড ছাড়া করিয়া অণুবীক্ষণ-যন্ত্রে পরীক্ষা করিতে হয়। যদি তন্মধ্যে পেব্‌রিন্ রোগের চিহ্ন-মাত্র পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেগুলি কাপড়ের টুকরা ও ডিম্বসমেত দগ্ধ করা উচিত। যে পতঙ্গকে পরীক্ষা করিয়া এই রোগের লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয় না, তাহাদের ডিম যত্নে পালন করিলে উত্তম নীরোগ কীট পাওয়া যায়।

পাস্তুর এই পরীক্ষাপ্রণালী আবিষ্কার করার পর সেই প্রথা বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত হইতে আরম্ভ করে। আলেস্ সহরের মধ্যে অনেকগুলি অণুবীক্ষণ-যন্ত্র বসান হয় ও তাঁহার প্রথা অনুযায়ী কাজ হইতে থাকে। এইভাবে তিনি নীরোগ রেশমকীট পাইবার ব্যবস্থা করিলে যত রেশমী পোকার বীজ-ব্যবসায়ী অসুবিধায় পড়িয়াছিল। কারণ, বাজারে মন্দ, রোগগ্রস্ত বীজের কাটতি একেবারে কমিয়া যায়। ব্যবসায়ীরা তাহার কোন উপায় করিতে না পারিয়া, শেষে পাস্তুরের আবিষ্কারের বিরুদ্ধেই নানারূপ মিথ্যা খবর রটাইতে থাকে। সেই সকল মিথ্যা গুজবে বহুদিন পর্য্যন্ত সাধারণ অশিক্ষিতদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু অবশেষে তাঁহারই পদ্ধতি সর্ব্বত্র প্রাধান্য লাভ করে। উত্তম রেশম-বীজ উৎপাদনের নিমিত্ত তাঁহারই সেই পদ্ধতি আজিও সর্ব্বদেশে প্রচলিত।

সাম্প্রদায়িকতা ও নেতৃবৃন্দ

... কারণগুলাকারগণ, অথবা নেতৃবৃন্দের মধ্যে যাঁহারা বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টকে সাম্প্রদায়িকতার জন্য অভিযুক্ত করিয়া হিন্দু জনসাধারণের পোষকতা লাভ করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের লেখা ও কথা পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, এই কারণগুলাকারগণ ও নেতৃবৃন্দ যাদৃশ পরিমাণে সাম্প্রদায়িকতার বিষ উদ্গীরণ করিয়া দেশের ও দশের যত অধিক পরিমাণে সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছেন, গভর্ণমেণ্টের উপর তাদৃশ সর্ব্বনাশের দায়িত্ব কোন ক্রমেই আরোপিত হইতে পারে না।

যেন 'অপকর্ম' চাপা দিবার উদ্দেশ্যে যদি জনসাধারণের মধ্যে ঢাক পিটাইয়া দেওয়া হয় যে, 'ওগো আমার অমুক যে দুষ্কর্ম করিয়াছে, তৎসম্বন্ধে অমুক অমুক আলোচনা করিতেছে, তোমাদিগকে তাহাদিগের কথা না লইতে হইবে,' তাহা হইলে ঐ অপকর্ম চাপা দেওয়ার পরিবর্ত্তে যেরূপ উহার প্রচারকার্য্যে ইন্ধন যোগান হয়, সেইরূপ উপরোক্ত কারণগুলাকারগণ ও নেতৃবৃন্দ সাম্প্রদায়িকতার ইন্ধন জোগাইতেছেন।...

• • •

আমাদের মতে বহির্বিশ্ব হইতে কলিকাতার হিন্দুদলের দ্বারা কলোরেশনে সাম্প্রদায়িক ভাব অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং তাহার প্রধান প্রযোজক আনন্দবাজার পত্রিকার মত কয়েকটী কাগজওয়ালারা, যেন ও কলহ প্রভৃতি পশুপ্রবৃত্তিসম্পন্ন তথাকথিত জাতীয় সংবাদপত্র।

এই সাম্প্রদায়িক মনোভাব যে জাতীয় জীবনের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্বনাশকর, তাহা যাঁহারা সম্যক্ ভাবে উপলব্ধি করিতে পারিবেন, তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা হিন্দু, তাঁহারা হিন্দুনেতা ও সাংবাদিকগণ যাহাতে মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে কোন কথা না করিতে পারেন, এবং যাঁহারা মুসলমান তাঁহারা মুসলমান নেতা ও সাংবাদিকগণ যাহাতে হিন্দুদিগের বিরুদ্ধে কোন কথা না করিতে পারেন, তাহার চেষ্টা করিলে এতাদৃশ সাম্প্রদায়িকতা অনেক হ্রাস হইতে পারে। নতুবা সাম্প্রদায়িক মনোভাব বৃদ্ধি পাওয়া এবং আমাদের সর্ব্বনাশ হওয়া অনিবার্য্য হইয়া থাকিবে।

প্রথম বৌদ্ধ সঙ্গীতি

—শ্রীঅ.....

বৈশাখী পূর্ণিমার রাত্রি প্রভাত-করা। সারা রাত্রি জ্যোৎস্নার ধারা ঢালিয়া চাঁদ যেন অবসাদে পশ্চিম গগনের প্রান্তে হেলিয়া পড়িয়াছে। সমস্ত শালবন আসন্ন নিপংপাতের ছায়ায় ম্লান। বুদ্ধদেবের অন্তিম শয্যা ঘিরিয়া তাঁহার শিষ্যগণ মৌন হইয়া বসিয়া আছেন। বিষাদের কাল মেঘ তাঁহাদের মুখের দীপ্তি কোন্ অজানা অন্ধকারে মিশাইয়া দিয়াছে। বুদ্ধদেব শেষ বারের মত শিষ্যদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

"অপ্পমাদেন ভিক্খবে সম্পাদেথ।—ভিক্ষুগণ! প্রমাদনিদ্রা ত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্যের পথে অগ্রসর হও" বলিয়া তিনি ধ্যানমগ্ন হইলেন। অতঃপর ধ্যান-রসে হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া নামরূপের ভার নামাইয়া দিয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেন। তখনই যেন সমস্ত আকাশের চন্দ্র, তারা আলোক হারাইয়া অন্ধকারে মিশিয়া গেল। ভিক্ষু-সঙ্ঘে ক্রন্দনের রোল উঠিল। তাঁহাদের উচ্চ বিলাপধ্বনি চারিদিক্ কাঁপাইয়া তুলিল। প্রভাতেই এই শোকাবহ বার্ত্তা দাবাগ্নির মত কুশীন নগরে ছড়াইয়া পড়িল। যে যেখানে ছিল, সে সেখানেই বজ্রাহতের মত নিষ্পন্দ হইয়া চাহিয়া রহিল। দিকে দিকে এই শোক-সংবাদ প্রেরিত হইল। দেশ-দেশান্তর হইতে দলে দলে বুদ্ধের ভক্তবৃন্দ আসিয়া কুশীন নগর জনাকীর্ণ করিয়া তুলিল। সকলের চোখ-মুখ অশ্রুকলঙ্কিত। এই শোকার্ত্ত জনতার মাঝে সুভদ্র নামক একজন বৃদ্ধ শ্রমণ ছিল, কিন্তু সে শোকের পরিবর্ত্তে আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল এবং রোরুদ্যমান ভিক্ষুসঙ্ঘকে সান্ত্বনা দিয়া কহিল—

"অলং আবুসো মা সোচিত্থ, মা পরিদেবিত্থ, মুমুত্তা ময়ং তেন মহাসমণেন, উপদ্দুতা চ হোম, ইদং বো কপ্পতি, ইদং বো ন কপ্পতি; ইদানি ময়ং যং ইচ্ছিস্সাম তং করিস্সাম, যং ন ইচ্ছিস্সাম তং ন করিস্সাম—বন্ধুগণ! আপনারা অনর্থক শোকাকুল হইবেন না, এতদিনে আমরা সেই মহা-শ্রমণের হাত হইতে নিস্তার পাইলাম, তিনি বিধিনিষেধের দ্বারা আমাদের কতই না উৎপাত করিয়াছেন, এখন আমরা আমাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যথেচ্ছ চলিব।"

সুভদ্রের এই বাক্য সঙ্ঘস্থবিরের মহাকাশ্যপের কানে শূলের মত বিঁধিল। তিনি ভাবিলেন—প্রভুর পরিনির্ব্বাণ হইতে না হইতেই ভিক্ষুর মনের এত পরিবর্ত্তন! এতাদৃশ ভিক্ষুগণই বুদ্ধবাণীকে অনুরভবিষ্যতে ধ্বস্ত করিয়া দিবে। এখন উপায় কি? ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার মনে হইল—যদি ভিক্ষুগণ একমত হইয়া ধর্ম্ম-সঙ্গায়না দ্বারা বিক্ষিপ্ত বুদ্ধবাণী সংগৃহীত করিয়া রাখেন, তাহা হইলে বুদ্ধশাসন জগতে আপনাকে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত করিয়া বিরাজ করিবে; ধর্ম্মহীনের কুবাক্য-কালিমা তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। এই কল্পনায় তিনিই প্রথমতঃ সঙ্গীতির স্বপ্ন দেখিলেন।

মহাসমারোহে বুদ্ধের দাহক্রিয়া সম্পন্ন হইল। বর্ষার অবসানে ক্ষীয়মান গঙ্গাপ্রবাহের মত কুশীন নগরের জনস্রোত ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া গেল। মহাকাশ্যপ সঙ্ঘসভায় সঙ্গীতির বিষয় উত্থাপন করিলেন। তাহা নির্ব্বিবাদে অনুমোদিত হইল। কোন আপত্তি উঠিল না। রাজগৃহই সঙ্গীতির উপযুক্ত স্থান মনোনীত হইল। কেবল আনন্দ স্থবিরের সমস্ত গুণ লইয়াই মতদ্বৈধ ঘটিল। কারণ তিনি আপনার আধ্যাত্মিক কর্ত্তব্য সমাপ্ত করিয়া অর্হত্ত্বপদের অধিকারী হইতে পারেন নাই। অন্যান্য নির্ব্বাচিত সকলেই অর্হত্বপদে প্রতিষ্ঠিত। আনন্দ তথাগতের পার্শ্বচর হইয়া তাঁহার সমস্ত বাণী শুনিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন এবং সেই সমুদয় নিজের স্মৃতি-ভাণ্ডারে সঞ্চিত রাখিয়াছিলেন। সেই জন্য ধর্ম্ম-ভাণ্ডারী বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। এই ধর্ম্ম-ভাণ্ডারীকে বাদ দিয়া ধর্ম্ম-সঙ্গায়ন অনেকেরই মনঃপূত হইল না। অতএব সঙ্ঘ ধর্ম্ম-ভাণ্ডারীকে সঙ্গীতির সদস্য নির্ব্বাচন করিতে বাধ্য হইলেন। অতঃপর স্থবিরবৃন্দ দেশভ্রমণ আরম্ভ করিলেন।

দেশভ্রমণে মাসাধিক কাল কাটিয়া গেল। বিদ্যুতের নৃত্যে, বর্ষণের গানে, বর্ষার অভিনয় সুরু করিয়া আষাঢ়

আসিল। আষাঢ়ের এই বর্ষাভিনয় স্থবিরগণের দেশভ্রমণ বন্ধ করিয়া দিল। তাঁহারা রাজগৃহে আসিলেন। রাজগৃহবাসী ভিক্ষুগণ তাঁহাদের বাসের সুবিধার জন্য অন্যত্র চলিয়া গেলেন। শুক্লপক্ষের চাঁদ দিনের পর দিন কলায় কলায় পূর্ণ হইয়া ভিক্ষুদের বর্ষাব্রত জানাইয়া দিল। তাঁহারা স্বীয় স্বীয় বিহারে বর্ষাব্রত অবলম্বন করিলেন।

বর্ষাব্রতের প্রথম মাসে রাজগৃহে বিহার-সমূহের জীর্ণ-সংস্কার হইল। রাজা অজাতশত্রু স্থবিরগণের নির্দ্দেশ মত বৈভার পর্ব্বতের পার্শ্বস্থিত সপ্তপর্ণী গুহার সম্মুখে সঙ্গীতির বেদী নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন। সেই কারুকার্য্য-খচিত বেদীর উপর প্রত্যেক সদস্যের জন্য একখানি আসন স্থাপিত হইল। বেদীর মাঝখানে রহিল ধর্ম্মাসন এবং তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে স্থবিরাসন। সঙ্গীতির দিন ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল। সঙ্ঘস্থবির আনন্দকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বন্ধু আনন্দ! কালই আমাদের সঙ্গীতির কার্য্য আরম্ভ হইবে, অর্হত্বপদে প্রতিষ্ঠিত না হইয়া তথায় তোমার মত সদাশয় লোকের উপস্থিতি বাঞ্ছনীয় নয়।"

সঙ্ঘস্থবিরের স্নেহবাক্য আনন্দের প্রাণের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। আনন্দ উদ্যমের শেষ সীমায় পৌঁছিয়া রাত্রির শেষ প্রহরে ধ্যানের নূতন আলোক অনুভব করিলেন। তখনই তাঁহার সমস্ত অন্তর উদ্ভাসিত করিয়া অর্হত্বের বিকাশ হইল। কামনা-বাসনার শেষ কালিমারেখা মন হইতে মুছিয়া গেল।

পর দিন সঙ্গীতির সদস্যগণ সঙ্গীতি-মণ্ডপে উপস্থিত হইয়া আপনাদের যথাযোগ্য আসন গ্রহণ করিলেন। কেবল স্থবির আনন্দের আসনই খালি পড়িয়া রহিল। তাঁহার শূন্য আসন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে তিনি অলৌকিক শক্তি প্রকাশ করিয়া আপনার আসন অধিকার করিলেন। সদস্যমণ্ডলী বিস্ময়বিমুগ্ধ নেত্রে তাঁহার পানে চাহিলেন। সভা গভীর নিস্তব্ধতায় মগ্ন হইল। সঙ্ঘস্থবির সভার স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ধর্ম্ম-সঙ্গায়নের জন্য সঙ্ঘ পাঁচশত ভিক্ষু নির্ব্বাচিত করিয়াছেন, ইহাতে যদি আপনাদের আপত্তি না থাকে, তূষ্ণীভাব অবলম্বন করুন।"

সভা মন্ত্রমুগ্ধবৎ নীরব রহিল। তখন সঙ্ঘস্থবির স্থবিরাসনে বসিয়া কহিলেন, "সুণাতু মে সঙ্ঘো যদি সঙ্ঘস্স পত্তকল্লং অহং উপালিং বিনয়ং পুচ্ছেয্যং—সঙ্ঘ আমার বাক্য শুনুন, সঙ্ঘ যদি উপযুক্ত সময় মনে করেন, আমি উপালিকে বিনয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিব।"

উপালি ধর্ম্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া বলিলেন, "সুণাতু মে ভন্তে সঙ্ঘো যদি সঙ্ঘস্স পত্তকল্লং অহং আয়স্মা মহাকস্সপেন বিনয়ং পুট্ঠো বিস্সজ্জেয্যং সঙ্ঘ···আমি আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপের জিজ্ঞাসিত বিনয়-প্রশ্নের উত্তর দিব।" এইরূপে সঙ্গীতির কার্য্য আরম্ভ হইল। মহাকাশ্যপ 'পারাজিকা' হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত বিনয় পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে জিজ্ঞাসা করিলেন। উপালি সমস্ত বিনয় উচ্চারণ করিলেন। অন্যান্য সদস্যগণ তাঁহার অনুসঙ্গায়ন করিয়া আপনাদের স্মৃতিসূত্রে বিনয় গাঁথিয়া লইলেন।

বিনয় সঙ্গায়ন সমাপ্ত হইবার পর, ধর্ম্ম সঙ্গায়নের প্রস্তাব হইল। বিধিবত মহাকাশ্যপ স্থবিরাসন এবং আনন্দ ধর্ম্মাসন গ্রহণ করিয়া সঙ্ঘের অনুমতি হইলেন। মহাকাশ্যপ ব্রহ্মজাল সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া পাঁচ নিকায়ের সমস্ত ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিয়া আনন্দের নিকট যথাযথ উত্তর পাইলেন। স্থবিরবৃন্দ অনুসঙ্গায়ন করিলেন। এইরূপে বুদ্ধদেবের সমস্ত বাণী একত্রিত করিয়া ধর্ম্ম ও বিনয়ের কৌটায় পুরিয়া রাখা হইল।

অতঃপর আনন্দ বলিলেন, "ভগবান পরিনির্ব্বাণ শয্যায় শয়ান হইয়া আমায় বলিয়াছিলেন, তাঁহার পরিনির্ব্বাণের পর সঙ্ঘ ইচ্ছা করিলে বিনয়ের ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদগুলি বাদ দিতে পারেন।" তখন ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদের বিচার আরম্ভ হইল। কিন্তু সঙ্ঘ তাহাতে একমত হইতে পারিলেন না। মহাকাশ্যপ বিবাদ থামাইয়া বলিলেন, "বন্ধুগণ! যদি আমরা এখন শিক্ষাপদের বাঁধন ভাঙ্গিয়া দিই, তাহা হইলে, লোকের অস্ত্র বাক্যবাণে আমাদিগকে বিদ্ধ হইতে হইবে। তাহারা বলিবে, গৌতমের চিতাগ্নির ধূমশিখা নির্ব্বাপিত হইতে না হইতেই তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহার আদেশ পদদলিত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সুতরাং আমরা প্রভুর আদিষ্ট সমস্ত শিক্ষাপদ মানিয়া চলিব তাহাতে আমাদের উপকার বৈ অপকার হইবে না।"

সঙ্ঘ একবাক্যে মহাকাশ্যপের উপদেশ অনুমোদন করিলেন। এইরূপে সাত মাসের পর প্রথম বৌদ্ধসঙ্গীতির কার্য্য সমাপ্ত হইয়াছিল।

এই ধর্ম্ম-সঙ্গীতি বৌদ্ধদের একমাত্র সাম্প্রদায়িক ভাব-বিমুক্ত মহাসম্মেলন। ইহাই বৌদ্ধ ধর্ম্মকে নূতন জীবন দিয়াছিল। ইহার সংগঠনের মূলে মহাকাশ্যপের উদ্যম নিহিত ছিল। এই জন্যই যেন তিনি বুদ্ধের এত প্রিয় ছিলেন, এমন কি বুদ্ধ স্নেহের আবেগে তাঁহার সহিত বসন বিনিময় করিয়াছিলেন।

বলা বাহুল্য, মহারাজ অজাতশত্রু সঙ্গীতির সংগঠনের সহায় হইয়া বৌদ্ধ জগতে আপনাকে অমর করিয়া রাখিয়াছেন।

সংবাদ ও মন্তব্য

ইংলণ্ডের টনক

> ৯ই মে'র সংবাদে প্রকাশ : ইংলণ্ডের কমন্স-সভায় বৃষি-সচিব মাননীয় মেজিল্যাণ্ড ডরম্যান-স্মিথ ইংলণ্ডের সরকার কর্তৃক ইংলণ্ডের জমির উর্ব্বরাশক্তির বৃদ্ধির চেষ্টার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, সার সংগ্রহ করা হইয়াছে এবং ট্রাক্টর ইত্যাদি নানারূপ যন্ত্রপাতি, খাদ্যদ্রব্য, আলানিকাঠ এবং চাষবাসের প্রয়োজনে লাগিবার বিভিন্ন দ্রব্যাদি সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ফুল বাধিলে চাষবাস করিতে রাজী, এইরূপ লোক সংগ্রহেরও ব্যবস্থা হইতেছে।

তবে কি ইংলণ্ডের টনক নড়িল? অবশ্য যে ভাবে নড়িলে কাজ হইত, সে ভাবে নড়ে নাই, তবে নড়িয়াছে। জমীর উর্ব্বরাশক্তির যে কমতি হইয়াছে, তাহা ইংলণ্ডের কৃষি-বিভাগের নজর পড়িয়াছে এবং ইহা না বাড়াইলে যে গতি নাই, তাহাও ইংরাজজাতি বুঝিতেছেন। বহুকাল ধরিয়া আহাজের আমদানী কৃষিদ্রব্য লইয়া দিন কাটাইয়া তাহাতেই ইংলণ্ড অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিলেন, কোনদিন যে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে, এমন আশঙ্কা হয় নাই। যুদ্ধের ধূম্র পড়ায়, সেই আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। জাহাজ সেদিনকার জিনিষ, আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যটাও বেশী পুরাতন নহে। এই শতাব্দীগুলি জন্মিবার পূর্ব্বে ইংলণ্ডের কিছুটা সময় অবশ্য খাদ্যদ্রব্যের অভাবে কাটিয়াছে, কিন্তু চিরকালই সে অভাব বর্ত্তমান ছিল না। বর্ত্তমান ভূতত্ত্ববিদের হিসাবেও ইংলণ্ডের ভূমির যে বয়ঃক্রম দাঁড়াইবে, সেই বয়ঃক্রমের চিরটা কাল ধরিয়াই যে ইংলণ্ডের লোক খাদ্যাভাবে ভুগিয়াছে, এমন কথা বলা যায় না। সুতরাং ইংলণ্ডের জমীরই ইংলণ্ডের লোক-সংখ্যাকে একদিন আহার্য্য দিবার সামর্থ্য ছিল—এ কথা একেবারে কাণ্ডজ্ঞানহীন ব্যক্তি ব্যতীত আর সকলেই স্বীকার করিবেন। ইংলণ্ডের জমীর সেই সামর্থ্য আজ নাই। থাকিলে উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধির কথা উঠিবার দরকার ছিল না। সেই স্বাভাবিক সামর্থ্য কি ভাবে গেল, তাহার আনুপূর্ব্বিক সন্ধান না করিয়া আজ আবার উর্ব্বরাশক্তির বৃদ্ধির জন্য ইংলণ্ডের নূতন চেষ্টা বাধ হইতে বাধ্য। ইংলণ্ডে কার্য্যকরণ সম্বন্ধিত ঘটনা-বিচারক্ষম একটি মাত্র ব্যক্তি থাকিলে ইহা বুঝা ইংরাজজাতির পক্ষে অসম্ভব হইত না। শুনা যায়, রিকার্ডো নামক হইনৈক তত্ত্ববাক্তি একবার গবেষণা করিয়া স্থির করিয়াছিলেন যে, কিছুটা সময় অবধি সকল জমীরই স্বাভাবিক একটা উর্ব্বরাশক্তি থাকে, অতঃপর চাষের কার্য্যে বহুদিন ব্যাপৃত হওয়ায় ফলে, তাহা অন্তর্হিত হয়। এই গবেষণা অবধারিত সত্য বলিয়া লইয়া ইংলণ্ড, তথা ইউরোপ, তথা আমেরিকা, সহ জগতের সর্ব্বত্র আজ অবাধাভাবে উর্ব্বরাশক্তির বৃদ্ধির চেষ্টা গৃহীত হইয়াছে। জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তির হেতু বর্ত্তমান বিজ্ঞানের কোন অধ্যায়েই লিখিত হয় নাই। তথাপি বর্ত্তমান বিজ্ঞান তাহার জ্ঞান-পরিমাণে সমুজ্জ্বল। মানবজাতির মস্তিষ্ক যদি সম্পূর্ণরূপে অন্ধত্বপ্রাপ্ত না হইয়া থাকেত, তবে আধুনিক বিজ্ঞানের এই অলিখিত অধ্যায় সম্বন্ধে সামান্য পরিমাণ উৎসুক্য দেখা যাইত। সে উৎসুক্য দূরে থাক্, বর্ত্তমান কৃষিকার্য্যের জটিলতাকে উপেক্ষা করিয়া নিত্যনূতন জটিলতার পাশে তাহাকে বন্দী করা হইতেছে—স্যর রেজিন্যাল্ড ডরম্যানস্মিথ সেই জটিলতার পাশের মধ্যেই ইংলণ্ডের কৃষির মুক্তির সন্ধান করিতেছেন। আমরা মনে করি, ইহা বর্ব্বরোচিত, ইংলণ্ডের শাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে চিন্তাশক্তির ভীষণ দৈন্য উপস্থিত না হইলে ইংলণ্ডের কৃষিবিভাগের এবং ইংলণ্ডের কৃষি-বিজ্ঞানের অলিখিত অধ্যায়ের প্রতি দৃষ্টি পড়িত। বর্ত্তমান বিজ্ঞানের লিখিত অধ্যায়সমূহের সহায়তায় কৃত্রিম উপায়ে প্রকৃতির কার্য্য বজায় রাখিবার যত চেষ্টাই হউক না কেন, তাহার দ্বারা মনুষ্যজাতির সহজ আহার-বিহার ছুটিতে পারে না। সহজ আহার বিহারের সন্ধান না পাইলে জগদ্ব্যাপী বর্ত্তমান হাহাকার নিবৃত্ত হইতে পারে না। তাই বলিতেছি, ইংলণ্ডের টনক পড়িয়াছে বটে, কিন্তু যে-ভাবে নড়িলে কার্য্য হইত, সে ভাবে নড়ে নাই। ভারতবাসীর টনক না নড়িলে ইংলণ্ডের টনক সে ভাবে নড়িবারও সম্ভাবনা নাই। তাই আমরা বারংবার বলিতেছি যে, ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ড, এই উভয় দেশের অধিবাসীর ঐকান্তিক মিলনের মধ্যেই জগদ্ব্যাপী হাহাকার থামাইবার বীজ নিহিত রহিয়াছে।

'এসেন্সিয়ালিজ্‌ম্'

> 'এসেন্সিয়ালিজম (Essentialism)' নামে সংপ্রতি লণ্ডন হইতে একটি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। লেখক ইহাতে ইউরোপীয় এসেন্সিয়ালিজ্‌মকে ধর্ম্মের এবং পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্মমতের একটি নূতন রূপ বলিয়া জানাইয়াছেন। পুস্তকে লেখক পৃথিবীব্যাপী সর্ব্বজাতির সর্ব্বমানবের সহযোগিতা প্রার্থনা করিয়াছেন—বিশেষতঃ জগতের চাষী ও শ্রমিকদের;

কেন না তাঁহার মত হইতেছে এই যে,যদি কৃষিকার্য্যকে যুক্তিসঙ্গত সংস্কার দান করা যায়, তবে অল্পই ইহা পৃথিবীব্যাপী বর্ত্তমান ক্রটিপূর্ণ আর্থিক ব্যবস্থার সংস্কার করিতে পারিবে এবং ক্রমশঃ পৃথিবীময় শান্তিধারা প্রতিষ্ঠিত হইবে।

•

পুস্তকখানি আমরা পাঠ করি নাই। সমালোচনা দৃষ্টে উক্ত সংবাদ গৃহীত হইয়াছে। পুস্তক পাঠ না করিলেও ইহার নামকরণ এবং বক্তব্যের অংশ সম্বন্ধে উপরের সংবাদ হইতে "এগ্রিকালচারালিজম্" বিষয়ে পাঠক যে সামান্য জ্ঞান লাভ করিবেন, তাহা তাঁহার চিন্তার খাদ্য উপস্থিত করিবে। সে চিন্তার ধারা এইরূপ হওয়া স্বাভাবিক যে, বর্ত্তমানে মনুষ্যজাতির যে বিশেষ দুর্দ্দিন, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ কোন দেশে কাহারও নাই। তদুপরি ইহার মূলে যে বর্ত্তমান জগতে আর্থিক বনিয়াদের বিপর্য্যয়, তৎসম্বন্ধেও অনেকেই চিন্তা করিতেছেন। কিন্তু পৃথিবীব্যাপী কৃষিকার্য্যের নূতন সংগঠন দ্বারাই যে এই বিপর্য্যয় দূর করিবার সূত্রপাত হইতে পারে, ইতিপূর্ব্বে "বঙ্গশ্রী" ব্যতীত আর কেহ তাহা বলে নাই। সংপ্রতি এই পুস্তকে উহা বলা হইয়াছে। সমগ্র পুস্তকে কৃষিকার্য্যের এই নূতন সংগঠনের কোন আভাস লেখক দিয়াছেন কি না, তাহা আমরা বলিতে পারি না। কৃষি-বিষয়ক প্রাকৃতিক নিয়ম না জানিতে পারিলে যে এই সংগঠন কিছুতেই সম্ভব নহে—লেখক তাহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন বলিয়া সমালোচনায় কুত্রাপি উল্লেখ নাই। তথাপি পাঠকের দৃষ্টি আমরা এই সংবাদের প্রতি আকৃষ্ট করিলাম—এই নিমিত্ত যে, পৃথিবীব্যাপী প্রকৃত সমস্যা কি তৎসম্বন্ধে ভারতেতর দেশেরও টনক নড়িয়াছে।

উন্নতির ধুয়া

১৩ই মে (২৮শে বৈশাখ) কলিকাতায় মেসিন ও প্রোসেস এক্সিবিশনে এক বক্তৃতা প্রদান করিয়া ডক্টর মেঘনাদ সাহা বলিয়াছেন: বলা হইতেছে যে, বৈজ্ঞানিক ধর্ম্ম পরিহার করিতে হইবে এবং আধুনিক সভ্যতা বর্জ্জন করিতে হইবে। এই সকল কর্ম্মপন্থাতে উন্নতির উপাদান (element of progress) বর্ত্তমান নাই।...বস্তুতঃ ইউরোপ আমেরিকার তুলনায় ভারতের অবস্থার দারিদ্র্যের উল্লেখ করিয়া ভারতকে ইউরোপ করিবার একমাত্র উপায় শিল্প-প্রসার, এই মত জ্ঞাপন করিয়াছেন।

ডক্টর মেঘনাদ সাহা বর্ত্তমান ভারতের নামকরা বৈজ্ঞানিক। তিনি যাহা বলেন, ভারতের ছাত্র-সমাজ তাহা নির্ব্বিচারে গলাধঃকরণ করিয়া থাকে। যখন ছাত্র ছিলেন, তখন তিনি তাহাদের দ্বারাই নির্ব্বিচারে অনেক বিষয় গলাধঃকরণ করিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন। এই "গলাধঃকরণে"র ব্যাপারটি বর্ত্তমান যুগে ধারাবাহিক ভাবে চলিয়া আসিতেছে। এ যুগে এই গলাধঃকরণ-এর ক্ষমতাটাই বিদ্যাবুদ্ধির সমার্থক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই তাঁহার সমগ্র বক্তৃতায় উন্নতি বলিতে কি বুঝা যাইবে, তাহার উল্লেখ পর্য্যন্ত নাই। কেবল ইউরোপের লোক যে ভারতের অপেক্ষা ১০ গুণ অধিক কাষ্য করে এবং সে কার্য্য হাতের কার্য্য নহে, যন্ত্রের কার্য্য—ভারতের যে তাহা না করিলে 'মান-সম্মান' বজায় থাকিবে না, বক্তৃতায় ইহারই জন্য হা-হুতাশ বর্ত্তমান কার্য্যের ফল যাহাই দাঁড়াক, ব্যক্তিগতভাবে এবং জাতিগতভাবে তাহার প্রতি ভ্রূক্ষেপও না করিয়াই তিনি এই হা-হুতাশ করিয়াছেন—যে-কার্য্যে না ঘুচে আর্থিক অভাব এবং পরমুখাপেক্ষিতা, না বজায় থাকে শরীরের স্বাস্থ্য এবং মানসিক শান্তি, সে কার্য্যটা যন্ত্র সাহায্যে বিশগুণ অধিক করা হইতেছে বলিয়াই তাহা উন্নতিমূলক হইতে পারে না। 'উন্নতির উপাদান' নাই বলিয়াই কোন কর্ম্মপন্থাকে বাতিল করিতে হইলে, উন্নতিটা কি বস্তু, তৎসম্বন্ধে স্থির-নিশ্চয় হওয়া প্রয়োজন। যান্ত্রিক সভ্যতাই হউক কিংবা অযান্ত্রিক সভ্যতাই হউক—উন্নতিটা 'যন্ত্র' কিংবা 'অযন্ত্রে'র মাপকাঠিতে নহে—মাপকাঠিটা মানুষ। মনুষ্যত্বের মাপকাঠিটা যেমন এফ. আর. সি. উপাধি নহে, তেমনই যন্ত্রটাই সভ্যতার ও উন্নতির পরিচায়ক নহে।

কচুরীপানা সপ্তাহ

গত এপ্রিল মাসের শেষ ভাগে বাঙ্গালার সরকার সমস্তরে কচুরীপানা সপ্তাহ উদ্‌যাপন করিয়াছেন। সংপ্রতি বাঙ্গালা সরকারের পল্লীউন্নয়ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী কচুরীপানা সপ্তাহের ফলাফল জানাইবার জন্য জিলা অফিসারদের নিকট পত্র প্রেরণ করিয়াছেন।

•

সরকারের এই কার্য্য হয়তো শুভেচ্ছা-প্রোতক। কিন্তু কেবলমাত্র শুভেচ্ছার দ্বারা কোন কার্য্য সাধিত হইতে পারে না, সঙ্গে বুদ্ধির প্রয়োজন। কচুরীপানা ব্যাধি নহে, উহা লক্ষণ মাত্র। যতদিন নদী, খাল, বিল, পুকুর, দীঘি থাকিবে, ততদিন কচুরীপানা কোন না কোনরূপে থাকিবার অজিলা খুঁজিয়া পাইবে। এই হাজা-মজা নদী, খাল, বিল, পুকুরের পূর্ণ সংস্কার আবশ্যক। সুসংগঠিত পরিকল্পনার সাহায্যে এই সংস্কারকার্য্যে যতদিন সরকার অবতীর্ণ না হইবেন ততদিন কচুরীপানার সহিত অন্নাভাব ও অস্বাস্থ্য, দেশের বুকে থাকিয়া যাইবে। কংগ্রেসী সরকারই হউন, আর অকংগ্রেসী সরকারই হউন—উভয়ের পক্ষেই কর্ম্মপন্থা এক। 'কচুরীপানা সপ্তাহ' ঘোষণা করিয়া এই কার্য্য হইবে না—এই কার্য্য সময়সাপেক্ষ এবং দুঃসাধ্য। কিন্তু দুঃসাধ্য হইলেও অসাধ্য নহে—তদুপরি ইহা ব্যতীত আর বাঁচিবার উপায় নাই। নাস্ত পন্থা। শুভেচ্ছার সহিত সুবুদ্ধির সংযোগ হইলেই ইহা বুঝা যাইবে।

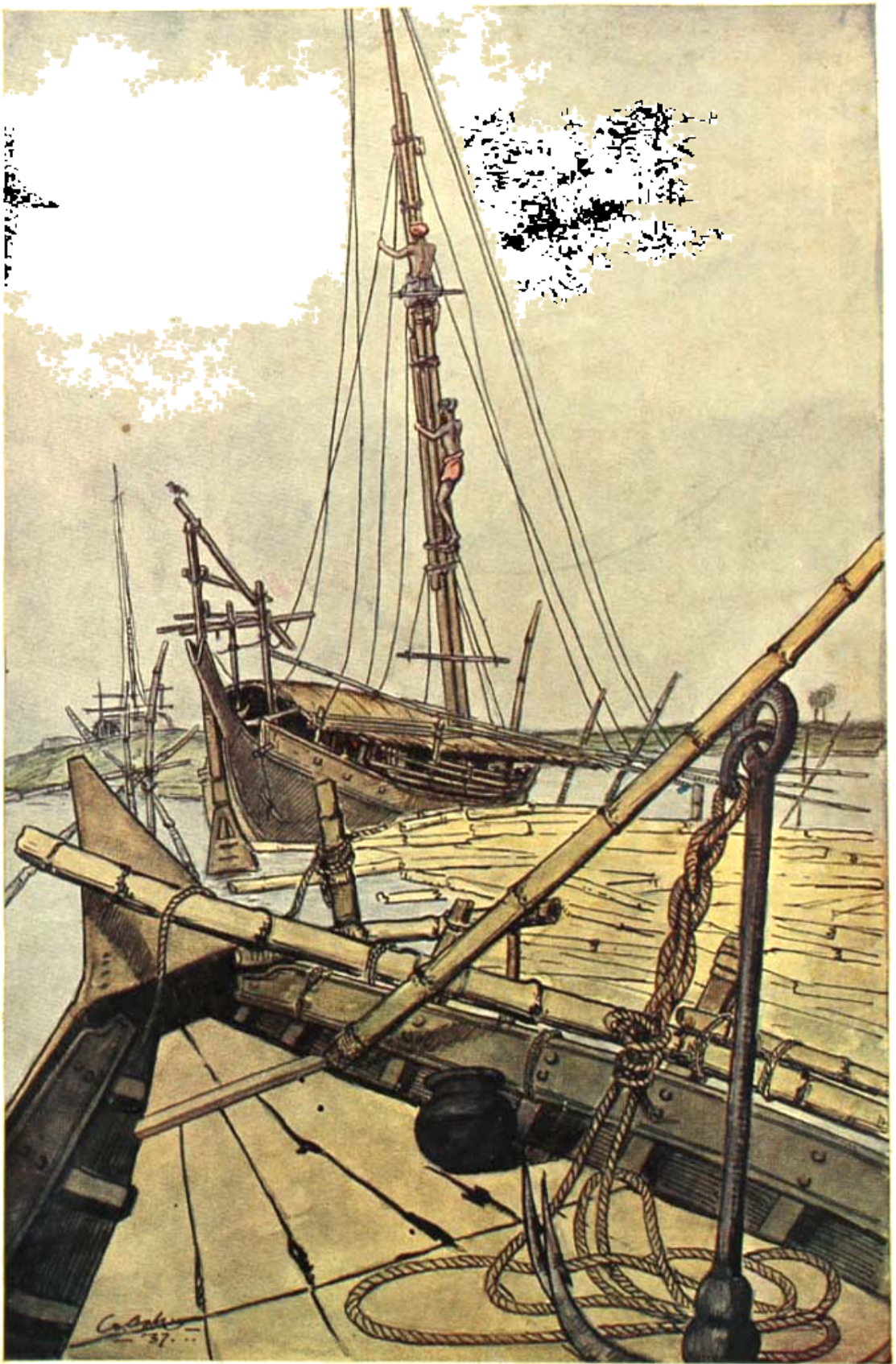

পদ্মানদীর মাঝি। [শিল্পী—শ্রীগোবর্দ্ধন আশ

"লক্ষ্মীস্ত্বং ধান্যরূপাসি প্রাণিনাং প্রাণদায়িনী"

বঙ্গশ্রী

আষাঢ়—১৩৪৬

৭ম বর্ষ, ১ম খণ্ড—৬ষ্ঠ সং

সম্পাদকীয়

—শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য

ভারতীয় ঋষির সভ্যতা ও কৃষ্টি সম্বন্ধে আধুনিক ধারণার নমুনা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আমরা [illegible] এই সন্দর্ভের সূচনাতেই বলিয়াছি যে, "ঋষিগণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল মনুষ্য পর্য্যন্ত ঋষিগণের সম্বন্ধে অজ্ঞতাবশতঃ কিরূপে ঋষির কথা ভ্রমপ্রমাদযুক্ত করিয়া তোলেন তাহা দেখান আমাদিগের এই সন্দর্ভের প্রধান উদ্দেশ্য।" এই উদ্দেশ্য সম্মুখে লইয়াই আমরা শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায়ের "হিন্দু শাস্ত্র ও মানব প্রগতি" নামক একটি প্রবন্ধ ও শ্রীযুক্ত ব্যস্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের "মত ও পথ" নামক অপর একটী প্রবন্ধের সমালোচনা করিতে বসিয়াছি তাহা পাঠকগণকে স্মরণ রাখিতে হইবে।

অনিলবরণ বাবুর প্রবন্ধের মধ্যে আলোচ্য বিষয় নিম্নলিখিত চারিটি :—

(১) ভারতীয় সভ্যতা ও আদর্শের প্রকৃতি ;

(২) ভারতীয় সভ্যতা ও আদর্শের প্রতি ভারতীয় বহুলোকের বিরক্তির কারণ ;

ছুঁৎমার্গ

বিধবাদিগের সম্বন্ধে হিন্দু শাস্ত্রের ব্যবস্থা।

উপরোক্ত চারিটী বিষয়ের মধ্যে প্রথমোক্ত তিনটী বিষয়ে অনিলবরণ বাবু যে কতখানি অযৌক্তিক মতবাদ [illegible] করিয়া থাকেন ও প্রচার করিয়া থাকেন তাহার কথায় কত ঋষিবিরুদ্ধ উক্তি স্থান লাভ করিয়া থাকে তাহা আমরা গত সংখ্যায় দেখাইয়াছি।

বিধবাদিগের সম্বন্ধে হিন্দু শাস্ত্রের ব্যবস্থা বিষয়ে অনিলবরণ বাবু যে মতবাদ পোষণ করিয়া থাকেন তাহার অযৌক্তিকতা কোথায় ইহা দেখান বর্ত্তমান সন্দর্ভের অন্যতম উদ্দেশ্য। এই প্রসঙ্গ লইয়া অনিলবরণ বাবুর সহিত ব্যস্তবাবুর বাদ-প্রতিবাদ উপস্থিত হয়। ঐ বাদ-প্রতিবাদের বিস্তৃত বিবরণ আমরা গত সংখ্যায় প্রকাশ করিয়াছি এবং তাহার শেষ ভাগে দেখাইয়াছি যে, ঐ বাদ-প্রতিবাদের মীমাংসা করিতে হইলে আমাদিগকে নিম্নলিখিত তিনটী বিষয়ের বিচার করিতে হইবে :—

(১) ভারতীয় ঋষির শাস্ত্রানুসারে বৈধব্য-পালন

বাধ্যতামূলক অথবা স্বেচ্ছামূলক অথবা বৈধব্য-ত্যাগ বাধ্যতামূলক অথবা আর কিছু।

(২) বৈধব্য-পালন কি রমণীর পক্ষে শাস্তি অথবা কর্তব্যপালন?

(৩) ভারতীয় ঋষির শাস্ত্রানুসারে ঈশ্বর জীবকে তাহার কর্মানুসারে সুখ-দুঃখ প্রদান করেন, অথবা জীব তাহার কর্মানুসারে সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে, অথবা আর কিছুর জন্য জীবের সুখ ও দুঃখের ভোগ হইয়া থাকে।

ভারতীয় ঋষির শাস্ত্রানুসারে বৈধব্য-পালনের ব্যবস্থা

ভারতীয় ঋষির শাস্ত্রানুসারে বৈধব্যপালন বাধ্যতামূলক অথবা স্বেচ্ছামূলক অথবা বৈধব্য-ত্যাগ বাধ্যতামূলক, অথবা আর কিছু তাহা আমরা এই প্রসঙ্গে আলোচনা করিব।

এই সম্বন্ধে অনিলবরণ বাবু যাহা যাহা বলিয়াছেন তন্মধ্যে তিনটী কথা উল্লেখযোগ্য, যথা :—

(১) বিধবা পুনর্ব্বার বিবাহ করিবে কি না……তাহা সে নির্দ্ধারণ করিবে নিজে, অপরে নহে।

(২) হিন্দু-শাস্ত্রে বিধবাগণকে এই স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছিল, শুধু বিধবারা নহে, 'নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ'—স্বামী দুশ্চরিত্র, মৃত, সন্ন্যাসী, ক্লীব বা পতিত হইলে নারী অন্য পতি গ্রহণ করিতে পারে, এ ব্যবস্থা মনুসংহিতাতেই (?) আছে।

(৩) হিন্দু বিধবারা স্বেচ্ছায় ব্রহ্মচর্য্য-পালনে ব্রতী হইলে সমাজে তাহারা বিশেষ সম্মান লাভ করিত, তাই বিধবার ব্রহ্মচর্য্য, শিষ্টাচার, দেশাচার হইয়া পড়ে। এখন ইহা গতানুগতিক হইয়া পড়িয়াছে।

অনিলবরণ বাবুর উপরোক্ত তিনটী কথার প্রথম কথাটী হইতে বুঝিতে হয় যে, ভারতীয় ঋষির ব্যবস্থানুসারে বৈধব্যপালন স্বেচ্ছামূলক অর্থাৎ বিধবাগণ ইচ্ছা করিলে পুনরায় বিবাহ করিতেও পারেন, নাও করিতে পারেন।

ভারতীয় ঋষিগণের ব্যবস্থানুসারে বৈধব্য-পালন (অর্থাৎ পুনরায় পতিগ্রহণ না করা) যে স্বেচ্ছামূলক তাহা দেখাইবার জন্য অনিলবরণ বাবু তাঁহার উপরোক্ত দ্বিতীয় কথায় পরাশর-সংহিতার

"নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥"

এই শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়াছেন।

এই শ্লোকটীর অর্থ লইয়া আধুনিক পণ্ডিতগণের মধ্যে দুইটী বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত আছে।

একদল পণ্ডিতের মতে উহার অর্থ—"যে পাত্রের সহিত বিবাহের কথাবার্ত্তা স্থির হইয়াছে, তাহার সহিত কন্যার বিবাহ দিতে হইবে, তবে ঐ ভাবী পতি যদি নিরুদ্দেশ হয়, মরিয়া যায়, প্রব্রজ্যা অবলম্বন করে, ক্লীব বলিয়া স্থির হয় বা পতিত হয়, তবে ঐ পঞ্চ প্রকার আপদে ঐ কন্যার পাত্রান্তরে প্রদান বিহিত।"

যাঁহারা বিধবা-বিবাহের বিরোধী তাঁহারা উপরোক্ত ভাবে শ্লোকটীর ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।

অপর একদল পণ্ডিতের মতে উহার অর্থ—"স্বামী যদি নিরুদ্দেশ হয়, মরিয়া যায়, প্রব্রজ্যা অবলম্বন করে, ক্লীব বলিয়া স্থির হয় বা পতিত হয়, তাহা হইলে নারী পত্যন্তর গ্রহণ করিবে।"

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি পণ্ডিতগণের মধ্যে যাঁহারা বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতী তাঁহারা এই শেষোক্ত অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

এই দুইটী অর্থের মধ্যে কোন্‌টী ঋষিপ্রণীত ব্যাকরণ-সঙ্গত অথবা কোন্‌টী ঋষিপ্রণীত ব্যাকরণসঙ্গত নহে কি না তাহার বিচার আমরা এখানে করিব না।

মোটের উপর দেখা যাইতেছে যে, বিধবার বিবাহে যে তাহার স্বেচ্ছামূলক তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য অনিলবরণ বাবু উপরি উদ্ধৃত শেষোক্ত অর্থটী গ্রহণ

করিয়াছেন। কিন্তু, অনিলবরণ বাবুর পক্ষে দুঃখের বিষয় এই যে, শেষোক্ত অর্থটী গ্রহণ করিলেও বিধবার বিবাহ তাহার স্বেচ্ছামূলক বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় না, কারণ "বি-ধীয়তে" এই পদটী হইতে "করিতেও পার, নাও করিতে পার" এবংবিধ স্বেচ্ছামূলক কোন বিধানের কথা পাওয়া যায় না, পরন্তু "করিতেই হইবে" এবংবিধ বাধ্যতামূলক বিধানের কথা পাওয়া যায়।

কাযেই দেখা যাইতেছে যে, ঋষিগণের শাস্ত্রানুসারে বিধবার বিবাহ যে তাহার স্বেচ্ছামূলক ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য অনিলবরণ বাবু যে শাস্ত্র-বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেই শাস্ত্র-বাক্যই তাঁহার সিদ্ধান্তের বিরোধী। ইহা হইতে আরও প্রতিপন্ন হইতেছে যে, অনিলবরণ বাবু সংস্কৃত ভাষার কিছুই জানেন না, এবং ঋষি-প্রণীত শাস্ত্র সঙ্গতভাবে গ্রহণ করিতে হইলে যে চিন্তা-শক্তির প্রয়োজন, সেই চিন্তা-শক্তিও তাঁহার নাই, অথচ, শাস্ত্রের জ্যেঠামী করিতে তিনি সঙ্কোচ বোধ করেন না। শাস্ত্র-বাক্য লইয়া এতাদৃশ জ্যেঠামীর আর একটী অবতার হইয়াছেন অনিলবরণ বাবুর গুরু "শ্রী-অরবিন্দ"। ঋষি-প্রণীত সংস্কৃত ভাষা ও শাস্ত্র সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ হইয়াও অরবিন্দ বাবু যে ঐ সম্বন্ধে অনেক জ্যেঠামী করিতেছেন এবং একদল লোককে বিপথগামী করিয়া তাহাদিগের ইহকাল ও পরকাল নষ্ট করিতেছেন তাহা প্রয়োজন হইলে আমরা তাঁহার রচনাসমূহ হইতে সপ্রমাণিত করিতে পারিব।

অরবিন্দ বাবু যেরূপভাবে সন্ন্যাস-ধর্ম্ম লইয়াছেন তাহা সমাজের বিশেষ অমঙ্গলপ্রদ এবং ঋষিগণের ব্যবস্থা-বিরুদ্ধ। এতাদৃশ সন্ন্যাসধর্ম্ম যদি সমাজের মঙ্গলপ্রদ হইত তাহা হইলে ভারতবর্ষের মনুষ্য সমাজ এবংবিধ হীনাবস্থায় উপনীত হইতে পারিত না। অরবিন্দ বাবু-শ্রেণীর তথাকথিত অনেক সন্ন্যাসী ও যোগী ভারত-সমাজে অনেক দিন হইতে তাঁহাদিগের কুহকজাল বিস্তার করিয়া আসিতেছেন। যদি এতাদৃশ সন্ন্যাসীর জীবন সমাজের পক্ষে মঙ্গলপ্রদ হইত তাহা হইলে তাঁহারাই ভারত-সমাজকে তাহার ক্রমিক পতন হইতে রক্ষা করিতে পারিতেন।

সন্ন্যাস অথবা যোগের নামে পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্ব পরিত্যাগ করিয়া যোগাশ্রম সংগঠন করা যে ঋষিগণের অভিপ্রেত নহে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ রহিয়াছে।

গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের "ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি", "কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরণ্, ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে", এবংবিধ বাক্যগুলি যথাযথ অর্থে বুঝিতে পারিলে আমাদিগের কথার সার্থকতা বুঝা যাইবে। মনু-সংহিতার ষষ্ঠাধ্যায়ের "অনবীপ্সা দ্বিজো বেদান্ অনুৎপাদ্য তথা সুতান্, অনিষ্ট্বা চৈব যজ্ঞৈশ্চ মোক্ষমিচ্ছন্ ব্রজত্যধঃ", অত্রি-সংহিতার প্রথম অধ্যায়ের "ক্রিয়া-হীনশ্চ মূর্খশ্চ সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিতঃ, নির্দ্দয়ঃ সর্ব্বভূতেষু বিপ্রশ্চাণ্ডাল উচ্যতে" এবংবিধ কথাগুলিও আমাদিগের কথার পরিপোষক।

অরবিন্দ বাবুর চেলা-চামুণ্ডারা তাঁহাকে একজন বড় যোগী বলিয়া মনে করিতে পারেন বটে এবং সময়ান্তরে উহা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টাও করিতে পারেন বটে, কিন্তু "যোগ" বলিতে কি বুঝায় তাহা যথাযথ অর্থে বুঝিয়া লইয়া উহা প্রত্যক্ষ করিবার চেষ্টায় আত্মরাম হইলে দেখা যাইবে যে, যেরোক্ত প্রকৃত যোগী হইতে হইলে সংসারাশ্রম একান্ত প্রয়োজনীয়। সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া "যোগ" কি তাহা প্রত্যক্ষ করিতে বসিলে শারীরিক কতকগুলি ইন্দ্রজালে সিদ্ধ হইলেও হইতে পারা যায় বটে, কিন্তু জীব-শরীরের মধ্যে যে প্রকৃতি ও স্বভাবের যোগ রহিয়াছে অথবা বিশ্ব-দুনিয়ায় যে খণ্ডমণ্ডল ও অখণ্ড-মণ্ডলের যোগ রহিয়াছে তাহা কখনও প্রত্যক্ষ করা যায় না। পরন্তু, সমাজের প্রতি দায়িত্ব নির্ব্বাহ না করিয়া সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিলে এবং যোগী হইবার চেষ্টা করিলে অতি দূষিত চরিত্রের ভণ্ড হইয়া পড়িতে বাধ্য হইতে হয়। যাঁহারা এবংবিধ তথাকথিত ভাবে যোগী তাঁহারা সর্ব্বদা দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন সমাজের দণ্ডার্হ—ইহা ঋষি-প্রণীত শাস্ত্রের নির্দ্দেশ। যথাযথ অর্থে বেদ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে,

যদি মনুষ্য-সমাজের মধ্যে একজন মানুষও প্রকৃত "যোগ" প্রত্যক্ষ করিবার রাস্তায় আগুয়ান হইয়া "যোগী" হইতে সক্ষম হন, তাহা হইলে তিনি সমস্ত মনুষ্যসমাজের অনাচার ও দুঃখ দূর করিবার মানসে সমাজের বিকৃত সংগঠন লইয়া তোলপাড় করিতে বাধ্য হন এবং ঐ কার্য্যে কৃতকার্য্যতা লাভ করেন। ইহা তাঁহার যৌগিক শক্তির অবশ্যম্ভাবী বিকাশ। অরবিন্দ বাবু এমন কিছু কার্য্যে সফল হইয়াছেন কি? যদি তাহা তিনি না হইয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহার শারীরিক ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে সমাজের কি উপকার হইবে?

ঋষিপ্রোক্ত যোগের রাস্তায় আগুয়ান হইতে পারিলে উহার প্রথম পদে স্বকীয় শরীরের ব্যক্তাংশ যে মেদ, অস্থি, মজ্জা, রসা, মাংস, রক্ত, চর্ম্ম ও তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ কি এবং উহার মূলে যে রস, তেজ, বায়ু ও আকাশ রহিয়াছে এবং তাহারও মূলে যে অপ্, বহ্নি, বায়ু-বীজ ও ব্যোম রহিয়াছে এবং ঐ অপ্ প্রভৃতি হইতে যে কি করিয়া প্রতিনিয়ত শরীরের মধ্যে মেদাদির অপ্ প্রভৃতি গঠিত হইতেছে তাহা প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয়। তখন যোগী দেখিতে পান যে, মেদাদি লইয়া যে জীবের ব্যক্ত শরীর তাহা কেবলমাত্র স্ব স্ব শরীর-পরিব্যাপ্ত এবং উহা প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তন ও ক্ষয়শীল, আর রস ও তেজ প্রভৃতি যে সমস্ত বস্তু ব্যক্ত শরীরের কারণ তাহা সমগ্র খণ্ডমণ্ডল-পরিব্যাপ্ত, উহার পরিবর্ত্তন ও ক্ষয় অপেক্ষাকৃত অনেক কম। উহা ছাড়া আরও দেখিতে পান যে, অপ্, বহ্নি প্রভৃতি যে সমস্ত বস্তু শরীরস্থ রস ও তেজ প্রভৃতির কারণ তাহা খণ্ড ও অখণ্ডমণ্ডল-মিশ্রিত বিশ্বদুনিয়ার ছয়টী লোক-পরিব্যাপ্ত এবং উহার পরিবর্ত্তন একরূপ নাই বলিলেও চলে। এইরূপে যোগের প্রথম পদে অগ্রসর হইলেই 'প্রকৃতি' ও 'স্ব-ভাবে'র সংজ্ঞা এবং উহার পরস্পরের সম্বন্ধ কি এবং জীবের শরীরগঠন-তত্ত্ব (anatomy) ও জীবের শরীর-বিধানতত্ত্ব (physiology) আমূল ও নির্ভুলভাবে পরিজ্ঞাত হওয়া সম্ভব হয়। অরবিন্দ বাবু উহা পরিজ্ঞাত হইতে পারিয়াছেন কি? শরীর-গঠন-তত্ত্ব ও শরীরবিধানতত্ত্ব নির্ভুলভাবে পরিজ্ঞাত হওয়া তো দূরের কথা, 'প্রকৃতি' ও 'স্ব-ভাবে'র সংজ্ঞা কি ও ঐ দুইটীর পরস্পরের সম্বন্ধ কি তাহা পর্য্যন্ত অরবিন্দ বাবু পরিজ্ঞাত হইতে পারেন নাই। তাহার প্রমাণ তাঁহার জঞ্জালময় রচনাসমূহ। 'লর্ড', 'লর্ড্', অথবা 'ঈশ্বর', 'ঈশ্বর' করিলেই যোগে আগুয়ান হওয়া হয় না। যোগে আগুয়ান হইতে পারিলে ক্রমে ক্রমে কাল, দিক্, পুরুষ, প্রকৃতি, ঈশ্বর ও ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয় এবং তখন ইহাদিগের পার্থক্য ও সম্বন্ধ পরিজ্ঞাত হইতে পারা যায়। অরবিন্দ বাবুর রচনাসমূহ পড়িলে দেখা যাইবে যে, কাল, দিক্, পুরুষ, প্রকৃতি, ঈশ্বর ও ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ করা তো দূরের কথা, ইহাদিগের পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য ও সম্বন্ধ যে কি, তাহা পর্য্যন্ত অরবিন্দ বাবু পরিজ্ঞাত হইতে পারেন নাই। কাল, দিক্, পুরুষ, প্রকৃতি, ঈশ্বর ও ব্রহ্ম পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ করিতে পারিলে সমস্ত মনুষ্য-সমাজকে অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব, অশান্তি, অসন্তুষ্টি, অকালবার্দ্ধক্য ও অকালমৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার সঙ্কেত পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। অরবিন্দ বাবু ঐ সঙ্কেত পরিজ্ঞাত হইতে পারিয়াছেন কি? ঐ সঙ্কেত পরিজ্ঞাত হওয়া তো দূরের কথা, অরবিন্দ বাবুর রচনা-সমূহ অধ্যয়ন করিলে দেখা যাইবে যে, কাল, দিক্, পুরুষ, প্রকৃতি, ঈশ্বর ও ব্রহ্ম সম্বন্ধে তাঁহার প্রকৃত উপলব্ধি (conception) পর্য্যন্ত বিন্দুমাত্র পরিমাণেও হয় নাই। 'কাল,' 'দিক্' প্রভৃতির উপলব্ধি তো দূরের কথা, প্রত্যেক শব্দের যে স্বাভাবিক অর্থ আছে, শব্দকে স্পর্শ করিতে শিখিলে যে উহা জানা যায় তাহা পর্য্যন্ত যে তিনি পরিজ্ঞাত হইতে পারেন নাই তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ তাঁহার রচিত আবর্জ্জনাগুলির মধ্যে রহিয়াছে। ইহারই জন্য আমরা তাঁহাকে 'ভণ্ড' বলিতে বাধ্য। যদি তিনি শিষ্যসম্প্রদায় গঠিত না করিয়া অথবা পুস্তক রচনা না করিয়া নিজকে লইয়া নিজে সন্তুষ্ট থাকিতেন তাহা হইলে আমরা তাঁহার প্রতি রুঢ় হইতাম না। কিন্তু, তিনি মনুষ্য-সমাজকে বিপথগামী করিতেছেন, কাযেই আমরা উহা মনুষ্য-সমাজকে দেখাইয়া দিতে বাধ্য। তিনি অজ্ঞতাময় বলিয়াই পবিত্র গীতার ও

উপনিষদের স্ব-কপোলকল্পিত যথেচ্ছ ব্যাখ্যা প্রচার করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। ভারতবর্ষ কতক-গুলি জড়তাপ্রাপ্ত মস্তিষ্কসম্পন্ন মানুষের আবাসস্থল হইয়া পড়িয়াছে বলিয়াই এতাদৃশ ভণ্ডগণও সমাজের শ্রদ্ধা লাভ করিতে সক্ষম হইতেছেন।

অরবিন্দ বাবু যতদিন পর্য্যন্ত "বাবু" ছিলেন ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহার চিন্তায় ও ভাবে দোষ থাকিলেও তিনি সত্যসত্যই মানুষের শ্রদ্ধার যোগ্য ছিলেন। কিন্তু, আজ তিনি "শ্রী-অরবিন্দ" সাজিয়া, যে-ভণ্ডের দল ভারতবর্ষের সর্ব্বনাশের অন্যতম প্রধান কারণ, সেই ভণ্ডের দলেরই আর একজন হইয়া পড়িয়াছেন—ইহা আমাদিগের সিদ্ধান্ত। ভারতবাসীকে পুনরায় দুর্দ্দশা-মুক্ত হইতে হইলে এই "শ্রী-অরবিন্দ"-শ্রেণীর মানুষকে উপেক্ষার চক্ষে দেখিতে হইবে। ইহাদিগের লজ্জা নাই, ইহাদিগের মস্তিষ্ক অসারতাপ্রাপ্ত, তাই ইহারা অকালে কত যুবকের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া সমাজ-প্রাণের ভবীরূপী যুবক-যুবতীগণ যখন অনাহারে অস্বাস্থ্যে জর্জ্জরিত, তখন তাহাদিগের অনশন ও অস্বাস্থ্য কি করিয়া দূর হইবে তাহার কথা চিন্তা না করিয়া দূরে সরিয়া থাকিয়া ভণ্ড যোগীর অভিনয়ে আত্ম-বিজ্ঞাপন করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন না। আমাদিগের মতে এতাদৃশ মানুষগুলি সমাজের সহস্র ধিক্কারের যোগ্য।

প্রাণের আবেগে, মনের যাতনায় সন্দর্ভের মূল-কথা হইতে সরিয়া আসিয়াছি। তজ্জন্য পাঠকগণের নিকট ক্ষমা চাই।

বিধবা-বিবাহের স্বেচ্ছামূলকতা সম্বন্ধে অনিলবরণ বাবু যে তিনটী কথা বলিয়াছেন তাহার দ্বিতীয় কথাটী হইতে দেখা যাইতেছে যে, ঋষির ব্যবস্থানুসারে বিধবা-বিবাহ যে স্বেচ্ছামূলক তাহা তিনি শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রমাণিত করিতে পারেন নাই, পরন্তু তিনি যে শাস্ত্রিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা প্রচলিত অর্থানুসারে গ্রহণ করিলে ঋষির শাস্ত্রানুসারে বিধবার বিবাহ বাধ্যতামূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। অথচ, তিনিই আবার তাঁহার তৃতীয় কথাটিতে (অর্থাৎ হিন্দু বিধবারা স্বেচ্ছায় ব্রহ্মচর্য্য-পালনে ব্রতী হইলে সমাজে তাহারা বিশেষ সম্মান লাভ করিত এতাদৃশ কথায়) যাহা বলিয়াছেন তাহা হইতে বুঝিতে হয় যে, বিধবাদিগের মধ্যে পুনরায় বিবাহ না করিবার প্রথাও বিদ্যমান ছিল। কাযেই দেখা যাইতেছে যে, ভারতীয় ঋষির শাস্ত্রানু-সারে বৈধব্য-পালন বাধ্যতামূলক অথবা স্বেচ্ছামূলক অথবা বৈধব্যত্যাগ বাধ্যতামূলক, অথবা আর কিছু তাহার কোন কথাই সঠিক ভাবে অনিলবরণ বাবুর প্রবন্ধ হইতে নির্দ্ধারণ করা যায় না। এই আলোচনায় হিন্দুর কর্ম্মবাদ ও জন্মান্তর-বাদের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে অনিলবরণ বাবু যে যে কথা বলিয়াছেন তাহা যে ভারতবর্ষের কোন্ ঋষির কোন্ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রীয়তা ও অশাস্ত্রীয়তার সহিত উহার প্রাসঙ্গিকতা যে কোথায় তৎসম্বন্ধে অনিলবরণ বাবু কোন কথাই বলেন নাই। বস্তুতপক্ষে যাঁহারা ভারতীয় ঋষির মূল গ্রন্থের সহিত পরিচিত, তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, যে অবান্তর কথাগুলিকে অনিলবরণ বাবু হিন্দুর কর্ম্মবাদ ও জন্মান্তরবাদের মূলতত্ত্ব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন তাহা কোন ভারতীয় ঋষির কথা নহে এবং বৈধব্য-পালনসম্বন্ধীয় ঋষির ব্যবস্থার সহিত জন্মান্তরবাদের কোন প্রাসঙ্গিকতা নাই, পরন্তু উহা সম্পূর্ণভাবে অনিলবরণ বাবুর স্ব-কপোল-কল্পিত।

এক্ষণে বৈধব্য-পালন সম্বন্ধে ঋষির ব্যবস্থাবিষয়ে বসন্তবাবু যাহা যাহা বলিয়াছেন আমরা তাহার আলোচনা করিব।

তাঁহার কথানুযায়ী "বিধবার ব্রহ্মচর্য্য, কৃচ্ছ্রসাধন হিন্দুশাস্ত্রেই আছে।" বিধবার ব্রহ্মচর্য্য এবং কৃচ্ছ্র-সাধনের উপদেশ যে হিন্দুশাস্ত্রে আছে তাহা দেখাইবার জন্য তিনি প্রথমতঃ মনুসংহিতার পঞ্চম অধ্যায়ের তিনটী শ্লোক এবং তাহার পর নবম অধ্যায়ের তিনটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন।

পঞ্চম অধ্যায়ের যে তিনটী শ্লোক বসন্তবাবু উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং যে যে অর্থে ঐ শ্লোক কয়টীর ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কামং তু ক্ষপয়েদ্ দেহং পুষ্পমূলফলৈঃ শুভৈঃ
ন তু নামাপি গৃহ্ণীয়াৎ পত্যৌ প্রেতে পরস্য তু।

মনু ৫ অঃ ১৫৭ শ্লোক

পতির মৃত্যু হইলে পত্নী পবিত্র ফলমূলাদি ভোজন করিয়া দেহ ক্ষীণ করিবে; পরপুরুষের নাম পর্য্যন্ত উচ্চারণ করিবে না।

(২) আসীতাধঃশায়িনী সাধ্বী নিয়তা ব্রহ্মচারিণী

মনু ৫ম অঃ—১৬০ শ্লোক

মৃত্যু পর্য্যন্ত নিয়ম পালন করিয়া ব্রহ্মচারিণী হইয়া থাকিবে।

(৩) অপত্যলোভাদ্ যা তু স্ত্রী ভর্ত্তারমতিবর্ত্ততে।
সেহ নিন্দামবাপ্নোতি পতিলোকাচ্চ হীয়তে।

মনু ৫ম অঃ—১৬১ শ্লোক

যে স্ত্রী সন্তানের লোভে স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষের নিকট যায়, তাহার ইহলোকে নিন্দা ও পরলোকে দুর্গতি হয়।

নবম অধ্যায়ের যে তিনটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা এই—

(১)

ন বিবাহবিধাবুক্তং বিধবাবেদনং পুনঃ।

মনুঃ ৯ম অঃ ৬৫ শ্লোক

বিবাহ-বিধায়ক শাস্ত্রে বিধবার পুনরায় বিবাহ উক্ত হয় নাই।

(২) ন দদ্যাৎ কস্যচিৎ কন্যাং পুনর্দ্দাতাং বিচক্ষণঃ।

মনু ৯ম অঃ—৭১ শ্লোক

জ্ঞানী ব্যক্তি একবার কন্যাদান করিয়া পুনরায় দান করিবে না।

(৩)

মনু ৯ম অঃ—৪৭ শ্লোক

কন্যা একবারই দান করা যায়।

আমাদিগের মতে উপরি উদ্ধৃত ছয়টী শ্লোকের যে ব্যাখ্যা বসন্তবাবু প্রদান করিয়াছেন, তাহা কুল্লুক ভট্টের ভাষ্যানুগত হইলেও উহার প্রত্যেকটী দোষযুক্ত এবং বেদাঙ্গের ব্যাকরণ ও নিরুক্তেরও নিয়মবিরুদ্ধ।

তর্কের খাতিরে যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, ভাষ্যকারগণের অথবা বসন্তবাবুর ব্যাখ্যাই সমীচীন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, মনুর ব্যবস্থানুসারে বৈধব্যপালন বাধ্যতামূলক এবং বিধবার পুনর্ব্বিবাহ সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ।

অথচ, মনুসংহিতারই নবম অধ্যায়ের পুনরায় বলা হইয়াছে যে—

"যা পত্যা বা পরিত্যক্তা বিধবা বা স্বয়েচ্ছয়া।
উৎপাদয়েৎ পুনর্ভূত্বা স পৌনর্ভব উচ্যতে॥"

অর্থাৎ পতি-কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া অথবা বিধবা হইয়া যিনি স্বেচ্ছায় পুনর্ব্বার অন্যের ভার্য্যা হইয়া, যে পুত্র উৎপাদন করেন, সেই পুত্র-উৎপাদকের পৌনর্ভব (অর্থাৎ বুদ্ধি ও শ্রীহীন) পুত্র হইবে।

ইহা ছাড়া আরও দেখা যাইবে যে, মনুসংহিতার ব্যবস্থানুসারেই এই "পৌনর্ভব" পুত্রগণ অবস্থাবিশেষে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী পর্য্যন্ত হইতে পারে।

মনুসংহিতার এই অংশানুসারে দেখা যাইতেছে যে, বিধবাগণ স্বেচ্ছায় পুনরায় বিবাহ করিতে পারেন এবং ঐ বিবাহের ফলে যে সন্তান উৎপন্ন হইত, সেই সন্তান নিন্দনীয় হইলেও সমাজের দ্বারা পরিগৃহীত হইত।

কাযেই, মনুসংহিতার ভাষ্যকারগণের ব্যাখ্যা সমীচীন বলিয়া ধরিয়া লইলে, উহার প্রণেতার মস্তিষ্কে কিছু গণ্ডগোল ছিল বলিয়া সন্দেহ করিতে হয়, কারণ একবার তিনি যাহা নিষিদ্ধ বলিয়া বিধান করিতেছেন, আবার তাহাই সমাজানুমোদিত হইবার যোগ্য বলিয়া ব্যবস্থা দিতেছেন।

ইহা দেখিলে বলিতে হয় যে, গণ্ডগোল শুধু অনিলবরণ বাবুর মস্তিষ্কে নহে, ভাষ্যকারগণের অথবা বসন্তবাবুর ব্যাখ্যা যথাযথ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলে মনুসংহিতা নিজেই যে গণ্ডগোলে পরিপূর্ণ তাহা পর্য্যন্ত অস্বীকার করা যায় না।

তাহার পর আবার পরাশরসংহিতার যে শ্লোকটী (অর্থাৎ "নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে" প্রভৃতি) অনিলবরণ বাবু উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেই শ্লোকটীকেও প্রচলিত ভাবে

ব্যাখ্যা করিলে উপেক্ষা করা যায় না। "পতিরন্যো বিধীয়তে" ইহার অর্থ "পাত্রান্তরের ব্যবস্থা করিতে হয়" বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলে, পরাশরসংহিতানুসারে বিধবার পুনর্ব্বিবাহ যে বাধ্যতামূলক ছিল, তাহা কোন ক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। "……মৃতে…

পত্যৌ" বাক্যের "পতি" শব্দটীকে "বাগ্‌দত্ত পতি" বলিয়া আধুনিক পণ্ডিতগণ ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা সত্য বটে, কিন্তু ঐ ব্যাখ্যা আধুনিক পণ্ডিতগণের মূর্খতার পরিচায়ক। "পতি" শব্দের অর্থ যে "বাগ্‌দত্ত পতি" হইতে পারে, তাহা কোন ঋষিবাক্যের দ্বারা কখনও প্রমাণিত করা সম্ভব হইবে না। "বাগ্‌দত্ত পুত্র", "বাগ্‌দত্ত পুরুষ", বাগ্‌দত্তা কন্যা", "বাগ্‌দত্তা রমণী" এবংবিধ কথা হইতে পারে বটে, কিন্তু "বাগ্‌দত্ত পতি" অথবা "বাগ্‌দত্তা স্ত্রী" এবংবিধ কথা কখনও হইতে পারে না। বহ্নি সিঞ্চন করিতেছে ("বহ্নিঃ সিঞ্চতি") এবংবিধ বাক্যকে যেরূপ সংস্কৃত ভাষার বাক্য বলা যায় না, কারণ ঐ বাক্যের মধ্যে যোগ্যতা-বিরহ রহিয়াছে, সোনার পাথরের বাটীকে যেরূপ কোন পদ বলা চলে না, সেইরূপ "বাগ্‌দত্ত পতি"কে অথবা "বাগ্‌দত্তা স্ত্রী"কেও কোন পদ বলা যায় না, কারণ যথাবিহিত সংস্কারের দ্বারা বিবাহিত না হইলে "পতিত্ব" ও "স্ত্রীত্বে"র উৎপত্তি হয় না। "পতি" অথবা "স্ত্রী" কখনও বাগ্‌দত্ত অথবা বাগ্‌দত্তা হইতে পারে না, কারণ, উহাতে "যোগ্যতা-বিরহ" থাকিয়া যায়। কাযেই দেখা যাইতেছে যে, হয় ঋষিগণের মস্তিষ্কে বিশেষ কোন গণ্ডগোল ছিল এবং সেই হিসাবে তাঁহারা সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের অযোগ্য, নতুবা অনিলবরণ বাবু ঋষি-প্রণীত শাস্ত্র পড়াশুনা না করিয়া যেরূপ অজ্ঞ, বসন্তবাবু ঐ ঋষি-প্রণীত শাস্ত্রের ভাষ্য পড়িয়াও ঠিক একই রকমের অজ্ঞ। বাস্তবিক পক্ষে, বেদাঙ্গের অষ্টাধ্যায়ী সূত্রপাঠ ও নিরুক্তের নিয়মানুসারে ঋষি-প্রণীত কাব্য, সাহিত্য এবং পৌরুষেয় ও অপৌরুষেয় শাস্ত্রের অর্থ যথাযথ ভাবে গ্রহণ করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, ঋষিগণের কথায় কুত্রাপি বিন্দুমাত্র অসামঞ্জস্য নাই। উহার প্রত্যেক ছত্রটী বৈজ্ঞানিকতার নিদর্শনে পরিপূর্ণ। ঋষিগণের প্রত্যেক ব্যবস্থাটী মানুষের কোন না কোন দুঃখ দূর করিয়া কোন না কোন-বিষয়ক জ্ঞান ও কর্ম্মশক্তি বৃদ্ধি করিবার পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু, বসন্তবাবুর শ্রেণীর পণ্ডিতগণ ও তাঁহাদিগের গুরু ভাষ্যকারগণ প্রায়শঃ ঋষি-প্রণীত ভাষার অর্থ গ্রহণ করিবার জন্য বেদাঙ্গের অষ্টাধ্যায়ী সূত্রপাঠে ও নিরুক্তে যে যে নিয়ম লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, তাহা যাদৌ পরিজ্ঞাত নহেন বলিয়া ঋষি-প্রণীত শাস্ত্রকে এতাদৃশ গণ্ডগোলময় করিয়া তুলিয়াছেন। এই ভাষ্যকারগণেরই এতাদৃশ অত্যাচারে একদিকে যেরূপ তাঁহারা নিজেরা বহু নির্ব্বংশ অথবা শ্রী-হীন বংশসম্পন্ন হইয়াছেন, অন্যদিকে আবার মানব-সমাজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত টলটলায়মান হইয়া পড়িয়াছে। ঋষি-প্রণীত শাস্ত্র যথাযথ অর্থে বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, উহার মধ্যে এমন একটী ব্যবস্থাও নাই, যাহা মানুষের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে পালন করা বিন্দুমাত্রও কষ্টসাধ্য। ইহা ছাড়া আরও দেখা যাইবে যে, ভারতীয় ঋষির ব্যবস্থা সম্যক্ ভাবে পালন করিলে মনুষ্য-সমাজের একজনেরও অর্থাভাব, দাসত্ব, অস্বাস্থ্য, অশান্তি, অকালবার্দ্ধক্য ও অকালমৃত্যু উপস্থিত হইতে পারে না।

আমরা এখনও বসন্তবাবুর শ্রেণীর পণ্ডিতগণকে গোঁড়ামী পরিত্যাগ করিয়া আত্ম-পরীক্ষার দ্বারা নিজ-দিগের অজ্ঞতা উপলব্ধি করিতে অনুরোধ করিতেছি। তাঁহাদিগের পক্ষে যে ঋষির শাস্ত্রের মূলভাগ যথাযথ ভাবে বুঝিয়া উঠা সম্ভব নহে তৎসম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় হইয়া প্রাণের বেদনা লইয়া তাঁহারা উহার জন্য সাধনা করুন এবং সাধারণকে তথাকথিত শাস্ত্রোপদেশ দিতে বিরত হউন, ইহাই বসন্তবাবুর শ্রেণীর পণ্ডিতগণের নিকট আমাদিগের প্রার্থনা।

অষ্টাধ্যায়ী সূত্রপাঠের প্রারম্ভে যে "মহেশ্বর-সূত্র"-গুলি রহিয়াছে তাহা অভ্যাস করিবার উপায় রহিয়াছে তন্ত্রের "শব্দ-মাতৃকাধ্যায়ে"। ঋষিপ্রণীত তন্ত্রের "শব্দ-মাতৃকাধ্যায়ে"র সাহায্যে "মহেশ্বরসূত্রে"গুলির অভ্যাসে সিদ্ধ হইতে পারিলে ভাষার মূল যে চৌষটিটী শব্দ তাহার

প্রত্যেকটীর অর্থ স্বতই যথাযথ অর্থে প্রতিভাত হয়, তখন শব্দ-সংমিশ্রণের প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক নিয়ম এবং সংমিশ্রিত শব্দ-কদম্বের অর্থগ্রহণের নিয়মও আপনা হইতেই উদ্ঘাটিত হইয়া থাকে। মৌলিক শব্দের অর্থ, শব্দ-সংমিশ্রণের প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক নিয়ম এবং সংমিশ্রিত শব্দ-কদম্বের অর্থ গ্রহণ করিবার নিয়ম, এই তিনটী পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে কোন ভাষ্যের সাহায্য না লইয়া পূর্ব্ব-মীমাংসায় প্রবিষ্ট হওয়া সম্ভব হয় এবং তখন যথাক্রমে নিরুক্ত, উত্তর-মীমাংসা ও অষ্টাধ্যায়ী সূত্রপাঠে প্রবেশ লাভ করিতে পারা যায়। এইরূপে দুইটী মীমাংসা, নিরুক্ত ও পাণিনিতে প্রবিষ্ট হইতে পারিলে কোন ভাষ্যের সাহায্য না লইয়া ঋষিপ্রণীত শাস্ত্রের অর্থ ও মর্ম্ম গ্রহণ করা সম্ভব হয় এবং তখন এমন কি বিবিধ বৃত্তি, ভাষ্য ও টীকার যাথার্থ্য পরীক্ষা করা সম্ভব হইয়া থাকে।

অন্য কোন উপায়ে ঋষি-প্রণীত সংস্কৃত ভাষায় অথবা তাঁহাদিগের শাস্ত্রে যথাযথভাবে প্রবিষ্ট হওয়া সম্ভব নহে। যাঁহারা দুইটী মীমাংসায় এবং নিরুক্তে ও অষ্টাধ্যায়ী সূত্র-পাঠে উপরোক্ত ভাবে প্রবিষ্ট না হইয়া সিদ্ধান্তকৌমুদী, কলাপ, মুগ্ধবোধ প্রভৃতি আচার্য্য-প্রণীত ব্যাকরণের অথবা বিভিন্ন অভিধানের সাহায্যে ঋষি-প্রণীত শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াসী হইয়া থাকেন তাঁহারা মূর্খ এবং তাঁহারাই মানব-সমাজকে ঋষি-প্রণীত শাস্ত্রসম্বন্ধে বিপথগামী করিয়াছেন এবং এই পাপের ফলে তাঁহাদিগের বংশধরগণ সর্ব্বতোভাবে হতশ্রী প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ঋষি-প্রণীত সংস্কৃত ভাষায় এবং শাস্ত্রে যথাযথভাবে প্রবিষ্ট হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, মেধাতিথি ও কুল্লুকভট্ট ঋষি-প্রণীত ভাষা সম্যক্ ভাবে না বুঝিতে পারিয়া মনুসংহিতাকে প্রায়শঃ বিকৃতভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং তাঁহাদিগের কুব্যাখ্যার ফলে ঋষিগণের সমাজসংগঠন-ব্যবস্থার মূলে যে বিশ্ব-বিজ্ঞান ওতপ্রোত ভাবে বিদ্যমান ছিল, ঋষি-পরিজ্ঞাত সেই বিজ্ঞানের চিহ্ন পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ডাঃ মেঘনাদ সাহা, অনিলবরণ রায়, শ্রীঅরবিন্দ, অথবা কলিকাতা ব্রাহ্মণ-সভার মস্তিষ্কহীন মূর্খগণ অথবা মদ্যপায়ী, লম্পট, ধূর্ত্ত, নাস্তিক্যদোষদুষ্ট তথাকথিত সন্ন্যাসিগণ ঐ বিজ্ঞান অদূর ভবিষ্যতে বুঝিবার সামর্থ্য অর্জ্জন করিতে পারিবেন বলিয়া আমরা মনে করিতে পারি না বটে, কিন্তু আমাদিগের বিশ্বাস, বসন্তবাবুর শ্রেণীর পণ্ডিতগণ উপদেষ্টার প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া ছাত্রের মত আত্ম-পরীক্ষানিরত হইলেই তাঁহাদিগের কাছে উহা প্রতিভাত হইবার সম্ভাবনা আছে।

ঋষি-প্রণীত সংস্কৃত ভাষায় এবং শাস্ত্রে যথাযথ ভাবে প্রবিষ্ট হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, মনু-সংহিতার পঞ্চম অধ্যায়ের মূল বিষয়—বিদ্বান্ মানুষ (সাধারণ মানুষ নহে) কেন অন্নায়ু অথবা অকালবার্দ্ধক্য ও অকাল-মৃত্যু লাভ করিয়া থাকে এবং কোন্ রাস্তায় চলিলে বিদ্বান্ মানুষ ঐ অকালবার্দ্ধক্য ও অকাল-মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে তাহা নির্ণয় করা। ইহাই যে পঞ্চম অধ্যায়ের মূল বিষয় তাহা ঐ অধ্যায়ের দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্লোকটী যথাযথ অর্থে বুঝিতে পারিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে। মূল বিষয় পরিষ্কার করিবার জন্য, সংহিতার প্রণেতা ঋষি সমগ্র অধ্যায়টীকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। এক ভাগে স্বভাবতঃ বিদ্বান্ পুরুষ সম্বন্ধে অধ্যায়ের মূল-বিষয়ক যে যে কথা বক্তব্য তাহার বর্ণনা রহিয়াছে, আর এক ভাগে রহিয়াছে স্বভাবতঃ বিদুষী স্ত্রীলোকসম্বন্ধীয় কথা। ৪র্থ শ্লোক হইতে ১৪৫ শ্লোকে স্বভাবতঃ বিদ্বান্ পুরুষ, আর ১৪৭ শ্লোক হইতে অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত স্বভাবতঃ বিদুষী স্ত্রীলোক কেন অকালবার্দ্ধক্য ও অকালমৃত্যু লাভ করেন এবং কোন্ রাস্তায় চলিলে তাঁহারা উহার হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারেন তাহার সম্পূর্ণ আলোচনা রহিয়াছে। ভাষ্যকারগণ যেরূপভাবে এই অধ্যায়ের শ্লোকগুলির ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে মনে হয় যেন প্রায় সমস্ত শ্লোকই কতকগুলি আদেশে পরিপূর্ণ। কিন্তু, ঋষি-প্রণীত সংস্কৃত ভাষা যথাযথ অর্থে বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, ত্রিবর্ণের (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের) বিধবাগণ পুনর্ব্বার বিবাহ করিলে কি

কি ফল হইতে পারে এবং কোন্ রাস্তায় চলিলে ত্রিবর্ণের বিধবাগণের পক্ষে বৈধব্যপালন করা সহজসাধ্য হইতে পারে, তৎসম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় অনেক কথাই এই পঞ্চম অধ্যায়ে রহিয়াছে বটে, কিন্তু বিধবাগণ পুনরায় বিবাহ করিবে অথবা করিবে না এতাদৃশ একটি আদেশও লিপিবদ্ধ নাই।

ভাষ্যকারগণের কৃত ব্যাখ্যা একে ত অষ্টাধ্যায়ী সূত্র-পাঠ ও নিরুক্তের নিয়মবিরুদ্ধ, তাহার পর আবার উহা অধ্যায়ের মূল বিষয়ের সহিত সঙ্গতিহীনতা অথবা "সন্নিধিমানতা"র অভাবে পরিপূর্ণ।

উদাহরণ-স্বরূপ, বসন্তবাবু এই অধ্যায়ের যে তিনটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহার একটী শ্লোক আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখাইব।

"কামন্তু ক্ষপয়েদ্দেহং পুষ্পমূলফলৈঃ শুভৈঃ।
ন তু নামাপি গৃহ্নীয়াৎ পত্যৌ প্রেতে পরস্য তু॥"

এই শ্লোকটী বসন্ত বাবু যেরূপ ভাবে অনুবাদ করিয়াছেন তাহা লক্ষ্য করিয়া উহার অন্বয় করিতে হইলে বাক্য করিতে হয়—

পত্যৌ প্রেতে (পতির মৃত্যু হইলে) (পত্নী) শুভৈঃ (পবিত্র) পুষ্পমূলফলৈঃ (ফল মূলাদি) (ভোজন করিয়া) দেহং ক্ষপয়েৎ (দেহ ক্ষীণ করিবে) পরস্য তু নামাপি (পর পুরুষের নাম পর্য্যন্ত) ন তু গৃহ্নীয়াৎ (উচ্চারণ করিবে না)।

পাঠকগণকে প্রথমতঃ লক্ষ্য করিতে হইবে, মূল শ্লোকের কোন্ কোন্ কথার অর্থ গ্রহণ করিতে বাকী থাকিল এবং দ্বিতীয়তঃ লক্ষ্য করিতে হইবে মূল শ্লোকাতিরিক্ত কোন্ কোন্ কথা উহ্য করা হইল। উপরোক্ত দুইটী বিষয় লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, শ্লোকের প্রথমেই যে "কামং" এবং "তু" এই দুইটী পদ রহিয়াছে তাহার কোন অর্থই গ্রহণ করা হয় নাই। ইহা ছাড়া অন্বয়-ভাগের নিম্নচিহ্নিত "পুষ্প", "পরস্য"র পরবর্ত্তী "তু," "নামাপি-ন"-এর পরবর্ত্তী "তু", এই তিনটী পদের কোন অর্থ অনূদিত হয় নাই। অন্যদিকে উপরিচিহ্নিত "পত্নী," "ভোজন করিয়া" এই দুইটী পদ সম্পূর্ণ ভাবে উহ্য করা হইয়াছে। তাহার পর আবার দেখা যাইবে যে, "মূলফলৈঃ" এই করণ-তৃতীয়ান্ত পদটীকে "ফলমূলাদি" "অভিহিত কর্ম্ম"-রূপে অনুবাদ করা হইয়াছে। তৃতীয়ান্ত পদকে "অভিহিত" অথবা "উক্ত" কর্ম্মার্থে গ্রহণ করা সংস্কৃত ভাষার সম্পূর্ণভাবে নিয়মবিরুদ্ধ। "ক্ষপয়েৎ" শব্দটীর অর্থ করা হইয়াছে "ক্ষীণ করিবে।" আধুনিক কোন কোন অভিধানানুসারে উহা হইলেও হইতে পারে বটে, কিন্তু "ক্ষপয়েৎ" পদের অর্থ যে "ক্ষীণ করিবে" হইতে পারে তাহা নিরুক্তের কোন সূত্রের দ্বারা প্রমাণ করা সম্ভব হইবে না। "পত্যৌ প্রেতে পরস্য তু" এই ভাগকে যেরূপভাবে বিচ্ছিন্ন করিয়া অন্বয় করা হইয়াছে তাহাও দেখা যাইবে বেদাঙ্গের "শিক্ষা"র নিয়মবিরুদ্ধ। সমগ্র শ্লোকটী যেরূপ ভাবে অন্বয় করা হইয়াছে তাহা যে অত্যন্ত অসঙ্গত, তাহা এমন কি "বৃত্ত-রত্নাকর" জানা থাকিলেও বুঝা যাইবে।

বসন্তবাবু অথবা ভাষ্যকারগণ এই শ্লোকটীর অর্থ যেরূপ ভাবে গ্রহণ করিয়া থাকেন তাহার মর্ম্ম উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিলেও দেখা যাইবে যে, উহাতেও অসঙ্গতি রহিয়াছে। ইঁহাদিগের কথানুসারে বুঝিতে হয়, ফল-মূল ভোজন করিলে দেহ ক্ষীণ হইয়া থাকে। কিন্তু, বাস্তবিক পক্ষে তাহা হয় কি? বিধবাগণের মধ্যে যাঁহারা ফলমূল ভোজন করিয়া জীবন যাপন করেন তাঁহারা কি অপেক্ষাকৃত সুস্থ ও সবল হন না? যাহা ভোজন করিলে বাস্তবতঃ মানুষ অপেক্ষাকৃত সুস্থ ও সবল হইয়া থাকে তাহা ভোজন করিয়া ক্ষীণ হইবার উপদেশ দিয়া থাকিলে, ঋষিগণ যে অদূরদর্শী ছিলেন এবং তাঁহারা যে সত্য-দর্শী ছিলেন না, ইহা বুঝিতে হয় না কি? কাযেই, ঋষিগণ তাঁহাদিগের রচিত কোন শ্লোকে এতাদৃশ কথা বলিয়াছেন, ইহা বলিলে তাঁহাদিগের সত্যদর্শিতার অভাব ছিল, ইহাই বলা হইয়া থাকে।

যে অর্থগ্রহণে মূল শ্লোকের এতগুলি প্রয়োজনীয় পদ বাদ দেওয়া হইয়াছে, শ্লোকাতিরিক্ত এতগুলি উহ্য পদ আনয়ন করা হইয়াছে, কারকের নিয়মের এত অপব্যবহার করা হইয়াছে, পদার্থ-গ্রহণে এত

নিষেধের নিয়মবিরুদ্ধতা করিতে হইয়াছে, অন্যায়গ্রহণে এত অনাচার করা হইয়াছে, মনে এত অশুদ্ধা প্রচারিত হইয়াছে, সেই অর্থগ্রহণ যে কখনও যথাযথ হয় নাই তাহা সাধারণ বুদ্ধির দ্বারাও বুঝা যাইবে। কিন্তু, বড়ই পরিতাপের বিষয় এই যে, যে দাম্ভিক মানুষগুলি পণ্ডিত নামে বিকাইতেছেন তাঁহারা ভাষার অজ্ঞতা-বশতঃ যদ্যপি এতাদৃশ আচরণ অহরহঃ করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন, তথাপি তাঁহারা স্ব স্ব অজ্ঞতা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হন না।

এই শ্লোকটীর প্রকৃত মর্ম্ম, স্ত্রীলোকের কাম-প্রবৃত্তির অর্থাৎ আহার, মৈথুন ও সাজসজ্জা প্রভৃতির ইচ্ছার উদ্ভব-বশতঃই দেহের বিকাশ,বৃদ্ধি ও বিনাশাত্মক অভিমান উপস্থিত হইয়া থাকে। পুষ্প, মূল ও ফলের বিকশিত কার্য্য ও উন্মেষপ্রবৃত্তি লক্ষ্য করিলে কামবিষয়ক উপরোক্ত কথা প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয়। স্বকীয় উন্মেষ ও বিকাশকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে কখনও পতির প্রতি অতিরিক্ত কামভাবাপন্ন হওয়া সঙ্গত নহে। এমন কি, পতি কামভাবাপন্ন হইলেও তাঁহাকে ও নিজকে সংযত রাখিবার চেষ্টা করিতে হয়। সংক্ষেপে এই শ্লোকের বক্তব্য—অতিরিক্ত আহার, মৈথুন ও সাজসজ্জার প্রয়াসী হইলে অন্যায় হইতে হয় এবং কাযেই যে স্ত্রীলোকগণ দীর্ঘায়ু লাভ করিবার প্রয়াসী হইবেন তাঁহাদিগকে অতিরিক্ত আহার, মৈথুন ও সাজসজ্জার বাসনা সর্ব্বাবস্থায় পরিত্যাগ করিতে হইবে।

মনুসংহিতার উপরোক্ত শ্লোকের উপরোক্ত মর্ম্ম কিরূপে আসিতে পারে তাহা দেখাইতে হইলে আমাদিগকে অষ্টাধ্যায়ী সূত্র-পাঠ ও নিরুক্তের বহু কথা বলিতে হইবে। তাহা এখানে সম্ভব নহে।

বিধবা পুনর্ব্বার বিবাহ করিবে না অথবা পুনর্ব্বার বিবাহ করিবে এবংবিধ কোন আদেশ যেরূপ মনু-সংহিতার পঞ্চম অধ্যায়ের কোন শ্লোকে পাওয়া যায় না, সেইরূপ নবম অধ্যায়ের কোন শ্লোকেও ঐরূপ কোন আদেশ পাওয়া যায় না। বসন্ত বাবু নবম অধ্যায়ের যে তিনটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার অনুবাদেও তিনি ভাষ্যকারগণের প্রদর্শিত মর্ম্মের অনুসরণ করিয়াছেন। উহার একটীর অর্থও যথাযথ হয় নাই। প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া যাইবে বলিয়া আমরা এখানে উহার আলোচনা করিতে পারিব না।

ভগবদনুকম্পা হইলে হয় ত কোন দিন সমগ্র মনুসংহিতারই বেদাঙ্গসম্মত মর্ম্ম বাঙ্গালা ভাষায় প্রচারিত হইবে।

নবম অধ্যায়ের মূল বিষয়—বিবাহিত জীবনে স্ত্রী ও পুরুষ এই উভয়েরই বহির্মুখিতার উদ্দাম কেন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং কোন্ রাস্তায় চলিলে বিবাহিত জীবনেও স্ত্রী ও পুরুষ এই উভয়ের পক্ষেই স্বকীয় অন্তর-স্থিত সত্ত্বা, আত্মা ও শরীর এই তিনটীর মধ্যে সত্ত্বার প্রতি সর্ব্বদা অবহিত থাকা সম্ভবযোগ্য হইতে পারে তাহার নির্ণয় করা। এই অধ্যায়টী যথাযথ অর্থে অধ্যয়ন করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, উহার প্রত্যেক শ্লোকটী ঐ মূল বিষয়েরই পরিপোষক। উপরে যাহা বলা হইল তাহাই যে নবম অধ্যায়ের মূল বিষয় তাহা শব্দমাতৃকার সাহায্যে "সংযোগ" ও "বিপ্রযোগ" এই দুইটী পদকে সম্যক্ ভাবে উপলব্ধি (conceive) করিয়া ঐ অধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকের অর্থ যথাযথ ভাবে গ্রহণ করিতে পারিলে বুঝা যাইবে। মেধাতিথি ও কুল্লুক ভট্ট ঐ দুইটী শ্লোক যে যে অর্থে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা আদৌ বেদাঙ্গসম্মত নহে।

অনিলবরণ বাবু পরাশর-সংহিতার "নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে" প্রভৃতি যে শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহার প্রচলিত কোন অর্থই শাস্ত্রসম্মত নহে। ঐ শ্লোকের শেষ ভাগে যে "পতিরন্যো বিধীয়তে" বাক্য রহিয়াছে তাহা আধুনিক পণ্ডিতগণের দ্বারা সাধারণতঃ "পাত্রান্তরে প্রদান বিহিত" বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। "শব্দ-মাতৃকা" জানা থাকিলে দেখা যাইবে যে, "বি-ধীয়তে" এই "তিঙন্ত" পদের মধ্যে প্রদানার্থক কোন কথাই নাই।

"প্রদান" কথাটী বাদ দিয়া যদি বলা যায় যে, "পতিরন্যো বিধীয়তে" এই বাক্যটীর অর্থ "আর একটী পতি বিহিত হইয়া থাকে", তাহা হইলে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, আর একটী পতি সম্বন্ধে কোন কার্য্য

বিহিত হইয়া থাকে তাহা না বলিলে বাক্যের সমাপ্তি হয় না, পরন্তু উহা অসমাপ্ত থাকিয়া যায় এবং ব্যাকরণের নিয়মানুসারে ঐ বাক্যের মর্ম্ম উপলব্ধি করা অসম্ভব হয়। "বাক্যং আকাঙ্ক্ষা-যোগ্যতা-সন্নিধিমৎ পদ-কদম্বং"—"সিদ্ধান্তপ্রদীপে"র এই সূত্রটী বুঝিতে পারিলে আমাদিগের কথার সার্থকতা উপলব্ধি করা যাইবে।

কাযেই দেখা যাইতেছে যে, 'পতিরস্তো বিধীয়তে' এই বাক্যটীর অর্থ যেরূপ 'পাত্রান্তরে প্রদান বিহিত' বলিয়া ধরা যায় না, সেইরূপ আবার 'আর একটী পতি বিহিত হইয়া থাকে' এতাদৃশ বাক্য বলাও চলে না।

'পতিরস্তো বিধীয়তে' এই বাক্যটীর সঠিক অর্থ স্থির করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে 'বিধীয়তে' এই তিঙন্ত পদটীর অর্থ স্থির করিতে হইবে, তাহার পর স্থির করিতে হইবে 'অন্ত' শব্দটীর অর্থ।

'বিধীয়তে' এই তিঙন্ত পদটীর অর্থ স্থির করিতে হইলে উহার মধ্যে চতুর্ব্বিধ (অর্থাৎ নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত এই চারিবিধ) শব্দের কোন্ কোন্-বিধ শব্দ বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহা দেখিতে হইবে। "বিধীয়তে" এই তিঙন্ত পদটীর মধ্যে আছে "বি" এই উপসর্গ, "ধৈ" ধাতু এবং তিঙন্ত "প্রত্যয়"। "বিধীয়তে" পদটীর অর্থে কি কি ধারণা (conceive) করিতে হইবে অথবা গ্রহণ করিতে হইবে তাহা স্থির করিতে হইলে "বি" এই উপসর্গের অর্থ যেরূপ সর্ব্বতোভাবে স্থির করিতে হইবে, সেইরূপ আবার "ধৈ" ধাতুর অর্থ এবং "তিঙন্তে"র যে প্রত্যয়টি লইয়া "ধীয়তে" নিষ্পন্ন হইয়াছে সেই প্রত্যয়টির অর্থ সম্যক্ ভাবে স্থির করিতে হইবে।

"বি" এই উপসর্গটির অর্থ বুঝিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে "উপসর্গে"র ধর্ম্ম কি তাহা জানিতে হয়। নিরুক্তের নিয়মানুসারে ক্রিয়ার অবস্থাভেদে উপসর্গের ধর্ম্ম ত্রিবিধ। উপসর্গের ঐ ত্রিবিধ ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে আলোচনা করিতে হইলে অনেক কথা বলিয়া সন্দর্ভের কলেবর অত্যন্ত বৃদ্ধি করিতে হইবে। তাহা এখানে সম্ভব নহে। "পতিরস্তো বিধীয়তে" এই বাক্য যে অবস্থার অন্তর্গত তাহাতে বুঝিতে হইবে যে, "বি" এই উপসর্গটি, "পতি" এই "নামে"র অর্থের সহিত "ধীয়তে" এই "আখ্যাতে"র কার্য্যের সংযোগ ও দ্যোতকতার কথা প্রকাশিত করিতেছে। "নামাখ্যাতয়োস্তু কর্ম্মো-পসংযোগদ্যোতকা ভবন্তি"- নিরুক্তের এই সূত্রটী যথাযথ অর্থে বুঝিতে পারিলে আমাদিগের উপসর্গ-সম্বন্ধীয় উপরোক্ত কথার সার্থকতা বুঝা যাইবে। অবস্থাবিশেষে উপসর্গমাত্রই নাম ও আখ্যাতের কর্ম্মোপসংযোগ ও দ্যোতক হইয়া থাকে। কাযেই প্রশ্ন হইবে যে, অন্য কোন উপসর্গ না বসাইয়া "বি" এই উপসর্গটি বসান হইল কেন? তাহার উত্তরে "বি" এই উপসর্গটির বিশেষ অর্থ কি তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে। নিরুক্তের কথা অনুসারে "বি" এই উপসর্গটির বিশেষ অর্থ "প্রাতিলোম্য" অর্থাৎ "অন্তর দেখিয়া অন্তরের কারণনির্ণায়ক।" "বি-অপ-ইত্যেতস্য প্রাতিলোম্যং"—নিরুক্তের এই সূত্র আমাদিগের উপরোক্ত কথার প্রমাণ। "প্রাতিলোম্যং" না বলিয়া যদি "প্রাতিলোভ্যং" বলা হইত তাহা হইলে বুঝিতে হইত, ঐ উপসর্গটি "অন্তর দেখিয়া অন্তরের কার্য্য-নির্ণায়ক" "অন্তরের কারণনির্ণায়ক" নহে।

কাযেই, "পতিরস্তো বিধীয়তে" এই বাক্যে "বি" উপসর্গটি বিদ্যমান থাকায় বুঝিতে হইবে যে, "ধীয়তে" এই তিঙন্ত আখ্যাতে যে কার্য্যের কথা বলা হইয়াছে সেই কার্য্য "পতি"র অন্তর দেখিয়া অন্তরের কারণ নির্দ্দেশানুক্রমে সাধিত করিবার কথা বলা হইতেছে। আজকালকার পণ্ডিতেরা "বি" উপসর্গের অর্থ "বিশিষ্ট-রূপে" বলিয়া ধরিয়া থাকেন, কিন্তু সেই বিশিষ্ট রূপটা যে কি, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। নিরুক্তের উপরোক্ত দুইটি সূত্র অনুধাবন করিলে ঐ বিশিষ্ট রূপটা যে কি, তাহা বিশদভাবে বুঝা যাইবে।

এক্ষণে দেখা যাউক, "ধীয়তে" শব্দের দ্বারা কি বুঝিতে হইবে। আগেই বলিয়াছি যে, "ধীয়তে" শব্দটি মূলতঃ 'ধৈ' ধাতুর সহিত একটি তিঙন্তের প্রত্যয় যোগ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। অনেকে মনে করেন যে, উহা 'ধ্যা' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। যাঁহারা উহা 'ধ্যা'

ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে বলিয়া মনে করেন, পাণিনির ধাতু-পাঠ সম্বন্ধে তাঁহারা অজ্ঞ, ইহাও বুঝিতে হইবে। অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, পাণিনির ধাতু-পাঠে "ধ্যৈ" ধাতুর কথা উল্লিখিত হইয়াছে বটে, কিন্তু "ধ্যা" ধাতুর কোন কথা উল্লিখিত হয় নাই। শব্দ-মাতৃকা না জানা থাকিলে কোন্ শব্দটি মৌলিক ধাতু তাহা অভ্রান্ত ভাবে স্থির করা যায় না। শব্দ-মাতৃকায় অভ্যস্ত হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, "ধ্যৈ" হইতে অনুলোমক্রমে "ধ্যা" এই ধাত্বর্থক শব্দের উৎপত্তি হইতে পারে বটে, কিন্তু "ধ্যা" কখনও মৌলিক ধাত্বর্থক শব্দ হইতে পারে না। "ধ্যা" এই শব্দটি যে মৌলিক ধাত্বর্থক নহে তাহা শব্দ-মাতৃকার সাহায্যে কিরূপে উপলব্ধি করিতে হয় তাহা আমরা পাঠকবর্গকে বুঝাইতে পারিব না। কাযেই, পাণিনির ধাতু পাঠে যখন "ধ্যা" ধাতুর উল্লেখ নাই, তখন "ধ্যা" শব্দটি কখনও মৌলিক ধাতু হইতে পারে না, ইহা বলিয়াই আমাদিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। ভট্টোজী দীক্ষিত তাঁহার প্রণীত ধাতু-সূচীতে "ধ্যা" ধাতুর উল্লেখ করিয়াছেন বটে, কিন্তু পাণিনির কোন্ সূত্র হইতে যে "ধ্যা" ধাতুর কথা আসিতে পারে অথবা "ধ্যা" ধাতুর অর্থ যে কি হইতে পারে তাহা তিনি দেখান নাই। ভট্টোজীর উর্ব্বর মস্তিষ্কে এইরূপ পাণিনি-বিরোধী অনেক অলীক কথা স্থান পাইয়াছে। আমরা এখানে তাহার আলোচনা করিব না। উত্তরমীমাংসা অথবা ব্রহ্মসূত্র যথাযথ অর্থে জানা থাকিলেও দেখা যাইবে যে, জীবের (ধ্+ই+অ)+(অ+ই) অর্থাৎ "ধ্যৈ" হইতে (ধ্+ই+অ)+অ অর্থাৎ "ধ্যা" বিকশিত হওয়া স্বভাবানুগ বটে, কিন্তু (ধ্+ই+অ)+অ অর্থাৎ "ধ্যা" হইতে (ধ্+ই+অ)+(অ+ই) অর্থাৎ "ধ্যৈ"-এর বিকাশ স্বভাবানুগ নহে।

পাণিনির ধাতু-পাঠ অনুসারে "ধ্যৈ" অর্থ "চিন্তা করা।" নহেশ্বর-সূত্রের শব্দ-মাতৃকানুসারে "কোন্ কর্ম্ম হইতে কোন্ গুণ ও দ্রব্যের বিকাশ কিরূপ হইতেছে তাহার চিন্তা"-কে "ধ্যৈ" বলিতে হয়।

এক্ষণে তিঙন্তের যে প্রত্যয়টী 'ধ্যৈ' ধাতুর সহিত যোগ করিয়া 'ধীয়তে' পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে, সেই প্রত্যয়টীর অর্থের সন্ধান করিতে হইবে। ইহা বড়ই দুরূহ কার্য্য। কোন্ প্রত্যয়ের যে কি অর্থ তাহা একমাত্র মহেশ্বর-সূত্রের শব্দ-মাতৃকার অভ্যাস ছাড়া সঠিকভাবে স্থির করা সম্ভব নহে। অষ্টাধ্যায়ী সূত্র-পাঠে ঐরূপ ভাবে প্রত্যেক মৌলিক প্রত্যয়ের অর্থ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে বটে, কিন্তু বৃত্তিকারগণের মধ্যে কেহ পর্য্যন্ত যে উহা সর্ব্বতোভাবে অনুধাবন করিতে পারিয়াছেন তাহার কোন নিদর্শন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এমন কি, অষ্টাধ্যায়ী সূত্রপাঠানুসারে তিঙন্ত প্রত্যয়-গুলির মধ্যে যে-কয়টী মৌলিক তাহাদিগের নাম ও সংখ্যা পর্য্যন্ত স্থির করিতে বৃত্তিকারগণ গণ্ডগোল করিয়াছেন। অষ্টাধ্যায়ী সূত্রপাঠানুসারে মৌলিক তিঙন্ত প্রত্যয় কেবলমাত্র আঠারটী, অথচ বৃত্তিকার-গণের অনেকেই একাশীটী তিঙন্ত প্রত্যয়ের কথা বলিয়াছেন। ইহার কোন্‌টী যে ঠিক এবং কোন্‌টী অঠিক তাহা স্থির করা সম্পূর্ণভাবে শব্দ-মাতৃক শব্দ-সাধনাসাপেক্ষ। ইহাই ঋষির তন্ত্রের সর্ব্বাপেক্ষা মৌলিক বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞান আপাতদৃষ্টিতে অত্যন্ত দুরূহ হইলেও যাঁহারা শব্দ-সাধনা-প্রয়াসী এবং স্বভাবতঃ ঐ শক্তিসম্পন্ন তাঁহাদিগের পক্ষে উহা বড়ই সহজ এবং মনোরম। এই বিজ্ঞান না জানিলে ঋষিপ্রণীত সংস্কৃত ভাষা সঠিকভাবে জানা যায় না। আজকাল ঋষিপ্রণীত কোন পুস্তকের মর্ম্মোদ্ধার না করিতে পারিলেও অনেকেই সংস্কৃত ভাষা শিখিয়াছেন বলিয়া মনে করেন বটে, কিন্তু ভারতবর্ষে একদিন সংস্কার ছিল যে, প্রকৃত ব্রাহ্মণ না হইলে সংস্কৃত ভাষা জানা সম্ভব হয় না। শব্দ-মাতৃক শব্দ-সাধনাই উপরোক্ত সংস্কারের গুপ্ত কথা। যাঁহারা প্রকৃতভাবে ব্রাহ্মণ্য-প্রয়াসী নহেন তাঁহাদিগের কাছে ঐ শব্দমাতৃক শব্দসাধনার কথা উল্লেখ পর্য্যন্ত করিতে ঋষিগণ নিষেধ করিয়াছেন, কারণ উহাতে উপহাসাস্পদ হইবার সম্ভাবনা আছে। যাহাই হউক, আমরা প্রত্যয়ের অর্থ-সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করিতে নারাজ এবং তাহা হইতে বিরত থাকিব।

প্রত্যয়ের অর্থ সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা না করিয়া তিঙ্ প্রত্যয়ান্ত পদের অর্থ স্থির করিবার অন্যোপায় বাক্যের 'কর্ত্তা' ও 'কর্ম্ম' স্থির করিয়া তাহাদের সহিত তিঙন্ত পদের সঙ্গতি কি, তাহা স্থির করা এবং ঐ সঙ্গতি অনুসারে অর্থোদ্ধার করা।

এস্থলে উহা করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, 'নারীণাং পতিরন্তো বিধীয়তে' এই বাক্যের কর্ত্তা 'নারীণাং' এবং কর্ম্ম 'পতিঃ',কারণ তিঙন্ত পদের 'তন্ত্রে'র অথবা কার্য্যের স্বত্ব যে, সে-ই 'কর্ত্তা' ('কর্ত্তা স্বতন্ত্র ইত্যুক্তঃ') এবং যাহাকে আশ্রয় করিয়া ঐ তন্ত্র অথবা কার্য্য নির্ব্বাহ করা হইয়া থাকে তাহার নাম 'কর্ম্ম' ('ক্রিয়াফলাশ্রয়ং কর্ম্ম')। অনেকে হয়ত নারীণাং এই ষষ্ঠ্যন্ত পদকে কর্ত্তা বলায় এবং প্রথমান্ত পদকে কর্ম্ম বলায় শিহরিয়া উঠিবেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে জানিতে হইবে যে, 'কর্ত্তৃ'কারকে ষষ্ঠী এবং 'কর্ম্ম'-কারকে প্রথমাও হইয়া থাকে।

'তত্র কর্ত্তর্যভিহিতে প্রথমৈব বিধীয়তে।
কৃষ্টীয়া অথবা ষষ্ঠী স্যাদনভিহিতে তথা।'
উক্তানুক্তে বিধা প্রোক্তে ইপ্সিতানীপ্সিতে ইতি।
প্রথমাদ্যভিহিতে কর্ম্মণ্যনুক্তে তু দ্বিতীয়িকা।"

অনভিহিত তন্ত্র অথবা কার্য্যাধিকরণে (অর্থাৎ যে কার্য্য কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা সম্পন্ন না হইয়া জ্ঞান ও অন্তরেন্দ্রিয়-দ্বারা সম্পন্ন হয় সেই কার্য্যবিষয়ে) কর্ত্তা যে ষষ্ঠ্যন্ত হইতে পারে, এবং ঐ কার্য্য যখন কোন অব্যক্ত বস্তুকে আশ্রয় না করিয়া ব্যক্ত জীবকে আশ্রয় করিয়া সম্পন্ন হয় তখন 'কর্ম্ম'তে যে প্রথমা হইতে পারে তাহা সজ্জনেন্দ্রপ্রয়োগকল্পদ্রুমের উপরোক্ত দুইটী শ্লোক যথাযথ অর্থে বুঝিতে পারিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে।

কোন অন্তরের কার্য্যের স্বত্ব অথবা কর্ত্তা যখন ষষ্ঠ্যন্ত হয় এবং ঐ অন্তরের কার্য্যের আশ্রয় অথবা কর্ম্ম যখন প্রথমান্ত হয় তখন ঐ অন্তরের কার্য্য প্রকাশ করিবার জন্য যে যে প্রত্যয় ব্যবহৃত হয় সেই সেই প্রত্যয় মোটামুটি যে অর্থে গৃহীত হইবে তাহার নিয়ম—

"সকর্ম্মকেভ্যঃ কর্ত্তৃস্থে কর্ম্মস্থে চ তথাত্মনে।
অকর্ম্মকেভ্যো ভাবাখ্যে কর্তরীতি তথাত্মনে।"

উপরোক্ত নিয়মানুসারে বাঙ্গালা ভাষায় "বীয়তে" এই তিঙন্ত পদটির মর্ম্ম হইবে—

"চিন্তার যোগ্য হইয়া থাকে"।

ইহার পর "অন্ত" শব্দটির অর্থ স্থির করিতে হইবে। "অন্ত" শব্দটি সাধারণতঃ সংখ্যাবাচক 'নামার্থে' ব্যবহৃত হইয়া থাকে। "অন্ত চসমা লইয়া আইস" এতাদৃশ বাক্য বলিলে আমরা বুঝিয়া থাকি যে, "আর একটি চসমা আনিবার কথা বলা হইতেছে"। কিন্তু, যদি বলা হয় যে, "চসমাটী অন্তরূপে চিন্তা কর" তাহা হইলে বুঝিতে হয় যে, দ্বিতীয় চসমার কথা বলা হইতেছে না, পরন্তু একই চসমার বিভিন্ন গুণের কথা চিন্তা করিবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইতেছে। কাযেই দেখা যাইতেছে যে, অন্ত শব্দটি যখন কোন দ্রব্য সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়, তখন উহা দ্রব্যের সংখ্যাবাচক হইয়া থাকে বটে, কিন্তু উহা যখন গুণের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয় তখন বুঝিতে হয় যে, একই দ্রব্যের গুণের ভেদাভেদের কথা বলা হইতেছে।

"পতি স্ত্রীলোকের চিন্তার যোগ্য হইয়া থাকেন" এবংবিধ বাক্যে বুঝিতে হয় যে, পতির গুণাবলী স্ত্রীলোকের চিন্তার যোগ্য, কারণ দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মের বিভিন্ন সম্বন্ধ কি, তাহা জানা থাকিলে দেখা যাইবে যে, ঐ দ্রব্যসমূহ গ্রহণের অথবা অপসরণের যোগ্য হয় বটে, কিন্তু চিন্তার যোগ্য হয় উহার গুণ ও কর্ম্ম। "নারীণাং পতিরন্তো বিধীয়তে" এই বাক্যে যখন পরিষ্কার দেখা যাইতেছে যে, 'বিধীয়তে' শব্দের অর্থ "চিন্তার যোগ্য হইয়া থাকে" তখন বুঝিতে হইবে যে, ঐ বাক্যের মর্ম্ম "পতির গুণের ভেদাভেদ অথবা বিভিন্নাংশ স্ত্রীলোকের প্রতিলোমক্রমে চিন্তার যোগ্য হইয়া থাকে" অর্থাৎ পতির বাহিরের যে-রূপ স্ত্রীলোকগণের কামের উদ্রেক হইয়া থাকে, সেই রূপ চিন্তা না করিয়া ঐ রূপের কারণ কি এবং উহা কোথা হইতে আসিতেছে তাহা আমূলভাবে স্ত্রীলোকগণকে চিন্তার উপদেশ দেওয়া হইতেছে, পরন্তু অপর আর

একটি পতিকে চিন্তা করিবার কথা বলা হইতেছে না।

"অন্যো দ্রব্যাশ্রিতাঃ সঙ্খ্যাযোগঃ সংসর্গণা বিনঃ।
ভেদাভেদকরস্তেষু ভেদাভেদবিধায়িনীঃ।"

বাক্যপদীয়ের তৃতীয় কাণ্ডের সংখ্যাসমুদ্দেশ-বিকরণের উপরোক্ত শ্লোকটি যথাযথ অর্থে বুঝিতে পারিলে আমাদিগের কথার সার্থকতা প্রতিপন্ন হইবে।

অষ্টাধ্যায়ী সূত্রপাঠের সাহায্য লইলেও দেখা যাইবে যে, 'অন্য' শব্দটি যখন কোন ব্যক্ত কর্ম্মের আশ্রয় সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়, তখন উহা দ্রব্যের সংখ্যাবাচক হইয়া থাকে বটে, কিন্তু উহা যখন কোন অব্যক্ত কর্ম্মের আশ্রয় সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়, তখন উহা সংখ্যাবাচক হয় না, পরন্তু গুণ ও কর্ম্মের ভেদাভেদ-নির্ণয়ের কথা প্রকাশ করিয়া থাকে।

অন্ ধাতুর সঙ্গে যৎ প্রত্যয় যোগ করিয়া "অন্য" শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। অন্ ধাতুর অর্থ কি এবং "যৎ অন্য নিত্-ধারণং" অষ্টাধ্যায়ী সূত্রপাঠের দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের এই সূত্রটীর সাহায্যে "যৎ" প্রত্যয়ের অর্থ কি, তাহা যথাযথ ভাবে বুঝিতে পারিলে আমাদিগের কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি করা যাইবে।

অষ্টাধ্যায়ী সূত্র-পাঠের "কাশিকা"-বৃত্তিকার "অন্য" শব্দটীকে "নাম"-শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া নির্দ্দেশ দিয়াছেন বটে, কিন্তু মূল সূত্র-পাঠে উহা কুত্রাপি "নাম" অথবা "সর্ব্বনাম"-শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। যাঁহারা বৈয়াকরণ তাঁহারা নিশ্চয়ই জানেন যে, বাক্যে যত কিছু পদ ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহা বেদাঙ্গানুসারে সর্ব্বসমেত চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা :—"নাম", "আখ্যাত", উপসর্গ" ও "নিপাত"। (তদ্ যানি এতানি চত্বারি পদ জাতানি নামাখ্যাতে চোপসর্গনিপাতাশ্চ তানি ইমানি ভবন্তি)। এতদনুসারে "সর্ব্বনাম" অথবা "অব্যয়" বলিয়া কোন পদ-বিভাগ বেদাঙ্গসঙ্গত নহে। "কাশিকা"-বৃত্তিকার "সর্ব্বাদীনি সর্ব্ব-নামানি" পাণিনির এ সূত্রটীর অনুসৃত ব্যাখ্যায় "সর্ব্বনাম"-শ্রেণীর পদ-বিভাগের কথা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। বেদাঙ্গান্তর্গত শিক্ষার শব্দ-বিভাগের নিয়ম অনুসরণ করিলে দেখা যাইবে যে, পাণিনির ঐ সূত্রটীর ভাগ-বৃত্তি হইবে "সর্ব্ব আং ঈন্-ই সর্ব্বদা সামানি" এবং উহার মধ্যে সর্ব্বনাম বলিয়া কোন পদ-বিভাগের কোন কথা নাই।

নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত এই চারিটি পদ-বিভাগের সংজ্ঞা যথাযথ ভাবে অনুধাবন করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, "অন্য" শব্দটি নিপাত-শ্রেণীর পদ। উহা লৌকিক বাক্যে সংখ্যাবাচক হইতে পারে বটে, কিন্তু মূলতঃ কখনও সংখ্যাবাচক নহে, পরন্তু উন্মেষ ও বিকাশের ভেদাভেদনির্ণায়ক।

নিরুক্তকার যেখানে নিপাতের অর্থ কিরূপ ভাবে গ্রহণ করিতে হইবে তাহার আলোচনা করিতে বসিয়া উদাহরণের দ্বারা "অন্য" শব্দটির অর্থ সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পদ্ধতি দেখাইয়াছেন, সেই স্থানটি বুঝিতে পারিলেও আমাদিগের কথার সার্থকতা প্রতিপন্ন হইবে। পরিতাপের বিষয় এই যে, দুর্গাচার্য্যের ভাষ্যের সহায়তায় নিরুক্তের কোন কথাই যথাযথ ভাবে সম্যক্ রূপে বুঝা সম্ভব নহে।

ঋষি-প্রণীত সংস্কৃত ভাষা বুঝিবার পদ্ধতি জানিতে পারিলে দেখা যাইবে যে,

"নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে" ইত্যাদি শ্লোকের মর্ম্ম—

পতির নষ্টত্ব, মৃতত্ব, প্রব্রজিতত্ব, ক্লীবত্ব এবং পাতিত্য এই পাঁচটি অবস্থার কোন একটি অথবা একাধিক অবস্থার উদ্ভব হইলে পতির কামতৃপ্তিকর বহিরঙ্গসমূহের চিন্তা না করিয়া যে শক্তির (অথবা কার্য্য-বিধির) বলে ঐ কামতৃপ্তিকর বহিরঙ্গসমূহের বিকাশ হইয়া থাকে সেই শক্তি (অথবা কার্য্যবিধি) স্ত্রীলোকগণের চিন্তার যোগ্য হয়।

পরাশর সংহিতার উপরোক্ত শ্লোকটির মর্ম্মার্থ উপরোক্ত ভাবে গ্রহণ করিতে পারিলেও দেখা যাইবে যে, উহার মধ্যেও বিধবার দ্বিতীয় পতি গ্রহণ করিবার কোন ব্যবস্থা উপদিষ্ট হয় নাই। "ধীয়তে" এই পদটি যে "ধৈ" ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে এবং "ধৈ" ধাতুর অর্থ যে মোটামুটি কিছু না কিছু চিন্তা করা" এইটুকু জানা থাকিলেই সাধারণ বুদ্ধির দ্বারাও দেখা

যাইবে যে, "পতিরন্যো" এই কথার দ্বিতীয় পতির কথা আসিতে পারে না। আগেই দেখাইয়াছি যে, "দ্বিতীয় পতিকে চিন্তা করিবে" এবংবিধ বাক্যে, বাক্যের একান্ত প্রয়োজনীয় যে "যোগ্যতা" অথবা "শক্তি" তাহা নষ্ট হইয়া যায়। কাযেই, এই শ্লোকে যে দ্বিতীয় পতি গ্রহণ করিবার কোন কথা আছে তাহা কোন ক্রমেই ধরা যায় না।

আমরা ১৩৩৫ সালের পৌষ-সংখ্যায় "সম্পাদকের বাঙ্গালা ভাষা-জ্ঞানের নমুনা ও আধুনিক হিন্দুস্থানী (২)"-শীর্ষক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, ঋক্, সাম, যজু এই তিনটি বেদের অভ্যাসে অভ্যস্ত না হইতে পারিলে অথর্ববেদের মর্ম্ম উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না এবং অথর্ববেদের মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে না পারিলে কোন সংহিতার মর্ম্ম যথাযথ ভাবে উপলব্ধি করা সাধ্যায়ত্ত হয় না। মনুসংহিতার ভাষ্যকার মেধাতিথি এবং কুল্লুকভট্ট যে কোন বেদের অভ্যাসে অভ্যস্ত ছিলেন অথবা অথর্ববেদের মর্ম্ম পরিজ্ঞাত ছিলেন তাহা তাঁহাদিগের রচনা হইতে কোন ক্রমেই মনে করা যায় না। চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, এই দুইজন ভাষ্যকারই সংহিতা ব্যাখ্যা করিবার অনধিকারী। ইহারই ফলে তাঁহারা উভয়েরই ভাষ্যের নামে মনুসংহিতার "ঘণ্ট" প্রস্তুত করিয়া মনুষ্য-সমাজের সর্ব্বনাশের সহায়তা করিয়াছেন। বসন্তবাবুর শ্রেণীর তথাকথিত পণ্ডিতগণও ঐ কার্য্যেরই সহায়তা করিতেছেন।

ঋষিপ্রণীত যে কয়খানি সংহিতা আছে তাহার সমগ্রভাগে সম্যক্ ভাবে প্রবিষ্ট হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, ঋষিগণ কুত্রাপি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীকে "বিধবা বিবাহ করিবে অথবা বিধবা বিবাহ করিবে না" এতাদৃশ আদেশ প্রদান করেন নাই। একাধিক পত্নীত্বে অথবা একাধিক পতিত্বে, পুরুষ ও স্ত্রীলোকের কর্ম্ম ও জ্ঞান-শক্তি সম্বন্ধে কি কি অপচয় হইয়া থাকে, তাহা অথর্ববেদের মধ্যে অতি স্পষ্টভাবে দেখান আছে। একাধিক পতিত্বের ফলে অথবা একাধিক পত্নীত্বের ফলে যে সন্তান উৎপন্ন হয়, সেই সন্তানের বৈশিষ্ট্য কি কি হইয়া থাকে তাহাও বেদের মধ্যে দেখান আছে। ঐ অর্থে দেখান হইয়াছে যে, একাধিক পতিত্বের ফলে অথবা একাধিক পত্নীত্বের ফলে যে সন্তান উৎপন্ন হয়, সেই সন্তান কখনও সর্ব্বোচ্চ-বুদ্ধিসম্পন্ন হইতে পারে না। ঋষিগণের কথা যে বর্ণে বর্ণে সত্য তাহা আধুনিক ইয়োরোপীয়গণের সামাজিক অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলেই প্রমাণিত হইবে।

"বিধবা পুনরায় বিবাহ করিবে" অথবা "পুনরায় বিবাহ করিবে না" এতাদৃশ কোন আদেশ ঋষিগণ তাঁহাদিগের কোন গ্রন্থে প্রদান করেন নাই বটে, কিন্তু সর্ব্বত্রই বিধবা পুনরায় বিবাহ করিলে যে নানাবিধ কুফলোদয় হইয়া থাকে তাহা দেখাইয়াছেন। অথচ, বিধবার সন্তান হইলে তাহাকে অবস্থাবিশেষে দায়াধিকারী হইবার ব্যবস্থা পর্য্যন্ত প্রদান করিয়াছেন।

ইহা হইতে বুঝিতে হয় যে, বিধবার পুনর্ব্বিবাহ ঋষিগণের মতে সমাজের মঙ্গলপ্রদ নহে এবং স্ত্রীলোক-গণ যাহাতে ঐ প্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত হয়, সর্ব্বতোভাবে তাহার চেষ্টা করা ঋষিগণের অভিপ্রেত। কিন্তু, তথাপি যদি কামবশে কোন বিধবা পুনরায় দ্বিতীয়বার পতি গ্রহণ করে, তাহা হইলে সমাজ তাহাকে নিন্দনীয় শ্রেণীতে অবনত করিবে বটে, কিন্তু তাহাকে বর্জ্জন করিবে না।

উপরোক্ত ব্যবস্থার কথা শুনিয়া হয়ত অনিলবরণ বাবুর দল মনে করিবেন যে, "তবেই ত বিধবার বিবাহ ঋষিগণের ব্যবস্থানুসারে স্বেচ্ছামূলক"। কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, যখন পুনর্ব্বিবাহিতা বিধবাকে সমাজের নিন্দনীয় শ্রেণীতে অবনত করিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে তখন ঐ পুনর্ব্বিবাহ কখনই বিধবা-গণের স্বেচ্ছামূলক বলিয়া ব্যবস্থিত হয় নাই।

বিধবা-বিবাহ-বিষয়ক ঋষিগণের এই ব্যবস্থা সম্যক্ ভাবে বুঝিয়া লইয়া বসন্তবাবুর শ্রেণীর পণ্ডিতগণ গোঁড়ামী পরিত্যাগ করিতে এবং উহা মানিয়া লইতে পারিবেন কি? আমাদিগের মনে হয় যে, এমন দিন সম্মুখে রহিয়াছে যখন নামাবলীওয়ালা পণ্ডিতগণের গোঁড়ামীও চলিবে না এবং অনিলবরণ বাবুর শ্রেণীর

মানুষের হৃদয়ের নামে উচ্ছৃঙ্খলতাও সমাজ বিধবার পরিত্যাগ করিবে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে "মানবতাওয়ালা"-গণের শতকরা ৯৯ জনই মনুর ব্যবস্থানুসারে অপাঙ্‌ক্তেয় এবং চণ্ডালোপম পঞ্চম তাঁহারাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গোঁড়ামী করিয়া থাকেন।

বৈধব্যপালন কি রমণীর পক্ষে শাস্তি অথবা কর্ত্তব্যপালন ?

বৈধব্য পালন করিতে হইলে রমণীগণকে আহার, নিদ্রা, বৈধুন, বসন-ভূষণ প্রভৃতি সম্বন্ধে যে যে নিয়ম পালন করিতে হয় তাহা যে বড়ই ক্লেশকর এবং তদনুসারে বৈধব্য যে একটী শাস্তি তদ্বিষয়ে অনিলবরণ বাবু এবং বসন্তবাবু উভয়েই একমত। শুধু অনিলবরণ বাবু এবং বসন্তবাবু কেন, আধুনিক শিক্ষিত সমাজের প্রায় প্রত্যেকেই বৈধব্যজীবনকে একটী অত্যন্ত ক্লেশকর এবং তদনুসারে শাস্তিমূলক বলিয়া মনে করেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবার পুনর্ব্বিবাহের ব্যবস্থা প্রদান করিয়া 'দয়ার সাগর' নাম পাইয়াছেন। এ বিষয়ে ভারতীয় ঋষির মতবাদ কি, তাহা অনুধাবন করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, তাঁহাদিগের মতে বৈধব্য-পালনে অভ্যস্ত হওয়া সকলের পক্ষে সহজসাধ্য নহে বটে, কিন্তু অভ্যস্ত হইতে পারিলে উহা ক্লেশকর হওয়া তো দূরের কথা, প্রত্যেকের জীবনের কাম্য যে আর্থিক প্রাচুর্য্য, স্বাস্থ্য, শান্তি, সন্তুষ্টি, দীর্ঘ-যৌবন ও দীর্ঘায়ু তাহা উহার দ্বারা রমণী-গণের পক্ষে লাভ করা অনায়াসসাধ্য হইয়া থাকে। বৈধব্য-পালনে অভ্যস্ত হওয়া সকল রমণীর পক্ষে সহজসাধ্য নহে বলিয়াই ভারতীয় ঋষিগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের বিধবাগণের পক্ষে বৈধব্য-পালনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যত অধিক কথা বলিয়াছেন, শ্রমজীবী শূদ্র বিধবাগণের পক্ষে উহার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তত অধিক কথা বলেন নাই।

ভারতীয় ঋষিগণের মতবাদই ঠিক অথবা আজকালকার ধুরন্ধরগণের বিধবাগণের জন্য দয়ার্দ্রতাই যুক্তি-যুক্ত তাহা স্থির করিতে হইলে আধুনিক সধবা ও বিধবাগণের জীবনের পার্থক্য কোথায়, তাহার বিচার করিতে হইবে।

অর্থের প্রাচুর্য্য বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে অধুনা সধবাগণও যেরূপ প্রায়শঃ হা-হুতাশে জর্জ্জরিত, বিধবাগণও প্রায়শঃ তদ্রূপ দৈন্য-গ্রস্ত। বরং বিধবাগণ অপেক্ষাকৃত কম জর্জ্জরিত, কারণ তাঁহাদিগের অভাব ও প্রয়োজন প্রায়শঃ অপেক্ষাকৃত অল্প। যখন দেখা যায় যে, সধবা ও বিধবাগণ সমানভাবেই অর্থাভাবে জর্জ্জরিত তখন বিধবাগণের বৈধব্য যে তাঁহাদিগের অর্থাভাবের কোন কারণ, তাহা যুক্তিসঙ্গতভাবে মনে করা যায় না।

স্বাস্থ্য-বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, বিধবাগণ এমন কি আজকালও শাস্ত্রতঃ যেরূপ স্বাস্থ্য রক্ষা করিয়া থাকেন, সধবাগণ সেইরূপ স্বাস্থ্য এখনও প্রায়শঃ রক্ষা করিতে সক্ষম হন না।

শান্তি ও সন্তুষ্টি বিষয়ে পরীক্ষা করিতে বসিলে আপাত-দৃষ্টিতে মনে হইবে যে, সধবাগণ যখন স্বামীর সহায়তায় কামের বিবিধ উপভোগে ও লোভের বিবিধ পরিতৃপ্তিতে সফল-মনোরথ হইয়া থাকেন তখন তাঁহারা নিশ্চয়ই বিধবাগণের তুলনায় শান্তি ও সন্তুষ্টি পাইতে পারেন। গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, উপভোগে কখনও কাম এবং লোভের পরিতৃপ্তি হয় না। বরং, উপভোগনিরত হইলে সর্ব্বদাই কাম ও লোভ অধিকতর মাত্রায় প্রজ্বলিত হয় এবং তাহাতে স্বভাবতঃ অতৃপ্তি, অশান্তি ও অসন্তুষ্টি থাকিয়া যায়। অন্য পক্ষে, কাম ও লোভের পরিতৃপ্তির প্রধান উপায় তৎ তৎ পক্ষে সংযত হওয়া। এই হিসাবে বিধবাগণ পরিতৃপ্তি, শান্তি ও সন্তুষ্টি লাভ করিবার যত অধিক সুযোগ পাইয়া থাকেন সধবাগণ স্বভাবতঃ তাহা কখনও পান না। এইখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, তাহা হইলে রমণীগণের বিবাহের ব্যবস্থা করা হয় কেন ? ইহার উত্তরে আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, বিবাহ-ব্যবস্থার প্রধান প্রয়োজন সমাজ-সংরক্ষণ।

সমাজ-সংরক্ষণ করিতে হইলেও প্রথমতঃ প্রয়োজন হয় মানুষের জন্ম এবং দ্বিতীয়তঃ প্রয়োজন হয় মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিপুষ্টি। এই উভয় পক্ষেই স্ত্রী-পুরুষের মিলন একান্ত প্রয়োজনীয়। এই উভয় পক্ষেই স্ত্রী-পুরুষের মিলন একান্ত প্রয়োজনীয় বটে কিন্তু, স্ত্রী-পুরুষের মিলনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি উভয়েরই ক্ষয়। এই উভয়-সঙ্কটে পড়িয়া কি কর্ত্তব্য তাহা স্থির করিবার জন্য ঋষিগণ তাঁহাদিগের প্রণীত অথর্ব-বেদে বহু আলোচনা করিয়াছেন। ঐ আলোচনায় তাঁহারা দেখাইয়াছেন যে, কাম স্ত্রী-পুরুষের মিলনের অবশ্যম্ভাবী পরি-পতি বটে, কিন্তু কি করিয়া কাম ও লোভ সংযত করিতে হয়

তাহা শিক্ষার দ্বারা অভ্যস্ত হইয়া সংযতভাবে স্ত্রী-পুরুষের মিলনে প্রবৃত্ত হইলে কখনও ক্ষয় সাধিত হয় না। উহারই জন্য তাঁহারা মানুষের অন্তর্মুখীন হইবার শিক্ষার ব্যবস্থা সমাজমধ্যে প্রবর্তন করিয়াছিলেন এবং যতদিন পর্য্যন্ত স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই ঐ শিক্ষায় নিপুণতা লাভ না করে ততদিন পর্য্যন্ত বিবাহ অথবা স্ত্রী-পুরুষের মিলন নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন। এইরূপে বিবাহ-ব্যবস্থার মূলেও কাম ও লোভের সংযম ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। বিবাহ-ব্যবস্থার মূলে কাম ও লোভের সংযম ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকিলে কাম ও লোভের পরিতৃপ্তির দ্বারা শান্তি ও সন্তুষ্টি লাভ করিবার কোন কথা উঠিতে পারিত না। বস্তুতঃ পক্ষে ঋষির শাস্ত্র অবগত হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, তাঁহাদিগের উপদেশানুসারে স্ত্রী ও পুরুষের মিলনের প্রয়োজনীয়তা কাম ও লোভের পরিতৃপ্তি নহে, পরন্তু একমাত্র ধর্ম্মপালন অথবা কর্ত্তব্য-পালনই ঐ মিলনের প্রয়োজনীয়তা। সন্তানোৎপাদন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিপুষ্টি-সাধনের দ্বারা ঐ কর্ত্তব্য প্রতিপালিত হইত।

কাযেই বলিতে হইবে যে, বিধবাগণও যেরূপ বাধ্য হইয়া কাম ও লোভ সংযত করিয়া থাকেন এবং তাহার ফলে প্রকৃত শান্তি ও সন্তুষ্টি লাভ করেন, সেইরূপ ঋষির ব্যবস্থা মানিয়া চলিলে সধবাগণও সংযত হইতে বাধ্য হইয়া থাকেন। ঋষির ব্যবস্থা মানিয়া চলিলে সধবা ও বিধবা উভয়েই শান্তি ও সন্তুষ্টি লাভ করিতে পারেন। আধুনিক উচ্ছৃঙ্খলতার ফলে সধবাগণ আপাতদৃষ্টিতে কামের ও লোভের পরিতৃপ্তির দ্বারা শান্তি ও সন্তুষ্টি পাইয়া থাকেন বলিয়া মনে হয় বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা হয় না। বরং, এখনও বিধবাগণেরই শান্তি ও সন্তুষ্টি পাইবার অধিক সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকে।

অকালবার্দ্ধক্য ও অকালমৃত্যু বিষয়ে লক্ষ্য করিলেও দেখা যাইবে যে, বিধবাগণ যত অধিক দিন তাঁহাদিগের শরীরের ঔজ্জ্বল্য ও পরমায়ু বজায় রাখিতে পারেন সধবাগণ তত অধিকদিন তাহা বজায় রাখিতে সক্ষম হন না।

কাযেই, বাস্তব অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলে সধবাগণ যে কোনরূপে বিধবাগণের তুলনায় প্রকৃষ্টতর জীবন যাপন করেন, ইহা মনে করা যায় না।

বস্তুতঃ পক্ষে, বিধবার কোন্ বস্তুর অভাব হয় এবং সধবার কোন্ বস্তুর অভাব থাকে না তাহা চিন্তা করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, বিধবার কাম-পরিতৃপ্তির সুযোগ নষ্ট হইয়া যায়, আর সধবার ঐ সুযোগ বিদ্যমান থাকে।

অন্যদিকে, বিধবার বিবাহ আরব্ধ হইলে সমাজমধ্যে কতকগুলি নিক্ষিতমস্তিষ্কের সন্তানের উৎপত্তি হওয়া অবশ্যম্ভাবী হইয়া থাকে।

সুতরাং, বৈধব্য-পালন যে রমণীর পক্ষে কোনরূপ শাস্তি তাহা যুক্তিসঙ্গতভাবে বলা চলে না। পরন্তু, উহাকে কর্ত্তব্য-পালনের ব্যবস্থাই বলিতে হইবে। তথাপি যে বৈধব্য-জীবন কোন ক্রমেই কাম্যনায় যোগ্য নহে তাহার কারণ দুইটী। যথা—(১) কাম ও লোভ সংযত করা সকল রমণীর পক্ষে সকল সময়ে সম্ভবযোগ্য নহে। যথোপযুক্ত শিক্ষার অভাব হইলে উহা অধিকতর দুঃসাধ্য হয়। (২) রমণীর শরীর-গঠন যেরূপ দুর্ব্বল তাহাতে তাহার রক্ষার জন্য পুরুষের আশ্রয় নিতান্ত প্রয়োজনীয়। অবশ্য, একথা বলিতেই হইবে যে, কর্ত্তব্যপরায়ণ দেবর অথবা ভ্রাতা বিদ্যমান থাকিলে স্বামীর অভাবেও রমণীর রক্ষা সম্ভবযোগ্য হইতে পারে। একদিন সমাজমধ্যে উপযুক্ত শিক্ষা এবং কর্ত্তব্যপরায়ণ দেবর ও ভ্রাতা বিদ্যমান ছিল বলিয়াই বৈধব্য-পালন কোনরূপে ক্লেশকর বলিয়া বিবেচিত হইত না। এক্ষণে ঐ শিক্ষা এবং কর্ত্তব্য-পরায়ণ দেবর ও ভ্রাতার অভাব হইয়াছে বলিয়াই বৈধব্যপালন ক্লেশকর হইয়া উঠিয়াছে।

এই হিসাবে বৈধব্যপালনের প্রথা উঠাইয়া দেওয়া যুক্তি-সঙ্গত অথবা যাহাতে অন্তর্মুখীন হইবার শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হয় এবং দেবর ও ভ্রাতাগণ কর্ত্তব্যপরায়ণ হন তাহার ব্যবস্থা করা যুক্তিসঙ্গত, ইহা ভাবিবার বিষয়।

জীবের সুখ ও দুঃখের কারণ

ভারতীয় ঋষির শাস্ত্রানুসারে ঈশ্বর জীবকে তাহার কর্ম্ম-অনুসারে সুখ-দুঃখ প্রদান করেন, অথবা জীব তাহার কর্ম্মানু-সারে সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে, অথবা আর কিছুর জন্য জীবের সুখ ও দুঃখের ভোগ হইয়া থাকে ইহা বর্ত্তমানে আমাদিগের আলোচ্য।

অনিলবরণ বাবু এ সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিয়াছেন তন্মধ্যে নিম্নলিখিত চারিটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(১) 'পূর্ব্বজন্মে কেহ কোন অপরাধ করিলে তাহার

জন্ম এজন্মে তাহাকে শাস্তি দেওয়ার কোনই সার্থকতা নাই।'

(২) 'মানুষের প্রকৃতি, মানুষের চরিত্র, তাহার কর্ম্মের দ্বারাই গঠিত হয়'।
'হিন্দু দর্শনের মতে ভগবান্ কাহাকেও তাহার কর্ম্মের জন্য সুখ-দুঃখ কোন প্রকার ফল প্রদান করেন না। তাহার প্রমাণ, গীতার এম অধ্যায়ের ২৪শ শ্লোক—

ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে।'

(৩) 'প্রত্যেক জীব হইতেছে ভগবানের অংশ, প্রত্যেকেই ভগবানের একটি বিশেষ শক্তি, একটি বিশেষভাব প্রকট করিবার জন্য জগৎলীলায় আবির্ভূত হইয়াছে, উহাই তাহার 'স্বভাব', এই স্বভাবই তাহার অদৃষ্ট। জন্ম-জন্মান্তরের ভিতর দিয়া নানা সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যুর ভিতর দিয়া জীব তাহার এই অন্তর্নিহিত ভাগবত ভাবের বিকাশ করিতেছে। এক জন্মে সে তাহার কর্ম্মের দ্বারা বিকাশের যে অবস্থায় উপনীত হইতেছে, তাহার দ্বারাই তাহার পর জন্মের জীবন ও কর্ম্মধারা নির্দ্ধারিত হইতেছে। এই ভাবেই সে পূর্ণ ভাগবত জীবনের দিকে অগ্রসর হইতেছে। অনেক সময়ে দুঃখ-ভোগের ভিতর দিয়াই আত্মবিকাশের সহায় হয়। তাই সে দুঃখ পাইতেছে, তাহার কৃতকর্ম্মের সাজার জন্য কেহ তাহাকে দুঃখ দিতেছে না, তাহার স্বভাবের বিকাশের প্রয়োজনেই সে কখনও দুঃখ, কখনও সুখ ভোগ করিতেছে, এই ভাবে সকল সুখ-দুঃখের ঊর্দ্ধে পরম-আনন্দময় দিব্য-জীবনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিয়া তুলিতেছে।
ইহাই হিন্দুর কর্ম্মবাদ ও জন্মান্তর-বাদের মূলতত্ত্ব'।

পাঠকগণকে মনে রাখিতে হইবে যে, আমাদিগের এই সন্দর্ভের মূল উদ্দেশ্য অনিলবরণ বাবুর শ্রেণীর মানুষ ঋষি-প্রণীত শাস্ত্র সম্বন্ধে কিরূপ অজ্ঞ এবং তাঁহারা অজ্ঞ হইয়াও বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বিষয়ে কিরূপ অযৌক্তিক পাণ্ডিত্যের ভাণ করিয়া থাকেন এবং দুঃখিত জন-সমাজকে কিরূপ বিপথগামী করিয়া থাকেন তাহা দেখান।

এই উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য আমরা প্রথমতঃ অনিলবরণ বাবুর কথায় জীবের সুখ-দুঃখের কারণ সম্বন্ধেও জ্ঞাতব্য কিছু সঠিক ভাবে পাওয়া যায় কি না, তাহার সন্ধান করিব এবং দ্বিতীয়তঃ তাঁহার কোন কথায় কোন অযৌক্তিকতা ও পরস্পরবিরোধিতা পাওয়া যায় কি না, তাহার পরীক্ষা করিব।

অনিলবরণ বাবুর কথায় জীবের সুখ-দুঃখের কারণ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য কিছু সঠিকভাবে পাওয়া যায় কি না, তাহার সন্ধান করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, অনিলবরণ বাবু তাঁহার উল্লেখযোগ্য কথার চতুর্থটীতে একস্থানে বলিতেছেন—

"তাহার (অর্থাৎ জীবের) স্বভাবের বিকাশের প্রয়োজনেই সে কখনও দুঃখ, কখনও সুখ ভোগ করিতেছে।"

উপরোক্ত বাক্যটী হইতে বুঝিতে হয় যে, অনিলবরণ বাবুর মতানুসারে জীবের সুখ ও দুঃখের কারণ তাহার 'স্বভাবের বিকাশের প্রয়োজন'।

বলা বাহুল্য যে, "স্বভাবের বিকাশের প্রয়োজন" বলিতে যে কি বুঝায় তাহা ধারণা করিতে না পারিলে অনিলবরণ বাবুর মতে জীবের সুখের ও দুঃখের কারণ যে কি, তাহা কিছুই উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। কাযেই, এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, 'শ্রী অরবিন্দে'র পরম সেবক "স্বভাবের বিকাশের প্রয়োজন" বলিতে কি বুঝায় তাহা ধারণা করিবার জন্য কোন কথা বলিয়াছেন কি না। এই উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, অনিলবরণ বাবু তাঁহার ৪র্থ কথাতেই সর্ব্ব-প্রথমে বলিয়াছেন—

"প্রত্যেক জীব হইতেছে ভগবানের একটী বিশেষ শক্তি, একটী বিশেষ ভাব প্রকট করিবার জন্য জগৎ-লীলায় আবির্ভূত হইয়াছে, উহাই তাহার স্বভাব।" অনিলবরণ বাবুর এই কথা হইতে বুঝিতে হয় যে, "জীবমধ্যস্থিত ভগবানের লীলা-বিশেষের নাম জীবের স্বভাব"।

এক্ষণে "জীবের সুখ ও দুঃখের কারণ তাহার স্বভাবের বিকাশের প্রয়োজন", আর "জীবমধ্যস্থিত ভগবানের লীলাবিশেষের নাম জীবের স্বভাব"—অনিলবরণ বাবুর এই দুইটী কথা মিলাইয়া লইয়া তাঁহার বক্তব্য অনুধাবন করিতে হইলে বলিতে হয় না কি যে, অনিলবরণ বাবুর মতে

"জীবের সুখ-দুঃখের কারণ—ভগবানের লীলাবিশেষের কোন না কোন নিকাশের প্রয়োজন?" অথবা সহজ কথায় ইহাই বুঝিতে হয় না কি যে, অনিলবরণ বাবুর মতে ভগবানের লীলাবশতঃই জীব সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে? এক্ষণে পাঠকগণ জীবের সুখ-দুঃখের কারণ সম্বন্ধে কতখানি জ্ঞান লাভ করিলেন তাহা চিন্তা করুন। আপনাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, আপনারা "ভগবান্" কি বস্তু তাহা জানেন না। "তাঁহার লীলা কি বস্তু" তাহাও আপনাদিগের জানা নাই, অথচ অনিলবরণ বাবুর মুখ হইতে আপনারা শুনিতেছেন যে, "ভগবানের লীলাবশতঃই জীব সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে।" "ভগবান্" কি বস্তু অথবা "ভগবানের লীলা" কি বস্তু তাহা যতক্ষণ না বুঝা যায় ততক্ষণ "ভগবানের লীলাবশতঃ জীবের সুখ-দুঃখভোগ হইয়া থাকে" এবংবিধ বাক্য হইতে কোন বস্তুর জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয় না। আমাদিগের মতে ইহা শ্রী-অরবিন্দ সম্প্রদায়ের "ফাঁকি-বাজী"র একটী নমুনা।

অন্যদিক্ দিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, "ভগবানের লীলাবশতঃ জীবের সুখ-দুঃখভোগ হইয়া থাকে" এবংবিধ কথা বলিলে বুঝিতে হয় যে, "ভগবানেরই কোন কার্য্যবশতঃ জীব সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে" অথবা "ভগবান্ই জীবকে সুখ-দুঃখ প্রদান করেন"। কাযেই, ইহা বলা যাইতে পারে যে, অনিলবরণ বাবু তাঁহার উল্লেখ-যোগ্য কথাগুলির চতুর্থ সংস্কার বলিয়াছেন যে, "হিন্দু দর্শনের মতে ভগবান্ই জীবকে সুখ-দুঃখ প্রদান করেন।"

যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, অনিলবরণ বাবুর মতে ভগবান্ একটি খাম-খেয়ালে লোকাই এবং তাঁহার খাম-খেয়ালের ফলেই জীবকে কখনও সুখ কখনও দুঃখ প্রদান করেন তাহা হইলে আমাদিগের কোন কথা নাই, কিন্তু যদি বলা হয় যে,জীবের সু-কর্ম্ম ও অ কর্ম্ম দেখিয়া ভগবান্ জীবকে কখনও সুখ, কখনও দুঃখ প্রদান করেন তাহা হইলে ধরিতে হয় যে, অনিলবরণ বাবুর মতে "ভগবান্ জীবকে তাহার কর্ম্মের জন্য সুখ-দুঃখ প্রদান করেন"।

অথচ, অনিলবরণ বাবু তাঁহার উল্লেখ-যোগ্য কথা চারিটীর তৃতীয় কথায় বলিতেছেন যে, "ভগবান্ কাহাকেও তাহার কর্ম্মের জন্য সুখ-দুঃখ কোন প্রকার ফল প্রদান করেন না"। কাযেই, ধরিয়া লইতে হইবে যে, অনিলবরণ বাবুর মাথায় কিছু বিশেষ গণ্ডগোল আছে, নতুবা তাঁহার মতে "ভগবান্ একটী খাম-খেয়ালপূর্ণ কিছু" এবং তাঁহার খাম-খেয়ালবশতঃ জীবের কখনও সুখ এবং কখনও দুঃখ-ভোগ হইয়া থাকে। বলিহারি মহামহিম শ্রীযুক্ত অনিলবরণ বাবুকে এবং তাঁহার শ্রী-গুরুকে শিক্ষাকে! অনিলবরণ বাবুকে জানিতে হইবে যে শাস্ত্র না জানিয়া শাস্ত্রের জ্যেঠামী করিতে বসিলে এইরূপ নাকাল হইতে হয়। খুব সম্ভব লজ্জা না থাকিলে জীব যে শ্রেণীর হইয়া থাকে অনিলবরণ বাবু সেই শ্রেণীর। তাই তিনি শাস্ত্রের কোন কথা সঠিকভাবে না জানিয়াও মানুষকে স্মৃতি-শাস্ত্রের ব্যবস্থা সম্বন্ধে শুনাইতে সঙ্কোচ বোধ করেন না।

মস্তিষ্কের মধ্যে যে পদার্থ থাকিলে উপরোক্ত যুক্তিতর্ক-গুলি অনুধাবন করা যায় সেই পদার্থ অনিলবরণ বাবুর মস্তিষ্কে আছে কি না তাহা আমরা জানি না, তবে খুব সম্ভব পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে, অনিলবরণ বাবু জীবের সুখ ও দুঃখের কারণ সম্বন্ধে কোন যুক্তিপূর্ণ কথা সঠিক ভাবে বলিতে পারেন নাই এবং উহা তাঁহার জানা নাই।

এক্ষণে তাঁহার কথাগুলির মধ্যে কোন অযৌক্তিকতা ও পরস্পরবিরোধিতা পাওয়া যায় কি না, আমরা তৎসম্বন্ধে পরীক্ষা করিব।

তাঁহার প্রথম কথা—

"পূর্ব্বজন্মে কেহ কোন অপরাধ করিলে তাহার জন্য এ জন্মে তাহাকে শাস্তি দেওয়ার কোনই সার্থকতা নাই।"

এই কথাটী যুক্তিযুক্ত বলিয়া ধরিয়া লইলে স্বীকার করিতে হয় যে, "কর্ম্ম যাহাতে ফল-প্রসূ হয় তাহার চেষ্টা করার কোন সার্থকতা নাই এবং স্বভাবের নিয়মানুসারে কর্ম্ম ফলপ্রসূ না-ও হইতে পারে"। যাঁহারা বৈশেষিক দর্শন যথাযথ অর্থে পরিজ্ঞাত হইতে পারিয়াছেন তাঁহারা নিশ্চয়ই বিদিত আছেন যে, ঋষিগণের মতানুসারে কোন "কর্ম্ম", "কার্য্য" ও "ক্রিয়া" কখনও কোন না কোন রকমের ফল প্রসব না করিয়া থাকিতে পারে না। কর্ম্মের এই ফল কখনও বা প্রত্যক্ষ ভাবে জীবের উপর, আর কখনও বা প্রত্যক্ষভাবে বায়ু-মণ্ডলের উপর ফল প্রসব করিয়া পরোক্ষভাবে জীবের উপর ফল প্রসব করিয়া থাকে। বাস্তব জগতে যাহা ঘটে তাহা লক্ষ্য করিলেও

সর্ব্বত্রই বৈশেষিক দর্শনের উপরোক্ত কথার সাক্ষ্য পাওয়া যাইবে। কুত্রাপি উহার ব্যভিচার দেখা যাইবে না। কাজেই বলিতে হইবে যে, অনিলবরণ বাবুর প্রথম কথাটী অযৌক্তিক এবং উহা কোন ঋষি-প্রণীত শাস্ত্রের অনুমোদিত নহে।

অন্য দিক্ দিয়া দেখিলেও দেখা যাইবে যে, যদিও অনিলবরণ বাবু তাঁহার প্রথম কথায় "কর্ম্ম যাহাতে ফলপ্রসূ হয় তাহার চেষ্টা করায় সার্থকতা নাই" এবংবিধ কথা বলিয়াছেন, তথাপি তাঁহার দ্বিতীয় কথাতেই আবার বলিতেছেন, "মানুষের প্রকৃতি, মানুষের চরিত্র তাহার কর্ম্মের দ্বারাই গঠিত হয়"। মানুষের "প্রকৃতি", মানুষের "চরিত্র" তাহার কর্ম্মের দ্বারাই গঠিত হয় ইহা স্বীকার করিয়া লইলে, "পূর্ব্বজন্মে কেহ কোন অপরাধ করিলে তাহার জন্য এজন্মে তাহাকে শাস্তি দেওয়ার কোনই সার্থকতা নাই" এবংবিধ কথা বলা চলে না। চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, এই দুইটী কথা পরস্পর-বিরোধী। অনিলবরণ বাবুর মস্তিষ্কে যে গণ্ডগোল আছে ইহা তাহার অন্যতম সাক্ষ্য।

অনিলবরণ বাবুর দ্বিতীয় কথা—

"মানুষের প্রকৃতি, মানুষের চরিত্র তাহার কর্ম্মের দ্বারাই গঠিত হয়।"

মানুষের চরিত্র যে পরোক্ষভাবে তাহার কর্ম্মের দ্বারাই গঠিত হয় তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই বটে, কিন্তু সাংখ্যদর্শনের "সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ" এই কথাটী অনুধাবন করিতে পারিলে "মানুষের কর্ম্মের দ্বারা তাহার প্রকৃতি গঠিত হয়" এমন কথা বলা কোন ক্রমেই চলে না। অনিলবরণ বাবুর এই দ্বিতীয় কথা হইতে বুঝিতে হয় যে, মানুষের "প্রকৃতি" ও "চরিত্র" অথবা "স্বভাব" কাহাকে বলে এবং দুই-এর মধ্যে পার্থক্য কি তাহা তিনি আদৌ বুঝিতে পারেন না। ইহা যে কেবলমাত্র তিনিই বুঝেন না তাহা নহে, তাঁহার শ্রীগুরুদেবেরও ঐ একই অবস্থা। এই জন্যই আমরা অসঙ্কোচে বলিতেছি যে, অনিলবরণ বাবুর সম্প্রদায় মূল শাস্ত্র না পড়িয়া শাস্ত্রের কথা বলিবার ধৃষ্টতা অবলম্বন করিতে লজ্জা বোধ করেন না।

মানুষের "প্রকৃতি" ও "চরিত্র" অথবা "স্বভাবে"র মধ্যে তফাৎ কি তাহার কথা আমরা জীবের সুখ-দুঃখের কারণ কি তাহার আলোচনাকালে বলিব।

"মানুষের প্রকৃতি, মানুষের চরিত্র তাহার কর্ম্মের দ্বারাই গঠিত হয়", এই কথা বলিয়া অনিলবরণ বাবু পুনরায় তাঁহার চতুর্থ দফায় বলিতেছেন যে, "তাহার কৃতকর্ম্মের সাজার জন্য কেহ তাহাকে দুঃখ দিতেছে না"। চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, এই দুইটী বাক্যের মর্ম্ম পরস্পর-বিরোধী।

অনিলবরণ বাবুর তৃতীয় কথা—

"ভগবান্ কাহাকেও তাহার কর্ম্মের জন্য সুখ-দুঃখ ফল প্রদান করেন না।"

এই কথাটী কতকাংশে শাস্ত্রসঙ্গত বটে, কিন্তু সর্ব্বতোভাবে শাস্ত্রসঙ্গত নহে। "ভগবান্ কাহাকেও তাহার কর্ম্মের জন্য সুখ দুঃখ ফল প্রদান করেন না", ইহা কতকাংশে সত্য হইলেও যখন পরিষ্কার দেখা যাইতেছে যে, জীব সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে, তখন যতক্ষণ পর্য্যন্ত জীব সুখ-দুঃখ ভোগ করিতেছে কেন, তাহা না বলা হয় ততক্ষণ বাক্য অসম্পূর্ণ ও অস্পষ্ট থাকিয়া যায়। অনিলবরণ বাবু তাঁহার এই কথাটী প্রতিপন্ন করিবার জন্য গীতার পঞ্চম অধ্যায়ের যে শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহার অর্থ তিনি সর্ব্বতোভাবে সঠিকরূপে বুঝিতে পারেন নাই। গীতার অর্থ সঠিকরূপে বুঝিতে হইলে বেদান্তের অষ্টাধ্যায়ী সূত্র-পাঠে প্রবেশ চাই এবং উহা সর্ব্বতোভাবে বুঝিতে হইলে যোগোপলব্ধি করিবার প্রযত্নের প্রয়োজন হয়। এই দুইটীর কোনটীই প্রায়শঃ দেখা যায় না। এই ইংরাজীনবীশগণ যথেচ্ছভাবে গীতার ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। গীতায় "ঈশ্বর", "ভগবান্", "শ্রীকৃষ্ণ", "প্রভু", "বিভু", "ব্রহ্ম" এই কয়টী অবাক্ত "কারণ"-সম্বন্ধীয় কথা প্রতিনিয়ত ব্যবহৃত হইয়াছে। সাধারণের ধারণা যে, ঐ কয়টী কথা সর্ব্বতোভাবে একার্থক। কিন্তু, বেদান্তে প্রবেশ করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, উহার প্রত্যেকটী বিভিন্নার্থক। চলতি ভাষায় আমরা "ঈশ্বর"কেই "ভগবান্" থাকি বটে, কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় "ভগবান্" ও "ঈশ্বর" বলিয়া এই দুইটী পদের অর্থে অনেক পার্থক্য আছে। এতৎসম্বন্ধীয় সমস্ত কথা এখানে বলা সম্ভব নহে। উহার কতকাংশ আমরা জীবের সুখ-দুঃখের কারণ সম্বন্ধে আলোচনাকালে বিবৃত করিব। ঐ আলোচনাকালে "ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি" প্রভৃতি শ্লোকেরও ব্যাখ্যা করিব।

অনিলবরণ বাবু তাঁহার চতুর্থ কথায় কতকগুলি অর্থহীন,

অসংলগ্ন, পরস্পর-বিরোধী (self-contradictory) কথা বলিয়া সর্ব্বশেষে বলিয়াছেন যে, 'ইহাই হিন্দুর কর্ম্মবাদ ও জন্মান্তরবাদের মূলতত্ত্ব।' উহাই যে হিন্দুর কর্ম্মবাদ ও জন্মান্তরবাদের মূল তত্ত্ব ইহা প্রতিপন্ন করিতে হইলে ঋষিপ্রণীত কোন মন্ত্র, সূত্র অথবা কারিকা উদ্ধৃত করিয়া তাহা দেখাইয়া দিতে হয়। অনিলবরণ বাবু তাহা পারিবেন কি ?

বস্তুতঃ পক্ষে 'তথাকথিত কর্ম্মবাদ' ও 'জন্মান্তরবাদ'-সম্বন্ধীয় অনিলবরণ বাবুর কথাগুলি সম্পূর্ণ কাল্পনিক। উহা যেমন ঋষিপ্রণীত কোন গ্রন্থে দেখা যাইবে না, সেইরূপ উহা বাস্তব জগতের ঘটনাবলী হইতেও প্রমাণিত করা যাইবে না।

অনিলবরণ বাবু যাহাকে 'স্বভাব' ও 'অদৃষ্ট' বলিয়াছেন তাহা ঋষিপ্রণীত 'শব্দ-বিজ্ঞান' অথবা 'ভাষাবিজ্ঞানে'র দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন কি ? অনিলবরণ বাবুর খুব সম্ভব জানা নাই যে, সংস্কৃত ভাষা, 'পদের' সম্মতি মূলক(conventional) অর্থের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। 'শব্দ ও অর্থের' মধ্যে যে নিত্য সম্বন্ধ আছে ইহাই সংস্কৃত ভাষার মূল কথা। প্রত্যেক শব্দ ও অর্থের মধ্যে যে নিত্য সম্বন্ধ আছে তাহা স্থির করিবার প্রণালী নির্দ্দিষ্ট করিয়া ঋষিগণ তাঁহাদিগের সংস্কৃত ভাষা রচনা করিয়াছেন। শব্দ ও অর্থের ঐ নিত্য-সম্বন্ধ স্থির করিতে না পারিলে ঋষিগণের বাক্যের মর্ম্ম যথাযথ ভাবে কখনও উদ্ধার করা সম্ভব নহে। অনিলবরণ বাবু ও তাঁহার শ্রীগুরু প্রত্যেক শব্দ ও অর্থের নিত্য-সম্বন্ধ যে কি তাহা স্থির করিবার নিয়ম পরিজ্ঞাত হইতে পারিয়াছেন কি ? এই জন্যই আমরা বারংবার বলিতেছি যে, মূল শাস্ত্র না জানিয়া তৎসম্বন্ধে জ্যেঠামী কথা অতীব গর্হিত।

এক্ষণে দেখা যাউক, বসন্ত বাবু জীবের সুখ-দুঃখের কারণ সম্বন্ধে কি কি বলিয়াছেন।

বসন্ত বাবু এই সম্বন্ধে যে যে কথা বলিয়াছেন তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কথাগুলি উল্লেখযোগ্য :—

(১) ঈশ্বর জীবকে কর্ম্মানুসারে সুখ দুঃখ প্রদান করেন, অনিলবরণ বাবু এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু, "ফলং অত উপপত্তেঃ" (ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।৩৮) এই সূত্রে মহর্ষি বেদব্যাস এই সিদ্ধান্তই স্থাপন করিয়াছেন এবং আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ উভয়েই ইহাকে বৈদিক সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এই সূত্রের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য এই মতের সমর্থনে দুইটী উপনিষদ্-বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং গীতার ৭।২২ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, যেখানে ভগবান্ বলিয়াছেন যে, লোকে অন্য দেবতার উপাসনা করিয়া যে অভীষ্ট ফল লাভ করে, তাহাও ভগবানের প্রদত্ত ফল।

ব্রহ্মসূত্র ২।১।৩৪ "বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথা হি দর্শয়তি" এই সূত্রে বেদব্যাস বলিয়াছেন যে, ঈশ্বর কর্ম্ম অনুসারে সুখ ও দুঃখ প্রদান করেন।"

ঈশ্বর কর্ম্মফল প্রদান করেন না, এই মত সমর্থন করিবার জন্য অনিলবরণ বাবু গীতা ৫।১৪ উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহার প্রকৃত অর্থ এই যে, আত্মা আনন্দ স্বরূপ, কর্ম্মফল, সুখ-দুঃখ আত্মাকে স্পর্শ করে না, অজ্ঞানহেতু জীব নিজকে সুখী বা দুঃখী মনে করে।

ছান্দোগ্য উপনিষদে (৫।১০।৭) বলা হইয়াছে যে, যাহারা উৎকৃষ্ট কর্ম্ম করে, তাহারা ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উত্তম যোনিতে জন্মগ্রহণ করে, যাহারা নিকৃষ্ট কর্ম্ম করে তাহারা চণ্ডাল প্রভৃতি নীচ যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে।

(৪) কঠোপনিষদ্ (২।৭) শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, জীব কর্ম্মানুসারে স্থাবর বা অস্থাবর যোনি প্রাপ্ত হয়।

(৮) গীতা (১৬।১৯) শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন যে, দুষ্টপ্রকৃতির লোককে তিনি আসুর যোনিতে নিক্ষেপ করেন।

(৭) সুতরাং ভগবান্ জীবকে এক জন্মের কর্ম্মের ফল পর জন্মে ভোগ করান, ইহা গীতা ও উপনিষদের মত।

বসন্ত বাবুর উপরোক্ত সাতটি কথানুসারে বুঝিতে হয় যে, ঈশ্বরের কর্তৃত্ব আছে এবং ঐ কর্তৃত্বের বলে "ঈশ্বর জীবকে কর্ম্মানুসারে সুখ-দুঃখ প্রদান করেন।" একটু চিন্তা

করিলেই দেখা যাইবে যে, "ঈশ্বর জীবকে কর্ম্মানুসারে সুখ দুঃখ প্রদান করেন" এবংবিধ বাক্য ব্যবহার করিলে "ঈশ্বর"কে বিচার-বুদ্ধি-যুক্ত ব্যতীত কিছু বলিয়া মনে করিতে হয়, কারণ যে বস্তু অবয়বযুক্ত নহে তাহা কখনও বিচারবুদ্ধিযুক্ত হইতে পারে না।

"বিচারে"র "বি" "বুদ্ধি"র "বু" এই দুইটি শব্দের অর্থ শব্দমাতৃকার সাহায্যে উপলব্ধি করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, অবয়বযুক্ততা বিচার ও বুদ্ধির সহিত অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। বাস্তব জগৎ পর্য্যবেক্ষণ করিলেও দেখা যাইবে যে, যে বস্তু অবয়বযুক্ত নহে, সেই বস্তু কখনও বিচার-শক্তি অথবা বুদ্ধিশক্তি সম্পন্ন হয় না। অবয়বযুক্ত না হইলে যেরূপ বুদ্ধি ও বিচার-শক্তিসম্পন্ন হওয়া কখনও সম্ভব হয় না, সেইরূপ আবার "ঈশ্বর" কখনও অবয়বযুক্ত হন না। "ঈশ্বর" হইতে গৌণভাবে অবয়বের উৎপত্তি হইলেও হইতে পারে বটে, কিন্তু ঈশ্বর নিজে কখনও যে অবয়বযুক্ত হন না তাহাও একটু চিন্তা করিলেই উপলব্ধি করা যাইবে; যদি তিনি অবয়বযুক্ত হইতেন তাহা হইলে তাঁহাকে চক্ষুর দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যাইত। ঈশ্বরকে আত্মার দ্বারা অনেক মহর্ষি "ঈক্ষণ" করিয়াছেন বলিয়া মনে করা যায় বটে, কিন্তু তাঁহাকে কেহ চক্ষুর দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন বলিয়া শুনা যায় না। "ঈশ্বর" যে অবয়বযুক্ত নহেন তাহা "ঈশ্বর" এই পদটীকে শব্দ-মাতৃকার সাহায্যে উপলব্ধি করিতে পারিলেও স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে। "ক্লেশকর্ম্ম-বিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ"—"পাতঞ্জল-সূত্রে"র এই সূত্রটীর মর্ম্ম যথাযথ অর্থে উপলব্ধি করিতে পারিলেও ঈশ্বর যে অবয়বযুক্ত নহেন তদ্বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ হইতে পারা যায়, কারণ অবয়বযুক্ত এমন কোন বস্তু হইতে পারে না যাহা ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক এবং আশয়ের অপরামৃষ্ট।

কাযেই বলিতে হইবে যে, "ঈশ্বর জীবকে কর্ম্মানুসারে সুখ-দুঃখ প্রদান করেন"—বসন্ত বাবুর এই বাক্যটী কার্য্য-কারণের সঙ্গতিহীন ও মেচ্ছ। ইহা হইতে বুঝিতে হয় যে, বসন্ত বাবু সংস্কৃত ভাষার বাক্য কিরূপ ভাবে গ্রহণ করিতে হয় এবং তাহা কিরূপ ভাবে প্রকাশ করিতে হয় তৎসম্বন্ধে অজ্ঞ।

এবংবিধ বাক্যের তথাকথিত সত্যতা প্রমাণিত করিবার জন্য বসন্ত বাবু যে সমস্ত শাস্ত্র-বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা পরীক্ষা করিলেও বসন্ত বাবুর উপরোক্ত অজ্ঞতা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে।

বসন্ত বাবু তাঁহার কথাগুলির প্রথম দফায় ব্রহ্মসূত্রের "ফলং অত উপপত্তেঃ" এই সূত্রটী (৩।২।৩৮) উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে, "এই সূত্রে মহর্ষি বেদব্যাস এই সিদ্ধান্তই স্থাপন করিয়াছেন।" অথচ, ঐ সূত্রটী হইতে যে এবংবিধ অর্থ কিরূপে গৃহীত হইতে পারে তাহার কিছুই দেখান নাই।

নির্ভুল ভাবে সর্ব্বতোরকমে সূত্রের অর্থ গ্রহণ করিবার নিয়ম পাওয়া যায় ঋষি-প্রণীত তন্ত্রের শব্দমাতৃকাধ্যায়ে। ঐ নিয়ম পরিজ্ঞাত হওয়া সাধনা-সাপেক্ষ। যাঁহারা সাধক নহেন তাঁহাদিগকে উহা পরিজ্ঞাত হইতে হইলে "যুক্ত-রত্নাকর" ও "বাক্যপদীয়" এই দুইখানি গ্রন্থের প্রণেতাগণের মত আচার্য্যগণের সহায়তা লইতে হয় এবং তখন দেখা যায় যে, এতাদৃশ আচার্য্যগণের সহায়তায় শব্দমাতৃকার অভ্যাসে অভ্যস্ত হওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ-সাধ্য হয় বটে, কিন্তু ঐ অভ্যাসে অভ্যস্ত না হইতে পারিলে কিছুতেই নির্ভুল ভাবে সর্ব্বতোরকমে ঋষিপ্রণীত সূত্রের মর্ম্মোদ্ধার করা সম্ভব হয় না। অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, উপরোক্ত শ্রেণীর আচার্য্য বহুসহস্র বৎসর হইতে মনুষ্য-সমাজে দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহার ফলে ঋষি-প্রণীত সূত্রেরও যথাযথ মর্ম্ম গ্রহণ করা ব্রহ্মজ্ঞানেচ্ছু সাধারণ মানুষের পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

উপদিষ্ট পন্থায় অগ্রসর হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, ঋষিপ্রণীত কোন সূত্রের মর্ম্ম যথাযথ ভাবে গ্রহণ করিতে হইলে সর্ব্ব-প্রথমে গ্রন্থের "নাম"টী উপলব্ধি করিয়া তাহার মূল-উদ্দেশ্য পরিজ্ঞাত হইতে হয়। তাহার পর দেখিতে হয়, গ্রন্থখানি কয় অধ্যায়ে এবং কয় পাদে সমাপ্ত হইয়াছে। গ্রন্থখানি কয় অধ্যায়ে এবং কয় পাদে সমাপ্ত হইয়াছে। তাহা পর্য্যালোচনা করিলে গ্রন্থের মূল বক্তব্য কোন্ পদ্ধতিতে ব্যক্ত হইয়াছে তাহা বুঝা যায়। গ্রন্থের মূল বক্তব্য কোন্ পদ্ধতিতে ব্যক্ত হইয়াছে তাহা স্থির করিবার পর আলোচ্য সূত্রটী কোন্ অধিকরণের তাহা লক্ষ্য করিতে হয়। এতৎ-সম্বন্ধীয় সমস্ত কথা আলোচনা করা এখানে সম্ভব নহে।

ঋষিপ্রোক্ত উপায়ে ব্রহ্মসূত্রের মর্ম্মোপলব্ধি করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, উহার মূল উদ্দেশ্য—"ব্রহ্ম হইতেই যে শব্দের উৎপত্তি হইয়া থাকে, এবং ক্রমশঃ স্বত্ত্বার বাক্তি সাধিত হইয়া থাকে এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে অনুভূতি অথবা আত্মা অথবা রাজসিকতা ও অহঙ্কার অথবা তামসিকতার উৎপত্তি হয়, তাহার প্রমাণোপায়, দৃষ্টান্তোপায়, নির্ণয়োপায় ও হেত্বাভাসোপায় কি, তাহা দেখান"। এই মূল কথাটী ভাষার অনেক ভঙ্গীতে বলা হইয়া থাকে।

তৃতীয় অধ্যায়টীতে নির্ণয়োপায় দেখান হইয়াছে। এই অধ্যায়ে নির্ণয়োপায় আছে বলিয়াই ইহাকে সাধনাধ্যায় বলা হইয়া থাকে।

তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদটী "ব্যাপ্ত-পাদ"। এই পাদটীতে ব্রহ্ম-সাধনানিরত হইলে কি কি বিঘ্নের উৎপত্তি হয়, কেন ঐ ঐ বিঘ্নের উৎপত্তি হয়, ঐ সমস্ত বিঘ্ন নিরাকরণের উপায় কি কি, তাহা বলা হইয়াছে।

"ফলং অত উপপত্তেঃ" এই সূত্রটী ফলাধিকরণের সূত্র। "ফলাধিকরণ" বলিতে বুঝায় ব্রহ্ম-সাধনার একটী বিঘ্ন "ফলাকাঙ্ক্ষা"। ফলাকাঙ্ক্ষার উৎপত্তি হয় কেন তাহা এই সূত্রে বলা হইয়াছে। এই সূত্রটীর মৌলিক মর্ম্ম—

"অ" এই শব্দটীর স্পর্শ লইতে আরম্ভ করিলে ব্রহ্মের রূপ-গ্রহণ যে কি প্রকারে তাহা শরীর-মধ্যে উপলব্ধি করিতে পারা যায় এবং তার পর "অর্থ" এই শব্দটীর স্পর্শের সহিত "উ" এই শব্দটীর স্পর্শের কি সম্বন্ধ তাহা উপলব্ধি করিতে পারিলে অব্যক্ত "ব্রহ্মরূপ" হইতে যে কিরূপ ভাবে ব্যক্ত "জগৎ-রূপের" উৎপত্তি হইয়াছে তাহা প্রত্যক্ষ করা যায়। এই-যে একটী হইতে আর একটী দেখা হয় তাহার নাম "ফলং" অথবা "ফলাশ্রয়"।

"ফলং অত উপপত্তেঃ" এই সূত্রটীর মূল ভাগে যে যে কথা আছে তাহা বাংলা-ভাষায় বলিতে হইলে উপরোক্ত কথাগুলি বলিতে হয়। ঐ কথাগুলি ছাড়া, ঐ সূত্রের পূর্ব্ববর্ত্তী সূত্রগুলি দেখিয়া উহা হইতে আরও কয়েকটী কথা ধরিয়া লইতে হয়। তাহা এই—

ব্রহ্ম হইতেই যে শব্দের উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং ক্রমশঃ স্বত্ত্বার বাক্তি সাধিত হইয়া থাকে এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে 'অনুভূতি অথবা "আত্মা" অথবা রাজসিকতা ও অহঙ্কার অথবা তামসিকতার উৎপত্তি হয় তাহা নির্ণয়োপায়ের দ্বারা অর্থাৎ শরীরমধ্যস্থিত বায়ুর চলা-চলন প্রত্যক্ষ করিয়া স্থির করিতে হইলে "ফল"-নামক পদার্থটী যে কি তাহা প্রত্যক্ষ করিতে হয় বটে, কিন্তু ফল সম্বন্ধে সতর্ক হইতে হয়, কারণ "ফল" কি তাহা প্রত্যক্ষ করিবার কালে ফলাকাঙ্ক্ষী হইবার আশঙ্কা থাকে এবং ফলাকাঙ্ক্ষী হইলে রাগ ও দ্বেষের উৎপত্তি হইয়া আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য নষ্ট করিয়া ফেলিতেও পারে।

ঋষিপ্রণীত শব্দ-বিজ্ঞানানুসারে "ফলং অত উপপত্তেঃ" এই সূত্রটী ব্যাখ্যা করিলে উহা হইতে উপরোক্ত কথাগুলি পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যকারগণের কেহই ঐ অর্থ গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা কে কি অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন এক্ষণে আমরা তাহার আলোচনা করিব। ব্রহ্ম-সূত্রের অনেক ভাষ্য। সকল ভাষ্যের আলোচনা করা সম্ভব হইবে না। আমরা কেবল ব্রহ্ম সূত্রের বৈদিক-বৃত্তিকার, শঙ্করাচার্য্য এবং রামানুজ কি বলিয়াছেন তাহার আলোচনা করিব।

এই সূত্রের মর্ম্মে বৈদিক-বৃত্তিকার বলিয়াছেন, "তস্মাদ্ ব্রহ্মণ এব ভবতি কর্ম্মফলমিতি যুক্তং প্রতিপত্তামহে" অর্থাৎ "অতএব ব্রহ্ম আছেন বলিয়াই" 'কর্ম্মফলের' উৎপত্তি হইয়া থাকে ইহা বলা যে সঙ্গত তাহা প্রতিপন্ন হইল"।

এই সূত্র সম্বন্ধে শঙ্করাচার্য্যের মূল কথা—

"কিম্ এতৎ (কর্ম্মফলং) কর্ম্মণো ভবতি? আহোস্বিৎ ঈশ্বরাৎ? ইতি ভবতি বিচারণা। তত্র তাবৎ প্রতিপত্তব্যে ফলমতঃ—ঈশ্বরাৎ ভবিতুমর্হতি। কুতঃ? উপপত্তেঃ" শঙ্করাচার্য্যের এই সংস্কৃত বাক্যগুলির বাংলা মর্ম্ম—

"কর্ম্মফল কি 'কর্ম্ম' হইতেই হইয়া থাকে, অথবা ঈশ্বর হইতে ইহার উৎপত্তি হয়—ইহাই বিচার করিবার বিষয়। এই বিচারে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, কর্ম্ম ফল ঈশ্বর হইতে হয় ইহা বলিতে হইবে। কি করিয়া ইহা বলা যায়? অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হয় ইহা দেখিলেই উহা বলিতে হয়।"

শঙ্করাচার্য্য তাঁহার এই কথাগুলি মূলসূত্রের কোথা হইতে যে পাইয়াছেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি না বটে, কিন্তু শঙ্করাচার্য্যও এই সূত্রের ব্যাখ্যায় এমন কথা বলেন নাই যাহা

হইতে বুঝিতে হয় যে, 'ঈশ্বরের' কর্তৃত্ব আছে এবং ঈশ্বরই জীবকে কর্মানুসারে সুখ-দুঃখ প্রদান করেন। পরন্তু ইহা বুঝিতে হয় যে, কর্ম-ফলের একমাত্র কারণ কর্ম নহে। ঈশ্বরের অস্তিত্বও উহার অন্যতম কারণ। যাঁহারা বিভিন্ন কারকের তাৎপর্য বিশদ ভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, "ঈশ্বর জীবকে কর্মানুসারে সুখ-দুঃখ প্রদান করেন।" আর, "ঈশ্বর হইতে (অর্থাৎ ঈশ্বরের অস্তিত্ব-বশতঃ, জীবের কর্মানুসারে তাহার সুখ-দুঃখের ব্যবস্থা হইয়া থাকে" এই দুইটি বাক্যের মধ্যে অনেকখানি পার্থক্য। শঙ্করাচার্যের কথাগুলি অনুসরন করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, তিনি শেষোক্ত বাক্যে যাহা বুঝাইতে মূলতঃ তাহাই বলিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

বৈদিক-বৃত্তিকার যে "তস্মাদ্ ব্রহ্মণ এব ভবতি কর্মফলং" বলিয়াছেন তাহাতে বুঝিতে হয় যে, সূত্রের মধ্যে ব্রহ্মের কোন কথা আছে। আর, শঙ্করাচার্য যে বলিয়াছেন "ফলমতঃ ঈশ্বরাৎ ভবিতুমর্হতি" তাহাতে বুঝিতে হয় যে, সূত্রের মধ্যে ঈশ্বরের কথা আছে। "ফলমত উপপত্তেঃ" এই সূত্রটীর "অতঃ" কথা হইতে ভূলক্রমে "ব্রহ্মের" কথা আছে বলিয়া মনে করা যায় বটে, কারণ "অ"-কারের অর্থ "ব্রহ্ম-রূপ", কিন্তু কোন ক্রমেই ঐ সূত্রে ঈশ্বরের কথা আছে বলিয়া মনে করা যায় না। ঈশ্বর কথাটী সম্পূর্ণভাবে শঙ্করাচার্য উহ্য করিয়াছেন। কাযেই বলিতে হয় যে, শঙ্করাচার্যের ব্যাখ্যার মূল সূত্রের সহিত অসঙ্গতি রহিয়াছে। তথাপি শঙ্করাচার্য যে এই সূত্রের ব্যাখ্যায় ঈশ্বরের কর্তৃত্ব আরোপিত করিয়াছেন, তাহা বলা চলে না।

রামানুজ কি বলিয়াছেন তাহার সন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, এই সূত্রে তাঁহার কথা—"ফলং অত এব পরস্মাৎ পুরুষাদ্ ভবতি ইতি সামান্যেন 'ফলমত' ইত্যুচ্যতে"। এখানেও "পরস্মাৎ পুরুষাৎ" এই পদ পঞ্চম্যন্ত, পরন্তু প্রথমান্ত নহে। ইহা হইতে বুঝিতে হয়, রামানুজের মতেও কর্মফলের কর্তৃত্ব যে মূল পুরুষের অস্তিত্ব তাহা নহে, পরন্তু তাঁহার মতে কর্ম-ফল, মূল পুরুষের অস্তিত্ববশতঃ ঘটিয়া থাকে, ইহা বুঝিতে হয়।

কাযেই দেখা যাইতেছে যে, রামানুজের ব্যাখ্যাও বসন্তবাবুর কথার পরিপোষক নহে।

সুতরাং বসন্তবাবু যে বেদান্ত-দর্শনের মূল সূত্রগুলি তো দূরের কথা, শঙ্করাচার্য ও রামানুজ প্রভৃতি ভাষ্যকারগণের ব্যাখ্যা পর্যন্ত তলাইয়া বুঝিতে পারেন না, ইহাই ধরিয়া লইতে হইবে।

বিশ্ব-সংসারের কোন কার্য "ব্রহ্ম" অথবা ঈশ্বরের কর্তৃত্ব দ্বারা নিষ্পন্ন হইতেছে ইহা ধরিয়া লইলে যে বেদ-বিরুদ্ধ কথা বলা হয় তাহা বসন্তবাবুকে স্মরণ রাখিতে হইবে। অবয়বহীন বস্তুমাত্রই অব্যক্ত অথবা অনভিহিত অথবা অনুক্ত। চলতি ভাষাতেও "অনুক্ত কর্তা"র অথবা "অনভিহিত কর্তা"র কখনও প্রথমা বিভক্তি হয় না; পরন্তু তৃতীয়া বিভক্তি ব্যবহৃত হয়। "অনুক্ত কর্তা"র কেন প্রথমা বিভক্তি না হইয়া তৃতীয়া বিভক্তি ব্যবহৃত হয় তৎসম্বন্ধে পাণিনির কথাগুলি উপলব্ধি করিলে অবয়বহীন বস্তুর কর্তৃত্ব যে কেন থাকিতে পারে না তাহা বুঝা যাইবে। "ব্রহ্ম" ও "ঈশ্বর" যে অবয়বহীন অথবা "অব্যক্ত কিছু" তাহা অতি সহজেই উপলব্ধি করা যাইবে। তাঁহাদিগের কর্ম বাক্ত বটে, কিন্তু তাঁহারা নিজেরা কখনও বাক্ত নহেন। তাঁহারা যদি বাক্ত হইতেন তাহা হইলে তাঁহারাও জীবের মত ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেন এবং তাঁহাদিগকে চক্ষুর দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যাইত। "ব্রহ্ম" ও "ঈশ্বর" গুণও নহেন, দ্রব্যও নহেন। তাঁহারা যদি গুণ অথবা দ্রব্য হইতেন, তাহা হইলে তাঁহারা বাক্ত হইতেন, কারণ গুণ ও দ্রব্য কখনও অব্যক্ত থাকে না। 'ব্রহ্ম' ও 'ঈশ্বর' এই উভয়েই এক একটী অখণ্ড ও খণ্ডমণ্ডল-ব্যাপী 'কর্ম', ইহাই বেদের কথা। আজকালকার মানুষের পক্ষে তাঁহাদিগকে উপলব্ধি করা যত দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে, বেদ পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, 'ব্রহ্ম' ও 'ঈশ্বর'কে সর্বতোভাবে উপলব্ধি করা সাধনাসাধ্য বটে, কিন্তু অসাধ্য নহে। 'ব্রহ্ম' ও 'ঈশ্বর'কে সর্বতোভাবে উপলব্ধি করিতে না পারিলে তাঁহাদিগের কোন রহস্যই সর্বতোভাবে বুঝিয়া উঠা সম্ভব নহে। তাঁহাদিগকে উপলব্ধি না করিয়া তাঁহাদিগের কোন রহস্য ব্যাখ্যা করিতে গেলে ভুল-ভ্রান্তি অবশ্যম্ভাবী। আমাদিগের মতে অনিলবরণ বাবুর শ্রেণীর লোক তো দূরের কথা, বসন্তবাবুর শ্রেণীর লোকেরও উহাতে হস্তক্ষেপ না করাই সঙ্গত। আবার যখন মানুষ বেদে অভ্যস্ত হইয়া 'ব্রহ্ম' ও 'ঈশ্বর'কে সর্বতোভাবে উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য অর্জন

করিতে পারিলে তখন বুঝিবে যে, এমন কি শঙ্করাচার্য্যও ব্রহ্ম ও ঈশ্বরকে সর্ব্বতোভাবে উপলব্ধি না করিয়া তাঁহাদিগের রহস্যের কথা তাঁহার কৃত ব্যাখ্যায় আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বলিয়াই, ঐ ব্যাখ্যা স্থানে স্থানে ভ্রম-প্রমাদে পরিপূর্ণ হইয়া মানুষের বিপক্ষগামিতার সহায়ক হইয়াছে।

ঈশ্বর জীবকে কর্ম্ম অনুসারে সুখ-দুঃখ প্রদান করেন ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য বসন্তবাবু গীতার সপ্তম অধ্যায়ের ২২শ শ্লোকটীর কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন। ঐ শ্লোকটী এই—

"স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্॥"

এই শ্লোকটি তলাইয়া চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, উহাও বসন্তবাবুর মতবাদের পরিপোষক নহে। 'ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্' এই বাক্যের অর্থ "আমার (অর্থাৎ স্পর্শ ও রূপের মধ্যস্থিত সম্বন্ধের) নিয়মের দ্বারাই 'কাম'সমূহ বিহিত (অর্থাৎ সংঘটিত) হইয়া থাকে"। 'ময়া' শব্দ হইতে স্পর্শ ও রূপের মধ্যস্থিত সম্বন্ধের কথা কিরূপে আসিতেছে তাহা বুঝিতে হইলে পাণিনির 'অস্মদ্' ও 'যুষ্মদ্' শব্দের ভাব বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে। অস্মদ্ ও যুষ্মদ্ শব্দের ভাব আংশিক রকমে সহজবোধ্য করিয়া লেখা হইয়াছে "সারস্বত" ব্যাকরণে। অস্মদ্ ও যুষ্মদ্ শব্দের ভাব সম্বন্ধে অষ্টাধ্যায়ী সূত্র-পাঠে যে যে কথা লেখা হইয়াছে তাহাতে প্রবিষ্ট হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, অবয়বযুক্ত বাক্ত বস্তু সম্বন্ধে যখন অস্মদ্ অথবা যুষ্মদ্ শব্দের কোন রূপ ব্যবহৃত হয় তখন উহার অর্থে 'আমি' অথবা 'তুমি' গ্রহণ করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু 'অস্মদ্ ও যুষ্মদ্' শব্দের কোন রূপ যখন কোন অবয়ব-হীন অব্যক্ত বস্তুর সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয় তখন উহার অর্থে 'আমি' অথবা 'তুমি' গ্রহণ করা চলে না, পরন্তু ঐ দুইটি শব্দের অন্তর্নিহিত অক্ষরের অর্থানুসারে অর্থ গ্রহণ করিতে হয়। 'ময়া' শব্দের অর্থ যাহাই হউক, উহা যে প্রথমান্ত নহে, পরন্তু তৃতীয়ান্ত এবং উহার মধ্যে যে করণত্ব আছে পরন্তু কর্ত্তৃত্ব নাই তদ্বিষয়ে মত-দ্বৈধতা হইতে পারে না। কাযেই, এই শ্লোকের দ্বারা "ঈশ্বর জীবকে কর্ম্মানুসারে সুখ-দুঃখ প্রদান করেন", ইহা প্রমাণিত হয় না। পরন্তু, "ঈশ্বরের নিয়মের অস্তিত্ববশতঃ জীব কর্ম্মানুসারে সুখ-দুঃখ পাইয়া থাকে", ইহাই প্রতিপন্ন হয়। "ঈশ্বর জীবকে কর্ম্মানুসারে সুখ-দুঃখ প্রদান করেন", আর "ঈশ্বরের নিয়মের অস্তিত্ব-বশতঃ জীব কর্ম্মানুসারে সুখ-দুঃখ পাইয়া থাকে", এই দুইটি বাক্যের মধ্যে যে কতখানি তফাৎ একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে।

বসন্তবাবু তাঁহার উল্লেখযোগ্য কথাগুলির দ্বিতীয় ধফায় ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদের ৩৪শ সূত্র ("বৈষম্য নৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথা হি দর্শয়তি" এই সূত্রটী) উদ্ধৃত করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন যে, "এই সূত্রে বেদব্যাস বলিয়াছেন যে, ঈশ্বর কর্ম্মানুসারে সুখ ও দুঃখ প্রদান করেন।"

বসন্তবাবুর এই উক্তিটীও ঠিক নহে।

"বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যে" ইত্যাদি সূত্র, বেদান্তোপদিষ্টভাবে উপলব্ধি করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, উহার মর্ম্ম—

জীবের চেষ্টায় বৈষম্য ও ভাবের অর্থাৎ জ্ঞানের অক্ষমতা কেন হয় তাহার সন্ধান করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির উন্মেষ তাহার ষোড়শকলাত্মক স্বত্তার আপেক্ষিক অর্থাৎ এই স্বত্তার সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং তজ্জন্যই জীবের এই বৈষম্য ও অসমানতা দেখা গিয়া থাকে।

আমাদিগের এই ব্যাখ্যা শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি কোন ভাষ্য-কারের ব্যাখ্যার অনুরূপ নহে তাহা সত্য, কিন্তু আমাদিগের ব্যাখ্যা মূলসূত্র-মধ্যস্থিত কোন "শব্দ" বাদ না দিয়া অথবা সূত্রবহির্গত কোন "শব্দ" উহ্য না করিয়া সাধিত হইতে পারে। পরন্তু, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি যে যে ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন ঐ ব্যাখ্যাগুলি মূল সূত্র হইতে কিরূপে আসিতে পারে তাহা চিন্তা করিতে বসিলে সূত্রবহির্গত অনেক শব্দ "উহ্য" করিবার প্রয়োজন। কাযেই, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি ভাষ্যকার-গণের ব্যাখ্যা দোষযুক্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতির ব্যাখ্যা দোষযুক্ত হউক আর না-ই হউক, উহাদিগের কোন ব্যাখ্যা হইতেই জীবের সুখ-দুঃখ বিষয়ে ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব প্রমাণিত করা যাইবে না। অনুবাদকারগণ স্থানে স্থানে ভুল করিয়াছেন বটে, কিন্তু ভাষ্যের মূলসংস্কৃতেও অনুরূপ দেখা যাইবে না।

বসন্তবাবু তাঁহার উল্লেখযোগ্য কথাগুলির তৃতীয় ধফায় বলিয়াছেন যে, গীতার পঞ্চম অধ্যায়ের চতুর্দ্দশ শ্লোকের অর্থ

। আনন্দস্বরূপ, কর্ম্ম ফল, সুখ-দুঃখ আত্মাকে স্পর্শ অজ্ঞানহেতু জীব নিজকে সুখী বা দুঃখী মনে

"ন কর্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে।"

এই শ্লোকটীর মধ্যে যে পদ ও বাক্যগুলি আছে তাহা হইতে বসন্তবাবুর অর্থ যে কিরূপে আসিতে পারে তাহা বসন্তবাবু পাঠকবর্গকে দেখাইয়া দিবেন কি? আমরা নিশ্চয়তার সহিত বলিতে পারি, তাহা তিনি কখনও পারিবেন না। গীতার এই মূল শ্লোকটীর মধ্যে বসন্তবাবুর কথাগুলি আদৌ নাই। এই অর্থ সম্পূর্ণ কাল্পনিক।

বেদান্তসম্মত ভাবে এই শ্লোকটীর অর্থোদ্ধার করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, উহার অর্থ—

যিনি জীবের ভাবের অথবা অনুভূতির অথবা জ্ঞানের মূল কারণ সেই প্রভু (অর্থাৎ জীবমধ্যস্থিত পুরুষ) কর্ত্তারূপে জীবের কর্তৃত্ববোধ অথবা সাধারণ কর্ম্ম-প্রবৃত্তির উৎপাদন করেন না। কর্ম্মফলের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি যে সুখ-দুঃখ-বোধ তাহাও তিনি কর্ত্তারূপে সৃষ্টি করেন না। জীবের এই কর্তৃত্বাভিমান, সাধারণ কর্ম্ম-প্রবৃত্তি ও সুখ-দুঃখ-বোধ তাহাও ষোড়শগণাত্মক (অর্থাৎ পঞ্চভূত ও একাদশ-ইন্দ্রিয়-সংবলিত) বিকারগ্রস্ত ব্যক্ত স্বত্তার ভাবের (অর্থাৎ বিকারগ্রস্ত অনুভূতি ও জ্ঞানের) ফলে ঘটিয়া থাকে।

এই শ্লোকটীর অর্থ তলাইয়া চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, ইহাও বসন্তবাবুর সিদ্ধান্তের বিরোধী।

বসন্তবাবু তাঁহার উল্লেখযোগ্য কথাগুলির ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম প্রকার ছান্দোগ্য উপনিষদের একটী শ্রুতি, কঠোপনিষদের একটী শ্লোক, গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, শাস্ত্রবাক্যানুসারে মানুষের এক জন্মের কর্ম্মানুসারে মানুষ অপর জন্মে উচ্চ ও নীচ যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহাদ্বারা তিনি আরও প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, ভগবান্ জীবকে এক জন্মের কর্ম্মের ফল পর জন্মে ভোগ করান। বসন্তবাবুর উদ্ধৃত ছান্দোগ্য উপনিষদ, কঠোপনিষদ্ ও গীতার বাক্যগুলি হইতে ইহা প্রমাণিত হইতে পারে বটে যে, "ভগবানের নিয়ম-বশতঃ জীব তাহার এক জন্মের কর্ম্মের ফলে অপর জন্মে উচ্চ ও নীচ যোনি লাভ করিয়া থাকে"। কিন্তু, "ভগবান্ তাঁহার কর্তৃত্বের ফলে জীবকে তাহার এক জন্মের কর্ম্মানুসারে অপর জন্মে উচ্চ ও নীচ যোনি প্রদান করিয়া থাকেন; অথবা, জীব উচ্চ যোনিপ্রাপ্তির ফলে সুখ পাইয়া থাকে এবং নীচ যোনি-প্রাপ্তির ফলে দুঃখ পাইয়া থাকে, এমন কোন কথা প্রমাণিত হয় না, কারণ উচ্চ-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিলেও দুঃখ পাওয়া সম্ভব হয় এবং নীচ-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিলেও সুখ পাওয়া সম্ভব হয়।

কাজেই দেখা যাইতেছে, বসন্তবাবুর কোন কথাও ধোপে টেকে না অর্থাৎ বিচারসহ নহে।

জীবের সুখ-দুঃখের কারণ সম্বন্ধে শাস্ত্রবাক্য কি, তাহা অনুসন্ধান করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, উহার মূল কথা সর্ব্বতোভাবে বিবৃত রহিয়াছে অথর্ব্ববেদে। সমগ্র অথর্ব্ব-বেদ উপলব্ধি করিতে না পারিলে ঐ কারণ সর্ব্বতোভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। সমগ্র অথর্ব্ববেদ উপলব্ধি করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, জীবের সুখ-দুঃখের মুখ্য কারণ দুইটী, যথা :—(১) ঈশ্বরের নিয়ম এবং (২) জীবের স্বকীয় জ্ঞান। আমরা সাধারণতঃ বলিয়া থাকি যে, জীব কর্ম্ম-ফলেই সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। কিন্তু, জগতের বাস্তব অবস্থা ও শাস্ত্র-বাক্য মিলাইয়া লইয়া অধ্যয়ন ও পর্য্যবেক্ষণ-নিরত হইলে দেখা যাইবে যে, আমাদিগের ঐ সাধারণ ধারণা যথাযথ নহে। জীবের "কর্ম্ম" তাহার সুখ-দুঃখভোগের গৌণ কারণ বটে, কিন্তু উহা তাহার মুখ্য কারণ নহে। জীবের কর্ম্ম-বশতঃ প্রতিনিয়ত তাহার সংগঠনের ও বিকারগ্রস্ত ষোড়শগণাত্মক স্বত্তার পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে বটে, এবং ঐ ষোড়শগণাত্মক স্বত্তার পরিবর্ত্তনানুসারে তাহার বুদ্ধি-শক্তিরও পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে এবং বুদ্ধি-শক্তির পরিবর্ত্তনানুসারে তাহার সুখ-দুঃখ-ভোগেরও পরিবর্ত্তন হইতেছে বটে এবং তদনুসারে কর্ম্মকে জীবের সুখ-দুঃখ-ভোগের গৌণ কারণ বলিয়া আখ্যাত করা যায় বটে, কিন্তু উহাকে কোন ক্রমেই সুখ-দুঃখভোগের মুখ্য কারণ বলা যায় না।

বুদ্ধিশক্তি অথবা জ্ঞানের তারতম্যানুসারে যে জীবের সুখদুঃখভোগের তারতম্য ঘটে তাহার বড় প্রমাণ, একই

বস্তু অথবা অবস্থাকে একজন মানুষ সুখের বলিয়া মনে করেন আবার সেই বস্তু অথবা অবস্থাকে আর একজন মানুষ অত্যন্ত দুঃখের বলিয়া মনে করেন। মাতাল ও লম্পট যে অবস্থাটীকে পরম সুখের বলিয়া মনে করে, সেই অবস্থাটীকে ব্রহ্মজ্ঞানেচ্ছু মানুষ অত্যন্ত দুঃখের বলিয়া কৃত-নিশ্চয় হইয়া থাকেন। যদি কর্ম্মই সুখ-দুঃখের মুখ্য কারণ হইত তাহা হইলে যে কর্ম্মে একজন মানুষ আনন্দ পাইতে পারে, সেই কর্ম্মে সকল মানুষই আনন্দ পাইতে পারিত। ঋষিপ্রণীত শাস্ত্রানুসারে জ্ঞানই যে সুখ-দুঃখের অন্যতম মুখ্য কারণ তাহার বড় প্রমাণ গীতার ৫ম অধ্যায়ের পঞ্চদশ শ্লোক, যথা :—

"নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ।"

ঋষিপ্রণীত কোন গ্রন্থে এই কথার অন্যথা দেখা যাইবে না।

ঋষির কথানুসারে দুঃখ হইতে সর্ব্বতোভাবে মুক্ত হইবার মুখ্য পন্থা দুইটী, যথা :—

(১) স্বকীয় শরীর-গঠন ও শরীর-বিধান সর্ব্বতোভাবে প্রত্যক্ষ করা। অথবা, এক কথায় আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করা।

(২) ঈশ্বরের নিয়ম পরিজ্ঞাত হওয়া।

স্বকীয় শরীর-গঠন ও শরীর-বিধান সর্ব্বতোভাবে প্রত্যক্ষ করিতে পারিলে স্বকীয় কোন্ কর্ম্মে নিজের মূল স্বত্ত্বা অর্থাৎ পঞ্চ মহাভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয় কিরূপ বিকারগ্রস্ত হয় তাহা উপলব্ধি করা সম্ভব হয় এবং তখন কোন্ কর্ম্মটী সৎ এবং কোন্ কর্ম্মটী অসৎ তাহাও নির্ণয় করা সম্ভব হয়।

ঈশ্বরের নিয়ম পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে বাহিরের কোন্ সংস্রবে নিজ মূল স্বত্ত্বা কিরূপ বিকারগ্রস্ত হয় তাহা উপলব্ধি করা এবং বাহিরের কোন্ বস্তুটী সৎ এবং কোন্ বস্তুটী অসৎ তাহা নির্ণয় করা সম্ভব হয়।

এইরূপে কোন্ কর্ম্মটী সৎ কোন্ কর্ম্মটী অসৎ এবং কোন্ সঙ্গটী সৎ ও কোন্ সঙ্গটী অসৎ তাহা নির্ণয় করিবার বুদ্ধি-শক্তি অর্জ্জন করিতে পারিলে অনায়াসেই তদনুসারে কার্য্য করা সম্ভব হয় এবং তখন সর্ব্বতোভাবে দুঃখমুক্ত হওয়াও অনায়াসসাধ্য হইয়া থাকে।

ঈশ্বরের নিয়ম সর্ব্বতোভাবে পরিজ্ঞাত হওয়াকেই ঋষিগণ 'জ্ঞান-বিজ্ঞান লাভ করা' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

ঋষিগণের এ-সম্বন্ধীয় কথা অতীব বিস্তৃত। তাহা সম্যক্ ভাবে বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা অথবা মাসিক পত্রিকার কোন সন্দর্ভে বর্ণনা করা সম্ভব নহে। যাঁহারা আরও বিস্তৃত ভাবে এই কথাগুলি জানিতে চাহেন তাঁহাদিগের কৌতূহল আমরা পৃথক্ ভাবে চরিতার্থ করিতে সম্মত আছি।

উপসংহার

উপসংহারে আমরা বসন্ত বাবু ও অনিলবরণ বাবু এই উভয়-শ্রেণীর শিক্ষিত মানুষকেই বলিতে চাই যে, মানুষ আজ-কাল দুঃখ-দুর্দ্দশার চরমে আসিয়া উপনীত হইয়াছে। এই অবস্থার মূল কারণ, ভারতীয় ঋষিগণের জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে মানুষের বিস্মৃতি। ভারতীয় ঋষিগণের জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে মানুষের বিস্মৃতিই যে মনুষ্য-সমাজের চরম দুঃখ-দুর্দ্দশার মূল কারণ তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে। অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, মনুষ্য-সমাজ কি করিয়া সর্ব্বতোভাবে দুঃখমুক্ত হইতে পারে অথবা কি করিয়া মানুষের অর্থাভাব, অস্বাস্থ্য, অশান্তি, অসন্তুষ্টি, অকালবার্দ্ধক্য ও অকালমৃত্যু সর্ব্বতোভাবে তিরোহিত হইতে পারে তাহার সর্ব্বাঙ্গীন পন্থা একমাত্র ভারতীয় ঋষিগণই আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। আর কাহারও গ্রন্থে অথবা কথায় ঐ সর্ব্বাঙ্গীন পন্থার সন্ধান পাওয়া যাইবে না। প্রাচীন আরবী ভাষায় লিখিত কোরাণে ও প্রাচীন হিব্রু ভাষায় লিখিত বাইবেলে ঐ সর্ব্বাঙ্গীন পন্থার সন্ধান আছে বলিয়া যুক্তিযুক্ত ভাবে মনে করা যায় বটে, কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, ঐ দুইখানি ধর্ম্মগ্রন্থও মূলতঃ ভারতীয় ঋষিগণেরই প্রণীত। অনুবাদক্রমে ঐ দুইখানি গ্রন্থ একণে যে সমস্ত কথায় পর্য্যবসিত হইয়াছে তাহার বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, উহাদের মূল ও অনুবাদের সহিত স্থানে স্থানে আকাশ-পাতালের মতপার্থক্য রহিয়াছে। প্রাচীন আরবী ভাষা ও প্রাচীন হিব্রু ভাষা কিরূপে অধ্যয়ন করিতে হয় এবং তাহার মর্ম্মই বা কিরূপে গ্রহণ করিতে হয়, এক্ষণে আর কেহ তাহা পরিজ্ঞাত নহেন। অথচ, বেদাঙ্গ যথাযথ অর্থে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, উহার মধ্যে যেরূপ প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা বুঝিবার পন্থা নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, সেইরূপ আবার

প্রাচীন আরবী ও প্রাচীন হিব্রু ভাষা বুঝিবার পন্থাও লিপিবদ্ধ আছে। এই তিনটী ভাষা "শব্দ-বিজ্ঞানের" অর্থাৎ শব্দের সহিত ঐশ্বরিক নিয়মের কি সম্বন্ধ তাহার জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত।

মানুষ কি করিয়া সর্ব্বতোভাবে দুঃখমুক্ত হইতে পারে, তাহার সর্ব্বাঙ্গীন পন্থা একমাত্র ঋষি-প্রণীত গ্রন্থে যে লিপিবদ্ধ আছে ইহা বুঝিতে পারিলেই, ঐ সম্বন্ধে বিস্মৃতিই যে মনুষ্য-সমাজের চরম দুঃখ-দুর্দ্দশার মূল কারণ তাহা সহজেই বুঝা যাইবে।

এই ধারণা আমাদিগের অত্যন্ত বদ্ধমূল হইয়াছে বলিয়াই কেহ ঋষি-শাস্ত্রের কু-ব্যাখ্যা করিলে অথবা ঋষির নামে কোন কুজ্ঞান প্রচার করিলে আমরা ধৈর্য্যহারা হই। অধৈর্য্য হওয়া একটী দুষ্টতা তাহা আমরা স্বীকার করি, কিন্তু যে সাধনা লাভ করিলে ঐ দুষ্টতার আশ্রয় সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করা সম্ভব, সেই সাধনা আমরা এখনও লাভ করিতে পারি নাই। আমরা তজ্জন্য দুঃখিত, কিন্তু অনন্যোপায়। আমরা তজ্জন্য তাঁহাদিগকে মনোবেদনা প্রদান করি তাঁহাদিগের নিকট ক্ষমা চাহিতে বাধ্য, কিন্তু তাঁহাদিগকেও স্মরণে রাখিতে হইবে যে, যাঁহারা অযথা চাটুকারিতা করে তাহারা মানুষের বন্ধু নহে, পরন্তু যাহারা অকুণ্ঠোচ্চারে দোষগুণ দেখাইয়া দেয় তাহারাই মানুষের বন্ধু। ইহা ছাড়া, ঋষি শাস্ত্রের মূলভাগ সমগ্র ভাবে অধ্যয়ন না করিয়া এবং ঋষিবাক্যসমূহ সম্যক্ ভাবে উপলব্ধি না করিয়া তৎসম্বন্ধে আলোচনা করা যে ধর্ম্মবিরুদ্ধ অনাচার, ইহা তাঁহাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে।

আধুনিক যুগের আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন বৈজ্ঞানিক হইবার নিমিত্ত সাধারণ বুদ্ধি বিবর্জ্জিত হওয়া কি প্রয়োজন ? *

কলিকাতার কমার্শিয়াল মিউজিয়ামে যে মেশিনারী ও প্রোসেস একজিবিশন হইয়া গেল, তথায় গত ১৩ই মে তারিখে 'শিল্প-দৃষ্টি (Industrial Outlook)' সম্বন্ধে ডক্টর মেঘনাদ সাহা যে ভাবোচ্ছ্বাসিত বক্তৃতা প্রদান করেন, বর্ত্তমান সন্দর্ভে আমরা তাহার আলোচনা করিব।

ডক্টর সাহার বক্তৃতার উল্লেখযোগ্য বিষয় নিম্নে সঙ্কলিত হইল :—

(১) নবজীবন-লাভার্থে কোন জোরালো (fighting) কর্ম্মপদ্ধতি অবলম্বন না করিলে আমাদের দ্বারা স্বাধীন হওয়া কিংবা দেশমধ্যে অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট জীবন যাপন-পদ্ধতির সংগঠন—উভয়ই সম্ভব হইবে না।

(২) বলা হইতেছে যে, যদি আমরা গ্রামে ফিরিয়া যাই এবং প্রত্যেক ব্যক্তি স্বকীয় পরিশ্রমে প্রাণাজ্ঞাপন ব্যবস্থা করে, তাহা হইলেই আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থা সংগঠিত হইবে। যন্ত্র-শিল্প এবং বর্ত্তমান সভ্যতাকে শতহস্ত দূরে রাখিতে বলা হইতেছে। এই সকল কর্ম্ম-ব্যবস্থার মধ্যে উন্নতির বীজ নিহিত নাই।

(৩) যদি পুরাতন আদর্শের ঘাটেই আমরা নৌকা বাঁধিয়া রাখি, কোন উন্নতিই সাধিত হইতে পারে না এবং আমরা যে অবস্থায় আছি, তদবস্থাতেই থাকিয়া যাইব।

(৪) আমাদের অন্যতম কর্ত্তব্য হইতেছে—বস্তুতঃ ইহাই প্রধান হওয়া উচিত—সমগ্রভাবে যাবতীয় শিল্প-সমূহের সম্পূর্ণ পুনঃ-সংগঠন।

(৫) যদি আপনারা আমেরিকা ও ইউরোপের প্রতি চাহিয়া দেখেন, তবে দেখিবেন, তথায় ভারতবর্ষ অপেক্ষা গড়পরতায় প্রত্যেক ব্যক্তি বিশগুণ অধিক কার্য্য করে। এই কার্য্য তাহার পেশী-নিহিত শক্তির সহায়তায় সাধিত হয় না, প্রকৃতি-নিহিত শক্তির দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে।

যদি আমরা আমাদের দারিদ্র্য ও বেকার-সমস্যা, তথা দেশ-রক্ষা-বিষয়ক সমস্যার সমাধান করিতে

* ইংরাজীতে লিখিত ও 'দি উইক্‌লি বঙ্গশ্রী' (The Weekly Bangashree) পত্রিকার ১৮ই মে তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত মূল সন্দর্ভ হইতে অনূদিত।

ইচ্ছুক থাকি, তবে আমাদের প্রাথমিক কর্তব্য হইতেছে, সমবেত চেষ্টায় আমাদের দেশের সমস্ত প্রাকৃতিক শক্তি-নিচয়কে বৃদ্ধি করিয়া অপরাপর দেশের ন্যায় তৎসমূহ জাতির কঠোর তত্ত্বাবধানের অধীন করা।

(৭) অন্যান্য দেশে শিল্প-সংগঠনের যারা কুফল হইয়াছে, তাহা সুবিদিত ও সুপরিস্ফুট। অপরাপর দেশের অভিজ্ঞতা হইতে লাভবান্ হইতে চাহিলে, আমরা অনায়াসেই এ দেশে এইরূপ শিল্প-সংগঠনের এমন পরিকল্পনা আবিষ্কার করিতে পারিব যাহাতে আমরা যে-পরিমাণ আশঙ্কা করি, তৎ-পরিমাণ সামাজিক বিশৃংখলা ঘটিবে না। ইহা যে অসম্ভব নহে, জাপান তাহা দেখাইয়াছে।

(৮) যে-সকল নেতা এইরূপে (অর্থাৎ অনুন্নত যন্ত্রযুগে ফিরিতে বলিয়া) জনসাধারণকে ভ্রান্ত করেন, তাঁহা-দিগকে যদি সেখানে বস্ত্র-শিল্প-সংক্রান্ত আবিষ্কৃত প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি শ্রেণীবদ্ধ ভাবে প্রদর্শিত হইতেছে এরূপ কোন বাবসায়িক প্রদর্শনীতে (commercial museum) ঘুরাইয়া দেখাইয়া আনা যায়, এই সবের সাহায্যে কি পরিমাণ শ্রম ও সময়ের সংক্ষেপ হইতে পারে, তাহাতে নিরর্থক বাগ্মিতার বিপুল অপব্যয় বন্ধ হইবে।

(৯) শিল্প-সংগঠনের প্রধান উদ্দেশ্য হইবে আরও কার্য-সৃষ্টি, অন্ততঃ বর্তমান অপেক্ষা বিশগুণ অধিক কার্যসৃষ্টি এবং ইহার লক্ষ্য হইবে জীবন-যাত্রার মানকে ইউরোপীয়গণের সমপর্যায়ে উন্নত করা। অধিকসংখ্যক কার্যসৃষ্টি হইলেই যে বেকার-সমস্যার আমূল সমাধান হইতে পারে, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য যুক্তিজালের অবতারণার আবশ্যকতা নাই।

ডক্টর সাহার ভাবোচ্ছ্বসিত বক্তৃতার উল্লেখযোগ্য যে-সব উক্তি উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে, যথাযথভাবে উহা পর্যা-লোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, তাঁহার মতে আদর্শ সমাজ-সংগঠন, তথা দারিদ্র্য ও বেকারসমস্যার সমাধানের প্রকৃষ্ট পন্থা হইতেছে, সর্বপ্রকার শিল্পের সম্পূর্ণ পুনঃসংগঠন। তাঁহার এই মত, অর্থাৎ সর্বপ্রকার শিল্পের সম্পূর্ণ পুনঃসংগঠন দ্বারা আদর্শ সমাজ সংগঠিত হইতে পারে এবং দারিদ্র্য ও বেকার-সমস্যার সমাধান হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে যাহাতে নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া যায়, তদ্নিমিত্ত তিনি অবশ্য কোন যুক্তি প্রদর্শন করেন নাই। কেনই বা করিবেন? তিনি দেশের একজন নাম করা বৈজ্ঞানিক, বিশেষতঃ সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিশিষ্ট একটি পদাধিকারের নিমিত্ত তাঁহাকে মোটা বেতনে আমদানী করা হইয়াছে। হয়তো তিনি মনে করেন যে, কি জন্য কোন বিশেষ কার্যপ্রণালী অনুসরণের নির্দেশ দান করা হইতেছে, তাহা না বুঝাইয়াও দেশবাসীকে যেরূপ অভিরুচি, তদনুরূপ পরামর্শদানের অধিকার তাঁহার পর্যায়ের ব্যক্তিবৃন্দের আছে।

সম্পূর্ণভাবে শিল্প-সংগঠন করিলেই আদর্শ সমাজ-সংগঠন, তথা দারিদ্র্য ও বেকার-সমস্যার সমাধান কিরূপে সম্ভব, তাঁহার বক্তৃতাতে ইহা না দেখাইয়াও তিনি বাগ্‌জাল ও কাহিনী বিস্তার করিয়া আমাদিগকে বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, একটা "নূতন কিছু" করিতে হইবে। যে ভাবে তিনি "নবজীবনের নিমিত্ত জোরালো কর্মপদ্ধতি"র কথা বলিয়া বক্তৃতা আরম্ভ করেন, তাহাতে আমরা মনে করিয়াছিলাম, বুঝি বা তিনি জন-সাধারণকে তাহাদের পাওলি উপরে করিয়া মাথা দিয়া হাঁটিবার কথাই বলিবেন, কিন্তু আমাদের সৌভাগ্য যে, সেরূপ কোন নির্দেশ তিনি দান করেন নাই। তিনি যে কেবল আমাদিগকে সম্পূর্ণভাবে "শিল্পসংগঠনে"র কথা বলিয়াই ক্ষান্ত দিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

পাঠককে আমরা লক্ষ্য করিতে বলি, ডক্টর মেঘনাদ সাহা তাঁহার সমগ্রভাবে শিল্পের পুনঃসংগঠন বলিতে কি বুঝেন। উল্লেখযোগ্য উক্তিসমূহের পঞ্চম দফায় দেখা যায়, তিনি বলিতেছেন, "যদি আপনারা আমেরিকা ও ইউরোপের প্রতি চাহিয়া দেখেন, তবে দেখিবেন, তথায় ভারতবর্ষ অপেক্ষা অল্পসময়তায় প্রত্যেক ব্যক্তি বিশগুণ অধিক কার্য করে। এই কার্য তাহার পেশীনিহিত শক্তির সহায়তায় সাধিত হয় না, প্রকৃতি-নিহিত শক্তির দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে।" ষষ্ঠ দফায় বলিয়াছেন—"প্রাথমিক কর্তব্য হইতেছে, প্রাকৃতিক শক্তি-নিচয়ের বৃদ্ধি..."

তাঁহার উল্লেখযোগ্য উক্তিসমূহের উপরোক্ত দুই দফা একত্র পাঠ করিলে বুঝিতে হয়, ডক্টর মেঘনাদ সাহা চাহেন, ভারতের প্রাকৃতিক শক্তি-নিচয় এমন পরিমাণে বর্দ্ধিত করা হউক, যাহাতে বর্ত্তমান সময় অপেক্ষা ভারতবাসীর কার্য্য-শক্তি অন্ততঃ বিশগুণ অধিক বৃদ্ধি পায়। ইহার অর্থ এই যে, ডক্টর মেঘনাদ সাহার মতানুযায়ী সমগ্রভাবে শিল্পের পুনঃসংগঠন কার্য্যকরী হইলে, বর্ত্তমানে ভারতে যে কার্য্য বিশটি ব্যক্তির দ্বারা সাধিত হইতেছে, সেই কার্য্য মাত্র একটি ব্যক্তির দ্বারা সাধিত হইবে।

আমরা এইবারে দেখিব, তাঁহার শিল্প-সংগঠন-পরিকল্পনার উদ্দেশ্য কি। উল্লেখযোগ্য উক্তিসমূহের নবম দফায় তিনি বলিতেছেন—

"শিল্প-সংগঠনের প্রধান উদ্দেশ্য হইবে আরও কার্য্য-সৃষ্টি, অন্ততঃ বর্ত্তমান অপেক্ষা বিশগুণ অধিক কার্য্যসৃষ্টি।...অধিক-সংখ্যক কার্য্য সৃষ্টি হইলেই যে বেকার-সমস্যার আমূল সমাধান হইতে পারে, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য যুক্তিজাল অবতারণার আবশ্যকতা নাই।"

তাঁহার পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং নবম দফা একত্র পাঠ করিয়া আমরা বলিতে বাধ্য যে, ডক্টর মেঘনাদ সাহার অন্তজ্ঞান অপূর্ব্ব এবং তিনি অত্যন্ত হিসাবদক্ষ ব্যক্তি।

একদিকে প্রাকৃতিক শক্তিনিচয় বাড়াইয়া ব্যক্তিগত কার্য্য-শক্তি বিশগুণ অধিক করা হইল এবং সমপ্রভাবে কার্য্য-সৃষ্টিও বিশগুণ বাড়ানো হইল, ফল যাহা দাঁড়াইল, তাঁহাতে আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, কার্য্যনিয়োগ নিশ্চয়ই বৃদ্ধি পাইবে। কেন না, খাঁটনামা বৈজ্ঞানিক ডক্টর মেঘনাদ সাহা আমাদিগকে এইরূপ বুঝাইয়াছেন।

প্রাকৃতিক শক্তিনিচয়-বৃদ্ধির নিমিত্ত এবং তাহার ফলে কার্য্যশক্তি বৃদ্ধি পাওয়ায় যে কার্য্য পূর্ব্বে বিশ জন লোকে করিত, সেই কার্য্য মাত্র এক জনে করিবে। সাধারণ গুণ-ভাগের দ্বারাই বুঝা যাইবে যে, প্রত্যেক ব্যক্তির কার্য্যশক্তি বিশগুণ বৃদ্ধি করিয়া যদি সমগ্র কার্য্যও তৎসহ বিশগুণ বৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থা হয়, (চাহিদা বৃদ্ধি পাইতেছে কি না তৎপ্রতি না হয় লক্ষ্য না-ই করা হইল) তাহা হইলেও কার্য্যনিয়োগ ২০ জনের, অর্থাৎ যেরূপ পূর্ব্বে হইত, তাহার অপেক্ষা অধিক হইতে পারে না।

কিন্তু ডক্টর মেঘনাদ সাহা বলিয়াছেন যে, এইপ্রকার শিল্প-সংগঠন করিলেই বিরাট বেকার-সমস্যার সমাধান হইবে, ইহা প্রমাণ করিতে যুক্তি-তর্কের প্রয়োজন নাই। যখন ডক্টর মেঘনাদ সাহার মুখ হইতে নিঃসৃত হইতেছে, তখন দেশের সাংবাদিক এবং গরীব বেচারীরা সকলেই ইহা মানিয়া লইতে বাধ্য। 'ডক্টরেট' (doctorate) অর্জ্জন করিবার জন্য অ-সাধারণ গুণান্বিত হইবারই প্রয়োজন বটে এবং যে-সব প্রতিষ্ঠান হইতে ডক্টরেট বিতরণ করা হয়, সেগুলিও অ-সাধারণই বটে। ডক্টর মেঘনাদ সাহা কবে নোবেল প্রাইজ, কিংবা 'নাইট' পদবী লাভ করিবেন, আমরা তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছি। এই চিন্তা-প্রণালী হইতেই বুঝিতে পারা যায়, ডক্টর মেঘনাদ সাহার শ্রেণীর অধ্যাপকবৃন্দ তাঁহাদের ছাত্রগণকে কি মূল্যবান্ উপদেশ দিয়া থাকেন এবং দেশের যুবকবৃন্দের কি মূল্যবান্ হিতই না তাঁহারা সাধিত করিতেছেন। এই মূল্যবান্ কার্য্যের মূল্য নিশ্চয়ই মূল্যবান্ হওয়া উচিত এবং আমরা ভরসা করি যে, যতদিন পর্য্যন্ত ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং তাঁহার গোত্রের ব্যক্তিরা এই প্রদেশের শিক্ষার মূল্যবান্ দায়িত্ব নির্ব্বাহ করিতে থাকিবেন, ততদিন এই শ্রেণীর বৈজ্ঞানিকদিগের ঢাক-বাজানো এবং তাঁহাদিগের মোটা মাহিনাই বরাদ্দ থাকিবে। যে-সব ব্যক্তি এই শ্রেণীর ব্যক্তিকে জনসভায় বক্তৃতা দিতে আহ্বান করেন, তাঁহারাও অবশ্যই অসাধারণ ব্যক্তি।

আধুনিক বস্ত্রশিল্পের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে বলিতে গিয়া ডক্টর মেঘনাদ সাহা প্রচুর বিজ্ঞাবত্তা দেখাইয়াছেন। আমরা জানিতাম না যে, ডক্টর মেঘনাদ সাহা বস্ত্রশিল্প বিষয়েও পারদর্শী! যে-বিষয়ে তাঁহার অ-আ-ক-খর জ্ঞান নাই, সে-বিষয়ে কথা বলিবার ন্যায় নির্লজ্জতা দেখাইয়া মেঘনাদ সাহা দেশকে অতি-আধুনিক কলকব্জার কবলশায়ী হইতে বলিলেও আমাদিগকে তাহা হয় তো নিশ্চয়ই গ্রাহ্য করিতে হইবে। কিন্তু, আমরা ডক্টর মেঘনাদ সাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, অতি-আধুনিক কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি সত্ত্বেও ইউরোপ ও আমেরিকার বস্ত্রশিল্প-সংশ্লিষ্ট অধিকাংশ মাকু ও তাঁতের কারখানা বন্ধ, ইহা তাঁহার বিদিত আছে কি এবং তিনি কি জানেন যে, ১৯১৭ সন হইতে এই সব দেশের অধিকাংশ বস্ত্রশিল্প-

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানেরই দুর্দশা চলিতেছে এবং লাভ-লোকসানের হিসাব তাঁহাদের দুশ্চিন্তার বিষয় হইয়াছে ? যদি তাঁহারা না জানা থাকে, তবে যাঁহাদের ইহা জানা আছে, তাঁহাদের নিকট শিক্ষার্থীর ভান লইয়া তাঁহাকে আমরা যাইতে বলিতেছি, তাঁহারা নিশ্চয়ই তথ্য ও অঙ্ক-প্রমাণ দেখাইয়া তাঁহাকে উহার সত্যতা বুঝাইতে পারিবেন। তিনি কি অতঃপর দেশবাসীকে বুঝাইয়া দিবেন যে, যদি অতি-আধুনিক কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি পৃথিবীর বর্তমান অবস্থা-বিপর্যয়ে এমনই কার্যকরী এবং এই ভাল সামলাইবার উপযোগী, তবে ইউরোপ ও আমেরিকাতে যাঁহারা ইহা কাজে লাগাইয়াছেন, তাঁহাদিগকে এমন বিপন্ন হইতে হইয়াছে কেন এবং তাঁহাদের লাভ লোকসানের খতিয়ানই বা দুশ্চিন্তার কারণ উপস্থিত করে কেন ? শিল্প তথা সমগ্র ভাবে শিল্পসংগঠন সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই,তাহা যে তাঁহার অপরিজ্ঞাত, তাহা উপলব্ধি করিবার ন্যায় অভিজ্ঞতাও যে কল্পলোকের নাই, ইহা বস্তুতঃ অনুকম্পার বিষয়। যাঁহারা নিজেরা নিজেদের বিশেষ কিছু না খাটাইয়া দেশের দরিদ্র জন-সাধারণের নিকট শেয়ার বিক্রয় করিয়া শিল্প-প্রতিষ্ঠানের লিমিটেড কোম্পানী খুলিয়া সেই টাকা নাড়া-চাড়া করেন, সেই সব দায়িত্বহীন ব্যক্তির ইহা না জানা থাকিতে পারে, কিন্তু যাঁহারা আগে যে-ভাবে যন্ত্রপাতি তৈয়ারী হইত এবং এখন যে ভাবে হইতেছে, এই উভয়ের নির্মাণ-প্রণালী সম্বন্ধে রীতিমত ওয়াকিবহাল, তাঁহারা জানেন যে, বর্তমান কালে যে-সব যন্ত্রপাতি তৈয়ারী হইতেছে, তাহা তৈয়ারী করিবার সময় যন্ত্র-নির্মাতারা নিজেদের লাভের কড়ির দিকে যতখানি অবহিত থাকেন, শিল্প-ব্যবসায়ীর স্বার্থের দিকে তত নজর রাখেন না, আগে ইহার বিপরীত ছিল। যন্ত্র-নির্মাতারা দূর-দৃষ্টি-সম্পন্ন নহেন বলিয়াই বোধ হয় এইরূপ ঘটিতেছে এবং এ বিষয়ে শিল্প-ব্যবসায়ীরা একেবারেই হয় তো অপারগ। মোটামুটি সরল ও সহজ কথা দাঁড়াইতেছে এই যে, শিল্প-ব্যবসায়ীর লাভের দিক্ হইতে অতি আধুনিক যন্ত্রপাতি আর যাহাই হউক, আদর্শের কাছ দিয়াও যায় না।

এইবার আমরা দেখিব, বর্তমান বিজ্ঞানের সহায়তায় সমগ্রভাবে শিল্প-সংগঠনই আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থা-প্রতিষ্ঠার প্রধান উপায় কি না। ইহার জন্য আমরা প্রথমেই নির্দ্ধারণ করিতে চাই যে, কোন সমাজ-ব্যবস্থাকে আদর্শ ব্যবস্থা বলিতে হইলে মূলতঃ কি প্রয়োজন। যদি আমরা বলি যে, কোন সমাজকে 'আদর্শ' আখ্যায় অভিহিত হইতে হইলে, যাহাতে তদন্তর্গত প্রত্যেকটি ব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে আর্থিক অভাব এবং বেকার সমস্যা, ব্যক্তির দাসত্ব, শারীরিক অস্বাস্থ্য, মানসিক-অশান্তি, অকালবার্দ্ধক্য এবং অকালমৃত্যু হইতে সম্পূর্ণ অব্যাহতি লাভ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে, তবে বিশ্ববিদ্যালয়-মার্কা সংস্কৃতজ্ঞান তোতাপাখীদের সহিত আমাদের মতানৈক্য ঘটিতে পারে, কিন্তু আমরা নিশ্চিত জানি যে, যাঁহারা বিষয়-বিশেষে অভিনিবিষ্ট হইবার ক্ষমতা রাখেন এবং স্বকীয় বিচার বুদ্ধির দ্বারা কর্তব্য স্থির করিতে পারেন, তাঁহাদের সহিত নিশ্চয়ই আমাদের মত পার্থক্য হইবে না। কোন সমাজেই এমন ব্যক্তি পাওয়া যাইবে না, যিনি নিজে এবং তাঁহার আত্মীয়-স্বজন আর্থিক অভাব এবং অনাহার, ব্যক্তির দাসত্ব, শারীরিক অস্বাস্থ্য, মানসিক অশান্তি, অকালবার্দ্ধক্য এবং অকালমৃত্যুর কবল হইতে চিরতরে মুক্তি লাভ করিবেন, এই সম্বন্ধে নিশ্চিত হইতে পারিলে সম্পূর্ণ সুখী না হইবেন। যদি দেখা যায় যে, আধুনিক যুগের যন্ত্রপরিচালিত কলকব্জা যে সব দেশ কাজে লাগাইয়াছে, তাহাদের মধ্যে একটিতেও উপরি লিখিত সমস্যার একটি হইতেও মুক্তি কিংবা প্রায় মুক্তি পাওয়া সম্ভব হইয়াছে, তবে আমাদিগকে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, ডক্টর মেঘনাদ সাহা যে নির্দ্দেশ দান করিয়াছেন, তাহাতে কিছু সঙ্গতি আছে। যদি এমনও দেখা যায় যে, কোন দেশ সমগ্রভাবে এই সকল সমস্যার একটি হইতে মুক্তি না লাভ করিলেও যে-সব ব্যক্তি এই শিল্প-সংগঠন-ব্যাপারে শ্রমিক হিসাবে, কর্ম্ম-পরিদর্শক-হিসাবে, কিংবা মহাজন হিসাবে যোগদান করিয়াছেন, তাঁহাদের যাহা প্রয়োজন কিংবা আকাঙ্ক্ষা, তাহার পূরণ হইয়াছে, তাহা হইলেও আমরা স্বীকার করিব যে, ডক্টর মেঘনাদ সাহার শিল্প-সংগঠন-তত্ত্বের নিমিত্ত আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। কিন্তু, আধুনিক যুগের যন্ত্র-চালিত শিল্প বরণ করিয়া একটি দেশের পক্ষেও কি এমন সম্ভব হইয়াছে যে, হয় তাহার সমগ্র জনসাধারণ, নয় অন্ততঃ শিল্প-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দ আর্থিক অভাব, অনাহার, ব্যক্তির দাসত্ব, শারীরিক অস্বাস্থ্য, মানসিক অশান্তি, অকালবার্দ্ধক্য

এবং অকালমৃত্যু হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছে ; ইউরোপের যে কোন দেশের অবস্থা নেপোলিয়ানের যুদ্ধসমূহের অব্যবহিত পরে কিরূপ ছিল এবং এখন কিরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহা নিরপেক্ষ সমালোচকের দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিলে নিম্নলিখিত ঘটনা-সমূহ দৃষ্টি আকর্ষণ করে :—

(১) উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে যেখানে আর্থিক অভাব এবং অনাহার হইতে মোটামুটি শতকরা ৮। জন ইউরোপীয় মুক্ত ছিল, সেইখানে, বর্তমানে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে, তাহাদের প্রায় প্রত্যেকেই আর্থিক অভাবগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে—কেহ হয়তো একটুকরা রুটি কিংবা বাসি মাংসের নিমিত্ত, কেহ বা শ্যাসাদোপম ট্রালিকা কিংবা সুখনোহর এরোপ্লেনের জন্য। উভয়ই আর্থিক অভাবের মাত্রা বিদ্যমান। যদি গ্রেট বৃটেনের অবস্থা পর্যালোচনা করা হয়, তবে দেখা যাইবে যে, ঐদেশবাসীর মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিরা নিজেদের দেশেই নিজেদের প্রয়োজনীয় খাদ্য ও কাঁচামালের শতকরা ৫৫ ভাগ আবাদ করিতে পারিত, আর তাহাদের বর্তমান প্রতিনিধিরা নিজেদের প্রয়োজনীয় খাদ্য ও কাঁচামালের শতকরা ৮৪ ভাগের জন্যই অপর দেশের মুখাপেক্ষী। আমরা বিস্মিত হইব না, যদি বর্তমান পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ কূটনীতি-বিশারদ হইয়াও অদূরভবিষ্যতে অপর দেশ হইতে সরবরাহ বন্ধ হইয়াছে বলিয়াই তাঁহাদিগকে স্বদেশবাসীর অনাহার-সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়।

(২) ব্যক্তির দাসত্বের দিক্ হইতে দেখা যাইবে যে, এমন কি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেও অধিকাংশ ইউরোপীয়গণই ব্যক্তিগত কোন প্রকার চাকুরীর অপেক্ষা না রাখিয়া স্বাধীন ভাবে কৃষিতে, কুটীর-শিল্পে, ব্যবসায়ে এবং অপরাপর পেশার সাহায্যে জীবিকানির্বাহ করিতে পারিত, আর বর্তমানে দেহে প্রাণ রাখিবার জন্য তাহাদের শতকরা ৯৯ জনকেই বেতনভোগী চাকুরীর মুখাপেক্ষী হইতে হইয়াছে।

(৩) শারীরিক অস্বাস্থ্যের দিক্ দিয়াও সিদ্ধান্ত করিবার কারণ আছে যে, সে কালে অস্বাস্থ্যভোগী ব্যক্তি কিংবা ব্যাধির সংখ্যা বর্তমানে গবর্নমেণ্টের স্বাস্থ্য-বিভাগের রিপোর্ট হইতে যেরূপ সাক্ষ্য পাওয়া যায়, তত অধিক ছিল না।

মানসিক অশান্তি, অকালবার্দ্ধক্য এবং অকাল-মৃত্যুর দিক্ হইতেও এই প্রকার পরিবর্তন পরিলক্ষিত হইবে।

এই সব ঘটনা হইতে, এমন কথা নিশ্চয়ই ধরা চলে না যে, ইউরোপে সমগ্রভাবে কোন দেশই আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থার গঠনের পথ প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং আধুনিক শিল্প-সংগঠনের পন্থানুসরণ করিয়া তথায় কোন উন্নতি সম্ভব হইয়াছে।

সমগ্রভাবে দেশের অবস্থার কথা যদি বাদ দেওয়াও যায় এবং যন্ত্রশিল্প-সংশ্লিষ্ট শ্রমিকের অবস্থার দিকে দৃষ্টি দেওয়া যায়, তবে দেখা যাইবে যে, এমন কি তাহারাও যন্ত্রশিল্পে যোগদান করিয়া লাভবান্ হইতে পারিতেছে না। আর্থিক অভাব হইতেও যেমন তাহারা মুক্তিলাভ করিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছে না, তেমনই ব্যক্তির দাসত্বে, শারীরিক অস্বাস্থ্য, মানসিক অশান্তি, অকালবার্দ্ধক্য এবং অকালমৃত্যু হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার সৌভাগ্যও তাহাদের হয় নাই। উপরন্তু, যদি যন্ত্র-শিল্পের অধীনে যে-সব শ্রমিক নিযুক্ত আছে, তাহাদের জীবনযাত্রার সহিত কুটীরশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের জীবনযাত্রার তুলনা করা যায়, তবে দেখা যাইবে যে, এমন কি বর্তমানেও যদিও যন্ত্র-শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিবৃন্দের উপার্জন পাউণ্ড শিলিং পেন্সের পরিমাণে তুলনায় কুটীরশিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিবৃন্দের উপার্জন অপেক্ষা অনেক অধিক, তথাপি কার্যে নিযুক্ত রাখিতে পারিলে ইহাদের আর্থিক অভাব কম, কেন না উহাদের ন্যায় ইহাদিগকে অযথা মদ্যপান কিংবা বিলাসিতা করিতে বাধ্য হইতে হয় না। ব্যক্তির দাসত্বের কথা ধরিলে, কুটীর-শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকবৃন্দের পেশা সম্পূর্ণ স্বাধীন। শারীরিক অস্বাস্থ্য, মানসিক অশান্তি, অকালবার্দ্ধক্য এবং অকালমৃত্যুর দিক্ হইতে কোন তুলনাই করা চলে না। যন্ত্র-শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিবৃন্দকে চাপাচাপি ভাবে আবদ্ধ অবস্থায় যন্ত্রদানবের বিকট শব্দের সান্নিধ্যে এবং যাবতীয় কাঁচামাল ও রাসায়নিকের

ঘণ্টাকের মধ্যে কাজ করিতে হয়, কিন্তু কুটীর-শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিবৃন্দ নুক্ত বায়ুতে,যন্ত্রের নিকট শব্দের সাহায্যে না আসিয়া, কিংবা অপর পক্ষের ন্যায় কাঁচামাল ও রাসায়নিকের গরল গলাধঃকরণে বাধ্য না হইয়াই কার্য্য চালাইতে পারে। ফলে, যেখানে কুটীর-শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিবৃন্দ এক প্রকার অস্বাস্থ্য ভোগ না করিয়াই ষাট বৎসর পর্য্যন্ত পরমায়ু ভোগ করিতে পারে, অপর পক্ষ যদি কোন ক্রমে চল্লিশ বৎসর বাঁচিয়া থাকিতে পারে, তথাপি তাহারা ক্রমাগত অস্বাস্থ্য ভুগিতে বাধ্য হয়।

আমাদের পাঠকবৃন্দের মধ্যে তথাপি এমন কেহ কি আছেন, যিনি বিবেচনা করিতে প্রস্তুত যে, আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থা গঠনে আধুনিক শিল্প-সংগঠন সাহায্য করিতে পারে কিংবা উহা সুবুদ্ধির পরিচায়ক? আধুনিক যুগের যন্ত্রশিল্পের সাহায্যে দেশের বেকার সমস্যার সমাধানের বিন্দুমাত্র সহায় হইতে পারে কি না, স্থির করিতে হইলে আমাদিগকে সর্ব্বাগ্রে নির্দ্ধারণ করিতে হইবে যে, মনুষ্য-কল্পনায় যতখানি সম্ভব, ততখানি পর্য্যন্ত জীবনযাত্রার মানবৃদ্ধি করিলেও, দেশের সমগ্র অধিবাসীর প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত ও সরবরাহ করিতে হইলে কি পরিমাণ লোক লাগিতে পারে। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আমরা প্রয়োজনীয় শিল্প দ্রব্যের কথা বলিতেছি, কৃষিজাত দ্রব্যের নহে। মনুষ্যের জীবনযাত্রার মান-বৃদ্ধির প্রসঙ্গে আমাদিগকে একটি সত্য উল্লেখ করিতে হইতেছে, ইহা ভারতীয় ঋষিগণ তাঁহাদের অপূর্ব্ববেদে সুনিপুণ যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সত্যটি হইতেছে এই যে, একটি মানুষকে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে যেমন তাহার প্রয়োজনের একটি কম পক্ষের পরিমাণ আছে, তেমনই যদি সে মরিতে না চাহে, তবে বেশীর দিকেও একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ পর্য্যন্তই সে সহ্য করিতে পারে। ইহা হইতে বুঝিতে হয় যে, যেমন আমরা আমাদের জীবনযাত্রার পক্ষে যাহা অপরিহার্য্য ভাবে প্রয়োজনীয়, তাহা না পাইলে অসুস্থ হইতে পারি, তেমনই যদি আমরা অনেক এবং এক গাদা দ্রব্য ব্যবহার করি, তাহাতেও অসুস্থ হইব। দৈনন্দিন জীবন-যাত্রায় যাহা ঘটে, তাহা হইতে এই সত্য অনায়াসে প্রমাণিত হইতে পারে।

ইহাতে প্রমাণ হয় যে, আমরা আমাদের কল্পনায় যত-খানি আসে, বস্তুতঃ জীবনযাত্রার মান সেই পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারি না। জীবনযাত্রার এই পরিমাপ স্থির করিয়া যদি ভারতবাসী ৩৬ কোটি লোকের দৈনন্দিন প্রয়োজনের অনু-পাতে দ্রব্য প্রস্তুত ও সরবরাহ করিতে কি-সংখ্যক লোক আবশ্যক, তাহার বিস্তৃত হিসাব করিতে চেষ্টা পাই, তবে দেখিব যে, কোন কুটীর-শিল্পের সহায়তা লইলে উহার জন্য ১০ লক্ষ ব্যক্তি যথেষ্ট এবং যদি মাত্র বস্ত্র শিল্পের কথা ধরিতে চাহি, তবে কিছুতেই ২৫ লক্ষ অপেক্ষা অধিক ব্যক্তি নিযুক্ত করা চলে না। আমরা যে হিসাব উপস্থিত করিলাম, তাহা যে মোটামুটি ভাবে যথার্থ, তাহা যে কোন মুহূর্ত্তেই প্রমাণ করা যাইতে পারে। কেবল সাংখ্যিক হিসাবের নীরস বিবরণ এড়াইতে চাহি বলিয়া উহা আলোচিত হইল না। হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে, যদি দেশের সমগ্র অধিবাসীর ব্যবহারে যে পরিমাণ দ্রব্য লাগিতে পারে, তদপেক্ষা অধিক দ্রব্য প্রস্তুতের অনুপাতে শিল্পপ্রসারের চেষ্টা হয়, তবে অতিরিক্ত উৎপাদন হইতে বাধ্য, যাহার ফলে হয় শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ হইবে, নয় তাহার বিক্রয়ার্থ শেষ পর্য্যন্ত আন্তর্জ্জাতিক যুদ্ধ কিংবা নানা প্রকার ফন্দী-ফিকির আরম্ভ করিবার প্রয়োজন হইবে।

সুতরাং বলিতে হইবে যে, শিল্প-সংগঠন কোন দেশের বেকার-সমস্যাসমাধানের উপযোগী পরিকল্পনা হইতে পারে না।

এতৎসত্ত্বেও যদি কোন আন্তর্জ্জাতিক-খ্যাতিসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক স্বকীয় বিদ্যাবত্তার দোহাই দিয়া এবং বিন্দুমাত্র যুক্তি প্রদর্শন না করিয়া শিল্প-প্রসারের প্রয়োজনীয়তার বাণী প্রচার করেন, বাধ্য হইয়াই তবে জিজ্ঞাসা করিতে হয়:—

"আধুনিক যুগের আন্তর্জ্জাতিক-খ্যাতিসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক হইবার নিমিত্ত সাধারণ বুদ্ধি (অর্থাৎ যে বুদ্ধি খ্যাতিহীন সাধারণ সাংবাদিকের নাগালের বাহিরে)-বিবর্জ্জিত হইতে হয়?"

আমরা ইতিপূর্ব্বে সবিস্তারে আলোচনা করিয়া দেখাই-য়াছি, কি ভাবে আমাদের আদর্শানুযায়ী ত্রুটিহীন সমাজ-ব্যবস্থা গঠিত হইতে পারে। বর্ত্তমানে সে আলোচনার পুনরুক্তি করিব না।

বৈজ্ঞানিকের নির্ব্বুদ্ধিতার নমুনা ও জন-সাধারণের দারিদ্র্য-সমস্যার সমাধান*

গত ২৮শে মে তারিখে কলিকাতার পোর্ট ট্রাষ্ট ইন্‌ষ্টিট্যুটে 'গণতান্ত্রিক পরিকল্পনা (Democratic Planning)' বিষয়ে ডক্টর মেঘনাদ সাহা একটি বক্তৃতা দান করেন। ঐ বক্তৃতা-পাঠকালীন আমাদের মনে যে চিন্তার উদয় হয়, বর্ত্তমান সন্দর্ভ তাহারই ফল।

ডক্টর সাহার বক্তৃতার মূল বক্তব্য "অর্থ-নৈতিক পরিকল্পনা ব্যতিরেকে নৈতিক অনুশাসন বেশীদূর অগ্রসর হইবে না", তাঁহার বক্তৃতার এই বাক্যে সংক্ষেপে প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। তাঁহার ধারণা যে যথার্থ, ইহা প্রমাণার্থ তাঁর দেশের উদাহরণ উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন "চীনদেশের বিখ্যাত জননায়ক সান-ইয়াট্‌ সেন ১৯২৫ সালে তাঁহার মৃত্যু হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, চীনের জনসাধারণের অবস্থার যে বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, সমগ্র ভাবে পরিকল্পিত আর্থিক সংগঠন ব্যতীত, উহা হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করা সম্ভব নহে।"

কি ভাবে এই আর্থিক সংগঠন পরিকল্পিত হইতে পারে, তাহার নির্দ্দেশ দিতে গিয়া ডক্টর সাহা বলিয়াছেন, "জাতীয় সংগঠন করিতে হইলে ভারতের বৈজ্ঞানিক ও শিল্পনায়কগণকে একত্র করিতে হইবে। যাঁহারা এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিবেন, তাঁহাদিগকেই যথাবিহিত উপলব্ধি করিতে হইবে, কি-ভাবে ইহা কর্ত্তব্য।"

এই সংগঠনের প্রয়োজন ও ইহার আয়াসসাধ্যতার কথা বলিতে গিয়া ডক্টর সাহা রুশিয়ার উদাহরণ দেখাইয়া বলিয়াছেন, "রুশিয়াতে যখন বলশেভিকগণ রাষ্ট্রশক্তি অধিকার করিলেন, তখন রুশিয়াবাসীর জীবনযাত্রা, অর্থনীতি ও শিল্পের দিক্ দিয়া সম্পূর্ণভাবে সংগঠনার্থ দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া তাঁহারা দেশের বৈজ্ঞানিকদিগকে সমবেত করিয়া বহু সম্মেলন, আলোচনা ও অনুসন্ধানে কয়েক বৎসর কাটাইবার পর বাস্তব রুশনীতি গঠন করেন।"

তাঁহার প্রস্তাবিত আর্থিক সংগঠন-পরিকল্পনার মর্ম্ম বুঝাইতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন, 'একেবারে চূড়ান্তের হিসাব দেওয়া কঠিন, কিন্তু আমার মনে হয়, যদি ভারতের খনিজ, (mineral), প্রাকৃতিক শক্তিগত (power) ও কৃষি-বিষয়ক সংস্থানের (agricultural resources) যথাযথভাবে নিয়োগ সাধন করা হয় এবং ভারতের শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার যথোচিতভাবে গঠিত করা যায়, তবে যে সকল দ্রব্য উৎপন্ন হইবে, তাহার বিক্রয় ভারতের ভিতরেই হইতে পারে। ক্রমশঃ জীবন-যাত্রার মান বৃদ্ধি পাইলে ইহার পরিসরও বৃদ্ধি পাইবে এবং শিল্পের প্রসার ঘটিলে জীবন-যাত্রার মান বৃদ্ধি পাইতে বাধ্য।' তিনি আরও বলিয়াছেন যে, খনিজ, প্রাকৃতিক শক্তিগত এবং কৃষিগত সংস্থানের নিয়োগ-সাধন ও শিল্পের প্রসার করিতে হইলে ভারতের জনসাধারণকে বর্ত্তমান বিজ্ঞানের অকাট্য বাক্যে (gospel of science) সম্পূর্ণ বিশ্বাসী হইতে হইবে এবং তাহাদিগকে ঐকাবদ্ধ কার্য্যে আত্মবান্ হইতে হইবে।

বর্ত্তমান বিজ্ঞানের নির্দ্দেশ সম্বন্ধে ডক্টর সাহা বলিয়াছেন, "পুরাকালের যুদ্ধজয়, দস্যুবৃত্তি এবং অপরাপর অভিযান অপেক্ষা —ইহাদিগেরই উপর অধিক গৌরব আরোপ করা হইয়া থাকে—বিজ্ঞানের আবিষ্কারসমূহ মানুষের হস্তে উৎকৃষ্টতর ও পূর্ণতর জীবন-যাপনের পক্ষে অনেক অধিক শক্তিশালী অস্ত্র তুলিয়া দিয়াছে এবং যদি মনুষ্যজাতি ঐকাবদ্ধ ও একপ্রাণ হইয়া কার্য্য করে, তবে আদর্শে উপনীত হওয়া অসম্ভব নহে।"

তাঁহার প্রস্তাবিত আর্থিক সংগঠন-পরিকল্পনা যে, বাঞ্ছিত ফল প্রসব করিতে পারে, তাহার প্রমাণ-স্বরূপ ডক্টর সাহা সুইডেনের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। তাঁহার মতে সুইডেন স্ব-সম্পূর্ণ এবং সুইডেনবাসীরা সুখী। সুইডেন যে আদর্শ দেশ এবং তাঁহার প্রস্তাবিত পরিকল্পনা যে-কার্য্যকরী হইতে পারে, এ বিষয়ে ডক্টর সাহা সুনিশ্চিত, কেন না, পদার্থ-বিদ্যায় নোবেল-প্রাইজ-ধারী ও নোবেল কমিটির সেক্রেটারী সুইডেনের অধ্যাপক সিগবান (Siegbahn) ডক্টর সাহা যে তাঁহার স্বদেশবাসীকে সৎসাহস দেখাইয়া কার্য্যে অবতরণ করিবার পন্থা প্রদর্শন করিয়াছেন, তজ্জন্য অভিনন্দন

* গত ইষ্টবেঙ্গল রঞ্জশ্রীতে ১লা জুন সংখ্যায় প্রকাশিত ইংরাজীতে লিখিত মৌলিক প্রবন্ধ হইতে অনূদিত।

জ্ঞাপন করিয়াছেন এবং প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করিয়াছেন যে, প্রায় দুই বৎসর পূর্বে সুইডেনও প্রায় ডক্টর সাহা-প্রদর্শিত পন্থাতেই ব্যাপক সংগঠন-কার্য্য সাধন করিয়া তাহাতে অনেক-খানি কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

যদি সমগ্র বক্তৃতাটী যথাযথ ভাবে অনুধাবন করা যায়, তবে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, ডক্টর সাহা তাঁহার দেশবাসীর সম্মুখে নিম্নের তিনটি নির্দ্দেশ উপস্থিত করিয়াছেন :—

(১) চীন দেশে প্রয়োজনীয়তা দেখা গিয়াছে বলিয়া ভারতবাসীকে অনতিবিলম্বে আর্থিক সংগঠন-কার্য্যে একাগ্র হইয়া ব্রতী হইতে হইবে।

রুশিয়া যখন এইরূপে কার্য্য করিয়াছে, তখন তাহা-দিগকেও স্বদেশের বৈজ্ঞানিক ও শিল্পনায়ক সমবেত করিয়া এই আর্থিক সংগঠনে অগ্রসর হইতে হইবে।

(২) সুইডেন যখন একই পন্থায় চলিয়া প্রায় আদর্শে উপনীত হইয়াছে, তখন ভারতবাসীকেও আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে মূলধন খনিজ, প্রাকৃতিক শক্তি ও কৃষিজাত সংস্থানের নিয়োগসাধন ও শিল্পের সম্প্রসারণ করিতে হইবে।

ডক্টর সাহার এই বাণীত্রয়ের মধ্যে আমরা উল্লেখযোগ্য কিছু প্রত্যাশা করিয়াছিলাম, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তিনি যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে আমরা কেবল চিন্তাশক্তি ও বুদ্ধি-শক্তির অভাব এবং হাস্যকরতা ও বিবেকহীনতার পরিচয় পাইয়াছি।

ডক্টর সাহা যে সকল প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমাদের অভিমত নিম্নে দেওয়া হইল :—

(১) মনুষ্যজাতির বুদ্ধি বর্ত্তমানে যে স্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহাতে কোন কার্য্যকরী বিস্তৃত আর্থিক সংগঠন-পরিকল্পনা করা যেরূপ সম্ভব নহে, তেমনই যতদিন পর্য্যন্ত না ক্ষুধার্ত্ত জনসাধা-রণের ক্ষুধা মিটাইবার নিমিত্ত যথেষ্ট খাদ্য-পণ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা না করা হইবে, ততদিন কোন বিস্তৃত পরিকল্পনা কার্য্যকরী ভাবে সফল করিয়া তুলাও সম্ভব নহে।

(২) সমাজকে আদর্শাবস্থায় উন্নত করিবার নিমিত্ত যে কার্য্যকরী আর্থিক পরিকল্পনার প্রয়োজন, তাহার আবিষ্কার বর্ত্তমান বিজ্ঞানের সহায়তায় বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক বল কর্ত্তৃক যেরূপ অতীতেও সম্ভব হয় নাই, তেমনই ভবিষ্যতেও সম্ভব হইবে না। বিস্তৃত ও কার্য্যকরী কোন আর্থিক সংগঠনের পরিকল্পনা কেবল তখনই সম্ভব হইবে, যখন মানুষ অপরের দুঃখকষ্ট সমপ্রাণতার সহিত অন্তরে অন্তরে বুঝিতে পারিবে এবং তাহার উপশমকল্পে বর্ত্তমান বিজ্ঞান ও দর্শনের সম্পূর্ণ ব্যর্থতা উপলব্ধি করিতে পারিবে।

রুশিয়ার বৈজ্ঞানিক ও শিল্পনায়কগণ কোন কার্য্য-করী আর্থিক সংগঠন পরিকল্পনার সন্ধানলাভে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, ইহা বলার বক্তার আর্থিক পরিকল্পনার সম্ভাব্যতা-নির্দ্ধারণে অসামর্থ্য সূচিত হইতেছে।

বর্ত্তমান বিজ্ঞানের সহায়তায়, মূলধন খনিজ, প্রাকৃতিক শক্তি, শিল্পসম্প্রসারণ এবং কৃষিজাত সংস্থানের নিয়োগ কখনও সম্ভবপর হইবে না, কেন না বর্ত্তমান বিজ্ঞানের মতে যাহা খনিজ, প্রাকৃতিক শক্তির নিয়োগ ও শিল্পসম্প্রসারণ, তাহা চিরকালই কৃষি-সংস্থানের সর্ব্বনাশসূচক। যখন মনুষ্যজাতি বর্ত্তমান যুগের খনিজ, প্রাকৃতিক শক্তি ও বৈজ্ঞানিক শিল্পসমূহের উন্নয়ন-পরিকল্পনা ধ্বংস করিতে নিঃসংশয়ে কৃতসঙ্কল্প হইবে, কেবল তখনই কৃষি-সংস্থানের উন্নয়ন সম্ভবপর হইবে।

আধুনিক সুইডেন মনুষ্যসমাজের আদর্শ ব্যবস্থার নাগাল পাইয়াছে, ইহা বলার বক্তার মনুষ্যসমাজের পক্ষে অত্যাবশ্যক ভাবে যাহা প্রয়োজন, তৎসম্বন্ধে ও আধুনিক সুইডেনের প্রকৃত অবস্থা বিষয়ে অজ্ঞতা সূচিত হইতেছে।

আমাদের অভিমত এই যে, বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজে যাঁহারা বৈজ্ঞানিক, শিক্ষা-বিশেষজ্ঞ, সাহিত্যিক, রাষ্ট্রনেতা, ধর্ম্মগুরু ও শাসক নামে বিকাইতেছেন, তাঁহারা অত্যন্ত পাপলিপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন এবং যাঁহারা কাজে-কর্ম্মে কিংবা মনে মনেও তাঁহা-দের কার্য্যাবলী সমর্থন করিতেছেন, তাঁহাদিগকে গুরুতর শাস্তি ভোগ করিতে হইবে এবং যতদিন পর্য্যন্ত না তাঁহারা

তাঁহাদের বহু-সাধের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ অসারতা উপলব্ধি করিয়া আত্মবিশ্লেষণ-পরায়ণ হইবেন, ততদিন পর্য্যন্ত কোন প্রকার পরিকল্পনাই তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না। যখন এই আত্মবিশ্লেষণ আরম্ভ হইবে এবং মনুষ্য-সমাজের দুঃখদুর্দ্দশা দূরীকরণের সম্পূর্ণ পন্থাসন্ধানে বর্ত্তমান বিজ্ঞানের সকল শাখা-প্রশাখার অসারতা উপলব্ধ হইবে, কেবল তখনই এই দুঃখদুর্দ্দশার প্রকৃত কারণের গবেষণা-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে।

দেখা যাইবে যে, আদর্শ সমাজ-সংগঠন করিতে হইলে যাহাতে সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তি আর্থিক অভাব, ব্যক্তির দাসত্ব, শারীরিক অস্বাস্থ্য, মানসিক অশান্তি, অকালবার্দ্ধক্য এবং অকালমৃত্যুর কবল হইতে পরিত্রাণ লাভ করে, তাহার ব্যবস্থা করা সর্ব্বাগ্রে বিধেয়। ইহাও দেখা যাইবে যে, ভারতবাসী, তথা জগদ্বাসীকে আর্থিক অভাব ইত্যাদি হইতে নিষ্কৃতি দান করিতে হইলে, জনসাধারণকে সর্ব্বপ্রথমে রেলের বাঁধ, মোটরের রাস্তা, ব্রিজ এবং আধুনিক ব্যবসায়-কেন্দ্র-স্বরূপ সহর ইত্যাদির নাগপাশ হইতে ভারতের সমগ্র নদ-নদীকে মুক্ত করিতে হইবে। যাহাতে জমীর অভ্যন্তর-ভাগে যে বালুকাস্তর রহিয়াছে, নদীস্রোতের গভীরতা তৎস্পর্শী হয় এবং জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করিয়া সস্তায় প্রচুর খাদ্যশস্যোৎপাদন এবং কাঁচামালের ব্যবস্থা সম্ভব হয়, তাহার নিমিত্তই জন-সাধারণকে এই কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, প্রকৃত ঐশ্বর্য্যের বিতরণ যাহাতে যথাসম্ভব সমতা লাভ করে, তদুদ্দেশ্যে ধাতুমুদ্রা ও কাগজের নোটের প্রচার সংযত করিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ, শিক্ষার যে বর্ত্তমান ব্যবস্থায় কাম, লোভ, সঙ্কীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি এবং বিবেকহীনতা প্রশ্রয় পাইতেছে, তাহা সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিয়া তৎপরিবর্ত্তে যুব-শক্তি যাহাতে সর্ব্বদিক্ দিয়া রাগদ্বেষবিমুক্ত এবং বুদ্ধিমান্ হইতে পারে, তদনুরূপ শিক্ষা ব্যবস্থিত করিতে হইবে।

প্রথম প্রথম এই সকল কার্য্য অত্যন্ত বাড়াবাড়ি বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু সংশ্লিষ্ট ঘটনাদি গভীরভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, উপরে যে-সব নির্দ্দেশের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তদ্ব্যতিরেকে মনুষ্য-সমাজের বর্ত্তমান দুঃখ-দুর্দ্দশার হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভের অন্য উপায় নাই।

আধুনিক যন্ত্র-পরিচালিত শিল্প-প্রসারের কিংবা উহা বন্ধ করিবার চেষ্টা, উভয়ই বর্ত্তমানে সম্পূর্ণ অর্থহীন। রাষ্ট্র-নীতি হইতে দূরে অবস্থিত জন-সাধারণই সমগ্র মনুষ্যসমাজের শতকরা নিরানব্বই জন এবং যতদিন না তাহাদের ক্রয়শক্তি যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইবে, ততদিন বিজ্ঞানের মন্ত্রে যত দীক্ষাই দেওয়া যাউক না কেন, শিল্প-প্রসারের কোন সম্ভাবনাই নাই। আবার জোর করিয়া এই সব প্রচেষ্টা বন্ধ করিতে গেলেও কলহ ও বিশৃঙ্খলা অবশ্যম্ভাবী। যদি কোন রকমে জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করা যায়, তবে বৎসরের পাঁচ মাস কাল মাত্র পরিশ্রম করিয়া কৃষক-সাধারণ মাটি হইতে প্রয়োজনীয় আহার্য্য উৎপাদন করিতে পারিবে এবং বাকী সাত মাস অতিরিক্ত কোন খরচার মধ্যে না গিয়াই কুটীরশিল্পের সহায়তায় প্রয়োজনীয় শিল্পদ্রব্যোৎপাদন করিতে পারিবে। শিল্পক্ষেত্রে ইহাতে এমন অবস্থার সৃষ্টি হইবে, যাহাতে কুটীরশিল্পের প্রতিযোগিতায় যন্ত্র-চালিত শিল্প টিঁকিয়া উঠিতে পারিবে না এবং ইহার ফলে যন্ত্র-শিল্প স্বাভাবিক ভাবেই ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া যাইবে।

আধুনিক যুগের তথাকথিত সুখস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে যাঁহারা মসগুল হইয়া রহিয়াছেন, রেল-রাস্তা কিংবা মোটরের রাস্তা অদৃশ্য হইবার নামে তাঁহারা হয়তো শিহরিয়া উঠিতেছেন, কিন্তু যদি জলযান চালাইবার উপযোগী জলপথের সুব্যবস্থা করা হয়, তবে লোক-যাতায়াত কিংবা মাল-আমদানী-রপ্তানীর নিমিত্ত কোন অসুবিধাতেই পড়িতে হইবে না।

এইবার আমরা দেখিব, ডক্টর সাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে কোন অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া যায় কি না, কিংবা আমাদের মতগুলিই সমর্থনযোগ্য।

প্রথম প্রসঙ্গে ডক্টর মেঘনাদ সাহা বলিয়াছেন যে, 'ভারতবাসীকে অচিরাৎ আর্থিক সংগঠন-পরিকল্পনার উদ্যোগী হইতে হইবে।' অনুপক্ষে আমাদের মত হইতেছে এই যে, 'মনুষ্যজাতির বুদ্ধি বর্ত্তমানে যে স্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহাতে কোন কার্য্যকরী বিস্তৃত আর্থিক পরিকল্পনা করা যেরূপ সম্ভব নহে, তেমনই যতদিন পর্য্যন্ত না ক্ষুধার্ত্ত জনসাধারণের ক্ষুধা মিটাইবার নিমিত্ত যথেষ্ট খাদ্যশস্য উৎপাদনের ব্যবস্থা

করা হইবে, ততদিন পর্যন্ত কোন বিস্তৃত পরিকল্পনা কার্যকরী ভাবে সফল করিয়া তুলাও সম্ভব নহে।'

অবশ্য, যদি মনুষ্য-মস্তিষ্কের বর্তমান অবস্থায় জন-সাধারণকে আর্থিক অভাব, ব্যক্তির দাসত্ব, শারীরিক অস্বাস্থ্য, মানসিক অশান্তি, অকালবার্দ্ধক্য, অকালমৃত্যুর হাত হইতে নিষ্কৃতিদানোপযোগী পরিকল্পনা আবিষ্কার সম্ভব হইত, তবে ভালই হইত। কিন্তু, অস্বীকার করা চলে না যে, মনুষ্যসমাজের প্রত্যেকেই যদিও আর্থিক অভাব, ব্যক্তির দাসত্ব, শারীরিক অস্বাস্থ্য, মানসিক অশান্তি ইত্যাদির কবল হইতে রক্ষা পাইতে চাহে, তথাপি তাহাদের শতকরা নিরানব্বই জনই যে এই সকল অভাবের যন্ত্রণায় কষ্ট পাইতেছে, ইহা বাস্তব সত্য। ডক্টর মেঘনাদ সাহাকে আমরা জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, যদি মনুষ্যবুদ্ধি যে স্তরে বর্তমানকালে আসিয়া ঠেকিয়াছে, তদ্দ্বারা কোন কার্যকরী পরিকল্পনা আবিষ্কার সম্ভব হইত, তাহা হইলে এতদিন উহা হয় নাই কেন? কেন, মনুষ্যসমাজের শতকরা নিরানব্বই জনই বর্তমানে আর্থিক অভাব ইত্যাদি হইতে কষ্ট পাইতেছে? হয়তো ডক্টর মেঘনাদ সাহা বলিবেন যে, যদিও বাঞ্ছিত ফলদানে অপর সব পরিকল্পনা অক্ষম হইয়াছে, তাঁহার এই "গণতান্ত্রিক পরিকল্পনা" ইহাতে সমর্থ হইবে। কিন্তু, আমরা নিম্নে দেখাইতেছি যে, তাঁহার এই গণতান্ত্রিক পরিকল্পনা চিন্তাহীনতা এবং বাস্তবিকতার ক্ষেনোচ্ছ্বাস ব্যতীত আর কিছুই নহে।

সুতরাং একমাত্র গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্ত দাঁড়াইতেছে এই যে, মনুষ্যবুদ্ধি এমন বিকৃত হইয়াছে যে, মনুষ্যের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অভাব হইতে রক্ষা করিবার কোন পন্থা আবিষ্কার করাও ইহার পক্ষে এক্ষণে সম্ভব নহে। হয়তো ডক্টর সাহা না জানিতে পারেন, কিন্তু তথ্যাদি দ্বারা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে যে, মনুষ্যসমাজের সমগ্র অধিবাসীর প্রয়োজনীয় আহার্য দ্রব্যাদির শতকরা পঞ্চাশ ভাগও বর্তমানে পৃথিবীতে উৎপন্ন হইতেছে না কিন্তু আশী বৎসর পূর্বেও এই প্রয়োজনের শতকরা কিছু বেশীই উৎপন্ন হইত। ডক্টর সাহা এবং তাঁহার সগোত্রের ব্যক্তিরা মনুষ্যসমাজের ক্রমোন্নতির কথা বলেন বটে, কিন্তু এই তথ্যবিবরণী হইতে প্রমাণ হইবে যে, তাঁহারা মস্তিষ্কহীন ও প্রতারক এবং তাঁহারা জনসাধারণকে প্রতারিত করিয়া সমাজের ইষ্ট অপেক্ষা অধিক অনিষ্ট সাধন করিতেছেন।

আমরা জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, যদি ডক্টর মেঘনাদ সাহার শ্রেণীর বৈজ্ঞানিকগণ মনুষ্যসমাজের কোন হিত-সাধনে সমর্থ হইতেন, তবে কেন তাঁহারা জন সাধারণের বাঁচিয়া থাকিবার পক্ষে যে-সকল দ্রব্যের অপরিহার্য ভাবে প্রয়োজন, তদুৎপাদনের হ্রাস রোধ করিতে পারিতেছেন না? ইহাতে কেবল প্রমাণিত হয় যে, তাঁহাদের মস্তিষ্কের সার পদার্থ এমন বিকৃত হইয়াছে যে, মনুষ্যের জীবনধারণ করিবার পক্ষে কি কি দ্রব্য অপরিহার্য, তাহাও তাঁহারা বুঝিতে পারেন না, এবং যখন মনুষ্যজাতির অস্তিত্ব পর্যন্ত বিপন্ন হইতে চলিয়াছে তখন পর্যন্ত নিজেদের ও বিজ্ঞানের জয়ঢাক বাজাইতে তাঁহারা লজ্জাবোধ করিতেছেন না। মস্তিষ্ক-শক্তির হ্রাসের ফলে জনসাধারণ কার্য করিতে পারিতেছে না এবং সেই জন্যই ডক্টর মেঘনাদ সাহার শ্রেণীর ব্যক্তিবৃন্দ ইহা বুঝিতে পারিতেছেন না বটে, কিন্তু ইহা সত্য যে, উদর যখন খাদ্যাভাবে জ্বলিতে থাকে, তখন মানুষ সুশৃঙ্খলে নিয়ম মানিয়া কার্য করিতে অসমর্থ হয়।

এই নিমিত্তই আমরা বলিতেছি যে, ক্ষুধার্ত জন-সাধারণের ক্ষুধা মিটাইবার উপযোগী পাশুদ্রব্যের যথেষ্ট ব্যবস্থা না হইলে কোন সুবিস্তৃত পরিকল্পনাকে কার্যকরীভাবে সার্থক করিয়া তুলা যাইবে না। এই জন্যই আমরা প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছি যে, প্রথমেই জন-সাধারণকে জমীর স্বাভাবিক উর্বরাশক্তি ফিরাইয়া সস্তায় যথেষ্ট স্বাস্থ্যপ্রদ ও কাঁচামাল উৎপাদন যাহাতে বাঞ্ছিত হয়, তদনুরূপ কার্যে অগ্রসর হইতে হইবে। যদি ভারতের সমগ্র নদ-নদী অব্যাহত স্রোত লাভ করে তবেই ইহা সম্ভব। ইহার অর্থ এই যে, উৎস হইতে মোহনা পর্যন্ত নদীর স্রোতপথে রেলের বাঁধ, মোটর রাস্তা, ব্রিজ, আধুনিক ব্যবসায়-কেন্দ্রস্বরূপ সহর প্রভৃতি যে-সকল প্রতিবন্ধক রহিয়াছে, তাহা নির্মূল করিতে হইবে। আমরা ইতিপূর্বে কয় সংখ্যায় দেখাইয়াছি যে, নদ-নদীর স্বাভাবিক স্রোতপথের বাধাসমূহ অপসারিত হইলে কি ভাবে জমীর স্বাভাবিক উর্বরাশক্তি বৃদ্ধি পাইতে পারে—এখানে উহার উল্লেখ করিব না। বর্তমান অবস্থায় মনুষ্য-জাতিকে বাঁচিতে হইলে নদী-স্রোতের এই সকল প্রতিবন্ধক-

অপসরণ যদিও সর্বপ্রধান কর্তব্য, তথাপি সমগ্র জনসংখ্যার অধিকাংশ যদি ঐক্যবদ্ধ না হয়, উহা কার্যে পরিণত করা সম্ভব নহে। যদি জনসাধারণ তাহাদের পার্থক্যের বিষয় লইয়া নিজেদের মধ্যে কলহ করিতে থাকে, তবে এই ঐক্য গঠিত হইতে পারে না। এই জন্যই আমরা বলিতেছি যে, জনসাধারণ যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহার স্বাভাবিক উর্বরাশক্তি বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হয়, ততক্ষণ তাহাদিগকে আর প্রত্যেকটি বিষয় উপেক্ষা করিতে হইবে এবং সমাজ-সংস্কারের অপরাপর সকল বিষয়ে উদাসীন হইতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, ডক্টর মেঘনাদ সাহা বলিয়াছেন যে, "রুশিয়া যখন করিয়াছে, তখন ভারতবাসীকেও স্বদেশের বৈজ্ঞানিক ও শিল্পনায়কদিগকে সমবেত করিয়া এই আর্থিক সংগঠনে অগ্রসর হইতে হইবে।" আর আমরা বলিতেছি যে, "সমাজকে আদর্শ ব্যবস্থায় উন্নত করিবার নিমিত্ত যে কার্যকরী অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রয়োজন, তাহার আবিষ্কার বর্তমান বিজ্ঞানের সহায়তায় বর্তমান বৈজ্ঞানিকগণ কর্তৃক যেরূপ অতীতেও সম্ভব হয় নাই, তেমনই ভবিষ্যতেও সম্ভব হইবে না। বিস্তৃত ও কার্যকরী কোন আর্থিক সংগঠনের পরিকল্পনা কেবল তখনই সম্ভব, যখন মানুষ অপরের দুঃখকষ্ট সমপ্রাণতার সহিত অন্তরে অন্তরে বুঝিতে পারিবে এবং তাহার উপলব্ধ-করে বর্তমান বিজ্ঞান ও দর্শনের সম্পূর্ণ ব্যবস্থা উপলব্ধ করিতে পারিবে। রুশিয়াতে বৈজ্ঞানিক ও শিল্পনায়কগণ কোন কার্যকরী আর্থিক পরিকল্পনার সন্ধানলাভে কৃতকার্য হইয়াছেন, ইহা বলার বক্তার আর্থিক পরিকল্পনার সম্ভাব্যতা-নির্দ্ধারণে অসামর্থ্য সূচিত হইয়াছে।"

ডক্টর মেঘনাদ সাহার বক্তৃতার প্রথম প্রসঙ্গে যে সকল প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে, তাহার আলোচনাক্রমে আমরা বর্তমান বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিকদের উদ্দেশ্যে যে-সব কথা বলিয়াছি, তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, আধুনিক বিজ্ঞানের সহায়তায় আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ কর্তৃক কোন কার্যকরী আর্থিক সংগঠন সম্ভব নহে। র‍্যাডাম্ স্মিথ্ হইতে আরম্ভ করিয়া মার্শ্যাল পর্যন্ত যাঁহারা অর্থনীতি শাস্ত্রের মৌলিক ও প্রামাণ্য গ্রন্থলেখক, তাঁহারা প্রত্যেকে নিজেদের ধারণানুযায়ী আদর্শ সমাজ-সংগঠনের উপযোগী পরিকল্পনা রচনা করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন এবং বিফলকাম হইয়াছেন, ইহা ডক্টর মেঘনাদ সাহার শ্রেণীর আত্মপ্রসন্ন, ক্ষীত-মস্তিষ্ক বৈজ্ঞানিকদের অবিদিত থাকিতে পারে, কিন্তু যাঁহাদের অর্থনীতি-বিষয়ক বর্তমান কালের চিন্তাপদ্ধতি, প্রামাণ্য লেখকদের (সঙ্কলয়িতা নহে) গ্রন্থ অধ্যয়নের সামর্থ্য আছে, তাঁহারা নিশ্চয়ই আমাদের মত সমর্থন করিবেন।

ইউরোপীয় সমাজের বর্তমান অবস্থা হইতেই নিঃসন্দিগ্ধ রূপে প্রমাণিত হয় যে, তাঁহাদের পরিকল্পনাসমূহ সম্পূর্ণ রূপে ব্যর্থ হইয়াছে। নিজেদের পরিকল্পনা বিষয়ে এই সকল প্রামাণ্য গ্রন্থলেখক যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহা যথাযথ ভাবে অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে যে, তাঁহাদের ব্যর্থতা স্বকীয় ব্যক্তিগত ক্ষমতাহীনতার নিমিত্ত নহে, যে-অসার বিজ্ঞান কিংবা কু-বিজ্ঞানের প্রতি নির্ভর করিয়া তাঁহাদের পরিকল্পনা তাঁহারা রচনা করিয়াছেন, তাহাই ইহার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী। আমরা ডক্টর মেঘনাদ সাহাকে জনসমক্ষে ব্যক্ত করিতে অনুরোধ করিতেছি যে, যদি বর্তমান বৈজ্ঞানিকগণ আদর্শসমাজ সংগঠনের উপযোগী কোন কার্যকরী পরিকল্পনা-রচনায় সমর্থ, তবে আধুনিক অর্থনীতি-শাস্ত্রের এই সকল প্রামাণ্য ব্যক্তি তাহা করিতে পারিলেন না কেন? যদি তিনি তাহা না ব্যাখ্যা করিতে পারেন, তবে তিনি কি স্বীকার করিবেন যে, যদিও তিনি খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক বলিয়া বিবেচিত হইতেছেন, তথাপি তিনি যাহা বলেন, তাহা অবোধ্য এবং অর্থহীন?

ডক্টর সাহা তাঁহার শ্রোতৃবৃন্দের সমক্ষে রুশিয়ার দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করিয়াছেন। রুশিয়াতে রুশিয়ার বৈজ্ঞানিক ও শিল্পধুরন্ধরগণ আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা সংগঠনোপযোগী পরিকল্পনা-রচনায় কৃতকার্য হইয়াছেন, তিনি এই কথা বলিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, ডক্টর মেঘনাদ সাহা রুশিয়ার অনুসৃত পন্থায় অনুধাবন করিতে পারেন নাই, কিংবা মনুষ্যসমাজের বিভিন্ন সংগঠনের বিভিন্ন ফল দেখিয়া কি তাহার পরিণতি হইতে পারে, তাহা নির্দ্ধারণে তিনি অক্ষম। সম্ভবতঃ, পরবর্তী উক্তিই তাঁহার পক্ষে প্রযোজ্য। কেন না, এই বিজ্ঞান বর্তমান বৈজ্ঞানিকগণের অবিদিত। যাঁহারা বেদ, বাইবেল ও কোরাণের মূল গ্রন্থ ও তাহার প্রকৃত তাৎপর্য-অধ্যয়নে সমর্থ, তাঁহাদেরই কেবল ঐ বিজ্ঞান পরিজ্ঞাত। মনুষ্য সমাজের বিভিন্ন সংগঠনের বিভিন্ন ফল দেখিয়া তাহার কি পরিণতি হইতে পারে, তাহার নির্দ্ধারণ-বিজ্ঞান যদি ডক্টর মেঘনাদ সাহার শ্রেণীর ব্যক্তিদের জানা থাকিত কিংবা যদি আমরা বুঝিতে পারিতাম এই হিসাব বুঝিবার সামর্থ্য পর্যন্ত তাঁহাদের আছে, তাহা হইলে দুই মিনিটের মধ্যে তাঁহাদিগকে বুঝানো সম্ভব হইত যে, রুশিয়ার যে-ব্যবস্থায় কার্য হইতেছে, তাহা নিষ্ফল হইতে বাধ্য। আমাদের অধিকাংশ পাঠকই হয় তো আমরা যাহা বলিতেছি, বর্তমানে তাহার সহিত একমত হইতে পারিবেন না, কিন্তু তাঁহাদিগকে আমরা অধিকপক্ষে আর সাত বৎসর মাত্র অপেক্ষা করিতে বলি, তখন তাঁহারা দেখিবেন যে, আমরা যাহা বলিতেছি, তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য।

তৃতীয়তঃ, ডক্টর সাহা বলিয়াছেন যে, "যুরোপে যখন একই পন্থায় চলিয়া প্রায় আদর্শে উপনীত হইয়াছে, তখন ভারত-

বাসীকেও আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে ভূপৃষ্ঠ খনিজ, প্রাকৃতিক শক্তি ও কৃষিজাত সংস্থানের নিয়োগ ও শিল্পের সম্প্রসারণ করিতে হইবে।" উহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, "বর্তমান বিজ্ঞানের সহায়তায় ভূপৃষ্ঠ খনিজ, প্রাকৃতিক শক্তির নিয়োগ, শিল্প-সম্প্রসারণ এবং কৃষিজাত সংস্থানের উন্নয়ন কখনও সম্ভবপর হইবে না, কেন না বর্তমান বিজ্ঞানের মতে যাহা খনিজ, প্রাকৃতিক শক্তির নিয়োগ ও শিল্প সম্প্রসারণ, তাহা চিরকালই কৃষিসংস্থানের সর্বনাশ-সূচক। যখন মনুষ্য-জাতি বর্তমান যুগের খনিজ, প্রাকৃতিক শক্তির নিয়োগ ও বৈজ্ঞানিক শিল্প-সমূহের উন্নয়ন-পরিকল্পনা ধ্বংস করিতে নিঃসংশয়ে কৃতসঙ্কল্প হইবে, কেবল তখনই কৃষি-সংস্থানের উন্নয়ন সম্ভবপর হইবে। আধুনিক সুইডেন মনুষ্য-সমাজের আদর্শ ব্যবস্থার নাগাল পাইয়াছে, ইহা বলায় বক্তার মনুষ্য-সমাজের পক্ষে অত্যাবশ্যক ভাবে যাহা প্রয়োজন, তৎসম্বন্ধে ও আধুনিক সুইডেনের প্রকৃত অবস্থা-বিষয়ে অজ্ঞতা সূচিত হইয়াছে।"

উপরের দুইটি মতবাদের কোন্‌টি যথার্থ, তাহা স্থির করিতে হইলে আমাদিগকে দেখিতে হইবে, প্রথমতঃ, আধুনিক সুইডেনের আর্থিক অবস্থা আদর্শ সমাজের সদৃশ কি না; দ্বিতীয়তঃ, যদি দেখা যায় যে, সুইডেনের আর্থিক অবস্থা আদর্শ সমাজের অনুরূপ এবং উহা যুগপৎ খনিজ, প্রাকৃতিক শক্তি ইত্যাদির নিয়ম দ্বারা লব্ধ হইয়াছে, তবে ডক্টর সাহা যে, সত্যই ক্ষমতাশালী পরিকল্পনাকারী এবং অনেকক্ষেত্রে যুগপৎ খনিজ, প্রাকৃতিক শক্তি ইত্যাদির নিয়োগ যে সুফলপ্রসূ হইতে পারে, তাহা স্বীকার করা ব্যতীত আমাদের গত্যন্তর থাকিবে না।

এখন আমরা দেখিতে চাই যে, আধুনিক আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থার সহিত সুইডেনের আর্থিক অবস্থার কথঞ্চিৎ সাদৃশ্যও বিদ্যমান কি না। বলাই বাহুল্য যে, আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থার সহিত কোন দেশের আর্থিক অবস্থার যে কথঞ্চিৎ সাদৃশ্যও আছে, ইহা বলিতে হইলে, ঐ দেশকে অন্ততঃপক্ষে বেকার-সমস্যাহীন এবং স্ব-সম্পূর্ণ হইতে হয়। তথ্য-বিবরণীর সন্ধান হইতে দেখা যায় যে, 'আধুনিক সুইডেন বেকার-সমস্যাহীনও নহে এবং ইহার জনসংখ্যার আহার্যার্থকল্পে বাহির হইতে গম আমদানী না করিলে ইহার চলে না।'

'কৃষি-তথ্য-বিবরণীর আন্তর্জাতিক বর্ষগ্রন্থ (International Year Book of Agricultural Statistics)' এবং মিঃ কোল লিখিত 'ইউরোপের অবস্থা (Mr. Cole's Review of Europe)' পুস্তকের পৃষ্ঠা উল্টাইলে দেখা যাইবে যে, বিগত ১৯৩১ সনের সুমারী (census) অনুযায়ী সুইডেনের জনসংখ্যা হইতেছে ৬১ লক্ষ ৬২ হাজার ৪৪৬ জন, তন্মধ্যে ১৫ লক্ষ কর্মক্ষম; সরকারী হিসাবে দেখা যায়, এই ১৫ লক্ষ কর্মক্ষম অধিবাসীর প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার জন বেকার। আহার্যের নিমিত্ত সুইডেনের ৫৫ লক্ষ কুইন্টাল* খাদ্য-শস্য প্রয়োজন, তন্মধ্যে মাত্র ৩২ লক্ষ কুইন্টাল খাদ্যশস্য সুইডেনে উৎপন্ন হয়, অবশিষ্ট ২৩ লক্ষ কুইন্টালের জন্য বাহির হইতে আমদানীর উপর নির্ভর করিতে হয়। সুতরাং আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থার সহিত সুইডেনের আর্থিক অবস্থার কথঞ্চিৎ সাদৃশ্যও আছে, ইহা বলা যায় না। এতৎসত্ত্বেও ডক্টর মেঘনাদ সাহার পর্যায়ের কোনও বৈজ্ঞানিক যদি উৎকৃষ্ট আর্থিক অবস্থার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতে গিয়া সুইডেনের কথা বলিতে দ্বিধা বোধ না করেন, তবে কি বক্তাকে বিশ্বাসের অযোগ্য ও কতক প্রবৃত্তিসম্পন্ন বলিয়া মনে করিতে হয় না?

'ষ্টেট্‌স্‌ম্যান' পত্রিকায় ডক্টর সাহার বক্তৃতার যে বিবরণী বাহির হইয়াছে, তদ্দৃষ্টে মনে হয়, ডক্টর সাহার মতে সুইডেন এখন আর খাদ্যদ্রব্য আমদানী করিতেছে না, পরন্তু উহা রপ্তানী করিতেছে। আমরা জানি না, তিনি এই সংবাদ কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। আমরা বলিতে বাধ্য যে, ইহা প্রামাণ্য দলিল সমূহের বিরোধী। সুতরাং সুইডেনের আমদানী-রপ্তানীর সামর্থ্য সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি উহা প্রামাণ্য তথ্যদ্বারা সমর্থন না করিবেন, ততক্ষণ আমরা উহাতে গুরুত্ব আরোপ করিতে পারিতেছি না।

যদি জমীর স্বাভাবিক উর্বরাশক্তির সঠিক বিজ্ঞান পাওয়া যায়, তবে দেখা যাইবে যে, সম্পূর্ণভাবে কোন দেশের কৃষিসংস্থান, যুগপৎ তাহার খনিজ শক্তির নিয়োগ এবং যন্ত্র-চালিত শিল্প-প্রসারের সহিত বৃদ্ধি করা চলে না। বাস্তব ঘটনাবৃত্তে বুঝা যায়, জমীর উর্বরাশক্তি বলিতে বুঝায় জমীর অন্তঃস্তরে রস ও তেজের সমধিক সংরক্ষণ। ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে, জমীর অন্তঃস্তরস্থ তেজ ও রসের স্বাভাবিক উৎস যদি অপসৃত কিংবা শুষ্কতা প্রাপ্ত হয়, ইহার উর্বরা-শক্তি হ্রাস পাইতে বাধ্য। ইহা হইতে আরও বুঝা যাইবে যে, এমন কি যদি কোনপ্রকারে জমীর ভিতরে কিংবা বাহিরের আবহাওয়ার তেজ ও রসের সংযোগ বাধাপ্রাপ্ত হয়, তবে জমীর স্বাভাবিক উর্বরাশক্তির প্রতি ইহা কুফল প্রসব করিতে বাধ্য।

এক্ষণে যদি পর্যালোচনা করা যায়, জমীর সহিত খনিজের কি সম্বন্ধ, তবে দেখা যাইবে যে খনিজ দ্রব্যই উহার তেজ সরবরাহ করিয়া থাকে। ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে, জমী হইতে খনিজ দ্রব্য অপসৃত করিলে, উহার তেজোভাণ্ডার অপসৃত করা হয়। তদুপরি যদি দেখা যায় যে, যন্ত্র দ্বারা কল চালাইবার জন্য শক্তি-জননের অর্থ কি, তবে বুঝা যাইবে যে, ইহাতে কোন না কোন উপায়ে জমীর তথা বাহিরের আব-

* কুইন্টালে ১০০ কিলোগ্রাম প্রায় ২২০ পাউণ্ড মোটামুটি ৪০ মণ।

হওয়ার চেয়ে ও বয়সের স্বাভাবিক সংমিশ্রণে বাধা উপস্থিত করা হয়।

সুতরাং ইহা নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে বলা যাইতে পারে যে, ধনিক সংস্থানের এবং শক্তিপরিচালিত বহু-শিল্পের উদ্ভবন জনীর স্বাভাবিক উর্বরাশক্তি হ্রাস করিতে বাধ্য। সুতরাং ইহা যথার্থ যে, কৃষিস্থানের উন্নয়ন মূলতঃ ধনিক সংস্থানের নিয়োগ এবং বহুগলিত শিল্পের প্রসারের সহিত সম্ভাপর নহে।

হইতে পারে যে, ডক্টর মেঘনাদ সাহা শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক-গণ এই অতি প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান বুঝিতে পারিবেন না, কিন্তু সে সময়ের বিলম্ব নাই, যখন জগদ্ব্যাপী অনাহার ও বেকার-সমস্যার ফলে তাঁহাদিগকে বুঝিতে হইবে যে, বর্তমান ওয়েষ্ট বিজ্ঞানের নামে যাহা চলিতেছে, তাহা বিজ্ঞান নহে এবং এই কথার শব্দগত অর্থে যে ধারণা হয় তাহাও নহে এবং উহা সম্পূর্ণ গোঁজামিল। তাঁহাদিগকে ইহাও বুঝিতে হইবে যে, বর্তমান মনুষ্য-সমাজের সর্বাঙ্গীন দুর্গতির মূলে প্রধানতঃ এই গোঁজামিল বিদ্যমান।

সুতরাং তাঁহার শ্রোতৃবৃন্দের মনকে ডক্টর মেঘনাদ সাহা যাহা সন্তুষ্ট প্রচার করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে বিশেষ ভাবে অভিনন্দিত করা যায় না।

যদিও বর্তমান বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য যুক্তিসঙ্গত ভাবে কোন প্রশংসা উচ্চারণ করা যায় না, তথাপি মানুষ হিসাবে বৈজ্ঞানিকদের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করিবার আমাদের যুক্তি আছে। কিন্তু, দুঃখের সহিত বলিতেছি যে, মানুষ হিসাবে ডক্টর মেঘনাদ সাহার প্রতি আমরা সেই শ্রদ্ধাও পোষণ করিতে পারিতেছি না। বিশ্ববিদ্যালয়লব্ধ প্রশংসাপত্রে তাঁহাকে অযথা স্ফীত-মস্তিষ্ক করিয়াছে এবং তিনি মনুষ্যত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছেন—আমাদের এই অভিমত পোষণ করিবার কারণ রহিয়াছে। তিনি সম্প্রতি 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় "আধুনিক বিজ্ঞান ও হিন্দুধর্ম" নামে যে প্রবন্ধ প্রকাশ করিতেছেন, তাহা পাঠে ইহা বলিতে আমরা বাধ্য হইতেছি। তাঁহার এই প্রবন্ধে তিনি পবিত্র বেদকে 'বাদ' বলিয়া (ভারতবর্ষ, জ্যৈষ্ঠ ১৪০ পৃষ্ঠা, ২য় স্তম্ভ, ৩য় পংক্তি দ্রষ্টব্য) ব্যঙ্গ করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। ইহাতে প্রমাণ হয় যে পবিত্র রচনার প্রতি যে শ্রদ্ধা-প্রদর্শন সকলের কর্তব্য তাহাও, তিনি প্রদর্শন করিতে কখনও কখনও পরাঙ্মুখ এবং ইহা তাঁহার নীচ মনোবৃত্তির পরিচায়ক।

পরবর্তী কোন রচনায় ডক্টর মেঘনাদ সাহার উক্ত প্রবন্ধ বিশ্লেষণ করিবার আমাদের ইচ্ছা আছে এবং সাধারণের নিকট প্রমাণ করিবার ইচ্ছা আছে যে, যদিও আধুনিক-যুগের বিদ্যাবত্তার অত্যন্ত বুলি মুখস্থ করিয়া তোতাপাখীর কারসাজী দেখাইয়া তিনি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চতম প্রশংসাপত্র লাভ করিয়াছেন, তথাপি তিনি প্রাচ্য অথবা পাশ্চাত্যের চিন্তানায়ক-গণের চিন্তাপ্রণালীর সামর্থ্য প্রয়োজন, তাহার কিছুমাত্র অর্জন করিতে পারেন নাই।

ডক্টর মেঘনাদ সাহাকে আমরা সতর্ক করিতেছি এবং আন্তরিক অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি যে, অন্ততঃ ততদিন পর্যন্ত শ্রদ্ধার্হ ব্যক্তি এবং শ্রদ্ধার যোগ্য রচনা সম্বন্ধে কি ভাবে কথা বলিতে হয়, তাহা না শিখা করিতে পারিতেছেন, অন্ততঃ ততদিন জন-সাধারণকে প্রতারিত করিবার কার্যে তিনি বিরত থাকুন।

আমরা তাঁহাকে আত্ম-বিশ্লেষণতৎপর হইয়া কি জন্য নিজের সম্বন্ধে তাঁহার এই উচ্চ ধারণা, তাহা চিন্তা করিয়া দেখিতে বলি। হইতে পারে যে, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ ডিগ্রীগুলি লাভ করিয়াছেন এবং এমন কি, অনেকে তাঁহাকে পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে একজন বলিয়াও গণ্য করেন, কিন্তু আজ যদি তাঁহাকে বেতনভোগী নফরগিরী ত্যাগ করিয়া নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইতে হয়, তবে সৎ ভাবে স্বকীয় জীবিকার্জনের সামর্থ্য তিনি লাভ করিয়াছেন, এই সম্বন্ধে তিনি কি একেবারে সুনিশ্চিত? আমরা স্পর্দ্ধার সহিত বলিতেছি যে, স্বাধীন ব্যবসায়ে উপার্জন করিতে হইলে মাসিক ১৮০ টাকা উপার্জনের যোগ্যতাও তাঁহার নাই, যদিও প্রকৃত যোগ্যতার দিক্ দিয়া বিচারে তাঁহার যাহা সত্যই প্রাপ্য, তদপেক্ষা দশগুণ বেতন তাঁহাকে দেওয়া হইতেছে। তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে হইবে যে, বেদ যে-ভাষায় লিখিত তিনি তাহা জানেন না এবং ভারতীয় ঋষিগণ বেদে কি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং কি করেন নাই, তাহা তাঁহার পক্ষে জানা সম্ভব নহে। মূল গ্রন্থ যেরূপ ভাবে লিপিবদ্ধ আছে, তাহা পাঠে অসমর্থ হইয়াও তৎসম্বন্ধে কোন সমালোচনা কি তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত দায়িত্বজ্ঞান-হীনতার পরিচায়ক হয় নাই?

এই মানুষটি—এই সকল ত্রুটি সত্ত্বেও যদি তাঁহাকে মানুষ আখ্যায় আখ্যাত করা যায়—সম্বন্ধে সতর্ক হইবার জন্য আমরা জন-সাধারণকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি।

যদি ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 'হিন্দু' বলিয়া প্রকৃত-পক্ষে নিজে অভিহিত হইবার দাবী রাখেন এবং হিন্দু-সমাজের প্রতিনিধি হইবার যোগ্য হইতে চাহেন, তবে এই ব্যক্তির সংশোধনের নিমিত্ত আমরা তাঁহার নিকট নিবেদন করিতেছি। এই ব্যক্তি (ডক্টর মেঘনাদ সাহা) কি এখনও তাঁহার ক্লাসের হিন্দু ছাত্রদের নিরপেক্ষের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন?

নদীয়ার কথা

—শ্রীবীরেন্দ্রমোহন আচার্য্য

বিদ্যাচর্চ্চা

নবদ্বীপ বিদ্যাচর্চ্চায় খ্যাতি বেশিদিনের নয়। সমগ্র প্রাচ্য ভারত নবদ্বীপের জ্ঞান-গরিমায় প্রদীপ্ত শিখায় সমুজ্জ্বল। অতি প্রাচীনকাল হইতে আরম্ভ করিয়া বিভিন্ন কালে ও বিভিন্ন দিকে হিন্দু সংস্কৃতির চিন্তাধারা ও সূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্ব বিশ্লেষণে নবদ্বীপ পণ্ডিতবর্গ বীশক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। শাস্ত্র-যুক্তির বিচারে ক্ষুরধারবুদ্ধি, বিতর্ক-লড়াই অপরাজেয়, তত্ত্বকথায় বাস্তবজ্ঞান পরিপুষ্ট, আত্মসমাহিত সাধক "নবের পণ্ডিত" শব্দ আজিও প্রবাদ-বাক্যের মত প্রচলিত।

সংস্কৃত বিদ্যা

নবদ্বীপের এই সংস্কৃত বিদ্যাচর্চ্চার খ্যাতির কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে বলিতে হয়, সুদূর অতীতের তামসী যুগে হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ের সূচনায় সেন রাজবংশ যেদিন নবদ্বীপকে কেন্দ্র করিয়া হিন্দুর জ্ঞান, ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি প্রচারের অনুষ্ঠান শুরু করিয়াছিলেন, সেই দিন হইতেই রাজানুগ্রহপুষ্ট হইয়া এই দেশ প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চ্চায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে।

লক্ষ্মণসেন দেবের সেনাপতি বিশ্বরূপ সেনের পুত্র শ্রীধর সেনের "সদুক্তি-কর্ণামৃত" নামে একখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়। ঐ গ্রন্থে রাজসভার বর্ণনায় জয়দেব, উমাপতি ধর, গোবর্দ্ধন, শরণ, ধোয়ী প্রভৃতি কবিদিগের নাম আছে। মহারাজ বৃদ্ধ বয়সে গঙ্গাতীরবর্ত্তী নবদ্বীপে টোল চতুষ্পাঠী পরিবেষ্টিত হইয়া কাব্য-দর্শনাদি ও হিন্দু শাস্ত্রালোচনায় যথোচিত উৎসাহ দিতেন। কবির পঙ্‌ক্তিতে ইহারা কেহই ন্যূন ছিলেন না, তবে গীতগোবিন্দের সাধক কবি জয়দেব ছিলেন এই রত্ন-মালিকার মধ্যমণি। বীরভূম জেলার অজয়তীরস্থ কেন্দুবিল্ব গ্রামে কবির জন্ম হইলেও লক্ষ্মণসেন দেবের সভাকবি রূপে নবদ্বীপ হইতেই তাঁহার কাব্য-প্রতিভা উদ্ভাসিত হইয়া তাঁহার কোমলকান্ত পদাবলীর অনুপম ঝঙ্কারময় বিন্যাস পরিব্যাপ্ত করিয়াছিল বলিয়া মনে করা যায়। কবি ও তাঁহার কাব্য-সম্বন্ধে বহু প্রকার অলৌকিক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, বর্ত্তমানে তাহার বিস্তৃত বিবরণ দিবার প্রয়োজন নাই।

উমাপতি ধর, হলায়ুধ, গোবর্দ্ধনাচার্য্য প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গের বিভিন্ন কাব্য-গ্রন্থ হইতে তাৎকালিক দেশের ও রাজবংশের অস্পষ্ট ঐতিহাসিক ইঙ্গিত পাওয়া যায়। 'পবনদূতের' রচয়িতা কবিবর ধোয়ী এই কাব্যের বিষয়-ভাগ, অলকা-পরিত্যাগিনি গন্ধর্ব্ব-রাজকুমারী যক্ষপত্নী নায়ক লক্ষ্মণসেনদেবের প্রতি প্রেম নিবেদন করিয়া পবনকে দূতরূপে প্রেরণ করিয়াছেন। সেই দৌত্য-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া পবন যে যে পথের উপর দিয়া লক্ষ্মণসেনের রাজধানীতে উপনীত হইল, তাহা হইতে লক্ষ্মণসেনের রাজধানীর ভৌগোলিক অবস্থিতি সম্বন্ধে অনেকটা আভাস পাওয়া যায়।

ন্যায়—নবদ্বীপের এই প্রাধান্যলাভের মূলে তাৎকালিক ন্যায়-বৈশেষিকাদি জ্ঞান-চর্চ্চার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্র ছিল মিথিলা। এইখানেই গঙ্গেশ উপাধ্যায় গোতমের ন্যায়সূত্রের অবলম্বনে প্রমাণ, অনুমান, উপমান ও শব্দ বিভিন্ন প্রকার প্রমাণ বিশ্লেষণ করিয়া 'চিন্তামণি'-নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থরত্ন রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত উদয়নাচার্য্য, মুরারি মিশ্র, পক্ষধর মিশ্র প্রভৃতি অলৌকিকপ্রতিভাসম্পন্ন পণ্ডিতবর্গের পাণ্ডিত্যে মিথিলা তৎকালে সমগ্র ভারতের চিন্তাক্ষেত্রে যে একচ্ছত্র নায়কত্ব করিত, তন্মধ্যে পক্ষধর মিশ্রের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি অপরিসীম। ইঁহার প্রকৃত নাম জয়দেব মিশ্র তর্কালঙ্কার, কিন্তু বিদ্বেষীরা পক্ষধর মিশ্র নামে তিনি পরিচয় দিয়াছেন। এই প্রকার ছদ্মনাম গ্রহণের কারণ সম্বন্ধে কথিত আছে যে, শাস্ত্রালাপের বিতর্কে যে কোন পক্ষ অবলম্বন করিয়া তিনি অবলীলাক্রমে জয়লাভ করিতে পারিতেন। কাহারও কাহারও মতে যে কোন পাঠ একবার দেখিয়া তিনি একপক্ষ কাল স্মরণ রাখিতে পারিতেন। এই প্রকার আরও যে সকল প্রবাদ প্রচলিত আছে, তাহার সকল তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। মুরারির সেকালে মিল না। এই সকল অতি দুরূহ তত্ত্ব-সম্বলিত গ্রন্থাদি অধ্যাপকগণ বহু ক্লেশে টীকা করিয়া সমাপ্ত করিতেন এবং মিথিলার ন্যায়ের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য এই সকল গ্রন্থের একখানি পত্রও যাহাতে মিথিলার বাহিরে না যাইতে পারে, সে বিষয়ে তাঁহাদের সতর্কতার অবধি ছিল না। ভারতের বিভিন্ন দিক্ হইতে ছাত্রবর্গ মিথিলায় উচ্চবিদ্যালাভার্থ গমন করিত এবং শিক্ষান্তে সমস্ত গ্রন্থ মিথিলায় ফিরাইয়া দিয়া তাহারা স্বদেশে ফিরিত। ন্যায়শাস্ত্রের মত দুরূহ বহু গ্রন্থ বাড়িতেকে পাঠ-পাঠনা সম্ভব নহে বলিয়া মিথিলার বাহিরে ন্যায়-অধ্যাপনা সম্ভব হইত না। এই ভাবে ন্যায়শাস্ত্র-চর্চ্চায় মিথিলা ছিল শতাব্দিক বৎসর ধরিয়া তাহার একচ্ছত্র আধিপত্য অব্যাহত রাখিয়াছিল। কিন্তু, মিথিলার এই একাধিপত্যের মূলে প্রথম কুঠারাঘাত করিলেন নবদ্বীপের বাসুদেব সার্ব্বভৌম ও পরে তাঁহার ছাত্র রঘুনাথ শিরোমণি।

বাসুদেব খৃষ্টীয় ১৪শ শতকের মধ্যভাগে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। বাসুদেবের পিতা মহেশ বিশারদ ('সার্ব্বভৌম পিতা বিশারদ মহেশ'—চৈঃ ভাঃ) তৎকালে নবদ্বীপে খ্যাতনামা পণ্ডিত ছিলেন। কথিত আছে, বাসুদেব বাল্যকালে পড়াশুনায় মোটেই মনোযোগী ছিলেন না বলিয়া একদিন পিতার নিকট ভর্ৎসিত হইয়াও ও তাড়িত হন। আত্মগ্লানিতে ব্যাকুল হইয়া গঙ্গায় আত্মবিসর্জ্জন করিতে গেলে পার্শ্ববর্ত্তী বনময় হইতে

আক্রমণ করিতে নিষেধ করিয়া বৈষয়াণি প্রস্থান করিল। পরে এক সন্ন্যাসীর নিকট হইতে শিরোমণি ও পুত্রার ঘট প্রাপ্ত হইয়া গ্রামের মধ্যে এক ঘটস্থাপনার স্থাপন করেন। ইহাই নবদ্বীপের সুবিখ্যাত বিল্ব জননী বা পোড়া-মা। প্রবাদবাক্য সত্য হউক আর মিথ্যা হউক, সেই সময় হইতে অদ্যাবধি নবদ্বীপের বিল্ব-জননী বিল্ব সমাজের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সমস্ত বিদ্যার্থীর ইষ্টদেবী হইয়া আসিতেছেন। অনেকের মতে তাই 'পোড়া-মা' শব্দ 'পড়ুয়ার মা'র অপভ্রংশ।

বাসুদেব সার্ব্বভৌম শাস্ত্র করিয়া প্রত্যাবর্তন করিয়া পুনরায় নিমিলায় নিজোপযোগী তাঁহার নিকট হইতে গ্রন্থ কাড়িয়া লওয়া হইল। গ্রন্থ আনয়নে সম্বৎসর নষ্ট দেখিয়া অন্যান্য কালের ন্যায়ই তিনি টীকা-টিপ্পনী সহ সমুদায় গ্রন্থখানি মুখস্থ করিয়া ফেলিলেন এবং মৈথিলী পণ্ডিতগণের চক্ষুতে এড়াইবার জন্য কাশীতে কিছুকাল অবস্থান করিয়া বেদান্তশাস্ত্র সমাপনের পর ত্রিপথে নবদ্বীপে আসিয়া গঙ্গার পরপারে বিদ্যানগর গ্রামে গ্রন্থের টোল খুলিয়া গ্রন্থ হইতে সমুদায় গ্রন্থের গ্রন্থ অনুসন্ধান করিয়া ফেলিলেন। মিথিলার বাহিরে ইহাই সর্ব্বপ্রথম গ্রন্থের টোল। (বিদ্যানগরে কিছুকাল অধ্যাপনা করিবার পর গৌড়দেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সার্ব্বভৌম পুরীতে গিয়া রাজা প্রতাপরুদ্রের গুরুস্থানীয় বাসুদেব সমবায় করিয়াছিলেন এবং সেইখানেই প্রৌঢ় বয়সে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠ-ধারায় অভিষিক্ত হইয়া তিনি সর্ব্বপ্রকার পাণ্ডিত্যাভিমান পরিত্যাগ করেন)।

এই কালে মিথিলায় গ্রন্থ-চর্চ্চার একাধিপত্যের মূলে কুঠারাঘাত হয়। কিন্তু, তখনও মিথিলার প্রাধান্য লুপ্ত হয় নাই। পক্ষে-পালনা অঙ্কুর হইলেও গ্রন্থের উপাধিদানের ক্ষমতা তখনও মিথিলা ছাড়া আর কাহারও ছিল না। এই প্রাধান্যও পরে সার্ব্বভৌমের যোগ্য ছাত্র 'নবীনার কানা ছেলে' রঘুনাথ শিরোমণি দ্বারা লুপ্ত হয়।

রঘুনাথ ১৬শ শতকের মধ্যভাগে নবদ্বীপে আবির্ভূত হন। এই ১৬শ শতকেই নবীন বঙ্গদেশে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল। বিভিন্ন প্রসঙ্গের অবতারণায় তাহার যৎকিঞ্চিৎ উল্লেখ করিয়াছি। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অলৌকিক লীলায় সমগ্র ভারত সমুদ্ভাসিত, আসামবাসীদের দ্বারা শাক্ত ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা, কেশব ভারতীর সন্ন্যাসসংস্কার, রঘুনন্দনের স্মৃতিসংস্কার ও রঘুনাথ শিরোমণির অভ্যুদয়ে ন্যায়শাস্ত্রের প্রাধান্য মিথিলা হইতে আসিয়া নবীনার অনুগামী হইল। প্রতিভার নৈয়ায়িক-কেশরী রঘুনাথ শিরোমণি সম্বন্ধেও বহু প্রবাদ গল্প ও কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। দরিদ্রের সন্তান রঘুনাথ বাল্যকালেই তাঁহার অদ্ভুত প্রত্যুৎপন্নমতি ও যৌক্তিক পাণ্ডিত্য প্রদান করিয়া নবদ্বীপের অধ্যাপকমণ্ডলীর সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পরে নবদ্বীপের পাঠ সাঙ্গ করিয়া মিথিলার পক্ষধর মিশ্রের নিকটে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে গমন করেন। সেখানে কি ভাবে আপনার অলৌকিক বিদ্যাবত্তার পরিচয় প্রদান করিয়া অধিবাসিক পক্ষধরের গর্ব্ব তিনি চূর্ণ করিয়াছিলেন, বাংলার জনসাধারণের কাছে সে কাহিনী প্রবাদ-বাক্যের মত হইয়া আছে, মিথিলার চতুষ্পাঠীতে বাংলার এই তরুণ ছাত্রটির অশেষ লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও চিত্তবৃত্তি সহ্য করিতে হইয়াছিল এবং এই প্রকার দুর্ব্যবহার চরমে উঠিয়াছিল সেই দিন, যে দিন বালক রঘুনাথ জ্ঞানবৃদ্ধ প্রবীন অধ্যাপকের গ্রন্থের দোষ-ত্রুটী উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে ভ্রান্ত প্রমাণ করিয়া দিলেন। অশেষে সভায় জয় হইল। গ্রন্থের প্রবীনতম অধ্যাপক পক্ষধর মিশ্র একদিন সর্ব্বজন-সমক্ষে আপনার পরাজয় স্বীকার করিয়া নবীনার তরুণ ছাত্রকে বিজয়-মাল্য প্রদান করিলেন। সেই দিন হইতে গ্রন্থের চরম উপাধিদানে মিথিলার ক্ষমতা লুপ্ত হইয়া নবদ্বীপের ক্ষমতা স্বীকৃত হইল। নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া রঘুনাথ হরিঘোষ নামক জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তির বিস্তীর্ণ গোশালায় চতুষ্পাঠী স্থাপন করিলে বিভিন্ন স্থান হইতে অসংখ্য ছাত্র আসিয়া তাঁহার চতুষ্পাঠী পূর্ণ করিয়া তুলিল। সেই হইতেই বহুজনসমাগম-মুখরিত স্থানকে 'হরিঘোষের গোয়াল' বলা হইয়া থাকে।

রঘুনাথ পরে বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া আপনার প্রতিভার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রধান গ্রন্থ 'চিন্তামণি-দীধিতি' গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের 'চিন্তামণি' গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত হইলেও বিষয়-বস্তুর নূতনত্বে ও যুক্তিজাল-বিন্যাসের অভিনবত্বে তাহা সুধীসমাজে ন্যায়ের মৌলিক গ্রন্থ হিসাবেই গৃহীত হইয়াছে। খোতন-নির্দ্দেশিত দৃষ্টিভঙ্গী হইতে তাঁহার গ্রন্থ-বর্ণন একেবারেই স্বতন্ত্র। এই হিসাবে ইহার নাম নব্য ন্যায়। সূক্ষ্ম বিচার-বিতর্কের ভিত্তি দিয়া নব্যন্যায় অধিষ্ঠিত। নবীনায় এই নব্যন্যায়ের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ এবং অন্যান্য দিকে নবীনার প্রাধান্যই আলোচ্য হইয়াছে।

বাসুদেব সার্ব্বভৌম হইতে নবীনার তথা বাংলার ন্যায়ের সূত্রপাত, রঘুনাথ কর্ত্তৃক ইহার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত। রঘুনাথের পর হইতে কত যে টীকাকী নৈয়ায়িক অধ্যাপক নবীনায় আবির্ভূত হইয়া এই সুবর্ণময় শাস্ত্রে আপনাপন প্রতিভার পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা বলিয়া ফুরাইবার নহে।

সার্ব্বভৌমের ছাত্র হরিনাথ ন্যায়ালঙ্কার ন্যায়শাস্ত্রের কয়েকখানি মৌলিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। 'কুসুমাঞ্জলি'র 'আলোক' নামে একখানি টীকা প্রণয়ন করিয়া তিনি কবী হইয়াছেন। রঘুনাথের এক শিষ্য জানকী তর্কভূষণ 'ন্যায়সিদ্ধান্ত-মঞ্জরী' নামে একখানি ন্যায়ের মূল গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। অপর শিষ্য মথুরানাথ তর্কবাগীশ 'চিন্তামণি' ও 'দীধিতির' এমন সহজ সরল টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন বলিয়া প্রচার যে, শিক্ষক অপেক্ষাকৃত ন্যায়ের মত দুরূহ শাস্ত্রেও ইহার সাহায্যে পাণ্ডিত্য লাভ করা যায়। এই টীকা 'মাথুরী' টীকা নামে আখ্যাত।

১৬শ শতকের মধ্যভাগে রামভদ্র সার্ব্বভৌম উদয়নাচার্য্য ও শিরোমণির কয়েকখানি বিভিন্ন ন্যায়গ্রন্থের টীকা প্রণয়ন করিয়া স্বীয় প্রতিভার পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন।

ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের সুবিখ্যাত 'প্রসাদনী টীকা' ন্যায়ের পশ্চিমাঞ্চলে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল। অষ্টাদশ রঘুনন্দন বাচস্পতি, রুদ্রনাথ ন্যায়-বাচস্পতি, দুর্গানাথ ন্যায়বাগীশ, হরিরাম তর্কবাগীশ প্রভৃতি খ্যাতনামা টীকাকী নৈয়ায়িকগণের আবির্ভাবের ফলে করিয়াই আজ হইতে হইল। বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন 'চিন্তামণি' অবলম্বনে "ন্যায়-সিদ্ধান্তের" নামে যে গ্রন্থ

রচনা করেন, তাহা ন্যায়শাস্ত্রের মৌলিক গ্রন্থ হিসাবে গৃহীত হইয়াছে। ইহা ছাড়াও 'সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলী' টীকা, খোতমের ন্যায়সূত্র অবলম্বনে 'ন্যায়সূত্র-বৃত্তি' ও শিরোমণির পদার্থতত্ত্বের 'তত্ত্বালোক' নামক ন্যায় টীকার বিস্তারিত পরিচয় দিয়াছেন। অনন্তর জগদীশ তর্কালঙ্কার ১৭শ শতকের শেষে নবদ্বীপে আবির্ভূত হন। ইঁহার প্রতিভা সম্বন্ধেও বহুপ্রকার কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। অর্থাভাবের নিরন্তর নিষ্পেষণে একাগ্রচিত্তে শাস্ত্র-চর্চ্চার অসুবিধা হয় বলিয়া জগদীশই সর্ব্বপ্রথম পুস্তকাদি গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা করেন। ফলে ধনাঢ্য পুস্তকাগারের অর্থানুকূল্যে নিশ্চিন্তমনে শাস্ত্র-চর্চ্চায় মনোনিবেশ সম্ভব হয়। ইহার কিছু পরে ষোড়শ শতাব্দীশেষে যে সময়ে নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িক, সেই সময়ে মহারাজ রাঘব কৃষ্ণনগরে রাজধানী স্থাপন করিয়া নবদ্বীপে আগমন করতঃ পণ্ডিতদিগের সহিত শাস্ত্রালাপ করিতেন। বহু ব্রাহ্মণপণ্ডিতকে ব্রহ্মোত্তর দান করিয়া বিদ্যোৎসাহী নবদ্বীপাধিপতি উপাধি লাভ করেন।

মহারাজ শিবচন্দ্রের সময়ে একান্ত বিষয়নিস্পৃহ চরিত্র নৈয়ায়িক-শিরোমণি রামরাম তর্কসিদ্ধান্ত নামক বিদ্যোৎসাহী অধ্যাপকের কথা গল্পের বিষয় হইয়া আছে। সভার বাহিরে ধনের মধ্যে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া অধ্যাপনা করিতেন বলিয়া ইঁহাকে লোকে 'গুরো রামনাথ' বলিত। তেঁতুলপাতা-ভক্ষণে পরিতৃপ্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণকে মহারাজা অতি সাধ্য সাধনা করিয়াও বৃত্তিগ্রহণে রাজী করাইতে পারেন নাই।

মিথিলার বাহিরে ন্যায়-চর্চ্চার প্রথম সূত্রপাত ও প্রাধান্য নবদ্বীপে এবং রঘুনাথের পর হইতেই এখানকার এক একজন পণ্ডিত ভারতের মধ্যে ন্যায়ের প্রধান অধ্যাপকের পদ অলঙ্কৃত করিতেছেন। এই প্রাধান্য অদ্যাবধি নবদ্বীপেই সীমাবদ্ধ আছে। ন্যায়ের মধ্যে এই বিষয়ে নবদ্বীপের শ্রেষ্ঠত্ব আজিও অবিসংবাদিত।

শিরোমণির পর হইতে কোন্ কোন্ পণ্ডিত এই প্রধান পদ অলঙ্কৃত করিয়া আসিয়াছেন তাহার ধারাবাহিক ইতিহাস নাই এবং তাহার বিস্তৃত আলোচনাও এখানে সম্ভবপর নহে। ১৮শ শতকের প্রথম ভাগে রামরাম তর্কবাগীশ প্রধান পান, তাহার পর হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত, শঙ্কর তর্কবাগীশ, পরশু তর্কালঙ্কার, শিবনাথ বিদ্যাবাগীশপ্রভৃতি, কাশীনাথ, শ্রীরাম শিরোমণি, রাঘব তর্কসিদ্ধান্ত, গোলক ন্যায়রত্ন, হরমোহন, প্রসন্ন তর্করত্ন প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণের নাম পাওয়া যায়। গোলক ন্যায়রত্নশীর্ষ পাণ্ডিত্যের অসাধারণ খ্যাতি অর্জ্জন করেন ও ইঁহার বহু প্রবাদ ভারতের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। রাজকুলের আশ্রয়ভ্রষ্ট বাঙ্গে লক্ষ্ণৌ-নিবাসী জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তির গুরুপুত্র প্রসন্ন তর্করত্নের টোলে পড়িত। গুরুপুত্রের আহার ও বাসস্থানের ক্রেশ দূরীকরণার্থে তদ্ধ অর্থব্যয়ে ইষ্টকনির্ম্মিত এক প্রকাণ্ড টোল-গৃহ তিনি নির্ম্মাণ করিয়া দেন। ইহাই নবদ্বীপের প্রাচীন পাকা টোল। পরে তর্করত্ন মহাশয়ের উত্তরাধিকারিগণের সহিত টোলের ট্রাষ্টিগণের টোলের স্বত্ব লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইলে, ট্রাষ্টিগণ করিয়া দিয়া ১৮৯৯ খৃঃ স্বতন্ত্র ভাবে নূতন পাকা টোলের প্রতিষ্ঠা করেন।

আধুনিক কালের নৈয়ায়িকগণের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নাম সর্ব্বপ্রথমে উল্লিখিত হয়। ১৮৮৭ খৃঃ মহারাণী ভিক্টোরিয়া সুবর্ণ-জুবিলি উপলক্ষ্যে প্রথমে যে ছয়জন পণ্ডিতকে মহামহোপাধ্যায় উপাধিভূষিত করেন ভুবনমোহন তাঁহাদের অন্যতম। ১৮৯২ খৃঃ হইতে নবদ্বীপে দুইজন ন্যায়ের অধ্যাপককে সর্ব্বদেশেষ্ট হইতে প্রতিবৎসর করিবার ব্যবস্থা হইলে বিদ্যারত্ন মহাশয় সর্ব্বপ্রথম প্রধান নৈয়ায়িকের পদ পাইয়া ১০০৲ টাকা মাসিক বৃত্তি লাভ করেন। ইঁহার ছাত্রদের মধ্যে মঃ মঃ রাম তর্ক সিদ্ধান্তপঞ্চানন, মঃ মঃ কামাখ্যা তর্কবাগীশ, মঃ মঃ সীতারাম ন্যায়াচার্য্য শিরোমণি প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গের নাম করিতে হয়।

মঃ মঃ রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন অতি তেজস্বী ও অসুরপ্রতিম্রাহী ছিলেন।

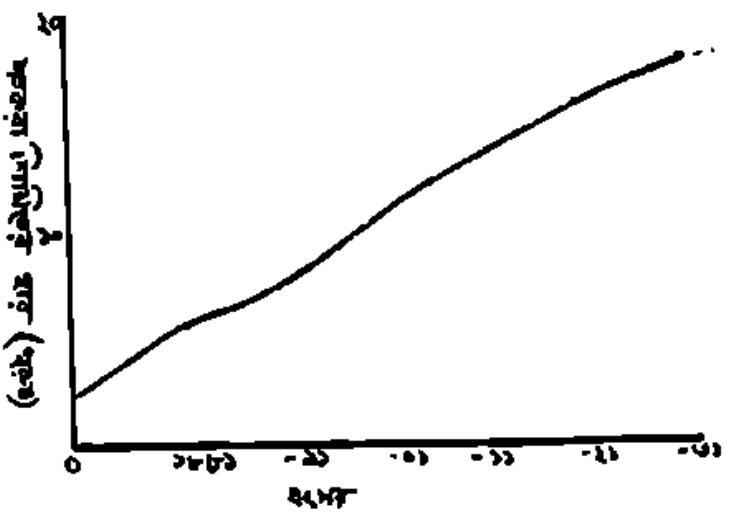

নবদ্বীপ শিক্ষিতের সংখ্যাবৃদ্ধির রেখা (৭২৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

ইঁহার ছাত্র কপিলেশ্বর তর্কবাগীশ, মঃ মঃ রঘুনাথ সার্ব্বভৌমের পর তর্কশেখর মঃ মঃ কামাখ্যা তর্কবাগীশ মহাশয় বহুকাল ধরিয়া ন্যায়ের প্রধান পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। নব্যন্যায়ে তর্কবাগীশ মহাশয়ের মনীষা ও টীকা বিচার বুদ্ধির খ্যাতি আছে। নিয়মানুসারে ন্যায়ের প্রধানের একজন বা একজন পুরণ করিবেনই, তর্কবাগীশ মহাশয়ের পরে আপাততঃ শ্রীচণ্ডীদাস ন্যায়তীর্থ ন্যায়ের প্রধান পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

স্মৃতি—হিন্দু ধর্ম্মের দার্শনিক তত্ত্ব বিশ্লেষণে পণ্ডিতবর্গ যেমন পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন, সামাজিক ও নৈতিক জীবনের ব্যবহারিক বিধিনিষেধের বিচারেও তেমনি চিন্তাশৈলতার প্রমাণ আছে। দেশ-কাল-পাত্রভেদে আচার ধর্ম্মনৈতিক ও সমাজনৈতিক অনুশাসন প্রাচীন কালে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। এই ব্যবহারিক অনুশাসনের নামই বোধ হয় স্মৃতি। স্মৃতিতে বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন সমাজের জন্য যে সকল বিধিনিষেধ লিপিবদ্ধ আছে, তাহাতে সর্ব্বত্র ঐক্য নাই বলিয়া লইয়া পরবর্ত্তী যুগে সমাজ পরিচালনার

ছত্র মীমাংসকের প্রয়োজন হয়। মেধাতিথি, বিজ্ঞানেশ্বর, ভট্টকণ্ঠ, বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি খ্যাতনামা পণ্ডিতের নাম এই সূত্রে উল্লেখ করিতে পারা যায়। পরে ১৬শ শতকে নবদ্বীপে রঘুনন্দন উদ্ভূত হইয়া সমগ্র স্মৃতিশাস্ত্র মন্থন করিয়া বিরাট মীমাংসা গ্রন্থ রচনা করেন।

প্রাচীন স্মৃতির প্রত্যেক ধারাটি তিনি তীক্ষ্ণ বিচার বুদ্ধি দ্বারা সমালোচনা করিয়া গ্রহণ বা বর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার সেই মীমাংসাই সমগ্র বঙ্গে অদ্যাবধি পূজিত হইয়া আসিতেছে। স্মার্ত্ত বলিতে একমাত্র রঘুনন্দনকেই বুঝায়। রঘুনন্দনের পর হইতে স্মৃতিশাস্ত্রের নবদ্বীপের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। সমগ্র বাঙ্গালায় হিন্দু সমাজের যে কোন সামাজিক বা ধর্ম্মসংক্রান্ত সমস্যার নবদ্বীপের পণ্ডিত স্থান সর্ব্বপ্রথমে। ১৮শ শতকের প্রথমে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার স্মার্ত্ত গোপাল ন্যায়পঞ্চানন তাঁহার দ্বারা রাজবল্লভের বিধবা কন্যার বিবাহে বাধা দিয়া বসিতে বেন নাই। পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি নবদ্বীপের স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণ মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্ম মোটেই সুনজরে দেখিতে পারেন নাই বা অনুমোদনও করেন নাই। সুবিখ্যাত স্মার্ত্ত পণ্ডিত রঘুনাথ বিদ্যাসাগর সর্ব্বপ্রথম শ্রীচৈতন্যদেবের অবতারত্ব সপ্রমাণ করিতে গিয়া বহু গ্রন্থ রচনা করেন ও হরিসভা স্থাপন করেন। সম্ভবতঃ ইহাই সর্ব্বপ্রথম হরিভক্তি-প্রচারিণী সভা। গ্রায় শাস্ত্রের মত স্মৃতিশাস্ত্রের একজন স্মার্ত্ত অধ্যাপককে গভর্ণমেণ্ট হইতে বৃত্তি-দানের ব্যবস্থা হইয়াছে। শ্রীত্রিপুরানাথ স্মৃতিতীর্থ বর্ত্তমানে এই বৃত্তিভোগী। ইহা ছাড়া ম: ম: শিরোমণি ভট্টপল্লি, ম: ম: কৃষ্ণনাথ পঞ্চানন, যোগেন্দ্র স্মৃতিতীর্থ প্রভৃতি স্মার্ত্তগণের নাম উল্লেখযোগ্য।

কাব্য—কাব্যেও নবদ্বীপের পণ্ডিতগণের প্রতিভার অনেক পরিচয় আছে। ম: ম: অজিত ন্যায়রত্নের মত অদ্ভুত অন্বিতশক্তিশালী ও বহু-অর্থবোধক সরল রেখ কবিতা মুখে মুখে অনর্গল রচনা করিয়া যাইবার মত প্রতিভাশালী কবি কোন কালে বা দেশেই অধিক জন্মায় না। ইনি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া যান, তন্মধ্যে কাশীখণ্ডের বঙ্গানুবাদ ও নাটোরপণ্ডিতের 'রাজ-সভা' নামক সরল টীকা-গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। বিভিন্ন স্থানে ও বিভিন্ন কালে কত যে বহু-অর্থজ্ঞাপক উদ্ভট শ্লোক তিনি রচনা করিয়াছেন, দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহার সমস্তই প্রায় হারাইয়া গিয়াছে, ২।১টি মাত্র এদিক ওদিক রহিয়া আছে।

জ্যোতিষ—কোন্ সুদূর অতীতকাল হইতে যে নবদ্বীপে জ্যোতিষ-চর্চ্চার সুরু হইয়াছিল তাহার ইতিহাস নাই, তবে লক্ষ্মণসেন দেবের রাজত্ব-কালে এই শাস্ত্রচর্চ্চা যে চরমে উঠিয়াছিল, তাহা জানা যায়। এমন কি লক্ষ্মণ সেনের অব্দের প্রবর্ত্তনের মূলেও এই জ্যোতিষশাস্ত্রের অসাধারণ বিশ্বাস ছিল বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। ১৬শ শতকের শেষে মহাপ্রভুর জন্মের সময়ে নবদ্বীপের সমধিক জ্যোতিষ-চর্চ্চার কথা উল্লেখ আছে। নবদ্বীপ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দ মজুমদার মহাশয়ের উদ্ভবের মূলেও না কি কোন কোন জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী ইঙ্গিত ছিল। জ্যোতিষ-শাস্ত্র চিরদিনই সমাজের ধনী ও রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই দিক্ দিয়া নবদ্বীপাধিপতিগণ যথানুক্রমিক ভাবে জ্যোতিষ শাস্ত্র-চর্চ্চায় যথোচিত উৎসাহ দিয়া আসিতেছেন। ভবানন্দের সভায় রমানন্দ বিদ্যার্ণব নামে একজন অসাধারণ জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতের নাম পাওয়া যায়। জ্যোতিঃসার সংগ্রহ নামে ইহার একখানি সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ আছে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়েই নবদ্বীপ রাজবংশের চরম গৌরবের কাল। উজ্জয়িনীর রাজসভার মহামিহিরের ন্যায় নবদ্বীপের রাজসভার তৎকালে রামকৃষ্ণ বিদ্যানিধির জ্যোতিষিক কীর্ত্তিকলাপের কথা আজিও গল্প হইয়া আছে। বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের ক্রিয়া-কর্ম্ম নির্ব্বাহের নির্দ্দেশক হিসাবে সেকালে একখানি মাত্র পঞ্জিকা গণিত হইত। মুদ্রাযন্ত্রের কল্যাণে ঘরে ঘরে তখন পঞ্জিকা প্রচারের সম্ভাবনা ছিল না। নবদ্বীপ রাজসভার প্রধান জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিত এই পঞ্জিকা গণনা করিতেন এবং সেই অনুসারে সমগ্র দেশে ক্রিয়া-কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইত। পঞ্জিকা-গণনায় নবদ্বীপ পণ্ডিতগণের প্রাধান্য অদ্যাবধি স্বীকৃত।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পর হইতে যথানুক্রমিক ভাবে এক একজন জ্যোতিষী রাজ-জ্যোতিষী ও বঙ্গের পঞ্জিকাকার হইয়া আসিতেছিলেন, নিম্নে তাঁহাদের তালিকা দিলাম।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র	(১৭২৮ খৃঃ)	পণ্ডিত রামভদ্র বিদ্যানিধি
" শিবচন্দ্র	(১৭৮২ ")	রামকৃষ্ণ বিদ্যানিধি
ঈশ্বরচন্দ্র	(১৭৮৮ ")	প্রাণনাথ বিদ্যানিধি
গিরিশচন্দ্র	(১৮০২ ")	রামময় শিরোমণি
শ্রীশচন্দ্র	(১৮৩২ ")	শ্রীরাম বিদ্যাভূষণ
ষষ্ঠীশচন্দ্র	(১৮৬০ ")	তারিণীচন্দ্র বিদ্যারত্নাকর
দ্বিতীশচন্দ্র	(১৮৭০ ")	দুর্গাদাস বিদ্যারত্ন

এই ভাবে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া বাঙ্গালার জ্যোতির্ব্বিদ্ সমাজে ও পঞ্জিকা-গণনায় নবদ্বীপ রাজবংশের প্রতিপত্তি অপ্রতিহত ছিল, কিন্তু মহারাজ দ্বিতীশ-চন্দ্রের মৃত্যু হইতেই এই প্রথা লুপ্ত হইয়া যায়। ইহা ছাড়া আরও বহু খ্যাতনামা জ্যোতির্ব্বিদ্ নবদ্বীপে আবির্ভূত হইয়া গণিত ও ফলিত জ্যোতিষ শাস্ত্রের উৎকর্ষ বিধান করিয়া গিয়াছেন।

আধুনিক ঘটিকা-যন্ত্র আবিষ্কারের বহু পূর্ব্বে গোকুলানন্দ বিদ্যানিধি সচ্ছিদ্র তাম্রপাত্রে উহা পারদ পূরিয়া একপ্রকার সূক্ষ্ম সময়-নির্ণয়ের যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

নবদ্বীপের সংস্কৃত চর্চ্চার ইহাই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। অন্যই যাহা, অতি সামান্য কয়েকজন প্রখ্যাতনামা পণ্ডিতের নামোল্লেখ মাত্র করিলাম। ইহা ছাড়া আরও অল্পসংখ্যক উচ্চশ্রেণীর অধ্যাপক বিভিন্ন কালে নবদ্বীপের আবির্ভূত হইয়া জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চ্চায় আপনাপন প্রতিভার পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। নবদ্বীপ সংস্কৃতচর্চ্চার প্রধান কেন্দ্র হইলেও পূর্ব্বস্থলী, বিল্বপুষ্করিণী, পাতিপুর, উলা, রাণাঘাট প্রভৃতি স্থানেও সংস্কৃত-চর্চ্চার বিশেষ প্রতিপত্তি আছে, বাহুল্যভয়ে তাহার বিশদ বর্ণনা দিলাম না। নবদ্বীপে দুইখানি ন্যায়ের টোল ও স্মৃতির টোল বর্ত্তমানে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত এখানে ৬ খানি ন্যায়ের, ৪ খানি

স্থিতি ও ধানি কাঞ্চা-ব্যাকরণাদির চতুষ্পাঠী বিদ্যোৎসাহী জনসাধারণের ও রাজবৃত্তি, ভূমিদত্ত বৃত্তি প্রভৃতির অর্থানুকূল্যে পরিচালিত হইতেছে।

ইংরাজী শিক্ষা—এতক্ষণ পর্যন্ত নদীয়ার সংস্কৃত বিদ্যার যে প্রভাব প্রতিপত্তির কথা উল্লেখ করিলাম, পাণ্ডিত্যের গভীরতায় তাহা প্রশংসনীয় হইলেও জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক ভাবে ইহারা বিদ্যাচর্চ্চার কোনও প্রসার তখন ঘটিতে পারে নাই। হিন্দু পাণ্ডিত্যের জ্ঞান চর্চ্চায় অধিকারীভেদ স্বীকৃত হওয়ায় ব্রাহ্মণেতর জাতি ও নিম্নবর্ণের মধ্যে প্রাচীন কালে বিদ্যাচর্চ্চার বিশেষ কোন ব্যবস্থাই বোধ হয় ছিল না। তবে ইহা উচ্চ-বিদ্যা সম্বন্ধেই বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য, তৎসামান্য প্রাথমিক শিক্ষা গ্রামে গ্রামে বিভিন্ন পাঠশালাতেই নির্ব্বাহ হইত। যাহা হউক, পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়াই জ্ঞানচর্চ্চায় প্রত্যেকের সমানাধিকার স্বীকৃত হইবার পর হইতে সমগ্র দেশ মাতিয়া ব্যাপক ভাবে বর্ত্তমান পাশ্চাত্য পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষা-বিস্তারের আন্দোলন আরম্ভ হইল। এই মহদুদ্যমের সূচনাতেও নদীয়া পশ্চাদ্‌পদ থাকে নাই। জাতীয় জীবনের মহাসন্ধিক্ষণে সার্ব্বজনীন জ্ঞানানুশীলন ও পাশ্চাত্য ভাবধারা আহরণ করিয়া আমিরা বর্ত্তমান কালের নদীয়া তাহার শিক্ষার গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। ১৮১২ খৃঃ যখন প্রথম সেন্সাস গৃহীত হয়, সে সময় এই জেলায় শিক্ষায়তন ও শিক্ষিতের সংখ্যা সম্বন্ধে বিশেষ কোন বিবরণই পাওয়া যায় নাই। তাহার পর হইতে প্রত্যেক সেন্সাসে নদীয়া শিক্ষায় যে ভাবে বর্দ্ধিত হইয়া চলিয়াছে, তাহার একটি গ্রাফ-চিত্র দেওয়া হইল।

১৮৩৬ খৃঃ সমগ্র জেলায় সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষায়তনে মোট সংখ্যা ছিল মাত্র ১৯টি, কিন্তু অতল্প কালের মধ্যেই অসংখ্য বিদ্যালয় বাড়িয়া উঠিয়া নদীয়ার বিদ্যোৎসাহিতায় পরিচয় দিয়াছে। ১৮৮৪ খৃঃ মোট বিদ্যালয়ের সংখ্যা হয় ৮৭৩টি; ১৯০৪ খৃঃ ১১৭৫টি এবং এই ভাবে বাড়িতে বাড়িতে বর্ত্তমানে (১৯৩০-৩১ খৃঃ) ইহার সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১৮২৪।

জনসাধারণের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে এই প্রকার শিক্ষা-বিস্তারের ফল সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখা যায়, এখানে হিন্দু শতকরা ১১·২ ও মুসলমান ৪·৩ মাত্র শিক্ষিত। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে শিক্ষার প্রসার সাধারণ ভাবেও ধীরে ধীরে এই সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। বেথুন সাহেবের সহযোগিতায় অন্য স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনের যাঁহারা চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন তন্মধ্যে নদীয়ার (চুয়াডাঙ্গা তৎকালে নদীয়ার অন্তর্গত ছিল) অক্ষয় কুমার দত্ত ও মদনমোহন তর্কালঙ্কারের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। মদনমোহনই সর্ব্বপ্রথম তাঁহার কন্যাকে উচ্চশিক্ষালাভার্থে কলিকাতার বেথুন স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে নদীয়ার হিন্দু সমাজে শিক্ষিতা স্ত্রীলোকের সংখ্যা শতকরা ৩·২ ও মুসলমান সমাজে ·৩ মাত্র।

উচ্চ শিক্ষায়তনের মধ্যে কৃষ্ণনগর কলেজ বাংলার প্রাচীনতম কলেজ-গুলির অন্যতম। ১৮৪৫ খৃঃ এই কলেজ প্রথম স্থাপিত হয়। বর্ত্তমানে যে প্রাসাদোপম অট্টালিকায় কলেজ প্রতিষ্ঠিত, তাহা নির্ম্মিত হয় ১৮৪৬ খৃঃ। পূর্ব্বে যেখানে কলেজ ছিল, কৃষ্ণনগরে এখনও সে স্থানকে পুরাতন কলেজের হাতা বলে। বর্ত্তমান কলেজ-পুষ্টি নদীয়ারাজ ও কাশিম-বাজারাধিপতি প্রদত্ত একশত বিঘা জমির উপর ৯১,৫১৯ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত হয় এবং উক্ত টাকার মধ্যে ১৩,০০০, টাকা স্থানীয় ভূম্যধিকারিগণ উঠাইয়া দেন। ইহা ছাড়া অনেকগুলি ফ্রি-ষ্টুডেন্টশিপ, বৃত্তি, পুরস্কার প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া নদীয়া মুসলমানগণ উচ্চশিক্ষা-প্রসারে যথোচিত উৎসাহ দিয়াছেন। অর্থাভাবনিবন্ধন ১৮৭১ খৃঃ তদানীন্তন লেপ্টেনাণ্ট গভর্ণর স্যর জর্জ্জ ক্যাম্পবেল এই কলেজ হইতে B. A. ক্লাস উঠাইয়া দিয়া মাত্র F. A. পর্য্যন্ত রাখেন। পরে নদীয়াবাসিগণ চেষ্টা করিয়া আরও

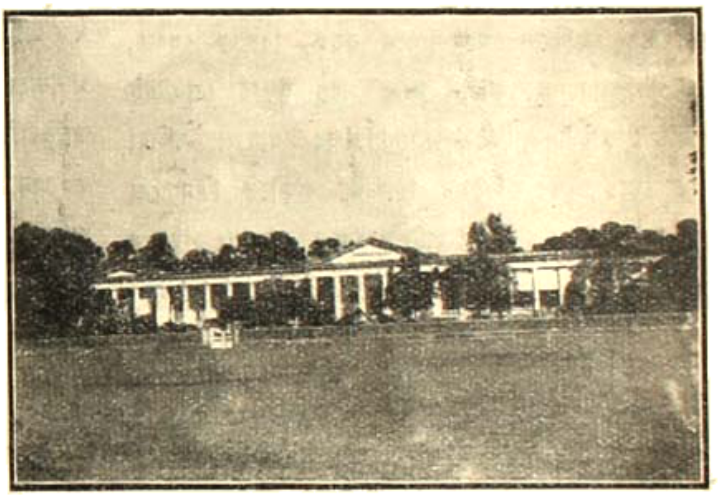

কৃষ্ণনগর কলেজ।

নয়ন ৩০০০০ টাকা তুলিয়া দিলে ১৮৭৫ খৃঃ পুনঃ B. A. ক্লাস খুলিবার অনুমতি দেন। ইহার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের নব-প্রবর্ত্তিত আইনানুসারে এই কলেজ অনুমোদিত হয় এবং B. A. ও B. Sc. বিভাগ খুলিবার ব্যবস্থা হয়। পূর্ব্বে কলেজের হিন্দু হোষ্টেল দূরে এক ভাড়া বাড়ীতে অবস্থিত ছিল, বর্ত্তমানে কলেজের প্রাঙ্গনের মধ্যেই একটি বিরাট ছাত্রবাস নির্ম্মিত হইয়া বিদেশাগত ছাত্রদের অসুবিধা দূর করিয়াছে। একটি মুসলমান ছাত্রাবাসও এই প্রাঙ্গনের মধ্যে সম্প্রতি নির্ম্মিত হইয়াছে। কৃষ্ণনগরে নদীয়ার গবর্ণমেণ্ট উচ্চ-বিদ্যালয়টি বর্ত্তমানে মনমোহন ঘোষ মহাশয়ের বিরাট প্রাসাদে প্রতিষ্ঠিত। এত বড় সুদৃশ্য ও সুদৃঢ় স্কুল-ভবন সচরাচর আর চোখেও পড়ে না।

বর্ত্তমানে নদীয়ার বহুস্থানে নিরক্ষরতা দূরীকরণার্থে ব্যাপক অভিযান আরম্ভ হইয়াছে। আশা করা যায়, শীঘ্রই এদেশ হইতে নিরক্ষরতার কলঙ্ককে বিলুপ্ত হইবে। অবশ্য তাহার পরিণামে কি দাঁড়াইবে, সে আলোচনার বাহির সুবিধাপেক্ষ।

আদর্শের বিপর্য্যয়

—শ্রী মেঘেন্দ্রলাল রায়

৬

প্রায় সাত আট দিন শ্রীহারিকা শ্যামবাজারে কাকার বাটীতে আছে। এই সাত আট দিনেই সে সকলের প্রিয় হইয়াছে। সে এত ভোরে সকলের চা টোষ্ট ডিম সিদ্ধ করিয়া দেয় যে, বাটীতে কখনও কালেই তাহা হইত না। শশধর সাধারণতঃ ভোরবেলা ভ্রমণে বাহির হইতেন। কিন্তু আগে প্রাতে চা হইত না, রুটী ডিম চা খাইয়া তোজ দুই আনা পয়সা খরচ করিতে মনে মনে বড়ই বিরক্তি হইত, কিন্তু গৃহবিবাদ অপেক্ষা দুই আনা খরচ করাই শ্রেয় এই জ্ঞানে চুপ করিয়া থাকিতেন। রান্নাঘর খারাপ বলিয়া কেহই তথায় প্রবেশ করিতেন না, অথচ বাড়ীতে তিন বৌ বিরাজমান। পাচক ব্রাহ্মণ বাটীতে আছে, সুতরাং রান্না যে সুবিধা হইত না এ বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না।

রামনারায়ণ ঠাকুর অনেক দিন হইতে শশধরের বাটীতে আছে। খুব বিশ্বাসী, খুবই দেখে শোনে, কিন্তু ইহাও পাড়াতে কিংবদন্তী আছে যে, ভাঁড়ারের চাবি রামনারায়ণের হাতে থাকায় শশধরের ভাঁড়ার হইতে মরদা, ঘি, চিনি, তৈল সব হঠাৎ-হঠাৎ অদৃশ্য হয় ও তাহাই মূলধন করিয়া রামনারায়ণ তাহার ভাই শ্যামনারায়ণকে বেশ একটি মুদীর দোকান করিয়া দিয়াছে ও দীর্ঘকাল হইতে শশধরকে ভজাইতেছে, যাহাতে বাড়ীর জন্য মাসকাবারী "চিঠা" তাহার ভ্রাতার দোকানে কাটা হয়। শশধর তাহাতে সম্মত হয় নাই। রামনারায়ণের মুদীখানা চালাইবার প্রক্রিয়া যে শশধর বা ভ্রাতাদের জ্ঞাত ছিল না, তাহা নহে, কিন্তু ঐ গৃহবিবাদের ভয়ে সব নির্ব্বাক্।

শ্রীহারিকা এমন সুন্দর মাছ কুটিয়া ধুইয়া দেয় যে, সকলেই বেশী বেশী মাছ পাইতেছে সে বুদ্ধিমতী, প্রথম দিনই বুঝিয়াছে যে, এ শ্রীরামপুর নয়, কলিকাতা, এখানে মাছের টুকরা বড় হওয়া নীতিবিরুদ্ধ। একটা ডিম-সিদ্ধকে তিন ভাগে ভাগ করিয়া ডালনা রন্ধন করা প্রথা। এই সব টুকী-টাকী সে জানিয়া লইয়াছে। দেড় সের দুধ দুই বেলায় লওয়া হয়, তাহা কি করিয়া দশজনের মধ্যে ভাগ করিয়া লইতে হয়, তাহাও সে জানিয়া লইয়াছে। আধ-ঘন দুধ যে শ্রীরামপুরেই চলিতে পারে, কলিকাতায় চলা সম্ভব নহে, তাহাও বুঝিয়াছে। ভাঁড়ারের চাবি সে লইয়াছে ও অতি সন্তর্পণে তৈল, ঘি খরচ করিতেছে। রান্নাঘরে আসিয়া হয় ত মাছের ঝোল বা আমের অম্বল বা ডালের বড়া দিয়া মোচার ঘণ্ট এই সব রাঁধে। দেখিয়া শুনিয়া রামনারায়ণ প্রমাদ গণিয়াছে। তাহার "ভবিষ্যৎ" ভাল নাই বলিয়া ছুটি চাহিবে ভাবিয়াছিল, কিন্তু যখন শুনিল যে, দিদিমণি শীঘ্রই চলিয়া যাইবেন, আর দুটীর তাগিদ না দিয়া তখন হইতে দিন গুণিতে আরম্ভ করিয়াছে।

শশধর স্ত্রীকে বলিল, "ওগো এবারে হল কি, আট দশ দিন হয়ে গেল এখনও ত ঠাকুর দোকানের খাতা এনে ধ'রলে না যে তেল, ঘি, চাল, চিনি সব ফুরিয়ে গিয়েছে? হল কি?"

শশধরের স্ত্রী বলিলেন, "বোধ হয় সব জিনিষ এবারে বেশী বেশী আনান হয়েছে।"

শশধর জানিতেন, কিছুই বেশী আনান হয় নাই, কিন্তু গৃহিণী বধূমাতার যে একেবারে সব অপরাধ, এই অপ্রিয় সত্য না বলিয়াই প্রস্থান করিলেন।

নীলাম্বর আজ বলিয়া গিয়াছেন যে, অরুণ, অরুণের মাতা, ভগ্নী, ভগ্নীপতি শ্রীহারিকাকে দেখিতে আসিবেন বেলা পাঁচটায়। শশধরের ভাবিনা জলখাবারের খরচ কম করিয়াও তিন টাকা; সে খরচ এখন কি তাহাকে বহন করিতে হইবে? সে বিষয়ে কিছু না বলিয়া সাড়ে তিনটার সময় আসিবে বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল। বাহিরের ঘর ঝাড়া-পোঁছা হইল।

বেলা প্রায় সাড়ে তিনটার সময় নীলাম্বর ঘর্ম্মাক্ত হইয়া তাহার ভাঙ্গা ছাতা মাথায় দিয়া শশধরের বাড়ীতে পৌঁছিল। সন্দেশ রসগোল্লা ইত্যাদির ভারে সে চলিতে অক্ষম, প্রায়

ছয় টাকার সন্দেশ-মিষ্টি কিনিয়াছে। রামনারায়ণ নীলাম্বরের হাত হইতে তাড়াতাড়ি খাবার লইতে গেল। শশধর বাধা দিয়া নিজেই সব খাবার লইয়া উপরে স্ত্রীকে দিয়া আসিল। শশধর খুব খুশী, তাহার আর খাবারের জন্য এক পয়সাও খরচ করিতে হইবে না, মহা দুশ্চিন্তার হাত হইতে সে রক্ষা পাইয়াছে।

সে বিগুণ উৎসাহে কাজে লাগিয়া গেল। সমস্ত বাড়ীতে সাজ সাজ রব পড়িয়া গেল। যাঁহারা কন্যা দেখিতে আসিতেছেন, তাঁহাদের বালীগঞ্জে বাড়ী, দামী মোটরগাড়ী, টেলিফোন আছে, সুতরাং বিশেষ সম্মান দেখাইতে হইবে। শশধর বলিল,"নীলুরা, একটু আগে খবর দিতে হত, এই কুশন চেয়ার আর সোফাগুলো যে দস্তায় সেকেণ্ড হ্যাণ্ড কিনেছি তার সে ছাপ এখনও লেগে আছে, সারিয়ে সুরিয়ে নিতাম।"

নীলাম্বর বলিল "তাতে কি হয়েছে? কুশন চেয়ার সোফা কতকগুলো এনে ঘরে জড় করলেই হ'ল! ঘর সে রকম বড় হওয়া চাই—যেখানে কুশন চেয়ার সোফাগুলো নিঃশ্বাস নিয়ে বাঁচতে পারে—সারালেও চেয়ার কুশন যেমনানই থাকতো সমান দামেরগোর অভাব।" শশধর নীলাম্বরের কথা শুনিয়া দমিয়া গেল।

সে নীলাম্বরের আচার ব্যবহার, কথাবার্ত্তা সব তাতেই এমন কি একটা দেখে যাহা খোপ দোরস্ত পাঞ্জাবী, চকচকে পাম্প-শু, হীরার আংটির মধ্যে দেখিতে পায় না—কি আশ্চর্য্য। নীলাম্বর ভাল করিয়া দাড়ী কামায় না, কাপড় চোপড় প্রায়ই আধ-ময়লা, জুতোতে হাফ-সোল মারা, ছাতাটির একটা শিক সর্ব্বদা খোলা, পায়ে ধূলা থাকেই—কিন্তু তাহাতেও তাহার চেয়ারা খারাপ মনে হয় না কেন? শশধর বুঝিত না যে, নীলাম্বর দরিদ্র, উপেক্ষিত হইলেও সে সত্য সত্যই অ্যারিষ্টোক্রাট্ অভিজাত, যাহা কোন দিন শশধর তাহার খোপ-দোরস্ত পাঞ্জাবী বা কতকগুলো সোফা বা চেয়ার বা হীরার আংটির সাহায্যে হইতে পারিবে না।

বেলা চারিটা হইয়াছে। শশধরের স্ত্রী নীহারিকাকে কাপড় পরাইতে ও সাজাইতে বসিয়াছেন। তিনি নীহারিকাকে তাঁহার দামী নূতন ধরণের শাড়ী পরাইবেন; নীহারিকা কিছুতেই সে শাড়ী পরিবে না, তাহার মাতার পুরাতন বেনারসী শাড়ী পরিবে জিদ্ ধরিয়া বসিল। তাহাকে জিদের কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, "মা বলেছেন, 'এই কাপড়ই পরিস, যখন তোকে দেখতে আসবে'—মার শুধু শাড়ী তো নয় এর সঙ্গে যে মার আশীর্ব্বাদও মিশিয়ে রয়েছে কাকীমা।" কাকীমা তাকে বুকের নিকটে টানিয়া বলিলেন—"তাই পর মা, মেয়ে নয় ত, সাক্ষাৎ কমলা। পর দিদির বেনারসীই পর।"

মার সজল চক্ষু ও দীর্ঘনিঃশ্বাসের সহিত তাহাকে কলিকাতায় পাঠান, পাঁচুর ঘন ঘন চিঠি "দিদি তুমি যবে আসিবে, আমরা তোমাকে ছাড়িয়া একেবারে থাকিতে পারি না", এমন কি গঙ্গার হাওয়া হাওয়া হয়, বুকুরের, সকল চোখ সব ভীরস্থ হইয়া দেখা দিয়াছে, নীহারিকার মানস মন্দিরে। তাহার চোখে জল আসিল। সে ভাবিল, আজ কোন্ অজ্ঞাত পথে সে যাইবে, তাহারই সূচনায় এই গৃহ মুখরিত, পরক্ষণেই আবার মনে হইল, তাহার বিবাহ হইলে পিতামাতা মুক্তি পাইবেন, মাতাকে প্রতিবেশিনীর নিকটে কঠোর বিদ্রূপ আর সহ্য করিতে হইবে না—পিতার অমন কড়িতুল্য আনন আর তাহার জন্য চিন্তায় ম্লান হইবে না। ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে শশধরের পূজার ঘরে গিয়া নীহারিকা ঠাকুরকে প্রণাম করিল।

বেলা পাঁচটায় সময় শশধরের বাড়ীর সম্মুখে মোটরগাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। গাড়ী হইতে নামিলেন জগত্তারিণী সরকার। অরুণ ও হীরেনবাবু নামিলেন। কিন্তু অরুণের তরুণ পরণে সামান্য দেশী কাপড় ও হাতে বেহ্‌ৎ মামুলী গহনা দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইলেও বড় ভাল লাগিল তাহাদের। জগত্তারিণী জোর করিয়া কন্যাকে সাদাসিধা বেশে লইয়া আসিয়াছেন। যাঁহাদের ওখানে আসিতেছেন তাঁহাদের অবস্থা এমন নহে যে, তাঁহার কন্যার সমতুল্য শাড়ী বা গহনা পরিতে পারেন, এক্ষেত্রে আত্মীয়তা বা সুটুম্বিতা যেখানে করিতে হইবে, সে স্থলে টাকার পার্থক্য না করাই শ্রেয়। কিন্তু এ বিষয়ে বৃদ্ধা জগত্তারিণী বিশেষ সচেতন থাকিলেও আমাদের অধিকাংশ মহিলা এ বিষয়ে নিজেদের প্রাধান্য বজায় রাখিতে বিশেষ যত্নবান্। কাহার স্বামীর কত টাকা আছে বা কত টাকা মাসে রোজগার করেন সেটা শাড়ী ও গহনাতে যাহাতে অতি সহজে প্রমাণ হয়, তাহার ব্যবস্থা অতি সুন্দর রূপেই দৃষ্ট হয়। যে দেশে আত্মীয়বর্গের মধ্যে শতকরা

নিয়ানব্বই জন অত্যন্ত গরীব ও অর্দ্ধাশনভোগী, সে দেশে ইহা বড়ই শোচনীয়।

শশধর ও তাঁহার ভ্রাতারা অভ্যাগতদের যথেষ্ট সমাদর করিল। উপরের ঘরে কন্যা দেখিবার স্থান হইয়াছে। জগত্তারিণী উপরে গিয়া এক দৃষ্টে নীহারিকাকে দেখিলেন। কি সুন্দর রূপ, কি কোঁকড়া চুল, কি অঙ্গ সৌষ্ঠব, কি গায়ের রং, কি নিখুঁৎ মুখ, কি ছোট কপাল, কি পাতলা ঠোঁট, কি টানা টানা চোখ। তিনি আনন্দে তাহাকে চুম্বন করিয়া কোলে লইয়া বলিলেন। বলিলেন, "ডাক ঠাকুর আর অরুণকে।" তাহারা আসিতেই জগত্তারিণী বলিলেন, "আহা নীরু মা এখানে নেই—হয়ত ভয়-টয় পাবে, তাই আমি কোলে করে বসেছি।"—সকলেরই নীহারিকাকে খুব পছন্দ হইল। জগত্তারিণী পুত্রকে হাত ধরিয়া কাছে টানিয়া বলিলেন "খোকা দেখ ভাল করে।" পার্শ্বের ঘর হইতে রমণীকণ্ঠে উত্থিত হাসির রোল শোনা গেল। দেখা হইলে পুরুষরা সব নীচে নামিয়া গেলেন।

জগত্তারিণী তাঁহার স্বামীর সহিত নীরুর ঠাকুর্দ্দার কি রকম ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল তাহারই গল্প করিতে লাগিলেন। শশধরের স্ত্রী আর তাঁহার জায়েদের এগল্প শ্রুতিকটু বোধ হইল। তাঁহারা অবাক্ হইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের বড় ঠাকুর একশ পঁচিশ টাকার কেরাণী, অবস্থা এত খারাপ যে, বাইশ বৎসর ডেলী প্যাসেঞ্জারী করিতেছেন, তাঁদের বাড়ী আসিলে অনেক সময় সাধারণ লোকদের দেওয়ার জন্য যে সস্তা চা রাখা হইয়াছে তাহাই দেওয়া হয়, আবার কোন দিন শশধর বাড়ী না থাকিলে তাহাও জোটে না, সেই বড় ঠাকুরের বাবার গল্প এতক্ষণ চলিতেছে! তাহারা ভাবিয়াছিল যে, ছেলের মা, ছেলের বোন সব বড় বড় গল্প করিবে—যেখানে মোটরগাড়ী বিরাট বাড়ীর কথা, হীরা-জড়োয়া-নেকলেস্ ইত্যাদি গহনার কথা সব বায়োস্কোপের ছবির মতন আনাগোনা করিবে, আর সেই ছবি তাহারা নির্নিমেষ বিস্ময়ে নিরীক্ষণ করিবে, কিন্তু এ কি হইল। এ কি গল্প করিতেছেন বৃদ্ধা? হায় জগত্তারিণী, আপনি খালীগঞ্জে বাড়ী করিলেন, স্বামী আড়াই হাজার টাকার সরকারী চাকুরিয়া ছিলেন, পুত্র-কন্যার প্রবল বন্যায় আক্রান্ত না হইয়া বিশেষ অর্থ আপনার বর্ত্তমান—আপনি এখনও শ্যামদাধর বাবুর কথা বলিতে এত আনন্দ পান? আপনি কি জানেন না যে, টাকাই সব আজকাল? না তাহা বোধ হয় তিনি আজও ঠিক জানেন না। তিনি আগেকার যুগের লোক, যখন হৃদয় ছিল বড়—টাকা এত ভয়াবহ আকারে প্রাধান্য লাভ করে নাই।

নীচের ঘরে পুরুষরা সব বসিয়া আছেন। নীলাম্বর চা খাবার পরিবেশন করিতেছেন। মোটা যজ্ঞোপবীত শুভ্রতায় চক্‌চক্ করিতেছে, শশধরও চা দিতেছেন। নীলাম্বরের সুন্দর সুগঠন চেহারা—মাংসপেশী সব সুদৃঢ় ও সুগোল, এককালে যে শারীরিক ব্যায়াম করিতেন, তাহার লক্ষণ এখনও পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান—বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি হইলেও সুপুরুষ ও মনে হয় যেন যৌবন এখনও অতিক্রম করেন নাই। আজকালকার যুবকের ন্যায় চশমা-শোভিত নহে, দন্তরাজির মধ্যে কীট প্রবেশ করার দন্তকে স্বর্ণ দিয়া রক্ষা করিতে হয় নাই। অরুণ আজ বিশেষ করিয়া নীলাম্বরকে দেখিতেছে। হীরেনবাবু নীলাম্বরকে বলিলেন, "আপনি এত খাটছেন, আমাদের যে লজ্জা করছে।" নীলাম্বর বলিলেন, "না না সে কি, আমার কর্ত্তব্য।" অরুণ এখনও এক দৃষ্টে নীলাম্বরকে দেখিতেছে। তাহার তরুণ হৃদয়ে আজ বড়ই ব্যথা জাগিয়াছে। এই নীলাম্বর বাবুকেই একদিন ভটিনী তাহারই বাড়ীতে "হুইজ দ্যাট ওল্ডফুল (বোকা বৃদ্ধ ব্যক্তিটি কে)" বলিয়াছিল, সে তাহার প্রতিবাদ পর্য্যন্ত করে নাই! সেই কারণে নীলাম্বর হয় ত মনে কতই দুঃখ পাইয়াছেন! কি গভীর মনোব্যথা তাহাকে পুনর্ব্বার খালীগঞ্জে পদার্পণ করিতে বাধা দিয়াছে!

বলা বাহুল্য সকলেরই কন্যা পছন্দ হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, ইহার মধ্যেই অরুণ নীহারিকার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে—পলকে প্রণয়ের ন্যায়। সে ভাবিল, তাই ত কি সুন্দর পবিত্র নম্র চেহারা—নারীর ভূষণ লজ্জা, নিজেকে জাহির করা নহে। সেই লজ্জা যেন নীহারিকার সুন্দর রূপকে অপরূপ শ্রীমণ্ডিত করিয়াছে, বঙ্গ-রমণীর শ্রী লজ্জা—বঙ্গমহিলার গৌরব নারীর লজ্জা, সঙ্কোচ, দ্বিধা।

কেই এ রূপ ত সে দেখে বা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে বা ঘটঘটে স্যাণ্ডাল বা উপানহ-শোভিত-পদ রাসবিহারী আভিনিউ-এ সাজ্ঞা-বিহারী প্রগতির ধ্বজাধারিণী মহিলার মধ্যে দেখে নাই—এ রকম লজ্জাশীলা, নম্র বঙ্গরমণী তবে

এখনও লক্ষ্য করা যায়? বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রমর বা দ্বিজেন্দ্রলালের সরযূ হবে এখনও নিছক কল্পিকল্পনা হয় নাই? অতি আধুনিকদের সাহিত্যে প্রচণ্ড প্রগতি অভিধানের মধ্যেও যে সব বাটিতে মেম শাড়ী-সিঁদুর পরিয়া বধূরূপে বিরাজ করিতেছে, সেই পরিবারেই অরুণের তারা হইলে আদর্শ বর?

কন্যা দেখা হইলে হীরেনবাবু বলিলেন, 'আশীর্ব্বাদের দিন শীঘ্রই ঠিক করা দরকার—এই সপ্তাহেই; আমার মোট এক মাস ছুটি আর আছে—"

নীলাম্বর বলিলেন, "হ্যাঁ নিশ্চয়ই।" সকলে প্রস্থান করিলে শশধর বলিল, "নীলুদা, টাকা-কড়ির কথা সব ঠিক হয়েছে ত?" নীলাম্বর বলিলেন "না, এখনই যাব বালীগঞ্জে।" বলিয়া নীলাম্বর বালীগঞ্জ রওনা হইলেন।

নীলাম্বর বালীগঞ্জের দিকে বড় আসেন নাই। বড় বড় বাড়ী, বাজার, নয়নতৃপ্তিকর বিপণীর শ্রেণী। মহিলারা সব প্রসাধনে, হাস্য-কলরবে ব্যস্ত। যেন সংসার মধুময়, লোকের কোন অভাব কোন দুঃখ নাই। সকলেই সুখী। কিন্তু আসলে অবস্থা ঠিক যে তাহার বিপরীত নীলাম্বর তাহা জানেন না। তিনি জানেন না যে, কত বাড়ী হস্তান্তরিত হইয়াছে, কত বাড়ী দশ বার হাত বদলাইয়া অবাঙ্গালী ধনীর হস্তে স্থায়ী ভাবে গিয়াছে, এমন কি সরকারী ভাল ভাল চাকুরী বা ব্যাঙ্কের মোটা মাহিনার চাকুরী কলিকাতা সহরেই বাঙ্গালী নিজের অযোগ্যতার জন্য আর গ্রহণ করিবার সুযোগ পায় না ও অবাঙ্গালীরা সেই যোগ্যতার জন্য বড় বড় চাকুরী পাইতেছে—রাসবিহারী আভিনিউএ বিরাট বিরাট বাড়ী তাহার সাক্ষ্য দিতেছে—যে বিরাট মোটরগাড়ীতে বাঙ্গালী মহিলা পুরুষ সব হাস্য কলরবে পথ প্রকম্পিত করিয়া প্রাসাদান, হয় ত সে মোটর-গাড়ীও বাঁধা আছে।

নীলাম্বর অরুণের বাড়ীতে আসিতেই হীরেনবাবু আর অরুণ উভয়েই খুব সমাদর করিয়া উপরে লইয়া গেলেন, চা খাবার ইত্যাদি সাদরে খাওয়াইলেন।

নীলাম্বর জগত্তারিণীকে বলিলেন, "আপনি ত জানেন আমার অবস্থা, বাবা—"

জগত্তারিণী বলিলেন, "তোমার কিছু ভাবতে হবে না—তুমি শ্যামাধব বাবুর ছেলে, যা পার তাই মেয়েকে দিও—ধার-দেনা ক'র না, আমার অরুণের কিছু অভাব নেই। আমি চাই সুশ্রী মেয়ে, সৎবংশ, তা একাধারে মেয়ের চেয়ে ভাল কোথায় পাব?"

নীলাম্বর কৃতজ্ঞ হৃদয়ে নমস্কার করিয়া যখন উঠিয়াছেন তখন জগত্তারিণী আবার বলিলেন, "মেয়ে-জামাইকে তুমি বিয়ের জন্য যা দেবে তা আমাদের 'রিটার্ণস্' দেবে কিন্তু—যদিও আমার স্বামী বড় চাকুরে ছিলেন কিন্তু তাঁরা ভাতবংশ, যে প্রথা তাঁর সময়ও ছিল এখনও তা চল্‌ছে—"

তাহার পরের দিন সকালে নীলাম্বর নীহারিকাকে লইয়া বাড়ী ফিরিলেন।

সৌদামিনী ম্লান মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। বাড়ীতে দিদিকে দেখিয়া পাঁচু মনের আনন্দে তড়াক্ করিয়া এক লম্ফ প্রদান করিল। ইঁদুর দিদির হস্ত হইতে পেঁটলা লইল, নীলাম্বরের হাতে বিরাট গয়না চিঁড়ির পুঁটলী, তাহা সৌদামিনী লইলেন। নীলাম্বর বলিলেন, "তুমি মুখ চুন করে দাঁড়িয়ে আছ কেন, কাল দিন পাকলে কাল অরুণকে আশীর্ব্বাদ করব। আমার শীগ্‌গির এক কাপ চা করে দাও, পুরুত ঠাকুরের কাছে যাব দিন দেখাতে, সময় নেই, বিয়ে খুব শীগ্‌গির দিতে হবে।"

সৌদামিনী আনন্দে কাঁদিয়া ফেলিলেন। দিদির নিজের কথা শুনিয়া ইঁদুর ও পাঁচু কোরাসে গান প্রদান করিল, ছোট খোকা মুখে একগাল হাসি, 'দিদি' বলিতে বলিতে হাত বাড়াইয়া নীহারিকার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। এক মুহূর্ত্তে দিদির আগমনে বাড়ীতে আনন্দের স্রোত বহিয়া গেল।

নীলাম্বরের উপরের ঘরে গিয়া প্রবেশ করিতেই পিতার বৃহৎ তৈলচিত্র সম্মুখে পড়িতেই তাঁহার চক্ষু সজল হইয়া আসিল। তাঁহার মনে হইল, আজ তিনি দুঃস্থ, অভাবগ্রস্ত আত্মীয়-স্বজন কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইলেও তাঁহার অমূল্য সম্পত্তি আজও বর্ত্তমান। সে সম্পত্তি তিনি শ্যামাধব বাবুর পুত্র—তাঁহার মুখ হইতে অস্ফুট স্বরে বাহির হইল—"বাবা—বাবা।"

ভটিনীর কথা মাঝে মাঝে আমরা বলিয়াছি বটে, কিন্তু ভটিনীর বিশেষ কিছু খবর এখনও পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

তবে তটিনী দিল্লীতে গিয়াছে ও অরুণকে সেখানে যাইতে অনুরোধ করিয়াছে, এ সংবাদ আমরা জানি। সে দিল্লীতে গিয়াছে পিতামাতার সহিত মনোবিবাদের কারণে। স্থানীয় মহিলা-বিদ্যালয়ে অতি সহজেই সে প্রধান শিক্ষয়িত্রীর কার্য্যে নিযুক্ত হয়। কিন্তু তিন মাস কার্য্য করার পর তাহাকে লইয়া নানা কথার সৃষ্টি হওয়াতে কমিটী বাধ্য হইয়া তটিনীকে কার্য্য হইতে অব্যাহতি দেন। বিপদে পড়িয়া কলিকাতার বন্ধু-বান্ধবীর কাছে অর্থ-সাহায্যের কথা জানায়। এই সময়ে তটিনী লতিকাকে কয় বার পত্র লেখে। লতিকা দুই বার পঞ্চাশ টাকা পাঠাইয়াছিল। কিন্তু এবারে সেও ফিরিয়েছে না—এই সময়ে তটিনী লতিকা মারফৎ অরুণকে দিল্লী যাইতে অনুরোধ করে—তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।

তটিনীর অবশ্য বর্ত্তমানে বিপদ অর্থের দিক্ হইতে নাই। কলেজে তটিনীর অভ্যাস হইয়াছিল পুরুষ মানুষকে লইয়া খেলা করা। তাহার রূপ ছিল অসাধারণ। বয়সও কম ছিল। কথা, চাল-চলন সব অতিমাত্রিক ছিল, সন্দেহপ্রবণ প্রত্যেকটী ছিল তাহার ভাসা-ভাসা জ্ঞানদীপ্ত দুটি বড় বড় চোখ। সব বিষয়ে সে ছিল অতি উগ্র রকমের আধুনিক। সুতরাং এ আহবে যে অনেক পতঙ্গ পুড়িয়াছে ও অনেকের সর্ব্বনাশ হইয়াছে, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। অরুণও সেই আহবে ঝাঁপ দিতে অগ্রসর হইয়াছিল, কিন্তু মাতৃদেবী ও বন্ধু পরেশ, ভগ্নী ও ভগ্নীপতির মিলিত চেষ্টাতে রক্ষা পাইলেও এখনও গোপনে অর্থ-সাহায্য হইতে নিস্তার পাইয়াছে কি না, বলা কঠিন।

বিলাতে আগে "harpies"এর কথা শোনা যাইত। সে মহিলাদের কার্য্য ছিল কোন শাঁসাল ভারতবাসীকে জালে আবদ্ধ করিয়া অর্থ শোষণ করা, এখনও যে নাই, তাহা নহে। আমাদের প্রগতিশীল সমাজেও ক্রমশঃ সেই "harpies" বঙ্গ-রমণীর মধ্যেই দেখা দিয়াছে ও ক্রমেই তাহাদের সংখ্যা যে অধিক হইবে, তাহাতে বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই।

আমাদের এই আখ্যায়িকাতে তটিনী কি রূপে কাহাকে আকৃষ্ট করিল বা কে তাহার বাংলোতে চাঁদিনী রাতে তটিনীর অপরূপ রূপরাশিতে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য সব সুখ বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হইয়াছিল বা তটিনী কি করিয়া তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার কলেজের কোন সুন্দর গৌরবর্ণ যুবকের প্রেমে পড়িল, সে সব ঘটনার বিশ্লেষণ বা বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। যদিও তাহা যুগধর্ম্ম, চিত্তাকর্ষক ও স্নায়ু উত্তেজক। এই রূপ এক একটি ঘটনা হইতে সুদীর্ঘ উপন্যাস লিখিত হয় এবং এই রূপ উপন্যাস পাঠেই আমরা যে বাঙ্গালী বা ভারতবাসী তাহা বিস্মৃত হইতে বসিয়াছি। সুতরাং আমরা এই প্রকার উত্তেজক ঘটনাবলী পরিত্যাগ করিয়া সুসংযত বাঙ্গালী পরিবারের জীর্ণ বাটীতে ফিরিয়া যাইব।

৮

আর বিবাহের মাত্র দশ দিন আছে। নীলাম্বর ভাগ্যবান্, অমন পাত্র পাইয়াছেন। আশীর্ব্বাদ হইয়া গিয়াছে। নীলাম্বর গিনি দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। কিন্তু কম করিয়া অন্ততঃ বেড় দুই হাজার টাকার কমে কিছুতেই হইবে না। সাহেবকে বলিয়া অনেক কষ্টে আফিস হইতে আটশ' টাকা ধার লইয়াছেন। ছোট সাহেব নীলাম্বরকে বড়ই ভাল বাসেন, তিনিও চেষ্টা করিয়া আরও দুই শত টাকা যোগাড় করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু তবুও এক হাজার টাকা আরও দরকার—কোথায় পাইবেন। স্ত্রীর অনেক গহনা আছে, তাহা বেচিলে দামী মোটা মোটা সোনার গহনা, আজকালকার ন্যায় শুধু দর্শনধারী নহে। কিন্তু স্ত্রীর গহনা তিনি কন্যার বিবাহে কিছুতেই গ্রহণ করিবেন না। টাকার ভাবনায় নীলাম্বর পাগলের মত হইয়াছেন। দিনের পর দিন চলিয়া যাইতেছে, টাকার কোন ব্যবস্থা হইতেছে না।

নীলাম্বর এক দিন বড়লোকের ছেলে ছিলেন। কখনও টাকার বড় কষ্ট পান নাই। পুত্র-কন্যা যখন ছোট ছোট, তখন অস্ত্রীয় বন্ধু-বান্ধব যাহার টাকার দরকার হইয়াছে, নীলাম্বরের সাধ্যমত সকলকেই সাহায্য করিয়াছেন। সকলেই নীলাম্বরকে ভাল বাসে। এ বিপদেও ভগবান্ মুখ তুলিয়া চাহিলেন।

তাঁহার পিতৃবন্ধু বৃদ্ধ অঘোর ডাক্তার তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "নীলু, কত টাকার তোমার দরকার?"

নীলাম্বর বলিলেন, "আরও এক হাজার।"

অঘোর ডাক্তার বলিলেন, "এস নিয়ে যাও, তোমার বাবা আমায় একদিন নয়শ' টাকা ধার দিয়েছিলেন। তারপর সে টাকার জন্য যখন হ্যাণ্ডনোট দিতে যাই, তিনি বলেছিলেন

যে, ছাওনোটের কি দরকার, যখন সুবিধে হয় দিও। তোমার মা আমার স্ত্রীকে বলেছিলেন যে, তোমার মেয়ের বিয়ের সময় এই টাকা তোমাকে দিতে। তা আমি এক হাজার টাকা পুরোই দিচ্ছি।"

নীলাম্বর অবাক হইয়া ভগবানের কি অনুগ্রহ তাহাই ভাবিতেছিলেন। অঘোর ডাক্তার বলিলেন, "আজকাল গহনা বেশী দেওয়া রীতি নয়।"

নীলাম্বর বলিলেন, "অরুণার মা ব'লেছেন যে, 'নিরীক্ষণী' হবার পর যেন নীরুর গহনা তিনিশপত্র সব কেনা হয়, তার আগে যেন কিছু না কেনা হয়।'

অঘোর ডাক্তার বলিলেন, "'নিরীক্ষণী' কি?"

নীলাম্বর বলিলেন, "পুরুত ঠাকুর বললেন, তিনিও ঠিক জানেন না, তবে মেয়ে আশীর্ব্বাদ বোধ হয়।"

অঘোর ডাক্তার বলিলেন, "সে যাই হোক্, সে টুকু ত আমরাও বুঝতে পারতাম কিন্তু · ···"

নীলাম্বর বলিলেন, "কি এখন ব্যবস্থা করা যায় তা হলে?"

অঘোর ডাক্তার বলিলেন, "আমার কথা যদি শোন, কলিকাতায় মেয়ে নিয়ে গিয়ে কোন রকমে এই বিয়ে সার, ধার-ধোরের মধ্যে যেও না, এখানে তোমার বাসার একটা নাম-ডাক আছে—অনেক খরচার মধ্যে প'ড়ে যাবে, তোমার ভাই শশধরকে ব'লে তার বাড়ীতেই যদি বিয়ে দিতে পার ভাল হয়, খুব অল্প খরচেই হবে।"

নীলাম্বরের কাছে কথাটা খুবই যুক্তিসঙ্গত বোধ হইল। বাড়ী ফিরিয়া টাকার সমস্যা অনেকটা তিরোহিত হইয়াছে সে কথা স্ত্রীকে জানাইলেন। কিন্তু শশধরের বাড়ীতে নীহারিকার বিবাহ দেওয়ার প্রস্তাব করাতে সৌদামিনী ক্ষুণ্ণ হইলেন। নীলাম্বর বুঝিলেন না স্ত্রী তাঁহার স্বভাবতঃই বাধা হইয়াও এই প্রস্তাবে এত বিরোধিতা করিতেছেন কেন।

নীলাম্বর বলিলেন, "বড়-বৌ অত চ'টছ কেন, দেখি না একবার শশধরকে বলে?" সৌদামিনী কেবল বলিলেন, "তোমার যা ইচ্ছা হয় কর।"

জামাইয়ের কাপড়-চোপড়, রিষ্ট ওয়াচ, ফাউন্টেন পেন, জুতা, ছাতা, জামা সব কিনিয়া আনিতে নীলাম্বর পরের দিন কলিকাতায় যাত্রা করিলেন। ঐ ফাঁকে শশধরের বাড়ীতেও গেলেন। গিয়া শশধরকে সব বলিলেন। শশধর মুখে দেখাইল বটে খুব চিন্তিত হইয়াছে, কিন্তু বলিল, "দেখ নীলু দা এ বাড়ীতে কি বিয়ে হয়? আমাদেরই ফুলোয় না।"

নীলাম্বর বলিলেন, "কেন, তেতালায় দুটো ঘর প্রায় খালিই পড়ে থাকে, দোতালায় একটা ঘর এমনিই হয়েছে, নীচে একটা ঘর দরকার হ'লে ব্যবহার করা যায়, ছাতে তোগুলা দিয়ে দিলেই খাওয়ার ব্যবস্থা হয়। কেন হবে না?"

শশধর বলিল, "কি যে বল নীলু দা তার ঠিক নেই। ঘর খালি কোথায় থাকে যে, ঘর খালি থাকে ব'লছো, সে ঘরে আমার বড় শ্যালক দিন চার পাঁচের মধ্যে স্ত্রী নিয়ে আসছে, সে তিন মাস ছুটী নিয়েছে।"

নীলাম্বর বলিলেন, "তা তিন মাস যখন ছুটি নিয়েছেন, তখন একটা টেলিগ্রাম করে দিলে ত এক সপ্তাহ পরেই আসতে পারেন।"

শশধর প্রশান্ত ভাবে দাড়ী কামাইতে কামাইতে বলিলেন, "তা কি হয় নীলু দা। সব ঠিক—আসবে সে, এখন কি আর টেলিগ্রাফ করা যায়।" তার পর বলিল, "দেখ নীলু দা, সম্পর্ক ত কেউ বড় রাখে না। কিন্তু বিপদ-আপদের সময় সকলেরই এই শশধরকে মনে পড়ে।"

নীলাম্বর দেখিলেন যে, মার্জ্জিত সুমিষ্ট ব্যবহারের মুখোস ভাঙ্গিয়া অন্তর প্রকাশিত হইতেছে। নীলাম্বর মনে মনে বুঝিলেন যে, নীহারিকার এই প্রকার ভাল বিবাহ হইতেছে, তাহাতে শশধর ঈর্ষান্বিত। তিনি আর কিছু বলিলেন না, আফিসে গিয়া বন্ধুবর্গকে দুঃখের কথা জানাইলেন। নীলাম্বরের আফিসে এক পাগলাটে বন্ধু ছিল, সে সাহেবের খুব প্রিয়। জুনিয়র অফিসার, মাসে তই শত টাকা মাহিনা পায়, খিদিরপুরে এক ফ্ল্যাটে থাকে, সে দুঃখ করিয়া বলিল, "নীলু দা, এই কথা, তুমি আমাদের ওখান থেকে মেয়ের বিয়ে দাও—আমার পাশেই একটা ফ্ল্যাট খালি আছে। ঘরে বাড়ী তিনি বড় ব্যবসাদার হ'লেও হরিভক্ত পরম বৈষ্ণব। তিনি তোমার বিপদের কথা শুনলে নিশ্চয়ই বিনা ভাড়ায় দিন দশেকের জন্য বাড়ী ছেড়ে দেবেন। চল আমার সঙ্গে আজই খিদিরপুরে।"

সন্ধ্যার পর আফিসের ফেরৎ সুরেশের সহিত নীলাম্বর খিদিরপুরে গিয়া বাড়ীর কর্ত্তার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

তিনি অসিতুল্য শোক, এক কথায় রাজী হইলেন। সুরেশ বলিল, "নীলু সে তোমার কোন ভাবনা নেই, দাদাকে ব'লে মোটর ট্রান্সপোর্টের বাস্ নিয়ে বৌদি ছেলেপিলেদের এনে ফেলু, এক পয়সা খরচ লাগবে না, টাকার যদি দরকার হয়…"

নীলাম্বর বাধা দিয়া বলিলেন, "না ভাই, টাকার দরকার নেই, যা ব্যবস্থা তুমি…" ইহার মধ্যে সুরেশ অন্যান্য ফ্ল্যাটে সব বন্ধুদের সংবাদ দিয়াছে। অন্যান্য ফ্ল্যাটের ঘর মশায়, প্রাচুর বাবু, কবিরাজ মশায়, যাঁহার বাড়ী তাঁহার পুত্রগণ, মিতাই, গোরাচাঁদ সব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলেরই কি সহানুভূতি।

নীলাম্বর কয়দিন ফ্ল্যাটে থাকেন নাই, তাঁহার সম্মুখে আজ হঠাৎ মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী সমাজের ছবি উদ্ভাসিত হইল।

নীলাম্বর ভাবিলেন, শশধর তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিল, আর সুরেশ, যাহাকে তিনি পাগলাটে বলিয়া মনে করেন, বিদ্রূপ করেন, সেই পাগলই তাঁহার বিপদে সাহায্য করিল।

রাত্রে বাড়ী ফিরিলেন নীলাম্বর। সৌদামিনী অভিমান করিয়া বসিয়া আছেন।

নীহারিকা ঘুমাইয়া গেল।

নীলাম্বর বলিলেন, "খুকী মাকে পাঠিয়ে দাও তো।'

সৌদামিনী আসিয়া বলিলেন, "ডাকছ কেন? আমার কথা ত কিছুই শোন না।"

নীলাম্বর বলিলেন, "কথা শুনি নি কি রকম, কলকাতায় বাড়ী ঠিক ক'রে এলাম। ঠিকই তুমি বলেছিলে শশধরের ওখানে সুবিধা হবে না।"

সৌদামিনীর মুখে হাসি ফুটিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কবে যেতে হবে?"

নীলাম্বর বলিলেন, "এই তিন চারি দিনের মধ্যে।"

বাড়ীতে আনন্দের ধ্বনি পড়িল। ইন্দুর আনন্দের আতিশয্যে পাচুর ঘাড়ে ঝুলিয়া পড়িল। পর মুহূর্তেই পাচু ভাগাযিত হইয়া ইন্দুরের পৃষ্ঠদেশে সজোরে চপেটাঘাত করিল।

নীহারিকা আসিয়া দুই ভাইকে আদর করিয়া ভুলাইল। আচম্বিতে তাহার মনে হইল, আর চারদিন পরেই তাহার ভাইদের এই সব ব্যাপার দেখিবার কাজ তাহার ফুরাইতেছে।

কোথায় কোন্ নূতন কাজে কে তাহাকে লইয়া যাইতেছে? সে কি সে-কার্যের যোগ্যতা অর্জন করিয়াছে?

[ক্রমশঃ

সাহিত্য

…"সাহিত্য" পদটী মূলতঃ 'কর্ম'-বিষয়ক। শব্দের অন্তর দেখিয়া অর্থ নির্ণয় করিবার পদ্ধতি অনুসারে 'সাহিত্য' এই পদটী হইতে বুঝিতে হয় যেটি বাক্য, যে-বাক্যের দ্বারা কোন দ্রব্য অথবা গুণ অথবা কার্যের বিশেষত্বের যোগ রূপের সহিত তাহার অন্তর্নিহিত ভাব এবং তাহার কি সম্বন্ধ, তাহা শ্রোতা অথবা পাঠকের মনে ভাসাইয়া তোলা হয়।" অথবা "কোন দ্রব্য অথবা গুণ অথবা কার্যের বিশেষত্বের কোন রূপের সহিত তাহার অন্তর্নিহিত ভাব এবং তাহার কি সম্বন্ধ, তাহা যে বাক্যের দ্বারা কাহারও মনে প্রকাশ করা হয় সেই বাক্যের নাম "সাহিত্য"। এই হিসাবে 'সাহিত্য' এই পদটী মূলতঃ "কর্ম"-বিষয়ক। সাহিত্য নামক বাক্যে যে দ্রব্য অথবা গ্রন্থে বিদ্যমান থাকে, তাহাও সাহিত্য। এই হিসাবে 'সাহিত্য' পদটী মূলতঃ কর্ম-বিষয়ক হইলেও ব্যবহারে দ্রব্য-বিষয়কও হইতে পারে। অর্থাৎ 'ক্রিয়া'-বিষয়ক হইতে পারে বটে, কিন্তু যে গ্রন্থে অথবা কর্মে 'সাহিত্য' নামক কর্ম বিদ্যমান নাই, সেই দ্রব্য অথবা কর্মকে কোনক্রমেই "সাহিত্য" বলা চলে না।…

নব ম্যাকবেথের বিভীষিকা।

পরশুরাম কুণ্ড-স্নান

—স্বামী ভূমানন্দ

রায় সাহেবের এক নেপালী বন্ধু বল্লভ রায়, আমাদের জন্য ঘাটে অপেক্ষা করিতেছিলেন। আমরা ঘাটে নামিতেই আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া সহরের ভিতরে লইয়া গেলেন। পলিটিক্যাল অফিসারের হেড-ক্লার্ক রজনী বাবু রায় সাহেবের পুরাতন বন্ধু ও স্বদেশবাসী; অতি ভদ্রলোক। ইনিই পূর্ব্বে পাশ প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি সকলকে চা খাইয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। চাতালেরা সকলেই চা-এর নিমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করিলেন। ছোট ছেলে মেয়েরাও তাহাদের সঙ্গে রজনীবাবুর বাসায় গেল। আমরা কয়েকজন মোটরে বসিয়া কমলা লেবুর আস্বাদ আরম্ভ করিলাম। ট্যাক্সি খানার পাশ ছিল না। রজনীবাবুর সাহায্যে শীঘ্রই পাশ পাওয়া গেল। পাশ লইতে জন পিছু ৸৵৯ লাগে, গাড়ীর জন্য স্বতন্ত্র। শুনিলাম, এই আয়টা পরশুরামকুণ্ডে যাইবার রাস্তা মেরামতে প্রতি বৎসর ব্যয় হয়। রায় সাহেবের অন্যান্য বন্ধুরাও আসিয়া দেখা করিলেন। তিনি ফিরিবার সময় তাঁহাদিগের আতিথ্য গ্রহণ করিবেন বলিয়া আশা দিলেন। এদিকে চা খাওয়া শেষ হইলে, সকলে ফিরিয়া আসিয়া মোটরে উঠিল। দুই মোটরে ভরপুর পেট্রল ভরিয়া লইয়া, আমরা প্রায় আড়াইটার সময় সদিয়া হইতে রওনা হইলাম। সদিয়া ডিব্রুগড় হইতে ৭১ মাইল।

মোটর ছাড়িতেই কমলার টুকরীর উপর সকলেরই দৃষ্টি পড়িল কয়েক মিনিটের মধ্যেই টুকরী একদম খালি। বেড় মাইল অগ্রসর হইয়াই কুণ্ডিল নদীর তীরে পৌঁছিলাম। আসাম প্রদেশে একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের কন্যা রুক্মিণীকে শ্রীকৃষ্ণ যখন হরণ করিয়া লইয়া যান, তখন এই নদী পার হইবার সময় রুক্মিণীর কর্ণের কুণ্ডল জলে পড়িয়া যায় ও এই জন্য নদীর নাম হয় কুণ্ডিল। মাচা-বাঁধা ডোঙ্গা নৌকা তখন ওপারে; আমরা কয়েকজন একখানা ছোট নৌকায় উঠিয়া পূর্ব্বেই পার হইয়া গেলাম। পর পারে গিয়া টাটকা শাক, বেগুন, মূলা প্রভৃতি কিনিয়া একটা প্রকাণ্ড শিমুল গাছের তলায় বসিয়া, মোটরের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। এদেশে শিমুল গাছ খুব বেশী, যেমন মোটা, তেমনই লম্বা। অল্পক্ষণ পরেই মোটর আসিয়া পৌঁছিল, আমরাও মোটরে উঠিয়া রওনা হইলাম। ১৪ মাইল চলার পর কাঠের পুলের উপর দিয়া বালিজান নদী পার হইলাম, কেহ কেহ ইহাকে সনপুরা নদীও বলে। এখন শীতকালে উহা নামে মাত্র নদী, জল নাই বলিলেই হয়, কেবল বালি ও পাথরের নুড়িতে ভরা, অর্থাৎ এখন নদীটির তিন ভাগ স্থল ও একভাগ জল। বালিই এ নদীর প্রাণ অর্থাৎ জীবন বলিয়াই, বোধ হয় ইহার নাম বালিজান। নদী পার হইয়াই সনপুরা বাংলা। স্থানটি অতি চমৎকার। চতুর্দ্দিকে অনেক দূর পর্য্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। অনেকগুলি সরকারী কর্ম্মচারী আছেন; পুলিশের ব্যবস্থাও আছে। এইখানেই পাশ দেখাইতে হয়। রায় সাহেব পাশ লইয়া নামিয়া গেলেন, আমি এক বিরাট শিমুল গাছের ছায়ায় বসিয়া থাকিলাম। কর্ম্মচারিগণ আসিয়া আমাদের যা কিছু দেখিবার, দেখিয়া ছাড়িয়া দিলেন। সকলে মোটরে উঠিয়া পুনরায় রওনা হইলাম। বালিজান নদীর তীরে চিপুলিন নামে একটি গ্রাম আছে। গ্রামের নিকটে নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে একটী বিরাট প্রাচীন নগরীর ও তাহার রাজপ্রাসাদ, দেব-মন্দির প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ আছে। প্রবাদ, ইহাই রুক্মিণীর পিতা ভীষ্মক রাজার রাজধানী বিদর্ভনগর ছিল। এদেশে ঐ স্থানকে ভীষ্মকনগর ও কুণ্ডিলপুর বলে। জানি না, এই প্রবাদের আদি সূত্র কোথায়। মহাভারত ও ভাগবতে বিদর্ভনগরের একটি নাম কুণ্ডিননগর, কোনও কোনও পৌরাণিক গ্রন্থে ইহাকে কুণ্ডিনপুর বলিয়াও বর্ণনা আছে। বোধ হয় কুণ্ডিল ও কুণ্ডিন শব্দদ্বয়ের ধ্বন্যাত্মক সাদৃশ্য ধরিয়াই এই প্রবাদের সৃষ্টি। সনপুরা হইতে ৮ মাইল পূর্ব্বে জঙ্গলের ভিতরে ভামেশ্বরী মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে। কাহারও

মতে মন্দিরটি তামার পাতে মোড়া ছিল বলিয়া উহার নাম তাম্রেশ্বরী। কেহ কেহ বলেন মন্দিরে যে দুর্গামূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহারই নাম তাম্রেশ্বরী; তাই লোকে মন্দিরটিকে তাম্রেশ্বরী মায়ীর মন্দির বলে। মন্দিরটি যে প্রাচীন কালের। এখানে পূর্ব্বে নরবলি হইত তাহাই হউক, এই মন্দির বা মূর্ত্তিসমূহের আমাদের নজরে পড়ে নাই, কাজেই দেখা ঘটে নাই। সমস্ত পথে যাত্রীর বাইতেই পারা জঙ্গল—রিজার্ভ ফরেষ্ট। এখানে একখানি ডাক বাংলো ও জঙ্গলী কর্ম্মচারিদিগের থাকিবার উপযুক্ত বাসা, আফিস প্রভৃতি আছে। রিজার্ভ ফরেষ্ট দুই প্রকার, আসামী কাঠের ও টিম্বারের। পাহাড়, টিম্বার ফরেষ্ট। এদিকে যত ফরেষ্ট আছে তাহার এইটিই সর্ব্বাপেক্ষা বড়; ইহার আয়তন ৯২ বর্গ-মাইল। এইখানেই অরণ্যপ্রবেশ আরম্ভ হইল।

এ রকম বিরাট জঙ্গল পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। প্রথম প্রথম গভীর জঙ্গল দেখিতে বেশ লাগিল। রাস্তার দু'ধারে কেবল বড় বড় গাছ, যেন পাল্লা দিয়া আকাশ ছুঁইবার জন্য উর্দ্ধে উঠিতেছে। সূর্য্যের কিরণ পর্য্যন্ত প্রবেশ করিবার উপায় নাই। সমুদয় বনানী নিস্তব্ধ, গম্ভীর। একটি ভ্রমোরার বা পাখী দেখিলাম না, অথবা তাহাদের কোনও শব্দ শুনিতে পাইলাম না। রাস্তায় জনমানব নাই, কেবল আমাদের দুই গাড়ী চলিতেছে। পূর্ব্বে ভাল রাস্তা ছিল না। পায় হাঁটিয়া, পাহাড় জঙ্গল ভাঙ্গিয়া, প্রাণের মায়া বিসর্জ্জন দিয়া তীর্থে যাইতে হইত। এখন মোটর যাওয়ার মত চওড়া রাস্তা হইয়াছে। রাস্তার দু'ধারের ক্ষুদ্র জঙ্গলও কাটিয়া পরিষ্কার করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহার পরেই দু'ধারে ছোট ছোট সহস্র সহস্র কলাগাছের শ্রেণী। গাছের মোচা ও কলা উভয়ই সাদা। কেহ কেহ এই জাতীয় কলাকে রামকলা বলেন। রাত্রে হাতীর দল আসিয়া এই সব কলা গাছ খায়, অবশ্য কোনও চিহ্ন পাইলাম না। একটু ভয় ভয় করিতে লাগিল। ছোট ছেলে মেয়েরাও নিস্তব্ধ ও শঙ্কিত, কাহারও মুখে কথাটি পর্য্যন্ত নাই। দুই তিন মাইল এইরূপ কলাগাছের শ্রেণী বা জঙ্গল চলিল। তাহার পরেই বাঁশের জঙ্গল আরম্ভ হইল। এত বাঁশ কখনও দেখি নাই। বাঁশের ঝাড়গুলি বাংলা দেশের মত পৃথক্ পৃথক্ নয়, প্রায়ই লাগালাগি। হাতীতে তাড়া করিলে নাকি এই বাঁশের ঝাড়ের ভিতরে আশ্রয় লইতে পারিলে নিরাপদ হওয়া যায়, হাতীর বাবারও সাধ্য নাই যে, সেই বাঁশবনে প্রবেশ করে। কয়েক মাইল এই ভাবে যাইতে যাইতে প্রাণ যেন হাঁপাইয়া উঠিল। বনানীর সেই মনোহারিতা নাই, একটু ফাঁকা পাইলে বাঁচি। এই ভাবে আরও কিছু দূর যাইবার পর জঙ্গল শেষ হইল, একটা ফাঁকা জায়গায় আসিয়া পড়িলাম।

এতক্ষণ কাহারও মুখে কথাবার্ত্তা ছিল না। এখন নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিলাম, "এক দণ্ডে খুলে গেল মেঘেদের মুখ"; নানা কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল। দূরে ব্রহ্মপুত্রের শীর্ণ কলেবর দেখা যাইতেছে। নদীর পরপারেই মিশমী পাহাড়শ্রেণী। পাথরের নুড়ির উপর দিয়াই রাস্তা করিয়া দেওয়া হইয়াছে; মোটর সাবধানে চলিতে লাগিল। স্থানটি দেখিলেই মনে হয়, উহা বর্ষাকালে জলমগ্ন থাকে। দূরে বরফের দেওয়াল দেখা গেল। এবার 'অভ্রভেদী ধবল শৃঙ্গ' নয়; একটা বিরাট শ্বেতপ্রাচীর একটানা বহুদূর পর্য্যন্ত পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তৃত। কী সুন্দর দৃশ্য। খোকাবাবু বলিলেন, "ওটা কি"? আমি উত্তর দিলাম—"হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ"। একটা ফটো লওয়া হইল। মোটর পুনরায় অন্য জঙ্গলে প্রবেশ করিল। সাধারণতঃ ইহাকে তেজু ফরেষ্ট বলে। ঠিক একই রকমের জঙ্গল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে তেজু বাংলায় পৌঁছিলাম। একজন কর্ম্মচারী আসিয়া একটি ছোট বাড়ী দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, এই দুইটি ঘর আপনাদের জন্য রিজার্ভড আছে। তেজু পৌঁছিয়াই ডাক বাংলা হইতে অল্প দূরের জঙ্গলের উপর দিয়া দেখি হিমালয়ের একটি তুষার-মণ্ডিত উচ্চ শৃঙ্গের উপর অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের রক্তিম কিরণ পড়িয়াছে। মনে হইতেছে, যেন পাহাড়ের উপর হইতে গিনি সোনা গলিয়া পড়িতেছে। অবাক্ হইয়া সেই সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিলাম। অল্পক্ষণ পরেই সূর্য্যদেব অস্ত গেলেন। সমগ্র পাহাড়টি ক্রমে অস্ত বর্ণ ধারণ করিল। বরফগুলির এখন আর সে রক্তিমাভা নাই, তাহারা বিচ্ছিন্ন ধূসর জটাজালের ন্যায় নূতন শোভা ধারণ করিল, কেবল মাত্র অত্যুচ্চ শৃঙ্গের অগ্রভাগটুকু তখনও ঈষৎ শুভ্র; উহা হরশিরশ্চিত চন্দ্রলেখার ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল—

ক্রমে নৈশ তিমির পর্ব্বতমালার নিম্নদেশ আচ্ছন্ন করিয়া শৃঙ্গগুলি আক্রমণ করিবার জন্য ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিল। অপরূপ দৃশ্য! হঠাৎ বশিষ্ঠ দেবের উপমা মনে পড়িল—

দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী তমালতালীবনরাজিনীলা।

অর্থাৎ কৃষ্ণা যমুনা যেন সপত্নী স্বর্গগঙ্গাকে বহুনিম্নোপরে অবস্থিত দেখিয়া, অবসর বুঝিয়া মহাদেবকে আলিঙ্গন করিলেন। কবি যাহা কল্পনা করিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, আমি তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলাম।

চাকরেরা ইতিমধ্যে মালপত্র নামাইয়া বারান্দায় ফেলিল, মোটর তুফানি গাড়ীকে চলিয়া গেল। দুই ঘরে বিছানা পড়িল। ঘর দুটি ছোট, তুষারধবল মত বড় নয়। তাহার ভিতরেই সামলাইয়া করিয়া লওয়া হইল। দুই বারান্দায় রান্না-বান্না আরম্ভ হইল, আমাদের অ-সবল পাকে পৃথক্। রাস্তার কেনা ও পাওয়া শাক, বেগুন, মূলা প্রভৃতি দিয়া এক তরকারি, ডাল, আর ভাত। সন্ধ্যাবন্দনাদি সারিয়া অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। দূর হইতে বড় আসার মত একটা আওয়াজ শুনিতে পাইলাম। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম নিকটেই তেজু নদী, তাহারই শব্দ। এদেশের অধিকাংশ স্থানেরই দেখিলাম, নদীর নামে স্থানের নামকরণ হয়। রাত্রি ৯ টার মধ্যেই আহারাদি সমাধা করিয়া শুইয়া পড়িলাম।

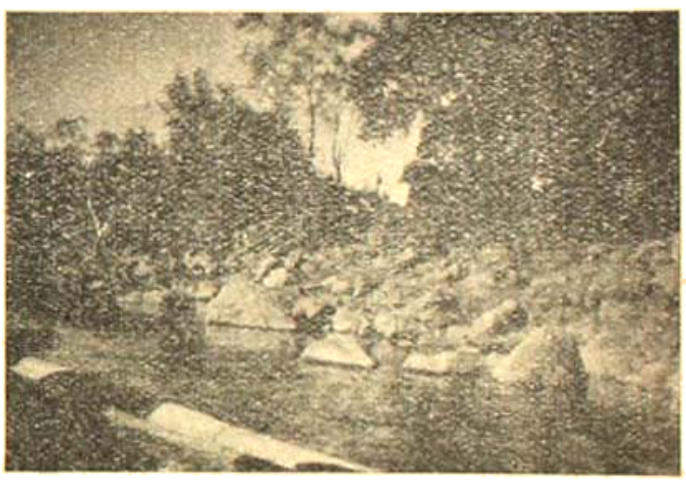

মিশমী খাট।

সকালে উঠিয়াই "সাজ রে সাজ রে সৈন্যগণ ত্বরিতে", পরশুরাম যাইতে হইবে। যাদবপত্নী পূর্ব্ব রাত্রেই প্রাতরাশের সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া শুইয়াছিলেন, কাজেই বেলা আটটার সময়ই ছোট ছেলে-মেয়েদের জন্য ভাতে-ভাত রান্না হইল। অন্য সকলে গোলোযোগ করিয়া, কেহ বা খাইয়া তীর্থ হয় না বলিয়া অযোগ করিয়া, কেহ বা চা-কে খাদ্যের মধ্যে ধরা যায় না বলিয়া একটু কা পান করিয়া, চাকরেরা ও ড্রাইভার দু'জন ভাতপুর খাইয়া, যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইল। গৃহলক্ষ্মী সকলকে খাওয়াইয়া এবং সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসিয়া কি কি রান্না হইবে, তাহারও ব্যবস্থা করিয়া, নিজে সামান্য একটু চা খাইলেন এবং বাহিরের সমস্ত জিনিষপত্র শুদ্ধ উঠাইয়া তালা বন্ধ করিয়া মোটরে উঠিলেন। বেলা প্রায় ১০টার সময় রওনা করিলাম।

তেজু বাংলার এক দিক্ দিয়া পরশুরাম যাইবার রাস্তা, অপর দিক্ দিয়া তিব্বত, চীন, বর্মা প্রভৃতি দেশে যাইবার পথ। আমরা পরশুরামের রাস্তায় চলিলাম। পুনরায় বন-প্রবেশ। রাস্তা সংকীর্ণ, কাঁচা, উঁচু নীচু, কোনও রকমে একখানা মোটর যাইতে পারে। রাস্তা তখনও সম্পূর্ণ মেরামত হয় নাই, কোনও কোনও স্থানে পাহাড়ী কুলিরা কাজ করিতেছে দেখিলাম। অনেকগুলি ছোট ছোট পুলের উপর দিয়া মোটর চলিল। কোথাও বাঁশের পুল, কোথাও কাঠের, কোনও স্থলে শুষ্ক নির্ঝরিণীকে মাটি ও পাথর দিয়া ভরাট করিয়া তাহার উপর বাঁশের ছাঁচা মেলিয়া দেওয়া হইয়াছে; রাস্তার গর্ত্তগুলো তখনও সব ভরাট করা হয় নাই; কাজেই মোটর মাঝে মাঝে লাফাইতে লাগিল। ছোট ছোট পার্ব্বত্য নদী, নালা, খাদ, নির্ঝর, নির্ঝরিণী যে কত পার হইলাম, তাহার ইয়ত্তা নাই। আবার সেই নিস্তব্ধতা। একটা লোহার পুলের নিকটে রাস্তার ধারে কুলিরা কাজ করিতেছে, সিদ্ধনেই শুকনো পাতার ছোট কুঁড়ে। রাত্রের তাহারা এই কুঁড়ের ভিতর থাকে। বন্য তাহাদের সাহস! বাঘ ভল্লুক সাধুকেও দেখিলাম, কেহ পরশুরাম যাইতেছেন, কেহ বা ফিরিতেছেন। মধ্যে মধ্যে গাছে এবার পাখীও দেখিলাম, তবে খুবই কম।

নয় মাইল এই ভাবে চলার পর টমাটে বাংলায় পৌঁছিলাম। ঠিক বাংলা নয়, Subordinates' quarters মাত্র। ছোট

গম, চাংএর উপর। সরকারী কর্মচারীরা কার্যোপলক্ষে এদিকে আসিলে, এই খানেই বিশ্রাম করেন। বাংলার কাছেই মাড়োয়ারীর একখানি ছোট দোকান আছে। এই পর্য্যন্তই মোটর চলে। সকলে নামিলাম। মাড়োয়ারীর দোকানে অপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্র সমস্ত রাখা হইল, কারণ ড্রাইভারেরাও সঙ্গে যাইবে। রায় সাহেবের বন্দোবস্ত চমৎকার; দেখিলাম, ৩খানি ডুলি লইয়া মিশমী কুলিরা প্রস্তুত রহিয়াছে। একখানিতে রায় সাহেবের স্ত্রী উঠিলেন, অপরখানিতে প্রয়োজনমত কেহ (অর্থাৎ রায় সাহেবের পুত্রবধূ, রায় সাহেব নিজে বা আমি) উঠিব, এই রকম ব্যবস্থা হইল।

এদিকের জঙ্গলে ও পাহাড়ে মিশমী নামে এক প্রকার পাহাড়ী জাতি বাস করে। ব্রহ্মপুত্র, ডিং ও ইথুন নদীর উপত্যকাই তাহাদের আদি বাসস্থান। এখন অনেকে সমতলে

মিশমী মেয়ে : ৬পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

আসিয়া বাস করিতেছে, এবং আবর, মিরি, ডাফলি প্রভৃতি অন্য পার্ব্বত্য জাতির সহিত সংমিশ্রণে একটি মিশ্রজাতিতে পরিণত হইয়াছে। আদি মিশমীরা সাধারণতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত, তারাও বা ডিগারু মিশমী, মিজু মিশমী, মিডি বা চুলিকাটা মিশমী এবং মিডু বা বিবিত্রিয়া মিশমী। পূর্ব্বে এ অঞ্চল মিশমী রাজার অধিকারে ছিল। তাঁহাকে ভেট না দিলে কাহারও পরশুরাম যাইবার অধিকার ছিল না। ভেট দিতে হইত, আফিং, লবণ ও দেশলাই। আবর যুদ্ধের পর এ প্রদেশ ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের শাসনে আসিয়াছে, এখন আর ভেট দিতে হয় না। টিমাই হইতে পদব্রজে রওনা হওয়া গেল। অপর ডুলিখানিতে কেহ উঠিল না, সকলের কাপড় চোপড় তাহাতেই বোঝাই দেওয়া হইল। মিশমী কুলিরা ডুলি বহিয়া চলিল; আরও কয়েক জন মিশমী আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিল, উদ্দেশ্য কি, তখন বুঝিতে পারিলাম না। একটা পাথরের নুড়ির নদীর ভিতর দিয়া রাস্তা। কতকগুলি নুড়ি একত্রিত করিয়া দুধারে মধ্যে মধ্যে ঢিবি করা আছে। দুই দিকের ঢিবির মধ্য দিয়া চলিতে হইবে; ইহারই নাম রাস্তা। এক জায়গায় একটা গর্ত্ত ও তাহাতে সামান্য জল ছিল। তাহার উপর দিয়া দুখানা বাঁশ ফেলা আছে, তাহার নাম পুল; অতি সাবধানে তাহার উপর দিয়া চলিলাম। নুড়ির উপর দিয়া চলিতে ভয়ানক পা পিছলাইয়া যায়, কাজেই ধীরে ও অতি সাবধানে চলিতে হইল। ছোট ছেলে-মেয়েরা অবশ্য লাফাইতে লাফাইতেই চলিল, পড়িয়া গেলেও তাহারা হাসে; কি স্ফূর্ত্তি তাহাদের। সর্ব্বাগ্রে রায়-গৃহিণীর ডুলি, ও সর্ব্বপশ্চাতে খালি ডুলি, মধ্যে আমরা। প্রদেশন ক্রমে পূর্ব্ব দিকে চলিল। রাস্তায় নানা রংএর নুড়ি; একটা নুড়ির উপর রোদ পড়িয়াছে। তাহার ভিতর সরকাদ্রের গুঁড়ার মত স্বর্ণরেণু দেখিলাম। এদিকের অনেক নদীতেই এই রকম সোনা-পাথর পাওয়া যায়। সুবনশিরি নদীর বালুকাও স্বর্ণময়, তাই তার নাম সুবর্ণশ্রী। এ প্রদেশের Geological Survey Report-এ এই সোনা-পাথরের উল্লেখ আছে।*

সুবর্ণশ্রীকূলা নদীর কথা বাল্যকালে ভূগোলে পড়িয়াছিলাম, তখন বিশ্বাস করি নাই, কবি-কল্পনা বলিয়াই ঠিক করিয়াছিলাম; এখন সচক্ষেই প্রত্যক্ষ করিলাম। এক টুকরা এই সোনা-পাথর ও এক টুকরা কষ্টিপাথর কুড়াইয়া লইলাম। ক্রমে আমরা একটা উঁচু পাহাড়ের গোড়ায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। পাহাড়টি ঘুরিয়া রাস্তা গিয়াছে। হঠাৎ উপরে চাহিয়া দেখি, পাহাড়ের একটা "ধস্" নামিয়াছে; অর্থাৎ বর্ষার সময় জলের বেগে পাহাড়টির কতক অংশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। পাহাড়ের সেই অংশে দেখি, কে যেন

* "The gravels of many of the rivers contain minute quantities of gold The proportion is greatest in the Subansiri; but even here, the amount is so small that it is unlikely that its extraction could be made a paying proposition. The gold is presumably obtained from gold-bearing quartz veins occurring amongst the metamorphic rocks somewhere in the hills, but the locality is quite unknown".

অনন্ত গোল গোল, পালিশ-করা, সাদা-কালো নুড়ি ওঁজিয়া রাখিয়াছে। যেখানে "ধস্" পাহাড়ের গোড়ায় পড়িয়াছে, সেখানেও দেখিলাম নুড়ির একটা বিরাট স্তূপ; চতুর্দ্দিকে বহু বিচ্ছিন্ন নুড়িও দেখিলাম। বহুকালের একটা ভ্রম সংশোধন হইল। যখন হরিদ্বার ছিলাম, তখন কনখলের নীচে গঙ্গার চরে বহু ছোট বড় নুড়ি দেখিয়াছিলাম। সকলেই বলিল, ও আমিও তখন বিশ্বাস করিয়াছিলাম, টুক্‌রো পাথর পাহাড়ের উপর হইতে জলের বেগে গড়াইতে গড়াইতে আসে, তাহাতেই তাহারা গোল ও পালিশ হইয়া যায়। এখানকার পাহাড়ে "ধস্" নামা ভাবখানা দেখিয়া স্পষ্টই বুঝিলাম, ঐ রকম পালিশ করা গোল নুড়ি দিয়াই পাহাড় গঠিত। কিছুদূর গিয়াই মিশমী ঘাট, কেহ কেহ ইহাকে টিমাই ঘাট বলেন।

নদীটি এখানে সংকীর্ণা, সমস্রোতা, খরস্রোতা, প্রস্তর-বহুলা। কল্ কল্ শব্দে জল চলিতেছে। বড় বড় নুড়ি গুলার মাথা জাগিয়া আছে, ছোটগুলো জলের নীচে, কিন্তু জল এত পরিষ্কার যে, তলের নুড়িগুলাও বেশ দেখা যাইতেছে। কেহ এই নদীকে মিশমী নদী, কেহ টিমাই-নদী বলে; কিন্তু স্বরূপতঃ উহা ব্রহ্মপুত্রই। ধারে ধারে পর্ব্বত-শ্রেণী। ঘাটে পৌঁছিয়া দেখিলাম, অনেকগুলি মিশমী স্ত্রী-পুরুষ দাঁড়াইয়া আছে। প্রত্যেকের মুখে একটি একটি পাইপ। ইহারা অত্যন্ত তামাকপ্রিয়। মেয়েদের মধ্যে অনেকের পিঠে ছেলে বাঁধা। ছেলে কোলে করার ঝামেলা এদেশে নাই। ফটো লইবার জন্য দুই ক্যামেরা নিশানা করিতেই প্রায় সকলে ভয়ে দৌড় দিয়া পলাইয়া গেল। মাত্র তাও জন থাকিল, কেহ কেহ বা পরে ফিরিল। পুরুষগণ অর্দ্ধনগ্ন, চৌদ্দ আনা বলিলেও চলে। শীতকাল বলিয়া নিজেদের তৈয়ারী মোটা জামার মত একটা গায়ে আছে, হাতা নাই, বুক খোলা, হাঁটুর উপর পর্য্যন্ত পড়িয়াছে। কটিদেশে এক টুক্‌রা ছোট কালি কাপড় ঝুলাইয়া দিয়া কোনও রকমে লজ্জা নিবারণ করে মাত্র। মেয়েদের পরণে মোটা কাপড়, হাঁটু পর্য্যন্ত, কাহারও বা হাঁটুর নীচে। শীতকাল বলিয়াই এইরূপ ব্যবস্থা। গ্রীষ্মকালে স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই আচ্ছাদন নামে মাত্র থাকে, তাও বোধ হয় বিদেশীদের জন্যই। চীন-বাসী দিগের চেহারার সঙ্গে ইহাদের চেহারার অনেকটা মিল আছে; আকৃতি খর্ব্ব, রং একটু ময়লা, কাহারও কাহারও রং পীতাভও দেখিলাম। ঘাটের উপর ঘাটওয়ালার দোচালা একখানি কুঁড়ে। পারানি প্রত্যেকের জন্য আট আনা দিতে হয়। গড়পড়তা হিসাব তাহারা বুঝে না, সকলের জন্য হিসাব করিয়া একসঙ্গে নোট বা টাকা দিলে চলিবে না, প্রত্যেকের জন্য একটি করিয়া আধুলি দিতে হইবে। রায় সাহেব এ সংবাদ পূর্ব্বে জানিয়াই অনেকগুলি আধুলি সঙ্গে আনিয়াছিলেন। মানুষ ও আধুলি গণিয়া মাঝিরা মিল করিয়া লইল। রায় সাহেব তাহাদের জন্য কতকগুলি সিগারেটও সঙ্গে আনিয়াছিলেন, কতক তাহাদিগকে দিলেন। যাহারা পলাইয়া গিয়াছিল, তাহারাও তখন আসিয়া জুটিল। মহানন্দে

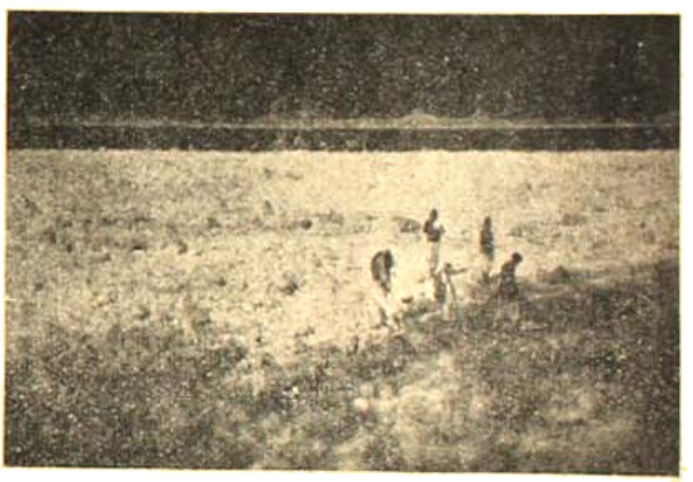

নুড়ি-পূর্ণ নদীগর্ভ।

সকলেই সিগারেট পাইবামাত্র মুখে দিয়া পাইপের আগুনে ধরাইয়া লইল। হাসিয়া হাসিয়া কি সব বলা-কওয়া করিল কিছুই বুঝিলাম না, কেবল ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া মোটের উপর বুঝিলাম, ভারি খুসী। মাঝিরা আমাদিগকে ছোট নৌকায় পার করিয়া নামাইয়া দিল বটে, কিন্তু কূল-কিনারা পাইলাম না। নামিতে হইল নদী-গর্ভেই, বড় বড় নুড়ির উপরে। নুড়ির নীচেই জল; কাজেই অতি সাবধানে এক একখানা নুড়ির মাথায় পা দিয়া, ধীরে ধীরে, হেলিয়া দুলিয়া, লাঠির সাহায্যে ঝোঁক ও টাল সামলাইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। চাকরেরা ছোট ছেলে-মেয়েদের কোলে পিঠে কাঁধে করিয়া লইল। রায়-গৃহিণীকে তাঁহার এক পুত্র হাত ধরিয়া লইয়া

চলিল। অল্প দূর গিয়াই মোটা বালি ও ছোট নুড়ির চরের উপর নামিয়া নিঃশ্বাস ছাড়িলাম, ফাঁড়া কাটিল। কয়েক মিনিট পরেই তীরে উঠিলাম। মেয়েদের পৌঁছিতে একটু দেরী হইল।

সকলে একত্রিত হইয়া পুনরায় হাঁটিতে আরম্ভ করিলাম। আবার জঙ্গল। রাস্তাটি বেশ পরিষ্কার ও সমতল। শুনিলাম, মাত্র কয়েক বৎসর হইল গভর্ণমেণ্ট এই রাস্তা করিয়া দিয়াছেন। পূর্ব্বে রাস্তা ছিল না। সাধু-সন্ন্যাসীরা অতি কষ্টে ও নানা অসুবিধা ভোগ করিয়া তীর্থে যাইতেন, কেহ কেহ বা কালগ্রাসেও পতিত হইতেন। গাছের উপর হইতে এক রকম সাপ না কি ঝাঁপাইয়া পড়িয়া পথিকদিগকে দংশন করিত। নীচে অজস্র ভোঁক একযোগে আক্রমণ করিত। একজন ডাক্তারের নিকট পরে শুনিলাম, ভোঁকের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য একবার তাঁহাকে প্রায় দুই মাইল দৌড়িয়া যাইতে হইয়াছিল। বাঘ, ভালুক, শূকর, হাতী, প্রভৃতি বন্য জন্তুর ভয়ও যথেষ্ট ছিল। পার্ব্বত্য দস্যুরাও মধ্যে মধ্যে লুটপাট করিয়া লইত। এখন ৪ হাত চওড়া পরিষ্কার রাস্তা করা হইয়াছে। রাস্তার দু'ধারে আরও ২০ ফুট করিয়া জঙ্গল একদম সাফ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক বৎসরই বহুযাত্রীর গমনাগমন হওয়ায় বন্য জন্তুরাও দূরে গিয়াছে, চোর-ডাকাতের ভয়ও আর নাই। আমরা এ পর্য্যন্ত একটি জানোয়ারও দেখিলাম না। বনের ভিতরের অংশও তেজু ফরেষ্টের মত অন্ধকারাচ্ছন্নরূপ নয়। নির্ভয়েই চলিতে লাগিলাম। কিছুদূর গিয়া একটা ফাঁকা জায়গায় পড়িলাম। দূরে শীর্ণ ব্রহ্মপুত্র দেখা যাইতেছে। চতুর্দ্দিকে কেবল পাথরের নুড়ি, তাহার উপর দিয়াই রাস্তা। মধ্যে মধ্যে বড় বড় শিমুলগাছ ও কেঁদের ঝোপ। স্থানে স্থানে বড় বড় 'চাপড়ী'। চরের বালি ও পাথরের উপর ঘাস ও জঙ্গল জন্মাইলে সেই অংশকে এ দেশে 'চাপড়ী' বলে। এ সমস্তই বর্ষাকালে ডুবিয়া যায়। খুব বড় বড় নানা রং-এর নুড়ি এক স্থানে কে যেন একত্র করিয়া রাখিয়াছে। একখানা অর্দ্ধমস্ত অর্দ্ধকৃষ্ণ পাথর দেখিয়া তাহার নাম দিলাম হরগৌরী, একজন বলিলেন রাধাকৃষ্ণ। একখানা বড় কাল পাথরের উপর ৪ ইঞ্চি চওড়া একটা সাদা ফিতার মত রেখা দেখিয়া নাম দিলাম দস্তাত্রেয়, শ্বেত রেখাটি তাঁহার পৈতা। ঠিক করিলাম, ফিরিবার সময় কিছু রং বেরং-এর সুন্দর সুন্দর ছোট নুড়ি কুড়াইয়া লইয়া যাইব। একজন কুলি বামদিকের উঁচু পাহাড় দেখাইয়া বুঝাইয়া দিল ঐ খানে মিশমী রাজার বাড়ী। পাহাড়ের মাথার উপর একটা ঝাণ্ডির মত কি দেখাও গেল। মিশমী-পাহাড়ের উপর দিয়া বরফের পাহাড় এখন খুব পরিষ্কার ভাবেই দেখা যাইতে লাগিল এবং অতি নিকটে মনে হইল। ইহার পরেই একটু উঁচুতে উঠিয়া পুনরায় জঙ্গল। হরীতকী ও আমলকীর গাছ অনেক দেখিলাম। দূর হইতে পাকা আমড়ার গন্ধ পাওয়া গেল। নিকটে গিয়া কৌতূহলবশতঃ একটা কুড়াইয়া চাখিয়া দেখা হইল, কুইনাইনের মত তিক্ত। বাজারা ছাড়িল না, কেহ কেহ বেশ আনন্দেই খাইয়া ফেলিল। রায়-পত্নী ডুলি হইতে নামিয়া হাঁটিয়া চলিলেন, ডুলিতে অসহ্য ঝাঁকুনি। আমি উঠিলাম। বাহকেরা দেখিলাম, আমাকে লইয়া বিব্রত ও ক্লান্ত হইয়া পড়িল, কারণ এক মণের পরিবর্ত্তে দুমণে বোঝা চাপিয়াছে। আমাকেও মাথা হেঁট করিয়া থাকিতে হইতেছিল, কারণ মাথার উপরেই বাঁশ বাঁধা : সোজা হইয়া বসিলে আমার মত ৬ ফুট লম্বা লোকের মাথায় বাধে। মাত্র দুই ফারলং গিয়াই বিরক্ত হইয়া নামিয়া পড়িলাম। রায় সাহেবের পুত্রবধূটিও ক্লান্ত হইয়া পূর্ব্বেই অপর ডুলিতে উঠিয়াছিলেন, কিন্তু বেশীক্ষণ থাকিতে না পারিয়া তিনিও নামিয়া পড়িয়া বলিলেন, "সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভাল।" রায় সাহেবের ছোট ছেলে উমানন্দ এক ডুলিতে ও ছোট নাতনী মনু অপর ডুলিতে উঠিল। যতই ঝাঁকুনি লাগে, ততই তাহারা হাসে। দেখিলাম, একটি বিরাট মোটা লতা দুই বৃহৎ বৃক্ষকে আলিঙ্গন করিয়া আছে, তাহার কতক অংশ মাটির কাছে নামিয়াছে। তাহার উপর চড়িয়া একটু দোল খাওয়া গেল। হঠাৎ কতকগুলি উলুকের হুহু হুহু আওয়াজ 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল', সকলেই চমকাইয়া উঠিলাম, কিন্তু একটিও দেখিতে না পাওয়ায় 'নয়ন না তিরপিত ভেল'। পরক্ষণেই ছোট ছেলে-মেয়েরাও হুহু হুহু চীৎকার করিয়া জবাব দিল। এদিকের জঙ্গলে ও পাহাড়ে বহু উলুক বাস করে। মিশমীদের অখাদ্য কোনও পক্ষী বা পশু নাই, কিন্তু তাহারা উলুকের মাংস খায় না ও তাহাদের উপর

কোনও রূপ অত্যাচার করে না, কারণ তাহাদিগের ধর্মসংস্কার অনুসারে উহুকে তাহারা দেবতা জ্ঞানে ভক্তি-শ্রদ্ধা করে। এই জন্য উহুর সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতেছে। সরকারী রিপোর্টে উহুক সম্বন্ধে একটু বিবরণ পাওয়া :—

'The hoolook is sacred to some of the tribes who, as rule, have few scruples as to their food.'

চার মাইল চলা হইয়াছে। রাস্তায় মাইল ও ফার্লং পোষ্ট পোঁতা আছে; অবশ্য পাথর, লালকাঠ বা কংক্রিটের নয়, সরু সরু গাছের ডাল পোঁতা, তাহার উপর টিনের পাতে মাইল ও ফার্লং সংখ্যা লেখা। কিছু দূর অগ্রসর হইতেই জলপ্রপাতের মত একটা শব্দ শুনিতে পাইলাম, বুঝিলাম, আমাদের গন্তব্য, দ্রষ্টব্য ও জ্ঞাতব্য পরশুরামকুণ্ড নিকটবর্ত্তী। ছোটিয়া ছুটিয়া চলিল; আমরা গল্প করিতে করিতে ধীরে ধীরেই চলিতে লাগিলাম। অল্পক্ষণ পরেই তীর্থে পৌঁছিলাম। এ স্থান হিমালয়েরই পাদদেশ, সদিয়া মংকুমার অন্তর্গত। ডিব্রুগড় হইতে আমরা প্রায় ১২০ মাইল আসিলাম।

অন্য তীর্থের মত এখানে দোকান-পাট, সাধু-সন্ন্যাসী ও যাত্রী প্রভৃতির ভীড় নাই, ভীড় কেন, নামগন্ধও নাই বলিলেই হয়। মাত্র ৪।৫টি নবাগত সাধু দেখিলাম, কেহ দশনামী, কেহ রামাউত। তাঁহারাও আমাদেরই মত স্নান করিতেই আসিয়াছেন, পৌষ-সংক্রান্তি পর্য্যন্ত থাকিবেন। স্থানটি অতি মনোরম। সম্মুখে উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী, পাশ দিয়া লৌহিত্য সগর্ব্বে ছুটিয়াছে। দেখিলেই গন্ধমাদনকোলা মনে পড়ে। গঙ্গা যেখানে পর্ব্বতমালা হইতে বহির্গত হইয়া সমতলে আসিয়া নিঃশ্বাস ছাড়িলেন, ঠিক সেই রকম দৃশ্যই আমাদের সম্মুখে। কেহ কেহ এই স্থানকেই ব্রহ্মপুত্রের উৎপত্তি-স্থান বলেন; কিন্তু স্বরূপতঃ তাহা নহে, উৎপত্তি-স্থান বহু দূরে ও বহু উচ্চে। তবে ইহার পর আর যাইবার রাস্তা নাই। ব্রহ্মপুত্রেরই এক অংশ পাহাড়ের একটা ছোট খোনার ভিতরে গিয়াছে, ইহাই পরশুরামকুণ্ড। উপর হইতে ব্রহ্মধারা নামে একটি শুভ্র জল-প্রবাহ, কৃত্রিম ব্রহ্মকুণ্ডের ভিতর দিয়া ঝর ঝর শব্দে পরশুরামকুণ্ডের নীল জলে পড়িতেছে। অবাক্ হইয়া সেই জলধারার দিকে চাহিয়া রহিলাম। শুন শুন করিয়া একটা পুরাতন গানের এক অংশ গাহিতে লাগিলাম—

> জল দেখি যে হিমালে, কার প্রেমে হ'ল অচল
> সদা চলিতেছে অশ্রুজল, কার অনুরাগ বলে,
> কোথায় আছে সে।

পাণ্ডা আসিয়া আমাদিগকে পাকড়াও করিলেন। তিনি বলিলেন, হিমালয়ের ব্রহ্মকুণ্ড হইতে এই জলধারা নামিয়া আসিতেছে বলিয়া ইহার নাম ব্রহ্মধারা। আরও বলিলেন, সেই ব্রহ্মকুণ্ড কোথায় তাহা এ পর্য্যন্ত কেহ দেখে নাই, কারণ উপর দিয়া যাইবার পথ নাই। পরশুরামকুণ্ডের জল বরফের মত ঠাণ্ডা, কিন্তু ব্রহ্মধারার জল ঈষদুষ্ণ, কতকটা শীতকালের কুয়ার জলের মত। কুণ্ডের নীলবর্ণ স্বচ্ছ জলের ভিতরে

দিশমী পাহাড়।

অসংখ্য কালো কালো মাছ খেলা করিতেছে, দেখিতে অনেকটা শৈল বা গজাড় মাছের মত। হরিদ্বারে যেমন ব্রহ্মকুণ্ড প্রভৃতিতে অনেক যাত্রী মাছের ঝাঁকের ভিতরে আটার দলা ফেলিয়া দেয় ও মাছগুলো লাফালাফি করিয়া সেইগুলো ধরিয়া খায়, আমাদেরও সেইরূপ এখানে "মছলী খেলান"র ইচ্ছা হইল, কিন্তু দোকান-পাট না থাকায় সে ইচ্ছাটা পূর্ণ হইল না। কিছুক্ষণ পরে ছোট মেয়েরা পাউরুটি টুকরা করিয়া কতকগুলি জলে ফেলিয়া দিল, মাছে খাইল না। টুকরাগুলো পাক খাইতে খাইতে ক্রমে ব্রহ্মপুত্রের স্রোতে গিয়া পড়িয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। মাছের এই রকম অস্বাভাবিক বৈরাগ্য দেখিয়া সকলেই একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। ব্যাখ্যা করিলাম, এমন তীর্থের জলের মাছ অপবিত্র পাউরুটি স্পর্শ করিবে কেন?

এখন স্নানের পালা। কুণ্ডের জলে স্নানই এ তীর্থে একমাত্র কার্য্য। কোনও বিগ্রহ নাই, কোনরূপ পূজাদির ব্যবস্থাও নাই। থাকিবার জন্য কোনও ধর্ম্মশালা নাই, দোকান-পাট ত নাইই। পৌষ-সংক্রান্তির দিন এখানে একটা সাময়িক মেলা বসে। অনেক সাধু ঐ দিনে স্নান করিবার জন্য পূর্ব্বেই আসিয়া উপস্থিত হন। প্রতি বৎসর প্রায় এক হাজার লোক সমবেত হয়, অধিকাংশই সাধু-সন্ন্যাসী। কয়েক দিনের জন্য একটা দোকান খোলা হয়, তাহাতে চাউল, ডাউল, ছাতু, আটা প্রভৃতি সাধারণ আহার্য্য থাকে। কোনও কোনও মাড়োয়ারী ঐ সময় সাধুদিগকে ভাণ্ডারাও দেন। একটা থাকিবার মত আশ্রয়-স্থানও তখন তৈয়ারী করা হয়, কিন্তু তাহাতে সঙ্কুলান হয় না, আগুন জ্বালিয়া অনেক সাধুকেই বাহিরে রাত্রি কাটাইতে হয়। দেখিলাম, বেলা প্রায় ১টা, অথচ কুয়াসা সম্পূর্ণ সরিয়া যায় নাই, সূর্য্যদেবও পাহাড়ের বড় বড় গাছের আড়ালে পড়িয়াছেন।

আমি পূর্ব্বেই ঠিক করিয়াছিলাম স্নান করিব না, কুণ্ডের জল স্পর্শ করিব মাত্র, কারণ আমার শরীর তখনও ঠিক সবল হয় নাই। কিন্তু সকলের উদ্যোগ পর্ব্ব দেখিয়া আমারও স্নান স্পৃহা জাগিতে লাগিল। রায় সাহেব অঙ্গে দিয়া অঙ্গে তৈলমর্দ্দন করিতে পরামর্শ দিলেন, তাহাতে না কি ঠাণ্ডা কম লাগে। জানা গেল, খুলিয়া তবে তবে সামান্য তেল লইলাম। রায় সাহেবের মনঃপূত হইল না। তিনি স্বহস্তে জল্ জলে করিয়া আমার বুকে পিঠে তেল মাখাইয়া দিলেন। ৩০ বৎসর পরে গায়ে তেল পড়িল, কেমন যেন বিশ্রী বোধ হইতে লাগিল। যাহা হউক আমিই প্রথমে স্নানে নামিলাম। কুণ্ডটির এমনই একটা গম্ভীর চেহারা যে জলে নামিতে ভয়ই হয়। পাথরের সিঁড়িবাধান ঘাট, সেই সিঁড়ি দিয়া নামিলাম। পূর্ব্বে ঘাট ছিল না, অতি কষ্টে খণ্ড খণ্ড উঁচু নীচু পাথরের উপর দিয়া সাবধানে নামিতে হইত, মধ্যে মধ্যে দুর্ঘটনাও ঘটিত। একজন মাড়োয়ারী ভদ্রলোক এক সময় তাঁহার বৃদ্ধা মাতাকে লইয়া কুণ্ডে স্নান করিতে আসিয়াছিলেন। মাতা অতি কষ্টে পুত্রের সাহায্যে স্নান করিয়া উঠিয়া পুত্রকে বলেন—এত লোক এখানে প্রতি বৎসর স্নান করিতে আসে অথচ দেখিতেছি তাহাদের কষ্টের সীমা নাই; তুমি সকলের সুবিধার জন্য একটি ঘাট বাঁধাইয়া দাও। পুত্র, মাতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া, বহু অর্থব্যয়ে এই ঘাট বাঁধাইয়া দিয়াছেন। ধর্ম্মপ্রাণা মাতা ও মাতৃভক্ত পুত্রটি বহু লোকের আশীর্ব্বাদ-ভাজন হইয়াছেন, হইতেছেন ও হইবেন, সন্দেহ নাই।

ঘাটে নামিয়াই সম্মুখে দেখিলাম, একটি মোটা শিকল দিয়া জলের কতক অংশ ঘেরা। শিকল ছাড়াইয়া কেহ স্নান করিতে যায় না, আরামও লাগেও হয় না; হঠাৎ পা পিছলাইয়া গেলে পাক-জলের মধ্যে পড়িতে হয় না, শিকল ধরিয়া প্রাণ রক্ষা করা যায়। একজন পাণ্ডা আসিয়া স্বস্তি-বাচন ও সঙ্কল্প করাইলেন। "গঙ্গা গঙ্গেতি" বলিয়া মাথায় জলের ছিটা দিয়া ধীরে ও সাবধানে জলে নামিলাম। মনে হইল, করাত দিয়া পা কাটিতেছে, জল বরফের মত ঠাণ্ডা। কাদা পাঁকের বালাই নাই, শুধুই নুড়ি। মাছগুলা নির্ভয়েই গায়ের কাছ দিয়া খেলা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাড়াতাড়ি কোমর পর্য্যন্ত জলে নামিয়া দুই ডুব দিলাম। আমাদেরই একজন উপর হইতে হাঁকিলেন, তিন ডুব দিতে হয়, কাজেই অনিচ্ছায় আর এক ডুবও দিলাম। হাতের আঙ্গুলগুলো আড়ষ্ট হইয়া আসিতে লাগিল, পা দুটো আছে কি না বুঝিতে পারিলাম না। তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলাম। শরীরের চতুর্দ্দিকে যেন ধোঁয়া উড়িতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে শরীরে এমন একটা আরাম বোধ হইতে লাগিল, তাহা বর্ণনাতীত। ব্রহ্মধারার জল পূর্ব্বেই স্পর্শ করিয়া আসিয়াছিলাম, কাজেই আর সেখানে উঠিলাম না। কাপড় ছাড়িয়া গরম জামা-কম্বল গায়ে দিয়া সিঁড়ির উপর একখানা মোটা কম্বলের উপর বসিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আত্মকার্য্য করিতে লাগিলাম।

ইতিপূর্ব্বে অন্যান্য সকলেরও তেল-মাখা শেষ হইল। কেহ কেহ স্নান করিবার জন্য নূতন কাপড় পরিলেন। এখানে একটি প্রথা আছে, স্নানের পর যে কাপড় ছাড়া হয় তাহা মিশমীদিগের প্রাপ্য। এই কাপড়ের লোভেই কয়েকজন মিশমী টিমাই হইতে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিল। রায় সাহেব পূর্ব্ব হইতেই এ ব্যবস্থা জানিতেন এবং সেইজন্য, নিজের, স্ত্রীর, পুত্রবধূর ও বড়মেয়ের জন্য নববস্ত্র সঙ্গেই আনিয়াছিলেন। তাঁহারা নববস্ত্র পরিহিত হইয়া প্রথমে

পরশুরামকুণ্ডে স্নান করিলেন ও উঠিয়াই হি হি করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে, ছোটরা হাসিতে হাসিতে, ব্রহ্মধারার কুণ্ডে গিয়া জল উঠাইয়া মাথায় ঢালিলেন। সকলেই সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, 'বাঃ বেশ জল ত।' কথাটা ঠিকই। বরফ জলে স্নান করিয়া ঝরণার জল ও গরমই বোধ হইবে, গরম ঠাণ্ডা ত আপেক্ষিক। কাপড় ছাড়িয়া, গরম জামা প্রভৃতি গায়ে দিয়া সকলেই আমার চতুঃপার্শ্বে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া করজোড়ে বসিলেন; সমস্বরে গুরুগম্ভীর পাঠ আরম্ভ হইল। পুরুষদিগের মোটা সুরের সঙ্গে ছোট মেয়েদের উচ্চ সরু সুর মিশিয়া এক অভিনব মধুর সুরে স্তোত্র-পাঠ চলিতে লাগিল। উপস্থিত সাধুবর্গ ও মিশনীগণ নির্ব্বাক্ হইয়া আমাদের স্তোত্র-পাঠ শুনিতে লাগিলেন। গম্ভীর নিস্তব্ধতা বিক্ষুব্ধ করিয়া সুর-সঙ্গীত আকাশমার্গে প্রতিধ্বনিত হইল, চতুর্দ্দিকের পর্ব্বতমালাও আমাদিগের সেই অপূর্ব্ব স্তোত্রপাঠে যোগদান করিল এবং প্রতিধ্বনিচ্ছলে বলিতে লাগিল—"তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ"।

স্তোত্রপাঠ সমাপ্ত হইলে পাণ্ডা আসিয়া পরশুরাম-কুণ্ডের মাহাত্ম্য ও পরশুরামের কীর্ত্তি সম্বন্ধে অনেক কথাই রায় সাহেবকে শুনাইতে লাগিলেন। কোথায় পরশুধারা পর্ব্বত বিদীর্ণ করিয়া তাহার ভিতর দিয়া তিনি ব্রহ্মপুত্রকে মর্ত্তালোকে আনিয়াছেন, কুণ্ডের বামদিকে সেই বিদীর্ণ পর্ব্বত দেখাইলেন। কোথায় তাঁহার হাতের কুঠার ঘসিয়া পড়িয়াছিল, কোথায় তিনি আরও কি কি করিয়াছিলেন, আরও কত হাতগড়া, মনগড়া, আজগুবি গল্প শুনাইতে লাগিলেন। এ তীর্থে ব্রাহ্মণকে দান করিলে অক্ষয় স্বর্গলাভ হয় তাহাও বিশেষ করিয়া বুঝাইতে লাগিলেন। পূর্ব্বে এখানে আসিয়া কে কি-রকম দান করিয়া গিয়াছেন তাহাও বলিলেন। আমি সে দিকে বিশেষ কর্ণপাত না করিয়া, ব্রহ্মপুত্র সম্বন্ধে যে সমস্ত পৌরাণিক আখ্যায়িকা পড়িয়াছিলাম, তাহা চিন্তা করিতে লাগিলাম।

ব্রহ্মপুত্রের উৎপত্তি ও মর্ত্তালোকে অবতরণ সম্বন্ধে নানা-প্রকার ইতিবৃত্ত আছে। পুরাকালে শান্তনু নামে একজন মুনি ছিলেন, তাঁহার স্ত্রীর নাম অমোঘা। তাঁহারা হিমালয়ের অন্তর্গত কৈলাস পর্ব্বতে "লোহিত" সরোবরের তীরে আশ্রমে থাকিয়া তপস্যা করিতেন। সরোবরের অপর দিকে গন্ধমাদন পর্ব্বত—

তয়া সার্দ্ধং স কৈলাসসরোলোহিতপর্ব্বতেঽবসৎ
লোহিতাখ্যস্য সরসস্তীরে বৈ গন্ধমাদনে।

এক সময় স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা, দেবকার্য্য ও জগতের মঙ্গলের জন্য ঔর্দ্ধ্বরেতরণ প্রয়োজন, চিন্তা করিলেন। তাহার ফলে শান্তনু মুনি ঊর্দ্ধ্বরেতঃ ধারণ করিয়া, উহা স্বীয় পত্নী অমোঘার সংক্রামিত করিলেন। কালে অমোঘ ব্রহ্মতেজ অমোঘার গর্ভ হইতে জলরাশি সহ পুত্ররূপে ভূমিষ্ঠ হইল। পুত্রটি পীতবাস-পরিহিত,

ছোট ঝরণা, ঘুরে চলে গেছে পাহাড়

চতুর্ভুজ ও ব্রহ্মার ন্যায় ত্রিনেত্রবিশিষ্ট। শান্তনু, সদ্যোজাত জলমধ্যস্থ সেই ব্রহ্মনন্দনকে তাহার আশ্রয়ভূত জলের সহিত হিমালয়ের চারিটি পর্ব্বতের মধ্যস্থিত একটি কুণ্ডে স্থাপন করেন। কুণ্ডের উত্তরে কৈলাস, দক্ষিণে গন্ধমাদন, পশ্চিমে জারুধি ও পূর্ব্বে সংবর্ত্তক—

তং জাতক তপাভূতং শান্তনুর্লোকশান্তনুঃ
চতুর্ণাং পর্ব্বতানাঞ্চ মধ্যদেশে ন্যবেশয়ৎ।
কৈলাসোত্তরতো যাম্যে দক্ষিণে গন্ধমাদনঃ
জারুধিঃ পশ্চিমে শৈলঃ পূর্ব্বে সংবর্ত্তকাহ্বয়ঃ।

শিশু ঐ কুণ্ডে ক্রমে ক্রমে স্বয়ংই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। যথাকালে ব্রহ্মা পুত্রসমীপে আগমন করিয়া সংস্কার দ্বারা শিশুর দেহের আশ্রয় জলরাশির শুদ্ধি বিধান করিলেন। কালে ঐ

পুত্র জলস্বরূপে পঞ্চ যোজন বিস্তৃতি লাভ করে। দেবগণ ঐ মানসোপম সরোবরে স্নান করিতেন ও উহার পবিত্র, নির্ম্মল, সুমিষ্ট, স্নিগ্ধজল পান করিতেন। এইভাবে ঐ সরোবর একটি পুণ্যতম মহাতীর্থে পরিণত হয় ও উহা ব্রহ্মকুণ্ড নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। কাহারও মতে ইহাই মানস-সরোবর।

পরবর্ত্তী কালে পরশুরাম, পিতা জমদগ্নির আদেশে মাতার শিরশ্ছেদন করেন। অন্য পুত্রগণ ঐ কার্য্য করিতে অস্বীকার করায় জমদগ্নি কুপিত হইয়া তাহাদিগকে অভিশাপ প্রদান করেন ও পরশুরাম পিতৃ আজ্ঞায় মহাপাতকস্বরূপ মাতৃবধ করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না দেখিয়া, পুত্রের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলেন। তদনুসারে পরশুরাম করযোড়ে বিনীতভাবে পিতার নিকট যথাক্রমে ছয়টি বর প্রার্থনা করেন। প্রথমতঃ মাতার পুনর্জ্জীবন, দ্বিতীয়তঃ মাতার নিধনবৃত্তান্ত-বিস্মৃতি, তৃতীয়তঃ ভ্রাতৃবর্গের অভিশাপ মোচন, চতুর্থতঃ নিজের মাতৃবধজনিতপাপ-মুক্তি, পঞ্চমতঃ যুদ্ধে সর্ব্বত্র বিজয় ও ষষ্ঠতঃ কল্পায়ু আয়ু—

ন তু মাতো বরান্ মহ্যং মাতৃহত্যাবধার্হিতঃ
বধস্মারং তথা ভ্রাতৃণাং শাপমোচনম্।
মাতৃহত্যাপমার্জ্জং যুদ্ধে সর্ব্বত্র বৈ জয়ম্
আয়ুঃ কল্পায়ুষঞ্চাপি প্রযাচে নৃপসত্তম।

জমদগ্নি সন্তুষ্ট মনে পাঁচটি বর দিয়া বলিলেন, 'বৎস, বরদ্বারা মাতৃহত্যা-পাপের শান্তি হয় না; অতএব তুমি সর্ব্বপাপহারী ব্রহ্মকুণ্ডে গিয়া তাহার পবিত্র জলে স্নান কর, তাহা হইলেই তুমি শীঘ্রই পাপ-মুক্ত হইয়া ফিরিয়া আসিতে পারিবে। এই উপলক্ষে তোমার দ্বারা জগতেরও সুমহৎ মঙ্গল সাধিত হইবে, অতএব তুমি সত্বরই ব্রহ্মকুণ্ডে প্রস্থান কর—

ন পুত্র বরদানেন মাতৃহত্যাপহন্যতি
তস্মাত্ত্বং ব্রহ্মকুণ্ডস্য পুণ্যে গচ্ছ মাতুর্হ্রদে।
তত্র স্নাত্বা মুক্তপাপো ন চিরাৎ পুনরেষ্যসি
জগদ্ধিতায় পুত্র ত্বং ব্রহ্মকুণ্ডং ব্রজ দ্রুতম্।

পরশুরাম পিতার আদেশানুসারে ব্রহ্মকুণ্ডে গমন করেন ও তাহার জলে স্নান করিয়া মাতৃহত্যা-পাপ হইতে মুক্তিলাভ করেন। অনন্তর ভূতলবাসীদিগের কল্যাণ-কামনায়, পরশুরাম স্বীয় কুঠারদ্বারা পর্ব্বত বিদারণ করিয়া পথ প্রস্তুত করতঃ সেই পথে এই মহাপাতকহারী, সদ্যোমুক্তিপ্রদাতা ব্রহ্মপুত্রকে নির্ম্মাণ করেন—

বীচি পরশুনা কৃত্বা তত্র স্নানফলায়তং

কিন্তু ব্রহ্মপুত্র ব্রহ্মকুণ্ড হইতে বহির্গত হইয়া কৈলাস পর্ব্বতের উপত্যকায় লোহিত সরোবরে বেগে পতিত হইয়া সেইখানেই আবদ্ধ হন। পরশুরাম তদ্দর্শনে নিরুপায় হইয়া প্রথমে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়েন; পরে সরোবরের উচ্চ তীরভূমিতে আরোহণ করিয়া পুনরায় কুঠারদ্বারা পথ নির্ম্মাণ করিয়া, ব্রহ্মপুত্রকে ক্রমে পূর্ব্বদিকে লইয়া যান ও পথিমধ্যে অন্যান্য শৈল-অবরোধ বিদীর্ণ করিয়া উহাকে ভূতলে অবতরণ করাইয়া কামরূপ প্রদেশে প্রবাহিত করেন। পূর্ব্বকালে হিমালয়ের উত্তর-পূর্ব্ব সানুপ্রদেশ হইতে কুচবিহার পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগই কামরূপ নামে প্রসিদ্ধ ছিল। যে স্থলে ব্রহ্মপুত্র প্রথমে ভূতল স্পর্শ করিলেন, সেই স্থানেরই নাম পরশুরামকুণ্ড। ব্রহ্মা স্বয়ং এই নদের নাম রাখিলেন "লোহিত-গঙ্গক।" লোহিত সরোবর হইতে ইহার উৎপত্তি বলিয়া উহা "লৌহিত্য" নামেও অভিহিত হইল এবং ব্রহ্মনন্দন বলিয়া উহার অপর নাম হইল ব্রহ্মপুত্র। ইহাই তিব্বত অঞ্চলে সান্‌পো (Tsanpo) নামে পরিচিত; আবরেরা এই নদীকে সিয়াং ও মিশমীরা ইহাকে দেহু বলে; সরকারী রিপোর্টে ইহার নাম লোহিত-ব্রহ্মপুত্র। ইহাই যমুনা নামে বঙ্গদেশের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া গোয়ালন্দের পশ্চিমে আরিচা নামক স্থানে পদ্মানদীর (Ganges) সহিত মিলিত হইয়াছে। ব্রহ্মপুত্র দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৮০০ মাইল।

আসাম গবর্ণমেণ্টের সার্ভে রিপোর্টে (Survey Report) ব্রহ্মপুত্রের উৎপত্তি ও গতি সম্বন্ধে এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায়—

"The main artery of the province—the Brahmaputra river—enters Assam in the Sadiya district, Rising near Mansorowar lake (মানস-সরোবর), away north of Kashmir, if flows eastward as Tsanpo through Tibet, being crossed by the India-Lahssa road at Chaksam ferry, not far from Lahssa and then turns southward cutting the main Himalayan axis at a point of which the approximate latitude is 29°35' and longitude 93°20'. In its bend it encircles some magnificent peaks dominated by Namcha Barna (24445 ft.). The Tsanpo receives many tributaries in its course through the Abor hills and is known to the Abors as Siang. It leaves the hills and enters the plains at Pasighat. Some 28 miles beyond Tameswari Mai.....

one reaches Parsuramkund, where the Lohit-Brahmaputra river emerges from the hills."

ব্রহ্মধারার জল পরশুরামকুণ্ডে পড়িয়া পাক খাইতে খাইতে বাহির হইয়া গিয়া যে স্থানে ব্রহ্মপুত্রের প্রধান ধারায় পড়িয়াছে সেই স্থানটিও দেখিতে বড়ই সুন্দর। দুই জল একত্রে মিশিয়া তীব্রবেগে কড় কড় শব্দে ছুটিতেছে; মনে হয় স্বয়ংস্রষ্ট ব্রহ্মনন্দন শিলাপৃষ্ঠে আছাড় খাইয়া পড়িয়া "উচ্চ বীচি-রবে" কাঁদিতে কাঁদিতে চলিতেছেন "কহিতে বারীশে ক্ষেম সে দুখ-বারতা।" নীল জলের নীচের নুড়িগুলি স্রোতের বেগে গড়াইতে গড়াইতে চলিয়াছে বেশ দেখা যায়। তাহাদের পরস্পর ঘর্ষণেই কড় কড় শব্দ। এখান হইতেই লৌহিত্য, ব্রহ্মপুত্র নামে অভিহিত ও এই নামেই সাধারণের নিকট পরিচিত।

শাস্ত্রানুসারে ব্রহ্মপুত্রের জলে স্নান করিলে অশেষ পাপ হইতে মুক্তিলাভ ঘটে। বিশেষতঃ চৈত্র মাসের শুক্লাষ্টমীতে (অশোকাষ্টমী) ব্রহ্মপুত্রস্নানের মাহাত্ম্য ও ফল অনন্ত বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, কারণ ঐ সময়ে পৃথিবীর যাবতীয় সমুদ্র, পুণ্য নদী ও তীর্থ ব্রহ্মপুত্রে আগমন করেন—

চৈত্রে মাসি সিতাষ্টম্যাং যো নরো নিয়তেন্দ্রিয়ঃ।
স্নাতি লৌহিত্যতোয়েষু ন যাতি ব্রহ্মণঃ পদম্।

এই পর্ব্বোপলক্ষে ব্রহ্মপুত্রের তীরবর্ত্তী সকল স্থানেই স্নান-সমারোহ হয়। বাঙ্গলাদেশে নারায়ণগঞ্জের নিকটবর্ত্তী নাঙ্গলবন্ধেই সমারোহ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। পূর্ব্বে নদী এই দিক্ দিয়াই প্রবহমান ছিল, এক্ষণে একটা খাড়ী মাত্র আছে। ব্রহ্মপুত্র-স্নানের মন্ত্রও শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই মন্ত্র পাঠ করিয়া স্নান করিতে হয়—

পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি সরিতঃ সাগরাণি চ।
সর্ব্বে লৌহিত্যমায়ান্তি চৈত্রে মাসি সিতাষ্টমীম্।
ব্রহ্মপুত্র মহাভাগ শান্তনোঃ কুলনন্দন
অযোধর্ম্মসমুদ্ভূত পাপং লৌহিত্য মে হর।

কুণ্ডের সমুদয় কার্য্য সমাধা হইলে রায়সাহেব উপস্থিত সাধুবর্গ ও মিশমীদিগকে কিছু কিছু দান করিলেন। মিশমীরা নূতন কাপড় পাইয়া মহা খুসী, কাপড়গুলি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া বার বার দেখিতে লাগিল। নূতন কাপড় পড়িয়া স্নান পূর্ব্বে কেহ করিয়াছে কি না জানি না। পাণ্ডাকেও তাঁহার প্রাপ্য দক্ষিণাদি দেওয়া হইল, তিনি "পুনরাগমনায়চ" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। চাকরেরা অন্যান্য ভিজা কাপড়গুলি একসঙ্গে পোটলা বাঁধিয়া লইল, সকলে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিলাম। এক বাচ্চা সাধু আসিয়া আমাদিগকে পথ দেখাইয়া পরশুরামের চরণ-পদ্ম দেখাইতে লইয়া চলিল। একখানি ছোট টিনের ঘরের ভিতরে এক সাধু ধুনি জ্বালাইয়া বেশ জমকাইয়া বসিয়া আছেন; পুষ্পাদি লইয়া পূজার আয়োজন করিতেছেন। "নমো নারায়ণায়" প্রভৃতি আপন প্রধান তাঁহার সহিত হইয়া গেল। পাথরের উপর দাগ দেওয়া কুঠির চরণ-পদ্ম দেখিয়া কিছু টেক্স দিয়া সকলে বাহিরে আসিলাম। আমি

কুণ্ডের দিকে আর একবার দৃষ্টি ফিরাইয়া উদ্দেশে প্রণাম করিলাম; সকলেরই গমন এখন ধীর। রায় সাহেবের স্ত্রী ও পুত্রবধূ দুলিতে চলিলেন, কিন্তু কিছু দূর গিয়াই ঝাঁকুনি অসহ্য হওয়ায় নামিয়া পড়িলেন। কমলালেবুর অভাবটা এখন খুবই বোধ হইতে লাগিল। আবার সেই ফাঁকা জায়গায় আসিয়া পড়িলাম। নানা রংএর ছোট, বড়, মেজো, সেজো নুড়ি কুড়ান হইল। একজন একটা বিরাট নোড়া মহানন্দের জন্য উঠাইয়া লইল। গাছতলা হইতে হরিতকী ও আমলকী কুড়ান হইল। যখাকালে মিশমী ঘাটে পৌঁছিলাম, কিছুদূর গিয়াই টিমাই বাংলোর কাছে আসিয়া সকলে বসিয়া পড়িলাম। একটু বিশ্রাম করিয়াই দোকানি হইতে দ্রব্যাদি লইয়া দোকানদারকে কিছু বকশিস্

ও কুলিদিগকে তাহাদের প্রাপ্য ও অধিকন্তু কিছু বকশিস্ দিয়া মোটরে উঠিয়া বসা হইলাম, ঠিক সন্ধ্যার সময় তেজু বাংলায় পৌঁছিলাম। আজ প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ভোগ করার শক্তি ও প্রবৃত্তি কাহারও নাই, সকলেই ক্লান্ত ও বুভুক্ষু। গরম জলে হাত-পা-মুখ ধুইয়া সন্ধ্যা-বন্দনাদি সারিয়া লম্বা হইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলাম। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর উঠিয়া রায় সাহেবের ঘরে গেলাম। খুতের গল্প চলিতে লাগিল। কেহ বলিলেন, "কি সুন্দর মাছগুলো", কেহ বলিলেন "কি তরিবৎ টাট্‌কা জল," "কি grand বরফের পাহাড়গুলো" ইত্যাদি কত রকমের 'কি কি' চলিল সকলেরই ইচ্ছা, কেমন এখানে নিশ্চিন্তভাবে সময়াদ করিয়া যাওয়া। কিন্তু রায় সাহেবের ভকরী সরকারী কাজ আছে, দেরী করিতে পারিবেন না, কাজেই ultimatum দিলেন কাল সকালেই রওনা হইতে হইবে। আমিও নিজের মত সকলকে জানাইয়া দিলাম—"সরাবের অনুমতি কালি হবে বস।" যথাকালে আহারাদি করিয়া শয়ন। সে রাত্রে কি ভয়ানক শীত। ঘরে টিনের না থাকায় দুমদুমার কম্বল আনান হইল না। প্রথম প্রহরেই "বেনের পুঁটুলি" হইতে হইল। এক ঘুমেই ভোর; কাক কোকিলের বালাই নাই, কেবল জলের ঝাঁ ঝাঁ শব্দ ও তেজু নদীর কল্লোল। বেলা দশটার সময় রওনা হইতে হইবে, রাত্রে দুমদুমায় স্থিতি। সেই হিসাবে বিছানাপত্র বাঁধা প্রভৃতি চলিতে লাগিল। কি ভয়ানক কুয়াসা সেদিন সকালে; ২০ হাত দূরের মানুষ দেখা যায় না। টিনের চাল বহিয়া ছপ ছপ করিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছে, মনে হয় যেন ঝিস্ ঝিস্ বৃষ্টি। সকালের কাজকর্ম ও প্রাতঃকৃত্য সারিয়া ক্রমে রওনার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম, ওদিকে চা-পর্ব্ব চলিতে লাগিল।

তেজু বাংলার পাশ দিয়া যে রাস্তাটি তিব্বতের দিকে গিয়াছে, তাহার উপর প্রায় দশ দশ মাইল অন্তর তিনটি camp বা stage অর্থাৎ ঘাঁটি আছে—ডেনিং, ড্রেয়ার ও থেরোলিয়াং (Denning, Dreyer, Theroliang)। প্রত্যেক ষ্টেজেই সরকারী অফিসার ও মিলিটারী পুলিস প্রভৃতির বন্দোবস্ত আছে; সদিয়ার সহিত প্রত্যেক ষ্টেজেই ফোনের যোগ আছে। ভ্রমণকারীদিগের থাকিবার উপযুক্ত বাংলাও আছে। এই তিন ঘাঁট পার হইয়া টিডিং পুল, (Tidding bridge) পার হইলেই তিব্বতের সীমান্ত-প্রদেশ। দেখিলাম, একজন সাহেব তাঁহার পৌঢ়া নব-পরিণীতা বয়োধিকা স্ত্রীকে লইয়া লোকজন সহিত দুই মোটরে ফিরিতেছেন। আমাদের পাশ দিয়াই চলিয়া গেলেন, তেজুতে নামিলেন না। মনে হয় Tidding bridge পর্য্যন্তই গিয়াছিলেন। শুনিলাম, একজন বাঙ্গালী যুবক, এক কম্বল মাত্র সম্বল করিয়া ঐ রাস্তায় তিব্বতের দিকে গিয়াছেন। কিছুক্ষণ পরে দেখিলাম, কয়েকজন তিব্বতী পশুপালক ছাগলের পাল লইয়া আসিল ও সদিয়ার দিকে চলিয়া গেল। ছাগলগুলি বেশ মোটা মোটা, খর্ব্বাকার, কিন্তু সাধারণ ছাগল অপেক্ষা তাহাদের ধড় লম্বা। বড় বড় শিং পিঠের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, গায় লম্বা লম্বা লোম। ছেলেবেলায় পড়িয়াছিলাম "তিব্বত দেশীয় ছাগলের লোমে শাল হয়।" সে ছাগল কখনও দেখি নাই, এইবার প্রথম দেখিলাম। ছাগলকে তিব্বতী ভাষায় "চ্যাংড়া" বলে। বাংলা দেশের কোনও কোনও জেলায় ছোট ছেলেদের চ্যাংড়া বলিয়া গালাগালি দেওয়া হয়। বোধহয় উহা একই অর্থব্যঞ্জক। তিব্বতীদের সঙ্গে নানাবিধ চামড়া, লোম, চামর, মৃগনাভি, শিং প্রভৃতি থাকে। এই সমস্ত জিনিষ তাহারা নিজেই বিক্রয় করিত। এখন সমস্ত জিনিষপত্র Political Officer-এর গুদামে জমা দিতে হয়। পরে চ্যাংড়া ও জিনিষপত্র সমস্ত নিলামে বিক্রয় হইয়া গেলে যে যাহার প্রাপ্য লইয়া তিব্বতে ফিরিয়া যায়। বিক্রয়মূল্যের শতকরা ১০ টাকা সরকারে জমা হয়। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া মনে হইতে লাগিল, তিব্বতের সীমান্তটা একবার দেখিয়া গেলেই হইত। নয়কের পাহাড়ের গোড়াও যাওয়া যাইত। কিন্তু সে রাস্তার জন্য পাশ লওয়া ছিল না, কাজেই "উথায় ক্বচি লীয়ন্তে দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ" মহাবাক্যের যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে হইল। আহারাদি শেষ হইল, সেই চির-পুরাতন অথচ নিত্য-নূতন খিচুড়ী। রায় সাহেব বাংলার চাকরদিগকে তাহাদিগের আশাতিরিক্ত বকশিস দিলেন, তাহারাও এই লোভেই যথেষ্ট সুবিধা করিয়া দিয়া ছিল, উভয় পক্ষেই মঙ্গল। গীতা মনে পড়িল—"পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্থথ"।

তেজু হইতে মোটর ছাড়িল। দুমদুমার কম্বলার বস্তা

শিরোধার্য্য হইয়া চলিলেন। ৩।৪ মাইল যাইতেই সেই চাংড়ার দল সামনে পড়িল। মোটরের হর্ণ শুনিয়া তাহারা রাস্তার এদিক্ ওদিক্ ছুটাছুটি করিতে লাগিল। কতকগুলি চাংড়া একদম সামনে আসিয়া দাঁড়াইল, মোটর থামিল। পাণ্ডাপাণ্ডেরা "হাঃ হৈঃ" করিয়া তাহাদিগকে রাস্তার একপাশে সরাইয়া দিল। মোটর চলিল, ক্রমে জঙ্গল পার হইয়া সনপুরা বাংলার নিকট পৌঁছিলাম। দেখিলাম, সেই সাহেবটি তাঁহার ধর্ম্মপত্নীকে সঙ্গে লইয়া সস্ত্রীক "ধর্ম্মাচরেৎ" করিবার জন্য দোনালা বন্দুক হাতে করিয়া বাহির হইতেছেন। তাঁহারা সনপুরাতেই রাত্রিবাস করিবেন বলিয়া বোধ হইল। এবার আর পাশ দেখানর কেসাদে নাই। পুল পার হইয়া মোটর ছুটিল। ক্রমে কুণ্ডল নদী পার হইয়া বেলা ১২ টার সময় সদিয়া পৌঁছিলাম। রায় সাহেব তাঁহার বন্ধু-বান্ধবদিগের সহিত দেখা করিলেন; পরে সহরটি ঘুরিয়া দেখিলাম।

পরশুরাম কুণ্ড।

সদিয়া একটি ক্ষুদ্র 'কলোনি' (colony) বিশেষ। আসামের এই উত্তর পূর্ব্ব সীমান্ত প্রদেশ পূর্ব্বে নর্থ লখিমপুর জেলার অন্তর্গত ছিল। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে পার্ব্বত্য আবর জাতির সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এ অঞ্চলের আবর, ডাফলা, মিরি, মিশমী, নাগা, মোষা, আকা প্রভৃতি পার্ব্বত্যজাতিকে সুশাসনে রাখিবার জন্য দুইটি সীমান্ত জেলা গঠন করেন, একটির নাম বালিপাড়া, অপরটির নাম সদিয়া। সদিয়া জেলার হেডকোয়ার্টার্স এই সদিয়াতেই স্থাপিত হয়। আবর, মিরি, মিশমী, খামটি অধিবাসীই এদিকে অধিক। সদিয়া জেলা দুইটি মহকুমায় বিভক্ত, একটি সদিয়া বা সদর, অপরটি পাসিঘাট। এখানকার আইন-কানুন সম্পূর্ণ পৃথক। পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট গ্রেডের একজন ব্রিটিশ অফিসার এখানকার পলিটিক্যাল অফিসার। তিনিই এ রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা। বিচারাদি কার্য্যের সুবিধার জন্য দুই জন সহকারী পলিটিক্যাল অফিসার আছেন; একজন সদরে অপর জন পাসিঘাটে থাকেন। পলিটিক্যাল অফিসারই এখানের জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট; অন্য কোনও Judical বা Executive Officer নাই; সমস্ত ক্ষমতাই পলিটিক্যাল অফিসারের হস্তে। এমন কি, হাইকোর্টেরও এখানে Jurisdiction নাই। পলিটিক্যাল অফিসারের বিচারের বিরুদ্ধে আপীল করিতে হইলে, আসাম গবর্ণমেণ্টের নিকটেই করিতে হয়, গবর্ণমেণ্টের হাতই চরম। পলিটিক্যাল অফিসারের আরও অনেক powers ও privileges আছে। কোনও আদালত, আমলা, উকিল, মোক্তার, এখানে নাই। বিচারের জটিলতা নাই, কারণ 'মিশমী প্রভৃতি পার্ব্বত্য জাতিরা এখনও মিথ্যাকথা বলিতে শেখে নাই। কেহ নালিশ করিলে অপরাধী দোষ স্বীকার করে ও সঙ্গে সঙ্গে নজরানা দিয়া যায়। একজন Civil Surgeon একজন Executive Engineer ও একজন Deputy Conservator of Forests আছেন। একটি Millitary Cantonment আছে। একজন British Commandantএর অধীনে 24th Battalion of the Assam Rifles এখানে এখন

স্থায়ী ভাবেই অবস্থিত। দুই জন Assistant Commandant আছেন, তাঁহারাও ইংরাজ। তাঁহাদের অধীনে ৮ জন সুবাদার ও ১ জন জমাদার আছে। সমস্তসমেত সৈন্য-সংখ্যা প্রায় ৮০০। গুরখা, কাছাড়ী, মেচ, গারো ও আসাম জাতীয় সৈন্য লইয়াই এই ব্যাটেলিয়ানটি গঠিত। পাহাড়ের ঘাঁটিগুলিতে এখান হইতেই সৈন্যাদি সরবরাহ হয়। ক্ষুদ্র সহরটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, রাস্তাগুলি অতি সুন্দর। ভূতপূর্ব্ব Political Officer Mr. Dundasএর স্মৃতিকল্পে Dundas Memorial Hall নামে একটি সুন্দর বাড়ী আছে। ঐ বাড়ীতেই Indian Club, থিয়েটার প্রভৃতির স্থান। সাহেবদিগের অবশ্য একটি পৃথক্ Club আছে। পোষ্ট অফিস হিস্পেন্সারী প্রভৃতি সবই আছে। একটি এম. ই. স্কুল আছে। একমাত্র এই স্কুলেই এদিকে ইংরাজী পড়ান হয়। এম. ই. পরীক্ষা তখন মেমো-রিয়াল হলে চলিতেছিল। "বালিয়া বাবার থান" নামে একটি প্রসিদ্ধ ধর্ম্মস্থান আছে। 'থান' শব্দের অর্থ মন্দির, কিন্তু সেখানে কোনও মন্দির নাই, মাত্র একটি শিবলিঙ্গ সে স্থানে প্রতিষ্ঠিত। 'বালিয়া' শব্দের অর্থ পাগল। প্রতি বৎসর এখানে মেলা বসে ও বহু পাহাড়ী জাতির সমাগম হয়। "বুড়াবুড়ীর থান" নামে একটি মন্দির আছে, এখানেও বাৎসরিক মেলা হয়। "বুড়াবুড়ী" মানে হরপার্ব্বতী। একটি ছোট বাজার আছে, নিত্যব্যবহার্য্য সমস্ত দ্রব্যই বাজারে পাওয়া যায়। শীতকালে এখানে তিব্বত ও অন্যান্য পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে যথেষ্ট কস্তুরী আমদানী হয় ও খুব সস্তাদরে বিক্রয় হয়। এদিকের কস্তুরীই "কামরূপী-কস্তুরী নামে প্রসিদ্ধ এবং উহা নেপাল ও কাশ্মীরের কস্তুরী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—

কামরূপোদ্ভবা শ্রেষ্ঠা নৈপালী মধ্যমা ভবেৎ
কাশ্মীরদেশসম্ভূতা কস্তুরীহধমা স্মৃতা

অধিবাসীরা প্রায় সকলেই সরকারী কর্ম্মচারী অথবা সরকারী কার্য্য সম্পর্কে এখানে আছেন। উড়িষ্যার দেশী কর্ম্মচারী প্রায় সকলেই সিলেটবাসী বাঙ্গালী। স্থানটি মাত্র ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত।

সদিয়া সহরটি নূতন হইলেও তাহার নামটি অতি প্রাচীন। গ্রামের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি প্রাচীন ইতিহাস পাওয়া যায়। উত্তর-পূর্ব্ব পার্ব্বত্য প্রদেশে চুটিয়া নামে একটি জাতি আছে। পূর্ব্বকালে তাহাদিগের মধ্যে বিবার নামে একজন চুটিয়া নিজের বুদ্ধি ও শক্তিবলে চতুঃপার্শ্বস্থ গ্রামসমূহের মধ্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন ও ক্রমে আধিপত্য বিস্তার করিয়া তাহাদিগের সর্দ্দার হইয়া উঠেন। বিবারের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র আরও প্রতাপান্বিত হইয়া উঠেন ও চতুর্দ্দিকে নিজের প্রভুত্ব বিস্তার করতঃ পর্ব্বতরাজ নাম ধারণ করেন। কালে বিবারপুত্র স্বস্থান হইতে সদলবলে নামিয়া আসেন ও সমতলস্থ রাজা ভদ্রসেনকে যুদ্ধে পরাস্ত করতঃ রত্নধ্বজ নাম গ্রহণ করিয়া এ প্রদেশের রাজা হন ও মাতুলী নদীর তীরে নিজের নাম অনুসারে নামকরণ করিয়া রত্নপুরে রাজত্ব স্থাপন করেন। বাংলার গৌড় তখন সেন-বংশীয় হিন্দু রাজাদিগের অধিকারে ছিল। রত্নধ্বজ এক সময় গৌড় দর্শন করিতে যান ও তাঁহার নিজ পুত্রকে বিদ্যা-শিক্ষার জন্য গৌড়ে রাখিয়া নিজে রত্নপুরে ফিরিয়া আসেন। কিছুকাল পরে পুত্রটি গৌড়ে কালগ্রাসে পতিত হয় ও তাহার মৃতদেহ পিতার নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হয়। শবাধার যখন রত্নধ্বজের নিকট আনিয়া উপস্থিত করা হয়, তখন তিনি তাঁহার নূতন রাজধানী নির্ম্মাণ করাইতেছিলেন। প্রিয় পুত্রের শব দেখিয়া পিতা যারপরনাই মর্ম্মাহত হইলেন ও মৃত পুত্রের স্মৃতি-রক্ষার জন্য তিনি রাজধানীর নাম রাখিলেন "শদিয়া" (শ-দিয়া)। "শ" শব্দের অর্থ শব ও "দিয়া" শব্দের অর্থ দেওয়া। পুত্রের শব আনিয়া তাঁহাকে ঐ স্থানে দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া তিনি উহার নামকরণ করিলেন শদিয়া। পরে উহার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী স্থান ও বর্ত্তমান সহরের নাম হইল ইংরাজীতে Sadiya, বাংলা ভাষায় সদিয়া, সাদিয়া। আসামে "শ"-এর উচ্চারণ "হ"এর মত, এই জন্য আসামীবাসীরা ঐ স্থানকে হদিয়া বলে। বর্ত্তমান নূতন সদিয়ার ৭।৮ মাইলের মধ্যে প্রাচীন রাজধানীর অনেক স্তূপ, ভগ্নমন্দির, রাজবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ এবং বড় বড় পুষ্করিণী এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। পুষ্করিণীগুলির ঘাট ইট দিয়া বাঁধান।

সদিয়া ঘুরিয়া বেলা প্রায় দুইটার সময় ব্রহ্মপুত্র পার হইলাম ও ক্রমে অপরাহ্ণে ডুমডুমা পৌঁছিলাম। ডাক বাংলার একটি ঘর একজন অফিসার পূর্ব্ব হইতেই দখল করিয়া আছেন; অপর একটিমাত্র ঘরে আমাদের স্থান সঙ্কুলান হইবে না,

কাজেই এস্থানে রাত্রিবাসের সঙ্কল্প ত্যাগ করা হইল। বিশেষতঃ তখনও বেলা আছে, সন্ধ্যার সময়ই ডিব্রুগড় পৌঁছান যায়। অগত্যা বাংলার প্রাঙ্গণে ঘাসের উপর বসিয়া সকলে জল ও সদিয়ার কমলা খাইয়া পুনরায় মোটরে উঠিলাম ও ক্রমে তিনসুকিয়া পৌঁছিলাম। রায় সাহেবের কি একটু কাজ এখানে বাকি ছিল, তাই সে রাত্রে তিনি সস্ত্রীক তিনসুকিয়া ডাক বাংলায় থাকিবেন সাব্যস্ত হইল। দুই মোটরই ডাক বাংলায় চলিল। ডাক বাংলায় গিয়া সেই অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সাহেবটির বর্ণিত ভূতের গল্প সম্বন্ধে খান-সামার নিকট অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম সর্ব্বৈব মিথ্যা। রায় সাহেব একটু হাসিয়া বলিলেন,"লোক ভাগানর মতলব।" সেই ইংরেজটির 'all humbug' কথাটাও মনে পড়িল। রায় সাহেবকে নামাইয়া দিয়া ছোট মোটর ছাড়িয়া দেওয়া হইল, আমি গিয়া 'কলাঞ্চের রথে (অর্থাৎ বড় বাসে)' উঠিলাম। সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পরেই সকলে ডিব্রুগড় পৌঁছিলাম।

সন্ধ্যার সময় মোটরে ঠাণ্ডা লাগায় অনেকেই নামিয়াই চা খাইবার প্রস্তাব করিলেন। রায় সাহেবের এক নাতনী বাহাদুরী দেখাইবার জন্য তাড়াতাড়ি চা প্রস্তুত করিতে গেল। ফুটন্ত জলে চা দিয়া চার মিনিট পরে দেখা গেল ভাল রং হয় নাই। পুনরায় আরও কিছু চা দেওয়া হইল; কিন্তু তবুও ঠিক মত রং হইল না। চা-এর গন্ধ, বর্ণ বা আস্বাদের দিকে তখন কাহারও লক্ষ্য ছিল না, প্রয়োজন ছিল শীঘ্র একটু গরম জল পেটে দেওয়া। কাজেই সেই চা-ই ছাঁকিয়া, দুধ-চিনি মিশাইয়া পান করিয়া সকলে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে চা-দানী পরিষ্কার করিতে গিয়া দেখা গেল, কতকগুলি তিল সিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। একটা হাসির রোল উঠিল। রায় সাহেব বাসায় না থাকায় বাড়ীটি বেশ মুখরিত হইল। রাত্রি দশটার মধ্যে আহারাদি শেষ করিয়া নিশ্চিন্তভাবে শয্যায় শুইয়া পড়িলাম। নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নেও সেই অপূর্ব্ব তুষার-ধবল হিমালয়-শৃঙ্গ দেখিলাম ও পরশুরামকুণ্ডের সেই গম্ভীর ভাব উপভোগ করিলাম। পরদিন সকালে রায় সাহেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গত রাত্রের চা খাওয়ার গল্পটা অন্যান্য মেয়েরা তাঁহাকে শুনাইতে ছাড়িল না। কয়েকদিন পরশুরামকুণ্ডের কথাবার্ত্তাই চলিতে লাগিল। তার পরই যথাপূর্ব্বম্।

ব্রাহ্মণ ও পূজার্চ্চনা

"...আজকালকার তথাকথিত ব্রাহ্মণগণ দেব-দেবী ও দেবতা কি, তাহা না বুঝিয়া পূজা, যাগ, যজ্ঞ, ব্রত ও কর্ম্ম কি করিয়া হয়, তাহা পরিজ্ঞাত না হইয়া, পূজার নামে যাহা করিয়া থাকেন, তাহা বি-কর্ম্ম অথবা কু-কর্ম্ম। যথাযথভাবে দেব-দেবীর পূজা করা সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয় এবং তাহা যতদিন পর্য্যন্ত কোন না কোন যাদুঘরে শিক্ষা করা সম্ভব না হয়, ততদিন মনুষ্য-সমাজকে আজকালকার মত অর্থাভাবে, যাদুভাবে, অশান্তিতে এবং অসন্তুষ্টিতে যাদুঘর খাইতে হইবে, তাহা খুবই সত্য, কিন্তু আজকালকার ব্রাহ্মণগণ না বুঝিয়া পূজার নামে যে সমস্ত বি-কর্ম্ম অথবা কু-কর্ম্ম করিয়া থাকেন, তাহা করা অপেক্ষা চেষ্টা না করাই ভাল। ব্রাহ্মণগণ কোন্ অবস্থা হইতে কোন্ অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিলে আমাদিগের উপরোক্ত কথার যুক্তিযুক্ততা প্রতিপন্ন হইবে।...

পরীক্ষা

—শ্রীকানাইলাল মণ্ডল

চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে সুখানিচ দুঃখানিচ···

মানবজীবনে সুখ-দুঃখ চক্রের ন্যায় পরিবর্ত্তনশীল। কিন্তু উমেশ ছেলের জীবনে ভাগ্য-বিধাতা বোধ করি ভুল করে 'সুখানিচ দুঃখানিচ'র পরিবর্ত্তে 'দুঃখানিচ দুঃখানিচ' লিখে দিয়েছিলেন। কারণ অতি শৈশব হতে এই যৌবনের শেষ ধাপে পৌঁছেও তার জীবনে সুখের একটু যে ছিটে-ফোঁটাও পড়েছিল, এ কথা তার শত্রু-মিত্র কেউই বলতে পারবে না কোন দিন ভুলেও।

জ্ঞানী ব্যক্তিরা বলেন, সোনাকে পুড়িয়ে যেমন 'খাদ' বাদ দিয়ে তাকে খাঁটি সোনায় পরিণত করা হয়, সেইরূপ বিধাতা মানবকেও দুঃখানলে পুড়িয়ে তাকে খাঁটি মানবে পরিণত করেন। জানি না, উমেশ ছেলেকেও সেইরূপ খাঁটি মানব সৃষ্টি করা হচ্ছে কি না! যদি তাই হয়, তা হলে বুঝতে হবে, বর্ত্তমানে দুঃখ-দৈন্য-পূর্ণ আমাদের এই ভারতভূমি 'মহাশ্মশান' তৈরী করবার একটা অদ্বিতীয় প্রতিষ্ঠান।

গ্রামের শেষ সীমায় উমেশ ছেলের একখানি খড়ের ঘর। চালে খড়ের অভাবে বৃষ্টির জল বাইরের মত ঘরের মধ্যে না পড়লেও একেবারে যে কম পড়ে তাও নয়। উঠানের চার পাশে বাকল গাছের বেড়া। ঘরের পশ্চাতে একটা নেড়া তালগাছ চাল-কলের চিমনির মত মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। দূরের লোক এই তাল গাছটা দেখিয়ে উমেশের বাড়ী নির্দ্দেশ করে। চিররুগ্না স্ত্রী, গোটা চার পাঁচ 'পিসে' ও 'ন্যাংটা'প্রায় ছেলে মেয়ে, ঘরদোর একটা কুকুর ও একটা 'হুমো' বেরাল, এই নিয়ে তার সংসার।

উমেশ খুব ভোরেই জাল ও খাঁচা নিয়ে বেরিয়ে যায় খালে মাছ ধরতে। ফিরতে অনেকটা বেলা হয়ে যায়। তারপর আবার সেই মাছ কটা নিয়ে পাড়ায় যায় বেচতে—যে কটা পয়সা পায় তাই দিয়ে চাল-ডাল কিনে বেলা বারটা একটা হয়ে যায় বাড়ী ফিরতে। তারপর কোনদিন নিজেকে করে নিতে হয় রান্না—স্ত্রীর দু'একদিন ছাড়া জ্বর লেগেই আছে। ছেলেরাও পড়পড়তা দু'জন করে জ্বরের সঙ্গে যুদ্ধ করে চলেছে সমানে। উমেশেরও যে জ্বর হয় না এমন নয়—হয়, আবার ছেড়ে যায়, তার নিত্যনৈমিত্তিক কাজে সাহস করে না বাধা দিতে।

সেদিন দুপুরে উমেশ মাছ বেচে ফিরে এসে দেখলে, তার স্ত্রীর আজও আবার জ্বর হয়েছে, ছেলে কটাও ছেঁড়া কাঁথা জড়িয়ে প্রবল জ্বরে কাঁপতে কাঁপতে করুণ কম্পিত কণ্ঠে ডাকছে, "মা, জল খাব, মা, জল খাব।" তার স্ত্রী প্রবল জ্বরে জ্ঞানশূন্য অবস্থায় অস্ফুট স্বরে কি বলছে, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। সে তাড়াতাড়ি চাল ডালসমেত চুপড়ীটা রেখে দিয়ে জল ঢেলে একে একে ছেলেদের খাইয়ে, শতচ্ছিন্ন ময়লা কাঁথাখানি তাদের গায়ে যথাসম্ভব ঢাকা দিয়ে, স্ত্রীর কাছে গিয়ে তার রোগ-মলিন ললাটে হাত দিয়ে ডাকলে, "বৌ, ও বৌ?"

তার স্ত্রী একটা বহুপ্রয়াসজাত কাতর অস্ফুট ধ্বনি করে চোখ চেয়ে দেখলে। কি করুণ সে চাউনি!

উমেশ মুখটা একটু নামিয়ে বললে, "বৌ, আজ কি জ্বরটা একটু বেশী হয়েছে?" তার স্ত্রী সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে মৃদুস্বরে বললে, "খোকাদের দেখ—"

উমেশ অল্পক্ষণ তার ম্লান মুখের দিকে চেয়ে থেকে পরক্ষণেই ছেলে-মেয়েদের দিকে একবার তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাওয়ায় এসে একটা ঘুণ-ধরা আধা-মজবুত খুঁটি হেলান দিয়ে বসে আকাশের দিকে চেয়ে রইল।

দুঃখের সঙ্গে সারা জীবন সমান ভাবে লড়াই করে চলেছে, কোন দিনই তাকে এতটুকু বিচলিত কেউ দেখেনি! পাকাল মাছ কাদার মধ্যে থাকলেও যেমন তার গায়ে কাদা লাগে না, উমেশ এত দুঃখ-কষ্টের মধ্যে থেকেও তাকে যেন গায়ে মাখত না। আজ সেই কোন্ ভোরে উঠে জাল নিয়ে কত কষ্টে সের সের মাছ ধরে সে পাড়ায় বেচতে যায়। চৌধুরীদের বাড়ীর ধার দিয়ে যেতে যেতে ডাক্তার বাবু তাকে বলে, "ওরে ব্যাটা, দেখি তোর মাছ?" উমেশ তাদের মাছ দেখাতে তারা বলে, "কত করে সের দিবি

গত ২৭শে মে তারিখে একটি হিন্দু প্রতিনিধিদল বাঙ্গালার লাট বাহাদুরের নিকট সরকারী চাকুরীর সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্পর্কে নিবেদন জানাইতে যান। দলের নেতা ছিলেন বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর এবং অন্যান্য সদস্য ছিলেন—ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মিঃ নরেন্দ্রকুমার বসু, মিঃ এস. এন. ব্যানার্জি, স্যর মনিলাল খান, নৈনসিংহের মহারাজা এবং মিঃ এন. সি. চ্যাটার্জি।

বল ?" উমেশ বলে, "আজ্ঞে দর আমি করি নে বাবু, ছ' আনা করে দিতে হবে !" ডাক্তার বাবু দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বলে, "বলিস্ কি রে ব্যাটা, ছ' আনা করে আবার আজকাল মাছের দর আছে না কি ?" উমেশ হাত জোড় করে বলে, "আজ্ঞে, পারব না বাবু, বাড়ীতে ছ'সাতটা পেট, আমি মাছ ক'টি বেচে তাদের জন্যে চাল কিনে নিয়ে গেলে তবে তারা দুটি খেতে পাবে"—বলে চুপড়ী আবার মাথায় তোলে। ডাক্তার বাবু রেগে পার্শ্ববর্তী লোকদের দিকে চেয়ে বলে, "দেখলে ব্যাটার আক্কেল ! ব্যাটা এক দর দিখেছে—ঐ জন্যে তো ছোটলোকদের উন্নতি হয় না।" উমেশ শোনে আর যেতে যেতে ভাবে। উমেশের মনে সেই সব কথাই এখন এক সঙ্গে এসে দেখা দিতে লাগল ভোট পাকিয়ে। সকাল থেকে এখনও যে কিছু পেটে পড়েনি সে কথা তার মনেই হল না। ক্ষুধা-তৃষ্ণা তার যেন কোথায় চলে গেছে।

উমেশ উঠে রাম ঠাকুরের দোকানের দিকে চলতে লাগল। সকলের অসুখ—তাদের ত আর ভাত দেওয়া যায় না। মাছ বিক্রী করে যে কটা পয়সা হয়েছিল সে সবই তো চাল ডাল কিনে এনেছে। এখন রাম ঠাকুরের দোকানে গিয়ে দেখতে হবে, যদি সাবু-মিছরী ধারে কিনে আনতে পারে ; নৈলে আর উপায় ত কিছুই নেই। এখন ক্ষমতা তার নেই যে ডাক্তার-কবিরাজ দেখায়। না থাকুক, তবু তো তাদের মুখে সাবুটা-বার্লীটা দিতে হবে।

উমেশ দোকানে গিয়ে বললে, "দা'-ঠাকুর, সাবু-মিছরী আনা ছ'য়েকের দেবেন ?"

ঠাকুর তখন ডাঁটিভাঙ্গা চশমা চোখে দিয়ে তেলচিটে একটা বিছানার উপর বসে হিসাবের খাতায় কি একটা হিসাব দেখছিলেন ; মাথাটা তুলে তাদা দাঁত বেখান হাসি হেসে বললেন, "বেশ, দেব না ? দেবার জন্যেই তো বসে রয়েছি—বুঝলে কি না—"

উমেশ একটু ইতস্তত: করে বললে, "এই বলছিলুম কি দা' ঠাকুর পয়সাটা আজকে থাকবে।"

দা'-ঠাকুরের মুখটা একটু গম্ভীর হয়ে গেল, বললেন, "কেন হে আবার ধার-টার কেন, আমার একে টানাটানি—বুঝলে কি না—"

উমেশ কাতর ভাবে বললে, "না দিলে চলবে না দা'-ঠাকুর, বাড়ীতে সকলের অসুখ, তাদের মুখে একটু সাবু না দিতে পারলে তারা কি করে থাকবে ? আমি কাল আপনার পয়সা দিয়ে যাব।"

দা'-ঠাকুর চশমা মুছতে মুছতে বললেন, "হ্যাঁ হে, তা ত দেবে জানি—দেবে না ত কি করবে—আমি তো আর দাতব্য করতে বসিনি। তবে বলছিলুম কি জান—আমি ধারে বিক্রী একেবারে বন্ধ করে দিয়েছি—বুঝলে কি না—"

উমেশ ব্যস্তভাবে বললে, "দোহাই দা'-ঠাকুর সকাল থেকে তাদের পেটে একটু জল ছাড়া আর কিছুই পড়ে নি। দয়া করে দিন ; কাল সকালেই মাছ বেচে আমি দাম দিয়ে যাব।"

দা'-ঠাকুর চশমার কাঁচ মুছতে মুছতে বললেন, "দেখ উমেশ বলছিলুম কি, ছ' আনার সাবু-মিছরী দিচ্ছি নিয়ে যাও। তবে এক কাজ কর, কালকে সেরখানেক মাছ দিয়ে যেও—তোমায় আর পয়সা দিতে হবে না—বুঝলে কি না—"

উমেশ মিনতি করে বললে, "আজ্ঞে দা'-ঠাকুর মোটের উপর হয়ত সেরখানেক মাছ আমি ধরতে পারব—আপনি অনুগগেহো করুন, আমি আপনাকে আধসের মাছ দিয়ে যাব।"

দা'-ঠাকুর চশমাজোড়া আবার চোখে দিয়ে খাতাটা টেনে নিয়ে বললেন, "বুঝলে কি না—তোমার সব কথাই ত আর রাখতে পারি না, যার তাইলে তাতেই রাজি হলুম—আবার একটা আবদার করলে ত হবে না—বুঝলে কি না—"

ম্লান মুখে উমেশ বললে, "আচ্ছা দা'-ঠাকুর তাই দিন।" দা'-ঠাকুর তখন হাসতে হাসতে বললেন, "দেখ উমেশ, আমি এমন কিছু অন্যায় বলি নি। তোমার বিপদের সময় সাহায্য করছি, এইটেই কত বড় উপকার। তাতে এক সের মাছ এ আর এমন কি—বুঝলে কি না—"

উমেশ চলে যাবার সময় দা'-ঠাকুর আবার বললেন, "দেখ উমেশ এ অপাত্রে দিচ্ছ না—ব্রাহ্মণকে দিলে তোমার বহু পুণ্যি হবে—বুঝলে কি না—"

পরদিন উমেশ ভোর হবার অনেকটা আগেই উঠে স্ত্রীর

ললাটে হাত দিয়ে দেখলে গা একই রকম গরম আছে। বারকয়েক ডাকাডাকিতে 'উঁ' 'আঁ' ছাড়া অন্য কিছু উত্তর পাওয়া গেল না। বড় ছেলেটীর জ্ঞান তখন ছেড়ে গেছে: সে বললে—"কেন বাবা?"

উমেশ তার গায়ে হাত দিয়ে বললে, "এইবার আমি মাছ ধরতে যাব কি না—তা দেখ বাবা পীতু, তোমার ত জ্বর ছেড়ে গেছে এদের একটু দেখ, আমি শীগ্‌গির করে ফিরব'খন। কেমন?"

পীতু ঘাড় নেড়ে বললে—"আচ্ছা বাবা।"

উমেশ জাল খাঁচা নিয়ে বেরিয়ে গোগলার দরজাটা টেনে দিতে দিতে বললে—"এখনও অনেক রাত আছে, ঘুমিয়ে পড় বাবা।"

উঠান পার হয়ে যাবার সময় বাকস গাছের বেড়ার কোল ঘেঁসে দুতপক্ষ কুকুরটা শুয়েছিল, অন্ধকারে লোক চিনতে না পেরে বারকয়েক ডেকে উঠল ঘেউ ঘেউ করে। সেই শব্দে বেড়া তালগাছটায় একটা কাল প্যাচা বসেছিল, উড়ে গেল একটা কর্কশ ডাক ডেকে। উমেশ চলতে লাগল, কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করেই। হাজরাদের ডাঙ্গাবাড়ীর ধার দিয়ে—শুঁড়ীদের শানবাঁধান ঘাট ফেলে রেখে,দত্তদের আম-বাগানের ভেতর দিয়ে পড়ল একটা কাঁচা রাস্তায়। সেই রাস্তা ধরে দক্ষিণ দিকে খানিকটা গিয়ে বাঁ'হাতি একটা গাব গাছ আছে, তারই নীচে দিয়ে নেমে ধেনো মাঠের উপর দিয়ে চলতে লাগল, শুকতারাটীকে সামনে করে—এই মাঠের ওপারেই মহে ধরবার খাল।

উমেশ ভাবতে ভাবতে চলল, আজ ভাগ্যে কতগুলি মাছ আছে কে জানে? কিন্তু যতই থাক, দা'-ঠাকুরকে একসের দিতেই হবে। বাকী মাছ বেচে সাবু-মিছরী কিন্তু কিনতে হবে—চাল না কিনলেও আমার দু'একদিন চলে যাবে··· জমিদারের তেওয়ারী দারোয়ানটা আবার ক'দিন খাজনার তাগিদ দিয়ে যাচ্ছে।···বৌ'র অবস্থাটা আজ যেন বড়ই খারাপ খারাপ ঠেকছে।···এমন ক্ষমতা আমার হল না যে, একদিন ডাক্তার-কোবরেজ দেখাতে পারলুম!

সে দিন আশাতিরিক্ত মাছ পেয়ে উমেশ বাড়ী ফিরছিল একটু খুসী মনেই। সের খানেক অন্যান্য মাছের সাথে একটা সের-আড়াই রুই-মাছ পেয়ে উমেশ মনে মনে ঠিক করলে এই একসের মাছ দা'ঠাকুরকে দেবে আর রুই মাছটা বিক্রি করে বৌ এর জন্য একজন কবরেজ ডেকে এনে দেখাবে।

কিন্তু ঘরের কাছে এসে দেখলে বাকস বেড়ার বাইরে দাঁড়িয়ে তেওয়ারী দারোয়ান ডাকছে—"এ উমেশ, বাড়ী হায়?"

উমেশ বললে, "দরোয়ানজী কি মনে করে?"

দারোয়ানজী তার আকর্ণবিস্তৃত গুম্ফরাশি এক হস্তে মর্দ্দন করে ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দিতে বললে, "দারোয়ানজী খেল করতে আসছে না। তোম খাজনা দেগা কি নেই দেগা বোল!"

উমেশ বললে, "কেন দারোয়ানজী, আমি ত আপনাকে সে দিন বলে দিয়েছি, দিন কতক পরে দেব, বাবুকে বোল।"

দারোয়ানজী লাঠী ঠুকে বললে, "নেই নেই, ও বাৎ চলবে না। তোম চল। বাবু তোমকো বুলাতা হায়।"

উমেশ কাতর স্বরে বললে, "দোহাই দারোয়ানজী, আমার ছেলে-মেয়ে-বৌ সকলের অসুখ, আমি এই মাছ বেচে সাবু-মিছরী না কিনে খাওয়ালে তারা আজ খেতে পাবে না—"

দারোয়ানজী এবার রুই মাছের দিকে তাকিয়ে বললে, "ওঃ, বহুৎ বড়া মছলি তোম পাকড়ায়া, দেখ্ উমেশ তোম এই মছলিটা বাবুকো সেলাম দেও—বাবুর গোসা জল হইয়ে যাবে।"

উমেশ হাত জোড় করে বললে, "দোহাই দারোয়ানজী এই মাছটা আজ না বেচলে আমার ছেলে পিলেরা মারা যাবে—"

দারোয়ানজী বাধা দিয়ে বললে, "নেহি নেহি, ও বাৎ ছোড় দেও, এই মছলি বাবুকা ওয়াস্তে হামি লিয়ে যাবে—তোম দো চার রোজ পরে খাজনা দেনেসে চলে যা" তারপর দারোয়ানজী মাছটা তুলে নিয়ে চলে যাবার উদ্যোগ করলে।

উমেশ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ভাবে হতভম্বের মত ক্ষণকাল দাঁড়িয়ে রৈল,—কিন্তু পরক্ষণেই তার শিশুপুত্রের ও স্ত্রীর করুণ, রোগজীর্ণ, পাণ্ডুর মুখগুলি তার চোখের সম্মুখে ফুটে উঠল, উমেশ চেয়ে দেখলে দারোয়ানজী কয়েক পা অগ্রসর হয়েছে—উমেশের চোখ ফুটোয় আগুন জ্বলে উঠল, উমেশ দৌড়ে গিয়ে দারোয়ানের হাত থেকে মাছটা ছিনিয়ে নিয়ে বললে, "এ মাছ আমি কিছুতেই দিতে পারব না দারোয়ানজী, অন্য একদিন আমি নিজে গিয়ে দিয়ে আসব।"

দারোয়ানটা ভয়ানক রেগে গেল। অকথ্য ভাষায় গালা-গালি করতে করতে বলে গেল, "চোট্টা শালা, দেখ তোমরা ক্যায়সা হাল হোয়।"

উমেশ অল্পক্ষণ কি ভাবল তারপর ভাল-খাঁচা নিয়ে বাড়ীর মধ্যে চলে গেল।

*

বিকাল বেলা।

কবিরাজ দেখে বললে—"উমেশ, একেবারে শেষ করে আমায় ডেকে এনেছ, আর কোন উপায় নেই।"

উমেশ কবিরাজের পা দুটী জড়িয়ে ধরে বললে—"দোহাই কবরেজ মশাই ওকে বাঁচিয়ে দিন, আমি আপনার কেনা গোলাম হয়ে থাকব।"

কবিরাজ উমেশের হাত ধরে তুলে বললে—"আমার ত কোন হাত নেই উমেশ, এখন ভগবানের উপর নির্ভর কর, ওষুধে কিছু হবে না।"

কবিরাজ তার পাওনা-গণ্ডা নিয়ে চলে যেতে উমেশ ঘরের মধ্যে গিয়ে ছেলেদের গায় একবার হাত দিয়ে দেখে অশ্রুভারাক্রান্ত চোখে বসল পত্নীর ছিন্ন-মলিন শয্যার পাশে।

বৌ চোখ চাইল, তার ঠোঁটের কোণে একটু ম্লান হাসি দেখা গেল। উমেশ সাহস পেয়ে বললে—"এখন কেমন বুঝছ বৌ?"

পত্নী অতি ক্ষীণস্বরে উত্তর দিলে—"ভাল না। তুমি এখন যাও, আমি ভাল বুঝছি নি।"

বড় ছেলেটা সকালে ভাল ছিল আবার দুপুর থেকে তার ভয়ানক জ্বর এসেছে, সে কম্পিত কণ্ঠে বললে—"বাবা, একটু জল।"

উমেশ উঠে তাড়াতাড়ি এক গেলাস জল ঢেলে বীনুর মুখে ধরল—বীনু চোঁ চোঁ ক'রে খানিকটা জল খেয়ে আবার ছেঁড়া কাঁথাখানি জড়িয়ে শুয়ে পড়ল। উমেশ ধীরে ধীরে উঠে আবার পত্নীর পাশে এসে ব'সে তার হাতখানি নিজের কোলের উপর রেখে তার মুখে, মাথায়, গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

এমন সময় বাইরে সেই ঘৃতপক্ক কুক্কুরটা নক্ক গলায় বারকতক ঘেউ ঘেউ করে উঠবার সঙ্গে সঙ্গেই একটা ছেঁড়ে গলায় 'উমেশ্' 'উমেশ্' বলে ডাক শোনা গেল। উমেশ বুঝতে পারলে. এ গলা তেওয়ারীর। আস্তে আস্তে তার স্ত্রীর হাতটা কোল থেকে নামিয়ে রেখে বললে—"বৌ, কে ডাকছে একবার শুনে আসি।" তার স্ত্রী চোখের দৃষ্টিটা উমেশের বুকের উপর ফেলে মৃদুস্বরে বললে—"না গো আমার বুকটা কেমন করছে, আমি হয়ত আর বেশীক্ষণ বাঁচব না।"

উমেশের চোখে জল ভরে এল, সে পত্নীর মাথায় হাত বুলিয়ে বললে—"ছি, বৌ, ওকথা বলতে নেই। তুমি শীগ্‌গির সেরে উঠবে, ক'বরেজ বলে গেছে। একটু চুপ করে থাক বৌ, বেড়ে দেখে আসি বাইরে কে ডাকছে।"

উমেশ বাইরে আসতেই তেওয়ারী তার হাত দুটো ধরে টান দিয়ে বললে—"চল, বাবু তোম লোককো বুলাতা হ্যায়। আমি যানে হোগা"। আরও চার পাঁচ জন যবকন্দাজ উমেশকে ঘিরে দাঁড়াল।

উমেশ হাত যোড় করে কাঁদতে কাঁদতে বললে—"দোহাই তোমাদের, আমার পরিবার মারা যাচ্ছে, তার মুখে শেষ একটু জল দিতে আমায় দাও। আমি কাল গিয়ে বাবুর সঙ্গে দেখা করব।"

তেওয়ারী লাঠি উঁচিয়ে বললে—"শালে লোক ঝুট্ ঝুট্ বাৎ বোলতা হ্যায়। এই পাকড়ো শালাকে।"

যবকন্দাজরা উমেশকে পাঁজা-কোলা করে ধরে কাঁধে তুলে নিয়ে চলতে লাগল। উমেশ অনেক কান্নাকাটী করল কিন্তু কোন ফল হল না।

উমেশ ত জানে না, যমদূতের কাছে পায় পাওয়া গেলেও যেতে পারে, কিন্তু মানুষের-যমের নিকট অব্যাহতি নেই।

উমেশের হৃদয়-বিদারী কান্নায় পল্লীপথ মুখরিত হয়ে উঠল, কিন্তু কে-ই বা তা শোনে···

জমিদার হরবল্লভ রায় চৌধুরী পরিষদবর্গপরিবৃত হয়ে বৈঠকখানায় অম্বুরী তামাকের সঙ্গে পাশা-ক্রীড়ায় মত্ত। অম্বুরী তামাকের গন্ধে যেমন ঘর ভরপুর হয়ে উঠেছিল, তদ্রূপ পরিষদবর্গের স্তোক-বাক্যে জমিদার মহাশয়ের প্রাণও কাণায় কাণায় ভরে উঠেছিল খুসীতে। খেলাটাও তখন খুব জমে উঠেছে।

তেওয়ারী এসে একটা লম্বা সেলাম করে বললে, "হুজুর ও বদমাস্‌কো লে আয়া।"

জমিদার একটু বিরক্ত ভাবে বললেন, "আমি গুণার ধরমে বন্ধ, রাখো

তেওয়ারী

গেল।

আকাশ ছেয়ে গিয়েছিল মেঘে মেঘে, এইবার বৈশাখের রুদ্র নৃত্য আরম্ভ হল। উন্মত্ত বাতাসের সঙ্গে বৃক্ষশ্রেণীর ভয়ানক মাতামাতি সুরু হয়ে গেল। ধূলিরাশিতে গগন-মণ্ডল পরিব্যাপ্ত হয়ে গেল—সঙ্গে সঙ্গে দিগন্ত প্রকম্পিত করে বজ্রনাদে জগতের জীবগুলিকে সচকিত ও সন্ত্রাসিত করে দিলে। উন্মত্ত তাণ্ডব করকাপাতে বুঝি আজ সৃষ্টি রসাতলে যায়···

উমেশ অন্ধকার কক্ষমধ্যে আবদ্ধ হয়ে মেঝেয় লুটিয়ে পড়ল। বহুদিনের সঞ্চিত অশ্রুরাশি আজ কক্ষতল সিক্ত করতে লাগল প্রবল উচ্ছ্বাসে। বাহিরে প্রকৃতির যেমন মাতামাতি চলেছে উমেশের অন্তরেও বুঝি বা তার চেয়েও অধিক চলেছে প্রলয়কাণ্ড।

নিশাদেবী তাঁর তমিস্রাঞ্চলখানি পৃথিবীর বুকে জড়িয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই দুরন্ত কালবৈশাখী শিশুটি অতি নিরীহ ভাবে যেন ঘুমিয়ে পড়ল তাঁর কোলে। প্রকৃতিও বাঁচল এতক্ষণে নিঃশ্বাস ফেলে।···

জমিদার বাবু তখন ডাক দিলেন "তেওয়ারী ও বদমাস-কো লে আও ইধার—"

উমেশ যখন এসে হাত যোড় করে জমিদার বাবুর সম্মুখে এসে দাঁড়াল, তখন তার দিকে চেয়ে দেখলে অতি বড় নিষ্ঠুরেরও দয়ার উদ্রেক না হয়ে যায় না। তার শতছিন্ন একখানি মলিন বস্ত্র পরিধানে—ধূলিধূসরিত দেহ—ক্রন্দনা-রক্ত চোখ দুটী হতে অজস্রধারে অশ্রু বর্ষিত হচ্ছে—যেন দুঃখের মূর্তিমান বিগ্রহ!

জমিদার আরক্ত নেত্রে কঠিন স্বরে বললেন, "তুই আমার দারওয়ানের হাত থেকে মাছ কেড়ে নিয়েছিস্?"

উমেশ কম্পিত কণ্ঠে বললে, "দোহাই হুজুর আমি বড় গরীব—"

জমিদার কর্কশ কণ্ঠে বললেন, "ও সব কথা শুনতে চাই না, তুই কেড়ে নিয়েছিস্ কি না?" উমেশ জমিদারের পায়ের কাছে বসে পড়ে বললে, "দোহাই হুজুর পেটের দায়ে—আমার পরিবার হয়ত এতক্ষণ মারা গেছে, আমায় ছেড়ে দিন, আমি অন্য একদিন আপনাকে মাছ দিয়ে যাব।"

জমিদার এবার ভয়ানক রেগে গিয়ে বললেন, "কি? জমি-দার মাছ খেতে পাবনা রে বেটা এত বড় তোর স্পর্দ্ধা! আমার দারোগানের হাত থেকে তুই মাছ কেড়ে নিস্—৬-বছরের খাজনা বাকী আবার তেজ দেখাচ্ছ? তেওয়ারী বেটকে পচিশ ঘা জুতো মেরে ছেড়ে দে···আর তিন দিনের মধ্যে খাজনা চাই।"

উমেশ "দোহাই বাবু" বলে জমিদারের পা দুটো জড়িয়ে ধরতেই তেওয়ারী ঘাড় ধরে তাকে টেনে নিয়ে চলে গেল।

উমেশকে যখন ছেড়ে দেওয়া হ'ল তখন তার সর্ব্বাঙ্গ লাগরার আঘাতে দাকড়া দাকড়া ভাবে ফুলে উঠেছে, স্থানে স্থানে কেটে গিয়ে ছুটছে রক্তের ধারা। উমেশ উন্মাদের মত উর্দ্ধশ্বাসে লাগল ছুটতে—তার কাণে কেবলই ধ্বনিত হতে লাগল, তার স্ত্রীর সেই ক্ষীণ কথা কয়টী "আমার শেষ সময় তুমি এখন কোথাও যেও না।" উমেশ ভুলে গেল নিজের যন্ত্রণা, প্রাণপণ চেষ্টায় ছুটতে লাগল সেই অন্ধকারের বুক চিরে। সেই বৈশাখের রুদ্র-নৃত্য-থেমে-যাওয়া প্রকৃতির স্তব্ধতা উমেশের কাছে যেন বড় ভয়ানক ঠেকতে লাগল—উমেশের মনে হল, সে যেন কোন প্রেত-লোকের মধ্যে এসে পড়েছে। দেহ অবসন্ন হয়ে পড়েছে, পা আর চলতে চায় না, তবুও প্রাণপণ শক্তিতে উমেশ ছুটছে।

বাড়ীর ধারেই আসতে কুকুরটা ঘেউ ঘেউ ক'রে বার কয়েক ডেকে উঠল। উমেশের কাছে আজ যেন এ ডাক প্রেতলোকের অট্টহাস্যের মতই শোনাল। কোন রকমে ঘরের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল, অন্ধকার—কেবল অন্ধকার। উমেশ কম্পিত হস্তে স্পন্দিত বক্ষে জ্বালালে মাটীর প্রদীপটা—কি এ কি!···

পত্নীর লুটিয়ে পড়া মাথাটা কোলের উপর টেনে নিয়ে তার অসাড় নিস্পন্দ বুকের উপর হাত রেখে, মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে আকুল কণ্ঠে ডাকলে—"বৌ, বৌ ও বৌ!"

কিন্তু তার প্রাণ-পাখী বহুক্ষণ পৌঁছিল ছেড়ে উড়ে গেছে।

দক্ষিণ সমুদ্রে প্রবালের বড় বাঁধ

—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

দুইজন অষ্ট্রেলিয়ান ভ্রমণকারী বিখ্যাত 'দি গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ' সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন এবং এ সম্বন্ধে বই লিখিয়াছেন।

প্রবালের এই ১,২০০ মাইল দীর্ঘ বাঁধ প্রশান্ত মহাসমুদ্রের একটী অদ্ভুত প্রাকৃতিক দৃশ্য। বাইরের লোকে অনেকেই এই বাঁধের কথা জানেন না, জানিলেও বেশী কিছু খবর রাখেন না ইহার বিষয়ে।

'গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ' বা প্রবালের বড় বাঁধের দক্ষিণ দিকের সমুদ্রের জলের ঢেউ কম, সুতরাং সমুদ্র অনেক শান্ত। উত্তর দিকের ঢেউয়ের তোড় বাঁধের গায়ে প্রতিহত হইয়া বাঁধের পিছন দিকে এই নিস্তরঙ্গ সমুদ্রবক্ষের সৃষ্টি করিয়াছে।

যদি কেহ দক্ষিণ দিক্ হইতে এই শান্ত বাঁধে-ঘেরা সমুদ্র-বক্ষে আসিয়া প্রবেশ করে, তবে সে দেখিতে পাইবে, বাঁধের এক জায়গায় একটি লাইট হাউস এবং লাইট হাউসের পারে কিছু দূরে একখানা ছবির মত টীমার—সম্ভবতঃ নোঙর করিয়া আছে।

টীমারখানি দেখিয়া এ কথাও মনে হইবে যে, উপকূলচারী পোতসমূহের গমন-পথ হইতে টীমারটির অবস্থান-স্থান একটু বেশী পূব দিকে।

দক্ষিণ-পূর্ব্ব বাণিজ্য-বায়ু যে-দিন সমুদ্রবক্ষে ছোট বড় বীচিমালার সৃষ্টি করে, সে-দিন নোঙর-করা টীমারখানির দৃশ্য মনে যেন একটা অমঙ্গলের বার্ত্তা বহন করিয়া আনে।

আসলে টীমারখানি প্রবাল-বাঁধে ধাক্কা খাইয়া জখম হইয়া ও-অবস্থায় পরিত্যক্ত হইয়াছে অনেক দিন আগে। ১৯২৬ সালের আগষ্ট মাসে এই দুর্ঘটনা ঘটে। টীমারখানির নাম ছিল 'সুমা'। এখন দূর হইতে জলপোতের এই দৃশ্য দেখিয়াই নাবিকেরা বুঝিতে পারে যে, তাহারা প্রবাল-চড়া-সমাকীর্ণ অত্যন্ত বিপদ্‌সঙ্কুল সমুদ্রবক্ষে প্রবেশ করিতে চলিয়াছে—যেখানে বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন আছে, যদি বাঁচিয়া দেশে ফিরিতে হয়।

এতটুকু বিবেচনার অভাব ঘটিলে এ সমুদ্রে সঙ্গে সঙ্গে দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে।

কর্কটক্রান্তির মণ্ডলে প্রশান্ত মহাসমুদ্রের এই স্থানে অনেকগুলি বিচ্ছিন্ন প্রবালের চড়া আছে—প্রকৃতপক্ষে 'ব্যারিয়ার রিফ' সুরু এইখান হইতেই—এখান হইতে তাহা চলিয়া গিয়াছে ১,২০০ মাইল দূরে কুইন্‌স্‌ল্যাণ্ড উপকূল পর্য্যন্ত একটানা—শেষ হইয়াছে নিউ গিনির দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে মারে দ্বীপপুঞ্জের কাছে।

দক্ষিণ প্রান্তের দিকে এই বিরাট প্রবালের বাঁধ অষ্ট্রেলিয়ার তীরভূমি হইতে প্রায় একশত মাইল দূরে অবস্থিত।

'হেরোল্ড' ব্রেঁার প্রবালের দ্বীপ

মেলভিল অন্তরীপের প্রবাল-বাঁধ আরও নিকটে আসিয়া একটা অপ্রশস্ত সমুদ্রের খাড়ির সৃষ্টি করিয়াছে—এই খাড়ির বিস্তৃতি মোটে ৭ মাইল। এখান হইতে বাঁধটা আবার বহির্সমুদ্রের দিকে চলিয়া গিয়াছে।

যদি কোনও দর্শক ১,২০০ মাইলদীর্ঘ এই বাঁধের সমগ্র তল পরিদর্শন করেন তিনি বুঝিবেন, ইহাকে ঠিক প্রবালের বেড়াজাল বলা যায় না। কারণ বাঁধের মাঝে মাঝে নিরেট প্রবালের চড়া আছে, প্রবালের বাঁধে ঘেরা নিস্তরঙ্গ সরোবর আছে, প্রবাল-দ্বীপ আছে।

স্থানে স্থানে প্রবাল-বাঁধ এত নীচু যে, জোয়ারের সময় সেই অংশ ডুবিয়া যায়—ভাঁটার সময় মাত্র জাগিয়া থাকে।

এই সব বাঁধ ও প্রবাল-দ্বীপের মাঝে মাঝে অপ্রশস্ত পথ আছে, তাহার মধ্য দিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া জাহাজ বাহিরের সমুদ্রে পড়িতে পারে।

কেপ ইহার উত্তর প্রান্তের অর্দ্ধেক প্রায় ছয় শত মাইল দীর্ঘ ও প্রায় অবিচ্ছিন্ন দেওয়ালের মত। দেখিলে মনে হয়, প্রাচীন যুগের মহাদেশের উপকূলভাগ যেখানে সমুদ্রের জলে ডুবিয়া আছে, প্রবাল-বাঁধ এক সময় সেই উপকূলের ধারে ধারে গড়িয়া উঠিয়াছিল।

এই জায়গায় ভিতরের দিকে, অর্থাৎ বাঁধ ও উপকূলের মধ্যবর্ত্তী স্থানের সমুদ্র খুব সম্ভব এই জন্যই কিছু অগভীর, কোথাও কুড়ি হইতে ত্রিশ ফ্যাদমের বেশী নয়।

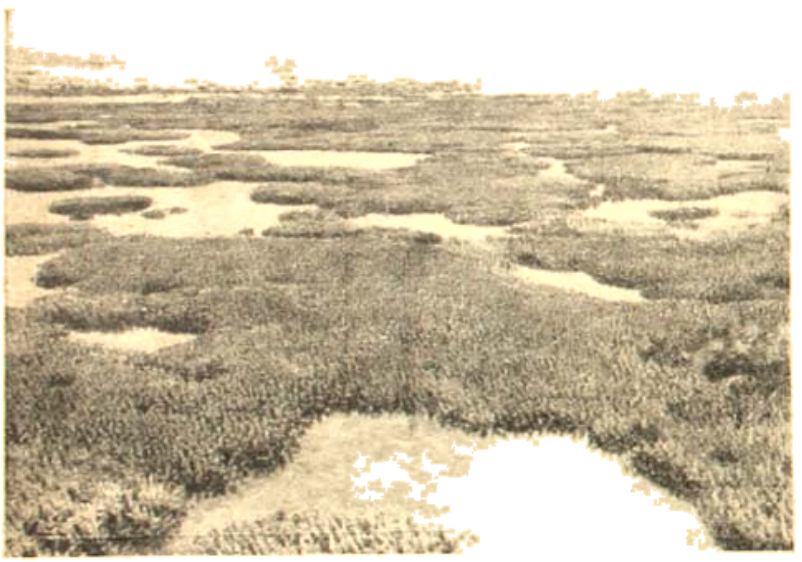

সমুদ্রের জল ভেদিয়া দাঁড়াইয়া আছে 'ট্যাবুলার' প্রবালের বিচিত্র বৃক্ষ।

এই অগভীর খাড়িটা ছয় সাত মাইল চওড়া এবং এই পথ দিয়াই দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ার বন্দর হইতে ইউরোপ ও এশিয়াগামী জাহাজসকল যাতায়াত করিয়া থাকে।

হঠাৎ যদি কেহ না জানিয়া এই বাঁধের মধ্যবর্ত্তী খাড়ি দিয়া জাহাজ চালায়—সে বুঝিতে পারিবে না যে, এক বিশাল প্রবাল-বাঁধের ভিতরে আসিয়া পড়িয়াছে। কারণ সাধারণতঃ 'ব্রেকওয়াটার' বলিলে যে শান্ত ও নিস্তরঙ্গ সমুদ্রবক্ষকে বোঝায়, এই অপ্রশস্ত সমুদ্র-খাড়ি তেমন শান্ত নয়।

দক্ষিণ-পূর্ব্ব বাণিজ্য-বায়ু প্রবাহের দ্বারা তাড়িত হওয়ায় জন্য সব সময়েই এখানে ছোট-বড় ঢেউ দেখা যায়, সে-গুলিকে প্রথমটা বাহিরের সমুদ্রের উর্ম্মিমালা বলিয়া ভুল করা বিচিত্র নয়। বছরের মধ্যে আট মাস এই অবস্থা। আরও ভুলের কারণ ঘটে যে, মাঝে-মাঝে ছোট-খাট দ্বীপ দেখা যায়, কোনও স্থানে এই দ্বীপগুলি অনুর্ব্বর ও গাছপালাশূন্য—আবার যে জায়গায় আগ্নেয়গিরির ছাই পড়িয়া ভূমি উর্ব্বর, সেখানে ঘন, সুদৃশ্য বন-জঙ্গল, বড় বড় পৌড়ি গাছ ও উষ্ণমণ্ডলের অন্যান্য বনস্পতি।

এই সব নারিকের দৃষ্টিবিভ্রম উৎপাদন করে, কারণ সে ভাবে ওই দ্বীপগুলি মহাদেশের অংশ।

আসলে এই দ্বীপগুলি প্রাচীন উপকূলরেখার ধ্বংসাবশেষ। অর্থাৎ পুরাকালের যে উপকূল পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে বিস্তৃত ছিল, তাহার সর্ব্বোচ্চ স্থানগুলি ঐ ভাবে জলের ভিতর হইতে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বাকী অংশটুকু প্রশান্ত মহাসাগরগর্ভে প্রবেশ করিয়াছে বহুদিন।

এই দ্বীপগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, ইহাদের উত্তর-পূর্ব্ব দিকে অশ্বক্ষুরাকৃতি প্রবালের বাঁধ; তবে যেখানে দেশের উপকূল খুব কাছে, সেখানে এই প্রবালের বাঁধ নাই। কারণ বর্ষাকালে নদীর মিষ্ট জল তোড়ে বাহির হইয়া আসিয়া বহু দূর পর্য্যন্ত সমুদ্রে পৌঁছায় এবং এই বাঁধ ভাঙ্গিয়া ফেলে।

অশ্বক্ষুরাকৃতি যে বাঁধের কথা বলা হইল, ইহার সঙ্গে উপরে যে 'গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ্'-এর কথা বলা হইয়াছে, তাহার কোন সম্পর্ক নেই।

এই দ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিক্ সর্ব্বত্রই অনুর্ব্বর ও বৃক্ষ-শূন্য। এমনকি, যেখানে এই সব দ্বীপ বৃষ্টিবহুল অঞ্চলে অবস্থিত, সেখানেও এই অবস্থা।

এই দ্বীপসমূহের মধ্যে হিচিনব্রুক্ বলিয়া যে বৃহৎ দ্বীপটী আছে, সেটি ভাল করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, প্রবাল-দ্বীপগুলির দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকের অনুর্ব্বরতার কোন রহস্যময় কারণ আছে, নতুবা যে-হিচিনব্রুক দ্বীপের উত্তরভাগ অষ্ট্রেলিয়া মহাদ্বীপের সামনা-সামনি—যে-অংশ দুর্ভেদ্য জঙ্গলে পূর্ণ, মাঝে মাঝে জঙ্গলের মাথায় মাথায় পাহাড় হইতে নামিয়া

আসিয়াছে এমনি কত রৌপ্যসূত্রের মত জলপ্রপাত—দূর হইতে এই নিবিড় বনরেখা ও রৌপ্যসূত্রের ন্যায় প্রতীয়মান জল-প্রপাতের দৃশ্য অতি মনোহর, কিন্তু সেই দ্বীপেরই দক্ষিণ-পূর্ব দিকে যদি যাওয়া যায়, তবে দেখা যাইবে, এক বিরাট পাষাণ-প্রাচীর পথিকের পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

প্রসঙ্গক্রমে হিচিন্‌ব্রুক দ্বীপ সম্বন্ধে আর একটা কথা বলিতেছি।

হিচিন্‌ব্রুক দ্বীপের এই ঘন ও সুদৃশ্য জঙ্গল থাকে থাকে উঠিয়া গিয়াছে পিছন দিকের তিন হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ের চূড়ায়। এই জঙ্গল সমুদ্রবক্ষ হইতে দেখিতে অতীব সুদৃশ্য বটে, কিন্তু কোন ভ্রমণকারী এ পর্যন্ত এই ঘন বনে প্রবেশ করিয়া কোথায় কি আছে দেখে নাই।

হিচিন্‌ব্রুক দ্বীপটী যদিও মাত্র ত্রিশ মাইল লম্বা এবং কয়েক মাইল চওড়া, কিন্তু ইহার জঙ্গল এমন ঘন ও দুর্ভেদ্য যে, সম্ভবতঃ এই বনের মধ্যে কোন অজানা বন্য জন্তু প্রচ্ছন্ন আছে। অষ্ট্রেলিয়া হইতে দ্বীপটী বিচ্ছিন্ন হইবার পূর্বে হয়ত সেই জাতীয় জন্তু এখানকার বনে আশ্রয় লইয়াছিল। অষ্ট্রেলিয়ার বনমধ্যে সে জন্তু এখন হয়ত আর দেখা যায় না, কিন্তু এই জঙ্গলে তাহা এখনও খুঁজিলে পাওয়া যাইতে পারে।

আমি নিজে (ড্যাম্পিয়ারের লিখিত বিবরণ হইতে) এই ঘন বনের প্রান্তদেশে তাঁবু ফেলিয়া কিছুদিন কাটাইয়াছিলাম, কিন্তু ইহার মধ্যে প্রবেশ করি নাই।

হিচিন্‌ব্রুক দ্বীপ হইতে উত্তরে 'ব্যারিয়ার রিফ'* অষ্ট্রেলিয়ার উপকূলের দিকে আরও ঘেঁষিয়া আসিয়াছে। ইহার একটা কারণ, এখানকার সমুদ্রতল অগভীর। আরও একটা কারণ, এই অংশে কোন বড় নদীর মোহানা নাই, যাহার পরস্রোত প্রবালের বংশ ধ্বংস করিতে পারে।

পূর্বেই আমি বলিয়াছি নদীমুখে মিষ্ট জলের স্রোত প্রবালের উপনিবেশ একেবারে নির্মূল করিয়া দেয়।

একটি উদাহরণ দিই।

১৯১৮ সালে অষ্ট্রেলিয়ার উপকূলে ৬টি সাইক্লোন হয়। একটার অল্প পরেই আর একটা। সেই সঙ্গে বৃষ্টিও নামে খুব। আট দিনের মধ্যে ৫৬ ইঞ্চি বারিপাত হয়। যাহা এই দেখে বড় একটা দেখা যায় না।

এই ভীষণ ঝড়বৃষ্টির ফলে উপকূলে যে সব বড় বড় নদীর মোহানা, সেই সব নদীপথে এত বেশী মিষ্ট জল আসিয়া সমুদ্রে পড়িয়াছিল যে, উপকূলের নিকটবর্তী প্রবালের ক্ষেত্র একেবারে ধ্বংস হইয়া যায়।

হোন দ্বীপের নিকটবর্তী সমুদ্রে অনেকখানি জায়গায় উৎকৃষ্ট বনজাত প্রবালের ক্ষেত্র ছিল, সে সব সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়া যায়।

যেখানে নদীর অত্যাচার নাই, সেই সব স্থানেই প্রবালের

হিথ আইলাণ্ডের দৃশ্য, বামে লাগুনের নীল জল : মধ্যে ঃ

ক্ষেত্র অত্যন্ত উর্বর। বহির্মুক্তের উদ্ভিদাদাও প্রবালের বংশবৃদ্ধির অনুকূল নয়। এজন্য দ্বীপের দক্ষিণ দিকে ক্ষেত্র-গুলি যেমন সুদৃশ্য, উত্তর দিকে তেমন নয়।

প্রবালের এত বড় বাঁধের কল্পনা করিতে হইলে দীর্ঘ অথচ মাঝে মাঝে বিচ্ছিন্ন একটি প্রবালক্ষেত্রের ছবি মনে আনিতে হইবে। তাহার দুইধারে—অর্থাৎ সমুদ্রের দিকে এবং অষ্ট্রেলিয়ার উপকূল ভাগের দিকে, মৃত প্রবালের স্তূপ।

প্রবাল জিনিসটার হ্রাসবৃদ্ধি আছে, এ কথা মনে রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন।

অনেকের এ সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা নাই। তাঁহাদের অবগতির জন্যে বলা যায় যে, মানচিত্রে প্রবাল-বাঁধের দীর্ঘ

রেখা দেখিয়া মনে হওয়া সম্ভব যে 'ব্যারিয়ার রিফ্' পাথরের দেওয়ালের মত কঠিন, অনড় ও অটল পদার্থ।

আসলে তাহা নয়, কারণ, প্রবাল এক প্রকার সামুদ্রিক কীট। বহু লক্ষ প্রবাল এক সঙ্গে বর্দ্ধিত হইয়া এক বিশাল উপনিবেশের সৃষ্টি করে।

এই উপনিবেশ কখনও বাড়ে, কখনও কমে।

আমি একবার গ্রীন্ দ্বীপের স্কুলে কিছুকাল বাস করিয়াছিলাম। একটা প্রবাল-দ্বীপের অপ্রশস্ত চড়ায়। আমাদের হইত, আমি এরূপ একটা সহরে বাস করিতেছি, যে-সহরের অধিবাসীরা সংখ্যায় ক্রমশঃ বাড়িতেছে এবং সহরের আয়তন ইঞ্চি ইঞ্চি বাড়িতেছে।

নৌ আইলাণ্ড : দূরে রঙ ধরিয়াছে ঢেউটে নৌকা।

প্রবাল দ্বীপটা, যেটাতে আমি থাকিতাম, প্রাচীন প্রবাল-ক্ষেত্রের অংশ। এই প্রবাল-দ্বীপের মাঝখানে অপ্রশস্ত অঙ্গুরীয়াকার প্রবালের চড়া দ্বারা সীমাবদ্ধ সরোবর (lagoon) ছিল এবং দ্বীপটীতে ছিল নিবিড় জঙ্গল। কিন্তু নৌকা করিয়া কিছু দূর গেলে নবজাত প্রবাল-ক্ষেত্র চোখে পড়িত।

উপোলো ব্যাঙ্ক নামক স্থানে সারা সমুদ্রতীরটা নতুন প্রবালে আচ্ছন্ন ছিল। ইহার উপর পাখেরা বালির এক পুরু স্তর পড়িয়াছিল, কালক্রমে ইহার ওপরে বৃক্ষলতা জন্মাইতে পারিবে।

আরও কিছু উত্তরে অমেষ্টার বে নামক স্থানে প্রবালময় চড়ার ওপর ঘাস জন্মিয়াছে দেখিয়াছি। এমন সময় আসিবে যখন উহার উপরে গাছপালা গজাইবে।

দূরে দূরে অনেক প্রবালক্ষেত্র দেখিয়াছিলাম—তাহারা সব সময়েই জলের ওপরে জাগিয়া থাকে, কোনও অবস্থাতেই জল-মগ্ন হয় না—কিন্তু ইহাদের মধ্যে অনেক মৃত প্রবালক্ষেত্র আছে। এখনও তাহার প্রবালগুলি চূর্ণ হইয়া বালুকাতে পরিণত হয় নাই।

অনেক জায়গায় তীরভূমি এই রকম প্রবাল-বালুকাতে তৈয়ারী।

দেখিলে খুব চকচকে বালি মনে হইবে, কিন্তু হাতে লইয়া মনোযোগ দিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে, সেগুলি প্রবাল-চূর্ণ ছাড়া কিছু নয়। মৃত প্রবালক্ষেত্র বহুদিন পরে এই প্রকার বালুকা সৃষ্টি করে। 'ব্যারিয়ার রিফ'-এর কোনো কোনো স্থানে এই প্রকার বালুকাময় চড়া আছে।

তাহা ছাড়া এমন প্রবালক্ষেত্র আছে, যাহা জোয়ার আসিলে ডুবিয়া যায় না, এমন অসম্পূর্ণ নবজাত ক্ষেত্র আছে—যাহা এখনও জলের উপর মাথা তুলিয়া জাগিয়া উঠে নাই।

গ্রীন্ দ্বীপের নিকটস্থ প্রবালক্ষেত্রগুলির যে বর্ণনা করা গেল, তাহা হইতে 'গ্রেট' ব্যারিয়ার রিফ'-এর সাধারণ আকৃতি ও প্রকৃতি অনেকটা বুঝা যাইবে।

এই বিশাল প্রবালের বাঁধ যুগ-যুগ-সঞ্চিত প্রবালকীটের মৃত কঙ্কাল ও নবজাত প্রবালক্ষেত্রে তৈয়ারী বটে—বহু যুগ ধরিয়া ইহার গঠন চলিয়া বর্ত্তমানে এই অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে বটে—কিন্তু প্রবাল-ক্ষেত্রের বংশবৃদ্ধির যে বর্ত্তমানে কি ভাবে হইতেছে, তাহা আমাদের চোখেই পড়ে।

যাহারা এই সমুদ্রে সর্ব্বদা যাতায়াত করে, তাহারা প্রবালের বংশবৃদ্ধি বেশ বুঝিতে পারে।

সাধারণতঃ দেখা যায়, প্রবালক্ষেত্রগুলি উচ্চতায় ও বিস্তৃতিতে বৎসরে গড়ে দু'ইঞ্চি করিয়া বাড়িতেছে। প্রবাল-

ক্ষেত্রের এই বৃদ্ধি জাহাজ চালনার বিঘ্ন উৎপাদন করে। আজ যেখানে দিয়া সমুদ্রপথ মানচিত্রে নির্দ্ধারিত আছে—কয়েক বছর পরে দেখা যাইবে, সে পথ নবজাত প্রবালক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

প্রশান্ত মহাসাগরের এই অঞ্চলে এই জন্য মাঝে মাঝে দুর্ঘটনা ঘটে।

১৮৯০ সালে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া নেভিগেশন কোম্পানীর জাহাজ 'কোয়েটা' এডেলিফাস চ্যানেলে এক প্রবালক্ষেত্রে ধাক্কা লাগিয়া তিন মিনিটের মধ্যে ডুবিয়া যায়—প্রায় একশত জন আরোহী জলমগ্ন হয়। এই প্রবালক্ষেত্রের উল্লেখ চার্টে ছিল না—সুতরাং বেশ বুঝা যাইতেছে যে, এটি নতুন প্রবালক্ষেত্র।

এই অঞ্চলের জাহাজ-যাতায়াতের পথ খুব সতর্কতার সঙ্গে তৈয়ারী—প্রবালক্ষেত্রের দিকে নজর রাখিয়া এই সব চার্ট তৈয়ারী করা হইয়াছে। কিন্তু বিশেষজ্ঞগণ বলেন (ডাঃ ডেভিস ক্যানন তাঁহাদের মধ্যে একজন) যে, মানচিত্র যে সময়ে তৈয়ারী হইয়াছিল—তারপর প্রবালক্ষেত্রগুলি এভাবে বাড়িয়াছে যে, নূতন চার্ট আবার প্রস্তুত করা আবশ্যক, নতুবা জাহাজ যাতায়াতের পথ নবজাত প্রবালক্ষেত্র দ্বারা বিপজ্জনক হইয়া উঠিবে।

বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে—যখন সমুদ্রের চার্ট খুলিয়া জাহাজ চালান এত সহজ, তখনই 'গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ' যদি জাহাজ চলাচলের পক্ষে তত নিরাপদ না হয়—তাহা হইলে ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন কুক্ প্রশান্ত মহাসাগরের এই অজানা প্রবালক্ষেত্রের দীর্ঘ বিপৎসঙ্কুল অঞ্চলে কি ভাবে তাঁহার জাহাজ 'এন্‌ডেভার' চালনা করিয়াছিলেন (দীর্ঘ 'গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ'-এর দৈর্ঘ্য ও বিস্তৃতির, তিনি উল্লেখ করেন নাই বটে) তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।

প্রথমে তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে, তাঁহার জাহাজ চলিতেছে অতি বিপৎসঙ্কুল এক বিশাল প্রবালক্ষেত্রের ভিতর দিয়া। কারণ তাঁহার দৃষ্টি তখন নিবদ্ধ ছিল অষ্ট্রেলিয়া মহাদ্বীপের তীরভূমির প্রতি।

কিন্তু অর্দ্ধেক অগ্রসর হওয়ার পরে তিনি বুঝিতে পারেন যে, ভয়ানক জায়গায় আসিয়া পড়িয়াছে তাঁহার জাহাজ—মৃত্যুসঙ্কুল প্রবাল-ক্ষেত্রের একেবারে মাঝখানে আসিয়া পড়িয়াছেন—তাঁহার চারিধারেই সমুদ্রগর্ভে প্রবালের চূড়া কোথায়ে ডুবিয়া আছে; হয় ত, কোনও অসতর্ক মুহূর্ত্তে প্রবালের চূড়ায় ধাক্কা লাগিয়া সব শেষ হইয়া যাইতে পারে।

কাপ্তেন কুক্ যে কত বড় নাবিক ছিলেন ইহা হইতে তাহা বুঝা যায়—সেই অজ্ঞাত বিপৎসঙ্কুল প্রবালক্ষেত্রের মধ্যে সুকৌশলে তিনি তাঁহার জাহাজ পরিচালনা করিয়াছিলেন।

ট্রিবুলেশন অন্তরীপের কাছে তাঁহার জাহাজ একটা প্রবাল চূড়ায় আটকাইয়া যায়—বহু কষ্টে 'এন্‌ডেভার'

ধারের উত্তর পূর্ব্ব দিক : জলের উপরে প্রবাল দেখা যাইতেছে।

জাহাজকে মুক্ত করিয়া তিনি কয়েক মাইল উত্তরে মোড়র ফেলেন। এখানে তাঁহার জাহাজ মেরামত করিবার পরে তাঁহার সম্মুখে আর এক সমস্যা উপস্থিত হইল। এ্যালি ছিল দ্বীপ হইতে নদীর মোহানা পর্য্যন্ত উত্তর দিকে যতদূরে নজরে পড়ে, শুধুই প্রবালের চূড়া এবং অগভীর জলের খাড়ি—আর কিছু দেখা যায় না।

কিন্তু এখান হইতে ফিরিবার উপায় নাই—কারণ, বাণিজ্য-বায়ু সবেগে দক্ষিণ হইতে উত্তরে বহিতেছে। তখন তিনি খুব সুকৌশলে সতর্কতার সঙ্গে জাহাজ পরিচালনা করিলেন এবং লিজার্ড দ্বীপের কাছে বাহিরের সমুদ্রে যাইবার একটা সরু পথ দেখিতে পাইলেন।

দু' দিনের পথ অগ্রসর হওয়ার পরে হঠাৎ বাণিজ্য-বায়ু বন্ধ হইয়া যাওয়ার ফলে জাহাজ অচল অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইল। যে কোনও মুহূর্তে বাহিরের বড় প্রবালের বাঁধে ধাক্কা লাগিয়া জাহাজ তখন চূর্ণ হইয়া যাইতে পারে। তখন একটা সরু খাড়ি দিয়া উডনেস্রোতকে অগ্রাহ্য করিয়া কুক্ আবার জাহাজ চালাইয়া আসিলেন প্রবাল-বাঁধের পিছনকার নিস্তরঙ্গ খাড়িতে।

আজি যে ক্ষুদ্র প্রবাল-দ্বীপের চড়ায় তাঁবু ফেলিয়াছিলেন, ১৪০ বছর আগে কাপ্তেন কুক্ সে দ্বীপের নামকরণ করিয়াছিলেন এঁন্ হা

১৯২৮-২৯ সালে ডাঃ সি. এম. ইয়োন্ড-এর অধিনায়কত্বে যে 'ব্রিটিশ বারিয়ার রিফ অভিযান' প্রেরিত হয়—তাহারা তাঁবু ফেলিয়া এই দ্বীপে অনেকদিন ছিল।

এই বিখ্যাত অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক, কিন্তু কিছু ভৌগোলিকও বটে। জীবতত্ত্ববিদ্ কয়েকজন বৈজ্ঞানিক এই দলে ছিলেন—প্রবাল-কীটের জীবনেতিহাস পর্যবেক্ষণ করাই ইহাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। ইহাঁদের সঙ্গে দু'একজন অর্থনৈতিক পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহারা প্রবাল-বাঁধের নিকটবর্তী সমুদ্রের অর্থনৈতিক সম্ভাবনার বিষয় অনুসন্ধান করিতে আসিয়াছিলেন।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে, প্রবাল-বাঁধের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা খুব বেশী নয়। জাল ফেলা এই সমুদ্রে সম্ভব হয় না, কারণ অগভীর সমুদ্রের সর্বত্রই প্রবালের চড়া—জাল ছিঁড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা খুব বেশী। উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তে বড় বড় সামুদ্রিক কচ্ছপ যথেষ্ট দেখা যায়। মুক্তার ঝিনুক বেশী নাই। এই সব অসুবিধা সত্ত্বেও অনেক বছর ধরিয়া জাপানী জাহাজ এই সব অঞ্চলে যাতায়াত করে প্রবাল ও অন্যান্য সামুদ্রিক জন্তু সংগ্রহের জন্যে। কিছু কিছু ঝিনুকও মেলে। প্রায় এক লক্ষ পাউণ্ডের বাণিজ্যদ্রব্য ইহারা এই সমুদ্র হইতে প্রতি বৎসর সংগ্রহ করিয়া লইয়া যায়।

এপ্রিল মাসে ঝড়ের সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাওয়ার পরে এই সব জাহাজ থার্সডে দ্বীপ হইতে যাত্রা করিয়া এখানে আসে। প্রবাল বাঁধের দক্ষিণ প্রান্ত হইতে শীতকালের বাণিজ্য-বায়ুর সাহায্যে ইহারা ক্রমশঃ অগ্রসর হয়। নিকটবর্তী দ্বীপবাসিগণ ইহাদের জাহাজে নাবিকের কাজ করে। এক একখানা জাহাজে কুড়িজন নাবিক থাকে সাধারণতঃ। এই সব জাহাজ সব সময় মুক্তা খুঁজিয়া বেড়ায় না। ইহারা ট্রোকাস্ নামে এক প্রকার সামুদ্রিক গেঁড়ি সংগ্রহ করে। ট্রোকাস বড় বড় গেঁড়ি-শুগলি জাতীয় জীব। ইহারা উদ্ভিজ্জাণু ভক্ষণ করিয়া জীবিত থাকে। অগভীর প্রবাল-চড়ায় সাধারণতঃ ইহাদের পাওয়া যায় এবং মুক্তা ডুবুরীর মত ইহাদের তুলিতেও কৌশলী ডুবুরীর দরকার। ইহাদের খোলাতে জামার বোতাম তৈয়ারী হয়। জাপানে ট্রোকাসের খোলা হইতে জামার বোতাম তৈয়ারী করা একটা লাভজনক কুটীরশিল্প। ঝিনুকের তৈয়ারী বোতামের চেয়ে সস্তা বলিয়া ইহার চলন বাজারে খুব বেশী—অথচ জিনিসটা সুদৃশ্য ও টেঁকসই।

ট্রোকাস সংগ্রহ করিয়া ছোট ছোট ডিঙিগুলি সন্ধ্যার সময় দূরে নোঙর-করা জাহাজে ফিরিয়া যায়। সেখানে ট্রোকাস গরম জলে সিদ্ধ করা হয় এবং ভিতরের শাঁস সমুদ্রজলে ফেলিয়া দেওয়া হয়। খোলাগুলি জাহাজের উপর রৌদ্রে শুকাইয়া লইলেই পণ্যদ্রব্যে পরিণত হয়।

তবে জাপানী জাহাজের এ বাণিজ্য বেশীদিন টিকিবে না। ফুইজিদ্বীপ গবর্ণমেণ্টের নূতন আইন অনুসারে স্থানীয় দ্বীপবাসীদের সুযোগ দেওয়ার ব্যবস্থা হইতেছে সর্বাগ্রে।

এপ্রিল মাসের প্রথম হইতে নভেম্বর মাসের শেষ পর্যন্ত ট্রোকাস্ সংগ্রহের উপযুক্ত সময়।

পলিয়াদের বিবাহ

—শ্রীবিশ্ববন্ধু গুহ মজুমদার

আমি কিছুদিন পূর্ব্বে বিষ্ণুপুর নামক এক গ্রামে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। গ্রামটি দিনাজপুর জেলার ভিতরে এবং সহর হইতে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত। ঐ সমস্ত জায়গার অধিবাসীদিগকে পলিয়া বলে। ইহাদিগকে এখনও সভ্য জগতের আলো-বাতাস স্পর্শ করিতে পারে নাই। অবশ্য সেটা বুঝিয়াছিলাম শুধু ইহাদের পোষাক দেখিয়াই। পুরুষরা নেংটি পরিয়া থাকে আর মেয়েরা বুক হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত এক প্যাচ দিয়া কাপড় পরে। কথাবার্ত্তা আমরা ভাল বুঝিতে পারি না, মেয়েদের কথা আরও বেশী অপরিষ্কার। ইহারা সবাইকেই 'তুই' 'তুই' বলে। কোন সময়ে 'আপনি'ও হঠাৎ বলিয়া ফেলে, অর্থাৎ তাহাকে কি বলিতে হয় তাহা ইহারা জানে না। কিন্তু ইহারা বেশ ভদ্রতা জানে। আমাকেই অনেকে অভিবাদন করিয়াছে। নিজেদের মধ্যেও অভিবাদনের চল আছে। যে বাড়ীতে বিবাহ হইল সেই বাড়ীতেই আমি ছিলাম। খাওয়া-দাওয়ার বিষয়েও আমাকে ইহারা খুব যত্ন করিয়াছে।

ইহারা জাতিতে ক্ষত্রিয়। অবশ্য, এখন ইহাদের ব্যবসায় যুদ্ধ নহে, এখন ইহারা কৃষিজীবী, ইহাদের মধ্যে রীতিমত বিধবা-বিবাহের চল আছে। একদিক্ দিয়া ইহারা আমাদের অপেক্ষাও আধুনিক। ইহাদের মধ্যে পর্দ্দা নাই। মেয়েদের মাথায় আবরণ মোটেই নাই—পুরুষ, স্ত্রীলোক একসঙ্গে মিশিতেছে। কোন বাধা নাই। যাক, আমার প্রবন্ধের যাহা উদ্দেশ্য তাই এখন লিখি, এ সব খুটি-নাটি লিখিয়া প্রবন্ধ দীর্ঘ করিবার ইচ্ছা আমার নাই।

মেয়ের বিবাহ। ইহাদের মধ্যে মেয়ের পণ আছে, কিন্তু বোধ হয় পুণ্যসঞ্চয়ের মানসে এ লোকটি মেয়ে দান করিল। এদের বিবাহের পূর্ব্বের দিন ও পরের দিন সংকীর্ত্তন হয়। আমি সংকীর্ত্তন শুনিয়া একজনকে বলিলাম যে, ঐ গান আমি লিখিয়া লইব। তখন সে যেখানে সংকীর্ত্তন হইতেছিল সেখানে সাদরে আমাকে লইয়া গেল, গানের পদও যেমন অদ্ভুত, সুরও তদ্রূপ। অবশ্য ইহাদের কাছে আমাকে দেখিয়া তাহারা উৎসাহের সহিত গান ধরিল। গানের পরে আমি বলিলাম বেশ হইয়াছে, গান যে আমার নিকট কিরূপ শ্রুতি-মধুর হইয়াছিল তাহা পাঠক-পাঠিকাদিগকে খুলিয়া বলিতে হইবে না,—রচনার নমুনা দেখিয়াই বুঝিবেন। নিম্নে দুইটি গান উদ্ধৃত করিয়াছি :—

প্রথম—

উঠ রে উঠ রে গোপাল উঠ দুলালিয়া
ঘরের দুয়ার ঘর আছে বাড়াইয়া
উঠ রে উঠ রে গোপাল উঠ রে ধেনিক
সুখের সাগর পাইয়া কত নিদ্রা যাও তুমি,
মায়ের বচন শুনি উঠিয়া গোপাল নীলমণি
চলিল মায়ের পানে চাইয়া—
হাসি হাসি গোপাল বলে
এইবার মা মোকে নেও কোলে
গোপালের কোলে করি মায়ের নন্দরাণী
লক্ষ চুম্ব দিয়া কত যায়
ওরে যাদু নীলমণি
আজিরাতে খেল তুমি
আমি যাইয়া পুরুকর্ম করি
এখানে আসিবে বসু, আমারে বলিবে বসু ...ইত্যাদি

দ্বিতীয়—

নাইচে আয় রে ঘুমুর ঘুমুর ঘুমুর
যেই মোনি নাচিয়া গেল সেই মোনি নাচিয়া আইল
নাইচে নাইচে চরণ ভারি আর কি নাচিতে পারি
নাইচে নাইচে কোলে চড় মায়ের ওরু সফল কর
নলী দিব বলি দিয়া মোরে নাচাও ওলী...ইত্যাদি

চমৎকার ছন্দের মিল। আমি নিজে উহাদের পাতা হইতে এগুলি উদ্ধৃত করিয়াছি।

এদিকে বিবাহে "জোর চোপর" হয়, অর্থাৎ বিবাহের পূর্ব্বদিন একবার কুকের রাখালগণের সেবা হয়, আবার বিবাহদিবসেও ঐরূপ হইয়া থাকে। একটা বাঙ্গালীর পাচটা কলাগাছ পুঁতিয়া চারি কোণে চারিটা আর দুইটার মাঝখানে একটা, তার পর বাহটা কলার ডোগোর কলা, ছাতু, খৈ রাখে। একজন ঠাকুরের পূজা করেন। পূজা অন্তে ছোট ছোট ছেলেরা সেই প্রসাদ পায়। ইহাকে 'রাখাল ভোজন' বলে, এবং এইরূপ অনুষ্ঠানের নামই "জোর চোপর।"

বিবাহের দিন দুপুরে আমি শুইয়া আছি এমন সময়

হঠাৎ বাড়ীর ভিতরে ক্রন্দনের রোল উঠিল। আমার ঘরে একজন সেই দেশী লোক ছিল, তাহাকে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে উত্তর করিল, যার বিবাহ হইবে সেই কাঁদিতেছে।

আমি—কেন ?

সে—এখন মেয়েকে কুড়[১] মাখাইয়া স্নান করাইতেছে।

আমি—এ রকম কাজার কি নিয়ম আছে না কি ?

সে—হাঁ, নিয়ম আছে।

আমারও তাই মনে হইল, কারণ তার কয়েক মিনিট পূর্ব্বেই ক'নেকে হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছি। এখনি কি শোক একেবারে উথলিয়া উঠিল ? এদেশের মেয়েরাও বিবাহে গান করে। তাহা হঠাৎ শুনিলে ভয় পাইতে হয়। স্নান করানর সময় গাহিতেছিল :—

কাচা কাচা হলুর আর দুইয়া পরে ডেল রে
ঐ মত কেনবাড়ার ভাবেত খেছে দিব রে
কেন্ নাড়া চাহে নাল পড়কাত রে—
নাল পড়কা তবে যাবেত তালিয়া রে—ইত্যাদি

তার পর অনেক রাত্রিতে বর আসিয়া পৌঁছিল। বর পাল্কীতে আসিয়াছিল, আর সকলেই হাঁটিয়া আসিয়াছিল। বিবাহ শেষ রাত্রে হইয়াছিল। পরদিন আমি পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ দেশে বিয়ে কি লগ্ন অনুযায়ী হয় ?" পুরোহিত বলিলেন, "এরা বোঝে না, যখন ইচ্ছা বিয়ে দিলেই হ'ল।" আমি বিবাহ-বাসরের ও একটি কথা লিখিয়াই প্রবন্ধ শেষ করিব।

পূর্ব্বোক্ত "জোর-চোপরে"র জন্য যে জায়গায় কলাগাছ পুঁতিয়াছিল সেইটাই বিবাহ-বাসর। পুরোহিত মন্ত্র পড়াইতে ছিলেন। ক'নের বাপ কন্যা সম্প্রদান করিল, অবশ্য কন্যা-দাতা চুপ করিয়াই ছিল, কারণ সে সংস্কৃত শব্দ উচ্চারণ করিতে অক্ষম। ঐ দিক্‌কার লোকে বিবাহে চেলি ব্যবহার করে না। বর-ক'নে উভয়েই সাদা কাপড় পরিয়াছিল। পাঠক-পাঠিকা মনে করিবেন না, বিবাহের সময়েও বর নেংটি পরিয়া ছিল আর ক'নে পূর্ব্বোক্ত অদ্ভুত ভাবে কাপড় পরিয়াছিল। তখন আমরা যেমন পরি ঐরূপই পরিয়া ছিল। ক'নে অল্পেখানি ঘোমটাও টানিয়াছিল।

অন্যান্য লোকও কাপড় পরিয়াছিল। বর "পোহরিঙ্-রু[২]" উপরে অদ্ভুত মুকুট পরিয়াছিল। ক'নেরও মুকুট ছিল। দুর্ভাগ্য বশতঃ আমার সহিত ক্যামেরা ছিল না, থাকিলে উহাদের অনেক ফোটো পাঠক-পাঠিকাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারিতাম। বিবাহ-বাসরে প্রথমে বর মন্ত্র পড়িতেছিল। কিছুক্ষণ পরে ক'নেকে একটি স্ত্রীলোক কোলে করিয়া লইয়া আসিল। বিবাহ কতকটা আমাদের দেশের মতই। আর ইহারাও ত বাঙ্গালীই, হইবে না কেন ? শিক্ষা এখনও ইহাদের ভিতরে প্রবেশাধিকার পায় নাই, সেই জন্যই বা বৈশাদৃশ্য। দেখিলাম বর ক'নের শুভদৃষ্টি হইল বিবাহান্তে। আমাদের দেশের মত বিবাহ-বাসরে ক'নের মুখ দেখানর নিয়ম নাই। বিবাহের সময়েও মেয়েরা গান করিতেছিল। কতকগুলি মেয়ে এক জায়গায় জড় হইয়া একে অন্যকে জড়াইয়া ধরিয়া দুলিয়া দুলিয়া অপূর্ব্ব সুরে গান করে। বিবাহ-বাসরে যে গান করিয়াছিল তাহার একটি নমুনা দিলাম :—

পান দিনু গুইয়া দিনু রে—
খালার কেন্ নাড়ার খাইও না রে—
খালং[৩] দিনু সতরুং দিনু রে—
খালার কেন্ নাড়ার বৈঠ না রে। ইত্যাদি—

মেয়েদের নিকট হইতে গান সংগ্রহ করিতে আমার অনেক বেগ পাইতে হইয়াছিল। আরও অনেক গান উহারা গাহিয়াছিল কিন্তু সব লেখা সম্ভবপর নহে।

বিবাহের রাত্রিতেই বাসি-বিয়ের যজ্ঞ হইল, তার পর পূজনীয় পূজনীয়ারা বর-ক'নেকে আশীর্ব্বাদ করা আরম্ভ করিল, আশীর্ব্বাদেরই বা কি রীতি ! শীতের রাত্রি, এক এক জনে জলঘট হইতে অনেকখানি করিয়া জল লইয়া বর-ক'নের গায় দিতেছিল, কতকগুলি করিয়া ধান তাহাদের মাথায় ছিটাইয়া দিতেছিল আর একপ্রকার শব্দ করিতেছিল, এই সব শেষ হইতে হইতে সকাল হইল।

কিছুক্ষণ পর বরযাত্রীদের খাওয়া-দাওয়া হইল, তার পর বিদায়ের পালা, মেয়ে ত কাঁদিয়াই খুন, সঙ্গে সঙ্গে তার আত্মীয়-স্বজনও কাঁদিতে লাগিল, মেয়ে কিছুতেই পাল্কীতে উঠিবে না। একজন বরযাত্রী হুকুম করিল জোর করিয়া পাল্কীর ভিতরে ঢুকাইয়া দিতে। তখন দুই জন লোক জোর করিয়া তাহাকে পাল্কীর ভিতর বসাইয়া দিল, মেয়ের মা'কে সেখানে দেখিলাম না, বোধ হয় ঐ করুণ দৃশ্য দেখিতে অক্ষম বলিয়াই ওখানে ছিল না। ঘরে বসিয়া কাঁদিতেছিল, বাস্তবিক সে দৃশ্য বড়ই মর্ম্মস্পর্শী।

১ হলিয়া
২ বর
৩ হার বিশেষ
৪ পাল্কীর মত

জীবন-চিত্র

—শ্রীবিজনবালা দেবী

ছুটি

পূর্ণিমা তিথিতে নিমাইচাঁদের জন্ম হইল। শ্বশুর জামাইকে লিখিয়া জানাইলেন।

সাত মাসে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, তুলায় করিয়া দুধ খাওয়ান হয়, গায়ে ভালি কাঁটার মত বড় বড় লোম, তুলায় বিছানায় শুইয়া থাকে। লীলার সাধ্য কি? লীলার মা অহোরাত্র দৌহিত্র লইয়া ব্যস্ত। দ্বিজেন ভাইপোকে দেখিয়া আসিল।

উত্তর হইতে পূর্ব্বে, পূর্ব্ব হইতে উত্তরে দিন দু' তিনখানা করিয়া চিঠি চলিতে লাগিল।

সাত মাসের ছেলে মা ও ছেলে নিজ রাজ্যে আসিল।

ষ্টেশনে পৌঁছিল বেলা বারটার সময়। পিতার সমস্ত কাজ পঞ্জিকা দেখিয়া, এক চুল এদিক্ ওদিক্ হইবার যো নাই। ষ্টেশনে আগেই লোক পাঠান হইয়াছে, খাবার দুধ সমেত। বেলা তিনটা পর্য্যন্ত সময় খারাপ, ততক্ষণ ষ্টেশনে থাকিতে হইবে, পরে স্থানীয় দেবালয়ে প্রণাম করিয়া তবে বাড়ীতে আসিবে।

গৃহ-বিগ্রহ-মন্দিরের সামনে আঙ্গিনায় আল্পনা দিয়া আসন পাতা, সেই দিকের দুয়ার-পথে পাল্কী ঢুকিল, লীলা ছেলে কোলে করিয়া নামিয়া মন্দিরে উঠিয়া প্রণাম করিল, তার পরে আসনে আসিয়া বসিল।

সকলের আগে পিতা আশীর্ব্বাদ করিবেন, ধান দূর্ব্বা দিলেন বৌয়ের মাথায়, নিমাই চঞ্চল, উজ্জ্বল চক্ষে চাহিয়া চাহিয়া জনতা ও কার্য্য-কলাপ দেখিতেছে, পরের বার তার মাথায় ধান-দূর্ব্বা দিতে হাত তুলিবামাত্র সে হাত-পা ছুঁড়িয়া হাসিয়া দুই হাতে দাদামশির হাতখানা ধরিল জড়াইয়া, অমনি দাদামশি নাতিকে তুলিয়া লইয়া প্রস্থান! আর কাহারও আশীর্ব্বাদ করা হইল না।

তার পরে নিমুর কোষ্ঠী তৈয়ারীর পালা। এক কোঁটা ছেলে বাড়ী তোলপাড় করিয়া তুলিয়াছে। তেজেনের পরে এই প্রথম শিশু, যদিও দিদিদের কল্যাণে বাড়ীতে ছোট ছেলে-পিলের অভাব নাই, তথাপি পিতার বংশধর ত তাহারা নয়। বিশ্বকর্ম্মা-সুরুচি আসিয়াছেন—বড়-দি আসিয়াছেন। নিমু সব সময় হাসি-খুসী, পিতা বলেন, "ইহা যে, ও কাঁদে না!" একটু কান্না শোনা যায় না কখনও, পিতার বোধ হয় নাতির কান্নাও একটু শুনিতে সাধ হয়। বড়-দি বলেন, "দুধের সাধ কি ঘোলে মেটে? এই হল বাবার আসল জিনিষ, আমরা মেয়ের পাল রাজ্যি জুড়ে রয়েছি এতকাল!"

জন্মের পরই নিমুর নামকরণ হইয়া গিয়াছে, নিমাইচাঁদ, কৃষ্ণানন্দ।

কোষ্ঠীর ফল অপূর্ব্ব, শ্রীচৈতন্য যে তিথি নক্ষত্রের শুভ সন্মেলনে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই ক্ষণে নিমাইও জন্মিয়াছে, ফলে বাল্যকালে ঘোর দুরন্ত, বিষয়-উদাসী, বৈরাগী স্বভাব, দুড়ি বছর বয়সে এক পরমা সুন্দরীকে বিবাহ ও একুশ বছর বয়সে সন্ন্যাস লইয়া গৃহত্যাগ।

শুনিয়া পিতার মুখে চিন্তার ছায়া পড়িল, দিদি নির্ব্বাক্, এই সংসার-সম্পত্তি নিমু ভোগ করিবে না? লীলা একটু কাঁদিয়া ফেলিল, (যদিও সে ছেলের ধার ধারে না, বোধ হয় শ্বশুরের মন রাখিতে), সুরুচি ও তাপসী অতি উৎসুক! "বাবা, নিমু যদি সন্ন্যাসী হয়ে যায়, তার চেয়ে কি সৌভাগ্য আছে? বংশে এক জন সন্ন্যাস নিলে উর্দ্ধতন চোদ্দ পুরুষ অক্ষয় স্বর্গবাসী হন।"

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, "তোমাদের পণ্ডিতি একটু থামাও।" নামও হইয়াছে আগে হইতেই যেন কোষ্ঠী অনুসারে!

অকালজাত শিশু অসুখ-বিসুখ লইয়াই থাকে। নিমাই-চাঁদের গা গরম হইলেই লীলার স্নান নিষেধ, অন্ন নিষেধ, ভোরে উঠা নিষেধ। লীলা কাঁদ-কাঁদ হইয়া কাপড় মুড়ি দিয়া শোয়, অমনই আসুক ভাল করিয়া। লীলার ধারণা, নিমাই আসিবার পরে বাবার কাছে তাহার আদর কমিয়া গিয়াছে।

মেদিনীপুরের মধ্যেই দু' তিনটা জায়গায় কিছুকাল যাপন করিয়া শেষে বিশ্বকর্মা সমরে পদার্পণ করিয়াছেন—ঝিকেনের বিবাহ-বার্তা পাইয়া হরিষে বিষাদ! কোন মতেই যাওয়া সম্ভব হইল না; সে দুঃখ আজিও দুই পক্ষের মন হইতে মিলায় নাই। ঝিকেন তো কথায় কথায় খোঁটা দেয়।

সুরুচির পিতা প্রতি দেবীপক্ষে তীর্থযাত্রা করেন, ছয় মাস তীর্থ বাস, চৈত্রে বাড়ী ফেরেন।

এবার কাশী—মনের মত সঙ্গীটিও জুটিয়াছে তাঁহার—শ্রীমান্ নিমাইচাঁদ। বাপ-মায়ের সঙ্গে নিমাইদের সম্পর্ক নাই।

চিঠির উপর চিঠি—বিশ্বকর্মার মন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে; সুরুচি গেলেন, বিশ্বকর্মা গেলেন, সরোজও গেল, নীহারই বা ছাড়িবে কেন?

শ্বশুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি তোমার পিতামাতার শ্রাদ্ধ তর্পণাদি কর না?"

জামাতা জবাব দিলেন, "বাড়ীতে দাদা করেন।"

"তা হোক, তোমার নিজেরও করা উচিত, না করা অন্যায়, তুমি কনিষ্ঠ পুত্র, শাস্ত্র-সঙ্গত অধিকার তোমার। কাশীতে শ্রাদ্ধ কর, এই জন্যে তোমাকে বিশেষ করে আসতে লিখেছি, আমার পাণ্ডা সব ঠিক করে দেবেন।"

পরদিন গঙ্গা-স্নানান্তে বিশ্বকর্মা পিতৃকার্য্য করিতে বসিলেন, সমাপন হইল বেলা দু'টায়।

দিদি একপাক দেখিয়া আসিয়া বলিলেন, "কি সুন্দর মন দিয়ে মন্ত্র পড়ছে! কে বলবে সেই মানুষ, তোমরা শুধু ঠাট্টাই কর, কেমন ভক্তিমান্ স্বভাব।"

সুরুচি বলিলেন, "যে আচরণ সে আর বলে কাজ নেই।"

"আচরণে কি আসে যায়? আসল হচ্ছে মন, এখন চাকরী-বাকরী করে, নিষ্ঠা-নিয়ম কি চলে ওদের? বয়েস হলে, তখন দেখো। যিনি যতই বাহাদুরি করুন, পরে আস্তিক হতেই হবে। ও সব দাঙ্গাবাজি দু'চারদিন, যিনি যত অনাচারী কালে তিনিই তত দেশী আচারী।"

কাশীবাসী শ্বশুর-বাড়ী, পুকুরে জাল পড়ে না, শুদ্ধ সত্ত্ব নিরামিষ!

পিতা বলিলেন, "ওর বড় কষ্ট হচ্ছে, ওর জন্যে মাছের যোগাড় কর।"

দিদি ব্যবস্থা করিলেন—কিন্তু বিশ্বকর্মা তীব্র নিষেধ করিলেন। স্নান-মাহাত্ম্যে মনের পরিবর্তন—গঙ্গাস্নে মন্দিরে-মন্দিরে যান, নৌকায় গঙ্গায় বেড়ান, গলায় ফুলের মালা, কপালে চন্দন।

নিমুকে কেন্দ্র করিয়া দিনগুলি বহিয়া যায় ঝরণার মত। বড় খেয়ালী নিমু, যা কিছু ভাল জিনিস, কাক, বিড়াল ও বানরকে খাওয়াই, ভিখারীকে পয়সা দেওয়া চাই-ই। কথা ফুটিবার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত জাহির করিতে শিখিয়াছে, ঠাকুর দাদার মত। 'না' বলিলে 'হাঁ' বলায় কার সাধ্য?

উলঙ্গ সন্ন্যাসী। গায়ের গহনা খুলিয়াছে বহু দিন, যখন অস্ফুটবাক্ শিশু ছিল তখনই টানাটানি করিয়া, কাঁদিয়া দুরন্ত পশ্চিমের শীতে নিমু দাদামণি বা পিসীমাদের আলোয়ানের তলায় কাটাইয়া দেয়, নিজে কিছু পরিবে না।

শিশুরা কেনে রঙীন খেলনা, নিমু কেনে পূজার সাজ, ছবি। মন দিয়া কীর্ত্তন শোনে, কোলে চড়িয়া দেবালয়ে বেড়ায়, দাদামণির কাছে বসিয়া নাক টিপিয়া ধরিয়া সন্ধ্যাহ্নিক করে।

ছোট্ট পিতলের ফুলের সাজি, ধূপদানী, নামাবলী, কমণ্ডলু নিমুর পূজার সাজ আলাদা, নৈবেদ্য ফুল জল লইয়া নিমু তাহার গোপালের ছবিটির সামনে পূজায় বসে, গোপালের চেহারাটিও কি সুন্দর, যেমন হাসি-হাসি, তেমনই দুষ্ট-দুষ্ট ভাব।

নামাবলী গায়ে বিশুদ্ধ মুক্ত পদ্মাসনে নিমু পূজায় বসে, চোখের তারা স্থির হইয়া নাসাগ্রে বদ্ধ হয়, নিখুঁত সংহার-মুদ্রায় উদ্দেশে প্রণাম করে।

ভবিষ্যৎ অজ্ঞাত—কোন্ কার্য্যে কোন্ কারণের বীজ নিহিত থাকে কে বলিতে পারে। কেবল গোপাল বোধ হয় ঈষৎ বাঁকা চোখে নিমুর দিকে চাহিয়া দুষ্ট হাসি হাসেন।

বাড়ীটা গঙ্গার উপরে বেশ বড়। সমস্ত ত্রিতলটা সুরুচির পিতার। দ্বিতলে ও নীচে দু'তিন ঘর অন্য ব্রাহ্মণ পরিবার আছেন।

ত্রিতলে কল নাই। ভারী জল দেয়। নীচের ভদ্রলোকেরা

চাকরী করেন, আটটায় বাহির হইয়া যান, ছয়টায় ফেরেন, সুতরাং নীচের কলে দিনিদের যাইতে বাধা নাই।

দিদিকে দেখিয়া গিন্নীরা বলিতেন, "তোমাদের এত নিয়ম আবার? আমাদেরও এমন নয়।"

দিদি বলিলেন, "আমার আর কি? আমার ছোট বোনকে দেখবেন।"

তাপসীর তখন জ্বর, নীচে নামেন না।

তারপরে তাপসী যখন কলতলায় পুজার বাসন ধুইয়া স্নান করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "ওমা, ছেলে মানুষ তুমি, তোমার এত কেন? আমাদের বাবুনের যেও যে এর অর্দ্ধেক কেউ করে না।"

তাপসী সহাস্যে জবাব দিলেন—"আমার দিদিকে তো দেখেন নি আমার অনেক ওপরে সে।"

"বল কি বাছা? অবাক্ করলে যে? সে আবার কেমন?"

"আসবে শীগগির, দেখবেন।"

তাঁহাদের তো অন্তর জুড়াইল!—এরা দুই বোনেই দুই ঘণ্টা, আবার তিনি আসিলে হইবে কি?—কলতলার আর আশা নাই।

তারপরে সুরুচি আসিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "এই কি তোমার সেই দিদি?"

"হ্যাঁ।"

"তোমাদের তো কলের জল, গঙ্গা জল সব ভারী দেয়।"

"গরম পড়েছে কি না, তোলা জলে আরাম নেই।"

সকলে অসন্তুষ্ট, বিরক্ত। "তোমরা আরাম কর, আমরা এমনি থাকি।" জলের প্রয়োজন সকলেরই হয়—আবার ঘণ্টার জল যায় চলিয়া।

তাঁহারা সুরুচিকে বলেন, "যাও বাছা এবার, আর মাথার জল ঢেল না, যাগো, তুমি সংসার কর কি করে? সত্যি বলছি, জন্মে আমরা এমন বিচার দেখিনি।"

সুরুচি বলিলেন, "আমাদের কি আর দেখেছেন, আমার বড়দি সবার ওপরে, তাঁর কাছে আমাদের শেখা।"

শুনিয়া তো চক্ষু স্থির। মুখে আর কথা নাই, হতভম্ব হইয়া চাহিয়া আছেন, শেষে একজন বলিলেন, "তিনিও আসবেন না কি?"

"আসবে বোধ হয় চিঠি তো দিয়েছে।"

সুরুচি উপরে উঠিতে উঠিতে শুনিতে পাইলেন, "না এ বাড়ীতে আর না:—এরাই অস্থি করে তুলেছে, ওদের বড়দি এলে আর বাঁচা নেই, তার আগেই উঠে যাচ্ছি।"

ছুটির পরে

আসানসোল। দুই মাসের জন্য হাওয়া পরিবর্ত্তন,—কিঞ্চিৎ বৈচিত্র্য এবং বদলী—এক সঙ্গে তিন।

বিশ্বকর্ম্মার একান্ত ইচ্ছা নিজে গাড়ী চালাইবেন, হইয়াই উঠে না। আসানসোলে সেই সখটা নূতন করিয়া জাগিল।

তাঁহার বাহির হইবার সময় অসময় নাই, আগে হইতে বলিবার অভ্যাস নাই, বেচারী সোফার এক মিনিটের ছুটি পায় না, তারও দু'একটা জিনিষ কেনার দরকার হয়, কোন কিছু দেখিবার বা একটু বেড়াইবার সখ হইতে পারে, সেটা বিশ্বকর্ম্মা বোঝেন না।

একদিন বেচারী ছুটির দিন দুপুর বেলা গিয়াছে কাপড় কিনিতে, বিশ্বকর্ম্মা চটিয়া বলিলেন, "আজই আমি ড্রাইভিং শিখব।"

যেমন সঙ্কল্প অমনি কাজ! কয়েক দিন নিজের কম্পাউণ্ডের মধ্যেই ঘোরা-ফেরা করিলেন, হাত একটু ঠিক হইলে বলিলেন, "এবার সোজা রাস্তায়, এস।"

সুরুচি বলিলেন, "না।"

"না কেন? বিশ্বাস হয় না আমাকে?" ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বিশ্বকর্ম্মা গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন।

বিশ্বকর্ম্মা-চালিত যানে অবস্থান মোটেই নিরাপদ নয় সেটা আর সুরুচি প্রকাশ করিলেন না। বীরের মান লাঘব না করাই ভাল।

আসানসোলের যে সুন্দর পথ ঢেউ খেলিয়া চলিয়াছে দূর হইতে দূরান্তরে—দিল্লী যাও, পেশোয়ার আজমীর চলিয়া যাও, সেই গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের অগণ্য যান-বাহনের ভিড়ের মধ্যে গাড়ী চালান নূতন শিক্ষার্থীর পক্ষে বিপজ্জনক; কম্পাউণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া থাকিবার সময়ও আর নাই। রোড ছাড়িয়া বিশ্বকর্ম্মা একটা নির্জ্জন পথে গাড়ী চালাইলেন,

সোজার উটস্থ হইয়াই থাকে, সে মোড় ঘুরাইয়া দিল। উৎসাহ ক্রমেই বাড়ে, বিশ্বকর্ম্মা ঠিক ভাবেই গাড়ী চালান, গাড়ীটারই বোধ হয় কিছু দোষ আছে, একবার ডাইনে যায় আবার বাঁয়ে যাইতে যাইতে পাক খাইয়া সোজা হয়, ইত্যাদি নানা ভঙ্গীতে আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিল ঘণ্টায় পাঁচ মাইল স্পীডে!

ডান দিকে একটা য়ুরোপীয়ান ক্লাবের প্রকাণ্ড লন—বিশ্বকর্ম্মাই সেই দিকে চালাইলেন, কি গাড়ীই পরিত্রাণের আশায় সেই পথ ধরিল বলা কঠিন, কিন্তু বেশ বিনা আপত্তিতে লনটার উপরে গিয়া হাজির!

ঘণ্টা খানেকের মধ্যে সেই কোমল মৃত্তিকার মসৃণ সবুজ গালিচাটি লণ্ড-ভণ্ড ও বিক্ষত হইয়া গেল প্রকাণ্ড জংশনে রেল লাইনের ক্রসিংয়ের মত, গাড়ীর চাকার অগণ্য কাটা-কাটি দাগ রাখিয়া উৎফুল্ল মনে ঘোড়ার মত বিশ্বকর্ম্মা বাড়ী ফিরিলেন।

কোলিয়ারীর ম্যানেজার মিঃ জোন্স একজন আশ্চর্য্য মোটরিষ্ট, তাঁহার গাড়ী দিনে তীরের মত, রাত্রে উল্কার মত মত ছোটে, এমনই উদ্ভট গতি। বিশ্বকর্ম্মার সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব। পরদিন দেখা হইলে মিঃ জোন্স বলিলেন, "ওরেল মিষ্টার রায়, তুমি এত সুন্দর ড্রাইভিং শিখিয়াছ!"

সুখ্যাতিতে ভদ্রলোকমাত্রই কুণ্ঠিত হন, বিশ্বকর্ম্মাও তেমনি ভাবে বলিলেন, "না, তোমার মত কি আর!" "নিশ্চয় নিশ্চয়, রেকর্ড রাখবে তুমি, কিন্তু এই লনটা তোমার গাড়ীর পক্ষে কিছু ছোট, কিছু অসুবিধাজনক, কেমন নয়? ক্লাবের পিছনে একটা প্রকাণ্ড ফিল্ড আছে। সেটা তুমি লক্ষ্য কর নি বোধ হয়, ওখানে তুমি ফুল স্পীডে গাড়ী ছাড়তে পারবে। এস দেখবে এস—"

কিন্তু বিশ্বকর্ম্মা আর ষ্টিয়ারিং হুইল ধরা প্রয়োজনই বোধ করিলেন না—যান-জগতে চালক হিসাবে যিনি রেকর্ড স্থাপন করিবার যোগ্য হইয়াছেন, তাঁর আবার মহলা!

সন্ধি-বিচ্ছেদ

বাপের বাড়ী হইতে ফিরিলে সুরুচির হিন্দুয়ানীটা কিছু দিন উৎকট আকার ধারণ করে, আবার ধীরে ধীরে ঠিক হইয়া যায়। ভাগ্যগুণে বিশ্বকর্ম্মা সেটা সবচেয়ে কম পছন্দ করেন সেইটাই তাঁহার কপালে!

আর সব এক রকম সহিয়া যায়, কিন্তু যখন তখন স্নান বিশ্বকর্ম্মা মোটেই সহ্য করিতে পারেন না। সুরুচিরা পাঁচটি বোনই তেমনি—মানে আলস্য নাই।

বৈশাখের শেষ, ভয়ানক বৃষ্টি, সারাদিনে ছাড়ে না। রীতি-মত শীত, ঠাণ্ডা বাতাস, ঘরে ঘরে জ্বর।

সুরুচিরও অল্প জ্বর। বিশ্বকর্ম্মার সামনে ঘরের বাহির হইবার যো নাই। তিনিও মফঃস্বলে বাহির হইয়াছেন, সুরুচিরও বাথরুমে প্রবেশ।

ভোর বৃষ্টিতে যাওয়া অসম্ভব, বিশ্বকর্ম্মা ফিরিয়া আসিয়া ঘরে পা দিয়াছেন, ওদিক হইতে সুরুচিরও প্রবেশ।

"এ কি? স্নান? স্নান করা হল কেন?"

"দু'দিন স্নান করি নি, থাকতে পারা যায়?"

অশনিগর্জ্জনের ন্যায় অকস্মাৎ বিশ্বকর্ম্মার ব্যাঘ্রনাদ—"থাকতে পারা যায় না? আমরা মানুষ নই? শিশি শিশি ওষুধ পড়েই আছে, তার উপর স্নান? বারণ করি নি? করি নি?"

"করেছিলে।"

"কেন শোনা হল না আমার কথা? আমার কথা যে না মানবে ফার্ষ্ট নাগপুর প্যাসেঞ্জারে সে চলে যাক।—চলে যাক সে আমার সামনে থেকে"—গর্জ্জন-শব্দে সমস্ত বাড়ী ত্রস্ত, কম্পিত, আড়ষ্ট হইয়া গেল।

যে যে দিকে পারিল, সরিয়া বাঁচিল।

ভীষণ মূর্ত্তি ধরিয়া বিশ্বকর্ম্মা পালঙ্কে বসিয়া রহিলেন—প্রলয় আসন!

এদিকে সুরুচি ধীরে সুস্থে মাথা মুছিয়া গরম জামা পরিয়া ঘরে আসিয়া দেখিয়া একটু চমকাইলেন।

জ্বর ও রাগ দু'জনেরই সমান, তবে বিশ্বকর্ম্মা যতেক পরেই সব ভুলিয়া যান, সুরুচি কিছুতেই না, এইটুকু তফাৎ। আজ উল্টা।

অন্যায় করিয়াছেন সুরুচিই—সেই জন্য একটু ভয়ও হইল এবং আগেই কথা বলিলেন, "অমন করে বসে আছ যে?"

"শোন, স্ত্রী স্বেচ্ছাচারিণী হয়, কোন স্বামীই সেটা চায় না, জান?"

স্বর গম্ভীর, মুখ আঁধার, ভাব ভীষণ।

অন্ধের আলোকপ্রাপ্তি

নিমেষে সুরুচির শান্ত, নম্র ভাবও অন্তর্হিত হইল, কপাট ধরিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "স্বেচ্ছাচারিণী মানে ?"

"মানে যখন যা খুশী করা, আমাকে গ্রাহ্য না করা। তিন দিন তোমাকে বলেছি যে, তোমার এই সব বেখাপ্পা ব্যবহার আমার অসহ্য, বলি নি ?"

"বলেছ।"

"তবে ? শোনা হয় না, মানা হয় না কেন ?"

"কোন্ কথা না শুনি তোমার ?"

"সব আমার ধৈর্য্যের মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে, আর নয়, বুঝেছি তোমার স্বভাব বদলাবে না। তবু আজ শেষ কথা বলছি, তোমাকে এই সব ছাড়তে হবে, এই স্বেচ্ছাচার আমার কাছে আর চলবে না, চলবে না, চলবে না। যদি চালাতে চাও, যেখানে খুশী যাও, গিয়ে যা খুশী করগে, এখানে আর নয়, নয়, নয় !"

কয়েক মিনিট দুই জনই চুপ।

তার পরে সুরুচি বলিলেন, "আচ্ছা"। বলিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে ফিরিয়া বলিলেন, "এ কথা আগে বলনি কেন ? ফার্ষ্ট নাগপুর প্যাসেঞ্জার যোগই ছাড়ে, তার জন্যে এত কষ্ট সহ্য করবার তোমার কি দরকার ছিল ? আমি জানি যে, আমার কিছুই তোমার চোখে ভাল লাগে না। না লাগুক, তাতে আমার কোন দুঃখ নেই। জেনো—আমারও স্বভাব আমি বদলাতে পারব না, পারব না, পারব না" বলিয়া চলিয়া গেলেন।

বাক্যালাপ বন্ধ হইয়া গেল।

কর্ত্রী বাড়ীতে ছিল, সুরুচি জরুরি চিঠি লিখিয়া দিলেন, চিঠি পাইবামাত্র সে চলিয়া আসিল।

বাড়ী নিস্তব্ধ, নীরব—যেন কেহই নাই, এমনই ভাব। নিঃশব্দেই সুরুচি প্রস্তুত হইয়া আছেন।

যাত্রার দিন বিশ্বকর্ম্মা প্রলয়মূর্ত্তি ধরিয়া অফিস-ঘরে বসিয়া রহিলেন। নীরার বাড়ী গিয়াছে, নূতন যাহারা আছে তাহারা কিছুই বুঝিল না। হিসাবের খাতাটা ও চাবি-ছড়া টেবিলে রাখিয়া (নীরবে চার্জ্জ বুঝাইয়া দেওয়া আর কি !) সুরুচি গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন। ফার্ষ্ট নাগপুর প্যাসেঞ্জার।

পথে

কয়েক দিন আগে 'কওর' ষ্টীমার ডুবিয়াছে। যার হাত জলের নীচে পনের হাত ষ্টীমার উল্টাইয়া রহিয়াছে, জল হইতে ষ্টীমার তিন হাত উঁচু হইয়া ছিল, তোমার নামিবার পর এখন জল বাড়িয়া ঠিক ষ্টীমার সমান হইয়াছে, ঢেউগুলি তীরের দিকে যাইতে ষ্টীমারে ধাক্কা খাইয়া ছলছলিয়া উঠে—ছুরি দিয়া যেন জল কাটিয়া দুই ভাগ করা হইয়াছে।

ষ্টীমারে বসিয়া সুরুচি সেই দিকে চাহিয়া আছেন, তীর বেশী দূর নয়, ষ্টীমার যখন ডুবিয়া ছিল, তখন আরও কাছে ছিল, অথচ এইটুকু জলের মধ্যে এমন সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে। জায়গাটির আশে পাশে জন-পল্লীর ভিতরে কি আতঙ্ক ও ভয়ের সৃষ্টিই না হইয়াছে ! অনেক রাত্রে ভোর বাতাসে উঠে, বহু কণ্ঠের তীক্ষ্ণ করুণ আর্ত্তনাদ উঠিয়া বাতাসে মিলাইয়া যায়, ভয়ে কেহ ঘরের দরজা খোলে না।

সেই ভয়াবহ স্থানটি ছাড়িয়া ষ্টীমার অনেক দূর চলিয়া গেল তবু আরোহীরা খুঁকিয়া দেখে, তাহাদের কথার বিষয় এক—'কওর' ষ্টীমার।

সুরুচি ভাবিতেছেন, বিশ্বকর্ম্মার কথা।

অনুতাপ না কষ্ট ? "চুপ করে থাকলেই হত, আপনি থেমে যেতেন, মীরার নেই"—

তৎক্ষণাৎ স্ব-স্বভাবের প্রত্যাবর্ত্তন ! "চুপ করে থাকলে কি হবে ? নিজের ইচ্ছেয় কিছু করতে পারব না ? যখন তখন যা মুখে আসে বলবেন, কেন, ওঁর কাছে ছাড়া জগতে আর জায়গা নেই না কি ?"

ষ্টেশনে নামিতে বেলা একটা, আগে জানান না থাকিলে যান-বাহন আসে না। ষ্টেশনেরও কিছু স্থিরতা নাই, ষ্টীমে যেখানে ষ্টেশন দেখিয়াছে, বর্ষায় দেখিবে যাইল দুই শুকাতে। আবার কখনও বড় বড় ষ্ট্যাণ্ড-ষ্টীমারে ষ্টেশন বসে !

সুরুচি বলিলেন, "হোটেলের ভেতর আজ-যাব না, একটা নিরিবিলি জায়গায় আমাকে রেখে তুমি নৌকা ঠিক কর।"

হোটেলের কাছে একটা নির্জ্জন জায়গা গাছ-পালায় ঘেরা—সেইখানে একটা গাছের গুঁড়ির উপর সুরুচি বসিয়া রহিলেন, কর্ত্রী নৌকার সন্ধানে গেল।

হোটেলে ভিড় নাই, 'কওর' জাহাজ ডুবিবার পর হইতে

যাত্রী-সংখ্যা আসে কম,
যায়।

অবশেষে ষ্টীমার ছাড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে অস্থায়ী ষ্টেশনটার অস্তিত্বও যেন মায়া-বলে অন্তর্হিত হইল। লোক-জন কেহ কোথাও নাই, দু'চারখানা ছোট ছোট খড়ের বাড়ী, কর্ম্মচারীরা একে একে তাহার ভিতরে ঢুকিয়া গেল।

ফল্গুর দেখা নাই, সুরুচি বসিয়াই আছেন। এমন নিঝুম দিন, যেন অনেক রাত্রি।

একজন খাটো চেহারার শুষ্ক-ভদ্র লোক অনেকক্ষণ হইতে এদিক্ ওদিক্ ঘোরা-ফেরা করিতেছিল, এইবার কাছে আসিয়া বলিল, "আপনি যাবেন কোথা?"

এক নিমেষে সুরুচি সজাগ হইয়াছেন, পরিচয় কিছুতেই দিবেন না। পাশের গ্রামের নাম বলিলেন।

"আপনার সঙ্গে যে বাবুটি ছিল, সে গেল কোথা? আপনি কতক্ষণ বসে থাকবেন এখানে?"

"সে নৌকো ঠিক করতে গেছে।"

"দু'চার দিন হলো নৌকো ভেসেছে, ষ্টেশনে নৌকো পাওয়া মুস্কিল, আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি, আপনি হোটেলের ভেতর বসুন না।"

"না ও ভিড় গোলমাল আমার ভাল লাগে না, আমি বেশ আছি।"

লোকটি চুপ করিল।

সুরুচি বলিলেন, "আপনি কে?"

"আমি এখানকার ইজারদার।"

"আপনি দেখবেন আমার বাকস-বিছানাটা একটু? কাল ছুটোয় উঠেছি, আজ দুটো বেজে গেছে, স্নান করে আসি।"

"তা দেখব, একা যাবেন না ঘাটে—বড় ঢেউ, বড় টান।"

"কুমীর নেই ত?"

"না ইষ্টিমার-ঘাটে কুমীর আসে না বড়, তবে বিশ্বাসও নেই, বেশী জলে যাবেন না—ছেলেটি আসুক না?"

"দেরী হয়ে যাবে", বলিয়া সুরুচি বাক্স খুলিয়া কাপড়-চোপড় সাবান বাহির করিয়া লইলেন। ছেলেদের কয়েকজন ছেলে মেয়ে ছুটাছুটি করিতেছিল, ইজারদার তাহাদের ডাকিয়া বলিল, "এঁর সঙ্গে যা।"

উঁচু পাড় হইতে পায়ে পায়ে জলে জলে পিচ্ছিল ঢালু পথ। কিনারায় জল একেবারে কাদা-মাখা, সরিতে সরিতে অনেকটা গিয়া তবে পরিষ্কার জল পাওয়া গেল, ঢেউয়ের বড় জোর, দাঁড়াইয়া থাকা মুস্কিল। ছেলেদের ছেলেরা সুরুচির আট দশ হাত আগে গিয়া নির্ভয়ে ঝাঁপাঝাঁপি করিতে লাগিল। কুমীরের ভয়ে অন্তর কম্পিত, সুরুচি প্রায় হাঁটু জলেই স্নান সমাধা করিয়া ফেলিলেন।

ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, ইজারদার দাঁড়াইয়া দেখিতেছে ঘাটের পথের দিকে। বলিল—"আপনার দেরি দেখে আমার ভয় হয়েছিল।"

"আপনি আর একটু দাঁড়ান" বলিয়া সুরুচি আয়না-চিরুণীটা লইয়া হোটেলের ভিতর ঢুকিলেন,—লোকটা ভিড় নাই, তবে বড় অপরিচ্ছন্ন, মাছি ভন্ ভন্ করিতেছে। এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া একটি ছোট ঘরের দরজায় একটি বৌকে দেখিতে পাইয়া সুরুচি সেই ঘরের ভিতর গিয়া প্রবেশ করিলেন।

ঘরের একদিকে মাচা, গোটা কয়েক ছেলেপিলে খেলিতেছে, একজন গিন্নী মানুষ এক কোণে রান্না চড়াইয়া দিয়া মালা জপ করিতেছেন, সুরুচিকে দেখিয়া অত্যন্ত অপ্রসন্ন হইয়া বলিলেন, "এই ঘরে থাকবে তুমি?"

"না"—বলিয়া সুরুচি মাচার উপর আয়নাটা রাখিয়া কেশ-বিন্যাস করিয়া লইলেন, হোটেলের এক ঠাকুর, ইহাকে সুরুচি বার কয়েক নদীর ঘাটে যাতায়াত করিতে দেখিয়াছেন,—ছোট এক হাঁড়ি মিষ্টান্ন ঘরের সামনে রাখিয়া সুরুচিকে বলিল "আপনাকে দিলে।"

"রেখে যাও" বলিয়া ফিরিয়া দেখেন, গিন্নীটির মুখে দারুণ বিরক্তি, বৌটি আধ-ঘোমটার মধ্য হইতে সকৌতূহলে সুরুচিকে দেখিতেছে। মেয়ে দুটি কাছে আসিয়া বলিল, "তুমি থাকবে আমাদের কাছে? থাক, এইখানে শোবে, আমরা আজ এখানে থাকব।"

উনানের পাশে কতকগুলি কলাপাতা ছিল, অদূরে একখানা টানিয়া লইয়া সুরুচি ঘরের মেঝের পাতিলেন, গিন্নীর ঘটটা হইতে জল ঢালিয়া পাতা দুইলেন এবং হাঁড়ির মিষ্টিগুলি সেই পাতার উপর ঢালিয়া গিন্নীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমি জাত জাত, আপনার জল নষ্ট হয় নি, এই

মিষ্টিগুলো দুই ছেলে মেয়েদের দেবেন" বলিয়া হাসিয়া ফেলিয়া আবার চিরুণী লইয়া বাহির হইয়া আসিলেন।

ইতারাদার বেচারা বলিয়াই আছে, দুর্ভোগ তার, সেজন্যে উপকার করিতে আসিয়াছে! সুরুচিকে দেখিয়া বলিল, "আপনি কেমনতর মানুষ? ভয়-ভাবনাও কি নেই? বাক্স-টাক্স সব ফেলে।"

সুরুচি বলিলেন, "এবার যান আপনি!"

"সে ছেলেটা কেমন ধারা লোক, আপনাকে একা ফেলে কোথায় গিয়ে রইল।"

"আসবে এখনি, ভয় কি?" বাক্স-বিছানার জন্য সুরুচির কিছু ভয় নাই, গহনা যা গায়েই। খান কয়েক আট-পৌরে জামা-কাপড় ছাড়া বাক্সে কিছুই নাই। বিশ্বকর্মার সঙ্গে রাগ করিয়া আসা, ভাল পোষাক-পরিচ্ছদ আনিবেন কি? বিছানাও পথেরই যোগ্য, এগুলি হারাক বা চুরি যাক, তেমন ক্ষতির আশঙ্কা নাই।

"জল খেয়েছেন? মিষ্টি পাঠিয়েছিলাম।"

"আপনি পাঠিয়েছিলেন; আমি ভাবছি, ফণী।"

লোকটি একটু কাঁকের সঙ্গে বলিল, "কোথায় আপনার ফণী? আচ্ছা লোক সে, তবে যাই আমি কাজ আছে, আবার একুণি আসব।"

"একলা যেতে হবে।"

চমকিয়া ফিরিয়া সুরুচি দেখেন, এক অচেনা ভদ্রলোক। আর একটু কাছে আসিয়া ভদ্রলোক বলিলেন, "একবার উঠুন, চলুন আমাদের ঘরে।"

আশ্চর্য হইয়া সুরুচি বলিলেন, "কেন?"

"আমি সব শুনলাম, খুব বকুনি দিলাম ওদের, এই ষ্টীমারে নেমেছেন, স্নান করে জল স্পর্শ করেন নি, আপনার খাবার আমার ছেলে-পিলেদের দিয়ে এসে বাসী মুখে বসে আছেন, ওরা আপনাকে আসতে দিলে? নাই বা চেনা-জানা হল, এক দেশের লোক, আমার বাড়ী মহাদেবপুর, আমার নাম সুরেশ মিত্র, আপনি কি ব্রাহ্মণ?"

"না, কায়স্থ।"

"তবে আসুন আসতেই হবে।"

"আমরা একুণি যাব যে।"

"একটুও দেরী হবে না, আপনার কোন কথা শুনব এস না গো, হাত ধরে নিয়ে যাও না।"

বেড়ার আড়াল হইতে অমনি সেই বৌটি আসিয়া সুরুচিকে ধরিয়া টানিয়াই লইয়া চলিল, বৌটি দেখিতে ছোট-খাট, গায়ে কি জোর!

বিব্রত ভাবে সুরুচি বলিলেন, "আমার জিনিস"?

"ও আমি দেখব।"

সেই গিন্নীটি ডালাপাতা দুইতেছেন, বলিলেন, "এস মা এস, আমার দেওর-পো কত বকলে-রাগলে, পথে ঘাটে সবাই সবাইয়ের বন্ধু, আমরা বলি তুমি হোটেলেই খেয়েছ।"

কি যত্ন; কি আদর! বৌটি কাপড় ঝাঁড় করিয়া আসন পাতিয়া দিল, পিতলের গ্লাসে জল ঢালিয়া দিল, গিন্নী পাতায় পাতায় আতপান্ন ঢালিলেন, ভদ্রলোক দুয়ারে দাঁড়াইয়াই আছেন, "আর একটু ঘি ঢালো, দুজনেই বস, দেখুন লজ্জা করবেন না, বিপুরের কুল আর কি! তুমি দাঁড়িয়ে কেন? একটা টাকা দাও ত, দিয়ে পান সাজ।"

লজ্জা, কুণ্ঠা আবার আনন্দও! আনন্দ নয়? এত যত্ন, এত আগ্রহ জীবনে হয় ত দেখাও হইবে না কোন দিন।

"এই বয়েসে তোমার এমন বিচার কেন? আমার বৌ-নাতনীরা ছেলে সব হোটেলে খেয়েছে, ছেলে বললে মহীর অবস্থা ভাল না, আজ এইখানে থাকবে, কাল জোরে নৌকোয় উঠব, তা দেখ মা, কে কাকে খাওয়ায়? আমার একার চাল নিয়েছিলাম, দু'জনের হয়ে আর চারটি রইল, আলু-ভাতে ভাত, তোমার কত কষ্ট হল? আমি চাল ডাল সব সঙ্গে নিয়েই বেরুই, কিনি নে বড়।'

বৌ চুপি চুপি বলিল, "ছেলে-পিলের জন্যে আমি চারটি চাল বেশী দিয়েছিলাম।"

সুরুচি বলিলেন, "যাঃ ওদের ভাগ আমিই লুট করে খেললাম।"

"আর আমরা যে তোমার মিষ্টি খেয়ে ফেললাম, বাবা কত বকলে।"

ভদ্রলোকটি আসিয়া বলিলেন, "নাঃ, কিছু পেলাম না, না দই না মিষ্টি, বেটারা দোকান-টোকান তুলে চলে গেছে। আমার ছেলে-পিলেগুলো আস্ত রাক্ষস! একটা মিষ্টিই রাখুক, সব উড়িয়েছে!"

এমন সময় কণীর দেখা, "আপনি এখানে? খুঁজে খুঁজে

"নৌকো পেয়েছ?"

"পেয়েছি।"

সকলের সঙ্গে সম্ভাষণ শেষ করিয়া সুরুচি বাহিরে আসিবা-মাত্র ইজারাদার কণীকে বলিল, "আচ্ছা লোক আপনি?" ইত্যাদি, ইত্যাদি।

কণী বলিল, "তাই আপনি কিছু খাবেন না, সেলাম নৌকোয় খেতে, এক সঙ্গে, সে নৌকোয় উঠবার সময়ও করতে পারবেন। আর আমার দরকারই বা কি, কাকার সঙ্গে রাগ করে এলেন, একটু একা থাকতে পারবেন না?"

ষ্টেশনের এক কর্ম্মচারী কণীর চেনা, সে ধরিয়া খাওয়াইয়া দিয়াছে।

"কি দুঃসাহস আপনার, নদীতে নেমেছিলেন! আপনার সঙ্গে পারা যাবে না। কাপড় ঘাটেই ফেলে এসে-ছিলেন আবার।"

"ঐ যাঃ, আনতে মনে ছিল না।"

ইজারাদার একটি লোককে দিয়া কাপড়-চোপড় ধুইয়া শুকাইয়া রাখিয়াছে।

সুরুচি বলিলেন, "ঐ ছেলেদের কিছু পয়সা দাও, ওরা আমাকে স্নান করিয়ে এনেছে।"

সুরুচির নিজের কাছে এক পয়সাও নাই, রাগ করিয়া বিশ্বকর্ম্মার পয়সা আনিবেন না কি? বেশ-ভূষা ঠাট সব ত্যাগ—একেবারে বৈরাগ্য! সম্মান-রক্ষার জন্য পথে ঘাটে দিব্য গাত্রাভরণ পরিতে হইয়াছে বটে, বাড়ী গিয়াই সব বর্জ্জন! এবং একেবারে বিশ্বকর্ম্মার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদন!

ইজারাদারের কাছে সুরুচি যে গ্রামের নাম করিয়া বলিয়াছিলেন, সেই গ্রামের এক ভদ্রলোক ছোট ছেলেকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া গিয়াছিলেন, বড় ছেলের বৌকে আনিতে, সেই বড় ছেলেকে বিশ্বকর্ম্মা চাকরী দিয়াছেন বছর দুই হইল। অনেক আগে অবস্থা ভাল ছিল, মাঝে খুব কষ্ট গিয়াছে, চাকরীর পরে আবার ভাল হইয়াছে।

নৌকা না পাইয়া কণী ইঁহাদের নৌকায় যাইবে ঠিক করিয়াছে, অর্দ্ধেক ভাড়া দিবে।

বিপুল ঢেউয়ে নৌকাটি নাচিতেছে, দেখিয়াই ভয় হয়। এত ছোট নৌকায় সুরুচি কোন দিন ওঠেন নাই, খান দুই তাদাইয়ের একটুখানি ছই, যেন মোচার খোলাটি! বিশ্বকর্ম্মা প্রকাণ্ড নৌকা ভাড়া করেন, ঠিক যেন বাড়ী ঘর! থাক্, সে কথা ভাবিবার দরকার কি?

ভদ্রলোকটি বিশ্বকর্ম্মাদের খুব ভালই জানেন, তাঁহাদের গ্রাম দিয়াই বিশ্বকর্ম্মার বাড়ী যাইবার পথ। খুব আদর করিয়া সুরুচিকে গ্রহণ করিলেন।

কণী সুরুচিকে তুলিয়া দিয়া বলিল, "আমরা হেঁটে যাচ্ছি, নৌকায় জায়গা হবে না।"

বর্ষার সঙ্গে সঙ্গে ডুলি পাল্কী উঠিয়া গিয়াছে, অগ্রহায়ণ মাসে আবার আসিবে। জলের যদি জোর না হয় আরও মাস খানেক হাঁটা পথ চলে।

নৌকায় পদার্পণমাত্র সুরুচি যে রূপে অভ্যর্থিত হইলেন, সে বলিবার নয়। এখনও ইজারাদারটি ঘাটের উপরে দাঁড়া-ইয়া আছে, সেই বস্তুটি হোটেলের পিছনকার দুয়ারে দাঁড়াইয়া! বিচিত্র জগতে বিভিন্ন স্বভাবের পরিচয়! শ্বশুর এক পাশে সরিয়া বসিলেন, "বস মা, বস মা, তোমরা দু'জন দুইয়ের মধ্যে বস, আমি বাইরে বসছি।"

বউটি শুইয়া ছিল, তাড়াতাড়ি উঠিয়া দুই মেয়েকে টানিয়া সরাইয়া বিছানা গুটাইয়া সক্রোধে বকার দিয়া উঠিল, "এ কি বন্ধণা! এ কি যন্ত্রণা! নৌকার মধ্যে এ কি উৎপাত, এইটুকু নৌকা এর মধ্যে আবার মানুষ জুটল।"

ও দিকে শ্বশুর কণীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, বিশ্বকর্ম্মা কবে আসিবেন? "আহা, বেঁচে থাক্ সে-মানুষ একটা মানুষ, আমাদের বাঁচিয়েছে, আমার সুরেন (বড় ছেলে) তার কথা কয়ে শেষ করতে পারে না, মহৎ-মহৎ-মহৎ, পিতার সন্তান না হলে কি এমন হয়? নিজের কাছে রাখলে, চাকরী দিবে।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

সুরুচির একবার মনে হইল নামিয়া যান, আবার ভাবি-লেন একটু পরেই সন্ধ্যা হইবে, অকূল অথৈ দেশ, থাকিবেন কোথা? বিশ্বকর্ম্মার সহিত বিবাহের পর এত যে ভাল ভাল বই পড়িয়া মন দৃঢ় করিয়াছেন, এই কি তার পরিচয়?

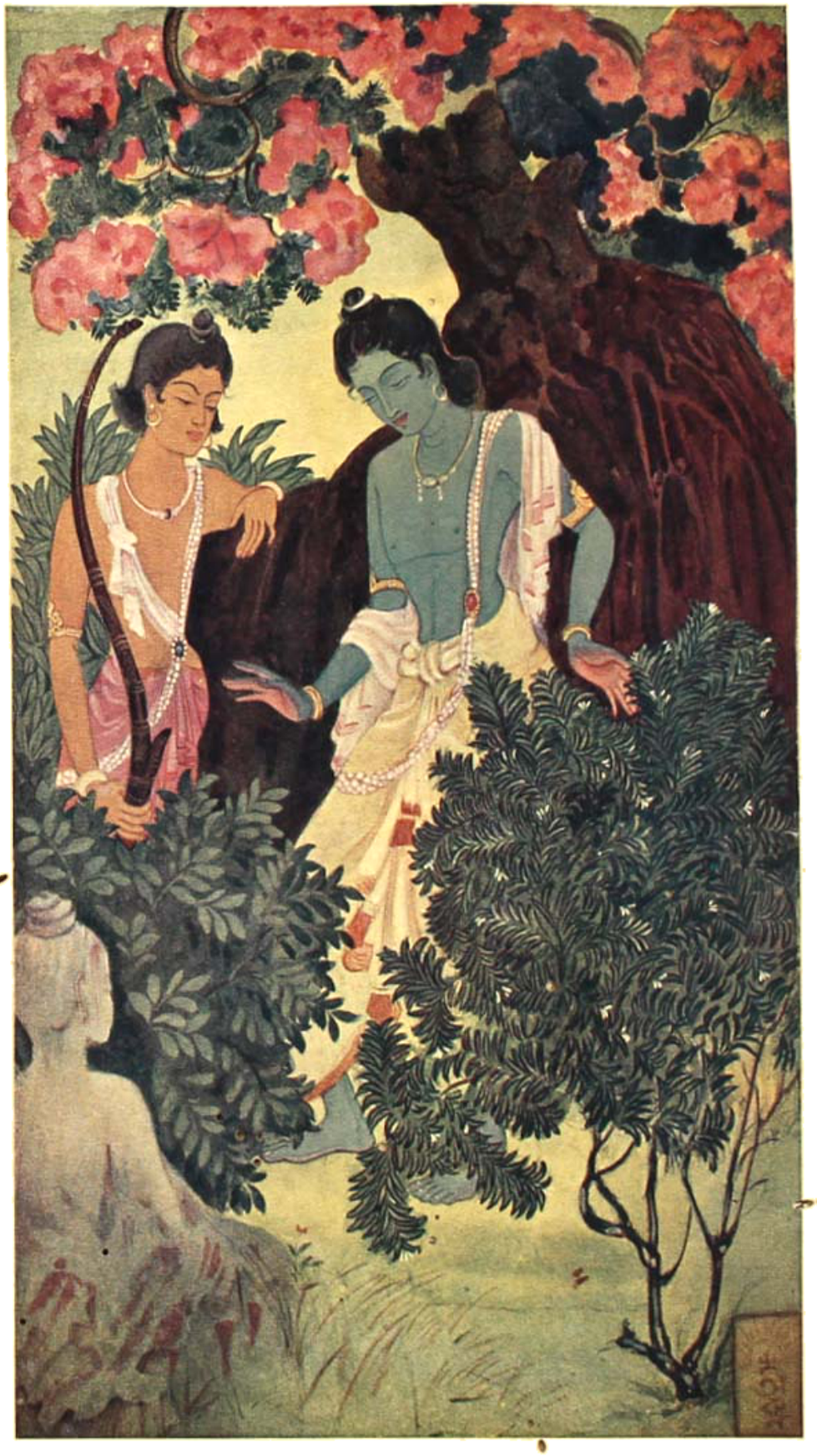

অহল্যার শাপমুক্তি। [শিল্পী—শ্রীঅরুণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

সাহিত্যে কালাপাহাড়

—শ্রীবরদারঞ্জন চক্রবর্ত্তী

বাঙ্গালার কোন কোন মাসিক পত্রিকায় যে সকল গল্প ও উপন্যাস প্রকাশিত হয়, দেখিতে পাই তাহার অধিকাংশই অমার্জ্জিত, অস্বাভাবিক ও উৎকট প্রেমলীলায় অভিনয়পূর্ণ।* দুই চারিটি নাস্তিক শ্রেণীর কথা বাদ দিলে একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায় যে, বাঙ্গালার কোন হিন্দু, মুসলমান বা ব্রাহ্ম ভদ্র-পরিবার এই শ্রেণীর উপন্যাস-কথিত নায়ক-নায়িকার লীলাক্ষেত্রে পরিণত হয় নাই। যে শস্য-শ্যামলা বঙ্গভূমি একদিন 'সোনার বাঙ্গালা' বলিয়া পরিচিত ছিল, সেই বঙ্গভূমি আজ দুর্ভিক্ষ ও আধিব্যাধিতে শ্মশানে পরিণত হইতে চলিয়াছে। বাঙ্গালার ঘরে ঘরে আজ আর সেই প্রাণখোলা আনন্দের উচ্ছ্বাস নাই। সভ্যতা এবং শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে বিবিধ প্রত্যক্ষ ও কল্পিত অভাবে ঘরে ঘরে হা-হুতাশ সতত বিরাজ করিতেছে। মা, ভগিনী ও কন্যারূপিণী বঙ্গরমণীগণ নিজের সুখ, স্বার্থ ও শারীরিক সুখ-স্বচ্ছন্দতা বিস্মৃত হইয়া যে স্নেহ, প্রীতি ও ভক্তির পূত শান্তি-সুধা বিতরণ করিতেছেন, মরুভূমির মধ্যে ওয়েসিসের ন্যায় অভিশপ্ত বাঙ্গালী জীবনের ইহাই এখনও বিধিদত্ত শান্তির পবিত্র উৎস। এ সুখ-শান্তি ইউরোপে দুর্লভ। দুঃখ-দৈন্য-পীড়িত জীবন-সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত বাঙ্গালীর জীবনে শান্তির এই শেষ স্মৃতিটুকুও যাহারা ধ্বংস করিতে উদ্যত, তাহারা নিশ্চয়ই দেশের শত্রু। বাঙ্গালার মাসিক পত্রিকায় ও স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত অনেক গল্প ও উপন্যাস পাঠে মনে হয় এইগুলি 'পত্রিকাতন্ত্রের' মন্ত্র ব্যতীত কিছুই নহে।

ইউরোপের 'ফ্রি লাভ'-এর ক্ষেত্র যে বাঙ্গালা নহে, ইহা অনেক উর্ব্বরমস্তিষ্ক লোকের মনে স্থান পায় না। আর্ট বা কলার নাম দিয়া বঙ্গসাহিত্যে যাহা চলিতে আরম্ভ হইয়াছে, ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর তাহার কাছে কিছুই নহে। এই শ্রেণীর কাম ও লালসা-উদ্দীপক গল্প, উপন্যাস বা নভেলগুলি এবং ইহাদের প্রাণস্বরূপ মাসিক পত্রিকা-গুলি স্কুল কলেজে বা বাঙ্গালীর অন্তঃপুরে অবাধে প্রবেশ করিতেছে। গল্প বা উপন্যাস না হইলে মাসিক পত্রিকা চলে না; তাই কোন কোন মাসিক পত্রিকার সম্পাদক সাধারণের মনস্তুষ্টির জন্য ছাই-ভস্ম যা' তা' গল্প দিয়া সাধারণের কুরুচি উদ্রেকে সহায়তা করেন। পাশ্চাত্য স্ত্রী-স্বাধীনতার অন্ধ অনুকরণকারী কতিপয় মুষ্টিমেয় তথাকথিত উচ্চশিক্ষিতাভিমানী পরিবার হয়ত এই শ্রেণীর উপন্যাস-কথিত নায়ক-নায়িকার লীলা-ভূমি হইতে পারে; কিন্তু বাঙ্গালার সাধারণ হিন্দু-মুসলমান বা নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্ম-পরিবারের রমণীচরিত্রে এই শ্রেণীর উচ্ছৃঙ্খলতা, লজ্জাহীনতা ও শুচিতার অভাব কখনই পরি-লক্ষিত হয় না। জনৈক বন্ধু একটি মাসিকপত্রিকার একটা গল্পের এক যায়গায় দেখাইলেন, স্বামী স্ত্রীর পাতের উচ্ছিষ্ট খাইতেছেন, আর শাশুড়ী সামনে থাকিয়া বৌমাকে উৎসাহ দিয়া বলিতেছেন, 'কেড়ে কুড়ে খা, তা' না হ'লে ও ডাকাত সব খেয়ে ফেলবে।'

গল্পটি ঐ পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের লেখা। এই পত্রিকাখানি সাধারণের নিকট সুপরিচিত। স্কুল-কলেজ ও অন্তঃপুর সর্ব্বত্র এই পত্রিকার স্থান আছে। ধৃষ্টতা এবং নির্লজ্জতার একটি সীমা আছে, কোন সুপরিচিত পত্রিকা-সম্পাদকের ইহা অতিক্রম করিতে দেখিলে মনে কষ্ট হয়। অনেক মাসিক পত্রিকাতেই একটা বিশিষ্ট লোকের নাম সম্পাদক বলিয়া লিখিত থাকে; তিনি বোধ হয় প্রবন্ধ লেখিবার, এমন কি সময় সময় কোন্ সংখ্যায় কি প্রবন্ধ যাইবে তাহা জানিবারও সুবিধা পান না। অথচ শিরো-নামায় লেখা থাকে সম্পাদক শ্রীযুক্ত ·····। এতদ্ব্যতীত অনেক মাসিক পত্রিকাই যেন একটি লিমিটেড কোম্পানী; কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট লেখকের লেখা বাহির হইবেই,

* উত্তরা-বঙ্গ সাহিত্য-সম্মেলনে পঠিত।

ছাই-ভস্ম যাই হউক। এইগুলি প্রকাশ হইবার পরে যদি স্থান থাকে, তবে হয়ত অপরিচিত ও নিঃসম্পর্কিত লেখকের লেখা বাহির হইতে পারে, তাহা না হইলে অনেক সারগর্ভ প্রবন্ধেরও পরিণাম ঘটে অজ্ঞাতবাস।

উপরে পত্রিকা বিশেষের সহকারী সম্পাদকের লেখার যে নমুনা প্রকাশিত হইল, বাঙ্গালার হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম-পরিবারে এরূপ চিত্র বিরল বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। একদিকে সুরুচির নায়ক-স্থানীয় ঐ পত্রিকার এই চিত্র—অন্যদিকে বাঙ্গালার নিজস্ব ধারা ও সর্ব্বাঙ্গীন জীবনে ভাগবত ভিত্তির কথার প্রচারক পত্রিকাগুলির কাহাকে ছাড়িয়া কাহার কথা বলিব? উপন্যাসহীন বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকার গ্রাহক ও পাঠক সংখ্যা অতি অল্প, কৃষি ও বিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় পত্রিকার অবস্থাও তদ্রূপ।

একটি সুপরিচালিত মাসিক পত্রিকার একটি গল্পের একস্থলে লেখা ছিল, তিনি বহু পুরুষের প্রেমশালিনী হইয়াও স্বীয় সতীত্বধর্ম্ম বজায় রাখিয়াছিলেন।

মাসিক পত্রিকাগুলিতে ছবির প্রয়োজন। শুনিতেছি যে-সংখ্যায় যত নগ্ন চিত্র থাকে, সেই সংখ্যা তত বেশী বিকায়। বাঙ্গালার গৌরব দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন-সম্পাদিত "নারায়ণে" যখন এক শ্রেণীর উপন্যাস বা কথানাট্য প্রকাশিত হইতেছিল, তখন আমি সম্পাদককে লিখিয়াছিলাম—"নারায়ণের" বক্ষে কৌস্তুভ শোভা পায়, ঐ পূতি-গন্ধময় আবর্জ্জনা কেন?" প্রত্যুত্তরে "ধর্ম্মনীতি ও আর্ট" নামক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। বস্তুত আর্ট জিনিষটা যে কি এবং আর্টের উদ্দেশ্য কি, এই সম্বন্ধে অনেকেই অনেক প্রকার আলোচনা করিয়াছেন। টলষ্টয় তাঁহার 'What is Art?' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "যে সকল অনুভূতি দ্বারা মানব-হৃদয়ের শ্রেষ্ঠতম ভাবের বিকাশ লাভ ঘটিয়া আমাদিগকে উন্নতির পথে পরিচালিত করিতে পারে, তাহাই আর্টের প্রতিপাদ্য হওয়া উচিত।"

তিনি আরও বলিয়াছেন, "আর্ট শুধু আর্টের জন্য নহে, বস্তুতঃ ইহা দ্বারা মানব-সমাজের যে পরিমাণ মঙ্গল বা অনিষ্ট সাধিত হইতে পারে, সেই অনুপাতেই ইহা ভাল অথবা মন্দ।"

কিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় "আর্ট ও সাহিত্য" নামে যে গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তাহার ভূমিকায় রায় দীননাথ সান্যাল বাহাদুর লিখিয়াছেন, "এখন যে ভাষায়, যে ভাবে, যে ধরণে, যে উপকরণে এবং আদর্শে উপন্যাসরাজি রচিত হইতেছে, তাহার জন্মদাতা সাহিত্যিক-চূড়ামণি বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্র তখন বিলাতি প্রভাবান্বিত সুতরাং তিনি তাঁহার উপন্যাসের আদর্শ লইলেন পাশ্চাত্য দেশ হইতে. সে উপন্যাসের প্রধান উপাদান-বস্তু নরনারীর প্রেম। তাই পাশ্চাত্য আদর্শের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য উদ্দাম প্রেমলীলা ও বাঙ্গালার উপন্যাস সাহিত্যে নানা ভাবে প্রকটিত হইতে আরম্ভ করিল। সুদক্ষ শিল্পীর হাতে দেশী ছাঁচে ঢালা হইলেও তাহার ভাব বিদেশী, ছন্দ বিদেশী এবং সর্ব্বোপরি প্রবৃত্তি-মূলক প্রেমের তীব্র আলোচনা মনোজ্ঞ ভাষায় মনোহর বর্ণনায় মণ্ডিত হইয়া বঙ্গীয় পাঠিকাদের মস্তিষ্কে বেশ একটু গোলাপী গোছের উন্মাদনার সৃষ্টি করিল··· উপন্যাসের ঐ ধারা যাহা বঙ্কিম বাবু বহাইয়া গেলেন, সেই ধারাই শত ধারায় বিক্ষিপ্ত হইয়া বঙ্গ দেশের সাহিত্য প্লাবিত করিয়া চলিতেছে।"

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বর্ত্তমান কালের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক বলিয়া বিখ্যাত। কোন শিক্ষিত ভদ্রলোক সম্প্রতি তাঁহার "চরিত্রহীন" নামক উপন্যাসের অংশবিশেষ পাঠ করিয়া আমাকে শুনাইতেছিলেন। কিছুক্ষণ শুনিয়া আমার মনে হইল, শক্তিশালী লেখক এইরূপ চিত্র অঙ্কন করিয়া শক্তির অপব্যবহার করিলেন কেন?

"চরিত্রহীন" সম্বন্ধে সুলেখক যতীন্দ্রমোহন সিংহ লিখিয়াছিলেন:—

"রবীন্দ্রনাথ কি কুক্ষণেই লিখিয়াছিলেন—কবির কার্য্য স্কুল-মাষ্টারি নহে। আমার বোধ হয়, তাঁহার এই নীতি অবলম্বন করিয়াই শরৎবাবু তাঁহার চরিত্রহীন উপন্যাস লিখিয়াছেন। ইহাতে যেন কাব্যের স্কুল-মাষ্টারদিগকে challenge করা হইয়াছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি,' 'নষ্টনীড়' ও 'ঘরে বাহিরে' অপেক্ষা শরৎবাবুর

'চরিত্রহীন' সমাজের পক্ষে অধিকতর অনিষ্টকর, কারণ শরৎবাবুর 'আর্ট অধিকতর মর্ম্মস্পর্শী এবং তাঁহার লেখা অনেক বেশী Popular ; আবার এই 'চরিত্রহীনে' আমরা রবীন্দ্রনাথ-সৃষ্ট বিনোদিনী, চারুলতা ও বিমলাকে একসঙ্গে পাই, Congress-এর Omnibus Resolution-এর ন্যায় ইহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব চরিত্রহীন ও চরিত্রহীনাদের একটা বিরাট মিলনভূমি, অথবা তাহাদের একটা বড় মেলা।'

স্কট, বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্রের 'আইভ্যানো,' 'দুর্গেশনন্দিনী' ও 'বঙ্গবিজেতা'র নায়ক-নায়িকার সাদৃশ্য থাকিলেও রমেশচন্দ্রের 'জীবন-প্রভাত' ও 'জীবন-সন্ধ্যা'র নায়ক-নায়িকার প্রেম মার্জ্জিত ভাষা ও ভাবে বর্ণিত এবং সর্ব্বোপরি দেশ-প্রেমের উচ্চ আদর্শে মণ্ডিত হওয়ায় বস্তুতই ইহা মনোজ্ঞ হইয়াছে।

বাঙ্গালা ভাষার আদি উপন্যাস টেকচাঁদ ঠাকুরের 'আলালের ঘরের দুলালে' দুর্নীতি প্রবেশ করে নাই।

বড়ই দুঃখের সহিত একটি অপ্রিয় সত্য কথা বলিতেছি, বাঙ্গালার বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণকেও সময় সময় খেলো উপন্যাসের করকবলন হইতে মুক্ত না দেখিলে মনে বড়ই কষ্ট হয়। ইহা অপ্রিয় হইলেও সত্যের খাতিরে বলিতে হইতেছে। শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেন মহাশয় একজন উচ্চশিক্ষিত ও সহৃদয় লোক, তাঁহার ন্যায় লোকের নিকট হইতে আমরা এই শ্রেণীর খেলো উপন্যাস ছাড়া আরও কিছু ভাল জিনিষ পাইবার আশা রাখি।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গ বা ভক্তদের নিকট যুগান্তরকারী বলিয়া বিবেচিত হইতে পারেন ; তিনি যে শক্তিশালী লেখক এ কথা আমি অস্বীকার করি না, তবে তাঁহার অঙ্কিত চিত্র সবই যে বাঙ্গালার বাস্তব চিত্র নহে ও সমাজের মঙ্গলজনক নহে, ইহা বাস্তব সত্য।

বঙ্গ-সাহিত্যতরণী এখন কর্ণধারহীন। সেই 'বঙ্গ-দর্শন' নাই, বঙ্কিমও নাই ; 'বান্ধব' নাই কালীপ্রসন্নও নাই ; 'সাধারণী' নাই অক্ষয়চন্দ্রও নাই ; কাব্যবিশারদ ও ইন্দ্রনাথ একে একে সকলেই অন্তর্ধান করিয়াছেন ; বঙ্গ-সাহিত্যের শেষ স্বাধীন সমালোচক 'সাহিত্য'-সম্পাদক সমাজপতির তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গ-সাহিত্যে স্বাধীন সমালোচনার স্রোত একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

বঙ্গ সাহিত্যের এই তরুণের অভিমান ও উচ্ছৃঙ্খলতার যুগে যিনি তাঁহার বাস্তব জীবন ও সাহিত্যে যত স্বেচ্ছাচারী ও উচ্ছৃঙ্খল হইতে পারেন, তিনিই তত বড় লেখক। শুনিয়াছি, আজকাল অনেক স্থলেই শিক্ষকদের মধ্যে রীতি আছে, আমার বই তুমি পাঠ্য করিবে তোমার বই আমি পাঠ্য করিব। বর্ত্তমানে সাহিত্য-সমালোচনাও অনেকটা এই রীতিতে চলিতেছে।

সাহিত্য এখন আর লোক-হিতার্থ নহে, শুল্ক-তাম্র-ন্যায় ইহাও এখন ব্যবসায়ে পরিণত হইতে চলিয়াছে। সমাজের সর্ব্বনাশ হক তাহাতে আমার ক্ষতি কি, আমার পকেট ভর্ত্তি হইলেই হইল, ইহাই চলিতেছে।

বিহগ-মিথুন-বধদৃষ্টে আদিকবি দস্যু রত্নাকরের হৃদয় প্লাবিত করিয়া যে করুণার পূতধারা এবং আদর্শ ভ্রাতৃপ্রেম ও সতীমাহাত্ম্য জগতে কবিতারূপে প্রকাশ পাইয়াছিল ; যে বিরাট আত্মম্ভরিতা ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে জগতের লোক-শিক্ষার্থ ত্রিকালজ্ঞ দার্শনিক কবির 'যথা ধর্ম্ম তথা জয়' কুরুক্ষেত্রে এই মহাবাণী ঘোষিত হইয়াছিল, সেই করুণায় পূত কাহিনী ও ন্যায়ের বজ্রনির্ঘোষ বাণী যুগে যুগে সাহিত্যিককে অমর করিয়া তুলিয়াছে। বড়ই দুঃখের বিষয়, বঙ্গবাণীর পূত মন্দিরে আজ সেই বিজয়শঙ্খ-ধ্বনির পরিবর্ত্তে কাম-লালসার পূতিগন্ধময় ছাগ-সাহিত্যের বিকট কোলাহল মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। আজ জাতি মরিতে বসিয়াছে, অন্ন সমস্যা, সাম্প্রদায়িক সমস্যা এবং জাগ্রত জাতির জীবন-মরণের বহু সমস্যা এখন জাতির সম্মুখে মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিয়াছে। এই দুর্দ্দিনে সাহিত্যিকের কর্ত্তব্যও কঠোর। এই আত্ম-বিস্মৃত জাতিকে আত্মপ্রতিষ্ঠ করিতে হইবে এবং সাহিত্যের মধ্য দিয়া তাহার সাধনা চলিবে।

শরৎচন্দ্রের ন্যায় রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ উপন্যাস-গুলিও অস্বাভাবিক, বাস্তব চিত্রহীন ও সমাজের মঙ্গল-জনক নহে, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। এই শ্রেণীর উপন্যাসগুলি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আমার উদ্দেশ্য নহে। বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত ও সুলেখক ললিত বন্দ্যো-

পাধ্যায় ও যতীন্দ্রমোহন সিংহ এই সম্বন্ধে যথেষ্ট গবেষণা ও আলোচনা করিয়াছেন; কাজেই এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা না করিয়া মাত্র সংক্ষেপে বঙ্গ-সাহিত্যে বর্ত্তমানে (১) সধবার প্রেম, (২) বিধবার প্রেম, ও (৩) বারবনিতার প্রেম কিরূপ বিস্তার লাভ ও কুফল প্রসব করিতেছে, এই সম্বন্ধে কিছু আভাস প্রদান করিতে ইচ্ছা করি।

"বসন্তের মলয় হিল্লোল বহিলে যেমন বনস্থলী পর্য্যাপ্ত পুষ্প পল্লবে শোভিত হইয়া উঠে, বড়ই সুখের বিষয় বিগত অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে অর্থাৎ মাইকেলের মেঘনাদ-বধ কাব্য ও বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশ-নন্দিনী প্রকাশিত হওয়ার পর হইতে আমাদের বঙ্গ-সাহিত্যে অসংখ্য কাব্য, নাটক, নভেলের উৎপত্তি হইয়াছে। বসন্তকালে বনস্থলীতে যতগুলি পত্র পুষ্প গজাইয়া উঠে তাহার সবগুলিই যেমন স্থায়ী হয় না, অথবা স্থায়ী ফল প্রসব করে না, সেইরূপ এই সব কাব্য, নাটক, নবেলের সবগুলিই যে স্থায়ী হইয়াছে বা হইবে, এরূপ আশা করা যায় না। বরং দেখিতে পাওয়া যায় ইহাদের অনেকগুলিই অকালে ঝরিয়া পড়িয়া বিস্মৃতি-সাগরে ডুবিয়া গিয়াছে। তাহার প্রধান কারণ, সেই গুলিতে প্রকৃত আর্টের অভাব। আমাদের বঙ্গ-সাহিত্যে কবি হইয়াছেন ও হইতেছেন অনেক, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে প্রকৃত আর্টের অধিকারী কয় জন? প্রকৃত আর্ট থাকুক বা না থাকুক, আজকাল দেখিতে পাই অনেক বাঙ্গালী লেখকেরই নবেল রচনার দিকে একটা ঝোঁক পড়িয়াছে। কবিতার ন্যায় চৌদ্দ অক্ষর মিলাইতে হয় না বলিয়া অনেকে মনে করেন, নবেল লেখা খুব সহজ। আবার পাঠক-পাঠিকাগণও অতি সহজে, এমন কি ঘুমাইতে ঘুমাইতে নবেল পড়িতে পারেন। তাহার ফলে আজকাল প্রতি মাসে বিস্তর নবেল ও গল্পের বই প্রকাশিত হইয়া মাসিক পত্রিকাগুলির বিজ্ঞাপন-স্তম্ভগুলিকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিতেছে। যদি কেবল মাসিক পত্রিকার বিজ্ঞাপন স্তম্ভে সেগুলি নিবদ্ধ থাকিত, তবে ক্ষতি ছিল না। কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ নবেল ও গল্পের বই আমাদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া সেখানে যে একটা অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার সৃষ্টি করিতেছে—আমাদের সমাজের বায়ু দূষিত করিতেছে, ইহাই আমাদের প্রধান আপত্তির কারণ। যে সকল লোকের আর্ট নাই তাহাদের গ্রন্থ ত অনিষ্টকর নহে, কারণ তাহা একটা ক্ষণস্থায়ী উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াই লুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু এ বিষয়ে যাঁহারা প্রকৃত কবি ও আর্টিষ্ট তাঁহাদিগের গ্রন্থই বেশী অনিষ্টকর—কারণ তাঁহারা পাঠক-পাঠিকার মনে একটা অস্বাস্থ্যকর ভাব চিরস্থায়ী ভাবে মুদ্রিত করিয়া দিতে পারেন। বড়ই দুঃখের বিষয়, যে সকল মহাত্মা প্রকৃত ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতার অধিকারী তাঁহারা art for art's sake এই ধুয়া ধরিয়া সমাজের বিশেষ অনিষ্ট সাধন করিতেছেন।

"এই স্থলে কেহ হয়ত বলিবেন, যাঁহারা নাটক নবেল পড়েন, তাঁহারা সেগুলিকে গল্প বলিয়া মনে করেন ও তাহার দ্বারা সাময়িক আমোদ উপভোগ করেন মাত্র। তাহা তাঁহাদের জীবনে কার্য্যে পরিণত করিবেন এইরূপ পাগল সংসারে কয়জন আছেন?

"এরূপ পাগল যে একেবারেই নাই একথা বলা যায় না। এ সম্বন্ধে কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমার প্রমাণ। তাঁহার "চোখের বালি"র নায়িকা বিনোদিনীর সহিত বিহারীর এইরূপ কথোপকথন হইতেছে:—

'বিহারী কহিল—তুমি অনেক স্পষ্ট কথা বলিবার চেষ্টা করিয়াছ এবার আমিও একটা স্পষ্ট কথা বলি। তুমি আজ যে কাণ্ডটা করিলে এবং যে কথাগুলি বলিতেছ ইহার অধিকাংশই তুমি যে সাহিত্যে পড়িয়াছ, তাহা হইতে চুরি। ইহার বার আনাই নাটক নভেল।'

"বিনোদিনী—নাটক, নভেল!'

"বিহারী—হাঁ, নাটক, নভেল! সেও খুব উচ্চদরের নয়। তুমি মনে করিতেছ, এই সমস্ত তোমার নিজের, তাহা নহে। এই সবই ছাপাখানার প্রতিধ্বনি। যদি তুমি নিতান্ত মূর্খ, নির্ব্বোধ, সরল বালিকা হইতে, তাহা হইলেও তুমি সংসারের ভালবাসা হইতে বঞ্চিতা হইতে না, কিন্তু নাটকের নায়িকা ষ্টেজের উপরই শোভা পায়, ঘরে তাহাকে লইয়া চলে না।'

"নাটক নবেল পড়িয়া কোন কোন গৃহস্থের কুলবধূ যে ষ্টেজের নায়িকা হইতে পারেন ইহা কেবল রবীন্দ্রনাথের

কল্পনা নহে। কবিবর নবীনচন্দ্র সেনও 'আমার জীবন' গ্রন্থে তাহার দুই একটি দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন।

"তিনি রাণাঘাট থাকাকালীন একজন স্ত্রীলোক 'কুন্দনন্দিনী' নাম স্বাক্ষর করিয়া ও বিষ খাইয়া মরিবেন এইরূপ ভয় দেখাইয়া তাঁহাকে প্রেমপূর্ণ পত্র লিখিয়াছিলেন। তাঁহার 'জ্যোছনা' নবেলের নায়িকা ভিন্ন আর কি হইতে পারে? "কুন্দনন্দিনী"র সৃষ্টিকর্ত্তা স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও ঘরে ঘরে অনেক কুন্দনন্দিনী ও হৈমবতীর সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন—তাহাদের কেহ কেহ জলরোগে, উদ্বন্ধনে, বিষপানে অকালে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন একথা পূজনীয় তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয় আমাকে বলিয়াছেন এবং সে সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রও না কি শেষ বয়সে অনুতাপ করিয়াছিলেন।

"নাটক নবেলে বর্ণিত প্রেমের চিত্র অপরিণতবয়স্ক ও অগঠিতচরিত্র বালক-বালিকাদিগের মধ্যে যে কতটা হলাহল ছড়াইতে পারে, ইহা দ্বারা তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে। আমার বোধ হয়, কলেরা, প্লেগ, বসন্তের বীজ অপেক্ষাও এই প্রেমের বীজ সমাজশরীরে অধিকতর মারাত্মক।

"আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে বিধবার প্রেমে পড়ার চিত্র কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। প্রাচীন কবিগণ ব্রহ্মচারিণী বিধবাকে চিরদিন সম্মানের চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন। রামায়ণে বালির স্ত্রী তারা বা রাবণ-বনিতা মন্দোদরীর তৎকালে প্রচলিত সেই সেই সমাজের প্রথা অনুসারেই পুনর্ব্বার দেবরের সহিত বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহারা কাহারও প্রেমে পড়েন নাই। আমাদের আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে, স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রই কুন্দনন্দিনীর সৃষ্টি করিয়া ইহার পথ দেখাইয়াছেন। কুন্দনন্দিনীর পরে রোহিণীও তাঁহার সৃষ্টি। কিন্তু কুন্দফুল সূর্য্যমুখীর পাশে অতি নিভৃতে নিতান্ত জড়সড় হইয়া ফুটিয়াছিল, ফুটিতে ফুটিতে অকালে শুকাইয়া গেল। কবি তাহাকে নায়িকার পদে অভিষিক্ত করিয়া তাহাকে লোকচক্ষুর সম্মুখে খুব বড় করিয়া ধরেন নাই।

"কবির মানসোদ্যানের নীলোৎপল ভ্রমরের পার্শ্বে রোহিণী যেন উজ্জ্বলবর্ণ, গন্ধহীন বিলাতী ফুল, তাহার দ্বারা টেবিল সাজানো চলে, কিন্তু তাহা দেব-পূজায় লাগে না। ফল কথা, কুন্দনন্দিনী বা রোহিণীকে কবি নায়িকার আসন দেন নাই, বরং তাহাদের শোচনীয় পরিণাম দেখাইয়া তিনি সমাজের উপকার সাধন করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন।" *

রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের পাপচিত্র অধিকাংশই অতি উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। এই সব পাপচিত্রের সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদের সহিত ঘনিষ্ঠতা জন্মিলে পাপের প্রতি ঘৃণার মাত্রাও ক্রমে কমিয়া আসে। এই হিসাবেও এই শ্রেণীর উপন্যাস-সমূহ সমাজ-দেহের পক্ষে বিষবৎ। বিশ্ববিশ্রুত রবীন্দ্রনাথের ঔপন্যাসিক না হইলেও ক্ষতি ছিল না, তাঁহার কবিপ্রতিভাই তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিত।

বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশের পূর্ণচন্দ্র—বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, "প্রেম কি তাহা আমি জানি না, দেখিল আর মজিল, আর কিছু মানিল না, কই এমন দাবানল ত সংসারে দেখিতে পাই না। প্রেমের কথা পুস্তকে পড়িয়া থাকি বটে, কিন্তু সংসারে 'ভালবাসা' স্নেহ ভিন্ন প্রেমের মত কোন সামগ্রী দেখিতে পাই নাই, সুতরাং তাহার বর্ণনা করিতে পারিলাম না। প্রেম যাহা পুস্তকে বর্ণিত, তাহা আকাশ-কুসুমের মত কোন একটা সামগ্রী হইতে পারে, যুবক-যুবতীদের মনোরঞ্জন জন্য কবিগণ কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে বোধ হয়। তবে একটা কথা স্বীকার করিতে হয়। ভালবাসা বা স্নেহ যাহা সংসারে এত আদরের তাহা পুরাতনেরই প্রাপ্য, নূতনের প্রতি জন্মে না। যাহার সংস্পর্শে অনেক কাল কাটাইয়াছি, বিপদে-সম্পদে, সুদিনে-দুর্দ্দিনে যাহার গুণ বুঝিয়াছি, সুখ-দুঃখের বন্ধনে যাহার সঙ্গে বদ্ধ হইয়াছি ভালবাসা বা স্নেহ তাহারই প্রতি জন্মে।"

কিন্তু আমাদের উপন্যাসে ত 'দেখিল আর মজিল' প্রেমেরই ছড়াছড়ি। ইহা যে দেশের গুরুর সেই পাশ্চাত্য দেশেরও অমর কবি শেক্সপীয়রও ইহাকে "চোখের ভালবাসা" বলিয়াই বুঝিয়াছিলেন।*

---

* 'সাহিত্যের স্বাধীনতা'—যতীন্দ্রমোহন সিংহ।

* So soon forsaken, youngman's love then lies not truly in their hearts, but in their eyes.

Romeo and Juliet.

ক্রিয়াকর্ম্মে মৎস্য

—শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র বিশ্বাস

হিন্দুর নিকট মৎস্য শুধু বিলাসের—লৌকীন রসনা-তৃপ্তির উপাদান নয়। পরন্তু তাহার ধর্ম্মাচরণে—পারমার্থিক ক্রিয়াকাণ্ডেও এই জীবটির স্থান সুবিস্তীর্ণ। আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব, মৎস্য আমাদের দেহের পুষ্টি সাধন করিয়াই ক্ষান্ত নহে—আমাদের আত্মিক উন্নতি বিধানেও ইহার যথেষ্ট ক্ষমতা পরিদৃষ্ট হয়।

শ্রীভগবান স্বয়ং যখন মৎস্যরূপ পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তখন নিষ্ঠাবান্ হিন্দুর নিকট এই জীবটি যে নারায়ণরূপেই পূজিত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? মেরুতন্ত্র গ্রন্থে এই মৎস্যরূপী বিষ্ণুর নিম্নোদ্ধৃত রূপ পরিকল্পিত হইয়াছে—

নাভেরধোরোহিতস্য আকণ্ঠক নরাকৃতিঃ।
ঘনশ্যামস্তুর্ভুজঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ।
পৃষ্ঠিমৎস্যনিভোষ্ণীষী লক্ষ্মীঅঙ্গবিরাজিতঃ।
পদ্মচিহ্নিতসর্ব্বাঙ্গঃ সুন্দরশ্যামলোচনঃ।

অর্থাৎ ইহার নাভি হইতে নিম্নভাগ রোহিত মৎস্যাকৃতি, নাভি হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত নরাকার, ইনি ঘন শ্যামবর্ণ, চতুর্ভুজ ও শঙ্খ-চক্র গদাধারী। ইঁহার মস্তক শৃঙ্গি মৎস্যের ন্যায়, বক্ষে লক্ষ্মী বিরাজিতা, সর্ব্বাঙ্গে পদ্ম চিহ্নিত এবং ইনি চারু লোচন সংযুক্ত।

বৈশাখ, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ ও মাঘ মাসে ইহার পূজা করিলে অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়া থাকে।

"হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে" লিখিত আছে যে, মৎস্যাবতার-মূর্ত্তি ছত্রিশ অঙ্গুলি (দুই হস্ত) পরিমিত দীর্ঘ ও তদুপযুক্ত বিস্তৃত। পুচ্ছদেশের মাপ দেহের অষ্টমাংশ। ইঁহার মুখবিবর বিস্তৃত ও রোহিত মৎস্যাকৃতি। কিঞ্চিৎ বক্রাকারে এই মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে হয়। নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হইলে, ইঁহার সর্ব্বদেহ নারায়ণরূপে কল্পনা করিয়া যদি কেহ ইঁহার পূজা করে, তাহা হইলে তাহার সর্ব্বপ্রকার লাভ ও সর্ব্ব-বিপদ বিদূরিত হয়। মৎস্যপুরাণের মতে যদি কেহ সুবর্ণের ঐরূপ মৎস্য নির্ম্মাণ করাইয়া শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে দান করে তাহা হইলে তাহার পৃথিবী দানের ফল হয়।

শ্রীভগবান শিলামূর্ত্তিতে—শালগ্রামরূপে হিন্দুর নিকট সর্ব্বদা সংপূজিত। মৎস্য এই শিলামূর্ত্তির প্রকারভেদ বলিয়া কীর্ত্তিত রহিয়াছে। মৎস্যাখ্য শীলার পরিচয় সম্বন্ধে নানা পুরাণে নানারূপ লক্ষণ বর্ণিত আছে।

ব্রহ্মপুরাণের মতে—

"দীর্ঘকাঞ্চনবর্ণা যা বিষ্ণুত্রয়বিভূষিতা।
মৎস্যাখ্যা সা শিলা প্রোক্তা ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদা।

অর্থাৎ দীর্ঘাকার, সুবর্ণবর্ণ, তিনটি বিন্দু-সমন্বিত শিলাই মৎস্যশিলা। ইঁহার অর্চ্চনায় ভুক্তি ও মুক্তি লাভ হয়। স্থানান্তরে "কাঞ্চনবর্ণের" স্থলে "কাংস্যবর্ণের"ও উল্লেখ পাওয়া যায়। পদ্মপুরাণের মতে মৎস্যশিলা "কাচবর্ণং সুশোভনং"। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের মতে—যে শিলা দীর্ঘ, স্থূল ও চক্রে চিহ্নিত; যাহার পুচ্ছভাগে একটি চক্র, দক্ষিণে শকটাকৃতি ও বামে রেখা দেখা যায়, তাহাই মৎস্যমূর্ত্তি। এই মূর্ত্তি শুভপ্রদ। মৎস্যসূক্তে দেখা যায়—মৎস্যাকৃতি, দীর্ঘাকার এবং মস্তকে চিত্রযুক্ত চক্রই মৎস্যচক্র বা মৎস্যমূর্ত্তি শিলা। আবার পুরাণ সংগ্রহের মতে—তিনটি বিন্দু ও শঙ্খ-চক্র-পদ্ম চিহ্নিত দীর্ঘাকার দক্ষিণাস্য শিলাচক্রই মৎস্য চক্র।

শুধু বৈষ্ণবের নহে, শাক্তের চক্রেও মৎস্য পরম পবিত্র ও ইষ্টসাধনার অন্যতম উপায়রূপে সংপূজিত। ইহা তন্ত্রের পঞ্চ ম-কারের তৃতীয় ম-কার বলিয়া উল্লিখিত।

প্রথমস্তু ভবেন্মদ্যং মাংসঞ্চৈব দ্বিতীয়কম্।
মৎস্যশ্চৈব তৃতীয়ং স্যাদ্ মুদ্রা চৈব চতুর্থিকা।
পঞ্চমঃ মৈথুনং বিদ্যাৎ পঞ্চৈতে নাদতঃ স্মৃতাঃ।

পঞ্চ ম-কারের সাধনাই তান্ত্রিকের চরম ও পরম সাধনা বলিয়া কথিত। মৎস্য সম্বন্ধে কুলার্ণবতন্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে—মায়া মল প্রভৃতির প্রশমন, মোক্ষমার্গের নিরূপণ ও অষ্টবিধ দুঃখের বিনাশন হয় বলিয়া ইহার নাম "মৎস্য"।

মাত্রামন্যানিশমন্যাশোকমার্গনিরূপণাৎ।
ক্রষ্টুঃশিবিরহাদংশেতি পরিকীর্ত্তিতা॥

শৈবের মৎস্যভক্ষণ নিষিদ্ধ। মহাদেব মৎস্য ও মাংসরত ব্যক্তি হইতে দূরে অবস্থান করেন।

ক মদ্যং ক শিবে ভক্তিঃ ক মাংসং ক শিবার্চ্চনম্।
মৎস্যমাংসরতানাং বৈ দূরে তিষ্ঠতি শঙ্করঃ॥

(কালীতন্ত্র)

কিন্তু চড়ক সংক্রান্তির পূর্ব্ব দিন অঙ্গদেশে একটি পর্ব্ব দিবস। উক্ত দিনে পুত্রবতী প্রত্যেক রমণীই "নীলের উপোস" বা নীলকণ্ঠের উপবাস পরম নিষ্ঠা সহকারে করিয়া থাকেন। সমস্ত দিবস নিরম্বু উপবাস করিয়া সন্ধ্যায় তাঁহারা দুগ্ধ, চিনি ও সিদ্ধি মিশ্রিত গঙ্গাজলে দেবাদিদেবের পূজা করিয়া প্রজ্বলিত প্রদীপ দ্বারা "নীলের ঘরে বাতি" দেন। গভীর রাত্রে ব্রতধারী "সন্ন্যাসিগণ" লীলাবতীর (দুর্গার) সহিত নীলকণ্ঠের বিবাহ দিয়া থাকেন। ঐ বিবাহের বিরাট উৎসব এখনও বহু শিবতলায় দেখিতে পাওয়া যায়। নববস্ত্র, পুষ্পমাল্য ও পোলার টোপরে "বুড়া শিব"কে নবীন বরবেশে সজ্জিত করা হয়। ঢাকের বাদ্যে নিশীথ গগন প্রকম্পিত করিয়া সসম্ভারোহে সন্ন্যাসিগণ বিধিমতে সংপূজিত একটি পুষ্করিণী হইতে লীলাবতীকে নূতন কলসী মধ্যে করিয়া মন্দিরে আনেন এবং উক্ত কলসী মহাদেবের বামভাগে স্থাপিত করিয়া নানা অনুষ্ঠান ও মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক হর-পার্ব্বতীর বিবাহ দিয়া থাকেন। পরদিন আবার সন্ন্যাসিগণ বিবিধ বিচিত্র সাজে সজ্জিত হইয়া—ভূত দানব ইত্যাদি সাজিয়া বহু সহ বরের স্বগৃহে প্রত্যাগমনের অভিনয় করিয়া থাকেন। ইহাই সর্ব্বজনবিদিত চৈত্র সংক্রান্তির 'সং'এর মূল কথা। ঐ দিন সন্ন্যাসিগণের যে শোভাযাত্রা বাহির হয়, তাহাই চৈত্রের সংযাত্রা। কিন্তু অনেকে হয়ত জানেন না যে, লীলাবতীরূপে নূতন কলসীতে করিয়া যাহাকে পুষ্করিণী হইতে মন্দিরে আনা হয় সেটি একটি সজীব মাগুর মাছ—তাহার সচকিত লীলায়িত গতিই লীলাবতীর প্রতীক। সুতরাং মৎস্য শৈব্যের পুণ্য ও ধর্ম্মাচরণের সহায়।

শুধু হিন্দু নয়—জৈনগণ তাঁহাদের ধর্ম্মমন্দির-সংলগ্ন পুষ্করিণী বা কৃত্রিম জলাশয়ে পরম যত্নে মৎস্য পালন করিয়া থাকেন। ঐ সকল মৎস্যকে নিত্য আটা, ছাতু, মুড়ি, খৈ প্রভৃতি আহার্য্য যোগান তাঁহাদের ধর্ম্মাচরণের অঙ্গীভূত। কেহ ঐ মৎস্য মারিলে অথবা মারিবার চেষ্টা করিলে, তাঁহারা ধর্ম্মদ্রোহিতা করা হইল বলিয়া বোধ করেন। দৈবাৎ কোন মৎস্য মৃতাপ্লু হইলে তাঁহারা সেই মৃত জীবটীর সৎকার করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করেন।

বৌদ্ধ ধর্ম্মে জীব-হত্যা নিষিদ্ধ। তাঁহাদের নিকট অহিংসাই পরম ধর্ম্ম। সে কারণ মৎস্য-পালন তাঁহাদের ধর্ম্মের অন্যতম আচরণ। জৈন মন্দিরের ন্যায় বহু বৌদ্ধ-মন্দিরেও মৎস্যকুল সযত্নে প্রতিপালিত হইতে দেখা যায়।

খৃষ্টানের নিকট—রোমান ক্যাথলিক মতাবলম্বী খৃষ্টানের নিকট—শুক্রবার অতি পবিত্র দিবস। ঐ দিনে তাঁহারা কোনরূপ মাংস গ্রহণ করেন না, কেবল মৎস্য ভোজনই উক্ত দিবসে প্রশস্ত। তাঁহারা উহাকে অর্দ্ধোপবাস দিবস (Half-fast day) বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সেইরূপ "গুড্-ফ্রাইডে"র প্রায় দুই মাস পূর্ব্ব হইতে (Lent) তাঁহারা প্রতি বুধবারেও মাংস আহারে বিরত এবং মৎস্য ভোজনেই ধর্ম্মাচরণ করিয়া থাকেন। সুতরাং খৃষ্টানের নিকটও মৎস্য "ধর্ম্মপথের নেয়ে" বলিয়া গ্রাহ্য।

মুসলমানগণ ধর্ম্মাচরণকল্পে, রক্ত নাই বলিয়া, চিংড়ি মাছ ভক্ষণ করেন না। বৈজ্ঞানিকের চক্ষে চিংড়ি মাছের রক্ত থাকিলেও, তাহা লোহিত কণিকা (red corpuscle) শূন্য বলিয়া ধার্ম্মিক মুসলমান উহাকে রক্তহীন জীব বলিয়াই ধরিয়া লন। মৃত মৎস্য ভোজনও অনেক ধর্ম্ম-নিষ্ঠ মুসলমানের নিকট পরিত্যাজ্য। তাঁহারা জল হইতে মৎস্য তুলিয়াই স্বধর্ম্মানুমোদিত বিধিমতে মোল্লাদির দ্বারা "হালাল" করাইয়া তবে খাইয়া থাকেন।

সুতরাং দেখা যায় যে, পৃথিবীর প্রচলিত প্রায় সকল ধর্ম্মেই মৎস্য তাহার প্রভাব প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে।

আমরা পৃথিবীর সকল ধর্ম্মের সংবাদ রাখি না—রাখিবার শক্তিও নাই। স্থূল দৃষ্টিতে যে সকল ধর্ম্মে মৎস্যের প্রভাব অল্প-বিস্তর লক্ষিত হয় তাহারই উল্লেখ করিলাম। তবে হিন্দুর ঘরে জন্ম বলিয়া, হিন্দুর সংসারে

প্রচলিত ক্রিয়া-কাণ্ডে মৎস্যের যে স্থান তাহার কিছু পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি মাত্র। আমাদের সেই পর্য্যবেক্ষণের ফল আমাদের পাঠকগণকে উপহার দিতে চাই। ইহাও উল্লেখ করিয়া রাখা প্রয়োজন যে, ইহাতে কেবল ধর্ম্মের অনুশাসন নয়—দেশাচার ও কুলাচারের কথাও কতক পরিমাণে বর্ত্তমান আছে।

মনু মৎস্য ভক্ষণ নিষেধ করিয়াছেন।* কিন্তু এই মনুসংহিতাতেই আবার উক্ত হইয়াছে যে, দৈব ও পৈত্র-কর্ম্মে দেবতা ও পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে মৎস্য ভোজন বিধিবিরুদ্ধ নহে।

প্রেতোদ্দেশ্যে যে সকল শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে মৎস্য দেওয়ার বিধি আছে। আদ্যশ্রাদ্ধ ও নান্দীমুখ শ্রাদ্ধই প্রেতশ্রাদ্ধ। সপিণ্ডীকরণের পর মৃতের প্রেতত্ব নাশ হয়। সেজন্য সপিণ্ডীকরণ পর্য্যন্ত যে শ্রাদ্ধ করা হয় তাহা আমিষ দ্বারা কর্ত্তব্য। সপিণ্ডীকরণের পর আর আমিষ দ্বারা শ্রাদ্ধ করিতে নাই।

সপিণ্ডীকরণং যাবৎ প্রেতশ্রাদ্ধন্তু ষোড়শম্।
পক্কান্নেনৈব কর্ত্তব্যং সামিষেণ বিজাতিভিঃ।

ইহার পর মৃতের দোষ প্রশমনের জন্য যে কৃত্য করিতে হয়, তাহাতেও মৎস্য এক অপরিহার্য্য অঙ্গ। মন্ত্রপূত মৎস্যের রক্ত প্রজ্বলিত হোমকুণ্ডে আহুতি দিয়া গ্রহাচার্য্যগণ মৃতের দোষ খণ্ডন করেন।

মৃতাশৌচ অন্তে আদ্যশ্রাদ্ধের "নিয়মভঙ্গে" মৎস্যের যে বিপুল সম্ভারের দ্বারা জ্ঞাতিবর্গ ও আত্মীয় কুটুম্বগণের সহিত একত্রে অগ্নিকর্ত্তার মৎস্যভোজনের প্রথা এদেশে প্রচলিত আছে, তাহাও আমাদের মৎস্যের প্রতি আন্তরিক প্রীতির নিদর্শন। আর সেই ভূরি ভোজনের প্রারম্ভে শোলমাছ পোড়া খাইয়া মুখের রুচি ফিরানর যে নিয়ম চলিয়া আসিতেছে তাহা শুধু "পোড়ার মুখে সব ভাল" বলিয়া নয়, পরন্তু তাহার সঙ্গে মাছ যে আমাদের কত আদরের সামগ্রী তাহারও পরিচয় বর্ত্তমান।

মৎস্য ও দধি মাঙ্গল্য সূচনা করে। এজন্য বংশে প্রথম সন্তান জন্মিলে জাতকের কল্যাণকল্পে গুরু, পুরোহিত, ধাত্রী, নাপিতানী প্রভৃতিকে মৎস্য উপঢৌকন দেওয়া আমাদের দেশাচার। প্রতি বৎসর জন্মতিথি পূজায় কোন জীবিত মৎস্য (সাধারণতঃ শোল বা বৈ) জলাশয়ে ছাড়িবার যে প্রথা যে এতদ্দেশে প্রচলিত আছে তাহা শুধু মৎস্যপ্রীতিপ্রসূত নয়, অপিচ একটি মরণোন্মুখ জীবকে আসন্ন মৃত্যুর গ্রাস হইতে রক্ষা করিয়া নিজ ভবিষ্যৎ জীবন নিরুদ্বেগ ও দীর্ঘতর করিবার প্রচেষ্টা। সেইদিন যে জাতককে মৎস্য ভোজন করিতে দেওয়া হয় না, তাহারও ঐ একই উদ্দেশ্য।

বিবাহের প্রারম্ভে গাত্রহরিদ্রায় মৎস্যের তৈল আমাদের সর্ব্বজনবিদিত প্রথা। ইহাতে মাঙ্গলিক সূচিত হয়। নব দম্পতির ভবিষ্যৎ জীবন মধুময় ও মঙ্গলময় করিবার উদ্দেশ্যে আম্যুদ্ধার উপলক্ষে বর ও কন্যাকে মৎস্যের মেজা ভাজা খাওয়ানর প্রথা কোন কোন স্থানে দৃষ্ট হয়। ইহা আমাদের শৈশবে শ্রুত "মেজা খেলে রাজা হয়" কথার প্রমাণের প্রচেষ্টা। অনেক স্থলে দেখা যায়, অধিবাসের পূর্ব্বে পতিপুত্রবতী মেছুনীকে হলুদ-মাখান চাউল ও নব-বস্ত্র উপঢৌকন দিয়া নবদম্পতির কল্যাণ কামনার প্রথা বর্ত্তমান। নব-বধূর পতিগৃহে প্রথম প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে সাদরে বরণ করিয়া ঘরে লওয়ার সময়, একটী সজীব ল্যাটা মাছ তাহার হস্তে দেওয়ার প্রথা, বিদ্রূপচ্ছলে কেহ কেহ ইহাকে "বিয়ের পর নানা ল্যাঠা এসে জুটার প্রতীক" বলিয়া উল্লেখ করিলেও, ইহার মূল উদ্দেশ্য বধূর আয়ুস্তি ও কল্যাণ কামনা। মৎস্য-ভোজন আমাদের সধবা নারীর আয়ুস্তি রক্ষা ও পতির কল্যাণ কামনার নিদর্শন

বিষয়কর্ম্মে মৎস্যের সমাদর প্রখ্যাত জমিদারগণের নববর্ষের 'পুণ্যাহ' প্রথায় পরিদৃষ্ট হয়। একটি জীবন্ত মৎস্য (সাধারণতঃ মাগুর মাছ) একটি নূতন কলসীতে রাখিয়া সেই কলসীকে পূর্ণ ঘট বা পুণ্যঘটরূপে স্থাপনা করা হয়। সেই ঘটই সমস্ত জমিদারীর ভবিষ্যৎ মঙ্গল সূচনা করে। আবার এই 'পুণ্যাহ' উপলক্ষে জমিদারীর একজন বিশিষ্ট জেলেকে নববস্ত্র ও নগদ মুদ্রা উপহার দেওয়ার প্রথা সর্ব্বত্র বর্ত্তমান। ইহার দ্বারা কি সূচিত হয় না যে, উক্ত মৎস্যজীবী সেই জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত সমস্ত জলাশয়ে প্রচুর মৎস্য উৎপাদন করিয়া প্রজাগণের নিত্য আহারের সুব্যবস্থা এবং তাহাদের দৈনন্দিন জীবন উপভোগ্য ও আনন্দময় করুক ?

* মনুসংহিতায় প্রচলিত পাঠ যে প্রকৃত পাঠ নহে, ইহার উল্লেখ বর্ত্তমান সংখ্যার সম্পাদকীয়তে পাওয়া যাইবে। বঃ সঃ

পূজার্চ্চনায় দেখিতে পাওয়া যায়, নানা ব্রত-ব্রত ও দেবারাধনায় মহিলাগণ বহু মৎস্যের চিত্র আঁকিয়া আলপনা দিয়া থাকেন। কালিকগণ মহাসমারোহে যে মহাকালের পূজা করিয়া থাকে, তাহাতে মৎস্য বলিদানের নিয়ম আছে। এই মহাকাল চলিত কথায় 'মাকাল' ঠাকুর নামে সকলের নিকট পরিচিত। মাকাল পূজা না দিয়া কোন জলাশয়ে প্রথম মাছ ধরা জালিকগণের আচারবিরুদ্ধ।

পুত্রাদির কল্যাণে 'জীতু' পূজা বা জীমূতবাহনের (ইন্দ্রের) পূজা বৈদিক যুগের প্রথা। ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই পূজার জন্য একটি ছোট খাত খুঁড়িয়া তাহার মধ্যস্থলে ইক্ষুদণ্ড ও নানাবৃক্ষাদি রোপণ করিয়া একটি 'রচনা' করিতে হয়। আর সেই খাতটী জলপূর্ণ করিয়া তাহাতে কৈ, মাগুর প্রভৃতি মৎস্য ছাড়িয়া দিতে হয়। এই পূজা বাঙ্গালা অপেক্ষা বিহার ও উড়িষ্যায় এ কাল পর্য্যন্ত অধিক প্রচলিত আছে।

গৃহস্থের বাটীতে প্রথম ইলিশ মৎস্য আসিলে আমাদের কুললক্ষ্মীগণ সিন্দূর দিয়া, শঙ্খধ্বনি সহকারে তাহার সম্বর্দ্ধনা করেন। শ্রীপঞ্চমীর দিন পূর্ব্ববঙ্গের প্রতি হিন্দুগৃহে ইলিশ মৎস্যের পূজা হইবার প্রথা আজও বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইলিশ মৎস্য সংগৃহীত না হইলে তদভাবে উহার আঁইস ই পূজিত হইয়া কুলাচার সংরক্ষণ করে।

পুরীধামে শ্রীমন্দিরের 'সিংহদ্বার' অতিক্রম করিয়া জগন্নাথের 'চাঁদমুখ' দেখিয়া আসিয়া বহু ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি সারা জীবনের মত সিঙ্গি ও চাঁদা মাছ ভক্ষণ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। অবশ্য সিংহদ্বার বা সিংহদুয়ার সহিত সিঙ্গি মাছ এবং চন্দ্রবদন বা চাঁদমুখের সহিত চাঁদা মাছের কোন সম্বন্ধ বর্ত্তমান আছে কি না, তাহা আমাদের জানা নাই। কিন্তু ঐ দুইটি স্বাদু সহজলভ্য মৎস্য উপভোগ চিরদিনের মত ত্যাগ করায় তাঁহাদের ধর্ম্মনিষ্ঠার যথেষ্ট পরিচয় মিলিয়া থাকে এ কথা সত্য।

মৎস্যপূর্ণ জলাশয় দেবোদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণকে দান মহাপুণ্যকাজ। কর্ণেল টড তাঁহার রাজস্থানের সুপ্রসিদ্ধ ইতিবৃত্তে উল্লেখ করিয়াছেন যে, কোটারাজ্যে এইরূপ অনেকগুলি জলাশয় কানাইয়ার (শ্রীকৃষ্ণ) উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণগণকে প্রদত্ত হইয়াছিল।

মহাভারতে বনপর্ব্বের 'বক-যুধিষ্ঠির সংবাদ' হইতে জানা যায় যে, বকরূপী ধর্ম্ম যুধিষ্ঠিরকে যে সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন তাহার মধ্যে একটা 'নিদ্রাকালেও কাহারা চক্ষু মুদ্রিত করে না?' যুধিষ্ঠির উত্তর দেন 'মৎস্য'। বাস্তবিক মৎস্যগণ চিরকাল নির্নিমেষ থাকে বলিয়া তাহাদিগকে সর্ব্বদা জাগ্রত বলিয়া বোধ হয়। এই চির-জাগ্রত সর্ব্বদর্শী ভাব অভিব্যক্তির জন্যই দাক্ষিণাত্যে দেবী 'মীনাক্ষী'র প্রতিষ্ঠা। তিনি স্নেহময়ী, সন্তানবৎসলা জননীর ন্যায় জগতের কল্যাণকল্পে সারাক্ষণ অপলক নেত্রে তাহার মুখের পানে চাহিয়া আছেন। মূর্খ, অজ্ঞ, আত্মম্ভরী আমরা মায়ের এই করুণার কথা একবারও ভাবিয়া দেখি না।

কোন মূল্যবান্ দ্রব্য চুরি গেলে চোর ধরিতে অনেকে দেবী-মন্দিরে, বিশেষভাবে শীতলা মন্দিরে, কৈ মাছের গায়ে চুণ মাখাইয়া ছাড়িয়া দেয়। তাহাদের বিশ্বাস ঐ মাছটি যেমন ছট্‌ফট্ করিতে থাকিবে, চোরও অনুরূপ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া চুরি বস্তুটি সত্বর ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হইবে। আর যদি সে ফিরাইয়া না দেয়, তাহা হইলে অল্পদিন মধ্যেই তাহার সর্ব্বদেহ চুণের মত সাদা হইয়া যাইবে। ফলে শ্বেতকুষ্ঠগ্রস্ত বলিয়া সে সারা জগতের নিকট ঘৃণ্য ও অবজ্ঞাত থাকিবে।

প্রিয়জনের কঠিন ব্যাধির উপশমের জন্য তাহাদের জীবনের আশায় নিরাশ হইলে, অনেকে বাজারে বিক্রয়ার্থ আনীত জীবন্ত মৎস্য কিনিয়া নদীতে ছাড়িয়া দেয়। তাহাদের বিশ্বাস, সেই মৃত্যুর দ্বারে নীত জীবটীর জীবন-রক্ষার ফলে তাহাদের প্রিয়জনের জীবন রক্ষা পাইতে পারে। এ প্রথা জৈনগণের মধ্যে সমধিক লক্ষিত হয়।

রবিবারে মৎস্য ভক্ষণ করিতে নাই; করিলে সপ্তজন্ম কুষ্ঠী ও দরিদ্র হইতে হয়। রবিবারে মৎস্য-ভক্ষণকারী সাতজন্ম অপুত্রক হইয়া থাকে। ইহা শাস্ত্রের অনুশাসন।

কার্ত্তিক মাসে শুক্লা একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত

পাচদিন 'বকপক্ষক' নামে খ্যাত। প্রবাদ এই যে উক্ত সময়ে বকেও মৎস্য আহার করে না।

> ত্রয় একমাত্তোদ্দিষ্টে দিবি পক্ষে বকপক্ষকম্।
> অকোদ্গমে তত্র নাদীয়াৎ মৎস্যকৈর কদাচন।

সে কারণ ঐ সময়ে কাহারও মৎস্য-ভক্ষণ উচিত নয়। কিন্তু সাধারণভাবে সমগ্র কার্ত্তিক মাস অনেকেই ধর্ম্মোপদেশে নিরামিষ আহার করিয়া থাকেন। শুধু কার্ত্তিক মাস নয়,—বৈশাখ, কার্ত্তিক ও মাঘ পুণ্যমাস বোধে বহু বর্ষজীবি হিন্দু মৎস্য-ভোজন ত্যাগ করিয়া থাকেন।

উল্লিখিত মাসত্রয়ে ধর্ম্মানুষ্ঠানকল্পে মৎস্য-ভক্ষণ না করার বিধান দিয়া শাস্ত্রকারগণ মৎস্য সংরক্ষণের যে সহজ, সুন্দর ও প্রকৃষ্ট উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা মৎস্যভোজী মাত্রেরই প্রণিধানযোগ্য। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যায় যে, উক্ত তিনটি মাস কোন না কোন জাতীয় মৎস্যের ডিম্ব ধারণের সময়; বৈশাখ মাসে রুই, কাতলা, মৃগাল প্রভৃতি মিঠাজলের ও ভেটকী, তপসী প্রভৃতি নোনা জলের মাছ ডিম্ব ধারণ করে। কার্ত্তিক মাসে ইলিশ, পার্শে, ভাঙ্গন, টেংরা প্রভৃতি নদের ও তড়াগজ মাছের এবং মাঘ মাসে কৈ, মাগুর, সিঙ্গি, শোল, শাল প্রভৃতি মাছে ডিম্ব ধারণ করিয়া থাকে। সুতরাং সে সময় একটি মৎস্য মারার অর্থ সেই জাতীয় শত সহস্র মৎস্য-ভ্রূণের জীবন নাশ করা। সে কারণ প্রজ্ঞাবন্ত দূরদর্শী ঋষিগণ জাতির কল্যাণ ও দেশের সম্পদ্ সংরক্ষণের জন্য ব্যাপকভাবে ঐ মাসত্রয়ে মৎস্য ভক্ষণ একেবারে নিষেধ করিয়াছেন। আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা আজকাল সে নিষেধ-বাক্য উপেক্ষা করি—অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখি—ফলে দেশে মৎস্য উৎপাদন দিন দিন হ্রাস হইয়া পড়িতেছে।

প্রসঙ্গক্রমে একাদশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও অষ্টমী তিথিবিশেষে এবং প্রতি রবিবারে মৎস্য ভক্ষণ নিরোধের যে শাস্ত্রীয় অনুশাসন বর্ত্তমান আছে, তাহার উল্লেখ করিয়া আমরা বলিতে চাই যে, ধর্ম্মের সম্বন্ধ ছাড়িয়া দিলেও উক্ত বিধান স্বাস্থ্যতত্ত্বের দিক্ দিয়া, রুচির দিক্ দিয়া যেমন অপরিহার্য্য, সংরক্ষণের দিক্ দিয়াও তেমনি অত্যাবশ্যক। কারণ বৈচিত্র্যবিহীন—একঘেয়ে একই দ্রব্য রোজ খাওয়ায় রুচিবিকারও জন্মে, দেহের পুষ্টিও কম হয়। আর সাধারণতঃ সপ্তাহে অন্ততঃ দুই দিন যে দ্রব্য ব্যবহৃত লোকে না খায়, তাহা বৎসরের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কাল সংরক্ষিত হইয়া থাকে। সুতরাং এ বিধান জাতির কতদূর কল্যাণকর তাহা ভাবিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে।

সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বুঝিয়া রাখিতে হইবে যে, শুধু আমাদের বাস্তব জীবনের সঙ্গে নহে—পরন্তু আমাদের ধর্ম্মজীবনের সহিতও এই জীবট কি নিবিড়ভাবে সংবদ্ধ রহিয়াছে।

রাষ্ট্রভাষা

যাঁহারা মানবজাতির ভাষাপ্রকৃতি সম্বন্ধে সামান্যমাত্রও লক্ষ্য করিবার অবকাশ পাইয়াছেন, তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, প্রাকৃতিক বিধানানুসারে স্থানের দূরত্বানুসারে ভাষার পার্থক্য হওয়া অনিবার্য্য এবং সমগ্র পৃথিবী অথবা সমগ্র দেশ যে সুদূর কথা, কোন একটি সমগ্র প্রদেশের মানুষও ঠিক ঠিক এক ভাবে কোন ভাষা ব্যবহার করে না। কাজেই সমগ্র দেশের সমস্ত মানুষের মধ্যে একটি মাত্র ভাষা প্রচলন করিবার চেষ্টা করা স্বভাববিরুদ্ধ কাজ।

পিতৃ-ঋণ

—শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়

মাস পাঁচ ছয় হইল পায়ের ব্যথাটা বেশ একটু বাড়িয়া উঠিয়াছে, বেশী হাঁটাহাঁটি করা চলে না, ডাক্তারেরও নিষেধ: অথচ দেহটাকে একরূপ জোর করিয়াই ধরিয়া রাখিতে হয়, মনটা কিন্তু ঠিক সেই পরিমাণেই আলসা হইয়া ওঠে। বাজারের ফর্দ্দটা করিয়া দেওয়া, বারোয়ানির খাতনা অনেক দিনের বাকী—তদ্বির তাগাদা করিতে আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছে, আজ তাহার কিছুটা অন্ততঃ মিটাইয়া না দিলে আর ভদ্রস্থ থাকে না, ছোট মেয়েটা উপরি উপরি তিন খানা চিঠি দিয়াছে শ্বশুর-বাড়ী হইতে। সব চেয়ে বড় অভিযোগ তার, দিদিকে আনিবার বেলা পিতার না কি তা'র সময়ের অভাব হয় না, সেই শুধু পিতা-মাতার একেবারে পর হইয়া গিয়াছে। এই তার শেষ চিঠি, আর সে যদিয়া গেলেও একটা খবর দিবে না তাঁহাদিগকে—ইত্যাদি, ইত্যাদি, নানারূপ; মনটাও যেন কেমন কেমন করিয়া উঠে।

বেলা প্রায় দশটা বাজিয়া যায়, এমনই এবং আরও অনেক কল্পনা-কল্পনায়।

বিকালের দিকটা একরূপ বন্ধ কাটে না নকুলদের ওখানে; সন্ধ্যা হইতেই আড্ডাটা বেশ জমিয়া উঠে। একখানা পাশার ছক্, জোড়া দুই তাস, আধসের তামাক ও শ'খানেক পান, ইহাই ছিল নকুলেশ্বর চক্রবর্ত্তীর বরাদ্দ 'হুল-হাউসের' দিন। মোটের উপর সন্ধ্যাবেলায় চক্রবর্ত্তী-বাড়িতে এই কলরোল যেমন দেখিতে দেখিতেই পড়িয়া উঠে, ঠিক তেমনই অকস্মাৎ এবং অতর্কিতেই আবার ভিতর হইতে শিথিল নড়িয়া উঠে, রাত্রি প্রায় সাড়ে এগারটার সময়। ত্রিলোচন ভট্‌চায্ "ইস্তক-বিস্তি" কাবার করিতেই ভুলিয়া যান। রামু অধিকারী "দু-তিন-নয়" বলিতে গিয়া বলিয়া ফেলেন "ঝুড়ে-বারো-পাশা"; চাটুয্যে খুড়ো বলেন—এবার "দেবযানীতে ভেরো করো, বাবা, নকুলেশ্বর আমার আসন টলেছে, আর না।" হরিশ গুরুমশায় নিবিষ্ট চিত্তে এক কোণে বসিয়া বিদ্যা এবং সুন্দরের রসালাপটা পড়িতেছিলেন, হঠাৎ "বিনা মেঘে বজ্রাঘাত" বলিয়া সশব্দে চীৎকার করিয়া উঠেন; "বইটা আজ আমার কাছেই থাক নকুলদা; রাত্রি জেগেই পড়ে ফেলতে হবে দেখছি।"

ঘড়ির চাতের উপর মানুষের হাত কাজ করছে না-কি, চক্কোত্তি মশায়?—বলিয়া রামপ্রাণ মিত্তির নিষ্প্রাণ বিড়িটাতে বার দুই টান দিয়া প্রাণ সঞ্চার করিবার বৃথা চেষ্টা করেন। আরও আধঘণ্টা এমনই করিয়াই কাটিয়া যায়।

মাসের মধ্যে শনিবার কয়টাতেই চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর এই মজলিসটা পুরাদমে জমিয়া ওঠে—সেটা নকুলেশ্বরের সৌভাগ্যই হোক আর দুর্ভাগ্যই হোক। "তোমার কিন্তু আসা চাই-ই, চৌধুরী, 'লেট্' না হয় যেন। আরও খানিকটা লেখা হয়েছে, শোনাব'খন"—এইরূপই ছিল তাহার আদেশ বা অনুরোধ, যাহা হোক একটা কিছু আমার উপর। গীতার তিনি আধুনিকতম ভাষ্য লিখিতেছেন, সেইটাই শুনিতে হইবে। দেরী হইবার উপায় নাই, তাহারই আগে গ্রেফ্ তারি-পরোয়ানা আসিয়া হাজির হয়; কৈফিয়তের ত' কথাই নাই, সব চেয়ে বেশী দিতে হয় কমলার কাছে। চায়ের কাপ ও পানের রেকাবীটা নামাইয়া দিয়া মুহূর্ত্তের জন্য সে গম্ভীর হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে, তাহার পর "আলোটা নিয়ে আসব, বাবা?" বলিয়া সে উত্তরের আর কিছুমাত্র অপেক্ষা না করিয়া তেমনি গম্ভীর ভাবেই চলিয়া যায়; তাহার পিতা ছাড়া ঘরের মধ্যে যে আরও একজন দ্বিতীয় ব্যক্তি আছেন, ইহা যেন সে স্বীকারই করে নাই। মিনিট দু'য়ের মধ্যে আলো আসে, মুখখানা কিন্তু আরো বেশী গম্ভীর তার;—"মা: বাবা, এমন করে আমি আর পারব না; মাসীমা চলে যাবে, আর তোমরাও অমনি এসে বসবে। আলোটাও জ্বেলে দিতে পারে না হতভাগা, হাতটা এমন পুড়ে গেল।"

গীতা হইতে মুখ না তুলিয়াই নকুলেশ্বর জানাইলা দিলেন, এরূপ দেরী করিয়া বসার মধ্যে তাঁহার ত' কিছুমাত্র দোষ নাই-ই, সমস্তই কিছু দোষ আমার; এবং গদাইকে দিয়া

ডাকিতে না পাঠাইলে আরও যে বেশী দেরী হইত আমার আসিতে, একথাটাও তিনি শুনাইতে বাকি রাখিলেন না। কিন্তু মুহূর্ত্তের মধ্যেই মুখখানা কমলার অত্যন্ত রকমের বিবর্ণ হইয়া ওঠে, যখন সে শোনে—দেরী করিয়া আসাটা আমার ইচ্ছাকৃত নয়, পায়ের ব্যথাটা একটু বাড়িয়াছে, "আপনি কিন্তু শরীরের এতটুকুও যত্ন নেন না, কাকা বাবু।" চোখ দুইটা তার টল্‌টল্ করিয়া ওঠে। "কাল কিন্তু দুপুর বেলায় রমাদিকে পাঠিয়ে দেবেন আমাদের বাড়ী, ভুল না হয় যেন।" আর একটাও কথা বলে না সে, ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া যায়।

নকুলেশ্বর চক্রবর্ত্তীদের আদিবাস এ গ্রামে নয়, কোথায় ঠিক জানি না; তবে শুনিয়াছি, প্রায় দেড় শত বৎসর আগে গ্রামের জমিদার রামভদ্র শীল না কি জননীর কি একটা ব্রতোপলক্ষে বাড়ীর মধ্যে একটা বিষ্ণুবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁহারই সেবার জন্য নকুলেশ্বরের প্রপিতামহ মুকুন্দ চক্রবর্ত্তীকে বহুদেশ খুঁজিয়া সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসেন। পরে ভবিষ্যতে বংশধরদের মতিগতি কিরূপ হয় বলা যায় না, এইরূপ কিছু একটা আশঙ্কা করিয়া রামভদ্র শীল শ'খানেক বিঘা লাখেরাজ জমি ও বিষ্ণুবিগ্রহটীকে পুরোহিত মহাশয়ের হাতে অর্পণ করেন। আশঙ্কাটা যে তাঁহার নিতান্ত অমূলক হইয়াছিল এরূপ বলা চলে না; রামভদ্র শীলের পুত্র ছিল না, একমাত্র কন্যা; দৌহিত্র না কি তাঁর নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল ও অসৎ-চরিত্র ছিলেন এবং তাঁহারই আমলে শীলেদের প্রকাণ্ড জমিদারী এবং বাড়িঘরদোর প্রায় পাড়ে পনেরো আনাই নীলাম হইয়া যায়; যেটুকু আজও অবশিষ্ট আছে তাহাও যে আর বেশী দিন কালের দণ্ড এড়াইয়া চলিতে পারিবে এরূপ বলিয়া মনে হয় না। এমন একদিন না কি ছিল, যে-দিন ইঁহাদের কুললক্ষ্মীরা বাড়ীর বাহির পর্য্যন্ত হইতেন না, পথ চলিবার সময় রাস্তার দুই ধারে, উপরে ও নীচে পরদা টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইত; প্রকাণ্ড উঠানটার মধ্যেই ছিল পুষ্করিণী, ঘাট ও বধূদের বেড়াইবার স্থান; উত্তর কোণে একটা হ্রদের মত ছিল শ্বেত-পাথরে বাঁধান, নানা দেশের নানা জাতীয় হাঁস চরিত সেখানে। মাঝখানে ছিল তার প্রকাণ্ড একটা ফোয়ারা। কোন দিনই না কি তার জল শুকাইত না, জ্যোৎস্না-রাত্রে বধূরা আসিয়া সেই ফোয়ারার জলে স্নান করিতেন। সব কিছুই আজ রূপকথার মত শোনায়; প্রকাণ্ড বাড়ী, ঠাকুরদালান। ইটগুলাই শুধু কঙ্কালের মত দাঁড়াইয়া আছে। আজও না কি ফুটার জল শুকায় নাই, কোন দিন শুকাইবে বলিয়াও মনে হয় না; অতীতের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে হাঁসগুলাও উড়িয়া গিয়াছে; পদ্ম বা শালুক কিছুই আর ফোটে না সেখানে, সমস্ত জলটাই পানায় ঢাকা। অনেক দিন অপরাহ্নে এই বাড়ীটার পাশ দিয়া গিয়াছি, ভিতর হইতে যেন একটা শব্দ পাওয়া যায়—ঘাঁতায় করিয়া গম বা কলাই ভাঙ্গারই মত একটা শব্দ।

যাক, সে কথা ভাবিয়া আজ আর কোন লাভ নাই; অতীতের সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছুই যায়। অনেক কিছুই আবার গড়িয়া উঠে। শীলেদের পতনের সঙ্গে সঙ্গে চক্রবর্ত্তী বাড়ীর দিন দিন উন্নতিই হইতে লাগিল।

নকুলেশ্বরের সংসার মোটের উপর সুখেরই সংসার বলিতে হইবে; আধিক দুঃখকষ্ট এ সংসারে কোন দিন আসিয়াছে বলিয়া মনে হয় না; পারিবারিক শান্তি জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ্, নকুলেশ্বর সে বিষয়ে সৌভাগ্যবান্, পাঁচজনে একথা স্বীকার ত' করেই, নকুলও কোনদিন এ কথা অস্বীকার করেন নাই। তাঁহার জীবনের ইতিহাসের একটিমাত্র কলঙ্কময় পৃষ্ঠা, বহুদিনই ত' তিনি উহাকে ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছেন; গ্রামের যাহারা জানিত অনেকেই তাহাদের ইহলোক হইতে বিদায় লইয়াছে, যাহারা বাঁচিয়া আছে তাহাদের বোধ হয় সে কথা আজ আর মনেও নাই।

নকুলেশ্বরের পিতা ছিলেন গ্রামের সমাজপতি, কড়া প্রকৃতির লোক, অন্যায় কাহারও কোনদিন তিনি সহ্য করিতেন না, শাস্তিবিধানও করিতেন উচিত মত। তাই যেদিন পুত্রবধূ হেমলতার নামে গ্রামে একটা "কানাঘুষা" শোনা গেল, তিনি তাহাকে ক্ষমা করিলেন না; একমাত্র পুত্র নকুলেশ্বর এবং তাঁহার একমাত্র বংশধর দুই বৎসরের 'বিনু' তাহার মুখ চাহিয়াও না। হেমলতার পিতাকে স্পষ্টভাষাতেই সমস্ত কথা লিখিলেন এবং একথাও বেশ স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দিলেন যে, তাঁহার কন্যাকে তিনি আর এক মুহূর্ত্তও ঘরে রাখিতে পারিবেন না। বিশ্বনাথ কিন্তু মায়ের আঁচল ছাড়িল না। নকুলেশ্বর তখন সবেমাত্র কাজে ঢুকিয়াছেন, যথাসময়ে সমস্ত কথা গিয়া তাঁহার কানে

পৌঁছিল; ব্যাপারটা তিনি ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না, এবং আরও বেশী আশ্চর্য্য হইলেন, যেদিন তাঁহার পিতা স্বয়ং আসিয়া পুত্রকে লইয়া গেলেন তাহার দ্বিতীয়বার বিবাহ দিবার জন্য। পিতার আদেশ অমান্য করা নকুলেশ্বরের স্বভাব এবং শাস্ত্র উভয়েরই বিরুদ্ধ; এ কারণে যেদিন তিনি পুত্রকে আপনার পায়ে হাত দেওয়াইয়া শপথ করাইলেন যে, নকুলেশ্বর কোন দিনই আর আপনার পূর্ব্বপত্নী বা পুত্রের সঙ্গে এতটুকুও সম্বন্ধ রাখিবেন না, সেদিন তাঁহার মুখ দিয়া একটাও প্রতিবাদের কথা বাহির হইল না। বর্দ্ধমান জেলায় রহিমপুর না এমনি কি একটা গ্রামে নকুলেশ্বরের প্রথমপক্ষের শ্বশুরালয়।

থাক, নকুলেশ্বরের সুখের সংসারে দুঃখের একথা না আনাই ভাল। তিনি হয়ত' একথা আজ ভুলিয়া গিয়াছেন।

গ্রামের "সনাতনী হিন্দুসমাজ", নকুলেশ্বর ছিলেন তা'র সভাপতি; গুণী এবং জ্ঞানী বলিয়াও দু'দশখানা গ্রামের মধ্যে তাঁহার বিশেষ খ্যাতি ছিল, লোকের বিপদে আপদে, দায়ে-দৈবে তিনি-ই মাত্র ছিলেন 'মাথা' হইয়া দাঁড়াইবার মত লোক। নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ, গোঁড়ামি কিন্তু এতটুকুও আছে বলিয়া মনে হয় না। বয়স পঞ্চাশ হইতে ষাটের ভিতরে; শ্যামবর্ণ দেহ, একমুখ দাড়ি ও গোঁফ, মুখখানা তাঁ'র আরও সুন্দর দেখায়। বৎসর তিন হইল 'পেন্‌সেন্' লইয়া বাড়ীতে আসিয়া বসিয়াছেন, কি একটা না কি বড় দরের চাকুরী করিতেন কলিকাতায়। চক্রবর্ত্তী-জায়া মহামায়াদেবী স্বয়ং অন্নপূর্ণা; মুখে তাঁ'র কোন দিনই হাসির অনটন হয় না, উঁচু কথা কেহ কোনদিন তাঁহার মুখে শুনিয়াছে বলিয়া ত' মনে পড়ে না। কোন প্রকার তিন বৎসরের খাজানা বাকী পড়িয়াছে, মহামায়াদেবীর কাছে আসিয়া পড়িল, অমনি তাহার সমস্ত খাজানা মাফ্; কাহারও আজ দুইদিন আহার জোটে নাই, মহামায়াদেবীর কাণে পৌঁছিল, তাহাকে আর দশদিনের জন্য ভাবিতে হইবে না। বলেন, ছেলেমেয়ের উপর যতটুকু কর্ত্তব্য তাহাত' করিয়াছেন। মেয়েরা পড়িয়াছে রাজার মত ঘরে, বড় ছেলেকে ডাক্তারী পাশ করাইয়া আরও বেশী শিক্ষার জন্য বিলাত পাঠাইয়াছেন; ছোট ছেলে কলিকাতায় কলেজে পড়ে, পরে তাহারও একটু কিছু হেস্ত-নেস্ত হইবে; তবে আর টাকা রাখিয়া যাওয়া কাহার জন্য। তবে কমলা? মহামায়াদেবীর চোখ দুইটা ছল ছল করিয়া ওঠে; দুই দুইটা ভাই থাকিতে তাহার কি কোন একটা গতি হইবে না?

অনেক দিন এমন হইয়াছে, নিবিষ্ট মনে নকুলেশ্বরের গীতার ভাষ্য শুনিতেছি, কমলা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে চোখের কাছ ঘেঁষে; হঠাৎ চোখ পড়িয়া গেল তাহার মুখখানার দিকে। সুন্দর কপালে দুইটা বড় বড় রেখা পড়িয়াছে, বয়স যেন বাড়িয়া গিয়াছে অনেক বেশী। এইত' সেদিনের কমলা, কোলেপিঠে করিয়াই মানুষ করা, বয়স তখন আর তাহার কত হইবে, পাঁচ কিংবা ছয়, সুরমারই বয়সী; নাকে একটি ছোট 'নোলক্', কাণে দুইটি লাল পাথরের 'দুল্', দুইজনে একসঙ্গে বসিয়া আমাদের তুলসীমঞ্চের নীচে "পুণ্যিপুকুর" পূজিত; আজও যেন বেশ স্পষ্ট চোখের সম্মুখে দেখিতে পাইতেছি, সেদিনের সে ত্রয়োদশবর্ষীয়া দুইটি আজও তেমনি করিয়া তিনটি আঙুলের ফাঁকে একটী রক্তজবাকে মাটীর উপর আঁকা "দশপুতুলের" উপর চাপিয়া ধরিয়া উঁচু হইয়া বসিয়া আছে, আর ঘাড় দুলাইয়া দুলাইয়া সুর করিয়া বলিতেছে—"ধরিলে মনিষ্যি হয়,...রামের মত পতি পাব..." রামের মত পতিও ত' সে পাইয়াছিল; কিন্তু দুই বৎসরও কাটিল না, হতভাগিনী তাহাকে চিরনির্ব্বাসনে দিয়া আসিয়াছে। আর সুরমা? অনেক দিনই ত' সে ফাঁকি দিয়া গিয়াছে; মনটা অত্যন্ত বরফের মত ঠাণ্ডা হইয়া উঠে, গীতা শুনিবার মত মনের অবস্থা আর থাকে না।

মাস দুই হইল আর একটা কাজ বাড়িয়াছে। নকুলেশ্বরের একখানা নূতন বাড়ী হইতেছে 'বাংলো'প্যাটার্ণের, হাট এবং রেলনের মাঝামাঝি একটা খোলা জায়গায়। শশাঙ্ক না কি বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া এইখানেই ডাক্তারখানা খুলিবে, জানাইয়াছে। বাড়ীখানা কেমন হইতেছে, কয়টা আলমারী অন্ততঃ ঔষধ রাখিবার জন্য লাগিবে, ডাক্তারখানার এত নিকটে একটা পচা পুকুর থাকা কিছুতেই উচিত নয়; ডাক্তার বসিবেন একখানা ঘরে, রোগীরা এক ঘরে, যেসব রোগীকে বিশেষরূপে পরীক্ষা করিতে হইবে তাহাদের জন্য একখানা ঘর এবং ঔষধ দিবার জন্য একখানা, এই চারিখানা ঘর হইলেই উপস্থিত এখন চলিবে; প্রয়োজন হয় পরে আর একখানা ঘর বাড়াইয়া দেওয়া যাইবে। এইরূপ নানা

কথাই শুনিতে হয় দুপুরবেলায় বসিয়া। ছেলে এখন বিলাত হইতে না ফিরিতে ফিরিতেই নানাস্থান হইতে বিবাহের সম্বন্ধ আসিতেছে, অবশ্য ছেলের মত না লইয়া এখন কিছু করা যায় না, তাহাকে কিছু কথাও দিতে পারেন না তিনি; পুত্র তাঁহার যে আদর্শ বাছিয়া লইয়াছে, প্রত্যেক প্রকৃত দেশ-সেবীরই সেই আদর্শ হওয়া উচিত; ইংরাজীতে না কি কি একটা কথা আছে Charity begins at home, প্রথমে আপনার গ্রামের সেবা কর, তা'রপর দেশের; কয়টা দেশসেবী ও আদর্শ লইয়া কাজ করে? পাঁচবার জেলে যাওয়া, অথবা সপ্তাহে তিনবার করিয়া বক্তৃতা দেওয়া, তাহার চেয়ে শশাঙ্ক যে রোগপীড়িত দুঃস্থদের সেবা করিয়া দেশমাতৃকার, তথা ভগবানের শ্রেষ্ঠ সেবা করিবে ইহাতে তাঁর কিছুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না।

খুড়ার ভাস্য লেখা উপস্থিত এখন বন্ধই আছে। এইরূপ নানারকমের পরামর্শ করিতে হয় তাঁহার সঙ্গে।

'বাংলো'র সম্মুখে 'কেয়ারি'করা একটি ছোট ফুলের বাগান; অনেকদিন দেখিয়াছি, বৃদ্ধ নকুলেশ্বর অত্যন্ত যত্নের সহিত ফুলগাছগুলির গোড়ার মাটি ভাঙিয়া দিতেছেন, কোথায় খানিকটা দেয়ালের উপর কিসের একটা দাগ লাগিয়াছে আপনিই সেই স্থানটা এক ছোপ্ চুণ মাখাইয়া দেন। "চৌধুরী, কাল একখানা শশাঙ্কর চিঠি পেয়েছি, দিন পনেরর মধ্যেই আসছে সে; দাঁড়াও চিঠিখানা নিয়ে আসি", নকুলেশ্বর একরূপ ব্যস্তভাবেই ঘরের ভিতরে চলিয়া গেলেন।

কমলা তখনও আলোটা দিয়া যায় নাই, অন্ধকার পক্ষের রাত্রি, বর্ষা আরম্ভ হইয়াছে—মনটা, কি জানি কেন, অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া উঠিল; নকুলেশ্বরের এই যে এত আনন্দ, এত উৎসাহ—গীতার ভাষ্য লেখাটা উপস্থিত বন্ধ থাকুক, বাংলোটা শেষ হওয়া চাইই তাহার আগে—তারপর সমস্ত জিনিষটা যেন একটা বিশ্রী রকমের পাগলামি বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

বাহিরের জমাট-বাঁধা অন্ধকার, তাহারই বুকের দিকে চাহিয়া চাহিয়া, কোথায় কবে কি একটা গল্প শুনিয়াছিলাম, বোধ হয় রূপকথারই গল্প, তাহারই খানিকটা মনে পড়িয়া গেল—

—কে ছিলেন রাজা, প্রকাণ্ড এক রাজ্যের রাজা। লোক-লস্কর ধনদৌলত কিছুরই অভাব ছিল না তাঁর; একমাত্র মহিষী অনন্ত রূপ-যৌবনা, সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী যেন। এত সুখ কিন্তু রাজার অদৃষ্টে সহিল না; মহারাণী সুমিত্রা অকালে ইহলোক ত্যাগ করিলেন,—রাজকুমারের বয়স আর তখন কত হইবে, দেড় কিংবা দুই বৎসরের বেশী নয়। রাজার আর রাজকার্য্যে মন বসিল না; সুন্দর মেহকান্তি—মুখখানা অবিকল মহারাণীর মত, রাজা একদৃষ্টে চাহিয়া থাকেন রাজকুমারের মুখের দিকে,—ঝর্ ঝর্ করিয়া দুই গাল বহিয়া তাঁর জল পড়ে।

অনেকদিন কাটিয়া গেল। রাজপুত্র বড় হইয়াছেন; রাজা বৃদ্ধ, জরাগ্রস্ত—সর্ব্বাঙ্গে কিসের যেন একটা ব্যথা, রাত্রে ঘুমও হয় না যন্ত্রণায়। একদিন না কি রাজা স্বপ্ন দেখিলেন—দূরে, বহুদূরে, সাত সমুদ্র তের নদীর ওপারে, কোথায় কোন্ যেন এক রাজার দেশ। রাত্রে জ্যোৎস্নালোকে রাজকন্যা চুল শুকায় ছাদের উপর—মাথার উপর বসিয়া থাকে একটি সোনার পাখী, রূপার খাঁচায়; তাহারই একটা পালক আনিয়া কে যেন রাজার সর্ব্বাঙ্গে বুলাইয়া দিল,—রাজার সমস্ত যন্ত্রণা দূর হইয়া গেল, ঘুমাইয়া পড়িলেন। সকালে উঠিয়া রাজকুমার স্বপ্নের কথা শুনিলেন, হাতী-শালায় হাতী সাজিল, ঘোড়া-শালায় ঘোড়া সাজিল, রাজপুত্র চলিলেন—কোথায় সেই স্বপ্নে দেখা রাজার দেশ, জ্যোৎস্নারাত্রে রাজকুমারী চুল শুকায় ছাদের উপর—মাথার উপর বসিয়া থাকে সোনার পাখী রূপার খাঁচায়। সেটা না কি রাক্ষসীর দেশ; রাজকন্যাও রাক্ষসী—রাজকুমারকে ভুলাইল।

রাজা বসিয়া থাকেন রাজকুমারের প্রতীক্ষায়। গ্রীষ্ম আসে, পথিকের পায়ের নীচে করা পাতার শব্দ ওঠে, রাজা চমকিয়া উঠিয়া বলেন—ওই বুঝি আসে! বৃষ্টির ধারা দুয়ারে আসিয়া ঝাপটা মারে, রাজা ভাবেন—এবার নিশ্চয় আসিয়াছে! রাজপুত্র আসিল না।

আজও না কি প্রচণ্ড গ্রীষ্মের দিনে দুপুর বেলায়—সমস্ত পৃথিবী যখন ঝাঁ ঝাঁ করে, সেই রাজপ্রাসাদের ধ্বংসস্তূপের পিছনে পলাশ এবং অশোক গাছ দুইটার পাতাগুলি একটি দুইটি করিয়া ঝড়িয়া পড়ে—কে যেন সেই শুষ্ক পাতাগুলি সরাইয়া সরাইয়া কাহাকে খুঁজিয়া বেড়ায়; বর্ষার দিনে

অন্ধকার রাত্রে যখন ঝড় উঠে, তাহার যেন একটা করুণ আর্তনাদ শোনা যায় ওই ধ্বংসস্তূপের ভিতর হইতে। পথিক সে পথ দিয়া আর চলে না।

ছিঃ, এ কি ভাবিতেছি? আপনা-আপনি সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল। কমলা আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে চায়ের কাপ লইয়া। সমস্ত জিনিষটা কি সে বুঝিতে পারিয়াছে? এক চুমুকেই প্রায় চায়ের কাপটাকে নিঃশেষ করিয়া ফেলিলাম, দেহ এবং মন খানিকটা সতেজ হইল। শশাঙ্ক ভাল ছেলে, চিরদিনই তাহাকে জানি—একরূপ কোলে-পিঠে করিয়াই তাহাকে মানুষ করিয়াছি। জীবনের যে ব্রত গ্রহণ করিয়া সে আসিতেছে, এত বড় স্বার্থত্যাগ দেশের কয়জন ব্যক্তি করিতে পারিয়াছে? স্বাধীনতার মধ্যে বিচরণ করিয়া, স্বাধীন লোকের সংস্রবে মনটা তাহার কত দেশী উদার হইয়াছে, ভাবিয়া বিস্মিত হইলাম। ধন্য তাহার পিতামাতা, তাহাকে পাইয়া দেশও ধন্য হইবে—আত্মীয়গর্বে মনটা ভরিয়া উঠিল।

বর্ষার দিন। পায়ের ব্যথাটা এই দিনেই একটু বাড়ে; কিন্তু তবুও নিস্তার নাই। চক্রবর্তী বাড়ীতে আজ মহোৎসব, শশাঙ্ক আসিবে সাড়ে পাঁচটার ট্রেনে, বোম্বাই হইতে এইরূপ সে জানাইয়াছে। 'বাংলো' এবং বাস্তুবাড়ীখানা নানারকম করিয়া সাজান হইয়াছে—গ্রামের সকলেরই আজ নিমন্ত্রণ এ বাড়ীতে; ঘণ্টাখানেকের ছুটি তাহাও অনেক কষ্টে পাইয়াছি। "তিনটের মধ্যে কিন্তু আসা চাই-ই, চৌধুরী। সাহেবী কায়দায় রিমিন্ডার্স কথা ওসব আমার ঠিক আসে না জানত—তুমি ষ্টেশনে না গেলেই চলবে না—"

ছোট মেয়েটা আজ সাতদিন হইল আসিয়াছে। আসিয়াই পরদিন হইতে জ্বর। হোমিওপ্যাথিতে বিশেষ কিছু উপকার হইতেছে না, এলোপ্যাথিই দেখাইতে হইবে। শশাঙ্ক ত' আজই আসিতেছে, দেখা যাক, তাহার সঙ্গে একটা পরামর্শ করিয়া যাহা হোক কিছু করা যাইবে।

নকুলেশ্বরের কথামত ঠিক তিনটার সময় আসিয়া উঠিতে পারিলাম না, পৌণে চার প্রায় বাজে। কমলা জানাইল, পিতা তার উপরের ঘরে আছেন, সেইখানেই আমাকে যাইতে বলিয়াছেন। বর্ষাকাল, পথঘাটও ভাল নয়—একটু আগে হইতেই ষ্টেশনে যাওয়া ভাল; নকুলেশ্বর এখনও উপরে বসিয়া আছেন, বিস্মিত হইলাম।

ভিতরে ঢুকিয়াই যাহা দেখিলাম, সমস্ত মাথাটা যেন অসম্ভব রকমের ঘুরিয়া উঠিল; নকুলেশ্বর চোখ বুজিয়া বিছানার উপর শুইয়া আছেন, হাতে একখানা 'বঙ্গবাসী'—দুই গাল বাহিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িতেছে; নানারূপ অমঙ্গল-আশঙ্কা একসঙ্গে আসিয়া মাথার ভিতর আঘাত করিল। কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই নকুলেশ্বর একবার চোখ মেলিয়া চাহিলেন, 'বঙ্গবাসী'খানা আমার দিকে আগাইয়া দিয়া পাশ ফিরিয়া শুইলেন বিপরীত দিকে। সমস্ত ব্যাপারটা যেন একটা প্রকাণ্ড রহস্য, মনটা ব্যথিত হইয়া উঠিল। কাগজের খানিকটা জলে ভিজিয়া গিয়াছে, পড়িবার চেষ্টা করিলাম, ঘটনাটা দিন সাত আগের—

"অসাবধানে হইয়া 'হেন্‌সুইচ বোর্ডে' হাত দেওয়ায় গতকল্য কানপুর পাওয়ার হাউসে একজন মিস্ত্রির শোচনীয় ভাবে মৃত্যু হইয়াছে; বয়স প্রায় ত্রিশের কাছাকাছি, নাম বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। তদন্ত করিয়া জানা গিয়াছে, মৃতের মাতুলালয় বর্দ্ধমান জেলায় রহিমপুর গ্রামে; বৃদ্ধা জননী এখনও জীবিত আছেন। মহাশয় কোম্পানী অনাথিনীর আজীবন ৫৲ টাকা হিসাবে মাসহারার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া উদারতার পরিচয় দিয়াছেন।"

মুখ দিয়া একটা কথাও সরিল না। দেয়াল-ঘড়িটায় ঠং করিয়া একটা ঘণ্টা বাজিল, সাড়ে চার। নকুলেশ্বর একটু নড়িয়া সরিয়া শুইলেন; অস্ফুট একটা শব্দ যেন কানে গেল "ভগবান!"

"নকুল দা?" নকুলেশ্বর চোখ মেলিলেন।

"শুভদিনে আজ চোখের জল ফেলতে যে—" আপনার কণ্ঠস্বরে আপনিই চমকিয়া উঠিলাম, গলাটা অসম্ভব রকমের কাঁপিতেছে। যথাসম্ভব আপনাকে সংযত করিয়া লইয়া বলিলাম—"ট্রেন আসতে আর বেশী দেরী নেই, নকুল দা। একটু আগে থাকতেই ষ্টেশনে যাওয়া ভাল, বাদল বৃষ্টির দিন।"

অজীর্ণরোগের জল-চিকিৎসা

—শ্রীকুলরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

১

দেহের কোন যন্ত্র যে সুস্থ আছে, সাধারণতঃ ইহাই তাহার প্রমাণ যে, আমরা তাহার অস্তিত্ব বুঝিতে পারি না। যখনই দেহে কোন বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়, তখনই প্রকৃতি বেদনা প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া আমাদিগকে জানাইয়া দেয়, কোথায় গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে।

পরিপাকের যন্ত্রগুলির সম্বন্ধেও এই কথা বহুলাংশে প্রযোজ্য। যতদিন পরিপাক-যন্ত্র ভাল থাকে, ততদিন আমরা বুঝিতেই পারি না যে, আমাদের পরিপাক-যন্ত্র বলিয়া কিছু আছে। যখন উহাদের ভিতর গোলযোগ উপস্থিত হয়, তখন প্রকৃতি বিভিন্ন রোগলক্ষণ উৎপন্ন করিয়া আমাদিগকে রোগের প্রকৃতি জানাইয়া দেয়। কখন কখন ভুক্তদ্রব্য অত্যন্ত কষ্টের সহিত হজম হয় এবং পেট-বেদনা, পেট-ফাঁপা, তরল ভেদ, কোষ্ঠবদ্ধতা, পাকস্থলীতে ভারবোধ প্রভৃতি লক্ষণ উৎপন্ন হয়। যখন এই সমস্ত অথবা ইহাদের কতকগুলি প্রকাশ পায়, তখন আমরা তাহাকে বলি, অজীর্ণ বা ডিস্পেপ্‌সিয়া।

অজীর্ণ রোগ খুব মারাত্মক রোগ নয়—অর্থাৎ অজীর্ণ রোগের জন্যই লোক সহজে মারা যায় না। কিন্তু অধিকাংশ অবস্থায় ইহা বহুসংখ্যক মারাত্মক রোগ উৎপন্ন করিয়া থাকে। যক্ষ্মা অবস্থায় যক্ষ্মা, বিভিন্ন স্নায়বিক রোগ এবং লিভার ও কিডনি প্রভৃতির বহুবিধ যান্ত্রিক রোগ অজীর্ণ হইতে প্রকাশ পায়।

দেহের পুষ্টি নির্ভর করে ভুক্তদ্রব্য যথেষ্টরূপ জীর্ণ হইবার উপর। যদি ভুক্তদ্রব্য ভাল ভাবে জীর্ণ না হয়, তবে পুষ্টির অভাবে দেহকে যে-কোন যন্ত্রই দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হইতে পারে। বিশেষতঃ, অজীর্ণ হইতে দেহের বিষ-মোক্ষণকারী যন্ত্রগুলি দুর্বল হইয়া পড়ে। তাহাতে দেহের ভিতর যে-বিষ সঞ্চিত হয়, তাহা যে-কোন দুর্বল অঙ্গ আক্রমণ করিয়া ঐ অঙ্গে রোগ উৎপন্ন করিতে পারে। সুতরাং অজীর্ণ যদিও মারাত্মক নয়, তথাপি ইহা না করিতে পারে দেহের এমন ক্ষতি নাই।

ইংরাজীতে প্রবাদ আছে,—আমরা নিজেদের দাঁত দিয়াই নিজেদের কবর খুঁড়ি। অজীর্ণ সম্বন্ধে এ-কথাটা খাঁটী সত্য। যে-সমস্ত কারণে অজীর্ণ হয়, তাহাদের ভিতর আহারের ত্রুটিই সর্ব্বপ্রধান। সাধারণতঃ দ্রুত আহার, অসময়ে আহার, শীতল অন্ন আহার, অত্যধিক আহার, অত্যধিক গুরুপাক দ্রব্য আহার, অনেকগুলি পদ একসঙ্গে আহার, অত্যধিক মসলা আহার, অত্যন্ত ঘন ঘন আহার, আহারের সময় জলপান, শ্রান্ত অবস্থায় আহার, আহারের পরই পরিশ্রম, আহারের পরই নিদ্রা এবং অত্যধিক চা ও কফি পান প্রভৃতি দীর্ঘ দিনের কদভ্যাসে অজীর্ণ রোগ উৎপন্ন হয়। কিন্তু অজীর্ণ পরিপাক-যন্ত্রের রোগ বলিয়াই মনে করা উচিত নয়। আমাদের পরিপাক-যন্ত্র দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন পৃথক্ একটা যন্ত্র নয়। সমস্ত দেহের সহিতই ইহা অবিচ্ছিন্ন ভাবে জড়িত। দীর্ঘ দিনের আহার-বিহারের দোষে সর্ব্ব-দেহেই একটা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। তাহাতে দেহের বিষমোক্ষণকারী যন্ত্রগুলি তাহাদের কর্ত্তব্য সম্পাদনে অক্ষম হইয়া পড়ে এবং দেহে অত্যধিক দূষিত পদার্থের সঞ্চয় হয়। যখন ঐ বিষ পরিপাক-যন্ত্রকেই আক্রমণ করে, তখনই প্রকৃত অজীর্ণ রোগ উৎপন্ন হয়।

সময় সময় কুসফুস, কিডনি কি লিভারের রোগ হইতে অজীর্ণ রোগ প্রকাশ পায়। অজীর্ণ যেমন দেহের বিষ-মোক্ষণকারী যন্ত্রগুলিকে দুর্বল করিয়া বিভিন্ন রোগ সৃষ্টি করে, তেমনি দেহের দূষিত অবস্থাই আবার অজীর্ণ রোগ উৎপন্ন করিয়া থাকে। দেহের যে সকল যন্ত্র প্রতিনিয়ত বিষ বাহির করিয়া দেয়, তাহারা দুর্বল বা অসুস্থ হইয়া পড়িলে, অন্ন তাহাদের অপনয়নমূলক কর্ত্তব্যের কতকটা অংশ সময় সময় গ্রহণ করে। তাহাতেই অজীর্ণ স্থায়ী হয়।

সময় সময় গ্রন্থিবাত, বাতব্যাধি এবং ডায়াবিটিস্ রোগ হইতে অজীর্ণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ সব রোগে প্রকৃতি দেহের বিষ অন্নের পথে যখন বাহির করিয়া দিতে চায়, তখনই এই রোগ জন্মায়।

কোন কোন সময় স্নায়বিক কারণে অজীর্ণ রোগের প্রকাশ হয়। কিন্তু দেহের দোষযুক্ত অবস্থাই স্নায়ুগুলিকে দুর্বল বা উত্তেজিত করিয়া অজীর্ণ রোগ উৎপন্ন করে।

আরও বিভিন্ন কারণে এই রোগ উৎপন্ন হয় এবং বিভিন্ন লক্ষণ লইয়া প্রকাশ পায়। ঐ সকল কারণ ও লক্ষণ অনুযায়ী ইহার বিভিন্ন নাম দেওয়া হয় এবং বিভিন্ন শ্রেণীতে ইহাকে বিভক্ত করা হয়। কিন্তু ইহার যত নামই দেওয়া হউক এবং যত শ্রেণীতেই উহা বিভক্ত থাকুক, এমন এক শ্রেণীর অজীর্ণও নাই যাহার সহিত দৈহিক দোষযুক্ত অবস্থার সম্পর্ক না আছে।

যে-কারণেই হউক, পূর্ব্বে দেহে কতকগুলি বিষের সঞ্চার হয়, তাহার পর উহা যখন পরিপাক-যন্ত্রের মাংসপেশীগুলিকে দুর্বল করিয়া ফেলে এবং রক্তকে দূষিত করিয়া পাচক-রস-গুলিকে শক্তিহীন করিয়া দেয়, তখনই মাত্র পূর্ণাঙ্গ অজীর্ণ রোগ উৎপন্ন হয়।

সেইজন্য অজীর্ণ প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বদৈহিক রোগ। ইহার বিশেষ প্রকাশ হয় মাত্র পরিপাক-যন্ত্রে। সুতরাং কেবল পরিপাক-যন্ত্রের চিকিৎসাই ইহার চিকিৎসা নয়। সমস্ত দেহকে সবল ও দোষমুক্ত করিবার সঙ্গে সঙ্গে পরিপাক-যন্ত্রকেও দোষমুক্ত করাই ইহার প্রধান চিকিৎসা।

বিভিন্ন উপায়ে পরিপাক-যন্ত্রকে সবল ও দোষমুক্ত করা যাইতে পারে। কিন্তু জল-চিকিৎসার যত প্রয়োগ-বিধি আছে, তাহাদের ভিতর এই অবস্থায় ভিজা কোমর-পটিই (wet girdle) সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ। এক খানা পাতলা ভিজা নেকড়া খুব ভাল করিয়া নিংড়াইয়া পাকস্থলী হইতে তলপেটের শেষ সীমা পর্য্যন্ত দুইবার ঘুরাইয়া লইয়া পুনরায় তাহা একখণ্ড শুষ্ক ফ্লানেল বা আলোয়ান দ্বারা ভাল করিয়া আবৃত করিলেই এই পটি দেওয়া হয়। ইহা প্রথম প্রথম আহারের পর দুই ঘণ্টার জন্য রাখিয়া দেখে সমস্ত রাত্রির জন্য রাখা যাইতে পারে।

ইহা ব্যবহারে পরিপাক-যন্ত্রের মাংসপেশী সবলতা লাভ করে। এই জন্য যাহাদের কিছুই হজম হয় না, তাঁহারাও এই পটি দুই তিন দিন মাত্র ব্যবহার করিলে, তাঁহাদের হজম-শক্তি ফিরিয়া আসে। ইহা নিয়মিত ব্যবহারে পাচক-রসের স্রাব ও ক্ষুধা যথেষ্টরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই জন্য অজীর্ণের চিকিৎসায় এই পটি সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান।

এই সঙ্গে চিকিৎসার প্রথম সাত দিন, তলপেটের উপর সকালে অথবা সন্ধ্যায় ১৫ মিনিটের জন্য সেঁক দিলে বিশেষ উপকার হয়। ইহার পরও পেট গরম হইলে, মাঝে মাঝে তিন চার দিনের জন্য সেঁক দেওয়া চলিতে পারে।

অজীর্ণ অত্যন্ত প্রবল হইলে কয়েক দিন পর্য্যন্ত আহারের পর এক হইতে দুই ঘণ্টার জন্য পাকস্থলীর উপর গরম জলের থলি (hot water bag) রাখা বিশেষ ভাবে আবশ্যক। গরম জলের থলি না থাকিলে গরম জলের বোতল রাখা যাইতে পারে। ইহাতে রক্তবহা নাড়ীগুলি প্রসারিত হয় এবং প্রচুর পাচক-রস নির্গত হয় বলিয়া পরিপাক-ক্ষমতা যথেষ্টরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যদি পাকস্থলীর ঠিক বিপরীত দিকে মেরুদণ্ডের উপর একান্তর পটি (alternate compress) প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে স্নায়বিক প্রতিক্রিয়ায় আরও ভাল ফল লাভ হইয়া থাকে। পাঁচ মিনিট গরম সেঁক দিয়া তাহার অব্যবহিত পরই শীতল জলে ভিজান তোয়ালে ঐ স্থানে ৫ মিনিটের জন্য রাখিলে একান্তর পটি দেওয়া হয়। ইহা একই সময় অর্দ্ধ ঘণ্টার জন্য প্রয়োগ করা আবশ্যক।

আহারের এক ঘণ্টা পূর্ব্বে এক গ্লাস করিয়া জলপান করিলেও বিশেষ ফল লাভ হইয়া থাকে। আহারের অব্যবহিত পূর্ব্বেও এক গণ্ডুষ জল পান করা কর্ত্তব্য। আমাদের দেশে আহারের পূর্ব্বে আচমন করিবার বিধি আছে। এই বিধিটি অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর। যাহাদের পরিপাক-ক্রিয়া অত্যন্ত মন্থর তাঁহারা আহারের এক ঘণ্টা পরেও খুব অল্প করিয়া কয়েক চুমুক জল পান (sip) করিতে পারেন।

ইহার প্রত্যেকটি ব্যবস্থাই পরিপাক যন্ত্রের কার্য্যকারিতা ও পাচক-রসের নিঃসরণ যথেষ্টরূপ বৃদ্ধি করিবে। কিন্তু এইসঙ্গে রক্তটিকেও নির্দ্দোষ করা আবশ্যক। পাচক-রসের প্রচুর স্রাব হওয়াই যথেষ্ট নয়। পাচক-রস গুণেও (quality তে) যাহাতে উন্নতি লাভ করে, তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কিন্তু সমস্ত দেহ, বিশেষতঃ রক্ত নির্দ্দোষ না হইলে কখনও তাহা হইতে পারে না।

রোগীর দেহ দোষমুক্ত করিবার জন্য রোগীকে মধ্যাহ্নের

প্যাক (trunk pack) প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এক খানা ভিজা পাতলা চাদর দ্বারা রোগীর গলা হইতে তলপেটের শেষ সীমা পর্য্যন্ত বুক ও পিঠ ঘুরাইয়া পুনরায় একখানা কম্বল দ্বারা আবৃত করিলেই এই প্যাক দেওয়া হয়। এই প্যাকের ভিতর রোগীকে এক ঘণ্টার জন্য রাখিয়া দিলে রোগীর লোম-কূপগুলি খুলিয়া যায় এবং তাহার ভিতর দিয়া যথেষ্ট দূষিত পদার্থ বাহির হইয়া যায়।

প্রায়ই দেখা যায়, অজীর্ণ-রোগীর চর্ম্ম অত্যধিক নিষ্ক্রিয় থাকে এবং তাহারা প্রায়ই ঘামে না। চর্ম্মের এই অবস্থাই বিশেষ ভাবে রোগ বৃদ্ধি করিয়া থাকে। সাধারণ অবস্থায় প্রকৃতি চর্ম্মের পথে দৈনিক অর্দ্ধসের হইতে এক সের পর্য্যন্ত দূষিত পদার্থ বাহির করিয়া দেয়। যখন চর্ম্ম নিষ্ক্রিয় এবং তাহার লোমকূপগুলি বন্ধ থাকে, তখন প্রকৃতি ঐ-বিষ রেচের সাধারণ নরদমা দিয়া বাহির করিয়া দিতে বাধ্য হয়। এই জন্য লোমকূপ খুলিয়া দিয়া রোগের বোঝা ঘুরাইয়া দেওয়াই অজীর্ণ রোগের অন্যতম প্রধান চিকিৎসা।

চর্ম্মের স্বাস্থ্য ফিরাইয়া আনিতে মর্দ্দনও বিশেষ ভাবে সাহায্য করে। রোগীর সর্ব্বদেহ দিনে দুইবার মর্দ্দন করিয়া দিলে বিশেষ ফল লাভ হয়। স্নানের পূর্ব্বে তাহার সমস্ত শরীর অল্পই তৈল দ্বারা মর্দ্দন করা আবশ্যক। কিন্তু অজীর্ণ রোগীকে কখনও জোরে মর্দ্দন করিতে নাই। হাত খানা ধীরে ধীরে ঘুরাইয়া এমন ভাবে তাহাকে মর্দ্দন করিতে হয়, যেন তাহার আরাম বোধ হয়। হস্ত ও পদ মর্দ্দন করিবার সময় সর্ব্বদাই নিম্নদিক্ হইতে হৃৎপিণ্ডের দিকে মর্দ্দন করা আবশ্যক।

আতপ স্নানও অজীর্ণ রোগীর পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। ইহা রোগীর লোমকূপ খুলিয়া দিয়া রোগীর দেহকে যে কেবল রোগমুক্ত করে তাহাই নয়, ইহা অজীর্ণ রোগীর দুর্ব্বল দেহে নবজীবন দান করে। সূর্য্যই সমস্ত তেজ ও শক্তির উৎস। কিছুদিন নিয়মিত ভাবে সূর্য্যস্নান গ্রহণ করিলে রোগীর দেহ আশার সবল হইয়া উঠে। স্নানের পূর্ব্বেই সর্ব্বদা সূর্য্যকর গ্রহণ করিতে হয়। প্রথম খুব অল্প সময়ের জন্য আরম্ভ করিয়া অত্যন্ত ধীরে ধীরে কর-গ্রহণের সময় বৃদ্ধি করিতে হয়। ঐ-সময় মাথাটি সর্ব্বদাই শীতল জলে ভিজান তোয়ালে দ্বারা আবৃত রাখিয়া রাখা আবশ্যক।

এই সকল চিকিৎসার সঙ্গে রোগীর প্রচুর জল পান করা প্রয়োজন। কারণ প্রকৃতি মূত্রের সহিত যথেষ্ট বিষ বাহির করিয়া দেয়। কিন্তু আহারের সহিত কখনও জল পান করিতে নাই। তাহাতে দুর্ব্বল পাচক-রস আরও দুর্ব্বল হইয়া যায়। যখন পেট খালি থাকে তখনই জল পানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সময়। এই জন্য উষাপান অজীর্ণ রোগীর পক্ষে অত্যন্ত ফলপ্রদ। ইহাতে পাকস্থলীটি সম্পূর্ণরূপে ধৌত হইয়া যায়। ক্রমশঃ অভ্যাস করিয়া রোগীর শীতল জল পান করাই উচিত। কিন্তু যখন পুনঃ পুনঃ ভেদ হইতে থাকে, তখন খুব শীতল জল পান করা উচিত নয়। কারণ খুব শীতল জলে অন্ত্রের কৃমিগতি বৃদ্ধি পায়।

যেমন রোগীর দেহ রোগমুক্ত করা আবশ্যক, তেমনই রোগীর জীবনী-শক্তি বৃদ্ধি করা এবং দেহ গড়িয়া তোলাও প্রয়োজন। শীতল জলে অল্প সময়ের জন্য স্নানের মত জীবনী-শক্তির উদ্দীপক আর কিছুই নাই। অজীর্ণে প্রতি-দিন একবার অথবা দুইবার খুব অল্প সময়ের জন্য স্নান করা আবশ্যক। স্নানের পূর্ব্বে সূর্য্যকর প্রভৃতির দ্বারা শরীরটাকে গরম করিয়া লইয়া শরীর গরম থাকিতে থাকিতে স্নান করিলে বিশেষ উপকার হয়।

রোগী এক বেলা স্নান করিয়া অন্য বেলা হিপবাথও গ্রহণ করিতে পারেন, অথবা প্রতিদিন স্নানের পূর্ব্বে পাঁচ কি সাত মিনিটের জন্য হিপবাথ গ্রহণ করিতে পারেন। একটা জল-পূর্ণ গামলার ভিতর পা বাহিরে রাখিয়া বসিয়া অনবরত তলপেট ও কুঁচকি ঘর্ষণ করিলেই হিপবাথ নেওয়া হয়। ইহা যেমন কোষ্ঠ পরিষ্কার করিতে সাহায্য করে, তেমনই অন্ত্রের রসশোষণ-ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া অজীর্ণ রোগ আরোগ্য করে। কিন্তু সর্ব্বপ্রকার শীতল স্নান যখন অল্প সময়ের জন্য লওয়া হয়, তখনি তাহার প্রতিক্রিয়ার দেহে উদ্দীপনা আসে। সুদীর্ঘ সময়ের জন্য শীতল স্নান প্রয়োগে উদ্দীপনার পরিবর্ত্তে অবসাদ আসে এবং তাহা অজীর্ণ বৃদ্ধিই করিয়া থাকে।

সাধারণতঃ ব্যায়ামেই দেহ গড়িয়া উঠে। প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে রোগীর কিছু কিছু ব্যায়াম করা আবশ্যক। প্রথম অল্প সময়ের জন্য ব্যায়াম করিয়া ক্রমশঃ ব্যায়ামের সময় বৃদ্ধি করিতে হয়। পেটের ব্যায়ামগুলি তাহার পক্ষে বিশেষভাবে প্রয়োজন। রোগী প্রতিদিন খালি পেটে মেঝের উপর শুইয়া

হাত দুইটি মাথার পশ্চাত দিকে টান করিয়া রাখিবেন। তাহার পর পা দুইটি ধীরে ধীরে তুলিয়া দেহের সহিত সমকোণ অবস্থায় আনিয়া আবার ধীরে ধীরে নামাইয়া নিবেন। এইরূপ কয়েকবার করিয়া উর্দ্ধদেহের সহিত হাত দুইটিও ধীরে ধীরে তুলিয়া ক্রমশঃ মাথা নোয়াইয়া হাত দ্বারা পায়ের আঙ্গুল স্পর্শ করিবেন। পাকস্থলী ও অন্ত্র সবল করিবার পক্ষে কেবল এই দুইটি ব্যায়ামই যথেষ্ট।

তলপেট মর্দ্দনও এই রোগের পক্ষে অত্যন্ত হিতকর। আমেরিকার একজন ডাক্তার অজীর্ণ রোগীদিগকে গ্যারান্টি দিয়া আরোগ্য করিতেন। চিকিৎসা করিবার পূর্ব্বে তিনি রোগীদিগকে প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইতেন যে, চিকিৎসার পদ্ধতি তাঁহারা কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে পারিবেন না। তিনি তাঁহার পদ্ধতি দ্বারা বহু লোককে আরোগ্য করিলেন। তাহার পর তাঁহার নিজেরই যখন অন্তিমকাল উপস্থিত হইল, তখন সকলকে তিনি বলিয়া গেলেন, তাঁহার অদ্ভুত চিকিৎসা আর কিছুই নয়, কেবল প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় হাতখানা ঘাটির মত করিয়া তাহার দ্বারা তলপেট ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া আঘাত করাই অজীর্ণ আরোগ্যের প্রধান উপায়।

সময় সময় অজীর্ণ-রোগীর বিভিন্ন রোগ-লক্ষণ উৎপন্ন হয়। কোন কোন রোগীর পেট প্রায়ই ফাঁপিয়া থাকে। ঐ সকল রোগীর পেটে সকাল ও সন্ধ্যার দুইবার পনের মিনিটের জন্য গরম সেঁক দিয়া তাহার পর দুই ঘণ্টার জন্য ভিজা কোমরপটি বাঁধিয়া রাখিলে অনেক সময় অত্যন্ত অল্প সময়ে পেট ফাঁপা সারিয়া যায়। কিন্তু ঐরূপ অবস্থায় ভিজা কোমরপটি প্রত্যেক অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে হয়।

পুরাতন অজীর্ণ-রোগীদের চরম অবস্থায় পাকস্থলীটি অনেক সময় বড় (dilated) হইয়া যায় এবং অনেক সময় ঝুলিয়া পড়ে। ইহাতে ভুক্তদ্রব্য হজম হইতে অত্যন্ত বিলম্ব হয় এবং তাহা দীর্ঘ সময় পাকস্থলীতে থাকিয়া কুপিত (fermented) হইয়া উঠে। ভিজা কোমরপটি ব্যবহারে এই অবস্থায় যথেষ্ট উপকার হইয়া থাকে।

অজীর্ণ-রোগী বাড়ীর বাহির হইতে সাহস পায় না। কারণ কখন মলের বেগ আসিবে, তাহা সে জানে না। এই পটি ব্যবহারে ঐরূপ অস্বাভাবিক বেগ আপনা হইতে কমিয়া যায়।

অধিকাংশ অজীর্ণ রোগীরই কখন তরল ভেদ হয়, আবার কখন কোষ্ঠবদ্ধতা থাকে। কোষ্ঠবদ্ধতা দূর করিবার জন্য অজীর্ণ রোগীদের পক্ষে রেচক ঔষধ ব্যবহারের মত ক্ষতিকারক খুব অল্পই আছে। কিন্তু ভিজা কোমরপটি নিয়মিতভাবে গ্রহণ করিলে কোষ্ঠ পরিষ্কার সম্বন্ধে কখনও ভাবিতে হয় না।

অজীর্ণ-রোগীরা পেটে প্রায়ই বেদনা বোধ করিয়া থাকে। এই অবস্থায় রোগীর পেটের উপর পর্য্যায়ক্রমে গরম ও শীতল জল ঢালিলে বেদনা কমিয়া যায় এবং রোগীর অত্যন্ত উপকার হয়। গরম জল রোগী যতটা গরম সহ্য করিতে পারে ততটা (১২০° হইতে ১২৪°) হওয়া উচিত এবং ঠাণ্ডা জল অত্যন্ত শীতল (৫০° হইতে ৬০°) হওয়া প্রয়োজন। রোগীর পেটের উপর এক হইতে চার মিনিট পর্য্যন্ত গরম জল ঢালিয়া তাহার অব্যবহিত পরই ঐ স্থানে ৮ হইতে ১২ সেকেণ্ডের জন্য ঠাণ্ডা জল ঢালিতে হয়।

যখন অন্য কোন রোগের জন্য অজীর্ণ উৎপন্ন হয়, তখন অজীর্ণের সেই মূল কারণ দূর করাই প্রধান কর্ত্তব্য। যে-মূল রোগের জন্য অজীর্ণ উৎপন্ন হয়, তাহা দূর করিলে অজীর্ণ আপনা হইতে আরোগ্য লাভ করে।

৩

অজীর্ণ-রোগীদের পথ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা বিশেষভাবে প্রয়োজন। কিন্তু অজীর্ণ-রোগীদের জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট পথ্য বলিয়া দেওয়া শক্ত। কারণ এক একজন রোগীর এক একটি দ্রব্য সহ্য। তথাপি কতগুলি পথ্য অজীর্ণ-রোগীদের পক্ষে বিশেষ ভাবে প্রশস্ত।

সাধারণতঃ পুরাতন চাউলের অন্ন, কাঁচা পেঁপে, পটোল, ডুমুর, কাঁচকলা প্রভৃতি তরকারি, ক্ষুদ্র টাটকা-ধরা মৎস্য, অন্ধসিদ্ধ ডিম, ঘোল, ঘোলের সহিত মুড়ি, খই বা পাতলা চিড়া এবং শুষ্ক মিষ্ট ফল অজীর্ণ রোগীর পক্ষে হিতকর। সুপক্ক পেঁপে ও আনারস প্রভৃতি অজীর্ণ রোগীর পক্ষে অত্যন্ত ভাল পথ্য। রোগী অল্পান্ত মিষ্ট ফলের রসও প্রচুর পান করিতে পারে। কচি ডাবের জলও ফলের রসের মধ্যে গণ্য।

ভিজা কোমরপটি (wet girdle) প্রভৃতি কিছু দিন ব্যবহার করিলে, রোগী প্রায় সকল পথ্যই হজম

করিতে পারে। তথাপি রোগ আরোগ্যের পরও কয়েক মাস পর্য্যন্ত কতগুলি দ্রব্য রোগীর বর্জ্জন করাই কর্ত্তব্য। এই সকল দ্রব্যের মধ্যে নূতন চাউলের অন্ন, টাটকা পাউরুটি, তৈলাক্ত মৎস্য, চর্ব্বিযুক্ত মাংস, সংরক্ষিত খাদ্য, আলু, বিলাতী কুমড়া, কচুরি, সিঙ্গাড়া, ক্ষীর ও মিষ্টান্ন প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে।

খাদ্য নির্ব্বাচনের মত আহার্য্যগ্রহণের পদ্ধতির উপরও বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক।

সকল খাদ্যই খুব ভাল করিয়া চিবাইয়া গ্রহণ করা উচিত। না চিবাইয়া গিলিয়া খাইলে কোন অবস্থাতেই অজীর্ণ যায় না। খাদ্যের শ্বেতসারের সঙ্গে লালা মিশিয়া তাহা চিনিতে রূপান্তরিত হয় এবং তাহা হইলেই কেবল তাহা হজম হয়, অন্যথা হয় না। যত অধিক সময় মুখে খাদ্য রাখা যায়, তত কম সময় ইহা পাকস্থলীতে থাকে।

অজীর্ণ-রোগীরা অনেক সময় বার্লি প্রভৃতি তরল খাদ্য খাইয়া থাকে। কিন্তু উহা চিবাইয়া না খাইবার জন্য ভালরূপ হজম হয় না। এই জন্য যে-সকল পথ্য চিবাইয়া খাওয়া যায়, তাহাই অজীর্ণ-রোগীর পক্ষে উত্তম।

খাদ্য খুব গরম বা শীতল হওয়া উচিত নয়। খাদ্যের তাপ সর্ব্বদাই দেহের তাপের সমান হওয়া উচিত।

কখনও বেশী খাইতে নাই, বরং সর্ব্বদাই কিছু ক্ষুধা রাখিয়া খাওয়া আবশ্যক। অজীর্ণ-রোগীদের সকালে বিকালে জলখাবার না খাইয়া, কেবল দুই বেলা ভাত খাওয়াই উচিত। অনেক অজীর্ণ-রোগী কেবল দিন-রাত্রে দুইবার মাত্র আহার অভ্যাস করিয়াই দুরারোগ্য অজীর্ণ রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে। ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যক, কতকগুলি খাইলেই দেহ গড়িয়া উঠে না, দেহ গড়িয়া উঠে হজম করার উপর।

মধ্যে মধ্যে উপবাস, অত্যন্ত ফলপ্রদ। যখনই তরল ভেদ হইবে, তখনই ২৪ ঘণ্টা হইতে ৩৬ ঘণ্টা উপবাস দিয়া থাকা কর্ত্তব্য। তাহা ব্যতীত প্রতি একাদশী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে উপবাস করিলে রোগীর যথেষ্ট উপকার হইয়া থাকে।

আহারের অব্যবহিত পূর্ব্বে বা পরে কখনও কঠোর পরিশ্রম করিতে নাই। পরিশ্রমের পর দেহ সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইলেই তবে খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করা উচিত। আহারের পরেও আবার বিশ্রাম না করিয়াই অফিস প্রভৃতিতে ছুটিয়া যাইতে নাই। বরং নিয়মিত সময়ের অন্ততঃ ঘণ্টা পূর্ব্বে আহার করিয়া, কিছু সময় বিশ্রামের পর গৃহ হইতে বাহির হওয়া উচিত।

আহারের পরই নিদ্রা দেওয়া উচিত নয়, উহা কতকটা বাতির সলিতা কমাইয়া দেওয়ার মত। ঘুমান মাত্রই পরিপাক-ক্ষমতা অর্দ্ধেক কমিয়া যায়। সেই জন্য অজীর্ণ-রোগীদের দিন থাকিতে থাকিতে অথবা কেবল সন্ধ্যার খাইয়া তাহার অন্ততঃ চারি ঘণ্টা পর শয্যায় যাওয়া কর্ত্তব্য। রাত্রির খাদ্য সর্ব্বদাই অত্যন্ত হালকা হওয়া উচিত।

কিন্তু সকল রোগীর পক্ষেই নিদ্রা বিশেষ ভাবে আবশ্যক। অজীর্ণ-রোগীর পক্ষে সুনিদ্রা আরোগ্যলাভের অন্যতম পদ্ধতি।

জল-চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে এই সকল পদ্ধতি মানিয়া চলিলে অজীর্ণ আরোগ্য না হইয়া পারে না।

স্ত্রী ও পুরুষ

...মানুষের বিশেষ (অর্থাৎ শারীরিক, মানসিক ও বুদ্ধিগত) বল অথবা শক্তি বলিতে কি বুঝায়, তদ্বিষয়ক দর্শনে প্রবিষ্ট হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, মূলতঃ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, ও গন্ধ লইয়াই মানুষের অর্থাৎ পুরুষ ও স্ত্রীর প্রাকৃতিক বল অথবা সামর্থ্য। পুরুষ ও নারী এই উভয়েরই ঐ পাঁচটী বিষয়ক বল অথবা সামর্থ্য বিদ্যমান থাকে বটে, কিন্তু উহার কোন একটি বিষয়ে সমানভাবে থাকিলেও পুরুষ ও নারী এই উভয়ই ঠিক ঠিক সমান পরিমাণ সামর্থ্য লাভ করিতে সক্ষম হয় না।...

স্থিতি ও গতি

—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ

৯

নরেনবাবু গিয়া অখিলবাবুর সঙ্গে সন্ধ্যার পর একদিন দেখা করিলেন। অখিলবাবু নিজেও রবীনের এই আচরণে এবং রাস্তায় রাস্তায় প্রাচীর-গাত্রে প্রদর্শিত এই সব চিত্র দেখিয়া অতি বিরক্ত এবং কিছু উদ্বিগ্নও হইয়া উঠিয়াছিলেন। হয়ত মনে হইত, নরেন হয়ত আসিয়া এই সব কথা তুলিবে, হয়'ত বা বিবাহেই আপত্তি করিবে। কারণ, ধনি-গৃহের বহু বিলাস-ভোগে অভ্যস্ত, বয়ঃপ্রাপ্ত, সৌখীন যুবাদের কিছু উচ্ছৃঙ্খল স্বেচ্ছাচার উপেক্ষা করিতে পারিলেও শিষ্ট সমাজে সর্বদাই নিন্দনীয় প্রকাশ্য এইরূপ সব কেলেঙ্কারী সহজে কেহ উপেক্ষা করিতে পারে না, আরও, যে এইরূপ কোনও যুবাকে কন্যা দান করিতেছে। তবে সম্বন্ধটা ভাঙ্গিয়া যায়, ইহা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। কারণ এতগুলি টাকা সহ সমপদস্থ সম্ভ্রান্ত ঘরের একটি কন্যা সহজে সর্বদা পাওয়া যায় না, কন্যাটির প্রতি আবার আন্তরিক একটা স্নেহও তাঁহার জন্মিয়াছিল।

নরেনবাবুকে দেখিয়াই অখিলবাবুর মনে হইল, আর কিছু নয়, এই প্রসঙ্গেই কিছু একটা আলোচনা করিতে আসিয়াছে। মুখের ভাবও যেন বেশী কিছু গম্ভীর, মনে বেশ একটা ভারই রহিয়াছে। সম্বন্ধটা—নাঃ, এতদূর অগ্রসর হইয়া এখন একেবারে ভাঙ্গিয়া ফেলিতেও বোধ হয় চাহিবে না। তবে মনটা অতি বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে, অনুযোগের দুই চারিটা কথা বলিতে পারে বই কি? তা যে অভিপ্রায় লইয়াই আসিয়া থাক খুশী করিয়া ইহাকে তুলিতে হইবে, ভুলাইয়া আবার রাগেও আনিতে হইবে, সত্যই যদি ফিরিবার কোনও অভিপ্রায় তাহার থাকে।

"এই যে, এস এস ভায়া! কদ্দিন দেখিনি—তা খবর সব ভাল ত?"

এক গাল হাসি মুখ ভরিয়া ফুটিয়া উঠিল। বিপুলকায় কটিদেশে আঁটিতে আঁটিতে ত্রস্ত উঠিয়া অখিলবাবু ভাবী বৈবাহিককে আলিঙ্গন করিলেন।

বেশ একটু নরম হইয়াই নরেনবাবু উত্তর করিলেন, "নমস্কার! হাঁ, তা আছি শরীর গতিক মন্দ নয়। খবর—এই যাচ্ছে এক রকম। তা বসুন বসুন, ভাল আছেন ত আপনারা সব?"

"এই যেমন দেখছ। বুড়ো হ'য়ে উঠলাম, কতই আর ভাল থাকতে পারি বল? তবে দিন গণছি, কবে আমার মা'টি ঘরে এসে ছেলেটার ভার নেবেন—তত্ত্ব তল্লিস একটু ক'রে দুটো চারটে বছর আর বেঁচে থাকতে পারি তার ব্যবস্থা যা হয় করলেন। কি জান, গিন্নীও আর পেরে উঠছেন না—বয়স ত তাঁরও এই কম হ'ল না। একটি মায়ের তদ্বির তাঁরও বড্ড দরকার হ'য়ে পড়েছে। তা ব'স ব'স, এস!"

বলিতে বলিতে অতি আদরে হাতখানি ধরিয়া লইয়া সম্মুখের আসনে তাঁহাকে বসাইয়া দিয়া ঘুরিয়া গিয়া নিজের আসনে অখিল বাবু বসিলেন।

"ওরে কেষ্টা! যা যা ভেতরে যা, গিন্নীকে গিয়ে বল্, যাই এয়েছেন, যা করতে হয় করুন।"

হাত জোড় করিয়া নরেনবাবু কহিলেন, "না না, মাফ করবেন, করতে আর কিছু হবে না। এমনই আমার নমস্কার তাঁকে জানাবেন।"

হাসিয়া অখিলবাবু কহিলেন, "তা প্রতি-নমস্কার কিছু গ্রহণ করবে বই কি? মানটাও ত তাঁর রাখতে হয়।"

"মান? তা বলবেন পায়ের ধুলো তাঁর মাথায় নিচ্ছি—"

"হাতে তুলে দেওয়া মিষ্টিও কিছু মুখে দিতে হবে বই কি? আর এক কাপ চা সঙ্গে—"

"তা দেখুন, রাত হয়ে গেল, অসময়ে এখন।"

"বিলক্ষণ? ছেলেমানুষ তোমরা, এর আর সময় অসময় কি? আর চা ত হরদম ছেলেরা খাচ্ছে, সামনে এলেই হ'ল।"

একটু হাসিয়া নরেনবাবু কহিলেন, "আজ্ঞে সে বয়েস বহুদিন পেরিয়ে এসেছি।"

"তা আন্‌তে পার, তবে দেখে তোমাকে কেউ বলবে না, চল্লিশ পেরিয়েছ। রবীনও না কি তাঁর মাকে সেদিন বলছিল, ওঁর ত' মেয়ে। সে আর কত বড়ই হবে? হাঃ হাঃ হাঃ!"

"হাঃ হাঃ হাঃ" মনে মনে বেশ একটু খুসী হইয়াই নরেনবাবু কহিলেন, "বটে! তাও বলছিল না কি? তা বিন্দুও ত আমার প্রথম সন্তান নয়, তার ওপরে আরও দুটি রয়েছে"—

"সেটা বোধ হয় জান্‌ত না। গিন্নী যখন বুঝিয়ে বললেন, শুনে ত অবাক্! বললে, ওঁদের পরিবারটির স্বাস্থ্য তবে খুব ভাল হবে। ও আবার শুনেছি আজকালকার এই সব রোগা-প্যাংটা হাড্ডিসার লিকলিকে মেয়ে গুলোকে তেমন পছন্দ করে না। তা বিন্দু মা আমার ভাল আছেন ত?"

"আপনাদের আশীর্ব্বাদে আছে মন্দ নয়।"

"তা হলে এখন দিনকণ একটা দেখে মাকে ঘরে আনবার বন্দোবস্ত করে ফেলা যাক্, কি বল?"

"হুঁ—তাই ত এসেছিলাম—এখন—"

বলিতে বলিতে থামিয়া গেলেন। কেমন-একটু ইতস্ততঃ ভাব লক্ষ্য করিয়া অখিল বাবু কহিলেন, "হাঁ, এখন পাকা দেখা সব হয়ে গেছে, মিছে আর দেরী করাটা কিছু নয়। তারপর বলব আর কি ছাই মাথামুণ্ডু, ভানই ত' সব, এই একটা কেলেঙ্কারী হতভাগা করে ফেলেছে, লজ্জায়, বলতে কি দাদা, মুখ দেখাতে কাউকে পারছি নি—"

"হুঁ তাই ত ভাবছিলাম, কি করে যে এটা ঘটল, আপনি রয়েছেন মাথার ওপর—"

"কি করব দাদা? বড়-সড় এখন হয়ে উঠেছে, পড়া শুনাও এদিক্‌কার যা করবার সব শেষ করে ফেলেছে, স্বাধীনভাবেই এখন চলে ফেরে, বুঝা আমি কিছুতে দিই না। কেউ-ই দেয় না; আর আজ-কালকার সব ছেলে,—দিলেও কেউ আঁটকে কাউকে কোনও নিয়ম শাসনে রাখতে পারে না। নিজের ইচ্ছেমত বেড়ায়, বন্ধুবান্ধব কে কোথায় আছে, কাদের সঙ্গে মেলে মেশে, অত খোঁজ-খবরও আমি কিছু রাখিনি। কেই বা রাখতে পারে এত বল? এই ত বয় তোমার ধুলি—বয়েস আর কতই হয়েছে পড়া-শুনাও এখনও শেষ করে বেরোয় নি। সে কি করে না করে, কাদের সঙ্গে মেলে মেশে চলে ফেরে, খোঁজ-খবর তার কতটা রাখতে পার?"

"না, সে আর সত্যি কতটুকুই বা রাখতে পারি? তবে মোটের ওপর চাল-চলনে বেয়াড়া ঢং বড় কিছু দেখতে পাই না—"

"হাঁ, সেই দিকে একটা দৃষ্টি বাপেদের রাখতে হয়। বাপেরা নেহাৎ না পারলেও মায়েদের রাখতে হয়; রাখেও তারা। আর তেমন কিছু দেখলে বাপেদের সেটা জানাতে হয়, জানিয়েও থাকে সবাই। তা সে যাবার বেয়াড়া ঢং কিছু ওর আমিও লক্ষ্য করি নি, তোমার বানীও কখনও কিছু বলেন নি এসে।"

"হুঁ"—

"পড়াশুনো শেষ হয়েছে, একটু বেশী স্বাধীন ভাবেই এখন চলে ফেরে। আর সেটায় ছেড়েও দিতে হয়। তা কোথায় কাদের সঙ্গে এই নাটকটায় গিয়ে জুটেছে জানতেও পারি নি কিছু। জানতে পারলাম বিজ্ঞাপনটা যখন বেরুল। তখন আর কি করি বল? আপত্তি একটু জানাতেই হেসে উড়িয়ে দিলে বললে, 'এ সব ত আজকাল রেওয়াজ হয়ে উঠেছে, সবাই করছে।' আর সত্যি, বলবই বা কি? ঐ তোমাদের রবি ঠাকুর, দেশের মাথা, পৃথিবীশুদ্ধ লোক যাঁকে মাথায় করে নাচছে, তিনি নিজে কি করছেন! তাঁর ঐ শান্তি-নিকেতনের একদল ছোকরা-ছুকরী নিয়ে নাচ-গানের নাটক করে পয়সা হোগগায় করে বেড়াচ্ছেন। আর সে সব নাটকই বা কি! কাঁচা বয়সের ছেলেমেয়েদের মিলে মিশে করবার মত কিছু কি? সবাই দেখছে, মজা লুটছে আর বাহাবা দিচ্ছে! দেখাদেখি এখানে-ওখানে আরও কেউ কেউ সুরু করে দিয়েছে! কাকে কি বলা যায়? এও তবু ভাল বলি!—এই যে ছেলেমেয়েগুলো এক সঙ্গে কলেজে পড়ছে, নাটক-কাটকও কলেজের ছাত্তরয়া করে বেশী; আর দেরী নেই, কবে দেখবে ছেলেমেয়েরা এক সঙ্গেই ষ্টেজে নেমেছে, হাত ধরা-ধরি গলা ধরা-ধরি করে নাচগান করছে। নাচটা ত চলতি হয়েই উঠেছে। ছেলেদের যে 'সোসাল' (social) টোসাল হয়, তাতেও গিয়ে মেয়েরা নাচে, নইলে তাদের আসর জমে না। নাম একটা উঠেছে 'ওয়েষ্টার্ণ ড্যান্স' যেন ওই-

মন্তর আর গন্ধরাজের ছিটে! কথাটি আর বলবার যো নাই। বলবে যে সেই হবে একঘরে, ভাতমারা!"

"হুঁ—দিন কাল যা পড়েছে, কেউ কিছু আর ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। কি যে হবে দেশের গতি?"

"ফিরবে ফিরবে, ফিরতেই হবে। যখন বুঝবে কি বিষ চার দিকে ছড়াচ্ছে, ঘরে ঘরে এসে ঢুকছে। তখন সামাল সামাল ডাক পড়ে যাবে—"

"হবে সামলাতে তখন পথ পেলে হয়। তা সে যা হক, নাটকটা যা করেছিল করেছিল, ঐ যে সিনেমার ছবি তুলে নিয়েছে আর আর সব পোষ্টার (poster) রাস্তায় রাস্তায় বেরিয়েছে—"

"কেলেঙ্কারীটা আসলে হয়েছে ঐখানে। শুনেছি নাটকটা না কি ওরা ভালই করেছিল। কোন্ সিনেমাওয়ালারা দেখে মুগ্ধ হয়ে যায়, পয়সা লুটবারও খানা একটা ফন্দী দেখে অমনি গিয়ে অনেক টাকা ক'বলে ছবি তুলে নিয়েছে। ওরাও উঠেছিল মেতে, ভালমন্দ আর ভাববার ফুরসুৎ কারও হয় নি।"

"হুঁ—তা হ'লে এখন কি করা যায়? কোনও প্রতিকার এর—"

"প্রতিকার আর কি করবে? কিসেরই বা করবে। সিনেমার ছবি যা উঠবার উঠে গিয়েছে, পোষ্টারও যা বেরোবার বেরিয়েছে, আরও বেরুবে, কেউ তা বন্ধ করতে পারবে না। তবে দেখতে হবে, আবার নতুন একটা কেলেঙ্কারী গিয়ে ওরা না করে। তা সেটার ভয় কিছু নেই। যাহার হক, ভদ্রলোক ত ওরা। মেয়েগুলোও ভদ্রঘরের মেয়ে। লজ্জা একটা যেমন আমরা, তেমনি ওরাও পেয়েছে। আর খবরও আমি নিয়েছিলাম, ঐ যে মোকার্জ্জির মেয়েটা, মেয়েটা না কি ভাল ধাতেরই মেয়ে। তবে চালচলন সাহেবী, হুজুগে মেতে এই নাটকটায় এসে পড়েছিল—"

"হুঁ! বিন্দুর সঙ্গে একত্র পড়ত, খুব ভাবও তদের ছিল। সেও না কি বলেছে, শুনছিলাম মেয়েটি খুব ভাল।"

"নিশ্চয়ই ভাল! না হলে আমার মা বিন্দুর সঙ্গে এমন ভাব একটা হতেই পারত না। সুতরাং আসল ভয় সেখানে, ভদ্রের কোনও কারণই সেখানে নেই। তবে কি জান দাদা—তোমাতে আমাতে কথা হচ্ছে, খোলাখুলিই সব বলতে পারি, এই যে দুষ্কৃত-সমুদ্ভবা হয়ে নাটকটায় ওতনে নেমেছে, বিহার্সাল-টালও দিয়েছে, তাতে করে দুদিনের মত একটু চোকের নেশা লাগতে পারে। তবে এমন serious কিছু হয় নি। হলে এই বিয়েতেই তাকে রাজি করা যেত না। এখন এই বাঁধনটাই তাড়াতাড়ি করে বেঁধে ফেলতে পারলেই ও নেশা যদি কিছু লেগেই থাকে, দুদিনেই কেটে যাবে।"

"হু—! সেটা সম্ভব বটে। তবে কি না সিনেমাগুলোর রোজ 'শো' (show) হচ্ছে, ঐ পোষ্টারগুলো বেরোচ্ছে।"

"হুঁ—সেগুলো ত' বন্ধ করবার উপায় কিছু নেই। আর তাতে করে নিজের মনেও তোমার একটু পুঁৎখুঁতি হতে পারে। আর আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধবরা এসেও দু'কথা বলতে পারেন, হয়ত বলছেনও, যাতে তোমার—"

"না না, তেমন কিছু নয়। তবে কি না, বুঝতেই পারছেন, বাপ আমি মেয়েটি দিচ্ছি—"

হাসিয়া অখিল বাবু কহিলেন, "সে বেশ বুঝতে পারছি। কেলেঙ্কারীটা যা ক'রেছে, তাতে মেয়ে ওর হাতে দিতে মনে একটা দ্বিধা সবারই হবে। তবে সে তুমি বোঝ ভায়া, সময় ত আছে, ফিরতে যদি এখনও চাও—"

বহুবিধ ফল ও মিষ্ট সহ শ্বেত-পাথরের বড় একখানি রেকাব, হাত ধুইবার ও পানীয় জল ইত্যাদি আনিয়া দুইটি ভৃত্য তখন টেবিলে নরেন বাবুর সম্মুখে রাখিল। একজন গিয়া আবার একখানি ট্রের উপরে করিয়া চা, চিনি, দুধও আনিল। আর একজন নূতন একটি গড়গড়ায় জল ফিরাইয়া এক কলিকা তামাকও লইয়া আসিল।

একটু অপ্রস্তুত হইয়াই নরেন বাবু বলিয়া উঠিলেন, "না না, সে কি আর এখন হ'তে পারে? বাগ্‌দান হ'য়ে গেছে।"

"বিয়ের আসরেও কত বিয়ে আজকাল ভেঙ্গে যায়। গায়-হলুদ, অধিবাসের পরেও অন্য এক পাত্রে মেয়ের আবার বিয়ে হয়। তা সেটা তুমি বোঝ। আমার দিক্ থেকে তোমাকে মুক্তি দিতে সর্বই চিত্তে আমি প্রস্তুত। এখন তুমি কি ক'রবে ঠিক ক'রে ফেল। তা সে যাই কর, আপাততঃ তোমার বাসনের—আমে দুধে—এই রবীনের গর্ভধারিণীর—সম্মানটা একটু রাখ। ওটায় ত বাধা কিছু হ'তে পারে না। হাঃ হাঃ হাঃ!"

"না না, ওসব কি ব'লছেন, তিনি বানই বটেন।

বাগ্‌মান ক'রেছি মেয়েকে, ধর্ম্মে বাঁধা পড়েছি, মুক্তির কথা আর উঠতেই পারে না। দিতে আপনি চাইছেন, আপনার উদারতা! নমস্কার জানাচ্ছি।"

বলিয়া হাত দুইয়া একটু জল মুখে দিলেন। দিতে দিতে কহিলেন, "ওসব মুক্তি-টুক্তির কথা আর উঠতেই কিছু পারে না। তবে এসেছিলাম আপনার কাছে— কেলেঙ্কারীটা যেমন আমার, তেমনি আপনারও ত' কম হয় নি— ভাবলাম, একবার আসি আপনার কাছে, আলাপ-সালাপ একটা করি, কি উপদেশ আপনি দেন, প্রতিকার এখন কি হ'তে পারে—"

"প্রতিকার এক হাতে-চাত বেঁধে ফেলা! ঐ মোকাজ্জির হয় ত মতলব একটা এখন হ'তে পারে ওকে পাকড়াবে ঐ মেয়েটার টোপ ফেলে'।—ভালঘরের ভাল ছেলে কাউকে বাগে পেলে অনেকেই আজকাল সেটা ক'রতে চায়। তবে বিয়েটা এদিকে হ'য়ে গেলে যখন বুঝবে সে আশা কিছু আর নেই, ঐ টোপই সে তখন সামলে নেবে। পাস্তাও আর ওখানে দিয়ে হতভাগা পাবে না।"

"হাঁ। সেইটেই এখন ক'রে ফেলতে হচ্ছে। তবে কি না ভাবছি, এই আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবরা পাঁচ কথা এসে বলবেন।"

"তা এক কাজ বরং করা যাবে। বিয়েতে খুব একটা জানাজানি ক'রে ঘটা-পটা কিছু নাই ক'রলাম আমরা। রবীনও না কি তার মাকে ব'লেছে, ঘটা-পটা কিছু ক'রতে পারবে না, চুপচাপ কাজটা যখন হয় সেরে ফেলো। সেও হয় ত ভাবছে, এত বড় এই একটা কেলেঙ্কারী হ'য়ে গেল, এখন—"

"সম্ভব বটে। তাই তাহ'লে করা যাবে। একটা দিন টিন তাহ'লে দেখুন।"

"আচ্ছা। পণ্ডিত মশাইকে কাল খবর দেব। কোষ্ঠি ঠিকুজি নিলিয়ে দিন একটা তিনি দেখুন, তার পর তোমাকে জানাব।"

কিছু জলযোগের পর এক পেয়ালা চা-পান ও তামাকু সেবন করিয়া রাত্রি প্রায় ন'টায় নরেন্দ্র বাবু বিদায় গ্রহণ করিলেন।

১০

রবীন আসে যায়, সন্ধ্যের পর ডিনারও ঘন ঘন আসিয়া যায়। তার পর দুই জনে গান-বাজনায় ঘণ্টা দুই করিয়া কাটায়। তাঁহাকেই এক একদিন ঘড়ীর দিকে চাহিয়া মনে করাইয়া দিতে হয়, রাত্রি অনেক হইয়াছে। গভীর প্রেমে ওরা দুজনে সত্যই ডুবে পড়িয়াছে! মোকাজ্জি সাহেব যার পর নাই আনন্দিত হইলেন। কেনই বা না হইবেন? সব বিষয়েই রবীন্ অতি বাঞ্ছিত পাত্র। ঐশ্বর্য্যবান্ পিতার একমাত্র পুত্র, সুশিক্ষিত, উদারমতি, অগ্রসরগতি, দেখিতে অতি সুপুরুষ, আবার বিলাতও যাইতেছে! আরও কয়েক বৎসর আগে গেলেই ভাল হইত। কিরিয়া এত দিনে যোগ্য পদে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতেই পারিত। কেন যে এখানকার বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বাজে এই পরীক্ষাগুলার জন্য এতটা সময় নষ্ট করিয়াছে, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন না। খরচ চালাইতে যাহারা পারে, বালোই একেবারে, এখানকার স্কুল-শিক্ষার ছাপ একটা পড়িবার আগেই, ছেলেদের বিলাত পাঠান তাহাদের উচিত। বড় কাজের জন্য বড় একটা বিদ্যা শিক্ষার প্রয়োজনে কেবল নয়, মানুষের মত মানুষ হইবার প্রয়োজনেও বিলাত যাইতে হয়। সেখানকার উন্নত ভাবের আবহাওয়ার মধ্যে পরিপুষ্ট হইবে, উন্নত উদার আদর্শে চরিত্র গড়িয়া উঠিবে, প্রগতিশীল পরিমার্জ্জিত আদবকায়দায় দুরস্ত হইবে, তবেই না ছেলেরা ঠিক মানুষ হইয়া উঠিতে পারে। কেবল উচ্চতর একটা বিদ্যাশিক্ষা অপেক্ষা এটা অনেক বড় কথা। অর্থোপার্জ্জন তা বিলাতী শিক্ষা ব্যতীতও যথেষ্ট অনেকে করিয়া থাকে। হাইকোর্টের এক একজন এডভোকেট, এটর্ণী, ব্যারিষ্টারদের অপেক্ষা কম উপার্জ্জন করেন না। আর ঐ যে সব ভাটিয়া মাড়োয়ারী—"ক"অক্ষর গোমাংস,' হইয়াও টাকার এক একটা কুমীর এক একজন। সুতরাং কেবল অর্থকরী বিদ্যার জন্য নয়, প্রগতিশীল এই যুগে প্রগতির আবহাওয়ায় থাকিয়া প্রগতির সব ভাবধারা গ্রহণে যুগযোগ্য মানুষ হইয়া উঠিতে পারে,উঠিয়া যুগের গতির সঙ্গে সমান তালে চলিতে পারে, তাহার জন্যই বালোই ছেলেদের ঐ সব প্রগামী দেশে পাঠাইতে হয়। কেনই যে লোকে এটা বোঝে না? কেন যে মরা অতীতের শুষ্ক খোলসে জড়ান পুরাতন পচা পাঁকে পণ্ডিত আর তাতেই

অচল অড়তার দিক, এই দেশের নিশ্চল আবহাওয়ার নির্জীব মাটিতে ছেলেগুলোকে মাটির পুতুলের মতই করিয়া তোলে! তবে অন্যকে কি বলিবেন? তিনি নিজেই যে এই ভুল করিয়াছেন। পুত্র দীবেশকে মাত্র দুই বৎসর আগে বিলাত পাঠাইয়াছেন। আহা, আরও অন্ততঃ সাত আট বৎসর আগেও যদি পাঠাইতে পারিতেন! কথাটা যে মনে হয় নাই, তা নয়। তবে—তবে—অতিশয় ব্যয়সাপেক্ষ কি না—তাই। হায়, এই দেশটাই যদি ঠিক বিলাত হইত! তবে ত আর এ সব কিছু ভাবিতে হইত না। কেন হইল না? কি করিয়া হইবে? দেশ ত মানুষ লইয়া। এ দেশের যে সব মানুষ—যেমন দেহে তেমন মনেও ঘন অন্ধকার কালো! আর ওরা সাদা, যেমন দেহে তেমন মনে-প্রাণেও ধবধবে আলোয় সাদা! কেবল তাঁরা কটি লোক দেহে মনে যেটুকু সাদা হইয়াছেন, কেবল তাহাতেই ত সারা দেশটাকে 'সাদাইয়া' তুলিতে পারেন না!

দূর হউক ছাই! এ সব চিন্তা এখন বৃথা। যা হয় নাই, তা হয় নাই, হইবার নয়, হইবেও না। এদেশে যে বিলাত নয়, হইবেও না, দীবেশকে যে বালো বিলাত পাঠাইতে পারেন নাই, রবীন যে বালো বিলাত যাইতে পারে নাই, আর প্রগতিশীল পাশ্চাত্য সভ্যতার আবহাওয়ার পুষ্ট,হুবহু তাঁহারই ছাঁচে গড়া,—যেমনটি তিনি চান, বিপুল পিতৃ-সম্পদের উত্তরাধিকারী হইলেও,নিজে সুপ্রতিষ্ঠিত ও স্বাধীন ঠিক তেমন মানুষটি হয় নাই, এ সব সত্য ত' উল্টাইয়া দিতে পারেন না। দেশ যেমন আছে আছে, আর সেই দেশের ছেলে রবীনও যেমন আছে তেমনই তাহাকে গ্রহণ করিয়া লইতে হইবে। আর তাই বা এমন মন্দ কি?

বিলাত ত যাইবে। আর ইতিমধ্যে এই দেশে থাকিয়াই উন্নত ভাবে ও আদব-কায়দায় যেরূপ অগ্রসর হইয়াছে, বয় তার স্বভাবতঃই যেরূপ উদার, তাহাতে বৎসর-দুই কাল বিলাত-বাসই তাহার পক্ষে যথেষ্ট হইবে। তা হইবে। কিন্তু কথা হইতেছে, তার আগে বিবাহ যে হইতে পারে না। না, সেটা কি কোন প্রকারে সম্ভব নহে? বিবাহের পর মীনাকে হইতে হইবে একদম তার নিজ গৃহের স্বাধীনা গৃহিণী। অন্য রকম কোনও অবস্থা কি ব্যবস্থা কল্পনাই করা যায় না। বিলাত হইতে ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করা—না, সেটাই বা এখন কেমন হয়? প্রেমে যে ওরা দুটিতে একেবারে হাবুডুবু খাইতেছে? এই প্লেটায় আবার ব্যাপারটা দ্রুত অতি অগ্রসর করিয়াও দিয়াছে। এখন এই অবস্থায় দীর্ঘ আর দুটি বৎসর অপেক্ষা করা—আবার কোথায় সেই দূরদেশে রবীন আর কোথায় এই কলিকাতায় মীনা—সাপ্তাহিক মেলে একখানা করিয়া চিঠি মাত্র—সেটা উহাদের পক্ষে যার-পর-নাই দুঃসহ হইয়া উঠিবে। তার পর কে জানে, দূরের তরল মতি, বিলাত যাইতেছে, কত প্রলোভন সেখানে! আবার বিবাহযোগ্যা সব কন্যা লইয়াও পরম ধনী ক্লনেকে আজকাল বিলাত যান—ছেলে পাকড়াইবার খাসা একটা ফন্দী বটে! যদি সেখে হাতছাড়া হইয়াই যায়! তাহা হইলে এরূপ আর একটি পাত্র মীনার পক্ষে দুর্লভ হইবে। মনটা গোড়াতে একটু ভাঙ্গা-ভাঙ্গা হউক, ভালও হয়ত আর কাউকে তখন বাসিতে পারে। First loveই (প্রথম প্রেমই) মেয়েদের পক্ষেও সর্বদা last love (শেষ প্রেম) হয় না। প্রেমটা যতই আন্তরিক সত্যকার একটা টান বলিয়া মনে হউক, আশা না থাকিলে সত্যই চিরস্থায়ী হইয়া কাহারও মনে থাকে না, নূতন আশার সম্ভাবনা থাকিলে নূতন পাত্রের প্রতিও প্রেমের টান খিঁচা পড়িতে পারে। প্রেমটা হয়ত হইতে পারে, কিন্তু সেই প্রেমের পাত্রকে লাভ করাটা সহজ কি সম্ভব নাও হইতে পারে। রূপে গুণে দুইই সোভনীয়া হউক, সকলেই প্রচুর যৌতুকের আশা করে। 'রোমান্স'টা বাইরের কষ্টি-নষ্টিতে যতই দেখা যায়, কাজের বেলায় তত দেখা যায় না। যুবকরাও এখন বেশী হিসাবী হইয়া উঠিয়াছে; কেবল প্রেম, কেবল রোমান্স, কারোর বাড়িবে বাস্তব জীবনে বিনামূল্যে বড় বিকায় না। অনেকের সঙ্গেই ইঙ্গিতে কথা পাড়িয়া দেখিয়াছেন, লম্বা 'চেক' ব্যতীত তাঁহাদের এই সমাজে যোগ্য পাত্র কেহই মীনাকে গ্রহণ করিবে না, flirtation (উপর উপর প্রেমের, কষ্টি-নষ্টি) তাহার রূপে ও সঙ্গীত-নৃত্যাদিতে আকৃষ্ট হইয়া সেই যত আসিয়া জুটুক। তাহার জামাতৃত্ব স্বীকারের যে মূল্য ইহারা প্রত্যাশা করে তাহা তিনি দিতে পারেন না। অর্থোপার্জন কম করেন না, কিন্তু ব্যয় অত্যধিক। সঞ্চয় কিছুই নাই, বরং ধারই সর্বদা করিতে হয়। না করিয়াও যে উপায় নাই, কেবল উপার্জনের টাকায় যে চলে না ছাই! কোন্ ব্যয়টা

কমাইতে পারেন? এই বাড়ী ছাড়িয়া শ্যামবাজার বাগ-বাজার গড়পার চোরবাগানের এঁদো গলিতে পুরাণো, পচা একটা বাড়ী ভাড়া করিয়া তিনি কিছু আর এখন গিয়া থাকিতে পারেন না। সেখানে একটা ঠিকা-ঝি আর উড়ে চাকর-বামুনে কি তাহার সংসার চলে? মোটর বিক্রয় করিয়া ট্রামে-বাসে কি কখনও ট্যাক্সীতে কি তিনি মীনাকে লইয়া বেড়াইতে পারেন? মধ্যে মধ্যে আবার সিমলা, দার্জ্জিলিং, উটি, ওয়াল্টেয়ার, দেরাদুন, মুসৌরী, বোম্বে প্রভৃতি স্থানে বেড়াইতে যান। তা না গিয়া কি বার মাস ত্রিশ দিন কলিকাতার এই গরমে বদ্ধ হাওয়ায় মীনাকে লইয়া তিনি থাকিতে পারেন? এই ভ্রমণও তাহাকে থার্ড ক্লাসের সেলুনে করিতে হয়, সেখানে ঘান পদোপযোগী আসনে তেমনই ভাবে থাকিতে হয়। কাজেই আয়ে না কুলাইলে দেনা বই আর গতি কি? আবার ধীরেশের লম্বা একটা বিলাত-খরচ আছে। সেও ত গরীব ছেলেদের মত যেমন তেমন ভাবে থাকিতে পারে না। বাহিরের লোকে যত বড়ই ধনী বলিয়া তাঁহাকে মনে করুক, বন্ধু-সমাজে তাঁহার ভিতরের অবস্থা কাহারও অবিদিত নাই। আজ অকস্মাৎ তাঁহার হার্ট বন্ধ একটা কিছু হইলে মীনার জন্য কিছুই থাকিবে না। স্বামীর সম্পত্তি কিছুই নাই। অস্থাবর সম্পত্তি সব বেচিয়া আর বীমার টাকা আদায় করিয়া দেনা শুধিয়া যদি কিছু বাঁচে, বাকী দুই একটা বৎসর ধীরেশের বিলাতের খরচটাও হয়ত চলিবে না। আশানুরূপ কোনও পাত্র যে অমন মীনাকেও বিবাহ করিতে অগ্রসর হইতেছে না, তাহার কারণও ত এই। তিনি ত' কন্যা-দায়গ্রস্ত পিতার ন্যায় কন্যা-দানের প্রার্থনা লইয়া কাহারও দ্বারস্থ হইতে পারেন না। পাত্রপক্ষকে আসিয়া বিবাহের প্রস্তাব করিতে হইবে। তখন সম্মতি (মনোমত হইলে) দিতে পারেন। যে সমাজে, যে আদর্শে তিনি জীবন যাপন করিতেছেন, তাহার কারবাই হইল এই। ভাল যৌতুকের আশা না থাকিলে, বাছিয়া পাত্র কেহ আসে না সত্য, তবে সে অবস্থায় কৌশলে পাত্র পাকড়াইতে হয়। পাকা গৃহিণীরাই এটা পারেন, জাল কোথায় কি ভাবে ফেলিতে হয় সব জানেন। কিন্তু গৃহিণী তাঁহার নাই। গৃহিণীর অভাবে কন্যাদের নিজেদেরই ফাঁক খুঁজিয়া পাকা হাতে জাল ফেলিতে হয়। মীনা সে জাতীয় মেয়ে নয়। তবে রবীন আসিয়া না কি আপনিই ধরা দিল, ঐ নাটকটাও তখন হইতেছিল, তাই এতবড় একটা সুবিধা হইয়া গেল। ঐ যা একটা ত্রুটি রহিয়াছে, বিলাত হইতে ফিরিয়া যোগ্য কোনও পদে এখনও বসে নাই। নহিলে বিবাহের প্রস্তাবটা—তা বরং কোনও কৌশলে এখনই রবীনকে দিয়া করান যাইতে পারিত। কিন্তু এটা ত যেমন তেমন একটা ত্রুটি নয়। সবে এই বিলাত যাইতেছে। অন্ততঃ দুটি বৎসরের আগে ফিরিতে কি পারিবে? ইতিমধ্যে কি করা যায়? রবীন এই সমাজে বিবাহ করিতে প্রস্তুত, ইহার একটু আভাস পাইলেও অনেকে আসিয়া ঝুঁকিয়া পড়িবে। সঙ্গীতনৃত্যকলায় নিপুণা সুন্দরী কন্যা আরও আছে, তার সঙ্গে আবার প্রচুর যৌতুকও জুটিবে। কুশলীরাও অনেকে অনেক রকম দিবে। তাঁহার নিকটে ঐ এক কন্যা ব্যতীত আর যে কিছু পাইবে না, ইহা রবীন এখনও জানে না। কিন্তু স্বার্থান্বেষী আর পাঁচ জনে জাগাইবার মতলবে তাহাকে জানাইবে। এমন একটা ছেলে পাকড়াইতে পারিলে কে ছাড়িবে? অনেক টোপ আসিয়া অনেকে ফেলিবে, কত চালচক্র চলিবে। মনোমত কন্যা এবং সঙ্গে সঙ্গে বহু ধনের লোভ আসিয়া জুটিলে রবীন কি তাহা সামলাইতে পারিবে? কোনও রবীনই পারে না। প্রেমে পড়িয়াছে? এমন প্রেমে যুবক-যুবতী মাত্রই পড়িয়া থাকে। চোকে ধরিয়াছে, দুজনকেই দুজনের ভাল লাগিয়াছে, আরও এই নাটকটা করিল, রঙিন একটা নেশায় দুই জনে বিভোর হইয়া আছে। তেমন জোর টান অন্য দিকে পড়িলে, ইহা অপেক্ষাও মধুর লোভ অন্য দিকে জুটিলে, এ নেশা বেশ কাটিয়া যাইবে। বহু এমন ঘটনা ঘটিয়া থাকে। তবে এই নেশার ঘোরটা থাকিতে থাকিতেই যদি বাঁধন একটা পড়িয়া যায়, তবে আর ভাবনা কিছু থাকে না। তার পর সে খেলার খেলীলের মত কোথাও কখনও একটু মিলিলে, এদিক্ ওদিক্ একটু কিছু হইলে, এমন আসে যায় না কিছু। এমন একটু সাময়িক ত্রুটিবিচ্যুতি দিলদরিয়া সৌখীন ঘুণা করে না। ও সব ধরিতেও নাই, দেখিতেও নাই। যে সব মেয়েরা এই সব খুঁটিনাটি কেবলই দেখে, আর তাহা লইয়া খোঁচাখুঁচি করে, তাহারা অতি অবোধ। বুদ্ধিমতী নারী এ সব দিকে একেবারেই চোখ বুজিয়া থাকে, স্বামীকে যতখানি বশলে পাইয়াছে তাহাতেই আপনাকে ভাগ্যবতী

বলিয়া মনে করে। সে থাক্, ও সব হইল পরের কথা। এখন রবীনকে ধরিয়া রাখা যায় কিরূপে? বিলাত যাত্রা করিবার পূর্বেই বিবাহ—না, সেটা বড় একটা বিশ্রী ব্যাপার হয়। মীনার অমর্য্যাদা তাহাতে হইবে। কেবল অধ্যয়নশীল ছাত্রের সঙ্গে বিবাহ আর বিবাহের পরে কন্যার পিতৃগৃহে বাস—না, এটা বড়ই একটা লজ্জার কথা হইবে বটে। মীনা যে তার শ্বশুরগৃহে গিয়া শ্বশুর অধীনা বধূ হইয়া থাকিবে, ইহা ত কল্পনাই করা যাইতে পারে না। আর সেই শ্বশুর, সেকেলে সেই অখিলবাবু, তিনি সহজে এই বিবাহ অনুমোদন করিয়া মীনাকে বধূ রূপে গ্রহণই করিবেন কি না সন্দেহ। তবে বিবাহের কথাটা পাকাপাকি এমন হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু তার পর দীর্ঘ এই প্রবাস। প্রবাসের সুদূর ব্যবধানে শেষে কি হইবে কে জানে? বিবাহ সহজে না ভাঙ্গিলেও বিবাহের সম্বন্ধ অনেক ভাঙ্গিয়া থাকে। বড় একটা আশঙ্কার মধ্যেই থাকিতে হয় বটে। তার পর যদি ইতি মধ্যে তাঁহার মৃত্যু হয়, মীনা ত তখন একেবারে নিঃস্ব ও নিঃসহায় পড়িবে। নাঃ, বড়ই একটা সঙ্কট বটে! সমাধানেরও কোনও পথ দেখা যাইতেছে না। তা রবীন্ একটা প্রস্তাবও করে না ছাই! তাহা হইলেও ত যা হয় একটা কিছু রফা করিবার চেষ্টা দেখা যাইত। বোধ হয়, সঙ্কোচ বোধ করিতেছে। হাজার হইলেও বিলাত ত যায় নাই, তাহাদের সমাজেও এ যাবৎ তেমন মেলামেশা কিছু করে নাই, সঙ্কোচের জড়তা বেশ একটু তাহার ব্যবহারে দেখা যায় বটে।

আবার জরুরী একটা কাজে শীঘ্রই তাঁহাকে বোম্বে যাইতে হইতেছে। মীনাও সঙ্গে যাইবে। মাস তিনেক সেখানে থাকিবেন। ফিরিতে ফিরিতেই রবীন্ হয় ত বিলাত চলিয়া যাইবে। ইতিমধ্যে কে তাহার কাণে কি মন্ত্র দিবে, কে কোন্ মোহে কি লোভে ভুলাইয়া ফেলিবে, তার ঠিক কি? অনেকেরই লোভ তাহার উপরে পড়িয়াছে। কেবল মীনার প্রতি তার অনুরাগ আর তাহার টানে এখানে এত যাওয়া-আসা পক্ষ্য করিয়া স্পষ্ট কোনও চেষ্টা কেহ কিছু করিতে পারিতেছে না, কেবল হিংসায় জ্বলিয়া মরিতেছে! এত বড় কাঁক একটা পাইলে কি সহজে কেহ ছাড়িবে? কে কোথায় ছাড়ে? আচ্ছা রবীনের ত বিলাত যাইতে আরও মাস তিনেক দেরী হইবে, তাই সে বলিয়াছিল। এখানে এমন কাজও কিছু নাই। যদি সে তাঁহাদের সঙ্গে যায়, তবে ত খাসা হয়। আশঙ্কার কারণ থাকিবে না, এ দিকেও একবারে আঁটিয়া যাইবে, আলগা হইয়া সরিয়া যাইতে আর সহজে পারিবে না।

১১

"এই যে রবীন্! বাঃ! এস, এস, তোমার কথাই ভাবছিলাম।"

উঠিয়া খুব জোরে রবীনের হাত ঝাঁকিয়া মোকার্জ্জি তাহাকে কাছেই একখানা চৌকিতে টানিয়া লইয়া বসাইলেন।

হাসিয়া রবীন্ কহিল, "আমার কথা! কেন কি হ'য়েছে বলুন ত! আবার কোনও প্লে—"

"না, না, প্লে আর শীগগির নতুন কিছু একটা হ'চ্ছে আর কই? তবে শকুন্তলার এই sensational success (চমকপ্রদ সাফল্য)টা দেখে কেউ কেউ ব'লেছেন বটে, প্রাচীন নাটকগুলো এই রকম modernise ক'রে (নূতন ছাঁচে ঢেলে) প্লে ক'রলে খাসা হবে। মেলাই না কি নাটক আছে, এই মৃচ্ছকটিক, রত্নাবলী, মালবিকাগ্নিমিত্র, মালতীমাধব, খাসা সব রোমান্স! শুনছি, সিনেমা কোম্পানী কারও কারও বেজায় ঝোঁক প'ড়েছে, এ গুলোর ছবি তুলে নেয় তোমাদেরই এই পার্টিকে ছুটিয়ে নিয়ে। তা সে পরে দেখা যাবে, এই বোম্বে থেকে ফিরে এসে। তবে তখন ত আবার তোমার বিলেত যাবারই সময় হ'য়ে উঠবে বোধ হয়?"

"বোম্বে! আপনি কি বোম্বে যাচ্ছেন এখন?"

"কেবল আমি নই, মীনাও যাচ্ছে। মাস তিনেক সেখায় থাকতে হবে কি না।"

"মাস—তিনেক—থাকতে হবে! মীনাও যাবে!"

যুগপৎ একটা হর্ষ ও বিষাদের বিপরীত তরঙ্গ-বিক্ষোভে রবীনের চিত্ত ভরিয়া উঠিল। ইঁহারা যে এমন বাহিরে যাইতেছেন, সেটা বড়ই একটা সৌভাগ্যের কথা। ইতিমধ্যে তাহার বিবাহটা হইয়া যাইবে, কিছুই ইঁহারা জানিতে পারিবেন না। তবে দীর্ঘ তিন মাস কাল আবার মীনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে না। তার সঙ্গে প্রেমটা কেবল পাকিয়া বেশ সরস হইয়া উঠিয়াছে, সহসা এই বিচ্ছেদে ঠাণ্ডা হইয়া 'ঠস' মারিয়া না যায়। আবার এখন তাহার বিবাহ কল্পনা জল্পনা, সাক্ষ্য বিনোদন, নৈশ সুখস্বপন—এই ই ত। বঞ্চিত

হইয়া দীর্ঘ তিনটি মাস কি প্রকারে কাটাইবে? যখন ইহারা ফিরিবেন, তখনই হয় ত তার জাহাজ ছাড়িবে, অবিলম্বে যাত্রা করিতে হইবে। তাই ত! কি করা যায় এখন? আবার এই ফাঁকটা বিবাহের ঐ ঝামেলাটা চুকাইয়া দিবার পক্ষেও খাসা একটা ফাঁক বটে!

তীব্র দৃষ্টিতে মোকাজ্জি রবীনের মুখ পানে চাহিয়াছিলেন। কেমন একটা মন-ভাঙ্গা ভাবও দেখা গেল, আবার যেন একটু খুসী খুসীও মনে হইতেছে। রকমটা কি? মতলবই বা কি? এ দোমনা ভাবটা কেন? তবে কি মনটা দো-টানা হইয়া কারও কোনও কূটচক্রে পড়িয়াছে? চক্রীরও অভাব নাই চারিদিকে, সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হয়। ঐ যেমন যেমন বিজ্ঞাপন থাকে, beware of pickpockets তেমনি ভাবে! দেখা যাউক! চোক গিলিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, "হাঁ, তা কি করি বল? বড্ড জরুরী কাজ। ওখানকার একটা ব্যাঙ্কের টাকা লেন দেনের ব্যাপারে আর হিসাব-পত্রে বড় কি একটা গোলমাল উপস্থিত হ'য়েছে। সব ঠিক ঠাক ক'রে গুছিয়ে আবার দিতে পারে এমন একজন expertএর (বিশেষজ্ঞের) সাহায্য তারা চায়। এই ত কালই টেলিগ্রাম পেলাম, লিখেছে, মাস তিনেক লাগতে পারে। আমিও জবাব দিয়ে দিয়েছি, যাব। এ দিকে আমার অসুবিধে কিছু হবে না, বেশ কিছু পাওয়াও ওখানে যাবে। তা মাস তিনেক থাকতে হবে, মীনাকেও কাজেই সঙ্গে নিয়ে যেতে হ'চ্ছে। কার কাছে ওকে রেখে যাই বল? ছেড়েও ওকে বেশী দিন কোথাও থাকতে পারি নে। তার কলেজেরও ত গ্রীষ্মের ছুটি এল, ক্ষতিও এমন কিছু হবে না।"

"হুঁ, তা তিন মাসই থাকতে হবে ওখানে?"

"লিখেছে ত ওরা তাই। তবে গিয়ে কাজের রকমটা দেখে তখন বুঝতে পারব, কদ্দিন লাগতে পারে। তা লিখেছে তিন মাস, 'অন্ততঃ মাস আড়াইয়ের কমে কি হবে?'"

একটি নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বেশ একটু বিমনা ভাবেই রবীন্ তখন কহিল, "তখন হয় ত আমার বিলেত যাবার সময় একেবারে এসেই প'ড়বে। আপনাদের সঙ্গে—"

"হাঁ, দেখাশুনো আর যাবার আগে তেমন হবার সম্ভাবনা বড় কমই দেখতে পাচ্ছি। মীনাও তাই ব'লে বড় দুঃখু ক'রছিল।"

"মীনা দুঃখ ক'রছিল!" মুখখানি রবীনের লালিম হইয়া উঠিতে উঠিতে আবার নিষ্প্রভ হইয়া পড়িল। বড় কৃশ একটা নিঃশ্বাস সে ছাড়িল। লক্ষ্য করিয়া মোকাজ্জি মনে মনে বড় উল্লসিত হইয়া উঠিলেন। কহিলেন, "হাঁ, কাল অবধি কেবল ঐ কথাই ব'লছে। তোমাদের বন্ধুত্বটা সবে এই ঘটল কি না, পরস্পরের সঙ্গ লাভে তেমন তৃপ্তি একটা কারুরই হয় নি। হঠাৎ ছাড়াছাড়ি হ'য়ে যাচ্ছে, সেটা বেশ একটু কষ্টকর হ'তে পারে বই কি? তোমাকেও ত কেমন যেন মনমরা মত দেখাচ্ছে, নয়? হাঃ হাঃ, হাঃ! ধরা প'ড়েছ হে, ধরা প'ড়েছ!"

সলজ্জ লালিমমুখে একটু হাসিয়া রবীন্ কহিল, "তা প'ড়েছি সেটা স্বীকার ক'রতে কুণ্ঠিত হ'চ্ছি না। আমাদের এই বন্ধুত্ব সত্যই একেবারে hearty (প্রাণের) একটা বন্ধুত্ব। কি যে ভাল লাগে আমার এখানে যখন আসি! যতক্ষণ থাকি মনে হয় যেন মধুর একটা স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ ক'রছি। বাইরে গেলেই সব অন্ধকার—কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা হ'য়ে যায়!"

চটুল একটু হাসি মোকাজ্জির মুখে ফুটিল। কহিলেন, "তা বেশ ত এ ক'মাস এমন কাজ ত তোমার এখানে কিছু নেই। চল না আমাদের সঙ্গে?"

"আপনাদের সঙ্গে!"

"ক্ষতি কি? কি করবে মিছে মিছি এখানে বসে? মীনা যাচ্ছে, আমি থাকব কাজকর্ম্ম নিয়ে সারাটি দিন্ বাইরে, তারী খালি খালি লাগবে তার। তোমরা দুটিতে আমোদ আহ্লাদে থাকবে, তাকে দেখিয়ে শুনিয়ে নিয়ে বেড়াবে, একদম নিশ্চিন্ত হয়ে আমার কাজকর্ম নিয়ে আমি থাকতে পারব।"

আনন্দে রবীনের মুখ খানি অতি উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। চমৎকার সুযোগ, উপস্থিত, সে যেমন চাহিয়াছিল! কিন্তু এমনি ত ইহাদের সঙ্গে সে যাইতে পারিতেছে না। বিবাহটা —ভাবিতে ভাবিতে কহিল, "ধন্যবাদ মিষ্টার মোখাজ্জি! যা যাব; যেতেই আমাকে হবে। কিন্তু ঠিক এমনি, আপনাদের সঙ্গেই, বোধ হয় হয়ে উঠবে না।"

মোখাজ্জি একটু উৎকণ্ঠিত হইলেন; এমন একটা লোভনীয় প্রস্তাবে রবীন যে অতি আগ্রহে লাফাইয়া উঠিবে— এই মুহূর্ত্তে যাইতে পারিলেও যে যাইতে চাহিবে। হাঁ, আনন্দ

একটা হইয়াছে ; কিন্তু এমন মো-মনা ভাব আবার কেন ? এমন আমতা আমতা করিয়া কথা কয় কেন ? সময় নিতে চায় কেন ? তবে কি সত্যই মো-টানায় পড়িয়াছে ? নতুবা কিছু আছে না কি ? মুখে দুটি মধুর বচন ঝাড়িয়াই কাজে বেলায় ফাঁকি-বাজি একটা করিবে না ত শেষে ? সেই মো-টানায় কোন গুপ্ত শত্রু তবে টানিল ? বন্ধুদের অনেকের উপর দৃষ্টিটা দ্রুত চলিয়া গেল। কিন্তু ধরিবার মত কাহাকেও পাইলেন না।

রবীন কহিল, "এখনও বন্দোবস্ত কিছু হয় নি কি না, সব ঠিক-ঠাক করে নিতে হবে—"

"পাগল ! আরে ওতে আর লাগবে কি ? আসল হল টাকা। তাই যদি ঠিক থাকে কিছুতেই আর আটকায় না। ভাবছ কেন ? এদিকে যা নেহাৎ দরকার, তুমি বল না, দু'তিন দিনের ভেতরই ঠিক-ঠাক করে দিচ্ছি। বাকী যা সব ওখানেই গুছিয়ে নিতে পারবে। একেবারে বিদায় হয়েই চল না ? ওখানেই জাহাজে উঠবে।"

"সেটা বোধ হয় সম্ভব হবে না, মিষ্টার মোখার্জ্জি। বাবাই বোধ হয় আপত্তি করবেন—"

"হুঁ—হুঁ—তা করতে পারেন বটে, তা করতে পারেন। তবে তুমি কি ফিরে এসে তার পর সব ঠিক-ঠাক করে নিতে চাও না কি ? সে যে ঢের দেরী হয়ে যাবে।"

"না, তা চাইনে। একেবারে ওখান থেকেই যেতে পারব। তবে ওঁদের ঠেঁয়ে বিদায় হয়ে বেরোতে আরও পনের-কুড়ি দিন দেরী হতে পারে। এর আগে যে ওরা ছাড়বেন, এমন মনে হয় না।"

মোকার্জ্জি দেখিলেন, রবীন এমন অসার কথা কিছু বলিতেছে না। তাই ত পিতার একমাত্র পুত্র, দীর্ঘ কালের তরে দূর প্রবাসে যাইবে, তাঁর পরজে তাড়াতাড়ি করিয়া দুদিনেই কি করিয়া বিদায় হইয়া যায় ? হাঁ, এখন বুঝা যাইতেছে, কেন তার ঐ ইতস্ততঃ ভাবটা দেখা গিয়াছিল, কেন তার উৎফুল্লতাটা বাহিরে পুরা পুরি তেমন ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। এমন প্রমোদ-ভ্রমণে অবিলম্বেই তাঁহাদের সঙ্গে যাইতে পারিতেছে না, ইহাতেই মনে সে বড় ক্ষুণ্ণ হইতেছিল। ভাবিতেছিল, কি করা যায়। ছি ছি, কি অন্যায়ই তিনি করিয়াছেন ! ভুল বুঝিয়া বেচারীকে কত বড় অপরাধীই মনে করিয়াছেন। কহিলেন, "হুঁ—তা বেশ, তাই তবে যেও। তা বেশী দেরী করো না যেন। যত শীঘ্র তোমার মা বাবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমাদের সঙ্গে গিয়ে মিলতে পার, চেষ্টা করবে। মীনা ত তোমার পথ চেয়ে কেবল দিন গণবে, আর ছট ফট করবে।"

"সেটা, বলতে কি মিষ্টার মোখার্জ্জি, আমাকেও করতে হবে। তবে উপায় ত নেই। কি করব ?"

"আচ্ছা, তা হলে এই কথা রইল। তবু মাস দুই তোমাকে যদি পাই, খালা আনন্দে থাকব। অবিশ্যি তোমার বাবার সুখও তোমাকে চাইতে হয় ; তবে এটাও মনে করে নিতে পার, এখন আমিও তোমার একজন বাবার মতই বটি।"

সলজ্জ অতি মধুর লালিম হাসিমুখে রবীন কহিল, "আহা, একেবারে যদি সেই ভাগ্যের অধিকারী হতে পারতাম !"

আনন্দে রবীনের পিঠ চাপড়াইয়া মোকার্জ্জি কহিলেন, "সে অধিকার ত এক রকম পেয়েছই বাবা ! কেবল মুখের একটা কথা বইত নয় ? তা সেটার এত তাড়াতাড়িই বা কি, যখন হয় হবে।"

"মীনা বুঝি বাড়ীতে নেই আজ ?"

"না, অরুণাদের ওখানে গেছে, বাড়ীতে থাকলে কি আর লুকিয়ে থাকত ? ছুটে এসে তোমাকে এরি মধ্যে পাগল করে তুলত না ?"

"কাল তার সঙ্গে দেখা হবে ত ?"

"হবে। তুমি যদি এস তাকে বলব কোথাও না বেরোয়।"

"আসব।"

রবীনের চক্ষু মুখ ভরিয়া যেন আগুন জ্বলিতেছিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "তা হলে উঠি আজকে, গুড্ ইভ্‌নিং।"

"এখুনি ! বিলক্ষণ ! এইত এলে। চা-টা খাও। মীনা নেই বলে কি আমাদের কাছে দু'মিনিট বসতে নেই ?"

"না না, তা নয়, তা নয়। একটা কাজ আছে বড় জরুরী। হঠাৎ মনে পড়ে গেল।"

"আচ্ছা, তা হলে এস। তা কাল ঠিক আড়াই এসো কিন্তু।"

"সে ত আসবই। আপনারা কবেতক যাচ্ছেন ?"

"তরশু।"

"তরশু ! আচ্ছা, আমিও এই পনের কুড়ি দিনের ভেতরই গিয়ে জুটব। তা হলে উঠি এখন ? গুড ইভ্‌নিং।"

[ক্রমশঃ

অর্থ-সঙ্কট

বাঙ্গালা দেশের বর্ত্তমান অর্থসঙ্কট কি ভাবে ভারতীয় জীবনে বিভিন্ন সমস্যার পরিস্ফুট করিয়াছে, তাহাই দেখাইবার জন্য নিম্নের দুইটি পরস্পর-বিরোধী সন্দর্ভ প্রকাশিত হইতেছে। বলাই বাহুল্য, আমরা ইহার কোন মতটিই সম্পূর্ণ সমর্থন করি না। আমাদের মতামত সম্পাদকীয় পাঠকের সুবিদিত। প্রতি সংখ্যাতেই সম্পাদকীয় বিভাগে আমাদের মত আলোচিত হয়।

জমীদার এবং দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা

বর্ত্তমান জগতে আর্থিক সঙ্কট যেরূপ প্রবলভাবে দেখা দিয়াছে, তাহাতে চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই এই আর্থিক সমস্যার সমাধানের উপায় উদ্ভাবনে ব্যস্ত এবং উদ্বেগী। এমন অনেকেই বলিতেছেন যে, পুরাতন অর্থ নৈতিক পদ্ধতি ধ্বংস না হইলেও ক্রমশঃ ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হইতেছে। সুতরাং আজ পুরাতন অর্থনৈতিক পদ্ধতিকে নূতন আকারে দেখিতে উদ্যুক্ত। রক্ষণশীল ভারতও আজ নূতনের সন্ধানে ছুটিয়াছে, পুরাতন অর্থনীতিকে তাহার আর্থিক উন্নতির একটী প্রধান অন্তরায় বলিয়া মনে করা হইতেছে। রক্ষণশীল ভারত আজ নূতন এবং পুরাতনের সন্ধিস্থলে সন্দেহদোলায় দোদুল্যমান, আশা করা হইতেছে যে, আজ এই 'জাগরণের' দিনে ভারত পুরাতনকে আঁকড়াইয়া ধরিবে না, কারণ পুরাতন অর্থনৈতিক ধারাই তাহার আর্থিক উন্নতির প্রধান অন্তরায়। ইতিহাস-পাঠক মাত্রই অবগত আছেন যে, ভারতের এই আর্থিক দুর্গতি ইতিহাসে নূতন নহে, ইহা পুরাতন দুর্গতির মাত্রাধিক্যমাত্র। নানাবিধ কারণে ভারতের এই আর্থিক দুর্গতি, এ স্থলে তাহার পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক। বর্ত্তমান দুর্গতির সহিত অতীতের তুলনা হয় না—দেশের বর্ত্তমান দুঃখকষ্ট পূর্ব্বের চেয়ে প্রবলতররূপে দেখা দিয়াছে।

বর্ত্তমানে আমাদের প্রধান সমস্যার বিষয়: কি উপায়ে দেশকে এই অর্থসঙ্কট হইতে মুক্ত করা যায়। দেশে বেকার-সমস্যা প্রবল আকারে দেখা দিয়াছে এবং শ্রমজীবিগণ নানাপ্রকার অসুবিধার মধ্যে কার্য্য করিতেছে—এই দুই সমস্যার সমাধান সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। ভারতীয় সাধারণ প্রজাবৃন্দ অনেকদিন ধরিয়াই ধৈর্য্যের সহিত অপেক্ষা করিতেছে, কখন তাহাদের সুদিন আসিবে—তাঁহাদের ধৈর্য্যের বাঁধন কবে শিথিল হইয়া পড়িবে কে বলিতে পারে! তাহাদের ধৈর্য্যচ্যুতি দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলার পক্ষে এক প্রধান অন্তরায় হইবার সম্ভাবনা। ভারতীয় রাষ্ট্রীয় আন্দোলন প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া দেশের তথাকথিত শোষণ-নীতির বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া আসিতেছে—কিছুকাল পূর্ব্বে বাঙ্গলার স্বদেশী আন্দোলনেই ইহা সর্ব্বাঙ্গ বিকাশ লাভ করিয়াছে। বঙ্গদেশ আজ উন্নত মস্তকে ঘোষণা করিতেছে, সেই স্বদেশী আন্দোলনের যুগে ভারতীয় ব্যাঙ্কিং, বীমা, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শিল্প-প্রতিষ্ঠান-সমূহে কিরূপ সহায়তা করিয়াছিল। বলা বাহুল্য, আজ সেই প্রতিষ্ঠান-সমূহের অবিদ্যমানের কারণ, যে অনুপ্রেরণা এবং উদ্যমে উহার ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা আজ নাই এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে আমাদের রক্ষকতার অভাব। তবে এ কথা স্বীকার্য্য যে, এই আন্দোলনে উদ্যোক্তাদের উদ্যম অনেকাংশে সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছিল। এই আন্দোলনকে বৈদেশিক ধনতন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া দেশীয় মহাজনদিগকে স্বদেশী প্রতিষ্ঠান-সমূহে প্রতিষ্ঠিত করিতে বহুল পরিমাণে চেষ্টা করিতে হইয়াছিল। এই আন্দোলনের ফলেই আজ প্রধানতঃ দেশীয় মহাজনগণ স্বদেশী প্রতিষ্ঠানে তাহাদের অর্থ নিয়োগ করিতেছে।

তথাপি দেশের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে কি? ভারতবর্ষ সম্পূর্ণরূপে কৃষি-প্রধান দেশ। তথাপি ইতিহাস-পাঠক মাত্রই অবগত আছেন, প্রাচীন ভারত ব্যবসা-বাণিজ্যে কতদূর উন্নত ছিল এবং তাহার পণ্যদ্রব্য কিরূপে ইউরোপে এবং ভারতের বাহিরে অন্যান্য দেশে অধিক মূল্যে বিক্রয় হইত। কিন্তু ক্রমশঃ দেশের অবস্থার ভীষণ পরিবর্ত্তন সাধিত হইল। সেই পরিবর্ত্তন দেশের শিল্পোন্নতির প্রতিবন্ধক

হইয়া দণ্ডায়মান হইল। সেই অবস্থায় স্বদেশীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান-সমূহ এবং কুটীর-শিল্প ক্রমশঃ ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইল, ফলে সেই সমস্ত পণ্য দ্রব্য আমাদের দেশে বিদেশ হইতে আমদানী হইতে লাগিল। অবশ্যম্ভাবী ফল এই হইল যে, দেশের শতকরা নব্বই জন লোককে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে কৃষিকার্য্যের উপর নির্ভর করিতে হইল এবং সামান্য যাহা পূর্ব্বে করিবার যে সামান্যটুকু বিদ্যমান ছিল, তাহাও কৃষিজাত দ্রব্যের উপর নির্ভর করিল। স্বদেশী শিল্পের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের সমাজের শিল্প-প্রধান জাতিগুলিও বাধ্য হইয়া কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছে। তাই কৃষিকার্য্যই আজ জীবন-মরণ সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং কৃষিকার্য্যের উন্নতি কি উপায়ে সম্ভব তাহাই এখন সর্ব্ব-প্রধান সমস্যা। যে সামান্য কয়েকটি স্বদেশী শিল্প বিদেশ হইতে আগত পণ্যদ্রব্যের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া আজিও দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহারাই আমাদের প্রাচীন ভারতের লুপ্ত গৌরবের একমাত্র নিদর্শন। একথা অবশ্য কোন প্রকারেই অস্বীকার করা যায় না যে, উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই ভারত ক্রমশঃ শিল্পোন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। দেশে রেলপথ স্থাপিত হইয়া সস্তায় এবং নিয়মিত ভাবে আমদানী-রপ্তানীর পথ সুগম করিয়া দেওয়ায় বিদেশী মহাজনগণ আমাদের দেশে আসিয়া নানা প্রকার শিল্প এবং ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহা হইতে অত্যন্ত আনন্দের বিষয় এবং শুভলক্ষণ যে, আমাদের দেশীয় উদ্যমী ও উৎসাহী মহাজনগণও বিদেশী মহাজনগণের অনুকরণে অনুপ্রাণিত হইয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ সময় পর্য্যন্তও যে সমস্ত শিল্প বিদেশী মহাজনগণের একচেটিয়া ছিল, তাহাতে সমস্ত চেষ্টা ও অর্থনিয়োগ করিতেছে। কিন্তু তথাপি দেশের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে কি?

বঙ্গদেশের আধুনিক শিল্পোন্নতির বিষয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে সর্ব্বপ্রথমেই স্মরণ হয়, এদেশের জমিদারদিগের কথা। তাঁহাদেরই চেষ্টা, সহানুভূতি ও সহযোগের ফলেই কতকগুলি দেশীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়া দেশের আর্থিক উন্নতিকল্পে অনেকাংশে সাহায্য করিয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানসমূহের ভিত্তিস্থাপনে তাঁহাদিগকে যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছে। দেশের আর্থিক দুর্গতির জন্য যে বৈরাগ্য আজ সকল শ্রেণীর মধ্যে দেখা দিয়াছে, সমাজের ঊর্দ্ধতন মহোদয়গণ তাঁহাদের প্রজাবৃন্দের সম্পদে বিপদে সাহায্য, সহানুভূতি এবং ত্যাগ স্বীকার না করিলে উহা আরও বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইত। খুব অল্পসংখ্যক লোকই অবগত আছেন, দীর্ঘ সময়ের এই আর্থিক দুর্গতিতে প্রজাবৃন্দের জমিদারগণের নিকট বকেয়া খাজনা কিরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, উহা লিপিবদ্ধ করিলে হতবুদ্ধি হইয়া যাইতে হয়। কিন্তু জমিদারগণ যদি প্রকৃতপক্ষে স্বকীয় স্বার্থের নিমিত্তই ব্যস্ত থাকিতেন, তবে বৎসরে চারিবার করিয়া তাঁহাদের জমিদারীর অবস্থা টলটলায়মান হইত না। বাস্তবিক পক্ষে জমিদার মহোদয়গণের এই দুরবস্থার মূল অত্যন্ত মর্ম্মান্তিক, কিন্তু আজ সেই প্রসঙ্গ তোলা কোথায় যে, তাহার জমিদারের গুণাবলী দস্তাই মনে করিবে? আজ-কাল এক শ্রেণীর লোক দাঁড়াইয়াছেন, তাঁহারা মনে করেন, জমিদারীপ্রথা এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তই দেশের এই আর্থিক দুর্গতির এবং সমস্ত অনিষ্টের মূল, তাই তাঁহাদের তীব্র সমালোচনা, এই দুইটি প্রথার বিরুদ্ধে অভিযান এবং ইহাদের উচ্ছেদসাধনকল্পেই নিয়োজিত হইয়াছে। কিন্তু এস্থলে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, কয়টি অভিযানকারী বা সমালোচক দেশের আর্থিক উন্নতি-কল্পে প্রকৃত গঠনমূলক উপায়উদ্ভাবন করিতে সক্ষম হইয়া-ছেন? সাধারণের দুঃখ অপনোদনে তাঁহারা কতটুকু সাহায্য করিয়াছেন? দরিদ্র এবং অজ্ঞ ও অশিক্ষিত শ্রমজীবী ও কৃষকপরিবারের জ্ঞানবিস্তারে তাঁহারা কয়টি প্রাথমিক, শিল্প-বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় বা ব্যবসা-সম্বন্ধীয় (vocational) বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন? তাঁহাদের নেতৃবৃন্দ উহাদের পানীয় জলের অভাব, পীড়ার কষ্ট এবং ঋণের চিন্তা কতদূর লাঘব করিয়া-ছেন? এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না যে, আমাদের কৃষিকার্য্যের প্রথাতে এমন একটি গণ্ডগোল (maladjustment) রহিয়াছে, যাহার জন্য আমাদের দেশের কৃষকবৃন্দ ঋণজালে জর্জ্জরিত হইয়া কায়ক্লেশে জীবিত আছে মাত্র এবং বৎসরে নয় মাসই অন্য কোন উপজীবিকার অভাবে তাহাদিগকে বসিয়া থাকিতে হয়। নিরক্ষরত্ব, অজ্ঞতা, সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনের অভাব এবং আর্থিক অনটনের মধ্যে

কালাতিপাত করিয়া যে জমিদারগণ স্বকীয় ত্যাগ স্বীকার করিয়াও তাহাদের সম্পদে-বিপদে চিরকালই সাহায্য করিয়াছেন ও করিতেছেন এবং প্রজাবৃন্দ প্রভুকে ত্যাগ করিতে বাসনা করিলেও যাঁহারা সাদরে তাহাদের আশ্রয় দিতেছেন

আলোচনা করিতেছেন, সেই সমাশ্রয় জমিদারের বিরুদ্ধে অভিযান অলীক-কল্পনা। এক শ্রেণীর উচ্ছেদ সাধনে অপরের সম্পূর্ণ বিনাশ অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং মিলন এবং মৈত্রীই উভয়শ্রেণীর পক্ষে মঙ্গলজনক; উভয়পক্ষের দ্বন্দ্ব দেশের এবং জাতির পক্ষে ভয়ানক অকল্যাণকর।

জমিদারবর্গের আর্থিক দুর্গতিও উপেক্ষার বিষয় নহে। সামাজিক, রাজনৈতিক, এবং দেশের অন্যান্য উন্নতিকল্পে তাঁহাদের অতীতের অসাধারণ দানের নিমিত্তই আজ তাঁহারা সমাজে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছেন। হাসপাতাল, ডাক্তারখানা এবং সাধারণের শিক্ষার নিমিত্ত তাঁহাদের দানের অবধি নাই। ইচ্ছা করিলে তাঁহারাই অর্থ-নৈতিক সংস্কারে প্রবৃত্ত হইতে পারেন। তাঁহাদের হিতাকাঙ্ক্ষিগণ দেশের কৃষিকার্য্য এবং শিল্পোন্নতির জন্য সম্পূর্ণ ভাবে তাঁহাদের উপর নির্ভর করিতে পারে। কেন না তাঁহাদের সম্পত্তির আয় হইতে এখনও মূলধন লইয়া ইচ্ছা করিলেই বহু শিল্প-প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি স্থাপন হইতে পারে, অবশ্য যদি তাঁহারা ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে আত্মনিয়োগ করেন। শিল্পোন্নতি এবং ব্যবসায়ে যদি এখনও তাঁহারা মনোনিবেশ না করেন, তবে তাঁহাদের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।

দেশের স্বাধীনতার জন্য এক শ্রেণীর লোক, জমিদার, মহাজন এবং শাসক সম্প্রদায়ের শোষণ-নীতির বিরুদ্ধে ভীষণ আন্দোলন করিতেছেন। ইহাঁদের মতে শ্রেণীগত (vested interests) বা সমষ্টিগত ব্যক্তিবর্গের সমস্ত স্বার্থ ধ্বংস না করিলে যথার্থ বা ভারতীয় জন-সাধারণ ও প্রজাবর্গের কষ্টের গুরুতার কিছুতেই লাঘব হইবে না, তাহাদের উন্নতির পথ চিরকালের জন্য অবরুদ্ধ থাকিবে। ইহারা আরও বলেন, এমন কি যদি বিদেশী শাসনের পরিবর্ত্তে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাঁহাদের হস্তে সমস্ত ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়, তথাপি দেশে প্রকৃত স্বাধীনতা আসিবে না। পল্লীবাসিগণ আজ অভূতপূর্ব্ব অন্নসঙ্কটে নিপতিত। এ হেন সময়ে চক্ষুশূলের অন্নে উত্তেজিত অজ্ঞ কৃষকবৃন্দকে এইরূপ ভাবে ক্ষিপ্ত করিয়া একটি কৃষক-আন্দোলনের সূত্রপাত করা দেশের এবং দশের পক্ষে ভয়ানক অহিতকর।

এই প্রকার সমালোচনা ও আন্দোলনের ফলে সমাজের অর্থ-নৈতিক ভিত্তি এবং দেশহিতকর আইনকানুন একেবারে ধ্বংস হইয়া যাইবে। এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে, পূর্ব্বেকার এই প্রকারের আন্দোলনের ফল কি বিষময় হইয়াছিল, তাহা যেন সমালোচকগণ বা আন্দোলনকারী নেতৃবৃন্দ বিস্মৃত না হন। সহানুভূতিসম্পন্ন নেতৃবৃন্দের কোন প্রকারেই এই অজ্ঞ, সরলচিত্ত, নিরক্ষর, কৃষকবৃন্দকে একটী রাজনৈতিক আন্দোলনের মুখপাত্র না করিয়া বরঞ্চ তাহাদের দারিদ্র্য ও নিরক্ষরত্ব দূর করিতে যত্নবান হওয়া উচিত।

জমিদারদিগের বিশেষরূপে চিন্তা করা উচিত যে, নূতন শক্তির অভ্যুত্থানে তাঁহাদের মান-সম্ভ্রম এবং প্রতিপত্তি বিনষ্ট হইতে বসিয়াছে। যে নেতৃত্ব এতকাল তাঁহাদের হস্তে ন্যস্ত ছিল এবং যাহা আজ বিরোধীদলের হস্তান্তরিত হইবার উপক্রম হইয়াছে, এখনও যদি তাঁহারা তাঁহাদের কার্য্যকরী শক্তির যথার্থ প্রয়োগ না করেন, তাহা হইলে অচিরাৎ উহা বিলুপ্ত হইবে, তাঁহাদের আত্মপ্রসাদজনিত অলীক নিরাপত্তা অতি শীঘ্র দূরীভূত হইবে এবং তাঁহাদের আর কোন অস্তিত্বই থাকিবে না। সুষুপ্তির ক্রোড় হইতে উত্থিত হইয়া যে ভীষণ সমরাভিযান তাঁহাদের চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, স্বজনদলের নিশ্চিত তাঁহার বিরুদ্ধে প্রত্যাবর্ত্তমান হওয়া তাঁহাদের অবশ্যকর্ত্তব্য।"

শ্রীতারাগোবিন্দ চৌধুরী

বাঙ্গলার কৃষিজীবী

বাঙ্গালা একান্ত ভাবে কৃষি-প্রধান দেশ। সুতরাং বাঙ্গালার জাতীয় সমস্যা অথবা আর্থিক সমস্যা বলিতে কৃষি-সমস্যাকেই বুঝাইয়া থাকে। এই কৃষি-সমস্যাকে উড়াইয়া বাঙ্গালার আর্থিক উন্নতির কোন পরিকল্পনাই সুফলপ্রদ হইতে পারে না।

ইউরোপ শিল্পপ্রধান (industrialised) দেশ। কল-

কারখানার বিস্তার ও যন্ত্র-পরিচালনের পরিশ্রমের উপর সেখানকার ধনতন্ত্র নির্ভর করিতেছে। এই জন্য ধনতান্ত্রিক ইউরোপের অর্থনীতি ধনিক ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। শ্রমিকের পরিশ্রমজাত অর্থের বণ্টন লইয়া শ্রমিক ও ধনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে সেখানে যে অধিকার-ভেদ ও স্বত্বভেদের আন্দোলন উঠিয়াছে, ধনতান্ত্রিক ইউরোপের তাহাই জাতীয় সমস্যা।

ইউরোপের শ্রমিকের কোনও অর্থকরী মূলধন নাই, কায়িক পরিশ্রমের উপর তাহাকে নির্ভর করিতে হয়। পক্ষান্তরে ধনিক সম্প্রদায়ের মূলধন হইতেছে অর্থ, মস্তিষ্ক এবং উৎপন্ন মালের কাটতির দায়িত্বগ্রহণ। অতএব ইউরোপের অর্থ-বণ্টন-নীতির প্রতিযোগিতা চলিতেছে দুইটী বিরোধী শক্তির মধ্যে—

(১) শ্রম, ও

(২) মস্তিষ্ক এবং অর্থকরী মূলধন প্রয়োগের দায়িত্ব। কিন্তু বাঙ্গলার অর্থোৎপাদনের প্রকৃতি ও বণ্টনের নীতি সম্পূর্ণ ভিন্নরূপে পরিচালিত।

বাঙ্গলার শতকরা ৭০ জন লোক কৃষিজীবী; অর্থাৎ ভূমির উৎপন্ন ফসলে প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল। ইহা ব্যতীত গভর্ণমেণ্ট, জমিদার ও তদধীন ভূস্বামিগণও অনেক স্থলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিজাত উদ্বৃত্ত ভোগ করেন।

বাঙ্গলায় মোট প্রায় ২ কোটী ৩০ লক্ষ একর জমি কর্ষিত হয় এবং এই কর্ষিত জমির জন্য কৃষিজীবিগণকে খাজনা দিতে হয় বাৎসরিক প্রায় ১৪।১৫ কোটী টাকা। ইহার মধ্যে জমির সর্ব্বোচ্চ মালিক হিসাবে গভর্ণমেণ্ট রাজস্ব বাবদ জমিদারের নিকট হইতে আদায় করেন বাৎসরিক প্রায় ৩ কোটী টাকা। অর্থাৎ ভূমিজাত জাতীয় অর্থের ১/৫ অংশ মাত্র গভর্ণমেণ্ট পায় অর্থাৎ দেশের কার্য্যে ব্যয় হয়, বক্রী ৪/৫ অংশ অর্থাৎ প্রায় ১২ কোটী টাকার বণ্টন হয় জমিদার ও তাঁহাদের অধীন ভূস্বামীদের মধ্যে।

অতএব দেখা যায় কৃষিজীবী প্রদত্ত প্রায় ১২ কোটি টাকা কতকগুলি ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িতেছে। ইউরোপের ধনিকদের ন্যায় ইহাদের অর্থ-প্রয়োগের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয় না অথবা মস্তিষ্কের ন্যায় কোনও মূলধনও প্রয়োগ করিতে হয় না। পক্ষান্তরে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সৃষ্ট এই পরগাছা বিশেষের সুখ-সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্য দান করিবার জন্য যাহারা অকাতরে বাৎসরিক ১২ কোটি টাকার উপর সেলামী দিয়া আসিতেছে, তাহাদের দায়িত্ব ত্রিবিধ :—

(১) কায়িক পরিশ্রম;

(২) জমিভোগের মূল্যপ্রয়োগ;

(৩) জমিকর্ষণের দায়িত্বগ্রহণ।

এই ত্রিবিধ মূলধনের বিনিময়ে তাহারা লাভ করে ভূমিজাত ফসল। প্রতিদানে দিতে হয় জমিকর্ষণের স্বত্বস্বরূপ ১৫ কোটি টাকা খাজনা। ইহাদের মূলধনের সহিত ১৫ কোটি টাকা যোগ দিয়া উৎপন্ন ফসলের মূল্য দাঁড়াইলে দেখা যাইবে কৃষিজীবীর সমস্ত লাভের কড়ি ভোগ করিতেছে কতকগুলি ব্যক্তি, যাহাদের কৃষি-মঙ্গলের জন্য দান নিতান্ত নগণ্য। গভর্ণমেণ্টও কৃষিমঙ্গলের প্রতি তুল্যরূপ উদাসীন। গভর্ণমেণ্ট কৃষিজীবীর নিকট হইতে খাজনা বাবত বাৎসরিক প্রায় ৩ কোটি টাকা পাইয়া থাকে। তাহার প্রায় সবই ব্যয়-বহুল শাসন-কার্য্যে ব্যয় করা হয়। কৃষির উন্নতির জন্য অথবা কৃষিজীবীর মঙ্গলের জন্য খুব কমই খরচ করা হয়। জমির উর্ব্বরা-শক্তি দিন দিন হ্রাস পাইতেছে। নদী, খাল, বিল, ক্রমশঃই শুকাইয়া যাইতেছে। ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধি কৃষিজীবীর স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে। তাহাতে কৃষির উন্নতির জন্য আবশ্যক পরিশ্রমের ব্যাঘাত ঘটিতেছে। অজন্মার সময় কৃষিজীবীর বাঁচিবার জন্য জমি-বন্ধক ব্যাঙ্কের নিতান্ত অপ্রাচুর্য্য, ফসিপণ্য কাটতির জন্য সুপরিচালনাধীন সমবায়-প্রতিষ্ঠানের অভাব, অবসর সময়ে কৃষিজীবীর বিদ্যাশিক্ষা অথবা অর্থকরী শিল্প-শিক্ষার কোন রূপ ব্যবস্থা নাই। এই সব দিকে গভর্ণমেণ্টের অনেক কর্ত্তব্য রহিয়াছে, যাহার উপর দেশের কৃষি-উন্নতি তথা আর্থিক উন্নতি নির্ভর করিতেছে। এই সব বিরাট সমস্যা ব্যক্তি-গত চেষ্টা দ্বারা সমাধান হইতে পারে না। কিন্তু নিতান্ত পরিতাপের বিষয় কৃষি-উন্নতি সম্পর্কে উক্ত সমস্যাগুলির প্রতি—গভর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণ উদাসীন। এত দুঃখ-দুর্দ্দশা ও সরকারী ও বেসরকারী ঔদাসীন্যের মধ্যেও বাঙ্গলার কৃষিকার্য্য বন্ধ হয় নাই, কারণ কৃষিজীবিগণ শ্রমের মূল্য বাবদ বা জমির মূল্য বাবদ যে মূলধন নিয়োগ করিয়াছে, তাহার যে কোনও উপস্বত্ব

থাকিতে পারে তাহা ভাবিতে শিখে নাই অথবা ভাবিবার প্রয়োজন বোধ করে নাই। ১৫ কোটি টাকার উপর উৎপন্ন ফসলের আর খতাইলে উদ্বৃত্ত টাকাকেই গাছের ধন মনে করিয়া ইহারা সন্তুষ্ট আছে। প্রকৃত পক্ষে অর্থনীতির দিক্ দিয়া এই রূপে বাঙ্গালার যে কতখানি কার্য্যকরী কৃষিশ্রম ও ভূমিস্থ বারদ মূলধনের অপব্যয় হইতেছে, দেশের জন সাধারণ তাহার প্রতি চাহিয়া দেখিবারও অবসর পায় না। কারণ যে কয়টী বিরুদ্ধ-স্বার্থ-বিশিষ্ট ১৫ কোটি টাকার উপস্বত্বভোগী সম্প্রদায় বা প্রতিষ্ঠান বিলাস-বৈভব অথবা ব্যয়-বাহুল্যের মধ্যে দিনাতিপাত করিতেছে, তাহাদের জন্য দরদ দেখাইবার লোক আছে অনেক—কিন্তু নিগৃহীত পনর কোটী টাকার করপ্রাত্তাগণের অধিকার, আর্থিক স্বচ্ছলতা বা স্বত্বরক্ষার জন্য কোনও প্রকার সু-পরিচালিত সমিতি বা সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠান নাই। আমরা ভূস্বামী ও কৃষকের মাঝে কল্পনার চোখে একটা সংস্থাচীন সম্পর্ক রচনা করিয়া যতই নিশ্চিন্ত থাকি না কেন, এই দুই শ্রেণীর মধ্যে অর্থনীতির বণ্টনে ও অ-সীমাংসিত ভূমিস্বত্বে একটা সুস্পষ্ট প্রতিযোগিতা ক্রমেই প্রকট হইয়া পড়িতেছে। ইহার ফলে একটা শ্রেণী-বিরোধের আবহাওয়া সৃষ্টি হইয়াছে। তিনটি বিভিন্ন স্বার্থ-বিশিষ্ট পক্ষ লইয়া এই বিরোধের সৃষ্টি—(১) গবর্ণমেণ্ট, (২) জমিদার ও তদধীন ভূমাধিকারিগণ, এবং (৩) প্রজা বা কৃষক।

ইহার মধ্যে প্রকৃত ভূমাধিকার-সমস্যা ও পক্ষবিশেষের স্বত্ব-সমস্যার প্রতিযোগিতা চলিতেছে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে। ইহার ফলে শ্রেণী-সংঘর্ষের (class war) সৃষ্টি হওয়া আশ্চর্য্য নয়। এই দুই পক্ষের অর্থ-নৈতিক অসঙ্গতি ও অ-মীমাংসিত ভূমাধিকার-সমস্যার সন্তোষজনক শ্রেণী-বিন্যাস না করিলে আমাদের কৃষি-সমস্যা, তথা জাতীয় সমস্যার সমাধান হইবে না। বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের মধ্যে সম্প্রতি কৃষিজীবীর স্বার্থ অনেকখানি দৃঢ় করা হইয়াছে এবং এই দুই শ্রেণীর স্বত্ব উপভোগের মাঝে ঘারিত্ব-বোধ ও শৃঙ্খলা-বোধ সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে বটে, কিন্তু বর্ত্তমান সুস্পষ্ট স্বার্থ প্রতিযোগিতার পথে তাহা অপর্য্যাপ্ত।

দেশের অর্থ-নৈতিক কল্যাণ ও কৃষির শ্রীবৃদ্ধিসাধনের জন্য অচিরে একটী সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন আরম্ভ করা উচিত এবং কৃষি-উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য একটী সুচিন্তিত পরিকল্পনানুযায়ী কার্য্য আরম্ভ হওয়া উচিত। দেশের কল্যাণকামী ও কৃষিজীবিগণের দৃষ্টি এই দিকে নিপতিত হইলেই বর্ত্তমান পুঞ্জীভূত অর্থ-সঙ্কট হইতে বাঙ্গলার রক্ষার উপায় হইতে পারে।

—শ্রীমনোমোহন চৌধুরী

ভারতীয় কৃষক

"...ভারতীয় কৃষকগণ ৫০ বৎসর আগেও কোন চাষ্টীর উপর নির্ভর না করিয়া স্বাবলম্বনে, সন্তুষ্টির সহিত স্ব স্ব পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন, তাঁহাদের মধ্যে শান্তি, সন্তুষ্টি ও সাধুতা আজকাল যেমন দেখা যাইত। কাজেই শিক্ষার উদ্দেশ্য কি এবং কোথায় তাহা সফল হইয়াছে, ইহা স্থির করিয়া ভারতীয় কৃষকগণ শিক্ষিত অথবা অশিক্ষিত, তাহা স্থির করিতে হইলে তাঁহাদিগকে যুক্তিসঙ্গতভাবে শিক্ষিত বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হয়। জমির স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি রক্ষিত না হওয়ায় এবং দেশের জলবায়ু বর্ত্তমান বিজ্ঞানের পদ্ধতিতে ঘুষিত হওয়ায় তাঁহাদের অনেক অভাবে, অন্যায় এবং অকালমৃত্যু দেখা দিয়াছে। ঐ কারণগুলি দূরীভূত করিতে পারিলে ভারতীয় কৃষকগণ যে কতখানি শিক্ষিত, তাহা মানুষ মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন।...

চাষীর।

—শ্রীসুধীরচন্দ্র রাহা

ডাক্তারী পাশ পড়িতে মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছিলাম, আশা ছিল প্রচুর। দিবারাত্র নিজেকে পুস্তকের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিতাম, ভবিষ্যতে একজন বড় ডাক্তার হইব, এই বিদ্যার অন্তরে প্রবেশ করিয়া, মানবের কল্যাণের জন্য, এমন কিছু ঔষধ বাহির করিব, যাহাতে সকল প্রকার কঠিন ব্যাধি চিরতরে ধ্বংস হইয়া যায় এই আশায়। মনে মনে স্বপ্ন দেখিতাম, মানুষের এই অকাল-মৃত্যু, নানা দুরারোগ্য ব্যাধি, এমন কি শেষ পর্য্যন্ত মৃত্যুকেও আমার নিকট পরাজয় মানিতে হইবে। একটিমাত্র ইন্‌জেকসন্, একটীমাত্র ঔষধে মানুষের যৌবন চিরকালের মত স্থির ও অটুট হইয়া রহিবে। মানুষের মৃত্যু কেন হয়—দেহযন্ত্রের অভ্যন্তরে কোন্ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যন্ত্র বিকল হইয়া মানুষকে, এই বেদনাহীন, বোধহীন, অনুভূতিহীন নিদ্রার স্তরে ঘুম পাড়াইয়া রাখে, তাহা বহু নির্জ্জন নিশীথে চিন্তা করিয়াছি। আমার অধীত পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও, বহু বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধীয় পুস্তক-পুস্তিকা পড়িয়া মনে মনে বহু চিন্তা ও তর্ক-বিতর্ক করিয়া দেখিয়াছি, বর্ত্তমান বিজ্ঞান, বর্ত্তমান চিকিৎসাশাস্ত্র ভুল পথে চলিয়াছে। এই বিজ্ঞান, এই চিকিৎসাশাস্ত্র শুধুমাত্র মানুষকে ভুলাইয়া অর্থোপার্জ্জনের জন্যই সারা জগতে এক ফাঁদ পাতিয়া বসিয়া রহিয়াছে। মনুষ্যজীবনের কল্যাণের জন্য যে সাধনার প্রয়োজন, যে কঠোর পরিশ্রম, গভীর চিন্তার দরকার, এই সব গবেষণার মধ্যে তাহার কিছুই পরিলক্ষিত হয় না। বর্ত্তমানের এই সব চিকিৎসাপ্রণালী ও বিজ্ঞান মাত্র মানুষের বহিদ্দেশ লইয়াই আলোচনা করিয়া থাকে, অন্তরের অন্তস্তলে প্রবেশ করিবার মত, ইহাদের সাধনা, ধৈর্য্য, সংযম বিন্দুমাত্র নাই।

কত বিনিদ্র নিশীথরাত্রে তারা-ভরা আকাশের পানে তাকাইয়া ভাবিয়াছি, সেই বিগত দিনের—প্রাচীনকালের সেই সব সত্যদ্রষ্টা মহাজ্ঞানী সাধক মুনি-ঋষিদের কথা। প্রকৃত জ্ঞান ও প্রকৃত সাধনার সন্ধান একমাত্র তাঁহারাই পাইয়াছিলেন। আমরা আজ হীরক পাইয়াও কাচ লইয়া খেলিয়া বেড়াইতেছি, ক্ষীরভাগ গ্রহণে অসমর্থ হইয়া নীর লইয়া নাচিতেছি।

যাহা হউক, একদিন আমার সকল আশা, সকল স্বপ্ন অকস্মাৎ চুরমার হইয়া গেল। খুব সবল মানুষ স্টুডিসে কাজ করিতে করিতে অকস্মাৎ চেয়ার হইতে পড়িয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, আর সে মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল না।

একবার মাত্র, একটী কথা পিতৃদেব বলিতে পারিয়াছিলেন, বুলাকে দেখো। বুলা আমার স্ত্রীর ডাক নাম।

তখন আমার থার্ড ইয়ার চলিতেছে, অর্থ-প্রাপ্তির আর কোন আশা কোনদিক্ হইতেই নাই, তাই জগত্যা সকল আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সবলে ঠেলিয়া মেডিক্যাল কলেজ হইতে সরিয়া আসিতে হইল। দীপ্তিরাণী তাহার গায়ের গহনা বিক্রয় করিয়া আমার পড়ার খরচ চালাইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু আমি লইতে সাহস করি নাই। ঐ কয়েকটি সামান্য গহনায় আরও দীর্ঘ তিনবৎসর কোনরূপেই চলিবে না, ভবিষ্যতের একমাত্র সম্বলকে এখনই নষ্ট করিবার দুঃসাহস আমার হয় নাই। তা ছাড়া যাহাকে এককণা সোণা কখনই দিতে পারি নাই—তাহার কাছ হইতে কোন্‌মুখে দুই হাত পাতিয়া, তাহার সকল অলঙ্কার ঘুচাইয়া নিঃস্ব করিব? এ ছাড়া দীপ্তিকে অলঙ্কারহীন দেখিতে নিজেই বেদনা বোধ করি।

জগত্যা কলিকাতার বাসা উঠাইয়া, নিজের জন্মভূমিতে ফিরিয়া আসিলাম। বহুদিন দেশে না আসা-যাওয়ার জন্য সংস্কার অভাবে, বাড়ীখানি কোন প্রকারে আজও খাড়া হইয়া রহিয়াছে। চারিদিকে ঘন জঙ্গল, পড়া ভোগা, আর বাঁশ-ঝাড়ের মধ্যে বাড়ীখানি, স্তিমিত নয়নে এতদিন যেন আমারই প্রতীক্ষা করিতেছিল। একবার চারিদিকে তাকাইয়া দীপ্তিকে কহিলাম, এর ভেতর থাকতে পারবে?

'অভ্যাস হয়ে যাবে—প্রথম প্রথম অবশ্য একটু কষ্ট হবে—কিন্তু তারপর সবই ত সয়ে যাবে।'

আম-কাঁঠালের একটি বাগান আর বিঘা কয় খেনো জমি

ছিল, তাহারই সংস্কারে মন দিলাম। আর নিজের বাহিরের ঘরে ভাঙ্গা আলমারীতে ঔষধপত্র সাজাইয়া গ্রামা ডাক্তার হইয়া বসিলাম। একদিন মনে মনে যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, সর্ব-মানবের চির-যৌবন ও অমরত্ব দান করিবার অকোঙ্ক্ষা—সকল মানুষের দুরারোগ্য ব্যাধি-যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতিদান, আজ সবই যেন আমার কাছে নিশীথ-রাত্রের অলীক স্বপ্ন-কাহিনী বলিয়া মনে হইতে লাগিল। মানুষের সকল ইচ্ছা কি যুগ-যুগান্তর ধরিয়া এমনি ভাবেই নিষ্ঠুর বিধির বিধানে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া শতখান হইয়া ধূলায় মিশাইয়া যায়?

ভুটবেলা নিয়মিতভাবে রোগী দেখিতেছি, একটী স্বল্প-মূল্যে ঘোড়া কিনিয়া গ্রামের পথে পথে মাঠের মধ্য দিয়া, আলের উপর দিয়া, নদীর ধার আর বেতবনের পাশ দিয়া যাতায়াত করিতেছি। আমার বাহনটী বড়ই নিরীহ—হাজার মারিলেও কোনরূপ শব্দ করে না, অথবা ছুটিবার কোন লক্ষণ দেখায় না। সেই দুলকী চালে ঘাড়টী কাত করিয়া স্তিমিত চোখে মাঠে মাঠে আলে আলে একপা একপা করিয়া হাঁটিতে থাকে।

দীপ্তি আমার এই অপরূপ বাহন এবং সহযাত্রী কালো নেড়ী কুকুর দেখিয়া হাসিয়া বলে, 'শিবাজী অন্ হর্স-ব্যাক্।'

হাসিয়া উত্তর দিই, 'হুঁ, এবার দিগ্বিজয়ে বেরুবো।'

সেদিন দুপুর বেলায় জানালা দরজা বন্ধ করিয়া শুইয়া আছি, এ ভিন্ন অন্য উপায় নাই। বেলা দশটা বাজিতে না বাজিতে বাহিরে যেন অগ্নিদেবের প্রলয়নৃত্য চলিতে থাকে। আকাশে মেঘের বিন্দুমাত্র সন্ধান নাই, সমস্ত আকাশ যেন তপ্ত কটাহ আর সেই কটাহে টগবগ করিয়া আগুন ফুটিতেছে। গাছপালা শুকাইয়া পুড়িয়া যাইতেছে, মাটী ফাটিয়া শতখান হইয়া উঠিয়াছে—ডোবা-পুষ্করিণীর সামান্য ঘোলাটে জলটুকু রৌদ্রের বিষনিঃশ্বাসে বাষ্প হইয়া শূন্যে মিলাইতেছে।

চারিদিক ভাদ্রাকার, বৈশাখ শেষ হইতে চলিল, অথচ একবিন্দু বৃষ্টি নাই, চাষীরা মাথায় হাত দিয়া শুষ্ক শূন্য নয়নে তাকাইয়া রহিয়াছে। কিন্তু কোথায় সেই নয়ন কোমল বৃষ্টির রাশি, তাহাদের কোন সন্ধানই নাই।

চোখটা একটু বুজিয়া আসিতেছিল, দীপ্তি ঠেলিয়া কহিল, 'ওগো শুনছ, বাইরে কে যেন ডাকছে।'

কান পাতিয়া শুনিলাম—সত্যই কে যেন ডাকিতেছে, 'ডাক্তারবাবু, ও ডাক্তারবাবু।'

বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, নষ্টপুরের চারু সেখ। আমাকে দেখিয়া চারু হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল—'বাবুগো আমার নাসীর বুঝি বাঁচে না—'

'কি হয়েছে রে?'

'আজ্ঞে কদিন থেকে জ্বর হয়েছিল। সেই জ্বর-গায়েই ক্ষেতের কাজ-কর্ম করছিল। আজ মাঠের-মধ্যে দাঁতি লেগে পড়ে যায়, এখনও জ্ঞান হয়নি বাবু।'

ঘর হইতে ব্যাগটি লইয়া ঔষধের বাক্সটি চারুর হাতে দিয়া কহিলাম, 'আচ্ছা চল।'

সেই দুপুর রৌদ্রে বাহিরে আসিয়া যা দেখিলাম, তাহাতে দুই চক্ষু আমার স্থির হইয়া গেল।

চারিদিকের খোলা মাঠের উপর দিয়া হু হু করিয়া আগুনের হল্কা বহিয়া যাইতেছে—মনে হইতেছে সমস্ত শরীর বুঝি এখনই পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে। সাদা রৌপ্য-শুভ্র রৌদ্রের দীপ্তি অনন্ত নীলাকাশ হইতে নামিয়া আসিয়া সমস্ত চরাচরকে গ্রাস করিয়া, পৃথিবীর সব রস-কস শুষিয়া লইতেছে। এ যেন সংহার-মূর্তি—চারিদিকে শুধু রৌদ্রের বিষ-নিঃশ্বাস—উপরে, নীচে, আকাশে, বাতাসে শুধু তীক্ষ্ণ হলাহল-মাখা রৌদ্রের উত্তাল তরঙ্গ হু হু করিয়া বহিয়া যাইতেছে। কালভৈরব অগ্নি-বৈশাখের প্রলয়-নেত্রের আগুনে সব বুঝি এখনই ভস্মীভূত হইয়া যায়। ছাতা দিয়া নিজেকে কোন প্রকারে আড়াল করিয়া কহিলাম,—'হারু এ ত চলাই দুষ্কর—আর কখনও যেতে হবে না—অনেকটা পথ।'

'বাবু না গেলে নাসীর আমার বাঁচবে না।' এর পর আর কি বলিব!

'বাবু এবার আর ধান পাট কিছুই হ'বে না। বোশেখ মাস শেষ হতে চললো—আর দেখছেন কি রকম রোদের তেজ। আল্লা ছেলেপিলের জানটা বুঝি আর রাখল না। কোথাও একটু পানি নেই বাবু—আমাদের নষ্টপুরের সেই ডোবার যতটুকু পানি ছিল—আজ দেখি এই এতটুকু—আর কি ঘোলা—খালি কাদা—'

আমার মুখ দিয়া কথা সরিতেছিল না—সমস্ত শরীর জ্বলিতেছে—মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত যেন তপ্ত বহিয়া যাইতেছে। মুখ চোখ যেন পুড়িয়া গিয়াছে—মাতালের মত টলিতে টলিতে জিহ্বা দিয়া বার বার মুখ-গহ্বর লেহন করিতে করিতে অবশেষে কোন প্রকারে নন্দীপুরে আসিয়া পৌঁছাইলাম।

নাসীরকে দেখিলাম, ভীষণীর্ণ সনের ষোল বৎসরের বালক পাইতে না পাইয়া, শরীরের অন্যান্য অংশ শীর্ণ, শুধু সমস্ত শরীরের মধ্যে পেটটি বড়। বুঝিলাম, পীহার ও প্লীহা উদর জুড়িয়া রাজত্ব করিতেছে।

দু একবার ডাকিলাম। রক্তজবার মত লাল লাল চোখ কোন প্রকারে মেলিয়া তাকাইল। গা পুড়িয়া যাইতেছে—মনে হইল জ্বর বোধ হয় একশো-পাঁচ—

'মাথায় খালি জল ঢালতে হবে—জ্বর ঢালা হয় নি বোধ হয়।'

হারু এক কলসী কাদাগোলা জল আনিয়া কহিল,—'জল কি আর আছে বাবু!'

'যা আছে, তাই মাথায় ঢাল—আর বাতাস কর।' নাসীর মাঝে মাঝে চীৎকার করিয়া উঠিতে লাগিল। হাত দেখিলাম, জ্বর সেই প্রকারই। সমস্ত শরীরে রক্তের লেশমাত্র নাই—হয় ত কালাজ্বর হইয়াছে—হইয়াছে কি না তাহাই বা কে বলিবে।

হাঁ করিয়া জল খাইতে চাহিল—সেই মলিন কর্দ্দমাক্ত জল খাইতে দিতে দেখিয়া বলিলাম, 'ও কি? ভাল জল দাও।'

এত দুঃখের মধ্যেও হারু হাসিয়া কহিল,—'ভাল জল কোথায় পাব বাবু—এই জলই সবাই খাচ্ছে।'

'কেন তোমাদের জমিদার গাঙ্গের কোন বড়লোক ভাল জলের ব্যবস্থা কি করতে পারেন না?'

হারু পুনরায় একটু হাসিল মাত্র।

ঔষধ দিলাম। কিন্তু আমার মনে হইতে লাগিল—উহাকে ঔষধ দেওয়া বৃথা। আমার দুই দাগ ঔষধে উহার কি হইবে। ভাল পানীয় নাই—পথ্য নাই—আর এতদিনকার অনাচার, অত্যাচার এবং অর্দ্ধাশনে যে রোগ তিল তিল করিয়া সৃষ্টি হইয়াছে তাহা দুইদাগ ঔষধে কি হইবে?

হারু কহিল, 'বাবু নাসীর আমার ভাল হবে ত?' কিন্তু কি বলিব—দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বাগটি উঠাইতে উঠাইতে হারু কহিল, 'আল্লা যা করে।'

ভাবিলাম—ঐ একমাত্র পথ।

উপায়ই আমি দেখিতেছি না।

মাঠের মধ্যে প্রায় একশত ঘর চাষী মুসলমান ঘর বাঁধিয়াছে। চারিদিকে মাঠ ধূ ধূ করিতেছে—কোথাও একটি গাছপালা নাই। সমস্ত দিন, সেই সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মাঠে মাঠে লাঙ্গল ঠেলিয়া ঘরে আসে। কোন প্রকারে দাবান্ত দুটি ভাত মুখে দিয়া, ছেঁড়া মাদুরের উপর শুইয়া পশুর মত নিদ্রা যায়। মাথার উপর দিয়া বর্ষা বাদল ঝড় হাঁকিয়া যায়। এক হাঁটু কাদা—জল থৈ থৈ জলের ভিতর, আর আষাঢ়-শ্রাবণ মাস—অজস্র বৃষ্টির মধ্যে ঐ মাঠে লাঙ্গল ঠেলে।

এমনি ভাবে, সারা বৎসর অর্দ্ধাশনে অনশনে—শীতের প্রচণ্ড প্রকোপে হি হি করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ম্যালেরিয়ার সহিত যুদ্ধ করিয়া—সারা বৎসর কটাইয়া দেয়।

জগতের মাঝে কি যে হইতেছে কিছুরই সন্ধান পায় না—বা সন্ধান জানে না। শুধু তাহারা অত্যন্ত দুঃখ-দুর্দ্দশায় আকাশের পানে তাকাইয়া সকরুণ সুরে ডাকে—'আল্লা রক্ষা কর।'

আমি দেখিলাম, শুধু মুসলমান চাষী-পাড়াতেই, দুঃখ-দুর্দ্দশা, অনশন-অনাটন বাসা বাঁধিয়া নাই—ইহা সর্ব্বত্র সমান ভাবে হিন্দু মুসলমান সকল চাষীর ঘরে দুঃখ কষ্টের নির্ম্মম পেষণ চলিতেছে। দুঃখ-কষ্ট কাহাকে দেখিয়া, বা মানুষ বাছিয়া বাছিয়া চাপিয়া ধরে না—ইহার কাছে সকলেই সমান। আমি ইহাদের কি চিকিৎসা করিব? ইহাদের ঔষধ বা পথ্য কিনিবার মত সামর্থ্য নাই। দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর চাপে—সকল প্রকার বোধশক্তি—বা সামান্যতম জ্ঞান পর্য্যন্ত ইহারা হারাইয়া ফেলিয়াছে। এক অদৃষ্টকে মাথার উপর রাখিয়া ইহারা অগ্রসর হইতেছে—যাহার কপাল সুপ্রসন্ন সেই শুধু কোন প্রকারে বাঁচিয়া রহিয়াছে। তাই মাঠের মধ্যে দাঁড়াইয়া ভাবিলাম—এই বৃহৎ বিরাট সারা বাংলা-জোড়া চাষী সম্প্রদায়ের একই অবস্থা—অন্ন নাই—বস্ত্র নাই—জ্ঞান নাই। রোগে ঔষধ নাই না—পথ্য পায় না—কোনরূপে ভারবাহী

পশুর মত সমাজের সমস্ত কিছু দ্রব্য উৎপন্ন করিয়া পশুর মতনই জীবন যাপন করিতেছে। ইহার প্রতিকার করা কাহার সাধ্য? আর একা আমি বা কি করিতে পারি?

• • •

মাতাবপুরের কৈবর্ত্তরা কয়দিন হইতে আমার কাছে ঘোরাঘুরি করিতেছিল—কিন্তু নানা কারণে আমার অবসর হয় নাই। তাই আজ সন্ধ্যার সময় তাহাদের আসিবার জন্য বলিয়াছিলাম।

সবেমাত্র চা খাইয়া তামাকটা ধরাইয়াছি—কৃষণ আসিয়া ডাকিল।

'কিরে তোদের খবর কি?'

'বাবু, আপনার কথামত ইউনিয়ন বোর্ডের অফিসে গিয়াছিলাম—তা বাবু কিছু আশা তো দেখলাম না। ওনারা বললেন—নলকূপ এবার আর হবে না—আসছে বছর দেখা যাবে।'

'কেন? তোদের গাঁয়ে জল নেই—জল না খেয়ে, কাদাপাক খাচ্ছিস। রীতিমত ট্যাক্সও দিচ্ছিস—অথচ তোদের গাঁয়ে নলকূপ হবে না—এ কি রকম কথা?'

সুমতি বলিল—'হুজুর ওনাদের ঐরকমই কথা। মেম্বার বাবুদের বাড়ীর কাছে নলকূপ বসছে—প্রেসিডেন্ট বাবুর বাড়ীর সুমুখে একটা বসছে। দেখুনগে বছরে তিনবার করে ওনাদের বাড়ীর সম্মুখের রাস্তায় মাটি পড়ছে—কিন্তু আমারা সেই এক হাঁটু কাদা ভাঙ্গছি—এক এক সময় মনে হয়—'

বাধা দিয়া কহিলাম, 'বাপ করতে নেই রে। কিন্তু তোদের ওখানে একটা নলকূপ হওয়া বিশেষ দরকার। আচ্ছা কাল আমি যাব—দেখি কি হয়।'

কিন্তু হইল না কিছুই।

প্রেসিডেন্টবাবু সবিনয়ে কহিলেন, 'আর ত এখন হচ্ছে না বিনয়বাবু। মিটিংএ জায়গা পর্য্যন্ত সব ঠিক হয়ে গেছে।'

আশ্চর্য্য হইয়া কহিলাম, 'কিন্তু ওদের দুরবস্থাটা দেখুন, আপনার উচিত হচ্ছে, আপনার বাড়ীর সম্মুখে টিউবওয়েল না বসিয়ে ওদের ওখানে বসান। যেখানে গিয়ে কি দুরবস্থায় ওরা রয়েছে। পচা ডোবার কাদামাখা পাঁক-জল—তাই এই গরমে, ছেলে বুড়ো সব খাচ্ছে। লোক যে মরে সাবাড় হয়ে গেল চরণবাবু। আপনি করেছেন কি?'

চরণবাবু দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া কহিলেন, 'সবই তাঁর ইচ্ছা—সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় সবই হচ্ছে। বিনয়বাবু আপনি নতুন এসেছেন। ও সব ছোটলোক বেটারা—অমনি চিরকাল, ঐ জন্যই বাড়াচ্ছিস—আজকেই দু চারটে টিউব-ওয়েল বসাচ্ছি—অমনি সব বেটারা ক্ষেপে উঠেছে। বুঝুন, কথাটা একবার। হাঁরে গোবে তো-বেটারা চালাকী পেয়েছিস—না?'

দেখিলাম গোবে নামধারী ব্যক্তিটা এই গ্রামের চৌকীদার। জীর্ণ শরীরে সরকারী কাল রংয়ের জামা আর পাগড়ীতে ভূষিত হইয়া, লাঠিও একগাছি লাঠি ঘাড়ে করিয়া হাত যোড় করিয়া কাঁপিতেছে।

'হুজুর!'

'হুজুর কি রে বেটা? যে ঘর ঝাঁট দে, দিয়ে কলসী তিন গঙ্গাজল নিয়ে আয় দেখি। কই কলা আর কলার পাতা কই। আর সে সব কই? আঁ্যা বেটাদের সব ফাইন করব, তবে ঠিক হবে।'

গোবে বোধ হয় গোবিন্দ নামের অপভ্রংশ। যাই হোক গোবিন্দ কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, 'হুজুর ডিম এনেছি গাঁ খুঁজে খুঁজে তবে—আজকাল গরমে পাওয়া যায় না। আর পাতাটাতো হুজুর কাল আনব, যে বোল।' এ সব দৃশ্য আমার কাছে নূতন। ইহারাই গ্রাম-রক্ষী, হয়ত ছয় সাত টাকা মাহিনা পায়, কিন্তু যে মাহিনা পায়, তাহা তাহাদের পরিশ্রমের চেয়ে অনেক কম। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে প্রেসিডেন্ট-বাবুর বাড়ী আর থানা এই দুই জায়গার জল তুলিয়া গঙ্গার পরিচর্য্যা করিয়া ইহার উহার বাগান হইতে, কলার পাতা, কলীর মোচা অথবা গ্রামান্তর হইতে, ডিম সংগ্রহ করিয়াই কাটিয়া যায়। রাম মাত্র রাত্রে একবার পাহারা দিয়া, কর্ত্তব্য শেষ করে। কিন্তু উপায় বা কি? অথচ ইহাদের ভিত্তি করিয়া, এতবড় শাসন কার্য্য চলিতেছে।

• • •

বন্ধুর সাথে জমিদারী কিনিয়াছে। চিরকাল বাপ ঠাকুর্দ্দার আমল হইতে, পাঁচা আফিঙ আর পচাই মদের

দোকান করিয়া আসিতেছে, ইহাই একমাত্র ভরসা। মধের দোকানের কাঁচা পয়সা যখন সিন্ধুকে ঘরিতেছিল না, ঠিক এই সময় কিসুরগাছির রায়েদের জমিদারী নীলামে উঠিল।

নগদ টাকা গণিয়া দিয়া মধুর বা এমন জমিদার হইয়াছে। এ দিকটা সবই মধুর বার জমিদারীর মধ্যে। কি এক কারণে বহুদিন হইতে, পাটনীদের চারুর সহিত, মধুর বার মনোমালিন্য ছিল—আজ এতদিন পর বামাচ্ছ এক ছুতা লইয়া রাতারাতি মধুর বার লোকজন চারুবাবুর কাছারীঘর পোড়াইয়া দিল।

চারুবাবুও সহজে ছাড়িবার লোক নহেন। সদরে হাইকোর্ট তোড়-জোড় করিয়া মকর্দ্দমা রুজু হইল।

এখন হাটে-মাঠে, পথে-দোকানে শুধু ই ঘর-আলানোর গল্প। মধুর বার হইয়া, নন্দ মুখুয্যে সাক্ষী খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। এমন সাক্ষী চাই, যে-সাক্ষী উকীলের কাণ কাটিতে পারে অর্থাৎ উকীলের শত-সহস্র প্রশ্নে বিন্দুমাত্র জর্জ্জরিত না হইয়া, অচঞ্চল থাকিয়া স্থিরভাবে মিথ্যার পর মিথ্যা কথা দিয়া, পরিষ্কার একপাছি মিথ্যার মালা কোর্টের গলায় ঝুলাইয়া, বুক ফুলাইয়া বাড়ী ফিরিতে পারে।

নন্দ মুখুয্যের সহিত রাস্তায় দেখা হইলে, কহিলাম, 'কিন্তু মুখুয্যে মশাই, এত মিথ্যা সাক্ষী কোথায় পাবেন?'

মুখুয্যে হাসিয়া, বড় বড় মশলা দাঁত বাহির করিয়া কহিলেন, 'তুমি ত ছেলে মানুষ ভায়া,' এই বলিয়া ট্যাঁক হইতে একটা টাকা বাহির করিয়া ছবার বাজাইয়া কহিলেন, 'ছনিয়া গোলাম।' ভাবিলাম তা বটে।

সন্ধ্যার পর ভূষণ দাস আসিয়া কহিল, 'বাবু বড় মুস্কিলে পড়েছি।'

'কি হ'ল আবার?'

'বলুন দেখি, ওরা না হয় জাতে ছোট।' ওরা ও কথা ত বলবেই, কিন্তু তুমি বামুনের ছেলে হ'য়ে ও কথা বল কি করে? এই আমাদের প্রেসিডেন্ট বাবু বললেন, 'ভূষণ, বাপু একটা সাক্ষী তোকে দিতে হ'বে। দশটা টাকা পাবি, যা মধুর বাবুর হ'য়ে একটা সাক্ষী কালনায় গিয়ে দিয়ে আয়, আর তা ছাড়া উনি তোমার মনিব, আর জমিদার।' কি করি বলুন ত ডাক্তার বাবু?'

আমি কি বলিব, কহিলাম, 'ভূষণ বলবার কিছুই নেই, তবে ধর্ম্মপথে থেকো এই একমাত্র আমার কথা।'

ভূষণ চলিয়া গেল।

আজও বৃষ্টি হইল না, আকাশে বিন্দুমাত্র মেঘ নাই। সীমাহীন সুনীল আকাশখানি রৌদ্রের আলোকে আয়নার মত ঝক্‌মক্ করিতেছে। নদীর জল, পুষ্করিণী, কূপ সব শুকাইয়া ধরিত্রীর বুকের অন্তস্তলে প্রবেশ করিল, কিছু বাষ্প হইয়া শূন্যে মিশিয়া গেল। গাছ-লতা-পাতা শুকাইয়া অঙ্গার হইয়া উঠিল। চতুর্দ্দিক হাহাকার ধ্বনিতে ভরিয়া গেল। চাষীপাড়া, হাড়ী-মুচিদের পাড়ায় কলেরা আর বসন্ত, দুই মহামারী প্রলয় মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিল। লোক মরিতেছে, চারিদিকে আর্ত্তনাদ, ঘরে ঘরে কান্নার রোল। পিপাসায় মানুষের ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে, পুত্রের মুখ হইতে একবিন্দু জল কাড়িয়া লইবার জন্য মাতা-পিতা সাগ্রহে হাত বাড়াইতেছে। ঔষধ নাই, পথ্য নাই, রোগের শুশ্রূষা নাই। জল, জল, জল কিন্তু কোথায় জল। ঘরে ঘরে, রাস্তায় রাস্তায় মানুষ মরিয়া স্তূপীকৃত হইয়া রহিয়াছে, কে ইহার প্রতীকার করিবে?

গ্রামগুলি নিস্তব্ধ, সব মহাশ্মশানের মত ভয়াবহ। রাস্তায় লোক-চলাচল নাই, শিশুকণ্ঠের কোলাহল নাই। সব নিস্তব্ধ, নিঃশব্দ। এখানে ওখানে আমগাছের তলায়, ডোবার ধারে, বাঁশবনের মাঝে, ঘরের কোণে মৃতদেহ স্তূপীকৃত হইয়া রহিয়াছে।

দীপ্তি আমার পথ আটকাইয়া, কাঁদিয়া কহে, 'না, ওপাড়ায় আর যেতে পাবে না। চল এখান হ'তে কলকাতায় ফিরে চল, এখানে আমার ভয় আটকে আসছে।'

হাসিয়া বলি, 'ভয় নেই বুলা, মিথ্যে ভয় করো না। জীবনে আজ পর্য্যন্ত কোন অধর্ম্ম করিনি। আমার কোন ভয় নেই, তুমি ভয় পেও না।' কিন্তু দীপ্তি কিছুতেই যেন প্রবোধ মানিতে চাহে না।

ছুটিয়া প্রেসিডেন্ট বাবুর কাছে যাই, 'হাঁ মশায়, এখনও উপরে খবর দিলেন না, গাঁ যে সাবাড় হয়ে গেল।' তেমনি হাত দুটী যোড় করিয়া একবার ঊর্দ্ধে তাকাইয়া চরণ বাবু কহিলেন, 'সবই তাঁর ইচ্ছে। আপনি আমি

কি করতে পারি, আমরা উপলক্ষ্য মাত্র। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন জানেন ত?'

'না, এখন ওসব তত্ত্বকথার ফুরসুৎ নেই। আজ আমিই ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে লিখে দিলাম।'

চোখ দুটী বড় বড় করিয়া চরণ বাবু কহিলেন, 'সাহেবকে লিখলেন না কি, তা আমায় জানাতে হয়।'

রাগে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যাইতেছিল, বলিলাম, 'শুধু ম্যাজিষ্ট্রেটকে নয়, আপনার সম্বন্ধে খবরের কাগজে লিখে পাঠিয়েছি।' হন্ হন্ করিয়া চলিয়া আসিতেছিলাম, পিছন হইতে শুনিলাম, চরণবাবু ডাকিতেছেন, 'শুনুন বিনয়বাবু একটু চা খেয়ে যান।'

ভূষণ আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল।

ঘর-জ্বালানী মকর্দ্দমায় মিথ্যা সাক্ষ্য না দেওয়ায় জন্য তাহার পায়ের দোষ নাই। সমস্ত গা খুলিয়া সে দেখাইল, তাহাতে আমার দুই চক্ষু যেন সে দৃশ্য বিশ্বাস করিতে চাহিল না। সমস্ত শরীরে দড়া-দড়া রক্তমুখী ঘাগ, কোথাও তিল ধারণের স্থান নাই। কাঁদিয়া ভূষণ কহিল, 'শুধু কি এই হুজুর? এবার না খেয়ে মরব। আজ জমিদার জোর করে জমি কেড়ে নিলেন।'

'কেন, খাজনা দিতিস্ না?'

'এক বছরও বাকী নেই ডাক্তার বাবু, আজ জমিতে গিয়াছিলাম, দুই নগদী আমার কাণ ধরে জমি থেকে তাড়িয়ে দিল। বলে দিল, এর পরও জমিতে ঢুকলে ঠ্যাং খোঁড়া করে দিবে। কি হবে হুজুর?'

অবাক হইয়া গেলাম, সামান্য ক্ষণ চুপ করিয়া রহিয়া কহিলাম, 'তুই মকর্দ্দমা কর।'

'সে যে অনেক খরচ বাবু, আর তা ছাড়া জমিদারের বিরুদ্ধে মকর্দ্দমা করলে, রাত্রে ছেলে-বউ শুদ্ধ ঘরে আগুন লাগিয়ে দেবে। ওনারা সব করতে পারে। কিন্তু আমি কি করিতে পারি, আমার অর্থবল নেই লোকবলও নেই!' ঊর্দ্ধে আকাশের পানে তাকাইয়া, মনে মনে ভাবিলাম, 'ঈশ্বর তুমি কি সত্যই নাই?'

কয়দিন আগে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। মহাজনী ঘরের কর্ত্তারা তাই একটু কমের দিকে, লোকে শোক-দুঃখ ভুলিয়া, নিজ নিজ মাঠে লাঙ্গল চালাইতেছে। এমনি ত সময় বহিয়া গিয়াছে; আউশ পাট যা হইবে, তাহাতে খরচ উঠিবে কি না সন্দেহ। তবুও চাষীরা, মাঠকে শূন্য ফেলিয়া রাখিতে পারে না, ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া, ছেলেমেয়েদের শুষ্ক কাতর মুখের ভাতের কথা ভাবিয়া, জমিদারের খাজনা এবং মহাজনের সুদের কথা স্মরণ করিয়া ইহারই উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

বৈকালে মাঠে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলাম। দিগন্ত-প্রসারিত ছোট ছোট আল-দেওয়া বহু-বিস্তৃত চাষের জমি স্তরে স্তরে সজ্জিত রহিয়াছে। গাছপালা-গুলি বর্ষার কোমল বৃষ্টির স্পর্শে সজীবতা ফিরিয়া পাইয়াছে। আকাশে কাল কাল জমাট মেঘ, মাঝে মাঝে শুর শুর করিয়া আমগাছের মাথার উপর দিয়া, গ্রাম ছাড়াইয়া, মাঠ পার হইয়া দূরে চলিয়া যাইতেছে। হয়ত এখনি বৃষ্টি আসিবে, আসুক আসুক, কোমল বৃষ্টিধারা নামিয়া আসুক। শোঁ শোঁ করিয়া বাতাস বহিতে লাগিল, আকাশে শত-সহস্র বিদ্যুৎ-বাতি জ্বলিতেছে, নিভিতেছে।

আমি সেই সুবিস্তীর্ণ চষামাটীর উপর দাঁড়াইয়া আজ বহু দিন পরে, সত্য জীবনকে যেন প্রত্যক্ষ করিলাম। এ কি সুন্দর অপরূপ দৃশ্য! ঐ মাটী-গাছ, বন লতা, এই জলস্থল, আকাশ, বাতাসকে ভুলিয়া, এত দিন কোথায় ছিলাম? প্রকৃতির অপরূপ লীলা-নিকেতন, শত-সহস্র পক্ষীর কূজনমুখরিত পল্লীবাট ছাড়িয়া, এই স্নেহ-সুকোমল জননী ধান-ক্ষেতগুলিকে এতদিন কি করিয়া ভুলিয়া ছিলাম? যাহারা প্রকৃতভাবে জননী বসুন্ধরার লুক্কায়িত স্নেহরাশি আহরণ করিতেছে, যাহারা অজ্ঞাত অভুক্ত রহিয়া দুঃখ-দৈন্য-দুর্দ্দশায়, অনাহারে-অর্দ্ধাশনে এই যে প্রচুর খাদ্য-সম্ভার উৎপন্ন করিতেছে তাহাদের কি করিয়া ভুলিয়া ছিলাম? আমাদের সকল সভ্যতা, সকল কৃষ্টিকে মাথায় করিয়া রহিয়াছে, এই অসংখ্য পল্লী আর অবজ্ঞাত নিরন্ন চাষীকুল। কল-কোলাহলময়ী নগরী, যানবাহন, আলোকোজ্জ্বল, প্রচুর ধন-বিলাস, বিরাট আধুনিক কলকব্জা, বস্তুপাতি আর এই 'সুসভ্য' সভ্যতাকে মাথায় করিয়া রহিয়াছে, এই চাষীরা। ইহাদের সুই চাষের ফসলের বিনিময়ে, ইহাদের বুকের রক্তের বিনিময়ে, ইহাদের অর্দ্ধাহার, অনশনের ও ভিক্ষের অন্নের উপর আমাদের সকল বিলাসিতা উত্তাল তরঙ্গের

মত ছুটিতেছে। অথচ কোন দিন কি আমরা ইহাদের কথা ভাবিয়াছি, না—না, কোনদিনই ভাবি নাই। আমাদের ঘরের পাশ দিয়া সেই অন্ধকার রাত্রি পাকিতে, কাহারা যে, বিশুষ্ক মুখে, বিশীর্ণ দেহে, জীর্ণ বস্ত্রে মাথা নীচু করিয়া মাঠের দিকে প্রতিদিন মৃদু পদক্ষেপে ত্রস্ত ভীত নয়নে চলিতেছে, তাহা কি আমরা ভাবিয়া থাকি? না, কোনদিনই ভাবি নাই, ভাবিবার চেষ্টাও করি নাই।

সে দিন ভোর বেলায় ঘোড়ায় চড়িয়া বাহির হইয়াছিলাম। রোগী দেখিতে নয়—মাতাবপুরে আমার যে কয় বিঘা জমি ছিল তাহা কতদূর চষা হইল তাহাই তদারক করিতে চলিতেছিলাম। তখন মাঠের মাঝে গাছ-লতা-পাতায় জড়াইয়া রাত্রির অন্ধকার জড়াজড়ি করিয়া রহিয়াছে। মাঠের স্নিগ্ধ হাওয়ায় পাখীর মধুর ডাকে চমৎকার লাগিতেছিল। শরীর ও মন দুই প্রফুল্ল ও স্নিগ্ধ হইয়া উঠিতেছিল। সহরের মাঝে এ প্রকার স্বাচ্ছন্দ ও আনন্দ কখনও বোধ করি নাই। তাই খুব আস্তে আস্তেই চলিতেছিলাম। হঠাৎ সজাগ হইয়া উঠিলাম—দেখি, মাঠের মাঝে, একটা চষা জমির উপর কে যেন ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কাছে যাইয়া ডাকিলাম, 'কে?'

'আজ্ঞে আমি ভূষণ। ডাক্তার বাবু না কি?'

'হাঁ, তা তুই এখানে কি করছিস রে?'

অপ্রতিভের হাসি হাসিয়া, ভূষণ কহিল, দেখতে এলাম।'

সবিস্ময়ে কহিলাম, 'জমি দেখতে এলি? কিন্তু এ ত এখন তোর জমি নয়। এ জমি দেখে তুই কি করবি?'

'ডাক্তার বাবু, এ জমিকে বুকের রক্ত দিয়ে, ছেলের মত করে মানুষ করেছি। আজ বিশ বছর থেকে, এই জমির ভাত খাচ্ছি, মার মতন যে একে দেখি বাবু। যখনই মন খারাপ করত তখনই এর কাছে এসে বসতাম, পরাণডা, জুড়োতো। আর মাকে রাখতে পারলাম না, বুকের ভেতরটা টন্ টন্ করছে।' ভূষণ ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

ভোরের আবছায়া আলোকে খুঁড়ো ভূষণ দাস তাহার বিগত জমির উপর বসিয়া, তাহার মাটী সর্ব্বাঙ্গে মাখিতে মাখিতে, পাগলের মত হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। আমি নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলাম, সান্ত্বনা দিবার মত কোন ভাষাই মুখে আসিল না।

এতদিন সহরে কাটাইয়া আসিয়াছি, বাংলা দেশের অগণিত, অসংখ্য গ্রাম্য সমাজ সম্বন্ধে, গ্রামগুলি সম্বন্ধে, গ্রাম্য অধিবাসীদের জীবন-যাত্রা সম্বন্ধে তেমনকপ ধারণা ছিল না। আজ সব দেখিতেছি বুঝিতেছি। গ্রামের অপরূপ লক্ষ্মীশ্রী, পল্লীশ্রী যাহা ছিল, তাহা যেন আজ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। বাংলার পল্লীর সকল প্রাণশক্তি পুড়িয়া খাক্ হইয়া যাইতেছে। নিরন্ন গরীব চাষীকুল ধ্বংসের সর্ব্বশেষ স্তরে উপনীত হইয়াছে। ইহার প্রতিকার কে করিবে? শ্রাবণে, অজন্মায়, অনাবৃষ্টিতে মানুষ আজ বৈশ্য-দশার শেষ ধাপে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, ইহার প্রতীকার কোথায়?

* * *

সেদিন বেলা বোধ হয় দশটা, রোগী দেখিয়া ফিরিতেছি। রাস্তার ধারে ভূপতির বাড়ীর সম্মুখ দিয়া আসিতেছিলাম। আমাকে দেখিয়া ভূপতি কাঁদিয়া ফেলিল, 'বাবু আমার সর্ব্বনাশ হয়ে গেল।'

'কেন রে কারুর অসুখ হয়েছে না কি?'

হাউমাউ করিয়া কাঁদিয়া ভূপতি কহিল, 'দশগণ্ডা টাকা ধর্ম্মদাসবাবুর নিকট হইতে ধার করেছিলাম। আজ ক'বছর থেকে সুদ দিয়ে আসছি। সুদ দিয়েছি ত্রিশ গণ্ডা টাকা, কিন্তু দেনা শোধ দিতে পারলাম না। আজ দেখছি গোপনে গোপনে নালিশ করে, বাড়ী-ঘর ক্রোক করছেন। ছেলে বউ নিয়ে পথে দাঁড়ালাম যে বাবু।'

আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। ভূপতির ছেলে বউ পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আদালতের পেয়াদা, ধর্ম্মদাসের নগদী বরকন্দাজ ঘরের জানালা দরজা খুলিতেছে, জিনিষপত্র টানিয়া বাহির করিতেছে। ধর্ম্মদাস চরণবাবুর সহিত হাসিয়া হাসিয়া সিগারেট টানিতেছে। রাগ সামলাইতে পারিলাম না, ঘোড়ার উপর হইতে কহিলাম, 'ধর্ম্মদাস তুমি একটা চামার। আমার ইচ্ছে হচ্ছে, এই চাবুক দিয়ে তোমার ঐ হাসি বন্ধ করে দিই। ইতর কোথাকার।'

ধর্ম্মদাস ফিরিয়া কহিল, 'কেন, তোমার গায়ে লাগছে কেন?'

'গায়ে লাগবে না। চল্লিশ টাকা ধার দিয়ে একশো টাকার ওপর নিয়ে আজ এই ঘটী-বাটী বার করছ। ভাবছ, উপরে ধর্ম্ম নেই। এ অত্যাচার আর সইবে না, সইবে না। এদের মত তোমাকেও উচ্ছন্ন যেতে হবে।'

ইহার পর কি হইল স্মরণ নাই, ধর্ম্মদাসের বাঙ্গোক্তি ও অশ্লীল দুটু কথা সহ্য করিতে পারিলাম না। ঘোড়ার উপর হইতে বসিয়া বসিয়া চাবুক দিয়া ধর্ম্মদাসকে মারিতে

মারিতে সেইখানে শোয়াইয়া দিলাম। নগদী বরকন্দাজ ছুটিয়া আসিল, কিন্তু ভূপতি আর ভূপতির ভাই দুই জনে কোথা হইতে দুই গাছি লাঠি আনিয়া আমার সহিত যোগ দিল। তাহাদের পুরাতন আশা আজ যেন এতদিন পরে পূর্ণ হইল। যে লোক মরিতে বসিয়াছে তাহার আবার ভয় কিসের? হুকুমের ধাক্কার স্রোতে ভূপতি তাহার প্রতিশোধ লইল।

ইহার পর ঘটা করিয়া বকধর্ম্ম সুরু হইল। চরণবাবু ও মধুর না ধর্ম্মদাসের হইয়া আমার বিরুদ্ধে যেন কোমর বাঁধিয়া লাগিলেন।

দীপ্তি শুনিল না, গায়ের গহনাগুলিকে বেচিবার জোকানে দিয়া আসিলাম। অগত্যা বহুকষ্টে ছেলের হাত হইতে রক্ষা পাইলাম, কিন্তু ভূপতি রক্ষা পাইল না। তাহার এক বছর জেল হইয়া গেল।

নন্দ মুখুয্যে মহাশয় একদিন দেখা করিয়া বলিলেন, 'ভায়া, এ ভাবে ত গাঁয়ে বাস করতে পারবে না। একালে তোমাদের বা হতে যথেষ্ট উপকার পেয়েছিলাম, তাই বলছি।'

'বলুন, কি করতে হবে?'

নন্দ মুখুয্যে নিকটে সরিয়া আসিয়া বলিল, 'ভায়া, দুশিয়া টাকার গোমাস্তা। নইলে বামুন হয়ে ঐ সব ছোট জাতের খোসামোদ করি। কিন্তু আমি বামুন মানুষ, এও বলে রাখলাম, ওদের উচ্ছন্ন যেতে বেশী দেরী নেই।

'আমি সত্যই লোক ভাল নই—অনেক অকাজ কুকাজ করেছি। কাল দলিল মিথ্যে সাক্ষী, ঘরে আগুন লাগান এ সবই করেছি। যা করেছি, সব পোড়া পেটের জন্যে। তার শাস্তিও কম পাচ্ছি না। উপরে ভগবান্ আছেন ভায়া—ওরা উচ্ছন্ন যাবে, উচ্ছন্ন যাবে—কেউ ঠেকাতে পারবে না। একটা কথা বলি, কাউকে প্রকাশ কর না। ওরা তোমায় মারবে বলেছে—তাই বলছি, এখান থেকে চলে যাও। গাঁ এই রকমই হয়েছে, কেউ কারুর ভাল দেখতে পারে না। খালি ঝগড়া—ঈর্ষা—হিংসা—তুমি এসব কি করবে?'

নন্দ মুখুয্যে চলিয়া যাইতেই, দীপ্তি কাঁদিয়া আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, 'সব পড়ে থাক্—আজকের বিকেলের ট্রেনে কলকাতায় চল।'

'কিন্তু সেখানে যাব কি?'

'যা হয় হবে, না হয় ভিক্ষে করে খাব। এ গাঁয়ে আমি একদণ্ড থাকতে পারব না। তুমি আজই চল।'

বুঝাইয়া বলিলাম, 'আজ ত হয় না—একটু গোছগাছ করে, কাল পরশু যাব।'

ঘর হইতে বাহির হওয়া মুস্কিল—সেটা ভয়ে নয়, দীপ্তির সতর্ক পাহারার জন্য। কিন্তু কলিকাতায় যাইতেই হইবে, তাহার জন্য টাকা চাই। তাই জমি আর বাগানটি বিক্রয় করিতে মনস্থ করিলাম—এখানে এইভাবে তিল তিল করিয়া নিদারুণ দারিদ্র্যের চাপে আত্মহত্যা করার চেয়ে—কলিকাতায় একটু কষ্ট করিয়া দু'চারদিন থাকিয়া—অবলম্বনের জন্য কিছু সন্ধান করা লক্ষ গুণে শ্রেয়।

কয়দিনের চেষ্টায় জমি বাগান বিক্রয় করিয়া ফেলিলাম। দুদিনের বাজারে, আর আমার প্রয়োজনের তাগিদে যাহা পাইলাম, তাহাই যথেষ্ট মনে করিলাম। সমস্ত গোছগাছ সারা হইয়াছে—কিছুদিন চলিবার মত টাকাও যোগাড় করিয়া ফেলিয়াছি। পরের দিন ভোরের ট্রেনে, রওনা হইব, ঠিক করিয়া, একখানি গরুর গাড়ীর ব্যবস্থা করিয়া দু'একজনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ফিরিতেছিলাম।

সবে মাত্র সন্ধ্যা হইয়াছে—আকাশের এক কোণে তৃতীয়ার ক্ষীণ চাঁদ দেখা দিয়াছে। নির্জ্জন পল্লীর রাস্তা অন্ধকার ও জনমানবহীন। এক মনে কি জানি চিন্তা করিতে করিতে ফিরিতেছিলাম। হঠাৎ অতর্কিতে পাশের বন হইতে, কে যেন ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিয়া, আমার উপর সজোরে লাঠি বসাইয়া দিল। সেই ভাগ্য বলিতে হইবে, লাঠি মাথায় না লাগিয়া, বাঁ হাতে পড়িল, মনে হইল হাত যেন ভাঙ্গিয়া গেল। এ কয়দিন সতর্ক হইয়া চলিতেছিলাম, তাই সব সময় হাতে একগাছি গুপ্তি রাখিতাম। চমকাইয়া একপাশে সরিয়া যাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলাম, 'কে?' সঙ্গে সঙ্গে হাতের গুপ্তি চক্ষের নিমিষে খুলিয়া সেই লোকটাকে লক্ষ্য করিয়া, সজোরে চালাইয়া দিলাম। লোকটা আর্ত্তনাদ করিয়া বনমধ্যে অদৃশ্য হইল।

বুনোপাড়ার হাড়ী-বাগ্দীরা সেই মাত্র মদ খাইয়া হল্লা করিতে করিতে ফিরিতেছিল। আমার চীৎকারে সকলে দৌড়াইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। আমার সর্ব্বাঙ্গে রক্তের চিহ্ন। গুপ্তিখানি যথাস্থানে পুরিয়া কহিলাম—'বাছাধন টের পাবে। ভবিষ্যতে এমন কাজ আর করবে না।' হাত ফুলিয়া উঠিয়াছে, কপাল সুপ্রসন্ন যে হাত ভাঙ্গে নাই।

ভোরের ট্রেণে কলিকাতায় রওনা হইলাম। গাড়ী হইতে মুখ বাহির করিয়া শেষ বারের মত নিজ জন্মভূমিকে দেখিয়া লইলাম। হঠাৎ ভূপতির কথা মনে হইল, হয় ত আজিও সে নিয়মিত ভাবে, ভোরের বেলায় তাহার হারাণ জমিতে যাইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরিতেছে।

লবণ-বাণিজ্যে বাংলা

—শ্রীজিতেন্দ্রকুমার নাগ

বাংলার বাজারে প্রতি বৎসর গড়ে প্রায় পাঁচ লক্ষ টন বা প্রায় ১৪০ কোটী মণ অন্য দেশীয় লবণ আমদানী হয়। স্বদেশে যে অতি সামান্য অংশ লবণ সমুদ্র-নিকটবর্ত্তী বাসিন্দাদের দ্বারা প্রস্তুত হয়, ইহার তুলনায় তাহা কিছুই নহে। এই দেশী লবণের চালানী নাই বলিয়া কোন ডিউটী দিতে হয় না, সেই জন্য কি পরিমাণ লবণ প্রস্তুত হয় তাহার হিসাব পাওয়া যায় না। বিদেশী আমদানীতে বঙ্গদেশবাসীর নিকট হইতে মণ-পিছু ১৸৵০ একটাকা নয় আনা শুল্ক রূপে প্রায় পাঁচ সিকা পয়সা দেশের বাহিরে চলিয়া যায়। বৎসর বৎসর প্রায় দুই কোটী টাকার লুণ আমরা কিনিয়া থাকি। তাহার মধ্যে অর্দ্ধেক চলিয়া যায় এডেনের সিন্ধী, বোম্বাইবাসী ও ইতালীয়ান ব্যবসায়ীদের গর্ভে। কিছু চলিয়া যায় ইউরোপ আফ্রিকায়, বাকিটা ভারতের কয়েকটি প্রদেশে যাইলেও নিজেদের কিছুই থাকে না। কলিকাতা ও চট্টগ্রাম বন্দরে কি পরিমাণ লবণ আজকাল কিরূপ আমদানী হয় এবং ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে কত ছিল দেখুন।

	১৯৩০-৩১	১৯০৩-৪
এডেন	৭৬,৮৩,৩১৬	১৩,৪৭,০২১
ওমান	১০,৩৮,৫৮৬	
করাচি	৮,১০,১৯৭	
বোম্বাই	৭,২৮,৫১৯	
ইউটীকোরিন		
মাদ্রাজ		
নবলঙ্কা (মোরভি)	১,৫৮,১৫০	
মরিশস	১,৬৬,৩২০	
(পোরবন্দর)		
মোট ভারতীয়	১,১০,০৩,২৭৪	১৩,৮১,৬০৪
	(৮৯ ৵০) (১১০ লক্ষ মণ)	(১৪ লক্ষ মণ)
মোট	১,২৩,৫৮,৪২০	১,০৭,২১,১৭৫

	১৯৩০-৩১	১৯০৩-৪
লিভারপুল (ইংলণ্ড)	১৯ মণ	৩৩,২১,৭৯৩ মণ
হামবুর্গ (জার্ম্মানী)		
মোট ইয়োরোপ		
স্পেন		
সালিফ (লোহিত সাগর)		১,০৯,১৬২ পানিয়ান খালাসী
জাঞ্জিবার (লোহিত সাগর)	২,০০,৬২০	১৪,৮০,২৭০
আফ্রিকার	১ ২৭২	
মোট বিলাতী	১৩,২৪,৩৭০	মোট বিলাতী ৩৩,৩১,৩৩০
	(১১ ৵০) (তের লক্ষ মণ)	(বত্রিশ লক্ষ মণ)

উপরোক্ত অঙ্কগুলিতে * দেখা যাইতেছে যে, অধুনা মোট আমদানীর শতকরা প্রায় ১১ ভাগ মাত্র বিলাত হইতে আসে, যে স্থলে ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে শতকরা ৮০ ভাগের উপর লবণ বিলাত হইতে আসিত। ১৯০৩ সালে এডেন মাত্র ১৩ লক্ষ মণ লবণ বাংলার বাজারে বিক্রয় করিতে সমর্থ হইয়াছিল, সেখানে সে বর্ত্তমানে সমস্ত চাহিদার অর্দ্ধেক মিটাইতে সমর্থ হইয়াছে। করাচি সে সময় পাত্তাই পাইত না, কিন্তু এক্ষণে সেও দাড়ে আট হইতে দশ লক্ষ মণ লবণ প্রতি বৎসর আমাদের দেশে চালান করিতেছে। বিগত ইউরোপের মহাসমর এবং ১৯৩১ সালের Additional Salt Import Duty, বিলাতী লবণের উপর বাড়তি শুল্ক বসিতে

সুদূরবনে ইণ্ডিয়ান সল্ট কোম্পানীতে নূন জ্বাল দেওয়া হইতেছে।

এডেনের ভারতীয় লবণ-ব্যবসায়ীরা বিলাতী লবণকে প্রতিযোগিতায় পশ্চাদ্‌পদ করিয়া তাহাদের সুলভ মূল্যের লবণ বিক্রয় করিতেছে।

এডেনের সুলভ মূল্যের লবণ সাধারণের সুবিধা মিটাইয়া দানী বিলাতী লবণকে প্রতিযোগিতায় হার মানাইলেও আমাদের দেশের একটি ভীষণ ক্ষতি করিতেছে, তাহা হইতেছে স্বদেশী লবণের কোনরূপ বাজার না পাওয়া। এডেনের ন্যায় সস্তা, অল্প খরচে লবণ প্রস্তুত করা আমাদের ভিজা মাটীর দেশে সম্ভব নহে। মাদ্রাজে দুইবার বর্ষা এবং রেঙ্গুনে বর্ষা অধিকতর, তথাপি এই দুটি দেশ তাহাদের লবণের চাহিদা মিটাইতে বিস্তৃতভাবে লবণ প্রস্তুত করিতেছে এবং এডেনের লবণকে প্রবেশ করিতে দেয় না। বাংলা দেশে ঠিক এই দেশ দুইটীর মতই লবণ প্রস্তুতি সম্ভব হইলেও বিশেষ লাভজনক হইতে পারে না, যতক্ষণ না সরকার পক্ষ হইতে সুবিধা দেওয়া হয়। মাদ্রাজের মত আমাদের বাংলাদেশের সাগরকূল সুগম এবং সুবিস্তৃত নহে। কাঁথি, চট্টগ্রাম ভিন্ন, সুন্দরবনের উপকূল দুর্গম ও ভিজা—তথাপি কয়েকটি প্রতিষ্ঠান সুন্দরবনের মধ্যে লবণের কারখানা প্রস্তুত করিতেছে এবং এক দেশে অনুসৃত পদ্ধতিতে কার্য্য করিতেছে। মনে হয় যতক্ষণ না যাতায়াতের সুবিধা হইবে, ততক্ষণ মাদ্রাজের মত অতগুলি কারখানা খোলা সম্ভব হইবে না। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির আগাগোড়া সমুদ্রের ধারে ধারে নৌপদা হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত বড় বড় ৪০।৫০টি লবণের কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে।

আমরা কেবল ক্রয় করিতেই আছি, অথচ এই যে সুবিধা এডেন, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি দেশের ব্যবসায়ীরা করিয়া লইল, তাহা আমরা করিতে পারি নাই। এক মাদ্রাজের মতই বঙ্গোপসাগরের উপকূলে কাঁথি হইতে আরম্ভ করিয়া চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত নোনা সাগর-তটে কি বিস্তৃত ভাবেই না লবণ প্রস্তুত হইত! সেই স্বদেশের লবণ শুদ্ধ বাঙ্গালী নহে—যুক্তপ্রদেশ, বিহার, নেপাল, ভূটান, আসাম সকল দেশের লোকেই ব্যবহার করিত।

বিগত যুদ্ধের সময় এবং মিঃ গান্ধীর তথাকথিত আইন-অমান্য আন্দোলনের সময় ভাবপ্রবণ বাঙ্গালীজাতি রাজনীতিতে মাথা ঘামাইয়া নিজের দেশের যে অনিষ্ট করিল এবং অন্য দেশের ব্যবসায়ীদের যে সুবিধা করিয়াছিল, তাহা আমরা আজ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি।

গত ইউরোপের মহাযুদ্ধের সময় লবণের আমদানী কমিয়া বাজারের দর এত চড়িয়া উঠে যে, সেই সময় ভারত সরকার সর্ব্বপ্রথম চিন্তা করেন যে, কি উপায়ে স্বদেশে পুনরায় লবণ-প্রস্তুত প্রচলন হইতে পারে। যুদ্ধের পূর্ব্বে গড়ে বিলাতী লবণের মূল্য ছিল শত মণের ৪০৲ টাকা (ডিউটী বাদ);

* বাংলা সরকারের বাণিজ্যিক রিপোর্ট হইতে সঙ্কলিত।

এডেন বা পোর্ট সৈয়দের লবণ বিক্রয় হইত ৪০ টাকার মত মণ। যুদ্ধের সময় সেই দর আগুন হইয়া ১৯১৭ সালে ২৭৪৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল—আমদানীর অবস্থাও নিম্নলিখিত তালিকায় বুঝিতে পারিবেন।

কলিকাতায় লবণ আমদানী—(মণ হিসাবে)*

	ইংলণ্ড	জার্ম্মানী	পোর্ট সৈদ	এডেন	মাদ্রাজ	বম্বাই	করাচি	মাল্টা
১৯১৩	৩৫,৭৬,০০০	১৫,৭৬,০০০	৩,৫০,০০০	৩,৫০,০০০	১,৭৫,০০০	১,৭৫,০০০	১,৭৫,০০০	১,৭৫,০০০
১৯১৪	৩৫,৭৬,০০০	১৫,৭৬,০০০	৩,৫০,০০০	৩,৫০,০০০	১,৭৫,০০০	১,৭৫,০০০	১,৭৫,০০০	১,৭৫,০০০
১৯১৫	৩৫,৭৬,০০০	১৫,৭৬,০০০	৩,৫০,০০০	৩,৫০,০০০	১,৭৫,০০০	১,৭৫,০০০	১,৭৫,০০০	১,৭৫,০০০
১৯১৬	৩৫,৭৬,০০০	১৫,৭৬,০০০	৩,৫০,০০০	৩,৫০,০০০	১,৭৫,০০০	১,৭৫,০০০	১,৭৫,০০০	১,৭৫,০০০
১৯১৭	৩৫,৭৬,০০০	১৫,৭৬,০০০	৩,৫০,০০০	৩,৫০,০০০	১,৭৫,০০০	১,৭৫,০০০	১,৭৫,০০০	১,৭৫,০০০
১৯১৮	৩৫,৭৬,০০০	১৫,৭৬,০০০	৩,৫০,০০০	৩,৫০,০০০	১,৭৫,০০০	১,৭৫,০০০	১,৭৫,০০০	১,৭৫,০০০

চেশায়ার, লিভারপুল এবং হাম্বুর্গ হইতে যুদ্ধের ঠিক পূর্ব্বে প্রায় ৫৫ লক্ষ মণ লবণ সংবৎসরে কলিকাতা বন্দরে আমদানী হইত। এডেন, বোম্বাই খানিকটা অংশ পাঠাইলেও মাদ্রাজ এবং করাচি তখনও বাঙ্গারে লবণ পাঠাইতে আরম্ভ করে নাই। যুদ্ধ বাধিতেই বিলাতী চালানী একেবারে ২৫।২৬ লক্ষ মণে পড়িয়া যাইতেই দ্বিগুণ দরে এডেনই ৩২ লক্ষ মণ লবণ আমদানী করিল। উপরে দেখা যাইতেছে, যুদ্ধের বৎসরে শত্রুতলস্থ জার্ম্মানী লবণ একেবারে আমদানীই করিতে পারে নাই, বিলাতী লবণ মাত্র বাজারে ৩ লক্ষ ১৬ হাজার মণ আসিয়াছিল। এডেনের সস্তা লবণ এই সময় হইতেই বাংলার বাজারের অর্দ্ধেকেরও উপর গ্রাস করিয়া লইয়াছে, যেহেতু ইহা অতি সুলভ।

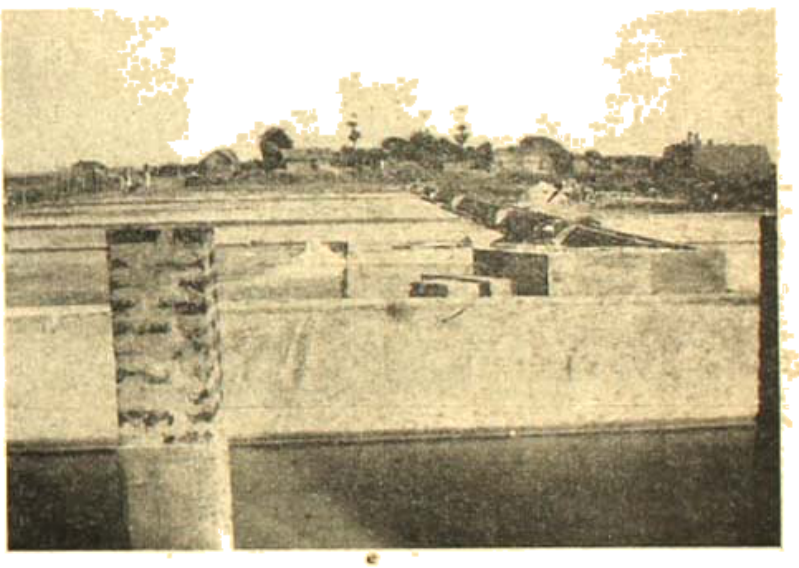

বেঙ্গল সল্ট কোম্পানীর কাঁথি কারখানায় করকত লবণ প্রস্তুত হইতেছে।

বাংলার বাজারে এই সময়ে আক্রা নরের জন্য লবণের চাহিদা এত কমিয়া যায় যে, গবর্ণমেণ্টের লবণ-করের আদায় ভয়ানক নামিয়া যায়। এই সময় ভারত সরকার বাঙ্গালীকে বা বঙ্গদেশে লবণ-প্রস্তুত প্রয়াসে সাহায্য করিতে ১৮ই মে ১৯১৮ তারিখের এক নোটিফিকেশনে বাংলা সরকারকে দেশীয় যে-কোন প্রতিষ্ঠানকে যদি তাহারা লবণ প্রস্তুত করিবার কোন ফ্যাক্টরী করে, লাইসেন্স দিবার জন্য আদেশ দিলেন। কিন্তু এই শিল্পের পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা করিতে কেহ ভরসা করিলেন না। একটা মাত্র প্রতিষ্ঠান (এণ্ড্রু ইউল কোম্পানী পরিচালিত) লাইসেন্স লইয়া কাঁথির সমুদ্র-তীরে পুরুষোত্তম মৌজায় যেখানে এখন বেঙ্গল সল্ট কোম্পানী কারখানা বসাইয়াছে, কলকব্জা বসাইয়া পরিষ্কার লবণ প্রস্তুত

* Representation of Indian Salt Associations to the Govt. of India p—16. and part.

† Tarift Board's Report 1938 হইতে লইয়াছি।

করে। কিন্তু যে পদ্ধতিতে ইহারা লবণ প্রস্তুত করিয়াছিল সে পদ্ধতিতে লাভ হইতে পারে না। সে জন্য এটী পরে উঠিয়া যাইতে বাধ্য হয়।

যুদ্ধের কয়েক বৎসর পরে বিলাতী লবণের আমদানী পুনরায় বৃদ্ধি পাইতে থাকে: ইহাতে ভারতীয় এবং এডেন (তখন বোম্বাই সরকারের অধীন) লবণের সহিত বিলাতী লবণের পুনরায় প্রতিযোগিতা চলে। দেশীয় পক্ষ এক জোট হইয়া দর-কষাকষি করিতে থাকে, কিন্তু অধিকতর উত্তম হওয়ায় লিভারপুল ডাঙ্কার্কের খনিজ লবণ ভালই এই স্বদেশী আন্দোলনের অনুষ্ঠানে বোম্বাই ও মাদ্রাজ

প্রভৃতির লবণ ব্যবসায়িগণের উৎসাহে, টারিফ বোর্ড এবং নার ওর্ক্ক খৃষ্টাব্দের সল্ট সার্ভে কমিটীর নির্দ্দেশে ১৯৩১ সালে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের, আইন সভায় অ্যাডিশনাল সল্ট ইম্পোর্ট ডিউটী (Additional Salt Import duty) পাশ হইয়া যায়। এই আইনের ফলে বিলাতী লবণের উপর মণপিছু সাড়ে চারি আনা বাড়তি শুল্ক বসে। ইহাতে বিলাতি লবণের মূল্য বৃদ্ধি পাইতে উহার আমদানী ক্রমশঃ কমিয়া আসিল। যে লিভারপুল ১৯২৯ সালে বিশ লক্ষ মণ লবণ বাংলার বাজারে বিক্রয় করিতে সমর্থ হইয়াছিল, সেই লবণ ১৯৩১ সালে এই বাড়তি শুল্কের ফলে ৫ লক্ষ মণের অধিক বিক্রীত হইতে পারে নাই। অথচ অতি সুলভ এডেন সোলার সল্ট (Solar Salt) এই ১৯৩১ সালে ৭৫ লক্ষ মণ আমদানী হয় কলিকাতা ও চট্টগ্রামের বন্দরে।

উপরোক্ত আইনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যে, এই বাড়তি শুল্কের আয় সমস্ত ভারতবর্ষের লবণ-শিল্পের উন্নতির জন্য নিয়োজিত হইবেক এবং বিশেষ করিয়া বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম, অর্থাৎ যে যে প্রদেশে বিদেশী লবণ অতি মাত্রায় চালান হয়, সেই সমস্ত প্রদেশে লবণ-শিল্পের উন্নতিবিধানের চেষ্টা করা হইবে। কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, বাড়তি শুল্কের অর্থ যে যে দেশে যেরূপ আদায় হইবে, সেইরূপ অংশে সেই সব প্রদেশের লবণ-শিল্পের উন্নতি-বিষয়ে ব্যয় করা হইবে। শুনা যায়, এই জন্য না কি প্রথম বৎসর ভারত সরকার বাংলা সরকারকে লবণ-শিল্পের পুনরুদ্ধারের জন্য ১৩ লক্ষ টাকা দিয়াছিলেন, কিন্তু এই মোটা টাকার সমস্তটাই না কি অন্য ভাবে খরচ হইয়াছে। এই এক বৎসরের টাকাটাই ঠিকমত ব্যয় হইলে, কিংবা অন্তত ইহার অষ্টমাংশ পাইলেও বাংলার লবণ বাংলা নিজে জোগাইতে পারিত।

বঙ্গদেশের লবণশিল্পকে পুনরুদ্ধার করিবার জন্য সরকার পক্ষ হইতে কতটুকু কাজ হইয়াছে তাহা বলিতেছি। প্রথম ১৯৩১ সালের নভেম্বর মাসে উত্তর ভারতের খেওড়ী লবণখনির তৎকালীন জেনারেল ম্যানেজার সি. এচ. পিট সাহেবকে বঙ্গদেশে লবণ-প্রস্তুত সম্ভব কি না অনুসন্ধান করিতে প্রেরণ করেন। পিট সাহেব উপর উপর যেটুকু দেখিয়া গিয়াছিলেন, তাহার উপর ভিত্তি করিয়া এক রিপোর্ট দিলেন। সে রিপোর্টে তিনি বলিলেন যে, রৌদ্রতাপে (solar evaporation) বাংলায় লবণ প্রস্তুত সম্ভব নয়। তিনি অবশ্য বলেন নাই যে, অন্য কোনও পদ্ধতিতে হইবে না, বা সরকার পক্ষ হইতে সাহায্য করিলে হইবে না। তাঁহার কথা বিশ্বাস করিয়া, কি কেন্দ্রীয় কি স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট, না

* *Salt Industry*, by Agarhwal.

করিয়াছেন দেশীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে কোনরূপ সাহায্য দান, না চেষ্টা করিয়াছেন কোন লবণ-কারখানা স্থাপনা।

আমি সম্প্রতি মিঠে কাঁথিতে বেঙ্গল সল্ট কোম্পানীর কারখানা দেখিয়া আসিয়াছি—শীতকালে এবং এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত অর্থাৎ প্রায় বৃষ্টি নামিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সূর্য্য-কিরণসম্পাতে, কোনরূপ ইঞ্জিন ব্যবহার না করিয়া কেমন পরিষ্কার করকচ লবণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমার এই উক্তি সমর্থন করিয়া সম্প্রতি রায় বাহাদুর ডি. এন. মুখার্জ্জি বলিয়াছেন যে, বাংলায় লবণ-প্রস্তুত সফলকাম হইবে না, ইহা বলিয়াও পিট সাহেব ভয়ঙ্কর ভুল করিয়াছেন।* আর আর্দ্রতা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে ব্রহ্মদেশ হইতে বাংলা বরঞ্চ তুলনায় শুষ্ক। ব্রহ্মদেশে যে প্রণালীতে লবণ প্রস্তুত হয় বঙ্গদেশে তাহা অধিকতর সফলকাম হইবার সম্ভাবনা।†

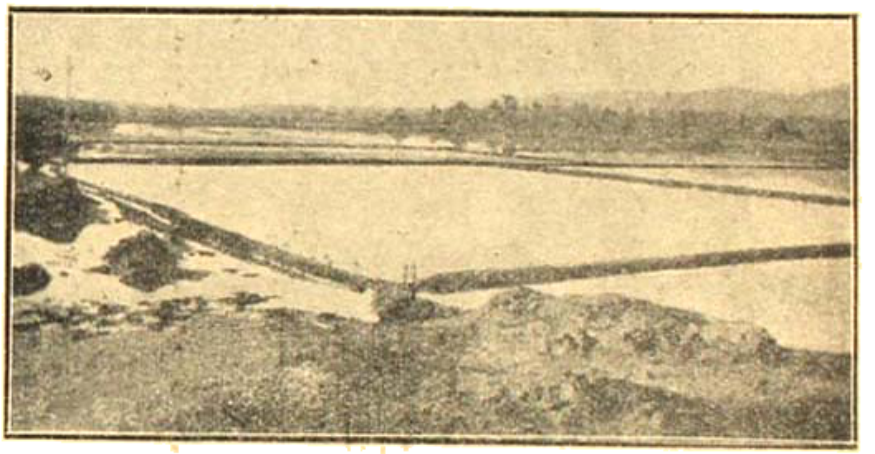

বিলাতি লবণের উপর বাড়তি শুল্কের যে অর্থ সংগ্রহ হইয়াছিল ভারত সরকার তাহার কিছু অংশ আইনানুসারে প্রথম বৎসর বাংলা সরকারকে দিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের সরকার সে অর্থের (১৩ লক্ষ টাকা) একটী পয়সাও বাংলার লবণ-শিল্পের উন্নতির জন্য ব্যয় করেন নাই। অথচ আইনে স্পষ্ট লেখা ছিল যে, এই অর্থের ৭।৮ অংশ অন্যান্যের সহিত বিশেষ করিয়া বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় লবণ-শিল্পের পুনরুত্থান সম্ভব কি না পরীক্ষা করিয়া দেখা হইবে।‡ এই আইনের ফলে মাদ্রাজ কিম্বা ভারতের পূর্ব্ব সমুদ্রকূলে ক্রমশঃ তাহার মত লবণ-শিল্পের উদ্ধার করিতে সমর্থ হইল অথচ বঙ্গদেশ যথা পূর্ব্বং তথা পরং অবস্থায়ই পড়িয়া রহিল।

সাধারণ নোণা মাটী বা সমুদ্রের নোণা জল হইতে লবণ প্রস্তুত করিলে সচরাচর তাহা মুখে লোণাই লাগে না। এই জন্য বাংলায় অন্য কোন পদ্ধতি অবলম্বন করা যায় কি না, এ বিষয়ে অনুসন্ধান করেন সর্ব্বপ্রথম একটী প্রবীণ বাঙ্গালী (শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ চৌধুরী মহাশয়)। ইনি স্বর্গত ইঞ্জিনীয়ার সৌরেন্দ্র বসুকে সঙ্গে করিয়া বর্ম্মার লবণ-কারখানা পরিদর্শন করিয়া আসেন। তাঁহারা ব্রহ্মদেশে অনুসৃত পদ্ধতিকেই বাংলার উপযুক্ত মনে করিয়া বঙ্গীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে চালু করেন। ইঁহাদের তাগিদে গবর্ণমেণ্ট ব্রহ্মদেশের মিষ্টার রায় এবং দিল্লীপ্রবাসী করাচীর শ্রীযুক্ত কৃপলানী এই দুই জন লবণবিদ্‌কে বাংলায় প্রেরণ করেন। তাঁহারা উভয়েই পিট্ সাহেবের ভ্রান্ত ধারণাকে গ্রাহ্য না করিয়া বঙ্গদেশে লবণ-প্রস্তুত খুব সম্ভব বলিয়া রিপোর্ট দেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা ছাপান হয় নাই। সরকার পক্ষ হইতে দৃষ্টি সাহায্য পাইয়া ব্রহ্মদেশ আজ নিজের দেশে লবণ প্রস্তুত করিতেছে।

---

* Mr. Pitt was not correct when he said that there was no likelihood of salt manufacture being successful in Bengal by any other method.....So far as the climatic conditions are concerned, Bengal presents a much better prospect of salt manufacture by the Burmah process than Burmah itself.—p.30

Report of the Possibilities of Salt Industry in Sunderbans—Mukerji and Rao.

† The investigation of the possibility of the development of other sources of supply in India, for example in Bengal, Bihar and Orissa and generally on the East coast, including possibly actual experiments in suitable methods—*Salt Survey Commission.*

আমাদের বাংলাদেশে লাল-শিল্পের অন্তরায়—

(১) বিদেশী এবং অ-বাঙালী বণিকদের বাংলার বাজারকে নিজেদের করতলগত রাখিবার অক্লান্ত প্রয়াস।

(২) সরকার পক্ষের সংরক্ষণশীল (conservative) নীতি, কোনরূপ উদ্যোগ বা সাহায্যদানের অভাব।

(৩) বঙ্গদেশের অধিবাসীদের মজ্জাগত প্রতিকূল বিশ্বাস এবং অন্ধ দৃষ্টি।

বাংলা সরকার একটী কাজ এতদিনে করিয়াছেন, তাহাও রায় বাহাদুর ডি. এন. মুখার্জ্জি রিপোর্ট দিবার পর। তাঁহারা সুন্দরবনে পরীক্ষার্থ ফাক্টরীর জন্য ১২,০০০৲ বার হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন ও চট্টগ্রামের ষ্টেডিং ইউনিয়ান কোম্পানীকে কিছু সাহায্য করিয়াছেন। ইঁহারা খুষ্ণরাজারের চুলহড়িতে একটী লবণের কারখানা স্থাপন করিয়াছেন। সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান কাজ হইবে যদি বাংলা সরকার এডেন ও অন্য প্রদেশীয় এবং বিলাতী আমদানী লবণের উপর বাড়তি শুল্ক বসাইয়া সেই বাড়তি শুল্কের সমস্ত টাকাতে বাংলার উপকূলে কয়েকটী কারখানা স্থাপন করেন। ইহা ছাড়া ফ্রেটচার্জ্জ ও ইস্কনের রয়ালটী বিশেষভাবে হ্রাস করিতে হইবে। গত বৎসর কলিকাতা ও চট্টগ্রাম বন্দরে (১,৫৭,২৯,০০১ মণ এক কোটী ৫৭ লক্ষ মণ লবণ আমদানী হয়। প্রতি মণে যদি অন্ততঃ এক আনা করিয়াও বাড়তি শুল্ক বসান যাইত, তাহা হইলে নয় লক্ষ টাকার বেশী আদায় হইত। এই নয় লক্ষ টাকায় অতি সুন্দর ভাবে দশটী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতে পারিত।

বসুন্ধরা

—শ্রীনমিতা দেবী

ওগো মাতা শ্যামা বসুন্ধরা,
ফল-ফুল, পত্র-পুষ্প, বিহগের গানে চিরস্নাত পূর্ণাদল ভরা।
তারি পরে এল কবে আদি নরনারী, প্রকৃতির দুলাল-দুলালী,
তোমারে বন্দনা করি নাচি নাচি তারা শ্যামা তোরে স্তোত্র গান ঢালি।
প্রভাত আলোয় তারা এল নাচি নাচি মধ্যাহ্নে মা স্নিগ্ধ তরুচ্ছায়ে,
ঘুমায়ে পড়িল তারা তোর স্নেহ-ধূলি মাখা মা তাদের সারা গায়ে
তারপর সৃষ্টি হল লক্ষ নর-নারী বক্ষে নব মানব-মানবী,
তাদেরি কোলেতে তোর বক্ষে এলগনেচে আদিম যুগের মহাকবি।
তরুলতা কাটি তোর ধূলামাটি দিয়া বাঁধিল তাঁহারা হেথা গেহ,
কৃষিকার্য্য গৃহস্থালী বক্ষে তোর সুরু, শস্যে তোর ঢেলে দিলি স্নেহ।
হে সরলা, সে সরল মানব-মানবী বক্ষে তারা কোথা আজি তোর
নাহি সে-আনন্দ-মূর্ত্তি লোভে হিংসা পাপে রহেছে তাহার আঁখিলোর।
মানব মানবে আজ করিতেছে ঘৃণা রক্তে তার জর্জ্জরিত বিশ্ব,
অন্ন গড়ি গ্রাসে করে নিজেরে সে নিজে, বেশারেশি হিংসা অহর্নিশ।

কাড়িতে ভ্রাতার খাদ্য ভ্রাতা করে যুদ্ধ, ভগ্নারে সে মনে করে ভয়,
কোটি কণ্ঠে জীবনের কলঙ্ক-কাহিনী উঠে তার—অবসান নয়।
তব বুকে সৌধ গড়ে আজি গো মানুষ - মানুষের মেরুদণ্ড ভাঙি,
প্রতি ধূলি-কণা ইট প্রস্তরের কুচি উঠে তার রক্তে রাঙা রাঙি।
মানুষ করিছে আজি মানুষের প্রতি নরূপী উন্মত্ত প্রতাপ,
মানুষ আবার তারি কীর্ত্তিগান গাহে, ঘৃণা সে লজ্জার অভিশাপ।
তোমার মাটীর স্বর্গে কারা আজি তব মানুষেরে ঢালে রক্তধারা,
শ্যামল নবুজ দেহে কারা হতভাগা বুলিতেছে ঈথর সাহারা?
তব মাটি লাগি সবে করে কাড়াকাড়ি জননী গো লোভে আর দ্বেষে,
মহামারী ছর্ভিক্ষেরে করে নিমন্ত্রণ ধ্বংসস্তূপ রয়ে যায় শেষে।
প্রকৃতির ছেলে-মেয়ে তোর বক্ষে আজ সৃষ্টি করে নব কৃত্রিমতা,
মা তোর জীবন থেকে নিজেরে ছাঁকিয়া রচিল সে কোটি মিথ্যাকথা।
হে জননী, আজি তবে ঢাকো স্নেহমুখ মেলে দে মা তোর রক্ত চোখ,
অকৃতজ্ঞ পুত্র তোর রোষমূর্ত্তি হেরি ক্ষণেকে মা সচেতন হোক।
ক্ষমামূর্ত্তি আজি তবে ঢেকে দে মা তোর ক্রোধদৃষ্টি দূর হয়ে যাক,
প্রলয়ের শুষ্কডঙ্কা কণ্ঠে তবে তোর হোক সবে স্তম্ভিত নির্ব্বাক।
সহসা পাগল ঝড় আসিবে মা মেতে বক্ষে তোর হা-হা অট্টহাসি,
বক্ষে তোর মানবের রচা পাপ-সৌধ চূর্ণি তাহা হোক ধূলারাশি।
রক্ষা নাই রক্ষা নাই ছেঁকে থাক কড় ভূমিকম্পে মরণ-সমাধি,
প্রান্তর-পাহাড় তোর বন-উপবন নদ নদী উঠিয়াছে কাঁদি।
পর্ব্বত-ললাটে তোর রোষ-বহ্নি-শিখা দেখা দিক মত্ত হুতাশন,
তপ্ত তোর সিন্ধুজলে ধৌত করি পাপ কর মা গো প্রলয়গর্জ্জন।
সহসা গর্জ্জিবে পুনঃ উন্মাদ পাগল ঘূর্ণিবায়ু মত্ত-হাহা রবে,
তপ্ত আকাশের পরে ঘন উল্কাপাত প্রলয়ের শিলাবৃষ্টি হবে।
তারপর রুদ্রলীলা শেষ হলে তোর শান্ত সব স্তব্ধ হবে চুপ,
চারিদিকে কিছু নাই ছড়ানো কেবল প্রলয়ের মহাধ্বংসস্তূপ।
মা গো তোর বক্ষপরে ধ্বংসি সব পাপ শান্ত হবে প্রলয় মত্ততা,
দেখিবে গো হে ধরণী ধুয়ে গেছে সব জীবনের সব পঙ্কিলতা।
তারপর উন্মাদ সে প্রলয়ের পর সৃজনের নবীন গৌরবে,
তোমার এ ধ্বংসস্তূপে নব-বিধাতার সুন্দর নবীন সৃষ্টি হবে।
প্রলয়ের অন্ধকার হবে যাবে শেষ হবে সৃষ্টি নবীন প্রভাত,
সমুদ্র করিবে গান ঘিরি ঘিরি তোমা বসুন্ধরা সহ প্রণিপাত।
তারি মহাছন্দে ছন্দে বন্দনায় তার স্বাগত আহ্বান গানে তারি,
সৃষ্টির আদিম প্রাতে শ্যাম বক্ষে তব আবার আসিবে নর-নারী।

বর্ত্তমান জগৎ

—শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

চেক সাধারণতন্ত্র এবং মেমেল দখল পর্য্যন্ত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র দুটি কোন রকমে সহ্য করেছিল। ভেবেছিল, এতেই হিটলারের রাজ্যলিপ্সা শান্ত হবে। হিটলার নিজেও ভরসা দিয়েছিলেন, ইউরোপে তাঁর আকাঙ্ক্ষা এই শেষ। কিন্তু মেমেল প্রসঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে কথা উঠল, এইবার? এইবার কে? রুমানিয়া না পোলাণ্ড?

ইতিমধ্যে মুসোলিনীর এক আঘাতে আলবানিয়া ধরাশায়ী। রাজা জোগ সপরিবারে পলায়ন করলেন। রাণী জেরাল্ডিন এই অবিচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে বৃটেন ও ফ্রান্সের কাছে প্রতিকার প্রার্থনা করলেন। বৃটেনে ও ফ্রান্সে জনমত উত্তেজিত হয়ে উঠল। উভয় দেশের সরকার তাদের শান্ত করলেন। কাজটা যে অন্যায় হয়েছে তাতে আর সন্দেহ নেই। কিন্তু উপায় কি? দখল সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। এখন করবার কিছু নেই। তবে ভবিষ্যতে অন্য কোন রাজ্য সম্বন্ধে এ রকম যাতে আর না হতে পারে, তার ব্যবস্থা করতে হবে।

পোলাণ্ড ও রুমানিয়া

এই ব্যবস্থার প্রথম ধাপ হিসাবে বৃটেন এবং ফ্রান্স একযোগে পোলাণ্ড এবং তার পরে রুমানিয়াকে এই প্রতিশ্রুতি দিলে যে, যদি কেউ তাদের রাজ্য আক্রমণ করে এবং স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে যদি তারা যুদ্ধ করে, তাহলে বৃটেন এবং ফ্রান্স তাদের সাক্ষাৎভাবে সাহায্য করবে।

এর মধ্যে একটুখানি ফাঁকিও আছে, "স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে যদি তারা যুদ্ধ করে।" যদি যুদ্ধ না করে, কিংবা আপোষে অথবা তৃতীয় পক্ষের চাপে যদি তারা আক্রমণকারীর দাবী মিটিয়ে দেয়, তাহলে আর তাদের সাহায্য করবার কোন দায়িত্ব রইল না। এই ফাঁকির দিকে ইঙ্গিত করে অনেকে আপত্তি করতে লাগলেন, ডানৎসিক নিয়ে যে দাবী জার্ম্মানী করেছে, সম্ভবতঃ দ্বিতীয় একটা 'মিউনিক'-চুক্তির সাহায্যে বৃটেন এবং ফ্রান্স শেষ পর্য্যন্ত তাকে ডানৎসিক ছেড়ে দিতে বাধ্য করবে। সে ধারণা এখনও অবশ্য যায় নি।

কিন্তু এই প্রতিশ্রুতিরই বা অর্থ কি? পোলাণ্ড এবং রুমানিয়ার ভৌগোলিক অবস্থান এমন এবং বৃটেন ও ফ্রান্স থেকে এত দূরে যে, ইচ্ছা থাকলেও সাহায্য করার অনেক অসুবিধা। ওদের সাহায্য এসে পৌঁছুতে পৌঁছুতে দখল সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। সকলেই এ কথা উপলব্ধি করলে। মিঃ লয়েড জর্জ এবং শ্রমিক দল চাপ দিতে লাগলেন যে, এ অবস্থা-সঙ্কট থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় রাশিয়া। জার্ম্মান আক্রমণের বিরুদ্ধে অবিলম্বে ওদের সাহায্য করতে পারে একমাত্র রাশিয়া। সামরিক শক্তিতেও রাশিয়া জার্ম্মানীর চেয়ে শ্রেষ্ঠতর যদি না নাও হয়, সমকক্ষ যে তাতে আর কোন ভুল নাই।

পোলাণ্ড এবং রুমানিয়াও এ যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করলে। তবু তাদের আপত্তিও ছিল। দুটি দেশেই ধনিক-তন্ত্র প্রবল, কমিউনিজম সম্বন্ধে স্বাভাবিক কারণেই তাদের আতঙ্ক আছে। 'Devil' আর 'deep sea'র মধ্যে শেষ পর্য্যন্ত deep sea কেই বেছে নেওয়া ছাড়া তাদের উপায় রইল না।

ইঙ্গ-ফরাসী-সোভিয়েট চুক্তি

মিঃ চেম্বারলেনেরও আপত্তি কম ছিল না। কিন্তু নিরুপায় হয়ে তাঁকেও শেষ পর্য্যন্ত সোভিয়েটের সঙ্গে চুক্তিতে অগ্রসর হতে হল। কিন্তু রুমানিয়ার ঘন ঘন বিরুদ্ধেই সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছে। মিউনিক চুক্তিতে ফ্রান্স ও বৃটেন যে ভাবে চেকোশ্লোভাকিয়াকে ডুবিয়েছে তাতে ডানৎসিক এবং 'করিডর' নিয়ে শেষ পর্য্যন্ত যে তারা কি করবে, কে নিশ্চয় করে বলতে পারে? পোলাণ্ডও এতকাল ধরে জার্ম্মানীরই বিশ্বস্ত বন্ধু ছিল। এমন কি, সে দিনও চেকোশ্লোভাকিয়া ভাগ-ভাগির সময় জার্ম্মানীর মত তারও (এবং হাঙ্গেরীরও) আগ্রহ কম ছিল না। সুযোগ

পেয়ে চেকোস্লোভাকিয়া থেকে একটা থাবা দিয়ে কিছুটা অংশ তুলেও নিয়েছে। রুমানিয়াও যে রাশিয়ার প্রতি প্রীতিপরায়ণ নয়, তাও সকলেই জানে। অথচ জার্মানীর বিরুদ্ধেও একটা কিছু করা দরকার। সঙ্কিত মন নিয়েই পোলিশ আপোষ প্রস্তাবে এগিয়ে এল।

চুক্তি যতটা সহজ মনে হয়েছিল, ততটা সহজ হল না। বৃটেন এবং ফ্রান্স গ্যারাণ্টি করলে, জার্মানীর লোভ প্রতিহত করবার জন্য এবং ইউরোপে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য পোলাণ্ড এবং রুমানিয়াকে তুমিও অভয় দাও। রাশিয়া ব্যাপারটা ভেবে দেখলে। শান্তি-প্রতিষ্ঠায় তার আগ্রহ আছে, জার্মানীকেও হুমকি দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু এত দেশ থাকতে শুধু পোলাণ্ড এবং রুমানিয়াকে অভয় দিলেই যে কি করে শান্তির রথ গড় গড় করে ইউরোপে নেমে আসবে ভেবে রাশিয়া তা পেলে না। বললে, ও আমি বুঝি না। সত্যি সত্যি যদি পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার আগ্রহ তোমাদের থাকে, তাহলে পৃথিবীতে যেখানে কোন দুর্বল রাজ্যের উপর সবলের আক্রমণ হবে, সেখানেই তোমাদের ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। ইউরোপ থেকে পূর্ব এশিয়া পর্যন্ত সকল ছোট রাজ্যকেই অভয় দিতে হবে।

চুক্তি ভেঙে যায় আর কি! মাসাধিক কাল টানাটানির পর রাশিয়া সুদূর প্রাচ্যকে ছেড়ে দিতে রাজি হয়েছে। কিন্তু বাল্টিক দেশগুলিকে—এস্তোনিয়া, লিথুনিয়া ও লাটভিয়াকে অভয় দেওয়া চাই-ই। এগুলির সঙ্গে রাশিয়ার স্বার্থ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। রাশিয়া এদের কিছুতেই ছাড়তে রাজি নয়, বৃটিশ এবং ফরাসী সংবাদপত্রগুলি এই প্রস্তাবকে 'আপোষ' বলে উল্লেখ করেছেন।

পোলিশ-জার্মান সমস্যা

পোলিশ-জার্মান সমস্যা প্রধানতঃ তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করে: (১) সংখ্যালঘিষ্ঠ জার্মান সম্প্রদায়, (২) করিডর, এবং (৩) ডান্‌ৎসিক।

পোলাণ্ডে যেমন প্রায় ১০ লক্ষ জার্মান অধিবাসী আছে, জার্মানীতেও তেমনি প্রায় সমানসংখ্যক পোল আছে। জার্মানীর অভিযোগ এই যে, পোলাণ্ডে সংখ্যালঘু জার্মানদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করা হয়। যাঁদের প্রত্যক্ষভাবে এ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে, তাঁরা এ অভিযোগ সত্য বলে মনে করেন না। আসল কথাটা এই যে, মুডেটেনল্যাণ্ডে জার্মানী যে নাৎসী প্রচার-কার্য চালিয়েছিল, এরা তা চালাতে দিতে সম্মত নয়। কোন প্রকার পোলিশ-বিরোধী নাৎসী আন্দোলন (যেমন 'white stocking' আন্দোলন) এরা মাথা তুলতে দিচ্ছে না।

পূর্ব-প্রুশিয়া ও জার্মানীর মধ্যে যে সঙ্কীর্ণ পোলিশ ভূখণ্ড আছে তাকে বলে করিডর (corridor)। এর উপর দিয়ে জার্মানী থেকে পূর্ব প্রাশিয়ার যাবার রেলপথ, স্টেশনে যেতে জার্মান যাত্রীরা কতকগুলি বিশেষ সুবিধা ভোগ করে থাকে—যেমন, তাদের পাসপোর্ট লাগে না, শুল্ক সম্বন্ধীয় কড়াকড়ি নেই। জার্মানী চাইছে, এর উপর দিয়ে একটা মোটরের রাস্তাও করতে। রাস্তা করতে দিতে পোলাণ্ডেরও আপত্তি নেই। কিন্তু জার্মানীর দাবী, সেই রাস্তা এবং তার দুপাশে ৫ কিলোমিটার (তিন মাইলের কিছু বেশী) করে স্থান জার্মানীর হাতে ছেড়ে দিতে হবে। তারা সেই রাস্তা সামরিক পদ্ধতিতে সুরক্ষিত করবে। তার ফলে পোলাণ্ডের সমুদ্রের রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে, তার স্বাধীনতার পক্ষেও ব্যাপারটা নিরাপদ হবে না। পোলাণ্ড সেই কারণে এ ব্যবস্থায় রাজি নয়।

তৃতীয় সমস্যা ডান্‌ৎসিক। লোকসংখ্যা এবং সংস্কৃতির দিক্ দিয়ে এই সহরটি যে জার্মান সেকথা আর বলা নেই। কিন্তু ডান্‌ৎসিকের সমৃদ্ধি যে জন্য, তা পোলিশ মাল আমদানী-রপ্তানীর বন্দর হিসাবে। মহাযুদ্ধের আগে এটি জার্মানীরই অধীন ছিল। মহাযুদ্ধের পর free cityতে (স্বাধীন সহর) পরিণত হয়েছে। এর শুল্ক-বিভাগ এবং বৈদেশিক নীতি পোলাণ্ডের হাতে। বাকি সমস্ত বিষয়েই স্বাধীন। হিটলারের অভ্যুত্থানের পর থেকেই ডান্‌ৎসিকের জার্মানরা একে জার্মানীর অধীনে আনবার জন্যে চেষ্টা করে আসছে। পোলাণ্ড এবং জার্মানী উভয় দেশের স্বার্থ বজায় রেখে কি ভাবে এই সমস্যার সমাধান হতে পারে সেইটেই এখন চিন্তার বিষয়।

জার্মানী করবে কি?

এ সম্বন্ধে জার্মানী যে কি করবে তা নিয়ে অনেক কথা উঠছে। এ পর্যন্ত মনে হয়েছে যে, ইঙ্গ-পোলিশ চুক্তির পর জার্মানী এই নিয়ে মহাযুদ্ধের সূচনা করবে না। হিটলার

নিজেও সেই ভরসা দিয়েছেন। জার্মান জনসাধারণ বিশ্বাস করে যে, মহাযুদ্ধ ছাড়াই ডানৎসিক ও করিডর 'রাইশ'-এর মধ্যে ফিরে আসবে।

কি ক'রে ?

ডানৎসিকে শতকরা ৯৮ জন জার্মান। তারা একটা আইন করেছে যে, ১৮ থেকে ২৫ বৎসর বয়সের প্রত্যেক লোককে "পুলিসে" কাজ নিতে হবে। এই "পুলিস" আর কিছুই নয়, ছদ্মবেশী সৈন্য। রাত্রের অন্ধকারে পূর্ব প্রাশিয়া থেকে প্রায় প্রতি রাত্রেই অস্ত্র-শস্ত্র চালান আসছে। এই ভাবে ইচ্ছা করলেই এরা পোলিশ প্রভুত্ব অচল করে তুলবে।

তারপরে ?

"A 'little' war against the Poles would flatter the German Army and be good for the Fuehrer's prestige. A short sharp victorious campaign would show the world that the new Germany is great and powerful in the arts both of peace and war."

ব্যাপারটা এই রকম :

ডানৎসিকের চারদিকে লিথুয়ানীয় পুলিশ আগলে আছে ৫০ হাজার পোলিশ সৈন্য বলে আছে। তারা আধ ঘণ্টার মধ্যে ডানৎসিকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। ডানৎসিকে গোলযোগ হলে যদি তারা ঝাঁপিয়েই পড়ে, জার্মান বাহিনী ডানৎসিকের জার্মানদের রক্ষার অজুহাতে সেখানে হানা দেবে। এটাকে তারা যুদ্ধ বলবে না, বলবে 'local incident (স্থানীয় ঘটনা)।' এর পরেও যদি বৃটেন এবং ফ্রান্স পোলাণ্ডের সাহায্যে আসতে চায়, তা হলে যুদ্ধ ঘোষণার দায়িত্বও তাদেরই নিতে হবে। হিটলারের বিশ্বাস, তাতে তারা রাজি হবে না। সুতরাং "a little war" এই ডানৎসিক জার্মানীর অঙ্গীভূত হবে। শোনা যাচ্ছে, শরৎকালে এই ব্যাপারটা আরম্ভ হবে।

হিটলারের কৃতজ্ঞতা

কোন একটি "নিউজ-লেটারে" হিটলারের কৃতজ্ঞতা সম্বন্ধে একটি চমৎকার গল্প বেরিয়েছে। অনেক দিন পূর্বে, হিটলার যখন 'স্যুয়ার ও নেতা' হন নি, কেউ যখন তাঁকে চিনত না, তখন একজন ইহুদি তাঁর প্রাণ রক্ষা করেছিল। হিটলার তাকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, তার এই জীবনদাতাকে তিনি কোনদিন ভুলবেন না। ১৯৩৬ সালে যখন ইহুদিরা হিটলারের দৃষ্টিতে বিরক্ত হয়ে উঠল, তখন ইহুদিটি পূর্বের কথা স্মরণ করিয়ে সাহায্য ভিক্ষা করলে। হিটলার তাঁকে দশ হাজার মার্ক দিয়ে দেশত্যাগ করতে বললেন। ১৯৩৮ সালে আবার উভয়ের সাক্ষাৎ হল ভিয়েনাতে। হিটলার তখন অষ্ট্রিয়া দখল করে ইহুদি-বিরোধী নীতি চালাচ্ছেন। এবারও হিটলার তাঁকে দশ হাজার মার্ক দিয়ে অষ্ট্রিয়া ত্যাগ করতে বললেন। ১৯৩৯ সালে আবার তাঁর সঙ্গে দেখা প্রাগে। হিটলার তাঁকে আবার দশ হাজার মার্ক দিয়ে বলেছেন, "পালাও—কিন্তু ১৯৪০ সালে যদি তোমায় ভিয়েনাতেও দেখতে পাই, তা হলে নির্ঘাৎ বন্দীশিবিরে পুরব।"

গল্প হিসাবে ব্যাপারটা নিশ্চয়ই উপভোগ্য !

মুসোলিনি ও ইতালীরাজ

শোনা যাচ্ছে, আলবানিয়া দখল সম্বন্ধে ইতালীর রাজা ভিক্তর এমানুয়েলের না কি মত ছিল না। বৃহস্পতিবারের খৃষ্টীয় পর্ব্বদিনে (ইস্টার ইভে) মুসোলিনি প্রথম তাঁকে এই অভিযানের কথা শোনান। এই ব্যবস্থার প্রতিবাদে রাজা না কি প্রথমে সিংহাসন ত্যাগ করবার ভয় দেখিয়েছিলেন। কিন্তু বাদোগ্লিওর পরামর্শে শেষ পর্য্যন্ত না কি নরম হন। আরও শোনা যায় যে, সিনিয়র প্রান্দি, বাদোগ্লিও এবং বাল্বো না কি জার্মান মিতালীর পক্ষপাতী নন। ইতালীর পররাষ্ট্র নীতিতে জার্মানী যে প্রভাব বিস্তার করেছে, তাঁরা না কি তা সমর্থন করতে পারছেন না।

ইতালীর অভ্যন্তরীণ ব্যাপারও খুব সুবিধাজনক নয়। সামরিক ব্যয়-বাহুল্যের ফলে অর্থনৈতিক দুর্গতি আরও বেড়েছে। প্যারিসে যে সব ইতালীয়ান আছে, তাদের মনোভাবে এবং কার্যকলাপেই ভিতরের এই অবস্থার কথা বুঝতে পারা যায়। ডিক্টেটারদের দেশে শান্তির জন্য প্রচার-কার্য্য চালাবার একটা চেষ্টাও হচ্ছে।

ফ্রান্স ও ইতালী

মুসোলিনি প্রথমে ভেবেছিলেন, একটা ধমকি দিলেই ফ্রান্সের কাছ থেকে টিউনিস এবং উত্তর-আফ্রিকার অন্যান্য সুবিধা পাওয়া যাবে। তিনি জানতেন না, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি অন্যের স্বার্থ-হানির বিষয়ে আশাতিরিক্ত উদার হলেও যেখানে নিজের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সেখানে ঠিকই আছেন। এক

ছি ছি এত্তা অজ্ঞান

ঘুমকিতে টিউনিস পাওয়া গেল না। অনেক ভেবে-চিন্তে এখন তিনি আপোষের সাহায্যে ব্যাপারটার মীমাংসা করতে সম্মত হয়েছেন। আপোস আলোচনা চলছেও। তিনি বিনিময় অঞ্চলে বাণিজ্যাগতে কিছু সুবিধা চান। টিউনিসে যে সমস্ত ইতালীয়ান অস্ত্রশস্ত্র করবে, তারা কত বৎসর পরে ফরাসী বলে গণ্য হবে, সে সম্বন্ধেও একটা ব্যবস্থা করতে চান। সমস্যার মীমাংসা হল কি না, তা আপোষের পরেই বোঝা যাবে।

ইঙ্গ-তুরস্ক চুক্তি

ইঙ্গ-তুরস্ক চুক্তিপত্র এখনও পাকাপাকি ভাবে স্বাক্ষরিত হয় নি, একটা খসড়া অস্থায়ী ভাবে অনুমোদিত হয়েছে মাত্র। এ সম্বন্ধে সকল সর্ত জানা যায় নি। তুরস্কের নূতন প্রেসিডেন্ট ইনেউন্থ ঘোষণা করেছেন যে, যদি মহাযুদ্ধ এবারে বাধে, তা হলে তুরস্ক বৃটেনের পক্ষেই যোগ দেবে। মুস্তাফা কামালেরও এই নীতিই ছিল। সেবারে তুরস্ক জার্মান পক্ষে যোগ দিয়ে যে ভাবে ঠকতে বসেছিল, এবারে সে-ভুল আর সে করবে না। কামাল বলেছিলেন, ছোট যুদ্ধে জার্মানী বৃটেনকে হারাতে পারে। কিন্তু বড় যুদ্ধে, যা অনেকদিন ধরে চলবে, তাতে ধনী বৃটেনকে হারান জার্মানীর পক্ষে অসম্ভব। বোধ করি সেই নিদানের কথা ভেবেই এবারে তুরস্ক বৃটেনের সঙ্গেই সন্ধি করলে। এই সন্ধির ফলে বৃটেনের দুটো লাভ হয়েছে। প্রথম, তুরস্কের সাহায্যে ভূমধ্যসাগরে প্রাধান্য এবং দ্বিতীয়, ইসলাম জগতের সহানুভূতি ও সমর্থন।

'পরিবেষ্টনে'র আশঙ্কা

বৃটেন এবং ফ্রান্স জার্মানীর চারপাশের দেশগুলির সঙ্গে যে ভাবে চুক্তি করতে আরম্ভ করেছে, তাতে জার্মানী উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে। তার বিশ্বাস, জার্মানীকে চারিদিক দিয়ে 'পরিবেষ্টন (encirclement)' করার উদ্দেশ্যেই এই ব্যবস্থা হয়েছে। এর ফলে জার্মান জাতি এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। তারা বলছে, পৃথিবীতে জার্মানী যাতে ঠাঁই না পায়, তার জন্যই এই ব্যবস্থা, এবং এই ব্যবস্থার ফলেই গতবারে মহাযুদ্ধ হয়েছিল। তারা বলছে :

"Very well, it 1914 was 'encirclement' when it consisted of an alliance (Franco-Russian) and an entente (Franco-British), can one doubt that a triple alliance between France, Great Britain and Russia, plus the pacts between Poland and Great Britain and Turkey and Great Britain, not to mention the imminent Franco-Turkish pact would constitute Encirclement with a capital E.!"

অর্থাৎ—১৯১৪ সালে যদি ফরাসী-রুশ ও ফরাসী বৃটিশ চুক্তির ফলেই 'পরিবেষ্টন' সম্ভব হয়ে থাকে, তাহলে ফ্রান্স, বৃটেন ও রাশিয়ার মধ্যে এই ত্রিশক্তি-চুক্তি আর তার সঙ্গে ইঙ্গ-পোলিশ ও ইঙ্গ-তুরস্ক চুক্তি এবং আসন্ন ফরাসী-তুরস্ক চুক্তিকে বৃহত্তর 'পরিবেষ্টন' ছাড়া আর কি বলতে পারা যায়?

কে জানে! মিঃ চেম্বারলেন পুনঃ পুনঃ বলছেন, সে রকম কোন উদ্দেশ্য তাঁর মাথায় নেই। এই সব চুক্তির কোনটিই পরস্পর আক্রমণের জন্যে নয়, কেবল মাত্র আত্মরক্ষার জন্যে।

ডেনমার্ক-লাটভিয়া-এস্তোনিয়া

বৃটেনের এই চেষ্টার বিরুদ্ধে হিটলার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন যে, তিনি এই কাজ মোটেই সহ্য করবেন না। রাশিয়ার সঙ্গেও তিনি মিতালী করার চেষ্টা করেছিলেন। সে চেষ্টা সফল হয় নি। সম্প্রতি কিন্তু ডেনমার্ক, লাটভিয়া ও এস্তোনিয়ার সঙ্গে জার্মানীর অনাক্রমণ (non-aggression) চুক্তি হয়েছে। মোটামুটি সর্তটা এই রকম যে, আগামী দশ বৎসরের মধ্যে কেউ কাকেও কোনো কারণেই আক্রমণ করবে না, কিংবা তৃতীয় কোন পক্ষ যদি আক্রমণ করে, তাকে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ কোন ভাবেই সাহায্য করবে না। এই চুক্তির ফলে দুর্বল ডেনমার্ক, তথা লাটভিয়া ও এস্তোনিয়া যেমন তার প্রবল প্রতিবেশীর সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হল, জার্মানীরও তেমনি এক দিক্‌কার দুর্ভাবনা ঘুচল।

অবশ্য এর পরেও এই দেশগুলির অন্য যে কোন দেশের সঙ্গে এই রকম চুক্তি করার স্বাধীনতা রইল। আরও মনে রাখতে হবে যে, চুক্তির পরমায়ু মাত্র দশ বৎসর।

স্পেনের আভ্যন্তরীণ অবস্থা

দীর্ঘকালব্যাপী গৃহযুদ্ধে যে ক্ষতি স্পেনের হয়েছে, সহজে তা পূরণ হবার নয়। নগরের পর নগর, গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। কত লোক গৃহহীন ও সর্বস্বহীন হয়েছে, তার সীমা সংখ্যা নেই। জার্মান ও ইতালীয় বাহিনী কিছু কিছু দেশে গেছে

অনেকে এখনও রয়েছে। ফ্রাঙ্কো গবর্ণমেণ্টকে এই আর্থিক সমস্যার সঙ্গে যুদ্ধ করে পরে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে হবে। সে কাজ বড় সহজ নয়

ইতিমধ্যে ডিক্তাণ্টারের কাছে স্পেনীয় সৈন্য সমাবেশের একটা সংবাদ বেরিয়েছিল। মুসোলিনি ভূমধ্য-সাগরের প্রবেশ-পথের এই বৃটিশ ঘাঁটিকে প্রীতির চক্ষে দেখেন নি। তাঁরই ইঙ্গিতে এই আয়োজন হয়েছিল। কিন্তু এ সম্বন্ধে এখন আর কোন কথা শোনা যায় না। এখন গৃহযুদ্ধের অবসানের পরে ট্রংফুল্ল স্পেনীয় নর-নারীর নৃত্য-গীত আমোদ-প্রমোদের ছবি বেরুচ্ছে।

আমেরিকার মনোভাব

বৃটিশ পররাষ্ট্র-নীতি সম্বন্ধে আমেরিকার মনোভাব কি, সে সম্বন্ধে বিখ্যাত ইংরাজ লেখক অধ্যাপক হ্যারল্ড্ লাস্কির একটি চমৎকার প্রবন্ধ বেরিয়েছে। ফাশিস্ত নীতির বিরুদ্ধে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট অত্যন্ত কঠোর মনোভাব প্রদর্শন করেছেন। অধ্যাপক লাস্কি লিখেছেন :

"I found no American who did not view with horror the idea of war But I found few Americans who were not convinced that Hitler and Mussolini were a threat to the foundations of our common civilization."

মার্কিন জনসাধারণ মিঃ চেম্বারলেনের তুষ্টির নীতি পছন্দ করে না। তাদের বিশ্বাস, সাধারণ লোকের স্বার্থের চেয়ে মিঃ চেম্বারলেন পুঁজিবাদীদের স্বার্থ সম্বন্ধেই অধিক সচেতন। তারা সবাই জিজ্ঞাসা করে, চেম্বারলেনকে কি মসনদ থেকে সরাবার কোনও উপায় নেই? প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট যেভাবে ডিক্টেটারদের চ্যালেঞ্জ করেছেন, চেম্বারলেনের উক্তিতে সে সুরের নিতান্ত অভাব। তারা বলে :

"So long as that is absent from Mr. Chamberlain's speeches, Americans will continue to doubt the *bona fides* of his policy."

অর্থাৎ,—যতদিন মিঃ চেম্বারলেনের বক্তৃতায় সেই সুর না ফুটে উঠছে, ততদিন মার্কিন জনসাধারণ চেম্বারলেনের নীতির আন্তরিকতা সম্বন্ধে সন্দেহের ভাব পোষণ করবে।

এই মনোভাব শুধু আমেরিকার নয়, সর্বত্রই প্রবল হয়ে উঠছে।

গঙ্গা

—শ্রীহরিপদ দত্ত

গঙ্গোত্রী হইতে নব জীবন প্রবাহ
ইচ্ছাময় ইচ্ছাবশে তব বহিল যখন
বিশাল ভারতবক্ষে উত্তপ্ত, উষর,
বিষ্ণু-পাদোদক বলি' ফুল-ফল সহ
পূজিলা তোমারে ভক্তিভরে আর্যগণ।
অকূল ধরিত্রী জানি', নিজে গঙ্গাধর
নিলেন পাতিয়া শির করিতে ধারণ
প্রপাতের তীব্র বেগ, তরঙ্গ ভীষণ।

সঙ্কুচিত তব ধারা কিছু ভাগ্যদোষে
বিচূর্ণ, বিধ্বস্ত বহু তরঙ্গ-বিঘাতে।
ভাসিলে নিজের অভিরুচিবশে—
জনপদ সৌধ-মালা ভেসে গেল স্রোতে
যেদিকে পাইলে বালা অকূলনাশিনি,
সাধিলে তাহার ধ্বংস নির্মম অন্তরে
প্রণয়ীর সঙ্গে প্রাণ যথা প্রণয়িনী
মিলা'লে জীবন অবশেষে সিন্ধুনীরে।

দানিলে স্নিগ্ধতা, শৈত্য বক্ষে ভারতের,
বুচাইয়া পীতবর্ণ আতপজাত
দিলে তা'য় শ্যামলতা, ধন-ধান্য-ভারে
করিলে ভাণ্ডার পূর্ণ—উৎপল্ল ক্ষেত্রের—
অনাবিল করিলে আকাশ, সুখে মাত
নর দেহ প্রকৃতির, পূর্ণ স্বাস্থ্যভারে
জীবদেহ, তৃপ্তিভরে আনন সবার
শান্তিময়—ছবি হেন শুভ্র জ্যোৎস্নার।

পশ্চাৎ এবে তুমি জাহ্নবী জননি !
বিক্ষুব্ধ কঠিন শিলাখণ্ডে পার্শ্বদ্বয় ;
বাষ্পীয় শকট আদি, কত নাহি জানি,
বহিয়া অঙ্গারবাশি, মৃগ, হস্তী, হয়,
করিছে তরল তব বক্ষ বিদলিত ;
লঙ্ঘে তব পুণ্য তনু কুক্কুর শৃগাল।
কেন মা এ দুর্দ্দশায় এবে উপনীত,
আচ্ছন্ন আলস্যে কি গো হৃদয় বিশাল ?

পরিহরি অলসতা উঠ পুনর্ব্বার
বিরাট মূরতি, গঙ্গে, করিয়া ধারণ,
ভাঙ্গ কূল, খরস্রোতে বহ মা আবার
করিয়া বিচ্ছিন্ন তব সকল বন্ধন।
ঢাল উর্ব্বরতা মাতা পুনঃ ক্ষিতি প'রে,
কর মা সরস পুনঃ অন্তর ধরার—
স্বাস্থ্য, শান্তি বহুক পবন, বক্ষ 'পরে
হাসুক ভারত ল'য়ে সমৃদ্ধির ভার।

সংবাদ ও মন্তব্য

গান্ধিজীর দায়িত্ব-ত্যাগ

গত ৯ই জুন 'হরিজন' পত্রিকায় মিঃ গান্ধী এক প্রবন্ধে জানাইয়াছেন যে, "আমি বর্ত্তমানে কোথাও খোলাখুলি নেতাগিরির কাজে লিপ্ত নাই। তবে পরামর্শ যাচ্ঞা করিলে 'বিশেষজ্ঞ' হিসাবে আমাকে পরামর্শ দিতে হয়।"

রাজকোটের 'ঠাকুর সাহেব' তাঁহার নিকট পরামর্শ চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন বলিয়া আমরা শুনি নাই। তাঁহাকে রাজ্য-চালনা বিষয়ে তিনি পরামর্শ দান করিতে গেলেন কেন ? এবং উপবাস করিয়া 'বিশেষজ্ঞে'র প্রাপ্য হিসাবে মোটা ফি-ই বা আদায় করিলেন কেন ? লর্ড লিনলিথগোর সহিত তাঁহার যে মোলাকাৎ, তাহাও কি 'বিশেষজ্ঞ' হিসাবেই হইয়াছে ?

জওহরলালের স্বপ্ন

লণ্ডন হইতে প্রকাশিত 'সানডে হেরাল্ড' পত্রিকায় মিঃ জওহরলাল নেহেরু প্রবন্ধ লিখিয়া বলিয়াছেন, "একটি বিশ্ব-সঙ্ঘের (world union) বর্ত্তমানে অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়াছে। ইহা কেবল সম্পূর্ণ গণতন্ত্র এবং স্বাধীনতার ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিতে পারে...এই সঙ্ঘে সোভিয়েট রুশিয়া না থাকিলে সঙ্ঘের টিকিবার কিন্তু কোন সম্ভাবনা নাই।"

'গণতন্ত্র'ও চাই, 'সোভিয়েট'ও চাই—এমন আশ্চর্য্য সমবায়ে যে বিশ্ব-সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিবে, তাহার সহিত সকল 'রূপকথা'র মনোযোগী শ্রোতার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। মিঃ নেহেরু বর্ত্তমান 'শিশু সাহিত্য'-রচনায় হাত পাকাইতেছেন না কি ?

শরৎচন্দ্রের উপদেশ

গত ৩রা জুন তারিখে পাবনার হিমাইতপুর গ্রামে পাবনা জেলার রাষ্ট্রনৈতিক সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণে মিঃ শরৎ চন্দ্র বসু বলিয়াছেন : যদি নেতারা জন-সাধারণকে প্রকৃত পন্থার নির্দ্দেশ দান না করিতে পারেন, জন-সাধারণকে তাঁহাদিগকে সেই কার্য্যের প্রেরণা দিতে হইবে।

ঠিক কথা। শরৎচন্দ্র যতদিন নেতা ছিলেন, (এখন আর নাই বলিয়াই তাঁহার কথা হইতে মনে হইতেছে), তত দিন তাঁহাকে আমরা জন-সাধারণের হইয়া অনেক কথা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি—কিন্তু সে সব কথা কি তাঁহার কর্ণে গিয়াছে ? নেতা হইবার একটা প্রয়োজনীয় গুণ হইতেছে, কর্ণে তুলা গুঁজিয়া রাখা এবং বোধ হয় চোখে ঠুলি দেওয়া। দেশের নেতাদের আচরণ দেখিয়া আমাদের এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে।

সুভাষচন্দ্রের বেদনা-বোধ

৪ঠা জুন তারিখে ঐ একই সভায় সুভাষচন্দ্র বক্তৃতায় বলেন : অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, দেশের হোমরা-চোমরা বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা ক্রমাগতই বলিতেছেন, যাহাই হউক্, ঐক্য সভায় [illegible] প্রয়োজন।

পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ সুভাষচন্দ্রের পক্ষে ; তিনি আর সবই করিতে পারেন, কিন্তু একতা

বজায় রাখাটা উঁহার নিকট প্রায় 'কুসংস্কার' সদৃশ। পাঠ্যাবস্থা হইতে এ-পর্য্যন্ত তাঁহাকে এই কুসংস্কার মানিয়া চলিতে কম বেগ পাইতে হয় নাই। এইবারে মনে হইতেছে, তিনি বেপরোয়া হইয়াছেন।

রাজেন্দ্রপ্রসাদের আশা

৭ই জুন তারিখে বোম্বাই সহরের আজাদ ময়দানে এক জন-সভায় কংগ্রেস-সভাপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলিয়াছেন, কংগ্রেসে অনেকে থাকিতে পারে।

—

নিশ্চয়ই। 'কংগ্রেস' যাহার নাম, অর্থাৎ মিলন-সভা, তাহার এক মাত্র পরিচয় অমিলনে। কানা ছেলের নামই লোচন, পদ্মলোচন রাখে। আর তাহা না হইলে রাজেন্দ্রপ্রসাদের চাকুরীটা বজায় থাকে কি করিয়া?

সরকার বর ভাষ্য

৭ই জুন তারিখে ভবানীপুরে মহাকোশল প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভা সম্মেলনে মিঃ খেমারক ঘোষের সরকার ঘোষণা করিয়াছেন, দেশাত্মবোধ কিংবা সাম্প্রদায়িকতা পাপও নহে, পুণ্যও নহে, সময়বিশেষে উহার পাপ হইতে পারে, সময়বিশেষে উহারা পুণ্য হইতে পারে।

সময়বিশেষে? অর্থাৎ মিঃ সরকার যখন বলিবেন যে, দেশাত্মবোধ কি সাম্প্রদায়িকতা পাপ, তখন দেশাত্মবোধ ও সাম্প্রদায়িকতা পাপ, আর যখন তিনি তাহা না বলিতে চাহিবেন, তখনই উহারা পুণ্য। ইহাকেই ইংরাজীতে সময়-সেবক (time-server) বলে বুঝি? ইংরাজী ভাষার একটা মহিমা আছে, ইহাতে ভদ্র (?) ভাবে প্রকাশ করা যায় না, মনুষ্যচিত্তে এমন দুষ্প্রবৃত্তি খুব কমই আছে।

'প্রকৃত ভারত'

১লা জুন তারিখে বোম্বাই সহরের মোটরি ক্লাবে মাদক দ্রব্য নিবারণ আন্দোলনের সমালোচনা প্রসঙ্গে বোম্বাইয়ের আর্চবিশপ মহোদয় বলিয়াছেন: যদি প্রকৃত ভারত (Real India) কংগ্রেসের মাদক [illegible] না করে, তবে ইহা [illegible]

মদ্যপান নিবারণ আন্দোলনে আমাদের একমাত্র আপত্তি, ইহা দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় অনৈকাবৃদ্ধি করিবে (রাজেন্দ্রপ্রসাদ ক্ষমা করিবেন) কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ যে কতদূর নির্দ্দোষ, তাহা এই প্রকার আন্দোলন বর্ত্তমানে চালাইবার চেষ্টায় বুঝা যাইতেছে। প্রথমতঃ আর্চবিশপ মহোদয় যে-কথাটি বলিয়াছেন, সেই 'প্রকৃত ভারত' কথাটির অর্থ কি? তাহাই আমরা জানিতে চাহি। প্রকৃত ভারতের সহিত বিন্দুমাত্র সংযোগ না থাকিলেও এদেশে অনেক কিছু চলিতেছে বলিয়া আমাদের এই বিশ্বাস—রেলগাড়ী চলিয়াছে, মোটরকার চলিয়াছে, ইলেকট্রিসিটি চলিয়াছে, ডিক্টেটরশিপ চলিবার উপক্রম করিয়াছে। তবে 'সাকল্যান্বিত' হওয়া এবং 'চলা' অবশ্য এক কথা নহে। আর্চবিশপ মহোদয় ইহা স্বীকার করিবেন কি না জানি না।

ডক্টর সৈয়দ মামুদের আবিষ্কার

বিহারের শিক্ষা-মন্ত্রী ডক্টর সৈয়দ মামুদ তাঁহার সংপ্রতি প্রকাশিত একটি পুস্তকে উল্লেখ করিয়াছেন যে, "১৯৩১ সালে এক বিহারেই [illegible] কমতি পড়ে ৩১ কোটি মণ—"

—

বিহারের বাহিরের সংবাদ যদি ডক্টর সৈয়দ মামুদ সন্ধান করেন, তবে দেখিবেন সর্ব্বত্রই অবস্থা একই প্রকার। বিহারের বাহিরে বলিতে কেবল আমরা ভারতবর্ষের প্রদেশগুলি বুঝিতেছি না, সমস্ত পৃথিবীতেই এই খাদ্যশস্য হ্রাসের ব্যাপারটি কোন না কোন রকমে ধরা পড়িবে। বাঙ্গালা ভাষার যে প্রবাদবাক্যটি আছে, 'আর সব দুঃখই ঘুচিয়াছে, কেবল অন্নবস্ত্রের অভাব মিটে নাই', বর্ত্তমান সভ্যতার অবস্থা দাঁড়াইয়াছে ইহাই। কিন্তু ইহার রহস্যটি ডক্টর মামুদ জানেন কি? তিনি যদি পরিহাস না মনে করেন, তবে তাঁহাকে একটা কথা বলি—ইংরাজী ভাষায় লিখিত কোন পুস্তকে তাহার সন্ধান নাই।